গল্পচর্চা

গল্পচর্চা

সম্পাদনা

ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সহযোগিতা

বিশ্বজিৎ কর্মকার

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০০০৯

GALPACHARCHA,
A Critique on Bengali short stories Edited by Dr Ujjal Kumar Majumder & Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata - 700009, Rs 450 00

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
কলকাতা - ৭০০০০৯

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
দে'জ পাবলিশিং
একুশ শতক

মূল্য : চারশো পঞ্চাশ টাকা

বাংলা গল্পকারদের উদ্দেশে নিবেদিত

ভূমিকা

অনেকদিন ধরেই ভেবেছি, বেশ কিছু বাংলা গল্পের আলোচনার একটা সংকলন হোক যাতে একজন নয়, অনেক লেখকই তাঁদের রুচি অনুযায়ী, দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এবং গল্প-বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী, কিংবা গল্প-বিশেষের কোনো উল্লেখযোগ্য দিক নিয়েও আলোচনা করবেন। সে-সব আলোচনা সংবেদনশীল পাঠকের সামনে এক-একটি রূপকর্মের উদাহরণ হিসেবে যেমন থাকবে, তেমনি সেইসব রূপকর্ম থেকে নানা তর্ক-বিতর্ক বা বিচারের অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গির তাড়নাও আসবে। তাতে গল্প-বিশেষের গুরুত্বকে যেমন বুঝিয়ে দেওয়া হবে তেমনি আলোচকদের ক্ষমতার প্রমাণও পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত, সেইরকমই একটি বড় সংকলন করা সম্ভব হল অনেক আলোচকদের সাহায্য নিয়ে। তাঁদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

মনে রাখতে হবে, এই আলোচনাগুলি কখনোই 'মডেল' হিসেবে নেওয়া ঠিক হবে না, বরং এগুলি নানা তর্ক-বিতর্কের উপলক্ষ্য হয়ে উঠবে, এইটেই আমাদের একান্ত আশা।

প্রকাশক দেবাশিস ভট্টাচার্যের অদম্য উৎসাহেই এই গল্প-আলোচনার আসরটি জমে উঠেছে। এত বড় সংকলন তো একা করা যায় না। কাজেই অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কর্মকারের সাহায্য যেমন প্রথম থেকেই পেয়েছি, তেমনি অক্লান্তভাবে সাহায্য করে গেছেন অধ্যাপক সন্দীপকুমার মণ্ডল। অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক পরামর্শ ও সাহায্যও মান্য করতে হবে। এছাড়া এত বড় সংকলনটি প্রকাশে অনেকেই পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ দণ্ডপাঠ, সৌমি দাশ, শুভ্রা মহান্তি। প্রকাশন-সংস্থার কর্মী সুমিত চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস ঘোষাল, অলোক কর্মকার, প্রুফ সংশোধনকারী সুব্রত মজুমদার, প্রণয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ শিল্পী অতনু গাঙ্গুলী, বর্ণ সংস্থাপক গৌতম চক্রবর্তী ও রূপম চক্রবর্তী এবং মুদ্রণ কর্মী অরুণ কুণ্ডু। তাঁদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভুল-ত্রুটির দায় আমাদেব। সেজন্য পাঠকদের কাছ থেকে খোলাখুলি মতামত চাইছি।

সূচিপত্র

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৪৭-১৯১৯)

উঃ চব্বিশ পরগণা জেলার অধুনা শ্যামনগরের রাহুতা গ্রামে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট রসের প্রবক্তা তিনি। নির্মল কৌতুকের অপূর্ব সুন্দর রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো দক্ষ শিল্পী সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯) তাঁর প্রথম রচনা। এই উপন্যাসটি 'সাধনা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন উপন্যাসটির। তাঁর উপন্যাস ধর্মী অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কঙ্কাবতী', 'ফোকলা দিগম্বর' (১৩০৭), 'ময়না কোথায়' (১৩১১) ও 'পাশের পরিণাম' (১৩১৫)।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সর্বাধিক কৃতিত্ব তাঁর ছোটগল্পগুলির জন্য। ছোটগল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'ভূত ও মানুষ' (১৩০৫) 'মুক্তমালা' (১৩০৮), 'মজার গল্প' (১৩১৩) 'ডমরু চরিত' (১৩৩০) প্রভৃতি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ডমরুধর আজও পাঠক মহলে জনপ্রিয়। বেশ কিছু বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা।

স্বদেশী কোম্পানী : একটি সরস গল্প
ব্রততী ঘোষ রায়

বাংলা সাহিত্য ধারায় তাঁর কঙ্কাবতী (১২৯৯), সেকালের কথা (১৩০১), মুক্তমালা (১৩০৮), ময়না কোথায় (১৩১১), মজার গল্প (১৩১১), পাপের পরিণাম (১৩১৫), ডমরুচরিত, ভারতীয় বিজ্ঞান সভা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এর মধ্যে 'ডমরুচরিত' (তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২৩ খ্রিঃ মুদ্রিত) কে অধিকাংশ সমালোচক ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন।

এছাড়া ইংরাজি ভাষায় লেখা ইউরোপের নানা জায়গায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতামূলক গ্রন্থ A VISIT TO EUROPE ভারত সরকারের অনুরোধে লেখা :

Art manufactures of India
A Description Catalogue of products
A List of Indian Economic Products ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ বিজ্ঞান বোধ ও অন্য কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকেরও প্রণেতা। বিশ্বকোষ গ্রন্থ রচনা ও Wealth of Indian এই মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া ওড়িয়া ভাষা শিখে তিনি 'উৎকল শুভঙ্করী' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞানী রূপে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। ১৮৮৮ খ্রিঃ ২৪ নভেম্বর বাঙ্গালোর শহরের মেয়ো হলে 'Change and Progress' বিষয়ক তাঁর বক্তব্য Daily Post পত্রিকায় মুদ্রিত ও বিপুল প্রশংসিত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃজন সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। ড. সুকুমার সেন তাঁর ':বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরু চরিতকে Cerventes-এর Don Quixote-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশী ত্রৈলোক্যনাথের রচনাশৈলী প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক সুইফট এর রচনাভঙ্গি। জীবনের বিষতিক্ত অভিজ্ঞতা কৌতুক রসে সিক্ত করে পরিবেশন করেছেন বিশ্বের অনেক সাহিত্যিক। জোনাথন সুইফট বা ডন কুইক্সোট রচয়িতা Cerventes এর নাম এ প্রসঙ্গে ওঠে এবং ত্রৈলোক্যনাথের রচনার সঙ্গে এঁদের লেখার তুলনা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত আলোচকেরা করেছেন।

এই আলোচনা সূত্রে শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরী মহাশয়ের মতামত উল্লেখযোগ্য। Cerventes এবং Swift এর থেকে ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে কথাকে তাঁর রচনায় কখনোই অস্ত্রে প্রয়োজন নির্বাহ করতে হয়নি। জীবনের জ্বালাকে প্রকাশ করবার জন্যই তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্যম নয়, এমন কি অসাম্য এবং অসঙ্গতির প্রতি বক্রদৃষ্টিও তাঁর রচনার প্রধান বিষয় নয়, যথার্থই তিনি মজার গল্প লিখেছিলেন, যে কোন আদর্শ 'গল্প বলিয়ের মতোই কাহিনীর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। এখন মূল কাহিনীর আড়ালে-আবডালে বক্তার বিশ্বাস এবং অনুভূতি স্মিতহাস্যের মত এখানে ওখানে অনায়াসে ছড়িয়ে

পড়েছে।' [দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ), ২০০৩]

প্রকৃতপক্ষে শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ডমরুচরিত গ্রন্থে শ্রোতাদের মনে জীবনের বিষাক্ত দিকটি তুলে ধরে আঘাত করেছেন, কিন্তু তা সুইফটের মত বিষতিক্ত রূঢ় কষাঘাত নয়। এ আঘাত কৌতুকের মৃদু আঘাত, 'মনে একটু সুড়-সুড়ি, বড়জোর আদর করা চিমটি আঘাত।....বাঙালী তথা ভারতবাসীর যুগ যুগ স্বার্থান্ধতার রুদ্ধ দ্বারে দরদী হাতের এই মৃদু আঘাত।'

বাংলা সাহিত্যে তাঁর কালের প্রসিদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টিকারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু 'ঝাঁঝালো আক্রমণেই ছিল প্রধান ঝোঁক। পরবর্তী প্রখ্যাত রস সাহিত্যিক পরশুরামের (রাজশেখর বসু) সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের লেখনির তুলনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—''বাংলা উপন্যাসে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনার মেশামেশিতে তিনি যে বেপরোয়া অকুতোভয় মনোভাব দেখাইছেন সেখানেই তাঁহার বিশেষত্ব নিহিত।......যে মানস প্রতিবেশে রূপকথার জন্ম ও সাধারণ জীবনের সহিত উহার সহজ সহ-অবস্থান তাহা প্রচুর পরিমাণ ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে রক্ষিত আছে; এই রূপকথার কল্পনাকে তিনি বাস্তব জগতের সহিত নূতন সংশ্লেষে মিলাইয়াছেন।'

এই দিক দিয়া তিনি রাজশেখর বসুর অগ্রবর্তী ও পথপ্রদর্শক. ...। তবে রাজশেখর বসুর পরিমিতিবোধ আরও সূক্ষ্ম ও তাঁহার অলৌকিক জগতে পদক্ষেপ যদৃচ্ছ নহে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত।....ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে ভৌতিক জগতের আকাশ বাতাসে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ, স্বচ্ছন্দ বিহার—বিলাস অনুভব করিয়াছেন, রাজশেখর সেখানে কয়েকটি সুনির্বাচিত ও বিশেষভাবে চমকপ্রদ খণ্ডাংশে স্বীয় অভিযান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

দুই

'স্বদেশী কোম্পানী' শীর্ষক ডমরুধরের গল্প শেষ হয়েও শেষ হয় না। সেই কাহিনীর শেষে বন্ধু লম্বোদরের ডমরুর এই গল্প তার শঠতা মিথ্যাচার ইত্যাদি নানাবিধ অন্যায়ের জন্য কোনো তির্যক মন্তব্য নেই। বরং গল্পের প্রথমে ডমরু উক্ত তার সাম্প্রতিক কোনো বিপদ সম্পর্কেই কৌতূহল প্রকাশ পায়। এবং ডমরুও তার বন্ধুদের কাছে সেই বিপদের বিবরণ প্রদান করে আর একটি গল্পের সূত্রপাত ঘটাতে চায়।

'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পটি এভাবেই শেষ হয় এবং এই গল্পের ডমরু চরিত্রও সমস্ত আখ্যানের সরল বক্তা হিসাবে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তার কথার ভঙ্গিতে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে নানা উপমা প্রয়োগে হাস্যরস প্রবল বেগে উৎসারিত হয়। পাঠক ডমরুর দোষের হিসেব করতে ভুলে যায়।

লম্বোদরের প্রশ্ন ও ডমরুর জবাবের মধ্যে ডমরুর সরল স্বীকারোক্তি ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্যমূলক বাক্যে সৃষ্টি হাস্যরস।

ক. লম্বোদর বলিলেন 'সেবার স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি বাড়ি ভুঁড়ি গরীব দুঃখীর টাকা হাস করিয়া ছিলে।' ডমরু উত্তর করিলেন. 'হ্যাঁ ভাই! স্বদেশী কোম্পানী বৃথা যায় না। কিছু না কিছু দিয়া যায়।'

কৃষ্ণকান্তি ডমরুর গৌর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা (সম্ভবত অ-গৌর সাধারণ নারী পুরুষের লুকিয়ে রাখা, গোপন বাসনার স্মারক, সেই সঙ্গে এদেশে গৌরবর্ণের প্রায় সমস্ত নরনারীর আসক্তির ব্যাপারটিকেও লেখক সরল প্রকাশভঙ্গির আশ্রয়ে গূঢ় ইঙ্গিতবহ করেছেন।) আর গৌরকান্তি ধারণ করলে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অধিকারী পয়ষট্টি বৎসরের কুদর্শন বৃদ্ধের প্রতি সমাজের নিম্নবর্গীয়া কোনো নারী আসক্ত হবে এরকম বাসনা যেভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে তার মধ্য দিয়ে সমাজের উচ্চবর্ণীয়, ধনবান এক শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন লোভ লালসাকেই যেন ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন, 'এই ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখিনা কেন? যদি আমার রং ফর্সা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।'

শঙ্কর ঘোষের বক্তৃতা যাদুতে ভুলে আট আনা পয়সা ঠকে যাওয়ার ব্যাপারটি ডমরুধরকে শঙ্করের ধূর্তবুদ্ধি বা চাতুরি সম্পর্কে সচেতন করায় এই প্রসঙ্গে তাকে ঠকানোর মত বুদ্ধি আছে সে লোক যে যেসে প্রতারক নয়—এই চিন্তা এবং সেই ব্যক্তিটির সাহায্যে যে ডমরু এক নতুনতর লোক ঠকানোর ব্যাপার ঘটাতে পারবে সেই চিন্তা সে যেভাবে প্রকাশ করে তা হাস্যরস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ডমরুর গূঢ় কূটবুদ্ধিরও ইঙ্গিত দিচ্ছে, 'আমি ডমরুধর। ......আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল।.....ইহা দ্বারা কি কোনোরূপ কাজ করিতে পারা যায় না?'

এই কার্যসিদ্ধির জন্যই ডমরু শঙ্কর ঘোষকে ''আদর'' করে ডেকে নেয় এবং নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব দেয়। বলাবাহুল্য বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুলের মত ডমরু ও শঙ্কর ঘোষ পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শঙ্কর ডমরুর কাছে হেরেছে।

ডমরুধরের বিবৃতির আলোয়—নির্বোধ অবৈষয়িক শিক্ষিত বাঙালীদের প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ—'কাগজ সম্বন্ধে ইহাঁর গভীর জ্ঞান দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।'

বক্তৃতাবাগীশ ভেতর ফাঁপা হুজুগে কিছু বাঙালী সম্পর্কে মিছরির ছুরির মত ডমরুর মন্তব্য—'সেই যাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল কলেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তার জোগাড় করিয়াছিলাম।'

শুধু এই প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনাই নয় ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুধরের মুখ দিয়ে তদানিন্তন ইংরাজী শিক্ষিত কিছু বাঙালীর বিদেশী বেশ ভূষারও যে বিরোধী ছিলেন তা সামান্য একটি বাক্যে প্রকাশ করে পাঠকের প্রচুর হাসির আয়োজন করেছেন। 'তাঁহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন। তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন।'

'কয়েকজন উগ্রবক্তা ডাইরেক্টর ও পরিচালক হইলেন'—উগ্র কথাটি যুক্ত করে লেখক এই শ্রেণীর মানুষদের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বিরাগ অনাবিল হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যেমন, তেমনই লিমিটেড বা বহু লোকের অংশীদারী ব্যবসায় মাথার ওপর ওজনদার লোকদের বসানোর চালাকিটিও প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ছদ্ম দেশপ্রেমের নাটক যে সাধারণ হুজুগে দিবাস্বপ্ন দেখা বাঙালীদের আবেগকে ভালই উস্কে দিতে পারে আর তার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ তারা কি ভাবে ঘটায় তার হাস্যকর রূপটি ডমরুর সরল সরসতায় গল্প

পাঠকের কাছে এক মুহূর্তে ধরা পড়ে। 'দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোনও দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতায় বাঙালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।'

বিলাতি বর্জন ও দেশী বস্তু নির্মাণের ও ব্যবহারের বাস্তব দিকটি তুলে বৃথা বা অর্থহীন আন্দোলনের চিন্তাকে এভাবে ত্রৈলোক্যনাথ ভালই পরিহাস করেছেন।

ডমরুচরিত্র এবং তার সাগরেদ শঙ্কর ঘোষের চরিত্র নির্মাণে ত্রৈলোক্যনাথের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার মাটিই যে মূল উপকরণ হয়েছে একথা তার অনর্গল উদ্ভট গল্প বর্ণনা সত্ত্বেও পাঠকের বুঝতে দেরী হয় না। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু এই আলোছায়ার মিশ্রণেই একটি সার্থক হাস্যরসময় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। গল্পটি যথার্থ হাস্যরসের দরবারে চিরস্থান লাভ করেছে।

তিন

ব্যক্তিজীবনে রূপকথার মত অবিশ্বাস্য দুর্যোগের শোভাযাত্রাই ত্রৈলোক্যনাথকে জীবনের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ--নিস্পৃহ করেছিল আর নিজের ক্ষুধার দুঃসহ জ্বালা. দেশের ঘোরতর দুর্ভিক্ষ তাঁকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় নরনারীদের সেবায় নিয়োজিত হতে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, '.......যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারত ভূমিতে দুর্ভিক্ষ হইতে না পারে, এইরূপ কার্যে আমি আমার মনকে নিয়োজিত করিব।.....আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন করিতেছি।.......'' (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ ভাষার লেখক)। এই প্রতিজ্ঞাকে শ্রদ্ধেয় প্রথমনাথ বিশী বলেছেন এ ত্রৈলোক্যনাথের.....জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড।' নিজের জীবনে এই মহৎ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেও ডমরু চরিতের ডমরুধর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরু চরিত গ্রন্থের ষষ্ঠ গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোণাম 'স্বদেশী কোম্পানী'। এই গল্পটির মুখ্য চরিত্র ডমরুধর। ডমরু চরিত্রের একটা রেখাচিত্র এগল্পে মোটামুটি প্রকাশ পেলেও তার সম্পূর্ণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি ডমরু চরিত গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের আশ্রয় নিয়ে লিখতে হয়। ডমরু বিষয়ক অন্যান্য গল্প এবং স্বদেশী কোম্পানী গল্পাংশটি অবলম্বনে দেখা যাচ্ছে ডমরুধর এক বিচিত্র জটিল চরিত্র। ডমরুধর সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের এরকম মূল্যায়ন : 'তাঁহার (ত্রৈলোক্যনাথ) সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সৃষ্টি ডমরুধর চরিত্র।.......ডমরুধর পৃথিবীর ব্যঙ্গ সাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়াসক্তি ও ঘোরতর নীচ স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার সপ্রতিভতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে নিঃসংকোচ সত্যভাষণের জন্য যে আমাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় না। ফলস্টাফের দৈহিক স্থূলতা তাহার সমস্ত ফাঁকি-জুয়াচুরী মিথ্যা আত্মশ্লাঘা ও নিরঙ্কুশ রসিকতার নির্ভরযোগ্য আধার রচনা করিয়াছে। সেই রূপ ডমরুধরের ঘোর কৃষ্ণকান্তি দেহ ও আত্মগর্বস্ফীত, ইতর মন তাহার সমুদয় কৌতুককর দুববস্থা ও কল্পনার অনিয়ান্ত্রিত ভ্রমণবিলাসকে এক স্বাভাবিক আশ্রয়ের বৃন্তে ধরিয়া রাখিয়াছে।' [দ্র : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।]

এই মূল্যায়ন সর্বাংশেই যথার্থ। বস্তুত একটি মানুষের শারীরিক, মানসিক ও ব্যবহারিক রূপের এমন সমন্বয় কদাচিৎ ঘটে। ডমরুধরের বহিরাকৃতি, তার মানসিকতা ও কার্যকারীতা একে অন্যের পরিপূরক।

কলকাতার দক্ষিণে গ্রামের অতি দরিদ্র ডমরুধর কূট ও ধূর্ত্ত বুদ্ধির সাহায্যে অর্থশালী হয়েছে, এখন তার পাকা দালান বাড়ি। পূজার মণ্ডপ, সে দুর্গোৎসব করে। অনেক ইয়ার বন্ধু। সুন্দরবনেও সে অনেক জমি কিনে রেখেছে। তার বয়স পয়ষট্টি। তৃতীয় বিবাহ করেছে। এই স্ত্রীর নাম এলোকেশী। এলোকেশীর, মাতাও বর্তমান। ডমরুর একটি পুত্র সন্তান। সে মানুষ হয়নি। ডমরু তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছে।

তার শীর্ণ হাড়বের করা চেহারা। মাথার সামনে বৃহৎ টাক। চারপাশের অল্পকটি চুল পাকা। চোখ মুখ বসা, গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হঠাৎ তাকে দেখলে কঙ্কাল মনে হতে পারে।

কুৎসিত দর্শন এবং পঁয়ষট্টি বছর হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয়বার বিবাহ করতে পারে। মানুষ না হওয়ার অজুহাতে ছেলেকে ত্যাগ করতে পারে। মায়ামমতাহীন তো বটেই সেই সঙ্গে চরিত্রদোষেও দুষ্ট। বাগদিনী দুর্লভীর প্রতি তার কিঞ্চিৎ দুর্বলতার ইঙ্গিত স্বদেশী কোম্পানী গল্পে লেখক দিয়েছেন। 'যদি আমার রং ফর্সা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইবে।'

চরিত্রের দূষণের সঙ্গে সঙ্গে নীচতা, ক্রূরতা, হীনতা, শাঠ্য, ভণ্ডামি, ঠকবাজি, ইতরামি এবং অনর্গল মিথ্যা ভাষণ তার স্বভাবেব প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই নীচ ও অসত্য মানুষটি মা দুর্গার একান্ত ভক্ত, সে বিশ্বাস করে ঐ দেবীর কৃপাতেই সে হাজার অন্যায় করলেও প্রতিবাব উদ্ধার পেয়ে যায়।

স্বদেশী কোম্পানী গল্পে এই ডমরুধরকে পূজা দালানে দুর্গাপঞ্চমীর বিকেলে বন্ধু বান্ধব সহযোগে মজলিস জমাতে দেখা যাচ্ছে। তার বন্ধুদের নাম লম্বোদর, গজানন, হলধর প্রভৃতি। লম্বোদরই তার বেশি ঘনিষ্ঠ। আর তার কুকার্যের সঙ্গী বা সাগরেদ শঙ্কর ঘোষ। শঙ্কর ঘোষের কথা ডমরুর জবানীতে পড়ে শোনা গেছে।

ডমরুর বন্ধু লম্বোদর ইত্যাদিরা ভালো ভাবেই তার শঠ স্বভাব সম্পর্কে সচেতন। ফলে অনায়াসে লম্বোদর বলতে পারে 'সেবার স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেক বাড়ি ভুঁড়ি গরীব দুঃখীর টাকা হাস করিয়াছিলে।....'

গল্পের শুরুতে পঞ্চমীর বিকেলে ডমরুর ঐ মজলিসে বন্ধু লম্বোদর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করে ডমরু আবার স্বদেশী কোম্পানী খুলে বহু অর্থ লাভ করেছে—তখন বোঝা যায় ডমরুধরের স্বদেশী কোম্পানী খোলা একটা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। প্রত্যুত্তরে নির্দ্বিধায় ডমরু জানায়—'স্বদেশী কোম্পানী বৃথা যায় না/কিছু না কিছু দিয়া যায়।' এক্ষেত্রে উনবিংশ শতক থেকে শুরু হওয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্রতী বাঙালীর স্বাদেশিক চেতনাজাত বিভিন্ন ধারার কর্মকাণ্ডের কথা অনিবার্য ভাবে স্মরণে আসে।

রামমোহন বিদ্যাসাগরের স্বদেশ চিন্তার ধারা কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্রের জাগ্রত দেশাত্মবোধ এবং অন্যান্য অভিঘাতে শিক্ষিত বাঙালীর চেতনায় সক্রিয়ভাবে বা আন্দোলনের পথে স্বদেশ প্রেমে যুক্ত হওয়ার বিপুল আবেগ সঞ্চারিত হয়। এবং বিভিন্ন সভা সমিতি, মেলা, সংবাদপত্র,

গুপ্ত সমিতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের অপমান থেকে মুক্তি চিন্তা সোচ্চার প্রকাশ পায়।

সেগুলির মধ্যে হিন্দু মেলা-রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে সঞ্জীবনী সভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবাত্মক নয় বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে দেশীয় দ্রব্যের প্রস্তুত ও ব্যবহার এবং প্রস্তুতকারকদের উৎসাহ দানের চেষ্টা এই স্বাদেশিকতা বোধের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

হিন্দুমেলায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙালী অংশগ্রহণ করেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও সেখানে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে লেখা দেশপ্রেমের কবিতা পাঠ করেন। সঞ্জীবনী সভা বা তৎকালীন ঐ রকম স্বাদেশিক ভাবনা ও কার্যাবলীর বিবরণ-রবীন্দ্রনাথ নিজেই কিছুটা রসিকতার সুরেই লিখেছেন। তিনিও সঞ্জীবনী সভার বালক সদস্য ছিলেন। আসলে এই ধরণের গুপ্ত সভা যে প্রকৃত স্বদেশ উদ্ধারের কঠিন কাজের ভার নিতে সক্ষম ছিল না—শুধু আয়োজন সার-এরকম ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন তাঁর জীবন স্মৃতির স্বাদেশিকতা অংশে—"এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনায় আগুন পোহানো। কিন্তু এক টুকরো গামছা যদি দেশীয় কলে প্রস্তুত হয়ে থাকতো তাতেই তৎকালীন মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিনটেণ্ড এবং বালক রবীন্দ্রনাথদের 'ঘরের শিক্ষক' ব্রজবাবুর মত শিক্ষিত বাঙালী ও "মাথার চুলে পাক ধরা সত্ত্বেও উল্লিখিত হতেন।—(দ্রঃ জীবন স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা)

আসলে এ হ'ল বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ আবেগ। কিন্তু এই আবেগ তাড়িত নিঃস্বার্থজন ব্যতীত বহু সুযোগ সন্ধানী স্বদেশী নাম দিয়ে যে লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে দেশের অসংখ্য সরল মানুষজনকে ঠকানোর রাস্তা নিয়েছিল সে কথাও সঠিক। বহু বেসরকারী সমবায়, ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠান দু চার জন ধূর্ত্ত অবিবেকি মানুষের শঠতা ও চুরির জন্য বিনাশ পেয়েছে এবং অসংখ্য মানুষকে পথে বসিয়েছে। পরশুরামের (রাজশেখর বসুর) শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পে সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরী করে সাধারণ জনতার কাছে শেয়ার বিক্রি করে সব অর্থ কয়েক জন কিভাবে আত্মস্যাৎ করে ঐ কাগজে কলমে বানানো যৌথ মূলধনী কোম্পানী গুলিকে লাটে উঠিয়ে দিতে পারে তার চমৎকার ছবি ফুটেছে। এই সমবায় দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে পরশুরাম অসামান্য হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পের ত্রৈলোকানাথ মেকি দেশপ্রেমিকদের কটাক্ষ করতে পারেন। কিন্তু সেই কটাক্ষের চেয়ে ব্যক্তি ডমরুধরের মাধ্যমে তিনি যে কোন শঠ, প্রতারক, ভণ্ড নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী অবিবেকি ও লম্পটজাতীয় চরিত্রই নির্মাণ করেছেন। আর সেই ব্যক্তির এই "দুস্ক্রিয়াপূর্ণ" এবং অসম্ভব ধরনের আচরণের ও জীবনগতির বিভিন্ন দিকগুলি এমন এক নির্বিকার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে অনায়াস সরলতায় তারই জবানীতে ব্যক্ত করেছেন যে পাঠক সেই ব্যক্তির নীচতা হীনতার দিকটি ভুলে এক ভিন্ন ধরনের হাস্যরসে নিমজ্জিত হয়। কাহিনীর উদ্ভটতা ও অসম্ভবতার দিকগুলি পাঠকের সম্পূর্ণ কৌতূহলকে আকর্ষণ করে এবং পাঠকের সেই অসম্ভব জগতের আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। অফুরন্ত কৌতুক রসে ডুবে পাঠক ডমরুর যাবতীয় শয়তানি ভুলে লম্বোদরের মতই তার পরবর্তী মিথ্যা-রাহাজানি বাটপাড়ির গল্প শুনতে উৎসুক হন।

'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পে ডমরুধর বন্ধু লম্বোদরের কথায় তার নতুন স্বদেশী কোম্পানী

গড়ার ভূমিকা স্বরূপ তার উপযুক্ত সহকারী এক চরিত্র শঙ্কর ঘোষের আমদানি করেছেন।

শঙ্কর ঘোষের উপস্থাপনাটি ও নির্বিকারভাবেই ডমরু করেছে। একদিন সকাল বেলা দশটায় চব্বিশ পঁচিশ বয়সের গৌরবর্ণ 'কালো গোপ' সুশ্রী শঙ্কর ঘোষ তার কাছে এসে খুব সুমিষ্ট ভাষণে কথার মায়াজালে বিশেষত রং ফর্সা হওয়ার লোভ দেখিয়ে আট আনা পয়সা দিয়ে এক শিশি ওষুধ বিক্রি করে। ওষুধ কিনবার পরমুহূর্তে শঙ্করের ঠকবাজিকে ডমরু নিজের কাজে লাগানোর জন্য তাকে ডেকে একটি লাভজনক ব্যবসা করবার পরমর্শ করে।

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির মতই ডমরু ও শঙ্করের অবস্থান, শঙ্কর অম্লান বদনে পরদিন ধবধবে সাদা কাগজ এনে সেটি এঁটেল মাটি থেকে প্রস্তুত হয়েছে বলে ডমরুকে দেখায়। ডমরু এই মাটি থেকে কাগজ প্রস্তুতির এক স্বদেশী কোম্পানী খোলার প্রস্তাব রাখে। প্রস্তাব শুনে ধুরন্ধর ডমরুর ভাষায়—'এঁটেল মাটি ও কাগজ দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসলাম।'

এর পরেই ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুর ভাবনার মাধ্যমে সাধারণ বাঙালীর অবৈষয়িক হাল্কা সরল বিশ্বাসী বুদ্ধি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অথচ নিশ্চিত ঘা মেরেছেন—'স্বদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভাবিলাম যে একাজ হালাগুলো বাঙালীর উপযুক্ত বটে।'

এর পর ঐ কোম্পানী খোলার নামে যথেষ্ট চালাকি এবং ভড়ং এর বিশদ বিবরণ ডমরু দিয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে দুই চারিজন বড়লোকের নাম আবশ্যক এবং মিটিং দরকার। এবং খোদ কলকাতার এই তথাকথিত বড়লোকেদের নিবুর্দ্ধিতা বোঝানোর জন্য তাদের একজনের বিজ্ঞসুলভ উক্তি...'আমি মনে করিতাম যে খড়িমাটি দিয়ে কাগজ প্রস্তুত হয়।' প্রত্যুত্তরে অম্লানবদনে শঙ্কর ঘোষ যখন বলে খড়ি মাটিতে খরচা বেশী—তখন ব্যক্তিদের শঙ্করের জ্ঞানের প্রশংসা করার মাধ্যমে উল্লিখিত বড় মানুষদের নিবুর্দ্ধিতাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে ইঙ্গিত করেছেন।

'গ্র্যাণ্ড, স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড খুলে এবং সেই যাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল কলেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দেয়'—সেই ধরনের দুজন বক্তা রাখার কথা জানিয়ে ডমরুর মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ ইংরাজী ভাষার অন্ধমোহে পড়া অবোধ কিছু অল্পবয়সী ছাত্রদের কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেন নি। তবে তীর্যক ব্যঙ্গের ছুরিটি এত তীক্ষ্ণধার যে যখন চেতনায় প্রবেশ করে তখন বোঝা যায় না—অনাবিল হাস্যরসের উদ্রেক করে কিন্তু পরে যে সেই শ্লেষের ভিতরের আঘাত কতখানি রক্ত ঝরাতে পারে—যাঁর বোধগম্য হয় তিনিই জানেন।

এইভাবে ক্রমশ লোকঠকানো স্বদেশী কোম্পানী খুলে তার বাইরের আড়ম্বর তথা দোকানদারী সাজিয়ে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার মত বিজ্ঞাপন দিয়ে অজস্র শেয়ার বিক্রিকরা হ'ল, ধূর্ত ডমরু কোষাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে সব টাকাটি আত্মসাৎ করে এবং লিমিটেড কোম্পানী হওয়ার দরুন লোকসানের দায় সব সদস্যদের ওপর সমভাবে বর্ত্তায় এবং সেই সঙ্গে শঙ্কর ঘোষের জালিয়াতি যুক্ত মিথ্যা হিসাবে লাভের পরিবর্তে লোকসান বেশি দেখানো হয়। 'মোকদ্দমা ফাঁস হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিল না।' ডমরু নির্বিকার ভাবে জানায়—'অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে সেই টাকাগুলি সমুদয় আমি পাইলাম।'

কিন্তু উপযুক্ত শাগরেদ শঙ্কর ঘোষের মত শঠকেও ডমরু কিভাবে বঞ্চিত করল সে

ব্যাখ্যাও সে নির্বিকার ভাবেই সবল সত্যের আশ্রয়েই করে এবং দেখা যায় শঙ্কর নিজের পাতা ফাঁদেই নিজে ধরা দিয়েছে। 'শঙ্কর ভাগ চাহিল। আমি বুঝাইয়া বলিলাম'—হিসাবের বই তুমি নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে, কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।

নিজের ফাঁদে পড়ে এহেন আশাভঙ্গে শঙ্কর ঘোষ 'ঘোরতর রাগান্বিত' হতেই পারে, কিন্তু 'তোমাকে আমি দেখিয়া লইব'—এইরকম ফাঁকা ভয় দেখানোর আওয়াজ করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না।

বলাবাহুল্য ডমরুর এই বৃত্তান্ত পাঠকবর্গকে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত করলেও তা ডমরুর ওপর বর্তায় না। তার অনর্গল অনায়াস অমৃত ভাষণ, মনগড়া উদ্ভট পরিকল্পনা ও তার রূপান্তর তার তঞ্চকতা আমাদের গোটা সমাজের দুর্বল ও বোকামির দিকটিকেই পাঠকের মনশ্চক্ষে তীক্ষ্ণ রেখায় বিঁধিয়ে যায়।

'ডমরুচরিত' গল্প সম্মেলনে ত্রৈলোক্যনাথ ডমরু নামের একটি অসাধারণ চরিত্র নির্মাণ করেছেন। তার যাবতীয় ধূর্তামি, শয়তানি, শঠতা ও নীচতা এবং অনায়াস মিথ্যাভাষণ নিয়ে সে বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য হাস্য রসের যোগান দিয়েছে।

এই ডমরুধরের বন্ধুবান্ধব ছাড়াও—একটি যথাযোগ্য সহচর আছে। সে শঙ্কর ঘোষ। ''স্বদেশী কোম্পানী'' গল্প যা ডমরুচরিত গল্প সংকলনের (বা উপন্যাসের) পঞ্চম গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম। সেই কাহিনীতে ডমরুর মত ধূর্ত ধুরন্দর কোনো ব্যক্তির উপযুক্ত সাগরেদ হিসাবেই শঙ্কর ঘোষ উপস্থিত।

শঙ্কর এই গল্পে প্রত্যক্ষ হয়নি। ডমরু ধরের ঘটনা কাহিনী বিবৃতির মাধ্যমেই পাঠকের সামনে জীবন্তভাবেই উপস্থিত। স্বদেশী কোম্পানী গল্পে ডমরুর সঙ্গে শঙ্করের প্রথম চেনা। অন্যান্য কয়েকটি আখ্যানেও ডমরুর পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়ে তার অবস্থান। স্বদেশী কোম্পানী কাহিনীতে শঙ্করের বিশেষ ভূমিকা। অবশ্যই ডমরুর মিথ্যা কারবারের যথাযোগ্য সাগরেদ হিসেবে। ডমরুর বর্ণনায় শঙ্করের শারীরিক বর্ণনা যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনই তার ধূর্তামি বা লোক ঠকানো বুদ্ধিও।

ডমরুধর বন্ধু বান্ধবদের মজলিশে বসে শঙ্করের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের চমৎকার উপস্থাপনা করেছে—''ব্যাগ হাতে করিয়া এক ছোকরা আসিয়া উপস্থিত হইল।'' তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ অল্প ফর্সা রঙ, কালো গোঁপ আছে। দেখিতে সুশ্রী ভদ্রঘরের ছেলে বোঝা যায়।

বিনা বাক্য ব্যয়ে নিপুণ সেলসম্যানের মত শঙ্কর চারটি ওষুধের শিশি দেখিয়ে সে গুলির গুণ ব্যাখ্যায় মুখর হল। তার প্রধান অস্ত্র মুখের মিস্টি বুলি, সুভদ্র, ধৈর্যশীল এবং নাছোড়বান্দা ব্যবহার। প্রথম কথাতেই ডমরু তাকে নাকচ করে দিলেও সে মোটেই দমে না। বরং অতি সুমিষ্ট স্বরে 'ওষুধ গুলির গুণ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পান্ডিত্য ও গুণাবলী বর্ণনা করে। সে তিনটা পাস দিয়েছে। সেই বিদ্যাবলে বহু পদার্থের মিশ্রণে নতুন বস্তু তৈরি করতে পারে এবং ওষুধ চারটি তার প্রমাণ। দিন কয়েক ব্যবহার করিলেই আপনার শরীরে কান্তি ফুটিয়া পড়িবে। আপনি নব যৌবন প্রাপ্ত হইবেন।' 'শরীরের কান্তি' এবং নবযৌবন লাভ করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালীন।

পুরানের রাজা যযাতির অভিশপ্ত বার্দ্ধক্য বহন করেছিল তার পুত্র। সুতরাং সাধারণ মানুষের এই গোপন গভীর সূক্ষ্মকামনাকে যে শঙ্করের মত সুচতুর সেলসম্যান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে সে খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু ডমরু নিজে শঠ চূড়ামণি, তঞ্চক। কাজেই শঙ্করের কথায় সে ঘায়েল হয়না—বলে 'দ্যাখ—আমি বৃথা একটি পয়সা ও খরচ করিনা। তোমার ঔষুধ আমি ক্রয় করিব না।'—এহেন বুনো ওল যদি ডমরু তবে শঙ্করও বাঘা তেঁতুল। সে ডমরুর ঝাড়া জবাব শুনেও দমে না। বরং শেষ পর্যন্ত তার মন গলানো চাটুবাক্যে ডমরুর মত ধুবন্ধর, মানুষও কাৎ হয়ে যায়। নিজেই ডমরু স্বীকার করেছে—"এমনি সুমিষ্ট ভাষায় সে বক্তৃতা করিতে লাগিল যে, ক্রমে আমার মন ভিজিয়া আসিল।"—কি এমন সেই সুমিষ্ট বক্তৃতা যে ডমরুধরকে ভোলাতে পারে তা শুনতে পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়ে। এই বক্তৃতা হ'ল নির্জ্জলা এবং নির্লজ্জ চাটুকারিতা।

শঙ্কর ঘোষ যে নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ সে পরিচয় তার ঐ মন ভোলানো সুমিষ্ট চাটুকারিতা থেকেই বোঝা যায়। মানুষ সাধারণত নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। তাই পরম ধূর্ত্ত, ভণ্ড ও শঠ ডমরুর কঠিন মনকেও ঐ ভন্ড চাটুকারিতায় ভিজিয়ে দিতে নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মত শঙ্কর মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ে—'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য কিন্তু মন আপনার বৃদ্ধ হয় নাই। মনটি আপনার নব যৌবনে টলমল করিতেছে।....এই রং ফর্সা হইবার ঔষুধটি দিন কতক মুখে মাখিয়া দেখুন। আপনি ফুট ফুটে গৌরবর্ণ হইযা পড়িবেন। সুন্দর সুকুমার কুড়ি বৎসরের যুবক হইবেন।"—এই মোক্ষম অস্ত্রে ডমরু ঘায়েল হয়েছে। কৃষ্ণকায় কুরূপ ডমরু এক মুহূর্তের দুর্বলতায় ভেবেছে যদি বং সুন্দর হয় তবে "দুর্লভী বাগদিনী" তাকে দেখে মুগ্ধ হবে। ঐ নারীকে মুগ্ধ করার লুব্ধ চেতনায় সে আটআনা পযসায় ঔষুধটি কিনেছে।

শঙ্কর ঘোষ ডমরুকে আট আনা পয়সা ঠকিয়েছিল। পরিবর্তে তাকে ভালোই মূল্য দিতে হয়েছে। কেননা, ডমরুধর তারই উপযুক্ত সাগরেদ হিসেবে শঙ্করকে সাদরে গ্রহণ করে লোক ঠকানো ব্যবসা ফাঁদতে চেয়েছে।

শঙ্কর তার উপযুক্ত গুরু পেয়ে কয়েক তা সাদা ধবধবে কাগজ ডমরুকে দেখিয়ে জানিয়েছে এগুলি এঁটেল মাটি থেকে তৈরি এবং প্রাথমিক কিছু খরচ পেলে সে এই কাগজ তৈরির জন্য একটি 'স্বদেশী কোম্পানি' খুলবার, প্রস্তুতি নিতে পারে। তার এত উদ্ভট মিথ্যাচার ডমরু বুঝেও শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করে সাধারণ মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার এক লিমিটেড কোম্পানী গ্রান্ড স্বদেশী কোম্পানি খুলে অচিরে নানা ভড়ং দ্বারা কলকাতার বেশ কিছু ধনী মানুষদের একত্র করে সেই সভায় ইংরেজী জানা শিক্ষিত ভাল বক্তার বক্তৃতা প্রদান করে এঁটেল মাটি থেকে দেশীয় কাগজ তৈরী করা হবে, স্বাদেশিকতার এই চেতনা কৌশলে তাদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রচার করে বহু শেয়ার হোল্ডার করে। শঙ্কর ঘোষ এ বিষয়ে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়ে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির লাভের বদলে ক্ষতিগ্রস্ত এরকম নির্ভুল হিসেব তৈরি করে। এই ফাঁদে শঙ্করই ধরা পড়ে। কেননা কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যে অর্থ ডমরুর হাতে আসে, সব সেই আত্মস্যাৎ করে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা হলে শঙ্করের নির্ভুল হিসেবে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত প্রমাণিত

হওয়ায় মামলা নাকচ হয়। তখন শঙ্কর নিজের অর্থভাগ-চাইতে গেলে তার চেয়ে ধূর্ত্ত ও মিথ্যাচারী ডমরু বলে কোম্পানীর হিসেব শঙ্করেরই দেওয়া। ফলে কিভাবে শঙ্কর টাকা পেতে পারে। শঠতায় ডমরুধরের কাছে হেরেও শঙ্করের কিছু করার থাকেনি। একমাত্র 'দেখে নেবো'—এই মিথ্যা রণহুঙ্কার দেওয়া ছাড়া। শঠে শাঠ্যং বলে যে প্রবাদ বাক্য আছে সেটি এ ক্ষেত্রে ঠিক খাটেনা; কেননা শঙ্কর ও ডমরু দু'জনেই শঠ ও প্রতারক। বরং দুই শঠের মধ্যে ডমরুধর আছে সেটি এক্ষেত্রে ঠিক খাটেনা। শঙ্কর চোস্ত সেলসম্যান সুমিষ্ট ভাষী মনস্তত্ত্ববিদ। শঙ্করের তুলনায় ধূর্ত বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে এ কথা বলে এক শঠের কাছে আর এক শঠের পরাজয় এরকম বলা ভাল।

স্বদেশী কোম্পানী একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আখ্যান হলেও কথক বা স্বয়ং ডমরুর ইতিপূর্বের ও পরবর্তী জীবন ঘটনার স্পষ্ট ইঙ্গিত বা সূত্র এগল্পে আছে।

ডমরুধর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য লোকঠকানো বা তঞ্চকতা এবং ছলে-কৌশলে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করা। স্বদেশী কোম্পানি কাহিনীতে সেই ঘটনাই ডমরু নিজে বিবৃত কবেছে। সে উপযুক্ত সঙ্গী শঙ্কর ঘোষের সহায়তায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মানুষদের ঠকিয়ে প্রচুব টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত শঙ্করকেও বোকা বানিয়ে তাকেও বঞ্চিত করেছে। সে ক্ষেত্রে এই কাহিনীর ডমরুর ঠকবাজি বা প্রতারণা ইত্যাদি ধরনের নামকরণ হলেও কিছু অনুপযুক্ত হ'ত না।

তা সত্ত্বেও "স্বদেশী কোম্পানী" নামকরণ যে লেখক যথাযথ যথপোযুক্ত কারণেই দিয়েছেন এবং এই নামকরণ গূঢ় ইঙ্গিতময় সে কথাও গল্প পাঠান্তে বোঝা যায়।

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজের অধীনতা বা নিজেদের স্বাধীনতা হীনতা সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকেন। এসব ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলায় ঘনীভূত হতে থাকে নানাভাবে। যেমন নানা সংগঠন, মেলা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালীর এই স্বদেশ চেতনার প্রকাশ ঘটতে থাকে। এ ব্যাপারে স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণ ও গ্রহণ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আগ্রহ ও তজ্জনিত আন্দোলন চলতে থাকে। হিন্দু মেলা বা স্বদেশী মেলা নানা গুপ্ত সংগঠন ইত্যাদিতে বাল্যকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অংশ নিয়েছেন। এই স্বাদেশিকতা বোধে বাঙালীর একটা তীব্র আবেগ কাজ করেছিল। বিশিষ্ট বাঙালী মনীষী, ঠাকুর বাড়ির রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা এই আবেগে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আবেগ উচ্ছ্বাস এবং কার্যকরী পরিকল্পনা ও তার যথাযথ রূপায়ণ এক কথা নয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অবৈষয়িক কিছু বাঙালীকে এই সুযোগে বহু ঠকবাজ কর্তৃক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। বহু স্বদেশী কোম্পানী রাতারাতি তৈরী হয়। বহুজনের বহু অর্থ শেয়ার হিসেবে গৃহীত হয়, কিন্তু প্রবঞ্চকের কূটকৌশলে সেই কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত প্রমাণ করে সাধারণ বিশ্বাসী মানুষদের সমস্ত জমা টাকা আত্মসাৎ করে তাদের পথে বসায়। এইভাবে স্বাদেশিকতার নামে জালিয়াৎ মানুষদের কার্যকারীতায় সে সময় বহু ব্যাঙ্ক, কারখানা, প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বাদেশিকতার' নামে বিশুদ্ধ আবেগের এবং বিলেতি বর্জনের নামে জ্ঞানহীন যথার্থ পরিকল্পনাহীন অবাস্তব কিছু কর্মের সমালোচনাও করেছেন তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। স্বাদেশিকতা প্রবন্ধে ঈষৎ রস রসিকতায় তিনি যা বলেছেন কিম্বা ঘরে বাইরে উপন্যাসে

সরাসরি বিলেতি বর্জনের অবাস্তবতার প্রতিবাদ করেছেন। ত্রৈলোকানাথ ডমরু ও তার উপযুক্ত সঙ্গী শঙ্করের শঠতা তঞ্চকতা এবং শিক্ষিত কিছু জ্ঞানী মূর্খ বাঙালীর নিরেট বোকামিকে হাস্যরসের আধারে বেশ ভাল মতই বিদ্ধ করেছেন।

'স্বদেশী কোম্পানী কিছু না কিছু দিয়ে যায়'—অর্থাৎ এই ব্যবসা ফাঁদলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়না, অথবা স্বদেশী কোম্পানী বলেই তার সঙ্গে মোকদ্দমার ব্যাপারটি থাকবেই নির্বিকার ভাবে ডমরু এরকম সত্যি কথা অক্লেশে বলে। ডমরু এই সব সুযোগ-সন্ধানী জাল স্বদেশীদের একজন খাঁটি প্রতিনিধি।

এই স্বদেশী কোম্পানী খুলতে বড় বড় ভাষণ এবং সেই ভাষণ ইংরেজীতে দিতে হবে—এ রকম ব্যাপারটা হলে সাধারণ মানুষ কোম্পানীকে গুরুত্ব দেবে। কেননা সেখানে ডমরুর পরিকল্পনা মত কিছু নামকরা শিক্ষিত ব্যক্তিকে নামে সভাপতি ইত্যাদি হিসেবে রাখা হয় এবং ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ বক্তৃতা বাজ এরকম দু'জন বক্তা যোগাড়ও ডমরুদের ছিল। তাছাড়া ছিল ছাপানো বিজ্ঞাপনের ভড়ং। বিজ্ঞাপন যে মানুষকে কতখানি বিভ্রান্ত করতে পারে ডমরু বা শঙ্কর তো ভালই জানত তাই ঐ বিজ্ঞাপন ও তাদের লোক ঠকানোর হাতিয়ার হয়। কোম্পানীর নামটিও গাল ভরা—'গ্রান্ড স্বদেশী কোম্পানী'। সবজান্তা কিছু অবৈষয়িক বাঙালীর জ্ঞানবুদ্ধিকে কটাক্ষ করে ডমরু বলেছে 'এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ধুরন্ধর। ইহারা না জানেন এমন বিষয় নাই।' কিন্তু এই সবজান্তাদেরই সমস্ত অর্থ ডমরু কৌশলে আত্মসাৎ করে।

দেশপ্রেমিক যেমন থাকেন—দেশপ্রেম ও দেশ সেবার নামে লোভী সর্বস্ব অপহারক কিছু ব্যক্তিও থাকে। ডমরু কিছু আবেগ সর্বস্ব এবং কিছু জ্ঞানীমূর্খদের ফাঁদে ফেলেছিল। সে নিজে ভন্ড দেশব্রতীদের প্রতীক। সবজান্তাভাবের মানুষদের বা জ্ঞানীমূর্খদের পরিচয় ডমরু সামান্য দু'একটি বাক্যালাপের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, যেমন—'একজন বলিলেন......আমি মনে করিতাম যে খড়ি মাটি দিয়ে কাগজ প্রস্তুত হয়'' এই উত্তরে ডমরুর ঠকবাজির সাকরেদ, শঙ্কর ঘোষ যখন অম্লান বদনে উত্তর দেয় যে ''এঁটেল মাটির তুলনা'য় খড়ি মাটি দিয়ে কাগজ তৈরিতে বেশি খরচ''—তখন সভার অন্যান্য সবাই—''কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার গভীর জ্ঞান দেখিনা' প্রশংসায় মুখর হন। এইভাবে স্বদেশী কোম্পানী অর্থে স্বদেশ ভাবনায় ব্যবসাদারি প্রতিষ্ঠান এরকম ব্যঙ্গ মূলক ইঙ্গিত দিয়ে গল্পের ঐ নামকরণ করে হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথ সেই দেশপ্রেমেব জোয়ারের ভেসে আসা একধরনের মেকি দেশ হিতৈষীদের জালিয়াতির প্রতি এবং কিছু আবেগ সর্বস্ব এবং অবিবেচক দেশভাবুকদেরও স্পষ্টতই এই ভর্ৎসনা করেছেন গভীর রসিকতার আড়ালে। সুতরাং স্বদেশী কোম্পানী গল্পটি যে লেখকের গূঢ় ভাব চিন্তার ব্যঞ্জনাবহ হয়ে যথার্থই সার্থক নামা হয়েছে এ বিষয়ে পাঠক নির্দ্বিধ হন।

চার

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরু চরিত' গ্রন্থকে উপন্যাস বা ছোটগল্পের সমাহার দুরকম ভাবেই ভাবা যেতে পারে। কেননা উপন্যাসের যে প্রধান লক্ষণ জীবনের বিশাল বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতময় আখ্যান একজনকে কেন্দ্র করে—তার চতুস্পার্শ্ব ঘিরে একাধিক ঘটনা কাহিনী ও চরিত্রের আয়োজন—'ডমরু চরিতে' প্রাথমিকভাবে সেটি লক্ষণীয়। 'ডমরুচরিত' ডমরুধর

নামে এক বিচিত্র জটিল চরিত্রের সুবিস্তৃত বহু পল্লবিত জীবন আখ্যান। এই গ্রন্থে মোট সাতটি গল্প আছে। প্রতিটি গল্প একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক শিরোণাম আছে। সাতটি গল্প মোট আটচল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের পৃথক পৃথক শিরোনাম আছে। পরিচ্ছেদ বলা হলেও প্রতিটি শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদ ডমরুর এক একটি পৃথক জীবন ঘটনা।

এই ডমরুধর মূলত দুঃশীল এবং হীন চরিত্র। সে অনর্গল মিথ্যাচারী। শঠতা ভন্ডামি অপরকে পথে বসানোতে তার জুড়ি নেই। অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ সন্তান তার ধূর্তামি ও তঞ্চকতার সাহায্যে ধনবান হয়েছে। এখন তার পাকা ঘরবাড়ি ও পূজা দালান। অজস্র বন্ধু বান্ধব। ডমরু ধরের বয়স বর্তমানে পঁয়ষট্টি হওয়া সত্ত্বেও সে তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করেছে। তার নাম এলোকেশী। ডমরু দেখিতে অতি কুৎসিত কৃষ্ণকান্তি, মাথা ভরা টাক, চার পাশে দু চারটি পক্ককেশ। এই রূপবান এবং তদপেক্ষা বেশী দুর্মতি ও দুর্নীতি পরায়ণ ডমরু এই গল্পগুলির কথক।

নিজের অপকীর্তি অন্যায় অপরাধ, মিথ্যাকথা সে অবলীলাক্রমে ও নির্বিকারভাবে শ্রোতা বন্ধুদের জানায়। শ্রোতা বন্ধুরা তার নীচতা, হীনতা, ঠকবাজির খবর রাখলেও সে বিষয়ে সরাসরি প্রতিবাদে যায় না। ক্রোধ-বিরক্তি ও প্রকাশ করে না। প্রত্যেক জীবন কথার শেষে তারাই পুনশ্চ ডমরুর নতুন জীবন ঘটনাবলী জানতে ঔৎসুক্য দেখায়। ফলে গল্পটি খন্ডিত বলে বোধ হয় না। মনে হয় পর্বে পর্বে সজ্জিত এক দুষ্কৃতিকারীর নানান দুষ্কার্যমূলক জীবন ঘটনা লেখক প্রকাশ করছেন। ডমরুর জীবন ধারাতে অজস্র পার্শ্বচরিত্র এসেছে। লম্বোদর, গজানন প্রমুখ বন্ধুবান্ধব, শঙ্কর ঘোষ নামে উপযুক্ত শঠ সহকারী যুবক, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশী, তার শাশুড়ি ঠাকরুণ—এরকম বহু চরিত্র এবং যে সব মানুষদের ঠকানো হয়েছে—সেসব লোকজন তাদের নানা কার্যকারীতা নিয়ে ডমরুর জীবন স্রোতের মধ্যে পড়েছে। ডমরু তাদের কাছ থেকে যাবতীয় পাওনা বুঝে নিয়েছে। এইসব কারণে ডমরু চরিতকে উপন্যাস বলা যায়।

কিন্তু উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বাস্তবধর্মীতা—সেটির 'ডমরুচরিতে' নিতান্ত অভাব। উদ্ভট আজগুবি কল্পনার যথেষ্ট বিবরণ ডমরু দিয়ে যাচ্ছে, ফলে উপন্যাসের মূল ভিত্তি যে প্রকৃত বাস্তবচারিতা সেটি এই সব কল্প কাহিনীতে সত্য, মিথ্যা, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, জীবন অবাস্তব কাহিনী ঘটনা ও চরিত্রকে তিনি অনায়াসে এক সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ফলে 'ডমরুচরিতে'র গল্পগুলি যতই স্বাভাবিকতায় খোলসে রাখা হোক—সেইগুলিতে বাস্তবতার অভাব অচিরেই ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়ত দু একজন বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী কিম্বা সাগরেদ থাকলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডমরুর পাশে কোনো নায়িকা নেই। ডমরুর তৃতীয়া পত্নীর গা ভরা ঝকমকে গহনা এবং তার প্রতি ডমরুর কিঞ্চিৎ ভীতি থাকলেও এলোকেশীকে নায়িকা পর্যায়ে ফেলা যায় না। পাশাপাশি কোনো যথার্থ শাখা বা উপকাহিনী ডমরুর জীবন কথাকে পুষ্টি দান করেনি। এ কাহিনীগুলির কোনো ধারাবাহিকতা নেই। ঘটনা কাল ও স্থানেরও ঐক্য নেই। যেগুলি উপন্যাসের ভিত্তি রচনা করে, ডমরু চরিত্রেরও কথক লেখক নন। স্বয়ং ডমরুধর। সে তার

খেয়াল খুশিমত এক কল্পরাজ্য নির্মাণ করে নিজের কুকীর্তির কথাগুলি বাস্তব-অবাস্তব ভেদাভেদ ভুলিয়ে সামনে উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে বর্ণনা করছে। ফলে বক্তা ও শ্রোতা দুপক্ষের উক্তি প্রত্যুক্তি গল্পে বারবার এসে পড়ে উপন্যাসের রস ক্ষুণ্ণ করেছে। মজলিসি আড্ডার কাহিনী যেমন একস্থান থেকে শুরু করে অন্য এক অচিন্তনীয় স্থানে গিয়ে শেষ হয়, কোনো স্থান-কাল পাত্রের ঐক্য সেখানে মাথায় থাকে না—ডমরু চরিতের গল্পমালায় তাই ঘটেছে। এছাড়াও উপন্যাসে লেখকের এক গভীর জীবন দর্শন প্রচ্ছন্ন স্রোতের মত বহমান। নায়ক চরিত্রের উত্তরণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেতে পারে। কিম্বা কাহিনী বিকাশ পরিণতির মধ্য দিয়ে। 'ডমরুচরিতে সেটি লক্ষিত হয়না—এখানে সুনির্দিষ্ট আদি মধ্য অন্ত যুক্ত একটি কাহিনী নেই এবং ডমরুচরিত্রের ও কোনো উত্তরণ নেই। তার জীবন দর্শন লোক ঠকানো। কিন্তু 'ঠকচাচা' বা "ভাঁড়ু দত্তের" (চন্ডীমঙ্গল কাব্য) যে বিষণ্ণ পরিতাপ বা আত্মগ্লানি বোধ—সে রকমটি ডমরু চরিত্রে নেই। ফলস্টাফ চরিত্রের বাহ্যিক রূপ ও নষ্টামির সঙ্গে ডমরুর আপাত মিল দেখা গেলেও—ডমরুর ইতরতা ফলস্টাফে নেই। তবে ডমরু এক অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুকে অনর্গল মিথ্যাবাদী, লম্পট, ঠক, প্রবঞ্চক, অর্থলোভী, অবিবেকি ইত্যাদি যাবতীয় অমানবিক দোষে দুষ্ট চরিত্র হিসেবে দেখলেও তাব উদ্ভট মিথ্যার অকপট উচ্চারণের ফলে ভাঁড়ু বা ঠকচাচার মত চরিত্র হয়ে ওঠেনি। পাঠকের রাগ বিরাগ তার ওপবে কিছুই জন্মায় না—সে যেন এক জলে ভাসা শোলাব মত। যাবৎ দুবৃত্তায়ণের ঘোলা জলে থেকেও নোংরা চরিত্রে পরিণত হয়নি। অবলীলাক্রমে পাঠকের মনের নরম কোন্‌টিতে স্থান করে নিয়েছে।

ছোটগল্প হিসেবে ডমরুচবিতের অন্তর্গত 'স্বদেশী কোম্পানী' কাহিনীটি বিচার করতে গেলে প্রথমেই এর ঘটনা কাহিনী বা বিষয়বস্তুর ভিত্তির দিকে তাকানো যাক। ছোট গল্প যেহেতু আধুনিকতম সাহিত্য সৃষ্টি, ফলে জীবন বাস্তবতা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেক্ষেত্রে কোনো 'স্বদেশী কোম্পানী' খোলা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের স্বদেশ ভাবনাকারী বাঙালীর পক্ষে অচিন্তনীয় ব্যাপার নয়। ঐ স্বদেশিকতার নামে কিছু অবৈষয়িক আবেগ-প্রবণ বাঙালীর উচ্ছ্বাস কল্পনা বিলাসিতাকে একটি খোঁচা দেওয়ার গোপন ইচ্ছা ও হয়ত ত্রৈলোক্যনাথের এই গল্প রচনার পেছনে ছিল। যেভাবে ধূর্ত ডমরুধর ও তার উপযুক্ত শঠ শাগরেদ শঙ্কর ঘোষ এঁটেল মাটি থেকে সাদা ধবধবে কাগজ বানানোর অবাস্তব একটি সুস্পষ্ট তঞ্চকতার পরিকল্পনা দিয়ে কিছু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙালীকে বোকা বানিয়েছে এবং তাদের অর্থ আত্মস্যাৎ করেছে তাতে সবল মানুষদের আবেগকে পুঁজি করে সমকালীন কিছু প্রবঞ্চক যারা স্বাদেশিকতার নামে লোক ঠকানোব ব্যবসা ফেঁদে অজস্র মানুষের অর্থনাশ করেছিল—তাদের প্রতিই ত্রৈলোক্যনাথের তীব্র কটাক্ষ প্রবল হাস্যরসের মাধ্যমে বর্ষিত হয়েছে।

এই বাস্তব ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে 'স্বদেশী কোম্পানীতে' ছোটগল্পের আরও অন্যান্য উপাদান আছে। এই গল্পটির সূত্রপাত ঘটেছে একেবারেই অভিনব ধরনের মুখবন্ধ দিয়ে। পাঠককে জানানো হচ্ছে ডমরুধবের প্রথম উপাখ্যানে কি কি বিষয় বর্ণিত হয়েছিল এবং সেই উপাখ্যান পাঠের ফল কি তা আট পংক্তির পাঁচালী জাতীয় পদ্য মারফৎ লেখক বলেন। তার শেষ দুই পংক্তি এবকম "পযসাদিয়া ডমরুচরিত কিনে রাখ ঘরে/ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে

ইহার বরে''—এই অভিনব মুখবন্ধে পাঠক হতচকিত হন। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব উপাখ্যান জানতেও উৎসুক হন। এই কৌতূহল রসের সঙ্গে সঙ্গে অতি অবলীলায় উদ্ভট চরিত্র বিষয়ক ডমরুর আত্মশ্লাঘা মূলক নিম্নমানের পদ্যটি পাঠকের অফুরন্ত হাসির খোরাক হয়।

চমক দিয়ে গল্পের সূত্রপাত ছোট গল্পের অন্যতম আঙ্গিক লক্ষণ। কথক হিসেবে ডমরু গল্প শুরু করে বন্ধুদের কাছে। লোক ঠকানোর আজগুবি উপাখ্যান অর্থাৎ এঁটেল মাটি থেকে কাগজ তৈরি এবং বহু শিক্ষিত মনের সেটি নির্বিবাদ মেনে নেওয়া, বোকাবনা, অর্থনাশ হওয়া, ডমরুর যাবতীয় অর্থ প্রাপ্তি এবং শঙ্কর ঘোষের মত শঠকেও প্রতারিত করার গল্প এত সহজে ডমরু বলে যে অবিশ্বাস্য হয়েও পাঠকের কাছে গল্পটি পরম উপভোগ্য হয়ে থাকে। গল্পের মধ্যে কেউ বাধা দিয়ে গল্পরস ক্ষুণ্ণ করেনা—এরকম টান টান কাহিনী হওয়ায় তা আজগুবি মিথ্যা কাহিনী হলেও ছোটগল্পের রচনা শৈলীকে ক্ষুণ্ণ করেনি।

গল্পের শেষেও গল্প শেষ হয়নি, ডমরুর শ্রোতা বন্ধুদের কৌতূহল ফুরায়নি। তারা ডমরুর পরবর্তী জীবন ঘটনা শুনতে আরও আগ্রহ প্রকাশ করে, ডমরুও তা শুরু করতে যায়। সেই পরবর্তী কাহিনী হল ডাক্তারের গল্প।

আগামী কাহিনী সম্বন্ধে কৌতুহল জাগ্রত করে স্বদেশী কোম্পানী শেষ হয়েছে পাঠকের অতৃপ্তি বোধ দিয়ে। যে অতৃপ্তি বোধ ছোট গল্প পাঠের পর পাঠকের চিত্তে সৃষ্টি হয়।

ছোটগল্পের চরিত্র হিসেবেও ডমরুকে ধরা যায়। শঠ প্রতারক কুদর্শন ও দুঃশীল ডমরু গল্প কথক হিসেবে উপস্থিত হয়েও তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে প্রকাশ করতে পারছে। তার মাধ্যমেই তার শঠতার সাগরেদ শঙ্কর ঘোষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যও জানা হয়ে যায়।

জীবনের এক খন্ডাংশ ছোটগল্পে বর্ণিত হয়। ডমরুর জীবনেরও এক খন্ডাংশ এখানে বর্ণিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি যথার্থ ছোটগল্প নয়, কেননা মুখবন্ধ থেকে এবং সমাপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ''স্বদেশী কোম্পানী'' সার্থক ছোটগল্পের মত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিটোল গল্প নয়। এ গল্পের চরিত্রগুলি পূর্ব ও পববর্তী কালেব সঙ্গে যুক্ত। তাদের উদয় বিকাশ ও পরিণতি এই গল্পেই দেখানো হয়নি। ডমরুর কাহিনী পূর্বকাল ও পরবর্তী কালের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। তার জীবনের বহু ঘটনা একটি গল্পে মজলিসি মেজাজে ডমরু নিজে বলেছে। ফলে যেমন সম্পূর্ণ উপন্যাস হিসেবে ডমরুচরিত কে ধরা যায়না, তেমনই ছোটগল্পেব কিছু স্বাদ-গন্ধ বা লক্ষণ যুক্ত হয়েও 'স্বদেশী কোম্পানী' খাঁটি বা যথার্থ ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারেনি। একটি সরস গল্প হিসেবেই এ গল্প স্বীকৃতি পাবে।

বিংশ শতকের ম্যাজিক রিয়ালিজম বা যাদুবাস্তবতা ব্যাপারটি ল্যাটিন আমেরিকার কিছু লেখকের কলমে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবকে সরাসরি প্রবেশ করানো এবং সে বিষয়ে লেখকের সচেতনতা ডমরুর একাধিক কাহিনীতে দেখা যায়। 'স্বদেশী কোম্পানী' গল্পের পরবর্তী গল্প ভিকু ডাক্তার এবং চঞ্চলার গাইগরু সেই অসম্ভব কল্পনা ও বাস্তব ভিত্তির অসামান্য সংযোজন। আধুনিক ম্যাজিক রিয়ালিজমের পূর্বাভাস সে সব গল্পে আংশিক হলেও পাওয়া যাচ্ছে— পাঠক যদি এমনটি মনে করেন ভুল হবে না।

চঞ্চলার গাইগরু : ডমরুধরের এক বৃত্তান্ত

রানু ঘোষ (কর্মকার)

ত্রৈলোক্যনাথের "ডমরুচরিত" বৈঠকি রীতিতে রচিত একটি গল্পমালা। গল্পগুলি ছোটগল্পের রীতিতে রচিত হলেও এগুলিকে ছোটগল্প আখ্যা দেওয়া যায় না। 'ডমরুচরিতে'র পঞ্চম গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদের গল্প হল 'চঞ্চলার গাইগরু'। ডমরুধর গল্পটি আরম্ভ করেছেন এইভাবে—'দুর্লভী ভাল হইলে চঞ্চলা আপনার গ্রামে চলিয়া গেল। কিন্তু চঞ্চলার সহিত সদ্ভাব করিতে আমার বাসনা হইয়াছিল।" দুর্লভী ছিল এক বাগদিনী মহিলা। ডমরুধরের বয়স পঁয়ষট্টি এবং তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত ছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি চলে যেতেন সেইসব মহিলাদের কাছে। তাই যখন তাঁর শরীরটি নাদুস-নুদুস নধর হল তখনই তিনি চুপি চুপি এলোকেশীকে না জানিয়ে চলে গেলেন দুর্লভীকে দেখতে। গিয়ে দেখেন যে দুর্লভী কয়েকদিন ধবে জ্বরে পড়ে আছে। ঝিঁঝিঁডাঙ্গা গ্রাম থেকে দুর্লভীর বোনঝি চঞ্চলা এসেছে তার সেবা করতে। চঞ্চলাকে দেখে ডমরুধরের মনে হয়েছিল যে চঞ্চলার সঙ্গে সদ্ভাব করলে দুর্লভীর মনে মনে হিংসা হবে, আর দুর্লভীর রাগ থাকবে না ডমরুধরের উপব। রং ফর্সা করাব জন্য শঙ্কর ঘোষ ডমরুধরকে যে ওষুধ দিয়েছিল তা ডমরুধর দুর্লভীকে খাইয়ে দিতেই সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। যেহেতু তাঁর ওষুধের জন্যই দুর্লভীর প্রাণ ওষ্ঠাগত তাই চঞ্চলাব মুখ থেকে তিনি ভিকু ডাক্তারের কথা শুনে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হয়ে তাঁকে ডেকে আনেন। ভিকু ডাক্তার দুর্লভীকে সুস্থ করে তোলেন। তারপর ডাক্তারকে ভিজিট না দিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেন।

"চঞ্চলার গাইগরু" গল্পে আমরা দেখি ডমরুধব চঞ্চলার সঙ্গে দেখা করতে দুচারবাব ঝিঁঝিঁডাঙ্গা গ্রামে গেছেন। তাদের দাওয়ায় বসে তিনি গল্পও করেছেন। অনেকদিন পর একটা ন' হাতি কাপড় কিনে ভোররাত্রিতে বিছানা ছেড়ে উঠে চঞ্চলাকে দেখতে তাদের গ্রামে চললেন ডমরুধর। বেলা প্রায় ন'টার সময় চঞ্চলাদের গ্রামে এসে তিনি উপস্থিত হন। রাস্তায় চঞ্চলার পিতা সহদেব বাগদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সহদেব তখন গাইগরুর দড়ি ধরে বড় রাস্তা দিয়ে মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছিল। সহদেব বাগদি আর ডমরুধর গল্প করতে এতই মগ্ন ছিলেন যে পিছন থেকে একটা মোটর গাড়ী 'ভোঁ ভোঁ' শব্দ করছিল তা তাঁরা টের পাননি। ফলে মোটর গাড়ীটি এসে ডমরুধর ও গাইগরুটিকে চাপা দেয়। ডমরুর শরীর দুখানা হয়ে যায়। কোমর সমেত পা দুটো গাড়ীর চাকার সঙ্গে আটকে যায়। আর গরুটির শরীরও দুখানা হয়। ডমরুর ধড়টি রাস্তায় পড়ে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে থাকে। এমন সময় ভাগ্যবশত ভিকু ডাক্তার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এই অবস্থা দেখে তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন। ডমরুধরের ধড়টি খুঁজে পেলেও তার কোমব সমেত পাগুলি তিনি খুঁজে পান না। চোখের সামনে তিনি দেখতে পান গরুটির কোমর সমেত পিছনেব পা দুটো। তাড়াতাড়ি করে ডমরুর ধড়ের সঙ্গে গরুটির পিছনের পা দুটো জুড়ে

দেন। ভিকু ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণে ডমরুধরের ধড় ও গরুর কোমর সমেত পা জোড়া লেগে যায় এবং ডমরুধর সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান। ভিকু ডাক্তার এক আজীব প্রাণীর সৃষ্টি করেন। যে প্রাণীর পরিচয় সুকুমার রায়ের কবিতায় পাওয়া যায়, সেই 'বকচ্ছপ' বা 'হাঁসজারু'র মত এক প্রাণী 'গোমানব' সৃষ্টি করেন ভিকু ডাক্তার। গরুর পিছনের পা থাকায় ডমরুধরকে মাটিতে হাত পেতে চতুষ্পদ জন্তুর মতোই দাঁড়াতে হল। ভিকু ডাক্তার ডমরুধরের শরীরটি জুড়ে না দিলে এতক্ষণ মরেই যেতেন। যেহেতু তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছেন তাই এই আজীব জীবটিকে নিজ অধিকারভুক্ত করতে চাইলেন। কারণ, দুর্লভীকে বাঁচাতে ভিকু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসে ডমরুধর তাঁর পাওনার টাকা দেননি। তাই এই জীবটিকে দিয়ে ভিকু ডাক্তার ক্ষেতে কাজ করিয়ে পাওনা টাকা উসুল করতে চান। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয়। যেহেতু জীবটির অর্ধেক অংশ চঞ্চলার গাই-এর—তাই সহদেব বাগদিও তার অধিকার ছাড়তে চায় না। সহদেবের মতে—"ইহার আধখানা চঞ্চলার গাই। এখনও ইহার দুধ হইবে। আমবা ইহাকে ছাড়িয়া দিব না।" উদ্ভট প্রাণীটির অধিকার নিয়ে যখন সমস্যা ঘোরতর আকার ধারণ করল তখন গ্রামের লোকেরা এসে তার মীমাংসা করে দেয়। দিনের বেলা ডমরুধরকে ভিকু ডাক্তারেব বাড়ীতে থাকতে হবে। সারাদিন নিজের খুশি মত ভিকু ডাক্তার প্রাণীটিকে দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নেবেন। আর রাতের বেলা তাকে দোহন কববে সহদেব বাগদি, চঞ্চলাদের গোয়ালঘরে তার ঠাঁই হবে। একবেলা ভিকু ডাক্তার খেতে দেবেন আর রাতেব বেলা চঞ্চলা খেতে দেবে। এই চুক্তি দুজনেই একবাক্যে মেনে নেয়।

পবদিন সকালে দোহন করার পর চঞ্চলা বাছুর ছেড়ে দেয়। বাছুরটি ডমরুর পেটে গুঁতো মারতে থাকে। গুঁতোনি খেয়ে ডমরুধরের অবস্থা যখন ওষ্ঠাগত তখন ভিকু ডাক্তার এসে তাঁর কষ্ট লাঘব করে দেন। তিনি বলেন পেট যেহেতু তাঁর ভাগে পড়েছে তাই তিনি বাছুরকে পেটে গুঁতো মারতে দেবেন না। ফলে ডমরুধর এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। এরপর ভিকু তাঁকে ক্ষেতে নিয়ে যান। কোমল দুটি হাতে ও শক্ত দুটি ক্ষুরে তাঁকে সারাদিন লাঙ্গল টানতে হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় ডমরুধরের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তিনি লাঙ্গল টানতে পারেন না। ফলে কৃষক তাঁব লেজে মোচড় দিয়ে লাঙ্গল টানতে বাধ্য করে। এমন সময় সহদেব বাগদি সেখানে এসে হাজির হয় এবং লেজ মোচড়ানোর জন্য ঘোরতর আপত্তি জানায়। কারণ লেজ তার ভাগে পড়েছে, তাই কৃষক লেজ মলতে পারবে না। এতে কৃষক লেজ মলা বন্ধ করে। কিন্তু তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করে ডমরুধরের উপর। পিঠে ছড়ির ঘা মারতে থাকে। ডমরুধরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। অত্যধিক অত্যাচারে, শাসনে, শোষণে, অনশনে তাঁর নাদুস নুদুস নধর শরীরটি শীর্ণ হয়ে যায়। অবশেষে মা দুর্গা তাঁকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করেন। গতবছর পূজায় কিছু ত্রুটির জন্য তাঁকে এই কষ্টভোগ করতে হয়েছে। একমাস ধরে তিনি দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী এমনকি বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত কেউ খোঁজ নেয়নি। লম্বোদর এই কথার খুঁত ধরেন এবং বলেন প্রায় ছমাস ধরে যখন ডমরুধরকে দুবেলা দেখে চলেছেন তখন সন্ধান নিতে যাবেন কিসের জন্য। এই কথা ডমরুধর হেসে উড়িয়ে দেন এবং বলেন জগদম্বার মায়ার জন্যই তাঁদের এরকম হয়েছে।

মা দুর্গা ডমরুধরকে বিপদমুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে উদ্ধারও করেছেন। যখন চঞ্চলা ও সহদেব বাগদি দোহন করতে এসে ছিটেফোঁটা দুধ না পেয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠে 'পুনরায় বাছুর না হইলে দুধ হইবে না, তাহার যোগাড় করিতে হইবে।'—একথা শুনে ডমরুধরের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ঠিক তার পরদিনই শঙ্কর ঘোষ ডমরুধরের কাছে তার পাওনার টাকা আদায় করতে আসে; একসময় ডমরুধর তাকে টাকা ফাঁকি দিয়েছিল। শঙ্কর ঘোষ ডমরুধরের ডান হাত ধরে টানতে শুরু করে। এই অবস্থা দেখে দৌড়ে আসেন ভিকু ডাক্তার। তাঁর সম্পত্তি বাঁচাতে তিনি ডমরুধরের বাম হাত ধরে টানতে শুরু করেন। নীচের অংশটি যেহেতু চঞ্চলার গাইগরুর তাই চঞ্চলাও তার জিনিস ছাড়তে রাজী নয়; সে পিছন দিকের ডান পা ধরে টানতে থাকে। এরকম অবস্থায় এলোকেশী এসে হাজির হয়। সে তার স্বামীর পিছনের বাম পা ধরে টানতে আরম্ভ করে দেয়। চারিদিকের টানাটানিতে ডমরুধরের শরীর থেকে গরুর পিছনের অংশটি 'ফস' করে খুলে যায়। তারপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি দেখেন যে, তাঁর শরীরে মানুষের মতই সমস্ত কিছু আছে, কোন রদবদল হয়নি। তিনি সমস্ত কিছুকেই জগদম্বার মায়া বলে বিশ্বাস করলেন।

'ডমরুচরিতে'র পঞ্চম গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হল 'চঞ্চলার গাইগরু'র গল্প। এই পরিচ্ছেদে ত্রৈলোক্যনাথ যে কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন তার বীজ নিহিত আছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। কারণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনীটি জানলে তবেই এই পরিচ্ছেদের চরিত্রগুলিকে সঠিকভাবে চেনা যাবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রধান চরিত্রের নামানুসারেই লেখক নামকরণ করেছেন 'ভিকু ডাক্তার'। যিনি তৃতীয় পরিচ্ছেদেও নিজ ব্যক্তিত্ব ও কীর্তিকলাপের জোরে পাঠকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি হাতুড়ে ডাক্তার; কিন্তু তাঁর ওষুধ ধন্বন্তরীর মতই কার্যকরী। ডমরুর ফর্সা হওয়ার ওষুধ খেয়ে মৃতপ্রায় দুর্লভী নতুন জীবন পায় ভিকু ডাক্তারের ওষুধের গুণে। কিন্তু তাঁর ভিজিট বাকী রাখেন ডমরুধর। 'চঞ্চলার গাইগরু'তে ভিকু ডাক্তার সুদে-আসলে ডমরুর কাছ থেকে তাঁর পাওনার টাকা উসুল করে নিয়েছেন।

ভিকু ডাক্তার কোলকাতার কোন এক ডাক্তারখানায় ছ'মাস কম্পাউন্ডারীর কাজ করে ভুল চিকিৎসায় একরোগীর জীবন নাশ করে ছ'মাস জেল হাজত বাস করেন। তারপর নিজগ্রামে ফিরে বেশ পসার জমান। তাঁর অভূতপূর্ব চিকিৎসার গুণে নেহালা গ্রামের ত্রিলোচন সরখেল মশাই এর পেট থেকে এক ধামার মত কচ্ছপ বেরিয়ে আসে। সরখেল মশাই সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান। শুধু তাই নয়, তাঁর ওষুধের গন্ধে কমিটি করা ভূতের দল সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে যায়। আর কিছুক্ষণ থাকলেই ভূতের দল ছাই হয়ে যেত। মৃত মানুষের মুখে ওষুধ দিয়ে তিনি নতুন করে তার জীবন দান করেন। এমন কি দক্ষের মাথায় ছাগমুন্ডও তাঁর ওষুধের দ্বারাই জোড়া লেগেছিল। 'চঞ্চলার গাই গরু' গল্পে তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধের দ্বারা ডমরুর অর্ধেক শরীর ও গাই গরুর পিছনের অর্ধেক অংশ জোড়া লাগিয়ে নতুন এক প্রাণী "গো-মানব" সৃষ্টি করেন। এসব কীর্তিকলাপের দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি হলেন এক অসাধ্যসাধনকারী চিকিৎসক। এরকম চিকিৎসক বাংলা সাহিত্যে বিরল।

"ডমরুচরিতে"র 'চঞ্চলার গাইগরু" গল্পটির প্রধান চরিত্র হলেন ডমরুধর। আর

রয়েছেন ভিকু ডাক্তার, সহদেব বাগদি এবং চঞ্চলা। এছাড়া আর একটি চরিত্র হল গাইগরু। ডমরুধরের অসাবধানতাই তাঁর দুঃখ-ভোগের কারণ—যা আলোচ্য গল্পটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তিনি অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছিলেন বলেই মোটর গাড়ীর ধাক্কায় তাঁর শরীর দু'ভাগ হয়ে যায়। আর তাঁর সঙ্গেই অর্ধেক হয় চঞ্চলার গাইগরুর শরীর। এরকম অবস্থায় ভিকু ডাক্তারই ডমরুধরকে বাঁচান। গাইগরুর পিছনের অংশ আর ডমরুর সামনের অংশ তাড়াহুড়ো করে জুড়ে দিয়ে তিনি এক অভিনব জীব তৈরি করেন। যে জীবটির কাজ হল সারাদিন সারারাত গরুর ভূমিকা পালন করা। সারাদিন ভিকু ডাক্তারের জমিতে বলদের মতো হল কর্ষণ করতে হয়, আর রাতের বেলা তাকে দোহন করে চঞ্চলা ও তার বাবা। গরুর মতোই তাকে গোয়াল ঘরে রাত কাটাতে হয়। কিন্তু খাবার দেওয়া হয় কুড়কুড়ে মুড়ি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীটির অর্ধেক অংশ ডমরুধর হলেও গল্পের সমগ্র কাহিনীতে তিনি গরুর আচরণই করে গেছেন, মানুষের কোন ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখি না। আর চঞ্চলার গাইগরুর পিছনের অংশ জোড়া দেওয়ার জন্যই যেহেতু তাঁকে এরূপ বিপত্তি ভোগ করতে হয়েছে, তাই গল্পের নামকরণ 'চঞ্চলার গাইগরু'' —সার্থক হয়েছে

নয়নচাঁদের ব্যবসা : বসন্ত বাণিজ্য

অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়নচাঁদের অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। মনের প্রশান্তি হেতু তার মুখে একটু 'কান্তি বাহির হইয়াছে।' শরীরে লাবণ্য হেতু গায়ে 'তেলা মারিযাছে।' চাট হিসেবে চিনির জলের ঘোলাতে তার অরুচি ধরে গেছে; সন্দেশ, রসগোল্লা না হলে এখন আর তার চলে না। নয়নচাঁদ গুলিখোর। একা নয়নচাঁদকেই বা দোষ দিই কেন—লম্বোদর, গগন ইত্যাদি সান্ধ্য আড্ডাধারীরা সকলেই নেশাখোর। কিন্তু আড্ডাধারীদের মধ্যে একমাত্র নয়নচাঁদেরই বাড়বাড়ন্ত। কেন? কিভাবে?—তাই নিয়েই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যকে সম্পূর্ণ আলাদা ডাইমেনশান দান করেছে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের কবিতার কথাও আমরা বলতে পারি। দুটির একটিকেও সনাতন কোনও রঙের ধারণার মধ্যে আমরা ফেলতে পারি না। দু ক্ষেত্রেই আলোচনার অনেকটা ময়দানই খোলা পড়ে আছে। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটি একান্তই ত্রৈলোক্যনাথীয় স্টাইলে লেখা। হাস্যরস, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, কৌতুক সবই এখানে উপস্থিত, কিন্তু এক উদ্ভট পরিস্থিতির সাহচর্যে সেগুলো সবমিলিয়ে এমন আকার ধারণ করেছে যে গল্পটিকে সাধারণের তালিকাভুক্ত থাকতে দেয় নি। গল্পটি নটি পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেক পর্বের আলাদা আলাদা নামকবণ করা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে—আঠারো, কপাৎ, এই কিল তো এই কিল, বসিয়া আছে দুইটি ভূত, কর্তা ভূত বলিতেছেন, নেই আঁকুড়ে দাদা, এঁড়ে গরু, মিস্ত্রিরদার পুণ্য ও পরিশেষ।

নয়নচাঁদের বাড়ী ফরাশ ডাঙ্গা। সন্ধ্যেবেলা নয়নচাঁদ, লম্বোদর, গগন এবং আবও কয়েকজন মিলে আড্ডায় বসে 'নিত্যক্রিয়া' সম্পন্ন কবে। ক্রিয়াটির গুণ সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথেব বক্তব্য লক্ষণীয—"ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজাব কথা চাই।' ঠিক পরের বাক্যের শুরুতেই 'তাই' শব্দটির ব্যবহার ত্রৈলোক্যনাথ ইচ্ছে করেই করেছেন। এর ফলে নয়নচাঁদের গোটা গল্পটাই ঐ 'মজাব মজার কথা'-র অন্তর্গত হয়ে গেছে। আর মজার কথার মজা হলো এই যে, তা সত্যিও হতে পারে আবাব মিথ্যেও হতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথের মনোগত অভিপ্রায বোধহয় প্রথমেই আমাদের বলে দেওয়া যে—দেখ বাপু, আমি ন্যারেটার মাত্র। গল্পটা একজন গুলিখোবের নেশার আড্ডায় বলা গল্প।

নয়নচাদ লম্বোদরদের ভালই চেনে, লম্বোদরদের কাছ থেকে সে এতখানি প্রত্যাশাও করে না। একে তো নয়নচাঁদের গল্পটা একটু গোলমেলে, তার উপর সে নিজেও গল্প বলিয়ে হিসেবে বেশ খুঁতখুঁতে। তাই কেউ কোনও কিছু বলার আগেই সে বলে, "আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, খৃষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী। আর কী নাম করিতে বাকী রহিল আড্ডাধারী মহাশয়?" অর্থাৎ তার গল্প সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে এবং এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে একেবারে জাত থাকা না থাকাব সম্পর্ক। কিন্তু এ ধরনের কথা একবার নয বারবাব বলেছে নয়নচাদ। কেন? অনুমান করি শ্রোতাদের মনে গল্পের চাহিদা

আর গল্প শোনার খিদে দুটোকেই সে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। পাকা গল্প বলিয়ের এও এক কায়দা, যা গল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে। যাইহোক, নয়নচাঁদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আড্ডাধারী মশাই এক ব্রাহ্মণের গল্প বললেন, 'যিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন।' গল্পটি নিয়ে আর বাক্যব্যয় করলাম না। শুধু এটুকু বলি, একগল্পের মাঝে অন্য গল্প টেনে আনা ত্রৈলোক্যনাথের স্টাইল। কঙ্কাবতী, ডমরুধর পড়লে স্টাইলটিকে আরও ভালো ভাবে সনাক্ত করা যায়। বিশেষ পরিবেশে এমনভাবে ত্রৈলোক্যনাথ একটি গল্পের মধ্যে আরেকটি গল্প এনেছেন যে কখনই তা খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছে না। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পে আড্ডাধারী মশায়ের গল্পটিকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও যারা একটু আধটু নেশার আড্ডা সম্পর্কে অবহিত তাঁরা জানেন এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় গল্পই সেখানে স্বাভাবিক। ত্রৈলোক্যনাথের অসাধারণত্ব এখানেই যে তিনি এ গল্পে নেশার আড্ডায় যা স্বাভাবিক তার সঙ্গে নিজের গল্প কথনের রীতিকে আশ্চর্যভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়পর্বে (কপাৎ) নয়নচাঁদ সকলকে পরামর্শ দেয়—"দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করতে বলি।" কী কাজ? দেবতাদের সন্তুষ্ট করা। তবে দেশের অবস্থা আর আগের মত নেই। নয়নচাঁদ তাই তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়েই তেল দিতে বলছে না। বেছে বেছে কয়েকটি মাতালো মাতালো দেবতা বেছে নিলেই হলো; যেমন—কাটিগঙ্গা, ফণীমনসা। এরকম লাভজনক প্রস্তাবে আড্ডাধারীরাও খুশি। মাটিতে মাথা ঠুকে সকলে বললো, "হে মা কাটীগঙ্গা! হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।' এখানে নয়নচাঁদের প্রতিভার আরেকবার পরিচয় পাওয়া গেল। সেরা বাজিকরের আস্তিনের শেষ তাস যেমন টেক্কা, তেমনি নয়নচাঁদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতার নাম সকলের শেষে বললো—মা শীতলা। এতক্ষণ শীতলার নাম কারুর মাথায় ছিলো না। একটু আগেই যারা ফুৎকরে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম নামঞ্জুর করে দিয়েছে, তারাই মা শীতলার নাম মনে পড়ায় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ভয় থেকেই আসে ভক্তি। আড্ডাধারীরা মা শীতলাকে একসঙ্গে ভয় এবং ভক্তি দুটোই করুক—এটাই ছিলো নয়নচাঁদের কাম্য। এতে গল্পের জোর যে অনেকটাই বেড়ে যাবে এটা সে বুঝতে পেরেছিলো। তবে এটুকুতেই সে ক্ষান্ত থাকে নি। এই পর্বের শেষে দেখবো, সকলে যার যেমন ক্ষমতা সেই মতো মা শীতলার পুজো মানলে তবেই নয়নচাঁদ গল্প শুরু করেছে।

তৃতীয় পর্বে (এই কিল তো এই কিল) নয়নচাঁদের গল্প শুরু হয়—"এবার আমার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিলো। খাওয়া কোনদিনও হয়, কোনওদিন হয় না।" কিন্তু কথায় আছে কারুর পৌষমাস কারুর সর্বনাশ। তাই "এমন সময় কোলকাতায় বসন্তের হিড়িকটি" পড়লে নয়নচাঁদ তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। প্রথমেই নয়নচাঁদ একখানা ভারী চমৎকার শীতলা তৈরী করে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, নয়নচাঁদের শীতলাটি একেবারে খাঁটি মাল-মশলায় তৈরী। সেইজন্যই বোধকরি সেটি খুব জাগ্রত; অন্তত কর্ত্তাভূতের তাই মতামত (পঞ্চমপর্ব)। এরপর নয়নচাঁদের বউকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা, কলকাতায় নয়নচাঁদ পাণ্ডা হিসেবে কিভাবে প্রতিষ্ঠা পেল সে বর্ণনা গল্পেই পাই। শীতলার স্বপ্নাদেশের গল্প ফাঁদার মধ্যে দিয়ে নয়নচাঁদ আবারও নিজের সহজাত ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

পাণ্ডাগিরি করে নয়নচাঁদের বেশ নামডাক হলো। কিন্তু নেশাখোরের স্বভাব ধর্ম যাবে কোথায়। নেশার আড্ডাকে ভুলে বেশীদিন থাকা নয়নচাঁদের পক্ষে অসম্ভব। বেরসিক সাহেবরা আবার কলকাতার সব আড্ডা তুলে দিয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোজগার বাড়িয়ে নেবার দিকে নয়নচাঁদকে মন দিতে হলো। কারণ বসন্তের হিড়িক তো বেশীদিন থাকবে না। বেশী রোজগারের জন্য নয়নচাঁদকে নিজের পাড়া ছেড়ে শীতলা হাতে ভিক্ষায় বের হতে হত। 'সব কাজে হুনহর' নয়নচাঁদ শীতলার একটা মোক্ষম গানও বাঁধলো। ডাক্তারী শাস্ত্র সম্পর্কে যাদের আগ্রহ আছে তারা নাকি গানটি পড়ে দেখতে পারেন—বসন্তের নানা রকমফের সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই পর্বেই সাদাচোখো আর মাতালদের সম্পর্কে নয়নচাঁদ তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে। বলাবাহুল্য এ অভিজ্ঞতা স্বাদে তিক্ত। সাদাচোখো, মানে যারা নেশা করে না, তাদের সম্পর্কে নয়নচাঁদ বলছে—এদের "মনটি সদাই জিলিপির প্যাঁচ "আর এরা সর্বদা মিথ্যা অপবাদ রটায়।" গল্পে সাদাচোখো হিসেবে উপস্থিত একমাত্র নয়নচাঁদের গিন্নি। হতে পারে, নয়নচাঁদের এ অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবন থেকেই লব্ধ। বিশেষত গুলিখোরের গিন্নিদের তাদের স্বামীদের প্রতি এ অপবাদ চিরকালীন। আর মাতালদের সম্পর্কে নয়নচাঁদের অভিযোগের লিস্টি আরও লম্বা—এরা দিন নেই রাত নেই মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে, যততত্র যার তার গায়ে বমি, সবসময় তাদের মেজাজ গরম হয়েই আছে, পুজো পার্বণে মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকে। তার উপরে এক মাতালের (মিত্তির দা) বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়ে নয়নচাঁদের যা অবস্থা হলো—মাতালের "এক একটি কিলে" নয়নচাঁদের পিঠের "জায়েন খুলিয়া গেল।" মাতাল নয়নচাঁদের সাধের শীতলা কেড়ে নিল। নয়নচাঁদ পালাল। মনে মনে সে শীতলাকে বলল—"মা! আর তোমার গান করিতে চাই না, তোমার চাল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর"। এই অবধি বলে নয়নচাঁদ থামলো, গগন সুবলের গল্প বললো। আগেই বলেছি এক গল্পের ফুরসতে আরেক গল্প টেনে আনা ত্রৈলোক্যনাথের স্টাইল।

মাতালের কাছে মার খেয়ে পালিয়ে আসার কিছুদিন পরে নয়নচাঁদ তার শীতলা নিয়ে যাবার জন্য একখানা চিঠি পেল ঐ মাতালের কাছ থেকে। ন্যাড়া আরেকবার (অনেক ভেবে চিন্তে, গিন্নির ধাঁতানিতে) বেলতলায় গেল। সেখানে গিয়ে নয়নচাঁদের সঙ্গে দুজনের দেখা হল—একজন কর্তাভূত (সেই মাতাল মরে ভূত হয়েছে) আর একজন নেই আঁকুড়ে দাদার ভূত। কর্তাভূত নয়নচাদকে তাদের এই পরিণতি ও পুনরায় মর্ত্যে আগমনের আশ্চর্য গল্প শোনাল।

পরবর্তী চারপর্ব ধরে কর্তাভূত সেই আশ্চর্য গল্প নয়নচাঁদকে বলেছে। সে গল্পে কে নেই—কর্তাভূত, যমদূত, চিত্রগুপ্ত, যমরাজ, এঁড়ে গরু, নেই আঁকুড়ে দাদা, নারায়ণ, বিধবা স্ত্রীলোক, নরকের পাপী সবাই সেখানে উপস্থিত। দেবতাদের প্যারাডাইস লস্ট থেকে প্যারাডাইস রিগেইন অবধি প্রায় সমস্ত ঘটনাই এ গল্পে স্থান পেয়েছে। সমগ্র 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের মধ্যে এই অংশই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বাস্তব, অবাস্তব, যাদু, রূপকথা সর্বকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে এমন এক জগৎ তৈরী করেছেন—যার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণের লজিক দিয়ে

এর ব্যাখ্যা করা আর এর রসহানি ঘটানো একই ব্যাপার। একমাত্র যাঁরা গল্পটি পড়েছেন তাঁরাই এর প্রকৃত রস উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, যাঁরা পড়েন নি পড়ে নেবেন। এ প্রসঙ্গে যাদু বাস্তবতা বা Magic Realism এর কথা না বলে পারছি না। গ্যাব্রিয়েল গর্সিয়া মার্কেসের মতো বাঘা লেখকও স্বীকার করেছেন, "My most important problem was destroying the lines of demarcation that separates what seems real from what seems fantastic". (One Hundred Years of Solitude) অথচ ত্রৈলোক্যনাথের এ ক্ষমতা ছিলো সহজাত। একের পর এক গল্পে তিনি নানা ধরনের উদ্ভট পরিস্থিতি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে বাস্তব অবাস্তব সেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং ম্যাজিক রিয়েলিজমের বীজ ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ছিলো—একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। বীজ বললাম এ কারণে ম্যাজিক রিয়েলিজমের যে বিশেষ উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তা হয়ত তার রচনায় সবসময় ছিলো না, কিন্তু ম্যাজিক রিয়েলিজমের একটা এসেন্স ছিলো। অতকাল আগে কেবলমাত্র উদ্ভট পরিস্থিতি নিয়ে যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনা সম্ভব তা ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

যাইহোক, নবমপর্বে (পরিশেষে) এসে দেখা গেল বৈকুণ্ঠ ঘুরে আসা শীতলার গুণে নয়নচাঁদের 'একগুণ পসার' 'দশগুণ হইল'। সাহেবরা পর্যন্ত এসে নয়নচাঁদের শীতলাকে পুজো দিত।

গল্প শেষ হলো, রাত হয়ে আসছে। সকলে (আড্ডাধারীরা) বাড়ি যাবার আগে সাধের দেবতাদের প্রণাম জানায়, "হে মা কাটি গঙ্গা। হে বাবা ফণীমনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ নমঃ।" গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু সকলে তো প্রণাম পেল, আসল দেবতা শীতলাকে তো কেউ প্রণাম করলো না। নেশা চড়েছে তাই শীতলাকে আর..........

স্বর্ণকুমারী দেবী

(১৮৫৫-১৯৩২)

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালে কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল। ঠাকুর বাড়ির বিদগ্ধ পরিমণ্ডলে লালিত পালিত স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল অল্প বয়সেই।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি বিচরণ করেছেন—উপন্যাস, কবিতা, গল্প, গান, নাটক, প্রহসনে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সব মিলিয়ে তিনি তিরিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। —দীপনির্বাণ' (১৮৭৫), 'স্নেহলতা' (১৮৭৯), 'ছিন্নমূল' (১৮৭৯), 'মালতী' (১৮৮০), 'হুগলির ইমাম বাড়ি' (১৮৮৮), 'কাহাকে' (১৮৯৮) ইত্যাদি।

১৮৮২ সালে তাঁর 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ বিদেশী ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে। ১৮৮৪ সাল থেকে দশ বৎসরেরও বেশি স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি সাহিত্য এবং সমাজ সংস্কার মূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী পরলোক গমন করেন।

কেন? : নারীত্বের অপমান

মনোজ ভোজ

স্বর্ণকুমারী দেবীকে ভাবিয়েছে নারীর স্থাণুবৎ অবস্থান। তাই তাঁর ছোটগল্পের জগৎকে 'প্রতিবাদহীন প্রেমেরই জগৎ' বলতে পারিনা, অন্তত 'কেন?' গল্পের ক্ষেত্রে তো নয়ই। 'অমরগুচ্ছ' গল্পের কথিকার স্বপ্নে 'স্বামী দেবতা' কর্তৃক শূন্যমার্গে উঠে যাওয়া ছাড়া কিবা করার ছিল, 'যমুনা' গল্পে যমুনার শ্মশানবাস তার হতাশা ও অসহায়তার নামান্তরমাত্র। 'কেন?' গল্পে কথিকার স্বামীর প্রতি প্রীতিকে সর্বংসহা নারীর 'প্রতিবাদহীন প্রেম' বললে তার অবস্থানের প্রতি অবিচারই করা হবে।

প্রশ্ন ওঠে, কথিকার সর্বংসহা রূপের মূল চাবিকাঠি নিয়ে। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য জেনে নিতে হয় :

> "অন্যাসক্ত স্বামীকে নিয়েই যন্ত্রণা এ গল্পের গৃহবধূটির, তবু স্বামীর প্রতি ভালোবাসার অন্ত নেই তার, অকাতরে স্বামীর হাতে তুলে দেয় নিজের গয়না, স্বামীর সমস্ত স্খলন-পতন-ত্রুটি মেনে নিয়ে তারই অপেক্ষায় প্রহর গোনে,...।"

স্বামীর প্রতি ভালোবাসাকে স্বয়ং কথিকা চিহ্নিত করে, নেশাখোরের নেশা হিসাবে। এই নেশাকে সনাতন বাঙালি নারীর সংস্কারজাত অভ্যাস বলা যাবে। নেশাখোরের নেশার দ্রব্য হাতছাড়া হবার মত তার স্বামী-বিরহ তুলনা করে সংস্কারজাত মানুষের অভ্যাসচ্যুত অসহায়তার ছবিই আঁকলেন গল্পকার। নেশার প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কথিকা বলে, 'সমস্ত বুঝি, তবু নেশা তাড়াইতে পারি না।' আর সেই কারণেই নেশাসক্ত মানুষের মতো শুভাশুভ জ্ঞান অন্তর্হিত হয়—'কাজেই শাশুড়ির শুভ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া মনে মনে তাঁহার নিন্দাবাদ করি।' সংস্কারের বশে শতকষ্টেও বলে, 'উমি, তাকে গাল দিস কেন? আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেন নি, তার কি দোষ?' আমাদের সমাজকাঠামো এর চেয়ে বেশি বলতে দেয়নি। প্রতিবাদমুখর নারীর চিত্র সময়ের বিকৃতি ঘটাত। মনে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ' কবিতার দুটি পংক্তি,—"হিঁদুর মেয়ে অনেক করে/শ্রদ্ধা রাখে স্বামীর পরে," সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কথিকার পতিভক্তি অসহায়তাকে কেন্দ্র করে, প্রেম নয়, নেশা বা সংস্কারের অভ্যাসই এখানে মুখ্য। এবং এই অসহায়তার সূত্রেই সে প্রতিবাদহীনা। সর্বংসহা তাকে জন্মাবধি বানানো হয়েছে মাত্র। নারীর অসহায়তার জগৎকে 'প্রতিবাদহীন প্রেমের জগৎ' বলায় তাই হাস্যকর মনে হয়।

গল্পটির শেষে 'কেন?' প্রশ্ন আমাদেরকে অন্যভাবে ভাবায়—তবে স্বামীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নয়, স্বামীর পরিবর্তনে স্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায়, এই পরিবর্তনকে কথিকা গ্রহণ করেছে বিপুল অপ্রাপ্তির মধ্যে সামান্য প্রাপ্তিকে অসামান্য মনে করে। এই ভাবনার মধ্যেও জড়িয়ে আছে সমকালীন নারীর শ্রেণী অবস্থানের চিত্রটি। জন্মাবধি না-পাওয়া একজন মানুষকে ক্রমাগত চাহিদাহীন করে তোলে। সেই ইচ্ছাহীনতার মধ্যে যে কোন রকম পাওয়া অনেক

বড় হয়ে ওঠে, তাকে পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, আর তাই যখন কথিকার স্বামী তার অজানা কারণে বিষাদ গম্ভীর হয়ে যায়, খোকাকে বুকে তুলে ধরে, স্ত্রীকে বুকে টেনে নেয় তখন তা হয়ে ওঠে পরম প্রাপ্তি, সেই অনুভূতিকে কথিকা ব্যাখ্যা করেন এইভাবে :

> "অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল, আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই, পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই দিন আমি জানিয়াছিলাম।"

সুখ জীবনে কখনো হয়নি বলে স্বামীর পরিবর্তনের সুখকে পরম-পাওয়া মনে করেছে, তাই তার স্বামী কেন পরিবর্তিত হয়েছে সেই প্রশ্নেই উদ্বেল কথিকা। এটা তার শ্রেণী অবস্থান থেকে উৎসারিত। এই দিক থেকে দেখলে লেখিকার উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল নামকরণের ক্ষেত্রে। এই কেন প্রশ্ন গল্পটির চাবিকাঠি. লক্ষণীয় বিষয় কথিকা গল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে কোন 'কেন' সুলভ প্রশ্ন রাখেনি। যুক্তির মূল পরাকাষ্ঠা 'কেন?' শব্দ উনিশ শতকে প্রবলভাবে এলেও যুক্তিবাদ সাধারণ নারীর মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই জীবন সংক্রান্ত কোনো রকম অসংগতিতে 'কেন?' জাতীয় প্রশ্ন করা তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। অথচ অদ্ভুতভাবে জীবনের ক্ষেত্রে যা অস্বাভাবিক, দাম্পত্যচর্চাকে দূরে ঠেলে স্বামীর অন্য নারীতে আসক্ত হওয়া, তার পরিবর্তনে 'কেন?' প্রশ্ন জেগেছে কথিকার মধ্যে, স্বর্ণকুমারী দেবী আসলে কোন অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত ঘটনার দিকে 'কেন?' প্রশ্নটিকে ছুঁড়ে দিতে চাননি। পরিবর্তে 'কেন?'—তার মধ্যে দিয়ে জীবনের পাওয়া না পাওয়ার ভুল হিসেবকে (উনিশ শতকের নারীর কাছে যা তখনো পর্যন্ত ঠিক হিসেব বলেই বর্তমান ছিল) প্রকাশ করতে চাইলেন লেখক। তাই 'কেন?'-র উত্তর কথিকার মতো সমসাময়িক নারীরা এভাবে কোনদিনই পায়নি।

তবে গল্পের অন্তর্গত মূল ঘটনাটিকে উপলব্ধি করতে হলে 'কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখানে উপর উপর একটি ঘটনা রয়েছে। মনে হতে পারে স্বপ্নে পাওয়া মাকালীর জবা ফুলের প্রভাবে কালীঘাটে পুজো দেওয়ার ফল স্বরূপ মাকালী কথিকার স্বামীকে সুমতি দিয়েছেন এবং অনেকটা অলৌকিকভাবে অপরিচিত বৃদ্ধা কথিকার গহনাগুলি ফেরত দিয়ে যায়। অলৌকিক ভাবেই কথিকার স্বামীও পরিবর্তিত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কালীঘাটের মন্দিরে দেখা হওয়া রমণী কথিকার জীবনের গল্প শোনে এবং লেখক অব্যক্ত উচ্চারণে জানিয়ে দেন ওই রমণী কথিকার স্বামীর আকাঙ্ক্ষিতা নারী। সে অনুভব করে কথিকার বেদনা, তার সক্রিয় চেষ্টাতেই কথিকা সমস্ত গহনা ফিরে পায় শুধু নয়, কথিকার স্বামীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ওই নারীর সক্রিয়তা রয়েছে। গল্পকার দেখাননি যে সেই নারী কথিকার স্বামীকে কী বলেছিল বা তার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে। তবে একথা অনুমান করা যায় সুব্যবহার আর দুর্ব্যবহার-ই হোক সত্যাচার বা মিথ্যাচারই হোক ওই নারীর ভূমিকাই এক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে আছে। কারণ গহনা ফেরত পাওয়ার কথা জানার পর কথিকার স্বামী 'অন্যদিনের মত চলিয়া গেলেন' এবং ফিরে আসে আমূল পরিবর্তিত হয়ে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই তার কাছে সেই অন্যনারী স্ত্রীর প্রতি

ভালোবাসার কথা প্রকট করে তুলতে সক্ষম হয়। সুতরাং পাঠক যেমন 'কেন?'-র উত্তর পায় এভাবেই, সমসাময়িক নারীর প্রতিনিধি কথিকা তেমনই 'কেন?'-র উত্তর পায় না। আর এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটায় গল্পটির শিরোণাম।

'কেন?' গল্পটি প্রকাশ পায় 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১২৯৮ আষাঢ় সংখ্যায়। অবশ্য গল্পটি রচনার ইতিহাস অনেক পূর্বের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানতে পারা যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী বিবাহের (১৮৬৭) পূর্বে কতকগুলি 'ছোট ছোট গল্প' রচনা করেছেন। শিশিরকুমার দাসের মতে,—

"সম্ভবত ঐতিহাসিক অর্থে তিনি (স্বর্ণকুমারী দেবী) রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বসূরী।"
[বাংলা ছোটগল্প, ১৮৭৩-১৯২৩]

ছোটগল্পকে 'ছোট ছোট গল্প', কখনো 'নবকাহিনী' নামে চিহ্নিত করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। আধুনিক ছোটগল্পের যে রীতি পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায়, তার সার্থক সূচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ছোটগল্প কেবলমাত্র আয়তনের দিক থেকে যে ছোট তা নয়, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে তা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল প্রাক্ রবীন্দ্রনাথ পর্বেই, স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা এই মন্তব্যকে প্রমাণ করে। প্রসঙ্গত 'কেন?' গল্পটির শিল্পরূপ বিচারের অপেক্ষা রাখে।

'কেন?' গল্পে জীবনের তাৎপর্য কতটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে সে আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি। আর একথাও স্বীকার করতে হয়, সেই তাৎপর্য একতম বক্তব্যে এক সংকটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পের কথিকার সংকট তার স্বামীর স্বেচ্ছাচার, কিন্তু একইসঙ্গে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীর শ্রেণী অবস্থানের চিত্র মুখ্য হয়ে ওঠে—খণ্ড ঘটনা সমাজ কাঠামোয় নারীর শ্রেণী অবস্থানের অখণ্ড রূপটি ফুটিয়ে তোলে।

খণ্ড ঘটনা সম্পন্ন কাহিনী অনেকটাই আকস্মিকভাবে সূচিত হয়। তাই ছোটগল্পের সূচনায় দেখা যায় আকস্মিক বাক্য,—

'সংসারের স্বামীর ভালোবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ?' 'কেন?' গল্পের ভনিতাহীন সূচনায় বোঝা যায়, ঘটনাটির সূচনারও সূচনা আছে, পাঠক নিজের মত কল্পনা করে নেবেন, সেই কল্পনাকে পল্লবিত করার কয়েকটি সূত্র অবশ্য গল্পের মধ্যে আছে,— কথিকার স্বামী মাঝে মাঝেই বাড়িতে থাকে না, এবার ১৫ দিনের মত বাড়িতে আসে নি, অন্য এক মহিলার প্রতি আসক্ত, স্ত্রীর গহনা পর্যন্ত নিয়ে যায়।

ছোটগল্পের পরিসর সীমিত হওয়ার কারণেই গল্পকার এক বিশেষ শিল্পরীতি অবলম্বন করেন। সূচনা থেকে দ্রুত ও স্পষ্টত মূল সংকটে পৌঁছে যান। এখানে মুখ্য সংকট কথিকার স্বামীকেন্দ্রিক সমস্যা, তাই লেখক গল্পের প্রথম বাক্য থেকে সমস্যাকে ঘনীভূত করে তুললেন।

গল্পটির তিনটি পর্ব—অতিসীমিত পরিসরে পর্বগুলি বিনাস্ত, ঘটনা বিশ্লেষণের পরিবর্তে গল্পকার রেখাচিত্র অঙ্কনে প্রয়াস পান। ঘটনা নয়, সংকটই মুখ্য হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে।

ছোটগল্পের শিল্পরীতি অনুযায়ী স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পটির কাহিনীকে দ্রুত উপসংহারে পৌঁছে দেবার প্রয়াস পান। ছোটগল্পের উপসংহার উপন্যাসের মত ধীর লয়ে পরিণতি পায় না, ঋজু ভঙ্গিতে কাহিনী ধাবিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী 'কেন?' গল্পের কাহিনীর প্রথম দুটি

পর্বে উপসংহারের কোন আভাস দেননি। শেষ পর্বটিতে অতিদ্রুত ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয়েছে, গহনা ফিরে পাওয়া, স্বামীর ফিরে আসা এবং স্বামীর হঠাৎ বদলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে কাহিনী উপসংহারে পৌঁছে যায়।

উনিশ শতকে নারীর শ্রেণী-অবস্থান অনুযায়ী কথিকার সংকটের কোনো সমাধান সম্ভব নয়। কথিকার সমস্যা বা সংকটের সমাধান হলেও নারীর এ জাতীয় সমস্যা আজও বর্তমান। তাই একথা ভাবলে ভুল হবে, নারীর সর্বংসহা চরিত্রই পারে পুরুষকে বদলে দিতে। কথিকার ঘটনা ব্যতিক্রম মাত্র, গল্পকার অন্তত এই সমাধানে পৌঁছতে চাননি। গল্পের শেষে 'কেন?' প্রশ্নটিকে দ্বিমাত্রিক রূপে দেখা যেতে পারে। একদিকে কথিকার মনের প্রশ্ন, অন্যদিকে সমাজ কাঠামোয় নারীর শ্রেণী অবস্থানজনিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাঠকের মনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে এই জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার কোনো সমাধান নেই।

ছোটগল্পের পরিসর সীমিত হওয়ার জন্যই গল্পের প্রতিটি চরিত্র বিশ্লেষিত না হয়ে রেখাঙ্কিত হয়। খুব বেশি পরিচয় তাদের থাকে না। যেমন এখানে কথিকা সাধারণ গৃহবধূ, যে সর্বংসহা হিসেবে চিত্রিত। কথিকার শাশুড়ি সম্পর্কে গল্পকার বিশেষ মন্তব্য করেননি। কেবলমাত্র জানা যায় যে তিনি কৌশল্যার মতো পুত্রবধূর দুঃখে কাতর। কথিকার স্বামী সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তার চরিত্রের বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই। স্বেচ্ছাচারী, পরনারী আসক্ত এই মাত্র। তবে এখানে আর একজন নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে যে গল্পের ঘটনাগত পরিবর্তনের নিয়ন্তা, যে কথিকার স্বামীর অন্য নারী। কথিকার বেদনায় তার সংবেদনশীল হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। আর তাই কথিকার দাম্পত্যজীবনকে সুন্দর করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই নারী সম্পর্কেও গল্পকার কোনোরকম পরিচয় রাখেননি। আসলে ছোটগল্পের সংকট যেহেতু বক্তব্যে নিটোল হয়ে সংবদ্ধ থাকে, যেহেতু প্রতীতি (impretion) মুখ্য হয়ে ওঠে, সেহেতু ছোটগল্পে ঘটনা বা চরিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ সম্ভব হয়ে ওঠে না, স্বর্ণকুমারী দেবী তাই ছোট্ট একটি ঘটনাকে চিত্রিত করে বিশ্লেষণহীন ভাবেই সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে আঙুল নির্দেশ করেন। আব এখানেই সার্থক হয়ে ওঠে 'কেন?' গল্পের শিল্পকৌশল।

মিউটিনি : স্বদেশানুরাগের প্রতিবিম্বন

অনুজা শেঠ

রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীর লেখা সম্পর্কে কোনোদিনই খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। রানী চন্দের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি একদা জানিয়েছিলেন—"আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম। সংসারের বাধা বিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের brain এতটা কাজ করতেই পারে না।"[১] অধিকাংশ গুণিজনও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন, যে মেয়েরা মন নিয়ে কারবার করে—মননের সঙ্গে তাদের চির শত্রুতা। স্বর্ণকুমারীও জানতেন সে কথা। তাই 'ভারতী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ লিখেছিলেন—"যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে, তাহারা পাগল, কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্তত অর্ধেক—নারীজাতি।" নারী বলেই বোধহয় স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্র-সমোচ্চতায় উঠতে পারেননি. কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিন্দুমেলা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির নিজস্ব আবর্তে যে স্বদেশচেতনার জাগরণ ঘটেছিল তাতে অবগাহন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো স্বর্ণকুমারীও। তাঁর চেতনাতেও জন্ম নিয়েছিল এক 'বোধ', যা তাঁকে ক্লান্ত না করে হয়েছিল ভাবনামূলক সাহিত্য সৃজনের প্রেরণাস্থল। 'মিউটিনি' গল্পের উৎসার এখান থেকেই।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায় গল্পটির প্রথম প্রকাশ, পরে 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থে স্থান লাভ। বর্তমানে 'মিউটিনি' নামে গল্পটি অধিক পরিচিত হলেও স্বর্ণকুমারী এর নাম দিয়েছিলেন 'ছোটখাট মিউটিনি'। নিজের দেহরক্ষিদের মধ্যে ছোটখাট বিবাদ কী ভাবে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এক ইংরেজ রমণীর মূর্ছা যাওয়ার হেতু হয়েছিল, তাই গল্পের মূল বিষয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে এই গল্পের সিপাহী বিদ্রোহের কোনো তুলনাই হয় না। তাই বোধহয় 'ছোটখাট' শব্দটির সচেতন প্রয়োগ। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এই যে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহের তকমা দেওয়া হলেও তা কখনোই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান ছিল না। স্বর্ণকুমারীও সে কথা জেনে লিখেছিলেন—"ইংরাজ যদি আজ প্রজাদমন অভিপ্রায়ে তোপের মুখে সমস্ত ভারতবাসীকে উড়াইয়া দিতে চায়— আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা তাহার প্রতিরোধ করি। বোম্বাই সহরের প্রজা বিদ্রোহে কি ঘটিল? বস্তুত তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর, ন্যায় বিচারের ওপরেই আমাদের একান্ত ভরসা।" (কর্ত্তব্য কোন্ পথে?)। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ যেমন ছিল অন্তঃসারশূন্য তরবারির ঝলকানি তেমনি গল্পে সিপাহীদের যে বচসার খবর রয়েছে, তা কখনোই যথার্থ বিদ্রোহ নয়। তবু গল্পনামে এসেছে তার চমক। এ যেন ব্যঙ্গেরই কষাঘাত। এই কষাঘাত আরো তীক্ষ্ণ হয় 'ছোটখাট' শব্দটি বর্জনে।

গল্পটির কথাবস্তুর উল্লেখ প্রসঙ্গত বাঞ্ছনীয়। মূল কাহিনীর আগে একটি উপকাহিনী জুড়ে দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী, যা তাঁর স্বদেশানুরাগের পরিচয়বাহী । বম্বে প্রদেশে এক উচ্চ অভিজাত ইংরেজ গৃহে কেতাদুরস্ত কিছু দেশী-বিদেশী নরনারী আপ্যায়িত হয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত বিদেশিনীরা

প্রত্যেকেই নিজের জাতির গৌরবে গরবিনী এবং তাঁদের কথায় আত্মম্ভরিতার সাড়ম্বর প্রকাশ। লেখিকা তাঁদের কোনো ব্যক্তি নামে চিহ্নিত না করে মিসেস এ, মিসেস বি, মিস সি বলে টাইপ চরিত্রে পরিণত করেছেন। মিসেস এ সগর্বে বলেছেন—"তিনজন ফ্রেঞ্চম্যান পাঁচজন জর্ম্মানের সমান, আর একজন ইংরাজ সেই তিনজন ফ্রেঞ্চম্যানের সমান।" এমনকি কানহোজি আঙ্গ্রিয়েকে তাঁর মনে হয়েছিল pirate অর্থাৎ দস্যু। আংরে আঁধারী এবং কান্ডারী দুর্গে তার বন্দীদের রাখতো। পেশোয়া, ইংরেজ, মুসলমান, পর্তুগীজ কেউ-ই তাকে পরাভূত করতে পারেনি। লেখিকার মনে হয়েছে—"একজন স্বাধীন ইংরাজের পক্ষে যাহা বীরত্ব, একজন দাস নিগরের পক্ষে তাহা ঘৃণ্য সাহস—দস্যুতা নয় ত আর কি!" আসল কথা হল অন্য জাতির 'উন্নত শির' অবলোকনে শাসক ইংরেজের অনীহা। অথচ তারা নিজেরা যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে ভারতবর্ষকে পিষ্ট করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা স্থাপন করতে চেয়েছে তা আখেরে দস্যুতারই নামান্তর। যখন অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় ইংরেজ প্রভুর পদলেহনে ব্যস্ত, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে স্বর্ণকুমারীর এ হেন বক্তব্য অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখে।

এরপর দস্যুতার সূত্র ধরে জনৈক স্কচললনা মিস সি'র ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং মিসেস এ'র একবার মিউটিনিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বর্ণন। গৃহকর্ত্রী কথিত কাহিনীই হল গল্পের মূল বিষয়। লেখিকা এ ব্যাপারটায় বেশ মজা পান। গল্প শোনা সাঙ্গ হলে তিনি হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝে পান না, বলেন—"এ কথার সত্যতা পাঠককে অনুভব করাইবার ইচ্ছায় আমরা এখানে তাঁহার মুখ দিয়াই গল্পটি পুনরাবৃত্তি করিতেছি, —যদি কৃতকার্য না হই তবে সে আমারই বর্ণন অপটুতা।" লেখিকার এই বক্তব্যই গল্পের চরম মুহূর্ত। মূল কাহিনী শোনার পর পাঠকেরও কান্না এবং হাসির মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। যে মিসেস এ আংরেকে দস্যু বলেছেন, নিজের জাতির বীরত্বের গৌরবে স্ফীত হয়েছেন, তিনিই—আবার সিপাহীদের সামান্য তর্কাতর্কিতে মূর্চ্ছা গেছেন। তীব্র বিদ্রূপের খোঁচায় স্বর্ণকুমারী উক্ত ইংরেজ সাহেবাকে বিদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় মিউটিনির যথার্থ মিউটিনি হয়ে উঠতে না পারার অক্ষমতায় হয়েছেন পীড়িত।

গৃহকর্ত্রীর স্বামী 'শঙ্করের আসিস্টেন্ট কালেক্‌টার' নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে মাঝে মাঝেই বঙ্গের বাইরে যেতে হত। একবার এমন হল যে পুলিসকর্তা তাঁর সিপাহীদের দিয়ে মিসেস এ' কে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে চাইলেন। নিজের 'বাঙ্গলো'য় যথেষ্ট দাস দাসী ও সিপাহী থাকায় তিনি পুলিসকর্তার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। শুধু সিপাহীদের সংখ্যাধিক্য নয়, তাদের ব্যবহারিক গুণাবলীতেও তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর মতে, "আমাদের দেশের তুলনায় এ দেশের ছোট লোকেরা সৈনিকেরা বহু গুনে শিষ্ট শান্ত; এবং চাকর দাসীরা নির্ব্বোধ ত নহেই অধিকন্তু খুবই প্রভু-পরায়ণ।" রবীন্দ্রনাথ যেমন একদা দেশীয় ভদ্রলোকদের বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন—

> "ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ- মানা এ প্রাণ
> বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।" (দুরন্ত আশা)

শুধু ভদ্রলোক নয়, দেশের সাধারণ মানুষও যে তখন নিদ্রামগ্নই ছিল তার প্রমাণ রয়েছে উপরোক্ত উক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের জনসমাজ 'কর্তাভজা।' এখানে স্বর্ণকুমারী

তাদের বলেছেন 'প্রভুভক্ত'। প্রভুর ইচ্ছায় কর্ম করাই তাদের নিষ্ঠুর বিধিলিপি। সুতরাং ইংরেজ প্রভুর বশ্যতা না করে তারা বিদ্রোহে সামিল হবে তা 'নৈব নৈব চ।'

কিন্তু গভীর রাতে 'ভয়ানক কলরবে' গৃহকর্ত্রী ১৮৫৭ সালের অনুরূপ একটি মিউটিনির সম্ভাব্যতায় শঙ্কিত হলেন। আয়ার সেবা পরায়ণ মুখশ্রী দেখেও 'Help' চাইলেন 'God'- এর কাছে এবং মূর্চ্ছিত হলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর দেখলেন তাঁর সেবা করছে সেই ভারতীয় আয়াই। পরে জানা গেল গল্পের মিউটিনির মূল হেতু ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল না। পুলিস কর্তার প্রেরিত সিপাইদের আগমনে মিসেস এ'র নিজস্ব সিপাইরা অসম্মানিত হয়েছিল। উপরন্তু গৃহকর্ত্রীর পাটাওয়ালাদের একজনের সঙ্গে আয়ার বিবাহ ঠিক হয়েছিল। পুলিস সিপাহীদের মধ্যেও আয়ার এক প্রণয়ী ছিল, যাকে দেখে আয়ার ভাবী স্বামী ক্রোধান্বিত হয়। "প্রণয়ীদ্বয়ের এই ঈর্ষা- স্ফুলিঙ্গেই সে রাত্রের দুই পক্ষের সিপাহীগণের বিদ্বেষানল প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।"

দুটি বাক্যে না ধরে এই ত্রিভুজ প্রেমকেই গল্পের মুখ্য উপজীব্য করলে গল্পটিও যেমন সংহত হত তেমনি নামকরণের ব্যঞ্জনাও হত সুদূর প্রসারী, এমন অভিমতও ব্যক্ত হয়েছে সমালোচক মহলে। কিন্তু দেশে-দেশে, কালে-কালে যে চিরন্তন ত্রিকোণ প্রেম মিউটিনির সৃষ্টিকর্তা, তাকে লেখিকা মরমে উপলব্ধি করলেও এ গল্পে বিশেষ আমল দিতে চাননি। যে আর্থিক— সামাজিক— রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তৎকালীন ভারতবর্ষ, সেই পরিস্থিতিতে সংকীর্ণ দলাদলি ভুলে জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়াই প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। স্বর্ণকুমারী নিজেও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। ১৮৮৯-এ বোম্বাইতে এবং ১৮৯০-এ কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ১২৯৩ সালে 'সখি সমিতি' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করে দেশহিতকর কার্যসাধনের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সঠিক পরিকল্পনা এবং যথার্থ অভিপ্রায়ের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল—এই বেদনা ভারতীয় হিসেবে স্বর্ণকুমারীর কাছে ছিল বিরাট আক্ষেপের বিষয়। কাজেই মিসেস এ'র বাংলোয় সিপাহিদের পরাধীনতার জ্বালায় ফুঁসে ওঠা নয়, একজন আয়াকে ঘিরে মনোমালিন্যের ব্যাপারটিকে স্বর্ণকুমারী বিদ্রূপ করার জন্যই সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরে গল্প-কথন শেষ করেছেন।

অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ গল্পটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"'মিউটিনি' গল্পটির মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম কৌশলের অবতারণা নেই. পরিণতির মধ্যে কোনো দূর-সঞ্চারী ব্যঞ্জনাও নেই।" যথার্থ প্লট বা আখ্যান রচনা করতে না পারার দুর্বলতাকে মেনে নিলেও এখানে স্বর্ণকুমারীর যে নিজস্ব স্বদেশানুভব ব্যক্ত হয়েছে, তার আবেদন নাকচ করা যায় না। ডঃ দাশ সার্বিক বিচারে স্বর্ণকুমারীর গুণ হিসেবে সুরুচি এবং আভিজাত্যকে নির্দেশ করেছেন এবং "তাঁর রচনার মধ্যে সর্বত্রই একটি নিভৃত বেদনার সমাগম" লক্ষ্য করেছেন। 'মিউটিনি'র মধ্যে পূর্বাপর এই রুচিশীলতা অক্ষুন্ন থেকেছে এবং গল্পটির কায়া নির্মাণে আভিজাত্য বোধ স্পষ্ট হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষিত-সচেতন-সুচিন্তক ভারতীয় রূপে পরাধীনতার যে যন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তে তিনি পীড়িত হয়েছেন, সেই 'নিভৃত বেদনার সমাগম' গল্পটিকে করে তুলেছে অনবদ্য।

'মিউটিনি' তাই শুধু সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংরেজ রমণীদের এক গল্প হয়ে থাকেনি।

বিদ্রোহের বিভীষিকা ও অপরিচিত ভারতবর্ষের প্রতি মেমসাহেবদের সদা শঙ্কিত মনোভাব দুয়ে মিলে কাহিনীতে রোমাঞ্চকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। মিসেস এ কথিত গল্পটি অন্যান্য বিদেশী রমণীদের কতখানি রোমাঞ্চকর অনুভূতি দান করেছিল সে আলোচনা অবান্তর। কিন্তু তা ভারতীয় লেখিকার কাছে হয়ে উঠেছিল আমোদের বিষয়। আর এই আমোদের অন্তরালে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে আহত সত্তার নীরব ক্রন্দন। দেশীয় সিপাহী আছে সত্য, আছে তাদের হাতে অস্ত্রও। তাদের সামান্য হাতাহাতি, টোটা চালাচালিতেই ইংরেজ রমণী কল্পনা করে নিতে পারেন 'মিউটিনি'র রোমাঞ্চকর পরিবেশ এবং তাতে আক্রান্ত হওয়ার কথা। কিন্তু তবু সত্য হয় না 'মিউটিনি'—সার্থক হয় না পরাধীনতার গ্লানি মোচন। এই বেদনাই স্বর্ণকুমারীর 'মিউটিনি' গল্পটিকে সার্থক স্বদেশ প্রীতির গল্প করেছে।

ছোটগল্প সমগ্রতার অভিসারী নয়, জীবনের কোনো খন্ডাংশে চোরালণ্ঠনের মত তার আলোক ক্ষেপন। মিসেস এ'র জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে লেখিকা Flash back রীতিতে উপস্থাপিত করেছেন পাঠকের সামনে। মিসেস এ'র অবচেতন মনে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের একটি আশঙ্কা সুপ্ত ছিল। তাই স্বামীর অনুপস্থিতিতে সিপাহীদের হট্টগোল শুনে তাঁর মনে হয়েছে মিউটিনির কথা। জীবনের সংকটময় মুহূর্তে গাল্পিক চরিত্রের যে বিশেষ উপলব্ধি ঘটে জেম্‌স জয়েস তাকে বলেছেন apiphany। কিন্তু মিসেস এ'র সেরকম গভীর কোনো উপলব্ধি জাগেনি, উপরন্তু তাঁর সংকট ব্যক্তিক বা সামাজিক সংকট নয়, পুরোটাই সকপোল কল্পিত বা মনগড়া ব্যাপার। তাই এই ঘটনাকে কখনোই apiphany বলা যাবে না। তবে এর যে একটা মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে তা অনস্বীকার্য। তৎকালীন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মনস্তত্ত্ব সম্মত চরিত্র সৃষ্টি করে স্বর্ণকুমারী এক অনন্য নজির রেখেছেন। হাস্যকর হযেও মিসেস এ'র চরিত্রে তাই অস্বাভাবিকতার কালিমা সিঞ্চন করা যায় না।

অতিথি অভ্যাগতাদের সামনে মিসেস এ নিজেকে উচ্চকোটির সুসংস্কৃত রমণী হিসাবে প্রকাশ করার যে প্রয়াস করেছেন, তাতে লেখিকা প্রথমে হীনমন্যতায় ভুগেছেন। সতীস্তম্ভে সতীদের আত্মদানের মহত্বকে গৃহকর্ত্রী চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার নিজের বুদ্ধি বিভ্রমতার গল্প বলে তিনি নিজেই নিজেকে উপহাসের পাত্রী বানিয়েছেন। এবং এই সত্য স্বরূপ ভারতীয় লেখিকার দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়েছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁকে অসহায়, ভীত স্ত্রীলোক ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। ছোটখাট মিউটিনিতেই তিনি কুপকাৎ, বড়সড় মিউটিনি হলে কি করতেন এটাই স্বর্ণকুমারীব কৌতুকময় প্রশ্ন। 'ছোটখাট মিউটিনি' নামকরণে এই প্রশ্নেরই দ্যোতনা।

গল্প পাঠে স্পষ্ট হয়েছে সিপাহীদের মধ্যে যে মারামারি হয়েছে তা প্রভুদের নির্দেশে নয়, এমনকি প্রভুদের বিরুদ্ধেও নয়। দুই পক্ষের সিপাইদেরই লক্ষ্য ছিল গৃহকর্ত্রী বিদেশিনীকে রক্ষা করা। কিন্তু বিদেশিনী ভাবলেন রক্ষকই ভক্ষক । অথচ তা সত্য নয়। উভয় দলেরই মর্যাদা রক্ষার ছোটখাট লড়াই ছিল এটা। ১৮৫৭-র মিউটিনিও ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম ছিল। হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের দাঁত দিয়ে যে টোটা টানতে হত তাতে গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহারই ছিল অসন্তোষের কারণ। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসম্মান রক্ষার একটা তাগিদ আছে, কিন্তু কোথাও-ই দেশরক্ষার গরজ নেই ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মানস পূর্বাপর সক্রিয় ছিল। 'ভারতী' সম্পাদনার প্রথম পর্বে তিনি জানিয়েছিলেন—"রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করা ভারতীর একটি উদ্দেশ্য।" (রাজনৈতিক আলোচনা)। সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় তিনি 'মিউটিনি' গল্পটিও লিখেছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সম মর্যাদায় আসীন হতে গেলে আগে নিজেদের জাতিকে সুগঠিত হতে হবে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এদিক ওদিক ঘটে যাওয়া দুচারটে ছোটখাট মিউটিনি কোনো মহৎ কার্য সিদ্ধি করতে পারে না। প্রকৃত অর্থে "আমাদের গোড়াতেই গলদ। জাতিগঠনের প্রকৃত চেষ্টা আমাদের নাই বলিলেই হয়। চরিত্রবান বৃদ্ধির চেষ্টাই প্রকৃত জাতিগঠনের চেষ্টা।" তাঁর মতে "উত্তেজনার মুহূর্তে প্রাণদান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব; কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক।" তাহলে ইংরেজরা দস্যু বলে ঘৃণাও করতে পারবে না, আবার 'প্রভুভক্ত' বলে আয়েস করতেও কুণ্ঠিত হবে।

আপাতদৃষ্টিতে পুরো গল্পটাকে হাস্যরসাত্মক মনে হলেও এর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে মিউটিনি সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতেই একটি কার্য- কারণ সম্পর্ক থাকে। এখানেও পুলিস কর্তা তাঁর সিপাইদের পাঠানোর ফলে মিসেস এ-র সিপাইদের আত্মসম্মানবোধ আহত হয়। আর সেখান থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। কিন্তু এই কার্য-কারণ সম্বন্ধ না জেনেই মিসেস এ কামানের শব্দে, অস্ত্রের আওয়াজে তাকে মিউটিনি করে তোলেন। এর ফলে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস বা উইটের সৃষ্টি হয়। এই প্রথমে ভয়ঙ্কর পরে হাস্যকর মিউটিনিকে নামকরণে স্থান দিয়ে লেখিকা তাঁর Irony বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব মননের আধারে মূল মিউটিনির সঙ্গে ছোটখাট মিউটিনির তুলনা করে ভারতীয় সিপাহীদের মূঢ়তায় ব্যথিত হয়েছেন। মেয়েলি আলাপ- চারিতার সীমা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন গল্পের বিষয়কে। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র দেশ কালকে ধরার অভিপ্রায়ে 'মিউটিনি ' হয়ত ছোটগল্পের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে স্বর্ণকুমারীর স্বদেশানুরাগের যথার্থ প্রতিবিম্বন।

তথ্যনির্দেশ

১ ভূদেব মুখোপাধ্যায় . পুত্র কন্যা ১৭ই জানুযারী ১৯৩৮ (আকর . পাবিবারিক প্রবন্ধ পৃ ৯২—৯৫)

২ সোমা পাল স্বর্ণকুমাবী দেবীব মিউটিনি (বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা সম্পাদনা - ডঃ হীবেন চট্টোপাধ্যায়)

৩. শিশিব কুমাব দাশ বাংলা ছোটগল্প।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা, প্রচারক ও লেখক। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, বিশ্ববিখ্যাত কবি। বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করলেও শেষপর্যন্ত স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি তিনি। এর জন্যে তিনি কখনো শিক্ষক, কখনো প্রতিষ্ঠান কখনো বা পাঠ্য পুস্তককে দায়ী করেছেন। কিন্তু গৃহশিক্ষক ও ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে ধীরে ধীরে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও গদ্যচর্চায় উৎসাহী করে তোলে। বাবার উৎসাহে যেমন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়েছেন, তেমনি তাঁরই নির্দেশে মধ্য ও উত্তরবঙ্গে জমিদারি দেখাশোনাও করেছেন। তাঁর কাব্য ও গদ্যচর্চায় এই অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লেগেছিল। মূলত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার সমস্যার সমাধানেই তিনি বাবার কেনা বোলপুরের জমিদারিতে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই আশ্রমই পরে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের যৌথ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এবং পরে বিশ্বভারতী হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়ে। আমৃত্যু তিনি যেখানেই থাকুন, এই বিশ্বভারতীর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়েই চিন্তা করে গেছেন।

কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, নাট্যচর্চা, অভিনয়, গদ্যচর্চা, পত্রিকা সম্পাদনা, জাতীয় ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বদেশী সঙ্গীতচর্চা রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় বহুমুখী প্রতিভা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। মূলত বিদেশি পাঠকের অনুরোধেই তিনি তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনার ইংরিজি অনুবাদ করেন ও হিতৈষীজনকে দিয়েও বেশকিছু রচনা অনুবাদ করান। সেই সব অনুবাদ বিদেশের পরিচিত বন্ধুদের (তার মধ্যে ডবলু. বি. ইয়েটস্ অন্যতম) নজরে পড়ে এবং তাঁদেরই কয়েকজন নোবেল কমিটির কাছে তাঁকে পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করেন। ১৯১৩ সালে প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এই পুরস্কার তাঁকে সমস্ত পৃথিবীর পাঠক সমাজের সামনে পরিচিত করে দেয় song off sings-এর কবি হিসেবে। ইয়োরোপ, অ্যামেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ), রাশিয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, সিংহল ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ তাঁকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি বিচিত্র বিষয়ে, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণ আমাদের অনেকখানি উপকৃত করেছে।

কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, নাট্যচর্চা, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য চর্চা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা, গল্প-উপন্যাস চর্চা, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর চিন্তা তাঁর মৃত্যুর প্রায় সত্তর বছর পরেও খুবই প্রাসঙ্গিক।

উপন্যাস-রচনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের আশির দশক থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর গল্পগুলি প্রথমদিকে ছোট ছোট সংকলন হিসেবে প্রকাশ পেলেও পরে 'গল্পগুচ্ছ' সংকলনে একত্রিত হয়। উনিশ শতকে যখন তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন তখন খুব কম লেখকই এই গল্প-সাহিত্যকে শিল্পকর্ম হিসেবে চর্চা করতেন। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি এবং উনিশ বিশ শতকের বিদেশি গল্পলেখকের রচনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

নষ্টনীড় : বাংলা গল্পের ধ্রুবতারা
প্রণয়কুমার কুণ্ডু

দস্তয়েভস্‌কি বলেছেন যে নিকোলাই গোগোলের ওভারকোট থেকে রুশ লেখকদের উদ্ভব হয়েছে। এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোগোলের আরো দুটি বিখ্যাত রচনা ইনসপেক্টর জেনারেল ও ডেড সোল-এর কথা মনে রেখেই তিনি এমন একটি অর্থবহ মন্তব্য করেছেন, যা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। দস্তয়েভস্‌কি নিজে একজন বড় মাপের লেখক। কাজেই অন্য এক লেখক সম্পর্কে তাঁর অভিমত যে নিছক কোনো সমালোচনা নয়, তা বলাই বাহুল্য।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের সাহিত্যে আমরা কোনো দস্তয়েভস্‌কির সমতুল্য লেখকের দেখা পাইনি যিনি বলতে পারতেন রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্পের ভগ্ননীড়ের ভিতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে উত্তরকালের বাংলা গল্পের ধারা। বস্তুত, ওভারকোট রুশ সাহিত্যে যে স্থান ও মর্যাদা পেয়েছে, নষ্টনীড়ও আমাদের সাহিত্যে সেই দাবি রাখে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে, গোড়াতেই তা জানিয়ে রাখা গেল।

নষ্টনীড় কিন্তু গল্প নয়, ছোটগল্পের প্রকৃতি অনুসারে ছোটগল্প তো নয়ই, বরং ওভারকোটের মতোই একটি ন্যুভাল। সব দিক থেকেই। আয়তনের দিক থেকে এই ন্যুভাল দুটির পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫ ও ৪১ অর্থাৎ আকার প্রায় সমান। অবিশ্যি তাদের মধ্যে আর কোনো মিল নেই, থাকার কথাও নয়। তবু যে নষ্টনীড়ের আলোচনায় ওভারকোটের প্রসঙ্গ তুলেছি তার কারণ দস্তয়েভস্‌কির উপরোক্ত মন্তব্য যা অনেকাংশে নষ্টনীড় সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে। দস্তয়েভস্‌কি বলতে চেয়েছেন যে ওভারকোট লেখকদের সামনে সাহিত্য-সৃষ্টির যে আদর্শ তুলে ধরেছে তা লেখকদের পক্ষে সর্বকালীন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কথাসাহিত্য ও উপন্যাসকে পৃথকভাবে দেখা হয়। য়ুরোপীয় আদর্শে উপন্যাস হচ্ছে বাস্তব জীবনভিত্তিক কল্পনাবিহীন রচনা। অ্যান্টনি ট্রলোপ বলেছেন যে উপন্যাসের চরিত্র হবে জীবন্ত সব মানুষ : "এটা এমনিই যে আমি আমার চরিত্রদের সঙ্গে বাস করতাম।" ওভারকোট হচ্ছে সেই রকমই একটি ন্যুভাল বা ছোট উপন্যাস যার হতভাগ্য নায়ক এমনি এক জীবন্ত চরিত্র, সোজাসুজি বাস্তব জীবন থেকে উঠে-আসা, এক ব্যর্থ সাধারণ মানুষের কাহিনী, যেখানে সামান্যতম কল্পনা-বিলাসের স্পর্শ নেই। এই কারণেই, ওভারকোট যেমন রুশ সাহিত্যে লেখকদের কাছে সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ হয়ে আছে, নষ্টনীড়ও তাব অভাবনীয় মৌলিকতার জন্যে বাংলা গল্পের ধারায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

বস্তুত, আমার চোখে এই কারণেই নষ্টনীড় বাংলা সাহিত্যের ওভারকোট। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে বিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই লেখাটি একদা উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে তা পূর্ণায়ত না হলেও ন্যুভাল তো বটে। এখন এই লেখাকে গল্পগুচ্ছে স্থান দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে, তাই নষ্টনীড়কে গল্প রূপেই গ্রহণ করছি। অন্তত এডগার এ্যালান পোর সংজ্ঞা মনে রেখে।

নষ্টনীড় ভারতীতে ১৩০৮ সালে বৈশাখ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে, একটু আগে বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল চোখের বালি। 'আঁত্রের কথা' চোখের বালি 'আধুনিকতার' প্রবর্তক রচনা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই যে নষ্টনীড় নিয়ে আলোচনায় কেউ কখনো এই গল্পের গুরুত্ব কোথায় তা দেখাননি। বরং, পরে রচিত স্ত্রীর পত্র নিয়ে অনেককেই মাতামাতি করতে দেখা গেছে, মৃণালের সঙ্গে ডোরার তুলনা করা হয়েছে।

নষ্টনীড় লেখার আগে রবীন্দ্রনাথ ৬৩টি গল্প লিখেছেন। সেগুলি ছোট ছোট প্রাণের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কথা নিয়ে লেখা নিতান্তই ছোটগল্প, যে নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। ছোটগল্প নামে তাঁর একটি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৪ সালে। বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের গল্পকে বলেছিলেন 'বস্তুতন্ত্রতাবিহীন।' কিন্তু, এইসব গল্পের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের জীবন থেকেই। অবিশ্যি একথাও সত্য যে ওইসব গল্প অনেকাংশেই বাস্তবতা ও কল্পনায় রচিত এক একটি কাহিনী। তারপরেই, অকস্মাৎ, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নষ্টনীড়। রুশ সাহিত্যে ওভারকোট যে চমক ও নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছিল, নষ্টনীড়ও বাংলা কথাসাহিত্যে সেইভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে।

দুই

কথাসাহিত্য হচ্ছে কথা নিয়ে রচিত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট জাঁর। তারই অন্যতম শাখা গল্প। এমন যে গল্প, তার প্রধান আকর্ষণ গল্প, টেল বা স্টোরি অর্থে। ফরস্টারের মতে গল্পই হচ্ছে কথাসাহিত্যের বা উপন্যাসের মুখ্য উপাদান। গল্পাংশ হচ্ছে তার মেরুদণ্ড। গুস্তভ ফ্লবেযার এর উল্টো কথা বলেছেন। তাঁর অভিমত এই যে গল্প না-থাকাটাই প্রধান গুণ। অ্যান্টনি ট্রলোপ জোর দিয়েছেন গল্পের ওপর। একজন লেখক যখন লেখেন তখন তিনি একটি গল্প বলেন, তাঁর কারণ আছে একটি গল্প, বলার জন্যে। ট্রলোপ এইভাবেই গল্পকে সমর্থন করেছেন। বস্তুত গল্প তৈরি হয় ঘটনা দিয়ে, তা সে যেমনই হোক না কেন। ঘটনা দু'রকমের হ'তে পারে—বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের, সাদামাটা কথায় বলতে গেলে বাইরের ও ভিতরের।

নষ্টনীড়ের আগে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে বাংলা কথাসাহিত্যের সবটাই দাঁড়িয়ে আছে বহির্জগতের ঘটনাপুঞ্জের ওপর। একটি নিটোল গল্প, ঘটনার ঘনঘটা, বিচিত্র চরিত্রমালা সৃষ্টি করাই ছিল লেখকদের লক্ষ্য, অর্থাৎ সবই ছিল গল্পপ্রধান রচনা। তখনকার পাঠক সমাজ লেখকদের কাছে সেটাই চাইতেন এবং সেইসব গল্প তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন। সেইসব গল্পের বেশির ভাগটাই যোগান দিয়েছে ইতিহাসের ভাঁড়ার, কখনো-সখনো সমসাময়িক সামাজিক কোনো কোনো ঘটনা, যেমন বিধবাবিবাহ। এখানেই শেষ কথা নয়। ওই সব ঘটনাপ্রধান বইয়ের গল্প বানাবার জন্যে লেখকরা দেদার নির্ভর করেছেন কল্পনার ওপর। ভাবতে পারা যায় কি—কপালকুণ্ডলা ও নৌকাডুবি স্রেফ বানানো গল্প? ওই সব রচনা যুধিষ্ঠিরের রথের মতো, জীবনেব ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলেছে, মাটির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের দৃষ্টি বাস্তবে যা ঘটে তার দিকে ছিল না কখনো, ছিল হলেও-

হ'তে-পারে ঘটনার ওপর। হওয়া ও হতে-পারের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। হ'লে-হতে-পারে যেহেতু কল্পনার সামগ্রী, তাই তার ওপর নির্ভর করে যা'ই রচিত হোক না কেন, তা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত বাস্তব জীবনচিত্র বা উপন্যাস হ'য়ে ওঠে না, হয় ফিকশন বা কথাসাহিত্য, যা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। বাঙালী লেখকরা আর কিছু না পারুন গল্প বানাতে ওস্তাদ। তাই বিস্তর ভারী-ভারী বই লেখা হয়েছে কিন্তু একটাও ওভারকোট বা 'দ্য ওল্ডম্যান এ্যান্ড দি সী' লেখা হয়নি। ওই সব লেখার প্রায় সবটাই বহির্জগতের কাল্পনিক গল্পমালা, অন্তর্জীবনের স্পর্শ আদৌ নেই। বলবার ভঙ্গীতে অথবা রচনাশৈলীর গুনে হ'লেও-হ'তে-পারে গল্প পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হলেও তা' জীবনের বাইরের চালচিত্র হ'য়ে ওঠে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। চোখের বালি ও নষ্টনীড়ের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যে, সেগুলি এই কারণেই অন্তর্জীবনের বা জীবনের ভিতরের কথা হয়ে ওঠেনি। আর, যাদের নিয়ে সেইসব কথা, তারা বড় মাপের আদর্শ চরিত্র হতে পারে, কিন্তু তারা কেউই বাস্তব জীবন্ত নরনারী বা মানুষ নয়। ফলত, নষ্টনীড়ের 'আগে কোনো গল্প জীবনের সত্য রূপ হ'য়ে ওঠেনি, হ'য়ে ওঠেনি ভিতরের কথাও।

গল্প হিসেবে নষ্টনীড়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা সর্বতোভাবে ভিতরের কথা। এই ন্যুভাল বা গল্পে প্রচলিত ধাবণায় বিধৃত কোনো বহির্জীবনের ঘটনা নেই, সবটুকুই অন্তর্জীবনের উৎসার। এমন একটি গল্পের আলোচনায় মনে রাখা দরকার যে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে এই দুটি বচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পিঠোপিঠি এই রচনা দুটির একটি নভেল, অন্যটি ন্যুভাল। একটু ভিতর থেকে দেখলে মনে হবে যে তারা পরস্পরের সম্পূরক অথবা পরিপূরক। লক্ষণীয় এই যে দুটি রচনাই বিশেষ পারিবারিক পরিধিতে সীমাবদ্ধ। পার্থক্য হচ্ছে চোখের বালির কাহিনীব পরিধি ব্যাপক, অন্যদিকে নষ্টনীড়ের পরিধি ছোট, একটি বৃত্তের মধ্যে সীমিত। এই বৃত্ত রচিত হয়েছে চারু-অমলের পারস্পরিক সান্নিধ্যে যেখানে দুটি সমবয়সী তরুণ প্রাণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক নিভৃত অন্তর্জীবনের আনন্দ-বেদনায় ভরা অনুপম এক জীবনচিত্র।

এই গল্পের পটভূমি বা প্রেক্ষাপট কলকাতার এক ধনী বনেদী পরিবার। ভূপতি ও চারুলতার সংসার ধনের প্রাচুর্যে আপন মহিমায় ভরপুর। এমন একটি পবিবাবের গৃহবধূ চারুলতার স্বভাবতই কোনো অভাব ছিল না। তার অভাবটা ছিল অভাবের অভাব। আর সেটা মেটাতে আনতে হয়েছে মন্দাকিনীকে। কিন্তু বিনা ভূমিকায় এসেছে অমল, পড়াশোনার প্রয়োজনে। যে সময়ে তরুণ দম্পতি পরস্পরের দৈহিক ও মানসিক আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে কাছে পায়, সেই সময় ভূপতি সংবাদপত্রের মধ্যে ডুবে থেকে চারুলতার কাছ থেকে দূরে সরে রইল। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করল অমল, গড়ে উঠল চারু অমলের জগৎ।

বাহ্যত তাদের সম্পর্ক বৌদি ও দেওরের। গল্পটি পড়তে পড়তে কিন্তু এই সম্পর্কের কথা মনে থাকে না। বরং পাঠক দেখতে পায় কীভাবে তারা দু'জনে একটু একটু করে নিভৃত সুন্দর একটি জগৎ গড়ে তুলেছে। তাদের পরস্পরের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে যে জগৎ রচিত হয়েছে সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রগাঢ় নিবিড়তায় তারা দু'জনে মিলে

একটি বাগান তৈরির স্বপ্নে মগ্ন থেকেছে দিনের পর দিন। চারুকে মেটাতে হয়েছে অমলের নানান ফরমাস, আব্দার। চারুর কাছে তা ছিল আনন্দের ও তৃপ্তির। মেয়েদের কাছে কিছু চাইলে মেয়েরা খুশি হয়। কারণ, দিতে পারাটাই মেয়েদের জীবনের পরম চরিতার্থতা। তারপরে এসেছে দু'জনের সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গ। অমলের প্রতীক্ষায় চারুর সময় কাটতে থাকে। কখনো-বা মান-অভিমানে দু'জনের বোঝাপড়ার মুহূর্ত তৈরি হয়। কিন্তু সব কিছুতেই থাকে দু'জনের ভূমিকা। এইভাবেই তাদের ওই একান্ত নিজস্ব নিভৃত জগৎটা গড়ে উঠেছে। এরই মধ্যে কখন যে তারা পরস্পরের মধ্যে নিমগ্ন হ'য়ে ভালোবেসেছে, তারা তা জানতেই পারেনি। কিন্তু পাঠকের কাছে তাদের সেই প্রেম চাপা থাকে না। প্রেম হচ্ছে বর্ষাকালের ছাতিম ফুল, সহজেই তার গন্ধ পাওয়া যায়। চারু যেন গ্যেটের সেই চিরন্তন নারী, এবং ম্যাথু আর্নল্ডের ফিলোমেলার ইটারনাল প্যাশনের প্রতিমূর্তি। অমলের জন্যে এই নারী তার অন্তরের গভীরে যে আসন পেতে রেখেছিল তার সবটুকুই ছিল অপূর্ব লাবণ্যে ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। পাঠক বুঝতে পারেন যে এই লাবণ্যময় মাধুর্যভরা প্রেমের অঞ্জলি সাজিয়ে চারুর প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুখ হ'য়ে থাকে অমলের কাছে আত্মনিবেদনের জন্যে।

গল্পের শেষে দেখি প্রতারিত সর্বস্বান্ত ভূপতি ফিরে এসেছে তার ঘরে, যে ঘর স্বেচ্ছায় সে ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারলো যে সেই ঘরে তার আর স্থান নেই। শুধু ঘরেই নয়, অসহায় ভূপতির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চারুর অন্তর্লোকে তার কোনো ঠাঁই নেই, সেখানে শুধু অমলের স্মৃতিমালা নিরন্তর জেগে আছে। অন্যদিকে অমল যখন বুঝতে পারলো ভূপতি-চারুর মাঝখানে সে কী মর্মান্তিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তখন সে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যেই বিলেতে চলে যায়। তাতেও অবিশ্যি সমস্যা মেটে না। বরং অমলের শূন্যতা চারুর কাছে আরো বেশি নিবিড় হয়ে ওঠে, অমলহীন গৃহে চারু অমলের স্মৃতিমালা বুকে চেপে ধ'রে দিন কাটায় অবরুদ্ধ যন্ত্রণায়। ভূপতি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে চারুর কাছে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। তবু, যখন সে চারুকে তার কর্মস্থলে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে, চারু তা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। ছোটগল্পে যেমন দেখি, ঠিক সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথ একটি অতর্কিত মোচড় দিয়ে নষ্টনীড় গল্পটি শেষ করেছেন।

বস্তুত, নষ্টনীড় গল্পে দু'টি নীড়ের কথা আছে। একটি ভূপতির, অন্যটি চারুর। ভূপতির নীড় প্রথাগত এক নীড়, সেটা তারই সম্পত্তির অন্তর্গত। কিন্তু চারুর যে নীড় তার বাহ্যিক কোনো অস্তিত্ব নেই, সেই নীড় রচিত হয়েছে চারু-অমলের অন্তরের গভীরে। এই নীড় একান্তভাবেই অন্তঃপুরের ও অন্তরাশ্রয়ী, তাই বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। কিন্তু দুটি নীড়ই অন্যোন্য। এবং দু'টি নীড়ই শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। ভূপতির নীড় নষ্ট হবার জন্যে সে নিজেই দায়ী। কিন্তু চারুর নীড় যে নষ্ট হয়েছে, তার জন্যে সে দায়ী নয়। অমলের প্রতি তার যে প্রেম এবং সেই প্রেমে রচিত যে নীড়, তাকে কোনমতেই অসঙ্গত ও নিন্দনীয় বলা চলে না। বরং তা সর্বতোভাবে মধুর ও সুন্দর। এই নীড় নষ্ট হওয়ার মধ্যে যে ট্র্যাজেডী নিহিত আছে, তা নির্মম ও মর্মান্তিক এক পরিণতি। ভূপতি ও চারুর নীড়ের মধ্যে পার্থক্য যা'ই থাক না কেন এবং নীড় দু'টি নষ্ট হবার মূলে যে কারণই থাকুক, দু'টি নীড়ই নষ্ট হয়েছে একসঙ্গে। তাই নষ্টনীড়।

তিন

নষ্টনীড় যখন লিখিত হয় তখন সে ছিল দোসরহীন। তার আগমন ছিল অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত। সে এসেছিল একা, সেইভাবেই প্রকাশ করেছিল নিজেকে। এদিক থেকে সে অন্যোন্য নয়, অনন্য। কোথায় তার সেই অনন্যতা, এবার তা দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, নষ্টনীড় গল্পের পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতায় বহির্জগতের চিহ্ন মাত্র নেই। এই গল্প প্রকৃতপক্ষে সেই কারণেই একটি ঘটনাবিহীন ঘটনার গল্প। চারু-অমলকে ঘিরে যা কিছু ঘটেছে সবই তাদের অন্তরের আকৃতি ও ছবি। রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই তাঁর সৃষ্টিকে বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে এনে তাঁর নায়িকা-নায়কের অন্তরে অবগাহন করেছেন। এরই অনুসরণে লেখকরা আর বাইরের ঘটনার সন্ধানে আগ্রহী নন, সেদিকে তাকান না। তার বদলে তাঁরা ডুবুরীর মতো জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনেন অন্তর্জীবনের ঝিনুক। এই অন্তর্মুখীন অভিব্যক্তিই এখনকার কথাসাহিত্যের তথা গল্পের প্রধান লক্ষণ। তারই প্রথম প্রকাশ দেখতে পাই নষ্টনীড় গল্পে।

দ্বিতীয়ত, গল্পের শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে বিচার করলে নষ্টনীড় এক অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের গল্প। মনস্তত্ত্বের মূলে আছে একটি জিজ্ঞাসা : কেন এমন হয়? এই 'কেন'র কারণ অন্বেষণে, নরনারীর জীবনেব রহস্য উদঘাটন করার জন্যে, নরনারীর মনকে বিশ্লেষণ করা মনস্তত্ত্বের কাজ। নষ্টনীড় গল্পেও একটা গভীর মাত্রার 'কেন' শীর্ষক প্রশ্ন আছে চারু-অমলের প্রেমকে ঘিরে। বস্তুত, তাদের মধ্যে যে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের বিষয়, এমনকি ফ্রয়েডীয় লিবিডো যৌন-তত্ত্বেরও। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতায় ভূপতি চারু অমলের সমবায়ে নষ্টনীড়ের মতো যে মনস্তাত্ত্বিক গল্প লিখেছেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যে সর্বতোভাবে এক নতুন দিগন্ত।

তৃতীয়ত, সামাজিক বিধানে চারু-অমলের যে বৌদি-দেওরের সম্পর্ক, তার মধ্যে প্রেমের কোন স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুশাসন না মেনে চারু-অমলের প্রেমের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন,যা পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছে নিষিদ্ধ প্রেম রূপে। এই নিষিদ্ধ প্রেম আমাদের কথাসাহিত্যের অনেকটা অংশ অধিকার করে আছে। চারু-অমলের প্রেমকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়ে নষ্টনীড় গল্পের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর উদবোধন করেছেন।

চতুর্থত, কথাসাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য নরনারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ। এক নারীকে কেন্দ্র করে দুজন পুরুষের যে সমস্যা তা নরনারীর সম্পর্কের চিরন্তন একটি সমস্যা। এই সমস্যা থেকেই কথাসাহিত্যে ত্রিভুজ দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে। দু'জন পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নারীর সামনে দেখা দেয় 'টু বি অর নট টু বি'র মতো একটি প্রশ্ন, তখন তার মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষতবিক্ষত হয়। ঠিক এইরকম একটি প্রশ্ন চারুর সামনে ছিল না, কেননা সে তো দ্বিচারিণী নয়। তবু ভূপতি ও অমলের মাঝখানে সেই রকম একটা ইঙ্গিত রয়ে গেছে, বিশেষত ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হয়ে ভূপতি তার গৃহে ফিরে এসে যখন তার অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছে তখন চারুকে অবশ্যই ওই প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে হয়েছে। তবে তা ক্ষণিকের জন্যে। মুহূর্তের মধ্যে সে

সমস্ত জড়তা দ্বিধা কাটিয়ে উঠে অমলের মধ্যেই মগ্ন হয়েছে, যেমন ছিল আগে। হয়তবা ন্যুভাল বা গল্প বলেই রবীন্দ্রনাথ এইরকম একটি সমস্যাসংকুল মুহূর্তের জন্যে বেশি সময় দেননি। কিন্তু এর ভিতর দিয়েই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের জন্যে একটা নতুন পথনির্দেশ করেছেন। স্বামীর প্রতি বিবাহিত রমণীর আনুগত্য যে একমাত্র আদর্শ নয়, তার চেয়ে অনেক বড় তার প্রেম, নষ্টনীড় গল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইভাবে, নষ্টনীড় শুধুমাত্র রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যেই নয়, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে তার এই অনন্যতার জন্যে। ওভারকোট একভাবে রুশ উপন্যাসকে পথ দেখিয়েছে, নষ্টনীড় আর একভাবে দেখিয়েছে বাংলা গল্পকে।

চার

রবার্ট ব্রিজেস বলেছেন যে কাব্য হচ্ছে কবির নিজের জীবনের প্রতিধ্বনি—ইকো অফ পোয়েটস্ ওন লাইফ। একথা কথাসাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একথা মনে হবেই যে নষ্টনীড় শুধুমাত্র একটি ন্যুভাল গল্প নয়, তার আরো-এক গভীরতর পরিচয় আছে। প্রকৃতপক্ষে এই গল্প কবির নিজের জীবনের একটি বিশেষ পর্বের প্রতিচ্ছবি। ভূপতি চারুলতা ও অমলের আড়ালে আবশ্যিকভাবেই যে মুখগুলি ভেসে ওঠে সেগুলি যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী ও তরুণ রবীন্দ্রনাথের। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই গল্পের উপজীব্য ও ভিত্তিভূমি, সন্দেহাতীতভাবেই।

এই সূত্রেই, এই গল্পের নেপথ্যবর্তী তথ্য হিসেবে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। কবি এই গল্পটি লিখেছিলেন বৌঠানের মৃত্যুর সতেরো বছর পরে, যদিচ পুষ্পাঞ্জলি লেখা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অনতিপরেই। এই গল্প আত্মজীবনীমূলক। কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত কাহিনীর আরো এক গভীবতর তাৎপর্য আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি তাঁদের সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখেনি, মেনে নেওয়া তো দুরের কথা। নেবার কথাও নয়, কারণ প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনে বৌদি-দেওরের প্রেম ছিল অকল্পনীয় ও অভাবনীয়। তাই তাঁদের সেই সম্পর্ক অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু, প্রকৃত অর্থেই তাঁরা পরস্পবকে ভালোবেসেছিলেন, ভালোবাসা বলতে যা বোঝায়। নারীপুরুষের চিরন্তন পারস্পরিক আকর্ষণ ও আত্মনিবেদনের অন্য নাম ভালোবাসা। বৌঠান কাদম্বরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কারণেই সেইভাবেই ভালোবেসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বৌঠান কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে লিখেছেন। সেইসব স্মৃতিচারণের মধ্যে যেভাবে তাঁদের দেখি, তারই হুবহু ছবি নষ্টনীড় গল্পে দেখতে পাই। এই গল্পে বর্ণিত যে খোলা মাঠের কথা আছে, যেখানে চারু ও অমল বাগান তৈরি করার কথা ভেবেছিল, তা আসলে ঠাকুর বাড়ির সামনে প্রশস্ত ফাঁকা মাঠ। তাছাড়া, দক্ষিণের বারান্দা, এবং অন্যান্য বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িরই পারিপর্শ্বিকতা।

আরো লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন কাদম্বরী দেবীকে বৌঠান বলে ডাকতেন, অমলও চারুকে সেইভাবেই, সেই সুরেই বৌঠান ব'লে সম্বোধন করেছে। ভূপতির সংবাদপত্র চালানোর ব্যর্থতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবসা চালানোর ব্যর্থতার কথা স্মরণ করায়। চারুর কাছে অমলের নিত্যনতুন আবদার, উপহারের জন্যে ফরমাস, খুনসুটি মান-অভিমান, দু'জনের

সাহিত্যচর্চার আয়োজন, ইত্যাদি বিবরণ বৌঠান-রবীন্দ্রনাথের দিনযাপনের প্রতিচ্ছবি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাওয়া, তাঁর বিয়ের প্রসঙ্গ অমলের বিয়ে ও বিলেত-যাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। তাই, কোনো ভুল নেই যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে নষ্টনীড় গল্পের ফ্রেমে তাঁর নিজের জীবনকে ধরে রেখেছেন। বৌঠানের স্মৃতিকে সামনে রেখে তিনি অসংখ্য কবিতা ও গান লিখেছেন। কিন্তু নষ্টনীড় গল্পের মতো এমন অন্তরঙ্গ রচনা আর নেই। বৌঠানকে স্মরণ করে একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।" গল্প হিসেবে নষ্টনীড় ধ্রুবতারার মতোই একই সঙ্গে রবীন্দ্র ও বাংলা কথাসাহিত্যকে প্রতিভাত ক'রে আছে।

ল্যাবরেটরি : সোহিনীর যজ্ঞবেদী

অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নামের মধ্যেই গল্পটির বক্তব্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত। কাহিনী সামান্য। কয়েকটি চরিত্র বিশেষ করে প্রধান চরিত্র সোহিনীকে চিত্রিত করার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গল্প। তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে মূল গল্পের শুরু যা সংলাপ সর্বস্ব এবং নাট্যধর্মী।

বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোরের ব্রত ছিল বিজ্ঞানচর্চা এবং ছাত্রদের মধ্যে তা প্রসারিত করা। এর জন্যে বিদেশের মতো উঁচুমানের ল্যাবরেটরির প্রয়োজন। নন্দকিশোর এই ল্যাবরেটরি গড়ার জন্যেই 'নিষ্কামলোভে' রেলওয়ে কোম্পানির টাকা নির্দ্বিধায় চুরি করেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে তাঁর অনুব্রতা সঙ্গিনী সোহিনী সেই ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে উপযুক্ত ঋত্বিক সন্ধানের কাজে লেগেছে।

প্রথম সাক্ষাতে ঘাঘরা দুলিয়ে বিশবছরের সোহিনী নন্দকিশোরকে বলেছিলো—"অনেক পুরুষকে আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তাহলে তুমি ঠকবে"।

আর নন্দকিশোর, "দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্‌ঝক্ করছে ক্যারেকটারের তেজ, বোঝা গেল নিজের দাম ও নিজে জানে, তাতে একটু মাত্র সংশয় নেই।"

সোহিনীকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়—এই চারিত্র্য শক্তিই সোহিনীর সর্বস্ব। তাঁর নারীত্ব, তার ব্যক্তিত্ব সবই এই শক্তিকে প্রদক্ষিণ করে সব নিন্দাপ্রশংসাকে তুচ্ছ করে দেদীপ্যমান।

নন্দকিশোর পাঞ্জাবের ছত্রির মেয়ে সোহিনীকে যে দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল এবং নিভৃত ছিল না। একথা সে নিজেই বলেছে—"আমি ছিলাম পতিত—উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন"। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর সুন্দরী এই মেয়েটি মনে হয় না কোনো সামাজিক পরিস্থিতির যূপকাষ্ঠে অসহায় নিজেকে বলি দিয়েছিলো। সোহিনীর,—"মনে পড়ে প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস।" অন্যত্র, "মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য।" বেহিসাবী যৌবনের প্রমত্ত কামনা ও প্রবৃত্তিরই একান্ত বশ ছিল সোহিনী। মন্দের মাঝে সহজে ও সানন্দে সে ঝাঁপ দিয়েছিল। নন্দাকিশোরের কাছেও সোহিনী এসেছিল প্রেমের টানে নয়। তার সন্তানের জননী-পদ-লাভের জন্যেও নয়। এসেছিল নন্দকিশোরের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের টানে। সে বুঝেছিল যে, নন্দকিশোরের শক্ত ব্যক্তিত্বের জন্যেই তার সুপ্ত ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারবে।

বিদেশ থেকে পাস করা ঝক্‌ঝকে বুদ্ধিদীপ্ত ইঞ্জিনীয়র নন্দকিশোরের যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময় ছিলো না। সর্ববিধ সংস্কার-মুক্ত নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত খাঁটি বৈজ্ঞানিক মনের মানুষ নন্দকিশোর সোহিনীকে এনেছিলেন নন্দকিশোরি করার জন্যে। শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়নি বলেই মনে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী বলতে তিনি বুঝতেন যে, স্বামীর ব্রতের সঙ্গে স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলিয়ে দেবে।

দেখা যাচ্ছে, নন্দকিশোরের সঙ্গে সোহিনীর এক মিত্র-সম্পর্ক ছিলো। প্রেমের টানে কিংবা সংসার গড়ার জন্যে দু'জনে কাছে আসেনি। প্রচলিত নীতিধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই দুজনের সহাবস্থান ছিলো। প্রায় স্বৈরিণী সোহিনীকে নন্দকিশোর মেনে নিয়েছিলেন যোগ্য কর্মসঙ্গিনী হিসাবে। বিদ্যার পরে নন্দকিশোরের নিষ্কাম ভক্তি সোহিনীকে যেমন মুগ্ধ করেছিলো, তেমনি নন্দকিশোর সোহিনীর মধ্যে এমন মূল্য খুঁজে পেয়েছিলেন যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। তাই জীবনের সর্বস্ব যে ল্যাবরেটরি এবং কষ্টার্জিত বিপুল বিত্তের ভার তিনি অকালমৃত্যুর পরে নিশ্চিন্তে সোহিনীর দায়িত্বে রেখে গেলেন। দেহের টানে সামাজিক আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে সোহিনীর বাধে না কিন্তু প্রাণ গেলেও তার শুক্‌নো পাঞ্জাবী মন বেইমানি করতে পারবে না। "যেখানে আমি ছিলেম ছোট সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন।" নন্দকিশোরের জীবনব্যাপী সাধনার ধন যে ল্যাবরেটরি, যে কীর্তির মাঝে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হতে চেয়েছিলেন, তার পবিত্রতা ও নিরাপত্তা নিরাপদে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনে নারীধর্মের পবিত্রতা বিসর্জন দিতে সোহিনীর কোনো কুণ্ঠা ছিলো না। প্রাণপণে ল্যাবরেটরি রক্ষাতেই সে তার অভিনব সতীধর্ম পালন করেছে। একে কায়মনোবাক্যের সতীত্ব হয়তো বলা যাবে না। তবে নারীব্যক্তিত্বের সতীত্ব বলা যায়।

নীলা নন্দকিশোরের সন্তান নয়। বহুপরিচর্যাকারিণী সোহিনীও তার পিতৃপরিচয় বলেনি। জানা যায়, প্রথম যৌবনে কোনো একজন ওকে প্রবলভাবে টেনেছিলো যার রূপ, বিদ্যা, বংশগৌরব ছিল না কিন্তু যথার্থ পৌরুষ ছিল—যার চুম্বকশক্তি অকথিত কামনার প্রবলটানে মেয়েদের সবকিছু আমূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

নন্দকিশোর ও সোহিনীর মধ্যে সাধারণ দাম্পত্য সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না। নন্দকিশোরের ছাত্রদের লুব্ধতাও সোহিনী চুটিয়ে উপভোগ করেছে। প্রফেসরকে সে বলেছে, "বলতে ইচ্ছা করে না, নোংরা আমি। দু-চার জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুড়িয়ে ধরে।" অসংকোচে সোহিনী বলেছে "আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতা-সাবিত্রী।" সাজিয়ে তোলা এইসব কৃত্রিমতা থেকে সোহিনী সম্পূর্ণ মুক্ত। এখানেই সে একান্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম। তার ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্যকারী নন্দকিশোরকে সে দিয়েছিলো কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস যেখানে এতোটুকু ফাঁকি ছিলো না। আর ভাবাবেগহীন নন্দকিশোর চিরদিন গুণের মর্যাদাই দিয়েছেন। ল্যাবরেটরির মাতাল, ছোটলোক হেডমিস্ত্রি প্রসঙ্গে নন্দকিশোর বলেছেন—"ওযে গুণী, তার সে গুণ-বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ-খুঁজে মিলবে না"। এর থেকে বোঝা যায়, নীলার জন্মবৃত্তান্ত জানা সত্ত্বেও তিনি কেন সোহিনীকে এতো মান দিয়েছিলেন। সোহিনী প্রফেসরকে বলেছে—"আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনদিন একটু মাত্র নষ্ট করিনি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর কারও কাছে পেতেন না।" সে সস্তা দরের নষ্ট মেয়ে নয়। কলঙ্কের দাগ তার গায়ে লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ ফেলেনি।

প্রফেসর চৌধুরী এবং একমাত্র সন্তান নীলাকে সোহিনী নিজের স্বার্থেই ব্যবহার করেছিলো। কিন্তু ঘটনা যতো এগিয়েছে দেখা যায়, প্রফেসর সম্বন্ধে তার যতো স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছে তার থেকেও বেশী করে গড়ে উঠেছে নিখাদ বন্ধুত্ব। স্বামীর সাধনাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে ব্রতচারিণী সোহিনী ল্যাবরেটরির যোগ্য ঋত্বিক সন্ধানে প্রথমে প্রফেসারের দ্বারস্থ হয়েছিলো। ধীরে ধীরে সোহিনীর শান্ত মধুর রূপান্তর দেখতে পাই। "দেখুন চৌধুরী মশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যার কাছে অসংকোচে বলতে পারি, আপনি আমার সেই বন্ধু।" অন্যত্র "লোভ নেই আপনার একটুও। আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি"। গল্পের এক বিপজ্জনক বাঁকে সতীর্থের মৃত্যুর জন্যে অধ্যাপককে যখন সাময়িক বিদায় নিতে হচ্ছে, তখন সোহিনীর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। প্রতিপক্ষের জন্যে যার হাতে ছুরি সহজেই খেলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অবৈধ কিছুতেই যার অরুচি নেই, তার মনও বোধ হয় এই প্রথম উন্মত্ত অভিসার পর্যায় পেরিয়ে শুদ্ধ, শান্ত ভাবসম্মিলনে স্থির হলো। চৌধুরীর গলা জড়িয়ে সোহিনী বলেছে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেকেনা, এও মুহূর্তকালের জন্যে"—বলেই পায়ের কাছে পড়ে সে অধ্যাপককে প্রণাম করেছে।

সোহিনীর মেয়ে নীলা। অসাধারণ সুন্দরী এই মেয়েটির অশান্ত ভরাযৌবন মায়ের কামনা ও প্রবৃত্তির তপ্ত আগুন স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করেছে। দুজনের পার্থক্যের মধ্যে সোহিনীব মননশীলতা, নন্দকিশোরের মতো বৈজ্ঞানিক আশ্রয়ে নিজেকে সুস্থিত করেছিলো, নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানচর্চায় তার চাঞ্চল্য হযেছিলো স্তিমিত। ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তার ছিল গঠনমূলক প্রাণান্ত চেষ্টা। বাযোলজি ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর খরগোসের জন্যে সোহিনী হাসপাতাল বানাতে চায়, মানুষেব মতো মানুষ পেলে তার সব পাওনা শোধ করাকেই ধর্মকর্ম বলে মনে করে নাস্তিক সোহিনী। নন্দকিশোরের সঞ্চিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে চায় ল্যাবরেটরির উঁচুমানের যন্ত্রপাতি কেনাব জন্যে। তারপর তা দান করতে চায় পাবলিককে। কিন্তু নীলা ভাঙ্গন ধরানো মেয়ে। কলুষিত উদগ্র তার স্বভাব, নির্লজ্জ লালসাভরা তার সংসর্গ যে কালান্তক তার অকালবৈধব্যের মধ্যেও হয়তো তার ইঙ্গিত আছে। ল্যাবরেটরিকে ধ্বংস করার জন্যই যেন সে তার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে কাজে লাগাতে চায়। অসম্ভব তার অর্থের লোভ। ল্যাবরেটরির সঞ্চিত অর্থ লুঠ করার ফন্দিফিকির সে খুঁজে বেড়ায়। মতলববাজ কিছু স্তাবকবৃন্দ তার এই ধ্বংস লীলাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। নীলা যখন দেখে যে, সোহিনী বেবতীকে জামাই না করে সাগ্রহে ট্রাস্টফান্ডের প্রেসিডেন্ট করে দিলো, তখন সে মাযের অনুপস্থিতে শরীরের ছলাকলায় রেবতীর গবেষণার কাজে ব্যরবার বাধা সৃষ্টি করে। স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী নীলার রেবতীর মতো নিস্তেজ পণ্ডিতের কোন প্রয়োজনই ছিলো না। সে শুধু রেবতীর মাধ্যমে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল, মায়ের কঠিন শাসনে একান্ত বিরূপ হয়ে সংহার লীলায় মেতেছিল।

সুনামের দিক দিয়ে বিতর্কিত জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদে রেবতীকে বসিয়ে মায়ের প্রতিমুখী শক্তি হিসাবে নীলা তার সর্বনাশের খেলা শুরু করল। রেবতী সোহিনী ও অধ্যাপক চৌধুবীর সনির্বন্ধ নিষেধ অমান্য করে গবেষণার কাজে চরম অবহেলা করে নীলার মোহজালে

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলো। শুধু তাই নয়, ল্যাবরেটরির ট্রাস্টফান্ডের টাকা পর্যন্ত নীলার প্ররোচনায় নয় ছয় করতে লাগল। ঠিক এই সময় আম্বালার কাজ মিটিয়ে সোহিনী উপস্থিত হলো। মা মেয়ের এই নগ্ন নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় সোহিনী জাগানী ক্লাবের গ্রাস থেকে ল্যাবরেটরিকে রক্ষার জন্যে সকলের সামনে নীলার জন্মবৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটন করেছে। সবাই জানালো যে, উত্তরাধিকার সূত্রে নীলা নন্দকিশোরের সম্পত্তির দাবিদার হতে পারে না। এই মর্মান্তিক সংবাদে নীলার টাকার থলির লুব্ধ স্তাবকেরা হতাশায় নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। শেষপর্যন্ত রেবতী নামক অপদার্থের গলায় মালা দেওয়া ছাড়া হয়তো নীলার আর কোনো উপায় থাকতো না। কিন্তু নীলা যেমন সোহিনীর কাছে রেবতীর আসল স্বরূপ দেখিয়ে ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়ে ছিলো তেমনি রেবতীকে এবং নীলাকেও বাঁচালেন পিসিমা।

অল্পবয়সেই সায়ান্সের ডাক্তার পদবিপ্রাপ্ত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র রেবতী সোহিনীর পছন্দের তালিকায় পয়লা নম্বরে ছিলো। কিন্তু অধ্যাপক ওকে ডাকতেন রেবি-বেবি। পিসিমার হাতে মাতৃহীন রেবতীর পৌরুষ ছাতু-হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপকের ভাষায়, "এক মালাজপকারিনীর হাতে মালার গুটি"। অসামান্য মেধাবী ছাত্র রেবতী ভট্টাচার্যের অসীম সম্ভাবনা ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ভাগ্যাকাশ রাহুর মতো জুড়ে ছিলেন তার পিসিমা। যতোটুকু পরিচয় তার পাওয়া যায় তাতে পৌরুষ বা ব্যক্তিত্বহীন রেবতী পিসিমা ছাড়া হয়তো অন্যকোন নারীর সংস্পর্শেও আসেনি। তাই সোহিনী কিংবা নীলার মতো তীব্র আধুনিকাদের সংস্পর্শে-রেবতী যে একান্ত বেমানান এবং অসহায় বোধ করবে তা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে নীলার সম্মোহনী মাদকতা রেবতীর মতো অনভিজ্ঞের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সোহিনী তাকে ল্যাবরেটরির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিল—যা ছিলো বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করার উপায় এবং একইসঙ্গে নন্দকিশোর ও দেশের সদ্‌গতি। সব প্রলোভন জয় করে বিজ্ঞান সাধনার নিষ্কম্প নিষ্ঠা রক্ষা করতে যে দুরূহ প্রয়াসের প্রয়োজন। রেবতীর মতো সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অপাপবিদ্ধ, অবোধ ঋষ্যশৃঙ্গ নারীর ছলনায় আত্মসমর্পণ করেছিল। তাতে তার পৌরুষ ও সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছিল কিন্তু এখানে দেখা গেল বিজ্ঞানী রেবতীর পরাভব ও অপমৃত্যু। সোহিনী ফিরে এসে তাকে ল্যাবরেটরি থেকে শুধু বরখাস্তই করেনি—তীব্র শ্লেষে বলেছে।— "এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারিনি—কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম—গোবরের কুণ্ডে আর একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

এই নাটকীয় বিপর্যয় রেবতীব পক্ষে হয়তো শাপে বরও হতে পারে। কারণ সংসারে খাঁটি নীলা অনেক না থাকলেও নকল নীলারও অভাব নেই। তাই পিসিমার আজন্ম পরিচিত নিরাপদ অঞ্চল ছাড়া রেবতী ভট্টাচার্যের জীবনে বারবার বিপদ আসার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

'স্ত্রীর পত্র : প্রতিবাদের কথাসূত্র
বিপ্লব চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি আসলে স্ত্রীর লেখা একটি পত্র। সে পত্রের শেষে স্বাক্ষর করেছে একটি মেয়ে—মৃণাল। মৃণালের পত্রই স্ত্রীর পত্র। তথাপি স্ত্রীর পত্রটি শুধুমাত্র মৃণালের পত্র নয়। কারণ স্ত্রীর পত্র বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার অতিরিক্ত একটি অর্থদ্যোতনা রয়েছে। সেটি হল স্ত্রীর প্রতিবাদপত্র। কথাসূত্র বিশ্লেষণ করলে গল্পটি কীভাবে একটি প্রতিবাদপত্র হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায়।

কথাসূত্র-১. 'আমি তোমাদের মেজোবোউ'

কথাসূত্র যোজনার শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ পরস্পর বিরোধী দুই বাক্য লিখেছেন মৃণালের কলমে। যথা—

ক. আমি তোমাদের মেজো বৌ।

খ. এ তোমাদের মেজ বৌয়ের চিঠি নয়।

যে মেয়ে সংসারের মেজোবউ, তার চিঠি তো মেজবৌয়ের চিঠি হবারই কথা। তথাপি সেই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বলেই পত্র শেষে যে স্বাক্ষর রয়েছে সে হল মৃণাল, মেজোবৌ নয়।

মৃণাল যে আর মেজোবৌ নয় তা শেষ পর্যন্ত গল্পশেষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তথাপি গল্পের সূচনায় তা ইচ্ছাকৃত-ভাবেই অস্ফুট রাখা হয়েছে। কথাসূত্র যোজনায় এই জন্যই রয়েছে বিরোধাভাস। স্বভাবতই পাঠকের ঔৎসুক্য বেড়ে চলে। প্রশ্ন জাগে, বিবাহের পনেরো বছর পরে মেজোবৌ কেন চিঠি লেখে? শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে এসে সে একা কেন? কেন তার স্বামী ছুটির দরখাস্ত করে অফিস ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে এল না? তখন অনেক প্রশ্ন বহুগুণিত হতে হতে কথাসূত্র বেড়ে চলে।

কথাসূত্র-২. আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি।

মৃণাল যে সাহস করে চিঠি লিখেছে তা শুধু কার্য নয়, কারণও। পনেরো বছর পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে জানতে পেরেছে তার জগৎ ও জগদীশ্বরের সঙ্গে তার অন্য সম্বন্ধ। এইখানেই তার সাহস, তার মনোবল।

প্রশ্ন উঠবে, সাহসের কথা আসছে কেন? মনোবলই বা কিসের?

উত্তর রয়েছে মৃণালের লেখা আর একটি বাক্যে : "আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।"

মরণ নেই জেনেই মৃণাল জীবন সন্ধান করেছে। সেই জীবন সন্ধানের প্রথম কথাটাই হল সাহস—বাঁচার সাহস, প্রতিবাদের সাহস, যখন বাঁচাটাই প্রতিবাদের নামান্তর।

গল্পচ্ছলে নিজের জীবনকথা শোনায় মৃণাল। গল্পের শুরুতে রয়েছে তার শিশু বয়সের কথা যখন সন্নিপাতি জ্বরে তার ভাইটি মারা যায়, কিন্তু সে বেঁচে ওঠে। পাড়ার মেয়েদের ব্যাখ্যা, মৃণাল মেয়ে কিনা, তাই ও বাঁচল।

ক্রমে এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় ছড়িয়ে যায় তার জীবন। সে জীবন অনন্ত। তাই গল্প শেষ হয় না বিন্দুর মৃত্যুতে। বরং বালিকা বিন্দুর মৃত্যু অনন্ত জীবনের স্পর্শ এনে দেয়। সে স্পর্শে নতুন জীবন, মুক্তির জীবনে খুঁজে পায়। সেই মুক্তি সন্ধানে সাহস অর্জন করে। আর সেইজন্যই সাহস করে চিঠি লেখে মৃণাল।

কথাসূত্র-৩. আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

স্বামীকে লেখা চিঠিতে মৃণাল তার আত্মপরিচয় দান করেছে মেয়ে মানুষ হিসেবে নয়, বরং একজন বুদ্ধিমান মানুষ রূপে। বুদ্ধিমান বলেই সে বুঝেছে, হাজার রূপেগুণেও মেয়ে মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

তাই মানুষরূপেই সে সংকোচ ঘুচিয়ে ফেলেছে মৃণাল। কেমনভাবে তা এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছে মৃণাল নিজে।

বুদ্ধিমান বলেই মৃণাল তার নিজের জগৎ খুঁজে নিতে পেরেছে। গোপন রেখেছে তার কবি পরিচয়। সে যে কবি তা তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পনেরো বছরেও বুঝতে পারেনি।

কবি হিসাবে মৃণাল শুধু কবিতা লেখেনা, সত্যকে দেখতে পায়। সত্যের সীমা প্রসারিত হয় তার দৃষ্টির অভিক্ষেপে। সে সীমার একদিকে রয়েছে বিন্দু অন্যদিকে সিন্ধু।

ঘরকন্নার বাইরে লুকিয়ে কবিতা লিখত মৃণাল। বারো বছরের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বৌ হয়ে এল শহরে। মেয়ের রূপের ওপর ভরসা করে বাপ তার বিয়ে দিলেও রূপের গুমর ছিল না তার, তার রূপের কথা শ্বশুর বাড়ির লোক ভুলে গেলেও ভুলতে পারেনি যে তার বুদ্ধি আছে।

একদিকে বাধা মেনে চলার আহ্বান। অন্যদিকে বুদ্ধি মেনে চলায় উদ্বোধন। বেশি বুদ্ধি বলে তাকে লোকে মেয়েজ্যাঠা বলে গাল দেয়। কবিপ্রাণ বলেই মৃণাল উপলব্ধি করে কটু কথাই হচ্ছে অন্তরের সান্ত্বনা। কবি বলেই সে কটূক্তিকারীদের ক্ষমা করে।

কথাসূত্র-৪. মা হবার দুঃখটুকু পেলুম; কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

এই খেদোক্তি মৃণালের। এই দুঃখই তাকে মুক্তির পথ দেখায়। বলা ভাল, মুক্তির পথ সে নিজেই খুঁজে নেয়।

শৈশবে তার ভাই মারা গিয়েছিল অথচ সে বেঁচে যায়। বিবাহের পর তার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। তথাপি সে যেন মৃতবৎসাকে ডাক দিয়ে গেল। সে বেঁচে থাকলে মৃণাল মেজ বৌ থেকে মা হতে পারত। মা হবার সেই মুক্তি না পেলেও শেষ পর্যন্ত মৃণাল তা খুঁজে নেয়

আঁতুড় ঘরে মৃণালের আত্মসম্মানবোধ শতগুণে জেগে ওঠে। কেননা, সেখানে শুধু অনাদর আর উপেক্ষা। সেখানে মেয়ে মানুষের দুঃখকে কেউ বুঝতেই চায় না। সেদিন মরণ সামনে এলেও মৃণাল ভয় পায় না, কেননা অনাদর অবজ্ঞায় জীবন মরণ সেখানে সমান। তবুও মৃণালের মনে প্রশ্ন জাগে। বাঙালি মেয়ে যে কথায় কথায় মরতে যায়, তাতে বাহাদুরিটা কী?

এরপরেই এসেছে আর এক কন্যার কথা। সে তো কন্যা নয়, যেন অশ্বত্থ গাছের অঙ্কুর। হাওয়ায় তাদের সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে উড়ে এসে পড়ে ছিল। সে বিন্দু—মৃণালের বড় জায়ের অনাথা বোন বিন্দু।

অনাথা বিন্দুকে বড় জায়ের দাসীবৃত্তি করতে দেখে প্রাণ কেঁদে উঠল মৃণালের। বড় জাকে সম্মানে অসম্ভব খাটো হতে দেখেও তার ভাল লাগল না। বিন্দুকে নিয়ে শুরু হল দুই জার টানাপোড়েন। গল্প এগিয়ে চলে। মৃণালের মুক্তি পথযাত্রাও।

কথাসূত্র-৫. আমি সেটাকে ভালো বলে বুঝি, আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়।

বড় জায়ের বোন বিন্দুকে এই জন্যই নিজের ঘরে টেনে নেয় মৃণাল। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এই মেয়েটিকে নিয়েই তার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ততদিন নিজের বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল মেজ বৌ, তখন তা বড় বৌয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে উজ্জ্বলতর হল। বিন্দুকে কাছে টেনে নেওয়াটা তার বিবেচনায় সঠিক ছিল বলেই তাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিন্দুকে কেন্দ্র করে বড় বৌ নিজেকে যতটা খাটো করতে পেরেছে তার স্বামী ও অন্যদের কাছে মৃণালের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বিন্দুর হীনমন্যতাবোধ তাকে বুঝিয়ে দিলে, অনাবশ্যক মেয়েমানুষের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নেই। এই বোধ নিয়েই মৃণাল বাড়ির সকলের বিরোধিতা করেই মেয়েটাকে আপন করে নিল। আর বিন্দুও তখন ভালবাসলো তার এই নতুন দিদিটিকে। বিন্দুর অস্থির ভালবাসাতেই মৃণাল দেখতে পেল তার মুক্ত স্বরূপ।

বিন্দুর মতো মেয়েকে আদরযত্ন করাটা মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভাল চোখে নিল না। স্বদেশী হাঙ্গামায় বাড়িতল্লাসির সময় বিন্দুকে পুলিশের পোশা মেয়ে-চর বলতেও তাদের বাধেনি। তবুও জোর করে বিন্দুকে যে বিদায় করা হয়নি সেটা মৃণালের বুদ্ধির জয়। তার ব্যক্তিত্ববোধের জয় সেটাই।

কথাসূত্র-৬. একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে—

কালো মেয়ে বিন্দুর বিবাহ পর্বটা গল্পের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। বরপক্ষ মেয়ে দেখতেও এল না। কন্যাপক্ষ নিশ্চিন্ত বোধ করলে, কেননা মেয়েটিকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই তারা বাঁচে। ব্যতিক্রম একমাত্র মৃণাল।

সংসারে অনেক লড়াই করেও মৃণাল সাহস করে বিন্দুর বিয়ে বন্ধ করার কথা বলতে পারেনি। তবে কাব ঘবে চলল, কী দশা হবে বিন্দুর এসব ভাবতে তার প্রাণ কেঁপে উঠল। কিন্তু বিন্দু নিজে বারবার নিজের মৃত্যু কামনা করলেও লাভ হল না। গোয়াল ঘরে পড়ে থেকে সে বিয়ে এড়াতে চাইলেও তা সম্ভব হল না। কেননা, বিন্দুর দিদি বললে, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি, মুক্তি সব।

মৃণাল এ বিবাহ বন্ধ করতে চায়নি, তবে চেষ্টা করেছে, বিবাহটা যাতে কনের বাড়িতেই হয়। কৌলক প্রথার দোহাই দিয়ে বরের বাড়িতেই বিয়ে হল।

বিয়ের তিন দিন পরেই বিন্দু পালিয়ে এসে জড়সড় হয়ে বসে রইল মৃণালদের ভেড়া রাখাব ঘরে। মৃণালই তাকে ভেড়াকে দানা দিতে গিয়ে খুঁজে পেল। তাকে দেখে বিন্দু নিঃশব্দে পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বিন্দুর স্বামী পাগল। শাশুড়ি জেদ করে বিয়ে দিয়েছে। শ্বশুরের মত ছিল না বলে তিনি পূর্বে কাশী চলে গিয়েছিলেন। এসব কথা মৃণাল বিন্দর কাছ থেকে জানতে পারল।

বিন্দুর স্বামী যখন উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন তাকে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। পাগল স্বামীর সঙ্গে যখন তার শাশুড়ি তৃতীয় রাত্রে শুতে বললে, তখন বিন্দু ভয়ে মরে গেল। অনেক রাত্রে কৌশলে সে পালিয়ে এল। মৃণালের মনে দেখা দিল তীব্র প্রতিক্রিয়া। কেননা মেয়ে মানুষরাই বলে, 'ও মেয়ে মানুষ বৈ তো নয়। ছেলে হোক না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

কথাসূত্র-৭. তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল....

বিন্দু পালিয়ে আসার পরই মৃণালের সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল রাগে ও ঘৃণায়। এবার প্রতিবাদে ফুসে ওঠে মেজবৌ। এখন থেকে তার প্রতিবাদী চেহারাটা ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মেজবৌয়ের খোলস প্রায় খসে পড়ে।

বিন্দুর বিয়ে অস্বীকার করাটা এই প্রতিবাদের প্রথম ধাপ। সে স্পষ্টই ঘোষণা করে, 'এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়।'

বিন্দুকে আগলে রাখতে চায় মৃণাল। শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তার বাদপ্রতিবাদ বেড়েই চলে। তারা ভয় দেখায় বিন্দুর শ্বশুর বাড়ির লোকে পুলিশ-কেস করলে মুশকিল হবে। বিন্দুর হয়ে মৃণাল প্রশ্ন তোলে। ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছ এ কথা কি আদালত শুনবে না? অতএব নিজের গয়না বেচে মৃণাল আদালতে যাওয়ার কথা ভাবে। কসাইয়ের হাতে গরুদেওয়ার মতোই বিন্দুকে ফিরিয়ে দেওয়াটা সে মেনে নিতে পারে না।

সাতাশ বছরের মেয়ে গৃহবধূ মৃণাল। সে লড়াই করে বারো-তেরো বছরের এক অসহায়ার জন্য। স্বামীকে স্বামী হতে হবে, পাগল ছাগল হলে চলবে না। তাই 'স্বামী তো বটে' কথাটা সে মানতে পারে না। কুষ্ঠরোগীকে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়ি পৌঁছে দিতে পারে, কিন্তু তাকে মৃণাল সতীসাধ্বী বলে মানতে নারাজ।

গৃহবধূ হয়েও মৃণাল লড়াই চালায় একা। একদিকে বিন্দুর জন্য তার বুক ফাটে, অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জন্য তার মনে জাগে লজ্জা আর ঘৃণা। প্রতিবাদে সে যখন মুখর তখন কোন ফাঁকে বিন্দু ভাসুরের কাছে ধরা দেয় যার জন্য লড়াই। সে দুর্বল হয়ে পড়লেও মৃণাল লড়াই চালিয়ে যায়।

কথাসূত্র-৮. নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন....

সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ করেই একথা লিখেছিল মৃণাল। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছিল বিন্দু। করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে ভাসুরের কাছে ধরা দিয়ে স্বেচ্ছায় সে ফিরে গিয়েছিল মেজবৌয়ের অনিষ্ট হবার ভয়ে। তার পর আবার সে পালিয়ে গিয়েছিল খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি আশ্রয় পাবার আশায়। তারাও আশ্রয় দেয়নি তাকে, পুনরায় ফিরিয়ে রেখে যায় ঐ শ্বশুরবাড়িতেই যেখানে বিন্দুর থাকা না থাকা দুই-ই সমান।

বিন্দু প্রতিবাদ করেছে এইভাবেই। আর মৃণালের প্রতিবাদটা অন্য ধরনের। তার পরিকল্পনা দুঃসাহসিক হলেও মৃণালের নিজস্ব বুদ্ধিচালিত। খুড়িমার সঙ্গে সেও পুরীতে তীর্থ করতে যাবে বলায় শ্বশুর বাড়ির লোকেরা খুশি হয়ে উঠল। তারা বুঝতেই পারেনি এটা বিন্দুকে

সরিয়ে নিয়ে যাবার মৃণালকৃত এক কৌশল। মৃণাল তার ছোটভাই শরৎকে ডেকে বলেছিল পুরী যাবার গাড়িতে বিন্দুকেও তুলে দিতে। শরৎ বিন্দুকে পুরী পর্যন্ত পৌঁছে দিতেও রাজি ছিল। বাধ সাধল বিন্দু নিজেই। আগের দিন রাত্রে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরল সে। দেশশুদ্ধ লোক বললে, এটা একটা ফ্যাশন। প্রতিবাদে মৃণাল জানতে চাইল, ফ্যাশনটা শুধু মেয়েদের শাড়ির ওপর দিয়ে হয় কেন, বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার ওপর দিয়ে নয় কেন?

মৃণালের প্রতিবাদ শুধু কথায় নয়, কর্মেও। সে শ্বশুরবাড়ি আর ফিরে না যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। চিঠি লিখে জানাল সে কথা স্বামীকে। প্রতিবাদী মৃণাল লিখল স্ত্রীর পত্র। পুরী থেকে কলকাতায়। বিন্দু থেকে সিন্ধু যাত্রায়।

কথাসূত্র-৯. আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।

অতি সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করেই মৃণাল এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। কন্যাসমা বিন্দু-যা করতে চেয়েও পারেনি, মৃণাল তা করে দেখাল। শ্বশুরবাড়ি, স্বামীর ভিটে সে অবলীলায় ত্যাগ করে চলে এলে। তার এই দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে প্রতিবাদী নারীরা বারংবার অনুসরণ করেছে। প্রেরণা দিয়েছে মৃণাল।

বেঁচে থেকে রূপে গুণে কোনো প্রশংসাই পায়নি বিন্দু। মরেও পেল না। তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে দেশের পুরুষরা গেল চটে। সেই পুরুষ সমাজকে ততোধিক চটিয়ে দিলে মৃণাল।

মৃণাল যখন তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে এলে, তখন তার স্বামী অফিসের কাজে ব্যস্ত। তীর্থে এসে মৃণাল চিঠি লিখল স্বামীকে—স্ত্রী পরিত্যক্ত স্বামীকে। নালিশ জানাবার জন্য সে চিঠি লেখেনি। লিখেছে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। অন্যায়ের প্রতিবাদ। অত্যাচাবেব প্রতিবাদ।

মৃণালের স্থির সিদ্ধান্ত সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে আব না ফেরার। সে গলিতে মেয়ে বৌয়েব জীবনকে পায়ের তলায় চেপে রাখা হয়। প্রতিবাদটা তারই বিরুদ্ধে। নারীর প্রতিবাদ তাই ধ্বনিত হয় পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে।

কথাসূত্র-১০ আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই।

গল্পশেষে পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে বেরিয়ে আসে মৃণাল। আর ফিরে যায় না সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে। সে গলিতে চারদিকে বাধা, চাব দিকে প্রাচীর, বালিকার ভাঙা হৃদয়ের মূক ভাষা সেখানে গুমরে মরে। বালিকা চলে যায় মৃত্যুর পরপাবে অনন্ত জগতে। আব তার মৃত্যুতে মৃণাল শুনতে পায় এক বাঁশিব ডাক। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা আর সংসারের ডাক তুচ্ছ করে সে বেরিয়ে আসে। মাখন বড়ালের গলিতে অন্দর মহল পেরিয়ে হীনতার সব নাগপাশ বন্ধন ছিঁড়ে সে বাইরে আসে।

এইবার খোলস ছিন্ন হল মেজবৌয়ের, সেখানেই তার গৌরব। এই গৌরব এতই বড় আর বিশাল যে রাখবার জায়গা নেই। সেখানে সুন্দবের আবাস। তার এতদিনের অনাদৃত রূপকে ভাল লেগেছে সেই সুন্দরের। এইবার মরেছে মেজবৌ। তবে বেঁচে উঠেছে মৃণাল।

মেজবৌয়ের খোলস ছেড়ে মৃণাল বাইরে আসে। স্ত্রীর পত্র যখন সমাপ্ত হয় তখন শ্বশুরবাড়ির চরণতলাশ্রয় ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে বেঁচে থাকে। আর এই তার শেষ কথা, 'আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।'

স্ত্রীর পত্র প্রতিবাদের গল্প। সে প্রতিবাদ একজনের বিরুদ্ধে নয়। গোটা পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে। তাদের নির্দয় নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। তাই মৃণাল বারবার তোমাদের লিখেছে। কোথাও লেখেনি 'তোমার।'

মৃণালের আর ভয় নেই। সে আর মেজবৌ নয়। সে আর মাখন বড়ালের গলির বাসিন্দা নয়। তার সামনে নীল সমুদ্র, মাথার ওপর খোলা আকাশ আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

অভ্যাসের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে মৃণাল, সে ছিল এক বিরাট আবরণে ঢাকা, আজ তার আবরণ হয় ছিন্ন। বিন্দু নিজের মৃত্যু দিয়ে সে আবরণ মুক্ত করে দেয়।

বিন্দু প্রতিবাদ করতে চাইলেও পারেনি। তার হয়ে প্রতিবাদ করে মৃণাল। প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে দেয় স্বামীর কাছে।

বাঁচবার জন্য অনেক মেয়েকে আজও মরতে হয়। মৃণাল তারও প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। তার জীবন দিয়ে সে দেখিয়েছে বাঁচতে চাইলে বাঁচা যায়, তার জন্য মরতে হয় না। সে লেগে থাকে। এই লেগে থাকাটা তার প্রতিবাদের, আপোষের নয়।

প্রতিবাদের গল্পটা রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নারীমুক্তি আন্দোলনে যে সব মানুষের অবদান রয়েছে রবীন্দ্রনাথ তার অগ্রগণ্য। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন শুধু নয়, নারী আন্দোলনের চারণগীতও। প্রতিবাদের কথাসূত্রে গাঁথা সে গীত আজও অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

একরাত্রি : এক মাহেন্দ্রক্ষণ

মন্দিরা রায়

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জন্মলগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তিনিই তাঁর রচিত গল্পগুচ্ছের বিস্তৃত সম্ভারে এনেছেন বিচিত্র ভাব এবং সুরের বর্ণালি। ছোটগল্পের পূর্বনির্ধারিত আঙ্গিক-কাঠামোকেও ভেঙেচুরে তিনি নতুন মাত্রা দান করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন সর্বদা। সমাজ, দেশ, কাল, ব্যক্তিক অনুভবের জগৎ, তার আলো-আঁধারি, রহস্যময়তা-যন্ত্রণা ও আনন্দের সমুচ্চ উৎসার রবীন্দ্র-ছোটগল্পে এনেছে অনন্যতার স্বাক্ষর।

গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের সত্তার বন্ধন অঙ্গাঙ্গী এমন আপ্তবাক্য না মেনে উপায় থাকেনা যখন দেখা যায় গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের অন্তরসত্তায় প্রায়শই শুধু উপস্থিত নন ফ্রেমে বাঁধা বাস্তব পটভূমি, সমকাল বস্তুবিশ্বের উপস্থিতির মধ্যেও মুহূর্তে সঞ্চারিত করে দেন গভীর লাবণ্য, ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম দ্যুতি। কোথাও তার মাত্রা সামান্য, কোথাও বিশেষ ব্যাপ্ত। আর এই ব্যাপ্তির নিরিখেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পে কখনো কখনো প্রবল হয়ে ওঠে গীতিকাব্যিকতা, গীতিকবিতার আপাত বস্তুভারহীন হার্দ্য অনুভবী সমাপ্তি এ জাতীয় গল্পের একান্ত বিশিষ্টতা। যদিও পরিবেশ সৃজনে, চরিত্রের বহির্কাঠামো ও অন্তঃকাঠামো নির্মাণে, প্রকৃতি চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী সমবায়েই নির্মিত হয় এ জাতীয় গল্পের কায়া।

'গল্পগুচ্ছ' ১ খণ্ডের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্পের রচনাকাল উনিশ শতকের শেষ দশক। (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সেই প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গমকালে স্বাধিকারের স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধিতার শপথে যুবশক্তির আত্মোৎসর্গের্র পরম অভীপ্সা অনেকটাই তাত্ত্বিক স্তরে সীমায়িত ছিল। শুধু যে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে দূরত্ব তাই নয়। মধ্যবিত্ত-মানসের সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে অনেক ক্ষেত্রেই সেই আকাঙ্ক্ষার শিকড় সাধারণ জনমানসের গভীরে তেমনভাবে প্রোথিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে ঔপনিবেশিক শোষণের লাগাম ছাড়া তীব্রতার অনুকারেই যেমন সাধারণ মানুষ তাদের ভবিষ্যকে প্রায় মেনে নিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে যুববয়সের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও দেশপ্রেমের উন্মাদনা সংঘশক্তির সঠিক সূত্রে গ্রথিত হতে পারেনি বলেই একদা-প্রাণিত অনেক তরুণই শেষ পর্যন্ত নিজস্ব নির্জনতায় প্রায় বাধ্যতামূলক নির্বাসনকেও মেনে নিয়েছিলেন। 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক-চরিত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিলো। এই গল্পের মূল সত্য যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রেমানুভবের ক্ষণমাত্রিক উত্তরণ তার পশ্চাদপট দেশ-কালের সেই অমোঘ অনিবার্যতায় নির্মিত হয়েছে। এই সূত্রে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই পর্বের আর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর (রচনাকাল ঃ আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) নায়ক শশিভূষণের কথা। শশিভূষণের রাজনৈতিক সক্রিয়তা, একক প্রতিবাদ, কারাবাস এবং পরবর্তী-পর্বের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের কথা।

'একরাত্রি' গল্পটি বিবৃত হয়েছে উত্তমপুরুষের জবানীতে আত্মকথনের ভঙ্গীতে। বর্ণনাধর্মিতায় শৈথিল্যের প্রশ্রয় নেই, এর মিতকায়গঠনে চরিত্রটির পূর্বাহ্নের প্রেক্ষাপট এবং

ভাবগত দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনীরেখাটি এইরকম—গল্পের কথকের পাঠশালার সঙ্গিনী সুরবালার সঙ্গে ছেলেবেলার সম্পর্কটি ছিলো আন্তরিক। বউ-বউ খেলা'র অনুষঙ্গে ওই বালক বয়সেই সুরবালা সম্পর্কে এক ধরনের স্বাভাবিক অধিকারবোধ জন্ম নিয়েছিলো কথক-পুরুষের মনে। জমিদারী সেরেস্তার নায়েব-পুত্র হিসেবে ভবিষ্যতে জমিদারি-সেরেস্তার গোমস্তাগিরির কাজের কথা তার পিতা ভাবলেও তার ইচ্ছে ছিলো নাজির বা জজ আদালতের হেডক্লার্ক হওয়া। এই উল্লেখের মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্রিটিশ আমলের আইন-আদালত-সংক্রান্ত বৃত্তিজীবীদের সৌভাগ্যোদয় সম্পর্কে ব্যঙ্গের আভাসটি গোপন থাকেনি। এই কারণেই গ্রামের এক যুবক নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহী হয়ে কথকের কলকাতা-যাত্রা-লেখাপড়া শেখা ইত্যাদি। কিন্তু দেশপ্রেমের স্ফীত উন্মাদনায় সভাসমিতি স্বেচ্ছাসেবককর্ম, চাঁদা আদায় ইত্যাদিতেই সময় অতিবাহিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের উনিশ শতকের জনপ্রিয় বীরনায়ক, মাটসিনি গারিবালডি হবার আয়োজনের মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠানের স্থান ছিল না। ফলে সুরবালার বিবাহ হয়ে যায় উকিল রামলোচনবাবুর সঙ্গে। দেশোন্নতির কাজে ব্যস্ত থাকায় সংবাদটি তার গুরুত্ব হারিয়েছিল কথকের কাছে। আকস্মিকভাবে পিতার মৃত্যুর পর সংসার প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নোয়াখালি বিভাগের ছোটো যে শহরে কথক-যুবাটিকে 'এন্ট্রেন্স' স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের পদ নিয়ে কর্মজীবন শুরু করতে হয়েছিল—ঘটনাক্রমে সেখানেই ছিলো সুরবালা— রামলোচন রায়ের বাসা। স্কুল ঘরের বড়ো আটচালা-সংলগ্ন যে চালায় তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল—সেখানে থেকে রামলোচন বাবুর বাসাবাড়ির অবস্থান বিশেষ দূরবর্তী ছিল না।

রামলোচন বাবুর বাড়িতে ছুটির দিনে আড্ডার আসরে সুরবালার উপস্থিতির আভাসই যেন কথকের এতোদিনকার সুষুপ্তির পর্দাকে একটু একটু করে উন্মোচিত করে দেয়। সুরবালা আজ তাব শুধু যে অপ্রাপনীয়া তাই নয়, তাদের দুজনের পরিচয়ের মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে—ভবিষ্যতের এই অমোঘ নির্দেশ তার কাছে ক্রমশই অসহনীয় হয়ে উঠে সুরবালার প্রতি তার মনে প্রেমের সুনিশ্চিত আসনখানিকে প্রতিষ্ঠা দান করে। নৈতিকতাকে ধ্বংস করে নয়, সমাজনীতিকে ভেঙে নয়, তবু তার এই গভীর বোধোদয় তার নিজের কাছে বড়ো বেশী সত্য হয়েই উঠেছিল,—"আপন মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না।"

গল্পের গতি এর পর রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তায় এগিয়ে গেছে এবং দ্বন্দ্বের শীর্ষবিন্দু ছুঁয়েছে ও প্রশান্ত সমাপ্তিরেখার দিকে এগিয়েছে। এই উপসংহারে প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এক সহসা-উদ্ভূত ঘটনাকে ঘিরে। প্রবল ঝঞ্ঝাবৃষ্টির প্রলয়কালে বন্যার আবির্ভাব সংবাদে ত্রস্ত হয়ে পুষ্করিণীব এক উচ্চপাড়ের মাত্র হাত পাঁচ ছয় দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন অবস্থানে সুরবালা এবং কথক যুবাপুরুষ সেই গভীর মৃত্যু-সমাকীর্ণ নিশীথে নিঃশব্দে নীরবে কোনও কুশলপ্রশ্ন-বিনিময়ও না করে রুদ্ধশ্বাসমুহূর্ত অতিবাহিত করলেন। প্রায় জন্মলগ্নের সম্পর্ক যেন মৃত্যুলগ্নের সমীপবর্তী অবস্থানে এক অখণ্ড সত্যের বৃত্তকে সম্পূর্ণ ছুঁয়ে গেল—

এমনটি মনে হয়েছিলো সেই যুবার। সমস্ত পৃথিবী-বিচ্যুত সেই একটি রাত্রির অ-সাধারণী অভিজ্ঞতা যেন তাকে সমগ্র জীবনের পূর্ণতা দান করেছিল।

প্রবহমান বাস্তব-সংসারের অবশিষ্ট সত্য স্বামীপুত্র গৃহধনজন নিয়ে সুরবালার আগামী জীবনযাপনের সঙ্গে তার এই অমূল্য দ্যুতিময় অনুভূতির কোনো বিরোধ নেই। কথকের প্রগাঢ় স্বগত উচ্চারণে বিধৃত হয়েছে সেই সত্য—'আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।"

রাত্রিশেষে-ঝড়-জল থেমে গেলে সুরবালা ও কথক পুরুষ যার যার নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন—কিন্তু আপাত-নিস্তরঙ্গ জীবন-অভিজ্ঞতার মাঝখানে এই অনন্তের অনুভব—এই 'একটি মাত্র রাত্রি' তার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এক অসামান্য উত্তরণ এনে দিয়েছিল।

গল্পের এই সমাপ্তিলগ্নটি গীতিকবিতার প্রসারিত ব্যক্তি-অনুভবের গভীর ধ্বনিতে পাঠক-হৃদয়ে বেজে উঠেছে।

কাহিনীর শুরু থেকে যুবাপুরুষের বাল্যপ্রণয়লীলার সামান্য উল্লেখ, গ্রাম পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে জাতীয়তাবাদ ও দেশের প্রতি ভালোবাসার নান্দীপাঠ গ্রহণ, পিতার আকস্মিক মৃত্যু, পরবর্তী সময়ে রামলোচন রায়ের শহরে স্কুল মাস্টারের গতানুগতিক চাকরিগ্রহণ—রামলোচনের গৃহে সুরবালার ক্বচিৎ উপস্থিতির অনুভব পর্যন্ত কাহিনীর গতি মোটামুটিভাবে সমতলভূমি-আশ্রয়ী। কিন্তু ঝঞ্ঝাসংকুল রাতে পুষ্করিণীর পাড়ে দ্বীপোপম সংকীর্ণ স্থানে মৃত্যুর মুখোমুখি রুদ্ধশ্বাস অবস্থানের মধ্যে নাটকীয় অনুভবের উচ্চশিখরে আপাত-সরল কাহিনীর গতি পরিবর্তিত হয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো দ্রুত সমাপ্তির দিকে ছুটে যায়। এক গভীর মরমী গীতিকবিতার লাবণ্যে 'একরাত্রি' গল্পটি পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই গীতিকাব্যিকতা যে আলোচ্য গল্পের মূল প্রাণধর্ম এবং চরিত্র সে কথা অনস্বীকার্য। বহির্জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ঐকতানে, মানবপ্রকৃতির যে সুসমঞ্জস ছান্দিক জাগরণ—সেই গীতিপ্রাণতা ঈষৎ পূর্বকালে লেখা 'পোস্টমাস্টার'—গল্পের সমাপ্তি-অংশের মতোই বড়ো বেদনার মতো বেজেছে। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে আলোচক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যেমন লিখেছেন—"সেই রাত্রিটি শুধু সেই ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের কাছেই তুচ্ছজীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা হইয়া রহিল না, তাহার জীবনের সমগ্র ট্র্যাজেডিটুকুও সেই একটি রাত্রির একটি সুরের মধ্যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিল।' কাহিনীর একমুখিনতা শুধু নয়, আলোচ্য গল্পটি যেন চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও একমুখী। গল্প-কথকের পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব, বাল্যসঙ্গিনী সুরবালা, সুরবালার স্বামী বামলোচন রায়—এঁরা উল্লিখিত হয়েছেন মাত্র—কিন্তু আত্মকথনের ভঙ্গীতে পরিবেশিত এই গল্পের কথকপুরুষই শুধুমাত্র বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সময়ের অভিজ্ঞতাবৃত্তের উল্লেখে বিকাশধর্মী চরিত্রের উদাহরণ হয়ে উঠতে পেরেছেন।

সুরবালার সঙ্গে পাঠশালায় বিদ্যালাভ থেকে ঈষৎ পরবর্তীকালে পল্লীবাসী জনৈক নীলরতনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কালেকটর-সাহেবের নাজির হবার লক্ষ্যে ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য কলকাতায় পলায়নের মধ্যে যে ব্যক্তিগত উচ্চাশা-প্রতিপূর্তির অভিযান ছিল; কলকাতায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের উত্তাপে জড়িয়ে পড়ে তা থেকে

অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন তিনি—সংকীর্ণ আত্মপ্রেম থেকে দেশপ্রেমের মহান ব্রতে আত্মোৎসর্গ করবার মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে সুরবালার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত তার জীবন পরিক্রমার একটি পর্ব। সুরবালার অন্যত্র বিবাহ সম্পন্ন হওয়া, পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক দায় পালনের জন্য গ্রামের ভাঙা স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি গ্রহণের মধ্যে তা ভিন্নতর একটি পর্বে পৌঁছোয়। শুধুমাত্র 'এগ্‌জামিন-সর্বস্ব পাশের' পাঠদানের বাইরে ছাত্রদের শিক্ষাদানের অন্য কোনো প্রয়াসই যে তথাকথিত কলোনিয়াল শিক্ষা-কাঠামোয় নিষিদ্ধ সে-সত্যটি উপলব্ধি করলেন কথক এবং এই পর্বেই উকিল রামলোচন রায়ের গৃহে যাতায়াত ক্রমে একদা বাল্যসঙ্গিনী এবং প্রস্তাবিত বিবাহের পাত্রী সুরবালার 'স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টির' পূর্বানুষঙ্গ তার হৃদয়ে এতোকাল ঘুমিয়ে থাকা বিরহী সত্তার জাগরণ ঘটায়—ঝঞ্ঝা ও বন্যাবিক্ষুব্ধ একরাত্রে অন্ধকার আকাশের তলে বিপন্না সুরবালার সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যৌথ অস্তিত্বের ক্ষণিকতৃপ্ত অনুভবের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তিক্ষণে চরিত্রটির অনালোকিত হৃদয়ের এক চকিত উদ্ভাসের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। আলোচ্য গল্পের কথক পুরুষ চরিত্রটি একইকালে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে অ-মূর্তলোকের পুষ্পসন্ধানী এবং এই উপস্থাপনের মধ্যে কোথাও তালভঙ্গ হয়নি। 'একরাত্রি' গল্পের মূল অভিমুখ যেহেতু গীতিকাব্যিকতায় উত্তরণ—সেক্ষেত্রে গল্পটির ভাষা-ব্যবহার, গদ্যশৈলী, শব্দচয়ন ও বর্ণনাভঙ্গির গুরুত্ব অসাধারণ, আলোচ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অংশে ছোটো ছোটো বাক্যব্যবহার করেছেন। স্মিতকৌতুক ও ব্যঙ্গের রসায়নে নির্মিতি, সেই গদ্যরীতির মধ্যে কথকের প্রথম জীবনের উদ্দীপিত দেশের কাজ এবং সমকালের প্রায়-বায়বীয় বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের অন্তঃসারশূন্যতাকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাসঙ্গিক একটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে;—

"দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।" গ্রামীণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণের পর ছাত্রদের দেশোদ্ধারের স্বপ্নে উদ্দীপিত করবাব ব্রত যখন কর্তৃপক্ষের বাধাদানে বন্ধ হলো, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রাকৃত উপমার উপস্থাপনে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণশলাকাবিদ্ধ আত্মসমলোচনায় ঋদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে;—'আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে .লেজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে-ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।" এখানে 'লেজমলা' শব্দটির ব্যবহার কী অব্যর্থ এবং মর্মদাহী।

আবার কাহিনীর অন্তিমে সুরবালার প্রতি কথক পুরুষের সুপ্ত প্রেম-ভাবনার জাগরণ এবং প্রলয়কালীন দুর্ভোগের সেই এক রাত্রে পরম বিপন্ন মুহূর্তের সহ-অবস্থানের বর্ণনায় তৎসম শব্দের সূচয়িত ওজস্বী ব্যবহারের সঙ্গে মিলেছে কাব্যিক উপমা চিহ্নিত এলায়িত ক্রিয়াপদ-প্রয়োগের লাবণ্য। আর এভাবেই ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের অসামান্য বাক্‌-নির্মাণরীতির সংযোগে 'একরাত্রি' গল্পটির অবয়ব যথার্থ এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ট্র্যাজিক কারুণ্যে

বিধৃত 'একরাত্রি' গল্পের উপসংহারে ধ্বনিত হয়েছে মার্মিক অনুভবের সামুদ্রিক গভীরতা—"জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে—এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।"

'একরাত্রি' গল্পের মর্মে আছে বাস্তব সংসারের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার বাইরে প্রেমের অনন্তমাধুরীর উদ্ভাস, প্রেম বিচ্ছেদ ব্যাহত বাহ্যিক অচরিতার্থতায় ক্ষুণ্ণ, তা সংসারে বাঁধা মাপের হিসেবে ব্যর্থ বা অসফল হতে পারে। কিন্তু দেশ-কালের সীমায় অপরিচ্ছিন্ন, বাসনা-কামনার জীর্ণ হস্তস্পর্শের বাইরে যে প্রেমানুভূতির অবস্থান, যা ব্যক্তিসত্তার তুচ্ছআত্মখণ্ডনের উর্ধ্বে অসীমের অভিসারী, আলোচ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই অপরিম্লান প্রেমানুভবের সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠাদান করেছেন। রবীন্দ্র জীবন দর্শন ও সাহিত্যদর্শনের মূলে আছে যে অখণ্ড, অনন্তের প্রতি খণ্ডজগৎ, সান্ত অনুভবের অভিযাত্রা, যার প্রকাশ উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর কবিতায়, গানে উপন্যাসে, নাটকে; ছোটগল্পও তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি অবশ্যই। 'একরাত্রি' গল্পেও রচনাকারের সেই স্বয়ম্প্রভ অনুভবের সুস্থিত নামাঙ্কন লক্ষ করা যায়।

প্রকৃতির অবস্থান রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রথম পর্বে ধ্রুব চরিত্রের মতো। যখন পূর্ববাংলায় জমিদারি-কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত হয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অপরিসীম প্রকৃতি-সম্পদ ও মানবসম্পদের সঙ্গে লেখক অভিজ্ঞতাসূত্রে যুক্ত হচ্ছেন—তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখনিতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে ছোটগল্পের জন্ম। প্রকৃতি যার প্রধানতম মাত্রা। 'একরাত্রি' গল্পেও ক্লাইম্যাক্স-পর্বে ঝঞ্ঝামুখরিত প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মুখোমুখি হয়ে কথক ও সুরবালার সম-অবস্থান গল্পের নির্দিষ্ট পরিণতিকে সম্ভব করে তুলেছে;—"তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে।" মানবজীবনের বিচিত্র ভাব ও ঘটনাপর্যায়ের প্রকাশকে প্রকৃতির প্রসারিত আয়তনে উপস্থাপন করে এক অখণ্ড যোগসূত্রে যুক্ত করে তোলা রবীন্দ্রনাথের লেখকসত্তার এক বিশিষ্ট স্বধর্ম, আলোচ্য গল্পেও প্রকৃতির এই নিশ্চিত এবং অনিবার্য উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে।

'একরাত্রি' গল্পের নামকরণটিও নিঃসন্দেহে গল্পটির গীতিকাব্যিকতার সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, কথক যুবকের ফেলে আসা-জীবনের পূর্বাবলোকন এখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, উনিশ শতকের শেষ পর্বে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের প্রারম্ভকাল ও ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সুযোগ-পাওয়া নবজাগ্রত তরুণ মানসিকতার কর্মে ও ভাবনায় দ্বন্দ্ব, ভাবালুতার অতিরেক—এসবের এক উজ্জ্বল ছবি ও যুবাপুরুষের প্রথম জীবনে বিধৃত—তবুও শেষপর্যন্ত গল্পটি স্থিত হয়েছে সুরবালা ও কথকের জীবনে আবির্ভূত এক প্রলয়কালীন রাত্রির প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত, ট্র্যাজিক প্রেমানুভূতির এক পরিব্যাপ্ত সত্যের উদ্ভাসে। তাই অন্য কোনো নামকরণ নয় 'একরাত্রি'—এই নামটিই হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পের একক এবং একমাত্র অভিজ্ঞান।

বোষ্টমী : ঝড়ের রাতে অভিসারী সেই মেয়ে

আণবিকা গঙ্গোপাধ্যায়

"না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
তেয়াগিলে আসে হাতে......"

রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' নিতান্তই ছোট প্রাণ ছোট ব্যথায় সহজ সরল উপাখ্যান। এ গল্পের অবতরণিকা অংশে আছে এক পল্লীপ্রকৃতির অনুপুঙ্খ প্রতিকৃতি। এই প্রকৃতির সারল্যের মধ্যে আছে সান্দ্রতা। জীবন এখানে সরল আর সমান্তরাল। ব্যক্তিত্বের অজস্র কাটাকুটি খেলার মধ্যে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠা নাগরিক জীবনে হৃদয় প্রবেশ করতে বাধা পায়। আর এই 'অজ্ঞাতবাসে' অন্তরের অন্তরালতার হাজারদুয়ারীতে তিনি খুঁজে পান এমন এক আশ্রয় দেশকালের কোন সুনির্দিষ্ট চিহ্নে যা আক্রান্ত নয়। সুখে দুঃখে মেলামেশি করে জীবন যেখানে সরল পথে চলে। এমন আরও একজনকে তিনি খুঁজে পান এই প্রকৃতির মধ্যে। পল্লীবাসিনী এক নারী এই প্রকৃতির মধ্যেই অজ্ঞাতবাসের আশ্রয় নিতে চেয়েছে—তাঁরই মতো। পালিয়ে বাঁচার জন্য লেখক শহর থেকে দূরে চলেছেন আর এই নারী ঢেকে নিয়েছে তার অস্তিত্বকে ধর্মের নামাবলিতে ধর্মের অন্তরালে থেকে তার হৃদয়মন সদা উৎসুক হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে সেই পরশপাথরটিকে, অজান্তে একদিন যা তার সমস্ত বন্ধনকে সোনায় গড়ে দিয়েছিল। যা সে অনায়াসে পেয়ে অবহেলায় হারিয়েছে আরও ভালো কিছু পাবার কামনায় সেই অমূল্যরতন সে পথে পথে খুঁজে বেড়ায়।

সুখী গৃহকোণে থাকা একটি মেয়ের ঘর হারানোর কাহিনি 'বোষ্টমী'। অনন্ত আকাশের নিচে যে বহমান জীবন, তার আনাচে কানাচে হয়ত থাকে এমনই উপকরণ যাকে কাহিনি করে তোলা যায়। আপাতনিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহের মধ্যে এমন বিচিত্র বর্ণ উপলখণ্ড খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আছে গভীর জীবন প্রীতি। এই 'বোষ্টমী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিষয় হিসেবেই নয়—এই নারীর জীবন দর্শন রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে স্মরণ এবং উল্লেখ করেছেন নানাপ্রসঙ্গে। পূর্বাশ্রমে বোষ্টমীর নাম ছিল 'আনন্দী'। গৃহজীবনে সচ্ছলতা, দাম্পত্য সুখ, তারুণ্যে ভরা জীবনরস দুহাত ভরে গ্রহণ করেছে আনন্দী। আনন্দীর স্বামী ছিল শান্ত, ধীর এবং কর্মনিষ্ঠ মানুষ। সরল—কিন্তু নির্বোধ নয়। যতটুকু তার পাওনা সে হিসেবে সে ভুল করে না। যা তার পাওনা নয় তার প্রতি তার আকর্ষণ নেই। সুন্দরী বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে সে পরম সম্পদের মতো গ্রহণ করেছে। মাতৃত্বের বিকাশের প্রস্তুতি না হতেই আনন্দীকে সন্তান ধারণ করতে হয়েছিল সেই বিড়ম্বনা তার স্বামী সাধ্যমতো অপনোদনের চেষ্টা করেছে। স্বামীর এই মহার্ঘ প্রেমোপহার আনন্দী অনাদরে অবহেলায় উপভোগ করেছে। রাতে সন্তান এর জন্য যেমন তার নিদ্রাভঙ্গ হয়নি তেমনি সন্তানের জন্য রাত জেগে যাত্রা দেখতে যাওয়া থেকে সে নিরস্ত হয়নি। সংসারের দ্বিতীয় বন্ধন বাৎসল্যও তাকে ছুঁতে পারেনি তাই। এই যে জীবন উপভোগের অবাধ স্বাধীনতা সে পেয়েছে তার জন্য এই সংসার কোনও শর্ত আরোপ করেনি তার ওপর। তাই কখনোই বাড়তি কিছু পাওয়ার অনুভূতি

হয়নি আনন্দীর। পরবর্তী জীবনে সে সমস্ত অনুভব দিয়ে বুঝেছে জীবনের পরম লগ্ন সে হেলায় হারিয়েছে। যে পরশ-পাথর তার হৃদয় শৃঙ্খলকে সোনা করে দিয়ে গেছে কোথায় তাকে সে হারিয়ে ফেলেছে—বোষ্টমীর জীবনে আনন্দী এই অনুসন্ধানই করে চলেছে।

প্রেম সম্ভবত একটা সমোচ্চতার গৌরব দাবি করে, অথবা নারীর প্রেম সর্বদা তার যোগ্যতাকে ছোট করে দেখতে ভালোবাসে। তার স্বামীপ্রেম এত অনুচ্চারিত এত সর্বংসহ এত স্নেহ প্রবণতায় আক্রান্ত ছিল—আনন্দী তার অন্তরের বিভা দেখতে পায়নি—সেই অনুভূতি প্রবণতা তার তখনো জন্মায় নি, হয়ত কাঁচা বয়সের কারণেই! আর একথা যদি সত্যি হয় স্নেহ সর্বদা নিম্নগামী—সেই সত্যও তার জীবনে ব্যর্থ হয়েছে একবার। সন্তানকে আনন্দী সেই স্নেহ দিতে পারেনি, এক আত্মসর্বস্ব অস্তিত্বের আবরণ তাকে এই স্নেহ এই প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু সন্তান তার হৃদয়াবেগের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি খুলে দিয়ে গেল, প্রাণাধিক জননীকে প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে। পুত্রশোকের দুঃসহ অকূল পারাবারের পারে ধর্মবাণীর ছদ্মাবরণে গা ঢেকে এল অন্যজীবন। এল প্রেম, এল সন্তান বাৎসল্যের তীব্র অনুভব।

আনন্দী সন্তানকে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয় নি—স্বামীর ক্লান্ত দিনাবসানে পাশে বসার অবকাশ পায়নি কখনও। সেই মেয়ে গুরুর সেবায় অকপটে কায়মন নিবেদন করেছে।— ‘তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তারপরে তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙ্গুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত, ব্রাহ্মণ নই, তাহাকে নিজের হাতে রাধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।”

সন্তানের জন্য যে বিপুল শূন্যতা আনন্দীর সমস্ত চেতনায় আসন পেতেছে তাকেই পূরণ করার অভিপ্রায় নিয়ে এল নতুন এক বিশ্বলোকের বার্তা। তার শূন্য হৃদয়ে সেই বার্তা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাতা হল ধর্মোপদেশের সাঁকো। তার এ প্রান্তে আনন্দী, আত্মউন্মোচনে ব্যাকুল হৃদয়—অন্য প্রান্তে এক সুন্দরকান্তি পুরুষ, ধর্মের ললিতবাণীতে যে আর্তের চিত্তশুদ্ধি-শোকমুক্তি ঘটায়। সমাজের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয়—গুরু। তৃতীয় কেউ নয়, হয়তো এই গভীর শোকের দিনে তার স্বামীকেই কাছে পাওয়ার কথা ছিল আনন্দীর, হয়ত দ্বিতীয় সন্তান ধারণই ছিল যথার্থ নিরাময়ের উপায়, কিন্তু এ যেন বড়ো আটপৌরে চাওয়া। আনন্দীর যোগ্যতার পক্ষে বড়ই অকিঞ্চিৎকর। তাই গুরু হল এত মহার্ঘ আয়োজন। এই চোরাবালিতেই ডুবে গেল জীবনের যা কিছু স্বচ্ছ-শুভ-শুভ্রতা। আনন্দী জন্মান্তরে ফিরে এল ‘বোষ্টমী’ বেশে।

দুই

শুধু এক রাত্রে ফোটা অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।।

সেদিন চৈত্রমাস ছিল না—প্রহরশেষের রাঙা বেলাও নয়, আনন্দীর জবানবন্দীতে জানা গেল-‘সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায়...’ সকালের প্রথম আলোয় ফাল্গুনের সপুষ্প উচ্ছ্বাসে সর্বত্র বসন্ত ছিল জাগ্রত। পঞ্চদশী কিশোরীর জীবন সময়ের স্বাভাবিক ছন্দে অষ্টাদশী তরুণীর নববসন্তে উপনীত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি ছিল। সেই প্রভাতে মুকুলিত আম্রকাননের পটভূমিতে অজস্র পাখির কাকলির শঙ্খধ্বনিতে স্নানসিক্ত আনন্দীর সৌন্দর্য বন্দিত হল। সেই বন্দনার কিছু অন্যবার্তা ছিল যা গুরু-শিষ্যা সংবাদের বহির্ভূত।

আনন্দীর চোখে তা চুরি। সহজ নৈবেদ্যের ডালির আড়ালে গোপন আদানপ্রদান। গুরু সন্নিধানে পুত্রশোকাতুরা আনন্দীর কেটে গেছে অনেকগুলি বছর। আনন্দীর স্বামী এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিল তার গুরুকে ভক্তির গৌরবে, আর স্ত্রীকে দিয়েছিল আসন প্রেমের অধিকারে। গুরুদক্ষিণা যে তার মূল্যমান অতিক্রম করে অনুচিত এলাকায় অনুপ্রবেশ করছে সে তা দেখতেই পায়নি। একচক্ষু হরিণের মতো বৈষ্ণব পরিবারের শান্ত জীবন প্রবাহে মৃত্যুবাণ এল তার দৃষ্টিহীন চোখের দিক থেকে।

গল্পের এই অংশে এসে পাঠকের মনে এমন সন্দেহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী—বোষ্টমী নিছক মনগড়া গল্প নয়। গল্পগুচ্ছের (অখণ্ড, শ্রাবণ ১৩৮৯ সংস্করণ) গ্রন্থ পরিচয় অংশে এমন সন্দেহের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে এই উদ্ধৃতি থেকে : 'বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। ...' (রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৯)

অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথ এই প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বিশ্বভারতী স্থাপনার প্রণোদনা হিসেবেও তিনি এই সেবাব্রতী ভিক্ষান্নসেবী উদগতাপ্রাণা নারীর জীবন দর্শনের সঙ্গে তাঁর মুক্তাঙ্গনে বালক শিক্ষার্থীদের নিয়ে আশ্রম গড়ে তোলার ভাবনার সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরিতেও এই বৈষ্ণবীর উল্লেখ আছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বৈষ্ণবী গল্পের একটি বিশেষ মুহূর্তের সংকট আলোচনা করে একটি চিঠিতে (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৯) লিখেছেন, 'বোষ্টমী স্নান করে যখন সিক্ত বস্ত্রে চলে আসছে তার গুরু বললে, তোমার দেহখানি সুন্দর। সে সময় তার কণ্ঠস্বর ও মুখভাবে যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছিল সেটাতে বোষ্টমীর নিজের মনের প্রচ্ছন্ন আবেগকে জানিয়ে দিয়েছিল।' —(রবীন্দ্রনাথ, ১৩ মাঘ ১৩৪৩)

এই গল্পের সত্যের সঙ্গে কল্পনার এক অপূর্ব সখ্য গড়ে উঠেছে। গল্পে যেভাবে আনন্দী এই ধরা পড়া প্রেমের বিপর্যয় থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে সেখানে সূক্ষ্ম সন্দেহের অবকাশ থাকে—তবে কি আনন্দীর কাছে এই প্রেমের আবির্ভাব খুবই আকস্মিক! এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন গল্পকাব। সত্যি যাই হোক, গল্পের আনন্দীকে এক বেদনার প্রহরায় রেখে গল্পকার এই গল্পে এক অসাধারণ মাধুর্য এনে দিয়েছেন। আনন্দীর কাছে এই প্রেম দুর্ঘটনার মতো, তার পূর্বাপর অস্তিত্বকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এই প্রেমকে সে অস্বীকার করতে পারলো না। গোপনে গোপনে চুরি—তার কাছে অপরাধের নামান্তর। যে প্রেমের যোগ্যতা সাংসারে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকারী নয়, অথচ যে প্রেম সর্বস্বান্ত করে দেয় সেই আশ্চর্য অরূপরতন নিয়ে আনন্দী এক আত্মউৎসর্গের পথ বেছে নিল। সে ঘর ছাড়লো। স্বামীর কাছে তার সংকটের কথা জানিয়েই তার এই অনড় সিদ্ধান্ত। তার স্নেহময় স্বামী এই চূড়ান্ত সংকটের মুহূর্তে আনন্দীর পাশে দাঁড়াতে চায়। খুবই সহজ আর স্পষ্ট ভাষায় গুরুর সঙ্গে তার জীবনের ঘনিয়ে ওঠা বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে চায়। কিন্তু সংকট যে নিতান্তই সরল রেখায় আসেনি আর এই সংকট থেকে মোচনের একমাত্র উপায় আনন্দীর সংসার ত্যাগ তা বুঝতে তার বিলম্ব হয়নি। কিন্তু জীবনের দুটি বড়ো বিচ্ছেদ বেদনাকে সে এভাবে উল্লেখ করেছে— 'পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়া ছিল, আমার ছেলে আর আমাব স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা

সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম।.....' গল্পের বোষ্টমী সেই বেদনার অকূল পাথারে ভেসে চলা একাকী মানুষ—যার হৃদয়ের দুর্বার আবেগ রাতের ফোটা ফুলের মতো একবার শতদলে বিকশিত হয়ে—ভোরের আলোর চরম সত্যের সামনে ঝরে পড়ে মাটিতে। রাত্রির অন্ধকারের মদির উল্লাস মিথ্যা স্বপ্নের মতো প্রভাত-সূর্যের সামনে নতি স্বীকার করে। এখানে বোষ্টমীর এই ঘর হারানো প্রেম সেই শুধু এক রাত্রের ফোটা ফুলের মতো সত্যি আর মিথ্যার সন্দিগ্ধ দোলাচলে বিড়ম্বিত।

তিন

জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।

'কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতে ছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল।...' গুরুভক্তি, পুত্রশোক, ভগবদ্‌চিন্তা এসব কিছুর সমান্তরালে চলছিল জীবন, যে জীবন স্পর্শকাতর—যে জীবনে সময় বড়ো নিয়ন্ত্রক। তাই এই গোপন চৌর্য ধরা পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, আনন্দীর সামনে খুলে গেল প্যানডোরার সেই দুঃখভরা বাক্স 'তারপর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলট পালট হইয়া গেল।' সন্তানের জন্ম নয়, সন্তানের মৃত্যুশোকই তাকে মাতৃত্বের বেদনা দিয়েছিল। আরও অনেক পরে আনন্দী জানতে পারলো সন্তান ছাড়া আরও একজন এই সংসারে তাকে ভালোবেসেছিল—সে তার স্বামী। নারীর যা পার্থিব-গৃহসুখ যা আনন্দী অনায়াসে পেয়েছিল, জীবনের চরম লগনে যাকে অবহেলা দিয়ে তুচ্ছ করেছিল সে-ই একদিন চরম সংকটের মুহূর্তে জানতে পারলো শকুন্তলার মতো হারিয়ে গেছে তার অভিজ্ঞান। এই সংকটে চিরদিনের মতোই তার স্বামী তাকে দুহাত বাড়িয়ে আগলে রাখতে চাইলো। কিন্তু প্যানডোরার বাক্স খুলে যাওয়া এই নতুন পৃথিবীতে কোনও শুভ-আলিঙ্গনই আর অভিপ্রেত হয় না। তার গৃহাঙ্গনে শিকড় গেড়েছে স্বর্ণলতা। নিষ্ফল নিষ্পত্র এই সর্বগ্রাসী বল্লরী গৃহস্থের প্রাঙ্গণে কল্যাণ-প্রহরী তুলসীমঞ্চে মাথা তুলেছে। জীর্ণ হয়েছে ওষধি—বিষ নিঃশ্বাসে সর্বনাশ করেছে তার, তবু তার মনোহারী রূপ তার মনোময় বিস্তার আচ্ছন্ন করেছে মনপ্রাণ—'কী সুন্দর রূপ তাঁর! বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূর-বিহারী চক্ষু দুটিকে বহুদূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিল—

অরুণ কিরণ খানি তরুণ অমৃত ছানি
কোন্ বিধি নিরমিল দেহা।'

বিবাহিত জীবন, ধান চালের কারবারের নিখুঁত হিসেব, সন্তানের জন্ম এবং মৃত্যু—এই নৈমিত্তিক বন্ধনের মধ্যে প্রেমের যে আবহ সঙ্গীত ছিল তা প্রদীপের আলোর মতো। তাতে ঘরকন্না চলে। বিদ্যুতের প্রভা নিয়ে যে প্রেম এল তার জীবনে—শুধু দহনজ্বালাই নয়, তারই অশনি সংকেতে আনন্দীর নিয়তি নির্ধারিত হল। তবু এই বিদ্যুৎস্পর্শই তার ধাতুকে রূপান্তরিত করল নতুন গোত্রে। পটভূমিতে ছিল বসন্ত—এ বসন্ত পুষ্প সমভারে বর্ণিল এই বসন্ত নারীর চিহ্নে জর্জর। অব্রাহ্মণ হবার অপরাধে শিষ্যা অন্নসেবায় গুরুর রসনাকে তৃপ্ত করতে না পারার দুঃখে দীন হয়ে ছিল—গুরুর দৃষ্টির অভিনন্দন তাকে এক মুহূর্তে সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করে দিল।

'সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ...ভিজাকাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ...তিনি আমার মুখের পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

'ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছে, ...মনে হইল সমস্ত আকাশ পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। ...একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর ঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখে কেবলই নাচিতে লাগিল। ...'

...ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুর ঘরে ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।'—সে পৃথিবী আর নেই, পৃথিবীর রং বদলে গেছে—জীবনের সরল ধারাপাতে অপরিচিত পদধ্বনি শোনা গেল।

যে সিক্ত বসনে শুদ্ধ হয়ে আনন্দী তার ঠাকুরকে স্পর্শ করার অধিকার পেত সেই সিক্ত সজ্জা-ই অপরাধের ভাগী হয়ে ঠাকুরকে তার প্রতি বিমুখ করে দিল। সেদিন আকাশ পাতাল পাগল হয়ে আলুথালু হয়ে উঠেছে কেন আনন্দী তা জানতো। তাই সে গৃহত্যাগের সংকল্প নিল। নামাবলির আড়ালে লুকানো তার গোপন দীর্ঘশ্বাস, কয়েক ফোঁটা অশ্রু আর গভীর কোনো অপরাধ বোধ! এ বোষ্টমী গল্পের আনন্দী। সত্যি আনন্দী (তার নাম সর্বখেপী) সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে বলছেন—'বোষ্টমী যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।' (চিঠিপত্র ৯/৭আশ্বিন ১৩৩৮) কিন্তু সত্যি বোষ্টমী আনন্দী হয়ে উঠলো তখনই যখন বেদনার মাধুর্যে সে মণ্ডিত হল। বোষ্টমীর ঘরের দুয়ার ভেঙ্গেছিল এক রাতের ঝড়ে। এতে কোনো সংশয় নেই। ঘর আর বাইরের মধ্যে নিজের অবস্থান খুঁজে পেতে বারবার সে আহত হয়েছে, সংশয়িত হয়েছে তীব্র অপরাধ বোধে ভিক্ষান্নজীবিকা বেছে নিয়েছে—এই নতি স্বীকার তার জীবন দেবতার কাছে। কিন্তু প্রেমের দেবতার কাছেও সে হার স্বীকার করে নিয়েছে। এই প্রেমই তাকে পথের ভিখারি করেছে—ভেঙ্গে যাওয়া ঘর মেরামত করতে মন চায়নি তার। তার নিস্তরঙ্গ জীবনে যে তরঙ্গ তুললো এই অজানিত প্রেম—ঝঙ্কৃত করলো তার জীবনবীণার তন্ত্রীগুলিকে সেই সুরে নিজের কণ্ঠস্বরে যেন কথা বলে উঠলো অপরিচিত কেউ। তবু এই অপরিচিতের অস্তিত্বে শঙ্কিত না হয়ে বড়ো প্রিয়জনের মতো বড়ো বেদনার মতো জড়িয়ে ধরেছে তাকেই। তার এই নবজন্মে হারিয়ে যায় অস্তিত্বের একমাত্রিকতা। জীবন জিজ্ঞাসার দোলাচলে ঘনিয়ে ওঠে অস্তিত্বের সংকট। এক নারীর-জীবনের অস্তিত্বের সংকট।

চার

'আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমার পথের সন্ধান কে করে।'

গল্পগুচ্ছে 'বোষ্টমী' গল্পটি সংকলিত হয়েছে কালানুক্রমে 'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ১৩২১) গল্পের

পরে এবং 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ ১৩২১) গল্পের আগে। বোষ্টমীর রচনাকাল উল্লেখিত হয়েছে আষাঢ় ১৩২১ (গল্পের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে গল্পকার লিখেছেন—'তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ় মাসের বিকাল বেলা'...)।

১৩২১ বঙ্গাব্দ বা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণযোগ্য ল্যান্ডমার্ক। কারণ অনুমেয়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী মানুষের নতুন নতুন সম্পর্ক এসময় গড়ে উঠতে শুরু করে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অথবা পরিবারগত কিংবা জাতিগত ভিত্তিতে মানুষের আইডেনটিটি নির্ধারিত হবে নাকি আন্তর্জাতিক নিরিখে তার সুখ দুঃখের জমি জরিপ করা হবে? এই প্রশ্ন বিশেষ করে সাহিত্যে বড়ো বেশি করে উঠতে শুরু করে। এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবে মুখ তুললো অন্য একটি প্রশ্ন—হিটলারের মতবাদে আলোড়িত বিশ্বে অবগুণ্ঠন খুললো নারী। প্রথমত তাকে প্রমাণ করতে হল বায়োলজিকালি সেও মানুষ। এই যন্ত্রণাদগ্ধ অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল সেই কবেই। জোয়ান অব আর্কের কথা অনেক দূরের হলেও রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ—বিদ্যাসাগর প্রমুখের স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনে আমাদের বাংলাতেও এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তরের দাবি উঠছিল—এ ভাবেও বলা যেতে পারে সমাজ, প্রশাসন এবং সর্বোপরি মানুষের চৈতন্যের কাছে দাবি করছিল স্বীকৃতি।

সাহিত্যের ইতিহাসে ইব্‌সেনের 'ডলস্ হাউস' নাটক এ প্রসঙ্গে বহু আলোচিত বিষয়। এবং এই সময়কার রবীন্দ্ররচনায় বিশেষ ভাবে আলোচিত বিষয়। এবং এই সময়কার রবীন্দ্র-রচনায় বিশেষ মনোযোগের কথাও সাহিত্যেব ইতিহাসকাররা আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র ছোট গল্পেই যদি দেখি সেই মকশো করার সময় থেকে (ভিখারিনী) দু'চারটি গল্প বাদ দিলে প্রতিগল্পেই অনন্যসাধারণ প্রকাশ নিয়ে নারী এসেছে বারবার—অনিবার্য ভাবেই। এভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের অর্ধেক আকাশ জুড়েই নারীর উপস্থিতি। এই নারী প্রতিমা অনিবার্যভাবে বিচিত্র রূপিনী। 'ঘাটের কথা' (কার্তিক ১২৯১) র কুসুম, 'দেনা·পাওনা' (১২৯৮) র নিরুপমা, 'পোষ্টমাস্টার (১২৯৮) র রতন এরা সেই অর্থে কোনো বিশ্বযুদ্ধসম্ভবা নয়, এবং 'দেনাপাওনা'র নিরুপমা-রা তাদের জীবনবৃত্তে কোনও ঢেউ তুলতেও চায়নি—কিন্তু সেই থেকে বিশ্বজুড়ে ঢেউ ওঠার অনেক আগে থেকেই নিরুপমা কিংবা রতনরা ভাবাচ্ছিল আমাদের সাহিত্যকে। বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ অভিঘাত চঞ্চল করেছিল সংবেদনশীল স্রষ্টাব চেতনাকে। তাই 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১) রবীন্দ্র ছোট গল্পের ইতিহাসের সনতারিখের নিরিখে আধুনিক কিংবা ভাষা রীতির ক্ষেত্রে নবযুগের স্বাক্ষর হলেও এগল্প কেবলই যুগের ফসল নয়। রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবাহের বিস্তীর্ণ অববাহিকায় এমন সম্ভার পূর্বাপরের সমন্বয়ে অবিরল।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই মানুষের অস্তিত্বের সংকটের ছবিগুলি বিশ্বসাহিত্যে আরও বেশি বেশি করে সংবেদনশীল প্রকাশ ঘটেছিল, বাংলা সাহিত্যেও তার প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করে রাখার আয়োজন শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রমথ চৌধুরী এবং 'সবুজপত্রে'র উল্লেখ। 'সবুজপত্রে'র পাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনাগুলির বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা আছে। এই বিশেষ সময়ের রবীন্দ্র রচনারীতি এবং রবীন্দ্রভাবনা উভয়ই আমাদেব বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক। 'সবুজপত্রে'র পাতায় উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু যে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেছেন তা স্মৃতিধার্য।

'তাঁর সাহিত্যজীবনে দু-বার কিছু বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। প্রথমটি এতই বড়ো যে বিপ্লবের কাছাকাছি পৌঁছয়,........সবুজপত্রের যুগে.......তিনি কাব্যে লিখলেন 'বলাকা' আর গদ্যে লিখলেন 'চতুরঙ্গ', 'চতুরঙ্গে'র অব্যবহতি পরে 'ঘরে বাইরে'। 'সবুজপত্রে' মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ;.......সবুজপত্রের আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই।....

'সেই যে 'ঘরে বাইরে' তে চলতি ভাষাকে বরণ করলেন; জীবনে আর সাধুভাষা লিখলেন না;' ('রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য' নিউ এজ ৩য় সংস্করণ পৃ. ১৫)

শুধু তাঁর সাহিত্যে ফরমের দিক থেকেই এই বাঁক এল তাতো নয় আসলে যে কনটেন্টকে প্রকাশ করতে চাইলেন—তারই ভার বহন করলো এই ভাষা।

'চতুরঙ্গ' এবং 'বোষ্টমী', 'ঘরে বাইরে'র অব্যবহিত পূর্বজ রবীন্দ্রকথাসাহিত্য। দামিনী (চতুরঙ্গ) এবং 'আনন্দী' (বোষ্টমী)র জীবনে কোথাও একটা সমস্কেলের সুরধ্বনি শোনা যায়। দুটি কাহিনিতেই গুরু একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে আসে এবং প্রেম গার্হস্থ্যজীবন, আত্মগতজীবন সমস্তকিছুকে নাড়াচাড়া দিয়ে যায়। দুজন নারীই গুরুর আশ্রয় পায় এবং হারায়। অবশ্যই ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দামিনীর স্বামী শিবতোষ এবং আনন্দীর স্বামী (নামবিহীন) স্বতন্ত্র মানুষ, বলা যায় বিপরীত ধরনের মানুষ। দামিনী তার স্বামীর উদ্ভট গুরুভক্তির নৈবেদ্য হিসেবে লালানন্দের আশ্রয়ে আসে সেখানে সে শচীশকে পায় এবং তাকেই গুরু বলে বরণ করে নেয়। দামিনীর গুরু শচীশের পিছনে চতুরঙ্গ উপন্যাসের যে পটভূমিকা আছে তার সঙ্গে বোষ্টমী গল্পের আনন্দী ও তার স্বামীর গুরুর (নামবিহীন) কোনো তুলনা হয় না। অবশ্য লালানন্দের (চতুরঙ্গ) সঙ্গে এই গুরু (বোষ্টমী)র আত্মবিলাসের নৈকট্য আছে এবং শিবতোষের অন্নধ্বংস করা, শচীশকে দিয়ে পদসেবা করানোর সঙ্গে বাল্যসাথী আনন্দীর স্বামীর ওপর নানা পীড়নের প্রসঙ্গ এখানে সাদৃশ্য হিসেবে মনে করা যেতে পারে।

চতুরঙ্গে শচীশ দামিনীর প্রেম অনুভব করে তাকে জীবনে গ্রহণ করতে পারে না, দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করে। শচীশের প্রেম হৃদয়ে নিয়ে শ্রীবিলাসের মতো স্বামী জন্ম-জন্মান্তরে পাবার অপূর্ণ সাধ নিয়ে দামিনী তার জীবনের অন্তিমে পৌঁছায়। স্বামী শিবতোষ, গুরুলালানন্দ, শচীশ-শ্রীবিলাস-এতজন মানুষের কাছাকাছি এসেও জীবনের অন্তিমে দামিনী একাকিত্বের বেদনা নিয়ে চলে যায়—নিঃসঙ্গা এক নারী যে একলা চলেছে আর ব্যাকুল হয়ে পথের সন্ধান জানতে চেয়েছে বারে বারে।

আনন্দীর বিবাহিত জীবনে সুখের প্রাচুর্য ছিল। সমস্ত দুঃখের ভার বহন করে তার স্বামী তাকে সুখে রেখেছিল। সন্তানের জন্য বিনিদ্র রাত যাপন—রাত জেগে গ্রামের যাত্রা-উৎসবের অংশীদারী হতে না পারায় দুঃখ—কোনো কিছুই তাকে পেতে হয়নি। প্রেম আর স্নেহের দুইপক্ষ বিস্তার করে তার স্বামী তাকে বিঘ্ন থেকে আড়াল করে রেখেছেন। পুত্রের মৃত্যু এসে প্রথম জানালো কী গভীর স্নেহছায়ায় মাতাপুত্রকে ঢেকে রেখেছিল সেই মানুষ। পুত্রের মৃত্যুতে সেই স্নেহময় পিতার শোকেরও কোনও উল্লেখ নেই—মাত্র দু-একটি বাক্যে আনন্দীর অনুভব থেকে তা ধরা পড়েছে—'আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।.......কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন কহিতে জানেন

না।' অথচ তিনিই আনন্দীর উচ্চকিত শোককে প্রশমিত করতে তাঁর গুরুর স্মরণ নিলেন। আনন্দী তার স্বামীর কাছে খেলাঘরের সাথী নয় সে তার মহার্ঘ সংগ্রহ। আনন্দীর শোকের নিরাময়ের মধ্যেই সে তার সন্তাপ হরণের পথ খুঁজে নিল। এই প্রথম আনন্দীর জীবনে নতুন এক মানুষের আবির্ভাব হল যার জন্য সে তার হৃদয়ের মাধুর্য, কায়িকশ্রম, প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের মনোযোগ সানন্দে অর্ঘ্য দিয়েছিল। বিবাহের পরবর্তীজীবনে স্বামীর উপস্থিতি তাকে চমকিত করেনি, কারণ তখন তার প্রেমানুভূতির বয়স হয়নি—পুত্রের জন্মে সে কিছুটা বিব্রত বিরক্তই ছিল কারণ—'ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে........'। কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রেম, কর্তব্য আর পুত্রের জন্য বাৎসল্য তার অন্তরের গোপন মৌচাকে জমেছিল পরিপূর্ণ হয়ে। সম্পর্কহীন এক তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যে তারই ক্ষরণ শুরু হল। যদিও তা ছিল আনন্দীর মনের অগোচরে কিন্তু তা ছিল অনিবার্য। আনন্দী জেনেছিল এই ধর্ম আলোচনা এই গুরুসেবা এ-ই তার সমস্ত দুঃখ মোচনের মুক্তির পথ। অথচ সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো অনন্ত বন্ধনময় প্রেম। পথের এই গোলকধাঁধা আনন্দীকে ব্যাকুল করে তুললো—কে বলে দেবে তাকে পথের সন্ধান! পথে নামলো আনন্দী পুরনো পরিচয়কে অস্বীকার করতে, বোষ্টমীর আবরণে ঢাকলো নিজেকে। এ তার জন্মান্তরের কাহিনি, এ-তার পথের সন্ধানে প্রব্রজ্যার গল্প।

পাঁচ

'সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।'

'বোষ্টমী' গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবেই 'বোষ্টমী' নিছক গল্পমাত্র নয়। রবীন্দ্র ছোটগল্পের চারুলতা (নষ্টনীড়), মণিমালিকা (মণিহারা), অচিরা (শেষকথা), সোহিনী (ল্যাবরেটরি)-রা সত্যি কিন্তু বোষ্টমীর নামাবলির আড়ালে আনন্দীর মুখটা যেন বড়ো বেশি ধরা পড়ে যাওয়া সত্যি। এর আগে প্রসঙ্গত আমরা আলোচনা করেছি 'চতুরঙ্গ'র সমসাময়িক 'বোষ্টমী'র রচনাকাল এবং সাধুগদ্যরীতির প্রান্তিক রচনাগুলির মধ্যে বোষ্টমী অন্যতম। 'বোষ্টমী' সংলাপ পূর্বাপর সাধুরীতিতে রচিত। এ গল্প আটপৌরে চলিত ভাষায় রচিত হওয়ায় সম্ভবত কোনও বাধাও ছিল না। কিন্তু বোষ্টমীর নামাবলির ওই ছদ্ম আবরণটুকুর মর্যাদা রেখেই সম্ভবত এগদ্যের মধ্যে সাধুরীতি একটা মর্যাদাকর দূরত্বের আবহ এনেছে। বোষ্টমীর প্রেমকে প্রতিদিনের পথের ধুলায় ধূসর করতে চাননি লেখক। এই গদ্যে বৈষ্ণবীয় বিনয় এবং সৌজন্য পরিপূর্ণ মাধুর্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আনন্দী গ্রামের মেয়ে, গ্রামেরই বধূ এবং সে দীক্ষিত-বৈষ্ণব। তার জীবন প্রবাহ এক শহুরে লেখকের ফাউন্টেন কলমের ধাতব শীর্ষে ততোটা যথাযথ হয়না—লেখকের উক্তির মধ্যেও তার স্বীকার আছে—'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার চলে কী করিয়া" উত্তর শুনিলাম,.......আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি', আবার 'শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না।......কিন্তু, এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়।......' বোষ্টমী গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল এর প্রকৃতি পরিবেশের আধার। গল্পগুচ্ছের

সংকলনে এর অব্যবহিত পরের ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র'। সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির মেজোবউ তার স্বামীকে জীবনের প্রথম এবং সম্ভবত শেষ চিঠিটি লেখে এই সমাজ সংসারের ওপর তীব্র শ্লেষ ব্যক্ত করে। সারাজীবন স্বামীগৃহে সে যে অন্নগ্রহণ করেছে তাকেই সে অনুগ্রহের দান বলে আত্মধিক্কার দিয়েছে। ভবিষ্যৎ তার অনিশ্চিত (অন্তত বাস্তব বুদ্ধি তাই বলে) সেই ভবিষ্যৎই তার জীবনের পূর্ণতার দিশারী। নবীন যুগের রাজনীতির হাওয়া তার মাখন বড়ালের গলির সপ্তবিংশতিতম গৃহাঙ্গনকেও কিছু তেজস্ক্রিয়তা অনুদান দিয়েছিল—শুভ্র একফালি মেঘের মতো তার ছোট ভাই শরতের সৌজন্যে। মৃণাল স্বামীর শ্রীচরণকমল ছিন্ন হয়ে শ্যাওলার মতো আলম্বনহীন হয়ে উঠতে চাইলো—এপথেই তার মুক্তি। আনন্দী বেছে নিল মাধুকরীর বিনতি। স্ত্রীর পত্রে মৃণাল সমাজ এবং জীবনের কাছে যত প্রশ্নের উত্তর সে নিজে পেয়েছে তাই সে সমাজ সংসারকে জানিয়েছে স্বামীর কাছে লেখা চিঠির ভাষায়। এবং তার এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে সে-ও স্মরণ করেছে মীরাবাঈকে (একটি মীরার ভজনের উল্লেখ আছে 'চিঠি'র শেষে)। আমাদের গল্পের বৈষ্ণবী—আনন্দী বোষ্টমী সত্যি সত্যিই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পুত্রর নাম কঠিন কণ্ঠে নিয়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে জীবনমন্থন সঞ্জাত নানা অমীমাংসাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছে। তার জীবনেও দামিনীর (চতুরঙ্গ) মতো একাধিক পুরুষের সান্নিধ্য তাঁকে মুক্তির পথ খুলে দেয়নি। অবশেষে একদিন সে পেলো এই লেখককে যার জীবনযাপনের সঙ্গে এই গ্রামের জীবনযাপনের কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। শুধু গ্রামের এই আকাশ এই আলো এই সরল প্রকট সৌন্দর্যের যে রূপগ্রাহী। বোষ্টমী তার সর্বোত্তম শ্রদ্ধার সম্বোধন 'গৌর' বলে তাকে সম্ভাষিত করলো এবং সমর্পণের ভঙ্গিতে তার গৌরের কাছে সে-উপদেশ চাইলো "গৌর, আমাকে কিছু একটা উপদেশ দাও।" জীবনের যে প্রশ্নগুলির উত্তর সে পেয়েছে তা সম্ভবত তার শান্তি হরণ করেছে। তাই তার সজ্জায় ভিখারিনীর নর্তশির নম্রতা, তাই তার সুখের জীবনের হাতছানিকে এড়িয়ে চলা। মৃত সন্তানকে খুঁজে বেড়ানো আসলে নিজেকেই খুঁজে ফেরা। সন্তান আর স্বামীর প্রতি অনাগ্রহ অপ্রেম তার বিবেককে পীড়িত করে রেখেছে। এত কিছুর পরেও সমস্ত শুভাশুভ বোধকে প্লাবিত করা প্রেম তাকে সপ্রশ্ন করে রেখেছে জীবন ভোর। কেন এ প্রেম এত স্পষ্ট এত সত্য হয়ে বেঁচে থাকে—এই তার প্রশ্ন। শান্তশ্রী পল্লীর চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে এই ব্যাকুল আত্মগত জিজ্ঞাসা খুব অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না লেখকেব কাছে। এই গল্পের প্রথমার্ধ তাই একটা দীর্ঘ পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিকায় অবতরণিক অংশ। বোষ্টমীর মূল গল্প তার আত্মকথনে এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে ছাদের উপব সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল, বোষ্টমী তাহার জীবন কথা আমাকে শুনাইল।—'

সন্ধ্যাতারা, যা আসলে শুক্রগ্রহ ভেনাস অর্থাৎ প্রেমের দেবী হিসেবেও তার পরিচয়, পরিচিত জ্যোতিষ্কের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী—সে পশ্চিমে থেকে পূর্বে পরিক্রমা করে। তার দৈনিক পরিক্রমণের দৃশ্যমানতাও সংক্ষিপ্ত কালিক। সে উজ্জ্বল কিন্তু সাময়িক। এই সন্ধ্যাতারাই কখনো শুকতারা যখন সে পুব আকাশে ভোরে দৃশ্যমান। এই গ্রহের সৌন্দর্য, ব্যতিক্রমিতা, অস্থিরতা নাম পরিবর্তন বোষ্টমীর জীবন কাহিনির উপর ছায়া ফেলে যায়।

এই সুনির্দিষ্ট সন্ধ্যার আগে বোষ্টমী ও লেখকের মধ্যে জানাশোনা হওয়ার একটা ছোট আপাততুচ্ছ মুখবন্ধ আছে। বিড়ম্বিত নাগরিক জীবন থেকে শ্যামলশান্ত পল্লী বসুধরায় ক্রোড়ে এসে নিজেকে সতর্ক লোকচক্ষুর কারাবাস থেকে মুক্ত মনে করার মধ্যে কিছু প্রাণের আরাম রবীন্দ্রনাথ পেতে চেয়েছেন। এখানেও তিনি জানতে পেরেছেন 'এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু একটা মনে ভাবিয়াছে।'.....তার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার বর্ণনাটিও এগল্পের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যবাহী—'.....তখন আষাঢ় মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, ...বৃষ্টি অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল।'

প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীয় শান্তশ্রীর মধ্যেও সম্ভবত এইভাবটাই ছিল। বনগন্ধ যেমন অযাচিত বন্ধুত্বের সৌরভ দিয়ে যায়—হঠাৎই ফুলের নৈবেদ্য দিয়ে বোষ্টমী একটা অনির্দিষ্ট সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয় লেখকের মন —পূর্বপরিচয়ের প্রসঙ্গ ছাড়াই। এই বোষ্টমী গল্পকারকে গ্রহণ করেছে তার ইষ্টরূপে। এই সমর্পণের মধ্যে নিরাশ্রয়ের ক্লান্তি ধরা পড়েছে। সম্পর্কের আর জটিলতা নয়, এখন আত্মমোক্ষণ প্রয়োজন। বিলাত ফেরত লেখকের সম্পর্কে কিছু কুকথা পল্লীর এই নির্মল আকাশেও দূষণ ছড়িয়েছে—বোষ্টমী স্বয়ং তার সাক্ষী। তবু রাতের আহারের পর তাঁর ভুক্তাবশেষ বোষ্টমী গ্রহণ করেন। কোথাও একটা মাথা নত করার ব্যাকুলতা—সকল অহংকারকে চোখের জলে ডুবিয়ে দেয়ার বিনম্রতার পাঠ সে ভাবেই নিতে চায়।

ছয়

'বোষ্টমী' আদ্যন্ত অসাধারণ এক প্রেমের গল্প। খুব সন্তর্পণে খুবই অনুচ্চ স্বরগ্রামে ধীরে ধীরে তা বোষ্টমীর আত্মকথনে উন্মোচিত হয়েছে। বন্যার জলের মতো প্রেম এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। এই বহিরাগত প্রেম বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল তার শান্ত গার্হস্থ্য জীবন। সেই ঝড় সেই প্লাবন আনন্দীর জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল। বন্যার জল সরে গেলে যেমন ক্লেদক্লিন্ন অবশেষ পড়ে থাকে তেমনি এই জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে 'আনন্দীর কোলে সেই কুৎসিত কুপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার বন্যার অবসানে যে উর্বর পলি ভরে দেয় সোনার ফসলে তেমনি এই দূরে ফেলে আসা জীবনের অভিজ্ঞ পলিতে আনন্দীর মানবজমিনে শুরু হল আবাদ—সোনা ফলানোর কৃষি। দূর থেকে জীবনকে ফেলে চেনা—সত্যকে ধ্রুবতারার মতো খোঁজা এ গল্পের উপসংহার। জীবনের প্লাবনের অধ্যায় আনন্দীকে বোষ্টমীর জন্মান্তরে উপনীত করলেও—তার জীবনের উপলব্ধি আশ্চর্য।

আনন্দী তার কাহিনি শুরু করে এই ভাবে—

'আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ. ... .'। পাশাপাশি অন্য একজন মানুষের কলঙ্কলাঞ্ছিত বর্ণনা-এই মানুষের শুভ্রতার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। স্বামী আর শ্রদ্ধেয় গুরুঠাকুরের কাছে তার ভক্তি এবং ভালোবাসার উত্তরে লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন পেয়েছে। সারা জীবন এই তদগত প্রাণ শিষ্যের অন্যেব প্রতিপালিত হয়ে তার শান্ত জীবনে দুর্ভাগ্য এনে দিয়েছে। পুত্রের মৃত্যুতে স্নেহময় পিতা শোক করলেও সংযম দেখিয়েছে—বোষ্টমী বলছে—'তিনি তো

কেবল সাইতেই জানেন, কহিতে জানেন না।' বক্তব্যের ক্রিয়ায় কালে একটা চিরসত্যকে স্বীকার করার আভাস আছে। গল্পের শেষে বোষ্টমী বলছে— তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম।......আমি জানি আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিযা লইলেন।' এই অন্তর অবলোকনের পাশাপাশি গুরুঠাকুরের প্রশস্তির কথা মনে পড়ে 'তোমাব দেহখানি সুন্দর'। গল্পে আনন্দীর শেষ উক্তি 'এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।' আনন্দীর স্বামী নিজে ঠকেছিল—ঠকায়নি অন্যকে। তার সেই সারল্য তার ঋজু সত্যপবায়ণতার কাছে বোষ্টমী তার ভিক্ষান্ন দেবার নম্রতার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন প্রণত হয়, সত্যের কাছে, সুন্দবের কাছে নয়। এই সত্যানুসন্ধানই এগল্পে ধ্রুবতারাব খোঁজ।

অতিথি : চিরকিশোর পথিকের গল্প

অপর্ণা দত্ত (চক্রবর্তী)

পার্থিব বিবিধ বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজন পথের—ঘর থেকে পথে মুক্তি—মুক্তির পথ। রবীন্দ্রনাথের মনের এক বিশেষ দিক-এই-চির-পথিক-সত্তা-কবির মনের গহনে এক ঘরপালানো পথে নামা বালক চিরকাল তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তা হয়ে থেকে গেছে। যার প্রকাশ ঘটে'ছে বিভিন্ন শিল্পে, বিভিন্ন সৃষ্টিতে বারে বারে। 'অতিথি' গল্পেব তারাপদও যেন কবির সেই বিশিষ্ট পথিক সত্তারই প্রকাশ। পথ তারাপদকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তাকে ক্ষ্যাপার মতো পাড়ায় পাড়ায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। পথের সন্ধান সে পায় নদীর স্রোতে—ঢেউ-এর গানে-পালতোলা নৌকার দ্রুতগতিতে। গানের সুর তাকে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দেয়। কূল থেকে অকূলে নিয়ে যায়। বারে বারে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে তাকে অতিথি করে আনে। কিন্তু কোনো ঘরই তাকে বেঁধে রাখতে পারে না।

তারাপদের পলাতক মন কোথাও খুঁটি বাঁধতে চায় না—পারেও না। সে যে চঞ্চল—তাই সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরি তাকে দূবের সুর শুনিয়ে ডাকে। কোথায়ও তাকে সীমার মধ্যে ধরে রাখা যাবে না। তার সীমা শুধুই অসীম আকাশ। আর সেই আকাশের ডাকেই তাকে বারবার ছুটে যেতে হয়। নদীর অকূল স্রোতের টান তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় দূর থেকে দূরান্তরে। স্থির হয়ে থাকা যে তাব রক্তে নেই, তার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে এক বিস্ময়বোধ যে বিস্ময়বোধ তাকে নিয়ে যায় প্রকৃতির বন্ধনহীন পূর্ণতায়।

পরবর্তী কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমরা দেখেছি সব সুখ সব প্রাপ্তি পার্থিব সব তৃপ্তি থাকা সত্ত্বেও যুবকটি একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের কাছে গিয়েছিল একা একা আত্মহত্যার ইচ্ছা নিয়ে। জীবনের অপার বিস্ময় তার মধ্যে বেদনা জাগিয়ে ছিল—বিষণ্ণতা জাগিয়েছিল। এই বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পেতে সে মৃত্যুর কাছে আশ্রয় পেতে গিয়েছিল। 'আট বছর আগের একদিন'-এর এই যুবকটি কবির যুগপ্রভাবে কিংবা জীবনানন্দের অন্তর্লীন বিষণ্ণতার কারণে সম্ভবত চির-নির্লিপ্ত ও চির উদাসীন-মৃত্যুর-কাছে আশ্রয় খুঁজেছিল। কিন্তু তারাপদর বিস্ময় কৌতূহল তাকে জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়নি বরং তার মনকে করে তুলেছে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ও স্বাধীন। তারাপদরও কোনো দুঃখ বা অভাব ছিল না। তার মা-দাদা-ভাইবোন এমনকি সমস্ত গ্রামবাসীর সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। তবু সে তার নিজের জন্মলক্ষণের বৈশিষ্ট্যে ছুটে চলেছে জীবনের কূলে কূলে ঘাটে ঘাটে। রবীন্দ্রনাথের পথিক দর্শনের প্রতিনিধি তারাপদব কৌতূহল বা বিস্ময় তাকে আরও বেশি জীবন সংলগ্ন করে তোলে কিন্তু কোথায়ও বদ্ধ করে না।—"সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত।"

প্রকৃতির অফুরান রূপ অম্লান সৌন্দর্য তার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ সমেত তারাপদ তার পিপাসার্ত দৃষ্টির মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে চাইত। তার সেই রূপতৃষ্ণা দৃষ্টির আওতা থেকে কিছুই যেন বাদ না যায় এই তার সর্বক্ষণের চেষ্টা।

তারাপদের আকর্ষণের বিষয়গুলি অপার্থিব—সে যেন বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের সাথে সংলগ্ন কোন চিরন্তন বেঁচে থাকার আনন্দ পেতে চায়। কিন্তু সাধারণ বালকদের যা আকর্ষণ অর্থাৎ আহার আরামে তার কোন মোহ নেই। যে কাজে সে আনন্দ পায় একমাত্র সেই কাজই সে করে। অন্তরে এক তীব্র স্বাধীনতা যা কোনভাবেই কোন স্নেহ অনুরোধ বা সুবিধা বা ঐহিক সুখের জন্য সে ব্যাহত করে না। রাঁধা-বাড়া-বাজার করা থেকে নৌকা চালনা-পর্যন্ত সকল কাজেই তার আগ্রহ। সে এই বিশ্বপ্রকৃতিরই যেন এক-অংশ—তাই প্রকৃতির মতোই সে সর্বদা-সচল-সর্বদা-ক্রিয়াশীল এবং একই ভাবে সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই নির্লিপ্ত। ভূত-ভবিষ্যতের সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই তার কাজ।

মনের ভেতরকার পথিকবৃত্তি কতকগুলি প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন নদী যার চলমানতা সর্বদা এগিয়ে যাওয়া। নৌকা যা অনবরত এগিয়ে চলে স্রোতের ধারায় তার কোনো সীমা নেই তার সীমা হল আকাশ—একমাত্র অসীম আকাশের সীমা দিয়েই তাকে সীমায়িত করা যায়। নদী তার স্রোতেব বহমানতায় তারাপদকে এক অমোঘ আকর্ষণে টানে।

তারপদর আর এক আকর্ষণের বিষয়—যাত্রাদল। যাত্রাদলের মধ্যেও যে আছে অস্থায়িত্ব। জীবন যে কোথাও থেমে থাকে না। থেমে থাকলেই জীবনের মৃত্যু ঘটে। এমনকি মৃত্যুকে নিয়ে অত্যধিক শোক করলে মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুও তার গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলে। তাই চলা আব চলা পথ দিয়ে যে পথিক চলেছে তার গান শুনে তারাপদর মরে থাকা দায় হয়ে উঠেছিল কবে কোন বালক বেলায়—সাত আট বছর বয়সে। "তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।" গানের সুর তাকে বড় টানে। এই সংবেদনশীলতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার কারণে সে "নানাদলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি প্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব-প্রাপ্ত হয় নাই।"

পথের নেশায় একবার নন্দীগাঁয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে মতিলালবাবুদের নৌকায় ওঠে। মতিলালবাবু সপরিবারে স্বগ্রাম কাঁঠালিয়ায় ফিরছিলেন। ব্রাহ্মণবালক তারাপদকে দেখেই তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীও। গল্পের সূত্রপাত এখান থেকেই। তারাপদ যেন এক চলমান প্রাণ। তাকে 'অতিথি' গল্পে মতিলাল অন্নপূর্ণার সংসারে সাময়িক অতিথিরূপে পাওয়া যায়। কিন্তু যত স্নেহ—যত ভালোবাসাই সে পাক-না কেন—"ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না।"

গল্পটিতে সূক্ষ্মরেখায় একটি প্রণয় উপাখ্যান আছে। প্রকৃতির যে বিচিত্র খেয়াল কখনো মেঘ আনে অথবা বৃষ্টি—কখনো-রোদ অথবা ঝড় সেই খেয়ালেরই প্রতিভূ চারুশশী। তার মনের খবর সে নিজেই বুঝতে পারে না। মতিলালবাবু ও অন্নপূর্ণার একমাত্র মেয়ে, কাঁঠালিয়া গ্রামের জমিদারের মেয়ে চারুশশী। এই সব প্রেক্ষাপট এবং মতিলালবাবু ও, অন্নপূর্ণার অত্যধিক আদর তাকে খামখেয়ালি করে তুলেছে। তারাপদকে তার পিতা ও মাতা যে স্নেহ করছে ভালোবাসছে এটা যেন চারুশশীর পক্ষে অত্যন্ত ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে—

ঈর্ষা অনুরাগেরই নামান্তর। এরপরও সে নানাভাবে রাগ ও ঝগড়া করেছে তারাপদের সাথে। তারাপদর প্রতি সোনামণির নির্ভরতা বা সোনামণির প্রতি তারাপদর স্নেহ চারু সহ্য করতে পারে না—অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অনেক অত্যাচার করে ফেলে তারাপদর উপর। পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়। তার মনের ভিতর বয়ঃসন্ধির রাগ ও অনুরাগের স্পর্শ তারাপদর চির বাউল মনকেও ছুঁয়ে যায়। হয়তো তার হৃদয় গেয়ে ওঠে "ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি"। বিভোর হয় সে—ভুল হয়ে যায় পড়ায়।

তারপর একসময় কাঁঠালিয়া গ্রামের আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে সানাই-এর সুর। মতিলালবাবু ও অন্নপূর্ণা দেবী তারাপদর গৃহে প্রস্তাব পাঠান। বিবাহের প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। সানাই-এর সুর এসে লাগে তারাপদর মনে—চারুশশীকে উন্মনা করে তোলে।

বিবাহের যোগাড়ও প্রস্তুত। তারাপদর অন্তরের এই গূঢ় পরিবর্তন তার কাছে বড় আশ্চর্য লাগল—স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। বনের পাখি যেন খাঁচায় এবার ধরা দেবে। চেতনার গূঢ় গভীর স্তরে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনায় একটা ভয়ও জাগে তারাপদর মনে।

"এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ প্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল।" আবাব নদী, আবার স্রোত—আবার সেই অসীমের আহ্বান—চিরপথিকের মুক্তির ইচ্ছা। তাকে সব মোহ অনুরাগের ঊর্ধ্বে ছুটিয়ে নিয়ে চলবেই। 'যেমন ছাড়া বনের পাখি।"—সুদূরের সেই ব্যাকুল বাঁশরি হয়ে এল এবার কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা।

পথিক আবার পথে ভেসে গেল। আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর এই বিপুল টান কি সে সংসারের আকর্ষণে গৃহের আকর্ষণে অগ্রাহ্য কবতে পাবে?

পাবে না। কারণ তার অন্তর্গত বাঁধন-ছেঁড়া মন তাকে ঘাটে ঘাটে, চিরকালের পথে পথে টেনে নিয়ে যাবেই, তারাপদ নিজেও তারাপদকে ধবে বাখতে পারে না। নদীর স্রোত যেমন দূর সমুদ্রের ডাক শুনে কোনো ঘাটে থেমে থাকতে পারে না—এগিয়ে চলে—চলতেই থাকে, তারাপদও তেমনি দূরের ডাক শুনে কেবলই এগিয়ে চলে—চলতেই থাকে—কোনো ঘাটে থেমে থাকে না। চলে গেল তারাপদ। তাকে চলে যেতেই হবে। চলমানতার প্রতিমান (Archetype) তারাপদকে থামলে চলে না। গানের সুরের সঙ্গে নদীর স্রোতের সঙ্গে জীবনেব অপাব প্রবাহে আবারও ভেসে গেছে চির-পথিক তারাপদ।

পোস্টমাস্টার : বহতা জীবনের শিল্প
কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস

'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী' (ছিন্নপত্রাবলী-৯৪। শিলাইদহ-৮ মে ১৮৯৩)—রবীন্দ্রনাথের স্বঘোষিত উচ্চারণ। 'লোকসমাজে কবিরূপেই তিনি অবিসংবাদী' (প্রথমনাথ বিশী, বাংলার লেখক, ১ম খণ্ড)। এতদ্‌সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই যে তিনি একজন বড়োমাপের ছোটোগল্পকারও। কেননা—'রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী প্রতিভা বিরল।' (প্রথমনাথ বিশী, বাংলার লেখক, ১ম খণ্ড)। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটোগল্পের ভাগ্য স্থিরীকৃত হয়েছিল আর এই ছোটোগল্প-চাষে রবীন্দ্রমনেও পরিণতির ছাপ স্পষ্ট। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিনী' ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং আরো চোদ্দবছর পরে লিখলেন 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা'। আসলে গল্প লেখা শুরু হলো ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'হিতবাদী' (সম্পাদনা রাজকমল ভট্টাচার্য) পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের ছ'টি গল্প—দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান এবং তারাপ্রসন্নের কীর্তি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে সাজাদপুরে থাকাকালীন ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি লিখেছিলেন। তার প্রমাণ আছে ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে—

'...আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেন্ট করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত।...এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট-অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতালায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম।' (সাজাদপুর ২৯ জুন ১৮৯২)

দুই

জাঁক্‌জমকপূর্ণ কল্লোলিত তিলোত্তমা কলকাতা শহরের ছেলে পোস্টমাস্টার। কর্মসূত্রে গণ্ডগ্রাম উলাপুরে পোস্টমাস্টার হিসেবে কাজে যোগদান। ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন মানসিকতা, ভিন্ন জীবনযাপনে সে হাঁপিয়ে ওঠে। 'জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হয়েছে।'

ডোবা-পানাপুকুর, জঙ্গলে ঘেরা অন্ধকার আটচালা ঘরে তার অফিস। কাজ কম থাকায়, সময় নষ্ট করবার তার অনন্ত অবসর। মেলামেশার লোকের অভাবে কবিমনের ঈষৎ প্রকাশ। তার অভিব্যক্তিতে মনে হয় তার বড়ো সুখেই দিন কাটে! কিন্তু অন্তর্যামী অন্যকথা বলে যে। অতি সামান্য বেতন হওয়ায় তাকে রান্না করে খেতে হয়। ভরসা এইটুকু গ্রামের 'পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালিকা' রতন 'চারিটি-চারিটি' খাওয়ার বিনিময়ে তার সংসারের কাজকর্ম করে দেয়। বয়স বারো-তেরো, তাই বিয়ের সম্ভাবনা তার বিশেষ নেই। সূর্যডোবার পালা শেষ হলে অন্ধকার রাত্রে ভীত হয়ে রতনের সঙ্গে তার আলাপচারিতা। আলাপচারিতা থেকে দু'জনার গল্পারম্ভ। গল্প-আসরে চলে তাদের

স্মৃতিরোমন্থন—রতনের শৈশবের স্মৃতি এবং পোস্টমাস্টারের পরিবার-পরিজনের। এমতাবস্থায় অধিক রাত হয়ে গেলে তারা খানকতক রুটি সেঁকে বাসি ব্যঞ্জন দিয়ে আহার সম্পন্ন করত। এরই সাথে চলতো রতনকে স্বাক্ষর করে তোলার প্রয়াস।

এসব ঠিকঠাকই চলছিল। বাধ সাধল শ্রাবণের বর্ষণ এবং পোস্টমাস্টারের অসুস্থতা। যদিও বারো-তেরো বছরের বালিকা রতনের আন্তরিক সেবা-যত্নে পোস্টমাস্টার সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু রোগশয্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বদলির সিদ্ধান্ত নেয়। দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে পোস্টমাস্টার কাজে জবাব দেন। রতনকে জানান তার চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। এ সবই নীরবে চলছিল। অবশেষে পোস্টামাস্টার তার পাথেয় রেখে সমস্ত অর্থ রতনকে দিতে গেলে, রতন পোস্টমাস্টারের পা জড়িয়ে ধরে বলে আমার জন্য কারও কিছু ভাবতে হবে না, আমাকে কিছু দিতে হবে না এবং এক দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পোস্টমাস্টার তার সমস্ত কিছু নিয়ে নৌকাভিমুখে চলে, নৌকায় ওঠে, নৌকা ছেড়েও দেয়। মর্মব্যথা প্রকাশ পায় বালিকা রতনের জন্য। কিন্তু পালের বাতাস, নদীর খরতর স্রোত, শ্মশানের দৃশ্যপটে পোস্টমাস্টারের ভাসমান নদীবক্ষে দার্শনিকতত্ত্বের উদয়—'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী! পৃথিবীতে কে কাহার।' কিন্তু সরল তত্ত্বহীন বালিকা রতনের মন দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়বার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তিন

রবীন্দ্রনাথ একজন বড়ো কবি, এই কবিই জমিদারি কাজকর্ম উপলক্ষে শিলাইদহ-পতিসর-সাজাদপুরের গ্রামবাংলায় বিচরণ করেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন পল্লীপ্রকৃতিতে। মূলত এসময় থেকেই তাঁর গল্পরচনা শুরু।

আজীবনই মানুষকে প্যাহাড়, নদী-সমুদ্র, অরণ্য প্রকৃতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। মনকে করে তুলেছে পাগল প্রায়, রোমাণ্টিক, কবিভাবাবেগে আপ্লুত। পল্লীপ্রকৃতির ছায়া-নির্বিড় নির্জনে, পাখির কুজনে মন হয়ে ওঠে আনমনা। একলা মন সেখানে কথা কয়। পোস্টমাস্টাব গল্পের পোস্টমাস্টারও কর্মহীন জীবনে পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে একাত্ম হয়ে যায়। কবিতা লেখে। তবে শহরের জলহাওয়ায় অভ্যস্ত পোস্টমাস্টার সঙ্গিহীনতায় প্রকৃতির কোলে হাঁপিয়ে উঠলেও 'দ্বি-প্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস,' 'রৌদ্রে ভিজা ঘাস,' গাছপালার গন্ধ, 'নাছোড় বান্দা পাখি'র ডাক পোস্টমাস্টারের মনকে রোমাণ্টিক করে তোলে। প্রকৃতির এই উদাস নির্জন দ্বি-প্রহরে, 'বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কন তরুপল্লবের হিল্লোলে' 'বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র' বাতাসে হৃদয় সংলগ্ন একান্ত আপনার জনকে স্মরণ করায়। পোস্টমাস্টারের মনে সেইভাবের উদয় হয়। কর্মজীবনের বাইরে অন্তর্গহনে সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তোলে এই পল্লীপ্রকৃতি। বস্তুত, এ তার রোমাণ্টিক মনেরই আত্মপ্রকাশ।

সুনির্বিড় পল্লীপ্রকৃতির সংস্পর্শে কবি, রোমাণ্টিক তথা প্রেমিক পোস্টমাস্টার প্রকৃতির এই মুক্তদীপ্ত মহাজীবন চিত্তভরে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির বিশালতা মনের প্রসারতা বাড়ায়। তাই পোস্টমাস্টার রতনকে ডেকে বলে—'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' এই পিতৃমাতৃহীন বালিকা রতনকে পরম-মমতায় সে গ্রহণ করেছিল। তাই হেঁশেলের কাজ

ফেলে জীবনস্মৃতির পাতা উল্টায় দু'জনেই। একজন have অন্যজন have not. Have not রতন। যার জীবনস্মৃতির পাতায় জীবিত কেউ নেই। যা আছে তা দুঃস্বপ্নে, দুঃখের স্মৃতিতে। ধনের কথা এখানে নাইবা বললাম। have পোস্টমাস্টার। 'ধন (wealth) নেই, কিন্তু সে ধরনের কথা বলার অভিপ্রায়ও নেই। এ ধন 'প্রবাসে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা।' 'ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা।' রতন সে ধন থেকে বঞ্চিত। এই রতনকেই পোস্টমাস্টার তার পরিবারেব কথা বলত 'কিছু মাত্র অসংগত মনে হইত না।' এ পোস্টমাস্টার চরিত্রের এক মহত্তর মনের পরিচয়।

গল্পে রতনের মতো পোস্টমাস্টারের বয়সের উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পোস্টমাস্টার ছিলেন বয়সে পরিণত একজন পূর্ণমনের মানুষ। যার আছে বাস্তব বুদ্ধি, এবং সে বাস্তব পরিস্থিতি পরখ করতে পারে। তাই রতন যখন জিজ্ঞাসা করে---'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?' উত্তরে 'পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, সে কী করে হবে।' বস্তুত এটাই বাস্তব। কেননা, সমাজ-পারিবারিক জীবনে এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে যা সমবেত-সম্মতির প্রয়োজন। একে সমাজভয়ের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমন জাযগা থেকে জনৈক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন---'পোস্টমাস্টার কেন রতনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পাবল না? বালিকা যে কাজের মেয়ে বা পরিচারিকা হিসেবে যেতে চাইছে তা নয়।' প্রশ্ন ওঠে, তবে কোন্ পরিচয়ে পরিচিত হতে বালিকা বতনের এই অভিলাষ। অনুমেয়---'প্রণযিণীরূপে'। বস্তুত, আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে যদি তাই-ই হয়, তবে এ পল্লীবালিকার এক দুঃসাহসের প্রকাশ। আমাদের মনে হয় অতো গভীরভাবে না ভেবে সহজ-সরলভাবে ভাবলেই হয় যে, পোস্টমাস্টারকেও হয়তো কারো সম্মতির উপর নির্ভর করতে হয়। একে সমাজ ভয়ের কারণ দর্শানো ঠিক হবে না। আবাব একশো বছরেরও অধিক সময়ের আমাদের সমাজ বাস্তবতায় 'বালিকা' রতনের এত দুঃসাহস সম্ভব ছিল না। যেটা মনে হয তা এই যে, রতন সামাজিক নিবাপত্তাব অভাববোধ থেকে বলেছিল। কেননা, সভ্যতার প্রথম থেকেই মহিলারা Insecure। পাশাপাশি 'চারিটি-চারিটি' খাওয়ার নির্ভরতা সে হারাবে এবং সে আবার অনাথিনী হয়ে পড়বে।

আর একজন শ্রদ্ধেয় সমালোচক বলেছেন---'রোগশয্যাশায়িত পোস্টমাস্টারের স্নেহ-বুভুক্ষা মেটাতে গিয়ে রতন তাকে ভালোবেসে ফেলল।' লাইনগুলো ভীষণভাবে কর্ণাকর্ষণ করে, তবে মর্মাকর্ষণ করে না। কেননা, লেখক যেখানে বলেছেন 'বিবাহেব বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।' এবং পোস্টমাস্টার সুস্থ হয়ে ওঠেন 'বহুদিন' পবে; মনে রাখতে হবে 'বহুমাস' পরে নয়। শ্রাবণের এক বর্ষণে পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়, তারপর আর শ্রাবণের বর্ষণ আসেনি। তাই রতনের বয়স 'বারো-তোরো'র পরিবর্তে 'তোরো-চৌদ্দ' হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। তবে আমাদের কৌলিন্য সমাজব্যবস্থায় বাল্যাবস্থায়ও বিয়ে হতো, অবশ্য তা ছিল একপ্রকার বিয়ে-বিয়ে খেলা। পরিণয়ের যে একটা গভীরতর অর্থ আছে তা তারা বুঝত না। রতনের বালিকা থেকে নারীতে রূপান্তর মানসিক পরিণতির স্তর পরম্পরা, সম্পর্কের নয়।

গল্প শেষে পোস্টমাস্টারের চরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এখানে লেখক গীতার 'নিরাসক্তবাদে'র পাশাপাশি 'গতিবাদে'র কথা বলেছেন। একদম শেষে দেখি পোস্টমাস্টার উপস্থিত হয়েছে প্রকৃতির এক সঙ্গমস্থলে। যেখানে খরস্রোতা নদী আছে, বাতাস আছে, শ্মশান ঘাট আছে। আছে উন্মুক্ত আকাশ। মনে পড়ে 'বলাকা'র চঞ্চলা (৮ সংখ্যক কবিতা) কবিতার কথা—

'হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরাবধি।'

কিংবা

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি,
উচ্ছ্বিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;

তাই শুনি

'ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গান—
হেথা নয়, অন্য কোথা; অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।'

শ্মশানের ব্যঞ্জনাও প্রকৃতির পটভূমিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে—'মরলেই সবাই মাটি,' বা 'চিতাতেই সব শেষ।' তাই 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ আছে, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' 'সম্মুখের বাণী'-ই পোস্টমাস্টারকে অনাথিনী বালিকা রতন এবং উলাপুর গ্রাম থেকে চির-বিচ্ছেদ করে দেয়।

চার

পোস্টমাস্টার গল্পে উলাপুর-গণ্ডগ্রামের অতি সামান্য রতন চরিত্রটি লেখক রবীন্দ্রনাথের লেখনিতে অসামান্য হয়ে উঠেছে। গল্পারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত রতনের জীবন-বিন্যাসটা দেখলে তা সহজেই বোধগম্য হবে। কিন্তু পরিণাম দেখি একই—সেই অনাথিনী রূপে। ভাগ্যটা যেন তার ঘোলা জলে ডোবা। তবে সেখানে বড়ো রকমের ইতিহাস না থাকলেও, বড়ো আন্তরিকতা, সেবা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বড়ো নারী-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা রতনের গল্পে আবির্ভাব—পোস্টমাস্টারের সাংসারিক কাজকর্ম করে দেয়, বিনিময়ে সে খেতে পাবে। বয়স বারো-তেরো, আপাতত বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে তার আলাপ গল্পের গোড়ার দিকে প্রকৃতির এক নির্জন সন্ধ্যায়—'যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবি হৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্পন উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন রতন।' এরপর 'কী গো বাবু কেন ডাকছ' বলে রতনের প্রবেশ এবং পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গ প্রবাসের একমাত্র সঙ্গিনী রতনের সঙ্গে তার অতীত স্মৃতিচারণ। সেখানে দুঃখের

ইতিহাসটাই বেশি—একদিকে অনাথা রতনের হারানো মা বাবা ভাই-এর স্মৃতিচারণ, সেখানে ভায়ের কথাই তার বেশি মনে পড়ে। অন্যদিকে প্রবাসী পোস্টমাস্টারের ছোটো ভাই, মা এবং দিদির কথা ভেবে হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠত। এভাবে জীবনস্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে রতন পোস্টমাস্টারের নিকট দ্বিধামাধবীর ভীতি কাটিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে—'এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত।'

অনাথা বালিকা রতনের মধ্যে আমরা অকৃত্রিম হৃদয়ের পরিচয় পাই। সহজ-সরল অনাথা বালিকাকে কোনো কৃত্রিমতা স্পর্শ করতে পারে না। দাদাবাবুর জন্য সে যা কিছু করে তার মধ্যে থাকে আন্তরিকতার স্পর্শ। এবং নৈসর্গিক পল্লী-প্রকৃতিতে পোস্টমাস্টারের ঈষৎ কম্পিত হৃদয়ে সাহচর্য দেয় রতন। রতন ছিল একনিষ্ঠ ছাত্রী। তাই সহজেই সে 'স্বরে অ, স্বরে আ', এবং অল্পদিনেই 'যুক্ত-অক্ষর' শিখে নেয়।

এক সময় শ্রাবণে বর্ষণে, বাদলায় পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন রতনের কাছে দ্বারের আর বন্ধন থাকে না। রতন তখন সর্বময়ী, কর্তব্যনিষ্ঠা নারীতে পরিণত হয়। 'রোগকাতর শরীরে' 'তপ্তললাটে', শাঁখা পরা কোমল হাতের স্পর্শ, স্নেহময়ী মা, দিদির রোগশয্যায় উজ্জ্বল উপস্থিতি তার হৃদয় আকাঙ্ক্ষা করে। তখনই রতন আর বালিকা থাকে না। সে স্নেহময়ী জননীর মতো গভীর মমতায় বৈদ্য ডেকে এনেছে, যথা সময়ে ঔষধ খাইয়েছে, সারারাত্রি শিয়রে জেগে পথ্য খাইয়েছে বিনিময়হীন রতনের এই সেবাপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা আমাদের ভাবায়, আমাদের আপ্লুত করে। এ নারীর এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। পরিণত বয়স-এর মানদণ্ড এখানে কাজ করে না। পরিবেশ-পরিস্থিতির বৈগুণ্যে পল্লী-প্রকৃতিব সংস্কৃতিতে, এবং শিক্ষিত পোস্টমাস্টারের সান্নিধ্য ও শিক্ষার ফলে রতনের এই জননী রূপের প্রকাশ বললেও বোধ হয় ভুল হবে না।

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে নিঃসঙ্গতার অনুভব, যার একদিকে আছে নিঃসঙ্গ প্রবাসী পোস্টমাস্টার, অন্যদিকে আছে গণ্ডগ্রামের নিঃসঙ্গ অনাথা বালিকা রতন। এই নিঃসঙ্গতার পারদ চড়তে থাকে রতন চরিত্রে। যখন অসুস্থ পোস্টমাস্টার রোগশয্যা ত্যাগ করে বাড়ি ফেরার সংকল্পের কথা রতনকে জানায় তখন—'রতনের মনের দুঃখ নিঃসঙ্গতার ব্যথা যেন সেই শ্রাবণসন্ধ্যায় এক প্রায়ান্ধকার ঘরের নিঃশব্দ মুহূর্তের চূড়ায় দাঁড়িয়ে স্তিমিত প্রদীপশিখাটির মতো থরথর করে কাঁপছে।' (রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী)। আসলে পোস্টমাস্টারের চলে যাওয়াতে রতন নীড় হারালো, সামাজিক নিরাপত্তার বা সুরক্ষার বাতাবরণ হারালো; হারালো দৈনন্দিন আহার। ছিন্নমূল রতনের পায়ের তলার এতদিনকার মাটিটা সরে গেল—রতন দ্বিতীয়বার অনাথ হলো। রতনের জীবনের আসন্ন ভয়ঙ্কর নিঃসহায় ও নিঃসঙ্গ সময়ের আর একটি নির্মম চিত্র প্রতিভাত হয় প্রকৃতির পটভূমিতে—'মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।' রতন চরিত্রের এ এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা। যেখানে আছে অন্তহীন বিষাদ, কারুণ্য ও বঞ্চনা। অনাথা সহায়-সম্বলহীনা বালিকা রতনের বন্ধুর-জীবনে বন্ধু পোস্টমাস্টার স্নেহ-মমতার এক আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে সেই উৎসমুখ শুষ্ক হয়ে গেলে রতন আবার অনাথিনী হয়।

পাঁচ

চিরকাল কবি-সাহিত্যিকের রচনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি মানবী-সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতির সান্নিধ্য, প্রকৃতির মুগ্ধতায় মানবমনের বিচিত্রভাবেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি সৌন্দর্যানুভূতি কতো তীব্র, কতো গভীর পরিব্যাপ্ত ছিল তার প্রমাণস্থল ছিন্নপত্রাবলী—

> 'বাংলাদেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত—কী একটা বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা। ...অন্তরের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড চিরবিরহ বিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী একটা উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়।'

> 'এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো...।'

> 'এই পৃথিবীটা আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসাব লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দু'জনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।...'

'সোনারতরী' কাব্যে রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্কারণ-এর ভূমিকায় আছে—'বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব।' শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিলেন মনের মধ্যে—'বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, সুর চিনি, ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়।'

বস্তুত, পল্লীপ্রকৃতির সুখ-দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ মানব সমাজে প্রবেশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেদিন রবীন্দ্রনাথকে ছোটোগল্প লেখায় প্রাণিত করেছিল।

পোস্টমাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র কৌশলে প্রকৃতির মধ্যে স্বতন্ত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এনেছেন, আর এই বৈশিষ্ট্য-পটভূমিতে চরিত্রগুলির নিজস্ব ধর্ম আরো বিকশিত হয়েছে। শহরের ছেলে পোস্টমাস্টার, গ্রামীণ-জীবনের নিঃসঙ্গতা, কর্মহীনতা তার মনকে উদাসীন নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতায় নিমগ্ন করেছিল। এই শূন্যতা আরো প্রকট হলো—'একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রেভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর নিশ্বাস গায়ের উপর আসিয়া লাগিতেছে

এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল।' এবং এরই পটভূমিতে পোস্টমাস্টার ভাবছিলেন—'এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।'—এই যে পরমশূন্যতার পরিচয় এর বিপরীতে প্রকৃতির মেঘমুক্ত ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস, রৌদ্রে ভেজা ঘাস, বৃষ্টিধৌত-মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল—এ সবই প্রকৃতির পরিপূর্ণতার চিত্র। বলা যায় প্রকৃতির পূর্ণতার বক্ষে পোস্টমাস্টারের শূন্যতা যেন প্রকৃতিকে তার বিপ্রতীপ চরিত্র করে তুলেছে।

গল্পের একেবারে শেষে দেখা যায় পোস্টমাস্টার দোলাচল চিত্ত-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। একদিকে অনাথিনী রতনের করুণ মুখচ্ছবি, অন্যদিকে প্রকৃতি জগতের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত জীবনের চরম দার্শনিক সত্য—'পৃথিবীতে কে কাহার।' পোস্টমাস্টার এখানে স্বীয় সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজেকে প্রকৃতির গতিপ্রবাহে সমর্পণ করেছেন। প্রকৃতিতে কিন্তু তখন স্থির সিদ্ধান্তের পালে বাতাস লেগেছে। মনে পড়ে রবীন্দ্রজীবনীর ১ম খণ্ডের (পৃ: ১০৩) একটি উদ্ধৃতি—'সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে বাংলাদেশের নদীই বাংলাদেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।'

রতন চরিত্রেও প্রকৃতি যেন সহমর্মী একান্ত আপনার জন। রতন যেদিন দাদাবাবুর কাছ থেকে তার চলে যাওয়ার কথা শুনল, সেদিন—'একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।' এ ধারাপাত যেন রতনের অশ্রুপাত। অর্থাৎ অনন্তের মধ্যেও যে চিরবিরহ বা বিচ্ছেদ আছে সেটাই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে প্রকৃতির চরিত্রের সান্নিধ্যে।

গল্পের একেবারে শেষপর্বেও দেখা যায় 'বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো' প্রতিভাত হয়েছে—এখানেও রতন আর প্রকৃতি যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ কখনো বিপ্রতীপতায়, কখনো বা একাত্মতায় প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন। এর ফলে প্রকৃতি যেন প্রেক্ষিত থেকে প্রায়শই মানবীকরণের দিকে উত্তরিত হয়েছে।

ক্ষুধিত পাষাণ : সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ?

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস

'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২) গল্পটি কবির মনে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল যখন তিনি কিছুদিন আমেদাবাদের শাহীবাগের বাদশাহী আমলের পোড়া রাজবাড়িতে ছিলেন। 'ছেলেবেলা'-গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সতেরো বছর বয়স তখন বিলেত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে জজীয়তি কর্মে নিযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কিছুদিন ছিলেন। শাহীবাগ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের বাসস্থল। সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ নির্জন শাহীবাগে একা ভ্রমণ করতেন। শাহীবাগের অসংখ্য প্রকোষ্ঠে অন্ধকার অলিন্দে ইচ্ছেমতন ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্র-মনে হাজার বছর পূর্বেকার অতীতের স্মৃতি,আড়াই শো বছরের পুরাতন শাহীবাগের মধ্যে খুঁজে পেলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো তখন তিনি গেলেন শাহীবাগ প্রাসাদে আর এখান থেকে গল্পের থিম আয়ত্ত করে আরও সতেরো বছর পরে তা মূর্ত করে তুললেন 'ক্ষুধিত পাষাণে'। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে মনে মনেই রূপ দিচ্ছিলেন। গল্পটিকে লেখার একবছর আগে ইন্দিরা দেবীকে সাজাদপুর থেকে একখানি পত্রে যা লিখেছেন তা-ই 'ক্ষুধিত পাষাণের' পূর্বসংকেত।—

> "কেন জানিনে. মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্র-ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আববা দেশ, দামাস্ক, সমরকন্দ. বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ, মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় পরা দোকানি খরবুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানালার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো—জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচাল পরা আমিনা জোবেদি সুফি—পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড় পরা কালো হাবশী পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময়, ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।" (ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)।

সাজাদপুর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। এর মোহ, এর মায়া—এখানকার বাতাস, সবুজ ডালপালা, পাখির রব, অজস্র ফুলের বিচিত্র গন্ধ কবিকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখত। বিশ্বপ্রকৃতি ও মহাজগতের জন্য কবি-মন এতদিন যে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার আভাসস্থল পেলেন এখানে। এখানে বসে কবির মনে "কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে ওঠে।"

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির শব্দ সংখ্যা প্রায় ৩৭৫০ (সাঁইত্রিশ শ পঞ্চাশ)। গল্পটি প্রকাশিত হয় "সাধনা"-র শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩০২-এ। এর কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মতো। গল্পটি 'ফ্যান্টাসি'। এ রোমান্সে ভরপুর। বস্তু ও বিষয়ের দিক দিয়ে রবীন্দ্র গল্পমালায় এর জুড়ি মেলা ভার। গল্পটি যখন লিখেছিলেন তার অল্প কিছুকাল আগে অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ শে জুন কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "বসে বসে সাধনার জন্যে একটি গল্প লিখছি। একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই...।"

রবীন্দ্রনাথ কোন গল্প লিখেছিলেন তার কিন্তু নাম করেন নি। তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তিনি 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই লিখছিলেন। কারণ "একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প" থেকে বোঝা যায়। আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তিবোধ হচ্ছিল"—এর থেকে মনে হয় এই অনিচ্ছাও বিরক্তির কারণ হল কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে তাঁর আসন্ন সাজাদপুর কুঠিবাড়ি পরিত্যাগের বেদনা। এই কুঠিবাড়ি রবীন্দ্রনাথের বড়ই প্রিয় নিকেতন। তাঁর গল্প সৃষ্টির জন্ম হয়েছিল এখান থেকে, আর এ চলেছিল প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর মতো। শাহীবাগ প্রাসাদের পরিবেশ নির্মিত হয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনের তৃষিত ক্ষুধার গল্প। নির্জন বরীচের গিরিকুন্ডই, শুস্তা নদীর উপর প্রস্ফুটিত আঁকা বাঁকা পথ, শা-মামুদের ভোগবিলাসের প্রাসাদ, তার স্নানশালা, যুবতী পারসিক রমণীদের স্নানের পূর্বে সেতার বাদন, দাক্ষাবনে গজল গান, দূর থেকে নহবতের আলাপ, নর্তকীর নূপুব নিক্কন—এসবই কবির রোমান্টিক মনের তৃষ্ণার সামগ্রী। কবির রোমান্টিক আতুরতাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে গল্পের নায়িকা। গল্পকথক বলেছে—"সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতল রাজ্যে স্বপ্নের জটিল পথ সঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

পাষাণপুরীতে বন্দিনী নায়িকা উষ্ণভেজা কণ্ঠে গল্পের কথককে সানুনয়ে মিনতি করে বলেছে—

> "তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার কর।"

মানস অভিসারে সিক্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ'। গল্প রচনার তিন বছর আগে 'সোনার তরীর' 'মানস সুন্দরী' কবিতা রচনা করেন। 'মানস সুন্দরীকে' কবি খুঁজে চলেছেন গোধূলি-সন্ধ্যা

ও ভোর পথের কনক-দ্যুতিতে সুগন্ধি বসন্ত বায়ুতে, সুপ্ত পূর্ণিমা রাতে অথবা হেমন্তের শেফালি চয়নিকার মাঝে। 'চিত্রা' কাব্যে এসে কবি একেই খুঁজে পেলেন ভিন্ন রূপে—

"অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।।"

'অনন্তরঙ্গিনী'কে স্বপ্নসঙ্গিনী করে তোলার জন্য কবি হত বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' অভিসারে লিপ্ত হয়েছিলেন আর এখানেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?"

রোমান্টিক ভাববেগের ব্যাকুলতা যেন পাড় খুঁজে পেল গল্পের জগতে। 'মানসসুন্দরী'র অভিসারিকা যেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অভিসারের সঙ্গিনী। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' 'অপরিচিতা', 'বিদেশিনী', 'মধুর হাসিনী'র ডাকে সাড়া দিয়ে কবি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছেন গল্পের মায়াময় জগতে আর তাই কবি যেন বলতে চান—

'করহ্ পরশ নিকটে আসি'।

গল্পের প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন বিস্ময়কর চিত্র রোমান্টিক ভাবাকল্‌তার এমন সৌন্দর্যময় রূপ কবি কল্পনার সাথে ছোট গল্পকারের এমন দূরগামীতার পরিচয় বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তথা বিশ্বসাহিত্য ভান্ডারের বিরল দৃষ্টান্ত।

শুধুমাত্র ছোটগল্পকার রবীন্দ্র-মননের সাথে কবি মননের সেতুবন্ধন ঘটেনি, ঘটেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতময় জগতেরও। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রগল্পেব সম্পর্ক বহুজায়গায় বিস্তারিত ভাবে রয়েছে তবে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে ববীন্দ্রনাথের আত্ম কথন-রীতির গল্পমালাতে। আত্ম-কথন-রীতির গল্প মোটামুটি—

১) 'ঘাটের কথা' (১২৯১)
২) 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১)
৩) 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২)
৪) 'বোষ্টমী' (১৩২১)
৫) 'পরীর পরিচয' (১৩২৯)—

এ সমস্ত গল্পের গল্পকাহিনীর সুরলিপি আমরা পাই গল্পগুলো প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে লেখা গানে। ১৩০২ সালের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির সুরলিপির তাল মেলে ১৩৩০ সালে রচিত একটি গানে—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে।
ও কি তার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল দুলি।
আজি কি পলাশবনে ওই সে বুলায় রঙের তুলি।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ওই ভঙ্গীতে।।
না গো না, দেয় নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে

মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে —
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথায় রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে।।"

কল্পলোকের অতীত ইতিহাসকে রোমান্টিক চেতনা দিয়ে রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করে কবি তাঁর কলমের স্পর্শে এমন এক অপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পাঠক পর্যন্ত গল্প থেকে এক অনির্বচনীয় ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা লাভ করে। নির্জন প্রাসাদে তরুণী ইরানী ক্রীতদাসীর পিছনে তুলার মাশুল কালেকটর সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়ায়। সে মাঝে মাঝে মনে করে, কে যেন, "আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে" আবার কখনও বা আর্শিতে "সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া" "পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগ তীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবন পুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে" দর্পণে মিলিয়ে যেত। কখনও বা মধ্যাহ্ন রজনীতে বিছানায় বসে একাকী শুনতে পায়—

> "কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিযা ফাটিয়া কাঁদিতেছে যেন আমার খাটে নীচে মেঝেব নীচে.. কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিস্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিযা তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিযা তোমার বুকেব কাছে চাপিয়া ধবিয়া বনের ভিতব দিয়া, পাহাড়ের উপর দিযা, নদী পাব হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরেব মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার কবো।"

গল্প নামেই ভীতিপ্রদ বাসনা রঞ্জিত হয়ে আছে। এক পাষাণপুরী সেখানে কোন এক প্রেত-সত্তা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জীবিত মানুষকে গ্রাস করতে লালায়িত। আফিসের কেরানি কবিম খাঁর ভাষায় বলতে পারি—

> "এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগেব শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে সেই-সকল নিস্ফল কামনাব অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তবখন্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালাযিত পিশাচীব মতো খাইয়া ফেলিতে চায।"

এই প্রাসাদের জনশ্রুতি সম্পর্কে জানা যায় দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য দেড়শত সোপানময় ঘাটের উপবে শ্বেত প্রস্তবে নির্জন প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। এখানকার স্নানাগারের ফোয়ারাগুলিকে গল্প কথক বলেছেন—

> "কোনো এক সময় তরুণীরা ফোয়ারার মুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত গোলাপগন্ধি জলধারায় স্নান করত, শীকরনিভৃতে গৃহে তারা স্নানেব পূর্বে সেতার কোলে নিয়ে দ্রাক্ষাবনে গজল গান করত।"

ইতিহাস আশ্রিত কল্পনা পাঠক মনকে এক ভিন্নধর্মী পরিবেশ জগতে নিয়ে যায়। যেমন বিজন প্রাসাদের বাদশাহী বিলাস, ইরানী মেয়েদের রূপসৌন্দর্যের কল্পনা, আতরের

গন্ধ, নূপুরের নিক্কন, সেতারের ধ্বনি, নহবতের আলাপচারিতা, প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি, সিরাজের মদিরা, কটাক্ষের বিষজ্বালা ইত্যাদি। ইতিহাস আশ্রিত কল্পলোকের গল্পের বক্তা, ফাস্ট ক্লাসের যাত্রী ইংরেজের বন্ধু। গল্পের মধ্যে অবিশ্বাস্য জগৎ জাগতে পারে এই আশঙ্কা করে তিনি শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের বিখ্যাত উক্তিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বলেন—

> "There happen more thing in heaven and earth, Haratio, tham are reported in your newspapers."

গল্পের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি না হলেও ভৌতিক রস জমে উঠেছে। গল্পের নায়ক পাষাণ পুরীতে তমসাবৃত্ত রজনীতে নেশা জালে জড়িয়ে পড়তো। এই নেশাগ্রস্থ পরিবেশে জড়ানোতেই নায়ক এক বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করত। গল্পে টুকরো টুকরো স্বপ্নময় আবেগে যে শিহরণ জাগায় তাতে ঠিক ভয় নয়, কিন্তু বাদশাহী যুগের অতিক্রান্ত জীবনের কাহিনী নিয়ে এতে সৃষ্টি হয়েছে এক রোমাঞ্চকর ভৌতিক পরিবেশ। ইতিহাসসিদ্ধ বাদশাহী জগতের বিচিত্র আলেখ্য দিয়ে গল্প পটভূমি রচিত হলেও মেহের আলীর উক্তিতে বাস্তব সচেতন পরিবেশকে স্মরণ করে দেয়। বাস্তব সচেতনতার উক্তিটি—

> 'তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।'

দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত তুলার মাসুল কালেক্টরভাবে সে অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, তবে রাতের বেলায় 'শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত' আরেকটি অপূর্ব ব্যক্তি হয়ে উঠতো। আর তাতেই সে অতিপ্রাকৃতের রহস্যপূর্ণ জালে জড়িয়ে পড়তো। এর মিল খুঁজে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের এ উক্তিতে—

> "যখন মনুষ্য হৃদয় কোন উৎকৃষ্টভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থ ও প্রত্যাশীভূত বলিয়া বোধ হয়। 'কপালকুণ্ডলার' সেই অবস্থা।"

বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই অবাস্তবতার সংমিশ্রণে রোমাণ্টিক কবিদের 'স্বতন্ত্র ধারনের সাধনা সৃষ্টি হয়েছে। Keats-এর 'La Belle Dame Sans Merci' কবিতা সম্পর্কে কোন এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—যে মন্তব্যের সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণের' সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—

> "It is a master piece of horror stricken reticence and magical suggestion." (Henford—The Age of Words Worth.)

গল্পের কথক পাষাণপুরীতে রাত্রিযাপনের সময় তার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আড়াই শ বছর আগেকার এক "রহস্যময় ঘেরা শিহরহণ জাগানো অভিজ্ঞতা।" (সময়ের প্রয়োগরীতি— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী) কিন্তু মাশুল কালেক্টরের জীবন তো কেবল রাত্রি নিয়ে নয়—রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত—এই তো চলমান বিশ্বের নিয়ম, আহ্নিক গতির ফলে যেমন দিন রাত্রি ঘুরে ফিরে আসে ঠিক তেমনি গল্পের কথক জীবনে দিনরাত্রি একইভাবে বিদ্যমান। কথক দিনের বেলায় কর্মব্যস্ত মানুষ সন্ধ্যা নামতেই কথকের মধ্যে আর এক বিশেষ অনুভূতি জাগ্রত হয়। একই ব্যক্তি দুটি ভিন্ন সত্তায় পরিব্যপ্ত। তাইতো কথক বলেছে—

"আমার দিনের সহিত রাতের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং....স্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম .... সন্ধ্যার পর আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম,....।"

মনুষ্য জীবনে দিন ও রাত্রির মতো মাঝে মাঝে বিরোধের সম্ভাবনার জাল সৃষ্টি হয়। ঠিক তেমনি গল্প-কথকেরও। রাতের অন্ধকারে শিহরণ জাগানো বর্ণাঢ্যময় মায়াজালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে কিন্তু ভোর পথের আলো ফুটতেই পাগল মেহের আলী চিৎকার করে বলেছে—

"সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

ঘূর্ণমান সময় বিন্যাসের বিচিত্র জটিল জালে রবীন্দ্রনাথ গল্পের বিষয়বস্তুকে সংহত রূপে উপস্থাপিত করার মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যে তার প্রকাশ যেন প্রতিপদে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব আর অবাস্তব কল্পলোকের সেতুবন্ধন।

নিশীথে : অতিপ্রাকৃতের আবরণে বাস্তবতা

সুমিতা রায়

'নিশীথ' শব্দটির অর্থ 'রাত্রি'। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে রাত্রির কবি হতে চেয়েছেন। 'কল্পনা' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতায় তিনি বলেছেন, '.......আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগরণ তলে/ নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন, কখনো 'খেয়া' কাব্যের 'দিঘি' কবিতায় এক নিশীথের গভীর অন্ধকারে কবি তলিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, —'ওগো বোবা, ওগো কালা, স্তব্ধ সুগম্ভীর গভীর ভয়ংকর, / তুমি নিবিড় নিশীথ-রাত্রি বন্দী হয়ে আছো—/ মাটির পিঞ্জর।' আবার নিবিড় নিশীথ রাত্রিই ঢেকে রাখে 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার ঘরটিকে, সুরঙ্গমা বলে ওঠে, "এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরী।" (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ—তপোব্রত ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, বাইশে শ্রাবণ ১৩১০, পৃ: ১২৩।)

'নিশীথে' গল্পে অন্যত্র রাত্রির স্রোতে ভেসে গেছে গল্পের নায়ক। রাত্রি এখানে কোনো ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ধরা দেয় রাত্রি। গল্পের রোমান্টিক নায়ক সেই সৌন্দর্য স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চলে। 'নিশীথে' গল্পের প্রায় প্রথমেই বরানগরের বাড়ির প্রসঙ্গ পাই, 'বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেন্দির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না। এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিদের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল।' (গল্পগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ.২২৪) এখান থেকেই সূত্রপাত নায়কের হৃদয়ের ভালবাসার অস্থিরতা।

'নিশীথে' গল্পে সমগ্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে অন্ধকারের মধ্যে। গল্পের ছলে নায়ক দক্ষিণাচরণ বাবু মৃতা প্রথমা স্ত্রীর কাহিনি বর্ণনা করেন বাড়ির পরিচিত ডাক্তার বাবুর কাছে। স্বাভাবিক ভাবেই গল্পে সৃষ্টি হয়েছে দুটি পক্ষ। একদিকে উত্তম পুরুষে আমি রূপী ডাক্তার আর অন্যদিকে নায়ক দক্ষিণাচরণবাবু তাঁর প্রথমা স্ত্রী এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমা। দক্ষিণাচরণ বাবু এক সংসারী ব্যক্তি। তিনি সহজেই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। উচ্ছ্বাসপ্রবণতাও নায়কের চরিত্রে এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। জীবনের গভীর রহস্যতল দক্ষিণাচরণবাবু কখনো হাতড়াতে যাননি, মানুষের উপরের সাদা-মাটা, সহজ-সরল রূপটা নিয়েই ছিল তাঁর কারবার। প্রেমের অগভীরতা নায়ককে করে তুলেছে ব্যক্তিত্বহীন। এই ব্যক্তিত্বহীনতার জন্যই দক্ষিণাচরণ বাবু স্ত্রীর কাছে স্বাভাবিক প্রবণতাকে সবসময় গোপন করার চেষ্টা করেন।

দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথমা স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করার পর নানাপ্রকার জটিল রোগে ভুগতে

থাকেন। স্ত্রীর রোগমুক্তির জন্য নায়ককে যেতে হয় এলাহাবাদে। সেখানে স্বজাতি হারান ডাক্তারের মেয়ে মনোরমার সঙ্গেও নায়কের আলাপ হয়। দক্ষিণাচরণবাবু অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তার উল্লেখ নায়কের মুখেই শোনা যায়,—'মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছজল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না'। (গল্পগুচ্ছ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ: ২২৬) সেইজন্যই রোগীর ঘর নায়কের কাছে নিরানন্দ হয়ে ওঠে। নায়কের জীবন দুটি মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে ক্লান্তির ছাপ আর অন্যদিকে যৌবনের উদ্দীপ্ত বাসনা এই দোলাচলের মধ্যেই নায়ক এগিয়ে গেছে যৌবনের উদ্দীপ্ত বাসনার হাত ধরে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিতেই ঘটে গল্পের পরিসমাপ্তি।

দক্ষিণাচরণবাবুর স্ত্রী নিজের প্রাণ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি নিজেই ডাক্তারকে বলেন 'ডাক্তার কতকগুলো মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছো কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো তখন এমন একটা ঔষধ দাও যাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।' এই কথা কয়টি ডাক্তারের হাতে মৃত্যুবাণ তুলে দেয়। ডাক্তারের মনে সহজেই রোগীকে হত্যা করার উপায় নির্দেশিত হয়ে যায়। যদিও গল্পে রবীন্দ্রনাথ কোথাও 'হত্যা' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। গল্পে 'আত্মহত্যা'র কথাই বলা আছে।

'নিশীথে' একটি ব্যঞ্জনাময় গল্প। জমাট বুননি থেকেই উঠে আসে গল্পের প্রকৃত ঘটনা। দক্ষিণাচরণ বাবুর স্ত্রীর শারীরিক যন্ত্রণা যেদিন সহ্যসীমাকে অতিক্রম করে সেদিনই হারান ডাক্তারের মেয়ে মনোরমা এসে হাজির হয় নায়কের বাড়ি। সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, —'বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।' (গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ: ২২৭) এই ব্যঞ্জনাদীপ্ত ভাষা থেকেই গল্পটি হয়ে উঠেছে সংকেতধর্মী।

ডাক্তারকন্যা মনোরমার ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক হয়ে উঠেছে কুণ্ঠিত। তাই দক্ষিণাচরণের স্ত্রী যখন স্বামীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেন, "ওকে', —ও কে। ওকে গো"। তার উত্তরে দক্ষিণাচরণ সহজেই বলে ওঠেন, "আমি চিনি না।" এ উক্তি দক্ষিণাচরণের হৃদয় থেকে উঠে আসা, তাই দক্ষিণাচরণ নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলেন, —'ও আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা। রোগিণীর সঙ্গে মনোরমার আলাপ চলাকালীন এসে হাজির হন হারান ডাক্তার। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ছিল দুটি শিশি ওষুধ। তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন সাবধান বাণী— "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর একটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।" (গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ: ২২৭) নীলরঙ মৃত্যুর রঙ। তাই নীলশব্দটি প্রয়োগ করে এবং বারবার রোগিণীকে সচেতন করে, রোগিণীর শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে শিশি দুটি রেখে দেন। যাতে রোগিণী সহজেই মৃত্যুর নিশানা খুঁজে পান। ডাক্তারকন্যা মনোরমা কিছুক্ষণ রোগিণীর কাছে বসতে চাইলে ডাক্তার

হেসে বলে ওঠেন,—'উনি মা লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।' আবার দক্ষিণাচরণ বাবুকে ডাক্তার বলেন, 'আসুন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।'' (গল্পগুচ্ছ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ: ২২৭) দক্ষিণাচরণ বাবুর প্রথমা স্ত্রীর আত্মহত্যাব পিছনে ডাক্তাবের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল পরোক্ষভাবে।

দক্ষিণাচরণ বাবুকেও নির্দোষ বলা চলে না, কারণ তিনি ডাক্তারের বাড়িতে রাত্রের খাবার খেয়ে ফেরেন। এমন কী দীর্ঘসময অসুস্থ স্ত্রীর পাশে না থেকেই তিনি আত্মাভিমানী স্ত্রীকে মৃত্যুর সুযোগ করে দেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হারান ডাক্তারের ইচ্ছাতেই মনোরমার সঙ্গে দক্ষিণাচরণবাবুর বিয়ে হয়। মনোরমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী অথচ কুলদোষ থাকার জন্য ডাক্তার-বাবা বিয়ে দিতে পারেন নি। অবশ্য ডাক্তারের নিজের মুখে শোনা যায় যোগ্য পাত্রের অভাবের জন্যই তিনি কন্যা মনোরমাকে বিয়ে দিতে পারেন নি। মনোরমার ইচ্ছার উপর রবীন্দ্রনাথ কোনো গুরুত্ব দেন নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে চিরপ্রচলিত প্রথা মেনেই মনোরমার বিয়ে হয়। গল্পটি বাস্তবতার পটভূমিতে আবর্তিত হতে হতেই এগিয়ে যায় অবাস্তবতার দিকে। অতিপ্রাকৃতের বেড়াজালেব আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকেন গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণবাবু। প্রকৃতির লীলারহস্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় নায়কেব মন। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মিশ্রণে দোলাচল মনে সৃষ্টি হয় বিচিত্র তরঙ্গলীলা।

মনোরমার কাছে নিবেদিত প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওযার পর দক্ষিণাচরণের মনে জেগে ওঠে পাপবোধ। মনোরমা সম্পর্কে দক্ষিণাচরণবাবু বলেন,—'আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার কবিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কী খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?' (গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ: ২২৮) স্থূলমনের কারবারি দক্ষিণাচরণ বাবু মনোরমাকে বুঝতে পারেন নি, তিনি মনোরমার নারীমূর্তিকেই ভালবেসেছেন। মনোরমাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার শক্তি দক্ষিণাচরণের ছিল না। মনোরমাকে না পাওয়ার সূত্র ধরেই দক্ষিণাচরণের মনে প্রথমা স্ত্রীর জাগ্রত সত্তা পিছুতাড়া করে।

বরানগরের বাগানে এক সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকে সাদা পাথরের বেদীর উপরে সাদা শাড়ি পরা মনোরমার মুখের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়লে দক্ষিণাচরণবাবু দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমার কাছে এসে দু হাতে তার হাতটি তুলে ধরে বলে ওঠেন, 'মনোবমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাচরণ নিজেই চমকে ওঠেন। প্রথমা স্ত্রীকেও তিনি একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'নিশীথে'র অন্ধকারের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতের পরিবেশ দেখা যায়, সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখায় উপর দিয়ে, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচ দিয়ে গঙ্গার পূর্বপার থেকে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হা হা-হা হা-হা-হা করে অতি দ্রুত বেগে একটা হাসি বয়ে যায়। সেই হাসি মর্মভেদী কী অভ্রভেদী হাহাকার, তা বলতে পারা যায় না। দক্ষিণাচরণ সেইসময় পাথরের বেদীর উপর থেকে মূর্ছিত হয়ে নীচে

পড়ে যান। মূর্ছাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিনের আলোয় স্পষ্ট শুনতে পান পাখির ঝাঁক উড়ার শব্দ। উত্তরদেশ থেকে হাঁসের দল তখন নদীর চরে চোরে বেড়াতো। আর সন্ধ্যার ঠিক আগে তারা দলবেঁধে উড়ে যেত। দক্ষিণাচরণের দুর্বল মন স্বাভাবিক ভাবেই কেঁপে ওঠে। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি লুকিয়ে-রাখা দুর্বলতা একটা শব্দে যেন দক্ষিণাচরণকে তোলপাড় করে তোলে। তাই দক্ষিণাচরণ সূর্যডোবার পর দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেতেন না।

বরানগরের বাড়ি থেকে মনোরমাকে নিয়ে দক্ষিণাচরণ বোটে করে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে যান। চারপাশের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মনোরমা দক্ষিণাচরণের কাছে আস্তে আস্তে হৃদয়ের বন্ধ দরজা খুলতে থাকেন। গঙ্গা ছাড়িয়ে, খড়ে ছাড়িয়ে, পদ্মার বুকে তাঁরা হাঁটতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল।' (গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক-১৩০৭, পৃ: ২৩০) দক্ষিণাচরণের মনের গোপন স্তরের সুপ্তপুলক জাগ্রত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির বুকে তিনি তাঁর প্রেমকে জাগিয়ে তোলেন। দক্ষিণাচরণ ও মনোরমার নিবিড় চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর কণ্ঠে তিনবার শোনা যায়, "ও কে। ও কে। ও কে।"

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই দক্ষিণাচরণ ও মনোরমা দু-জনই কেঁপে ওঠেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোটে ফিরে আসেন। রাত্রে ক্লান্ত শরীর নিয়ে মনোরমা ঘুমিয়ে পড়লেও দক্ষিণাচরণকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেই শব্দ কয়টি, 'ও কে। ও কে। ও কে গো।"

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নিবারণ ও তার স্ত্রী হরসুন্দরী—এই দুজনের মাঝখানে এক অশরীরী স্মৃতি চিরকালের মতো থেকে গেছে। সেই স্মৃতিকে যন্ত্রণাদায়ক করে তুলেছে অপরাধের গ্লানি। নায়ক দক্ষিণাচরণের মনেও সেই একই অপরাধবোধ কাজ করেছে।

ডাক্তারকে গল্প বলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণাচরণ তাঁর জীবনের গোপন চোরাগলিকে ধরা দেন। রাত্রের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে সমগ্র কাহিনিটি। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দক্ষিণাচরণের চোখেমুখে কোনো আতঙ্কের কালো মেঘ দেখা যায় না। অথচ রাতের অন্ধকারে কাল্পনিক পরিবেশের মধ্যেই আতঙ্কের জাগরণ হয়। নিশীথে দক্ষিণাচরণ ভাবতেন—'চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে। সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। (গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৩০৭, পৃ. ২২৯) আবার দিনের বেলায় তিনি আলাদা মানুষ, ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। নিশীথের অতিপ্রাকৃতের অভিজ্ঞতা যে নায়কের নিজের সৃষ্ট বিভীষিকা তা তিনি নিজেও স্পষ্ট অনুভব করেন। এই ভয়ঙ্কর নিশীথ দক্ষিণাচরণের ভিতরের আর এক আর্ত অপরাধী মনেরই প্রতিচ্ছবি। 'নিশীথে' গল্পটি আসলে একটি অপরাধীমনের ব্যঞ্জনাময় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

সুভা : বনের পাখি থেকে খাঁচার পাখি

শ্রীময়ী আগরওয়ালা

রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' ছোটগল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় মাঘ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। ঐ পত্রিকাতেই এর ঠিক আগে প্রকাশিত গল্পের নাম 'ছুটি'। প্রকৃতির উদার অসীমতায় মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কাতর এক গৃহবন্দী বালকের অসহায় বেদনা 'ছুটি' গল্পে রূপ নিয়েছে। এই মুক্ত বালক শহরের কংক্রিটের জঙ্গলের আবদ্ধতায় বন্দী হ'য়ে কিভাবে চিরকালের মতো ছুটি নিয়ে হারিয়ে গেলো, তার বাস্তব করুণ কাহিনি 'ছুটি'। 'সুভা' গল্পটিতেও আমরা সেই একই সুর একটু অন্যরকম ভাবে বাজতে দেখি। গল্পের শেষে প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন ও স্বামী-গৃহে নিষ্ঠুরতায় সুভা নাম্নী ওই 'বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে' যখন 'একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল' তখন যেন ছিন্নপত্রে রবীন্দ্র অনুভবের প্রতিধ্বনি 'মানব জীবনের সুকরুণ বেদনা গাথা' অনুরণিত হল। 'মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে।'

—এ যেন বিধাতার পরিহাস। তবে অনেক সময়ই দেখা যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোনো একটি অকেজো হ'লেও বাকি চারটি আরো বেশি মাত্রায় তীক্ষ্ণতর হয়। সুভা কথা কয় না, অনুভব করে। এই অতিমাত্রায় অনুভব প্রবণতা হেতু শিশুকাল থেকেই সে বুঝে গিয়েছিলো বিধাতার অভিশাপ রূপেই পিতৃগৃহে তার জন্ম গ্রহণ। তাই বোধ হয়, খানিকটা লজ্জা বশত সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে সে নিজেকে গোপন রাখতেই চেষ্টা করতো। 'মনে করিত আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।'

বাবা বানীকণ্ঠ তাকে একটু বেশি ভালোবাসতেন। মা সর্বদাই তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে ক'রে তার প্রতি বড়ই বিরক্ত ছিলেন। আগেই বলেছি যে, মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের কোনো একটি নিষ্ক্রিয় হ'লে বাকী চারটি অধিকমাত্রায় সক্রিয় থাকে। 'সুভার কথা ছিলো না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি চোখ ছিলো।'

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তা কতকটা তর্জমা করার মতো, সকল সময় তা ঠিক হয় না। কিন্তু কালো চোখ মনের আরশি : 'ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো মুদ্রিত, কখনো প্রসারিত হয়।'

আজন্মকাল যার অন্যভাষা নেই, তার চোখের ভাষা অসীম—উদার, স্বচ্ছ আকাশের মতো অতল স্পর্শ গভীর। এই জন্যই বোধ হয় সাধারণ বালিকা বা বালকদের থেকে সে আলাদা—নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন, সঙ্গীহীন। প্রকৃতিই এই সঙ্গীহীন বালিকার অভাব পূরণ করে দেয়, তার সঙ্গে কথা বলে। এখানেই সুভার সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'নদীর কলোধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ রাশির ন্যায় বালিকার চির নিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা।'

সুভার ভাষা প্রকৃতির ভাষারই এক বিশ্বব্যাপী বিস্তার। মধ্যাহ্নে যখন সমস্ত প্রকৃতি সমস্ত কাজ কর্মের মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিজন মূর্তি ধারণ করে, তখন মহাকাশের তলায় কেবল বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ ক'রে বসে থাকতো। এছাড়াও সুভার কতোগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। গোয়ালের দুটি গাভী—সর্বশী ও পাঙ্গুলি। এই গাভী দু'টিও মূক বালিকার কথাহীন কথার মর্ম ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝতো। এরা ছাড়া একটি ছাগল ও বিড়াল শাবকের সঙ্গেও সুভার কিঞ্চিত অন্তরঙ্গতা ছিলো।

সুভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উপমা ব্যবহার করেছেন—শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। এই উপমা পাঠককে অভ্রান্ত ভাবে মনে পড়িয়ে দেয় ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'লুসি' বা 'রুথ'-র কথা। যারা প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা নিসর্গের আত্মজা এবং সঙ্গীহীন। তারা অবশ্য বোবা ছিলো না। কিন্তু কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাদের মুখে কোনো কথা দেননি। এই তিনটি চরিত্রই ধর্মে এক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু সুভাকে ছোটগল্পের চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন, স্বভাবতই কবিতার চরিত্র থেকে সে স্বতন্ত্র। সুভার সঙ্গীহীনতার বেদনা প্রকৃতি খানিকটা হ'লেও মিটিয়ে দিয়েছে, গোয়ালের দুটি গাভী ও বিড়াল ছানাকে দিয়ে। 'উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল।'

গোঁসাইদের অকর্মণ্য সেই ছেলেটির নাম প্রতাপ। তার প্রধান সখ ছিপ্‌ফেলে মাছ ধরা। এই উপলক্ষ্যে সুভার সঙ্গে তার প্রায়ই সাক্ষাৎ হতো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝতো। সবাক মানুষদের সমাজে কথোপকথনই হলো বন্ধুত্বের প্রথম সোপান। কিন্তু এক্ষেত্রে কথা বলতে না পারার অক্ষমতাই সুভা এবং প্রতাপের মধ্যে একটি নাম না দেওয়া সম্পর্ককে গড়ে তুলেছিল। প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত পরিহাস। প্রতাপের প্রতিদিনের বরাদ্দ পান সুভা নিজেই সেজে আনত। প্রতাপের কোনো একটি কাজে লাগতে পারলেই সুভার মনে হতো, সেও এই প্রয়োজনের পৃথিবীতে অন্তত একজনের কাছে অপ্রয়োজনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আগেই জানিয়েছেন, যে কথা বলতে পারে না, সে যে অনুভব করতে পারে, তা সকলের মনে হয় না। কথা বলতে পারার মতো সহজ ক্ষমতাকে রপ্ত করতে পারার গর্বে সুভার মতো ব্যতিক্রমীদের নীরব বাচন তারা সহজেই উপেক্ষা করে। সবাক্ পৃথিবীতে সুভার নিঃশব্দে উচ্চারণ তাই ভোরের শিশিরের মতোই ঝরে পড়ে। কিন্তু শিশিরও বোধহয় কখনো কখনো গাছেব পাতায় 'টুপ্' শব্দ করে। তাই সুভাব মনোরাজ্যে কল্পলোকের মেঘেরা ভিড় জমায়—নাম না জানা নদী, অতল জলরাশি, জলের তলায় পাতালপুরী, প্রাসাদে সোনার পালঙ্ক এবং জনকন্যা 'বানীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু।' এই স্বপ্ন রাজ্য সুভা কল্পনা করে একটি স্বপ্নকেই সফল করতে। উপেক্ষিত একাকিনী বালিকা প্রতাপের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেয়েছে, তারই বিনিময়ে সে প্রতাপকে দিতে চায় তার স্বপ্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন—সাপের মাথার মণি। সুভা চিরকাল জেনে এসেছে, তার এই পৃথিবীতে আসাটা ভুল। তবু ফিরে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতেই সে হাজির হয় এমন কল্পনা রাজ্যে—যেখানে সে শ্রেষ্ঠ নারী। ঠিক এই জায়গাটায় আমাদের একটু নাড়া দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'সু সেই মনিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতাল পুরীর একমাত্র রাজকন্যা।'

ভাবতে অবাক লাগে সুভার স্বপ্নরাজ্য ও নিস্তব্ধ—শব্দহীন। এই মেয়েটি কখনো নিজেকে সবাক্‌ রূপে কল্পনা করে না—স্বপ্নেও না। আর একটি ব্যাপার লক্ষকরি, এই রাজ্যেও সে একা। প্রতাপ শুধুমাত্র তাকে দেখার অধিকার পেয়েছে। এই নিস্তব্ধ রাজ্যের রাজকন্যা হিসেবে।

সুভা, প্রতাপ, সর্বশী, পাঙ্গুলি, মাছ ধরা, পান সাজা আর নিস্তব্ধ প্রকৃতির আলোছায়া—এতক্ষণ 'সুভা' গল্পের এরাই ছিল মূল আকর্ষণের বস্তু। বাস্তবের উঁকি-ঝুঁকিও ছিল বটে, কিন্তু সুভার নিজস্ব জগতের সঙ্গেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন পাঠক। চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকেই রবীন্দ্রনাথ সচেতন করলেন আমাদের। মনে করিয়ে দিলেন, সুভার এই একাকী নিঃসঙ্গতার রাজ্য সমাজ বহির্ভূত নয়। তাই এতোদিন যারা সুভাকে নিজেদের সমতুল্য বলে মনেই করত না, তারা সুভার বিবাহ চিন্তায় চিন্তিত হ'য়ে উঠল। পাড়াপড়শীর ঘুম কেড়ে নেওয়া বেয়ারা বয়োবৃদ্ধিতে সুভার পিতামাতা চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। কারণ, 'লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়।'

সকলের মাঝে এতকাল হারিয়ে থাকা একটি মেয়ে হঠাৎ করেই সকলের চিন্তার বিষয় হ'য়ে উঠল। এতো গেল সমাজের কথা, সংসারের কথা, বাবা মায়ের কথা। কিন্তু সুভা যে 'ক্রমেই বাড়িয়ে উঠিতেছে' একথা সুভারও অজ্ঞাত নয়। কেননা,

> 'ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটী পূর্ণিমা তিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনা শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।'

সুভার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। তাই তার অবুঝ মন এক অজানা আকাঙ্খায় কেঁপে ওঠে। গল্পের শুরু থেকে প্রকৃতির কোলেই সুভাকে দেখে এসেছি আমরা। কিন্তু এই হঠাৎ বদলে যাওয়া দিনগুলিতে সুভা 'ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া।—
> ....এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।"

এতকাল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটা বোবা মেয়ে পরস্পর মুখোমুখি বসে নিজেদের ভাব বিনিময় করতো। আর এবার সেই বোবা প্রকৃতির সামনে 'নিস্তব ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।' 'দাঁড়াইয়া' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষনীয়। কেননা, এবার তার যাওয়ার পালা—প্রকৃতির কোল থেকে, একমাত্র আপনজনের আলয় থেকে।

> 'স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বানী বিদেশে গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলো, কলিকাতায় চলো।'

সুভা একে একে তার অবলম্বন গুলিতে আঁকড়ে ধরতে লাগল। প্রতাপ সুভার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলো কিনা বোঝা যায় না, বয়সী মেয়ের বিবাহই একমাত্র বিধান—এই ভেবে প্রতাপ বেশ আনন্দিতই হলো এবং পুনরায় মাছধরার কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। বানীকণ্ঠ বোধ করি মেয়েকে খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বিরহ মূলত কন্যা

বিরহেরই অন্তর্গত। বানীকণ্ঠের অশ্রু তাঁর বুকের বোঝাকেই খানিকটা হাল্কা করেছে। সুভা গোয়ালঘরের বাল্যসখীদের কাছ থেকেও বিদায় নিলো আর শেষবারের মতো আঁকড়ে ধরতে চাইলো তার চিরপরিচিত মাকে—প্রকৃতিকে। 'তুমি আমাকে যাইতে দিও না মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।' সুভার প্রকৃতি বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হলো। অতঃপর বিবাহ পর্ব। বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং বধূ দেখতে এলো : 'যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন।'

পরীক্ষার ফলাফল 'মন্দ নহে''। বরবেশ বিচক্ষণ ব্যক্তি। বালিকার কান্না দেখে বুঝতো এর হৃদয় আছে। চোখের ভাষা নয়, চোখের জলই হৃদয়ের পরিমাপ হ'য়ে গেলো। এ স্থানে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি অসাধারণ : 'শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল। তাহার হইয়া আর কোনো কথা বলিল না।'

কন্যার মূল্য—পিতার সম্পত্তির মূল্যই এখানে সব। বিশেষভাবে উল্লেখ্য সুভার দুই বড়োবোনকে বানীকণ্ঠ প্রচুর অর্থব্যয়ে (পণ সহযোগে) পাত্রস্থ করেছিলেন। সুতরাং সুভার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হওয়ার কথা নয়। নিষ্ঠুর হৃদয় অশ্রু বিন্দুতেও মুক্তার সন্ধান করে। নির্বিঘ্নেই সুভার বিবাহ হলো।

> 'বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পন করিয়া বাবা-মা দেশে চলিয়া গেল—
> তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।'

কেবল প্রকৃতির স্নেহ কোল বিচ্ছিন্ন অরক্ষিতা সুভা একা রয়ে গেল। এক্ষেত্রে বানীকণ্ঠের কথা না বলে থাকতে পারছি না। কেবলমাত্র পরকাল এবং জাতিরক্ষার্থে মেয়ের সংবেদনশীলতার তোয়াক্কা না করে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হয়তো অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে বানীকণ্ঠ ও সুভার চোখের ভাষা হযতো সবসময় বুঝতে পারেননি। তবে তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বড় একটা দোষও দেওয়া যায় না। বানীকণ্ঠ পরেশবাবু নন, আধুনিক পিতার মতো উচ্চশিক্ষিতও নন। তিনি গ্রামীণ পরিবেশ ও সংস্কারে লালিত কন্যাদায় গ্রস্ত বৃদ্ধপিতা, যার কন্যা দায় বড় দায়। তাই গল্পের বাস্তবতার খাতিরে এছাড়া তাঁর অন্য পথ ছিলো না। সকল পিতৃ হিসেবে সুভার সংবেদনশীলতার তুলনায় তাকে উপযুক্ত পাত্রস্থ করাই বানীকণ্ঠের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। 'সপ্তাখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই।'

প্রতারণা করেছে সুভার বাবা বানীকণ্ঠ। কার বানী? কার কণ্ঠ?—সমাজের। প্রতারণা করেছে সমাজ। প্রতারণা সুভার সঙ্গে যে মেয়ে কথা বলতে পারেনা, তার চোখের ভাষা পড়তে পারেনি সমাজ। প্রকৃতির কোল থেকে একটানে বৃন্তচ্যুত ক'রে সুভাকে প্রতারণা করেছে। স্বামীর ঘর, স্ত্রীর মর্যাদা—এসবই সুভা হয়তো চেয়েছিলো, ঠিক যেমন চার সাগরের মৎস্য কন্যারা। কিন্তু রূপকথার ঐ মৎস কন্যারা পাখনার বদলে একজোড়া পা ফেলে তবুও বা মানব সমাজে কোনো এক রাজপুত্রের রানী হ'তে পারে। কিন্তু সুভা, বেচারি সুভা—না পেলো মুখের ভাষা, না বোঝাতে পারলো চোখের ভাষা। ছোটগল্পের বাস্তবতার খাতিরেই দেখা দিলো না কোনো জাদু। মৃন্ময়ী খানিকটা হলেও আশীর্বাদধন্য। সে সবই পেল। মাটির

মেয়ে পেল আকাশের বিস্তার। তারাপদ পেল আকাশের নক্ষত্রের অমোঘ আকর্ষণ—দূর থেকে দূরতর হলো তার যাত্রাপথ। ফটিক মুক্তি খুঁজে নিলো মৃত্যুর নীলাভ শীতলতায়—সেখানে এক বাঁও, দুই বাঁও ছাড়িয়ে বহুমাত্রিকতার দিকে তার যাত্রা। কিছু পেল না আমাদের সুভা। রবীন্দ্রনাথ সুভার প্রতি একটু বেশিই নিষ্ঠুর। নিরুপমা সরে বেঁচেছিলো। সুভার অসীম অব্যক্ত কান্না অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না। সুভা মিলতে চেয়েও মিলতে পারলো না। সে পথিক হলো না, পথ হাঁটবার সুযোগই পেল না। তার অন্তিম পরিণতির কোনো আভাস আমরা এ গল্পে পাই না। যেটুকু পাই তা বড় করুণ—'এবার তাহাব স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষা বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিযা আনিল।'

তথ্যনির্দেশ

১ গল্পগুচ্ছ--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব
২ ববীন্দ্রনাথেব ছোটগল্প—প্রমথনাথ বিশী
৩ কথাকোবিদ ববীন্দ্রনাথ—নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪ ছিন্নপত্র—ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব
৫ ববীন্দ্রছোটগল্পের শিল্পরূপ—তপোব্রত ঘোষ
৬. গল্পগুচ্ছ জীবনেব মেঘ ও রৌদ্র—মীনাক্ষী সিংহ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৮৭৩-১৯৩২)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার গুরাপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পেশা ছিল ওকালতি ও অধ্যাপনা কিন্তু নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু। তাঁর রচিত চৌদ্দটি উপন্যাস ও শতাধিক গল্পের মধ্যে 'রত্নদীপ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে স্বীকৃত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'অভিশাপ', (ব্যঙ্গকাব্য), 'গল্পবীথি', 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প', 'সিন্দুর কৌটা', 'সতীর পতি', 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী' ইত্যাদি। তাঁর সাফল্যের মুকুটে জ্বল জ্বল করছে প্রথম কুন্তলীন পুরস্কার পাওয়ার গর্ব। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ছদ্মনামে লিখে তিনি এই পুরস্কার পান। সরল, অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখকরূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

কাশীবাসিনী : সংসার সীমান্ত

শর্মিলা বাগচী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাশীবাসিনী' যৌবনে পদস্খলিতা এক নারীর শৈশবে পরিত্যক্তা সন্তানের আকর্ষণে তার বিবাহিত সংসার জীবনে ফিরে আসা এবং পুনরায় ঠিকানা বিহীন বিশ্বে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। অসতী নারীর বাৎসল্য ইতিপূর্বেও বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় হয়েছে। কিন্তু সেখানে চরিত্রের অবস্থান যেন বাস্তব জগতের উর্ধ্বে। যা সাহিত্যের সত্য হলেও বাস্তবের সত্য নয়।

কাশীবাসিনী গল্পটি স্বাদে ও বৈচিত্র্যে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। নিরাসক্ত আবেগ বর্জিত ভাষায় দীর্ঘ অদর্শনের পর পরস্পর অপরিচিত মাতা এবং পুত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ পর্বটি যেখানে পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। 'কাশীবাসিনী'র অসাধারণত্ব প্রসঙ্গে যে কটি প্রসঙ্গ সামনে আসে তা হলো—

ক. গল্পের সূচনা নিতান্ত আবেগবর্জিত হলেও রূপ বৈচিত্র্যে কম অভিনব নয়। বিহারেব এক সাধারণ রেলস্টেশন খগোল। খগোল বাজার থেকে কিছু দূরে স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরিন্দ্রনাথের বাসাবাড়ি। বাড়িটিরও কোন বিশেষত্ব নেই। মাটিব বাড়ি এবং খোলার চাল। গিরীন্দ্র লোকটি শুধু সাধারণই নয় পাত্র হিসেবেও বিশেষ যোগ্য নয়। বিবাহের পূর্বেই নাকি তার চরিত্র দোষ ঘটেছিল।

এই বিবর্ণ পরিবেশে গিরীন্দ্রের নিঃসঙ্গ নববিবাহিতা স্ত্রী মালতী বৃদ্ধা ঝি ভজুয়ার মাইয়ের সঙ্গে বাস করে। বহির্পৃথিবীর সঙ্গে যার যোগাযোগের মাধ্যম দরজার ছিদ্রপথ। এই প্রাত্যহিকতাসর্বস্ব জীবনে গল্পের উপাদান পাওয়া কঠিন। কিন্তু লেখক এই প্রেক্ষাপটেই মালতীর সংসারে উপস্থিত করলেন অপরিচিতা কাশীবাসিনীকে।

অত্যন্ত সপ্রতিভতার সঙ্গে যিনি জানালেন, কাশী থেকে আসার পথে টিকিট হারিয়ে যেতে রেল কর্মচাবী তাঁকে এই স্টেশনে নাবিয়ে দিয়েছে। "আবার সেই রাত একটায় গাড়ি। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই, —তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে এলাম।" তখনকাব প্রবাসী বাঙালী সমাজে অতিথি বরণের এমন ঘটনা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই পাঠক কোন ভাবেই চমকিত হন না। মালতীও তাঁকে গ্রহণ করল। এবং এই নারীর পরিচয় সম্পর্কে কোন কৌতূহলও সৃষ্টি হল না। অথচ কাশীবাসিনী নিতান্ত বিপাকে পড়ে মালতীর সংসারে আসেনি। তার একটি গূঢ় কারণ ছিল।

খ. বিরোধী ঘটনা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্রগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষকে বিভিন্ন ভাবে আমাদের সামনে এনেছেন লেখক। সেইকালে স্বচ্ছল পরিবারের বিধবার যেমন কাশীবাসের সৌভাগ্য হত। তেমনি সেই বাসে সংসার কর্তৃক পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী বিধবার সংখ্যাও কম ছিল না। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে কাশীবাসিনীর এই সঙ্গীহীন যাত্রাও বিরল দৃষ্টান্ত বলা যায়। অদ্ভুত সাসপেনসের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষে ঘটিয়েছেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! মালতীর কাছে গল্পচ্ছলে যেভাবে কাশীবাসিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার বর্তমান সাংসারিক অবস্থা এবং বিবাহ পূর্ব জীবনের কথা জানতে চেয়েছেন

তাতে মালতীর মনে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ মালতী সংসার অনভিজ্ঞা হলেও বোকা নয়। কিন্তু তার মনে কোনও প্রশ্নই জাগেনি, অথচ তার মায়ের কুলত্যাগের কথা সে জানত। মালতী অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। যেমন তার স্বামী কখন আপিসে যান, কত মাইনে পান, উপরি আয় আছে কিনা এমনি অসংখ্য প্রশ্ন!

মালতী যখন বলল মাইনে ছাড়াও উপরি আছে, তখন দেখা গেল "কাশীবাসিনী একটু খুশী হইলেন।"

গ. কাহিনীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য গিরিন্দ্রকে কাজে লাগিয়েছেন লেখক। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিধিতে অনাবশ্যক কোন চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এই যে কাশীবাসিনীর সহসা আবির্ভাব সম্পূর্ণ অপরিচিত সংসারে, গিরীন্দ্র তাতে অসন্তুষ্ট। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেছে "কাশী থেকে একলা মেয়েমানুষ, কি রকম বিধবা তাই ভাবছি।" এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। গিরীন্দ্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশিত হয়েছে তদানিন্তন সমাজ যে সমাজ একদা নষ্ট চরিত্র যুবককে নারীর বিচারকের আসনে স্থান দেয়।

আধুনিক মনের মানুষ হলেও সমাজকে চিনতেন ও বুঝতেন লেখক। তাকে অগ্রাহ্য করে মাতা পুত্রীর প্রথম মিলনকে বির্বিঘ্ন হতে দেননি। তাদের মাঝে বারবার এনেছেন গিরীন্দ্রকে।

ঘ এব সঙ্গে লক্ষ্য করেছি বিরুদ্ধ পক্ষকে তার নিজেরই হাতিয়ার দিয়ে পর্যুদস্ত করার আশ্চর্য পারঙ্গমতা। যেমন, প্রথম থেকেই কাশীবাসিনীর উপস্থিতি অসহ্য লেগেছিল গিরীন্দ্রের। কাশীবাসিনীর সত্বর বিদাযের জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছিল স্ত্রীকে। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল—তার প্রয়োজনেই দ্বিতীয়বার যাত্রা স্থগিত হল।

কারণ আর কিছুই নয় গিরীন্দ্রের 'তাড়িঘাট' বদলী! পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াই শুধু নয়। উপরি আয়েরও সংস্থান আছে। বিদায় উপলক্ষ্যে স্থানীয় কিছু লোকজনকে খাওয়াতে হবে। যারা গিবীন্দ্রেরই স্বগোত্র। অতিথিটি যে রন্ধনে পারদর্শিনী তার পরিচয় সে আগেই পেয়েছে। তাই মালতীকে দিয়ে অনুরোধ জানায় "দেখ, উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা..."।

বলাবাহুল্য মালতী তাতে খুশিই নয়। আপাতত তাঁর যাত্রা স্থগিত হল। সে নিজেও বোঝেনা কেন এই অপরিচিতা এত শীঘ্র তাব অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু স্বামীর এঁর প্রতি মনোভাবও তার অজানা নয় "সত্যই ত, স্বামী যে ইহার উপর প্রসন্ন নহেন।"

মাংস রান্নার যে ফর্দ কাশীবাসিনী দিলেন তা দেখে গিরীন্দ্রের অভিজ্ঞ মন বলল "দেখ ইনি একজন খলিফা লোক। কাশীতে শুধু ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।"

এই প্রচ্ছন্ন অথচ সঙ্কেতময় মন্তব্যে এই নারীর প্রতি পাঠকের কৌতূহল আরও টান টান হয়েছে। কে এই কাশীবাসিনী? যার সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে এক রহস্যের আবরণ। অথচ কখনও যেন মনে হয় নিতান্ত সাধারণ এক সংসার স্বাদ বঞ্চিতা অসহায় রমণী!

ঙ. পাঠকের উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে যখন এই নারী গিরীন্দ্রের প্রয়োজনে অক্লেশে তুলে দিয়েছে তিরিশটি টাকা। মনে হতেই পারে এ যেন কোন বৃহৎ অপরাধমূলক পরিকল্পনার পূর্ব পদক্ষেপ। তার পরের ঘটনা তাড়িঘাটের উদ্দেশ্যে কাশীবাসিনীসহ গিরীন্দ্র দম্পতির রেল যাত্রা। তাড়িঘাটে যেতে হলে দিলদার নগরে গাড়ী পরিবর্তন করতে হয়। মালতীরা সেখানে নেবে গেলে কাশীবাসিনী সেই গাড়িতেই কাশী চলে যান।

এবার কাহিনির পট পরিবর্তন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনায়। মালতীর গহনার বাক্স রেলের কামরায় চুরি যায়। অনিবার্য ভাবে সন্দেহের সব কটি তীর কাশীবাসিনীর প্রতি বিদ্ধ হয়। প্রথমত তার আকস্মিক আগমন। দ্বিতীয়ত অতি অনায়াসে মালতীর হৃদয়ে স্থান গ্রহণ। তৃতীয়ত গিরীন্দ্রের বিরূপতা কুশলী মায়াজাল বিস্তার করে অপসারণ!

সন্দেহের কোন অবকাশই থাকেনা যে এর নেপথ্যে সক্রিয় ছিল অতি চতুরা অপরাধিনীর পেশাদারী কুশলত্ব। গিরীন্দ্র বাক্সটির ভ্রান্তি সম্পর্কে হতাশ হলেও আইনত যা যা করণীয় ছিল সবই করেছে। পুলিশে খবর দিয়েছে। তবে কাশীর লক্ষাধিক মঠের মধ্যে পুলিশ যে তাঁকে খুঁজে বার করবে এই দুরাশাও ছিল না।

চ. কিন্তু এই অসম্ভবও সম্ভব হল। এই প্রয়াসে বাংলা ছোটগল্পকে জীবনমুখী করলেন লেখক। তাঁর চরিত্র চিত্রণে কাশীবাসিনী অমর্ত্যবাসিনী দেবী নন। বাস্তবের নারী। তাই পুলিশের তাড়নায় আবার ফিরে এলেন মালতীর তাড়িঘাটের বাসা বাড়ীতে। দ্বারের ছিদ্র পথে সেই আগের মতই মালতী দেখতে পেল তাঁকে। কোন দৃঢ় বিশ্বাসে সে বিশ্বাস করত কাশীবাসিনী কোন মতেই প্রতারক নন। স্বামী তাঁকে মিথ্যা সন্দেহ করেছেন। "নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন?" সে মনে প্রাণে চেয়েছিল স্বামীর অভিযোগ যেন এঁর কানে না যায়।

কাশীবাসিনীর গম্ভীর মুখ এবং বিষণ্ন কথায় মালতীর আশঙ্কা সত্য হল "তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না?"

পুলিশ তাঁকে খুঁজে বার করেছিল। নগদ দুশোটি টাকা দিযে অবশেষে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কাশীবাসিনীর দুঃখে আর্ত কণ্ঠে মালতী বলে—"আমাদেব সঙ্গে আত্মীযতা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল।" এখনও সে জানেনা রক্তের কি অটুট বন্ধনে সে আবদ্ধ এই নারীর সঙ্গে। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসে। সেই মেঘের অন্ধকার ঘনীভূত হয় দুই নাবীর অন্তরে।

অসামান্য ব্যক্তিত্বে হৃদয়ের অসহনীয় বেদনা দমন করে তিনি মালতীর হাতে নিজের গহনাগুলি তুলে দিতে চান। যার অর্থমূল্য মালতীর গহনার চেয়ে অনেক বেশী।

মালতী অন্যের গহনা নিতে চায়না স্বাভাবিক মর্যাদা বোধে। যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন করে—

—আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব?

—আমি দিচ্ছি।

—আপনি দিচ্ছেন, আমি কোন অধিকারে নেব? সে আমি পারবি না।

রুদ্ধশ্বাস এক মুহূর্তে লেখক উন্মোচিত করেন অসহ্য নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য। কাশীবাসিনী এই সত্যের নগ্ন উদ্ঘাটন চাননি। অতীত, বাস্তবের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করুক তারপর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক বহুদিনের বিস্মৃত এক মায়ের বাৎসল্যের ক্ষীণ সূত্রটুকু। ক্রমশ উপলব্ধি করলেন, জীবন বড় নিষ্ঠুর। সে কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। জননীর নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণও নয়।

ছ. জীবনের এই পরম সত্য অবশেষে তাই কাশীবাসিনীকেই প্রকাশ কবতে হল—"তা হলে তুমি জান আমি তোমার পোড়ারমুখী মা।" আর মালতী? তাব হৃদয়েব পুরাতন ক্ষতে আবার নূতন করে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। গভীর নিশীথে মোক্ষদা ঠানদির চরম বাক্যে যার

সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর সকলের অজান্তে যে ব্যথা তার হৃদয়ে গভীর শলাকার মত বিদ্ধ হয়েছিল। মা তার পরলোকগতা নন। গৃহত্যাগিনী—কুলটা!

মালতী নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর কাছ থেকে খানিকটা সরে বসে। হয়ত এর মধ্যে কাজ করছিল তার অব্যক্ত অভিমান। আবার হয়ত কুলত্যাগিনী রমণীর সঙ্গে কুলবধূর মানসিক এবং সামাজিক দূরত্ব।

জ. মালতী এবং কাশীবাসিনীর মধ্যে এখন আমেরু ব্যবধান। যে ব্যবধানের নিয়ন্ত্রক যতটা সমাজ বা সামাজিক ব্যবস্থা তার চাইতেও পারস্পরিক সম্পর্কের অপরিমিত আবেগ। মানব জীবনের এই অনুচ্চারিত দিক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ-ধর্মকেই শুধু প্রতিফলিত করেনা, দুটি মানবীর অকথিত বেদনার আভাসকে বিশ্বপ্রসারী করে দেয়। তীব্র আক্ষেপে ভেঙে পড়তে পড়তে মালতী কেঁদে বলে "কেন তুমি জানালে তুমি কে?" তার মনে হয় অজ্ঞাতসারে এর প্রতি যে মায়াময় আকর্ষণ জন্মেছিল বরং তাই ছিল ভাল। সেই ভালোলাগার মধ্যে অন্তত কলঙ্কের কালিমা ছিল না। এই পরিচয় তো কোন গৃহস্থের অঙ্গনে মঙ্গল দীপের বার্তা বহন করে আনে না। শুধু এক মূর্তিমান অমঙ্গল এসে বিধ্বস্ত করে যায় মানুষের সংসার। কি হবে মালতীর? যদি এই সত্য প্রকাশ পায়? পতিতা মায়ের গহনার উত্তরাধিকারিণী তো সে নয়। স্বামীই বা কি মনে করবেন? কাশীবাসিনী সব বুঝলেন। 'যা ভেবেছ তা নয়। ও তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো। নইলে আমি তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি আজ চৌদ্দ বছর ধবে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর এর একখানিও পাপের অর্জন নয়। আমি মস্ত বড় মানুষেব মেয়ে ছিলাম—শোন নি?'

ঝ. ছোটগল্পের শিল্পমূল্য নির্ধারণে সংলাপের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। প্রভাতকুমারের গল্পে দেখা যায় ব্যবহৃত বাক্যে কখনও সাধু কখনও চলিত ভাষার মিশ্রণে অনন্য লোকজীবন-মনস্কতার পরিচয় আছে। চিরন্তন মানবের পাওয়া না পাওয়ার বেদনা যেমন স্বল্প আঁচড়ে বিবৃত, তেমনি জীবনে নিত্য উত্থিত ছোট ছোট তরঙ্গলীলা অসামান্যের আভাসে আভাসিত হযেছে।

তাঁকে মঁপাসার সঙ্গে তুলনা অনেকেই কবেছেন। কিন্তু মঁপাসা যেমন—সমাজ-ধর্ম ও নীতিকে নির্মম হাতে ভেঙেছিলেন, প্রভাতকুমার তেমনটা করেননি। শুধু বলা যায় জীবনে যারা সব কিছু হারিয়েছে তাদের দিয়েছেন স্বপ্ন দেখার অধিকার। হয়ত সেই স্বপ্ন চিরদিন অধরাই থেকে যায়। গল্পের শেষে মালতী তার মাকে বলেছে। "কেন তুমি জানালে তুমি কে?" আবার পরক্ষণেই "জানিয়েই ভাল করেছ। নইলে মা তো কখনো চোখে দেখতে পেতাম না।"

আসন্ন ধারাপাত অগ্রাহ্য করে কাশীবাসিনী তাঁর মেয়েকে শেষবারের মতো আশীর্বাদ জানিয়ে পথে নামলেন। পিছনে পড়ে রইল অতীত জীবন, তার সহস্র বন্ধন। কাশীবাসিনীদের তো গৃহস্থের সংসারে কোন ঠাঁই নেই। সংসার সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে যাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছুঁয়ে যেতে পারে জীবনের বহু সাধ বহু স্বপ্নকে। কাশীব'স তো প্রকারান্তবে সন্ন্যাসই। যেখানে আর পিছু ফিরে চাইতে নেই। হয়ত কাশীবাসিনীও এইবার জীবনের সর্ব বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজস্ব ভুবনের সন্ধান পাবেন। এমনই সম্ভাবনার রেশ থেকে যায় গল্পের শেষে।

মাতৃহীন : এক অনবদ্য আত্মদর্শন

পরমেশ আচার্য

"গল্পাঞ্জলি" (১৯১৩) গ্রন্থের 'মাতৃহীন' গল্পটি নিঃসন্দেহে ভিন্ন স্বাদের গল্প। ইংরেজ জাতিকে জানার ও বোঝার এক অসাধারণ নিদর্শন গল্পটি। বিদেশী জীবনের ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ রূপটিকে স্বদেশী ভাষায় ধরে রেখে দুই জাতির প্রাণের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন প্রভাতকুমার। ইংলন্ডে ভারতীয় ছাত্রের জীবন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র, আবার ভারতীয় নবাবের চিত্র সন্ধানে ব্যাপৃত ইংরেজ মহিলা—এসব অতি সুস্পষ্ট ও নিখুঁত ছবি গল্পকার তুলে ধরায় তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির তারিফ করতে হয়।

ইংলন্ডের উনিশ বছর বয়সী মড এবং তার দাদা ফ্রেডের বন্ধু একুশ বছরের চারুচন্দ্র দত্তের সংস্কৃত-ফরাসী শিক্ষা থেকে প্রণয়, একবছর বিরহ বেদনা সহ্য করে প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মডের পিতার কাছ থেকে বিবাহ বিষয়ে সম্মতি পাওয়া এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন ঠিক করে চারুচন্দ্র তার ভারতবর্ষীয় পিতামাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করায় ঘটনা ধারা সুগঠিত ভাবে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়েছিল। কিন্তু ১৮ই জুন ওয়াটার্লু যুদ্ধজয়ের বার্ষিক উৎসবের দিনে পিতার আশীর্বাদপত্রের পরিবর্তে বৃদ্ধ পিতা ভারতবর্ষ থেকে এসে হাজির হলেন। মডের পিতার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন,—

"আমায় ক্ষমা করুন। আমার ঐ একমাত্র পুত্র। আমাদের বুড়াবুড়ির ঐ একমাত্র অবলম্বন। দেশে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উহাকে জাতিতে তুলিয়া লইব। সেইখানে হিন্দুমতে উহার বিবাহ দিব। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে জন্মের মত উহার জাতিচ্যুতি ঘটিবে—বংশাবলীক্রমে আর কখনও সমাজে উঠিবার আশা থাকিবে না। ছেলেকে আমি ঘরে রাখিতে পারিব না। মরিবার সময় আমাদের মুখে জলগণ্ডূষ দিবার অধিকার থাকিবে না। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে আমার স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করিবে—আমি দুঃখে পাগল হইয়া যাইব।"

মিস্ ক্যাম্বেল কথিত গার্হস্থ্য নাটকের প্লট থেকে বুঝতে কষ্ট হয়না যে, তিনিই মূলকাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। পিতার সঙ্গে চারুচন্দ্র স্বদেশে ফিরে গেল—পিছনে পড়ে রইল তার বাগ্‌দত্তা বধূ। মড্ ওরফে মিস্ ক্যাম্বেল চারুর দেওয়া প্রণয় উপহার দুইজোড়া সোনার চুড়ি পরে এবং শোওয়ার ঘরে তার প্রণয়ীর একটি তৈলচিত্র টাঙিয়ে ইহজগতের পরপারে চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা জীবনধারণ করে। এসব কথা বলতে বলতে মিস্ ক্যাম্বেল মূর্চ্ছা গেলে পর একটু সুস্থ করে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্পকথক শরৎ মিত্র দেখলেন তাঁর বাবার যুবা বয়সের তৈলচিত্র টাঙানো—তখন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রভাতকুমার এভাবে কাহিনীবয়নে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

বস্তুত কাহিনী বয়নে, চরিত্রচিত্রণে আলোচ্য 'মাতৃহীন' গল্পে লেখকের গঠনশৈলী চূড়ান্ত শিল্প সাফল্য লাভ করেছে। বিলাত এবং ভারতবর্ষকে একেবারে কাছাকাছি এনে দিয়ে গল্পকার শিল্প সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন। 'মাতৃহীন' গল্পে গল্পকথক শরৎ মিত্রের মনের

ভাব, হৃদয়ের উষ্ণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু এ ধরনের রচনা আত্মজীবনীমূলক তাই লেখককে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে নিজের অবস্থান পাকা করে নিতে হয়। হাস্যরসের মোড়কে গল্পকথক নিজেই পরিচিতিকে রূপ দিয়েছেন। মূল গল্পের বিষয় খুবই সিরিয়াস। তাছাড়া মড্ এর জবানীতে মিস্ ক্যাম্বেল যে ত্যাগ, তিতিক্ষার কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা সত্যই অভিনব। এক বিদেশী নারী যেভাবে প্রেমের সাধনায় ত্যাগের জীবনাদর্শে ভারতীয় স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল তার মূল্য অসামান্য। জড়বাদের উপর ভিত্তি করে যে ইংল্যান্ড এগিয়ে চলেছে—দেববাদ, পরলোক যেখানে উপেক্ষিত, সেখানকার সন্তান মিস্ ক্যাম্বেল কিভাবে স্বামী নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে।

পেশায় চিত্রকর মিস ক্যাম্বেল ফরমাসি ছবি আঁকার উপাদান খুঁজতে খুঁজতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে শরৎ মিত্রকে দেখে হঠাৎ তাঁর বাঞ্ছিত প্রেমিকের যুবা বয়সের মূর্তি ভেসে ওঠে। শরৎ মিত্রের দেহসৌষ্ঠবে তাঁর শোওয়ার ঘরে টাঙানো প্রেমিকের যুবা বয়সের মিল তাঁকে আপ্লুত করে। কিন্তু গল্পকার সুকৌশলে ঘটনাধারা সাজিয়েছেন। নিয়ম ভেঙে মিস্ ক্যাম্বেল ভিয়েনা রেস্তোরাঁয় এলেন, আসলে তিনি যুবক শরৎ মিত্রের পরিচয় জানতে চান, রাজার শিকারের পোষাক কেমন হবে তা জানতে কৌতূহলী হয়ে তিনি যেন আলাপ করছেন এমন একটা ভাব দেখিয়ে গল্পবক্তার বাড়ি এমনকি পিতার নাম পর্যন্ত জেনে নিলেন। তবে তাঁর বাঞ্ছিত প্রেমিক যে পরলোকগত হয়েছেন সে খবর মিস্ ক্যাম্বেল রেখেছেন, হাতের চুড়ি খুলে ফেলে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হয়েছেন। এমনতর প্রেক্ষিতে প্রৌঢ়া ক্যাম্বেলের মানসিক অবস্থা দক্ষতার সঙ্গে গল্পকার চিত্রিত করেছেন। বাস্তব ভূমিতে যেন মিস্ ক্যাম্বেলকে আমরা দেখলাম। বাঞ্ছিতের সঙ্গে এই যোগিনীর মিলন হবে পরলোকে। কবির ভাষায়,—

"এ জীবনে মিটিল না সাধ ভালবাসি।"

পরজন্মে প্রিয়তমকে কাছে পাওয়ার ভারতীয় বিশ্বাস বিদেশিনীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। নতুবা পরলোকগত ব্যারিষ্টার মিষ্টার মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরলোকে দেখা হবে এই ভাবনায় থাকা নারীর সামনে বাঞ্ছিতের প্রাণপ্রিয় পুত্র হাজির—এ যেন দৈবকৃপা। ভাবনার ঘোর থেকে তিনি হঠাৎ বাস্তবে নেমে এসে নিজেই বিপর্যস্ত। তাই রেস্তোরাঁয় ভিড়ের অজুহাত দেখিয়ে তিনি সরে গেছেন, তবে নিমন্ত্রণের কার্ডটি কিন্তু করে গেছেন।

এরপর মড্ ও চারুচন্দ্র দত্তের প্রেমের কাহিনী শুনিয়ে পরিকল্পিতভাবে নিজ জীবনরহস্য ব্যক্ত করে নিজ প্রেমিকের ঔরসজাত পুত্রের সঙ্গে নিজেকেও মাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধেছেন মিস্ ক্যাম্বেল। গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে বিদেশিনীর মাতৃসত্তার বাৎসল্য রস ক্রমশ গাঢ় হয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি' হয়েছে এবং জুতা খুলতে দ্বিধাগ্রস্ত শরৎকে স্নেহময়ী মায়ের মত ক্যাম্বেল বলেছেন,—

"তোমার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহার সম্মুখে তুমি জুতা খুলিতে না? আমাকে তোমার মা মনে কর না কেন?"—

এতে যেমন মায়ের ছবি ফুটে উঠেছে, তেমনি গল্পবক্তা শরৎ মিত্রও তাঁর মাতৃহারা জীবনে ভারত থেকে দূরে বিদেশে মাতৃবাৎসল্য নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন।

এভাবে গল্পবক্তা মডকে চিনলেও তরুণ ব্যারিষ্টারকে চিনলেন, মিস্ ক্যাম্বেলের শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে তাঁর বাবার যুবা বয়সের তৈলচিত্র দেখে। পরের ঘটনা ক্যামেরায় পর পর ঘটে গিয়ে ফ্রেমবন্দী হয়েছে। শরৎ মিত্রের বিয়েতে বাবার বিদেশিনী মা'কে দেওয়া সোনার দুই জোড়া চুড়ি উপহার হিসেবে আসা এবং খোকার জন্মের পর তিনজনকে একত্রে দেখার বাসনা মাতৃবাৎসল্য পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে প্রবাহিত হয়েছে। গল্পকে এভাবে সাজানো প্রভাতকুমারের গঠনকুশলী মনের পারিচায়ক।

'মাতৃহীন' চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প। এতে অনেকগুলি চরিত্র থাকলেও দুই চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। সে দুটি হল মিস্ ক্যাম্বেল এবং গল্পকথক শরৎ মিত্র। মাত্র দুটি চরিত্রকে সামনে এনে উত্তম পুরুষে গল্প লিখে প্রেমের শান্ত অথচ সুগভীব ছবি নির্মাণ করেছেন প্রভাতকুমার।

তবে গল্পবক্তা শরৎ মিত্র যে স্বয়ং প্রভাতকুমার এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। বিলাত গিয়েছিলেন আই.সি.এস হবেন বলে কিন্তু মত পবিবর্তন করে প্রভাতকুমার হলেন ব্যারিষ্টার। আব ব্যারিষ্টার হিসেবে তাঁর সাফল্য না এলেও তিনি সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে সফল। অন্যদিকে শরৎ মিত্রও সাহিত্যস্রষ্টা হতে চেযেছিলেন। তাছাড়া গল্প বক্তাব মধ্য দিয়ে লেখকের ক্ষোভের বাঙ্ময় প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। মিস্ ক্যাম্বেলের কাছ থেকে মড্ ও চারুদত্তের প্রণয় কাহিনী শুনতে শুনতে 'মড্' যে স্বযং মিস্ ক্যাম্বেল এই ধাবণা শবৎ মিত্রের বদ্ধমূল হয়েছে। 'গার্হস্থ্য নাটকেব প্লট' আসলে মিস্ ক্যাম্বেলের বলা এবং শরতের শোনাব গুণে বাস্তব জীবনের হৃদয়ভেদী প্রণয়কাহিনী হয়ে উঠেছে। আর গল্পের প্রয়োজনে প্রথম থেকেই এই কাহিনী রহস্যে আবৃত ছিল। উত্তম পুরুষে বলা এই গল্পেব মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পরলোকগত ব্যারিষ্টাব পিতার অস্তিত্ব দেখে শরৎ মিত্রও আবেগ বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। তাই প্রভাতকুমাব মড্ ও চারুর উপাখ্যানকে উত্তম পুরুষে না বলে প্রথম পুরুষে উত্থাপিত করেছেন বলে পুত্রতুল্য শরতের কাছে মিস্ ক্যাম্বেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও উজ্জ্বল হয়েছে। এছাডা অন্য কোনভাবে বললে গল্পেব গুরুত্ব এবং চরিত্রের মাধুর্য বজায় থাকত না। মড্ এর কাহিনী যতই এগিয়েছে ততই মিস্ ক্যাম্বেলের ছদ্ম আবরণ খসে পড়েছে। তাই শরৎ মিত্রেব মনে হয়েছে,—

"আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া আসিতে ছিল—এই মড্ মিস্ ক্যাম্বেল ছাড়া আর কেহই নহে।"

এভাবে বিচার করলে শেষ পর্যন্ত নিজের পিতার তৈলচিত্র দেখে শরৎ মিত্র মিস্ ক্যাম্বেলকে তাঁর মায়ের আসনে বসিয়েছেন,—"উক্ত ঘটনার পর একটি বৎসর আমি বিলাতে ছিলাম। মিস্ ক্যাম্বেলের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতাম। তিনি আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবার সময় মাতৃ সম্বোধন করিয়া লিখিতাম।"

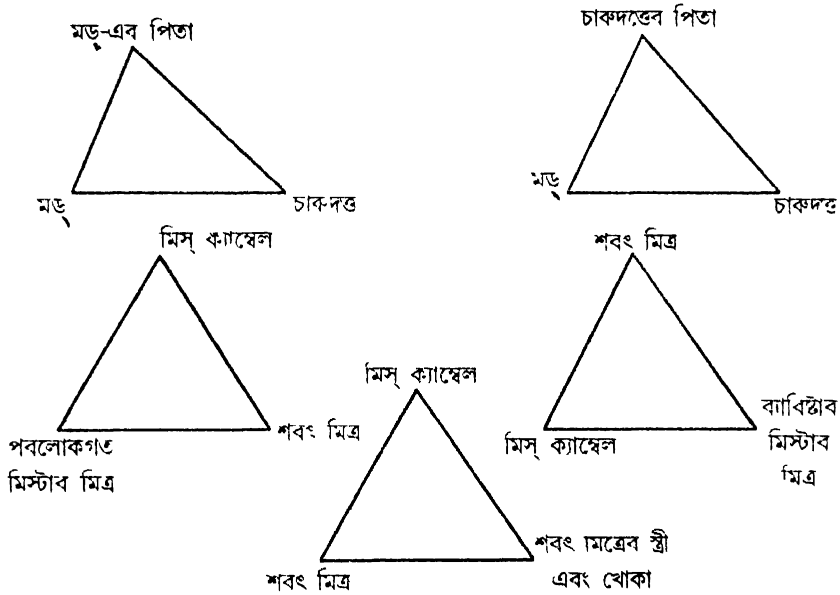
ব্যারিষ্টার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে শরৎ মিত্র পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বিদেশিনী মাকে কাছে রেখে সেবা পরিচর্যা করতে চেয়েছেন,—'বলিলাম—আপনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন। এখন সর্বদা আপনার সেবা যত্নের আবশ্যক। আমার গৃহে আসিয়া, মাতৃগৌরবে আমার সেবা গ্রহণ করুন।"

মিস্ ক্যাম্বেল তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে আর কোথাও যেতে রাজী না হলেও শরৎ মিত্রকে

নিজ পুত্রবৎ দেখেছেন। যখন পুত্র পুত্রবধূ ও নাতিকে একযোগে দেখার সুযোগ হল তখন তিনি মৃতা। গল্প কথক ফিরে আসা চিঠি দেখে উচ্চারণ করলেন,—"আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম।"

অন্যদিকে মিস্ ক্যাম্বেল অভারতীয়া হয়েও মডের ছদ্মবেশে যেভাবে ভারতীয় রীতি-নীতি, সংস্কার—আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা তাতে প্রভাতকুমারের পরিকল্পিত মনের ছবি সুস্পষ্ট। তাছাড়া অতি সহজে চারু তার রক্তের সম্পর্কযুক্ত পিতা-মাতাকে ছেড়ে বিদেশিনী মডকে বিয়ে করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়ায় মডের চিত্তে সংশয় দেখা দিয়েছে। তার মনে হয়েছে চারুচন্দ্রের এটা তাৎক্ষণিক মোহ। আর এই মোহ একদিন কেটে যাবে এবং সেদিন অপ্রাপ্তির তীব্র দহনে সব প্রাপ্তিই তিক্ত-কটু হয়ে উঠবে। বৃন্ত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া গোলাপ পাপড়ি ঝরিয়ে একদিনেই শুকিয়ে যাবে। জীবনকে এভাবে পথে ভাসিয়ে না দিয়ে মিস্ ক্যাম্বেলের ছদ্মবেশে মড় অপেক্ষা করেছে। তার বিশ্বাস বাঞ্ছিতকে ইহলোকে না হলেও পরলোকে পাবে।

মিস ক্যাম্বেল এবং গল্পবক্তা শরৎ মিত্রের চারিত্রিক উত্তরণ চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে,—



উত্তম পুরুষে লেখা আলোচ্য 'মাতৃহীন' গল্পে লেখকের অভিনবত্ব প্রশংসনীয়। ছোট ছোট কাটাকাটা বাক্য ব্যবহার করে গল্পকার একে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছেন। প্রভাতকুমার গল্পের চরিত্র, ঘটনা, গঠন কৌশল সবকিছুতেই নির্ভার গদ্যভাষার সৃষ্টি করেছেন। যখন তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের গল্পের সংলাপ অতিকথন দোষে দুষ্ট তখন চরিত্রের বিস্তৃত বর্ণনা না দিয়ে কেবলমাত্র ছোট নির্বিকার অথচ তীব্র সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন কত সহজে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মিস্ ক্যাম্বেল ও শরৎ মিত্রের কথোপকথন,—

"বেশ ত। কাল কখন আসিব বলুন?"

"কাল পাঠাগারে আসিবে কি?"

"আসিব।"

"তবে নাটকখানি সঙ্গে আনিও।"

শুধু তাই নয়, ইংরেজী ও বাংলা মিশিয়ে সংলাপ ব্যবহারে দক্ষ প্রভাতকুমার লিখেছেন, মিস্ ক্যাম্বেলের বাড়ী যাত্রাকালে শরৎ মিত্র বলেছেন, —"Rain before seven, clear before eleven." আবার শরৎকে দেখে ক্যাম্বেল বললেন,—

"How very sweet of you to come in this weather !"

বাক্য প্রয়োগে মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও প্রস্ফুটিত। তাছাড়া সাধুভাষা রীতির প্রয়োগ গল্পকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। আলংকারিক শব্দ প্রয়োগও স্থানে স্থানে গল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

নাটকীয়তা সৃষ্টিতেও 'মাতৃহীন' গল্পে প্রভাতকুমার কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। মিস্ ক্যাম্বেল মড্ ও চারুচন্দ্রের প্রেম কাহিনীকে যতটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন ততটাই তাঁর ছদ্ম আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে। মূল কাহিনীর মধ্যে অপর একটি কাহিনী এনে পরিণতিতে আসল ঘটনার অবতারণা নাট্যকুশলতাব পরিচায়ক। মড্ ও চারুচন্দ্রের প্রণয় কাহিনীর মাধ্যমে মিস্ ক্যাম্বেল ও ভারতীয় তরুণ ব্যারিষ্টারের কাহিনী উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সমাপ্তি যে গল্প কথকই ছদ্ম চারুচন্দ্র এবং তরুণ ব্যারিষ্টারের পুত্র তা প্রমাণিত হওয়ায় গল্পেও নাটকীয়তা এসেছে।

গল্পকার প্রভাতকুমার রচিত সবধরনেব গল্পের পরিণাম রমণীয়। 'মাতৃহীন'ও সেই ধারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'গার্হস্থ্য নাটকের প্লট' বলবেন বলে মড্ ও চারুদত্তের উপাখ্যান এনেছেন মিস্ ক্যাম্বেল। ঘটনা এমন ভাবে সুপরিকল্পিত যে প্রৌঢ়া মিস্ ক্যাম্বেলই যে যুবতী মডেব পরিণতি তা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে প্রতিভাত। যুবতী ক্যাম্বেলের মনের গুঞ্জনকে ভাষায় রূপায়িত করেছেন প্রৌঢ়া ক্যাম্বেল। নিজ পিতা মাতাকে ত্যাগ করে বিদেশিনীকে আঁকড়ে থাকার যে সিদ্ধান্ত চারুদত্ত নিয়েছে তাতে মড্ ওরফে ক্যাম্বেল দ্বিধান্বিতা। পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টিকে মড্ চারুচন্দ্রের তাৎক্ষণিক মোহ বলে ধরে নিয়েছে। যখন এই মোহ কেটে যাবে তখন সবটাই বিস্বাদ হয়ে উঠবে। আর সেদিন জীবনে আসবে ভয়ঙ্কর দুঃসময়। পরিবর্তে ভালোবাসার মর্যাদাস্বরূপ প্রণয়াস্পদের তৈলচিত্র শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে ক্যাম্বেল জানিয়েছেন অন্তরের পূজা। আর ভারতীয় জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীর ন্যায় তিনি অপেক্ষা করেছেন, যে তাঁর বাঞ্ছিতকে পরজন্মে কাছে পাবেন। মড্ ও চারুর মাধ্যমে মিস্ ক্যাম্বেলের শোক কাহিনী শরৎ মিত্র উপলব্ধি করেছেন এবং মিস্ ক্যাম্বেলকে চোখের জলে ভাসতে দেখে নিজেও ভেসেছেন। ভারতীয় বাঙালী লেখক প্রভাতকুমার মিস্ ক্যাম্বেলকে পরলোকে বিশ্বাসিনী করিয়ে প্রেমের চিরন্তন মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গল্পের শেষ দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে, মাতৃসিংহাসনে মিস্ ক্যাম্বেলকে শরৎ মিত্র বসিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে ক্যাম্বেলও গল্পকথককে তাঁর বাঞ্ছিতের ঔরসজাত পুত্র বলে চিহ্নিত করে স্নেহ-বিগলিতা হয়েছেন। স্থাপিত হয়েছে মাতা-পুত্রের মধুর সম্পর্ক।

বিয়ের পর শরৎ মিত্রের স্ত্রী পেয়েছেন ক্যাম্বেলের কাছ থেকে পুত্রবধূর মর্যাদা। প্রণয়ী ব্যারিষ্টার মিত্রের দেওয়া সোনার চুড়ি দুই জোড়া ক্যাম্বেল পুত্রবধূর কাছে পাঠিয়েছেন স্নেহের উপহার হিসেবে। সেগুলো গল্পকথকের স্ত্রী সর্বদা পরে থাকেন। খোকা জন্মালে তিনজনকে একবার একসঙ্গে প্রৌঢ়া দেখতে চেয়েছেন। এদিকে শরৎমিত্রের যখন পূজার ছুটিতে সকলকে নিয়ে বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা, তখন—

"পত্রখানি দেড়মাস পরে ফিরিয়া আসিল। খামের উপর লণ্ডনের পোষ্ট আফিস রবার স্ট্যাম্পের ছাপ মারিয়া দিয়াছে—মালিক মৃত, পত্র বিলি হইল না।"

তখন গল্পকথকের আন্তরিক অভিব্যক্তি,—

'আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম।" —এই অসাধারণ উপসংহার সচরাচর গল্পে দেখা যায় না।

গল্পবক্তা হৃদয়ে অনুভব করেছেন মাতৃহীন হওয়ার শোক। গল্পকে বিলেত থেকে ভারতে এতদূর টেনে আনার প্রয়োজন ছিল। বক্তার মাতৃহীন হওয়াটাই গল্পের শেষ কথা এবং লেখকের মূল লক্ষ্য। তাই গল্পনাম 'মাতৃহীন' যথার্থ।

বলবান জামাতা : স্নিগ্ধ কৌতুকের ছোঁয়ায়

নন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাতকুমারের গল্পগুলি অধিকাংশই ঘটনাপ্রধান, ঘটনার যথাযথ বিকাশের জন্যই চরিত্রের অবতারণা। 'বলবান জামাতা' গল্পটিতে একটি নিটোল কাহিনী আছে। ঘটনাপ্রধান এই গল্পে নায়ক নলিনীর দুই বৎসর পর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাত্রার আয়োজন, ছুটি পাওয়া, শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, এলাহাবাদে পৌঁছে গাড়োয়ান নলিনীর শ্বশুরের নাম ভুল করায় অন্য বাড়িতে জামাতারূপে তার পদার্পণ, প্রথমে জামাতা-আদর, পরে ডাকাত সন্দেহে হুলস্থূল কাণ্ড, ভুল বুঝতে পেরে নলিনীর মহেন্দ্র ঘোষের কাছে ক্ষমা চাওয়া, অতঃপর নিজ শ্বশুরালয়ে পৌঁছে চেহারার পরিবর্তনের কারণে ডাকাত সন্দেহে শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়ন পরে সে-ই যে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল জামাতা বুঝতে পেরে মহেন্দ্রবাবুর নলিনীকে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনা—এতগুলি ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে একটি আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত নিটোল কাহিনী লেখক গড়ে তুলেছেন। বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ থাকলেও কাহিনীর বিন্যাস একমুখী। নলিনীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা এবং নানা বিভ্রাট বিড়ম্বনার পরে সেখানে পৌঁছানো—এটাই কাহিনীর মূল বিষয়। কিন্তু মূল বিষয়টিকে রসোপভোগ্য করে তুলেছে নলিনীর চেহারার অসঙ্গতি। গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভাতকুমার 'ফ্ল্যাশব্যাক' পদ্ধতির সাহায্যে পূর্বকথা উল্লেখ করেছেন। দুই বৎসর পূর্বে বিবাহের সময় নলিনীর চেহারা ছিল 'গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের', 'গাল দুইটি টেবো-টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠ দেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন'। এরূপ চেহারার জন্য বিবাহবাসরে নলিনীর মেজ শ্যালিকা কুঞ্জবালা তার দেহটির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করেন। সুন্দরীমুখ নিঃসৃত এই শ্লেষবাক্য নলিনী বিস্মৃত হতে পারেনি। তাই দুই বৎসর ধরে রীতিমত ব্যায়াম করে, পূর্বের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে, দাড়িকামানো বন্ধ করে সে চেহারাটিকে পুরুষোচিত করে তোলে। "এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে।" গল্পের মূল ঘটনা অর্থাৎ নলিনীর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, তার কারণ নিহিত ছিল এই ঘটনার মধ্যে; অর্থাৎ স্ত্রী সরোজিনীর পতিসেবায় অধীর চিঠির তুলনায় 'দিনাজপুরের মেজদি' কুঞ্জবালাকে নিজের পুরুষোচিত চেহারাটা দেখানোর আগ্রহ নলিনীর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কুঞ্জবালা এলাহাবাদে এসেছেন, "সেইজন্যই বিশেষত এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ।"

সূচনার আকস্মিকতা ও সমাপ্তির চমকপ্রদ ব্যঞ্জনা, যা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য — তা 'বলবান জামাতা' গল্পে দেখা যায় না। 'শেষ হয়েও হইলনা শেষ'—এ জাতীয় অতৃপ্তি পাঠকের চিত্তে জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে কাহিনীতে যেটুকু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার সমাধানও লেখক গল্পের সমাপ্তিতে করে দিয়েছেন। মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নলিনীর বর্তমান চেহারার সঙ্গে পরিচিত না থাকায় তাকে চিনতে পারেননি, পরে ভুল বুঝতে পেরে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। নলিনীও এই ঘটনা নিয়ে শ্যালক-শ্যালিকাকে কোনরূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেনি। ফলে কাহিনী পরিণাম-রমণীয়তা লাভ করেছে।

প্রভাতকুমারের মতে, ঘটনাপ্রধান গল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নেই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিতভাবে, ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। 'বলবান জামাতা' গল্পের প্রধান চরিত্র আলিপুরের পোষ্টমাস্টার নলিনী। ঘটনাসংস্থানের প্রতিই লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় চরিত্রের ব্যক্তিপরিচয় সেখানে মুখ্য নয়, তবুও কাহিনীর মধ্যে থেকে নলিনী চরিত্রটির কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। নলিনী অপরের কথায় সহজেই প্রভাবিত; চেহারার কোমলতা তার পৌরুষকেও যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আবার এক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় চেহারার বিপুল পরিবর্তন তার অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। একইসঙ্গে নলিনীর মধ্যে সৌজন্যতাবোধের অভাব নেই। বড় উকিল মহেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কিংবা শ্বশুরবাড়িতে অপমানিত হওয়ার পরেও এই বিষয়ে নীরব থাকা তার সৌজন্যতাবোধকেই পরিস্ফুট করে।

গল্পে সমাজবাস্তবতাকে প্রভাতকুমার গুরুত্ব দিয়েছেন। আলোচ্য গল্পে বাঙালীর সামাজিক-পারিবারিক জীবনের পরিচয় রয়েছে। গল্পের সূচনায় পতিসেবায় অধীর সরোজিনীর (নলিনীর স্ত্রী) পত্রে বাঙালীর দাম্পত্যজীবনের ইঙ্গিত আছে। এলাহাবাদে বড় উকিল মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে নলিনীর জামাই আদরের মধ্যে থেকে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, বাড়ীতে অতিথি এলে (সে জামাতা হলেও) বাড়ির মহিলাদের প্রথমেই তার সম্মুখে বার না হওয়া, পরিচারক-পরিচারিকা দ্বারা তার অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন, সোনার গহনা দিয়ে সন্তানের প্রথম মুখ দেখা, দাস-দাসীদের বক্‌শিস দেওয়া, সরবত বলে লবণাক্ত জল পান করিয়ে 'জামাই ঠাট্টা' ইত্যাদি। নলিনীর বিবাহ-বাসরে জামাইকে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা জামাই-ঠাট্টারই অংশ।

কুঞ্জবালা (নলিনীর মেজ শ্যালিকা) তৎকালীন যুগের বিদুষী মহিলা, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা। মাসিক পত্রে তিনি ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতা লিখতেন। প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্পে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে, যেমন 'উকিলের বুদ্ধি', 'হাতে হাতে ফল', 'খালাস' ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য গল্পটিতেও সে প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। আবার তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ে বিলাসিতার প্রতি ব্যঙ্গ রয়েছে কুঞ্জবালার কথায়।

নলিনী যাত্রার আগে শ্বশুরবাড়িতে 'চারি আনা মূল্যের' টেলিগ্রাম করেছিল। গল্পকার পাদটীকায় জানিয়েছেন, "দিনকতক এইরূপ টেলিগ্রাম প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু এগুলি ছিল চিঠির অধম।" সেই টেলিগ্রাম যথাসময়ে পৌঁছয়নি। ডাকবিভাগের এই গোলযোগ কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধিতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি ডাকবিভাগের অনুন্নত ব্যবস্থাকেও তুলে ধরেছে।

'বলবান জামাতা' নামকবণের মধ্যেই গল্পের বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে। শ্যালিকা এবং সুন্দরী মুখনিঃসৃত শ্লেষের জবাব দিতেই নলিনী 'বলবান' হয়ে উঠেছিল। চেহারাকে আরও পুরুষোচিত করার জন্য শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় তদনুরূপ সাজসজ্জাও করেছিল। বিবাহের সময়কার নধর বাবু বাবু চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াতেই শ্বশুরের দ্বারা নলিনী লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়েছে। বলবান চেহারাই জামাতাকে বিপদে ফেলেছে। ফলে গল্পের নামকরণও সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মূলত সংযমস্নিগ্ধ রুচিকর রঙ্গকৌতুকের গল্পলেখক। সহজ ঘরোয়া সাংসারিক জীবনের সুপরিকল্পিত সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তীব্র আক্রমণের বদলে পরিস্থিতিজাত স্নিগ্ধ কৌতুক তাঁর গল্পকে রমণীয় করে তুলেছে। সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতিও ব্যক্তি স্বভাবকে কৌতুককটাক্ষ করাই প্রভাতকুমারের লক্ষ্য। কাহিনীতে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে তিনি তার সমাধান করেছেন চরিত্রের সংযম, ক্ষমাশীলতা বা প্রতিবাদী মনোভাবে সাময়িকতা দেখিয়ে বা প্লটের চাতুর্যের সাহায্যে।

'বলবান জামাতা' গল্পে নলিনী শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যে বিভ্রাটে পড়েছে তার মূলে রয়েছে তার চেহারার অসংগতি। বিবাহকালের চেহারা এবং বিবাহের দুই বৎসর পর ব্যায়াম ইত্যাদির দ্বারা গড়ে তোলা পুরুষোচিত চেহারা—উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য এবং নলিনীর সাজসজ্জার অসঙ্গতি তাকে বিপাকে ফেলেছে। অর্থাৎ গল্পে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে নিয়মভঙ্গ জনিত অসঙ্গতি। তাই মহেন্দ্রনাথ নলিনীকে চিনতে পারেননি এবং হাতে বন্দুক থাকায় ডাকাত ভেবে বিতাড়িত করেছেন। ফলে গল্পে কৌতুকরস সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের এই হাস্যরসকে আমরা Fun বলতে পারি। নলিনী প্রথমে ভুল করে অন্যের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে যে বিড়ম্বনায় পড়েছিল, সেখানেও রয়েছে একটি ভ্রম। এলাহাবাদ শহরে মহেন্দ্রনাথ নামে দুজন উকিল ছিলেন—একজন বন্দ্যোপাধ্যায় (নলিনী এঁরই জামাই), অন্যজন ঘোষ। মহেন্দ্র উকিলের বাড়ি বললে গাড়োয়ান নলিনীকে মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে নিয়ে গেছে। নলিনী সে বাড়ির জামাই নয়, সেকথা জানার পর বাড়ির মহিলাদের ভীতি, ভৃত্য রামশরণের উকিলদের পাশাখেলার আসরে গিয়ে গৃহকর্তাকে সংবাদ দেওয়ার ঘটনা কৌতুককর হয়ে উঠেছে। এখানে যে পরিস্থিতিগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান ঘটেছে নলিনীর গৃহকর্তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনায়। ফলে এখানেও মৃদু স্নিগ্ধ কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে।

গল্পের শেষ পংক্তির তির্যক ভাষণে সামান্য শ্লেষ রয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে নলিনী তার লাঞ্ছনার জন্য কাউকে কোনরকম বিদ্রূপ করেনি। একদিন কেবল মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, "যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়িতে পায় না।" তবে এই শ্লেষে ব্যঙ্গের তীব্রতা নেই।

গল্পের ভাষাকে অত্যন্ত সুনির্বাচিত করে ব্যবহার করেছেন গল্পকার। শব্দের ওপর চমক বা অমার্জিত প্রয়োগ দেখা যায় না, অথচ গল্পের ভাষার মধ্যে হাস্যরসের প্রবাহ সহজেই অনুভব করা যায়। 'বলবান জামাতা' গল্পের মহেন্দ্রনাথ ঘোষের ভৃত্য রামশরণের হিন্দী-বাংলা মেশানো সংলাপ, কিংবা মহেন্দ্র ঘোষের বাড়িতে মহিলাদের ভীত চীৎকার কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠেছে : "অ্যাঁ—ওমা কি সর্বনাশ হল গো! ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি! যা শিগগির বাবুকে খবর দে।"—এই সংলাপ একইসঙ্গে বাঙালী পরিবারের মেয়েদের কথাবার্তার ভঙ্গিটিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছে।

স্বতস্ফূর্ত হাস্যরসের এই গল্পে উচ্চহাস্য নেই, কিন্তু গল্প শেষ হবার পর ঘটনাগুলি ভাবলেও মজা লাগে, এক নিরবচ্ছিন্ন ভালো লাগার অনুভূতি মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে তাঁর গল্প সম্পর্কে বলেছিলেন, "তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে

হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই! ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন। তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম-পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না।" অন্যান্য গল্পের মতই 'বলবান জামাতা' গল্পেও নিতান্তই সহজ সুরে ও সহজ ভাষায় মানবজীবন কাহিনী এঁকেছেন প্রভাতকুমার; হালকা হাসির হাওয়ায় সব জটিলতাব সহজ সমাধান কবে দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকাব ভূদেব চৌধুবী।
২ বাংলা গল্পবিচিত্রা নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৩ প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়েব শ্রেষ্ঠ গল্প (ভূমিকা জগদীশ ভট্টাচার্য)
৪ কালেব পুত্তলিকা অরুণকুমাব মুখোপাধ্যায়।
৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েব ছোটগল্প বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য।

আদরিণী : অহং ও আদরের গল্প

সুজাতা কোলে

জ্যোতিরীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে তাঁর যে গল্পগ্রন্থটি হাতে পাওয়ার জন্য চিঠিতে ধন্যবাদ জানান, সেই 'গল্পাঞ্জলি' গ্রন্থেরই একটি অন্যতম ছোটগল্প হল ''আদরিণী''। ''গল্পাঞ্জলি'' গল্পগ্রন্থে মোট ছ'টি গল্প আছে—১। বাল্যবন্ধু, ২। বিলাত ফেরতের বিপদ, ৩। মাদুলী, ৪। রসময়ীর রসিকতা, ৫। মাতৃহীন এবং ৬। আদরিণী। ''আদরিণী'' গল্পের প্রথম প্রকাশ ঘটে 'সাহিত্য' পত্রিকায়—ভাদ্র, ১৩২০। পরে সেটি ''গল্পাঞ্জলি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সাধারণভাবে আমরা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে হাল্কা ধরনের গল্পলেখক হিসাবে জানি। সমালোচক বলেছেন ''প্রভাতকুমার মুখ্যত জীবনের লঘু অংশের শিল্পী। তাঁর প্রধানাংশ রচনাই রঙ্গমূলক। মানুষের ভুলভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা আর অহমিকাকে অসঙ্গত পরিবেশের মধ্যে ফেলে উচ্চ-হাসি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।'' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে এক পত্রে জানান ''তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।'' এসমস্ত উক্তি প্রভাতকুমারের গল্পের লঘুতার দিকটিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু প্রভাতকুমার কিছু সিরিয়াসধর্মী রচনাও সৃষ্টি করেছেন। ''আদরিণী'' এমনই একটি সিরিয়াসধর্মী গল্প।

বাংলা সাহিত্যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের নিয়ে যে কয়টি গল্প রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'আদরিণী' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য একটি নাম, কিন্তু গল্পটি শুধুমাত্র একটি গৃহপালিত প্রাণীরই গল্প হয়ে থাকে নি, হয়ে উঠেছে একক ব্যক্তি মানসের অহং-এর প্রকাশ।

''আদরিণী'' গল্পটি প্রভাতকুমারের সম্পূর্ণ সত্য অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। ''গল্পাঞ্জলি'' (১ম সংস্করণ) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন—'আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে ক্কচিৎ কখনও বাস্তব জীবনের দুই একটি ঘটনা থাকে বটে। কেবল ''আদরিণী'' গল্পটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। উহার প্রায় চৌদ্দ আনা সত্য। গল্পে এত সত্য ঘটনা আব কখনও লিপিবদ্ধ করি নাই।''

''আদরিণী'' গল্পটিতে আছে এক প্রতিষ্ঠিত মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কথা। গল্পটির মুখ্য চরিত্র তিনিই। পীরগঞ্জের রাজবাড়ির মেজবাবুর কন্যার বিবাহ। সেই বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষ্যে পাড়ার নগেন ডাক্তার ও কুঞ্জবিহারী উকিল জয়রামবাবুর কাছে আসেন। উদ্দেশ্য, বিবাহ-বাসরে যাওয়ার জন্য হাতীর ব্যবস্থা করে নেওয়া। জয়রামবাবু পীরগঞ্জে চিঠি লিখলেন হাতী পাঠানোর জন্য। কিন্তু হাতী পাওয়া গেল না। তখন জয়রামবাবু নিজেই একটি বাচ্চা মাদী হাতী কিনে বসলেন। সেই হাতীরই নাম আদরিণী, সংক্ষেপে আদর। এই আদরিণীর পিঠে চড়েই সেদিন জয়রামবাবু বাবুদের বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ক্রমে আদরিণী জয়রামবাবুর পরিবারেরই এক সদস্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে মুখুজ্যে মশাই-এর পসার কমতে থাকে। তখন আদরিণীর ব্যয়ভার বহন করা তাবপক্ষে আর সম্ভব

হয়ে ওঠে না। আদরিণীকে ভাড়া দিয়ে সেই ব্যয়ভার লাঘবের চেষ্টা করা হলেও শেষ রক্ষা হয় না। তাকে বিক্রী করার জন্য বামুনহাটের মেলায় এবং শেষে রসুলগঞ্জের মেলায় পাঠানো হয়। পথিমধ্যে আদর পীড়িত হয়ে পড়ে। জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে খবর আসে। তিনি গন্তব্য স্থলে গিয়ে দেখেন আদর মারা গেছে। আদরের মৃত্যুর পর জয়রামবাবু মাত্র দু'মাস জীবিত ছিলেন।

আপাতভাবে গল্পটির দিকে তাকালে এটিকে একটি পশুপ্রীতির গল্প বলে মনে হয়। মানুষ ও পশুর অনড় বন্ধনকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জেদের বশে কেনা হাতীটি অবশেষে বাড়িরই এক সদস্য হয়ে উঠেছে। আদরিণী জয়রামবাবুর বাটীতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাচ্চারা তাকে আপন করে নেয়। তাই পাড়ার অশিষ্ট বালকেরা যখন সুর করে বলে —"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি" তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং অপমান করে সেই অশিষ্ট বালকদের বাড়ির বাইরে করে দেয়। শুধু বাড়ির বাচ্চারাই নয়, জয়রামবাবুর কাছেও আদরিণী শুধুমাত্র একটি হাতী থাকে না। জয়রামবাবুকে তার পড়ন্ত অবস্থায় পাড়ার লোকেরা আদরকে বিক্রী করে দেবার কথা বললে তিনি বলেন—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদেব খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রি করে ফেল।" আদরকে বামুনহাটের মেলায় পাঠানোব আগে তিনি স্বহস্তে তাকে 'মুঠা মুঠা করিয়া' রসগোল্লা খাওয়ান এবং আদরকে, বিদায়বাণী উচ্চারণ করতে না পেরে বলেন— "আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।" আদর বামুনহাটের মেলা থেকে বিক্রী না হয়ে ফিরে এলেও বাড়িব কারো মনে কোন ক্ষেদ থাকে না। বরং তার ফিবে আসার জন্য বাড়িতে আনন্দ কোলাহল পড়ে যায়। আবার আদর যখন রসুলগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন মুখুজ্যে মশাই তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারেন না। নাতনীর মুখে তিনি শোনেন, আদরও যাবার সময় কাঁদছিল। তিনি সাশ্রুনয়ন হয়ে ওঠেন। আর গল্পের শেষে যখন জয়রামবাবুর কাছে আদরের অসুস্থতাব খবব আসে তখন তিনি উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠেন। আদরের মৃত্যুর পব তিনিও বেশীদিন জীবিত থাকেন নি। এইসমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক যেন পশু এবং মানুষের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককেই আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন।

কিন্তু এটি গল্পটির আপাত বাহ্যিক কাঠামো। এরমধ্যেও গল্পটির একটি অন্য মাত্রা আছে। গল্পটি আসলে একটি হাতীকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিব একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতির প্রকাশ। গল্পের আদরিণী নাম্নী হাতীটি জয়বাম মুখোপাধ্যাযের ঐশ্বর্য, বৈভবের প্রতীক। যেদিন জয়রামবাবুর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল সেদিন তিনি আদরিণীকে ঘরে আনেন। আর যেদিন তার এজলাসে যাওয়া বন্ধ হয়, একে একে কোম্পানীর কাগজ বিক্রী কবেন, সেদিন আদরিণীকে বিক্রী করার কথা ভাবেন। কিন্তু আদরিণীব মৃত্যুর পর তিনিও বেশী দিন বাঁচতে পারেন না।

আমরা দেখেছি, "আদরিণী" গল্পের সূচনা জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে দিয়েই। প্রথম থেকেই গল্পকার জয়রামবাবুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে আমাদের কাছে খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এই সমস্ত উক্তির মাধ্যমে—"অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল,"। তার "হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া

এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।" "মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে।" সেকালে হাকিমেরা একটু অবিচার-অত্যাচার করলেই জয়রামবাবু রেগে, চেঁচিয়ে অনর্থপাত করে তুলতেন। শুধু তাই নয়, সেকালে তিনি ডেপুটির উপর রাগ করে তার নামে বাছুরের নাম রেখেছিলেন। আর এক ডেপুটিকে বলেছিলেন—"আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি।" পাঁচ টাকা জরিমানা রহিত করতে ১৭০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছিলেন। আসলে জয়রামবাবুর "কাঁচায়-পাকায় মিশ্রিত" গোঁপগুলির মত মনটাও ছিল কোমলতা-রুক্ষতায় মেশানো। আপাতভাবে এদুটিকে বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে তার আত্মমর্যাদায়, আত্মাভিমানে ঘা লাগত, সেখানে তিনি হয়ে উঠতেন রুক্ষ। এক সুতীব্র আত্মসম্মানবোধই তার চরিত্রে রুক্ষতার স্থান করে দিয়েছিল। আর যেখানে ছিল তার পরিপুষ্টি, সেখানে তিনি অত্যন্ত কোমল। একথা যারা তার সঙ্গে মাত্র কয়েকদিন মিশেছেন তারা সকলেই জানেন। তাই গল্পের সূচনাতেই দেখি পাড়ার নগেনবাবু ও কুঞ্জবিহারীবাবু জয়রামবাবুর সঙ্গে উক্তি বিনিময়ের সময় নিজেদের কথাকে পরিবর্তন করে নিয়ে সহজেই মুখুজ্যে বাবুর হৃদয় বিগলিত করেন। এই আত্মাভিমানের পরিপুষ্টির কারণেই তিনি অকাতরে অন্নদান করতেন, অত্যাচারীত, উৎপীড়িত গরীব লোকের মোকদ্দমা বিনা ফিসে, এমনকি নিজ অর্থব্যয়ে চালিয়ে দিতেন। পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ি হাতীর জন্য চিঠি লিখে পাঠালেও তারা হাতী না পাঠালে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তাই আত্মাভিমানের বশেই তিনি এককথায় দু'হাজার টাকা দিয়ে হাতী কিনে বসেন। শুধু তাই নয় সে হাতী মহারাজ নরেশচন্দ্রকে না দেখানো পর্যন্ত তার ভালো ঘুম হয় না এবং যেদিন তা সম্ভব হয় সেদিনই তার সুনিদ্রা হয়। আদালতে নতুন ইংরাজী জানা উকিলরা তাকে যথোপযুক্ত সম্মান না দেওয়ায় তার অভিমান জন্মায়। আর যেদিন নতুন জজ সাহেব তাকে বলেন—"আপনি মোক্তার! আমি মনে করেছিলাম আপনি উকীল। যেরূপ দক্ষতার সহিত মোকর্দমা চালাইয়াছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি এখানকার একজন ভালো উকীল", সেদিন তার ডাগর চক্ষু দুইটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই প্রশংসাবাক্য শোনার পর তিনি জজ সাহেবকে আশীর্বাদ করেন এবং সেদিনের পর থেকে আর আদালতে যান না। এই আত্মাভিমানের কারণেই জয়রামবাবু তার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিনেও আদরিণীকে বিক্রয় করার কথা ভাবতে পারেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে ছলনার আশ্রয়ে নিজেরই মন ভোলাতে হয়—"তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়," এই আত্মাভিমানের কারণেই আদর মারা যাওয়ার পর বেশীদিন আর তিনি বাঁচেন নি। জয়রামবাবুর অতীত ঐশ্বর্য, বৈভব, প্রতিপত্তি সবই একে একে গিয়েছিল। বাকী ছিল শুধু আদর। সেটিও যাওয়ায় আর তার পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সমালোচক সুন্দরভাবেই জানিয়েছেন—"জয়রাম মুখোপাধ্যায় যৌবনে হাতী কিনিয়াছিলেন অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য। আদরিণী সেই হাতীটিরই নাম। আদারিণী যেন জয়রামেরই পৌরুষদৃপ্ত চরিত্রের প্রতীক। অথচ জীবনের পড়ন্ত বেলায় অর্থের প্রয়োজনে আদরিণীকে বিক্রয় করিবার জন্য হাটে পাঠাইতে তিনি বাধ্য হইলেন। যৌবনের তেজ, অহঙ্কার, অর্থের প্রাচুর্য একে একে

সবই গিয়াছিল। বাকী ছিল প্রাণ, আদরিণীর মৃত্যুর পর তাহাও গেল।" বস্তুত সমালোচকের মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হলেও স্মরণ রাখতে হবে জয়রামবাবু যৌবনে হাতী কেনেন নি। কিনেছিলেন তার বয়স যখন "পঞ্চাশ পার হইয়াছে"। তখনও আদালতে তার প্রভাব তথা প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। অর্থাৎ আদরিণী জয়রামবাবুর যৌবনের দিনে নয়, বৈভবের দিনে কেনা।

"আদরিণী" গল্পে আছে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ। এরমধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অর্ধেকেরও বেশী গল্পকার ব্যয় করেছেন জয়রাম চরিত্র পরিস্ফুটনে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে হাতী কেনার প্রসঙ্গ, যা পরোক্ষভাবে জয়রাম মুখুজ্যে চরিত্রকেই স্পষ্ট করে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে হাতী কেনার পর কেটে যাওয়া পাঁচটি বছর পরবর্তী ঘটনা। সেখানে জয়রামবাবুর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছবিই স্পষ্ট। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও জয়রামবাবুর আর্থিক অবস্থার মন্দা, সমস্ত সংসারের বোঝা একার মাথায় চাপা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। আদরিণীকে নিয়ে মুখুজ্যেবাবুর যেসমস্ত ভাবনা-চিন্তা তা পরোক্ষে জয়রামবাবু চরিত্রকেই প্রকাশ করেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে আদরের মৃত্যুর কথা। কিন্তু আদরের মৃত্যুতেই গল্পের সমাপ্তি নয়। তারপরও লেখককে ব্যয় করতে হয়েছে একটি পঙক্তি—'ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।" অর্থাৎ গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায় চরিত্রের উপস্থিতি। সমগ্র গল্প জুড়ে তারই উত্থান পতনের প্রকাশ। আর এই প্রকাশে সহায়তা করেছে আদরিণী। এই গল্পের লক্ষ্য জয়রামবাবুই, আদরিণী নয়। সে উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আদরিণী" গল্পটি আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকগণ শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পটির প্রসঙ্গ টেনেছেন। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন — "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দু'জনেই সমসাময়িক শিল্পী। গৃহপালিত প্রাণীকে নিয়ে এঁরা দুজনেই দুটি বিখ্যাত গল্প লিখেছেন। একটি 'মহেশ', অপরটি 'আদরিণী'।" কিন্তু "মহেশ" যেখানে সমাজসমস্যামূলক গল্প, "আদরিণী" সেখানে ব্যক্তিজীবনের গল্প। একটির মূলে সমাজ, অপরটির মূলে ব্যক্তি। "মহেশ" গল্পের গফুর ও মহেশ যৌথভাবে যেন একটি সম্প্রদায়ের প্রতিভূ। এই গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার শোষক ও শোষিতের প্রকৃত রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গফুর ও মহেশের পরিণতি যেমন আমাদের সমস্ত সহানুভূতি আদায় করে নেয়, তেমনি সমাজের প্রতি লেখকের তীব্রকণ্ঠ ধিক্কারও চাপা থাকে না। অন্যদিকে "আদরিণী" গল্পে ব্যক্তি-স্বভাব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত। ব্যক্তিকে ছাপিয়ে সমাজ সেখানে প্রকাশিত নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে এই গল্পের লক্ষ্য জয়রাম মোক্তারই। দুটি গল্পের রস-পরিণামও ভিন্ন। সমালোচকের কথায়—'আদরিণী" গল্পে জয়রাম মুখুজ্জের হাতী কেনা, শেষে অভাবে পড়ে তাকে বিক্রীর চেষ্টা এবং আদরিণী ও জয়রামের পরিণাম একটি অশ্রুপূর্ণ বিষাদ পাঠকের মনে সঞ্চার করে। কিন্তু সূচনাতেই যখন দেখা যায় হাতী কেনার অন্তরালে জয়রামের প্রবল একটি অহংবোধ বিদ্যমান, গল্পের আবেদনটি তখনই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—এর ব্যথা-বেদনা সমস্তই ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায়। বলদ 'মহেশে'র চাইতে হস্তিনী 'আদরিণী' আয়তনে অনেক বিশাল হলেও শরৎচন্দ্রের গল্পের ট্র্যাজিক বিশালতা তারমধ্যে

পাওয়া যায় না।" কিন্তু সমালোচকের এই মন্তব্যের দ্বারা প্রভাতকুমারের প্রতিভার সঙ্কীর্ণতা প্রমাণিত হয় না। 'মহেশ' আর 'আদরিণী'-র আসল পার্থক্য রয়েছে লেখকদ্বয়ের শিল্পী ব্যক্তিত্বের মধ্যে। "শরৎচন্দ্র সমাজ জীবনের শিল্পী, প্রভাতকুমার পারিবারিক জীবনের। শরৎচন্দ্র Unmasking-এর জন্য তৎপর—প্রভাতকুমার আত্মতৃপ্ত, নির্বিরোধ। সুতরাং শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে এনেছেন দেশের লাঞ্ছিত জনসাধারণেব জলন্ত অভিসম্পাত এবং প্রভাতকুমার এনে দিয়েছেন একটি পরিবারের অশ্রুবিন্দু।" এইভাবেই সমালোচক দুটি গল্পের মূল পার্থক্যকে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য আমরাও সমালোচকের সঙ্গে একমত। তবে একথাও ঠিব প্রভাতকুমার শুধুমাত্র একটি পরিবারেরই অশ্রুবিন্দু এনে দেন নি, সেই সঙ্গে একক ব্যক্তির অশ্রুবিন্দুও স্পষ্ট করেছেন। সেই ব্যক্তি জযরাম মুখোপাধ্যায।

দেবী : নারীত্বের সংজ্ঞায়

কাজরী মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। সমাজরুচি ও সাহিত্যরুচির দ্রুত আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর গল্পের উপভোগ্যতা আজও কমেনি। যুগরুচি ও পাঠকরুচিরও বহু পরিবর্তন তাঁর গল্পের পর্বতশিখর সমোচ্চ জনপ্রিয়তাকে ধ্বংস করতে পারেনি।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'দেবী' গল্পের প্লট প্রভাতকুমার পান রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এ গল্প রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখলে কেমন হত, সেকথা এখন আর ভেবে লাভ নেই, তার প্রয়োজনও নেই কারণ প্রভাতকুমারও যে বিষয়টিকে ব্যর্থ হতে দেননি, তার প্রমাণ দেখতে পাই উত্তরকালে, সত্যজিতের মধ্য দিয়ে।

প্রভাত কুমারের গল্পের আকাশে 'দেবী' উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই গল্পে প্রভাতকুমারের প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ কৌতুক ও হাস্যরসের বিন্দুমাত্রও নেই। আছে এক বিষাদ গম্ভীর, করুণ কাহিনীর মাধ্যমে তীক্ষ্ণ সমাজ বিশ্লেষণ। অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারেব বেদিমূলে নিরীহ মানবপ্রাণেব বলির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই গল্পে।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে লেখা এই কাহিনীর পটোত্তলন হয়েছে আরো একশ বছর আগের সময়ে --"সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসবের কথা।" অশিক্ষা ও কুসংস্কারের পঙ্কস্তূপে তখন গ্রাম বাংলা নিমজ্জিত।

জমিদার কালীকিঙ্কবকে আমরা দেখি সার্থকনামা হতে। অতীব ঈশ্বরভক্ত সংস্কারাচ্ছন্ন এই ব্যক্তি আদ্যাশক্তিতে অন্ধের ন্যায় আস্থাবান। এহেন জমিদারের বিশ বৎসরের পুত্র উমাপ্রসাদ সম্পূর্ণরূপে বিপবীত প্রকৃতির যুবক। কৈশোর কালে দয়াময়ীর সঙ্গে তার বিবাহ হলেও সবেমাত্র স্ত্রীব প্রেমময় সান্নিধ্য তার জীবনে ঘটছে। গল্পের প্রথম দুটি পৃষ্ঠা ব্যাপী আমরা দেখি উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ীর প্রেমপূর্ণ বাক্যালাপ। সম্পূর্ণ রোমান্টিক এই চিত্রে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রীতি, স্নেহ, মমতা এবং অবশ্যই রঙিন ভবিষ্যৎ কল্পনার প্রাধান্যই দেখি। স্বামীকে সামান্যক্ষণের জন্য হলেও সে নারী অদর্শনের বেদনায় কাতরা হতে পারে, সে যে কোনোদিন দেবীত্বে উপনীতা হবে তা ভাবতেও পাঠকের কষ্ট হয়। তখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান দয়াময়ীকে বড় জা'ব পুত্রটিকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে লালন করতে আমরা দেখি। তাকে খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, সাজানো প্রভৃতি সকল কর্মই দয়াময়ী মা'য়ের মমতা দিয়ে করে। খোকার পরিচর্যা, শ্বশুর কালীকিঙ্করের পূজাহ্নিক-এর জোগাড় প্রভৃতি গৃহকার্যের অধিকাংশই যে দয়াময়ী স্বহস্তে করত, পরবর্তীকালে এই একই সঙ্গে সর্বকর্ম নিপুণা ও প্রেমময়ী নারীর জীবনে যে ভয়ানক ট্র্যাজেডীব আঁধার নেমে আসে, তা হৃদয়ে গ্রহণ করতে বাধে। ধর্মীয় সংস্কার যে কখনো কখনো মানুষের জীবনকে কিরূপে ধ্বংস করতে পারে তা পাঠকবর্গ দয়াময়ীর করুণ পবিণতি দেখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

যাইহোক, গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে দেখি, দয়াময়ীর 'সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ

অনুগৃহীত' শ্বশুর কালীকিঙ্কর অকস্মাৎ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন স্বয়ং মা কালী তাঁর গৃহে আবির্ভূতা হয়েছেন—"মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোটবউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন।" স্বভাবতই ঈশ্বরভক্ত কালীকিঙ্করের "জন্মসার্থক হল", "জীবন ধন্য হল।" সংস্কারাচ্ছন্ন কালীকিঙ্কর উন্মাদ প্রায় হয়ে ওঠেন। তার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখি, দয়াময়ীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের জন্য পুত্রকে আদেশ করার সময়ে। তাঁর মতে যে কুলে তিনি জন্মেছেন 'তা পবিত্র হল" দয়াময়ীর কৃপায়। তাঁর এতদিনের সাধনা সফল হল। স্বামীর প্রেমে বিভোরা সদ্য নিদ্রোত্থিতা কিশোরী "দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত" হল।

অকস্মাৎ এ কি হল—তা বুঝে ওঠার পূর্বেই গৃহবধূ দয়াময়ীকে দেবীর আসনে বসিয়ে দীপধূপ জ্বালিয়ে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে ষোড়শোপচারে তার পূজা হতে লাগল। প্রবল প্রতাপান্বিত পিতার সম্মুখে দয়াময়ীর স্বামী উমাপ্রসাদেরও কিছু করার রইল না। প্রকাশ্যে তারও বাক্‌রোধ হল। কিন্তু অন্তরে সে নিজের পত্নীকে সহসা দেবী বলে মেনে নিতে পারল না। রাত্রির আঁধারে সকলের চক্ষু এড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গচ্যুত দুটি প্রাণ ভাব বিনিময় করতে থাকে।

"দয়া! তোমার কি মনে হয় যে একথা সত্যি? তুমি আমাব দয়া নও, তুমি দেবী?
না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছুই নই,
আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

কুসংস্কারের করাল পেষণে দুটি অসহায় হৃদয়ের যন্ত্রণাকে এখানে ঝরে পড়তে দেখি। দুজনে স্থির করে সপ্তাহ কাল পরে তারা অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে মানুষ হয়ে বাঁচবে। কিন্তু মানবী দয়াময়ীর কপালে দেবী দয়াময়ী কিছু অন্যরকমই লিখে রেখেছেন। কারণ ইতিমধ্যে গ্রাম-গ্রামান্তর হতে শত শত অন্ধ ঈশ্বরভক্ত মানুষ দয়াময়ীর কৃপার আশায় তার কাছে আসতে থাকে। দয়াময়ীর কাছে ভক্তের নানান প্রার্থনা। এক বৃদ্ধ তার মৃতকল্প নাতিকে বাঁচিয়ে তোলার আশায় দয়াময়ীর কাছে আসে। পরদুঃখকাতরা দয়াময়ী ঈশ্বরের কাছে বালকটির জন্য প্রার্থনা করতে থাকে—"হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।" বালকটির সৌভাগ্যক্রমে এবং অবশ্যই দয়াময়ীর দুর্ভাগ্যক্রমে বালকটি আরোগ্য লাভ করল। এইরূপ আরো কয়েকজনের আরোগ্যলাভের সৌভাগ্য ঘটল দয়াময়ীর দুর্ভাগ্যক্রমে। কোনো মানুষের আবোগ্য লাভ যে অপর কোনো মানুষের জীবনে ধ্বংসের বীজ বপন করে, তা দয়াময়ীকে দেখে পাঠককুল উপলব্ধি করে। এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণ অশিক্ষিতা কুলবধূ হলেও স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রভাবে নিজের দেবীত্বে স্বয়ং দয়াময়ীরই অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু অলৌকিক কিছু ঘটনা পরম্পরার প্রভাবে দয়াময়ীর মানবী বিশ্বাসে চিড় ধরল। সকলের সঙ্গে সে-ও নিজেকে দেবী রূপে ভাবতে লাগল। সপ্তাহ কাল পরে উমাপ্রসাদ সকল বন্দোবস্ত করে যখন দয়াময়ীকে নিয়ে যেতে এল তখন স্বয়ং দয়াই—প্রথমে যেতে অস্বীকার করল। কারণ সে তখন ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, সে দেবী "আমি যে দেবী নই, অমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।" কিন্তু এরপরও শিক্ষিত উমাপ্রসাদের চাতুর্যপূর্ণ বাক্যজালে সে সামান্যক্ষণের জন্য পরাভব স্বীকার করে।

"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য—যে তোমাকে বিবাহ করে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই,—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর!

যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

গ্রাম্য সরলা কিশোরীর মনে কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার এতই প্রগাঢ় যে আমরা দেখি, এরপর সে পালিয়ে যেতে গিয়েও পিছিয়ে আসে। অশিক্ষা, সংস্কার তার হৃদয়ে, দৃষ্টিতে সর্বত্রই অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের রঙ মাখিয়ে রেখেছে। মানবী দয়াময়ী দেবীত্বে উপনীতা হয়ে বলে ওঠে—'আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত মনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন?" বিপুল সংখ্যক অন্ধ ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস, ভক্তি গৃহবধূ দয়াময়ীর মন থেকে সাধারণ প্রেম ভালোবাসা সরিয়ে দিয়ে সেখানে দেবতার ঐশ্বর্য ভাব, গৌরব বসাতে সক্ষম হয়েছে।

দয়াময়ী ফিরে এসে পুনরায় দেবীর আসন গ্রহণ করে। তার স্বামী গৃহত্যাগ করল। গৃহ এবং গ্রামের সকলেই দয়াময়ীর দেবীত্বে অটল বিশ্বাসী হলেও দয়াময়ীর বড় জা হরসুন্দরীর কাছে সে ছিল চিরকালই গৃহের ছোট বউ মানবী দয়াময়ী।

গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে দেখি, গৃহের একমাত্র বালক, হরসুন্দরীর পুত্রের জ্বর হয়েছে তার কাতর অনুনয় সত্ত্বেও গৃহের কেউই মানুষ ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য ডেকে আনে না। যদিও বা গোপনে হরসুন্দরী কবিরাজের কাছে লোক পাঠাতে সক্ষম হল, দুর্ভাগ্য, সেই কবিরাজও স্বয়ং দয়াময়ীর আদ্যাশক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁরও বিশ্বাস যার ঘরে স্বয়ং 'মা' বিরাজমানা, সেই মা'য়ের কৃপাতেই খোকা ভালো হবে। কারণ দয়াময়ীই বলেছে, বৈদ্য ডাকবার প্রয়োজন নেই, সেই "ওকে ভাল করে" দেবে। দিনরাত দেবীর ক্রোড়ে শুয়ে থাকা সত্ত্বেও বিনা চিকিৎসায় খোকার মৃত্যু হল। সকলে বিস্ময়ে অধির হয়ে উঠল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধ কালীকিঙ্কর তখনও দয়ার দেবীত্বে বিশ্বাস করে বলে যেতে থাকেন, "মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে, এখনও দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।" আর কিশোরী দয়াময়ী? সেও অন্ধ বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে নিজের বোধবুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি বলি দিয়ে মানবী হয়েও দেবীর আসন থেকে যমরাজের উদ্দেশে আজ্ঞা করে "এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে" ফিরিয়ে দিতে।

কিন্তু এতসত্ত্বেও খোকার পুনর্জন্ম লাভ হল না। খোকার মৃত্যু, গ্রাম ও গৃহের সকল মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ীর নিজের মনেও দেবীত্বে অবিশ্বাসের জন্ম দিল। কিন্তু হায়; তখন বড়ই দেরী হয়ে গেছে। মানবী দয়াময়ী গৃহবধূরূপে যা যা লাভ করেছিল, সবই ততদিনে হারিয়ে ফেলেছে। নিজকৃত বিশ্বাসভূমিতে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যা সে করেছে, যা সে ভেবেছে সবই সে দেখল তার ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সে দেখে অন্ধ বিশ্বাস, সংস্কার তার জীবনকে ধ্বংসের পথেই টেনে নিয়ে গেছে। একদিকে অলৌকিক বিশ্বাসে অটল প্রতিষ্ঠ কালীকিঙ্কর, অপরদিকে তার অবিশ্বাসী পুত্র উমাপ্রসাদ-এর মধ্যে পড়ে

কিশোরী দয়াময়ী সর্বক্ষণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বিধায় দোলায়িত হতে হতে একদিন দেবীত্বের গর্বে স্পর্ধিতা হয়ে স্বামীসুখও প্রত্যাখ্যানে কুণ্ঠাহীনা ছিল। শেষে যখন সে নিজে সব উপলব্ধি করে দেবীত্বে অবিশ্বাসিনী হল, তখন আমরা দেখি, তার পায়ের তলার ভিত্তিমূল সরে গেছে। তাই আত্মহত্যা ব্যতীত দয়াময়ীর সামনে আর কোনো পথ ছিল না। "পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

আরোপিত দেবীত্বে বিপন্ন নারীর গল্প 'দেবী' প্রভাতকুমারের শিল্পসামর্থের অন্যতম প্রধান নিদর্শন রূপে আজও বিবেচিত। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সংঘর্ষজাত প্রভাতকুমারের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি এই গল্প সমগ্র বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

রসময়ীর রসিকতা : ঠিক বাজিকরের খেলা

জয়িতা জানা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল কর বিশিষ্ট ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দশটি সরস গল্পের সঙ্কলন গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছিলেন যে—

> "রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলতেন, বাঙালি জাতি হৃদয় মনের সঙ্গে আমোদ করতে জানে না, আমাদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই...।" "আমার ধারণা প্রভাতকুমারের সরস রচনাগুলি যথার্থভাবেই হৃদয় মনের আমোদ। সেগুলির ধর্ম প্রফুল্লতা।"

কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসাত্মক গল্প সাহিত্যের ধারায় প্রভাতকুমারের গল্পে যে সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্নিগ্ধ হাসির ছোঁওয়া পাওয়া যায়, তা বাংলা সাহিত্যের কৌতুক রসাত্মক রচনার এক বিরল উপস্থাপনা।

রবীন্দ্রনাথ যখন আপন দীপ্তিময় কিরণছটায় সাহিত্যের মধ্যাকাশে বিরাজমান এবং শরৎচন্দ্রের শরৎ-প্রভা যখন প্রত্যুষের বর্ণময় আলোক ছটায় উদ্ভাসিত—ঠিক তখন একটি সমৃদ্ধময় সময়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর আগমন (১৮৭৩-১৯৩২)। বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল সময়ে নিজেব জন্য সাহিত্যের আঙিনায় স্থান সঙ্কুলান করে নিতে তাঁর এতটুকু অসুবিধা হয়নি। এ সময়ে বেশ কতগুলি উপন্যাস ও অজস্র ছোটগল্প লিখে তিনি অবলীলায় নিজের যথাযোগ্য স্থান কবে নিতে পেবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে. অন্যধারার কথাসাহিত্যই হল তাঁর একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় 'বমাসুন্দবী' উপন্যাস। তাব আগে ১৯০৬-এ 'ষোড়শী' নামক গল্পসংকলনটি প্রকাশিত হয়। মোট চোদ্দটি উপন্যাস এবং প্রায় একশো চোদ্দটি গল্প প্রভাতকুমার রচনা করেছিলেন। সাবলীল পল্লী-নগর জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী রচনা করায় বহু সাহিত্য-সমালোচক তাঁকে বিখ্যাত গল্পকার মপার্সাঁর সঙ্গে তুলনা কবে দেখান। এ বিষয়ে হিন্দী কথাসাহিত্যিক প্রেমচাঁদের সঙ্গেও কেউ কেউ তাঁব বহু কাহিনীব সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন।

প্রভাতকুমার সুচারুভাবে প্রফুল্ল হাস্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে নির্মল হিউমারধর্মী হাস্যরসাত্মক বচনাব জগতে বিচরণ করলেন। যার মধ্যে স্যাটায়ারের নামগন্ধ নেই। পারিবারিক কাহিনীর আবর্তে তাঁর গল্পের সূক্ষ্ম বসবোধ ও স্নিগ্ধ হাসির ছোঁওয়া পাওয়া যায়। নির্মল আনন্দ ও প্রফুল্লতাই তাঁকে অন্যানাদের থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

বিমল কর বেশকিছুদিন আগে প্রভাতকুমারের যে দশটি সরস গল্পের একটি ক্ষুদ্র সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সেই গল্পগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত দাম্পত্য জীবনের নানান কৌতুকময় চিত্রকল্প। 'রসময়ীর রসিকতা' ছিল সেই সংকলনগ্রন্থের অন্যতম নির্বাচিত গল্প। কারণ দাম্পত্য প্রণয়ের এমন রৌদ্র রসাত্মক প্রকাশ নিঃসন্দেহে শুধু সংকলন গ্রন্থটি কেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের মধ্যে অন্যতম বিরল আবিষ্কার। গল্পের সূচনাতে লেখক ক্ষেত্রমোহনবাবু ও তার স্ত্রী রসময়ী সম্পর্কে বলেছেন—

> "ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দম্পতি জীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি

> করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না। ...'রসময়ী'! —এ নাম যে রাখিয়াছে, বলিহারি তার প্রতিভা! তবে রসও তো অনেকগুলি আছে কিনা—এক্ষেত্রে রৌদ্ররস।"

গল্পের শুরুতে রসময়ীর স্বভাব ও নামকরণ নিয়ে এরকম কটাক্ষ সন্দেহাতীতভাবে লেখকের কৌতুকপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এরপর গল্প যত অগ্রসর হয়েছে, লেখকের রসবোধ ততই প্রগাঢ় হয়েছে। এ গল্পের সবচেয়ে বড় ভেল্‌কি মৃত রসময়ীর জীবন্ত চিঠির উপস্থাপনায়। এই উপস্থাপনা গল্পটির মধ্যে ভূতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসজনিত তর্ককেও উস্‌কে দিয়ে গল্পটির সরল কৌতুককে ধোঁয়াশার ঘনায়মান আবর্তে একটু জটিল করে তুলেছে।

সন্তানহীন এই দম্পতির প্রাত্যহিক কলহ প্রায় প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতোই স্বাভাবিক। কোন কোন দিন গণ্ডগোল কিছু তীব্র হলে রসময়ী রণে-ভঙ্গ দিয়ে গঙ্গার ওপারে বাপেরবাড়ি হালিশহরে গিয়ে ওঠে। কেননা সে জানতো যে কিছুদিন বাদে ক্ষেত্রবাবু সেখানে হাজির হবেন এবং মান-অভিমানের পালা চুকিয়ে সস্ত্রীক বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু সন্তানহীন ক্ষেত্রবাবু বেশ কিছুদিন থেকে সন্তান প্রত্যাশায় দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবছেন। বিশেষত পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়স্বজনও সেরকম সৎ পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই এবারে যখন সামান্য কারণে বিবাদ করে রসময়ী ক্ষেত্রমোহনকে দুই দিনের জন্য বাড়ি ছাড়া করল এবং নিজে হালিশহরে বসে থাকল, তখন ক্ষেত্রমোহন তার স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। সে হালিশহরেই গেল না।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। ক্ষেত্রমোহনের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে রসময়ী চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেননা তার বরাবরের আশঙ্কা সুযোগ পেলেই তার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করে ফেলবে। অবশেষে জানা গেল তার আশঙ্কাই ঠিক। ক্ষেত্রমোহনের বিবাহ স্থির হয়েছে। পাত্রী চুঁচুড়ার হরিশচন্দ্র চাটুয্যের কন্যা। রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী গ্রামের এক বালকের কাছ থেকে কৌশলে বিবাহের সঠিক খবর জোগাড় করে এনেছেন। তারপরে দুই বোনে গাড়ি হাঁকিয়ে সটান চুঁচুড়াতে হানা দিল। রসময়ীর অগ্নিমূর্তি দেখে তারা সকলে ভয়ে অস্থির। রসময়ী চাটুয্যে বাড়ির অন্দরে সকলকে শাসিয়ে চলেছে চিল কণ্ঠে—

> "কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের করো না! চোখ দুটি গেলে দিয়ে যাই! নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে যাই!"

রসময়ীর ভীষণ রণরঙ্গিণী মূর্তি ও চাটুয্যে বাড়ির ভীত-সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি পাঠকমনে এক অনাবিল নির্মল হাসির সঞ্চার করে। এখানে প্রভাতকুমার যেভাবে বাস্তবের সঙ্গে গল্পের সঙ্গতি রক্ষা করে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তাতে তাঁর হাস্যকৌতুক সৃষ্টির মুন্সিয়ানাটি প্রকাশিত হয়েছে। চুঁচুড়ার হূলস্থুল ঘটনার পর রসময়ী গঙ্গা পেরিয়ে হালিশহর থেকে হুগলিতে এসে স্বামীকেও শাসিয়ে গেছে যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে সে মজা দেখিয়ে ছাড়বে। আরও জানায় ক্ষেত্রমোহন বুড়ো থুরথুরে না হওয়া পর্যন্ত 'রসিবামনি মরছে না'। কিন্তু শেষপর্যন্ত রসময়ীর এই অহঙ্কারী হুঙ্কার বজায় থাকেনি। এই ঘটনার ছয়মাস পরে রসময়ীর অকাল মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর আরও ছয় মাস পরে ক্ষেত্রমোহনের তৃতীয়বার

বিবাহ ঠিক হয় পাশের গ্রামের নায়েব রজনীকান্ত ঘোষালের 'ডাগর' মেয়ের সঙ্গে। বিয়ের আগে ক্ষেত্রমোহনের খুড়ো মশায় উপস্থিত হলেন গ্রাম থেকে।

এরপর মৃত রসময়ীর পর পর তিনটি পত্রাঘাত গল্পের গতিকে অন্য মোড়ে নিয়ে যায়। প্রথম চিঠিটি ক্ষেত্রমোহন পেলো আশীর্বাদের আগের দিন। রসময়ীর মতো অবিকল একইরকম অজস্র ভুল বানানে ও হস্তাক্ষরে লেখা প্রথম চিঠিতে মৃত রসময়ী ক্ষেত্রমোহনকে রীতিমত হুমকি দিয়ে লিখেছে—

> "আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিষ্কিতি পাইআছ তাহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে যে বটগাছ আছে তাইতে আমি আজকাল বাস করিতেছি। ...বিবাহ করিও না করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগতি নেকা আছে।
>
> রসমই।"

বলাবাহুল্য পরলোক থেকে আগত এই পত্র খুড়ো ভাইপোকে যারপরনাই ভীত ও শঙ্কিত করে তুলল। কিন্তু রামনাম যপ করে ও মৃত রসময়ীর পতিপ্রেমের প্রতি আস্থাবান থেকে তারা প্রথম ধাক্কাটি সাময়িকভাবে সামলে উঠলেও বিয়ের পাঁচদিন পূর্বে যখন ক্ষেত্রমোহন মৃত রসময়ীর প্রথম পত্র নিয়ে কয়েকজন উকিল বন্ধুর সঙ্গে শলাপরামর্শে ব্যস্ত, তখনই এল দ্বিতীয়পত্র। যার বয়ান আরও ভয়ানক—

> "তুমি মোনে করিআছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওয়াজ। রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। ...এ দুরামোতি পরিত্যাগ করো। নহিলে এক দিন গভীর রাতিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাছ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখানা দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।"

এই পত্র ক্ষেত্রবাবুর বৈঠকখানায় এতক্ষণ ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে যে প্রবল তর্ক চলছিল, তাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিল। কেউ কেউ হস্তাক্ষর পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিল। কথাটি ক্ষেত্রমোহনের মনে ধরল। কিন্তু সেখানেও বিফল হলেন। জানা গেল হস্তাক্ষর মৃত রসময়ীর-ই। তখন খুড়ো মশায় গয়ায় পিণ্ডিদান পর্যন্ত বিবাহ কার্য বন্ধ রাখবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তা-ও রক্ষা হোল না। কিছুদিনের মধ্যেই রসময়ীর তৃতীয় ভয়ঙ্কর পত্রটি এল। তাতে লেখা আছে—

> "শুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উধার হইয়া যাইব। তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেশ ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

এবারে ক্ষেত্রমোহন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বিবাহের আশা পরিত্যাগ করল।

আরও একবার হস্তাক্ষর পরীক্ষা করা হল। কিন্তু ফলাফল পূর্ব্ববৎ। ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে ক্ষেত্রমোহনের চারপাশে খুব আলোড়ন চলতে লাগল। অনেকে সরাসরি ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে চিঠিগুলির সত্যতা যাচাই করে গেল। কিন্তু ক্ষেত্রমোহন নিজে চারপাশের উত্তেজনাতে গা ভাসাতে কোন উৎসাহ পেল না। যথা নিয়মে দিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ একদিন রসাময়ীর ছোট ভাই সুবোধের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ক্ষেত্রমোহন উপযাচক হয়ে হালিশহরে উপস্থিত হয় এবং এই বিপদের দিনে তাদের সহায় হয়। সুবোধ আহত হয়েছিল দোল উৎসব উপলক্ষে বাজি ফাটাতে গিয়ে। ফলে পুলিশ আসে। সাহেব পুলিশ বিস্তারিত

খানা-তল্লাসি করে। সেসময় অকস্মাৎ ক্ষেত্রমোহনের সামনে আবিষ্কৃত হয় রসময়ীর স্বহস্তে লেখা ক্ষেত্রমোহনের নাম-ঠিকানাযুক্ত কতগুলি খাম ও প্রায় গোটা কুড়ি চিঠি। এতদিনে ক্ষেত্রমোহনের কাছে অতীতের পুরো বিষয়টা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে রসময়ী তার মৃত্যুর পর এইরকম সব পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে সেই অনুসারে মৃত্যুর আগেই চিঠিগুলি লিখে রেখে গিয়েছিল। রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী কেবলমাত্র পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই চিঠিগুলি হালিশহর থেকে পোষ্ট করে গেছে।

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের ঘটনার টানাপোড়েনের জটিলতা একটা সামান্য সমাধানের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। পাঠকমনের ভূত-ভবিষ্যতের তীব্র কৌতূহল প্রভাতকুমার প্রশমিত করেছেন সহজ ঘটনার মধ্য দিয়ে। এ যেন ঠিক বাজিকরের খেলা। গল্পটির চরম পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের মনে আর কোন খট্‌কা থাকে না। ছোটগল্পের এই তারল্য প্রভাতকুমারের বিরল প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছে। লেখকের এমন বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা সত্যিই অভাবনীয়।

লেখক অত্যন্ত ঘরোয়া-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে কাহিনী বয়ন করেছেন। হাসির উপাদান তৈরী করতে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলিকে তিনি মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভট ও চূড়ান্ত অসঙ্গত করে তোলেননি। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে রসময়ীর দিদি বিনোদিনী প্রচ্ছন্ন থেকে অতি সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারা এই গল্পের গতি-প্রকৃতিকে নতুন পথে চালিত করেছে। ফলে রসের ক্ষেত্রে বিনোদিনীর ভূমিকাও কম নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তার পাঠানো চিঠিগুলিই গল্পের নাটকীয়তাকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।

প্রভাতকুমারের কৌতুককাহিনী থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, হাসির গল্পের ভাষা কতখানি সংযত ও সুনির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে লেখকের এই দক্ষতা সুচারুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক পরিস্থিতি ও গল্পের ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন সচেতন শব্দচয়ন, ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই চাটুয্যেবাড়িতে রসময়ীর অগ্নিবর্ষী ভাষাভঙ্গিমা অসংযত, অবাস্তব হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে অল্প শিক্ষিত রসময়ীর চিঠির শব্দের বানানগুলি নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করে। চরিত্রের সঙ্গে মানানসই উদ্ভট বানান পদ্ধতি রসময়ীকে আরও বেশী হাস্যরসে একই সঙ্গে করুণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রত্যেক লেখকের একটা নিজস্ব বাচনভঙ্গি থাকে। প্রভাতকুমারের কৌতুকরসাশ্রিত গল্পগুলিতে রয়েছে বৈঠকী মেজাজের অনাবিল প্রফুল্লতা—যা নিঃসন্দেহে সমকালীন হাস্যরসাত্মক গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত উদ্ভট হাসি ও পরশুরামের তীক্ষ্ণ-তীব্র ব্যঙ্গের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

'রসময়ীর রসিকতা' ছোটগল্পটি নিরেট হাস্য রসাত্মক গল্প হলেও ক্ষেত্রমোহন ও রসময়ী চরিত্র নির্মাণে লেখক যে অপূর্ব মানবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা বাংলা কৌতুক রচনার আঙিনায় সার্থক বলে মনে হয়।

পরশুরাম

(১৮৮০-১৯৬০)

নদীয়ার বীরনগরের উলা গ্রামে রাজশেখর বসুর জন্ম। প্রেসিডেন্সি থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও রসায়নে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠিত হলে তিনি তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করেছেন। তুলনায় বেশী বয়সে সাহিত্য রসরচনায় পদার্পণ করেন। তিনি মূলত একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। বিভিন্ন পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। হাস্যরসাত্মক গল্প লেখার পাশাপাশি রামায়ণ মহাভারতের সারাংশ অনুবাদ ও গুরুগম্ভীর অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯২২ সালে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসু তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রচনা করেন। তাঁর রচিত 'গড্ডলিকা' গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন—''সহসা ইঁহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। .....বইখানি চরিত্র চিত্রশালা।''

পরশুরাম রচিত ছোটগল্পের গ্রন্থগুলি হল,—'গড্ডলিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৮), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭), 'গল্পকল্প' (১৯৫০), 'ধুস্তুরীমায়া' (১৯৫২), 'কৃষ্ণকলি' (১৯৫৩), 'নীলতারা' (১৯৫৫), 'আনন্দীবাঈ' (১৯৫৭) প্রভৃতি। নির্মল হাসি এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক পরশুরামের গল্পগুলোকে জীবন্ত করে রেখেছে। শুধুমাত্র সমাজ সমস্যাই গল্পগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, মানুষের মনস্তত্ত্বের মূলে পৌঁছে তার অসঙ্গতিগুলিকে উপস্থাপিত করেই তিনি গল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পগুলি কেবল মাত্র সেই সময়ের গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকেনি, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্প-রসও পরিবর্তিত হলেও আজও বাঙালি পাঠকের চিত্তে সেগুলি স্থায়ী হয়ে আছে।

দক্ষিণরায় : বিচিত্র বাঙালী

রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের গল্প শোনবার ও শোনাবার আগ্রহ চিরকালের; সেই গল্প যদি বলেন, পরশুরামের ছদ্মবেশে রাজশেখর বসু তাহলে তো কোনো কথা নেই; তাও যদি হয় বাঘের গল্প! 'বিনোদ', 'নগেন', আর 'উদো'-র সঙ্গে পাঠকবর্গও বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানার বাতাবরণ খুঁজে নেয়, চাটুজ্যেমশায়ের 'বচনামৃত' পান করবার জন্য। এই গল্প ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে বর্ণিত কুমীরের পেটের ভিতর বেগুন বেচার মতো উদ্ভট ঘটনাযুক্ত হলেও, তার মর্মমূলে থাকে চিরপরিচিত জীবন সমস্যার বিচিত্র দিকগুলির প্রতি তির্যক দৃষ্টি-নিক্ষেপ। আর গল্পবলার অসাধারণ পারদর্শিতায় শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। গল্পবলার ঠাসবুননে প্রশ্ন করার সুযোগ মেলা ভার। মাঝে মাঝে প্রশ্নাংশ উঠে আসে, পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তার বুদ্ধিকে শাণিয়ে দেবার জন্য। আর উত্তরও তথৈবচ—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পরশুরামের এই উদ্ভটরসের গল্পেও এসে পড়ে জীবনের বাস্তব সমস্যা ও সমাজ-ব্যাধির দিকগুলি। অস্বাভাবিক ঘটনা স্রোতে, বাস্তব জীবনধারার মিশ্রণ ঘটানো কোনো সহজ ব্যাপার নয়। দুই বিপরীতমুখী চিন্তাধারার মেলবন্ধন তখনই সম্ভব হয়, যখন পরশুরামের বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসিক মন, অস্বাভাবিক গল্প বলতে বলতে, সমাজ-জীবনের অসঙ্গতির জায়গাগুলিকে উদাহরণের মতো তুলে এনে, মূল ঘটনাস্রোতে মিলিয়ে দেন। তাই পরশুরামের উদ্ভটকল্পনার গল্পগুলি আর নিছক কষ্টকল্পনা থাকে না—হাসি আর অলীক ভাবনার অন্তরালে হয়ে ওঠে, জীবন-সমালোচনার সরস আর বাস্তব চিত্রায়ণ।

'পরশুরাম বাংলা-সাহিত্যে 'রিয়্যালিজম্'—আন্দোলনেরই অন্যতম তির্যক শিল্পী।"[১] পরশুরামের হাসির গল্পের এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাঁর 'কজ্জলী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দক্ষিণরায়' গল্পে। তাঁর এই গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের ধারাটি চোখে পড়ে। এখানে আড্ডা জমানো বৈঠকী-আমেজের মধ্যে 'সমাজনিরীক্ষা'মূলক 'কিছু কিছু নিরীহ আক্রমণ[২] আছে।"

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) বাংলা সাহিত্য-গগনের এক উজ্জ্বলতম তারকা, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবনকে সামনে রাখলে, অবাক হয়ে যেতে হয়। রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সর্বময়কর্তা ও পরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সভাপতি। এই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষটি 'চলন্তিকা' অভিধান প্রণয়ন করেন, 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। "বিজ্ঞানীর কর্মশালা থেকে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব,, অদ্ভুত তাঁর শৈলী এবং পর্যবেক্ষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হৃদয়রাজ্যে তাঁর দিগ্বিজয়ী পদক্ষেপন।"[৩] এই পদক্ষেপন আবার পরশুরামের কুঠার হাতে। মানব-সমাজে যেখানেই দেখেছেন অসঙ্গতি, সেখানেই তীক্ষ্ণধার কুঠারাঘাত করেছেন। এ এক অভিনব 'কুঠার', যার তীক্ষ্ণতা শব্দচয়নে, কাহিনী বয়নে, সংলাপ রচনায়, চরিত্রচিত্রণে—আর 'ধার' হল পরিহাস রসিক বুদ্ধিবৃত্তিতে। অথচ সেই ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা কখনো নির্মম আঘাত হানে না বরং আঘাত লাগলে সহানুভূতির

প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। "বের্গসঁ যাকে ইনটেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে পড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না।"[৪]

এই ধরনের সাহিত্য চিন্তার এক অসাধারণ সৃষ্টি পরশুরামের 'কজ্জলী' (১৯২৮) গল্পগ্রন্থটি। 'কজ্জলী' সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা যায়—

" ..... The author's characters are, each one of them veritable master-pieces. They live before our very eyes.....stories like these are seldom to be found. They do honour not only to their gifted writer but also to the language in which they are writhen. If anything has appealed to us particularly, it is the author's vigorous originality of conception and mastery over the style he wields."[৫]

"পরশুরামের গল্প দেখিতে দেখিতে অতি অল্পকাল মধ্যে বাঙলা ভাষাভাষী যেখানে যত লোক আছে সকলের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে—ইহাই তাঁহার ক্ষমতার সবচাইতে বড় সার্টিফিকেট।....পাঠক সাধারণকে এইভাবে জাদু করিবার ক্ষমতার গর্ব, বাঙলাদেশের খুব অল্প লেখকই করিতে পারেন।"[৬]

'কজ্জলী' গ্রন্থের তিন নম্বর গল্প 'দক্ষিণরায়'। 'দক্ষিণরায়' নামকরণ পাঠকমনকে পৌঁছে দেয়, সুন্দরবন অঞ্চলের বাদাবনের আতঙ্ক এবং সেই আতঙ্ক থেকে উদ্ধারকারী দেবতা সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর জগতে। পাঠও শুরু হয়, বাঘের মাহাত্ম্য দিয়ে, পরশুরামের একেবারে নিজস্বভঙ্গীতে।

দুই

সময়টা সাহেব প্রশাসিত ভারতবর্ষ। সুন্দরবনের বাঘ গ্রীষ্মকালে রুদ্রপ্রয়াগে হাওয়া বদলাতে যায়। এটা ঠিক, বাঙালির একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবনে, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য হাওয়া বদলের একটা ব্যাপার ছিল বা আছে। হয়তো বা কখনও-সখনও একটা সৌখিনতা গোছের অতিরেক থাকে। সেখানেও রসিকতার একটা সূক্ষ্ম আঘাত আছে। তাই বাঘ হাওয়াবদল করে যে 'ইয়া কেঁদো কেঁদো' হয়ে উঠবে, সেটা স্বাভাবিক! আর স্থান মাহাত্ম্যই হোক বা খোসমেজাজের জন্যই হোক, কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর মানসিকতা থাকে না, সেই সমৃদ্ধ হওয়ার মুহূর্তগুলিতে। তবে সচেতনতা আছে; দেশের শত্রু নিধনের উদ্দেশ্যেই "কেবল সাহেব ধ'রে ধ'রে খায়।" সত্যিই তো এমন বাঘ যদি রাজধানীর পথে গোটাকতক ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে তো 'চটপট স্বরাজ হয়ে যেত,—স্বদেশী বোমা, চরকা, কাউন্সিলভাঙা, কিছুই দরকার হ'ত না।" তবে বাঘকে রাজধানীতে আনা যায়নি। বাঘ তার নিজের জায়গায় থেকে ইলেকশন আর ভোটাভুটির কাজে সামিল হয়েছে। সেটা বকুলালের কাহিনী থেকে জানা যায়।

পরশুরামের গল্পবলার সেই পরিচিত সন্ধ্যাবেলার বৈঠকি আড্ডা। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা, 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের ১৪ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসের আড্ডাকে স্মরণে

আনে। আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বংশলোচনবাবু, বিনোদ উকিল, নগেন, উদয়—এরা সকলেই আছেন। গল্প জমিয়েছেন কেদার চাটুজ্যে। উকিলী প্রশ্নবাণকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে, গল্প চালিয়ে যেতে চান চাটুজ্যে—"...গবরমেন্ট কি সবজান্তা? There are more things." ঘটনাকেন্দ্রে আসবার কৌশল চলতে থাকে। উদ্ভটরসের স্রোতধারা কাহিনীকে টেনে নিয়ে চলে। চাটুজ্যের কথাগুল হোক না 'অলৌকিক', শুনলে দিক না গায়ে কাঁটা। দেবতার মাহাত্ম্য তো বটে; তাই উদোদের সঙ্গে পাঠকও যেন কথাগুলি হাঁ করে গিল্‌তে থাকে।

তিন

এই গল্পের ঘটনাকেন্দ্রে আছেন বকুবাবু, ওরফে বকুলাল দত্ত। ভদ্রলোক মারা গেছেন এবং তাঁর কপালীটোলাব মস্ত বাড়িটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ভাঙছে। এটা ঘটনা; তবে চাটুজ্যের গল্পে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন; যদিও তাঁকে চেনা যায় না। ইচ্ছে করলে তাঁর সাক্ষাৎ এখনও পাওয়া যেতে পারে। তবে তার জন্য একআনা খরচ করতে হবে। এই ইঙ্গিত যে গল্পের পরিণতিতে কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তা পাঠকের বোধের বাইরে। আর এখানেই ছোটগল্পের আসল মোচড়।

বকুবাবু বাবার কৃপালাভে ধন্য হতে চেয়েছিলেন কিন্তু বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট। এই বাবা হলেন আর কেউ নন, স্বয়ং বাবা দক্ষিণরায়—"কাঁচা খেকো দেবতা, বাঘের দেবতা।" বাবার প্রতি ভক্তিনত চিত্তে, তাঁর উদ্দেশ্যে তিনবার হাত কপালে ছুঁইয়ে সুর করে তিনি 'রায়মঙ্গল'-এর অংশ পাঁচালির ঢং-এ সুর করে পড়তে লাগলেন—

"নমামি দক্ষিণরায় সোঁদরবনে বাস,
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।....
গোবাঘা শার্দুল চিতে লক্কড় হুড়ার
গেছো-বাঘ কেলে বাঘ বেলে বাঘ আর
ডোরা-কাটা ফোঁটা-কাটা বাঘ নানা জাতি—
তিনশ তেষট্টি ঘর প্রভুর যে জ্ঞাতি।
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ,
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।......
কলাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী
ভাঁজেন তেঅটতালে হালুম্ব রাগিনী।......
বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্‌দি,
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হৈল হল্‌দি।
ছাগল শুয়ার গরু হিন্দু মুছলমান,
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।......
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাই যেন চরণের থাপা।"

উল্লিখিত পাঁচালি অংশের শব্দ ব্যবহার, ভাষাভঙ্গিমা বক্তব্যবিষয়, সর্বোপরি দক্ষিণরায়ের

রূপ ব্যাখ্যা ও গুণকীর্তন প্রমাণ করে এই 'তিনশ' বছরের পুরানো রায়মঙ্গলের পুঁথি—যার রচয়িতা, গল্পকথক চাটুজ্যেমশাই। এর উপর প্রবন্ধ লিখে চিমেশ মিত্তির ইউনিভার্সিটির 'ডাক্তার উপাধি' পেতে চেয়েছিলেন এবং এর জন্য দেড়শ টাকা পর্যন্ত প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলেন। অথচ চাটুজ্যে সম্মত হন নি এই কারণে যে, এর উপর প্রবন্ধ লিখে ডাক্তার হতে পারলে, যে 'নাড়ীজ্ঞান' দরকার, তা চাটুজ্যের আছে আর এর উপর ভরসা করে বুড়ো বয়সটা তাঁর কেটে যাবে। একই সঙ্গে দক্ষিণরায় আর ইউনিভার্সিটি কর্তৃক পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর প্রতি মৃদু আঘাত পড়েছে। দক্ষিণরায় যে স্বয়ং বাঘ নন, বাঘের আক্রমণ রোধকারী দেবতা—এ বিষয়ে সংশয় থাকবার কথা নয়। তবু এক্ষেত্রে দক্ষিণরায় সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য সামনে রাখলে, পরশুরামের গল্পের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হতে পারে—

দক্ষিণরায় সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত আছে। যশোহর জেলার ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি হিসাবে দক্ষিণরায়েব নাম পাওয়া যায়। "ব্রাহ্মণনগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণরায়ের পতন হইযাছিল কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ দক্ষিণবায়ের সম্মিলিত সৈন্যের সহিত সমস্ত মুসলমান সৈন্যেব আর একটি মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের প্রকৃত ফল কি হয়, তাহা জানা যায় না। তবে এই যুদ্ধে যে দক্ষিণরায দমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ বলেন, তিনি শেষযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইষ্টদেবতা সূর্যেব মন্দিরেব সম্মুখে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়া, দিব্যধামে গমন করেন। কিন্তু 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, তিনি এই যুদ্ধের পর গাজিব সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন :

> 'বড খাঁ গাজির সাথে, মহাযুদ্ধে খনিয়াতে
> দোস্তানি হইল তাব পর।'

এই দোস্তানি বা বন্ধুত্বের ফলে উভয়েই সুন্দরবন অঞ্চলে প্রভু হইয়া বসেন।"[৭]

অন্যত্র দেখা যাচ্ছে—"নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা বলিয়া একটি দেবতাকে কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহাব নাম দক্ষিণরায। বাংলাব দক্ষিণদিকের অধিকারী দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণরাক্ত বা দক্ষিণরায়। বাংলার দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রের বাসভূমি সুন্দরবন অবস্থিত; সেইজন্যই ইহার দেবতাকেও দক্ষিণদিকের অধিকারী বলিয়াই কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণরায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণে শিকার করেন। তাঁহার চরিত্রটিই ক্রমে দেবত্বে পরিণত হয়।"[৮] দক্ষিণরায অতীতে যেভাবেই পরিচিত হোন না কেন, পরবর্তীকালে মনুষ্য পরিচয় লুপ্ত হয়ে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। "তিনি ব্যাঘ্রভীতি নিবারক দেবতা। এইজন্য সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে, বিশেষত ২৪ পরগণার বারুইপুব অঞ্চলে ও আবাদী মহলে এই দেবতার পূজা হয়। ধবধ'বে গ্রামে এই দেবতার এক মন্দির ও তন্মধ্যে তাঁহার মুকুট ও যোদ্ধৃবেশধারী এক প্রতিমা আছে। গণেশমন্ত্রে ও গণেশেব ধ্যানোল্লেখ করিয়া এই দেবতার পূজা হয়।"[৯] স্বভাবতই বোঝা যায়, ইনি বাঘের দেবতা কিন্তু ব্যাঘ্ররূপী দেবতা নন। তাঁর এই ধরনের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়—

"বর্ণহরিদ্রা, মাথায় বাবরীচুল, তার উপর উষ্ণীষ বা মুকুট, কানে কুণ্ডল, কপালে রক্ততিলক, চোখ দুটি বিশাল, একটু রক্তাভ—'পদ্ম-পলাশ-লোচন' বলা যায়, নাক টিকালো, গোঁফ

জোড়া আকর্ণবিস্তৃত, পরিধানে হিন্দুযুগীয় রাজ-যোদ্ধার-বেশ—হাতে তীর ধনুক বা অসি-পরশু (দু'এক স্থানে মুঙ্গেরী বন্দুকও দেখা যায়), পিঠে ঢাল ও তূণীর। জানু পেতে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায়,...''[১০]

এই হল মোটামুটি দক্ষিণরায়ের পরিচয় এবং তাঁর রূপবর্ণনা। এই দেবতার মাহাত্ম্যসূচক যে দু একটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়—সেগুলি 'রায়মঙ্গল' নামে পরিচিত। পরশুরাম তাঁর গল্পে 'রায়মঙ্গল' এর উল্লেখ করেছেন ঠিকই কিন্তু আসল রায়মঙ্গলের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলে, বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলো মোরে দক্ষিণের রায়।।

বিনোদ তার স্বাভাবিক উকিলী বুদ্ধিতে জানতে চেয়েছিল—''ও পাঁচালি কোত্থেকে পেলেন?'' আর চাটুজ্যে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় এই 'তিনশ' বছরের পুরানো পাঁচালির সত্যতা প্রমাণ করতে চিমেশ মিত্তিরের প্রসঙ্গ এনেছেন—পরোক্ষে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন উক্ত 'রায়মঙ্গল'-এর বিশ্বাসযোগ্যতা, যা গবেষণার বিষয় হিসাবে অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ।

গল্পের মূল বিষয় হল বকুবাবুর কাহিনী। মজলিশ ভূমিকা শেষ হওয়ার পর এই কাহিনীর শুরু। বলাবাহুল্য গল্পের আরম্ভ এবং সমাপ্তিতে যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের চিত্রিত যে চিত্র আছে, সেটিও বকুবাবুর গল্পকেন্দ্রিক। প্রারম্ভের ছবিটিতে দেখা ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়, এখানে যিনি ব্যাঘ্ররূপী এবং বকুবাবুকে এইরূপেই দেখা দিয়েছিলেন সেই পাহাড় প্রমাণ দেবতা পিছনের দুটি পায়ে ভব দিয়ে, তার উপর লেজটি বিন্যস্ত করে, গোঁফগুলিকে শূন্যে নির্দিষ্ট করে, দুই থাবা তুলে ধবে ভক্তকে বরাভয় দান করছেন, দেবতা হওয়ার দরুণ তাঁর মস্তককে বেষ্টন করে দিব্যজ্যোতির বেষ্টনী। সামনে লিলিপুটের মত ক্ষুদ্রাকৃতির অতি সাধারণ তৃণসম বকুলাল হাঁটুমুড়ে, যুক্ত করে বাবাব দয়াপ্রার্থী। এই চিত্রটিও কিন্তু আসল দক্ষিণবায়কে বোঝায় না।

চাব

বকুবাবু আশি টাকা বেতনে তাঁর সহপাঠী অ্যাটর্নি রামজাদুবাবুর অফিসে কাজ করতেন। বকুবাবুর একটু হাতটান থাকায়, সামান্য উৎকোচ গ্রহণ কবতে গিয়ে চাকুরীটি খোয়ালেন। রাগের মাথায় তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। সত্যিই তো, ''...উকিলবাড়ি অমন একটু-আধটু উপরি অনেকে নিয়ে থাকে, তা বলে কি পুরানো বন্ধুকে অপমান করতে হয়?'' বকুবাবুর প্রতি সহানুভূতিব পরশ বুলিয়ে, সমাজের বিশেষ বৃত্তিজীবীর প্রতি একটু বক্রতা প্রকাশ। এ সত্যতা অস্বীকারেরও তো কোনো পথ নেই!

শনিবারের মেসের চেহারাটি অতি মনোরম। একেবারে যেন মধুবৃন্দাবন। মেম্বাররা সবাই থিয়েটার দেখতে গেছে—একমাত্র বকুবাবুর সেদিন কপাল মন্দ। তাই বাত ন'টায় খাঁ খাঁ করা মেসবাড়িতে ঢুকলেন। আর রান্নাঘরের ভিতর যা দেখলেন—সেখানে দক্ষিণরায়ের

কোনো দাক্ষিণ্য নেই। "মেসের ঝি বকুবাবুর পশমী আসনে—যেটা তাঁর গিন্নী বুনে দিয়েছিলেন—তাইতে বসে তাঁরই থালায় লুচি খাচ্ছে। মেসের ঠাকুর তাকে বাতাস করছে।" কপাল মন্দ হলে এমনই হয়। বিশেষত বাবার দয়া পেতে হলে, কপাল তো পুড়তেই হবে; নয়তো কপাল খুলবে কি করে। বকুবাবু মনে মনে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করছিলেন। বিপুল সম্পত্তির মালিক তাঁর এক বিধবা পিসী হুগলীতে থাকেন। তাঁর ছেলে ভুতো অকালে অধঃপাতে গেছে। সম্পত্তি বাখার যোগ্যপাত্র স্বয়ং বকুলাল থাকা সত্ত্বেও ওই ভুতোটাই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। তবে একজনের সর্বনাশ না হলে, অন্যের পৌষমাস আসে না। তাই বোধহয় বকুবাবুর একনিষ্ঠ তপস্যায় ভগবান সাড়া দিলেন। আর ভুতোর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছাল। আসলে এইরকম ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। এতো 'বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে' রীতিমত 'তপস্যা'—তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে প্রধান যাঁরা স্বর্গের স্ট্যাটাস অনুযায়ী একেবারে উচ্চবর্গের, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দিয়ে শুরু—"হে ভক্তবৎসল হরি, হে ব্রহ্মা, হে মহাদেব দয়া কর।" তারপর মধ্যবর্গে এসে—"হে দুর্গা, হে কালী, লক্ষ্মী, তোমাদের যে কেউ ইচ্ছে কবলে আমার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পার।" মোটামুটি দশলাখ তাঁর চাই। হতভাগা মধ্যবিত্ত ছা পোষা বাঙালি দশলাখের হিসেব করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়—বাড়ি, ফার্নিচার, গিন্নীর গয়না, অন্ততপক্ষে দু'খানা গাড়ি। শুধু তাই নয় তাব পরমশত্রু বামজাদুব প্রতি আক্রোশে ও প্রতিহিংসায়, ইচ্ছে করে "......ফুটপাথের ওপব ওর হামদো মুখখানা ঘষি।" কিন্তু এই কাজ কবতে গেলে, প্রেমের অবতারগণ তাঁর প্রতি বিরূপ হতে পারেন। সেদিকেও নজর রাখতে হয়—"হে বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, আজকের দিনে তোমরা আমায মাপ কর, তোমবা এসব পছন্দ কর না তা জানি। দোহাই বাবা সকল, আজ আমার এই তপস্যায তোমবা বাগড়া দিও না, এরপব তোমাদের একদিন খুশী করে দেব।" ধর্মেব নামে ভণ্ডামীব এও আব এক ধরন। তাই বকুবাবু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জাতের সকল দেবতাকেই স্মরণ কবেন। কাবণ তিনি কোনও ফাঁক রাখতে চান না—"হে নারায়ণ, হে দর্পহারী কৃষ্ণ, হে পয়গম্বর, হে ব্রাহ্মেব ব্রহ্ম, ইহুদীদের যেহোভা, পার্সীর অহুর, দেবদৈত্য যক্ষ রক্ষ, শয়তান--অ্যাঁ! রামো। তা শয়তানেই বা আপত্তি কি, না হয় শেষটায় নরকে যাব।" যেভাবেই হোক, সুযোগ পাওয়া নিয়ে কথা, তাই নরকে যেতেও প্রস্তুত, শুধু প্রার্থনা—'ধনং দেহি, ধনং দেহি।' এ ধন যে পথেই আসুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আর ডাকের মধ্যে কোনো ফাক ফোকর না থাকায়, ভক্তি, সুরাসুরের নাম স্মরণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাই বোধহয় কৃপা পেতে সময় লাগে না। সাইকেলের 'টিং টিং' শব্দ—'ব্রহ্মার হাঁস', 'শিবের ষাঁড়' 'বিষ্ণুর গড়ুর' নয়—তারের খবর, ভুতো মরেছে, বকুবাবুর বরাত ফিরেছে।

কোন দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেকথা বকুবাবুও জানেন না। সাইকেলের টিংটিং শব্দে গল্পরসে নিমজ্জিত পাঠকের দল যেন নগেনের সঙ্গেই শিহরিত প্রশ্ন করে ওঠে—'দক্ষিণরায়'? মজলিশি গল্প তখন জমে উঠেছে। গল্প-কথক চাটুজ্যে কিন্তু গল্পের সেই উৎসাহ ও কৌতূহলপূর্ণ পরিবেশটা নষ্ট হতে দিতে চান না। গল্পের চমকসৃষ্টিব ক্ষেত্রে মোচড় দেওয়ার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে। আর মজার ব্যাপার হল, গল্পেব মূল চরিত্র যিনি, তাঁর আগমনের

প্রতীক্ষায় পাঠক উৎসুকভাবে অপেক্ষমান, গল্প বলার ঠাসবুনুনিতে মনে হয় না, উদ্ভট কোনো কাহিনী শুনে সময় নষ্ট করছি। চাটুজ্যের বক্তব্যের মাঝে মাঝেই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে উৎকর্ণ প্রশ্ন—'দক্ষিণরায়'? শেষটায় পাঁচলাখ টাকায় যখন বকুবাবুর ''বাড়ি হ'ল, সব হল। বকুলাল নানারকম কারবার ফাঁদলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল, বকুলাল একই মাল পাঁচবার চালান দিতে লাগলেন, ধুলো-মুঠো সোনা-মুঠো হতে লাগল।'' টাকা বাড়তে লাগল, বয়স বাড়তে লাগল আর বুদ্ধি কমতে লাগল—মোটামুটি ইহজীবনের তপস্যায় সফলকাম তিনি, সেইসময় পাঠকের কথা ভেবেই যেন বিনোদ উকিলের প্রশ্ন—'কই চাটুজ্যেমশায়, বাঘ কই?' আসলে এই ধরনের গল্প যেমন গুছিয়ে বসে বলতে হয়, তেমনি গুছিয়ে বসে শুনতে হয়। এই গল্পের বয়ন প্রতিটি মুহূর্ত আর সংলাপ রচনা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে একেবারে টানটান উত্তেজনায় ঠাসা। চাটুজ্যে কিন্তু এই প্রশ্নে আর বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন না। এবার সময় হয়ে এসেছে। গল্প, কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করতে চলেছে। তাই বেশ রয়ে-সয়ে বলেন—'আসবে, আসবে, ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই আসবে।' অর্থাৎ ধীরে বৎস ধীরে—এত ব্যস্ত হলে যে, গল্পরসটাই মাটি!

পাঁচ

বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বছরে পা দিলেন, সেইদিনই রাত্রে বঙ্গমাতার স্বপ্ন। ভোগ তো অনেক হল, টাকাও তো বিস্তর জমে উঠল, একটা বিশেষ বয়সের পর ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম অনুযায়ী এবার ত্যাগও তো কর্তব্য—বিশেষত, বঙ্গদেশের এই দুরবস্থার দিনে কর্তব্যের কথা স্মরণ করাতে এসেছেন বঙ্গমাতা। কিন্তু বকুবাবুর সুখের শরীর—ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যান না, খদ্দর সয় না 'মিলের ধুতিতেই পেট কেটে যায়। আর—বোমা দূরে থাক, একটা ভুঁই-পটকা ছোড়বার সাহসও তাঁর নেই। বঙ্গমাতার পরামর্শে বকু কাউনসিলে ঢুকে পড়াই মনস্থ করলেন। কিন্তু সেখানেও সহজ ব্যাপার নয়—সহজেই যদি হবে, তাহলে দক্ষিণরায় কোন কাজে লাগবেন! অগত্যা 'যদি গবরমেন্ট তাঁকে কাউনসিলে নমিনেট করে' সেই আশায় এক সাহেবকে ধরলেন, তিনি হাজার তিনেক টাকা 'ড্রংকেন সেলার্স হোমে' দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সাহেব টাকার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না ''কারণ গবরমেন্ট যার-তার কাছে ঘুষ নেয় না।'' 'রাজনৈতিক চাঁই'কে ধরতে, 'নিখিলবঙ্গীয় সর্পনাশক ফাণ্ডের' জন্য 'চাঁইমশাই' লাখটাকা চেয়ে বসেন। টাকার অঙ্ক অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বকুলাল মুহূর্তেই অতি সৎ হয়ে যান, ঘুষ দিতে চান না।

সুন্দরবন অঞ্চলে বকুলাল কিছু জমিদারি কিনেছিলেন। কলকাতার ব্যাপারে বিফল মনোরথ বকু স্থির করলেন 'সাউথ সুন্দরবন কনস্‌স্টিটুয়েন্সি' থেকে ইলেকশনে দাঁড়াবেন কিন্তু সেখানেও বিপদ, রামজাদুও একই জায়গা থেকে দাঁড়াবেন। তিনি বেশ আটঘাট বেঁধেই কর্মযজ্ঞে নেমে পড়েছেন। নিজের দাঁড়ানোর জায়গাটাকে একেবারে পাকাপোক্ত করতে, দেশের মানুষের কাছে নিজের মহিমান্বিত রূপ-গুণ যাচাই করতে, ভবিষ্যৎ আদর্শ জননেতার ভাবমূর্তিকে বিকশিত করতে, একেবারে উপযুক্ত কাজটি করতে থাকলেন, বকুবাবুর নামে খবরের কাগজে অসাধারণ সব চারিত্রিক কুৎসা রটাতে লাগলেন। বকুবাবুর জবাবগুলো কিন্তু 'জুতসই' হল না। যেহেতু ''তাঁর তরফে তেমন জোরালো সাহিত্যিক গুণ্ডা ছিল না।''—অসাধারণ মন্তব্য,

রাজনীতির জগতে বেশ 'জোরালো' আঘাত কিন্তু সত্য বলে এই ব্যঙ্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হাসায়।

বকুবাবু ঠিক করলেন, পরিস্থিতি সামলানো যখন মানুষের অসাধ্য তখন, অগত্যা; আবার সেই ভগবানের তপস্যা। কিন্তু বঙ্গমাতাকে দিয়ে কাজ হবে না তাঁর। 'বঙ্কিম চাটুজ্যের হাতে গড়া। তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই'—এইসব বিপ্লবী দেবতারা শুধু লোক খেপাতেই পারেন। ইজিচেয়ারে শুয়ে যে প্রার্থনা তিনি 'রুজু' করলেন, তা হল—"হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুর্গা কালী ইত্যাদি, পূর্বে তোমরা একবার আমার মান রেখেছিলে, আমিও তোমাদের যথাযোগ্য পূজো দিয়েছি। তারপর নানান ধান্দায় আমি ব্যস্ত, তোমাদের তেমন খোঁজখবর নিতে পারিনি—কিছু মনে ক'রো না বাবারা। কিন্তু গিন্নী বরাবরই তোমাদের কলাটা মূলোটা যুগিয়ে আসছেন, সোনা-রুপোও কিছু কিছু দিয়েছেন। ঐ যে তাঁর রুপোর তাম্রকুণ্ড, কোষাকুষি, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শালগ্রামের সোনার সিংহাসন সে তো আমারই টাকায় আর তোমাদেরই জন্যে। আর আমিও দেখ, এখন একটু ফুরসত পেয়েই ধম্ম-কম্মে মন দিয়েছি,"—পাঠক জানেন, টেরিটিবাজার থেকে 'তিন নম্বরেব টিকি' কেনার ঘটনা। এখন আর 'ধনং দেহি' নয় 'রক্তং দেহি'। যেভাবেই হোক বামজাদুকে ঘায়েল করা—"দোহাই তেত্রিশ কোটি দেবতা, ওটাকে বধ কর। কিন্তু এক্ষুনি নয়, নমিনেশন পেপার দেবার দুদিন পরে,—নয়তো আর একটা ভুঁইফোড় দাঁড়াবে। কলেরা, বসন্ত. বেরিবেরি, হার্টফেল, গাড়িচাপা যা হয়। আমি আর বেশী কি বলব, তোমবা তো হবেক বকম জান। দাও, বাবারা, বজ্জাত ব্যাটার ঘাড় মটকে দাও—রেমোর রক্ত দাও—" রামজাদু থেকে 'রেমো' মনে করিয়ে দেয়, 'বৈবস্বত' থেকে 'বিবু'কে (বিরিঞ্চিবাবা/'কজ্জলী')। লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হল—ছা-পোষা মধ্যবিত্ত বকুলালের ঈশ্বর প্রার্থনায় একটা সকরুণ মিনতি ছিল, ভয়-ভক্তি ছিল। মানবপ্রেমের অবতারকেও চটাতে চান নি। সমাজে ওপর তলার উচ্চবিত্ত বকুলালের প্রার্থনার সুর ভিন্নতর। সেই ভয়-ভীতি বা করুণ মিনতির বদলে বেশ আদেশের সুব স্পষ্ট। 'রক্তং দেহি' বলাব ক্ষেত্রে আর প্রেমের অবতারদের পাত্তা দেন না। কিন্তু তাঁকে এবার কৃপা করলেন নিম্নবর্গের দেবতা, দক্ষিণরায়।

বকুবাবুর দ্বিতীয়বার তপস্যার ফল 'টুপ' করে শব্দ আবার সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। নগেনেব ঠোঁট নড়ে ওঠে কিন্তু 'দ' শব্দটি উচ্চারিত হতে না হতে চাটুজ্যের ধমক—'চোপ রও'। 'টুপ' শব্দটির অনুসন্ধানে বেরিয়ে এল. রামগিধড় শর্মা লিখিত, ইলেকশন সংক্রান্ত একটি পোস্ট কার্ড এবং সেই সঙ্গে জয়ের গ্যারান্টি। দেবতাদের পূজো দেবার আশ্বাস দিয়ে নিশ্চিন্ত করে, বকু নিজে নিশ্চিন্ত হলেন না, মনে মনে ভাবলেন দেবতাদেরও বিশ্বাস নেই, কাজ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং পরে একথা ভাবা যাবে। দেখা হল, 'পলিটিক্যাল পরিব্রাজক' ছোটখাট চেহারাব রামগিধড়ের সঙ্গে। "মেটে মেটে রং, ছুঁচলো মুখ, খাড়াখাড়া কান। পরনে পাটকিলে রঙের ধুতি মেরজাই গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে।" ভাষণেও বেশ 'হুয়া হুয়া' রব, বাংলার সঙ্গে হিন্দী মিশ্রিত কথা বলার জন্যে। সব মিলিয়ে নামের সঙ্গে একেবারে মানানসই তিনি। রামগিধড় তাঁর গিধড়ী বুদ্ধিতে বকুবাবুকে একটু বাজিয়ে দেখেন। অর্থাৎ বকুবাবুর রাজনীতির ধ্যানধারণাটা কেমনতর।

অর্থাৎ "তিনি স্বরাজী, না অরাজী, না নিমরাজী, না গররাজী।" বকু এর কোনোটাই নন, তবে প্রয়োজনে সবেতেই রাজী—একটাই চিন্তা, রামজাদুর পতন, তা না হলে দেশের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। রামগিধড় বকুকে 'ব্যাঘ্রপার্টি'তে যোগদান করতে বলেন। এই পার্টির সভ্যসংখ্যা 'তিনশ তেষট্টি'। এই পার্টির সেক্রেটারি গিধড় স্বয়ং। একটিমাত্র ভেকান্সি—কাউন্সিলের সমস্ত সীট তাদের দখলে। নিখিলবঙ্গীয় সর্পনাশক পার্টির মত ফাণ্ড না থাকলেও নখ-দাঁত আছে এবং বাবা দক্ষিণরায় তাঁদের সহায়। এবার বকুবাবুর ইচ্ছা হলে ক্রীডে সই করতে পারেন। বাবার প্রতিদিনের খোরাক যোগাতে পারলে বাবার কৃপায় শত্রু মারার ক্ষমতা আর কাউনসিলে অপ্রতিহত প্রতাপ। আর গভরমেন্টের চিন্তাও নেই কারণ 'গবরমেন্টের মাংসও বাবা খেয়ে থাকেন—' বিশেষ করে রামজাদুটা 'ঢ-য় দীর্ঘ-ঈ টীট' হবে জেনে বকুবাবুর 'কৃত্রিম দণ্ডে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল।' তার উপর আবার রামগিধড় রামরাজ্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে 'রামরাজ্যই হ'ক, আর রাক্ষসরাজ্যই হ'ক্, দেশের লোক বাঁচুক বা বাবার পেটে যাক, তাতে তাঁর ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তার থেকেও বড় আশ্বাস 'তাকে তুমি নিজেই বধ করো।' রামজাদু মরলে তিনি কাউনসিলে ঢুকবেন।

ছয়

অবশেষে 'সোঁদরবনে গভীর অমাবস্যা রাত্রে বাবা তাঁকে দর্শন দিলেন।' প্রথমে সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বকুকে বর দিতে চাইলেন—বকুবাবুর সেই একই প্রার্থনা, দেশহিত পরে। 'আগে রামজাদু'। এবারে বাবা নিজমূর্তি ধারণ করলেন।

পর্বত প্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কটি,
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জ্বলন্ত দেউটি।
হলুদ বরণ তনু তাহে কৃষ্ণ রেখা,
সোনার নিকষে যেন নীলাঞ্জন লেখা।
কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা,
বাঁশ ঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।
মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ তালু,
তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।
দু-চোয়াল বহি পড়ে সাদা সাদা গেঞ্জ,
আছাড়ি পাছাড়ি নাড়ে বিশ হাত লেঞ্জ।

লেজের ঝাপটার বরাভয় পেয়ে জাতে উঠে গেলেন বকুবাবু। 'দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।' বাবার ব্যাঘ্রবেশে দেখা দেওয়া ও লেজের ঝাপটের বরাভয় লাভ করে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করা—মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটি যায় বদলে। বাস্তব রাজনীতির জগৎ থেকে, চাটুজ্যের তৈরি করা সেই উদ্ভট জগতে প্রবেশ করেন লেখক আর সেই সঙ্গে পরশুরাম সুলভ তীক্ষ্ণধার খোঁচা বুদ্ধিকে শাণিয়ে দেয় আর কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলেও, তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সেই উদ্ভটত্বের মোড়কেই জীবন সমস্যা বিশ্লেষণে কাহিনীব সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী অংশটা এমনি, বাবা তাঁকে 'চরে' খেতে বললেন। কিন্তু বকুবাবু ভাত খাবেন কি করে! বাঙালি ভাত ছাড়া বাঁচে কি করে। গিন্নীও চিনতে পারবেন

না! কেঁদে আকুল হন তিনি। ব্যাঘ্ররূপ পেলে হবে কি, স্বভাবটি তো ষোল আনা বাঙালির। তাই রামগিধড়ের 'শক্র পকড়-পকড়কে খাও গে।' এই উপদেশের উত্তরে বকুলাল 'ভেউ ভেউ' করে কেঁদে উঠলেন। বিবক্ত রামগিধড় 'ঘ্যাঁক' করে তার পায়ে কামড়ে দিতে, তিনি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে একটি পগারে আশ্রয় নিলেন। পরেব দিন ক'জন চাষা তাঁকে আবিষ্কার করে, চ্যাংদোলা করে, ধরে ডেপুটিবাবুর কাছে নিয়ে গেল। এমন বাঘ কেউ কখনও দেখেনি— গাধার মতো রং, শেয়ালে কামড়ানো পা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সুস্থ করে তাঁকে আলিপুরে রাখা হয়েছে এবং সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন।

শ্লেষবক্রোক্তির মধ্যে দিযে কাহিনী শেষ হয়েছে। চাটুজ্যের বলা গল্পটি শোনবার পর স্বাভাবিক প্রশ্ন—"বাবা দক্ষিণবায কখনও গুলি খেয়েছেন?" উত্তব "গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।" কিন্তু এর পবেব প্রশ্নটি চাটুজ্যেকে একটু দমিয়ে দেয়—"তিনি না খান, তাঁব ভক্তরা কেউ খান নি কি?" চাটুজ্যেমশাই উঠে পড়েন, উপদেশ বাক্য বলে—"ঠাকুরদেবতা নিযে তামাশা ক'রো না, তাতে অপবাধ হয়।" ভাঙেন, তবু মচকান না। এইধরনের সংলাপ শোনা যায় পবশুবামেব 'বিরিঞ্চিবাবা'র ভণ্ডসাধুর মুখে। ভণ্ডামীর খোলোস যখন খসে পড়েছে তখনও বিরিঞ্চিবাবা বলছেন—'কেমন ওকপদ, এখন আশা মিটল তো? যে নাস্তিক তার দিব্যদৃষ্টি হবে কেন? ওই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না, শেষটায় মানুষের মূর্তি ধবে বিদ্রূপ কবলেন। 'দক্ষিণবায়' গল্পে চাটুজ্যের এই উক্তিতে, এই ধবনের ভণ্ডামীর প্রশ্ন নেই। এ শুধুই গল্প বলা আর শোনা। ভণ্ডামী মিশে আছে, গল্পের মধ্যে যে গল্প, সেই বকুবাবুর কাহিনীর অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং চারিত্রগত অসঙ্গতির সঙ্গে, যেখানে পরোক্ষভাবে আঘাত হানা হয়েছে—পরশুরাম-সুলভ হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে।

'দক্ষিণবায' গল্পটি মূলত কাহিনীপ্রধান। কাহিনীকেন্দ্রে আছেন বকুলাল আসল কথা হল, বকুলালের বাঘ হযে ওঠাব কাহিনী। সমাজেব স্তর বিন্যাসে সাধারণ মধ্যবিত্ত বকুলাল, দেবতাব অলৌকিক কৃপালাভে ক্রমশ সমাজেব উচ্চস্তবে আরোহণ কবেছেন। আর সামাজিক পদমর্যাদা অনুসাবে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যাব উপরে আর ওঠা যায় না। কিন্তু এতদিনের বুদ্ধিচর্চার মধ্যে দিযে যে জাযগায় এসেছেন— সেই জাযগাটিকে প্রতিষ্ঠিত কবতে কিছু যশকীর্তির প্রয়োজন। তা না হলে পরবর্তী মানুষ তাঁকে মনে বাখবেন কি করে! এই যশ প্রতিষ্ঠাব জন্য পরাধীন দেশে তো রাজা হওয়া যায় না—তাহলে না হয় ইতিহাসের পাতায় নামটি স্বর্ণাক্ষবে লেখা থাকত। আব এটা মধ্যযুগও নয় যে, দেবতাব কৃপালাভে ধন্য কালকেতু গুজরাট নগরেব বাজা হয়ে বসবেন। এ হল ব্রিটিশ শাসন ও শোষণযুক্ত এবং ইংরেজ অধ্যুযিত কলকাতা। এখানে মধ্যবিত্ত মানসিকতা সম্পন্ন বকুবাবুর দল বড়লোক হওয়াব পব বড়জোব দেশেব সেবায আত্মনিয়োগ করতে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু জীবনের একেবারে চবম চাওয়াব জাযগায় পৌঁছোতে গিযেই হয় বিপত্তি। দেবতার অদেয় কিছু নেই। আব দেবদত্ত আশীর্বাদে ব্যাঘ্রদেহ লাভ করলেও মানসিকতাকে বদলাতে পারলেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালি কোনোমতে খেযে পরে শান্তিতে জীবন কাটাবে, আব সেই শান্তি-নীড়ের তত্ত্বাবধানে থাকবেন গিন্নী, থালাভবা ভাত, একটি নির্বিবাদি শয়নকক্ষ, (যেখানে

ভাত-ঘুম দেওয়া যায়) আর পরিধানে 'সিল্কের চোগা-চাপকান (যেহেতু বড়লোক বাঙালি)। এই ভেবে আকুল হন বকুলাল—রামজাদুকে কামড়ে খাওয়ার মেজাজটাই সম্পূর্ণ বিগড়ে যায়। বর্তমান সুখের রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা মূর্তিমান অ-সুখ, তাঁর এই ব্যাঘ্রমূর্তি। জীবনের এই ট্র্যাজেডীর মোকাবিলা করতেই 'ভেউ ভেউ'করে কেঁদে ফেলেন তিনি। দুবর্লতার মুহূর্তে শেয়ালের কামড় খেয়ে বুঝতে পারেন, কী ভুল তিনি করেছেন। শেষ করব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অনবদ্য মন্তব্য দিয়ে। যেখানে তিনি থ্যাকারের রচনার সঙ্গে তুলনাসূত্রে বলছেন—"থ্যাকারের রচনায় আক্রমণ নগ্ন ও নির্মম, পরশুরামের আক্রমণ 'সুগার কোটেড কুইনিনের' মতো কোমল-কৌতুকের নেপথ্যে নিহিত।"[১১]

জাবালি : ভারতকথা

অনির্বাণ রায়চৌধুরী

পুরাণকথায় অন্তত পাঁচজন জাবালিমুনির সন্ধান পাওয়া যায়।

(১) ছান্দোগ্য উপনিষদ মতে—জাবালি ছিলেন জাবালি নাম্নী জনৈকা বারবধূর গর্ভজাত সন্তান। বাল্য বয়সে গুরু গৌতমের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের সময় পিতৃপরিচয় না জানার কথা অকপটে প্রকাশ করায় গুরুদেবের প্রশংসা পান এবং তদবধি 'সত্যকাম জাবালি' নামে অভিহিত হন। ঋষি গৌতম তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ দিয়েছিলেন।

(২) পদ্মপুরাণ মতে—জাবালি নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁর সন্তানেরাও জাবালি নামে পরিচিত ছিলেন। একদা অরণ্যে ভ্রমণকালে এক সুন্দর যুবা সাধুপুরুষকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখে তিনি কৌতূহলী হন। পরে জানতে পারেন যুবা সাধুপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। অতঃপর সেই সাধুপুরুষের উপদেশে জাবালি সুদীর্ঘকাল কৃষ্ণধ্যানে মগ্ন থেকে শরীর ত্যাগ করেন। পরবর্তী জন্মে চিত্রগন্ধা নামে গোপিকা রূপ ধারণ করে কৃষ্ণলীলা মধ্যে প্রকট হন

(৩) বিষ্ণুপুরাণ মতে—জাবালি ছিলেন মহামুনি পথ্যের শিষ্য। ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব সৃষ্ট অথর্ববেদের এক অংশ গুরু পরম্পরায় মহামুনি পথ্যের কাছ থেকে জাবালি পেয়েছিলেন।

(৪) স্কন্দপুরাণ মতে—ব্রহ্মবেত্তা জাবালি ছিলেন একজন ঘোরতর তপস্বী। তাঁর ঘোর তপস্যায় ভীত সন্ত্রস্ত দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে স্বর্গাঙ্গনা রম্ভাকে প্রেরণ করেন রম্ভার নৃত্যগীতে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ হয়। কিছুকাল একত্র বসবাস করায় তাঁদের একটি কন্যা জন্মায়। যৌবনকালে রূপমুগ্ধ রাজা চিত্রাঙ্গদ এই কন্যাকে অপহরণ করলে রুষ্ট জাবালির অভিশাপে রাজা চিত্রাঙ্গদ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হন।

(৫) প্রাচীন রামায়ণকথা থেকে জানা যায়, মহর্ষি জাবালি ছিলেন মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র তনয়। তিনি ছিলেন অথর্ববেদের আদি ভাষ্যকার। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যবহারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী ঋষি। তিনি অযোধ্যার রাজা দশরথের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা দশরথের একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও অন্যতম উপদেষ্টা

পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্ত্রী সীতাদেবী ও ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন এবং চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করছিলেন তখন কৈকেয়ী পুত্র ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে সপার্ষদ বনে গিয়েছিলেন। বশিষ্ঠাদি মুনি ঋষিদের সঙ্গে মহর্ষি জাবালিও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। সেখানে ভরতের শত অনুরোধেও রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে সম্মত না হওয়ায় রামচন্দ্রকে বোঝাতে গিয়ে ঋষি জাবালি সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কিছুটা নাস্তিকতা ক্ষণিকবাদ ও বৌদ্ধযুক্তি। তাঁর মতে, ইহজীবনের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী। পরলোক ইত্যাদির অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাও বাস্তবতাহীন। অতএব অন্ধভক্তি বা ধর্মপরায়ণতা বৃথা। পিতার প্রতি অন্ধভক্তি বশত বনবাসের কষ্ট স্বীকারও তাই নিতান্তই নিরর্থক।

মহর্ষি জাবালির এই কথায় শ্রীরামচন্দ্র প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে তাঁকে বেদবিরোধী নাস্তিক ও বৌদ্ধমতাদর্শী বলে ভর্ৎসনা করেন। তখন জাবালি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে, প্রয়োজনে কখনও তিনি নাস্তিক কখনও বা আস্তিক। কারণ জীবন ক্ষণস্থায়ী। আশ্রয়দাতা পালনকর্তা রাজার ইচ্ছানুসারে মনোভাব গ্রহণ করাই বাস্তবসম্মত ব্যাপার। কুলগুরু বশিষ্ঠ তখন রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করেন এবং বলেন যে, মহর্ষি জাবালি ব্যবহারবুদ্ধি সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ মহাতপস্বী। তিনি বেদ, ধর্ম, ঈশ্বর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। শুধুমাত্র রামচন্দ্রকে বনবাসের সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যই জাবালি এ ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

সম্ভবত শেষোক্ত এই পুরাণকথাদুটি থেকে কাহিনীসূত্র নিয়ে ব্যতিক্রমী চরিত্র মহর্ষি জাবালিকে অবলম্বন করে বচিত হয়েছে পরশুরামের বিখ্যাত গল্প—'জাবালি'। গল্পটি লেখকের 'কজ্জলী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দুই

'জাবালি'-গল্পের কাহিনীসূত্র হিসেবে পরশুরাম শুধুমাত্র বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ থেকে জাবালি-উপাখ্যান গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। গল্পটির সূচনায় তিনি লিখেছেন—জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্যন্ত আছে। যাহা নাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

অর্থাৎ রামচন্দ্র-জাবালির কথোপকথন পর্যন্ত রামায়ণের বিষয়। জাবালি গল্পে ঘটনাসমূহ লেখকের নিজস্ব কল্পনামাত্র। তবু এই গল্পে পৌরাণিক রস বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। লেখার প্রসাদগুণে গল্পটি অত্যন্ত উপাদেয় হয়ে উঠেছে। আগাগোড়া গল্পটিতে তথ্যসঞ্চয় ও বিন্যাসের কারুকার্য পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে।

পরশুরামের 'জাবালি' গল্পের মূলত তিনটি পর্ব। (ক) জাবালি-বালখিল্য সমাচার, (খ) জাবালি-ঘৃতাচী উপাখ্যান এবং (গ) জাবালি-যমপুরী বৃত্তান্ত।

ধর্মবুদ্ধি বিচার সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ায় জাবালি শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক ভর্ৎসিত হন। ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় একদিন খর্বট, খুল্লাট, খালিত প্রমুখ বালখিল্য মুনিগণ তাঁকে অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দেওয়ার ছলে তাঁর প্রতি চরম অবমাননাকর ও অপমানসূচক আচরণ করেন। ক্রুদ্ধ জাবালি পত্নীর পরামর্শে তাঁদের খেদিয়ে দেন। এই বিষয়টি জাবালি-বালখিল্য সমাচার।

অযোধ্যার সরযূ তীর সংলগ্ন পর্ণকুটীর ত্যাগ করে পত্নী হিন্দ্রলিনীকে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে শতদ্রু তীরে পর্ণকুটীরে বাসকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সন্দেহ হয় যে লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে মহর্ষি জাবালি হয়তো বা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিরত রয়েছেন। ফলে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য দিব্যাঙ্গনা ঘৃতাচীকে জাবালির আশ্রমে প্রেরণ করা হয়। মহর্ষি জাবালির আশ্রমে ঘৃতাচীর চরম দুর্দশা ঘটে। কারণ জাবালিকে ঘৃতাচী পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। তাঁর যৌবন মদালস শরীর, বিলোল কটাক্ষ, স্বর্গসুখের আহ্বান, অবহেলায় ত্যাগ করে জাবালি পত্নীনিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় স্থাপন করেছেন। এটিই জাবালি-ঘৃতাচী উপাখ্যান।

ঘৃতাচীর মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্রকে দেওয়া মহর্ষি জাবালির আশ্বাস সত্ত্বেও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হারানোর ভয় দূরীভূত হয়নি। জাবালিকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দেবর্ষি নারদের

সঙ্গে তিনি পুনরায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। দেবর্ষির পরামর্শে নৈমিষারণ্যে আহূত ব্রহ্মাপুত্র প্রজাপতি দক্ষ, সনকাদি ঋষিদের এক বিশাল সভায় মহর্ষি জাবালিও নিমন্ত্রিত হন। সেখানে সত্য ও ত্রেতা যুগে পাপ-পুণ্যের অবস্থান বিচারসভার তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনিসহ প্রায় সকলেই সমস্বরে অভিযোগ করেন যে, পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। এই বিচারসভার বিধানে বলপূর্বক নারদ প্রদত্ত চৈনিক হলাহল মহর্ষি জাবালির শরীরে প্রয়োগ করায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত জাবালি রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে রক্তমালা ধারণ করে গর্ধভবাহিত রথে যমপুরীতে গেলেন। সেখানে ধর্মরাজের সঙ্গে সমস্ত যমপুরী পরিভ্রমণ করে যমপুরীর বৃত্তান্তসকল প্রত্যক্ষ করলেন। পরিশেষে যমরাজের কাছে জানতে পারলেন যে, মুনি-ঋষি দেব-দানব-মনুষ্য আদি সবাইকেই একবার না একবার পাপমুক্ত হতে যমপুরীতে আসতেই হয়। মানসিক দৌর্বল্য বশত তাঁর যেটুকু দুষ্কর্ম ঘটেছে, তাতেও নিজের সঙ্গে যেহেতু তিনি আত্ম প্রবঞ্চনা করেননি, তাই মহর্ষি জাবালিকে তদ্রুপ পাপ স্পর্শ করেনি। এটিই হল জাবালি-যমপুরী বৃত্তান্ত। আসলে এটি হল স্বপ্নদৃশ্য। মারাত্মক বিষপ্রয়োগে নিদ্রায় অচেতন হয়ে জাবালি যমালয় দর্শন করেছেন।

পরশুরামের 'জাবালি' গল্পে এই তিনটি পর্ব ছাড়াও আছে সূচনা ও সমাপ্তি অংশ। সূচনায় রয়েছে রামায়ণ কথা অনুসরণে রামচন্দ্র-জাবালি কথোপকথন। এবং সমাপ্তিতে রয়েছে জাবালি-ব্রহ্মাদেব কথালাপ ও উভয়ের বরলাভ বৃত্তান্ত।

তপঃ প্রভাবে চৈনিক হলাহলের প্রভাব বিনষ্ট হওয়ায় মহর্ষি জাবালি অচেতন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেখলেন যে, তিনি পতিব্রতা হিন্দ্রলিনীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। চৈতন্যলাভ করে আরও দেখলেন যে তাঁব সামনে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন। এবং তাঁকে ইচ্ছানুযায়ী বর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু বিগতস্পৃহ জাবালি তাতে অসম্মত হন। কারণ ইহ জীবনের সুখ শান্তি বা অমরত্ব কোনটির প্রতি তাঁব কোন আগ্রহ নেই। তাই ব্রহ্মা মহর্ষি জাবালিকে 'সাবলম্বী মুক্তমতি, যশোবিমুখ তপস্বী' বলে অভিবাদন জানিয়েছেন। এবং মানবমনকে সংসারের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য তাঁর মত ও মন্ত্র লোকসমাজে প্রচারের আর্তি জানিয়েছেন। এখানে ব্রহ্মা হয়েছেন মহর্ষি জাবালির কাছে বরপ্রার্থী। মহর্ষি জাবালি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সম্মতি জানিয়ে বলেছেন—'তথাস্তু।' লেখক পরশুরাম এভাবেই তাঁর 'জাবালি' গল্পের উপসংহার টেনেছেন।

তিন

পরশুরামের জাবালি গল্পে অনেকগুলি চরিত্রের দর্শন পাওয়া যায়। যেমন—শ্রীরামচন্দ্র, বালখিল্য মুনিগণ, জামদগ্ন্যমুনি, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবর্ষি নারদ, দক্ষ প্রজাপতি, যমবাজ, প্রজাপতি ব্রহ্মা, স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, জাবালি-পত্নী হিন্দ্রলিনী এবং স্বয়ং মহর্ষি জাবালি। চরিত্রগুলি স্বল্পরেখায় সুঅঙ্কিত হয়েছে—কাহিনীর সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে গেছে, গল্পরসকে আস্বাদ্যমান করে তুলেছে।

রামচন্দ্রের সঙ্গে জাবালির কথোপকথনের মধ্যে রামচন্দ্রের ধর্মনিষ্ঠা ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা গেলে বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর অসম্মানজনক উক্তি, জাবালির প্রতি কঠোর নিন্দাবাক্য এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি তাঁর চরিত্রকে কিছুটা কালিমালিপ্ত করেছে বলে মনে হয়।

বালখিল্য মুনিগণ ক্ষুদ্রকায়—'খর্ববপু, বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর।' তদুপরি তাঁরা কোপন স্বভাব, পরছিদ্রান্বেষী, কলহপ্রিয়, ষড়যন্ত্রকারী। এই বালখিল্য মুনিদের প্রতিনিধি হলেন—খর্বট, খুল্লাট, খালিত প্রমুখ। বেদবিরোধী ও পাপযুক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত মহর্ষি জাবালির প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য তাঁরা যেভাবে জাবালির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে জাবালিকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছেন তাতে তাঁদের মিথ্যা ভাষণ, আত্মম্ভরিতা ও লোভী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁদের বিধান এইরূপ—'হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাক, তবে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ক্রয় স্বরূপ তিনশূর্প তিল ও শত নিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।' এছাড়া, যমপুরীতে পরিভ্রমণকালে বালখিল্যমুনিদের যমালয়ে দেখে মহর্ষি জাবালির প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানিয়েছেন, 'আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।'

ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্যার্জুন মহাতপস্বী জমদগ্নিকে হত্যা করায় জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম তাঁর শানিত কুঠারে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। নৈমিষারণ্যে আহূত সভায় তিনি বেদবিরোধী মহর্ষি জাবালিব জন্য ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ হয়েছে বলে অভিযোগ করে বলেছেন—'এই জাবালি ভ্রষ্টাচার উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই, রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন। বালখিল্যগণকে এই দুরাত্মাই নির্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।' জামদগ্ন্যমুনির এই উক্তির মধ্যে দিয়েই তাঁর চরিত্রটিও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি উগ্র স্বভাব, অহংকারী ও ব্রাহ্মণ হয়েও হত্যায় ইন্ধনকারী। রামায়ণে আছে—শ্রীরামচন্দ্র এঁর দর্পচূর্ণ করেছিলেন।

পুরাণে বলা হয়েছে—দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান আদিত্য। ঋকবেদের ইনিই প্রধান দেবতা। কিন্তু পুরাণকথায় ইনি স্বর্গাধিপতি। অমোঘ বজ্রধারী। শচীপতি। তবু এঁর দুষ্কর্মের কথা সর্বজন বিদিত। পুরাণমতে ইন্দ্রত্ব হল পদবিশেষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্নজন অধিকারী হয়ে থাকেন। তাই এই পদ হারানোর ভয়ে ইন্দ্র সর্বদাই ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন। যখন কেউ গভীর তপস্যায় মগ্ন হন তখনই তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শতদ্রুতীরে মহর্ষি জাবালির নির্জনবাস তাই দেবরাজ ইন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলেছে। দেবর্ষি নারদের সঙ্গে পরামর্শ করে জাবালির ধ্যানভঙ্গের জন্য দিব্যাঙ্গনা ঘৃতাচীকে জাবালির আশ্রমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর ব্যক্তিত্বটিও যথেষ্টই সরস। অপ্সরীশ্রেষ্ঠা উর্বশী আবার মর্ত্যলোকে যেতে অনিচ্ছুক শুনে ইন্দ্রদেবের মন্তব্যটি তার প্রমাণ।

জাবালির কাছে কোন অপ্সরাকে পাঠানো উপযুক্ত হবে, সে বিষয়ে নারদের যুক্তি—'জাবালিও যুবা নহে। একটি গৃহিণীবাহিনী জাতীয়া। অপ্সরাই তাঁহাকে ভালরকম বশ করিতে পারিবে।' অতঃপর উপযুক্ত বিবেচনা করে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে রূপসী ঘৃতাচীকে নির্বাচন করা হয় এবং তার সঙ্গে যখন নানা উপঢৌকন পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়, তখন নারদের সরস উক্তি—'আর একশত বন্য কুক্কুট। ঋষি বড়ই মাংসাশী।' নৈমিষারণ্যে সাধুসমাবেশে মহর্ষি জাবালির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ইন্ধন যোগানোর মধ্যে দিয়ে দেবর্ষি নারদের ষড়যন্ত্রপ্রিয় চরিত্রের প্রকাশ ঘটে।

দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাশাসনের জন্য ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে এঁর আবির্ভাব। মনুর কন্যা প্রসূতি এঁর স্ত্রী। এঁদেরই কন্যা সতী। ভয়ানক অহংকারী ও প্রভুত্ব পরায়ণ দেবতা। প্রচলিত পুরাণ কাহিনী অনুসারে—জামাতা দেবাদিদেব শংকরের সঙ্গে বিবাদের জেরে অপমানিত দক্ষ শিবহীন বৃহস্পতি যজ্ঞ করেন। যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা হওয়ায় কন্যা সতী সেখানে আত্মহত্যা করেন। তখন মহারুদ্র শংকরের ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হয় ও শিবনিন্দার কারণে দক্ষকে ছাগমুণ্ড ধারণ করতে হয়। 'জাবালি' গল্পে তাঁর ভূমিকা যৎ কিঞ্চিৎ। দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় আহূত নৈমিষারণ্যের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভাস্থ সকলে যখন জাবালিকে পাপাত্মা বলে নিন্দা করেন ও জমদগ্নিপুত্র তাঁর কুঠার দিয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন দক্ষ প্রজাপতি বাধা দেন। গল্পকারের বিবরণ এইরকম—'স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত! ছি ছি মনু কি মনে করিবেন। বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।'—দক্ষের এই উক্তি থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে যে ক্ষেত্র বিশেষে দক্ষ প্রজাপতি স্থিরপ্রজ্ঞ হলেও তিনি শ্রেণীস্বার্থবাদী, প্রভুত্বকামী ও ঠাণ্ডামাথার দণ্ডদাতা।

যমরাজ সূর্য ও সংজ্ঞার সন্তান। বৈবস্বত মনুর অনুজ ভাই। তিনি দক্ষিণের দিকপাল ও নরকের অধীশ্বর। মহিষবাহন ও মৃত্যুর দেবতা। 'জাবালি' গল্পের স্বপ্নদৃশ্যে যমপুরী দর্শনের সময় যমরাজের সঙ্গে জাবালির সাক্ষাৎ ঘটে। যমরাজ মহর্ষি জাবালির কাছে তাঁর কর্মের জন্য মনবেদনা প্রকাশ করে জানিয়েছেন—'হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠান সকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষাহেতুই আমাকে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়।' মৃত্যুর পর যমালয়ে আগত মুনি-ঋষিরাও নরক দর্শনের জন্য তাঁকে বাপ-বাপান্ত করেন ও অভিশাপ দিয়ে থাকেন।

স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী ইন্দ্রসভার একজন নৃত্য পটীয়সী রমণী। তপস্বীদের তপোভঙ্গ করার জন্য স্বর্গাঙ্গনাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। সেইমত মহর্ষি জাবালির ধ্যানভঙ্গের জন্য ঘৃতাচীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলংকার দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রচুর উপঢৌকন সব জাবালির আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল। জাবালির শতদ্রু তীরস্থ আশ্রমে তখন ঘোর বর্ষা। তাঁর আগমনে আশ্রম সহসাই বর্ষামুক্ত হয়ে বসন্তের আবির্ভাব ঘটায়। মহর্ষি জাবালি তখন শতদ্রুতীরে নিবিষ্ট মনে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। 'আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে' তিনি বিচলিত ও চমকিত হয়ে দেখলেন—'এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।' অতিশয় পিচ্ছিল ও উপল বিষম সৈকত ভূমিতে নৃত্যরতা দিব্যাঙ্গনার আছড়ে পড়ে কোমল অস্থি ভাঙতে পারে—এই আশংকায় আশঙ্কিত জাবালি ঘৃতাচীর কাছ থেকে তাঁর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হলেন। কিন্তু তাঁর বিলোল কটাক্ষ, স্ফুরিত অধর, নিটোল নিখুঁত চিরযৌবনের লোভ দেখিয়েও ঘৃতাচী পত্নীনিষ্ঠ জাবালিকে ভোলাতে পারলেন না। সেই সময় জাবালি-পত্নী হিন্দ্রলিনী তাঁকে ঝাঁটাপেটা করায় ঘৃতাচী দারুণ ভয় পান। মুহূর্তে কন্দর্প পরিকল্পিত বসন্তের পরিবেশ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন জাবালি প্রথমে তাঁর পত্নীকে প্রসন্ন করেন এবং ক্রন্দনরত ঘৃতাচীকে আশ্বস্ত করে স্বর্গে ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে নির্ভয় হওয়ার সংবাদ দিতে বলেন। গল্পকারের বিবরণ এইরকম—'ঘৃতাচী কহিলেন—তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না, হা, এমন দুর্দশা আমার কখনো হয় নাই।'—স্বর্গনারী ঘৃতাচীর এই উক্তির মধ্যে তাঁদের মত রমণীদের অসহায়তার পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

হিন্দ্রলিনী মহর্ষি জাবালির পত্নী। তাঁর পরিচয় পুরাণে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। অবশ্য চরিত্রটি লেখক পরশুরামের পুরোপুরি কাল্পনিক সৃষ্টি নয়। চরিত্রটি গল্পে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। জাবালি চিরকালই ইহলোকবাদী ও পেটুক প্রকৃতির মানুষ। অরণ্যের আদিবাসী সমাজ তাঁর ভক্ত। তাঁরাই অধিকাংশ সময় জাবালিকে ভোজ্য ইত্যাদি যোগান দিয়ে থাকেন। হিন্দ্রলিনী সেই সমস্ত সামগ্রী থেকে আহার্য প্রস্তুত করেন। যেমন—যবপিণ্ড থেকে তৈরি মোটামোটা খান কয়েক সেঁকা রুটি ও শূলপক্ব মৃগমাংস। তাঁর মনে শুধু দুঃখ এই যে, তিনি পুত্রবতী হতে পারেন নি। স্বামীর সম্পর্কে তাঁর ধারণা—'স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই—ইহলোকে দুবেলা নিযমিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষ্যপুত্রের কথা তুলিতে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যাকে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়।' তবু জাবালির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও নিষ্ঠা অটুট। স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী যখন জাবালিকে নানাভাবে প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন, তখন হিন্দ্রলিনীর সহ্য হয়নি। ঝাঁটাহাতে ছুটে এসে ঘৃতাচীর পিঠে ঘা কয়েক বসিয়ে দিলেন। গল্পকারের সরস বর্ণনা এই রকম—'হিন্দ্রলিনী কহিলেন—হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচী, তোর আস্পর্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস। আর ভো অজ্জ উত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপলী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে!'—এই উক্তির মধ্যে দিয়েই হিন্দ্রলিনী নারী-সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে ঘৃতাচীকে কপালপুড়ি, উৎকপালী, বেড়ালচোখী, মায়াবিনী বলে গালাগাল, অন্যদিকে আর্যপুত্র জাবালিকে 'বেআক্কেল' বলে ভর্ৎসনা—হিন্দ্রলিনীর চরিত্রকে বাস্তব করে তুলেছে। পৌরাণিক পরিবেশে হিন্দ্রলিনী যেন চিরকালীন নারী চরিত্র।

পরশুরাম তাঁর গল্পটির নাম রেখেছেন—জাবালি। স্বভাবতই জাবালি চরিত্রটি এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁকে ঘিরেই এ গল্পের কাহিনী পল্লবিত ও গতিশীল হয়েছে। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জাবালি-পত্নী হিন্দ্রলিনীর নির্বাক্যটি প্রথমেই স্মরণযোগ্য। হিন্দ্রলিনী মনে করেন—'তিনি একটি সৃষ্টি বহির্ভূত লোক, কাহারও সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাকে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপ, তপ নাই, অগ্নিহোত্র না, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারে।' জাবালি দরিদ্র কিন্তু অসৎ নন। কাউকে ঠকিয়ে বা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে কিছু গ্রহণ করেন না। তাঁর চিন্তাধারা বড়ই অদ্ভুত। লেখক পরশুরাম লিখেছেন—'জাবালি তখন সরযূতীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—'এই অন্ন-জলাবলম্বী মানবশরীরে পঞ্চভূতের কিংবিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাট্যোষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা।' এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় চিন্তাভাবনা সর্বদাই ব্যাপৃত থাকে। তাই বালখিল্য মুনিদের তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারেন—'তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান হও।'

বালখিল্যদের কাঞ্চনমূল্যে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান শুনে জাবালি তাঁর শ্রেণীস্বার্থকে সমর্থন করেননি। বরং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মতেজের ধারাণাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। জাবালির শরীর ছিল শালপাংশুবৎ বিশাল। কিন্তু অযথা কারোর ওপর বলপ্রয়োগ করেন না। তবু বালখিল্য মুনিদের অশিষ্ট আচরণে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে পত্নী হিন্দ্রলিনীর পরামর্শে তাঁদের ওপর বলপ্রয়োগ

করে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। দক্ষ প্রজাপতি নৈমিষারণ্যের সভায় তাঁর মার্গ দর্শন কি, তিনি নাস্তিক কি না—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে জাবালি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন যে, তিনি নাস্তিক কি আস্তিক তা তিনি নিজেই জানেন না। দেবতাদের কাছে তাঁর জীবনের তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানিয়ে তাঁদের বিব্রত করেন না। নিজ বুদ্ধিবলে তাঁর কার্য তিনি চালিয়ে নিয়ে যান। তিনি বলেন—'আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্তন সহ।' দক্ষ তাঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেন নি জানালে তিনি প্রায় ব্যঙ্গ করে বলেন—'হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না।' জাবালির মত বাস্তববাদী ঋষি সেযুগে প্রায় দেখাই যায় না। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি বাস্তবসম্মত যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তাতেও তাঁর পরলোকের প্রতি আস্থাহীনতা ও ইহলোকপ্রিয়তাই প্রকাশ পেয়েছে। রামচন্দ্র তাঁকে বেদবিরোধী ও বৌদ্ধপন্থী বলে ভর্ৎসনা করলেও তিনি রামচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হননি। বরং রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হয়েছেন। সাংসারিক অভিজ্ঞতাহীনতা ও প্রথাগত ধর্মশিক্ষা যে রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখের ছায়া ফেলতে পারে, তা ভেবেই তিনি মনে মনে আশঙ্কিত হয়েছেন।

মহর্ষি জাবালি শুষ্কহৃদয় তপস্বী ছিলেন। স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী এবং পত্নী হিন্দ্রলিনীর সঙ্গে সরস কথোপকথন তার চরিত্রের কোমলতাকেই প্রকাশ করেছে। এমন কি যমপুরীতে পরিভ্রমণকালে তাঁর নিন্দাকারী বালখিল্যমুনিদের দেখে তিনি ঈষৎ ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করেন—'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়েছে?' জাবালি সরল সহজ লোভহীন ঋষিপুরুষ। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা করতে বলায় জাবালি সম্মত হননি, কিন্তু ব্রহ্মা যখন বর দেওয়ার জন্য জাবালির কাছে প্রার্থী হয়েছে, তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন—'তথাস্তু।' তাঁর চরিত্রগুণে মুগ্ধ ব্রহ্মা তাই বলেছেন—'হে সাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর, তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। হে মহাত্মন, তুমি অমরত্ব লাভ কবিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংসারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।'

পৌরাণিক সাহিত্যে তাই মহর্ষি জাবালি প্রকৃতিই এক বিরল চরিত্র। গল্পকার পরশুরাম সেই পৌরাণিক কিন্তু বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন, সংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী চরিত্রটিকে অবলম্বন করে কল্পনার রস মিশিয়ে অত্যন্ত সরস ভঙ্গিতে সুনিপুণ আধুনিক পাঠকের জন্যেই তাঁর 'জাবালি' গল্পটি রচনা করেছেন।

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড : প্রখর সমাজদৃষ্টির আলোয়

শ্রাবণী পাল

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটির মধ্যে দিয়েই বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরামে'র আবির্ভাব। কোনো 'কুঠার' যদি তাঁর হাতে থাকে তবে তা ধাতব নয়, ব্যঙ্গকৌতুক নির্মিত। ১৯২২ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যখন গল্পটি প্রকাশিত হয় রাজশেখর বসুর বয়স তখন বিয়াল্লিশ। অর্থাৎ একটু যেন বেশি বয়সেই সাহিত্য ভুবনে তাঁর প্রবেশ এবং প্রবেশ মাত্রই তিনি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শেয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লিমিটেড কোম্পানির উত্থান-পতন, দুর্নীতি ও প্রতারণা কখনো আবার এই দুষ্কর্মের সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে নানারকম ভণ্ডামি-এসবই প্রতিফলিত হয়েছে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে। এ গল্প বাস্তব, তবে তার প্রকাশভঙ্গি তির্যক।

শ্রী শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী এই লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার 'সুযোগ্য' সহচর গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া এই কোম্পানির শেয়ার বাজারে ছাড়বেন এবং এদের হাতে পড়েছেন প্রবীণ অবসর প্রাপ্ত 'বিচক্ষণ' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়সাহেব তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত প্রায় নিমজ্জিত কোম্পানির ভার এই 'বিচক্ষণ' রায়সাহেবের ওপরেই ন্যস্ত করে শ্যামবাবু ও গণ্ডেরিরাম 'য পলায়তে স জীবতি' প্রবাদের মুখরক্ষা করেছেন। যে দেশকালের গর্ভে এই গল্পের জন্ম সেই সময়েই দিকে একবার তাকানো যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। অবিশ্বাস অপ্রেম আর হঠকারিতায় তখন জীবনযাপন আমাদের, শেয়ার বাজার এই জীবনযাপনেরই একটা দিক। একদিকে এ যেমন ব্যবসা, অন্যদিকে আবার 'ভোজবাজি' কেননা ব্যবসার সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রব নেই। ইংরেজ সরকার নিজেদেব প্রয়োজনে এ বাজার তৈরি করেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে এবং কলকাতা শহরে শেয়ার কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে বেশ বড় একটা বাজার জায়গা করে নিয়েছে। সেদিন অনেক লোকই শেয়ার কেনাবেচা করে অর্থ এবং প্রতিপত্তি দুই-ই লাভ করেছিলো। বলা বাহুল্য, স্বল্প আয়াসে ধনী হবার আকাঙ্ক্ষায় সেদিন অনেকেই শেয়ার বাজারকে অবলম্বন করেছিল, ফলে মিথ্যাচার ও দুর্নীতিই ছিল বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর মূলধন। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখব শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী আর গণ্ডেরিরাম কীভাবে নানারকম মিথ্যার আড়ালে, ছলনা-কৌশলে তাদের কার্যসিদ্ধি করেছেন।

গল্পটির শুরুতেই পরশুবাম জুডাস লেনের প্রাচীন এবং জীর্ণ একটি তেতলা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছেন পাঠককে। বেলা এগারটায় একতলার অন্ধকাবময় মালের গুদাম আর 'আশ্রমমৃগের' মতো নিঃশঙ্কচিত্তে সতত সঞ্চরমান ইঁদুর আর আরশোলায় ভর্তি সিঁড়ি পেরিয়ে এসে পাঠক দেখেন তেতলার একটি ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল মার্চেন্টস।' আব এইখানেই পাঠকের ভ্রূকুঞ্চিত জিজ্ঞাসার শুরু ব্রহ্মচর্য আর ব্যবসার স্বপ্ন একসঙ্গে? পাঠক ক্রমশ জানতে পারেন, এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ওষুধের কারবার করতেন, ব্যবসার লাভের পরিমাণ আরো বাড়াতে

পারলেই ই. বি. রেলওয়ে অডিট অফিসের চাকরিটি ছেড়ে দেবেন। নিঃসন্তান এই শ্যামবাবু 'ধর্মভীরু' লোক, পঞ্জিকা দেখে পা ফেলেন এবং অবসর মতো তান্ত্রিক সাধনা করে থাকেন। অফিসে এসেই মন্ত্র বলতে বলতে চারদিকে 'কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক' ছিটিয়ে দেন এবং 'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গা গ্রাফ' নামক যন্ত্রের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লেখেন। এই রবারস্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রী শ্রী দুর্গা' খোদিত আছে, 'সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়' অভিনব এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন, শ্যামবাবুর শ্যালক। বি.এস.সি সম্প্রতি পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে এ. এস. এস. এবং তা নিজের নামের সঙ্গে বিপিন যুক্তও করেছে। লেখকের বিদ্রুপ এখানে গোপন থাকেনি সেইসব নব্যযুবকের প্রতি যারা বিদেশি ডিগ্রি 'অর্জনের' জন্য উন্মুখ। সেসময়ে পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে পারলেই যে ভুয়ো ডিগ্রি পাওয়া যায়, সেই রূঢ় যুগপৎ লজ্জাজনক 'সত্যের' দিকে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসমান চরিত্রগুলি খুব জটিল নয়, বরং বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন সদ্যোজাত অ্যাটর্নি অটলবাবু, 'বয়সে নবীন হলেও চাতুর্যে পরিপক্ক', সবার আগে সে-ই নিজের শেয়ার বিক্রি করে দিতে চেয়েছে, আরো বেশি লাভের জন্য ছুটে নিজের 'লোকসান' করেনি। তিনকড়িবাবু 'জবরদস্ত হাকিম', দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না কিন্তু লাটসাহেবের কাছ থেকে বড় খেতাব পাবার জন্য 'তন্ত্রেমন্ত্রে' বিশেষ আপত্তি নেই, মিটিঙ্ একটু ঘনঘন করতে চান কেননা ডিরেক্টরস্ ফী বাবদ কিছু অর্থ তাহলে তার পকেটে আসে, বাড়ির পুরোনো কাঁসর মন্দিরের কাজে লাগতে পারে ভেবে কিছু সস্তায় বিক্রি করতে চান। তার স্কন্ধারোহী নিষ্কর্মা শ্যালীপোকে কোম্পানির কাজে লাগিয়ে দিতে চান। কোল্ডহাম সাহেবের প্রতি আনুগত্যে তিনকড়িবাবুর 'ঔপনিবেশিক' চেহারাটাই বেশি করে ফুটে ওঠে। নতুন কলেজ-পাস ছোকরা তিনকড়িবাবুর কাজে 'গলদ ধরবার আস্পর্ধা' দেখালে তিনি শরণ নেন সাহেবের, 'তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না'। এহেন তিনকড়িবাবু শ্যামানন্দ আর গণ্ডেরিরামের চাতুর্যের কাছে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। শেয়ারের কেনাবেচার প্রতারণার কারবারে শুধু যে অর্থ-বিনিয়োগের বোকামি করেছে তা নয়, দেড় বছর পরে ব্যবসা যখন 'ফেল' করেছে তখনও একহাজার টাকা পারিশ্রমিকের লোভে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবার ফাঁদে পা দিয়েছে, শ্যামবাবুর ১৬০০ শেয়ারের পিছনে আশি টাকা ঢেলে আরো ৩২০০ টাকাব দায় ঘাড়ে নিয়েছে। লেফাপা দুরস্ত কাজ তার পছন্দ, 'আমার কাছে কারো চালাকি চলবে না'—উচ্চকিত এই ঘোষণার পর আমরা দেখি কোম্পানির ডিরেক্টরদের কৌশলের কাছে উৎসর্গীকৃত এক 'বলির পশু'কে, বিমূঢ় তিনকড়িবাবুকে বসিয়ে রেখে একে একে সকলে গাত্রোত্থান করেছে।

তবে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের মূল আকর্ষণ বোধহয় গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, শ্রী শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর 'বিশেষ বন্ধু-বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া' এক 'খোট্টা' অসাধু ব্যবসায়ী, 'বহুত বাঙ্গালীর সঙে মিলা মিশা' করেন, 'বাংলা কিতাব ভি অন্‌হেক' পড়েছেন— 'বঙ্কিমচন্দ্ রবীন্দরনাথ অ্যাউর ভি সব', কবীরজীর 'বচন' উদ্ধার করে সংসারের অধিকাংশ

মানুষের চরিত্রটি স্পষ্ট করেছেন—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট।।

এর 'মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।' অবাঙালি ঝানু এই ব্যবসায়ীর কাছে কিভাবে যেন ধরা পড়েছিল সাধারণ মানুষের গড্ডলিকাপ্রবাহে গা-ভাসানোর প্রবণতাটুকু। এই লোকচরিত্রাভিজ্ঞতার জন্যই বোধহয় সে বলতে পেরেছিল—'বঙ্গালী ধরম জানে না, তিস রূপায়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রূপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্ ভি করে হিসাবসে।' এবং পাপকর্ম থেকেও যে পুণ্যের 'কমিশন' যেভাবে পায় তা সত্যই আশ্চর্যের এবং গণ্ডেরিরামের মিশ্রভাষাতেই সম্ভবত তা সম্যক প্রকাশ পেতে পারে। গণ্ডেরি পঁচিশ হাজার টাকা মূলধন করে সাড়ে চৌবিবশ হাজার মুনাফা করেছিল। কিন্তু সেটা পাপ নয়—"পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাক সে শুংখি-হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি-রূপয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে, পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হমার কি? যদি ফিল্ কুছ দোষ লাগে জানে রণ্‌ছোড়জী হমার পুন্‌ভি থোড়া বহুত জমা আছে......"

কেননা গণ্ডেরি একাদশী শিবরাত্রি রামনবমীতে উপবাস করে, আধটা ধর্মশালাও 'বানিয়েছে' সে, বা গণ্ডেরিরামের 'তদারকি'তে তৈরি হয়েছে সেগুলি। পুণ্যসঞ্চয়ের এই ভাবনা সত্যই অভিনব—'হামি' সলাহ্ দিয়েছি তব না রূপয়া খরচ কিয়েছে', অর্থাৎ তার টাকা কিংবা পরামর্শ, যদি কেউ তা অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় তবুও গণ্ডেরির পুণ্যার্জনে টান পড়ে না। কেননা গণ্ডেরির উদ্দেশ্য তো 'মন্দ' ছিল না। প্রয়োজনমতো নিজের সুবিধামতো বানিয়ে তোলা এই ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয় 'নীতি'র কোনো বালাই চরিত্রটির নেই। অতীব বিচিত্র যুগপৎ 'ডাইনামিক্' এই চরিত্রটি শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ব্যবসায়িক বন্দোবস্ত করেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে চলে যান, তারপরেই 'রবীন্দরনাথে'র রচনা উদ্ধার করেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নেহি

অর্থাৎ মার্চেন্ট অফিস থেকে রেসের মাঠ, রেসের মাঠ থেকে ধর্মসভা—সবকিছুতেই গণ্ডেরিরামের অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। যে সময় শুধুমাত্র নিজের 'সমৃদ্ধি'র কথাই ভাবতে শেখায়, 'সত্য'কে নিজের প্রয়োজনমতো 'বানিয়ে' তুলতে শেখায়, সেই সময়েই গণ্ডেরিরামের মতো চরিত্রেরা জাঁকিয়ে বসে।

অ্যাটর্নি অটল যথার্থই মন্তব্য করেছে—'আমাদের শ্যাম-দা ও গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।' সত্যই ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতারণায় দুজনেই সিদ্ধহস্ত। তবু কোথাও যেন একটা পার্থক্যও আছে। ধর্মভীরু বাঙালি হিসেবে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীর কল্পনা একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকে যায়, কিন্তু গণ্ডেরি জুয়াচুরিতে এতই পটু যে 'ধর্ম' নিয়ে সে ভাবে না, এমনকি অভিনব

উপায়ে 'পুণ্যের' দোহাই দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে। গণ্ডেরিরাম বাটপড়িয়া তার নামের মধ্যেই নিহিত তার চরিত্র, কিংবা তার চরিত্রের অনিবার্য প্রতীক তার নাম। আসরে তার আবির্ভাবমাত্র সমস্ত পরিবেশটাই বদলে গেল। তার বুদ্ধিচাতুর্য, অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার, তার মিশ্র সংলাপের কৌতুক, তার চেহারা নাম আর তার মুখের ভাষা সবকিছু মিলে চরিত্রটিকে—গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়াকে যুগপৎ 'অভিনব' ও উপভোগ্য করে তুলেছে।

কিন্তু শুধুমাত্র চরিত্রবৈচিত্র্য বা ভাষা সংস্থানের মধ্যে পরশুরাম তাঁর রচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। হাস্যরসাত্মক শিল্পসম্মত হাস্যরস উৎসারিত করা হয়েছে পরিস্থিতি-নির্মাণের মধ্যেও। শ্যামানন্দবাবুর পত্নী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী 'অবলা বিধায়' এবং 'দৈবাদেশ পালনার্থে' হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীমন্দির ও সংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তি লিমিটেড কোম্পানিকে 'সমর্পণ' করেছে। এরপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কর্ম কোম্পানির দ্বারাই সম্পন্ন হবে, অতিথিশালা নির্মিত হবে এমনকি হাটবাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ অর্থাৎ আমোদপ্রমোদের জন্যও যথেষ্ট আয়োজন থাকবে, আরও বিস্ময়ের কথা এই সে 'যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধ-প্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে।' এইভাবে ধর্মাচরণের সঙ্গে ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে মেলানোর বিষয়টি পরশুরামের সমাজদৃষ্টির তির্যকতাই প্রমাণ করে। বিশেষত দর্শনী প্রণামী মহাপ্রসাদ বিক্রয় বাবদ অর্থাগম ছাড়াও 'By-product recovery'-র যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা যেমন 'নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্যোতক, তেমনই হাস্যরসের উৎস আবার তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানভাবনাকেও। যেমন—

"সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগলসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।"

'বকড়ি' হত্যায় গণ্ডেরির আপত্তি আছে জেনে শ্যামানন্দ 'কুমড়ো-বলি'র ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। কুমড়োর 'চামড়া' তো আর 'ট্যান' হবে না, তাই 'বৈজ্ঞানিক' বিপিন একটা 'বুদ্ধি' নির্দেশ করেছে—'কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধহয় ভেজিটেব্‌ল শু হতে পারে।' 'এক্সপেরিমেন্ট' করে দেখার কথাও ঘোষণা করেছে সে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুর কথা। 'ডমরু-চরিত'-এ আমরা দেখেছি, ডমরু স্বদেশী কোম্পানি খুলেছে বছর পাঁচশের 'তিনটা পাস' দেওয়া এক 'ছোকরা'র সঙ্গে। সেই কোম্পানিতে একটাকার এঁটেল মাটি থেকে দশ টাকার কাগজ হবে, অর্থাৎ লাভের পরিমাণ নয় টাকা। ডমরুর কথায় 'চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুইজনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালোরূপ একটা স্বদেশী কোম্পানি খুলিতে হইলে দুই-চারিজন বড়লোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার জোগাড় করিলাম। একটি মিটিং হইল, এঁটেল মাটি ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য হইলেন...।"

সেই যাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল কলেজের

ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাতছানি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়। আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তা যোগাড় করিয়াছিলাম।...তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন—

আমাদের কোম্পানীর নাম হইল—'গ্রাণ্ড স্বদেশী কোম্পানি লিমিটেড'। কয়েকজন বড়লোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে হুনুহুর। ইঁহারা না জানেন এমন বিষয় নাই, শঙ্কর ঘোষ ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কোম্পানির বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, যে ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।''

বলা বাহুল্য, এই ঘোষণায় দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। এঁটেল মাটি থেকে যখন কাগজ হয়, তখন বালি থেকে কাপড় হবে, আর বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আমদানি করতে হবে না, দেশ টাকায় ভরে যাবে। স্বভাবতই এই অর্থের লোভে, অর্থসঞ্চয়ের আশায় 'প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতেও লাগিল।' কোষাধ্যক্ষ ডমরুধর, অতএব তাঁর ভাণ্ডারই স্ফীত হতে শুরু করল। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও ডমরু তাঁদের পরিকল্পিত ও প্রচারিত ঘোষণার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি, এঁটেল মাটি আর কাগজের মধ্যেকার পারস্পরিক ব্যবধান ক্রমশ দূর থেকে দূরতর হয়ে গেল। আসল টাকার মুখও কেউ দেখতে পেল না, ফলে কয়েকজন নালিশ করল। সেই ছোকরা তখন চমৎকার এক হিসাবের বই তৈরি করে কাছারিতে দাখিল করল, বলল যে, 'লোকসান'। 'লিমিটেড' কোম্পানি হওয়ার সুবাদে 'কারো গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিল না'। অর্থাৎ কার্যসিদ্ধির চূড়ান্ত হল, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা আবশ্যক রয়ে গেল। শঙ্কর ঘোষ এখানে কী ভূমিকা পালন করবে! জনগণের প্রদত্ত অর্থ সব ডমরু নিল, শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাইলে তাকে বলল, নিজের হাতে প্রস্তুত হিসেবের খাতায় শঙ্কর দেখিয়েছে যে 'লোকসান' হয়েছে, 'কোম্পানি ফেল হইয়া গিয়াছে' সুতরাং টাকা আর কোথা থেকে আসবে?

ডমরুর উত্তরাধিকারই কি শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী বহন করছে না? গ্রাণ্ড স্বদেশী কোম্পানির ছায়া কি শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোম্পানির ওপর পড়ে নি? এঁটেল মাটি থেকে কাগজ তৈরি আর কুমড়োর চামড়া 'ট্যান' করে ভেজিটেবল শু তৈরির মানসিকতার মধ্যে কি কোথাও সাযুজ্য নেই? ত্রৈলোক্যনাথ সেদিন তাঁর পারিপার্শ্বিককে যেভাবে দেখেছিলেন তাকেও তিনি সরাসরি উপস্থিত না করে কিছুটা হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। সমাজ-সমালোচনা তাঁর লেখাতেও ছিল, কিন্তু তাঁর হাসি ছিল কিছুটা 'প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁষে'। আর পরশুরামের হাস্যরসের মধ্যে যে Social Criticism তা কিছুটা 'প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে'। সমাজজীবনের এই অন্তঃসারহীনতার দিকটি, কৌশলে সাধারণের অর্থ আত্মসাৎ বজায় রেখেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ কিংবা পরশুরাম, এঁরা কেউই মানুষের দুর্গতিতে এতটাই নিরাসক্ত থাকতে পারেননি। তির্যক দৃষ্টিতে সেদিন তাঁরা এই সামাজিক সত্যকে উপস্থাপন করেছিলেন। ইংরেজ আমলে শেয়ার বাজার একভাবে চলছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তার চরিত্র কিছুটা বদলায় কিন্তু প্রতারণার মূল নীতিতে কোনো ফাঁক থাকে না। ত্রৈলোক্যনাথ অনেক আগেই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন, যুদ্ধোত্তর কালে সমস্যাটি আরো প্রকট হল,

সময়সচেতন পরশুরাম বিষয়টি সহমর্মিতার পাশাপাশি সংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও উপস্থাপন করলেন। অর্থলোভ, সম্পদ বাসনা এবং ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার বাজার কীভাবে প্রতারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—সেই বাস্তব দুর্দশার প্রতি পরশুরামের তীব্র শ্লেষ কোথাও গোপন নেই। "পরশুরাম সংসারী' মানুষকে তিরস্কার করবেন বলেই হয়তো তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'গড্ডলিকা'। গণ্ডেরিরামের 'কবীরজীকি বচন' (ঐসী গতি...) এই মানবসমাজের সারৎসারটুকু ব্যক্ত করে দিয়েছে। বাস্তবিক, 'সংসারের সব লোক যেন ভেড়ার পাল'। তারা সামনের জনকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে মাত্র এবং বেশিরভাগ সময়েই 'খাদ্দেমে গির পড়ে'। ব্যবসা সংক্রান্ত আইনকানুন, শেয়ার মার্কেটের নাড়িনক্ষত্র, হিন্দু ধর্মস্থানের ট্রাস্টী প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলে সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের মতো রচনা সম্ভব নয়। সেই অভিজ্ঞতাকে পরশুরাম তাঁর মননশীলতার সঙ্গে মিশিয়ে তাঁর গল্পে প্রতিফলিত করেছেন।

নিছক জনমনোরঞ্জনী কৌতুক সৃষ্টির জন্য পরশুরাম গল্প লেখেননি, আকস্মিক চমক সৃষ্টি করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রখর সমাজদৃষ্টিই তাঁকে জীবনযাপনের বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তাঁর প্রতিবাদই ব্যক্ত হয়েছে চরিত্রের 'আতিশয্যে' কিংবা 'উদ্ভট' কার্যকলাপে। ধর্মের দোহাই দিয়ে শেয়ার ক্রয়ে সকলকে উৎসাহিত করা অথচ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে 'ধর্মের লেশমাত্র না থাকা—কেননা এ ব্যবসায়ে মূলধন চাতুর্য আর প্রবঞ্চনা, সাধুতা নয় সততাও নয়। 'ধর্মকে সেদিন অনেকেই তো এভাবে নিজেদের প্রয়োজনে 'ব্যবহার' করেছে আর গল্পকার সেই ভণ্ডামির দিকেই উদ্যত রেখেছেন তাঁর তর্জনী, শ্যামানন্দ কিংবা গণ্ডেরিরাম তো এই 'নীতি'হীন সমাজ ব্যবস্থারই 'ফসল'। এই চরিত্রের আচরণে হয়তো কিছুটা অতিশয়তা আছে, অবাঙালির মিশ্র সংলাপের মধ্যে হাস্যরসের ইন্ধন আছে, কথার কারুকার্যে অপরকে বোকা বানানোর মধ্যে কৌতুক আছে, কিন্তু তবু মনে হয় পরশুরামের গল্প কেবল চরিত্রচিত্রশালা নয়। কিংবা শুধু পরিহাস প্রবণতার বা স্যাটায়ারের প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য নয়। দেশকালের এমন তির্যক প্রতিফলনেই তাঁর গল্প বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। একশ্রেণীর মানুষ কিভাবে তাদের কূটবুদ্ধির চাতুর্যে অন্য মানুষকে 'বোকা' বানিয়েছে, এর মধ্যে যুগপৎ নির্মমতা ও কারুণ্য আছে, পরশুরাম তার প্রকাশে যেমন আন্তরিক, তেমনই আঘাতপ্রবণ। বাংলা সাহিত্যে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' তাই শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী আর গণ্ডেরিরামের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত 'দুর্বুদ্ধির গল্প নয়, তিনকড়ি বাবুর 'অবুদ্ধি'রও গল্প। যেখানে মানুষের বিচারবুদ্ধি বর্জিত অন্ধত্ব, সেখানেই ঝল্সে উঠেছে পরশুরামের কুঠার।

ভূশণ্ডীর মাঠে : গল্পের ভেতরে গল্প

অশোককুমার মিশ্র

ভূতের গল্প গল্পের ভূত

রসায়নশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূতের একটা রূপ আঁকার চেষ্টা করেছেন 'জিজ্ঞাসা'য়—'ভূতের রং কালো, পা বাঁকা....' ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়েছেন সেই ভূতের থেকে নিষ্কাশিত তেলে অসাধ্য সাধনের উপায়—ছেঁদো ভূত নয়—নানা জাতের ভূতের ভূততত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ব নিয়ে যে বর্ণনা বাংলা ভাষায় রয়েছে তাদের অনেকটা টেক্কা দিয়ে রেখেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রসময়ীর রসিকতায়'—পরশুরামের 'ভূশণ্ডীর মাঠে' সেই সব ভূতের সহজ স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং মাতামাতি অনেকেরই রাত্রির নিদ্রার পরিমাণ দেয় বাড়িয়ে।

ভূতের গল্পের তালিকাতেই রাখতে হয় 'গড্ডলিকা'র 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পটিকে। রবীন্দ্রনাথ এ গল্পের সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখেছেন 'ভূশণ্ডীর মাঠের ভূত-প্রেতকুলের ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণ বিবরণের কোথাও লেখা আছে।' শুধু কথার কথা না ভেবে রবীন্দ্রনাথের কথাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করার দরকার আছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের কঙ্কালীতলার মাঠ, গনগনির ডাঙা, তেপান্তরের মাঠ কী এমন অনুভূতির বাইরের! যে রহস্যময় অনুভবের ঘেরাটোপ, যে গা ছমছম-করানো অনুভূতি, যে আতঙ্কের আবরণ ভূতের গল্পের ভৌতিক রসকে দেয় জমিয়ে—পাঠক এবং শ্রোতার কুঁচকে ওঠা কপাল আর বিন্দু বিন্দু ঘামে যার প্রমাণপত্র থাকে ঝোলানো পণ্ডিতেরা সে গল্পকে বলে থাকেন সত্যি ভূতের গল্প। ফ্যান্টাসি আর কল্পনা, অজানা আর জানিনার মিশ্রণে গড়ে ওঠে যে রসের ভিয়েন—পরশুরাম অন্তত 'ভূশণ্ডীর মাঠে' সে রস পরিবেশনে আগ্রহ দেখান নি। ভূতের গল্পের ভূতেরা আর গল্পের ভূতের সর্বদাই গাছে ওঠে। সে গাছ বাস্তবের গাছ নয়—হঠাৎ হঠাৎ ঘটিয়ে দেওয়া ঘটনার গাছ—যেমন শোনা যায় বোকা নাপিতের চালাকির গল্পে—চুল ছাঁটার আয়না দেখিয়ে ভূতকে জব্দ করে তার মাধ্যমে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করে নেওয়া কিংবা ভুঁড়ি সর্বস্ব পেটুক পুরোহিতের বুদ্ধির জোরে পূর্ণিমার রাত্রিতে দুই ভূতের ঝগড়ার মধ্যস্থতা—দড়ি না দড়া—এই সমস্যার সহজ সমাধান দড়ি নয়, দড়াও নয় তেপাকের পাক বলা—আনন্দিত পুলকিত ভূতেদের আপন অজ্ঞতায় লজ্জিত হওয়া এবং ব্রাহ্মণকে দুজনে মিলে যার ঘরে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব গল্পের রস ভৌতিক নয় ভূতের রস—আয় গুপী গাইন বাঘা বাইনের ভূতের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ এই রসের তারল্যমুক্ত নয়।

জন্মান্তরবাদ · মধ্যিখানে ভূত

বিদ্যাপতি ভক্তের দৃষ্টিতে বলেছেন ভারতীয় পুনর্জন্মবাদের কথা। তিনি বলেছেন,—

"কিয়ে মানুষ পশু　　　　পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে　　　　গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।।"

জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দর্শনের এক বিশেষ অংশ। পরমাত্মার থেকে জীবাত্মার জন্ম কিন্তু সে জন্ম নানাভাবে নানা রূপে হয়ে থাকে—প্রথমেই মানুষ নয়—কীটপতঙ্গ থেকে স্তরে স্তরে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। মানুষের মূল লক্ষ্য মুক্তি। কিন্তু এক জন্মে সে মুক্তি ঘটে না। তাই তাকে ঘুরে ফিরে আসতে হয়—জন্ম-মৃত্যু-জন্ম-এই হলো জন্মান্তর। পুনর্জন্মের মাঝে আর একটি স্তর আছে যাকে বলে ভূতস্তর। পরশুরাম এ ভূত স্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন চমৎকার ভাবে।

ভূততত্ত্বের মূলে রয়েছে আত্মা। জন্মান্তরবাদের মূলেও রয়েছে তাই। আস্তিকেরা এই বিশ্বাস রেখে চলেছে। নাস্তিকদের মধ্যে আত্মা নেই—শরীর পঞ্চভূতে গঠিত—শরীরের মৃত্যু ঘটলে তা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে নাস্তিকদের দৃষ্টিতে ভূত নেই।

আবার ভূত নিয়ে চিন্তায় এদেশীয়দের সঙ্গে সাহেবদের ভাবনার কিছু অদল বদল আছে। আস্তিক সাহেবরা মানুষের আত্মাকে বিশ্বাস করে—কিন্তু তার পুনর্জন্মে নয়। লেখকের মতে "তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাকের পর তাহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন।" এই অনন্ত নরকের পরিচয় রয়েছে দান্তের 'ডিভিনা কোম্মোদিয়ার'। পরশুরামের খোঁচাপ্রবণ মনের পরিচয় মেলে অতঃপর 'সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়।'

অন্যদিকে এদেশের মানুষ হিন্দুরা সব কিছুই মানে—পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল—আবার নির্বাণ মুক্তি প্রভৃতিকেও। হিন্দুরা মরলে প্রথমে তাদের ভূত হতে হয়। এ সময় সে যত্রতত্র স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে—আবশ্যক মত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে নানা কারবারও করতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থা চিরদিনের নয় কারো দুচার দিনের, কেউ দশ-বিশ বৎসর, কেউ আবার দু তিন শতাব্দী ধরে ভূত হয়ে থাকে। তারপর লাভ করে জন্মান্তর। লেখক বলে রেখেছেন তাঁদের কথাও যাঁরা মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করেন—কেননা তাঁরা ভাগ্যক্রমে কাশীলাভ করেছেন, নেপালে গিয়ে দেখে এসেছেন পশুপতিনাথকে, কেউ আবার হৃষিকেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন কত ইষ্ট অনিষ্ট—কাজেই মুক্তি।

জন্মান্তরবাদের সমস্যা : সমাধান

আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস রেখে অর্ধমুদিত চক্ষুতে নিশ্চিন্তে ভাববিভোর হওয়া যায় বৈঠকখানার গল্পের আসরে—কিন্তু বাস্তবে তার সমস্যা যে কত জটিল ভূশণ্ডীর মাঠে বোঝা গেল তা। জীর্ণ শরীর ছেড়ে আত্মা জন্মান্তরে শরীর বদল করে—সামাজিক নিয়মে ঘর সংসার করে—এখানেও বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের। কিন্তু পরশুরাম কৌশলে সেই সম্পর্কের মূলে একটু জল ঢেলে দিয়েছেন। পেনেটির শিবু ভট্টাচার্যের তিন পূর্বজন্মের পত্নী আর ইহ জন্মের পত্নী আলাদা—শুধু তাই নয় দারোগা নদেরচাঁদ মল্লিক যক্ষ হয়ে রয়েছে—তার স্ত্রী এখন নৃত্যকালী হয়ে ব্রহ্মদত্যি শিবুর সঙ্গে রয়েছে আবার দেখা গেল নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী আলাদা। ফলে ফলে শেষে শুরু হয়েছে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। পরশুরাম লিখেছেন—"তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও

কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল।'

এবার গল্পটি নিয়ে ভাবা যাক—গল্পের শুরুতে ভূত নেই, রয়েছে পেনেটির পত্নী শাসিত ব্রাহ্মণ শিবু ভট্টাচার্য আর তার মুখরা পত্নী নৃত্যকালী। স্বামীর বয়স বত্রিশ—স্ত্রীর পঁচিশ। স্বামীর প্রতি যত্নের তার ত্রুটি ছিল না। তবু শিবু ক্রমশ পত্নীর উপর বিমুখ হয়ে ওঠে কেননা সামান্য ব্যাপার নিযে নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটতে আরম্ভ করলে আর থামতেই চাইত না। পাঁচ মিনিটের প্রবল চেষ্টায় পত্নীর বাক্যবাণ রোধে বাঁধ দেবার বৃথা চেষ্টা করতো সে—তারপরই সে ভেসে যেত বাক্যস্রোতে—পাড়ার লোকজন তাকে কাপুরুষ, ভেড়া, মেনীমুখো প্রভৃতি অপুরুষোচিত বিশেষণে বিশেষিত কবে আরো ব্যথিত ও মনকে বিমর্দিত করে দিয়েছিল।

তার উপর স্বামীর চরিত্র নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয় নৃত্যকালী। শেষে বচসা ছেড়ে হাতে তুলে নেয় ঝাঁটা—ঝাঁটায় ঘা খেয়ে ক্ষুব্ধ শিবু পরের দিন হাজির হলো কালীঘাটে—মায়ের কাছে পুজো দিয়ে মানত করে আসে 'হে মা কালী, মাগীকে ওলাওঠায় টেনে নাও মা।'

পুজো সেরে বেরিয়ে এসে এক বড় ঠোঙা তেলেভাজা, আধ সের দই, আধসের অমৃত্তি খেয়ে চিড়িয়াখানা, জাদুঘব, হগ সাহেবের বাজার (নিউমার্কেট)—হাইকোর্ট দেখে সন্ধ্যাবেলা বীডন স্ট্রীটের হোটেলে এক প্লেট কারি, দু প্লেট রোস্ট ফাউল আর আটআনা ডেভিল খেয়ে সারারাত থিয়েটার দেখে ভোরবেলা ফিরে গেল পেনেটিতে। আর সাথে সাথেই শুক হল ভেদ বমি। কেননা মা বুঝি উল্টো বুঝেছিলেন। ডাক্তাব, কবিরাজ আব স্ত্রী নৃত্যকালীর অষ্টপ্রহর অসাধ্য সাধনের প্রয়াসকে বিফলে পর্যবসিত করে শিবু চলে গেল পরলোকে। হল ভূত।

পেনেটির থেকে ভূশণ্ডীর মাঠ—দূবত্ব অনেকখানি। গঙ্গা পেরিয়ে কোন্নগব-রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়িযে দু তিন ক্রোশ দূরে ভূশণ্ডীর মাঠ—এ ভ্রমণ যেন যক্ষের মেঘের ভ্রমণকে হার মানায। অতঃপব এই নবজন্মে প্রাপ্ত ভূতজন্মের আবাসস্থল ভূশণ্ডীব মাঠের বর্ণনা আরো চমকে দেয়। এটি একটি বহু পুবানো জনমানবহীন পরিত্যক্ত ইটখোলা, এখানে ওখানে গর্ত আব ঢিপি। মাঝে মাঝে বুনো ওল, বাব্‌লা, ঘেঁটু আর আস শ্যাওড়ার ঝোপ। একপাশে পরিতাক্ত ইটের পাঁজা—তারপাশে লম্বা তালগাছ আর একদিকে নেড়া বেলগাছ—সে গাছেই ব্রহ্মদত্যি হয়ে বাস করতে শুরু কবল শিবু।

দুতিন মাস ভালোই কেটেছিল শিবুর। কিন্তু তার পরই মনের মধ্যে নৃত্যকালীর অভাব অনুভব করতে থাকে সে 'মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যব একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে।' পেনেটিতে ফিবে যাবাব বাসনা তার হয়—কিন্তু বাদ সাধে লোকনিন্দার ভয়। ভূতের মনস্তত্ত্বের এই ছবি একদিকে হাস্যরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে অন্যদিকে গল্পের গোড়া বাঁধার কাজ করেছে—নৃত্যের প্রতি আকর্ষণ গল্প শেষে Irony হয়ে বেজেছে।

শিবুব মনুষ্য জন্মে নারীঘটিত মৃদু দোষ ছিল। ভূত জন্মেও সে সংস্কার ঘোচে নি। তাই

নৃত্যের কথা মন থেকে সরিয়ে রেখে সে নতুন উপদেবীর সন্ধানে ব্রতী হলো। রক্ত মাংসের শরীর নেই—তবু বসন্তের অনুকূত পরিবেশে ঘেঁটু ফুলের পাগল করা গন্ধে তার হৃৎপিণ্ডের জায়গাটা হঠাৎ ভরাট হয়ে ধক্‌ধক্ করতে শুরু করে। ভূশণ্ডীর মাঠের প্রান্তে পিটুলি ঝিলের ধারে শ্যাওড়াগাছে বাসকারী পেত্নীর কথা মনে পড়ে যায় তার। সেই পেত্নীর সঙ্গে শিবুর সাক্ষাৎদৃশ্যে শিবায়নের মেছুনীর পালার কাহিনীর মিশ্রণ ঘটিয়ে পরশুরাম অন্য এক রসের স্বাদ দিয়েছেন। সে পেত্নী সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরে। আপাদমস্তক ঘোমটা তার—শিবুকে একবার দেখেছে সে। সে দৃশ্য এরকম 'একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল।' কিন্তু শিবু কাৎ হয়নি তার কারণ—

(i) পেত্নীর বয়স হয়েছে।

(ii) তার সামনের দুটি দাঁত নেই।

তাই এই মোক্ষম দুই যুক্তিতে শিবু তার সঙ্গে ঠাট্টা চালাতে পারে। প্রেম? কখ্‌খনো নয়!

দ্বিতীয় যে ভূতনী শিবুর নজরে এসেছিল সে একটি শাঁকচুন্নী। একটা গামছা পরে একটা গামছা মাথায় দিয়ে এলোচুলে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাত ধরা হাঁড়ি থেকে গোবর জল ছড়ায়। সন্দিগ্ধ মন প্রশ্ন তুলতে পারে হাড়ের কাঠামোয় চুল! কিন্তু সে প্রশ্নে ভূতের গল্প জমে না।

শিবুর নজর কেড়েছে যে তৃতীয়া সে এক ডাকিনী। ক্ষীরী বামনীর পরিত্যক্ত ভিটেয় বাস তার। তাকে দেখেই মজেছে শিবু। Love at First sight আর কি! পরশুরাম লিখেছেন 'শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে।'

অতঃপর লেখক জানিয়েছেন কিছুদিন পূর্বে এসে ওঠা ডাকিনীর সঙ্গে শিবুর দেখা হওয়া এবং ডাকিনীর রূপের বাহারের কথা—

(i) ডাকিনী খেজুর গাছের ডাল দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। সে সময় দেখা হয় শিবুর সঙ্গে।

(ii) ডাকিনীর পরনে ছিল সাদা থান।

(iii) তার রূপ অসাধারণ। 'নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।'

(iv) রূপ দেখে মজেছে শিবু—মজে যাবার আরো কারণ বৃদ্ধা পেত্নী তাকে দেখে লজ্জায় জিভ কেটেছে। শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধা বিড়ালের মত ফ্যাঁচ করে উঠেছে আর ডাকিনী তাকে দেখে ঘোমটা সরিয়ে ফিক্ করে হেসেছে। শিবুর মনে এই ত্রয়ীর ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে টানা পোড়েন, সে গেয়ে উঠেছে—

'আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।''

শিবুর ভূশণ্ডীর মাঠে আগমন—তার স্বস্তি, তার অস্বস্তি—তার উপদেবী অন্বেষণ ইত্যাদি ব্যাপার সমাধা হয়ে যাবার পব গল্পের কাহিনী অন্যদিকে শাখা প্রশাখা বাড়িয়েছে। একে একে এসেছে আরো দুই ভূত—(১) কারিয়া পিবেত (২) যক্ষ।

কারিয়া পিরেত আসলে ভূতের গল্পের একানড়ী। 'একানড়ী কানে কড়ি তালগাছে তার

বাসা।' যদিও কারিয়ার কানে কড়ি নেই—তবু মাথায় আছে পাগড়ী। কুচকুচে কালো, লিকলিকে চেহারা তার—কাঁকলাসের মত দেখতে। শিবুর আহ্বানে নেমে এল সে। ব্রহ্মদত্যি শিবুর ইচ্ছায় বৈদ্যবাটির বাজার থেকে তামাক টিকা কল্কে এনে আগুন দিয়ে শিবুর হাতে দেয় সে মুহূর্তের মধ্যে। এরপর শিবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে শুরু করে সে তার মনুষ্যজীবনবৃত্তান্ত—মনুষ্য থেকে ভূত হবার বৃত্তান্ত।

জানা যায় ছাপরা জেলায় বাড়ি ছিল তার। ছিল মুখরা স্ত্রী মুংরী। একদিন ঝগড়ার সময় মুংরী তার পিঠ এক ঘা লাঠি কষিয়ে দিলে সে দেশ ছেড়ে ত্রিশ বছর আগে চলে আসে কোলকাতায়। খবর পায় মুংরীর বসন্ত রোগে মৃত্যুর। সেও আর বিয়ে করে নি—চাঁপদানীর মিলে কুলী সর্দার তখন সে—একদিন কপিকলে করে লোহার কড়ি তুলতে গিয়ে মাথায় চোট পায় সে। এক মাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী থেকে মৃত্যু হয়েছে তার। এখন তার আশ্রয় জুটেছে এই তালগাছে।

যক্ষের আগমন ঘটে ভৌতিকভাবে। শিবু কল্কিকায় লম্বা টান দিয়ে কারিয়ার হাতে দিতে গেলে ইটের পাঁজা ভেদ করে বেরিয়ে আসে সে। সে জানায় তার সম্পদ পোঁতা আছে এখানে—তাই সে যক্ষ হয়ে আগলাচ্ছে। সে জানায় কালিদাসের ভায়রাভাই হলো সে। কিন্তু অচিরেই বোঝা যায় যক্ষ মশায় মেঘদূতের কালিদাসের কথা নয়—হিজলিব নুনের গোমস্তার কথা বলছে। প্রায় সাড়ে তিনকুড়ি বছর হলো সে এখানে এসেছে। তাই অনেককে আসতে যেতে দেখেছে—এমন কি ব্রহ্মদত্যি শিবুকেও। সে বলেছে 'আরে, তুমি তো সেদিন এলে, কাঠপিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে।''

শিবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে যক্ষ জানায় তার জীবনের অতীত ইতিহাস। রিশড়ের কায়স্থ পরিবারের মানুষ ছিলো যক্ষ—নাম ছিল নদেরচাঁদ মল্লিক বা নাদু মল্লিক। পেশা দারোগাগিরি। রিশড়ে থেকে ভদ্রেশ্বর ছিল তার এলাকা। তার দাপটে লোকে অস্থির অথচ নিজে বৌয়ের দাপটে বেসামাল; খাণ্ডার গৃহিণী একদিন রাগের মাথায় চ্যালাকাঠ দিয়ে তাকে মেরেই বাপের বাড়ি চলে যায়—লোকলজ্জার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করতে পারেনি সে। কিন্তু সাতচল্লিশের মড়কে মারা গেল সে। ছেলেপুলে নেই, দত্তকও নেয়নি কারণ সব সময় তার মনে হতো তার পয়সা আবাগীর ছেলে খাবে—এখন বেশ আছে সে, নিজের পয়সা নিজে আগলাচ্ছে।

শিবু, কারিয়া পেরেতের পরিচয় পাবার পর যক্ষ বুঝতে পারে তাদের সবার কপালই এক ধরনের। কিন্তু মন খারাপ করে লাভ কী! অতএব তিন জনে মিলে শুরু হলো—অভিনব সংগীত প্রয়াস। যক্ষ বলে গানের বোল। কালোয়াতি গানের কলাকৌশল শেখাতে থাকে সে। এভাবে গল্পের মধ্যে লেখক কয়েকটি কাজ সেরে নিয়েছেন—

(১) প্রত্যেক ভূতের আগমন

(২) তাদের প্রত্যেকের ভূত হবার পশ্চাতে রয়েছে নিজ নিজ খাণ্ডার গৃহিণী

(৩) এখন তারা বেশ আছে।

কিন্তু বেশ আর থাকতে পারল কৈ? ভূতের রাজ্যেও দেখা দিল সমস্যা—এবং সে সমস্যার কারণ হয়ে উঠল জন্মান্তরবাদ। কার্যকারণ সূত্রের কথা ধরলে আলাদা—কিন্তু

ভূতের রাজ্যে নাকি কারণ আর কার্যের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া ভার। সেখানে মনুষ্য জীবনের মত 'অল্প লইয়া থাকি মোর তাই যাহা যায় তাহা যায়' নয়।—সেখানে স্মৃতি অত্যন্ত প্রখর। জন্ম-জন্মান্তরের কথা মনে থাকে—আর তাই তিন জন্মের তিন ভূত ভূতনী ভূশণ্ডীর মাঠে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে শুরু করেছে টানা পোড়েন। এই নাছোড়বান্দা টানাপোড়েনের সময় অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে সমাজ সমস্যার জটিলতায় মীমাংসায় সদা সচেষ্ট. ইহজীবনের তাবৎ তাবৎ ব্যক্তিবর্গের কথা—নিয়ম অনুসারে এখন তাঁরা কেউ এজগতের নয়—অন্য জগতের—শরৎচাটুজ্যে চারু বাঁড়ুজ্যে নরেন সেন আর যতীন সিংহের কথা এসেছে। সে জগতে গিয়ে তাঁদের আর একটু উদ্যোগী হতে হবে—উচ্চারণের এই তির্যকতা কাঁটার মতো বিঁধে, রক্ত ক্ষরণ ঘটায়—গয়ায় পিণ্ডদানের মাধ্যমে তিনি ভূতেদের শান্তির ব্যবস্থা করতে পথ নির্দেশ করলেও— আমাদের ভাবাবেগকে স্বয়ং ভূতাবেগ গ্রস্ত হয়ে লেখক বোধ হয় একটু বেশি খোঁচাখুঁচি করে ফেলেছেন—ঈশ্বর এই ভৌতিক খোঁচার হাত থেকে বেচারাদের রক্ষা করুন।

চিকিৎসা সঙ্কট : হাসির আয়নায় সমাজের মুখ দেখা

মহুয়া বসু ঘোষ

হাসির জন্ম জীবনের গরমিল বা অসঙ্গতি থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বাঙালীর রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—'মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া'। বেঙ্গল স্কুল অব কেমিস্ট্রির নব্যরাসায়নিক, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের অদ্বিতীয় রূপকার, গরমিলে মেলানোর অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা, পরশুরামের 'গড্ডলিকা' গল্প সংগ্রহের 'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পটি লেখকের প্রতিভা পরিমাপের এক উৎকৃষ্ট দর্পণ।

'চিকিৎসা-সঙ্কট' গল্পের রোগী বিপত্নীক, চল্লিশোর্ধ নন্দবাবুর পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব থেকে বোঝা যায়, বেঁচে থাকার লড়াই তাকে লড়তে তো হয়ই না, বরং সান্ধ্য-আড্ডায় ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে তার শৌখিন জীবন 'চা ও পাঁপড় ভাজার' সঙ্গে দিব্যি এগিয়ে চলছিল। এই সমস্যামুক্ত জীবন যখন সমস্যা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখনই ঘটল ট্রাম থেকে নন্দবাবুর পতন এবং সঙ্কটের সূচনা। অ্যালোপাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাকিমের দরজায় ঘুরে ঘুরে যখন তিনি সত্যিই রুগী হয়ে উঠতে যাচ্ছেন, সে সময় লেডি ডাক্তার মিস্ বিপুলা মল্লিকের সঙ্গে নন্দবাবুর পরিচয় এবং কয়েকটি 'সিটিং' এর মধ্যেই প্রেম-পরিণয়ের সঠিক পথ্যে সমস্ত সঙ্কটের অবসান ঘটে।

সূর্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে সাতটি রঙ পাওয়া যায়, যার এক প্রান্তে থাকে লাল, অন্যপ্রান্তে বেগুনী, মাঝখানে অন্য রঙ। তেমনি শুভ্র হাসির এক প্রান্তে থাকে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, অন্যপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু, কোথাও বা থাকে নিছক কৌতুক। পরশুরামের প্রবণতা প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে; আর এই জাতীয় রসের আবেদন পাঠকের হৃদয়ের কাছে নয়, বুদ্ধির কাছে। প্রসঙ্গতঃ, মনে রাখা দরকার, নিছক কমেডি বাদ দিলে আর যতরকম হাসি আছে তার উদ্দেশ্য হল সমাজ-সমালোচনা। কমেডি লেখক বিশুদ্ধ আনন্দ দান করেন, ব্যঙ্গরসিক বিচার করেন। সমাজ-সংস্কারের তিরস্কার ঘেঁষা হাস্য-বিচ্ছুরণে 'চিকিৎসা-সঙ্কট' প্রোজ্জ্বল।

এই গল্পে পরশুরামের তিরস্কারের লক্ষ্য, বাতিকগ্রস্ত ধনী সম্প্রদায়, যাদের কাছে রোগ এবং চিকিৎসা-দুই-ই বিলাসিতা এবং অর্থব্যয়ের এক নিষ্পাপ উপলক্ষ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করা এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয়। নন্দবাবুর চিকিৎসা-বিভ্রাটের অভিজ্ঞতা হয়তো আমাদের প্রত্যেকেরই আছে, কিন্তু গল্পকারের কৃতিত্ব হল, তিনি সুকৌশলে কার্যসিদ্ধি করেছেন, যাতে হাসির উদ্দেশ্যপূরণ হয়, অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হন না।

যেমন, নন্দবাবু চিকিৎসার জন্য যেসব চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে শ্রদ্ধার পরিবর্তে যে অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে, তির্যক কৌতুকে লেখক তাকেই চিত্রায়িত করেছেন। তাই অ্যালোপাথ ডাক্তার তফাদার সম্পর্কে হোমিওপ্যাথ নেপাল ডাক্তারের মন্তব্য—"তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর, আর টুপির ভেতর সিং, জুতোর ভেতর খুর, পাতলুনের ভেতর ল্যাজ।" আবার নেপাল ডাক্তার সম্পর্কে তারিণী কবিরাজের অভিমত —"অঃ ন্যাপ্লা,... সেডা আবাব ডাগদর হল কবে?" বৃত্তিগত প্রতিযোগিতার এই

ছবি আজো আমাদের অভিজ্ঞতায় সত্য, কিন্তু পরশুরাম সেই অতিপরিচিতকে চিরন্তন করে তুলেছেন বিশেষ এক কৌশলে, যেখানে প্রত্যেকেই মনে করে সে নিজে ছাড়া আর বাকি সকলেই তাঁর লক্ষ্য, ফলে অসঙ্কোচে হাসতে পারে।

এই গল্পের চরিত্রগুলি যেমন, নন্দবাবু, তার ইয়ার-বন্ধুরা, ডাক্তার তফাদার, নেপাল ডাক্তার, তারিণী কবিরাজ, হাকিম য়ুনানী এবং সর্বোপরি মিস্ বিপুলা মল্লিক—প্রত্যেকেই আমাদের অতি-পরিচিত, কিন্তু পরশুরামের কৃতিত্ব এই যে, অতি পরিচয়ের ধুলো সরিয়ে তিনি নতুনভাবে তাদের প্রকাশ করলেন। পর্যবেক্ষণ এবং প্রকাশের এমন সাহিত্যিক মেলবন্ধন সচরাচর দেখা যায় না। যেমন, M. D. M. R. A. S ডাক্তার তফাদারের মতে, নন্দবাবুর রোগটির নাম 'Cerebral tumour with strangulated ganglia' এবং এর প্রতিকার হল 'ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করা'। অন্যদিকে নেপাল ডাক্তারের প্রথম ওষুধের কাজই হবে 'শরীর থেকে আগে অ্যালোপাথিক বিষ তাড়ানো'। বিভিন্ন চিকিৎসকদের হাবভাব, চালচলন, এমনকি রোগীর পথ্যের তালিকা থেকেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাই তফাদারের অভিজাত পথ্য তালিকায় থাকে 'এগফ্লিপ, বোনম্যারো স্যুপ, চিকেন স্যুপ, বার্গান্ডি—এইসব', অন্যদিকে তারিণী কবিরাজের পথ্য হল—'ট্যাবা লেবুর রস আর মধু, ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ আর হাকিম য়ুনানীর চিকিৎসা হল 'বব্বরী সিংগীর মাথার ঘি।' অতিরঞ্জনের সামান্য প্রলেপে পরিচিতের মধ্যেই নতুনকে আবিষ্কার ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যে এবং বাস্তবানুগ চরিত্রচিত্রণে গল্পটি পাঠককে তৃপ্তির আস্বাদ এনে দেয়।

গল্পটির নাম যদিও 'চিকিৎসা-সঙ্কট' এবং একটা সঙ্কটও কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে, তবু পরশুরামের অন্যান্য হাসির গল্পের মত এই গল্পেও একটা সহজ, স্বচ্ছন্দ পরিবেশ চিরবিরাজমান। নন্দবাবুর বাড়ির নীচতলায় প্রতিদিন যে সান্ধ্য-আড্ডার আসর বসত, তা যেন পরশুরামের পৈতৃক বাসভবন ১৪ নং পার্শীবাগানের দৈনন্দিন আড্ডারই প্রতিচ্ছবি। 'চা পাঁপড়ভাজা', পান সিগারেটের সহযোগে, ইয়ার-দোস্তদের ঠাট্টা মস্করায় জমে ওঠা এই আসরটি নন্দবাবুর সমস্যাতাড়িত জীবনে শান্তির যেন এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়। শুধু নন্দবাবুই নয়, বর্তমানে দ্রুতগতির এই যুগে আমরা সবাই যখন ব্যস্ত প্রতিযোগিতার ইঁদুর-দৌড়-এ, যে জীবনে 'আড্ডা' শব্দটাই অবান্তর, সেখানে মানসিক বিশ্রামের এমন অবকাশ চিত্র আমাদের হাতছানি দেয়। তাই বন্ধু-পরিবৃত নন্দবাবুর আড্ডার এই ছবিটি গোটা গল্পের লঘু ও সহজ পরিবেশের এক অনিবার্য উপকরণ হয়ে উঠেছে।

চিত্রনির্মাণ দক্ষতায় পরশুরাম তুলনারহিত। অসামান্য শব্দচয়নের মাধ্যমে এই গল্পেও তিনি রচনা করেছেন একাধিক খণ্ডচিত্র। এই চিত্রগুলিতে রয়েছে সামান্য অতিরঞ্জন, যেন পাঠকের দৃষ্টি আকষর্ণের জন্য নীচে লাল কালির দাগ টেনে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন চিকিৎসকদের 'চেম্বার' ও তাদের বসে থাকার যে ছবি গল্পে আমরা পাই, তা থেকেই প্রত্যেকের নিজ নিজ বৃত্তিগত ও চারিত্রিক অবস্থান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন—ডিগ্রিধারী ডাক্তার তফাদার থাকেন 'গ্রে-স্ট্রীটে, প্রকাণ্ড বাড়ি, দুখানা মোটর, একটা ল্যাণ্ড'। কিন্তু হোমিওপ্যাথ নেপাল ডাক্তারের 'ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা, চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো, বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ-নেপালবাবু বসিয়া আছেন।'

আবার তারিণী কবিরাজের চিত্রায়ণ—'বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাঁড়ি গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া, আটহাতি ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন,.....ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপরে তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া।' অন্যদিকে হাকিম য়ুনানীর 'পরিধানে সার্টিনের চুড়িদার-ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর ও রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি।' উদ্ধৃতি আর দীর্ঘায়িত না করে বলা যায়, প্রতিটি চিত্রে স্বতন্ত্র পরিবেশ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে লেখক চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম বিচিত্র পার্থক্য সম্পর্কে পাঠককে অতিরিক্ত সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।

অধিকাংশ গল্পের মত পরশুরামের এই গল্পের পটভূমিও কলকাতা শহর। প্রতিভায়, পরিচয়ে, স্বভাবে, রুচিতে সম্পূর্ণ নাগরিক লেখক পরশুরাম। ফলে তাঁর রচনায় মার্জিত রুচিসম্পন্ন সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রসিকতা কোথাও ভব্যতার সীমা অতিক্রম তো করেই নি, বরং বুদ্ধির দীপ্তিতে ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় লেখকের নাগরিক বৈদগ্ধ্যকেই তা উজ্জ্বল করে তুলছে। যেমন, চিকিৎসার পেছনে অকারণ অর্থব্যয় দেখে বন্ধু-নিধু নন্দবাবুকে মোটর কেনার পরামর্শ দিলে, আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী ষষ্ঠীর বক্তব্য—''মোটর কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা, কিন্তু মেরামতির খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাটল, কাল গিন্নীর অম্লশূল, পরশু ব্যাটাবি খারাপ, তরশুও ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর।' মোটর ও গৃহিণীর এই বিদগ্ধ তুলনা লেখকের নাগরিক রুচিরই বুদ্ধিদীপ্ত বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় পরশুরাম স্বীকার করেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি তেমন বিস্তৃত নয়, এবং সেই অভিজ্ঞতাও এই শহর-কেন্দ্রিক। কিন্তু সেই সীমায়িত অভিজ্ঞতাকে যে তীব্রতা ও সংযত রুচিবোধে ব্যক্ত করেছেন তিনি, তাতে একদিকে সমকালীন কলকাতা শহরের খণ্ডচিত্র যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যদিকে নাগরিক মননের পরিশীলিত লেখনীতে Wit ও Satire এর মার্জিত মেলবন্ধন হাসির হীরকদ্যুতিতে বর্ণময় হয়ে ওঠে।

পরশুরাম যে-সময়ে গল্প লেখেন, তখন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত সবুজপত্রী ভাষাকেই প্রগতির চূড়ান্ত লক্ষণ বলে ভাবা হত। মনে করা হত যে, সাধুভাষার মধ্যে আর নতুন কোন সম্ভাবনাই নেই। সেইসময় সম্পূর্ণ সাধুভাষায় গল্প লিখে পরশুরাম সবাইকে চমকে দিলেন। গল্পটি পড়ার সময় টের পাওয়া যায় না, এই ভাষা কথ্য না সাধু গদ্য; কিন্তু একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়, এটি সাধুভাষা। নন্দবাবুর চিকিৎসা-বিভ্রাটের মত লঘু বিষয়কে সাধুভাবার গম্ভীর চলনে প্রকাশ করে লঘুতা ও গাম্ভীর্যের যে দ্বন্দ্ব লেখক-সৃষ্টি করেছেন, তাতে হাস্যরস গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। আরো লক্ষণীয় যে, বর্ণনা বা বিবৃতির ক্ষেত্রে সাধুভাষা, এবং সংলাপের ক্ষেত্রে চরিত্রোচিত কথ্যভাষা—এই দুইয়ের মিলনে এক অনন্য ভাষা শৈলী এই গল্পের সম্পদ। মিস্ বিপুলা মল্লিকের সাথে নন্দবাবুর প্রথম সাক্ষাৎ পর্বটি বিধৃত হয়েছে এই অপূর্ব আঙ্গিকে :

মিস্ বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফ্‌টিপিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন : কি চাই আপনার?

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তারপর মরিয়া হইয়া বলিলেন—'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

মিস্ মল্লিক।। পেন আরম্ভ হয়েছে?

নন্দ।। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না।

মিস্।। ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট?

নন্দ।। আজ্ঞে?

মিস্ ।। প্রথম পোয়াতী?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।

এই গম্ভীর হাস্যরস পরশুরামের একান্ত নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে এড়িয়ে এই অপূর্ব ভাষাশৈলী রচনা করে তিনি বাঙালি পাঠককে এক তৃপ্তিদায়ক সাহিত্যরসের আস্বাদ দিয়েছেন।

নানা-চিকিৎসকের বিচিত্র চিকিৎসায় বিভ্রান্ত নন্দবাবু যখন প্রকৃতই রোগী হয়ে উঠেছেন, তখন মিস্-বিপুলা মল্লিকের প্রেম-পরিণয়ের যে ঔষধ পথ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, গল্পে তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই না। অন্যান্য চিকিৎসকদের বিস্তৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ণিত হওয়ার পরে বিপুলা দেবীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্রিত। মনে হয় ব্যঙ্গলেখক পরশুরামের লেখনীর সঙ্গে প্রেমের বড় একটা মিল হয় না। শাণিত ব্যঙ্গের লক্ষ্য সবসময় জীবনের অপূর্ণতার দিকে, কিন্তু প্রেম প্রকাশ করে প্রাপ্তির পূর্ণতাকে। তাই ডাক্তার তফাদার, নেপাল ডাক্তার বা তারিণী কবিরাজের সঙ্গে নন্দবাবুর সাক্ষাৎপর্ব বিস্তৃত ব্যঙ্গের আলোকে সমুজ্জ্বল; কিন্তু মিস্ মল্লিক নন্দবাবুকে কয়েকটি প্রশ্নমাত্র করেই রোগনির্ণয় করেন। যেমন নন্দবাবুর বাড়িতে কে কে আছেন, কাজকর্ম কি করা হয়, মোটর-গাড়ি আছে কি না, ইত্যাদি, এবং সঠিক 'ডায়গনোসিস্' করেন যে, নন্দবাবুর 'যত্ন নেবার জন্য বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।' অবশেষে দিন সাতেকের মধ্যেই মিস্-মল্লিক, মিসেস বিপুলা মিত্র হয়ে নন্দবাবুর দেখাশোনার দায়িত্ব নিলে সব সঙ্কটের অবসান ঘটে। তাই সামগ্রিক গল্প পাঠের পর মনে হয়, পরশুরামের ব্যক্তিগত প্রবণতা যতখানি ব্যঙ্গের দিকে, ততখানি প্রেমের দিকে নয়, তাই প্রেমের পথে সমস্যার সমাধান করলেও তার বিস্তারিত বর্ণনা লেখক সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন; ফলে নন্দবাবুর অতি-সংক্ষিপ্ত প্রেম-চিকিৎসা পর্বটি পাঠকের অতৃপ্তিকে জাগিয়ে রেখে গল্পের ভারসাম্যকে যেন কতকাংশে বিঘ্নিত করেছে।

বিরিঞ্চিবাবা : বিজ্ঞানের ছোঁয়ায়

বিবেক সিংহ

পরশুরামের 'গড্ডলিকা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন 'বইখানি চরিত্রচিত্রশালা'। তাঁর গল্পগুলি আয়তনে বড় বলেই হোক, অথবা গল্পরস ও সিচুয়েশন সৃষ্টির জন্য চরিত্রকে উপযুক্তভাবে (কোথাও বা হয়তো কিছুটা অতিরিক্তভাবে) কাজে লাগাবার জন্যই হোক, অথবা মানব চরিত্রের বিভিন্ন অসংগতির প্রতি তাঁর পর্যবেক্ষণ ও আকর্ষণ কিছুটা বেশি বলেই হোক, তার গল্পগুলিতে চরিত্রের সংখ্যা একটু বেশি। 'লম্বকর্ণ', 'কচিসংসদ', 'চিকিৎসা সঙ্কট' 'মহাবিদ্যা' প্রভৃতি গল্পে তো চরিত্রের সংখ্যা দশ বা তারও বেশি, 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'ভূশণ্ডীর মাঠে' প্রভৃতিতেও তা ছয়-এর কম নয়। আলোচ্য 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পেও নাম পরিচয়ধারী চরিত্রের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ পনেরোর মতো, বিরিঞ্চিবাবার ধর্মসভায় উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দকে ধরলে সংখ্যাটি আরও অধিক। এদের মধ্যে সত্যব্রতকে অবশ্যই গল্পের নায়ক বলতে পারি। নিবারণ নায়কের প্রধান সহযোগী। বুঁচকিকে নায়িকা বলা যায় কিনা, তা অবশ্যই আলোচনার বিষয়, তবে গল্পের প্রধান খলনায়ক যে নামচরিত্র তথা বিরিঞ্চিবাবা তাতে কোনো দ্বিমত নেই। সহযোগী খলনায়ক হিসেবে ছোটমহারাজ কেবলানন্দ এবং গণেশমামাকে নির্দেশ করতে হয়। অপরাপর চরিত্রগুলিকে পার্শ্বচরিত্র বলা যেতে পারে যদিও এঁদের মধ্যে কয়েকজনকে পৃথক আলোচনায় আনা যেতে পারে।

বিরিঞ্চিবাবা এই গল্পের প্রধান খল চরিত্র এবং সেই সূত্রেই বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। তার নামেই আলোচ্য গল্পের নামকরণ। সুতরাং বহু সাহিত্য সমালোচকের বিচারে সত্যব্রত নিবারণের চেয়ে এই চরিত্রটির গুরুত্ব অধিক। অথচ একথা ঠিক যে সত্যব্রত ও নিবারণের বিপরীতে বিরিঞ্চিবাবা একটি নেতিবাদী চরিত্র। আর পাঁচটা গল্প উপন্যাসে নেতিবাদী চরিত্রের সচরাচর যে সক্রিয়তা ধরা পড়ে, বিরিঞ্চি বাবার মধ্যে তারও অনেকটা অভাব লক্ষ করা যায়। অথচ একথাও ঠিক যে তাকে কেন্দ্র করেই এগুলোর পরিকাঠামো বিন্যস্ত হয়েছে, এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিরিঞ্চিবাবা এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

বিরিঞ্চিবাবা আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন শুধুমাত্র প্রচার মাধ্যমের জোরে। লেখক যেন দেখাতে চেয়েছেন যে এই বিংশশতাব্দীর বিশ্বে প্রচারমাধ্যম সাধারণ ভণ্ড মানুষকেও কতখানি জনপ্রিয় ও লোকমান্য করে তুলতে পারে। লক্ষ্য করতে হয়, গল্প কাহিনীতে বিরিঞ্চিবাবার প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে পরশুরাম গল্পের মূল বক্তব্য ও রসপরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুটা গৌরচন্দ্রিকা করেছেন। একথা সবাই মানবেন যে তথাকথিত গুরুবাদ ও মানুষের অবচেতনায় সংগুপ্ত ধর্মের নেশাকে ব্যঙ্গ করাই এ গল্পের উদ্দেশ্য। বিরিঞ্চিবাবা চরিত্রটির সৃষ্টি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। তাই গল্পের শুরুতে বিরিঞ্চিবাবার নামোল্লেখের পূর্বে মিরচাই বাবা, রেডিও বাবা, কাগমার্গ প্রভৃতি গল্পগুলি বলে তিনি মূল গল্পের রসপরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, এবং তারপর পরমার্থ প্রভৃতি সাধারণ মানুষরূপী প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় বিরিঞ্চিবাবার অলৌকিক ক্ষমতা বিবৃত করেছেন। সেইসব বিবৃতিগুলি থেকে গল্পে বিরিঞ্চিবাবার

আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরিঞ্চিবাবার বয়স পাঁচশ কি পাঁচহাজার তা বোঝা যায় না। তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, ইচ্ছে করলেই যে কাউকে 'আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি.সি.তে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন। মেকিরাম আগরওয়ালাকে এইভাবেই একবার নাইন্টিন ফোর্টিনে আর এক বার নাইন্টিন নাইন্টিনে নিয়ে গিয়ে তাকে লোহার ব্যবসায়ে পনর লাখ টাকা লাভ করিয়ে দিয়েছেন। চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা কালে আইনস্টাইনকে তিনিই থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। বলাবাহুল্য যে বাবার এই সব অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে, বিশেষ করে মেকিরামের অর্থপ্রাপ্তির সংবাদে পুলকিত হয়ে নিতাইবাবু বিরিঞ্চিবাবার অনুগ্রহ লাভের আশায় পরমার্থকে নিয়ে দমদমার বাগান বাড়িতে যাত্রা করেন, এবং তাঁদের সঙ্গে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করে নিবারণ ও সত্যব্রত।

এরপর বিরিঞ্চিবাবার সাক্ষাৎগৃহে বাবার চেহারার যে পরিচয় পেলাম তাতে তিনি রীতিমত ভোগী মানুষ। তাঁর 'গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ', 'হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট' এবং 'অঙ্গে গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা' ও অনুরূপ কানঢাকা টুপি দেখে যথার্থই এক দিব্য পুরুষ বলে বোধ হয়। তবে বাবাজির প্রতি পাঠকের মনে ভক্তিরসের সঞ্চয়নটা পরশুরামের উদ্দেশ্য নয়, তাই অমন দিব্যরূপের মাঝেও 'দু-পয়সা দামের শিঙাড়ার মত সুবৃহৎ নাক'-এর উপমাটা তিনি বেশ ব্যঙ্গ করেই ঢুকিয়েছেন। অতঃপর নিবারণকে নিয়ে বাবা তাঁর ক্ষমতার খেলা দেখাতে শুরু করেছেন। তিনি নিবারণের পূর্ব জন্মের পরিচয় নিয়ে এক কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন এবং কথা প্রসঙ্গেই জানিয়ে দেন যে মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তারপর গোবর্ধন বাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাসও তাঁকে এককালে ঐ প্রশ্নই করেছিল। তুলসীদাসের মঙ্গলের জন্য তিনি তার রামায়ণ লেখা শেষ হলে তাকে মানসিংহ করে দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল এই যে তুলসীদাসের মৃত্যু হয়েছিল ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে আর বাংলাদেশে মানসিংহের রাজত্বকাল ছিল ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বলা বাহুল্য যে ত্রিকালজ্ঞ বিরিঞ্চিবাবা ইতিহাসের এই সূক্ষ্ম হিসেব খেয়াল করেননি, খেয়াল করেন নি তাঁর অনুগত ভক্তের দলও। তাই তাঁরা বিরিঞ্চিবাবার মুখে যীশুর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের কথা শুনে পুলকিত হয়েছেন, বিস্ময়ে মুখ ব্যাদান করেছেন বৈবস্বত মনুকে বিরিঞ্চিবাবা সাহায্য করেছেন শুনে। লক্ষ করতে হয়, এই বৈবস্বত মনুকে বিরিঞ্চিবাবা আপনার অতি পরিচিত লোকের মতোই 'বিবু' বলে ডেকেছেন, যীশুতো তার কাছে 'সেদিনকার ছেলে'। সূর্যবিজ্ঞান তাঁর করায়ত্ব, চন্দ্রসূর্য চালাবার ভার তাঁরই ওপরে। সূর্যের তেজ বাড়িয়ে পৃথিবীর অতিরিক্ত জল শোষণ করে তাকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন তিনিই।

এ হেন মহাপুরুষ বিরিঞ্চিবাবা কিন্তু নিতাইবাবুর মতো সাধারণ মানুষকে খুব একটা আমল দেবার পক্ষপাতি নন। তাই নিতাইবাবুর সস্তায় লোহা কেনার প্রার্থনা শুনে তিনি গোড়াতেই জেনে নিতে চান নিতাই বাবুর আর্থিক ক্ষমতার দৌড় কতখানি। তারপর ভলচার ব্রাদার্সের দেড়শ টাকা মাইনের লেজার কিপারকে তিনি অতি সহজেই থামিয়ে দেন এই বলে যে—

> "ষড়ৈশ্বর্য সস্তায় হয় না বাপু, কঠোর সাধনা চাই।...সূর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত না হলে কালস্তম্ভ করা যায় না। তাতে বিস্তর খরচ—তোমার কম্ম নয়।"

এরপরই তিনি নিতাইবাবুকে এমনভাবে মার্তণ্ডমন্ত্র জপের পরামর্শ দেন যা বাস্তবে অসম্ভব। আসলে বাকপটু বিরিঞ্চিবাবা তাঁর সমস্ত ঐশীক্ষমতার আত্মপ্রচার চালান ধর্মের নেশাগ্রস্ত বিত্তবান মানুষের বিত্তলাঘবের দিকে লক্ষ্য রেখেই। তাই নিতাইবাবুর মতো দেড়শ টাকার লেজারকিপারকে অনুগ্রহ করবার আগ্রহ তাঁর থাকার কথা নয়।

বিরিঞ্চিবাবার মতো ভণ্ড মহাপুরুষদের একটা বিশেষগুণ থাকে; তারা অনেক সময়ই ভাঙে তবু মচকায় না। গল্পের শেষে হোমঘরে অগ্নিসংযোগের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর কেবলানন্দ যখন নকল মহাদেব রূপে ধরা পড়ে যায় এবং বিরিঞ্চিবাবারও সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা যখন মিথ্যা ও ধাপ্পা বলে প্রমাণিত হয়, তখনও বিরিঞ্চিবাবা তাঁর পেশাসুলভ বাগবিস্তার বন্ধ করেন নি। বরং গুরুপদবাবুর সঙ্গে পূর্বের মতোই রহস্যালাপ করে বলেছেন—

> "কেমন গুরুপদ এখন আশা মিটল তো? যে নাস্তিক তার দিব্য দৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমাদের কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দেখা দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।"

এই অংশে বিরিঞ্চিবাবার ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের নির্মোক ভেঙে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আর পাঁচটা মানুষের মতো তিনি অতিসাধারণ হয়ে যান নি। আধুনিক সমালোচনায় অতি দুর্বৃত্ত চরিত্রের মধ্যেও একধরনের intellectual power-এর উপস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া হয়, যা চরিত্রটিকে অ-সাধারণ করে তোলে। বিরিঞ্চিবাবা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন না হতে পারেন, কিন্তু অসামান্য বাগ বিভূতি বলে তিনি যে নিজের সম্পর্কে এক অসাধারণ ইমেজ তৈরী করে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তুলতে পারেন তা মানতেই হয়। গল্পের অন্তিমে তাঁর সেই ইমেজ ঝরে পড়লেও বাগবিভূতিতে এতটুকু ভাঁটার টান পড়েনি।

বিরিঞ্চিবাবাকে কি গল্পের নায়ক বলা যায়? একথা ঠিক যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সৎ ও মহৎ চরিত্রই গল্পকাহিনীর নায়ক হত। কিন্তু আধুনিককালে নায়ক বিচারের সে সংজ্ঞা বদলেছে। তাই তারাশঙ্করের 'দেবতার ব্যাধি'র ডাক্তারবাবু বা মানিকের 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর ভিখুর নেতিবাদী চরিত্রও আজকাল নায়কের মর্যাদা পায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে খল চরিত্র হলেও বিরিঞ্চিবাবার নায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকা উচিত নয়, বিশেষত, গল্পের শিরোনাম যখন তাকে কেন্দ্র করেই রচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে 'দেবতার ব্যাধি' এবং 'প্রাগৈতিহাসিক'-এ উল্লিখিত নেতিবাদী চরিত্রদুটি গল্পের প্রথম থেকেই সক্রিয় এবং তাদের বিপরীতে তেমন কোনো ইতিবাচক চরিত্র নেই। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে কিন্তু সেক্ষেত্রে বিরিঞ্চিবাবার বিপরীতে সত্যব্রত ও নিবারণ নামে দু'দুটি ইতিবাচক, সক্রিয় প্রধান চরিত্র উপস্থিত। তাছাড়া এই ইতিবাচক চরিত্র দুটির একটি আবার গল্পমধ্যে সংগুপ্ত এক মধুর রসের ফল্গুধারারও অন্যতম আধার। গল্পের শেষে বিরিঞ্চিবাবার বিদায়ের পর সেই মধুর রস মিলন সম্ভাবনায় হাস্য মধুর হয়ে উঠেছে। তাই সেদিক থেকে এক যোগ্যতর নায়কের সন্ধান পাওয়ায় বিরিঞ্চিবাবাকে অন্য নায়ক বলা যায় না, যদিও কেন্দ্রীয়, মুখ্য, অনাতম

আকর্ষক চরিত্র হিসেবে তার ভূমিকা গল্পের অপরাপর চরিত্রের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল।

পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা গল্পটি যে সময়ে লেখা হয় তার প্রায় কয়েক বছর আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ উত্তাপ বাঙালীর গায়ে না লাগলেও যুদ্ধোত্তর পর্বে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটা আঁচ বাঙালীও যেন অনুভব করতে শুরু করেছিল। এরই সঙ্গে রাওলাট আইনের মাধ্যমে বৃটিশের দমননীতি স্পষ্ট হচ্ছিল, সরকারের শিল্পনীতির প্রভাবে সারা দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলিতে আন্দোলন দানা বাঁধছিল এবং দারিদ্র্য, বেকারী ও হতাশা বাঙালী সমাজকে একটু একটু করে গ্রাস করেছিল. এই হতাশা, দারিদ্র্য প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে কালের ধর্মপ্রাণ সাধারণ বাঙালীর একাংশ যে সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্রিয়া-কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। বলা ভালো যে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সাধু সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশই যথার্থ অর্থে অধ্যাত্ম জগতের মানুষ নন, ব্যক্তিগতভাবে কর্মবিমুখ ও ভবঘুরের স্বভাবের অধিকারী এক শ্রেণীর মানুষ আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত পাবার জন্যেই সাধু সেজে দেশের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরে বেড়াত। পরশুরামের সমাজ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এই সব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নিতে ভুল করেনি। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে শিল্পের খাতিরে কিছুটা অতিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় মানুষের পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা বা আর্থিক উন্নতি লাভের আশায় এইসব ছদ্ম সাধুদের কৃপাদৃষ্টি পেতে আগ্রহী এমন মানুষদের পরিচয় অঙ্কনেও পরশুরামের দৃষ্টি অভ্রান্ত। লক্ষণীয় যে এই সব মানুষদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার, নিম্নমধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, প্রভৃতি সবাই উপস্থিত। পরমার্থ পোশাকী পরিচয়ে ইনসিওরান্সের দালাল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে চাকরিপ্রাপ্তির সুযোগ লাভে বঞ্চিত শিক্ষিত যুবক, কারণ সে যুগে নিরুপায় হয়েই সাধারণ মানুষ এইসব জীবিকা গ্রহণ করতো এবং লোকসাধারণ এই ইনশিওরান্সের ব্যাপারে আগ্রহী না থাকায় তাদের উপার্জনও তেমন আশানুরূপ ছিল না। নিতাইবাবু নিম্নমধ্যবিত্ত দেড়শটাকা মাইনের কেরাণী, সংসারের জোয়াল কাঁধে বয়ে বয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। তাই অলৌকিক উপায়ে কিছুটা অর্থ উপায়ের সুযোগ-সন্ধানের আশাতেই এঁদের বাবার দরবারে আসা। অন্যদিকে ব্যারিস্টার মি. সেন ও মুৎসুদ্দি গোবর্ধন মল্লিক উচ্চমধ্যবিত্ত বা কিছুটা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রথমজন কয়লার খনিতে টাকা লাগিয়ে অনেক টাকার লোকসান করে (ভবিষ্যৎ লাভের আশায়?) ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন আর দ্বিতীয়জন তাঁর তৃতীয়পক্ষ ও কারবার সংক্রান্ত নানা অভিযোগের সমাধান সন্ধানেই যে বাবার স্নেহসান্নিধ্যের প্রত্যাশী তা বলাই বাহুল্য।

একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল এই যে দারোয়ান ফেকু পাঁড়ে ও মৌলবী সাহেবের বিরিঞ্চিবাবার প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, বরং বিরাগ আছে যথেষ্ট। মৌলবী সাহেবের বিরাগ বিদ্বেষের পেছনে ধর্মীয় কারণ থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু পরশুরাম যে কারণটিকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছেন সেটি হল বিরিঞ্চিবাবার আবির্ভাবে মৌলবী সাহেবের উপরি উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। ফেকু পাঁড়েকেও যে বাবার আবির্ভাবের ফলে অনেক উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে তাও তার মন্তব্যে ধরা পড়ে। আসল কথা, ধর্মের প্রতি

মানুষের অনুরাগ-বিরাগ যে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর নির্ভর করে এই সহজসত্যটা পরশুরাম তাঁর গল্পের মধ্যে স্পষ্ট করে গেছেন।

পরশুরাম ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং রসায়ন শাস্ত্রের এক অনলস দক্ষ গবেষক কর্মী। ফলে আবেগ প্রবণ ভাববাদ বা অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদ এবং বুদ্ধিবাদের ওপর নির্ভর করেই তাঁর মনোভূমিটি গড়ে উঠেছিল। ফলে পৌরাণিক বা সমকালিন যে কোনো পটভূমিতেই তাঁর গল্পগুলি লেখা হোক না কেন, তার মধ্যে বাস্তবতা ও ইহমুখিতার প্রতিফলন ঘটেছে বারবার। Rational philosophy বা যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন, গাণিতিক ন্যায়ের শৃঙ্খলে তাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। ফলে এই বস্তুবিশ্বের যেখানে যত অসঙ্গতি সেখানেই তাকে সুনিপুণ ব্যঙ্গের সাহায্যে উৎকটভাবে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে ধর্মের নেশায় আচ্ছন্ন, সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল, মোহান্ধ সাধারণ মানুষের মনে যুগোপযোগী যুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে একটা বড়োরকমের ঝাঁকুনি দিয়ে গেছেন। বলা দরকার যে ধর্মকে যে একদল বুদ্ধিমান সুবিধাবাদী মানুষ চিরকালই ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে তার প্রমাণ শুধু তাঁর 'বিরিঞ্চিবাবা'য় নয়। প্রায় একইকালে প্রকাশিত 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এবং 'মহাবিদ্যা' গল্পদুটিতেও রয়েছে।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে পরশুরাম চরিত্রানুসারী শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। সাধারণত এই ধরনের শিরোনাম কাহিনীর কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র, নায়ক বা নায়িকার নাম অনুসারেই নির্ধারিত হয়। আলোচ্য গল্পে বিরিঞ্চিবাবা অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র, তবে নায়ক নয়। বরং ধর্মের নামে সে যেভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছে তাতে তাকে খলনায়ক বলা যায়।

অবশ্য বিরিঞ্চিবাবাকে খলনায়ক হিসেবে কাহিনীর কেন্দ্রে রেখেই পরশুরাম তাঁর গল্পের ঘুঁটি সাজিয়েছেন। গল্পের গোড়াতেই বিরিঞ্চিবাবার প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেন নি ঠিকই, তবে এই ভণ্ডসাধুর নাম প্রস্তাবের-সঙ্গে সঙ্গেই গল্প এবং তার চরিত্রগুলি যেন কিছুটা নড়ে-চড়ে বসেছেন, তেমনি নিবারণ ও সত্যব্রতও বিরিঞ্চিবাবার প্রতারণা ও ভণ্ডামি লোকসমক্ষে প্রকাশের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে।

অতঃপর হাবশীবাগানের মেস থেকে গল্পের স্থানপট পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরিঞ্চিবাবাই হয়ে উঠেছেন আলোচনার মধ্যমণি। তাঁর প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের পূর্বেই গল্পের বিভিন্ন চরিত্র তাঁকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছে, তাতে তিনিই হয়ে উঠেছেন গল্পের কেন্দ্রীয় শক্তি। একথা হয়তো ঠিক যে আলোচ্য গল্পের তিনি পরিচালনশক্তি নন। কিন্তু তাঁর নাম মাহাত্ম্যেই গল্প যে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, এওতো অস্বীকার করবার নয়।

তবু প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোনো কাহিনীর খল চরিত্র অথবা নেতিবাদী চরিত্র কি সে কাহিনীর শিরোনামে স্থান পেতে পারে? এ সম্পর্কে বর্তমান লেখকের একটু ছোট্ট নিবেদন আছে। সাধারণ অবস্থায় poetic justice বা literary justice-এর কথা ভেবে কোনো খল বা নেতিবাদী চরিত্রকে গল্প উপন্যাস বা নাটকের অর্থাৎ কোনো আখ্যান নির্ভর সাহিত্যের শিরোনামে স্থান দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু উক্ত খল বা নেতিবাদী চরিত্র যদি super

intellect বা অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হয়। তাহলে? শেকসপীয়ার তাঁর 'Rechard III নাটকে এমনই এক উচ্চ মেধাসম্পন্ন খল চরিত্রকে শিরোনামে স্থান দিয়েছেন। বিরিঞ্চিবাবা গল্পের বিরিঞ্চিবাবাকেও আমরা তেমনই এক উচ্চমেধাসম্পন্ন খল চরিত্র বলতে পারি যার ব্যক্তিত্বে ও বাকচাতুর্যে অভিভূত হয়ে এ গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর পায়ে বিনম্র শ্রদ্ধার অপচয় ঘটিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বাবার মহিমার ছদ্ম আবরণ উন্মোচন করে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ও ভাগ্য বিপর্যয়ের হাস্যমধুর পরিণাম অঙ্কনই গল্পকারের উদ্দিষ্ট। সেদিক থেকে বিরিঞ্চিবাবার নামে শিরোনাম নির্বাচন করে গল্পকার কিছু ভুল করেছেন বলে মনে হয় না।

তাছাড়াও 'বিরিঞ্চিবাবা' নামটিও একটু বিশিষ্ট বোধক। 'বিরিঞ্চি' শব্দটি ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতারই পরিচয় বহন করায় শব্দটি ওজনে কিছুটা ভারী। এরই সঙ্গে 'বাবা' শব্দের মহিমা (ব্যাঙ্গার্থে?) ও অনুপ্রাসের ঝংকার মিলে 'বিরিঞ্চিবাবা' শিরোনামটিকে সত্যই বিশিষ্টবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

সংস্কৃত আলংকারিকের সাহিত্যের যে নয়টি রসের উল্লেখ করেছেন হাস্যরস তার একটি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এই রসটি কিছুটা উপেক্ষিত ছিল। হাস্যরস তখনকার দিনে প্রধানত স্থূল ভাঁড়ামো, অশোভন অঙ্গবিকৃতি ও অশ্লীল আদিরসযুক্ত কৌতুকের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিককালে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়ে রস সাহিত্যের জগতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। হাসিকে একালের সমালোচকেরা সমাজবীক্ষণ ও মানবমনের স্বতস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ মাধ্যম বলে মনে করেন। হাসির নানা উৎস বৈচিত্র্য সম্পর্কেও একালের সমালোচকেরা সচেতন। পাশ্চাত্যে humour, wit, satire, pun, fun ইত্যাদি হাসির নানা প্রকার ভেদও সমালোচকরা করেছেন। আধুনিক সাহিত্যে তাই হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই শ্রেণীবিভাগের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

লম্বকর্ণ : বৈঠকী বয়নশিল্প

মননকুমার মণ্ডল

'লম্বকর্ণ' গল্পটি গড্ডলিকা (১৩৩২) গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প। রায়বাহাদুর বংশলোচন ব্যানার্জীর নিরুপদ্রব জীবনে একটি ছাগলের এসে পড়া এবং তাকে নিয়েই গল্পের কৌতুকাবহ পরিণতি। গল্পের শুরুতেই বংশলোচন বাবুর যে ছবিটা ফুটে ওঠে তাতে বৈঠকী মেজাজের চরিত্রগুলির নিদর্শন আছে। ঔপনিবেশিক শাসনে প্রভুশক্তির প্রদেয় উপাধি নিয়ে যারা যথেষ্ট প্রতিপত্তিসহ নগর কলকাতার আশেপাশে টিকে ছিলেন তাদের মধ্যে বংশলোচন ব্যানার্জী অন্যতম। পুরো নাম রায় বংশলোচন ব্যানার্জী বাহাদুর অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে চল্লিশোর্ধ, স্থূলকায় হবার ফলে ডাক্তারী পরামর্শে ভাত-লুচি বর্জন করে প্রত্যহ বিকালে খালের ধারে হাঁটতে বেরোন। রাজশেখরের গল্পে ইংরেজদের পোষা এরকম অনুগত দেশী চরিত্র অনেক আছে। সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের তিনকড়ি বাবুর কথা মনে পড়ে। স্মরণে আসে তাঁর বহুখ্যাত উক্তি—'শেষে লিখলুম কোল্ডহ্যাম সাহেবকে, যে হুজুর তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না।'—এটাই বংশোলোচনবাবু গোত্রের মানুষগুলির পরিচয়। কিন্তু 'লম্বকর্ণ' গল্পে স্ত্রী মানিনী দেবীর সাথে বংশলোচনবাবুর মনোমালিন্য কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে টেনে ধরেছে 'লম্বকর্ণের' কাহিনী। এই আপাত অপ্রধান জন্তুর কৌতুক গল্পে প্রায় মূলসুর হয়ে উঠেছে। বংশলোচনবাবুর মত মানুষগুলোর অন্তর্নিহিত শূন্যতা অথবা মানসিক দৈন্যতা প্রকাশের সহায়ক হিসাবে লম্বকর্ণের অস্তিত্বকে ধরা হলে—গল্পটি নিতান্তই কৌতুকের থাকে না। এবকম অলস, পরজীবি, প্রভুশক্তির অনুগত বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষগুলো তো বাংলার নবজাগরণস্রোত মানুষ নয়। প্রভুত্বের চুঁইয়ে পড়া ক্ষমতার দম্ভে এঁরা বৈঠকী মজলিশি গল্পের প্রবহমানতাকে বজায় রেখেছিলেন। এদের আশেপাশে ঘিরে থাকে কিছু ক্ষমতালিপ্সু সময়-অপব্যায়ী মানুষ, যারা ঐ বৈঠকী মেজাজের অঙ্গীসুর। এরা সকলেই লম্বকর্ণকে নিয়ে ঘটনাগুলিকে Serious করে তোলে এবং seriousness-এর মাঝখানে হাস্যরসের রকমফের ঘটে যায়। পরশুরামের গল্পে বাগভঙ্গির Seriousness একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর বর্ণনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই গল্পে 'লম্বকর্ণ', 'চুকন্দর সিং', 'ভূশণ্ডীর মাঠ' গল্পে 'ক্ষীরী-বামনীর' অশরীরী চরিত্র এসবই এর উদাহরণ।

লম্বকর্ণ গল্পের কেন্দ্রে নিঃসন্দেহেই থাকে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ। একথা কয়েকজন সমালোচকের লেখাতেও দেখা গিয়াছে। অভিভাবকহীন ছাগলের সন্ধান পেয়ে তাকে গৃহে প্রতিপালন করার জন্য নিয়ে আসার সময় বংশলোচনবাবুর 'মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল'। দাম্পত্য কলহের এই কাঁটার স্বরূপ হল—

''আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তারপর দিনকতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধিস্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয় বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না।''

· এরকম একটি দাম্পত্য সম্পর্ক কিভাবে মিলনমধুরতার বৃত্ত সম্পূর্ণ করল, তার গল্প লম্বকর্ণ। গৃহকর্ত্রী মানিনী দেবীর সঙ্গে বংশলোচনবাবুর মান-অভিমান ছাগল লম্বকর্ণকে নিয়েই বেড়ে উঠল। 'ভদ্দর লোকে আবার ছাগল পোষে।' একথা বলে মানিনীদেবী দারোয়ান চুকন্দর সিংকে বলেন তাকে বের করে দিতে। কিন্তু বংশলোচনবাবু আত্মসম্মান আছে। তিনি বেলেঘাটার সম্ভ্রান্ত অনারারি হাকিম—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা একমাস জেলের শাস্তিবিধান তাঁর হতে। ফলতঃ 'কিসের লজ্জা, কিসের নারভাসনেস? বংশলোচন বার কয়েক মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা করেন না।' দারোয়ানকে তিনি বলে দিলেন ছাগল বাড়ির বাইরে গেলে চাকরিও যাবে তার। এই অবস্থায় পুরাকালে জাঁদরেল জেদী পুরনারীরা যা করতেন মানিনী দেবীও তাই করার কথা বলেন। "মানিনী স্বামীর প্রতি অগ্নিময় নয়নবান হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়।' হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।" এহেন মান-অভিমানের ফলশ্রুতিতে বৈঠকখানা ঘরে শোবার বিছানা করেন কর্তা অন্যদিকে কর্ত্রী পিত্রালয়ে। এখানে এই পারস্পরিক শয়নস্থান পরিবর্তনকে অপূর্ব ব্যঙ্গরসে জারিত করেছেন পরশুরাম। পুরাকালে বড়লোকদের গৃহে আর্যনারীদের একটি করে গোসাঘর থাকত। কিন্তু আর্যপুত্রদের তেমন ব্যবস্থার কথা শোনা যায় না। তারা এক পত্নীর সাথে মতান্তরে অন্য পত্নীর দারস্থ হতেন। কিন্তু, "আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।" এরকম বর্ণনার humour-এ যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিতুলনা পাওয়া যায় তা অসাধারণ। রাত্রে আহারের পর বৈঠকখানা ঘরে একাকী বংশলোচনবাবুর গীতাপাঠ এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি প্রয়াসেও সেই হাস্যরসের বিদ্যুৎছটা।

রাত্রে লম্বকর্ণ বংশলোচনবাবুর বিছানায় শয্যাগ্রহণের ঘটনা যেমন কৌতূহলদ্দীপক তেমনি কৌতুকাবহ। কিন্তু এখান থেকেই বংশলোচনবাবুর অপদস্থ হবার সূত্রপাত। এই অপদস্থতার সূত্রেই তিনি লাটুবাবুর কাছে লম্বকর্ণকে দিতে উদ্যোগী হন। শর্ত এই যে—'ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।' যাইহোক, 'ভদ্দরলোক কখনও ছাগল পোষে?' এই প্রশ্ন করেও লাটুবাবু লম্বকর্ণকে নিয়ে গেল। তারপর লাটুবাবুর ব্যান্ডের দলের সমস্ত সামগ্রী যখন একে একে গলাধঃকরণ করল সে তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল লাটুবাবু। 'লব্বইটাকার লোট্' খেয়ে ফেলার শোকে মুহ্যমান লাটুবাবুকে বংশলোচনবাবুর পরামর্শ—'একটা জোলাপ দিলে হত না?'। এই মন্তব্যগুলির একটা আপাত Seriousness-ই হাস্যরসের আধার। বিধ্বস্ত লাটুবাবু ও তার কেরাসিন ব্যান্ডের ইতিহাসও কৌতুকাবহ। যাইহোক একশ' টাকা ক্ষতিপূরণ নিয়ে লাটুবাবুর দল বিদায় নিলে লম্বকর্ণকে নিয়ে পুনরায় বিড়ম্বনা শুরু হল বংশবাবুর। বিনোদবাবুর সামনে টেঁপী বাবা-মায়ের ঝগড়ার কথা ফাঁস করে দিতে থাকলে বংশলোচন বলেছেন—'আরে এতদিন সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।' অর্থাৎ লম্বকর্ণ আর এখন অদ্ভুত আচরণকারী চতুষ্পদী ছাগলমাত্র নয়। সে মানুষের পরিবারে সমস্যা উদ্রেককারী আরেকটি মনুষ্যচরিত্রর

মত ভূমিকা তার। পরদিন বেলেঘাটা খালের ধারে লম্বকর্ণকে ছেড়ে আসার সময় প্রবল বজ্রপাত এবং দুর্যোগে বংশলোচনবাবু জ্ঞান হারালেন। আর একবার তার দুর্বলচিত্ত মনের প্রকাশ ঘটল। কিন্তু ছাগল লম্বকর্ণ বৃষ্টি ধরতেই বাড়িতে খবর দিলেন এবং গৃহকর্ত্রী ফিরে পেলেন কর্তাকে। ভুলে গেলেন অভিমান। সাদর আপ্যায়নে বাড়িতে রয়ে গেল লম্বকর্ণ। লোকজনের বিদ্রুপে তো লম্বকর্ণের কোনকালেই কিছু আসে যায় না। পরাশ্রয়ী জীব এমন আশ্রয়েই ভাল থাকে। বাবু সম্প্রদায়ের এই মজলিশি মানুষগুলো বিশ শতকের প্রথমার্ধের যুদ্ধকালীন ক্ষয়িষ্ণুতার স্মারক হয়ে আছেন। পরশুরামই সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যার কলমে এঁদের মন-মানসিকতার অন্যতর নির্মাণ ঘটেছিল।

সামগ্রিকভাবে গল্পটিতে হাস্যরসের প্রবাহ চারটি বিভিন্ন মাত্রায় হয়েছে। প্রথমতঃ নানা চরিত্রের উপস্থাপনায়—তাদের বর্ণনার সূক্ষ্মরীতিতে। দ্বিতীয়তঃ বংশলোচনবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডার বিষয় এবং কথোপকথনে। তৃতীয়তঃ বংশলোচনবাবুর নানা পর্যায়ে অপদস্থ হওয়া এবং তাঁর বিড়ম্বনায়। চতুর্থতঃ লম্বকর্ণের বিচিত্র কার্যকলাপ। গল্পে এগুলির উদাহরণ সুপ্রচুর। যেমন, দারোয়ান চুকন্দর সিং-এর পরিচয়—"'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। জীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।"

আবার লাটুবাবুর দল যখন এসেছে তাদের বর্ণনা এরকম—"তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার —ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা। মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট -ওয়াচ, গায়ে আগুলফলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।" আর তারপর লাটুবাবু একে একে তার কনসার্ট দলের সঙ্গী সাথীদের আলাপ করিয়ে দিতে বলেন—

> 'লবীন লিয়োগী ক্লারিয়নেট—এই লরহরি লাগ ফুলোট—এই লবকুমার লান্দন ব্যায়লা।'

এসব বর্ণনায় আবহটাই হয়ে ওঠে বৈঠকী মেজাজের, হাস্যরসের। বর্ণনায় একটা কার্টুনিস্টের মত ঝোঁক। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার শক্তি না থাকলে বর্ণনার ভাষায় এই Wit সঞ্চারিত করা যায় না। বংশলোচনবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডার পরিবেশে ও আড্ডার বিষয় ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-আসরের কথা স্মরণে আনে। বংশলোচনবাবুর সুসজ্জিত বড় ঘরের কার্পেটে আঁকা আছে কাল জমির ওপর আসমানী রঙের বিড়াল। বিড়াল বোঝানোর জন্য নিচে লেখা আছে CAT এবং রচয়িত্রীর নাম মানিনী দেবী। বিড়ালের রঙ সাদা না হয়ে আসমানী হবার কারণ জানান হয়েছে—"যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে।" আড্ডাখানার ঘরে একটি রাধাকৃষ্ণের ছবির বর্ণনাও চমৎকার। "কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই; কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁকার মাত্র।"

এরকম বর্ণনাত্মক বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাস্যরসের খোরাক। এই বৈঠকখানায় প্রতিদিন বহুসংখ্যক 'রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে'। পরমার্থতত্ত্ব, মোহনবাগান, আলিপুরের নতুন কুমির কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূরসম্পর্কের ভাগনে উদো'র (উদয়) বাগ-বিতণ্ডা প্রবল হাসির খোরাক। বাঘের মাপ সংক্রান্ত বিতর্কে তারা প্রায় মারামারির উপক্রম করেছে। পত্নীনিষ্ঠ উদোর কথায় কথায় নিজের স্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে আনার বদভ্যাস সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এরকম বৈঠকখানায় গল্প-আমেজের ছাপ এই গল্পের সর্বত্র। এমন মনে হয় যে, বৈঠকখানার সমস্ত মানুষগুলোই এরকম অদ্ভুত বিড়ম্বনার গল্পের চরিত্র। বৈঠকী মেজাজের মধ্যে যে স্বাভাবিক হাস্যরস এবং সিরিয়াসনেস পাশাপাশি চলে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। লম্বকর্ণকে টেনে বাড়িতে আনার পর সে সিরিয়াস হয়ে ওঠে। তখন ছাগলের স্বাভাবিক আচরণ মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিতার মধ্যে নিয়ে আসে বিড়ম্বনা, তৈরী হয় নির্মল হাসির পরিবেশ। ত্রৈলোক্যনাথের বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে এই গল্পের তুলনামূলক আলোচনায় সমালোচক শিশিরকুমার দাশ বিষয়টি ধরছেন সুন্দর ভাবে। উদ্ধার করি কিছু অংশ—'এই দুটি গল্পেই ('লম্বকর্ণ' এবং 'চিকিৎসা সঙ্কট') একটি আসর লক্ষ্য করা যায় এবং আসরের কথাবার্তা ও চরিত্রগুলির হাবভাবের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের আসরের ভঙ্গি অতি স্পষ্ট। ত্রৈলোক্যনাথ আসরেব প্রাধান্য দিয়েছেন বলে তাঁর গল্প আসলে গল্প-শৃঙ্খলের একটি অংশ। পরশুরাম এই আসরকে প্রাধান্য দেননি কিন্তু তার মর্যাদা দিয়েছেন।' (বাংলা ছোটগল্প : পৃ ১৬৯, দে'জ ২০০২)

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরামের পাত্রপাত্রীদের 'unconscious humourist' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এই গল্পে লম্বকর্ণকে নিয়ে বংশলোচনবাবুর বিড়ম্বনার বর্ণনায় সেকথাটা আবার স্মরণে আসে। বলা হয়ে থাকে, 'Humour may be ascribed either to a comic utterance or to a comic appearence or mode of behavior?' এখানে 'Comic utterence' র পাশাপাশি 'comic appearence' ও অপূর্বভাবে ধরা পড়ে। বেলেঘাটার খালের ধারে বেড়ানোর সময় যখন একটি ছাগল তাঁর সমস্ত চুরুট খেয়ে বলে 'অ-র-র-র' অর্থাৎ 'আর আছে?' তখন বিভ্রান্ত-হতবাক বংশলোচনবাবু। তার চামড়ার সিগার কেস ভক্ষণ করার পর—'রায়বাহাদুর হাসিবেন কি রাগিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—শ'-শালা'। বর্মা চুরুট খাওয়ার পর লম্বকর্ণ বংশলোচনবাবুর বারান্দায় শুয়ে রোমন্থন করছিল। ঘুম তার চটে গেছে। এরমধ্যে রাত্রি একটা নাগাদ জোর ঠাণ্ডা হাওয়া উঠলে সে বংশলোচনবাবুর বিছানায় আশ্রয় নেয়। ক্ষিদের চোটে সে খবরের কাগজ ও গীতার তিনটি অধ্যায় উদারস্থ করেছে—গলা শুকিয়ে গেলে জলাভাবে প্রদীপের তেল পান করলে প্রদীপ নিভে গেল। নিষ্প্রদীপ ঘরে বংশলোচনবাবু তার বিছানায় মানিনীদেবীর মানভঞ্জনহেতু আগমন কল্পনায় লম্বকর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘটে গেল ভয়ানক কাণ্ড। পাঠকের হাসির প্রাবল্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বংশলোচনের বিড়ম্বনা।

এরকমভাবেই লাটুবাবুকে 'লব্বইটাকার লোট' ফেরৎ পেতে জোলাপ খেতে পরামর্শ দেন তিনি। এই Serious পরামর্শই 'হিউমার‍্যাস'। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি বংশলোচনবাবুর বিড়ম্বনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এখানে বর্ণনাভঙ্গির মধ্যেই একটা

টেনশন তৈরী হয়। সিলোনে মনসুন আগমনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন লেখক। এখন 'দ্রুম-দুদ্দুড়-দুড়ু! আকাশে কে ঢেড়রা পিটিতেছে? ...আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে।' বংশলোচনবাবু বেলেঘাটার খালের ধারে যেখানে লম্বকর্ণকে পেয়েছিলেন সেখানে ছেড়ে দিলেন এবং ছাগলের গলায় লিখলেন—

'আল্লাকালী যীশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না'।

প্রাণে না মারার এই অহিংস প্রেমবাণী বারবার বাঁচিয়ে দেয় লম্বকর্ণকে। আসলে গল্পের এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ আর শুধু ছাগল নয়—মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি মনুষ্যেতর প্রাণী।

বংশলোচন ব্যানার্জ্জীর অসহায়ত্ব এই গল্পে লম্বকর্ণের কার্যকলাপের সমান্তরালে ফুটে উঠেছে। বৈঠকখানার আড্ডায় টেঁপি যখন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের কথা শিশুসুলভ চপলতায় প্রকাশ করে দেয় তখন তাঁর বিনোদবাবু বলেন 'হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশি ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল?' লম্বকর্ণকে 'ঘরভেদী বিভীষণ' বলেন তিনি। আসলে রায়বাহাদুরের পারিবারিক অবস্থার বর্ণনাগুলি প্রচ্ছন্নে একটা ব্যঙ্গও তৈরী করে। যে লোক ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরেজ সাহেবের আশীর্বাদপুষ্ট আমলা তিনিও কেমন নিজের পরিবেশ পরিস্থিতিকে করে তোলেন হাস্যাস্পদ-ব্যঙ্গাত্মক। মনে পড়ে 'চিকিৎসা সংকট' গল্পের নন্দবাবু নিজের অন্তিম সিদ্ধান্তে গল্পের মধুর পরিণতি ঘটে। বৈঠকী আড্ডাব পরিবেশ এই গল্পতেও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার পুণ্যের 'কমিশন' সঞ্চয়, তিনকড়িবাবুকে প্রতারণার অভিনব প্রকল্প সমস্তই রাজশেখর বসুব চরিত্রসৃষ্টির অভিনব প্রয়াস। এগল্পেও লম্বকর্ণ ও বংশলোচনবাবু, বিনোদ, লাটুবাবু, মানিনী দেবী, টেঁপি উদয় সকলেই অপরূপ অবয়ব নিয়ে ফুটে ওঠে। তাদের আচরণ, উৎকেন্দ্রিকতা, বিড়ম্বনা, সিরিয়াসনেস সমস্তটাই হাস্যরসের আধার।

'গড্ডলিকা'র অভিনব ছবিগুলির স্রষ্টা যতীন্দ্রকুমার সেন। দ্বারভাঙ্গার এই ভদ্রলোকের সাথে বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরির সময় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তিনি ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন বিভাগের চাকুরে। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'র সমস্ত স্কেচই তাঁর করা। এগুলো বাদ দিলে গল্পের হাস্যরস বা সৃষ্টি সামগ্রিক রস পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছবিগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন—'লেখার ধারা, রেখার ধারা সমানতালে চলে, কেউ কাহার চেয়ে খাটো নহে।' (প্রবাসী ১৩৩২) শ্রীসেন 'মানসী'তে 'মর্মবাণী'তে কার্টুন আঁকতেন ও ছড়া লিখতেন। লম্বকর্ণ' গল্পে মোট পাঁচটি ছবি আছে। 'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা', 'হজৌর', 'ভুটে বললে-হালুম', 'মরছি টাকার শোকে', 'লুচি কখানি খেতেই হবে' নামাঙ্কিত ছবিগুলি গল্পের রস ঘনীভূত করেছে।..বিশেষত দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছবিতে চুকন্দর সিং ও লাটুবাবুর যে অদ্ভুত রূপায়ণ দেখা যায় তা বর্ণনায় সবটা পাওয়া যাবে না। বর্ণনার পরিপূরক হয়েছে ছবিগুলো। গল্পের প্রারম্ভে ছাগলের মুখাঙ্কিত রেখাচিত্র ও বংশলোচনবাবুর খালের ধারে লম্বকর্ণকে নিয়ে বসে থাকার চিত্রটিও অনবদ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্ব বাংলা ছোটগল্পে বিচিত্র বিভঙ্গে ধরা পড়েছিল। মানুষ ও সমাজ সর্বাত্মক বিকৃতি-অস্থিরতা-গ্লানির মধ্যে জেগে উঠছিল নতুন মানুষ, নতুন বাস্তবতা।

বাংলা ছোটগল্পে এই বস্তুতান্ত্রিকতা থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন পরশুরাম। ফলতঃ রবীন্দ্রপূর্ব গল্পের বৈঠকীধারার সাথে চরিত্রের সামাজিকীকরণের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এরকম একটি হাসির গল্পেও দেখি প্রত্যেক চরিত্র এমনকি ঘর-আসবাব-পরিস্থিতি চিত্রণে সমকালীন বাস্তবতার বোধ সূক্ষ্মভাবে জারিত করে তাঁকে। ফলে নিতান্ত হাস্যরসের উৎসারণে সমাজের প্রেক্ষিতটি কখনই হারিয়ে যায় না। লম্বকর্ণের মত ছাগলকে বাড়িতে চিরকালের মত মানিনীদেবী যখন আশ্রয় দেন স্বামীর কল্যাণ্যার্থে তখন ভাঙনের সময়েও বাঙালী পরিবারের চিরন্তন গৃহী মূল্যবোধ (Values) গুলি চারিয়ে ওঠে। এ মূল্যবোধের ভাঙনেই হাসি, কিন্তু রক্ষার কঠিনব্রতও কত বিচিত্র পথে উঠে আসে! পরিবারের কল্যাণকামিতার প্রতীক হয়ে ছাগল লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনায় বাঁধানো হয়। রাজশেখর বসুর গল্পে পরিপূর্ণতা এইখানে যে, তা মানুষ ও পরিবারের বন্ধনগুলির সম্পূর্ণতাকে তুলে ধরে। অনেক জায়গাতেই আধুনিকতার প্রগল্‌ভ প্রকাশকে তিনি ব্যঙ্গ করেন। একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন যেন থেকে যায় সনাতন জীবনচর্যার প্রতি। রসের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নির্দ্বন্দ্ব মতামত আছে 'লঘুগুরু' প্রবন্ধাবলীতে। তিনি বলেন—'কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা'। (পৃ ৫৩, ১৩৪৬) এখানে কল্যাণকামিতার পারিবারিক সনাতন ভিত্তিকেই গল্পেব সমাপ্তি হিসেবে ব্যবহাব করেন তিনি। এই কল্যাণময়তার নির্মাণে তিনি হাস্য ও ব্যঙ্গবসেব পৃথক নন্দন নির্মাণ করেন। 'লম্বকর্ণ' নামের Connotation-এ স্বামী-স্ত্রীব দাম্পত্য সম্পর্কের সেই অনুষঙ্গ ভেসে আসে।

কচিসংসদ : কেষ্টর প্রেম

বাবুল হোসেন

যতীন্দ্রকুমারের ব্যঙ্গচিত্রই নাকি পরশুরামের হাসির গল্প লেখার উৎস। তবে উৎস যাই হোক না কেন জীবনরঙ্গমঞ্চে প্রতিদিনই যে বিভিন্ন অসঙ্গতি লক্ষিত হয় তা তাঁর গল্পে রয়েছে। এরসঙ্গে মিশেছে লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও যে গল্প রচনায় তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মননশীলতা ও সৃজনশীলতা উভয় দিকেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়া পরশুরামের গল্পের আর একটি উপাদান হল পরিবেশ রচনার দক্ষতা। রয়েছে চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্বও। চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে জীবন্তভাবে। আর এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে 'কঙ্কাবতী', 'ভূত না মানুষ' এবং 'ডমরুচরিত' এর স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে আসে। উপকরণ ও প্রকরণে পরশুরাম যদিও তাঁর থেকে আলাদা, তথাপি তিনি ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসূরি।

হিসেব করে ভালোবাসা হয় না। অঙ্ক থাকলেই ভালোবাসা ফাঁকি দেবে। ভালোবাসা বা প্রেম যাই হোক না কেন তা একান্ত ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়া। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতি কোনো কিছুই বিচার-বিবেচনা করে সে আসে না। আবার সে কখন আসে তা বলাও মুশকিল। এখানে হৃদয়ই মুখ্য ব্যাপার। বাকি সব গৌণ। প্রয়োজনে সমস্ত বিপদকে মাড়িয়ে সে মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। 'কচিসংসদ' গল্পের নায়ক কেষ্ট এর প্রমাণ। হিসেব করতে গিয়ে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়ল তার কাছে। অতএব নায়িকা পদ্মর সঙ্গে তার বিয়ে স্থগিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হল না। সমস্ত হিসাবকে পাশ কাটিয়ে এখন কোন অলক্ষ্যে কেষ্টর মন পদ্মর মনের ঘরে জায়গা করে নিয়েছে। সমস্ত হিসেব-নিকেশের ঊর্ধ্বে তখন হৃদয়। তাকে থামানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। শেষে শুভপরিণয় পদ্মর সঙ্গে কেষ্টর দার্জিলিং ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে।

'কচিসংসদ' গল্পের সংসদের সদস্যরা হলেন—শিহরণ সেন, বিগলিত ব্যানার্জি, অকিঞ্চিৎ কর, হুতাশ হালদার, দোদুল দে, লালিমা পাল (পুং)। শেষনামটি শুনে অনেকেব মেয়ে বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই নামের পাশে পুং শব্দটির সংযোজন।

আবার পেলব রায়ের পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। নামটি তার পছন্দ নয়। বোধহয় একটু পুরোনো গোছের। হয়তো বা প্রাচীনত্বের ছাপ কোথাও বা রয়ে গেছে। পেলারাম নতুন নাম নিতে চায়। একটু আধুনিক হতে চায়। বি.এ. পাশ করার পর তার মোলায়েম হবার সখ জেগেছে। একটু কচি হবার বাসনা। কচিসংসদের সদস্য হিসাবে যাতে মানানসই হয়। তাই ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে নাম বদল করতে গেলে সার আশুতোষ মুখুজ্যে এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া করেন। পেলারাম পালিযে আসে। কিন্তু কচি সে হবেই। তাই—

> "সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি টাইপিস্টের খোঁপার মতন মাথার দুপাশ ফাঁপাইয়া দিল।"

—সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক-মুগার পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফাউন্টেন পেন-এ সে সত্যিই কচি হয়ে উঠল। আর কচি সংসদের অন্যান্য সদস্যরা বয়সে যাই হোক না কেন নামে-কাজে-বাহ্যিক আচরণে কচিই বটে। হুতাশ হালদারের বর্ণনাতে লেখক বলেছেন—"হুতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে," তবে কচিসংসদের পুরো দায়িত্ব কেষ্টর। সে এই সংসদের প্রেসিডেন্ট। খরচপত্র সবই চলে তার পয়সায়। এই কচিসংসদের উদ্দেশ্য কি তা বোঝা মুশকিল। তথাপি এর সদস্য যে কেউ হতে পারে না। সদস্য হতে হলে ভয়াবহ দীক্ষাপ্রণালী অতিক্রম করে তবেই সম্ভব। নতুন সদস্যকে—'গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করস্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী ষোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ষোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এনতার চা খরচ হয়।"

গল্পের মূল চরিত্র কেষ্টকে নিয়েই কাহিনীর শরীর গড়ে উঠেছে। সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ব্রজেনবাবু চরিত্রটি। নকুড়মামাও। অন্যান্য চরিত্ররা তো আছেই। কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগ্নে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। পিতৃমাতৃহীন। বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র। অতএব কেষ্টর প্রতি নকুড় মামা বিশেষ যত্নবান। কিন্তু কেষ্ট মামাকে বড়ো গ্রাহ্য করে না। বরং ব্রজেনবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল খানিকটা। খ্যাপাটে ভাগ্নের কোনো আবদারই অগ্রাহ্য করে না মামা। তাই ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যেও নকুড়মামা দার্জিলিং-এ কেষ্টর জন্য এসে পৌঁছায়। এমন শীতের মাঝেও মামা আসতে বাধ্য। কেননা ভাগ্নের হঠাৎ বিয়ের সাধ জেগেছে। অতএব জরুরী তলব—'এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন ভিলায় ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ করিতে চাই।' এজন্য শুধু নকুড় মামাই আসেনি, তার আগে বরযাত্রীর দল এসে হাজির। বরযাত্রী মানে কচিসংসদের কচিসদস্যরা। স্ত্রীসহ ব্রজেনবাবু দার্জিলিং-এ হাওয়া বদলে এসে এই কাণ্ড-কারখানার সঙ্গে গেলেন জড়িয়ে। বিয়ের সব তোড়জোড় পাকা। কিন্তু পাত্রী কোথায় কেউ তা জানে না। সংসদের সদস্যরাও না। তবে কি বিয়ের নামে হেঁয়ালি করা? নাকি পাত্রী ঠিক আছে? সেকথা কি তাহলে শুধু কেষ্টই জানে? আসলে এইরকম কার্যকলাপ কচিসংসদেব পক্ষেই মানানসই। জীবন তাদের কাছে বোধহয় হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়।

দুই

নায়ক কেষ্ট বিয়ে করে সংসারী হলে তার কচিত্ব কেটে যাবে হয়তো। নকুড়মামা খানিকটা স্বস্তি পাবে। কেষ্টর বাউণ্ডুলে জীবনের সমাপ্তি হবে। কেননা সে খেয়াল-খুশি অনুযায়ী জীবন যাপন করে "দিনকতক খেয়াল হল, ছবি আঁকলে। তারপর আমসত্ত্বর কল করে কিছু টাকা ওড়ালো। চারপর কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দার হয়ে একটা সমিতি করলে।" এবার বিয়ে করে কেষ্ট সংসারী হবেন মামার ধারণা। কিন্তু পাত্রী কোথায়? মুন-শাইন ভিলায় সবাই উপস্থিত শুধু কেষ্ট ছাড়া। এমন সময় কেষ্টর প্রবেশ বিচিত্র রকমে—

> "তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন ছাঁটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট,

কোমরে বেল্ট, মালকোঁচা-মারা বেগনী রঙের ধুতি, পায়ে পট্টি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে ক্যাম্বিসের ন্যাপস্যাক স্ট্রাপ দিয়া বাঁধা।''

—বেশভূষায় কেষ্ট আর যাইহোক ভারতীয় নয়। ঠিক বাঙালীও নয়। বলা ভালো আধুনিক বাঙালী ও পাশ্চাত্যের মিশ্রণে গড়া। যত না বাঙালী তার চেয়ে বেশি বিদেশী। কিন্তু কেষ্টর এহেন পোশাক পরার পিছনে সে যুক্তিসম্মত কাবণ প্রদর্শন করে। তার কথায়—''মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীততাপ নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি একে বলে ইম্পিরিয়াল, এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা।...আমার পোশাক দেখুন—প্রাম ভায়োলেট অ্যান্ড সেজ-গ্রীন হোয়াইট স্পটস্—কলার কনস্ট্রাস্ট অ্যাণ্ড হারমনি।...এই যে দেখছেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর বোঁচকা, এতে পাবেন না এমন জিনিস নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বেপরোয়া।'' ব্রজেনবাবু কেষ্টর এহেন কথা শুনে থমকে গেলে পরক্ষণেই সে দুপকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে টানতে টানতে বলে—''পারেন এ রকম? একটা ভার্জিনিয়া একটা টার্নিশ। মুখে গিয়ে ব্লেন্ড হচ্ছে।'

আসলে কেষ্ট বাংলার আলো-বাতাসে বড়ো হলেও, বাঙালী হলেও সচেতন প্রয়াসে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের আশ্রয়ী। বেশভূষা কথাবার্তা তার প্রমাণ। তাই সে কচিসংসদেব সদস্য পেলব রায়কে বলে—'কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবার সময হযেছে।' সর্ব বিষয়েই তাই কেষ্ট নতুনত্ব খোঁজে। কার্যকারণ সম্বন্ধে সবকিছু চিনে নিতে চায। ইউবোপীয সংস্কৃতি দ্বারা চালিত হয়। বিয়ে করার আগে তাই প্রেম সম্বন্ধে অনেক তথ্য দেয। সেখানে—

''চণ্ডীদাস বলেছেন—নিমে দুধ দিয়া একত্রকরিয়া ঐছন কানুব প্রেম।

রাশিয়ান কবি ভড্‌কাউইস্কি বলেন—প্রেম একটা নিকৃষ্ট নেশা।

মেট্‌নিফক বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আবও উপকাবী।

মাদাম দে সেইরাঁ বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়।

খায়য়াম লিখেছেন—প্রেম চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী মিশুতে হয়।

হেনরি-দি-এইট্‌থ বলেছিলেন,—প্রেম অবিনশ্বব, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে।

ফ্রয়েড বলেন—প্রেম হচ্ছে পশুধর্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা।''

তবে প্রেমসম্পর্কে কেষ্টর অভিমত হল—'প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।' শুধু তাই নয় প্রেম তার কাছে—'একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রাপ্রপাত, আকস্মিক বিপদ যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।' অতএব বিয়ে করাব পূর্বে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করা তার একান্ত কর্তব্য। বিয়ে করে সে একটা পয়সাও নেবে না। শুধু জগৎকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্য সে বিয়ে করবে। সমাজে প্রচলিত দুরকম বিবাহ প্রথা কোনোটাই তাই তার মতে ঠিক নয়। দেখেশুনে বিয়ে করা বা দেখাশোনা করে বিয়ে দেওয়া। আগে বিবাহ, পরে প্রেম তার মতে বড় সেকেলে। আবার আগে প্রেম, পরে বিবাহ সেটাও ঠিক নয়। এর পিছনে কারণ দেখায় সে এইরকম।

"আগে বিবাহ হলে পরে যদি বনিবনা না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ এও সমান খারাপ, কারণ কোর্টশিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তারপর বিবাহ্ হয়ে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।"

কেষ্টর উভয় যুক্তিই ঠিক। কিন্তু ব্যতিক্রমও তো আছে। নইলে পৃথিবীর সমস্ত নারী-পুরুষের, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুদিনেই ভেঙে যেত। আর এই অঙ্ক কষে বিয়ে করার প্রথা চালু হতো। দুটি হৃদয়ের নিবিড় সম্বন্ধে যতবেশী অঙ্কের হিসাব থাকে তার থেকে বেশী থাকে হৃদয়ের চুম্বক কর্ষণ। সেখানে বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপরই মানবিক সম্পর্কগুলি টিকে থাকে দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বেঁচে থাকার জন্য, ভালো থাকার জন্য, ভালোবাসার জন্য তাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের হিসাব চলে নিরানব্বই ভাগ। কিন্তু নায়ক কেষ্ট প্রেমকে বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে চান। কেননা, প্রেমের গন্ধ থাকলে লুকোচুরি আসতে পারে এই ভেবে। পাত্রী ভুবন বোসের ভগ্নী পদ্মমধু বোসের সঙ্গে পরস্পর মত বিনিময়ে উপযুক্ত প্রমাণিত হলেই তবেই বিয়ে। নচেৎ নয়। মধ্যস্থতা করবেন ব্রজেনবাবু। আহার্য, বেশভূষা, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু নির্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি তিরানব্বইটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হবে উভয় পক্ষকে স্থির হল। যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভীষণরকমে মতভেদ হবাব সম্ভাবনা থাকে। অধিকাংশ বিষয়ে সমমত হলে বিয়ে। নতুবা জোড়াতালি দিয়ে বিয়ে করা নয়। ব্রজেনবাবু (আমি) মধ্যস্থতায় কেষ্ট ও পদ্মর মধ্যে শুরু হল হাইকোর্টশিপ। শুরু হল প্রশ্ন করা—

১. "কেষ্ট তুমি লঙ্কা খাও?

কেষ্ট। ঝাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি। পদ্ম কি বল?

পদ্ম। লঙ্কা না হলে আমি খেতেই পারি না।"

২. "আচ্ছা তোমরা চাযে কে ক চামচ চিনি খাও?

কেষ্ট। এক।

পদ্ম। সাত।"

৩. "আচ্ছা কেষ্ট, তুমি কি রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেষ্ট। একটু শক্তরকম, ধরুন দু-ইঞ্চি গদি। বেশী নরম হলে আমার ঘুমই হয় না।।

পদ্ম। আমি চাই তুলতুলে।"

৪. "আচ্ছা কেষ্ট পদ্মর চেহারাটা তোমার কি রকম পছন্দ হয়?

কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিযা তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—'খাখ্-খাসা চেহারা।'

পদ্ম, এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'যেন একটি সঙ!'

উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্যই দেখা গেল। সুতরাং বিয়ে ভেস্তে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত কেষ্টর নির্দেশানুযায়ী। কিন্তু অত সহজে ছাড়ার পাত্র কেষ্ট নয়। ব্রজেনবাবু যতই—

napoo, nothing doing। কেস এখন মুলতুবী রইল লিখুন না কেন উভয়ের মতামত আপোস করতে রাজি কেষ্ট। তার কথায়—

১. "আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।"

২. 'আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব।"

এ আমরা কোন কেষ্টকে দেখছি? এ তো কচিসংসদের কেষ্ট নয়। তবে কে? কেনই বা সে আপোস করতে চায়? সে তো আপোসের পক্ষপাতী নয়। আসলে এ কেষ্ট এখন আর কচিসংসদের প্রেসিডেন্ট কেষ্ট নয়। সে আঁতলামি মুক্ত কেষ্ট। প্রেমিক কেষ্ট। পদ্মর কেষ্ট। হাইকোর্টশিপের ফাঁকে পদ্মর কাছে মন হারিয়ে ফেলা কেষ্ট। কারণ ইতিমধ্যে সে পদ্মর প্রেমে ধরা পড়া পাখি। কখন ধরা পড়েছে সে নিজেও জানে না। কিন্তু সে এইটুকু বুঝতে পারছে ভালোভাবে পদ্মকে তার চাই-ই। যে কোনো মূল্যে আবার ব্রজেনবাবুও ছাড়ার পাত্র নয়— 'দেখ কেষ্ট চালাকি করো না।' কিন্তু আটকাবে কে? হৃদয়ের আকর্ষণ কি লোহার বেড়ি দিয়ে আটকানো যায়? যদি যেত তাহলে রাধা পাগল হত না কৃষ্ণের জন্য। আটকানো গেল না কেষ্টকেও। সে বিয়ে করলো পালিয়ে এসে কলকাতায়। পদ্মকে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে।

পদ্মর সঙ্গে বিয়ে না হলে কেষ্ট প্রাণ রাখবে না বলে স্থির করলো। তার মুখ কাঁদো কাঁদো। চোখে পাগলের চাউনি। পদ্মকে সে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে যে—'পদ্মর সঙ্গে বে না হলে সে আর প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা অ্যাসিড।' শুধু কচিসংসদের কেষ্ট নয়, পৃথিবীর প্রেমের ইতিহাসে সব প্রেমিক-প্রেমিকায় পরস্পরের জন্য এমন কিছু নেই যা তারা করতে পারে না। সত্যিকারের ভালোবাসায় সেখানে প্রাণ বিসর্জন তুচ্ছ ঘটনামাত্র। পূর্বেই বলেছি প্রেম ব্যাকরণ মেনে হয় না। সুতরাং পদ্মর সঙ্গে কেষ্টর বিয়েও সমস্ত ব্যাকরণকে বাদ দিয়েই সম্পন্ন হল। সমস্ত যুক্তির ঊর্ধ্বে প্রেমের জয় প্রদর্শন হল এইভাবে। যা সনাতন ভারতীয় আদর্শ দ্বারা পরিচালিত।

গল্পে নায়ক কেষ্ট পরশুরামের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে অদ্বিতীয়। জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যেই যে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। তার সাজপোশাক, আচার আচরণ সবই আলাদা। জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় জিনিস প্রেম তথা ভালোবাসাকেও যে যুক্তির মূল্যে কিনতে চায়। কিন্তু সব জায়গায় তো আর যুক্তি চলে না। একথা সে বুঝেছে পদ্মর সঙ্গে মত বিনিময়ের সময়ে। সেখানে সে উপলব্ধি করেছে হৃদয়ের কাছে যুক্তি হিসাবশাস্ত্র একেবারেই ব্যর্থ। সে জন্য রাজকন্যাও রাখালছেলের জন্য ঘর ছাড়ে। সুসজ্জিত পালঙ্ক ছেড়ে প্রণয়ী-যুগল আশ্রয় নেয় গাছতলায়। সেখানে সুস্বাদু মাংস-কাবাবের চেয়ে পোড়া বাসি রুটিও অনেক তৃপ্তিদায়ক। অতএব প্রেমের জন্য কেষ্ট এক চামচ চিনির বদলে তিন চামচ খেতে রাজি। খেতে রাজি ঝালও। প্রয়োজনে মাথার চুল এক ইঞ্চি বাড়িয়ে, সখের দাড়িও কেটে দিতে পারে। শুধু পদ্মর জন্য। পদ্মর ভালোবাসা পাবার জন্য। না হলে অ্যাসিড খেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার হুমকি। প্রেম যে অনেক কিছুই পারে এ গল্পে কেষ্ট তার একটা উদাহরণ মাত্র। তবে এ প্রেম একান্ত সনাতন ভারতীয় ভাবধারাপুষ্ট। তাই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রেমকে যাচাই করতে এসে কেষ্ট হোঁচট খায়। হোঁচট খেয়ে ফিরে

আসে স্বদেশে। আর লেখক একটু পর্দার আড়ালে থেকে এইভাবেই আলপিন ফুটিয়ে দেন আমাদেরকে। স্মরণ করিয়ে দেন দেশীয় ঐতিহ্যকে। সংস্কৃতিকে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে। ব্রজেনবাবুর স্ত্রীর মুখ দিয়ে তাই উচ্চারণ করান—"আমাদের মতন মুখ্খু লোকের সীতারামই ভালো।"

'কচিসংসদ' নামকরণের মধ্যে কিছুটা গোলযোগ আছে। সংসদের সদস্যদের আঁতলামি, কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয় নামকরণের পক্ষপাত পুষ্ট হলেও গল্পের বিষয় বা কাহিনী কিন্তু ভিন্ন পথে চালিত হয়েছে। কেষ্টর বিয়ের ব্যাপারটাই এখানে মুখ্য। কচিসংসদের কার্যকলাপ খুব বেশি জমি দখল করেনি। সুতরাং গল্পটির নামকরণ পরিবর্তিত হলে বোধহয় ভালো হত। সেক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে নামকরণ এরকম খাপছাড়া মনে হত না। যদিও পরশুরাম ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গাত্মক জীবনচিত্রকে তুলে ধরেছেন এখানে। সংসদের সদস্যরা আসলে যে কচি নয়, পেকে গেছে সে কথা বোঝাতে।

পরশুরাম গল্পটির মধ্য দিয়ে যেভাবে পাশ্চাত্য অনুকরণকে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই প্রভাব কাটিয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। এবিষয়ে তিনি সূক্ষ্ম মননধর্মীতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটি যথাযথ বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ও নাটকীয় রসে জারিত হয়ে পরিবেশিত। সঙ্গে হাস্যরসের পরিবেশনাও শিল্পসম্মত। যা আমাদের বক্তাক্ত করে না। ক্ষতবিক্ষত করে না। বরং প্রাচীন আদর্শ, ঐতিহ্যকে স্মরণ করায়।

সরলাক্ষ হোম : চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির সমস্যা

সুতপা সাহা সরকার

'সরলাক্ষ হোম' গল্পটি একটি মামুলী ত্রিকোণ প্রেমের গল্প হতে পারত। কিন্তু সরলাক্ষ হোম নামে জনৈক সর্বসমস্যা সমাধানকারী এবং তার বন্ধু ডাক্তার বটুক সেনের হস্তক্ষেপে এক ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। বাংলা কাগজে সরলাক্ষ হোমের বিজ্ঞাপনটি সবাইকেই আকৃষ্ট করেছিল। বরুণ বিশ্বাস, গদাধর ঘোষ, গদাধর কন্যা মাণ্ডবী এবং বরুণ বিশ্বাসের অফিসের খঞ্জনা দাস। এরা সকলেই সরলাক্ষ ওরফে সরলচন্দ্র সোমের কাগজে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়েছিল কারণ তারা প্রত্যেকেই একই সমস্যায় জর্জরিত।

গদাধর ঘোষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তাঁর মুরুব্বির জোর আছে। বরুণ বিশ্বাসকে তিনিই প্রতিপালন করেছেন কেননা শৈশব থেকেই বরুণ বিশ্বাস মাতৃপিতৃহারা। তাকে পিতৃবন্ধু গদাধর ঘোষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পড়াশোনা করিয়েছেন আমেরিকা থেকে। বরুণ ছমাস হল গোটাকতক ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে। গদাধর ঘোষ নেহাতই হৃদয়বৎসল বা অবিমৃষ্যকারী কোনটাই নন। তিনি পিতৃবন্ধুর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃকৃত্যটিও সেরে রাখতে ভোলেন নি। তাঁর মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে বরুণ বিশ্বাসের মত সুযোগ্য পাত্রের বিবাহ্ আগে থেকেই স্থিরীকৃত—তিনমাস পরেই সেই শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে।

বরুণ বিশ্বাস পাত্র হিসেবে অতি সুযোগ্য সন্দেহ নেই, শুধু ডিগ্রী প্রাপ্তিতেই উচ্চ সীমা তা নয়, বাজারী দরেও তিনি এখন বহুমূল্য। বরুণ এখন বানর-নির্বাসন অধিকর্তা অর্থাৎ ডিরেক্টর অফ মংকি ডিপোর্টেশন। এমন সুযোগ্য পাত্রকে জামাতা হিসেবে পেয়ে গদাধর ঘোষের এত অর্থব্যয় সার্থক। কিন্তু বিধি বাম্। বরুণের দৃষ্টিতে মাণ্ডবী 'ছোট বোন' এর মত। তাছাড়া বরুণের পছন্দের সঙ্গে মাণ্ডবী একেবারেই মেলে না। তার স্বাস্থ্যের স্থুল ভাব, তার সেকেলে ধরনের অতিমাত্রিক সাজসজ্জা, ফোর্থ ইয়ারে পড়া সত্ত্বেও ভুল ইংরেজী বলার সমস্যা সব মিলিয়ে সে ডিরেক্টর অফ মংকি ডিপোর্টেশনকে আকর্ষণ করতে সর্বৈব ব্যর্থ। অন্যদিকে খঞ্জনা দাস যে নাকি রোগা, লম্বা, যার কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ তোলা রুক্ষ ফাঁপানো চুল, কৃত্রিম প্রসাধনের ছাপ ভ্রূযুগল থেকে গাল, নখ, ঠোঁট সর্বত্র সুস্পষ্ট, সস্তা সিন্থেটিক পরণে, সেই মিস দাস বরুণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে মেমের মতো ইংরেজী বলা মেয়ে 'সুপর্ব।' বরুণ বিশ্বাসের মত অধিকর্তা পদে চাকরী করা পুরুষের নিজের পছন্দ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? সেখানেও জটিলতা। কেননা বরুণ বিশ্বাসের এই চাকুরীগত প্রতিপত্তির পিছনে রয়েছে তার ভাবীশ্বশুর গদাধর ঘোষের মুরুব্বির জোর। এখন খঞ্জনা দাসকে বিয়ে করলে স্বভাবতই চাকরী নট্। অতএব কি করণীয়? বরুণ বিশ্বাস মহাসমস্যার সাঁতার কাটছেন।

সম্পর্ক দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন গড়ে ওঠে তখন সেখানে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে তৃতীয় এবং অপরাপর ব্যক্তি। বরুণ বিশ্বাসের প্রতিপালন, প্রতিপত্তি সবই যে গদাধর ঘোষের বদন্যতায় আজ তার মেয়ে মাণ্ডবীকে হৃদয়ের মণিকোঠা তথা জীবন থেকে নির্বাসিত

করার ইচ্ছা দেখা দিলে তাতে গদাধর ঘোষ এবং মাগুবীর কিছু আসে যায় বৈকি। অতএব বরুণ এবং খঞ্জনার সঙ্গে মাগুবী এবং গদাধর ঘোষও দারুণ চিন্তাগ্রস্ত।

সব মুশকিলের আসান হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে মুশকিল আসানের জন্য আবির্ভাব সরলাক্ষ হোমের। তার প্রকৃত নাম সরলচন্দ্র সোম। সর্বমুশকিল আসান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। কে এই সরলাক্ষ হোম? বি.এ পাস করা এক যুবক। সে বি.এ পাস করার পরে স্থির করে যে পড়বে না, চাকরীও করবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জন করবে। কিন্তু এই পথে সে বিশেষ সাফল্য পায়নি, রাজজ্যোতিষীর ব্যবসা বা ডিটেকটিভের ভূমিকা কোনটাতেই সে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। এখন সে এই সর্বমুশকিল আসানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

শার্লক হোমসের জুড়িদার যেমন ডাক্তার ওয়াটসন, সরলাক্ষ হোমের তেমনি এক সহকারী বটুক সেন। বটুক সরলাক্ষর চাইতে বয়সে কিছু বড়, সম্প্রতি পাস করে ডাক্তার হয়েছে, তবে ডাক্তার হিসেবে পসার জমেছে এমন নয়। আপাতত সে সরলাক্ষ হোমের একমাত্র সহযোগী।

সরলাক্ষ হোম তার ব্যবসার প্রচারে কোন কার্পণ্য করেনি। মক্কেলও একেবারে নেই এমন নয়। একজনের সমস্যা সে বেঁটে বলে তাব প্রণয়নী তাকে গ্রাহ্য করছে না, একটি ছেলে কাশী থেকে পালিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসে সব টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় বাবাকে জানাতে লজ্জা বোধ করছে। সরলাক্ষ হোম তাদের প্রত্যেককেই সাধ্যমত বাস্তব অবাস্তব সমাধানের পথ দেখিয়েছে। এহেন সময়ে তার কাছে বিত্তসঙ্গতি সম্পন্ন মক্কেল মাগুবী ঘোষ, বরুণ বিশ্বাস, স্বয়ং গদাধর ঘোষ একে একে উপস্থিত হন। প্রত্যেককেই সরলাক্ষ তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। সাধ্যমত পরামর্শও দেয়, সমাধানের দায়িত্ব সে এবং তার সহকারী নিজ উৎসাহে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে।

সরলাক্ষ ও বটুক দায়িত্ব নিয়েছে, সমস্যার সমাধান না হয়েই যায় না। শ্রী গদাধরের সুপারিশে বরুণ দহরমগঞ্জে বদলী হয়, তার নতুন পদের নাম—কুক্কুটান্ড-বিবর্ধন-পরীক্ষা-সংস্থা-আযুক্তক অর্থাৎ অফিসাব ইন চার্জ হেন্‌স এগ এনলার্জমেন্ট এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন। বটুক সেন এখন আর সরলাক্ষর সহকাবী নয়, সে নতুন বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা। তার সঙ্গে শ্রীমতী খঞ্জনার পরিচয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই শুভ পরিণয় সম্পন্ন। ইতিমধ্যেই শ্রীমতী খঞ্জনা বরুণ বিশ্বাসকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, তাকে তীব্র ভাষায় চিঠিও লিখেছে। এখন মাগুবীর 'লাইন-ক্লিয়ার'। কিন্তু মাগুবী বরুণের কাছে সমর্পণের মোলায়েম চিঠি পেয়েও বরুণকে সে আর গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। অতএব গল্পের পরিণতিতে মাগুবীর সঙ্গে সরলাক্ষ হোমের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। সরলাক্ষ এখন গদাধর ঘোষের কৃপায় পরিকল্পনা মহোপদেষ্টা পদে উত্তীর্ণ। সবই যখন শুভ তখন বরুণ বিশ্বাসই বা প্রত্যাখ্যানের বিরহে কাতর থাকবে কেন? গল্প অনুযায়ী—তাকে বিয়ে কববার জন্যে একটা মাদ্রাজী, দুটো পাঞ্জাবী আর তিনটে ফিরিঙ্গী মেয়ে ছেঁকে ধরেছে, তাছাড়া ওখানকার জজ গিন্নী, ডেপুটি-গিন্নী আর উকি গিন্নীও নিজের নিজের আইবুড়ো মেয়েদের বরুণের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। বেচা বি করবে ভেবে পাচ্ছে না।"

'সরলাক্ষ হোম' গল্পটিতে পরশুরামের তীব্র তির্যক ব্যঙ্গ কটাক্ষের পাশাপাশি নির্মল কৌতুক রসের মেলবন্ধন ঘটেছে। গল্পটি ১৩৬০ (১৯৫৩) সালে প্রকাশিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে তখন শিক্ষিত চটকদার চাকুরীরতা 'খঞ্জনা দাস'দের উদ্ভব। তাদের 'মেমসাহেবের মত' ইংরেজী বলার দক্ষতায়, তাদের অত্যাধুনিক আকর্ষণীয় চেহারার চটকে বরুণ বিশ্বাসেরা কুপোকাৎ। সেই পর্বেই পরোক্ষে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব, ইঙ্গ প্রভাবিত ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধতাও পরবশতার বিষয়টি পরশুরামের দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রণয় বিষয়ে হৃদয় ঘটিত ক্ষেত্রগুলোর ভঙ্গুরতার দিকটিকে লেখক নির্মল হাস্যকৌতুকের প্রশ্রয়ে পরিবেশন করেছেন। খঞ্জনা কত সহজেই বরুণকে ত্যাগ করে বটুককে গ্রহণ করে, মাণ্ডবী তার 'বাঙালে গোঁ' বশতঃ বরুণকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করে না সরলাক্ষের সঙ্গেই তার মূল্যবান হৃদয়টির বিনিময় ঘটে যায়। হৃদয়গ্রাহ্য এই সম্পর্কগুলো সামাজিক লেনদেন আশ্রয়ী—এটাই রূঢ় বাস্তব। তাই সরলাক্ষ হোম এবং বটুক যেন গদাধর ঘোষের বদান্যতায় উচ্চপদস্থ চাকরীর বিনিময়ে দুই নারীকে গ্রহণ করে।

গল্পটিতে ভারতবর্ষের সরকারী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপদার্থতার দিকটি তীব্র ব্যঙ্গে প্রকাশিত। বানর নির্বাসন ও তার পরিসংখ্যান নির্ণয় জনিত হাস্যকর কারণে একটি বিভাগের সৃষ্টি যার অধিকর্তা বরুণ বিশ্বাস। বটুক সেন যখন সেই পদে বহাল হয় তখন বরুণ দহরমগঞ্জে যে পদে বদলী হয়ে যায় তার নাম কুক্কুটাস্ত বিবর্ধন পরীক্ষা-সংস্থা-আযুক্তক। সরলাক্ষ হোম উপকণ্ঠ গির্যাশ্রমের পরিকল্পনা জানিয়ে পরিকল্পন মহোপদেষ্টার পদ লাভ করে। প্রতিটি পদ সৃষ্টির কারণ এবং নামকরণে পরশুরামের সরকারী প্রশাসনের প্রতি ব্যঙ্গবোধই প্রকাশিত। গদাধর ঘোষের মত লোকেরা মুরুব্বীর জোরে অনুচিত, অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয়কে বাস্তব করে তোলেন এবং সরকারী তহবিলের নয়ছয় হয়। এরকম ঘোষ প্রবরদের মত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্র স্থাপনা করতে অযোগ্য জনসাধারণ লালায়িত এবং সম্পর্ক সূত্র একবার স্থাপিত হলে তাদের সমস্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তারা কিভাবে উচ্চবেতনভোগী সরকারের কৃপাধন্য কর্মচারী হয়ে উঠতে পারে আমলাতন্ত্রের এই ক্ষতিকর দিকটিকেও লেখক আবরণহীনভাবে তুলে ধরেছেন।

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—"রাজশেখর বাবুর হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন নৈপুণ্য।.......তিনি হাস্যরসিকের দৃষ্টি লইয়া জীবনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ খণ্ডাংশগুলি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্যপ্রবাহ ছুটাইয়াছেন।......পরিস্থিতির প্রভাবই তাহাদের মধ্যে হাস্যরস নিষ্কাশন করিয়াছে। হাসির বিন্দু যতই স্বচ্ছ হইবে, ততই তাহার মধ্যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য, জীবন সমালোচনার বিশেষ ধারা প্রতিফলিত হইবে।.......স্বতঃ উৎসারিত স্বচ্ছতার জন্য এই হাস্যরস বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।" 'সরলাক্ষ হোম' গল্পটির আপাত সমস্যা নরনারীর হৃদয় সঙ্কট জনিত প্রেমের ক্ষেত্রে ত্রিবিন্দু সমস্যা। এই সমস্যা ঘটিত কাহিনী নতুন কিছু নয় এবং এর সমাধানও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি বিন্দুর অপসারণ। কিন্তু এই গল্পে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হওয়া সত্ত্বেও ত্রিভুজের কোন বিন্দুর সঙ্গেই কারোর মিলন ঘটেনি বরং প্রত্যেকেই আরেকটি স্বতন্ত্র নিজস্ব বৃত্ত গঠন করেছে। যেভাবে পরিস্থিতির সমাধান দেখানো হয়েছে তাতে সমালোচকের ভাষা অনুযায়ী

'হাস্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন নৈপুণ্য' জনিত একান্ত মৌলিকতাই উদঘাটিত হয়েছে।

'সরলাক্ষ হোম' গল্পে মানব মানবীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি জনিত সমস্যার পাশাপাশি সমাজ প্রশাসন সমকালীনতার চিত্রটিও বিদ্রূপাকারে চিত্রিত। সমাজ নিরীক্ষার এই বুদ্ধিদীপ্ত ধাবালো কৌতুক পরশুরামের গল্পের একটি বিশিষ্ট ধারা। গল্পে বানরনির্বাসন প্রসঙ্গে তিনি যখন লেখেন 'ভারতবাসী যেমন গুরুকে মাতৃবৎ দেখে তেমনি বাঁদরকে ভ্রাতৃবৎ দেখে' তখন তাঁর ব্যঙ্গের শাণিত ভঙ্গীটিই আবার স্মরণ হয়। তাই সমালোচকেরা যখন হাস্যরস প্রধান কথাসাহিত্যে প্রথম চৌধুরীর পরেই রাজশেখর বসুকে স্থান দেন বা 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'-র স্রষ্টাকে 'ডমরুর' স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরী 'আধুনিক সংস্করণ' বলে প্রতিপন্ন করতে চান তখন তা অযথার্থ মনে হয় না।

পরশুরামের মতোই লেখনীতে কুঠারের তীব্র ধার নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা অসংগতি। যতীন্দ্রকুমার সেন বা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র তাঁর কিছুটা প্রেরণা নিশ্চয়। এভাবেই ব্যঙ্গচিত্র থেকে ব্যঙ্গগল্পের জন্ম। তাঁর সৃষ্টির অনেক ব্যক্তি-চরিত্র সামাজিক স্বভাবেরই প্রতিনিধি হয়ে তাঁর শাণিত আক্রমণেব লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। অহেতুক ভাববাদী বিলাস পরিহার করে প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন যে রিয়্যালিজম্ আন্দোলন বাংলা কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল পরশুরাম সেই পর্বেবই তির্যক তথা কৌতুকরস প্রদীপ্ত রিয়্যালিস্ট শিল্পী।

তিন বিধাতা : বিশ্বাসের অলৌকিক বিধাতা

বিপুল মণ্ডল

'গল্পকল্প' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের অন্তর্গত 'তিনবিধাতা' গল্পটি পরশুরামের রচিত গল্পের মধ্যে ভিন্নস্বাদের একটি রচনা। ধর্মীয় প্রসঙ্গের অবতারণা গল্পটিতে মুখোশ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অভিমুখ অন্যত্র। ঐশ্বরিক চিত্রের উপস্থাপনার আড়ালে পরশুরাম পাঠকের অন্তরাত্মার রুদ্ধদরজায় আঘাত হানতে চেয়েছেন। প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন অপরিণত মানববোধকে। ফলত ঢাল হিসাবে গল্পের পরতে উঠে এসেছে পৌরাণিক চরিত্রের প্রসঙ্গ। গল্পে দেখেছি, বিভিন্ন ধর্মালম্বীর প্রেক্ষিতে 'বিধাতা'-রাও যে ভিন্ন, ভিন্ন তাঁদের অবস্থানও। তীব্র বাস্তববোধ সম্পন্ন শিল্পব্যক্তিত্ব না হ'লে, পরশুরাম এমন অতিস্পর্শ-কাতর চরিত্রের স্থাপনায় রসিকতার ছলে নির্মম সত্য সম্ভাষণ করতেন না। 'তিনবিধাতা' গল্পটি পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই গল্পের মধ্যে জীবনতত্ত্ব বা জীবনভাষ্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এছাড়া সমাজ, ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, শান্তি, প্রেম, নর-নারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় উপস্থিত হয়েছে। 'জাবালি' নিঃসন্দেহে পরশুরামের জীবতত্ত্ব প্রধান গল্প। শুধু তাই নয় পরবর্তী কালের পৌবাণিক গল্পের মধ্যেও 'জাবালি' প্রথম। খুব সম্ভবত মহাভারত ও রামায়ণ থেকে তিনি নানা কাহিনি ও চরিত্র নিয়ে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। 'তিন বিধাতা' গল্পেব মধ্যে যে নানা চরিত্র পাই, যে ঘটনার প্রবাহ তার পরতে পরতে অধর্মীয় নানা আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা সমস্যা নিবারণের জন্য যখন আর কোন উপায় বের করতে পাবছেন না, তখন তারা নির্ভর করেন প্রথমে পূজা উপ্যসনাকারী সাধু মহাত্মার। সাধু-মহাত্মাবা তপস্যার দ্বারা জাগ্রত করেন তিন-বিধাতাকে। বিশ্ব মানবের হিতার্থী সাধু-সন্তরা তাঁদের অনলস পরিশ্রম, অধ্যাবসায় দ্বারা জাগ্রত করেন ঈশ্বরের। 'তিন বিধাতা' গল্পেব সূচনা সমগ্র বিশ্বেব প্রধান তিন বিধাতা বা 'Supreme power' বা সর্বোচ্চশক্তির আহ্বান দিয়ে।

দুই

'তিনবিধাতা' গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, পুরাণের সঙ্গে আধুনিক কালের মিশ্রণ যা পরশুরামের অধিকাংশ গল্পেব মূল সুর। 'তিন বিধাতা' গল্পটিও সেই ধারায় প্রবহমান। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাবনা-চিন্তার একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। তাব বাইরে খুব-বেশী এগোতে পারেন না। সীমা ছাড়িয়ে অসীমেব উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে গেলে, তার জন্য অভ্যাস, সাধন, অধ্যাবসায় আর অনলস পরিশ্রম প্রয়োজন। সুন্দর সময়টাকে কেউ সুন্দর ভাবছি বা চিন্তা করছি, আবার কেউ-কেউ অপচয় বা নষ্ট করছি। যেভাবে সময় ব্যয় করছি, জীবনযাত্রা নির্বাহে তাব মূল্যও তেমনটি পাচ্ছি। আমাদের এই ভারতভূমিতে সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও নানা মুনি-ঋষি সাধন-ভজন-আরাধনা করেছেন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিজ-নিজ জীবন উৎসর্গ করে মহোত্তম ত্যাগের দ্বারা ভারতের যে প্রাচীন ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যটাকে একটা ধারায় বয়ে নিয়ে চলেছেন। এ ভারতকে তাই আধ্যাত্মিকতার দেশ, শান্তির দেশ,

পবিত্রতার দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এখানে বড় আকর্ষণীয় মনোহর-মনোমুগ্ধ করে আমাদেরকে। সব ভেদাভেদ ভুলে আমরা সবাই যে একপ্রাণ বা এক আত্মা ব্যতিক্রম ছাড়া সন্দেহ নেই।

'তিন বিধাতা' গল্পের শুরুতে এক অলৌকিক ঘটনা দিয়ে গল্পকার এগিয়েছেন। যা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি তাও সম্ভব হল। গল্পের তিনবিধাতাকে একযোগে তপস্যা করে পাওয়া গেল। স্থানটি সুমেরু বা হিন্দুকুশ পর্বতে। নির্জন-নিস্তব্ধ-সু-নির্মল স্থানেই ঈশ্বরের বা ভগবানের বা আল্লার আবির্ভাব। তাঁরা আসেন শ্রদ্ধাভাজন ভক্তের কাছে, পবিত্র, সুরম্যস্থানে। গল্পের শুরুতে দেখতে পাই তিন ধর্মের তিন প্রতিনিধি এবং তাঁদের অনুচরেরাও এসেছেন। বিস্তর দেবতা-উপদেবতা এই ঐশ্বরিক সভার বিতর্কে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'-র ভয়ে তিন বিধাতার আহ্বান করা হয়।

ব্রহ্মার সঙ্গে ছিলেন নারদ। তাঁরা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। গডের সঙ্গে সেন্টপিটার। তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতিনিধি, এবং আল্লার সঙ্গে একজন পীর অনুচর রূপে অবতীর্ণ হন। এছাড়া অন্যান্য দেব-দেবী মজা দেখার জন্য আশে-পাশে অবস্থান করেন।

এই তিন বিধাতার হঠাৎ কেনই বা আগমন? এই প্রথম আমাদের মনে জাগে। নারদ-এর মুখ থেকে জানতে পারি, তাঁদের আগমনেব প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যে 'জগতে যাতে শান্তি আসে, মারামারি, কাটাকাটি দ্বেষ হিংসা, অত্যাচার, প্রতারণা লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপ কার্য যাতে দূর হয় তার একটা ব্যবস্থা করা।'

উক্ত সভার কাজ বর্ণনার আগে তিন ধর্মের তিন প্রবর্তকের পরিচয় আমরা জানব। প্রথমে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, হিন্দু ধর্মের বর্ণনা আছে। ভারতবর্ষে অধ্যাত্মসাধনার বিশেষত উপনিষদে এইযে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মাব কোন রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় না। ব্রহ্মা কখনো দৃশ্য বস্তু নন, তিনি নিত্য দ্রষ্টা। তিনি বাইরের নন, অন্তরের তাই তাকে কেউ চোখ দিয়ে দেখতে পান না। কঠোপনিষদে একটি শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—

"কশ্চিদ ধীরঃ প্রত্যা গাত্মান মৈক্ষদ্। আবৃত্ত চক্ষুক মৃতত্ত্ব মিচ্ছন।"

'তিন বিধাতা' গল্পের মধ্যে আমরা ব্রহ্মার বর্ণনাতে পাই, তাঁর চারহাত, চার মুখ, একবার মনে হয় দাড়ি গোঁফ আছে, আবার মনে হয় নেই। লেখক ব্যঙ্গ করে বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রহ্মার পরিধানে ধুতি, কাঁধে চাদর ও মাথায় মুকুট। ব্রহ্মার সাথে ছিলেন নারদ। বাহন হাঁস—গল্পের শেষে জানতে পারি হাঁসটি সভা চলাকালীন মানস-সরোবরে বেড়াতে যায়। এত শীঘ্র সভা ভঙ্গ হবে হাঁস জানত না, অবশেষে ব্রহ্মা নারদের ঢেঁকিতে চড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তিন বিধাতার দ্বিতীয় বিধাতা খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক গড। তাঁর সাথী সেন্ট পিটার। গল্পে তাঁকে যেভাবে দেখান হয়েছে তাহল—তিনি নিরাকার, তাঁকে দেখবার কোন উপায় নেই। কিন্তু ভক্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি পুরাকালের জিহোবার মূর্তিতে আসেন। তাঁর বুক ভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, কাঁধ ভরা চুল, বড় বড় চোখ, কোঁচকানো ভ্রূ, দুর্বাসা মুনির মতো রাগী চেহারা, পরনে আলখাল্লা। এই রূপ বর্ণনার ছবি পঞ্চাশ ষাট বছর আগে চীনাবাজারে ছবির দোকানে বিক্রি হতো। গড অত্যন্ত গম্ভীর, তবে মাঝে মধ্যে বর্তমানে একটু আধটু পরিহাস করেন।

তৃতীয় বিধাতা তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধি আল্লা। তিনি আবার গডের চাইতেও নিরাকার। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মূর্তিধারণ ও কোন কথা বলতে রাজী হলেন না। তাঁর সাথী পীর সাহেব বললেন, 'আল্লা সর্বত্র আছেন এখানে আছেন, তাঁর মতামত আমিই ব্যক্ত করব।' নারদ ও সেন্ট পিটার পীরসাহেবকে বলেন যে, তিনি যে নিজের কথা নিজে বলবেন না তার প্রমাণ কি? পীরসাহেব তখন চাঁদের প্রতীক ঝাণ্ডাটি ধরে পশ্চিমে দিকে মুখ করে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেন। যদি কোনো কিছু বাড়াবাড়ি বলেন, তবে সেই পবিত্র ঝাণ্ডা তার মাথায় পড়বে। পরে ব্রহ্মা ও গড রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর গল্পের মধ্যে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে তিন বিধাতার মধ্যে বাদ প্রতিবাদ, ক্ষমতার লড়াই বাধে। ব্রহ্মা বলেন—'আমি বয়সে সব চেয়ে বড়, অতএব আমিই সভাপতিত্ব করব।' গড বলেন—'তুমি হচ্ছ তেত্রিশ কোটীর একজন, আর আমি হচ্ছি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর' অন্যদিকে ঝাণ্ডার দিকে দুহাত বাড়িয়ে পীরসাহেব বলেন 'ইনিও, ইনিও।'

গড আর আল্লাতালা সভাপতির পদের দাবীদার ঘোষণা করায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে কতদিন চালাচ্ছে, জগৎ সৃষ্টি কে করেছে, কবে এই নিয়ে সভা যখন উত্তাল, কে বড় আর কে ছোট। আগে আর পরে এসেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নারদ এর কথামত তিনজনই সভার সভাপতি হয়ে সভার কাজে অগ্রসর হন। এখানে দেখতে পাই মূল যে সমস্যা জনমানসেব মধ্যে দ্বেষ-লাঠা-লাঠি, দ্বন্দ্ব তার একটা সুস্থ পথ বেব করে দেওয়া। গড জানান যে, সে উপায় তিনি পূর্বে আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মার প্র-প্রৌত্র বাসুকি সে ইচ্ছা নষ্ট করেছে। বাসুকি ছিলেন সর্পকুলের দেবতা। এখান থেকেই শুরু হয় গল্পের মধ্যে গল্প বলার যে ধারা। রাজশেখর বসুর রচনাশৈলীব বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানেও প্রস্ফুটিত হয়। রূপকথায় আমরা যেমন দেখতে পাই কৌটার মধ্যে কৌটা, তার মধ্যে কৌটা এবং সে কৌটার মধ্যে রাক্ষসের প্রাণভ্রমরটি আবদ্ধ। এই যে তার সন্ধান, এই প্রবণতা লেখকের প্রায়ই গল্পে দেখা যায়। বাসুকির কথা বলায় ব্রহ্মা প্রতিবাদ করে বলেন, সেকাজ গডের অনুচর শয়তানের কাজ। শয়তান বজ্জাত বটে, কিন্তু আদম-ইভকে নষ্ট করেনি। নষ্ট করেছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বাসুকি।

ব্রহ্মা নারদকে দিয়ে বাসুকিকে ডাকলেন। বাসুকি যেন প্রস্তুতই ছিলেন। সে নিকটে একটি দেবদারু বৃক্ষের ডালে ল্যাজ ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছিল। নারদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসে ব্রহ্মাকে পিতামহ সম্বোধন প্রণাম করে মূল ঘটনাটি উপস্থাপন করেন। এখান থেকে শুরু হয় গল্পের মধ্যে গল্প।

বাসুকি যে গল্পটা শোনান ওই দেবসভায় তা নিছক পৌরাণিক এক ঘটনার আখ্যান। পুরাণে এ ঘটনা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে, এ পৃথিবীতে প্রথম মানব সৃষ্টির ইতিহাস। পুরাণে দেখান হয়েছে আদম আর তার স্ত্রী ইভ পৃথিবীর প্রথম আদিমতম দুই নারী-পুরুষ। কিভাবে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আদিমতম মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তাদের দৈহিক মানসিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে সে সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে গেছে, সেখান থেকে আজও পর্যন্ত এই সৃষ্টিলীলা চলেছে অবলীলাক্রমে এবং মানুষের মধ্যে যে দ্বেষ, হিংসা-কলহ, কাম, মোহ সেখান থেকেই সৃষ্টি।

সমুদ্র মন্থনের পর শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে বাসুকি পৃথিবী পর্যটন করতে যখন

বের হলেন, তখন দেখলেন যে, তৌরস পর্বতের পাদদেশে একটা চমৎকার উপবন রয়েছে। সেখানে দুটো নর-নারী বন্দী হয়ে আছে। কোনও লজ্জাবোধ নেই, তারা একেবারে অসভ্য। সেই দু'জন নর-নারী আদম আর হবা। আদমের পাঁজরা থেকে জিহোবা হবাকে তৈরী করেছেন। তারা এই তৌরস পর্বতের পাদদেশে চাষবাস করে, ফলমূল খায় আর নেচে বেড়ায় মনের আনন্দে। বাসুকি জানতে পারে তাদের খাদ্যের তালিকায় আছে—আখরোট, আঙুর, আনার অর্থাৎ ডালিম, আঞ্জর অর্থাৎ ডুমুর জাতীয় ফল ইত্যাদি।

শুধু ওই দূরে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়া বারণ। জিহোবা বলেছেন, 'সর্বনাশ হবে আক্কেল বা জ্ঞান খুলে যাবে। ভাল-মন্দ জ্ঞান হবে' আর তারা সব বুঝতে পারবে।

বাসুকি ল্যাজে ভর দিয়ে নিষেধ উপেক্ষা করে অসম সাহসিকতার দৃষ্টান্ত রাখেন। তার আক্কেল দাঁত ঠেলা দিয়ে বের হলো। বুদ্ধি টনটনে হলো, কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ল। বাসুকি এরপর হবা ও আদমকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ালে তাদের মধ্যে এক পরিবর্তন আসে। হবা ডুমুর পাতার ঝালর পরিধান করলো। তার আরও প্রসাধন সামগ্রির প্রয়োজনের কথা বাসুকিকে জানায় এবং বাসুকির সাথে থাকার সিদ্ধান্ত জানায়। হবা আদমের উদ্দেশে বলে :

'ও বিশ্রী, কিছু দেয় না, ওর কিছু নেই। তুমি দাও আমি তোমার কাছে থাকব হুঁ—'

একথা শুনে বাসুকি জানায়, তার পঞ্চাশটা সাপিনী আছে, তারা জানলে তাকে ছোবল মারতে আসবে। বাসুকি হবাকে তার স্বামী আদমকে জোর করতে বলে, যেহেতু তার হাত পা আছে। সে ইচ্ছা করলে হবার সাধ পূর্ণ করতে পারবে। এ কথা আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ এক দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পাই। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাণ্ডবের ফলে সমগ্র জীবকুল ও উদ্ভিদকুলের মধ্যে যারা যোগ্য তারা একমাত্র বেঁচে বা টিকে থাকে। আর যারা দুর্বল, ভীত ক্ষণস্থায়ী তারা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের আর কেউ খোঁজ রাখে না।

ব্রহ্মা গডকে জানায় তাঁর খামখেয়ালীপনার জন্যে ঐ আদিম নর-নারী চিরকাল মূর্খ ও অজ্ঞ হয়ে থাকত। বাসুকি এক মহৎ মানবিকতার পরিচয় দান করেন কেননা তিনি তাদের উদ্ধার করেছেন। বাসুকির এই মহানুভবতার তারিফ গডের পছন্দ হয় না। এই নিয়ে তাদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ তর্ক চলতে থাকে। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে আবির্ভাব ঘটে শয়তানের। শয়তান জগতে সমস্ত ধনী-মানী ও জ্ঞানীর প্রতিনিধি হয়ে আসে তিন বিধাতার কাছে এক চুক্তি করতে। যারা পাঠিয়েছেন তারা নিজ নিজ কর্মের স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন, সেজন্য ইহলোক পরলোকে যাতে তাদের অসুবিধা না হয় সেজন্য তিন বিধাতার পারিতোষিক যা যা প্রয়োজন তা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। শয়তান প্রথমে ব্রহ্মাকে প্রণাম জানান পিতামহ সম্বোধন করে। কিন্তু অন্য দুই বিধাতার উদ্দেশ্যে নানা মতামত জানালে গড ও আল্লাতালা প্রতিনিধির পীরসাহেব কোন কথা বলেনি বা মুখ খোলেনি। যখন কোন শর্তে ব্রহ্মা রাজী হচ্ছে না দেখে শয়তান জিজ্ঞাসা করেন, তারা কত অংশ পেলে খুশী হবেন—ব্রহ্মা বলেন—'শতকরা পুরাপুরি একশ চাই।'

ব্রহ্মার প্রতিনিধি নারদ জানান, মর্ত্য জগতে সমস্ত মানব-মানবীকে তাদের সমস্ত কর্মের

ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করলে, তবেই তারা নিষ্কৃতি পাবে। হঠাৎ গল্পের শেষে গড ও আল্লাতালা অন্তর্নিহিত হন। অবশেষে শয়তান যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়, তখন ব্রহ্মা তাকে বরদান করে বলেন যে, সমাজের সেই সমস্ত মানুষকে তিনি নরকস্থ করবেন যারা কিনা তাকে দূত করে পাঠিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদেরই নামোল্লেখ করেন ব্রহ্মা যারা সমাজে বিভিন্ন ভূমিকায় আছে যেমন পুরোহিত, মোল্লা, পাদরী, পুলিশ, সাংসদ ইত্যাদি। সমাজের এই মক্কেলরা নির্বিঘ্নে অপকর্মে দ্বারা নরকের যন্ত্রণা উপভোগ করতে পারবেন। গল্পের মধ্যে সব শ্রেণীর মানুষের মোকাবিলা, অন্য দুই বিধাতার মতামতকে স্বীকৃতি দান একমাত্র ব্রহ্মাই করেছেন। তাঁর ভূমিকা অন্য দুই বিধাতার চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। গড, আল্লাতালা ও তাঁর প্রতিনিধি পীরসাহেব নিজস্ব মতামত জানিয়ে কোন সমস্যা থেকে উত্তরণের দিকে অগ্রসর হতে তাঁদের খুব বেশি দেখতে পাই না। যদিও গড মাঝে-মাঝে মুখ খুলেছেন। দু-একটা মতামত জানালেও আল্লাতালা একেবারেই নিষ্প্রভ। তার থেকে বরং বাসুকি ও শয়তানের ভূমিকা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তারা মানবের হিতার্থে কিছু যে করার প্রয়াস, তা সে ব্যর্থহোক কিংবা সফলতা পাক তবুও তাদের যে প্রয়াস বা অগ্রণী ভূমিকা 'তিন বিধাতা' গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। নারদ ব্রহ্মার প্রতিনিধি হয়ে ব্রহ্মার পক্ষে যেমন মত পোষণ করেছেন। তেমনি সর্বাধিক যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সেটা তার মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম বা নিজস্ব যে চিন্তা ভাবনা সেগুলোর সাপেক্ষে বড়ো সংকীর্ণ ও স্বার্থপর মনে হয়েছে। কোনরূপ সমস্যায় তাঁরা চেয়েছেন জগতের সবাই তাদের ধর্ম বা দলে এলে সব সমাধান হবে। অন্যথায় কখনো সম্ভব নয় বলে মতামত পোষণ কবেন। একমাত্র উদার বা মহানুভবতার পরিচয় পাই ব্রহ্মা ও নারদেব মধ্যে। এরা দুজন যেমন সক্রিয়, অন্যরা সে তুলনায় অনেকটা নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয়।

তিন

যখন ধর্মের উপর মানুষের গ্লানি আসে, আসে অনাদর-অবহেলা আর তিরস্কার। সমগ্র মানব সমাজ ক্রোধ-হিংসায় বশে উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ করতে বসে, এক ধর্মের অন্য ধর্মের বিরোধ বাদে, একে অপরকে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়, ঠিক এই আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পেতে আবির্ভাব ঘটে এক একজন মহামানবের। 'তিন বিধাতা' গল্পের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ-কলহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার হাস্যরসাত্মক উপায়ের ইঙ্গিত আছে। পৌরাণিক মিথগুলো তিনি অনায়াসে গল্পের মধ্যে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মুখ্যত উদ্দেশ্য দেবকৌলীন্যের উল্লেখের পাশাপাশি মানব-মনে একটা স্থিতিশীল অবস্থার উন্মেষ ঘটানো। গল্পকার গল্পের শুরুতেই সাধু সন্তদের তপস্যার জোরে সমস্যার সমাধানের জন্য তিন-তিনজন বিধাতাকে মর্ত্য ধামে আনান। তাঁরা প্রত্যেকেই হলেন বিশ্বধর্মের মূল প্রবর্তক। এ বিশ্বের ভাঙা-গড়া সব তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। ক্ষুদ্র মানব সে ততটাই ক্ষুদ্র যতটা বা যতদূর পর্যন্ত সে যেতে পারে। তারপর সেই মানুষের চিন্তা ছেড়ে দিতে হয় সেই অনির্দিষ্ট এক সর্বশক্তিমান বা অলৌকিক শক্তিব কাছে। গল্পকার ইচ্ছা করেই খেলাটা দেখানোর জন্য তিনধর্মের তিন প্রতিনিধিকে ডেকে আনেন। সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য। দেখা যায় সেখানে আরও বেশি সমস্যা জট

পাকাতে থাকে। একে অন্যের দুর্বলতার স্থান মর্ত্যলোকে তুলে ধরতে থাকেন। ফলে দেখা যায় নতুন সমস্যা। সে সমস্যা বাড়তেই থাকে।

অবশেষে গল্পকার একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্যে যেন-তেন প্রকারে বিধাতার মধ্যে প্রবেশ করান এক অশুভ আঁতাত বা শক্তির। এই অশুভ শক্তির এতটাই জোর যে তিন-তিনটা শুভশক্তিকে অতিক্রান্ত করে এগিয়ে আসে সে, তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সমাজে পাপকর্ম বা অপকর্ম যারা করে তারা যাতে সে সব করে রক্ষা পায়, তিন বিধাতার কাছে এই আর্জি নিয়েই তাঁর প্রবেশ। সে হচ্ছে শয়তান। দেখা যায় জিহোবা গড ও আল্লাতালা এই অশুভ শক্তির মোকাবিলা করতে একটা কথাও নষ্ট করেননি। ব্রহ্মা অ-সাধারণ ধৈর্য স্থৈর্য্য, অধ্যাবসায় সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় শয়তানের সব কথা শুনে তাঁদের যে ক্ষমতা কতটা তার প্রমাণ দান করেন। অন্য দুই বিধাতার কাছে মতামত নিতে গিয়ে ব্রহ্মা দেখেন তাঁরা অন্তর্হিত হয়েছেন অর্থাৎ যে স্থানে শয়তানের আগমন এটা তাঁদের অ-পছন্দ এ তারই বহিঃপ্রকাশ। একমাত্র হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি ব্রহ্মা তিনি তাঁর বয়সোচিত মানসিকতার পরিচয় রাখেন এবং শয়তানকে শিক্ষা জ্ঞান প্রদান করার প্রচেষ্টা চালান।

দেবতারা মর্তধামে পূজা প্রচারের জন্য নিজেরাই এসেছিলেন। আবার মানবের প্রয়োজনে যখন দেবতাকে প্রয়োজন হয়েছে তখন তাঁরা স্বেচ্ছায় এসেছেন। কখনো বা যুগ-যুগ ধরে যে সমস্ত সাধু-সন্তরা ঈশ্বর সাধনার মধ্যে ডুবে ছিলেন তাঁদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের আবির্ভব ঘটেছে। 'তিন বিধাতা' গল্পের শুরুতে আমরা তার পূর্বাভাষ পাই—নীরব নিভৃত সুরম্য পবিবেশে শ্রদ্ধা ভক্তির আহ্বানে আবির্ভাব ঘটে তিন বিধাতার। জায়গাটার নাম হিন্দুকুশ পর্বত। আরো অনেক দেবতা ঐ ঐশ্বরিক সভার বিতর্কে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও মূল উদ্যোক্তারা আগ্রহ দেখাননি, এই ভেবে যে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে। তাই লেখক খানিকটা ইচ্ছে করেই তিনি বিধাতাকে আহ্বান করে আনেন। অবশ্য এই তিন বিধাতার তিনজন অনুচরকেও অবতীর্ণ হতে দেখি (ব্রহ্মার সঙ্গে নারদ, গডের সঙ্গে সেন্ট পিটার, আল্লার সঙ্গে একজন পীর অনুচর)

'তিন বিধাতা' গল্পের কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গেছে তাঁদের এই অনুচরেরা। প্রথমে নারদের মুখে শুনতে পাই তিন বিধাতার আগমনের উদ্দেশ্যে। 'নারদ বললেন, আপনাদের কষ্ট দিয়ে এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্য—জগতে যাতে শান্তি আসে, মারামারি কাটাকাটি দ্বেষ-হিংসা অত্যাচার প্রতারণা লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপ কার্য যাতে দূর হয় তার একটা উপায় স্থির করা।' এই বিতর্ক সভার সভাপতি নির্ধারণ সেও নারদের কথামত হয়। যখন তিন বিধাতা নিজেদের মধ্যে কোন্দল বা বিতর্ক আরম্ভ করেছেন আর তার শেষ হয় না দেখে নারদ তিনজনকেই সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে সভার কাজ এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন। গল্পের শুরুতেই তিন বিধাতার মধ্যে এই ইগোর লড়াই বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের এক চিত্র উপস্থাপিত হয়। মনে পড়ে যায় মার্কস-এঙ্গেলেসের সেই শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাব যা তিন বিধাতার মধ্যেও আভাসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের লড়াই থামাতে গিয়ে তিন বিধাতাই জড়িয়ে পড়েন লড়াইয়ে। নিজ নিজ অবস্থানের সচিত্র পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় যাঁদেরকে আমরা সম্মানের স্থানে বসিয়ে ভাবি, তাঁরা নিষ্পাপ-পবিত্র সুন্দর

থেকে সুন্দরতর, আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার স্থল। তাঁদের সমস্ত প্রতিচ্ছবি পাওয়ার পর আমাদের চৈতন্যোদয় হয়, সম্বিত ফিরে পাই।

'তিন বিধাতা' গল্পের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। সে বিরোধ অনেকটা ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। ধর্ম-বর্ণ বিভক্ত বিশ্ববাসীর বিশ্বাসের জগতে অলৌকিক বিধাতারা সদা প্রবাহমান। পরশুরাম অত্যন্ত সচেতন ভাবে শিল্পসম্মত উপস্থাপনায় তা নিয়ে পরিহাস করেছেন। বিধাতারা যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ, শৃঙ্খলিত তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। জগতের বিধান এক হলে বিধাতাও এক হবে। পরশুরাম এসত্যটিকে আরো সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হয়েছেন। একদিকে বিধাতা অন্যদিকে বিধাতার অনুচর—এই সম্মিলিত চরিত্রের এক মানুষী উপস্থাপনায় তিনি সমকালকে প্রতীয়মান করে তুলেছেন। স্বভাবতই হাস্যের নানা প্রেক্ষিত গল্পটির পরতে পরতে জীবন্ত হয়ে উঠলেও তিনি শেষ পর্যন্ত পাঠককে সেই সত্যে উদ্ভাসিত করেছেন যেখানে ধর্মের ধ্বজাধারীরা অর্থহীন, আহাম্মক। তিনি মানুষের ঈশ্বরপ্রীতির জগতকে ব্যঙ্গভাষিত পার্থিব সত্যাভিমুখী করে তুলতে চেয়েছেন।

ভরতের ঝুমঝুমি : হাসির শিল্প
সুফল বিশ্বাস

চল্লিশোর্ধ বয়সে কলম হাতে নিয়ে সাহিত্য মাত করে দেবার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে শুধু নয় বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নেই। সৃষ্টির এই উদাহরণ বিস্ময়কর বলে স্বীকৃতি পেতে পারে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের সৃষ্টিমালা এই বিরল ঘটনা। তবে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে (১৯২২) পরিণত লেখনী দিয়ে "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" তৈরী করলেও সাহিত্যচর্চার অভ্যাস তার বরাবরই ছিল। আর তা পরবর্তীকালে জলধর সেন ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ ও উৎসাহে 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বেশ কয়েকখানি গল্পের ধার ও ভার প্রমাণ করে দেয়। তাঁর সমগ্র গল্পের জগৎ নির্মিত হাসির ভিয়ানের উপর। হাসি মানে তথাকথিত ভাঁড়ামী নয়। বের্গসঁ যাকে "ইন্টেলেকচুয়াল লাফটার" বলেছেন তার ছায়াভাগ তাঁর সৃষ্টি মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। হাস্যরসের সাহিত্যে, বিশেষভাবে বাংলা হাস্য সাহিত্যে তিনি অনন্য প্রতিভাবলে Wit, Humour, Fun এর মিশ্রণে দারুণ কারুশিল্প তৈরী করেছেন। তার্কিক সমালোচক নানা স্তরে তাঁর হাস্যরসপ্রিয়তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেও বিশুদ্ধ মজা বলতে যা বোঝায়—তা কিন্তু তাঁর গল্পে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত। বস্তুত তিনি যতটা রসিকতাপ্রিয় ততটা আক্রমণপ্রিয় নন। এই অনাহতকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর রসরচনা নির্বিচারে—এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে। "ভরতের ঝুমঝুমি" এই রসিক পরশুরামেরই সৃষ্টি। আলোচ্য গল্পে তিনি হাসতে হাসতে এবং হাসাতে হাসাতে অদ্ভুদ এক মায়াজাল বিস্তার করেছেন। যে মায়ায় রসিক পাঠক সে জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

গল্পের স্থান হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গার ধারের ধর্মশালা। পাত্র লেখক তাঁর মামাতো ভাই পুলিন, তার ছেলে পন্টু, টহলরাম চাকর আর তার চারটে সাদা ইঁদুর। সমস্ত সকাল 'টো টো করে ঘুরে বেড়ানোর পর যখন প্রচণ্ড খিদের সঙ্গে খাবার সহ শালপাতা নিয়ে পাত্ররা বসার উপক্রম করছে তখন আব এক এবং অন্যতম প্রধান পাত্র বাবাজী 'অয়মহং ভোঃ' বলে অনাহূত প্রবেশ। গল্পের এই পর্যায়ে খুব সাদামাটা কিছু ঘটনা ঘটেছে। হাসির লাগামছাড়া কোন মূর্তি এই পর্যায়ে চোখে পড়লেও হাসির একটা চোরাস্রোত পাঠককে ছুঁয়ে যায়। বিশেষ করে বাবাজীর পরিচয় উদঘাটনে :

"পুলিনের পেশা ওকালতি কিন্তু মক্কেল তেমন জোটে না, তাই বেচারা সুবিধা পেলেই যাকে তাকে সওয়াল করে শখ মিটিয়ে নেয়। বললে, আপনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ?

—সে খোঁজে দরকার কি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি? আমার ভাষা সংস্কৃত, তবে তোমরা তা বুঝবে না তাই বাংলা বলছি।

—আপনি কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, পুরি, ভারতী অরণ্য না আর কিছু?

—ও সব অর্বাচীন দলের মধ্যে আমি নেই। আমার আদি আশ্রম ব্রহ্মলোক, আমি একজন ব্রহ্মর্ষি।

—নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—বোবা যখন নও তখন না পারবে কেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবে কি? তোমরা তো পাষণ্ড নাস্তিক। আমি হচ্ছি মহামুনি দুর্বাসা।"

—ছাপোষা ক'টি তীর্থ পরিভ্রমণকারীর সামনে হঠাৎ করে—প্রাচীন কালের নামকরা ঋষি তা আবার যেমন তেমন ঋষি নয় স্বয়ং দুর্বাসার বিনা নোটিশে আগমন ঘটলে পাঠককে একটু নড়ে চড়ে বসতেই হয়। কারণ পরশুরামের হাসির ফোয়ারার ঠাণ্ডা স্পর্শ যে তাকে আহ্লাদিত করতে চলেছে তা তিনি অনুভব করতে পারবেন। দুর্বাসা গায়ে ঘুরে বেড়ানো ছারপোকায় ডিডিটি স্প্রে করার পুলিনের প্রস্তাবে এই হাসি আকর্ণ বিস্তারী হয়। তবে খাওয়া সাঙ্গ হওয়ার পর গল্পের পরবর্তী স্তরে দুর্বাসার হঠাৎ ধর্মশালায় আবির্ভূত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে উত্থিত হাসির দমকা হাওয়া পাঠককে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। পুরাণে বর্ণিত শকুন্তলা-মেনকা-দুর্বাসার পরিচিত বৃত্তান্তের কাঠামোতে অপূর্ব জড়োয়া শিল্পের নির্মাণ এর পরেই পাঠককে আরো একমুখী করে তোলে। পুরাণে বর্ণিত শকুন্তলার অভিশাপ বৃত্তান্তের সঙ্গে পরশুরাম প্রতিভার অভিনব চমক দুর্বাসাকে মেনকার দেওয়া 'ভরতের ঝুমঝুমি'। হাসির গল্প কখন কিভাবে শিল্প হয়ে ওঠে তার নিদর্শন আছে এই অভিনব উদ্ভাবনে। শকুন্তলাকে অভিশাপ দেওয়ার প্রায় পাঁচ মাস পর নির্জনে একটু পরমার্থচিন্তা করার সময় দুর্বাসাকে তার শিষ্য জানালো এক অপূর্ব রূপবতী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিরক্ত দুর্বাসা তাকে আসতে বললেন। নারীকে দেখেই চিনলেন সে মেনকা। তার 'ভব্যতার জ্ঞান নেই', দাঁতন চিবুতে চিবুতে এসেছে' ভাবছে তাতে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে'। স্বর্গের অপ্সরা হঠাৎ দাঁতন চিবুতে চিবুতে অতি বড়ো গোমড়া পাঠকের সামনে এলেও তার আকর্ণ বিস্তৃত হবেই। অসময়ে মেনকার উপস্থিতিতে বিরক্ত দুর্বাসা খেঁকিয়ে বললেন,

"কিজন্য আসা হয়েছে এখানে? জান আমি মহা তেজস্বী দুর্বাসা মুনি, বিশ্বামিত্রের মত হ্যাংলা পাওনি যে হাস্য-লাস্য ছলা-কলা হাবভাব ঠমক ঠমক দেখিয়ে আমাকে ভোলাবে।'

দুর্বাসার উক্তিতে ভেংচি কাটে মেনকা, বলে—

"........জগতে আর কেউ নেই যে তোমাকে ভোলাতে আসব।"

মেনকার 'তুমি' সম্বোধনের স্পর্ধায় রেগে আগুন দুর্বাসা শাপ দিতে যাচ্ছিলেন, "তুই শুঁয়োপোকা হয়ে যা"। কিন্তু রাগ সামলে বললেন, "কিজন্য এসেছো বল না ছাই"। শকুন্তলার অভিশাপ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে মেনকা দুর্বাসাকে বলে, মহাদেব তার উপর খুব রেগে গেছেন। তার রাগ প্রশমন করেছে সে। দুর্বাসা একটু দমে বলে,

"কি বললে তুমি তাকে?" মেনকা বলে,

"আহা নির্বোধ ব্রাহ্মণ, মাথার দোষও আছে, না বুঝে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে ফেলেছে। ....মহাদেব আমায় স্নেহ করেন, তাঁর শাশুড়ীর নাম আর আমার নাম একই কিনা। বললেন, বেশ ক্ষমা করবো কিন্তু আগে তুমি গিয়ে একটা প্রায়োশ্চিত্ত করাও।"

দুর্বাসা বললে, 'কি প্রায়োশ্চিত্ত করাবে শুনি।"

জবাবে 'মেনাকে বলে, শকুন্তলার ভরত নামে একটা ছেলে হয়েছে....মনে করেছিলুম

তাকে গিয়ে একবার দেখে আসব, কিন্তু তা আর হল না ইন্দ্র সব অপ্সরাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর ব্যাটা জয়ন্ত বিগড়ে যাচ্ছে—হবে না কেন, বাপের ধাত পেয়েছে তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন।" আর এজন্যে মেনকাকে ব্যস্ত থাকতে হবে তাই সে দুর্বাসাকে একটা ঝুমঝুমি দিয়ে বলে,

"এই ঝুমঝুমিটি খোকার হাতে দেবে আর আমার হয়ে তাকে একটু আদর করবে। কিন্তু তুমি বড়ো নোংরা। আগে ভালো করে হাত ধোবে তারপর খোকার থুতনিতে ঠেকিয়ে আলগোছে একটি চুমু খাবে।"

দুর্বাসা বলে, "সে আবার কি রকম?"

"এই রকম আর কি" বলে মেনকা দুর্বাসার দাড়িতে হাত ঠেকিয়ে এক শব্দ করলে। দুর্বাশা বুঝতে পারলেন না সেটা 'চুঃ কি মুঃ"। "জটাধরের বিপদ" গল্পে পরশুরাম জটাধরকে দিয়ে বলিয়েছিলেন,

"গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাই মালাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়।" ভরতের ঝুমঝুমি' পড়লে এই অনুভূতি হয় কিনা রসজ্ঞ পাঠক বলতে পারেন কিন্তু আমরা মনে করি বাংলা ছোটগল্পের সংসারে হাসিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে পেরেছেন কে ক'জন হাতে গোনা শিল্পী তার মধ্যে সর্বজনমান্য পরশুরাম শ্রেষ্ঠ শুধু নন, এই শ্রেণীর গল্পের পথপ্রদর্শকও বটে। আলোচ্য গল্পে সেই ছায়াভাসই প্রত্যক্ষও করি : শকুন্তলার ছেলেকে ঝুমঝুমি দিতে গিয়ে দুর্বাসা এর পর আবিষ্কার করলেন 'ট্যাঁকে" ঝুমঝুমি নেই। দু'জন বুড়ি তপস্বিনী কাছেই ছিল। একজন বললে,

"......তুমি ভারি অলবত্যেমুনি। নিশ্চয় নাইবার সময় তোমার ট্যাঁক থেকে জলে পড়ে গেছে আর মাছে কপ করে গিলেছে। যাও এখন রাজ্যের রুই-কাতলা ধরে ধরে পেট চিরে দেখ গে।" অন্যজন বললে,

"কি বলছ গা দিদি। শুধু-রুই-কাতলা কেন, মিরগেল চিতল বোয়াল, কালিবোস শোল চাঁই টাঁই এসব মাছের পেটেও যেতে পারে।" দুষ্মন্তের দেওয়া আংটির প্রাপ্তি মাছের পেটে হওয়ার মিথকে সামনে রেখে ভরতের ঝুমঝুমি খোঁজার প্রচেষ্টা কোন গভীর দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্ম দেয় কিনা তা খুঁতখুঁতে সমালোচক খুঁজবেন কিন্তু আমরা সাধারণ পাঠক মনে করি হাসি মানেই সে নিছক ভাঁড়ামি নয়, তা এই গল্পের সংস্পর্শেই আমরা বুঝতে পারি। দুর্বাসার উক্তিতে এই সত্যতা ধরা পড়ে—

"ওঃ মেনার কথা রাখতে গিয়ে কি সংকটেই পড়েছি। ঝুমঝুমি তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা সে মহাপাপ। তারপর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, অসংখ্যবার অসংখ্য স্থানে খুঁজেছি কিন্তু ঝুমঝুমি পাইনি। আমার আর শান্তি নেই। ব্রহ্মতেজ নেই, অভিশাপ দিলে ফলে না, আমি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছি। শিষ্যরা আমাকে ত্যাগ করেছে, আমি এখন ছন্নছাড়া হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

অবশেষে গল্পের পরের স্তরে—দুর্বসার দাড়ির জঙ্গল থেকে পুলিনের ঝুমঝুমি আবিষ্কারের এই বিশুদ্ধ হাসির মাত্রা চূড়ান্ত হয়।

পরশুরামের হাস্যরসের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে অনেকেই পূর্বসুরী ত্রৈলোক্যনাথের

রচনার কথা তুলনায় আনেন। সমালোচক বলেছেন দুজনেরই অশ্রদ্ধা 'যা কিছু অসুন্দর অসত্য সর্বোপরি যা কিছু ছদ্মবেশী তার প্রতি'' দুজনেরই আক্রমণের লক্ষ 'বৃহত্তর ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র নয়,' 'ছদ্মবেশী কয়েকটি মানুষ বা প্রতিষ্ঠান।'' রচনার দিক দিয়ে দুই হাস্যকলা সম্রাটের এই ধরনের মিল থাকলেও পার্থক্যও চোখে পড়েছে সামালোচকদের। ত্রৈলক্যের হাস্যরস ''প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁষে'' আর পরশুরামের ''প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিক ঘেঁষে।'' সময়ে সময়ে এই তিরস্কার প্রয়োজনে বিদ্রূপের বজ্রহাস্যেও বিবর্তিত হয়ে গেছে। আলোচ্য গল্পের শেষে তারই উদাহরণ স্থাপিত : 'ঝুমঝুমি হাতে পেয়ে পল্টুর মাথায় হাতদিয়ে দুর্বাসা আশীর্বাদ করলেন, ...বৎস আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হবে।

আমি বললুম, ও আশীর্বাদ ফলবার উপায় নেই প্রভু রাজা টাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন কোন ও মন্ত্রী হতে পারে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।

—বেশ সেই আশীর্বাদ করছি। কিন্তু রাজা না থাকলে রাজকার্য চলবে কি করে।

—আজকাল তা চলে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে কর্তা না থাকলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

দুর্বাসা বললেন, আমি এখন উঠি। যাঁর জিনিস তাকে অর্পণ করে সত্ত্বর দায়মুক্ত হয়ে ব্রহ্মালোক যেতে চাই।

—অর্পণ করবেন কাকে?

—কেন, মহারাজ ভরতের বংশধর নেই?

—কেউ নেই। ভরতবংশ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের বংশ লোপ পেয়েছে। তাদের যাঁরা উত্তরাধিকারী নন্দ মৌর্য শুঙ্গ অন্ধ্র গুপ্ত প্রভৃতি, তারপর পাঠান মোগল ইংরেজ এরাও ফৌত হয়েছেন। ভরতের রাজ্য এখন দু'ভাগ হয়েছে। বড়টি ভারতীয় গণরাজ্য, ছোটটি ইসলামীয় পাকিস্তান।

—একজন চক্রবর্ত্তী রাজা আছেন তো?

—এখন আর নেই, দুই রাজ্যে দুই রাষ্ট্রপতি বহাল হয়েছে, একজন দিল্লীতে আর একজন করাচিতে থাকেন। আইন অনুসারে-এঁরাই ভরতের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং ঝুমঝুমিটি এদেরই হক পাওনা। কিন্তু দেবেন কাকে? একজনকে দিলে আর একজন ইউ-এন-ও তে নালিশ করবেন, না হয়—ঘুষি বাগিয়ে বললেন, লড়কে লেংগে ঝুমঝুমা।''

দুর্বাসা কিছুক্ষণ ধ্যান করে মট করে ঝুমঝুমিটি ভেঙ্গে বললেন, ''একজনকে দেব এই খোলটা যাতে পাথর কুচি আছে, নাড়লে কড়র মড়র করে আর একজনতে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিঁ পিঁ করে।''

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ''বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি সোনা।'' আর আমরা বলি খাঁটি হীরে যার আভায় ঠিকরে পড়েছে মুঠো মুঠো হাসির রামধনু রঙ। যার প্রভাব শুধু বাংলার সাহিত্যেই নয় সমগ্রভারতীয় সাহিত্যেও নবপ্রভা লাভ করেছে।

হনুমানের স্বপ্ন : এক আধুনিক পুরাণ

সৌমি দাশ

পরশুরামের পুরাণের রাজ্যে পরিভ্রমণ আর তারই সাথে অনাবিল কৌতুকের ঝর্ণায় অবগাহন, তাঁর প্রথম পর্বের অবিস্মরণীয় ছোটো গল্পগুলির চাবিকাঠি। ছোটোবেলায় ঠাকুমা ঠাকুর্দার কাছে শোনা রাম-রাবণের গল্প, পুরাণের গল্পগুলি ছুটির দুপুরে শুনতে পাওয়ায় পরম উপভোগ্যতা ছিল। আর পরশুরামের অনাবিল বিদগ্ধ হাস্যরস, সেই কিশোর কালের মাধুর্যকেই ধরে রেখেছে শাশ্বত কালের পথে। কৈশোরের স্মৃতি যা প্রত্যেক বয়সের পাঠকের মনের কোনে সেই ধুলো পড়া দেরাজটার মতই বন্ধ ছিল, খুব দুর্লভ বলে। অতিসাবধানে তুলে রাখা সেই দেরাজটা খোলা হয়নি। কিন্তু পরশুরামের কাছে এমন এক চাবি আছে যা দিয়ে প্রত্যেক মানুষের মনের দেরাজটাই খোলা গেছে। তাঁর লেখা পৌরাণিক ছোটো গল্পগুলিতে আছে এক আলাদা Style,যা পাঠককে সর্বক্ষণই মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

পরশুরামের প্রথম পর্যায়ে লেখা গল্পগুলির নিটোল সরসতা, ব্যঙ্গের সঙ্গে নিছক রঙ্গের চিত্রায়ণ, সাময়িকের সঙ্গে শাশ্বত জীবনবোধের সুর এক অজানা রিয়ালিস্টিক বোধের কেল্লাস জমাতে পেরেছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন রিয়ালিজ্‌ম আন্দোলনের এক সৈনিক তিনি, তির্যক রিয়ালিষ্ট শিল্পী।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, 'পরিমার্জিত কৌতুকে চরিত্র চিত্রণের নৈপুণ্যে এবং বাগ্‌বৈদ্যগ্ধে তিনি [পরশুরাম] একাধারে বাঙালির জেরোম কে জেরোম এবং স্টিফেন লিক্‌ক।' কথাটি সত্যি। বিদেশী সাহিত্যের বেশ কিছু বিদগ্ধ শিল্পীদের সঙ্গে পরশুরামের কিছু তুলনা চলে, তবে পরশুরামের আর্টের বোধ মৌলিক। অন্য অনেকের থেকেই তাঁর বোধ পৃথক। তাঁর নির্মেদ ভাষাভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, 'তাতে বস্তুত এ যুগের বীরবলী বক্রতার সঙ্গে রাবীন্দ্রিক মাধুর্যের মিলন অপরূপ যুক্তবেণী রচনা করে রেখেছে।' ভলতেয়ার, মঁলিয়ে, উলন্যার, জেরোম কে জেরোম, থ্যাকারে, স্টিফেন লিক্‌ক প্রমুখ শিল্পীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ-ধর্মী তির্যক লেখনীর কিছু কিছু সমধর্মিতা হয়তো পরশুরামকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করেছে তাঁর নিজের স্নিগ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত বিদুর ব্যঙ্গ, বৈঠকী আমেজ, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বাদ, যা একেবারেই নতুন। সেই মনমোহিনী ঘ্রাণ পাগল করেছে সাহিত্যপ্রেমী প্রত্যেককে। এদেশে উনবিংশ শতাব্দিতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই উচ্চাঙ্গের ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হন। পরশুরাম তাকেও গ্রহণ করলেন তবে এক মার্জিত গভীর ভঙ্গিতে।

প্রথমেই বলেছি, পরশুরামের প্রথম পর্যায়ে লেখা গল্পগুলির প্রায় অধিকাংশই প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার ভিত্তিতে লেখা। জাবালি, হনুমানের স্বপ্ন, পুনর্মিলন, প্রেমচক্র প্রভৃতি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭-এ লেখা 'হনুমানের স্বপ্ন'—এ পুরাণের ওভারকোটের আড়ালে সমকালের বাস্তব জীবন আলেখ্যই স্থান পেয়েছে। উচ্ছ্বসিত সরসতার প্রশস্ত খাতে বয়ে চলা নদীর মতই কল্পনারীতির অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

বাস্তবতার অতিরঞ্জন, অবাস্তবতার বিশ্বাসযোগ্যতা, অসম্ভবের সম্ভব্যতা সৃষ্টি করেছেন। আবার পাশাপাশি মানুষে পশুতে একাত্মতা, রাজনীতি অর্থনীতির জটিলগ্রন্থি, ক্ষয়িত মূল্য বোধহীন সম্পর্কের সংকট লগ্নকে চিহ্নিত ক'রে কৌতুকরসের এক মধুভাণ্ড গড়েছেন পরশুরাম। আর হনুমানের স্বপ্ন যেন তারই দলিল হিসাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হনুমানের স্বপ্ন রামায়ণের কাহিনির মোড়কে সমকালীন সামাজিক সত্যরূপের ক্ষুরধার অথচ কৌতুক স্নিগ্ধ রূপক। বিভিন্ন পুরাণ নির্ভর কাহিনিকে আশ্রয় করে বাস্তবধর্মী কৌতুক সৃষ্টির বিজ্ঞতা যে পরশুরামের লেখাকে ঋদ্ধ করেছে তা আমাদের জানা। পাশাপাশি সমাজ সংসারের বিপন্নতা, আদর্শহীনতায় তিনি ক্ষীপ্ত হ'লেও জীবনরসিকের সজাগ সাধনায় সিদ্ধি লাভই তাঁর গল্পটিকে সঠিক শমে পৌঁছে দিতে পেরেছে। গল্পটিতে রামায়ণের চরিত্রগুলি থাকলেও গল্পটির মৌলিকত্ব সন্দেহাতীত। সম্পূর্ণ গল্পটিই রূপক চরিত্রগুলির আড়ালে লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত, তথ্য নিজস্ব।

গল্পটির শুরু রাম রাবণের যুদ্ধ পরবর্তীকালের বর্ণনায়। কোশল রাজ্যে রাজপদে অধিষ্ঠিত রাম। শ্রীরামচন্দ্রের 'অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন' এর নিষ্ঠা এবং সুশৃঙ্খল রাজ্যশাসনের ফলে দেশে কোনও অরাজকতা নেই, সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত। এই অসাধারণ প্রজা প্রতিপালনের ব্যাখ্যার আড়ালেও পরশুরামের ক্ষুরধার কুঠারের দ্যুতি দৃশ্যমান। যেখানে তিনি তাঁর Satire ধর্মী আঙ্গিকে বলেন—'ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসর বিনোদন করিতে লাগিলেন।' এমনই এক সমাজ-শরীর তিনি তুলে ধরেছেন যা আপাত দৃষ্টিতে নিটোল হলেও যার শিবায়-উপশিরায় ভীষণ এক ঘুণপোকা বাসা বেঁধেছে। এই সমাজেই থাকেন পবনপুত্র হনুমান, রামচন্দ্রের আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত হনুমান হঠাৎ করেই ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কান্তিহীন, কৃশকায় পবননন্দনের এরকম শারীরিক বিপর্যয়ের সঠিক কারণ কোনও বাজবৈদ্যই আবিষ্কার করতে পারে না। এই অবস্থায় রামচন্দ্র-জায়া সীতার কাছেই হনুমান তার অসুস্থতার কারণ খুলে বলে। অবিবাহিত হনুমান দুঃস্বপ্ন দেখে যে পিতৃপুরুষেরা ক্ষুধিত, পিণ্ডদানের অনিশ্চয়তায় চিন্তাগ্রস্ত। হনুমানের মৃত্যুর পর তাঁদের পিণ্ডদানের জন্য কোনও উত্তর পুরুষ না থাকায় হনুমান আত্মশ্লাঘায় জর্জরিত। বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপনীত হনুমান নিজের বিবাহ প্রস্তাব করাকেও নির্লজ্জতা বলে মনে করে। এই সংকটে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আদর্শবান হনুমান দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে হনুমান চরিত্রটি বীর, আদর্শায়িত, সৎচরিত্র। বৃদ্ধ ব্যক্তির দারপরিগ্রহণ তাই তার কাছে লজ্জার। তবু বংশবক্ষা হেতু পিতৃপুরুষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হনুমান সীতার পরামর্শে এবং যুক্তিতে তুষ্ট হয়ে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হনুমতী সন্ধানে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করে।

পরশুরামের কৌতুক স্নিগ্ধ বারিবর্ষণে সামাজিক অবক্ষয়িত দৃশ্যপট স্বচ্ছতা পেয়েছে। বিবাহ উদ্দেশ্যে যাত্রাকালের বিভিন্ন মজাদার ঘটনার আড়ালে বিবাহ নামক প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির পরিচয় পাওয়া গেছে। সমকালীন সময়ের বোধ, মানব-মানবীর সম্পর্ক, বিবাহ নামক শ্রদ্ধাশীল সম্পর্কের অবনতির কাহিনি গল্পটির প্রতিপাদ্য। গল্পটির আদ্যন্ত এক সুন্দর বুননের সংসৃতি লক্ষ্য করা গেছে।

বিবাহ উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে বনমধ্যে পর্ণকুটিরে হনুমানের সঙ্গে দেখা হয় তুম্বদেশের অধিপতি রাজা চঞ্চরীকের। এই রাজা চঞ্চরীক স্ত্রীর অত্যাচারে ভীত হ'য়ে অরণ্যে দিনযাপন করছে। চঞ্চরীক মনে করে এক ভার্যাই অনর্থের মূল। এসব জটিল দাম্পত্য কাহিনি শুনে হনুমান ভীত হয়ে পড়ে। এখানেও পরশুরামের Satire-এর ছুরির আঘাত চঞ্চরীক চরিত্রটিকে ছুঁয়ে গেছে। পত্নী পরম রূপবতী গুণবতী হওয়া সত্ত্বেও চঞ্চরীক চরিত্রের শিথিলতা, স্খলন এখানেই, যখন সে রাণীর সখীর সঙ্গে রসচর্চায় মত্ত হয়। দাম্পত্য ত্রাসে সন্ত্রস্ত চঞ্চরীকের বনবাসের কাহিনিই এখানে স্নিগ্ধ কৌতুকের প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন পরশুরাম। আর ঠিক এই সময়ই পর্ণকুটিরে দেখা হয় মহর্ষি লোমশ ঋষির সঙ্গে। বহুপত্নীক এই ঋষি, একশত পত্নীর কলহ যন্ত্রণায় অনাহারক্লিষ্ট এবং গৃহচ্যুত। লোমশ ঋষিকে অনেকে মনে করতো স্ত্রীতত্ত্ববিদ্, জ্ঞানী। কিন্তু বাস্তবে, দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল তত্ত্বস্রোতে নিজেরই ভরাডুবি ঘটেছে। এমনই সব হাস্য স্নিগ্ধ ছবি অসাধারণ নিপুন ভঙ্গিতে এঁকেছেন পরশুরাম। সামাজিক জীবনে বহু পত্নীত্বের যন্ত্রণা, অশান্তি, চারিত্রিক শিথিলতা অতি বড় মহর্ষিকেও যে যন্ত্রণার অগ্নিকুন্ডে প্রেরণ করে তারই বাস্তবধর্মী রূপক সৃষ্টি হয়েছে লোমশ ঋষির আখ্যানের মাধ্যমে। বিবাহের পূর্বে এমনই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটে হনুমানের।

এবপর গল্পের মোড় ঘোরে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে। এককালে সুগ্রীবের সহচর বন্ধু হনুমানের আবির্ভাব সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট তো করেইনি বরং অত্যন্ত উপেক্ষার ভঙ্গিতে সুগ্রীবের আত্মপ্রকাশ। যা রূপকের আড়ালের বাস্তবধর্মী চরিত্র অনুসন্ধানের সহায়ক হয়েছে। যে সুগ্রীবকে ভীষণ বিপদের দিনেও হনুমান সাহায্য করেছিল,সময়ের চক্রে আজ সে বানরাধিপতি সম্পত্তির ভাগ, রাজ্য ভাগের আশঙ্কায় বন্ধুর প্রতি অন্যায় আচরণ করতে আজ সে দ্বিধাহীন। এমনই এক পুরাণের কল্পরাজ্যের মায়াজালের অন্তরালে সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধহীন অন্তঃসারশূন্য বোধের চিত্রায়ণে কুঠার হাতে দন্ডায়মান পরশুরাম। অতীতকে ভুলে যাওয়া, জীবনের পরম বন্ধুকে অস্বীকার করার যে ছবি সুগ্রীব-হনুমান সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন তা হৃদয়সংবেদী। হনুমানের আসার আসল কারণ জানা মাত্র সুগ্রীবের ভাবলেশহীন পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। লেখকের আক্রমণের শাণিত ধারে সুগ্রীব চরিত্রটির একটা কাটিং পাওয়া যায়, যা সমকালীন সমাজেরই কোন ও এক পুরুষ চরিত্র। যে পেশী শক্তির দ্বারা বীরবিক্রমে স্ত্রী রত্নকে নিজের সম্পত্তি মনে করে। এখানে মজার ব্যাপার হল, 'কদলী বল্কল' দিয়ে কলহপ্রিয়া পত্নীদের মুখ বেঁধে রাখার অসাধারণ হাস্যকর ব্যঞ্জনা যা বিষয়টিকে খুবই Funny করেছে। এরপর সুগ্রীব হনুমানকে তারই বয়স্কা পত্নী তারাদেবীকে বিবাহ করতে বলে। হনুমান তাতে অসম্মত হয়, কারণ পূর্বে যিনি বালী পত্নী ছিলেন সেই তারাদেবী তাব কাছে নমস্যা। এই ঘটনার মধ্যে দিয়েও সুগ্রীবের মূল্যবোধ-হীনতাকেই লেখক কটাক্ষ করেছেন। শেষে সুগ্রীব কিচ্চট দেশের রাজকুমারী চিলিম্পাকে বিবাহ করার পরামর্শ দেয়। সাহসী এই দুর্বিনীতা বানরীর প্রতাপে ভীত সুগ্রীব তাকে নিজের পদানত করার অভীপ্সায়, হনুমানকে বিবাহ করতে বলে। এতে হনুমান সম্মত হয়।

হনুমান পত্নী সন্ধানে এসে পৌঁছায় কিচ্চট রাজ্যে। রাজকুমারী চিলিম্পার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় পবন পুত্র, তাকে একেবারে বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে বসে সে। দুর্বিনীতা চিলিম্পা আদর্শবান

হনুমানকে নানারকম প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে থাকে হনুমানের বীরত্বের কাহিনি শুনে চিলিম্পা খুশিও হয়। কিন্তু প্রেমতত্ত্বের জটিল তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তরে হনুমানের অপরিপক্কতা প্রকাশ পাওয়ায় চিলিম্পা হনুমানের প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। পরশুরাম এই ঘটনার রূপকে যে কথাটি বলতে চান তা খুবই স্পষ্ট, নারী মনের কানাগলির হদিস পাওয়া যে দুরূহ কাজ তাই যেন বোঝাতে চান লেখক। এসবের পর চিলিম্পার অসম্মতি এবং সুগ্রীবকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবার আদেশ হনুমানকে রাগত ক'রে তোলে। অসম্মানীত হনুমান রাগে চিলিম্পার চুলের মুঠি ধ'রে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করে। চিলিম্পা পরিস্থিতির ভীষণতায় ভয় পেয়ে হনুমানের গুণকীর্তন করতে থাকে। নারী চরিত্রের এই দ্বিচারিতা পরশুরাম কৌতুকরসের আঁধারে ভালই বুঝিয়েছেন। যে চিলিম্পা হনুমানের প্রতি দুর্বিনীত, অশালীন সে-ই যখন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে হনুমানের প্রিয়ার ভূমিকা নিতে সংশয়হীন, এমনই কষ্টসাধ্য ছবির রসগ্রাহী বর্ণনায় পরশুরাম যথার্থই অনন্য স্রষ্টা। সৎ, বুদ্ধিমান, আদর্শবান হনুমান লুণ্ঠনে বিশ্বাসী নয়। পৌরুষের জোরে অবলা নারীকে জয় করা তাকে মানায় না। তাই এই বানরটিকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করার মর্যাদা দিতে পারে না। চিলিম্পাকে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের ঘাঁড়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে হনুমান এগিয়ে চলে অযোধ্যার দিকে।

অযোধ্যায় পৌঁছে হনুমান সীতাকে বলে তার উপযুক্ত হনুমতী এ সংসারে নেই। যারা আছে তারা সামান্য বানরী। তার হৃদয় জুড়ে প্রভুরাম ও সীতাদেবীই বিবাজিত তখন সেখানে পত্নী ও পুত্রের স্থান কোথায়? তাই সীতার কাছেই পিতৃ ঋণশোধেব অনিশ্চয়তায় বিহুল হনুমান এই সমস্যার সমাধান প্রর্থনা করে। সীতার বরেই হনুমান অমবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং চিরকালই পিতৃপুরুষকে নিজের হাতে পিণ্ডদানের সৌভাগ্য অর্জন কবে।

পরশুরাম পুরাণের আবহে এমন এক মৌলিক প্লট ভাবনা এবং চরিত্রের ব্যবহাব করেছেন যা সত্যিই এক পুরাণ গল্পের স্বাদই দিয়েছে। হনুমান, সুগ্রীব, তারাদেবী, সীতা, রামচন্দ্র, লোমশ ঋষি এগুলি পৌরাণিক চরিত্র কিন্তু চিলিম্পা ও চঞ্চরীক লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি। ঘটনাগুলিকে পুরাণের গল্পগুলির সঙ্গে অসাধারণ বৌদ্ধিক প্রথায় Punch কবেছেন তিনি। চঞ্চরীক নামের রাজার সন্ধান পুরাণে নেই কিন্তু চঞ্চরীকের আভিধানিক অর্থ 'ভ্রমর' আর সত্যিই একটু ভাবলেই স্পস্ট হবে যে চঞ্চরীকের 'মধুকরলোভী' চরিত্রটিই পরশুরাম এই গল্পটিতে ব্যবহার করেছেন আর লোমশ ঋষির প্রসঙ্গে পুরাণের ঘটনা থেকে শত হাত দূরে অবস্থান করে, নিখুঁত কৌতুকের মনগড়া আবহ রচনা করেছেন। 'চিলিম্পার' ভাবনাও পরশুরামের মস্তিষ্ক প্রসূত নির্মেদ রচনাশৈলীর গুণে, পুরাণ ভাবনার সঙ্গে নিজস্ব সৃষ্টি ভাবনার মিশ্রণ সত্যিই অসাধারণত্বের দাবী রাখে।

এই রূপক কাহিনির মোড়কে যে জীবন রসিকের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা মানতেই হবে। হনুমান এমন এক সৎ, নিষ্ঠাবান, প্রভুভক্ত, আদর্শায়িত চরিত্র যার জীবনবোধের পাশে অন্যান্য চরিত্র গুলির অন্তঃসার শূন্যতা যেন বেশী স্পষ্ট হয়েছে। পুরাণের ছদ্মবেশে গল্পটির সমকালীন তাৎপর্য বাস্তবধর্মীতা যুগোপযোগী। উনবিংশ শতাব্দির বাবু কালচার, বহু বিবাহ, অবক্ষয়, মানবমানবীর ক্ষয়িষ্ণু সম্পর্ক জীবন শিল্পীর ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়েছে। পরশুরাম তাঁর রচিত কল্পনাতরীব মধ্যেই অতি সন্তর্পণে বাস্তবের সোঁদা গন্ধটা সৃষ্টি করেছেন। জীবনের

প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রূপ, হতাশা আছে, তবে তা কি ভাবে? হাসির অনাবিল দ্যুতিই গল্পটিকে স্নিগ্ধ করেছে। সৎ আদর্শবান মানুষের কাছে জীবনের মানেটা অন্য। ভালবাসা, দাম্পত্য সম্পর্ক তার কাছে শ্রদ্ধার, আর যুগের ক্ষয়িত মূল্যবোধহীন ভাবনার সঙ্গে মেলাতে না পারাটাই গল্পে স্পষ্ট। তাই হয়তো হনুমানের মুখে হনুমতী না পাওয়ার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

'হনুমানের স্বপ্ন' শিরোণামটির বিচারে গল্পটির ব্যাখ্যা করলে লেখকের মুন্সীয়ানাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। এই নামকরণ এক অর্থে যেমন তার দেখা দুঃস্বপ্নটিকে ঘিরে, তেমন প্রজ্ঞাবান অবিবাহিত হনুমানের চিরকাল প্রভু রামসীতাকে সেবা করার স্বপ্ন সার্থক হবার কাহিনি হিসেবেও গ্রহণযোগ্য। ছোটগল্পের চালচলন, নির্মেদ ভাষা ভাবনা, আদ্যন্ত চমক গল্পটিতে 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' এনে দিয়েছে।

পরশুরাম সজাগ সতর্ক রিয়্যালিস্ট সমাজ শরীরের রোগ তাঁর চোখে যে পড়েছে তা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারাই স্পষ্ট। গল্পটিতে যে Message গুলি তিনি দিতে চেয়েছেন তা সবই পুরাণ আর হাস্যরসের উজ্জ্বল প্রস্তুতির আড়ালে। তা বলে তাঁর অভিপ্রায় ঢাকা পড়ে থাকেনি, প্রকাশিত হয়েছে নতুন আঙ্গিকে। জীবন রসিক পরশুরাম মনে করেন বিবাহ সন্তান জন্মের প্রয়োজনে গড়ে ওঠেনি। ভালবাসার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়, মানব-মানবীর জীবনের এই পরম বিশ্বাসের সম্পর্কটি শাশ্বত থাকবে। তাতে প্রেম, মূল্যবোধ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এগুলির প্রয়োজন। আর এর অবক্ষয়ই দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থিকে শিথিল করে তোলে। তাই সৎ হনুমান নিজের আত্মঅন্বেষণে সার্থক। সে বুঝেছে তাঁর হৃদয় জুড়ে যখন প্রভু রাম ও সীতা সেক্ষেত্রে পুত্রার্থে বিবাহ স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করা। বহু বিবাহ, অবক্ষয়িত জীবন দর্শন, প্রেমহীন দাম্পত্য সম্পর্ক, সমাজের হৃদয়টাকে যে হৃদরোগে আক্রান্ত করে ফেলেছে, তাই শিল্পীর সংবেদনশীল হৃদয়ে অনুভব করেছেন পরশুরাম, 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রসঙ্গে একথাটির সত্যতা স্বীকার করাই যায়, যে হাস্যরস ও ক্ষুরধার ব্যঙ্গের যুগলবন্দী ঠিক যেন বীরবর বাহিনীর শাণিত আক্রমণ।

উলটপুরাণ : বিপরীত কথাচিত্রের কৌতুক পুরাণ

তুষারকান্তি নস্কর

পরশুরাম হাস্যরসের স্রষ্টা। 'উলটপুরাণ' গল্পটিও তাঁর এই বৈশিষ্ট্যবিরোধী নয়। কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ভাবনা ও প্রকরণ শিল্পের অভিনবত্বে গল্পটি অনন্যরূপে পাঠকের দরবারে হাজির হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকবর্গের অত্যাচার ও শোষণ এবং শোষিত, অত্যাচারিত ভারতবাসীর স্বভাবের উপস্থাপনা গল্পকার 'উলটপুরাণ' গল্পে করেছেন 'উলট' চিত্রের মাধ্যমে 'উলট' নিয়মেই। ভারত সেখানে ঔপনিবেশিক শক্তি, আর ব্রিটিশ শোষিত, অত্যাচারিত জাতি। রূপকে রূপকায়িত হলেও ব্রিটিশদেরকেও শ্লেষহানতে ভোলেননি পরশুরাম। ইংরেজ ও ভারতীয় সম্পর্কের বৈপরীত্য, সুবিধাভোগী কিছু ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নেতা, সামন্ত রাজার চিত্র তির্যকভঙ্গিতে প্রকাশে যেমন 'উলটপুরাণ' অনন্য, তেমনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়, বিজ্ঞাপনস্তম্ভ বা কখনও প্রতিবেদনের উপস্থাপনে গল্পটি আরও প্রাঞ্জল হয়েছে।

'উলটপুরাণ' পরশুরামের অনন্য ছোটগল্প। কিন্তু শিল্পগত সত্যের নিরিখে 'উলটপুরাণ' কে কী ছোটগল্প বলা যায়? ছোটগল্পের সাধারণ সূত্রগত বৈশিষ্ট্যে কোন অবিচ্ছিন্ন কাহিনি নেই, এমনকি কাহিনির গতিসৃষ্টিকারী কোন ঘটনাও নেই। ছোটগল্পের নিয়মমাফিক কোন চরিত্র বা কোন ঘটনাকে আশ্রয় করেই তা গতি পায় এবং চরমক্ষণ বা climax সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'উলটপুরাণে'-এ সুযোগ কোথায়?

গল্পটি চারটি খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে একত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন পরশুরাম। কিন্তু সূক্ষ্ম আন্তসম্পর্ক থাকলেও আদতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রথম চিত্রে দেখা যায়, রিচমণ্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা, যার পণ্ডিত মশায় মিস্টার ক্র্যাম সাহেব শিক্ষার্থী টম, ডিক, হ্যারি প্রভৃতিদের পাঠদান করছেন। এই খণ্ডচিত্রের শেষে দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষীণ প্রসঙ্গসূত্র খাঁ সাহেব গবসন টোডির পার্টির কথা আছে। বলা যেতে পারে এই কাহিনিরই ক্ষীণসূত্র ধরে দ্বিতীয় খণ্ড চিত্রের সূচনা : 'গবসন টোডির অন্দরমহল। মিসেস টোডি, তাঁহার দুই কন্যা ফ্লপি ও ফ্লাপি এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রী জোছনা-দি।' জোছনাদি'র শিখনের বিষয় বাংলাভাষা ও ভারতীয় দৃষ্টিতে সভ্য আচার-আচরণ। তৃতীয় চিত্রে হাইড পার্কে তিন হাজার জনতার সামনে দেশ সেবকের ভেকধারী স্বার্থপর নেতা স্যার ট্রিক্‌সি টার্ন্‌কোটের বক্তৃতা—কিন্তু তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্ববিরোধী। চতুর্থ ও শেষ চিত্রে ভোমস্টাট প্রাসাদের দেশীয় রাজা প্রিন্স ভোমের অলস বিলাসী-জীবনযাপনের চিত্র। দ্বিতীয় চিত্রের পরে লণ্ডনে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু তা গল্পের শেষ দু'মাস ব্যাপী হরতালের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, প্রতিটি খণ্ড চিত্রকে এক সুতোর টানে বেঁধে রেখেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা'র কিছু সম্পাদকীয় উদ্ধৃতি, সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন এবং প্রতিবেদন। সংবাদপত্রের এইসমস্ত একাধিক প্রসঙ্গ থেকে অনেক হাস্যকর প্রসঙ্গ উঠে আসে। দেশীয় সংসদে পুরুষজাতির একাধিপত্যের কারণে নারীজাতির প্রতিবাদ আন্দোলন হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কিন্তু

মনে প্রশ্ন জাগে, ছোটগল্পের মতো সাহিত্যপ্রকরণে সংবাদপত্রের বা অন্যান্যপত্র পত্রিকাব উদ্ধৃতির কী প্রয়োজন? আসলে প্রয়োজনটা কাহিনির বৈপরীত্য সৃজনের বাস্তবতায়, হাস্য-শ্লেষ-কটাক্ষ প্রকাশের চাহিদায়। গল্পের শেষ হয়েছে 'ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনেব জন্য সরকার যে কমিশন বসাইয়াছেন, সার ট্রিক্সির তার প্রেসিডেন্ট রূপে কামরূপ যাত্রাব সংকল্প দিয়ে।

গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভারতীয়দের অধিকারে স্থিত ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি দিকের কৌতুককর চিত্র। রূপক প্রকাশ করতে গিয়ে গল্পকাব নাট্যরীতির সাহায্য নিয়েছেন। গল্পের শুরুতেই ক্র্যাম সাহেবের পাঠশালায় কথোপকথন রীতিতে গল্প এগিয়ে যায়। তবে শুধু সংলাপনয়, নাটকের দৃশ্য শুরুর যেমন বর্ণনা থাকে, শুরুতেই পরশুরাম তেমন বর্ণনা করেছেন :

> 'রিচমণ্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা। মিস্টার ক্র্যাম (পণ্ডিত
> মহাশয়) এবং ডিক টম হ্যারি প্রভৃতি বালকগণ।'

আবার গবসন টোডির অন্দরমহলে জোছনা-দির পাঠদান, হাইড পার্কের সার ট্রিক্সি টার্নকোটের বক্তৃতা বা প্রিন্স ভোমের অলস জীবন যাপনেব ছবি—সবই চিত্রিত হয়েছে নাট্যরীতিতে সংলাপের মাধ্যমেই। তবে গল্পে এ বীতি অচ্ছুৎ নয়। আবার সমসাময়িক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি প্রবন্ধের প্রামাণিক আকবের মত। আসলে, পরশুরাম লিখছেন রূপকাশ্রয়ী গল্প; সুতরাং ছোটগল্পেব প্রচলিত বৈশিষ্ট্যেব আলোকে এ গল্পের গল্প কাঠামো বিচার করা অসঙ্গত। এ গল্পে আছে রূপক, আছে পরশুবামের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গ। অনেকগুলি ছবি একত্রিত হয়ে আদতে গল্পটি একটি কোলাজের সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞান বলে, অক্ষিগোলকের অন্তস্থিত করনিয়ায় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব তৈরী হয তা বস্তুব সাপেক্ষে উল্টো। অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্রই আমাদের অন্তর আযনায় প্রথমে উল্টো প্রতিবিম্ব গঠন করে। 'উলটপুরাণ'ও পরশুরামের অন্তরস্থিত 'উলট' চিত্র। গল্পটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য মৌলিক এবং অনন্য। 'উলট পুরাণ'কে ঠিক ছোটগল্প নয়, বলা যেতে পারে এটি একটি গল্পচিত্র বা গল্পকল্প।

দুই

শেক্সপীয়ার রোমিওকে দিয়ে বলিয়েছিলেন যে, নামে কিছু আসে যায় না। ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু না এসে গেলেও সাহিত্য নামের ক্ষেত্রে কিন্তু এসে যায়। 'উলটপুরাণ'-এর নামকরণের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। 'পুরাণ' কিন্তু তা 'উলট'। অথর্ববেদে আছে, 'ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ'—যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকে যজুর্বেদের সঙ্গে ঋক্, সাম, ছন্দ এবং পুরাণ সৃষ্টি হয়েছে। লণ্ডনে 'রাজসূয় যজ্ঞে'র আয়োজন শুরু হয়েছে। 'স্বয়ং মহাক্ষত্রপ ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে এই যজ্ঞের যজমান হইবেন।' রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকেই কি 'উলটপুরাণ'এর উৎপত্তি? আবার, ধর্মকথা পরিবেশন, স্বর্গস্থিত দেবদেবীর সরলীকরণও লোকায়ত রূপ উদ্ভাসনই পুরাণের কাজ। কৌতুকের মোড়কে বিপরীত কথাচিত্রের মধ্যে পুরাণের ধর্ম যোগ করাতেই পরশুরামের কৃতিত্ব।

পুরাণে আছে অলৌকিকতা, আছে চমক। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় রাজশক্তির কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ভারতীয়দের অধীনতা স্বীকার করেছে—যেমন অবাস্তব আবার তেমন ভাবে বাস্তবের দিক থেকে বিপরীতমুখী। অথচ চমক এবং অলৌকিক-অবাস্তব—তাই 'উলট'। এদিক থেকে গল্পকার প্রদত্ত নামে শিল্পের মানদণ্ডে কোনো অসঙ্গতি নেই। আবার 'উলটপুরাণ' কথাটি'র অর্থ হল মিথ্যা বিকৃতি বা অবাস্তব তথ্য বা উল্টোরকম ব্যাপার। কোন কার্যকারণ সম্বন্ধসূত্র এর মধ্যে থাকতে পারে না। বলা যেতে পারে, আসল ব্যাপারটাকে উল্টে দেখা। তবে এ নামের মধ্যে নিঃসন্দেহে কৌতুকের একটা বাতাবরণ আছে। আর প্রচলিত ধারার গতানুগতিক নামকরণের থেকে এ নাম একটু ভিন্ন পথের। ফলে কৌতুকরসের আস্বাদনের দিক থেকে গল্প নামকরণের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, আবার লেখকের মৌলিকতা প্রতিপাদনে প্রামাণিক দলিল।

'উলটপুরাণ' রূপকধর্মী গল্প। রূপকধর্মী গল্পের চরিত্রের রূপকধর্মীতা অসঙ্গত নয়। ফলে গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রথাগত রীতি-পদ্ধতি এখানে যথোপযুক্ত নয়। কারণ এ চরিত্র-গুলির বহুমাত্রিক দিক নেই, রূপকের উদ্দেশ্যের সীমায় সীমায়িত। চরিত্রগুলি সেখানে রূপকার্য প্রকাশেই অধিক দায়িত্বশীল। কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গ মিশ্রিত রূপকধর্মী 'উলটপুরাণ'-এর তাই মূলত উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত, সার্থক রূপকাঙ্গিক প্রকাশ, এবং দ্বিতীয়ত শ্লেষ-কৌতুক-ব্যঙ্গের সার্থক সন্নিবেশ। আবার 'উলটপুরাণ' গল্পে কোন নায়ক নেই, নেই একক কোন চরিত্রের কাঁধে চড়ে গন্তব্যের পথে যাত্রা। অনেকগুলি চরিত্রের একত্র যাত্রায় কাহিনির গতিময়তা; ফলে কাহিনির গতিময়তা রক্ষাই চরিত্রের প্রধান দায়িত্ব।

'পণ্ডিত মহাশয়' মিষ্টার ক্র্যাম এবং শিক্ষার্থী ডিক, টম, হ্যারি প্রভৃতিরা আচরণগত দিক থেকে হাস্যরস প্রবাহকেই অমোঘ করেছে। শিক্ষক ক্র্যাম ইংরেজ ঔপনিবেশে ভারতীয় কেরানী সমাজের প্রতিনিধি। তাই তিনি জীবন ও জীবিকার তাগিদে বলতে বাধ্য হন :

> 'ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্ছে তখন সত্যি বইকি।'

আবার শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার বদলে বিভিন্ন শিক্ষাকমিশন ইংরেজীভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতে। তারই রূপ উদ্‌ঘাটিত হল ব্রিটিশ শিশুদের বিশুদ্ধসাধু বাংলায় পাঠগ্রহণের চিত্রে। যার ফলশ্রুতিতে 'দোর্দণ্ড' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হয় : "The big rod. Under the soothing influence of the big rod."

আসলে, এ কথোপকথনে 'উলটপুরাণ'-এর মূল উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়েছে। বিপরীত চিত্রের মাধ্যমে এবং আচার-আচরণ ও বাণীতে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের সমবায় রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

গবসন টোডির অন্দর মহলে জোছনা-দি'র বাংলাভাষা ও আচরণ শিক্ষা, মিসেসটোডি এবং তাদের কন্যা ফ্লপি ও ফ্ল্যাপির আচরণের অসঙ্গতি 'উলটপুরাণ'-এর উদ্দেশ্যের পরিপূরক। প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি, রুচিবোধ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ইংরেজ অনুকরণ, ইংরেজ সংস্কৃতি ও রুচির আত্তীকরণের প্রচেষ্টার প্রতিকল্প গবসন টোডির অন্দরমহলের চিত্র। গবসন টোডি বিদেশী চরিত্র হলেও একান্ত বশংবদ খাঁ সাহেবের উপযুক্ত প্রতিনিধি। বাস্তবে ব্রিটিশ

বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে সুবিধাভোগী, আত্মসুখী মানুষের প্রমাণ দেয় ইতিহাস। এরকমই ছাঁদে প্রস্তুত স্বার্থান্বেষী, সুযোগ সন্ধানী ট্রিক্‌সি টার্নকোট চরিত্র। আবার শাসক ব্রিটিশ তোযামুদে, সামন্ত রাজাদের মত বিলাসপ্রবণ স্বভাবের সার্থক প্রত্যয়িত নকল ভোমস্টাট প্রাসাদের প্রিন্স ভোম। ম্যাক্‌ডুড্‌ল, ও'হুলিগান, লর্ডব্লার্নি, মন্ত্রী ব্যারণ ফন বিবলার, চৈনিক পর্যটক ল্যাংপ্যাং-সমস্ত চরিত্রই আসলে রূপকের অন্তরালে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মজ্জার মধ্যে অবস্থান করছে। উল্টো চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনেই তারা এসেছে এবং প্রত্যেকেরই উল্টোরূপে তা সার্থক হয়েছে।

তিন

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে নবরসের উল্লেখ আছে—হাস্যরস যার মধ্যে অন্যতম। মহাকবি কালিদাসের কাছে হাসির আদর্শ মহাদেবের অট্টহাস্য যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে শুভ্রকুমুদকুসুমরাশি বা তুষার মৌলি হিমগিরির সঙ্গে। 'শৃঙ্গোচ্ছ্রাঁয়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ কংরাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।' (পূর্বমেঘ।। ৫৮, মেঘদূতম্, কালিদাস)। আবার, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কোন কিছুর অসঙ্গতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে হাসির ঝিলিক। আর রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম হাস্যরসের রসিক। তাঁর হাসিতে শুধু হাসি নেই, আছে ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের তীক্ষ্ণতা। 'উলটপুরাণ' গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়। গল্পের নামকরণই হাসির বাতাবরণ প্রস্তুত করে।

ইউরোপীয় ইংরেজগণ ভারতীয়দের দ্বারা অধিকৃত, শাসিত এবং শোষিত—এই বিপরীত ধর্মী চিত্র পরিবেশন লক্ষ্য হলেও মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের আচার-আচরণের অসামঞ্জস্যতা এবং অসঙ্গতি তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ। তাই বক্রশ্লেষ অথচ ধারালো কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায় পণ্ডিত মশায় ক্র্যামসাহেবের জবানীতে :

> 'সেকালে নাম ছিল মেডিটেরিনিয়ান। ইণ্ডিয়ানরা উচ্চারণ করতে পারে না বলে নাম দিয়েছে মেতি পুকুর। সেই রকম আল্‌স্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইটসারল্যাণ্ডকে বলে ছছুরাবাদ, বোদো কে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাঞ্চেস্টারকে বলে নিম্‌তে।'

ইংরেজীয়ানার অন্ধ অনুকরকণের মতোই টম ধুতি পরে বাঙালীয়ানার অনুকরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে হ্যারির বক্তব্য হাস্যোদ্দীপক—'কাছা দিয়েছে যেন স্কিপিং রোপ!' আবার মিসেস টোডির 'নো, থ্যাংক্‌স,-থুড়ি', ফ্লপির 'পাঁচ'কে 'ফ্যাচ' বলা বা মিস্টার টোডির বাথরুমের ভিতর আম খাবার প্রসঙ্গ বিশুদ্ধ কৌতুকের পরিচায়ক। বিশুদ্ধ হাস্যরসের সঙ্গে শ্লেষ আছে 'রাষ্ট্রবিৎ' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে .

> 'অম্বুরীবরণ। মেমসাহেবগণের দুঃখ এবার দূর হইল। এই আশ্চর্য গুঁড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাশে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালি মেয়ের মতন রং হইবে,'

নারীজাতির মুখপত্র 'দি শি-ম্যান'-এর উদ্ধৃতি :

> 'পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগার খাই, ককটেল টানি। এরপর দরকার হয়তো মুখে কবিরাজী কেশতৈল মাখিয়া গোঁফদাড়ি গজাইব।'

এর মধ্যে বিশুদ্ধ হাসির সঙ্গে চাপা শ্লেষ কটাক্ষ প্রকাশিত। প্রমাণিত, পরশুরামের কটাক্ষ

ব্রিটিশদেরকেও বাদ দিয়ে নয়। আবার সামন্ততান্ত্রিক প্রিন্স ভোমের আলস্য, আরাম-প্রিয়তা, বিলাসিতা ও শারীরিক অক্ষমতা হাস্যরসের সৃষ্টি করে। চৈনিক পর্যটক ল্যাংপ্যা -এর সামনেই খানসামাকে বলে :

> 'কোবল্ট, একগুলি দে বাবা, তিনটে বাজে, হাই উঠছে। আহা, কি জিনিসই আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আবিষ্কার করেছিলেন হের প্যাং।.....আমায় বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে তো।' বা, 'বাবা, কোবাল্ট, আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দে তো।'

পুরুষজাতির মুখপাত্র 'দি মিয়ারম্যান' উদ্ধৃতাংশ থেকে জানা যায় 'দুর্বত্তা নারীগণ' নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে,' কিন্তু সরকারী উড়িয়া পুলিশ অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টার বদলে কেবলমাত্র হেসেছে 'হী-হ-হ-হ-হ'। আবার যারা নিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তাদের বলেছে 'এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব তো ডণ্ডা খিব।' এই চিত্র এবং ভাষায় শুধু প্রচ্ছন্ন হাসি নয়, হাস্য রসের উচ্ছ্বসিত ধারা প্রবাহিত হয়েছে।

'উলটপুরাণ'—উল্টোচিত্রে ইংরেজ ও ভারতীয় রাজনৈতিক-সামাজিক এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের রূপের প্রকাশ। ইংরেজ তোষণ, ইংরেজি ভাষা ও আচরণের প্রতি অন্ধ অনুকরণের ইচ্ছার প্রতি আছে পরশুরামের তীব্র-শ্লেষ-কটাক্ষ। নিন্দুকেরা হয়ত এত কিছুর পরেও বলবেন, পরশুরাম বড্ডবেশি উদ্দেশ্যমুখী—কাঠামোই দৃঢ় হয়েছে, কিন্তু গল্প বলতে কিছুই নেই। তবুও অভিনব বিষয় সৃজনে, শিল্পগত সত্যের পরশে এবং হাস্যরসের অনাবিল ধারায় পরশুরাম যেমন অনন্য, অসাধারণ, তেমনি 'উলটপুরাণ' হয়ে ওঠে অনুনকরণীয়।

পরশপাথর : সোনার সমাজ

ঋতব্রত বসু মল্লিক

বাংলা সাহিত্য জগতে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। হাসির গল্পে পাঠককে মজিয়ে রাখার কৃতিত্ব যে কয়েকজন সাহিত্যিকের প্রাপ্য পরশুরাম তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রথমদিককার গল্পগুলিতে যে হাস্যরস রয়েছে তা স্যাটায়ার মিশ্রিত। তাঁর সব গল্পই কমবেশী বিদ্রূপাত্মক তবে ১৩৫৭ সনে (১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত 'গল্পকল্প'-এর গল্পগুলিতে একটু ভিন্নধর্মী পরশুরামকে পাঠক আবিষ্কার করেন। এই গল্পসংকলনের অন্তর্গত 'পরশপাথর' (১৯৪৮) গল্পটিতে এজাতীয় ভিন্ন মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট। গল্পটি খুব আহামরি গোছের কোন গল্প নয়; এর মধ্যে লেখকের সৃষ্টিমূলক অভীক্ষাও তেমন মেলে না; তথাপি এই গল্পটির মধ্যে এমন কিছু কথা বলেছেন যা পড়ুয়াদের আলাদা করে ভাবতে হয়। আসলে পরশুরাম তাঁর আবির্ভাবলগ্ন থেকেই 'হাস্যরসিক' নামক একটি তক্‌মা পেয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোন কিছুর উপরই নির্ভর করেনি। তবে এই হাস্যময়তার অন্তরালে লেখকের একটি বিচারবুদ্ধিপ্রবণ মন সদাই সক্রিয় ছিল। 'পরশপাথর' গল্পেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

এক

পরশপাথর গল্পটি যখন রচিত হয় তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর সারা দেশেই একটা টালমাটাল ভাব, যদিও ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু তখনও ভারতবর্ষ তার স্বপ্নকে সম্পূর্ণ সাকার রূপ দিতে পারেনি। সকলের মনেই একটা কিন্তুর ভাব। পরশুরামও এই জায়গা থেকে সরে আসতে পারেননি। 'পরশপাথর' গল্পের শুরুই হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিতে : "পরেশবাবু একটি পরশ পাথর পেয়েছেন। কবে পেয়েছেন, কোথায় পেয়েছেন, কেমন করে সেখানে এল, আরও পাওয়া যায় কিনা—এসব খোঁজে আপনাদের দরকার কি। যা বলছি শুনে যান।" —এই গল্পটিকে যেন পাঠকের শরীরে লেখক inject করছেন। পাঠকের উপর এভাবে কর্তৃত্ব কিন্তু পরশুরাম অন্যান্য গল্পে খুব একটা করেননি। পাঠককে এভাবে সরাসরি ধাক্কা দিয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে একটা সুবিধা হয় যে, তাঁরা সমগ্র-গল্পটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের বক্তব্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। 'পরশপাথর' ব্যাপারটাই আজগুবী—বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু পরশুরামের কথনভঙ্গির মৌলিকতায় কেউই কিন্তু এর সত্যাসত্য বিচারে আগ্রহী হন না। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। তিনি যা বলবেন সেটাই শুনতে হবে—কোন প্রশ্ন তোলা চলবে না। লেখকের অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পটিও বিবৃতিমূলক তবে এই বিবৃতিমূলকতা কঠোর কর্তৃত্বের মধ্যে বাঁধা।

পরশুরামেব এই গল্পটিতে তিনটি বিষয় খুব স্পষ্ট—

১. মধ্যবিত্ত পরেশবাবুর পরশপাথর প্রাপ্তি, সেই পাথর দিয়ে লোহাকে সোনা করে প্রভূত বিত্তসম্পত্তির অধিকারী হওয়া ও শেষকালে ঐশ্বর্যের

প্রতি অনীহা একথাই প্রমাণ করে যে, পরম প্রার্থিত কাম্যবস্তু লাভ হলেও একসময় তা বিতৃষ্ণা উৎপন্ন করে।

২. পরেশ বাবু প্রভূত পরিমাণে সোনা তৈরী করায় বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের বিচ্যুতি ঘটতে থাকে যার ফলে বিশ্ব-অর্থনীতিতে ক্ষণভঙ্গুরতা দেখা দেয়। সামান্য একজন মধ্যবিত্তের পক্ষে বিশ্ব-অর্থনীতির ভিত ধরে টান মারা আপাত ব্যঙ্গাত্মক হলেও এর ভিতর দিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক অর্থ পরিকাঠামোর বেহাল দশা সহজেই বোঝা যায়।

৩. প্রিয়তোষ হিন্দোলার প্রণয় কাহিনি যেখানে হিন্দোলা ও তার পিতার সম্পদগৃধ্নুতা কাজ করেছে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কারণ পরেশবাবু পরশপাথর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সোনা তৈরী করছেন বলেই সোনার দাম ক্রমশ কমছে, ফলে বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের বিপর্যয় ঘটছে ও বিশ্ব অর্থনীতি ভঙ্গুর হচ্ছে। আর এত সোনা পরেশ বাবু নিজে তৈরী করতে পারছেন না বলেই প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকে নিযুক্ত করেছেন। প্রিয়তোষ তার কলেজের বান্ধবী হিন্দোলা মজুমদারের প্রেমে নিমগ্ন। হিন্দোলার বাবা প্রথমে প্রিয়তোষের সঙ্গে হিন্দোলার বিয়ে দিতে না চাইলেও পরেশ বাবুর প্রস্তাবিত যৌতুক দান ও প্রিয়তোষের পরশপাথর গিলে ফেলার কথা শুনে হিন্দোলার পিতা তাদের বিয়েতে রাজী হয়ে যান। কারণ তাঁর যুক্তি ছিল : "প্রিয়তোষ—এখন হিরণ্যগর্ভ হয়েছে, তার পেটে সোনার খনি। যবে হোক, একদিন বেরুবেই, তখন সেই পরশপাথর তোরই হাতে আসবে। পরেশবাবু সেটা আর নেবেন না, প্রিয়তোষকে যৌতুক দিয়েছেন।" সুতরাং বলতে গেলে হিন্দোলার পিতার কাছে প্রিয়তোষ এখন সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের মত। কিন্তু শেষাবধি 'হিরণ্যগর্ভ' প্রিয়তোষ হিরণ্য প্রসব করেনি বটে তবে তার উদরস্থ পরশপাথরের প্রতি প্রিয়তোষের শ্বশুরের প্রবল আগ্রহ তাঁর লোলুপতাকেই প্রকাশ করেছে।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, গল্পটার গতি কিন্তু খুব ঝরঝরে। পড়তে পড়তে মাঝখানে আটকে যায় না। প্রিয়তোষ হিন্দোলার প্রণয় কাহিনি আসায় গল্পটি একটু শ্লথ হয়ে গেলেও পরক্ষণেই লেখক এই উপকাহিনীটিকে মূল ঘটনার সঙ্গে বিজারিত করে দিয়েছেন। গল্পটির ভিতরকার মূলসুর বা তানটিকে একেবারে সপ্তকে বেঁধে রেখেছেন লেখক। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যই কিন্তু কার্যকারণ সূত্র মেনে গল্পে এসেছে। পরেশবাবুর সোনা তৈরী থেকে শুরু করে প্রিয়তোষকে সেই সোনা তৈরীর রহস্য বলে দেওয়া ইস্তক গল্পের মধ্যে কোন শিথিলতা আসেনি। আর এরই সঙ্গে জমেছে কৌতুক। পরেশবাবুর সোনা তৈরীর ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের জল্পনা কল্পনা বাস্তবতা—অবাস্তবতার মধ্যবর্তী পথে ত্রিশঙ্কুর মতো দোদুল্যমান—"যদি তাঁরা (বিজ্ঞানীরা) দু-শ বৎসর আগে জন্মাতেন তবে অনায়াসে বুঝে ফেলতেন যে পরেশবাবু পরশপাথর পেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে পরশ পাথরের স্থান নেই, অগত্যা তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে পরেশ বাবু কোনও রকমে একটা পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র খাড়া করেছেন এবং ভাঙা পরমাণুর টুকরো জুড়ে জুড়ে সোনা তৈরী করছেন, যেমন ছেঁড়া কাপড় থেকে

কাঁথা তৈরী হয়।" —এই ঠাট্টার মাধ্যমে গল্পকার প্রাচীন ভারতীয় মহাত্মাদের সঙ্গে আধুনিক জড়বিজ্ঞানীদের মৌল পার্থক্য সূচিত করেছেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়; বিশ্বের তাবড় তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের গল্পের সঙ্গে যুক্ত করে কৌতুকের রসকে আরও গাঢ় করেছেন— "পরেশ বাবু সোনার দর ক্রমেই কমাচ্ছেন, ...ব্রিটিশ সরকার সস্তায় সোনা কিনে আমেরিকার ডলার-লোন শোধ করেছেন....চার্চিলকে আর সামলানো যাচ্ছে না, তিনি খেপে গিয়ে বলছেন, আমরা কমনওয়েলথের সর্বনাশ হতে দেব না....বার্নাড শ বলেছেন, সোনা একটা অকেজো ধাতু....রাশিয়ার এক মুখপাত্র পরেশবাবুকে লিখেছেন, মহাশয়, আপনাকে, পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করছি, আমাদের দেশে এসে বাস করুন. খাসা জায়গা।"—এই বর্ণনা, কৌতুক একসাথে মিশে গিয়ে ছোটগল্পের সার্থক আবহ্ রচনা করেছে।

দুই

'পরশপাথর' গল্পের মূল চরিত্র পরেশবাবু ও প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দুটি—পরেশ বাবুর গৃহিণী গিরিবালা ও প্রিয়তোষ-প্রেয়সী হিন্দোলা। হিন্দোলার পিতা জগাই মজুমদার, গুঞ্জন ঘোষ, চার্চিল, বার্নাড শ প্রমুখ চরিত্র গল্পে এলেও খুব একটা মুখ্য ভূমিকা নেয়নি। গল্পের প্রয়োজনেই এরা এসেছে।

"পরেশবাবু মধ্যবিত্ত মধ্যবয়স্ক লোক।" তবে তিনি খুবই হিসেবী ও সাবধানী। উকিলি বুদ্ধি তাঁকে এই সাবধানী মনোবৃত্তি দিয়েছে। তাই পরশপাথর পাওয়ার পর তিনি উত্তেজিত বা আত্মহারা কোনটাই হননি। খুব সাবধানে সোনা তৈরী ও বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছেন। কারণ, "পরেশ বাবু শুনেছিলেন. এক ভদ্রলোক লটারিতে চার লাখ টাকা পেয়েছেন শুনে আহ্লাদ এমন লাফ মেরেছিলেন যে কড়িকাঠে লেগে তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিস। পরেশবাবু নিজের মাথা দুহাত দিয়ে চেপে রাখলেন পাছে লাফ দিয়ে ফেলেন।" —প্রিয়তোষকে কাজে বহাল করার পিছনেও তাঁর এই হিসেবী বুদ্ধি কাজ করেছে। প্রিয়তোষ সম্পর্কে তার মনোভাবটিও প্রণিধানযোগ্য—"পরেশবাবু মনে করেন, তিনি পরশপাথর ছাড়া আর একটি রত্ন পেয়েছেন—এই প্রিয়তোষ-ছোকরা।" পরেশবাবু প্রভূত সম্পত্তির মালিক হলেও বিলাসী হননি, বোলচালও বাড়াননি। এমনকী তাঁর সোনাতৈরীর কৌশলও কেউ বের করতে পারেনি। বিদেশী দূতাবাসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শ্যাম্পেন খেয়েও তাঁর পেটের কথা বের হয়নি। সুতরাং তিনি কেবল সাবধানী নন; বুদ্ধিমানও বটে। চাণক্য নির্দেশিত "মন সা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ"—এই আপ্তবাক্যকে তিনি তাঁর জীবনে ফলিয়ে তুলেছেন। ক্রমাগতঃ সোনা বেচতে বেচতে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম পড়ে গেল অন্যদিকে পরেশবাবুরও ঐশ্বর্যের বৃদ্ধিতে অনীহা জন্মাল। তবে কখনোই ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্য আসেনি। তাই পরশপাথর লুপ্ত হওয়ার পর তিনি লোহার কারখানা খুলেছেন। আসলে যে সময়ে পরশুরাম এই গল্পটি লিখছেন সেই সময়কার পরিবর্তিত অর্থনীতিতে পরেশবাবুর মতো একজন লোকই তাঁর দরকার ছিল যিনি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সদাই মানিয়ে চলতে পারবেন। ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' তথা 'Surrival of the rittest' নীতি এখানে আংশিক হলেও কার্যকর। খ্যাতি. প্রশংসা, নিন্দা, উচ্চমহলে সমাদর প্রভৃতি কিছুই তাঁর ব্যক্তিজীবনে তাঁকে সেন্টিমেন্টাল করে তুলতে পারেনি।

প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস একেবারে যথার্থ কলম পেষা কেরানী শ্রেণীর চরিত্র। সে পরেশবাবুর কারখানায় থাকে, খায় আর দেড়শ টাকা মাইনের চাকুরী করে। তার কাজ হল সোনা গলানো আর বাট তৈরী। সে এত সোনার উৎপত্তি বিষয়ে কোন কৌতূহল পোষণ করে না। এমন কী পরে সোনা তৈরীর কৌশল জেনেও আশ্চার্যরকম নির্বিকার ও অবিচলিত থেকেছে। তবে সে তার কলেজের বান্ধবী হিন্দোলা মজুমদারের প্রতি প্রণয়াসক্ত। তবে সেই প্রণয়ও খুব জোরদার কিছু নয়। হিন্দোলার কাছে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে রুখে না দাঁড়িয়ে পরশপাথরটাকেই বিষরূপে গিলে ফেলেছে। পরেশবাবুর চেষ্টায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে হিন্দোলার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের জন্য সে ধর্মপরিবর্তনও করেছে। তার চরিত্রের নিজস্বতা বলে কিছু নেই। তবে বিয়ের পর প্রিয়তোষ হিন্দোলা বিষয়ক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। পত্নী ও শ্বশুরের বাক্যবাণ সে আর গ্রাহ্য করে না—"সে বুঝেছে সে সেন্ট ফ্রান্সসিস আর পরমহংসদেব খাঁটি কথা বলে গেছেন, কামিনী আর কাঞ্চন দুই-ই রাবিশ।" অর্থাৎ আর পাঁচটা গড়পড়তা বাঙালি ছেলের মতোই প্রিয়তোষের প্রেমও বিয়ের পর হারিয়ে গেছে। প্রিয়তোষ আবেগসর্বস্ব ও কাজপাগল ছেলে। আবেগকে নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা তার ছিল না। পরশুরাম তাকে এভাবে অঙ্কন করে পরেশবাবুর দিকেই গল্পের ফোকাসটা রাখতে চেয়েছেন।

পরেশগৃহিণী গিরিবালা একেবারে মধ্যবিত্ত গৃহিণী রূপে চিত্রিত। তিনি মনের সুখে সর্বাঙ্গ সোনার গহনায় মুড়ে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বামীর এই সোনার কারবারের বিষয়টা পাঁচকান করেননি। অর্থাৎ গিরিবালাও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ও সাবধান। কিন্তু সোনা পরতে পরতে তাঁর ঘৃণা জন্মেছে। তিনি সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার ত্যাগ করে কেবল শাঁখা ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করেছেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি সন্দেহবশে তিনি স্বামীর নামে আগত চিঠিপত্রাদি তর্জমা করে শোনানোর জন্য মেম সেক্রেটারি রেখেছেন। স্বামীর কাছে কোন প্রেমপত্র এলে তাঁর হুকুমে মেমকে কটু কথায় জবাব দিতে হয়। এমনকি নোবেল প্রাইজ দেওয়ার সিদ্ধান্তকেও গিরিবালা প্রেমপত্র মনে করে মেমের মারফৎ উত্তর দিয়েছেন—'ড্যাম।' মধ্যবিত্ত গৃহিণীর বাসনা, সীমাবদ্ধতা, ভোগাসক্তি ও স্বামীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ মনোভাব গিরিবালা চরিত্রটিকে গল্পের উপযোগী করে তুলেছে।

হিন্দোলা মজুমদার আর তার পিতা জগাই মজুমদার গল্পের প্রয়োজনেই এসেছে। তবে জগাই মজুমদার লোভী প্রকৃতির হলেও হিন্দোলা ততটা লোভী ছিল না। সে গুঞ্জন ঘোষকে যে পিতার ভয়ে বিয়ে করতে চলেছে তা প্রিয়তোষকে জানিয়েছে। এমনকী বকুল মল্লিককে যেন প্রিয়তোষ বিয়ে করে সুখী হয়, এমন পরামর্শও দিয়েছে। যদিও তাদের প্রেমলীলার কোন পর্যায়সারণী গল্পে নেই তবুও তাদের এই প্রণয়সম্ভাষণ গল্পের মধ্যে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে। প্রেমকে বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে কিভাবে তাকে বস্তুগত করে তুলাদণ্ডে মাপা হয় তাকেই রাজশেখর প্রিয়তোষ হিন্দোলার প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন।

তিন

পরশুরামের সব গল্পই হাস্য রসাত্মক 'পরশুরাম গল্পসমগ্র'-র 'ভূমিকা'য় প্রমথনাথ বিশী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"পরশুরামের হাসি অনতি-প্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা।....এক্ষেত্রে বিভিন্ন

জাতের হাসি মিশে গিয়ে মিশ্ররসের এবং মিশ্রজাতের হাসি সৃষ্টি করে।" এই 'পরশপাথর' গল্পেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কতকগুলি উদাহরণ থেকে আমরা এই হাস্যরসের স্বরূপটি বুঝতে পাবে—

(ক) "বার্ণাড শ বলেছেন, সোনা একটা অকেজো ধাতু, তাতে লাঙল কাস্তে কুড়ুল কয়লার এঞ্জিন কিছুই হয় না।.....এখন তিনি চেষ্টা করুণ যাতে সোনাকে ইস্পাতের মতন শক্ত করা যায়। সোনার ক্ষুর পেলেই আমি দাড়ি কামাব।"

(খ) প্রিয়তোষের পেটে পাথরের এক্সরে রিপোর্ট দেখে ডাক্তারের মন্তব্য—"এই ছোকরার অ্যাসেণ্ডিং কোলনের পাশ থেকে ছোট্ট একটি সেমিকোলন বেরিয়েছে।"

(গ) খ্রীস্টান প্রিয়তোষের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে—"প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসের মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। তার শুদ্ধি হল, এক সের ভেজিটেবল ঘি দিয়ে হোম হল, পাঁচ জন ব্রাহ্মণ লুচি-ছোঁকা-দই-বোদে খেলে।"—

উপরোক্ত তিনটি উদাহরণের প্রতিটিতেই কিন্তু সমাজব্যবস্থা, ধর্মব্যবস্থার প্রতি একটা তির্যক কটাক্ষ রয়েছে।

সমগ্র গল্পটিতে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরশপাথর লাভের ফলে পরেশবাবুর ব্যক্তিগত জীবনাপেক্ষা আন্তর্জাতিক জীবন ও ভাবনা বেশী আলোড়িত হয়েছে। উদ্ভট কল্পনা দিয়ে গল্প শুরু হলেও আধুনিক জীবনের সর্বাধিক সমস্যাজড়িত বিষয়টি-ই ক্রমে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনে অর্থ প্রায়োজন, কিন্তু সেই অর্থই কতটা অনর্থের সৃষ্টি করে তা লেখক কৌতুকাবহের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনীবৃত্তের চতুর্দিকে উদ্বেল বিশ্বের দুশ্চিন্তাব বিভিন্ন প্রসঙ্গ গল্পটিকে গভীরতা দান করেছে। শেষ পর্যন্ত অলৌকিক পরশপাথর নির্বিকার ও নিরুদ্বেগ প্রিয়তোষের জঠরে বিলুপ্ত হয়েছে। ঐশ্বর্য বিষয়ে অনাসক্ত প্রিয়তোষ পবশপাথরকে তার নির্লিপ্ত দিয়ে গ্রাস করেছে। এখানেই গল্পের শিল্পসিদ্ধি ঘটেছে।

গা মানুষ জাতির কথা : বিজ্ঞানের ব্যঙ্গে
দেবাশিস জানা

প্রমথনাথ বিশী পরশুরামের হাস্যরসকে বলেছেন 'ইনটেলেকচুয়াল লাফটার' এবং—

"তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে পড়ে সচকিত ও সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। ...পরশুরামের হাসির লক্ষ্য Idea, Ideology, কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্যে ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকে মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসঙ্কোচে হাসতে তার বাধে না। গণ্ডেরিয়াম বাটপাড়িয়া, পেন্সনপ্রাপ্ত রায়সাহেব, তিনকড়ি বাবু, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বিরিঞ্চিবাবা, বকুবাবু, শিহরণ সেন এ্যান্ড কোং সকলেই প্রাণ ভরে হাসে, হাঃ হাঃ হাঃ—অমুক লোকটাকে খুব ঠুকেছে দেখছি, বেড়ে হয়েছে। ....পরশুরামের দর্পণ খানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানী করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।" (পরশুরাম গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড, ভূমিকা)।

এই অতিরঞ্জনের প্রকৃতিটি আবার যথাযথ ভাবে নির্ণয় করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' গ্রন্থে। বলেছেন রাজশেখরের অতিরঞ্জনেব কৌশলটি ব্যঙ্গচিত্রী বা cartoonist-এর সমগোত্রীয। ব্যঙ্গচিত্রী যেমন চেনা মানুষের কোন অসঙ্গতি বা বিশেষত্বকে অতিবঞ্জিত করে হাস্যরস সৃষ্টি করেন—পবশুরামও তেমনি পরিচিত সব চবিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন। এতে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে অথচ মানুষটিকেও ঠিক ঠিক চেনা গেছে। স্নিগ্ধতা-দাঢ্য, সহানুভূতি-ব্যঙ্গ,—দুই বিপরীত গুণের সমন্বয়ে তাঁর হাসি যেন আপন জনের তিরস্কার, গুরুমশায়ের চাবুক নয়।

রাজশেখরের সাহিত্যকর্মকে দুটি ভাগ কবা যায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা সাহিত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব আগে লেখা গ্রন্থগুলি অর্থাৎ 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'—পরশুরামের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ক্ষোভ, অস্থিরতা, যন্ত্রণা বিশ্বজুড়ে ছোটগল্পের জন্মকে করেছিল সমৃদ্ধ। পরশুরামও এ সময় অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন। কিন্তু সমাজের ক্লেদ, ব্যাভিচার বিঘ্নিত করেছে তাঁর পরিহাসেব মূলগত স্থৈর্যকে, ফলে মাঝে মাঝেই তিনি স্খলিত হযেছেন তাঁর প্রতিভার উচ্চ শিখর থেকে। তাঁর ব্যঙ্গের স্নিগ্ধতাটুকু যেন নষ্ট হয়ে গেছে এই পর্যায়ে। পরিবর্তে সঞ্চারিত হয়েছে ক্রোধের তিক্ততা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'গল্পকল্প' গ্রন্থে পবশুরামের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্পে পরশুরামের স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের পরিবর্তে ক্ষোভ ও তিক্ত ক্রোধ নিপুণ শিল্পরীতি লাভ করেছে।

দুই

পরশুরামের 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্পটিতে ভবিষ্যতের কাহিনীকে বর্তমানের ভাষ্যে বলা হয়েছে। কয়েকটি স্তরে লেখক গল্পের প্লট বা আখ্যানকে সাজিয়েছেন। ভূমিকায় এই গল্পের সূত্রপাতের কারণ এবং স্তরান্তরে গা মানুষ জাতির উৎপত্তি, বংশবিস্তার, রাজনৈতিক বিবোধ,

শান্তিসভা, মতভেদ, শান্তির উপায় আবিষ্কার ও গা মানুষ জাতির বিলুপ্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পটিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তার প্রায় ত্রিশ বছর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়েছে। কেননা বড় বড় রাষ্ট্রপ্রভুদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেকদিন থেকেই চলছিল। ক্রমশ তা বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায়। প্রত্যেক গোষ্ঠীই অপরকে ধ্বংস করে নিজেরা সুখে থাকতে চেয়েছিল। দুর্দৈবক্রমে তারা একে অপরের উপর 'অ্যানাইহিলিয়াম' বোমা প্রয়োগ করল। যার হাত থেকে কেউই নিস্তার পেল না। সমগ্র মানবজাতি, তার সমস্ত কীর্তি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ-গাছপালা—সবই মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হল।

কিন্তু প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ। লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, পিকিং, কোলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরের ড্রেন-এ যে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত,তাদের বেশীর ভাগই বিলীন হলেও কয়েকটি দৈবক্রমে বেঁচে গেল। তবে শুধু বাঁচা নয়, বোমা থেকে নির্গত গামা-রশ্মির প্রভাবে তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেল। এই নবোদ্ভূত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান না করে লেখক গামারশ্মির প্রভাবে মানবতুল্য এইসব প্রাণীদের 'গা-মানুষ' বলেছেন। মানবজাতি ধ্বংস হওয়ার ত্রিশ বছরের মধ্যেই গামানুষ অতিদ্রুত গতিতে সভ্যতার শীর্ষদেশে উপস্থিত হল। কেননা এদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। মানুষের সমস্ত গুণই তারা পেয়েছিল। তাই জাতিভেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি এই গামানুষ জাতির মধ্যেও দেখা দিল। বারবার মারাত্মক সংঘর্ষের পর বিভিন্নদেশের দূরদর্শী গামানুষগণ শান্তির উদ্দেশ্যে এক মহতী বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিশ্বশান্তির উপায নির্ধারণে বহু গামানুষ সেই সভায় উপস্থিত হলেন।

শান্তিসভার শুরুতেই সভাপতি চং লিং গামানুষ জাতির নিস্তারের জন্য বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেন। অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউন্ট নটেনফ সম্পদের বন্টন নিয়ে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার মূল্য স্বরূপ বিশ্বসম্পত্তির অর্ধেক দাবী করে বসলেন। বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ তাদের কর্তৃত্ব, সাম্রাজ্য চালানোর অভিজ্ঞতার প্রতি সকলের আনুগত্য দাবী করলেন। অন্যান্য দেশের উপর তাদের যে অধিকার কায়েম রয়েছে তা অছিগিরি মাত্র। বরং বন্ধুবর জেনারেল কীপফদের দৃষ্টান্তে শ্রমজীবীরা বিগড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন। কীপফও উল্টে গ্র্যাবার্থ-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লবের অভিযোগ আনলেন এবং একদিন এর শোধ তুলবেন বলে হুমকি দিলেন। তুলনায় পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজী গ্র্যাবার্থের মন্তব্যকে ভন্ডামী বলে দাবি করলেন। মহাতপস্বী মহারাজ অবলদাসকে শান্ত করতে চাইলেও ধর্মদাস রাষ্ট্রীয় সদ্‌বুদ্ধির উপায় স্বরূপ চরিত্র শোধন, বিলাসিতা বর্জন, নিরামিষ ভোজন ও ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বললেন। পণ্ডিত সত্যকামজী বিশ্বশান্তির উপায় নির্ধারণের জন্য সত্যভাষণের উপর জোর দিলেন। আর এই সত্যভাষণের জন্য জেনারেল কীপক সোডিয়াম পেন্টোথাল খাওয়ানোর পরামর্শ দিলেন।

সোডিয়াম পেন্টোথাল প্রয়োগে মানুষ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। তাই বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশন সকলের উপর প্রয়োগ করতে বললেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে নন্দী তা প্রথমে প্রয়োগ করলেন ধর্মদাসজীর উপর। দু-মিনিট পরে ধর্মদাস সেই নিরামিষ ভোজন, বিলাসিতা বর্জন এবং ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বললেন। তবে তিনিও যে আদর্শচ্যুত হয়েছেন—তা স্বীকার করলেন। জেনারেল কীপফ

ধর্মদাসের কথায় বিশ্বাস না করে নিজেই ইনজেকশন নিলেন। লর্ড গ্যাবার্থ তাকে বাধা দিতে চাইলে কীপফ জোর করে গ্র্যাবার্থকেও ইনজেকশন দেওয়ালেন এবং নটেনফকেও তাদের সঙ্গী করে নিলেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় গ্র্যাবার্থ তাঁর সত্যভাষণে 'জোর যার মুলুক তার'—এই রাজনীতির কথা জানালেন। নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা সভ্য-অসভ্য, শক্তিমান-দুর্বল সকল জাতির কাছ থেকে যথাসাধ্য আদায় করেন। আর এতে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপার নেই। কেননা এটাই সামাজিক অভিব্যক্তিবাদ। জেনারেল নটেনফও একই নীতির কথা জানালেন। ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করেই হোক জগতের আধিপত্য তাদের চাই। কীপফও একই নীতির অনুসরণকারী। তাই গ্র্যাবার্থ, নটেনফ, কীপফ সমস্বরে জানালেন—

> "আমারা বেশ আছি, শান্তি-টান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভাল মানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবন যাপন করতে চাই।"

বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের মতলব জানার পর সভাপতি বিশ্বশান্তির উপায় নির্ধারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তখন আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বশান্তির উপায় আবিষ্কারের কথা জানালেন। তঁর নবাবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হবে, তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম-ক্রোধ-লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি সম্ভব। ব্যোমবজ্রের বোমার উপর তখন সকল রাষ্ট্রপ্রভুরা নিজেদের অধিকার কায়েম করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সদস্যদেব টানাটানিতে বোমাটি ব্যোমবজ্রের হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল। বোমার শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গা-মানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর সকলের মধ্যে যখন ভ্রাতৃভাব উথলে উঠল তখন ব্যোমবজ্র জানালেন যে গামানুষ জাতির সকলে নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন তারা ইচ্ছেমত যেখানে খুশি যেতে পারেন। মৃতবৎসা পৃথিবী সুসন্তানের আশায় আবার গর্ভধারণ করবেন।

তিন

পরশুরামের 'গামানুষ জাতির কথা' গল্পটি তাঁর দ্বিতীয় পর্বের রচনা। এই পর্বে লেখক অনেক বেশি সমাজ মনস্ক। সমাজ পারিপার্শ্বিকতা, রাষ্ট্রীয় সঙ্কট, রাজনীতি ও অর্থনীতি লেখকের জীবন দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে এই পর্বের গল্পে পরিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গল্পটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই গল্পটির পূর্ববর্তী সময়টুকু তাই জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

কল্লোল পরবর্তী যুগ বলতে আমরা যে সময়টাকে বুঝি, তার পূর্বসীমা দ্বিতীয় বিশ্বসমরের সূচনা, উত্তরসীমা স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশবিভাগ (১৯৩৯-৪৭)। পরশুরামের গল্পটি এই পর্বেই লেখা। অল্পবিস্তর এই দশটি বছর বিশ্বসমাজ ও রাষ্ট্রে কালান্তরের পর্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা (১৯৩৯), জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), আগষ্ট আন্দোলন (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬), জাপানের চীন আক্রমণ, মিত্রশক্তির দ্বারা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ, জেনেভা সম্মেলন—এই পর্বের মধ্য দিয়ে এত বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বারুদের বিস্ফোরণ ও ধূমায়িত আগুন পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে দীর্ঘবাহু বিস্তার করেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অন্যতম সমরকেন্দ্র পূর্ব ভারতের গায়ে সেই আগুনের আঁচ লেগেগেছে। এই পর্বের অশান্ত বাতাবরণ পরশুরামের দৃষ্টিকে কিছুটা

ব্যাহত তীক্ষ্ণ ও আবিল করে তুলেছে। 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্পটি তারই নিদর্শন।

যুদ্ধ যেন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প। তার ফলে ভদ্রতার আবরণ, নীতির রক্ষাকবচ, পারিবারিক মান সম্ভ্রম, মায়া-মমতা আনুগত্য, যুগ-যুগান্তরের ধর্ম সংস্কার—সবই এই ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়েছে। তারই মাঝে শোনা যায় নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন আর শপথের উচ্চারণ। 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্পে পাই তারই নির্ভুল প্রতিচ্ছবি। রূপকধর্মী এই গল্পে জাপানের উপর আমেরিকার পরমাণু বোমা নিক্ষেপের প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্ম হয়ে পড়েছিল মূঢ়, বিকলাঙ্গ, দুর্বল প্রকৃতির। গল্পে এরাই 'গামানুষ'। মনুষ্যজাতির ধ্বংসের পর এদের উৎপত্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে শান্তি সম্মেলনের আহ্বান করা হয়েছিল (জেনেভা শান্তি সম্মেলন), গল্পে তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন লেখক এবং তার নিরর্থকতাও প্রতিপন্ন করেছেন। গা মানুষ জাতি যে বিশ্বশান্তি সভার আয়োজন করেছেন তার সভাপতি চং লিং চীনের রাষ্ট্রপ্রভু। চীন তখন জাপানী আক্রমণে বিব্রত। তাই তিনি বিশ্বশান্তির খোঁজে অন্য রাষ্ট্র প্রভুদের সাহায্য প্রার্থী। কাউন্ট নটেনফ জার্মানীর রাষ্ট্রনেতা। বিশ্ববাজনীতিতে জার্মানী তখন বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। তাই নটেনফের কথায় অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে—

> "দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচামাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্ব সম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে।"

স্পষ্টত জার্মানীর লক্ষ্য ইংল্যাণ্ডের দিকে। ইংল্যাণ্ডের তখন ভারতসহ একাধিক দেশে উপনিবেশ। লর্ড গ্র্যাবার্থ এই ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি। তার কথাবার্তায় মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রভুসুলভ মনোভাব। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জোর করে ক্ষমতা বজায় রেখে মুখে অহিংগিরির সাফাই গেয়েছেন। আবার নিজেদের দেশের শ্রমিক বিপ্লবের জন্য আমেরিকার উপর দায় চাপিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রভু জেনারেল কীপফ উল্টে ঘুষ দিয়ে তাঁদের দেশে বিপ্লব আনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন ইংল্যাণ্ডকে।

পরাধীন দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের দুই ধরনের জননেতার উপস্থিতি ঘটিয়েছেন লেখক পরশুরাম তাঁর এই গল্পে। কংগ্রেসের মধ্যে দুই ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ দেখা গেছিল সে সময়—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। গল্পের অবলদাসজী ও ধর্মদাসজী চরমপন্থী নেতৃত্বের দলে। অবল দাস তাই গ্র্যাবার্থের অহিংগিরির দোহাইকে ভণ্ডামি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট প্রতিবাদী বক্তব্য—

> "আমরা লায়েক কি নালায়েক তার বিচারের ভার যদি ওঁরা নিজের হাতে রাখেন তবে কোনও কালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না।"

পরাধীন ভারতের নরমপন্থী নেতৃত্বের প্রতিনিধি মহারাজ ও পণ্ডিত সত্যকামজী। মহারাজ তাই নিশ্চিত মনে বসে আছেন এবং অবলদাসকে শান্ত থাকতে বলেছেন। সত্যকামজী আবার গুরুত্ব দিয়েছেন অহিংসা বর্জন করে সত্যভাষণের উপর। রাষ্ট্রপ্রভুদের গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হলে শান্তি স্থাপিত হবে বলে তিনি মনে করেছেন। পরশুরাম নিজে ছিলেন রসায়ণ শাস্ত্রের লোক তাই ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। ভৃঙ্গরাজ নন্দীর গাজা থেকে আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশান তাই হাস্যরসের খোরাক হয়ে উঠেছে। যে ইনজেকশান

পরীক্ষা করা হয়েছে ইঁদুর এবং গিনিপিগের উপর এবং তাদের লেজনাড়া দেখে মনের অভিপ্রায় বুঝেছেন ডাঃ নন্দী। যদিও এই ইনজেকশানের প্রভাবে গ্র্যাবার্থ. নটেনফ, কীপফ প্রমুখ সত্যকথা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন—

"আমরা বেশ আছি, শান্তি টান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালোমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কড়াকড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবন যাপন করতে চাই।"

পরশুরামের এই গল্পে ব্যঙ্গ শ্লেষ ও তীর্যকতা প্রাধান্য পেয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস থেকেও তিনি বঞ্চিত করেননি পাঠকবর্গকে। আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রীর উপাধী একদিস্তা ফুলস্ক্যাপ কাগজে কুলোয় না। তাঁর আবিষ্কৃত বোমা থেকে নির্গত হয় আকস্মিক রশ্মি। সেই বোমা আবার ভুঁই পটকার মতো শব্দ করে ফাটে। বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার অ্যানাই হিলিয়ম বোমার তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়াম বোমা তুলো ভরা বালিশ মাত্র। গামা রশ্মির প্রভাবে ইঁদুর জাতি মানুষে পরিণত হয়। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি মানুষের থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি। গল্পে এসবই অবশ্য অনেকটা রূপকের আড়ালে পরিবেশিত হয়েছে। সে কারণেই গল্পকার বলেছেন—

"তাদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য কৃত্রিম নাম দিচ্ছি যা শুনতে ভাল এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।"

চার

পরশুরামের দ্বিতীয় পর্বের কিছু গল্পে মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হতে দেখা যায়। বিশেষত, 'বাল্যখিল্যগণেব উৎপত্তি' (কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প), 'গন্ধমাদন বৈঠক' (ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প), 'মাঙ্গলিক' (নীল তারা ইত্যাদি গল্প), 'গামানুষ জাতির কথা' (গল্পকল্প) ইত্যাদি গল্পের মধ্য দিয়ে পরশুরামের রাজনীতির প্রতি অনীহা ও বিরূপতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ এমন নয়, তিনি সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। বরং একজন ব্যঙ্গ শিল্পীর যা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকাব, তা যে তাঁর ছিল না, তা নয।

সমালোচক মহলে এই বলে ঝড় উঠেছে 'বাল্যখিল্যগণের উৎপত্তি'তে কমিউনিস্টদের প্রতি আক্রমণ, 'মাঙ্গলিক' গল্পে ভারত চীন মৈত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছে। আসলে এই শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী পরশুরামের প্রথম পর্বের, এমনকি দ্বিতীয় পর্বেরও কিছু গল্পে এমন তীব্র ভাবে দেখা যায়নি। পরশুবাম শ্রেণীতত্ত্বে বিশ্বাসী নন, আগ্রহী নন। একজন হাস্যরস স্রষ্টা হিসেবে সমাজ সংসাবের বা দেশের প্রবহমান ঘটনার মধ্যে কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেই তা গল্পের বিষয় করে নিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীর সামগ্রিক চেহারা বদলে দিয়েছিল। দেশে অগণিত মানুষের মৃত্যু, নগব জনপদ ধ্বংস, মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তন, রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধারদের দাযিত্বজ্ঞানহীনতা এবং যুদ্ধপ্রসূত সামগ্রিক ধ্বংসের করাল চেহারা এই শিল্পীর চিন্তাধারায় আমূল নাড়া দেয়। ফলে তিনি লেখেন 'গামানুষ জাতির কথা'।

গল্পের সূচনায় লেখক বলেছেন—'যে সময়ের কথা বলছি তাব প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে।'সমালোচকেব মতে—'এ এক অনাগত ভবিষ্যতেব কাহিনী—যেদিন 'গামা' রশ্মিক্রিয়ায় পৃথিবীর সমস্ত মানবকুল নির্মূল হয়েছে এবং ইঁদুবেবা ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ লিপ্সু বিশ্বসংহারোদ্যত এ যুগের মানব সমাজের প্রতি অসহ্য ঘৃণায় পরশুবাম তাদের ইঁদুর বলে কল্পনা কবেছেন। এমনি ঘৃণা থেকেই জোনাথন সুইফট লিলিপুট-রূপ রচনা করেছিলেন।'পবশুবাম এখানে ইঁদুর মানুষদের নাম

দিয়েছেন গা মানুষ। ব্যোমবজ্রের শান্তিস্থাপক বোমায় গামানুষজাতি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। আর তারপরেই লেখক উপসংহার টেনেছেন এইভাবে—'মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন, তারপর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বারবার গর্ভ ধারণ করবেন'।

পরশুরামের এই গল্পে একধরনের আদর্শবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ রাষ্ট্রের পাপ-অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারেননি, যে কারণে তিনি ধ্বংসের কথা বলেছেন। এটা নিছক নৈরাজ্যবাদ বলে সরলীকরণ করলে অন্যায় হবে, ভুল হবে। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই গল্পকার যা সত্য ও ন্যায় বলে ভেবেছেন তা গোপন করতে চাননি। রাজনৈতিক দলাদলি ও তঞ্চকতা তাঁর কাছে ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। সমাজক্ষেত্রে তো বটেই, সাহিত্যক্ষেত্রেও এ ধরনের জোটবদ্ধতা ও বিরোধ নোংরামি তাঁকে পীড়িত করেছিল। 'সাহিত্যিকের ব্রত' তাঁর কাছে অন্য অর্থ বহন করেছে। তিনি বলেছেন—

> "ব্যক্তিগত রাজনীতিক মত যাই থাকুক, আমাদের সকল লেখকই তাঁদের রচনা দ্বারা দেশব্যাপী মোহ, আলস্য আর দুষ্প্রবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারেন। এর চেয়ে বড় ব্রত আর কিছু নেই। জনকতক রাজনীতি নিয়ে বিতণ্ডা করুন, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়।" (বিচিন্তা)

ব্যঙ্গ কৌতুক শিল্পীর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য শুধু যে 'সার্মন' দেওয়া নয়, তা পরশুরাম জানতেন। কিন্তু রসস্রষ্টা কেবল কাল্পনিকতার আশ্রয় নেবেন, তা হয় না। মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম প্রসঙ্গে তার সচেতনতা কত জরুরি তিনি বুঝেছিলেন। তিনি সরাসরি বলেছেন—

> "সাহিত্যের অনেক উপাদান নীতি বিরোধী, অনেক উপাদান পরস্পর বিরোধী, কিন্তু কৃতী রচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। নিপুণ পাচক কটুতিক্ত মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত করে। নিপুণ সাহিত্যিকের পদ্ধতিও অনুরূপ।"
> [সাহিত্যের পরিধি : চলচ্চিন্তা]

পরশুরামের দুটি পর্বের গল্পে এই অম্লমধুর যৌথরূপের সন্ধান পেতে কষ্ট হয় না। তিনি রসস্রষ্টা। তাঁর প্রথম পর্বের অধিকাংশ গল্পকে তাঁর ভাষায় নিষ্কণ্টক বলা যায়। আর তাঁর দ্বিতীয় পর্বের গল্পও গ্রহণীয়, আস্বাদনযোগ্য কেন? তাঁর গল্প ভাবনা সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে — 'যে পাঠকরা অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ এবং মানবচিত্তের রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী, অর্থাৎ যাঁরা সমস্যাময় বাস্তব উপভোগ করেন।' (গল্পের বাজার : চলচ্চিন্তা)। 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্পটিও এ কারণেই উপভোগ্য। সমাজ পারিপার্শ্বিকতা-রাষ্ট্রিয় সংকট-রাজনীতি-অর্থনীতি লেখকের জীবন দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে গল্পবস্তু হয়ে উঠেছে। 'গা মানুষ জাতির কথা' পরশুরামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক একটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প।

তথ্যনির্দেশ

১ পরশুরাম গ্রন্থাবলী—১, ২, ৩
২ পরশুরামের হাসির গল্প পটভূমি প্রেক্ষিত ও মূল্যায়ণ কোরক
৩ বিচিন্তা পরশুরাম
৪ চলচ্চিন্তা · পরশুরাম
৫ কালের পুত্তলিকা অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

জগদীশ গুপ্ত

(১৮৮৬-১৯৫৭)

কালি-কলমের অন্যতম লেখক জগদীশ গুপ্ত। ফরিদপুর জেলায় খোর্দমেঘচামী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কল্লোলের তরুণ লেখকদের মতো তিনি কিন্তু বয়সে তরুণ ছিলেন না। জগদীশ গুপ্তর প্রথম গল্প সংকলন 'বিনোদিনী' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ তাকে সম্বর্ধিত করে চিঠি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে রাবীন্দ্রিক নন, এমনকি বাংলা কথাকারদের কারো সঙ্গেই যে তাঁর বিন্দুমাত্র সংগতি নেই, তা তিনি তার রচনার মাধ্যমে বারবার প্রমাণ করেছেন। জীবনের শুভ ও সুন্দর দিকগুলি নয়, তাঁর আকর্ষণ মূলত জীবনের ক্রূর-কুটিল ও অসুন্দর দিকগুলির প্রতি, নির্মমভাবে যেন তিনি ও তাঁর সাহিত্য সে কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর অন্যান্য গল্প গ্রন্থগুলি হল—'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬), 'শ্রীমতী' (১৩৩৭), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৫৭) প্রভৃতি।

শুধু গল্পই নয়, তিনি অনেকগুলি উপন্যাসও লিখেছিলেন। যেমন—'রতি ও বিরতি', 'দয়ানন্দ মল্লিকা ও মল্লিকা', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'চৌধুরাণী', 'কলঙ্কিত তীর্থ', 'রোমন্থন', 'দুলালের দোলা', 'সুতিনী', 'মহিষী', 'লঘুগুরু', 'অসাধু সিদ্ধার্থ' প্রভৃতি। তবে তাঁর 'সুতিনী' উপন্যাসটিকে অন্যতম বিশিষ্ট উপন্যাস বলে মনে করা হয়। 'লঘুগুরু' ও 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাস দুটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা।

শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী : একটি তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন
তপতী রাউত

"শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী" গ্রন্থে (১৩৪২) ছয়টি গল্পের অন্যতম "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী"—গল্পটি। গল্পলেখক পারিবারিক পরিবেশে এক কবিরাজের ব্যক্তিজীবনের গল্প লিখেছেন। মজলিশি আলাপচরিতায় গল্প পৌঁছে গেছে পরিণতিতে। এখানে বলা আবশ্যক জগদীশগুপ্ত প্রভাতকুমারের মতো পৃথিবীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি। আবার নরেশচন্দ্রের মতো সচেতনভাবে জৈববৃত্তিকে আমদানি করেননি। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্বের প্রভাব তাঁর গল্পগুলিতে এসে গেছে। আলোচ্য গল্পেও এ প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

আলোচ্য গল্পের কর্ণধার শশাঙ্ক কবিরাজ, প্রথম পক্ষের স্ত্রী ভোলাদাসী দেবী মারা যাবার পর, পিতা ও বন্ধুবান্ধবের প্রেরণায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ইন্দিরাকে। "অনেক বাজে আপত্তি আর পরিহার্য ঝঞ্ঝাটের পর শশাঙ্কশেখর গুপ্ত পুনরায় বিবাহ করিলেন।"—আপাত দৃষ্টিতে পিতা ও বন্ধুবর্গের প্রেরণা প্রাধান্য পেলেও প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্পকার দেখিয়েছেন বিবাহের পক্ষে শশাঙ্ক কবিরাজের আভ্যন্তরীণ প্রেরণাও কম ছিল না। সদ্য কন্যাহারা পিতামাতার প্রতি তার সহানুভূতি থাকলেও এবং মৃত স্ত্রীর গয়না সকল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার দোহাই দিয়ে শশাঙ্ক কবিরাজ বিবাহ করতে না চাইলেও—দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে সে। বিবাহের মূলে আছে শরীর রক্ষার তাগিদ ও জৈবিক বৃত্তির পরিতৃপ্তি। সে তাই বলেছে, "বিয়ে করতে আমার ষোলো আনা ইচ্ছে রয়েছে; না করলে চলবেই না—খাবো কী? আমার এই বয়সে কারো-কারো একবার বিয়েই হয় না। মোটে ছাব্বিশ চলছে! কিন্তু গ্রহের কোপে আমাকে একবারের স্থানে দু'বার করতে হ'লো।"

চার বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে গল্প এগিয়ে এল কাহিনীর মধ্যাংশে। ছোটগল্পকার নাটকীয় সংক্ষিপ্ত সংলাপ জুড়ে দিলেন গল্পের আঙ্গিকে—

কার্তিক বলিল, "আজ কী বার?

—শুক্রবার।

—কাল?

—শনিবার।

—পরশু?

—রবিবার।

—তা হ'লে রবিবারে?

—হুঁ।

সংক্ষিপ্ত সংলাপ ব্যবহারে কাহিনী লাভ করল ছোটগল্পের দ্রুতময়গতি।

কাহিনীর মধ্যাংশে ছোটগল্পকার ফ্রয়েডীর ভাবনার খোলস মুক্ত হয়ে কাহিনীর গায়ে জড়িয়ে দিলেন রোমান্টিকতার নির্মোক। শশাঙ্ক কবিরাজের তিন বন্ধুর অন্যতম সতীশ বন্ধুস্ত্রীকে নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচিত্র রঙে ইন্দ্রধনু রচনা করল। ইন্দিরা সতীশের কাছে আর

বন্ধু-স্ত্রী নয়,—পৃথক, ভিন্ন নারী। সে নারী ভোগ্যপণ্য নয়—তার প্রকাশ অন্যরূপ। যে দিন শশাঙ্কের কাছ থেকে নেমন্তন্ন আদায় করে শশাঙ্কের বাড়িতে তার বন্ধু তিনজন—কার্তিক, নবকুমার ও সতীশ নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছে—সেদিন আহারের পর হস্তপ্রক্ষালনের সময় সতীশ হঠাৎ দেখেছে ইন্দিরার অনাবৃত মুখ।

"মুখ অনাবৃত।

কেহ মুখ ফিরাইয়া চাহিবে ইহা ইন্দিরা ভাবিতে পারে নাই, চোখাচোখি হইতেই সে চক্ষু নত করিলো...।"

চোখ নামাবার ভঙ্গিটি লেখকের লেখনীতে মনোহর হয়ে ধরা পড়েছে—"তাহাতে নিষেধের অধিকার নামিয়া আসিলো না...সেই প্রস্ফুটিত শতদল একটি নিমেষের জন্য দলগুলি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিলো মাত্র"—

এই নারী সতীশের কাছে যেন গ্যেটের কথিত "শাশ্বত নারী।" যে রবীন্দ্রনাথের "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দর রূপসী/হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।" সতীশের মনে হ'ল "এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শয্যা রচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বসে না, এ কেবল মানুষকে রসিক করিয়া তোলে...এ নিকটে নাই, কিন্তু ঘিরিয়া আছে... তার আরও মনে হ'ল, "...বিরহী যক্ষের প্রিয়া এ, কবির মানসলক্ষ্মী এ, পুরুষের বেদনা ইহারই উদ্দেশ্যে চিরদিন নিবেদিত হইতেছে—মিলনে বিরহে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জগৎপ্রাণ নিয়ত নৃত্য করিতেছে..."

এইভাবে সতীশের কাব্যামোদ হু হু শব্দে চলতে লাগল। গল্প এখানে শেষ হলে রসাস্বাদে হয়ত বিঘ্ন ঘটত না। কিন্তু লেখকের লেখনী বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হ'ত। জগদীশ গুপ্ত রোমান্টিক রস রচনার পরিবেশ বৈপরিত্য তৈরী করে ক্রমে পৌঁছে গেলেন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষায়।

আমাদের কালিদাস উমাকে জননী রূপে না এঁকে তৃপ্তি পেলেন না। কারণ আমরা "ফুলবতী লতার চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি" বেশী আকৃষ্ট হই—তার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত। আমরা কুমারের জননীকে বেশী ভালবাসি। জগদীশ গুপ্ত তাঁর স্বাভাবিক মানসিক বৈশিষ্ট্যে এই সত্যে অবিশ্বাসী হতে পারেননি। তাই শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ইন্দিরা তিনমাস যেতেই হয়ে ওঠে অন্তঃসত্তা। "শশাঙ্ক কলকল করিয়া বলিয়া উঠিলো আরে, ভাই, তাই বুঝি ঘটে......বমি করছে হৌ হৌ করে......." এ সংবাদে বন্ধুদ্বয় কার্তিক ও নবকুমার আনন্দিত হয়ে কোলাহল করতে লাগল। কেবল সতীশের আবহমান কালের মানসীর সঙ্গে যে নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গতা জমেছিল তা খাঁড়ার ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। "অন্ধকার একটি মার্গ দিয়া সে যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো অন্তরীক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার দিকে পড়িতে লাগিলো—ছোটগল্প যে বাস্তব জীবনের কথা বলে—সেটি যে রোমান্স রচনার জগত নয়। "মৃত্তিকার দিকে পড়িতে লাগিলো"—এই বাক্যাংশ ব্যবহারে সেই নির্মম সত্যকেই স্পষ্ট করে দিলেন। একটি সুস্নাত সমাপ্তি ঘটল "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী" গল্পে।

গল্পটি পাঠে লক্ষ্য করা যায় চরিত্রগুলি ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেও আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। তারা অসাধারণ নয়, কিন্তু স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ না হলেও পঙ্গু নয়। শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী ইন্দিরা এ গল্পে রান্না ছাড়া কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। তথাপি

কাহিনী অনেকটাই বিবর্তিত হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। শশাঙ্কের কথায় আমরা ইন্দিরাকে যেন চিনতে পারি। নবকুমারের প্রশ্নের উত্তরে শশাঙ্ক বলেছে, 'ইনিও উদার; ......ইনি বলেন, একদিন যাঁদের মা বলেছো বাবা বলেছো, যাঁদের কন্যাকে ভালোবেসেছ, তাঁদের সঙ্গে সামান্য কয়েকভরি সোনার দাবি নিয়ে ঝগড়া ক'রো না অশিক্ষিত লোকের মতো।.....আমার অদৃষ্টে যদি সোনা পরা থাকে তবে অমনিই পরবো। আপনিই হবে। অদৃষ্টে যদি না থাকে তবে ও সোনা পেলেও আমার গায়ে থাকবে না...'' আবার সতীশের রোমান্টিক কল্পচারিতা ইন্দিরাকে ঘিরেই রূপ লাভ করেছে। চারবন্ধুর আলাপের অংশেও ইন্দিরার রন্ধন প্রক্রিয়ার সুখ্যাতি। কার্তিক, নবকুমার, সতীশ ও শশাঙ্ক কবিরাজ প্রত্যেকেই সহজ ও স্বাভাবিক। বন্ধুবর্গের কৌতুকালাপ ফল্গুধারায় রুক্ষ ব্যক্তিত্বকেও সরস করে তুলেছে। জগদীশ গুপ্ত নির্মম রুক্ষ হলেও হাস্যরসের নির্মল ধারাকে অস্বীকার করতে পারেননি। যেমন :

সতীশ বলিলো ''মাত্রা ডবল করো''

কার্তিক হাসিলে না—

এবং বলা বাহুল্য যে, হাস্যপূর্বক মাত্রা ডবল করা ছাড়া কবিরাজের উপায় ছিল না।

গুলি উদরস্থ করিয়া নবকুমার বলিলেন, বৌদি নাকি মাংস রাঁধতে শিখেছেন ভালো?... শশাঙ্ককে প্রশ্ন করিয়া সে কার্তিকে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলো।

শশাঙ্ক উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিলেন; বলিলো, ''আমি তো বৃথা মাংস খাইনে.....বাপের বাড়িতেও মাংসের সেরূপ চল্ নেই।''

'তা না থাক; এখানে এসে যদি শিখে যান তবে ভাইয়েরা যশ করবে.......বিদ্যেটা তো কম নয়।''

'সময় বড়ো কম। তা ছাড়া—'

''কেবল মুখো সিদ্ধ করাচ্ছো বঝি?''......বলিয়া নবকুমার একটা দুঃস্থ নিঃশ্বাস চাপিয়া গেলো।'

'কেবল মুখো সিদ্ধ করাচ্ছো বুঝি?''—এই প্রশ্নে তরল হাস্যপরিহাস অবাধে প্রকাশ পেল।

গল্পটি পাঠে লক্ষ্য করা যায় একটি কাহিনীস্রোত আদি মধ্য অন্তকে একসূত্রে গ্রথিত করে পরিণাম-মুখী হয়েছে। পাঠকের ঔৎসুক্য ব্যাহত হয়নি কোথাও, লেখকের প্রতীতি ও কাহিনীর সংহতি রক্ষিত হওয়ায় গল্পটি রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

শঙ্কিতা অভয়া : বিক্ষিপ্ত মনোদর্পণে সংবিগ্ন ছায়া

সিক্তা মুৎসুদ্দি

আলো আঁধারী জীবনের যে পথে জগদীশ গুপ্তের চিন্তা-ভাবনা অবিরত ক্রিয়াশীল, সেই পথেই তাঁর অনুভবী ব্যক্তিসত্তা সন্ধান করে চলে জীবনের এক অন্য মানে। কারণ ঘটমান বাস্তব ও পুরাঘটিত অতীত তাঁর মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তারই ভিত্তিতে তিনি জীবনানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। একথা ঠিক, জগদীশ গুপ্ত আলোক-সন্ধানী নন; বরং মনের চোরাকুঠিতে যে গাঢ় অন্ধকার গুপ্ত-ঘাতকের মতো ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে; সন্ধানী আলো ফেলে সেই আদিম-হিংস্র জগতের তমিস্রতা সযত্নে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। জীবনকে নিরাসক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলেই রূঢ় ও ক্লিন্ন বাস্তব অনায়াসেই তাঁর রচনায় পুনরাবৃত্ত হয়ে উঠেছে।

এক

'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শঙ্কিতা অভয়া' এমনই একটি গল্প যার পরতে পরতে মিশে আছে গল্পকারের তীব্র জীবনবোধ ও তীক্ষ্ণ জীবনদর্শনের এক অন্য প্রেক্ষিত। আগাগোড়া চাপা উত্তেজনায় গল্পটি টান-টান। এক বিপন্ন নারীর চিন্তা-সারণীর বক্রগামিতা ও অন্তর্গূঢ় জটিলতাকে কেন্দ্র করে যে উৎকণ্ঠাময় আবহ নির্মিত হয়েছে, তা নিরসনের প্রয়াস নেই গল্পের আদিতে বা মধ্যে। বরং কৌতূহলী পাঠকের উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য পাঠককে টেনশন্ ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন গল্পকার।

গল্পের শুরুতে কোনো নাটকীয় চমক নেই—বর্ণনা-কৌশলও অনুপস্থিত—বিবরণধর্মিতায় গল্পের সূচনা। প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে কমা ও ড্যাশ দিয়ে বাক্যকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। পূর্ণযতি পড়েনি কোনো বাক্যে—ফুট্‌কি চিহ্ন দিয়ে কোথাও কোথাও বাক্য শেষ হয়েছে। ফলে প্রতিটি বাক্যেই গল্পকারের তরফে আরো কিছু বলার আকাঙ্ক্ষা রয়েই যায়। আসলে মনঃসমীক্ষণমূলক এই গল্পে চরিত্রের মানসিক অস্থৈর্য ও অধীরতার নেপথ্যে যে কারণ নিহিত, তাকে ব্যঞ্জিত করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে থাকতে পারেন গল্পকার।

দুই

গল্পের নামকরণ 'শঙ্কিতা অভয়া' বিরোধাভাসের পরিচায়ক। নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রথম অনুচ্ছেদেই মানসিক উৎকণ্ঠাগ্রস্ত এক মায়ের অসহায়তা মূর্ত হয়ে ওঠে। 'অভয়া' নামের মধ্যে নির্ভীকতার পরিচয় থাকলেও তাঁর সাহসিকতাকে ব্যঙ্গ করতে 'শঙ্কিতা' বিশ্লেষণটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সমগ্র গল্পটি অভয়ার মনোগহনের অন্ধকার জগতেরই প্রতিচ্ছবি, যেখানে এক বিন্দুও আলো নেই, আছে শুধু সংশয় আর উৎকণ্ঠায় জর্জরিত এক নারীর আত্ম-অধীরতা। যাঁকে ঘিরে সংশয় তাঁরই আকর্ষণে ও ভরসায় দুঃসাহসী স্পর্ধা দেখিয়ে একদিন কুলত্যাগিনী হয়েছিলেন অভয়া—সংশয়িত মানুষটির নাম 'অতুল'। আর যার দেহ সৌষ্ঠবের অপরিমেয় লাবণ্যে বিম্বিত হয় অভয়ার নিজস্ব প্রতিরূপ, এবং যাকে কেন্দ্র করে অভয়ার অসম্পৃক্ত

মনে দানা বাঁধতে থাকে অশুভ ভাবনা ও শঙ্কা—সে তাঁর আত্মজা 'শান্তি'।

আসলে এই সন্দিগ্ধ ও সংবিগ্ন অনুভূতির মূলে ছিল শান্তির সঙ্গে অতুলের (যাকে শান্তি 'বাবা' বলে জানে) অন্তরঙ্গ মেলামেশা ও আলাপচারিতা, যা অভয়ার চোখে বরাবরই 'অস্বাভাবিক' ও 'বিসদৃশ' মনে হয়েছে। এই অস্বভাবী মনের তাড়নায় অভয়া আত্মহননের সংকল্প করলেও শেষ পর্যন্ত পারেননি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে।

ফ্রয়েডের ব্যাখ্যানুযায়ী, আত্মরক্ষার চেষ্টায় মানুষের মধ্যে যেমন প্রাণশক্তির (Eros) প্রাচুর্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি সমাজ-বিচ্ছিন্ন হওয়ার তাগিদে তার মধ্যে আত্মধ্বংস-বৃত্তির (Death-instinct) বাসনাও প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে অভয়ার বাসনা দ্বিতীয় পর্যায়ের হলেও ঐ দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে সাময়িকভাবে তাঁর প্রাণশক্তিই জয়ী হয়েছে।

জীবনকে দেখার মধ্যে, অনুভবের মধ্যে যে বিরাট ফাঁক ছিল অভয়ার, সেই ফাঁকেই একটু-একটু করে বাসা বেঁধেছে সন্দেহ আর বিদ্বেষের ভাইরাস। তাই সতত শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত অভয়া নৈশ-প্রহরীর মতো সদা-সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন অতুল-শান্তির প্রতি। এই দুজনের সম্পর্ক ঘিরে তাঁর মনে যে অসন্তোষ ও বিদ্বেষের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল, তারই চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটল তাঁর সশঙ্কিত জিজ্ঞাসায়—"বল্ সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?"—এই একটি প্রশ্নে গল্পের নামকরণের ব্যঞ্জনাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চরিত্র-ত্রয়ের সম্পর্কের বহুমাত্রিক জটিলতা ভেদ করে বেরিয়ে আসে যে অমোঘ বাস্তব, তারই সারাৎসার হয়ে ওঠে তাদের প্রাত্যহিক যাপন-ভঙ্গিমা, আর এখানেই গল্পের নামকরণ এক অন্য মাত্রা পেয়ে যায় গল্পের সামগ্রিক অবয়বে।

তিন

অতুল-অভয়া-শান্তি এই তিন নর-নারীর নিঃসম্পর্কিত জীবনের আল্‌গা ভিত যে পারস্পরিক সম্পর্কের বনিয়াদকে শিথিল ও ভঙ্গুর করে তুলছিল, কাহিনির স্তর-পরম্পরায় এই সত্যই অনাবৃত্ত হয়ে উঠেছে। সম্পর্কের মিথ্যে যবনিকা ভেদ করে আসল 'সত্য' যখন উদ্‌ঘাটিত হল, তখনই গল্প যেন ছুঁয়ে গেল 'ক্লাইমেক্স' বিন্দুতে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'অভয়া'র মানসিক শঙ্কার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একরাশ ভয় আর চাপা উত্তেজনার অবিরাম দংশনে জর্জরিত তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মনের চেহারা যতটাই স্পষ্ট, ভয়ের উৎস বা কারণ ঠিক ততটাই অস্পষ্ট। এমনকি অভয়ার অতীতও অনতিস্পষ্ট। অতীত-বর্তমানের সংঘর্ষে তাঁর অস্বভাবী আচরণের প্রেক্ষিতটি যদি বাস্তবায়িত হত, তবে তাঁর আশঙ্কা ও উদ্বেগ অনেক বেশি জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠত—অমূলক বলে মনে হত না।

এই গল্প অবলম্বনে যে উপন্যাস-নাটক ('নিষেধের পটভূমিকায়') রচিত, তার আদ্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। কিন্তু আলোচ্য গল্পটি উপন্যাসের মধ্যভাগ অবলম্বনে গড়ে ওঠায় কার্যকারণ শৃঙ্খলের দিক থেকে কিছুটা ফাঁক রয়েই গেছে। যদিও উপন্যাস বা নাটকের অভয়া অতুলের সম্পর্কের আকস্মিক ছন্দ-পতনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অতুল-অভয়ার পারস্পরিক দূরত্বের জন্য কে কতটা দায়ী তাও দুর্বোধ্য। ফলে কারণ হাতড়াতে মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়।

মনোবিজ্ঞানী-অ্যাডলারের মতে ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সামাজিকতাবোধের অভাবে ব্যক্তিবিশেষ মানসিক রোগগ্রস্ত বা অপরাধগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই সামাজিকতাবোধের উজ্জীবনেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

আলোচ্য গল্পে চরিত্রত্রয়ের সমাজ-জীবনগত বিচ্যুতি ঘটলেও অভয়ার ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি মানসিক নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে। ফলে তাঁর চারপাশের জগতের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে তাঁর অজান্তেই, সেই প্রাচীরের ওপাশের জগৎকে বড়ো ভয়ংকর, বড়ো কুৎসিত মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মনঃসমীক্ষক মাসলো (Maslow) বলছেন—"One insecure indıvıdual way solve his problems generally by with drawing, another by over aggressıveneṡs......" অভয়ার 'insecureıty' বা নিরাপত্তাহীনতাই তাকে over aggressıve বা উদ্ধত করে তুলেছে। মাসলো সমীক্ষা করে দেখেছেন; "........insecurity is associated with feelings of rejectıon or not being liked.......thc insecure person's attitude toward life in gcneral is one of alarm;... ....Such feelings.......being suspiciousness, inpulses of hostility and feelings of jealousy and hatred in their train."

এই উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, নিজেকে অবহেলিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করার যন্ত্রণায় অভয়া নিরাপত্তাহীনতায় কষ্ট পান। এবং আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সর্বদাই সতর্ক হয়ে চলেন। এই অদ্ভুত অনুভূতিই তাঁর মনে বিরোধ ও ঘৃণার বীজ বপন করে।

একটু গভীরে অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে, অভয়ার প্রতি অতুলের নির্বিকার মনোভাব, নিঃস্পৃহ আচরণ ও নীরব উপেক্ষা; পাশাপাশি শান্তির প্রতি সস্নেহ প্রশ্রয়, সহানুভূতিশীলতা ও গভীর মনোযোগ অভয়ার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে তাঁর অস্তিত্বের ভিতটুকু নড়িয়ে দিয়েছে। নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে তাঁর বিপন্ন মন সন্ত্রস্ত হয়েছে কোনো বিপদের আশঙ্কায়।

চার

প্রত্যেক মানুষই নিজের আয়নায় নিজেকে সুন্দর দেখে; অভয়াও তার ,ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁর মনোবীক্ষণে অতুল ও শান্তি এত স্থূলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যে, তাদের স্বাভাবিক আচরণই স্থানে স্থানে অসংগত বলে মনে হয়। অবশ্য এর দায় গল্পকারও এড়াতে পারেন না।

শান্তির স্বভাব চাপল্য ও খোলামেলা মনোভাব এবং যে কোন বিষয় নিয়ে বাবা অতুলের সঙ্গে আলোচনা ও মত বিনিময় অভয়ার দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, ফলে তার সারল্য, তার গুণপনা অভয়ার নজর এড়িয়ে গেছে। অতুলের সম্পর্কে তাঁর এতটাই বীতশ্রদ্ধা, যে শান্তির সামনে তাঁকে কদর্য-ভাষায় আক্রমণ করতেও তাঁর এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্লেটোনিক হতে পারে কিনা এই আলোচনায় শান্তি অতুলের কাছে 'যৌন আকর্ষণের দুর্বারতা' বিষয়ে জানতে চেয়ে যখন সঠিক উত্তর পেল না এবং অতুলের সঙ্গে একমত হতে পারল না তখন অতুল বলেন—"নারীর উপর পুরুষের অশেষ অক্ষয় আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই; পুরুষ জাগায় তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে আর নিজেকে দান করে নিঃশেষে। এটা হবেই......." অতুলের এই জবাবে

সন্দেহপ্রবণ অভয়ার মন আরো কঠিন হল—শানিত ভাষায় প্রতিবাদ করলেন—“..... তোমরা সম্পর্ক ভুলেছো এমন একটি মোহের বশে যাকে ঘৃণা করতেও যেটুকু গায়ে মাখতে হয় তাও যেন পারি নে।”

অতুল ও অভয়া চরিত্রদ্বয়ের জবানিতে যে বক্তব্য আভাসিত হয়েছে তার মধ্যে পাঠক বিপদের আঁচ পেতেই পারেন। কিন্তু কাহিনির চূড়ান্ত মুহূর্তে সেই আঁচটুকু বিলীন হয়ে যায়, পড়ে থাকে কল্পিত সম্পর্কের ভগ্ন খোলস।

আসলে 'অভয়া' চরিত্র হিসাবে যতটা বিকশিত হয়ে উঠেছেন, অতুল বা শান্তির ক্ষেত্রে একই কথা বলা চলে না। আজকের প্রযুক্তি-নির্ভর সময়ে অতুল শান্তির সম্পর্ক কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। নারী-পুরুষের সম্পর্কে নিঃসংকোচে যে কথা অতুল শান্তিকে বলতে পেরেছেন সেটা কতটা সংগত তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে, কিন্তু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে তা মোটেই অশোভন বা অশালীন নয়।

তবে অতুলের আচরণে কোনো কোনো জায়গায় খট্‌কা যে লাগে না তা নয়। গল্পকার যেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই অতুলের চারিত্রিক অসংগতি নির্দেশ করে দিয়েছেন। যেমন, শান্তিকে কেতাবি শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি শান্তিকে এসরাজ বাজানোয় উৎসাহিত করা এবং তার কাছ থেকে বাজানো শিখে নিয়ে তার ও তার গুরুর প্রশংসাধন্য অতুল মনে মনে পুলকিত হন এবং এই পুলকের পিছনে যে মনস্তত্ত্ব তা গল্পকার সুকৌশলে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অতুল শান্তিকে বলেন “ তোর কাছে শিখতেই আমার কতো আনন্দ..........বলিয়া সে যেন চুরি করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল, তোর গুরুর কাছে শিখলে ওটা হ'তো না।” মেয়ের কাছে বাবার শিখতে আনন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই স্বাভাবিকতাকে বিকৃত করছে অতুলের 'চুরি করে হাসা'। সম্পর্কের স্বাভাবিক মাপকাঠিতে এই আচরণ-ইঙ্গিত বহু বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'নিষেধের পটভূমিকায়' নাটকে অতুলের উক্তি (অভয়ার প্রতি)—“তোমার মেয়ে অসাধারণ সুন্দরী; তাকে আমি নষ্ট করতে চেয়েছি, এ ধারণা করে তুমি ভুল করেছ। তাকে হাসিয়ে নাচিয়ে খেলা দিয়ে চোখের সামনে তাকে উজ্জ্বল করে রেখে আমি তার রূপই দেখতাম; তোমার কথাগুলো কানে তুলিনি—এত আনন্দ পেতাম।”

আসলে শান্তির প্রতি অদম্য আগ্রহের মূলে ছিল অতুলের মনোগহনের রূপজ বাসনা—এই অবদমিত বাসনাই চরিতার্থতার পথ খুঁজেছে একটু ভিন্ন উপায়ে—সমাজের নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে। যা সমাজ-আচরণ বহির্ভূত, সাধারণের চোখে তা-ই অসামাজিক, অতএব তার 'বৈধতা' নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই—ঠিক যেমন প্রশ্ন উঠেছে অভয়ার মনে। গল্পকার অতুল শান্তির সম্পর্কের মধ্যে 'অস্বাভাবিকতার' বাঁকা রেখা টানলেও শেষ পর্যন্ত এই অস্বাভাবিকতাকেই 'স্বাভাবিক' বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন এই বোধে, যে সমাজ-সম্পর্ক-বিহীন মানুষের মনে নিজের অজান্তেই একটু একটু করে বেড়ে উঠতে থাকে অপরাধের বিষাক্ত ভ্রূণ। সমাজ-বিচ্ছিন্ন এই চরিত্রত্রয় তাই প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অস্বভাবী।

মা অভয়ার প্রতি শান্তির আগ্রহহীনতার পিছনে ছিল অভয়ার অসামঞ্জস্যপূর্ণ-কুরুচিকর আচরণ, হতাশাগ্রস্ত-কলহপ্রবণ মনোভাব, সর্বোপরি জ্ঞান-জগৎ ও ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে

অনাসক্তি—অন্যদিকে, অতুলের বৈদগ্ধ্য ও বিচারশক্তি তাঁর প্রতি মনোযোগী করে তুলেছে শান্তিকে। আসলে সমাজ-বিচ্ছিন্ন এই তিন নরনারী নিজেদের অভ্যস্ত জীবন-বৃত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে বিস্মৃত হয়েছে নিজেদের 'সত্য' পরিচয়। তাই নিজেদের বানিয়ে তোলা চেনা ছকে তারা হাতড়াতে থাকে টিকে থাকার গোপন চাবিকাঠি। সম্পর্কের এই বিচিত্র নক্‌শাই গল্পকারের কৌণিক পর্যবেক্ষণের সমগ্রতায় গল্পের বিষয়বস্তুতে যোগ করেছে এক অন্য তাৎপর্য।

তবে বিষয়বস্তু এমন কিছু অভিনব নয় যার আকর্ষণে আপ্লুত হওয়া যেতে পারে। বরং এক ধরনের অস্বভাবী অনুভূতির টানে ছুটে যেতে হয় গল্পের শীর্ষবিন্দুতে, যেখানে দাঁড়িয়ে অ-বাক্ পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে খুঁজতে থাকে গল্পের আদিম রহস্য। গল্পের পটভূমিকাও খুব স্পষ্ট নয়।

যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনে সংশয়ের ও শঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়, তার যথার্থ রহস্য উদ্‌ঘাটনে কিঞ্চিৎ-বিস্ময় থাকলেও রোমাঞ্চ নেই। অতুল-শান্তির সম্পর্কের বৈধতা নিয়ে অভয়ার মনে যে প্রশ্নকাতরতা, তার নিরসন ঘটে না বলেই তাঁর চিন্তা-চেতনায় ঘটে চলে 'অন্তর্বিপ্লব' যা গল্পের মূল 'থিম'কে সংবৃত করো দেয় রহস্যময় উৎকণ্ঠায়। চরিত্রত্রয়ের অনচ্ছ সম্পর্কের গ্রন্থিলতা ভেদ করে বেরিয়ে আসে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার এক নড়বড়ে কাঠামো, যার অভ্যন্তরে মানুষের 'আইডেন্টিটির' বিপন্নতাই অসংবৃত হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের চেনা ফ্রেমের বাইরে যে অন্য ফ্রেমের নক্‌শা বুনে চলেছে জীবন, আপাত-ভাবে যার হিসাব মেলানোর দায় নেই, সেই জীবনই জগদীশ গুপ্তর অভিপ্রেত জীবনবোধের নিশানা হয়ে উঠেছে সমগ্র গল্পে।

অরূপের রাস : জীবনতৃষ্ণার ইতিকথা

বিদিশা সিন্‌হা

লেখক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) 'কল্লোল' (১৯২৩)-এর কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য, তা অনেকটাই জগদীশ গুপ্তের রচনায় অভিব্যক্ত। যে কালচেতনা ও সমাজচেতনার ফসল কল্লোল, তার উৎস পূর্ববর্তী কালখণ্ডকে নতুন জীবনচরিত্র থেকে হারিয়ে ফেলার আন্তরিক প্রতিক্রিয়ার গভীরে। নবজাগরণের উত্তেজনায় ঘেরা ঔপনিবেশিকতার ফসল শহুরে শিক্ষিত বাঙালির জীবনের আমূল বনিয়াদ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল 'স্বদেশী' সমাপনের সময় (১৯১২) থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান সীমার (১৯১৮) পাড় ঘিরে। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থেকে নির্জিত আত্ম-অবদমন, ভরসা থেকে হতাশা, প্রত্যয় থেকে সংশয়ের বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়া চেতনা আমূল এক বিনষ্টির বোধে মথিত হয়ে চলেছিল। জগদীশ গুপ্তের ভাবনা এবং রচনায় সেই প্রতিক্রিয়া, মানবিক আকাঙ্ক্ষার তীব্রতর গভীর থেকে নিঃসৃত অমোঘ সার্বিক বিনাশের প্রতীতি প্রকট এবং সংহততম রূপ ধরেছিল। এই বিশেষ সময়কালেরই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব জগদীশ গুপ্ত। স্বতন্ত্র স্বাদের লেখক—শুধু স্বতন্ত্র বললে ঠিক বলা হয় না, বলতে হবে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে তিনি কিছুটা বেমানান। যে সময়ের লেখক তিনি, তখন ফ্রয়েড বাংলা সাহিত্যে বহু চর্চিত বিষয়। জগদীশ গুপ্তের রচনায় ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্বের প্রভাব থাকলেও সেটা সচেতনভাবে আমদানি করা নয় বলেই মনে হয়। আসলে তিনি ভীষণ নৈরাশ্যবাদী, রুক্ষ কঠোর এবং তিক্ততা সম্পৃক্ত জীবনের কথাকার। জগদীশ গুপ্তের গল্পে জীবনের প্রতি অমেয় বিশ্বাস চোখে পড়ে না। লেখার সময় হিসেব করলে জগদীশ গুপ্ত প্রভাতকুমারের প্রায় সমসাময়িক কালের। তাঁর আত্মপ্রকাশ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও পরবর্তীকালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র-র প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'-র ১৩৩০, চৈত্র সংখ্যায়, প্রেমেন্দ্রর 'সংক্রান্তি' এবং অচিন্ত্যকুমারের 'গুমোট'-'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় তাঁদের প্রথম প্রকাশিত দুটি গল্প; মুদ্রিত হয়েছিল শ্রাবণ ১৩৩১-এ।

পরিণত বয়সে জগদীশ গুপ্ত যখন গল্প-উপন্যাস লিখতে এলেন, তখন স্পষ্টই দেখা গেল তিনি "Philosophy of Sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না" (ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-চতুর্থ খণ্ড)। সমকালীন আলোচক তাঁকে 'দুঃখবাদী' বলে অভিহিত করেছিলেন (অনিলবরণ রায়—'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদী'-'বিচিত্রা'; ভাদ্র ১৩৩৬)। বস্তুত দুঃখবাদই ছিল শিল্পীর জীবনবোধের অন্তঃসত্ত্ব। মানুষের জীবনে অপ্রতিহত-অপ্রতিবিধেয় দুঃখ, তথা অশুভ পরিণামিতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল আমূল প্রোথিত। প্রসঙ্গত, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মনে আসে। কবি ছিলেন কথাশিল্পীর মাত্র এক বছরের ছোট। কবিপুত্র সুনীলকান্তি অবশ্য বলেছিলেন, পিতা তার 'দুঃখবাদী' নন, দুঃখচেতনার কবি, দুঃখই মানবজীবনের পরিণাম—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল সেই অমোঘ, অনতিক্রম্য দুঃখের একটা কার্যকারণ সূত্র—এক ধরনের দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ। যিনি

জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে আপন কবিধর্মের উপলব্ধিভরে স্বতঃই বলেছিলেন—

"যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত,
আমি সে ব্যথায় ব্যথিত।" ('কবি নহি': 'নিশান্তিকা')

জগদীশ গুপ্ত কোন গূঢ়তর তত্ত্বের সমর্থন খোঁজেননি; বরং নিষ্ঠুর কালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেন নিষ্ঠুরতর হতে চেয়েছেন, চেয়েছেন কালের মতোই নিরপেক্ষ, নিরঙ্কুশ হতে। জগদীশ গুপ্তের আদি অন্তহীন দুঃখ-অমঙ্গলের বোধ নিরেট। জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় নীতিবোধ ও কল্যাণচেতনাকে কেবলমাত্র অস্বীকার করেই তৃপ্ত নন,—বিশ্বপ্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তরূপে বিনাশক, —নিষ্ঠুর এবং কদর্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অনিলবরণ রায় লিখেছেন—

> "তিনি (জগদীশ গুপ্ত) দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এসবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রূর হৃদয় শয়তান। ...তিনি সর্বত্র দেখিতেছেন শুধু শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে রচনা করিতেছেন।"
>
> (আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ)

বিশ্বশক্তির নিষ্ঠুর স্বভাবেই তাঁর অন্ধ বিশ্বাস। অন্যদিকে, চরিত্রের অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের রহস্য উদঘাটন জগদীশ গুপ্তের রচনার মূল লক্ষ্য। পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালবর্তী মানিক, শৈলজানন্দ প্রমুখের সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলেও মনের অচেতন বা নির্জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ জগদীশ গুপ্তেই প্রথম এবং প্রগাঢ়। কথাসাহিত্য রচনায় তাঁর পথটি ছিল স্বতন্ত্র। বাংলা কথাসাহিত্য জগতে তাঁর উপস্থিতিই ব্যতিক্রমী।

মনের গঠনের দিক থেকে, জগদীশ গুপ্তের বেশ খানিকটা মিল আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনায়—

> "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। এ ধারা কল্লোল এর নয়। পূর্বগামী কোনো লেখকের পরোক্ষ প্রভাব যদি তাঁর ওপর কখনো পড়ে থাকে, তাহলে দুজনের নাম অনুমান করা যায়। একজন জগদীশ গুপ্ত, অপরজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।" (পরিচয় পত্রিকা/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩)

মানিকের মতোই জগদীশ গুপ্ত ও মনোবিকলনের জটিলতার মধ্যে দিয়ে জীবনরহস্য সন্ধানে প্রয়াসী। লেখক হিসেবে তিনি 'ন্যাচারালিস্ট' এবং জীবনের কোনো সম্পর্ককেই তাঁর স্বার্থবর্জিত মনে হয়নি। মোহিতলাল মজুমদারের আলোচনায় বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে—

> "সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থ বুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরেজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদের অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত চৈতন্যের অগোচর,

সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—এ সকল যেন তাহারই ক্বচিৎ-দৃষ্ট মূর্তি।" (বর্তমান বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য বিতান)

জগদীশ গুপ্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখিয়েছেন। আর এই দেখানোটা একেবারেই আরোপিত নয়, তাঁর সাহিত্যের অন্তর্জাত প্রবণতা। মানুষ যে চরিত্র সংশোধন করতে পারে, সমাজ যে নিজেকে সংশোধিত করে পরিবর্তন সাধন করতে পারে—এ ধরনের কোন বিশ্বাস তাঁর লেখায় চোখে পড়ে না। তাঁর বিশ্বাস যে মানুষের কতগুলো লোভতৃষ্ণা সঞ্জাত বৃত্তি আছে, যা মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই তাঁর গল্পে দুঃখবাদের তীব্রতা চোখে পড়ে। সহজ বিশ্বাসের সুর অনুরণিত হয় না তাঁর লেখায়। সবমিলিয়ে তাঁর লেখা গল্পগুলো অদ্ভুত প্রকৃতির। শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার মানিক-শৈলজানন্দ—এঁদের মধ্যে থেকেই তিনি নিজের মতো করে লিখে গেছেন। শরৎচন্দ্রের মতো গ্রামজীবনের কথা পেয়েছি তাঁর গল্পে। মানিকের মতো মনস্তাত্ত্বিক গল্প লিখেছেন তিনি, কিন্তু তার স্বাদ একেবারে আলাদা—মনোগহনের সর্পিল পথে তাঁর পরিক্রমা। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনগতি কতটা বক্রগতির ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তৃত বলা না গেলেও সংক্ষেপে যেটুকু বলতে পারা যায়, তা হল খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন লেখক। কুষ্টিয়া বা বোলপুরবাসী লেখক কোনো ব্যক্তিগত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেননি। লেখকের স্ত্রী শ্রীযুক্তা চারুবালা গুপ্ত সাহিত্য রচনার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। 'রসচক্র' নামে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বারোজন লেখকের একটি সাহিত্যবাসর ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জগদীশ গুপ্ত।

গল্পের নামকরণ 'অরূপের রাস' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'অরূপ' শব্দের অর্থ রূপাতীত; আর 'রাস' অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের মিলনের দিকে ইঙ্গিত করে এই মিলনের অনুষঙ্গ। রাণু ও কানুর মিলন হয়নি এ গল্পে। তাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থেকে গেছে। কানুর স্ত্রী ইন্দিরার স্পর্শে রাণু চেয়েছে তার প্রেমকে পরিতৃপ্তি দিতে। এইরকম ধরনের অভিনব কাহিনি বয়ন বাংলা গল্পের ধারায় অভিনব। আজন্মকাল ব্যবহৃত হয়ে আসা নায়ক-নায়িকা কেন্দ্রিক একরঙা প্রেমের গল্প থেকে এ গল্পের স্বাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মূল চরিত্র দুজন—কানু ও রাণু। দুজনে বাল্যকাল থেকে দুজনের সঙ্গে পরিচিত। বয়সের পার্থক্য দুজনের সাত বছর। গল্পের সূচনায় লেখক জানিয়েছেন—"সে সাত; আমি চৌদ্দো বছরের"।

সাত বছরের বড়ো হওয়ার অধিকারে কানু যখনই কোনো শাসন করার চেষ্টা করেছে রাণুকে, কোনো কাজ হয়নি; কারণ—

> "আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িত; বলিত,—'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা, তাই বকতে বসেছে। হি হি হি..."

বয়ঃসন্ধিকালে রাণুর যখন দশ, কানুর সতেরো,—কানু তার সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ করেছিল—

> "ডান হাত দিয়া মরণোন্মুখ নেলসনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।"

ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের ব্যাপারটি অনুভব করেছে রাণু সম্পূর্ণত—

"চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল—আর কী কী ছবি আছে দেখাও।"

দশ বছরের বালিকার এই 'অকালপরিপক্কতা' কানুকে বিস্মিত করেছে। শুধু তাই নয়, বাক্য বিনিময়ের প্রতিযোগিতাতেও কানু পরাজিত। কানুর ঘরে রানু কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে—নিছক দেখা না আরো কিছু—এ প্রশ্নের উত্তরে রাণু বলেছে যে, তার উদ্দেশ্য নিছক রসগোল্লার হাঁড়ি। কিন্তু রসগোল্লা খেয়ে যায়নি রাণু—

"পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম।...ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেল।"

দু'দিনের মধ্যেই এলো রাণুর বিবাহের সংবাদ। বিবাহের প্রস্তুতির পর্বে কানুর উল্লাস দেখে রানুর ক্ষোভ ব্যক্ত হয়। রাণু সম্পর্কে কানুর একটা স্থায়ী দুর্বলতা এই ইঙ্গিতে লেখক স্পষ্ট করেন। বিবাহ পূর্ব লজ্জারূপ ভাবটি দেখে কানু মুগ্ধ হলেও তার প্রতি রাণুর দুর্বলতা সে অনুভব করতে পারেনি। রাণুর অভিমানকে সে ক্রোধ বলে ভুল করেছে। বিয়ের কথা পুরোপুরি স্থিরীকৃত হলে দুর্লভদর্শন হয়ে উঠেছে রাণু। এই পর্বে কানুর অনুভব :

"কিন্তু মাঝখান হইতে আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিলাম কেন! ....অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি নাই। ....কথা বলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—যেন আমার সঙ্গে তাহার মুখ চিনাচিনিও নাই।........একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জন করিযা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পলাইবার পথ পাই নাই।"

পরে রাণু পূর্ণযৌবন নিয়ে উপস্থিত হলে কানু যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। রাণুর কাছে তা অজ্ঞাত থাকে না, রাণু তাকে ভৎর্সনা করে। কানুর বহু পরিশ্রমসাধ্য প্রীতি উপহার, যা রাণুর বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয়েছিল যে পদ্যে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-স্বদেশ-শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী প্রভৃতি গুরুজন; দেবর ননদ-দাস- দাসী সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশু পাখির প্রতি নারীর কর্তব্য, কিছুই বাদ পড়ে নি। সে পদ্য রাণু জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে। আসলে রাণুর বিয়ে উপলক্ষে কানুর কোনরকম উৎসাহপূর্ণ যোগদান রাণু কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। রাণুর বিবাহ হল—সানাই বাজল—রাণু শ্বশুরবাড়ি গেল। কানুও কলকাতায় চলে এসেছে বিদ্যার্জন উপলক্ষে। এরপর দৈবাৎ তাদের দেখা হয়েছে। পূর্ণ যৌবন-মধ্যাহ্নে উপনীত রাণুকে দেখে বুকে ঝড় উঠেছে কানুর ; কিন্তু রাণুর অভিমানাহত প্রত্যুত্তর :

"তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও।"

নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো ঘুরে ফিরেছে দুটি ভালবাসার মানুষ কানু আর রাণু। অথচ কেউ কারো কাছাকাছি বাহ্যত পৌঁছতে পারেনি। কানু প্রথম দিকে রাণুর ভালবাসা ও দুর্বলতা ঠিকমতো উপলব্ধিই করতে পারেনি। তা করতে পেরেছে রাণুর বিবাহের অনেক পরে তার লেখা চিঠির ভাষা থেকে। রাণু লিখেছে—

"কানুদা তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবেই না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড়ো দুঃখ। দুটি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে?......... যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? কারণ কী, তুমি নিশ্চয়ই জানো না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

ইতি—রাণু।"

রাণুর এ চিঠি পড়ে কানুর মুগ্ধ বিস্মিত মন দিশা খুঁজে পায়নি।

বহুদিন পর সন্তানবতী রাণু বিবাহিত কানুর দেশে এল, রাণুর পূর্ণতা দেখে নিজেকে সেদিন অপূর্ণ মনে করেছে কানু। রাণু ছেলের নামকরণ করেছে 'বেণু'— বোধহয় 'কানু' নামের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত। বেণুকে কোলে নিয়ে কানুর একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছে; কারণ রাণুরই—

"সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এই বিগ্রহ—তাহারই প্রাণের স্পন্দন, দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দরস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে...।"

অন্যদিকে, গল্প ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় যখন রাণু কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে দেহগত ভাবে একাত্ম হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে—

"আয় বৌ, তুই আর আমি এক হয়ে যাই।"

এখানেই প্রথম Fetichism বা বস্তুকাম-এর মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। ইন্দিরার সঙ্গে শয়ন করবার পরিকল্পনার মধ্যে ইন্দিরাকে Fetish হিসেবে গ্রহণ করবার ইচ্ছাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইন্দিরার শয়নকালীন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিতে ইন্দিরাকে যে সে Fetish হিসেবে ব্যবহার করেছে, তার পরিচয় পাই—

"ইন্দিরা বলিল,—যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।"

ইন্দিরার দেহে রয়েছে কানুর স্পর্শ। ইন্দিরার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে কানুর স্পর্শ লাভ করা যাবে এই কল্পনায় রাণু ইন্দিরার দেহকে ব্যবহার করেছে। কানু বিষয়টি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছে এবং বিপরীতক্রমে বস্তুকাম এর তৃপ্তি সেও স্পষ্ট অনুভব করেছে। ইন্দিরা যেন একটি মাধ্যম হিসেবে উভয়ের যৌন সম্পর্ক সূত্র স্থাপন করে উভয়কে তৃপ্ত করেছে—

"ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।.....আমি তৃপ্ত।"

বাস্তবিক 'অরূপের রাস' জগদীশ গুপ্তের একেবারে নতুন সৃষ্টি,—অন্য স্বাদের রচনা। ঠিক এ ধরনের সমস্যাকে ভিত্তি করে জগদীশ গুপ্তের আর কোন গল্প পাওয়া যায়নি। গল্পের কথক কানু—উত্তম পুরুষের বয়ানে রচিত গল্পটি। তবে রাণুর জীবনতৃষ্ণা বা অমেয় জীবনবাসনাই গল্পের লক্ষ্য। ধাপে ধাপে জগদীশ গুপ্ত উন্মোচন করেছেন রাণুর জটিল

মনস্তত্ত্ব। কানুর ভূমিকা গল্পের প্রয়োজনে যেভাবে ব্যবহার হয়েছে, তাতে অনেক সময় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'শ্রীবিলাস' এর কথা মনে পড়ে। জগদীশ গুপ্ত ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কতটা, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ হয়তো আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণে নতুন কিছু ভাবনার উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন। রাণুর অবর্ণনীয় মানসিক বিবর্তনের রূপ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গল্পের গোটা কাঠামোকে গড়ে দিয়েছে। প্রেমের পুতুল থেকে প্রতিমা রূপ বয়নের মাধ্যমে রাণুর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। রাণু স্বামী সন্তান নিয়েও বাল্যপ্রেমের খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমসৌন্দর্যের অনমনীয় বিভোরতায় তার প্রথম প্রেমিক কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে সমকামিতায় দেহসম্ভোগে প্রেমের মুক্তি চেয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'lesbianism' বাংলায় 'সমকামিতা', তা দিয়েও রাণুর অদ্ভুত ব্যবহারের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। সমকামিতা বিষয়টির মধ্যে বোধহয় থাকে অবচেতন স্বভাবে দৈহিক প্রেমের খেলা। রাণুর ক্ষেত্রে বিষয়টির মূলে কাজ করেছে বাল্যপ্রেমের অবোধ বাসনা। প্রেম সম্পর্কিত ধারণায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের Conception রাণুর ব্যবহারে আরোপিত। কৈশোরের প্রেম বিবাহিত জীবনেও অনড় থেকেছে রাণুর হৃদয়ে। ফলে স্বামী পুত্রসহ সংসার জীবনকে পাশে রেখে সে কানুর আসঙ্গলাভ করতে চেয়েছে সমকামিতাকে সুস্থ উপায় হিসেবে অবলম্বন করে। গল্পের শেষে রাণুর স্বামী বসন্তবাবুর বদলির খবর এলে রাণু সরাসরি কানুর কাছে প্রস্তাব রাখে—

> "তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।"

ইন্দিরা জানায়—"যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।" আর গল্পের শেষ চরণ কানুর উক্তি—"আমি তৃপ্ত।"

এখানেই প্রতিষ্ঠিত হল প্রেমিক-প্রেমিকার গোপনতম যৌথ প্রেম-স্বীকৃতি ও চিরন্তন বন্ধনের অঙ্গীকার। এ এক বিস্ময়কর ভালোবাসা, যা সমকামিতার গণ্ডী পার হয়ে বহু দূরাতিক্রমী পথে যাত্রা করেছে—অবচেতন মনের ভালোবাসার তত্ত্বের এ এক সম্পূর্ণ নতুন পাঠ। মানবহৃদয়ের পাঠশালার এ নতুন পাঠ ফ্রয়েডীয় বা অন্যান্য যৌনতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাকে দূরে সরিয়ে গভীরতম বাস্তব জীবনবেদ পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এটা ধরেওনি যে, জগদীশ গুপ্ত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তা হলেও 'অরূপের রাস' গল্পটি ফ্রয়েডের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের তত্ত্বকে খণ্ডন করে। ফ্রয়েড 'Sex' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই জীবন বা সমাজের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানেও 'যৌনতা' জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোধহয় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। 'রাস'-এই মিথটিকে কোন ধর্মীয় অনুষঙ্গে ব্যবহার করেননি, সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাধা-কৃষ্ণের মিলন সঞ্জাত অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বকে। পরকীয়া অর্থে রাণুর প্রেম—এও এক অচিন্তনীয় তত্ত্বের অঙ্গীকার; তবে নব চিন্তনে নবায়িত। নবায়িত কারণ, মাধ্যম হিসেবে ইন্দিরার ব্যবহার অভিনব। কানুর স্ত্রী ইন্দিরা—ফলে কানুর শরীরী প্রেমের ছাপ পড়েছে ইন্দিরার মধ্যে। সম্ভবত রাণু পুরুষের ভূমিকা নিয়ে ইন্দিরার কাছ থেকে কানুর শরীরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। ইন্দিরা নিজের অজ্ঞান্তে ['বউ বড় ভালো মানুষ'—রাণুর উক্তি] উভয়ের

শরীরী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সেতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাহিনির অন্তর্নিহিত অর্থ বাংলা কথাসাহিত্যে অভূতপূর্ব। রাণুর প্রেম সমকামিতার আবিলতায় আচ্ছন্নতাজনিত কারণে তুচ্ছ তো নয়ই, বরং এ প্রেম যেন নিকষিত হেম,—দেহ ও আত্মার চরমতম মিলনের মাধুর্যে সুন্দর ও নির্মল। অন্যদিকে, দেহাত্মবাদী দর্শনে বিশেষ ব্যঞ্জনাগর্ভ বা Symbolic:

রাণু (নারী)————স্বাভাবিক প্রেম— কানু (পুরুষ)

কানু (পুরুষ)————স্বাভাবিক দাম্পত্য প্রেম—ইন্দিরা (নারী-কানুর বিবাহিত স্ত্রী)

রাণু (নারী)————স্বাভাবিক মিলন বা—ইন্দিরা (নারী)

'অরূপের বাস'

এই হল গভীর ইঙ্গিতবাহী গল্পের প্লট। এর মধ্যে চরিত্রের মনোজগতের টানাপোড়েন ব্যতীত আর কোন জটিলতা বোধ হয় নেই। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস। এ উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়।........মনের সংসারের কারখানা ঘরে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি গড়ে উঠতে থাকে।"

অনেক পববর্তী কালের রচনা 'অরূপের রাস' পড়তে পড়তেও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে হয় মনের সংসারের কারখানা ঘরের এই 'আগুনের জ্বলুনির' বিষয়টি। চেতনাপ্রবাহের গভীর রহস্য অনুধাবন করে রাণুর জটিল মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়তো মেলে; তবে জীবনতৃষ্ণা যে অশেষ, অসীম, অপরিমেয়—সেই জীবনপাঠই গ্রহণ করতে হয় আমাদের। সেই জীবনতৃষ্ণার ইতিকথাই—'অরূপের রাস'।

কলঙ্কিত সম্পর্ক : অন্য জগদীশ

উৎপল মণ্ডল

'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পটি পড়ে 'দেশ' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক এবং সাহিত্যিক সাগরময় ঘোষ চমকে উঠেছিলেন আর জগদীশ গুপ্তের গল্পের প্রতি নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।[১] তাহলে 'চমকে' ওঠার মতো কিছু থাকারই কথা এই গল্পে। অথচ, গল্প তেমন চমকের নয়—সকালবেলায় খবরের কাগজে দেখা প্রায় দৈনিক ঘটনা। আসলে অসহ্য এক সামাজিক সংকট আর অমানবিক ব্যক্তিসংকট যেমন তীব্রভাবে মিলেছে এই গল্পে তেমনি স্পষ্টভাবেই উঠে আসেন এক অন্য জগদীশ গুপ্ত।

গল্প খুব সাধারণ। দেড় বছর পর বাড়ি ফিরবে একজন—সাতু। ধর্ষণের অপরাধে জেলে গিয়েছিল সাতু। অথচ বাড়ি ফিরবে 'কাল' জেনেও বাড়ির কারো কোন হেলদোল নেই। কিন্তু একজনের বড় দুঃখ—তীব্র অন্তর্দাহ—সাতুর স্ত্রী মাখনের। সাতুর ফেরার সংবাদে বাড়ির সবাই গলে গেলেও মাখন গলেনি। গল্পের অধিকাংশ জুড়ে তার দহন এবং শেষ পর্যন্ত শয়নঘরে স্বামীব মুখের উপর প্রত্যাখ্যান স্বামীকে। ফল—বাড়ির বাইরে বিশাল পৃথিবীর গভীর অন্ধকারকে বরণ।

মূলত তিনটি চরিত্র গল্পে—মাখন, শাশুড়ি বিরাজ আর স্বামী সাতু। অন্যরা ক্যাটালিস্টের কাজ করেছে মাত্র। মাখন প্রধান চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তার কথাবার্তা খুবই কম—শুধু তার মনস্তত্ত্ব—আর অন্তর্দাহের বর্ণনা। এখানেই লেখকের মুন্সীয়ানা।

মাখনের মতো প্রতিবাদী চরিত্র এই গল্পের সমকালে খুব কমই দেখা যায়। তবে মাখনের এই প্রতিবাদ লেখকের ইচ্ছাপূরণ একেবারেই নয়—যথেষ্ট যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত। তার মনোভাব আনুপূর্বিক স্পষ্ট। গল্পের প্রথমদিকেই—যখন মাখন ভাবে কাল তার স্বামী ফিরবে—একটি কথায় মাখনের মনস্তত্ত্বকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ কাব্যিক ভাষায়—

> "সূর্যের উদয়াস্তব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে এতো সংক্ষিপ্ত তার কোনদিন মনে হয় নাই; সাতকড়ি যেদিন যায় সেদিন তখন কেবল প্রভাত, আজ এই সন্ধ্যা।"

দীর্ঘ দেড় বছর পর সাতুর ফেরার কথা বলেছেন গল্পকার। গল্পের শুরুই 'দীর্ঘ' শব্দ দিয়ে। অথচ সেই 'দীর্ঘ দেড় বছর' যেন একটি দিন মাখনের কাছে। নাহলে এইভাবে বলতেন না—'যেদিন যায় সেদিন তখন কেবল প্রভাত, আজ এই সন্ধ্যা।' শুধু কি তাই? সাতু জেলে যাবার সময় প্রভাত—সূর্য উঠেছিল। সূর্য উঠেছিল মাখনের মনে। কিন্তু এখন সন্ধ্যা। অন্ধকার আসবে। অন্ধকার নেমে আসবে মাখনের জীবনে। সাতুব আসাব সংবাদ পেয়েছে যে।

কিন্তু সূর্য উঠেছিল কেন, সাতু জেলে যাবাব দিন? একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিয়ের পর মাখনের শাশুড়ি ছেলের সমস্ত দাযিত্ব ছেড়ে দিয়েছে মাখনকে। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিযে দিয়েছে সৌষ্টব, শ্রী, সম্মান—সবই মাখনেব হাতে। কেন? এতটা ছেড়ে দিয়েছে কেন? এর উল্টোটাই তো বেশী সমর্থনযোগ্য। অন্তত আমাদেব বাস্তব অভিজ্ঞতা তাই-ই। এইখানে সাতুব স্বভাব চরিত্রের আভাস পাবে পাঠক :

> "একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারও বাধে নাই; শাশুড়ি যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।"

—'পরিত্রাণ'-এই একটি শব্দের ব্যবহারে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন সাতুর চরিত্র। তা সত্ত্বেও গ্রাম্য নারীর স্বাভাবিক জীবনধারার নিয়মে সব মেনে নিয়েছিল মাখন। তাই পরবর্তী অনুচ্ছেদেই মাখন সম্পর্কে বলা হচ্ছে—'দুনিয়ার লোকে কী বলিতেছে, কী ভাবিতেছে তাহা সে জানে না'। জানে না তো বটেই, স্বামীর জীবন থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতেও চায়নি। মানিয়ে নিয়েছিল, মেনেও নিয়েছিল। ঐ ভাবেই চলছিল। এই মানিয়ে নেবার বাস্তবতাটাকে বুঝতে গিয়েই জরুরী হয়ে পড়ে গল্পের প্রথমাংশে বর্ণিত মধুডাঙার বর্ণনা। বিশ শতকের প্রথমার্ধের এক গ্রামের বর্ণনা, যে গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ মাখন; যে গ্রামের মেলায় 'মাত্র দশ বারোখানা দোকান বসে', 'বালতি কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, হরেকরকম খেলনা, মালা, ফিতে........এবং পান সিগারেটের।' এটা Sociological দিক থেকে। আর Psycological দিক থেকেও মাখনের এই মানিয়ে নেবার কারণটা দেখিয়েছেন লেখক গল্পের শেষদিকে—

> "সুখের হোক, দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিলো—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল, অভিমান বোধ ছিল; আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও—এতকিছু মেনে নেওয়া সত্ত্বেও সাতু যখন জেলে গেল ধর্ষণের অপরাধে তখন তো প্রভাত হবারই কথা—সূর্য উঠবারই কথা।

সূর্য উঠেছিল বলেই মাখন আর মেনে নিতে পারেনি স্বামীর ফিরে আসাকে। অথচ মাখন সেই সংসারেই আছে যেখানে আর সবার কোন ভাবনা নেই সাতুকে নিয়ে। এখানেই অন্তর্দাহ মাখনের। তাই সাতু ফেরার আগের রাত্রে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে সে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় সাতুর শয়নকক্ষে যেতে। কিন্তু মাখনের ঘৃণিত দৃষ্টির অর্থ যখন বোঝে না নির্বোধ সাতু—এগিয়ে আসে তার দিকে, তখন বিস্ফোরণ ঘটে আগ্নেয়গিরির—'আমায় ছুঁয়োনা'। কিন্তু তার ফল বড় মাবাত্মক—শাশুড়ির গলা ধাক্কা এবং বাইরের অনন্ত অজ্ঞাত অন্ধকারকে বরণ।

মাখন কোন উচ্চশিক্ষিতা নারী নয় বা কোন উচ্চসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়েও ওঠেনি। তাহলে এই প্রত্যাখ্যান—এই প্রতিবাদী ভাষা কি আরোপিত? রবীন্দ্রনাথের মৃণালও প্রতিবাদ করেছিল চিঠির মাধ্যমে। সমালোচকের এরূপ আশঙ্কার দূর করার জন্য লেখক কৈফিয়ত দিয়ে রেখেছেন গল্পের প্রথমদিকেই—মাখনের ভাবনায়—

> "স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এতো যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না; ....স্বামীর স্ত্রী হইয়া নারী তাহা ক্ষমা করে নাই; ভগবানের নাম করে বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই—এজ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই।"

অর্থাৎ মাখন নিজের অবস্থানে থেকে নিজের মতো করেই প্রতিবাদের ভাষা খুজে নিয়েছে। 'ভগবানের নাম যার বুকে আছে'—এই কথাটুকু মাখনকে নিজের অবস্থানে রাখার জন্য যেমন জরুরী, তার মুখে প্রতিবাদীভাষা যোগানোর জন্যও তেমনি যথেষ্ট। শিক্ষিতদের কাছেই তো ন্যায়-অন্যায় পাপপুণ্যের ধারণাটা আপেক্ষিকতার পর্যায়ে এসে যায়!

বিরাজ চরিত্রটি একটু প্রথাগত; অথচ বিস্ময়কর এক মা—বৌমার নিয়তি। শুধু মা-ই, নারী হয়ে উঠতে পারে নি। পারেনি বলেই বোধ হয় একটু বিস্ময়কর। ছেলের সমস্ত কুকীর্তি শুধু মেনে নিয়েছে তাই-ই নয়, ধর্ষণের আসামী ছেলে দাদার সঙ্গে বাড়িতে ফিরে না আসায় একেবারে মর্মাহত। তার চোখের জল থামে নি। এই পর্যন্ত, কুপুত্র সদাই হয় কুমাতা নয় কখনো তো—শাক্তকবির দোহায় দিয়ে বিরাজকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না পাঠকের কিন্তু মাখন মেনে নেয় নি; লেখকও না। তাই বিরাজের চোখের জল দেখে মাখনের অনুভব—

> "তাহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে যে পুত্র সে পুত্র কেমন পুত্র। এই চোখের জল সর্বকালের এবং সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা-জননীর বুকের স্নেহের অঙ্গে কলঙ্কের কালিমালেপন ইহা অভদ্র।"

'সর্বদেশের' এবং 'সর্বকালের' শব্দদুটি সচেতন ব্যবহার লেখকের। যে সামাজিক সংকটের কথা প্রথমেই বলেছিলাম, তার ব্যাপ্তি স্পষ্ট হয়। আর সেক্ষেত্রে এই বিরাজের মতো মা-দের দায়িত্বের প্রতি অনিবার্য ইঙ্গিত এখানে।

কিন্তু গল্পের শেষ পর্যন্ত গিয়ে শাক্তকবির দোহায় দিয়েও বিরাজকে মেনে নেওয়া বোধহয় কষ্টকর। বিরাজকে বরং এইভাবে ভাবাই সমর্থনযোগ্য যে, বুনো ষাঁড়কে বাঁধার দরকার—সুতরাং ছেলের একটা বিয়ে দাও এবং সব দায়িত্ব বৌমার হাতে দিয়ে 'পরিত্রাণ' পাও। আর সেই জনাই সাত পাকে বেঁধেও যখন ছেলেকে বাঁধা গেল না তখন সমস্ত ঝাল বৌমার উপর, আর ধর্ষণের আসামী স্বামীকে মেনে নিতে না পারার মর্মান্তিক পরিণতি রাত্রির অন্ধকারে বৌমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া—'যা চুলায়'।

গল্পের মূল সমস্যার কারণ যে সাতু, তার কথাবার্তা খুব বেশী নেই। অথচ এক স্বচ্ছ ধারণা হয়ে যাবে ছোটগল্পের মনোযোগী পাঠকের। মধুডাঙার মেলায় সাতুর ক্রিয়াকলাপ যে কোন আকস্মিক বা অনিচ্ছাকৃত ভুল নয়, কিছু কিছু শব্দের ব্যবহারে তা স্পষ্ট হয়। যেমন বৌমার হাতে সাতুকে সঁপে দিয়ে 'পরিত্রাণ' পেয়েছিল মা। সাতুর দলের লোকজনরা ছিল 'পাকালোক'। ঠিক-তেমনি, 'নিজের হাতে হামেশাই থাকে বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র তাহার স্ত্রীর বাঁ হাতে আছে।'

এহেন সাতু জেলখানা থেকে দিনের বেলায় ফেরে না। মনে হতেই পারে তার আত্মগ্লানির কথা—লজ্জার কথা। কিন্তু তা তো নয়! তাহলে, 'ভালো আছো'—বৌদির এই কথার উত্তরে 'তোমাদের আশীর্বাদে' বলে হাসতে পারতো না, যে হাসি দেখে বৌদি বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়, কিছু খেয়েছে কিনা মায়ের এই প্রশ্নে—

"সাতু তাহাদের আড্ডায় আজ যা খাইয়াছে সে জিনিস এ বাড়িতে রান্না হওয়া দূরের কথা, প্রবেশই করে না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিল, 'কিছুই খাইনি মা'।"

এই যে সাতু, সেও কিন্তু শোবার ঘরে স্ত্রীর অবিচল প্রতিবাদের কাছে ভয় পেয়ে যায় নিজের মতো করেই ভাবে স্ত্রীর হাতে বুঝি ছুরি আছে। পালিয়ে গিয়ে অভিযোগ করে মাকে ব্যাপারটা বাস্তব হল তো? এইখানে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন—'যার ভয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে। যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে

হয় মাখনকেই—বাড়ি ছেড়ে এবং শাশুড়ির গলাধাক্কা খেয়ে। এইখানে এসে গল্প শেষ হয় সাতুর নিজের সম্বন্ধে একটা কথায়—'জেলই আমার ছিলো ভালো।' জীবনানন্দ-ধিকৃত সমালোচককে ভাবাবেই এই ছোট্ট কথাটুকু। কিন্তু এখানেই লেখকের মুন্সীয়ানা। সাতুর ভয়ঙ্কর অপরাধ বাড়ির সবার কাছে সাধারণ ব্যাপার হলেও মাখন সর্বস্ব ত্যাগ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে বরণ করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্ষমার অযোগ্য।

এগল্পের ভাষা বাস্তবের কর্কশ পটভূমিতে দাঁড় করায়নি গল্পকে। জগদীশগুপ্ত প্রথমদিকে যে কবিতা লিখতেন সেই উপলব্ধিজাত কবিপ্রাণতাই বরং বেশি করে ধরা পড়েছে এই গল্পের ভাষাতে। সেটা বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্তও বটে। গল্পে গল্প তো তেমন নেই। মূল বিষয় মাখনের অনুভব। সেই অনুভবের প্রকাশে যথার্থ হয়ে উঠেছে লেখকের উপলব্ধিজাত ভাষা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

> ক. তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা ছি ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে......পৃথিবী সেখানে সত্যসত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হইয়া গেছে—জীবজগৎ শিহরিয়া কানে আঙুল দিয়া বসিয়া আছে।
>
> খ. এতো বড়ো আকাশে যেখানে যে জ্যোতিবিন্দুটি ছিল, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া গেছে; থই থই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গেছে; তাহার শ্বাস বহিতেছে না—

যেটা লক্ষ্য করার বিষয়, সাধু আর চালিত একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু খুব সচেতন না হলে পাঠককে তা ভাবাবেই না। এটাই কি তাহলে কাব্যিক বিশেষত্ব, যা কিছুটা সময়োচিতও বলা যায়?

শৈলীর দিক থেকে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় গল্পের উপস্থাপনা। অতীত আর বর্তমান কাল বারবার একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে লেখকের সচেতন প্রয়াস, দৃষ্টি এড়ায় না। গল্পের শুরু 'দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ি ফিরিবে' বাক্য দিয়ে। এই story telling জগদীশ গুপ্তের প্রবণতা। তারপর এতদিন সে কোথায় ছিল সেই হিসাব দিতে শুরু হয় একটি story। এই story-তে মধুডাঙার নাম থেকে শুরু করে তার মেলা সম্পর্কে বর্ণনা যে বিস্তৃত জায়গা নিয়েছে তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ার আশঙ্কা জাগতে পারে শুরুতেই। কিন্তু এই বর্ণনায় যে আবহকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তার গুরুত্ব বোঝা যায় মাখন চরিত্রের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে যে আলোচনা আগেই করেছি।

মূল গল্পের বিষয় দেড়বছর সময়কালের। কিন্তু তার উপস্থাপনা প্রায় তিরিশঘণ্টা মতো সময়ের—সাতু ফেরার আগের দিন সন্ধ্যা থেকে ফেরার দিন রাত্রি ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে লেখক যে বারবার অতীত বর্তমানে অনায়াসে যাতায়াত করেছেন তা সচেতন ভাবেই। 'কাল ৭ই'—এই কথা বলেছেন দুবার। কিন্তু আগের রাত্রে মূর্চ্ছিতা মাখনের মাথা কোলে নিয়ে শাশুড়ির ভাবনায় এসেছে 'আজ ৭ই'।

গল্পের প্রথম দিকে সাতুর জেলখানায় যাবার কারণ হিসেবে মেলা—অপরিচিত মেয়ে ফুর্তি থানা—সংক্ষেপে এই ঘটনার ইঙ্গিতেই পাঠক বুঝে নেয় যা বোঝার। সেসব কথার মধ্যেই হঠাৎ কখন যেন লেখক প্রবেশ করেন গল্পের দ্বিতীয় অংশে—মাখনের কথায়। কিন্তু সেখানেও 'কাল

৭ই' দিয়েই প্রবেশ বর্তমান কালে। আর ঠিক কি ঘটেছিল, যার জন্য সাতুকে জেলে যেতে হয় তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন গল্পের শেষ দিকে। সাতু যখন শোবার ঘরে বিছানায় বসে স্ত্রীর প্রতীক্ষায়, তখন সাতুর ভাবনায় ধরা পড়েছে সেই ধর্ষণের ইতিবৃত্ত। এর দুটি কারণ—

ক. সময় এবং চরিত্রের কার্যাবলীর অদ্ভুত বুনোন—প্রায় তিরিশ ঘণ্টার সময়কাল যে গল্পের সীমা তার মধ্যে সবার ক্রিয়াকলাপকে ধরা।

খ. যে অপরাধে সাতুর জেল হয়, এই গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র সাতুর পক্ষেই তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা সম্ভব। তবু একটা কথা—বিষয়টা অত স্পষ্ট করে বলার দরকার ছিল কি? প্রথম দিকের টুকটাক কথাতেই পাঠক তো বুঝে যায়। 'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলে'—এটাই তো ভাল ছিল ছোট গল্পের পক্ষে!

অবশেষে, সম্পাদকের নিষেধাজ্ঞা শিরোধার্য করেও জগদীশ গুপ্তের সম্পর্কে একটু বলতে বাধ্য হচ্ছি, না হলে আমার বলার বিষয়টাই অপূর্ণ থেকে যাবে। সমালোচকদের একটি শ্রদ্ধেয় অংশ জগদীশগুপ্তের জীবনদর্শন প্রসঙ্গে নিয়তি-অদৃষ্ট-দৈবশক্তি প্রভৃতির কথা বলেছেন। মানুষ এক নামহীন আকারহীন হিংস্রতার অসহায় শিকার—জানিয়েছেন মোহিতলাল মজুমদার।[২] অন্ধ অদৃষ্টশক্তির, মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা জানিয়েছেন সুকুমার সেন।[৩] ব্যর্থতার মূলে নিষ্ঠুর নিয়তির বীভৎস উল্লাস দেখেছেন গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।[৪] আর সুমিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে নিয়তিবাদী দৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ছোটগল্পে, উপন্যাসে নয়।[৫] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন নিরুপায় বোধের কাছে জগদীশের চরিত্রের আত্মসমর্পণ করার কথা।[৬]

কিন্তু এই গল্পে নিষ্ঠুর নিয়তিই বা কোথায়, নিরুপায় বোধই বা কোথায়? মাখন তো নিরুপায় হয়ে মেনে নেয় নি স্বামীকে। না হেরে উপায় থাকে না তার। কেননা সে একা, পরিবারের সবার থেকে আলাদা। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মাখন, হেরে গিয়েও। তাই সাতুর মত স্বামীও অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলেছে 'জেলেই আমার ছিল ভালো।' আর মাখনেব পরিণতির নিয়ন্তা যে 'নিয়তি'—একথা বোধহয় কোনো বিচক্ষণ জ্যোতিষিও বলবে না।

তথ্যনির্দেশ

১ সম্পাদকের বৈঠকে। সাগবময় ঘোষ।

২ সাহিত্য বিতান। মোহিতলাল মজুমদার।

৩. বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস। ৪র্থ খণ্ড। সুকুমাব সেন।

৪ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। গোপিকানাথ রায়চৌধুবী।

৫ জগদীশগুপ্ত জীবন ও সাহিত্য। ড সমরেশ মজুমদাব সম্পাদিত।

৬ প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক : মেটামর্ফসিস—প্রজা থেকে পাইক

মুক্তিপদ বিশুই

জগদীশ গুপ্ত কল্লোল যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কথাকার। তিনি তাঁর ছোটগল্পে যে ভাবে মানব মনের জটিল নির্মম ছবি এঁকেছেন তা পুরোপুরি এন্টি রোম্যান্টিক। তাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের শয়তানি, কিংবা কুপ্রবৃত্তিগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেননি, কিংবা এইগুলোর চরম সত্য বলে মনে করেন না। তিনি Thomas Hardy এর ন্যায় শঠতা মূঢ়তা কে ছাপিয়ে আরো মহত্তর জীবন দর্শনের কথা তুলে ধরেন। হয়তো সেইজন্য কৃষ্ণকান্তের পুত্র ভূতনাথের মধ্য দিয়ে শুভবুদ্ধি আত্মসচেতনতা কিংবা প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়।

দুই

'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' গল্পে একটি নিটোল কাহিনি আছে। অন্যান্য গল্পের মতোই জগদীশ গুপ্ত অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে গল্প শুরু করেছেন যাকে অধুনা naturalism বা যথাযথবাদ নাম দেওয়া হয়েছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'জমিদার জাহ্নবী দাশগুপ্তের একটি যোগ্যতাসম্পন্ন লোক চাই—কেরানী নয়, পাইক'। একেবারে Masterstooke, কোনরকম ভনিতা না করেই মূল গল্পের ভিতরে প্রবেশ। তারপর যথারীতি প্রথামাফিক নোটিশ দিয়ে উপযুক্ত লোককে বেছে নেওয়ার যাবতীয় কাণ্ডকারখানা মজুত।

"জাহ্নবীর ধারণা, কেরানী চাইলেই মেলে এবং এক কথাতেই ভালই মেলে—নির্বাচনে বিশেষ বুদ্ধি খাটাবার দরকার নেই, কিন্তু পাইক নিয়োগের বেলায় তা আছে—নির্জীবতা তার গুণ,.......সুতরাং জাহ্নবী মনে করেন পাইক নিয়োগে রাষ্ট্রবুদ্ধি সজাগ রেখে খুব হুঁসিয়ারী হওয়া দরকার।"

এক্ষেত্রে লেখক পূর্বতন পাইক ক্ষেত্রর নামোল্লেখ করেছেন, শুধু তাই নয় ক্ষেত্র'র বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর পরিচয়ও দিয়েছেন। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ছিল তার প্রত্যেকটি কাজে আর সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল প্রভুর ইজ্জতের দিকে। সে জাহ্নবীর পিতার আমল থেকে কাজ করত। কাজেই ক্ষেত্র মারা যাবার পর পাইক নিয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি যথারীতি প্রচারিত হয়েছে। পাইক পদের জন্য দরখাস্তও পড়েছে প্রচুর। লিখিত দরখাস্ত, কারণ আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে সবকিছু অনুষ্ঠিত হবে। কদম চুলো ছোট মহুরী নাম ডেকে ডেকে দরখাস্ত পেশ করতে লাগল। প্রথমেই ডাক পড়লো হারান বাগদির। সে যথারীতি জাহ্নবী জমিদারকে তুষ্ট করার জন্য প্রণাম করলো। জমিদার কেবলমাত্র একটুখানি তর্জনীটা নাড়ালেন। হারানের পাইকের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। সে ভবানন্দপুরের রায় বাবুদের সদর কাছারির পাইক ছিল। বয়স ৫২, বিপত্নীক, ছেলেরা আছে সমস্ত কিছু সে সবিস্তারে বলে। তারপর যথারীতি জমিদার বাবু বলেন—বাদ দিন'। পরের ব্যক্তিজন কেশব দাস, স্ত্রী আছে, তবে বড় মুখরা। সেও বাদ যায়। তৃতীয়জন ব্যক্তি প্রিয়নাথ গরাত্রী—অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে ম্যাট্রিক পাশ করেই অনেককে ডিঙিয়ে, ৩৫ টাকা

মাহিনের সরকারী চাকরি পেয়েছে। ভাল গৃহস্থ, জমিদার বললেন, 'বাদ দিন'। তারপর,' পরের প্রার্থী রামলাল ভান্ডারীও বাদ গেল। পঞ্চম ও শেষ ব্যক্তি—রমন রায়—জাতিতে সদগোপ.....দরখাস্তে যা লেখা আছে তার অতিরিক্ত কথা হচ্ছে এই যে, মিথ্যাসাক্ষী দিয়ে একবার ফৌজদারির ফেরে পড়েছিল' জমিদার এবারেও না মঞ্জুর করলেন, আর আদেশ দিলেন ২ আনাকরে খোরাকী খরচ দিয়ে ওদের বিদায় করতে।

ঠিকমতো লোক না পাওয়ায় সেদিনের সমস্ত কর্মপ্রণালী বানচাল হয়ে যায়। মহুরীও মনে মনে আহত হয়। 'সব কটিকে ছেড়ে দিলেন বাবু। লোক তো একটি চাই-ই আপনারা!'

জাহ্নবীর উত্তর—'চাই-ইবলে তাড়াতাড়ি করে অনুপযুক্ত লোককে ত নিতে পারিনে।'

লেখক ঠিক এইভাবে তার গল্পকে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যান। যেখানে জাহ্নবী কিংবা পাইকের মতো পাঠকরাও জানেন না, ঠিক কোথা থেকে পাইক পাওয়া যাবে। এইরকম এক পরিস্থিতিতে জাহ্নবী মিহির প্রামাণিককে আবিষ্কার করেন। আভাবিতভাবে। বাইরে বারান্দায় এসে দেখলেন প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে এক ব্যক্তি বসে আছে। "...........খুব অন্যমনস্কভাবে সে বসে আছে...তার হাতের কাছেই একটি নাদুস্ নুদুস্ ছেলে কাছারি ঘরের দিকে পিছনে ফিরে শান্তভাবে বসে আছে......" জাহ্নবী তার কাছে গেলেন, সে নতজানু হয়ে বসে পড়ে হাত জুড়ল, ললাট মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করল। দীর্ঘ ভূলুণ্ঠিত প্রণামে ও জাহ্নবী নিজেকে সংযত রেখে মনে মনে তাকে পাইক পদে নিযুক্ত করে নিলেন। জাহ্নবী কাছারী ঘরে নিজের অভিলাস ব্যক্ত করতেই মহুরী সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। "ওর মত আলসে দুনিয়ায় আর নেই। তার উপর এত ভালোমানুষ যে সাত চড়ে মুখে রা নেই............।" তা সত্ত্বেও জাহ্নবী তাকে চূড়ান্ত করলেন।

গল্পের পরবর্তী পর্বে মিহির প্রমাণিকের পরিবর্তনের কাহিনি পুনরুত্থানের কাহিনি। শুকনো ঘাসও যেমন বসন্তের প্রথম বর্ষণে নতুন করে কচি কচি ঘাস নিজেকে মেলে ধরে, তেমনি মিহির প্রামাণিকও যেন অনেকটা কবর থেকে নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরে। যে মিহির প্রামাণিককে প্রথম দর্শনে, ছাপোষা, সরল অনাড়ম্বর, ভাবলেশহীন মানুষ বলে মনে হয়, পাইকের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পরে তারই আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। তবে এখানে মনে রাখা দরকার, জাহ্নবীর চোখ জহর চিনতে ভুল করেনি।' তার বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সঠিকভাবে মিহির প্রামাণিকের সত্তা ধরা পড়ে।

পাইক হওয়ার পর মিহিরের বেতন ধার্য্য হল ৮ টাকা। '.....তারপর সিন্দুক খুলে হাতে অর্পণ করা হল পাগড়ি এবং পিতলের এক চাপরাশ। ঘরের কোন থেকে এনে তার হাতে দেওয়া হল পাকা একখানা বাঁশের লাঠি—জমিদারের দুর্দান্ত শাসনশক্তির দুর্দান্ত প্রতীক।' লেখক বলেছেন "চাপরাশ এবং পাগড়ী এবং লাঠিখানা নিয়ে আর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে মিহির বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তার পরিবর্তন শুরু পথের মাঝে এবং অকস্মাৎ।......."

এখন সে পূর্বের শুধু মিহির প্রাম্যণিক নয়, পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক, সে ভাবতে থাকে পূর্বে পাইকের ভয়ে তার গায়ে কতবার গা কাঁটা দিয়েছে। আর এখন জমিদার আর নিজেকে যুগপত এবং পুনঃ পুনঃ আর ক্রমশ ব্যাপক সুতীক্ষ্ণ করে অনুভব করার ক্ষমতা সে পেয়েছে। ধীরে ধীরে সে উত্তেজিত হয়। ঠিক এমন সময় রাস্তায় ভূপতি রক্ষিতের

সঙ্গে তার দেখা যে চিরকাল-তাদের 'ছোটলোক' বলে অবজ্ঞাভরে তফাতে সরিয়ে রেখেছে। ভূপতি প্রথমে যতমত খেয়ে যায় মিহিরের বেশভূষা দেখে। মিহির বলে বাবু দিয়েছেন। ভূপতি অগত্যা মিহিরকে সম্ভাষণ করতে বাধ্য হয়। নানারকম দোষামুদে কথাবার্তা বলে চলে গেল।

'মিহিরের চোখ ফুটতে আর রক্ত গরম হতে যতটুকু বাকী ছিল ভূপতি রক্ষিত তোষামদ, করে তা সম্পূর্ণ আর সুতীব্র করে দিয়ে গেল।' পথ চলতে চলতে তার মনে পড়ে যায় ভূপতির অত্যাচারের কথা। এই ভূপতিই মিহিরের ঠাকুমা মিহিরের মায়ের মুখ দেখে সে সোনার মাকড়ী দিয়েছিল তার একটা তিন টাকায় রেখে তা দিলই না। শেষে এই সুসংবাদ নিয়ে সে বাড়ী পৌছায়। স্ত্রী হরিমতি বলল 'কষ্ট ঘুচল' মিহির বলে—"খালি কষ্ট ঘুচল? অনেক আপদ ঘুচল। ছিলাম দাস, হলাম প্রভু.......।"

দাস থেকে প্রভু হতে যে অনেক যুগ অপেক্ষা করার দরকার নেই জগদীশ গুপ্ত মানব মনের এই জটিল তত্ত্বটিকে সুন্দরভাবে মিহিরের উত্থানের মধ্যে দেখিয়েছেন।

তিন

পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক

মিহিব প্রমাণিক এই গল্পের কেন্দ্রীয় চবিত্র। তাকে ঘিরেই সমস্ত গল্প। তাকে দিয়েই শুরু এবং শেষ। মিহির প্রামাণিক 'Round character' অর্থাৎ তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে, প্রথমে যা ছিল শেষে তার আমূল পরিবর্তন আসে।

দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার জাহ্নবী দাশগুপ্তের পাইক শ্রী ক্ষেত্র'র মৃত্যুতে পাইকের পদটি খালি হয়। এই রকম পবিস্থিতিতে যখন জাহ্নবী তাঁর কদমচুলো মহুরী নিয়ে পাইক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন ঠিক এই বাছাই পর্বের শেষে মিহির প্রমাণিকের গল্পে আগমন। অত্যন্ত সাদামাটা ভাবেই, জমিদার প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে সে বসে আছে। সঙ্গে তার নাদুস নুদুস ছেলে। তার সেরকম কিছু কাজ নেই—সে মাথা হেঁট করে দেশলাইয়ের মাথা পোড়া একটি কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত শিথিলভাবে সেটাকে মাটিতে বুলিয়ে চলেছে। জমিদার তাকেই পাকাপাকিভাবে পাইক পদে অভিষিক্ত করলেন। আকস্মিকভাবে।

জমিদার যেমন আকস্মিকভাবে তাকে পাইক পদে বসালেন, মিহির ও আকস্মিক ভাবে নিজেকে বদলে নিল—

তার পরিবর্তন শুরু হল পথের মাঝে এবং অকস্মাৎ.........।

এর পরের কাহিনি মিহির প্রামাণিকের বদলে যাবার কাহিনি। যাকে প্রথম দর্শনে কোন সম্ভ্রম তো দূরের কথা, অতি সাধারণ নিরুপদ্রব, ছাপোষা মানুষ বলে মনে হয়, সেই মিহির প্রামাণিক পাইক হবার পর এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ বদলাতে থাকে। যেন মরা গাছে ফুল ফুটতে থাকে। মিহিরের পরিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়ে বাড়ী যাবার পথে যখন ভূপতি রক্ষিতে সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মিহিরের আমূল পরিবর্তনকে ভূপতি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সাথে দেখে। মিহির ও অত্যন্ত সুকৌশলে নিজের উত্থানের কাহিনি জানায়। চোখে দেখে ও ভূপতির ঠিক ঠাহর হয় না যে মিহির এখন পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক।

ক্ষমতা বরং বলা ভাল রাজাব ক্ষমতা, জমিদার জাহ্নবীর ক্ষমতা মিহিরের রক্তে

সঞ্চারিত হবার অব্যবহিত পরে গোবেচারা মিহির যে কিনা মুদি দোকান চালানোর সময় ধার বাকীগুলি আদায় করতে পারে নি, সেই মিহির চলতে চলতে, রাস্তায় যেতে যেতে সম্পূর্ণ অন্য মিহিরে পরিবর্তন হয়। জমিদারের লাঠি, চাপরাশ কিংবা পাগড়ি তাকে শুধু বহিরঙ্গে পাইক করে না মনে মনে সে সেই ক্ষমতা উপভোগ করতে থাকে। যখন বাড়ী এসে তার স্ত্রী হরিমতীকে এই সুসংবাদ জানায়—হরিমতী বলল—'যাক, কষ্ট ঘুচল। মিহির বলে—'কিছু বোঝো না। খালি কষ্ট ঘুচল? অনেক আপদ ঘুচল। ছিলাম দাস, হলাম প্রভু।'

এখানেই মিহিরের চরিত্রের উত্থান, যে উত্থান আকস্মিক হলেও অভাবিত নয়। লেখক বিশ্বাস করেন উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অত্যাচারিত, পীড়িত তারা ও নিজের যোগ্যতা যথাযথ ভাবে প্রমাণ করতে পারে। মিহির প্রামাণিক তাদেরই একজন।

জমিদার : জাহ্নবী দাশগুপ্ত

জমিদার জাহ্নবী দাশগুপ্ত দোর্দন্ড প্রতাপ জমিদার। বিচক্ষণ, বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। অত্যাচারী জমিদার বলে কারো কারো ধারণা। লেখক বলেছেন উপর উপর দেখলে অত্যন্ত তাই মনে হয়। কিন্তু জমিদার বন্ধুদের কাছে যা কৈফিয়ৎ দেন তা শুনলে নির্বিবাদে মতের পরিবর্তন করতে না হলেও হঠাৎ ধোঁকায় পড়তে হয়।

গল্পের সমস্ত পটভূমি জাহ্নবী জমিদারের কাছারীকে ঘিরেই। সেখানে তিনি স্বমহিমায় হাজির। একে একে পাইক পদের প্রার্থীরা আসে, তাদের যোগ্যতার পরিচয় দেয, আর জমিদার যথারীতি তাদের না মঞ্জুর করেন। শেষ প্রার্থী রমণ বায়কে যখন জমিদাব নাকচ করলেন মহুরী পর্যন্ত খানিকটা অবাক ও বিরক্ত হয়। সে বলে, 'সব কটিকেই ছেড়ে দিলেন বাবু। লোক একটি তো চাই-ই আপনার।'

জাহ্নবীর সপ্রতিভ উত্তর 'দেখা যাক। চাই-ই বলে তাড়াতাড়ি করে অনুপযুক্ত লোককে ত নিতে পারিনে।'

ঠিক তারপরেই তিনি আবিষ্কার করেন মিহির প্রামাণিককে যে খুব অন্যমনস্কভাবে উঠোনের ঠিক মাঝখানে বসে ছিল। কিন্তু জহুরীর চোখ। ঠিক সময়ে ঠিক লোককে খুঁজে বের করা। সভার সমস্ত লোক এমনকি মহুরী পর্যন্ত হেসে উঠেছিল মিহিরকে পাইকের পদে বসানোয়। কিন্তু প্রখর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জমিদার জাহ্নবী জানতেন মিহির-ই হবে তার সবচেয়ে কাজের লোক, সে পূবর্তন ক্ষেত্রর জায়গাটা নিতে পারবে। গল্পের শেষে জগদীশ গুপ্ত সে কথাই প্রমাণ করেছেন যেখানে 'মিহির হাত তুলে গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে অভিবাদন ধ্বনিত করলো, সেলাম, হুজুর। মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়াবে বসলেন........মহুরী তখন হাসছে।

চার

গল্পের প্লটটি আঁটোসাঁটো এবং ঠাসবুনুনযুক্ত। জগদীশগুপ্ত অত্যন্ত সাদামাটাভাবেই শুরু করেছেন তার কাহিনী যেখানে প্লটের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রথমে জাহ্নবী জমিদার বলে মনে হতে পারে। তাঁর গুরু গম্ভীর কথাবার্তা, জাঁকজমকপূর্ণ সভা প্লটের সমস্ত আলো নিংড়ে নিতে থাকে। ধীরে ধীরে আলো সরে আসতে থাকে এবং অকস্মাৎ লেখক আলো ফেলেন গল্পের মুখ্য চরিত্র মিহির প্রামাণিক এর উপর। প্রথমে জাঁকজমকপূর্ণ—জমিদার কাছারি এবং তার সমস্ত চরিত্রকে লেখক দেখান দূর থেকে, একটি ক্যানভাসের মধ্যে অনেক চরিত্র—জমিদার

জাহ্নবী কিংবা মহুরী ছাড়াও পাইকপদের প্রার্থী পাঁচজন। হঠাৎ গল্পের সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ে মিহিরের উপর। এবং তারপরে শেষ পর্যন্ত শুধুই মিহির পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক। কাহিনি পরিবেশনের এই ভঙ্গিটি জেম্‌স জয়েসের 'দি ডেড' গল্পের কথনরীতিতে পাওয়া যায়। The Dead-র গঠন ভঙ্গিটি ঠিক যেন পিরামিডের মত। প্রথমে প্রচুর চরিত্র, আস্তে আস্তে চরিত্রগুলি বাছাই হতে হতে একটি বা দুটি চরিত্র যাদের নিয়ে গল্প।

কাহিনি যেহেতু মিহিরকে ঘিরেই, সেইজন্য জগদীশ গুপ্ত মিহিরকে দুটি foil সৃষ্টি করেছেন যারা মিহিরের চরিত্রটিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। তারা হচ্ছে এক. ক্ষেত্র জমিদারের পূর্বতন যোগ্যতাসম্পন্ন পাইক। দুই. ভূপতি-রক্ষিত যে চিরকাল মিহিরদের 'ছোটলোক' বলে অবজ্ঞাভরে তফাতে সরিয়ে দিয়েছে। ক্ষেত্র আমাদের বুঝতে সাহায্য করে পাইক হতে গেলে কতটা যান্ত্রিক, হৃদয়হীন হতে হয়—মিহির ঠিক তা পারবে কিনা। ভূপতি রক্ষিতের তোষামুদে কথাবার্তা মিহিরের পাইক সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। এমনিতেই জমিদারের ক্ষমতা পাওয়ার পর সে মনে মনে ভাবছিল—'এখন জমিদারের পাইক সে অর্থাৎ জমিদার যে ক্ষমতা পরিচালনা করবার হকদার, যে ক্ষমতা প্রতিরোধ করবার বিরুদ্ধে ক্ষমতা কারো নেই........সেই দুঃসহ ক্ষমতার সে মূর্তি।' যে ভূপতি রক্ষিতরা তাদের এতদিন শাসন শোষণ করে এসেছে আজ সময় হয়েছে তাদের জব্দ করবার। ভূপতি এখানে Catalist বা অনুঘটকের কাজ করেছে। মিহির মনে মনে যা ভাবছিল ভূপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তার সম্ভ্রম, তার তোষামোদ মিহিরের ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আর সে কারণেই তার স্ত্রী হরিমতিকে সে গর্বের বস্তুটি তারিয়ে তারিয়ে বলে। অত্যন্ত সাধাসিধে হরিমতি অন্নকষ্টের অবসানের কথা বললে মিহির তাকে তার ক্ষমতার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়—'ছিলাম দাস, হলাম প্রভু'।

জগদীশ গুপ্ত আশ্চর্য দক্ষতায় দীর্ঘ সময়ের ঘটনাকে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও কাহিনির শুরু পাইক পদের উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে, কিন্তু ঘটনা ক্রমে ক্ষেত্রর কর্মকুশলতা, জমিদারের আপাত কঠোর কিন্তু প্রজা বৎসল হৃদয় দু একটা ছোট বড় অনুচ্ছেদেই নিপুণভাবে ধরা পড়ে। মিহিরের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় তা তার ছেলেটিকে সঙ্গে জমিদার বাড়িতে আসার ঘটনায় বোঝা যায়, কিংবা হরিমতির প্রথম প্রতিক্রিয়াতে যখন সে স্বামীর পাইক হবার সুসংবাদটি শোনে।

পাঁচ

হতদরিদ্র মিহির প্রমাণিকের 'পাইক' শ্রী মিহির প্রামাণিক হবার নামই "পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক"। দাস থেকে প্রভু, শোষিত শোষকে রূপান্তরভবনের ইতিহাসই হচ্ছে এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। জগদীশ গুপ্ত মানুষের চরিত্রের ভালো এবং মন্দ দু'দিককেই গুরুত্ব দিলেও তিনি প্রধানত মন্দদিকটিকে বেশী আলোকপাত করেছেন। তিনি William Golding এর মতো বিশ্বাস করেন, 'Evil is innate or in born'—যথাযোগ্য পরিবেশ পেলে Evil তার নিজের রূপ প্রকাশ করে। ছাপোষা মিহিরের মধ্যে যে পাইক হবার যাবতীয় মালমশলা মজুত তা বিচক্ষণ জাহ্নবী দাশগুপ্ত ছাড়া আর কেউ-ই আঁচ করতে পারেনি। মহুরী-তো হেসেই ফেলল। সে যুক্তি দেখায়, যে তার নুন তোলার দোকানের ধার আদায় করতে পারে না,

সে কিনা জমিদারের খাজনা আদায় করবে? গল্পের শেষে লেখক সেই চমকটাই দেন—যখন মিহির পুরোপুরি 'পাইক'—কথায়, বার্তায়, চলায়, বলায়-। তখন মহুরী নির্বোধের হাসি হাসে।

জগদীশ গুপ্তের ভাষার ব্যবহারও গল্পটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ছোট বড় বাক্যের মিশেল চরিত্রগুলিতে বুঝতে সাহায্য করে। প্রার্থী বাছাইয়ের সময় জমিদার গম্ভীর ভাবে শুধু উত্তর দেন—'বাদ দিন'। এই ছোট্ট বাক্যটিতে তার প্রতাপের পরিচয় মেলে। অন্যদিকে মহুরীর বেলায় লেখক অনেক উদার, তিনি অনেক বাক্য, লম্বা বাক্য ব্যয় করেন, যেটা মহুরীর প্রগলভতাকে বুঝতে সাহায্য করেছে। লেখকের ভাষার প্রসাদগুনেই পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিকের অতীতটা কত শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, কিংবা ভূপতি রক্ষিতরা চিরকাল কেমন ঠকিয়েছে অল্প দু' একটি অনুচ্ছেদেই সহজেই ধরা পড়ে। মিহিরের ছোট বাচ্চাটিকে জমিদার বাড়ীতে সঙ্গে করে নিয়ে আসা তার দারিদ্র্যের দিকটিকে প্রকাশ করে। মিহিরের মায়ের মাকড়ি বন্ধক রাখা এবং ফেরৎ না পাওয়া তার শোষিত বঞ্চিত অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ভাষার ক্ষেত্রে লেখক আবেগহীন। কোথাও আবেগ বা উচ্ছাসপূর্ণ বাক্য নেই। এমনকি মিহির পাইক হবার পর ও সংযত, মার্জিত। ভূপতি রক্ষিতরা যারা চিরকাল ঠকিয়ে এসেছে তাদেরকে সে জব্দ করবে কিন্তু তার প্রকাশ সে করে না। শুধুমাত্র হরিমতির কাছে যেটুকু উচ্ছাস বা আনন্দ সে একটি বাক্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। জগদীশ গুপ্ত অত্যন্ত সচেতনভাবেই নির্মোহ, ভাবলেশহীন, নির্মেদ, 'straightforward' ভাবে গদ্য ব্যবহার করেছেন। এভাষা আধুনিক ভাষা, এ ভাষা গতিশীল ভাষা। "পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক" আদ্যন্ত ঠাসবুননযুক্ত, নিটোল কাহিনিযুক্ত। গল্পটিকে আরো সুসংহত রূপে পরিবেশনের ক্ষেত্রে লেখকের কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, ভাষার ব্যবহার সর্বোপরি তার নির্মোহ জীবনদর্শন গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে এমনভাবে সাজিয়েছেন যা গল্পের শেষে পাঠককে অন্য এক উচ্চতায় পৌছে দেয়, তখন মহুরীর মত আমরা ও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

সুলভ মৃত্যু : নাস্তিবোধের অমোঘ উচ্চারণ

নির্মাল্য মণ্ডল

গল্পের নাম—"সুলভ মৃত্যু"। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ "দেশ" পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়।[১] এখনও পর্যন্ত জগদীশ গুপ্তের কোনো গল্প সংকলনে বা রচনাবলীতে স্থান না পাওয়ায় গল্পটিকে তাঁর বহু অগ্রন্থিত গল্পেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা যায়।

একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবার, প্রাচুর্য উপচে পড়া ভরা সংসারে সুখের কোনো অভাব নেই। জাগতিক জীবনে মানুষ মোটামুটিভাবে যা পেলে তার সৌভাগ্য সংসারের কাছে যুগপৎ সমীহ ও ঈর্ষার বিষয় হতে পারে তার কোনো কিছুই এই সংসারটিতে দুর্লভ নয়। একটি নিটোল পরিবার, পরিপূর্ণ ধন ও ধান্য, ভয়-ভক্তি-ভালবাসার যথাযথ পারিবারিক সম্পর্কবন্ধন, শ্রম ও সঞ্চয়, ভোগ ও পরিমিতি, কর্তব্য ও হৃদ্যতার মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিবারটি জীবনে একটি চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। স্মরণকালের মধ্যে মাত্র একবারই অভাবিতভাবে কিছু আর্থিক ক্ষতি হওয়া ছাড়া তাদের সৌভাগ্যে আর কোনো কলঙ্করেখা পড়েনি। এই পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী সর্বমঙ্গলা। তাঁর একটি অদ্ভুত মুদ্রাদোষ। কাজে-অকাজে, উৎকণ্ঠায়-স্বাভাবিকতায়, প্রাত্যহিক নানা ঘটনাসূত্রে তাঁর অভ্যস্ত জিহ্বা উচ্চারণ করে—'মরণ হলে বাঁচি'। নিতান্তই কথার কথা কিন্তু একদিন এক বৃদ্ধা ভিখারিনি ভিক্ষাগ্রহণকালে শ্রুত এই বাক্যে গৃহিণীর অনির্দেশ্য বেদনাজাত বৈরাগ্যের আভাস পেয়ে বিস্মিত হয়, নিজেকে দিয়েই সে বোঝাতে চায় যে, এত দৈন্য-দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও মানুষ জীবনে বেঁচে থাকতেই চায়। এরপর থেকেই ভিখারিনি বহুদিন আসেনা, তার মৃত্যুর সম্ভাবনা চিন্তা করে সর্বমঙ্গলা বলেন—'মরণ হলে বাঁচি'।

"সুলভ মৃত্যু" গল্পে লেখকের বক্তব্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চরিত্ররা সেই বক্তব্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; ঘটনাধারাও তদনুরূপ। প্রচলিত গল্পের চেনা ছকটি এখানে প্রায় অনুপস্থিত। গল্পে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাবলম্বনের পরিবর্তে একটি পরিবারের নিস্তরঙ্গ সহজ সুখী জীবনের স্কেচটিকে তিনি উপস্থিত করেছেন; কিন্তু আপাত-সরল গল্প কাঠামোটিই সংশয় সৃষ্টি করে যে, যা স্পষ্ট বলা হল তাই-ই সব নয়, ব্যঞ্জনার মধ্যে নিহিত রয়েছে আরো কিছু।

লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্ন গৃহ, ফলন্ত উর্বর জমি, বৃহৎ পরিবার ও অটুট পারিবারিক সম্পর্কে শক্তি ও সৌভাগ্যের দ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ছে। কেউ অসাধারণ বিলাসী নয়, আবার ভিখারিকে দরজা থেকে তারা ফিরিয়েও দেয় না। তবু এই কি সব? নিরাপদ নিশ্ছিদ্র জীবনবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করেছে কিছু বিপরীত চিত্র, লেখক সুকৌশলে অথচ আপাত উদাসীনভাবে ছবিগুলিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। যত্নে রক্ষিত নোটগুলি উইতে নষ্ট করে; রক্তকরবীর গোড়ায় জমা আবর্জনায় পরিবারটির সৌন্দর্য জ্ঞানের ঘাটতি বোঝা যায়, সর্বমঙ্গলার মাথার চুলগুলি ঝরে পড়ে জীবনের অকিঞ্চিৎকরতাকেই আর একবার প্রমাণ করে। বধূদের অকুণ্ঠ সেবা-ভক্তির মধ্যেও গৃহিণীর মনে ভবিষ্যতের বার্ধক্যের দিনগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আর অস্বস্তি জেগে থাকে, ক্লান্ত অতিষ্ঠ প্রিয়জনেরা যেদিন তাঁর মৃত্যু চাইবে সেদিন—'তবু মরণ হইবে না।' মৃত্যু তাহলে যন্ত্রণাহর

ত্রাতার বেশে আসে না, আসে বেদনা-আতঙ্ক-অনিশ্চয়তার কণ্টকরূপে। তাই সর্বমঙ্গলার মনে জীবনের সুখের অনিত্যতা, ভবিষ্যতের দুরবস্থার দুর্ভাবনা জাগে, বর্তমানের আনন্দময় অস্তিত্বতেও ছায়া ফেলে; অবচেতন সত্তার এই আশঙ্কাই মুদ্রাদোষের মতো বারবার ফিরে এসে কাম্য সুস্থিরতাকে ভেঙে দেয়, অন্যদিকে ভিখারিনি শীতে মরলেও আয়ুতে মরতে চায়নি—'তোমাদের দিকে তাকিয়েই আমার ঢের সুখ। সেই সুখেই আমি মরতে চাইনে।' জরাগ্রস্ত দেহে, শূন্য জঠরে, জ্যোতিহীন দৃষ্টিতে নতুন করে আঘাত হানার কোনো স্থান নেই। তাই নিয়তি মৃত্যু নামক অমোঘ অস্ত্রটি দিয়েই তার বেঁচে থাকার একমাত্র আকাঙ্ক্ষাও ধূলিসাৎ করে দিল। জাগতিক জীবনের সমাপ্তিতে এই মার অবশ্য সর্বশেষ মার: তার আগে জীবনে নানান উপলক্ষ্যে, নানান মুহূর্তে তার অমোঘ পদধ্বনিকে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে উপস্থিত করে যে তিলে তিলে মার—মৃত্যুর সেই সুলভতাই তো এই গল্পের প্রতিপাদ্য। লেখকের এই মানসিকতা ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন,—'মনে হয় জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার।'[২]

জীবনের এই পরিণতির মধ্যেও হয়তো অনেকে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মহত্তম দিককে, তার ব্যর্থতার মধ্যেও ট্র্যাজেডির গৌরবকে চিহ্নিত করবেন, কিন্তু ক্ল্যাসিক সাহিত্যে বর্ণিত নায়কের ট্র্যাজেডিতে বড় কিছুর জন্য লড়াইকেই ব্যক্ত করা হয়। এই গল্পে শুধুমাত্র ভাত-কাপড় জীবনের বস্তুগত আর দেহগত সুরক্ষাটি বজায় রাখার জন্য যে আর্তি তা বড়ই স্থূল! যে দুর্ভাগা মানুষ নিজের জীবনে এই তুচ্ছ বিষয়গুলিকে সুনিশ্চিত করতে পারে না—অত্যুচ্চ কোনো নীতি আদর্শকে নিশ্চিত করার যোগ্যতা তার আছে কি?

গল্প হিসেবে "সুলভ মৃত্যু" ব্যঞ্জনাপ্রধান। সূক্ষ্ম কৌশলে তির্যক ভঙ্গিমাকে গল্পে নিগূঢ় রেখে তিনি আপাত সরল একটি কাহিনি বলেছেন—একটি পরিবারের সুস্থ অনাবিল জীবনধারাটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য—জীবনের বাস্তবকে বর্ণনা, নামকরণ, সর্বমঙ্গলার মুদ্রাদোষ, ভিখারিনির রিক্ততার দীর্ঘ বর্ণনা, নোটগুলির উইয়ে মাটি করার মতো ঘটনায় তার ইঙ্গিত। বেঁচে থাকতে আগ্রহী সবাই—ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করা ভিখারিনি পর্যন্ত! এই সামান্য ভিক্ষা আদায়ের জন্য তাই প্রার্থীদের কত 'ছল বেশ কৌশল আর দাতাকে সন্তুষ্ট করিবার ফিকির', ইহজীবন যাদের কিছুই দেয়নি—বরঞ্চ অপমানই করেছে, তারাও জীবনের জন্য লালায়িত! লোকের ব্যঙ্গ আর কৃপায় বেঁচে থাকার মধ্যে হীনতা থাকলেও তা সত্য এবং অনিবার্য বলেই ভালমন্দের বিচার না করে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বিষয়টি তিনি উপস্থিত করেছেন। অবশ্য গল্প-পরিবেশনের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন তির্যকতা সেটি তাঁর ব্যক্তি অনুভূতির সঙ্গেই জড়িত।

এখন প্রশ্ন হল,—এরূপ মনোভাবের কারণ কী? জীবনের ভঙ্গুরতাকে জেনে চিনেও মানুষ জীবনকে প্রতিমুহূর্তে এত নিখুঁত পরিপাটি করতে চায়, এত আশা নিয়ে বাঁচে বলে এই বৃথা প্রয়াসকে কটাক্ষ করতে চেয়েছেন? নাকি সর্বমঙ্গলার মুদ্রাদোষটির মধ্যে লেখক একজাতীয় অব্যর্থ কাতরতার সন্ধান পেয়েছেন যে—প্রতিমুহূর্তের যন্ত্রণাময় আশঙ্কার থেকে মুক্তি পেতে সেই সর্বশক্তিমান চিরজয়ী মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণই শ্রেয়? গভীর

বিফলতাবোধ মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তায় যে যন্ত্রণা বয়ে আনে এখানে কি তারই অবচেতন উচ্চারণ ঘটেছে? তাঁর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কোনো শৌখিন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি—বরঞ্চ নিজস্ব জীবনবোধ দিয়েই জীবনের এই মৌল সমস্যাটিকে তিনি চিনতে পারেন। এই বোধই তাঁকে মানুষ বিষয়ে কোনো রোম্যান্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেনি। মৃত্যু নামক প্রবল শক্তিধরের নিশ্চিত স্বেচ্ছাচারিতার সামনে জীবিত মানুষের আপনার জীবনচক্রকে অক্ষম বেদনায় ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু করার আছে কি? অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে একটি অব্যর্থ মন্তব্য করেছেন—'তিনি মানুষকে স্বসীমা সম্পর্কে সচেতন করেছেন।'[৩]

যে কোনো গল্পকারের সারাজীবনের সৃষ্টিকে একত্রিত করলে দেখা যাবে যে, বিষয় রীতি ও বক্তব্যের দিক দিয়ে বহু গল্পের মধ্যেই সাধর্ম্য রয়েছে। "সুলভ মৃত্যু"-ও এক্ষেত্রে একক নয়; নশ্বরতাবোধ এবং অদৃশ্য অমোঘ কোনো শক্তির হাতে পরাভূত, বিধ্বস্ত মানবচেতনা! মৃত্যু শুধু জীবনাবসান নয়, মৃত্যু এই জীবনে মানুষের যাবতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার প্রতীক। দশটাকার পাঁচটি নোটকে নিভৃত নিরাপত্তার মধ্যে রেখে তারা নিশ্চিন্ত ছিল—'কিন্তু শত্রু আক্রমণ করিল সম্পূর্ণ অন্যদিক হইতে'। সামান্য উইপোকা সম্পূর্ণ অভাবনীয় পন্থায় নোটগুলিকে মাটি করে দিল। অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে "দিবসের শেষে" গল্পেও; পাঁচুর ভয় এবং তার বাবা-মার আতঙ্ক-অস্বস্তি যখন দিনের শেষে অবসিত প্রায়, তখনই তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত করে নিরীহ কামদা নদীতে মৃত্যুদূত কুমীর এসে পাঁচুকে নিয়ে গেল। "তৃষিত আত্মা" গল্পে মৃত সীতাপতি রহস্যময় অপার্থিব শক্তির প্রতিরূপ। তাঁর মৃত্যুর পর প্রিয় নাতিটির প্রাণশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে যেতে লাগল এবং সেই ব্যাখ্যাহীন পরিস্থিতির সামনে জীবিতজনেরা শুধু আতঙ্ক বিহ্বলাবস্থায় নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা পালন করে যেতে বাধ্য হল। "ভরা সুখে" গল্পে হরিমোহিনীর গোছানো সুখের সংসার যখন মুমূর্ষু রোগিনীকে জীবনের উপকূলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার আনন্দে বিভোর, ঠিক তখনই —অন্নপথ্য করবার স্বর্গীয়ক্ষণেই তাঁর হৃৎস্পন্দন আচমকা বিনা নোটিশে স্তব্ধ হয়ে গেল। "শুভাশুভ" গল্পটি কিছুটা লঘু ভঙ্গিমায় বিবৃত; অনাথের মেসোমশায়ের বার্ধক্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে নানা উপদ্রবের পর নতুন করে দাঁত গজিয়েছিল। যৌবনকে ফিরে পাবার আনন্দে তিনি নবোদগত দাঁতের মাধ্যমে আপন শক্তি ও স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতে লাগলেন; কিন্তু ভুলে গেলেন যে, পাকস্থলিটি পুরনো, জীর্ণ; ফলে গুরুভোজেই তাঁর মৃত্যু হল। যে দাঁত ছিল তাঁর নবজীবনের প্রতীক, —তাই তাঁর জীবন হরণ করল। "সুলভ মৃত্যু" গল্পের ভিখারিনি ক্ষুধায় ক্লান্ত, জরাগ্রস্ত, শীতার্ত-শরীরটিকে নিয়েও বাঁচতে চেয়েছিল; কিন্তু সে শরীরও একদিন তার ইচ্ছার মূল্য না দিয়ে অচল হল। একইভাবে "শেষ খরচ" গল্পে আছে একটি হিসেবের খাতার সূত্রে ক্ষীণজীবী দরিদ্র একটি মানুষের ওপর দৈব-নির্যাতনের করুণ কাহিনি। 'বাঁচবার আর বাঁচাবার চেষ্টায় বিমুখ অদৃষ্টের সঙ্গে কি প্রাণপণ কঠোর সংগ্রামই সে করেছে।' তবু জীবনের হিসেবের অঙ্কে তার সঞ্চয়ের ঘরে জমা পড়েছে শূন্য আর খরচের ঘরে স্ত্রী কন্যাসহ সমগ্র সংসার। উদাহরণ দিতে গেলে এরকম বহু গল্প প্রসঙ্গই আংশিকভাবে আসতে পারে। আসলে "সুলভ মৃত্যু" গল্পে তাঁর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন কিছু

নয়, যে জীবনের মহিমা-কীর্তনে মানুষ উচ্চকণ্ঠ, তারই ভঙ্গুর চিত্ররূপকে কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো আভাসে তিনি এসব গল্পে বারবার উপস্থিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগদীশ গুপ্তের "বিনোদিনী" গ্রন্থটি পড়ে বলেছিলেন,—"ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।"[৪]

বাস্তব জীবন ঘেঁষা শিল্পী বলেই তাঁর গল্পরূপকে আলঙ্কারিক কারুকর্ম দ্বারা আকর্ষণীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত করার কোনো চেষ্টা নেই। এই প্রসঙ্গে একটি পত্রে তিনি উল্লেখ করছেন,—

"...আর যদি সেগুলি গল্প না হয় তবে সূক্ষ্ম কারুকার্য, কবিত্ব এবং সৌন্দর্য যতই ফুটাই আর মাখাই, সেটা কাপড় পরানো ছবির মতো দেখিতে হইবে।"[৫]

আলোচ্য "সুলভ মৃত্যু" গল্পে গল্প বলার প্রথাগত ঢং-টিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেননি। লেখক যেন কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন—উদাসীন অবহেলায় সেগুলিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন—গুছিয়ে বলার তাগিদই যেন তাঁর নেই। দ্বিজদাসের পরিবারটির অবস্থা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন,—'লক্ষ্মীশ্রী বাড়ির কোথায় থাকে তাহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার উপায় নাই, কিন্তু সংশয়াতীতভাবে অনুভব করা যায় যে, আছে। মানুষের মুখে থাকে কতক, মনে কতক, মাটিতে কতক, গোলায় কতক, দুয়ারে কতক, দাওয়ায় কতক, হৃদ্যতায় কতক, ভক্তিতে কতক.........সে ছড়াইয়া থাকে।' মনে হয়, অতি অলস ভঙ্গিতে লেখক কাহিনি বলে চলেছেন, বলারও যেমন তাড়া নেই, বলার বিষয়েরও তেমন ওজন বা গুরুত্ব নেই; কিন্তু আপাত নিরাসক্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ও সতর্ক একটি মন মনোযোগের সঙ্গে চিহ্নিত করে যাচ্ছে জীবনের দুর্বলতা, নঞৈর্থকতাকে। তাই এত বিপরীত চিত্রের ছড়াছড়ি! রূপকথার গল্প বলার মতোই তিনি একটি সুনিশ্চিত জীবনের গল্প বলে চলেন—'এরা খুব বড় গৃহস্থ। তিন বাপ-বেটা।........তাহারা বহু জমির মালিক।......নগদ টাকা এরা ভাঁড়ে করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, আর ধান ভরে গোলায়.......বউয়েরা ভাল ভাল কাপড় পরে—........সুতরাং এরা পরম সুখে আছে।' গল্প বলার ভঙ্গিমাও প্রায় রূপকথারই মতো; তবু এই স্বপ্নবৎ সুখের বর্ণনায় পূর্ণ এক একটি অনুচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁকে নিতান্ত বেমানান একটি করে বাক্য এসে যায় বারবার—'কিন্তু একবার বড় ক্ষতি হইয়াছিল।......এই দুঃখটা ওরা পাইয়াছিল........কিন্তু সৌন্দর্যজ্ঞান ইহাদের কম।'—এই জাতীয় বাক্যের আচম্বিত উচ্চারণে একটি অশুভ ইঙ্গিতের ছায়া ঘনাইয়া আসে। এখানেই শেষ নয়; আলোর অন্যদিকে অন্ধকারের মতোই পৌষের ধান গোলাজাত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পৌষলক্ষ্মীর হাত ধরেই যেন অশক্ত জীর্ণ ভিখারিনির অনিবার্য আবির্ভাবটি ঘটে। মাটির সরায় একমুষ্টি চাল—বুভুক্ষু দৃষ্টিতে মুষ্টিভিক্ষার জন্য ভিখারিনি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে—'দান আসিতেছে—দান আসিল'। কিন্তু সরার চালটুকুর সঙ্গে সঙ্গে কৃপার দানে বেঁচে থাকার অব্যর্থ যন্ত্রণাটি যেন ভিখারিনির হয়ে স্বয়ং দাত্রীই উচ্চারণ করলেন—'মরণ হলে বাঁচি।'

জগদীশ গুপ্তের অন্যান্য বহু গল্পের মতো এ গল্পেও সূচনা গতি-সমাপ্তি পূর্ণ একটি পরিচিত ছক নেই। স্কেচধর্মী গল্পে টুকরো অনুচ্ছেদগুলি আপাত বিচ্ছিন্ন, কিন্তু অন্তস্থলে অর্থসূত্রে পরস্পর গভীরভাবে লগ্ন। গল্প যেখানে মূলতঃ বক্তব্যপ্রধান এবং সে বক্তব্যেও

জীবনবিষয়ক নেতির সুরটিই জোরালো সেখানে ঘটনার ঘনঘটা, উপস্থাপনের অভিনবত্ব, ভাষার উষ্ণ আবেগ এবং মনোরম ভঙ্গিমা-বর্জন করাই স্বাভাবিক। উচ্ছ্বাসহীন, সংযত, শ্লেষাত্মক ভাষার উপস্থিতিও তাঁর গল্পের ভাবের সঙ্গে যথাযথভাবে সঙ্গত করেছে। কখনো শ্লেষের মধ্যে গভীর বেদনাও অন্তঃশীলভাবে প্রবাহিত,— 'ভিখারীর কাঁড়া-আকাঁড়া বাছিতে নাই.......প্রার্থী এই অবহেলার জন্য কাহাকেও অপরাধী করে না।' সাধুভাষার ভার ও মন্থরতা যেন অমোঘ সুনিশ্চিত জীবন-সত্যটিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে,—'ইহার আত্মার অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা কেবল ক্ষুধা-নিবৃত্তির—সে বাঁচিতে চাহে—আত্মরক্ষার জন্য তার ভিক্ষা চাই, এবং এই চাহিদা নিদারুণ......।'

কোনো কোনো স্থানে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে একটি চিত্র বা ভাবকে আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ভিখারিনির দেহে আগত জরার অভ্রান্ত বর্ণনা যেমন—'শরীর শুকাইয়া গেছে আর ত্বক এমন কুঞ্চিত যে, টানিয়া না ধরিয়াই দেহে সূঁচ চালান যায়।' কৃপার দানের মধ্যে যে অবহেলা আর বঞ্চনার ভাব ভিক্ষার চালের বর্ণনায় তা জীবন্ত—'ভিক্ষাপাত্রে দুমুষ্টি চাল রহিয়াছে—তার কতকগুলি প্রায় কালো, কতকগুলি প্রায় সাদা।'

গল্পের আকস্মিক সমাপ্তিটিও অভিনব। গল্প শেষ হয়নি ভেবে পাঠক ভুল করে পাতা ওল্টাতেই পারেন। একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ পরিণতি বিষয়ক বর্ণনা (যা কিনা গল্পবিষয়ক সাধারণ ধারণাসম্মত) তাঁর লক্ষ্য নয়; তাই ভিখারিনির মরতে না চাওয়া মুমূর্ষু দেহটির অবসানের ইঙ্গিতদান আর সর্বমঙ্গলার অতি কথিত বাক্যটিতে মানুষের নিস্তারলাভের উপায়হীন অসহায়তাকে উল্লেখ করেই গল্প শেষ হয়।

কবি কালিদাস রায় 'সুতিনী' গ্রন্থের ভূমিকায় জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে বলেন, —''যাঁহারা কেবল সমতল পথেরই পক্ষপাতী তাঁহারা বন্ধুর পথে কেবলই হুঁচোট খাইবেন।.......তিনি কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-গৌরবকেই স্পৃহনীয় মনে করেন বলিয়া আর পাঁচজনের মতো সরল লোকরঞ্জন ভঙ্গিতে লেখেন না।''[৬] সত্যই তাঁর গল্পে প্রথাগত শিল্পকৌশল, —গল্প লিখছি এই ভাবটি— এত কম যে, পাঠকের কাছে তা অন্যরকম মনে হতে বাধ্য। একথা ঠিক যে, তাঁর অন্য বহু গল্পে যে প্রখর দাহ, তীব্র আক্রমণ থাকে, তাঁর এ গল্পে সেটি তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু অন্যান্য গল্পের মতো এখানেও জীবনকে মোহমুক্তভাবে বিশ্লেষণ, ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত তির্যকতা ও জীবনের ওপরে অজ্ঞাত নিয়তির স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়ে ক্ষুব্ধতার পরিচয় আছে।

গল্পের মধ্যে শব্দ নির্বাচনে, বাক্যবিন্যাসে, শিথিলতার আড়ালে সতর্ক ইঙ্গিতগুলিও লক্ষ্য করবার, সর্বমঙ্গলার গৃহের সৌভাগ্য বর্ণনা প্রসঙ্গটি স্মরণীয়—'গৃহিণী সধবা—মহাকাল হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহারই হাসাচ্ছটা দগ্‌দগ্ করিতেছে এই গৃহিণীর ললাটে, শঙ্খ বলয়ে.........ইহাও সুখ—বাঁচিয়া থাকার সুখ, বজায় থাকার সুখ, পাওয়ার সুখ, দিতে পারার সুখ........আছি, ধ্বংস স্রোতের মাঝে একটি পুষ্পিত দ্বীপের মত আমরা আছি।' এখানে 'দগদগ' শব্দটি অত্যন্ত বিশিষ্ট, শব্দটিতে প্রসন্নতা ফোটেনি, বরঞ্চ কোথাও যেন সুখের বাড়াবাড়িরকম উচ্ছলতার মধ্যে একটি অমঙ্গলের সংকেত বয়ে এনেছে। 'মহাকাল'-এর উল্লেখও নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতবহ। একটি সাধারণ গৃহস্থঘরের বর্ণনায় 'মহাকাল'কে টানাটানি কেন? ছোট প্রাপ্তি, ছোট আনন্দকে মানুষ পরম বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরে, অথচ বিপুল সময়চেতনার নিরিখে এই ধন কত

অস্থায়ী! অনিশ্চিত! অনির্ভরযোগ্য! এই ভাবনাটিই জোরদার হয় উল্লিখিত অংশের শেষ বাক্যটিতে, বিশ্বজুড়ে প্রবহমান জীবনের স্বরূপটি তাহলে এই 'ধ্বংসস্রোত'! মধ্যে 'পুষ্পিত দ্বীপ'টি একটি নিশ্চিত সংসার—তার চারপাশে কুটিল মৃত্যুর প্রবাহ! ভয়াল ঢেউয়ের আহ্বান! এরই মাঝে এই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপে সুখের নিঃসঙ্গ আয়োজন বড়ই অনিশ্চিত নয় কি? এই ভয়ঙ্কর নশ্বরতাবোধের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন করে উপলব্ধি হয়— এই সংসারে মৃত্যুই একমাত্র সুলভ! দুর্লভ তাহলে কী? জীবনে সুখের স্থায়িত্ব, স্বস্তি, ইচ্ছার বাস্তবায়ন।

জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ গল্পের বিষয় হিসেবে মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল অন্ধকার চোরাগলি, মানুষের যৌনকামনা, অপরিসীম স্বার্থসর্বস্ব নীচতা, রহস্যময় অদৃষ্ট দ্বারা চালিত মানবজীবনের সংকট ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। জীবন সম্পর্কে আশা-আনন্দ-আশ্বাসের কথা সেভাবে তিনি শোনান নি। 'কল্লোল' পর্বের লেখকেরা কঠিন বাস্তবের চর্চা করলেও তাঁদের রচনায় নেতিবাচক সুর এত দৃঢ় ও নিস্পৃহ কাঠিন্যের সঙ্গে ধরা পড়েনি। অবশ্য "সুলভ মৃত্যু" গল্পের কথনভঙ্গিমা নিরাসক্ত হলেও রূঢ় নয়। তবু এ গল্পে সুখের নিরেট বুননের মধ্যেও অনিশ্চয়তাবোধ মিশে রয়েছে। এমনকী, যাবতীয় উদ্বেগ, যন্ত্রণার বিষকে গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়েও যে বাঁচতে চেয়েছিল তারও নিষ্কৃতিলাভ ঘটল না। তাই গল্পের পরিণামে পৌঁছে সংসারের সুখেব, সৌন্দর্যের চিত্রটি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায় এবং গল্পকার একপ্রকার শূন্যতাবাদী দর্শনে এসে গল্পেব সমাপ্তি টানেন। একবিন্দু জলেই যেমন লবণাক্ত সমুদ্রের পরিচয় মেলে, তেমনি "সুলভ মৃত্যু" গল্পেও গল্পকারের মনের গহনলোকের কিছুটা আভাস পাঠক লাভ করেন।

ঘটনাচক্রে জগদীশ গুপ্তের "সুলভ মৃত্যু" গল্পটি নিয়ে ডঃ সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল। জগদীশ গুপ্তের জীবনবোধ ও গল্পটিব রসোপলব্ধিতে তাঁর আন্তরিক সহায়তাকে এই প্রবন্ধে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে শ্রদ্ধাপূর্ণ ঋণস্বীকার একান্ত কর্তব্য।

উর্মিলার মন : নিরীক্ষণের আলোকে

সোমদত্তা ঘোষ (কর)

'পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক' গল্পসংগ্রহের (১৯৩৫) অন্তর্ভুক্ত গল্প 'উর্মিলার মন'। জগদীশ গুপ্তের রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অনেক গল্পে কাহিনী প্রাধান্য পায় না, চরিত্রের নানা সঙ্কটকে ঘিরে কাহিনি তৈরী হয়, যা গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'উর্মিলার মন' গল্পটিও চরিত্রের জটিল মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র উর্মিলা এবং তাকে সাহায্যকারী চরিত্র ললিতার পারস্পরিক নিবিড় সখ্যতা দিয়ে গল্পের সূচনা। সেই সখ্যতার জাজ্বল্য প্রমাণ উভয়েই তাদের সন্তানের কাছে 'বড়মা-শ্রেষ্ঠতর।' তাদের সামঞ্জস্যের নিদর্শন 'বিবাহ'ও যেন দৈবনির্দেশিত। তারা মনে করে তাদের এই বন্ধুত্ব চিরদিনের। এমন অবস্থায় উর্মিলার জীবনে ঘটে যায় পরপর দুটি বিপর্যয়—গর্ভস্থ অবস্থায় উর্মিলার স্বামী অমিতাভের মৃত্যু এবং তারপর উর্মিলার কাছে যা ছিল স্বামীর সত্তার শেষ নিদর্শন, সেই গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু। এই আকস্মিক দুটি মৃত্যু উর্মিলাকে দাঁড় করিয়ে দিল এক চরম, কঠিন বাস্তবের সামনে। অন্য সন্তান জীবিত থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে মনে করে নিরাবলম্ব, নিরাশ্রয়। বিধাতার দেওয়া এই আকস্মিক আঘাতে উর্মিলার মনে যে নৈঃসঙ্গ, নৈরাশ্যবোধের জন্ম নিল, তার রূপান্তর প্রতিহিংসায়। কিন্তু প্রতিহিংসার পাত্র বিধাতা নন কারণ তিনি অদৃশ্য। "তার দৃষ্টি যাইয়া পড়িল ললিতার উপর। ললিতা তার প্রিয়তমা।" সেই প্রিয় বান্ধবী হয়ে উঠল তার আক্রোশ প্রকাশের স্থল এবং এতদিনকার প্রণয় "আজ উর্মিলাকে ললিতার দিকে টানিতে লাগিল বক্রভাবে........আজ সেই প্রণয়কেই কেন্দ্র করিয়া উর্মিলার অপ্রকৃতিস্থ মন আবর্তন শুরু করিয়া দিয়াছে.....।" এখানেই বলা যায় গল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। কাহিনী যেন উর্মিলার মনের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন দিকে যেতে শুরু করল। ললিতাকে নিজের সমূহ বেদনার সংবাদ দিল উর্মিলা মানসিক নিপীড়ন করার উদ্দেশ্যে এবং সে সফল হল।

মৃত্যু যে স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম, তা মেনে না পারার যন্ত্রণা পরিণত হয়েছে উর্মিলার মনোবিকারে। তাই ললিতার সন্তান বিনুর যখন মৃত্যু ঘটল, তখন উর্মিলা—'বিনুর বড়মা'র মনে তা প্রভাব ফেলে অন্যমাত্রায়। লেখক জগদীশ গুপ্ত যেন সচেতনভাবে পুত্রশোকাচ্ছন্ন ললিতার বর্ণনা না করে উর্মিলার শোকগ্রস্ত রূপটি তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে, যাতে মনোজগতের অবদমিত ঈর্ষার কথা, বাসনার কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়—"উর্মিলা কাঁদিল বিস্তর—কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময় কোথা হইতে একটা সুখবোধ দেখা দিল তাহা সেও জানে না।" এই সুখবোধের কারণ বুঝতে পাঠকের কষ্ট হয় না। এখানে উর্মিলার মনোভাব "an example of sadism" ললিতা পুত্রশোককে ভুলতে চেয়েছিল উর্মিলার শোককে সামনে রেখে, উর্মিলা ললিতার শোককে সজীব করে রেখেছিল নিজের শূন্য জীবনযন্ত্রণাকে প্রশমনের চেষ্টায়। কারণ ললিতার স্বামী বর্তমান এবং তার সন্তানলাভের

সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তার সেই সম্ভাবনা নেই। পুত্রশোকাতুর দুই বান্ধবীর সাক্ষাতে স্বাভাবিভাবেই উর্মিলার অনুভূতিহীন, নির্মম, কদর্য মনের স্বরূপ প্রকাশিত হয় ললিতার কাছে, যা ছিল অপ্রত্যাশিত। বিনুর জন্য শোকপ্রকাশ উর্মিলার কাছে ক্ষিপ্ত নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয়। এইভাবে গল্পকার নিরাসক্ত ভঙ্গিতেই যেন গল্পের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

গল্পের বিশ্লেষণে দেখা যায়, গল্পকার মনস্তত্ত্ববিদের মতো সূক্ষ্মভাবে নিয়তিতাড়িত মানবজীবনেব অসহায়তাকে, মনের অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের সঙ্কটকে উর্মিলার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এই গল্পের দুই সখীর বন্ধুত্বের অন্তরালে একজনের অন্যজনের প্রতি ঈর্ষাজনিত যে মানসিক জটিলতা দেখা যায়, সেদিক থেকে বলা যায় 'উর্মিলার মন' গল্পটি হয়ে উঠেছে অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের মানসিক সঙ্কটকেন্দ্রিক গল্প। এই গল্পের ঘটনা ঘটেছে অলক্ষ্য দৈব নির্দেশে, কিন্তু লক্ষ্য মানুষের প্রবৃত্তি ও ভাগ্য।

দুই

'উর্মিলার মন' গল্পটি চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র উর্মিলা যেন লেখকের ভাবনার ধারক ও বাহক। গল্পের সূচনায় উর্মিলা চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায় সে স্নেহপ্রবণ, সাংসারিক কর্তব্যপরায়ণ, বন্ধুপ্রীতির প্রতি আস্থাবান এক সম্পূর্ণ নারী। দৈববিপর্যয়ে আকস্মিকভাবে সন্তান ও স্বামীহারা হলে তার মধ্যে দুঃখবাদ এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে, যা লেখকের বৈশিষ্ট্য—''জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষেব জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে—ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ।'' উর্মিলার জীবনকেও পবিচালিত করেছে দৈব, যিনি অদৃশ্য। সেই দৈবশক্তিব প্রতিক্রিয়ায় উর্মিলার বিদ্বেষী মন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে তার প্রিয় বান্ধবী ললিতার প্রতি। শোকপ্রকাশকে সে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে। তাই সদ্য পুত্রশোকাতুরা ললিতাকে তার মৃত পুত্র সম্পর্কে বলতে সঙ্কোচ হয় না—''ক্রমশ নির্জীব হতে হতে মারা গেল, না একসময় দপ করে ফুরিয়ে গেল? উর্মিলাও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেই প্রিয়দর্শন মধুর কণ্ঠ শিশুটি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মৃত্যুর গ্রাসের ভিতর প্রবেশ করিতেছে..... ......'' এইভাবে বারে বারে পুত্রের মৃত্যুর প্রসঙ্গ এনে প্রিয়বান্ধবীকে ধর্ষণ করার যে প্রবণতা, তাই উর্মিলাকে এক বিশিষ্ট চরিত্রে, মানসিক বিকারগ্রস্থ চরিত্রে পরিণত করেছে। গল্পের সূচনায় যে উর্মিলার পরিচয় পাওয়া যায়, তার থেকে ভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করেছে উর্মিলা গল্পের পরিণতিতে। এখানেই জগদীশ গুপ্তের আধুনিকতা। তাঁর পূর্বে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আপাত অসুন্দর দিককে তুলে ধরতে সাহিত্যিকেরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, যদিও জগদীশ গুপ্তের পূর্বসুরী বা সমকালীন লেখকের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের শুভা, শান্তি, পাপের ছাপ উপন্যাসে প্রধানতঃ নারী সমস্যাই ছিল বিষয়বস্তু। কিন্তু তা ছিল সমকালীন সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। জগদীশ গুপ্ত মানুষের মনের ভিতরকার কামনা বাসনা, স্বার্থবুদ্ধি, নৈরাশ্য, বিকারকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অনেকেই নিয়তি, যৌনপ্রবৃত্তির শিকার। সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত উর্মিলাও এইরকম নিয়তিব শিকার।

উর্মিলার মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে তার পার্শ্বে অবস্থানকারী ললিতা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। উর্মিলা ললিতার বাল্যসখ্যকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে ললিতা। বিবাহের পূর্বে উর্মিলা-ললিতার কথোপকথনে প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। পরবর্তীকালে স্বামীপুত্রহারা তারই উর্মিলার শোককে ললিতা নিজের শোক ভেবে ব্যাকুল, কাতর হয়ে উঠেছিল। এমনকি যখন তার নিজের পুত্র মারা যায়, তখন তাকে সে অনিবার্য, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে উর্মিলার শোককে সামনে রেখে। কিন্তু গল্পের শেষে সন্তানহারা দুই বান্ধবী যখন মুখোমুখি হল, তখন লেখক উর্মিলার মানসিক বিকারগ্রস্থ, সহানুভূতিহীন রূপটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই ললিতার মত নিঃস্বার্থ, বিদ্বেষহীন, সহানুভূতিসম্পন্ন চরিত্রটিকে পার্শ্বচরিত্ররূপে রাখলেন। উর্মিলার পরিবর্তিত মনের প্রতিফলন ঘটেছে যেন ললিতার দৃষ্টির দর্পণে। এই দিক থেকে ললিতা চরিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

এই গল্পে আর একটি চরিত্র রয়েছে, যে অদৃশ্য কিন্তু তার নিয়ন্ত্রিত শক্তিতেই চালিত হয়েছে উর্মিলাকে ঘিরে মূল কাহিনি। তিনি হলেন বিধাতা। বিধাতা সৃষ্ট নিয়মে জগৎ চলেছে। জীবন মৃত্যুকে স্বয়ং তিনি নির্দেশ করেন। মানুষের জীবন ও তার শক্তির সৃষ্টিকর্তা তিনি। পৃথিবীর সকল মানুষ এই রহস্যময় শক্তির নিয়ন্ত্রণে। এমন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত মানবভাগ্যকে জগদীশ গুপ্ত তাঁর গল্পে, উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন। এই সকল মানুষ—"একটি দুর্নিরীক্ষ্য আর অতিহিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত ক্রীড়ণক মাত্র।" উর্মিলার জীবনভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই শক্তির দ্বারা। তাঁর পরিচালনাতে উর্মিলার জীবনে ঘটেছে বিপর্যয় এবং সেই বিপর্যয় আঘাত হেনেছে তার আবাল্য বন্ধুত্বে। এই বিধাতাসৃষ্ট শয়তানির শিকার হয়েছে যে সাধারণ মানুষ, তার পরিচয় গল্পের সর্বত্র। তাই চরিত্রটি অদৃশ্য, অলক্ষ্য থাকলেও বিশেষভাবে দৃশ্য সর্বত্র। এইভাবে গল্পের প্রতিটি চরিত্রই যেন যথাযথ ও সংযত এবং গল্পটিকে একটি শৈল্পিক মাত্রা এনে দিয়েছে।

তিন

'উর্মিলার মন' গল্পের রচনারীতি, গদ্যরীতি, ভাষা বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব। যে বাস্তবতা তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন, মানবমনের জটিল স্বভাব ও অবচেতন মনের আদিম স্বভাবের যে পরিচয় তাঁর গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়, ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার প্রতিষ্ঠায়, কবি জীবনানন্দের যুদ্ধসমকালীন কাব্যভাবনায় অন্তঃসলিল প্রবাহে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'সরীসৃপ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনে স্বাভাবিক মানসিকতার অন্তরালে পাশব আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ। গল্পের নায়ক বনমালী, তার দু'পাশে দুই প্রধান নারীচরিত্র—চারু ও তার ছোট বোন পরী। বনমালীর মত অবিবাহিত মধ্যবয়সী পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই বোনের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যে মনের অন্ধকার দিকের প্রকাশ, তা যৌনবিকৃতির পশুসুলভ দিককে ফুটিয়ে তোলে। নিজের বোনকে মারার চেষ্টা, পরীর নিজের পুত্রের পাশে দিদির জড়বুদ্ধি পুত্রকে চাপা ঈর্ষায় অনিশ্চিত্যের উদ্দেশ্যে পাঠানোর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ মনের সক্রিয়তা, তা মানবমনের পাশবপ্রবৃত্তিকে তুলে ধরে। লেখক চরিত্রের যে জটিল মনস্তত্ত্বের

পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয় 'ঊর্মিলার মন' গল্পের। "ঊর্মিলা আর ললিতা উভয়েই সন্তানের জননী; আর পরস্পরের পরম হিতৈষিণী" এই বলে যে গল্পের সূচনা, সেই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে এইভাবে—"উভয়ের মধ্যে উগ্র ক্ষিপ্ত নির্মমতা ছাড়া আর কিছুই নাই যেন..." গল্পের এই পরিণতি প্রমাণ করে মানবমনের অবচেতন ক্লেদাক্ত জগতের বীভৎসতাকে, যা সুস্থ সম্পর্ক ধ্বংস করে দেয়।

এই মনোজগতের বিশ্লেষণ ঘটাতে সাহায্য করেছে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড। ফ্রয়েডীয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানকে নিজের মত করে গ্রহণ করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত এবং কল্লোল কালিকলমের লেখকগোষ্ঠী। ফ্রয়েড 'এরস্' অর্থাৎ 'কামপ্রবৃত্তি' এবং 'থ্যানাটস্' অর্থাৎ 'মৃত্যুচেতনাকে' মানবজীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি বলে মনে করেছিলেন। আত্মহত্যা, যুদ্ধ, আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে মৃত্যুচেতনার অস্তিত্ব প্রমাণিত। এই মৃত্যুচেতনা ঊর্মিলাকে প্ররোচিত করেছিল ললিতাকে মানসিকভাবে আক্রমণের মাধ্যমে হতাশার প্রশমন ঘটাবার চেষ্টা, যা জগদীশ গুপ্ত নিজস্ব রীতিতে তাকে বাস্তবযোগ্য করে তুলেছিলেন।

এই গল্পের গদ্যরীতি, ভাষা বৈশিষ্ট্য সার্থক, শিল্পসম্মত। গল্পের সূচনায় 'স্বীকারোক্তি'র ভঙ্গিতে কিছুটা গল্প বলার ছলে লেখক শুরু করেছেন। এটা তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি। আবার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন। লেখক এখানে নিজেকে অদৃশ্য রেখেছেন, কিন্তু সারাক্ষণ গল্পে চরিত্রকে ঘিরে একটা 'tension' পাঠকের কাছে রেখে দিয়েছেন, যার থেকে মুক্তি নেই। এই গদ্যরীতি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তাঁর যথাযথ ভাষাব্যবহার ও বাক্যগঠনপ্রক্রিয়ার নৈপুণ্যে। গল্পটি সাধু গদ্যে লেখা। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ভাবনাকে দার্শনিকের মত গল্পে উপস্থাপিত করেছেন—"মৃত্যুই সেই উৎস-সমুদ্র আর জীবনের জননী যেখান হইতে প্রাণধারা অবিরাম ছুটিয়া আসিতেছে।... তত্ত্বজ্ঞানে শূন্যস্থান পূর্ণ হয় না। ঊর্মিলার শূন্যস্থান পূর্ণ হয় নাই।" মৃত্যুকে কখনো দার্শনিকের দৃষ্টিতে, আবার একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে নান্দনিক ভাবে পরিবেশন করেছেন। গল্পের ভাবপ্রকাশের জন্য যতটুকু বলা দরকার, ততটুকু ভাষা প্রয়োগ করেছেন। বাস্তবতা প্রকাশের এটি অন্যতম শর্ত। কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদের ব্যাপারে বাংলায় কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কিন্তু গল্পে জগদীশ গুপ্ত 'ড্যাশ' এবং 'ডট' চিহ্নের ব্যবহার এত নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন যা গল্পের শালীনতাকে নষ্ট করে নি। যেমনঃ—

"এই দৃশ্য চোখে দেখা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়—কল্পনা করিয়া ঊর্মিলার উল্লাস জন্মিল।............মুখের গ্রাস শিকার পালাইলে হিংস্র জন্তুর হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জ্ঞানশূন্য অন্ধ একটা উদ্যম দুর্বার হইয়া আসে—" এই 'ডট্' ও 'ড্যাশ' এর ব্যবহার গল্পের নাটকীয়তাকে, ব্যঞ্জনাধর্মীতাকে সার্থক করে তুলেছে।

চার

এই গল্পের মূল লক্ষ্য গল্পের প্রধান চরিত্র ঊর্মিলা এবং তার মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট। মানসিকভাবে ঊর্মিলা ললিতার সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বামী, সন্তানের মৃত্যুর আঘাত তার মানসিক সঙ্কটের কারণ, মনোবিকলনের কারণ। সেই মনোবিকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে

বঙ্কুললিতার প্রতি আচরণে। সমস্ত কাহিনী আবর্তিত হয়েছে উর্মিলার মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটকে ঘিরে। তাই নামকরণটি সঙ্গত।

দ্বিতীয়ত অস্তিবাদী দার্শনিক হাইডেগারের দর্শনচিন্তায় লক্ষ্য করা যায় মানুষের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু, যদিও মৃত্যুর ক্ষণের অনিশ্চয়তা তাকে ব্যাকুল করে তোলে। এই মৃত্যুচেতনার সঙ্গে দৈবকে যোগ করেছেন লেখক। লেখকের নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ উর্মিলাকে নিক্ষেপ করেছে নৈরাশ্যের রাজ্যে, যার ফলশ্রুতি উর্মিলার মানসিক অপ্রকৃতস্থতা। এই সত্য গল্পের নাম ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ একদিকে উর্মিলার মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট, অন্যদিকে অদৃষ্টের অস্তিত্বজনিত কারণে মনোবিকলন—এই দু'দিক থেকে নামকরণটি তাৎপর্যময় ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

আদি কথার একটি : মনোসমীক্ষণে শরাহত কামিনী

নিবেদিতা চক্রবর্তী দত্ত

এ চলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী পণ্য, পুরুষের চোখে কুক্ষিগত সম্পত্তি। নারীকে মানুষ ভাবার দায় নেই কারো কারো। রক্তমাংসের মানুষীর দেহজ কামনা বাসনাও স্বীকৃত নয়, যৌনাচারে নারীর ভূমিকা গৌণ বলে প্রচার করা হয়। মার্কসও নারীর কামশক্তির মৌলিক অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। নারী কামহীন কায়ামাত্র। পুরুষের কামনার পরিতৃপ্তিতেই নারীর মোক্ষ। সমাজ পুরুষের রক্ষাকবচ। নারীর মারণবীজ-ধরিত্রী দ্বিধা না হলে পাতাল প্রবেশও যে বরাতে জোটে না। এই সমাজ গুড়িয়ার প্রাণ নেয়, শ্বশুরের লালসার শিকার পুত্রবধূকে একঘরে করে। মুখতারণ মাঈ সামাজিক সুবিচারের আশায় আশায় দরজায় দরজায় ঘোরে, জেসিকালালের খুনীরা প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, পুলিশ-প্রশাসন দার্শনিক-সুলভ নীরবতা পালন করে। সমাজ অনেকটা বদলালেও বদলায় না নারীর সামাজিক অবস্থান। উপমহাদেশের নারীকুলের জীবন বয়ে চলে একই খাতে। সংবাদপত্র ফলাও করে ছেয়ে থাকে নারী নিগ্রহের নিত্য নতুন কাহিনি। শত উন্নয়নেও নারীর পালে সুবাতাস বয় না। 'একবিংশ শতাব্দীর সীমানায় এসেও/এই পুরুষ শাসিত সমাজ বুদ্ধিমতীদের জন্য প্রস্তুত।'

জগদীশ গুপ্ত নারীর যৌন মনস্তত্ত্বের গভীরে আলোকপাত ক'রে অতলতল নারী কামনার বহিঃপ্রকাশ পূর্ণাবয়বে ফুটিয়ে তুলেছেন আদি কথার একটি গল্পে। কালিকলম পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'রূপের বাহিরে' তে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। নরনারীর মনের গতির পরিচয় মনঃসমীক্ষণের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির অখন্ডতা 'আদি কথা'র বাস্তবভিত্তি নির্মাণে সহায়ক। নারী নিগ্রহের চালচিত্রে সমাজের অবস্থান এ গল্পের পরিণামী গতিসঞ্চারে যেমন ক্রিয়াশীল, কথাকারের পরিবেশনের অভিনবত্বে ততোধিক বাস্তবসম্মত।

'আদি কথার একটি' গল্পের মূল ভরকেন্দ্র সুবল-কাঞ্চন, কাম-কামিনী। মূল গল্পের সূচনায় একটি উপকাহিনি আছে। প্রান্তস্থিত গ্রাম্যকাহিনি—দাসেরা পাঁচ ঘর বাস করে গ্রামের প্রান্তে। নিরুপদ্রবে দিনযাপন তাদের ধাতে সয় না। গাছের এলাকার আম-জাম-সুপুরী-করমচা নিয়ে মেয়ে মদ্দর নিত্য কাজিয়া। গালিগালাজের স্রোতে কখনও ভাটা পড়ে না। গ্রামের বিভীষিকা চন্ড গোঁয়ার বেণী দাস—তার সাথে পাল্লা দেওয়ার মত পুরুষ দাসেদের মধ্যে বিরল। সোজা পথে বেণীকে শায়েস্তা করা অসম্ভব বুঝে চক্রান্ত ক'রে রাতের অন্ধকারে একজন বেণীর বউ হরিমতীর জা সেজে হাজির হয়। রাতদুপুরে বেড়ার ধারে হরিমতীর নাম ধরে চুপি চুপি ডাকে। ক্ষিপ্ত বেণী তাড়া করেও রাতশিকারীর নাগাল পায় না। নাগালের বাইরের শিকার ফেলে হাতের কাছের সহজ শিকার হরিমতীর মাথা খ্যাঁচ করে দায়ের এককোপে ছিন্ন করে বেণী।

কত তুচ্ছ কারণে হরিমতীর প্রাণ যায়! বলির পাঁঠাও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে,

নিদ্রিতা হরিমতী সে অবসরও পায় না। পুরুষের রোখ, সমাজের রোষ কত সহজে নারীর জীবনের অধিকার হরণ করে। খুনের কথা কবুল ক'রে বেণী থানায় আত্মসমর্পণ করে। বিচারে বেণীর ফাঁসির হুকুম হয়।

বেণীর ফাঁসি দাসপাড়ায় ভাঙ্গন আনে—সকলেই অন্যত্র চলে যায়। থেকে যায় কেবল গোপন দাসের পরিবার আর সুবল দাস। গোপাল দাসের দ্বিতীয় স্ত্রী কাঞ্চন। মানুষের মন নারীর দেহে, তার মুখে, তার অঙ্গে অঙ্গে যত রূপ, যত সুষমা, যত নিবিড়তা কল্পনা করে কাঞ্চন তারই প্রতিরূপ। কাঞ্চনের গর্ভে দুটি কন্যা জন্মায়, গো মড়কের হুজুগে গোপাল যখন মারা যায় ছোট মেয়ে খুশির পাঁচ বছর বয়স। বড় মেয়ের বিয়ে গোপাল দিয়ে গিয়েছিল।

অনাথা কাঞ্চনের দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সুবল দাস, খুশিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কাঞ্চনের দ্বিমত করার কারণ ছিল না। সুবল সব দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র—সুপুরুষ, অবস্থাপন্ন। তবে তার বয়স বেশী, তেইশ চব্বিশ আর খুশির বয়স পাঁচ। খুশি সুবলের উপযুক্ত নয় জেনেও কাঞ্চন মনকে প্রবোধ দেয়—অমন তো কতই হয়। কাঞ্চন সম্মতি জানাতেই সুবল খড় বাঁশ কিনে ঘরামি লাগিয়ে, নতুন করে চাল ছেয়ে খুঁটি বদলে ঘরদুয়ার পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলে। তাগড়া জোয়ান সুবলের সাথে একরত্তি মেয়ে খুশির বিয়ে হয়ে যায় নির্বিঘ্নে।

বিয়ের পব খুশির কান্ড দেখে লোকে হেসে বাঁচে না। সে সুবলকে ডাকে 'সুবল' বলে, তুইতোকাবি কবে। সুবলের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। পড়শি বলে কাঞ্চনের সঙ্গে সুবলের আগেই পরিচয় ছিল, তাই সংকোচের কোন বালাই নেই। খুশির খুনসুটি, তাদের আবদারে তিনজনের সংসারে কৌতুক লেগেই থাকে, সুখে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন চালের ধামা মাটি থেকে তুলে সিধে হতে গিয়ে সুবল কোমরের হাড়ে চোট পায়। যন্ত্রণাকাতর সুবলকে দেখে কাঞ্চন দিশেহারা হয়ে পড়ে। খুশি কেঁদে ওঠে।—ওমা, সুবল যে মরে গেল। কাঞ্চন তেল মালিশ করে দেয় কোমরে। ব্যথার উপশম হয় না। দিনে কাজের ব্যস্ততায় ব্যথা তেমন মালুম হয় না, সন্ধ্যার পর তার প্রকোপ বাড়ে। ব্যাধির এমন প্রবলতায়, একদিন সুবল আচমকা উঠে বসে যে হাত দিয়ে কাঞ্চন অন্যমনস্কের মত তেল মালিশ করছিল, সে হাতখানাই ধরে ফেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত কাঞ্চন সুবলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনের নিষ্পলক চোখে বিদ্যুৎ খেলা করে। জীবনের সকল ব্যর্থতা স্পষ্টরেখায় ফুটে উঠতে থাকে। যে কামনা একদিন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল, তার অপ্রাপ্তি যে এত গভীর, এত শুষ্ক, এত তৃষিত নিজেই কাঞ্চন সে খবর জানত না। গুহানিহিত অন্ধকার থেকে কামনার নগ্নরূপের এমন আত্মপ্রকাশ কাঞ্চনকে ভীত করে তোলে। শুষ্ক চোখে অশ্রু চিকচিক করে, সেইসাথে ক্রোধের দাহে জ্বলতে থাকে শরীর। ঘুমন্ত খুশির কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে তারই মাথার উপর সে অশ্রু চটপট করে ফেলতে থাকে কাঞ্চন।

পরদিন খুশি কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরে বলে,—'মা, সুবল আমায় লাথি মেরেছে। দুরন্ত ক্রোধে কাঞ্চনের আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে। সুবলের খুশিকে বিয়ে করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তার চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে। শিউরে ওঠে কাঞ্চন। মা হয়েও কন্যার প্রতি হওয়া

অবিচারের প্রতিকার করতে পারে না, সুবলের প্রতি যতটা কঠোর হওয়া উচিত ছিল ততটা কঠোর হতে পারে না। দিনযাপনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যায়। সুবল খুশির বিয়ের পরিণামী নিষ্ঠুরতাও কাঞ্চন প্রত্যক্ষ করল নিদ্রিত স্বামী স্ত্রীকে একই শয্যায় শায়িতাবস্থায়। পূর্ণবিকশিত তেজপ্রাচুর্যের পাশে একরত্তি শিশুর অবস্থান বড় করুণ, বড় নিষ্ঠুর!

সুবল খুশিকে বিয়ে করেছিল কাঞ্চনকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আশায়। খুশি উপলক্ষ, সুবলের আসল লক্ষ্য কাঞ্চন। বুদ্ধির দোষেই কাঞ্চন সুবলের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হয়েছে। কোমরের ব্যথার অজুহাতে কাঞ্চনকে একান্ত সন্নিকটে আনতে গিয়ে সুবলের গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ল। পুরুষের কামশরবিদ্ধ নারী অদৃষ্টতাড়িতের মত ছুটে গেল অজানা লক্ষ্য পথে। কাঞ্চনের অবদমিত আবেগ তাই সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ভেদ করে অজান্তে আত্মপ্রকাশের তাড়নায় মাথা কুটে মরে। লজ্জায়, ভয়ে শরাহত কামিনী ছুটে বেড়ায়, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দিশেহারা দিকভ্রষ্ট কাঞ্চন আপন কোলের সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় আত্মগ্লানির অতলে ডুবে থাকে, অন্ধকার কোণে আশ্রয় নেয়। সুবলকে নিজের বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দিয়েও মন মানে না, মন মানে না বলেই পুনরায় তাকে ডাক দেয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সুবলও, পাল্টা প্রশ্ন তোলে—'কিন্তু আমার অপরাধ কি?'

সুবলের এই প্রশ্ন দুঃসাহসিকতায় পূর্ণ বলেই কাঞ্চন মনশ্চক্ষে দেখতে পায় বহুদিনের সঞ্চিত অদম্য কামনা ছলনার পরিপূর্ণ হয়ে শামুকের মত ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে। সুবলের ধৃষ্টতায় বাকরহিত কাঞ্চন তাকে বহির্বাটির পথ দেখিয়ে দিয়ে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। খুশি এসে সুবলের গৃহত্যাগের খবর দিল। অপরিসীম অন্তর্দাহে কাঞ্চনের মনে হল, মেয়েকে এই রক্তবর্ণ আঁখি দেখবার মত প্রবঞ্চনা আর পাপ জগতে কিছু নেই।

সুবলকে পৃথগন্ন করেও কাঞ্চনের প্রতি রোমকূপ প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। দুর্মর প্রবৃত্তি টেনে নিয়ে চলে সুবলের গৃহপানে। গৃহপরিমার্জনার ফাঁকে কখন যেন সুবল হাজির হয়ে সোজা ঘরে ঢুকে আসে। চারচোখের মিলিত দৃষ্টি সুবলকে প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়ে তুললেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সে গম্ভীর হয়ে যায়। প্রলয়ের তীব্র উচ্ছ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন হতচেতন হয়ে পড়ে। খুশি উঠোন থেকে চেঁচিয়ে বলে 'মা, কে এসেছে দেখ।' সুবল সরে যায়, কাঞ্চন আত্মসম্বরণ করে বাইরে আসে, কিন্তু যে দুনির্বার ঘূর্ণিপাক ক্ষণকাল পূর্বে তাকে উদ্‌গীরণ করে ছেড়ে গেছে তার চিহ্ন ধরা পড়ে আগন্তুক কাঞ্চনের পিসির চোখে। প্রজ্জ্বলিত হুতাশন গোপন রইল না। নিয়তিলাঞ্ছিত কাঞ্চনের প্রায়শ্চিত্তের সূচনা হল এভাবেই।

সুবল এতদিনে কাঞ্চনের মনের খবর জেনে গেছে। কাঞ্চনের তীব্র অন্তর্দাহের মর্ম সে বোঝে না, বুঝতেও চায় না, সে কেবল ছোঁ ছোঁ করে বেড়ায়, উকি ঝুঁকি মারে, অনুকূলক্ষণের অবসর খোঁজে। মর্মদাহ পীড়িত কাঞ্চনের চোখ কোটরগত, শীর্ণ শরীরে অবসন্ন মনে সে শুয়ে ছিল। খুশি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘরের ভিতর মাটির প্রদীপ টিপটিপ করে জ্বলছে। সুবল কাঁপতে কাঁপতে কাঞ্চনের দাওয়ায় উঠে এল নিঃশব্দে, দরজায় চোখ লাগিয়ে দেখে কাঞ্চন চোখ বুঝে আছে—গায়ে কাপড় নেই। দরজা খোলার শব্দে চোখ খুলে দরজার সামনে সুবলকে দেখে কাঞ্চন গায়ের কাপড় টেনে চিৎকার করে—'যাও, যাও যাও, যাও আমার

সামনে থেকে, শিগগির যাও, যাও বলছি যাও যাও....।" দুর্বল মস্তিষ্কে উত্তেজনার ভার সহ্য হয় না, কাঞ্চন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। সুবলের পশুত্ব ক্ষিপ্রতার চরম স্তরে পৌঁছে যায়।

ব্যভিচারিণী নারীকে শায়েস্তা ক'রে গ্রামকে অনাচারমুক্ত করার দায় সমাজের। অতএব সমাজ নড়েচড়ে বসে। পাপের ফল ততদিনে পাপীর অঙ্গে ফুটে উঠেছে। পিসির চোখেই তা ধরা পড়েছে। সুবলদের বাস্তুবাটির মাটির মালিক বামনদাস অধিকারীর আদেশে 'পাপিষ্ঠা'বে গ্রেপ্তার করে আনা হল, পরে সুবলকেও। চুলের মুঠি ধরে খড়ম পেটা করেও পাপিষ্ঠার পাপ ক্ষালন হয় না। রক্তাক্ত কাঞ্চনের দিকে বিহ্বলের মত চেয়ে থাকতে থাকতে সুবল সহসা বামনদাসের পায়ে পড়ে বলে—'যত দোষ আমার, আমাকেও মারুন। কে শোনে কার কথা। পুরুষের দোষ কোথায়। মেয়েমানুষে আস্কারা না দিলে বেটাছেলের সাধ্য কি তার কাছে এগোয়।'

ধন্য নারীর শক্তি—স্বর্ণলঙ্কা ছার খার ক'রে, কুরুকুল ধ্বংস করেও ক্ষান্তি নেই, পুরুষকে আবহমানকাল যাদুগ্রস্ত ক'রে তার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। সমাজ নারীকে তাই শাস্তি দেয়, বাসের ঘর ভেঙে রাস্তায় নামিয়ে আনে। ছোট্ট শিশু মাকে বেড় দিয়ে রাখে, মায়ের কোলের উপর শুয়ে সে বলে,—'মা ওঠো, চলো বাড়ি যাই।' কাহিনির উপর নেমে আসে যবনিকা।

জগদীশ গুপ্তের 'আদি কথার একটি' আদি রিপুর কথা অর্থাৎ কামকথা। নরনারীর জীবনের স্বর্গীয় প্রেম সুষমা বর্ণনায় তাঁর আগ্রহ নেই। তাঁর বিশিষ্টতা মনস্তত্ত্ববিদের—নরনারীর মনের গতির পরিচয়কে দক্ষহাতে ফুটিয়ে তোলা। কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উদ্‌ঘাটনে জগদীশ গুপ্ত সিদ্ধহস্ত। গল্পটিতে নারীর যৌন মনস্তত্ত্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত। পূর্ণবয়স্ক নরনারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা সামাজিক অনুমোদন-নির্ভর নয়। আদিতে যখন মানুষ পশুত্বের পরিধির মধ্যে ছিল তখন তাকে নাড়া দিত কেবল কাম। সভ্য সমাজ কামকে অস্বীকার করে প্রেমকে যেদিন থেকে মান্যতা দিতে শুরু করল সমাজ ততই শক্তহাতে নরনারীর কামনাকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করল। অথচ আদিম প্রবৃত্তি কোনো বাঁধন মানতে চায় না, মানতে চায় না বলেই সংঘাত অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। যদিও একক নরনারী সমাজের বিরুদ্ধ স্রোতে অনন্ত কাল ভেসে থাকতে পারে না। তবু এমন ঘটনাও ঘটে, যখন সমাজের রাতপাহারার নিষেধাজ্ঞা অতিক্রম করে কামকথা প্রকাশ্যে আসে। পূর্ণ বিকশিত নারীপুরুষ সহজাত তাড়ণাতেই মিলিত হয়, আদিতে বনমানুষও এই তাড়ণাতেই মিলিত হয়ে বংশগতিকে রক্ষা করেছে। দেহকে অস্বীকার করে মনের জ্যামিতিক ক্রিয়া নিয়ে কালহরণ সভ্যসমাজের ভণ্ডামি। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা' যদি কাম হয়, সে কাম জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। কামজ সন্তান সৃষ্টির উন্মুখরতার সাক্ষ্য বহন করে। এ সত্য কাহিনিকারের অজানা নয়। 'আদি কথা'র একটি সেই সত্যের সামাজিক অনুসন্ধান।

ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্র বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা সহজ কথা নয়। কথাকার যখন মনঃবিশ্লেষক বৈচিত্র্যের রূপায়ণ অনেক বেশী অভিনিবেশ দাবি করে। জগদীশ গুপ্তের কাহিনির গঠনশৈলীও অভিনব। টুকরো টুকরো মন্তব্যের দীপ্তি ও ব্যঞ্জনা চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি নির্মাণে সহায়তা করেছে। 'আদি কথা'র সুবল একরৈখিক—কামনাবতী নারীকে ছলে বলে কৌশলে ভোগ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে সুবল

চরিত্রের গভীরতা প্রত্যাশিত নয়, কাহিনির প্রয়োজনেই চরিত্রের অনিবার্য উপস্থিতি।

নারী চরিত্রের জটিল আবর্ত কথাকারের বিশ্লেষণের অন্যতম উপাদান। স্বভাবতই কাঞ্চনের জটিল জ্যামিতিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। মানুষের মনের ধ্যান-কল্পনার রূপ কাঞ্চনের করায়ত্ত হলেও 'বলিহারি বুদ্ধি'। কাহিনির সূচনায় কথাকারের এই তির্যক শ্লেষ পরিণামী ব্যঞ্জনার বার্তাবহ। বুদ্ধিহীনতার দোষেই কাঞ্চন সুবল-খুশির বিয়েতে অসম্মতি জানাবার জোরাল যুক্তি খুঁজে পায় না। নির্বুদ্ধিতার পরিণাম স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হ'লে তীব্র আত্মগ্লানিতে অন্ধকার কোণে মুখ লুকায়। মাতৃহৃদয়ের সহজ আকৃতি সত্ত্বেও কামনামদিরতায় আক্রান্ত হয় কাঞ্চন। তার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপরি তলে তুলে আনেন কথাকার। মাতৃসত্তা নারীসত্তার দ্বৈরথ কাঞ্চন চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ভিতর দেহগত সম্পর্কের গোপন অনুশীলন সমাজে চিরকাল ছিল। সাহিত্যে সে বিবরণ স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। বিশ শতকের সাহিত্যে সংস্কারমুক্তির যে ঢেউ লাগল, 'কল্লোল', 'কালিকলম' ছিল আর অন্যতম প্রকাশ ক্ষেত্র। জগদীশ গুপ্তের কলম সমাজের গোপন ব্যভিচার (?) কে ছোটগল্পের পরিসরে শৈল্পিক দক্ষতায় পরিবেশন করেছে। সমাজের তথাকথিত পাপাচারের রসাল বর্ণনা তাতে বিস্তৃতি পায়নি। আদিরসের ঘোলা জলে নেমে পাপ পঙ্কিলতার বিস্তৃত বিবরণের পরিবর্তে নরনাবীর মনের বিচিত্র সর্পিল গতির পরিচায় দানে জগদীশ গুপ্ত সীমায়িত রেখেছেন কাহিনির বেড়াজাল। কথাকারের শিল্পীস্বভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য, শ্লেষ কটাক্ষে সমাজের আধিপত্যের বাস্তবভিত্তিকেও উপস্থাপন করেছে। সমাজের দীর্ঘ ছায়া বিশ শ০ক ছাড়িয়ে একবিংশ শতকেও পক্ষপাতদুষ্ট। পুরুষের লাম্পট্য, ব্যভিচার সমাজদাক্ষিণ্যে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা, নারী আজও বলির পাঁঠা। নারী চিরকাল দায়ভার নিয়ে সমাজ সচলতার বীজ ধারণ করে। নারী এক মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে সমাজ তার বংশগতির ধারাকে অব্যাহত রাখে। বংশগতির রক্ষয়িত্রী নারীকে পুরুষ সম্পত্তি বানায়, অহেতুক সন্দেহ করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনতায় বাধ্য ক'রে সমাজের কাঠগড়ায় তোলে।

সমাজ নামক তথাকথিত অচলায়তন নারীর সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায় সন্দেহ নেই। নারীর অশেষ বাঁধন যেদিন ছিঁড়ে যাবে, নারী নিজের বলয়ে নিজের জন্য বাঁচতে শুরু করবে সেদিন সমাজ প্রস্তুত হবে নতুন নারীর আবাহনে। নারীকে চিরকাল পুতুল ক'রে রাখার অপচেষ্টা রুখে নতুন কিংবদন্তীর জন্ম দেবে সমাজ, প্রস্তুত হবে বুদ্ধিমতীদের জন্য। আমরা নতুন কলমে চিরায়ত নারীর মানব রূপের দ্রষ্টা হব। নারী মনোসমীক্ষণে স্ত্রীজাতি থাকবে না, মানবীয় জীবরূপেই তার নব পরিচয় লেখা হবে।

পুরাতন-ভৃত্য : একটি আলোচনা

মনোরঞ্জন গোস্বামী

জগদীশ গুপ্ত তাঁর সমকাল ও বর্তমান কালে সাধারণ পাঠকের কাছে একটি অপরিচিত নাম অথচ তিনি কল্লোল পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর স্বনির্বাচিত গল্পের ভূমিকায় বলেছেন—'অনেকেই আমার নাম শোনেন নাই'। একথা আজকের সময়েও সমান সত্য।

'পুরাতন-ভৃত্য' নামটি সাধারণ বাঙালির কাছে বহুল পরিচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার দৌলতে। আগ্রহী পাঠক খেয়াল করবেন এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নব কেষ্টর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। গল্পটির আরম্ভ এইভাবে 'বিশ্বেশ্বর যাজক ব্রাহ্মণ— তাঁর যত যজমান সবই নমঃশূদ্র।...

ভক্তির চাইতে সংসারে তার ঢের বেশী আদর এবং প্রয়োজন।'.......প্রারম্ভিক বাক্যটিই প্রমাণ করে তিনি জগদীশ গুপ্ত অন্য ধারার লেখক। আধুনিক বাস্তবতার বিচারে এর যেন কোনো বিকল্প নেই। ভারসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যয়ের বিজয়—এই পটভূমিতে লেখক জগদীশ গুপ্ত যেন চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন এবং লিখেছেন। জীবন সম্পর্কে যে বাস্তবতার উপস্থাপন করেছেন জগদীশ গুপ্ত, সেই বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত আছে একধরনের নিষ্ঠুরতা ও মুক্তিহীন নৈরাশ্যের যন্ত্রণা। এই নির্মম বাস্তবতা আমাদের জীবনে থাকা সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যে তার ছাপ পড়েনি জগদীশ গুপ্ত এর আগে। তাঁর লেখায় বাইরের বর্ণনা প্রধান নয়, সাধারণ মানুষের অন্তরের বীভৎস রূপই প্রাধান্য পায়। জগদীশ গুপ্ত গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ডের পাঁচ নম্বর গল্প হল 'পুরাতন ভৃত্য'। বিশ্বেশ্বর নামে এক যাজক ব্রাহ্মণ ও নব (বিন্ধ্যপ্রসাদ) নামে এক ভৃত্যের মানবিকতা ও অমানবিকতার গল্পের নাম—'পুরাতন ভৃত্য'।

বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যুর পর এই গল্পের যথার্থ সূচনা। শ্রাদ্ধের খরচ জোগাড় করার জন্য বিশ্বেশ্বর তার নমঃশূদ্র যজমানদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন আর তার সঙ্গী হল ভৃত্য নব। বিশ্বেশ্বর বৃদ্ধ এবং নব সাতাশ বছরের তরতাজা কুর্মী যুবক। বাইশ থেকে সাতাশ এই পাঁচ বছরে নব "বিশ্বেশ্বরের সংসারের অপরিহার্য পুরাতন একটা অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" তাই স্ত্রী বিয়োগের পর তার পারলৌকিক কর্মে বিশ্বেশ্বরের নির্ভরতা নব-র উপর আরও বেড়েছে। তারও আগে বিন্ধ্যপ্রসাদ বিশ্বেশ্বরকে বাবাঠাকুর আর ক্ষেমঙ্করীকে মা ডেকেছে। আর ক্ষেমঙ্করী বিন্ধ্যপ্রসাদ-এর নাম দিয়েছেন নব এবং বলেছেন—"তুই যে আমার ছেলে রে।"

এরপর অসুখের প্রাবল্য এবং তার পরিণতিতে ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যু। মৃত্যুর দুদিন পরে অনুচর নবকে নিয়ে বিশ্বেশ্বর ভিক্ষায় বেরোলেন। প্রভু বিশ্বেশ্বর ভিক্ষার্থী বিশ্বেশ্বরে পরিণত হলেন। আর শেষ পর্যন্ত পুণ্যলোভী শূদ্রদের দানে সাতশ টাকা সংগৃহীত হল। স্ত্রী বিয়োগের দুঃখ কিছুটা হয়তো লাঘব হল বিশ্বেশ্বরের এই সাতশ টাকার কারণে। নিরাপদে টাকা সহ

বাড়িতে ফেরার চিন্তায় তিনি স্ত্রীশোক হয়তো ভুলেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর ডাকটি তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করল। 'নব বলিল, —পালাও।' —এইবার বিশ্বেশ্বরের কল্পিত ভয় বাস্তবে পরিণত হল, তবে তা কোন তৃতীয় ব্যক্তির কারণে নয়; ''নব বলিল, —টাকা দাও',.....

—টাকা নে, কিন্তু প্রাণে মারিস নে বাবা।''

'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার থেকে 'পুরাতন' ভৃত্য'-এর নব যেন বাঙালির পরিবর্তনের প্রতীক। অধম-উত্তম বিচারের বাইরে নতুন বিচারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় আমাদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রটি আদ্যন্ত একটি নৈতিক ও মানবিক চরিত্র। কেষ্টর প্রভুভক্তি যেন একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ। আর এর বিপরীতে 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পের নব চূড়ান্ত অর্থলোলুপ, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন, নীতিবর্জিত এক ডাকাত মাত্র! মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। স্বার্থপরতা তার আদিম বৈশিষ্ট্য। মানব চরিত্রের এই বিষয়টি জগদীশ গুপ্ত অত্যন্ত নিরপেক্ষ, নিরাবেগ ও নির্মোহভাবে প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় একবিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠক যার জন্য প্রস্তুত থাকে না। এই গল্পে দেখি—''নব বাঁ হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল, টাকা দাও, না দিলে-বলিয়া ডান হাত বাড়াইয়া যে জিনিসটা সে বিস্ময়ে অবাক বিশ্বেশ্বরের নিষ্পলক চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ তুলিয়া ধরিল, সেটা যেন সর্ব্বনাশীর একটিমাত্র দাঁত, ভয়ঙ্কর ধারালো, ঝকঝকে। .....ছোরা দেখিয়া বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের শীর্ণ দেহ আর খাড়া থাকিতে পারিল না; টাকার থলিটা তাহার দিতে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ...টাকা নে, কিন্তু প্রাণে মারিস নে, বাবা। ....সে হয় না। এই কয়টি কথাই শুধু বিশ্বেশ্বরের কানে গেল........মুহূর্তের জন্য একটা তীব্র ব্যথার অনুভূতি তাঁহার মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া গেল।''.......কেষ্টর প্রভুভক্তির বিপরীতে নব-র দস্যুবৃত্তি বাঙালি পাঠককে চমকে দেয়। লেখক দেখাতে চেয়েছেন মানুষের জীবনে মানবিক বৃত্তি ও পাশবিক বৃত্তি দুইই আছে। কখন কোনটির প্রাবল্য দেখা দেবে তা মানুষেরও অজ্ঞাত। ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বরের পরিবারের সঙ্গে নবর পাঁচ বছরের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো ছলনা ছিল না। আবার তার দস্যুবৃত্তিও সত্য। জগদীশ গুপ্ত মানব জীবনের কোনো স্থির আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন না। মানসিক ভারসাম্য ও নীতিবোধের বিচলন তাই তাঁর গল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। মানুষের প্রবৃত্তিজগতে বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা যেমন সত্য। নিষ্ঠুরতাও তেমনি সত্য—একথাই যেন নব প্রমাণ করেছে।

মানুষকে জগদীশ গুপ্ত একটি প্রাকৃতিক জীব হিসেবে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন। তাই নব-র এই দস্যুবৃত্তি তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। মানব মনের অন্ধকার তলের সমস্ত কালিমা তুলে এনে তাঁর সাহিত্য জগতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিলেন। প্রকৃতির গূঢ় আঁধারও যেখানে গভীরতায় ম্লান হয়ে যায়। আমাদের প্রচলিত ও অভ্যস্ত মূল্যবোধগুলি তাঁর লেখনীতে বারবার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আর এই গল্পটি স্বার্থসর্বস্ব মানুষের নিষ্ঠুরতা ভিত্তিক একটি গল্প হয়ে ওঠে। অবচেতনতার শৃঙ্খলাহীন প্রকাশ এবং মানবজীবনের বহু বিচিত্র বিরোধ যে জীবনে সত্য হতে পারে আমোদের কথাসাহিত্যে তা বহু পরে স্বীকৃত হয়েছে। আর এই স্বীকৃতি এসেছে জগদীশ গুপ্তের হাত ধরে। বাংলা সাহিত্যে এই ব্যাপারটি যে নতুন তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কল্লোল যুগে রিয়ালিজমের একটি স্পষ্ট ঝোঁক ছিল।

জগদীশ গুপ্তের গল্পে এই ঝোঁক আছে কিন্তু যা নেই তা হলো রোমান্টিকতা। আধুনিক মানুষের মনোজগত ও তার মনোজাগতিক জটিলতা আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়—একথা তিনি প্রমাণ করেছেন। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ও কল্যাণ আশ্রিত বাংলা সাহিত্যের ধারায় তিনি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। উত্তর-তিরিশ বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক নিঃসঙ্গ যাত্রী। বাংলা সাহিত্যে এরকম নিরাসক্ত ও নির্মম লেখক বিরল।

দারিদ্র্য মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে শিথিল করে দেয় এই গল্পে নব যেন তা প্রমাণ করেছে। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মস্তিস্ক একটি নিরবচ্ছিন্ন চেতনা-জগত। তাই ভাবনাহীন জাগ্রত মানুষ অসম্ভব। তার ভাবনার মূল বুনিয়াদ রচিত হয় আর্থসামাজিক বাস্তবতার নিরিখে। আবার এই বাস্তবতার জগতটি হয়ে ওঠে পঙ্কিল। মানবিক আচরণ ও ভাবনা থেকে ক্রমশ সে দূরে সরে যায়। এই গল্পের নব যেমন অবক্ষয়ের তলানিতে পৌঁছে বিশ্বেশরকে আঘাত করে। প্রসঙ্গত মার্কস বলেছেন, শ্রমমূল্য ও উৎপাদিত সামগ্রী থেকে বঞ্চনার ফলেই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা। আর এই বিচ্ছিন্নতা থেকে দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব, ও নৈতিক অধঃপতনের সূচনা হয়। আমাদের আলোচ্য গল্পের নব চরিত্রটি এই জাতীয় অধঃপতনের প্রতীক। মানুষকে 'মরাল বিইং' হিসেবে না দেখে তিনি দেখেছেন বায়োলজিক্যাল অ্যানিম্যাল হিসেবে। সাহিত্য থেকে তিনি আবেগ ও আয়েশী জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রণয়, রোমাণ্টিকতা ও আদর্শের মোহাচ্ছন্নতাকে দূরে সরিয়ে কথাসাহিত্যে তিনি নিয়ে আসেন মানব জীবনের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রত্ন-ইতিহাস। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পটিও এই নির্মমতার সাক্ষ্য বহন করে।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থের এই গল্পটি আশি বছর পরে বাঙালি পাঠক মহানগরের গৃহভৃত্যদের অর্থলোলুপতার বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝবেন, নবর মতো মানুষেরা সমাজে স্বাভাবিক কারণেই থেকে গেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. জগদীশ গুপ্তের গল্পসমগ্র
২. জগদীশ গুপ্তের গল্প
৩. জগদীশ গুপ্ত—হীরেন চট্টোপাধ্যায়
৪. জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য—ড. সমরেশ মজুমদার
৫. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ—সরকার আবদুল মান্নান

রতি ও বিরতি : অন্তহীন যন্ত্রণার ভাষ্য

কিশলয় জানা

জগদীশ গুপ্তের 'রতি ও বিরতি' প্রথম প্রকাশ করে দক্ষিণ কলকাতার রসচক্র সাহিত্য সংসদ ১৩৪১বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে। একশো তিরিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে 'রতি ও বিরতি' ছাড়াও আরেকটি গল্প 'পামর' সংযোজিত ছিল। গ্রন্থটির কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয় প্রথম সংস্করণে 'রতি ও বিরতি' একটি উপন্যাস হিসেবে নাকি একটি বড়গল্প হিসেবে সংকলিত হয়েছিল 'পামর' নামক গল্পটির সঙ্গে। তবে অনেক বছর পর বসুমতী সাহিত্য মন্দির 'জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করলে [প্রকাশকাল: ১৩৬০ বঙ্গাব্দ] সেখানে উপন্যাসের শিবিরেই 'রতি ও বিরতি'কে স্থান দেওয়া হয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডেও লেখাটিকে উপন্যাসের পর্যায়ে রাখা হয়। লেখাটির একটি সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপ 'সবার শেষে গয়া' নামে লেখকের 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' সংগ্রহে [প্রকাশকাল : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ] স্থান পেয়েছিল। একমাত্র সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'জগদীশ গুপ্তের গল্প' গ্রন্থের তথ্যপঞ্জীতে 'রতি ও বিরতি'কে একখানি গল্পগ্রন্থ হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। (গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)। অবশ্য পববর্তীকালে বিবিধ সুধীজনের আলোচনায় 'রতি ও বিরতি' পূর্বদৃষ্টান্তে উপন্যাস হিসেবেই সমালোচিত হয়েছে। হীরেন চট্টোপাধ্যায় [বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা: জগদীশ গুপ্ত, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী], ক্ষেত্রগুপ্ত [বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬০, গ্রন্থনিলয়] , সুমিতা চক্রবর্তী [উপন্যাসের বর্ণমালা, ১৩৬০, পুস্তক বিপণি] প্রমুখ একখানি উপন্যাস হিসেবেই 'রতি ও বিরতি'র বিচার করেছেন।

'রতি ও বিরতি' কাহিনি-বিচার করলে বোঝা যায় নয়টি পরিচ্ছেদে বিধৃত গল্পটিতে স্পষ্ট স্তর আছে। গল্পের প্রধান উপজীব্য অবশ্যই ভিখারি রামের একটি টাকাকে ঘিরে গড়ে ওঠা রতিবাসনা এবং সেই টাকার অতর্কিত অন্তর্ধানে বিত্ত-রতির বিরতি ও স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ। রামের ভিক্ষুক-দশা প্রাপ্তি থেকে তার বিত্তরতি এবং পরিণামী ভয়াবহ মৃত্যু আখ্যানের প্রধান বা মুখ্য স্তর। কাহিনীর সূচনাংশে রামের পত্নী গয়ামণি ও পুত্র লবের মৃত্যুসংক্রান্ত যে কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ, রাম দিনমজুরের পেশা থেকে কীভাবে ভিখারিতে পরিণত হল সে সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল নিরসন। এটি সমগ্র গল্পের গৌণস্তর। মূল কাহিনি ছোটগল্পের রীতি মেনেই অতর্কিতে শুরু হয়েছে এবং দ্রুতগতিতে পরিণামী-বিন্দুর দিকে এগিয়ে গেছে। আমাদের জীবনের সকল প্রয়াস বারে বাবে কোনো শয়তানী শক্তির অঙ্গুলীহেলনে ব্যর্থ হয়ে যায়, মুখে খুদকুঁড়ার ঘ্রাণ লেগে থাকলেও নিয়তির সুতীক্ষ্ণ নখর আমাদের বুক ফালাফালা করে দেয়, রতির তীব্র দাহ বুকে নিয়েই বিরতির সাধনায় মগ্ন হতে হয়—এই সারসত্যকে যেন রাম নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে। রামের সহসা একটি টাকা প্রাপ্তি এবং তাকে ঘিরে রঙীন সুখের স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে ওঠার ঘটনায় আচমকাই যবনিকাপাত ঘটে। টাকাটা তো হারায়ই। তার সন্ধান করতে গিয়ে রামের

জীবনটাও শেষ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে কাহিনি ছোটগল্পের মতই একভাবকেন্দ্রিক হয়েই থেকেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছু কিছু উপকাহিনী যোগ করা হয়েছে, যা নির্দ্বিধায় বর্জন করা যেত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'রতি ও বিরতি'কে উপন্যাস বলতে কোথাও দ্বিধা জাগে। বাংলায় কোনো কোনো বাণিজ্যিক-পত্রিকার শারদসংখ্যায় 'উপন্যাসোপম বড় গল্প' বলে একটি বিভাগ থাকে। এটির সঠিক সংজ্ঞার্থ ও লক্ষণ যে কি তা জানিনে। তবে পড়ে মনে হয়েছে এগুলিতে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে একাধিক চরিত্রের আমদানি করা হয়, উপকাহিনী যুক্ত হয়, উপন্যাসসুলভ বিস্তারও দুর্লভ নয়, কিন্তু এগুলির চোরা টান ছোটগল্পের আকস্মিক পরিণতির দিকেই। অন্তধর্মে এরা ছোটগল্পই। জগদীশগুপ্তের 'রতি ও বিরতি' প্রসঙ্গে 'উপন্যাসোপম বড় গল্প' অভিধাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

জগদীশ গুপ্তের জীবনদর্শন প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন, "জগদীশচন্দ্র জীবনের নিষ্ফলতা ও শুভ প্রয়াসের ব্যর্থতার জন্য যে হতাশা ও বিষণ্ণতা বোধ করেছেন তার জন্য শেষ পর্যন্ত কোন সমাজ বা ব্যক্তিকে তিনি বিশেষভাবে দায়ী করেননি। সমস্ত ব্যর্থতার মূলে রয়েছে এক নিষ্ঠুর নিয়তির বীভৎস উল্লাস। মানুষ সেই নিয়তির নির্দেশকে কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারে না।" ['দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', ১৩৪০, পৃঃ৩০৭] 'রতি ও বিরতি' গল্পেও দেখা যায় কেন্দ্রচরিত্র রামের জীবন নিষ্ঠুর নিয়তির বীভৎস উল্লাসে বারম্বার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুখ তার জীবনে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো; ক্ষণিকের স্বপ্ন দেখিয়ে ঝরে পড়েছে, সহসা, টুপ করে।

গল্পে দেখা যায়, ফুল্লরা নদীতটবর্তী বৈষ্ণবদের পরিত্যক্ত ভিটায় রাম তার স্ত্রী গয়ামণি এবং তাদের একমাত্র সন্তান লবকে নিয়ে বাস করে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদ আদালতে বিবেচনাধীন। তবে রাম কোনোভাবেই সে জমির দাবীদার নয়। সে ভূমিহীন সামান্য দিনমজুর। অভাবের সংসারে তাদের একমাত্র আনন্দ পুত্র লব। কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। লবের যখন আট বৎসর বয়স, তখন এক ঝড়বাদলের রাতে ঘরের মেঝের গর্তে বসবাসকারী এক কালসাপ লবকে দংশন করলে তার মৃত্যু হয়। শোকে নিথর রাম ও গয়ামণি স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জীবন সম্পর্কেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। যে গর্ত থেকে সাপটা উঠে এসে লবকে দংশন করেছিল, "সেই গর্তের দিকে চোখ পাতিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, কিন্তু রাম তাহা বুজায় নাই, বুজাইতে দেয় নাই। কত আশা করিয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে সেই গর্তের ধারে মাথা রাখিয়া প্রত্যহ শয়ন করে।" কিন্তু কালসাপ গর্ত ছেড়ে আর উঠে আসে না তাদের দংশন করার জন্য।

দিনতিনেক পর পুত্রশোক সামলে উঠে পেটের দায়ে দা-হাতে রাম কাজে বেরিয়ে পড়লেও, পুত্রশোকে গয়ামণির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। গয়ামণির বিশ্বাস, লখীন্দরের দেহ যেমন ঈশ্বরের দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, তেমনি লবের দেহও সর্পবিশারদ কোনো গুণীর হাতে পড়বে এবং লব প্রাণ ফিরে পাবে। এই আশায় গয়ামণি প্রত্যহ নদীতীরে এসে বসে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই গয়ামণির এই স্বপ্নও বিফল হয়। অবশেষে একদিন পুত্রশোকে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে বসা গয়ামণি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

পরপর দুটি মৃত্যু রামকেও ধ্বস্ত করে দেয়। তার চেহারা ভেঙ্গে পড়ে, শোকে-দুঃখে তার

কাজ করবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই দা-হাতে নিয়ে কাজে বের হলেও তার মানসিক স্থিতি ও শারীরিক অবস্থার দিকে চেয়ে কেউ তাকে আর কাজ দেয় না। অবশেষে ভাগ্যের নিদারুণ অভিসম্পাতে বিপর্যস্ত রামের "বুকের হাড় প্রকট হইয়া উঠিল, দাড়ি বাড়িয়া গেল, পরণে নেংটি উঠিল—কাঁধে নিল ভিক্ষার ঝুলি—হাতে নিল সে নারিকেলের মালা।" রাম ভিক্ষোপজীবীতে পরিণত হল।

কিন্তু ভিখারির জীবনেও রাম সুখী নয়। অধিকাংশ গৃহস্থের হাতই উদার নয়। ফলে রামকে বেশীরভাগ জায়গা থেকেই শূন্য হাতে ফিরতে হয়। এমনি সময় একদিন নীলকণ্ঠ মজুমদারের নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হঠাৎ গিয়ে পড়া রাম ঘাড়ধাক্কার সঙ্গে সহৃদয় রায় বাহাদুরের কাছ থেকে একটি গোটা টাকা পেয়ে যায়। সঙ্গে ছ'ছখানা লুচি। দিনের পর দিন উপবাসে থাকতে অভ্যস্ত ভিখারী রামের কাছে এই প্রাপ্তি প্রায় লটারি পাওয়ার সামিল। এই পরম সৌভাগ্যকে দুর্ভাগা সে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারেনি; তার কেবলই মনে হয়েছে, "যে দাতা তাহাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত'?" অবশ্য রামের এই সংশয় অমূলক। সেরকম কিছুই ঘটেনি। বরং বাড়ি ফিরতে ফিরতে টাকার চিন্তায় মশগুল রাম গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে, কখনো আবার ঘিয়ের দর জিজ্ঞাসা করেছে; তার মনে হয়েছে—"আজ কিছুই অপ্রাপ্তব্য নাই—কোন ভোগ্য বস্তু হস্তগত করিবার আশা দুরাশা নয়।" বাড়ি ফিরে রাম মাটির স্পর্শদোষ এড়াবার জন্য সেই টাকা আর লুচি ক'খানি পুঁটলি বেঁধে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। লুচি সে প্রাণে ধরে খেতে পারেনি। লুচি দেখে দেখেই তার খিদে মিটে গেছে। অন্যদিকে টাকাটা পেয়ে তার আনন্দ-বিস্ময়ের অন্ত নেই; "টাকাটা বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জ্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত একবাব কপালে ছুঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ করিয়া মুষ্টি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিয়া তাহাকে অনুভব করিতে লাগিল.....হাত গরম হইয়া উঠিল।" একটি টাকাকে ঘিরে রামের সমস্ত বিত্তরতি কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে। রাম মাঝে মাঝে পরম লালসার সঙ্গে টাকাটির এপিঠ-ওপিঠ লেহন করে সন্তর্পণে আবার টাকাটিকে লুচির সঙ্গে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু এই টাকাটির মাধ্যমেই এবার রামের নিয়তি রামকে শেষের ভয়ংকর সেদিনের দিকে টেনে নিয়ে গেল। একটি গোটা টাকাকে ঘিরে রাম অসম্ভব সুখের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। অন্যত্র পাওয়া পয়সা দিয়ে নূতন হাঁড়ি, সরা, কলকে তামাক এ সব কিনে এনেছিল সে। কিন্তু নিয়তির অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। ঝুলির মধ্যে রেখে দেওয়া লুচি প্রথমে পচে, পরে শুকিয়ে শেষে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই গুঁড়ার লোভে ইঁদুর এসে তার ঝুলি ফুটো করলে ঝুলির মধ্যকার টাকাটা গিয়ে পড়েছিল সেই গর্তে, যে গর্তের কালান্তক সাপ রামের পুত্র লবকে দংশন করেছিল। টাকা হারিয়ে উন্মত্ত রাম সেই গর্ত খুঁড়ে টাকাটা উদ্ধারের চেষ্টা করেছে অনেক। কিন্তু টাকাটা যে গর্তের পথ বেয়ে কোন অতলে তলিয়েছে রাম তার খোঁজ পেল না। ইত্যাবসরে গায়ের উপর ঝুরো মাটি পড়তেই সেই কালসাপের নিদ্রা টুটে গেছে এবং বিবর থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। তাকে দেখেই রামের মুহূর্তমধ্যে লবের কথা মনে পড়ে গেছে। "কুম্ভকারের অক্ষয়ত চক্র যেমন ঘোরে এই

উদ্যতফণা বিষধরকেও অক্ষদণ্ড করিয়া রামের তুরিতপ্রাপ্ত স্নায়ুর উজ্জীবন আর আত্মার চৈতন্য তেমনি বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার কৈশোর যৌবন লব গয়ামণি ভিক্ষাপাত্র ঘূর্ণিত ধূমপটলের মাঝে অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের মতো ঝিকমিক করিয়া দেখা দিয়াই মিলাইতে লাগিল।" লবের কথা-গয়ামণির কথা মনে পড়তেই রামের জীবন-সম্পর্কে সমস্ত আসক্তি অন্তর্হিত হল। যে সাপের দংশনের প্রত্যাশায় তারা স্বামী-স্ত্রী একদিন গর্তের কাছে মাথা রেখে কত না কষ্ট করেছে, আজ সেই উদ্যতফণা বিষধরকে দেখে রাম আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। মাটির ঢেলা দিয়ে আঘাত করে সাপকে দংশন করতে উত্তেজিত করেছে এবং নিজের পা দুখানা একের পর এক সাপের মুখের সামনে এগিয়ে দিয়েছে। বিষধর তার স্বভাবসুলভ কাজ করেছে। রামের জীবনদীপ নিভে গেছে সর্পদংশনের সঙ্গে সঙ্গে। নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশে রাম এক ভয়াবহ পরিণতি লাভ করেছে—"রামের পা দু'খানা আকাশের দিকে উঠিয়া আড়ষ্ট হইয়া আছে। পায়ের দশটি আঙুল গোড়ালির উল্টা দিকে দুমড়াইয়া আছে। শরীরটা গহ্বরের ভিতর।"

এই বড়গল্পের একমাত্র এবং সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় চরিত্র রাম। বারে বারে তার জীবনের আশা ও আশাভঙ্গের বেদনা পাঠককে স্তম্ভিত বিমূঢ় করে দেয়। তখনও সে ভিক্ষোপজীবী হয়নি। দিনমজুরি করে তার অভাবের সংসার চালায়। কিন্তু সেই অভাবের সংসারে আনন্দের কোন কমতি ছিল না। বাৎসল্য এত শক্তি ধরে যে তা জীবনের আর সকল অভাবকে তুচ্ছ করে দেয়, অনুভূত হতে দেয় না অন্য অপ্রাপ্তির দুঃখকে। সন্তান পিতামাতার কাছে সবচেয়ে বড় 'বিত্ত'। লবকে ঘিরে তাই রাম ও তার স্ত্রী অফুরন্ত আনন্দে মেতে উঠেছে—"ছেলে গড়িতেছে.......দিন দিন তিল তিল করিয়া তার চৈতন্যের উদয় হইতেছে.......মুষ্টিবদ্ধ হাত তার মুদিত চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে।....... ছেলে হাসে, গয়ামণি আনন্দ করে...... ছেলে হাসিতেছে......রামও হাসে।"

রাম খেটে খায়। তার একা হাতের উপার্জনে সংসার অতিকষ্টে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু ছেলে বড় হলে সেও রোজগার করবে। বাপ-ছেলের সম্মিলিত উপার্জনে সংসারে সাচ্ছন্দ্য আসবে—এমন একটি ভবিষ্যৎ স্বপ্নও রামকে উল্লসিত করে তোলে—"ঐ ছেলেটি যেন দরিদ্র রামের গৃহে সেই অঙ্কুরের উদ্যম, যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া অপরিমেয় মজুত টাকার কাজ দিবে, একেবারে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন অকুতোভয় করিয়া দিবে।" কিন্তু ছেলেকে ঘিরে পল্লবিত রামের রতি নিয়তির ক্রূর হাস্যে অতর্কিত নিভে যায়। সর্পদংশনে লবের মৃত্যুতে রামের বাৎসল্য-রতির অকাল সমাপ্তি ঘটে। তার ভবিষ্যতের নির্বিঘ্নে সুখের স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়।

দিনতিনেক পরে রাম অবশ্য নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে। কাহিনীর প্রারম্ভেই লেখক মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু সকলের আগে মানুষ নিজেকে ভালবাসে।" রামও তার ব্যতিক্রম নয়। বাঁচার চেষ্টায় সে কাজে বের হয়। গয়ামণি বেঁচে থাকলে হয়ত জৈবিক প্রবৃত্তির বশে রাম আবার সন্তানলাভের আশা রাখত। হয়ত আবার ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্নে উত্তাল হতে পারত। রামের ভাবনা যাই থাকুক না কেন, নিয়তির ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। লবকে হারিয়ে বিকারপ্রাপ্ত গয়ামণি যেদিন নদীজলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল সেদিন

রামেরও বাৎসল্য-রতির সব স্বপ্ন চিরকালের জন্য ভেঙ্গে গেল। কঠোর বাস্তবের মুখে দাঁড়িয়ে রাম নিজেকে আবিষ্কার করল সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়, ব্যর্থ এক পুরুষ হিসেবে।

স্বপ্নভঙ্গের বেদনা রামকে দিনমজুর থেকে ভিখারিতে পরিণত করল। এতকাল যে কারুর কাছে হাত পাতেনি, এখন সে নির্বিকারচিত্তে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও ফের গিয়ে সেই দুয়ারেই হাত পাতে। যারা চাইলেই দেয়, তাদের দুয়ারে হাত পাততে বরং রামের লজ্জা—"কিন্তু যে দেয় তাহারই কাছে নিত্য যাইতে লজ্জা করে; যে দেয় না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারগৃহে যে বন্দী, সে যদি দৈবাৎ দেয় এই আশাতেই দানকুণ্ঠের সম্মুখে নিত্যই হাত পাতিতে হয়।" এই বোধ কোনো বিকারপ্রাপ্ত মানুষের বোধ নয়, সচেতন মানুষের বোধ। রাম ভিখারীতে পরিণত হলেও, দুঃসহ আঘাতে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে বসেনি। কিন্তু লোকের ধারণা অন্যরকম। রাম খেটে খাওয়ার চেষ্টা করলেও তার শারীরিক অবস্থা ও মানসিক বিকারের কথা ভেবে কেউ তাকে কাজ দেয়নি। দুর্বল অশক্ত শরীরে বাবুর বাগানের আগাছা পরিষ্কারের কাজ পেয়েও সে দিনের শেষে সিকিভাগও কাজ করতে পারেনি বলে তার কপালে জুটেছে নির্মম লাঞ্ছনা। অতঃপর বাধ্য হয়েই রাম ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিয়েছে।

অবশ্য রামের একমাত্র স্বস্তি, সে একা। তার ভিক্ষার উপর নির্ভর করে পথ চেয়ে বসে থাকবে এমন কেউই তার আর নেই। একারণে যেদিন গাঙ্গুলীর হোটেলে ভাত যতটা নষ্ট না হলে খদ্দের ঠকানো যায় না এবং কুকুরও তাড়াতাড়ি খেতে উৎসাহ বোধ করে না, সেদিন রামের কপালে সেই ভাত জোটে এবং সঙ্গে গাঙ্গুলীর নির্মম স্নেহস্বর শোনা যায়—"সব ক'টি ভাত খাস্ রাম; ফেলিস নে।" অন্ত্যেবাসী মানুষদের মুখে নিজেদের অর্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট তুলে দিয়ে আমরা যারা শ্লাঘা অনুভব করি, তাদের সকলের প্রতিনিধি এই গাঙ্গুলী। তবে রাম খায়ও, কৃতার্থ হয়েই খায়। তার মতো, তাদের মতো নিম্নবর্গের সর্বহারা মানুষদের স্নেহ-ভালবাসা, পাত্র-অপাত্র বিচার করলে চলে না; যেখানে একমুঠো অন্ন জোগাড় করাই দুঃসাধ্য, সেখানে কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হলেও অন্নের স্বাদ বদলে যায় না, বরং আরো মিঠা লাগে।

ভিখারী রামের জীবনে এরপরই আচম্কা সেই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটে। নীলকণ্ঠ মজুমদারের গৃহে প্রাথমিক নির্যাতনের পর সহৃদয় রায়বাহাদুরের দয়ায় (যদিও সে দয়া যতখানি আন্তরিক, তার চেয়েও বেশী প্রদর্শনীয় বিষয় বলে মনে হয়) একটি টাকা রাম পেয়ে গেছে। সেই সঙ্গে দু'খানা লুচি। এই একটি টাকা ভিখারী রামকে সহসা যেন অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারীতে পরিণত করেছে। তার চিন্তাধারাই আমূল বদলে গেছে। অতএব, "নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে রাম যখন নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন তার চিত্ত আনন্দিত—অশক্ত দেহে অপূর্ব একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—জনস্রোতের দিকে পুলকিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে রাম পথ চলিতে লাগিল—"। টাকাই যে এই পৃথিবীতে সকল আনন্দের সার কারণ, অতর্কিতে এই প্রত্যয় রামের মনে জাগ্রত হয়েছে। যেখানে একটি পয়সাই কেউ দিতে চায় না, সেখানে একটা গোটা টাকা পাওয়াটা সচরাচর দুর্লভ ঘটনা বলেই রামের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। লবের মৃত্যুতেও রাম যেন এতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি। কারণ জন্ম-মৃত্যু মানুষের জীবনে এমনিতেই স্বাভাবিক ঘটনা। গরীব মানুষের ঘরে আরো স্বাভাবিক। রোগ-

ভোগের সঙ্গে লড়াই করার, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার সামর্থ্য তাদের অনেকেরই থাকে না। কিন্তু নির্মম বিত্তবান সমাজের প্রত্যাখ্যানের ভাষা শুনতেই অভ্যস্ত যে রাম কিংবা রামের মতো আরো অনেকে, তারা যদি একটা গোটা টাকাই পেয়ে বসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের আনন্দের চেয়ে প্রথমে জাগে বিস্ময়। রামও টাকাটা পেয়ে এই প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কায় মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে তার ভয়ও হয়েছে পাছে দাতা আবেগের ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়ে, দেওয়া টাকা ফিরিয়ে নেবার জন্য লোক পাঠায়। এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবনায় পথ চলতে চলতে সে গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ঘি-এর দাম জিজ্ঞাসা করেছে পথচারীকে। এই উদ্‌ভ্রান্তি স্বাভাবিক। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর লেখা ছোটদের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—'টুনটুনি আর রাজার কথা'। ছোটদের জন্য লেখা হলেও টুনটুনির মানসিকতায় সেখানে ধরা আছে নিম্নবিত্তজীবী মানুষদের স্বপ্ন-চাহিদার বিশেষত্বটুকু। সমাজকাঠামোর বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানে বসবাসকারী মানুষদের চাহিদার সীমা-পরিসীমাও বিভিন্ন প্রকার। টুনটুনির মত সর্বহারা মানুষদের কাছে একটা গোটা টাকা পাওয়া মাত্রেই মনে হয়—"রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে।" রামের মানসিক অবস্থানও তদ্রূপ। একজন ভিখারীর কাছে একটি টাকার মূল্য অপরিসীম। একটি দুর্লভ স্বপ্নের মতই এ পাওয়া।

একটি টাকাকে ঘিরে রামের বিত্তমুখী রতি অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। রাম সেই টাকাকে পরম যত্নে রক্ষা করেছে, খরচ করতে মন চায়নি তার। টাকাটাকে ঘিরে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে ভালো করে নিরীক্ষণ করেছে টাকার দুই পিঠে ক্ষুদিত অজানা রাজার মুখের ছবিটিকে, অজানা অক্ষরের ছবির দিকে। এই ভেবে বিস্মিত হয়েছে যে, "একটা লোক, ধর যদি সে-ই, এই রকম একটা টাকা তৈরী করিতে বসে তবে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয় বিস্তর—যন্ত্রপাতিও অনেক সময় লাগে বোধ হয়—"। টাকাকে কেন্দ্র করে সে একটি অদ্ভুত বিকারে আচ্ছন্ন হয়েছে—'টাকাটা বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত একবার কপালে ছুঁয়াইল, তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ করিয়া মুষ্টি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিয়া তাহাকে অনুভব করিতে লাগিল.....হাত গরম হইয়া উঠিল; মুষ্টি খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, টাকাটা রহিয়াছে....... দেখিয়া সে নূতন করিয়া আর একবার অবাক হইল।" টাকার প্রতি ধীরে ধীরে রাম মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। টাকাটা যেন সজীব কোন সত্ত্বা। তাকে ভালোবাসা যায়, স্নেহ করা যায়, সম্ভ্রমও জাগ্রত হয় মনের মধ্যে, আর জাগ্রত হয় অপরিসীম বিস্ময়; এ যেন স্বপ্নকল্পনার কোনো অধরা মাধুরী বাস্তবের মূর্তিমতীরূপে ধরা দিয়েছে। রামের সঙ্গে টাকাটির এক বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

টাকার মূল্য সমাজের সবস্তরের মানুষদের কাছেই অপরিসীম। সহজে কেউ কাউকে এক আনাও দিতে চায় না। বাঘভাঙার শ্রীবাস সরকার কোটের পকেটস্থ রেজ্‌কির সঙ্গে অনেক লড়াইয়ের পর দু আনা ছুঁড়ে দেন ভিখারী রামের দিকে। তাও পুত্রের বিবাহ দিয়ে বহুপ্রাপ্তিসহ দেশে ফিরছেন খোশ মেজাজে, তাই এই উদারতা। রামের দুর্ভাগ্যের প্রতি লেখক তীক্ষ্ণধার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীবাস টাকাটা ছুঁড়ে দিলে রাম ধরতে গেল "কিন্তু শূন্যের জিনিষ লুফিয়া লওয়ার তৎপরতা রামের ছিল না—দু' আনিটা তাহার হাত এড়াইয়া মাটিতে পড়িল—"।

রামের মত মানুষদের জীবনে দৈবী অঘটন সচরাচর ঘটে না, যাও বা দু-একটা ঘটে, তাও উপযুক্ত তৎপরতার অভাবে হাতছাড়া হয়ে যায়। রামের জীবনে একটাকা বা দু'আনা পাবার সৌভাগ্য ক্ষণিক, কিন্তু সে টাকাও তার কোনো ভোগে লাগবে না, ঠিক সময়ে খরচ করার তৎপরতা না দেখানোয়। এমন ইঙ্গিত মেলে এখানে।

রামের মত মানুষদের জীবনে ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। সেই ক্ষুধার জ্বালাতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। উপবাসের চিহ্ন তার দেহের সর্বত্র—"বুকের দুই পংক্তি পঞ্জরাস্থির সর্বনিম্নের যে দুখানি উদরের ধারে আসিয়া বেঁকিয়া গেছে তাহা যেন অভ্যন্তরস্থ প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রকে ঠাসিয়া বসাইয়া দিয়া নীচের পানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—পেট পেটের আকারের নয়; বুকে সেই হাড় দু'খানা আর তলপেটের মধ্যবর্তী স্থান ব্যাপিয়া সে একটি গভীর গহ্বর কেবল; পেটের চামড়া তলাইয়া পিঠে লাগিয়াছে।" কিন্তু শরীরের এই দুর্ভোগ সত্ত্বেও রাম ভিক্ষালব্ধ গোটা টাকাটাকে খরচ করেনি, সঞ্চয় করে রেখেছে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন ভিক্ষায় বের হবার আগে—"টাকাটা হাতে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করে—জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তার দুই পিঠ বরাবর চাটে—তারপর তাহাকে আবার ঝুলিতে ফেলে—"।

টাকাকে ঘিরে রামের এই অস্বাভাবিক রতিও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিয়তির ক্রূর হাস্য আবার উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। লুচির গুঁড়ার লোভে আসা ইঁদুর ঝুলি ফুটো করে ফেলায় টাকাটা সাপের গর্তে গিয়ে পড়েছে। টাকা হারিয়ে রাম শোকে উন্মত্তবৎ হয়ে উঠেছে। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করে সেই গোটা টাকাপ্রাপ্তির দিনটাকেই স্মরণ করেছে বারবার। টাকা পাবার শুভ মুহূর্তের আনন্দে-রোমাঞ্চে পুলকিত হতে চেয়েছে—"রামের মনে পড়িতে লাগিল, তিনি জামার পকেটে হাত দিলেন—টাকাটা বাহির করিয়া আনিলেন—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতের দিকে চাহিলেন—তাহার হাত কাঁপিতেছিল—পাঁচটি আঙুল জড় করিয়া তিনি টাকাটা ধরিয়া ছিলেন—টাকাটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন—তাহার হাতের উপর পড়িল—স্পর্শ ঘটিল—স্পর্শের অপরিমেয় অনুভূতি মস্তিষ্কে হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গে এক নিমেষে ছড়াইয়া গেল—"।

এইসময় নির্জ্ঞানে রামের বিকারগ্রস্ত চিত্তে একটা দোদুল্যমান অবস্থার সূচনা হয়েছে। একদিকে যেমন টাকার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, অন্যদিকে আবার বহুদিন পরে সুষুপ্তির অতল তল থেকে মৃত পুত্র লবের স্মৃতি উঠে এসে রামের বিত্তরতির সামনে প্রশ্নচিহ্নের মত এসে দাঁড়িয়েছে। রামের স্বপ্নে দেখা চাঁদ তাই কখনো রাজার মুখ আঁকা টাকা, আবার কখনো মৃত পুত্র লবের মুখের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে। স্নেহবাৎসল্যমুখী রতি ও বিত্তমুখী রতির পারস্পরিক লড়াই বেধেছে।

জেগে উঠে রাম ঐ প্রাপ্তটাকার ইতিহাস নির্ম্মল নয়—এমন কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। এ চেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল। কিন্তু এ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। রাম নিজেই বুঝতে পেরেছে—"মিথ্যার দ্বারা কেবল ভয়ত্রস্ত নির্ব্বোধকে বঞ্চিত করিবার জন্য পাপ-পুণ্যের অগণিত কাহিনী বিরচিত হইয়াছে; স্বর্গকে পুষ্পে অমৃতে অপ্সরায় সুখময় এবং নরককে শেলে শূলে কণ্টকে এবং আরো অনেক কিছুর দ্বারা ভয়াবহ করিয়া চিত্রিত করা

হইয়াছে। ...শুধু তাহাই নহে.......পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া মানুষকে এমন দুস্ত্যজ্য অভ্যাসের বশবর্তী করিয়া আনা হইয়াছে যে, একটি চোখ নিজের ভিতরের দিকে আর একটি চোখ উর্ধ্বে অহেতুক আর অপরিচিত একটা স্থানের দিকে না রাখিয়া তার উপায় নেই।

"কিন্তু জ্ঞানীরা জানেন যে, ধনে পাপের ছোঁয়াচ লাগে না—অগ্নি যেমন কোনও মলিনতা গ্রহণ করে না, ধনও তেমনি।" রাম বুঝতে পেরেছে, "পয়সায় পাপ নেই।"

অবশ্য বিবরমধ্যস্থ কালসাপ সেই ফণা তুলে বেরিয়ে এসেছে, অমনি বিত্তরতি অন্তর্হিত হয়েছে। নির্জ্ঞানের অন্ধকার থেকে লবের স্মৃতি রামকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে পূর্বজীবনের একটি অচরিতার্থ স্বপ্নের দিকে। সেই স্বপ্ন সর্পদংশনে আত্মবিনাশের স্বপ্ন। নিয়তি রামকে বাঁচিয়ে রেখে যেন তার নিষ্ঠুর খেলা চালিয়ে যাবে ভেবেছিল। রাম যেন সেই নিয়তিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। সাপের উদ্যত ফণার সামনে পা বাড়িয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করেছে। বেঁচে থেকে নিয়তিকে পরাভূত করার ক্ষমতা রামের ছিল না। একারণে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেই রাম নিয়তির নিষ্ঠুর খেলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। এ মৃত্যু স্বেচ্ছাকৃত বলেই সর্পদংশনের যন্ত্রণা রামকে বিচলিত করতে পারেনি—"দংশন অনুভূত হইল। মস্তিষ্কে, তারপর শরীরের রক্ত আগুন হইয়া অগ্নিস্রোতের মতো বহিতে লাগিল। শরীর পুড়িতে লাগিল, শিরাগুলি ফাটিতে লাগিল, কিন্তু সে মুখ বিকৃত করিল না।"

রামের জীবনে প্রথমে নিজ সন্তান লবকে ঘিরে বাৎসল্য রতি এবং লবের মৃত্যুতে সেই রতির বিরতি; পরে একটি টাকাকে কেন্দ্র করে রামের বিত্তরতি জাগ্রত হয়েছে এবং সেই টাকার অন্তর্ধানে উক্ত রতিরও বিরতি ঘটেছে। মানুষ কোনো না কোনো রতির আকর্ষণেই জীবনকে উপভোগ্য বলে মনে করে, তার সবটুকু রঙ-সবটুকু রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ ভোগ করতে চায়; কিন্তু রামের জীবনে সকল রতির অতর্কিত বিরতিতে তার জীবনে একরাশ অন্ধকার শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। স্বপ্নে তাই সে ভেবেছে—"আকাশে মেঘ করিয়া আছে— তাহাতে বিদ্যুৎ নাই, সে গর্জন করিতেছে না, কেবল ক্রমান্বয়ে আরো ভারি দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে— মেঘের রং এত কাল যে, অতদূরে রহিয়াছে বলিয়াই তাহা সহ্য করা যাইতেছে—নামিয়া যদি কাছে আসিয়া দাঁড়ায় তবে বুক ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে—"। বর্ষণের প্রতিশ্রুতি যে মেঘে নেই, সে মেঘ কখনো আমাদের প্রিয় বল্লভ হয়ে উঠতে পারে না। রামের জীবনের বাকিটুকু এখন বর্ষণশূন্য নিকষ কালো মেঘের মতো—প্রতিশ্রুতিহীন, উদ্‌ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। স্বপ্নদর্শনে মনোজগতের এই নিষ্করুণ উদ্‌ভ্রান্তির প্রতিফলন ঘটেছে। তাই মৃত্যুকে বরণ করে সে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে রামের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। অবশ্য আঘাতে আঘাতে সেইসময় সে স্বাভাবিক-চৈতন্যের সীমা পার হয়েছিল এটাও মনে রাখতে হবে।

এই গল্পে 'নিয়তি' অদৃশ্যে থেকেও রামের ভাগ্যাকাশের দোসর, নিয়ন্তা। রামের পূর্বপরিকল্পিত সকলপ্রকার স্বপ্নকে বারম্বার লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে এই অদৃশ্য নিয়ন্তা। অনিলবরণ রায় 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' (বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৬) প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "প্রাচীন গ্রীসদেশীয় Tragedy-তে নিয়তির (Doom, Necessity, Fate) খেলা বর্ণিত হইয়াছে, জগদীশচন্দ্রের সয়তানী শক্তির সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ অদৃষ্ট বা নিয়তি

যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে, কোথাও একটু ফাঁক পাইলেই মানুষকে আক্রমণ করিবে।" 'রতি ও বিরতি'তে এই নিঠুর নিয়তির অকারণ আক্রোশের শব্দ বারবার শুনতে পাওয়া যায়। রামের নিজের কোনো দোষ-ত্রুটি না থাকলেও, নিয়তির অকারণ-বিরূপতায় অকালেই রাম রতির রাজ্যে বিরতির আবাহন গেয়েছে। গাইতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ যে নিয়তির হাতের ক্রীড়নকমাত্র, আর কিছু নয়, 'রতি ও বিরতি'তে জগদীশচন্দ্রে যেন আরেকবার তার প্রমাণ দিলেন।

রাম ও নিয়তি চরিত্রের প্রতিতুলনায় গয়ামণির বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গতানুগতিক, সরল, জট-জটিলতা-মুক্ত। পুত্রকে ঘিরে রামের মত গয়ামণিও বাৎসল্যরতিতে ভেসে গিয়েছিল। গয়ামণি আবহমানকালের মায়ের চেয়ে পৃথক কিছু নয়। সন্তানকে ঘিরে দুশ্চিন্তা-উৎকণ্ঠা-কৌতূহল-বিস্ময় ভালোলাগা ও ভালবাসা—কোনও কিছুরই অভাব নেই তার মধ্যে। ছেলের শৈশবদশা থেকে আটবৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি দশা গয়ামণির কাছে বিস্ময়ের নূতন জগতের দ্বার যেন উন্মোচন করেছে। লবকে ঘিরে গয়ামণির মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন রূপটি লেখক স্পষ্ট করেছেন—"ছেলে শান্ত হইয়া ঘুমাইলে গয়ামণির মনে হয়, এমন শান্ত কোনো ছেলে নয়; দৌরাত্ম্য করিলে মনে হয় এমন দুরন্ত ছেলে আর নাই.....কথা রাখিলে মনে হয়, মায়ের বাধ্য এই ছেলে যেমন, তেমন আর কাহারো ছেলে নয়; না রাখিলে মনে হয়, এমন অবাধ্য ছেলে যেন কোনো মায়ের পেটে না আসে।" লব রাম ও গয়ামণির কাছে যেন এক মূল্যবান বিত্তসম্পদ। তাদের সর্বক্ষণের চিন্তা এই দুর্লভ সম্পদটিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, যত্ন করা যায়—"ছেলেকে মূলধনের স্থানে স্থাপিত করিয়া রামের আর গয়ামণির তেমনি ক্ষণবিহারী খণ্ড খণ্ড সুখচিন্তার শেষ থাকে না, আর মাঝে মাঝে তেমনি সব হিসাব গোলমাল হইয়া যায়।" সর্পদংশনে লবের আকস্মিক মৃত্যুতে গয়ামণির সকল ভুবন কাঙাল হয়ে গেছে। দারিদ্র্যময় দু:সহ জীবনের একমাত্র আনন্দ, একমাত্র অবলম্বনকে হারিয়ে গয়ামণি তাই মানসিক সুস্থতা হারিয়ে বসেছে।

প্রথমে রামের মত গয়ামণিও সর্পদংশনে মরণ কামনা করে সাপের গর্তের কাছে মাথা রেখে শুয়ে থেকেছে। কিন্তু সাপ তাকে বা রামকে দংশন করতে বিবর ছেড়ে উঠে আসে নি। বৃথা আশা যেহেতু মরতে মরতেও মরেনা, তেমনি লব কোনও না কোনওভাবে বেঁচে ফিরে আসবে—এই আশায় শোকাতুরা মা নদীতীরে বার বার ছুটে গিয়েছে। গ্রামজীবনের সংস্কারবশতঃ এবং স্নেহের স্বভাবে এই কামনা স্বাভাবিক, একান্ত বাস্তব। লখীন্দর বাসরশয্যায় সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করার পরও পুনর্জীবনলাভ করে ফিরে এসেছিল; লবের শবও হয়ত কোনো সর্পবিশারদ গুনীর হাতে পুনর্জীবনলাভ করে ফিরে আসবে—এমন স্বপ্ন দেখে উন্মত্ত মা নদীতীরে বারবার ছুটে গিয়েছে এবং শেষে নদীজলেই ঝাঁপ দিয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। গয়ামণির মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ও দুঃখজনক পরিণতি আমাদের বেদনায় স্তম্ভিত করে দেয়। তার স্বপ্নদর্শন গ্রামবাংলার সাধারণ জনমানসের সংস্কারের প্রতিফলন। গয়ামণির জীবনের একমাত্র রতি ছিল বাৎসল্যরতি। কিন্তু অদৃশ্য এক নিষ্ঠুরের চক্রান্তে সেই রতি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, মৃত্যু এসে গয়ামণির বেঁচে থাকার যন্ত্রণাকে যেন লাঘব করেছে। তার রতিরও বিরতি ঘটেছে আচমকা, কোনো সাধ পূর্ণ হবার আগেই।

কাহিনিতে আরো কিছু গৌণ চরিত্র আছে—নীলকণ্ঠ মজুমদার, রায়বাহাদুর, তেওয়ারি, হরিপ্রিয়া, শ্রীবাস, রাখহরি—অল্প কয়েকটি রেখায় চরিত্রগুলির ঈপ্সিত বৈশিষ্ট্য লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। রায়বাহাদুর বা তেওয়ারি—দুটি চরিত্র দুই পৃথক সামাজিক বৃত্তের প্রতিনিধি. কিন্তু রামের প্রতি ব্যবহারে এরা মানসিকতায় পরস্পর পরস্পরের সমীপবর্তী। রায়বাহাদুর যেমন রামের স্পর্শের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে টাকাটা উপর থেকে ছেড়ে দেন, তেওয়ারিও তেমনি "[illegible] আলগোছ থাকিয়া উপর হইতে লুচি তাহার অঞ্জলির উপর ছাড়িয়া" দেয়। শ্রীবাস সরকারকেও দেখি "দু'আনিটা রামের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন"। রামের মত অন্ত্যেবাসী মানুষগুলির প্রতি সমাজের আর সকল স্তরের মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই নিষ্করুণ, এমনই অপমানজনক। চরিত্রগুলি যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সমজাতিয় মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেছে একদিকে, তেমনি আবার রামের কোণঠাসা সামাজিক অবস্থানের অসহনীয় রূপটিকে প্রকট করে তুলেছে।

তবে জগদীশ গুপ্তের গল্পে কখনো কখনো আবেগের প্রাবল্যে কাহিনি নিরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অপ্রয়োজনীয় অনেক আখ্যান গল্পের সূচীমুখী টানকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এই গল্পেও হরিপ্রিয়া বা রাখহরি কেন্দ্রিক কাহিনিগুলি 'সতর্ক পাঠেও' মূল গল্পের পক্ষে তেমন অনিবার্য মনে হয় না। এমনকি শ্রীবাস সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত দু'আনা প্রাপ্তির ঘটনাটিও অযথা পল্লবায়িত, আবেগ-শৈথিল্যের নিদর্শন। ধনীর রতি প্রবৃত্তির চিত্র যদি এগুলির মধ্যে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েও থাকে, তথাপি বলা চলে, তা আরও সংহত, সংযত হওয়া উচিত ছিল। রাখহরির ঘটনাটি একটি পৃথক অপরাধমূলক গল্পের বিষয় হতে পারত, তবে রামের পক্ষে এই গোপন অপরাধের ঘটনা এত খুঁটিনাটিসহ জানা যে প্রায় অসম্ভব, এ ব্যাপারটি লেখকের একবারও মনে হয়নি (সুখের কথা, একজন সাহসী সমালোচক অবশ্য পাদটীকায় হলেও এই সংশয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন; দ্র. চট্টোপাধ্যায়, ড. হীরেন—বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা· জগদীশ গুপ্ত; প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃ.১৬৬)।

পাঠক সংখ্যা বিচারে জগদীশ গুপ্তের অবস্থান বাংলা সাহিত্যে প্রান্তেবাসীর মত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালপর্বে তাঁর আবির্ভাব—স্বভাবতঃই তাঁর মনে ও মননে যুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার ক্ষতচিহ্ন। শুভবুদ্ধির অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সন্দিহান; এক অলঙ্ঘ্যনীয় দুর্দৈব অহরহ আমাদের সকল পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে প্রস্তুত এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি দেখেছেন বিশ্ববিধাতা কেবল 'ছবিই আঁকেন না, ছিঁড়েও ফেলেন', আর সেই ছবি আঁকা ও ছিঁড়ে ফেলার মধ্যবর্তী সময়টুকু অবিশ্বাসে-ঘৃণায়-ক্লেদাক্ত মানসিক বিসর্পিলতায় পূর্ণ। জীবন তাঁর কাছে অমৃত পিয়াসের কোনো আনন্দ জাগায় না, বরং তার স্বাদ তিক্ত-কষায়-কটুগন্ধী। এমনকি চারপাশের প্রকৃতিতেও তিনি রোমান্টিক ভাবালুতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাননি। তাঁর গল্পে উপন্যাসে প্রকৃতি একারণেই নিছক পটভূমিকা। 'রতি ও বিরতি'তেও আমরা দেখি, রামের জীবন নিয়ে, তার রতিপ্রবৃত্তি নিয়ে নিয়তির ছবি আঁকা ও ছিঁড়ে ফেলার খেলা। রাম যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ক। রাম রাজা নয়, সাধারণ ভিখারী। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিয়ে গ্রীক নিয়তি যেমন আপন অভিলাষ অনুযায়ী পাত্রপাত্রীর জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আনে, পরিণামে মৃত্যু, রামও তেমনি বারংবার নিয়তির হাতে পরাজিত হয়েছে।

রামের ট্র্যাজেডি তার পাপের বা অন্যায় অভিলাষের ফল নয়। জগদীশ গুপ্তের নিয়তিবাদে অতর্কিত নিষ্ঠুর অ-প্রাকৃত শক্তির যে ক্রূরহাস্য আমরা বারবার লক্ষ্য করি, রামের জীবনেও সেই 'অতর্কিত'ই পরিণামী সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

একইসঙ্গে প্রকৃতিকেও নিয়তির সহচর বলে মনে হয়। এ প্রকৃতির কোথাও শুশ্রূষার আশ্বাস নেই। ফুল্লরা নদী আপনবেগ পাগলপারা হয়ে ছুটে চলেছে। কোনো সমবেদনা নেই। রামের জীবনের দুঃখ দুর্দশার সে সহচর নয়, সমব্যথী নয়। বরং গয়ামণিকে গ্রাস করে ফুল্লরা নিয়তির নিষ্ঠুর খেলাকে জমিয়ে তুলেছে। সব মিলিয়ে কাহিনীতে রতির উৎপত্তি ও বিলয়ের যে ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে তা নির্মম, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ। আমাদের জীবনে এইরূপ শত শত রতির উদয় আর বিলয় তথা বিরতির ইতিহাস লেখা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একরাশ অতৃপ্তি নিয়ে মানুষ বাধ্য হয় সেই নিয়তি-নির্দিষ্ট বিরতিকে মেনে নিতে। রামের মতনই জীবন তখন অন্ধকার, দিশাহীন বলে মনে হয়, বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যায়। রাম যেমন স্বেচ্ছায় 'মরণ'কে 'শ্যামসমান' ভেবে নিয়ে বরণ করেছে, আমাদেরও দেহ-মন আত্মা সেইভাবে অচরিতার্থ রতির জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে। আমরাও তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হই। জীবনের এটাই চরম সত্য। জগদীশ গুপ্ত আপাতভাবে রামের কাহিনি বলেছেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি বুনেছেন মানুষের চিরন্তন অচরিতার্থতার কথা তথা রতিবিরতির যন্ত্রণার ইতিহাস। টি. এস. এলিয়েটের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ডে' সন্ত অগাস্তিন রতির যন্ত্রণায় হাহাকার করেছিলেন—'burning, burning' বলে; আমরাও সেই দাহই অনুভব করি।

চন্দ্র সূর্য যতদিন : একটি নিরীক্ষণ

পার্থ শর্মা

সূচনা থেকে সমাপ্তি জগদীশ গুপ্তের গল্প 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' একটি সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এমন একটি সম্পর্ক যা নাকি একজন নারীর তথাকথিত সমাজব্যবস্থায় বেঁচেবর্তে থাকবার শেষ সম্বল। অথচ নিরলঙ্কার বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটির পর একটি ঘটনা আমাদের জানিয়ে দেয় যে মূল্যবোধহীনতা, বিশ্বাসহীনতা এবং বিবেকহীনতা এই পুরুষ শাসিত সমাজের কতো বড় অভিশাপ। গল্পটি পাঠ করতে করতে আমরা বুঝতে পারি আসলে সম্পর্কগুলো কত বেশী করে ক্ষয়প্রবণ। নদীর পাড়ভাঙা আর গড়ার মতো। অথচ এমন নয় যে জীবনের গড়ে ওঠার বেলায় কোন আয়োজনের অভাব ছিল, এমনও নয় পূর্বের সম্পর্ক থেকে দীনতারণ বেরিয়ে এসেছিল। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রের এমন সুনিপুণ চিত্রণ খুব অল্পই দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্ত এই গল্পের মধ্য দিয়ে নারী মনের সুগোপন কথাগুলি তাব ইচ্ছা অনিচ্ছার ভাষারূপে ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রকরের মতো। নারী জীবনের যাপিত তন্তুগুলি জরিয়ে জরিয়ে এক অদৃশ্য পাক তৈরী হয়েছে গল্পে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় জগদীশ গুপ্তের পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ফলত এ গল্পও তাই 'বিবমিষা' জাগায়। উচ্ছ্বাস বিবর্জিত ভাবে সুর ও লয়ের এই সমন্বয়ী রূপ তৎকালীন সময়ে ছিল বিরল। তাই জগদীশ গুপ্ত তাঁর গল্পধারার স্বাভাবিক নিয়মেই ফুটিয়েছেন চবিত্র, পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং পরিপার্শ্ব। এভাবে গড়ে উঠেছে একটি গোটা গল্প। গল্পকার কেবলমাত্র সমাজ বীক্ষণের প্রতি মনোযোগী ছিলেন তাই নয় বর্তমানের নারীবাদের পূর্বরূপ তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশিত হয়েছে। ইঙ্গিতে অভ্যাসে এবং আভাসে অকথিত কাহিনি যেন গল্পের পরিবেশকে অন্যমাত্রায় ভাবিত করে গেছে।

আসলে সমাজের সেই সামগ্রিক রূপ যা তৎকালীন ব্যবস্থায় ছিল চিহ্নিত, সেই সামাজিক চরিত্রের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন গল্পকার। বিষয় বিন্যাসের এমন সুনিপুণ কাবিগরি দক্ষতা যেন জগদীশ গুপ্তকে স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করে। তাই গল্পের ভঙ্গিমা, বিষয় এবং চরিত্রগুলি যেন সম্পূর্ণ পৃথক এক শিল্পমূল্য অর্জন করে। এক সাবলীল গল্প কথন ভঙ্গিমা, অলঙ্কারহীন সহজ সরল ভাবে এত সুকঠোর এবং সুকঠিন বাস্তবের সমুচিত সজ্জা তৎকালীন অপর কোন গল্পকারের হাতে দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি দেখেছেন এবং দেখাকে শিল্পমূল্যে দীক্ষিত করেছেন। সংস্কার এবং সম্ভাবনাকে এক বিন্দুতে এনে স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁর 'গল্প পাঠকের ডায়ারি' শীর্ষক গ্রন্থে জগদীশ গুপ্তের গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন :

"প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্প উপন্যাসে এক ধরনের নৈরাশ্যবাদী তিক্ততা বজায় আছে। এই তিক্ততা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুরতায় পৌঁছেছে।"

আমরা একথা স্বীকার করে নিয়েই শুধু এটুকু বলতে পারি যে গল্পগুলির পরিপার্শ্ব লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়, তিনি তাঁর চারপাশ-জন-জাতি-জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

অচল পয়সার মতো পথে পথে ছড়ানো জীবনের গাথামালাকে তিনি কথাসূত্রে শব্দের পর শব্দে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঠিক সেকারণেই অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে" গ্রন্থে "রঞ্জন রশ্মির নীচে মানুষ: জগদীশ গুপ্তের গল্প" প্রবন্ধে এক সুচারু ভাষাকথায় বলে উঠেছেন :

"একস- রে-র' তলায় মানুষ যেমন বিবস্ত্র, যেমন লুকোতে পারে না নিজস্ব ক্ষতস্থান, জগদীশ গুপ্তের গল্পেও মধ্যবিত্ত মানুষ তেমন নির্মমভাবে ধরা পড়ে যায়! আর আত্ম-আবিষ্কারের উত্তেজনায়; বিস্ময়ে, এমন কি লজ্জায় হয়ে পড়ে অধোবদন! অথচ আশ্চর্য, তবু জিজ্ঞাসু পাঠককে ফিরে আসতেই হয় বাংলা গল্প-শিল্পের সবচেয়ে সিনিক্ এই মানুষটার সৃষ্টির কাছে—সত্যবদ্ধ জীবনের পাঠ নিতে।"

আর তারপরেই তিনি লিখছেন :

"জগদীশ গুপ্ত সিনিক কেননা, জীবনের জটিল বিন্যাস, বর্ণ এবং বর্ণ বিপর্যয়—সমস্তের মধ্যে কোথাও তিনি সেই তথাকথিত মানবিক মহত্বকে আবিষ্কার করতে পারেন নি। "লার্জার দ্যান লাইফ' মানুষকে তিনি খুঁজে পাননি আপন সময়ের চলাচল পথে, দুটো মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী লগ্নে।" এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারি কোন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জগদীশ গুপ্ত একের পর এক এই ধরনের গল্পগুলি রচনা করেন, যেভাবে জীবনের তিক্ত রক্তাক্ত ভূমিকা লিখিত হয়। যেখানে শেষ পর্যন্ত সহায় সম্বল থাকা সত্ত্বেও ক্ষণপ্রভাকে নগ্ন হয়ে যেতে হয় সকলের কাছে। এই নগ্নতা সময়ের, এই নগ্নতা মানুষের, এই নগ্নতা জীবনের। তাই একটিমাত্র চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়েই গল্পকার তাঁর প্রার্থিত সাফল্যকে স্পর্শ করতে পারেন। সময়ের জাদুকাঠি কিভাবে হারিয়ে দেয় সবকিছুকে। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে ক্ষণপ্রভা এবং প্রফুল্ল দুজনের একইগৃহে আসার একটা কারণ যেমন সম্পত্তি তেমনি একটি অছিলা ছিল ক্ষণপ্রভার উনিশবছর হয়ে যাওয়া। সে যেন কুড়ি হতেই বুড়ি হয়ে যাবে সংস্কারের বশে। এই অন্ধকার সর্পিল ব্যবস্থায় ক্ষণপ্রভাদের এভাবেই নগ্ন হতে হয়, জগদীশ গুপ্ত সেই সত্যসন্ধানকে গল্পকথায় বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি দিয়েই।

গল্পটির মধ্যে কাহিনীর যে গতায়াত তাতে মনস্তাত্ত্বিক বাধা বিপত্তি ভালো মন্দের ঝড়বৃষ্টি ঘটেছে অনবরত। কিন্তু সময় কোন কিছুকে মাফ করেনি। শেষপর্যন্ত তার হাতের নিয়ন্তা হয়ে গেছে সবকিছু। একজন স্বামীর দুইজন স্ত্রীকে নিয়ে নির্লিপ্ত জীবনযাপন আর অপরদিকে সদ্য মা হয়ে যাওয়া এক তরুণী গৃহবধূর সকরুণ কাহিনী কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ গল্পে সেই করুণ কথামালা শেষ হয়ে যায়নি। ক্ষণপ্রভা তার ক্ষণপ্রভা দান করে নিস্তেজ হয়ে গেছে বলে যারা ভেবেছিল তারা ভুল ভেবেছিল, আসলে সেই অন্ধকার দিনরাত্রির গভীর প্রকোষ্ঠে জমা হয়েছিল প্রচুর বারুদ। একদিন ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এসেছিল সব। সেদিন লজ্জা সম্ভ্রম আব্রু সবকিছু একসাথে হারিয়ে গেছিল একজন নারীর, প্রকাশিত হয়েছিল ঘৃণা। আমাদের স্বাভাবিক সাময়িক দুর্বলতাগুলো হারিয়ে গিয়েছিল ক্ষণপ্রভার। প্রবল মানসিক চাপ আর তাপে অস্থির হয়ে গিয়েছিল সে। মন আর মানুষের ক্রমাগত টানাপোড়েনে একদল অমানুষের মুখের উপর সে ছুঁড়ে দিয়েছিল একরাশ ঘৃণা আর এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ—তার নগ্নতাকে। তাই এই গল্প কেবলমাত্র এক অভিনব গল্পের সীমায় সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং

সময় পেরিয়ে অসময়ের দরজায় লেখকের সচকিত উপস্থিতি, দেখা আর না দেখা পৃথিবীর আশ্চর্য মেলবন্ধন।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যায় জগদীশ গুপ্তের অপর একটি ছোটগল্প 'পয়োমুখমের' কথা। সেখানে পণ দেওয়া নেওয়ার এক বিচিত্র খেলা চলে। বাড়ীতে বউ এলেই শ্বশুর মহাশয় মিথ্যা ঔষধ খাইয়ে তাদের মেরে ফেলেন। কিন্তু একদিন ছেলের কাছে এই ছলনা ধরা পড়ে যায়। ঠিক সেভাবেই দীনতারণ ভালোবাসার খেলা খেলেছে দুজনের সঙ্গে। কিন্তু সেই খেলার শরিক হতে পারেনি ক্ষণপ্রভা। প্রতিদিনের অসম্মান অবজ্ঞা লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে তার যৌবনকে সাক্ষী রেখেছে জনগণের সামনে। তার তথাকথিত বুড়িয়ে যাওয়া যৌবনকে আরেকবার প্রমাণ করতে চেয়েছে সে। তার মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর সংশয় তাব মনেব তন্তুগুলোতে একসাথে ঝংকাব বাজিয়ে দিয়ে গেছে।

গল্পটির সূচনাতেই আমরা পাই—"পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া এবং জননীর অনুমতিক্রমে দীনতারণ তাহার শ্যালিকা প্রফুল্লকে বিবাহ করিযা আনিল। প্রথমা পত্নী ক্ষণপ্রভা মরিয়া ত যায়ই নাই, উপরন্তু তাহার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানও জন্মলাভ করিয়াছে।" অর্থাৎ এখানে এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে একথা পাঠককে গল্পকার জানিয়ে দিতে চাইলেন যে দীনতারণেব আচরণ যেন পিতা মাতার অনুরোধে ঢেঁকি গেলা। আসলে তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছাই ছিল সম্পত্তি আর যুবতী প্রফুল্লেব প্রতি। এবং এই উক্তির মধ্য দিয়েই ক্ষণপ্রভার বর্তমান পরিস্থিতির কথাও গল্পকার জানালেন, জানালেন তার গর্ভজাত সন্তানের কথাও। এবং এই নিরাসক্ত ভঙ্গিমা বুঝিয়ে দিল সন্তান এবং প্রথমা স্ত্রীর থেকেও দীনতারণেব আগ্রহ প্রফুল্লব দিকেই বেশী। এবং একই সঙ্গে একথাটাও স্বীকৃত হয়ে গেল যে তিনি একই পরিবারেব দুইবোনকে সতীন করে নিয়ে এলেন। এক নতুন সম্পর্কের নিরীক্ষণ শুরু হল। দুইবোনের পারস্পরিক ভোগদখল সত্ত্বের টানাপোড়েন। ভালোবাসা আব ভোগের প্রাথমিক সংজ্ঞাটাই সেখানে এলিয়ে দিলেন দীনতারণ। আর বাৎসল্য প্রথমা চিরকালীন সংস্কার তাকেও কটাক্ষ করলেন গল্পকার, সন্তানের প্রতি দীনতারণের উপেক্ষার মধ্য দিয়ে সেকথা স্পষ্ট হল। জগদীশগুপ্ত তাঁর এই গল্পটিতে বাস্তবতার এক চরম নিদর্শন রেখেছেন। বাস্তব জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনামালাকে তিনি দূর থেকে যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করছেন। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে আমরা দেখতে পাই তিনি গল্পের বর্ণনাক্রমের মধ্যে দীনতারণের পরিবারের সকলের দুইবার করে বিবাহ করবার রেওয়াজ যে ছিল সুকৌশলে সেকথাও জানিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ঘটনাক্রমকে পরবর্তী ঘটনা অতিক্রম করে গেছে। প্রথমত দীনতারণের পূর্বপুরুষবা কেউই প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হলো পূর্বসূরীরা কেউই একই পরিবারের দুইবোনকে স্ত্রীরূপে নিয়ে আসেন নি। ক্ষণপ্রভা এবং প্রফুল্ল কুমারীব মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যে সীমারেখা তাদের মধ্যে টানাপোড়েনের জন্ম দিল তার একমাত্র কারণ তারা দুইবোন। দুজনার বেড়ে ওঠার মধ্যে যে পারস্পরিকতা স্নেহ প্রীতির সম্পর্ক একমুহূর্তে তা ছিন্ন হয়ে গেল। তখন স্বামীকে পাবার ব্যাকুলতা তাদের দুইজনকে

দুভাবে পেয়ে বসল। আর সেই মনের জটিল কারখানায় ক্রমাগত আঘাত পেতে পেতে ক্ষণপ্রভাব হঠাৎ দ্যুতি হারিয়ে গেল, সে উন্মাদ হয়ে পড়ল। জীবনের এই জৈবিক ও নৈতিক সমস্যাটিকেই লেখক দেখিয়েছেন, সমাধান নয় ছোটগল্পের ছোট পরিসরের মধ্যে পুরুষ মানুষের লোভ অপরের জীবনে কিভাবে নেমেসিস হয়ে নেমে আসে তার সাক্ষ্য বহন করেছে। দুইবোনের পারস্পরিক ভালোবাসা তখন ভাগাভাগি হয়েছে স্বামীর কাছে এসে। স্বামীর সমস্ত আবেগ আকুলতা আর শারীরিক ক্ষিদে যখন একমুখী হয়ে প্রফুল্লর উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছে সেই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে পারেনি ক্ষণপ্রভা। নিজের সন্তানকে দিয়ে স্বামীর সোহাগ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। কিন্তু সেই শেষ সম্বলটুকুও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। সে উন্মাদ হয়ে গেছে। তাঁর ভালোবাসাকে সে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিল, তার গোপন গভীর অধিকারবোধের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল স্বামীর কাছে, কিন্তু স্বামীর প্রত্যাখ্যানের ভাব, ভাষা আর শরীর সর্বস্ব ক্ষিদে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। প্রিয়জনের গভীর আয়োজন যখন তাকে ছাড়িয়ে অপরের উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রহর যাপন করে তখন ভালোবাসার একমাত্র অবলম্বন থাকে বিস্মরণ। ক্ষণপ্রভাও উন্মাদ হয়ে গিয়ে স্মৃতি থেকে ধূসর মায়াজালে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, তার সর্বস্ব হারিয়েছে সে।

আমরা লক্ষ্য করি অদ্ভুতভাবে জগদীশ গুপ্তের এই গল্পটি একটি অপ্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে। সেখানে বিবাহের নামে শুধুমাত্র দুইনারীকে ভোগ করাই হয়নি একাদিক্রমে তাদের শারীরিক ও মানসিক হেনস্থা করা হয়েছে। ক্ষণপ্রভার গর্ভের সন্তানটিও তাই দীনতারণের কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। পাশাপাশি এই ঘটনা অনেকটা যেন আজকের দিনের 'ইউজ এ্যান্ড থ্রো' এর নীতি নিয়ে চলেছে। হয়তো আগামীতে প্রফুল্লরও সেই একই অবস্থা প্রাপ্তি হবে। জীবনের সবচেয়ে যে বড় বন্ধন বিবাহ আসলে সেটা যে একটা কেবলমাত্রই লোকদেখানো সামাজিক বন্ধন মাত্র সেকথা এ গল্প প্রমাণ করেছে। সেখানে কোথাও কোন লগ্নতা নেই, প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আরাম নেই কেবল শারীরিক এক লোভী মানুষের তৃষ্ণা জেগে আছে। প্রবৃত্তি তাড়িত দীনতারণ যেন পুরনো খোলস ত্যাগ করবার মতো করেই প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে নিজেরই শ্যালিকাকে দ্বিতীয়া বধূ হিসেবে ঘরে এনেছে।

কিন্তু গোটা ঘটনাক্রমে দীনতারণের মা সুভদ্রাকে আমরা একটু অন্য আচরণ করতে দেখি। যদিও বাস্তব কোন ভিত্তি নেই তার তবুও ওর মন যেন অন্য কথা বলে। কিন্তু প্রথমে সে দুইবোনকে একঘরে একই স্বামীর স্ত্রী করে আনবার যে মানসিক ঘাত প্রতিঘাত তার কথা চিন্তা করেননি।—কারণ "স্বামীর সম্পত্তি বিষয়ক ওজস্বিনী সংযুক্তির স্রোত তাঁহাকে ওলট-পালট করিয়া দিয়া এমন বেগে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল যে, এই সংস্রবে সম্পত্তি ভিন্ন অন্যকথা ভাবিবার অবসর তাঁর মন পায়ই নাই।" কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ত ভিন্ন কথা বলেছে। এবং তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছেন—"নারী হৃদয়ের একাধিপত্যের লালসা সে কিরূপ দুর্নিবার প্রখর তাহা ত তাঁহার অগোচর নাই; সেই লালসাটিকে সে পরাস্ত করিতে চায় তাহাকে ক্ষমা করা যে কত কঠিন তাহাও তাঁহার সুবিদিত।" ফলত স্বামীসঙ্গ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই দুই নারীর মধ্যে যে চিরন্তন ব্যবধান সৃষ্টি করে তা সুভদ্রা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তবু তিনি বড় বউ এর প্রতি

যাতে অবিচার না হয় তা দেখতে চেষ্টা করেছেন। নারী মনের ব্যথাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। আবার অকারণে রেগেও গেছেন। প্রফুল্লকুমারীকে ভর্ৎসনা করেছেন অল্পতেই। ক্ষণপ্রভাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী সঙ্গের জন্য পাঠিয়েছেন যখন দীনতারণ প্রফুল্লর কামনায় মগ্ন। এবং এই যে সমস্ত ঘটনা তাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে দেখেছেন গল্পকার স্বয়ং। গল্পের এই ব্যাখ্যা আমাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে—"নারী নিজেই নিজের মন বুঝিয়া সর্বদা তাহা ধরিতে পারে কিনা সন্দেহ...কিন্তু ব্যাপার আরো কঠিন হইয়া ওঠে যখন দুটি স্ত্রী একঠাই হয়;—তাদের একটি রূপলাবণ্যময়ী যুবতী, আর একটি সন্তানের জননী।' এই ব্যক্তির ক্রাইসিস গোটা গল্পটিকে অন্যপথে চালিত করেছে, ভাবিয়েছে, বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে। তবে শেষপর্যন্ত রূপজ মোহের বশেই তাড়িত হয়েছে দীনতারণ।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই যে দীনতারণের অসম্ভব লোভ আর লালসা ছিল তা আমরা গল্পের শুরুতেই জেনে যাই। "এক স্ত্রী বর্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কারণ শ্বশুরমহাশয়ের সম্পত্তি। প্রফুল্লকুমারী অন্যঘরে গেলে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বাহির হইয়া যাইত—সম্পত্তিও সামান্য নয়।" এই প্রবল সম্পত্তির লোভ দীনতারণকে প্ররোচিত করল নিজের শ্যালিকাকে স্ত্রীর বর্তমানে নিজের ঘরে শয্যাসঙ্গিনী করে নিয়ে আসতে এবং ভাবতে অবাক লাগে ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্লকুমারীর পিতা স্বরূপচন্দ্রও কতটা হিসেবী বেনিয়া মানসিকতা সম্পন্ন যিনি নিজের সম্পত্তিকে মেয়ের থেকেও বেশী গুরুত্ব দেন। তাই তিনি অনায়াসেই ভাবতে পারেন সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার কথা।

"স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তি যেন কথা কয়—আর প্রসব করে স্বর্ণ। সেই সম্পত্তি তুচ্ছ কন্যাদায়ে ভাগবাটোয়ারা হইয়া সূতা ছিঁড়িয়া দুই অংশ দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িবে, এ চিন্তাও ক্লেশকর—স্বরূপচন্দ্র নিজের কবন্ধ মূর্তি অক্লেশে কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু ঐটি পারেন না।"

এভাবেই পুরুষ মানুষের উভয়ত লোভ লালসার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে নারী। আর তাই উন্মাদ হয়ে যেতে হয়েছে তাকে সেই অন্যায় অত্যাচারে, মানসিক উৎপীড়নে, সেটাই হয়েছে এই ব্যবস্থার প্রতি সার্থক প্রতিবাদ। কাহিনীকথার শেষপর্বে এসে ক্ষণপ্রভার স্বর্গোতোক্তিতে আমরা বুঝতে পারি আসলে সমস্ত নারীর পরিণতিই একপাক্ষিক। এই জীবনযাপনের জটিল জ্যামিতিতে তারা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। তাই সে প্রফুল্লর প্রসাধন, সাজসজ্জার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কেবল হতাশই হয়েছে। এবং তার বোনের পরিণতিও যে তারই মতো হবে সে বিষয়েও সে যেন নিশ্চিত এবং "ভোগের কেবলি বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এও মনে করিতেছে জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিল না।" এই মায়া এবং ছলনা যেমন ধরা পড়েছে ক্ষণপ্রভার কাছে, তেমনি একদিন ধরা পড়বে প্রফুল্লর কাছেও। এবং গল্প যত সমাপ্তির দ্বারলগ্ন হয় তত বোঝা যায় ক্ষণপ্রভাব মনোবেদনা কোন পর্যায়ে উপনীত। তাদের মানসিক সম্পর্কের অবসান এবং শারীরিক ঘৃণা তাদের ধীরে ধীরে কত দূরবর্তী করে রাখে-

"এমন সে কখনো ঘটিবে তাহা সে জানিত না...এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন

ঘিন করিতেছে!... অদূরবর্তী ঐ লোকটা যেন কেবল একটা মাংসপিণ্ড— যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ; তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে......মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণতীত .কানযুগে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

—এই গভীর ঘৃণা এই বিবমিষাই জগদীশ গুপ্তের গল্প পাঠকমনে তৈরী করে দেয়। এবং গল্প শেষ হয় ছেলে বুকে নিয়ে ক্ষণপ্রভার নগ্নদেহে উন্মাদিনী বেশে। আমরা বুঝতে পারি এক জীবনের জলছবি গল্পকার আমাদের উপহার দিয়েছেন। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক দীপ্তি ফুরিয়ে যেতে যেতেই প্রফুল্লর আগমন আর দুইবোনের স্বামীসোহাগ ভাগবাটোয়ারার অমীমাংসিত মনোবেদনা এই গল্পের আবেদনকে অনেকগুণ বর্ধিত করেছে সেকথা না বললেও চলে। সর্বোপরি নারী মনস্তত্ত্বের এক সুনিপুণ কারিগরের হাতে এ গল্প এক অন্যমাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং জীবনের এই জীবন্ত জটিল বিন্যাসকে লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিতরূপে সাজিয়ে তুলেছেন, করেছেন শিল্পিত, করে তুলেছেন এক আশ্চর্য অক্ষরমালা।

তথ্যনির্দেশ

১. গল্পসমগ্র —জগদীশ গুপ্ত
২. গল্প পাঠকের ডায়ারি—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
৩. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত—হীরেন চট্টোপাধ্যায়
৪. গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে—হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পয়োমুখম : বিকৃত জীবন চর্চার অনবদ্য আখ্যান

মৌমিতা নায়ক

'পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনাম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।।'

---বিষ্ণু শর্মা। হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ১১৩ শ্লোক

'পয়োমুখম্' গল্পের কৃষ্ণকান্ত একজন বিকৃত অর্থলোভী, সুচতুর ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র গল্পটির বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে। কল্লোলযুগের কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের মধ্যে যে রোম্যান্টিক ভাবনাহীন কঠিন-কঠোর বাস্তবের ছবি প্রত্যক্ষ করা যায় 'পয়োমুখম' নিঃসন্দেহে সেই ধারার একটি যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় আখ্যান। তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব, ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত, মানব মনের সূক্ষ্মবোধ, চরিত্রের বহুমাত্রিক উপস্থিতি আমাদের চমকিত করে। নিঃসন্দেহে 'পয়োমুখম্' 'মানুষের অন্তঃস্থিত শয়তানি বৃত্তি'র শিল্পসম্মত উপস্থাপনা, এক বাস্তবসম্মত ব্যাপ্তিলাভ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের বাংলা প্রগতিশীল সাহিত্য বিশেষ ধারার সঙ্গে তাঁর মননগত সংযোগ স্থাপিত হ'লেও তিনি বিষয় ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর তাপধারণ ক'রেও তিনি সমকালীন বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষতের চিত্র অঙ্কন করতে গভীর অভিনিবেশ প্রদান করেছেন। বলা যায়, তাঁর বিশিষ্ট জীবন দর্শন ও সমাজবীক্ষণ গল্পের পরতে পরতে ফুটে ওঠেছে সত্য বোধের অন্বেষণে, অভিপ্রায়ে। বিকৃত এবং ধ্বস্ত সময় ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান ক'রে তিনি আপ্রাণ প্রয়াসী ছিলেন মূল্যবোধের উদ্ভাসনে।

এক

একটি কবিরাজ পরিবারের কাহিনিকে কেন্দ্র ক'রে গল্পের আখ্যান ভাগ। পরিবারের কর্তা শ্রী কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা। পরিবারের অন্যান্য সদস্য তার স্ত্রী মাতঙ্গিনী ও দুই পুত্র ভূতনাথ ও দেবনাথ। ১৩১৯ সনে জ্যেষ্ঠ পুত্র উনিশ বছরে পদার্পণ করেছে, তখনও তার কবিরাজী বিদ্যার চর্চা চলছে। 'কলাপ' শেষে তার 'মুগ্ধবোধ' আরম্ভ হয়েছে। কবিরাজি শিক্ষার সঙ্গে ভূতনাথের যোগ থাকলেও এ বিষয়ে ভক্তি বিশেষ ছিল না। কৃষ্ণকান্তের কথা অনুযায়ী ভূতনাথের 'কার্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান একেবারে নেই।' ভূতনাথ বিশ্বাস করত, আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হ'লে সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন নেই। ফলত পিতা কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব একদা ক্রমবিস্তারিত হয়। কবিরাজ কৃষ্ণকান্তের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি পুত্রকে কবিরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান প্রধানত পুত্রের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করার নিমিত্তে। চিকিৎসাবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে অর্থোপার্জনের প্রয়াস থাকলেও হয়তো বিশেষ আপত্তির কিছু ঘটত না, কিন্তু বিষয়টি আদৌ তা নয়। সাবালক পুত্রের 'বিবাহ'কে কেন্দ্র ক'রে পণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা ছিল কৃষ্ণকান্তের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

দুই

গল্প পাঠে লক্ষ করা যায়, কৃষ্ণকান্ত তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন তিন বার।

প্রথম দু'টো বউ মারা যায় এবং তৃতীয়টি সামান্যের জন্যে বেঁচে গেলেও একটি বিশেষ মুহূর্তে তারও মৃত্যুদশা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। তিনটি বিয়েতে কৃষ্ণকান্তের অর্থাগমণ ঘটেছিল 'পণ' হিসাবে। কৃষ্ণকান্তের প্রথম পুত্রবধূ মণিমালার বিয়ে হয়েছিল মাত্র ন'বছরে। পণ হিসাবে তিনি লাভ করেন সাতশত টাকা। 'পণ সর্বসাকুল্যে সাতশত টাকা মাত্র। কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে পরের ঘরের অতগুলি টাকা আদায় হয় না।' সর্বাধিক পণ পাওয়ার প্রত্যাশায় কৃষ্ণকান্ত অত্যন্ত সচেতন ভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পিছপা হননি। তিনি কৌশলে বৈবাহিক মহলে প্রচার ক'রে দিয়েছিলেন—'ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীন কবিরাজ শ্রী গোপালকৃষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র.......ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে।' এর ফলেই বিবাহযোগ্য পাত্র হিসাবে ভূতনাথের দর বেড়েছিল। প্রকৃতার্থে কৃষ্ণকান্তের অভিপ্রায় সফল হ'তে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয়নি।

মণিমালা নাবালিকা। ভূতনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হলেও সে ছিল সত্যি শিশুসুলভ। শ্বশুরবাড়িকে সে নিজের বাড়ি বলে গ্রহণ করবার পরিণত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি। আপন 'ছেলেপিলে'র কথা শুনলে সে লজ্জা পায়। বিয়ের পরিণতিতে যে স্ত্রীর সন্তানাদি জন্মাবে তা সে যথেষ্ট বোঝে। স্বামী ভূতনাথের সঙ্গে তার যে মনের মিলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ সামান্য জ্বরে কৃষ্ণকান্তের দেওয়া কবিরাজি 'বড়ি' খেয়ে তার মৃত্যু হতে বিলম্ব হয়নি। 'শেষরাত্রি হতেই হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দু'টার সময় মণির নাড়ী ছাড়িয়ে গেল। ......সিঁথি ভরা সিঁদুর লইয়া লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়া ছাই হইয়া গেল।' তিনটি পুত্রবধূর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত স্বয়ং। গল্পপাঠে দেখেছি প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষ্ণকান্তের অভিপ্রায় ছিল সুনির্দিষ্ট। তিনি পুত্রবধূদের অসুস্থতা থেকে সারিয়ে তোলার পরিবর্তে মেরে ফেলার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। মণিমালাব মৃত্যু ভূতনাথের শরীরে-মনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। কবিরাজি শাস্ত্রচর্চায় মন-মানসিকতায় ছেদ পর্যন্ত এনে দিলেও কৃষ্ণকান্তের একান্ত চেষ্টায় ভূতনাথ পুনরায় কলাপ পাঠ শুরু করে।

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এবারও তিনি পণ গ্রহণ করলেন—তবে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা। পূর্বের অপেক্ষা দুইশত টাকা কম। এ পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মীশ্রী অনুপমা। 'মণি মরিয়া পাত্র হিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে; বৈবাহিক মূল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা—। কিন্তু সেটি আরো ভালো.......।' অনুপমার বিয়েতে দুইশত টাকা কম পণ হিসাবে পেলেও অনুপমার রূপ ছিল যেন 'বালার্কসিন্দুর শোভিত'। শাশুড়ী মাতঙ্গিনীর সঙ্গেও অনুপমার যোগ মণিমালার মতোই নিবিড় হয়ে ওঠে। একদা মাতঙ্গিনীর মনে হয়েছিল মণিমালার শোক তিনি ভুলতে পারবেন না। অনুপমাকে কাছে পেয়ে তিনি জন্মান্তরের পুত্রবধূ হারানোর শোক ভুলে গেলেন।

অনুপমা পুত্রবধূ হিসাবে গৃহে আসবার পর কৃষ্ণকান্তের অর্থাগম বাড়ে। একদিন 'প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া সিন্দুকে তুলতে তুলতে তিনি মাতঙ্গিনীকে বলেন, 'বৌমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করো। ওঁর লক্ষ্মী অংশ প্রবল।' কৃষ্ণকান্তের এমন মন্তব্য করাব পিছনে যুক্তি ছিল যে 'এবার পাটে দু'হাজার টাকা মুনাফা হয়েছে।' কিন্তু এই মুনাফার টাকা কৃষ্ণকান্ত ভোগ

করতে পারেনি। কেননা পাটের টানে আবার তা বের হ'য়েও গেছে। মণিমালার মতনই একদিন অনুপমার জ্বর হয় এবং সেও মারা যায়।

এমতাবস্থায় ভূতনাথের জন্য পুনরায় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ভূতনাথ কলাপ, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি পাঠ শেষে একজন পুরাপুরি ডাক্তার হ'য়ে উঠেছে এখন। কৃষ্ণকান্ত ধিক্কারে, ভর্ৎসনায়, অভিযোগে, অনুযোগে, দোহাইয়ে, অনুজ্ঞায়, অনুনয়ে ঘনঘন ভূতনাথকে নাস্তানাবুদ করে দিলেও সে পুনর্বিবাহে নিস্পৃহ থাকে। বরঞ্চ ভূতনাথ তার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে বিবাহে তার মন নেই। অবশেষে কৃষ্ণকান্ত শাস্ত্রের দোহাই ও লোকাচারের কথা উল্লেখ ক'রে একরকম বিয়েতে সম্মতি আদায় করে নেয়। চতুর কৃষ্ণকান্ত পণ ও পাত্রী দু'টিই পূর্বের থেকে ঠিক ক'রে রাখেন। পণ গ্রহণ করেন আটশত টাকা। পূর্বের বিয়ে অপেক্ষা আড়াইশত টাকা বেশি। হঠাৎ পণের পরিমাণ বেশি তার কারণ হয়তো পাত্রীর রং 'কালো' বলেই। এবারের কন্যা-বধূটির নাম বীণাপাণি। বীণাপাণির রং সুবিধার না হ'লেও সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু ও ভ্রূযুগল। স্ত্রী হিসাবে বীণাপাণির বিশেষ কতকগুলি গুণ আছে পূর্বের দু'জনের অপেক্ষা। সে অতিশয় শান্ত, অথচ তীক্ষ্ণধী। সকলের মনের কাছাকাছি সহজে পৌঁছতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পরের হাতের সেবা কেমন মাতঙ্গিনী আগে কখনো না পেলেও বীণাপাণির হাতে প্রথম লাভ করেছেন। বীণাপাণি ঘরে আসাব পর থেকে পসাব বেড়েছে ভূতনাথের। সংসারে তবু একটা 'নাই নাই' ভাব, কেননা দ্রব্য মূল্য অত্যধিক বেড়েছে। এ থেকে বোঝা যায় পসার ভূতনাথের যথেষ্ট হলেও আয় পর্যাপ্ত হয়নি।

মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে 'মণি অর্ডার' আসে। কে পাঠায়, কেন পাঠায় পরিবারেব কেউই জানতে পারে না। কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকিয়ে গ্রহণ করেন। একবার দূবের কোনো রোগীর লোকজন ভূতনাথের পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে যেতে আসে। কৃষ্ণকান্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পাল্কিতে ক'রে রোগী দেখতে যান। সেদিনই অকস্মাৎ মণি অর্ডার আসে। ভূতনাথ মণি অর্ডাব গ্রহণ ক'রে জানতে পারে দশটি ক'বে টাকা তার বাবা প্রতিমাসে পুত্রবধূর রঙের জরিমানা স্বরূপ পেয়ে থাকেন। এ কথা জেনে ভূতনাথের মনে ভয়ঙ্কর সন্দেহ জেগে ওঠে। রোগী দেখে কৃষ্ণকান্ত বাড়ি ফিরে এসে সকল বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে পুত্রকে কোনো রকমে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করেন। এ দিকে ভূতনাথ শ্বশুর মহাশয়কে টাকা না পাঠাতে অভয় দিলেন। শ্বশুর মহাশয় বলরাম বাবু উল্টে কৃষ্ণকান্ত বাবুকে ধাপ্পাবাজ, অর্থপিশাচ না বললেও পত্রে দারুণ ভাবে পত্রাঘাত করতে ছাড়েননি।

এঘটনার পর থেকে কৃষ্ণকান্ত বাবু পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ এক রকম বন্ধই করে দেন। আবারও বীণাপাণির জ্বর হল। মাতঙ্গিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল অকস্মাৎ—কেন না, পূর্বের দু'টির মতো মায়া কাটিয়ে এ পুত্রবধূটিও যদি চলে যায়। অসুস্থ বীণাপানিকে দ্রুত আরোগ্যের জন্য কৃষ্ণকান্ত সপ্রবৃত্ত হ'য়ে ঔষধ দিয়ে পবম তৃপ্তির সঙ্গে যখন সটকা টানতে ছিলেন তখন ভূতনাথ ঔষধ সমেত 'খল'টি নিয়ে বাবার কাছে উপস্থিত হয়। ঔষধটি সেবন করলে বীণাপাণিরও 'কলেরা' হত। সে একটু হাসিয়া যে কথা কয়টি বলল তা থেকে প্রমাণিত হয় এ ঔষধ বীণাপানি খেলে মারা যেত। 'এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না বাবা। .....পারেন তো আপনি নিজেই খেয়ে ফেলুন।'

তিন

কৃষ্ণকান্ত গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করেই সমগ্র গল্পটি আবর্তিত। সুচতুর কথার ছলে সকলকে তিনি স্তম্ভিত ক'রে তোলার সামর্থ্য রাখেন। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কথাতে স্ত্রী পুত্রেরাও সহজে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। অর্থের পিছনে অনবরত ছুটতে গিয়ে তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতিরও হ'য়ে উঠেছেন। অথচ এমন দাপুটে ব্যক্তিত্ব গল্পের শেষে দুমড়ে-মুচড়ে পড়েছে। কবিরাজি বিদ্যা ও চিকিৎসাতে সন্দেহ নেই কৃষ্ণকান্ত যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। আপন বিদ্যাকে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে তিনি অর্থবান হ'তে চেয়েছিলেন। সমাজের কাছে তাঁর একটা সুখ্যাতিও ছিল। কিন্তু সেই সুখ্যাতিকে ব্যবহার ক'রে তিনি লোভী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতেও চেয়েছিলেন। পুত্রের তিন-তিনবার বিয়ে দিয়েও তাঁর অর্থলিপ্সা পরিতৃপ্ত হয়নি। তৃতীয় পুত্রবধূকেও তাই পুনরায় চিকিৎসার নাম করে মেরে ফেলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দু'টি পুত্রবধূ তাঁরই দেওয়া ঔষধ খেয়েও বাঁচেনি। সুতরাং তার মতো অভিজ্ঞ-পোড়খাওয়া কবিরাজ ঔষধের পরিবর্তে অন্য কিছু দেননি তো? দেওয়াটাই সঙ্গত এ কারণে যে, পুত্রবধূ মারা গেলে তাঁর পক্ষে সহজে পুত্রবধূ পাওয়া সম্ভব ছিল অধিকন্তু তিনি প্রতিবারেই 'পণ' গ্রহণ করে লাভবান হ'তে পারবেন তা জানতেন। বিয়ের বাজারে পুত্রের পণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলেই তিনি পুত্রের প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কবিরাজিতে জোর করেই মনোনিবেশ করিয়েছিলেন। তা ছাড়া পুত্রের সম্পর্কে পিতা হয়েও বৈবাহিক মহলে প্রচার দিয়েছিলেন যে, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রী গোপালকৃষ্ণ দত্তগুপ্তের প্রিয়তম ছাত্র। এ সমস্ত অসৎ ও অনৈতিক প্রয়াস চিহ্নিত করে তার চরিত্রের কদর্য দিককে।

আমরা লক্ষ করেছি যে, মাতঙ্গিনীর মতো মমতাময়ী স্ত্রীকেও তিনি একাধিক বার ধোঁকা দিতেও পিছপা হননি। কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী হিসাবে মাতঙ্গিনী আর পাঁচটা স্নেহময়ী বাঙালি রমণীর মতন। বারংবার পুত্রের স্ত্রী-বিয়োগে তিনি অন্তর থেকেই যন্ত্রণাগ্রস্ত হ'য়ে পড়তেন। একাধিক বার পুত্রবধূদের কন্যাসম কাছে টেনে নিয়েও যখন বিদায় দিতে হ'ত একেবারের মতন তখন তাঁর মাতৃহৃদয় হাহাকারে ফেটে পড়ত তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কৃষ্ণকান্তের বিপ্রতীপে মাতঙ্গিনী সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ভূতনাথের প্রায় প্রতিটি স্ত্রীর সঙ্গে মাতঙ্গিনীর গভীরতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মা হ'য়ে ভূতনাথের মর্মবেদনা যেমন তিনি মর্মে উপলব্ধি করেছেন তেমনি পুত্রদের কাছে কখনো সামান্য কর্তৃত্বের জাহিরটুকুও করেননি। দ্বিতীয় পুত্রবধূ অনুপমাকে তিনি এতটাই ভালোবেসেছিলেন যে, 'বালার্কসিন্দুর শোভিত' বধূর দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ হ'য়ে যেত। অনুপমাকে বাপের বাড়ি যেতে না দেওয়ার আহ্বানে লুকিয়েছিল তাঁর অন্তরের টান। মাতঙ্গিনী বলেছেন, 'তোমার ঐ মুখখানিকে আর চোখের আড়াল করছিনে........।' মাতঙ্গিনীর এই অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণ সম্ভাষণে ফুটে ওঠে তার সরলতা, হৃদয়স্পর্শী টান। সেই অনুপমার মৃত্যুতে মাতঙ্গিনী পুত্রের সঙ্গে কেঁদেও ছিলেন। এ কান্নার সঙ্গে শোক যত মিশে ছিল তার অধিক ছিল অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তৃতীয় পুত্রবধূ বীণাপাণির জন্যেও তাঁর ছিল একই রকম ব্যবহার। কন্যাটির রঙ কালো হলেও তিনি বুঝতে দেননি একটিবারের জন্যেও কোনোদিন। বরঞ্চ অম্লানবদনে বীণাপাণিকে তিনি সোহাগে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধূ নূতন বাসভূমিতে পল্লবিত হয়েছিল।

বীণাপাণি রঙ কালো ছিলো বলে ভূতনাথ কোনো প্রকারে যাতে অসুখী না হয় সে চেষ্টাও তিনি করতেন। মা হ'য়ে একই সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূর সম্পর্কের উন্নতি প্রার্থনা করবেন তাই স্বাভাবিক, কিন্তু গৃহকর্তার যাবতীয় অন্যায়কে নীরবে মাথায় নিয়ে সংসার-পাথারে ভেসে বেড়ানো সহজসাধ্য নয়। সমগ্র গল্পটিতে মাতঙ্গিনীর যে প্রকাশ মূর্ত হয়ে ওঠে সেখানে তিনি সংসারের সকল আনন্দের মধ্যেও দুঃখতাপিত। তার নিজের সুখ-দুঃখ কোনোদিন তার হৃদয়ের একান্ত জিনিস হ'য়ে ওঠেনি।

গল্পের মধ্যে যে দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে সে হ'ল কৃষ্ণকান্তের প্রথম পুত্র ভূতনাথ। পিতার মতো কবিরাজি বিদ্যা চর্চা করলেও বিশেষ নিষ্ঠার অভাব তার ছিল। গল্পকার বলেছেন, 'মেধা মানব জাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয়; আর, ভগবান গৃহবিবাদে সালিশী করিতেও বসেন নাই যে, মামলা বাঁচাইতে ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিক্তির তৌলে সমান করিয়া মাপিয়া দিবেন! মেধা না থাকার পিছুটানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতিবেগ আর হৃদয়বেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধ্যবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশী বলা হয় না।' এ হেন ভূতনাথের কবিরাজি বিদ্যা চর্চা করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল পিতার নির্দেশে। গল্পের একেবারে পরিণতিতে পিতার কৃতকর্মের একবারই জোরাল প্রতিবাদ করা ছাড়া আর সকল সময়েই সে পিতার আজ্ঞাবাহী হ'য়ে থেকেছে। ভূতনাথের শিক্ষার্থে কৃষ্ণকান্ত সিন্দুক খুলে 'কলাপ আর মুগ্ধবোধ' দিলে ভূতনাথ খুশী হয়নি, খুশী হয়নি এমন শাস্ত্র পাঠ করতে। তবুও পিতার নির্দেশ অমান্য করার সামর্থ্য তার ছিল না। মাতঙ্গিনীর কাছে তার উপর চাপানো কবিরাজি বিদ্যার নানা কিছু নিয়ে নালিশও আছে। অন্তরের টান অনুভব করেনি বলেই হয়তো তার মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলো ফুটে উঠত সর্বশরীরে। অবশেষে করিরাজির জোরে ন'বছরের বালিকাকে সাতশত টাকার পণের বিনিময়ে বিয়েও করে ভূতনাথ। পণের বিষয়টি কৃষ্ণকান্তের এক্তিয়ারে থাকলেও মণিমালা ছিল ভূতনাথের কাছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে মণিমালার সঙ্গে ভূতনাথের যে দাম্পত্য জীবনেব ছবি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তাও মধুর। বালিকা বধূটিকে যতটা সম্ভব অন্তরের একান্ত ভালোবাসা দিয়ে ভূতনাথ লালন-পালন করলেও একদিন তাকে চিরতরে হারাতে হয়েছে। নবীন বয়সে জীবনের উপর নেমে আসা অভিঘাত কৃষ্ণকান্তকে ভারাক্রান্ত না করলেও ভূতনাথকে যে মর্মে দগ্ধ করেছিল আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

চতুর পিতা পুনরায় পণের লোভে পুত্রকে বিয়ে দিলেন। স্ত্রীর নাম অনুপমা। মণিমালা অপেক্ষা অনুপমা অনেকটা পরিণত হলেও তার মধ্যে পতিপ্রেমের গভীরতা গল্পে তেমন প্রকাশ পায়নি। অনুপমার কাছে ভূতনাথের অবস্থা জবুথবু হলেও দাম্পত্য জীবনে কলহ ছিল না। কিন্তু ভূতনাথের দ্বিতীয় স্ত্রীটিও বাঁচলো না—জ্বরে মারা গেল। ভূতনাথের তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন হ'ল দীর্ঘস্থায়ী পণের বিনিময়ে। ভূতনাথ পিতার অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হয়ে বিবাহোন্মুখ হ'লেও বিয়েতে তার রুচি না থাকারই কথা এবং ছিল না। বীণাপাণি তৃতীয় স্ত্রী, রঙ তার কালো। আচার-ব্যবহারে বীণাপানি লক্ষ্মী। কেবল মাতঙ্গিনী নয়, ধূর্ত শ্বশুরেরও সে মন জয় করেছিল একদিন। কিন্তু সে জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কৃষ্ণকান্তের লোকসান হওয়ার সাথে সাথে পুত্রবধূর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে। অবশেষে মণি অর্ডারের

টাকার খবর ভূতনাথের কাছে পৌঁছে গেলে আসে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। বিষাক্ত ঔষধ সেবনে কৃষ্ণকান্ত একদিন বীণাপানিকে মেরে ফেলার ফন্দী আঁটলে এত দিনে সংগুপ্ত ক্ষোভ ভূতনাথ প্রকাশ ক'রে ফেলে। একের পর স্ত্রী বিয়োগে ভূতনাথ বিধ্বস্ত এবং সে যখন বুঝতে পারে সকল অনিষ্টের মূলে তারই পিতা কৃষ্ণকান্ত তখন প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাতে সে ক্ষণিক বিলম্ব করেনি। মিষ্টভাষী অথচ অন্তরে কপটতা নিয়ে সমাজে পরিচিত পিতার পুত্র হ'য়ে সে কোথাও গল্পের মধ্যে বিপথগামী তো হয়ইনি, অধিকন্তু ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশে সে পিতার সঙ্গে সমুচিত ব্যবহারই করেছে। তার এই ঘুরে দাঁড়ানোতেই গল্পের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হ'য়ে ওঠে।

চার

জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম' গল্পটিতে কৃষ্ণকান্তের মতো বিকৃত মানুষের বিরল দৃষ্টান্ত থেকে মানব-জীবনের বিশিষ্ট দিক ধরা পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে পুত্র ও স্ত্রীর কাছে ধূর্তামি ক'রে তিনি ভাবমূর্তিকে স্বচ্ছ রাখলেও পাঠক হিসাবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁর চক্রী মানসিকতা কতটা প্রখর। পুত্রকে উচ্চপণে 'বিবাহ' দিতে পুত্রের সম্পর্কে যেমন মধুর অভিভাষণ করেছেন তেমনি পুত্রের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটলে তাঁর উপস্থাপিত যুক্তিগুলোও অনবদ্য হয়েই ধরা পড়ে। বিয়েতে অসম্মত পুত্রের পুনরায় বিয়েতে মনস্থির করাতে তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছে আশ্চর্য সুন্দর কথাকলি। মোহময় কথার ঝলকে তিনি সমগ্র পরিবারকে একত্রিত করেই রেখেছিলেন অথচ তার প্রতিটি মধুর বচনের গভীরতর দেশে ছিল অত্যন্ত করুণ আখ্যান। দু'টি পুত্রবধূকে সামান্য জ্বর থেকে না বাঁচাতে পারার যন্ত্রণা তাঁকে দগ্ধ করেনি, কেননা এ সব ছিল তাঁর অভিপ্রেত। তৃতীয় পুত্রবধূকে নিজের হাতে হত্যার পরিকল্পনা ভেস্তে না গেলে কৃষ্ণকান্তেব পরিবারের কারো পক্ষেই সম্ভব হত না বোঝা তাঁর বিষপূর্ণ মানসিকতার চিত্র কতটা হিংসাত্মক। পরিবারের সকলের সঙ্গে সদালাপ আছে, তাদের ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তা আছে আবার সকল কিছুকে অতিক্রম করে গেছে তাঁর বিষাক্ত চিন্তন, যেখানে তিনি লোভের বশবর্তী হয়ে প্রাণহানিও ঘটাতে পারেন।

'পয়োমুখম্' গল্পে কৃষ্ণকান্তের মতো চরিত্র অঙ্কন করে গল্পকার ঘুণ ধবা ধ্বস্ত-সমাজ ব্যবস্থার একটি বিরল দিক উপস্থাপিত করেছেন। স্ত্রী মাতঙ্গিনী, পুত্রদ্বয় ভূতনাথ ও দেবনাথের মধ্যে কোথাও আমরা মোহনীয় কথা শুনিনি যেখান থেকে তাদের জীবনাচরণগত ত্রুটি অনুসন্ধান করতে পারি, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত হৃদয়টি ছলকলা-ধূর্তামি পূর্ণ। ভূতনাথ ছাড়া সমাজের কোনো ব্যক্তিই তাঁর সেই অনালোকিত অভিপ্রায়কে ধরতে পাবেনি। এমন মিষ্টভাষী ব্যক্তির সান্নিধ্য আমাদের বাহ্যত আলোড়িত করলেও শেষ পর্যন্ত আশাহত করেছে। কৃষ্ণকান্ত আমাদের মরমীবোধকে নাড়া দেয়, 'সভ্য'-সমাজের বিচিত্র মনন-মানসিকতা বুঝাতে সহযোগিতা করে। প্রত্যক্ষ তাঁর মিষ্ট ভাষণ প্রোজ্জ্বল থাকলেও তিনি 'মিত্র' নন—বিষকুম্ভের ন্যায় ব্যক্তিত্ব।

দিবসের শেষে : সূর্যের শেষ রক্ত রশ্মি

আকাশচন্দ্র পাত্র

'দিবসের শেষে' জগদীশ গুপ্তের অদৃষ্ট নির্ভর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে সুলিখিত একটি ছোটগল্প। 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত আলোচ্য গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত ও অবচেতন মনের প্রকাশ লক্ষকরা যায়। জগদীশ গুপ্ত স্বভাবতই মানবজীবনের সেই সকল মনোবৃত্তি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন যেখানে আমাদের দৈনন্দিন ভাব ও কর্মের জগত প্রবেশ করতে সমর্থ হয় না। তিনি অনায়াসে এমন সাহিত্য-সত্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে যান যে পাঠক মাত্রেই বিশেষ শিল্পিত ধাক্কা বা বোধ অনুভব করি অন্তরে-বাইরে এবং বাস্তবিকই তা অস্বীকার করতে পারি না। 'দিবসের শেষে' গল্পটির প্রেক্ষাপটে বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে অ প্রাকৃত-অদৃষ্টের বর্ণময় ইঙ্গিত। বরাবরই মানবমনের নিভৃত কোনে উচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা কিংবা আর্তি জগদীশ গুপ্তের গল্পে যে ভাবে শিল্পধ্বনির সঞ্চার ঘটিয়ে পাঠক চিত্তের গভীরে ঝংকার সঞ্চারিত করতে সমর্থ হ'য়ে থাকে—এ গল্পটি তা থেকে কোনো অংশে ব্যতিক্রমী নয়। তাঁর শিল্প প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা হ'য়ে থাকে : 'জগদীশ গুপ্ত আগাগোড়া তিক্ত, রুক্ষ্ম ও নৈরাশ্যবাদী। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের মূল্যবোধগুলো প্রচণ্ড ভাবে নাড়া খায়। এবং স্বভাবতই আমরা নাড়া খাই।'

এক

জগদীশ গুপ্তের গল্পের মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধের উপর অভিঘাত আছে, বিশ্বাস-চেতনার জগত একদমকায় ভেঙে পড়ে, অবচেতনের অনির্ণীত ধ্বনিগুলো ভাস্বর হ'য়ে আমাদের চেতনসত্তায় আঘাত করে। তিনি গল্পের প্লট সৃজনে যথার্থ যুক্তি-শৃঙ্খল মানেন, ঘটনার পারম্পর্য মানেন অথচ গল্প পাঠে তাঁর পাঠকমাত্রেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রণা অনুভব করেন, বোধে অনির্দেশিত আড়ষ্টতার ছাপ বাস্তবাতীত জগত নিয়ে আবিষ্ট করে। রতি পুত্র পাঁচুর এমন অতিবাস্তব মৃত্যুদৃশ্য আমাদের কী কোনো প্রশান্তির কথা বলে? পাঁচুর কাকতালীয় মৃত্যু গল্পের পরিণতিতে আমাদের ভাষায়, 'নিশ্চল' করে দেয়।

গল্পটিতে দেখা যায়, রতি নাপিতের পুত্র পাঁচু বছর পাঁচেকের একটি শিশু মাত্র। অকস্মাৎ তাকে তারই পূর্বঘোষণা মতো নদীর তীর থেকে কুমীরে নিয়ে গেছে। রতি হ'ল লেখকের বর্ণনানুসারে 'বস্তুতান্ত্রিক' মন-মনস্কতা সম্পন্ন, পুত্রের 'ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্য' কথা স্ত্রী নারানীর মুখে শুনেও সে গ্রাহ্য করেনি। শিশুর কথা এতদিনের 'পোড়' খাওয়া মানুষ বিশ্বাস করবেন না তাই স্বাভাবিক। আসলে, পাঁচু শিশু হলেও তার মুখে উচ্চারিত সরলবাক্য : 'হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।' কথাটি কোনো অংশে সহজ ছিল না তা গল্পপাঠে অবগত হওয়া যায়। লেখক পাঁচু জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে যে কথাটি জানিয়েছেন তার মধ্যেও আছে অদৃষ্ট নির্দেশিত ইঙ্গিত। রতির তিন পুত্রের 'আঁতুড়' ঘরে মৃত্যু হলে চতুর্থ পুত্র এই পাঁচুই পাঁচুগোপালের 'মাদুলি' ধারণ করার পর মা নারানীর গর্ভে আসে। এক অতিলৌকিক বিশ্বাসের স্পর্শ লাভ করা যায় পাঁচুর বেঁচে থাকার মধ্যেও। 'অসংখ্য মাদুলী-কবচ-তাবিজ

প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে।' গল্পে আধিদৈবিক শক্তির জোরে পাঁচুর পাঁচ বছরের জীবন। অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে অনিবার্য বাস্তব প্রেক্ষিত, ঘটনা সমুহ্।

দেখা যায়, একদিন সকালে মায়ের হাত ধরে ক্ষেতে যাওয়া পথে পাঁচু তার মাকে শুনিয়েছে তাকেই কুমীরে নিয়ে খাওয়ার কথা। পাঁচু যে মাঝে মাঝেই অসংলগ্ন কথা বলত নারানী তা জানত ফলত তার এমন কথায় 'দুর্ভাবনা' জাগলেও পরক্ষণে বিষয়টি হাল্কা হ'য়েও যেত। রতিও পুত্রের এমন কথা শুনে তাকে ধম্‌কানি দিতে কসুর করেননি। বলেছেন : 'খবরদার, ফের যদি ও কথা মুখে আনবি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙব।' রতিরা স্নান করতে যায় কামদা নদীতে। গল্পের কাহিনিতে জানা যায়, তখন বর্ষাকাল। কামদা নদী কানাকানায় পূর্ণ। এ নদীর জল সকলের পরিচিত, পরিচিত নারানী-রতিরও। এ নদী কখনো মানুষকে আঘাত করেনি, বরঞ্চ মমতাময়ী। পল্লীকুঠীরে নদী পানীয় জল দান করে মায়ের মতো। সেই চিরদিনের পরিচিত নদীতে প্রত্যহের মতো স্নান করতে বাধা কোথায়? রতি স্নানের সময় পাঁচুকে ডাক দিলেও আমরা দেখেছি, সে স্নানে যেতে অসম্মতি জানিয়েছিল রতি বুঝতে পারে পাঁচুর মনে কুমীরের ভয় জেগেছে। তার ভয় ভাঙাতে ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির বিদ্রুপ, কটাক্ষ এড়াতে জোর করেই পাঁচুকে স্নানে নিয়ে গেছিল রতি। বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত ওখানে প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

স্নান করতে ও পাঁচুকে স্নান করাতে গিয়ে সেদিনকের রতিরও মনে ভয় লাগেনি তা নয়। নদীতে তারা ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে'র মধ্যে শুশুকের মতো কিছু প্রত্যক্ষও করে। তীব্রস্রোত, শব্দহীন গতিধারা রতি এর আগে কখনো নদীতে প্রত্যক্ষ করেনি। এতত সত্ত্বেও পাঁচুর হাত দু'টো ধরে রতি জলে ডুবিয়ে স্নান করাল। নদীতে স্নানের সময় রতি বা পাঁচুর নিত্য দিনের মতো কোনো বিপদ ঘটেনি। বিপদ ঘটেছে বিকালে। কাঁঠাল খেয়ে পাঁচুর সর্বশরীর গাঢ়রসে আবৃত হলে রতি পুনরায় পাঁচুকে নিয়ে গেছে কামদা নদীতে ধোয়াতে। পাঁচুকে ধুইয়ে বাড়ি ফেরার সময় পাঁচুরই মনে পড়ে সে নদীর তীরে তার খেলার ঘট ফেলে এসেছে। রতির অনুমতি নিয়ে পাঁচু একাই সেই ঘট আনতে যায়। যে মুহূর্তে পাঁচু জলের ঘট নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে সেই মুহূর্তে নিঃশব্দে দুটো বৃহৎ চক্ষু জলের উপর ভেসে ওঠে আর নদীর জল সেই মুহূর্তে আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং একটি কুমীর তার লেজের ঝাপটে এক পলকে পাঁচুকে জলে ফেলে দেয়। পাঁচুকে নিয়ে মুহূর্তে কুমীর নদীর অন্য পাড়ে চলে যায়। নদীর ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেলেও তাকে উদ্ধার করা যায়নি। দিবসের শেষে কুমীরের মুখেই পাঁচুকে দেখা গেল এবং কুমীরটিও অদৃশ্য হ'য়ে গেল শেষ পর্যন্ত। এখানেই গল্পের সমাপ্তি।

দুই

গল্পটিতে প্রধান যে দু'টি বিষয় দেখা যায়। ১. পাঁচুর জন্ম দৈব নির্দেশিত অর্থাৎ গল্পানুসারে পাঁচুগোপালের মাদুলির জোরে। ২. পাঁচুর মৃত্যু আপাতদৃষ্টিতে কুমীরের জন্যে ঘটলেও এ এক অদৃষ্টের অমোঘ টান ছাড়া সম্ভব নয়, তা গল্পকার আমাদের জানিয়েছেন। কামদা নদীতে কেউ কখনো কুমীর দেখেনি। জলে ভয়ঙ্কর ও কুৎসিৎ কিছু দেখে রতি বিস্মিত

হ'লেও তার মনে পড়েছে, 'কামদায় কুমীর ভাসিতে এ গ্রামের কেহ কখনও দেখে নাই, এমনকি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ গ্রামের কানে কখন পৌঁছায় নাই।' এ মত অবস্থায় কুমীরের মুখে পাঁচুর মৃত্যুকে কোনো স্বাভাবিক পরিণতি বলে হয় না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অকস্মাৎ কুমীরের আবির্ভাব অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

জগদীশ গুপ্তের বেশ কিছু গল্পের মধ্যে লক্ষ করা যায়, তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে কাহিনি বলেন কিন্তু অসম্ভব সব গল্পের উপাদান সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিকে আঘাত করে, ধাক্কা দেয়। ব্যতিক্রমী হলেও তাঁর গল্প অবচেতন মনের মূর্ত-বিমূর্ত প্রকাশ বাস্তবের কাছাকাছিতে সত্যে প্রতিপন্ন হয়েছে। চেতন-অবচেতন মনের মধ্যে যে বিশেষ ফারাক জীবনকে রহস্যাবৃত ক'রে তোলে, ঠিক মনের ফারাকহীনতাও যে রহস্য-বিস্ময় সৃষ্টিতে সক্ষম তা গল্প পাঠে অবগত হওয়া যায়। শিশু পুত্র পাঁচুর হঠাৎ ক'রে কুমীরে নিয়ে যাবে এমন স্ব-ঘোষণার মধ্যে তীব্র দৈব বা অলৌকিক নির্দেশ আছে। কেননা, সত্যের এমন ঘোষণা নিশ্চিত ভাবে বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। কার্য-কারণ সূত্রে ব্যাখ্যাহীন ঘটনার উপাদান শেষ পর্যন্ত যখন নির্দেশিত পথে অগ্রবর্তী হয়, তখন মনে হয় সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার সচেতন প্রয়াসের গভীরেও কোথাও যেন অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তি আছে। অপ্রতিরোধ্য সেই শক্তিকে আটকানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। যা ঘটার তা ঘটবেই— মানুষের অধিকার নেই নিয়ন্ত্রণ করার, প্রচেষ্টার বাইরের তার অবস্থান। ·

'দিবসের শেষে' গল্পটিতে পাঁচু রতি ও নারানীর 'আরাধনার ধন'। রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বাস্তব বোধসম্পন্ন পরিশ্রমী মানুষ। আবার তারই পুত্রের জন্মের ইতিহাস বাস্তবিকই অদৃষ্ট নির্ভর, এই বৈপরীত্যের পাশাপাশি আছে গ্রামের অভিজাত শ্রেণির তথা বাসিন্দাদের ব্যবহার। রতির পরিবারের গভীরে আধিদৈবিক শক্তির উপর বিশ্বাস থাকলেও বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গতির অভাব সমগ্র পরিবারে ট্রাজেডির অনেক কারণ ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। জগদীশ গুপ্ত গল্পের পরতে পরতে আকস্মিক বেদনা-কষ্ট সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন আর তা সংঘটিত করতে অলৌকিক বিশ্বাসের জগতকে ব্যবহার করেছেন। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে রতি পুত্রের সর্বনেশে কথা শোনালে তার প্রত্যুত্তরে তিনিও বলেছিলেন : 'রতি, রকম ভাল নয়, এটা মৃত্যু লক্ষণ; এ-রকম মনের ভুল হয় পাগলের কিম্বা যার মরণ ঘনিয়েছে।.....' এখানে নিশ্চিত মৃত্যুর অমোঘ নির্দেশ আছে, আবার যথার্থই তা ফলপ্রসূও হয়েছে।

কামদায় কুমীর থাকতে পারে না বলে যে গ্রামের বাবু চৌধুরী মহাশয় ক্ষু- ঘসতে ঘসতে রতি ও পাঁচুর উদ্ভট উক্তিতে অসঙ্গতির হাসি হেসেছিলেন, সেই নদীর বুকেই জেগে উঠেছে কুমীর। অচেনা জগতের মধ্যে মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয় এ তারই যেন ইঙ্গিত। সমাজের মন-মনস্তত্ত্ব বলে, নাপিতেরা স্বভাবতই চতুর হয়। এমন ধারণার কথা উল্লেখ ক'রে হলধর রাজবংশীরা রতির ব্যক্তিসত্তায় আঘাত দিলেও অদৃষ্টের বিধান খণ্ডন করা যে দুঃসাধ্য তা গল্প পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না। যুক্তি-বুদ্ধি-ঐতিহ্যের বাইরে আরো আরো কঠিন বাস্তব আছে যার পরিমাপ সচরাচর সম্ভব হয় না। জগদীশ গুপ্তের মননে-চিন্তনে-প্রকাশে তা শিল্পিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তিনি পারেন মানবমনের সংগুপ্ত

বাসনাকে তীক্ষ্ণভাবে স্পষ্ট ক'রে পাঠকচিত্তকে রসসিক্ত করতে। রতির মনের 'ভয় ভয়' ভাব কিংবা পাঁচুর মনে কুমীরের আতঙ্কের সঠিক কোনো কারণ-নেই, তবু অকারণ ইশারা দু'জনের ভাবনাকে মূর্ত করেছে। সর্বোপরি, পাঁচুর আত্মঘোষণার মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না এবং তা-ই যখন অনিবার্য ভাবে ফিরে আসে তখন জাগতিক সত্য সম্পর্কে আমাদের ভাবতে বাধ্য হ'তে হয়। ঘাড় বাঁকিয়ে কিংবা ভ্রু-কুঞ্চনে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'তে হয় একথা ভেবে যে এও কি করে সম্ভব? গল্পের সামগ্রিক উপস্থাপনে লেখক এমন কোনো দুর্বলতর দিক আমাদের কাছে উপস্থাপন করেননি যা থেকে প্লটের কোনো ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারা যাবে। যে কামদাতে কোনো কালে কেউ কুমীর দেখেনি, সেই কামদাতে অদৃষ্টের কারণে কুমীর আসতে পারে—এ মেনে নিতে দ্বিধা থাকার কোনো কারণ নেই। একই ভাবে পাঁচুর ঘোষণার দিনে কুমীরের কামদাতে আসা ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও, যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে হ'লেও সম্ভব। জগদীশ গুপ্ত প্রচলিত অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলেন। ব্যতিক্রমের ভিতর থেকে ক্রমকে সংগ্রহ ক'রে শিল্প ধ্বনির জন্ম দেন। এখানে তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষত্ব।

তিন

সমগ্র গল্পটিতে রতি নাপিতের ভূমিকাটিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রতির পাশাপাশি নিয়তির তথা অদৃষ্টের উপস্থিতিটিও বিশেষ আকর্ষণ দাবি করে সন্দেহ নেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রতি বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। যদিও বলা ভালো তার বাস্তবতার পরিধি নিঃসন্দেহে তার সমাজ-পরিবেশ সম্পৃক্ত। পাঁচুগোপালের মাদুলী ধারণে পুত্র পাঁচুর জন্মলাভ হ'লেও অদৃষ্টের, আধিদৈবিকের প্রতি যে তার বিশেষ আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের কোনো সময়ের জন্যেঐ মনে হয়নি। বরঞ্চ আমরা দেখেছি, পাঁচুর এমন কথা শুনে কেবল তাকে ধমকানোতেই রতি ক্ষান্ত হয়নি, তাকে এমন কথা বলার জন্য প্রহারেরও কথা বলেছে। আমাদের সমাজে এমন ধারণাই চলিত আছে যে অসম্ভব ভাবনাকে অবদমিত করতে কখনো কখনো সক্ষমেরা দমন নীতি চালাবেন। রতিও তাই করেছে। যদিও নাবালকের এমন আত্মঘোষণাতে কর্ণপাত না করাটাই যুক্তিসঙ্গত।

রতি বোঝেনি যে পাঁচুর ঘোষণা নাবালকের প্রলাপ নয়, তা দৈববাণী। বোঝার কথাও নয়। নতুবা স্নানের সময় কামদাতে যে প্রত্যক্ষ করেছিল, 'একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুস করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগবাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।' তা যে ভয়ঙ্কর কিছু এবং তাকে হাল্কা ভাবে নেওয়া উচিত ছিল না। অসচেতনা যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আনতে পারে। নিত্যদিনের অভ্যাসের কারণে রতি মনে হয়নি বলেই কুমীরের ইঙ্গিত তার কাছে সামান্য 'শুশুক' হয়েই আসে। বিপদ স্নানের সময় ঘটলেও আশ্চর্যের হয়তো বিশেষ ঘটত না। কিন্তু ললাটের বিধান খণ্ডানোর শক্তি মানুষের হাতে নেই তা তখনই প্রমাণিত হল যখন বিকালে গা ধুতে গিয়ে কুমীরের মুখে পাঁচু পড়ল। আসলে রতির মনে কুমীর সংক্রান্ত কিংবা অদৃষ্টের বিধান গভীর রেখাপাত করেনি বলেই হয়তো অনায়াসে সে প্রত্যহের নিত্যকর্ম হিসাবে ঘটনা প্রবাহকে গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, সমাজের মোড়ল-মাতব্বরদের সান্নিধ্যে রতির চৈতন্যের গভীরে যে বোধের উন্মেষ ঘটেছিল সেখান থেকে নেমে আসাটা সম্ভবও

ছিল না। রতি চরিত্রের এই বিশিষ্টতাই শেষ পর্যন্ত তাকে নাতিদীর্ঘ গল্পে জীবন্ত ক'রে তুলেছে। নারাণীর প্রসঙ্গ গল্পে নামমাত্র উল্লেখিত হয়েছে গল্পের উৎসমুখ উন্মোচিত করতে। আর পাঁচটি সন্তানের জননী সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যেমন উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকে নারাণীও তেমনি। সন্তানের মুখে 'সর্বনেশে' কথা শুনে তারও হৃদয় কম্পিত, মন চিন্তাগ্রস্ত হলেও গৃহস্বামীর কথা বেদবাক্য মেনে পাঁচুকে স্নানে পাঠাতে সে দ্বিধান্বিত হয়নি। সনাতন বাঙালি বধূর ছবিটি সামান্য পরিসরে ধরা পড়লেও আধিদৈবিক শক্তির উপর বিশ্বাসের আভাসটি অগ্রাহ্য করার নয়।

দৈবের ভূমিকা গল্পটির কেন্দ্রিয় আকর্ষণ। পাঁচুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অদৃষ্টের আভাস গল্পের বৃত্তীয় গঠনকে ধারণ ক'রে আছে। পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত নারাণীর তিনপুত্রকে প্রসব গৃহ থেকে নদী গর্ভে নিক্ষেপ করতে হয়েছিল যে কারণেই হোক না তা থেকে মুক্তি পেতে অদৃষ্ট নির্ভর এই মাদুলি এবং চতুর্থ পুত্র পাঁচুর জন্ম। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস শেষ পর্যন্ত গল্পে ফুটে ওঠে যে পাঁচুকেও একদিন অকালে সেই নদী গর্ভে কুমীরের ভোগে যেতে হয়েছিল। মূলবিষয় হল, যতই রতি বাস্তববোধ সম্পন্ন হোক না কেন, তবু নিয়তির বিধানকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। রতি নাপিতের পারিবারিক জীবনের ট্রাজেডি এখানে যে, পূর্বের তিনপুত্রের মতনই তার চতুর্থ পুত্রকেও সেই নদীগর্ভে যেতে হ'লো। কামদায় কুমীরের অকস্মাৎ আগমনের মতোই পাঁচুর মুখের স্বঘোষিত আপন ভবিতব্যের কথাও। আমাদের একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, নারাণীর কোনো পুত্রই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘায়ু লাভ করবে না তারই ইঙ্গিত গল্পের পরিসরে আছে। চলমান জীবনে এমন অনেক অনেক ঘটনা ঘটে যে তার কোনো ব্যাখ্যা আমাদের কাছে থাকে না। সেই ব্যাখ্যাতীত ঘটনাই তো অদৃষ্ট নিয়তি বলেই আমরা মানি। জগদীশ গুপ্ত তাঁর গল্পের মধ্যে জীবনের সেই বিচিত্র সব ঘটনাকে শিল্পিত ক'রে তোলার কথাকার।

চার

'দিবসের শেষে' গল্পের একটি অভ্যন্তরীন ব্যঞ্জনা আছে। গল্পের মূলকাহিনিটির সময়কাল মাত্র একদিনের। কোনো একদিনের সকাল থেকে দিবসের শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সময়কালে পাঁচুর পরিণতিই উপজীব্য। তথাপি দিবসের শেষে পাঁচুর মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি। একথা সত্য যে, পাঁচুর এমনভাবে মৃত্যু হওয়াটা গল্পের শেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবহ ঘটনা। কিন্তু সকালে পাঁচু ঘুম থেকে উঠে নিঃশব্দে যেতে যেতে তার মাকে যখন জানায় : 'মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।' তখন সে কথা অবিশ্বাস্য হলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। দিবসের শেষে শেষ অবধি মৃত্যু ঘটলেও পাঁচুর স্বঘোষিত বার্তা কম আকর্ষণীয় নয়। গল্পকার সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না ক'রে গল্পের নামকরণে প্রাধান্য দিলেন দিবসের শুরু নয়—শেষকে। আমাদের মনে হয়, 'দিবসের শেষে' নামকরণের মধ্যে নানান সূক্ষ্মদিক আছে। প্রথমত, দিবসের 'সকাল' দিয়ে গল্পের আখ্যান ভাগের শুরু এবং 'শেষ' দিয়ে শেষ। শুরুতে অবিশ্বাসের জগত থাকলেও শেষে বিস্ময় ছাড়া আর কী থাকতে পারে? সর্বপরি, জগদীশ গুপ্তের আলোচ্য গল্পের মধ্যে দিবসের এই অন্তিমক্ষণ আলঙ্কারিক বর্ণনায় উল্লিখিত হওয়ায় গল্পের কেন্দ্রিয় অভিপ্রায়টিও অনেকটাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গল্পে পাই : 'যখন

ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।...জনতা হায় হায় করিয়া করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল।...সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিল না।' পাঁচুর মৃত্যু সেই কুমীরের দ্বারাই সংগঠিত হল। সকালের উচ্চারিত ধ্বনি কেবল উচ্চারণ হয়ে থাকেনি। দিবসের মধ্যভাগে পূর্ণতা পাওয়ার ইঙ্গিত দেখা দিলেও তা সম্পূর্ণ হয়নি দিবসের শেষভাগে সম্পূর্ণ হয়েছে। দিবসের শেষ ভাগটাও তো দিবসেরই অংশ। এবং গল্পে দিবসের শেষ একটি অশনি সংকেতের মতো বেজে উঠেছে। দৈব নির্দেশ শেষ পর্যন্ত শেষ রক্তরশ্মিতে পূর্ণতা পেল। অদৃষ্টের বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার নয়। রতি দুপুরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাঁচুকে স্নান করালেও কুমীরের মুখ থেকে সেদিন পাঁচুকে সে রেহাই দিতে পারিনি।

প্রকৃতি কিংবা নিয়তির উপর মানুষের তির্যক মনন-চিন্তন তথা দম্ভের প্রকাশ চলে না। মানুষ জানতে পারে না কোথা থেকে, কিভাবে কী ঘটে গেল, ঘটে যায়। রতি অবিশ্বাস তা যতই যুক্তি-বুদ্ধি সম্পন্ন হোক না কেন কখন কি ঘটে যায় কিচ্ছু বলা যায় না। অনভিপ্রেত বিষয় এমন বাস্তব প্রেক্ষিত নিয়ে উপস্থাপিত হয় যে তাকে অলৌকিক ঘটনা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু থাকে না কখনো কখনো যদি দেখা যায়, সত্য নির্ধারণের উপাদানগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। দুপুরের স্নান সেরে পাঁচু বাড়ি এসে খেতে বসার সময় রতি পাঁচুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল। '—কেমন, কুমীরে নেয়নি ত?' এ ধ্বনি যেন বিধাতার বাণীকে লঙ্ঘন করার মতোই। 'দিবসের শেষে' সেই কুমীরের মুখে পাঁচুর অনিবার্য পতিত হওয়ার মধ্য দিয়ে রতির কৃতিত্বের পরাজয় ঘটে, পাঁচুর মুখ নিঃসৃত অবিশ্বাস ও ভয়ঙ্কর কথার সত্যে পরিণতি ঘটে। মৃত্যু তথা অনিবার্য ঘটনা যখন ঘটবে তখন সুসময় বলে কিছু থাকে না। প্রায় অপরিহার্য কারণ ছাড়াই দিবসের শেষে পাঁচু কামদার জলের ঘাটে যায়, জলে নামে না তবু মৃত্যুর হাতছানি পিছু ছাড়ে না। দিবসের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর ললাট-লিখন সত্যে উত্তীর্ণ হ'তে 'কুমীর'ও ওতপেতে থাকে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৯৪-১৯৫০)

কল্যাণীর কাছে মুরাতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে বিভূতিভূষণের জন্ম হয়। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর কলকাতায় গিয়ে রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯১৬ সালে আই. এ এবং ১৯১৮ সালে বি. এ. পাশ করলেন। এমন সময়ে বসিরহাটের পানিতর গ্রামের গৌরী দেবীব সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শ্বশুর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি একই সঙ্গে এম. এ এবং আইন পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু পাঠ্যাবস্থাতেই গৌরী দেবীর মৃত্যু হয়। বিভূতিভূষণের পড়ার ইতি ঘটল এখানেই।

১৯১৯ সালে জঙ্গীপাড়া মাইনর স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। কিছুদিন পরেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে এলেন। এরপর অল্প কিছুদিন শিক্ষকতা করলেন হরিনাভির একটি স্কুলে। এ চাকরিও তাকে ছাড়তে হয়। তারপর ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত একটানা ভাগলপুর খেলাত ঘোষের জমিদারি এস্টেটে তিনি ম্যানেজারেব কাজ করেন। এখানেই একটু একটু করে গড়ে উঠল 'পথের পাঁচালী'। ভাগলপুর অঞ্চলে দীর্ঘ অরণ্য বাসই তাঁর অনন্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, হয়ে উঠেছে অতুলনীয় উপন্যাস 'আরণ্যক'। এরপর তিনি একে একে ১৩টি উপন্যাস রচনা কবেন।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' (১৯৩১)। 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রা দল' (১৯৩৪), 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৭)-সহ মোট ১৯টি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালে ভাগলপুর থেকে ফিরে এসে কলকাতায় খেলাত ঘোষ ইন্সটিটিউশনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৪০ সালে রমা দেবীকে বিয়ে করেন। ১৯৪১ সাল থেকে বারাকপুরে থাকতে শুরু করেন এবং অনতিদূরে গোপাল নগরের হরিপদ ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর রাতে ঘাটশিলার বাড়িতে বিভূতিভূষণ পরলোক গমন করেন। ১৯৫০ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসটির জন্য তাঁকে রবীন্দ্র পুবস্কাব দেওয়া হয়।

মেঘমল্লার : আস্বাদনে একটি চিরকালীন গল্প

সিদ্ধার্থ সেন

কথাসাহিত্যের ধারায় বিশেষত ছোটগল্পে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ ঐশ্বর্যের কথা মনস্ক সুধী পাঠকদের অজানা নয়। এই ঐশ্বর্যের মূল কারণ বাংলা ছোটগল্পের প্রবাহ কখনও একমুখী থাকেনি, বিষয়-রচনাশৈলির বৈভিন্ন্য ও বিস্তার এই শাখাটিকে আজও সজীব রেখেছে। শরৎচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য যখন 'কল্লোলিত', প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তের নাগরিক অচরিতার্থতা যখন মাথা কুটে মরছে, আবার কারোর যন্ত্রণার আর্তি ঘুরে মরছে প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দীদশায়, যখন একদিকে মনে হচ্ছে শিকড় হারিয়ে যাচ্ছে—দেখা দিচ্ছে শরৎবাবুর আঁকা মফঃস্বলীয় এক ভবঘুরে শ্রীকান্ত আর অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র অমিত যেন এক নাগরিক পলাতক হয়ে একই সমাজবাস্তববতার দুটি দিককে যেন প্রতিফলিত করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যের শাসক হিসেবে দেখা দিলেন যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রজ বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রি.) বক্তব্য, পরিবেশনা, জীবনবোধ সকল দিক থেকেই আজও স্বতন্ত্র, অননুকরণীয় হয়ে আছেন। তিনি মনে করতেন : "জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনায় নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে।" তাঁর সাহিত্যে এই প্রচেষ্টা আশ্রয় করে আছে মহাকালকে। "পথের পাঁচালী", "অপরাজিতা" থেকে শুরু করে "ইছামতী" পর্যন্ত, "উপেক্ষিতা"-"মেঘমল্লার" থেকে "কুশল পাহাড়ী" পর্যন্ত মহাকালের স্পর্শ। বই পড়ে নয়, পদাতিক বিভূতিভূষণ হাঁটতে হাঁটতেই উপলব্ধি করেছিলেন নৈসর্গিক ও মানবিক বিস্ময়ে পূর্ণ এই ধরিত্রী। যেন এক গভীর অনুভবে তিনি নির্মাণ করে নেন এক 'ব্যক্তিগত পুরাণ'। মরমী পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে তাঁর "তৃণাঙ্কুর" নামে প্রকাশিত এক দিনলিপির কিয়দংশ : "মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো-এক বড় দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো দু-হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীলনদের রৌদ্রতপ্ত তটে, কোনো দরিদ্রঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেছে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্য এসেছি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাইবোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচহাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাব কে জানে? এই Cyle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন, আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েছি—তিনি এক বড় শিল্পী।" ইত্যাদি। এই "অদৃশ্য দেবতা" কে তিনি কখনও সম্বোধন করেছেন 'গ্রহদেব' বলে আবার কখনও বলেছেন 'দিক্‌পাল বৈশ্রবণ'। যতদূর সম্ভব এই দৈব রূপকল্পটি তিনি লাভ করেছিলেন মহাযান বৌদ্ধ পুরাণ থেকে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় মেলে 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পে, 'নাস্তিক' গল্পে।

এক

স্বভাব-রোম্যান্টিক বিভূতিভূষণ প্রাচীন যুগ বিশেষত হিন্দু-গ্রিক, ও বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্টিক গল্প রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'মেঘমল্লার' এই জাতীয় গল্প যার ভিত্তি ঘটনা নয়, চরিত্র। সুপ্রাচীন বৌদ্ধযুগ, নিসর্গ-ইতিহাস-চিরন্তন নরনারীর প্রেম মিলেমিশে গড়ে উঠেছে এই গল্প। 'মেঘমল্লার' গল্পটির প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩০ সংখ্যায় (মার্চ ১৯২৪ খ্রি.)। চিরন্তন রোম্যান্টিক রসের আস্বাদনেই এই গল্প আজও পাঠকের মনে বিস্ময় জাগায়! গল্পটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় "মেঘমল্লার" নামের গল্প-সংকলনে। প্রকাশকাল মাঘ ১৩৩৮ (৩০ জানুয়ারী ১৯৩২ খ্রি.)।

'মেঘমল্লার' গল্পের কেন্দ্রে আছে মানুষের প্রত্যাখ্যান জনিত প্রেমকাহিনি। কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে বৌদ্ধতন্ত্রাচারে বন্দিনী করাতে চেয়েছেন আজীবন সন্ন্যাসীর শিষ্য গুণাঢ্য। সেই উদ্দেশ্যে সে তার পরিকল্পনার জাল বিস্তার করেছে। গল্পটির শুরু দশপারমিতার মন্দিরে। এই দশপারমিতার প্রধানা দেবী হলেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'পারমিতা' শব্দটি দ্ব্যর্থক। একটি হল 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে, পারে গমন করেছে অথবা যে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু এই অর্থে মান্যবর পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহমত হতে পারেননি। তাঁর মতে : "মিশ্রভাষায় পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি পারমি হইয়া যায়। বৌদ্ধ সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা করিলে 'পারমিতা' হয়। অর্থ হয় পরমের ভাব—সর্বোৎকৃষ্টের ভাব।" পাঠকের এই জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটলে প্রশ্ন জাগতে পারে 'দশ' সংখ্যাটির পরিভাষাগত অবস্থান সম্পর্কে। ঈশানচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'জাতক' ১ম খণ্ডের অনুবাদে বলেছেন মোট পারমিতার সংখ্যা দশ। যদিও অন্য মতের সন্ধানও পাওয়া যায়। নলিনাক্ষ দত্ত মনে করেন সর্বজনসম্মত ধারণায় পারমিতার সংখ্যা দশ এবং মিশ্র হীনযান যুগে অর্থাৎ আনুমানিক ৩৫০ থেকে ১০০ খৃষ্টপূর্ব সময়ে পারমিতার জ্ঞান প্রচলিত ছিল। 'দশভূমিকাসূত্র'-তে এর উল্লেখ প্রথম দেখা যায়। এগুলি হল 'dana, sila, nekkhama, panna, viriya, khanti, sacca, adhitthana, metta, upekkha'.

প্রখ্যাত দার্শনিক হাইনরিশ জিমার মনে করেন, 'পারমিতা' হলেন 'highest virtues or perfections.'। মহাযান বৌদ্ধদের বিশ্বাস, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই 'বুদ্ধত্ব' আছে, তার মধ্যে শক্তি আছে নিজেকে 'সম্যক-সম্বুদ্ধ' করে তোলার। প্রয়োজন গভীর সাধনা যার সাহায্যে সে তার নিজের অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করে 'পারমিতা'র উন্মেষ ঘটিয়ে বোধিচিত্তকে লাভ করতে সক্ষম হবে। এদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' হল প্রধান, অন্যান্য পারমিতা এর পরিবার বিশেষ—'ইয়ং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনিজগৌ'। গল্পে দশপারমিতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে শুরুতেই সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য জনসমাবেশ লক্ষ করা যায়। গল্পের নায়ক প্রদ্যুম্ন ও সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে হঠাৎ গায়ক সুরদাসের দেখা পেয়েছে। গল্পে এই গায়ক সুরদাসকে কেন্দ্র করে জমাট বাঁধে অপার কৌতূহল। শুরুতেই তার ইঙ্গিত : "...তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।" পারমিতার পুজোর সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। আর সেই সংক্রান্তির উৎসবে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসার

কথাই প্রদ্যুম্নকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে 'সাপুড়ে' প্রসঙ্গ চলে আসে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, বৌদ্ধদর্শনের অনুষঙ্গে পাখি-পশু-সর্প-সমস্তই মানুষের সঙ্গে এবং পারস্পরিক জীবজাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে যুক্ত। 'জাতক কথা'য় বোধিসত্ত্ব পক্ষী, নকুল, গরুড়, মৎস্য, কচ্ছপ, গৃধ্র, কুম্ভীর ইত্যাদি নানা জীবের রূপধারণ করেছিলেন—এটাই তার প্রমাণ। 'শ্রীজাতক' অনুবাদ গ্রন্থে এইপ্রকার ছড়ার দেখা মেলে :

মৈত্রীভাব—হয় যাহে বিশ্বের উদ্ধার,—
বিমুক্তি-বিজ্ঞান হতে উদ্ভব যাহার,—

..... .

তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স্ পারমিতাচয়
প্রত্যেক বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি যার বলে হয়,—

অর্থাৎ পারমিতাচয় পালন করে তবেই বিশ্বমৈত্রী প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু 'সাপুড়ে' শব্দের উল্লেখে যে লৌকিক তন্ত্র-মন্ত্র পূজার্চনার ঐতিহ্য যুক্ত হয়ে যায় তা মহাযান ধর্মের প্রতিষ্ঠার যুগে লক্ষণীয়। তাই গল্পটির ভেতরকার কাল-পরিধি ১০০ থেকে ৩০০ খৃষ্টপূর্বে। এই কাল-পরিধিতে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ বুদ্ধমত প্রাঞ্জলতা হারিয়েছে। পরিবর্তে বৌদ্ধধর্মে লৌকিক আচার ও তন্ত্রধারণার মিশ্রণে একটি অলিখিত মিশ্র বিধি তৈরি হয়েছে। সর্প প্রসঙ্গে কোন কোন পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" উপন্যাসের কিয়দংশ : "দরজার দুপাশে দুটি সাপ আঁকা-বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে আর দরজার ঠিক মাঝখানে মাথার উপর দুইটি ফণা মিলিয়া আছে। এই সর্প মুখোমুখি করিয়া রাখাব নাম কুলকুণ্ডলিনী।" তন্ত্রমতে জীবের মেরুদণ্ড বা কশেরুকার শেষ প্রান্তে এই দেবীর অধিষ্ঠান। সাধারণ অবস্থায় তিনি নিদ্রামগ্ন। সাধনামার্গে তাঁকে জাগ্রত করা এবং ক্রমশ মেরুদণ্ডের উর্ধ্বভাগে প্রলম্বিত করাই হল সিদ্ধির পদ্ধতি। 'সাপুড়ে' শব্দটির উল্লেখ গল্পকার বিভূতিভূষণ গল্পের পটপ্রেক্ষিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারের প্রসঙ্গটি যেন সূক্ষ্মভাবে আভাসিত করতে চেয়েছেন।

ইতিহাসে আগ্রহী বিভূতিভূষণ যে স্থানের কথা এই গল্পে উল্লেখ করেছেন তাও ইতিহাসসম্মত হয়ে ওঠে। সে স্থান অবন্তী নগর। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে বৌদ্ধ দর্শন ও শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। পরে তা তান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। এই সূত্রের ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে এই গল্পে। আষাঢ়ি পূর্ণিমার রাতে তান্ত্রিক গুণাঢ্যের দুরভিসন্ধিকে নিজের অজান্তে ফলপ্রসূ করে তোলার পর মহাকোঠ্‌ঠি বিহারের তরুণ অধ্যায়ী প্রদ্যুম্ন যখন পরদিন আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে সুরদাস (গুণাঢ্য)-এর সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ থেকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে তখন আচার্য তাকে তিরস্কার কবে বলেন : "পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের ধর্ম কর্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা না করতে পারে এমন কোন কাজই নেই—।" আচার্যের এই উক্তিতে বুঝতে পারা যায় "মেঘমল্লার' গল্পটির ঘটনাকাল। অষ্টম শতকের আচার্য শ্মশানচারী যোগাচারপন্থী তান্ত্রিক পদ্মসম্ভব পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে নালন্দায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ৭৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মহাযানবৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রিত হয়ে

তিনি তিব্বত গমন করেন এবং ৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নেপালে ফিরে আসেন। তাঁর কুড়িজন শিষ্য ছিলেন তান্ত্রিক কার্যকলাপে বিশেষ পারদর্শী। এইরূপ এক ব্যক্তি ও সরস্বতীকে বন্ধনের ক্ষেত্রে তন্ত্রাচারের উপচারের ছবি 'মেঘমল্লার' গল্পে দেখা যায় :

"আষাঢ়ী পূর্ণিমায় রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর ঘাটে গেল।...প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এলে বস্ত্র পরিবর্তন করেন। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুকের কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে করে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন।......." লক্ষণীয় ছদ্মবেশী গায়ক সুরদাস যে তিথিতে সরস্বতীর জন্য ধ্যানসমাধিতে নিমগ্ন হয়েছেন তা হল আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত। জাতক থেকে জানা যায় যে, এই তিথিতেই বুদ্ধদেব গভীর রাতে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

দুই

"মেঘমল্লার' গল্পে পরিবেশ সৃজনেও আছে অপার রহস্য ও নাটকীয়তা। এই গল্পের প্রেক্ষাপট যদিও ধূসর অতীতের রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত, তবু তার মধ্য থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মসাধনার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়। এদের মধ্যে তিনটি উল্লেখ করা যেতে পারে— সরস্বতী মন্দির ও তার বন্ধনমুক্তির আখ্যান সম্বলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার, 'বিহার', 'ত্রিপিটক' ও আচার্য শীলব্রতকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মচর্যা এবং সুরদাস ওরফে কাপালিক গুণাঢ্যের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড-নির্ভর তন্ত্রসাধনা। দশপারমিতার মন্দির, মগধ, অবন্তী, কৌশাম্বী, ভদ্রাবতী নদী, মহাকোট্‌ঠি বিহার, তক্ষশীলা, উরুবিল্ব, বিদিশা প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ লেখক বিভূতিভূষণের বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেয়। পাশাপাশি এই গল্পে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে সরস্বতী প্রসঙ্গ। এই গল্পে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মেঘমল্লারের সুরে আষাঢ়ি পূর্ণিমায় আবির্ভূতা সরস্বতীকে হিন্দুপুরাণের মাঘী শ্রীপঞ্চমীর সরস্বতীর সঙ্গে যেন ঠিক মেলানো যায় না। বিভূতিভূষণের আরও অন্যান্য গল্পের মতোই এই গল্পেও অলৌকিক কিংবদন্তী ও স্থানের উল্লেখ মেলে পূর্ণবর্ধনের বয়ানে। বহুযুগের ইতিহাস ও লোকপ্রচলিত কিংবদন্তীর আস্বাদ গ্রহণ করে প্রদ্যুম্ন :

"...নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়ক মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন।" এই লোকশ্রুতির উন্মোচন বন্দিনী সরস্বতী প্রসঙ্গে গল্পে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সুরদাস ওরফে গুণাঢ্যের কাছে এই কাহিনি প্রদ্যুম্ন শুনলেও পুরোটা শোনেনি বা বলা ভালো গুণাঢ্য শোনাতে চাননি। সেই কারণ উন্মোচিত হয় পূর্ণবর্ধনের কথনে : "...এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে এই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লার সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন।"

'গুণাঢ্য' শব্দটির অর্থ গুণবান, বিভিন্ন গুণে সমৃদ্ধ। কিন্তু এই গল্পে গুণাঢ্য নামক ব্যক্তিটি বৈগুণ্যে পরিপূর্ণ বলা যেতে পারে। সে যে গুণাঢ্য, সুবদাস নয় তা জানতে পারা যায় কাহিনি বেশ কিছুটা এগোনোর পর। গুণাঢ্য কোন্ উদ্দেশ্যে প্রদ্যুম্নের কাছে এসেছিল তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে গল্পে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে সে প্রদ্যুম্নের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। নদীর ধারে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ সাময়িক আস্তানা, লোকালয়ে বসবাসের পরিবর্তে সেই ভগ্নস্তূপকে বাসস্থান হিসেবে নির্বাচন শুরুতেই মানুষটি সম্পর্কে প্রদ্যুম্নকে কৌতূহলী করে তোলে। আর এই কৌতূহলী মনোভাব প্রদ্যুম্নকে ভবিষ্যতে বিরাট বড় এক বিপদের সঙ্গে জড়িয়েও দেয়। পূর্ণবর্ধন প্রদ্যুম্নের এই দুর্বলতা সম্পর্কে তাকে ভর্ৎসনাও করে : "আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্বনাশের মূল হবে।" সঙ্গীতের প্রতি তীব্র অনুরাগ, বীণাবাদন শিক্ষায় অসীম আগ্রহ, আপাত যা কিছু কৌতূহলজনক তা-ই প্রদ্যুম্নকে বিহারের কঠিন শৃঙ্খলাকে ভাঙতে সাহস জুগিয়েছে। তার বহির্গমনের আর একটি আকর্ষণ শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনন্দা যে তার বাঁশি শুনতে ভালোবাসে। কিন্তু নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে বসবাসকারী সুরদাস প্রদ্যুম্নের বাঁশির সুর এলোমেলো করে দেয়। তাই নদীতীরে বসে সে সুনন্দাকে বাঁশি শোনালেও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। তার মনে হয় "সে বাঁশী বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাসা ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না।" অথচ এই দিনই এরকম মনে হয়, কেননা প্রদ্যুম্নের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল ওই বাঁশি সুনন্দাকে অবসরমতো শোনানোর জন্য। কিন্তু এই দিনটিতে ভেতরে অজানা এক অস্থিরতা। এই গোপন অস্থিরতা সুনন্দারও দৃষ্টি এড়ায় না : "প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদ্রভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনও লক্ষ্য করেনি।" কল্লোল-কালিকলমের যুগে বিভূতিভূষণও নরনারীর প্রেমের কথা বলেছেন তবে সে ভালোবাসা কখনোই উচ্চকিত নয়। তাই এই মেদুর নিরুচ্চার ভালোবাসার ছবি!

সুরের প্রতি অনবধানতার কারণটিও গল্পে অব্যক্ত থাকে না : "কি জানি কেন প্রদ্যুম্নেব বারবার মনে এসেছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারেব কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম

শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভুর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং।" এই শারীরিক বর্ণনা গুণাঢ্যের অন্তরালবর্তী জটিল মানুষটিকে যেন স্পষ্টতর করে তোলে। জীর্ণ পরিচ্ছদ, বাহ্যিক দর্শনে অদ্ভুতপ্রকার, জরাগ্রস্ত, কুশ্রী, লোলচর্ম, শীর্ণাকার— সৌন্দর্যের একদম বিপরীতে তার অবস্থান; এক সর্বগ্রাসী মালিন্য যেন তার অন্তরাত্মাটিকে বাইরে বার করে আনে! এই জরা, অন্ধকার, ঘটনার অনিবার্যতায় প্রদ্যুম্নকে স্পর্শ করে। সুনন্দার উপস্থিতিও তাকে দূর করতে পারে না। গুণাঢ্যের পরিচ্ছদের রংটাও 'অপ্রীতিকর মেটে লাল রং' কিন্তু তার প্ররোচনার জালে প্রদ্যুম্ন আটকা পড়েছে। প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্যের প্রকৃত রূপ ধরা পড়েছে আষাঢ়ি পূর্ণিমার রাতে মেঘমল্লারের সুরে অপ্রাকৃত পরিবেশ যখন সৃষ্টি করে প্রদ্যুম্ন : "তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না।" সরস্বতীকে বন্ধনের পূর্বের এই দৃষ্টি কার্যসিদ্ধি অর্থাৎ সরস্বতীকে বন্দিনী করার পর যেন বদলে যায় আরও : "...তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে, তাঁর চোখ দুটো যেন অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।" এই জ্বলন্ত চোখ যেন কোন শ্বাপদ অথবা সাপের কথা মনে করায়। প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে সাপুড়ে ও বাজিকরদের উল্লেখ; নদীতীরের মন্দিরের সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস—গুণাঢ্যের সঙ্গে যেন যুক্ত হয়ে পড়ে।

এবার ফিরে আসা যেতে পারে সরস্বতী প্রসঙ্গে। গল্পের মধ্যপরিধিতে সেই মায়াবী আষাঢ়ি পূর্ণিমার রাত নেমে এসেছে যে রাতে তন্ত্রসাধক সুরদাস ওরফে গুণাঢ্য প্রদ্যুম্নের সাহায্যে দেবী সরস্বতীকে বন্ধনের আয়োজন করেছে। সেই বন্ধনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুকালের অতৃপ্ত এক ক্ষুধা যা গুণাঢ্যের চোখের ভাষায় প্রদ্যুম্ন লক্ষ করেছে। তার অন্তর্গূঢ় কারণটি পরবর্তীকালে প্রদ্যুম্নের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন পূর্ণবর্ধন : "...সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হবার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়.আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর অত্যন্ত রাগ হয়।" এই গল্পে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাবকে ঘিরে জমাট বেঁধেছে রহস্যময়তা; তান্ত্রিক গুহ্যাচার দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করে বহুদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে গোপনে পূর্ণ করতে চেয়েছে তান্ত্রিক গুণাঢ্য। সুযোগমতো সে কথা প্রদ্যুম্নের কাছে ব্যক্ত করেছে গুণাঢ্য: "...একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে।...কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।" প্রকৃতিকে বিভূতিভূষণ বলতেন, দেবতার কবিতা, আমার বিশল্যকরণী—"পশ্য দেবস্য কাব্যম্; ন মমার ন জীর্যতি।" বিভূতিভূষণের অন্তর্মুখীনতা এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসকে প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে ঠিক হয় না। এই সুন্দর পৃথিবীতে থেকেই তার উপাসনা। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ৬ জানুয়ারি তারিখে দিনলিপির একটি অংশে বিভূতিভূষণের এই অনুভব ধরা পড়ে: "...ভগবান কোথায় কোন আকাশে এই ironstone এর পদার্থ দিয়ে নক্ষত্র ও বিশ্ব তৈরি করে এই বন, এই পাহাড়ের গাম্ভীর্যের মধ্যে নিজেকে অদৃশ্য করে কোথায় আছেন সেই great being? আজ তাকে বুঝলাম ভালো করে। বনে, পাহাড়ে, এমনি রাত্রে, তারা ভরা অন্ধকার আকাশতলে তাঁকে বোঝা যায়। মন্দিরে নয়, বাড়ীতে পূজার ঘরে নয়। আশ্রমে নয়।" এই গল্পেও দেবী সরস্বতীর আবির্ভাবের পূর্বে প্রকৃতি

যেন তাঁর আগমনের পটভূমি তৈরি করে : ''তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনের মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শালবনের ডালপালার বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শালবনের কাছে দিকচক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শষ্প শয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দ সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে।'' এইরকম রহস্যঘন পরিবেশে প্রদ্যুম্নের সামনে সৃষ্টি হয় এক অলৌকিক দৃশ্য: ''প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী!'' তার মনে হতে লাগল ''সে যা দেখলে—এ স্বপ্ন না সত্য?'' এই সংশয়ের কারণও ছিল : ''আচার্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেকবার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই।'' এই অসম্ভবকে সত্যে পরিণত হতে দেখে সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছে। তবে এই সরস্বতী কি হিন্দু সরস্বতী? না বৌদ্ধধর্মেও এর কোন মূল আছে?

তিন

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে বজ্রযান সম্প্রদায়ে সরস্বতীর পাঁচটি রূপের দেখা মেলে : মহাসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসাবদা, আর্যসরস্বতী ও বজ্রসরস্বতী। গল্পের শুরুতেই যে প্রজ্ঞাপারমিতার উল্লেখ আছে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যেতে পারে বিভূতিভূষণেরই আর একটি গল্পের কথা। সে গল্পটির নাম 'প্রত্নতত্ত্ব'। সেই গল্পের প্রত্নতাত্ত্বিকের উদ্যোগে ঢাকা-বিক্রমপুরের প্রাচীন স্তূপ থেকে একটি সরস্বতী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটিকে দেখে বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের প্রভাবহেতু দেবী না হয়ে দেবমূর্তি হলে অনায়াসে মঞ্জুশ্রী মূর্তি বলে মনে করা যেতে পারত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই 'মঞ্জুশ্রী' হলেন মহাযানবৌদ্ধ দেবসংঘের অন্যতম প্রধান বোধিসত্ত্ব। এই মঞ্জুশ্রীই বাগীশ্বর। তাঁর হাতেই থাকে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ—যা পরাজ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ। এই মঞ্জুশ্রীরই শক্তি হলেন বাগীশ্বরী সবস্বতী। 'সরস্বতী' সম্পর্কে প্রদ্যুম্নের অনুভবে দুটি চিত্রকল্প গল্পকার বিভূতিভূষণ এঁকেছেন। প্রথমটি 'মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী!' 'তার নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি', 'তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত'—সর্বশুক্লা হিন্দু দেবী সরস্বতীকে মনে করায়। আরও একটি রূপচৈতন্য 'তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে......'। বজ্রযানে 'মহাসরস্বতী' শুক্লবর্ণা আবার তন্ত্রে নীল বা মহানীলসরস্বতীর রূপকল্প যেন এই অংশে একাকার হয়ে গেছে। তন্ত্রে 'মহানীলসরস্বতী' হলেন হিন্দুসরস্বতী ও তন্ত্রতারার মিলিত বিগ্রহ।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে জড় সৌন্দর্য কিংবা মানবজীবনের নিছক পটচিত্র হিসেবে ভাবেননি। 'মেঘমল্লার' গল্পেও প্রকৃতির ব্যবহারের এক গভীর তাৎপর্য আছে। এক সুধী সমালোচকের

ভাষায় "ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি এই ত্রিতত্ত্ব সমন্বিত চেতনাকেই বিভূতিভূষণ জীবন-চেতনা বলে মনে করতেন।" দেবী সরস্বতীকে দেখানোর প্রস্তাব গুণাঢ্যের কাছে পাওয়ার পর উত্তেজনায় প্রদ্যুম্নের মনে হয়েছে "... দেবী সরস্বতী স্বয়ং? শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী!"

তারপরেই দেখি গল্পে আসে ভদ্রাবতী নদীর তীরে শাল-তমালের অরণ্যে ঘনঘোর বৃষ্টি। শব্দশিল্পী বিভূতিভূষণের সেই বর্ণনার ধ্বনিব্যবহারে যেন সেই না-দেখা ধারাপাতেরই শব্দ শুনতে পাই : "সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিনী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল-দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ মেঘ-মেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!" লক্ষণীয় এখানে বিরহতাপিত 'মেঘদূত'-এর চকিত উল্লেখ। এখানে আবহ বর্ণনায় রঙের মিল ও অমিলের ব্যবহারে যন্ত্রণাময় সরস্বতী সত্তার পরিণতিকে ব্যঞ্জিত করা হয়েছে। যেমন: 'মেঘবরণ চুলের রাস', 'অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ', 'মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক'। কিছু পরেই সুরদাসের (গুণাঢ্য) পুজোর আয়োজনে রক্তজবার উল্লেখ এবং তার কিছু পরেই অন্ধকারে 'মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী' যার 'তুষার ধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পভরণে মণ্ডিত' এবং 'তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান', 'তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্য মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল' ফুটে ওঠার বর্ণনা নিছক বিবৃতি হয়ে থাকে না। প্রথমে ধূসর বর্ষা, অন্ধকারে ক্ষণিক দামিনীর চমক, দ্বিতীয় স্তরে সরস্বতীর শুভ্রতার উল্লেখ এবং শেষ স্তরে রক্তকমলের লালিমা ও বাসন্তী রঙের ফুলের উল্লেখে একাধিক রঙের মিশ্রণে 'নীল' একদিকে 'নীলসরস্বতী' অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে হিন্দু ও তন্ত্র দর্শনের মিলিত বিগ্রহ অন্যদিকে লাল হল বিশুদ্ধ শক্তিসাধনার সমভিব্যাহারবিশেষ আবার পাশাপাশি বাসন্তী রঙের উল্লেখ যেন হিন্দুর বাসন্তী পুজোকে মনে করিয়ে দেয়।

সরস্বতী দর্শনের পর তাঁর অন্তর্ধান ঘটলে প্রকৃতির চেহারা আবার বদলে যায়। ক্ষণিক আগের ঔজ্জ্বল্য পরিণত হয় বিবর্ণতায়। গল্পে আসে এমন বর্ণনা : "জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।" খানিক পরে বিহারের দিকে রওনা হওয়া প্রদ্যুম্নের চোখে পড়ে প্রকৃতির আরও পরিবর্তন : "একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হল্‌দে রং এর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।" এখানে হলদে রঙের স্পর্শ এবং গ্রহণের উপমা গল্পের গভীর বেদনাকে ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। এই অংশে তান্ত্রিক গুণাঢ্যের মন্ত্রে বন্দিনী সরস্বতীর ক্ষণিক আগের জ্যোতির্ময়ী মূর্তিটিও যেন অন্তর্হিত। প্রত্যাগমনে উদ্বিগ্ন প্রদ্যুম্নের চোখে পড়ে : "বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে।..... সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মত নয়" 'পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে' উঁকি মারা সেই আলোর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অবাক হয়

সে : "সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, সেই অপরূপ দ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয়—তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে।" সরস্বতীর এই বিবর্ণ রূপটিই গল্পে প্রকট হয়েছে, দিব্যমূর্তি চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। বন্দিনী সরস্বতী যেন মোহাবিষ্ট : "তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারপাশ হাতড়ে বার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।" এই কেন্দ্রে এসে গল্পের অলৌকিকত্ব ভেঙে যায়, এই সরস্বতী কোন দিব্যশক্তির আধার নন, প্রদ্যুম্নের চোখে এই সরস্বতী সাধারণ এক দুঃখিনী নারীমাত্র।

সরস্বতীর আবির্ভাবের প্রাক্‌মুহূর্তে বর্ষার উল্লেখ, আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি এই গল্পে যেন আর এক দিক থেকেও ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৪৩ সূক্তের ১১ সংখ্যক শ্লোকে 'সরস্বতী' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায় :

আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী
যজতা গন্তু যজ্ঞং।
হবং দেবী জুজুযানা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু।।

অর্থাৎ, "দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়া ও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগের এই সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।" শ্রী রমেশচন্দ্র দত্তের এই অনুবাদ থেকে আরও জানতে পারা যায় যে, আদি সরস্বতী বা বৈদিক সরস্বতীর কল্পনায় তিনি অন্নদাত্রীও। আবার তিনি উষার সঙ্গে অভিন্ন, কারণ উভয়েই জ্যোতির্ময়ী। সূর্যাগ্নির দীপ্তিময় রশ্মি মেঘরূপে বৃষ্টি দান করে, কৃষি ও পশুবৃদ্ধির সহায়ক হয়। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল তৃতীয় সূক্তে ১০-১১ শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে "পবিত্রা, অন্নযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্টা ও যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন। সুনৃত বাক্যের উৎপাদায়িত্রী, সুমতি লোকদের শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী আমাদের যজ্ঞ গ্রহণ করেছেন। সরস্বতী প্রবাহিত হয়ে প্রভূত জলসৃজন করেছেন এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করেছেন।" অন্নদা হিসেবেই নয়, জলসৃজনীশক্তি হিসেবেও সরস্বতীকে কল্পনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল সংক্রান্ত টীকায় আরও মেলে: "সরঃ অর্থে জল, সরস্বতীর প্রথম অর্থ নদী এতে সন্দেহ নেই, আর্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে তাই প্রথমে সরস্বতী দেবী বলে পূজিতা হয়েছিলেন।" যাস্ক বলেছেন, সরস্বতী একদিকে 'নদীরূপা', অন্যদিকে 'দেবতারূপা'। শ্রী উমেশচন্দ্র বটব্যাল 'সরস্' শব্দের আদি অর্থ ' জ্যোতিঃ'. এবং তাই সূর্যের একটি বৈদিক নাম 'সরস্বান্', সে কারণে 'সরস্বতী' হলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী—এই অর্থ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঋগ্বেদে আরও পাওয়া যায় প্রাচীনকালে সরস্বতী সর্বোত্তম তীর্থ ছিল। শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে পাওয়া যায় গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু সরস্বতী নদীর তীরে এক তীর্থ স্থাপন করেছিলেন। 'মেঘমল্লার' গল্পে আচার্য পূর্ণবর্ধনের বয়ানে পাই : 'নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা ছিল সেকালের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান।"

চার

গল্পের নাম 'মেঘমল্লার'। এই নামকরণেও বর্ষার অনুষঙ্গ। 'মেঘমল্লার' বর্ষার রাগ। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে রাগ মেঘ আর তার ছয় রাগিণীর প্রথমা মল্লারীর যে মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে তা মূলত শৃঙ্গারমূর্তি। ভুসুকুপাদ রচিত মল্লারী রাগের একটি চর্যায় দেখি "করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ। / ভাবাভাব দ্বংদল দলিআ" অর্থাৎ ভাবাভাবের দ্বন্দ্বকে দলিত করে করুণা মেঘ নিরন্তর স্ফূরিত হচ্ছে। প্রদ্যুম্ন মেঘমল্লার বিস্তারে বিশেষ পারদর্শী এবং এই রাগেরই প্রকৃত সৃজনে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব সম্ভব, আবির্ভাব-তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত এবং বর্ষার মেঘভারাক্রান্ত পৃথিবীর ছবি সব মিলিয়ে এই গল্পে জলধারা ও মেঘমল্লার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গল্পের কাহিনীর শেষার্ধে 'জ্যোতিঃহীনা, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র' পরিহিতা সরস্বতীকে অনেক অনুসন্ধানের শেষে উরুবিল্ব গ্রামে এক জলাশয়ের ধারে জল তুলে আনায় উদ্যোগী অবস্থায় আবিষ্কার করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় কথাকার বিভূতিভূষণের বহু গল্পেই নারী দেখা দেয় কোনো এক দিঘি, পুকুর, হ্রদ বা নদীতীরে। 'উপেক্ষিতা', 'বেনীগীর ফুলবাড়ী', 'একটি দিনের কথা' গল্প সেই প্রমাণই দেয়। 'উরুবিল্ব' এই নামটি গল্পে বৌদ্ধ প্রভাবটিকে যেন আরও প্রতিষ্ঠিত করে। বিহার, ত্রিপিটক, প্রজ্ঞাপারমিতা, আচার্য পূর্ণবর্ধন, পদ্মসম্ভব ইত্যাদির পাশাপাশি আর একটি বৌদ্ধ প্রসঙ্গ গল্পে সরাসরি উল্লেখিত হয়েছে। গুণাঢ্যের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে মোহাবিষ্টের মত সহায়তা করার পর আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে নিজস্ব দোষস্বীকারের ফলশ্রুতিতে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পেরেছে গুণাঢ্য তাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে মাত্র। আচার্যের নির্দেশে সেই মুহূর্তেই সে যখন নদীতীরের ভাঙ্গা মন্দিরের উদ্দেশ্যে ছুটেছে তখন বিহারের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'মহাদর্শনজাতক' গ্রন্থের একটি শ্লোক :

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবং বাদী মহাসমনো.....

এর সারকথা, কারণ থেকে বিশ্বে যা উৎপাদিত হয়, তা স্বয়ং তথাগত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে সময়ের মাটিকে খুঁজতে ততখানি উৎসাহবোধ করেননি, যতখানি আগ্রহ বোধ করেছেন মানুষকে খুঁজতে। মানুষ তার দীন আশা-আনন্দ, দুঃখবেদনাকে সম্বল করে এত আপাদমস্তক মানুষ, এত হৃদয়স্পর্শী যে কিছুতেই তাকে পর বলে মনে হয় না। তেমনই এক মানুষ এই গল্পের প্রদ্যুম্ন। 'প্রদ্যুম্ন' শব্দটির নানা অর্থ—'রুক্মিণীর গর্ভজাত কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সন্তান'; 'নটের ছদ্মবেশে বজ্রপুরে প্রবিষ্ট যাদব'; 'অনঙ্গ বা মদনদেব'। এই গল্পে শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনন্দার সঙ্গে তার অনুরাগের কিছু চিত্র থাকলেও অন্তিমে সে সুনন্দাকে জীবনে লাভ করতে পারেনি। অদম্য কৌতূহল, বীণা শিক্ষার অসীম আগ্রহ, যুবোচিত উদারমনস্কতাই তার জীবনের পরিণতির লিখন বদলে দিয়েছে। সুরদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার কাছ থেকে বাণীর অভীষ্ট ধন, সৌন্দর্যলক্ষ্মী সরস্বতীকে দর্শনের কৌতূহল ক্রমশ সুনন্দার

থেকে তাকে দূরতর করে তুলেছে। সরস্বতীকে বন্দিনী করার কাজে সেই গুণাঢ্যের সহায়তা করেছে—এই মর্মযন্ত্রণায় সে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছে। অপ্রত্যাশিত সরস্বতী-কাণ্ডে সে বিমূঢ় হয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে ভদ্রাবতীর গভীর কালোজলের তলায় কোন এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলে বারে বারে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করছেন, নদীর মাছগুলো তার কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে। দেবীর দুঃখে হেসে অস্থির একটি বড় মাছ যার মুখ গায়ক সুরদাসের মত। এই স্বপ্ন যে ইঙ্গিতের জন্ম দিয়েছিল তার মনের মধ্যে তাই সত্যে পরিণত হয়েছে পরবর্তী সময়ে। নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প গ্রহণ করে প্রদ্যুম্ন বিহার ছেড়েছে, পাঠত্যাগ করেছে, এমনকি প্রণয়িনী সুনন্দাকে পর্যন্ত ভুলেছে। দেবীকে পুনরুদ্ধারের বাসনায় সে যেতে যেতে দেখেছে তাহার বিহারের চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রতের ছবি আঁকার মুহূর্তে মুখে অসাফল্যের ছাপ, বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের অবসরে তার কানে এসেছে নানা কথা—মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজাদেশে যে ভগবান তথাগতের মূর্তি গড়েছেন তার মুখ দস্যু দমনকের মত রূঢ় ও ভাববিহীন হয়ে পড়েছে। তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য নির্ণয়ে সূত্রের অর্থ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, মহাকোট্‌ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা শিক্ষক বসুব্রত তাঁর 'বুদ্ধ ও সুজাতা' নামক ছবিটি বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত আঁকতে না পেরে শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কলালক্ষ্মী সরস্বতীর দুর্দশাপ্রাপ্তির পরোক্ষ ফল এইসমস্ত ঘটনা। আর শেষ ঘটনাটি উল্লেখিত হওয়ার পরেই গল্পে উচ্চারিত হয়েছে 'উরুবিল্ব' গ্রামের নাম। যে গ্রামের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তথাগত বা বুদ্ধদেবের নাম।

বহু সন্ধানের পর উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তে এক পাহাড়ের সানুদেশে ঝরণার ধারে সে মন্ত্রশক্তিতে আত্মপরিচয়লুপ্ত দেবী সরস্বতীকে আবিষ্কার করেছে। তবে সে দেবী নয়, যেন মানবী। প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছে "তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।" জলাশয়ের বুকে ফুটে থাকা কুমুদ ফুল সংগ্রহে ব্যর্থ দেখে প্রদ্যুম্ন তাঁকে সেই ফুল এনে দিয়েছে এবং দেবীর সঙ্গে প্রথম কথোপকথনের সুযোগ লাভ করেছে। ক্ষুধা নিবারণের কথা ব্যক্ত করলে দেবী তাকে পাহাড়ের উপর কুটিরে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর দেশ কোথায়—প্রদ্যুম্নের এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন তাঁর দেশ কোথায় না জানলেও এর আগে তিনি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন, এক সন্ন্যাসী সেখান থেকে উঠিয়ে এনেছেন। সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে তাঁর পদ্ম-পাপড়ির মতো চোখ দুটি বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছে। তাঁর কান্না দেখে প্রদ্যুম্ন অনুভব করেছে দেবীর এই পরিণতির জন্য সে-ই দায়ী। সে ভেবেছে : "...ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এককণা ধুলোরও যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধুলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে?" কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে লোভী মানুষ নিজস্ব স্বার্থে বন্দিনী করতে চায় (সুরদাস ওরফে গুণাঢ্য) আর শুদ্ধচিত্ত সাধক নিজের জীবন বিপন্ন করেও

তাঁকে মুক্ত করে দিতে চায় (প্রদ্যুম্ন)। উরুবিল্ব গ্রামে আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী সরস্বতী আর দেবী নন, মানবী। তাই রাত্রে একা কুটিরে থাকতে জাগতিক নারীর মতোই ভয় পান, পায়েসের লোভ দেখিয়ে প্রদ্যুম্নকে রাতে থাকতে অনুরোধ করেন। সমস্ত রাত সে কুটিরের বাইরে খোলা হাওয়ায় বসে কাটায়। কিন্তু দেবী বাইরে আসেন না, ঘরে কাটান। এও তো বন্দিনী জীবনযাপনের ইঙ্গিত বলে মনে হয়। দেবী কারণটিও ব্যাখ্যা করেন : "এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে..."। জ্যোৎস্না রাত্রিকে দেবীর ভয় পাওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। এক একদিন প্রদ্যুম্ন দূর থেকে শুনতে পেত দেবীর গান। সে গান শুনে তার মনে হত "...পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণ-ধারায় আদিম ঝরণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পথিক তারার গান।" এই গল্পে প্রদ্যুম্নকে একাধিক বার খোলা আকাশের নীচে দেখা যায়। এই আকাশ কি মুক্তির পটভূমির ইঙ্গিত?

হঠাৎই একদিন গুণাঢ্যকে আবিষ্কার করে প্রদ্যুম্ন। এও জানতে পারে গুণাঢ্য নিজের কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত। প্রতি রাত্রে সে স্বপ্ন দেখে, কারা যেন তাকে জানায় তার শেষ পরিণতি নরকবাস। অনুতপ্ত গুণাঢ্য প্রদ্যুম্নকে জানায় বন্ধনকারী মন্ত্রের বিপরীত এক মন্ত্র সে তার গুরু আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে শিখে এসেছে, এক্ষেত্রে এক ভয়ংকর বিপদও আছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে দেবী আবার বন্ধনমুক্ত হতে পারবেন কিন্তু যে ছিটিয়ে দেবে সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। স্বভাবভীরু, তঞ্চকে, স্বার্থান্বেষী গুণাঢ্য একাজ করতে একেবারেই অপারগ। অগত্যা গল্পকার বিভূতিভূষণের লেখনীতে উঠে এসেছে এই গল্পের নির্মম সমাধান তথা সমাপ্তির ইঙ্গিত : "যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মম প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।" তার জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, সাধ-স্বপ্ন-প্রেম সমস্তই এই আত্মত্যাগের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তার এই অন্তিম মুহূর্তে মনে পড়েছে বারাণসীতে প্রবাসী অপেক্ষমান মায়ের কথা, তার সঙ্গে দেখা করার অদম্য ইচ্ছা প্রাণে জেগেছে। কিন্তু কর্তব্যের কাছে, প্রেরণার কাছে বাসনা হার মেনেছে। দেবীকে জলাশয়ের ধারের থেকে ফিরে আসতে দেখেছে সে, দেবীর হাতে অনেকগুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল। আমাদের মনে পড়ে যাবে দেবীর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময়েও প্রদ্যুম্নের কুমুদ ফুল সংগ্রহের কথা। প্রদ্যুম্নের জীবন, স্বপ্ন-সাধ সবকিছুই যেন ওই আধ-ফোটা কুমুদ ফুলের মতো। যে অন্যায়, অপরাধের শাস্তিগ্রহণে কাপুরুষ গুণাঢ্য ভয় পেয়েছে সেই শাস্তিকেই গ্রহণ করেছে উদারমনা প্রদ্যুম্ন; প্রসন্ন অনুভব করেছে এই ভেবে যে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার একমাত্র সে-ই লাভ করেছে। শেষ মুহূর্তে তাঁর মাকে মনে পড়েছে, শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনন্দাকে নয়।

আর এই কাহিনির পাশের যবনিকা স্বরূপ আর একটি বিমিশ্র ক্লেদনানির্ভর পরিণতি নেমে এসেছে পাঠকের চোখের সামনে: "কুমার শ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সামন্তদাসের

মেয়ে। ...সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।" গল্পে এই শবরীর মত প্রতীক্ষা নিয়ে সুনন্দা দেখে, মাঠের জ্যোৎস্নাজাল পেরিয়ে কাউকে আসতে দেখলে তার মনে পড়ে প্রিয় প্রদ্যুম্নের কথা। 'প্রদ্যুম্ন' শব্দটির একটি অর্থ 'নটের ছদ্মবেশে বজ্রপুরে প্রবিষ্ট যাদব'। গল্পের প্রদ্যুম্নও পরিণতিতে জীবন বিসর্জন দিয়ে পাষাণের বজ্রপুরে প্রবিষ্ট হয়েছে। সুনন্দা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেও প্রদ্যুম্নকে ভুলতে পারেনি, অন্তহীন প্রতীক্ষায় নিয়োজিত হয়েছে সে। হয়তো মরমী কথাকার বিভূতিভূষণ সূক্ষ্মভাবে এঁকে দিলেন গৌতমের অন্তর্ধানের পর যশোধরার প্রবজ্যাগ্রহণ কাহিনি। 'মেঘমল্লার' গল্পের শেষে তত্ত্বদর্শনের সরস্বতীর মুক্তিলাভ ঘটলেও মানবী সুনন্দা কুমারশ্রেণীর বিহারে অতীত স্মৃতিকে সম্বল করে বন্দিনী হয়ে থেকেছে। প্রদ্যুম্ন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ 'পারমিতা' প্রজ্ঞার সন্ধান করেছে, মেঘমল্লার শুনিয়ে শুধু দেবীকে নয়, সে সুনন্দাকেও বেঁধে ফেলেছিল কিন্তু সেই মেঘমল্লার প্রদ্যুম্নের জীবনের পরিণতিকে চিরকালীন বন্দীত্বে বেঁধে ফেলেছে। এক এক রাতে সুনন্দার স্বপ্নে দেখা দিত কোন এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনে লুকোনো অর্ধভগ্ন পাষাণমূর্তি। আর সেই জনহীন পাহাড়ের বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে মেঘমল্লার। 'মেঘমল্লার' বর্ষার রাগিণী, এই বর্ষার মেদুরতা, বিষণ্নতা যেন গল্পের আধার, চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করেছে। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় এ স্বপ্ন কি জন্মান্তরের স্বপ্ন? অর্হত্বকামনা করলেও প্রদ্যুম্ন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে জীবনের জন্মমৃত্যু চক্রেই ফিরে আসতে চেয়েছে আর এভাবেই যেন রচিত হয়েছে মহাবিশ্বজগতের রহস্যে ঘেরা আর এক মানবিক জাতককথা আর তার ফলেই যেন বেদনাঘন 'ভাবজীবন' শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত হয়েছে 'আনন্দজীবন'-এ। এই 'আনন্দজীবন' এর ধারণা বিভূতিভূষণের নিজস্ব। আনন্দঘন জীবন—এই অর্থে 'আনন্দজীবন'। এই আনন্দজীবনের উৎসপথ নিসর্গজগৎ ও মনোজগৎ নয়, তাকেও পেরিয়ে আত্মিকজগৎ। মরমী পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে "স্মৃতির রেখা" গ্রন্থের কিয়দংশ : "আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর........মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিষ নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, এক অনন্তজীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যুস্পৃষ্ট না হয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে, তা তোমার আমার সকলের।" সকল লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় না কিন্তু বিভূতিভূষণ পারতেন সেই বিরাট space-time এর অঙ্কে নিজেকে স্থাপন করতে। বিভূতিভূষণের ধারণায় 'এই বস্তু বিশ্ব ও অবস্তু বিশ্ব' পাশাপাশিই রয়েছে। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে 'মেঘমল্লার' গল্পের পরিণতিকেও স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে কোন কোন পাঠকের।

পাঁচ

বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার' গল্প পাঠ করলেও মনে পড়ে যেতে পারে নন্দনতত্ত্ববিদ্ ক্রোচের এই কথাগুলি : "In aesthetic analysis it is impossible to separate subjective from objection, lyric from epic, the image of feeling from that of things." এই গল্পেও যেন image of things ও image of feelings—বস্তু এবং ভাব মিলেমিশে যেন একাকার। এই গল্প 'মানুষের বুকের কথা'। এবং সে কথা করুণকথা।

ফ্লবেয়ারের একটি চিঠিতে পাওয়া যায় : "Human life is a sad show, undoubtedly : ugly, heavy and complex." বিভূতিভূষণ দুঃখকে সুন্দর করে তুলেছেন, যা বড় করুণ তার মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে বিভূতিভূষণ যে সৌন্দর্য দেখিয়েছেন মানুষের দুঃখকেও তিনি সেই সৌন্দর্য দান করতে চেয়েছেন। দুঃখও যেন এই সুন্দর প্রকৃতিরই একটা অংশ। একটা tragic sense বিভূতিভূষণের অন্তর্জীবনের এক প্রধান ভাব; এই ভাবের এক সুন্দর প্রমাণ 'মেঘমল্লার' গল্পের শেষাংশ।

কথাসাহিত্যের ভাষাকে বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা—এই দুটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা চলে। কিন্তু এই গল্পে বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা চলিত। সংলাপের মধ্য দিয়ে চেনা যায় তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে কতখানি চেনেন। যখনই বিভূতিভূষণের ভাষার বিন্যাসে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের নিবিড়তার সঙ্গে অলৌকিকতার মায়াময়তা মিশিয়ে এক কল্পভুবন গড়ে তুলেছেন তখন ভাষাও কিছুমাত্রায় তৎসমগন্ধী হয়ে পড়ে। যেমন এই গল্পে সরস্বতীর আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তের ভাষা।

বিভূতিভূষণকে প্রকৃতির কথাকার হিসেবেই অনেকে প্রাধান্য দিতে চান, কিন্তু তিনি মানুষেরও কথাকার—হোক না সে মানুষ দুঃখী মানুষ! 'মেঘমল্লার' সেই মানুষেরই জীবনের ইতিকথা; আস্বাদনে একটি চিরকালীন গল্প।

পুঁইমাচা : নানা দৃষ্টিকোণ থেকে

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতিপ্রেমিক কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় দ্বিশতাধিক গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'পুঁইমাচা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। গল্পটির বিষয়বস্তুর মধ্যে তেমন কোন নূতনত্ব নেই। ক্ষেন্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে গল্পটি রচিত। সেই এ গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল মণিগাঁয়ের শ্রীমন্ত মজুমদারের পুত্রের সঙ্গে। বিয়ের সবকিছু যখন প্রায় পাকা, আশীর্বাদও হয়ে গেছে, তখন ক্ষেন্তির পিতা সহায়হরি হঠাৎ জানতে পারলেন ছেলেটির চরিত্র ভাল নয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাই তিনি সম্বন্ধ নাকচ করে দেন। কিন্তু নাকচ করে দিলেও সহায়হরি ভুলে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বাস করেন তার নাম 'সমাজ', সমাজে একবার কোন মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেলে সেই মেয়েকে নাকি বলে 'উচ্ছগ্‌গু' করা মেয়ে, উচ্ছগ্‌গু করা মেয়ের বিয়ে কোন কারণে স্থগিত হলে তার এবং তার পরিবারের অখ্যাতি রটে। এ নিয়েই স্ত্রী অন্নপূর্ণার সঙ্গে সহায়হরির বিরোধ। সেদিন সহায়হরি তারকখুড়োর গাছ থেকে একটু খেঁজুর রস আনবে বলে একটি বাটি কি ঘটী কিছু একটা চাইলেন। অন্নপূর্ণা প্রথমে কিছু বলেন নি, কিন্তু তারপর বেশ ঝাঁঝালো হয়েই বলে উঠেছেন, "একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না।...........যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ি, বাগ্দী-বাড়ি উঠে ব'সে দিন কাটাও।" অনতিবিলম্বে মেয়ে ক্ষেন্তি আবার কোথা থেকে চাট্টি পুঁইডাটা এনে হাজির করলে অন্নপূর্ণার আর ক্রোধের অন্ত থাকে না, বলে ওঠেন "বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?........কোথায় শাক, কোথায় বেগুন; আর একজন বেড়াচ্ছেন—কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ.........ফেল্‌ বলছি ওসব........ফেল্‌।"

এই নিয়েই অন্নপূর্ণার সংসার। সংসারে দারিদ্র্য রয়েছে, রয়েছে 'উচ্ছগ্‌গু' করা মেয়ে আর উদাসীন স্বামীকে নিয়ে অন্নপূর্ণার চিন্তা। নিন্দা অপমান আর তিরস্কার। তবু তারই মাঝে রয়েছে আবার একটু আনন্দও। সেদিন পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে অন্নপূর্ণা পিঠে তৈরি করতে বসেছিলেন। ক্ষেন্তি মাকে জোগাড় দিচ্ছিল। ছিল ক্ষেন্তির দুই বোন পুঁটি ও রাধীও। খাওয়ার সময়ে ক্ষেন্তিই পিঠে বেশি খেয়েছিল। যতই অন্নপূর্ণা তাঁর এই ভোজনরসিক মেয়েটির প্রতি বিরক্ত হন তবু তিনি মা। মায়ের প্রাণ কোমল মমতাশীল। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "ক্ষেন্তি, আর নিবি?......ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন।"

তারপর হঠাৎ একদিন বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির দুসম্পর্কিয় এক আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহে বরপক্ষ যা পন চেয়েছিলেন তা সহায়হরি পুরোটা দিতে পারেননি, আড়াইশ টাকার মতো বাকি ছিল, আর তারই পরিণামে ক্ষেন্তির

ওপর চলে মানসিক নির্যাতন। তার পিতৃগৃহে আসাও বন্ধ হয়। শেষপর্যন্ত বসন্ত রোগ হয় ক্ষেন্তির, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে সহায়হরিরই এক আত্মীয়ার বাড়ি তুলে দিয়ে যায়। গা থেকে গহনাগুলি পর্যন্ত খুলে নেয়। একদিন সেখানেই ক্ষেন্তির মৃত্যু হয়।

তারপর কয়েকমাস কেটে গেছে। বছর ঘুরে আবার এসেছে পৌষপার্বণের দিন। অন্নপূর্ণা পিঠে তৈরি করতে বসেছেন। রাত্রে অনেকক্ষণ পর পিঠে গড়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন এমনসময়ে ক্ষেন্তির এক বোন পুঁটি হঠাৎ বলে উঠল "দিদি বড় ভালোবাসত......."। হঠাৎ সকলেরই চোখে পড়ল উঠানের এক কোণে রোপিত এক পুঁইগাছের ওপর। গাছটি ক্ষেন্তিই নিজের হাতে পুঁতেছিল। তখনও "বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে,.....সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।" ক্ষেন্তিরও তো এমনভাবে লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে বেড়ে ওঠারই কথা ছিল। কিন্তু সে সুযোগ সে পেল না—এমন এক ট্রাজিক রসের মধ্য দিয়েই গল্পটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গল্পটির নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নামকরণ হল সেই চাবিকাঠি যা পাঠককে বক্তব্যবিষয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। নামকরণ করার নির্দিষ্ট কোন রীতি না থাকলেও সাধারণতঃ প্রধান চরিত্র, বক্তব্যবিষয় অথবা বিষয়কে ব্যঞ্জিত করার উপযোগী নামকরণই লক্ষিত হয়। এসবের প্রেক্ষিতেই আমাদের আলোচ্য 'পুঁইমাচা' গল্পটির নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার্য।

গল্পটির নামকরণের মূলে গল্পের একেবারে শেষের পংক্তি অথবা অনুচ্ছেদে প্রকৃতির প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনাকে অনেকেই দায়ী করেছেন। ঐ অনুচ্ছেদে পুঁইগাছের সুস্পষ্ট ক্রমবর্ধমান লাবণ্যের সঙ্গে যোগ রেখে ক্ষেন্তির জীবনের কোথায় যেন একটি যোগসূত্র বিদ্যমান রয়েছে তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। প্রয়াত সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন, ঐ বেড়ে ওঠা সুপুষ্ট পুঁইগাছটি স্বরূপত ক্ষেন্তির জীবনতৃষ্ণারই রূপক, অকালে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তো মৃত্যুহীন, পুঁইগাছটি যেন তার সেই মৃত্যুহীন প্রাণেরই ব্যঞ্জনা বহন করে আনে—"সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে........মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে.....সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।"

এখানে প্রতিটি শব্দ লেখক অত্যন্ত সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। পুঁইগাছের মাচা জুড়ে বেড়ে ওঠা, ক্রমবর্ধমান হয়ে মাচা থেকে বাইরে ঝুলে পড়া এবং সর্বোপরি সুপুষ্ট নধর হয়ে জীবনের লাবণ্যে পূর্ণ হওয়া বুঝিয়া ক্ষেন্তি বেঁচে থাকলে তার জীবন ও যৌবন বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনাকেই ইঙ্গিত করছে। কেউ কেউ আবার নামকরণটির মূলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের প্রকাশও লক্ষ্য করে থাকেন, যেমন করেছেন বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' নামক গ্রন্থে—"বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি তাঁর আত্মার আত্মীয়। সেই প্রকৃতিকে তিনি এ গল্পে পুঁইগাছের প্রতীকে ঘনপিণদ্ধ করেছেন। লেখক প্রকৃতির মধ্যে গভীর রহস্যের সন্ধান করেছেন নানাভাবে।........নায়িকার জীবন ও পুঁই-এর জীবনের বৈপরীত্যের

মূলেই প্রকৃতি-ভাবনার সূত্রে লেখক-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।......ক্ষেন্তির সামগ্রিক জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতিরই খেলা। এই খেলা নির্মম ও নিরাসক্ত। তা না হলে ক্ষেন্তির চলে যাওয়ার পরেও কোন রহস্যে তারই শিশুকালে লালন করা বড় আদরের পুঁইগাছটি সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়?'

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, গল্পটির নাম 'পুঁইগাছ' কিংবা 'পুঁইচারা' হল না কেন? প্রশ্নটি উক্ত লেখকও তুলেছেন। আমাদের উত্তর এই—'পুঁইগাছ' বললে তার ক্রমবর্ধমানতা কিংবা তার লাবণ্যকান্তির ওপর ইঙ্গিত প্রদত্ত হয় না, 'পুঁইচারা' বললে তো নয়ই, কিন্তু 'পুঁইমাচা' বললেই তৎক্ষণাৎ যেন মাচা থেকে দুলে পড়া একটি গাছের লাবণ্য তথা যৌবনের ছবি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যার বিপরীতে ক্ষেন্তির জীবনের করুণ পরিণতি তাৎপর্যময়। আবার গল্পটির নামকরণ যদি ক্ষেন্তির নামানুসারে হত তাহলে তা খুবই সাদামাটা ব্যাপার হত। সেদিক থেকে বরং বর্তমান নামকরণটি অনেকবেশি ব্যঞ্জনা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে স্বীকার করতে হয়।

গল্পে লোকজীবনের প্রেক্ষিতকেও গ্রহণ করা হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। প্রায় একইরকম ভৌগোলিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত যে বিশেষ এক জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলনে স্বাভাবিক দক্ষতা অর্জন করে সেই সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিই হল লোকসংস্কৃতি। সংহত সমাজ বলতে আমরা সেই সমাজকেই এখানে নির্দেশ করতে চাইছি যার অন্তর্গত প্রতিটি মানুষ প্রায় একইরকম জীবনাচরণে অভ্যস্ত, তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা যা করে সেই সবই লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে কয়েকটির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন ছড়া ধাঁধা প্রবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার লোকসাহিত্য, লোকউৎসব, লোকখাদ্য, লোকবিশ্বাস, লোকচিকিৎসা, লোকতৈজস, লোকপ্রযুক্তি, লোকভাষা, লোকযান, লোকশিল্প, লোকপানীয় প্রভৃতি। পরিশীলিত সাহিত্যের স্রষ্টরা তাঁদের সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলতে এসব লোকজ উপাদানের সাহায্য প্রায়ই নিয়ে থাকেন। আমাদের কালজয়ী সাহিত্যগুলির কালোত্তীর্ণ হওয়ার মূলে অনেকেই দায়ী করেছেন সেসব রচনায় লোকজ উপাদানের বহুল ব্যবহারকে। রবীন্দ্রনাথকেও মন্তব্য করতে দেখা গেছে—আমাদের নিম্নসাহিত্য ও উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ রয়েছে, যা আপাতভাবে স্পষ্ট না হলেও সম্বন্ধটা সত্য।

আমাদের আলোচ্য বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পেও আমরা তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। এসেছে এখানে চণ্ডীমণ্ডপের কথা, লোকখাদ্য-লোকপানীয়-লোকবিশ্বাস-লোকউৎসব প্রভৃতির প্রসঙ্গ, ঘটেছে প্রবাদ প্রভৃতির ব্যবহার। গ্রামীণ মেয়েলি ভাষার ছাঁদটিও ধরা পড়েছে ক্ষেন্তির মায়ের কথোপকথনে। গল্পটি শুরুই হয়েছে খেজুর রসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, যা আদতে লোকপাণীয়েরই উদাহরণ। ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরি চাটুজ্জে গ্রামের প্রতিবেশী তারক খুড়োর গাছ থেকে খেজুর রস আনতে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে বলেছেন, "একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।" সহায়হরির কথায় স্ত্রী কোনরকম সাড়া দিচ্ছেন না দেখে ফের একটু অগ্রবর্তী হয়ে বললেন, "তুমি তেল

মেখে বুঝি ছোঁবে না?" এই তেল মেখে কিছু না ছোঁয়া একধরনের ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা, যা গ্রামীণ লোকসমাজ থেকে ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করেছে আমাদের পরিশীলিত সমাজে। গল্পটির আরো এক জায়গায় একধরনের ট্যাবুর পরিচয় বিদ্যমান। সংস্কার হল, ঋতুমতী অবস্থায় মহিলাদের কোন শুভকাজে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ পূজার্চনা বা ঐধরনের কোন ধর্মীয় কাজে। মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকি দুর্গাকেও তাই ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণাকে উদ্দেশ করে বলতে শোনা গেছে, "—খুড়ীমা, মা বলে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না। তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার করে দিয়ে আসবে?"

নবান্নের কথা যখন এসেই গেল তখন বলি নবান্ন আমাদের গ্রামবাংলারই এক প্রধান লোকউৎসব। নতুন ধান্যে নবান্ন পালিত হয় গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে। আমন ধান গৃহে আসার পর অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক বিশেষ শুভ দিন দেখে পালিত হয় এ উৎসব। নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। প্রকারান্তরে এ আসলে কৃষিলক্ষ্মীরই উৎসব। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, তাই নবান্ন উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ কৃষির প্রতি জ্ঞাপন করেন তাদের কৃতজ্ঞতা। আলোচ্য 'পুঁইমাচা' গল্পেও এসেছে তার কথা। শুধু নবান্ন নয়, এসেছে পৌষপার্বণের কথাও। পৌষপার্বণ মানেই পিঠে পরব। 'পুঁইমাচা' গল্পের বেশ খানিকটা অংশ জুড়েই রয়েছে তার বর্ণনা, এসেছে পায়েস-ঝোলপুলি-মুগতক্তি এবং পাটিসাপটার কথা। এসব লোকখাদ্যেরই উদাহরণ বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, পিঠে তৈরির প্রসঙ্গে যে লোকযন্ত্রটির কথা গল্পে উল্লিখিত হয়েছে তা হল কুড়ুল। কুড়ুল ছাড়াও রয়েছে চুলা, খুন্তি, প্রভৃতির উল্লেখ। লোকতৈজসপত্রাদির মধ্যে এসেছে পিঁড়ি, ঘটী, হুঁকো প্রভৃতির প্রসঙ্গ। হুঁকো খাওয়া একধরনের লোকনেশা। সহায়হরির এ নেশা ছিল। লোকযানের মধ্যে কেবল উল্লিখিত হয়েছে পাল্‌কি। ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার বর্ণনায় পাই তারই উল্লেখ—"বাড়ীর বাহির হইয়াই আমলকীতলায় বোহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন.......ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।"

এই শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই ক্ষেন্তির কাল হল, বছর ঘুরতে না ঘরতেই ঘটল তার মৃত্যু। এদিকে আবার এসে গেল পিঠে পার্বণের উৎসব। অন্নপূর্ণা যথারীতি পিঠে তৈরি করতে বসেছেন। হঠাৎ ক্ষেন্তির এক বোন পুঁটি হঠাৎ বলে উঠল, "মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।" ষাড়া ষষ্ঠী আসলে এক লোকদেবী। বনে জঙ্গলে নাকি তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁকে পিঠে উৎসর্গ করে পিঠে খাওয়ার কথা আমরা ও গল্পেই পাই।

গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশও। যেমন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়া, একঘরে করা, পিঁপড়ের টোপ, কলের পুতুল, জাতমারা প্রভৃতি। লোকউৎসবের উদাহরণ রূপে কেবল নবান্নের কথাই গল্পে আসেনি, এসেছে অরন্ধনের কথাও, এসেছে হরিপুরের রাসের মেলার প্রসঙ্গ, এসেছে চণ্ডীমণ্ডপের কথাও। চণ্ডীমণ্ডপে বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আগে চারচালা বা আটচালা চণ্ডীমণ্ডপ দেখা যেত, তৈরি হত মাটি দিয়ে। ওপরে থাকত খড়ের ছাউনি। এখন অবশ্য পাকা চণ্ডীমণ্ডপ দেখা যায় গ্রামেগঞ্জে। চণ্ডীমণ্ডপে কেবল বাৎসরিক পূজাই নয়, সেইসঙ্গে কীর্তন, কথকতার

আসর, মোড়ল বা গ্রামপ্রধানদের উপস্থিতিতে গ্রামের কোন একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা অথবা বিচার প্রভৃতিও চণ্ডীমণ্ডপে হয়ে থাকে, যেমন হয়েছিল 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির প্রথম বিবাহের সম্বন্ধ সব পাকা হয়ে গিয়েও তা ভেঙে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। চণ্ডীমণ্ডপের কালীময় ঠাকুর বেশ কড়া গলাতেই সহায়হরিকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, "....পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্য শুনি? ও তো একরকম উচ্ছগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা,.......সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল।"

এই হল সেকালের গ্রাম্যসমাজ। ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণার কথোপকথনেও উঠে এসেছে মেয়েলি গ্রাম্যভাষার ধাঁচ। যেমন—দেখ রঙ্গ কোর না বলছি, একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, অত নোলা কিসের প্রভৃতি। এভাবেই নানা অনুষঙ্গে 'পুঁইমাচা' গল্পে বাংলার লোকায়ত জীবনের পরিচয় মেলে, লোকজ উপাদানের সমাবেশে গল্পের ঘটনাপট চরিত্র প্রভৃতিও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অতঃপর সমাজচিত্রের প্রসঙ্গ। সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। কবি সাহিত্যিক বা লেখক যেহেতু সমাজেরই সৃষ্টি সেহেতু সমাজজীবনের প্রতিফলন তাঁদের লেখায় পড়তে বাধ্য। সমাজচেতনার দ্বারা লেখকরা কমবেশি প্রভাবিত হন বা হয়ে থাকেন। আমাদের আলোচ্য গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গল্পের মূল কাহিনীটি পল্লবিত হয়েছে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা হল পণপ্রথা। পণপ্রথা দুষ্ট ক্ষতের মতো আজও আমাদের সমাজদেহে বিদ্যমান। ক্ষেন্তির বিবাহেও তার পিতা সহায়হরিকে পণ দিতে হয়েছিল এবং আড়াইশ টাকার মতো বাকি থাকায় ক্ষেন্তিকে তার পিতৃগৃহে পাঠাতে চাইতেন না তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, বলতেন "ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও"। শেষে মেয়ের নামে তারা নিন্দা ওঠাল। ক্ষেন্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেও কোন সংবাদ তারা দেননি। শেষে ক্ষেন্তির গা থেকে গহনা খুলে নিয়ে তাদেরই দুসম্পর্কিয় এক আত্মীয়ার গৃহে এনে ক্ষেন্তিকে তারা তুলে দিয়ে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের মতো এগল্পেও সমাজবাস্তবতার পটে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে পণপ্রথার বিষময় ফল।

গল্পে এসেছে 'একঘরে করার' প্রসঙ্গ। 'একঘরে করা' অর্থে বোঝায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, কোনভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা। আগেকার দিনে কোন ব্যক্তি সমাজে গুরুতর অপরাধে অপরাধী বিবেচিত হলে গ্রামের পাঁচজনে মিলে সভা করে তাকে 'একঘরে' করতেন। কোনরকম সামাজিক কার্যে তিনি নিমন্ত্রিত হতেন না, তার হাতের ছোঁয়া জল কেউ খেতেন না। তেমনই নাকি গুরুতর অপরাধ করে বসেছিলেন ক্ষেন্তির পিতা সহায়হরি। তাঁর অপরাধ, কথাবার্তা হয়েও শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট পাত্রে তিনি মেয়ের বিয়ে দেননি। সম্বন্ধটি ঠিক করে দিয়েছিলেন কালীময় ঠাকুর। আসল ঘটনাটি হল এই—পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে যাওয়ার দিনকতক পর সহায়হরি সংবাদ পান তার চরিত্র ভালো নয়। কোন এক কুম্ভকার বধূর সঙ্গে সে এমনকিছু আচরণ করে যে বধূটির আত্মীয়স্বজন কর্তৃক প্রহৃত হয়ে পাত্রটি কিছুকাল শয্যাগত ছিল। অতএব এমন চরিত্রহীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন সহায়হরি, আর তাতেই যত রাগ চাপে

কালীময় ঠাকুরের। চণ্ডীমণ্ডপে বসে তিনি সহায়হরিকে স্পষ্টই জানিয়েদেন, "ও তো একরকম উচ্ছগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো?......সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না।" স্ত্রী অন্নপূর্ণা আগেই সহায়হরিকে এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, "একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে।" এই ছিল সমাজ-বিধান। প্রসঙ্গত বলি, 'সাতপাকের বিয়ে' এটি একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। হিন্দুধর্মের নিয়মানুযায়ী বিয়ের সময়ে বর ও বধূতে একসঙ্গে সপ্তপদ গমন করতে হয়। এক বলে সপ্তপদী। এর ফলে বিবাহবন্ধন দৃঢ় হয় বলে ধর্মীয় সংস্কার। কালীময় ঠাকুরের কথায় সেই সামাজিক রীতিটির প্রতিই ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন গ্রামপ্রধানদের বাস্তব চেহারাও।

অন্যদিকে সহায়হরি, অন্নপূর্ণা এবং বাকি সব চরিত্রগুলিও গ্রামজীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। মেয়ের বিয়ের জন্য অন্নপূর্ণার দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে তাবৎ গ্রাম্যজননীর দুশ্চিন্তা। তুলনায় বরং সহায়হরির চরিত্রটি একটু বেমানান। মেয়ের মতো তিনিও পাড়া ঘুরে ঘুরে বেড়ান। অন্নপূর্ণার মতো মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি মোটেই ততটা ভাবিত নন। অন্যদিকে ক্ষেন্তির চরিত্রে রূপ পেয়েছে গ্রামবাংলারই এক অতি সাধারণ সহজস্বভাবের মেয়ে, যার চলতে ফিরতে কোথাও যেন এতটুকু বাধে না। ভোজনপ্রিয়তা ও সারল্য তাকে আমাদের অতি কাছে নিয়ে আসে।

গল্পে এসেছে পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, হরিপুরের রাস প্রভৃতি নানা লোকউৎসব লোকাচারের কথা, এসেছে চণ্ডীমণ্ডপ, নানা লোকখাদ্য, লোকপাণীয়, লোকনেশা, লোকযন্ত্র, ট্যাবু প্রভৃতির প্রসঙ্গ। এসবের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার লোকায়ত সমাজের প্রতিচ্ছবিই যে ফুটে উঠেছে তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার গল্পটিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। প্রখ্যাত সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর 'বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "বিভূতিভূষণের বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টি বৃহৎ পটভূমিকায় নানা বর্ণাঢ্য ঘটনা ও জটিল চরিত্রের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-পতিক্রিয়ার সমাবেশে যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পরিসরে নিতান্ত সহজ সরল ঘটনা ও তুচ্ছ শাদামাটা মানুষের রূপায়ণে তাঁর বাস্তবতাবোধ সাফল্যের শিখর স্পর্শ করে। আর সেই সাফল্যের স্তরে......তাঁর গল্পগুলি নিছক বাস্তবনিষ্ঠ বলে প্রতিভাত হয় না, তারা মানুষের তুচ্ছ লৌকিক সুখ দুঃখের অলৌকিক রসনিবিড় ছবি হয়ে যায়।......গ্রামবাংলার এইসব তুচ্ছ অবহেলিত মানুষের কাহিনি বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে বারবার ভেসে উঠেছে এদের জীবনের ব্যর্থতা-বেদনা ও বঞ্চনার ছবি। সে ছবি বহুবর্ণ না হতে পারে কিন্তু লেখকের বর্ণবিরল তুলির অনায়াস টানে......তা নিঃসন্দেহে জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'মৌরীফুল' গল্পের সুশীলা, 'ডাকগাড়ি' গল্পের রাধা, 'বিপদ' গল্পের হাজু প্রমুখের নাম করেছেন, নাম করেছেন 'পুঁইমাচা' গল্পের ক্ষেন্তিরও।

ক্ষেন্তি 'পুঁইমাচা' গল্পের মুখ্য চরিত্র। গ্রাম্যপ্রকৃতির সহজ সরল উন্মুক্ত পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে। প্রকৃতির কোলেই তার স্বাভাবিক বিকাশ। প্রকৃতি থেকে যেন কোনভাবেই

তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সে বেড়ায়। বয়স চোদ্দ পনের। তার আরো দুটি ছোট বোন আছে—পুঁটি ও রাধী। গল্পে আমরা ক্ষেন্তিকে প্রথম পাই এক বোঝা পুঁইশাক হাতে। পুঁইশাকের তরকারী খেতে সে খুব ভালবাসে। তাদের সংসার নিম্ন মধ্যবিত্ত। ক্ষেন্তির পোশাক পরিচ্ছদে তাই দারিদ্র্যের ছাপ। যে সেফটিপিনটি দিয়ে তার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একত্রে বাঁধা তার বয়স খুঁজতে গেলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়ে পড়তে হয়। তবে তার চেহারাটি গোলগাল, মাথার চুলগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও অগোছালো। দৈর্ঘ্যে ক্ষেন্তি বেশ লম্বা। কিন্তু এহো বাহ্য। তার চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রয়েছে তার ভোজনপ্রিয়তা ও স্বভাবসুলভ সরলতায়। সে কেবল খায়ই না, সময় সময় মায়ের হাতে হাতে জোগাড়ও দেয় অনেক। পৌষপার্বণের দিন পিঠে হবে বলে সে নারকেল কুরতে বসেছিল। তার ভোজনপ্রিয়তায় অন্নপূর্ণা যতই বিরক্ত হন না কেন, অন্নপূর্ণার প্রশংসা লাভেও ক্ষেন্তি বঞ্চিত নয়। কারণ ক্ষেন্তির সব থেকে বড় গুণ হল সে সাত চড়ে রা কাড়ে না। উঁচু গলায় কখনো কথা বলে না। তাই অন্নপূর্ণাকে বলতে শোনা গেছে, "ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই।" শুধু কি তাই, ক্ষেন্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করে সমালোচক লিখেছেন, "একাধিক ক্ষেত্রে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েও তার সভয় সত্যভাষণ, যে পুঁইশাক চিংড়ি মাছ দিয়ে খাওয়ার লোভ সেই পুঁইচারা রোপণ ও তাকে খেলার ছলেই বড় করার গোপন-মধুর বাসনা, পৌষসংক্রান্তিতে দারিদ্র্যের সংসারে পিঠে খাওয়ার অদম্য আবেগ এবং স্বাদগ্রহণের কৌতূহল—এসব আমাদের ক্ষেন্তিকে অনেক কাছের করে তোলে।" কিন্তু আমাদের অতি কাছের এই ক্ষেন্তিই একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যায় দূরে বহুদূরে। মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে। তখন তারই হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি বেড়ে উঠছে গাছটির আপন স্বভাবে, জীবন যৌবনে পূর্ণ হয়ে, বুঝিবা তা ক্ষেন্তির 'জীবনতৃষ্ণার'ই রূপক হয়ে।

ক্ষেন্তির পরই চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করতে হয় অন্নপূর্ণার কথা। নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূ তিনি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অপমানের জ্বালা তাঁর নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি সব থেকে বেশি বীতশ্রদ্ধ স্বামী সহায়হরির ঔদাসীন্যে। মেয়ে ক্ষেন্তির বিয়ে একবার ঠিক হয়ে ভেঙে গেলেও তাঁর হুঁশ নেই, হুঁশ নেই গ্রামের পাঁচজনের কথায়। সেই রাগই তাঁর গিয়ে পড়ে স্বামী এবং ভোজনরসিক মেয়ে ক্ষেন্তির ওপর। কিন্তু সেসব তাঁর মনের কথা নয়, সংসারের শতজ্বালায় জর্জরিতা অন্নপূর্ণার মানসিক আক্ষেপেরই ফল সেসব। সন্তানের প্রতি মমত্ব ভালবাসা তাঁরও রয়েছে বৈকি! তাই ক্ষেন্তির বয়ে আনা পুঁইডাটাগুলি তিনি ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেও পরে আবার সেগুলি উঠান থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে তরকারী রেঁধে দিয়েছেন সস্নেহে, পৌষপার্বণে পিঠে রাঁধতে বসেছেন সকলে খেতে ভালবাসে বলে, শতমুখে ক্ষেন্তির ঠান্ডা স্বভাবের প্রশংসাও করেছেন, বলেছেন, "বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই।"

ক্ষেন্তি তার এই স্বভাব বোধকরি তার পিতা সহায়হরির কছে থেকেই পেয়ে থাকবে। সহায়হরিও সংসারকর্মে উদাসীন এবং খাওয়ার প্রতি লোভ তাঁরও রয়েছে। প্রখ্যাত গল্পকার ও সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "তার সাংসারিক দারিদ্র্য তাকে জ্বালা ধরায় না,

ক্ষোভে ভেঙে দেয় না, বরং সেও মেয়ের মতো প্রকৃতির বুকে সাংসারিক সমস্তরকম সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতি থেকে মুক্তির স্বাদ নেয়। তার মধ্যে কন্যার প্রতি স্নেহ যেমন প্রবল তেমনি কন্যার অপাত্রে বিবাহদানের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতার দিকও স্পষ্ট।"

কালীময় ঠাকুরের চরিত্রে স্পষ্ট সেকালের গ্রামপ্রধানদের চরিত্রটি। সহায়হরি যে 'উচ্ছুগ্‌গু' করা মেয়েকে ঘরে রেখে দিয়েছেন এবং অন্যত্র আর কোন বিবাহের সম্বন্ধ করছেন না সেজন্য সহায়হরিকে তিনি বেশ কয়েককথা শুনিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে "সমাজে ব'সে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি ভেব না।" আগেই বলা হয়েছে যে সহায়হরির মেয়ে ক্ষেন্তির প্রথম বিয়ের সম্বন্ধটি কালীময় ঠাকুরই ঠিক করে দিয়েছিলেন। ছেলেটি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানত না। তবু যে তিনি ক্ষেন্তির সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন তাতে তার যুক্তি ছিল— "লেখাপড়া নাই বা জানলে?.......দিব্যি বাড়ি বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টী আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল। দুই ভায়ের অভাব কি?......"

কালীময় ঠাকুর, সহায়হরি, অন্নপূর্ণা, ক্ষেন্তি প্রমুখ প্রধান চরিত্র ছাড়াও গল্পে আরো কিছু গৌণ চরিত্রেরও উল্লেখ মেলে। যেমন ক্ষেন্তির দুই বোন পুঁটি ও রাধী, ক্ষেন্তির বর ও শাশুড়ি, কেষ্ট মুখুজ্জে, কুম্ভকার বধূ, মুখুজ্জে বাড়ির ছোটখুকী দুর্গা, গয়া পিসি, শ্রীমন্ত মজুমদার, জ্যাঠাইমা প্রভৃতি।

অতঃপর গল্পে প্রতিফলিত লেখকের প্রকৃতিভাবনার প্রসঙ্গ। বিভূতিভূষণের গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য. "বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি যে ব্যাপক ও বিশিষ্ট ভূমিকা পেয়েছে তাঁর গল্পসাহিত্যে প্রকৃতির সেই অনন্যতা নেই, সেখানে মুখ্য ভূমিকা মানুষের। কিন্তু তবু নানা ভাবে প্রকৃতি তাঁর গল্পে কিছুটা স্থান করে নিয়েছে ঠিকই।" এমনই একটি গল্প তাঁর আলোচ্য গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ক্ষেন্তি একেবারে প্রকৃতির আদলেই গড়া। প্রকৃতির মতোই উন্মুক্ত স্বাধীন এবং সহজ সরল তার স্বভাব। কখনো অনুগত আবার কখনো বা অবাধ্য। মৃত্যুর পর আবার তার প্রকৃতির মাঝেই ফিরে যাওয়া। আর তখন তার সমগ্র অবয়বের অস্তিত্বই যেন হয়ে ওঠে তার হাতে রোপণ করা পুঁইগাছটি, যা লাবণ্যকান্তিতে তখন ভরপুর। অদ্ভুত এ প্রতীকায়িত ব্যঞ্জনায় বুঝিবা লেখক বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন—ক্ষেন্তি আছে, মরেনি. সে তার আপন স্বভাব ও লাবণ্য নিয়েই বিশ্বচরাচরে বিদ্যমান। লেখক যেন তাকে পুঁইগাছের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাপক অর্থ তাৎপর্য দিয়েছেন। এখানেই বিভূতিভূষণের রোমান্টিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।" এছাড়াও সমগ্র গল্পে গাছ-লতাপাতায় ঘেরা গ্রাম্যপ্রকৃতির জীবন্ত চিত্রও উপহার দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। সব মিলিয়ে গল্পটি পাঠ করে কেন জানি না তারাশঙ্করের 'কবি'র মতই বলতে ইচ্ছা করে—

হায় জীবন এত ছোট কোনে।

পরিশেষে আরো কিছু কথা থেকে যায়। গল্পটির শ্রেণী বা গোত্র বিচার করলে একে সমাজসমস্যা মূলক গল্পই বলতে হয় সাধারণ ভাবে। প্রকৃতিচেতনার প্রতিফলনও গল্পে রয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজচেতনাই যেন গল্পটি লেখার সময়ে লেখককে তাড়িত করেছে বেশি। গল্পটির প্লটে কোন জটিলতা নেই, নেই কোন নূতনত্বত্ত, কিন্তু তাও যেন বর্ণনার

নিপুণতায় তা পাঠককে শেষপর্যন্ত আকর্ষণ করে। তবে এটিকে ঠিক ছোটগল্প বলে মনে হয়না কোন দিক থেকেই। প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেন ঠিকই ধরেছেন, 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের ছায়া এর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। গল্পটির গঠনকৌশলেও দৃঢ়পিণদ্ধ ভাব বিদ্যমান। ধীরে ধীরে আপন গতিতেই তা ক্রমে এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। চরিত্রগুলিও অত্যন্ত বাস্তব। গল্পের একেবারে শেষাংশে প্রকৃতিও যেন একটি চরিত্রে রূপান্তরিত, ক্ষেন্তির 'মৃত্যুহীন জীবনতৃষ্ণার' রূপকে রূপকায়িত। ভাষা ব্যবহারেও লেখকের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। অত্যন্ত সহজ সরল ও অনাড়ম্বরময় এ গল্পেব ভাষা চবিত্রগুলির মুখে মানানসই। গল্পটির রস শেষপর্যন্ত করুণ, তবে তা "মানবজীবনের প্রতি ভালবাসা ও সুগভীর মৃত্তিকা-তৃষ্ণার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত।" সর্বোপরি লেখকের মৃত্যুচেতনাও এখানে ছায়া ফেলেছে ক্ষেন্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে। তবে অন্যান্য রচনায় যেমন তিনি "মৃত্যুর বিষণ্ণধূসর পটভূমিতে অসহায় অথচ প্রগাঢ় জীবনপ্রীতির হৃদয়স্পর্শী চেতনাকেই পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন," এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর উক্ত গ্রন্থে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' সহ মৌরীফুল, ভণ্ডুলমামার বাড়ী প্রভৃতি সার্থক গল্পগুলির রসোত্তীর্ণতার মূলের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে মন্তব্য করেছেন তাঁর "গল্পের মানুষগুলি সকলে মিলে কোন সমষ্টিবদ্ধ সমাজ নয়, তারা দারিদ্র্য দুঃখ ও তুচ্ছতার আবরণে ঢাকা এমন কতকগুলি সত্তা, যাদের জীবন—জীবনেব গভীর সঞ্চারী এক পবিচয়ের ইশারা জানায়।.....তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পবিস্ফুট হয়েছে নরনারীর বাস্তব জীবন-সমস্যার সামাজিক পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই। এখানেই বিভূতিভূষণেব গল্পের শিল্পশরীরের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত রহস্য। তাঁর সার্থক গল্পগুলি জীবনের যে গূঢ় পরিচয় বা রসসৌন্দর্যের সংকেতই বহন করুক না কেন, তাদের বাস্তবতা যেন ঘটনায়, চরিত্রে, সংলাপ-পবিবেশে পাঠকের পুরোপুরি প্রত্যযসিদ্ধ," যেন লেখকের অভিজ্ঞতার জারকরসে জারিত সে গল্পগুলি। এখানেই বিভূতিভূষণেব অনন্যতা।

কিন্নরদল : এক নিষ্ঠুর অপচয়ের কাহিনী

মিঠু নাগ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এগারোটি গল্প সম্বলিত 'কিন্নরদল' গ্রন্থের শেষ গল্প কিন্নরদল। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' ব্যতীত এ গ্রন্থের সব গল্পই বিষাদান্তক। গল্পগুলির মধ্যে অবশ্য নাম-গল্পটিই বেশি মনোগ্রাহী। এর কাহিনীতে যে অসাধারণত্ব বিশেষ আছে—এমন নয়, কিন্তু গল্প বলায় আছে এক অমোঘ আকর্ষণ। বিভূতিভূষণের গল্পের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সামগ্রিকভাবে ছড়িয়ে থাকে যাতে পাঠক, রসসিক্ত হয়, আকণ্ঠ তৃপ্তি পায়।

গল্পটির কাহিনী অংশ সামান্যই। ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীপতি অব্রাহ্মণ শহুরে শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করে দশ-বারো বছর পরে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছে। গ্রামটিকে এক অজ-পাড়া-গাঁ বলা যায়। এখানকার মানুষ দরিদ্র এবং হয়ত বা এ কারণেই সঙ্কীর্ণ চিত্ত। অন্যের সমৃদ্ধিতে এরা ঈর্ষাকাতর হয়। অন্যকে প্রবঞ্চনা করে এরা সংসার চালায়। গল্পের সূচনাতেই রয়েছে—"পরস্পরকে ঠকিয়ে পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।" (বিভূতি রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩)। এভাবেই গ্রাম—গ্রামের মানুষের একটা ছবি লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। শ্রীপতির বিবাহের সংবাদে তাই স্বভাবতই অখুশি গ্রামের লোক। কারণ "পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলেছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দু'দিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না।' (ঐ পৃ. ৩০৩) শ্রীপতিদের পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন যে একসময়কার মস্ত বড় সংসারের এখন পাঁচ জন মাত্র সদস্য। শ্রীপতির পশ্চিমে চাকরি, শ্রীপতির মেজভাই কলকাতায় কলেজে পড়ে, ছোটভাই জন্মাবধি কালা ও বোবা, শ্রীপতির কাছে থেকে সে মূকবধির বিদ্যালয়ে পড়ে। এই পরিচয় পর্বের পরে গল্পের আর কোথাও পিসিমা বা শ্রীপতির ছোট ভাইয়ের উল্লেখ নেই। শ্রীপতির মেজভাই উমাপতির দেখা মেলে আর এক বার, যখন যে তার দাদা-বৌদির গ্রামে আসার আগে গ্রামের বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছিল। গ্রামের মহিলারা শ্রীপতির বিবাহ প্রসঙ্গে প্রথমে বউ এর বয়স, জাত বা বর্ণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা তথা নিন্দায় মুখর হয়, কিন্তু ক্রমশ এই নিন্দা প্রশংসায় পরিবর্তিত হয়। এর কারণ অবশ্য প্রথমত শ্রীপতির বউ-এর নম্র মধুর ব্যবহার, তার অসামান্য রূপ, গ্রামের সকলের প্রতি তার ভালোবাসা, মমতা। পরে অবশ্য গ্রামের লোকেরা জানতে পারে যে এ বউ গান গাইতে জানে, এস্রাজ বাজাতে জানে, অভিনয়েও সে বিশেষ দক্ষ। কিন্তু প্রথম পর্বে তাকে ভালো লাগার কারণ তো তার

আচরণ। তার 'কোন ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই।' (ঐ, ৩০৬)। এছাড়া শহুরে মেয়েটি যেদিন গ্রামের আর দশজন বউ-এর মতো একরাশ বাসন নিয়ে ডোবার ঘাটে এল, তখন দূরত্ব যেটুকু ছিল শিক্ষা, সচ্ছলতা ও রূপের কারণে, তাও দূরীভূত হল। তবু "দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেক্‌লো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণত: কালোকোলো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা-পরিহিতা মূর্তিই দেখা যায় বা দেখার আশা-করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদের খোঁপাবাঁধা, ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজ পরা, রূপকথার রাজকুম'রীর মত রূপসী, নবযৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ যায় না।" (ঐ, ৩০৬-৩০৭)। এছাড়াও সংসারের সব কাজ শ্রীপতির বউ নিজেই করত। পাড়াগাঁয়ের গরীব মেয়েদের প্রায়ই লুচি-হালুয়া খাওয়ানোও তার জনপ্রিয়তার একটা কারণ। সে ধার দিয়ে শোধকরার জন্য তাগাদা দেয় না। একাদশীর দিন দুপুরে পাশের বাড়ির বিধবা বয়স্কা চক্রবর্তী গৃহিণীর পায়ে সে তেল মালিশ করে দেয়। এছাড়াও তার এস্রাজের সুরে, গানে, গ্রামের মেয়েরা বৌদিদির ভক্ত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, গ্রামের মেয়ে বউদের অন্যভাবে আনন্দদানের কথাও সে ভাবে। পূজোর সময় গ্রামের পুরুষেরা যায় সত্রাজিৎপুরে যাত্রা দেখতে। তাই গ্রামের মেয়েদের জন্য সে কলকাতা থেকে তার নিজের এবং জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনদের গ্রামে আনিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করে। অভাবক্লিষ্ট নিরানন্দ গ্রামের মেয়েদের কাছে এই অনুষ্ঠান ছিল আশাতীত, স্বপ্নময়। "সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলেন শ্রীপতির বৌ কি ধরণেব মেয়ে।" কেবল তারা জানলেন না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকারের আর্টিষ্ট।" (ঐ, পৃ. ৩১২)। তারা জানতে পারে কলকাতাতে শ্যামবাজার অঞ্চলে এদের সকলে 'কিন্নরদল' নামেই চেনে। এরপর শ্রীপতির বউ-এর ভাই-বোনেরা ফিরে যায় কলকাতায়। গ্রামে আসতে থাকে কিন্নরদল ভাঙার সংবাদ, রমা-পিন্টুর মৃত্যুর খবর। প্রসবের জন্য শ্রীপতির বউও যায় কলকাতায়। গ্রামে আসে তারও মৃত্যু-সংবাদ। প্রসবের সময়েই তার মৃত্যু হয়। বৌদিদির একান্ত অনুগত শান্তি তার অসুখী দাম্পত্যের সুতো ছিন্ন করে ফিরে এসেছে গ্রামে, যদিও ততদিনে তার বৌদিদি চলে গেছে এ সংসার, এ গ্রাম, এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। তবু বৌদিদির স্মৃতি তো আছে। একদিন গ্রামের বাড়িতে শ্রীপতির কলের গানে বৌদিদির গান শুনে শান্তি বিস্তৃত হয বৌদিদির মৃত্যুর বাস্তবতা। "অল্পক্ষণেব জন্য শান্তির মনে হ'ল তার কুমারী জীবনের সুখেব দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে।" (ঐ, পৃ. ৩১৪)।

গল্পের নাম 'কিন্নরদল'। কিন্নর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'অশ্বের ন্যায় মুখ এবং মানুষের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দেবলোকের গায়ক জাতি'। শ্রীপতির বউ-এর জ্যাঠামশাই শ্রীপতির বউ ও তার ভাইবোনদের নামকরণ করেছিলেন 'কিন্নরদল', এরা সকলেই রূপে গুণে অসামান্য। "বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটিব মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি তত সুবিধের নয কিন্তু যেটিব বয়স আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্তমাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয যেন মোমের

পুতুল।" (ঐ, পৃ. ৩০৯)। এরা প্রত্যেকেই নাচে-গানে-অভিনয়ে পারদর্শী। অভিশপ্ত কিন্নরী শ্রীপতির বউ যেন শ্রীপতির গ্রামকে আলোকিত করার জন্যই এসেছিল গ্রামে। কাজ শেষ হলে সে ফিরে গেল দেবলোকে। শুধু সে নয়, রমা-পিন্টু সকলেই যেন শাপভ্রষ্ট কিন্নর-কিন্নরী। মহা-অষ্টমীতে মানুষ যখন দেবী দুর্গার কাছে বোধময়ী রূপে জাগ্রত হবার প্রার্থনা জানায়, তখন এই কিন্নরদল গ্রামের মানুষের মনে সেই বোধের জাগরণ ঘটাতে এসেছিল। এরপর একে একে এল মৃত্যুসংবাদ। রমার মৃত্যু সংবাদে শ্রীপতির বউ শান্তিকে বলেছিল তার আশঙ্কার কথা—"জানিস শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে....."(ঐ, পৃ. ৩১২)। এরপর শ্রীপতির বউ প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল, তার পরে পিন্টু মারা গেল বসন্ত রোগে। শ্রীপতির বউ-এর মৃত্যুতে দুঃখকাতর মন্টুর মা বলে—"সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে এসব মেয়ে জন্মায়।...শাপভ্রষ্ট কিন্নর-ই তো ছিল।....যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান......ওকি আর মানুষ, মা!" (ঐ, পৃ. ৩১৩)। ভেঙে গেল সত্যিই কিন্নরের দল। কিন্তু গ্রামের বাতাসে যে সুর এই কিন্নরী ছড়িয়ে দিয়েছে, তা কোনওদিন থেমে যাবে না, যে আলো সে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তা কখনও নির্বাপিত হবে না। গ্রামের মানুষের মনে বেঁচে থাকবে এই কিন্নরদল। আর তাই তো অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে সমস্ত গ্রাম অশ্রুবিসর্জন করেছে। যে গ্রাম শুধু পরনিন্দায়, পরচর্চায় সময়-অতিবাহিত করত, শ্রীপতির বউ-এর কিছুদিনের সাহচর্যে তারা সুরে, ভালোবাসায় পরস্পরকে আপন করতে শিখেছে। ভালোবাসতে শিখেছে বলেই কলের গানে বৌদিদির গলা শুনে শান্তি ভেবেছে যে বেঁচে আছে কিন্নরদল। কারণ কিন্নরদলের উপস্থিতিতো শুধু শরীরী নয়, এ উপস্থিতি গ্রামের মানুষের মনে, সুরে, গ্রামের আকাশে, বাতাসে। শ্রীপতির বউ-এর মীরার ভজন শুনে তাকে কারও কারও মীরা বলে যেমন মনে হয়েছে, তেমনই যেদিন শ্রীপতির বউ-এর গাওয়া হিন্দী গানের কথা, অর্থ বুঝতে পারেনি, সেদিনও সুরের মূর্চ্ছনায় তারা আকুল হয়েছিল। গল্পকার যেন সত্যিই শ্রীপতির বউ-কে কিন্নরী রূপেই উপস্থাপিত করেছেন। এই ধূলিমলিন মর্ত্যজগতের অধিবাসী যেন সে নয়, আর নয় বলেই সে এক অপার্থিব আলো ও সুরে গ্রামকে নতুন ভাবনায় জাগ্রত করে ফিরে গেল স্বস্থানে।

এ গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুটি—শ্রীপতির বউ ও শান্তি। আর রয়েছে শ্রীপতি। শ্রীপতিকে এ গল্পে তিনবার দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমবার সস্ত্রীক গ্রামের বাড়িতে আসা এবং পাড়ায় পিসিমা-বৌদিদের ডেকে নিজের স্ত্রীকে বরণ করতে বলার সময়। দ্বিতীয়বার দেখা যায়, সে যখন রমা পিন্টুদের পূজোর সময় গ্রামে নিয়ে আসে। এবং তৃতীয়বার দেখা যায় স্ত্রীর মৃত্যুর পর গ্রামের বাড়িতে তার কলের গান বাজানোর সময়। পশ্চিম থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পরেও কেন সে স্ত্রীকে একাকী গ্রামের বাড়ীতে রেখে যায়, তার কোনও কারণ গল্পে পাওয়া যায় না। এ গল্পের সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র প্রিয় মুখুজ্যের অবিবাহিতা কন্যা শান্তি। বয়স তার ষোল-সতেরো। লেখক গ্রামের ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—"সকলের অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে

তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না।....এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।" (ঐ, পৃ. ৩০৩)। এরই সাক্ষ্য পাওয়া যায় শান্তির কথায়, আচরণে। মেয়ে মজলিসে নিন্দাবাদের সময় মায়ের বয়সী অনুপস্থিত মন্টুর মা সম্পর্কে সে মন্তব্য করে—"ওঃ, সে কথা আর বোলোনা খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মন্টুর মা! ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখিচি, এমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!" (ঐ, পৃ. ৩০৪)। এজন্য তাকে অবশ্য কেউ শাসনও করে না। এরপর শ্রীপতির বিবাহ প্রসঙ্গ ও শ্রীপতির বউ-এর সমালোচনায় শান্তির উৎসাহ, হাসি তার গ্রাম্য অশিক্ষিত স্বভাবের পরিচয় বহন করে। লেখক খুব গভীর ভাবে গ্রাম চিনতেন। 'দুই বাড়ী' উপন্যাসেও দেখি—"এসব গ্রামের অশিক্ষিত কুরূপা মেয়েগুলা এমন অকালপক্ক যে বারো-তোরো বছরের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতৃব্য সমতুল্য প্রতিবেশীর সামনে দিয়া চলাফেরা করিতে বা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ করে।" (ঐ, পৃ. ১৭৫)। গ্রামের কিশোরীদের এই অকালপক্কতা এবং অভিভাবকদের শাসনহীনতার চেহারা লেখকের দেখা বলেই তিনি এত স্পষ্ট গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষের ছবি আঁকতে পেরেছেন। শ্রীপতির বউ গ্রামে আসার আগের এই শান্তি শ্রীপতির বউ-এর সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ নতুন শান্তিতে পরিণত হল। প্রথমে বৌদিদির রূপে সে মুগ্ধ, তারপর গানে, সুরে। বৌদিদির কাছেই শুরু হয় তার গান বাজনার শিক্ষা। এক অপার্থিব আনন্দময় জগতের সন্ধান পায় সে। পরিশীলিত হয় শান্তি। বৌদিদিকে ভালোবেসে সে নতুন করে ভালোবাসতে শেখে। এরপর বিয়ে হয় তার। শ্রীপতির বউ-এর মৃত্যুর সংবাদ যখন গ্রামে আসে, শান্তি সে সময় পতিগৃহে। "তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কার্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ জানে না। মুখে সে-সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্ ভ্যাজ্ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?" (ঐ, পৃ. ৩১৩)। মুখরা শান্তির এই গভীরতা শ্রীপতির বউ-এর সুরের দান, শিক্ষার দান, ভালোবাসার দান। শান্তি তার অচরিতার্থ জীবনের বেদনায় পূর্ণের স্বরূপ সন্ধান করেছে বৌদিদির গানে, সুরের মূর্চ্ছনায়। শান্তি চরিত্রের বিবর্তন এ গল্পের আকর্ষণীয় দিক। এই বিবর্তনের কারণেই চরিত্রটি জীবন্ত-বাস্তব। তুলনায় অন্তর্দ্বন্দ্বহীন শ্রীপতির বউ শুধুই ভালো হওয়ার কারণেই বোধ হয় ততটা সজীব নয়।

এ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে শ্রীপতির বউ। শ্রীপতির বউকে লেখক সর্বগুণযুক্ত করে অঙ্কন করেছেন। সুন্দরী শিক্ষিতা শহরের মেয়েটি গ্রামে এসে গ্রামের মানুষের মনে একপ্রকার আলো জ্বেলে দিয়েছে। ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ মানুষগুলিকে অন্য এক আনন্দের আস্বাদন করিয়েছে, অন্য এক জগতের সন্ধান দিয়েছে সে। সুরে সুরে ভরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রাণ, ভালোবাসায় ভরিয়েছে তাদের মন। তাইতো শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে কমলা শ্রীপতির বউ-এর গলা জড়িয়ে কেঁদে বলেছিল—"বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে।" (ঐ, পৃ. ৩০৯)। মা জন্ম দিয়েছে কমলাকে, কিন্তু বৌদিদির কাছে এসে তার চেতনার জগৎ উন্মোচিত হয়েছে,

এও তো একরকম নবজন্মদান। শ্রীপতির বউ-এর আপন পর জ্ঞান নেই। নির্দ্বিধায় সে বয়স্কা অসহায় প্রতিবেশিনীর সেবা করে। ভালোবেসে সে ধার দেয়, শোধ দেবার জন্য তাগাদা দেয় না। ভালোবেসেই সে শান্তি-কমলাদের প্রায়শই লুচি হালুয়া খাওয়ায়। তার আচরণেই মুগ্ধ গ্রামের মানুষ। গ্রামের মেয়েরা, বিশেষত, শান্তি-কমলা তার একান্ত অনুগত ভক্ত হয়ে পড়ে। তার আচরণের জন্যই গ্রামে আর তার 'বদ্দি বামুন' হওয়া নিয়ে আলোচনা হয় না। নিন্দুক গ্রামবাসিনীদের সে সংকীর্ণ ভাবনা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। ভাই-বোনদের নিয়ে মহা-অষ্টমীতে অভিনয় করে শুধু মুগ্ধই করে না গ্রামের মানুষকে, এ অভাবিত আনন্দেরও সন্ধান দেয় তাদের। যে গ্রামে শিক্ষা-সংস্কৃতি কিছু ছিল না, সেখানে সে সংস্কৃতির, শিল্পের ফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছে। তাই তো শান্তি অসুখী বিবাহিত জীবন ছেড়ে এসে বৌদিদির স্মৃতিতে প্রশান্তি খুঁজেছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার 'কিন্নরদল' অবলম্বনে 'আলো' নামে যে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন, তাতে শ্রীপতির-বউ-এর নাম দিয়েছেন অনুরাধা ওরফে আলো। আলো যথার্থ নাম। গ্রামে শিক্ষা সংস্কৃতি ভালোবাসার আলো জ্বালাতেই তো এসেছিল শ্রীপতির বউ। আলো জ্বালিয়ে দিয়েই তাই সে চলে গেল সকলের হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে। শেষ হল তার অভিশপ্ত মানবী জীবন—কিন্নরী ফিরে গেল দেবলোকে।

এবার একটু অন্যভাবে দেখা যাক। শ্রীপতির বউ রূপসী, শিল্পী, সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে শ্রীপতিকে। বিয়ে করে নিজের সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে শ্রীপতির গ্রামের বাড়িতে বাস করতে এসেছে। তার প্রধান গুণ সে ভালোবাসে, ভালোবাসে শ্রীপতিকে, শ্রীপতির গ্রামকে, গ্রামের মানুষদের,—পাশের বাড়ির বিধবা চক্রবর্তী গিন্নীকে, শান্তিকে, কমলাকে—সকলকে। মেয়েরা ভালোবাসবে—এই তো স্বাভাবিক। প্রশ্নহীন সমর্পণে ভালোবাসাই তো তাদের কাজ। তারা নীরব নম্রতায় আত্মসমর্পণ করে ঘর-সাজিয়ে রাখবে, লাবণ্যে ভরিয়ে তুলবে সংসার—এই তো সমাজের চাহিদা। লেখক শ্রীপতির বউকে দিয়ে সমাজ মনের এই চাহিদা পূরণ করেছেন। তাই শ্রীপতির বউ শুধুই শ্রীপতির বউ—তার কোনও নাম নেই। নাম মানুষের নিজস্বতা, অস্তিত্ব সচেতনতার পরিচায়ক হতে পারে বলেই বোধহয় শ্রীপতির বউ-এর নাম নেই। যেন এই সমর্পণের মধ্যেই তার যা কিছু গৌরব। লেখক পাঠককে জানিয়েছেন যে শ্রীপতির বউ একজন প্রতিভাশালিনী গায়িকা। "সে ভালোবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েচে-যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে।" (ঐ, পৃ. ৩১২)। আরো বিস্মিত হয় পাঠক, যখন জানতে পারে যে শ্রীপতি থাকে কলকাতায় কর্মোপলক্ষে, সপ্তাহান্তে গ্রামে আসে। তাহলে গ্রামের বাড়িতে শ্রীপতির বউ একাই থাকে। কেন থাকে? কোন্ মহত্ব প্রদর্শনের জন্য? পাশের বাড়ির গিন্নীর সেবা করবে বলে, নাকি কমলা-শান্তিদের সঙ্গ দেবে বলে? তার সমস্ত ভালোত্ব যেন শহরের জীবন, যশ, অর্থের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে ডোবায় বাসন মাজা, বয়স্কা প্রতিবেশিনীর পায়ে তেল মালিশ করে দেওয়ার মধ্যেই নিহিত। শ্রীপতির বউ-এর সঙ্গে তুলনীয় লেখকেরই অপর একটি গল্প 'সুলেখা'-র নীরজাসুন্দরী মিত্র। সুগায়িকা নীরজাসুন্দরী অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কনট্রাক্ট ফর্ম পেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি

হেসে তালের বড়া ভাজতে বসে। নীরজা পরম সুখে গ্রামের মানুষের কাছে নীরদা হয়ে চচ্চড়ি, মোচার ঘন্ট, বড়ির টক-এ নিজেকে উজাড় করে দেয়। শ্রীপতির বউ বা নীরজাকে বিভূতিভূষণ সুখী করেই এঁকেছেন। কিন্তু বানী বসুর 'গান্ধর্বী' উপন্যাসে অপালা সংগীত বিহীন বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি। তার কাছে জীবনের অর্থ ছিল ভৈঁরো থেকে ললিত, ললিত থেকে রামকেলী, রামকেলী থেকে পরজ, পরজ থেকে আলাহিয়া বিলাবল। পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি তথা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয় তাকেও। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে অপালা রেওয়াজের সুযোগই পেত না, অপরপক্ষে শ্রীপতির বউ তো শান্তি-কমলা বা গ্রামের সকলকেই গান অথবা এস্রাজের সুর শোনাবার সুযোগ পেত। নীরজা সুন্দরীও অনেক রাতে জয়জয়ন্তীর আলাপ করার সুযোগ পেত। কিন্তু এতে কি শিল্পীমন তৃপ্ত হতে পারে? এ তো এক নিষ্ঠুর অপচয়ের কাহিনী। নারীর শিল্পীসত্তা কি শুধু ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলার জন্য?

এই দেবলোকের শিল্পীকে যখন মর্ত্যলোকের নানা সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে বেঁধে ফেলে তার শিল্পীসত্তাকে গৌণ করা হয়, তখন শিল্পের ও শিল্পীর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। বিপুল অপচয় ঘটে যায় এক প্রকৃত শিল্পীর।

তথ্যনির্দেশ

১. কিন্নরদল—বিভূতি রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৫ম খণ্ড
২. দুই বাড়ী—বিভূতি রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্কবণ, ৫ম খণ্ড
৩. গান্ধর্বী—বাণী বসু
৫. বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস—রুশতী সেন

জন্ম ও মৃত্যু : এক সূত্রসন্ধান

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

'জন্ম ও মৃত্যু' নামক গল্পটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের আগে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ও ধারণার ভিত্তি-ভূমিটা একটু ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে তাঁর একটি চিঠি আমরা স্মরণ করতে পারি—'আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই। দৈনন্দিন ছোটো-খাটো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে—আসল জিনিসটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো-প্যাঁচ কসা, কৃত্রিম 'সিচুয়েশন' তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি-শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়।'

গল্পটিতে মূলত বলা হয়েছে শহরের সম্ভ্রান্ত বিত্তশীল ভদ্রলোক বিশ্বনাথবাবুর জীবনের একটি বিশেষ দিনের কথা এবং গ্রামের হতদরিদ্র এক বৃদ্ধা শশীঠাকরুণের জীবন বৃত্তান্ত। ঘটনাক্রমে দুজনের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে লেখক গিয়ে পড়েছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে পরিস্থিতিগত বৈপরীত্যের চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পটিতে। গল্পটির নাম 'জন্ম ও মৃত্যু'। নামকরণের মধ্যে দিয়েই লেখক গল্পের মূল সূত্রের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। গল্পটির শুরুতেই আমরা জানতে পারি ভবানীপুরের এক ধনী ভদ্রলোকের বাড়িতে লেখক গিয়েছিলেন মধুপুরে একটি বাড়ি ভাড়া পাওয়ার আশায়। কিন্তু সেই বিশেষ দিনটি ছিল ভদ্রলোকের জন্মদিন। সম্পদশালী ব্যাক্তিত্বের জন্মতিথি যে কতখানি আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হতে পারে তারই এক সজীব চিত্র পরিবেশিত হয়েছে গল্পের প্রারম্ভেই। ভদ্রলোকের ঘর আলো করে এলেন একে একে তাঁর পুত্র-কন্যা-জামাতা- পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রী, ভ্রাতুঃষ্পুত্র ভাতৃবধূ ইত্যাদি। 'ভদ্রলোক ভাগ্যবান, এঁদের মত লোকের সাহায্য না পেলে প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষা অবসম্ভব হয়ে উঠত।' বিশ্বনাথবাবুর সাত ছেলে, চার মেয়ে। এদের সকলেরই আবার ছেলেমেয়ে এবং অনেকেরই নাতি-নাতনী, নাতজামাতা ইত্যাদি হয়ে গিয়েছে। বিশ্বনাথবাবুরা আবার তিনভাই। তাদের প্রত্যেকের অবার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল-'বুড়োর হাতে হাজার পঞ্চাশ-ষাট টাকা অছে, সকলেরই চোখ সেদিকে একথা যদি বলি, তবে সেটা খুব খারাপ শোনাবে হয়ত। কিন্তু কথাটা মনে না উঠে কি পারে?'—এ প্রশ্নটা চিরকালীন এবং প্রতিটি মানুষের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সত্যি। 'পৃথিবী টাকার বশ'—এ আপ্তবাক্য যেমন মিথ্যে হবার নয়-তেমনই সত্যি হয় এই কথাটিও-'money is sweeter than honey'!

বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনের দু-সপ্তাহ পরে লেখক স্বগ্রামে ফিরলেন। বাড়ি গিয়ে শুনলেন গ্রামের বৃদ্ধা শশী ঠাকরুণ মারা গিয়েছেন। শশী ঠাকরুণেরও চার ছেলে ও তিনমেয়ে। কিন্তু বড় ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই বিদেশে চাকরি করে—বড়ছেলে তেমন লেখাপড়া না শেখার জন্য দেশে থেকে সামান্য কাজকর্ম করে, তার অবস্থাও তেমন ভালো নয়, অনেকগুলো

ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার যাপনই দুরূহ। ভায়েরা পৃথক, কেউ কাউকে সাহায্য করেনা। কর্মস্থান থেকে দেশেও কেউ আসে না।

অর্থের নিদারুণ অভাবে ক্লিষ্ট শশী ঠাকরুণের জীবন। জীর্ণ একটি চালা ঘরে ইদানীং তিনি পড়ে থাকেন, যেটুকু প্রয়োজন সাধ্যের মধ্যে বড় ছেলেই মেটাতো, তবে সে করায় আগ্রহের যথেষ্ট অভাবও লক্ষিত হত। সম্ভবত তার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠত যে, মা তার একার দায় নয়। অন্যেরা বিত্তশালী হয়েও যদি নিজের দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে, তবে সেই বা কেন এত অনটনের মধ্যে এ ভার একা বয়ে চলবে, প্রতিটি ছেলেমেয়েদেরই উচিত তাকে সাহায্য করা, দায় বণ্টন করে নেওয়া।

শশী ঠাকরুণের অন্য পুত্র-কন্যারা সকলেই অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের কেউই কখনও মায়ের সন্ধান নিত না। আবার অর্থ সাহায্যের কথা উঠলেই তারা নিজেদের খরচ বাঁচিয়ে অর্থ প্রেরণে যে অপারক, সেই অক্ষমতার কথাই জানাত বার বার।

নিদারুণ অনটন, তার পাশেই ছেলেমানুষের মত লোভ, সব মিলিয়ে বড় করুণ এক চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। সহায়সম্বলহীন বুড়ি শেষ পর্যন্ত থালা-বাটি বিক্রি করে নিজের সামান্য প্রয়োজন মেটানোর বৃথা চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত মধুর মরণ আসে জীবনের সব গ্লানি মুছে দিতে। মরণকালেও ধনী ছেলেরা আসেনা মায়ের অন্তিম প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু শশীঠাকরুণের খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হয়, শহুরে বিত্তশালী ছেলে-মেয়েরা এসে জড়ো হয় বৃদ্ধার গ্রাম্য ভিটেতে।

জন্মতিথি পালনের এক বর্ণাঢ্য বর্ণনা দিয়ে গল্পের শুরু, আর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এক আড়ম্বরপূর্ণ চিত্রে গল্পের সমাপ্তি। সাদৃশ্য এইটুকুই-অর্থের ও প্রতিপত্তির সীমাহীন বহিঃপ্রকাশ, যদিও ক্ষেত্র দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। কিন্তু লেখক নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে এবং জীবনের প্রতি এক অনাসক্ত দৃষ্টিতে এই সত্যকেই হয়ত তুলে ধরতে চেয়েছেন যে আমাদের এই মুখোশ আঁটা চেহারাটাই আজ মুখ হয়ে গেছে, ভনিতাটুকুই হয়ে গেছে ধ্রুব সত্য—তাই হৃদয়ের গভীরের কোন উপলব্ধি আজ আমাদের জীবনকে শাশ্বত কোনো সত্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেনা, শুধু বাহ্য আড়ম্বরটুকুই রয়ে যায় একমাত্র সত্য হয়ে। তাই ওই বৃদ্ধের জন্মতিথি তাঁর পুত্র-কন্যা অর বহু আত্মীয়-আত্মীয়ার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে কোন আনন্দ আর তৃপ্তির পরশ রেখে গেল, সে প্রশ্নের চেয়ে অনেক বড় যেমন হয়ে উঠল ওই আনন্দের বহিঃপ্রকাশটুকু, তেমনই বৃদ্ধার জীবদ্দশায় তাঁর প্রয়োজন মেটানো বা সেবা যত্নের পরিবর্তে দামী হয়ে উঠল তাঁর সন্তানের কাছে তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যায়বহুল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

দুই

জগৎ এবং জীবনকে দেখার এক বিশেষ ভঙ্গী বিভূতিভূষণের গল্পগুলির সম্পদ। বিভূতিভূষণ এখানে শুধু স্রষ্টা নন—জীবন রস রসিক। তাঁর অধিকাংশ গল্পই উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা। নিজেকে কাহিনীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেখে গল্পের প্লট পরিকল্পনা ও চরিত্র-চিত্রণ এক দুরূহ কর্ম। বলা বাহুল্য সে কর্মে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ।

জগৎ ও জীবনকে দেখার ভঙ্গী প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো শিল্পী মানব চরিত্রের অন্ধকার দিকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশে তার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ করেছেন-মানুষের

চরিত্রে নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, লোভ—এই নিয়েই ছবি এঁকেছেন মানব জীবনের। আবার কেউ বা মানুষের মহত্ব প্রতিষ্ঠায় অনন্যমনা। সর্বগুমের সমন্বয়ে মানুষ সেখানে দেবতার উর্ধ্বে। বিভূতিভূষণের গল্পে যে এই কোন পথটিই অভীপ্সিত নয়, তাঁর গল্পের চরিত্রের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সেই সত্যকে খানিকটা বোধহয় তুলে ধরতে পারব।

'জন্ম ও মৃত্যু'—গল্পের মূল চরিত্র প্রধানতঃ দুটি—একজন ভবানীপুর নিবাসী ধনশালী, সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথবাবু এবং ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে স্থাপন করেছেন গ্রাম্য হতশ্রী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক বৃদ্ধা—নাম শশী ঠাকরুণ। চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বিশ্বনাথবাবু এক অতিথিপরায়ণ ভদ্রলোক। মধুপুরে একটি বাড়ি ভাড়া পাওয়ার জন্য লেখক এমন দিনে ভদ্রলোকের কাছে যান যে দিনটি ছিল তাঁর জন্মতিথি। এমন দিনে লেখব অতিথি হয়ে এলে, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করে বলেন—'আসুন, আসুন বড় ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মতিথি কিনা, তাই বাড়িতে একটা উৎসব গোছের আছে। তা বেশ, এসেছেন যখন আপনাকেও ছাড়ছিনে ইত্যাদি।' তাঁর জন্মতিথিকে স্মরণীয় করে তুলতে যারা পুষ্পস্তবক নিয়ে উপস্থিত—তাদের প্রত্যেকে অত্যন্ত আন্তরিকতায় সমাদর করে কাছে ডেকে নিযেছেন।

এই আভিজাত্যেব চমক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি লেখক এনেছেন গ্রাম্য, অর্থহীন শ্রীহীন শশী ঠাকরুণকে—ঠিক যেমন আলোব পাশে থাকে অন্ধকার, আনন্দের পিছনে থাকে একরাশ যন্ত্রণা—ঠিক তেমনভাবেই। হতদরিদ্র বৃদ্ধা খেতে পায় না—কিন্তু ক্ষুধাব জ্বালা অহরহ বেদনা দেয়—তবু বিত্তহীন জ্যেষ্ঠপুত্রের ঘাড়ে নিজের প্রয়োজনের বোঝা তুলে দিতে চায় না বলেই ঘটি-বাটি যা পাব বিক্রি করে। বাঁধা দিয়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে। অসহায়ভাবে বলে 'সিধুর কাছে আব কত চাইব। সে নিজের ছেলেপিলে নিয়ে আতান্তবে পড়ে আছে। আহা বাছার আমার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায। আমি তার কাছে কিছু নিই নে।' হৃদয়ের যে অসীম মমতা ও বাৎসল্যকে লেখক মাত্র কয়েকটি বাক্যেই তুলে ধরেছেন তা কিন্তু অর্থের অনটনে নিঃশেষ হয়ে যায না। আর তা যে মাতৃহৃদয়ে ফল্গুধারার মত বয়ে চলে, শত অভাব আর যন্ত্রণায়ও এতটুকু মলিন হয়ে যাবার নয়, সেই প্রত্যয়ই ফিরে পাই বৃদ্ধার কথায়। লেখককে দেখে সে যখন বলে—'আমার দিন তো আর চলে না, হাতে মোটে পয়সা নেই। সিধু খুলনে গিয়েছে আজ চার-পাঁচ দিন। বাড়ি একেবারে অচল। ছেলেপিলেগুলো খেতে পায়না এমন অবস্থা!' এই অবস্থায় শশী ঠাকরুণ বিয়ের কাঁসার দানের বাটিটা বিক্রয় করে ছেলেব সংসারের একটু সুবাহা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু জীবনের এই তীব্র ব্যঙ্গ লেখকের বর্ণনার গুণে হয়ত তীক্ষ্ণতা হারায়, কিন্তু তার আবেদন এতটুকু কমে যায় না। শশী ঠাকরুণ মৃত্যুশয্যায় পুত্রবধূকে ডেকে বলে—'বৌমা লেপটা সরিয়ে নাও, চার পাঁচ টাকা দামের লেপটা—আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা কোথায় পাবে সিধু যে আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ করে লেপ বানাবে? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হলে।'

হয়তো তুলনা সঠিক হবে না, তবু শশী ঠাকরুণের কথা বলতে গেলেই অনিবার্য ভাবে

দুটি চরিত্রের কথা আমাদের মনে পড়ে যাবেই—'আহ্বান' গল্পের সেই আতুর মসলমান বুড়ি এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' এর অন্তর্গত বৃদ্ধা ইন্দিরা ঠাকরুণ। প্রথম গল্পে গ্রাম্য এই বুড়ি সকলের কাছেই বঞ্চিত, নিজের ছেলেদের কাছে তো বটেই। লেখককে দেখলেই সে সম্ভাষণ করত 'অ মোর গোপাল' বলে। জীবনে সে কিছুই পায়নি, কিন্তু লেখককে সন্তানের অধিক স্নেহে স্মরণ করেছে, লেখক মৃত্যুর পর তার কাফনের কাপড়টুকুর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

ইন্দির ঠাকরুণ অবশ্য শশীর মত নয়, তার চাহিদা ছিল। কথায় আছে, 'অল্প শোকে কাতর, বৃহৎ শোকে পাথর।' দীর্ঘ জীবন কিছু না পেয়ে পেয়ে তাব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা বেড়ে যায়। তেমন কিছুই নয় অবশ্য, বিভূতিভূষণের গল্পের পাত্র-পাত্রীরা বাড়ি-গাড়ি কিছুই চায়না, তারা চায় একটু চালভাজা কিংবা নোনা ফল, বড়োজোর একটা সুতী কাপড় এবং তা পেলে যে কত খুশী হয় তার প্রমাণ তার কথয় 'দিব্যি, কেমন ওম্—মোটাসোটা দিব্যি কাপড়—তা দাদা বেঁচে থাকো—কানাই বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় প্রমাই হোক—কাঙ্গাল গরিবকে কেউ দেয় না। তার আরো বাসনা থাকে, এ কাপড় যে মরার সময় দুর্গাকে দিয়ে যাবে—'নূতন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ীর কাছে ভারী উপাদেয়, ভারী শৌখিন বলিয়া মনে হয়।'

এ গল্পে উল্লেখযোগ্য চরিত্র এ দুটিই, সুতরাং অন্য চরিত্রগুলিকে কেবল সহায়ক চরিত্র বলা হয়।

তিন

বিভূতিভূষণের শিল্পসৃষ্টির দেহরূপ আশ্চর্যভাবে আধুনিক। লেখক কোথাও গল্প গড়ে তোলার সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান না; কিন্তু একান্ত নিস্তরঙ্গভঙ্গীতে যেন প্রাত্যহিক জীবনস্রোত বয়ে চলে নিজস্ব পরিচিত খাতে। প্রবৃত্তির অসংযত তাড়না, কিংবা ঘটনার প্রবল, বিক্ষুব্ধ প্লাবন সেখানে অনুপস্থিত যেমন, তেমনই খুঁজে পাওয়া যায় না নাটকীয় চমকও, অথচ এক শাশ্বত আবেদনে এবং গভীরতম সত্যের অকপট উন্মোচনের দাবীতে সেই সামান্যের মালাখানিও অসামান্য হয়ে ওঠে পাঠকের উপলব্ধিতে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যেহেতু উপন্যাসের বিস্তৃতি এবং বহুকথনের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় অনুপস্থিত, তাই যে নিটোল ভাব precise economy-ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন লেখকের ক্ষেত্রে বোধহয় তার অভাব আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর ভঙ্গী যেন একটু এলোমেলো নিতান্ত ঘরোয়া—organic প্লট নেই, একটিমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি অমোঘ অগ্রগতি নেই, চরিত্রসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস নেই—রয়েছে শুধু পাঠকের বুকের কাছে লেখকের ঘনিষ্ঠ, সহৃদয় উপস্থিতি, সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সুনিবিড় ভালোবাসা, আছে সাহিত্যের সংকীর্ণ গঠনপ্রণালীর বাইরে মানবিকতার পূর্ণ অধিষ্ঠান। যা তাঁর রচনাকে কালোত্তীর্ণ করে শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা প্রদান করে।

এই গল্পে আমরা দেখি ভাষার আশ্চর্য এক সারল্য। ভাষা প্রয়োগের একটু 'শৌখিন মজদুরি' তেই যে গল্প একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক গল্পে রূপান্তিত হতে পারত, সে গল্প অতি সহজ সরল এক গ্রাম্য গল্পের চেহারা পেয়েছে কেবল ভাষার আশ্চার্য সারল্য ও দক্ষতায়।

যে গল্প সত্যিই এক বড় মাপের জীবন দর্শন তুলে ধরেছে—মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় করে তার অভিজাত্য এবং চিত্তসম্পদ; মানুষ এই সম্পর্ক যখন দেখাতে চায় তখন আসলে সে নিজের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতা কোনো ভাবেই তুলে ধরেনা, সে কেবল করতে চায় আত্মমহিমা প্রচার। এই নিগূঢ় হৃদয় সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য গল্পের একটা মননদীপ্ত এবং চমৎকৃত সূচনা ভাবা যেতে পারত। আমেরিকান লেখক এডগার অ্যালান পো থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকেই বলেছেন, গল্পের সূচনা বাক্যটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠক একেবারে নিবিড় আকর্ষণে তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন, সে গল্প না পাঠ করে তা কোনো উপায় থাকবে না। আমরা বিশ্বাস করি সে সুযোগ এই গল্পে ছিল, অথচ বিভূতিভূষণ কী ভাবে গল্পটি শুরু করেছেন দেখা যাক—

'জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে সেগুলোর মূল্য বড় কম নয়।'

লক্ষ করবার মত শব্দ হল—'চমৎকার', 'ভেবে দেখবার' এবং 'উপভোগ করবার।' সে গল্প পড়ে আমাদের প্রাণমন বিষিয়ে ওঠে সে গল্পকে বিভূতিভূষণ বলেছেন 'চমৎকাব'। জীবনকে কত নিরাসক্ত এবং নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে এমন ঘটনাকে চমৎকার বলা যায়, সাহিত্যের যেন কোনো সমঝদার পাঠকই তা বুঝবেন। গল্পটিতে 'ভেবে দেখবার' উপকরণ যে অনেক আছে, সে কথা তিনি যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, তার প্রমাণ এই কথা দুটি অর্থাৎ ভেবে দেখবাব অনেক উপকরণ এখানে আছে। তৃতীয় যে কথাটি 'উপভোগ করবার' সেটি আমাদের আমাদের সূচনা অংশকেই প্রমাণ করে—আমরা বলেছি তিনি আস্বাদনপন্থী, বিশ্লেষণ পন্থী নন। জীবনের গরল তিনি পান করেছেন, কিন্তু অমৃত আস্বাদন করতে দিয়েছেন আমাদেব।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৪-১৯৮৭)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের প্রায় বেশিরভাগ সময়ই বাংলার বাইরে কেটেছে। পড়াশুনা বিহারের দ্বারভাঙা পীতাম্বরী' বিদ্যালয়ে। কিন্তু তবুও তিনি বাঙালি জীবনের সামাজিক পরিবেশ পরিমণ্ডল অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। প্রবাসী হিসেবে বিহারে থাকার জন্য সেখানকার মানুষের কথাই তিনি তার সাহিত্যে বেশি ক'রে তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প-সংকলন 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। তাঁর রচিত গল্প গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশেরও বেশি। তবে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলি হল,—'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৯৩৭), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ', (১৯৩৮), 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (১৯৪০), এবং 'রাণুর কথামালা' (১৯৪১), 'অতঃকিম' (১৯৪৩), 'কলিকাতা নোয়াখালি বিহার' (১৯৪৭), 'কথাচিত্র' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণের রচনা একান্তভাবেই 'হিউমার' তথা বিশুদ্ধ হাস্যরস-প্রধান, এই রস সৃষ্টিতে কোন অসহিষ্ণুতা নেই, বিদ্বেষভাব নেই, আছে সহানুভূতি, অশ্রুসজল হাসি। তবে একথা বলা যায় যে, বিভূতিবাবুর রচনা বৈশিষ্ট্য একান্তভাবে তাঁর নিজের এবং ব্যক্তিগত সৃষ্টি, এমনকী বাংলা সাহিত্যে তার সেরকম কোন উত্তরসূরী নেই।

গল্প ছাড়াও তিনি বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪২), 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' (৩য় খণ্ড), 'নবসন্ন্যাস', 'প্রিয়ংবদা' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্রধারার রূপকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কুইন অ্যান : দৃষ্টির প্রতিসরণ

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৪৭)-এর রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (ভাদ্র, ১৩৪৫)-এর অন্তর্গত 'কুইন অ্যান' গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি মাদি ঘোড়া। পশুচরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কম গল্প লেখা হয়নি। প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে হাল আমলের আনসারউদ্দিনের 'একটি ষাঁড়ের কাহিনী'—সবই কোন মনুষ্যেতর পশুকে প্রায় 'চরিত্র' করে গড়ে তোলা। চরিত্র হয়ে ওঠা মানে আচরণে মানুষের ছায়া পড়ে ঐ মনুষ্যেতর প্রাণীটির উপর। হয়ত সেই পশু বা প্রাণীটির আচরণ স্বাভাবিকই; কিন্তু মানুষের চেতনায় সেই আচরণের সঙ্গে সচেতন মানবীমনের সংশ্লেষ ঘটে যাচ্ছে দ্রষ্টার, মনস্তাত্ত্বিক কারণে—এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয়। গল্পকার সম্পূর্ণ শিল্পপ্রয়োজনেও মানব মনের আপতন ঘটাতে পারেন কোন পশু বা প্রাণীচরিত্রে। আসলে তখন তারা জাতে যে পশুই হোক, তালে সবাই মানুষ।[১]

লেখালেখির ক্ষেত্রে এ খুব একটা নতুন কোন টেকনিকও নয়। মানুষের সঙ্গে কতিপয় পশু-প্রাণীর সখ্য অতি পুরনো। সেই সখ্যের প্রত্ন চিহ্ন রয়ে গেছে পঞ্চতন্ত্র বা ঈশপস ফেবলস্-এর গল্পে। সিংহ যে অভিজাত আর শিয়াল ধূর্ত, তা শিশুকাল থেকেই আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। তবে যুগে যুগে যেটা বদলেছে, তা হল পশু বা প্রাণীচরিত্রগুলির পরিকল্পনার তাৎপর্য। মুকুন্দ চক্রবর্তী যে তাৎপর্যে পশু-প্রাণী চরিত্রের মুখে অত্যাচারিত মানুষের সংলাপ যোজনা করেন, এ কালের কোন কবি সে উদ্দেশ্যে পশুচরিত্র অঙ্কিত করেননা নিশ্চয়ই। তাৎপর্য যাই হোক, এটা অস্বীকার করা চলেনা যে পশু বা প্রাণীচরিত্রের উপস্থাপনায় গল্প অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং পশু বা প্রাণী চরিত্রের জবানিতে মানুষের সমালোচনা উপস্থাপিত হলে তার তির্যক ভঙ্গি অনেক বেশি অব্যর্থলক্ষ্য হতেও পারে। একালের গল্পকারেরা নিশ্চয়ই মানবচরিত্র সংশোধনে বসবেন না, কিন্তু মানুষ নামক দ্বি-পদী প্রাণীটিকে ভেংচি কাটার সুযোগ কোন কালই হারাতে চাইবে না। পশু চরিত্রটিকে নির্বাক রেখেও শুধু তার আচরণের নতুনতর ব্যাখ্যা মানব মনের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে ব্যাপক ওলট-পালট ঘটাতে পারে। বস্তুতই, পশু চরিত্রের আচরণ মানুষচরিত্রের দৃষ্টিতে প্রতিসৃত হয়ে সমূহ মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে দৃষ্টির প্রতিফলন না-বলে প্রতিসরণ বলাই যুক্তিযুক্ত। দর্পণে ভেংচি কাটলে দর্পণ সঙ্গে সঙ্গেই তা ফিরিয়ে দেয় নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং সমান মাপে। কারণ দর্পণ জড়পদার্থ। দর্পণের কোন অতিরিক্ত মূল্যায়ন ঐ প্রতিফলনে যুক্ত হয়ে থাকে না। কিন্তু কোন পশু বা প্রাণীর আচরণে মানুষেরই ধর্ম আরোপিত হলে, দ্রষ্টার দৃষ্টি বিভ্রমে হলেও, একরকম মূল্য যুক্ত হয়ে পড়ে। মূল্যায়ন সহ ঐ আচরণ প্রতিফলনের মতো নৈর্ব্যক্তিক এবং সমান মাপের নয়, বরং তা কিঞ্চিত তির্যক, শ্লেষের দিকে হেলে পড়া। এজন্যই বলছিলাম পশু-প্রাণী চরিত্রের উপস্থাপনায় গল্পের জীবন সমালোচনায় ঘটতে পারে দৃষ্টির 'প্রতিসরণ'। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে মনুষ্যেতর পশু চরিত্র পরিকল্পনায় এই প্রতিসরণ ঘটতে দেখি কুইন অ্যান এবং রংলাল

গল্পে। 'রংলাল' (রাণুর তৃতীয় ভাগ) গল্পের দৃষ্টান্তটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রংলাল নামের একটি কুকুর প্রতিপদে যেন তিরস্কার করে সাহেবসাজা এক বাঙালি বাবুকে। ঐ গল্পের কথক-বাবুটি নিজেও জানে তার ঐ সাহেবিয়ানা ঐ পরিবেশে বড় বেমানান। তার মনে হয় কুকুরটা যেন সেই অসঙ্গতির জন্য তাকে নিয়ত বিদ্রূপ করে চলেছে অথচ কোন মানুষ-চরিত্র সে প্রশ্নে নির্বিকার। কথকের মনে হয়, 'হোক কুকুর কিন্তু ভাবটা এতই মানুষের অনুরূপ যে ...মনে হল... যেন হ্যাট-কোট ধারী কালাসাহেব আমি সকলের দৃষ্টি হারাইয়া শেষ পর্যন্ত এক মহাবিচক্ষণ সমালোচকের হাতে পড়িয়া গিয়াছি।... যদি কথা কহিয়া বলিত, এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না।' এখানে কথকের আত্ম-সমালোচনা কুকুরের প্রতিক্রিয়া বা আচরণে প্রতিসৃত হয়ে কথকের কাছে ফিরে আসছে কিঞ্চিত মূল্যায়ন সহ। আর তাতেই লেখকের কাঙ্ক্ষিত তির্যকতা অনেক বেশি ধারালো হয়ে উঠতে পারছে।

'কুইন অ্যান' গল্পে আছে ঘুড়ী কুইন অ্যানের স্বেচ্ছাচারের মধ্যে দিয়ে রায়বাহাদুরের সমালোচনা। রংলালের কথক উত্তমপুরুষ, ফলে তা আত্মসমালোচনা কিন্তু 'কুইন অ্যান' -এর রায়বাহাদুর ননীগোপাল চক্রবর্তীর সমালোচনা উপস্থাপিত হয় প্রথম পুরুষ কথনরীতিতে। ফলে, এ গল্প রায়বাহাদুরের গল্পই হয়ে ওঠে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যও মনে করেছেন, 'এ গল্পে অশ্বিনী 'কুইন অ্যান' রসসৃষ্টির উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে রায়সাহেব অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটই এর লক্ষ্য।'[২] এ গল্প রায়বাহাদুরের গল্প। তার ছদ্ম বাহাদুরি প্রতি মুহূর্তে প্রতিহত হয়েছে কুইন অ্যানের প্রতিবাদী আচরণে। স্তাবকপার্ষদেরা যে মিথ্যাকে মিথ্যে জেনেও সত্যের আবরণ দিতে চেয়েছে, একটি মনুষ্যেতর পশু তার স্বেচ্ছাচারে, অঙ্গ সঞ্চালনায় তাকে বেআব্রু করে দিয়েছে নিয়ত। অবশ্য বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসের প্রকৃতি মুখ্যত নির্মল কৌতুক জাতীয়, তাতে অসঙ্গতি নিয়ে অনেকদূর মজা করা গেলেও তা একেবারে নির্মমভাবে মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে না। হিউমারের ধর্মই এই যে তাতে উদ্দিষ্ট চরিত্র বা ঘটনার প্রতি একরকম সমবেদনাও জড়িয়ে থাকে। একরকম প্রচ্ছন্ন ক্ষমার ভাব থাকে; প্রায়শ্চিত্ত কিংবা শাস্তির আয়োজন থাকে না। তেমন গল্পের শেষ ভাগে শরৎকালের আকাশের মতো নিষ্কলুষ একচিলতে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ে, চারপাশে যার পেঁজাতুলোর মেঘের লঘু উপচ্ছায়া। ঈষৎ বাষ্পীয় আভাস জড়ানো তাতে! সমলোচক বলেন তাই, 'যথার্থ হিউমারের অর্থ—হাস্যতরঙ্গের সঙ্গে সূক্ষ্ম বেদনার স্পর্শ।'[৩] বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টির সারাৎসারও বোধহয় তাই। জীবন এইরকমই বিচিত্র, বিচিত্র অসঙ্গতি মানুষের। সেসব নিয়েই তবু মানুষ মানুষ। সেইখানে সে সুন্দর, আগ্রহণীয়।

'কুইন অ্যান' গল্পে নাস্তানাবুদ রায়বাহাদুরের শেষমুহূর্তে মানরক্ষা করেন লেখক। প্রায় অনিবার্য অনাবরণের মুহূর্তে চকিত রাশ টেনে ধরেন গল্পের। যেন রায়বাহাদুর জীবনে আর একবার সুযোগ পেলেন বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাবার। তাতে 'পারিষদদের মধ্যে একটি নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।' ফলে কুইন অ্যানের খেয়ালি আচরণ ঘিরে যে উৎকণ্ঠা তৈরি হচ্ছিল তা একটি শীর্ষমুহূর্ত ছুঁয়ে দ্রুত সমে ফিরে এল। এই নিশ্চিন্ত পরিণতি আসলে একটি পূর্ণ যতিপাত। গল্পের এইখানেই শেষ। এরপর আর কোন 'তারপর' নেই। সুতরাং এ গল্প শেষ হয়েই শেষ হল। এ গল্পটিকে সমালোচক তাই হয়ত সার্থক ছোটগল্প বলবেন

না। বস্তুত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেই ধারার বাঙালি লেখক যার পূর্বসূরী বলা চলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিককে। Tale-ধর্মী গল্পের দিকেই এঁদের প্রবণতা; আর তাঁদের কৌতুকের অন্তরালে একরকম স্নিগ্ধ প্রসন্নতার বেদনা চারপাশে যেন বলয়ের মতো ঘিরে থাকে। অথচ তা সূক্ষ্ম, দৃষ্টি এড়াতেও পারে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নিজেই নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমার লেখার হাস্যকৌতুক রস বেশ খানিকটা স্থান পেয়েছে; বাটখারা নিয়ে ওজন করলে বোধহয় এটাই বেশী হবে। তাই থেকে ধারণা হওয়ার কথা, তবে হাসিই বোধহয় আমার সাহিত্যসত্তার অন্তরতম জিনিষ। কিন্তু বিচার করে দেখলে তাই বা দাঁড়ায় কোথায়?..........নিজেকে যতোটা জানি, বিষণ্ণতাই আমার মনের গঠনে যেন মূল উপাদান।'[৪]

বিভূতিভূষণ এই স্ব-স্বীকৃত বিষণ্ণতার বোধ আমাদের তাঁর রচনা পাঠে আর একটু মনোযোগী করে তোলে। হয়ত সেভাবে দেখলে দেখতে পাব অনেক গুরুতর সামাজিক অসঙ্গতির ইঙ্গিতমাত্র দিয়েই তিনি মূল গল্পে চলে গিয়েছেন। কিন্তু ঐ ইঙ্গিতটুকু লক্ষ্য করাই ভাল। 'কুইন অ্যান' গল্পে রায়বাহাদুরের ছদ্মবাহাদুরি এবং যাবতীয় অসঙ্গতির প্রেক্ষাপট হিসেবে একটি বিশেষ সময়কালের ধরতাই দেওয়া হয়েছে। খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ (১৯১৯-২০)-এর পটভূমি। উডবার্ন সাহেবের ঘোড়া যে কেউ কিনতে চায়না তার কারণ সেটা পশ্চিমী ওয়েলার জাতীয়। আর্বোবিয়ান ঘোড়া হলে সাহেবকে অসুবিধায় পড়তে হত না। পশুব উপব মানুষের জাতপাত আরোপ হাস্যকর কিন্তু নির্মম সত্য। সাহেবও আশঙ্কায় ছিলেন, 'তিনি যাত্রা করিলেই জাত ভাঁড়াইয়া ঘুড়ীটাকে প্রাচ্য করিয়া লইবে।' গেইনমিনোল্ট, নিমিজার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গবেষণায় খিলাফৎ-কালীন রাজনীতির নেপথ্যবর্তী সামাজিক বাজনীতির অনেক চোরা আবর্ত উন্মোচিত হয়েছে। সেই সব রাজনীতি ও জাতপাতের সমীকরণ পেরিয়েই রায়সাহেব ননীগোপাল বাবুকে ঘুড়ীটা দিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত হল। বায়সাহেবের এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার অনেক কারণ আছে। এক তো, দাসত্বের উপাসনার ধরণই হল বশ্যতা স্বীকারে কৃতকৃতার্থ হওয়া, আর দ্বিতীয়ত, 'ছ্যাকরা গাড়ির মতো' হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া অসংখ্য রায়সাহেবের মধ্যে বিশিষ্ট ও কৃপাদৃষ্ট হয়ে ওঠার মওকা লাভ করা। কিন্তু, গল্পে এখান থেকেই তৈরি হয়েছে এক মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিবাদ। রায়সাহেব যেমন ইংরেজদের দাসানুদাস, তার ঘুড়ীটা তেমন, 'প্রভুভক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, বাধ্য ভব্যসভ্য, নিরীহ নয়। রায়সাহেবকে সে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। তার মান শেষপর্যন্ত অন্তত সম্পূর্ণ নিরাবৃত না হয়ে পড়ুক এই ভাবনায় আশঙ্কিত থাকে শুধু স্তাবকেবা। মেরুদন্ডহীন এই 'প্রাণীগুলি' সবই বোঝে তবু এমনই তারা দুর্বল যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার মতো নিত্য তারা ভজনা করে একটিই মন্ত্র 'তা বটেই তো, তা বটেই তো।' রায়সাহেব জানে, শুধু স্তাবকতা করতে আর স্তাবকতা দেখতে। আর জানে ক্ষমতার দম্ভ। জানে, 'ঘোড়ার তেদ বাড়তে দিয়েছে কি বিগড়েছে; —ঘোড়ার আর রেয়তের।' এ হেন মানুষ, যে যশের কাঙাল, মানভিখারি অথচ জীবনবোধশূন্য, তাব জন্য, তার সেই অসঙ্গতির জন্য বেদনা ছাড়া কীই বা করা যায়? এ হেন উনিশ শতকীয় প্রহসন-সংস্করণের প্রতিনিধি বাবুটি এঁটে উঠতে পারেনা কিনা একটি ঘোড়ার সঙ্গে। ঘোড়ার পিঠে উঠে মিথ্যে আত্মপ্রসাদের ফটো

তুলে রাখার রায়বাহাদুরি অপচেষ্টাকে সবশেষে কুইন অ্যান হার্ডল রেসের তিনপায়া জ্ঞানে অবজ্ঞা করেছে। যে-স্তাবকতা তার এত প্রিয়, সেই স্তাবকতাই তার কাছে দায় হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। নিয়তির মতো প্রায় অমোঘ হয়ে উঠেছিল আত্মরচিত মিথ্যে নির্মাণের সমূহ স্খলন। তাই 'দায়ে পড়া বীরত্বের' সঙ্গে তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে নিতে হয়েছে ঘোড়ার লাগাম। কারণ 'সযত্নে গোলমাল' করে তেমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে তুলেছিল স্বয়ং ঐ রায়সাহেব। তাই 'বিবর্ণমুখে' আত্মপ্রসাদী হাসিটা ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছে শেষপর্যন্ত। দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে মুমূর্ষু মুহূর্তেও ঠাট বজায় রেখে বলতে হয়েছে তাকে, 'তোমরা কেউ ল্যাজ চেপে ধর, কিছু বলবে না, খুব ঠান্ডা ঘো—।' এই অসমাপ্ত বাক্যের মতো পর্দাফাঁস অবস্থা তখন রায়সাহেবেরও। ঘোড়াকে তুষ্ট করতে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকরণে 'ডার্লিং, প্রিটি ডিয়ার' বলতে হয়েছে তাকে। তাও ঘোড়াকে ডার্লিং বা নটি গেরেল[৫] বলা সমীচীন কিনা এক পারিষদ আবার তারও হিসেব কষতে থাকে। রায়বাহাদুরের প্রাণ না মান কোন্‌টা বেশি দামি, তা নিয়ে ধন্দ থাকে পারিষদদেরও। রায়বাহাদুরের নিয়তিই তাই। মানের মিথ্যে লতায় জড়িয়েছে সে নিজেই নিজেকে।

প্রবলভাবে অসঙ্গত এই রায়বাহাদুর জাতীয় জীবেদের বিপ্রতীপে আর এক সত্যিকারের প্রাণীর আচরণের তুল্যমূল্য বোঝাপড়ায় এই গল্পের রসস্ফূর্তি। এখানে এ গল্পের কৌতুক রসের উৎস। বাংলাসাহিত্যের আর এক রসশিল্পী পরিমল গোস্বামী যথার্থই বলেছেন, গল্পের 'কৌতুক রসের দিক থেকে কুইন অ্যানও ব.ভ.ম[৬] মার্কা খাঁটি জিনিস।'

ননীচোরা : পাঠকের দৃষ্টির আলোকে

শ্যামলী পাল

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা।।

গোপাল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ননীচুরি করে খেয়েছে তাই শাস্তিস্বরূপ মা গরু বাঁধবার দড়ি দিয়ে তার হাত দুটি বেঁধে রেখেছেন। আর তাই গোপালের অনুযোগ পালকপিতা নন্দের কাছে। আমাদের আলোচ্য গল্পের নামও 'ননীচোরা'। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি অসামান্য ছোটগল্প। এখানেও আমরা গোপালের সন্ধান পাই যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। গল্পের সূচনা এইভাবে : 'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সৃষ্টির পাট, একটু যদি নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে। তাহার উপর ওই দজ্জাল ছেলে সামলানো।'......বধূটি যখন সংসারের হাজারো ঝক্কি সামলানোয় ব্যস্ত, দজ্জাল ছেলে তখন ব্যস্ত হাজারো দস্যিপনায়। কখনো কাকার সঙ্গে তার দৌরাত্ম্য, কখনও মায়ের সঙ্গে, আবার কখনো বা ঠাকুমার সঙ্গে। স্বামীর নটায় গাড়ি, দেবরের দশটায় স্কুল। এরূপ সময়ে বধূটির যখন তরকারি নামাতে, ঢালতে, কড়া চেঁছে আবার চড়াতে একটু দেরী হয়ে যায় তখন কড়ায় তেল দেবার জন্য পিছন দিকে তেলের বাটি নিতে গিয়ে দেখে, সেটা ছেলের দখলে। বর্ণনা এইরূপ : 'হাত দুইটি তেলে চোবানো, পেটটি তেলে চকচক করিতেছে, নীচে একরাশ তেলের ছড়াছড়ি। মার পানে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিল, অঙ্গা অঙ্গা।' অর্থাৎ গঙ্গা গঙ্গা। ব্যস্ত মা এই দৃশ্য দেখে স্বভাবতই রেগে ওঠেন। চড় উঁচিয়ে ধমকাতে শুরু কবেন কিন্তু যখনই দেখেন খোকার চোখে জল ওমনি মুখের ভাব হঠাৎ বদলে ফেলে বলেন : 'ওরে খোকন, না না, তোকে বলিনি, তোমায় কি বলতে পারি বাবা! আমি যে তেলকে বলছিলাম, হতভাগা তেল, আমার যাদুর পেটে উঠে কি করেছিস বল্ তো?—ওরে খোকা, কি চমৎকার পাখি দেখ্? তুই নিবি?'......এই স্নেহাতিশয্য শুধু মায়ের নয়, ঠাকুমারও। ঠাকুমা মনে করেন 'দৌরাত্মির বয়স এখন, সইতে হবে। হীরে থির থাকলে আলো ঠিকরোয় না।' বধূকে যখন এই উপদেশ দিচ্ছেন সদ্য গঙ্গাস্নান সেরে পূজার ঘরের রকে এসে দাঁড়িয়ে আর ঠিক তখনই খোকা দুলতে দুলতে তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরবার উপক্রম করল। যতই ঠাকুমা এড়াবার চেষ্টা করেন, সে ততই দুই হাত তুলে ঠাকুমাকে ছোঁবার জন্য ছোটে। যাট বছরের বৃদ্ধা নাতিব সমবয়সী হয়ে সাবা রকটা ছোটাছুটি করতে থাকেন আর চেঁচান 'অ দাদু, খাস নি মাথা আমার, আবার নাওয়াস নি বুড়ীকে—ও বউমা, শিগগির এস বাছা সব ছেড়ে—'

গল্পটিকে আপাতভাবে বাৎসল্যরসের গল্প বলেই বোধ হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যেন শিশুবেশে ঘরে ঘরে আবির্ভূত হন আর দৌরাত্ম্যে সকলের স্নেহ ভালবাসা আদায় করে নেন। যশোদা যেমন পুত্রকে শাসন করেন আবার পরমুহূর্তেই কাছে টেনে মুখ চুম্বন করেন, গল্পেও

আমরা খোকার প্রতি অনুরূপ স্নেহই ক্ষরিত হতে দেখি। কিন্তু গল্পটি এই বাৎসল্যরসের বর্ণনাতেই শেষ হয়ে যায় না, পূজার ঘরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পটি শেষাবধি নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও মমতার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খোকার অশেষ দৌরাত্ম্যের পর ঠাকুমা যখন পূজার আসনে বসেন মন তাঁর কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়েই থাকে। নানা কথা মনে উদিত হতে থাকে। যশোদা, গোপাল, ননীচুরি, ছাঁদন দড়ি, শিশুর অদম্য লোভ ইত্যাকার ভাবনায় মন আন্দোলিত হয়। পূজার সম্ভার পড়ে থাকে, মন্ত্র অনুচ্চারিত, মুদিত চোখের পদ্ম ভিজিয়ে শুধু অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ একটা স্বপ্নের ঘোরে মনটা আচ্ছন্ন থাকে। বধূকে দেরি করে দেওয়ার জন্য ছেলের বকাবকিতে আবিষ্ট ভাবটা কাটে। বৃদ্ধা নিজের মনেই বলেন, 'আজ তুমি তো ঠিক ধ্যানের রূপে দেখা দিলে না ঠাকুর, কেন, তা তুমিই জান।' এরপর পুষ্পরাশি চন্দনে মাখিয়ে বেদীতে নিক্ষেপ করেন। তারপর কুশিতে জল নিয়ে নৈবেদ্য নিবেদন করতে যেতেই 'এ কি হল!' চিত্রার্পিতের মত কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে যান। রেকাবির মাঝখানের নৈবেদ্যের চূড়ার উপর বড় যে ক্ষীরের নাড়ুটি রেখেছিলেন সেইটি নেই। চোখের জলে দৃষ্টি কিছুটা ঝাপসা, অঞ্চল দিয়ে মুছে নেন। বারবার ভাল করে মোছেন। নাড়ুটি একবার পড়ে গিয়েছিল, ভাল করে বসিয়ে দেন, ভুলের কোনই সম্ভাবনা নেই, এমতাবস্থায় নাড়ুটি কোথায় যেতে পারে? 'শরীর কন্টকিত, মনে হয়, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙিয়া সমস্ত শরীরের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে। চক্ষের জলে মুছিবে কে? কূল ছাপাইয়া বন্যা নামিয়াছে।

মুখে একটি মাত্র কথা, আনন্দ-ব্যাকুল একটি মাত্র বিস্মিত প্রশ্ন, 'হে ঠাকুর, এ কি দেখালে?' শুনে বধূরও চোখ বিস্ফারিত, নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত। শাশুড়ি বললেন, 'এ সেই যাঁর নাম করিতে পারি না, গোঁসাইয়ের বংশ বউমা, এ রকম ব্যাপার তো এ বাড়িতে নূতন নয়; তবে আজকাল আর আমাদের পুণ্যির জোর নেই এই যা।' বলে শ্বশুর কিভাবে গোপালের দর্শন পেয়েছিলেন তা সবিস্তারে বউমাকে ব্যাখ্যা করলেন। তখন দুজনের চোখই জলে ভেসে যাচ্ছে। পাছে কেউ অবিশ্বাস করে, গোপালের লাঞ্ছনা হয় তাই তাঁরা কথাটা গোপন রাখলেন। এদিকে আশায় আশায় দিন কাটে, গোপালের আগমনের কিন্তু কোন নিদর্শনই আর পাওয়া যায় না। এদিকে নৈবেদ্যের পরিবর্ধিত আয়োজন—শুদ্ধাচারে তৈরী করা, দুটি অন্তরের ভক্তিরস দিয়ে সিঞ্চিত—যেমনকার তেমনিই পড়ে থাকে। বাটিতে বাটিতে সর ক্ষীর ননী, রেকাবীতে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নাড়ু কোনটারই কোনখানে প্রত্যাশিত করচিহ্নটুকু পড়ে না, এভাবে চারদিন কেটে যায়। হাতে দুটি নাড়ু নিয়ে রান্নাঘরের রকে এসে শ্রান্তকণ্ঠে শাশুড়ি বলেন, 'নাঃ বউমা, কাল থেকে গয়লা বউকে বলে দিও, যেমন দুধ দিচ্ছিল তেমনি দেবে। মিছে আশা।

পরদিন রবিবার। রান্নাবান্নার তাড়া নেই। বড় ছেলেকে রোজ আটটার সময় আহার করতে হয় বলে রবিবার দিন একটার সময় আহারে বসে যুগপৎ নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং চাকরির উপর আক্রোশ মেটায়। সেদিনই শাশুড়ী বধূতে পরামর্শ করে, পূজার সময় সেদিন বধূ পর্যন্ত বাড়িতে থাকবে না, খোকাকে নিয়ে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে। ভিতর বাড়িতে শুধু শাশুড়ি থাকবেন একা, পূজার ঘরে।

নির্দিষ্ট দিনটিতে রাত থাকতেই শাশুড়ি বধূতে উঠে, একান্ত শুচিতার সঙ্গে স্নানাদি সেরে পূজার আয়োজন করে। একটু বেলা হলে বড় ছেলে রবিবারের আড্ডায় চলে যায়, ছোট ছেলের ক্যারম প্রতিযোগিতা সামনে, সে মহলা দিতে যায়। বধূও কিছু পরে খোকাকে নিয়ে পাশের বাড়ী চলে যায়। 'নির্জন নিঃশব্দ বাড়িটিতে শুধু একটি ব্যাকুল ভক্ত সংসারের সহস্র প্রয়োজনে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সাধ্যমত আকৃষ্ট করিয়া, আশায় অবাধ্য নয়নদ্বয়কে প্রতীক্ষায় সংযত করিয়া পূজার আসনে বসিয়া রহিল।'......অনেকক্ষণ গেল, ক্রমেই শরীর মন যেন কি একটা অপার্থিব সুষমায় ভরিয়া আসিতে লাগিল—প্রথম দিনের মতই, ক্রমে প্রথম দিনকেও অতিক্রম করিয়া।' আর সেদিনই 'ননীচোরা'র সন্ধান মিলল। ঠাকুমার যখন গভীর আবেগে মুদিত নয়নযুগলে ধারা গড়িয়ে পড়ছে; একটু দূরে কালো পাথরের বাটিতে ক্ষীরের মধ্যে হাত ডুবিয়ে খোকা তখন সতর্কভাবে ঠাকুমার মুখের দিকে চেয়ে। কাকা এবং মা দেখে ফেলে এই দৃশ্য। ননীচোরা হাতে নাতে ধৃত হয়। বধূর ভ্রান্তি ঘোচে। কিন্তু 'একজনের মনে কেমন করিয়া সত্যের একটি শিখা অম্লান আলোয় জ্বলিয়া রহিল।' বধূকে আদেশ করলেন পরদিন থেকে খোকার জন্যে ছোট একটি নৈবিদ্যি তাঁর আসনের পাশে যেন রাখা থাকে, যখন গোপালকে নিবেদন করবেন, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে। গল্পটিকে শিশুটিকে উপলক্ষ করে বালগোপালের সেবায় আত্মনিবেদিত একটি বৈষ্ণব পরিবারের ভক্তিপ্রাণ তার চিত্রই অঙ্কন করেছেন গল্পকার। বিশ্বাস যে কত দৃঢ়মূল হতে পারে গল্পটি তার সাক্ষ্য বহন করে। যখন প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয় তখনও যেন বধূটির শাশুড়ির বিশ্বাস অমলিন থাকে। তিনি যেন খোকার মধ্যেই বালগোপালকে খুঁজে ফেরেন। খোকাই তাঁর নিকট সাক্ষাৎ বালগোপাল। তাই তাঁর বিশ্বাসে চিড় ধরে না কখনো। গল্পটি একাধারে বাৎসল্যরসের গল্প, এবং বিশ্বাসময়তা, ভক্তিপ্রবণতার সাক্ষ্যবাহী। এছাড়াও লঘুচপল হাস্যরস গল্পটিকে অনন্যতা দান করেছে। 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা'র যে ছোটগল্প, সেখানে 'ননীচোরা' যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বরযাত্রী : নির্মল হাস্যরসের সন্ধান

সৈকত মণ্ডল

বরযাত্রী গল্পটি আলোচনা করার আগে সংক্ষেপে আমরা গল্পের বিষয়বস্তুটা জেনে নিতে পারি। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় যে ত্রিলোচন বিয়ে করতে যাবে তার তোড়জোড় চলছে। বিয়ের বরযাত্রী যাবার জন্য তার অন্যান্য বন্ধুরা চলে এলেও গণশা তখনো পৌঁছায়নি। অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ছিল রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গণশা এসে পৌঁছাল। ত্রিলোচনের বিয়ে গোপালপুরে। অবশ্য ঐ জায়গাটির নাম হয় কালসিটে গোকুলপুর। বরযাত্রীর সঙ্গে এল ত্রিলোচনের বাবা, মেসো, সেজপিসে, সহায়রাম বাবু, পুরুত ঠাকুরের পরিবর্তে তার কাকা রাতকানা এবং কানে কালা ন্যায়রত্ন মশাই এবং 'চীনে নাপতে'। বিয়ে বাড়িতে এসে সহায়রাম বাবু কন্যা পক্ষের কয়েকজন লোকের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে। সহায়রামবাবু বলেন যে এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ তিনি প্রথম দেখলেন আবার কন্যাপক্ষের লোকেরা বলেন যে এমন বরপক্ষ তারা এই প্রথম দেখলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকে এবং নিজেদের প্রশংসা কেউ নিতে চায় না। এরপর এই নিয়ে প্রায় হাতাহাতির জোগাড়। এছাড়া বিয়ে বাড়িতে বরপক্ষের অনেকেই অল্পবিস্তর মদ খাওয়ায় অপ্রকৃতিস্থ ছিল। যদিও এই নিয়ে তারা বেশি উচ্চবাক্য করেনি। এরপর শুরু হয় গল্পের মূল আকর্ষণ। এদিকে ত্রিলোচনের বন্ধুরা বিয়ে বাড়িতে এসে নিজেদের মধ্যে আড্ডার আসর বসিয়েছে। বর বিয়ের পিঁড়িতে চলে গেলে এবং খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকে গেলে গণশা (গণশা অবশ্য তোতলা) এসে খবর দেয় যে তিলু বাসর ঘরে গেছে এবং সেখানে তাকে অনেক ষোড়শী কন্যা পরিবৃতা হয়ে থাকতে দেখা গেছে। এই নিয়ে তো অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে উৎসাহের সীমা নেই। বন্ধুদের মধ্যে রাজেন সবার আগে সেখানে যাবার প্রস্তাব দিল। গণশা জানায় অভিযানটি বেজার শক্ত। ঘন আগাছার মধ্য দিয়ে ছাই গোবর, ভাঙা ইট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা সবাই মিলে সেখানে পৌঁছায়। পথে আসতে আসতে গোরাচাঁদের পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবরের গাদায় ডুবে যায়। তবুও বাসর ঘর দেখার লোভ সামলাতে পারে না। দুটো জানলার মধ্যে হাত চারেক জায়গা সেখানেই উঁকি মারেন রাজেন, গণশা, ঘোৎনা, এবং কে. গুপ্ত। তারা বাসরঘরের রঙ্গতামাশা দেখতে থাকে। এরই মধ্যে এক রাশ এঁটোপাতা, খুরি গেলাস তাদের মধ্যে দুজনের মাথায় কাঁধে, পিঠে সজোরে আছড়ে পড়ে। তারপর তাদের ফেরার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী কণ্ঠে ও বাবা গো ডাকাত বলে একটা চিৎকার শোনা যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে গণশারা সবাই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে। ছুটতে ছুটতে রাতের অন্ধকারে তারা একটা পুকুবেব মধ্যে গিয়ে পড়ে। এদিকে কন্যাপক্ষের লোকজন জড়ো হয়ে যায়। তারা ভাবে প্রকৃতই ডাকাত পড়েছে বাড়িতে। এই নিয়ে চলতে থাকে বিভিন্নরকম কথাবার্তা, কেউ বা বন্দুক আনার কথা বলে, কেউ পুকুরে ঢিল ছোঁড়ে। এদিকে গণশারা বারবার বলার চেষ্টা কবে তারা বরযাত্রী। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। তারপর এক সময় তাদেরকে ধরে বেঁধে এন বরের মুখোমুখি কবা হয়। তখন সবার ভুল ভাঙে। এবং তাদের আপ্যায়ন করা হয়। শেষে মেয়েলি রঙ্গ রসিকতার মধ্যেই গল্পটির শেষ হয়।

এবার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বরযাত্রী' গল্পটিকে কয়েকটি দৃষ্টি থেকে বিচার করতে পারি।

দুই

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মূলত কীর্তিমান হয়ে আছেন হাস্যরসাত্মক গল্পকার হিসাবে। 'বরযাত্রী' গল্পটিতে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই, ত্রিলোচনের বিয়ে। রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোঁৎনা এসে হাজির হয়েছে অথচ গণশা এসে পৌছায়নি। প্রথমেই লেখক আমাদের কিছুটা হাসিয়ে দেন ঘোঁৎনা নামটি বলে। তারপর গণশা যখন এসে বলে—'গ-গ্ গণশাকে আটকায় সে এখনও মা-মায়ের পেটেও' তখনও আমরা পাঠকরা এরমধ্যে নির্মল হাস্যরসের সন্ধান পাই। লেখক এ গল্পটিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, তার বেশীরভাগ জায়গায় আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে। সেইধরনের কথার কিছু উদাহরণ আমরা একের পর এক দিয়ে যাব। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখি সামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্ণ মুখে বসে আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যেতে দেখলেই বাসর ঘর স্মরণ-করে অস্ফুট স্বরে বলছে-'বাপ-রে, দফাসারলে আজ!' এরপর বিয়ে বাড়িতে এসে বরপক্ষের সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েক জনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করছিলেন। তার বক্তব্য ছিল তিনি অনেক জায়গায় বরযাত্রী গিয়েছেন বটে কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ দেখেননি। এদিকে মুসকিল হল কন্যাপক্ষের কেউ তার সেই কথা মেনে নিচ্ছে না। তারা পাল্টা বলে যে বরপক্ষই যে বরং অতিশয় ভদ্র এবং সম্মানীয়. এগ্রামে এরকম বরযাত্রী আসেই নি। কথাটা অমায়িক মৃদু হাস্যে হাতজোড়, বিনয়োচিতভাবে ভাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষে একটা জেদাজেদির মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা একটু গরম হচ্ছিল। এই দেখে ত্রিলোচনের পিসে কিছুটা রেগে গিয়ে বললেন—'কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখিনি, তা কোন মতেই মানবেন না? উপরি জ্বালা তো?' কন্যাপক্ষের একজন তার প্রত্যুত্তরে বলে—'আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহলে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যাবাদী হলাম?' তার উত্তরে সহায়রাম বাবু বলেন—'কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুনে দিনতো দেখি, চিনতে পারছিনা। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানে না। আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে যান।' লেখকের এই বর্ণনা অসাধারণ। আরেক জায়গায় আমরা দেখি ত্রিলোচন মানে তিলু গণশার কাছে ভুলে যাওয়া গানটি জিজ্ঞেস করে। গণশা তখন তার তোতলা মুখে গান ধরে—

"মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি
চিত মোর ব্যা-ব্যা-ব্যা.....।"

এবং একনাগাড়ে ব্যা-ব্যা করতে থাকে। তখন রাজেন নিজের গলাটা জুড়ে দিয়ে গাইতে থাকে—

"ব্যাকুল হোয়
ময়না নিদ জানত নেহি
মানত নেহি...।

গণশা মাঝখানে থেকে আবার ধরে—

"জা-জ্জা-জ্জানত নে-ন্নে।" এবং রাজনের হাতে চিমটি সূক্ষ্ম হাস্যরসাত্মক 'সেন্স'কে আমরা পাঠকরা দারুনভাবে উপভোগ করি। গল্পটার একজায়গায় লেখক আমাদের জানালেন কন্যাপক্ষের একজন গণশাদেরকে গান গাইতে অনুরোধ করছেন তখন গণেশ সবার মুখপাত্র হয়ে বলেন—'মা-ম্মাপ করবেন; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ্ গাইতে বাজাতে জানে না।" তখন কন্যাপক্ষের একজন বলে—'সে কথা শুনবো কেন মশাই? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে—"। পাল থেকে আরেক ছোকরা সেই সঙ্গে আরো জুড়ে দিল—'গিটকিরি ছাড়াতো কিছু বেরুবে না।' গণশার এই তোতলামিটা গিটকিরি বলে আখ্যা দেওয়াতে গণশা রেগে গণ্ডগোল করতে যাচ্ছিল তখন রাজেন এসে চাপা গলায় বলল—'হাড় কখানির মায়া বাখ।' এদিকে গণশা কারণ জানতে চাওয়ায় রাজেন বলে যে স্ত্রী আচার দেখতে যাবে কি যাবেনা ভাবছিল এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে কে একজন এসে কাঁধের উপর হাত দিয়ে বলে—'কে মশায় আপনি?' তখন সেই লোকটি সম্পর্কে রাজেনের বর্ণনা এইরকম—'ফিবে দেখি, ইয়া, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবব নিয়ে জানলাম কনের কাকা নাম জগুদা।' থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী স্ত্রী আচার দেখছি। জগুদা সম্পর্কে রাজেনের যে অভিব্যক্তিকে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেটুকু পড়ে বোধ করি কোন রসিক ব্যক্তির পক্ষেই দাঁত না বের করে থাকা সম্ভব নয়।

এরপর হাস্যরসের চূড়ান্ত নিদর্শন আমরা পাই গণশারা সবাই যখন রাতেব অন্ধকারে বাসর ঘর দেখতে যায়, যেতে যেতে গোরাচাঁদের পা গোবর গাদায় ডুবে যায়। সেই সময় লেখকের বর্ণনা ছিল এইরকম—'পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবর গাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল।" গণশার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল—"ওরে গণশা বড্ড কুটকুট করছে; উঃ কি করি বল তো?" কিন্তু গণশা তখন অন্যরাজ্যে। সে ত্রিলোচনের বাসর ঘর দেখতেই ব্যস্ত। এরই ফাঁকে গোরাচাঁদ আবার গণশাকে বলে—"শুনছিস? গেলাম মাইরি, গোবুরটা নিশ্চয় পঁচা ছিল'। এদিকে গণশা বাসর ঘর দেখতে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে সে আবার উল্টে গোরাচাঁদকে প্রশ্ন করল—'কি করে জানলি?' গোরাচাঁদ রেগে বলল—'কি করে জানলি? ভয়ানক কুট কুট করছে যে পা দুটো!' বর্ণনাগুলোতে লেখকের হাস্যরসিক মানসিকতা অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে।

এরপর বন্ধুরা মিলে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাসরঘর দেখার সময় তাদের মধ্যে দুজনের উপর এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস প্রভৃতি পড়ে। একজন চিৎকার করে বলে ডাকাত। তখন লেখকের বর্ণনা দারুন উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আবার ঐ বন্ধুদের পুকুরের মধ্যে পড়ে যাওয়া, সেই পরিস্থিতি এবং সত্যঘটনা প্রকাশ পাওয়া সব জায়গাতেই হাস্যরসের সন্ধান মেলে। আসলে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁব এই গল্পে কোনরকম জীবনের সমস্যা; তার থেকে উত্তরণ বা সমাজ শিক্ষার আভাস-কোন কিছুই দেননি। সমাজের জটিলতাকে পাশে সরিয়ে তিনি বারবার দেখাতে চেয়েছেন—নির্মল হাস্যরস। তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় পাই এই গল্পে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সবসময় হাসিয়েছেন। এমন কি শেষ কথাতেও।

তিন

ছোটগল্পের গঠনের ক্ষেত্রে যেমন হওয়া উচিত যে, প্রথম কথাতেই পাঠক আকৃষ্ট হবে। কেননা এখানে উপন্যাসের মত ততটা বিস্তৃত জায়গা পাওয়া যায়না ঘটনা বর্ণনা করার জন্য। এই গল্পেও আমরা প্রথমেই দেখি লেখক পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। গল্পটি শুরু হয়েছে একটি আকর্ষণীয় কথা দিয়ে। "ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে.গুপ্ত, গোরাচাঁদ, রাজেন আর ঘোঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গণশার অপেক্ষা;"—সুতরাং বোঝায় যাচ্ছে একটা রসালো ঘটনা দিয়ে লেখক শুরু করেছেন। এরপর গল্প যত এগিয়েছে ঘটনা ততই জমে উঠেছে। ছোটগল্প যে কতটা গতিশীল এবং চমকপ্রদ হতে পারে তারও প্রমাণ দিয়েছেন লেখক তাঁর নিপুণ বর্ণনায়। আমরা যখন গল্পটা পড়ি তখন ঘটনার গতিময়তা আমাদেরকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে চমক দিয়ে সুকৌশলে গল্পটিকে আরো আঁটোসাটো করেন লেখক। শুধু তাই-ই নয় প্রাঞ্জল ভাষায় এবং ছোট ও মাঝারি ধাপের সংলাপের ব্যবহার গল্পটিকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। যেমন—'শুনে সুখী হলাম। একলা যে?' 'হাড় কখানির মায়া রাখ?' ইত্যাদি। এই গল্পটির আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের নাটকের গঠনের কথা মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ এই গল্পটির ক্ষেত্রে নাটকের উত্থান-পতনের লক্ষণগুলি মিলে যায়। তবে একটাই পার্থক্য তা হল 'বরযাত্রী' নাটক নয় ছোটগল্প। গল্পটিতে আমরা দেখি ত্রিলোচনের বিয়ে, বন্ধুরা বরযাত্রী যাবে, সঙ্গে আরো কয়েকজন যাবে এরপর বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়িতে পৌঁছায়। তাদের আপ্যায়ন করা হয়, কখনো গানের আসর বসে ইত্যাদি ঘটনা। গল্পের এই ঘটনাটাকে আমরা নাটকে exposition এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এর পরেই দেখি গল্পটিতে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। তিলুর বন্ধুরা বাসর ঘর দেখতে যায়। তার আগে অবশ্য দুই পক্ষের মধ্যে অর্থাৎ বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কিছুটা তর্ক বিতর্ক হয় যা কিনা প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছায়। এবং এর পরেই আসে Climax অর্থাৎ শিল্পটা চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছায়। সেখানে দেখা যায় গণশা ঘোঁৎনারা লুকিয়ে বাসর ঘর দেখতে যায়। খিড়কির দরজা দিয়ে জনৈক মহিলা তাদের গায়ে বিয়ে বাড়ির এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস ইত্যাদি ফেলে এবং তাদের ডাকাত বলে সন্দেহ করে। এবার শুরু হয় মূল আকর্ষণ গল্পের। আমাদের পাঠকদের মনেও তখন নানা প্রশ্ন জাগে। এখন কি হবে? এরপর তারা সবাই মিলে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং একজন পেঁপে গাছে ওঠে। বাকি তিনজন মাঠ ভেবে পুকুরের মধ্যে পড়ে। আমাদের Suspense আরো বেড়ে যায় এবং শুরু হয় Falling action। তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বরের কাছে, পরীক্ষা করবার জন্য তারা ডাকাত না বরযাত্রী। এবার আসে Conclusion। বর তাদের সনাক্ত করে এবং গল্পটির মধুর পরিসমাপ্তি হয়। তাই বলা যায় গল্পটি অনেকটাই নাট্যগুণ সমন্বিত এবং গানটাও নাটকের মত। এই ছোট ছোট চিত্রের সমন্বয়ে একটি একটি নিটোল কাহিনী। ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে চমক এবং প্রতিটি চরিত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়ে লেখক বরযাত্রী গল্পটিকে একটি সার্থক ছোটগল্পের আকার দিয়েছেন। যেখানে অনেকটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে গল্পটির গঠন কৌশল।

চার

এই গল্পটির অনেক জায়গায় এমন সুন্দর বর্ণনা লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যা কিনা লেখকের দেখার চোখের গভীরতারই প্রমাণ দেয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বিভূতিভূষণের ছেলেবেলা। তার ছেলেবেলায় বারবার তাকে পড়াশোনার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে। ফলে গ্রামের অতিসাধারণ বিষয়কেও নিখুঁতভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই কাজে লেগেছে এখানে। গল্পের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা সেই কারণেই লেখকের চোখ এড়ায় না। যেমন যে পুকুরের বর্ণনা গল্পে আছে—পুকুরটি পানায় ভর্তি, মাছ চাষও হয়। সেই পুকুরে পড়লে যে মাথায় পানা লাগবে এবং গায়ে চুলকোবে তা স্বাভাবিক। তারপর রাজেনের পচা গোবরে পা পড়ায় মাছেদের তা যে প্রিয় খাদ্য হয়ে ওঠে লেখক সে কথা বলতেও ভোলেননি। এরপর দেখা যায় ঘোঁৎনা পেঁপে গাছ থেকে নামার সময় তার কোমরে জড়ানো র‍্যাপারে কয়েকটা পেপের ডাটা বেধে গেছে। এই ঘটনাগুলি না জানলে গল্পের মূল রস থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম না কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন এই সাধারণ ঘটনা দিয়ে অসাধারণভাবে রস ত্বরণ ঘটানো যায়। তাই বলা যায় সূক্ষ্ম দেখার চোখ না থাকলে এই অসাধারণ ঘটনাগুলি কখনোই এতটা রসমণ্ডিত হতে পারত না আমাদের কাছে। এখান থেকেই বোঝা যায় লেখকের দেখার চোখ অনেক অনেক বেশি স্বচ্ছ।

কোন লেখকই তাঁর সমাজকে তাঁর যুগকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সেই সব প্রভাব থাকবেই। আমরা জানি লেখকের জন্ম ১৮৯৪সালে এবং 'বরযাত্রী' গল্পটি লেখা হয় ১৯৪৯সালে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ সবে স্বাধীনতা পেল। এখান থেকে একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার যে সেই সময় বাংলা দেশের মানুষের মনে কুসংস্কার, স্থূলতা ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল। সেই সঙ্গে আর একটা কথা বলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ তাই তার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা প্রভৃতি। 'বরযাত্রী' গল্পটিকে বিচার করতে গেলে এই কটা কথা মাথায় রাখতে হবে। গল্পের মধ্যেও আমরা দেখি তৎকালীন সমাজের ছবি। সেখানে দেখা যায় ঠুনকো সৌজন্য, অবিশ্বাস, স্থূলতা, গ্রাম্যতা, প্রভৃতিব টুকরো-টুকরো ছবি। এই বিষয়গুলো এবার গল্পের মধ্য থেকে মিলিয়ে নেওয়া যাক। 'বরযাত্রী'রা কন্যাপক্ষেব লোকেদের সঙ্গে বিনয়ীভাবে কথা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তা প্রায় হাতাহাতি মারামারির মত জায়গায় পৌঁছায়। এটাকে সৌজন্যতাব নামে প্রহসন ছাড়া আর কিই বা বলা যায়। মানুষের মনের অবিশ্বাসটাকেও লেখক ধরেছেন গল্পে। গণশা, ঘোঁৎনা, রাজেন, কে.গুপ্ত এরা পুকুরের মধ্যে পড়ে যাবার পর কন্যাপক্ষের কেউই তাদের চিনতে পারেনি। তারা বারংবার বলা সত্ত্বেও তাদের চিনতে পারে না। বরযাত্রীদের মধ্যে তারাই ছিল সিংহভাগ এবং রীতিমত তারা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে গানের আড্ডা, হৈ হুল্লোড় ইত্যাদি নজরে পড়ার মতই সব কাজ করেছে অথচ কন্যাপক্ষের কেউই তাদের চিনল না! লেখকের এই বর্ণনা আমাদের কাছে কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে। মনে হয় গোঁজামিল দিয়ে ব্যাপারটাকে মেলানো হয়েছে। আসলে ভালোভাবে বিচার কবলে দেখা যায় মোটেই তা নয়, তখনকার পরিস্থিতিতে মানুষের মনের যে

অবিশ্বাস, সন্দেহ তা ধরতে গেলে লেখককে এটুকু করতেই হত। সেটাই তিনি এখানে করেছেন। গল্পটিতে আরো দেখা যায়, গ্রাম্য স্থূলতা, রঙ্গতামাশা, বিশেষ করে মহিলামহল থেকেই তা বেশি করে উঠে এসেছে। তারা একবার বরের কান মলে দেবার কথা বলেছে। গল্পের শেষেও এই রঙ্গতামাশা প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া চার বন্ধুর জন্য এক কিশোরী চারটে শাড়ি, চারটে সায়া ও চারটে ব্লাউজ নিয়ে আসে তাদের পরার জন্য। এই ব্যাপারগুলো দেখলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে তৎকালীন সমাজটা জীবন্তভাবে উঠে এসেছে লেখকের কলমে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যায় মহিলাদের রঙ্গ তামাশাটা এই গল্পের মধ্যে লেখক যেভাবে ধরেছেন তা যে সেই সময়ের মেয়েলি আচার ছিল একথা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরিত্র একটা বড় বিষয়। লেখকের সৃষ্টির গুণে আজো তাই বেঁচে আছে ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, গোরা, নন্দিনী, নিখিলেশ, মানিকলাল প্রভৃতি অজস্র চরিত্রেরা। 'বরযাত্রী' গল্পের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলা যায় লেখক একশ তে একশ শতাংশই সফল। প্রতিটি চরিত্রই যেন খুবই চেনা। কোথাও যেন কৃত্রিমতা নেই চরিত্র চিত্রণে। সবাই একেবারে নির্মেদভাবে ধরা দিয়েছে আমাদের কাছে এই গল্পে। গল্পে গণশা তোতলা। এটা কোন বিশেষ কথা নয়। কথা হল তাকে যেভাবে গল্পের মধ্যে হাঁটাচলা, কথাবলা হয়েছে তাই অনবদ্য। তার মুখের ভাষা প্রত্যেকটি প্রাণোচ্ছল। সে কথা বলে লেখক হুবহু তাই তুলে ধরেছেন গল্পে। শুধু গণশা কেন ঘোঁৎনা, রাজেন বরপক্ষের অভিভাবক, কন্যাপক্ষের অভিভাবকরা সকলে জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। যুব সমাজের মুখের ভাষা কেমন হওয়া উচিত তার প্রমাণ পাই রাজেনের কথায়। গণশার মুখে তিলুর বাসরঘরের কথা শুনে রাজেন কল্পনায় ছবিটা মনে মনে এঁকে নিয়ে বলে—'উঃ যেতে হবে মাইরি!' এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে গল্পে তিলুর বিশেষ ভূমিকা নেই। অথচ তার চরিত্রও বাস্তবানু হয়ে উঠেছে গল্পে। বিয়ে মানে একটা আলাদা, নতুন মিঠে কড়া অনুভূতি। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একটা সাধারণ মানুষের যা করা উচিত তিলু তাই করে। সে বারবার আয়নায় মুখ দেখে আর স্নো ঘসে গালে। অন্যদিকে রাজেন একটু কবি প্রকৃতির লোক তার আচরণেও কোন অসঙ্গতি নেই বরং যথাযথ। কে.গুপ্ত সে বাঙালী নয়। একজন অবাঙালীর যেমন ভঙ্গিমা হওয়া উচিত কে.গুপ্ত তার চূড়ান্ত নিদর্শন। আর ঘোঁৎনা তো অনবদ্য। প্রথম থেকে শুরু হয়েছে তার বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলা, শেষ পর্যন্তও তা চলেছে। এককথায় গল্পের প্রতিটি চরিত্রকে লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর গণশা—ঘোঁৎনা তো বাংলা সাহিত্যে আরেক অমর সৃষ্টি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় .কবিতাও লিখতেন। তাই হয়তো তিনি তাঁর কাব্যিক সত্তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। মাঝে মধ্যেই কাব্যময়তার প্রভাব পাই তাই এই ছোট গল্পটির মধ্যে। এই রকম কাব্যিক গুণের সন্ধান পাই আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে। আসেল কাব্যিক বুননের মূল কথা হল বাক্যের গঠনকে ভেঙে কবিতার আকারে নিয়ে আসা। বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিভূতিভূষণ ছিলেন অনবদ্য। তাঁর লেখার মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এখানে আমরা তাঁর কাব্যময়তার কতকগুলো উদাহরণ

দেখবো। 'অনুমতি দিন এইবার', 'বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা', 'সেকি! দুৎ, মিছে কথা' তাছাড়া কোন কোন জায়গায় গিয়ে আমাদের মনে হয় আমরা কবিতা পড়ছিনা তো? সেইরকম দু-একটি জায়গা হল—

ক) 'একজন খোনা ছিল।'
'একটা ঘোঁড়া ছিল।'
'তা এখনও হতে পারে।'

খ) 'ওরে শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।'
'কাপড়, জামা, র‍্যাপার শিগগিরি!'
'চা করতে বলেদে, দেরি না হয়।'

এসব ক্ষেত্রে আমরা শুধু বাক্যের গঠন যে শুধু কাব্যের মতন তা তো লক্ষ্য করিই সেই সঙ্গে বাহ্যিক আকারও কাব্যের মত।

বিভূতিভূষণের এই গল্পে উপরোক্ত আলোচিত বিষয় ছাড়াও আরো যে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করা যায় তা হল গল্পটির মধ্যে তিনি অসাধারণ শব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে উপমাব ব্যবহাব ও চোখে পড়ার মত তাঁর এই গল্পে। যেমন 'সতেজ পানার কার্পেট' বিভূতিভূষণ বাংলা ছোটগল্পকে নতুন পথ দেখাতে না পারলেও ভিন্ন স্বাদের সঞ্চার যে ঘটিয়ে ছিলেন তা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি। সবমিলিয়ে তাই বলা যায় 'বরযাত্রী' মূলত উপভোগ্য হাস্যরসাত্মক গল্প।

পীতু : কল্পলোকের ছবি

অপর্ণা সরকার

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে সর্বপ্রথম নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে ছোটদের নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলি, যেখানে রয়েছে বিশুদ্ধ, নির্মল হাস্যরসের ভিয়ান। এদিক থেকে 'রাণু'-র অবদানের কথা পাঠক সমাজ কখনও ভুলতে পারেন না। ১৩৪৪-এর বৈশাখ মাসে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী পাঠকসমাজ ও সাহিত্যরসিকদের চিত্তজয়ে সমর্থ হন তিনি। এরপর থেকে বিভূতিভূষণ নিরন্তর শিশুচরিত্র এঁকে গিয়েছেন। বিচিত্র এই শিশুকুলের মানসজগৎও বিচিত্র। রাণু-পোনু-পীতু-বাদল এরা সকলেই সেই বিচিত্র মানসজগতের বাসিন্দা। শিশুমনোজগতের দিগন্ত রেখাটিকে গল্পকার বারংবার প্রসারিত করেছেন এইসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

শিশুদের জন্য বিভূতিভূষণের নিরন্তর ভাবনা, উদ্বেগ, শিশুচরিত্র চিত্রণে তাঁর অব্যাহত প্রয়াস এবং শিশু-মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে বাংলা গল্প সাহিত্যে শিশুলীলার অদ্বিতীয় কথাসাহিত্যিক রূপে অধিষ্ঠিত করেছে। 'পীতু' গল্পটি সেই অসাধারণ শিশু-মনস্তত্ত্বের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। গল্পটির প্রধান চরিত্র তিনটি—মেজকাকা, তাঁর ভাইঝি ছবি এবং ছবির গুরু পীতু। 'পীতু' গল্পটির আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে পীতুর শিশুমনের বিস্তৃত কল্পনা রাজ্য। সেই কল্পনা রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট সে। তার দেহ বর্তমানের জগতে থাকলেও তার সুদূর পিয়াসী মন দূর বনরেখার ওপারে নীল আকাশের সীমা ছাড়িয়ে কোন্ দূর অতীতের কল্পলোকে পাড়ি দেয়। বুদ্ধিমান প্রবীণ মন সেখানে প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করে, পীতুর শিশুমন যেখানে সমস্ত সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অনায়াসে অতিক্রম করে যায়।

পীতুর বয়স 'চার হইতে সাতের মধ্যে'। কিন্তু মনটি তার অবাক বিস্ময়ে ভরা। পীতুর শিশুমনের আবেগময় বিস্ময়-মাখানো আনন্দের অব্যক্ত অনুভূতি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন গল্পকার। তার কাছে উন্মুক্ত, সুদূর বিস্তৃত কল্পনার জগৎ। রাত্রে গল্প বলতে বলতে মা ঘুমিয়ে পড়লে পীতুর কল্পজগতে যাত্রা শুরু হয়। তখন ভগবান এসে পীতুর চোখে বুলিয়ে দেন তাঁর 'ঘুমের মত ঠান্ডা আর নরম হাত'। তারপরই ভগবানের বাড়িতে পীতুর স্বপ্নাভিসারের সূচনা হয়। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, শিশুমানস নিয়ে যত গল্প রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ, তার চরমোৎকর্ষ ঘটেছে 'পীতু' গল্পে। বস্তুত এই গল্পটি শিশুর স্বপ্ন দিয়ে গড়া ভগবদ্‌লীলার অনাস্বাদিতপূর্ব এক অপরূপ রূপকথা। এক আত্মলীন ভাবতন্ময়তা পীতুকে মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে যায় এক অজানা-অচেনা দূরের দেশে, সেখানে ''কত বড় সোনার বাড়ি! আকাশে-র মত উঁচু।'' এই প্রসঙ্গে অবশ্য বিভূতিভূষণের 'পোনুর চিঠি'-র কথা মনে পড়বে। 'পোনুর চিঠি'-তে ছিল ভগবানের কাছে শিশুর দাবিদাওয়ার কথা। আর 'পীতু' গল্পে আছে ভগবানের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দিবাইতিহাস।

পীতু ও তার শিষ্যা ছবির শৈশবের স্বপ্নলোক মেজকাকার মনেও পরিয়ে দিয়েছে

মায়াঞ্জন। এর তুলনা মেলা ভার। ছবি ও পীতু যেন দুয়ে মিলে এক, উভয়ে উভয়ের স্বপ্নসহোদর। সমগ্র গল্পে পীতুকে আমরা দেখেছি ছবির চোখ দিয়ে। সবজান্তা পীতুর উপর ছবির অগাধ ভরসা এবং সেই ভরসায় সে মেজকাকার মতো সকলকেই সাথী করতে চায়। আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে শিশুমহলের মধ্যে যে একটি অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার আছে, গল্পকার তার দ্বারটি আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ছবির প্রবীণাসুলভ কথাবার্তা ও আচার-আচরণে যে হাস্যোদ্দীপক-সরসতা আছে, তাকে অবলম্বন করেই বিভূতিভূষণ সখ্য-বাৎসল্যের সঙ্গে হাস্যরস মিশিয়ে এক নতুন মিশ্ররস পরিবেশন করেছেন। অবিবেচক বয়স্ক মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সব ধারণাই যে ভ্রান্ত, একথা প্রমাণের জন্যই ছবি সবজান্তা পীতুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। ছবির কাছে তার মেজকার যুক্তি, বুদ্ধি সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ছবি যখন তার মেজকাকে প্রশ্ন করে ভগবানের বাড়ি কোথায়, তখন সেই সরল প্রশ্নের উত্তরে মেজকা বলেন ভগবানের বাড়ি স্বর্গে। কিন্তু ছবির কাছে তার সেই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। তার মতে স্বর্গ ভগবানের কলকাতার বাড়ি, দেশের বাড়ি 'পীতুদের বাড়ির জানালা থেকে ধানবাদে যে পাহাড়টা দেখা যায় না—অনে-ক দূরে', ভগবানের বাড়ি তার পেছনে। ছবির এ ধারণাও পীতুর কাছ থেকে পাওয়া। মোটের উপর সব জিনিষ সম্বন্ধেই পীতুর এই রকম নিজের একটি স্বাধীন মতমত আছে। সত্যিই যেন পীতু-ই ছবির গুরু, পীতুর চোখ দিয়েই সমগ্র পৃথিবীকে দেখে ছবি।

'ছবি' নামকরণের মধ্যেই রয়েছে ব্যঞ্জনা। ছবি আসলে সমগ্র শিশুকুলের প্রতিনিধি। তার মধ্যে দিয়েই শিশুমহলের কল্পনার জগৎ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। পীতু-ছবির কল্পনার জগতে মেজকার মতো আমাদেরও সঙ্গী হওয়ার সাধ জাগে। কারণ এই একটিমাত্র জগতে বয়স্ক মানুষদের অন্তর-বাইরের সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। শিশুর কল্পলোকের মুক্ত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমরা পরম বিলাস অনুভব করি। যদিও সে জগৎ ভ্রান্তির জগৎ, তবু একবার সেই জগতে প্রবেশ করতে পারলে শুধুই আনন্দ, যেখানে দুঃখ-বেদনার স্থান নেই। সেই 'সব পেয়েছির দেশে' আমরা সবাই স্বরাট। সেখানে পীতুর সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ লেনদেন। পরম শিল্পী বিভূতিভূষণ পীতু-ছবির 'দাঁতের আলো'-তেই স্বর্গীয় দ্যুতি দেখতে পান। আমাদের এই কুঁড়েঘরও তখন মেঘের পাখায় ভর করে স্বর্গরাজ্য পার হয়ে যায়। 'পীতু'র স্বপ্নে চোখ ডুবিয়ে আমরাও যেন দেখতে পাই, 'মেঘের রাজ্য অতিক্রম করিয়া, রামধনুর ফটক পার হইযা, কত উঁচুতে—রাত্রে যেখানে তারার জানালা খুলিয়া দিয়া আকাশের ওদিক থেকে দেববধূরা দলে দলে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে'', কতই অবাধে সেখানে পীতু বিচরণ করে।

পীতুর চোখেব মায়াঞ্জন মেখে মেজকাও তাদের জগতে প্রবেশ করতে চান। প্রত্যহ ছবির মুখে তাদের কল্পলোকের কাহিনী শুনে মেজকার মতো আমরাও যেন সত্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু এ সত্যচ্যুতিতে কোন দুঃখ নেই, গ্লানি নেই, বেদনা নেই। মেজকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই বলতে ইচ্ছে করে, ''এ আমার পরম বিলাস; তাই প্রতিদিনের আপনাদের এই গতানুগতিক জীবনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বার বার পড়া একই কাহিনীর মত জীবন যখন ঠেকে নিতান্ত বিস্বাদ, অনুচ্চাবচ সমতলের মত বৈচিত্র্যহীন,

ছবিকে কাছে ডাকিয়া লই, ধানবাদের পীতুর কথা পড়ি।'' শিশুর এই জগৎ 'এক আশ্চর্য স্পর্শকাতরতায় সদাতরঙ্গিত রহস্য-জটিল জগৎ।' পরিণতমনস্ক বয়স্ক মানুষের চেয়ে নিজের জীবন, ভাবনা, এমনকি আজগুবি কল্পনাকেও সে অনেক বেশি সিরিয়াসভাবে গ্রহণ করে থাকে শিশুমন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পীতু ও ছবি। তাদের ভাব-বিশ্বাস-কল্পনার অসংগতি দেখে আমাদের পরিণত মন স্মিতহাস্যে চকিত হয়ে ওঠে। পাঁচ বছরের ছবি এবং 'চার হইতে সাতের মধ্যে পীতু নিতান্ত ছোট্ট দুটি মেয়ে হয়েও নিজেদের খেলাঘরে সকলের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। তাইতো দেখি 'মেজকা'-র উপরে ছবির কর্তৃত্বের একাধিপত্য, মেজকা-র ভুলকে সেই শুধরে দেয়।

শিশুচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মায়ের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও টান। পীতুর সমগ্র কল্পনাজগতের বাইরে, সবকিছুর ওপরে জড়িয়ে আছে তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা। তাই কল্পনায়, বিস্ময়ে, ভয়ে, আনন্দে সে বার বার মায়ের কোলের কাছে ফিরে আসে। যখনই কল্পনার জগতে বহুদূরে পৌঁছে যায়, মায়ের জন্য তার মন কেমন করে। সুনিপুণ শিল্পী বিভূতিভূষণ একদিকে পীতুর শিশুমনের কল্পজগতের বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাব ও রোমাঞ্চকর অনুভূতি এবং অন্যদিকে মায়ের জন্য তার ব্যাকুলতা পরিস্ফুট করেছেন। ''পীতু মাকে বড় ভালোবাসে—ভগবানের চেয়েও।'' মায়ের মুখে ধ্রুবেব গল্প শুনতে শুনতে তার শিশুমন কেঁদে ওঠে। তাই ''পীতু গল্প শুনিতে শুনিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক করিল, মা ঘুমাইলে সে ধ্রুবের মত ঘুমন্ত মায়েব পাশ হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া যাইবে এবং গিয়া বলিবে মায়ের যেন কখনও মোটে একখানি কাপড় না হয়, আর বনে বনে ঘুরিয়া যদি রাত্রে হঠাৎ আসিয়া পড়ে, ভগবান যেন দুয়ারের পাশটিতে চুপি চুপি খাবাব রাখিয়া যান। কাহারও কাছে চাহিতে গেলে মার বড্ড লজ্জা করে, চোখে জল আসে; সে-সময় মাকে দেখিলে বড় কষ্ট হয়।''

পীতুর কাছে তার মা সুন্দরের প্রতিমূর্তি—ঠিক 'দুগ্-গা ঠাকুরের' মত। চাঁদের মত মুখ পীতুর মাব। পীতু অনেকক্ষণ ধরে তার মাকে দেখে ঘুমন্ত অবস্থায়। মায়ের মত সুন্দর জগতে বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। তার ছোট্ট শিশুমনে মাতৃপ্রেম টলমল করে। তার মনে হয়, 'ভগবানের চেয়ে মা অনেক ভাল'। ভগবান তাকে ধ্রুবলোকের লোভ দেখিয়েও ধরে রাখতে পারেন না ''পীতু ভগবানের বুকে ছটফট করিয়া উঠিল। না, সে যাইবে;—তাহার চাই না কিছু—চাই না ধ্রুবলোক। সে মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবে। ভগবান বড় দুষ্ট, ভগবানের চেয়ে মা ঢের ভাল।'' ডানাওয়ালা পরীদের সঙ্গেও পীতু মিলিয়ে দেয় তার মাকে। তার মাও নিশ্চয় আগে পরী ছিল, পরীদের মত তখন তিনি এমনি করে তাকে ডানায় ঢেকে রাখতেন, এখন যেমন তিনি তাকে রাঙা পাড়ের আঁচলে ঢেকে রাখেন।

প্রাচীন বহুপরিচিত উপাখ্যানের চরিত্রদের নিজের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া পীতু-র অপর বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন মধুসূদন দাদার উপাখ্যানকে কল্পনাপ্রবণ পীতু নিজের জীবনে 'আত্মসাৎ' করে নেয়, অবশ্য মূল উপাখ্যানে সেখানে গুরুমহাশয়ের মায়ের শ্রদ্ধ ছিল, 'নিজের গল্পে পীতু খোদ গুরুমহাশয়েরই অন্ত্যেষ্টি ঘটাইয়াছে।' তার কল্পনাশক্তি প্রবল। তাই তো বৃষ্টিপাতের ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় তার বা ছবির—কারোই বিশ্বাস নেই। পীতুর মতে 'ওটা' কতকগুলি

হাতির কীর্ত্তি; তাহারা ভগবানের আকাশের মত বড় পুকুর থেকে কলসী কলসী জল আনিয়া স্বর্গের রাস্তায় ছিটায়, তাহাতেই বর্ষা হয়।' এতেই সে সন্তুষ্ট নয়, আরও আছে—এঞ্জিনের হাঁকডাকের কারণ তার মধ্যে একটি রাক্ষসের বাস, আবার তার-ই একটি ছোট্ট মেয়ে গ্রামোফোনের মধ্যে বসে মিষ্টসুরে গান করে। পীতুর এই কল্পগত মেজকা-র মতো আমাদেরও সবেগে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণ এতই প্রবল সে তার থেকে দূরে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমরাও পীতু ও ছবির সঙ্গী হয়ে তাদের জগতে প্রবেশ করে আনন্দে গা-ভাসাই।

শিশুমনের হাস্যকর অসংগতি ও অদ্ভুত কল্পনা প্রবণতার বিষয় নিয়ে যে কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ, তাদের মধ্যে অন্যতম 'পীতু' গল্পটি। তাঁর হাস্যরসপ্রধান এই গল্পটিতে অকৃত্রিম হাসির নির্ঝর প্রবাহিত হয়েছে। শিশুচিত্তের নানা বিস্ময়কর খেয়াল ও কল্পনার বাস্তব দলিল 'পীতু'। শিশুর অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের হিসাব যে শাস্ত্র রাখেনা, তাকে উপহাসের ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার জন্যই যেন 'পীতু' গল্পটি রচিত হয়েছে। গল্পের নির্মল হাস্যরস পরিতৃপ্ত করেছে আমাদের, এক অপার আনন্দলোকের সন্ধান দিয়েছে। এই আনন্দলোকের অন্ত নেই। শিশুর অবোধ হাসির কাছে পরিণত মানুষের হাসি যেন বিবর্ণ মনে হয়। শিশু মনের ভুলে ভরা, অস্পষ্ট, অর্ধোচ্চারিত কলকাকলির তুলনা মেলা ভার। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি, পরিণত মনে যেটাকে আমরা তুচ্ছ বলে অবহেলা করি, হঠাৎ শৈশবের দৃষ্টিতে সেই তুচ্ছের মধ্যেও সৌন্দর্য-মাধুর্যের অন্ত থাকে না। বিভূতিভূষণের এহেন ছোটগল্পের রসমাধুর্যের সৌরভ আমাদের সচকিত করে, "যেন শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজীর মন্দির সংলগ্ন পাক্‌শালায় চিরন্তন কিশোর-কিশোরীর রসনাতৃপ্তির জন্য, অতি নির্লোভ ভক্তিমান পূজারী শুচিবাসে ও শুদ্ধচিত্তে পায়স-ব্যঞ্জন পাক করিতেছেন। সে পাকের তিনটি রস প্রধান—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।" শিশুর রূপ ধরে স্বয়ং ভগবান যেন তার রসলীলায় আমাদের ঘর-সংসারকে আলোয় ঢেকে দিয়েছেন। আর এখানেই বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য, সফলতা।

রমেশচন্দ্র সেন

(১৮৯৪-১৯৬২)

গল্পকার ও ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র সেনের জন্ম ফরিদপুরের পিঞ্জরী কোটালি পাড়ায়। কবিরাজবংশে জন্মে রমেশচন্দ্র প্রথম জীবনে বাবার কাছে ও পরে কলকাতার হাতিবাগানে সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতশিক্ষা করেন। ইংরিজি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে তিনি এম. এ. পড়া বন্ধ রেখে বাবার মৃত্যুর পর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতেই আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়েই তিনি 'সাহিত্য সেবক সমিতি' নামে একটি সাহিত্য-চক্রের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রথিতযশা লেখকই এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী' (বাং ১৩৫২) বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। পরবর্তী জীবনে লিখেছিলেন দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কুরপালা' ও 'গৌরীগ্রাম'। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'মালঙ্গীব কথা', 'চক্রবাক', 'সাগ্নিক', 'পূব থেকে পশ্চিম'। তাঁর বিখ্যাত গল্পের মধ্যে 'মৃত ও অমৃত', 'তারা তিনজন', 'সাদা ঘোড়া', 'রাজার জন্মদিন' উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরিজি ও চেকোশ্লোভাক ভাষায় তাঁর গল্প অনূদিত হয়েছে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।

ডোমের চিতা : নিবিড় পাঠ

তপোধীর ভট্টাচার্য

ছোটগল্প এমন-একটি শিল্পমাধ্যম সেখানে তাৎপর্য আধার ও আধেয়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়। গল্পভাষা মূলত সংকেত-গ্রথিত ভাষা ; 'গল্প' বা কাহিনি তাতে উপলক্ষ মাত্র। ছোটগল্প আমাদের কাছে কাহিনির উদ্বৃত্তকে তুলে ধরে, বুঝিয়ে দেয়, ভাষার ঐশ্বর্য প্রমাণিত হয় বর্ণনা ও ঘটনার চিরাচরিত গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতায়। আর, অবশ্যই জয়ে-পরাজয়ে উজ্জ্বলতায়-মালিন্যে প্রাপ্তিতে-শূন্যতায় অনন্য মানুষের বিচিত্র রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উন্মোচনে ছোটগল্প ব্যক্ত করে আপন বৈভব।

রমেশচন্দ্র সেনের (১৮৯৪-১৯৬২) 'মৃত ও অমৃত' নামক গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত 'ডোমের চিতা' পড়েও এই কথাগুলি মনে এল। বহুপঠিত লেখক তাঁকে বলা যায় না , বর্তমানজীবী প্রজন্মের কাছে তিনি বিস্মৃত এবং অনালোচিত। রমেশচন্দ্রের 'শতাব্দী' উপন্যাস পড়ে মোহিতলাল মজুমদার যে-চিঠি লেখেন, তার কিছু অংশ সাধারণভাবে তাঁর স্রষ্টা-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রযোজ্য : 'দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ, তেমনই স্থির , কল্পনা অতিশয় সংযত—কোনখানে অতিরিক্ত রং বা মশলা নাই, ভাষাও তদুপযুক্ত। এই ভাষাই রচনাটির জীবন, উহাই আপনার প্রধান কৃতিত্ব। আপনাব দৃষ্টি বা মনোভাব, কল্পনার সমগ্র রূপ রচনার যাহা কিছু কৌশল তাহা ঐ ভাষাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঐ ভাষাই তাহা ধরিযা আছে। সকল শ্রেষ্ঠ রচনার লক্ষণ ইহাই, ভাষাই সব ; প্রেরণা যদি সত্য এবং সম্পূর্ণ হয়, তবে লেখক তাহার উপযুক্ত ভাষাও লাভ করেন—ঐ ভাষাই তাহার মূর্তি, উহাই শক্তি, উহাই আনন্দ।'

'ভাষাই সব'—মোহিতলালের এই মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পভাষা যে রচনাকৌশল মাত্র নয়, তা যে বিশ্ববীক্ষার সূক্ষ্ম ও গভীর দ্যোতনাময় অভিব্যক্তি : 'ডোমের চিতা'র বয়ানে এই সত্য স্পষ্ট হয়েছে। এর গল্পাংশে জটিলতা নেই ; অন্তর্নাট্য আছে পাঠকৃতির অবতলে। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী যারা সবচেয়ে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য—সেই শ্মশানচণ্ডাল বা ডোমদের কথকতা সংবেদনশীল লেখকের প্রতিভার ছোঁয়ায় মানবিক সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। মোহিতলাল যে-ভাষার প্রশংসা করেছেন, তার সহজ সাবলীল চলনে এমন স্বচ্ছতা যে চেতনার তলদেশ পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে পড়েছে। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। জীবনের নিষ্ঠুর শ্বাসরোধী বাস্তব যাতে উন্মোচিত হতে চলেছে, সেই পাঠকৃতিরও প্রারম্ভিক স্তবকে গল্পকার নিসর্গের মধ্যে বুক-ভরা নিঃশ্বাস নেওয়ার অবকাশ খুঁজে নিয়েছেন। ডুবুরি যেমন অতল জলে ডুব দেওয়ার আগে ফুসফুসে পর্যাপ্ত শ্বাস ভরে নেয়, ঠিক তেমনই। 'মৃত ও অমৃত' গল্পের উপসংহারে যে-নিষ্করুণ বাস্তবের মুখোমুখি হই, জীবনের সেই সমূহ অপচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ভাবনার প্রস্তাবনা লক্ষ করি নিসর্গ-খচিত প্রারম্ভিক তিনটি স্তবকে-

'চারিদিকে বিরাট নিস্তব্ধতা, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, জগতের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা যেন ঐখানে গিয়া জমাট বাঁধিয়াছে। বিলের নিকষ কালো জলে তারই প্রতিবিম্ব।

দুইধারে ধু-ধু করে ধানের খেত, মাঝখান দিয়া শালিকরাঙার খাল দক্ষিণে মধুমতীতে গিয়া মিশিয়াছে, উত্তরে ঘাঘরের গাঙে। ধানের স্নিগ্ধ রূপ দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী শস্যের বুকে যেন তাঁর সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন।

দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে, ধানের শীষগুলি একটু একটু নড়ে, কচুরিপানার বেগুনী ফুলের উপর ছোট ছোট পাখি আসিয়া বসে, বসে রঙ-বেরঙের প্রজাপতি।'

একই ভাবে 'ডোমের চিতা'র প্রারম্ভিক স্তবক ও বয়ানের মুখ্য প্রবণতার সঙ্গে আপাতভাবে সঙ্গতিবিহীন :

'ধু-ধু করে প্রকাণ্ড বিল। চারিদিকে জল আর জল। জলের বুকে কচুরিপানার গাদার মাঝে মাঝে রক্তশাপলা ও রক্তকমল। নানারকম ঘাসের বুকে বিচিত্র রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়াছে। কোনটা নীল, কোনটা বেগুনী, কোনটা বা ধবধবে সাদা। উপরে পাখির দল উড়িতেছে—আকাশের গভীর নীলিমার বুকে একটা সুর জাগাইয়া। সমুদ্রের বুকে লাইটহাউসের মত মাঝে-মাঝে দুই একটা বাড়ি দেখা যায়।

একই জলরাশির মাঝখানটায় শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা যেন প্রকৃতির একটা অনিয়ম।'

তাহলে, কেন এমন উপক্রমণিকা? চিত্রকলায় যেমন বৈপরীত্যকে প্রকট করে মূল অন্বিষ্টের প্রতি মনোযোগী করে তোলা হয়, রমেশচন্দ্রও কি গল্পভাষায় সেরকম কোনও প্রকৌশলের আভাস দিচ্ছেন! প্রকৃতির তন্ময় অভিব্যক্তি যেন রূঢ় নিষ্ঠুরতার নিশ্ছিদ্র উপস্থিতিকে আরও একটু অমোঘ ও শ্বাসরুদ্ধকর করে তুলেছে। উদ্ধৃত গদ্যাংশের শেষ বাক্যে যে-বৈপরীত্যকে 'প্রকৃতির একটা অনিয়ম' বলা হয়েছে, সেই অনিয়মই হয়ে উঠেছে এই গল্পকৃতির অবলম্বন। জীবনসত্যকে গল্পকার ঐ বিপরীতের মধ্যে অনুশীলন করেছেন ; মানুষের সার্বিক পরাজয়ের বৃত্তান্ত খুঁজে নিয়েছেন কখনো হার-না-মানা মানবতার অস্তিত্ব-ঘোষণা। মনে পড়ে জীবনানন্দের অসামান্য বাচন : 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায়' কিংবা 'মানব ক্ষয়িত হয় না জাতি ব্যক্তির ক্ষয়ে'। রমেশচন্দ্র যেমন তাঁর এই গল্পে হারু ও বদন নামক দু'জন অন্তেবাসী ডোমের মধ্যে লক্ষ করেছেন মানুষের অনিঃশেষ স্বভাবের 'অমূল্য মুগ্ধতা'। এই পর্যবেক্ষণেব শক্তিতেই 'ডোমের চিতা'র গল্পত্ব প্রতিষ্ঠিত।

দুই

যেমন লিখেছি একটু আগে, রমেশচন্দ্র বর্ণনার অনুপুঙ্খকে দ্যোতনাগর্ভ গল্পভাষায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। জীবনের এত লীলা, প্রকৃতির এত রূপ এই বার্তা নিয়ে গল্পকৃতির প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ তুলে ধরেছিল নানা রঙের ফুলের শোভায় ঋদ্ধ বিশাল জলরাশির কথা। আর ছিল আকাশের গভীর নীলিমার বুকে সুর-জাগানো উড়ন্ত পাখির কথা। এই মুক্তির আবহের উল্টো মেরুতে রয়েছে দুটি রুদ্ধ মানুষের কথকতা। হারু ও বদন বৈপরীত্যের আকর হিসেবে ডোমের কাজ করে। তাদের দিন যায়, রাত আসে একই যান্ত্রিক ও জৈবিক আবর্তনে; পদচিহ্নময় পথ তাদের জন্যে কোনো দিক্ বা গন্তব্যের বার্তা নিয়ে আসে না। প্রকৃতি নিয়মের রাজত্ব নিশ্চয়, আবার তারই মধ্যে অনিয়মের উপস্থিতি নিয়মের অমোঘতাকেই প্রমাণ করে। সমাজ-সংসারের চলমান স্রোতের উপান্তে থেকে হারু ও বদন তেমনই আলো-

আঁধারে দোলায়িত জীবনের দ্বান্দ্বিক স্বভাবকে চিনিয়ে দেয়। এই গল্পকৃতিতে প্রথাগত 'গল্প' সামান্যই; চিহ্নায়িত অনুপুঙ্খের গ্রন্থনায় মর্যাদা পেয়েছে বাচনের উদ্বৃত্ত। ফলে বিবরণও হয়ে উঠেছে সংকেত-গর্ভ।

বহমান বিপুল 'জলরাশির মাঝখানটায় শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা' যেমন নিষ্ঠুর বৈপরীত্যের চিত্রকল্প তৈরি করে, তেমনই জনসমাজ থেকে দূরে শ্মশানের উপযুক্ত পটভূমি রচিত হয়। মানবিক বোধের সজলতা ও প্রাণচাঞ্চল্য যেখানে অনুপস্থিত, সেই প্রেক্ষিতের 'grotesque realism' আরও প্রকট ও শাণিত হয়ে ওঠে নিষ্প্রাণতার ইঙ্গিতবহ অনুপুঙ্খের সম্প্রসারণে : 'ভিটার উপর পাতাহীন মৃতপ্রায় গাছগুলি বিকলাঙ্গ কুষ্ঠীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ওখানে ছড়ানো রহিয়াছে কয়লা, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মানুষের মাথার খুলি।' এই বিকট পরিবেশ যেন মনুষ্যত্বের পরিসীমার বাইরে, স্বভাবের বদলে সেখানে বিকারের আধিপত্য। হারু ও বদন নামে দুটি ডোম ঐ মাদারের ভিটায় কুঁড়ে বেঁধে থাকে; কালো মিশমিশে তাদের গায়ের রং—দু'জনেই প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান। তফাত শুধু এইটুকু হারুর মাথায় বাবরিচুল আর বদনের চুল কদমফুলের মতো চারদিকে সমানভাবে ছাঁটা। এরা বিশ বছর আগে কোথা থেকে এসে সেই শ্মশানে মড়া পোড়ানোর কাঠ যোগান দিতে শুরু করেছিল, তা কেউ জানে না। এরা যেন দুয়ে মিলে এক, অন্তেবাসী শ্মশানচণ্ডাল হিসেবে নির্বিকারভাবে দূরবর্তী কোনো বসতি থেকে বয়ে-আনা মৃতদেহ সংকার করে তারা। পার্থিব অবশেষ নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ তাদের নেই; শোকার্ত আত্মীয়-পরিজনদের আবেগ-অনুভূতি তাদের কাছে অর্থহীন। এরা শুধু একজন আরেকজনকে জানে। গল্পকার এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। 'বাইরের জগৎ এই ডোমদুটির কাছে অর্থহীন। জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবন্ত। তারাই তাদের জীবিকা।'

হারু ও বদনের বেঁচে থাকা যে অপরিচিত কোনো সমাজবদ্ধ মানুষ-মানুষীর নিয়মিত মৃত্যুর ওপর নির্ভরশীল, এই তথ্যের অন্তর্বৃত নিষ্ঠুর শ্লেষ কার্যত গল্পকৃতিতে রূপকের চরিত্র অর্জন করেছে। সাধারণ ভাষা ব্যবহারে আমরা 'জীবন জীবিকা'-তে অভ্যস্ত, অথচ ওদের ক্ষেত্রে জীবিকার সঙ্গে জীবন নিঃসম্পর্কিত। যত বেশি মৃত্যু, তত ওদের জীবিকা স্বচ্ছন্দ। কেননা 'কাঠ বেচিয়া, মাছ ধরিয়া, মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাল, ডাল, ফল-ফলারি সিদ্ধ করিয়া তারা উদরান্নের সংস্থান করে। প্রায়ই উনান ধরাইতে হয় না। চিতার উপর হাঁড়ি চড়াইয়া দেয় বা রুটি সেঁকিয়া লয়।' এমন যাদের দৈনন্দিন জীবন, কোনও ধরনের স্যাঁতসেঁতে আবেগ বা ভাবালুতা তাদের ক্ষেত্রে অবান্তর। গল্পকার সেপথে যানও নি। প্রচলিত সামাজিক কথকতা এদের নিয়ে তৈরি করেননি রমেশচন্দ্র। পাঠককে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, হারু ও বদন নিজেদের মধ্যেও খুব একটা কথা বলেনা, তাদের মুখে হাসি দেখা যায় না। যদি বা কখনও কথা বলে, তাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হলো কোন্ মৃতদেহ কীভাবে পুড়েছে, কোন্টার হাড় কতটা শক্ত। তাদের বিরল হাসি জাগে শুধু মৃতদেহের অস্বাভাবিকতায় এবং এইজন্যে এই হাসি যেন জান্তব হিংস্রতার অভিব্যক্তি। বীভৎসতাই এই গল্পের একমাত্র অবলম্বন। মোটামুটি ভাবে এই হলো গল্পকৃতির ঔপক্রমণিকা।

তিন

গল্পকার এই বিন্দু থেকে শুরু করেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত আখ্যানের নির্মাণ। দু'দিন থেকে কোনও মড়া আসেনি শ্মশানে, তাই তাদের হাঁড়িতেও চাল ছিল না। সমস্ত দিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল বলে একক্রোশ দূরের দোকানে ওরা চাল কিনতে যায়নি, শুকনো ছোলা চিবিয়ে দিনটা কাটিয়ে দিয়েছে। হাতে যেকয়টা পয়সা ছিল, তাতে একবেলার বেশি চলবে না। এই পরিস্থিতিতে হারু বদনকে বৃথাই সান্ত্বনা দেয়। তাদের আহার যোগাতে পারে শুধু মৃতদেহেরা, এই বোধের ভেতরকার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ পাঠককে বিদ্ধ করে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় এই বাক্-ব্যবহার : 'বদন শূকরের মতো অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল, ছাই এরাজ্যে দু-দিনের মধ্যে এক বেটাও মরলনা, মানুষগুলো দিন দিন যেন অমর হয়ে উঠছে।'

অর্থাৎ এদের জৈবিক অস্তিত্ব জান্তত স্বভাবের এবং তাই মৃতদেহের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া এদের মনে অন্যচিন্তা নেই। ক্ষুধার্ত অবস্থায় এরা ঘুমের চেষ্টা করে কিন্তু ঘুম আসে না। মধ্য রাত্রে একজন যুবক কোলে মৃত শিশু নিয়ে একাই শ্মশানে আসে। এই লোকটি জাতিতে পদ্মরাজ, তাই জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাসী সামাজিক অচলায়তনের বিধি অনুযায়ী অন্য নিচুজাতির মানুষেরা পদ্মরাজের মড়া ছোঁয় না। এভাবে গল্পকার বদ্ধ-সমাজের নির্মম বাস্তবতার প্রতিও ইশারা করেন। এতে এই বয়ানের সামাজিক প্রেক্ষিতটি আরও একটু স্পষ্ট হলো। সর্বব্যাপ্ত নিকষকালো অন্ধকারের পটভূমিতে অন্তেবাসী দুটি ছায়াপিণ্ড তুল্য অস্তিত্বের পরিধিতে সম্পৃক্ত মৌল অন্ধকার আরও তীব্র ও দুঃসহ হয়ে ওঠে এতে।

সন্তানহারা সেই যুবক বড়ো গরিব; একটাকার বেশি পুঁজি তার ছিল না। কিন্তু বদন কিছুতেই এক টাকায় মড়া পোড়ানোর কাঠ সরবরাহ করতে রাজি নয়। নিরুপায় যুবকের কান্নায় হারুর মনে করুণা দেখা দেয়, কিন্তু বদন নির্বিকার থাকে। যুবকটি যখন শিশুপুত্রের সৎকার করাতে না-পেরে মৃতদেহ জলে ফেলে দিতে তৈরি, নাছোড়বান্দা বদন দেখল, এক টাকাও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কয়েক বেলার চালের সংস্থান হবে না। তখন 'মড়ার দুখ্খু দেখে গললে চলবে কেন' বললেও শেষ পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে মড়া পোড়াতে রাজি হল। যুবকটি পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে আরও এক টাকা দিয়ে যাবে বলে কথা দিল কেননা ছেলের ঋণ সে রাখবে না। এই সংক্ষিপ্ত এপিসোডে নির্জন নিষ্করুণ শ্মশানের পরিবেশ যেন আরও নিশ্ছিদ্র ও বীভৎস হয়ে উঠেছে। হারু ও বদন—এই দুই ডোমের মধ্যে মনে হয়, হারুর চেতনায় মানবিকতার ক্ষীণ অবশেষ রয়ে গেছে কিন্তু বদনের জান্তব অস্তিত্বে করুণার বাষ্পও নেই। গল্পকৃতি যেন ঠিক এই বিন্দুতে চূড়ান্ত উদ্ভাসনের বীজধান করেছে। উপসংহারে পৌঁছেই শুধু বুঝতে পারি, সংক্ষিপ্ত এই এপিসোডে আসলে ক্লাইম্যাক্সে নিহিত ট্র্যাজিক আয়রনির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

বর্ষণক্লান্ত রাতের শেষ যামে শিশুটির চিতা রচিত হয়েছিল; পরদিন সকালে তা যখন প্রায় নিভে এসেছে, বদন হারুকে একটাকা ও কয়েক আনা পয়সা দিয়ে চাল কিনতে পাঠাল। পাঠক জেনেছেন ইতিমধ্যে, তিনদিন ধরে এরা উপবাসী; সুতরাং চিতা নিভে যাওয়ার আগেই চাল কিনে ফিরে আসাটা জরুরি। নইলে আরও জ্বালানি কাঠ লাগবে অর্থাৎ এতে তাদের মড়া-পোড়ানোর পুঁজিতে টান পড়বে। এ কথায় কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে শিশুটির

বাবার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই বদনের। কেননা প্রতিটি মুহূর্তই বেঁচে থাকার লড়াইতে খরচ হয়ে যায়, অন্য কোনো বিবেচনা তার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। এবার গল্পাকৃতি ধাপে-ধাপে এগিয়ে গেল শীর্ষবিন্দুর দিকে। গল্পকার রমেশচন্দ্র সেন সংহত ভাষায় কথাবস্তুর ক্রমিক আরোহী পথটি নির্মাণ করেছেন। সেইসঙ্গে পাঠকের কৌতূহলও ধরে রেখেছেন। তাঁর শিল্পিত সংযম খুব প্রশংসনীয়; তাই যেখানে আবেগ বিস্ফোরিত হতে পারত, তিনি কার্যত নির্বাক, আপাত-নিরাসক্ত। যে-পাথরে কখনও কোনও আঁচড় পড়ে না, কোন্ মর্মবিদারী আলোড়নে তার অন্তর্লোক ছিন্ন-ভিন্ন করে শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে—তা অনুভব করার দায়িত্ব সংবেদনশীল পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন গল্পকার। রূঢ় ও নিষ্করুণ বাস্তবের চাপে জান্তব আত্মরক্ষার তাগিদে মানবিক সত্তাকে যতই আড়াল করুক, শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে মানুষের একান্ত নিজস্ব স্বভাব আর সম্পর্কের নিহিত দুর্গতি ও উত্তাপ—এই বার্তাই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন রমেশচন্দ্র।

চার

এই নিরিখে 'ডোমের চিতা'র শীর্ষবিন্দুগামী পর্যায়ের শিল্পিত নির্মিতি নিবিড় পাঠ দাবি করে। হারু চাল আনতে যায় কিন্তু সময়মতো ফেরে না। একসঙ্গে সব কথা জানানো হয না। নিজের শক্ত মুঠোয় সুতো ধরে রাখেন গল্পকার, একটু একটু করে শিথিল কবেন মুঠো আর তাতে সুতোর শেষ প্রান্তে বাঁধা গল্পবস্তু ও গল্পভাবনার ঘুড়ি অল্প-অল্প করে মন্থর ভাবে হাওয়ায় ওড়ে। আমরা তার মৃদু লয়ে তালে গাঁথা জীবনসঙ্গীতের সুর শুনি। নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে হারু ফিরে না আসায় বেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বদনেব ক্ষুধা বাড়তে লাগল। স্বভাবত অধৈর্য হয়ে সে হারুর উদ্দেশ্যে গালাগাল দিতে শুরু করল। গল্পকাব আমাদেব জানিয়েছেন শুধু যে আগের দিন সে উপবাসী ছিল তা নয়; এর আগেও বেশ ক'দিন পেট-ভরা খাবার জোটেনি। ছোটগল্পের নিজস্ব শিল্পভাষার সূক্ষ্মতা এই পর্যায়ে লক্ষণীয। তাদের একমাত্র ডিঙিটা হারু নিয়ে গিয়েছিল বলে রিক্ত শ্মশানের পটভূমিতে নিতান্ত নিরুপায় ভাবেই রুদ্ধ হয়ে রইল বদন। 'চারিদিকে অসীম জলরাশির মধ্যে বদন একা বসিয়া আছে'—এই বিবরণ যেন সংকেতগর্ভ। একদিকে এক-পা-ও নড়তে না পাবার মতো পরিস্থিতি, অন্যদিকে সর্বগ্রাসী জান্তব ক্ষুধা। হারু ফিরে না এলে এই ক্ষুধাই বদনকে জীর্ণ কবে ফেলবে। এইটুকু পড়ার পরে পাঠকের মনেও খটকা জাগে, হারুর না ফেরার তাৎপর্য বুঝতে উৎসুক হয়ে ওঠে মন। কিন্তু, একটু আগে যেমন লিখেছি, গল্পকার নিতান্ত বিলম্বিত লয়ে পাঠককে তুঙ্গ-মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত করেছেন। একটু একটু করে জমে-ওঠা আততিকে ঈষৎ লঘু করার প্রয়োজনেই যেন প্রাকৃতিক অনুপুঙ্খ ব্যবহৃত হযেছে।

সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ আর দু'একটা কাকের ডাক ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মতো মধ্যে মধ্যে বদনের নিষ্ফল গর্জন তার নিরুপায় অবস্থানকেই প্রকট করে তুলেছে। দুপুরের পরে বৃষ্টি একটু কমে এলে সে একটা ন্যাড়া গাছের উপরে উঠে বিলের দিকে তাকিয়ে জেলে ও বেদেদের নৌকো দেখতে পেল, শুধু ডিঙিটা কোথাও নেই। হারুর নাম ধরে ডেকেও কোনও সাড়া মেলে না। এইসব সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসলে তুঙ্গ মুহূর্তের দিকে গল্পকৃতির যাত্রার দ্যোতক। বিকেলের দিকে

বদন শুধু দুর্বলই হলোনা, হারুর ওপর রাগ কমে গিয়ে দেখা দিল ভয়। অথচ সঙ্গীর খোঁজে যাওয়ার কোনও উপায়ও তার নেই। কয়েকবার হারুর নাম ধরে ডাকার পরে দূর থেকে একটা শকুন সাড়া দিল। এই অনুপুঙ্খটি যেন বিপর্যয়ের সূচক হিসেবে চিহ্নায়িত। পরদিন সকালে একটি স্ত্রীলোকের শব নিয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন। কাঠ নিয়ে আসার জন্যে এদের নৌকোটি চেয়ে নিল শ্রান্ত, অভুক্ত, শঙ্কিত বদন।

এবার ঘনিয়ে এলো গল্পাকৃতির তুঙ্গ মুহূর্ত। একঘণ্টা পরে কাঠের বদলে নৌকোর সঙ্গে হারিয়ে-যাওয়া সেই ডিঙিটা বেঁধে নিয়ে ফিরে এল বদন। ডিঙিতে রয়েছে হারুর মৃতদেহ। পাতিয়ার বিলে হারুর হাতে ছোবল দিয়েছে সাপ। হারুর শব ফুলে গেছে এবং সাপের বিষে নীল হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। দেখা গেল সের দশেক লাল মোটা চাল ও কয়েকটি কই মাছ জোগাড় করেই ফিরে আসছিল হারু। ক্ষুধার অন্ন এসেছে বদনের জন্যে, শুধু দীর্ঘ উপোসের পরে খাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্যে হারু ফিরে আসেনি। এই পরিস্থিতিতেও মিতবাক গল্পকার অসামান্য শিল্পিত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। কই মাছগুলি হারুর মৃতদেহের দু'চার জায়গা খেয়ে ফেলেছে এবং পাখির ঠোকরে তার শব ক্ষত-বিক্ষত : এই বর্ণনায় কেবল অন্তর্বৃত কারুণ্য নেই; আছে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক বিপর্যাস জনিত নির্মম কূটাভাসও।

পাঁচ

এই মুহূর্ত থেকে বদনের মধ্যেও যে প্রকৃতিগত দ্রুত রূপান্তর সূচিত হয়েছে, তা গল্পকারের দু'একটি ইশারায় বুঝে নেওয়া যায়। বিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হারুর অপঘাত মৃত্যুতে তার কঠিন নির্মোকের অন্তরালে যে মানবিক বেদনার ফল্গুধারা বয়ে যেতে শুরু করেছে, তার ইঙ্গিত পাই আত্মমুখী নীরবতায়। স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ সংকারের জন্যে ভিটার একটি মরা গাছ সে কেটে ফেলে এবং শবানুগমনকারী ভদ্রলোকের সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়। বদনদের জন্যে সংযোগের প্রয়োজন অনাবশ্যক; রাষ্ট্র ও সমাজ অপ্রাসঙ্গিক। তাই থানায় খবর দেওয়ার পরামর্শ সে গ্রহণ করে না। সবাই চলে যাওয়ার পরে সেই শ্বাসরোধী নির্জনতায় হারুর জন্যে পরম যত্নে চিতা সাজিয়ে নেয় বদন। 'ডোমের চিতা' নামকরণ যেন অভিধার পরিধিকে ছাড়িয়ে যায়। নিঃসঙ্গ সেই শ্মশানে একজন ডোমই অন্য আরেক ডোমের মহাপ্রস্থানের আয়োজন করতে পারে। পারাপারহীন নির্জনতায় এই প্রথম প্রকৃত বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করে বদন।

অন্তিম পর্যায়ে চিতার বিবরণেও রমেশচন্দ্র সেন রৈখিকতা পরিহার করেছেন। চিতার ধোঁয়া সাপের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশে উঠতে থাকে যখন, তাতে নীল রঙের আভা দেখা যায়। বদন ডোমের কাজ করতে করতে কখনও এত ধোঁয়া দেখেনি। এই ধোঁয়ায় দৃষ্টি যে ঝাপসা হয়ে আসে, এর কারণ, হারুকে শেষ বিদায় জানাতে গিয়ে বদনের প্রকৃত মানব-স্বরূপে নিহিত হিমশৈল অঝোরে গলতে শুরু করেছে। আর, সেই বিগলিত করুণা চোখের উপত্যকায় বিন্দুবিন্দু অশ্রু হয়ে ঝরতে চাইছে। এই করুণ আবহকে গল্পকারের দার্শনিকতুল্য বয়ান, আপাত-নৈর্ব্যক্তিক ও আপাত-বিপ্রতীপ বিবরণের মধ্য দিয়ে যেন আরও মর্মভেদী করে তুলেছে

'সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য আগুনের হলকা ঢালিয়া দিতেছিল। হারুর চিতার ধোঁয়া সূর্যের জ্যোতিকে ম্লান করিল। তারপর চিতার বুক হইতে উঠিতে লাগিল

লোলজিহ্বা অগ্নিশিখা, যেন কতগুলি লাল সাপের ফণা; ক্রুদ্ধ তার গর্জন, অফুরন্ত তার হিংসাবৃত্তি।' এই লোলজিহ্বা অগ্নিশিখা আসলে বদনের মনের গভীরে ঝড়ের মাতনের প্রতীকায়িত অভিব্যক্তি। সর্বব্যাপ্ত এই দহনে সব অবলম্বন, সব গ্রন্থি ছাই হয়ে যায়। তবু অক্ষুণ্ণ থাকে বদনের বাস্তব, জৈব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের অভ্রান্ত প্রক্রিয়া।

অতএব সর্বাত্মব্যাপ্ত নিঃসঙ্গতার চাপ দূর করতে বদন নিজের সঙ্গেই কথা বলে এবং বন্দাদনকার সখা হারানের চিতায় ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দেয়। হাঁড়িব ভেতরে চালের সঙ্গে গোটা দুই মাছ সিদ্ধ হতে থাকে যখন, গল্পকৃতি বর্ণনাতিযাসী বাচনের উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরশীল হয়। বয়ানের সূচনায় যেভাবে নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ ব্যবহৃত হয়েছিল, যেন সেই বিন্দুতে সিন্ধুর মতো আখ্যানবৃত্তের আপাত পূর্ণতার দ্যোতনা বয়ে আনে। যেন আভাসে বুঝিয়ে দেয় সীমায়িত মানুষের জীবন-মৃত্যু মূলত অমোঘ প্রাকৃতিক সত্য ও নিয়মের অঙ্গ। তবু শিল্প সৃষ্টির তাগিদে যেতে হয় ঐ সীমায়িত মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আপাত-তুচ্ছ সসীম অনুপুঙ্খ বিন্যাসে। লক্ষ করতে হয়, প্রকৃতির বিপুল নিস্পৃহ নিরপেক্ষ প্রেক্ষিতে ভাঙা-মানুষ অণু-মানুষ বিন্দুর মতো হলেও আখ্যানের শিল্প তাকেই তাৎপর্যবহভাবে অভিনিবেশের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। 'ডোমের চিতা'র গল্পকৃতির উপসংহার-সূচক বাক্যগুলি-এর অভ্রান্ত প্রমাণ দিচ্ছে। 'ফুটন্ত ভাতের টগবগানি, চিতার চড়্-চড়াৎ শব্দ—তাছাড়া সবই নিস্তব্ধ'—অন্তিম পর্যায়ের এই প্রথম বাক্যটি গূঢ়ার্থবহ বৈপরীত্যের স্মারক। নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতাকে ঘনতর করে তুলেছে একই বাস্তবের দুটি ভিন্নমুখী উপস্থিতির অন্তর্নাট্য 'ফুটন্ত ভাতের টগবগানি' যেন চলমান জীবনের দাবির স্মারক, যার সঙ্গে এই ছোটগল্পে একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে উল্টো-পিঠে-থাকা মৃত্যু, 'চিতার চড়্-চড়াৎ শব্দ'। জীবন ও মৃত্যু যুগপৎ সম্পৃক্ত ও বিযুক্ত : এই সত্যের অভিঘাতে সর্বগ্রাসী হয়ে পড়ে শুধু হিমশীতল নিস্তব্ধতা। আর, এই সূত্রে রমেশচন্দ্র ফিরে যান তাঁর পারিবেশিক দর্শন ভূমিতে :

'ঊর্ধ্বে অনন্ত নীল আকাশ, চারধারে সীমাহীন জলরাশি—তার মধ্যে বাতাসের তালে তালে ঘাসের পাগল নৃত্য, উচ্ছল জলের সাবলীল ভঙ্গী।'

অর্থাৎ নিচে, মাটির পৃথিবীতে, মানুষের ক্ষুধা-মালিন্য-মৃত্যু-বিচ্ছেদের যে পালাবদল চলেছে—তাতে ঐ অনন্ত ঐ সীমাহীন ঐ উচ্ছল জলের কিছু যায় আসে না।

গল্পকার তাই এবার এগিয়ে এসে দুয়ের মধ্যে বিনিসুতোর মালা গেঁথে লেখেন। 'দূরে আকাশের বুকে বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকাল-সূর্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল।' যেন 'জলরাশির মাঝখানটায় শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা' আর 'প্রকৃতির একটা অনিয়ম' হয়ে রইল না। বরং ঐ ভিটা হয়ে উঠল প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতীক। এতে গল্পকৃতি সমৃদ্ধতর হয়েছে নিঃসন্দেহে। এই উদাসীন প্রকৃতির পটভূমিতে, জল ও আগুনের নিগূঢ় দ্বিবাচনিকতায়, গ্রথিত হলো মানুষের করুণার্দ্র সংরূপ। অন্তিম বাক্যে সমস্ত অপেক্ষমাণ মূর্ছনা যেন ব্যক্ত হলো : 'চিতার দিকে চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।' কেননা সমস্ত আখ্যানই মানুষের সম্পর্কের, ভালবাসার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বীবভূম জেলার লাভপুব গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত জীবনের (স্বদেশী আন্দোলনে যোগ, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আজন্ম) চাকরি, ব্যবসা বা জমিদারি দেখাশোনার কাজে যুক্ত থাকলেও পরবর্তী জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবেই সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত করেন। জন্মসূত্রে বীরভূম এবং কিছুকাল ব্যবসা সূত্রে কয়লাখনি বসবাসের জন্য তিনি সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের জীবনযাত্রা বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। জমিদারী ব্যবস্থাকে গ্রাস করছিল ধনতন্ত্র। এক সংঘাতের সামনে এক সম্প্রদায় বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল সামন্ততন্ত্র উদীয়মান ধনতন্ত্রে তথা পুঁজিবাদী বাজারী সভ্যতার কাছে। আর সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে মূর্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর কবিতা এবং নাটকের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'মারাঠাদর্পণ' নামে একটি নাটক এবং ১৯২৬ সালে 'ত্রিপত্র' নামে একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর ১৯২৮ সাল থেকে কল্লোল, কালিকলম-এর সঙ্গে যুক্ত হবার সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনায় বিশিষ্টতা ফুটে উঠতে থাকে।

সাহিত্যিক রূপে তারাশঙ্করের আত্মপ্রকাশ ১৩৩৪ সালে ; 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' (আষাঢ় ১৩৩৪) ও 'উল্কা' (আশ্বিন ১৩৩৪) এবং কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত 'রসকলি' (ফাল্গুন ১৩৩৪) গল্প তিনটি তাঁর সাহিত্যানুশীলনের প্রথমপর্বে রচিত। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯২৮)। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬) তারপর 'জলসাঘর', 'তিনশূন্য', 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি সবর্মিলিয়ে ৪০টিরও বেশি গল্পগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

১৯৬১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমী পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কালাপাহাড় : 'না-মানুষে'র মানবায়ণ

রীতা মোদক

পশুপাখি-জীবজন্তুর মনস্তত্ত্ব নিয়ে মনোবিজ্ঞান কতটা গবেষণা করেছে জানিনা, কিন্তু সাহিত্যে এ বিষয়ে আলোকপাত হয়েছে বহু। ঈশপস্ ফেবলস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু 'না-মানুষ' চরিত্র আলোচিত হয়েছে সাহিত্যে—না-মানুষ হয়ে উঠেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় কিছু পশুচরিত্র রয়েছে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পের সর্বশী-পাঙ্গুলী মূক সুভাকে প্রকৃতির বালিকা করে তুলেছে, অভিজ্ঞান শকুন্তল-এ হরিণশিশু, নারায়ণ সান্যালের 'গজমুক্তা'র হাতি, 'না-মানুষের পাঁচালী'র বাদুড়, বীভার, কুসিমাঙ্গি প্রভৃতি, লীলা মজুমদারের বেড়াল, সত্যজিৎ রায়ের অসমঞ্জবাবুর কুকুর, রমেশচন্দ্র সেনের সাদাঘোড়া ইত্যাদি। আবার চিল, পেঁচা, ইঁদুর জীবনানন্দের কাব্যে দারুণভাবে প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালাপাহাড়' গল্পে কালাপাহাড়কে যেভাবে এঁকেছেন তা এককথায় অতুলনীয়।

রংলাল বড় চাষী, জমিজমা যেমন প্রচুর, তেমনি গোয়ালে তার গরুও আছে বেশ বড় বড়। কিন্তু সেরকম গরু আরও অনেকেরই আছে। তাই রংলাল এমন একজোড়া 'সর্বাঙ্গসুন্দর' গরু কিনতে চায় 'এ চাকলার মধ্যে তাহার গরুর মত গরু যেন আর কাহারও না থাকে'। পুত্র যশোদার যুক্তিপূর্ণ বারণ ও স্ত্রীর অনিচ্ছাকে এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত রংলাল গরু কিনতে যায়। কিন্তু হাট থেকে কিনে আনে একজোড়া মোষ। বলশালী এক সাংঘাতিক সুন্দর মোষদুটি দেখে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কিনে ফেলে। আসলে দৃষ্টিটাই তার যে উঁচু। দুটি মোষ—কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে নিয়ে বছর তিনেক খুব ভালো চাষবাস চলল রংলালের। কিন্তু একদিন জঙ্গলে বাঘের মুখ থেকে তাকে বাঁচাতে বাঘের আক্রমণেই কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হয়। সাথীহারা কালাপাহাড় দেখতে দেখতে ভয়ংকর এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোষটিকে বিক্রির করে দিতে বাধ্য হয় রংলাল। কিন্তু প্রভুভক্ত কালাপাহাড় অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করে না। নতুন প্রভুর আওতা থেকে বেরিয়ে রংলালের কাছে ফিরতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। শহরের অচেনা রাস্তায় বিভ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছোটাছুটি করে। চিহ্নিত হয় 'পাগলা মহিষ' বলে। গল্পের শেষটি ভারী চমৎকার এঁকেছেন তারাশঙ্কর কালাপাহাড়ের পরিণতির রং দিয়ে—

> "সাহেব রিভলবারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কনেস্টবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকা বোলাও।
>
> "সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই। বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে শান্ত হয়, তাহা না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।"

রংলাল সম্পর্কে একথা বলে গল্পটি শুরু। এবং চরিত্রটি আলোচনার জন্য উদ্ধৃত অংশটি একান্ত অপরিহার্য। বেশ অবস্থাপন্ন চাষী রংলাল এবং তার জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর, চাষের উপর যত্নও তার ততোধিক, 'বলশালী প্রকান্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না।' নিজের কাজের ব্যাপারে যেমন একশভাগ সচেতন, তেমনি সচেতন নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে। আগেই বলেছি রংলাল একজন বড় চাষী। সেই সেন্টিমেন্টও গল্পের প্রথম দিকে ভীষণভাবে রয়েছে। গোরুর উপর তার সখ যেমন খুব, তেমনি যেমন তেমন গোরু হলেও চলবে না। তার গোরু হবে সর্বাঙ্গসুন্দর—"কাঁচা বয়স, বাহারে রং, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। এবং শুধু তাই নয়, তেমন সুন্দর গোরু এলাকার আর কারও যেন না থাকে। শিক্ষিত পুত্রের সঙ্গে এ নিয়ে মতান্তর হয়। পুত্র যশোদা বোঝায় আপাতত যেহেতু ভালোভাবেই চলছে, তাই সামনের বছর গোরু কিনলেই চলবে। কিন্তু এখানেও রংলালের একগুঁয়েমি জিতে যায়। অবশ্য তার যুক্তিটিও তার দিক থেকে অকাট্য হয়ে ওঠে—'লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।' বড় চাষীর গর্বের সাথে সাথে রংলালের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা আমরা অনুভব করি। পাচুন্দির হাটে গিয়ে মোষ কেনার মধ্য দিয়েও আমরা এই পরিচিত রংলালকে লক্ষ্য করি। মোষ সম্পর্কে পাইকারেব বক্তব্য—'একে লেবে ভাই রাজায় জমিদারে,........'। রংলালও প্রশংসমান দৃষ্টিতে মোষদুটির দিকে তাকায় যা থেকে যথার্থই তার উচ্চদৃষ্টি পড়ে নিতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না—

> "দেহের অনুপাতে পা-গুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ-মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিতে হইবে! কী কালো রং! নিকষের মতো কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!"

শুধু কার্যকারিতা নয়, দারুণ সৌন্দর্যবোধ ও মমতার স্পর্শও উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে অনুভূত হয়।

ভেতরে ভেতরে রংলাল যে খানিকটা দুর্বল ও ভীত তাও বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। যেমন, শিক্ষিত পুত্র যশোদাকে এমনিতে সে যথেষ্ট সমীহ করে চলে। রংলাল সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব জটিল চরিত্র কখনোই নয়। কিন্তু খুব সাধারণ কিছু মানসিক দ্বন্দ্ব তার মধ্যে দেখি। যেমন, পছন্দের তাড়নায় বড় বড় দুটি মোষ কিনে ফেলে এবার সে যথার্থই ভীত। ভালো গোরু থাকতেও শুধুমাত্র নিজের প্রতিপত্তি ও সামন্ততান্ত্রিক মেজাজ রক্ষা করতেই যে এ দুটো কেনা এটা সে ভালোই অনুভব করেছে। তাই এ নিয়ে তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। একদিকে কল্পনা নেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস দৃষ্টি মনে করে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লেখাপড়া জানা ছেলের যুক্তির কথা ভেবে ভয় হয়, আর স্ত্রীতো মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়।' এই মানসিক টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে শেষে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—"কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে?......' এসবের ভেতর থেকে যে রংলাল বেরিয়ে আসে সেই-ই

আসল—'মাটির মানুষ', ধরিত্রীর বুকের ভেতরের অমৃতরসের সন্ধান যেন তারই জানা—

> "মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন।"

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করে স্তিমিত হয়ে পড়ে ও মনে মনে তাদের জন্য তোষামোদ বাক্য রচনা করে নেয়।

পশুর প্রতি প্রীতি রংলাল চরিত্রে আর এক নতুন মাত্রা যোগ করে। গোরুদের নানাভাবে আদরযত্ন করে শুধু নয়, নানা বাক্যালাপও চলে কালাপাহাড় কুম্ভকর্ণের সাথে। খাটাখাটানি বেশী হলে তাদের পা টিপে সেবাও করে, কালাপাহাড়-কুম্ভকর্ণকে নিয়ে নদীর ধারে যায়, ওরা ঘাস খায়, রংলাল গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। দূরে চলে গেলে 'আঁ-আঁ' বিচিত্র শব্দে ডাকে, মোষ দুটাও অবিকল 'আঁ-আঁ' শব্দে সাড়া দিয়ে চলে আসে। এই যে পশুর ভাষায় পশুর সাথে ভাববিনিময়—এ কাজ সবার নয়। যখন যুদ্ধ বাধে কালাপাহাড়-কুম্ভকর্ণের মধ্যে তখন পিটিয়ে যুদ্ধ ছাড়ায় এবং শাস্তি স্বরূপ বিচ্ছিন্ন করে অনাহারে রাখে সে দিন। পরের দিন আলাদাভাবে স্নান করিয়ে খাইয়ে তবে তাদের মিলিতে দেয়। আপন অস্তিত্বের সাথে অভিন্ন দেখে তাদের অস্তিত্ব। সেজন্যই অনেক উপদেশ দেয়—'ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই! একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবি—তবে তো।' সেজন্যই বাঘের মুখে পড়লে আত্মরক্ষার জন্য রংলাল আহ্বান করে মোষদেরই। তারাও অদ্ভুত কৌশলে আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করে দেয় বাঘকে। শেষ পর্যন্ত প্রভুর প্রাণ-রক্ষার্থে মারা যায় কুম্ভকর্ণ। কালাপাহাড় এরপর ভয়ংকর হয়ে উঠলে দামের পরোয়া না করে যোগ্য জোড় কিনে আনে। কোনোভাবেই কালাপাহাড়কে শান্ত করতে না পারলে যশোদা বেচে দেওয়ার কথা বলে। এক্ষেত্রে বাস্তবে সেই সিদ্ধান্ত নিলেও রংলালের আন্তরিক যন্ত্রণা আমরা অনুভব করি। প্রথমবার কালাপাহাড় বিক্রি না হওয়ায় তার আনন্দও কালাপাহাড়ের প্রতি ভালোবাসার আর এক প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতেই হয়। কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল ঝরে। এবং কালাপাহাড়েরও শেষে যে তার প্রতি মনোভাব পাই তাতেই পশুপ্রীতি ব্যাপারটি আরও গভীরভাবে তার চরিত্রে যুক্ত হয়। গৃহস্থের উচ্চদৃষ্টি, সারল্য ও পশুপ্রীতি সব মিলিয়ে চরিত্রটি সাবলীল স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর।

অভিভূত হতে হয় কালাপাহাড় চরিত্র পাঠে। আসলে আমাদের অভ্যস্ত চোখ যখন জন্তুকে জন্তুর মতো দেখতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে, সেখানে কালাপাহাড় আমাদের একশো আশি ডিগ্রি ঘুড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। কী অসম্ভব প্রভুভক্তি! অবশ্য একই কথা প্রযোজ্য কুম্ভকর্ণ সম্পর্কে। সে তো নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করেছে রংলালের জীবন। তবে কুম্ভকর্ণ মরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কালাপাহাড়ের আচরণ মোটামুটি পরিচিত, স্বাভাবিকও। রংলাল আদর বা তিরস্কার করলে বোঝে। নিজেদের মধ্যে মারামারিও করে। রংলালের 'আঁ আঁ' ডাকের সাড়া দেয়, উপদেশ শোনে ও মানে। তবে এ সবই পরিচিত একই আচরণ-- যে কোনো পশুই করতে পারে। তা সত্ত্বেও চেহারায় ক্ষমতায় ও আচরণে স্বাতন্ত্র্যটুকু না বললে নিলেই নয়।

চেহারার বিশেষত্ব—'এ কি মহিষ না হাতি?' 'এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্য এখন লোক খোঁজ!' 'বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ, লাঙল বড় করলেই

জানোয়ার জব্দ! এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।' চেহারাও বলিহারি, দেহের তুলনায় পা খাটো, কিন্তু বিশ-মণ ওজন অনায়াসে তুলে নেবে। আর কী কালো রং! নিকষের মতো কালো। শিঙ দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি।' মোষ শুনে যশোদার মা যারপরনাই বিরক্ত হলেও দেখা মাত্র ভাব পাল্টে যায়—

> "যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।"

রংলালের অত্যন্ত বশংবদ মোষ দুটো। নদীর ধারে তাদের চরতে দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দূরে চলে গেলে 'আঁ-আঁ' করে ডাকে, তারাও সাড়া দিয়ে চলে আসে, মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ায় যেন প্রশ্ন করে 'ডাকিতেছ কেন?' রংলালের শাসনের পর কাছাকাছিই থাকে। চেহারা অনুযায়ী ক্ষমতাও তাদের অনেক—

> 'মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকান্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকান্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুইধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে; রংলাল হাসে।"

সবার চেয়ে সে 'সম্পন্ন'—রংলালের এ অহংকারের মর্যাদা দেয় কালাপাহাড়-কুম্ভকর্ণ। আবার নিজেদের মধ্যের যুদ্ধের সময় রংলাল দুর্দান্ত পিটিয়ে শাসন করে। যুদ্ধের বর্ণনাও ভারী চমৎকার। একই সাথে পরিস্ফুট হয় মোষের রাগের মুহূর্তের বাস্তব চিত্র—'উহারা যুযুধান অসুরের মতো সামনা সামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন শিং উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়।' আবার কৌশলে বাঘকে দু'দিক থেকে ঘিরে ধরে শৃঙ্গাঘাতে কাহিল ও মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের যে প্রভুভক্তি ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মানসিকতা ধরা পড়েছে তা প্রশংসনীয়। মোটামুটি এ পর্যন্ত আলোচনায় কালাপাহাড়ের সঙ্গে অনেকটা কুম্ভকর্ণের কথাও মিশে থাকে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর যে কালাপাহাড়কে আমরা পাই সে সত্যিই অনন্য।

> "বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ-আঁ করিয়া চিৎকার করে আর কাঁদে।"

রংলাল অনুভব করে জোড় না হলে কালাপাহাড় থাকতে পারছে না। কিন্তু রংলালের আনা নতুন মোষকে জোড় হিসেবে মানে না। দীর্ঘদিনের সঙ্গীর বদলে হঠাৎ নতুন সঙ্গীকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করে এবং রংলাল যখন কোনো ক্রমে কালাপাহাড়কে আয়ত্তে আনে তখন নতুনটির শেষ অবস্থা। উত্তরোত্তর অশান্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাকে বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম বিক্রির দিন পাইকারের সাথে কিছুটা গিয়েই আবার ফিরে

এসেছে। নতুন সঙ্গী নতুন মালিক কিছুই তার পছন্দ নয়। আর এর মধ্যে দিয়ে মানবিক সম্পর্কের বন্ধনের বিষয়টা পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অথচ মানুষ রংলালের যতই কষ্ট হোক বাস্তব পরিস্থিতির কাছে হার মানে। কিন্তু অবোধ-অবুঝ পশুতো তা বোঝে না। তাই বারবার ফিরে আসতে চায়।

শেষ পর্যন্ত দূরের হাটে বিক্রি হয় কালাপাহাড়। রংলালের কথা মতো সে ফেরার পরই পাইকার কালাপাহাড়কে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অপরিচিত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে সে যাবে কেন? তাই বারবার 'আঁ-আঁ' শব্দে প্রভুকে ডাকে। পাইকার আবার যাবার জন্য আঘাত করে—'কালাপাহাড় পাগলের মতো চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।' কিন্তু 'কই, সে কই? নাই, সে তো নাই!' এবার দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উর্ধ্বমুখে বাড়ির দিকে ছুটে আসে, সঙ্গে পরিচিত আঁ-আঁ ডাক। পাইকার লোক জড়ো করে আটকাতে পারে না। 'দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠি বর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল'। কিন্তু সবকিছু যে তার অপরিচিত—রাস্তা, দোকান, জনতা, ঘোড়ার গাড়ীকে দেখে ভয় পেয়ে ছুটল পাশের রাস্তায়। এমন সময় একটা মোটরকার আসছিল, আর কালাপাহাড় তার 'মনশ্চক্ষে' দেখছিল আপনার বাড়ী ও রংলালকে। 'মনশ্চক্ষে' কথাটা ভাবায়। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জন্যই তো মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা মনে হয়। কিন্তু কালাপাহাড়ের মন আছে। পশুত্বকে অতিক্রম করে তার যে মানবায়ণ তা একদম শেষে আরও স্পষ্ট হয়। আমরা ভুলে যাই সে পশু। মনশ্চক্ষে বাড়ী দেখা, রংলালকে খোঁজা—এ যেন দুর্দান্ত-ডানপিটে শিশুর বাড়ি থেকে হারিয়ে অপরিচিত জনবহুল স্থানে দিশেহারা হয়ে যাওয়া—

> "লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ-আঁ-আঁ! কিন্তু একী! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায় কতদূর তাহার বাড়ী?
> আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল
>
> . . . .
>
> মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচন্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল।—কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।"

এই যে কালাপাহাড় প্রতিমুহূর্তে ভাবছে এটা তার বাড়ির রাস্তা, আবার ভাবছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, মোটরগাড়িকে অপরিচিত জানোয়ার ও প্রতিপক্ষ মনে করে 'ক্রুদ্ধ বিক্রমে' তার সাথে লড়ার জন্য দাঁড়ানো—এই মানসিক অনুভবগুলি সরাসরি কালাপাহাড়ের মধ্যে এঁকে তারাশঙ্কর চরিত্রটির মানবায়ণ ঘটিয়েছেন এবং চরিত্রটি ভীষণ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়ে টলতে টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর

পুলিশ সাহেবের একটি ছোট্ট কথা 'ডোমলোগকো বোলাও'। অর্থাৎ ডোমরা নিয়ে যাবে কালাপাহাড়কে। কিন্তু 'কালাপাহাড়' চিরস্মরণীয় হয়ে থেকে যাবে পাঠকের মনে। যাবেই। এখানেই গল্পটির গল্পত্ব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের রূপরীতি সম্পর্কে প্রচলিত মতের থেকে একটু ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষ সবার আগে গল্প চায়। তাঁর গল্পের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিণতির ছেদ আছে। আধুনিক আর্টের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হল স্বাভাবিক পরিণতির আগেই অসমাপ্তির মধ্যে ইঙ্গিত টেনে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন যে গল্প সম্পূর্ণ বলার আগেই ইঙ্গিত দিয়ে ছেড়ে দিলে সাধারণ মানুষ তৃপ্তি পায় না। এটা তিনি বুঝেছিলেন বলেই সমসাময়িক ছোটগল্প থেকে তার গল্পের স্বাদ ভিন্ন। গল্প বলার ঢঙে তিনি যেন পুরাতনপন্থী। সুন্দর পরিপূর্ণ গল্প বলে পাঠককে তৃপ্ত করাতেই তার সৃষ্টির আনন্দ।

'কালাপাহাড়' বিবৃতিধর্মী রচনা। পাঠক শুরুতেই তা চট্ করে আন্দাজ করে নেয়—'সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে.......'—রংলাল সম্পর্কিত বিবৃতি থেকে। গল্পের পরপর ঘটনাগুলিও ঘটে চলেছে নিটোলভাবে। তবে বিবৃতিধর্মিতা কখনো একঘেয়েমি সৃষ্টি করে নি। মোষ কিনে বাড়িতে ফেরার পথে রংলাল নানাভাবে মনকে প্রস্তুত করে, কীভাবে স্ত্রী-পুত্রের সম্মুখীন হবে এইভেবে। মন কখনো বিদ্রোহী হয়, কখনো সংকুচিত। কিন্তু ফেরার পরের মুহূর্তটি পরিবেশিত হয়েছে খুব পরিমিত ভাষণে—

> ''বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই একজোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।
>
> যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকান্ড উঁচু একজোড়া বলদ কিনিয়াছে; সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু। বেশ শক্ত শক্ত। গিঁঠ-গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।
>
> একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনিলাম।
>
> যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?
>
> হ্যাঁ।
>
> যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি?
>
> হ্যাঁ।
>
> আর এমন করে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।—যশোদার মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।''

অথবা কালাপাহাড়-কুম্ভকর্ণের যুদ্ধদৃশ্য বা বাঘের সাথে তাদের লড়াইয়ের দৃশ্যটি ভাবা যেতে পারে। কুম্ভকর্ণের শেষ অবস্থা বোঝানোর জন্য 'চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে' বাক্যটিই যথেষ্ট মনে করেছেন লেখক, পাঠকও। আর গল্পের শেষে কালাপাহাড়ের মানসিক অবস্থার Direct বর্ণনা কালাপাহাড়কে মানবিক করে তোলার উপযোগী বলেই অতুলনীয়।

ডাইনী : মানহারা মানবী

মৌ দত্ত

রাঢ় অঞ্চলের সমস্ত রুক্ষতা, আদিমতা, নানান লোকসংস্কার ও বিশ্বাস এবং বিভিন্ন কিংবদন্তী বারবার তারাশঙ্করের গল্পের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। মানুষ মাত্রে প্রত্যেককেই আপন কর্মের ফলভোগ করতে হয়। কিন্তু সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানেই হোক, আপন স্বভাবের কোন একটি বিশেষ ত্রুটি বা দুর্বলতাকে আশ্রয় করে নিয়তি যখন বাসা বাঁধে মানুষের মর্ম্মমূলে তখন তার অসহায়তা করুণার উদ্রেক করে মানব হৃদয়ে। আর তারাশঙ্করের এই জাতীয় করুণ রসের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'ডাইনী'।

> "গ্রাম্য কুসংস্কার ও কিংবদন্তীর সঙ্গে ছাতিফাটার মাঠের তৃণচিহ্নহীন দগ্ধরূপ এক অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। গল্পটির পটভূমিকায় এই বিশাল প্রান্তরের চমৎকার বর্ণনা আছে। এই রৌদ্রজ্বালাময় নিয়তির মত নির্মম প্রান্তরের বর্ণনায় তারাশঙ্কর অসামান্য শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।"
> ('শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা; জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃ-১১)

'বেদেনী' সংকলনের (১৯৪০) অন্তর্ভুক্ত 'ডাইনী' নামক ছোটগল্পটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজন সাফল্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গল্পটি বিস্ময়কর। কারণ, এর একদিকে আছে লোক-সংস্কারের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, আর অন্যদিকে আছে মানবিকতা বিরোধী শ্বাসরোধকারী অস্তিত্ব। একটি বিশেষ ব্যক্তি চরিত্রের জীবন ট্র্যাজেডির আধারে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে তার ভয়াবহ সম্ভাবনাকে। গল্পটির কাঠামো অনুযায়ী একে বলা যায় চরিত্রাশ্রয়ী ছোটগল্প। কিন্তু একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পারিপার্শ্বিক এবং জনমানসগত কঠোর কঠিন বাস্তবের মাত্রা। তাই দেখি বহুমাত্রিকতার গৌরবে, সার্থকতার নিরিখে এর ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনা পাঠক মনকে শুধুমাত্র অভিভূত করে না, ভাবিয়েও তোলে।

'ডাইনী' গল্পের বিচারণায় প্রবেশের আগে এই গল্পের যে লোকজীবন তার সঙ্গে লেখকের নিজের পরিচয় তাঁর উক্তিতেই স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

> "জমিদার ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাক-হরকরা-প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করবার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধকরি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেন নি।" ('আমার সাহিত্য জীবন', তারাশঙ্কর)

'ডাইনী' গল্পের পটভূমির নির্মিতি ঘটেছে রাঢ়ের গোটা গ্রামীণ সমাজ—উচ্চ-নিম্নবর্গের মিলিত জীবনযাত্রায়। শুধু উপজীব্য নয়, কাহিনীর উৎসেও একই পটভূমি লক্ষিত হয়। লেখক এখানকার লোকের জীবন বলয়ের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন সেই অংশটি—যা লোক-সংস্কারের গাঢ়তম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই সংস্কারের কবল থেকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন কোন সম্প্রদায়েরই রেহাই ছিল না। আমাদের দেশের একদিকে যেমন আছে পুরা

কাহিনী, কিংবদন্তী, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার-বিশ্বাস, প্রবাদ-প্রবচন জাতীয় লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান, অপরদিকে তেমনই আছে লোক সংস্কারের এক অন্ধকারময় দিক,—যেখানে যাদুবিদ্যা, ডাইনী বিদ্যা, ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুঁক, কর্মফল জাতীয় নানা বিচিত্রতা ফলপ্রসূ হয়। দৈনন্দিন জীবনে এদের ভূমিকা অভ্যস্ততার জন্য পরিদৃশ্যমান নয়, কিন্তু কখনো কখনো এদের কোন একটি প্রবল হয়ে এমন সর্বনাশা রূপ ধরতে পারে, যার কবলে পড়ে ঘটে মানবাত্মার অপচয়, এমনকি মানুষের দৈহিক নিধনও। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এর প্রবল অস্তিত্ব আজও অক্ষুণ্ণ।

'ডাইনী' গল্পের মূল নিহিত আছে লোক-সংস্কারের উপাদান যে ডাইনী বিশ্বাস তার মধ্যে। বাংলা সাহিত্যে ডাইনীর স্থান এর আগেও পাওয়া গেছে। যেমন ''পথের পাঁচালী''র আতুরী ডাইনী, জগদীশ গুপ্তের (তারাশঙ্করের একই এলাকার মানুষ) 'হার' গল্পে অঘটন ঘটন পটিয়সী এক ডাইনীর উল্লেখ আছে। তারাশঙ্কর নিজেও আর একটি গল্পে স্বর্ণ ডাইনীকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু 'ডাইনী' গল্পে লোক সংস্কারের এই দিকটির মানবিক তাৎপর্য যে ভাবে ফুটেছে তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। মূল চরিত্রটির আদল বা ঘটনা লেখকের নিজের দেখা। নিজের দৃষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে সৃজনী কল্পনার রসায়ন ঘটিয়ে এবং সম্ভাব্যতার সীমা রক্ষিত করে তিনি রচনা করেছেন এক জীবন ট্র্যাজেডির কথা। লেখক এই সমাজের লোক-জীবন চর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়েও অভূতপূর্ব সংযমের সঙ্গে বজায় রেখেছেন শৈল্পিক দূরত্ব। এতে লোক সংস্কারের যে আপাত-অপ্রতিহত প্রাধান্য সূচিত হয়েছে—তার সাথে লেখকের নিজের বিশ্বাসগত কোন যোগই নেই। বস্তুতঃ তিনি লোক সংস্কার এবং তার দ্বারা আচ্ছন্ন সমাজ বাস্তবের হাতে একটি মর্মান্তিক, চরম মানবিক অপচয়কে ব্যঞ্জিত করেছেন। গল্পটির কথাবস্তু মানবতার জয়গান; ডাইনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাণঘাতী লোকসংস্কারের কুৎসিত ও ভয়ঙ্করতম রূপচিত্রটিই এখানে উদঘাটিত হয়েছে। এই গল্পটি কালানুক্রমের দিক থেকে সরল, গতিময়। জীবনের অতীত বর্তমানের নিপুণ সংস্থাপনায় লেখক সরা ডাইনীর কিশোর কাল থেকে চল্লিশ বছরের যে অস্তিত্বকে রূপায়িত করেছেন তার মধ্যে অনায়াসেই সঞ্চারিত করে দিয়েছেন ট্র্যাজিক পরিণতির অমোঘ ধারা। ডাইনীর করুণ পরিণতির প্রধান দিকটা কিন্তু তার মৃত্যুর মধ্যে নয়; তা হল তার সেই আত্মিক মরণের দিক—যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে একটি জীবন্ত মন এক অকারণ অমূলক বিশ্বাসের চাপে অনিবার্য গতিতে কিভাবে নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়, তারই একটি করুণ প্রতিচ্ছবি।

এই গল্পের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল পারিপার্শ্বিকতার চাপে সরোধুনি বা সরা নামক মেয়েটি ক্রমশ নিজেই বিশ্বাস করেছে যে, সে প্রকৃতই ডাইনী। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, স্বাভাবিক মানবজীবনযাত্রায় তার অংশ নেওয়ার কোন অধিকারই নেই। এবং সে এও বুঝেছে যে সেই অধিকার সে চাইলেও নিষ্করুণ সমাজ তাকে দেবে না। লেখক ঘটনা পরম্পরায় তার পরিবর্তনের অনিবার্য গতিটি দেখিয়েছেন। ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে—কোন অবাঞ্ছিত বা অশুভ ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যায় অক্ষম কিংবা আদিম কাল থেকে অভ্যস্ত চিন্তাধারার দরুণ অনীহ লোকমানস কিভাবে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তার জন্য দাবী করে এবং সেই শক্তির মাধ্যমে ডাইনী জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। লোক

মানসের ধারণা ডাইনীর ওপর ক্ষতিকর এক অশুভ অলৌকিক শক্তির ভর হয়; আর ডাইনীর চাহনি, ইচ্ছা, বাণমারা, তুক্‌তাকের ফলেই গ্রাম জীবনে অশুভ ঘটনার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে সেই ডাইনী হয়ে ওঠে সকলের ভীতি ও ঘৃণার পাত্র। তাকে কেউ চটায় না। সব সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় সে কার্যত একঘরে হয়ে যায় এবং কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে জীবন দিয়ে এই সমাজ ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মারাত্মক কথা হল এই যে, ডাইনীর নিজের মনেও নিজের অলৌকিক মারণশক্তির সক্রিয় অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে। তার মনে হয় তার বিরুদ্ধে লোক-বিদ্বেষ আদৌ অস্বাভাবিক নয়। লেখক 'ডাইনী' গল্পে নিপুণভাবে এই বোধের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

বীরভূমের এক তাপদগ্ধ, রুক্ষ ও অনুর্বর প্রান্তরের পটভূমিকায় 'ডাইনী' গল্পের সূত্রপাত। প্রথমেই এক অনবদ্য বর্ণনার চিত্ররূপ দেখি ছাতিফাটা মাঠের—

> "ছাতিফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রাম চিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়।.....ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধুলার একটা আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নেব মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।"

—এই জলহীন, জনহীন, ছাযাশূন্য, অভিশপ্ত ছাতিফাটার মাঠের পূর্ব প্রান্তেব এক আমবাগানে দীর্ঘ চল্লিশ বছব ধরে বাস করছে এক বৃদ্ধা ডাইনী। তার সম্পর্কে নানান ধরনেব ভয়ঙ্কর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। লোক তাকে পরিহার করে চললেও, চল্লিশ বছর ধরে তারা সভয়ে তাকে লক্ষ্য করেছে। দেখেছে—

> "তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বছর ধরিয়াই নিস্তব্ধ হইয়া আছে ঐ মাঠখানার উপর।"

—তার অতীত সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, সে তিনচারখানা গ্রাম প্রায় ধ্বংস করে অবশেষে একদিন আকাশ পথে একটা গাছ চালিয়ে উড়ে যেতে যেতে এই ছাতিফাটার মাঠের নির্জন রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং এখানে নেমে এসে ঘর বাঁধে। আসলে "নির্জনতাই উহারা ভালোবাসে, মানুষেব সাক্ষাৎ উহারা চায় না।" ডাইনীর নিজের স্বভাবের প্রাথমিক পরিচয় লেখক দিয়েছেন এই ভাবে—মানুষ দেখলেই তার অনিষ্টস্পৃহা জেগে ওঠে অর্থাৎ মানুষের যে স্বাভাবিক বৃত্তি ভালোবাসার ক্ষমতা—তা লোপ পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে মানব-বিদ্বেষ, তা যে অকারণে হয় নি তা পরবর্তী বিশ্লেষণে বোঝা যাবে।

বৃত্তান্ত শুরু হয়েছে বহুকালের পুরানো আয়নায় ডাইনীর নিজের মুখ দেখার ঘটনা দিয়ে। "জরা-কুঞ্চিত মুখ, শণের মতো সাদা চুল, দন্তহীন মাড়ী" আর ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে "পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার"—যার প্রতিবিম্ব দেখে তার নিজেরই ভয় হয়। এই প্রতিবিম্ব দর্শনে তার যে অতীতের সেই হারানো মেয়েটির স্মৃতি, তার বেদনাব প্রকাশের মধ্যে দিয়ে লেখক প্রথমেই দেখিয়েছেন তার মানবিক সত্তার নিহিত অস্তিত্ব। তার কল্পনার চোখ দিয়েই দেখানো হয়েছে সেই কিশোরী মেয়েটিকে, যার জীবন স্বাভাবিক পথে চলার সুযোগ পায় নি।

"প্রথমে দিনের কথা"—অর্থাৎ ডাইনীত্বের কথা—প্রথম পদক্ষেপে এই মুখ দেখার সূত্রেই তার মনে পড়ে যায়, দশ-এগারো বছরের কিশোরী যখন পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখে মুগ্ধ, তখন আকস্মিক ভাবে নেমেছিল দুর্ভাগ্যের আঘাত; এই বয়সে তখন একদিন বামুন পাড়ার হারু চৌধুরী তাকে প্রথম সচেতন করে বলেছিল—"হারামজাদী-ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ?"—তার নজরে পড়ে বামুনের ছেলে পেটের বেদনায় ছটফট করেছে। সেই থেকে কত অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে মানুষ নয়; মানুষের দেহরস লোলুপ রাক্ষসী। বারবার শুনে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হয়ে গেছে যে তার নরুণ দিয়ে চেরা ছুরির মতো চোখে, বেড়ালীর মতো দৃষ্টিতে যাকে তার ভাল লাগে তার আর রক্ষা থাকে না। তার স্বামীকেও একদিন সে শোষণ করে মেরে ফেলেছিল। মায়ের কোলে কচি শিশু, স্বাস্থ্যবতী যুবতী, মায়ের হয়তো প্রথম সন্তান, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মতো নরম-সরস ডাইনীর দৃষ্টিপথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দন্তহীন মুখের কম্পিত জিহ্বার তলের ফোয়ারাটা যেন খুলে যায়, নরম-গরম লালায় মুখটা ভরে ওঠে। যেন শিশুর দেহের সমস্ত রস নিঙড়ে নিঙড়ে পান করছে সে। মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার রসাস্বাদ। সুতরাং শুধু জনপদের সর্বলোকেরই নয়, হতভাগিনীর নিজেরও বিশ্বাস যে সে ডাইনী।

ক্রমশ সে আবিষ্কার করে যে, কোন কিছুর প্রতি ভালোলাগা বা ভালোবাসার টান অনুভব করলেই ঘটে বিপর্যয়। তার সংস্কারাচ্ছন্ন মনে এ দুয়ের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে যায়। গল্পে পরপর এর নিদর্শন লেখক দিয়েছেন। যেমন—বন্ধু সাবিত্রীর নবজাত পুত্র সন্তানটিকে দেখা মাত্র তার নারী মনে বাৎসল্যের টান উৎসারিত হয়; তখন তার মনে হয়েছিল "এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ" কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায় যে, সে সুনিশ্চিত হয়েছে—এ হল তার ডাইনী চোখের দৃষ্টি, কারণ কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাটি ভয়াবহ মূর্তি ধরে। তার বাস্তব কারণটা ধনুষ্টঙ্কার, কিন্তু সেও বোঝে নি, গ্রামের লোকেও বোঝে নি—উভয় পক্ষই দায়ী করেছে সরার ডাইনী বৃত্তিকে। এর পরের অভিজ্ঞতা তার জীবনে মূল ট্র্যাজেডির কারণ। তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে দশাসই বেপরোয়া এক হৃদয়বান যুবক; তাকে মর্যাদা দিয়েছে এবং সেই জোয়ান মরদের সাথে সরার জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি দিন কেটেছে। কিন্তু দেখা যায় সেই জোয়ান মরদ ক্রমশ রোগগ্রস্ত হয়ে "তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া মরে যায়।" আর সরার মনে হয় যাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালবাসত, কোনদিন যার ওপর এতটুকু রাগও করে নি সেও তার দৃষ্টিতে শুকিয়ে নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলে মরে গেছে। ফলতঃ তার নিজের ভালোলাগাকে সে ভয় করতে শুরু করে—এর চেয়ে নিষ্ঠুরতম আত্মিক মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না। একদিকে সে নিজের অলৌকিক অশুভ শক্তির অধিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত, অন্যদিকে গাঁয়ের লোকেরও সেই একই বিশ্বাসের ফলে সে 'নগর বাহিরী' সর্ব বর্জিত জীবনযাত্রা নির্বাহে বাধ্য হয়; এতে যেমন তার নিজের সুবিধা, কারণ ভালোলাগার হাত থেকে সে রেহাই পায়, তেমনই আবার যারা তাকে ভীতির পাত্রী হিসেবে ঘৃণা করে তাদের প্রতি তার চরম আক্রোশ। এই দ্বন্দ্ব তার জীবনের চল্লিশ বছরের বাস্তব সত্য।

শেষে দেখা যায় দুটি ঘটনা। প্রথমটি ঃ ছাতিফাটা মাঠ পেরিয়ে বুকের সন্তান আগলে এক মায়ের আশ্রয় সন্ধানে আসা। সে ঐ অপরিচিতা পথচারিণীর গরম লাগা বাচ্চাটিকে দেখে প্রবল সমবেদনা অনুভব করে; কিন্তু এই ভালোলাগার মুহূর্তটি তাকে সচকিত করে দেয় এর পরিণতি সম্পর্কে। এবং সে নিতান্ত অসহায়ের মতো আর্তস্বরে বলে ওঠে,— "খেয়ে ফেললাম—ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে, পালা পালা তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি"। কিন্তু বৃথা; প্রবল গ্রীষ্মের প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটি বাঁচে নি। এতে ডাইনীর নিজের এবং গ্রামবাসীদের ধারণাটা আরো সমর্থিত হয়েছে। শেষ ঘটনা—এক যুবক-যুবতীর গোপন প্রেমকে তার ভালোলাগার ব্যাপার। যা সে হারিয়েছে, যার স্মৃতি তার অবচেতনে মধুর-রসসিক্ত হয়ে আছে—তারই পুনরভিনয় তার নীরস অস্তিত্বের মধ্যে রসের ধারা এনেছে, সে তাদের মিলনের পথে বাস্তব যে টাকা-পয়সার বাধা তার সুরাহা করবার জন্য নিজের স্বল্পতম পুঁজিও ভাঙতে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত, কেননা তাকে দেখা মাত্র 'এতবড় একটা জোয়ান মরদ" ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পায়ে বিঁধিয়েছে হাড়ের টুকরো; যার পরিণাম টিটেনাস, এবং অনিবার্য মরণ। চিকিৎসা তার হয়নি, আনা হয়েছে এক গুনীনকে—যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাকে ভালো করার এবং ডাইনীকে জব্দ করার। অসুস্থ ডাইনী মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় যখন অস্বস্তি বোধ করছে তখন তার মনে হয়েছে গুনীন তাকে 'মন্ত্র প্রহারে জর্জ্জর' করার চেষ্টা করছে। কিছু পরেই দুপুরের নৈঃশব্দ্য খান খান হয়ে "একটি উচ্চ কান্নার রোল ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মতো ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।" কারণ, সে বুঝেছে এখানে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

কিন্তু এই ডাইনীত্বের পিছনে রয়ে গেছে মনুষ্যত্বের করাল হাতছানি। গল্পে প্রায় প্রতিটি ঘটনায় ডাইনীর ডাইনীত্বের সঙ্গে-মনুষ্যত্বের বেধেছে দ্বন্দ্ব। মানুষকে আঘাতের শক্তি মাঝে মধ্যে তার ভিতর জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে সে নিজেই ভয় পায় নিজেকে দেখে। আর তখনই তার মধ্যে জেগে ওঠে সুপ্ত মনুষ্যত্বের নিদারুণ বেদনা—সে হয়ে ওঠে মানবী। তাইতো কতবার সে দেবতার কাছে কাতর হয়ে মানত করেছে—"মা আমাকে ডাইনী থেকে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব"—মা মুখ তুলে চান নি। চল্লিশ বৎসর এই অভিশপ্ত জীবন যাপনের পর একদিন ঘটনাচক্রে রটে গেল যে, সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মেরে মেরে ফেলেছে। এ সংবাদ রচনার পর আর তার রক্ষা নেই। সুতরাং তাকে পালাতে হবে। সে গ্রাম ছেড়ে পা বাড়ায় ছাতিফাটার মাঠে অনির্দেশ্য যাত্রায়; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা তাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। ছাতিফাটার মাঠ আগুনে পুড়ছে নিস্পন্দ শব্দের মত "একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে"—সন্ধ্যার মুখে বৃদ্ধা ডাইনী নেমে পড়ল মাঠের বুকে। কিছুটা আসার পর সে হারিয়ে ফেলতে লাগল তার চলার গতি। আর তখনই ঘটল গল্পের climax—জীবনের এই চরম মুহূর্তে তার অবচেতনে পুঞ্জীভূত স্মৃতি সুধার অর্গল মুক্ত হয়েছে এবং "অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো তুমি ফিরে এসো গো।"

—এই হল গল্পের চরম Pathetic situation বা Pitiful Tragic moment। তারপরে প্রচন্ড কালবৈশাখী ঝড়ের বাতাসের তোড়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে খৈরী কাঁটার ঝোপের ওপর। ডাইনী মরে বেঁচেছে অবশেষে; শেষ মুহূর্তে সে আর ডাইনী ছিল না। প্রিয়তমের জন্য আকুল কান্নায় তার নিহিত যে মানবী সত্তা, তারই অভিপ্রকাশ ঘটেছে।

মানুষের নিষ্ঠুরতার ইতিহাসের সঙ্গে চৌদ্দ-পনেরো বছরের নিরপরাধ নির্দোষ মেয়েটির নিজের মনে ডাইনীতে রূপান্তরের ক্রমবিকাশ আশ্চর্য সাহিত্য সৃষ্টি। লেখক স্পষ্ট করে কোথাও নিজেকে ব্যাখ্যা করেন নি; প্রচ্ছন্নতা, ইঙ্গিত ও আভাসের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ চিত্রখানি তারাশঙ্করের অসাধারণ শক্তির একটি চিহ্ন। ছোট ছোট চিত্রের মাধ্যমে ডাইনীর মনকে, জীবনকে দেখিয়েছেন শিল্পী তারাশঙ্কর। অসহায় নির্দোষ বৃদ্ধার একা বঞ্চিত ধিকৃত দিনযাপন, অবশেষে আত্মহত্যা, সেন্টিমেন্ট বর্জিত কারুণ্যের চিত্র। আগাগোড়া মানুষী ডাইনী শেষ সময়েও নিজের সঞ্চয় দিয়ে অন্যের প্রেমকে সার্থক করতে চেয়েছিল, মায়া-মমতায় সর্বদাই সে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চায়। একদিন ভালোবাসা পেয়েছিল সে, অকস্মাৎ একমাত্র আশ্রয় স্বামীর বিয়োগে নিজেকে ডাইনী ভাবার বাধা রইল না। জীর্ণ দেহে, ভগ্ন গৃহে সাধারণ মমতাময়ী নারীর জীবন-যাপনে কেবলমাত্র জনতার বিষ জিহ্বা তাকে ডাইনীর সজ্জা পরিয়েছিল। অবজ্ঞাত ঘৃণিত লাঞ্ছিত এই জীবটির প্রতি স্রষ্টার মমতা নিরাসক্ত-নিষ্ঠুর শিল্পী সুলভ চাতুর্যে বর্ণিত হলেও অধরা নয়। তাই আমাদেরও মন করুণায় অভিষিক্ত হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে 'নারী ও নাগিনী'র মতই 'ডাইনী'ও একটি অসাধারণ গল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে 'নারী ও নাগিনী' এবং 'ডাইনী' এই দুটি গল্পই বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং অনন্যসাধারণ প্রকাশভঙ্গীর জন্য 'বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিক হয়ে থাকবে।' এ সম্পর্কে তাঁর সুনিশ্চিত মতামত হল এই যে, "কুসংস্কারের ভিত্তিতে একটি গ্রামের মেয়ের দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত এতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অদ্ভুত বলিষ্ঠতায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।" (বাংলা গল্প বিচিত্রা', পৃ.৭৭).

—শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই গল্পটি অতিপ্রাকৃত বা ভৌতিক কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। লেখক তারাশঙ্কর এখানে এক অসহায়া বৃদ্ধা ডাইনীর মানবিক আর্তির কাহিনী গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

এই গল্পে লেখক একদিকে যেমন জ্ঞান ও রহস্যের আলো ছায়ার লীলায় পরিবেশন করেছেন গল্প রসকে, অন্যদিকে তেমনই ডাইনীরূপিণী মিথ্যা আখ্যায় নিন্দিত নারীর স্তরে স্তরে যে মর্মোদঘাটন করেছেন—বাংলা সাহিত্যে তার জোড়া নেই। চেতন ও অবচেতনের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ সীমারেখায় নেমে তিনি আহরণ করেছেন উপকরণ, তাই তাঁর গল্প চমৎকৃত বিস্ময়ে নাড়া দেয় পাঠককে। শেষে বলা যায়,—এই হতভাগিনী 'মানহারা মানবীর' প্রতি অপূর্ব মমত্ববোধ তারাশঙ্করের প্রতিভা ও সৃজনী শক্তির পূর্ণ পরিচয় বহন করে চলেছে।

তারিণী মাঝি : কয়েকটি প্রসঙ্গ

মিলনকান্তি বিশ্বাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুল জনপ্রিয় ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'তারিণী মাঝি' অন্যতম। গল্পটি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'তারিণী মাঝি' গল্পের নায়ক তারিণী, অন্ত্যেবাসী শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করে সে। তারিণীর জীবনে বৌ সুখী ছাড়া আরও একজন আছে—সে হল ময়ূরাক্ষী নদী। তারিণীর গোটাজীবনের সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর ভূমিকা জড়িত হয়ে আছে। ময়ূরাক্ষী শুধু তারিণীর জীবিকার সংস্থানই করেনা, তার জীবনছন্দকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এমনকি, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর অমোঘ টানে তারিণীর জীবন, পরিণাম অভিমুখে ছুটে চলে।

তারিণী শুধু খেয়াপারাপার করে না, জলতলে কোথায় কোন্ মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে, অবলীলায় খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাকে তুলে আনে। ময়ূরাক্ষী ছাড়াও, তারিণীর আর একজন মনের মানুষ আছে; সে বৌ সুখী। উভয়ের ভালোবাসায় এতটুকু খাদ নেই। সমস্ত সুখ-দুঃখের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্ত আপন হয়ে থাকে। নদীর করালগ্রাস থেকে ঘোষদের বধূউদ্ধারের বিনিময়ে তারিণী প্রথমে—'এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা' দাবি করলেও, পরমুহূর্তে সে চাইতে ভোলেনি 'ফাঁদি নত' এবং দশহরার পার্বণে চাদরের পরিবর্তে 'শাড়ি'—। সুখী হয়ত সন্তান দিতে পারেনি, তবে দিয়েছে অগাধ ভালোবাসা আর নির্ভরতা।

এক বছর বাদে অর্থাৎ তেরশো বিয়াল্লিশ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে, দশহরার দিন, ময়ূরাক্ষীর পূজা করেই; ডোঙা মেরামত করে তারিণী। কিন্তু তারিণীর আশা, নিরাশায় পরিণত হলো। আষাঢ় মাস চলে গেল, বান তো দূরের কথা, নদীর বালিও ভিজল না। খরার আগাম বার্তায়, দেশে উঠলো হাহাকার। গ্রামের অনেকেই খাদ্যের অন্বেষণে পৈতৃক ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে লাগল। তারিণীও নিরুপায় হয়ে গ্রাম-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল।

তিনদিন পথ চলার পর, অভিজ্ঞ মাঝি তারিণী, গামছা উড়িয়ে বুঝতে পারল, পশ্চিমে বাতাস বইছে। তার অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ভারি বর্ষা আসছে। নিয়তি রূপিণী ময়ূরাক্ষীর অমোঘ টানেই সে দ্রুত গ্রামে ফিরে এসেছে, বৌ সুখীকে সঙ্গে নিয়ে। সন্ধ্যার মধ্যেই 'হড়পা' বাণের জল গ্রামে প্রবেশ করল। মুহূর্তের মধ্যেই রাস্তা ঘাট ঘর-বাড়ি সব ভেসে গেল। পশু পাখি, মানুষের প্রবল চিৎকারের সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর প্রবল গর্জন মিলেমিশে এক ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করল। গতিক ভালো নয় দেখে, সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করে সুখীকে পিঠে করে নিয়ে বানের জলে সাঁতার দিতে থাকে তারিণী। এখানেই তারিণীর চরম মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বন্যার উত্তাল জলরাশিতে ভাসতে ভাসতেও তারিণী, সুখীকে সান্ত্বনা দেয়—'ভয় কি তোর, আমি—' কথা শেষ হয় না; মুহূর্তে তারিণী অনুভব করে, নদীর প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে তারা। পরক্ষণেই বুঝতে পারল—'অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া

চলিতেছে।' তারিণী অনুভব করে, সুখী যেন তাকে নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরছে। সুখীর কঠিন বাহুর বন্ধনে, তারিণীর দেহ মন ক্রমশ অসাড় হয়ে আসল। কঠিন পরীক্ষা শুরু হল তারিণীর। একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী, অন্যদিকে নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদ। অনন্যসাধারণ, শৈল্পিক নিপুণতায় গল্পকার তারাশঙ্কর, নির্মম সেই পরিণতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে—"তারিণী-সুখীর দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস-বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশ সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল।" সুখীর প্রতি তারিণীর এমন খাঁটি মানবিক প্রেম তুচ্ছ হয়ে গেল তার আদিম জৈব-জীবনতৃষ্ণার কাছে।

'তারিণী মাঝি' গল্পের পরিণাম ক্রূর ভয়াবহ হলেও, লেখকের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এর মধ্যে নিহিত। চরম মুহূর্তে মানুষের কাছে নিজের জীবন ছাড়া আর কিছুই প্রিয় নয়—কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা কিছুই নয়। তারিণী যে সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে, তা তার সচেতন ইচ্ছাজাত নয়। তার জীবন পিপাসার অনুসারী 'আলো ও মাটি'র স্পর্শ প্রাপ্তির চরম আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে তার অভিব্যক্তিতে—'আঃ আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে কামনা করিল, আলো ও মাটি।'

মানবজীবনের অস্তিত্ব রক্ষার যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল আত্মরক্ষার তাগিদ। এই তাগিদের কারণেই, তারিণী তার জীবনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে, তার নামের মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি। 'তারিণী' কথার অর্থ—যে ত্রাণ করে, অর্থাৎ গল্পে তার ভূমিকা ত্রাতার হলেও সে শুধু খেয়াপারাপার করে না; বন্যার জলে ভেসে যাওয়া মানুষ জনকেও বাঁচায়। কিন্তু গল্পের অন্তিমে জীবনরক্ষার বা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রিয়তমা স্ত্রী সুখীকে গলাটিপে হত্যা করে, জীবনদাতার ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়েছে সে। এখানেই তার নামের ট্র্যাজেডি। তবে এই ট্র্যাজেডিতে গল্প শেষ হয়নি। তারিণীর বেঁচে ওঠার মধ্যে, তার যে জীবনপিপাসা প্রকাশিত হয়েছে, তা সর্বকালের মানুষের আদিম জৈব-প্রকৃতির অনুসারী।

সুতরাং, দেখা গেল, তারাশঙ্করের এ গল্পে, ধাতুপ্রবৃত্তির জয় নয়, ধাতুপ্রবৃত্তির উর্ধ্বে মানবজীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে, তারিণীর 'আলো ও মাটি' কামনার মধ্যে। 'আলো ও মাটি' এখানে জীবনের প্রতীক। গল্প লেখার ক্ষেত্রে, লেখক স্বয়ং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—

> "জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে, সেই খানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে—ইচ্ছে হলো এমনই গল্প লিখব।"

এ গল্পে লেখক সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। উপসংহারের এই চমকপ্রদ অনিবার্যতা সৃষ্টির অপূর্ব বস্তু-নির্মাণক্ষম প্রস্তার দ্বারাই সম্ভব।

দুই

২.১ 'তারিণী মাঝি' গল্পটি চরিত্রমুখ্য গল্প। নামকরণের মধ্যেই তা বোঝা যাচ্ছে। তারিণী মাঝিকে কেন্দ্র করেই, গল্পের সমস্ত ঘটনা আবর্তিত। মাটিও মানুষের সংস্পর্শ ব্যতীত এমন চরিত্রসৃষ্টি, অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না। তারিণী ও ময়ূরাক্ষী মিলেমিশে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা মূল্যহীন বলে মনে হয়।

লোকালয়ে তারিণী মাথা হেঁট করে চল্‌লেও নদীর বুকে সে 'খাড়া-সোজা'। নদী ব্যতীত তারিণী যে অসম্পূর্ণ, এ ইঙ্গিত-ময়তা দিয়েই গল্পের শুরু। গঙ্গাস্নান-ফেরত পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে তারিণীর উক্তির মধ্যে তার চরিত্রের প্রবল কৌতুক রসিকের দিকটি ধরা পড়ে। ভদ্র সভ্য সমাজের রমণীরা যখন বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে, যেন তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি করতে চায়; তখন অন্ত্যেজ শ্রেণীর একজন মাঝির মুখে এ হেন পরিহাস—'আর লয় গো ঠাক্‌রুণরা, আর লয়। গঙ্গাস্নান ক'রে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।' আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে পীড়িত করে।

তারিণীর ভালোবাসা ময়ূরাক্ষী ছাড়াও আরেক জনের ওপর, সে-তার স্ত্রী সুখী। তবুও জন্মগত অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে সে ঘোষদের বধূ উদ্ধারের প্রাপ্য হিসাবে সর্বাগ্রে 'এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা' চেয়ে বসল। এখানেই তারিণী, আদিমজীবনস্বভাবের ক্রীড়ানক। যখন তার সে চাহিদা পূরণ হয়েছে, তখন সে একে একে চেয়েছে তার মনের মানুষকে সাজানোর সামগ্রী—'ফাঁদিলত', 'শাড়ি' ইত্যাদি। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'লোতুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতের আমদানি।' এখানেই সে থেমে থাকার পাত্র নয়, স্ত্রীকে সে নথ পরিয়ে; উচ্ছিষ্ট হাতে লম্ফ তুলে ধরে স্ত্রীর মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থেকেছে। তারিণীর স্বভাব কোমলে কঠোরে গড়া। এটা তার কোমলতার দিক। 'সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।' ঠিককথা, তবে এসুখের পিছনে রয়েছে ময়ূরাক্ষীর অকৃপণ দান। আর সে কারণেই তারিণী 'বানের লেগে পূজো দেয়।'

পরের বছর তারিণী পূজো দিলেও দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে নদীতে জল না থাকায় সে সরকারী কর্মচারীদের সাইকেল পারাপার করে সংসার চালাতে থাকে। শ্রাবণের শেষে বন্যা এলো বটে, তবে তিনদিনের মধ্যে, তা হাঁটুজলে নেমে আসল। ময়ূরাক্ষী, তারিণীর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের সঞ্চার করল। বানাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সেস্তাৎ কালাচাঁদ দেশত্যাগ করল। শুধু কেলে নয়, পাড়ার সকলেই—। পলাশ ডাঙার একব্যক্তির গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার খবরে তারিণী কিছুটা ভীতও হলো।

যে ময়ূরাক্ষী ছাড়া তারিণী অসম্পূর্ণ, সেই ময়ূরাক্ষীকে ত্যাগ করে, তারিণী শহরের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। গ্রাম্য জীবন ত্যাগ যেমন তার বেদনা দিল, তেমনি বেদনা দিল তার নামও। তারিণীর বাস্তববোধ প্রখর। পথে চল্‌তে চল্‌তে গামছা উড়িয়ে তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তখনই বান আসবে। তিনদিনের পথ, তারিণী সুখীকে নিয়ে দুদিনেই ফিরে আসে। তার পক্ষে সবই সম্ভব। জলের শরীর রোদে টান ধরেছিল, জল পেয়ে আবার ফুল্‌ল।

মুহূর্তের মধ্যেই, প্রবল হড়পাবানে সমস্ত পথ-ঘাট ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নদী-লোকালয় একাকার হয়ে গেল। সুখীরও পরম নির্ভরস্থল স্বামী তারিণী। তাই দাওয়ার উপর বানের জল আসা সত্ত্বেও, সে চালের বাঁশ ধরে পরমভরসায় স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। প্রবল সাহসিকতায় তারিণী, সুখীকে পীঠে করে অকূল পাথারে, কূলের আশায় সাঁতার দিল। এখানে তারিণীর চরম স্বভাবের পরিচয় মেলে। কিন্তু গভীর বিচক্ষণ দৃষ্টির অধিকারী তারিণীর, সব হিসেব ভুল হয়ে গেল। তারা গিয়ে পড়ল নদীগর্ভে। হয়ত, ময়ূরাক্ষী, তার শেষ পরীক্ষায় তারিণীকে উত্তীর্ণ হতে বল্‌ল। তারিণী, সুখীকে আশ্বাস দিতে কুণ্ঠিত হয়নি—'ভয় কি তোর,

আমি—' পরমুহূর্তে তারিণী অনুভব করল, —'অতল জলের তালে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিতেছে।' সুখীর বাহুর কঠিন বন্ধনে তারিণীর তাগদ শরীর যেন অসাড় হয়ে এল। লেখক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞায় গল্পকে পৌঁছে দিলেন ক্লাইমেক্সে—'বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়ল সুখীর গলায়।' গল্পের নায়ক এক পলকে হয়ে গেলেন 'ট্রাজিক হিরো'। তার জীবনার্তির কাছে সুখীর এমন মানবিক প্রেম মিথ্যা হয়ে গেল। তারিণীর 'আলো ও মাটি'র কামনায় আদিম জৈব প্রবৃত্তির জয় হলো। প্রাণধর্মের জয় হলো। তারিণী, চিরন্তন কালের রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠল।

২.২. সুখীকে বোঝার ক্ষেত্রে তারিণীর একটি উক্তিই বোধ হয় যথেষ্ট—''উ না থাকলে আমার 'হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি' হয় ভাই।'' বানের দ্রব্য ধরা নিয়ে যখন কেলে ও তার স্বামীর মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে, তখন সে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গিতে মীমাংসা করে দিয়েছে। অর্থাৎ তারিণী ময়ূরাক্ষীর ত্রাতা হলেও লোকালয়ের ত্রাতা সুখী। সুখী হয়ত সন্তান দিতে পারেনি ঠিকই, তবে, তার স্বামী তারিণীকে ভালোবাসা দিয়ে প্রেয় ও শ্রেয় করে তুলেছে। সেখানে কোন খাদ নেই। সুখীর এই করুণ পরিণতি দেখে, তার প্রতি আমাদের প্রবল সমবেদনা জাগে। এই কঠিন সত্যের পিছনে আমাদের বিবেক বুদ্ধি সায় না দিলেও; ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস হিসেবে মানতে বাধ্য হই।

২.৩ কালাচাঁদ ওরফে কেলে, তারিণীর নৌকার দাঁড়ী। সেও নেশায় বিভোর হয় বটে, তবে তার মাঝির মত সমস্ত রাস্তায় 'নেলা' কাটা দেখে না। তাকে দেখে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বলে মনে হয়। বানের ভাসা দ্রব্য ধরা নিয়ে, তারিণী তাকে অপমান করলে সে— '...অপমানে আগুন' হয়ে ওঠে। আবার সুখী মিমাংসা করে দিলে, সে 'সুখীর পায়েব ধূলা লইয়া কাঁদিয়া, বুক ভাসাইয়া' দেয়। অর্থাৎ তার সম্ভ্রমবোধ প্রবল। অন্যমনস্কতার কারণে, তারিণী তাকে ঠাস্ করে 'চড় কষিয়ে দিলে' সে শিশুর মত অপলক নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এখানেই তার শিশুসুলভ সারল্য ধরা পড়ে। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সে গ্রাম ত্যাগে বাধ্য হয়। শুধু তারিণী নয়, এগল্পের প্রত্যেকেরই জীবনতৃষ্ণা প্রবল। সুখীর জীবনতৃষ্ণার প্রাবল্যে, তার স্বামী তারিণীর পীঠে চড়ে প্রবল বানের মধ্যে কূল পেতে চেয়েছিল, কেলেও জীবনতৃষ্ণার জন্য পৈতৃক ভিটেমাটি ত্যাগে কুণ্ঠিত হয়নি, তারিণীও জীবনতৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে সুখীকে গলাটিপে হত্যা করেছে। এ গল্পে প্রত্যেকেই তাই জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

তিন

৩.১ তারাশঙ্করের শিল্পনৈপুণ্য ও শিল্পনিরাসক্তি—দুইয়েরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'তারিণী মাঝি'। গল্পটি চরিত্রপ্রধান। তাই গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর অস্তিত্ব, চরিত্রের অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পে প্রত্যক্ষ কাহিনীতে আছে মাত্র দুটি চরিত্র—তারিণী আর সুখী। লেখকের বর্ণনাগুণে ও প্রকৃতিদর্শনের গুণে ময়ূরাক্ষীও স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনীবৃত্তটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী নিঃসন্তান তারিণী, ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝি। তার একমাত্র সঙ্গী কালাচাঁদ বা কেলে। এই ময়ূরাক্ষীর বুকে, তারিণীর জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনাকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন লেখক।

গল্পের আরম্ভেই আছে শিল্পের শাসন; শেষেও তাই। লেখক এখানে নিরাসক্ত দ্রষ্টা। আরম্ভ হয়েছে তারিণীর কথা দিয়ে, তার সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের বৃত্তান্ত দিয়ে। আর শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে তারিণীর জীবনরক্ষার চিত্রাঙ্কনে। গল্পের শুরুতে, কাহিনীনিহিত গল্পাংশের হাত ধরেছে তারিণী-মাঝি স্বয়ং। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচিতে ফেরত গঙ্গাযাত্রী-র ভিড়ে, তারিণীর ডোঙায় পারাপারের ঘটনায় তারিণী কাহিনীর মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পারাপারের সময়টুকুর মধ্যেই ঘোষ বউ-এর ডুবে যাওয়ার ঘটনা, তারিণীকে ঘটনাবর্তের সঙ্গে যুক্ত করে। কাহিনী বয়নে লেখকের অতিসচেতন সংযত শিল্পভাবনা এখানে লক্ষ করার মত। এতটুকু বাড়তি অংশ নেই। ময়ূরাক্ষী ও তারিণীর যৌথভাবে কাহিনীকে টেনে নিয়ে যাবার মধ্যেই আসে তারিণীর মনের মানুষ স্ত্রী সুখী এবং তার লোভনীয় দুর্বার প্রেম। অন্যদিকে, ময়ূরাক্ষী শুষ্করূপে তারিণীর জীবনে প্রেমহীনতার প্রতীক হয়ে হাজির হয়। ময়ূরাক্ষীর শুষ্ক পরিবেশ যেন, তারিণী-সুখীর প্রেমের গভীরতার পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়। কাহিনীর হাল তারিণী ও সুখী ধরে থাকে।

অবশেষে, ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যায়, তারিণীর জৈব আদিম জীবন প্রেমের কাছে, জাগতিক মানবপ্রেম মিথ্যে হয়ে যায়। এখানেই গল্পের গর্ভঃসন্ধি বা climax। নাটকীয় বিন্যাসের মধ্যে তীব্রগতিতে, চূড়ান্ত পরিণতির এক চমকপ্রদ অনিবার্যতায় নীত। 'ক্লাইমেক্সের (climax) চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দুতে শব্দ চয়ন ও বিন্যাসে যে কত সতর্ক ও প্রজ্ঞা-চক্ষু হতে হয়, শিল্পী তারাশঙ্কর তা আমাদের দেখিয়ে দেন।'

সবশেষে বলা যায়, এগল্পের কাহিনীবৃত্ত নিটোল পরিমিত ও সংযত। লেখকের মূল বক্তব্যের পক্ষে যতটুকু জরুরী, ততটুকুই উপস্থিত করেছেন। সার্থক গল্পের উপযোগী কাহিনী বয়নে লেখক সিদ্ধহস্ত। কাহিনী অংশে ঘটনাংশও স্বল্প।

৩.২. তারাশঙ্কর, সাধু ও চলিত—যে ভাষারীতিতেই লিখুন না কেন, কথোপকথনের ক্ষেত্রে মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। সাধুভাষার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তৎসম শব্দের বহুল পরিমাণে ব্যবহার ঘটিয়েছেন। যেমন—পথশ্রমকাতর, লক্ষ্যভ্রষ্ট, করতল, রৌদ্রাভয়, তরঙ্গ, শ্বাসরোধ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মত, তারাশঙ্করও সাধুভাষায় লেখা শুরু করলেও পরে চলে গেছেন চলিত ভাষার দিকে। বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ের ভাষা তাঁর গল্পগুলির ভাষায় আঞ্চলিক আবহাওয়া তৈরী করেছে। তারিণীর ভাষায় রাঢ়ের প্রভাব ধরা পড়েছে—

(i) 'আর লয় গো ঠাকরুণরা আর লয়।'

(ii) 'আর মান কেড়ো না মা, দম লাও দম লাও। সেই যে বলে—লাজে মা কুঁকড়ি বেপদের ধকুড়ি।' ইত্যাদি।

পাশাপাশি ভদ্রসমাজের ভাষায় এসেছে আদর্শ কথ্য ভাষা—'হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?' কিংবা ঘোষমহাশয়ের উক্তি—'দশহরার সময় পর্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী?' ইত্যাদি। তারিণী যখন বলে—'ই আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে।' 'শরীর' এখানে 'শরীল' হয়ে ধ্বনিগত রূপান্তর ঘটেছে। কিংবা অন্যত্র তারিণী বলে—'জল হয় নাই, ক্যালেন আছে কিনা' এখানে ক্রিয়ার সাধুরূপ এবং কথ্যশব্দ-এর সঙ্গে বর্ণবিপর্যয় ঘটে এক নতুনত্ব দান করেছে। বর্ণনাংশে

সমান্তরালতা (Paralleism) ধরা পড়ে—'সুখী তন্বী', 'সুখী সুশ্রী।' নেশাগ্রস্ত তারিণীর কণ্ঠে একই শব্দের পুনঃপুন আবর্তনে, তার উন্মত্ততার রূপ যেমন ধরা পড়েছে; তেমনি জলের আবর্তের প্রতিমা তৈরি করেছে—'জলাম্পয়—সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই।' আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে তারিণীর ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ গল্পের পুরুষচরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভাষা আরও বেশি রাঢ়ঘেষা বলে মনে হয়—'সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? ... ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?' চরিত্র বর্ণনায় লেখক যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি ভাষা রহস্যময় হয়ে উঠেছে প্রকৃতিবর্ণনায়—'বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী-মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী।' নানা উপমাদি প্রয়োগে, লেখক প্রকৃতির ভয়ঙ্করতা বাস্তবোচিত করে তুলেছেন—"গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চিৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন; বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ—লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, তেমনি ভাবে।" কখনও প্রকৃতির কোমলরূপের বর্ণনায় লেখক উপযুক্ত উপমা ব্যবহার করেছেন—'রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুষ্পিত ফেনা ফুলের মত দ্রুত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।'

গল্পের সমাপ্তিতে থমথমে পরিবেশে, কাটাকাটা বাক্য ব্যবহৃত হওয়ায় এবং ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করে, বিপর্যয়ের ভাবকে অনেকটা লাঘব করার চেষ্টা করেছেন লেখক। সবশেষে বলা যায়, সাধুরীতির গদ্য এবং তৎসমবহুল শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে, এক অপূর্ব ছন্দোময় জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে তারাশঙ্করের গদ্যে।

চার

রাঢ়বাংলার নানা বিশ্বাস, সংস্কার, মৌখিক সাহিত্যের নানা উপাদান যেমন—প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি তারাশঙ্করের সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পেও সে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গল্প শুরু হয়েছে, গঙ্গাস্নান যাত্রীদের প্রত্যাগমনের মধ্যদিয়ে। তাদের বিশ্বাস, পুণ্যদিনের পবিত্রক্ষণে গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। লোকায়ত মানুষ নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে বিশ্বাসী, তারিণীও 'বানের লেগে পূজো দেয়।' এই উপলক্ষ্যে সে, পাঁঠাবলিও দেয়।

লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস, পিঁপড়ে মুখে ডিম নিয়ে চললে প্রবল বন্যা হয়। তারিণীও গ্রাম ত্যাগ করে পথে চলার সময়ে লক্ষ করেছে—'পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল।' কিংবা অন্যত্র বিপদের সঙ্কেত পেয়েছে তারিণী—'দেখিতে, দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল।'

লোকায়ত মানুষ আধুনিক যুক্তি-বিদ্যায় পারদর্শী না হলেও, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা ভীষণ বিচক্ষণ হয়। তারিণীও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, গ্রাম ত্যাগ করার পূর্বে সে কেলেকে বলে—"বাতাস ঘুরেছে, লয় কেলে, পচি বইছে না? বলিতে বলিতেই সে লাফ দিয়া ডাঙায় উঠিয়া শুষ্ক বালি একমুঠা ঝরঝর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল।" তিনদিন পথ চলার পর, তারিণী হঠাৎ সুখীর কাছ থেকে গামছা চেয়ে নিয়ে—'হাতে

ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল।' এরপর সে, দ্রুত গ্রামে ফিরেছে।

লোকায়ত সমাজে আসন্ন বিপদের বার্তা হিসেবে গ্রামে গ্রামে টিন, ডুগডুগি বাজিয়ে ঢেঁড়া দেওয়ার রীতি লক্ষ করা যায়। এ গল্পেও দেখি তারিণী সুখীকে বলেছে—'কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায়·না?' এরকম অসংখ্য বিশ্বাস সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণকে লেখক নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে।

মৌখিক সাহিত্য-ধারার মধ্যে প্রবাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এ গল্পেও কয়েকটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত মেলে। তারিণী, সুখীকে বলে 'মায়ের বুকে ভয় থাকে?' কিংবা 'ময়ূরাক্ষীর পলিত দেশে সোনা ফলে।' ময়ূরাক্ষী, তারিণীর কাছে 'মা'-এর সমান। আবার, ময়ূরাক্ষীর বন্যার জলে আসা পলিতে দুইতীরে সোনার ফসল ফলে—এসত্যও তারিণীর কণ্ঠে উচ্চারিত প্রবাদে ধরা পড়েছে। বানের জিনিস ধরা নিয়ে তারিণী কেলেকে ব্যঙ্গ করে বলে—'বড় ঘুরন-চাকে তিনটি বুটবুটি।' কখনও বলে—'পচি দিকেও তো ডাকে না।' আবার সুখী সম্পর্কে সে বলে—'হাড়ির ললাটে ডোমের দুগগতি।' আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তারিণীর কণ্ঠে একটি ছড়ামূলক প্রবাদ উচ্চারিত হয়েছে—'কাক কুটো তুলেছে/—বাসার ভাঙা ফুটো সারবে।'

কেবল প্রবাদ নয়, প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার-ও লক্ষ করা যায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে; যেমন—'পেট আঁচলে', 'শরীল বুজি পাথরের?' ইত্যাদি। একটি সঙ্গীতেরও ব্যবহারও লক্ষ করা যায় এ-গল্পে। আকণ্ঠ মদ গিলে ঘরে ফিরে তারিণী; সুখীকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গান ধরে—'লো-তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতের আমদানি—।' এগানের কথা তারিণীর জীবনসঞ্জাত এবং এর সুর হৃদয়মন্থনজাত। তারশঙ্করের এ গল্প এরকম অসংখ্য লোকায়ত উপাদানে ভরপুর।

কোনও সৃষ্টি তখনই চিরকালের হয়ে ওঠার ছাড়পত্র পায়, যখন তার মধ্যে একক সমস্যা তাবৎ মানুষের সমস্যা হয়ে ওঠে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণীর 'আলো ও মাটি' কামনার মধ্যে সেই একক সমস্যা চিরন্তন সত্যে উন্নীত হয়েছে, যা, দেশ-কাল-নির্বিশেষে তাবৎ মানুষের জীবনে এক কঠিন পরিস্থিতিতে হয়ত সত্য। তারাশঙ্করের এগল্প রসোত্তীর্ণ ও শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে।

জলসাঘর : এক প্রজন্মের জীবনদর্শন

চন্দনা মজুমদার

'জলসাঘর' গল্পটি তারাশঙ্করের লেখক-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়।

গল্পের রচনাকাল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। সময়টা বিশ শতকের তিরিশের দশকের মধ্যবর্তী কাল। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশের উপনিবেশ। ইংরেজদের দ্বারা দেশ চালিত। গোটা বঙ্গদেশ সামন্ততন্ত্রের শিকলে বাঁধা।

তারাশঙ্কর পরিকল্পনা করেছিলেন, জলসাঘরে নিয়ে তিনটি গল্প লিখবেন। প্রথম গল্পটি 'রায়বাড়ি'। দ্বিতীয় গল্পটি অর্থাৎ 'জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুসের' কাহিনী আর লেখা হয়নি। তৃতীয় গল্পটি 'জলসাঘর'। এখানে ভাঙন বা ক্ষয়ের কথা আছে।

'জলসাঘর' গল্পের দুটি খন্ডে রায় বংশের গৌরবের কাল এবং পতনের ম্লান ঐতিহ্য সমান্তরালভাবে প্রকাশিত। গল্পটির ভূমিকা প্রসঙ্গে 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন :

> কে বলেছিলেন মনে নেই, বলেছিলেন—'জলসাঘরে'র ভাঙনের কথা লিখলেন; গড়নের কথা লিখুন। তখন থেকেই কল্পনা ছিল—আরও দুটি গল্প লিখে 'জলসাঘর' নাম দিয়েই একটি বই প্রকাশ করব। প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুস, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে অ্যছে।....
>
> 'জলসাঘরে'র মাঝের গল্প আর লেখা হয়নি। লিখি নি। এর এক বৎসর পরেই 'জলসাঘর' বই প্রকাশিত হল।....ওই দুটিকে এক করেই জলসাঘরের পালা শেষ করলাম।[১]

'রায়বাড়ি' প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দেব অগ্রহায়ণ মাসে। গল্পে জলসাঘর গড়ে ওঠার কাহিনী আছে। এর নায়ক রাবণেশ্বর রায়। তিনি রায় বংশের চতুর্থ পুরুষ।

'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায় এই বংশের সপ্তম পুরুষ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে গল্পকার পরিচয় ঘটান নি। গল্পে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন .

> চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্রই নয়। রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশও হইয়া গেল।[২]

'জলসাঘর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৯৩৭ খ্রিঃ)। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় আসেন। তারাশঙ্কর বিচিত্রা-ভবনে

উপস্থিত হয়ে, রবীন্দ্রনাথকে 'জলসাঘর' গ্রন্থটি উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' পাঠ করে খুশী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর জানিয়েছেন :

> এখানে এম্পায়ারে এবং ছায়ায় নৃত্যনাট্যের পালা হল। সে বোধ হয় সবসুদ্ধ সাত-আট দিন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে যাঁরা যাওয়া-আসা করলেন, তাঁদের কাছ 'জলসাঘরে'র প্রশংসার কথা শুনলাম।।[৩]

তারাশঙ্করের গল্পের প্রধান উপজীব্য নবীন-প্রাচীনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর জলসাঘর গল্প।

দুই

তারাশঙ্কর ছোট জমিদার বংশের সন্তান। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সঙ্গে নতুন ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরোধের পটভূমিকায়, তাঁর কৈশোর অতিবাহিত। তাঁর গ্রাম লাভপুরে দেখেছেন, অস্তিত্বরক্ষার জন্য সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের সঙ্গে অসম দ্বন্দ্বে নেমেছে।

গ্রামীণ সমাজে নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব, তাদের সঙ্গে জমিদারদের বিরোধ, নতুন ও পুরানোর সংঘর্ষের ফলাফল, তিনি দেখেছেন। তাঁর গ্রাম লাভপুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জমিদার। অন্যদিকে গ্রামের একটি পরিবার কয়লাখনির মালিক হয়ে ধনী হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ী, উভয়েই নিজ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। 'আমার কালের কথা'য় তারাশঙ্কর তাঁব দেশ-কাল প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। জমিদার প্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার-বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন.....।......ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন।[৪]

'জলসাঘর' গল্পে জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলীর দ্বন্দ্বের মধ্যে আঞ্চলিক সংঘাতের প্রতিফলন ঘটেছে। জমিদার চরিত্রের প্রতি তারাশঙ্করের সহানুভূতি স্পষ্ট। তিনি এদের পতন ও ধ্বংসের বিষণ্নমূর্তি তুলে ধরেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের তিনি সাক্ষী। সামন্ততন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পুঁজিবাদের উদ্ভব, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বুঝেছেন, উদীয়মান ধনতন্ত্রকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে, গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ জমিদারদের কেন্দ্র করে অবস্থান করছিল। ইংরাজ-রাজত্বে জমিদারদের সামনে এসেছে ধনগর্বী ব্যবসায়ী শ্রেণী। ব্যবসায়ীদের অর্থের প্রাচুর্য, জমিদারদের গৌরবহানির মূল কারণ।

তাঁর সাহিত্যজগতে আবির্ভাবের সময়ে, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বে জমিদারশ্রেণী ক্ষয়ে যাচ্ছে। এ এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। তারাশঙ্করের রক্তে সামন্ততন্ত্রের চেতনা নিহিত। তাই ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর উত্থানে, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। জমিদারদের অত্যাচারী স্বরূপের দিকে তিনি দৃষ্টি দেন নি।

সামন্ততন্ত্রের গৌরবময় অতীতকে আঁকড়ে থাকা যে অসম্ভব, লেখক তা বুঝেছেন। তাই

তাঁর এই ধরনের চরিত্রগুলিকে তিনি কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। 'জলসাঘরে' আছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের কথা। সমাজ-বিবর্তনের ধারায়, সামন্ততন্ত্র ভেঙে বৈশ্যতন্ত্র উঠে আসছে। এই পটভূমিকায় তারাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে জমিদারশ্রেণীর অন্তিম ট্র্যাজিডি তুলে ধরেছেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-আদর্শের প্রভাবে, পুরানো সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কাঠমো ভেঙে পড়েছে। তারাশঙ্কর গভীর সহানুভূতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এর নিপুণ আলেখ্য রচনা করেছেন। তিনি কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নতুন যুগের দাবিকে, তিনি অস্বীকার করেন নি। জমিদারদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব সত্ত্বেও যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অবহেলা করেন নি। জমিদার ও ব্যবসায়ী, পুরানো ও নতুনের দ্বন্দ্বকে তিনি প্রধান করে তুলতে চেয়েছেন।

'জলসাঘরে' দ্বন্দ্বের চেয়ে লেখকের বেদনার অনুভূতি, তাঁর দীর্ঘশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর অনুভূতিতে, জমিদারশ্রেণী গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহক, তারাশঙ্কর পুরাতনের আভিজাত্যের মধ্যে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজিক চেতনাকে রূপ দিয়েছেন। যুগ-জীবনের রূপান্তরকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বেদনা সার্থক রূপ লাভ করেছে।

'জলসাঘরে' জমিদার বিশ্বম্ভরের বিষণ্ন মূর্তি, তাঁর অতীত ঐশ্বর্য রোমন্থন, বন্ধ জলসাঘর খুলে বাঈজীর নাচ-গানের আসর বসিয়ে ধনী গাঙ্গুলীদের সঙ্গে ব্যর্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

নতুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে, পুরাতনের অন্তর্বেদনা ও ট্র্যাজিক রসকে নিপুণ নিষ্ঠায় রূপ দিয়েছেন। নতুনের জয়যাত্রাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। রায়বংশের প্রাসাদটি প্রকান্ড, কিন্তু জীর্ণ। রাতের অন্ধকার ফাটল-ধরা প্রাসাদের উপর বিষণ্ন ছায়া ফেলেছে। এরই পাশে—'এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তি বিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল।'

অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের প্রতি তারাশঙ্করের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে 'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী', 'গণদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসে। 'জলসাঘরে' বিশ্বম্ভরের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের গৌরবের রেশটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। জলসাঘর আলোকিত করে, বিশ্বম্ভর বাঈজীর আসর বসিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, মহিম ধনী হলেও আভিজাত্যে রায়দের সমগোত্রীয় নয়। প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েও মহিম জমিদার হয়ে উঠতে পারে নি। তারাশঙ্কর জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। মহিমের মত উঠতি ধনী ব্যক্তিকে, তিনি মনে মনে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর আত্মচরিত 'আমার কালের কথা'য় একথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন ঃ

> ''জলসাঘর' গল্পে জলসাঘরের বাতিগুলো নিবিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং বিশ্বম্ভরে চাবুকটা সশব্দে আছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের জন্য ঔপন্যাসিকের বেদনা চাপা থাকে নি।[৫]

জমিদারী ব্যবস্থার ভগ্নদশার মধ্যে তিনি লালিত, এর প্রভাব, জমিদার-জীবন নিয়ে লেখা গল্পের মধ্যে পাই। এ প্রসঙ্গে 'রায়বাড়ী' ও 'জলসাঘর' গল্পের কথা বিশেষ উল্লেখ্য।

তিন

গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভর রায়। মধ্যযুগীয় জমিদারতন্ত্রের বিশশতকীয় প্রতিনিধি। লেখক গল্প শুরু করেছেন বিশ্বম্ভর রায়ের ভোর রাত্রের পায়চারি দিয়ে। প্রৌঢ় বিশ্বম্ভর ভোর তিনটেয় উঠে ছাদে পায়চারি করছেন। ছাদ থেকে তাঁর চোখে পড়েছে, ধনী গাঙ্গুলীদের অট্টালিকার শীর্ষে উজ্জ্বল বিজলীবাতি জ্বলছে।

রায়বাড়ির অবস্থা জীর্ণ। পুরানো খানসামা অনন্ত, বিশ্বম্ভরের জমিদারী অভ্যাসগুলি যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। আস্তাবলে আছে বৃদ্ধ ঘোড়া তুফান। এককালে তরুণ বিশ্বম্ভর এর পিঠে চড়ে বেড়াতে বা শিকারে যেতেন। আর আছে হস্তিনী মতি। এর আদরের নাম 'ছোট গিন্নী'। মাহুত রহমত 'ছোট গিন্নী'র তত্ত্বাবধায়ক।

রাজারামপুরের জমিদার-বংশের সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর। গল্পে তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচয়ের সূত্র, গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা আছে। বর্তমানে তিনি নিঃস্বও একাকী। রোগজীর্ণ ও সম্পদহীন। মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন। আদি থেকে বংশানুক্রমে তিন পুরুষ সঞ্চয় করেছেন। চতুর্থ পুরুষ রাজত্ব করেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে তলানিতে পৌঁছেছে। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর ঋণভারে জর্জরিত।

পারিবারিক জীবনে তিনি প্রবল আঘাত পেয়েছেন। বাড়ির উপনয়ন উৎসবের শেষে সাত দিনের দিন কলেবায় তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও কয়েকজন আত্মীয় একসঙ্গে মারা গেছেন। সেই থেকে— 'শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য—প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষাব মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।'

ব্যক্তিজীবনে এমন আঘাতের পরেও দুই বছর জলসাঘরে বিলাস চলেছে। পূর্বপুরুষের রক্তের ধারা বজায় রেখেছেন। এরপর প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে, রায়বংশ সব সম্পত্তি হারিয়েছে। আছে শুধু বাড়িঘর ও লাখেরাজের কায়েমী বন্দোবস্ত। এতে দৈনন্দিন খরচ চলে। সেই থেকে বিশ্বম্ভর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

গ্রামে বণিক সম্প্রদায়েব উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বম্ভরের সামনে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ। তাঁর ঐশ্বর্য নেই। আছে শুধু অতীত ঐশ্বর্যের স্মারক নায়েব, তুফান, মতি আর জলসাঘর। এককালে বিলাসে জীবন কাটালেও বর্তমানে অর্থসংকট প্রবল, চোখের সামনে প্রিয় ঘোড়া তুফানকে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে রুগ্ণ হয়ে যেতে দেখেছেন। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়াতা স্ত্রীর স্মৃতি-জড়িত মোহর, মহিমের বাড়িতে উপহার পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। জলসাঘরে পিয়ারীবাঈকে বক্‌শিশ দিতে না পেরে, ব্যথিত চিত্তে মাথা নীচু করেছেন। অসহায় অবস্থার বেদনা, নিরুপায় বিশ্বম্ভরকে ভারাক্রান্ত করেছে।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অকালমৃত্যু তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে। মনের দিক থেকে তিনি একাকী। জমিদারী হারিয়ে প্রজাদের দায়িত্ব থেকেও ভারমুক্ত। পুরানো খানসামা অনন্ত, নায়েব তারাপ্রসন্ন, তুফানের সহিস নিতাই ও 'ছোটগিন্নী'র মাহুত রহমত—এরা তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারণের সহায়ক। আর আছে স্মৃতিময় অতীত। পলায়নী মনোবৃত্তি অবলম্বন করে, বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। কিন্তু কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করা সহজ নয়।

মহিমের বাড়ির অন্নপ্রাশনের উৎসব শেষ হলে, বাঈজীরা জমিদার বাড়িতে এসেছে জলসা বসাবার অনুরোধ নিয়ে। নায়েব তারাপ্রসন্ন বুঝেছে, মহিম সুকৌশলে বিশ্বম্ভরকে বিব্রত করতে চায়। বিশ্বম্ভর নিজের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে, কর্মচারীদের জলসাঘর সাজাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্বম্ভর কৃষ্ণাবাঈয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি দুটি কারণে। প্রথমতঃ আর্থিক শূন্যতা সত্ত্বেও গাঙ্গুলীদের সামনে রায় বংশের আভিজাত্যকে অম্লান রাখতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ সুন্দরী বাঈজীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। গল্পকার জানিয়েছেন : 'বাঈজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।'

অব্যবহৃত জলসাঘরে জ্বলে উঠেছে ঝাড়লণ্ঠন। তিনি বাঈজী-নাচের খরচের ব্যবস্থা করেছেন। রায়বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিটিকে দেবোত্তরের খাতায় জমা দিয়ে, পরিবর্তে দেড়শ টাকা খরচ লিখেছেন। আসরে বসার উপযুক্ত বিলাসী পোশাকে সজ্জিত হয়েছে। জমিদারী আভিজাত্য বজায় রাখতে, পানীয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাঈজী কৃষ্ণাবাঈ নাচ-গানে আসর মাতিয়েছে। কৃষ্ণাবাঈ-এর পর মহিমের অনুরোধে তরুণী বাঈজী পিয়ারীবাঈ চটুল কণ্ঠে লঘু সুরের গান ধরেছে। এই বাস্তবের সঙ্গে প্রৌঢ় বিশ্বম্ভরের যোগ সামান্য। তাঁর রক্তে জরার পদধ্বনি। পিয়ারীর চটুল লঘু সঙ্গীত তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি অতীতের স্মৃতিতে মগ্ন থেকেছেন :

> পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বকশিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর।

অতিথি মহিম গৃহস্বামীর আগে বক্‌শিশ দিয়ে, জলসার নিয়ম ভেঙেছে। বিশ্বম্ভরের কাছে ইনাম দেওয়ার মত অর্থ ছিল না। তিনি জলসাঘর ত্যাগ করে, বাড়ির উপরতলায় চলে গেছেন। পরে তারাপ্রসন্ন এসে, বাঈজীদের ইনাম দিয়েছে। সে জানিয়েছে, বুকের ব্যথার জন্য বিশ্বম্ভর আর জলসায় আসতে পারবেন না। জলসা শেষ হয়েছে।

দুই বিপরীত অবস্থার টানাপোড়েনে, বিশ্বম্ভরের মানসিক সংকট প্রতিফলিত। গল্পে বিশ্বম্ভর রায় বংশের শেষ জমিদার। মহিম নতুন ধনী। মহিমের সামনে নিজের আভিজাত্য বজায় রাখতে তিনি সতর্ক। মহিমের কথা ও কার্যকলাপ, তাঁর কাছে স্পর্ধা বলে মনে হয়েছে। মহিমের আভিজাত্যহীন আড়ম্বরকে তিনি ঘৃণা করেছেন। মহিম সম্পর্কে বিশ্বম্ভরের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কঠিন মনোভাব জেগে উঠেছে।

তিনি মহিমের সঙ্গে মর্যাদার লড়াইতে নেমেছেন। দীর্ঘদিন পর জলসাঘর খোলা হয়েছে। আভিজাত্য বজায় রাখতে, গহনার বাক্স আরো শূন্য হয়েছে। নায়েবের হাত দিয়ে একটি রেকাবে দুটি মোহর জলসাঘরে নাচের আসরে বক্‌শিশ পাঠিয়েছেন। বাঈজীকে বক্‌শিশ দিতে, তাঁর শেষ সম্বল খরচ করেছেন বিশ্বম্ভর। তবু তাঁর সান্ত্বনা : 'রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।'

গাঙ্গুলীরা পুরুষানুক্রমে রায় বংশের ছত্রছায়ায় মহাজনী করেছে। প্রিভিকাউন্সিলের রায়ে, রায় বংশের জমিদারী নিলামে উঠেছে। সব দখল নিয়েছে গাঙ্গুলীরা। বেঁচেছে শুধু দেবোত্তর

ও লাখেরাজ সম্পত্তি। এর থেকে বিশ্বম্ভরের জীবনযাত্রার খরচ চলে। তবু তিনি মহিমের কাছে হার স্বীকার করতে চাননি। বিশ্বম্ভর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> অভিমানক্ষুব্ধ আভিজাত্য ও বেদনাহত আত্মমর্যাদাজ্ঞান তাঁর চরিত্রে বিশালতা এনে দিয়েছে। শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায় নিজের গৃহকোণেই তাই আত্মগোপন করেছেন। শুধু তুফানের উচ্চ হ্রেষারব ও ছোটগিন্নীর গর্জন মাঝে মাঝে তাঁকে অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬]

গাঙ্গুলী ও রায় পরিবারের মধ্যে আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। ধনী মহিম দামী মোটরে চড়ে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে রয়েছে বুড়ো হাতি আর ঘোড়া। ব্যবসায়ী মহিম আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ। বিশ্বম্ভর নিঃস্ব। তাঁর ভগ্ন অট্টালিকা ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ম্লান। পাশেই মহিমের বাড়ি তার নিজস্ব ডায়নামোর বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল।

মহিমের বাড়ির অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত বিশ্বম্ভর, মৃতা স্ত্রীর গহনা ও অবশিষ্ট কয়েকটা মোহর দিয়ে রায়বাড়ির মর্যাদা রক্ষা করেছেন। জলসাঘরে বাঈজীকে বক্‌শিশ দিতে গিয়ে, বিশ্বম্ভরের স্ত্রীব গহনার বাক্স নিঃশেষ হয়েছে। তাঁর সামনে, বাঈজীকে টাকার তোড়া উপহার দিয়েছে মহিম। নিরুপায় বিশ্বম্ভর জলসাঘর ত্যাগ করেছেন।

জলসার শেষে সকলে বিদায় নিলে, বিশ্বম্ভর শূন্য জলসাঘরে ফিরে এসেছেন। আত্মবিস্মৃতিই তাঁব সঙ্গী। জলসাঘরে নিভৃত পরিবেশে প্রৌঢ়া কৃষ্ণাবাঈকে দেখে, তাঁব মনে অতীতের চন্দ্রাবাঈয়ের রোমান্টিক প্রেমের স্মৃতি জেগে উঠেছে। তিনি তখন অতীত দিনের আবেগে পূর্ণ এক অন্য মানুষ। তাঁর তরুণ সত্তা জেগে উঠেছে। জলসাঘরের উজ্জ্বল আলো, মদ্যপান, রূপবতী বাঈজীর নৃত্য—এই পরিবেশে বিশ্বম্ভরের মনে মোহের সৃষ্টি হয়েছে।

জীবনসায়াহ্নে বিশ্বম্ভর নিঃসঙ্গ। একদিকে প্রৌঢ় জীবনের বয়সজনিত অসহায় ভাব ও বিপর্যস্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণামে করুণ আর্থিক অবস্থা। অন্যদিকে পারিবারিক আভিজাত্যেব গৌরব ও অহংবোধ। তিনি অতীত ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন। শূন্য কোষাগার, শূন্য গহনার বাক্স, জীর্ণ প্রাসাদ, বৃদ্ধা 'ছোটগিন্নী', প্রৌঢ় তুফান—বর্তমানের এইসব ভুলে অতীতে প্রস্থান করেছেন।

জলসাঘরে বসে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে, বিশ্বম্ভর ফিরে গেছেন পঁচিশ বছর আগের দীপ্ত যৌবনে। যৌবনকালের প্রিয়তমা দিল্লীর চন্দ্রাবাঈ যেন ফিরে এসেছে কৃষ্ণা-বাঈ-রূপে। জমিদারবংশের আভিজাত্য, আবেগ ও মোহ বিশ্বম্ভরকে মাতাল করেছে।

জমিদারবংশের এই শেষ উত্তরাধিকাবীর মধ্যে এক ধরনের অসহায়তা-মিশ্রিত পলায়নবাদী মনোভাব প্রকাশিত। পতন অনিবার্য জেনেও তিনি যেন বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে থেকেছেন। বারে বারে স্মৃতির রাজ্যে ফিরে গেছেন। মাঝে মাঝে ঘটনার অভিঘাতে, নিমগ্ন চেতনাস্তর থেকে বাস্তবে ফিরে এসেছেন।

শূন্য জলসাঘরে বিশ্বম্ভর সুরাপান করেছেন ও এস্রাজ বাজিয়েছেন। ভোরের দিকে বাঈজী ক্লান্ত শরীরে ফরাসের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্বম্ভর তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়েছেন। গাঙ্গুলীবাড়ির ঘড়িতে তিনটের ঘণ্টা বেজেছে। তিনি প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ছাদে পায়চারী করেছেন। অনন্তকে নির্দেশ দিয়েছেন, পুরানো দিনের পাগড়ি ও সওয়ারের পোশাক আনতে।

সহিস নিতাইকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুফানকে প্রস্তুত করার জন্য। অভিজাত পোশাকে সজ্জিত হয়ে, তুফানের পিঠে চেপে বেড়াতে গেছেন।

বিশ্বম্ভরের মনের জগতে আবেগ-উত্তেজনা জেগেছে। দীর্ঘদিন পরে জলসাঘর সাজানো, জলসার উপযুক্ত পোশাক পরিধান, মদ্যপান, এস্রাজ বাজানো, চন্দ্রাবাঈ ভেবে কৃষ্ণাবাঈকে আদর করা, উত্তেজনার বশে প্রৌঢ় বয়সে অশক্ত শরীরে তুফানের পিঠে চেপে বহু দূরে ভ্রমণে যাওয়া—এই সবকিছু ঘটেছে সেই আবেগে। তুফানের পিঠে চেপে, তাদের হারানো লাট কীর্তিহাটে পৌঁছে গেছেন। সেখানে পুরানো জমিদার সম্পর্কে প্রজাদের সশ্রদ্ধ কথাবার্তা তাঁর কানে এসেছে :

> পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ি চালিয়েছে। আরোহী তাহাতে দুই জন। বোধ হয় তাহারা হাটে চালিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল, গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে—
>
> রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিরোধ করিলেন। তখনও গাড়ির আরোহী বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—

জমিদারদের সরিয়ে অনিবার্যভাবে মহিমরা আসবে, এটাই ইতিহাসের নির্মম সত্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিরিশের দশকে তারাশঙ্কর এই সত্য বুঝেছিলেন। তবে তিনি জমিদারী প্রথার প্রতিই আস্থা রেখেছেন। বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতি বিশ্বাসী হতে পারেন নি। তাঁর এই মনোভাব 'জলসাঘর' গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রিভি কাউন্সিলের রায়, জমিদারদের পক্ষে নয়। এই রায়ে, বিশ্বম্ভরের প্রায় সব কিছু হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবু নতুন ধনী মহিমের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব শুধু বিশ্বম্ভর নয়, সাধারণ প্রজারাও মানতে চায় নি। বিশ্বম্ভরের জমিদারীর অধিকাংশ মহিমের অধীনে। তবু গাঙ্গুলীরা প্রজাদের কাছে 'বাবু'। নিঃস্ব রায়েরা প্রজাদের কাছে 'রাজা'। মহিমের চেয়ে জমিদারী হারানো বিশ্বম্ভর, প্রজাদের কাছে বেশী শ্রদ্ধেয়।

আবেগে-উত্তেজনায় তুফানের পিঠে চেপে, বিশ্বম্ভর বহু দূরে চলে যান। সুরার প্রভাবে দুর্দম যৌবন-স্বভাব জেগে ওঠে। বিশ্বম্ভর আবার ফিরে আসেন বর্তমান মানসিকতায়। দূরে চলে গেছেন বুঝতে পেরে, ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসেন। হারানো কীর্তিহাটের সামনে থেকে তাঁর বাড়ি ফিরে আসার চিত্র এইরকম :

> তিনি হাঁপাইতেছিলেন। অনুভব করিলেন, তুফানও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহাব সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতেছিল।

পঁচিশ বছর আগে, যৌবন-মদমত্ত তুফান ব্যান্ডের তালে নাচত। এখন তুফান ছুটতে গিয়ে ক্লান্ত। তাঁর ক্ষমতার শেষ' বিন্দু নিঃশেষিত। বিশ্বম্ভর বর্তমানকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। তুফানের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে, তিনি ফিরে এসেছেন কঠিন বাস্তবে। তাঁব অতীতচারিতার মোহ ছিন্ন হয়েছে। তাঁর প্রকৃত অবস্থান, নিজের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

গাঙ্গুলীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে, এক রাত্রে সুরা ও বাঈজীর মোহে বাস্তবকে

ভুলেছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য অতীত বৈভব ও হারানো যৌবনকে ফিরে পেয়েছিলেন। ভোরের অবসানে দিনের আলোয়, তাঁর সে বিভ্রম বা মায়াস্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে রোধ করার শক্তি কারো নেই। রক্তাক্ত তুফানকে দেখে বিশ্বম্ভর সস্নেহে বলেছেন :

> ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ্-ওঠ্।

কথাগুলি বিশ্বম্ভর যেন নিজেকেই বলেছেন। তিনি আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে উঠেছেন। তার অতীত স্মৃতির মোহ, ছিন্ন হয়েছে। বাড়ির দোতলায় ওঠার সময়, বিধ্বস্ত বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি পড়েছে জলসাঘরের খোলা দরজার দিকে। জলসাঘর তখনও আলোয় উজ্জ্বল :

> দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন।

বিশ্বম্ভরের মনে সভয় আত্মসচেতনতা জেগেছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় দেখেছেন, পূর্বপুরুষের মুখে মত্ত হাসি। তাঁর মনে হয়েছে, সাত পুরুষের মোহমত্ততা যেন রায়বংশে অভিশপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। অতীতের খ্যাতি ও ঐতিহ্যের মোহে, এতদিন তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন। নির্মম বাস্তবের আঘাতে তাঁর মোহজাল ছিন্ন হয়েছে। অসম প্রতিযোগিতা যে অর্থহীন, এই কঠোর সত্যটি তিনি বুঝেছেন। তাঁর অনুভূতি :

> সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন— মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।

বিলাসিতা ও মোহ, তিলে তিলে জীর্ণ করেছে রায়বংশের বনিয়াদ। সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, বিশ্বম্ভর প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেছেন। জলসাঘরের হাহাকার ও রিক্ততা, তাঁর অন্তরাত্মার স্বরূপ উন্মোচন করেছে। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে অনন্তকে বলেছেন :

> বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর্—জলসাঘরের—

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে তিনি অনন্তকে ভয়ার্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিয়েছেন, জলসাঘর বন্ধ করে দেওয়ার। বিশ্বম্ভরের হাতের চাবুক, জলসাঘরের দরজায় সশব্দে আছড়ে পড়েছে। চাবুকের আঘাত করে, তিনি অতীতের জমিদারী মোহকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন। জলসাঘরের দিন শেষ, এই সত্য উপলব্ধি করেছেন।

নিরুপায় বেদনায়, বিশ্বম্ভর মূক হয়ে গেছেন। ভূপতিত বিশ্বম্ভর নির্বাক, নিস্পন্দ। প্রৌঢ় বয়সের শারীরিক দুর্বলতা, মদ্যপান, নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন, তুফানকে প্রাণপণ ছুটিয়ে বহু দূরে প্রাতঃভ্রমণে যাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম ও উত্তেজনা—তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছে।

লেখক চরিত্রে নাটকীয়তা এনেছেন। বিশ্বম্ভরের মনে অতীত স্মৃতির অনুষঙ্গে মোহের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে, মর্যাদালাভের জন্য জলসাঘরের দরজা স্থায়ীভাবে খুলে রাখা সম্ভব নয়—গল্পের শেষে এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন।

বিশ্বম্ভরের মৃত্যুর মধ্যে যে অসহায়তা ও বেদনা, তার মধ্যে তারাশঙ্করের মমত্ববোধ প্রকাশিত। চরিত্রটির বিন্যাসে নাট্যরসের সফল প্রয়োগ ঘটেছে। চরিত্রটির পরিণতি প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> দুই একটি পুরাতন ভৃত্য ও কর্মচারীর অপরিবর্তিত সম্ভ্রম ও সেবাযত্ন ভগ্নস্তূপের

> উপর শেষ সূর্যাস্তরেখার ন্যায় তাহার করুণ অসহায়তাটিকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নূতন ধনী বংশের সবিদ্রূপ প্রতিযোগিতা ও ছদ্ম-সমবেদনার স্পর্ধিত অপমান লাঞ্ছনার কন্টক শয্যা বিছাইয়া দারিদ্র্য-দুঃখকে আরও অসহনীয় করিয়াছে। শেষে একদিন.......স্মৃতিজর্জর বিশ্বম্ভর রায় যৌবনের ফেনিলোচ্ছল সুরা আকণ্ঠ পান করিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে।[৭]

গল্পে ভেঙে-পড়া সামন্ত-আভিজাত্যের দীর্ঘশ্বাস ফুটে উঠেছে, বিশ্বম্ভর রায় যুগাবসানের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন। সাত পুরুষের জমিদারীর ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা পেরিয়ে, ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজনে উন্নতদেহী বিশ্বম্ভর মাথা নত করেছেন। মহিমের কাছে তাঁর পরাজয় কেবল ব্যক্তিগত নয়, তা ঐতিহাসিক সত্য। নিঃস্ব জমিদার বিশ্বম্ভরের যে বেদনা, তা ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের চিরন্তন বেদনা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> তাই জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায় গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো নিয়তির অনিবার্য শিকার। পতন সুনিশ্চিত জেনেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মাথা উঁচু করে রেখে যেতে চান।[৮]

বিশ্বম্ভর রায়ের দীর্ঘশ্বাস যেন স্বয়ং লেখকের। 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা'য় কালের নিয়মকে তারাশঙ্কর নিরাসক্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'জলসাঘরে' সামন্ততন্ত্রের বর্ণনায়, তিনি হৃদয়-বেদনাকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন নি। জমিদারেরা লেখকের স্ব-শ্রেণীর। ভালো-মন্দ মিলিয়ে তাদের যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টা তিনি করেছেন। তারাশঙ্করের হাতে বিশ্বম্ভর রায় বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সজীব ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। চরিত্রটি নিঃসন্দেহে শিল্পসফল।

চার

পুরনো জমিদারতন্ত্রের পাশাপাশি নব্য সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে। মহিম গাঙ্গুলী নতুন ধনী। নতুন কালের আত্মম্ভরী ব্যবসায়ী। জীবনযাপনে মহিম আধুনিক। সে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি। তার বাড়িতে বিজলীবাতি জ্বলে। তার নব-অর্জিত আভিজাত্যের পরিচয় মেলে বাড়ির পেটা ঘড়ির শব্দে, মোটর গাড়ির ব্যবহারে, পুত্রের অন্নপ্রাশনে ব্যান্ডের বাজনা ইত্যাদিতে।

পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে বাড়িতে বাঈজীর আসর বসিয়েছে। মহিমের আলোয় ঝলমল বাড়ির আসর, আধুনিক জীবনের চাকচিক্যকে তুলে ধরেছে। মহিম নর্তকীদের অতিরিক্ত তিন দিন রেখে দিয়ে, উৎসবের জের টেনেছে। পাঁচ দিন ধরে বাঈজীদের নাচ-গানের আসর বসানোর মধ্যে দিয়ে, তার বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি আকর্ষণ ও অর্থের অহংকারের পরিচয় মেলে।

জমিদার শ্রেণী অবলুপ্ত হলে তাদের স্থান কারা নেবে, তারাশঙ্কর তা বুঝেছেন। তাই বিশ্বম্ভরের পাশে এঁকেছেন মহিমকে। এককালে মহিমরা ছিল জমিদারের অধীন। জমিদারের অর্থানুকূল্যেই তাদের প্রতিষ্ঠা। মহিমের পূর্বপুরুষেরা বংশানুক্রমে জমিদার রায় বংশের এলাকায় মহাজনী করেছে। রায় পরিবারের প্রতি তাদের আচরণ ছিল অধস্তন কর্মচারীর মত। মহিমের পিতা জনার্দন রায়, রায়বাড়ির কর্তাকে 'হুজুর' সম্বোধন করত। মহিম সচেতনভাবে সেই সম্মান দেয় না বিশ্বম্ভর রায়কে। রায়বাড়ির আভিজাত্যের প্রতি সে ঈর্ষাপরায়ণ। সুযোগ পেলেই সে রায়বাড়ির হারানো মর্যাদায় আঘাত করার চেষ্টা করেছে।

মহিম ধনতন্ত্রের প্রতীক। ভঙ্গুর সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছে ধনতন্ত্র। মহিমদের প্রয়াস, বিশ্বম্ভরের মতো জমিদারতন্ত্রের উত্তরাধিকারীদের দ্রুত বিলুপ্তির পথে নিয়ে গেছে। গল্পের ব্যঞ্জনায় এই বিষয়টিকে তারাশঙ্কর সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন।

পতনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের প্রতি তারাশঙ্করের দুর্বলতা বা আকর্ষণ স্পষ্ট। জমিদারবংশের সন্তান তিনি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন। তাঁর লেখায়, নবীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আদর্শ চরিত্র হয়ে ওঠেনি। 'কালিন্দী'র মিল-মালিক বিমল মুখার্জী বা 'জলসাঘরে'র ব্যবসায়ী মহিমকে তিনি অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তারাশঙ্করের বিশ্বাস, এরা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা সম্মান পাবে না।

গাঙ্গুলীদের সঙ্গে রায়বাড়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। মহিম তার পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবে বিশ্বম্ভরকে নিমন্ত্রণ করতে জমিদারবাড়ীতে এসেছে। সে তার ঝকঝকে মোটরগাড়ী নিয়ে জীর্ণ রায়বাড়িতে ঢুকেছে। সুগন্ধী শরবত পান করেছে। বিশ্বম্ভরকে 'ঠাকুদা' বলে সম্বোধন করে জানিয়েছে, বাড়ির জলসায় লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আসছে। প্রৌঢ় বিশ্বম্ভর মহিমের আসরে তাঁর উপস্থিত থাকার অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বয়সজনিত শারীরিক অসুবিধার কথা বলেছেন।

মহিম নানাভাবে নিজের অর্থগৌরব ও রুচির আভিজাত্য প্রকাশ করতে আগ্রহী। পুত্রের অন্নপ্রাশনে বিশ্বম্ভরকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে, তার ধনগর্ব ও স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে। রায়বাড়ির অট্টালিকা ভগ্ন। মহিম জমিদারবাড়ীর জীর্ণ অবস্থার দিকে, বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এইভাবে :

> বাড়ীটা ক'রে রেখেছেন কি ঠাকুরদা, মেরামত করানো দরকার যে।

সে তার উক্তির মধ্যে দিয়ে, প্রাক্তন জমিদারের অর্থদৈন্য ও অক্ষমতার প্রতি শ্লেষ করেছে। গল্পে মহিম চরিত্রটির পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর সচেতন। চরিত্রটির মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। সে নতুন সভ্যতার উপকরণ নিয়ে গল্পে উপস্থিত। বণিক সভ্যতা ও অর্থনীতি, বুর্জোয়া সংস্কৃতির মিশ্রণে চরিত্রটি গঠিত। তার মধ্যে রয়েছে সামন্ততন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা, উপহাস ও ব্যঙ্গের মনোভাব।

মহিম জমিদারবংশের অবশ্যম্ভাবী পতনের দিকে ইঙ্গিত করেছে। মহিমের উদ্ধত আচরণ ও কার্যকলাপ, জমিদারী হারানো বিশ্বম্ভরের ব্যর্থতার চিত্রকে আরো বিষাদময় করে তুলেছে। নতুন বণিকতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইংরেজ-তোষণ। পারিবারিক আভিজাত্যহীন, ব্যক্তিত্বহীন, তোষামোদপ্রিয় এক শ্রেণীর স্বভাববৈশিষ্ট্য মহিমের মধ্যে ফুটে উঠেছে :

> মহিম উঠিয়া তাচ্ছিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

মহিমের আচার-আচরণ স্থূল। নিঃস্ব জমিদার বিশ্বম্ভরের নায়েব, খানসামাও তাকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছে। অর্থের অহংকারে সে নানাভাবে বিশ্বম্ভরকে ছোট করার চেষ্টা করেছে। মহিম ধনগর্বী। তার ঔদ্ধত্য, নির্বুদ্ধিতা ও রুচিহীনতায় সে নিজেই নিজেকে ছোট করেছে। তার আচরণ কখনো কখনো হাস্যকর।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম। মহিমের পুত্রের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে, বিশ্বম্ভর

রায় খেতে যান নি। সেই অভিযোগ জানাতে ও রাত্রে লক্ষ্ণৌ থেকে আসা বাঈজীদের নাচ-গানের আসরে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাতে সে রায়বাড়িতে এসেছে। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে কথোপকথনে, মহিমের মমত্ববোধহীন অহংকারী মনোভাব প্রকাশিত :

> তেমনই হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদা বলে ভুলে যাও ভাই।......শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড় কাতর করে আমাকে।
>
> মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তা হ'লে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তাঁরা সব আসবেন কিনা।

মহিম বিশ্বম্ভরকে 'ঠাকুরদা' বলে সম্বোধন করেছে। অথচ বিশ্বম্ভরের শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনেও কোন সহমর্মিতা বা সহানুভূতিসূচক উক্তি তার মুখে উচ্চারিত হয় নি। সে অসুস্থ প্রৌঢ়কে কোন সান্ত্বনা বা আশ্বাসের কথা শোনায় নি। অর্থগর্ব মানুষের মানবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। মহিমের এই আচরণের মধ্যে দিয়ে অর্থগর্বী ধনতান্ত্রিক সভ্যতাব নিষ্ঠুরতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন লেখক।

জমিদারদের ক্ষয় ও বণিক সমাজের উত্থানে, তারাশঙ্কর ব্যথিত হযেছেন। নতুন কালের আবির্ভাবকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এর ভোগসর্বস্ব ও হৃদয়হীন রূপটিকে মানতে পারেন নি। মহিমের মানসিকতার কদর্য দিক, প্রাচীনের প্রতি উঠতি ধনীর অবজ্ঞাকে, তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর বর্ণনায় মহিমের প্রতিপক্ষ বিশ্বম্ভরের তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ, পাঠকের হৃদযকে ব্যথিত করেছে। নতুন ধনতন্ত্রের হৃদয়হীনতা,. লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

মহিমের জলসার আয়োজন, সব দিক থেকেই জমিদারবাড়ির জলসাঘরের অনুষ্ঠানের বিপরীত। শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা, তার উদ্দেশ্য নয়। অর্থের আড়ম্বর প্রকাশেই সে উৎসাহী। জমিদারী হারিয়েও রায়বাড়ির প্রতি সকলের সশ্রদ্ধ মনোভাবে, সে ক্ষুব্ধ। মহিম নিজেকে বিশ্বম্ভরের মতো রুচিবান, শিল্পমোদী হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে।

নতুন ধনীর দল, বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতির ধারক। সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা সম্পর্কে তাদের সূক্ষ্ম বোধবুদ্ধির অভাব আছে। পুত্রের অন্নপ্রাশনে মহিম তার বাড়িতে যে জলসার আয়োজন করেছে, এব পিছনে রয়েছে জমিদারের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য খর্ব করার কূট প্রচেষ্টা। কৃষ্ণাবাঈদের আরো তিন দিন রেখে দিয়ে, গান-বাজনার আসরকে দীর্ঘায়ত করেছে। এর কাবণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধাবোধ নয়,' অর্থ ব্যয় করে. সে সমাজের সম্ভ্রম পেতে চেয়েছে।

মহিমের কূট বুদ্ধির পরিচয় পাই। পড়ন্ত জমিদারবংশের অর্থ-সংকটের কথা সকলেই জানে। জলসাঘরে নাচ-গানের আসর বসানোর সার্মথ্য, রায়বংশের আর নেই। মহিমা তার বাড়িতে অনুষ্ঠান করতে আসা বাঈজীদেব পরামর্শ দিয়েছে, জলসা বসাবার অনুরোধ নিয়ে জমিদারবাড়ীতে যেতে। মহিমের উক্তি :

> বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়তো হতে পারে।

বণিক সভ্যতার দম্ভ ও কুটিলতা মহিমের চরিত্রে প্রকাশিত। নায়েব তারাপ্রসন্ন মহিমের অশিষ্ট আচরণে ক্ষুব্ধ। তার ভাবনায়, মহিমের স্বভাবের যথাযথ পরিচয় মেলে। জলসা বসানোর অনুরোধ নিয়ে বাঈজীরা রায়বাড়িতে উপস্থিত হলে সে ভেবেছে :

> এ ওই কুটিল মহিম গাঙ্গুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে।

বনেদী জমিদারী আভিজাত্যের পাশে, লেখক চরিত্রটিকে কিছুটা ছোট করে দেখাতে চেয়েছেন। মহিম পারিবারিক ঐতিহ্যহীন। তার স্বভাব অমার্জিত ও রুচি-সংস্কৃতিহীন। রায়বাড়ির জলসাঘরে বিশ্বম্ভরের উপস্থিতিতে মহিমের আচরণ এইরকম :

> কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে, চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুত আচ্ছা।
>
> রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

নর্তকীর নাচ-গান শেষ হওয়ার আগেই, মহিম বারংবার প্রশংসা করে আসরের ছন্দ ভেঙেছে। বাঈজী-নাচের আসরে, মহিম মাত্রা ছাড়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। তার স্বভাবে উন্নত রুচি ও সূক্ষ্ম রসবোধের অভাব ফুটে উঠেছে। চরিত্রটির অসঙ্গত রসবোধের প্রতি গল্পকার ইঙ্গিত করেছেন।

জলসাঘরের আসরে মহিম নিয়মভঙ্গ করে, বাঈজী পিয়ারীকে বক্‌শিশ দিয়েছে। বিশ্বম্ভরের অতিথি হয়ে তাঁর সামনেই মহিম বলেছে : 'কৃষ্ণাবাই, থোড়া ইনাম ইধার।' মহিমের আচরণে নব্য ধনীদের আত্মম্ভরিতা ও রুচিবোধের অভাব স্পষ্ট। নতুন ধনীদের এই মত্ততার চিত্র, শ্লেষের ব্যঞ্জনা দেয়।

গল্পে মহিম ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি। কিন্তু সে বিশ্বম্ভরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রতিযোগিতা, সমানে-সমানে হয় নি। মহিমের মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রুচির অভাব প্রকট। অর্থ, বুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে সে গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে পারে নি। মহিমরা পুরুষানুক্রমে সুদখোর মহাজন।

> গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিমের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে—হুজুর।

গল্পে ঘটনার নানা স্তরে অর্থ, সাংগঠনিক শক্তি ও কূটকৌশলের জোরে জমিদারপক্ষের সঙ্গে মহিমের দ্বন্দ্ব জমে ওঠে নি। দুই প্রবল প্রতিপক্ষের সংঘাত, গল্পটিকে ঘাত-প্রতিঘাত সম্পন্ন করে তুলতে পারেনি। 'কালিন্দী' উপন্যাসে দেখি, চিনিকলের মালিক বিমল মুখার্জী ও জমিদার ইন্দ্র রায় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> বিমল মুখার্জী অর্থ, বুদ্ধি ও ক্ষমতার দাপটে গ্রামবাসী এবং কর্মচারী উভয়ের কাছেই সমীহের পাত্র। এমনকি শেষের দিকে ইন্দ্র রায়ও তাকে তেমন ঘাঁটাতে চাননি। কিন্তু মহিম বিশ্বম্ভরের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসই পায় না।[৯]

জমিদারী হারিয়েও বিশ্বম্ভর সমাজে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিপত্তি, মহিমের ঈর্ষার কারণ। বিশ্বম্ভরের সামাজিক সম্মান প্রসঙ্গে তার এইরকম মনোভাবের পরিচয় মেলে :

> তাই এই জীর্ণ ফাটল ধরা রায়বাড়ীর নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।
>
> সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।
>
> মহিম গাঙ্গুলী ভাবে, মরা-পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।

এটাই পুরানো ও নতুন, বিশ্বম্ভর ও মহিমের দ্বন্দ্বের প্রধান দিক। নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে স্বরূপ তুলে ধরার জন্য গল্পে চরিত্রটির উপস্থিতি। আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার অর্থনির্ভর অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি মহিম। গল্পে চরিত্রটি বিশ্বম্ভর রায়ের সামগ্রিক রূপ নির্মাণে ও বিকাশে সহায়ক হয়েছে। মহিমের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, বংশগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জমিদাব বিশ্বম্ভর রায়ের একেবারে বিপরীত। এই বৈপরীত্য, গল্পের অবয়বকে শিল্প-সুষমা দিয়েছে।

পাঁচ

'জলসাঘর' গল্পের ভাষা, রচনারীতি ও নাটকীয়তা লক্ষণীয়। গল্পের মূল কথা, বিশ্বম্ভর রায়ের আভিজাত্যের গর্ব। নতুন ধনীর সঙ্গে পুরানো জমিদারের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে, লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিপর্যয়ের সামনে বসেও বিশ্বম্ভরের মধ্যে তেজ ও দম্ভের প্রকাশ ঘটেছে। গল্পে তারাশঙ্কর তা উপযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করে, যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

গল্পের শুরু, বিশ্বম্ভরের ভোর তিনটেয় ছাদে উঠে প্রতিদিনের মতো পায়চারির মধ্যে দিয়ে। পরিচারক অনন্ত, সহিস নিতাই, মাহুত রহমত, তুফান, 'ছোটগিন্নী' নামে হাতিব উল্লেখ করে লেখক পটভূমি রচনা করেছেন। বিশ্বম্ভরের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও লেখকের কিছু বিবৃতির মাধ্যমে অতীতের ঘটনা ধরা পড়েছে।

তারাশঙ্কর জানেন, কেবল অতীতের মোহ জমিদারতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তাই তিনি জমিদারশ্রেণীর পতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে সরাসরি সম্পূর্ণ পতন বা অন্ধকারের ছবি আঁকেন নি। তিনি শিল্পীর যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। জমিদারতন্ত্রের ঔজ্জ্বল্যের পাশাপাশি অন্ধকার নেমে আসার বৈপরীত্যটি, পাঠকের সামনে স্পষ্ট করেছেন।

তারাশঙ্করের গল্পে নাটকীয়তার অভাব নেই। এই নাটকীয়তা যুক্ত হয়েছে 'জলসাঘর' গল্পেও। আবেগের তীব্রতা কিভাবে নাটকীয় সংঘাতের সৃষ্টি করে, গল্পে তার উদাহরণ পাই। কাহিনীতে কতগুলি আকস্মিক বাঁক বা ঝাঁকুনি আছে। এগুলি পাঠককে কৌতূহলী করে।

গল্পে লেখক সামন্ততন্ত্রের গৌরবময় দিনগুলির অধঃপতন তুলে ধরেছেন। রায়বংশের ছয় পুরুষের রাজত্বকালের সমৃদ্ধিময় দিনগুলি ফুরিয়ে গেছে। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের সময়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। সেই অনিবার্য অন্ধকারের চিত্র রয়েছে এই গল্পে।

তারাশঙ্কর ধাপে ধাপে একটির পর একটি ঘটনা সাজিয়েছেন। জমিদারী-হারানো বিশ্বম্ভরের

যন্ত্রণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বোঝাতে চেয়েছেন। বিশ্বম্ভর নিজের জীবনের পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে, নিজস্ব গন্ডীর মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। অতীতের মোহকে আঁকড়ে ধরেছেন। বর্তমানের প্রতি তাঁর আস্থা নেই।

গল্পে লেখক নাটকীয় কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন। রায়বাড়ির সমৃদ্ধির দিনে বিশ্বম্ভরের পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। সেইসময় কলেরায় গোটা পরিবার বিপর্যস্ত। একসঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে হারিয়ে, বিশ্বম্ভর স্তম্ভিত। রায়বংশের বিলুপ্তি,তিনি নিজের দুর্ভাগ্য হিসাবে মেনে নিয়েছেন। পূর্বপুরুষ রাবণেশ্বর রায়ের মতো আবার বিরহ করেন নি।

স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে হারিয়ে, তাঁর হৃদয় ভেঙে গেছে, তবু জমিদার হিসাবে সমাজে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই দুর্ঘটনার পরেও জলসাঘরে আসর বসেছে। আলো জ্বলেছে। বাঈজীর ঘুঙুর, সেতার ও সাবেঙ্গীর সুর বেজেছে।

প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে, সব ভূসম্পত্তি জমিদারের হাতছাড়া হয়ে যায়। বিশ্বম্ভরের কাছে এই আঘাত সবচেয়ে মারাত্মক। ঋণের দায়ে তাঁর সম্পত্তি মহাজনের গ্রাসে চলে যায়। তাঁর জমিদার-সত্তায় চরম আঘাত লাগে। জলসাঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বম্ভর বাড়ীর উপরতলা থেকে নীচের তলায় নামা বন্ধ করে দেন।

গাঙ্গুলীরা উঠতি ব্যবসায়ী। এতকাল তারা রায়বাড়ির কর্তাদের কাছে মাথা নত করে এসেছে। এখন তারা অত্যন্ত ধনী। কিন্তু বিশ্বম্ভর তাদেরকে রায়বংশের সমকক্ষ বলে মেনে নিতে পারেন নি।

মহিম তাঁর দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করার জন্য বাঈজীদের রায়বাড়ীতে পাঠিয়েছে। বাঈজীরা জলসা বসানোর অনুমতি চেয়েছে। বিশ্বম্ভরের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব জেগে উঠেছে, তিনি বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে, শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছেন। তবু মহিমকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেবার আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করেছেন।

ঘটনার চেয়ে চরিত্রসৃষ্টিতে তারাশঙ্কর বেশী নিপুণ। তিনি শেষপর্যন্ত পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখতে পেরেছেন। বিশ্বম্ভরের জীবনের অনেক কথা বলা হয়েছে। তবে ছোটগল্পের একমুখীনতা, ঘটনার ক্রম-পরিণতি গল্পে বিদ্যমান।

বিশ্বম্ভর বংশের শেষ প্রতিনিধি। সামন্ততন্ত্রের ঐতিহ্যের ধারক। তিনি জমিদারী হারিয়েছেন। কিন্তু মেজাজে, বিলাসে তাঁর ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশিত। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু মনের দিক থেকে দুর্বল নন। জমিদারী হারিয়েও তাঁর অধিকারবোধ অটুট।

উদীয়মান ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের সংঘর্ষে, নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তারাশঙ্কর অসাধারণ রসনৈপুণ্য সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বম্ভর ও মহিমের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, শেষপর্যন্ত ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত মান-অভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ, তাদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

তারাশঙ্কর গল্পের সূচনায় দুটি অনুচ্ছেদে পড়ন্ত জমিদারবংশের চিত্র রচনা করেছেন। ফাটলধরা জীর্ণ প্রাসাদ, মালীর অভাবে শ্রীহীন ফুলের বাগান, রায়বাড়িতে ঘড়ির ঘণ্টা না বাজা—এসবের মাধ্যমে বিশ্বম্ভরের অসহায় অবস্থা তুলে ধরেছেন।

এর পাশে গাঙ্গুলীবাড়ির 'প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে'

জলার চিত্র পাই। তাদের ছাদের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহর ঘোষণা করা হয়। রায় ও গাঙ্গুলী বাড়ির চিত্রের বৈপরীত্য, গল্পের মূল বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বম্ভর সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য, দাম্ভিকতা, সংগীতপ্রিয়তার প্রতীক। মহিম একালের ঔদ্ধত্য, রুচিহীনতা, হীন মনোবৃত্তির প্রতীক। বিশ্বম্ভরের স্মৃতিতে নহবৎ-এর সুর। গাঙ্গুলীবাড়ির উৎসবে বেজেছে ব্যান্ডপার্টির সুর। রায়বাড়িতে মার্গসঙ্গীত, বেলোয়াড়ি ঝাড়লণ্ঠন, বৃদ্ধা হস্তিনী ও অশ্বের মিলিত ঘরানা। মহিমের বাড়ীতে ব্যান্ডের বাজনা, পেট্রোম্যাক্সের আলো, মোটরগাড়ির আওয়াজের মাধ্যমে নতুন ধনীর ধনের আড়ম্বর। এইসব বিপরীত চিত্রের মাধ্যমে গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবের বিকাশ ঘটেছে।

জলসাঘরে বিশ্বম্ভর রায়ের কৃষ্ণাবাঈকে চন্দ্রাবাঈ বলে মনে করাটা জটিল মনস্তাত্ত্বিক মোহের প্রকাশ। প্রৌঢ় বিশ্বম্ভর যৌবন বয়সের মত তুফানের পিঠে চেপে, তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। পরে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে ও জলসাঘরের সামনে শোচনীয় মৃত্যু। গল্পের কাহিনীতে যে জট, তা মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা।

জলসাঘরের রোমাঞ্চকর পবিবেশে বিশ্বম্ভরেব আবেগের তীব্রতা, গল্পের শেষে চিত্রের পক্ষে যথাযথ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। গাঙ্গুলীদের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, বিশ্বম্ভরকে সংকুচিত ও বিব্রত করেছে, লেখক বিশ্বম্ভরের মধ্যে অতীতের মোহ, সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষায়, গহনার বাক্স শূন্য হয়েছে, তিনি আত্মবিস্মৃতির মধ্যে মগ্ন থেকেছেন।

গল্পে মাঝে মাঝে অতিনাটকীযতা আছে। কুসুমাডিহি গ্রামের পথে তুফানের পিঠে চড়ে ভ্রমণ কবছিলেন বিশ্বম্ভর। হাটেব পথে তরকারী বোঝাই দুটি গাড়ি চলেছে। দুই আরোহীর সংলাপ তাঁর কানে আসে :

> গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে— .খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—

এই অংশে গাড়ীর আরোহীদের কথোপকথন ও বিশ্বম্ভরের শোনার মধ্যে আছে অতিনাটকীয়তা। এই অতিনাটকীয়তার প্রয়োগ, প্লটকে শিল্পের মর্যাদা দান করেছে। এই ধরনের চিত্র এঁকে সাধারণ প্রজাদের কাছে জমিদারী ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি, লেখক তা বুঝিয়েছেন।

জলসাঘর খুলে রায়বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরে, বিশ্বম্ভব আনন্দিত, সেইসময় আকস্মিকভাবে তাঁর মনে বিপরীতমুখী ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। তুফানের পরিণতি দেখে, তাঁর মনে অনিবার্য পতনের আতঙ্ক ঘনীভূত হয়েছে। দ্রুতবেগে ছুটতে গিয়ে, লাগামের টানে তুফানের মুখ রক্তাক্ত। তার মুখ তোলার ক্ষমতা নেই।

বিশ্বম্ভর যাকে সাফল্য বলে মনে করেছিলেন, তা যে আসলে ব্যর্থতা—এই সত্য অনুভব করেছেন। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি যে আর কোনদিন ফিরবে না, তা বুঝেছেন, জমিদারীর করুণ পরিণতি, তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছে :

> দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত।

> অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই, সে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে......।

বিশ্বম্ভরের রোমান্টিক আবেগ, প্লটে গতি এনেছে। অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখোমুখি হয়ে তিনি বুঝেছেন, তাঁর সময় অতিক্রান্ত। নতুন কাল, ব্যবসায়ী মহিমদের কাল, তাঁর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে করুণাঘন ট্র্যাজিডি প্রতিফলিত। বিশ্বম্ভরের এই মানসিকতা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> আত্মগৌরবের চূড়ান্ত মুহূর্তে বিশ্বম্ভরের এই বেদনাময় পরাজয়ের অনুভূতি তারাশঙ্কর অসাধারণ নাটকীয় দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাই বিশ্বম্ভর-মহিমের সংঘাতের মধ্য দিয়ে নয়, বিশ্বম্ভরের অন্তর্দ্বন্দ্বের ওপরই জলসাঘরের শিল্পোৎকর্ষ দাঁড়িয়ে আছে।[১০]

গল্পের শেষ অংশ নাটকীয়। তবে বিশ্বম্ভর চরিত্রের পরিণতি হিসাবে স্বাভাবিক। বিশ্বম্ভরের মৃত্যুর ব্যঞ্জনাতে গল্পের শেষ। তারাশঙ্কর এই মৃত্যুর চিত্র, দক্ষ শিল্পীর কলমে সফলভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের পরিণতিতে ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে উঠেছে জমিদারতন্ত্রের প্রতীক জলসাঘর। অসহায় প্রৌঢ় বিশ্বম্ভরের নির্দেশসূচক বাক্যে গল্পের শেষতম ব্যঞ্জনা .

> বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর্—জলসাঘরের—

এটাই জমিদার বিশ্বম্ভরের শেষতম ভাঙ্গা সংলাপ। শেষ সংলাপেব প্রয়োগ, সংযত শিল্প-অবয়বে সুষম। গল্পের শেষে, জলসাঘরই গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। শেষ অংশটি হল—

> ......আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

গল্পেব শৈল্পিক ব্যঞ্জনা এখানে ধরা পড়েছে। জলসাঘরের দিন শেষ। প্রবল আত্মাভিমানী জমিদারের শেষ নির্দেশ, তা-ই জানায়। বিশ্বম্ভরের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, জমিদারতন্ত্রের পতনের ছবি ব্যঞ্জনাঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। গল্পের এই পরিণাম, প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত। এই তাৎপর্য হল, নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে পুরাতনের পরাজয় অনিবার্য।

গল্পের নামকরণ 'জলসাঘর' হলেও এখানে জলসাঘর একটি ছোট প্রসঙ্গ। গল্পের প্রধান লক্ষ্য, বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র। জলসাঘর তাঁর অন্তরের পরিস্থিতি তুলে ধরার ক্ষেত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন :

> নির্বাপিত প্রায় জমিদার-বংশের শেষ-প্রদীপ বিশ্বম্ভর রায় শেষবারের মতো তাঁর 'জলসাঘরে' সহস্রচ্ছটা ছড়িয়ে কি ভাবে মহানির্বাপণের মধ্যে তলিয়ে গেলেন —নাটকীয় বিন্যাসের মধ্যে এই গল্পে তা বলা হয়েছে। রোম্যান্টিক আবেগ এবং নাট্যরসের পরিবেশনে গল্পটি উপভোগ্য।[১১]

লেখক বিশ্বম্ভরের চরিত্র বলিষ্ঠভাবে এঁকেছেন। তিনি এইসব চরিত্র দেখেছেন তাঁর পিতৃপুরুষ ও সমসাময়িকের মধ্যে। সেইজন্য চরিত্রগুলি তাঁর কাছে এত সজীব ও বাস্তব। অতীতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও লেখক নতুন কালের পদধ্বনি আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন। কারখানার মালিকেরা এ যুগের প্রতিনিধি। অস্তমিত সামন্ততন্ত্রের বেদনাকে তুলে ধরে, লেখক সমকালের চেয়ে পুরানো আমলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ ফুটিয়ে তুলেছেন।

মূক শ্রেণীর সঙ্গে মানব সম্পর্কের দিকটি, লেখক সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। একলালের দুর্দান্ত ঘোড়া তুফান। যৌবনে ছিল উদ্দাম। বিশ্বম্ভরের মত তুফানও বার্ধক্যের সীমা ছুঁয়েছে। প্রৌঢ় বিশ্বম্ভর নিজের ভগ্ন প্রাসাদে স্বেচ্ছাবন্দী। বর্তমান থেকে পালিয়ে যেতে চান। অতীতের সুখস্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকতে চান। তিনি যখন যুবক ছিলেন, তাঁকে পিঠে নিয়ে দুর্দান্ত বেগে তুফান নৃত্যের ছন্দে ছুটত। লেখক জানিয়েছেন :

বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্বের অসমসাহসী জোয়ান বিশ্বম্ভর রায়ের দুর্দান্ত বাহন।

জলসাঘর খোলার পর, বিশ্বম্ভর কিছু সময়ের জন্য মনে মনে তরুণ বয়সে ফিরে গেছেন। তুফানের পিঠে সওয়ার হয়ে, তীব্র বেগে ছুটেছেন। প্রভুকে পিঠে নিয়ে, তুফানও যেন পঁচিশ বছর আগেকার অবস্থায় ফিরে গেছে। প্রাণপণ ছুটে তাঁর শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। রক্তাক্ত তুফান মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। তুফানের বার্ধক্য-বিপর্যস্ত রূপ দেখে, বিশ্বম্ভর নিজের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন।

হস্তিনীটির নাম 'ছোটগিন্নী' বিশ্বম্ভরের মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। আগে নাম ছিল মতি। বিশ্বম্ভরের পিতা একে বলতেন 'ছোটগিন্নী'। বিশ্বম্ভরের মা বলতেন 'সতীন'। এই মূক প্রাণীটির সঙ্গে বিশ্বম্ভরের হৃদয়ের সম্পর্ক চমৎকারভাবে ফুটেছে। হস্তিনী তার শুঁড় বিশ্বম্ভরের কাঁধে এমনভাবে তুলে দিয়েছে, যেন সে বিশ্বম্ভরকে আশীর্বাদে উদ্যত। মূক প্রাণী দুটির ভূমিকা, গল্পটির রসকেন্দ্রকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে।

একটার পর একটা ঘটনার আবর্তে, কাহিনীর সুপরিণতি ঘটেছে, ধনী মহিম নিজের গাড়ী চেপে বিশ্বম্ভরকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। ছোটগিন্নীর পিঠে চেপে, তারাপ্রসন্ন গাঙ্গুলীবাড়িতে উপহার নিয়ে গেছে। রায়বাড়ির জলসাঘরে বাঈজীর নাচ গানের আসর বসেছে। বিশ্বম্ভর শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন।

গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবটিকে তারাশঙ্কর টান টান রেখেছেন। জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের অতীত আভিজাত্য ও বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা চিত্রিত করেছেন। নতুন সভ্যতার বিকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বিদায়ী জমিদারী প্রথার জন্য বিষাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য, নিটোল প্লট ও চরিত্রের সক্রিয়তায় ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করের গল্প প্রধানত দীর্ঘবিন্যস্ত। চরিত্রপ্রধান গল্প-রচনার দিকে তাঁর ঝোঁক, গল্পগুলি কাহিনী বা বিবৃতিধর্মী। তাঁর গল্পে, উপন্যাসের বীজ থাকে। প্রয়োজনে তা বিস্তৃত করা সম্ভব। রীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন নন। তাঁর রচনা কৌশলসর্বস্ব নয়। আধুনিক ছোটগল্পের সূক্ষ্ম আঙ্গিকের দিকে, তাঁর দৃষ্টি নেই। এইজন্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:

তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবনরসের রসিক। আর্টিস্টের সদাজাগ্রত উদ্দেশ্যবোধ ও নিগূঢ় কলাকৌশল অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ বিচরণের মধ্য দিয়ে জীবনের সুগভীর রসোপলব্ধি.....তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের মূল নিহিত।[১২]

তারাশঙ্করের প্রকাশভঙ্গীতে আছে বিবৃতিধর্ম ও নাটকীয়তা। গল্পে লেখকের নিজস্ব কলমে, কিছু বৃত্তান্ত অংশ আছে। বিশ্বম্ভর রায়ের পাঁচ পূর্বপুরুষের পরিচয়, তাদের জীবনযাপন প্রণালী, তাদের পরিণাম ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে বণিক সভ্যতার সঙ্গে রায়বংশের বিরোধের বৃত্তান্ত, ছোটগল্পের সংযত ও পরিমিত শিল্পকৌশলে তুলে ধরেছেন।

বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গল্পের গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিশ্বম্ভরের চরিত্র, মানসিকতা, কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক বৃত্তান্তের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বিবৃতির মধ্যে গল্পের প্রবাহ থেমে যায় নি। পাঠক কোথাও থেমে থাকার ক্লান্তি অনুভব করেননি। তারাশঙ্করের ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

> তারাশঙ্করের ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত, কখনো অমার্জিত, গ্রীষ্মদগ্ধ বীরভূমেব প্রকৃতির মতোই রুদ্র—রৌদ্রোজ্জ্বল। স্বভাবতই এই ভাষায় ইঙ্গিতের চাইতে বিবৃতি সার্থকতর......।[১৩]

লেখক স্বয়ং গল্পের কিছু জায়গায় উপস্থিত হয়ে কিছু অংশ যোগ করেছেন। এভাবে গল্পকার কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের বিস্তারকে এনেছেন। তবে তা বড় গল্পের গঠনকে শিথিল করে নি, কাহিনী কোথাও প্রধান চরিত্রের দাবিকে ছাড়িয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আরো বলেছেন :

> আঙ্গিকের দিক থেকে "জলসাঘর" উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।[১৪]

'জলসাঘর' একটি শিল্পসার্থক ছোটগল্প। এর কেন্দ্রীয় ভাব, নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ অঙ্কনে, লেখক সফল, তারাশঙ্করের গল্প বলার রীতি সরল। গল্পের প্লটে তেমন জটিলতা নেই। গল্পের প্লট, সার্থক বুননের মাধ্যমে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পের গতি মন্থর। ধীরে ধীরে গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছেন। পরিণতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, ব্যঞ্জনাগর্ভ কাহিনীকে গল্পরস সংহতি দিয়েছে।

লেখক বর্ণনার মধ্যে একাধিকবার শ্লেষ ব্যবহার কবেছেন। জমিদারী হারানো বিশ্বম্ভরের পড়ন্ত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মহিম শ্লেষাত্মক উক্তি করেছে। লেখক স্বয়ং মহিম চরিত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ব্যবহার করেছেন। রায়বাড়ির নিবন্ত বাতিগুলির দিকে তাকিয়ে, মহিমের উক্তি :

> কটাবাতি নিবে গেল যে হে!......নায়েববাবু! .....আমার ড্রাইভারকে ব'লে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

এই ধরনের শ্লেষাত্মক সংলাপ, তারাশঙ্করের প্রকাশরীতিকে শিল্পসফল করেছে। লেখকের সংলাপ-রচনার কৃতিত্ব, গল্পের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সংলাপে চলিত রীতির গদ্য ব্যবহৃত। বর্ণনায় সাধু গদ্য ব্যবহৃত। লেখক এই ভাষায় জমিদারবংশের কাহিনীতে যথাযথ গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পেরেছেন।

ভাষায় কিছু আরবী-ফারসী শব্দ পাই। লক্ষ্ণৌ থেকে যে বাঈজীরা এসেছে, লেখক তাদের ভাষায় এইসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—নসিব, হুজুর, ইনাম, কসুর, মজলিস, আমীর, মেহেরবানি, মতলব, তবিয়ত, সেলাম, এত্তালা, বাঁদী, তওয়াইফ ইত্যাদি।

তারাশঙ্করের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। বিশ্বম্ভর চরিত্রের বিপরীতে মহিম চরিত্রের অবতারণা, গল্পের গতিকে মন্থর করেছে। বিশ্বম্ভর প্রবল ব্যক্তিত্বশালী ও আভিজাত্যগর্বী। তুলনায় মহিম চরিত্রটি দুর্বল। জমিদার বিশ্বম্ভবের সঙ্গে বাবসায়ী মহিমের দ্বন্দ্ব, সজীব হয়ে ওঠে নি। এই সংঘাত বেগবান নয়। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনো কখনো কিছুটা অসম বা নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়েছে। এটুকু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায়, নাটকীয়তা, রোমান্টিক চেতনা ও কবি-কল্পনা তারাশঙ্করের গল্পকে আকর্ষণীয় করেছে।

ছয়

গল্পের 'জলসাঘর' নামকরণ নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের পরিবেশে জমিদারশ্রেণীর দীর্ঘকাল-লালিত বিলাসবহুল জীবনের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটছে। গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভর জমিদারী হারিয়ে, পারিবারিক আভিজাত্য ও অহমিকায়পূর্ণ শেষ দিনগুলি কাটাচ্ছেন। বিশ্বম্ভরের পারিবারিক মর্যাদা এবং রায়বংশের অতীত ঐশ্বর্যের প্রতীক হল জলসাঘর।

রায়বংশের ষষ্ঠ পুরুষ থেকে পতন শুরু হয়েছে। বিশ্বম্ভর রায়ের আমলে তা পূর্ণ হয়েছে। দেবোত্তর ও লাখেরাজ সম্পত্তি ছাড়া গোটা জমিদারী নীলামে হাতছাড়া হয়েছে। জলসাঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অকাল-মৃত্যুতে, বিশ্বম্ভরের জীবনে অকাল বার্ধক্য নেমে এসেছে। অতীতের সুখ-স্মৃতিচারণাই তাঁর মুখ্য কাজ।

অতীতচারী হয়েও, বাস্তবের দাবীকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। রায়বাড়ির জলসাঘরের দরজা, দীর্ঘদিন পরে উন্মুক্ত হয়েছে। গহনার বাক্স ও দেবোত্তরের শেষ সম্বল নিঃশেষ হয়েছে। পারিবারিক আভিজাত্য রক্ষায়, তিনি গাঙ্গুলীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।

জলসাঘর সুসজ্জিত ও আলোকিত করে, বাঈজী নাচের আসর বসেছে। শূন্যজলসাঘরে বসে প্রৌঢ় বিশ্বম্ভর আবেগতাড়িত হয়ে মদ্যপান করেছেন। এস্রাজ বাজিয়েছেন। মনে মনে ফিরে গেছেন পঁচিশ বছর আগের জীবনে। কৃষ্ণাবাঈকে দেখে, অতীতের প্রেমিকা চন্দ্রাবাঈয়ের স্মৃতি জেগে উঠেছে।

আবেগে ও উত্তেজনায়, তুফানের পিঠে চেপে প্রাতঃভ্রমণে গেছেন। অনেকটা পথ দ্রুত পার হয়ে, তুফান এবং তার মালিক দুজনেই ক্লান্ত। বৃদ্ধ তুফানের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে, তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। বাড়ীর দোতলায় উঠতে গিয়ে দেখেছেন, জলসাঘরে তখনও আলো জ্বলছে। জলসাঘরের দেওয়ালে ঝোলানো তাঁর পূর্বপুরুষদের দীপ্ত মুখের মত হাসির ছবি। বিশ্বম্ভরের প্রতিক্রিয়া এইরকম:

> সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।

বিশ্বম্ভর রায়ের ভাবনার মধ্যে 'জলসাঘর' নামকরণের সার্থকতা স্পষ্ট করেছেন লেখক। জলসাঘর হল জমিদারদের বিলাসব্যসন, মোহকে লালন-পালন করার বংশানুক্রমিক আশ্রয়। তাদের বিলাসকে আড়ম্বরপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করতে, তাদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে জলসাঘরের জন্ম। জলসাঘর বাদ দিলে, জমিদারবংশের আভিজাত্য অনেকটাই লুপ্ত। এই ধরনের অভিজাত প্রমোদভবন, অনেকসময় জমিদারদের পতনেরও কারণ।

প্রচুর অর্থব্যয়ে জমিদারদের বিলাস ও বৈভব প্রদর্শনের জন্য জলসাঘরের নির্মাণ। পরিণামে তা অনেকসময় তাদের নিয়তি হয়ে ওঠে। গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভরের জীবনে, জলসাঘর হল শেষ নিয়তি। গল্পের অন্তিমে, জলসাঘর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্প-সুষমায়। নামকরণের শৈল্পিক ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সমালোচক নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :

> জলসাঘর হ'ল একটি প্রতীক, সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক অভিজ্ঞান।

> প্রজাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর আদায়ে বা শাসনে-শোষণে যে অর্থাগম, তাকে নিজেদের বিলাসের স্বার্থে ব্যয় করা হয়েছে এখানে। তার ওপর জমিদারদের বিলাসের মধ্যে ছিল যে সঙ্গীতপ্রীতি, যে সূক্ষ্ম সঙ্গীত শিল্প ঘরানার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, তাকে স্থায়ী করেছে এই জলসাঘর।[১৫]

বিশ্বম্ভর নৃত্য-গীতের যথার্থ সমঝদার। তিনি নিজেও একজন শিল্পী। শূন্য জলসাঘরে বসে, এস্রাজে সুর তুলেছেন। জলসাঘরের আসরে অত্যুৎসাহী মহিম যখন নাচের মাঝখানে হঠাৎ তারিফ করে নৃত্যগীতের ছন্দে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, মহিমের শিল্পবোধহীন আচরণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণাবাঈয়ের অনবদ্য কণ্ঠ, সুরের মাধুর্য, গানের মাদকতা, সুর-তাল-লয়ের সমন্বয়, নৃত্যের বৈচিত্র্য—নতুন ধনীমহিমের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি।

বিশ্বম্ভরের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু সময়ের জন্য মার্গসঙ্গীত-নৃত্যের নিখুঁত উপস্থিতি ঘটেছে রায়বাড়ীর জলসাঘরে। তারাশঙ্কর এই প্রসঙ্গটিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। জলসাঘর বিশ্বম্ভরের মনে মোহের জাগরণ ঘটিয়েছে। সেই সঙ্গে বনেদী পরিবারের সৌন্দর্য ও শিল্পচর্চার প্রকাশ ঘটিয়েছে। গল্পের নামকরণে নতুন-পুরাতনের প্রচ্ছন্ন সংঘর্ষের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। একদিকে নতুন ধনী মহিমের বাড়ির জলসা ও তার রসবোধের অভাবের চিত্র পাই। অন্যদিকে রায়বাড়ির জলসাঘরের আসর ও বিশ্বম্ভরের নৃত্য-গীতের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের চিত্র তারাশঙ্কর দুইই তুলে ধরেছেন।

রায়বাড়ির জলসাঘরের অভিশাপ পরিবেশে, বিশ্বম্ভরের পাশে মহিমের আচরণ বিসদৃশ। সঙ্গীত-নৃত্যের গুণাগুণ বিচার করার মতো শিল্পমনস্ক মনোভাবের অধিকারী সে নয়। তাঁর সঙ্গীতবোধের বৈশিষ্ট্য, লঘু ও চটুল রসরসিকতাবোধ। বিশ্বম্ভরের পাশে মহিমের আচরণ, তাকে হাস্যাস্পদ করেছে। বিশ্বম্ভরের মতো সঙ্গীত-নৃত্যের প্রতি ভালোবাসা বা শিল্পজ্ঞান তার নেই।

প্রজাপীড়ন, অর্থশোষণ, ভোগবিলাস ইত্যাদি জমিদারশ্রেণীর ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ। এর পাশে তাঁরা সঙ্গীত-শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। গল্পে জমিদারশ্রেণীর ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির যুগ সমাপ্ত। বিশ্বম্ভর চরিত্রে, এর বিলীয়মান অস্তিত্বের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফুটে উঠেছে।

বিশ্বম্ভরের উদ্যোগে দীর্ঘকাল পর জলসাঘরের দরজা খুলেছিল। পরে তিনি নিজেই আতঙ্কিত হয়ে, তা বন্ধ করে দেন। বিশ্বম্ভর বুঝেছেন, তাঁর অতীতের সমৃদ্ধির দিনগুলি আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

> এই কারণেই এই গল্পে শেষপর্যন্ত জলসাঘর স্বর্ণরশ্মি।[১৬]

'জলসাঘর' নামটির মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনার অনুরণন আছে। জলসাঘরের নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ মর্যাদা আছে। আবার গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভরের মনে মোহের সৃষ্টি, পুরানো প্রেমিকা চন্দ্রাবাঈয়ের স্মৃতি জাগরণ, আবেগ-উত্তেজনা, অসহায়তা ও পরিশেষে মৃত্যু—এইসব ঘটনা জলসাঘরের তাৎপর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জলসাঘরের নিজস্ব গুরুত্ব ও নায়ক চরিত্রের পরিণতি মিলে, গল্পের নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গল্পটির মধ্যে মুখ্য হয়েছে বিশ্বম্ভরের আত্মবিস্মৃতি থেকে মুক্তি। কঠিন বাস্তবের নির্মম আঘাতে, তিনি অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেছেন। নিজের অতীতচারিতার ভ্রান্তি উপলব্ধি করে, তাঁর হৃদয় নিরাশায় ভরে গেছে। গল্পের সমাপ্তিতে, জলসাঘরের আলো নিভিয়ে দরজা

বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তীব্র কণ্ঠে নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বম্ভর। এই ঘটনা ব্যঞ্জনাধর্মী।

ঘটনাটি যুগাবসানের ইঙ্গিত বহন করছে। জলসাঘরের দরজাকে উন্মুক্ত রাখার শক্তি, বিশ্বম্ভরের নেই। জলসাঘরের দরজা বন্ধের নির্দেশ দিয়ে, তিনি ফিরে যেতে চেয়েছেন তাঁর অতীত স্মৃতির মধ্যে। এরপরেই জমিদারের জীবনের অন্তিম লগ্ন। এইভাবে কাহিনীতে জলসাঘর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাই 'জলসাঘর' নামকরণটি ভাবার্থের দিক থেকে সার্থক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। নামকরণের যৌক্তিকতা শিল্পসম্মত।

না : বিবেকের আর্তস্বর

আব্দুর রহিম গাজী

৭৩ বছর ১ মাস ২১ দিনের জীবনকালের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৫ সালের আশ্বিন মাসে 'না' গল্পটি রচিত হয়। এই গল্পটি পরবর্তীকালে বাংলা ১৩৬০ সালের চৈত্র মাসে পরিবর্ধিত আকারে উপন্যাসের রূপ লাভ করে। বলাবাহুল্য তখনো উপন্যাসটির নাম হয় 'না'। মোট এগারো-বারো পৃষ্ঠার এই গল্পটির প্রথম দেড় পাতা ও শেষের দেড় পাতা বর্তমান কাল এবং সর্বসাকুল্যে দেড় থেকে দুইদিনের ঘটনা যুক্ত। বাকী আট-নয় পাতা অতীতের প্রায় আট বছরের ঘটনাশ্রিত। প্রথম দেড় পাতায় দেখা যায় আট বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া কালীনাথের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার চলছে আদালতে। আগামীকাল কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরাণীকে সাক্ষ্য দিতে হবে। আজই তার বাপের বাড়িতে তার মানসিক প্রস্তুতির তোড়জোড় চলছে। কারণ স্বামীর বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য আজও ব্রজরাণীকে ভীত-বিহ্বল করে তোলে—আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙে যায়—স্বপ্নে চিৎকার করে ওঠে সে। তাই দাদা হরদাসবাবু ও মার তত্ত্বাবধানে ব্রজরাণীর এই মানসিক প্রস্তুতি। এহেন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সেখানে হাজির হয় ব্রজরাণীর স্বামীহন্তার পিতা ও শ্বশুর ক্ষমার আবেদন নিয়ে। ব্রজের মা কঠোর-কঠিনভাবে ব্রজের অনড়-অরাজী মনোভাবের কথা পুত্র হরদাসকে জানিয়ে দেয়। অতঃপর ব্রজের স্বামীহন্তা অনন্তের শ্বশুরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা দেওয়ার কথা শুনে দৃপ্তকণ্ঠে ব্রজরাণী তাতে অসম্মতিসূচক 'না' বলে দেয়।

কিন্তু কেন এই হত্যা? কেন আট বছর পরে তার বিচার? আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেন ব্রজরাণীর ক্ষমায় আপত্তি?—এসব প্রশ্নের উত্তর দিতেই পরের আট-নয় পৃষ্ঠা ব্যাপী অতীতের প্রায় আট বছরের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার অবতারণা। অনন্ত ও কালীনাথ মামাতো-পিসতুতো ভাই। কালীনাথ বয়সে প্রায় চার বছরের মতো বড়ো। অনন্ত তাকে 'কালী-দা' বলেই ডাকে। উত্তাল যৌবনই তাদের দুজনকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধে। সর্বোপরি তামাক-সিগারেটের নেশায় এই দু'জন এক কক্ষের মানুষ। দু'জনে কাছাকাছি দুটি বাড়িতে থাকে। দুজনেই অবিবাহিত ও ধনী-সচ্ছল পরিবারের ছেলে।—এত সব মিল থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অমিল কম নয়। কালীনাথ পিতা-মাতা, ভাই-বোনহীন অবস্থায় একা থাকে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত ছেলে। কিন্তু তামাক-সিগারেটের নেশায় অনন্তের পথপ্রদর্শক সে। অন্যদিকে অনন্ত অল্পশিক্ষিত, অমার্জিত, গোঁয়ার টাইপের ছেলে। হৈ হৈ করে পশু-পাখি মেরে বেড়ানো ও একে-তাকে শাসন করাই তার কাজ। পিতার মতো জমিদারী মেজাজীর অধিকারী অনন্ত ডাকাবুকো হলেও ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। যাইহোক এখন এই দুই অসম-প্রকৃতির যুবক সকাল হতেই রিপীটার বন্দুক নিয়ে পাখি মারতে যায় সখ্যতার সূত্রে। অনন্তের নেতৃত্বে ও উৎসাহে পাখি মারা, জন্তু-জানোয়ারে টিপ করা চলতে থাকে। কালীনাথ তাকে সঙ্গ দেয় মাত্র। এছাড়া বাড়িতে একসঙ্গে বসে চা খাওয়া, পাখির মাংস খাওয়া—এসব তো আছেই।

হরিহর আত্মা এই দুই বন্ধুর একসঙ্গে বিয়ের উদ্যোগ শুরু হয়। অনন্তের জন্য বিত্তশালী, চাকুরীজীবী বংশের মেয়ে ব্রজরাণীকে এবং কালীনাথের জন্য কলিকাতার নিকটস্থ জমিদার বাড়ির সদ্য শিক্ষিত পরিবারের এক মেয়েকে ঘটক মারফৎ ঠিক করা হয়। কিন্তু কালীনাথের কারসাজিতে শেষ পর্যন্ত ব্রজরাণীর সঙ্গে কালীনাথের বিয়ে হয় এবং অনন্তের ভাগ্যে পড়ে কলিকাতার নিকটস্থ জমিদার বাড়ির মেয়েটি। একই সঙ্গে দুজনের বিয়ে হওয়ার পর একই রাতেও দুজনের ফুলশয্যা। এই পর্যন্ত ঘটনা মোটামুটি ঠিক ছিল। এর পরই শুরু হতে থাকে একের পর এক সমস্যা—দুর্ঘটনা। ফুলশয্যার রাতেই অনন্তের স্ত্রী অনন্তের পড়ার ঘর বা লাইব্রেরির কথা জানতে চেয়ে যখন পরিষ্কার বুঝতে পারে অনন্ত অশিক্ষিত, গোঁয়ার, ডাকাবুকো টাইপের ছেলে, তখন নববধূ অনন্তের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং দারুণ ক্ষোভে-অভিমানে ও হতাশায় অনন্তের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করে। ঘটনার আকস্মিকতায় আহত ও বিরক্ত হয়ে অনন্ত বাড়ির বাইরে গিয়ে কালীনাথের ফুলশয্যার ইতিবাচক দিক উপলব্ধি করে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। ক্ষোভে-ক্রোধে নববধূর উপস্থিতিতেই সে রিপীটার দিয়ে সেই রাত্রেই নারকেল গাছের মাথায় বসা একটি পেঁচাকে মারে।

অনন্তের স্ত্রী বাপের বাড়িতে এসে তার ক্ষোভের কথা জানাতেই শ্যালক-শ্যালিকারা অশিক্ষিত জামাইবাবুকে অপমান করে এবং শাশুড়ী ও শ্বশুর তাকে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করার উপদেশ দেয়। শ্বশুর এই মর্মে অনন্তের পিতাকে একটি চিঠিও লেখে। সকলের অজ্ঞাতে অনন্ত শ্বশুর বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরে এসে নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে। শ্বশুরের চিঠি অনন্তের পিতার হাতে পড়তেই পিতা রাগান্বিতভাবে পুত্রবধূকে ঘরে ফেরার ব্যাপারে এক চরম পত্র পাঠিয়ে দেয়। মায়ের কাছ থেকে শ্বশুরের দেওয়া চিঠির সঙ্গে আসা বেনামী পত্রটি পেয়ে অনন্ত তার হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারে সেটি কালীনাথের হাতের লেখা। সঙ্গে সঙ্গে সে চিঠিখানি কালীনাথের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কিঞ্চিৎ আলাপের পর তাকে দেখায়। কালীনাথের বিবর্ণ মুখ দেখে এবং বৌদির হাতের জলখাবার খেয়ে ও স্বর্গের দেবীর মতো বৌদির প্রশংসা করে অনন্ত বাড়ি আসে।

অনন্তের পিতার চরম পত্র পেয়ে পুত্রবধূ একদিন বাড়ি ফিরে এল। সেদিনই অনন্ত ফুটবল টীম নিয়ে ম্যাচ খেলতে যাবে। এতদিন পর স্ত্রী বাড়ি আসায় খুশি ও আনন্দে অনন্ত তাকে সোহাগ করতে গিয়ে তার কাছ থেকে বিরূপ আচরণ পেল। অনন্ত কালীনাথের বউ-এর সঙ্গে তার ব্যবহারের তুলনা করতেই বধূ অনন্তকে বাঁদর, মাতাল, মূর্খ বলে অপবাদ দেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে অনন্ত বউ-কে হান্টারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে কালীনাথের বাড়ি এসে ব্রজরাণীর হাতের জলখাবার খেয়ে ও তার অবৈধব্য ব্রতের নিমন্ত্রণ নিয়ে তার বাপের বাড়িব দেশে ফুটবল ম্যাচ খেলতে চলে যায়। ম্যাচ জেতার পর অনন্ত ব্রজরাণীর বাপের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সেখানে সে ব্রজের সুখ্যাতি করে। কিন্তু নাটকীয়ভাবে ব্রজের দাদা হরদাসের মুখ থেকে কৌশলে অনন্ত কালীনাথের বেনামী চিঠি লেখা ও কারসাজি করে ব্রজকে বিয়ে করার বিষয়টি জানতে পারে। ক্ষোভে-দুঃখে শেষপর্যন্ত সে কালীনাথকে ক্ষমা করল এবং পড়াশুনা করে জীবনে প্রশংসা ও শান্তিবিধানের সংকল্প করল।

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে অনন্ত যখন শুনল তার স্ত্রী দুর্ব্যবহার করে চলে গেছে, তখন

সে শ্বশুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বধূকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য ও পিতৃপ্রদত্ত 'বংশের কলঙ্ক' অপবাদ ঘোচানোর জন্য সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শ্বশুরের পা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু নির্দয় শ্বশুর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে হানটারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দারোয়ান ডেকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে উদ্যত হল। অনন্তের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ক্ষোভে-অভিমানে ও হতাশায় সে প্রথমে শ্বশুরকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করবে সংকল্প করল। কিন্তু বাড়ি ফিরে রিপীটারটা নিয়ে সে শুধু আত্মহত্যার সংকল্প করে কালীনাথের বাড়ির পাশ দিয়ে বিহ্বলের মত চলেছিল। কালীনাথ তাকে ডাকতেই হঠাৎ তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কালীনাথের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে সংকল্প করল কালীনাথকে মেরে নিজে আত্মহত্যা করবে। কালীনাথের ক্ষমাপ্রার্থনা সত্ত্বেও তীব্র আক্রোশে তিনটি কার্তুজে কালীনাথকে ব্রজের সামনে নৃশংস ভাবে হত্যা করে অনন্ত ব্রজের অবৈধব্য ব্রতের দিনেই তাকে বিধবা করল। এরপর সে নিজে আত্মহত্যা করতে গিয়ে যখন দেখল আর কার্তুজ নেই, তখন সে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চাইল। কিন্তু হঠাৎ কালীনাথের মৃত্যুদৃশ্যে আতঙ্কিত হয়ে সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। দশদিন পর সে যখন ধরা পড়ল, তখন সে ঘোর উন্মাদ। আট বছর পাগলা-গারদে থাকার পর সে যখন স্বাভাবিক হয়েছে, তখনই তার বিচার শুরু হয়েছে। সেই ব্রজরাণীর সাক্ষ্য দেওয়ার দিন আগামীকাল।

তাই একদিন আগে ক্ষমার আবেদন নিয়ে অনন্তের বাবা, শ্বশুর, মা, বউ—সবাই এসেছে। কিন্তু ব্রজ অনড়। হরদাসবাবু এমনকি মার কথাতেও সে কান দেয় না। চোখ বন্ধ করে একা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে যেন প্রতিশোধকল্পে ধ্যান করছে। পরদিন আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে ব্রজরাণী যখন আসামী রূপে রোগা, কুঁজো, সাদাচুলে, বিহ্বল দৃষ্টিযুক্ত, জোড়হস্তরূপী অন্য এক অনন্তকে দেখল, তখন আট বছর পূর্বের অনন্ত সম্পর্কিত ইতিবাচক স্মৃতির আলিম্পনে আকস্মাৎ সে যেন হারিয়ে গেল। তার মধ্যে জেগে উঠল মমতাময়ী দেবী মূর্তি। রক্ত-চক্ষুর পরিবর্তে অশ্রুভরা চোখে ব্রজরাণী যখন সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে জানাল যে অনন্ত তার স্বামীহন্তা নয়, তখন আদালতে উপস্থিত জনতা-দর্শকের মতো পাঠকও বিস্মিত-অভিভূত হল। এই ঘটনা নিয়ে বাড়িতে সমালোচনাও হল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ও ছেলের ভবিষ্যতের জন্য হরদাসবাবু যখন ব্রজকে তার মামাশ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে প্রাপ্যটা নেওয়ার কথা জানাল, তখনও ব্রজরাণী তাতে অসম্মতি জানায়। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে একা ঘুমন্ত ব্রজকে তার মা নীচে শোওয়ার কথা জানালেও ব্রজরাণী তাতে অসম্মতি জানিয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

দুই

'না' গল্পটির রসবিচার করতে গেলে প্রথমেই শিল্পী তারাশঙ্করের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনের কথা এসে যায়। শিল্পী মাত্রেই সমসাময়িক যুগ-কালের দাবিকে অস্বীকার করতে পারেন না। তারাশঙ্করও তাই। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে তাঁর আবির্ভাব। উনিশ শতকের জমিদারী প্রথা বিশ শতকের গোড়ায় এসে এক গভীর সঙ্কটের মুখে পড়ে। উদীয়মান বণিকতন্ত্র বা ধনতন্ত্র তাকে গ্রাস করতে চায়। পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে জাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জমিদারী আস্ফালনকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সামাজিক

মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এহেন যুগ-পরিবেশে দাঁড়িয়ে জমিদারনন্দন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় দুই-এর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটালেন স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। পুরাতন সব কিছু শুধু ভেঙে ফেলা নয়—তাকে নতুন করে গড়ার কথাও তিনি ভাবলেন। আর গড়তে গিয়ে একদিকে তিনি জমিদারীর আভিজাত্য, বংশ মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইলেন, অন্যদিকে শোষিত, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিও দেখালেন। তবে শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে গেলেন না। পরিবর্তে নীতি-আদর্শযুক্ত আস্তিক্যানুভূতির আলোকে এক আদর্শনিষ্ঠ সমাজ গড়তে চাইলেন। আর সেভাবেই গল্প-উপন্যাসের পরিণতি দানের কথা ভাবলেন। আর এই পরিণতিকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে তাঁর গল্পের রসরূপ।

আলোচ্য 'না' গল্পটির রসবিচারের ক্ষেত্রে আমাদের একথাগুলি মনে রাখতে হবে। গল্পটিতে করুণ ও রৌদ্র রসের উপস্থিতি ঘটলেও শেষপর্যন্ত এ দুটির কোনোটিই প্রাধান্য পায় নি। পরিশেষে এক শান্ত, সমাহিত, নিস্তরঙ্গ ভাব বিরাজ করেছে। এক গভীর শান্তি ও স্নিগ্ধতাই বড় হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে যেন ইতিবাচক জীবনরসই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ঠিক যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের পরিণতিতে শান্তি-সমাহিত এক জীবনরস বড় হয়ে উঠেছে। বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ।

জমিদারনন্দন অনন্তের সঙ্গে ঘটনাচক্রে কলিকাতা নিকটস্থ সদ্য আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত জমিদার-কন্যার বিয়ে হয়। কিন্তু তার বিয়ে হওয়ার কথা শিক্ষিত, ধনী পরিবারের মার্জিত কন্যা ব্রজরাণীর সঙ্গে। ব্রজকে কৌশলে ও কারসাজি করে বিয়ে করে কালীনাথ দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই বৈপরীত্যে অখুশী অনন্ত নিজেকে কালীনাথের সঙ্গে তুলনা করত না, যদি তার স্ত্রী ব্রজরাণীর মতো আচরণ করত। কিন্তু সদ্য শিক্ষিতা অনন্তের স্ত্রী ফুলশয্যা রাতেই শিক্ষার অহংকারে অশিক্ষিত স্বামীকে পাত্তাই দিতে চায় না। শ্যালক-শ্যালিকাবা শিক্ষা নিয়েই অনন্তকে অপমান করে, শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া করার কথা বলে। একটা বিরুদ্ধ পরিবেশে অনন্ত হাঁফিয়ে ওঠে। তবুও ম্যাচ খেলার দিন বউ আবার বাড়ি ফিরে এলে সে তাকে সোহাগে ভরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে অনন্ত যখন ব্রজরাণীর স্বামীভক্তির কথা তুলে ধরে, তখন বউ বলে—

> "......কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছ? শিবে আব বাঁদবে! সে বিদ্বান্—"

অতঃপর 'মাতাল', 'মুখ্য' অপবাদে ক্ষীপ্ত অনন্ত স্ত্রীকে হান্টার দিয়ে আঘাত করে বসে। পরে ভুল বুঝতে পেবে শ্বশুরকে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গিয়ে যখন তার কপালে জোটে তীব্র হান্টারের আঘাত ও অপমান তখন সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আত্মহত্যাব সংকল্প করে। ঘটনাচক্রে মৃত্যুপথযাত্রী অনন্ত যখন কালীনাথের ডাক শুনল, তখন এক মুহূর্তে তার অবচেতন মনে সুপ্ত ঈর্ষা জেগে উঠল—

> "........কালীনাথ! তাহার জীবনের কুগ্রহ—তাহার সুখে পরমসুখী কালীনাথ!........একা সে কোথায় যাইবে?"

পরমুহূর্তেই কালীনাথকে খুন করল অনন্ত। ঘটনা পরম্পরায় পরিষ্কার বোঝা যায় সদ্য আধুনিক শিক্ষার গর্বে স্ফীত, অহংকারী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর অনন্তের স্ত্রী ও তার বাপের

বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত জমিদারপুত্র অনন্তের মধ্যে যখন কালীনাথ সম্পর্কিত সুপ্ত ক্রোধ ও ঈর্ষা জেগে উঠল, তখনই কালীনাথ খুন হল। খুন হওয়ার আগের ঘটনায় (অনন্তের পাখি ও জানোয়ার মারা, হান্টার দিয়ে বউ মারা, শ্বশুর কর্তৃক হান্টার দিয়ে অনন্তকে মারা, রিপীটার দিয়ে পেঁচা মারা ইত্যাদি) পশুমানব সুলভ আচরণে রৌদ্র রসের উৎসারণ ঘটেছে। আবার কালীনাথের খুন হওয়ার পর থেকে অনন্তের আত্মহত্যার চেষ্টা, পাগল হওয়া, ব্রজরাণীর আট বছর যাবৎ বিনা তেলে স্নান, হবিষ্যান্ন আহার, মাটিতে শোওয়া, ঘুমের মধ্যে খুনের দৃশ্য দেখে শিউরে চিৎকার করা—এসব ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে করুণ রস ঘনীভূত হয়েছে।

পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ব্রজরাণীর সামনে তার অবৈধব্য ব্রতের দিন অনন্ত কালীনাথকে হত্যা করেছে বলে ব্রজের প্রতি তার সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা অমূলক—মেকি। যে অনন্ত কালীনাথের বেনামী চিঠি দিতে এসে বউদির হাতের জলখাবার সম্পর্কে মন্তব্য করে—"বউদি আমার স্বর্গের দেবী-তার হাতের জিনিস, এ যে অমৃত!" ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাবার সময় বাড়িতে বউকে হান্টার দিয়ে মেরে এসে ব্রজরাণীর দেওয়া জলখাবার খেতে খেতে অবৈধব্য ব্রতের প্রসঙ্গে বলে—"বাঃ। মেয়েদের এই ধরণটা আমার ভারি ভাল লাগে কালীদা।" ব্রজকে বলে—"বউদি স্বর্গের দেবী তুমি।"; এমন কি ব্রজের মায়ের কাছে যে অনন্তের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"........সতী-সাবিত্রী—বইয়ে পড়েছি-বউদির মধ্যে চোখে দেখলাম!"; সর্বোপরি ব্রজের মায়ের মুখের—"তা ব্রজর আমার তপস্যা ভাল। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই।"—কথা শুনে যে অনন্ত পড়াশুনা করে জীবনে শান্তি ও প্রশংসা পেতে চায়, সে অনন্তের ব্রজ ভক্তি কখনো মিথ্যা—অমূলক হতে পারে না। পারে যে না তার বলিষ্ঠ প্রমাণ পাই গল্পের শেষে এসে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ব্রজরাণী যখন দীর্ঘ আট বছর কষ্টভোগ করার পর তার স্বামীহন্তা অনন্তকে খুনী বলতে পারল না। আসলে ভক্তের জন্য ভগবানের মন তো কাঁদবেই। সাময়িক উত্তেজনার বশে অনন্ত কালীনাথকে খুন করে পরে আত্ম-অনুশোচনায় সে পাগল হয়েছে, দীর্ঘ আট বছরে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে তার শরীরের অবক্ষয় টেনে এনেছে। এর পরেও কি ভক্তরূপী অনন্তের জন্য ভগবান বা দেবী রূপিণী ব্রজের মনে একটু দয়া হবে না? ব্রজের মধ্যে তখন সত্যিই এক মমতাময়ী দেবী মূর্তি জেগে উঠেছে। যার জন্য অনন্তকে ক্ষমা করার পর ব্রজ তার মামাশ্বশুরের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থও নিতে চায় না। পরিবর্তে এতদিন পর সমস্ত দুশ্চিন্তা, প্রতিশোধস্পৃহা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যায়। এহেন মধুর পরিসমাপ্তিতে শিল্পী তারাশঙ্করের নীতি-আদর্শযুক্ত আস্তিক্যানুভূতির জয় ঘোষিত হল। প্রাধান্য পেল রৌদ্র ও করুণ রস নয়—ইতিবাচক জীবনরস। যে জীবন শুধু ভাঙতে শেখায় না—গড়তে শেখায়, প্রতিশোধ নিতে শেখায় না—ক্ষমা করতে শেখায়, অর্থলোভী হতে শেখায় না—উদার হতে শেখায়, ভোগী হতে শেখায় না—ত্যাগী হতে শেখায়। আসলে শিল্পী তারাশঙ্কর উন্মত্ত যৌবনের আকর্ষণে সংঘটিত বন্ধুত্বকে মানব মনের সুপ্ত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের টানাপোড়েনে বিচ্ছেদের মধ্যে টেনে আনলেও শেষপর্যন্ত মানবিক গুণাবলীর জোরেই আবার নতুন জীবন ও সম্পর্ককে গড়ে তুললেন। ফলে ব্রজরাণী

তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আবার নতুন করে সংসার শুরু করার জন্য মানসিক জো: পেল এবং অনন্ত তার স্ত্রীকে নিয়ে আবার সংসার করার সুযোগ পেল। আর এখানে: ঘনীভূত হল শাশ্বত জীবনরস।

তিন

'না' গল্পটির নামকরণ বিচারে প্রথমে দেখা যাক শিল্পী তারাশঙ্কর প্রদত্ত আগে ও পরে: নামকরণে কোন হের-ফের হয়েছে কিনা। ১৩৪৫ সালের আশ্বিন মাসে 'না' গল্পটি রচিত হয়। এই গল্পটি পরবর্তীকালে বাংলা ১৩৬০ সালের চৈত্র মাসে পরিবর্ধিত আকারে যখ: উপন্যাসের রূপলাভ করে, তখনও তার নাম রাখা হয় 'না'। বোঝাই যাচ্ছে 'না' নামকরণটি এতই সুপ্রযুক্ত হয়েছে যে শিল্প প্রকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও নামকরণ পাল্টায় নি।

এবার গল্পটির ভিতরে প্রবেশ করে দেখা যাক এই নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে সাহিত্য প্রকরণের নামকরণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যথা—চরিত্র ভিত্তিক, বিষয়ব: ভিত্তিক, প্রতীক বা ব্যঞ্জনাধর্মী, তত্ত্বভিত্তিক, স্থানকেন্দ্রিক ইত্যাদি। একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছে: মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অভিপ্রেত বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করাই নামকরণের উদ্দেশ হিসাবে কাজ করে। স্রষ্টার বিবেচনাই এখানে চূড়ান্ত রূপ পায়। তারাশঙ্করের 'না' গল্পটি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

অতীতের প্রায় সাড়ে আট বছরের ঘটনা এবং বর্তমানের মাত্র দুই দিনের ঘটনা নিয়ে: সমগ্র গল্পটির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। প্রায় এগার-বারো পৃষ্ঠার এই গল্পটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ জুড়ে রচিত আখ্যানভাগের মধ্যে কোথাও নামকরণ সূচক 'না'—এর উল্লেখ নেই এতটা জায়গা জুড়ে গল্পকার তারাশঙ্কর যেন ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ 'না'—এর প্রেক্ষাপট ব পটভূমি তৈরী করেছেন। কিভাবে অনন্তের মতো অর্ধশিক্ষিতের সঙ্গে কালীনাথের মতে একটি শিক্ষিত ছেলের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, কিভাবে অনন্ত ও কালীনাথের বিয়ে হল, কিভাবে অনন্ত ও তার পরিবারের সঙ্গে তার স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের মধ্যে একটা তিত সম্পর্ক তৈরী হল, কিভাবে কালীনাথের প্রতি অনন্তের সুপ্ত ক্রোধ ও ঈর্ষা এবং ব্রজরাণী: প্রতি অনন্তের ভক্তি- শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরী হল, কোন পরিস্থিতিতে অনন্ত কর্তৃক কালীনা: খুন হল এবং খুনের দীর্ঘ আট বছর পর কেন আদালতে তার বিচার হচ্ছে—এ সকল বিষ: তারাশঙ্কর কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত করে নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এরই মধে লুকিয়ে রয়েছে পরবর্তীতে উচ্চারিত 'না'-এর শিকড়।

সমগ্র গল্পটির মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ আড়াই-তিন পাতায় বর্ণিত মাত্র দেড়-দু দিনের ঘটনায় ৮বার 'না' উচ্চারিত হয়েছে। প্রতিবারেই বক্তা ব্রজরাণী এবং শ্রোতা কখনে হরদাসবাবু, কখনো তার মা, আবার কখনো বা আদালতের দর্শক জনতা। প্রতিটি ক্ষেত্রে 'না' নঞর্থক উপসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে আদালতে যাওয়ার আগের দি সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে ব্রজরাণী ৫ বার 'না' বলেছে, আদালতে গিয়ে ১ বার এব আদালত থেকে বাড়ি ফিরে ২ বার 'না' বলেছে। ব্রজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া আগের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময় ব্রজের মামাশ্বশুর অর্থাৎ অনন্তের পিতাও তার দাম্ভি শ্বশুর ক্ষমার আবেদন নিয়ে ব্রজের কাছে উপস্থিত হলে ব্রজের হয়ে তার মা অসম্মা

জানিয়ে দেয়। অতঃপর হরদাসবাবুর মারফৎ অনন্তের শ্বশুর যখন তার মেয়েকে বাঁচাতে এবং ব্রজ ও তার ছেলের ভবিষ্যৎ-এর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা দেওয়ার কথা জানালেন, তখন তা শুনে মুহূর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ব্রজ দৃঢ়কণ্ঠে 'না' বলে দিল। এই 'না' তীব্র ক্ষোভ, জ্বালা-যন্ত্রণাসূচক ও প্রতিশোধমূলক 'না'। প্রাণপ্রিয় স্বামী কালীনাথকে অনন্ত যেভাবে ব্রজের সামনে নৃশংস ও পাশবিকভাবে খুন করেছে ব্রজ তার সুবিচার ও প্রতিশোধ চায় বলে এই 'না'। দেবর অনন্ত ও বৌদি ব্রজরাণীর মধ্যে পবিত্র ও হার্দিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আর পাঁচটা রক্ত-মাংসে গড়া মানবীর মতো ব্রজের এই আচরণ যুক্তিযুক্ত। কারণ সেও তো সজীব ও প্রাণবন্ত অবস্থায় স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করতে চায়—যেটা দীর্ঘ টানাপোড়েনের পরেও অনন্তের স্ত্রী চেয়েছে।

অনন্তের মা, বউ একে একে সবাই আসে ক্ষমার আবেদন নিয়ে। রাত অধিক হয়ে যায়। তবুও ব্রজ অনড়-অটল। না ক্ষমা নেই। হরদাসের পর ব্রজের মা কিছুটা নিমরাজি হয়ে বলে—"........নইলে যা হবে হোক, ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হত।" দীর্ঘ আট বছর ব্রজ অশৌচ পালন করে আসছে সুবিচারের আশায়। হঠাৎ একদিনে তাকে কি টলানো যায়? সে যেন যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে একা চোখ বন্ধ করে চরম মুহূর্তের জন্য ধ্যান করছে। হরদাসবাবু নিজে গিয়ে ডাকতে ব্রজ চোখ না খুলে দ্বিতীয়বার 'না' বলল। পুনরায় হরদাসবাবু তার কথা শুনতে বললে তৃতীয়বার ব্রজ 'না' বলে। এ যেন চণ্ডীদাসের রাধার মতো অবস্থা—

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।"

তবে চণ্ডীদাসের রাধা পরমাত্মা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য ধ্যানে মত্ত হয়েছিলেন, আর এখানে বিধবা ব্রজরাণী স্বামীশোকাতুরা হয়ে স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে ধ্যানস্থ হয়েছে। ব্রজের মা ব্রজকে ঘুমিয়ে নেওয়ার কথা বললে ব্রজ চতুর্থবার 'না' বলে। এমন কি মা তার গায়ে হাত দিয়ে রাখার কথা বললে ব্রজ পঞ্চম বার 'না' বলে। কারণ ঘুমালেই তার স্বামীর খুনের দৃশ্য স্বপ্নে তাকে বিহ্বল করে দিতে পারে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ ও সুবিচারের জন্য ব্রজ এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই নিজের দাদা, মার কথা পর্যন্ত না শুনে সে নিজের লক্ষ্যে অবিচল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ থেকেছে। এখানেই ব্রজ চরিত্রের দৃঢ়তা ও কঠোরতা সুপরিস্ফুট হয়েছে।

কিন্তু এহেন কঠোর-কঠিন ব্রজ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যখন দাম্ভিক, বলশালী যুবক অনন্তকে খুঁজতে গিয়ে শুভ্রকেশী, শীর্ণ ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, জোড়হাত যুক্ত অনন্তকে দেখল, তখন সে তাকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না—"এ কি সেই মানুষ?—না,-না, এ সে নয়, হইতে পারে না!" এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের জেল ফেরত আসামী রহমতের মিনি দর্শন। এক মুহূর্তেই ব্রজের সমস্ত প্রতিশোধস্পৃহা, কঠোর-কঠিন মনোভাব কোথায় চলে গেল। শিল্পী তারাশঙ্কর অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক কৌশলে যখন ব্রজকে লক্ষ্য করে অনন্তকে দিয়ে বলালেন—"দেবী, দেবী! স্বর্গের দেবী! তুমি বউদি!",

তখন ব্রজের মধ্যে সত্যিই মমতাময়ী দেবীমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। স্নেহ-মমতায় বিগলিত, অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ব্রজের চরম উপলব্ধি—

"........হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে। এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার!"

এই উপলব্ধির সরণী বেয়েই সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে ব্রজ ষষ্ঠবার 'না' বলল। এই 'না' প্রতিশোধমূলক নয়, বরঞ্চ ক্ষমামূলক, মানবতামূলক। এখানেই শিল্পী তারাশঙ্করের ন্যায়-নীতি, আদর্শযুক্ত আস্তিক্যানুভূতির জয় হল। এই অনুভূতি জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলল। তাই এই ষষ্ঠ বারের 'না' নঞর্থক হলেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ও গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। এখানে আইনের বিচার নয়, মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিচারই হয়েছে—যেটা আসল বিচার। কেননা কবি বলেছেন—

"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

দীর্ঘ আট বছর অশৌচ পালন করে যে ব্রজ আদালতের সুবিচারের জন্য অপেক্ষা করেছে, সেই ব্রজ আজ মুহূর্তের মধ্যে নিজেই সবকিছুর বিচার করেছে এবং 'না' বলে সবাইকে তা শুনিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই 'না' তো ব্যঞ্জনাধর্মী বটেই। শুধু তাই নয়, হরদাসবাবু ব্রজকে তার মামাশ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে প্রাপ্যটা নিতে বললে সেখানে ব্রজ সপ্তমবার 'না' বলেছে। এতে তার উদার, নিঃস্বার্থ পরোপকারী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর ক্লান্ত ব্রজ ঘরের মধ্যে একা ঘুমিয়ে পড়লে তার মা তাকে নীচে শোওযাব কথা বললে সে অষ্টম বার 'না' বলেছে। এই 'না'-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পর উজ্জ্বল প্রশান্তি। লক্ষণীয় এই আট বার 'না' -এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বারের 'না' জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে এবং শেষ তিন বারের 'না' জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। নেতি থেকে এই ইতি-তে উত্তরণ যেমন ব্যঞ্জনাগর্ভ, তেমনি লেখকের আদর্শায়িত জীবনবাদেরও পরিচায়ক।

তাই সামগ্রিক ভাবে বলা যায় আলোচ্য গল্পের কাহিনী কাঠামোয় 'না' বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তাই ব্যঞ্জনাধর্মী এই 'না' নামকরণ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

চার

আঙ্গিক বা Form বিচাব করতে বসে প্রথমেই বলতে হয় তারাশঙ্করের গল্পে কল্লোলীয়দের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঙ্গিকগত উপাদানের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ তারাশঙ্কর ততটা আঙ্গিক সর্বস্ব শিল্পী ছিলেন না। তবে তাঁর কিছু ছোটগল্পে যে আঙ্গিক সচেতনতা চোখে পড়ার মত, তা অস্বীকার করা যায় না। আলোচ্য 'না' গল্পটি অনেকটা সেরকমই একটি ছোটগল্প।

গল্পটি আকারে খুব বেশি বড় নয়—এগার-বারো পাতার গল্প। এর মধ্যেই জীবনের একটি খণ্ডাংশ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে আট বছরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কালীনাথ হত্যার মামলা দিয়ে গল্প শুরু এবং সেই মামলার পরিণতি দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। মাঝখানে গল্পকার

হত্যার কারণ ও প্রেক্ষাপটকে ব্যাখ্যা করেছেন। সবমিলিয়ে খণ্ডজীবন রূপায়িত হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে লেখকের আদর্শবাদের ছায়ায় ও আস্তিক্যানুভূতির প্রলেপে গল্পটির মধ্যে একটি অখণ্ডতাও সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। লেখক যেন বলতে চাইলেন ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে হানাহানি নয়, ত্যাগ, সেবা ও পরোপকারের মধ্যেই জীবনের সারসত্য লুকিয়ে আছে। এভাবে জীবনকে দেখা মানে শান্তিপূর্ণ ও পুষ্টিকর সমাজ গঠনের ভাবনাকে উদ্‌বোধিত করা। সুতরাং খণ্ডের মধ্যে এই অখণ্ডের দ্যোতনা গল্পটিকে আঙ্গিকগত দিক থেকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

সার্থক ছোটগল্পের আঙ্গিকে শুরুতে যেমন আকস্মিকতা এবং শেষে যেমন অতৃপ্তি ও ব্যঞ্জনা থাকে, আলোচ্য 'না' গল্পটির মধ্যেও তা আছে। গল্পকার শুরুতেই ভণিতা বা বিবৃতি বাদ দিয়ে সরাসরি বর্ণনীয় বিষয়ের কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছেন এবং বলেছেন—"...আগামীকাল নিহত কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরাণীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।" শুরুর মধ্যেকার এহেন চমক ও আকস্মিকতার পাশাপাশি শেষে ব্রজরাণীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অতৃপ্তি ও ব্যঞ্জনা ঘনীভূত হয়েছে। কেননা দীর্ঘ আট বছর ধরে অশৌচ পালন করে এসে ও সবার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে যে ব্রজরাণী স্বামী হত্যার সুবিচার চেয়েছে, সেই ব্রজরাণীই চরম মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়াল ইতিবাচকভাবে বলল—'না'। শুধু তাই নয়, এতদিনের উৎকণ্ঠা. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়—সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে "সে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত করিল।" এখানে গভীর ব্যঞ্জনা ঘনীভূত হয়েছে। কেননা কি করে ব্রজ নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়ল, তা তো পাঠক জানতে চাইবেই। এছাড়া পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন থেকে গেছে। এরপব ব্রজরাণীর কিভাবে চলবে? তার পুত্রের ভবিষ্যৎ কি হবে? ইত্যাদি প্রশ্ন তো এসেই যায়। সুতবাং 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'—গোছের ভাবনাও উঁকি মারে। আসলে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে গল্পটি শেষ হওয়াতেই এটা হয়েছে।

সমগ্র গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কাহিনী হঠাৎ হঠাৎ করে বাঁক নিয়েছে। ফলে এসেছে নাটকীয়তা। যেমন—কালীনাথ ও অনন্ত দুই বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কালীনাথের কারসাজিতে অনন্তের ভাগা থেকে ব্রজরাণী ছিটকে গেল, আবার অনন্তের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার প্রতি বিরূপ, অনন্ত আত্মহত্যা করতে গিয়ে কালীনাথকে হত্যা করে বসে, ব্রজরাণী আট বছর ধরে সুবিচার চেয়ে শেষপর্যন্ত সে অনন্তকে ক্ষমা করে বসে—এইসব ঘটনায় সৃষ্ট চমক থেকে এসেছে নাটকীয়তা। আর এই নাটকীয়তা গল্পটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে আঙ্গিকগত দিক থেকে গল্পটি সাফল্যের দিকে এগিয়েছে।

তবে নাটকীয়তার পাশাপাশি ঘটনার একমুখীনতা গল্পটির আঙ্গিককে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। গল্পটির আদ্যন্ত প্রবহমান ঘটনাস্রোত একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখে রওনা হয়েছে। কোথাও কোনো শ্লথ ভাব আসেনি। কালীনাথ হত্যার বিচার ও তার প্রেক্ষাপট-এর আঙিনায় সমস্ত ঘটনা কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। গল্পের শুরু ও শেষ বিচার দিয়েই। কিসের বিচার, কেন বিচার, বিচারের পরিণতিই বা কি হল—এসব বিষয় ঘটনার পর ঘটনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কালীনাথ হত্যার বিচার ও তার প্রেক্ষাপট—এই বিশেষ একটি মাত্র কাহিনী ঘটনার মালায় যেন সাজানো হয়েছে—যে ঘটনাগুলি তীব্র গতিতে বিচারের অভিমুখে যাত্রা

করেছে। বর্তমান—অতীত-বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ঘটনাগুলির এই একমুখীনতা (যেমন-গল্পের শুরুতে কালীনাথ হত্যার বিচারে আদালতে আগামীকাল ব্রজরাণীর সাক্ষ্য গৃহীত হবে—হরদাসবাবু কর্তৃক ব্রজকে সাক্ষীর ব্যাপারে সচেতন করা—ব্রজ কর্তৃক আট বছর পূর্বের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে আঁৎকে ওঠা ও তা নিয়ে মা-বৌদিদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-হরদাসবাবু কর্তৃক ব্রজ ও তার মাকে অনন্তের বাবা ও শ্বশুরের ক্ষমার আবেদন নিয়ে হাজির হওয়ার কথা জানান—মা ও ব্রজ কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি) গল্পের মধ্যে একটা গতি সঞ্চার করেছে।

ব্যঞ্জনাই ছোটগল্পের প্রাণ। আলোচ্য 'না' গল্পটি যে ব্যঞ্জনাধর্মী তা নামকরণ আলোচনার সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতিরিক্ত বর্ণনা, তত্ত্ব-উপদেশের পরিবর্তে এখানে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের ব্যাপার ঘটেছে। ফলে সংক্ষিপ্ততা, ইঙ্গিতধর্মিতা এই ছোটগল্পের আভরণ হয়ে উঠেছে। 'না' গল্পের কেন্দ্রীয়-নায়িকা চরিত্র ব্রজরাণীর মুখ নিসৃত 'না' শব্দটি গভীর তাৎপর্যবাহী ও ব্যঞ্জনাধর্মী। মোট আট বার 'না'-এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বারের 'না'—নেতি ধর্মী এবং শেষ তিন বারের 'না' ইতি ধর্মী। জীবন সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির বিচাবে নেতি থেকে এই ইতি-তে উত্তরণ 'না' শব্দটিকে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছে। শেষ তিনবারেব হ্যাঁ-রূপী 'না'-এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে শিল্পী তারাশঙ্করের আদর্শায়িত জীবনবোধ। সুতরাং তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনায় এই গল্পের 'না' নামকরণ ঋদ্ধ হয়েছে। ফলে আঙ্গিকগত দিক থেকে গল্পটি ঐশ্বর্য লাভ করেছে।

ব্রজরাণীর সাক্ষ্য দেওয়ার আগের দিন হরদাসবাবু ব্রজকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়াব কথা বলায়—"...ব্রজরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল।" এবং ক্ষমার কথা শুনে ব্রজের মা—"...মা কঠিন হাসি হাসিলেন।"—ইঙ্গিতময় এই কঠিন হাসির অর্থ যে ক্ষমা নেই, তা ব্রজের প্রথম 'না' বলার মাধ্যমে দ্যোতিত হয়েছে। আবার অনন্ত কালীনাথের লেখা বেনামী চিঠিখানি তাকে দিতেই—"কালীনাথের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল।" এবং ব্রজের হাতের জলখাবারের প্রশংসাসূচক কথাবার্তায়—"কালীনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়।"—এই বিবর্ণ মুখ ও শুষ্ক হাসি কালীনাথকৃত অপরাধের ইঙ্গিত দেয়। এরজন্য লেখক বেশি বর্ণনা না দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আকারে-ইঙ্গিতে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ব্রজরাণীর অবৈধব্য ব্রতের দিনই বিধবা হওয়ার ঘটনাটি চমকপ্রদ ও ব্যঞ্জনাধর্মী। লেখক যেন ইঙ্গিতেও ব্যঞ্জনায় বলতে চাইলেন মানুষের জীবনের স্থায়িত্ব তার হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—ভাগ্য ও ভগবানের উপর নির্ভরশীল। এহেন ইঙ্গিতধর্মিতা গল্পটিকে আঙ্গিকগত দিক থেকে ঋদ্ধ করেছে।

কালীনাথের হত্যা ও অনন্তের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি গল্পকার অতি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ততার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি সুবিচারের প্রত্যাশী ব্রজরাণী আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে আইনের বিচার অপেক্ষা মানবিক বিচারকে বড় করে দেখেছেন, সেখানে সংক্ষিপ্ততার মাধ্যমে গভীর ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হয়েছে। লেখক যেন ব্যঞ্জনায় বলতে চাইলেন নিজকৃত অপরাধবোধের অনুশোচনায় যে অনন্ত পাগল হয়ে আট বছর কাটালো, প্রকৃতির মারে যার "শুভ্রকেশ শীর্ণ ন্যুব্জদেহ,

স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি," এমনকি যে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে; তার উপর আইনত বিচার নয়—মানবিক বিচারই সুপ্রযোজ্য। বলাবাহুল্য সেই মানবিক বিচারকেই লেখক সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ফলে আঙ্গিকগত দিক থেকে গল্পটি সার্থক হতে পেরেছে।

আলোচ্য 'না' গল্পের চরিত্রগুলি উপন্যাসের মতো বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত নয়, কেন্দ্রীয় নায়িকা চরিত্র হিসাবে ব্রজরাণী মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার মত ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয়ও নয়—ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক তথা সামাজিকভাবে এই চরিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। তবে সার্থক ছোটগল্পের আঙ্গিকের মতো এই গল্পেও একাধিক চরিত্রের ভিড়ে নায়িকা ব্রজরাণী হারিয়ে যায় নি। বরঞ্চ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও গোটা গল্পে এই চরিত্রের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে। নারী-পুরুষ অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও এই চরিত্রের স্বকীয়তা ও মৌলিকতা চোখে পড়ার মত। কালীনাথের 'হৃদয়-রাজ্যের রাণী', অনন্তের সতী-সাবিত্রী বউদি তথা 'স্বর্গের দেবী', মা ও দাদা হরদাসবাবুর স্নেহের ধন ও আদরের বোন, আচার-আচরণে-আতিথেয়তা ও সেবায় মমতাময়ী এই চরিত্রটি এক কথায় অনবদ্য। কাহিনীর মূলকেন্দ্রবিন্দু এই ব্রজরাণী। সুতরাং সার্থক ছোটগল্পের আঙ্গিকের মতো আলোচ্য 'না' গল্পটির আঙ্গিকেও সঠিকভাবে চরিত্রায়ণ ঘটেছে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় আলোচ্য 'না' গল্পটি আঙ্গিক বা গঠনগত দিক থেকে একটি সার্থক ছোটগল্প।

পাঁচ

শিল্পীর মনের ভাব ও সেই ভাব যে সাহিত্য প্রকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তার আঙ্গিক অনুযায়ী যদি সঠিকভাবে ভাষা নির্মিত হয়, তবে যে কোনো সাহিত্য শাখা সাফল্য লাভ করে। অর্থাৎ Content ও Form অনুযায়ী ভাষাবিন্যাস আবশ্যক। এজন্য কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনীয় বিষয় উপস্থাপনের কৌশলগত পার্থক্য, শিল্পীর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চরিত্রের গোপন মনোভাব, আবেগ-অনুভূতি, ইঙ্গিতধর্মিতা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও ভাষার মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'না' ছোটগল্পের ভাষাবিন্যাসে আমরা ছোটগল্পের ভাবোপযোগী ভাষার সন্ধান পাই। প্রথমেই চোখে পড়ে গোটা গল্পে গল্পকারের বর্ণনা সাধুভাষায় এবং সংলাপগুলো সব চলিত ভাষায় রচিত। যেমন—"ওদিকে বারান্দায় এক ভ্রাতৃবধূ যেন শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিল—'বাপের জন্মে এমন ভয় দেখি নি কিন্তু। আজ আট বছর হয়ে গেল—।"

একই ভঙ্গিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' (যেমন—".........হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, 'দ্যাখ দ্যাখ বাবা,—বামুন-মা এই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে।" এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুঁইমাচা' (যেমন—'সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—'একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো,..........") গল্প লিখেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে দেখি গল্পকার বর্ণনা ও সংলাপ দুটোকেই চলিত ভাষায় লিখেছেন। যেমন—"বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, 'দেখব আবার কী? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার

হবে?..." স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে জীবনের খণ্ডাংশকে চকিতে উদ্‌ভাসিত করতে গল্পকারগণ সংলাপের ভাষায় চলিতকে স্থান দিয়েছেন। এতে চরিত্রের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিব অবস্থান অনুসারে সহজে তার মনের ভাব প্রকাশ পায়। আর এই প্রকাশ প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। গল্পের প্রধান গুণ যে বাস্তবতা—তা রক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্র যে সাধুগদ্য ব্যবহার করেছেন, তা মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিতী গদ্য নয়, বঙ্কিম উপন্যাসে ব্যবহৃত তৎসম শব্দযুক্ত গুরুগম্ভীর গদ্যও নয়—এ গদ্য সাধু হলেও অনেকটা সহজ-সরল, তদ্ভব, দেশী শব্দ যুক্ত। রবীন্দ্র ছোটগল্পে ব্যবহৃত বিবৃতিধর্মী সরল সাধু গদ্যভাষার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত। প্রসঙ্গ ক্রমে বলতেই হয় বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে তাঁর 'রজনী' উপন্যাসের সংলাপে চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সাধু-চলিত দুটো ভাষাই ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দেনাপাওনা' গল্পের সংলাপেও চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সাধু-চলিত দুটো ভাষাই ব্যবহার করেছেন, সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'না' গল্পের সমস্ত চরিত্রের মুখে চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' নামক গল্পে গল্পকারের বর্ণনা ও চরিত্রের সংলাপ দুটোতেই চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।—এ থেকে বোঝা যায় সময়ের হাত ধরে বাংলা কথা সাহিত্যে সাধুগদ্যের পরিবর্তে ধীরে ধীরে চলিত গদ্যের একাধিপত্য স্থাপিত হতে থাকে। আর এ ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের অবদান তো আছেই।

শিল্পী তারাশঙ্কর বিবৃতিধর্মী সাধুগদ্য ভাষার মাধ্যমে চরিত্রের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করেছেন। যেমন—আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলশালী, দাম্ভিক যুবক অনন্তকে খুঁজতে গিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্রজ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। শিল্পীর বর্ণনায় তা এভাবে ধরা পড়েছে—

> "তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে থর থর কবিয়া কাঁপিতেছিল। চোখ দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।"

সাধু গদ্যে লেখা হলেও এ বর্ণনা থেকে ব্রজের মানসিক অবস্থা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। আবার বাক্যগঠনের সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচে Action-কে ফুটিয়ে তোলার বিষয়টি-ও এই গল্পে দৃষ্ট হয়। যেমন-শ্বশুরকে হাতে-পায়ে ধরে স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে অনন্ত শ্বশুরের হান্টারের প্রথম আঘাত পেল এভাবে—

> "অকস্মাৎ তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া লাফ দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—হান্টাব উদ্যত করিযা রক্তচক্ষু শ্বশুর।"

বোঝাই গেল শ্বশুর অনন্তকে পিছন থেকে হান্টার দিয়ে আঘাত করে। বাক্যগঠনের বিশেষ ভঙ্গির জন্য চকিতে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

আলোচ্য 'না' গল্পটির মধ্যে শব্দচয়ন কোথাও কোথাও ইঙ্গিতধর্মী, আবার কোথাও কোথাও তা ব্যঞ্জনাধর্মী। যেমন—আদালতে সাক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে দাদা হরদাসবাবু ব্রজকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে বললে—"ব্রজরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল।" আবার অনন্তের পিতা ও শ্বশুর ক্ষমার আবেদন নিয়ে হাজির হলে "মা কঠিন হাসি

হাসিলেন।" লক্ষ্যণীয় 'বিচিত্র হাসি' ও 'কঠিন হাসি' শব্দদ্বয় গূঢ় ইঙ্গিতবাহী। কেননা মা ও মেয়ে কেউই যে ক্ষমা করতে চায় না, তা এই শব্দদ্বয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সুতরাং লেখকের ইঙ্গিতধর্মী শব্দচয়নের বিষয়টি এখানে পরিষ্কার ধরা পড়ে। 'না' গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'না' শব্দটি যে যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী, তা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

গল্পটির মধ্যে চরিত্রানুযায়ী ভাষা সৃষ্টির দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অনন্ত অর্ধশিক্ষিত, গোঁয়ার প্রকৃতির যুবক বলে লেখক তার মুখে সে রকম সংলাপ বসিয়েছেন। যেমন—বিয়ের আগে অনন্ত কালীনাথকে সকাল হলেই এসে ডাকত এভাবে—"কালী-দা! বাপ্‌স্ কি ঘুম তোমার!" শিকার করতে বেরিয়ে কালীনাথকে বলে—"......হাত কিন্তু আমার নিস্‌পিস্ করছে, কি মারি বল ত?" ফুলশয্যার রাতে নববধূর লাইব্রেরির কথায় অনন্ত বলে—"ওসব লাইব্রেরি-টাইব্রেরির ধার-টার ধারি নে আমি। বছরে সরস্বতী পূজো একদিন—পাঁঠা কাটি, ফিষ্টি করি, ব্যস।" ফুটবল টীম নিয়ে খেলতে যাওয়ার দিন স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে মদ খেয়ে এসে অনন্ত বলে—"হ্যাঁ, খাই, মদ খাই গাঁজা খাই সব খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই?" অনন্তের সংলাপগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'বাপ্‌স্', 'নিস্‌পিস্', 'লাইব্রেরি—টাইব্রেরি', 'পাঁঠা-কাটি', 'ফিষ্টি করি', 'মদ খাই', 'বাপের পয়সায়' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ থেকে তার চরিত্রের গ্রাম্যতা ও আদিমতার দিকটি ফুটে ওঠে। অবশ্য বৌদি ব্রজরাণীর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ প্রশংসার যোগ্য।

শিক্ষিত, মার্জিত কালীনাথ পাত্রী দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গে অনন্তের কথার উত্তরে বলে—"এক্‌সেলেন্ট আইডিয়া! বহুৎ আচ্ছা ব্রাদার আমার রে!" আবার ব্রজরাণীর অবৈধব্য ব্রতের প্রসঙ্গে কালীনাথ বলে—".. ...আমার আগে মববার পাশপোর্টের ব্যবস্থা করছেন আর কি!"—লক্ষ্যণীয় এক্‌সেলেন্ট আইডিয়া, ব্রাদার, পাশপোর্ট প্রভৃতি ইংরাজী শব্দ এবং বহুৎ আচ্ছা হিন্দী শব্দের ব্যবহারে শিক্ষিত কালীনাথের মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, ক্রুদ্ধ হয়ে অনন্তের শ্বশুর যখন দারোয়ানকে বলে—"দারোয়ান! নিকাল দো ইস্‌কো।", তখন বোঝাই যায় দারোয়ান হিন্দীভাষী।

আলোচ্য 'না' গল্পটির মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের আবহ-অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলতে রিপীটার বন্দুক, হান্টার, রিভলবার, দারোয়ান, পাল্কী, আস্তাবল, সহিস ইত্যাদি শব্দ বা বিষয় ব্যবহৃত হয়েছে। আর আধুনিক শিক্ষার প্রভাবকে ফুটিয়ে তুলতে লাইব্রেরি, কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করা, ইংরাজী বই, 'An idle brain is the devil's workshop'—রূপী ইংরাজী প্রবাদ ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'না' ছোটগল্পে সাধু-চলিতের ব্যবহার, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশক বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, চরিত্রের ভাব প্রকাশক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিষয়-অনুষঙ্গ কেন্দ্রিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ইত্যাদি দিক থেকে ভাষার-বুনিয়াদ গড়ে ওঠায় গল্পটি সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছে।

ছয়

চরিত্র বিচারে প্রথমেই বলতে হয় ব্রজরাণীর কথা। আলোচ্য 'না' গল্পের কেন্দ্রীয় ও নায়িকা চরিত্র হল ব্রজরাণী। গল্পটি শুরু হয়েছে আদালতে তার সাক্ষ্যের কথা দিয়ে, শেষও

হয়েছে তার সাক্ষ্য সম্পাদনের মাধ্যমে। ব্রজরাণীর মুখনিসৃত 'না' ধ্বনি দিয়েই গল্পের নামকরণ করা হয়েছে 'না'। লেখকের আস্তিক্যানুভূতি যুক্ত আদর্শবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তার মাধ্যমে। এগার-বারো পাতার এই গল্পটি প্রায় সাড়ে আট বছরের বর্তমান-অতীত-বর্তমানের ঘটনাশ্রিত কাহিনী নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে যেখানে যেখানে ব্রজের উপস্থিতি, সেখানে সেখানেই সে অন্যান্য চরিত্রের মাঝখানে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো শোভাবর্ধন করেছে। তার উপস্থিতি যেন আবির্ভাব। কম কথা বলে বেশি মনের ভাব প্রকাশ করা, বেশি কাজ করা ও অন্যকে প্রভাবিত করা—এ সকল গুণ তার মধ্যে উপস্থিত। ব্রজরাণীর সামনে ও আড়ালে অন্যান্য চরিত্র তাকে নিয়ে আলোচনা করেছে। মনে-প্রাণে নিজে আলোড়িত হওয়া ও অন্যান্যদের আলোড়িত করার মাধ্যমে চরিত্রটি বিবর্তিত হয়ে একটি Round character-এ পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের জয়কালী দেবী, শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের ষোড়শী, বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পের অন্নপূর্ণার মতো আলোচ্য 'না' গল্পে ব্রজরাণীর চরিত্রে কঠোর-কঠিন রূপের আড়ালে স্নেহময়-মমতাময়ী রূপ ফুটে উঠেছে। এই রূপই শেষপর্যন্ত তাকে মহীয়সী নারীতে পরিণত করেছে। গল্পটি সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহীয়সী নারী হয়ে ওঠার সমস্ত গুণ প্রথম থেকেই তার মধ্যে বর্তমান ছিল। মাঝখানে যে তার স্বামী কালীনাথকে হারিয়ে আর পাঁচটা রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানবীর মতো স্বামী হত্যার সুবিচার চেয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আইনত সুবিচার চেয়েও শেষপর্যন্ত নিজেই সে মানবিক বিচার করে মহীয়সী নারীতে পরিণত হয়েছে।

ব্রজরাণী ধনী চাকুরে বংশের মেয়ে। সুতরাং বংশগত দিক থেকে শিক্ষা ও অর্থ সমান্তরালভাবে তার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পাত্রী হিসাবে সে যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলে কালীনাথ তাকে প্রথমে দেখেই মুগ্ধ হয়েছে এবং তাকে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে বেনামী চিঠি লিখেছে। ভাল বর পেতে ব্রজ যে তপস্যা করেছে, তা তার মার কথায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে—
"তা ব্রজর আমার তপস্যা ভাল। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই।...."

স্বামী কালীনাথের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা। তাই স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখতে সে অবৈধব্য ব্রতের আয়োজন করে। বোঝাই যায় যে সে ঠাকুরভক্ত। তাদের স্বল্পস্থায়ী সুখী দাম্পত্য জীবন ফুলশয্যার রাত থেকে যে ইতিবাচকভাবে শুরু হয়েছিল, তা তাদের কথা থেকেই পরিষ্কার—

"তোমায় আমি রাণী বলেই ডাকব। আমার হৃদয় রাজ্যের রাণী তুমি।..........কিন্তু তুমি আর আমি যেখানে শুধু, সেখানে বলব রাণী।" ব্রজরাণী আধুনিকা নারী নয়। তাই নতুন বিয়ের পর স্বামীর ঘরে অপরিচিত অনন্ত আসতেই".......ব্রজরাণী ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গেল।" লজ্জাশীলা বঙ্গবধূর মতো তার এই বিনম্র আচরণ ফুলশয্যা রাতে কালীনাথের সঙ্গে কথাবার্তায়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—"দূর, সে আমার লজ্জা করবে। তার চেয়ে সবাই যা বলে তাই বলবে—ওগো।"

ব্রজরাণী এতটাই বিনম্রা ও লজ্জাশীলা যে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অনন্তের পিতা ও শ্বশুর ক্ষমার আবেদন নিয়ে ব্রজদের বাড়িতে হাজির বলে—'ব্রজরাণী চঞ্চল হইয়া মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিল, যেন মামাশ্বশুর সান্নিধ্যেই কোথাও রহিয়াছেন।"

ব্রজরাণী কালীনাথের লক্ষ্মী স্বরূপা স্ত্রী। অনন্তের চোখে ব্রজের সেই লক্ষ্মী রূপের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—"বাড়ির চারিদিকে একটি লক্ষ্মীশ্রী সুপ্রসন্ন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় যেন উছলিয়া পড়িতেছে।" কালীনাথের কথায় ব্রজের প্রশংসা শোনা যায়—"রাণীর গুণ একমুখে বলে শেষ করতে পারব না অনু। দেখছিস না ঘরদোরের অবস্থা।......"

বোঝাই যাচ্ছে ব্রজরাণী ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের ছাঁচে গড়া এক নারী চরিত্র। শিল্পী তাকে মহীয়সী দেবী চরিত্র হিসাবে ফুটিয়ে তুলতেই যেন এখানে প্রারম্ভিক কাজটি সেরে নিচ্ছেন। আর সেজন্যই দেবর অনন্তের প্রতি তার স্নেহ-বাৎসল্য মোটা রঙে চিত্রিত। বৌদি ব্রজের হাতের জলখাবার সম্পর্কে অনন্ত বলেছে—"বউদি আমার স্বর্গের দেবী—তার হাতের জিনিস, এ যে অমৃত!" এমনকি অবৈধব্য ব্রতের প্রসঙ্গে ও ব্রজের মায়ের সামনেও অনন্ত ব্রজরাণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

এই পর্যন্ত ব্রজরাণী মানবিক গুণে গুণান্বিতা এক নারী যে সু-প্রবৃত্তির অধিকারিণী। কিন্তু এর পরেই তার জীবনে নেমে এসেছে নৈরাশ্য ও আশাভঙ্গের কালো ছায়া। অপ্রত্যাশিতভাবে তার সামনেই অনন্ত যখন কালীনাথকে খুন করল, তখন নিয়তিলাঞ্ছিত এক ট্র্যাজিক নারী চরিত্র রূপে আমরা ব্রজরাণীকে দেখতে পাই। যে অনন্ত তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সেই অনন্তই তাকে বিধবা করল—এ যেন তার কল্পনাতীত। অথচ এর জন্য ব্রজের কোন দোষ-ত্রুটি ছিল না। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদলে গঠিত এই চরিত্রটি তীব্র মর্মজ্বালা ও যন্ত্রণা নিয়ে আট বছর অশৌচ পালন করেছে এবং স্বামীহত্যার সুবিচার প্রার্থনা করেছে। এখানে সে আর পাঁচটা রক্ত-মাংসে গড়া মানবীর মতো প্রতিহিংসায় জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ক্ষমার আবেদনকে অগ্রাহ্য করে চরম মুহূর্তের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে পাঁচ বার 'না' বলেছে। যেখানে ব্রজের মা বলেছে—"......নইলে যা হবে হোক, ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হত।", সেখানেও ব্রজ অনড় থেকেছে। এখানে কঠোর-কঠিন, প্রতিশোধপরায়ণা নারী হিসাবে আমরা ব্রজকে দেখতে পাই। আর সেজন্য পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে উদাসীন থেকেছে।

কিন্তু আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাম্ভিক বলশালী যুবক অনন্তকে খুঁজতে গিয়ে যখন ব্রজের চোখে পড়ল অন্য এক অনন্ত, ('শুভ্রকেশ শীর্ণ ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।') তখন অকস্মাৎ এক আবেগে 'ব্রজরাণীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল।' তার মধ্যে জাগ্রত মমতাময়ী দেবী মূর্তি তখন মানবিকভাবে অনন্তের বিচার করতে চাইল।

> "...হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে! এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার!..."

এরপর ব্রজরাণী জীবন সম্পর্কে তিনবার ইতিবাচক হ্যাঁ-রূপী 'না' উচ্চারণ করে এবং নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়ে। এভাবে একেবারে শেষমুহূর্তে ব্রজরাণীর মধ্যে জীবাত্মার প্রতি অন্তরাত্মার আকর্ষণ তথা অধ্যাত্মচিন্তায় আচ্ছন্ন হওয়ার মাধ্যমে শাশ্বত জীবনসত্যের প্রকাশ ঘটল। যে জীবন অসৎ থেকে সৎ, হিংসা থেকে ক্ষমার পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়—সেই জীবনই বড় হল। জীবন-মৃত্যুর গভীরতর রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে শিল্পী

তারাশঙ্কর তাঁর 'না' গল্পের নায়িকাকে পৌঁছে দিলেন এক পরম প্রশান্তিময় ক্ষেত্রে—যেখানে গল্পকার বিভূতিভূষণও অপেক্ষা করছেন। সার্থক হল তারাশঙ্করের ভেঙে-গড়ার স্বপ্ন। শিল্পী যেন ট্র্যাজিক নায়িকা ব্রজরাণীকে সঙ্কীর্ণতা, কলুষতা, স্বার্থপরতা থেকে এক উদার-উন্মুক্ত প্রশান্তির জগতে মুক্তি দিলেন। ফলে চরিত্রটির উত্তরণ ঘটে যাওয়ায় এটি একটি Round Character-এ পরিণত হয়েছে। আর এহেন উত্তরণ তথা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ঘটনা তারাশঙ্করের 'কবি', 'শ্যামাদাসের মৃত্যু', 'বোবা কান্না', 'ইমারত', 'শিলাসন' প্রভৃতি গল্পেও দেখা যায়।

তারাশঙ্করের ৪৩ বছরের সাহিত্য জীবনের মধ্য ও শেষ পর্বের শিল্পসফল এই 'না' গল্পটির (যেটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) কেন্দ্রীয় ও নায়িকা চরিত্র ব্রজরাণীর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পিছনে দুটি বিষয় কাজ করেছিল।

যথা—১. আট বছর পরে অনুশোচনায় দগ্ধ, যন্ত্রণায় কাতর, হৃতশ্রী অনন্তের ভগ্নরূপ দর্শন।

২. অনন্ত কর্তৃক পূর্বের স্মৃতিকে ('দেবী, দেবী! স্বর্গের দেবী। তুমি বউদি!') আকারে-ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

সুতরাং অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বিষয়টি আরোপিত নয়—পূর্বাপর কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ও চরিত্রের মর্মমূলে প্রোথিত। আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই চরিত্রটির দ্বান্দ্বিক রূপ। কেননা যে ব্রজরাণী অনন্তকে দেবর হিসাবে স্নেহ-মমতার পাশে আবদ্ধ করেছে, তাকেই স্বামীহত্যার দায়ে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চেয়েছে। অথচ শেষপর্যন্ত তাকে ক্ষমা করতে হয়েছে। এর মধ্য থেকে ব্রজের চরিত্রে সুপ্ত দ্বন্দ্বের বিষয়টি আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। শাশ্বত জীবনসত্যে বিশ্বাসী তারাশঙ্কর আলোচ্য 'না' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রজরাণীকে দিয়ে শেষপর্যন্ত যেন বলালেন—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।"

এভাবে জীবনে জীবন যোগ করে শিল্পী তারাশঙ্কর একটি আদর্শনিষ্ঠ জীবনঘনিষ্ঠ নায়িকা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—যা এক কথায় অবিস্মরণীয়।

অনন্ত চরিত্রটি গ্রীক ট্র্যাজেডির আদলে গঠিত। গল্পে তার Doing ও Suffering কম নয়। নিয়তি ও পরিবেশের প্রভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত এই চরিত্রটি যথার্থ অর্থেই আলোচ্য গল্পের ট্র্যাজিক নায়ক। জমিদার পুত্র অনন্ত অর্ধশিক্ষিত, বলশালী ও উদ্ধত সাহসী যুবক। কিন্তু সে প্রতারক বা কপট নয়—অন্যের কপটতাকেও বরদাস্ত করে না, বরঞ্চ তার চরিত্রে ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা, শান্তি-সুস্থিতির কামনা—এসবই আছে। তার চরিত্রে এক পশুমানব আছে, যার প্রভাবে সে পাখি, জন্তু-জানোয়ার মারা থেকে শেষপর্যন্ত মানুষও মারতে পারে। ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যবোধের জিদ এই চরিত্রটির মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে, তা থেকেই তার জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। চরিত্রটি শিল্পী তারাশঙ্করের জমিদারী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অঙ্কিত 'কালিন্দী' উপন্যাসের রামেশ্বর চক্রবর্তীর বড় ছেলে মহীন্দ্রের মতো অনেকটা। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মমর্যাদা ও আভিজাত্যবোধ বড় হয়ে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে।

উত্তাল যৌবনের প্লাবনে অনন্ত বয়সে চার বছরের বড়, শিক্ষিত পিস্‌তুতো ভাই কালীনাথকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধে। একসঙ্গে চা তৈরী করে খাওয়া, শিকার করা পাখির মাংস খাওয়ায় সেই বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হতে থাকে। তামাকের নেশা ও একসঙ্গে পাখি মারতে যাওয়ার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ পায়। অতি নৈকট্যের সুবাদে অনন্ত পাত্রী দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে যখন বলে—

> "দাদা, তোমার পাত্রী দেখতে যাব আমি, আর আমার পাত্রী দেখতে যাবে তুমি।"

অনন্তের এহেন সরল বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কালীনাথ যখন বেনামী চিঠি লিখে ব্রজরাণীকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করল, তখনই গল্পে ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত হল। যে ব্রজ অনন্তের পাওয়ার কথা কালীনাথ প্রতারণা করে তাকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করতে থাকে; অথচ অনন্ত কলিকাতার নিকটস্থ প্রাচীন জমিদার বাড়ির আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পাত্রীকে বিয়ে করে বিপদে পড়ে। শিক্ষার সূত্র ধরে স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। স্ত্রীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অনন্ত বলে—"কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন?" সঙ্গে আরো বলে—"ওই তো কালীদাদার বউ, তার ব্যবহার দেখে এস—স্বামীকে সে কত ভক্তি—।"

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অশালীন কথা কাটাকাটি থেকে অনন্ত কর্তৃক স্ত্রীকে হান্টারের আঘাত ও তার বিষয় প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে শ্বশুর কর্তৃক অনন্তকে পাল্টা হান্টারের আঘাতে অনন্তের সব গোলমাল হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অনন্ত প্রথমে শ্বশুরকে হত্যা, পরে নিজে আত্মহত্যা করে শ্বশুরকে শিক্ষা দেওয়া ও সবশেষে নাটকীয়ভাবে কালীনাথের প্রতি ভয়ঙ্কর ঈর্ষা ও ক্রোধ থেকে তাকে হত্যা করে পরে নিজে আত্মহত্যা করার সংকল্প নেয় অনন্ত। অনন্ত কালীনাথকে হত্যা করলেও নিজে আত্মহত্যা করতে না পেরে ভয়ে, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়ে পাগল হয়ে যায়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পরিবেশ-পরিস্থিতি সবই অনন্তের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ায় চরম শূন্যতাবোধ থেকেই তার জীবনের এই ট্র্যাজেডি।

প্রাক্-বিবাহিত জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তি, স্বাধীনতা ও লাগাম ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ানো, যৌবনের ফেনিল উদ্দামতাকে উপভোগ করা—এসব থেকে শতযোজন দূরে গিয়ে বিবাহিত জীবনে অনন্ত অনুভব করেছে অস্থিরতা, অপমান ও চরম জীবন-যন্ত্রণা। ফুলশয্যার রাত থেকে লাইব্রেরির ("তোমার লাইব্রেরির কথা জিজ্ঞেস করেছি আমি।") প্রসঙ্গ নিয়ে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে চলে যায়, শ্বশুরবাড়িতে শ্যালকের ইংরাজী পড়া বুঝানো এবং শ্যালিকার ইংরাজী খবরের কাগজ পড়ার প্রসঙ্গে সে অপমানিত হয়, শ্বশুরের 'An idle brain is the devil's workshop- কলকাতায় থেকে পড়াশুনো কর।'—কথায় সে আহত হয়, কালীনাথের লেখা বেনামী চিঠিখানা হাতে পেয়েও সুপ্ত ক্রোধ ও ঈর্ষা গোপন রেখে দিতে হয়, পিতার অপবাদ ('তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক।...তুই মরলি না কেন?) মুখ বুজে সহ্য করতে হয়—এসব অনন্তের মনের মধ্যে একটি অগ্নিগর্ভ অবস্থা সৃষ্টি করে। বধূর "মাতাল মুখ্যু বেরোও......." কথায় তা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো ফেটে পড়ে এবং শ্বশুরের হান্টারের আঘাতে তা দাউ দাউ

করে জ্বলে ওঠে। সেই আগুনের শিখায় কালীনাথ নিহত হয় এবং অনন্ত নিজে পাগল হয়ে যায়। অথচ সুস্থ-ভাবে বাঁচার জন্য সে কম চেষ্টা করে নি। স্ত্রীকে লাইব্রেরির ব্যাপারে সে সত্য কথাই বলেছে। আহত স্ত্রীকে সোহাগ করে বলেছে—"কি হল বলবে না? লক্ষ্মী! শোন কথার উত্তর দাও!" ফুটবল টীম নিয়ে খেলতে যাওয়ার আগে দীর্ঘদিন পর স্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে। ব্রজের দাদার মুখ থেকে কালীনাথের বেনামী চিঠির কারসাজি ও মায়ের মুখ থেকে জামাই কালীনাথের রূপ-গুণের প্রশংসা শুনেও উত্তপ্ত মস্তিষ্কে অনন্ত স্থির করে—'না-সে পড়াশুনাই করিবে। জীবনে প্রশংসা শান্তি—এ তাহার চাই—তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয় সে তপস্যাই করিবে। সর্বান্তঃকরণে সে কালীনাথকে মার্জনা করিল, ব্রজরাণীকে বারবার মনে মনে আশীর্বাদ করিল—তুমি চিরায়ুষ্মতী হও।"

বোঝাই যাচ্ছে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার জন্য, শান্তি-সুস্থিতির জন্য অনন্তের এহেন তপস্যা-ত্যাগের পরিকল্পনা জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। এখানে অনন্ত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। অথচ ভাগ্যের নির্মম-নিষ্ঠুর পরিহাসে বিরুদ্ধ পরিবার ও পরিজনের ধাক্কায় এই সংকল্প ভেঙে খান খান হয়ে গেল। বাবার অপবাদ ও শ্বশুরের হান্টারের আঘাতে তার সমস্ত দেহ-মন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পরিণতিতে তীব্র বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল তার সুপ্ত ঈর্ষা ও ক্রোধাগ্নি। মুহূর্তে ঘটে গেল প্রলয়।—এ থেকে বোঝা যাচ্ছে গল্পকার তারাশঙ্কর অনন্তকে মোটা দাগে চিত্রিত করেছেন। দ্বন্দ্বপূর্ণ এই চরিত্রটি ইতিবাচকভাবে বাঁচার জন্য লড়াই করেও ব্যর্থ হল—এর মতো ট্র্যাজিক ঘটনা আর কি হতে পারে!

অবশ্য শিল্পী তারাশঙ্কর এই চরিত্রটির ভিতরকাব শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার দিকটিকে আস্তিক্যানুভূতির আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে ব্রজ তার স্ত্রী হতে পারত, যার সঙ্গে তার রোমান্টিক-মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত; সেই ব্রজ তার বৌদি হলেও মধুর সম্পর্কের হানি ঘটে নি। বরঞ্চ এক হার্দিক ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে বৌদির সঙ্গে। পাশাপাশি কালীনাথের সঙ্গে সম্পর্ক আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করেছে। বৌদি ব্রজ সম্পর্কে অনন্তের উপলব্ধি এরকম—"...বউদি স্বর্গের দেবী তুমি!"ব্রজের মার কাছেও অনন্ত ব্রজ সম্পর্কে বলেছে—"এ যুগে এমন মেয়ে হয় না মাউই-মা। সতী-সাবিত্রী বইয়ে পড়েছি—বউদির মধ্যে চোখে দেখলাম!"

বোঝা যায় অনন্তের চোখে ব্রজ দেবী তথা মানবী প্রতিমা। উভয়ের মধ্যে যেন পবিত্র ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক। ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র অশান্তির পর অনন্ত ফুটবল টীম নিয়ে যাত্রার আগে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ব্রজের কাছে এসে বলেছে—

"...এখন কিছু খেতে দাও তো বউদি?" জগজ্জননী অন্নপূর্ণার মতো ব্রজরাণী তখন অনন্তকে জলখাবার খাইয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিয়েছে। অথচ উন্মাদ ক্রোধান্ধ হয়ে অনন্তের কালীনাথ হত্যার সময় ব্রজরাণীর ব্যাকুল কাতরোক্তি কোনো সাড়া না জাগালেও পরক্ষণেই আতঙ্ক, অনুশোচনা ও পরিণতির কথা ভেবে অনন্ত পাগল হয়ে যায়। বোঝাই যায় স্বাভাবিক অবস্থায় অনন্ত হত্যা করে নি। তা না হলে সে কখনো পাগল হত না। পরিবেশ-পরিস্থিতি

ও ভাগ্য তাকে এই পরিণতি দিয়েছে। এজন্যই সে বিড়ম্বিত হতভাগ্য ট্র্যাজিক নায়ক। তার বিড়ম্বনা এখানেই শেষ নয়, আট বছর পর সে সুস্থ হয়ে উঠলে আদালতের কাঠগড়ায় তাকে বিচারের জন্য আনা হয়। ব্রজ যখন দেখল অনন্ত "শুভ্রকেশ শীর্ণ ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" তখন অকস্মাৎ তার মধ্যে মমতাময়ী দেবী সত্তার আবির্ভাব ঘটল। কেননা কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের ছাপ তখন অনন্তের সমগ্র দেহসজ্জায় ধরা পড়েছে। আর এই উদ্‌বোধিত দেবী সত্তার জন্যই অনন্ত শেষপর্যন্ত রক্ষা পেল। সার্থক হল বৌদির সঙ্গে তার পবিত্র অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। অনন্ত এক নতুন জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পেল শিল্পী তারাশঙ্করের অধ্যাত্মচিন্তার ছোঁয়ায়। শিল্পীর ভেঙে গড়ার কাজও সম্পন্ন হল। সবমিলিয়ে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে আট বছর ধরে অনন্ত যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারজন্য আলোচ্য 'না' গল্পে সে যথার্থ অর্থেই ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য 'না' গল্পে কালীনাথ চরিত্রটি অনন্ত ও ব্রজরাণীর পাশে অনেকটা নিষ্ক্রিয় এক রঙা চরিত্র বলে মনে হয়। কালীনাথ অনন্তের পিস্‌তুতো ভাই এবং ব্রজরাণীর স্বামী। যৌবন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কালীনাথ অনুজ অনন্তের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। একসঙ্গে পাখি মারতে যাওয়া, এক সঙ্গে বসে চা ও পাখির মাংস খাওয়া সেই বন্ধুত্বকে গাঢ় করে তোলে। তামাকের নেশায় দু'জনের ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যায়। এই পর্যন্ত কালীনাথ যেন অনন্তের অনুসরণকারী রূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে যত্রতত্র তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে।

উচ্চ-শিক্ষিত এই কালীনাথ বিয়ের পাত্রী দেখার ব্যাপারে যেভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনন্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাতে তার চরিত্রের স্বার্থপর, কূটকৌশলী রূপটি ধরা পড়ে। তারাশঙ্কর এই গল্পে আধুনিক শিক্ষার অহংকারে দৃপ্ত অনন্তের স্ত্রী ও তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের দুর্ব্যবহার-এর-যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উচ্চশিক্ষিত কালীনাথের নীতিহীন কারসাজিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষাকে তিনি মেনে নিলেও তার কিছুটা কুফল তিনি এই গল্পে দেখালেন। কেননা কালীনাথ বেনামী চিঠির মারফৎ কৌশলে ব্রজরাণীকে স্ত্রী হিসাবে পেলেও তার শোচনীয় পরিণামে শেষপর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। শিক্ষার আলো কালীনাথকে আসল-নকল চিনতে শিখিয়েছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কালীনাথ ব্রজরাণীকে দেখে পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সেই তার উপযুক্ত ঘরণী হতে পারে। কিন্তু বন্ধু অনন্তকে গোপন করে সে যেভাবে ব্রজকে লাভ করেছে, সেখানে তার সুবিধাবাদী কৌশলী মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে শিক্ষিত মহেন্দ্র বন্ধু বিহারীর জন্য পাত্রী আশালতাকে দেখতে যায়। কিন্তু নিজের পছন্দ হওয়ায় সে আশাকে বিয়ে করে। কিন্তু সেখানে কোনো কারসাজি বা কৌশল নয়, তীব্র হৃদয়াবেগ ও কামনাই বড় হয়ে উঠেছে। আসলে তারাশঙ্কর আলোচ্য 'না' গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের মাঝখানে আধুনিক শিক্ষাকে জীবনের গতি নির্ণায়ক ভূমিকায় আসীন করতে চেয়েছেন।

বিয়ের পর সুখী-দাম্পত্য জীবনে বিভোর কালীনাথ বন্ধু অনন্তের কথা ভুলে যায়। বেনামী পত্র নিয়ে অনন্ত প্রথম কালীনাথের কাছে এলে কালীনাথ ব্রজের প্রশংসা করে

বলে—"রাণীর গুণ একমুখে বলে শেষ করতে পারব না অনু। দেখছিস না ঘরদোরের অবস্থা। তুইও বৌকে এইবার নিয়ে আয়, বুঝলি।" কেন অনন্তের স্ত্রী বাপের বাড়িতে আছে? কি করলে সে আসবে? কিভাবে অনন্ত সুখী হবে?—এসব গভীর সমস্যার কথা কালীনাথ ভাবতে চায় না। শুধু উপদেশ দিয়েই কাজ শেষ করতে চায়। বোঝাই যায় বন্ধুত্বের গাঢ়ত্ব কমে আসছে। এরপর অনন্ত কালীনাথের লেখা বেনামী চিঠিখানা তাকে দিতেই "কালীনাথের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল।" বৌদির হাতের জলখাবারের প্রশংসা করতেই "কালীনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়।" কালীনাথের বিবর্ণ মুখ ও শুষ্ক হাসি থেকে পাঠক অনায়াসেই তার অপরাধবোধের কথা জানতে পারে। আর এই অপরাধবোধ থেকেই পরবর্তীতে মারমুখী অনন্তের কাছে সে বলেছে—"অনু, ক্ষমা-ক্ষমা!" তবে ঘটনাচক্রে কালীনাথের লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়েছে। আর সেজন্যই সতী-সাধ্বী স্ত্রী ব্রজ দেবর সম্পর্কে ভুলে গিয়ে স্বামীহত্যার সুবিচার চেয়েছে।

কালীনাথ স্ত্রী ব্রজরাণীকে ভীষণ ভালোবাসে। ফুলশয্যার রাতে কালীনাথ নববধূ ব্রজকে বলে—"তোমায় আমি রাণী বলেই ডাকব। আমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী তুমি।"

অতঃপর স্ত্রীকে ".....তুমি আর আমি যেখানে শুধু, সেখানে বলব রাণী" কথা দিলেও অনন্তের সামনে ব্রজের প্রশংসা করতে গিয়ে বলে—"রাণীর গুণ একমুখে বলে শেষ করতে পারব না অনু।" পরিষ্কার বোঝা যায় ব্রজ কালীনাথের হৃদয়-রাজ্যের রাণী। ব্রজের মাও কালীনাথের প্রশংসা করে বলে—"তা ব্রজর আমার তপস্যা ভাল। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই। ব্রজ বলতে পাগল।" সে যাতে ব্রজের পাশে দীর্ঘজীবন থাকতে পারে, তারজন্য ব্রজের অবৈধব্য ব্রতকে মেনে নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ব্রজের অবৈধব্য ব্রতের দিনই কালীনাথ অনন্তের হাতে নিহত হয়। শিল্পী তারাশঙ্কর যেন বলতে চাইলেন—চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না—চাওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততা থাকতে হবে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় আলোচ্য 'না' গল্পে কালীনাথ দোষে-গুণে গড়া একটি একরঙা চরিত্র।

বেদেনী : অন্ধকারের গুহায়

শর্মিষ্ঠা গন্ডরায়

বাংলা অভিজাত সাহিত্যের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের হাতে। তাঁর লেখাতেই প্রথম ভিড় করে এসেছে সাধারণ মানুষ। সাহিত্যের রাজপথ তিনি খুলে দিয়েছেন তথাকথিত অভদ্র ইতরজনের জন্য। সেটাই বাংলা ছোটোগল্পের বয়ঃসন্ধির কাল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যের সেই অন্যতম কারিগর যিনি ছোটগল্পের শৈশব উত্তীর্ণ শরীরে যৌবনের প্রলেপ লাগিয়েছেন। যিনি কৃষাণের জীবনের শরীক। কাজে ও কথায় তাদের সত্যিকারের আত্মীয়। তবে তিনি শুধু মাটির কাছাকাছি নন। উঠে এসেছেন একেবারে মাটির বুক থেকে। উত্তররাঢ়ের মাটি ও সমাজ, মন ও মানুষ তাঁর প্রতিটি লেখায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। ডোম, বাউরী, বাগ্দী, কাহার, বেদে, সাঁওতালেরা এই সাহিত্যের নায়ক হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র আঞ্চলিক সাহিত্যের আঙিনাকে ভরিয়ে তুলতেই এরা আসে নি। জৈবপ্রবৃত্তির যে প্রাগৈতিহাসিক চেতনা মানুষের রক্তমাংসের শরীরে প্রতিমুহূর্তে ছোবল মারে তার অকুণ্ঠ প্রকাশও তাঁর অপবিত্রতা, সুন্দর-অসুন্দর এই সমস্ত চেতনার ঊর্ধ্বে। এই প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। এই চেতনার কাছে সে অসহায়। এই আদিম চেতনাকেই তাঁর গল্পের বিষয় করেছেন তারাশঙ্কর। 'বেদেনী' গল্পটি—এই আদিম জীবনসত্যেরই একটি রূপের প্রকাশ।

''মানুষের মানে চাই-গোটা মানুষের মানে!/রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত—/গোটা মানুষের মানে''—এই গোটা মানুষের মানে খুঁজতে গেলেই বোধ হয় জন্ম হতে পারে 'নারী ও নাগিনী'-র। জন্ম হতে পারে 'দেবতার ব্যাধি' কিংবা 'তারিণী মাঝি' বা 'আখড়াইয়ের দীঘি'-র। অথবা জন্ম নিতে পারে 'বেদেনী'। মানুষ পশু নয়। আবার দেবতাও নয়। সে যেন আধুনিক নৃসিংহ অবতার। সে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে। আবার প্রহ্লাদকে বুকে টেনে নেয়। যার মধ্যে একই সাথে আছে ভয়ঙ্কর আর সুন্দর। যদিও পশুত্ব থেকে দেবত্বেই তার অভিযাত্রার শুরু, কিন্তু এই journey-এর মাঝখানে সে হয়ে পড়েছে জগতের সবচেয়ে অবোধগম্য জীব। অন্যদের কাছে। এমনকি নিজের কাছেও। তার আপাত শোভন, সুন্দর ব্যক্তিত্বের আড়ালে তার মনের একটা সর্পিল গতি আছে। তার বাঁকগুলো অত সহজে বোঝা যায় না। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক আদিম বর্বরতা। এক অরুগ্ণ, বলিষ্ঠ, হিংস্র, নগ্ন বর্বরতা। সে কোনো প্রথাকে মানে না, সংস্কারকে মানে না। সে শুধু জানে অনন্ত ক্ষিদে। শরীরের ক্ষিদে। 'বেদেনী'-রাধিকা-র এই ক্ষিদে দুর্বার। এই ক্ষিদে নিয়েই সে ছেড়েছে তার প্রথম স্বামী শিবপদ বেদের ঘর। সহবাস করেছে শম্ভু বাজিকরের সঙ্গে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। চাপা দিয়ে রেখেছে তার অতৃপ্ত যৌবন বাসনাকে। আবার সেই অতৃপ্ত শরীরই তাকে বাধ্য করেছে কেষ্টো বেদের সঙ্গে দেশান্তরী হ'তে। শম্ভুকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে। বড় মর্মান্তিক হিংস্র তার শেষ সংলাপ—

''টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।''

শেষ থেকে যে গল্পকে বোঝার চেষ্টা করছি আমরা তার নায়িকা বা প্রধান চরিত্র এই বেদেনীই। এই নিষ্ঠুর, উন্মত্ত, যুবতী বেদেনী রাধিকা। গল্পের শুরুতেই তার শরীরী বর্ণনা করেছেন লেখক অনবদ্যভাবে :

"কালো সর্পিনীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতোর মতো সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধ নিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিয়াছে; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা।"

কিন্তু রূপে মাতালই করে না, ক্ষতবিক্ষতও করে। এই রূপের আড়ালেই কোথাও লুকিয়ে আছে ক্ষুরধার তীব্রতা। একটা হিংস্র, তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস। মোহমত্ত পুরুষকে যা ভুলিয়ে আনে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে এমনকি মৃত্যুর নিশ্ছিদ্র গহ্বরে। এই দামাল যৌবনের অধিকারিণী যে রাধিকা সারাজীবন ধরে তাকে চালিত করেছে একটিমাত্র প্রবৃত্তি। তার নাম কাম। কামই রাধিকার একমাত্র চাওয়া। সে ভালোবাসা কখনও শরীর থেকে মনের পথ খুঁজে পায় নি। শরীরের মন ভালো রাখবার জন্য সে বাররার বদলেছে তার পুরুষ সঙ্গী। প্রথমে তার বিয়ে হয়েছিল শিবপদ বেদের সঙ্গে। রাধিকার স্মৃতিচারণেই আমরা তার একটা চেহারা পাই :

"শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াধর দৃষ্টি।"

সে ছিল রাধিকার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। অর্থাৎ যুবক। কিন্তু বেদেনীর কাছে সে ছিল নিতান্তই খেলার পুতুল, গ্রামের সকলের কাছে তার সম্মান ছিল। নিজের চেষ্টায় সে কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল। অথচ রাধিকার কাছে সে ছিল ক্রীতদাসের মত। সে রাধিকাকে সুখে রেখেছিল। কিন্তু আরামে রাখতে পারেনি। রাধিকার দুর্বার কামতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা ছিল না। এমন মানুষের সঙ্গে রাধিকা কাটাবে কি করে?

এমন সময় তার জীবনে এল শম্ভু। সঙ্গে একটা বাঘ, একটা তাঁবু, আর একজন বিগতযৌবনা বেদেনী, রাধিকার অতৃপ্ত মন এই প্রথম দুলে উঠল। এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ প্রৌঢ় মানুষটি তাকে জিতে নিল। এক মুহূর্তে সে সব কিছু ভুলে গেল। ঘর ছাড়ল, স্বামী ছাড়ল। এমনকি শিবপদর কাতর মিনতিকে তার মনে হল কাপুরুষতা। ঘৃণায়, রাগে, তার মন ঘিন ঘিন করে উঠল। সে নির্দ্বিধায় গায়ে মেখে নিল সকলের অপবাদ।

শিবপদকে সে ভালোবাসে নি। কিন্তু বয়সের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও শম্ভুকে ভালোবাসত, সে তার উদ্ধত পৌরুষের জন্য। এই উগ্র, দুর্বার, পুরুষ সৌন্দর্যের প্রতিই রাধিকার চিরকালীন দুর্বলতা। যা পুড়িয়ে মারলেও তার নারীমন তৃপ্ত হয়। যার প্রবল পাশবিক নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে গেলেও তার যৌবন সুখ পায়। কিন্তু শারীরিক কামনা চোরাবালির মত। তা মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষকে অতলে টেনে নিয়ে যায়। পাঁচ বছর ধরে শম্ভু বাজিকরের সঙ্গে থেকেও কোথায় রাধিকার মনের খাঁজে তৈরী হয়ে গিয়েছিল আরও একরকম অসুখ। যার

সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না নিজেও। পরিচিত হল তার জীবনের তৃতীয় পুরুষটির সাক্ষাতে। কেষ্টো বেদে। তার প্রবল পৌরুষ রাধিকার শরীর ও মনকে একসঙ্গে অবশ করে দিয়েছে :

"একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা দেহ—'তেজী ঘোড়ার' যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হালকা সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে।"

কেষ্টোর সঙ্গে প্রথম দেখাতেই বেদেনীর অন্তরে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ আগুন একদিকে কামনার। অন্যদিকে ঈর্ষার। কি এক অদৃশ্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায়—এর পর থেকে রাধিকার আচরণ বড়ই দুমুখী। একদিকে কেষ্টোর প্রতি তার প্রবল ঈর্ষা, রাগ আর ঘৃণা—প্রতিযোগী বাজিকর হিসাবে। এর ফলে সে কেষ্টোকে আঘাত করতেও পিছপা হয় না। কিন্তু যতই লাগাম টানতে চায় সে, অবাধ্য ঘোড়া বশ মানে না কিছুতেই। রাধিকা হেরে যায় বার বার। তার এই পরাজিত নারীসত্তাতেই জন্ম নেয় এক প্রবল পিপাসা। যৌবনকে ভোগ করবার। নিজের অবস্থার প্রতি এই প্রথম দয়া জন্মায়, তার লেখক চমৎকার বৈপরীত্য সন্নিহিত করেছেন এখানে দুটি বাঘের অনুষঙ্গে :

"রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিয়াছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ......সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকমকে চিকন লোম, মুখে হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটার স্থবির শিথিল দেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে।"

—এ ঘৃণা বাঘটার প্রতি যতটা, শম্ভুর প্রতি তার চেয়েও বেশি। তরুণ, সবল বাঘটির দৃপ্ত পৌরুষ আসলে কেষ্টোরই পরিপূরক। তার শরীরের দহন এই মানুষটাই নেভাতে পারে, এই গোপন দুর্বলতার কারণে সে কেষ্টোকে বাঁচায় পুলিশের হাত থেকে। আর শম্ভুর হাতে মারও খায় বিনা প্রতিবাদে।

বিচিত্র মানুষের মন। বিশেষত আধুনিক মানুষের মনের অন্দরমহল। প্রতিটি অনুভূতি সেখানে এমনভাবে মিশে থাকে যে বোঝা যায় না তাদের সূক্ষ্মতম পার্থক্য। রাধিকার জীবনে ঈর্ষা আর প্রেম—একই অনুভূতির ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কেষ্টোর সার্কাস বা 'বিড়ালীর মত গাল মোটা স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা'-কে তার যে ভালো মনে হয়—এর কারণ এই ঈর্ষাই—"আজ সে বেণী বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞার ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।" জনতা যখন স্রোতের মত কেষ্টোর তাঁবুতে ঢুকেছে প্রবল ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে রাধিকার মনে। সে আর শম্ভু মিলে পরিকল্পনা করেছে—রাতে আগুন লাগিয়ে দেবে কেষ্টোর তাঁবুতে।

রাধিকার সংকল্প দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গভীর রাতে সে জেগে ওঠে নিশাচরী বাঘিনীর মত। দুচোখে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা। থমথমে অন্ধকারে সে সঙ্গী করতে চায় শম্ভুকে। কিন্তু—'শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে!" এই বিতৃষ্ণাকে বুকে নিয়েই সে ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মত উপস্থিত হয়েছে

কেষ্টোর তাঁবুর বাইরে। সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ঢুকেছে তাঁবুতে। তারপর দেখেছে নিদ্রারত কেষ্টোকে। ঘুমন্ত তরুণের দামাল পৌরুষে একমুহূর্তে ওলোটপালোট করে দিয়েছে বেদেনীর সমস্ত কষা ছক। বুকের মধ্যে কোথা থেকে জমা হয়েছে একরাশ অসুখ—কামনার অসুখ—অতৃপ্তির যন্ত্রণা। এবং তার উদ্দীপন বিভাব শম্ভুর বিপরীতে ঘুমিয়ে থাকা কেষ্টোর ছবি—

"কেষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস। উঃ বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলো কি নিটোল, তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কেষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষত চিহ্নটা-ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন।"

আহত বাঘের মত কেষ্টোর এই দুর্দান্ত শরীরী আবেদনে অবশ হয়ে গেছে রাধিকার শরীর ও মন। সে ভুলেছে সংকল্প। ভুলেছে প্রতিহিংসা, লেখকের ভাষাতেই—

"রাধিকার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া বলিষ্ঠ বাহুর ঘেরাটোপে। আবার এক নিরুদ্দেশের পথে তার অভিযান, সঙ্গী কেষ্টো। তার বর্তমান প্রেমিক। তার বর্তমান নাগর। শম্ভু এখন অতীত। অকেজো অতীত। তাই তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে এগিয়ে চলে বেদেনী।

মানুষ আসলে এক অভিজাত পশু। তাই জগতের দুটি মৌলিক চাহিদা তাকে একই রকম ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটা পেটের প্রয়োজনে নারীকে টেনে নিয়ে যেত গুহায়। সভ্যতার সিঁড়ি চড়ে আজ সে পরিশীলিত মোড়কে নিজেকে মুড়েছে। কিন্তু তার মনের অন্ধকারে আজও বেঁচে আছে সেই পশু। প্রবৃত্তির সেই যন্ত্রণা মেটাতে সে নিজেকে উলঙ্গ ক'রে দেয় প্রতি মুহূর্তেই। সেখানে কোনো সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে না। উঠতে পারেও না। তাই তারাশঙ্করের এই গল্পের বেদেনী স্বৈরিণী কিনা এ বিতর্কে আমাদের জড়াতে ইচ্ছে করে না। কেষ্টোর সঙ্গে ও যে ঘর বাঁধতে পারবে না এরকম একটা ইঙ্গিত গল্পের শেষে থেকে যায়। কারণ প্রবৃত্তি কোনো বন্ধন চায় না। চায় শুধু নিবৃত্তি। মানুষের মনের কোনো একটা অন্ধকার কোণে যে আর একটা অসুখী মানুষ বাস করে তারাশঙ্কর তাকেই তুলে এনেছেন পাঠকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্বপ্নে যে মানুষ ধরা পড়েছে সে রসিক মানুষ। শরৎচন্দ্রের কল্পনার মূলে আছে প্রেমিক মানুষ। কিন্তু তারাশঙ্করের মানুষেরা প্রখর ভাবে জৈবিক। প্রবল ভাবে অর্থনৈতিক। আর এদের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক সামাজিক মানুষ। নৈতিকতার শক্ত দেওয়াল তাদের চারিদিকে নেই। আদর্শমানবতার বিগ্রহ সেখানে পুজো পায় না। তারা শুধু এক আদিম শক্তির বশীভূত মাত্র। এই সৃষ্টির মূলীভূত সে শক্তি। 'বেদেনী' গল্পটি সেই শক্তিরই প্রকাশ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম বিহারের পূর্ণিয়ায়। আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার বরাহনগর। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প উপন্যাস নাটক শিশুসাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে তাঁর স্মরণীয় এবং অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি। কল্লোলের সমকালীন হয়েও তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক। আবার সমকালীন প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে বোম্বাই (মুম্বাই) যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি তিনি লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হল,—'গৌড়মল্লার', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'কালের মন্দিরা', প্রভৃতি।

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত গোয়েন্দা সাহিত্য খুব সবল ছিল না। কিন্তু তিনি গোয়েন্দা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, বিদেশী প্রভাবিত বাঙালি গোয়েন্দাকে তিনিই প্রথম বাঙালি করে চিত্রিত করেছেন। ব্যোমকেশ-ই প্রথম আধুনিক এবং সার্থক বাঙালি গোয়েন্দা। শরদিন্দু অনেকগুলি গোয়েন্দা গল্প উপন্যাস লিখেছেন, তা হল—'বরদা', 'সজারুর কাঁটা', 'চিড়িয়াখানা', 'বিষের ধোঁয়া', 'জাতিস্মর', 'দুর্গরহস্য' প্রভৃতি। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যেকে তিনি সর্বাংশে আধুনিক করে তুলেছেন। আর সেজন্যই তিনি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ঝি : হাস্যরসের অনন্য আখ্যান

অনিলকুমার রায়

মানুষের জীবন নিয়তই গড়ে উঠছে অসংখ্য অন্য জীবনের সংস্পর্শে। মনের গতি-প্রকৃতিও নির্ণীত হচ্ছে তার পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে। বিশেষ কোন চাহিদার পূরণ না হলে সে মানুষ কখনো রুদ্র প্রকৃতির হয়ে ওঠে। আবার চাহিদা পূরণ হলে সে হয়ে ওঠে হৃদয়বান আত্মভোলা এক মানুষ। আমাদের জাগতিক সংসারে এ রকম মানুষ প্রায়ই চোখে পড়ে। ঠিক ক্রূর প্রকৃতির মানুষ বলতে যা বোঝায়। আপাত মিষ্টভাষিতার আড়ালে শয়তানকে যেন মানুষ পুষে রাখে সেরকম এ মানুষ নয়। এ মানুষ কর্কশ ব্যবহারে আপাতভাবে বিরক্তি উৎপাদন করলেও তার অন্তর্জগতে বয়ে চলে ভালোবাসার ফল্গুধারা। বিশেষ কোন অভাব পূরণ হলেই সে সন্তুষ্ট। মানুষের প্রতিও সদয় ব্যবহারে, রসালাপে সে মানুষ বড় গ্রহণযোগ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝি' গল্পটিতে আমাদের সমাজজীবনের এইরকম একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গল্পকার এমন একটি বিষয় এ গল্পে তুলে ধরেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রচনাকৌশলে যা স্বাভাবিকভাবে হাসির খোরাক জোগায়। গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয় পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তা আচরণে অসংগতি দেখা দিলে কোন মুদ্রাদোষ থাকলে বা অঙ্গ বিকৃতির কারণে। অবশ্য হাস্যরসের বিভিন্ন ভাগ আছে। সংক্ষেপে তা তুলে আলোচ্য 'ঝি' গল্প কোন্ শ্রেণীতে পড়বে তা দেখা যেতে পারে।

হাস্যরসের প্রধান যে তিনটি শ্রেণী আছে তার মধ্যে, প্রথমটি হল বিশুদ্ধ হাস্যরস বা হিউমার। একে Fun বা কৌতুকও বলা যায়। পাত্র-পাত্রীর কার্য ও আচরণের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখানো হয় এই প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসে। আমাদের অভ্যস্ত জীবনে যখন অসংগতি দেখা যায় এবং চিত্তের উত্তেজনা জনিত এক ধরনের সুখ অনুভূত হয় তখনই কৌতুক বা বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধে এই বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ''আমাদের অন্তরের বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য, সমস্তই চিরাভ্যস্ত চিরপ্রত্যাশিত। এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমি মধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষ রূপে অনুভব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। (পঞ্চভূত)'' আচরণে অসংগতি জনিত এই হাস্যরস সৃষ্টি হলেও এর পিছনে লেখকের প্রবল সহানুভূতি থাকে। তাছাড়া, বৈদগ্ধ্য ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপজাতীয় হাস্যরসও হাস্যরসের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝি' গল্পটির বিষয় খুবই সামান্য। নায়ক শৈলেন পিতৃবন্ধু গণপতি সরকারের হাত ধরে একটি মার্চেন্ট অফিসে সহজেই চাকরি পেয়ে গেল। চাকরির প্রথম দিনেই তাকে গণপতিবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মার্চেন্ট অফিসের বড়সাহেব মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষের সঙ্গে। মিঃ ঘোষের সঙ্গে শৈলেনের প্রথম দিনের আলাপ বড় সন্তোষজনক।

বড় সাহেব যে প্রাণখোলা হয়ে একজন সামান্য কেরানির সঙ্গে মিশতে পারেন, সহজ হতে পারেন তা শৈলেনকে অভিভূত করেছে। শৈলেন তাঁর মধ্যে, 'নিরহংকারী অমায়িক প্রকৃতির মানুষ' আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এই বড়সাহেবই আবার তাঁর বাড়ীতে মাতৃহীন শিশুপুত্রকে লালন পালন করার জন্য ঝি বা আয়া না পেলে ভয়ানক হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর সামনে দাঁড়ানো যায় না। যাঁকে সামনে পান তাকেই ধমক দিয়ে ওঠেন। অফিসে কর্মরত শৈলেনের ভাগ্যেও তাই ঘটল। বড়সাহেবের কাছে রীতিমতন ধমকানি খেয়ে শৈলেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অফিসে কাজ করে ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে। কখন আবার বড় সাহেবের কোপদৃষ্টি পড়ে সেই আশঙ্কায় সে সন্ত্রস্ত। এই বড় সাহেবই আবার ঝি সমস্যা মিটে গেলে শৈলেনের সঙ্গে মিষ্টি মধুর ব্যবহার করেছেন। মিষ্টি মধুর আলাপেই গল্পটি শেষ হয়েছে।

শিশুপুত্রকে দেখভাল করার জন্য ঝি বা আয়ার থাকা না থাকার মধ্যে দিয়ে বড় সাহেব মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষের আচরণ জনিত অসংগতি লেখক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে তা বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করে সহজেই।

গণপতি বাবু নায়ক শৈলেনকে তার চাকরির প্রথম দিনেই বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে এলেন। গণপতি নিজের কাজে চলে গেলে বড় সাহেব মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষ শৈলেনকে বলেছেন, "......তারপর বিয়ে থা করেছ নাকি.......বেশ বেশ; আরে তোমাদেরই তো বয়স। এখন চাকরি হল আর কি। মন ঘামিয়ে কাজ করবে, বাস্ দেখতে দেখতে উন্নতি। আমার অফিসে কাজের লোক পড়ে থাকে না। নাও, পান খাও......।" একজন কেরানীর উদ্দেশ্যে বড়সাহেবের এরকম প্রথম আলাপেই আমাদের অভ্যস্ত মন হঠাৎ যেন বাধা পেয়ে হাস্যরসে ফেটে পড়ে। বড়সাহেব এবং তাঁর অফিসের কর্মচারীর যে ব্যবধান থাকে তা এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রথম পরিচয় যে ভাবে হওয়া স্বাভাবিক তা এখানে আচরণের অসংগতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসও সৃষ্টি হয়েছে।

আবার মাস তিনেক পরে নায়ক একদিন দুপুরে বড় সাহেবের ঘরে দেখা করতে গেল। বড় সাহেব মনমরা অবস্থায় চোখ লাল করে শৈলেনকে রীতিমত ধমক দিয়েছে : "কি চাও? এ ঘরে তোমার কি দরকার?" শৈলেন থতমত খেয়ে গেলে বড় সাহেব আরও গর্জন করে বলে উঠেছেন, "পান চিবতে চিবতে পাঞ্জাবি উড়িয়ে অফিস করতে এসেছ ছোকরা? এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি পেয়েছ বটে। গায়ে ফুঁ দিয়ে এয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিই? যাও—টুলে বসে কাজ করগে। তোমার মত পুঁচকে কেরানী খবর না দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে কোন্ সাহসে? ফের যদি এ-রকম বেচাল দেখি, দূর করে দেব—" এখানেও নায়কের উপর বড়সাহেবের অকারণ ধমকানি অসংগতিজনিত আচরণের উল্লেখ্য উদাহরণ। এমন অস্বাভাবিক আচরণে হাসি সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে।

সবশেষে, শৈলেন যখন ফাঁসির আসামীর মত কর্তার ঘরে গেছে তখনও কর্তা অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে উঠেছেন, "এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভাল জর্দা আনিয়েছি দেখ দেখি খেয়ে—মুক্তোভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড় গরম জিনিস-হে-হে-হে-" কর্তার এই প্রফুল্ল মনে কথা বলে যাওয়ায় হাস্যরস কম উপভোগ্য হয় নি। আর গণপতি বাবু যখন ধমক খাওয়া শৈলেনকে পুরো রহস্যটা না বলে শুধু বলেছেন 'ঝি' তখনও কৌতুক বোধ হয় বইকি।

এছাড়া গল্পে গণপতি সরকারের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'চেহারাটি ছিল পাকানো উড়ানি চাদরের মতই ধোপদুরস্ত', গণপতি বাবুর মুদ্রাদোষের মধ্যে ছিল তাঁর মুখের বামদিকের একরকম ভঙ্গী—'তাঁহার অধরোষ্ঠের প্রান্ত হইতে চোখের কোন পর্যন্ত গালের উপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাঁজ পড়িয়া যাইত।' এই রকম দৈহিক বর্ণনাতেও হাস্যকৌতুক বেশ অনুভূত হয়। বড় সাহেব মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষের দৈহিক বর্ণনাটিও কম হাস্যকর নয়—"সায়েব মোটেই নয়—ঘোরতর কালা আদমি। চণ্ডীর মহিষাসুরকে জলজ্যান্ত নরমূর্তিতে কল্পনা করিলে ইঁহার চেহারাখানা অনেকটা আন্দাজ করা যায়; ঠোঁট মোটা, গজস্কন্ধ, চক্ষু দুটি কুঁচের মত লাল, তাহার উপর বিলাতী পোশাক পরিয়া অপূর্ব খোলতাই হইয়াছে।.......প্রকান্ড টেবিলের সামনে বসিয়া একমুখ পান চিবাইতেছেন এবং দেশলায়ের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছেন।" এ বর্ণনায় এক কিম্ভূতকিমাকার মানুষকে কল্পনার চোখে দেখে নিয়ে রীতি-মতন হাস্যকর অবস্থায় পৌঁছতে হয়। গল্পকার ঘনশ্যাম বাবুর অসংগতি ফুটেয়ে যেমন তুলেছেন তেমনি চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতিও দেখিয়েছেন। বিশুদ্ধ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত হিসাবে। 'ঝি' গল্পটি অবশ্যই স্মরণীয়।

দুই

'ঝি' গল্পটি ছোট্ট আয়তনে একমুখীন লক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যঞ্জনা প্রধান হয়ে উঠেছে। গল্পকার কাহিনী বিন্যাস এতই দক্ষতার সঙ্গে করেছেন যে ঝি চরিত্রটিই প্লটের সামগ্রিক রসাবেদন সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

গল্পকার তিনটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। এই তিন পরিস্থিতিতেই ঝি সশরীরে অবস্থান না করেও কাহিনীকে টানটান করে ধরে রেখেছে। প্রথমেই দেখি শৈলেন তার পিতৃবন্ধু গণপতি বাবুর চেষ্টায় কেরাণির চাকরী করতে একটি মার্চেন্ট অফিসে যোগ দিতে এসেছে। গণপতি বাবু মার্চেন্ট অফিসের বড় সাহেব মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে মিঃ ঘোষ একেবারে প্রাণখোলা হয়ে শৈলেনের সঙ্গে আলাপ করেছে। সে আলাপ একেবারেই বন্ধুত্বের আলাপ"...তারপর বিয়ে থা করেছ নাকি.....বেশ বেশ; আরে তোমাদেরই তো বয়স। এখন চাকরি হল আর কি। মন ঘামিয়ে কাজ করবে, বাস্, দেখতে দেখতে উন্নতি।......" মার্চেন্ট অফিসের বড় সাহেব নিজের অবস্থান ভুলে গিয়ে কী সহজভাবেই না মিশে গেছে সামান্য কেরাণি শৈলেনের সঙ্গে। তাঁর এই আত্মাভিমানশূন্য খুশ মেজাজী স্বভাবটি নায়কের কাছে ধরা পড়েছে নেপথ্যে থাকা ঝি-র জন্যই।

নায়কের কর্মজীবন যে সুখস্বপ্নেব মত কাটছিল এবং ঘনশ্যামবাবুর মধ্যে 'নিরহংকার অমায়িক প্রকৃতির মানুষ' দেখে নায়কের যে আত্মতৃপ্তি লাভ তা-ও সম্ভব হয়েছে ঝি-র ভূমিকায়।

আবার, কিছুদিন যেতেই নায়ক সম্পর্কে ঘনশ্যামবাবুর যে তিক্ততা সৃষ্টি হল তারও মূলে রয়েছে ঝি-র ভূমিকা। মাতৃহীন শিশুপুত্রকে লালন পালন করার জন্য পিতা ঘনশ্যাম যে ঝি বা আয়াকে রেখেছিলেন সে বিবাহ করার অজুহাতে চলে গেল। আর কোন ঝি-ও কিছুদিন ধরে মিলল না। তা থেকেই বিপত্তি ঘটল। মনমরা হয়ে ঘনশ্যামবাবু অফিসে যান। কারুর সঙ্গে তেমন কথাও বলেন না। বিশেষ একটি দিনে দুপুরবেলা অবকাশ সময়ে শৈলেন দেখা

করতে যাওয়া মাত্রই মিঃ ঘোষ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠেছেন, "........গায়ে ফুঁ দিয়ে এয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্য আমি তোমাকে মাইনে দিই? যাও টুলে বসে কাজ করগে। তোমার মত পুঁচকে কেরাণি খবর না দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে কোন্ সাহসে?" এতখানি রূঢ় ব্যবহার ঘনশ্যাম যে করলেন তাও বাড়িতে ঝি না থাকার জন্য। এই ঘটনায় শৈলেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। গণপতি বাবুর কাছে ঘনশ্যামবাবুর ঝি নির্ভর জীবনের রহস্য জানতে পেরে রীতিমতন সতর্ক হয়ে গেছে। শৈলেন এখন ভয়ে ভয়ে থাকে। বড় সাহেবের কোপদৃষ্টি এই বুঝি তার উপর পড়ল—এই ভয়ে শৈলেন সংকুচিত হয়ে থাকে।

গল্পের একেবারে শেষে দেখি, বড় সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রফুল্লচিত্তে আবার শৈলেনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মিঃ ঘোষ তখন যেন সদাশিব। আবার তিনি প্রাণখোলা হাসিতে ভরে উঠেছেন। শৈলেনকে হার্দিক উষ্ণতায় কাছে টেনে নিয়েছেন। লক্ষ্ণৌ থেকে আনা জর্দা তাকে খেতে দিয়েছেন। দেড় ঘন্টা ধরে চলেছে শৈলেনের সঙ্গে মধুর আলাপ। এখানেও নেপথ্যে সেই ঝি র অবস্থান। বাড়িতে শিশুপুত্রকে দেখার জন্য নতুন ক'রে ঝি পাওয়া গেল বলেই ঘনশ্যামবাবুর এমন রসালাপ।

বস্তুত, মার্চেন্ট অফিসের বড়সাহেব ঘনশ্যামবাবু ও সামান্য কেরাণি শৈলেনের কখনো মধুর কখনো তিক্ততার সম্পর্ক ঝি-র জন্য গড়ে উঠেছে। শিশুপুত্রকে দেখার জন্য মনের মত ঝি হলে ঘনশ্যাম বড়ই সাদাসিধা প্রাণখোলা মানুষ আর ঝি-র অবর্তমানে ঘনশ্যাম হয়ে উঠেছেন ভয়ংকর। তাঁর কোপদৃষ্টি পড়েছে অফিসে কর্মরত কেরাণীদের উপর। তার উপরেও পড়তে পারে বলে শৈলেন আতঙ্কিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ঝি থাকা না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে নায়কের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে বাড়িতে ঝি ছিল বলেই মিঃ ঘোষ হয়ে উঠেছেন সরল প্রকৃতির আত্মভোলা মানুষ। তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে নায়ক ভেবেছে; 'তারপর সুখস্বপ্নের মত দিনগুলি কাটিতে লাগিল। চাকরি যে এত মধুর তাহা কোন দিন কল্পনা করি নাই।" আবার, ঝি ছিল না বলেই দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে নায়ক ভর্ৎসিত হয়েছে ঘনশ্যাম বাবুর কাছে। নায়ক তখন ভয়ে সিঁটিয়ে থেকেছে। শঙ্কিত হয়েছে এই ভেবে—'অফিসে যতক্ষণ থাকি, কাঁটা হইয়া থাকি; কি জানি কখন আবার মাথার উপর হুড়মুড় শব্দে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" একেবারে শেষে দেখি, ঝি পুনরায় মিলল বলেই মিঃ ঘোষ সেই আগের সদাশিব প্রকৃতি নিয়ে ধরা দিলেন। নায়কও ভেবেছে, 'যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়।'

ঝি থাকা না থাকার মধ্যে দিয়ে ঘনশ্যামের দুটি প্রকৃতি ধরা দিয়েছে। একদিকে তিনি নিরহংকারী অমায়িক মানুষ অন্যদিকে, হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ভয়ংকর আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। এই সঙ্গে নায়ক .শৈলেনেরও একটি খেয়ালী জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছে। ঝি থাকার জন্য কর্মচারীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, শৈলেন মনের সুখে কাজ করেছে। আবার ঝি না থাকার জন্য কর্মী ছাঁটাই হয়েছে, শৈলেনের উপর রূঢ় বাক্য বর্ষিত হয়েছে। সমগ্র গল্পটির রসপরিণতি ঘটেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র অনামা ঝি র জন্যই। গল্পটির নামকরণ তাই সার্থক।

তিন

'ঝি' গল্পে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান তিনটি চরিত্রকেই স্বল্পায়তনে অত্যন্ত সজীব করে এঁকেছেন। নায়ক শৈলেনের পিতৃবন্ধু গণপতি সরকার তাঁর আচার-আচরণে সংযত, মিতবাক, রসিক পরায়ণ। তিনি শৈলেনকে মার্চেন্ট অফিসে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন বড় সাহেবের সঙ্গে যেন দূরত্ব রক্ষা করে চলে। সাহেব যতই খাতির করুক, কেরাণি হয়ে শৈলেনের প্রয়োজন ভিন্ন বড় সাহেবের কাছে না যাওয়াই ভালো। গণপতি বাবুর এই সতর্কীকরণ তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণকেই চিহ্নিত করে। এমনকি শৈলেন বড় সাহেবের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি বেশিকথা না বলে 'ঝি' শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করে আর, ভাবে ভঙ্গীতে, গালের ভঙ্গীতে যে ভাবে বড় সাহেবের রেগে যাওয়ার রহস্য তুলে ধরেছে তাতে তাঁর রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষের চরিত্রটিকে গল্পকার বড় সুন্দর করে এঁকেছেন। একটি মার্চেন্ট অফিসের মালিক হয়েও তাঁর ভিতরে বাস করা সদাশিব, নিরহংকারী অমায়িক প্রকৃতির মানুষটিকে চিনিয়ে দিতে লেখক কার্পণ্য করেন নি। ঝি বা আয়া পুত্রকে দেখভাল করার জন্য থেকে গেলে মিঃ ঘোষ একেবারে মাটির মানুষ হয়ত শ্বশুরের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা বিপত্নীক মিঃ ঘোষকে আরও বেশি ঝি নির্ভর করে তুলেছে। তাহলেও তাঁর স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে দ্বৈধরূপ। একরূপে তিনি প্রাণখোলা খুশমেজাজী মানুষ। তখন কত অনায়াসেই তিনি শৈলেনকে প্রাণের উষ্ণতায় ভরিয়ে তোলেন। প্রথম আলাপেই বন্ধুসুলভ আচরণ, পান খেতে দেওয়া প্রভৃতি যেন ঘনশ্যামের আত্মভোলা প্রকৃতির ইঙ্গিত করে। কিন্তু ঘনশ্যামের আরেক রূপ বড় ভয়ংকর। পুত্রের পরিচর্যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঝি চলে গেলে এবং নতুন ঝি না পাওয়া পর্যন্ত ঘনশ্যামবাবু যেন কঠোর রুক্ষ হয়ে উঠেন। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেও তিঁনি কসুর করেন না। শৈলেনকে 'পুঁচকে কেরাণি' বলে কড়া কথা শুনিয়ে দেন। আবার ঝি নতুন করে মিলে গেলে তিনি 'সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে' অন্যের অন্তর সিক্ত করে তোলেন। গল্পের শেষে শৈলেন ভেবেছে—"কোথায় সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র দৃষ্টি, কোথায় সে কর্কশ দুঃসহ গলার আওয়াজ। তিনি আবার আমাকে তাঁহাব সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি মন্দ লোক একথা আর কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।" ঘনশ্যামের এই দ্বৈত সত্তার পরিচয় দিয়ে লেখক গল্পরস জমিয়ে তুলেছেন।

এ গল্পের নায়ক মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী শৈলেন। তার চরিত্রটিও কম উপভোগ্য নয়। বংশে সাত পুরুষে কেউ চাকরি করে নি। সেই বংশ থেকে প্রথম চাকরি করতে এসেছে শৈলেন। লাজুক বিনম্র শৈলেন বড় সাহেবের কাছে হার্দিক অভ্যর্থনা পেলে তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। ঘনশ্যামবাবুকে সাদাসিধা আত্মভোলা মানুষ বলে মনে হয়েছিল তার। আবার, ঘনশ্যামবাবুর অকারণ ধমকানিতেও সে বড় অভিমানী। সহজ, সরল ঘনশ্যামবাবুই সে কী ভয়ংকর হতে পারে, ক্ষুধার্ত বাঘের মত হিংস্র হতে পারে, তা বুঝতে দেরী হয়নি শৈলেনের। ঘনশ্যামবাবুর চোখ রাঙানিতে, কড়া কথায় সে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে ঘনশ্যামবাবুর কাছে সদয় ব্যবহারে কৃতজ্ঞতা বোধ, আনুগত্যপরায়ণতা তার চরিত্রে

যেমন দেখা গেছে তেমনি বড়সাহেবের নির্দয়তার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকাও তার চরিত্রে আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করা গেছে। সবশেষে, শৈলেনই ঘনশ্যামবাবুর মধ্যে রুদ্রপ্রকৃতি ও নম্রস্বভাব দুইয়ের আশ্চর্য সহাবস্থান লক্ষ্য করেছে। তার কৌতূহল গল্পটিকে নাট্যগুণান্বিত করেছে।

চার

'ঝি' গল্পটি শিল্পসার্থকতা পেয়েছে এর গঠনগত উৎকর্ষের জন্য। বিশেষ একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণই এ গল্পের মূল ভাবকেন্দ্র। গল্পকার এই মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে ফুটিয়ে তুলতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কাহিনী বিন্যাস করেছেন। নায়কের জবানীতেই গল্পটি শুরু হয়েছে নায়ক জানিয়েছে তার বংশে সাতপুরুষে কেউ চাকরি করেনি। সে গণপতি সরকারের বদান্যতায় চাকরি পেয়েই ভেবেছে 'না জানি কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা আছে।' তার এই স্বগতোক্তির ইঙ্গিত দিয়েই গল্পকার অতিপ্রয়োজনীয় কথাগুলি নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। চাকরির প্রথম দিনেই শৈলেন গণপতি সরকারের সঙ্গে বড় সাহেব মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষের কাছে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ঘনশ্যামবাবু প্রার্থীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে প্রত্যাশিত ভূমিকা-না করেই বলে উঠেছেন, "........তারপর বিয়ে থা করেছ নাকি........বেশ বেশ, আর তোমাদেরই তো বয়স। এখন চাকরি হল, আর কি! মন ঘামিয়ে কাজ করবে, বাস্, দেখতে দেখতে উন্নতি।........." ঘনশ্যাম বাবুর এই স্বভাব ঔদার্যে মুগ্ধ হয়েছে শৈলেন। সে ভেবেছে বড় সাহেবের মত লোক বিরল। এমন সহজ, সরল মানুষের সান্নিধ্যে এসে শৈলেন ধন্য হয়েছে।

এইভাবে শৈলেনের মধ্যে, বড় বাবু সম্পর্কে উচ্চধারণা তৈরী করে দিয়ে, বড় মনের মানুষ হিসেবে তার মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে গল্পকার কাহিনীটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। গণপতিবাবু সতর্ক করে দিয়েছিলেন বড় সাহেবের কাছ থেকে দূরে থাকতে। শৈলেন সে কথায় গুরুত্বও দেয়নি। চাকরি পাওয়ার আনন্দ আর বড়সাহেবের সদয় আচরণ তাকে বেশ খুশমেজাজী ক'রে তুলল। অবকাশ পেলেই সে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসে।

কিন্তু তিনমাস কাটতেই শৈলেনের জীবনে নেমে এল দুঃসময়। অন্যদিনের মত স্বেচ্ছায় বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে চূড়ান্ত অপমানিত হল। বড় সাহেব চোখ লাল করে বিরক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন। শৈলেনকে 'পুঁচকে ছোঁড়া' বলে কটু কথা শুনিয়েছেন। আর বড় সাহেবের ঘরে যখন তখন না আসতে নিষেধ করেছেন। এ ঘটনায় শৈলেন অপমানিত, লাঞ্ছিত, তার মনের মধ্যে চলেছে অস্থিরতা। বড় সাহেব কেন তাকে অকারণ বকলেন তার কারণ জানতে সে বড়বাবু গণপতির কাছে গেছে। 'ঝি' না থাকাই যে এর কারণ তা গণপতি ইঙ্গিতে ও পরে স্পষ্ট করে জানালেও শৈলেনের মনে রীতিমতন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। নিজে কোন অপরাধ করেছে কিনা তা অনুসন্ধান করেও কোন উত্তর খুঁজে পেল না। নায়ককে এইভাবে সংকটের মধ্যে ফেলে গল্পকার গল্পের সংকট (Crisis) মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। নায়ক একেবারে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। অফিসে কাজ করতে আসে ভয়ে ভয়ে। বড় সাহেবের যে মূর্তি শৈলেন দেখেছে তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এইরকম সংকট অবস্থায় শৈলেনের আবার ডাক পড়ল বড় সাহেবের ঘরে। তখন বড়সাহেব আর সেই রুদ্র প্রকৃতির নয়। একেবারে সদয় হৃদয়বান মানুষ। বড় সাহেব বলে উঠলেন, 'এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভাল জর্দা আনিয়েছি—দেখ দেখি খেয়ে—মুক্তো ভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড়

গরম জিনিস—হে হে হে—" শৈলেন যেন প্রাণ ফিরে পেল। গল্পের শেষে এই মহামুহূর্ত (Climax) সৃষ্টি করে গল্পকার আসল রহস্যের উন্মোচন করেই গল্প শেষে করেছেন;

গল্পটি ছোট্ট আয়তনে একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারকেই কয়েকটি মাত্র মুহূর্তে বিশ্বাস যোগ্য করে তুলেছেন। 'ঝি' যবনিকার আড়ালে থেকে কীভাবে বড়সাহেবকে প্রভাবিত করেছে তাঁর মেজাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং নায়কের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা গল্পকার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে ব্যঞ্জনাময় পরিণতি দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক গল্পে যে 'Unity of impression' বা প্রতীতিজাত সমগ্রতার কথা বলা হয় তাও এই গল্পে সার্থকভাবে লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র শিশুপুত্র প্রসব করতে গিয়ে মা মারা যাওয়ায় ঘনশ্যাম বাবুকে বাধ্য হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে লালন পালন করতে ঝি রাখতে হয়। অন্য কারণও রয়েছে। তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করলে শ্বশুরমশাইয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর হয়ে যাবে এবং দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়কে শ্বশুরমশাই সেবায়েত নিযুক্ত করবেন। সম্পত্তি যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় তার জন্য তিনি আরও বেশি ঝি নির্ভর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পুত্রকেও দেখবে এবং ঘরের প্রয়োজনও মিটবে। তাই ঝি থাকা অবস্থায় ঘনশ্যাম বাবু একেবারে দিলদরিয়া মানুষ। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে কত প্রাণখোলা মেলা মেশা, আর ঝি যখন বিবাহ করতে বাড়ি চলে যায় তখন পুনরায় নতুন ঝি পাওয়া পর্যন্ত তাঁর বদমেজাজ। সকলের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার। দুজনের চাকরিও চলে গেছে নায়ক শৈলেনও এই বদমেজাজের শিকার। কিছুদিন পরে আবার ঝি পাওয়া গেলে ঘনশ্যামবাবু অহংকারের আবরণ খসিয়ে একেবারে সহজ মানুষ। শৈলেনকে নিয়ে তিনি দীর্ঘসময় গল্পও করে যান।

ঝি থাকা না-থাকার মধ্যে দিয়ে মেজাজের পরিবর্তন এবং তার প্রভাব কিভাবে ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি করে ও সুন্দর সমাধান ঘটে তাকেই কেন্দ্রে রেখে গল্পকার এই গল্পে প্রতীতিজাত সমগ্রতার (Uinty of impréssion) নিয়ে এসেছেন। মিঃ ঘনশ্যাম ঘোষ ও নায়ক শৈলেন—মাত্র এই দুটি চরিত্রের পরস্পর রসালাপ, তিক্ততা আবার মধুর সম্পর্ক পরিণতি গল্পটিতে ঝি থাকা না-থাকা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সার্থক হয়েছে। ঝি কে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। একটি ভাবকেন্দ্রে থেকেই গল্পটি সংহত ও ব্যঞ্জনাপ্রধান হয়েছে।

চুয়াচন্দন : বৈচিত্র্যে ও বিশেষত্বে

সোনালী চক্রবর্তী মিশ্র

কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের রাজনৈতিক বোধ, জাতীয়তাবাদী আস্থা, বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি ঘৃণা, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, যুগক্রান্তির প্রভাব নিয়ে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর জনক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি সার্বজনীন। কিন্তু রবীন্দ্র-শরৎ পর্বের পরে শরদিন্দুতে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরুজ্জীবন। তাঁর ইতিহাস রসাশ্রিত গল্পগুলিও অসামান্য। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাল পরিধিকে বিধৃত করে আছে তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি। তিনি সাকুল্যে সতেরোটি ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করেছেন। এরমধ্যে 'শঙ্খ-কঙ্কণ', 'রেবারোধসি' 'তক্ত্ মোবারক', 'বাঘের বাচ্চা', 'রক্ত-সন্ধ্যা' ও 'চুয়াচন্দন'—এই ছয়টি গল্প ভারতবর্ষের মুসলিম কালকে ধারণ করে আছে। চুয়াচন্দন গল্পগ্রন্থের (১৩৪২) অন্তর্গত 'চুযাচন্দন' গল্পটির সময়কাল সম্ভবতঃ ১৫০২ সালের কাছাকাছি সময়।

কাহিনীটির বিষয়বস্তু মিষ্টি মধুর প্রেম। চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন বিরহ প্রেম কথাই গল্পের মূল ভাব। মাত্র ছাব্বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপৃত এ গল্পটি চৈতন্যদেবের জীবনের প্রথম পর্যায় নিযে রচিত। লেখক মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য চুযাচন্দন ছ'বার লিখেছিলেন। চৈতন্যদেবের মত একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গল্প ফাঁদা যে সহজ ব্যাপার নয় সেটা শরদিন্দুবাবুও জানতেন। তাই তাঁকেও বারবার ভাবতে হয়েছে। অধঃপতিত বামাচারী পুরুষ মাধব ধর্মের ছদ্মবেশে উচ্ছৃঙ্খল অজাচারে লিপ্ত, তারই হাতে বন্দিনী এক ষোড়শীর বন্ধন মোচনের পূর্বরাগ রঞ্জিত কাহিনী এর উপজীব্য।

চুয়া নামের এক বিপন্ন ষোডশীকে উদ্ধারের কথা এখানে শুনিয়েছেন লেখক—নবদ্বীপের সংগতিসম্পন্ন বেনে কাঞ্চন দাস-এর একমাত্র কন্যা এই চুয়া। সমুদ্রে নৌকা নিয়ে বাণিজ্য করতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি কাঞ্চনদাস। এই আঘাতে চুয়ার মাও বেশীদিন বাঁচল না। তখন থেকে মাতৃপিতৃহীন চুয়ার দেখাশোনা করতে থাকে বুড়ি আয়ি—কাঞ্চন দাসের মাসী।

নৌকাডুবির ফলে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই নষ্ট হয়ে গেছিল। ছিল কেবল একটা ছোট বাড়ি। বুড়ি বাড়ির সামনে ছোটখাটো দোকান করে কোনরকমে সংসার চালাতো, এইভাবে কয়েক বছর কাটার পর যথাসময়ে অর্থাৎ বাল্যবিবাহ প্রথার নিয়ম মেনে মাত্র দশ বছর বয়সে এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে চুয়ার বিবাহ স্থির হয়ে যায়। কিন্তু নিয়তির অমোঘ 'বিধানে জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র লম্পট মাধবের নজর পড়ে চুয়ার ওপর। মাধব জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও স্বভাব তার চণ্ডালের মতো। চণ্ডাল মাধব আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হুকুম জারি করে যে,—চুয়ার ষোল বছর বয়স যেদিন হবে সেইদিনই তন্ত্র সাধনায় দৈবকার্যে চুয়াকে নিযুক্ত করা হবে। —এই আদেশ জারি হওয়ার পর বাড়িতে কান্নাকাটির মহারোল পড়ে যায়।

চার বছর পর চুয়া পূর্ণযৌবনা ষোড়শীতে উত্তীর্ণা হয়ে ওঠে। ঠিক হয় আসন্ন অমাবস্যার রাতে চুয়াকে উৎসর্গ করা হবে। বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে মধুকর ডিঙা নিয়ে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে এসে নোঙর করে। অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র চন্দন দাস। দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে সাময়িকভাবে তার বাণিজ্যতরী নবদ্বীপের ঘাটে এসে বাঁধা হয়। নগর দর্শনে বেরিয়ে গঙ্গায় স্নাত চুয়ার স্নিগ্ধ কোমল রূপ দেখে বণিকপুত্র "চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল।" [শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২২।]

এত রূপ সত্ত্বেও মেয়েটির মুখ ম্লান, কোন অনাবিল আকর্ষণে চুয়াচন্দন পরস্পর আকৃষ্ট হয়। চন্দন দাস ঘুরতে ঘুরতে চুয়ার আয়ির কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং চুয়ার নিরুপায় বন্দিনী জীবনের কাহিনী শোনে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে সেই দিনটা ছিল কৃষ্ণা চতুর্দশী। পরের দিনটা চুয়ার জীবনে সেই ভয়াল দিন, অন্ধকারাচ্ছন্ন অমাবস্যা তিথিতে মাধব উৎসর্গ করবে চুয়াকে দৈবকার্যে।

চন্দনদাস চুয়ার কাহিনী শোনার পর এই অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করতে উদ্যোগী হয়। বিধি বাম হওয়ায় চুয়ার প্রতিহারী চাঁপা মাধবকে খবর দিয়ে দেয়। মাধব এসে চন্দনের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা বাধিয়ে দেয়, চন্দন তখন পরিত্রাণ পেতে মাধবের নাকে কিল মেরে তারই ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যায় আর মাধব চুয়ার বাড়িব সামনে পাইক মোতায়েন করে আপাতত ফিরে যায়। আর চন্দন দাস ভাবতে থাকে সমগ্র নবদ্বীপে তাকে কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? তখন তার নিমাই পণ্ডিতেব কথা মনে পড়ে যায়। তিনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিতই নন। সংকার্য করার সাহসেও অদ্বিতীয়।

একটি গ্রাম্য বালকের সাহায্যে নিমাই পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হয়ে চন্দন তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলে। চন্দনের সবকথা শোনার পর তিনি তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রথমে তিনি চন্দনকে পেটভরে ভোজন করালেন এবং তারপর চুয়া উদ্ধারের কার্যপ্রণালী নিয়ে পরামর্শ করলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইজন ব্রাহ্মণপল্লী থেকে অনেকটা উত্তরে নৌ-কর সূত্রধরদের বাসস্থলে উপস্থিত হয়ে, দাম কষাকষি করে একটি ছোট্ট ডিঙা কিনে পরের দিন বিকালে নেবে বলে বায়না করে আসে, এরপর নিমাই পণ্ডিত গৃহে ফিরে যায়। আর এদিকে রাত্রি তিন প্রহরে চন্দনদাস সকলের অলক্ষে যায় চুয়ার সঙ্গে দেখা করতে। রাতের অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের হাতে হাত রাখে প্রেমের জোয়ারে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে।—

> 'চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হসিমুখে একবার চন্দন দাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, চুয়া নয়—চুয়া বউ, এই আমাদের বিয়ে।"

[শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০।]

গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রির শেষ প্রহরে শুকতারার শুভ্র আলোকে চন্দনদাস চুয়াকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেল।

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিনে সূর্য অস্তমিত হলে পূর্ব পরিকল্পনামাফিক মহারোলে কাঁসর-ঘণ্টা, শিঙা, ঢোল বাজিয়ে, দুই সারি ঢাল সড়কিধারী পাইক নিয়ে বলিদানের পূর্বে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে এল চুয়া। পণ্ডিতের নির্দেশে চন্দনের সঙ্গে চোখের ইশারায়-ইঙ্গিত পেয়ে

সে জলে ডুব দিল, ইতিমধ্যে বণিক তার গলার মুক্তার হার ছিঁড়ে ফেলে লোভী পাইকদের মুক্তো কুড়োতে ব্যস্ত করে তুলল আর সেই অবকাশে নিজে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবসাঁতার কেটে চুয়ার নিকটবর্তী হ'ল। এদিকে ঘাটে ধর্ ধর্, পালাল, পালাল রব ওঠে, কয়েকজন পাইক জলে লাফাল, কয়েকজন ছুটল নৌকার সন্ধানে। কিন্তু ঘাটে একটাও নৌকা নেই কারণ মাঝিদের আগাম বায়না দিয়ে ওপারে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল বণিকপুত্র। মাধবকে ডেকে এনেও কিছু করা গেল না। কেননা চুয়াচন্দন ততক্ষণে সাঁতার দিয়ে পৌঁছে গেছে নিমাই পণ্ডিতের ডিঙিতে। পণ্ডিত নিজে দাঁড় টেনে ডিঙি নৌকায় ক'রে তাদেরকে নবদ্বীপ থেকে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার বুকে নোঙর করা চন্দনদাসের বাণিজ্যতরীতে পৌঁছে দিয়েছে, শুধু তাই নয়, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দিয়েছেন—

> "ঈশ্বর সাক্ষী করে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক।" [শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৩।]

চন্দনদাস তার জীবনে আবির্ভূত দেবতার উদ্দেশ্যে দক্ষিণা অর্পণ করতে চাইলে পণ্ডিত অস্বীকার করেন এবং বাড়ি ফিরে সমাজবিধি মেনে লৌকিক বিবাহ করার বিধান দিয়ে, মায়ের নির্দেশ পালন করতে সেই রাত্রেই তিনি আবাব 'পাঁচ-ছ' ক্রোশ দাঁড় টেনে ফিরে যান নবদ্বীপে। গমনোদ্যত নিমাই পণ্ডিতের উদ্দেশে চুযাচন্দন প্রণতি জানায়। এ প্রণতি কেবল চুয়াচন্দনের নয়। লেখক শরদিন্দুবাবু ও সমগ্র পাঠককুলের ভক্তিবিনম্র নিবেদন—এক মহামানবের নিমিত্তে।

দুই

নায়ক নায়িকার নামে নামকরণের রীতি বহুল প্রচলিত। চুয়াচন্দন গল্পের নায়িকা চুয়া, তার প্রেমিক চন্দন। জমিদারের ভাইপো মাধবের কাপালিক লীলার হাত থেকে চন্দনের চুয়া উদ্ধারের কাহিনীই এ গল্পের বিষয়বস্তু। ইতিহাসনির্ভর এই রোমান্টিক কাহিনীর নায়ক ইতিহাসের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব নিমাই পণ্ডিত। কিন্তু নায়িকা চুয়ার দোসর যে চন্দন।—তাই প্রেমাকাঙ্ক্ষিত এই যুগলমূর্তির মিলনকে অমরত্ব দান করতেই হয়তো এ গল্পের নামকরণে 'চ' বর্ণের অনুপ্রাস এনে প্রেমী যুগলের নাম চুয়াচন্দন সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

চুয়া কথার আভিধানিক অর্থ হল—'চুয়াইয়া তৈয়াবী সুগন্ধ নির্যাস।' [বাংলা ভাষার অভিধান, শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ।]

অর্থাৎ চুযা হল বিশিষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য আর চন্দন হল সুগন্ধি কাষ্ঠ। সুতরাং চুয়া ও চন্দন সাজসজ্জার সামগ্রী। বৈষ্ণবদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম অঙ্গরাগ চুয়াচন্দন—'কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি।' স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাধন সামগ্রীর প্রধান দুই উপকরণের অনুষঙ্গে রোমান্টিক কাহিনীতে ভগবৎ সাধনার আবহ তৈরী হয়েছে।

চুয়াচন্দনের প্রেমাকর্ষণ দেখানো লেখকের অভিসন্ধি ছিল, তাই প্রথম থেকেই তিনি চুয়াচন্দন কথাটি গল্পের সর্বত্রই প্রয়োগ করেছেন। বুড়ি ঠান্‌দির সঙ্গে চন্দনের আলাপ জমাবার আছিল'য় 'চুয়া' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক সচেতনভাবে—

> "তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভালো চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে-কথা সে ভুলে নাই, আজ নগর-ভ্রমণের

সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু চুয়া কিনিবার আছিলা এমনভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৪।]

প্রথম দিকে 'চুয়া' কথাটি প্রেমিক চন্দনের কাছে তার প্রেয়সীর নিকটে পৌছবার অছিলামাত্র ছিল। তারপর আয়ি বুড়ির কাছে তার নাতনীর দুঃখের বারমাস্যা শুনে চন্দন নবদ্বীপের ঘাটে ক্ষণিক দেখা রমণীটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, মনে মনে তার দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়েছে। কিন্তু আয়ি বুড়ির সম্বোধনে যখন চন্দন প্রেমিকা চুয়া এসে সামনে দাঁড়িয়েছে তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঝাঁকুনি খেয়েছে চন্দন আবার মনে মনে উল্লসিত হয়েছে এই ভেবে—

"সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে!
এ কি দৈব যোগাযোগ।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬।]

সহজিয়া সাধনার উচ্ছৃঙ্খলতা রুখতে বৈষ্ণবীয় সাধন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন লেখক। তাই শাক্ত সাধনার প্রধান উপকরণ রক্তচন্দনের বিপরীতে চুয়াচন্দন কথাটি প্রয়োগ করে বৈষ্ণবীয় ধর্মান্দোলনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন শরদিন্দুবাবু। গল্পটির চুয়াচন্দন নামকরণ উদ্দেশ্যগত সফলতা এনেছে। সর্বশেষে বলা যায় যে নিমাই পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় চুয়াচন্দনের রাক্ষসমতে বিবাহ দানের মধ্যে দিয়ে চুয়াচন্দন নামকরণ ঐতিহাসিক সফলতা লাভ করেছে।

তিন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অতীতাশ্রয়ী কাহিনীগুলিতে লেখকের প্রবল ইতিহাসপ্রীতি ও প্রগাঢ় কল্পনাশক্তির অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কল্পনায় অতীতাশ্রয়ী গল্পের ঐতিহাসিকতাটিই হয়ে যায় মায়া। ঐতিহাসিক গল্প রচনায় তিনি কল্পনার শাখায় ভর ক'রে সম্ভাব্যতার এক আনন্দ-নিষ্যন্দী ভুবন রচনা করেছেন। যুগ যুগান্তরের চিরন্তন মানুষই সেখানে সত্য। ইতিহাস পরিবেশ রচনায় তিনি কাহিনীর চারিদিকে যেন একটা ইতিহাসের পাড় বুনে দিয়েছেন। চুয়াচন্দন গল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। সমগ্র কাহিনী জুড়ে রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। মূলতঃ ইতিহাসকে সাক্ষী করেই এ গল্পের সত্যতা বজায় আছে। পুরানো বাংলার পটভূমিকায় গল্পটি সার্থক। পঞ্চদশ শতাব্দীর অরাজক বাংলার চিত্র লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। নবদ্বীপ যে সেকালের নৌ-বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং বিভিন্ন বণিকদের এখানে আনাগোনা ছিল—তার বিবরণও লেখক দিয়েছেন।

"সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি সপ্তাহেই দুটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯।]

নবদ্বীপের সমৃদ্ধি লোকমুখে প্রচলিত ছিল। বাজারের দোকানগুলিতে 'লক্ষ তঙ্কার সওদা' কেনা যেত। পথে পথে নাট্যশালা, পাঠশালা, রাজপথে ব্যস্ত লোকের আনাগোনা নগরটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতো।

এ গল্পে ইতিহাস কতকটা ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হলেও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তির সক্রিয় উপস্থিতিই গল্পে সাহিত্যিক সত্য ও ঐতিহাসিক বাস্তবের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছেন—

তিনি নিমাই পণ্ডিত। এখানে তিনি টোলের অধ্যাপক, নব্যন্যায়ের প্রবক্তা, সর্বোপরি দুঃসাহসী যুবক। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় জলে ডুবে যাওয়া পণ্ডিত কাণভট্টকে উদ্ধার করে নতুন জীবন দিয়েছেন। শিরোমণি মশাই তাঁর নাম দিয়েছেন 'নিপাতনে সিদ্ধ'। স্বভাবসিদ্ধ পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক ভাবমূর্তি গড়া হয়েছে এখানে। এ ছবি স্বকপোলকল্পিত। এ গল্পে রঙ্গপ্রিয়, নির্ভীক, সংবেদনশীল, হৃদয়বান যুবকরূপে তাঁর যে পরিচয় মেলে তার সবটাই যে কাল্পনিক, ঐতিহাসিক সত্যতা যে মোটেই নেই তা নয়। 'চৈতন্য-ভাগবত'-কার বৃন্দাবনদাস চৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যকালের ঘটনা বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন—কৈশোরে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য নিমাই পণ্ডিত বলে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। যৌবনে তিনি বিদ্যারসে মাতাল হয়েছিলেন, কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে তখন কোন বাসনার উদয় হয়নি। ভক্ত বৈষ্ণবদের দেখলে তাদের তিনি পরিহাস করতেন। [বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।] এই বাস্তব ভিত্তিকে অবলম্বন করেই শরদিন্দুবাবু দেখালেন টিকিধারী পণ্ডিত ও তাদের পাণ্ডিত্যকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা প্রসঙ্গ।

বাস্তবিকই চৈতন্য রেনেসাঁ আসার পূর্বেকার সমাজ ও ধর্মীয় অরাজকতার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। সেযুগে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সঙ্গে শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হয়ে যে বীভৎস বামাচার উদ্ভূত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত।

বাংলার সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে (১৪৮৬-১৫৩৯) বাঙালী জাতির চৈতন্যচন্দ্রোদয় ঘটেছিল। একজন ধর্মপ্রচারককে কেন্দ্র করে একটা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিণামমুখী বিকাশের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে আলোচ্য কাহিনীতে—

> "তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতে ছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না।"
>
> [শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৮।]

সে যুগের সমাজ বিপ্লবের একমাত্র কর্ণধার শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব ওরফে নিমাই পণ্ডিত এ গল্পে Catalistic agent-এর ভূমিকা পালন করেছেন। এই একটিমাত্র চরিত্রই কাহিনীর ইতিহাসরস ও রোমান্স রসের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পকে ইতিহাসরসাশ্রিত রোমান্সরসে বেঁধে রেখেছেন তিনি। কাহিনীর শেষে তাঁর মাতৃভক্তির যে পরিচয় রয়েছে—

> "আজই আমায় ফিরতে হবে। রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন।"
>
> [শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৩।]

তা থেকে সহজেই চিনে নেওয়া যায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই মানুষটিকে যিনি প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পদর্শনে মৃত্যুর পর কেবলমাত্র মায়ের অনুরোধেই দ্বিতীয়বার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এ হেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কিংবদন্তী চরিত্র যে গল্পকাহিনীর মধ্যমণি, সেই গল্প অবশ্যই ইতিহাসনির্ভর। তাই বলা যায় চুয়াচন্দন গল্প কেবল এই একটিমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতিতে ইতিহাসগন্ধী হয়ে উঠেছে।

চার

চুয়াচন্দন গল্পটি শরদিন্দুবাবুর ছোটগল্প রচনাসম্ভারে অতি সাধারণ রোমান্সরস নির্ভর গল্প। একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাই গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রী। তবে এই দুই কেন্দ্রীয় আকর্ষণকে ছাপিয়ে গেছে অনন্ত পুরুষ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যিনি এই প্রেমীযুগলের মিলন ঘটিয়েছেন। সমকালীন পণ্ডিতদের কাছে তিনি 'নিপাতনে সিদ্ধ' নামে পরিচিত। কাহিনীর প্রারম্ভে বণিকের নৌকা নবদ্বীপের ঘাটে এসে নোঙর গাড়লে সেই জলোচ্ছ্বাসে ঘাটে স্নানরত কানা গোঁসাই জলে ডুবে যায়। সম্মিলিত জনতার 'গেল' 'গেল' রব শুনে নিমাই পণ্ডিত এক ডুবে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত পণ্ডিতের টিকি ধরে তুলে এনে প্রাণে বাঁচায়। কানা গোঁসাই-এর উদ্ধার প্রসঙ্গে রঙ্গপ্রিয় নিমাই পণ্ডিতের অন্য এক মূর্তি এঁকেছেন। গঙ্গাঘাটে উপস্থিত সকলে নিমজ্জমান গোঁসাই এর হদিস পাওয়ার জন্য উদগ্রীব প্রত্যেকেই প্রশ্ন করছে তাঁকে—

"পেয়েছ? পেয়েছ?'

তিনি সরসভঙ্গীতে উত্তর করেন ......

এক মুঠো টিকি পেয়েছি।"

ষোড়শ শতকে ধর্ম ও সমাজের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ ঘোর দুর্দিন থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। সে কথারই আগাম ইঙ্গিত রয়েছে। মানবপ্রেমের অগ্রদূত এই ন'দের নিমাই টিকিধারী শাস্ত্রের বচনসর্বস্ব পণ্ডিতদের মনে মনে বেশ ঘৃণা করতেন। বাহ্যিক জ্ঞানের আস্ফালন, ভেকধারী তর্কবাগীশদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কটাক্ষঘাত করতেন, 'টিকি' নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ প্রসঙ্গে শরদিন্দুবাবু সেই বিষয়টির প্রতিই আলোকপাত করতে চেয়েছেন। 'বিশ্বম্ভর' নামটি প্রয়োগে যেমন চরিত্রটির ঐতিহাসিক ভিত্তিকে দৃঢ় করা হয়েছে, তেমনি চৈতন্য জীবনীকারের আঁকা চৈতন্য ভাবমূর্তি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক ছবি এঁকেছেন লেখক। গল্পের শেষপর্বে চুয়াচন্দনের বিয়ে দিয়েই নিমাই পণ্ডিত বাড়ি ফিরতে উদ্যত হলে বণিকপুত্র তার নৌকায় বিশ্রাম করার অনুরোধ জানালে তিনি ছোট্ট একটু রসিকতা করে বসেন—

"তোমার নৌকায় তো একটি বই ঘর নেই।—বলিয়া মৃদু হাসিলেন।"

[শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩]

এই একটিমাত্র উক্তিতেই শরদিন্দু গতানুগতিক চৈতন্য চরিত্রের বদলে স্বতন্ত্র এক ভাবমূর্তি যেন অবলম্বন করেছেন। তাই তো সমালোচক বলেছেন—

"যাঁহারা চৈতন্যদেবের গতানুগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।"

(প্রমথনাথ বিশী, চুয়াচন্দন পুস্তকের আলোচনা, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩।)

নিমাই পণ্ডিতের প্রাথমিক হাস্যপরিহাসোচ্ছল মূর্তি গড়ে পরবর্তী ঘটনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অর্থাৎ লঘুচপল পণ্ডিতমনস্ক এই মানুষটি নরখাদক মাধবের কবল থেকে চুয়াকে উদ্ধার করে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। পরার্থপরতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেলা ভার। মূলতঃ তাঁর বুদ্ধিতেই চন্দনের চুয়া লাভ হয়েছে। কার্যসিদ্ধিতে তিনি চাতুরী অবলম্বন করতেও পিছপা নন।—

"মাধব যে রকম দুর্ধর্ষ পাষণ্ড তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনও ফল হবে না।"
[শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৫]

তাঁর পৌরোহিত্যে চুয়াচন্দনের রাক্ষসমতে বিবাহের মধ্যে দিয়ে উভয়ের মিলন ঘটেছে, এ ঘটনা কাল্পনিক হলেও শরদিন্দুর লেখনীগুণে নিমাই পণ্ডিতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রসজ্ঞ সমালোচক প্রমথনাথ বিশী তাই যথার্থ লিখেছেন—

"যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি আবার একদিন অন্ধকার রাত্রে মাঝগঙ্গায় চন্দনের সহিত চুয়ার রাক্ষস বিবাহ দিয়েছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য আগে পড়ি নাই।

(প্রমথনাথ বিশী : চুয়াচন্দন পুস্তকের 'আলোচনা, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩।)

আলোচ্য গল্পে নিমাই পণ্ডিত ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার জীবন দ্বারা ষোড়শ শতকে বাঙালীর আতিথেয়তা, আচার আচরণ, রন্ধন ব্যঞ্জনের পরিচয় দিয়েছেন। উভয়ের সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে, অতিথিসেবাপরায়ণা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণা, পতিভক্তিসম্পন্না অনাদৃত গ্রামবাংলার বধূমাতাদের উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে। সবমিলিয়ে চুয়াচন্দন গল্পে নিমাই পণ্ডিতের এক অনবদ্য ও অভিনব মূর্তি গড়ে তুলেছেন শরদিন্দুবাবু।

নিমাই পণ্ডিতের পর আলোচ্য গল্পে যে চরিত্রটি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত তিনি বণিকপুত্র চন্দনদাস। কল্পনার রঙে রাঙানো সেকালের বাঙালী বণিকপুত্রদের যোগ্য প্রতিনিধি। এই চন্দনদাসের সূত্রেই আলোচ্য গল্পে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া হল গৌরাঙ্গ-ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ক্ষণিকের সাক্ষাৎ।

একুশ বাইশ বছর বয়স্ক এই সুদর্শন যুবাপুরুষটি যেমন বাক্‌পটু, বিনয়ী তেমনি সৌখিন আবেগচপল। দীর্ঘদিন বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে বাড়ী ফেরার পথে মধুকর ডিঙা নিয়ে নবদ্বীপের ঘাটে এসে উপস্থিত হন এবং কৌতূহলী মন নিয়ে নগর দর্শন করেন। নগর পরিভ্রমণকালে তার চোখ দিয়েই ইতিহাসপ্রেমী শরদিন্দু পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন :

"সে সময়ে নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটাশালা, পাঠশালা, চূর্ণ-বিলেপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু কলস, প্রতি দ্বারে কারু খচিত কপাট; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ অঙ্কের সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে, রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

(শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২।)

সহজ সরল মানসিকতা সম্পন্ন এই যুবকটি জন্মসূত্রে অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। এক বছর নয় মাস পরে বাড়ি ফেরার পথে মাঝিমল্লাদেব ক্লান্তি দূর করতে সাময়িকভাবে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন নিছক বেড়ানো এবং মায়ের আদেশ (চুয়া কিনে নিয়ে যাওয়া) পালন করতে। কিন্তু নবদ্বীপের ঘাটে স্নান করতে আসা চুয়াকে দেখামাত্রই আবেগপ্রাচুর্যে বণিক চন্দনের মন ভেসে যায় প্রেম জোয়ারে। মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে বিদ্যাপতির শ্লোক—

'অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অব লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।'

লাভ-ক্ষতি, হিসাব-নিকাশের কারবারি এই বণিক যুবকটি চকিতেই প্রেমিকপ্রবর পুরুষে পরিণত হয়। ক্ষণিকের দৃষ্টিবিনিময়েই চুয়াচন্দনের প্রেমপর্ব শুরু। মোহাবিষ্টের মতো চুয়াকে অনুসরণ করে বণিকপুত্র পৌঁছে যায় তার বাড়ি পর্যন্ত। সেখানে কৌশলে বৃদ্ধা আইমার কাছ থেকে চুয়ার দুঃখবিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। এমনকি তাকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞাও করে বসে বণিকপুত্র চন্দন। এক্ষেত্রে শুধু প্রেমাবেশ নয়, আর্তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বিরল দৃষ্টান্তের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

কেবল প্রেম নয়, অসাধ্যসাধন করার মত তীক্ষ্ণ, স্থির ও দৃঢ় মানসিকতা চন্দনদাস চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। পাষণ্ড মাধবের দুরাচার থেকে চুয়াকে উদ্ধার করার মনোভাব প্রকাশ করে চরম মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন এই মানুষটি। চুয়ার প্রতি চন্দনের এই আকর্ষণ যে কেবলমাত্র রূপজ মোহ নয়, সাময়িক হৃদয়-দৌর্বল্য নয় তার প্রমাণ মেলে রাতের অন্ধকারে দরজায় পাহারা সত্ত্বেও চুয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়ে যান। শুধু কি তাই, সাময়িকভাবে চুয়া আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে উঠলে চুয়ার মনোবল বৃদ্ধি করতে তাকে অভয় দিয়ে বলে যান—

"চুয়া, বুকে সাহস আনো। আমি এসেছি দেখেও তোমার সাহস হয় না?"
[শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯]

নিজের জীবনকে বাজী রেখে কে এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে? একজন প্রেমিকই পারে তার প্রেমিকার জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ত্যাগ করার মতো এতটা কৃচ্ছ্রসাধনা। এই নিরিখে চন্দনদাস চরিত্রটির প্রেমিকপ্রবর নায়কের শিরোপা প্রাপ্য।

তার চারিত্রিক গুণাবলীর অপর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও তিনি এতটুকু বুদ্ধিভ্রষ্ট হন নি। তবে দুর্দান্ত মাধবকে মুষ্ট্যাঘাত করে তারই ঘোড়ায় চড়ে পালানোর মধ্যে কিছুটা হঠকারিতা প্রকাশ পেলেও এই ঘটনার পরবর্তী প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্যে দিয়ে তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে।

কাহিনীর নামকরণেই 'চুয়া' চরিত্রটির গুরুত্ব আরোপিত। চুয়াচন্দন গল্পের নায়িকা তথা অন্যতম প্রধান চরিত্র এই চুয়া। তার জীবনের পরিণাম বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য।

এ কাহিনীর ঘটনাস্রোত কেবলমাত্র চুয়াকে ঘিরে আলোড়িত হলেও আদতে সে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। বিষকন্যার 'উল্কা' বা 'মৃৎপ্রদীপ'-এর সোমদত্তার মত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার শক্তি তার নেই। অত্যন্ত নির্বিবাদী এই নারী নিজেকে নিয়তির হাতেই সঁপে দিয়েছিল। প্রতিকূল ভাগ্যকে জয় করার কোন চেষ্টাই তার ছিল না, কেবল মাঝে মধ্যে নদীতে ডুবে মরতে গিয়েও মরতে পারে নি,সাঁতার জানত বলে প্রত্যেকবারই বেঁচে উঠত, চুয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গেও নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন লেখক—

"তাহার উপর কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে; পরণে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ি। দেহে একখানিও গহনা নাই;

এমন কি নাকে বেসর, কানে দুল পর্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দুগাছি শঙ্খ।"
[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২২]

পাপিষ্ঠ মাধবের লালসার যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি চড়ানোর জন্য প্রহর গুনছিল সে। সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন 'প্রতিহারী' চাঁপা রূপে নিত্য তার ঘরের দুয়ারে অপেক্ষা করছিল। এমন পরিস্থিতিতে চুয়ার জীবনে চন্দনের আবির্ভাব নতুন করে বাঁচার আশা জাগালো, ঠান্‌দির ভাষায়—

"...হয়তো অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই; নচেৎ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?"
[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬]

নবদ্বীপের সম্পন্ন বেনে কাঞ্চনদাসের কন্যা চুয়া। চুয়ার সাত বছর বয়সে পিতা কাঞ্চনদাস নৌকা সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন বাণিজ্যের জন্য কিন্তু আর ফিরে আসেনি। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পরেই চুয়ার মাও মারা যায়। তখন কাঞ্চনদাসের মাসীই আট বছর বয়স থেকে আইমা হয়ে চুয়াকে দেখাশোনা করে। জন্মের প্রথম পর্যায় থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে চুয়ার জীবনে, তবুও চুয়া অথৈ জলে পড়ে যায় নি। কিন্তু তার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়েই নেমে এসেছে করুণ দুর্গতি—চুয়ার বয়স যখন দশ বছর তখন জমিদারের ভাইপো মাধবের লোলুপ নজর পড়ল গিয়ে চুয়ার ওপর। অমাবস্যার কয়েকদিন আগে এসে মাধব তার পাপানুষ্ঠানের আয়োজন করে যায়—

অমাবস্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গাঁয়ের ঘাটে গিয়া স্নান করিবে; স্নানান্তে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে সাধনস্থলে অর্থাৎ উদ্যান বাটিকায় উপস্থিত হইবে।"
(শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৮)

চুয়ার জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্তেই পরিত্রাতা হয়ে এসেছে প্রেমিক চন্দনদাস। আয়ি বুড়ির অনুমতি নিয়ে নিমাই পণ্ডিতের সাহায্যে চরম পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করে চুয়ার বিফল জীবনে পূর্ণতা এনে দিয়েছে প্রেমিক নায়ক চন্দন। মূলতঃ তার কার্যকুশলতায় চুয়া ট্র্যাজিক নায়িকা হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সফল নায়িকা হয়ে উঠেছে।

জীবনের প্রথম দুটি পর্বে চুয়া ছিল নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ যন্ত্রবৎ। তৃতীয় পর্বে চন্দনের সঙ্গে পরিচয় মুহূর্তেই চুয়া যেন কোন জাদু মন্ত্রে সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নির্বাক নিস্পন্দ চুয়ার মুখে বুলি ফুটেছে। রাতের অন্ধকারে চন্দন চুপিচুপি তার সঙ্গে দেখা করতে এলে

"চুয়ার নিশ্বাসের মতো মৃদু চাপা স্বর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে বলিল, "তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্যে সারা রাত জেগে আছি।" (শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮)

—এ তো কোন নারীর সাধারণ বাণী নয় এ যেন 'অভিসারিকার প্রণয়বাণী।'

প্রেমিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চুয়া তার জীবন যৌবন চন্দনকে সমর্পণ করে পরিপূর্ণা শ্রেয়সী নায়িকায় উত্তরিত হয়েছে—

"চুয়া অশ্রু আর্দ্র হাসিমুখ একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, "চুয়া নয়—চুয়া বউ, এই আমাদের বিয়ে।" (শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০)

চুয়ার এই উক্তিতে সাবেকী বঙ্গবধূর রূপটি ফুটে উঠেছে। আসল কথা হল অসাধারণ চরিত্র স্রষ্টা শরদিন্দু চুয়াকে আকৃতি-প্রকৃতিতে মধ্যযুগের বাঙালী নারী করে গড়েছেন।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় চুয়ার আয়ি বুড়ি (ঠান্‌দি)র কথা। স্নেহে মায়ায় মমতায় তিল তিল করে বড় করে তুলেছেন বলেই দুরাচার মাধবের হাতে নাতনীকে তুলে দিতে মন চায়নি। অহোরাত্র শুধু পরিকল্পনা করেছেন কীভাবে সর্বনাশের বেড়াজাল থেকে চুয়াকে উদ্ধার করবে। নিরুপায় হয়ে একবার নাতনীকে নিয়ে পালানোর চেষ্টাও করেছিল অর্থাৎ বিপরীত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েও কোন কূলকিনারা করতে পারে নি। তাই চুয়া বলির পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিক চন্দনদাসের চুয়া কিনতে আসাকে সে কোনভাবেই অপব্যবহার করেনি। জীবনযুদ্ধে হারতে হারতেও ঠান্‌দি যেন A Drowning man catches at a straw অর্থাৎ চন্দনদাসকে ধরে চুয়ার মুক্তির শেষ চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছে—এটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। নিমাই পণ্ডিত চুয়াচন্দনের মিল ঘটিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ঠান্‌দি সেই মিলনের পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে দিয়েছে। সর্বোপরি চুয়াচন্দন রোমান্টিক জুটির নামের অর্থগত সামঞ্জস্য প্রকাশ পেয়েছে এই ঠান্‌দি চরিত্রটির সান্নিধ্যে এসে, সেদিক থেকে চরিত্রটি অপ্রধান হয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

এই শ্রেণীর চরিতশাখায় ঠান্‌দির পরেই যার নাম প্রথমেই মনে আসে সে মাধব। তন্ত্র মন্ত্র বিশিষ্ট মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার একটা অঙ্গ হল এই মানুষটি। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে দেখা যায় যে একদল মানুষ তান্ত্রিক সাধনাকে অবলম্বন করেই তাদের আর্থিক লোভ, নারী-লোলুপতাকে চরিতার্থ করত। মাধব এই পাপিষ্ঠ অত্যাচারী মানবশ্রেণির যোগ্য প্রতিনিধি। মারধর ভাঙচুর, মদ্যাসক্তি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুন্দরী চুয়াকে দেখামাত্রই লোভে চক্‌চক্ করে ওঠে তার অন্তর, সঙ্গে সঙ্গে বিধান দেয় সে চুয়াকে দৈবকার্যে উৎসর্গ করার।

প্রাচীনযুগে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। এই দেবদাসীদের দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করলেও ভোগকর্তা ছিল পুরোহিত ও সাধকগণ। মাধব শক্তি সাধনার সাধক, তারওপর আবার জমিদারের ভাইপো সুতরাং চুয়ার ওপর তার অধিকার তো সবার আগে। ক্ষমতার অপব্যবহার সেযুগের সামাজিক লক্ষণ। এ গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। অত্যাচারী মাধবের কানে যখন খবর পৌঁছয় যে ঠান্‌দির এক দূরসম্পর্কের নাতি আনাগোনা করছে চুয়ার আশেপাশে, তখন মাধব শিকার ফস্কে যাওয়ার ভয়ে সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছে চুয়ার বাড়িতে। সেখানে বাক্‌বিতণ্ডার পরেই খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে, চন্দনের এক ঘুঁসিতেই মাধব কুপোকাৎ। সবচেয়ে মজার কথা হল এত দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মানুষ মাটিতে পড়ে দিযে আস্ফালনই করেছে। শত্রুকে তাড়া করার মানসিক বলটুকুও তার নেই। লেখক মাধব চরিত্রের এই নিষ্ফল আস্ফালনের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দৈহিক শক্তিতে ও বুদ্ধির যুদ্ধে সততই পরাজিত। মাধবের দুরাচারকে নিষ্ক্রিয় করতে 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন'—এই আপ্তবাক্যকেই নতুনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন শরদিন্দুবাবু। মাধব পাপী, লোভী মদ্যপ অসৎ চরিত্র ঠিকই কিন্তু নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। গল্পের কথাশরীরে মাধবের দুরাচারের পাপাতঙ্ক বজায় রেখে কাহিনীকে টান টান উত্তেজনায় বেঁধে রেখেছে। ফলে চরিত্রটি পাপী অসাধু শয়তান গোত্রীয় চরিত্র হয়েও অসম্ভব গুরুত্ব পেয়েছে।

চাঁপা চরিত্রটির অবস্থান সংক্ষিপ্ত। কিন্তু স্বভাববৈগুণ্যে উল্লেখ্য চরিত্র এটি। মাধবের দাসী হওয়ার সুবাদে চাঁপা, চুয়ার বলির অন্যতম ষড়যন্ত্রী। যেমন—বিশ্রী তার চেহারা তেমনি বাজে তার স্বভাব, চুয়া, ঠান্‌দি, চৈতন্য ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্র অঙ্কন করে নারীত্বের চিরন্তন গৌরবকে মহিমান্বিত করেছেন শরদিন্দু। অপর দিকে চাঁপা চরিত্র উপস্থাপনা করে নারীত্বের নেতিবাচক দিকগুলি উদঘাটন করে নারী চরিত্রের বৈপরীত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গল্পের কেবলমাত্র উল্লেখের মধ্য দিয়ে চৈতন্য-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার শান্ত, নম্র, ত্যাগ, তিতিক্ষার মূর্তিময়ী রূপটি চিত্রিত হয়েছে। প্রখর মধ্যাহ্নে বাড়িতে অতিথি অভুক্ত শুনে নিজের মধ্যাহ্ন ভোজের থালা পতির অনুরোধে জলের ছড়া দিয়ে আসন পেতে আদর করে অতিথিকে খাইয়ে দিয়েছেন। নিজে অভুক্ত অবস্থায় কেবল জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। অতিথিপরায়ণা, পতিগতপ্রাণা এ নারী যুগে যুগে নমস্যা। বাঙালী সতী লক্ষ্মী রমণীর স্বভাব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করতেই বোধহয় শরদিন্দুবাবুর বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্র সৃষ্টি। ক্ষণিকের আবির্ভাবেই কাহিনীটি তাঁর দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

পাঁচ

জীবন ও শিল্প পারস্পরিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ শরদিন্দু সাহিত্য, রচনাশৈলী ও ভাষা সৃষ্টি প্রয়োগে তিনি অবিসংবাদিত শিল্পী। চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কাহিনীর পাত্রপাত্রীর চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারেও শরদিন্দুর কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। নায়িকা চুয়ার রূপ বর্ণনায় লেখক যেভাবে ভাষা বিন্যাস করেছেন—

> "তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২২।]

সমস্তরের সমশ্রেণীভুক্ত মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে অপরজনের সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি অনায়াস নৈপুণ্যে পরিস্ফুট করেছেন। নিমাই পণ্ডিতের যে ভিন্নধর্মী ছবি এখানে আঁকা হয়েছে তাতে চরিত্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতটুকু নষ্ট হয় নি সংলাপ রচনার গুণে। চুয়াচন্দনের রাক্ষস মতে বিবাহের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে চন্দন যখন বলে—

> "ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?" নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে বিয়ে অমান্য করে কে?"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৪৩।]

এ গল্পে ঐতিহাসিক চরিত্রের সংলাপ শুনে মনে হয়, সে যুগে মানুষেরা আধুনিক বাংলা বললে হয়তো এই রকমই বলতো।

বাংলা গদ্যকে পরিপূর্ণভাবে বাংলা রেখেও তাতে সংস্কৃতের রূপ ও ছন্দ স্পর্শ আনায় শরদিন্দুর কৃতিত্ব নজিরহীন—নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের স্বতঃসিদ্ধতা বোঝাতে 'নিপাতনে সিদ্ধ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। চুয়ার পরিচারিকা ও নজরদারির জন্য চাঁপার বিশেষ ভূমিকা বোঝাতে লেখক 'প্রতিহারী' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

'হ্যাগো ভালোমানুষের মেয়ে"—সেযুগের কথোপকথন রীতির এই আলাপচারিতা ভাষাচিত্র

ফুটে ওঠে। 'ইমেজ' বা 'চিত্রকল্প' সৃষ্টিতেও শরদিন্দুর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। যেমন—"ও মাগী যমের দূত"—ঠান্‌দির এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে চাঁপার ইমেজ পরিপূর্ণতা পেয়েছে। উপমা প্রয়োগেও তিনি অবিসংবাদিত শিল্পী।—বণিকপুত্রের নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম প্রসঙ্গে "তুলসীপাতার ছোট বড় নাই"—এই সুন্দর উপমাটি ব্যবহার করে নিমাই চরিত্রের পবিত্রতা, পাণ্ডিত্য, ভগবত সাধনাকে বহুগুণে গুণান্বিত করে তুলেছেন।

শরদিন্দুর ভাষা ও রচনাশৈলীতে কালিদাস রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ গল্পের নায়িকা চুয়া যেন পদাবলী দিয়ে গড়া রাজপথ দিয়ে হেঁটে যায়। তার অপূর্ব শান্ত মধুর স্বভাব বোঝাতে লেখক বার বার বৈষ্ণব কবিদের সাহায্য নিয়েছেন—

"গেলি কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১২৩।]

ঐতিহাসিক রোমান্সের জন্মদাতা যদি হন বঙ্কিম, তবে এই শাখার প্রাণপুরুষ শরদিন্দুবাবু। মূলতঃ তাঁর হাতেই ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সেই সূত্রেই শরদিন্দুবাবু বঙ্কিমের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছেন—গল্পের শেষপর্বে এসে চুয়াচন্দনের সন্তরণ দৃশ্য 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা' অংশে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে—

"চুয়া ও চন্দন দাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের কালো মাথা দুটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দন দাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাসি চন্দন দাসকে পুরস্কৃত করিল।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা—১৪১]

বাঙালীয়ানার অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য গল্পে, নদীমাতৃক বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে, মাঝিদের কথোপকথনে তাদের অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায়। 'বালকের ডাংগুলি' খেলার দৃশ্যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার 'পিঁড়ি পেতে জল ছড়া দিয়ে' অতিথিকে অন্নব্যঞ্জন ধরে দেওয়ার মধ্যে আটপৌরে গ্রাম বাংলার সংস্কার ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে—

"ব্রাহ্মণপল্লী হইতে অনেকটা উত্তরে গঙ্গাতীরে নৌ-কার সূত্রধরদের বাস।"

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা—১৩৬]

সামাজিক বৈষম্য চিহ্নিতকরণের এমন জীবন্ত উদাহরণ আর হয় না। বদন সর্দার ও অন্যান্য চরিত্রগুলিও যেন শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব করেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুয়াচন্দন গল্পে ভাষা ও বিষয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে, কোন ধোঁয়াশাপূর্ণ আবছা জটিল ধারণা এ গল্পে বিরল। ভাবকে ফোটানোর জন্য যথার্থ ভাষা যেন সর্বদাই তৈরী রয়েছে। তাঁর ভাষার পিছনে যেন আদিম অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ও বলশালী মন কাজ করেছে, সেই মন কবিত্বপূর্ণ, প্রসন্ন, কৌতুকশীল ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত। সুতরাং বলা যায় যে চুয়াচন্দন গল্পের কাহিনীকে সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে তরতর করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে শরদিন্দুবাবুর ভাষা। গভীর ধ্বনিময়তা, প্রতিটি লাইনে লুকিয়ে থাকা চাপা হিউমার বাক্যের তাৎপর্যকে গভীর করে তুলেছে।

পথের কাঁটা : গহীন রহস্যের মায়াজাল

ললিতা রায়

গোয়েন্দাগল্প ছোটগল্পের অন্তহীন বৈচিত্র্যপ্রবাহে একটি বিশেষ ধারা। বিষয় ও প্রসঙ্গ এবং গল্পগঠনের দিক থেকে ছোটগল্পের রূপ-বৈচিত্র্যের প্রকৃতই সীমা নেই। কথাটি সামগ্রিকভাবে ছোটগল্পের হলেও গোয়েন্দাগল্পের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীতে অজস্র মানুষের মধ্যে অজস্র ধরনের অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়—কখনও অপরাধের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রবণতা, কখনও চুরির অপরাধ, কখনও বা মানুষকে অপহরণের অপরাধ আবার কখনও কোনো মানুষকে তিলে তিলে ক্ষয় করে দেবার সাংঘাতিক জিঘাংসাবৃত্তি। তবে গোয়েন্দাগল্পের জগতে সিংহভাগই স্বার্থসংশ্লিষ্ট অপরাধ। গল্পকার গল্প লেখেন অপরাধকে কেন্দ্রে রেখে চারপাশে রহস্যের আবরণ সৃষ্টি করে। তারপর সেই রহস্যের আবরণকে ঘনতর করে অবশেষে সেই আবরণ ভেদ করে অপরাধ ও অপরাধীর উদ্‌ঘাটন। গল্পের শেষে অবশ্যই শাস্তির ইঙ্গিত থাকে। এই সঙ্গে লক্ষ করতেই হয় আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি অপরাধ ও অপরাধীর ক্রিয়াকর্ম অতি সূক্ষ্ম জটিল রহস্যের সৃষ্টি করেছে তেমনি সেই বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগেই সেইসব রহস্যের উদ্‌ঘাটনও সম্ভব হয়েছে। এজন্যই সময় যত এগিয়েছে গোয়েন্দাগল্পের চরিত্র ততই জটিল হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিক যেহেতু প্রতিটি গল্পের রহস্যকে আমাদের জীবনের বাস্তব ভালোমন্দ, আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত করে দেন সেইহেতু কেবল রহস্য উন্মোচনেই গল্প শেষ হয়ে যায় না, আমাদের মনের সেইসব গল্প স্বাভাবিক জীবনরসেরও আস্বাদন দিয়ে সাহিত্যজগতে স্থায়ী আসন লাভ করে।

বাংলাভাষায় নবীনধারায় ডিটেক্‌টিভ গল্প কাহিনীর সৃষ্টিকর্তা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন 'সত্যান্বেষী' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) গল্পের মাধ্যমে। তাঁর 'পথের কাঁটা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ৭ই আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। গল্পটি খুনের রহস্য ['গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি'] নিয়ে লেখা এবং সেকালে গল্পটি যে চমকপ্রদ হয়েছিল, তা ঘটেছিল খুনের পদ্ধতির অভিনবত্বে। অস্ত্র দিয়ে কারুর মুণ্ডপাত না করে অথবা রিভলবারের গুলিতে কারুর হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ না করে একটি জীবন্ত হৃৎপিণ্ডে কেবলমাত্র একটি গ্রামোফোনের পিন বিদ্ধ করে সেই হৃৎপিণ্ডের প্রাণস্পন্দন থামিয়া দেওয়ার কাহিনী রীতিমতো চমকপ্রদ। গল্পটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী ও সহকারী অজিতকে নিয়ে সুন্দর বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই হার্দ্য পরিবেশের মধ্যেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সমাবেশ ও পরিণামে অপরাধীর শনাক্তকরণ গল্পরস জমিয়ে তুলেছে। লেখক শরদিন্দুর সরস কৌতুকমধুর ব্যক্তিত্ব অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পটিতেও সঞ্চারিত হয়ে আছে। তা যেমন ভাষায়, চরিত্র-বিশ্লেষণে তেমনি আপাতমধুর মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপনায়। নিতান্তই স্বার্থসন্ধ খুনগুলির পিছনে আশুতোষবাবুর প্রণয় কান্ডের প্রসঙ্গ যেভাবে মৃদুপরিহাসরসিকতায় ব্যক্ত হয়েছে তা গল্পের রহস্যরোমাঞ্চকে কিছুমাত্র শিথিল না করে জীবনরসের আস্বাদ

দিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা ও দুর্ঘটনা সমস্তই তৎকালীন বাস্তব সমাজ পরিবেশের অসংশয়িত অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

দুই

'পথের কাঁটা' গল্পটি খুব সংক্ষেপে এই,—

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী ও সহকারী অজিতের একদিন খবরের কাগজের বিচিত্র বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে যায়,—

"পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র তিনলাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল।...

"পথের কাঁটা"

'যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবারে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।...."

দু তিনবার পড়েও এই বিজ্ঞাপনের মর্মার্থ না বুঝে অজিত ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হয়। গত তিনমাস ধরে খবরের কাগজে প্রতি শুক্রবার বের হওয়া এই বিজ্ঞাপনের অদ্ভুত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যোমকেশ অভিমত প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তার আত্মগোপনের চেষ্টা প্রবল। ইতিমধ্যেই কলকাতায় 'গ্রামোফোন পিন মিস্ত্রি' শহরবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সুকিয়া স্ট্রীটের জয়হরি সান্যাল নামক প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে পদব্রজে যাবার সময রাস্তা পার হতে গিয়ে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে যান—এবার সকলে তাঁর নিথর দেহ আবিষ্কার করে। হত্যার সম্ভাব্য কোনো কারণ জানা না গেলেও মরণোত্তর পরীক্ষায় প্রমাণ হয়, হত্যার কারণ একটি ক্ষুদ্র গ্রামোফোনের পিন,—

"বন্দুক অথবা ঐ জাতীয় কোনো যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক হইতে বক্ষের চর্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।" এর কিছু পরে অল্পদিনের ব্যবধানে সংবাদপত্রে পিনরহস্যের পর পর খবর বের হয়। রেডরোডের কাছে মারা যান কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক এবং ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের কাছে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য মহাজন কৃষ্ণদয়াল লাহা। 'দৈনিক কালকেতু' পত্রিকা জানায়,—

"আবার গ্রামোফোন পিন
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য
কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়।"

গ্রামোফোন পিন রহস্যের চতুর্থ শিকার নেবুতলার ব্যবসায়ী শ্রী আশুতোষ মিত্র ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হন। জোড়াসাঁকোর কাছে গানবাজনার মজলিস শুনে ফেরার পথে হ্যারিসন রোডের চৌমাথার কাছে রাস্তা পার হবার সময়, তিনি বুকে কাঁটা ফোটার বেদনা অনুভব করেন,—

"মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি ঘড়ি বার হচ্ছে না, কিসে আটকে

যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ি বার করলাম তখন দেখি তার কাঁচখানা গুঁড়ো হয়ে গেছে—আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়িটাকে ফুঁড়ে মুখ বার করে আছে।" নেহাতই বুকপকেটের ঘড়ির জন্যই সে যাত্রা বেঁচে যান আশুবাবু। রহস্যের তদন্ত করতে গিয়ে ব্যোমকেশের অনুমান দৃঢ় হয় যে—পথের কাঁটা-র বিজ্ঞাপন এবং গ্রামোফোন পিন রহস্য—এই দুইয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। এছাড়াও সমস্ত হত্যাই হয়েছে রাস্তায়, তার কারণ হত্যার জন্য নির্ধারিত অস্ত্রকে রাস্তা ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করা চলে না। যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছেন, সবাই বিত্তমান এবং অপুত্রক। নিজের দুর্ঘটনার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে না পারলেও বুকে ধাক্কার সময় তিনি 'সাইক্লের ঘন্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ' শুনেছিলেন তা ব্যোমকেশকে জানান। ব্যোমকেশও আশুবাবুর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে। আশুবাবু অবিবাহিত, নিজের বলতে একটি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের মাতাল ভাইপো। গত বারো-তেরো বছর ধরে জোড়াসাঁকোর এর রূপসী নাগরিকার সমস্ত ভরণপোষণের দায়ভার তিনিই গ্রহণ করেছেন, হয়ত এই নাগরিকাই আশুবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। ঘটনাচক্রে ব্যোমকেশ জোড়াসাঁকোব বাড়ীতে গিয়ে আশুবাবুর উকিল বিলাস মল্লিকের সাক্ষাৎ পায়। বিলাস মল্লিকের সঙ্গে নাগরিকার গোপন পত্রালাপ রহস্যের মোড় কিঞ্চিৎ ঘনীভূত করে। ইতিমধ্যে 'পথের কাঁটা' বিজ্ঞাপনের ব্যাপার সরেজমিনে তদন্তের জন্যই অজিত ও ব্যোমকেশ ছদ্মবেশে নির্ধাবিত স্থানে বহুক্ষণ অপেক্ষাব পর যখন প্রায় ফিরে আসবে সেই সময় এস্‌প্ল্যানেডের কাছে লুঙ্গি পরা একজন নীচ শ্রেণীর মুসলমান একটা ছবির খামের মোড়কে অজিতকে চিঠি দিয়ে যায়। চিঠির বক্তব্য এই।—

"আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কি? আপনি কি চান, পরিষ্কার কাবয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেস্‌কোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক্ হইতে আসিবে; তাহার চোখে মোটর-গগ্‌ল দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময়ে আপনি সংবাদ পাইবেন। পদব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

ইতিমধ্যেই আশুবাবু দুঃসংবাদ বয়ে আনেন যে তার উকিল বিলাস মল্লিক ও জোড়াসাঁকোর বান্ধবীটি বেপাত্তা হয়েছেন। ব্যোমকেশ তাঁকে এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে সান্ত্বনা দেয়,—

"আশুবাবু আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালই হল—অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই—এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

বিলাস উকিল পলাতক হলেও বর্ধমান পুলিশের হাতে ধরা পড়াও যে অবশ্যম্ভাবী একথাও ব্যোমকেশ আশুবাবুকে জানায়। এই ঘটনার পরদিন রহস্য সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নেয় সম্পূর্ণ অচেনা এক আগন্তুকের আগমনে। প্রফুল্ল রায় নামে ত্রিশ বছরের এক ভদ্রবেশধারী

সুশ্রী যুবক নিজেকে বীমা কোম্পানির এজেন্ট বলে পরিচয় দেন। তাঁর সুশ্রী চেহারার মধ্যে একমাত্র বিকৃতি একটি জিনিস,—

''হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়.....লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পানখোর, কারণ দাঁতগুলো পানের রসে রক্তাক্ত হইয়া আছে। সুন্দর মুখ সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়।'' 'পথের কাঁটা' বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েই তিনি ডিটেকটিভের শরণাপন্ন হয়েছেন বলে তিনি জানান। অন্য বীমা কোম্পানীর এক ব্যক্তি ক্রমাগত প্রফুল্ল রায়ের বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চলেছেন। সেই 'পথের কাঁটা'কে দূর করবে বলে প্রফুল্ল রায় মনস্থির করলে তিনিও অজিতের মতোই একটি চিঠি পান। যাতে আগামী ১১ই মার্চ রাত্রি বারোটায় পূর্বকথিত স্থানে 'অভিসার'-এর উল্লেখ আছে। পুলিশের ব্যাপারে ব্যোমকেশের মতামত বিরূপ জেনে নিশ্চিন্ত হয়েই প্রস্থান করে প্রফুল্ল রায়। নির্ধারিত দিনে ছদ্মবেশে রাত্রি বারোটার সময় বুকের মধ্যে চীনামাটির প্লেল বেঁধে (আত্মরক্ষার্থে) ব্যোমকেশ ও অজিত হাজির হয় পূর্বকথিত স্থানে, পথের কাঁটা'-র নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে। রাত্রিবেলা কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রামলাইন যেখানে বিভক্ত হয়ে গেছে তার কিছু দূরেই অজিত চিঠির নির্দেশমতো হেঁটে চলতে থাকে আর,—

''ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা আমার কাছেও তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিক ছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল, যেন আমি একাকী।''

ঘড়িতে যখন মধ্যরাত্রি ঘোষিত হচ্ছে ঠিক সেই সময় বহু দূর থেকে সম্মুখে ক্ষীণ আলোকবিন্দুর সঙ্গে বাইসিক্ল আরোহীর দেখা পাওয়া যায়। বাইসিক্ল আরোহী যখন অজিতের দশ গজের ব্যবধানে ঠিক সেই সময় কড়াং কড়াং করে সাইকেলের ঘন্টি বেজে ওঠে আর,—

''তখন.....সঙ্গে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা খাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শতখণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম। তারপর নিমেষের মধ্যে একটা কান্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল।........ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।......লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটো শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল........অজিত ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়!.....ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!''

ব্যোমকেশের তৎপরতায় প্রফুল্ল রায়কে শনাক্ত করা গেলেও পুলিশের হাতে ধরা দেবে না বলেই নিজের পানের ডিবে থেকে বিষাক্ত পান খেয়ে প্রফুল্ল রায় ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করে।

সমস্ত ঘটনার সারাংসার বের করে ব্যোমকেশ জানায়, যেদিন অজিত 'পথের কাঁটা'-র চিঠি নিয়ে বাসায় ফিরে আসে সেদিনই প্রফুল্ল রায় তাকে অনুসরণ করে জানতে পারে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী স্বয়ং এই কেসে জড়িয়েছেন এবং অজিত ব্যোমকেশের প্রতিনিধি। গোয়েন্দার মন বোঝার জন্যই ইনসিওর কোম্পানীর দালাল সেজে ছদ্মপরিচয়ে সে নিজে

এসেছিল ব্যোমকেশের বাসায়। প্রফুল্ল রায়ের দৃঢ় ধারণা ছিল প্রথমবার অজিত গেলেও দ্বিতীয়বার ব্যোমকেশ নিজেই যাবেন। অন্যদিকে প্রফুল্ল রায়ের খুনের পদ্ধতিটিই অভিনব। যাঁরা গ্রামোফোন পিনের ঘায়ে মারা গেছেন তাঁরা সকলেই অন্যের সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচে ছিলেন। তাই 'পথের কাঁটা' ও 'গ্রামোফোন পিন রহস্য' এই দুই রহস্যের যোগসূত্র খুবই স্বাভাবিক। "এদিকে পথের কাঁটা নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ওদিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। মিলটা সহজেই চোখে পড়ে না কি?"

প্রত্যেকটি খুনের সময় শোনা বাইসিক্লের ঘন্টির শব্দই ব্যোমকেশকে এই রহস্য উন্মোচনে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছিল। তাই প্রফুল্ল রায়ের আত্মহত্যার পর তার বাইসিক্লটির ঘন্টির মাথা খুলে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারেনি,

"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা! এরকম একটা যন্ত্র তৈরী করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায় আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে বন্দুকের বারুদ,—কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিং-এর! কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে-এর নল,—যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু-কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়।.....মনে আছে—সেদিন কথা হয়েছিল শব্দে শব্দ ঢাকে গন্ধ ঢাকে কিসে? এই লোকটা যে কতবড় বুদ্ধিমান, সেইদিন তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম।" প্রফুল্ল রায়কে যারা টাকা দিয়েছিলেন খুন করার জন্য তারাও জানেননি লোকটা কে ও কি দিয়ে খুন করে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর গল্পটি শেষ করেন স্বাভাবিক ভাবেই আশুবাবু ও সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে ব্যোমকেশের আর্থিক পুরস্কার প্রাপ্তির কথা বলে।

তিন

কিন্তু গোয়েন্দাকাহিনীর শেষপর্বে লেখকের আবশ্যিক কর্তব্য থাকে রহস্য উন্মোচনের সূত্রগুলিকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দেওয়া। সেই কাজটিও শরদিন্দু নিখুঁতভাবে করেছেন। অজিতের কাছে ব্যোমকেশ সমস্ত ব্যাপারটা সূত্রাকারে যা জানিয়েছেন তা হল—পথের কাঁটার বিজ্ঞাপন ও গ্রামোফোনের পিনে পথের মাঝখানে কয়েকটি খুনের মধ্যে একটা সংযোগ আছে। আশুবাবুর ঘটনা এবং আশুবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় নিয়ে ব্যোমকেশের মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো একজন দারুণ ধুরন্ধর ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখে এই খুনের কাজগুলো করেছে। নাই খুনের পদ্ধতিটা কি রকম? তার একটা আন্দাজ নিতে অজিতকে ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপনানুযায়ী ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়াতে বলে নিজে অলক্ষ্যে থেকে ব্যাপারটা নজর করেছিল। কিন্তু অজিতের একটু অস্বাভাবিকতা দেখে ধুরন্ধর ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ না করে অন্যরকমভাবে অজিতকে অনুসরণ করে জেনে নিয়েছিল অজিত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহকারী। সুতরাং এ বার এই চিঠি অনুসারে অজিত না এসে ব্যোমকেশই স্বয়ং আসবে এটা অনুমান করে ব্যোমকেশকেই হত্যা করবার আয়োজন করেছিল প্রফুল্ল রায়। কেননা তার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল ব্যোমকেশ তার ক্রিয়াকর্মের অনেকটাই জেনে ফেলেছে, সুতরাং আটঘাট বেঁধেই নির্ধারিত স্থানে উপস্থিতি ও অবশেষে প্রফুল্ল রায়ের চতুরালির অবসান।

বলা বাহুল্য এরূপ গোয়েন্দা গল্পের আগাগোড়াই লেখক খুব সতর্কভাবে গ্রন্থিসন্ধি ও গ্রন্থিমোচনের পরম্পরাটি তৈরী করেন নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। রীতিমতো মুন্সীয়ানার সঙ্গে তিনি অপরাধ-রহস্যের বিবরণ দিয়েছেন। সংবাদপত্রের দুই ভিন্ন বিজ্ঞাপনের দ্বারা একই কার্য সাধন ব্যাপারটিকে রহস্যের আবরণে রেখেছেন। তারপর ব্যোমকেশের বিশ্লেষণ ও বিচারসূত্র ধরে রহস্যভেদের স্তরগুলি উপস্থাপন করেছেন। ব্যোমকেশের বুদ্ধিতে প্রথমেই ধরা পড়েছিল যারা খুন হয়েছেন তারা সবাই প্রৌঢ় এবং রীতিমতো বিত্তশালী। দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে তাদের প্রিয় উত্তরাধিকারী বা সন্তানাদি নেই। সুতরাং এমন ব্যক্তি থাকা সম্ভব যারা এই প্রভূত অর্থের অধিকারী হতে চায় এবং তার জন্যে কাঞ্চন বিনিময়ে খুনী নিযোগ করতে মনস্থ করে। সুতরাং এই দুই বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটা গূঢ় রহস্যময় সংযোগ আছে। সেইটি বার করবার জন্য অজিতকে নিয়ে একটা চতুর অভিনয়ের আয়োজন। যার ফলে চিঠিতে নির্দিষ্ট খিদিরপুরের বিশেষ স্থানটিতে অজিতকে সঙ্গে রেখে অন্ধকার অদৃশ্য ছায়ার মতো ব্যোমকেশের অনুসরণ। এরই মধ্যে ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে, আশুবাবুর কাছে সাইকেলের ঘন্টির কথা শুনে খুনের সঙ্গে সাইকেলের ঘন্টির একটি নিশ্চিত যোগ আছে। সাধারণত গোয়েন্দার এই রহস্যভেদের সূত্রগুলি গল্পের শেষপর্যন্ত লেখকেরা অন্তরালেই রাখবার চেষ্টা করেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুন্সীয়ানা এইখানে যে রহস্যভেদের পুরো চিত্রটি শেষপর্বে দিলেও গল্পটির প্রথম থেকেই টুকরো টুকরো করে এগুলিকে উপস্থাপন করেছিলেন। ব্যোমকেশের কৃতিত্ব এইখানে যে এই খণ্ড চিত্রগুলিকে সঠিক sequence বা বিন্যাসে এ স্থাপন করে রহস্যভেদের ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। লেখকের এই মুন্সীয়ানাতেই গল্পের বিভিন্ন অংশে যেমন তৎকালীন সমাজজীবনের কিছু চিত্র, আদিরসের কিঞ্চিৎ রম্য আকর্ষণ এবং অর্থসম্পত্তির প্রতি লোভ ইত্যাদি গল্পটির অঙ্গে অলঙ্কার যুক্ত করেছে—তেমনি আঙ্গিক সৌন্দর্যও বেশ মনোরম হয়ে উঠেছে। কেবল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যে পরিচ্ছন্ন শোভন পরিহাসরসিকতা থাকে সেই পরিহাসরসিকতার স্থানই এই গল্পে একটু কম। গল্পের ঘটনাস্তরগুলি যে রকম সাবলীল গতিতে আমরা পার হয়ে যাই বিশেষ করে ব্যোমকেশের স্বচ্ছন্দ সাবলীল চারিত্রিক হার্দ্যতায় তা গল্পটির অন্যতম শিল্পসম্পদ। অর্থাৎ 'পথের কাঁটা' শুধু রহস্যভেদেরই কাহিনী নয় সেইসঙ্গে একাধিক মানুষের সহজ হৃদয়ের অনুভূতিরও কাহিনী। এই হার্দ্যতাগুণ গল্পটিকে আমাদের কাছে আরো প্রিয় করে তুলেছে অর্থাৎ গল্পটির প্রিয়তার মূলে আছে চরিত্রচিত্রাঙ্কন দক্ষতা।

চার

অন্যান্য গোয়েন্দাকাহিনীর মতোই 'পথের কাঁটা' গল্পটিরও মধ্যরেখার দুপাশে দুই প্রধান চরিত্র। একদিকে অপরাধী প্রফুল্ল রায় অন্যদিকে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী। কোনো লেখকেরই কোনো একটি চরিত্র একাধিক গল্পে অপরাধী হয় না। প্রকৃতপক্ষে অপরাধী চরিত্রের বিশেষ অপরাধ ও তার পরিণতি বর্ণনার মধ্যেই তার চরিত্র পরিচয় নিবদ্ধ থাকে। স্বভাবতই তাই 'পথের কাঁটা' গল্পের অপরাধী প্রফুল্ল রায়ের বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি এবং তার কর্মপদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো চারিত্রিক পরিচয় লেখক দেন নি। গ্রামোফোনের পিন দিয়ে হত্যা করবার সময় সাইকেলের বেল বাজানো জুড়ে দিয়ে প্রফুল্ল রায় যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তা রীতিমতো

উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কিন্তু অতিশয় চতুর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও যে কখনও কখনও অত্যন্ত সাধারণ ভুল করে থাকে প্রফুল্ল রায় সেই ভুলই করেছিল। শেষপর্যন্ত সেই ভুলের মাশুলই তাকে দিতে হল, পুলিশের হাতে ধরা না দিলেও আত্মহত্যা করে।

অন্যদিকে পৃথিবীর সব বিখ্যাত গোয়েন্দাকাহিনির লেখকই তাঁদের কাহিনীতে এমন একজন গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যে চরিত্র গল্পের পর গল্পের মধ্যে দিয়ে ক্রমশই পূর্ণতা পেয়েছে এবং গল্পকাহিনী ছাড়াই চরিত্র হিসেবে স্মরণীয় হয়েছে। যেমন কন্যান ডয়েলের শার্লক হোম্‌স, আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো, পাঁচকড়ি দে'র দেবেন্দ্রবিজয়, তেমন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী। ব্যোমকেশ অবশ্যই শার্লক হোমসের মতো বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেনি। কিংবা এমন একটি বাস্তব চরিত্রও হয়ে ওঠেনি যার বাসস্থান ও দিনযাপন নিয়ে বিস্তৃততর গবেষণা চলতে পারে। 'পথের কাঁটা' গল্পে সেই ব্যোমকেশের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল সে পেশাদার গোয়েন্দা নয়, অপরাধ রহস্যের পেছনে যে বাস্তব সত্য থাকে তার সন্ধানে তাঁর কৌতূহলী মন তৃপ্তি পায়। আর সেই সূত্রেই বুদ্ধির শতরঞ্জ খেলায় রাজাকে মাত করবার খুশিতে একটা যুদ্ধজয়ের আস্বাদ পায়। 'পথের কাঁটা'-র রহস্য যে খুব জটিল ছিল তা নয় কিন্তু রহস্যটা একটা অদ্ভুত পদ্ধতির ক্রিয়াকাণ্ডে পুলিশ এবং বহু বুদ্ধিজীবীর কাছেই বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে বেশ ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। ব্যোমকেশের কৃতিত্ব এইখানে যে সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ পরপর সাজিয়ে তার মধ্য থেকে কয়েকটা সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করার এবং সেই অনুসারে রহস্যমোচনের কর্মপন্থা স্থির করে নেওয়া। ব্যোমকেশ লক্ষ্য করেছে,—

ক। খুনের পদ্ধতি হৃৎপিণ্ডে গ্রামোফোনের পিনকে ঢুকিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব।

খ। আশুতোষবাবুর বিবরণ থেকে তার মনে চিন্তা জেগেছে খুব প্রবল শক্তির ধাক্কা না থাকলে এরূপ কাজ সম্ভব নয়।

গ। প্রায় বন্দুকের গুলির মতোই এ ছোট্ট পিনটিকে কোনো ট্রিগার টিপে হৃৎপিন্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাহলে শব্দ হওয়ার কথা। সেই শব্দ ঢাকা পড়ে কিসে?

আশুবাবুকে প্রশ্ন করে ব্যোমকেশ জানতে পেরেছে যে একটা বাইসিক্লের ঘন্টি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতর একটা প্রকান্ড ধাক্কা আশুবাবু অনুভব করেছে। ব্যোমকেশ সমস্ত ঘটনা বা আঘাতের মুহূর্ত বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছে নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ চাপা পড়েছে বাইসিক্লের ঘন্টির শব্দে। এ বিষয়ে তার ধারণা নিশ্চিত হয়েছে চিঠিতে সাইকেল আরোহীর উল্লেখ থেকে। গোয়েন্দা চরিত্রের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক তুচ্ছ ঘটনাগুলিকেও মূল ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার শক্তি ও তারপর সঠিক পথে নিজের কাজকে চালিত করে ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রও ঠিক ঠিক ভাবে দেখিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু ব্যোমকেশের চরিত্রে এমন একটা কিছু ছিল যাকে বলা যায় সহজ স্বাভাবিক লোকের সঙ্গে মেশবার দক্ষতা। নিজেকে কখনোই বিশেষ ব্যক্তিরূপে সকলের কাছে তুলে না ধরবার মনোবৃত্তি। চোখের দৃষ্টিতে, কথাবার্তায়, আচার আচরণে তার অত্যন্ত সাধারণ ভদ্র রুচি পাঠকের কাছে কোনোরকম বিস্ময় সৃষ্টি না করে প্রিয় করে তুলেছে।

গল্পের তৃতীয় আকর্ষণীয় চরিত্র অজিত। অবশ্যই সে ব্যোমকেশের সহকারী বন্ধু। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার অপরিহার্য ভূমিকা। এই গল্পটিতেও সেইরকম ভূমিকা সে নিয়েছে—রীতিমতো ছদ্মবেশ ধারণ করে ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে তারপর কিছুটা ত্রস্তভাবে হলেও খিদিরপুরের অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছে অজিত। এরকম চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অজিতের মধ্যেও দেখা গেছে—কোনো প্রশ্ন না করেই পূর্ণ বিশ্বাসে ব্যোমকেশের নির্দেশমতো কাজ করেছে। কিন্তু যেটা লক্ষণীয়, এই বিশ্বাস ছিল বন্ধুত্বের বিশ্বাস। কোনো মুহূর্তেই আনুগত্যের ভাব নয়। এই বন্ধুত্বের রসই গল্পটির রসরম্যতা বৃদ্ধি করেছে।

পাঁচ

কিন্তু 'পথের কাঁটা' গল্পের খ্যাতি আরো একটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হল গল্পের ভাষাভঙ্গি। গোয়েন্দা গল্পের ভাষা সবসময়েই নাটকীয়। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির বিভিন্ন ভঙ্গি—কখনও অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো, কখনও সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সুরুচির পরিচায়ক, কখনও সরাসরি আক্রমণাত্মক, কখনও গম্ভীর সাহিত্যিক বর্ণনাত্মক, আবার কখনও ভীতত্রস্ত ব্যক্তির ভয়ার্ত উক্তির বাচন।

ক। "এই গ্রামোফোন-পিন রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, সব হত্যা এক সুতোয় গাঁথা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে।"

খ। "গ্যাং-এর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা ঋত্বিক এবং যজমান। এককথায় পরব্রহ্মের মত ইনি একমেবাদ্বিতীয়ম।"

গ। "আমি মাটি হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই ব্রজমুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে।"

ঘ। "ঘড়িতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বসিল—'উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সংকেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

ঙ। "আশুবাবু বলিলেন.....দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজতে পারেনি। ভাগ্যে পকেট ঘড়িটা ছিল......নইলে আমিও তো এতক্ষণে হাসপাতালে মড়ার টেবিলে শুয়ে থাকতাম....এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে মশায়।"

বনফুল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার (বর্তমানে কাটিহার জেলা) মণিহারীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় মণিহারীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে বলাইচাঁদ জ্যেষ্ঠ। তিনি নিজে এবং তাঁর অপর তিন ভাই ডাক্তারী পেশাতেই স্বীকৃতি লাভ করেন। এই মুখোপাধ্যায় পরিবার বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতে জনহিতকর কাজের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৯১৮ সালে সাহেবগঞ্জে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে, ১৯২০ সালে হাজারীবাগে সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই. এস. সি সমাপ্ত করে কলকাতায় এম. বি. পাশ করেন। এই মেডিকেল কলেজেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের। আর সেই সূত্রে 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে যেমন—'ভারতবর্ষ', 'বিজলী', 'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি।

শিক্ষা শেষে ভাগলপুরে ল্যাবরেটারী সাজিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন, পাশাপাশি চলতে থাকে সাহিত্য চর্চাও। বিহারের বিভিন্ন স্থানে প্রায় তেষট্টি বৎসর কাটিয়ে দেন বনফুল। তারপর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি কাটিযে দেন দমদমের লেকটাউনে, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কেন বনফুল নাম গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন পশ্চাৎপট' গ্রন্থে—"ছেলেবেলায় ভৃত্য মহলে আমার নাম ছিল জংলি বাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোবাসি। বাল্যকালে অনেক কীটপতঙ্গ প্রজাপতির পেছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখি চিনিবার জন্য অনেক জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য নিকেতন। এই জন্যই বোধ হয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম।"

বনফুল বিচিত্র এবং বৈচিত্রময় সাহিত্য রচনা করেছেন। এবং সাহিত্যের সব শাখাতেই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। 'তৃণখণ্ড' (১৯৩৫) তাঁর প্রথম উপন্যাস। একে একে পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস রচনা করেছেন আর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা কুড়িটিরও বেশি। বনফুলের গল্প গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'বনফুলের গল্প', 'বনফুলের আরো গল্প', 'বিন্দু বিসর্গ', 'আরো কয়েকটি নবমঞ্জরী' 'ছোটলোক', 'তিলোত্তমা', 'নিমগাছ', 'ক্যানভাসার' ইত্যাদি। বনফুলের প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'বনফুলের গল্প'।

দুধের দাম : মূল্যবোধের শেষ রবিরেখা

বিভাবসু দত্ত

গল্পকারের সংবেদনশীলতা কখনো কখনো পাঠকের শিকড় ধরে টান দেয়, পাঠককে পৌঁছিয়ে দেয় আত্মসমালোচনায় আর সেখান থেকেই ঘটে যায় আত্মশুদ্ধি; বনফুলের 'দুধের দাম' নিশ্চিতভাবেই সেই শ্রেণীর গল্প। মধ্যবিত্ত সমাজ হারিয়ে ফেলেছে যে মূল্যবোধ, ক্রমশ হয়ে উঠেছে অমানবিক, সেই মূল্যবোধকে গল্পকার ধরতে চান এই গল্পে—আর গল্পকার যেহেতু বনফুল তাই এই গল্পে পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে একটি সদর্থক বার্তা।

এই গল্পে কেন্দ্রভূমিতে আছেন এক বৃদ্ধা—যার কপালে সারাক্ষণ জুটেছে অবহেলা, অপমান আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ; কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বৃদ্ধাই অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠেন, তিনি উপকারের মূল্যস্বরূপ রেলের কুলিকে দুধ খাওয়ার জন্য যে দুটি টাকা দিয়েছেন তা আর অর্থমূল্যের সীমারেখায় বাঁধা থাকে না, সে অর্থ অমূল্য হয়ে যায়।

একটি দিনের অল্প কিছুসময় 'দুধের দাম' গল্পের সময়সীমা। একজন বৃদ্ধাকে কেন্দ্র করেই গল্প আবর্তিত। একটি অচিহ্নিত স্টেশনের প্লাটফর্মে যাত্রীসাধারণের ভিড়, ছড়ানো মালপত্র। এরই মধ্যে একটি হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকে পড়ে যান একজন বৃদ্ধা এবং মচকিয়ে যায় তার ডান পা কিন্তু ট্রেন ধরার তাড়ায় সেই পায়ের ব্যথাকে গুরুত্ব না দিয়ে একটি ইন্টারক্লাস কামরায় কোনোরকমে উঠে তথাকথিত ভদ্রযাত্রীদের বিরক্তি উৎপাদন করে মাটিতে বসে পড়েন তিনি। তাঁকে দুই স্টেশন পরে নেমে ধরতে হবে গয়ার ট্রেন। আর তারপরই শুরু হয় বিপত্তি। পায়ের যন্ত্রণায় তিনি আর উঠে দাঁড়াতে পারেন না। কোনোরকমে দু-হাতে ভর দিয়ে ঘ্যাঁসটিয়ে দরজার কাছে পৌঁছন বৃদ্ধাটি। অনুরোধ করেন যাত্রীদের কাছে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু কেউ তো সেই অনুরোধ রক্ষা করেই নি উপরন্তু বৃদ্ধার কপালে জুটেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। অনেকে তাকে ভিখারী, অশিক্ষিত, টিকিটবিহীন যাত্রী মনে করেছে কিন্তু এর কোনটিই সত্য নয়—তাঁর কাছে বৈধটিকিট যেমন ছিল তেমনই তিনি বেথুন স্কুলে পড়া শিক্ষিতা, বাংলা, ইংরাজী এবং হিন্দি—এই তিনভাষাতেই তাঁর দখল। কেউ যখন তাঁর কথায় কর্ণপাত করছে না ঠিক সেই সময় একজন রেলের কুলি দয়াপরবশ হয়ে তাকে কোলে করে নামিয়ে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখে যায় আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় গয়ার ট্রেন এলে তাঁকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার। এই ওয়েটিংরুমেও অপেক্ষমাণ যাত্রীদের হেনস্তা সহ্য করতে হয় বৃদ্ধাটিকে। শেষপর্যন্ত রেলের কুলিটি গয়াগামী ট্রেনে বৃদ্ধাকে তুলে দিলে তিনি যখন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কুলিটিকে দুটাকা দিতে চান তখন কুলিটি তার মজুরী আট আনা উল্লেখ করে এই টাকা নিতে অস্বীকার করে। বৃদ্ধাটি সে সময় যা বলেছে তা অবশ্যই অশ্রুতপূর্ব : "তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি ত তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসে এক চিরন্তন মা—মায়ের প্রত্নপ্রতিমাটি অনায়াসে ধরা পড়ে যায় এই বৃদ্ধার মধ্যে। "কুলি ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল," এখানেই শেষ হয়ে যায় গল্পটি। বৃদ্ধার কথাটিই এই গল্পের বীজবাক্য বা keyword। এই দুধের দাম মনে করে টাকা নেওয়ার কথা বলায় গল্পটিতে যোজিত হয় একটি অতিরিক্তমাত্রা, গল্পটি একটি নাটকীয় বাঁক নেয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে স্পর্শ করে সার্থকতার ভূমি। এই নাট্য-সমাপ্তি গল্পটিকে করে তোলে কালোত্তীর্ণ। গল্পনামের ব্যঞ্জনাটি অমোঘভাবে ধরা পড়ে যায় এখানে।

বনফুলের 'দুধের দাম' নিশ্চিতভাবেই সমাজসন্ধানী মানবিক গল্প। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ হারিয়ে ফেলেছে যে মানবিকতা—সেই মানবিকতার উপরই আলো ফেলেছেন গাল্পিক; সামাজিক অবক্ষয় আর মূল্যবোধের বিচ্যুতিকে ধরার চেষ্টা করেছেন ছোটগাল্পিক। গল্পটি তৃতীয় নেত্রে দেখা, এই নেত্রটি অবশ্যই গল্পকারের। তিনি দর্শক এবং সর্বজ্ঞ; সর্বজ্ঞ এই কারণেই যে, বৃদ্ধার ভিতর ও বাহিরের সমস্ত খবর তাঁর জানা। জীবনরসপিপাসু গল্পকারের প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই লেখা এই-গল্পটি। ঘটনাস্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন সমস্ত ঘটনাটিকে কিন্তু নির্মোহ নয় এই দেখা—আমাদের সমাজের অসঙ্গতি তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে ফলে তীক্ষ্ণ শ্লেষ জড়িয়ে গেছে সমস্ত গল্পটির গায়ে। অবশ্য শেষপর্যন্ত মূল্যবোধের শেষ রবিরেখা স্পর্শ করেছে গল্পটিকে।

'দুধের দাম' গল্পটি বর্ণনামূলক বা ন্যারেটিভ ফর্মে লেখা। শুরু, মধ্যাংশ এবং শেষাংশ নিয়ে গল্পের যে প্লট ভাবা হয় এই গল্পটি সেই প্রথাঅনুসারী। গল্পটি প্রথম থেকে শুরু হয়ে শেষ পৌঁছিয়ে গেছে একটি পরিণতিতে। গোড়া বেঁধে গল্প যাকে বলা হয় এটি সেই ধরনের গল্প। গল্পের শেষে একটি বিস্ময়-চমক সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। গল্পের পাঠক পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই অভাবিত চমকটি বুঝতেই পারে না।

'দুধের দাম' গল্পের আঙ্গিকটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব এগল্পটি স্পষ্টতই চারটি স্তরে বিভাজিত—যদিও স্তরগুলি অবশ্যই একটি অপরটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধাকে আমরা চারটি ক্ষেত্রে দেখতে পাই। গল্পের প্রয়োজনে একটি স্থান থেকে অপর একটি স্থানে তিনি পৌঁছিয়ে যান—কখনো নিজে, কখনো কুলির সাহায্যে। এগুলি হল : ১. অচিহ্নিত একটি স্টেশন চত্বরে, ২. প্রথম ট্রেনের কামরায়, ৩. ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে, ৪. গয়া প্যাসেঞ্জারের কামরায়।

হোল্ড-অলের স্ট্রাপে পা আটকে পড়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই গল্পে বৃদ্ধার আবির্ভাব; হোল্ড-অলের মালিক ভদ্রলোকের কাছে শুনতে হয়েছে ভর্ৎসনা, তিনি ট্রেনে ওঠার জন্য প্লাটফর্মময় ছোটাছুটি করেন—এখানেই শেষ হয়ে যায় গল্পের প্রথম পর্ব। ট্রেনের ইন্টারক্লাস, বর্তমানে যা সেকেণ্ডক্লাস, কামরায় ওঠার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় গল্পের দ্বিতীয়পর্ব। এই কামরায় কেউই বৃদ্ধাকে বসতে না দেওয়ায় অগত্যা তিনি এক যাত্রীর পায়ের কাছে বসে পড়েন, এরপর শুরু হয় বিপত্তি—মচকানো পায়ের ব্যথায় তিনি উত্থানশক্তিরহিত হয়ে যান। গন্তব্য স্টেশনে ট্রেন থামার পর ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কামরার সহযাত্রীদের কাছে কাতর আবেদন জানান কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি; অবশেষে একটি রেলকুলি সব শুনে তাঁকে ট্রেন থেকে নামায়—সমাপ্ত হয় গল্পের দ্বিতীয় স্তরের। তৃতীয় পর্বটি সংঘটিত হয়েছে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের মধ্যে। কুলিটি তাঁকে এখানে রেখে গেলে

যথেষ্ট হেনস্তা হতে হয়। বৃদ্ধা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন : "আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদের মত একজন প্যাসেঞ্জার।" বৃদ্ধা জানিয়েছেন; "আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।" অপেক্ষমান সহযাত্রীদের সঙ্গে বৃদ্ধার বাক্য বিনিময়ের সময় গয়া প্যাসেঞ্জার আসার বার্তা নিয়ে হাজির হয় সেই কুলিটি—এখানেই ওয়েটিংরুম পর্ব তথা তৃতীয় ভাগ শেষ হয়। চতুর্থ পর্বটি ঘটেছে গয়া প্যাসেঞ্জারের কামরায়। এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, এই অংশটির জন্যই গল্পটি সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠতে পেরেছে। বৃদ্ধাটি উপকারের স্মারক হিসেবে কুলিটিকে দু টাকা দিতে গেলে সে নিতে অস্বীকার করে, জানিয়ে দেয় তার মজুরী আটখানা, বেশী নিয়ে ধর্ম বিক্রি করতে সে রাজী হয় না। কিন্তু বৃদ্ধা দ্বিধাজড়তাহীন কণ্ঠে তাকে পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দুধ খাওয়ার জন্য এই টাকা দিয়ে দেন। বৃদ্ধার কথায় কুলিটি আবেগে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে প্রণাম করে ট্রেন থেকে নেমে যায়। গল্পটির এক মানবিক পরিসমাপ্তি ঘটে যায় এখানে।

ভাষার ভিতর দিয়ে বনফুলের 'দুধের দাম' গল্পের ভুবনটি দেখে নিতে হবে, কারণ ভাষা দিয়েই নির্মিত হয় একটি গল্প—গল্পকারের ভাবনাটি মূর্ত হয়ে ওঠে ভাষার মধ্যে দিয়ে, গল্পকারের অভিপ্রায়টি ধরা পড়ে এই ভাষার ভিতরে। রচনারীতিব মূল রহস্যটি আবিষ্কারের জন্য ভাষার আলোচনার সাহায্য নিতেই হবে।

সাধুভাষা এবং চলিতভাষা—বাংলায় যে দুটি ছাঁদ প্রচলিত বনফুল তাঁর গল্পে অবিমিশ্রভাবে কোনো একটা রীতিকে গ্রহণ না করে দুটি রীতিরই মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি গল্পের বর্ণনা অংশে ব্যবহার করেছেন সাধুভাষাকে আবার প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন চলিতভাষাকে। লক্ষণীয় যে, সংলাপের ক্ষেত্রে বনফুল যে চলিতভাষার ব্যবহার করেছেন তা কথ্য ভাষার কাছাকাছি—মুখের ভাষা উঠে এসেছে এখানে। যেমন :

১. 'পথ দেখে চলতে পার না? আর একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে।'
২. 'ভিখিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে তার উপর আবার—'
৩. 'উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা?'
৪. 'আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি।'
৫. 'এইসব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই নাকি, আশ্চর্য কাণ্ড।'
৬. 'দয়াময়ী, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন।'
৭. 'পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।'
৮. 'আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট লেগেছে।'
৯. 'বলেন কি! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম না কি। মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভালরি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, একথা ভাল করেই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—'
১০. 'তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যালরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদেব বেলা।'
১১. 'আরে, এ আবাব কোত্থেকে জুটল এসে এখানে?'

১২. 'কোন ভিখিরী-টিকিরী বোধ হয়।'
১৩. 'সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখ ফুটে চাইতেও পারে না।'
১৪. 'আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদেরই মত একজন প্যাসেঞ্জার।'
১৫. 'আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।'

বহুভাষিকতা এ গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্পটিতে শুধুমাত্র বাংলাভাষা নেই, গল্পের প্রয়োজনে সংলাপ অংশে মুখের হিন্দিভাষাও এসেছে। মারোয়ারী যাত্রীটি কথা বলেছে হিন্দিতে : "এই বুড়ি, হটো দরয়োজাসে।" আবার অবাঙালী কুলিটি যখন কথা বলেছে তখন ব্যবহৃত হয়েছে হিন্দিভাষা :

১. 'মাইজি কিরপা করকে থোড়া হাট্‌কে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর কাহে বৈঠ গায়ে?'
২. 'আপ কাঁহা যাইয়ে গা—?'
৩. 'চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।'
৪. 'আপ হিঁয়াপর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার কা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইমপর আকে আপকো ট্রেন মে চড়া দেঙ্গে।'
৫. 'চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।'

অবশ্য গল্পের শেষে রেলকুলি এবং বৃদ্ধার কথোপকথনটি হিন্দিতে হলেও তার সারমর্ম দেওয়া হয়েছে বাংলাতেই।

গল্পের সূচনাবাক্যটি একটি সংবাদ : "ট্রেন আসিয়াছিল।" দ্বিতীয় বাক্যে যুবতীদের কথা এসেছে এবং সেটিও একটি সংবাদ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃদ্ধার সঙ্গে একটা বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য লেখক সচেতনভাবে যুবতীদের প্রসঙ্গটি গল্পের প্রথমেই এনেছেন : "কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন।" যুবতীরা এখানে বিশেষণে সবিশেষ হয়ে উঠেছে। পরপর তিনটি বিশেষণ—'সুবেশা', 'সুতন্বী' এবং 'সুরূপা'—যুবতীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে বৃদ্ধার সঙ্গে বৈপরীত্য।

'দুধের দাম' গল্পটি বর্ণনামূলক বাক্যের সমাহার। গল্পটিতে সরলবাক্য ও জটিলবাক্য মিলে একটি আশ্চর্য ভাষানক্সার সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ সরলবাক্যই খর্বাকৃতির। অনেকসময় পরপর সরলবাক্য ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় এই গল্পে। যেমন :

১. 'বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল।'
২. 'তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্লাটফর্মময় ছোটাছুটি করিতে লাগিলেন।'
৩. 'তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে।'

এইগল্পে বাক্য-সম্পর্কসূচক নিত্যসম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্ম বা প্রতিনির্দেশক (correlatives) পদবন্ধ ব্যবহার করে কোনো কোনো জটিলবাক্য তৈরী করা হয়েছে; যেমন :

১. 'যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল।'
২. 'বৃদ্ধা যে স্টেশনে নামিবেন, সে স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল।'

আবার দীর্ঘ আয়তনের জটিলবাক্যও এগল্পে মেলে : "গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাহাদের

মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ির কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।' এগল্পে এমন বাক্য পাই যার স্পষ্টত দুটি অংশ—প্রথমটি সিদ্ধান্ত অংশ, শেষেরটি হেতু অংশ। যেমন :—

১. 'করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্‌রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়।'

২. 'অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আকারের মানুষ গুটিসুটি হইয়া বসিয়াছিলেন।'

এ গল্পে একটি অধিবাক্যও (Surface Sentence) ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি হল : 'অসম্ভব'। এই অধিবাক্যটি বুঝতে হলে অবশ্যই পূর্বের বাক্যের সাহায্য নিতে হবে।

নির্মেদ, শাণিত এবং শ্লেষাত্মকভাষা সমস্ত গল্পটির গায়ে জড়িয়ে আছে। গল্পের ভিতর লেখক মাঝে মাঝেই বিদ্রুপের খোঁচা দিয়েছেন :

১. 'ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশীগত শিভ্যাল্‌রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়।'

২. 'যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে দুইটিতেই সাহেবী পোষাক পরা দুজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন।'

৩. 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্ন হাস্যমুখী যে নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

৪. 'শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবত এই সাহেবী পোষাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গসুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।'

৫. 'তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকরীর অনুবোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষাব পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।'

গল্পের প্রয়োজনে একটি উপমা দু'বার ফিরে এসেছে এখানে, অবাঙালী কুলিটি যখন বৃদ্ধাটিকে কোলে করে তুলে ধরেছেন তখনই এসেছে উপমাটি। গল্পের বাঞ্ছিত বক্তব্যটি মূর্ত হয়ে উঠেছে এই উপমাব ভিতরে :

১. 'বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলিটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল।'

২. 'তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।'

'দুধের দাম' গল্পের শব্দ নির্বাচন আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। শব্দের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ রচনায় বা আবহসৃষ্টিতে অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছেন বনফুল। গল্পের ভাষাব রেজিস্টার (Language Register) লক্ষ্য করলে দেখব সেখানে রেল সংক্রান্ত অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে : ট্রেন, স্টেশন, প্লাটফর্ম, ইন্টারক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ট্রেনের কামরা, প্যাসেঞ্জার, উইদাউট টিকিট, ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুম, গয়া প্যাসেঞ্জার, কুলি।

কখনো কখনো গল্পে তির্যকতা প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন একটি শব্দকে বেছে নিয়েছেন গল্পকার। সেরকমই একটি শব্দ 'ছোকরা'। এই শব্দের ব্যবহারটি একটু লক্ষ্য করা যেতে পারে :—

১. 'তাহাদেরই আশেপাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহবা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল।'

২. 'কুলীর পিছনে চপ্পল পায়ে নীল-চশমা পরা লক্কা গোছের এক ছোকরা।'

৩. 'ছোকরা' ভিড়ে অন্তর্ধান করিল আর ফিরিল না।'

এ গল্পে প্যারডি বক্র ভাষারীতি দেখতে পাই। শব্দ ব্যবহারের মধ্যে গল্পকারের তির্যকতার ঝাঁঝ স্পষ্ট। যেমন, 'বাঙালী' শব্দের পরিবর্তে গল্পকার ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন 'বঙ্গ -সন্তান', 'বঙ্গসুন্দর'।

কথ্যভঙ্গি আনবার একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হল বাক্যের ভিতর ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। বনফুল তাঁর 'দুধের দাম' গল্পে কথ্যভঙ্গি আনতে চেয়ে কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ এবং অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দগুলি হল : খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, হুড়মুড়, হাঁ হাঁ, গুটিসুটি, ঘ্যাসটাইয়া, ভিখিরী-টিকিরী, ধমকধামক।

বিষয় এবং আঙ্গিকের মেলবন্ধনে বনফুলের 'দুধের দাম' নিশ্চিতভাবেই বাংলা ছোটগল্পের ভূখণ্ডে ভিন্নতর মাত্রা যোজনা করেছে।

তিলোত্তমা : মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আখ্যান

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের আলোচ্য বনফুলের 'তিলোত্তমা' গল্পটি তথাকথিত 'অণুগল্প' নয়, যে ধরনের গল্পে বনফুলের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তবে বিষয়গত দিক থেকে উপন্যাস হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল এর কাহিনীতে। কিন্তু শিল্পীর সংযম নিয়ে যিনি লেখনী ধারণ করেন, তিনি অনায়াসেই বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটান। ন'টি ছোট অনুচ্ছেদে 'তিলোত্তমা' গল্পটি বিন্যস্ত। গল্পের শুরুতে অতি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনায় কাহিনীর মূল সুরটি ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক। যে সহজ সরল জীবনানুরাগ বনফুলের ছোটগল্পকে বিশিষ্ট করে তুলেছে আলোচ্য গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ও তার বিচিত্র টানাপোড়েন তাঁর অনেক গল্পেরই বিষয় হয়ে উঠেছে। জীবনদ্রষ্টা বনফুল জানতেন, আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যথেষ্ট ফারাক আছে। আমরা যা চাই, সবসময় তা পাই না। আবার যাকে পরম প্রাপ্তি বলে মনে করি তার মধ্যেও অনেক ফাঁক থেকে যায়। বনফুলের দাম্পত্য সম্পর্ক নির্ভর কিছু গল্পে এই প্রাপ্তি -অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বটি চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। 'তিলোত্তমা' গল্পে দ্বন্দ্বের প্রশ্নটি ওঠে গোকুলের দিক থেকে। রূপে-গুণে ও পারিবারিক 'স্ট্যাটাসের' দিক থেকে বিয়ের বাজারে গোকুল যথেষ্ট সুপাত্র। একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হতেই পারতো। এই চাওয়াটা তার অতিরিক্ত কিছু চাওয়া নয়। সে সভ্য, বাধ্য, সংযত ও রুচিশীল। পিতার প্রতি অভিমানে রূপহীনা স্ত্রীর সংস্পর্শ সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে পারতো সে। কিন্তু লেখক জানিয়েছেন— "তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বৈ কি! একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভালমানুষ।" তিলুকে সে ভালবেসেছে বা ভালবাসার চেষ্টা করেছে,—এমন দাবি আমরা করছি না। কারণ, তিলোত্তমা শুধু রূপে-গুণেই দীন ছিল না, গোকুলের সঙ্গে তার মানসিকতারও বিস্তর পার্থক্য। যে শিল্পী-মনের অধিকারী ছিল গোকুল, তিলোত্তমার তা ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। মনে হয়, তার মন বিকশিত হওয়ার যোগ্য পরিবেশ সে পায়নি। নিজের অধিকারের জায়গাটা তার ভাবনায় এতটাই ক্ষুদ্র-পরিসর ছিল যে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কোনো দোলাচলতা সেখানে স্থান পায় নি। ফলে নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুলের সঙ্গত ভাবনা—"একটা চাকরাণীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!"

যার নামে গল্পটি নামাঙ্কিত সেই 'তিলোত্তমা' নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে তিলে তিলে সঞ্চিত এক অনুপম রূপ-সৌন্দর্যময়ী মানবীব প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে; আর সেখানেই এই গল্পের বিরোধাভাস। যেমন করে কানা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পের বোবা মেয়ে সুভাষিণীকে মনে পড়ে। ঠিক তেমনই বৈপরীত্য তিলোত্তমার নাম এবং রূপে। নামটির অবশ্য একটি পৌবাণিক অনুষঙ্গ আছে। সুন্দ ও উপসুন্দ বধের জন্য তিল তিল করে সৃষ্টির যাবতীয় সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমার নির্মিতি। কিন্তু, আলোচ্য গল্পের তিলোত্তমা 'কুচ্ছিত হাঁদামুখো মোটা মেয়ে', 'মুক্তকেশী বেগুনের মতো মুখ', 'ত্রিলের মতো কুচকুচে কালো এবং গোল' এমন পুত্রবধূ

দেখে স্বামীর উদ্দেশে গোকুলের মায়ের বিষোদগার—"ভীমরতি ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ, সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে?" সুতরাং সৌন্দর্যের চিরাচরিত সংজ্ঞা তিলোত্তমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়৷ এ হেন নারীকে শুভদৃষ্টির সময় প্রথম দেখে গোকুলের ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। বিশেষতঃ নাম শ্রবণে যেখানে গোকুলের কল্পনার বিস্তারে তার মনের মধ্যে এক অপরূপার ছবি আঁকা হয়েছিল। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এতখানি তফাতে গোকুল সঙ্গত কারণেই বিচলিত হয়েছে। তার মানসিক অবস্থা বোঝাতে লেখক 'ঘাবড়াইয়া গেল' শব্দ দুটির দুবার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি প্রভৃতি বিচিত্র ধ্বনির উল্লেখে গোকুলের চিত্ত-আলোড়ন ব্যঞ্জিত করেছেন। ঘটনা ও চরিত্রের চকিত উদ্ভাসনে ছোটগল্পের সংহতরূপ সর্বত্রই যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

যাকে নিয়ে এত সমস্যা সেই তিলোত্তমা কিন্তু নির্বিকার। তার পিতার উদ্দেশে শ্বশুরের মিথ্যা ভাষণকে সে বিবাহ ব্যাপারে 'এসব হইয়া থাকে' বলে মনে করে এবং স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্ভাবনাও তার মতে "হিঁদুর ঘরে হয়তো অমন"। স্বামীকে সে ভালোবাসে। পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ও নির্ভরতা আছে, আছে আজন্ম লালিত কিছু সংস্কার। অন্য হিন্দু রমণীর মতো স্বামীর সুখকে সে নিজের সুখ বলে মনে করে। স্বামীর ভালবাসা পেল কি না পেল সে বিষয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। তথাপি শ্বশুরবাড়িতে সে ব্রাত্য হয়েই রইলো। শাশুড়ী তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেন না। শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজা ও রাশি রাশি কাপড় কাচার মধ্যেই শ্বশুরবাড়িতে তার টিকে থাকা। কিন্তু সংসারে তার অবস্থান নিয়ে তিলু এতটুকু প্রশ্নাকুল নয়। অধিকারবোধ ও অভিমানবোধের কোনো দ্বন্দ্ব তার মধ্যে লক্ষিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে এই জাতীয় চরিত্র ব্যক্তিত্বহীন বলে মনে হয়। অবশ্য ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সে পেয়েছিল কি-না এ প্রশ্ন থেকেই যায়। গল্পকার তিলোত্তমার পিতৃগৃহের কোনো পরিচয় দেন নি। তবে সে "না জানে লেখাপড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব"—ইত্যাদি বলার মধ্য দিয়ে তার পিত্রালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যায়। রূপ না থাকার কারণে সে হীনম্মন্যতাতেও ভুগতে পারে। তাই তার নিজের মধ্যে নিজের সসঙ্কোচ আত্মগোপন। প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করে যে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, "অনধিকারী হইয়াও ভাগ্যবলে এমন সুখস্বর্গে" প্রবেশ করেছে। এটুকু সে কোনো অবস্থাতেই হারাতে চায় না। আবার, এও ঠিক যে, হীনম্মন্যতাবোধ থেকে বহুক্ষেত্রে মানসিক বিকৃতি আসে। তখন আত্মপীড়ন ও পরপীড়ন গোছের অদ্ভুত মানসিকতার উদ্ভব বিচিত্র কিছু নয়। তিলোত্তমা কিন্তু এসবের ব্যতিক্রম। কোনো অসহিষ্ণুতা বা অক্ষমা তার আচরণে কখনো প্রকাশ পায় নি। সে রান্নাঘরে প্রবেশ-অধিকার না পেলেও "বাহিরের কাজকর্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে।" বাইরের সৌন্দর্যহীনতা তিলোত্তমার অন্তঃকরণকে শ্রীহীন করে নি। কোনো কিছুর মধ্যে নেতিবাচক বা খারাপ খোঁজা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। নিজের রূপের দীনতা সম্বন্ধে সে সচেতন, কিন্তু চিত্ত-বিক্ষোভের কোনো প্রকাশ তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি না। সে যেন—

"যা কিছু পেয়েছি
যাহা কিছু গেল চুকে"

জাতীয় সমঝোতাতেই সন্তুষ্ট। উষার সঙ্গে গোকুলের বিবাহ স্থির হয়ে যাওয়ার পরেও সে ভাবান্তরহীন, নির্লিপ্ত। গোকুল অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করেছে—"তোমার আপত্তি নেই তো?" তিলোত্তমার সংক্ষিপ্ত উত্তর—'না"। স্বামীর বিবাহের পরই নববধূর জায়গা ছেড়ে দিতে তাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে হবে জেনেও সে অবিচলিতচিত্ত। বলেছে, "তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া ক'রে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।" তিলোত্তমা সরল বিশ্বাসে তার স্বামীর কাছে এই সামান্য প্রাপ্তিটুকু আশা করেছে। স্ত্রীর অধিকারবোধের জায়গা থেকে কোনো কিছু দাবি করে নি। দাম্পত্য সম্পর্কের পুরনো আদলে যে বিশ্বাসী তার কাছে অবশ্য অধিকারবোধের প্রশ্ন-টশ্ন অবান্তর। স্বামীর আশীর্বাদের দিনও সে একইরকম নির্বিকার। কী হারাতে চলেছে এমন ভাবনাতেও সে এতটুকু বিচলিত নয়। এমন কি গোকুলের সঙ্গে কথোপকথনেও তার মধ্যে আত্মসচেতনতার সামান্যতম প্রকাশ ঘটে নি। অন্যান্য দিনের মতো সে তার অভ্যস্ত রুটিনেই সেদিনটিও শুরু করেছে—"তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।" বলাবাহুল্য, এ চিত্রে শ্বশুরবাড়িতে তার অনাদৃত অবস্থানটিও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ছোট ছোট ইঙ্গিতে এই গল্পের কায়া নির্মিত হয়েছে। ক্ষুদ্র চিত্রে এসেছে বৃহৎ ব্যঞ্জনা। কুরূপা তিলোত্তমা শ্বশুরবাড়িতে সমাদর না পেলেও বধূ-নিগ্রহের কোনো উল্লেখ নেই এই গল্পে। যদিও তিলোত্তমার শাশুড়ী পুত্রবধূ সম্বন্ধে পেত্নীর তুলনা এনেছেন। তার শ্বশুর বেগতিক দেখে অবলীলায় মিথ্যা ভাষণ করেছেন—"ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ গোলগাল গড়ন।" এবং তাঁর ঘোষণা—"ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।" —ইত্যাদি বর্ণনায় শ্বশুর-শাশুড়ীর যে ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তা নববধূর পক্ষে ভয়ঙ্কর তো বটেই। আবার, এও মনে রাখতে হবে, তিলুর বাবা যে নগদ টাকা ও দানসামগ্রী দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করেন নি। অভিজ্ঞ নকুল নন্দী মোটা পণের বিনিময়ে ঐ 'কুচ্ছিত' মেয়েটিকে পুত্রবধূ করতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁর মতো হিসেবী মানুষকেও দারুণভাবে ঠকে যেতে হয়েছে। সুতরাং প্রত্যাঘাতের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ছেলের পুনঃবিবাহের আয়োজন তিনি করতে পারতেন। অথচ বিবাহের এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল, এ বিষয়ে তিনি কোনো উদ্যোগ নিলেন না। তবে তিলুর সারাদিন বাসন মাজা ও কাপড়কাচার উল্লেখে গৃহবধূর মর্যাদার প্রশ্নটি উত্থিত হলেও এ প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনাটি মনে রাখা জরুরি—"গুণের মধ্যে মহিষের মতো খাটিতে পারে" এবং এর জন্য "তার ভ্রূক্ষেপ নাই।" কাজেই সে লাঞ্ছিত এমন ভাবা সঙ্গত নয়। স্বামী হিসেবে গোকুলকেও অমানবিক বা অত্যাচারী ভাবা যায় না। রূপহীনা স্ত্রীর মধ্য থেকে সে তার স্বভাবের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিল। এদিক থেকে গোকুল সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পের সুকুমারের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। তাই শুধু রূপের জন্য নয়, মনের সঙ্গী হিসেবেও অন্য কোনো নারীর সাহচর্য-কামনায় তার পুনর্বিবাহের ইচ্ছা হয়েছে। তীব্র অভাববোধ থেকেই তার এই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা।

উষাকে দেখে গোকুল কূল হারালেও তটস্থ হওয়ার শক্তি তার মনের মধ্যেই নিহিত ছিল। সেই শক্তির মূলে আছে তার বিচারবোধ এবং অনুভূতিপ্রবণ মন। কাজেই বারবার গোকুলের মনে হয়েছে, "তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য"। অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে তিলোত্তমাকে অস্বীকার করেনি সে। তার প্রশ্ন করার ভঙ্গিটিও আন্তরিক—"দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো?" শেষপর্যন্ত অবশ্য তিলোত্তমার অসম্মতি নয়, গোকুলের আপত্তিতেই উষার সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে গেছে। অত্যন্ত সংযত ভঙ্গিতে সে তার আপত্তি জানিয়েছে—'‘আমাকে মাপ করবেন," তারপর দুহাতে মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দ্রুতপদে উপরে উঠে গেছে। নাটকীয় ক্ল্যাইম্যাক্স-এ এখানেই গল্পটির যোগ্য উপসংহার রচিত হয়েছে।

ছোট ছোট চিত্র ও ব্যঞ্জনায় 'তিলোত্তমা' গল্পের প্রতিটি চরিত্রই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রূপ ও যৌতুকের প্রতি কম-বেশি প্রায় সকলেরই আকর্ষণ থাকে। উষাকে দেখে শুধু গোকুল নয়, তার জননীও মুগ্ধ হয়েছেন। মুগ্ধতার সঠিক মাত্রাটি বোঝাতে লেখক 'আত্মহারা' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। গোকুলের পিতার আত্মহারা হওয়ার কারণ অবশ্য অন্য— "নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটোখাটো একটা জমিদারি ঘরে আসিবে।" পাওনা-গণ্ডার পরিমাণ বিচার করে উষার মায়ের কলঙ্কও এক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছেন নকুল নন্দী। মানুষের লোভ এবং ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির পরিচয় এখানে স্পষ্ট। আবহমানকাল ধরে এই মানুষ কেনা-বেচার পদ্ধতি চলে আসছে। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে সে বাইরের।

এই গল্পে বৈপরীত্যের অনেকগুলি মাত্রা আছে। প্রথমতঃ, তিলোত্তমার নাম ও রূপের বৈপরীত্য। দ্বিতীয়তঃ, গোকুলের সঙ্গে তার স্বভাব-বৈপরীত্য এবং তৃতীয়তঃ, উষার সঙ্গে তার রূপের বৈপরীত্য। —তিলোত্তমা "তিলের মতই কুচকুচে কালো" আর উষা—"উষা নয়—দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্র কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে।"

আবার, তিলোত্তমার—"ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি।" কিন্তু উষার—"চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ।" এমন সুন্দরী রূপবতীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিলোত্তমা পেরে উঠবে কীভাবে? উষা তিলুর মতো সংকুচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী নয়, স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে বলতেই সে ভালবাসে।.তাই বিবাহের আগেই সে একটা শর্ত করলো— "তিলোত্তমাকে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।" উষা নিজের প্রতি উদাসীন নয় বলেই আপন অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন; আর তিলোত্তমা স্বামীর সুখের জন্য নিজের অধিকার বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এই 'contrast' বা বৈপরীত্যের আবর্তেই আলোচ্য গল্পের সমাপ্তি পর্বটি সম্ভাবিত হয়েছে।

কোনো কিছু পাওয়ার মধ্যে আছে আনন্দ, কিন্তু ছাড়ার মধ্যে আছে শক্তি। সেই শক্তি সংকুচিত ব্যক্তিত্বের তিলোত্তমার ছিল। সংসারে সবচেয়ে তুচ্ছ ও অপাংক্তেয় যে, এতবড় এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি সে পেল কোথা থেকে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সেই শক্তি, সেই ভীরু শঙ্কিত ভালোবাসার নীরব বেদনা গোকুলের স্পষ্ট অনুভবে ধরা পড়েছে, যখন তারই আশীর্বাদের শাঁখ বাজানোর ডাক পড়েছে তিলোত্তমার এবং শাশুড়ীর সেই আদেশ পালন করতে 'শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া

দাঁড়াইল।" কিন্তু শাঁখটা বেজে উঠতেই গোকুলের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিদ্যুৎ শিহরণ হয়তো তার সুপ্ত বোধের উন্মেষ। এই বোধের অধিকারী যে, সে কূল হারিয়েও কূলে ফিরতে জানে। মাত্র এক বৎসর সময়কালে তিলোত্তমা তিলে তিলে যে কীভাবে তার হৃদয় অধিকার করেছে তা গোকুল নিজেও বুঝতে পারে নি। মানব-মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের শিল্পসম্মত প্রকাশেই এই গল্পের সিদ্ধি। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাই যথার্থই বলেছেন— "মানুষের বাইরের মন ও ভিতরের মনের চেতন-অবচেতন লোকের বাসনা ও সংস্কার, বুদ্ধি ও ব্যবহারের মধ্যে যে সংঘাত এবং তার ফলে জীবনের সুখ-দুঃখের যে লীলাবৈচিত্র্য তার রহস্য উন্মোচনেও বনফুলের শিল্পদৃষ্টি অব্যর্থ।"

পুরাণে দৈত্য-নিধন তথা অশুভের বিনাশের জন্য যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছিল, বনফুলের গল্পে তাকেই আমরা চেতনার শুভ-আলোকে খুঁজে পেয়েছি। পুরাণের অপ্সরা তিলোত্তমার হাস্য-লাস্য-কটাক্ষ কালের স্রোতে ভেসে গেছে, শুধু পড়ে আছে তার প্রীতি-স্নিগ্ধ, শোভন-সুন্দর অন্তর্লোক, —একালের তিলোত্তমা তারই উত্তরাধিকার বহন করছে।

শ্রীপতি সামন্ত : অভাজনে মহাজন

সনৎকুমার নস্কর

'শ্রীপতি সামন্ত' কেবল বনফুলের নয়, বাংলা গল্পভাণ্ডারের এক অনন্য সম্পদ। গল্পটি আকারে খুব ছোট, কিন্তু সেই আয়তনকে ছাপিয়ে যায় গল্পটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। যে-টেক্নিক্ লেখক অন্য অনেক গল্পে ব্যবহার করেছেন এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। গোড়া থেকে পরিবেশ-পরিস্থিতি-ঘটনা ও চরিত্রগুলি স্বল্পরেখায় আঁকতে আঁকতে হঠাৎ পৌঁছেছেন গল্পের ক্লাইম্যাক্সে; তারপরেই সেই চাবুক-হাঁকড়ানো পরিণতি আর তীব্র ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে লেখকের দ্রুত প্রস্থান। কাকে তিনি বিদ্ধ করেন এই গল্পে? বাক্সর্বস্ব, অপদার্থ, আড়ম্বরপ্রিয়, ধোঁকাবাজ এক বাঙালি সাহেবকে। যিনি স্বদেশে তথাকথিত অভদ্রজনকে মনুষ্যপদবাচ্য বলে বিবেচনা করেন না, তাদের সুখ-দুঃখেও কোথাও বিচলিত হন না এবং কৌশলে বাক্পটুতায় ঢাকতে চান নিজের দৈন্য ও অপরাধ। 'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন'—এইরকমের এক আপ্তবাক্য হয়তো পাঠকের মন আউড়ে নিতে পারে সাহেববেশী বাঙালিবাবুটিকে দেখে; কিন্তু না, এ গল্পে মেকী সাহেবটিই যে লেখকের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু নয়, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে এর অ-দ্ব্যর্থ শিরোনামে। লেখক তাঁর চিন্তার ভরকেন্দ্রটিকে রক্ষা করেছেন শ্রীপতি সামন্ত নামের এক নিতান্ত গোবেচারা গ্রাম্য মানুষটির উপর। এই চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে তোলবার তাগিদে বিপরীত প্রান্তে আনা হয়েছে সাহেবসুবোটিকে। বেশবাসের চাকচিক্য বা ভাষার পারিপাট্যই যে মানুষের শেষ পরিচয় নয়, প্রকৃত ভদ্র আচরণ ও নৈতিক সাধুতাই একজন লোককে যথার্থ মানুষ পদবাচ্য করে তোলে—এ ধরনের একটা কেন্দ্রীয় ভাবনা বেরিয়ে আসে পুরো আখ্যানটি ভেদ করে। বলাবাহুল্য, সমগ্র গল্পটি স্নিগ্ধ কৌতুকে মুড়ে খুবই হাল্কাচালে পরিবেশন করেছেন লেখক, অথচ আঘাত যেখানে লাগবার সেখানে সেটা মোক্ষম হয়েই লেগেছে।

একথা বলার বোধহয় অপেক্ষা রাখে না যে শক্তিমান গল্পকারদের গল্পের নিজস্ব কিছু চরিত্র থাকে। বনফুলের গল্পও সেই তাৎপর্যে অবশ্যই চরিত্রবান। বাক্সংক্ষিপ্তির কারণে তাঁর অণু গল্পগুলি তো ভীষণই আঁটোসাঁটো গঠনের। কোথাও তা ঘটনা-বহুলত্বে এলায়িত হয়ে পড়ে না। কোনো দীর্ঘ ভূমিকার অপেক্ষা না করেই তাঁর গল্প বিদেশী সংজ্ঞা মেনে শুরু হয়ে যায় 'from the initial sentence –' এই। আমাদের আলোচ্য 'শ্রীপতি সামন্ত'-কে কেমন টান-টান তারে বেঁধেছেন বনফুল তা একটু লক্ষ করা যাক। দুটি বিপরীতধর্মী মানুষকে স্পষ্ট করবার জন্য তাঁর এই গল্পের আয়োজন। খুবই সাদামাটা সিকোয়েন্স। ব্যস্তসমস্ত এক শহরতলীর প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাত্রীবোঝাই একটি ট্রেন। চলেছে কলকাতার অভিমুখে। ট্রেনটি অসম্ভব ভিড়ে ঠাসা। তবে ভীড় সর্বত্র সমান নয়। রেলের শ্রেণীগুলি যেহেতু টিকিটের অর্থমূল্যের উপর নির্ভরশীল তাই তৃতীয় থেকে প্রথম শ্রেণী অবধি চারটি শ্রেণীতে ভীড় ক্রমশ পাতলা হয়ে গেছে। সূচনাতেই লেখক প্রথমশ্রেণীস্থ সাহেবী পোষাক পরিহিত

এক 'ভদ্রলোক'-এর কথা জানিয়ে দিয়ে তাঁর পাঠককে সামান্য উদ্দেশ্যাভিমুখী করে তোলেন। এরপরেই কাহিনীবৃত্তে ঘটে শ্রীপতি সামন্তের প্রবেশ। শ্রীপতি দেহাতী মানুষ। তাঁর বেশবাস, কথাবার্তায় কোথাও কোনও শহুরে পালিশের নামগন্ধ নেই। লেখক তাঁর বাহ্যদৃশ্যের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তাতে লোকটি সম্পর্কে পাঠকের কোনও উচ্চধারণাই গড়ে ওঠে না। বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু নিখুঁত ও চরিত্র প্রকাশক : 'পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দেশী মুচির তৈয়ারী চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডানদিকে ডাণ্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা।' এধবনের মানুষ নিয়ত আমাদের চারপাশে ঘোরে, কিন্তু আমারা চরম উদাসীনতায় মনের ধূসর পর্দা থেকে এদেরকে মুছে ফেলি। কেননা বাহ্যত এদের মধ্যে আকর্ষণীয় কোনও জৌলুস নেই, মনোযোগ দাবি করবার মতো কোনো ঐশ্বর্য নেই। কিন্তু গল্পকার বনফুলের স্বভাবই এই যে, তিনি প্রায়শই সাধারণের মধ্যে খুঁজে পান কোনো অসাধারণত্বকে, অপাংক্তেয়কে দেখেন চরিত্রের কোনো দ্যুতিময় আলোয়। শ্রীপতি সম্পর্কেও পাঠকের মনে একটা প্রাথমিক ধাবণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তিনি, পরে অপূর্ব কৌশলে ভেঙে দেন সেই সযত্ন-নির্মিত ধারণাকে। তুচ্ছ, অনাকর্ষক একটি মানুষেব মধ্যে অসম্ভব এক সদ্‌গুণকে উপলব্ধি করে পাঠকও বিস্মিত না হয়ে পারে না। এখানে শ্রীপতি সম্পর্কে পাঠকের প্রাথমিক ধারণাটি কেমন? স্বল্পরেখায় যেটুকু ফুটেছে তাতে মনে হয়, আর পাঁচজন ছাপোষা গেবস্তের মতো তিনিও সুযোগসন্ধানী। 'বিনযগদগদ' মুখখানি তাঁর কাজ হাসিলের মস্ত হাতিয়ার। এই ভীড় ট্রেনেই তিনি কলকাতায় চলেছেন, আর তাঁর টিকিট তৃতীয় শ্রেণীব—সবচেয়ে সস্তা দামেব। সেখানে তাঁব পক্ষে ওঠা অসম্ভব, কেননা লেখক পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে।' সামন্ত-মশাই হয়তো সেই 'বোঝার উপর শাকেব আঁটি' হতে পাবতেন কিন্তু সেখানে তিনি উঠতে পাবলেন না সম্ভবত আবো দুটি ব্যক্তিগত কাবণে। প্রথমত বিগত দুইরাত্রি তিনি নিদ্রাহীন, তাই 'অদ্য তাঁহার নিদ্রার অত্যন্ত প্রয়োজন', আব দ্বিতীয়ত, তিনি কলকাতায় চলেছেন ব্যবসাব কাজে। তিনি একা নন। তাঁব সঙ্গে রয়েছে কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড, একটি তবমুজ, একটা বঁটি, একটা ছিপ অনেকগুলো বোঁচকা ও পুঁটলি, এক টিন ঘি এবং একজন পরিচাবক। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও সুযোগসন্ধানী মাত্রই যা করে থাকে শ্রীপতিও তাই করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ রেলের কোন পদস্থ ব্যক্তিকে ধরে ট্রেনের খালি জায়গাতে ব্যবস্থা করে নেওয়া—সে ব্যবস্থা যত অস্বাচ্ছন্দ্যেব এবং নিচু স্তরের হোক না কেন। স্টেশনের ছোটবাবুকে হাতের কাছে পেয়ে শ্রীপতি কাকুতি মিনতি করতে থাকেন ফার্স্ট ক্লাসের লাগোয়া চাকরদের জন্য বরাদ্দ কামরাতে চড়ে বসতে। সামন্ত-মশাইয়ের এই কথাবার্তা ও আচার-আচরণের নীরব শ্রোতা ও দর্শক ছিলেন সেই সাহেবী পোষাকের বাঙালি ভদ্রলোকটি যাঁর ধূমায়মান পাইপটি তাঁর উচ্চশ্রেণী ও আভিজাত্যেব সূচক হয়ে মুখের এক প্রান্ত থেকে ঝুলছিল। শ্রীপতির কাতর আবেদনে ছোটবাবুর মন কিছুটা সরস হলেও সেই ভদ্রলোকটি শ্রীপতির বেশবাস, চেহারা ইত্যাদি দেখে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাঁর পক্ষে চাকবেব জন্য বরাদ্দ কামরাতেও শ্রীপতিকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। বৃদ্ধ

সামন্ত-মশাই তবুও বাবুটির আনুকূল্য পাবার আশায় হাত জোড় করে বলে ওঠেন, 'আমিও তো হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি। অনুমতি যদি করেন দয়া করে—।' কিন্তু তবুও মন গলে না ভদ্রলোকের। তিনি বৃদ্ধের সঙ্গে অনর্থক বাগবিতণ্ডা করে সময় নষ্ট করতে নারাজ। তাই স-পাইপ মুণ্ডটি ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে চটকে যাওয়া মেজাজকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক পাখাটা 'ফুল ফোর্সে' চালিয়ে দেন। ট্রেন ছাড়ার শেষ ঘন্টি বেজে যায়। তখন অগত্যা শ্রীপতি সামন্ত মতিস্থির করে নেন এবং প্রথম শ্রেণীতে পা দিয়ে তাঁর যাবতীয় মালপত্র তাড়াহুড়োয় সেখানে উঠিয়ে নেন। আর সঙ্গের ভৃত্যটিকে পাঠিয়ে দেন পাশের চাকরদের কামরায়।

গল্পটির দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্যায় শুরু হয় এরপর। এ পর্যায়ে উপর্যুপরি এমন দুটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যায়, যার আকস্মিকতায় পাঠক প্রথমত বিমূঢ় হয়ে পড়ে, পরে ধাক্কা সামলে উৎকট হাস্যে ফেটে পড়ে। আর অপ্রত্যাশিত আঘাতের রেশ ফুরোবার আগেই সুযোগ বুঝে ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে লেখকও কেটে পড়েন গল্পটির জমাটি মজলিশ থেকে। কী কী ঘটনা ঘটে এই পর্যায়ে? কর্তব্যরত এক পাঞ্জাবী টিকিট পরীক্ষক যথাসময়ে এসে দেখা দেন ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। শ্রীপতি সামন্ত উপযুক্ত ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রসিদটি গুছিয়ে রাখেন ট্যাঁকের গেঁজেতে। তারপর বোধহয় তিনি নিশ্চিন্ত মনে সুখনিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ভাগ্যে যার সোয়াস্তি নেই, তাঁর কপালে তো নানা উটকো ঝঞ্ঝাট জুটবেই। নিদ্রাসক্ত সামন্তমশাইয়ের তন্দ্রাচ্ছন্নতা হঠাৎ ঘুচে যায় পাঞ্জাবী ক্রু ও বাঙালি সাহেবটির সচিৎকার হিন্দী বচসায়। বচসা বেধেছে সাহেবটির টিকিট নিয়ে। পাঞ্জাবী ক্রু-টি নিয়মমাফিক টিকিট দেখতে চাইলে বাঙালি সাহেব বাক্-কৌশলে টিকিট দেখানোর ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চান, কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ টিকিট পরীক্ষক ভদ্রলোকের প্রকৃত মতলবটি বুঝতে পেরে খানা-তল্লাশি চালিয়ে কোন টিকিটই খুঁজে পান না। এ নিয়ে দু'দলের বাগ্‌বিতণ্ডা চরমে ওঠে, আর সেই আওয়াজে জেগে ওঠেন শ্রীপতি সামন্ত। আকস্মিক এই ঝগড়ায় সামন্তমশাই মনে মনে খুবই বিরক্তি-বোধ করেন, দোষ দেন নিজের মন্দভাগ্যের। কেননা অনেক পয়সা বেশি দিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে যেতে চেয়েছেন কেবল আজ রাতটা নিরুপদ্রবে নিদ্রা দেবেন বলে। কিন্তু এ রকম ধুন্ধুমার ঝগড়া চলতে থাকলে নিদ্রা অসম্ভব—অর্থাৎ আখেরে টাকাটা তাঁর জলেই গেল। এই কথা ভেবে তিনি ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে হাই তোলেন। এমন সময়ে তাঁর কানে আসে পাঞ্জাবী ক্রু-টির এমন একটি মন্তব্য যাতে তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ক্রু-টি মিথ্যাবাদী, চালিয়াৎ, প্রবঞ্চক ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে সমস্ত বাঙালি বাবুদের উদ্দেশে যে-মন্তব্য করে বসেন তা শুনে জাতি-সম্মানে গর্বিত শ্রীপতি সামন্ত আহত হন এবং নিজের গেঁজে থেকে টাকা বের করে অপরিচিত বাঙালি সাহেবটির পুরো ভাড়া মিটিয়ে দেন। কেমনভাবে টাকাটা তাঁর গদিতে পরিশোধ করবেন সেকথা সাহেবটিকে জানানোর পর হিন্দীভাষী পাঞ্জাবী ক্রু-টির দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে সামন্ত মশাই বললেন, 'কটা বাঙালি আপ দ্যাখ্যা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন্ দিশি ভদ্রতা রে বাপু!' এবং তারপরেই ইষ্টনাম জপতে জপতে কামরার বেঞ্চে লম্বমান হলেন। কেননা 'অদ্য তাঁহার

নিদ্রার অত্যন্ত প্রয়োজন।' গল্পটি শেষ হয় লেখকের পরিহাস-নিপুণ এক মন্তব্যে : 'বাঙালি সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরৎ দিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।'

এমন নির্মেদ, রসঘন, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ গল্প খুব অল্পই লেখা হয়েছে সারা বাংলা সাহিত্যে—যার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রচণ্ড টান-টান কৌতূহল কাহিনীর অভ্যন্তরভাগে রয়ে গেছে। এ গল্পে ব্যবহৃত কোন বাক্যকেই অতিরিক্ত অবান্তর বলে মনে হয় না। ঠিক যতটুকু প্রকাশ করার প্রয়োজন বনফুল কেবল সেটুকুই উপস্থাপিত করেছেন এখানে। বাক্যের শব্দগুলিও সুনির্বাচিত, অমোঘ। ঘটনা-সংস্থাপনের মুন্সিয়ানায় মুখ্য চরিত্র-দুটি তাদের দোষ-গুণ-বিশেষত্ব নিয়ে চমৎকার স্পষ্টতায় উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লেখকের চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতাও চমৎকার। অণু গল্পে স্থান স্বভাবতই সংকীর্ণ, অধিকাংশ বাক্যই ইঙ্গিতধর্মী। তবু জাত-খেলোয়াড় যিনি তিনি এই স্থানটুকুতেই দুর্দান্ত খেলতে পারেন। বনফুল এসব ক্ষেত্রে অনবদ্য। তিনি শব্দখরচে ভীষণই মিতব্যয়ী। প্রয়োজনের বাইরে একটা অতিরিক্ত বাক্যও লিখতে তিনি কৃপণ। এই কৃপণ হাতেই তিনি এ গল্পে এঁকেছেন জাত্যাভিমানী শ্রীপতি সামন্তকে, অথচ কোথাও মানুষটিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় না। শ্রীপতি গড়পড়তা বাঙালিরই একজন। নিজেকে কোনভাবেই জাহির করার চেষ্টা নেই। পোষাক-আশাকে, চেহারায় তিনি নিতান্ত সাদামাটা। বেশবাসের বাইরে লেখক তাঁর শরীরের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তাতে কোথাও কোন জৌলুষ চোখে পড়ে না : 'ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা; চক্ষু দুইটি রক্তাভ, চোখের পাতা নাই। মাথায় টাক। বর্ণ নাতি-ফরসা-কালো।' তবে চোখের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শ্রদ্ধা আকর্ষক ও তাঁর লোলচর্ম নির্লোভ মুখখানি বিনয় গদগদ। এ মানুষের মধ্যে কোথাও যে কোন ব্যক্তিত্ব কিংবা বিশিষ্ট মূল্যবোধ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কল্পনারও অতীত। সেজন্য এই মানুষটি যখন হাত কচলে তোয়াজের সুরে স্টেশনের ছোটবাবুর কাছে চাকরদের কামরায় ওঠবার অনুমতি ভিক্ষা করেন, তখন সেটাকে খুব একটা অসঙ্গত মনে হয় না কারো। এমনকি বাঙালি সাহেবটির চাকরের তুল্য নিজেকে ছোট করতে তাঁর কোথাও আত্মসম্মানে বাধে না। হঠাৎ মনে হতে পারে, দারিদ্র্য বোধহয় লোকটিকে এতটাই হীনমন্য করে তুলেছে; তিনি বোধহয় কৃপা ও করুণার প্রত্যাশী। ফলে তাঁর কোন-কিছুতেই কোন অপমানবোধ নেই। কিন্তু এ হেন অবজ্ঞেয় শ্রীপতি সামন্ত সম্পর্কে গড়ে ওঠা ধারণা ধীরে ধীরে গল্পকার ভেঙে দেন তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে। প্রথম ধাপ : স্টেশনের ছোটবাবু ও বাঙালি সাহেবের কাছে কাকুতি-মিনতি করার পরেও চাকরদের কামরায় উঠতে না পেরে সর্বোচ্চ মূল্যের প্রথমশ্রেণীতে তাঁর চড়ে বসা। দ্বিতীয় ধাপ : টিকিট পরীক্ষকের আগমনে কোমর থেকে গোঁজে বের করে টিকিটের উচিত মূল্য বিনা বাক্যব্যয়ে চুকিয়ে দেওয়া। লেখক সেখানে একটি অতিরিক্ত তথ্য দেন যা কৌতূহলজনক—'যদি কেহ গণিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোট রহিয়াছে।' এইখানে হঠাৎ পাঠকের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়, শ্রীপতি সামন্তের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করা কি তাঁর দারিদ্র্য-বিলাস, না স্বভাব-কার্পণ্য? সম্ভবত এই দুই বিকল্পের কোনটাই এর যথার্থ উত্তর

নয়। আসলে শ্রীপতি সামন্ত প্রখরভাবে মিতব্যয়ী; প্রয়োজনে তিনি পয়সা খরচে দরাজহস্ত। যেটা দেখা গেল তৃতীয় ধাপে। পাঞ্জাবী ক্রু-র বাঙালি-জাতির সমালোচনা স্বাজাত্যভিমানী শ্রীপতিকে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ করে তোলে, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতে পারেন না স্বজাতির এক চালিয়াৎ সাহেব-সুবোর অপকীর্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণে। তাই নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে অপমানের হাত থেকে সেই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাককে উদ্ধার করার পরই প্রতি-আক্রমণে নামেন তিনি। একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির জন্য তাঁর এই দরদ পাঠককে বিস্মিত করে, আমরা আরো স্তম্ভিত হই একথা ভেবে যে কিছুক্ষণ আগে সামন্ত মশাই এই সাহেব ভদ্রলোকটির কাছে যে-ধরনের ব্যবহার পেয়েছিলেন তা ইতিমধ্যে ভুলে গেলেন কীভাবে। একি সেই প্রৌঢ়োক্তিকে স্মরণ করায় : 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?' শ্রীপতি সামন্ত যে কেন এই অসম্ভব উদারতা দেখিয়ে ফেলেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা গল্পের মধ্যে না থাকলেও তাঁর কথিত একটি উক্তিতে এর ইঙ্গিতটি অর্থপূর্ণভাবে ধরা আছে। বাঙালি বাবুটির অপরাধ থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাবী ক্রু-টির জাত তুলে গালি দেওয়াটাই সবচেয়ে বেশি লেগেছে শ্রীপতির। এই বিশেষ বোধের সরণী বেয়ে নিতান্ত সাদাসিধে গোবেচারা শ্রীপতি সামন্ত সম্পর্কে এবার স্পষ্ট একটা ধারণায় পৌঁছে যাই আমরা। তিনি নিজের জীবনযাপনে কোথাও বিলাস বা আরামপ্রিয়তার ছাপ রাখেন না বটে, তবে তিনি একজন পরিপূর্ণ আত্মসচেতন, জাতিগর্বী মানুষ। কোন জাতের বিশেষ একটা মানুষকে দেখে সমস্ত জাতটাকে বিচার করার পক্ষপাতী তিনি নন এবং বিপন্ন স্বজাতির উদ্ধারে তিনি কখনো আত্মপর বিবেচনা করেন না। এই মহৎ গুণই শ্রীপতি সামন্তকে এ গল্পের নায়ক বানিয়েছে। বিচিত্রদর্শী লেখক শ্রীপতিকে উপস্থিত করেছেন তুচ্ছের মধ্যে উচ্চগুণের আবির্ভাবের সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে। সাধারণের ভিতর অসাধারণত্বকে প্রত্যক্ষ করার নামই যদি হয়ে থাকে কবি-দৃষ্টি, তাহলে এ গল্পে বনফুল সেই দুর্লভ প্রজ্ঞাদর্শনকেই তুলে ধরেছেন অতি সাধারণ অতি নগণ্য অথচ মহৎ গুণের অধিকারী অশিক্ষিত গ্রাম্য অপরিচ্ছন্ন কুদর্শন শ্রীপতি সামন্তের মধ্য দিয়ে।

অন্যপক্ষে, প্রাদেশিক সৌভ্রাতৃত্ববোধের মানদণ্ডে যদি ধোপ-দুরস্ত বাঙালি সাহেবটিকে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সামন্ত মশাইয়ের ঠিক বিপরীত বিন্দুতে। তাঁর যাবতীয় প্রয়াস যেন নিজের জন্মগত জাতি-পরিচয়টিকে মুছে ফেলে দিতে। তাঁর কেতা-দুরস্ত সাহেবী পোশাক, মুখের সধূম পাইপ, পাইপ চিবিয়ে ইংরেজিতে কথা বলা এবং সর্বোপরি স্বদেশী ও স্বভাষী বিপন্ন মানুষটিকে কোনভাবে আনুকূল্য না করা—তাঁর বাঙালি-পরিচয় অস্বীকারের এক-একটি লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর কাছে বৃদ্ধ শ্রীপতির অসহায়তা, দুশ্চিন্তা, ছুটোছুটি, কাকুতি-মিনতি এক উপভোগ্য কৌতুককর বিষয় বলে মনে হয়েছে এবং তিনি প্রথমাবধি ট্রেনের জানালার বাইরে মাথা গলিয়ে ধূমপান করতে করতে এই দৃশ্য একজন নীরব দর্শকের মতো মজার সঙ্গে উপভোগ করছিলেন। কেবল তখনই সামন্ত মশাই তাঁর কাছে আপদ বলে বিবেচিত হন যখন ছোটবাবুটি বৃদ্ধের অসহায় অবস্থা দেখে সামান্য নরম হয়ে চাকরদের জন্য বরাদ্দ কামরায় ওঠার সিদ্ধান্ত

গ্রহণের ভার এই সাহেবটির উপর ছেড়ে দেন। আপদ-বালাইকে মুহূর্তে বিদায় করতে কোথাও বাধে না জামা-জুতোর পালিশে সাহেব হয়ে ওঠা এই ভদ্রলোকটির। তিনি স্পষ্টই মাথা নেড়ে জানিয়ে দেন—'দ্যাট কান্‌ট বি। আই কান্‌ট অ্যালাউ।' বৃদ্ধ শ্রীপতি তখন শেষ চেষ্টা স্বরূপ করজোড়ে বিনীত আবেদন করলেও তাঁর কঠিন মন গলে না এবং তিনি বাগ্‌বিতণ্ডা করে সময় নষ্ট করতে সম্মত না হয়ে উটকো ঝঞ্ঝাটটিকে ঝেড়ে ফেলতে ট্রেনের বাইরে বেরনো মাথাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেন। আসলে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, কথা-বার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, শরীরী জৌলুষ ইত্যাদি কোন সূত্রেই এই মানুষটিকে নিজের 'দেশোয়ালী' বলে ভাবতে পারেননি; তাঁর মধ্যে কোথাও কোন প্রাদেশিক ভাবাবেগের স্পর্শ ছিল না। গল্পের শেষে লেখক এই নির্বিকার-চিত্ত মানুষটির কিঞ্চিৎ বিকার দেখিয়েছেন। যে-বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে এই অবস্থানটি গড়ে ওঠে তার জন্য বনফুল তাঁর পাঠককে কোথাও প্রস্তুত করে রাখেন না। এইজন্য টিকিটহীন ফেরেব্বাজ বাঙালি বাবুটি পাঠকের কাছে আকস্মিক এক আঘাত। বনফুলের গল্পে এই চমক বারবার দেখা দিয়েছে এবং এতেই তিনি নিঃসংশয়ে বাজিমাৎ করেছেন। এ গল্পে দেখা যায়, টিকিট পরীক্ষক এসে টিকিট দেখতে চাইলে টিকিটহীন সাহেবটি আত্মরক্ষার্থে বাক্‌-ছলের শরণাপন্ন হন : 'মাই টিকেট ইজ ইন মাই স্যুটকেস। প্লীজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।' কিন্তু ক্রু-টি নাছোড়বান্দা। ফল যা ঘটবার তাই ঘটে। তাঁর ব্যাগপত্র তল্লাসির পর সাব্যস্ত হয় তিনি টিকিটহীন যাত্রী। আশ্চর্য যে, টিকিটহীনতা সাহেবটিকে কোনমতেই অপরাধবোধে পীড়িত করে না; তিনি বরং এ নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন এবং ইংরেজি ভাষা ছেড়ে রাষ্ট্রভাষার শরণাপন্ন হন। বচসার সূত্রে ক্রু-টি যখন একজন ঠগবাজ বাঙালির আচরণ-দৃষ্টান্তে 'বাঙালি বাবুদের' চরিত্র সম্পর্কে হীনোক্তি করেন তখন প্রাদেশিক ভাবাবেগে আপ্লুত শ্রীপতি সামন্ত আর নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। নিজের পয়সা দিয়ে ফেরেব্বাজ সাহেবটির টিকিট কেটে পাঞ্জাবিটির মুখের উপর উচিত মতো জবাব দিয়ে দেন। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে অনেকগুলি টাকা ধার দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রস্তাবে সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হন। এই বিস্ময়ের ঘোরেই কি সাহেবটি পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে ভুলে যান? না, বোধহয়। লেখক এ প্রসঙ্গে একটি মোক্ষম শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর গল্পটির শেষ বাক্যে—'সাহস'। বস্তুত, সাহেবটির এই 'সাহস' তথা আত্মসম্মান এক ফুৎকারেই নিভে গিয়েছিল যখন তিনি প্রবঞ্চক প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। যে-পাইপ কিছুক্ষণ আগে তাঁর ভদ্রতা, ভব্যতা, বিত্তশালিতা ও আভিজাত্যের স্মারক হয়ে মুখের এক প্রান্ত থেকে ঝুলছিল, জুয়াচুরি ধরা পড়ে যাওয়ার পর সেই মুখ এখন অপমানের কালিতে মসীবর্ণ। উপরন্তু যে-মানুষটিকে তিনি একটু আগে চাকরেরও সম্মান দিতে নারাজ ছিলেন, এখন তাঁরই অযাচিত বদান্যতায় নিজের সিটে বহাল তবিয়তে গন্তব্যস্থলে যেতে সমর্থ হচ্ছেন বলে হয়তো-বা ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত। বিবেচনা করি, এই অনুতাপ কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে মিশে গিয়ে বৃদ্ধ শ্রীপতি সম্পর্কে সাহেবটির মনে জাগিয়ে তোলে সমীহবোধ। আভিজাত্যের প্রতীক পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে নবোদ্ভূত লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধই যে তাঁর বাধার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

আলোচনার উপান্তে এসে একথা এখন বলা চলে যে, পাঠকের মনোহরণ-সামর্থ্যে বনফুল বাংলাসাহিত্যে অনবদ্য এক ছোটগল্পকার। তাঁর লোকপ্রিয়তার প্রধানতম ভিত্তি বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও প্রখর বাস্তবসচেতনতা। আঙ্গিকের বিচারে আয়তনগত হ্রস্বতা, চমকপ্রদ উপসংহার ও মৃদু ব্যঙ্গের হাল্‌কা কথন-চাল তাঁর রচনাগুলিকে পাঠকের মনের দরজায় খুব সাবলীলভাবে পৌঁছে দিয়েছে। স্যাটায়ারের সূক্ষ্মকাজে তাঁর মুন্সিয়ানা বোধহয় দ্বিতীয়-রহিত। ক্ষণমুহূর্তের অনুভবকে এত চমৎকার শিল্পসফল করে তুলেছেন যা অন্যত্র দুর্লভ। অধিকাংশ গল্পের সমাপ্তি অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর। আণবিক আয়তনের কারণে স্থান সংকীর্ণ হলেও চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য খুব দীপ্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে; যেমন ফুটে বেরোয় আতস কাঁচের নীচে বিন্দু-সমাপতিত কেন্দ্রীভূত আলো। তবে ব্যঙ্গ কিংবা পরিহাস তাঁর সব গল্পের আবশ্যিক উপকরণ নয়। আসলে বনফুল ছিলেন জীবনের পূর্ণরূপের উপাসক। বলিষ্ঠ ও সুস্থ জীবনপ্রত্যয় তাঁর শিল্পীহৃদয়ের মূলাশ্রয় ছিল। 'কিন্তু যেখানে তাঁর অত্যাচার বা অনাচার ঘটেছে, দেখা দিয়েছে জীবনের রুগ্‌ণ ব্যাধিত রূপ, যেখানে মানুষের দুর্বলতা ও মূঢ়তায়, তার অত্যাসক্তি ও অতিলোলুপতায় প্রাণধর্ম স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়ে হয়েছে বিকারগ্রস্ত ও স্বভাববিচ্যুত, সেখানেই তাঁর প্রাণপুরুষের ওষ্ঠাধরে দেখা দিয়েছে ঘৃণাদ্বেষক্রোধপ্রদীপ্ত বক্রহাসি। সে হাসি কখনো ভ্রূকুটি-কুটিল, কখনো ওষ্ঠাধর-প্রান্তলগ্ন; কখনো তাতে আছে ক্রোধোদ্দীপ্ত রুদ্রের বহ্নিদাহন, কখনো আছে করুণাকাতর স্রষ্টার কমনীয় অনুকম্পা। মানুষের স্খলনে ও পতনে, তার আচার-আচরণের মূঢ়তায় ও আত্যন্তিকতায়, তার দুর্নিবার নিয়তি ও স্বকর্মার্জিত দুর্গতিপ্রাপ্তিতে স্রষ্টার এই হাসি বনফুলের ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ।' (জগদীশ ভট্টাচার্য : 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকা) এ গল্পেও এক নিপাট সাহেববেশধারী মানুষের অভদ্রতা ও অনৈতিকতা উন্মোচিত করে তার আচার-আচরণকে লেখক মৃদু ভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যঙ্গ এক অর্থে গালি দেওয়া, ভর্ৎসনা করা। তবে এই গালি কিংবা ভর্ৎসনা খুব তীব্র ভাষায় বনফুলের গল্পে প্রকাশ পায় না—এখানেও পায়নি। লেখকের সুহৃদ পরিমল গোস্বামী তাঁর 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' গ্রন্থে বনফুলের রসিকতাপূর্ণ রচনার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে চমৎকার একটি গল্প পরিবেশন করে বনফুলেরই লেখা একটি হাসির কবিতার ('শালা') এক স্তবক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, তাঁর আক্রমণ খুব ঘটা করে আরম্ভ হয়ে সমাপ্তিতে ঋষিশ্রাদ্ধের চেহারা পায়। এ প্রসঙ্গে বনফুলের মানস-গঠন সম্পর্কে পরিমলবাবুর বক্তব্য হল, বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন দপ্‌ করে জ্বলে উঠতেন, তেমনি খপ্‌ করে নিভেও যেতেন। 'ভেবেচিন্তে মনের জ্বালা মনে দীর্ঘকাল পোষণ করে কঠিন আক্রমণের কঠিনতা' তিনি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারতেন না। তাঁর হিসাব-নিকাশ সর্বদাই ছিল হাতে-হাতে চুকিয়ে নেবার। এই বিশেষত্ব কম-বেশি তাঁর গল্পগুলিতেও সঞ্চারিত। ব্যঙ্গপ্রধান কাহিনীর শেষে হুল থাকে বটে (স্মর্তব্য : 'sting at the tail'), তবে সে হুল বৃশ্চিকের নয়, মধুপায়ী মক্ষিকার। আমাদের চারপাশে এলোমেলো প্রসারিত জীবনকে দেখার ধরন সম্পর্কে বলাইচাঁদের যে স্বতন্ত্র এক দৃষ্টি ছিল রবীন্দ্রনাথ তা জানিয়েছেন বনফুলকে লেখা একটি পত্রে (তারিখ : ৭ অক্টোবর, ১৯৩৮)—যেখানে তিনি বনফুলকে

'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক' বলে চিহ্নিত করেছেন। বিজ্ঞানী যেমন কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে সব কিছুকেই খুঁটিয়ে দেখেন, তাঁর আগ্রহ থেকে বাদ পড়ে না তুচ্ছ-অকিঞ্চিৎকর কিছু, তেমনি বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিকরা জগতের আনাচে-কানাচে থাকা ধূলি-ধূসরিত উপজীব্য বিষয়কে তুলে আনেন পাঠক-সমক্ষে। তাতে জমে ওঠে 'কৌতূহলের রস'। গেঁয়ো অশিক্ষিত অপরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিহিত প্রায়-কৃপণ স্বভাবের সাধারণ চেহারার শ্রীপতি সামন্ত সেই তুচ্ছদেরই একজন, যারা চোখের সামনে দিনরাত ঘুরলেও সেভাবে কখনো মনোযোগ দাবি করতে পারে না। অথচ সেই 'অভাজন মহল' থেকে তাঁকে খুঁটে তুলে এনে অন্য রকমের এক আলোয় মেলে ধরলেন জীবনের বর্ণময় কথাকার বনফুল। পাঠক প্রত্যক্ষ করলো সেই তুচ্ছ মানুষটির মধ্যে উচ্চ এক মানবিক গুণ। সার্থক ছোটগল্প যদি হয় ম্যাজিক লণ্ঠনের অদ্ভুত আলো, তবে সেই আলো যে সংকীর্ণ পরিসরেও এখানে জ্বলে উঠেছে তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এমন দীপ্তির ঝল্‌কানিতে বারবার চমকে উঠেছে বনফুলের গল্প-পাঠক, আর সেখানেই স্রষ্টা হিসেবে অনবদ্য কথাকার বলাইচাঁদের অনন্যতা।

ক্যানভাসার : বাস্তবতার প্রখর খর স্পর্শে

অপু দাস

ক্যানভাসার হীরালাল আর ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল—বাংলা ছোটগল্পের ধারায় দুটি উল্লেখ করার মতো গল্পের চরিত্র এই দুজন। গল্পদুটির লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম-সময়ের, এবং তাঁরা পরস্পরের সুহৃদও বটে। দুটি গল্পের ক্যানভাসার চরিত্রদুটি বোঝার ক্ষেত্রে, চরিত্রসৃষ্টির পেছনে লেখকের মানসিকতা অনুধাবনের জন্য যদি গল্পদুটি পাশাপাশি রাখা যায় তাহলে বৈপরীত্য ও মিলের আলোকে গল্পদুটির বিশিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুলের 'ক্যান্‌ভাসার' গল্পটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে তাঁর "বনফুলের আরও গল্প" নামের সংকলনে। 'ক্যান্‌ভাসার কৃষ্ণলাল' নামের বিভূতিভূষণের গল্পটি ১৯৪৪ সালে তাঁর "নবাগত" গল্পসংকলনে স্থান পেয়েছিল। বনফুল এবং বিভূতিভূষণ দুজনেই তুচ্ছ সাধারণ নগণ্য বিষয় নিয়ে চমৎকার ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন ছিল তাঁদের জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, আলাদা হয়েছিল তাঁদের চরিত্রচিত্রণ ও গল্প বলার ধরন। 'হীরালাল' আর 'কৃষ্ণলাল' নামদুটির ভেতর 'লাল' শব্দের মিল দেখে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে বনফুলের হীরালালের গল্প বিভূতিভূষণের কৃষ্ণলালের গল্পের প্রেরণা হয়েছিল কিনা। বিজ্ঞানের বিচিত্র খুঁটিনাটির দিকে লেখক-দুজনের অদম্য কৌতূহলের কথা স্মরণ রাখলে এমন প্রশ্ন আরো সঙ্গত মনে হয়। হীরা আসলে কার্বন বা কয়লার রূপভেদ আর কয়লার রঙ হলো কৃষ্ণ। তাহলে হীরালাল আর কৃষ্ণলাল ক্যানভাসারদের দুটি রূপভেদ। দুজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি আর লেখার ধরন তাদের ভিন্ন অস্তিত্বের জন্য দায়ী। দুটি গল্পেই ক্যানভাসারের পেশায় নিযুক্ত চরিত্রদুটি বৃদ্ধ, তাদের জীবনের এক আপতকালীন সময়ে তাদের জীবিকার সঙ্কট গল্পদুটির উপপাদ্য বিষয়। বিভূতিভূষণ গল্পটি লিখেছেন কৃষ্ণলালের জায়গা থেকে। তাঁর গল্পে বৃদ্ধ কৃষ্ণলালের কাছে তার ক্যানভাসের পেশা রুটি-রুজির বেশী কিছু, তা নিয়ে তার একধরনের গর্ব আছে, গল্পের শেষে 'হেড ক্যানভাসারের' অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে তার পদোন্নতি ঘটেছে। আর বনফুলের গল্পটি অন্য একটি চরিত্রের(ভৈরবের) জায়গা থেকে দেখা। এই গল্পে হীরালাল ক্যানভাসারের পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছে বৃদ্ধ বয়েসে তার উপযুক্ত পুত্রটি মারা যাওয়ায় নেহাতই পেটের দায়ে। একটি গল্পের সমাপ্তি মধুর, অন্যটির পরিণতি করুণ।

বাংলা কথাসাহিত্য যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাস্তবতার ধারা থেকে সরে যাচ্ছে বনফুলের 'ক্যানভাসার' গল্পটি তার দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা যায়। বনফুলের এই গল্প ততখানি সুস্বাদের নয়, যতখানি তা তিক্ত ও ঝাঁঝালো। আয়তনে ছোট তাঁর অন্যান্য অনেক ছোটগল্পের মতো এই ছোটগল্পটিতেও ভরাট নিটোল বিস্তৃত কোনো কাহিনী গঠনের চেষ্টা নেই। বরং ভৈরব ও হীরালাল দুটি মাত্র চরিত্রের প্রত্যক্ষ সংলাপ ও সংঘাত এবং নেপথ্য একটি চরিত্র কাত্যায়নীর পরোক্ষ ও কার্যকরী উপস্থিতি নিয়ে গড়ে-ওঠা এই গল্পটিতে বনফুল বাস্তবতার অনিবার্য কর্কশ মর্মান্তিক রূপটিকে চকিত তৎপরতায় ধরে দিতে চান।

বিশ শতকের ত্রিশ দশকের গোড়া থেকে শুরু হওয়া অর্থনীতির সঙ্কট বনফুলের 'ক্যানভাসার' গল্পের পটভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছে। গত শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী নিম্নবিত্তের মধ্যবিত্তের জীবিকার সংস্থান, আয়ের ধরন কেমন ছিল সে নিয়ে কোনো গভীর অনুসন্ধান এখনো হয়নি। কিন্তু অর্থনীতির ইতিহাস ঘাঁটলে এটুকু অন্তত বোঝা যায় এ সময়ে ভারতে জন-প্রতি খাদ্যশস্যের যোগান কমছে, কৃষিভিত্তিক আয় আর বাড়ছে না, শিল্প-ভিত্তিক আয় কিছু বাড়ছে আর পরিষেবা-ভিত্তিক আয় বাড়ছে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হারে। ক্ষেত্র-ভিত্তিক এরকম নড়াচড়ার লক্ষণগুলোকে গ্রাম ও শহরের মানুষদের ভেতরের অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ার চিহ্ন হিসেবে দেখা যায়। শহুরে মানুষদের চাহিদা মেটানোর জন্য এইসময় গড়ে উঠছে সাবান, মাজন, সুগন্ধি তেল, চা, বিস্কুট, সিমেন্টের ছোটখাটো কারখানা। ১৯২৯-৩০ সালে আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয় এদেশের জনজীবনেও তুমুল নাড়া দিয়ে গেলো। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমশ মূল্যবৃদ্ধি আর ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা এদেশের মানুষের জীবনকেও বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলতে চাইল। অর্থনীতির এই পটটি পেছনে রাখলে বনফুলের 'ক্যানভাসার' গল্পের স্থান কাল চরিত্রগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দু একটি খর রেখার আঁচড়ে বনফুল এই গল্পে এক বেকারের জীবনের একটি দ্বিপ্রহরের ঘটনা চিত্রিত করেছেন। বেকার ভৈরব অর্থাভাবের কারণে তার স্ত্রী কাত্যায়নীর একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ মেটাতে পারে নি : 'ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যা নাই, তাহা সত্য'। এই গল্পে অন্য একটি চরিত্র হীরালাল পেটের দায়ে ক্যানভাসারের বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে : সেও 'গরীব—এই ক'রে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়। ক্যানভাসারের বৃত্তি গ্রহণ একভাবে ক্যানভাসার হওয়ার বিদ্যা অর্জন। পেটের অন্ন আর পেটের বিদ্যা, প্রয়োজন এবং শখ এইভাবে এখানে এক দ্বিক-সম্পর্ক রচনা করে। কাত্যায়নীর সংসারে অর্থাভাব আছে তবু সে শৌখিন শাড়ি পরার শখ করে। হীরালালের সংসারেও অর্থাভাব আছে আর তা-ই সে শৌখিন জিনিস বেচার বিদ্যা রপ্ত করার চেষ্টা করে। আর এ দুজনের মাঝে আছে ভৈরব যার অর্থও নেই, শখ বা বিদ্যাও নেই। কাত্যায়নী ও হীরালাল দুজনকেই সে প্রতিহত করতে চায় : 'স্ত্রীকে সে এই স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে।' কিন্তু স্তোকবাক্য নয়, হীরালালকে সে সরাসরি খারিজ করে দিতে চায় : 'স'রে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এসে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?'

কাত্যায়নী ও হীরালালকে প্রতিহত করতে গিয়ে ভৈরব দেশের কথা পেড়েছে। কিন্তু 'দেশটা উচ্ছন্ন' যাওয়া বা 'দেশটাকে রসাতলে পাঠানো'—ভৈরবের এই তিরস্কারের এই প্রত্যাখ্যানের ভাষায় দেশোদ্ধারের ব্রত নেই। 'দেশ' এখানে কোনো রাজনৈতিক পরিভাষা নয়। বাংলা লৌকিক ভাষায় 'দেশ' শব্দটি 'গ্রাম' শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় (যেমন : দেশ-বাড়ি দেশ-ঘর) আর বনফুলও এই গল্পে বাংলার সাধারণ দেশগ্রামের সাধারণ মানুষদের গল্প বলতে চান। আর দেশগ্রাম বদলে যাচ্ছে, দেশের মানুষের জীবনে কিভাবে কেমনভাবে শহুরে মূল্যবোধের অভিঘাত অবধারিতভাবে পড়ছে—দু-একটি আঁচড়ে লেখা এই গল্প সেই

সমস্যাগুলোকে স্পর্শ করে বলয়িত হয়ে উঠছে দেখা যায়। এভাবে দেখলে প্রায় সত্তর বছর আগে লেখা এই গল্প আজকের পাঠকের কাছে ইতিহাসের সামগ্রীর মতো মনে হতে পারে। হীরালাল দাঁতের মাজন বিক্রি করছে, বিক্রি করছে চুলের কলপ। কিন্তু গ্রামের মানুষ তার প্রত্যাশিত খদ্দের নয় : 'ক্যান্‌ভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার শহরে যাইবার কথা। যাইতেওছিল; কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।' তবু রেলপথ শহর ও গ্রামের ভেতর যে সেতু নির্মাণ করে দিয়েছে সেই সেতু দিয়ে শহুরে দ্রব্য গ্রামে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে যায় : 'সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু বিজনেস্‌ হয়, এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।' শহর ও গ্রামের সম্পর্ক এগল্পে ধরা পড়েছে 'নিমের দাঁতন' আর 'দাঁতের মাজন' এর বিপরীত সম্পর্কের মধ্যবর্তিতায় :

> ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল। মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট সুটকেশ হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

হীরালালের সুটকেশ নিয়ে শৌখিন দ্রব্য বিক্রি করার প্রচেষ্টা ভৈরবের কাছে উপদ্রবরূপে প্রতিভাত হয়েছিল—তা যেন পাড়াগাঁয়ের শান্তি বিঘ্নিত করছে। বাংলাভাষায় লেখা এই গল্পে 'ক্যান্‌ভাসার' 'সুটকেশ' 'ওভারক্যারেড' 'বিজনেস্‌' হীরালালের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত এই ইংরেজি শব্দগুলো সেই বিঘ্নকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু গ্রামবাংলার জনজীবনে দাঁতের মাজন বা চুলের কলপ নিয়ে এখন তেমন আর টানাপোড়েন নেই, যেমন নেই বাঙালির মুখের ভাষায় বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিলমিশ নিয়ে কোনো বাছবিচার।

ক্যানভাসার বৃত্তির বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ রাখলে এ গল্পের করুণ পরিণতির অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে। বাংলার অর্থনীতিতে তখন ক্যানভাসারের পেশাটি নতুন। ক্যানভাসার ফেরিঅলা নয়। বিভূতিভূষণের গল্পে কৃষ্ণলাল ক্যানভাসার ও ফেরিঅলার পার্থক্য করেছিল, এবং ক্যানভাসারকে মর্যাদার দিক থেকে উচ্চপদে বসাতে চেয়েছিল। ফেরিঅলা বাজার থেকে নানা দ্রব্য ক্রয় করে এবং ঘুরে ঘুরে তা বিক্রি করে। কিন্তু ক্যানভাসার একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির হয়ে কাজ করে, সেই কোম্পানির জিনিস বিক্রি করে সে নির্দিষ্ট কমিশন পায়। এখনের সেলস্‌ম্যান বা সেলস্‌গার্লদের মতো ক্যানভাসাররা ততখানি ঝকঝকে তকতকে নয়। অবস্থানগতভাবে প্রায়ক্ষেত্রেই তারা দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতায় থাকবে। তবু তাদেবকেও প্রচারের আলোয় নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে হয়, সপ্রতিভভাবে কথা বেচে নিজের রোজগারের উপায় খুঁজে নিতে হয়। বনফুলের গল্পের হীরালাল আসলে বৃদ্ধ, কিন্তু পেশার কারণে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে হবে বলে সে নকল দাঁত ব্যবহার করে, কলপ দিয়ে গোঁফ রাঙায়। গল্পের শেষে ভৈরবের চপেটাঘাতে তার নকল দাঁত খুলে যায়, গোঁফের কলপের কথা সে নিজেই স্বীকার করে। বনফুলের গল্প এখানে শেষ হলে তা লোককথা হতো। লোককথায় যেমন বোকা মানুষের কাছে চালাক মানুষের পরাভব ঘটে, দুর্বল পক্ষ শক্তিশালী পক্ষকে নির্জিত করে এ গল্পও তেমন গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের কাছে শহুরে মানুষের চালাকি ধরা পড়ার হাস্যরসাত্মক গল্প হতো। কিন্তু 'গরিব মানুষ—এই ক'রে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই।

বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে'—হীরালালের এই অসমাপ্ত স্বীকারোক্তিতে এ গল্প লোককথা ভেঙে আধুনিক ছোটগল্প হয়ে উঠল। এবং চকিতে ট্রাজিক পরিণতি পেল।

হীরালালের এই ট্রাজেডি কেবলমাত্র একজন ক্যানভাসারের ট্রাজেডি নয়, ছেলের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত 'উপযুক্ত' শব্দটিতে বোঝা যায় এই ট্রাজেডি শেষপর্যন্ত একজন বাঙালি পিতার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি মেনে পশ্চিমি সমাজে পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যার বিচ্ছিন্ন থাকাটাই সঙ্গত বিবেচিত হয়। গড়পড়তা বাঙালির পারিবারিক জীবন তেমন নয়। পুত্র উপযুক্ত হলে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উপার্জনে সক্ষম হলে বৃদ্ধ বাবা-মা পুত্রের সংসারে ভরনপোষণের নির্ভরতা পাবে এমন প্রত্যাশা এদেশে মৌল আদর্শরূপে গণ্য হতে চায়। হীরালালের ট্রাজেডিতে তাই একটা বাড়তি মাত্রা যুক্ত হয়। ভেঙে পড়ছে অর্থনীতি, নিম্নবিত্ত মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন জোটানো দুষ্কর হয়ে পড়ছে। প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে মানুষ নতুন পেশা খুঁজে নিতে চাইছে, কিন্তু সেখানেও সকলে মানিয়ে নিতে পারছে না, ছলনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে তাকে, নিজের ভাত-কাপড়ের মতো আবশ্যকীয় সামগ্রীটুকু জোটানোর জন্য মানুষকে বিলাসী ভোগ্যপণ্য বিক্রির ব্যবস্থায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হচ্ছে—বাংলার সমাজের বাঙালির পারিবারিক জীবনের এই টালমাটাল সময়ে হীরালালের ট্রাজেডি সামাজিক ট্রাজেডি হয়ে উঠতে চেয়েছে। দাঁত নেই হীরালালের কিন্তু, সে ঝকঝকে নকল দাঁত দেখিয়ে দাঁতের মাজন বিক্রি করছে এই ঘটনায় আইরনি আছে। 'গ্রাসাচ্ছাদন জোটানই দুষ্কর—দাঁতের মাজন।' ভৈরবের এই সংলাপের 'গ্রাসাচ্ছাদন' শব্দটিতে সেই আইরনি অন্তঃশীল রয়েছে। 'গ্রাসাচ্ছাদন' এক অর্থে খাওয়া ও পরা, অন্য অর্থে হাঁ-মুখের আচ্ছাদন অর্থাৎ দাঁত। ভৈরবের কাছে প্রথম অর্থে গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দুষ্কর মনে হয়েছিল, হীরালাল দ্বিতীয় অর্থে গ্রাসাচ্ছাদন জুটিয়েছিল কিন্তু সেটাও রক্ষা করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ল। 'হীরালাল' নামটির ভেতরেও সেই আইরনি আছে : হীরালালের নামের ওপর হীরা ঝকঝক করলেও হীরালাল আসলে কয়লার মতোই তুচ্ছ সাধারণ মলিন। 'ক্যানভাসার' গল্পে ট্রাজেডির নির্মমতাকে চিনিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে বনফুল যেন সুকৌশলে এই আইরনি বুনে দিতে চেয়েছেন।

লোককথার ছক ভেঙে বেরিয়ে এসে এ গল্প যেমন আধুনিক হয়ে উঠতে চেয়েছে, তেমনি পুরাণের স্মৃতি উশকে দিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে গল্পটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ভৈরবের আরেক নাম শিব, কাত্যায়নী দুর্গার অন্য এক নাম এবং ভৈরব-কাত্যায়নী এই কাহিনী যেন শিব-দুর্গার দারিদ্র্য ও দাম্পত্য কলহের পৌরাণিক কাহিনীর এক নতুন এবং কালোপযোগী সংস্করণ। বাঙালির লেখা শিবায়নে গরিব ঘরের গৃহিণী দুর্গার শাঁখা পরার শখের কথা আছে। 'ক্যানভাসার' গল্পে কাত্যায়নীর অনেক দিনের শখ একটি শৌখিন শাড়ি পরার। শাক্ত তান্ত্রিক দর্শনে পুরুষ নিষ্ক্রিয় আর প্রকৃতি সক্রিয়া, নিষ্ক্রিয় পুরুষকে প্রকৃতিই সক্রিয় করে তোলে। শিব শবরূপী আর দুর্গা শক্তিরূপা। সমস্ত জগতের চালিকাশক্তি মহামায়া দুর্গা। এই কাহিনীতে কাত্যায়নীকে সমস্ত ঘটনার মূল কারণ বলা হয়েছে : 'কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।' তার গঞ্জনায় ভৈরব উত্তেজিত না হলে হীরালালের ঘটনা ঘটত না। অন্যদিকে এই গল্পের হীরালালের যুবক সাজার প্রয়াস যযাতির পুনর্যৌবনপ্রাপ্তির কাহিনীটি মনে করিয়ে দেয়। যযাতি তার পুত্র পুরুর যৌবনের বিনিময়ে নতুন যৌবন ফিরে

পেয়েছিল। বৃদ্ধ হীরালালও যেন তার মৃত পুত্রের স্থান গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য যুবা হয়ে উঠতে চেয়েছে।

বাঙালির/ভারতীয়র সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে বনফুল 'ক্যান্‌ভাসার' গল্পটিতে পুরাণের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কাহিনী রচনার বঙ্কিমভঙ্গি পুরাণকে ব্যঙ্গ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। বনফুল জানেন এই নিরক্ষরতার দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরাই তাঁর গল্পের পাঠক। আর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে আত্মতুষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙালির বিরুদ্ধে কেমন এক প্রতিশোধস্পৃহা, নির্লিপ্তভাবে আঘাত করার কেমন এক নিষ্ঠুর অভীপ্সা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাঁর এই পর্যায়ের গল্পগুলির সমাপ্তিতে চূড়ান্ত বৈপরীত্যের আকস্মিক চমক থাকত। যেন পাঠক যা ভাবে পাঠক যা চায় তিনি কিছুতেই তেমন ঘটতে দেবেন না। চমকে দেবার মতো সেই সব সমাপ্তি তবু সস্তা চমকসৃষ্টির জন্য নয়। পাঠককে যেন তিনি নিয়তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চান। আর 'ক্যান্‌ভাসার' গল্পে যেমন, তেমনই 'সমাধান', 'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ', 'মানুষের মন', 'আত্মপর', 'জৈবিক নিয়ম' তাঁর এমন অনেক গল্পে সেই নিয়তি অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর রূপ ধরে আসে। 'ক্যানভাসার' গল্পটি শুরু হয়েছিল কমিক ভঙ্গিতে : 'কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী'। এ হলো পুরুষের অবস্থান থেকে নারীর মূল্যায়ন। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা যেমন সমস্ত দোষের দায় নারীর দিকে ঠেলে দিতে চায়, এই কাহিনীর ভৈরব তেমন এক পুরুষ, বনফুলের গল্পের পুরুষ পাঠকও ভৈরবের অবস্থানে নিজেকে বসিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারবেন। আর কাত্যায়নীর চরিত্রে নারীর প্রথাসিদ্ধ কলহপ্রিয়া, কল্প রূপটিও তাঁদের তৃপ্ত করতে পারবে। শিব কলহান্তরিতা দুর্গাকে সুখে রাখার জন্য ত্রিশূল ভেঙে তৈরি লাঙল কাঁধে নিয়েছিল। এই কাহিনীতে কাত্যায়নী ভৈরবকে বলেছে : 'যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল্ ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?' শিবের লাঙল এখানে ভৈরবের বন্দুকে রূপান্তরিত। ভৈরবের পৌরুষত্বকে আঘাত করতে চেয়ে উক্ত কাত্যায়নীর এই সংলাপে যুদ্ধভীরু বাঙালি পুরুষের প্রতি শ্লেষ আছে। আরও আছে মেয়েলি গোপন ভাষার ঝাঁঝ। 'লাঙল' শব্দটি লিঙ্গ বাচক আর এখানে লাঙলের বিকল্প 'বন্দুক' শব্দেও যৌনতার অনুষঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বন্দুক অক্ষম পুরুষের অস্ত্র। সংস্কৃত পুরাণে অপমানিত ভৈরবের পুরুষত্ব প্রকাশক চণ্ডরাগ নিরীহ ক্যানভাসারের গণ্ডদেশে চপেটাঘাতে বদলে যায়। অন্যদিকে যযাতির পুনর্যৌবনপ্রাপ্তি এই কাহিনীর বাস্তবতায় এক অসহায় বৃদ্ধের তরুণ সাজার ব্যর্থ করুণ প্রয়াসে পর্যবসিত হয়। লক্ষ করা দরকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় পুত্রের ওপর পিতার অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে এই কাহিনী ট্র্যাজিক পরিণতি পেতে পেরেছে : হীরালালের উপযুক্ত ছেলে না মরে মেয়ে মারা গেলে এ কাহিনীর প্লট এমন ট্র্যাজিক হতো না। হীরালালের ছেলের মৃত্যু সংবাদে হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের মতো বনফুলও এ গল্পের পাঠককে বিমূঢ় করতে চেয়েছেন। তবু অন্য একটা সম্ভাবনা থেকে যায় : হতে পারে ক্যানভাসার হীরালালের এও অনৃতবাচন কিন্তু ভাবাবেগ-চালিত বাঙালি পাঠক গল্পের লোভে কত সহজে তার কথায় আস্থা রাখতে পারে বনফুল যেন সে-নিয়ে ব্যঙ্গ করতে চান। মধ্যবিত্ত পাঠককে ট্র্যাজিক রসের আস্বাদ দিতে চাওয়ার তাঁর এই মুদ্রাও হয়তো বা তাঁর ব্যঙ্গপ্রবণ মনের আরেক অভিব্যক্তি : তীক্ষ্ণ তিক্ত চূড়ান্ত।

তাজমহল : এক প্রেমের স্থাপত্য

সুরজিৎ বসু

'বনফুলের আরও গল্প' পাঠ করে ৭/১০/৩৮ তারিখে বনফুলকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা, পরগাছা, ঔষধি, বনস্পতির সব কিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে, সে কৌতূহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাইতো এতো আমি দেখিনি কিংবা ঠিকটি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখ ভোলানো সামগ্রী নিয়ে, এখনকার সাহিত্য চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে, তাতে রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজ-পরানো কনে-দেখানোর মত করে প্রকৃতিকে দেখতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ঠিকটি দেখা গেল বলে হাততালি দিয়ে ওঠার উৎসাহ চলে যায় জগতের আনাচে-কানাচে, আড়ালে আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যাঁরা, তুচ্ছতার মূল্যেই তাঁদের মূল্যবান করে দেখার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে—তোমাদের মত বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক।'

সাধারণ, অবজ্ঞাত, ক্লেদাক্ত জীবনের মধ্যেও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণাই — বনফুলের অনেক গল্পকেই পৌঁছে দেয় এক অন্য স্তরে। জীবনের আশ্বাস, বেঁচে থাকার রসদ এভাবেই বনফুলের গল্পে অলক্ষ্যে পেয়ে যায় চিরকালের পাঠক সমাজ।

এই ধারারই একটি গল্প 'অদৃশ্যলোকে' (১৯৪৬) গ্রন্থের অন্তর্গত 'তাজমহল'। গল্পটির কাহিনীভাগ সামান্য। উত্তমপুরুষে গল্পটির কথক স্বয়ং ডাক্তাররূপী লেখক। প্রথম যখন তিনি তাজমহল দেখতে আগ্রায় গিয়েছিলেন তখন ট্রেন থেকে একজন সহযাত্রীর ইশারায় তাজমহল দেখে দমে গিয়েছিলেন। তাজমহল-কে তাঁর মনে হয়েছিল চুনকাম করা সাধারণ একটা মসজিদের মতন। যদিও পরে পূর্ণিমার পরদিন জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় ঢাকা মনোমুগ্ধকর এই অমর স্মৃতিসৌধ দেখে তিনি 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম'। তারপর অনেক দিন কেটে যাওয়ার পর নিত্যদিনের কর্মতৎপর ব্যস্ততায় তাজমহল আর লেখককে আকর্ষণ করে না। এরকম মানসিকতার মধ্যে একদিন লেখক চিকিৎসালয়ের আউটডোর সেরে বেরোতে যাচ্ছেন, তখন দেখা যায় এক বৃদ্ধ মুসলমান পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বেঁধে তাঁর কাছে এলো। ঝুড়ির মধ্যে তার অসুস্থ স্ত্রী। অত্যন্ত গরিব বলে সে বাড়িতে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাতে পারবে না। তাই আউটডোরে নিয়ে এসেছে। হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোরখা খুলতেই ডাক্তার দেখলেন মুখের আধখানা পচা, ডানদিকের গালটা নেই, দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে বীভৎসভাবে। এই দুরারোগ্য অসুখ সারবার নয়। ভয়ংকর দুর্গন্ধে সেই রোগীকে হাসপাতালে রাখা গেল না, অবশেষে হাসপাতালের সামনে একটা গাছতলায় রেখে ডাক্তার চিকিৎসা করতে থাকেন। এক প্রবল বর্ষণের দিন দেখা যায় রোগীকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার বৃদ্ধ স্বামী একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধে ও

আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জ্বরে তার বউয়ের গা পুড়ে যাচ্ছে, আধখানা মুখে বীভৎস হাসি আর সেই বৃদ্ধ মুসলমান বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে ঠকঠক করে। সেইসময়ে বৃদ্ধ তার স্ত্রীর বাঁচবার কোনো আশা আছে কিনা জানতে চাইলে ডাক্তার জবাব দিয়ে দেন। বৃদ্ধ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপরের দিন ডাক্তার দেখেন গাছতলা খালি। আরও কয়েকদিন পরে একদিন হঠাৎ ডাক্তার দেখেন এক মাঠের ভেতরে খাঁ খাঁ রোদের মধ্যে সেই বৃদ্ধ ভাঙা ইট ও কাদা নিয়ে তার বেগমের কবর গাঁথছে। সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই ডাক্তার তার নাম, বাসস্থানের হদিশ জানতে চাইলে বৃদ্ধ জানায় সে আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়ায়, নাম ফকির শা-জাহান। ডাক্তার সেই শুনে 'নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে' রইলেন। কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

তাজমহল গল্পের কাহিনী সরল, একমুখী। একটি বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে তার অন্তরসত্তাকে উদঘাটন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। গল্পের বক্তব্যের মধ্যে নেই কোনো জটিলতা। গল্পটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করানোর মধ্যে গল্পকারের রয়েছে এক গূঢ় উদ্দেশ্য। তামাম ভারতের সম্রাট শা-জাহান নির্মিত তাজমহল তাঁর পত্নী মমতাজের অপরূপ স্মৃতিসৌধ। এই সৌধ নির্মাণের পশ্চাতে রয়েছে শা-জাহানের প্রেমিক-সত্তা, তাঁর শিল্পী সত্তা। তাজমহল একদিকে যেমন শা-জাহানকে অমরপ্রেমিক হিসেবে ঠাঁই দিয়েছে ইতিহাসের পাতায়, তেমনি তাজমহল শা-জাহানের অর্থের আড়ম্বর, ঐশ্বর্যের গরিমাকেও সদম্ভে প্রকাশ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। আর ঠিক এরই পাশে চিত্রিত হয়েছে হতদরিদ্র এক ভিখারী প্রেমিক শা-জাহানের এক বিষণ্ণ প্রান্তরে আচ্ছাদনহীন নগণ্য এক কবরের চিত্র। সেই কবরে নেই কোনো জৌলুস, নেই কোনো চাকচিক্য, কিন্তু অন্তরে রয়ে গেছে একই অশ্রুজল, প্রেমিকার জন্য দীর্ঘশ্বাস। বৈভবে, বর্ণময়তায় সম্রাট শা-জাহানের প্রেমের অভিজ্ঞানের পাশে দরিদ্র ভিক্ষুকের স্ব-রচিত প্রেমের স্মারক কোনোই মূল্য পায় না। কিন্তু এছাড়াও গল্পটিতে আরও বৈপরীত্য আমাদের মুগ্ধ করে। তাজমহল বানিয়েছিলেন শা-জাহান ভারতবিখ্যাত সুন্দরী মমতাজের জন্য, আর দরিদ্র ফকির শা-জাহান তাজমহল বানাচ্ছেন তাঁর পত্নী যার 'মুখের আধখানা পচে গেছে। ডান দিকে গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।' কিন্তু প্রেমের স্বরূপে হরিপদ কেরাণী আর আকবর বাদশা এখানে এক অভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে যার অন্য নাম মানবিকতা। মানবিকতার এই গভীর ও উদার প্রাঙ্গনে একত্রে এসে দাঁড়ালেন সম্রাট ও ভিখারি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চোখ এড়িয়ে যাওয়া' দরিদ্র এই বৃদ্ধের প্রেমের উপাখ্যান রচনা করলেন বনফুল তাঁর 'তাজমহল' গল্পে। সম্রাট শা-জাহানের মমতাজ-প্রেম যুগ যুগ ধরে রচিত হয়ে চলেছে কত প্রেম-গাঁথা কিন্তু ফকির শা-জাহানের প্রেমের আখ্যান রচনা করে বনফুল হয়ে রইলেন যথার্থই মানবদরদী আধুনিক মনের কুশলী কথাকার।

চরিত্রাত্মক গল্প 'তাজমহল'-এ লেখক একটি চরিত্রের একটি ঘটনার সাহায্যেই জীবনের এক সমগ্র চিত্র, এক মহত্তম সত্যকে তুলে ধরেছেন। গল্পে একটিমাত্র ঘটনা হওয়ায় ফকির শা-জাহান চরিত্রও ঘটনার ঘূর্ণিপাকে বিবর্তিত হয়নি। একমুখী সরলরৈখিক চরিত্র শা-জাহান।

সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সে তার অকৃত্রিম মানবিকতাবোধের দীপ্তিতে ভাস্বর। স্ত্রীর জন্য কষ্টসহিষ্ণুতায় ও ধৈর্যশীলতায় সে হয়ে উঠেছে প্রেমিক সম্রাট শা-জাহান। তখন তার দিকে 'নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে' থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

তাজমহল গল্পে তাজমহল নেহাতই উপলক্ষ্য মাত্র নয়। আসল লক্ষ্য সমান্তরালভাবে এক অমর প্রেমগাথার বিবরণ। সমান্তরাল দুটি আখ্যানের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন প্রেমের স্বরূপ। একদিকে জগতবিখ্যাত শাশ্বত প্রেমের স্মারক আগ্রার 'তাজমহল' আর একদিকে এক দরিদ্র ফকিরের ইট কাদা দিয়ে খাঁ খাঁ রোদে মাঠের মাঝখানে নির্মিত কবর। গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখকের অভিপ্রায়—এও তো এক প্রেমের শাশ্বত কীর্তি নির্মাণ—'তাজমহল'। এই দুই তাজমহল নির্মাণের লক্ষ্য,অভিপ্রায় ও বাসনা তো একই।

নিপুণিকা : জীবন দক্ষ শিল্পী

সুস্মিতা সাহা

বনফুলের গল্পের একজন পাঠক হিসেবে বলব : সীমিত আয়তনের গল্প লেখাই তাঁর শেষ কথা ছিল না, আঙ্গিকের অসাধারণত্বই তাঁকে সবটুকু চেনায় না, গল্পের শেষে চিরাচরিত চমকেও তাঁকে সম্পূর্ণ পাবো না, কাটা ছাঁটা শব্দ ও বাক্যের পরিমিত ব্যবহারে তিনি গড়ে তুলেছেন যে 'অমরাবতী' তার বিশেষ একটি দিক্ হলো 'নারী'। তাঁর অসামান্য ছোটগল্পের জগতের 'নিমগাছ' গল্পটি মাত্র কয়েক পংক্তির সমাহার, অথচ বলার গুণে আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় গল্পটির কবিতার মতো নরম শরীর, তার থেকেও বেশী করে ছুঁয়ে যায় এক গৃহবধূর অনাদৃত জীবনকে—যে জীবন তুলনীয় বাড়ির একপাশের নিমগাছটার সঙ্গে।

নারীদরদী মনের পরিচয় পাই 'নিমগাছ' গল্পে এবং ঠিক তার উল্টো ধরনে লেখা 'নিপুণিকা' গল্পটিতে। আমাদের আলোচ্য 'নিপুণিকা' গল্পের 'নিপুণিকা' শব্দের অর্থ হলো—যে নারী নিপুণ বা দক্ষ। গল্পটি শুরুতেই লেখক 'নিপুণিকা' নারীর একটি বর্ণনা দিয়েছেন—এইভাবে—''লীলাময়ী তন্বী রূপসী। খঞ্জন নয়নের চটুল চাহনী, পীবর বক্ষের সংযত অসংযম লাস্য-চপল ললিত গমন-ভঙ্গিমা, মিষ্ট কণ্ঠের রজত নিক্কণনিভ হাস্যধ্বনি, ছদ্ম-কোপ কমনীয় ভ্রূভঙ্গী পাষাণকেও উতলা করিয়া তোলে।'' এই পর্যন্ত যারা পড়বেন তাদের মধ্যে উন্নাসিক, রক্ষণশীল কেউ যদি থেকে থাকেন তাহলে স্রেফ আঁতকে উঠে ভাববেন চিকিৎসক ও সমাজকল্যাণকামী বনফুল এ কোন শ্রেণীর নিপুণিকা অসংযমী তন্বীর কথা বলতে বসেছেন। এ নারী নির্ঘাত জানে ছলাকলা, পুরুষকে প্রলুব্ধ করার সব কৌশলই এর আয়ত্ত। তারা এরপর যা ইচ্ছে ভাবুন, এবং ভাবতে থাকুন। পাঠক, আসুন, আমরা এগিয়ে যাই আমরা দেখি 'নিপুণিকা'কে নিয়ে বনফুল ঠিক কি ভেবেছেন, কারণ তাঁর তো বরাবর মানুষ নিয়েই কারবার।

কাজেই 'নিপুণিকা' গল্পের স্তরে স্তরে যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তা বনফুলের মানুষ চেনার অন্য একটি দিক্‌কে ফুটিয়ে তোলে। 'নিপুণিকা' গল্পের চারটি পর্ব আছে। প্রথম পর্বে যুদ্ধে আহত সেনাপতি ও সুন্দরী নার্সের মধ্যে কিছু ভাবের আদানপ্রদান ঘটেছে। সংলাপের বাহুল্য বনফুলের ধাতে নেই। তিনি প্রায় ইশারা ইঙ্গিতেই পাঠককে এবং সেনাপতিকে বুঝিয়ে দেন যে লাস্যময়ী চপলা নার্সটি সেনাপতির প্রেমে পড়েছে এবং তার শিবিরে যেতে চায়।

দ্বিতীয় পর্বে গভীর রাত্রির পটভূমিকা, সেনাপতির শিবিরে নার্স উপস্থিত, চারপাশ নিস্তব্ধ, 'অত্যন্ত তীব্র-মদির নীরবতা'। সেনাপতি নার্সের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে আরো ঘনিষ্ঠ করবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—নার্স কিন্তু জানতে চায় সেনাপতির পরবর্তী যুদ্ধের প্ল্যান, সেনাপতি বজ্রাহত, 'এই মায়াবিনী তাহা হইলে স্পাই' এরপরে যা ঘটলো তা এইরকম—যুদ্ধের প্ল্যান দিতে বাধ্য হলেন সেনাপতি কারণ নার্সের যৌবনের টান যে আরো সাংঘাতিক, এই প্রলোভন ত্যাগ করা সেনাপতির অসাধ্য।

তৃতীয় পর্বে সেনাপতি ও নার্স শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে, নার্সের মুখে মৃদু হাসি,

কিন্তু হঠাৎ নির্মম কঠিন মুখে সেনাপতির পিস্তল গর্জন করে উঠলো, নার্সের সমস্ত হাসি এক নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেলো, হঠাৎই সেনাপতির নজরে পড়লো একটি চিঠি—

'প্রিয় সেনাপতি মহাশয়,

আমি ধরা পড়িয়াছি, হয়তো আমাকে এজন্য মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। আপনার হাতে মরতে আমার আপত্তি নাই। .... এই ক্ষুদ্র অনুরোধ করিয়া যাইতেছি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে এ অনুরোধ হয়তো আমি করিতাম না, আপনাকে সত্যিই আমি ভালোবাসিয়াছিলাম, সেই ভালবাসা-জনিত স্পর্ধায় এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি করিতে সাহস করিতেছি। আমার মৃতদেহটা আমার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। ...' প্রায় সম্পূর্ণ চিঠিটি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারা গেলো না, কারণ স্বচ্ছ সরল ভাষার এই চিঠিটিই গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, আমাদের কৌতূহলী করে তোলে, আমরা জানতে চাই কি ব্যাপার?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই চতুর্থ অর্থাৎ শেষ পর্বে, এবং সেইসঙ্গে বুঝতে পারি কতবড়ো মনের মানুষ ছিলেন বনফুল, নারীবাদ না নারীবাদ নয় সে তর্ক থাক্, খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এক নারীকে কত উঁচু স্থান দিয়ে দিলেন। কারণ নার্সের মৃতদেহ স্বদেশে আনীত হলে তার পেট চিরে যুদ্ধের প্ল্যানটি পাওয়া গেল। জীবিত নার্স আগেই সংবাদ পাঠিয়েছিলো—'আমার শব হয়তো গোপন সংবাদটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে।'

তাহলে এই হলো 'নিপুণিকা'-র নৈপুণ্য, আমরা সবিস্ময়ে দেখি নার্স তার জীবনের মায়া তুচ্ছ করে প্রতিপক্ষের সেনাপতির শিবিরে প্রবেশ করে, বুদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধের প্ল্যান হস্তগত করে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, এর বিনিময়ে তাকে দিতে হয় নিজেব শরীর এবং বরণ করতে হয় মৃত্যু, আমরা তো জানি দেশের জন্য কত নারীই আত্মবলিদান দিয়েছেন, সহ্য করেছেন শারীরিক নির্যাতন, বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসেও আমরা এরকম নারীর সন্ধান পেয়েছি।

গল্পটি প্রথম থেকে শুরু হয়েছে একরকমভাবে, তথাকথিত 'বাজে' মেয়েদের মধ্যে একজন ঐ নার্স—এমনটাই মনে হয়। অথচ খুব আড়ম্বরহীনভাবে গল্পকাব শেষ করেন গল্পটি এবং আমাদের জন্য একটি চমক অপেক্ষা করে থাকে, আমাদের চোখের সামনে নার্স সাধারণ নাবী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেবী-তে। বনফুলের কাছে এরকম গল্প আমাদের অপ্রত্যাশিত নয়, যিনি 'শিককাবাব' এর মতো একাঙ্ক নাটক লিখতে পারেন—যে নাটকে নারীশরীর ও সুস্বাদু কাবাব দুই-ই ভোগী, লম্পট পুরুষের তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার জিনিষ হয়ে ওঠে—তাঁর কাছেই তো পাবো নারীকে মর্যাদা দেওয়ার কথা, তিনিই তো বলতে পারেন একজন সেবিকা দেশকে সেবা করার জন্য বিপক্ষের সেনানায়ককে প্রলুব্ধ করার আর্টও জানে, আবার মরতেও জানে। এ নারী অতি দক্ষ, অতি কৌশলী এবং মানবিক ও দেশপ্রেমিক।

সংলাপ বনফুলের প্রধান অস্ত্র, খুব শান্ত ভঙ্গিতে পাঠককে তিনি মুগ্ধ করে রাখেন। গল্পটিতে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একটি ধারাবাহিক উত্তেজনা বা আকর্ষণ বজায় থাকে। একটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত রূপটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পও শেষ হয়।

ছোটলোক : এক বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভাস

চৈতালী ব্রহ্ম

বাংলা তেরশো একান্ন সালের বৈশাখ মাসে (১৯৪৪) প্রকাশিত 'বিন্দু-বিসর্গ' গল্পসংকলনে 'ছোটলোক' গল্পটি প্রথম সংকলিত হয়। যে সময়ে এই গল্প লেখা হয়েছে, সময়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ঘটে সাম্যবাদী শাসন স্থাপিত হয়েছে। কম্যুনিজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশেও ১৯২৮ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু গোপনে। এক মার্কসীয় শ্রেণীচেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে বিশ্বের শ্রমিক-কৃষক তাদের শ্রেণীসত্তাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। ফলত সমাজে দ্বন্দ্ব বাধে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে প্রলেতারিয়েত গোষ্ঠীর। মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্বে যে সামাজিক পাঁচটি স্তরের কথা বলা হয়েছে, যৌথ মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা, ভূমিদাস—সামন্ততন্ত্র প্রথার শেষে সেখানে স্থান নিয়েছিল ধনতন্ত্র। শিল্পায়নের মাধ্যমে সমাজ সৃষ্টি করেছিল দুটি শ্রেণীর,—ভোগী বুর্জোয়া এবং শোষিত সর্বহারা তথা প্রলেতারিয়েত। যে উৎপাদন শ্রমের ফল, সেই উৎপাদনের মালিকানা চলে গিয়েছিল শিল্পপতি বুর্জোয়াদের হাতে, এবং উৎপাদক শ্রমিক-কৃষক কেবল দারিদ্র্য আর অনাহারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটে সেখানে সর্বহারাদের প্রতিষ্ঠা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সমগ্র বিশ্বের সর্বহারারা ছিল কেবল শোষিত নিপীড়িত ও বঞ্চিত। বুর্জোয়াদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল নানা স্তরভেদ—উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। সেখানে কিন্তু মধ্যবিত্তরা ভোগী হলেও তাদের অবস্থা অনেকটাই ত্রিশঙ্কু গোছের। অর্থাৎ তারা উচ্চবিত্তের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, তাদের কাছে সম্মানপ্রাপ্ত নয়। তাদের আদর্শবোধ আছে এবং বিবেকও মাঝে মাঝে জাগরিত হয়। কিন্তু যেহেতু তারা শোষিত-প্রলেতারিয়েতও নয়, তাই শ্রেণী চেতনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তারা সর্বহারাদের সঙ্গেও সম্পূর্ণ মিলিত হতেও পারে না। অথচ সমাজে নিজেদের স্বার্থে শোষক শ্রেণীরা এই হতাশ বঞ্চিত সম্প্রদায়কে প্রাণপণে জিইয়ে রেখেছিল। এইরকমই একটি মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী শ্রেণীর প্রতীক ছোটলোক গল্পের রাঘব সরকার।

রাঘব সরকার উন্নত মস্তক এবং মস্তক কখনও কোথাও অবনত করতে চান না। আর এইজন্যই তিনি "যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। তিনি পরোপকারী আত্মবলে বলীয়ান এক ভোগ বিরোধী মানুষ। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।" এ হেন রাঘব সরকার আবার কম্যুনিজম, মার্কসিজম্ তথা নানা প্রকার সমাজনীতি নিয়েও ভেবে থাকেন। সম্ভবত এই কারণেই প্রবল গ্রীষ্মেও তাঁর মাথায় নেই ছাতা, পায়ে কণ্টকসঙ্কুল জুতো, পরিধানে খদ্দর এবং চলাচলের জন্য রিক্সার বদলে দুটি পদই অধিক কাঙ্ক্ষিত সম্বল।

এক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে রাঘব সরকার তাঁর এই বিশিষ্ট স্বকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছেন, এমন সময় সওয়ারির প্রত্যাশায় এক রিক্‌শাওয়ালা ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁর পিছু নিল। কিন্তু রাঘব সরকার মানুষ হয়ে মানুষের পিঠে বা কাঁধে সওয়ার হওয়াকে তাঁর বিচারে অপরাধ

বলে গণ্য করেন। তাই তিনি রিকশাওয়ালাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর মনে হল যে রিকশাওয়ালা এইভাবেই অন্নসংস্থান করে থাকে। এক মুহূর্তে রাঘব সরকারের "মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র নারায়ণ, বলশেভিজম্, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল।" তাঁর মনে হল এই লোকটি সামাজিক, বঞ্চনা ও শোষণের শিকার। রাঘব সরকারের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল, শ্রেণীদ্বন্দ্বে দীর্ণ এ মানুষটি পরাজিত ও শোষিতের পর্যায়ে পড়ে। এক জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে সাহায্য করার বাসনায় রাঘব সরকার জানতে চাইলেন সে শিবতলা যেতে কত পয়সা নেবে। তারপর তিনি রিক্শা না চড়ে রিক্শাওয়ালাটিকে পিছু পিছু হাঁটিয়ে নিয়ে এলেন শিবতলা পর্যন্ত। হতবাক রিক্শাওয়ালা তাঁকে বারংবার রিক্শা চড়ার অনুরোধ করেও বিফল হল।

তারপর যখন শিবতলা অবধি রিক্শাওয়ালাটি আসল, তখন রাঘব সরকার পকেট থেকে ছটি পয়সা বের করে তাকে দিতে চাইলে সে প্রত্যাখ্যান করে বলল যে বাবু তাঁর রিকশায় চড়েননি, তাই সে পয়সা নিতে পারবে না। কথাপ্রসঙ্গে রাঘব সরকারের মন্তব্য—"আমি রিক্শা চড়ি না। রিক্শা চড়া পাপ।" তখন রিক্শাওয়ালাও বলে—"আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না।" এই বলে রাঘব সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে, তাঁর উন্নত মস্তক অবনত করে দিয়ে রিক্শাওয়ালা ঘন্টা ঠুন্ঠুন্ করতে করতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল। এইটুকুই হল গল্পের সারমর্ম।

কিন্তু এই দু'পাতার গল্পটির মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন শ্রেণীচরিত্র, তাদের অবস্থান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে বিশ্লেষণী অনুপুঙ্খ ফুটে উঠেছে, তা দুটি ভিন্ন শ্রেণীর তুমুল বিভেদ ও বৈষম্যকেই প্রমাণ করে। এই দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হল শোষক ও শোষিত শ্রেণী, যাদের এখানে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ও সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রেণী তথা সামাজিক গোষ্ঠী, অর্থাৎ যে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে, এরকম ভোগী ও লাভবান গোষ্ঠী বা শ্রেণী হল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া, যার প্রতিভূ রাঘব সরকার। অপর দিকে যে গোষ্ঠীর শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে তাদের শোষণ করে নিঃস্ব করে ফেলা হয়, তারা হল সর্বহারা, যার প্রতিভূ সেই রিক্শাওয়ালা। এই দুটি চরিত্র এবং তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে দুটি চরিত্র তথা দুটি শ্রেণীর রূপের প্রকাশ তথা শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটনই এই গল্পটির মূল উদ্দেশ্য। গল্পের নামকরণ চরিত্রপ্রাধান্যকেই সূচিত করে।

চরিত্রব্যাখ্যা করতে গেলে আগে রাঘব সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই চিহ্নিত হয় রিক্শাওয়ালার সঙ্গে তাঁর শ্রেণীগত পার্থক্য। রাঘব সরকার একজন নিতান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শবান মানুষ। তাঁর আদর্শ তাঁকে শেখায় সকল মানুষকে সাহায্য করতে অথচ নিজে সাহায্যপ্রার্থী না হতে, তাঁর আদর্শের ফলেই তিনি দরিদ্র শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি আধুনিক ধনতন্ত্রের কুফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, তিনি জানেন শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম কি। রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলন, কর্মবিভাজন, ধনতান্ত্রিকতা, সামন্ততান্ত্রিকতার স্পষ্ট রূপ অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ের নানা সংজ্ঞা বা অভিধা সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। তাই একজন

বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসাবে তিনি করুণাপরবশ হয়ে উঠলেন রিক্‌শাওয়ালাটির প্রতি। তাঁর মনে হল একে তাঁর দয়া বা দাক্ষিণ্য করা প্রয়োজন। কিন্তু রাঘব সরকার ভেবে দেখলেন না যে মার্কসিজম বা কম্যুনিজমে যে শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রমিক বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে, তা এই শ্রেণীবিভেদ বিলোপ করার জন্য, শোষক ও শোষিত এই দুটি শ্রেণীকে মিশিয়ে একটি শ্রেণীতে পরিণত করার জন্য। এইভাবে নিজের শ্রেণীতেই অধিষ্ঠিত হয়ে সেখানে অপর শ্রেণীকে করুণা দেখানোর কোনো অধিকার শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে রাঘব সরকার যতই নিজেকে শ্রেণীচেতনাহীন বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন না কেন, বস্তুত তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না যে তিনি মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং রিক্‌শাওয়ালাটি তাঁর থেকে কম পদমর্যাদাসম্পন্ন সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই রাঘব সরকার কখনোই রিক্‌শাওয়ালার সমগোত্রীয় হতে পারেন না। কেননা সমগোত্রীয়রা একে অপরের প্রতি সমবেদনাসম্পন্ন হতে পারে, কিন্তু দয়া দেখানোর কোনো অধিকার তাদের নেই। অথচ রাঘব সরকার রিক্‌শাওয়ালার প্রতি দয়া পরবশ হয়েছেন, উচ্চে অবস্থানের অপরিসীম দম্ভে তিনি রিক্‌শাওয়ালাকে করুণা করতে সাহস করেছেন। তিনি কখনোই একজন সমগোত্রীয় ভদ্রলোককে 'তুই' সম্বোধন করতে পারতেন না। অথচ তিনি রিক্‌শাওয়ালাকে অনায়াসে 'তুই' সম্বোধন করেছেন। রিক্‌শা চড়া পাপ, এরকম এক ঠুনকো আদর্শবোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি রিক্‌শাওয়ালার অহম্‌বোধে আঘাত করে তাকে তার নিজস্ব সম্মানবোধে জাগিয়ে তুলেছেন। আর এভাবেই রাঘব সরকার নিজের শ্রেণী চরিত্রটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। শেষ কালে যখন রিক্‌শাওয়ালা দ্বারা রাঘব সরকার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন, তখনই যেন শ্রেণী সংগ্রামের তুঙ্গ মুহূর্তটি সূচিত হয়েছে। করুণার দান ছ'পয়সা নিতে অস্বীকার করে প্রলেতারিয়েত রিক্‌শাওয়ালা মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়া রাঘবের সম্মানের দুর্গে আঘাত হানছে, টলমল করে উঠছে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্থিতিশীল অবস্থান। বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা ছোটলোক রিক্‌শাওয়ালা এক মুহূর্তে হয়ে উঠছে গল্পের নায়ক। দয়ার দান ফিরিয়ে দিয়ে সে বস্তুত বুর্জোয়াদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।

রিক্‌শাওয়ালাটি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। সে মানুষকে কাঁধে করে নিয়ে যায় একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে। কিন্তু শিক্ষা ও আভিজাত্যের অভাব তাকে বুর্জোয়া সমাজের কাছে 'ছোটলোক' এই পরিচিতি দিলেও রিক্‌শাওয়ালা তার নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর। রাঘব সরকার হয়তো বা সত্যকারের অভিজাত ও উদারহৃদয় মানুষ। তাই তিনি রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে দরাদরি করেননি। এবং তিনি রিক্‌শা না চড়েও যে পয়সা দিতে চেয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে একদিক থেকে তাঁর পরোপকারী মানসিকতার পরিচয়ও মেলে, কিন্তু এই উদারতা ও পরোপকারচেতনা যে অপর শ্রেণীভুক্ত মানুষটির পক্ষে অপমানজনক, একথা রাঘব সরকার এতটুকু উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ নিজের স্তর থেকে নেমে এসে তিনি কখনোই রিক্‌শাওয়ালার স্তরে নেমে তার সম্মানবোধকে দেখতে পারেননি। কিন্তু রিক্‌শাওয়ালার আছে প্রবল ব্যক্তিত্ব ও অহম্‌বোধ। সে দয়ার দান নিতে রাজি নয়। আপন শ্রমের ফলটুকু গ্রহণ করতে তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ তাকে করুণা করবে এ তার কাঙ্ক্ষিত নয়। ভিক্ষা সে কোনোদিনই নেবে না। জীবনের ন্যূনতম পাথেয়টুকু অর্জন করার জন্য সে

প্রবল গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রীর প্রতীক্ষা করে, সম্ভাব্য যাত্রীর পিছু পিছু ধাবমান হয়, উদ্দেশ্য যাত্রীর কষ্টলাঘব এবং নিজস্ব অর্থোপার্জন। কিন্তু এই রিক্‌শা টানায় কোনোরকম অসম্মান আছে বলে রিক্‌শাওয়ালাটি কখনোই মনে করে না। সওয়ারিশ্রেণীর প্রতি তার বিনম্র শ্রদ্ধাবোধেরও প্রকাশ ঘটে রাঘব সরকারকে তার 'বাবু' 'আপনি' সম্বোধনে। অথচ রাঘব সরকার কিন্তু রিক্‌শাওয়ালাকে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে পারেন না। আসলে রিক্‌শাওয়ালা যে সর্বহারারই একজন, একথা সেও ভালই জানে এবং রাঘব সরকারের শ্রেণী থেকে এক বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং নিজস্ব শ্রেণীসচেতনতা তাকে আরও দৃঢ় ও আত্মসচেতন করে তোলে। তাই যে মুহূর্তে সে রাঘব সরকারকে ফিরিয়ে দেয়, তখন যেন রাঘব সরকারই হয়ে যান ছোটলোক এবং স্বভাবগরিমায় উন্নতমস্তক হয়ে রিক্‌শাওয়ালা একদিন যে সর্বহারাদেরই জয় হবে, তারই ইঙ্গিত বহন করে।

'ছোটলোক' গল্পটির নামকরণের মধ্য দিয়েই গল্পের মূল ভাব সুপরিস্ফুট। আপাতদৃষ্টিতে গল্পে ছোটলোক বলতে সেই রিক্‌শাওয়ালাটিকেই বুঝিয়েছে। বড়লোক অথবা ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত নয় রিক্‌শাওয়ালাটি। সে খেটে যায়, মানুষকে তার কাঁধে করে বহন করে অর্থ রোজগার করে। তার নেই কোনও শিক্ষা, কোনো আভিজাত্য। তাকে কেউ তাই 'আপনি' বলে সম্বোধন করে না। তাকে রাঘব সরকার 'তুই' বলে ডাকলেও তার কোনো অপমানবোধ হয় না। রাঘব সরকার জাতীয় মানুষদের, যাদের সে বহন করে, তাদের প্রতি সে যথেষ্ট সশ্রদ্ধ। সমাজের নিম্নকোটিতে বাস তার, সেই সমাজের মানুষগুলিকে তথাকথিত বুর্জোয়া ভদ্রলোকেরা ছোটলোক বলে ভাবতেই অভ্যস্ত। অপর দিকে রাঘব সরকার এক শিক্ষিত মার্জিত আদর্শবান কৃতবিদ্য ব্যক্তি, যিনি সমাজের সকল শ্রেণীর কাছ থেকেই সম্মান পান। তাই রাঘব সরকার ভদ্রলোক্, তিনি বুদ্ধিজীবী, আর রিক্‌শাওয়ালা ছোটলোক, সে শ্রমজীবী। তবু যখন রাঘব সরকার তাঁর অবস্থানের দম্ভে অহম্‌বোধে দৃপ্ত হয়ে রিক্‌শাওয়ালাটির প্রতি করুণা বর্ষণ করতে যান, তখন আত্মমর্যাদাবোধে রিক্‌শাওয়ালা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে রিক্‌শাওয়ালা এত অকিঞ্চিৎকর একটি মানুষ ছিল, যার কোনো নির্দিষ্ট একটি চরিত্র নামও আমরা গল্পে পাই না, সেই সাধারণ চরিত্রটি অসাধারণ হয়ে ওঠে এক মুহূর্তে তার স্বভাবের দীপ্তিতে এক প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। বস্তুত 'ছোটলোক' গল্পটি শ্রমজীবী শ্রেণীর আত্মসম্মানবোধের উজ্জীবনের কাহিনী। এ গল্পের মূল চরিত্র সেই ছোটলোক রিক্‌শাওয়ালাটি। অথবা বলা যায় যে রিক্‌শাওয়ালা তার সাধারণত্বে ও পদমর্যাদায় রাঘব সরকারের কাছে 'ছোটলোক' শ্রেণীভুক্তই ছিল, সে করুণা ও দয়ার দানের প্রত্যাখ্যানে প্রমাণ করলো যে সে মানুষ বহনের কাজ করলেও তার কাছে তার জীবিকা অসম্মানজনক নয়, এবং তার মধ্যে এই দার্ঢ্য আছে যে সে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ-উপার্জন করে. কারো দয়ার দান গ্রহণের মাধ্যমে তার মনুষ্যসত্তা সঙ্কুচিত হয়। আর কাউকে অকারণ ভিক্ষাদান তাকে অপমান করা, এই কথা সে তার আচরণের মধ্য দিয়ে রাঘব সরকারকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে। রাঘব সরকার উন্নত মস্তক হয়ে তাকে কৃপা করে ভিক্ষাদান করতে গিয়ে নিজেই হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে, তার কাছে হেরে গেছে। আচরণের হীনতায় যেন রাঘব সরকারই হয়ে গেছে ছোটলোক, আর রিক্‌শাওয়ালাটির চারিত্রিক উত্তরণ ঘটেছে। দুটি বিপরীত শ্রেণীর মানুষের অহংবোধের দ্বন্দ্বে

জয়ী হয়েছে রিক্‌শাওয়ালাটি। এখানে রিক্‌শাওয়ালা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ হলেও সে অনায়াসেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে পারছে তার প্রভু শ্রেণীর চরিত্রকে। অর্থাৎ রিক্‌শাওয়ালারা আর মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে দাস্যমনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে না। তাদের কর্মেই তাদের পরিচয় ও সেই কর্ম তাদের কাছে যথেষ্ট সম্মানের। তাই কর্ম না করে সে কখনোই ভিক্ষা নিতে পারে না। রাঘব সরকারের দয়ার মনোভাব, ভিক্ষা দানের প্রচেষ্টা ও 'রিক্‌শা চড়া পাপ' জাতীয় আদর্শ—এ সবই বুর্জোয়া সমাজেরই চারিত্র্যরূপ। রিক্‌শওয়ালা তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের মাধ্যমে সেই চরিত্রকে আঘাত হানে, উভয়ের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বে অবশেষে বিজয়ী হয় ছোটলোক সেই শ্রমজীবী রিক্‌শাওয়ালা। তাই গল্পের শেষে—"লোকটার চোখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল। ..ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।" এতক্ষণের অর্থার্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা জলাঞ্জলি গেল দেখেও তার কোন বিকার নেই। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে রাঘব সরকার সংক্রান্ত ঘটনাটিকেও সে যেন মুছে ফেলে অনায়াসে নতুন সওয়ারির সন্ধানে এগিয়ে যেতে পারে। গল্পটির মধ্য দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে মাত্র দুটি চরিত্র—রিক্‌শাওয়ালা ও রাঘব সরকার। আর কোনো চরিত্রর উপস্থিতি এই গল্পে নেই। কেবলমাত্র দুটি চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমেই উদ্ভাসিত হয়েছে একটি সমগ্র সমাজ, যে সমাজে দুটি অর্থনৈতিক ও সম্মানগত দিক থেকে ভিন্ন দুটি শ্রেণী অহরহ পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত। এ সমাজে উচ্চ শ্রেণী সর্বদাই অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও শোষিত শ্রেণীকে অবজ্ঞা করে, অবহেলা ও বঞ্চনা করে, কৃপা করে। কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীটিও নিজের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাদেরও আছে নিজস্ব জীবনদর্শন, জীবনসংগ্রাম এবং কোথাও তারাও পরাজিত হতে চায় না। তাদের আত্মসম্মান রক্ষার্থে তারাও পাল্টা আঘাত হানতে প্রস্তুত এবং এভাবেই সম্মানের লড়াইতে তারা বিজয়ী হয়। যারা তাদের ছোটলোক বলে অবজ্ঞা করে, তারাই নিজেদের কর্মের ফলে এই শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে সম্মান হারায়, আর মাথা উঁচু করে নিজেদের অবস্থিতিকে সমাজপ্রেক্ষিতে আরও দৃঢ় করতে সমর্থ হয় রিক্‌শাওয়ালারা। আর এভাবেই গল্পের নামকরণ, মূল ভাব ও ব্যঞ্জনা সার্থক ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গল্পটি গঠনশৈলীর দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র দুটি পৃষ্ঠা জুড়ে গল্পের বিস্তার। তার মধ্যেই লেখক তাঁর বলতে চাওয়া সমস্ত কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পের বৃত্তবিভাগ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সোপানারোহ বা stair step plot অনুযায়ী গল্পটি সজ্জিত। গল্পের একটি নির্দিষ্ট সূচনা আছে, climax-এ গিয়ে গল্পটি তুঙ্গী এবং তার পরে একটি চমকিত সমাপ্তি বা ending-এর মধ্য দিয়ে গল্পটি পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। সূচনায় দেখি নির্দিষ্ট বর্ণনাশ্রয়, গল্পের অন্যতম মুখ্য চরিত্র রাঘব সরকার তাঁর বিশিষ্ট ইজ্‌মের লক্ষণ সারা শরীরে ও পোশাকে এবং আচরণে ধারণ করে কঠোর উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে পায়ে হেঁটে ছত্রবিহীন অবস্থায় চলেছেন। এই সূচনাতেই রয়েছে উক্ত রাঘব সরকারের চরিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এরপরই রিক্‌শাওয়ালার আবির্ভাব এবং রাঘব সরকারের মনে নানা তত্ত্বের উদয়। গল্পের ক্লাইম্যাক্স সূচিত হয় যখন রাঘব সরকার রিক্‌শাওয়ালাটির রিক্‌শায় না চড়ে তাকে হাঁটিয়ে শিবতলার দিকে নিয়ে যেতে শুরু করেন। গল্পের সমাপ্তি যথেষ্ট চমকপ্রদ। রিক্‌শা না চড়েই

যখন রাঘব সরকার রিক্‌শাওয়ালাকে ভাড়া দিতে গেলেন, তখন সে সেই ভিক্ষার দান নিতে অস্বীকার করল এবং আবার সওয়ারির প্রত্যাশায় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর আগে পর্যন্ত বোঝা যায়নি যে রিক্‌শাওয়ালাটির আত্মসম্মানবোধ এত দৃঢ় এবং সে রাঘব সরকারকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এইভাবে গল্প অত্যন্ত দ্রুততায় অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বর্ণনার বাহুল্যহীনতাকে যথাযথ অনুসরণ করে শেষ হয়েছে।

গল্পটি পড়ে প্রথমে মনে হতে পারে বুঝি এটি চরিত্রমুখ্য গল্প। কারণ রিক্‌শাওয়ালা ও রাঘব সরকার এই দুটি চরিত্রের উল্লাসই গল্পের মুখ্য আকর্ষণ। কিন্তু একটু গভীরে বিচরণ করলেই গল্পের প্রতীকধর্মিতাকে চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। গল্পে দুটি মাত্র চরিত্র, কিন্তু কেবল ব্যক্তি চরিত্র হিসেবেই তাদের পরিচয়ের শেষ নয়, তারা দুটি সামাজিক শ্রেণীর প্রতীক। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতীক রাঘব সরকার এবং সর্বহারা শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতীক রিক্‌শাওয়ালা। বস্তুত এই শ্রমজীবী শ্রেণীর উত্থান ও সম্মানবোধের কথাই গল্পের মূল উপজীব্য। তাই এই শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতীক রিক্‌শাওয়ালাটির কোনও ব্যক্তিনাম থাকে না। সে কেবল একজন শ্রমজীবী মানুষ, যারা খেটে খায়, যারা কর্মহীনভাবে অর্থগ্রহণকে ভিক্ষার দান বলে মনে করে এবং তা ফিরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। আর এই দুটি শ্রেণীর বৈষম্য ও তাদের দ্বন্দ্বই গল্পের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে গল্পটিকে প্রতীতিমুখ্য করে তুলেছে।

সাধুভাষায় লেখা গল্পটি অনেকাংশেই সংলাপ প্রধান। সংলাপের স্থানগুলি বাস্তবতাকে মেনে চলিত কথ্য ভাষায় লিখিত। সাধু-চলিতের এই প্রয়োজনীয় মিশ্রণ গল্পের ভাষাকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। ভাষার বর্ণনামূলকতার অংশতেও কোথাও নেই কোনো বাহুল্য, যেখানে যে শব্দটির ব্যবহার যথোপযুক্ত, সেখানে সেই শব্দের ব্যবহারে ভাষা সুমিত। "রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁর মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্রনারায়ণ, বলশেভিজম, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল।" —এই একটিমাত্র বাক্য রাঘব সরকার চরিত্রটির পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার গল্পের গতিশীলতাকে আরো বাড়িয়েছে। আদর্শ ছোটগল্প বা অণুগল্পের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুনরুক্তিবর্জন, বর্ণনার সংক্ষিপ্তি, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা, গল্প বলার ভঙ্গির সহজ সরল সাবলীলতা, সমাপ্তির আকস্মিক চমক এসবই নিখুঁতভাবে এই গল্পে প্রযুক্ত, ছোটলোক গল্পটি যে তার ভাব-ভাষা ও বিষয়ে বনফুলের ছোটগল্প তথা অণুগল্প রচনাপ্রতিভার একটি স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিরজুর মা : বিষয়, ভাবনা ও আধুনিকত্ব

হিমাদ্রীশ চট্টোপাধ্যায়

"বিরজুর মা" গল্পটি ১৯৬৩ সালে "মনিহারী" গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ। পরে এটি গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত "বনফুলের গল্পসমগ্রে"র চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত বইটির নামের সঙ্গে এই গল্পে মিল চোখে পড়ার মত। বিরজুর মা এক গয়লানী। তিনি যে গ্রামে থাকতেন তার নামও মনিহারী। হয়তো গল্পকার বিভিন্ন বিচিত্র গল্পের সম্ভারের জন্য গল্পগ্রন্থের নাম মনিহারী রেখেছেন। কিন্তু এই গল্পের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রে বর্ণময়তা খুব একটা দেখা যায় না। এখানে বিরজুর মা একাই একশো। ক্ষুদ্র চারপাতার মধ্যে তিনি যা বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন তাতেই গল্পটির নামকরণ যথার্থ ও সার্থক।

গল্পটি শুরু গল্পকারের বাল্যস্মৃতি দিয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন গ্রামের ডাক্তার। মা সংসারের কর্ত্রী। তবে সেই স্নেহময়ীর সংসার তাঁর বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গ্রামের চৌদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দাজ করা যায় স্বামী ডাক্তার হবার সুবাদে, তাঁর বাড়িতে গ্রাম শুদ্ধ লোকের আসাযাওয়া ছিল। এবং চিকিৎসা সুলভ হওয়ায় তিনি বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের অসুখ বিসুখ, নাকে সিকনি, মুখে ঘা ইত্যাদি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর এই স্নেহময়তার পূর্ণ সদব্যবহার করতেন বিরজুর মা। তিনি যখনই দুধ দিতে আসতেন সঙ্গে করে একটা না একটা ছেলে মেয়ে নিয়ে আসতেন। তাদেরই আনতেন যাদের বাপ-মার ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবার মত সচেতনতা বা সক্ষমতা ছিল না। মানুষ প্রধানত স্বার্থপর হলেও গল্পের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মধ্যে অনায়াসে প্রমাণিত হয় বিরজুর মা দরদী ছিলেন। কিন্তু তিনি কি নিঃস্বার্থ ছিলেন?

বিরজুর মা পেশায় গয়লানী কিন্তু নেশায় গাঁয়ের গেজেট। এ বাড়িতে তিনি মাত্র একপোয়া দুধ দিতে আসতেন যদিও বাড়িতে অনেক দুধ হোতো। তবে তাঁর দুধের বৈশিষ্ট্য সেটি কালো গরুর দুধ। তাই গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা সে একপোয়া করে দিয়ে যায়। বলাই বাহুল্য এটি অজুহাত মাত্র। গৃহিণীর উদ্দেশ্য গ্রামের সব ঘরের হাঁড়ির খবর। তার সঙ্গে বাড়ির গরুগুলোর গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিয়ে দেওয়া। বিরজুর মার স্বার্থ বিনাপয়সায় ডাক্তার দেখানো। এখন বোঝা যাচ্ছে দুই নারীই হৃদয়বতী ছিলেন। দুজনেই কিছু লোকদেখানো স্বার্থের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। যেটুকু না রাখলে হয়তো যাতায়াত বা খবর সংগ্রহের নিত্যতা বজায় থাকত না। দুইমায়ের স্বার্থই বৃহৎ স্বার্থ। কিন্তু বিরজুর মার স্বার্থগুলো কেমন যেন অন্যতর। সেই সব স্বার্থগুলো মানুষ হিসেবে তাঁকে মহৎ করে তোলে।

বিরজুর মার চেহারাটি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানানসই। তিনি বেঁটে, রঙময়লা, ঘাড়টি ডানদিকে সামান্য হেলানো, চোখের তারার মাঝখানে সাদা দাগ, বয়স লেখকের মায়ের মতো। তাঁর কণ্ঠস্বর প্রধানত তিন প্রকার। সদুপদেশে উদারা, বাক্যালাপে মুদারা ও কলহে

তারা। এছাড়াও পরনিন্দার সময় সেটি ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো। তিনি জাতিতে বিহারী। এমত বর্ণনার থেকে এই বর্ণময়ী সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা করা যায় তা দিয়ে গল্প তরতরিয়ে এগিয়ে চলে।

গল্পটি দুটি প্রধান অণুগল্প দিয়ে গঠিত।

প্রথম কাহিনীতে বিরজুর মাকে দেখা যায় গৃহিণীর কাছে অভিযোগ করতে। তাঁর ছেলে হক্রু তাঁর দুটি রূপোর বালা ছিনতাই করেছে। সে অতি অবাধ্য। বৌয়ের কথায় ওঠে বসে। বৌটিও মহা পাজী। লুকিয়ে বাপের বাড়ি যায়। মাসে দু-তিনটে করে হাঁড়ি ভাঙে। কাপড়ে খোঁচা লাগিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। মাথাটি তেলহীন কাকের বাসা বিশেষ। তার বাপ নিমু গোয়ালাও পাজী ছিল। দিনরাত তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকত। সে হকরুকে বশ করেছে। তাই হকরুও কাজকর্ম ফেলে পেছন পেছন ছোটে। কারণ মেয়েটা ফর্সা আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। এমত অভিযোগের সামনে পড়ে থতমত হয়ে যেতে হয়। গৃহিণী ডাক্তার বাবুর কাছে হক্রুকে বিচারের জন্য সমন পাঠান ও সে আসে। তাকে দেখে হকরুর মায়ের ছেলে বলে মনেই হয় না। সে কালো, ষণ্ডা, তাল গাছের মতো লম্বা ও তথৈবত হাত পা ওলা একটা লোক। সে ছিনতাইএর কথা অস্বীকার করে বলল তার মা তাকে ওদুটো গরু কেনার জন্য দেবে বলেছিল। দরদাম করে চাইতে গেলে জানায় মেখুকে দিয়ে দিয়েছে। বাক্স খুলে দেখা যায় সেদুটো তার মধ্যেই আছে। তাই সে নিয়ে গেল। না নিয়ে উপায়ও ছিল না। এহেন ক্লাইম্যাক্সের মধ্যে বিরজুর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে আসল অভিযোগটি পেশ করেন যে ও আজকাল তাঁকে মানে না বৌ-এর কথায় ওঠে বসে। এরপর ডাক্তারবাবু ধমকে, মার পা-ধরে ক্ষমা চাইবার রায় দেন। হকরুও তা পালন করতে গেলে স্নেহময়ী খুশি ও গরবিনী হয়ে অচিরাৎ ক্ষমা করে দেন।

দ্বিতীয় গল্পটি লেখকের বছরদশ বয়সের। গ্রামের দূরবর্তী এক জমিতে তাঁদের বাড়ির চাষ ছিল। সেখানে মটরশুঁটি হয়েছে শুনে বালকের মাঠে বসে গাছ থেকে মটরশুঁটি ছিঁড়ে খাবার সাধ হয়। শীতের এক দুপুরে সেই বালক বের হয়ে পড়ে। জমিটি দূরে। রাস্তা অচেনা। অচেনা রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ এগিয়ে হঠাৎ একটি চলমান বোঝা দেখে সে থমকে যায়। বোঝার নীচে দুটি পা। ও সঙ্গে একটি ছেলে। এক বোঝা মটরশুঁটি বিরজুর মা মাথায় করে নিয়ে আসছিলেন। বালকের অভিপ্রায় জানতে পেরে তিনি বটগাছতলায় বসিয়ে প্রাণভরে তাকে মটর খাওয়ান। বালকটি মাকে না বলার প্রস্তাব দিলে তিনি অবশ্য একটি শর্ত আরোপ করেন। তিনি অনুরোধ করেন যদি তাঁকে একটি চুমো দেয় তবে তিনি বলবেন না। বালকটি এ প্রস্তাব যতক্ষণ বিবেচনা করছে ততক্ষণে তিনি হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে একটি চুম্বন দেন ও ছোটো ছেলেটিকে দিয়ে তাঁর আর এক বড়, ফর্সা, লম্বা, ঘাস কাটিয়ে মেয়েকে ডেকে বালকটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

বিরজুর মা প্রায়ই লেখকের মাকে বলত তাঁর ছেলেটি তারও আর এক ছেলে। সেই ছেলের জন্য তিনি প্রতি পুজোয় রঙিন জামা কিনে দিতেন। তারপর নিজের হাতে সেই জামা পরিয়ে ঠাকুর দেখাতেন। সেসময়ও তাঁর সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে থাকত। সবাইকেই তিনি কিছু না কিছু কিনে দিতেন। যেমন গণেশ, মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি প্রায়ই সর, চাঁছি, মিষ্টি, পেয়ারা ইত্যাদি নিয়ে আসতেন।

এহেন বিরজুর মাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তাঁর ছেলে বিরজু কোথায় তিনি কেঁদে ফেলেন। জানা যায় যে বছর গ্রামে কলেরা হয় সে বছর বিরজু ওপরওলার মর্জিতে মারা যায়। সে খুব ভাল ছেলে ছিল।

গল্পের অন্তিম পর্ব বিরজুর মার শবযাত্রার দৃশ্যে। সমস্ত গ্রাম, সমস্ত বয়সের মানুষ, একপাল ছেলেমেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। এই অন্তিম পর্বে বালক যখন সদ্যযুবক হয়েছেন তিনি জানতে পারেন বিরজুর মা চিরকুমারী ছিলেন। বিরজুর বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে ভেঙে যায়। বিরজুর বাবা অন্য জায়গায় বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম সন্তান বিরজু। বিরজুর বাবা সেই সন্তানটিকে তাঁকে দান করেন। সেই থেকে তিনি বিরজুর মা নামে পরিচিত। যদিও তাঁর আসল নাম ছিল সোহাগ।

গল্পটির শেষাংশ আমাদের স্তব্ধ করে। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলো আমাদের ভাবিয়ে তোলে ও ভেবে দিশাহারা হতে হয়। যে সমস্ত খণ্ড চিত্র জুড়ে এই চরিত্রটি তৈরী তার কোনোটাই অবাস্তব নয়। সেই কারণেই গল্পটি পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। বা পড়তে গিয়ে শেষের আগেটুকু পর্যন্ত একবারও মনে হয় না কোনো অতিরঞ্জন হচ্ছে। কিন্তু শেষটুকু পড়ে একবার অন্তত ঢোক গিলতে হয়। হয়তো পেছন ফিরে দেখতে হয়— কেউ দেখছে না তো? কারণটা খুবই সহজ। মানুষ হিসেবে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা এখানে ধরা পড়ে যায়। অথচ নিশিদিন বাঁচতে গিয়ে কত সযত্নে আমাদের কতো রকম মহত্ত্ব নিজেদের ওপর আরোপ করতে হয়। সে গুলো বাঁচিয়ে, আবার স্বার্থও বাঁচিয়ে চলার মধ্যে একটা সংঘাত তৈরী হয় যার থেকে আর বের হওয়া যায় না। যদি আদৌ কখনো বের হতে হয় তাতে অনেক লজ্জা। অথচ এই সামান্য নারী কি অনায়াসে তাঁর জীবনের এক বিশিষ্ট অপমানকে জড়িয়ে ধরেই বাঁচার রাস্তা তৈরী করে নিয়েছেন। সাধারণত দুঃখের শুরু আনন্দের শেষ থেকে। এঁর ক্ষেত্রে একটি আনন্দময় জীবন শুরু হয়েছে এক গভীর দুঃখের শেষে।

বিরজুর মার চরিত্রের যে দিকটি ভারী বর্ণময় সেটি হল তাঁর কোঁদল করার বিষয়। শাশুড়ী বউ এর ঝগড়া বঙ্গ জীবনে বা ভারতীয় সমাজে নতুন নয় বরং বিশদ গবেষণার বিষয়। সেই ঝগড়ার বিষয়বস্তু প্রায়ই দোষ, গুণ, ভাষা, ভাব, আপোষ বা বিচ্ছেদের বৈচিত্র্যে আমাদের কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বিস্মিত হবার একটু অন্য কারণ থাকে। প্রথম কারণ হক্‌রু তাঁর নিজের সন্তানই নয়। তা সত্ত্বেও অপত্য স্নেহ প্রকাশে তিনি বহু মাকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত হক্‌রু তার বৌ-এর কথায় ওঠে বসে। সে তার বৌ-কে একটা রঙীন শাড়ি তাঁকে না জানিয়ে কিনে দিয়েছে। এই উষ্মাপ্রকাশ তাঁব অপ্রাপ্তিকেই প্রমাণ করে। জীবনে তাঁরও হয়তো রঙীন শাড়ি স্বামী লুকিয়ে এনে দিচ্ছে বা স্বামী তার কথা শোনে এরকম রোম্যান্টিক স্বপ্ন তখনো অবশিষ্ট থেকে থাকবে। চিরকুমারী এই নারীর সেই অপ্রাপ্তিকে এক বিচিত্র মোড়কে প্রকাশ করেছেন। এর থেকে যেটা প্রমাণ হয় যে তিনি নারী হিসেবে আর পাঁচটা শাশুড়ীর থেকে খুব একটা আলাদা নন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঠিক মেনে নেওয়া যায় না তাঁর চরিত্রের অন্য দিকগুলির দিকে তাকালে। সেখানে তিনি অদ্ভুত ভাবে আলাদা।

বিরজুর মার সবচেয়ে আকর্ষক দিকটি হল তাঁর মাতৃত্ব। তিনি গ্রামসুদ্ধু ছেলেমেয়েরেই

মা। মাতৃদুগ্ধদানের অভাব তিনি তাঁর পেশার মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও পূরণ করেছেন। আর বাড়তি পাওনা হিসেবে পেয়েছেন সব বাড়ির অন্তঃপুরে যাবার অধিকার। সে জন্য তাঁর গ্রাম সুদ্ধু ছেলেমেয়ে চেনা। মনে রাখা উচিত এমন অধিকার আরও অনেকলোকই পান—যেমন নাপিত বৌ বা মাছওয়ালী। কিন্তু সব শিশুর মা হওয়ার কোনো তাগিদ তাদের থাকে না। বিরজুর মার ক্ষেত্রে তাগিদটা স্বাভাবিকএর চেয়ে যেন কিছুটা বেশি। গ্রামসুদ্ধু শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি যেন বারবার নিজের মাতৃত্বকে খুঁজে পেতে চান। তাঁর মধ্যেও যে মাতৃ-অনুভূতিগুলো আছে সেগুলো তিনি কিছুতেই হারাতে দিতে চান না। বরং সেই অনুভূতিগুলোকে সযত্নে বাঁচিয়ে ও বাড়িয়ে নেন। বেঁচে থাকাটা তিনি নিজের মত করে অর্থপূর্ণ, বর্ণময় ও শূন্যতাশূন্য করে তোলেন।

বিরজুর মা প্রথম যে সন্তানটি প্রতিপালন করেন সেটি তাঁর না হওয়া স্বামী তাঁর কোলে তুলে দেন। যদিও এখানে একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচা দেয় যে ছেলেটির জন্মদাত্রী মা কি করে এত সহজে বিষয়টা মেনে নিল? হয়তো এটাই ছোটোগল্পের চরিত্র, সব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া। কারণ এতক্ষণ যতটা পাওয়া গেছে সেই আখ্যানমালা এতই মসৃণ যে তারপরে এটা মেনে নিতে সামান্য অসুবিধে হলেও উপায় থাকে না। এই মাতৃত্ব কি বিরজুর মার মা সত্তা ছাড়াও প্রেমিকা সত্তাটিকে প্রকট করে? একবার বিয়ে ভেঙে গেলে দ্বিতীয়বার বিয়ের ঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তিনি সে রাস্তায় যান নি। তিনি তাঁর প্রেমের যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়েছেন সমস্ত জীবন একা থেকে। এই একাকীত্ব আমাদের নাড়া দেয়। মানুষ হিসেবে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে। তিনি—ঠিক হয়, ভেঙে যায়, আবার হয়—এমন মানুষ-এর মিছিলে না গিয়ে একাই অন্য একটা দল তৈরী করেছেন। সেটা হয় না এবং দরকার নেই এর দল। যারা হারিয়ে আক্ষেপ করে না। বরং পাওয়া ও না-পাওয়াটাকে সমান দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে। জানতে ইচ্ছে হয় তাঁর সদ্য যৌবনে যখন তিনি এ রাস্তায় হাঁটা শুরু করেন তখন এ শিক্ষাটি তিনি কোথা থেকে পেলেন। এরকম ভাগবতী শিক্ষা—সুখদুঃখে সমদর্শী হওয়া-অতি উচ্চমানের সাধকের পক্ষেও বিরল। এ নারী শুধু শিক্ষাটি গ্রহণ করেন নি, তিনি জীবন দিয়ে তা পালনও করে এসেছেন। তিনি ধার্মিক ছিলেন সেটা শিশুদের গণেশ, মহাদেব বা শ্রীকৃষ্ণ উপহার দেবার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। কিন্তু ধর্ম পালনের ব্যাপারটা তিনি মানবধর্মে পাল্টে ফেলেছেন। এখানেই তিনি একবারে আলাদা।

আবার ভাবতে ইচ্ছে হয় তার মাতৃরূপটি ঠিক কি ধরনের? এককথায় বলা যায় মা হিসেবে তিনি ভীষণ পরিপূর্ণ। তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি বিরজুকে বেশিদিন কাছে পাননি। যে বছর গ্রামে কলেরার মহামারী হয় সে বছর বিরজু মারা যায়। যদিও এর মধ্যেও তিনি ওপরওয়ালার মর্জিই দেখতে পেয়েছেন। মনে হয় যদি বিরজু বেঁচে থাকত তাহলে তাঁর মাতৃত্ব এরকম সর্বব্যাপী হোতো না। কিন্তু প্রথম অপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয়বার পেয়ে হাবানো এ নদীর দুকূল ভেঙে দেয়। আর সেই মাতৃত্বের প্লাবনে তিনি গোটা একটা গ্রামকে ভাসিয়ে দেন। আরও একবার দেখতে পাই মানুষ হিসেবে তিনি একদিকে যেমন প্রেমিকা ও দরদী অন্যদিকে তেমনি কঠিন, বাস্তববাদী ও আশাবাদী। সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয় তিনি যে মাতৃত্বের সংজ্ঞায় বিশ্বাসী তার সামনাসামনি হলে। একদিক থেকে ভাবলে বিরজু তাঁর সতীনেব

ছেলে। যেটি তাঁর পক্ষে অসহ্য হতে পারত সেই প্রায় সতীনের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে তিনি বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজেছেন। সেটি যখন হারিয়েছেন তখন তিনি মাতৃত্বের এক আধুনিক সংজ্ঞা খুঁজে নিয়েছেন। বিশ্বমাতৃত্ব ঠিক কি হতে পারে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং এই দেখানোটা যে নেহাতই লোক-দেখানো নয় তা তাঁর মৃত্যু দৃশ্যে প্রমাণ পাই। গোটা গ্রামের সমস্ত মানুষ তাঁর শবযাত্রায় চলেছেন। সব বয়েসের লোক। একপাল ছেলে-মেয়ে। সবাই আকুল ভাবে কাঁদছে।

বিরজুর মা সময়ের সাপেক্ষে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। প্রথমত তিনি প্রেমকে মহত্ত্ব দান করেছেন। তাঁর না হওয়া স্বামী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করলেও তিনি সেই স্মৃতি ও তাঁর দিকের প্রতিশ্রুতি আজীবন রক্ষা করেছেন। এটি যদি আমরা লগ্নভ্রষ্টা হিসেবে দেখি তাহলে ভুল করব। তাঁর বিবাহ লগ্ন কখনো স্থির হয়নি। এমন ট্রাজেডির সামনেও তিনি অবিচল। বস্তুত এটি একটি প্রেমগাথা। দ্বিতীয়ত একক মাতৃত্ব বা দত্তক গ্রহণের মতো যে সব ধারণা আজকে আমরা অতি শ্লাঘার সঙ্গে বলে থাকি সেটা তিনি সে সময়েই করে দেখিয়েছেন। বরং তাঁর পক্ষে কাজটা আরও একটু জটিল ছিল। একক মাতৃত্বে সামাজিক স্বীকৃতির অভাব থাকে। মাতৃত্বের বাকি দিকগুলো একই থাকে। দত্তকের ক্ষেত্রেও একটা সামাজিক বা আইনি দিক থাকে। এক্ষেত্রে আমরা দুটো দিকেরই কিছু কিছু অংশ দেখতে পাই। স্বামীর স্মৃতিকে হারাতে না দেবার জন্য তাঁর সন্তানকে প্রতিপালন-বঞ্চনা ও ক্ষমার এমন মিশেল খুব একটা দেখা যায় না। তৃতীয়ত তাঁর আর এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমদর্শিতা। তিনি শুধুমাত্র দুঃখ সুখের ক্ষেত্রেই সমদর্শী ছিলেন তা নয়, সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একই নীতি নিয়েছেন। বিরজু থেকে হক্রু, ডাক্তারবাবুর ছেলে থেকে নাকে সিকনিওলা বালক সবাই তাঁর 'বেটা'। এছাড়াও তিনি ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে যে প্রভেদ করা হয় সেটিও মানতেন না, শিশুমাত্রেই তাঁর সন্তান। সাধারণভাবে অভাবী সংসার যেসব বিষয়ে উদাসীন হয় যেমন চিকিৎসা, বিনোদন, পোষাক সেগুলি তিনি যথাসাধ্য মিটিয়ে গেছেন। এব্যাপারে তাঁর উচ্চ-নীচ, গরিব বড়লোক ভেদাভেদ ছিল না। চতুর্থত যে ব্যাপারটা বেশ নাড়া দেয় যে তিনি সমাজের নীচের তলার মানুষ হয়েও কোনো জায়গায় ব্যবহারে বা অধিকার প্রয়োগে কুণ্ঠিত ছিলেন না। সর্বত্র তাঁর একটি অনায়াস গতি ছিল। তাঁর জীবনের কথা নিশ্চয় গ্রামের লোকেদের অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি সেই সত্যিকে অকপটে জানাতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। আমরা যখন তথাকথিত শিক্ষার বড়াই করি বা নিজেদের আধুনিক বলে জাহির করি তখনো কিন্তু এই নারীর করা কাজকর্ম করার আগে আমরা দুবার ভাবব অথবা করবো না। আমাদের শিক্ষিত ধারণাগুলি প্রায়ই আরোপিত। বিরজুর মার ক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক। তিনি যেমন শাশুড়িদের বউ এর বিরদ্ধে অভিযোগের পুরোনো ধারাটি বজায় রেখেছেন তেমনি এককমাতৃত্বের বা বিশ্বমাতৃত্বের নিঃস্বার্থ ধারাটি নিজেরমত করে বইয়ে দিয়েছেন। সমাজ তাঁকে প্রতিদানে কি দেবে তা চিন্তা করে তিনি এসব কাজ করেন নি। কিছুটা নিজের বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে—বাকিটা আনন্দে। এই কাজে তাঁর স্বাবলম্বন—তাঁর দুধ বিক্রির পেশা তাঁকে সাহায্য করেছিল। তিনি সেই উপার্জন অকাতরে খরচ করতেন শিশুদের জন্য মনের মতো জিনিস কিনে। এককথায় তিনি মহৎ ছিলেন। এবং এই মহত্ত্ব

আরোপিত বা লোক দেখানো ছিল না। তিনি যা করে দেখিয়েছেন তা সেই সময়ে কেন আজকের নিরিখেও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। কিন্তু তিনি যে অনায়াসভাবে এগুলি করেছেন সেটাই গল্পটিকে উত্তীর্ণ করে তোলে।

এই ছোট গল্পটির সামনে আমাদের রুদ্ধবাক হতে হয়। যে সমস্ত ধারণাকে আমরা আধুনিকতা বা অতি আধুনিকতা বলে থাকি তার অনেকগুলিই এখানে এসেছে এমন একটা সময়কালে এমন একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যার মুখোমুখি হলে আমাদের হেরে যেতে লজ্জা হলেও না হেরে উপায় থাকে না। আমরা অত্যাধুনিক ধ্যান ধারণা দ্বারা ঋদ্ধ হলেও প্রায়ই তা পালনে অসমর্থ। যদি বা কখনো পালন করি কবে তা প্রচারে অতি ব্যগ্র থাকি। এই সহজিয়া গল্পটিতে যে ধরনের আধুনিকতা দেখানো হয়েছে তাতে আমাদের লজ্জায় পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। আর তা থেকে বের হতে গেলে যতটা নিঃস্বার্থ হতে হয় তা অনেকসময় সম্ভব হয় না। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিরজুর মা একক ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন। তাঁর আধুনিকতা আমাদের আচ্ছন্ন করে। আর এই ক্ষুদ্র গল্পটি কখন যে এত কথা বলে ফেলে তা বুঝতে গিয়েই গল্পটি আর একবার পড়া শুরু করতে হয়।

বুধ্‌নী : বর্বর জননীর মাতৃত্ব

তপন মণ্ডল

বাংলা কথাসাহিত্যে কল্লোলের কালে কিন্তু কল্লোলগোষ্ঠী বহির্ভূত এক অসাধারণ জনপ্রিয় ছোটগল্পকার ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রথমজীবনে 'বনফুল' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। পরবর্তীকালে 'বনফুল' বাংলা সাহিত্যে একটি জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠল। কবিতা, উপন্যাস, নাটক এবং বিশেষ করে ছোটগল্প লিখে তিনি সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন। ছোটগল্প সৃজনকৌশলে বনফুলের তারিফ করতেই হয়। বলাই বাহুল্য, ছোটগল্প, একদিক থেকে গীতিকবিতার সমধর্মী। উভয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে মুহূর্ত লীলার মধ্যে শাশ্বত জীবনরহস্যের এক অভিব্যঞ্জনা।

ছোটগল্প সৃষ্টি সম্ভারে মানবজীবনের সেই সত্য ও অতিবাস্তব মুহূর্তকে বিচিত্ররূপে বনফুল তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। শিল্পীর সুনিপুণ তুলির আঁচড়ে কখনো তা হয়ে উঠেছে অতিসুন্দর, কখনো বা কুৎসিত, আবার কখনো তা উদার কিম্বা নীচ অথবা কখনো তা আত্মসুখপরায়ণতায় অতি সংকীর্ণ। পৃথিবীর এই বিচিত্র লীলাখেলা মানবজীবনের প্রতি পদে পদে ভিন্নরূপ নেয়, ভিন্ন স্বাদ পায়—গল্পকার সেই বিচিত্ররূপের দক্ষ শিল্পী। তিনি বাস্তবের মাটিতে পা রেখে সমাজ সংসারের লীলাখেলার অংশীদার হয়ে সমাজের তথা মানব জীবনের চরম বাস্তবসত্য ঘটনাকে যেমনটি দেখেছেন, ঠিক তেমনটি এঁকেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, বনফুল পাশ্চাত্য ছোটগল্পকার মোপাসাঁ, জোলা বা বালজাকের মত লেখক নন। কারণ, তিনি জীবনের শুধু রূপকার নন, জীবনের সার্থক ব্যাখ্যাকারও বটে। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ শুধু মানুষ—সে স্বর্গের দেবতাও নয় আবার নরকের শয়তানও নয়। সমাজ সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ভুল করে, পাপ করে, আবার ভুলের মাশুলও দেয়, পাপের সাজাও পায়। আমরা জানি, মানবজাতির এসব কাহিনী নিয়ে সৃষ্টি হয় মানুষের নিয়তি। গল্পকার মানবজাতির সেই জীবনকে যথার্থ মূল্যে স্থান দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। আমাদের আলোচ্য 'বুধ্‌নী' গল্পেরও মূল বিষয় সেই মানুষের কথা।—মানব জীবনের জৈবিক তাড়নায় যৌবনের উন্মাদনায় মিলিত হয়েছে একজোড়া অন্ত্যজ নরনারী।—তাদের বর্বর জীবনের প্রণয়লীলা আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়।

দুই

'বনফুল'-এর ছোট্ট এই গল্পটির স্থান হাজারিবাগের পার্বত্য অঞ্চল। লেখক একদিন জেলখানায় বেড়াতে গিয়ে এক কয়েদীর আর্ত-করুণ চিৎকার শুনতে পান। " 'বুধ্‌নী-বুধ্‌নী-বুধনী-বুধ্‌নী-বুধ্‌নী!' ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে স্ত্রীর নাম ধরে চিৎকার করে চলেছে হাজারিবাগ পার্বত্য পল্লীর এক বলিষ্ঠ যুবক—বুধ্‌নীর স্বামী বিল্‌টু। কাল তার ফাঁসি হবে। আইনের চোখে সে দোষী, সমাজের মঙ্গল কামনায় এই শিশু-হত্যাকারী অপরাধীর ফাঁসি। বিল্‌টুর জীবন প্রদীপের তেল শেষ হয়ে যায়নি, সলতেও শেষ হয়নি, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে—কিন্তু সে শিখা

নিভে যাবে।-শুধুমাত্র একটি সবল ফুৎকারে তা নিভিয়ে দেওয়া হবে। অপরাধ বিল্টু-বুধ্নীর প্রেমের প্রতিফল এক নিষ্পাপ শিশু—এবং তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এই বিল্টু—
"নৃশংস শিশু হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।"

'বুধ্নী' গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর এক নবদম্পতির আব্রুহীন প্রণয় কাহিনী স্থান পেয়েছে। বর্তমান সভ্য সমাজের তুলনায় এদের প্রণয় অভিব্যক্তি অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির—কারণ, তারা বর্বর বন্য দম্পতি, কাজেই তাদের প্রণয় অভিব্যক্তি আদিম প্রকৃতির হওয়াই স্বাভাবিক। হাজারিবাগের পার্বত্য প্রদেশে এদের বসবাস। পার্বত্য পল্লীর এক ধনুকধারী বিল্টু। অরণ্যচারী ধনুকধারী বিল্টু শিকার সন্ধান করতে করতে একদিন এক মহুয়া গাছের তলায় সাক্ষাৎ পেয়েছিল নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী-কিশোরী বুধ্নীর। বিল্টু বুধ্নীকে প্রথম দর্শনেই তাকে বন্য পশুর মতই তাড়া করেছিল। সভ্যসমাজের কোন যুবক আলো ছায়া খচিত মহুয়া গাছের তলায় কোন যুবতীকে দেখলে হয়তো ঔদাসীন্য ভরে চলে যেত, কিন্তু বিল্টু তা করেনি। বরং বন্যপশুর মতই এই কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরীকে তাড়া করেছিল—

> "ত্রস্তা হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু বিল্টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।"

অবশেষে বিল্টু তাকে বিবাহ করেছিল। প্রাণসংশয় শক্তি পরীক্ষায় বিল্টু উত্তীর্ণ হয়েছিল। তারপর বুধ্নীকে বিবাহ করতে সক্ষমও হয়েছিল। এদের সমাজে এক অদ্ভুত বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কখনো কখনো সকালবেলা এক বিস্তীর্ণ মাঠে এদের সভা বসত। সেই সভায় কুমার কুমারীরা উপস্থিত হত। একটা পাত্রে কিছুটা সিঁদুর গোলা থাকত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হলে তাকে সেই কুমারীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিতে হত। তারপর সেই যুবকের প্রাণসংশয়। ঐ কুমারীর আত্মীয় পরিজনেরা সাথে সাথে ধনুর্বাণ, সড়কি, বল্লম নিয়ে ঐ যুবককে তাড়া করবে। যুবক যদি আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলে যুবকের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু যুবক যদি সারাটি দিন ধরে আত্মরক্ষা করতে পারে তাহলে আত্মীয় স্বজনেরা সন্ধ্যায় মহাআনন্দে মাদল, বাঁশি বাজিয়ে, কলরব করতে করতে পাত্রের বাড়িতে কন্যাকে পৌঁছে দেবে। এই শক্তি পরীক্ষায় বিল্টু উত্তীর্ণ হয়ে বুধ্নীকে জয় করেছিল।—
"এইতো সেদিনের কথা! এখনও দুই বৎসর পুরা হয় নাই।"

বিবাহের পর বিল্টু বুধ্নীকে কি ভাষায় প্রণয় নিবেদন করেছিল তা আমাদের অজ্ঞাত। কল্পনা করাও শক্ত। লেখক নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমি ড্রইংরুম বিহারী সভ্য লোক, বর্বর বন্য দম্পতির আদব কায়দা আমার জানা নাই। যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।" শুধু এটুকু বলা যায়, বিবাহের পর বিল্টু বুধ্নীকে এক দণ্ডের জন্যও ছাড়ে নি। বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্বত যেখানে সে গেছে বুধ্নীকে সাথে নিয়েই বিচরণ করেছে। বুধ্নীর খোঁপায় পরা লাল টকটকে পলাশফুল, বিল্টুর হাতে বাঁশের বাঁশি—বন্য নব দম্পতি মহাআনন্দে পাহাড় পর্বতে অবলীলাক্রমে বিচরণ করেছে।

হঠাৎ তাদের জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটল। বর্বর এই মানব-মানবীর উষ্ণ প্রেমের প্রতিফলে বুধ্নী মা হয়ে গেল। "বুধ্নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানব শিশু।" বুধ্নী মা হল বটে, কিন্তু অসভ্য বন্য এই মানব-মানবীর আদিম অবিচ্ছেদ্য মিলনে প্রথম বিপর্যয় ঘটাল এই শিশু। 'নববধূ জায়া ও জননীতে দ্বিধাবিভক্ত হল। নারীর অধিকার নিয়ে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল তারই ঔরসজাত শিশু সন্তান।' বুধ্নী মাতৃত্বের আনন্দে আপ্লুত, বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে—বুধ্নী যেন তার পূর্ণস্বাদ উপভোগ করল। লেখকের ভাষায়—"বর্বর জননীর মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান লিপ্সা স্নেহময়ী জননী কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।"—কিন্তু বিল্টু! বিল্টু দেখল বুধ্নী তো তার একার আর নেই। সে এই ছোট্ট অংশীদারকে সহ্য করতে পারল না।—আপন ঔরসজাত শিশু সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। বর্বর বিল্টু আদিম প্রবৃত্তির টানে আপন উত্তরসূরীকে হত্যা করায়—আইনের চোখে সে অপরাধী। তাই আগামী কাল তার ফাঁসি হবে। 'নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।' লেখক গল্পের শেষ অংশে উল্লেখ করেছেন—তিনি বিল্টুর ফাঁসি দেখতে গিয়েছিলেন। অপরাধী বিল্টু মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করে গেল তার মনের মানুষের নাম ধরে—'বুধ্নী-বুধ্নী-বুধ্নী-বুধ্নী' যেন মনে হয় পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই—বুধ্নীই তার সব, বুধ্নী ধ্যান বুধ্নী জ্ঞান। বর্বর নরনারীর এ প্রেমলীলা মানব জাতির আদিম প্রেম কাহিনীর এক স্বতন্ত্র নিদর্শন।

তিন

গল্পের প্রকরণগত দিক সংক্ষেপে একটু বলা যাক। বিশেষত, ছোটগল্প রচনায় আকারগত দিকের সংক্ষিপ্ততায় বনফুলের একটি স্বতন্ত্র পারদর্শিতা আছে। মূলত, ছোটগল্প বলতে আমরা বুঝি—এটি একদিকে যেমন ছোট হতে হবে, তেমনি আবার গল্প হতে হবে। তবে কতখানি ছোট হবে সে সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা ছক নেই। ছোটগল্পের আকার যে ছোট তা নয়, এর মধ্যে সাধারণত ঘটনার ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য বিশালতা ও বিস্তৃত জটিলতা থাকে না। জীবনের কোন খণ্ডিত বা ছোট ঘটনাই বিবৃত করে ছোট গল্প।

গল্পের বিচারে 'বুধ্নী' একটি সার্থক ছোটগল্প হিসেবেই ধরা যায়। লেখক হঠাৎ জেলখানায় ভ্রমণ করলেন, সেখানে এক পুরুষ কণ্ঠের মিনতিভরা চিৎকার রহস্য উদঘাটন থেকে বেরিয়ে এল বিল্টু-বুধ্নীর জীবনের এক চরমতম পর্ব। যা বনফুলের শিল্প কুশলতায় সার্থক একটি ছোটগল্পের রূপ নিয়ে পাঠক বর্গ তথা সাহিত্য সৃজনডালাকে অলংকৃত করল। কাহিনী সৃষ্টিতে, চরিত্র নির্মাণ, ভাষা ব্যবহারে ও মানবচরিত্রের হৃদয় রহস্য উদ্ঘাটনে বনফুলের 'বুধ্নী' একটি সার্থক ছোটগল্প।

উৎসবের ইতিহাস : এক বিপন্ন সময়ের ইতিহাস

প্রসেনজিৎ মৃধা

বাংলা ছোটগল্পে বনফুল বহুস্বরিক। বিশেষত ছোটগল্পের বিষয় ভাবনায় ও প্রকরণ পদ্ধতিতে বনফুল যেমনভাবে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন এবং একান্ত নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন বাংলা ছোটগল্পের জগতে তেমনটি আর দেখা যায় না। বনফুল অনেক সময়েই ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি ভেঙে স্বতন্ত্র পথ খুঁজেছেন। তাঁর অনেক গল্প খুব ছোট হলেও তাদের আকর্ষণীয়তা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ লেখকের সহজ বর্ণনা, সরস দৃষ্টিভঙ্গি, তির্যক শ্লেষাত্মক অব্যর্থ সংলাপ সৃষ্টি, দু'চার রেখায় জীবন্ত চরিত্রাঙ্কন, পরিমিতি বোধ, পরিচিত জগতের নবনির্মাণ ও গল্পের আকস্মিক পরিণাম—এ সমস্তই পাঠককে নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট করে। বনফুল জন্মেছিলেন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে আর চিকিৎসকের পেশা তাঁকে দিয়েছিল নির্মোহ নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি। রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনের উপান্তে তখন বনফুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'বনফুলের আরও গল্প' প্রকাশিত হয় (১১-৮-১৯৩৮)। এই গল্পগ্রন্থ পড়ে তিনি একটি চিঠিতে বনফুলকে জানান (৭ ১০-১৯৩৯)—"তুমি জান বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানেব মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা পবগাছা ওষধি বনস্পতি সবকিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলেব দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাই তো, এ তো আমি দেখিনি, কিংবা এই আমি দেখলুম। আগেকাব সাহিত্য চোখ ভোলানো সামগ্রী নিয়ে, এখনকার সাহিত্যে চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে।

"জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান ক'রে দেখাবার কাজে কোমর বেঁধে বেবিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক। তোমাদের সন্ধান জগতেব অভাজন মহলে—তোমাদের ভয় পাছে ছোটকে বাড়িয়ে বলো, পাছে তাব অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট ক'রে ফেলো।" (বনফুল রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৬২১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩) লেখক বনফুল এই আপাত তুচ্ছ অপরিচিত বিষয় অবলম্বনেই বহু সার্থক গল্প রচনা করেছেন। দু'চারটি উজ্জ্বল রেখার আঁচড়ে তিনি অপ্রত্যাশিত সব মুহূর্তে এক অননুভূত ভাবসত্য প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। 'উৎসবের ইতিহাস' নামের গল্পটি লেখকের সেই সক্ষমতারই অন্যতম এক অভিজ্ঞান।

এক

'উৎসবের ইতিহাস' গল্পটি 'বনফুলের আরও গল্প' গ্রন্থে সংকলিত।' গল্পের কাহিনি অংশ সামান্য। গল্পটি এক কৃতী উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের সামান্য কেরাণীর চাকুরী অর্জনের ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখা। অতি সংক্ষিপ্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদের মূল কাহিনীক্রমটি এরকম—নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম.এ.। কিন্তু শুধুমাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষা পাশের শংসাপত্র দেখিয়ে যে চাকুরী পাওয়া যাবে না এই ধ্রুবসত্য সে সময়ের সঙ্গে চলতে চলতে জেনেছে। তাই তাকে প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তি বিশু সান্যালকে 'তৈল নিষিক্ত'

করতে হয়। বিশু সান্যাল নিয়োগকর্তা আখ্‌তার আলিকে পত্র লিখলেন। খবরটি বিশু সান্যালের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীর অগোচর রইল না। ক্ষমতাদর্পী চক্রবর্তী মহাশয়ও আখ্‌তার আলিকে পত্র লেখেন। ফলে আখ্‌তার আলি পড়েন মহাসংকটে ক্ষমতা প্রদর্শনের এই কূটকচালে চাকুরীর অনিশ্চয়তা উপলব্ধি করে নরেন 'খাইয়ে' মুখুজ্জের শরণাপন্ন হন। পরিণামদর্শী মুখুজ্জে মহাশয় নরেনকে 'ঘাগি লোক' পরাণ সিংহের কাছে পাঠান। নরেন তাকে 'যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত' করায় তিনি আশ্বাস দেন এবং তাকে সঙ্গে ক'রে পানু মিত্রের কাছে যান। 'পানু মিত্তির ঘুঘু' লোক, শুধু শুধু তোষামোদে তুষ্ট হওয়ার পাত্র নন। তিনি নরেনকে বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার মাথায় স্বার্থবুদ্ধি উপস্থিত হয়। পরাণ সিংহকে অন্তরালে ডেকে নিয়ে তিনি যে গুরুতর পরামর্শ সেরে রাখলেন তার বিন্দু-বিসর্গ নরেন জানল না। তাকে এটুকুমাত্র জানানো হল, শুধু হাতে কাজ হবে না, বোতল দু'য়েক হুইস্কিসহ 'ভালগোছের ডালি' নিয়ে সাহেবের কাছে যেতে হবে। পরদিন অনোন্যোপায় নরেন পানু মিত্রের সঙ্গে গিয়ে সাহেবকে সেলাম জানানোর সুযোগ পান এবং তুষ্ট সাহেব আখ্‌তার আলিকে ফোন করেন। এই অব্যর্থ উপায়ে নরেনের তিরিশ টাকা বেতনের কেরাণী-চাকরীর পাকা ব্যবস্থা হল। কিন্তু গূঢ় সমাচারটি নরেনের অজানা রইল। পানু মিত্রের বয়স্কা কুশ্রী কন্যার সঙ্গে প্রবীণ মল্লিক (নরেনের পিতা) তাঁর পুত্রের বিবাহের প্রতিশ্রুতি দানের পর কন্যার পিতার উদ্যোগে নরেনের অসাধ্য-সাধন হয়েছে। আর এই অসাধ্য-সাধনের তথা নরেনের দিগ্বিজয়ের মুখ্য ও সহযোগী কারিগরবর্গকে পোলাও-ভোজনের ব্যবস্থা করতে নরেনের অর্থহীন পিতাকে সুদখোর মুখুজ্জের দ্বারস্থ হ'তে হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর এম.এ. পাশ সন্তানের চাকুরী পাওয়ার খেসারত স্বরূপ কুশ্রী বয়স্কা পুত্রবধূ তো ঘরে আনতেই হবে উপরন্তু এই 'ভাগ্যবান' পিতাকে 'সিক্‌স্ পারসেণ্ট' সুদে টাকা ধার ক'রে মহাসমারোহে ভোজনোৎসব সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হয়েছে। সোজাসুজি ক'রে বলা এই পরিমিত কাহিনিতে ঘটনা সামান্যই। কিন্তু লেখকের সরস তির্যক বর্ণনা ভঙ্গি, শ্লেষ, ব্যঙ্গোক্তি, নিপুণ সংলাপ, অননুকরণীয় পরিমিতিবোধ ও সর্বোপরি অভাবিত আকস্মিক পরিণাম গল্পে এক অসামান্য অভিনব স্বাদ এনে দিয়েছে।

'উৎসবের ইতিহাস' গল্পের ক্ষুদ্র দর্পণে আমরা আমাদের সময়-সমাজ-সামাজিকের স্বরূপটি বড় বেশী জীবন্ত করে দেখতে পাই। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটি অসৎ পথে এক বেকার যুবকের চাকুরী পাওয়ার গল্প। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবক নরেন চাকুরীর শর্তে দুর্নীতি ও কুরুচিকর নানা প্রস্তাবে বিদ্রোহ না ক'রে আপোষ করেছে এ ঘটনা বেদনাদায়ক হলেও বাস্তব। শিক্ষিত বেকারের অর্থহীন পিতাও পরিস্থিতির শিকার। কুশ্রী কন্যার পিতাকেও সমাজ-কাঠামোর প্রেক্ষিতে সুযোগ-সন্ধানী শিকারী হ'তে হয়েছে। সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিশালীরা যে যার মত ওত পেতে বসে আছে স্বার্থ পূরণের লক্ষ্য নিয়ে। আদর্শ, নৈতিকতা, বিবেক, মানবিক মূল্যবোধ সমস্তই এক অচেনা সর্ব-বিনাশী দস্যুর হাতে নিশ্চিহ্ন। বনফুল এ গল্পে শুধু বেকার-সমস্যা, আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের ছবিই আঁকেননি। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখাটিও অণু-প্রয়াসে প্রতিফলিত করেছেন। প্রবীণ মল্লিকের ছোট সংলাপেই ধরা পড়েছে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চিত্রটি—"দেখো হে, আখ্‌তার মিঞা

আলাদা বসেছেন ব'লে যেন কিছু বাদ না পড়ে।" ভোজন উৎসবে মুখুজ্জে-মিত্তিরদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনে আখ্‌তার আলির সুযোগ হয় না। কিছু বাদ পড়ার বিষয়টি কি শুধুই ভোজ্য সামগ্রী বুঝিয়েছে? এই অপল্লবিত বাক্যবন্ধে কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বঞ্চনার বিষয়টি আভাসিত হয় না? বস্তুত এই গল্পে লেখক একটি যুবকের চাকরির বিষয়কে কেন্দ্র করলেও শানিত দৃষ্টিতে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতটি আখ্যানের পরিধিতে নিপুণভাবে সংস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দুই

'উৎসবের ইতিহাস' ঘটনাকেন্দ্রিক গল্প। কিন্তু চরিত্রের গুরুত্ব যথেষ্ট অনুভূত হয়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র নরেন মল্লিক। তবু তিনিই যে নায়ক জোরের সঙ্গে সে দাবী করা যায় না। সক্রিয়তা ও বিড়ম্বনা তাঁর কম নয়। কিন্তু তার সক্রিয়তার কোনো ইতিবাচক দিক নেই। প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সে কোন মানবিক উচ্চাদর্শ স্থাপন করতে পারেনি, কোন নৈতিকতার পথই সে মাড়ায় নি। চাকরির স্বার্থে সে যে কোনো রকমের অনৈতিক মতলবের আপোষ করতে সে প্রস্তুত। তার মত উচ্চশিক্ষিত যুবকের এই দ্বিধাহীন আপোষ ও তোষামুদে স্বভাব বিসদৃশ ও পীড়াদায়ক। লেখক প্রথম শ্রেণীর এম.এ. পাশ যুবকের সুস্থ-স্বাভাবিক পথে চাকুরী না পাওয়ার মর্মান্তিক চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে দেখালেও তাঁর নৈতিক শিক্ষা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের দিকটি শ্লেষের সঙ্গেই উপস্থাপিত করেছেন। এরকম চরিত্রকে নায়ক বলে দাবী করা যায় না। আসলে দুঃসময় নামের এক নেপথ্য নায়কের দ্বারা এ গল্পের ঘটনা ও চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সময়ই নরেন মল্লিককে শিক্ষা দিয়েছে বাধ্য করিয়েছে চলতি হাওয়ার পন্থী হ'তে! কুশ্রী বয়স্কা কন্যার দায়গ্রস্ত-পিতা পানুমিত্র সমাজ ও সময়ের অনুগত দাস হয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রবীন মল্লিকও দাবি মেনেছে। কন্যার পিতার কাছে নতজানু হয়ে পুত্র-সম্প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং চাকরি-র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তুষ্ট করতে ঋণ করেও ভুরিভোজের ব্যবস্থা করেছে।·এমনকি আখ্‌তার আলিও সময়ের ভার ও অধিনায়কত্ব অগ্রাহ্য করতে পারেনি। সেদিক থেকে বিচার করলে গল্পের প্রত্যক্ষগোচর সমস্ত চরিত্রই কমবেশী 'টাইপ ধর্মী'। চরিত্র নির্মাণে লেখকের ক্রিয়া ও বিশেষণ প্রয়োগ লক্ষ্য করবার মত—খাইয়ে মুখুজ্জে, ঘাগি সিঙ্গী (পরাণ সিংহ), ঘুঘু মিত্তির (পানু মিত্র), (নরেনের) তৈল-নিষেক-শক্তি, তৈল নিষিক্ত বিশু সান্ন্যাল দিশাহারা, (লেখনী আস্ফালক) বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তী, অসহায় (প্রবীণ) মল্লিক, (সমস্যাকুলচিত্ত) আখ্‌তার আলি, (প্রকৃতই গুণীজন সুলভ) সাহেব। এই সুনির্বাচিত পদ প্রয়োগে চরিত্রগুলির 'টাইপ' স্বভাব চিহ্নিত হয়েছে। এরা কেউ-ই বৈচিত্র্যময় চরিত্র (Round character) হয়ে ওঠেনি। এদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বিবর্তন নেই। চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনার ধারক কিন্তু নিয়ন্ত্রক নয়। সকলেই নিজের অবস্থান বুঝেছে এবং সময়ের স্রোতে ভেসে গেছে। সময়ের কাছে বিকিয়ে যাওয়া মানুষগুলির মধ্য দিয়েই লেখক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পারিপার্শ্ব তুলে ধরেছেন। এ গল্পে কোন নায়কের স্পষ্ট অস্তিত্ব না থাকলেও একাধিক খলনায়কের অস্তিত্ব রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে আগে উল্লেখযোগ্য সাহেব চরিত্রটি।

তিন

'উৎসবের ইতিহাস' গল্পটি পাঁচটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত। প্রথম পরিচ্ছেদ সংলাপ

ধর্মী, ভোজন উৎসবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা, কিন্তু ক্লান্তিকর মন্থর নয়, গতিশীল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উৎসবের অর্থ সংগ্রহের প্রসঙ্গ—এখানে গল্পের মূল বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তুলনামূলক ভাবে বিস্তৃত পরিসর ব্যয়িত। এখানে লেখক ধারাবাহিক বাক্যবন্ধে ঘটনার বর্ণনা দেননি, ক্রমিক বিবৃতির মাধ্যমে বাস্তব কাহিনিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেই নরেনের চাকরি নিশ্চিত করার অভাবিত পথ পরিক্রমার পরিচয় পাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদে চাকরি পাওয়ার নেপথ্যে যে হীন শর্ত ও ষড়যন্ত্র ছিল সেই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। পঞ্চম বা শেষ পরিচ্ছেদটি চাকুরীপ্রার্থীর শিক্ষাগতা যোগ্যতা প্রকাশক। লক্ষণীয় বিষয়, গল্পটির ঘটনার ক্রমবিন্যাস উল্টোরকমের অর্থাৎ পরিণতি থেকে সূচনার অভিমুখে। অবশ্য ভাবক্রমটি অনুরূপ নয়। লেখক এখানে লঘু-সরস ভঙ্গিতে কাহিনি বর্ণনা করলেও একটি গুরুতর বিষয় আড়ালে রেখেছেন। এবং গল্পের গভীর ভাবসত্যটি পূর্ণতা পেয়েছে অন্তিমে। এই গল্পের চরম পরিণতি ঘটেছে শেষ পরিচ্ছেদে। পরিচ্ছেদটি পাঠকের চৈতন্যকে আকস্মিকভাবে আঘাত করে। এ গল্পে পরিচিত মানুষের হীনতা-নীচতা লেখকের বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পড়লেও তা আমাদের চেতনায় বোধ হয় খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হোত না যদি না পরিশেষের ঐ বৈদ্যুতিন চাবুক কিংবা বৃশ্চিক দংশন এক অন্যার্থ সংবেদনার জন্ম দিত।

গল্পটি বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রথম পুরুষ বচনে লেখা হলেও বর্ণনার পরিবর্তে এখানে বিবৃতি ও সংলাপের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বিবৃতি এখানে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক। যেমন—

(ক) দায়ে পড়া মানুষকে যিনি 'সিকস পারসেন্ট' সুদে টাকা ধার দেন তার সম্পর্কে লেখকের বিবৃতি "......মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক। চাহিবামাত্র টাকাটা ঝড়াৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।"

(খ) নরেনের সঙ্গে নিজের (পাত্রমিত্রি) কুৎসিত বয়স্ক কন্যার বিয়ের ভয়ঙ্কর ভাবনা লেখকের ভাষায় এক নিরীহ মতলব—"তাঁহার মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্মপ্রকাশ করিল।"

(গ) যে পদস্থ ব্যক্তি বোতল দু'য়েক হুইস্কি ও পর্যাপ্ত ঘুষ ছাড়া বেকার যুবকের চাকুরী দিতে পারে না তার সম্পর্কে বলেছেন—"সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজন সুলভ।"

(ঘ) শেষ পর্যন্ত যাঁর হাত দিয়ে একটি অসত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই নিয়োগকর্তা আখ্তার আলি সম্পর্কে—"আখ্তার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন।"

(ঙ) যে নানা ঘাটে ঘুরে ঘুরে, তোষামোদ ক'রে, ঘুষ দিয়ে, কদাকার বয়স্থা পাত্রীকে বিয়ের শর্তে একটি সামান্য তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণী চাকুরী সংগ্রহ করেছে সেই চাকুরী প্রার্থীর সম্পর্কে শ্লেষোক্তি—"নরেন নির্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।"

· (চ) নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যে সন্তান বহু শ্রম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে গৌরবের সঙ্গে উচ্চ ডিগ্রী পেয়েছে কিন্তু পরিশেষে যাকে হীন পথে চাকুরী পেতে হ'ল তার সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য—"নরেনের এতদিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।"

(ছ) গল্পের সবচেয়ে জরুরী তথ্যটি পরিবেশনে লেখকের বিবৃতিতে যে শ্লেষ ধরা পড়ে তার শিল্পসার্থকতা অনবদ্য—"অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্ততঃ করিয়া সর্বশেষ উল্লেখ করিতেছি।

নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম.এ.।"

বাক্যের পদবিন্যাসের মধ্য দিয়েও লেখক এই ধরনের শ্লেষার্থ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন—খাইয়ে মুখুজ্জে/তৈল-নিষেক- শক্তি/তৈল-সুখ/নিরামিষ তৈল/ঘাগি-ঘুঘু সম্মিলন/ঘাগি-ঘুঘু সংবাদ/ঘুঘু-সমভিব্যাহারে স-ডা‌লি নরেন প্রভৃতি। এই গল্পের শ্লেষ মিশ্রিত তির্যক বাচনভঙ্গি ঘটনা ও চরিত্রের মর্মরূপটি যথাযথ প্রতিফলিত করেছে। ভাষা ব্যবহারে লেখক শুচি-অশুচির প্রশ্নকে প্রশ্রয় দেননি। ভাষা এখানে ঘটনা ও চরিত্রানুগ। তিনি ভাষার ব্যবহারিক উপযোগিতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কথাসাহিত্যিক অনেক সময় তাঁদের রচনায় এমন কিছু অনুভবী শব্দ (Emotive word) বারবার ব্যবহার করেন যার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ভাবসত্য ফুটে ওঠে। আলোচ্য গল্পে লেখক একাধিক বার 'তৈল' ও 'ঘুঘু' শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানসের নীচতা-শঠতা- মূল্যবোধহীনতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

সংলাপ এখানে চরিত্রের সনাক্তকরণে সহায়ক হয়েছে। উৎসবের আয়োজনে অর্থের প্রয়োজন। প্রবীণ মল্লিক 'খাইয়ে' মুখুজ্জের শরণাপন্ন। টাকা ধার দিয়ে মুখুজ্জে বললেন—"ফিস্টি একটা করতে হবে বই কি! ফিস্টি না করলে চলে। এ কটা টাকা—যদি সিক্স পারসেন্ট দাও—কদিন যাবে শুধতে! অমন তৈরী ছেলে তোমার! বড় ভাল ছোকরা নরেন—বড় ভাল—ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও —দেখো—" এই সংলাপের একজন সুদখোর মানুষের স্বরূপ ও তার বাচনিক বিশিষ্টতা যথাযথ ভাবে ধরা পড়েছে। প্রায়-সম্পূর্ণ সংলাপে রচিত প্রথম পরিচ্ছেদটি। এখানে একক ব্যক্তির (প্রবীণ মল্লিক) ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়েই লেখক ভোজনোৎসবের অনুপুঙ্খ বাস্তব চলচ্চিত্র আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় গল্পটি সাধু গদ্য রীতির আশ্রয়ে লেখা হলেও সংলাপের ভাষায় তিনি কোথাও সাধু ভাষা প্রয়োগ করেননি। সংলাপের ভাষা এখানে একান্তই চরিত্রাভিমুখী, লেখকের আত্ম ভাবনা বা ব্যক্তিসত্তার সংস্পর্শহীন। শুধু সংলাপের ভাষায় নয় লেখক বর্ণনার ভাষাতেও চরিত্রের স্বাধীন সঞ্চরণে বাধা দেন নি, ঘটনা প্রবাহে আত্মভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার অবকাশ খোঁজেননি। তিনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে চরিত্রকে চিনিয়ে দিয়েছেন, ঘটনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। শানিত ব্যঙ্গে অতি হিসেবী মিতাক্ষর বাক্যবন্ধে ঘটনা কিংবা চরিত্রকে চকিতে পাঠকের ভাবনায় ছেপে দিয়েছেন। এ গল্পে ঘটনাধারা এতই দ্রুতগতিবেগ সম্পন্ন যে পাঠক গল্প পাঠের সময় ভাববার অবকাশ পান না, পাঠ-শেষে হতচকিত হয়ে ভাবতে থাকেন। এখানে অলস মন্থর আবেগময় দীর্ঘ আখ্যান নেই। তারাশঙ্কর কিংবা প্রভাতকুমারের গল্পের মত এখানে আখ্যানকের স্বাদ পাওয়া যায় না, গল্প-চূর্ণকেরই স্বাদ পাওয়া যায়। এখানে গল্পের রূপরীতি ও বিষয় এক নিবিড় সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ। বলাবাহুল্য 'উৎসবের ইতিহাস'এ সমস্ত বিশিষ্টতায় কোন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়, তাঁর অধিকাংশ গল্পেই এসকল বিশিষ্টতা কম-বেশী অনুভব করা যায়।

চার

'উৎসবের ইতিহাস' গল্পের নামকরণটি ঘটনাকেন্দ্রিক। এখানে যে উৎসবের কথা বলা হয়েছে তা কোন ধর্মীয় বা সামাজিক বা প্রচলিত কোন সাংস্কৃতিক উৎসব নয়—এ একটি ভোজনোৎসব। চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়েছেন—"উপরোক্ত ভোজনোৎসবের সংক্ষিপ্ত

ইতিহাস এই।" প্রথম পরিচ্ছেদে ঐ উৎসবের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। বেকার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি চাকুরী। দরিদ্র পিতার বেকার সন্তান নরেন মল্লিক কেরাণীর চাকুরী পেয়েছে। তাই পিতা প্রবীণ মল্লিক জনা তিরিশেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভোজে আহ্বান করেছে। ভোজের যে সমারোহ যে কর্মব্যস্ততা ও চিৎকার-চেঁচামেচি তা অনেকাংশে উৎসবের মেজাজ পেয়েছে। এ পর্যন্ত উৎসব কেন এবং তার শ্রেণী-চরিত্র কী তা বোঝা গেল। কিন্তু গল্পের নাম ভোজনোৎসব নয় 'উৎসবের ইতিহাস' বনফুল এখানে এক বেকার যুবকের চাকরি লাভের নেপথ্য ইতিহাস তথা ঘটনাক্রম বা চাকুরি লাভের কার্যকারণ সূত্র সাজিয়ে দিয়েছেন। অবক্ষয়ের অ-ভাবিত চিহ্নগুলি সনাক্ত করেছেন আর যথার্থ রূপদক্ষের মতোই নির্ভুল লেখনীতে তা রূপায়ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই এ গল্প শুধু এক বেকার যুবকের চাকরির ইতিহাস নয়, দরিদ্র পিতার দিন যাপনের ইতিহাস, সুদখোর মহাজনের ইতিহাস, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মানসিক বিকৃতির ইতিহাস, উচ্চপদস্থের স্বেচ্ছাচারের ইতিহাস, স্বার্থান্বেষী মানুষের ইতিহাস, সাম্প্রদায়িক ভেদা-ভেদের ইতিহাস, সামাজিক অবক্ষয়ের ইতিহাস, এক বিপন্ন সময়ের ইতিহাস। সুতরাং এ গল্পের নামকরণে ব্যবহৃত 'উৎসব' শব্দটির শ্লেষার্থ সহজেই অনুভূত হয়।

জাগ্রতা দেবতা : বিশ্বাস একটা সাংঘাতিক জিনিস

রাজেন্দ্রপ্রসাদ দে

বনফুলের লেখা 'জাগ্রত দেবতা' একটি ছোটগল্প। আক্ষরিক অর্থেই। গল্পের বিষয়বস্তু কমপক্ষে যতটুকু জায়গার মধ্যে লেখা যায়, গল্পটি সেটুকুর মধ্যেই লেখা এবং যেটুকু না বললেই নয়, কেবলমাত্র সেটুকুই এর মধ্যে আছে। বাড়তি কথা একটিও নেই। একটাই ঘটনা একটিমাত্র চরমফলের দিকে, কোনোদিকে না তাকিয়ে তরতর করে সোজা এগিয়ে গেছে। আশেপাশের ছোটখাট ঘটনা বা কোনো এক মুহূর্তের চমকপ্রদ বর্ণনার প্রলোভন সযতনে সংবরণ করা হয়েছে। অলঙ্কারের ভার না থাকায়, কথাগুলো বেশ হাল্কা, সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অনায়াসে বয়ে চলেছে, ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়নি।

ইচ্ছা করলেই গল্পটি বেশ বড়সড় করা যেত। গ্রামের একটা মনোহারী বর্ণনা, বড়লোকেদের বাড়ির ঘটা, গরীবদের দুর্দশা, উৎসবের জাঁকজমক, চরিত্র আরও কিছু বাড়িয়ে সংলাপগুলি আরও নাটকীয় করা যেত। বর্ণনা ও সংলাপের রস আরও গাঢ় করা যেত এবং এক চিমটে স্মিত হাস্যরস ছাড়াও পরিমাণমত অন্যান্য রসগুলোও মিশিয়ে জিনিসটা কড়াপাকের করা যেত। মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব বেশ করে আলোচনা করা যেত। ক্লাইম্যাক্সে পাগলের দু'চারটি অট্টহাস্য উদ্রেককারী ঘটনা বলা যেত। সৌভাগ্যের বিষয় এতসব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে সবের অপব্যবহার না করে যে বাক্‌সংযম এখানে দেখানো হয়েছে তা গল্পটিকে নতুন আঙ্গিকের একটি সার্থক ছোটগল্পে পরিণত করেছে।

এইটুকু গল্পটিতে চারটি অংশ আছে। প্রতিটি অংশের আয়তন এক একটি ছোট অনুচ্ছেদের মত। প্রথম অংশে সনাতনপুরের মহাদেব ও তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে মূল ঘটনা। চতুর্থ অংশে হঠাৎ একটি অভাবনীয় ঘটনায় গল্পটির শেষ।

গল্পটির মূল বিষয় এইরকম : সনাতনপুর নামে একটি গ্রামে একটি পুরনো মহাদেবের মন্দির আছে। জাগ্রত ঠাকুর কারণ তার কৃপায় কেউ মোকদ্দমায় জেতে, লটারিতে টাকা পায়, কারো ব্যবসায় উন্নতি হয় বা রোগমুক্তি ঘটে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৎসরে একবার বিরাট উৎসব হয় এবং প্রতি বৎসর সেই উৎসবের দিনে একজন পাগল হয়ে যায়। কিন্তু এক বৎসর দেখা যায় উৎসবের পরেও কেউ পাগল হয়নি। সেজন্য গ্রামের অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেউ পাগল হয়নি একথা বিশ্বাস করল না গ্রামের এক প্রবীণ ব্যক্তি নীলমণি। সে বৈশাখ মাসের দুপুরে গ্রামের পথে পথে কে পাগল হয়েছে খুঁজতে লাগল। গ্রামের লোকেরা নিশ্চিন্ত হল।

বাংলা বা ভারতবর্ষের প্রায় সব গ্রামেই ছোট-বড় কোনো না কোনো মন্দির বা দেবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির কিছু সুফল আছে এবং কুফলও কম নেই। এগুলি কেন্দ্র করে গ্রামে সংহতি গড়ে ওঠে, আশেপাশের গ্রামের লোকেরাও তাতে যোগ দেয়। মন্দির বা দেবতাকে উপলক্ষ্য করে গ্রামে বৎসরের বিশেষ দিনে উৎসব বা মেলা বসে যা নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনে গ্রামবাসীদের সারা বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত দিন। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রামের

সংস্কৃতি চর্চাও ঘটে। দেবস্থান ঘিরে থাকা গাছগুলি কুঠারের আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকে, ফলে গ্রামের পরিবেশ নির্মল থাকে।

কিন্তু এই সমস্ত দেবস্থান বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের বাসভূমি ও উৎপাদনক্ষেত্র। অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মানুষের মনে পরজীবীর মত বাস করতে থাকে। গ্রামের জলাগুলোয় যেরকম মশা জন্মায় এবং তার মাধ্যমে দেহে রোগজীবাণু বাসা বাঁধে সেরকম এই সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতল 'দেবস্থান'-গুলি থেকে অন্ধবিশ্বাস জন্মায় ও অশিক্ষার মাধ্যমে সমস্ত গ্রামবাসীর মন একসময় তার দ্বারা সংক্রমিত হয়।

লোকে এমনি এমনি পূজা করে না। পূজা বা ভক্তি করার কারণ মূলত ভয় এবং স্বার্থসিদ্ধি। এটা কেবল বাংলার গ্রাম নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই একটি সাধারণ নিয়ম। গ্রামের দেবতাগুলিকে পূজা পেতে হলে 'জাগ্রত' হতে হয়। অর্থাৎ অলৌকিক কিছু কার্যকলাপ দেখাতে হয়। এটা প্রধানতঃ কিংবদন্তীর আকারে থাকে, মানে একটা অলৌকিক ঘটনা অতীতে ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু বর্তমানে জীবিত কেউ তা দেখেনি। অথবা কোনো একটি অলৌকিক ঘটনা নিয়মিত ঘটে, বর্তমানেও ঘটে। শেষ ব্যাপারটা অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায় ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই না অথবা সাধারণ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে অলৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু শুধু অলৌকিক ঘটনা প্রচার করে কিছু লাভ নেই যদি না সেই দেবতা মানুষের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পূজা করলে ঠাকুর যে কেবল টাকাকড়ি পাইয়ে দেবে, রোগ ভালো করে দেবে তাই নয়, পূজা না করলে ভিখিরি হয়ে যাবে। রোগ হবে, ছেলে মারা যাবে, এসবও হতে পারে। সব মিলিয়ে দেবতার মাহাত্ম্য। যদি এসব কিছু কারো ক্ষেত্রে না হয় তবে সেটারও নানারকম বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।

'জাগ্রত দেবতা' গল্পে সনাতনপুরের মহাদেব জাগ্রত। তার কৃপায় গ্রামের বিপিন চৌধুরী মামলা জিতে বিশাল সম্পত্তি পেয়েছে। মুখুজ্যেরা পাটের ব্যবসায় উন্নতি করেছে। হরিহর ঘোষ লটারিতে টাকা পেয়েছে। পালেদের বাড়ির ছেলের টাইফয়েড ভালো হয়েছে। এগুলিই মহাদেবকে জাগ্রত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এছাড়াও একটি অলৌকিক ঘটনা প্রতি বৎসর ঘটে যা থেকে ঠাকুর যে জাগ্রত তার নিশ্চিত প্রমাণ হয়। প্রতিবৎসর মহাদেবকে কেন্দ্র করে যে উৎসব হয় তাতে গ্রামের একজন পাগল হয়ে যায়। ব্যক্তিগত লাভ কাকতালীয় হতে পারে কিন্তু প্রতিবৎসর একজন করে পাগল হচ্ছে, এটা তো কাকতালীয় বলা যায় না।

দেবতার মহিমা স্বরূপ অস্থায়ীভাবে পাগল হবার যে কথাগুলো শোনা যায় সেগুলো হয় নাটক না হয় স্নায়বিক বিকারের ঘটনা, যার চিকিৎসা দরকার। স্থায়ীভাবে পাগল হওয়া বাস্তবে সম্ভব না। পাগল মানে অসুস্থ মস্তিষ্কের রোগী। দেবতার কৃপায় এরকম সৌভাগ্য হয় না। বিশেষ করে একটা উৎসবের দিনে একজন করে পাগল হবার ঘটনাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। এরকম কোথাও ঘটলে মানব সভ্যতার একটা দীর্ঘকালের বিতর্কের অবসান ঘটে যেত। তাছাড়া উৎসবটি মাত্র পঞ্চাশ বছরের পুরনো হলেও গ্রামে

জনাপঞ্চাশ পাগল থাকত। একটা গ্রামে এত পাগল থাকলে এবং বাকিদেরও ক্রমশ পালা আসার সম্ভাবনা থাকলে, লোকের ভক্তি চটকে যেত, গ্রাম ছেড়ে সবাই পালাত।

সত্যি সত্যি ঘটুক বা না ঘটুক লোকের মাথায় একবার যা দেবতার মহিমা হিসেবে ঢুকে যায় তা আর বেরোয় না, পরিপুষ্ট হতে থাকে। সনাতনপুরের লোকেদেরও বিশ্বাস যে প্রতি বৎসর মহাদেবের কৃপায় একজন করে পাগল হয়। গল্পে তাই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। গ্রামের লোকেরা পাগল হবার জন্য আতঙ্কিত হয় না বরং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে কেউ পাগল না হলেই আতঙ্কিত হয়, ভাবে গ্রামের অমঙ্গল হবে।

এক বৎসর কেউ পাগল না হতে গ্রামের লোকেরা তার নানা ব্যাখ্যা দিতে লাগল। গ্রামের মহিলাদের মত, বৎসরে একদিনমাত্র পূজা করে বাকি দিনগুলি মহাদেবকে ফেলে রাখার জন্য এমন অঘটন ঘটেছে। হালদার মশায়ের মত, কলিকালে অনেক মহাদেবের মহিমাই লোপ পেয়েছে, তাদের গ্রামের মহাদেব অন্য গ্রামের মহাদেবের থেকে ক্ষমতাশালী বলে এতদিন টিকে ছিল, এবার পতন ঘটল। মুখুজ্যেরা অনাচারী পুরোহিতকে দায়ী করলে পুরোহিত চৌধুরীদের পশ্চাতে আত্মগোপনের চেষ্টা করতে লাগল। গোটা গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গেল।

বিশ্বাস একটা সাংঘাতিক জিনিস। কোনো একটা বিষয় লোকে বিশ্বাস করলে তাকে বিচারবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দেয়। বিশ্বাস করে লোকে স্বার্থত্যাগ তো বটেই প্রাণত্যাগও করতে পারে। এজন্য কার্য উদ্ধারের জন্য অনেক সময় লোকের এই বিশ্বাসকে কাজে লাগানো হয়। এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনেক সুফলও দেয়। কিন্তু অলীক বিষয়ে যুক্তিহীন বিশ্বাস মারাত্মক জিনিস। তা কারও ভালো করে না। অলৌকিক বিশ্বাসী নিজেও বেশিরভাগ সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গল্পে নীলমণিরও সেই অবস্থা হল। মহাদেবের উৎসবের দিন একজন পাগল হবে, এই অলীক ও অযৌক্তিক বিষয়ে তার অন্ধবিশ্বাস। পাগল হবার মিথটা যে মিথ্যা তা দেখাই গেল, সে বৎসর কেউ পাগল হয়নি। নীলমণির দৃঢ় বিশ্বাস কেউ না কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। এই ভেবে ভেবে সে মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং পথে পথে ঘুরে পাগলটাকে খুঁজে বেড়াতে থাকে। নিজে পাগল হয়ে নিজের বিশ্বাসকে সত্য করে তোলে।

গল্পটি এখানেই শেষ হল। মনে হতে পারে, শেষে একটা হাসির ব্যাপার ঘটল। কিন্তু আসলে তা নয়। একটা সুস্থ লোক পাগল হয়ে যাওয়ায় হাসির কিছু নেই। পাগলামিই সম্ভবত একমাত্র রোগ যাতে রোগীর ভাগ্যে সহানুভূতির থেকে উপহাস ও বিদ্রুপোক্তিই জোটে। সমাজের সমর্থনও তাতে থাকে। গ্রামের একটা অর্থহীন বিশ্বাসের অন্ধ অনুসরণের ফলে একটি লোকের চেতনার জগৎ থেকে নির্বাসনই এই গল্পের চরম ফলশ্রুতি।

গণেশ জননী : একটি সার্থক নির্মিতি

জয়ন্তকুমার মণ্ডল

'গণেশ জননী' বনফুলের মানবেতর প্রাণীর মধ্যে মানবীয় উত্তাপের একটি নিটোল ছোটগল্প। সাধারণ বিষয়কে অবলম্বন করে অসাধারণ রূপনির্মিতির জোরে বনফুলের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। 'গণেশ-জননী' গল্পটিও এরকম একটি অসাধারণ গল্পের উদাহরণ। অপত্য-প্রেমের বিকাশ একটি হাতীকে কেন্দ্র করে কিভাবে গড়ে উঠেছে তার স্বরূপ আছে গল্পটির মধ্যে। গল্পের সমালোচনায় যাওয়ার আগে তার বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন।

গল্পটি এক পশুচিকিৎসকের জবানীতে বিবৃত হয়েছে। ঐ চিকিৎসক সুদুর মফস্বল থেকে এক 'কল' পান একটি হাতীর চিকিৎসার জন্য। পসারের ভালো আশা নিয়ে চিকিৎসক তাই দীর্ঘ সাত-আট ঘণ্টার পথ ট্রেনযোগে পাড়ি দেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেখলেন সেটি "ছোট গ্রাম। ষ্টেশনটি ছোট। বেশী যাত্রী নাই।" ষ্টেশনে যে লোকটি তাঁকে নিতে এসেছেন তার "পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা গায়েও মলিন জামা-কাপড়, একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি। পাঁচ সাত দিন কামানো হয় নাই"। লোকটির এই চেহারা দেখে স্বভাবতই চিকিৎসক মনে করেছেন, যে জমিদারের হাতী ইনি বোধহয় সেই জমিদারের কর্মচারী। তাঁর চমক আরো বাড়ে যখন দেখেন তাঁর জন্য একটি ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে দিয়ে কর্মচারী নিজের সাইকেলে গৃহাভিমুখে রওনা দিলেন। গাড়ি এক সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জমিদারসুলভ কোনো লক্ষণের দেখা না পেয়ে চিকিৎসক আরো অবাক হলেন। উৎকণ্ঠা আর দমন করতে না পেরে শেষমেষ বলেই ফেললেন—'আমার রুগী কোথায়?" ভদ্রলোক বললেন 'আমারই হাতী'। বছর দশেক আগে এক কচ্ছি তার ঘোড়া দিয়ে আসছিল এবং হঠাৎ ঘোড়া তাকে ফেলে দিয়ে যায় তার মাঠের মধ্যে। ভদ্রলোক সেই কচ্ছিকে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। কিছুদিন পর সেই কচ্ছিই লোক দিয়ে এক বাচ্চা হাতী উপহার হিসেবে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে হাতীটা তাদের বাড়িতেই আছে। নিঃসন্তান দম্পতি হাতীটিকে সন্তানস্নেহে পালন করেছেন এবং নাম দিয়েছেন গণেশ। এই গণেশকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের আবর্তন। প্রতি বৎসর পুজোয় গণেশকে সাজ পরিয়ে দিতে হয়। এবার তার জন্য রূপোর ঘণ্টা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ জন্য স্যাকরার কাছে ইতিমধ্যেই ধার হয়ে গেছে। আর গণেশও গিন্নি স্নান করতে গেলে পিছু পিছু বালতি গামছা নিয়ে যায়, রান্নার সময় শুঁড় দিয়ে হাওয়া করে। গণেশের জন্য সারা বাড়িটিকেই হলঘর বানিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে তার অবাধ যাতায়াতে বাধা না থাকে। সেই গণেশের আজ অসুখ। সে খাওয়া বন্ধ করেছে। গণেশের সঙ্গে সঙ্গে শোকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছেন গিন্নিও। তাই চিকিৎসকের তলব পড়েছে।

অসুখের কারণ ও স্বরূপটিও বেশ চমকপ্রদ। বাগান থেকে মালী ল্যাংড়া আম দিয়ে গেলে ফাঁকা-বাড়ি পেয়ে সব আম গণেশ নিজে খেয়ে ফেলেছে। তাই কুপিত রাগে গিন্নি

গণেশকে এক চড় মেরে বলেছে—"রাক্ষস সব খেয়ে বসে আছে, একটি রাখতে পারনি আমাদের জন্যে"। সেই থেকে গণেশ গুম মেরে বসে আছে। ডাক্তার পরীক্ষা করেও দেখলেন যে রোগের কারণ শুধুমাত্র অভিমানই, অন্য কিছু নয়। এরপর রুগী দেখে ডাক্তার ফিরে আসতে চাইলে তাকে দক্ষিণার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু ডাক্তার তা নিতে অস্বীকার করলে কর্তা বারান্দায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নিম্নকণ্ঠে বলেন—"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে যাও।" অতঃপর ডাক্তারের উপলব্ধি—'গণেশ জননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।'

গল্পের বিষয়বস্তু এই। সামান্য এক হাতী পরিবারটির সঙ্গে কেমনভাবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে তাই দেখানো হয়েছে এই গল্পের মধ্যে। সন্তানহীনা নারী তার অতৃপ্ত বাৎসল্যপ্রেমের আধাররূপে গ্রহণ করেছে এই গণেশকেই।

দুই

বাংলা সাহিত্যে মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে ছোটগল্প রচনা বনফুলেই প্রথম নয়। শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত ছোটগল্প 'মহেশ' বা প্রভাতকুমারের 'আদরিনী', তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়', বিভূতিভূষণের 'বুধির বাড়িফেরা', পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' প্রভৃতি এ ধারার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু বনফুল এই শ্রেণীর গল্পকে এক অন্যমাত্রা দিলেন এবং মনুষ্যেতর প্রাণীকে অবলম্বন করে প্রচুর পরিমাণে ছোটগল্প রচনাও করলেন। আর শুধু ছোটগল্পেই নয়, তিনি এই মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে এলেন তাঁর উপন্যাসেরও বিশেষ চরিত্র করে। এমন অনেকগুলি উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে যেখানে মানুষের সাথে মনুষ্যেতর পশুও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়েছে উপন্যাসে। যেমন—তার বহুশ্রুত উপন্যাস 'ডানা'—যেখানে বিচিত্রবর্ণ হলুদ রং-এর পাখীটির জন্য যোগমায়া দেবীর দুর্নিবার আকর্ষণ লক্ষণীয় বা 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসে মুরগী কুকুরের সঙ্গে ডাক্তারের যে আত্মীয়তা পাই, অথবা 'মহারাণী' উপন্যাসে সিংহ ময়ূর প্রভৃতি পশু-পক্ষীর সঙ্গে মহারাণীর যোগ কতখানি তা দেখানো হয়েছে। ছোটগল্পের মধ্যে এ প্রসঙ্গে নাম করা যেতে পারে—'একফোঁটা', 'পারুল', 'সবর্ণ গোয়ালা', 'অঙ্কের বাহিরে', 'বাঘা', 'কাকের কাণ্ড' প্রভৃতি গল্পের।

'গণেশ জননী' গল্পটির সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিনী' গল্পের মিল পাওয়া যায়। দুটি গল্পই হাতীকে কেন্দ্র করে রচিত। পরিবারের সঙ্গে হাতীটি কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে তা দুটি গল্পেই চিত্রিত। অবশ্য 'গণেশ জননী' গল্পে পশুপ্রীতির সঙ্গে নিঃসন্তান দম্পতির বাৎসল্য রসের যে সম্পর্ক আছে, 'আদরিনী' গল্পে তার স্বরূপ এমন নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বনফুল যেভাবে সীমিত পরিসরের মধ্যে বাৎসল্য রসেব এই ব্যঞ্জনাকে ধরেছেন তা অতুলনীয়। প্রভাতকুমারের ক্ষেত্রে পরিসর ছিল দীর্ঘ, তাই রসপ্রকাশের সুযোগও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

তিন

বনফুল সচেতন কথাশিল্পী। তাই তার সাহিত্যের মধ্যে এক সচেতন নির্মাণ কৌশল লক্ষ্য করা যায়—লক্ষ্য করা যায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ছোটগল্পের রূপ-রীতিকে নিযে

বনফুলের মত এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও য পূর্ণতার প্রকাশ অনুভব করা যায় তার প্রমাণ বনফুলের ছোটগল্প। 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে ড. ভূদেব চৌধুরি বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যে বনফুলের ছোট গল্পগুলি এক অপরূপ বিস্ময়, সে কেবল ঐ আশ্চর্য বাক্-সংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয়, শৈলী ও ভাষানুষঙ্গে এমন এক অনির্বচনীয় রহস্যকরতা আছে যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্পকথার সর্বাঙ্গ ঘিরে বচনাতীতের মৌন স্পর্শ যেন নিরন্তর গুঞ্জন করে ফেরে।"

'গণেশ জননী' গল্পেও এ বাচনিক সংক্ষিপ্ততা আছে। যেজন্য গল্প পাঠকালে মনে হয় গল্পকার একটু বিস্তৃত হলে বোধহয় গল্পটি আরো সুন্দরতর হয়ে উঠত। কিন্তু বনফুলের স্টাইলই ঐ। তিনি নিজে এক কলম লেখেন ও পাঠককে দিয়ে ভাবিয় নেন আরো দশ কথা। 'গণেশ জননী' গল্পটির ফর্ম form এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—

প্রথমতঃ গল্পটি রচিত উত্তম পুরুষে। এখানে ডাক্তারের মুখ দিয়েই প্রায় সমগ্র গল্পটি নির্মিত হয়েছে। মাঝখানে দু-একবার কর্তার সংলাপ আছে তাও আবার ঐ ডাক্তারকে লক্ষ্য করেই।

দ্বিতীয়ত, বনফুলের অনেক ছোটগল্পের মতো এ গল্পের মধ্যেও গল্পকার চমক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন এবং সব চমকের অবসান হয়েছে একেবারে গল্পের শেষে গিয়ে। এখানে গল্পের মধ্যে যেখানে যেখানে বর্ণনার মধ্য দিয়ে সে চমকের নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়—

ক. হস্তী চিকিৎসার 'কল' পাওয়া ও ট্রেনে সাত-আট ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো।

খ. যে গন্তব্যস্থানে পৌছানো গেল সেখানের গ্রামটিও ছোট, স্টেশনটিও ছোট। ফলে চিকিৎসকের যা প্রত্যাশা ছিল তার সঙ্গে এ গ্রাম মিলছে না।

গ. যে লোকটি তাঁকে নিতে এসেছে তার পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা গায়েও মলিন জামা-কাপড়। ডাক্তার আশা করেছিলেন অন্য কিছু—এখানে আর একবার আশাভঙ্গ।

ঘ. আবার যখন জানতে পারছেন হাতীটি এই ভদ্রলোকেরই। একজন অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের হাতী পোষার ঘটনা জেনে স্বভাবতই আশ্চর্য হয়েছেন।

ঙ. যখন জানলেন হাতীর রোগ শুধুমাত্র অভিমান।

চ. গল্পের একেবারে শেষ মুহূর্ত যেখানে জানা যায় গিন্নি তার গহনা বন্ধক রেখে গণেশের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হয়েছে।

এইভাবে গল্পে কতকগুলি 'উৎকণ্ঠা বিন্দু'র সৃষ্টি করেছেন গল্পকার—যার ফলে সারা গল্প জুড়েই জেগে রয়েছে নাটকীয় উৎকণ্ঠা। আর সে উৎকণ্ঠার সমাপ্তি ঘটেছে একেবারে গল্পের শেষ লাইনে গিয়ে—"বুঝিলাম গণেশ জননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়ে আমার 'ফি' সংগ্রহ করেছিলেন। বনফুলের ছোটগল্পের এ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতি পদে চমক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পছন্দ করতেন তিনি। আর সে জন্যই এই শ্রেণীর

ছোটগল্পগুলি কখনো ক্লান্তিকর মনে হয় না; বরং পাওয়া যায় বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ।

তবে 'গণেশ জননী' গল্পে যে কিছুমাত্র অভাববোধ নেই তা নয়। গল্পটি প্রথম পাঠকালে মনে হয় কোথায় যেন গল্পকার অতি তাড়ার সৃষ্টি করে ফেলেছেন। কাহিনীর স্রোত এত দ্রুত বয়ে চলেছে যে গল্পের শেষে পৌঁছে মনে হয় গল্পটি আরো একটু বিস্তৃত হলে ভালো হত। গল্পের শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আরো একটু সচেষ্ট নির্মাণে 'গণেশ জননী' গল্পটি হতে পারত বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গল্প, কিন্তু গল্পকার সে সুযোগকে সচেতনভাবেই গ্রহণ করেননি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই তা এড়িয়ে গেছেন। কারণ বনফুলের শিল্পীমূলেই ছিল যে বৈচিত্র্যনির্মাণী মানসিকতা তা রক্ষা করার জন্যই তিনি গল্পটিকে কিছুটা সংক্ষিপ্ততার মধ্যে শেষ করেছেন।

গণেশ-জননী গল্পের আরো এক শিল্পগত অভাববোধ লক্ষ্য করা যায়। তা হল যতই বনফুল গল্পের প্রতিপদে চমকের সৃষ্টি করে যান না কেন গল্পপাঠকালে কাহিনীতে কিছুটা অগ্রসর হলেই যেন জানতে পারা যায় গল্পের পরিণতি কি হতে চলেছে। অবশ্য স্বীকার্য যে গণেশ জননী গল্পের এ এক শৈল্পিক ত্রুটি।

চার

গল্পটির নামকরণে বনফুলের শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় আছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে আছে ঐ পোষা হাতী গণেশ। তাকে ঘিরেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। নিঃসন্তান দম্পতির কাছে সন্তান হয়ে এসেছে ঐ গণেশই। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার, রাগ অভিমান সবই গণেশকে কেন্দ্র করে তার পরিচয়ও গল্পের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পরিবারের কর্তা যাঁর কথাতে আপাত বিচারে মনে হয়, হয়তো বা গণেশের অসুস্থতায় তার ভালোই হয়েছে, কারণ হাতীর খাদ্য সংস্থান তাকে আর করতে হচ্ছে না। কিন্তু এ তাঁর কৌতুক মাত্র। তিনি নিজেও ভেতরে যে কতখানি পীড়িত তার পরিচয় মেলে যখন ডাক্তারের জবানীতে জানতে পারি—

"হাতী পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে, কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।"

এই গণেশের জন্য তাদের বাড়ির গঠন কাঠামোটাই গিয়েছে বদলে। বড় হলঘর, দরজা প্রায় খোলা ও বিশাল বিস্তৃত যাতে গণেশের যাতায়াত অবাধ হয়। পুজোর সময় প্রতিবার নিজ সন্তানের মত গণেশের জন্যও সাজ বানিয়ে দিতে হয়। এবার পুজোতে পোদ্দারকে দিয়ে রূপোর ঘণ্টা বানিয়ে দিতে হয়েছে। গণেশও তার গিন্নিমার বাধ্য সন্তানেরই মত। গৃহিণী যখন স্নানে যান, তখন পিছনে পিছনে বালতি গামছা নিয়ে যায় গণেশ। আবার গরমের সময় রান্নার কাজে যখন গৃহিণী ব্যস্ত থাকেন তখন গণেশ তার শুঁড় দিয়ে পাখার হাওয়া করে দেয়। এই যে গণেশ ও গৃহিণীর মধ্যে সম্পর্ক সে এক সার্থক সন্তান মা সম্পর্কেরই পরিচায়ক।

এই একে অপরের সেবাপরায়ণতার যেমন ছবি আছে তেমনি রাগ-অভিমানের ছবিটিও ফুটে উঠেছে গণেশের রাগের প্রসঙ্গটিকে ঘিরে। বাগান থেকে মালী আম দিয়ে গেলে বাড়িতে কেউ না থাকায় সে আম গণেশ একাই সব খেয়ে নেয়। বাড়ি ফিরে আম না পেয়ে

গিন্নি রেগে গিয়ে গণেশকে একটি চড় মারে। সেই থেকে রাগে গণেশ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে। গণেশের অসুস্থতাও এটিই। গণেশের না খাওয়ার জন্য গিন্নির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সব সময় সে গণেশের সামনে অনুনয় বিনয় করে চলেছেন, কিন্তু অভিমানী ছেলের অভিমান আর কিছুতেই ভাঙে না। রাগ ভাঙানোর জন্য তার জন্যে এক 'বাথ-টর্বে' লেবু দিয়ে বার্লির সরবত তৈরী করা হয়েছে। দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল গিন্নি ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"ওর নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে—ওকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।" ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু রোগের কোন চিহ্ন পাননি। ব্যাপারটা অভিমানই। অবলা গণেশ মুখ দিয়ে তাঁর অভিমান প্রকাশ করতে পারেনি। তাই শিশুসুলভ ভঙ্গীতে সে 'গুম মেরে' বসে আছে।

এই অভিমান ও গিন্নির তাকে ঘিরে দুশ্চিন্তা এই মুহূর্তটুকুই এ গল্পের প্রাণ। দুশ্চিন্তায় পড়ে শহর থেকে ব্যয়বহুল ডাক্তারকে আনা হয়েছে অসুখ সারানোর জন্য। আগেই গণেশের সাজ নির্মাণের জন্য পোদ্দারের কাছে ধার করতে হয়েছে। নারীর প্রাণপ্রিয় সম্পত্তি যে গহনা তাকেও বন্ধক রেখে দিয়েছে প্রিয় সন্তানের (গণেশের) চিকিৎসার জন্য। গল্পের শেষ লাইনে এসে আমরা সে কথা জানতে পারি ডাক্তারের জবানীতে—

"বুঝিলাম গণেশ-জননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।"

এখানেই গল্পের সূচীমুখ গণেশ থেকে গণেশ-জননীর দিকে ফিরে যায়। মায়ের বাৎসল্যপ্রেম, তার উৎকণ্ঠা প্রকাশই হয়ে ওঠে গল্পকারের ঈপ্সিত বিষয়। অপত্যপ্রেমের বন্ধনে একাকার হয়ে গেছে পশুসন্তান ও মানবসন্তান; সন্তানহীনানারী তার অতৃপ্ত বাৎসল্যরসের পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে ঐ পুত্রসন্তানেরই মধ্যে। মাতৃত্বের এমন মানবিক ও সুন্দর প্রকাশ বাংলা গল্পসাহিত্যে অল্পই লভ্য। তাই এ গল্পের নামকরণ 'গণেশ-জননী' পুরোপুরি শিল্পসম্মত ও সার্থক।

পাঁচ

গল্পের জননী চরিত্রটি যেমন চিরন্তন মাতৃসত্তার পরিচায়ক তেমনি পিতৃসত্তার পরিচায়ক হল গল্পের কর্তা-র চরিত্র। গল্পের অন্যতম চরিত্র এই কর্তার চরিত্র। সংলাপ থেকে তাঁর শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। বিত্তের অভাব তাঁর খুব একটা ছিল না প্রমাণ হিসেবে এই সংলাপগুলিকে নেওয়া যায়—

ক. "আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না।"

খ. "একশ বিঘে জমি আছে মশাই"

কিন্তু গল্পে তাঁর যে আর্থিক সংকটের পরিচয় আছে তার জন্য দায়ী শুধুমাত্র গণেশই। একটা হাতীর খাদ্য-সংস্থান করা সহজ কথা নয়। কিন্তু এরজন্য তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তার পরিচয়ও গল্পে পাই ডাক্তারের জবানীতেই—

"হাতী পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।"

গণেশকে পরিবারের আর কেউই পশু বলে মনে করে না। সে পরিণত হয়ে গেছে তাদের সন্তানেই। গণেশের মতো সন্তানের জন্য কর্তা যে গর্বিত তা গোপন থাকে না। গণেশ-জননীর মতো তিনিও অসুস্থতার জন্য উৎকণ্ঠিত এবং শহর থেকে ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেছেন, চিকিৎসার জন্য তাঁর যাবতীয় সম্পত্তিকেও বন্ধক রাখতে তার বিন্দুমাত্র বাধেনি। এখানে চিরন্তন পিতৃসত্তার পরিচায়ক হয়ে উঠে তাঁর চরিত্রটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

অন্য এক প্রধান চরিত্র ডাক্তারের চরিত্র। তাঁর জবানী দিয়েই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি সরকারী পশু চিকিৎসক। তাই তাকে রোজগারের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু তার পরিবারটি খুব বড়, তাই উপরি কিছু রোজগারের পথ তাকে দেখতেই হয়। এ জন্যই যখন পুজোর ঠিক আগে মফস্বল থেকে হাতী চিকিৎসার জন্য এ রকম একটি 'কল' পান তখন সাগ্রহেই তিনি পাড়ি দেন সাত-আট ঘণ্টার দীর্ঘ পথ। কিন্তু গন্তব্যস্থানে গিয়ে তার ভুল ভাঙে। যে আশা নিয়ে এসেছিলেন সে আশা যে পূর্ণ হবার নয় তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি তাঁর। এই গৃহস্থে এসে মানুষ ও পশুর অদ্ভুত সম্পর্ক-বন্ধন দেখে মোহিত হয়ে যান তিনি। মোহিত হয়ে যান মাতৃত্বের এহেন স্বরূপ দেখে। আর এর ফলেই জাগ্রত হয়ে যায় তার দয়ার্দ্রশীল মানবসত্তাটি। যে গণেশের সাজ নির্মাণের জন্য ইতিপূর্বেই পোদ্দারের কাছে ধার হয়ে গেছে সেই গণেশের চিকিৎসার 'ফি' আর নিতে মন চায়নি তার। তাই কর্তা 'ফি' এর কথা বললে তিনি বলেছেন—''অপরের কাছে হলে দুশ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে ফি নেব না।'' সহানুভূতির আবেগে তাঁর চরিত্রের এই পরিবর্তনটুকু খুবই উপভোগ্য।

নিমগাছ : সার্থক অণুগল্প

সুজাতা বাগ

"কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ বা ভাজছে গরম তেলে। খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই ...."

--শুরুটা পড়লে গল্প বলে মনেই হয় না। মনে হয় যেন একটা নিমগাছের ব্যবহারিতার বর্ণনা; যে গাছ কেউ কোনদিন লাগায় না, বেড়ে ওঠার জন্য যত্ন করে না। সকলের দৃষ্টির আড়ালে অবহেলায় একদিন যখন সে বড় হয়ে ওঠে তখন অনেকেই তাকে কাজে লাগায়। এই সাধারণ অতিপরিচিত নিমগাছের সঙ্গে মানুষের জীবনকে অন্বিত করে যে গল্পের আমেজ তৈরী করা যেতে পারে, একথা পাঠক শুরুতে ভাবতেই পারে না। বনফুলের 'নিমগাছ' এমনই একটি বিশিষ্ট ছোটগল্প।

ছোটগল্পের প্রচলিত আঙ্গিকে 'নিমগাছ' গল্পটি গঠিত হয়নি। বনফুল ছদ্মনামধারী এ গল্প গঠনে ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্পাঙ্গিক। আর সে শিল্পাঙ্গিকে রয়েছে ভাবনার বৈপরীত্য আর বাহ্য বৈপরীত্যের অন্তর্লীন সাদৃশ্য, বিষয় সম্পর্কে ছদ্ম উদাসীনতা, বাক্‌সংযম, একমুখীনতা, রূপকের ব্যবহার এবং সর্বোপরি তীক্ষ্ণ বাস্তবতা।

'নিমগাছ' গল্পটি পড়লে মনে হয় বাহ্য বর্ণনা আর প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বল্প পরিসর বাহ্য বর্ণনায় রয়েছে একটি নিমগাছের নানান ব্যবহারিতার কথা। শেষে একটি মাত্র বাক্যে 'গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটার' সঙ্গে নিমগাছের তুলনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে গল্পের প্রকৃত ঘটনা।

কিন্তু এই বৈপরীত্য প্রদর্শনই বনফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আসলে আপাত সাদৃশ্য বিহীন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়কে কোন এক অন্তর্লীন যোগসূত্রে মিলিয়ে দেবার অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বনফুলের মধ্যে। সাধারণের দৃষ্টিতে সে অন্তর্লীন যোগসূত্র ধরা পড়ে না, ধরা পড়ার কথাও নয়। এ যেন বনফুলের এক অদ্ভুত কল্পনা শক্তি, আর এখানেই তাঁর নিজস্বতা। 'নিমগাছ' গল্পে একটা অ প্রাণী বাচক বস্তু (নিমগাছ) আর একজন ব্যক্তি মানুষের জীবন—আপাতদৃষ্টিতে যাদের মধ্যে কোন মিল চোখে পড়ে না—তাদের একটা অন্তর্লীন যোগসূত্রে আশ্চর্যভাবে গল্পের শেষে মিলিয়ে দিয়েছেন বনফুল।

ঘটনার বৈপরীত্য বা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি পরিণামে দুটি পৃথক বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে পাঠক মনে চমক জাগানোর প্রবণতা শুধু 'নিমগাছ' গল্পেই নয়, রয়েছে বনফুলের একাধিক ছোটগল্পে। 'আত্ম-পর' গল্পে চার-পাঁচ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা লোমহীন, ডানাহীন, কিম্ভুতকিমাকার, অসহায় অপরিণত শালিক পাখির ছানার মৃত্যু, আর পরে গল্প কথকের 'বড় আদরের একমাত্র ছেলে'র মৃত্যুর বেদনাকে একসূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছেন বনফুল। 'এক ফোঁটা গল্পে' মা সম্পর্কে সাধারণের ধারণা আর রামগঞ্জের খেয়ালী জমিদার

শ্যামবাবুর ধারণার মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য। যে মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন, সেই মা যে আসলে তাঁর গর্ভধারিণী নয়, তাঁর দুগ্ধদায়িনী মঙ্গলা গাই—একথা পাঠক ভাবতেই পারে না।

প্রচলিত গল্পের মত 'নিমগাছ' গল্পটির নেই কোন কাহিনী। শুরু থেকে লেখক একটা অবহেলিত, অপাংক্তেয় নিমগাছকে মানুষ কত রকম ভাবে ব্যবহার করতে পারে তার বর্ণনা দিয়েছেন—সে বর্ণনাও অতি সংক্ষেপে, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় বিষয় সম্পর্কে বনফুল সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু সম্পর্কের গভীরে লুকিয়ে থাকা স্নেহ-মায়া-মমতা, কারুণ্য, নিষ্ঠুরতা, বিষাদ, বেদনা—সমস্ত কিছু সম্পর্কে তিনি যে কতটা সচেতন তা বোঝা যায় গল্পের পরিণতিতে গিয়ে। গল্পের শেষে একটি মাত্র লাইনে যখন বনফুল বলেন—"ওদের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।" তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে এক লহমায় পাঠকের মনের আয়নায় সবকিছু ঝলমল করে ওঠে। পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে 'গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার' মর্মান্তিক বেদনাদীর্ণ জীবনকে চিত্রিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে বনফুলের সফলতায় সহায়তা করেছে তাঁর বিচিত্র ও বিপুল বাস্তব অভিজ্ঞতা। আর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আপন কল্পনা ও বিশ্বাসকে যথাযথ ভাবে যুক্ত করতে পেরেছেন বলেই আগ্রহকে অনাসক্তির ছদ্মবেশ পরিয়ে গল্পটির উপস্থাপনকে করে তুলেছেন অভিনব।

দীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা কাহিনী সৃষ্টি বনফুলের উদ্দেশ্য নয়। বাক্সংযম বনফুলের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'নিমগাছ' গল্পে প্রয়োজনের বাইরে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি গল্পকার। ছোট ছোট এক একটি বাক্য যেন এক একটি পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠেছে। গল্পের বর্ণনায় বনফুলের বাক্সংযম ক্ষেত্রবিশেষে পাঠককে সংশয়ে আচ্ছন্ন করে তোলে। 'নিমগাছ' গল্পের শুরু থেকে গাছের বর্ণনা স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল। পাঠকের মনে প্রথম ধাক্কা লাগে যখন 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক' এসে, নিমগাছটার 'ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু'—পাঠকের মনে জাগে সংশয়। এরপর লেখক যখন জানান—'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়'—তখন সংশয়ের সঙ্গে পাঠক মনে দোলা দেয় ক্ষীণ আশার সুর। মনে হয় এতদিনে বুঝি নিমগাছটার সঠিক মূল্যায়ন হবে। কিন্তু পাঠকের মনের আশা ঘনীভূত হবার আগেই লেখক পাঠকের মনের সমস্ত আশা ভেঙে চুরমার করে দেন। গল্পকার চাইলেই এখানে গল্পের কাহিনীকে বিস্তারিত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বাক্সংযম গল্পটিতে এনে দিয়েছে অন্য এক মাত্রা। গল্পকার অচিরেই জানিয়ে দেন নিমগাছটার ইচ্ছে পূরণ না করতে পারার কথা। কিন্তু এই না পারার কারণ স্বরূপ লেখক কোন বিস্তৃত বর্ণনার আশ্রয় নেননি। কারণ স্বরূপ লেখক একটিমাত্র বাক্য ব্যয় করেছেন—'মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে।' একটি মাত্র বাক্যেই যে উদ্ভাসিত হতে পারে কত 'না-বলা বাণীর ঘন যামিনী' তা বোঝা যায় গল্পের একেবারে অন্তিমে পৌঁছে, নিমগাছের সঙ্গে 'গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার' তুলনায়। গৃহবধূর বঞ্চিত, অবহেলিত জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়াটা এখানে কিছু অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু বনফুল তা করেননি। করেননি

কারণ, তাঁর বিপুল অধ্যয়ন আর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে—বাক্‌সংযম সেই স্বাতন্ত্র্যের চাবিকাঠি।

একমুখীনতা ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সার্থক ছোটগল্পকার গল্পের শুরু থেকে একলক্ষ্যাভিমুখী গতিতে পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেন। তাই ছোটগল্পে থাকে না কোন শাখাকাহিনীর বিস্তার। সেক্ষেত্রে চরিত্র সংখ্যাও যে বেশি হবে না, একথা বলাই বাহুল্য। 'নিমগাছ' গল্পেও বনফুল শুরু থেকে তাঁর লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন এবং একমুখীন গতিতে সেই লক্ষ্যের দিকে দ্রুত বেগে ছুটে গেছেন—যদিও গল্পের শেষ বাক্যটি পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গল্পকারের সেই লক্ষ্য পাঠকের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট হয়েই থেকেছে। কিন্তু শেষ বাক্যটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক বুঝতে পারে নিমগাছ এ গল্পের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। নিমগাছের রূপকে গৃহবধূর জীবনকে ব্যঞ্জিত করাই গল্পকারের লক্ষ্য। দ্রুত সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যই সমস্ত আয়োজন।

গৃহবধূর জীবনকে ব্যঞ্জিত করাই যখন বনফুলের লক্ষ্য, তখন শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনা দিয়ে সরাসরি গৃহবধূকে কেন্দ্র করেই একটা মনোরম গল্প অনায়াসেই রচনা করা যেত, কিন্তু বনফুল তা করেননি। কারণ বনফুলের গল্পের একটি প্রকরণ হল রূপক। 'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছের রূপকের আড়ালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গৃহবধূর জীবনকথা। এই রূপকের আশ্রয়ই গল্পটিকে পাঠকের কাছে অধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বনফুলের গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তীক্ষ্ণ বাস্তবতা। গল্প রচনার ক্ষেত্রে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তাই বলে তাঁকে আবেগহীন, মমতাহীন বলা যাবে না। আপন কল্পনাকেও তিনি মুক্তি দিয়েছেন গল্পে। কিন্তু আবেগের জোয়ারে ভেসে যায়নি কল্পনা। তার মূল সুরটি বেঁধে রেখেছেন বাস্তবের শক্ত মাটিতে। গল্পের শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনা বাস্তবসম্মত ভাবেই চলছিল। হঠাৎ কবি চরিত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের আবেগ মিশ্রিত কল্পনা যেন মুক্তি পেতে চেয়েছে। লেখকের কল্পনাকে ভর করে পাঠকের কল্পনাও যেন পক্ষ বিস্তার কবতে চায়। কিন্তু তাকে দীর্ঘায়িত না করে শেষের একটি বাক্যে রূপকের আবরণ ভেদ করে পাঠককে তীক্ষ্ণ বাস্তবেব সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পে বাস্তবতা একান্তভাবে প্রত্যাশিত, 'নিমগাছ' গল্পটির শিকড় সেই বাস্তবের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত বলেই, পাঠকের মনোভূমিতে এ গল্পের আবেদন মহীরূহের মত বিস্তারিত হতে পেরেছে।

দুই

স্বল্প পরিসরে অল্পসংখ্যক চরিত্রকে কেন্দ্র করেই সাধারণত ছোটগল্পের অবয়ব গড়ে ওঠে। পরিসরের দিক থেকে 'নিমগাছ' এতই ছোট যে একে অনেকে 'অনুগল্প' বলতে চেয়েছেন। আর চরিত্র-সংখ্যা গণনা করতে গেলে অল্প না বলে বিরল বলাই শ্রেয়। প্রথম থেকে প্রাণীবাচক কোন চরিত্রকে আমরা গল্পে দেখতে পাই না, যা পাই তা হল একটি নিমগাছের প্রসঙ্গে বর্ণনা। গল্পের সিংহভাগ জুড়ে থাকা নিমগাছটাই যেন শুরুতে চরিত্রের রূপ নিয়েছে। গল্পের পরিণতিতে গিয়ে গল্পকার আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে নিমগাছ আর ব্যক্তি

মানুষকে এমন অভিন্ন করে তুলেছেন, যার ফলে গল্প পাঠের পরে নিমগাছ আর 'গৃহকর্ম-নিপুণা-লক্ষ্মী বউটার' ছবি যেন একাকার হয়ে গেঁথে থাকে পাঠকের মনে। এই বউটিই গল্পকারের লক্ষ্য। অথচ গল্পে একবার একটিমাত্র বাক্যে তার উল্লেখ। প্রত্যক্ষভাবে একটি গৃহবধূকে নিয়ে গল্প বলার কোন চেষ্টাই গল্পকার করেননি। কিন্তু নিমগাছের সঙ্গে তুলনার মধ্য দিয়েই গৃহবধূর জীবনচিত্রটি আমাদের কাছে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এটি আসলে আমাদের দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ, সরল, নিরীহ, স্নেহ-মায়া-মমতাপূর্ণ গৃহবধূর বাস্তব জীবনের ছবি। নারীর এই রূপ বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। সংসারে সকলের কাছে অবহেলিত, অপমানিত হয়েও হাসিমুখে সবকিছুকে মেনে নিয়েছে এমন গৃহবধূর ছবি যেমন বাংলা সাহিত্যে আছে, তেমনি সেই সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে এমন গৃহবধূও বাংলা গল্প-উপন্যাসে কম দেখা যায়নি। কিন্তু নিমগাছ গল্পের গৃহবধূকে যেমন তিনি সর্বংসহা প্রতিমা হিসাবে গড়ে তোলেননি, তেমনি তার মুখে প্রতিবাদের ভাষা বসিয়ে তাকে আদর্শায়িত চরিত্র রূপেও চিত্রিত করেননি। তাকে করে তুলেছেন রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ। রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ বলেই কবির মুগ্ধ দৃষ্টির কাছে একবার হলেও সে ধরা দিতে চেয়েছে, নিজের ভালোলাগাকে মনে মনে হলেও স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সংযমী লেখক জানেন যে, সমাজ সংসারকে অস্বীকার করে আপন অস্তিত্বকে বড় করে দেখতে এদেশের গৃহবধূরা কোনদিনই পারে না। আর 'মাটির ভিতর' নিমগাছটার 'শিকড় অনেক দূর চলে গেছে'—একথা বলার মধ্য দিয়ে গল্পকার বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দেশের গৃহবধূরা স্নেহ-মায়া-মমতা আর সংস্কারের জালে কিভাবে সংসারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। ইচ্ছা থাকলেও সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কোন উপায় নেই তাদের। গল্পকার ইচ্ছা করলে এই গৃহবধূকে প্রতিবাদী করে তুলতে পারতেন। তা যদি করতেন তাহলে চরিত্রটা আমাদের কাছে বাস্তববাদী না হয়ে, হয়ে উঠতো আদর্শবাদী, আর গল্পটাও হারাতো তার বাস্তবতা।

গৃহবধূ ছাড়াও বনফুল এ গল্পে ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে একজন কবিকে এনেছেন। গল্পে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা হয়তো খুব বেশি নয়। আসলে এই চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা গল্পকারের উদ্দেশ্যও নয়। কিন্তু গল্পকারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এই চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল। নিমগাছের রূপকে গৃহবধূর গতানুগতিক জীবনযাত্রা বর্ণনার মাঝে এই চরিত্রটির উপস্থিতিই প্রথম পরিবর্তন এনেছে, গৃহবধূর অন্তরসত্তাটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আর একটু বিস্তৃত করে বলা যায় যে, কবি আর গৃহবধূ এই দুটি চরিত্র নিছক ব্যক্তি চরিত্রের সীমায় আবদ্ধ না থেকে, যেন বৃহত্তর সামাজিকের প্রতিনিধি রূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

গল্পের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনার পর প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে নামকরণ প্রসঙ্গ। এ গল্পের নামকরণ কোন চরিত্র বা স্থানের নাম অনুসারে হয়নি, হয়েছে একটি অতি পরিচিত গাছের নাম অনুসারে—'নিমগাছ'। শুরু থেকে নিমগাছ সম্পর্কিত আলোচনাই স্থান পেয়েছে গল্পটিতে। শুধু নিমগাছ গল্পেই নয়। বনফুলের একাধিক গল্পে চোখে পড়ে অ-মানবীয় কিছু বস্তু ও প্রাণীর ছবি, যে ছবি বনফুলের একান্ত নিজস্বতায় চিহ্নিত। কখনও পাকা ফল, কখনও আম, কখনও ফুলের ভাবনা, ষাঁড়েদের বিতর্ক, বালিশের

আত্মকথা, কুকুরের বলা গল্প, তালগাছের কথা ইত্যাদি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি গল্প পড়লেই বোঝা যায় যে এই অ-মানবিক চরিত্রগুলো আসলে মানব চরিত্রেরই বিকল্প। 'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছকে আসলে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন গল্পকার। আর উদ্দিষ্ট বিষয়কে রেখেছেন সেই রূপকের আড়ালে। এই রূপকের ব্যবহারই গল্পটি সম্পর্কে পাঠককে মনে মনে আগ্রহী করে তোলে। নিমগাছের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনকিছুই গল্পকার স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেননি, সংকেত দিয়েছেন মাত্র। গল্পে কবির হঠাৎ আগমনের যে ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন তা পাঠকের ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে তোলে। আর নিমগাছের সঙ্গে গৃহবধূর তুলনা করে লেখক যেখানে গল্প শেষ করেছেন, সেখান থেকেই পাঠকের ভাবনারাজ্যের দ্বার পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে যায়। পাঠকের ভাবনা গল্পের আকার নিতে চায়। আসলে গল্পকার নিজে একটুখানি সংকেত দিয়ে পাঠককে ভাবিয়েছেন অনেকখানি। পাঠকের ভাবনার ওপর এই গুরুত্ব আরোপের ফলে গল্পটি হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। রূপকাশ্রয়ী নামকরণ যে সেক্ষেত্রে সর্বাংশে সার্থকতা পেয়েছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ছোটগল্পের গল্প : ছোটকথায়

দেবযানী দে

বিংশ শতকের চারের দশকে বনফুল বিরচিত 'ছোটগল্পের গল্প' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ কথিত 'শনিবারের চিঠির বিছুটি' (বনফুল) যিনি প্রতিনিয়ত সাহিত্যের চিরাচরিত বিষয়-আঙ্গিকে তীব্র ব্যতিক্রমের হুল ফোটাতে অভ্যস্ত বর্তমান ছোট গল্পটি তাঁর প্রতিভার যোগ্য সৃষ্টি। স্বয়ং গল্পকারের কথায়—'আমি আমার খেয়াল খুশি মতো যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়াছি। আমি চেষ্টা করিতাম যাহাতে আমার দুইটি বই যেন একস্বাদের না হয়।'[১] বস্তুতঃ বৈচিত্র্যের প্রতি এই আগ্রহ তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রতিফলন। কবি সুহৃদ পরিমল গোস্বামী তাঁর এই বৈচিত্র্য পিপাসা তথা খেয়ালী মানসিকতাকে অভিহিত করেছেন 'একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য'[২] বলে। এই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রেরণাতেই ছোটগল্পের রূপরীতি সংক্রান্ত সাহিত্যিক আলোচনা অতি সহজ অনুভববেদ্য ভঙ্গীতে 'ছোটগল্পের গল্প'টির মতো গল্পের সার্থক বিষয় হয়ে উঠেছে।

বনফুল রচনাবলীর দশম খণ্ডের 'তন্বী' গল্পগুচ্ছে 'ছোট গল্পের গল্প'গল্পটির অবস্থান। 'তন্বী' চুয়াল্লিশটি গল্পের সংকলন। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬ সালে অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রীঃ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন কবিশেখর কালিদাস রায়কে। 'তন্বী' গল্প সংকলনটির রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেলেও 'ছোট গল্পের গল্প' গল্পটির বচনাকাল এবং প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য মেলে না। মোটামুটি ভাবে অনুমান করা চলে ১৯৪৯ খ্রীঃ বা তার কিছু পূর্বে গল্পটি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বনফুলের 'ছোটগল্পের গল্প' গল্পটির মূল্যায়নে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে যদি বলা হয় 'গল্পটি ছোট গল্পময়' তবে বোধ হয় বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন না হলেও ছোট গল্পটির বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়ে যায়। এখানে ছোটগল্পের সার্থক প্যাটার্নে পরিবেশিত হয়েছে ছোটগল্পের কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে বর্ণময় কাহিনীর ভাষ্যকার বনফুল ছোট গল্পের মনুষ্যরূপ নির্মাণ করে অনেকটা সমাসোক্তির ঢঙে শুনিয়েছেন কথাসাহিত্যের এই বিশিষ্ট ধারাটির সুখ-দুঃখের কথা। ব্যক্তিস্বর স্বীকরণের ফলে ছোটগল্পের বক্তব্য সহজ-বোধ্য লৌকিক হৃদয়গ্রাহী রূপ-লাবণ্য লাভ করেছে।

গল্পটির মর্মবস্তু হলো—এই গল্পে দুটি চরিত্র লেখক ও তন্বী। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় ছোটগল্পের অনুসন্ধানে লেখক বারবার মানসিক টেলিফোনে রিং করেন। কিন্তু কিছুতেই পূজার মরসুমে মাসিক পত্রের চাহিদা মেটাতে অতিব্যস্ত ছোটগল্পের নাগাল পান না। শেষে ছোটগল্পের সংযোগ পান এবং ছোটগল্প সময় বের করে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তন্বী গল্পের রূপের সঙ্গে সুপরিচিত লেখক বিস্মিত হন তার বিশালায়তন চেহারা দর্শনে, যদিও শেষ পর্যন্ত 'তিন থাক চিবুকের খাঁজে খাঁজে পাউডার, বৃত্তাকার স্বকজ্জল চক্ষু ও সুপুষ্ট অধোরোষ্ঠে সুপুষ্ট রঙ, বিরাট দেহ ঘিরিয়া জমকালো একটা বেনারসী শাড়ি ব্লাউজের হাতায় সোনার জরি'[৩] ইত্যাদি জবরজং মেকআপ বর্জন করে ছোটগল্প তার পরিচিত

চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। লেখকের তথা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে জানায় 'প্রকাশকদের কাছে ছোটগল্পের আদর নেই! ছোটগল্পের আদর মাসিকের পাতায়। প্রকাশকের কাছে যেতে হলে তাই উপন্যাসের মেকআপ নিয়ে যাই।'[৪] এরপর উভয়ের দীর্ঘ আলাপচারিতায় বর্ণিত হয়েছে ছোটগল্পের প্রতি লেখকের ঐকান্তিক ভালোবাসার কথা, ছোটগল্পের বৈচিত্র্যের কথা, যুগ চাহিদা মেটাতে ছোটগল্পের গঠন শৈলী ও বিষয় ভাবনার ইঙ্গিত।

গল্পটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সাহিত্য তত্ত্বের গল্প। গল্পটিতে লেখক ছোটগল্পকে লাবণ্যময়ী তন্বী রমণীর রূপ দিয়েছেন। তার প্রকাশক মনোরঞ্জক ছদ্মবেশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের সঙ্গে তার পার্থক্যের দিকটি। এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ছোটগল্পের প্রতি তার ভালোবাসার কথা। satire-এর মৃদু ছোঁয়ায় দেখিয়েছেন সাহিত্যকে কিভাবে বাজার অর্থনীতির সনাতন দাবীটিকে মেনে নিয়ে প্রকাশকের সঙ্গে আপোষ করতে হয়, নানান রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক তকমা ধরতে হয় কিংবা ছোটগল্পকারকেও হতে হয় ঔপন্যাসিক। যদিও শেষপর্যন্ত অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন খাঁটি ছোটগল্পের শিল্পরূপের প্রতি। আসলে বিহারের গ্রামীণ পরিবেশে এক প্রখর অস্তিবাদী চেতনায় বনফুলের শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কল্লোলের কোলাহল পর্বে কলকাতায় ডাক্তারি পড়বার সূত্রে পরিচিত হন কল্লোলের প্রখর নাস্তিক্যবাদী দর্শনের সঙ্গে। ফ্রয়েড মার্কসীয় দর্শনের উত্তাপ, সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, সর্বোপরি রবীন্দ্র-বিরোধিতার অতি ঔৎসুক্য এই পর্বের কবি শিল্পীদের পুরাতন মূল্যবোধ বিধ্বস্ত। এই বিশেষ কালপর্বে তরঙ্গিত প্রক্ষেপ বনফুলের শিল্পীসত্তাকে দোলায়িত করলেও বিশ্বাসের স্থৈর্য তিনি হারননি বরং ছোটগল্পের বহু বিচিত্র উদ্‌গীরণের মধ্যদিয়ে পাঠকের চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন জীবনের যথার্থ সুরকে—আর তারই দরুণ আমরা তাঁর গল্পে পাই দারিদ্র্য নিষ্পেষিত রিক্‌শাওয়ালার প্রখর আত্মসম্মানবোধ (ছোটলোক গল্পে), নিমগাছ রূপী ছোট বউটির প্রকৃত স্তাবককে ('নিম গাছ' গল্পে) ফকির শাজাহান বিনির্মিত প্রেমের অচঞ্চল তাজমহলকে ('তাজমহল' গল্পে)। ছোটগল্পের শিল্প স্বরূপের সন্ধানে বনফুল বর্তমান গল্পটিতেও এই অকৃত্রিমের সাধনায় মগ্ন। তাই তিনি বলেন—

'আমি ছাপ চাই না। আম সবুজ শীষের গল্পটা শুনতে চাই।'[৫]

গল্পটির আবহে লেখক সুকৌশলে মৃদু প্রেমের সৌরভ আমদানি করেছেন। লেখকের বলবার বিশেষ ভঙ্গীতে ছোটগল্প কখন যেন গল্পের তন্বী নায়িকায় পরিণত হয়েছে। লেখকের ছোটগল্পের প্রতি ভালোবাসা নরনারীর প্রেমের সুবাস ছড়িয়েছে,—

"এবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল, তাহার যে রূপ আমাকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই অর্ধস্ফুট মাধুরী আবার প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক হাসি জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল।

'আপনার কি মনে হচ্ছে জানি, দোহাই আপনার বলবেন না সেটা। আমার সময় নেই। আপনি কি চান বলুন।'

'তোমাকে চাই। ছোটগল্পকে—'"[৬]

বাংলা ছোটগল্পের প্যাটার্নে বনফুল সর্বপ্রথম 'Five minute short story' বা 'Short

short story' এর প্রণেতা। তাঁর অধিকাংশ গল্পই এক থেকে দেড় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বর্তমান গল্পটি অবশ্য আকারে কিছুটা বড়, প্রায় চার পৃষ্ঠার। সংক্ষিপ্ততা অবশ্যই ছোট গল্পের অন্যতম শর্ত। বর্তমান গল্পটিতে স্বয়ং গল্পকার গল্পের চরিত্রদ্বয়ের জবানীতে এ বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন—

"সে যে বড্ড ছোট হবে। একটা মুহূর্তের ঘটনা—'

'হোক ছোট তাই বল তুমি'—"[৭]

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আকৃতি অবশ্যই ছোটগল্পের প্রধান শর্ত নয়। কিন্তু গল্পকার যদি স্বয়ং বনফুল হন, সেক্ষেত্রে আকৃতি সচেতনতা পাঠকের মনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংক্রমিত হয়।

বনফুলের 'ছোটগল্পের গল্প' ঘনপিনদ্ধ রচনা। ছোটগল্পের রীতি মেনে কাহিনী ছোটগল্পের গল্পতেই একমুখী থেকেছে, যা স্মরণ করায় ওয়েবস্টার ডিকশনারী সেই বিখ্যাত সংজ্ঞাটিতে—'A short story usually presenting the cri is of single problem.' কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের দর্শনটিকে—'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতিতি জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্যদিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'[৮]

লক্ষণীয়,বনফুল ছোটগল্পের চাহিদা, তার মাধুর্য বৈচিত্র্য ও মুক্তির পথ অন্বেষণের মধ্যেই 'ছোটগল্পর গল্প' রচনাটির কাহিনীকে কেন্দ্রায়িত করেছেন। এককথায় কাহিনী একটি বিষয়ের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেছে। এ গল্পে লেখক যতটুকু বলার তার বেশি বলেননি অথচ গল্পের যথার্থ চাহিদাটিকে মিটিয়েছেন।

ছোটগল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের শৈল্পিক দর্শনটি গল্প কাহিনীতে প্রত্যয়ের সঙ্গে আভাসিত—

"আমি ছাপ চাই না। আমি সবুজ শীষের গল্পটা শুনতে চাই। তোমার কথা, তোমার ব্যথা, তোমার আনন্দ, তোমার কল্পনা—যা তুমি কাউকে বলনি—কিন্তু যা তোমার মনে অহরহ জাগরুক হয়ে আছে সেইটে আমি চাই—"[৯] ব্যক্তির আনন্দ বেদনার অকৃত্রিম অনুভূতি যা দেশকাল ভেদে ছোটগল্পের প্রাণ, বনফুলের বক্তব্যে মেলে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। আর এই ব্যক্তি হৃদয়ের অকৃত্রিম বহিঃপ্রকাশ গীতি কাব্যের প্রধান সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য'[১০] আর তারই দরুণ ছোটগল্পের আত্মীয়তা গীতিকাব্যের সঙ্গে। ছোটগল্পের বিষয় ভাবনায় বনফুল সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-পথের পথিক। 'সোনার তরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্ত সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারই দু-চারিটি অশ্রুজল"

তখন আমরা রবীন্দ্র-উক্তিতে বনফুলের বিষয় চেতনার আভাস পাই। ছোটগল্পের

সমাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্র-বনফুল সমদর্শী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ'

শেষ হয়েও নিঃশেষিত না হবার উচ্চরব শপথ বনফুলের গল্পে ঘোষিত না হলেও ছোটগল্পের বক্তব্যে ধৃত গল্প কাহিনীর সমাপ্তি অংশে লেখক হাতে-কলমে তার নজির তুলে ধরলেন—'আমার সমস্ত 'মেকআপে'র মধ্যে এই কথাটি কিন্তু আমি ভুলিনি যে তারা এসেছিল। এখনও আশা করে আছি হয়তো আবার আসবে'....."[১১]—সেই সোনালি মুহূর্ত তন্বী ছোটগল্পের জীবনে আদৌ ফিরে এসেছিল কিনা সেই কৌতূহলকে উন্মুখ রেখেই ছোট গল্প সমাপ্ত হলো।

বনফুলের ছোটগল্পের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য লেখকের অবিস্মরণীয় আত্মসংহতি, যা তাঁর শক্তিমত্তার পরিচায়ক। বনফুলের গল্পের বুনটে যেমন কোন ফাঁক থাকে না, তেমনি গল্পের সমাপ্তিতেও নেই কোনো অতিবিস্তার বা শৈথিল্য। বিচিত্র বিষয় সমৃদ্ধ তাঁর প্রতি গল্পেই থাকে কিছু জোরালো বক্তব্য। তার ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত অবয়ব পাঠক মনে দীর্ঘ প্রশ্নের জন্ম দিয়েই বিদায় নেয়। 'ছোট গল্পের গল্প'-এও লেখক কোনো অতিকথনকে প্রশ্রয় না দিয়ে কুশলী শিল্পীর মতোই স্বল্প ভাষণে ছোটগল্পের শিল্পরূপের স্পষ্ট সংহত ধারণাটুকু দিয়েই বিদায় নিয়েছেন।

বনফুলের নাট্যরচনার সহজাত প্রতিভার পরিচয় বনফুলের বহু ছোটগল্পের শরীরেও মুদ্রিত হয়ে আছে। বর্তমান 'ছোটগল্পের গল্প' গল্পটির সামান্য কিছু লেখকের বক্তব্য বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশটি পুরোপুরি সংলাপনির্ভর। গল্প গঠনের ভঙ্গীটি নাটকীয় কৌতুক উৎকণ্ঠার চুম্বক শক্তি নিয়ে জীবনের ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে যাবার পথিক বৃত্তিতে দীপ্ত। গল্পের শুরুতেও আছে ঈষৎ নাটকীয়তার ছোঁয়া—

'অদৃশ্য মানসিক টেলিফোনে বারংবার রিং করিবার পর অবশেষে ছোটগল্পের সাড়া পাইলাম'—এই সহজ সূত্রপাতে পাঠকের মনে এক জাতীয় কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। এরপর গল্প পটভূমিতে ছোটগল্পের আবির্ভাব। লেখক তার আবির্ভাবে বিস্মিত হলেন। কিন্তু গল্পকার প্রথমেই কারণ ব্যক্ত করলেন না। পাঠকের কৌতূহল সুউচ্চ তীব্রতায় পৌঁছে দিয়ে ধীরে ধীরে তার জট খুললেন। ছোট গল্প একগাল হেসে বলল—"চিনতে পারছেন না নিশ্চয়—মহিলাটি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিটি ঠিক তেমনি আছে। দেহটা এমন ভাবে বদল হইল কি করিয়া।"—পাঠক বুঝলো ছোটগল্পের দৈহিক পরিবর্তনের কারণেই লেখক তাকে চিনতে পারছেন না। কিন্তু এই কৌতূহল নিরসন হতে না হতেই তিনি জাগিয়ে তুললেন নতুন কৌতূহল—'দেহটা এমন ভাবে বদল হইল কি করিয়া!'—বাক্যটিকে ছুঁড়ে দিয়ে।

শুধু কাহিনী বিন্যাসেই নয়, সমাপ্তিতেও রয়েছে নাটকীয়তা। ছোটগল্পর মুখে বর্ণিত কাহিনী সমাপ্ত হতে না হতেই তন্বী বিদায় নিল—'হলতো চললুম। সুটকেশ হাতে লইয়া ছোটগল্প বাহির হইয়া গেল।'

তথ্যনির্দেশ

১ বনফুল, পশ্চাৎপট, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-২৬৭
২. পরিমল গোস্বামী—স্মৃতিচিত্রণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড (১৩৬৭) পৃষ্ঠা-২১০
৩. বনফুল রচনাবলী, দশম খণ্ড, সম্পাদনা : ডঃ সরোজমোহন মিত্র, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ পৃষ্ঠা-৩৪৩
৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৪
৫. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৬
৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৪
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪৬
৮. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৬১)
৯. বনফুল রচনাবলী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৩৪৬
১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ
১১ বনফুল রচনাবলী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৩৪৬, ১০ম খণ্ড

জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল। জীবনানন্দ দাশ বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মা কুসুমকুমারী দেবীও ছিলেন একজন কবি। জীবনানন্দ অধ্যাপনা ও কর্মসূত্রে বার বার স্থান পরিবর্তন করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৭) প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। তারপর তিনি একে একে লিখেছেন—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহা পৃথিবী' (১৯৬৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১), সুদর্শনা (১৯৬৩)। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় কোন গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—'মাল্যবান' ও 'সতীর্থ' তাঁর মৃত্যুর পরে একে একে সেগুলি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর কথাসাহিত্যের পরিমান এবং গুণমান প্রমাণ করে। কথাগদ্যেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জামরুলতলা : এক স্মৃতির সরণীতে

সোমা রায়

'জামরুলতলা' গল্পটি ১৯৩১ এ লেখা। বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে এ সময়। এ সময়টাতে কোম্পানী বা সওদাগর স্ফীত হচ্ছে কিন্তু শিল্পায়ন ঘটছে না। উনিশ শতক জুড়ে বণিকের মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ডে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কলকাতা ইংরেজদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্য' প্রবন্ধে যে 'বাবু'দের কথা বলেছেন তারা সাহেবদের ভাষায় 'বাবু'—অর্থাৎ কর্রানিকবৃন্দ, ডাক্তার, উকিল, সরকারি ও সওদাগরি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—এরাই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠেছিল কলকাতা মহানগরীতে। শিল্পায়ন বিনা নগরীকরণের ফলে কলকাতার অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বাড়ছে হু হু করে তা নয়, তবে শহরে লোকেদের কিছুটা পকেট ভারী হচ্ছিল গ্রামের মানুষের ট্যাক খালি করে। গ্রাম ও শহরের অসমতা বেড়ে ওঠার দরুন শহরে মানুষদের লাভ হচ্ছিল আর উল্টোদিকে গ্রামীণ আয়ের আপেক্ষিক অবনতি ঘটছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বশাসিত, স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার কথা বললেও, গান্ধীজী গ্রামীণ হস্তশিল্পকে উজ্জীবিত করবার স্বপ্ন দেখলেও উপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে শহরের জেল্লা বেড়ে যায়, গ্রাম হয়ে পড়ে দুর্বল। ইংরেজ শাসন এদেশের মানুষের মনে ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ জাগ্রত করেছিল। এ অবস্থায় গ্রামের মানুষ শহর পানে ছুটবে তাতে আর আশ্চর্য কী? ধাবমান জনস্রোত যে গ্রামজীবনকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে তার একটা মূর্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে। দেশের বাড়ির টান থাকে না, প্রকৃতি সংসর্গ আর উদ্দীপিত করে না, বসতবাড়ি জনহীন হয়ে পড়ে সে কারণেই। জীবিকার খোঁজে চাকরির লোভে কলকাতায় ছুটতে হয় গ্রামের মানুষকে। অক্ষম, উদ্যোগহীন মানুষ কখনো কখনো জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। সংসার আর সংসার থাকে না তখন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, নর-নারীর প্রেম, সজীব জীবনের কল্পনা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। গল্পে শোভনা এক বছর কলকাতায় বাপের বাড়িতে কাটাবে বলে। কথক (তথা লেখক) তা অকাতরে মেনে নেন। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে কলকাতায় কাজের সন্ধান মেলে না বলে কথককে গ্রামের বসতবাড়িতেই থাকতে হয়। মেজকাকা বিয়ে-থা করেন নি, শহরের জীবনের আকর্ষণ অনুভব করেন না। পিসিমা বিধবা হয়ে এখানে ঠাঁই নিয়েছেন। একদল অসমর্থ, অসফল উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ গ্রামকে আঁকড়ে থাকে।

জামরুলতলাকে লেখক গ্রাম-জীবনের রোমান্স হিসাবে দেখেছেন। এখানে যে হারানির সঙ্গে কথকের দেখাসাক্ষাৎ ঘটত (কথা হত না, তার প্রয়োজনও হয় নি) সে হারানিও কলকাতায়—বি.এ পড়বে, চাকরি করবে বলে। জীর্ণ অসুস্থ অবনী, তার পিতার বয়সী অবনীর সঙ্গে সুশ্রী, বলা ভাল সুন্দরী হারানীর বিবাহ কথককে মর্মাহত করে। যে জীবনের কথা ভেবে বড় হয়েছেন কথক সে জীবনকে বিপুল ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে চলেছে অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শাসন। এ অবস্থায় লেখকের গল্প লেখার পরিকল্পনায় আঘাত আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

গল্প এবং ছোটগল্প এক নয়, বলা ভাল সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। জীবনানন্দ কখনো গল্পকার, কখনো ছোটগল্পকার। তিনি ছোটগল্পের প্রথাবদ্ধ নিয়মরীতি মেনে চলেননি। ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে ছোটগল্পের অ্যাকাডেমিক শর্ত নিয়ে ছাত্রদের সামনে নানারকম আলোচনা করেছেন হয়ত। কিন্তু সৃজনশীলতার জগতে তিনি নির্ধারিত ছোটগল্পের হাত ধরে প্রবেশ করেন নি। সনাতন সমালোচক বলতে পারেন জীবনানন্দ সার্থক ছোটগল্পকার নন। কিন্তু একথা মানা অসম্ভব। কোন সমালোচক বলেছেন—"পড়তে ভাল—তার বেশি কিছু নয়। ভাষায় কবিতা-কবিতা গন্ধ। আগাপাছা কিছু নেই।" জীবনানন্দের গল্প সম্পর্কে এরূপ কটাক্ষ করলেও জীবনানন্দের ছোটগল্পের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না। তবে একথা ঠিক আদি-মধ্য-অন্ত স্পষ্টভাবে নেই তাঁর ছোটগল্পের বিন্যাসে। আর সেখানেই জীবনানন্দের ছোটগল্প আলাদা, ভিন্নধর্মী, স্বতন্ত্র। এই অনুসঙ্গেই 'জামরুলতলা' গল্পের কথকের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করা যায়। গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। কথক বলেছেন-"অনেক বাংলা গল্প অনেক জায়গায় তো পড়েছি, গল্পটা আমার সে সমস্ত গল্পের কোনো একটির মতন হবে নাকি?" গল্পের উত্তম পুরুষকে ব্যক্তি জীবনানন্দ ভাবাই যায়। এই প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কার যে, প্রচলিত ধরনের গল্প তিনি লিখবেন না। এই সূত্র থেকে বোঝা যায় জীবনানন্দ সচেতন ছিলেন গল্প লেখার ব্যাপারটিতে। এবং তিনি চাইতেন এমন গল্প লিখতে যা হাজার রচনার ভিড়ে হারিয়ে যাবার নয়।

আশিরনখ যিনি কবি তিনি গল্প লেখেন কখনো অন্তরের তাগিদে কখনো গল্পকার হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। 'জামরুলতলা' গল্পে কথক বলে যান কথা—তার কথা একটানা নয়, কিছু অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন, ছাড়াছাড়া। মনে হয় কোনো ঘন পিনদ্ধ জমাট গল্প লেখার দায় জীবনানন্দের নেই। তিনি কথকের ফ্রেমের বাইরেও যেতে চান না। তাই কথকের দৃষ্টিতে বা ভাবনায় যা ধরা পড়ে তাই উঠে আসে গল্পে-কথায়। নাই বা থাকল সেখানে ঘটনা বা টান-টান কোনো কাহিনী। ধরা-বাঁধা কোন ছক নয়, একটানা বলা কোন আখ্যান নয় বরং পাঠকের ভাবনাকে রীতিমত ধাক্কা দেয় এ গল্পের আঙ্গিক। মনে হয় জিগ্ শ (Jig saw) পাজেলের খণ্ড খণ্ড ছবি জুড়ে তৈরি হয়েছে 'জামরুলতলা'। যদিও তা জুড়তে খুব বেশি জোর খাটাতে উদ্যোগী নন লেখক। নিজস্ব বর্ণ, শব্দ, সুরে সৃষ্টি হয় এ গল্পের বয়ন—তাই বোধ হয় কথকের নামটি পাঠককে জানাতেও আগ্রহ বোধ করেন নি তিনি। এ গল্প গড়ে নিয়েছে তাই নিজের চলার ছন্দ। প্রারম্ভেই যখন কথক বলেন—

> "অনেক লোকজন, অনেক লোকজন নিয়ে সংসার; কিন্তু ধীরে ধীরে জীবনের প্রয়োজনে সকলকেই প্রায় ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে।"

তখন মনে হয় অনেক কথাই যেন বলা হয়ে গেছে আগে। বলতে থাকা কথাকে হঠাৎই যেন লেখক নিয়ে এলেন গল্পের কাঠামোতে। অলসভাবে বিবৃত কথাপুঞ্জ নিয়ে তৈরী হয়েছে কথকের বয়ান। সেই সঙ্গে গল্পেরও। এসবই 'জামরুলতলা'কে পৌঁছে দেয় এক অন্য মাত্রায়। মেজকাকা, পিসিমা আছেন সংসারে। কলকাতা থেকে দাদার পাঠানো টাকায় (খুব সামান্য) দিন গুজরান হয় তাদের। অনেক জনের বাড়ি, বর্তমানে মাত্র তিনজন প্রাণী—তাই চারিদিক খাঁ খাঁ করে। তবে 'বড় ভরসার কথা' শুনিয়েছেন কথক-'বাড়ির ভিতরে একটি

মেয়েমানুষ যে সদা সর্বদা নড়াচড়া করছে তাই উপলব্ধি করতে পারি।" পিসিমা গৃহস্থালির নানাবিধ কাজে নিজেকে সারাদিন ব্যস্ত রাখেন—বড় বড় কচুর পাতায় তেল মাখিয়ে খেসারির ডালের বড়ি দেন, তরকারি কোটেন, আমচুর তৈরি করেন, পুঁইমাচা ও লাউডগার তদারক করেন আর বাড়ির লাগোয়া জমিতে বেগুন, লঙ্কা, টমেটোর ক্ষেত তৈরি করেন। এসবই কথকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও যেন অলস ভঙ্গীতে বসে বসে দেখে। কথকের কোন কাজ নেই। উঠোনটা পরিষ্কার করার কথা ভেবে কাস্তে হাতে নেমেও থেমে যান, কাস্তেও ছুঁড়ে ফেলেন ঝোপে। 'কী লাভ'-এ ভাবনা থামিয়ে দেয় তাঁকে। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে জীবনের প্রতি কোন গভীর প্রত্যাশা তাই নেই, নেই কোন চাহিদা। মেজকাকা বাজারে যান। এ কাজ তাঁর অপার আনন্দের। দু-তিন ঘন্টা সময় নিয়ে তিনি সামান্যই বাজার করেন। কারণ মাসিক বরাদ্দ ত্রিশ টাকায় বাজারে প্রত্যহ যাওয়া-আসাই সার হয়। মাছ কেনা আর হয়ে ওঠে না।

এসব কিছুই স্পর্শ করে না কথককে। সংসারে যেন কোন ভূমিকা নেই তাঁর। চাকরিহীন, রোজগারহীন কথক তাই শুধু দর্শক। তাঁর একটি মাত্র বাসনা—গল্প লেখা। চিরাচরিত যে ধরনের গল্প পড়তে কথক অভ্যস্ত তেমন গল্প নয়। এমন গল্প যা 'ধূসর বিকেলের ময়ূরপঙ্ক্ষী পালঙ্কের দেশে' চিরকালের জন্য হারিয়ে' যাবে না। সারাদিন এই গল্প লেখার প্রয়াস চালান তিনি। তাঁর মনে হয়-"সারাদিন গল্পটা লিখতে গিয়ে যদি গ্রন্থিমাংসের পুনরুক্তি ও জীবনের জীর্ণশীর্ণ পুরনো বিষণ্ণতার ও মূল্যবোধের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারি তা হলে আমার কাজ হবে।" কিন্তু তেমনটা কি সত্যিই সম্ভব? গল্প লেখার জন্য কাগজ তাও সহজে মেলে না, 'নচ্ছার পাড়ায়' আধমাইল হেঁটে ব্রজেন মুন্সির মুদির দোকান থেকে এক দিস্তা কাগজ কেনা হয়। দোয়াত, কালি, কলম জোগাড় হয় অনেক চেষ্টায়। কিন্তু লিখতে যেতেই হাজির হয় নির্মল। জানায় হারানি ও অবনীর বিবাহের কথা। যে অবনী সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিল তাকেই হারানি ভালোবেসে বিয়ে করে। তার অসুস্থতায় আপ্রাণ সেবা করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঁচানো যায়নি অবনীকে। হারানিকে নিয়ে কিছু স্মৃতি আছে লেখকের মনে। লেখকদের 'জামরুলতলায়' রোজ ঠিক দুপুরবেলায় আসত কিশোরী হারানি। লেখক তাঁর কলমটা টেবিলের উপর রেখে চুপচাপ বসে তাকে লক্ষ্য করতেন। যতক্ষণ তার শাড়ির পাড় অব্দি দেখা যেত ততক্ষণ পর্যন্ত মনঃসংযোগ করা লেখকের পক্ষে অসম্ভব হত। কথা না হলেও দৃষ্টি বিনিময়ে বাধা পড়ে নি। শুধু এটুকুই বলেছেন লেখক। লেখক হারানির প্রতি অনুভূতিপ্রবণ গল্পে তাঁর কোন ইঙ্গিত দেন নি তিনি। তবু হারানির প্রেমকথা শোনেন খুঁটিয়ে। তাঁর আর নির্মলের কথোপকথনেই প্রতিভাত হয় হারানির বাঁধভাঙা প্রেমের কথা। আর এই কথামালার হাত ধরেই লেখকের মনে ফিরে আসে হারানির স্মৃতি। হারানির প্রেমের প্রত্যক্ষদর্শী নির্মল এ কাহিনী বলাতে অকুণ্ঠ প্রগল্‌ভ। এই প্রেম, এই দাম্পত্য তার কাছে মহিমাময়। অথচ কি অদ্ভুত আয়রনি সে নিজের স্ত্রীর অসুস্থতায় কিছুমাত্র কাতর নয়। স্ত্রীর অসুখের কারণে সে রেখে এসেছে তাকে কলকাতায় বৌ-এর মাসীর বাড়ি। দেখতেও যায় না। কথক 'কী অসুখ' জানতে চাইলে সে মুখ বিকৃত করে বলে-"কোথায় একটা টিউমার না কী হয়েছে।" বাঁচার আশা না থাকায়

নির্মল স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্য পালন করতেও ইচ্ছুক নয়। চিকিৎসায় সারার সম্ভাবনা না থাকায় সে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত করে স্ত্রীকে।

পরম অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে জানতে চায়, "আচ্ছা শালী মরবে যখন টিউমারটা পোড়াতে কতক্ষণ সময় লাগবে বলতে পারো?" কলকাতায় যাওয়ার কথা বললে সে অবলীলায় জানায় পরশু দুপুরে এসেছে টেলিগ্রাম, পরশু সকালে তার বউ মারা গেছে। এরপর প্রবল ঘৃণায় সে বলে—"হ্যাঁ শুকনিটা গেছে, পোড়াবার লোক পাচ্ছে না—তাই আমাকে খিঁচে টেলি"। তার কথায় প্রতিক্রিয়ায় শুধু কথককে নয়, পাঠককেও স্তম্ভিত হতে হয়। এ কি অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! সে হারানির দাম্পত্য প্রেমকে অমর বলে ভাবে, সেই প্রেমকথা অন্যকে বলে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় প্রত্যক্ষদর্শীর দাবিতে, সে-ই নিজের স্ত্রীর বিষয়ে আশ্চর্যরকম হৃদয়হীন। কখনো কখনো তাকে নিষ্ঠুর বলেই মনে হয়। তার চরিত্র বা মানসিকতা নিয়ে কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা লেখক দেননি, তার প্রয়োজনও বোধ করেননি। খুব সামান্য তুলির আঁচড়, কিছু সংলাপ ফুটিয়ে তুলেছে এসব। তাতে যদি সম্পূর্ণ ছবিটা স্পষ্ট নাও হয় তাতেও যেন কিছু যায় আসে না লেখকের। নির্মলের শেষ উক্তিতে বিব্রত বোধ করেন লেখক। এই কথা যেন জীবনের ভেতরকাব নিরক্ত হাড় মাংস বের করে আনে। লেখকের গল্প লেখার পরিকল্পনা আঘাত পায় এই মানবতাবোধহীন বক্তব্যের অভিঘাতে। এই বাস্তব যেন লেখককে দাঁড় করায় এক নগ্নতার মুখোমুখি। কলম রেখে দেন তিনি। সৃষ্টি থমকে যায়। "সবুজ পল্লবিত জারুলের ঐশ্বর্য, হেলিওট্রোপ রঙের ফুল, মেহেদি পাতার বলে স্বপ্নাতুর ঝিঁঝি, ছাতিমের ডালপালার গাঙশালিকগুলোর জীবনোচ্ছ্বাস কৃষ্ণচূড়ার অজস্র কুড়ি, হারানির প্রেম, চারদিককার সফল, প্রচুর, সজীব জীবনের কালীদহ কলরব কিছুই আমাকে সাহায্য করতে পারে না।"—তবে লেখার কি হবে? থেমেই থাকবে কলম? এ প্রশ্ন ভাবায় পাঠককে। আর সেসময়ই গল্পের ইতি টানতে চান লেখক। তাঁর আগে তিনি উল্লেখ করেন একটি রাত্রির কথা। শোভনার সঙ্গে সেই লেখকের শেষ রাত। সমগ্র গল্পে এক আধবার শোভনার নাম এসেছে। মনে হয় তাকে ঘিরে এক বিষণ্ণতার বোধ কাজ করছে লেখকের মনে তবে তার প্রকাশ খুব অস্পষ্ট। কোনো বিরহ কী পীড়া দেয় তাঁর মনে? তার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট নয়। তবে তাঁর দাম্পত্য যে তাঁকে ভাবায়, তারই প্রমাণ তার অনুভূতির গহনে ছাপ ফেলে যাওয়া সেই রাত। তবে সেইদিনই ভোর রাতে শোভনা বাপের বাড়ি যাবার জন্য স্টিমারে ওঠে। একি বিচ্ছেদ কাতরতা! বিরহ! এ বলব একে, সমগ্র গল্পে কোন সুরই উচ্চকিত নয়, কোন বর্ণই খুব উজ্জ্বল নয়, কোন শব্দ খুব তীব্র নয়—পুরো আবহটাই যেন একটু অবসন্ন, ক্লান্ত বিষণ্ণতায় ভরা।

· জামরুলতলা নামটির মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে সেই বেদনা, সেই স্মৃতি—যা এখন নেই, কিন্তু ছিল-এখনও আছে তার স্মরণে। তাই তো জামরুলতলাকে ঘিরে লোকজন, আড্ডা-গল্প এসব স্মৃতি টানে কথককে। আর এখানে এসে দাঁড়াত সে হারানি—যার সঙ্গে একটিও শব্দ বিনিময় না করেই তৈরি হয় এক আকর্ষণ—যার হয়ত কোনো ভিত্তি নেই, তবুও তা মিথ্যা নয়। দাম্পত্য জীবনের প্রতিও যেন কথক মোহহীন, আপাত ভাবে মনে হয় শোভনার সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাওয়াতে তাঁর কোন অভিযোগ বা আপত্তি নেই। তবু

কোথায় যেন বাজে বেদনার ধ্বনি, খুব মন দিয়ে শুনলে পাঠকের কানে ধরা পড়ে তা। গল্প লেখার প্রচেষ্টা চলতে থাকে নিরন্তর। কথক ভাবতে থাকেন গল্প লিখতে গেলে তো জীবনকে নিয়ে যেতে হবে বাস্তবের সীমা ছেড়ে কল্পলোকে,—"গল্প লেখার ঘন্টা-মুহূর্তগুলো মানুষের জীবনের খুব একটা সুন্দর উৎসর্জনের জিনিস বলে মনে হয়। মানুষ ভাত খেয়ে বাঁচে না শুধু। সে পুঁইশাকের চচ্চড়ি ও কুচো চিংড়ির ঘন্ট খেতে পারে, কিন্তু চিন্তা ও কল্পনা তবুও তার। পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ আবিষ্কার করতে পারে, অদৃশ্য সমুদ্রের শব্দ শুনতে পারে। ভোরের রাঙা সূর্যে অর্ধনারীশ্বরের ভয়াবহ সুন্দর রূপ দেখতে পারে। চাই উপলব্ধি ও কল্পনার গভীরতা ও সাহস......."এই বর্ণনা অভিজ্ঞান স্বরূপ চিনিয়ে দেয় গল্পকার জীবনানন্দকে। কিন্তু এর পরেই কথক বলেন—'কই, গল্প লিখছি না তো।' এই গল্প লেখার আকাঙ্ক্ষা এবং লিখতে না পারার অতৃপ্তি যুগপৎ শোনা যায় 'জামরুলতলা' গল্পে

'জামরুলতলা' যেন এক স্মৃতির সরণী বেয়ে হেঁটে যাওয়া। যেন নস্টালজিয়ায় ভেসে যাওয়া এক মানুষ বাস্তবের ধাক্কায় বিপর্যস্ত। কবি জীবনানন্দ যেমন তৈরি করেন নিজ কাব্যজগৎ, ছোটগল্পকার জীবনানন্দও তেমন ভাবেই সৃষ্টি করেন নিজ গদ্যভাষা, কোন বিষয় নয়, বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বোধ, চেতনা ফুটে ওঠে গল্পের অবয়বে। এখানেই জীবনানন্দের গল্প নির্মাণের অনন্যতা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

খ্যাতনামা কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমারের জন্ম নোয়াখালিতে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে কল্লোল ও সমসাময়িক অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় যে-সব লেখক পাঠকমনে আলোড়ন তুলেছিলেন অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অন্যতম। 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মুন্সেফ, সাব-জজ ও জেলা জজ হিসেবে চাকরি সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা বিচরণে অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে কাজে লাগিয়েছিলেন দক্ষতার সঙ্গেই। প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। প্রচুর গল্প ও উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পেরেছিলেন। 'কল্লোলযুগ' বইটি বিশ-তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা ও সৃষ্টির দলিল হিসেবেই স্বীকৃত। 'অমাবস্যা' (কবিতা), 'ইন্দ্রানী', 'কাকজ্যোৎস্না', 'রূপসী রাত্রি', 'প্রচ্ছদপট', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', 'মন্দাক্রান্তা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (কবিতা) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। শত গল্প ও প্রেমের গল্প তাঁর গল্প সংকলন। জীবনীসাহিত্যেও তিনি একটু অন্য মাত্রা আনতে পেরেছিলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পরমাপ্রকৃতি সারদা, প্রভৃতি জীবনীগ্রন্থ রচনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় বাচনভঙ্গি নির্ভর করে লিখেছিলেন—'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। কাব্যভাষা ও গদ্যভাষা—দু'ক্ষেত্রেই অচিন্ত্যকুমার তাঁর প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য রেখে গেছেন। তাঁর গল্পে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম দু'বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন্ত চালচিত্র।

সারেঙ : পিতৃত্ব আবিষ্কারের আখ্যান

কৃষ্ণগোপাল রায়

'কল্লোল'-কে এখন আর আন্দোলন বলে মানতে চাননা সকলে। এ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি-প্রতিযুক্তির অবতারণা চলেছে, চলতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস 'কল্লোল'ই করেছে, বদলে দিয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের জীবন-প্রেক্ষণ কোণ। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেছিলেন মূলত তত্ত্বের আধারে এবং যে-সব চরিত্রকে আশ্রয় করে তাঁর এ দেখার কাজ চলছিল তারা মূলত তাঁর কল্পনা কখনো-কখনো অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে উঠে আসা, তবু তাদের গায়ে মাটির গন্ধ ছিল না তেমন। একথা যখন বলছি, তখন ভুলে যাচ্ছি না তাঁর ছোটগল্পের শিলাইদহ পর্ব—রাইচরণ, রহমত-দুখিরাম-ছিদাম-রাধা-চন্দরার কথা, বস্তুত এরা আমার কথার বিপরীত সাক্ষ্যই, কিন্তু 'সবুজপত্র' পর্বে প্রবেশ করার আগেই এরা মিলিয়ে গেছে তাঁর সৃষ্টি-প্রেরণা থেকে; আর, যেখানে এরা ছিল সেখানেও এদের আকরিক স্বরূপটার চেয়ে লেখকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল এদের আত্মিক দিকটাই। তার চেয়ে বড় কথা, এ সব অভাজনদের পুরোভাগে রেখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের আসর সোৎসাহে পাততে চাননি মাটির উপর অসংখ্য চরিত্রের ভীড়ে এরাও এসেছে—এইটুকুই বলা যেতে পারে, তাও সংখ্যায় এরা খুব কম। 'কল্লোল' গুরুত্ব দিল এই জায়গাটিকেই। রক্ত-মাংসের তাড়নায় উদ্বেল, স্বার্থাস্বার্থের টানাপোড়েনে দ্বান্দ্বিক, বিবেক ও মনের অন্তক্রিয়ায় চির-মানুষের আত্মজ যারা বিভিন্ন পেশা বিচিত্র নেশা এবং অদ্ভুত ধান্দা ও ফিকিরে নানান আর্থ-সামাজিক আবেষ্টনের মধ্য ক্রিয়ামগ্ন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যাদের কথা বেশি বলা হল না, শরৎচন্দ্র যাদের চিনতে পেরেও ভাবের ঘোরে দিগভ্রান্ত হয়ে গেলেন, 'কল্লোলে'র কথাকারেরা এদেরকেই গুরুত্ব দিলেন সচেতন ভাবে ('কালি কলমে'র নামও করা জরুরি 'কল্লোলের'ই সঙ্গে)। অবশ্য বুদ্ধদেব উৎসাহী হলেন না এতে, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র হলেন, জীবনানন্দও হয়েছিলেন, হয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমারও এই প্রবণতাই বাংলা কথাসাহিত্যের অপরিমেয় দিগন্ত হয়ে উঠল শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে।

কিন্তু শৈলজা বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিকের পক্ষে কাজটি ততখানি জটিল ছিল না যতখানি ছিল অন্তরে রবীন্দ্র-মগ্ন এবং আবেগে-অতীব প্রগাঢ় অচিন্ত্যকুমারের পক্ষে। সহজাত অন্তর তাঁকে টেনেছে 'শেষের কবিতা'-র মতো করে 'বিবাহের চেয়ে বড়' লিখতে কিন্তু দায়বোধ তাঁকে উদ্দীপিত করেছে 'ছন্নছাড়া'-র মতো কবিতা কিম্বা 'সারেং'এর মতো গল্প লিখতে। এই অনতিক্রম্য দায়বোধ তাঁর মধ্যে বর্তেছিল 'কল্লোলে'র ব্যতিক্রমী হাওয়া থেকে, আবার উল্টে এটাও বলা যেতে পারে, যুগের হাওয়া তৈরী হচ্ছিল এই জাতীয় দায়বোধেরই চাপে।

দুই

রবীন্দ্র-শরতে লালিত পাঠকের কাছে 'সারেঙ'-এর জগৎ অভিনব অবশ্যই। সতর্ক কৌতূহলে তাকে চিনতে হয় যেমন করে চিনেছিল নাসিম। বস্তুত গল্পের কথন-কৌশলে

তার চোখ ও অনুভব দিয়েই পাঠককে রপ্ত হতে হবে এ অচেনা ভুবনে।—কনকদিয়া গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে জাহাজ ঘাট। ডোবা অঞ্চলে জল জমিয়ে থাকে পাট ক্ষেতের পাশ দিয়ে। যাত্রীরা জল ভেঙে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। ঘাটের ধারে বাদাম গাছের তলায় জাগা ডাঙায় ছোট একটা টিনের বাক্স নিয়ে বসে টিকিট বেচে ঘাট সরকার, ছাড়ার আগে স্টিমারে উঠে গিয়ে টিকিট পরীক্ষা করে হিসাব করে জাহাজ বাবুর সঙ্গে। স্টিমার থামলে যাত্রী নামানোর জন্য দুখানা সিঁড়ি পেতে দেওয়া হয়, সিঁড়ির এ-ধার থেকে ও-ধারে লগি ধরে দাঁড়ায় দু'জন খালাসি। যাত্রীরা নামা-ওঠা করে লগি ধরে। কাচ্চা-বাচ্চাদের তোলা হয় কাঁধে করে, অল্পবয়সী বউদের তোলা হয় পাঁজা-কোলে করে।—নামা-ওঠায় লগি লাগে না ঘাট সরকারের। সে নামলে সিঁড়ি তোলার হুকুম দেয় সারেঙ। নোঙরও তোলা হয় তারপর।

সারেঙ স্টিমার-রাজ্যের রাজাধিরাজ। একচ্ছত্র তার আধিপত্য। সাহেবরা স্টিমারের যাবতীয় খায়-খরচা থেকে কর্মচারীদের বেতন তারই হাতে তুলে দেয়, তারা শুধু দেখে মালে-মানুষে বোঝাই করে ঘাটে ঘাটে ঘুরে স্টিমার মোটা মুনাফা এনে দিচ্ছে কিনা। বাকী সব দায় সারেঙের। স্টিমার চলতে চলতে যদি নৌকা ডুবিয়ে দেয় তার খেসারৎ সারেঙকে দিতে হবে, অন্য স্টিমারের সঙ্গে কোনো কারণে যদি জটলা বাধে, মামলা-মকদ্দমা হয়, তার দায় সারেঙের, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে, স্টিমার যদি ডুবেও যায় তারও দায় সারেঙের। আবার ঝড়-তুফান থেকে স্টিমারকে নিরাপদে বের করে আনতে পারলে তার পুরস্কারও সারেঙের। মিস্ত্রী খালাসীরা যতই হাঁক-ডাক চেষ্টা-চরিত্র করুক, সাহেবরা কোনো পুরস্কারই তাদের দেবে না। তারা জানে শুধু মুনাফা, চেনে শুধু সারেঙকে।

স্টিমার রাজ্যে সারেঙ-ই তাই শেষ কথা। তার বিরুদ্ধে কোনো নালিস-ফায়সালা নেই। সে যে কোনো অপরাধে যেমন খুশি শাস্তি দেয়, যাকে খুশি পুরো বেতন দেয়, যাকে খুশি বেতন কাটে, জরিমানা করে, খোরাকি কাটে, যখন খুশি কিল-চড় লাথি কষায়। মিস্ত্রী, খালাসী, কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, ইঞ্জিনওয়ালা—স্টিমারের প্রত্যেকটা লোক তার তাঁবেদার। স্টিমারের মোকররী ইজারাদার সে।

তার গালমন্দ-মারধর প্রত্যেকে যে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে, তার কারণ সে-ই চূড়ান্ত সার্টিফিকেট দেবার মালিক। সারেঙের ধোপা-মুচির কাজ দিয়ে কর্মচারীদের কাজ শুরু হয়, তার পর সিঁড়ি ফেলা, পাটাতন ফেলা, দড়ি-কাছি বাঁধা-এমনি করে ধীরে ধীরে পদোন্নতি। শেষ উন্নতি সারেঙ হওয়া এবং সেটা হবে ঐ সারেঙের সার্টিফিকেটেই। সুতরাং সারেঙের বিরুদ্ধে কিছু বলারই উপায় নাই। সে স্টিমার থেকে নামিয়ে দিলে অন্য স্টিমার কাজ দেবে না, পালিয়ে গেলে সারেঙ মিথ্যা অভিযোগে জানাবে পুলিশে, তার হয়ে কেস লড়বে সাহেবরা, শেষে জেলে যেতে হবে।

মকবুল, আবদুল, আফসার উদ্দীন, বিলায়েত আলি, ইয়াদালি প্রভৃতি এই জাহাজের নানা স্তরের কর্মচারী। নাসিম এসে জুটেছে এদেরই একজন হয়ে—কিন্তু এদের চেয়েও হীন শর্তে, তার মাইনে নেই।

এ জগত তবু সম্পূর্ণ নিরানন্দ নয়। সারেঙের তিরিক্ষ আচরণ ও নির্দয় অত্যাচারে কেউ

কারোকে বাঁচাতে না এলেও একে অপরের জন্য সহানুভূতি বোধ করে, সারেঙের চোখের বাইরে খাটো গলায় নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলে, নবীন আগন্তুককে সুপরামর্শ দেয়, পরিস্থিতি বোঝায়, নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টাও করে।

'সারেঙে'-এর স্টিমার চলেছে এই সতন্ত্র ভুবন নিয়ে। কখনো সে নদীর চোরা চবে ঠেকে, চাকা বসে যায় মাটিতে, ছাড়ান পেতে দেরী হয়; ওদিকে ঘাটে ঘাটে যাত্রীরা বসে থাকে হা পিত্যেস করে।

যাত্রীদের সঙ্গে স্টিমারের লেন-দেনের সম্পর্ক। যাত্রীরা আসে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে। তাদের পরিষেবা নিয়ে ভাবিত নয় কেউ, বোধ হয় প্রতিযোগিতা কম বা নেই বলে। পরিষেবা নিয়ে ভাবনা তো নেই-ই, উল্টে তাদের জিনিস-পত্রও মাঝে সাঝে চুরি হয়ে যায়। চোরাই মাল ঘরে এলে সারেঙ অখুশি হয় না।—স্টিমারে টেনে যে-সব ভার্জ চাল, লবণ, লঙ্কা, পেঁয়াজ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে যায়, চোরাপথে তার মাল উঠে আসে স্টিমারের স্টোর রুমে।—ডাঙার জেলে মাছ বেচতে আসে, গোয়ালা আসে দুধ নিয়ে, শশা-খিরা নিয়ে আসে পসারী, ছল-চাতুরি করে স্টিমারের লোক ঠকে তাদের। সারেঙ তখন হাসে। গতিতে সে হারিয়ে দেয় ডাঙার মানুষজনকে।

'সারেঙ' গল্পের পটভূমি-পরিবেশ হল এই রকম। লক্ষণীয় এ পটভূমির তন্নিষ্ঠ উপস্থাপনা যা লেখকের স্পষ্ট অভিজ্ঞতা এবং তার শিল্পোপস্থাপনা সম্পর্কে সতর্ক করে সচেতন পাঠক-মাত্রকেই। কল্লোলের কালের আগে এ জিনিস বাংলায় ছিল না।

তিন

ডাঙ্গার জীবন আর নদীতে ভাসা স্টিমারের জীবন—দু'রকমের জীবন-ধারা রয়েছে এ গল্পে।

ডাঙ্গার ইতিবৃত্ত এ গল্পে যেটুকু তা ঐ নাসিমকে জড়িয়ে। নাসিম স্টিমারে উঠে আসার পর ডাঙ্গার আর ইতিবৃত্ত নেই, স্মৃতি যদি বা তার মধ্যে কখনো ক্রিয়াময়, ডাঙ্গার জন্য টান কিছু নেই তার। যার জন্যে টান থাকতে পারতো, তার 'মরা মুখ' কল্পনা করে সে, 'মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।'—হতে পারে এক নির্বেদ মুহূর্তে—যখন নদীর জীবনকেও ডাঙ্গার জীবনের মতো বিস্বাদ মনে হয় নাসিমের তখনই ঐ ইমেজ খেলে উঠেছে তার মনে। কিন্তু মায়ের প্রতি অভিমানটা তার নিতান্ত অগভীর এবং মৌহূর্তিক নয়।

অকালে মরে যাওয়া বাপজান ছিল গরীব কিন্তু ভালোবাসতো নাসিমকে। নাসিম তাকে চাইতো একটা নৌকা; 'মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভালো লাগে'—আবদার করত সে বাপজানের কাছে। বাপজান তাকে হাটে করে দিতে চেয়েছিল কাটা কাপড়ের দোকান। কিন্তু সেটা করে দেবার আগেই নাসিমকে জলে ভাসিয়ে সে মারা গেছে।—জলে তবু ভাসতো না নাসিম; বাপ ছিল না বটে, কিন্তু কিছু গোরু-বাছুর ছিল, ছিল কিছু জমি-জমা, খোড়ো ঘর, আর সর্বোপরি ছিল মা। মায়ের স্নেহপুটেই থাকতে পারত নাসিমের আশ্রয় ও জীবন-সংগ্রামের সাহস। কিন্তু বাপজানের মৃত্যুর পর নাসিমের মা গোলাবানু ভেসেছে গহরালির নেহার দরিয়ায়, নাসিমের আশ্রয় ও জীবন সংগ্রামের ঠিকানাও সে

সোপর্দ করতে চেয়েছে গহরালিতেই। এ তার নবপ্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে, কিন্তু নাসিম তা মানবে কেন, কেন ছাড়বে মায়ের উপর করে অধিকার? বিদ্রোহ করে সে, গহরালির কর্তৃত্ব মানবে না। গরু-বাছুর দেখাশোনা বা চাষ-বাস ঠিক মতো না করতে পারলে মা যদি মারে মারুক, শাসন করতে পাবে না গহরালি। গহরালির হাতে মার খেলে সে ফোঁসে, ভাবে বাপজান বেঁচে থাকলে কেউ তাকে মারতে পারত না। বাপের স্থান নেবার জন্য যে এগোচ্ছে, রূঢ়তায় নাসিমকে সে করে তুলেছে বিদ্রোহী। মাও পক্ষ নিয়েছে এই গহরালিরই। এইখানেই মায়ের উপর রাগ নাসিমের। গরু-বাছুর, জমি-জমা যা হারাচ্ছে তার জন্যে দুঃখ নেই, দুঃখ এবং ক্ষোভ শুধু মাকে হারানোর জন্য। তারুণ্যের এ ক্ষুব্ধ আবেগে নাসিমকে চেনা যায় এক প্রাঞ্জল মনের স্নেহপ্রত্যাশী বালক বলে। যখন সে স্থির করে জানল যে মা নিকা-বসাবে গহরালির সঙ্গে, ভাসবে অন্য দরিয়ায়, নাসিমকে হতে হবে সে-দরিয়ার ছিন্ন শৈবাল, তখনই মাটির বন্ধন তাঁর ছিঁড়ে গেল। দরিয়ার পানি তার বেশি ভালো লাগতো, দরিয়াতেই ভাসল সে, স্টিমারের হুইলে উঠে এসে সারেঙকে সে চাইল একটা কাজ, জানাল তার বাপ-মা কেউ নেই, একেবারে নিরাশ্রয়।—মিথ্যা বলেছিল সে? বাহ্যত অর্ধসত্য হলেও, অভিমানাহত অন্তরের সেই তার সত্যভাষণ। সুতরাং সারেঙের কাছে তার কাজ চাওয়া প্রকারান্তরে একটি আশ্রয় চাওয়া। আশ্রয় খুঁজেছিল বলেই বেতন নিয়ে তার মাথা-ব্যথা ছিল না। সারেঙের ব্যক্তিগত চাকর হিসাবে সে রাজি হয়েছিল বাসন-মাজা, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, রাঁধা-বাড়া এইসব কাজ করতে।

নদীতে ভাসা নাসিমের পুরানো স্বপ্ন। কিন্তু বুকের ভিতর অসহ ব্যাথা নিয়ে সেই স্বপ্নে এসে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই আচ্ছন্ন আহ্লাদ তার আহত হল। একটা কাচের বাসন ভেঙে প্রথম দিনই সারেঙের হাতে প্রচন্ড মার খেল সে। বাপ মরা, মা-হারানো, অসহায় ছেলেটাকে ঝর ঝর করে কাঁদতে হল নীরবে। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে সহকর্মীদের কাছে শুনে এবং নিজে চাক্ষুষ দেখে নাসিম জেনে গেল নদীবক্ষে ভাসমান এ স্টিমার-রাজ্যের ইজারাদার সারেঙ স্বৈরাচারী।

এ সময়ে মনে মনে গহরালির সঙ্গে সারেঙের তুলনা করা নাসিমের পক্ষে একান্ত অনিবার্য ছিল, লেখক তা করেন নি, কিন্তু নাসিমের মনকে ভরে যেতে দেখিয়েছেন নির্বেদে—'নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনো একলাটি এসে বসে নাসিম। ...বাড়ি ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে কোথায় তার বাড়ি-ঘর! তাঁর বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মুখ। মনে করে, তার মা নেই। তার মা কবে মরে গেছে।"

নদীর জীবন সম্পর্কে তার পুরানো যে স্বপ্ন ছিল তারও রঙ চটে যায় দ্রুত। একদিন পর পর একই পথে যাতায়াত করে স্টিমারটি, কোথাও কোনো নতুনত্ব নেই, আসা-যাওয়ার সময়টারই শুধু যা-হয় হের ফের; নইলে সেই একই জলের শব্দ, যাত্রীর ভীড়, নোঙর ওঠা নামার হড়হড়ানি, সিঁড়ি-কাছি ফেলার চিৎকার-হাঁকাহাকি। নাসিমের ভালো লাগে না। 'নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না' সে, দূর-বিদূরের মধ্যে দিয়ে নদীর সমুদ্রগমনের ছবি অলক্ষ্যে তার মন থেকে মুছে কখন মিলিয়ে যায়।

চার

অন্তরে-বাইরে অনিকেত যে, জীবন তার সতত উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতে। যে নাসিম চুরিকে ঘৃণা করত, বার্জ থেকে চাল, লবণ, পেঁয়াজ, মরিচ গোপন পথে স্টিমারের স্টোর রুমে চলে আসাকে ভালো চোখে যে দেখত না, কিছুদিনের মধ্যেই সে চুরি করতে শুরু করল। মাছ নিয়ে, দুধ নিয়ে, শশা-খিরা নিয়ে বেচনদারকে পয়সা কম দিয়ে বা না দিয়ে সে মজা পেল। তারপর একদিন এক যাত্রীর জুতো চুরি করে আনল, আরেক দিন আনল একটা টিনের বাক্স, আরেক দিন আনল টাকার পুঁটলি। কিন্তু লক্ষনীয়, চুরির মাল সে নিজে আত্মসাৎ করে না, এনে দেয় সারেঙের হাতে। সারেঙের মন পাওয়ার জন্যে স্টিমারের সবাই যে হীন প্রতিযোগিতা চালায়, নাসিমও তার একজন বনে যায়। সবার ভীড়ে নিজেকে হারাতে চায় সে। তার সব গেছে, নিজত্বটুকুও যাক। নিজত্ব বিলোপের এই উৎসাহেই সবার মতো সারেঙের হাতে মার খেয়ে সে মকবুলদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। কিন্তু এ তার কৃত্রিম চেষ্টা, কারণ প্রকৃতিতেই সে সবার থেকে আলাদা। সবাই সারেঙকে খুশি করতে চায় সারেঙ হওয়ার স্বপ্নে সফল হতে। নাসিমের সে স্বপ্ন নেই। তবু যে সে সারঙকে খুশি করতে সদাসতর্ক থাকে, চুরি করে, তা লুঙি বা হাফশার্ট পেয়েছে বলে বা আরো কিছু পাওয়ার আশায় নয়, নিজেরই অগোচরে সারেঙকে সে ভালোবাসে বলে। সারেঙ বদমেজাজি, কথা-বেকথায় লাথি-চড় লাগাতে বেপরোয়া, ঠকাতে বা চুরির মাল নিতে দ্বিধাহীন, আরো আছে নানা বদগুণ, তবু এসব ছাপিয়ে এক কঠোর পৌরুষ রয়েছে তার, যার আকর্ষণ নাসিমকে টানে, ভালোবাসায়, নির্বেদ থেকে তুলে আনে, স্টিমার থেকে যেতে দেয় না কোথাও।

গহরালি এবং সারেঙ, দুজনেই পিটিয়েছে নাসিমকে। নাসিম গহরালিকে সহ্য করেনি, অথচ জীবনের মাঝে স্বীকার করেছে সারেঙকে। কেন?—কারণ গহরালি পেটানোর চেয়ে বেশি সর্বনাশ করেছে তার মাকে কেড়ে নিয়ে, যে মা ছিল তার জীবনের অবশিষ্ট আশ্রয়, অন্যদিকে সারেঙ পেটালেও—পেটানোর আগেই তাকে আশ্রয় দিয়েছে। শত রূঢ় ব্যবহারের মধ্যেও ক্রমে সে সারেঙের চোখে এমন ঈশারা পেয়েছে যা একটা স্নেহবসতের ব্যঞ্জনা। ক্রমে সারেঙ যখন তাকে মারধর করা কমিয়ে দেয় তখন ঐ ব্যঞ্জনাটা স্পষ্ট হয়ে আসে নাসিমের অনুভবে। নাসিম তাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসাই উচ্চারিত স্নেহস্পর্শে কান্না হয়ে ঝরে সেদিন, যেদিন ভীড় জাহাজে নবীনা দুলহিনের গলা থেকে হার চুরি করে বেদম মার খায় নাসিম। মারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে আচকান গায়ে কিস্তি টুপি মাথায় চটি পায়ে সারেঙ হুইল থেকে নেমে এসে গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করে 'কে মারছে আমার ছেলেকে?'—ভীড়কে সে এটাও বলেছিল—'ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান।' এ তার মিথ্যা কথা, কিন্তু এ মিথ্যাচারে নদীবক্ষের রাজ্যে নাসিম পেল একটা নতুন পরিচয়, তার চেয়েও বড় কথা, ফিরে পেল তার হারানো পিতৃস্নেহ।

স্টিমারে সহকর্মীরা সবাই দেখল সিঁড়ি ধরার আদেশ পেয়ে নাসিমের দীক্ষা হল, এরপর সে ধরবে পাটাতন, তারপর হবে শুখানি, তারপর একেবারে সারেঙ, কাপ্তেন জাহাজ-নাখোদা। সবাই ভাবল, মার খেয়েই ভাগ্য খুলে গেল তার। বস্তুত ভাগ্য তার খুলতই, কারণ

সারেঙ স্নেহাপন্ন হয়েছিল তার প্রতি, মার খেয়ে সেটা ত্বরান্বিত হল। কিন্তু এসব নিয়ে একটুও ভাবেনি নাসিম, সারেঙের স্নেহেই সে ধন্য। তাই নিকার দুলহিন গোলাবানুকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে সে মায়ের মরা মুখ দেখেছে ঘোলাটে জলের ছায়ায়, আর উপরে দাঁড়িয়ে বাহবা হাঁকা সারেঙকে দেখেছে 'দিনরাত করে যে সুয্যি, যেন তার মতো চেহারা।'

পাঁচ

সারা গল্পটি এগিয়েছে নাসিমের মনোলোক এবং জীবন-আবহের পথে, অথচ গল্পের নাম—লেখক দিয়েছেন 'সারেঙ'। সুতরাং এ গল্পের নামকরণের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। বিশেষতঃ যখন দেখি সারেঙের অন্তর্বিবর্তনের স্তর পরম্পরা নাসিমের অনুমান সাপেক্ষে আভাসিত—লেখকের ইশারায় একবার একটু আভাসিত হলেও যথোচিত গুরুত্বে অনুন্মোচিত। ঠিক বটে যে সারেঙের অন্তর্বিবর্তন ক্রমান্বয়ে বিবৃত হলে গল্পের নাটকীয় আবেদন ক্ষুণ্ণ হত, পেরিপেটির ঢঙে গল্পের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিয়ে 'সারেঙ' যে পরিণতিকে ধরে দিয়েছে—সম্ভব হত না তাও, হয়ত বজায় থাকত না সারেঙ চরিত্রের রহস্যময়তাও, তবু রূঢ়, বদমেজাজি, আত্মপর সারেঙ কেন ও কিভাবে নাসিমের প্রতি এমন স্নেহাকৃষ্ট হল, গল্পে তার স্থির বিবৃতি না-হোক ক্রমিক সংকেত থাকা একান্ত জরুরি ছিল। লেখক সেদিকে খেয়াল করেন নি বলে এ গল্পে শিল্প-ন্যায় কিছুটা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছেই তা অস্বীকার করা যাবে না।

তা হলেও, অর্থাৎ সারেঙের অন্তর্বিবর্তন বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলেও, সারেঙই এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাসিমের জীবন বৃত্তান্ত তারই প্রকাশ-পট। নাসিমের দেখা দিয়েই তাকে দেখি আমরা, বুঝি নাসিমের অনুভবের মধ্য দিয়ে। নাসিম পর্যবেক্ষণী, পর্যবেক্ষ্য হল সারেঙ। নাসিমের, সেই সঙ্গে স্টিমারের আর সবার প্রাত্যহিক আচার-আচরণ ও মনোগতি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে সারেঙের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; গল্পের পরিণতিও তার সক্রিয় আত্মাভিযোজনার ফল। সুতরাং গল্পের সে অবিসংবাদী নায়ক এবং সেক্ষেত্রে তার নামে গল্পের নামকরণও শিল্পসম্মত।

ছয়

গল্পে প্রধান চরিত্র দুটি—নাসিম ও সারেঙ। মকবুল, আফসার উদ্দিন ইত্যাদি স্টিমারে কাজ করা আর যাদের নাম শুনি বা প্রত্যক্ষ করি কোনো আচরণে, তারা কেউই চরিত্রবৈয়ব পায়নি, পাওয়া জরুরিও নয়। গহরালির চারিত্র্য স্বরূপ এবং মনোলোকের একটা প্রায় পূর্ণায়ত ধারণা লেখক দিতে পেরেছেন অল্প কিছু কথা খরচ করেই। গোলাবানুর সঙ্গে নিকা বসানোর আগেই তার সাংসারিক ব্যাপারে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ কিম্বা গোলাবানুর আগের পক্ষের ছেলেকে শাসন-ত্রাসন যেভাবে সে করেছে, কিম্বা জাহাজে হার-চোর হিসাবে ধরে নাসিমকে যে-ভাবে সে পিটিয়েছে তাতে তাকে ষণ্ডামার্কা গ্রাম্যপুরুষ বলে মনে হয়। অনুমান, তার নিকা-বসানো নতুন সংসারে নাসিমকে সে অনভিপ্রেত মনে করেছিল, আর জাহাজে চোর ধরে তাকে বেশি পিটিয়েছিল নবীনা দুলহিনের কাছে বাহাদুরি দেখানোর লোভে, অথবা ধর্ষামি তার প্রকৃতিগত।

—এ হেন গহরালিকে যে নারী ভালোবেসেছিল তার রুচিকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই,

এ জীবনের টান। নবীন দুলহিন রূপে গোলাবানুকে বেমানান মনে হয়নি, অথবা গহরালির মতো লোক যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার থেকে অনুমান করা যায় তার বয়স বেশি নয়। নাসিমের বয়স দশ-বারো,- সেক্ষেত্রে গোলাবানুর বয়স ত্রিশের আশে-পাশে হওয়া সম্ভব। যৌবনে ঢল নামা এ বয়সে গোলাবানু গহরালির প্রেমে পড়েছে হয়তো তার ধর্ষকামী পৌরুষের টানেই, হয়তো তার জীবনের প্রথম পুরুষ—নাসিমের বাপ অপত্যের টানে—আর্থ সমস্যার চাপে শেষের দিকে কিছুটা নিস্তেজ হয়েছিল। সে-সব নিয়ে অবশ্য গোলাবানুর কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা অনুভাবনা গল্পে ধরা পড়েনি, পড়া-জরুরিও ছিল না। গল্পে তার যে-দিকটা লেখক ব্যবহার করেছেন সেটা তার মাতৃত্বের দিক। মায়ের প্রতি নাসিমের অতিতীব্র অভিমানের কারণে সতত মনে হয় গোলবানু বুঝি মাতৃত্বকে অবজ্ঞা করেছিল নির্দ্বিধায়, তা কিন্তু নয়। আর পাঁচজন নারীর মতো—বৈধব্য দশায় প্রেমে পড়ে ও বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবার সময় সেও তার পত্নীত্ব এবং মাতৃত্বের স্বাভাবিক সমীকরণই চেয়েছিল। নাসিমকে ত্যাগ করে সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নি, নতুন সংসারের মাঝে প্রথম সন্তানকে গ্রহণের ব্যবস্থাই সে করেছিল; সেটা সম্ভব হয়নি গহরালির উগ্রতায় এবং নাসিমের বিদ্রোহে। হবু স্বামী এবং প্রথম সন্তানকে মেলাতে না পারার জন্য যন্ত্রণা গোলবানুর মনে ছিলই। হবু স্বামীকে সে ত্যাগ করতে পারেনি, বিয়ে করেছে, আবার সন্তানের প্রতিও স্নেহশূন্য হতে পারেনি; জাহাজে মিথ্যা ভাষণে মারের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে। সন্তানের যে পরিণতি সে চাক্ষুষ করেছে তাতেই স্টিমার থেকে নামার সময় পা টলমল করেছে তার। আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, মাতৃত্ব, পত্নীর তথা রক্তমাংসের টান—এই নানামুখী টানাপোড়েনের মিতবাণী শিল্পায়ন গোলবানু—লেখকের প্রশংসনীয় সৃষ্টি।

কিন্তু এতখানি প্রশংসা করা যাবে না সারেঙ চরিত্রায়নের। তার চারিত্রের বিকাশ নাটকীয়তার পথে, কিন্তু সে নাটকীয়তাকে বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তুলতে পারেন নি লেখক। সারেঙের গল্পের অধিকাংশ স্থান জুড়ে দেখেছি—সে রূঢ়, অধস্তনদের কথা-বেকথায় লাথি-চড় মারতে সে কসুর করেনা, জিনিসপত্র ক্ষতি করলে বেতন থেকে মাইনে কাটে, টাকা ধার দিয়ে সুদ নেয়, বার্জের মাল চোরাপথে স্টিমারের স্টোর রুমে ঢোকায়, মাছওয়ালা, দুধওয়ালাকে ঠকাতে পারলে হাসে, দশ-বারো বছরের ছেলে নাসিমকে পেটভাতায় বেগার খাটায়, যাত্রীদের চুরি করলে শাসনের বদলে প্রশ্রয় দেয়। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়েই সে জাহাজ-রাজ্যে চালায় স্বৈরাচারিতা। এ হেন মানুষেরই মনে নাসিমের জন্য স্নেহ জন্ম নিল। মকবুল বা আর কারো জন্য নেয়নি, নাসিমের জন্য কেন নিল? কিভাবে নিল? এবং সে স্নেহ গভীর অপত্যে পৌঁছালো কবে? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর লেখক দেন নি তাঁর গল্পে। দেওয়া জরুরি ছিল। যদি ধরি, নাসিমকে মাতৃ-পিতৃহীন অসহায় জেনেই সে স্নেহাপন্ন হয়েছিল, তবে সেটাও স্পষ্ট করে জানানো দরকার ছিল। নাসিমকে তার লুঙ্গি বা হাফশার্ট কিনে দেওয়া কিম্বা তাকে মারধর কমানো কিম্বা তার প্রতি চোখের ভাষা পাল্টে যাওয়া সারেঙের ভালোবাসার ইশারাবাহী, মানছি, কিন্তু সে ভালোবাসা জন্ম নিল কবে ও কিভাবে?—এ প্রশ্নের উত্তর নেই। তার পক্ষ নিয়ে দুলহিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিল; দুলহিনটা যে নাসিমেরই মা তা তার জানা ছিল না। তাহলে চোরকে নিরপরাধ প্রমাণ

করতে সে গেল কোন সাহসে?—গল্প পরিকল্পনার এ আরেক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। এই ত্রুটি সারেঙ চরিত্রকেও দুর্বল করেছে। সবে মিলিয়ে সারেঙ চরিত্রের যে মহিমময় উপস্থাপনা লেখক করতে চেয়েছেন, শৈল্পিক দৃষ্টিতে তা তেমন মহিমময় হয় নি।

সে তুলনায় নাসিমের চরিত্রায়ন মহিমময়। গহরালিকে নতুন পিতা হিসাবে মানতে না পারা, তার রূঢ় নির্দয় আচরণের তুলনায় বাপজানের স্নেহশীতল স্মৃতিচারণ কিম্বা রক্ষাকর্তা হিসাবে বাপজানের কথা মনে করা, গহরালির সঙ্গে মায়ের নিকা বসানোর সিদ্ধান্তকে মানতে না পেরে অভিমানে ঘর ছাড়া—তার পক্ষে স্বাভাবিক।—পানির জীবন তাকে আগে থেকেই টানতো, তাই স্টিমারে এসে কাজ খোঁজা, সারেঙের মন পুষিয়ে কাজ করা এবং তার ক্ষমতা ও রূঢ় পৌরুষের অন্তরালে স্নেহের ইশারা পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া—এসবও তার চারিত্র্যসংহতির মধ্যেই সমায়োচিত। চরম বিপদের মধ্যে পিতার ভূমিকায় সারেঙের আবির্ভাবে তার চোখে যে আনন্দাশ্রু উদ্‌গত হয়েছিল তাও একান্ত স্বাভাবিক। পিতাকে হারিয়ে তার জীবনের গল্পকথার শুরু, নতুন রূপে পিতাকে ফিরে পাওয়ায় গল্পের শেষে। তাকে সিঁড়ি ধরতে দেওয়া হল কি হল না, তা এতবাহ্য। যে সুয্যি রাতকে দিন করে সারেঙকে তার সেই সুয্যি মনে হয় তার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আলোয় উত্তরণের অভিজ্ঞতায়। বস্তুতঃ গল্পটিকে ধরে রেখেছে নাসিমের প্রশংসনীয় চরিত্রায়ণ।

সাত

আমাদের ধারণা গল্প-শিল্প-সাধনায় প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি আয়োজন ছিল অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে। 'সারেঙে'-কে অবলম্বন করেও তার কিছু সংকেত পাওয়া যেতে পারে।

বিষয়কে কিভাবে উপস্থাপনা করলে তা শিল্পসম্মত এবং যথার্থ মনোগ্রাহী হবে তা নিয়ে ভাবতেন অচিন্ত্যকুমার। একটা রগচটা, রূঢ়, ব্যহত ভয়ঙ্কর ও সদসৎগুণে মিশ্রিত মানুষ, যে-কখনো স্নেহ-মায়া-দয়া-দাক্ষিণ্যের ধার ধারেনি, একটা নিরাশ্রয় কিশোরের অসহায় আনুগত্যে কি করে তার মধ্যে উৎসারিত হতে পারে অমল অপত্য—এটাই 'সারেঙ-এর অন্বীক্ষা। এ-কাজের শিল্প-দায় পালনে অচিন্ত্যকুমার গল্পের প্রথমেই হাজির করেছেন কিশোরটি কেন ও কিভাবে অসহায় হয়ে পড়েছে তার বস্তুনিষ্ঠ বৃত্তান্ত। বুকের ভিতরে যে ব্যথা নিয়ে নাসিম স্টিমারে এসে উঠেছে, সেই ব্যথা তার আচার-আচরণ, অবসাদ, হাসি বা চাঞ্চল্যকে কারুণ্যের টানে বেঁধে রেখেছে আগাগোড়া, এবং এই কারুণ্যই ভিতর থেকে টেনেছে দুর্মদ সারেঙকেও, যদিও পাঠক নাসিমের যে ব্যথিত অতীতকে জানে, সারেঙ তা জানে না। সারেঙ জানে তার বাপ-মা কেউ নেই, সে নিরাশ্রয়। এটাই সারেঙের নব-সংবেদনার প্রথম উৎস। লেখক গল্পের শুরুতেই নাসিমের বিমূঢ় বিপন্নতা সম্পর্কে অবহিত করে তার প্রতি যে সংবেদনা জাগিয়ে দিয়েছেন পাঠকের মনে তারই আলোয় পাঠক অনুভব করে সারেঙের অন্তঃস্থল ও পিতৃত্ব জাগরণের হেতু। স্টিমার জগতের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের ভালোমন্দ মেশানো জীবনধারা ও পরিবেশ সম্পর্কে যেমন স্পষ্ট ধারণা দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তেমনি সম্ভব হয়েছে সারেঙের খর মেজাজের ভয়ঙ্করতা স্পষ্ট করা। এটাও অত্যন্ত জরুরি ছিল গল্পের, কারণ সারেঙের ভয়ঙ্করতা যত দুর্দম হবে, তার পিতৃত্বের জাগরণ ও ঘোষণার মুহূর্তটিও হবে তত নাটকীয়। লেখক এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত

সচেতন। সুতরাং উপস্থাপ্য কথাবস্তুকে কৌশলী শিল্প-বিন্যাসে সাজিয়ে নিতে তিনি যে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ভাষা ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের ইন্দ্রজাল সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাঁর ভাষার পরিচিত আলঙ্কারিকতা এখানে নেই। সৃজনী সাহিত্যের ভাবানুষঙ্গ ভাষায় রক্ষা করার শর্ত সম্পর্কে তিনি আগাগোড়া সতর্ক। গল্পের প্রতিটি চরিত্র মুসলমান, এ কথাটি মনে রেখে তিনি প্রচুর আরবী-পারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন; যেমন—ইলাকা, জুনিরাত, কেরায়া, মুফৎ, বাপজন, চাচা, বেখেয়াল, মোকররী, বিবি, নিকা, ইজারা, তাঁবেদার, সালিস, ফায়সালা, এজাহার, জেব, বরখাস্ত, বরবাদ, গোসল, জখম, গলতি, মর্জি, মাফিক, বেতবিরৎ, দুলহিন, নজদিগ, খেসারৎ, দরজা, বাহবা ইত্যাদি। চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলার জন্য কেবল যে তাদের সংলাপ বা অনুচিন্তায় লেখক মিশিয়েছেন এসব শব্দ, তা নয়, নিজের বর্ণনা-ভাষাতেও মিশিয়েছেন বাতাবরণকে বস্তুতান্ত্রিক রূপ দেবার জন্য। ভাষা-প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে সেট, স্টোররুম, থার্ড, সার্চ-লাইট, স্টিমার, হুইল, প্রমোশন ম্যাজিস্ট্রেট, হুইস্‌ল, লেট, প্যাসেঞ্জার, মাইল, নোটবুক, বোট, ব্রাঞ্চ-লাইন ইত্যাদি ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করেছেন অচিন্ত্যকুমার প্রাঞ্জলতা এবং বস্তুতান্ত্রিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে। আবার, অশিক্ষিতদের মুখে বা ভাবনায় সাট্রিফিকেট, ফারস্ট ক্লাস, ইস্টিশন ইত্যাদি বিকৃত উচ্চারণকেও তুলে দিয়েছেন। জিগ্‌গেস, বিনি-মাইনে, বলা-কওয়া, নিঘ্‌ঘাত, দূর-বিদুর, ছ্যামড়া, খাওন-পিরন, ঢেউ-টিন, ছুটলে, ফক্কা, নিত্যিকর, গা-সাওয়া, সমুদ্দুর, টেক্কাটেক্কি, মসমসিয়ে, চুকলি, হাত-সাফাই ইত্যাদি বাকবন্ধ বা শব্দকে তৎসম-তদ্ভব বা সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে মিশিয়ে গল্পের ভাষায় এক স্বতন্ত্র সূচিমুখ নব্যতা এনেছেন লেখক, —সংলাপগুলিকে রচনা করেছেন চরিত্রের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে। 'সারেঙ শুটকি, দরগা, এই নিয়ে চাঁটগা' কিম্বা 'ধান ডাকাত খাল, এই নিয়ে বরিশাল', 'সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না'. ইত্যাদি প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়, গল্পে যা সৃষ্টি করেছে লোকায়ত আবহাওয়া।

প্রতীক চিত্রকল্প এবং সংকেতের ব্যবহার অচিন্ত্যকুমারে শিল্পসৌকর্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গল্পের শেষে 'উড়ছে তার সাদা আচকান, সাদা দাড়ি'—সারেঙের এ বর্ণনায় 'সাদা' রঙটা প্রতীক; গল্পের শেষ বাক্য 'দিনরাত করে যে সুয্যি, যেন তার মতো চেহারা'-তে 'সুয্যি' উপমান হলেও তার প্রতীকী ব্যঞ্জনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।—উদ্ধৃত প্রথম বাক্যটি একটা চিত্রকল্পও, কিম্বা 'মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না'-ও একটি চিত্রকল্প। 'নদী এত ছোট, তার স্রোত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম'—অংশের নদীটিও স্টিমারের জীবনে নাসিমের হতাশার প্রতীক।—'আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু'—গল্পের একেবারে শেষের দিকের এ বাক্যটিও চিত্রকল্প। দুলহিন বেশে জাহাজ থেকে নামার একটু আগেই হার চুরির পরে-পরেই গোলাবানু চিনেছিল তার ছেলেকে, জাহাজ থেকে নামার সময় তাই তার পা টলছিল। পা কাঁপা বা টলা তার অন্তরের তুমুল আলোড়নের সংকেত। এই সংকেতটি ছাড়া গোলাবানুর অন্তরের আলোড়ন ব্যঞ্জিত করতে আর একটি শব্দও ব্যবহার করেন নি অচিন্ত্যকুমার। সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় তাঁর শিল্পী-প্রত্যয়।

বিন্যাস কলায় সূক্ষ্ম নাটকীয়তা সৃষ্টির দিকেও যত্নবান অচিন্ত্যকুমার। স্টিমারের নাসিম

যার হার চুরি করল সে যে তারই মা, এটা আগে ভাগে ব্যক্ত না করার পেছনে রয়েছে তাঁর নাটকীয়তা সৃষ্টির অভিপ্রায়। তেমনি, নাসিমকে চিনতে পেরেই যে গোলাবানু তার অপরাধ লাঘব করে জবানবন্দি দিয়েছে—এটা শেষ পর্যন্ত ব্যক্ত না-করে এবং পাঠককেই তা বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গোলাবানুর মাতৃহৃদয়ের আলোড়নকে অসীম ব্যঞ্জনায় ধরেছেন লেখক। এটাও অভিনব নাটকীয়তা, কাব্যের কান্তিতে যা আস্তীর্ণ। আবার, হার চুরির অপরাধে বেদম মার খেয়ে যন্ত্রণায় নাসিমের ককিয়ে ওঠার মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে—

"বাবা গো'—নাসিম চিৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তিটুপি মাথায়, চটিপায়ে সারেঙ এসে হাজির। বলে, 'কি হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?"

নাসিমের 'বাবা গো' বলে চিৎকার করার পরেই বাবা হিসাবে সারেঙের আগমন দেখে বোঝা যায় নাসিমের আর্ত পিতৃস্মরণ এক নাটকীয় মুহূর্তের ভূমিকা।—গল্পের একেবারে অন্তিমে নিকা বসানো মাকে দেখার পর—লেখকের বর্ণনায়—নাসিম "ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ। আর উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে।"—এখানে নাটকীয়তা আরো অন্তর্লীন। সারেঙের বাহবা ঠিকভাবে সিঁড়ি তোলার জন্য নয়, যেন আত্মপর মাকে নাসিম কর্তৃক মৃত গণ্য করা বা নস্যাৎ করার জন্যও যেন। এ নাটকীয় ব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে উদ্ধৃত বাক্য দুটিকে পাশাপাশি লেখার ফলে। বাণী-বিন্যাস তাহলে যে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এবং স্থির শিল্পবুদ্ধিতেই করেছেন লেখক, তা অস্বীকার করা যাবে না।

গৃহীত ঘটনার একমুখীনতা, এককত্ব, তার নির্মেদ পরিবেশন, গতি, দীপ্ত, চমৎকারিত্বের ভাস্বর পরিণতি ইত্যাদি ছোটগল্পের আত্মিক দিকগুলিতে যেমন, তেমনি গঠন কৌশলে, বাণীশিল্পে, উপমা ও প্রতীক-চিত্রকল্প-সংকেতের সুমিত ব্যবহারে 'সারেঙ'-এর লেখক ছোটগল্পকার হিসাবে যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—তা স্বীকার করতেই হয়। গল্পটি অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পমালার মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়ের মর্যাদা পেতে পারে।

গার্ডসাহেব : মধ্যবিত্তের জীবনবোধের দলিল

পিয়ালি দে মৈত্র

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'গার্ডসাহেব' গল্পটি। ইতিমধ্যেই 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-'প্রগতি'-র অক্ষরমালায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'গার্ডসাহেব' গল্পে চোখে পড়ে তাঁর আর এক উদ্ভাস।

গল্পটির শুরু থেকেই মধ্যবিত্তের নিতান্ত সাধারণ জীবন-যাপনের দৃশ্যমালার ফাঁক থেকে উঁকি মারতে থাকে তাদের ছোট ছোট স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নভঙ্গের ছবি। রেল-কোম্পানীতে 'গার্ডসাহেব'-এর চাকরি করে নিবারণ। দীর্ঘ দশ বছরের দাম্পত্য-জীবন তার আর লতিকার। বিবাহ-বার্ষিকীতে উৎসবের আয়োজন করা তাদের কাছে বিলাসিতার নামান্তর। এই দম্পতির বিবাহিত জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর একত্রে বসবাস করা সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র সুবিধাজনক বাসস্থানের অভাবে। কারণ স্বল্প বেতনের নিবারণ পৃথক বাসা ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাততে নিতান্ত অপারগ ছিল। তাই—

"প্রথম পাঁচ বছর তারা ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছে—নিবারণ মেসে, লতিকা বাপের বাড়ি, নয়তো বা শ্বশুরবাড়ির কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে। ছ-বছরের মাথায় তারা প্রথম কোয়ার্টার পায়—ইনসাইড কোয়ার্টার। সে-ও দু-কুঠুরিরই আস্তানা—একটার মধ্যে আরেকটা ঘর। এবার, দশ বছরের বার, পাশাপাশি ঘরের কে-টাইপের কোয়ার্টার পেয়েছে। সামান্য একটু ভদ্রতা এসেছে বসবাসে।"

—এই 'সামান্য একটু ভদ্রতা'-কে বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে অসমান্য করে তুলতে চেয়েছিল নিবারণ-লতিকা। "বড় ছোট ঘরে, ছোট জীবনের মধ্যে.....স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধের মধ্যে" নিবারণ যে বসবাস করে, তা সে জানে। তাই রাত-ভোর ডিউটির পর যখন সে দেখছে, বারো ঘণ্টা মামুলি ছুটির সঙ্গে 'আরো কয়েক ঘণ্টা ফাউ' মিলবার সম্ভাবনা, তখন সে বিয়ের দিনকে মনে রেখে কয়েকটি বন্ধু-কে সান্ধ্য চায়ের নিমন্ত্রণ করে। ছোট্ট এই আকাঙ্ক্ষাটি বড় মায়াময় ভঙ্গিতে পরিবেশন করেন গল্পকার—

"বন্ধুরা কিন্তু জানতেও পারে না কেন কি হচ্ছে—শুধু জানবে তারা দুজনে, একটু বা নতুনতরো অর্থে। কিছু ফুল জোগাড় করবে হয়তো। বিশেষ একটি অনুভবের লালিত্যে ফর্সা ও আস্ত একখানা শাড়ি পরবে লতিকা, বিকেলের দিকটা না হয় দাড়ি কামাবে নিবারণ। মুহূর্তের জন্যে হোক্, তবু সব আবার কেমন নতুন মনে হবে, মনে হবে আশ্চর্যের মতো.... কিছু ফুল-পাতা কিনেছিল, কিনেছিল কিছু গন্ধওয়ালা চা, ছোট্ট এক শিশি দামী এসেন্স।"

অথচ সাধ তাদের অপূর্ণই থেকে যায়, স্বপ্ন থেকে যায় অধরা। চাকরির অমোঘ চুক্তির নির্দেশে কল-পিওনের এগিয়ে দেওয়া কল-বুকে সই করে জেনে নিতে হলো আগামী দু-ঘণ্টা পরে স্টেশনে গিয়ে কোন্ মালগাড়ীর গার্ড হিসেবে তাকে রওনা হতে হবে কোন্ ঠিকানায়। বড় দুঃখে লতিকা বলে—"এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষে করাও ভালো।" গল্পকার ঠিকই বলেন—"সেই ছোট ঘরে ছোট হয়ে থাকার হুকুম। একটা নতুন কিছু দেখবার নতুন কিছু বোঝবার থেকে বঞ্চনা।"

মধ্যবিত্ত মানুষ তার একটুকরো মামুলি জীবনকে যে কত ভয়ে, কত নানাবিধ উৎকণ্ঠার ঘেরাটোপ থেকে আগলে রাখতে চায় অজস্র কুসংস্কারের পাকে পাকে, তারও এক নিপুণ ছবি আঁকলেন গল্পকার। লতিকা এই আকস্মিক 'কর্মদণ্ড' থেকে মুক্তি পেতে 'সিক্-রিপোর্ট' পাঠাবার পরামর্শ দেয় নিবারণকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। দু-দুবার মিথ্যে 'সিক-রিপোর্ট' পাঠিয়েছিল নিবারণ। দু-বারই কাকতালীয় ভাবে এই 'মিথ্যে' রিপোর্টের পর 'সত্য' অসুখের মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাদের। প্রথমবার বড় ছেলে অস্তুর হয়েছিল ডবল-নিউমোনিয়া, আরেকবার নিবারণের নিজের রক্ত-আমাশা হয়েছিল। তাই, সংস্কারজনিত ভয়ে লতিকা কথা ফিরিয়ে নেয় দ্রুত। মধ্যবিত্ত জীবনের নানাবিধ সঙ্কটকে সামলাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত কত মিথ্যে, কত ছোট-বড় জুয়াচুরিকে সঙ্গী করতে হয়েছে চলার পথে, কিন্তু তবু 'অসুখের ভয়টা যেন বুক-চেপে ধরা, দমবন্ধ করার মতন।'

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি নিবারণ তার গন্তব্য এবং কাজকর্মের বিশদ বিবরণ বুঝে নেবার তাগিদে স্টেশনে আসে খাদ্য ও পোশাকের প্রস্তুতিসহ। যে 'নতুন'-এর স্বাদ পাবার স্বপ্নে বিভোর ছিল সে, সে সব মিলিয়ে গেছে চাকরির চাকায়। এখন যা রইল তা '.....একই চর্বিতচর্বণ। একই থোড়-বড়ি খাড়া। এতটুকু রহস্য নেই কোথাও। নেই এতটুকু কোথাও নতুনতরো অনুভূতি।'

রহস্যের উন্মোচন কিন্তু ঘটতে থাকে পাঠকের চোখের সামনে। অচিন্ত্যকুমার এক অসামান্য দক্ষতায় পাঠকের হাত ধরে নিয়ে আসেন সরকারি রেল-দপ্তরের নানাবিধ খুঁটিনাটির জগতে। প্রায় শিক্ষকের মতো চিনিয়ে দেন 'গার্ডসাহেব'-দের জীবনের কর্তব্যকর্মের বিস্তারিত বিবরণ। পাঠক জানতে পারে, 'বক্স গোডাউন', 'অয়েল গো ডাউন', 'টেইল ল্যাম্ব', 'সাইড ল্যাম্প' বা 'হ্যাণ্ড সিগনাল ল্যাম্প' কাকে বলে ! জানতে পারে, 'ফ্ল্যাপ ডোর', 'সিল রিভেট', 'জে-টি-আর ফর্ম' কি? শুধু তাই নয়, রেলকর্মীদের জীবনের ন্যায়-অন্যায়বোধের যে ছবি তিনি উপহার দেন, পাঠকের অনুভূতির গভীরতম তলদেশে তা যেন আঘাত করে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক সত্যানন্দ গুহ মন্তব্য করেছেন—"প্রত্যেকটি গল্প অভিজ্ঞতার উষ্ণস্পর্শে জারিত। প্রতিটি চরিত্র বাস্তব ও জীবন্ত বলে মনে হয়।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : শতবর্ষের আলোকে)

গল্পকারের সেই অভিজ্ঞতার আলোয় গল্প-পাঠক দেখতে পান সেই জগৎ, যেখানে মালগাড়ীকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় নানাবিধ কারচুপি ও ঘুষের ব্যবস্থা প্রায় 'অধিকার'বোধের জোরেই রেলকর্মীরা করে চলেছেন। মাল গাড়ীতে যেসব ব্যবসায়ীদের মালপত্র যায়, তাদের সঙ্গে 'টি-টি-ই' ড্রাইভার-দের ব্যবস্থা করা থাকে, যাতে মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে 'ওয়াগান' ভেঙে কিছু মালপত্র সরানো যায়। টাকা এসে যায় ড্রাইভার থেকে শুরু করে ওয়াচম্যান পর্যন্ত, কখনো বা গার্ডের ভাগ্যে জোটে কিছু, কখনো জোটে না। ব্যবসায়ীরা উল্টে রেল-কোম্পানীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী করে। সত্যিই তো, "সর্বাঙ্গে ঘা, ওষুধ লাগাবে কোথা? সুতরাং, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, খেসারত দিয়ে মরো রেল-কোম্পানি।"

আসলে, মধ্যবিত্তের জীবনটাই তো কতকগুলি 'মামুলি কর্মচক্রের' সমষ্টিমাত্র। সেখানে আছে শুধু দিনগত পাপক্ষয়, প্রাণ-ধারণের গ্লানি। তাই, বড় স্বচ্ছন্দে ওয়াগন-ড্রাইভার, ফোরম্যান, পার্শেল-ক্লার্ক, গার্ড সকলেই সংঘবদ্ধ হয়ে ঘটিয়ে চলে 'রাজসূয়' চুরি থেকে 'ছোটখাট' চুরি। এমনকি কিছু না পেলে ল্যাম্পের জন্য বরাদ্দ কেরোসিনের কিছুটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া চলে অনায়াসে। এক অদ্ভুত আত্মকথনের ভঙ্গিতে উঠে আসে সেই ছবি, সেখানে মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্নবিলাসিতাকে আঘাত করে গল্পকার লেখেন—'ঘুষ না পেলেও ঘুষের স্বপ্ন দেখতে মন্দ লাগে না।' নিবারণ তো চেয়েছিল ভালোবাসার স্বপ্নে একটা দিন অত্যন্ত বিভোর হয়ে থাকতে। কিন্তু পারলো কই? পেটের দায়ে মেনে গিয়েছে নিজের ভাগ্যকে। আর তাই—

"দর্পই বলো আর প্রেমই বলো ওসবে আর চোখ পড়ে না, এখন চোখ শুধু বাঁধা মাইনের উপরে কিছু উপরি আয়ের দিকে। একে আর ঘুষ বোলো না, বোলো বক্‌শিস, বোলো অনুগ্রহ।

"কিন্তু আজকের দিনে একটু প্রেমের কথা ভাবলেই বা। স্ত্রীর হাতের অসমাপ্ত মালা না নিয়ে চলে এসেছ তুমি। এখন স্নিগ্ধ মনে তার কথা একটু ভাবা উচিত।

"স্নিগ্ধ মন-টন বড় কথা। ওসব বড় কথা বড় ভাব পাবে না ঘুণাক্ষরে। বরং ভাবা যাক, গাড়ি কখন থামবে কোন্ মাঠের মাঝখানে, আসবে কোন এক মার্চেন্টের লোকজন, মালখালাসির মিলবে কিছু নগদ মুনাফা। তা হলেই প্রেম পরিতৃপ্ত হবে। পেট পরিতৃপ্ত হলেই প্রেম পরিতৃপ্ত।

"গয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিবারণ যদি বলে, আর কিছু নয়, শুধু এই কেরোসিন তেলটুকু এনেছি, তখন কি বলবে লতিকা? বলবে কেরোসিন তেলটুকু গায়ে ঢেলে দেশলাই ধরিয়ে দাও। দিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে এসো।

"সংসারে সর্বত্র এই উপরি-পাওনার জন্যেই ছট্‌ফটানি। মজুর থেকে হুজুর, কেরাণি থেকে কর্ণধার—"

অবশেষে গাড়ী থামে। কিন্তু এবার কোন চুরির ঘটনা ঘটেনি। জানা গেল গাড়ি 'পার্টিং' হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ওয়াগনের 'কাপলিং' ছিঁড়ে গাড়ি দুভাগ হয়ে গেছে। এখন উপায় একটাই। মেট আর জ্যাককে নিয়ে, গাড়ির প্রথম খণ্ডটা নিয়ে এঞ্জিন সমেত ড্রাইভার আগে চলে যাবে। বাকি আধখানা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকবে নিবারণ, যতক্ষণ না 'রিলিফ ইঞ্জিন' আসে।

আর এরপরই শুরু হল এই গল্পের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর অধ্যায়। আতলান্ত অন্ধকারকে নিঃসঙ্গ নিবারণ কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। অচেনা অন্ধকারের গাঢ় রহস্যময়তায় সে ডুবতে থাকে। ক্রমশ তার সমগ্র সত্তা জুড়ে নেমে আসে প্রগাঢ় ভয়ের অনুভূতি। অচিন্ত্যকুমারের কলম তুলি হয়ে এই নিঃসীম আঁধারের যে ছবি আঁকে, তার স্পর্শে পাঠকও কেঁপে ওঠে। নিবারণ ক্রমশ তার ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতাকে অতিক্রম কর মনুষ্যত্ববোধের আলোকিত রাজপথে এসে পৌঁছতে পারে, যে পথ ধরে, তার বর্ণনা একই সঙ্গে রোমান্টিক রহস্যময়তায়, চিত্রকল্পে, রোমাঞ্চকর অনুভবে ঋদ্ধ—

"....সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। তার সংকীর্ণ সংসার থেকে ছিন্ন করে কে নিয়ে এল তাকে এই বিশাল অনুভূতির মাঝখানে। তার ছোট ঘর ছোট উঠোন থেকে অন্তহীন এই অঙ্গনের মুক্তিতে। তার প্রাণধারণের ছোট ছোট চেতনার বিন্দু থেকে মহিমময় মৃত্যুর মুখোমুখি।

"খল-খল-খল-খল শব্দে কে যেন হঠাৎ উচ্চরোলে হেসে উঠল। ভয়ে চমকে উঠে চোখ মেলল নিবারণ। না, ভূত-প্রেত নয়, কাছেই কোথায় একটা পাহাড়ী ঝরণা। বৃষ্টির জল পেয়ে উল্লাস করে উঠেছে। কে জানে, তাকে দেখে যেন খর-খল-হাস্যে বিদ্রুপ করে উঠেছে। ... সে যে এক ক্ষীণপ্রাণ, হীনগতি প্রগল্‌ভ মানুষ তারই প্রতি উপহাস। তার যে একটা ছোট সংসার আছে, ভীরু আশা আর হীন হতাশা দিয়ে তৈরি—তারই প্রতি উদ্ধত ব্যঙ্গ। তার ক্ষুদ্র লোভ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে ক্ষুদ্র ভবিষ্যত চেতনার উপরে কঠিন ভর্ৎসনা।"

হয়তো এই ভর্ৎসনাই নিবারণের অন্তরে জাগিয়ে তোলে সেই অদম্য প্রাণশক্তি, যার জোরে 'সংজ্ঞাহীন, সীমাহীন, শরীরহীন ভয়'-কে সঙ্গী করেও সে জীবনকে স্বাগত জানাতে পারে। যে আধখানা রেলগাড়ি নিয়ে সে অপেক্ষা করছে রিলিফ ইঞ্জিনের, সেই লাইনের ওপর যে কোন সময় এসে পড়তে পারে যে কোন ট্রেন। তাই নিবারণকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে বসাতে হবে পরপর চারটে ডিটোনেটর—যাকে বলে ফগ সিগনাল। আকস্মিক যদি কোন ট্রেন এসে যায় তবে আধমাইল অন্তর অন্তর তিনটে পটকা ফাটবে, ড্রাইভার বুঝে যাবে বিপদ-সঙ্কেত। বেঁচে যাবে দুটো গাড়িই। আর অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ আকাশ বাতাসকে মুখব করে তুলবে না। কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষণে নিবারণের মনে হয়েছে—"..তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, তার স্থিব কোন আশ্রয় নেই, দৃঢ় কোন পরিচয় নেই...এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রমোশন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কথা যা মনে আসছে না শুধু মৃত্যুর কথা মনে আসছে—তার ভয়" পৃথিবীতে একমাত্র সত্য।

কিন্তু এসব কিছু পেরিয়েও নিবারণের মত এক ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অভাবের কাছে মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া এক মামুলি মধ্যবিত্ত সমস্ত গ্লানি আর অন্ধকারকে কাটিয়ে উঠে জীবনকে বাঁচাতে পারে। নিজের জীবন শুধু নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবন। হয়তো বা যে মানবত্বের মহিমাকে সে ভুলতে বসেছিল। তাকেই জাগিয়ে তুলল। বড় মায়াময় এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শব্দমালা গাঁথেন অচিন্ত্যকুমার—

"সমস্ত মৃত্যুর পর এই নবজীবনেব সংকেত সমস্ত ক্ষুদ্র অস্বিত্বের পর এই বিরাট এক সত্তার অনুভব—এইটিই আজকের উপরি পাওনা।

আজকের নয়—অনন্তকালের।"

গল্পের এই শেষাংশে গল্পকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন মহাকালের অমোঘ ও অনিবার্য অস্তিত্বকে। যাকে অতিক্রম করা যায় না, সেই দুর্লঙ্ঘ্য কালচেতনায় ইতি ঘটে গল্পের। গল্পকার 'কল্লোলের কাল' থেকে পরবর্তী সময়ে সে অধ্যাত্মবোধে দীক্ষিত হয়েছেন, তারই এক আভাস এখানে পাওয়া গেল। সেই 'বিরাট এক সত্তা' যার 'দু-হাতে সোনার খঞ্জনী', যাঁর আবির্ভাব ক্ষুদ্র মানবীয় চেতনাকে নব উদ্ভাসে, নবীন সূর্যোদয়ে আলাকিত করে তোলে—গল্পের সমাপ্তিতে তার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন অচিন্ত্যকুমার। এই সত্তার অনুভব

অনন্তকালের 'উপরি-পাওনা বটেই, কারণ এ তো আসলে মানবত্বের জাগরণ, মধ্যবিত্তের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের জাগরণ এ 'সত্তা' মহাকালের নয়, মানুষেরই অন্তর্নিহিত বোধ, অনুভব।

দুই

ছোটগল্পের নির্মাণ শৈলী সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের নিজস্ব মতামত বিষয়ে 'শতগল্প' সংকলনের ভূমিকায় (১৯৬৫) তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন—

"ছোট গল্প লেখবার আগে চাই ছোট গল্পের শেষ, কোথায় সে বাঁক নেবে, কোন্ কোণে।... শেষ না পেলে ছোট গল্পে আমি বসতেই পারবো না। শুধু ঘটনা যথেষ্ট নয়, শুধু চরিত্র যথেষ্ট নয়; চাই আবার সমাপ্তির সম্পূর্ণতা। .....গল্পকে বৃত্ত বলেছি বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত লঘুবৃত্ত। তার বেষ্টনী বক্র, গতি দ্রুত, পরিসর ক্ষীণ, সমাপ্তি তীক্ষ্ণ।.....তারপর সবচেয়ে যা বিস্ময়ের, গল্পের যা শৃঙ্গভাগ, তা হচ্ছে বিস্ময় উৎপাদন।....তবে আমরা কি পেলাম—বাঁক বা বৃত্তরেখা। শেষের প্রতি আরম্ভের শাণিতাগ্র ধাবমানতা, বিস্তারবর্জন বা ভার লাঘব। রসের এককত্ব এবং অপ্রত্যাশিত বিস্ময়সৃষ্টি। এবং সর্বশেষে চাই সেন্স অব ফর্ম বা আকার-চেতনা। এই আকারের পরিমিতি থেকেই রসের সমগ্রতা আসে।"

'গার্ডসাহেব' গল্পটির নির্মিতিতে লেখকের এই বিন্যাস সচেতনতা প্রমাণিত। যে নাটকীয়তায় অচিন্ত্যকুমারের সিদ্ধি, এ গল্পের সূচনাবাক্যটি থেকেই সেই চমক লক্ষণীয়। অসামান্য দক্ষতায় 'বাবু কিতাব!' এই শব্দগুচ্ছের বারংবার ব্যবহারে পাঠকের কৌতূহলী মনের সামনে আস্তে আস্তে মূল ঘটনাক্রমকে নিয়ে আসেন তিনি—

"বাবু, কিতাব'।

ঠিক বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ে। শুনেও শোনে না নিবারণ। ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরে একবার। কিন্তু ও 'ডাক কি ভুল শোনবার?

কল-পিওন আবার হাঁক পাড়ে : 'গার্ডবাবু, কিতাব হ্যায়!'

বই হয়েছে! তার মানে সর্বনাশ হয়েছে।

দুখানা ছোট-ছোট কুঠুরিতে অধস্তন কোয়ার্টার। উনুনে আগুন দিচ্ছে লতিকা। ডাক শুনে সেও আঁতকে ওঠে।

'বাবু কিতাব'!

সমস্ত সংসার শান্তির উপরে উদ্ধত বজ্র।"

পাঠক প্রবেশ করেন মূল ঘটনাস্রোতে। মালগাড়ির এক গার্ডসাহেবের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের পৃথিবীতে। যে 'কিতাব'-এ লেখা আছে 'কোন্ ট্রেন, ইয়ার্ডে কোন লাইনে আছে, কোথায় যেতে হবে এ যাত্রা', সেই 'কিতাব' নির্ধারিত গার্ডসাহেবের জীবনযাপনের এক অংশীদার হয়ে যান পাঠক। তার চোখের সামনে ছবির মত স্পষ্ট হয় ছোট ছোট কুঠুরির অধস্তন কোয়ার্টারে কে টাইপের পাশাপাশি ঘরে পাতা দশ বছরের পুরনো দাম্পত্যকে নবীকরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত এক দম্পতির হতাশার ছবি, মালগাড়ির গার্ডের যাত্রা পূর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি—যে প্রস্তুতির ছবিতে বাদ পড়ে না হাজিরা বইয়ে সই করা থেকে শুরু করে ব্রেক-ভ্যানে গিয়ে ওঠা পর্যন্ত মানুষটির কার্যকলাপ। পাঠকের জানা

হয়ে যায়, মালগাড়ির ড্রাইভারগার্ড জ্যাক-মেট-ফায়ারম্যান-ওয়াচম্যানদের সঙ্গে মার্চেন্টদের নানাবিধ সব ছোটখাটো চুরি থেকে 'রাজসূয় ব্যাপার'-এর মতো 'বড় চুরি'-র নানাবিধ কৃৎ-কৌশল। আর, তারপরই সেই 'অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টি'। এক অতিসাধারণ, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, স্বার্থ-সর্বস্ব রেলের গার্ডের সুগভীর দায়িত্বজ্ঞান, 'কাপলিং' ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যাওয়া ট্রেনের অর্ধাংশ-কে পাহারা দিয়ে রাতের অন্ধকারে একা একা কোয়ার্টার মাইল অন্তর 'ডিটোনেটর' স্থাপন করা এবং সময়ের ধাবমানতার সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব আত্মআবিষ্কার—'এই দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে সে যে একেবারে একা'—এই সত্য আবিষ্কার। আর তখনই এক হিম করা মৃত্যুভয় আচ্ছন্ন করে তাকে। অবশেষে, পুব আকাশে রক্তিম সূর্য নবজীবনের আশ্বাস বহন করে আনে। 'উপরি পাওনা'র স্বপ্ন দেখা গার্ডসাহেব উপলব্ধি করে—

"সমস্ত মৃত্যুর পর এই নবজীবনের সংকেত সমত ক্ষুদ্র অস্তিত্বের পর এই বিরাট এক সত্তার অনুভব—এইটিই আজকের উপরি পাওনা।

আজকের নয় অনন্তকালের।"

—আর এই বিশ্বাসে স্থির হয় গল্পের নায়ক, গল্পকার এবং অনিবার্যভাবেই গল্পের পাঠক-ও। 'ছোট গল্প লেখবার আগে চাই ছোটগল্পের শেষ। কোথায় সে বাঁক নেবে, কোন্ কোণে'—এই উচ্চারণ প্রতিষ্ঠা পায় 'গার্ডসাহেব' গল্পটির শেষ অংশে।

আলংকারিক, চিত্রময়, বর্ণাঢ্য গদ্যের পরিচয় এ গল্পের সর্বত্র উপস্থিত। কখনো বা একইসঙ্গে একাধিক প্রবাদের শৃঙ্খল রচনা করেন তিনি—

"....বলতেই বলে এক পা রেলে এক পা জেলে। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। আর চোকা কড়ি রোখা মাল। হাতে-হাতে দে রে ভাই দাঁতে দাঁতে খাই।"

আবার কখনো শব্দ নিয়ে ব্যঙ্গের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তের সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন তিনি—

"আর যদি-টি-টি-ই হতে পারতে, তবে 'ঝাঁপসেই' ফেঁপে উঠতে নিটোল হয়ে। 'ঝাঁপস' শোনেনি বুঝি। ও একটা মুখচল্‌তি টার্ম—ঝাঁ করে আপোষ করতে হয় বলেই সন্ধি করে ঝাঁপস।"

আছে অসাধারণ কাব্যময়তা। মহাকালের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ। একটু একটু করে জীবনসত্য উন্মোচিত হয় তার চোখের সামনে, অসীমের কাছে ক্রমশ কুঁকড়ে যায় তার ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ সব চরিতার্থতার স্বপ্ন—

"কিসের টানে নেমে পড়ল নিবারণ। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে একবার বুঝে নিতে চাইল চেহারাটা। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে শুধু বিশাল স্তূপ পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। তার সংকীর্ণ সংসার থেকে ছিন্ন করে কে নিয়ে এল তাকে এই বিশাল অনুভূতির মাঝখানে। তার ছোট ঘর ছোট উঠোন থেকে অন্তহীন এই অঙ্গনের মুক্তিতে। তার প্রাণধারণের ছোট ছোট চেতনার বিন্দু থেকে মহিমময় মৃত্যুর মুখোমুখি।

"খল-খল-খল-খল শব্দে কে যেন হঠাৎ উচ্চরোলে হেসে উঠল। ভয়ে চমকে উঠে চোখ মেলল নিবারণ। না, ভূত প্রেত নয়, কাছেই কোথায় একটা পাহাড়ী ঝরণা বৃষ্টির জল পেয়ে

উল্লাস করে উঠেছে। কে জানে তাকে দেখে যেন খর-খল-হাস্যে বিদ্রূপ করে উঠেছে। যে মহা-স্তব্ধতা পুঞ্জিত হয়ে আছে পাহাড়ে-অরণ্যে, তা যেন অমনি এক উপহাসেরই উচ্চস্বর। সে যে এক ক্ষীণপ্রাণ হীনগতি প্রগল্ভ মানুষ তারই প্রতি উপহাস। তার যা একটা ছোট সংসার আছে, ভীরু আশা আর হীন হতাশা দিয়ে তৈরি—তারই প্রতি উদ্ধত ব্যঙ্গ। তার ক্ষুদ্র লোভ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে, ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ চেতনার উপরে কঠিন ভর্ৎসনা।''

'ক্ষুদ্র' শব্দের বারবার ব্যবহার পাঠকের চেতনায় আঘাত করে চলে ক্রমাগত। এমনই উদাহরণ রয়েছে অন্যত্রও। 'ভয়' শব্দটির একাধিকবার প্রয়োগ এবং তারই ফলে তা অনিবার্যভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় পাঠকেব বোধে—

''কিন্তু তার আগেই নিবারণ মরে যাবে। শুদ্ধ আতঙ্কে মরে যাবে। বাঘ-ভালুক-চোর-ডাকত ভূত প্রেতের ভয় নয়। আরেক রকম ভয়। সংজ্ঞাহীন, সীমাহীন, শরীরহীন ভয়। একটা বিরাট চেতনা বিশাল উপস্থিতির ভয়। এই দুশ্ছেদ্য অন্ধকারে সে যে একেবারে একা, তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, তার স্থির কোন আশ্রয় নেই, দৃঢ় কোন পরিচয় নেই তার ভয়। এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘুষ, ক্ষুদ্র প্রমোশন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কথা যে মনে আসছে না—শুধু মৃত্যুর কথা মনে আসছে—তার ভয়।''

সমগ্র গল্পটির নির্মাণ তাই একধারে ঘটনাধারার টানটান বুনোটে, আকস্মিক বাঁক-বদলে, বহুল ইংরেজি শব্দের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অথচ অনায়াস ব্যবহারের সঙ্গে অসামান্য কাব্যময়তায় স্নিগ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ করে পাঠককে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, গল্প এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে। আবার সেই সঙ্গে আধুনিকতার মুখপত্র 'কালিকলম'-এর সম্পাদক রূপে আধুনিকতার প্রবর্তন যেমন করেছেন, তেমন-ই নব্য লেখক সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল যুগের একজন বলিষ্ঠ কবি। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল— 'প্রথমা', 'সাগর থেকে ফেরা', 'অথবা কিন্নর', 'কখনো মেঘ' প্রভৃতি। তবে কবিতা রচনার আগে তিনি ছোটগল্প লেখা শুরু করেছিলেন ১৯২২ সালে প্রবাসী পত্রিকায় 'শুধু কেরানী' এবং 'গোপনচারিণী'-র মধ্য দিয়েই তিনি লেখার জগতে অনুপ্রবেশ করেন। এরপর তিনি 'মিছিল', 'আগামীকাল', 'অমলতাস' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তবে উপন্যাস থেকে তাঁর ছোটগল্পই বেশি বাস্তব এবং জীবন্ত বলে মনে হয়। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখর সঙ্গে একই বলয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মত রোমান্টিক ভাবনা-চিন্তা গ্রাস করেনি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'পাঁক', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা', 'বেনামী বন্দর', 'ধূলি-ধূসর' 'সাগরসঙ্গমে', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'স্টোভ', 'সংসার সীমান্তে' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি গোয়েন্দা গল্প রচনা করেছেন, তার সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র হল পরাশর। আর তাঁর অমর সৃষ্টি ঘনাদা চরিত্র, যা বাংলা কিশোর সাহিত্যকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।

সাগরসঙ্গমে : মানবতার মুক্তিস্নান

মীনাক্ষী সিংহ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র প্রেরণা ও প্রাণবিন্দু। আক্ষরিক অর্থে কল্লোলের লেখক না হলেও তাঁর মধ্যেই সার্থক ধ্বনিত হয়েছিল কল্লোলযুগের সুর। সদ্য জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত এই সব্যসাচী সাহিত্যকার একাধারে কবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক। এই তিনসত্তার মেশামেশি তাঁর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রকে করেছে বিস্তৃততর।

যে কর্মভূমিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকাশ, সেই যুগক্রান্তির যন্ত্রণা থেকেই উৎসারিত তাঁর কবিতা ও ছোটগল্প। তিনি নিজেই বলেছেন যে দুঃখ দেখেছেন, দেখেছেন কদর্যতা, দেখেছেন জীবনের তিলে তিলে ক্ষয়, কিন্তু সেইসঙ্গে খুঁজে পেয়েছেন দুঃখ-উত্তীর্ণ অনুভব, অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণের মুক্তিপথ। প্রলয়তাড়িত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রে অনির্বাণ বাতিঘর তাঁর অনন্য একটি ছোটগল্প—সাগরসঙ্গম-ই আমার প্রতিবেদনের উৎস।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থ 'পুতুল ও প্রতিমা'-তে গল্পটি সংকলিত হ'য়েছিল। মুদ্রিত গ্রন্থের একাধিক সংস্করণে গল্পটির শীর্ষনাম ভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত—'সাগরসংগমে' ও 'সাগরসংগম'। 'নাভানা' প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প প্রথম সংস্করণ-এর সূচিপত্রে শীর্ষনাম ছিল 'সাগরসঙ্গম'। আমরা দে'জ সংস্করণ (২০০৪) অনুসারে 'সাগরসংগম' নাম ও বানানটিই গ্রহণ করেছি। গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলাসাহিত্যে কয়েকটি স্মরণীয় সৃষ্টি আছে, যা 'সাগরসংগম' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে পড়বে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—'সাগরসঙ্গমে'। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দেবতার গ্রাস'-এর প্রেক্ষাপট গঙ্গাসাগর। এই দুটি চিরস্মৃত উপন্যাস ও কবিতার পর কথাসাহিত্যের নবীনধারা ছোটগল্পে গঙ্গাসাগর তার জলধারার তরঙ্গায়িত স্রোতে ভাসিয়ে এনেছে একটি নিটোল মুক্তোবিন্দু—প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'সাগরসংগম'।

শতাব্দী অতিক্রান্ত এক উপন্যাসে দেখেছি গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভ্রমণার্থী নবকুমার নামে এক যুবক তার সাথীদের দ্বারা সাগরসঙ্গমে একাকী বিসর্জিত হয়েছিল।

মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাগরসঙ্গমে যাত্রার অভিলাষে মোক্ষদা নামে বিধবা রমণীর প্রার্থনাও আমাদের শ্রবণে জাগরুক। মাসীর স্নেহাঞ্চলে লালিত বালক রাখাল সেদিন তার মার সঙ্গে সাগরে যাবার জন্য জেদ ধরেছিল। তাকে নিবৃত্ত না করতে পেরে জননী মোক্ষদা বলেছিল—"চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে" সেই অজ্ঞানকৃত শপথ যে দেবতার গ্রাস হ'য়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল বালককে—সাগরসঙ্গমের সেই অকরুণ নিষ্ঠুরতা সমগ্র কবিতাটিকে ঘিরে যেন হাহাকার করে ফেরে।

আধুনিক কালের কথাকার প্রেমেন্দ্র মিত্র-ও তাঁর গল্পে সাগরসঙ্গমে বিসর্জন ঘটিয়েছেন এক অপাপবিদ্ধা বালিকার। অন্ধকারের পঙ্ক থেকে জাত এই কুসুমকলিকা সাগরসঙ্গমে হারিয়ে গেছে।

'দেবতার গ্রাস' কবিতায়, রাখালের আপন জননীর চেয়ে মাসীই ছিল বেশী আপনার জন, কাছের মানুষ—তাই সাগর জলে বিসর্জিত হবার মুখে সে মাসীকেই ডেকেছিল আর্তব্যাকুল স্বরে।

'সাগরসংগম' গল্পে বাতাসি নামের ছোট মেয়েটি তার গর্ভধারিণী মাকে নয়, দুদিনের পাওয়া দাক্ষায়ণীকেই 'মা' বলে ডেকে বাঁচতে চেয়েছে। ছোটগল্প বলেই এতে বর্ণনার ছটা নেই, নেই ঘটনার ঘনঘটা, তাই মৃত্যুকালে বাতাসি 'মা' বলে ডেকে দাক্ষায়ণীর স্নেহাঞ্চল খুঁজেছিল কি না সে প্রশ্ন অনুত্তর থেকে গেছে। শুধু গল্পশেষের বাক্যাংশ এক অনবদ্য মানবিক আবেদনে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—ভেদ-বিভেদের সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে হৃদয়ের কান্না মিশে গেছে সাগর জলের অতলান্ত গভীরে।

গল্পটির সমস্ত অবয়বে এক সহজ ভঙ্গি জড়ানো। এর প্রথম পরিচ্ছেদের মিতভাষণেই পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীর চেহারা স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে। পুণ্য অর্জনে আগ্রহী কিছু মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসে গল্পের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্প আঁচড়ে 'সেথো' লক্ষ্মণের স্বভাবের লোভটুকুও পাঠক জেনে যায়, জেনে যায় দাক্ষায়ণীর পরম নিষ্ঠা ও আচার সর্বস্ব ধর্মপ্রাণতাকে, পরিচয় পেয়ে যায় পতিতাদলের রমণীদের সঙ্গে আসা ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে বাতাসির।

গঙ্গাসাগরের সংগমে পুণ্যস্নানের জন্য সমবেত হ'য়েছে নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-বিধবা ও বেশ্যাপল্লীর নাগরিকারাও। সকলের লক্ষ্য পুণ্য সঞ্চয়। এই আচারনিষ্ঠ ব্রতপালনের যাত্রাপথেও কদর্য কলহর মধ্য দিয়ে গোটা সমাজ যেন বিম্বিত হ'য়ে ওঠে।

গল্পের শুরুতেই একটা বিরোধের ছবি ফুটে ওঠে। নিষ্ঠাবতী গ্রামের বিধবাদের নিয়ে পুণ্যার্থী যে লক্ষ্মণ গঙ্গাসাগর অভিমুখে যাত্রা করেছে, কয়েকটা পয়সার লোভে সে যে পতিতপল্লীর রমণীদের একই নৌকোয় নিয়ে চলেছে—তার ফলেই এই বিরোধ। এবং এর কেন্দ্রে আছে পতিতাদের একটি মেয়ে—আট বছরের বাতাসি।

লেখক কি সচেতনভাবেই এর নামকরণ করেছিলেন? হালকা হাওয়ার মত ভেসে আসা এই মেয়েটি গল্প শেষে বাতাসের মতই মিলিয়ে গেছে। তার প্রথম আবির্ভাবে সে যেন ঝড়ের বাতাস—কচি কণ্ঠে কটু তার মিথ্যা ভাষণ, জন্ম পরিচয় ও পতিতাপল্লীর মালিন্য তার আচারে-আচরণে, ভাব ও ভঙ্গিতে। কিন্তু গল্পের ফুলটি যখন ক্রমেই পাপড়ি মেলতে শুরু করে তখন বাতাসি যেন তার নামের মত হালকা হয়ে ভেসে বেড়ায়, তার মালিন্যের ধুলো সরে গিয়ে সে এক স্নিগ্ধ বাতাসের মত ঘুরে ফেরে।

কাহিনীর শুরুতেই যে কলহ-বিবাদ ও কুৎসিত কটুভাষণের চিত্র, তাতে গঙ্গাসাগর স্নানের পুণ্য অনেকটাই বিঘ্নিত হয়েছে। মানুষের মনের মধ্যে যে পাপপুণ্যের সহাবস্থান তারই বিষামৃতের প্রকাশ রয়েছে গল্পটিতে। শুধু তাই নয় শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিতে যে বৈপরীত্যের আভাস—'assimilation of opposites' -এর প্রকাশ ঘটে, এই ছোট গল্পের সীমিত পরিসরে সেই বিরোধাভাসের অনন্য প্রকাশ। তাই পতিতাপল্লীর যে অকালপক্ক মেয়েটি দাক্ষায়ণীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে 'ধূমসি মাগী' বলে বিকৃত কণ্ঠে গালি দেয়, গল্পের অন্তিমে সেই বালিকা-কণ্ঠই পরম নির্ভয়ে দাক্ষায়ণীকে 'মা' বলে ডেকে তাঁর কোলে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয়। কটু কণ্ঠের অশ্রাব্য গালি থেকে জগতের মধুরতম 'মা' ডাকের এই উত্তরণে সমগ্র গল্পের

মেজাজ বা Mood ধরা পড়ে। পাঠক অনুভব করে সাগরসংগমের ঝোড়ো বাতাসে সমস্ত গ্লানি, মালিন্য, পাপ দূর হ'য়ে এক মৃদু সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই বাতাস মানবিকতার উষ্ণ আবেগদীপ্ত অনুভব, যা কোনো নিয়ম নীতির অপেক্ষা না করে হৃদয়ধর্মকেই বড় করে তোলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি; তাঁর অনেক গল্পেই ভাষার লাবণ্যে ভেঙে গেছে গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান। 'শুধু কেরানি' বা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' যেন গদ্যে লেখা কবিতা হ'য়ে ধরা পড়েছে।

'সাগরসংগম' নিখাদ গদ্যে লেখা অকরুণ বাস্তবের রেখাচিত্র। তবু গল্পের মধ্যপথে ঝড়ের যে আভাস তার মধ্যে লেখকের কবিভাষার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে—

"কুয়াশাচ্ছন্ন তিমিরলিপ্ত রাত্রে তীরতটে কিছু দেখা যায় না, শুধু নৌকার গায়ে গাঙের স্রোতের মৃদু আঘাতের শব্দ শোনা যায়। আকাশ ও জল অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে; তাহারই মাঝে শুধু দূরে দূরে সাগরমুখী চলমান কয়েকটি নৌকার ক্ষীণ আলো দেখিয়া গাঙের সীমা নির্ণয় করা চলে।"

এরপরই প্রবল তরঙ্গাঘাতে যে তরণী নিমজ্জনের ছবি আঁকেন লেখক, তার মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অসামান্য রেখা চিত্রিত হয়। গল্পের পটভূমি যে শান্ত পরিবেশ ছেড়ে উত্তাল ঝড়ের মধ্যে হালভাঙা নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মত ভেসে যাবে এ যেন তারই ইঙ্গিত। এই ঝড়ের মতো মাতনে ছোট গল্পের সীমিত পরিসরে যেন বিশাল উপন্যাসের মহাকাব্যিক বিস্তার ঘটে। প্রকৃতির এই ঝড় অন্তঃপ্রকৃতির ঝড়কেও প্রতীকিত করে। প্রবল বাতাসে যেমন সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে যায়, অন্তরের ঝড়ের মাতনেও ভেঙে যায় সব সংস্কারের দুর্গ। তখনই ভাঙাঘরের রাঙাধূলোয় আমরা ফিরে পাই হারানো রতন।

কিন্তু গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র এত সহজেই দাক্ষায়ণীর হৃদয়ের পরিবর্তন দেখাননি। আশ্চর্য সংযম ও কুশলতায় তিনি স্তর থেকে স্তরে বিন্যস্ত করেছেন দাক্ষায়ণী ও বাতাসির সম্পর্কের স্তরকে। ঝড়ের মাতনে মাঝিদের ভুল ভাবা সম্পর্ককে দাক্ষায়ণী সহজেই মেনে নেননি। আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানা পোড়েনে, স্নেহ ও বীতরাগের দোলাচলে ধীরে ধীরে স্থিত হ'য়েছে তাঁর অন্তর। সংস্কার, নিষ্ঠা ও আচার সর্বস্ব ধর্মবোধের সঙ্গে অক্লান্ত লড়াই করে করে শেষপর্যন্ত মানবিকতারই জয় ঘটেছে। তখন দাক্ষায়ণী এই পতিতাপল্লীর মেয়েটাকে নিয়ে নতুনভাবে বাঁচার জন্য নিজের পরিচিত সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করার মত মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেছেন। সহজাত মাতৃত্বের মমতা দিয়ে সমাজবিধির রক্তচক্ষুর শাসনকে অগ্রাহ্য করার অনমনীয় দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছেন।

তার আগের ক্রান্তিপর্বকে অতি বিশ্বাস্য নিপুণতায় এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মাঝিরা যখন বাতাসি ও তাঁর মা-মেয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত, তখন তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেও মেনে নিতে বাধ্য হ'য়েছেন দাক্ষায়ণী। কিন্তু মনে মনে তাঁর সামাজিক নিষেধের দিকটি জাগ্রত ছিল। কোনোমতে গঙ্গাসাগরে পৌঁছে বাতাসিকে ফেলে পালিয়ে যাবার কথাও তিনি ভেবেছেন। পাশাপাশি লেখক বাতাসি চরিত্রের রূপান্তরও দেখিয়েছেন। প্রথমে ভয়, আশঙ্কা, তিরস্কার, পরে সহাবস্থানের নিরাপদ দূরত্বে সে আশ্রয় পেয়েছে, কখন নিজের

অজানিতেই দাক্ষায়ণীকে 'মা' বলে ডেকেছে। তার নিজের মাকে একবার মাত্র গল্পের প্রথমে দেখা গেছে, কিন্তু প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবে সব হারিয়ে এই ছোট্ট মেয়েটি পিছনের কিছুই খুঁজে ফেরেনি—তার নতুন জীবনে দাক্ষায়ণীই তার অস্তিত্ব ও সত্তা জুড়ে আছেন। পরম নির্ভয়ে সে তাঁর হাতটিকে ধরেছে। পড়ে গিয়ে, জনারণ্যে হারিয়ে গিয়ে আবার তাঁকেই ফিরে পেয়েছে। প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জলমগ্ন বাতাসি যে আঁকড়ে ধরেছিল দাক্ষায়ণীর হাত কোনো ভাবেই তার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়নি। এমনকি গল্পশেষে তার মৃত্যুতেও সে দাক্ষায়ণীর মন থেকে হারিয়ে যায়নি, লিখিত সনদপত্রে দাক্ষায়ণী তাঁর মাতৃত্বের অধিকারকে দিয়েছেন সামাজিক স্বীকৃতি। হারিয়ে গিয়ে একেবারে হৃদয়ের মর্মমূলে রক্তের অক্ষরে সে বাঁধা পড়েছে। বৃদ্ধ মাঝির উক্তি যেন Dramatic Irony-র মত অমোঘ সত্য হ'য়ে দেখা দেয়—"নাড়ীর টান বড়ো টান মাঠাকরুণ, ও কি আর লুকোবার জো আছে?"

তাই দেখি দাক্ষায়ণীর মানস প্রতিরোধ একে একে ভেঙে ফেলেন লেখক। গঙ্গাসাগরের ত্রাণশিবিরে এসেও তিনি ভেবেছেন কিভাবে বাতাসিকে এড়িয়ে দেশে ফিরে যাবেন। যতই মমতা জাগুক, নিষিদ্ধপল্লীর এই বালিকাকে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর শ্বশুরকুলের পবিত্র বংশকে অপবিত্র করতে পারবেন না কিছুতেই। একসময় এও ভেবেছেন পাপের বীজ ধ্বংস হওযাই ভালো—"বাঁচিলে যখন অশেষ দুর্গতি, তখন বাতাসির মরাই ভালো।"

কিন্তু এরপরই লেখক দেখিয়েছেন মেলার বাজার থেকে ফেরার সময় দাক্ষায়ণীর দুই হাত খেলনা ও পুতুলে বোঝাই। তখনই মনে পড়ে যায় 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় মোক্ষদার মর্মভেদী নিস্ফল আর্তি—

"শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা
শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা?"

—তাই সমস্ত সংস্কারের চেয়ে যা পুরাতন, যা সব ধর্মের চেয়ে প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙক্ষার প্লাবনে দাক্ষায়ণীর মনের সব সংকীর্ণ সীমার বেড়া ভেঙে ও ভেসে যায়। তখন বাতাসিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মমতার আশ্রয়ে চিরবন্দী করার দুর্মর বাসনায় দাক্ষায়ণী ছুটে যান হাসপাতালে, যেখানে নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই অসুস্থ বাতাসিকে ভর্তি করতে হয়েছিল।

গল্পের শেষ যেন ঝড়ের পর মৃদু নিস্তরঙ্গ সাগরের প্রসন্ন মূর্তি। ডাক্তার ও স্বেচ্ছাসেবক ছেলেটির কথা দাক্ষায়ণীর কানে যায় না, শুধু অশ্রুত সেই কথা পৌঁছয় তাঁর মর্মে। মৃত বাতাসিকে শেষ দেখার ইচ্ছে তাঁর হয় না, নিঃসীম শূন্যতাকে বুকে নিয়ে নিঃশব্দে তিনি ফিরে চলেন, মনে হয় বাতাসি যেন চুপি চুপি তাঁর পিছু চলেছে, বন্ধনহীন সেই গ্রন্থিকে তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না। একটু আগে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি স্থির করেছিলেন যত লাঞ্ছনা অপবাদ সহ্য করতে হয় হোক তবু বাতাসিকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে একাকী তিনি দেশে ফিরবেন না; তাকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন। এই মুহূর্তে মৃত্যুর হাতে বাতাসিকে সমর্পণ করে যখন তিনি নিমজ্জিত হলেন নৈঃশব্দ্যের অন্ধকার অন্তরালে, তখন তাঁর বিক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়ের ঝড়কে লেখক প্রকাশ করেন নি। মঁপাসার গল্পে যে চমক উদ্যত ফণা সর্পের মত গল্প শেষে পাঠককে তীব্র দংশন করে, তার পরিবর্তে এক মৃদু গুঞ্জন

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ গল্পে ঘুরে ফেরে। মনে পড়ে যায় ছোটগল্পে চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পিত মৃদু প্রশান্তির কথা, যা পাঠককে আবিষ্ট করে, অনন্তকে যেন ছুঁয়ে যায়।

তবু প্রেমেন্দ্র মিত্র শেষের পরেও এক অশেষের ব্যঞ্জনায় গল্পটিকে শেষ করেছেন। সমস্ত সামাজিক নিষেধের বেড়া, আচার নিষ্ঠার প্রাচীর ভেঙে ফেলে গল্পটি মানবিকতার শীর্ষ বিন্দু স্পর্শ করে যখন ডাক্তার দাক্ষায়ণীকে দাহকার্যের নিয়মনীতির কারণে সদ্যমৃতা বাতাসির কুল পরিচয়, পিতৃনাম দিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড়ো বউ দাক্ষায়ণী সমস্ত সংস্কার ভুলে বাতাসিকে সেই বংশের কন্যার পরিচয়ে চিহ্নিত করার জন্য কাগজে তাঁর নাম, তাঁর স্বামীর নাম পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। কলুষিত পতিতাপল্লীর জন্ম পরিচয়ের কলঙ্ক কালিমা থেকে বাতাসিকে দেন ঐতিহ্যবাহী মুখুজ্যে পরিবারের নাম, পিতৃপরিচয় ও উত্তরাধিকারের স্বীকৃত আলোর ঠিকানা।

ছোটগল্পের লক্ষ্য যদি হয় বিষয়ের একমুখিনতা তবে এ গল্পের লক্ষ্য মানবিক মূল্যবোধ যা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। গল্পের শুরুতে পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের দেখা মেলে— দাক্ষায়ণীও পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সাগরসঙ্গমে এসেছেন; পবিত্র মুহূর্তে সাগরসংগমে স্নান করলেই ঘটবে দেহশুদ্ধি, চিত্তমুক্তি।

অন্তিমে দাক্ষায়ণীর সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ কি না তার কোনো উত্তর মেলে না। তবে অনুভবী পাঠকের মনে দাক্ষায়ণীর শুদ্ধ চরিত্রের মলিন মুক্তির অনবদ্য রূপটি ধরা পড়ে। সুপ্রাচীন মুখুজ্জ্যে পরিবারের বড় বউ কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবার যে নিষ্ঠা ও আভিজাত্যের অহংকার দাক্ষায়ণী চরিত্রে প্রথমে দেখেছি - তার নির্মোক ছেড়ে বেরিয়ে আসা এক শুদ্ধ চরিত্রবতী মহিলার দেখা কাহিনী শেষে পাই। দাক্ষায়ণী যেন অনুভব করেন —

"এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হ'বে
হ'বে গো এইবার
আমার এই মলিন অহংকার"

আচার সর্বস্ব ধর্মভাবনা ও কৌলীন্য গৌরবের অহমিকার যিনি পতিতা কন্যার স্পর্শ বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলেন তৎপর, কাহিনীশেষে সাগরসংগমে স্নান আক্ষরিক অর্থেই তাঁর মুক্তি ঘটিয়েছে। এ তাঁর মানসমুক্তি। মানবিকতার তীর্থবারিতে দাক্ষায়ণীর মুক্তিস্নান সার্থক হ'য়ে উঠেছে। সাগরসংগমে পুণ্য স্নানের পবিত্র মহিমায় দাক্ষায়ণীর কাছে পতিতা কন্যা বাতাসি হ'য়ে উঠেছে মুক্তিপথের দূত।

চিত্ত যেদিন জাগে, সেদিনই তো মানস মুক্তি। যতক্ষণ অহংকার ঘিরে থাকে ব্যক্তিকে— ততক্ষণ তার মুক্তি স্নান অসম্পূর্ণ। আমরা জানতেও পারিনা, শুচি বসন পরবো বলে তীর্থস্নান যখন করতে যাই তখন মানসমুকুল বিকশিত না হলে তীর্থবারি হৃদয় থেকে দূরেই থেকেই যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্নান সমাপন'(পুনশ্চ) কবিতায় দেখিয়েছেন গুরু রামানন্দ অচ্ছুৎপল্লীতে গিয়ে অস্পৃশ্য চামারকে বুকে তুলে নিয়ে বলেছেন—

"স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে
তাই যিনি সবাইকে দেন. ধৌত করে

তাঁর সঙ্গে মনের মিল হ'ল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপাবন ধারা"

প্রেমমন্ত্রের সোচ্চার ঘোষণা না করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'সাগরসংগম' গল্পে সহজ মানবিক বোধে হৃদয়াবেগের অনুভবে বিশ্বপাবন ধারার সেই মুক্তিস্নানকেই প্রতীকিত করেছেন।

গল্পের নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণ ভেদে কখনো 'সাগরসংগম' ও কখনো 'সাগরসংগমে' নামে এটি চিহ্নিত। দুটি অভিধাই তাৎপর্যবাহী।

'সাগরসংগমে'-স্থানিক পরিচয়কে চিহ্নিত করে। এটি ঘটনার পটভূমি। গঙ্গাসাগর যাত্রাকালে সাগরসংগমে যে ঘটনা ঘটেছে তারই বিবৃতি এই কাহিনী। এই সাগরসংগমেই বাতাসি দাক্ষায়ণীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দূরত্ব থেকে কন্যাস্নেহে উত্তীর্ণ হ'য়ে শেষে মৃত্যুসংগমে বিসর্জিত হ'য়েছে। সমস্ত ঘটনাবর্তের পটভূমি গঙ্গাসাগর। তাই দাক্ষায়ণী বা বাতাসির নামে নামকরণ না করে লেখক স্থানিক পরিচয় রেখেছেন নামকরণে। দাক্ষায়ণীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ এ গল্পের প্রাণ তাই তাঁর নামে নামকরণ হ'তে পারতো। কিন্তু লেখক গল্পনামে চরিত্র প্রাধান্যর চেয়ে ব্যঞ্জনাকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন মনে হয়। সেক্ষেত্রে 'সাগরসংগম' নামটি অসামান্য তাৎপর্যে ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে উঠেছে।

নদী এসে সাগরে মেশে। উৎস থেকে উৎসারিত নদী পর্বতগাত্রে ঝর্নারূপে নির্গমিত হ'য়ে পরে উপলব্যথিত গতিতে জনপদ দিয়ে ভেসে চলে। তখন তার কলহাস্য মুখরিত স্রোতোধারার সহর্ষ চাঞ্চল্য। কিন্তু যখন সে সাগরসংগমে এসে মেশে তখন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে অতলান্ত গভীরে তার পরম আশ্রয়। সেখানে সমস্ত উচ্ছলতা, গ্লানি, চাঞ্চল্য বিরোধের শেষে মমতার অতলান্ত সমুদ্রে মানবসত্তার নিমজ্জন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এ গল্প মানবিকতার সেই সাগরসংগম।

মহানগর : নাগরিক কথা

রতনকুমার নন্দী

'মহানগর' গল্পটি ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মহানগর' নামে ছোটগল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গল্পটি প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শ্রেষ্ঠ গল্পসম্ভারের অন্যতম। লেখক তাঁর কবিসত্তাকে সমন্বিত করে রচনা করেছেন এই ছোটগল্প, যার মধ্যে রয়েছে একটা লিরিক কবিতার আমেজ। 'মহানগর' গল্পের বিষয়বস্তু এক ছোট্ট বালকের মহানগরে হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজে বের করবার কাহিনী। বিষয়টিকে অন্যভাবে বলাই বোধ হয় সঙ্গত। অর্থাৎ এক গ্রামের মেয়ে, এক গ্রামের গৃহবধূ কিভাবে তার স্বস্থান থেকে চ্যুত হয়ে মহানগরের এক অন্ধ গলিতে হতভাগ্য রমণীদের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল তারই বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্তকে তুলে ধরা হয়েছে এক বালকের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বালকের চোখে দেখানো হলেও, আসলে গল্পটি জীবনের জটিলতার গল্প, পরিণত বোধের গল্প।

আষাঢ় মাসের ভোরবেলা। বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জোয়ারের টানে নৌকা ভেসে চলেছে। ছই-এর ভেতরে মাঝিরা একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হালে বসে আছে মুকুন্দ। তার কাছে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছে রতন, মুকুন্দের ছেলে। সে ভয়ে ভয়ে এসে বসেছে হালের কাছে। তার আশঙ্কা বাবা হয়ত ধমকে তাকে ছই-এর ভেতরে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু রতনের ভেতরে থাকা সম্ভব নয়, কারণ নৌকা পেয়েছে মহানগরের নাগাল। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে আনতে চায়নি। নৌকায় এতটা পথ যাওয়া সোজা কথা নয়। শহরে গিয়ে রতনের কিছু করারও নেই। তবুও রতন বাবাকে রাজি করিয়ে শহরে এসেছে; শর্ত একটাই, দুষ্টুমি ও বিরক্ত করা চলবে না। সব শর্তই সে মেনে নিয়েছে, কারণ সে শহর দেখতে চায়—"রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর"।

অবশ্য, শুধু শহর দেখার ব্যাকুলতাই রতনকে শহরে টেনে আনে নি। রতনদের নৌকা নদীর বাঁক ঘুরে পোনাঘাটে এসে পৌঁছয়। সকলে যখন পোনার হাঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত, তখন রতন বসে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। নোঙর করার পর রতন নৌকা থেকে নেমে যায়। পিতা মুকুন্দ প্রথমে ধমক দিলেও শেষ পর্যন্ত রতনকে পাড়ে নামার অনুমতি দেয় এবং বলে—"কোথাও যাসনি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা!" কিন্তু রতন কদমতলায় বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কাকুতি-মিনতি করে সে শহরে আসে নি। তার উদ্দেশ্য উল্টোডিঙি যাওয়া। লক্ষ্মণের কাছে জানতে চেয়েছিল উল্টোডিঙি কি পোনাঘাটের কাছে? লক্ষ্মণ উত্তর দিয়েছিল উল্টোডিঙি অনেকটাই দূরে। রতন চাপা ছেলে। সে পেটের কথা বের করে না। তাই কেন সে উল্টোডিঙির খোঁজ করছে সেকথা লক্ষ্মণের কাছে গোপন রাখে।

একসময় কাউকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। পথে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে সে উল্টোডিঙির পথের নিশানা পায়। সে উল্টোডিঙি যাচ্ছে তার দিদিকে খুঁজতে।

রতনের কাছে শহর মানেই তার দিদি। সে খুঁজতে এসেছে নিজের তাগিদেই। বাড়িতে দিদির নাম করাও মানা। ছোটবেলায় সে মাকে হারিয়েছে। দিদিই তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ের পর দিদি যখন শ্বশুরবাড়ি গেল, তখনও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কাছাকাছি দুটি গাঁ। রতন যখন তখন পালিয়ে গিয়ে দিদির কাছে হাজির হত। দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা হত না। কেন যে দিদির কাছে বেশিদিন থাকা যায় না, কেন তা দোষের একথা রতন বুঝতে পারত না। তারপর একদিন তাদের বাড়িতে গণ্ডগোলের সূচনা হল। সেদিন তার দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছিল, থানা থেকে চৌকিদারও এসেছিল। সে শুনতে পেল দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেমানুষ বলে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এ সংবাদে রতন খুব কেঁদেছিল। রতন বুঝেছিল বাবা তার কাছে কিছু লুকোতে চায়। কি লুকোতে চায়, কেন লুকোতে চায় তা সে বুঝতে পারে না।

এরপর একদিন খবর পেল দিদিকে পাওয়া গেছে। দিনের পর দিন পার হয়ে গেলেও দিদি আসে না, কেন আসে না সে বুঝতে পারে না। তখন তার রাগ হয়। একদিন সে সকালে দিদির শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়। সেখানে দিদি নেই। কেউ তার সঙ্গে ভালো করে কথাবার্তাও বলে নি। তাই সে বাড়ি ফিরে আসে। বাবার কাছে দিদিকে ফিরিয়ে আনার কথা বলে সে ধমক খেয়েছে। রতন যদি জানত যে তার দিদি কোথায় আছে, তাহলে সে নিজে গিয়েই তাকে ডেকে আনত। তারপর একদিন কোথা থেকে সে জানতে পারে দিদি থাকে শহরে জায়গার নাম উল্টোডিঙি। তাই তো সে কাকুতি-মিনতি করে মহানগরে এসেছে। সে চলেছে দিদির সন্ধানে। সে দিদিকে খুঁজে বের করবে, ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বাড়িতে।

সেদিন দুপুর গড়িয়ে বেলা যখন বিকেলের দিকে, রতন তখন তার দিদির খোঁজ পায়। একটি মেয়ে তার দিদির সন্ধান দিয়েছে। রতনের দিদির নাম চপলা। সে থাকে একটা মেটে বাড়িতে। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে রতনকে দেখে তার দিদি চপলা চমকে যায়। সে ভাইকে ঘরে নিয়ে যায়। চপলার সাজানো গোছানো মাটির ঘর দেখে রতন অবাক হয়। ঘরের ভেতরের সব জিনিস দিদির। এটা দেখে সে বিস্ময়বোধ করে। রতন তখন স্পষ্ট করে বলে—"তোমায় কিন্তু বাড়ি যেতে হবে দিদি"। চপলা জানায় তার যাওয়ার উপায় নেই। কেন যাবার উপায় নেই—তা রতন বুঝতে পারে না। শুধু এটাই অনুভব করে বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, তাকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই। তখন সে জেদ করে বলে—"আমি তাহলে যাব না দিদি"। চপলা শেষ পর্যন্ত ভাইকে ফেরৎ পাঠায়। বিদায়ের মুহূর্তে সে দেখে দিদির চোখে জল। তারপর সে ধীরে ধীরে ফিরে যাবার জন্য পথ ধরে। রতন গলি থেকে বড় রাস্তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। এটুকু পথ চলতে চলতেই তার মুখের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। তারপর ফিরে এসে দিদিকে বলে—"বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না"।

দুই

গল্পের নাম 'মহানগর'। গল্পের পটভূমি এবং মর্মবাণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে মহানগর—রাজধানী কলকাতা। গল্পের প্রারম্ভিক বাক্য থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ধ্রুব

পদের মতো—মহানগর শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের সূচনাটি এইরূপ—

"আমার সঙ্গে চলো মহানগরে—যে-মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর. ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে-পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে-পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে-পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।

এ-মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত—ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত"।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষজীবনের সুতো নিয়ে মহানগর বিশাল সূচি চিত্র নির্মাণ করে চলেছে। সেই চিত্রে কখনো কখনো সুতোর সঙ্গে সুতো জড়িয়ে যাচ্ছে, খেই যাচ্ছে হারিয়ে। মহানগরের বৃহৎ জটিল ও সামগ্রিক রূপ অঙ্কন করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন—"আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি — মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী—সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ"।

এরপর গল্পের নায়ক রতনকে লেখক হাজির করালেন মহানগরের পটভূমিতে। নদী যখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে, দুধারে জাহাজ-স্টীমার আর বড় বড় কারখানার জেটি তখন নৌকার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সে হালের কাছে বাবার পাশে বসেছিল। নৌকা যখন মহানগরে পৌঁছয় তখন বিস্ময়ের সঙ্গে রতন লক্ষ্য করে—"রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর"। এরপর রতন মহানগরের মাটিতে পা রাখে। লেখক মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে কলকারখানা, জাহাজ, স্টীমার এবং লোহালক্কড়ের ভিড়ে ঠাসা মহানগরের একটা হৃদয়হীন, কঠিন অবয়ব ও ভিড়ে ঠাসা জীবনের চিত্র এঁকেছেন। এই মহানগরে মানুষ হারিয়ে যায়, এই ভিড়ের মধ্য থেকে মানুষকে খুঁজে বের করার কাজটি সহজ নয়। রতনদের নৌকা একসময় মহানগর ছাড়িয়ে জীর্ণ শহরতলিতে প্রবেশ করে। এসময় রতন আশ্বস্ত হয়। কারণ বড় নদীতে মহানগরের রূপ দেখে সে ভয় পেয়েছিল, হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। গ্রাম থেকে অল্প বয়সের এই বালকটি মহানগরে এসেছিল। কেন এসেছিল সেটা জানাবার পূর্বে লেখক আবার মহানগর সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন—

"মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে; —কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মত শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে?"

এরপর লেখক নিজেই উত্তর দিলেন—

"রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায়না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে খুঁজে বার করবে। শহর মানে তার দিদি"।

এভাবে গল্পের কেন্দ্রভূমিতে প্রবেশের পূর্বে লেখক সচেতন এবং সযত্নে মহানগরের জটিলতা সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন তিনি গল্পের মধ্যে উপস্থাপন করতে চলেছেন একটা বিষাদ-করুণ কাহিনীকে। যে কাহিনীব মূল প্রোথিত ছিল গ্রামের সরস মৃত্তিকায়। সেখান থেকে লেখকের অভীষ্ট বিষয়, অর্থাৎ

রতনের দিদিকে উৎক্ষিপ্ত করে শহরের বেনামী বন্দরে ভাঙা জাহাজের ভিড়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

উল্টোডিঙির পথে নেমে রতন যখন তার দিদিকে খুঁজছিল, তখনো এসেছে মহানগরের প্রসঙ্গ। মহানগরের "পথের অরণ্যে খুঁজতে আসা মানুষেরাও হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন মুছে দেয়।" কিন্তু রতন হারিয়ে যায়নি। সে তার দিদিকে খুঁজে পেয়েছিল। হঠাৎ ভাইকে দেখে রতনের দিদি চপলা যখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছিল তখন লেখক জানালেন —

> "মহানগরের পথে ধূলো, আকাশে ধোঁওয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব-কিছুকে দাগী ক'রে দেয়। সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে"।

মহানগরে রতন প্রথম এসেছিল। অর্থ, যশ বা এজাতীয় কোন কিছুর খোঁজে সে আসেনি। সে এসেছিল দিদিকে খুঁজতে। রতন সফল হয়েছিল। তার সাফল্য আসে অপ্রত্যাশিত ভাবেই। কিন্তু সে সাফল্য তো তৃপ্তিদায়ক নয়? সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বরূপটিকে বোঝাবার পূর্বে লেখক মহানগরের অনুষঙ্গ এনে সংক্ষেপে পাঠককে আগাম সচেতন করলেন একথা বলে যে—'মহানগর সব কিছুকেই দাগী করে দেয়। সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে'। এরপর বোঝা গেল গ্রামের বধূ চপলা নগরের গণিকায় পরিণত হয়েছে। বিষয়টি পাঠক বুঝলেও রতনের বুঝতে একটু সময় লাগে। রতন তার দিদির জীবনের পরিবর্তন এবং পূর্বস্থানে ফিরে যাওয়ার অক্ষমতার কারণটিকে বুঝতে পারে। এরপর বড় হয়ে দিদিকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন পোনাঘাটের পথ ধরে তখন "মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়"।

স্পষ্টতই বোঝা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্লট নির্মাণে মহানগরের পটভূমির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন এবং তা করেছেনও। একটি গ্রামের মেয়ে তার গ্রামীণ পরিবেশ থেকে, তার সহজ স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ থেকে বিচ্যুত হয়ে গণিকায় পরিণত হয়েছিল — এই তথ্যটিকে লেখক অন্যভাবেও উপস্থাপন করতে পারতেন। জীবনের বৃন্ত থেকে বিচ্যুত করে নারীকে দেহ-পসারিণীতে রূপান্তরিত করার ইতিহাস নতুন নয় এবং তার দায়িত্ব শুধু নগরায়ণের উপরই নির্ভরশীল নয়। অতি আদিমকাল থেকেই দেহ-ব্যবসা চলে আসছে। একটি নারী সেই আদিম পেশাকে জীবনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে নানা কারণে। লেখক সেই ব্যাপক বিস্তৃত দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চান নি। মহানগরের ব্যাপক বিস্তার এবং আপাতগ্রাহ্য সম্পদ সমৃদ্ধি ও আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যপটের অন্তরালে যে সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলির সৃষ্টি হয়েছে, গণিকাবৃত্তি তার অন্যতম। উল্লেখ্য যে, মুকুন্দরামের কালকেতু যখন নগরপত্তন করেছিল, তখন সেখানে গণিকালয়ের জন্য স্থান রেখেছিল। সভ্যতার অগ্রগতি এবং মানুষের পাশববৃত্তির অনিবার্য সম্মিলনেই মহানগরের বুকে নানাভাবে গণিকাবৃত্তির প্রসার ঘটে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পের কাঙ্ক্ষিত সূত্রকে অনুসরণ করে পাঠকের সামনে সেই বিন্দুটিকে উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। মহানগরের বহু বিস্তৃত জীবনের একটা বিশেষ ক্ষতস্থান গণিকালয়কে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। চপলা সেই আদিম বৃত্তিরই শিকার। তাকে খুঁজতে এসেছে কোন পরিণত বয়স্কের মানুষ নয়, অবুঝ শিশু, সন্তানতুল্য ছোট ভাই।

ছোট্ট শিশুর সরলতা এবং একাগ্র আকুতির ফলে গল্পের বিষাদ-করুণ ভাবরূপটি সংহত হয়ে হীরকখণ্ডের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

তিন

'মহানগর' গল্পের নায়ক রতন একটি বালক। জীবনের জটিল দিক সম্পর্কে সে অজ্ঞ। অভিজ্ঞতার ঘাট বেয়ে সে জীবনের নির্মম সত্যকে উপলব্ধি করেছে। নদী যখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে তখনই পাঠকের সাথে রতনের প্রথম পরিচয়। রতন কে, কেন সে মহানগরে যাচ্ছে একথা পাঠক তখনও জানে না। বড় নদীতে যখন জোয়ারের টানে নৌকা ভেসে চলেছে, তখন রতন এসে বসে হালে বসে থাকা পিতা মুকুন্দের পাশে। বহুদিনের স্বপ্ন ও সাধ তার পূর্ণ হতে চলেছে। আকাশের তারা জলের উপর নেমেছে, আলো ছিটানো এই নগরের অন্ধকারকে সে গোগ্রাসে পান করে চলেছে। লেখক জানিয়েছেন—"সে শুধু একবার শহর দেখতে চায় ...... কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের?" গ্রামের এক শিশু শুধু শহর দেখার আগ্রহেই সব শর্ত পূরণ করে শান্ত সুবোধ বালক হয়ে যে শহরে আসেনি এটা বোঝা গেল। বোঝা গেল আবার যে রতনের মধ্যে লুকিয়ে আছে অন্য এক অভিপ্রায়। মহানগরে পৌছাবার আগেই সে প্রশ্ন করেছিল পোনাঘাটের থেকে উল্টোডিঙি কতদূর। লক্ষ্মণ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল সে উল্টোডিঙির খোঁজ করছে কেন? পোনাঘাট থেকে উল্টোডিঙির দূরত্ব অনেক একথা জেনেও রতন চুপ করে থাকে নি। পিতার নির্দেশ অমান্য করে এই অসহায় ছেলেটি বেরিয়ে পড়ল উল্টোডিঙির খোঁজে। শান্ত স্বভাবের সুবোধ বালক হঠাৎই সাহসী ও দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠে। মহানগরের অরণ্যে সে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে খুঁজে পাওয়ার আশা রাখে, বাস্তবিক তার দুঃসাহস অসীম। তারপর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে অনেক পথ হেঁটে সে পৌছয় উল্টোডিঙিতে। শিশুহৃদয়ের বিশ্বাস তার একাগ্রতায় ও সাহসিকতায় সফল হয়।

রতন গ্রামের ছেলে। শৈশবে সে মাকে হারায়। দিদিই ছিল তার মায়ের মত। একসময় দিদির বিয়ে হয় পাশের গাঁয়ে। রতন মাঝে মধ্যেই দিদির কাছে গিয়ে থাকত। বাড়িতে আসতে চাইত না। তার বাবা গিয়ে তাকে জোর করে নিয়ে আসত। শিশু রতন বুঝতে পারত না যে বাড়িতে দিদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস থাকতে পারে, সেখানে বেশিদিন তার থাকাটা কেন দোষের। একদিন খবর এল দিদির বাড়িতে গোলমাল। কেন গোলমাল তা রতনকে জানতে দেওয়া হয়নি। একদিন দিদির শ্বশুরবাড়িতেও সে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে সে ভাল ব্যবহার পায়নি। ব্যাকুল হয়ে বাবার কাছে সে দিদির কথা জানতে চেয়েছে, কোন উত্তর পায়নি। বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে যা বাবা তার কাছে লুকোতে চায়। দারোগা-পুলিশের আবির্ভাব এবং বাড়িতে দিদির নাম উচ্চারণে নিষেধ থাকায় রতনের মনে সংশয়ের বোধটি আরও দৃঢ় হতে থাকে। সে যে ধীরে ধীরে বিচক্ষণ হয়ে উঠছে তা বোঝা যায় তার এসময়ের অনুভূতিগুলি থেকে। এসময়ে রতন বুঝতে শিখেছে কোন কথা গোপন করতে হয়। সে দিদিকে নিয়ে আত্মীয় স্বজনের রহস্যময় আচরণের থেকে শুনতে পেয়েছিল উল্টোডিঙির নাম। জেনেছিল সেখানেই তার দিদি বাস করে। তাই নিজের ইচ্ছেকে গোপন করে পিতার নির্দেশ মান্য করে সংযত

থেকে পোনাঘাটে নামে। তারপর অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে সে দিদিকে খুঁজে বের করে।

রতন চরিত্রের এই উত্তরণের পর্যায়গুলিকে লেখক দেখিয়েছেন সতর্ক ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে। উল্টোডিঙির গণিকাপল্লীতে সে হঠাৎই খুঁজে পেয়েছিল তার দিদিকে। পরিস্থিতির চাপে রতনের বোধবুদ্ধিতে পরিণতির ছাপ পড়তে শুরু করলেও দিদি কেন এখানে রয়েছে সেটা সে বুঝতে পারেনি। বরং নগরের পরিবেশে দিদির ঘরের সম্পদ, বিলাস সামগ্রীর উপকরণ দেখে সে বিস্মিত হয়েছিল। সে অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল—"এ সব তোমার দিদি?" চপলার ইতিবাচক উক্তি রতনকে থামাতে পারেনি। কারণ তার মূল উদ্দেশ্য দিদিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া। তখনও রতনের মধ্যে কাজ করে চলেছে সরল শিশু হৃদয়। তাই গোরুর গাড়ি ডেকে জিনিষপত্র তুলে ফেরার উদ্যোগের কথা বলেছে। চপলা কাতর মুখে জানিয়েছিল তার যাওয়ার উপায় নেই। তখন তার মনে পড়ে বাড়িতে তার বাবার রাগ। তার সামনে দিদির নাম উচ্চারণও নিষেধ। হয়ত সত্যিই দিদির বাড়িতে ফেরার উপায় নেই। দিদিকে খুঁজে পেয়েও তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে না পারার বেদনায় রতন কাতর হল। তাই সিদ্ধান্ত নিল—"আমিও তাহলে যাব না দিদি"। পিছুটান, তার জন্য বাবার দুশ্চিন্তা—সবকিছুকেই সে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু চপলার কাছ থেকে সে জানতে পারে—এখানে তার থাকার উপায় নেই। ধীরে ধীরে রতন ফিরে যেতে থাকে। একবেলার অভিজ্ঞতাতেই সে যেন জীবনকে বুঝতে শিখেছে। তাই কিছুটা ফিরে এসে শুধু একটা ঘোষণা করেছিল—"বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।" গল্প তথা রতন চরিত্রে এটাই চরম মুহূর্ত। এই উক্তির মধ্য দিয়ে শুধু রতনের অভিমান হত হৃদয়টিই ব্যক্ত হয়নি, প্রকাশ পেয়েছে একটা পরিণতির ছাপ।

'মহানগর' গল্পের অপর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল চপলা। রতনের প্রয়োজনে চপলাকে গল্পে স্থান দেওয়া হলেও তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাঠকের মনে জন্মায়। চপলা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে গল্পের একেবারে শেষে। তবে তার পূর্বেই দক্ষ ছোটগল্পের রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র দুই-একটি প্রসঙ্গ বর্ণনার মাধ্যমে এই চরিত্রকে একটা ব্যাপ্তি দান করেছেন। গল্পের প্রথমে রতনের অনুভূতিতে জানা যায় চপলা তার দিদি। শৈশবে রতনের মাতৃবিয়োগ হয়। চপলাই তাকে মানুষ করেছে। ছোটভাইকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। খেলার সাথী ভাইয়ের সাথে চপলার ছাড়াছাড়ি হয় বিবাহের পর। বিয়ের পর চপলা শ্বশুরবাড়ি যায়। এ সময় রতন যখন তখন পালিয়ে দিদির কাছে চলে যেত। অনেক কষ্টে ভাইকে বাড়ি পাঠাতে হত। কিন্তু হঠাৎই চপলার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। কি সে বিপর্যয় তা স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি। লেখক রতনের মাধ্যমে জানিয়েছেন—"কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধরে"। কিভাবে গ্রামের মেয়ে চপলা নগরের গণিকায় পরিণত হল সেটা কল্পনা করার দায়িত্ব লেখক অর্পণ করেছেন পাঠকের উপরে। এরপর জানা গেল চপলা থাকে উল্টোডিঙিতে।

উল্টোডিঙির চপলাকে পাঠক স্পষ্ট করে দেখতে পায়। তার ঘরটা মাটির, কিন্তু সুন্দর করে সাজানো। ঘরে রয়েছে সুন্দর সুন্দর জিনিস। বিয়ের পর চপলার শ্বশুরবাড়িতে রতন যখন থাকতে চাইত, তখন বোঝা যেত দিদির বাড়িতে তার দিনের পর দিন থাকা সম্ভবপর

নয়। কিন্তু চপলা তো নতুন আস্তানায় পাকাপাকি থাকে—তবুও কেন সে থাকতে পারে না তা বতন বোঝে না। এই থাকতে না পারার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার পর রতনকে ফিরতে হয়েছিল দিদির নতুন আস্তানা থেকে। এটা বোঝাবার জন্যই চপলা-রতনের সংক্ষিপ্ত মিলন দৃশ্যকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে যাওয়ার পর বোনের সঙ্গে ভাইয়ের একটা ব্যবধান তৈরী হয়, তার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। কিন্তু গ্রামের বধূ যখন দেহকে জীবিকা করে তোলে, তখন সেই সম্পর্ক যে পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় এটা লেখক বোঝাতে পেরেছেন চপলার মাধ্যমে। কিন্তু মনের বাঁধন তো ছেঁড়ার নয়। তাই নিজের পরিবর্তিত আশ্রয়ে ভাইকে দেখে সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি সংলাপের মাধ্যমে ভাইয়েব প্রতি তার মমতাকে প্রকাশ করতেও সক্ষম হয়েছে। রতনের উপলব্ধিকে তুলে ধরাই ছিল লেখকের অভিপ্রায়। ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে চপলার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও লেখক চপলার যন্ত্রণাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। লেখক হিসাবে এটাই তাঁর কৃতিত্ব।

চার

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পের জাত শিল্পী। গল্পের শিল্পরূপ সম্পর্কে তাঁর একটা সহজাত দক্ষতা ছিল। সাধারণত ছোটগল্প শুরু হয় আকস্মিকভাবে। প্রথম বাক্য থেকেই গল্পের জটিলতা সৃষ্টি হয়। ছোটগল্পে সাধারণত ভূমিকা থাকে না। আলোচ্য গল্পে লেখক একটা প্রস্তাবনা রেখেছেন এবং তা তুলে ধরেছেন নিজের ভাষ্যে। লেখক নিজেই গল্পের বর্ণনাকার, কিন্তু গল্পেব সূচনায় তিনি স্বয়ং একটি চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উত্তম পুরুষীয় ভাষণে গল্পের প্রথম বাক্য শুরু হল। তিনি জানালেন যে পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠককে নিয়ে যেতে চান মহানগরের পরিসরে। তারপর বারবার তিনি উত্থাপন করেছেন মহানগরের কথা—ভয়াবহ বিস্ময়কর গ্রক সঙ্গীতের কথা। গল্পের মূল অবলম্বন এক বালকেব বিষাদকরুণ জীবন অভিজ্ঞতা। এই বালক তার দিদিকে হারিয়েছে, গ্রামের এই সরল প্রাণবন্ত নারীকে আশ্রয় নিতে হয়েছে নগরের কানাগলিতে। এই উপলব্ধিটি ধীরে ধীরে অর্জন করবে একটি বালক। বালকের পক্ষে এই গভীর দার্শনিক উপলব্ধিকে প্রথমেই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তাই দাযিত্ব গ্রহণ করেছেন লেখক স্বয়ং। একটা কাব্যিক বিবরণের সহায়তায় তিনি ধীরে ধীরে একটা বিষণ্ণ পরিস্থিতি রচনা করে পাঠকের মনকে প্রস্তুত করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে এটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প বর্ণনার একটা বহুল পরিচিত কৌশল। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পেও লেখক এভাবেই একটি পটভূমি তৈরী করে মূল বৃত্তান্তে প্রবেশ করেছিলেন। ছোটগল্পের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং লক্ষণের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রীতির সহায়তা গ্রহণের কৌশলটি প্রশংসনীয়। গল্পে ভূমিকা আছে, কিন্তু সেই ভূমিকা মূল প্রসঙ্গের অনিবার্য অঙ্গ। এই গৌরচন্দ্রিকা আসলে গল্পের প্রতিপাদ্য রসের সঙ্গে সম্পর্কিত; তাই মহানগর সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘ উপস্থাপনা এবং মাঝে মধ্যেই মহানগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন গল্পের পক্ষে অনাবশ্যক বা বোঝা বলে মনে হয় নি।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশের প্রক্রিয়াটিও চিত্তাকর্ষক। মহানগর এবং নগর সংলগ্ন প্রাকৃতিক পটভূমিব বর্ণনা দিতে দিতে লেখক হঠাৎ উচ্চারণ করলেন রতনের নাম। সে হালের কাছে

বসা পিতার পাশে চুপটি করে বসেছে। নৌকা তখন মাঝ নদীতে। প্রকৃতির যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন এবং যেভাবে রতন দুচোখ ভরে নগর জীবনের প্রেক্ষাপটকে আস্বাদন করেছে তাতে মনে হয় কখনো শহরে না আসা রতন বুঝি রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত এই শহরকেই দেখতে এসেছে। নৌকা পোনাঘাটে এসে পৌছানো পর্যন্ত গল্পের মূল সঙ্কটের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয় নি। তারপর একটা সংক্ষিপ্ত প্রতীকী বিবরণ—"কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁতলে নোংরা হয়ে গেছে। পোনা-চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই।" মহানগরের বিকিকিনির হাটে হস্তান্তরিত হয়েছিল গ্রামের ফুলের মতো একটি বালিকা। হৃদয়হীন মানুষের চাপে সে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে তার জীবনের স্বপ্ন। লেখক এই সংবাদ পাঠককে জানাতে চেয়েছেন। মাঝে উল্টোডিঙির কথা বর্ণনা করে লেখক প্রশ্ন করলেন—"মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে?" উত্তর দিলেন স্বয়ং লেখক—"এবার তা হলে বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে।" লক্ষণীয় যে লেখক এপর্যন্ত গল্পের অন্যতম চরিত্র, তিনি ভাষ্যকার। এরপরেই গল্পের মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। তিনি প্রবেশ করেন মূল প্রসঙ্গে। আর গল্পের হাল ধরে স্বয়ং রতন।

এরপর দুটো স্বতন্ত্র পটভূমিতে গল্পের বিষয়কে স্থান দেওয়া হল। একটা গ্রামের পটভূমিতে ভাই ও বোনের পূর্ব মিলন, অপরটি নগরের হৃদয়হীন পরিবেশে উত্তর মিলন। প্রথম অবস্থা অর্থাৎ গ্রামীণ পটভূমিতে ঘর গৃহস্থালির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বোঝা যায় সেখানে দুজনের মধ্যে সম্পর্কটি ছিল আন্তরিক ও নিবিড়। গল্পের শেষে সংক্ষেপে চপলার ঘরের কথা বলা হল। মাটির ঘরও যে এত সাজানো-গোছানো হতে পারে এই বিস্ময়সূচক অনুভূতির মাধ্যমে লেখক গ্রামীণ জীবনের সরল, সতেজ ও স্বাভাবিকতার পাশে নগর জীবনের মেকি আবরণটিকে তুলে ধরতে সক্ষম হলেন। প্লট নির্মাণ এবং গল্পের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটনে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তাকেও প্রশংসা করতে হয়। তিনি চপলার সঙ্কটটিকে বুঝিয়েছেন দু-একটি বাক্যে-আভাসে-ইঙ্গিতে। যেমন "দিদিকে খোঁজার কথা তো কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা।" কিংবা "দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভীড় ক'রে, ভীড় ক'রে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে।" এ থেকে বোঝা যায় চপলার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা তাকে কলঙ্কিত করেছে, যেজন্য তার নাম উচ্চারণ করা যায় না। রতনের উপলব্ধিতে জানানো হয়েছে চপলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কারা ধরে নিয়ে গেল, কিভাবে ধরে নিয়ে গেল সে সম্পর্কে লেখক স্পষ্ট করে কিছু না বলেও অনেক কথা বলে দিয়েছেন।

. গল্পের শেষে দিদির কাছ থেকে রতনের ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনাটি স্মরণীয়। একদিকে একটি ছিন্নমূল তরুণীর অস্বস্তিকর অবস্থা, অপরদিকে এক সরল শিশুর নির্বোধ আকুতি, —পারস্পরিক আকর্ষণ যে গভীর এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না অথচ মিলনের উপায় নেই। নিজের কাছে ভাইকে রাখার অসুবিধা যে কোথায় এটা চপলা বুঝিয়ে বলতে পারে না, অন্যদিকে রতনও বুঝতে চায় না। শেষপর্যন্ত রতনকে ফিরে যেতে হয়। কিছুটা পথ এগিয়ে হঠাৎই রতন অনুভব করে বাস্তব পরিস্থিতির। এরপর সে ফিরে এসে তার অঙ্গীকারের

কথাটি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে—"বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না।" পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে রতন অনুভব করেছিল দিদির গ্রামে ফেরার পথে প্রধান অন্তরায় বড়রা। সে অনুভব করেছিল বাড়িতে দিদির নাম উচ্চারণ করাতেই নিষেধ আছে। তার দিদি কেন কিভাবে নগরে এসেছে তা সে জানে না, নগরে সে কিভাবে জীবনযাপন করছে সেটাও বোঝে নি। কিন্তু বুঝতে পেরেছিল বড়রা তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবে না, ফিরে যেতে দেবে না। যারা ভুল করে চপলার মতো জীবনযাপনে বাধ্য হয় কিংবা যাদের ছিনিয়ে এনে নিন্দনীয় জীবিকা গ্রহণে বাধ্য করা হয়—তাদের কাউকেই সমাজ পূর্বস্থানে ফিরে যেতে দেয় না। সমাজ তো বড়দের নিয়েই। এই বড়রা বড় হয়েও প্রকৃত অর্থে শিশুর মতোই অবুঝ। রতন তাই অঙ্গীকার করেছিল, সে বড় হয়ে নিষেধের বাঁধন অগ্রাহ্য করেই দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই ঘোষণার মধ্যেই গল্প চূড়ান্ত মুহূর্তে উপনীত হয়।

নাগরিক জীবনের জটিলতা, হৃদয়হীনতা বা মহানগরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ও কথাসাহিত্যে বারবারই ঘুরে ফিরে এসেছে। 'প্রথমা'র 'নগর-প্রার্থনা' কবিতায় 'লৌহ-কাষ্ঠ', লোভ ও চক্রান্তে কলুষিত 'পতিতা' রূপী মহানগরকে কালিমামুক্ত করার জন্যে 'সৌম্যশুচি কুমার সন্ন্যাসীকে' তিনি আবাহন করেছিলেন। 'এই শহরে' কবিতায় কবি আক্ষেপ করেছিলেন—'যাদের তুমি চিনতে, তারাও/হারিয়ে যাবে/এই শহরে'—আলোচ্য গল্পে মহানগরে রতনের চেনা দিদিও হারিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে বের করলেও দিদিকে তার অচেনা বলে মনে হয়েছে। এই অচেনা দিদির পক্ষে মহানগরের বদ্ধ জীবন থেকে যে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না তা বুজেছে। তাই, ভবিষ্যতে সেখান থেকে দিদিকে মুক্ত করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েই বিদায় নিয়েছে।

কুয়াশায় : একটি মূল্যায়ন

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী

প্রেমেন্দ্র মিত্রর গল্প বলার একটা নিজস্ব ঢং আছে। পাঠককে সরাসরি গল্পের অলিগলিতে টেনে নিয়ে যান; তারপর সম্মোহিতের মতো গল্পের টানে পাঠক এগিয়ে চলেন।

জীবনের অলিগলি, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের মনের অলিগলি, যেন তাঁর করায়ত্ত। তাই অতি অনায়াসভঙ্গিতে পাঠককে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন সেই অলিগলি পরিভ্রমণে। তারপর একসময় যখন মনে হয় খুব সাধারণ, সাদামাটা, প্রত্যাশিত ছকে গল্প শেষ হতে চলেছে—যেমন হয় সাধারণ মানুষের জীবনেও—ঠিক তখনি, একটা সূক্ষ্ম মোচড়ে উন্মোচিত হয় বহু-চেনা মুখগুলির অচেনা পরিচয়। যেমন হয়েছিল 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এ যেমন 'পুন্নাম'-এ—তেমনি 'কুয়াশায়'।

কলকাতার পথঘাট, এই মহানগরীর কেরাণীকুল তাঁর গল্পে অসাধারণ রসদ হিসেবে এসেছে বারবার। 'কুয়াশায়' গল্পটি শুরুই হয় হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় থেকে—

"হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে নেমে অত্যন্ত বাঁকাচোরা কটি গলিপথ পার হয়ে হঠাৎ একটি ছোট্ট রেলিং-ঘেরা জমি কোনোদিন কেউ হয়তো আবিষ্কার করতে পারে—অনেকে করেছে-ও।"

আমাদের এতো চেনা হ্যারিসন রোড আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়, যে, কেমন একটা উৎসাহ অনুভব করি—জায়গাটা খুঁজে বের করার। কারণ, কলকাতার দমবন্ধ গলিঘুঁজি পেরিয়ে এমন রেলিং-ঘেরা এক-টুকরো জমি—যা সবার জানা নয় বলে জনবহুল-ও নয়—আমাদের প্রলুব্ধ করে বৈকি! যেমন প্রলুব্ধ হন 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর শহুরে পাঠক কারও 'ফুসলানি'-তে—আর-ও স্পষ্ট করে বললে, লেখকের 'ফুসলানি'-তে।

শহুরে শ্রান্ত পাঠককে প্রলুব্ধ করাই যে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তা আরও স্পষ্ট হয় পরের অনুচ্ছেদে। তার আগে প্রথম অনুচ্ছেদের ছোট্ট একটা শব্দ দেখে নেওয়া প্রয়োজন—"হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে নেমে" অর্থাৎ বাসে করে ঐ মোড় দিয়ে যাতায়াত করেন যে সাধারণ মানুষটি—এ-প্রলোভন তাঁর জন্য। 'নেমে' শব্দটাই বুঝিয়ে দেয় বাসযাত্রীর অনুষঙ্গ।

ছোটোগল্প শিল্পরূপ হিসেবে খুবই সংহত। যতো সংক্ষেপে, যতো আভাসে, যতো ব্যাপ্ত বোধ ও বিপুল অনুষঙ্গ ধরা যাবে, ছোটোগল্প ততোই সার্থক ও ঋদ্ধ হয়ে উঠবে।

গল্পের একটি মাত্র অনুচ্ছেদ পড়া হয়েছে অথচ ব্যস্ত কলকাতার আবহ, ঘিঞ্জি কলকাতার শ্বাসরোধকারী অনুভব এবং এ-দুয়ের প্রেক্ষিতে, একটু কষ্ট স্বীকার করলেই একখণ্ড নিরিবিলি রেলিং-ঘেরা ঘাসে-ছাওয়া জমি পেয়ে যাবার প্রলোভন জেগে উঠেছে পাঠকমনে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জানান—

"আবিষ্কার কথাটার ব্যবহার এখানে নিরর্থক নয়, কারণ অত্যন্ত কুটিল গলির গোলোকধাঁধায় ঘোরবার পর ক্লান্ত পথিকের কাছে ঠিক আবিষ্কারের বিস্ময় নিয়েই এই সামান্য জমিটুকু দেখা দেয়।"

তেলেনাপোতা-ও কিন্তু 'আবিষ্কার' করেন নায়ক এবং পাঠক। আর তেলেনাপোতা কোনো জায়গার নামমাত্র নয়। তা' সম্ভবত আমাদের সত্তারই এক অজ্ঞাত স্থান। যা' না চিনলেই হয়তো ভালো ছিল। তাই তেলেনাপোতা আবিষ্কার করেন যখন কেউ—তখন আসলে শনি ও মঙ্গলের মিলন ঘটে। সেই ক্ষণে অর্থাৎ দুই মারক গ্রহের মিলন-জাত সেই অশুভ ক্ষণেই মানুষ তেলেনাপোতা আবিষ্কার করে ফেলে। আবার শারীরিক অসুস্থতায় ও দ্রুতগতি নাগরিক জীবনে সেই আবিষ্কারের স্মৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন তারার মতো হয়ে যায় ক্রমে।

অতএব 'কুয়াশায়' গল্পের ঐ ভূখণ্ডটুকু-ও নেহাৎ-ই একটুকরো জমি বলে মনে হবেনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-পাঠকের।

জমিটুকু দেখা যাক—

"পুরনো নোনাধরা ইঁটের মান্ধাতার আমলের তৈরি বাড়িগুলি ওই সামান্য রুগ্ন ঘাসের শয্যাটিকে কারাগারের প্রাচীরের মতো ঘিরে আছে। দেখলে কেমন মায়া হয়—ওর ঘাসগুলির বিবর্ণতায় যেন পৃথিবীর দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরগুলির বিচ্ছেদের কান্না আছে।"

ভগ্ন অট্টালিকা, ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রায়ই গড়ে তোলেন স্মৃতিমেদুর আবহ। নস্টালজিয়া, ঈষৎ সুদূরতা গড়ে তোলে রোমান্টিকতার আমেজ; আর সেই রোমান্টিকতাকে ছিন্নভিন্ন করে গল্পের শেষে জেগে থাকে এক অতিবাস্তব বেদনা।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর শেষে জেগে থাকে বঞ্চিতা যামিনীর বেদনা। 'কুয়াশায়' গল্পের পরিণামে সরমার, গলায় দড়ি দেওয়া দেহটি, তার যন্ত্রণাকাতর মুখটি যেন প্রত্যক্ষ করতে পারেন পাঠক।

রেলিং-ঘেরা, ঘাসে ঢাকা ঐ একটুক্‌রো জমি যেন কলকাতা শহরে বড়ো একা, বিচ্ছিন্ন। তার ঘাসের বিবর্ণতায় লেখক তাই প্রত্যক্ষ করেন 'পৃথিবীর দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরগুলির বিচ্ছেদের কান্না'।

কারণ, ঐ জমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক নারীর যন্ত্রণার ইতিহাস—যা' পুলিশের লোকেদের নীরস বিবরণে দায়সারাভাবে লিপিবদ্ধ। কিন্তু এমনি সব বিবরণ যদি দেখার চোখ দিয়ে দেখেন কেউ—তা'হলে অনুভব করা যায় তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। আবার ওপর ওপর চোখের দেখায় 'পৃথিবীর সবচেয়ে, বিস্ময়কর ঘটনাকে প্রতিদিনের শেয়ারমার্কেটের রিপোর্টের মতো বর্ণহীন ও নীরস করে' দেখা এবং লেখা যায়। লেখকের বক্তব্য, এভাবে যেকোনো বিষয়কে দেখার অদ্ভুত দক্ষতা আছে 'পুলিশের লোকেদের'। কিন্তু ছোটগল্পকারের রয়েছে ঠিক বিপরীত ক্ষমতা—বিবর্ণ নীরস ঘটনার-ও অন্তর্নিহিত প্রাণের উত্তাপটুকু তাই ধরা পড়ে তাঁর সংবেদনশীলতায়।

জমিটিকে ঘিরে, তার অজ্ঞাত কাহিনীকে ঘিরে কুয়াশা জমে উঠেছিল স্বতঃই। সেই কুয়াশা আরও ঘনীভূত হল, যখন লেখক জানালেন "......এই সামান্য রেলিংঘেরা তিন কাঠা

পরিমাণ জমিটির ভেতরে দশ বছর আগে শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল, যা তাদের নির্লজ্জ কলমের নিষ্ঠুর আঁচড় স'য়েও আজও বুঝি রহস্যমণ্ডিত হয়ে আছে।"

তবে পুলিশের রসবোধহীনতা-বিষয়ে দীর্ঘ-ভাষণ বা রেলিং-ঘেরা ঘাস-জমিটুকুকে ঘিরে তৈরী করা হ'ল যে আকর্ষণ—তা কিন্তু অতিকথন বলেই মনে হয়, গল্প যতোই এগোয়।

কারণ, পুলিসের রসবোধহীনতা-বিষয়ে মন্তব্য গল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং রেলিং-ঘেরা ঘাস-জমিটি সরমার আত্মহত্যা স্থল—এছাড়া, আলাদা কোনো গুরুত্ব ঐ স্থানটির নেই। অবশ্য এ বিরাট শহরে সরমার শেষ আশ্রয় ঐ জমিটি এবং বিশাল প্রান্তরের বিচ্ছিন্ন টুক্‌রোটির সঙ্গে হতভাগিনী নারী-সমষ্টির বিচ্ছিন্ন প্রতীকস্বরূপ সরমার মিল—পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখক।

কিন্তু ......। আবার একটা কিন্তু, আবার একটা প্রশ্ন জাগে। তা' হ'ল সরমার আত্মহত্যা পর্যন্ত গল্পকে টেনে নিয়ে যাওয়া আদৌ শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা! তারও পরে অতিসচেতন ভাবে সরমার জীবনে জমিটির গুরুত্ব-বিষয়ে লেখকের ব্যাখ্যা গল্পের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নষ্ট করেছে।

কারণ, গল্পের charm কিন্তু সরমার আত্মহত্যার ঘটনায় নিহিত নেই। এ গল্পের আসল মোচড় সরমার স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা ভেঙে যাবার মুহূর্তটিতে। সরমার প্রেম, গৃহত্যাগ—এ-সব এতো পরিচিত খাতে বইছিল যে, হঠাৎ নরেনের পকেটে রাখা খোকার খেলনা গায়ে ফোটা, খোকা ও খোকার মা-র সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে কলকাতার নির্জন রাত্রির কুয়াশার মধ্যে সরমার হারিয়ে যাওয়া—পাঠককে এবং নরেনকে একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দেয়। এখানেই গল্প শেষ হলে ভালো হ'ত। আত্মহত্যা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ায় গল্পটি-র সমস্ত সম্ভাবনা অতি সাধারণ, অতি-সুলভ করুণ-রসাত্মক আবেগে বিনষ্ট হয়েছে। সরমার গভীর সেন্টিমেন্ট, অতি-সাধারণ বোধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রেমিককে বিস্ময়ের কুয়াশার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে রাতের কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া—সরমা-চরিত্র ও গল্পের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে মুহূর্তটি তৈরী করেছিল, তা নষ্ট হয়েছে।

আবার সরমার সেন্টিমেন্ট-টি যে পাঠকের খুব অপরিচিত, খুব ব্যতিক্রমী—তা' কিন্তু নয়। ব্যতিক্রমী হল গল্পে তার সুন্দর, সময়োপযোগী প্রয়োগ। নামহীনা, গোত্রহীনা নারীর মতো, জরাজীর্ণ অট্টালিকার হেঁশেলের এক কোণে বৈচিত্র্যহীন অথচ নিরাপদ জীবন কাটিয়ে দিতে কোনো আপত্তি ছিলনা সরমার। জীবন সম্পর্কে কোনো বড়ো রকমের অভিযোগ পর্যন্ত তার ছিল না। কিন্তু প্রেমিকের পাশে নাম-গোত্রহীন, পরিচয়হীন নারী হয়ে দাঁড়ানো, আরেক নারীকে বঞ্চনা করা, দুই নারীকে খুব নির্লিপ্তভঙ্গিতে জীবনের অঙ্গীভূত করতে চায় যে পুরুষ—তাকে প্রেমিক হিসেবে মেনে নেওয়া—সরমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সংসারে সংকুচিত, লজ্জিত, নিরীহ এই মেয়েটি যখন নির্জন রাতে তার প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করে কুয়াশার মধ্যে হেঁটে চলে যায়—তখন বোঝা যায় কত গভীরে তাঁর বেজেছে। সেই টানটান উৎকণ্ঠাময় মুহূর্তে, কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জন রাতের কলকাতার পটভূমি ও আবহে—সরমার অকস্মাৎ, তীব্র

প্রতিক্রিয়ায় অতি পরিচিত সেন্টিমেন্ট-ও হয়ে উঠেছিল নাটকীয়, আবেদনময়, রহস্যময়, কুয়াশাময়। এই ব্যঞ্জনাঘন মুহূর্তে গল্পটি শেষ হলে সম্পূর্ণ হ'ত শিল্প-সিদ্ধি।

কারণ, পুলিস-বিষয়ক মন্তব্য, রেলিং ঘেরা জমিটিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্বদান, সরমার মৃতদেহ বর্ণনা ও বিশেষণবহুল মন্তব্যে কারুণ্য ফোটাবার সচেতন-চেষ্টায় ত্রুটি থাকলেও অস্বীকার করা যায় না চলচ্চিত্রের টেক্‌নিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে লেখকের মুন্সিয়ানা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র-র গল্প পড়তে গেলে মনে হয় ঠিক যেন ক্যামেরা চলছে। হ্যারিসন রোড আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে নেমে বাঁকাচোরা কটি গলিপথ পেরিয়ে ছোট্ট রেলিং-ঘেরা একটুক্‌রো ঘাসজমি, তার আশপাশের জীর্ণ অট্টালিকাগুলি, জরাজীর্ণ কিছু মানুষ, তাদের কুয়াশাময় স্মৃতির জগতে পার্কের এককোণে অবস্থিত বাচ্চাদের দোলনাটি ঘিরে এক স্মৃতি অব্‌ধি পাঠক পৌঁছে যান ছবির অমোঘ টানে।

তারপর যেন ক্যামেরা ক্লোজে ধরে সেই বিশেষ স্মৃতিটিকে; ঘন ধোঁয়াটে কুয়াশা, সূর্যের আলো তখনও ভালো করে ভেদ করতে পারেনি সে কুয়াশা। এমনি আবছায়া পরিবেশে রেলিং ঘেরা ঘাসজমিটির একপাশে ছোটো ছেলেমেয়েদের দোলনার ওপরের দন্ড থেকে কণ্ঠে মলিন দোরোখা জড়ানো একটি নারীর মৃতদেহ ঝুলছে।

প্রথমে মৃতদেহের সমস্ত শরীর, তারপর মুখটিকে ক্লোজআপে ধরা হল। বোঝা গেল মেয়েটি কিশোরী নয়; কিন্তু পূর্ণযৌবনাও নয়। পরনে বিধবার মলিন বেশ, কিন্তু গলায় একটি সোনার হার। মাথার দীর্ঘ, রুক্ষ চুলের রাশ তার মুখ ছেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়ানো চুলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার ঈষৎ বিকৃত মুখ; যে মুখে অসীম ক্লান্তি আর অসহায় কাতরতা মাখানো।

এতো স্পষ্ট, এতো অনুপুঙ্খ-সহ ছবি যে, ছবির টানেই গল্প এগিয়ে চলে অনায়াসে। এই চিত্রধর্মী ভাষা প্রেমেন্দ্র মিত্র-র গল্পের এক বিরাট সম্পদ।

মেয়েটির মৃত্যুরহস্য ভেদ করা যায়নি, তা' কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে গেল—এই তথ্যটুকু জানিয়ে এবং সরমার সঙ্গে রেলিংঘেরা জমিটির সম্পর্ক বিষয়ে দুটি ছোটো অনুচ্ছেদ রচনা করে লেখক চলে গেলেন আরেকটি ছবিতে। চক্‌মেলানো এক বিশাল প্রাসাদের ছবিতে। যে প্রাসাদের জীর্ণ দেওয়ালে অস্তমিত গৌরবের চিহ্ন। আনলেন একটি অপূর্ব চিত্রকল্প, বিষয়টি বিশদ করার জন্য—

"বৃদ্ধা রূপসীর মতো আজও তার গায়ে অতীত গৌরবের দিনের অলঙ্কারের দাগ মেলায়নি; তার লোল চর্মের মালিন্য-কে ব্যঙ্গ করে আজও সে চিহ্নগুলি মানুষের চোখকে ব্যথিত করে।"

আবার শুরু হল চলচ্চিত্রের টেকনিকে ক্যামেরার দৃষ্টিপথ ধরে চলা। পুরোন প্রাসাদের দেউড়ির পাশে বসা ঝিমন্ত বৃদ্ধ দারোয়ানের পাশ কাটিয়ে, পাশের কুঠুরিতে এ-পরিবারের বিশ্বস্ত সরকার মহাশয়ের তামাক খাবার মৃদু শব্দটি শুনতে শুনতে বাঁধানো আঙিনা অতিক্রম করে পাঠক পৌঁছে যান ভেতর মহলে; যেখানে মৌচাকের মতো অসংখ্য কুঠুরি। সেসব

কুঠুরিতে জমিদার বংশের দরিদ্র উত্তরাধিকারীরা ভিড় করে বাস করে। স্মৃতি ছাড়া সযত্নে রক্ষা করার মতো আর কোনো মূল্যবান জিনিস তাদের নেই।

অন্দরমহলের প্রকাণ্ড হেঁশেল এবং সরকার মহাশয়ের দপ্তর—এই বৃহৎ বিচ্ছিন্ন পরিবারের একান্নবর্তিতার দুটি চিহ্ন; এ-তথ্য জানাবার পরই পাঠককে পৌঁছে দেন লেখক হেঁশেলঘরে।

হেঁশেলঘরের চলমান চিত্রটি মুহূর্তে পাঠককে আকৃষ্ট করে। তিনটে বড়ো বড়ো উনুন জ্বলছে। মোক্ষদা ঠাকরুণ দাঁতে গুল দিতে দিতে চর্‌কির মতো ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছেন।

মোক্ষদার গতিপথে চোখ রেখে পাঠক প্রথমে দেখলেন রামের মাকে—খারাপ করে চাল ধোবার জন্য যে মুখঝামটা গেল মোক্ষদার কাছে। তারপর দেখা গেল বিন্দিকে—যে আঁশবঁটিতে নিরমিশ হেঁশেলের কুট্‌নো কোটার জন্য তিরস্কৃত হল। তার পরমুহূর্তেই দেখা গেল প্রায়-নির্বাক, নতমস্তক সরমাকে। তাকেও তাড়া লাগালেন মোক্ষদা; কিন্তু সুরটি ততোটা তিরস্কারের নয়—বরং প্রচ্ছন্ন স্নেহে কোমল। মোক্ষদার কথা মতো দ্রুত কুট্‌নো কোটার চেষ্টা করে সরমা। মোক্ষদা কিন্তু সেখান থেকে চলে গেলেন না। নাম ভুলে গেছেন বলে নাম জানতে চাইলেন। বোঝা গেল মেয়েটি এ হেঁশেলে নতুন এবং পাঠক শুনতে পেলেন তার নাম ও মৃদু কণ্ঠস্বর।

কথায় কথায় জানা গেল মোক্ষদার মৃতা ভাগ্নে বৌ-এর নাম-ও ছিল সরমা, তার-ও ছিল, এমনি রূপ এবং মোক্ষদার চোখে তার ভাগ্নে বৌ 'একেবারে লক্ষ্মীঠাকুরুণটি'।

হেঁশেলে নবগতা সরমা যে এই বৃহৎ অট্টালিকার এককোণে মোক্ষদার স্নেহ-আশ্রয়টুকু পেয়ে যাবে, তা' এই দৃশ্যেই বুঝতে পারেন পাঠক।

এভাবেই ছিন্নমূল মানুষ গল্পে বা জীবনে, নিজের-ও অজ্ঞাতে, অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যায় একখণ্ড স্নেহশীতল জমি; তারপর শিকড় চারিয়ে যায়, পল্লবিত হয় অজস্র কামনা-বাসনা। আবার হঠাৎই একদিন টের পায় সব শিকড় ছিঁড়ে তাকে পালিয়ে যেতে হবে কোথাও, ভেসে যেতে হবে ফের ছিন্নমূল হয়ে। যেমন মনে হয়েছিল সরমার, নরেন বিবাহিত, সন্তানের পিতা—এ-সত্য জানবার পর; গাড়ি থেকে নেমে নীরবে পথ চলতে শুরু করে সরমা, সে বোঝে "নরেনের কাছ থেকে, তার নিজের কাছ থেকে, সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে তাকে বুঝি দূরে সরে যেতেই হবে।"

আবার ফিরে যাওয়া যাক্ হেঁশেলঘরে; যেখানে সরমার কারুণ্য ও মোক্ষদার স্নেহ—দুই-ই আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ক্ষ্যান্ত পিসির প্রবল চরিত্রের বৈপরীত্যে। ক্ষ্যান্তপিসি এই হেঁশেলচারিণীদেরই একজন। এ ভিন্ন তাঁর আলাদা কোন পরিচয় দেননি লেখক। তবে জানিয়েছেন—"সিঁথির সিন্দুর মুছলে বধূ ও কন্যারা হেঁশেলে আশ্রয় পায়, এই এ বাড়ির সনাতন নিয়ম।" অতএব, হেঁশেলের 'সেপাই' (আড়ালে অন্যরা এ নামেই ডাকে ক্ষ্যান্ত পিসিকে) ক্ষ্যান্ত পিসি-ও এই পরিবারেই-ই কোনো ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী। ভাগ্যবিড়ম্বনা যাকে করে তুলেছে প্রবলা, যেমন মোক্ষদা-কে করে তুলেছে স্নেহময়ী, আর নলিনীকে করে তুলেছে বিষমুখ পয়োকুম্ভ। নলিনী প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

ক্ষ্যান্ত পিসি এ-গল্পের আলো-আঁধারি, আব্ছায়ার মধ্যে সবথেকে বর্ণবহুল চরিত্র। বিশাল-দেহী, গেরুয়াধারী, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, রূঢ়ভাষী, কুটিল অনুসন্ধিৎসায় নিষ্ঠুর এই মহিলাই পাঠকের সামনে সরমার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে দেন। বালবিধবা সরমার বিয়ে হয়েছিল তেরো বছর বয়সে, এ-বাড়িরই ফটিকের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে সরমার পরিচয় অতি-সংক্ষিপ্ত। কারণ, 'ধূলোপায়ে'র পর বাড়ি ফিরে এক রাত মাত্র বেঁচেছিল তার স্বামী।

এই বিবরণ ক্ষ্যান্ত দিয়েছেন স্ত্রী হিসেবে সরমা কতোটা অলক্ষণা, তা'-বোঝাবার জন্য। কিন্তু এ-বিবরণ পাঠকের মনে নিরপরাধ, অসহায় সরমার জন্য একটুক্‌রো সহানুভূতির জমি তৈরী করে রাখলো। নরেনের প্রেম চিরবঞ্চিত এই মেয়েটির জীবনে কতখানি আবেদন নিয়ে পৌঁছবে তা-ও অনুমান করতে পারবেন পাঠক এই পটভূমির প্রেক্ষিতে।

এই হেঁশেলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নলিনী। নলিনী হল বিষমুখ পয়োকুম্ভ। শুক্‌নো, শীর্ণদেহী নলিনীর মুখে বিরক্তি যেন লেগেই আছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠ, রূঢ় কথাবার্তা; নলিনীর বাইরেটা অত্যন্ত কঠোর। ভাষায় ক্রোধের বিষ। কিন্তু তার অন্তর পয়োকুম্ভ বা অমৃতকুম্ভ। এ-সত্য পাঠক ও সরমা অচিরেই উপলব্ধি করেন।

নলিনী সরমাকে স্নেহ করে। সরমার জীবনে আপাতরুক্ষ এই নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অজস্র মুখঝাম্‌টার পর নবাগতা সরমাকে নিজের শয্যাটি সে-ই দিয়েছে, এ-বাড়ির কোনো বৌ যখন সরমাকে মিষ্টি কথায় খাটিয়ে নিয়েছে, তখন ক্রোধে জ্বলে উঠেছে নলিনী, নরেন ও সরমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় দেখে বিস্মিত চোখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে চলে গেছে, রাতের অন্ধকারে গোপনে দেউড়ির তালা খুলে সরমাকে রওনা করিয়ে দিয়েছে। আর গৃহত্যাগের মুহূর্তে নলিনীর চাপা রূঢ় সংলাপের প্রচ্ছন্ন স্নেহ, আন্তরিক করস্পর্শ আর সধবাবেলার একমাত্র স্মৃতি একগাছি সোনার হার উপহার তথা পাথেয় হিসেবে পেয়েছিল সরমা। গল্পের শুরুতে মৃত সরমার কণ্ঠে দেখা গিয়েছিল একটি সোনার হার। গল্পের প্রায় পরিণতিতে এসে জানা গেল সে হার নলিনীর স্নেহের দান। আপাতঃ নীরস, রুক্ষ নলিনীর অন্তঃসলিলা স্নেহের স্মারক, তার সধবাজীবনের একমাত্র স্মৃতি—ঐ হারটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা সরমার সংক্ষিপ্ত জীবনে নির্ভেজাল ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে থেকেছে, সরমার মৃত্যুর পরও।

নরেন-কে ভালো বা মন্দ কোনো চূড়ান্ত অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, বিবাহিত এক পুরুষের বিধবা, স্বল্প পরিচিতা নারীটির প্রতি সহানুভূতি এমনকি গোপন দুর্বলতা দোষের না হলেও, আবেগে ভেসে গিয়ে তাকে চিঠি লেখা, বিছানার তলায় সে চিঠি গুঁজে রেখে আসার হঠকারিতা নরেন-সম্পর্কে পাঠককে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে না। সরমা যখন তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত, তখন সে বলে—"তোমাকে সত্যিই আমি ঠকাতে চাইনি; আমি ভেবেছিলাম, আমার সব কথা তুমি জানো। আর এসব জেনেও তোমার এত বিচলিত হবার কি আছে সরমা, বুঝতে পারছি না। আমাদের অতীত যেমনই কেন হোকনা, এখনকার ভালোবাসাই আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড়ো সত্য নয় কি?"

এই সংলাপ আরও স্পষ্ট করে দেয় নরেন চরিত্রের দুর্বলতা। যে স্ত্রী দেশে আছে, যে

নরেনের সন্তানের মা, কতো সহজে তার ভালোবাসা বা তার প্রতি কর্তব্যের দায় ঝেড়ে ফেলেছে নরেন। অথচ নরেনের দাম্পত্য-সম্পর্কে কোথাও কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল, অতৃপ্তির জায়গা ছিল—এমন কথা লেখক আমাদের জানাননি।

কিন্তু দুর্বল জেনেও নরেনকে নিকৃষ্ট বলা যায়না; কোথাও একটু বাধো বাধো ঠেকে। যখন শুনি বিমুখ সরমার পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে বলছে—"তোমার এ-বিপদের জন্যে আমি দায়ী সরমা! আমায় তুমি অন্তত তার প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসরটুকু দাও। আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার সঙ্গে গেলে, তোমার অসম্মান কখনও আমি করব না!"

আসলে সাধারণ মানুষ ঠিক এমনি দোষেগুণে গড়া। চূড়ান্ত ভালো বা চূড়ান্ত খারাপ কোনোটাই নয় তারা; তাই সাধারণ; নরেনের মতো।

ভাষার চিত্রধর্মিতা, উপমা-চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগ, নিপুণ-চরিত্রাঙ্কন—সব কিছু ছিল এ গল্পে; ছিল সার্থক হবার যাবতীয় সম্ভাবনা। কিন্তু অতি-কথন ও নিয়ন্ত্রণহীন আবেগ শেষপর্যন্ত এ-গল্পের শৈল্পিক সিদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার : মধ্যবিত্তের বিবেক যন্ত্রণা ও বাস্তব

অঞ্জনা গুহঠাকুরতা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পীসত্তার মধ্যে বাস্তবতা এবং রোম্যান্টিকতার দুটি সমান প্রবল স্রোত সমান্তরালভাবে বহমান। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যিক সত্তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই বাংলা দেশে দ্বিতীয় শিল্পী যিনি ছোটগল্পে এবং কবিতায় সমোন্নত শীর্ষবিহার করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যিক সত্তা নিয়ে যদি কবি গল্পকারদের মধ্যে সন্ত কবীরের শবদেহের মতো বিরোধ বাধে, তা হলে কবীরের ভক্তদের মতোই কোনো পক্ষ নিরাশ হবেন না।"(চতুর্থ প্রসঙ্গ 'দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী', প্রেমেন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৪২)

বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটিকে 'কল্লোল যুগ' বলা হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই পর্বের অন্যতম প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে ও জীবনদর্শনে যে সত্য, শিব ও সুন্দরের অধিষ্ঠান, তাকেই তাঁরা প্রবল যৌবনোদ্ধত ভঙ্গিতে অস্বীকার করলেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই তাঁদের জীবনদর্শনের এই বিপুল পরিবর্তন। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কল্লোলীয়রা দেখেছেন, দেখেছেন পরাধীনতার জ্বালা, গ্লানি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রথম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের মণ্ডপকলা। মার্কসের সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন, ফ্রয়েডের অবচেতন মনস্তত্ত্বলোকে অবগাহন করে মানুষের কার্যকারণের সম্পর্ক খোঁজা। নুট হামসুনের 'হাঙ্গার'-এ নরনারীর যৌনজীবনের বিশ্লেষণ—'কল্লোল' গোষ্ঠীর তরুণ সাহিত্যিকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই যুগসন্ধির যন্ত্রণাই ফলিয়ে তুলল 'কল্লোল যুগ'-এর অসামান্য কবিতা এবং ছোটগল্পের ফসল। কল্লোলীয়রা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ করেছেন, কিন্তু কবিতায় বা ছোটগল্পে তাঁরা যে জোয়ার এনে দিয়েছিলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারই উর্বর ভূমিতে সাহিত্যিকরা সোনার ফসল ফলিয়ে তুলছেন। এই যুগের যন্ত্রণাই হল ইংরেজি কবিতার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ফরাসি কবিতার নবজন্মক্ষণ এবং পৃথিবীর দেশে দেশে ছোটগল্পের আশ্চর্য ও সুপ্রচুর উদ্ভাস।

বিশ শতকের প্রথম দিকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন, কেরানি জীবন নিয়ে গল্প লেখার যে প্রবণতা, তারও সূত্রপাত সম্ভবত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী' গল্পটি থেকেই। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-দেখা মন, তার ভালোবাসা, রোম্যান্টিকতা-অথচ নির্মম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে অসহায়তা—সবই প্রখর বাস্তব এবং শিল্পসফল। 'শুধু কেরাণী' 'ভবিষ্যতের ভার' প্রভৃতি গল্প তারই স্মারক।

আবার অধঃপতিত এক জীবনধারার ছবি—কুলি, মজুর, ছাগলের দুধব্যবসায়িনী গণিকা —এদের কথাও পরম মমতায় উঠে আসে তাঁর 'মোট বারো' 'পোনাঘাট পেরিয়ে' 'সংসার-সীমান্তে' 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রভৃতি গল্পে। দেহের যে জগৎ, যে জগৎ সভ্য সমাজের

কাছে কামনায় মলিন, তাকেও অস্বীকার করেন নি প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'সাগরসঙ্গম' গল্পেও সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বিধবা বড় বউ দাক্ষায়ণীর মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা দেখেছি।

মানুষই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে সবচেয়ে বড়ো। তার জৈবিক সত্তার অংশই হয়তো কখনো কখনো বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু তার অন্তরালে মনুষ্যত্বের চিরন্তন প্রবৃত্তিগুলি কখনোই মরে না—শত দুর্যোগ—বিপর্যয়েও প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের মনে সেই বিশ্বাসের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রাখতে পারেন।

'তেলেনেপোতা আবিষ্কার' প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গল্প—সর্বজনস্বীকৃতরূপে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আঙ্গিকের নতুনত্বে, উপস্থাপনার ভঙ্গিতে—গল্পটি পাঠকের মনে এক বিষাদঘন আবহ তৈরি করে তোলে।

"টেকনিকের দিক থেকে রচনাটি যেমন অভিনব—তেমনি এর বিষয়বস্তুটিও সজলকারুণ্যে এক নিবিড় বেদনায় পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়।"(বাংলা গল্প বিচিত্রা / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

এরও মূলে মধ্যবিত্তের অসহায়তাই। রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসী মনও কখনও কখনও তার প্রার্থিত প্রিয়াকে খুঁজে পায়—

'দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে, উজ্জয়িনীপুরে"

('স্বপ্ন,' 'কল্পনা'/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

না হলেও কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে তেলেনাপোতা নামক অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে মাধুরী অধরাই থেকে যায়—কারণ বাস্তব অত সহজ নয়। শহরের ব্যস্ত নাগরিক জীবনে একসময় তেলেনাপোতার সেই স্বপ্নময় পরিবেশ, সেই ধ্বংসপুরীর, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি, —যার নাম যামিনী—তাকে "দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা" বলে মনে হ'বে।

গল্পের আঙ্গিকটিও অভিনব। প্রথম থেকেই উত্তমপুরুষে বলা এই গল্পটিতে লেখক পাঠককে তাঁর এক বিচিত্র যাত্রার সঙ্গী করে নেন।

কলকাতারই আশেপাশে এই তেলেনাপোতা। লেখকের মাছ ধরার নেশা—এবং তেলেনাপোতায় পুকুর এবং মাছ দুটোই সুপ্রচুর পাওয়া যায়—এই কথা শুনে তিনি দুই বন্ধুকে সঙ্গী করে রওনা হবেন তেলেনাপোতার উদ্দেশ্যে।

যাত্রার বিবরণটিও চমকপ্রদ। একটি মৃদু বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক প্রথম থেকেই গল্পের বর্ণনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

"পাতালের কোনো বামনের দেশ" থেকে বেরিয়ে আসা "গোরুর গাড়ির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ," বাঘ তাড়ানোর জন্য গাড়োয়ানের ক্যানেস্তারা নিনাদ—এসব পাঠকের মনকে কৌতুকে ভরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আর পাঠককে তেমনই আবিষ্ট করে রাখে এ গল্পের ভাষার সৌন্দর্য। চিত্রকরের আবছা তুলিতে যেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিহাসের কোনো লুপ্ত নগরীর ছবি এঁকে যান—

"আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধহয় উঠে এসেছে। ......স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দুপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।"

অতীত এখানে স্তব্ধ হয়ে আছে। লেখকের মনে হবে জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে তিনি অতীতের কোনো ধূসর কুয়াশাময় জগতে এসে পড়েছেন। রাত এখানে যেন ফুরোয় না—স্তব্ধতার মধ্যে সবকিছু ডুবে আছে—

"জাদুঘরের নানা প্রাণিদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।"

আশ্চর্য রোম্যান্টিক এই ছবি। ইতিহাস, স্বপ্ন, অতীত—মায়াময় কল্পনার রঙে মাখামাখি। মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের কবিতার জগৎ—

"মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।
ফালগুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্র পাড়ের কাহিনী।
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা।"

(নগ্ন নির্জন হাত / বনলতা সেন)

আজ নেই, অথচ যে বৈভবময় সম্পন্ন নগরী একদিন ছিল, ছিল সম্পন্ন মানুষজন, তারই ক্ষণিক আভাস নিয়ে আসে এই সব অপরূপ স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, এক লুপ্ত সৌন্দর্যজগৎ আমাদের মনে আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময় জাগায়।

নানা দিক থেকেই 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটির সঙ্গে 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটির সাদৃশ্য আছে। এই গল্পেও আছে বোঝা-না-বোঝায় মেশা, আলো-আঁধারিতে ঘেরা রহস্যময়ী এক নারী—যার জীবনের ব্যর্থ অনন্ত প্রতীক্ষা আর তার নিষ্ফলতা আমাদের মনকে বেদনাময় করে তোলে। আবারও মনে করিয়ে দেয়—বাস্তব জীবন অতি রূঢ় ও নির্মম।

মেয়েটির নাম যামিনী। যামিনীর জীবনও স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের এক করুণ কাহিনী। নিরঞ্জন নামে এক যুবক সেই গ্রামে বেড়াতে এসে যামিনীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে সে এখন অন্যত্র বিয়ে করে সুখেই ঘর-সংসার করছে, কিন্তু যামিনীর মা সে কথা জানেন না। সেই অন্ধ বৃদ্ধা যামিনীকে বুকে আঁকড়ে নিরঞ্জনের বিদেশ থেকে ফেরার আশায় দিন গুণছেন। নিরঞ্জনের সংবাদ যামিনী অবশ্য জানে কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিনী বৃদ্ধা মাকে সে কথা জানাবার সাহস তার নেই। লেখক ছদ্ম-পরিচয় দিয়ে যামিনীর মা'কে আশ্বস্ত করেছেন। এই কাহিনীর মধ্যে হয়তো খুব অভিনবত্ব নেই—কিন্তু রোম্যান্টিক মুহূর্ত নির্মাণে, কাব্যব্যঞ্জনায় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রই জয়ী হয়েছেন।

যামিনী চরিত্রও যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া। 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় জীবনানন্দ যে বলেছিলেন—

"যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে—

অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।"

ইতিহাসের এক বিলুপ্ত নগরীর কথা বলেন জীবনানন্দ—বলেন—

"আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ,
আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।"

যামিনী যেন এই জগতের কেউ নয়। অতীতের রহস্যমাখা রোম্যান্টিক স্বপ্নলোক থেকে সে উঠে এসেছে—কণ্ঠস্বর তার মধুর ও গম্ভীর। দরিদ্র এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত হলেও এক অটল ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে। প্রথম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ক্ষীণ আলোয় সেই ধ্বংসপুরী লেখকের মনে হয়েছিল

"অপরূপ মোহময়।"

মনে হয়েছিল—

"খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে—বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন।"

যামিনীই যেন লেখকের জীবনে সেই বন্দিনী রাজকুমারী। তাঁর জীবনে ক্ষণিকের জন্য ভেসে ওঠা এক "স্বপ্নের বুদবুদ"। জীবনানন্দের সেই অতীত সৌন্দর্যলোকে এক নারীও ছিল—কারণ নারীকে ছাড়া জীবনের কোনো সৌন্দর্যই তো সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু নিরঞ্জনের মত লেখকও তো প্রতিশ্রুতি বক্ষা করতে পারলেন না। তিনিও তো প্রতিশ্রুতিভঙ্গই করলেন।

"তোমার মুখের রূপ কত শতাব্দী আমি
দেখি না, খুঁজি না।"

'নগ্ন নির্জন হাত'-এ কবির এই বেদনা তো এই গল্পের লেখকেরও।

যামিনীর মৃত্যুপথযাত্রিনী মায়ের কাছে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও তিনি নিরঞ্জনের অভিনয় করেছিলেন। হয়তো সে বৃদ্ধা ও তাঁর কন্যার প্রতি করুণাবশতই। কিন্তু সে কি নিছকই করুণা? অন্য কিছু নয়? তা হলে বিদায় নেবার সময়ে যামিনীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেন বলবেন—

"থাক না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে?"

উক্তিটি গভীর প্রতীকগর্ভ। এবং এর উত্তরে যামিনীর আচরণ—

"যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।"

এক মধুর লাবণ্যময় পূর্বরাগের আভাসই দেয়।

কিন্তু শত ইচ্ছা সত্ত্বেও লেখক আর তেলেনাপোতায় ফিরতে পারবেন না। কারণ, আর

ফেরা যায় না। যেমন উলাপুর গ্রামে আর ফিরতে পারেননি রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাষ্টার। সাধ ও বাস্তবের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। পোস্টমাষ্টারও শারীরিক অসুস্থতার কারণে উলাপুর ত্যাগ করেছিলেন, লেখকও তেলেনাপোতা থেকে কঠিন ম্যালেরিয়া সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন।

যখন সুস্থ হলেন, তখন তেলেনাপোতার স্মৃতি "অস্ত-যাওয়া তারার মতো একটা ঝাপসা স্বপ্ন"। তেলেনাপোতার অস্তিত্বই অবাস্তব বলে মনে হবে। যামিনীকেও মনে হবে এক অলীক কল্পনা।

"একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।"

শহরবাসী নাগরিক মানুষের এও এক রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাস। দুদিনের জন্য তাঁরা গ্রামে বেড়াতে যান, মাছ ধরেন, গ্রামের মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষজনের অকৃত্রিম আন্তরিকতার প্রশংসাও করেন। কিন্তু শহরে একবার ফিরে এসে সেখানকার সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য আলোকোজ্জ্বল জীবন নিয়ে আর সেই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এঁদো পাড়াগাঁয়ে ফিরে যাওয়া চলে না।

হয়তো এটাই স্বাভাবিক। তবু গল্পের মধ্যে লেখকের মনের দোটানা ভাবটুকুও অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক মধ্যবিত্ত শহরবাসী শিক্ষিত মানুষের এটাই ট্র্যাজেডি। পারিপার্শ্বিকতার চাপে নির্মম তাকে হতেই হয়—তবুও তার বিবেকও কষ্ট পায়। বিবেক তার আছে—একেবারে মরে যায়নি।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে মধ্যবিত্তের এই বিবেকের যন্ত্রণা ও নিরুপায় অসহায়তা বড়ো সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

স্টোভ : দাম্পত্য-সম্পর্কের জটিল অন্তর্বয়ন

দিলীপ সাহা

পঞ্চাশের বেশি উপন্যাস লিখলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বাক্ষর এক্ষেত্রে তেমন নেই। 'পাঁক' উপন্যাসটি (১৯২৬) সমকালে পাঠকমহলে সাড়া জাগালেও মূলত ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবেই প্রেমেন্দ্রর যাবতীয় খ্যাতি। ছোটগল্পেই প্রেমেন্দ্র চিরজীবিত। অন্তত ছোটগল্পে কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র কবি প্রেমেন্দ্রকে অতিক্রম করে গেছেন একথা বলা যায় নির্দ্বিধায়। যুগস্রোতের বিপ্রতীপে জীবনকে দেখা ও ব্যাখ্যায়, সংরক্ত বাসনাময় দ্বন্দ্ব-জটিল নগর জীবনের সংকট ও সমস্যা চিত্রণে, নির্মোহ অথচ নিরাসক্ত রচনাশৈলীর নিপুণতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্র পরবর্তী সবচেয়ে আধুনিক কথাকার। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, কবিতায় তাঁর অন্বিষ্ট যেখানে 'গোটা মানুষের মানে', ছোটগল্পে সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে 'ভাঙা মানুষের' কথা। নীচুতলার বঞ্চিত অপজাত অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি, মানবজীবনের 'কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ'-এর কাহিনী, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মর্মোদঘাটন, ব্যথা-বেদনা ও বিকৃতির উৎস সন্ধানে দুর্জ্ঞেয় জটিল মনোলোকের নিবিড় অনুধ্যান, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা, অস্থির আত্মদ্বন্দ্ব সর্বোপরি অস্তিত্বের দুর্বহভার—এ সবই প্রেমেন্দ্রর ছোটগল্পের উপজীব্য। অনার্দ্র, সংহত, পরিশীলিত ভাষা ও কাব্যিক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতময়তা তাঁর গল্পে যেমন সংযোজিত করেছে ভিন্ন মাত্রা, বৈচিত্র্যসৃষ্টিতেও তেমনি হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী।

চরিত্রের অন্তর্মুখিনতা ও মনোবিশ্লেষণের শিল্প-কুশলতার ওপর নির্ভর করে যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর শক্তির পরিচয়। নরেশ সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যালের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পও এহেন চারিত্র্য-লক্ষণে বিশিষ্ট। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক নগর জীবনের হতাশা ও সংশয়, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের কুটিল প্রতিবেশ, অন্তর্লোকের নেপথ্যে বীভৎস বর্বরতা, গোপন কামনার বিসর্পিল হিংস্রতা ও কূটৈষণা, পাশব লোভ ও লালসা, হতাশাজনিত বিকৃতির নগ্ন প্রকাশ এবং মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পগুলিকে ভিন্ন দ্বান্দ্বিক মাত্রাই দেয়নি, মণ্ডিত করেছে নতুন তাৎপর্যেও। সমকালীন যুগমানস এর পিছনে যেমন সক্রিয় ছিল, তেমনি ন্যুট হামসন ও ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাদর্শের প্রভাবও এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের কুশলী চিত্রকর প্রেমেন্দ্র মিত্র। নগর জীবন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও সমস্যা, মনোবিশ্লেষণ, মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র জটিল রহস্যে পরিবৃত তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে আমাদের আলোচ্য 'স্টোভ' গল্পটির নিবিড় পাঠ। গল্পটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' গল্প-সংকলনে, ১৯৪৬ সালে। পরে আবার অন্তর্গত হয় 'জলপায়রা' সংকলন গ্রন্থে, ১৯৫৮ সালে। 'স্টোভ' গল্প ছাড়া মধ্যবিত্ত নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল রূপ সংস্থিত হয়েছে 'হয়তো' ও 'শৃঙ্খল' গল্পেও। 'হয়তো' গল্পটি জটিল। সম্পূর্ণ নতুন এক আঙ্গিক রীতিতে রচিত। এক অন্ধকারময় ঝড়ের রাতে একটি

অর্ধসমাপ্ত কাঠের সেতুর ওপর গল্পটির নাটকীয় সূচনা। তারপর মূল গল্পের শুরু। ভৌতিক পরিবেশ সত্ত্বেও চরিত্রের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে, বিশেষত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মহিমের দ্বৈতসত্তার কমপ্লেক্স চিত্রণে, সিচুয়েশন সৃষ্টির অনবদ্য নৈপুণ্যে, বর্ণনার ঐশ্বর্যে এ গল্প এককথায় অনবদ্য। স্বামী-স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচার আচরণের ফলে যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি, 'শৃঙ্খল' সেই মানসিক জটিলতারই গল্প। আর মনোবিকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কিভাবে জটিলতা সৃষ্টি করে তারই প্রতীকী গল্প 'স্টোভ'।

একটা পুরোনো অব্যবহার্য-প্রায় স্টোভের প্রতীকে আবর্তিত 'স্টোভ' গল্পটি। একদা কলেজের সহপাঠিনী, প্রাক্তন প্রেমিকা মল্লিকা শশিভূষণ-বাসন্তীর সংসার দেখার কৌতূহল নিয়ে হঠাৎ হাজির হলে আপ্যায়নের জন্য বাসন্তী তাড়াতাড়ি তাদের পুরোনো অকেজো স্টোভটা ধরাতে গেলে উদ্বিগ্নভাবে শশিভূষণ বলে ওঠে, 'তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ'! স্বামীর দিকে চেয়ে, একটু হেসে বাসন্তী উত্তর দেয়, 'তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে তো আর বিদেয় করতে পারি না'। একনাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধরে উঠলে চায়ের কেটলিটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে। বলে, 'আমায় একটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা ব'সে ততক্ষণ গল্প করুন।'

মল্লিকা মাথা নিচু করে বসে থাকে। আর এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত তা বুঝতে না পেরে শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ ঈষৎ চাপা গলায় মল্লিকা বলে, 'এভাবে এসে বোধ হয় ভালো করিনি। ....কেন যে এতদিন বাদে এ খেয়াল হল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরো দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদলাবার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষাও করেছি চার পাঁচ ঘণ্টা। তখনো জানতাম তোমরা এখানেই আছ।' শশিভূষণ এ কথার কোনো জবাব দেয় না। এই কথাবার্তার মাঝেই স্টোভটা হঠাৎ দপদপ ক'রে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নিভে যায়। নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু সরে বসে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজে গোটা ঘরটা ভরে যায়। শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পাম্প দিতে বারণ করে বলে, 'স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে'। শশিভূষণের দিকে তাকিয়ে মল্লিকা জবাব দেয়, 'তাহলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়—না'? স্টোভের আওয়াজে বাসন্তী দরজায় এসে দাঁড়ায়। তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা টেবিলে রেখে বলে, 'খারাপ হতে যাবে কেন? ওঁর ওইরকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হলেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায়'! মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। আর কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চিৎকার করে বলে, 'তোমার ভয় নেই ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে আগুন ধরাব বলে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক নিবে গেলেও একটা দুটো স্ফুলিঙ্গ হয়তো এখনো আছে, নির্লজ্জের মতো এই আশাই করেছিলাম।' এ-সব কিছুই সে বলে না অবশ্য। কারণ শশিভূষণ সেই জাতের পুরুষ যে ভাগ্যের কাছে আগে থাকতেই হার মেনে বসে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস অন্তত তার চরিত্রে নেই। এতটুকু চারিত্রিক

দৃঢ়তা থাকলে সেদিন তাদের জীবনের ইতিহাস অন্য খাতে বইতো। নিজেকে সংযত করলেও মল্লিকা মনে মনে ভাবে, সেদিন সে চরম ভুল করেছিল। একটু নির্লজ্জ হয়ে সেদিন শশিভূষণের ওই জড়তা ভেঙে দিতে পারত। বা ইচ্ছে করলে সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি সে-ই তো তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারীসুলভ সংকোচে, লজ্জায়, আর কিছুটা অভিমানে। আবার এ প্রশ্নও চকিতে তার মনে জাগে, এই ব্যক্তিত্বহীন, দুর্বল মানুষটির জন্য গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্তে সে নিঃশব্দে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে, কিন্তু শশিভূষণকে জয় করে নিলে সত্যিই কি সে সুখী হত?

এদিকে কেটলির জল ফুটে স্টোভের ওপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর হুঁশ হয়। কেটলি নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিবিয়ে দেবার জন্য চাবিটার দিকে সে হাত বাড়ায়। তার ভয়, স্টোভটা কি এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? বিয়ের পর স্বামীর এই প্রেমিকাটির কথা শুনে ক্ষোভে-বিতৃষ্ণায় সেদিন এই স্টোভটাকেই সে 'শেষ মুক্তির পথ' বলে ঠিক করে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না। কিছু বুঝবে না। কোনো অপবাদ কারও গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে, শুধু একটা 'দুর্ঘটনা' হল। সেদিন এত বড়ো নিদারুণ সংকল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য লাগে। মল্লিকাকে সে কি ভাবেই না কল্পনা করেছে। সে-কল্পনার সঙ্গে আজকের এই চাক্ষুষ পরিচয়ের কত তফাত! মল্লিকাকে ঠিক কুশ্রী বলা চলে না। তবে সে-রূপও তার নেই যাতে পুরুষের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। শিক্ষিতা আধুনিকা বলে তার সাজসজ্জায় একটা পরিচ্ছন্নতা থাকলেও বয়সের ছাপটা একেবারে আর লুকোনো নেই। স্বামীর সঙ্গে কলেজে পড়ত, কাজেই বয়সও নেহাত কম হল না।

ও-ঘরে বসে ওরা গল্প করছে। যাই করুক, কিছু এসে যায় না। স্থির বিশ্বাসে বাসন্তী জানে, কোনো রং যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে সে-রং আজ ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ আর কোনো ভয় নেই। 'ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে'? চমকে ওঠে বাসন্তী। কী ভাববে তাহলে মল্লিকা? অনায়াসেই ভাবতে পারে, এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সে-ই বুঝি মূল। সে আসাতেই বুঝি 'বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ'! এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই আজ মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা কিন্তু সত্যিই উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করে ওঠে। কোথাও সরে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পর্যন্ত পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে তাই চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কারণ কিছুতেই আজ সে মল্লিকার কাছে হার মানতে রাজি নয়।

দুই

শুধু বিষয়বস্তু নয়, প্রকরণ কৌশলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কত দক্ষ শিল্পী এ গল্প তার প্রমাণ। মনস্তত্ত্বমূলক এই গল্পটির শুরু নাটকীয়ভাবে :

> 'স্টোভটা আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে যায়। কোনোরকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে-থেকে অদ্ভুত শব্দ করে এমন দপদপ করে ওঠে যে ভয় করে'।

আর পরিণতি ইঙ্গিতধর্মিতায় : 'কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না'।

একদা কলেজের সহপাঠিনী প্রাক্তন প্রেমিকা মল্লিকা রায়কে উপলক্ষ করে শশিভূষণ-বাসন্তীর মনোবিশ্লেষণের রেখাচিত্র অপরূপ শিল্প কুশলতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে স্টোভের প্রতীকে। গল্পটির প্রাণ ভাবের এই একমুখিতায়। প্রতীকের অন্তর্মুখে ত্রিকোণ প্রেমের জটিল মনস্তত্ত্বকে এমন কৌশলে ধরবার পারদর্শিতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনন্য শিল্পকুশলতার পরিচায়ক। কাহিনীর প্রয়োজনেই ঘটনার বিন্যাস। কিন্তু এর পরিণাম তাৎপর্যপূর্ণ। শশিভূষণ-বাসন্তীর পাঁচ বছরের সাংসারিক জীবন দেখার কৌতূহল নিয়ে মল্লিকার হঠাৎ উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে দুটি নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই এ গল্পের আসল রসকেন্দ্র। শশিভূষণ না বললেও মল্লিকা এতদিন বাদে নিজেই যেচে এসেছে। তাই বাসন্তী মনে মনে খুশিই হয়েছে। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে, এ যেন তারই ঋণশোধ। ও-ঘরে বসে শশিভূষণ-মল্লিকা গল্প করছে এখনো। ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে? চমকে ওঠে বাসন্তী। কী ভাববে তাহলে মল্লিকা? 'কী ভুল ধারণাই না সে করতে পারে! অনায়াসেই ভাবতে পারে এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সে-ই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ!' উপযুক্ত সংকট ও স্থান পরিবেশে মহামুহূর্তের এই চরম ক্ষণে গল্পটি ভিন্ন তাৎপর্যে হয়ে উঠেছে মহিমা-মণ্ডিত। প্রকাশভঙ্গির এহেন ইঙ্গিতধর্মিতায় গল্পটি বিশিষ্ট। সেইসঙ্গে কথাকার প্রেমেন্দ্র মধ্যবিত্ত মানব মনস্তত্ত্বের যে কত বড়ো সুনিপুণ রূপকার সেই জীবনবোধও আলোচ্য গল্পে সমানভাবে প্রতিভাসিত। বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষার উপযোগ্যতাও প্রশংসনীয়। রচনার গতি অনায়াস। বলবার ভঙ্গিটিও মনোরম। প্রতীতির সমগ্রতাও সযত্নে রক্ষিত। আর 'স্টোভ' ছাড়া এ-গল্পের নামান্তর ভাবাই যায় না।

স্টোভ শুধু বাসন্তীরই নয়, তাদের দাম্পত্য সম্পর্কেরও যেন মূর্ত প্রতীক। স্টোভটার হঠাৎ হঠাৎ দপদপ করে ওঠা, আঁচ নিবে যাওয়া, শিখা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজে ঘর ভরে ওঠা বা নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে ফণা তোলার মধ্যে শশিভূষণ, মল্লিকা ও বাসন্তীর চরিত্রের সাধর্ম্যে একান্তভাবে সংলিপ্ত। যেমন :

১. 'হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে আরে করছ কী? অত পাম্প দিয়ো না'। পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে—'কেন'? 'মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে'। শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে, 'তাহলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়—না'?

২. হঠাৎ শশিভূষণ চমকে উঠে বলে—'ও কী হচ্ছে কী? বলছি পাম্প দিয়ো না, বিপদ হতে পারে'। স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড়ো একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে—'বিপদ আবার কি হল'? মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুকে হাসির সঙ্গে বলে—'দেখুন তো বউদি! আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে! স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি'?

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোটো টেবিলটার ওপর রেখে বলে,—'খারাপ হতে যাবে কেন? ওঁর ওইরকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হলেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায়'?
'আমিও তাই বলি'। মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে চারিধারে যেন ফণা তোলে।
শশিভূষণ কী বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু ভীত অসহায়ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়।

৩. মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে বলে—'আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন যে স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম'।
'না, ভয় পাব কেন? ফাটবার হলে ও স্টোভ অনেক আগেই ফাটত'!

এই কারণেই স্টোভ এ গল্পের মূল চরিত্র। শুধু তাই নয়, প্রধান চরিত্র তিনটির ভাবনা চিন্তা, মনের গহন কোণে নানান নাটকীয় ওঠাপড়া, টানাপোড়েন, বাচনভঙ্গিও স্টোভের বিচিত্র আচরণে নিয়ন্ত্রিত। আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল শশিভূষণকে নিয়ে মল্লিকার ঘর বাঁধার স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গজনিত হতাশা, নিরুদ্ধ কামনার যন্ত্রণা স্টোভের 'নীল আগুনের শিখা'-র মতোই 'হিংস্র গর্জন'-এ ফেটে পড়তে চেয়েছে। অপরদিকে বিয়ের পর বাড়ির আর পাঁচজন হিতৈষি ও স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম শুনলেও বাসন্তী ততটা আহত হয়নি, যতটা হয়েছে শশিভূষণের 'আপাতনির্বিকার নীরবতায়'। কোনো ব্যাপারেই তাঁর যেন কৌতূহল নেই : 'অসহ্য, অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভালো ছিল।' স্বভাবতই ওই স্টোভের সামনে বসে তার মনে হয়েছিল, 'কী ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ করে দিলে'। তারপর ধীরে ধীরে এই নিরুত্তাপ জীবনকে মেনে নিয়েছে। বদলে গেছে। তবু মাঝে-মধ্যে তার ভয় করে। স্টোভটা যদি ফেটে যায়! তাহলে তো মল্লিকার এই ধারণাই হবে, এই 'বিস্ফোরণ' বুঝি 'বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার' 'আত্মঘাতী' পরিণাম। আর শশিভূষণ শুধু ব্যক্তিত্বহীনই নয়, ভীত, সর্বদাই সংকুচিত। মল্লিকার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বাড়ির সবাই জানত। কিন্তু শেষপর্যন্ত দায়িত্ব এড়িয়ে সে সরে গেছে। ভাগ্যের কাছে নতজানু এই মানুষটি স্রোতের বিপরীতে হাঁটার সাহসটুকু পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। এটাই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। সুতরাং স্টোভ এই গল্পের প্রধান তিন চরিত্রের যাবতীয় ভাবনা ও পরিস্থিতির বিশিষ্ট প্রতিরূপক।

সাধু ও চলিত দুই ভাষারীতিতে লিখলেও প্রেমেন্দ্রর আলোচ্য গল্পের ব্যবহৃত ভাষা মান্য চলিত গদ্য। তাতে অবশ্য তৎসম শব্দ ব্যবহারে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। যেমন :

> 'অনেক ভেবে-চিন্তে মিউজিয়মের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক করে নিয়েছিল।....মিউজিয়মের সেটা পাথুরে নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ হয়ে আশ্চর্য পাথর হয়ে গেছে, গ্রহলোক থেকে যত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গেছে, সে-ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।'

শশিভূষণ-মল্লিকার একসময়ের ভালোবাসার সম্পর্ক যে পাথুরে মিউজিয়মের মতোই নিষ্প্রাণ, প্রস্তরময় এ বর্ণনা তারই সার্থক দৃষ্টান্ত।

কখনো এক একটি বাক্যে চরিত্রকে নিখুঁতভাবে ধরবার অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রেমেন্দ্র। তিনটি উদাহরণ :

ক. 'স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই।'

খ. 'শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস করে চিনতে চায় না।'

গ. 'ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হয়ে উঠত না কি?'

ভীরু, কাপুরুষ শশিভূষণকে চিনতে উপরি-উক্ত তিনটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। বিশেষত স্টোভের 'ভিজে সলতে'-র সঙ্গে ব্যক্তিত্বহীন শশিভূষণের প্রতি-তুলনাটি নিঃসন্দেহে ব্যঞ্জনাধর্মী।

শব্দ ব্যবহারেও প্রেমেন্দ্র সমান সচেতন। 'দপদপ' ধ্বন্যাত্মক শব্দ যেমন চরিত্রের মানসিক অবস্থার ইঙ্গিতবহ, তেমনি 'থেকে থেকে', 'আরে আরে', 'ভেবে চিন্তে', 'পুড়ে পুড়ে', 'সাজিয়ে গুছিয়ে', 'ফেটে টেটে', 'ধীরে ধীরে', 'ধুয়ে মুছে' প্রভৃতি শব্দদ্বৈত বিশেষ ঘটনা, পরিস্থিতি বা পটভূমি উদঘাটনের সূচক। আর 'সাইলেন্সার', 'পাম্প', 'কর্কশ' 'কেলেঙ্কারি', 'হিংস্র গর্জন', 'ফণা', 'শিখা', 'সলতে', 'দুর্ঘটনা' প্রভৃতি শব্দ স্টোভের প্রতীকী ব্যঞ্জনার দ্যোতক।

'স্টোভ' গল্পটিব শিল্পসৌকর্য প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির এহেন সংশ্লেষে। প্লটের উপস্থাপনায়, স্মৃতি রোমন্থনেব অতীত উদ্ভাসে, নাটকীয় ঘটনার টানাপোড়েনে, মনোবিশ্লেষণের অভ্রান্ত নৈপুণ্যে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, নিরাবেগ সংযত ভাষার মার্জিত প্রয়োগে 'স্টোভ' প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি সার্থক মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প।

তিন

একথা ঠিক, মণীশ ঘটকের মতো প্রেমেন্দ্র 'দুর্ধর্ষ' 'উদ্দাম' নন, পটলডাঙার পাঁচালিকারও নন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনায় তাঁর শিল্পিমানস ভাবাবেগে আপ্লুত নয়। এমনকী বুদ্ধদেব বসুর মতো ভালোবাসাব বিচিত্র রূপে, নস্ট্যালজিক স্মৃতির ভারে তিনি আন্দোলিত নন। স্নিগ্ধতা, পেলবতার সম্পূর্ণ বিরোধী তিনি। বরং ভাঙাচোরা মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের জটিল চালচিত্র অঙ্কনে, বহুবিচিত্র মানবিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যানে তিনি এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকোবিদ। আর এখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাতন্ত্র্য। অনন্যতাও।

হয়তো : বিকল্প সম্পর্কের সাংকেতিক সেতু

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

'হয়তো' শব্দটিকে সামনে রেখেই গল্পের অভ্যন্তরে গল্পের বিকাশ এবং পরিণতির ইঙ্গিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'হয়তো' গল্পে ('পুতুল ও প্রতিমা' গল্পগ্রন্থ, ১৯৩২)[১] বর্ণিত সেতুটির দুই প্পারের অন্ধকারের মতো কাহিনির শুরু এবং শেষ রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা, মাঝখানে বিশ্বাস ও সন্দেহে দোদুল্যমান বিপজ্জনক জীবনসেতু—যেখানে আটকে ঝুলছে দাম্পত্যসম্পর্ক। আকস্মিক আঘাতে পড়ে গিয়েও সেতুতে উঠে আসে লাবণ্য চরিত্র নয়, যেন পাঠকই। কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কাব বিপর্যস্ত হয়ে যায়, শুধু থাকে স্বস্তিহীন অনুভূতি 'হয়তো'। আদি অন্তহীন কাহিনীর বুননে আস্থা-অনাস্থার টানাপোড়েনে গাঁথা মানব-মনের অনুভূতি—যার রহস্য 'হয়তো' আদি অন্তহীন—মনোলোকের সেই অতল অন্ধকারে জেগে আছে একটি বিন্দুশীর্ষ 'হয়তো' ...

'কেন লিখি' প্রবন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন,

> ....''লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়, মানসিক বিলাস নয়।
> সামনে ও পেছনেব এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুর্জ্ঞেয় পণ্যময় জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়।''[২]

অন্ধকার দুর্যোগের রাতে সেতু পারাপারের চেষ্টা করেছে মহিম ও লাবণ্য; তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের একদিকে সংশয়বিদ্ধ বিশ্বাস এবং অন্যদিকে বিশ্বাসব্যাকুল সন্দেহ, মাঝখানে—

> ...''একটা নূতন অর্ধসমাপ্ত সেতু....। ....চলাচলের উপযুক্ত হইয়া ওঠে নাই।''

এখান থেকেই ছোটোগল্পের কুশলী শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র 'জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়' স্বীকার করে নিয়েছেন।

কবি এবং কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রেমেন্দ্র দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে জীবনের সমগ্রতাকে দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রোত্তর কালে কল্লোলের লেখককুল যে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন তার মূলে ছিল বাস্তব জীবন। রবিশস্যের খামার পেরিয়ে আধুনিক জীবনের জটিল মননের ভূমিতে উত্তরণের পথে সেদিন দুঃসাহসী লেখককুলের স্বাধিকারপ্রমত্ত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র তাঁদেরই একজন। 'প্রথমা'-র কবি প্রেমেন্দ্রর অন্বিষ্ট 'গোটা মানুষের মানে!' এই বস্তুনিষ্ঠ সমগ্রদৃষ্টি গল্পকার প্রেমেন্দ্রকে দিয়েছে অনন্যতা। তাঁর সহানুভূতি জীবনের প্রতি, কোন বিশেষ মানুষের প্রতি নয়।

· গল্পের মূল চরিত্র সংশয়। টানটান অনিশ্চয়তায় বিশ্বাসের সেতু থেকে পড়ে গিয়েও পাঠক লেখকের হাত ধরে উঠে আসে জীবনের সেতুতে; কিন্তু সে জীবনে সংলগ্ন হয়ে যায় সংশয়—'হয়তো'; এখানেই গল্পকারের 'বস্তুনিষ্ঠ সমগ্রদৃষ্টি' এবং স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। জীবনের মধ্যে যে আকস্মিকতার স্পর্শ আছে তাকে ছুঁয়েছেন তিনি। ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার রাতে অস্পষ্ট আলোকে স্পষ্ট দেখা গেছে দাম্পত্যসম্পর্কের ফাটল। লাবণ্য এবার রক্ষা পেলেও লেখকের নির্লিপ্ত মন্তব্য—

> "হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে!"

আকস্মিক মুহূর্তটি জন্ম দিয়েছে অনির্দেশ্য ঘটনার সম্ভাব্য ইঙ্গিত 'হয়তো'... গল্পটি বিষয় এবং আঙ্গিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সার্থক সংলগ্ন।

আলোচ্য গল্পের বিষয় দাম্পত্যসম্পর্কের জটিল বাস্তব রূপ। শুধু 'হয়তো' নয়, প্রেমেন্দ্র-র বেশ কিছু গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় দাম্পত্যসম্পর্কের জটিলতা ('ভস্মশেষ', 'শৃঙ্খল', 'স্টোভ' ইত্যাদি)। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প 'শুধু কেরাণী' দম্পতির গল্প। দাম্পত্য সম্পর্ককে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। প্রতিটি গল্পেই দাম্পত্য বিষয়ের ভিন্নতর ব্যঞ্জনা।

'হয়তো' গল্পের দম্পতি মহিম এবং লাবণ্য। এই নাম দুটি লেখকের কল্পনার চিহ্নমাত্র, আদিম রহস্যময় অন্ধকারে তারা নির্বিশেষ—

> ....."তরল অন্ধকারে দুইটি নাতিস্পষ্ট নরনারী-মূর্তি"....

অবস্থানগত বাস্তবতার হেরফেরে এ গল্প দম্পতির নয়, জটিল দাম্পত্যসম্পর্কের গল্প, যা প্রেমেন্দ্র-র অন্যান্য গল্পগুলির থেকে স্বতন্ত্র। গল্পের তথা দাম্পত্যসম্পর্কের অভ্যন্তরে প্রবেশের কুঞ্চিকা এক অদ্ভুত অনুভূতি—'হয়তো'—দাম্পত্যসম্পর্কের রহস্যময় অন্ধকার তলদেশ ঘেঁটে তুলে আনা অনাদি-অনন্ত ইশারা।

উপস্থাপনার নিরিখে 'হয়তো' গল্পের কাহিনি অনন্য। গল্পকারের কৈফিয়তের সূত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শিল্পী একটি দৃশ্যকে ভিত্তি করে একটি নিটোল ছোটোগল্প পরিবেশন করতে চেয়েছেন। কাহিনি তাঁর সাজানো বলে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন 'হয়তো'—সম্ভাব্য ইঙ্গিতে; এখান থেকে শুরু হয়েছে পাঠকের মনে মনে আর এক কাহিনির নির্মাণ। 'হয়তো' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের নির্মোক খুলে গেলে উদ্ভাসিত হয় গল্পের অন্তর্গত গল্পটি (story within a story)।

গল্পটি শুরু হয়েছে লেখকের দেখা একটি ঘটনার কথা দিয়ে। কোন এক অন্ধকার ঝড়ের রাতে দুই নরনারী অর্ধসমাপ্ত বিপজ্জনক সেতু পার হবার চেষ্টা করছে। ভীত অনিচ্ছুক মেয়েটিকে যেন পুরুষটি আকর্ষণ করছে। পার হতে গিয়ে পড়ে যায় মেয়েটি। তার চিৎকার শুনে লেখক দেখেন সেতুতে শাড়ি আটকে মেয়েটি নিম্নমুখী হয়ে নদীর ওপর অতল অন্ধকারে ঝুলছে। সঙ্গী পুরুষটির সাহায্যে লেখক তাকে টেনে তুলে আনেন সেতুটির ওপর। ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে যাবার সময় তাদের পারস্পরিক সংলাপ লেখকের মনে 'চিরন্তন সন্দেহ ও বিস্ময়' জাগিয়ে তুলেছে। মেয়েটি বলে,

> ..."কী আশ্চর্য দেখো, প'ড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হল তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা ফসকে তো পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হল তুমি ঠেলে দিলে..."

পুরুষটি তাকে হেসে বলে,

> "পাগল! কি যে বলো; আমি ঠেলে দেব তোমায়..."

লেখকের দেখা এবং শোনা এখানেই শেষ। এখান থেকেই দ্বিতীয় কাহিনির শুরু। লেখক জানিয়েছেন তিনি ঐ ঘটনা ভুলতে পারেন নি—

> "সময়ে অসময়ে সেই বিপদসঙ্কুল সেতুর উপর অস্পষ্টভাবে দেখা মূর্তি দুইটি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ, নানা প্রশ্ন মনে জাগে।"

মানুষের জান্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই গল্পকারকে প্ররোচিত করেছে একটি কাহিনি রচনায়—

> "সেই অসাধারণ ঘটনা ও সেই অস্পষ্ট দেখা দুইটি মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটি কাহিনী মনের ভিতর আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে।"

দ্বিতীয় গল্পটি কল্পনা মাত্র জানিয়ে লেখক কাহিনির অভ্যন্তরে নিয়ে যান পাঠককে। 'নিয়োগীদের সাতপুরুষের কোটা' এক জরাজীর্ণ অট্টালিকায় প্রবেশ করছে নবদম্পতি মহিম এবং লাবণ্য। একদা অত্যাচারী-অনাচারী সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের শেষ বংশধর মহিম। সে স্ত্রী লাবণ্যের সঙ্গে অসুস্থ দাম্পত্যজীবন যাপন করে। তার ব্যবহারে ধারাবাহিকতা নেই। অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তরের মাঝে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে—

> "একবার জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে নিলেই পছন্দ হয়ে গেল!
> এই তো পছন্দের দাম? কেমন, না?"

আবার উত্তেজনা কমে গেলে বলে,

> "ও কিছু নয়, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করলাম! তুমি আমায় সারাজীবন সত্যি ভালোবাসবে তো? —বাসবে?"

কখনো রাতে সে লাবণ্যর আঁচলে আর নিজের কাপড়ে গেরো বেঁধে রাখে। কখনো বা তাকে ঘরে বন্ধ করে দেয়। মাধুরী এসে তাকে মুক্ত করে। কিন্তু সেও অস্বাভাবিক এবং রহস্যময় চরিত্র। লাবণ্যর ফুলশয্যার রাতে তার ফুলের গহনা নিজে পরে এবং তারপর নষ্ট করে ফেরত দিয়ে যায়। আবার কখনো মাধুরী লাবণ্যকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চায়। একচক্ষু পিসিমা মূর্তিমতী জরা, শকুনির মতো দৃষ্টি নিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো সম্পত্তি আগলে রয়েছে।

মহিম সম্পত্তির পিছুটান উপেক্ষা করে পথে বেরিয়ে পড়ে। লাবণ্যর ভালোবাসায় শুচিস্নান করে সে সুস্থ জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু অকারণ সন্দেহ তার রক্তের গভীরে অসুখের জন্ম দিয়েছে। সেতু পারাপারের সময় টানাটানিতে অথবা তার ধাক্কায় লাবণ্য পড়ে গিয়েও উঠে আসে সেতুতে। কিন্তু দাম্পত্যসম্পর্কটিকে আমূল বিদ্ধ করে দেয় সন্দেহের কাঁটা—'হয়তো'....। এখানেই দ্বিতীয় গল্পটি শেষ।

পোল পার হয়ে দম্পতি কোথায় গেল লেখকের কল্পনার অগম্য। নিজের কল্পনায় ছেদ টানলেও লেখক তৃতীয় গল্পটির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছেন পাঠকের কল্পনাকে উসকে দিয়ে—

> "কে জানে, মাধুরী হয়তো সেই জনহীন ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে এখনো প্রেতিনীর মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।"

কে এই মাধুরী? চৌধুরী বংশের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? 'প্রেতিনীর মতো' উপমায় লেখক কি ইঙ্গিত করেছেন? লাবণ্য এবারের মতো বাঁচলেও মহিম কি তাকে আবার অন্য কোথাও ফেলে দেবে? এরকম অনেকগুলি 'হয়তো' ...কে ঘিরে পাঠকের মনে লতিয়ে ওঠে তৃতীয় গল্পটি—যার আভাসমাত্র দিয়ে লেখক অর্ধসমাপ্ত কাহিনির সেতু পথটি পার হয়ে যাবার দায় পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন।

পরিকল্পিত বিভ্রান্তি (calculated indirection)-এ গল্পের শৈলীর বৈশিষ্ট্য। গল্পকার পাঠককে reality থেকে illusion-এর জগতে নিয়ে যাবার জন্যে সচেতনভাবে আপাত বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন।

প্রথম গল্প উপস্থাপিত হয়েছে উত্তম পুরুষ বা আত্মকথন রীতিতে, দ্বিতীয়টি সর্বজ্ঞ রীতি এবং তৃতীয় গল্পের সম্ভাবনা জেগে উঠেছে আত্মকথন রীতিতে।

ছোটোগল্পের প্রকরণ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক এবং উদ্ধারযোগ্য :

> "...সব গল্পেরই আরম্ভ মাঝখান থেকে, ...। গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মত বয়ে, তার মাঝের খানিকটা ধরি মাত্র, ...এই ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। ব্যস্ এই পর্যন্ত কিংবা বলতে পারো অপরূপ কোন বয়ন বস্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রঙের কাজ অফুরন্ত বনাত, আমরা মাঝখান থেকে হঠাৎ কাঁচি চালাই, কেটে আনি এক টুকরো রঙ বেরঙ-এর কাপড়।"[৩]

জীবন নামক বাস্তবের শুরু এবং শেষ রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা। 'হয়তো' গল্পেরও শুরু এবং শেষ নেই। এই আঙ্গিক স্মরণ করিয়ে দেয় গল্পকারের উক্তি—

> "...শুরুও সত্যি বলতে গেলে কোন গল্পেরই নেই, শেষও না।"[৪]

'হয়তো' গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে রহস্যময় শিহরণ জাগানো আবহে। একটি দৃশ্য দেখে এবং শুনে লেখক কাহিনি কল্পনা করেছেন। তিনি ছেলেবেলায় প্রথম কল্পনার ব্যবহার শিখেছিলেন খেলার সাথী লজ্জুর কাছে এবং গল্পলেখার হাতে খড়ি কিশোর বয়সে বীরুমামার কাছে।[৫] সেইসূত্রে 'স্বপ্নালোকিত জরাজীর্ণ অট্টালিকার প্রকোষ্ঠ', 'রহস্যময় পরিবেশ' তাঁর শিশুমনকে প্রভাবিত করেছিল। 'হয়তো' গল্পের পরিবেশে তার ছায়া ('তেলেনাপোতা আবিষ্কারে'ও)। ঝড়বৃষ্টির রাতের অন্ধকার, অস্পষ্ট আলোকে ছায়াচ্ছন্ন নরনারী, বিশাল ভগ্ন প্রাসাদ, মাকড়সা, চামচিকে, ইঁদুর, সরীসৃপ ইত্যাদির আশ্রয়; মহিমের অসুস্থতা, পিসিমার বীভৎস দৃষ্টি, মাধুরীর অস্বাভাবিকতা—সব মিলিয়ে লাবণ্য কেন পাঠকেরও গা ছম্ ছম্ করে। এই শিহরণ জাগানো আবহে পরিবেশিত হয়েছে নরনারীর বিষিয়ে যাওয়া সম্পর্কের গল্প।

শ্রেণিবিচারে দাম্পত্যসম্পর্কের এই গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। লেখকের সাজানো কাহিনিতে গল্পের বাস্তবতা আসলে পাত্রপাত্রীর মনোলোকের রহস্যময়তায় নিহিত। জীর্ণ অট্টালিকা, মহিমের ব্যবহারে বৈপরীত্য, মাধুরীর অস্বাভাবিকতা এবং ইঙ্গিতময় সংলাপ, পিসিমার হিংস্র দৃষ্টি, সঞ্চিত গহনার স্তূপ—এসবই প্রতীকী মাত্রায় উদ্ভাসিত হয় পাঠকের মনে। মহিমের মনে বাসা বেঁধেছে বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত অসুস্থতা; মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম 'Paranoia', আর কবির ভাষায় তার রক্তের গভীরে খেলা করে বিপন্নতা—নিজে

পুড়ে অন্যকে পুড়িয়ে যার পরিণতি অতল খাদের অনির্দেশ্য অন্ধকারের দিকে। এই বিধ্বংসী অসুস্থতার পাশাপাশি স্ত্রীর ভালোবাসার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। —দুয়ের টানাপোড়েনে মহিম অস্থির। জীবনের সেতু থেকে পড়ে যাওয়া এই মানুষটি লাবণ্যকে আশ্রয় করে উঠে আসতে চেষ্টা করে—

> "তুমি জানো না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে। কিন্তু এ-বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই।"

> "...অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে-সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই।'

কিন্তু নতুন জীবন শুরু করার আশা দিয়েও সে স্ত্রীকে সেতু থেকে ফেলে মারতে চায়। তাকে তাড়া করে সন্দেহ—

> "কী বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কী তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ!"

লাবণ্য বেঁচে ফিরে এলেও সন্দেহের কাঁটা বিঁধে যায়—'হয়তো'। লেখক নরনারীর সম্পর্কের গভীরে ডুব দিয়ে তলদেশ ঘেঁটে তুলে এনেছেন জটিল মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি—প্রবহমান জীবনের রহস্যময় ইশারা—সম্ভাব্যতার শিহরণ অজস্র 'হয়তো'...

গল্পটির গদ্যভাষা পরিবেশ সৃজনে, চরিত্র নির্মাণে যথাযথ এবং আবেদনে সূচীমুখ। ভাষার দুটি রূপ—বর্ণনা ও সংলাপ। বর্ণনার ভাষা সাধু এবং সংলাপের চলিত। সাধু ও চলিত রীতির গ্রন্থনে বর্ণনা ও সংলাপের যুগলবন্দি আদ্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখে।

শব্দ ব্যবহারে বৈপরীত্য গল্পের প্রবাহে মানানসই। সাধু গদ্যে কথ্য ভাষা বর্জনের শুচিতা নেই। একই বাক্যে 'অনুসরণ' এবং 'গজ গজ', 'গন্ধভারাক্রান্ত পথ' এবং 'হোঁচট' শব্দযুগ্মের সহাবস্থান বিসদৃশ হয় নি। একাধিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে সঞ্চারিত হয়েছে অভ্যস্ত ঘরোয়া সুর ঃ

> ক. "পিছনে ঝি বাধ্য হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে করিতে আপনমনেই গজগজ করিতেছিল"—...
>
> খ. 'ট্যাং ট্যাং ক'রে এক মড়িপোড়া পুরুত এল বরকে নিয়ে;"

চরিত্রানুগ সংলাপ রচনায় শব্দচয়ন লেখকের বাস্তবতাবোধের পরিচায়ক। কনের সঙ্গী কাজের মহিলার সংলাপে 'গা', 'গো', 'ওমা', 'মিনসে', 'বরযাত্তর', 'মড়িপোড়া', 'আকখুটে', 'জ্ঞাতগোত্তর', 'শ্যাল-কুকুর', 'নেমকানুন', 'মুখপোড়া' প্রভৃতি কথ্য বাংলা শব্দ চরিত্রের সামাজিক অবস্থান এবং মানসিক বিরক্তির সার্থক প্রকাশ।

মহিম প্রসঙ্গে মাধুরীর সংলাপে 'কুরে কুরে খায়' শব্দগুচ্ছে ঘুণপোকার চিত্রকল্পে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষয় ফুটে উঠেছে। বর্ণনার ভাষায় প্রেমেন্দ্র একাধিক অলংকার ব্যবহার করলেও কবিত্বের সৌরভ ভাবালুতা সৃষ্টি করে নি। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

> ক. "পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দির মতো মাটির

শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

খ. "শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়া মূর্তিমতী জরা যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।"

'হয়তো' নামকরণ সাংকেতিক। গল্প তথা দাম্পত্যসম্পর্কের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে সম্ভাব্যতার শিহরণ; অথবা বলা যায় 'হয়তো' এই সম্ভাব্যতাকে সামনে রেখেই গল্পের বিস্তার।

লেখকের কৈফিয়ৎ অনুযায়ী গল্পের ভেতরের গল্পটি কাল্পনিক অর্থাৎ 'হয়তো'-কে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে এবং গল্পের শেষে দুটি বাক্যে 'হয়তো' শব্দের ব্যবহারে তৃতীয় গল্পের সম্ভাব্য ইঙ্গিত দিয়ে লেখক পাঠকের কল্পনাকে উসকে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, মহিম চরিত্রটির মন আগাগোড়া নানান 'হয়তো'র টানাপোড়েনে অস্থির। তার চরিত্রটি চিহ্নিত হয়েছে 'হয়তো' কে সামনে রেখেই। মাধুরীর অস্বাভাবিকতা আবর্তিত হয় 'হয়তো'-কে ঘিরে। লাবণ্য মরতে মরতেও ফিরে আসে 'হয়তো'-র কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে। পিসিমা চরিত্রটিও 'হয়তো'-র ঘেরাটোপে ঘেরা।

'হয়তো'-কে ঘিরে উপস্থাপনায় গল্পের বিষয় এবং আঙ্গিকে এসেছে স্বাতন্ত্র্য। কাহিনীর শুরু এবং শেষ অন্ধকারে—যে আবহে 'হয়তো'-র বিস্তার। আগাগোড়া 'হয়তো'-কে ঘিরে বিকশিত গল্পের দাম্পত্যসম্পর্কটির কেন্দ্রবিন্দুতেও 'হয়তো'। এমন বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রাসঙ্গিক ও সার্থক নামকরণ 'হয়তো'।

নিটোল ছোটোগল্পের উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সরল প্রয়াস করেন নি প্রেমেন্দ্র; তিনি মনস্তাত্ত্বিকের মতো মনের সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের উপরিতলের চিত্র তুলেছেন, বাকি সবটুকুই অতলে ইশারা করেছেন। কাহিনিরচনার কৈফিয়ৎ দুর্বলতা[৬] নয়, বরং শৈলীর স্বাতন্ত্র্য। কাহিনির আদি ও অন্ত রহস্যের অন্ধকারে অদৃশ্য, কেবল নড়বড়ে সেতুটিই অস্পষ্ট আলোকে দৃশ্যমান—'হয়তো' শব্দ সংকেত যেন সেই অতল অন্ধকারে জেগে থাকা বিন্দুশীর্ষ।

গল্পের বাস্তবতা বহির্জগতের নয়, মনোজগতের। আসলে জীবনের সেতু থেকে লাবণ্য নয়, পাঠকই যেন পড়ে যায়, লেখকই যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। দাম্পত্যসম্পর্কের আদিপ্রতিমা (archetype)[৭] ভেঙে যায়। তলিয়ে যেতে যেতেও লেখকের হাত ধরে উঠে আসে পাঠক। কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে যায় অভ্যস্ত মূল্যবোধ; 'হয়তো'র সংকেতে বিকল্প সম্ভাবনার কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে পাঠক মনে মনে পারাপার করে সেতুর নামান্তরে জীবনের বাকি পথ আর সে পথের সঙ্গী হয় অজস্র 'হয়তো'...

পাশাপাশি : মানবিক সম্পর্কের টান

সান্ত্বনা চক্রবর্তী

বাস্তবতা বর্ণনা করার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনো হঠাৎ গল্পের শুরু, কখনো হঠাৎ শেষ, কখনো চাবুক মারা সমাপ্তি, আবার কখনো বিষয়ের গভীরতায় ছোটগল্পগুলিকে এক অনাস্বাদিত মহিমায় উন্নীত করেছেন। রীতির দিক দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র মোপাসাঁ, চেকভ ও এলান পো'র মিলিত রূপ হলেও মৌলিক প্রকৃতির লেখক। আপন মহিমায় আপনি প্রোজ্জ্বল হয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনচিত্র, ফ্রয়েডীয় চেতনা এবং সাধারণ মানুষের বহিরঙ্গে স্থূল সূক্ষ্ম চিত্রের প্রকাশ ঘটেছে।

শাশ্বত-চেতনার গল্প 'পাশাপাশি'। এটি 'মৃত্তিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প। গল্পটি মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী। দুই ভাই পাশাপাশি দুটি ঘরে বাস করে। একই বাড়িতে দুটি ঘরের মাঝে একটি দরমার বেড়া আছে। কিন্তু তাতে আবরু রক্ষা হয় না। দরমার বেড়া থাকলেও তাদের জলের কল কিন্তু এক জায়গায়। সামান্য ভাড়ার ভাড়াটে তারা। তাই তাদের অনেক কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়।

বিধুভূষণ এবং অমল দুই ভাইয়ের সংসার কিন্তু আলাদা থাকা সত্ত্বেও তাদের গৃহিণীদের মধ্যে সব সময় অসামঞ্জস্য রয়েছে। বিধুভূষণের অফিস যাওয়ার সময় ভাতের থালাব সামনে বসে মেজবৌ তাকে বলে, 'আর একটা একানে বাড়ী দেখ বাপু।' কারণস্বরূপ সে বলে যে কলে তার যাওয়ার কোন উপায় নেই। যখনই সে যেতে চায়, তখনই দেখে ওদের বুড়ি পিসি কলে বসে রয়েছে। বিধুভূষণ একথার উত্তরে কোন কথা না বলে শুধুমাত্র 'হুঁ' শব্দটি উচ্চারণ করলেন। বারবার একই কথা বলা সত্ত্বেও সে কিছু না বলে শুধু বললো, 'পান সাজা আছে তো?' আসলে বাড়ীর গৃহিণীদের এসব ছোটোখাটো কথায় সে কোন সময়ই গুরুত্ব দেয় না। আবার মেজ-বৌ বলতে থাকে "চার বছরের ছেলেটাকে পর্যন্ত সামলান দায়। এই এটা ভাঙছে, এই সেটা ফেলছে। তা মা কি শাসন করবে একটু।" একথার উত্তর না দিয়ে বাড়ির কর্তা বলে যে তার কাপড়টা যেন রিপু হয়।

মেজবৌ তার স্বামীকে চেনে, তাই তার ওপর সে রাগ করতে নারাজ। সে জানে যে তার স্বামী প্রয়োজন ছাড়া একটি কথাও বলবে না। সুতরাং নিজে নিজেই কিছুটা কথা বলেই সে চুপ করে।

হঠাৎ দরমার ওপাশের ঘর থেকে তার দেওর অমল তার বৌদিকে বলে যে সে বিচার না করলে চলবে না। আসলে মেজ বৌয়ের জা কাননবালা তার স্বামীকে বলেছিল যে তাদের ছেলেটি তার মামাদের দিক থেকে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু অমল-এর এই কথাটি মোটেই পছন্দ নয়। তাই সে তার বৌদিকে এ বিষয়ে বিচার করতে বলেছিল।

বিধুভূষণের ভাই অমল কথা একটু বেশি বলে এবং সে সহজ-সরল। তাই তার ওপর মেজ-বৌ বিরক্ত হতে পারে না। অন্যদিকে তার স্ত্রী কাননবালার ব্যবহার অসহ্য। সে যেমন স্বার্থপর, তেমনি অহঙ্কারী। তার স্বামী বি.এ পাশ করে বায়োস্কোপের টিকিট বিক্রী করে বলে

সে অহঙ্কারে কথা বলতে চায় না। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তারা বাপের বাড়ির গল্প-ও করতে ছাড়ে না।

ছোট্ট একটি বাড়ির মধ্যে শুধুমাত্র দারিদ্র্যের তাড়নায় দুটি পরিবার জোড়াতালি দিয়ে বাস করে। তাদের মধ্যে মনোমালিন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও মিলও আছে। অমল হঠাৎ একদিন তার বৌদিকে বলে যে 'পিসিমাকে ক্ষ্যাপাতে হবে'। এই বলে সে মেজবৌকে সঙ্গে নিয়ে পিসিমার কাছে উপস্থিত হয়। অমল পিসিমাকে বলে, আগামীকাল কলকাতার সমস্ত লোক প্রায়শ্চিত্ত করবে। কারণ গতকালের জলের ট্যাঙ্কে একটা মোষ পড়ে গিয়েছিল। বহুকষ্টে সেটিকে তোলা হয়েছে কিন্তু তার একটি পা ট্যাঙ্কের ভেতরেই পড়ে আছে। অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও সেই ঠ্যাং পাওয়া যায়নি। জলের কলের চাকায় ছাতু হয়ে সেটি শহরের সমস্ত লোকের পেটে চলে গেছে। একথা শুনে পিসিমা কি করবে বুঝতে পারে না। তখন অমল তাকে বলে যে পণ্ডিতেরা সকলকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে দিয়েছে। এসব কথা শুনে মেজবৌ এবং কাননবালা হাসি সামলাতে না পেরে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এ অংশটুকু পড়লে বোঝা যায় যে অভাবের তাড়না নিয়ে গল্প শুরু হলেও সেই তাড়নার মধ্যে হাস্যরসিকতার অভাব ছিল না।

দুই পরিবারের মধ্যে মিলনের আর একটি সূত্র হলো ছেলেটি। সে দেওর অমল এবং কাননবালার ছেলে। যখন তখন জ্যেঠিমার কাছে সে হাত পাতে। কিছু ভোজ্যদ্রব্য না পেলে সে নড়বার নাম করে না। ছেলেটার দুরন্তপনায় মেজবৌ মাঝে মাঝে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। তার জন্য প্রতিদিন রাত্রে সব কাজ ফেলে রেখে লুচি না ভেজে সে পাবে না।

জ্যেঠিমার বিছানায় সমস্ত বালিশ একত্র করে তার মোটর খাটের ওপর তৈরি হয়। মেজবৌকে এগুলিও দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হয়।

তাছাড়া মেজবৌয়ের আলমারিতে সাজানো পুতুলগুলির প্রায় সবই খোকার হাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়েছে। খোকার উৎপাতে মেজবৌ-দেশলাই-এর বাক্স সরিয়ে রাখেন। কেরোসিন তেল আজকাল তিনি আলমারির ওপর সরিয়ে রাখেন। না হলে কেরোসিন তেলটিকেই খোকা মাথার তেল হিসেবে ব্যবহার করবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই খোকাকে নিয়েই এই দুই পরিবারের মধ্যে গভীর বিচ্ছেদ ঘটলো। খোকার অসুখকে কেন্দ্র করে পিসিমা এবং অমলের স্ত্রী কাননবালা তাকে যারপর নাই অপমান করেছিল। কাননবালা বলেছিল, "মানুষের নিজের যদি লজ্জা-সরম না থাকে ত কে কি করতে পারে?"

পিসিমা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছে, "ঠিক মাফিকসই রান্না আর কোন গেরস্তের হয় মা? সংসারের খাবার দাবার বাঁচে বই কি; কিন্তু তাই ব'লে ওই দুধের ছেলেকে সেগুলো যখন তখন কি খাওয়ায় মা! দেখ্‌ছ ও হাঁড়ির তলানি. পাত কুড়োন খেয়ে ছেলেটার কি অবস্থা হয়েছে?"

এই অন্যায় আক্রমণে মেজবৌ প্রচণ্ড পরিমাণে রেগে ওঠে। খাওয়ার ব্যাপারটাকে এমন বিকৃত করে কেউ যে ব্যাখ্যা করতে পারে, এটি তার কল্পনাতেও আসেনি। পিসিমা তাকে

অপমান করে আরো বললো, "কপালে যাদের আদর করা নেই, তাদের আদর যে সয় না কিছুতে—পাপ হয় যে!"

এসব কথা মেজবৌ তার স্বামীকে কিছু বললো না ঠিকই, কিন্তু তাকে অন্য বাড়ি দেখতে বললো।

ইতিমধ্যে খোকার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু দুই পরিবারের ব্যবধান দূর হলো না। খোকা মাঝে মাঝে জ্যেঠিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কাছে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু জ্যেঠিমা তার ডাকে সাড়া দেয় না। এসবের কোন কিছুই অমল জানে না। সে আগের মতোই হাসি-ঠাট্টা করে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ শোনা গেল, অমলের টিকিট বিক্রির চাকরিটি আর নেই। মেজবৌ বারবার তার স্বামীকে অন্য বাড়ির খোঁজ করতে বললো। কারণ স্বরূপ সে বললো যে ঠাকুরপো-দের দুবেলা খাওয়ার পয়সা নেই। এবার তাদের পুরো বাড়ির ভাড়া গুনতে হবে। পুনরায় মেজবৌ হাতের তেলের টিনটা সামনে রেখে বলতে লাগলো যে, "আরও বুঝতে চাও তো এই দেখ। মাসের সবে সাতদিন, একটিন তেলের সিকিভাগও খরচ করিনি। আর দেখ দিকি তেল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে।"

একথা শুনে তার স্বামী বিধুভূষণ অবাক হয়ে তাকাতে মেজবৌ বললো যে অত অহঙ্কার অমলের স্ত্রী কাননবালার, অথচ চুরি করতে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না, সঙ্কোচ হয় না। এরপর থেকে প্রায়শই তার রান্নাঘর থেকে সামান্য সামান্য জিনিস চুরি হতে থাকে। মেজবৌ বাধ্য হয়ে রান্নাঘরে তালা লাগায়। সে কাননদের অভাব বোঝে। কিন্তু সামনে এসে চাইতে তার অহঙ্কারে বাধে, কিন্তু গোপনে চুরি করতে তার বাধে না দেখে কাননের ওপর মেজ বৌ-এর ঘৃণা জন্মাতে থাকে। এতে মেজবৌয়ের আনন্দ হওয়ারই কথা, কিন্তু অমল এবং ছেলেটার কথা ভেবে সে সুখি হতে পারে না।

অন্যদিকে অমল চাকরীর চেষ্টা করে শুকনো মুখে বাড়ি ফেরে কিন্তু মুখের হাসি তার মেলাতে চায় না। রাস্তায় ভিখারীর বেশে গণকঠাকুরকে পয়সা দেওয়ায় সে তাকে আশীর্বাদ করে বলেছে যে সামনের আষাঢ় মাস পার হলেই অমলের ভাগ্য ফিরবে। একথা সে মেজবৌ অর্থাৎ তার বৌদিকে বলেছে। দেওর-বৌদি এ নিয়ে হাসাহাসিও করেছে।

এদিকে বিধুভূষণ বাড়ি দেখেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা উঠে যাবে তাও ঠিক হয়েছে। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন অমলের সংসারের অবস্থা উপলব্ধি করে মেজবৌ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ছোট্ট ছেলেটাও তার উদাসীনতা দেখে এখন আর কাছে আসে না। সেদিন তার রান্নাঘরের কাছে সে এসেছিল—একথা তার জ্যেঠিমা জানে। হঠাৎ সে শুনতে পেলো যে ছেলেটি কাঁদছে। সকাল থেকেই সে লুচি খাওয়ার বায়না করেছিল। কিন্তু তা না দিয়ে তাকে মুড়ি দেওয়া হয়েছিল। খেতে না চাওয়ায় কাননবালা এবং পিসিমা তাকে একটি চড় মেরেছে।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে মেজবৌ সবই শুনতে পেলেন। একবার সে ভেবেছিল সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ছেলেটাকে তার কাছে নিয়ে আসবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল পিসিমার কথাটা। তাই তাদের কাছে সে আর গেল না। শুনতে পেল পিসিমা

উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছে, "নবাবের বেটা আবার বলে, লুচি খাব। চাল বিনে আজ হাঁড়ি চড়বে না যে রে হতভাগা! লুচি খাবি কি, তোর বাবা যে একমাসে একটা পয়সা ঠেকাতে পারেনি, সব যে এই বুড়ির ঘাড় দিয়ে চলেছে!"

এসব কথা শুনে আর স্থির থাকতে না পেরে মেজবৌ থালায় কিছু চাল আর অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে কাননদের দরজায় গিয়ে বলে যে সে গতমাসে চাল ধার করেছিল, তাই এখন দিতে এসেছে। কানন কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে যে তারা চাল ধার দেয়নি। কিন্তু পিসিমা তার কথাকে নস্যাৎ করে নিজেই থালাটা নামিয়ে নিল।

এদিকে রাতে মেজবৌ রান্নাঘরের তালা শোওয়ার ঘরে নিয়ে এসে নিজের মনেই গজ্ গজ্ করে বললো, "ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু, এমন নচ্ছার মেয়ে হয় জানতাম না। দেমাকে এদিকে মাটিতে পা পড়ে না, অথচ চুরি করতে বাধে না।" একথা বুঝতে না পেরে বিধুভূষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মেজবৌ আবার বলতে থাকে যে কাননবালাকে সামনাসামনি কিছু দিতে গেলে নেবে না। "নবাবের বেটির যে তাতে মান যায়। তা বলে ওই দুধের ছেলেটা উপোষ করে মরবে!" বিধুভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সামান্য হেসে বলে যে "তাহলে বাড়ি বদল আর দরকার নেই।" মেজবৌ তখন উচ্চস্বরে বলে যে, অমল ঠাকুরপো-র চাকরী না হওয়া পর্যন্ত সে এবাড়িতেই থাকবে। তারপর বাড়ি খুঁজে অন্যত্র চলে যাবে।

মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ দুটি পরিবার পাশাপাশি দুটি ঘরে বাস করে। তাদের জীবন-চর্যার পরিচয় গল্পটিতে রয়েছে। তাদের মধ্যে অমিল থাকলেও তারা একই পরিবারের মানুষ। শুধুমাত্র দারিদ্র্যের তাড়নায় তারা পাশাপাশি দুটি ঘরে। মেজবৌ তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমল ও কাননবালার সংসারের অভাবই তাকে একই বাড়িতে থাকতে বাধ্য করলো। তার মানে মানবিক বোধই শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পেল। তাই শেষে মেজবৌ বলেছিল যে ঠাকুরপোর চাকরী হলেই সে অন্য জায়গায় বাড়ি নিয়ে চলে যাবে। সুতরাং সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে 'পাশাপাশি গল্পটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি দেখা গেলেও শাশ্বত ভাবনার পরিচয় এতে পাওয়া যায়।

সংসার সীমান্তে : শিকড়ের সন্ধানে

সুশান্তকুমার চাকু

আধুনিকতার ও বাস্তবতার সাহিত্যিক প্রবর্তনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগ তথা বিশ-তিরিশের দশক যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন কবি-উপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮)।

বাংলা ছোটগল্প ধারাটি কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্মোহ জীবনবাদী দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবি হিসেবে তিনি লিখেছিলেন—

"মানুষের মানে চাই—
গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।" (মানে, প্রথমা)

মানবজীবন সম্পর্কে এই বলিষ্ঠ অনুসন্ধান প্রয়াস তাঁকে কল্লোল যুগের তথাকথিত রোমান্টিক বিদ্রোহ ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে যে বিষের ধোঁয়ায় সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দেয় গভীর হতাশা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তাব প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত-জীবনে যে অনিবার্য সংকট দেখা দিয়েছিল, শহর কলকাতার যে জীর্ণ, জরাগ্রস্ত রূপ বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী হয়ে পড়েছিল তাকে অস্বীকার না করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার মধ্যে থেকেই মানবিকতার অনন্ত সম্ভাবনাকে চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে।

দুই

নারীর দেহজীবিকা মানব সভ্যতার এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট অভিশাপ। এদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পূর্বে কয়েকটি গল্প লেখা হলেও তাদের অসহায়তা, বিকৃতি, যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার কঠিন, গ্লানিকর ও রূঢ় জীবন সত্যকে তাঁর মতো এমন মর্মস্পর্শী করে রূপায়িত করতে পারেননি কেউই। আলোচ্য 'সংসার সীমান্তে' গল্পটি (নিশীথ নগরী, ১৯৩৮) সমাজের সেই অভিশপ্ত জীবনের এক চিরন্তন আলেখ্য। গল্পের সূচনায় আত্যন্তিক বিশ্বাস থেকেই লেখক জানিয়েছেন—

'সত্যই এ কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নেই। ....এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মত দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়।'

উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ লেখক এদের সম্পর্কে নিজের 'দরদ' এর প্রতিও সন্দিহান থেকেছেন। এখানে দুটি জীবন যাদের নিয়ে তাদের একজন যৌবনোত্তীর্ণা পতিতা রজনী

এবং অপর জন লাঞ্ছিত জীবন পথের পথিক চৌর্য জীবিকাশ্রয়ী অঘোর। গল্পের আরম্ভ বর্ষার এক দুর্যোগের আবহাওয়ায়। পটভূমি মহানগরের নোংরা বস্তির পতিতাপল্লী। পরিবেশ নির্জন, থমথমে। রাতের গভীরতা গাঢ়তর হয়েছে 'কেরোসিনের ধূমবহুল শিখা'য়। এরই মধ্যে খদ্দেরের প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হতাশ চোখে বসে আছে রজনী। তার বর্ণনা থেকে চরিত্রটির অন্তঃরূপ ও শরীর স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> 'সত্য কথা বলিতে কি, দেখিবার আর সেখানে কিছু নাই। কোনদিন তাহার দেহে ও মুখে প্রাণের শিখার দ্যুতি ছিল কিনা তাহাই সন্দেহ হয়। ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা কুৎসিত বিকৃতি মাত্র।'

বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বিগত যৌবনা রজনীর চরম দারিদ্র্য এবং তা থেকে মুক্তিলাভের দুরন্ত প্রয়াস। জীবন সংগ্রামের এ কঠিন, প্রাণান্তকর অবস্থাটি লেখক তুলে ধরেছেন 'মৃত মন,' 'গাঢ় ছায়া', 'ধূম ও কালি', 'কুৎসিত বিকৃতি' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে।

তিন

নিস্তরঙ্গ অবস্থাটি মুখর হয়ে ওঠে আকস্মিকভাবে। কাদের তাড়া খেয়ে এবং তাদের থেকে মুক্তি পেতে সেখানে 'কৃষ্ণকায় একটি বিশাল মূর্তি'র আবির্ভাব ঘটে। রজনীকে বিস্মিত করে লোকটি একরকম জোর করে তার টিনের চালা ঘরে ঢুকে পড়তে চায়। ঘটনার আকস্মিকতায় ধাতস্থ হলে রজনী তাকে চলে যেতে বলে। শেষে এক টাকার বিনিময়ে লোকটি ঘরে থাকার ছাড়পত্র পায়। পতিতা হলেও লোকটির কথাবার্তা হাবভাব রজনীর ভালো লাগে নি বলেই প্রথমে সে তাকে ঘরে ঢোকাতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটি তার সহজাত বাচনভঙ্গিতে রজনীকে সন্দেহ মুক্ত করে। সঙ্গে আনা পুঁটুলিটা মাথার নীচে রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতে, ঘুমন্ত রজনীর আঁচলে বাঁধা চাবি খুলে লোকটি রজনীর যথাসর্বস্ব অপহরণ করে পালিয়ে গেলে সকাল বেলায় পতিতাপল্লীতে সোরগোল পড়ে যায়। কিন্তু রজনীর হিসেব ওলোটপালট হয়ে যায় দুপুরে লোকটি চুরির টাকায় ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক হয়ে ফিরে এলে। প্রচন্ড আক্রোশে রজনী তাকে লক্ষ্য করে হাতের 'নোড়া' ছুঁড়ে মারে। চিৎকার করে লোকটির চুরির খবর ফাঁস করে দেয়। ফলে, তার ভাগ্যে জোটে গণপ্রহার। রজনীও তাতে অংশ নেয়। প্রহারে অর্ধমৃত লোকটিকে রেখে পুলিশের ভয়ে সকলে গা ঢাকা দেয়। রজনীকেই এজন্য সকলে দোষী সাব্যস্ত করে। বাড়ী ওয়ালীর পরামর্শে শেষ পর্যন্ত রজনীকেই তাকে আশ্রয় দিতে ও সেবাশুশ্রূষার ভার নিতে হয়। লোকটির নাম যে অঘোর দাস তা তার জবানীতে জানা যায়।

গল্পের কাহিনী জমাট বাঁধে অঘোরের কয়েকদিন রাত্রি যাপনে। উভয়ের মধ্যে ক্রমে একটা মানসিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেরে উঠেও অঘোর যেতে চায় না। রজনীর তিরস্কারেও সে পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে সে কিছু টাকা কড়িও রজনীর হাতে দেয়। তাতে বেশিদিন চলে না। রজনী কুৎসিত ভাবে ঝগড়া করলে অঘোর একদিন সকালে চলে যায়। বাড়ীওয়ালী রজনীকে ভৎর্সনা করে। রজনী ভেবেছিল 'আপদ' বিদেয় হয়েছে। গভীর রাতে কপালে

রক্তক্ষত নিয়ে জামা কাপড়ে ধুলো কাদা মাখা অঘোর ফিরে আসে। রজনীকে টাকার গোছা দিতে গেলে সে চমকে ওঠে। রজনীর সন্দেহ গাঢ় হয় যে অঘোর সত্যিই চোর। অঘোরও গোপন করে না চুরির কথা। রজনী তাকে পীড়াপীড়ি করে চুরি ছাড়ার জন্যে। কোন কাজকর্ম করতে পরামর্শ দেয়। দেশ ছেড়ে চলে যেতেও বলে। অঘোর তাকেও সঙ্গে নিতে চায়। রজনী তার দেনার কথা জানিয়ে অসহায়তা প্রকাশ করলে অঘোর তা শোধ করার দায়িত্ব নেয় শেষ বারের মতো চুরি করার আকাঙক্ষা জানিয়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। অঘোর-রজনীর ঘর বাঁধার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। অঘোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। বিচারে তার জেল হয়। গল্পটির কাহিনী বিন্যাসে কোন জটিলতা দেখা যায় না। ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে কাহিনী হয়েছে পরিণামমুখী।

চার

গল্পটির গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লেখক উপজীব্য চরিত্র দুটির বিকাশধর্মিতাকে সুকৌশলে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। দেহোপজীবিনী রজনীর নারীত্ব ও যৌবন—দুই-ই 'কুৎসিত বিকৃতি'তে পৌঁছেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পতিতা পল্লীর কর্কশ রূঢ় ভাষা যেখানে মাধুর্যের লেশমাত্র দেখা যায় না। অঘোরও পোড় খাওয়া দাগী চোর। তার মধ্যেও প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বার্থত্যাগের হদিশ দুর্লভ। উভয়েই প্রচলিত সংসারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বঞ্চিত সংসার সীমান্তের কুশীলব। রজনী প্রতীক্ষা করছিল খদ্দেরের। ধরা পড়ার ভয়ে অঘোর পালাচ্ছিল। বর্ষার দুর্যোগ, গভীর রাত তাদের দুজনকে মিলিয়ে দেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। রজনী তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবশত এই উটকো লোকটিকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েও পারেনি। অঘোর বিতাড়িত হতে গিয়েও ছলে, বলে বশীভূত করে রজনীকে। কিন্তু তাদের প্রথম মিলনের ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছে অঘোরের স্বার্থপরতা ও লোভের কালিমায়। তার বিশ্বাসঘাতকতায় রজনী মনে মনে জ্বলে উঠেছে। দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখি অঘোরের নির্লজ্জ প্রত্যাবর্তন। রজনীও প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি। তার সর্বস্ব অপহরণকারীর চরিত্র ফাঁস করে দিয়ে তাকে গণপ্রহারে অর্ধমৃত করে ছেড়েছে। নিজের অজান্তেই রজনী আরও জড়িয়ে পড়ে অঘোরের সঙ্গে। তার নিজের বাসাতে অঘোরকে শুধুমাত্র আশ্রয় দিতেই বাধ্য হয়নি, তার খাওয়া পরা, সেবা শুশ্রূষারও দায়িত্ব নিতে হয়েছে পুলিশি ঝামেলার ভয়ে। এভাবেই তাদের দ্বিতীয় মিলন রাত্রির ঘটনা জটিল আয়োজনে ঘটে। তৃতীয় স্তরটি গল্পকে ক্রমশঃ অন্য মাত্রার দিকে নিয়ে যায়। পড়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে অঘোর জমিয়ে বসে রজনীর ঘাড়ে। রজনী এ দায় থেকে মুক্তি পেতে চায়। সপ্তাখানেক কোনরকমে অঘোরের 'ভিটকেলমি' সহ্য করে সে মুখ খুলতে তাকে। অঘোর পুলিশের ভয় দেখালে রজনীও তাকে প্রথমদিনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। অঘোরকে বাড়ী ছাড়া করতে গালিগালাজ করে ঝগড়া বাধায়। তার পুরুষত্ব নিয়ে খোটা দেয়। প্রচণ্ড শপথ করেও অঘোর যেতে চায় না। তার মনস্তত্ত্বটি লেখক সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। 'ছন্নছাড়া জীবনে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাগ্যের দ্বারা খালি বুঝি সে বিতাড়িত হইয়াই ফিরিয়াছে। একটুখানি নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান বুঝি তাহার কখনো মিলে নাই। তাই যাইতে তাহার মন ওঠে না।' তথাপি টাকাপয়সা নিয়ে রজনী একদিন ভীষণ ঝগড়া করলে অঘোর সকালে কোথায় চলে

যায়। বাড়ীওয়ালীর ভর্ৎসনায় রজনী বলে, 'আপদ গেছে বেঁচেছি।' কিন্তু এটা যে রজনীর কথার কথা তা বোঝা যায় গভীর রাতে দরজায় টোকা পড়লে রজনীর শশব্যস্তে দরজা খুলে দেওয়ার মধ্যে। অতরাত পর্যন্ত অকারণে সে জেগে বসেছিল। অঘোরের কপালে রক্তক্ষত দেখে রজনীর প্রশ্নে ধরা পড়েছে উদ্বেগ। রজনীর কাছে থেকে যেতে চাওয়ার মধ্যে যেমন অঘোরের, তেমনি, রজনীর উদ্বেগ চরিত্রদুটির মানস পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কেবল মাত্র শরীরগত ভাবে নয় উভয়ের মধ্যে যে একটা মানসিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় রজনীর চুরির টাকা নিতে না চাওয়ার মধ্যে। রজনীর নারীমন অঘোরের জন্য আশঙ্কিত হয়েছে সমবেদনায়। তার আত্যন্তিক মমত্ব এবং একপ্রকার দাবি যেন প্রকাশ পেয়েছে অঘোরকে একান্তে চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে দেবার জন্য পীড়া[illegible]ত। অঘোর এই বৃত্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেও প্রাণের ভয়ের উল্লেখ করেছে। রজনী [illegible] দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেয়। অঘোরও নিশ্চই মনে মনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এই সদাশঙ্কিত জীবনে। সুস্থ ভাবে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ইচ্ছা যে তারও ছিল—সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশ পেয়েছে রজনীকেও তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। রজনীর সহানুভূতি তার আবৃত মনুষ্যত্বকে যথার্থই স্পর্শ করেছিল। রজনী তার দেনাগ্রস্ত অসহায়তা জানালে অঘোর তাতে দমে যায় না। রজনীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সমস্ত অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে সে নতুন করে বাঁচতে চায়। রজনীকে ঋণমুক্ত করতে অঘোর শেষবারের মতো চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই স্তরে আমরা দেখি দুটি চরিত্রই ফিরতে চেয়েছে জীবনের মূল স্রোতে। দুটি পরস্পর অপরিচিত ভিন্ন গোত্রের সমাজ পরিত্যক্ত নরনারী উভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছে কাঙ্ক্ষিত ভালবাসার সংসার। শরীরের ক্ষুধা নয়, সেখানে থাকবে সুখদুঃখময় জগৎ আর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। গল্পের চতুর্থ স্তরটিকে এ গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্ত বলা যায়। তাদের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় আকস্মিক দুর্ঘটনায়। 'চুরি বিদ্যের খতম'—নির্ণায়ক চুরি করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায় অঘোর। বার পাঁচেক জেল খাটা দাগী চোর অঘোর বিচারশালায় শিশুর মতো কান্নাকাটি করে। ঈশ্বরের নামে চুরি না করার শপথ করে মিনতি জানায় তাকে এ বারের মতো মাফ করে দিতে। জেলে গেলে তার 'সর্বনাশ' হয়ে যাবে। বিচারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড শুনে অঘোর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। বিচারককে আক্রমণ করতে যায়। তার অস্বাভাবিক আচরণে ও কান্নার পিছনে কিছু গূঢ় অর্থের কথা নবীন বিচারকের মনে হলেও তা কার্যকর হয়নি। অঘোরের জেল হয়ে যায়।

রজনীর ভালবাসার স্পর্শে, মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণায় তার সংশোধিত মন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জেলের অন্ধকার কুঠুরীতে কোন পরিণামে পৌঁছেছিল তা আমরা অনুমান করে নিতে পারি গল্প শেষ থেকে। রজনী হতাশ নয়নে পথের দিকে চেয়ে থাকে খদ্দেরের ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। বাস্তব সংসারের কঠিন পেষণে 'পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবন লীলার অনুকরণ' করা তাদের হয়ে উঠেছিল কিনা জানা যায় না। বর্তমানের ক্লেদ-পঙ্কিল অবস্থা থেকে উত্তরণের যে মুক্তি তারা চেয়েছিল তার সন্ধান 'সংসার সীমান্তে' মেলেনি। এই ট্রাজিক হাহাকারই গল্পটিকে শিল্পরসে মণ্ডিত করেছে।

পাঁচ

গল্পটির নামকরণ হয়েছে ব্যঞ্জনাধর্মী। সীমান্ত বাসী দুটি নরনারী যৌবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়ে নতুন করে যে সংসার রচনা করতে চেয়েছিল কঠিন বাস্তব তাদের সে স্বপ্ন চূর্ণ করে দেয়। মানব সংসার ও জীবনধারার প্রান্তেই রয়ে গেল তারা। বারাঙ্গনা রজনীর জায়ারূপ বা দাগী চোর অঘোরের সংসারী রূপ—কোনটাই সমাজ-সংসারের মূলস্রোতে অনুমোদন পায়নি। সংসারের মাঝে নয়, সীমান্তেই তাদের ঠাঁই পেতে হয়।

ছোটগল্পের যে ভাবৈক্য, একমুখীনতা, পরিণাম-সম্ভাব্যতা এবং রস সংহতি এ গল্পে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সংসার রচনার প্রয়াস একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে কিভাবে তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে তার নির্মম ব্যর্থতাটিকে লেখক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, ভাষার নিটোল সংহতিতে তুলে ধরেছেন। সাধুভাষায় লেখা হলেও কোথাও সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। গণিকা ও চোরের ভাষায় যে গ্রাম্য কথ্য শব্দের প্রয়োগ তা চরিত্রদুটির জীবন্ত-রূপকে যথাযোগ্য ভাবে উপস্থিত করে এবং ঘটনার বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। সংসার সীমান্তবাসী দুটি নরনারীর জীবনে যে ভালবাসার উন্মেষ, সংসার গড়ার যে আন্তরিক প্রয়াস, জীবনকে ভালবাসার যে আকাঙ্ক্ষা লেখক তাকে ব্যঙ্গ করেননি। চরিত্র দুটির ওপরেই নির্ভর করেছেন কাহিনী বৃত্তের পরিণামে। এতেই বোঝা যায় লেখকের দরদী সহানুভূতিশীল মনটিকে। মাঝে মাঝে করা তাঁর মন্তব্যগুলি তাই অনাবশ্যক হয়ে গল্পরসকে উদ্দেশ্যপ্রবণ বা ভারাক্রান্ত করেনি। গল্পে ভাবাবেগ প্রকাশের যথেষ্ট মুহূর্ত সৃষ্টি হলেও তা সযত্নে পরিহার করেছেন লেখক।

তথ্যনির্দেশ

১. ছোটগল্পের রূপশিল্পী : প্রেমেন্দ্র মিত্র—ড. রমারঞ্জন রায়
২. কল্লোলের কাল—জীবেন্দ্র সিংহরায়
৩. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪. কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৫. বাংলা ছোটগল্প : পর্বপর্বান্তর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের কলাকৌশল, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়
৬. প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প —সম্পাদনা, সৌরীন ভট্টাচার্য

জনৈক কাপুরুষের কাহিনী : সমাজ ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব

শর্মিষ্ঠা সরকার

প্রতিনিধিস্থানীয় হয়েও ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল 'কল্লোল' যুগের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর রচনায় কল্লোল যুগের আধুনিকতার স্পর্শও যেমন ছিল তেমনি কোথাও পরিচিত কল্লোলিয়ানদের চেয়ে নিজস্বতার, মৌলিকতার অভিজ্ঞানও ছিল। 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' তেমনি এক মৌলিকতার স্বাক্ষর। লেখকের অনুসরণেই গল্পটি আমরা পড়তে শুরু করব, পড়তে পড়তেই বিশ্লেষণ করব, বিশ্লেষণের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব সেই বিশেষত্বকে যা একান্তভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের।

কাহিনীতে প্রবেশের প্রথম দিক নির্দেশক তার নাম। আর সে নাম যদি হয় এমন ব্যতিক্রমী, অভিনব তাহলে তো তা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবেই। 'জ-নৈ-ক কা-পু-রু-ষে-র কা-হি-নী'—পড়লেই মনে হয় যেন কোনো সাংবাদিকের রচিত কোনো সংবাদনির্ভর প্রতিবেদনের শিরোনাম। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ বিবৃতি। বিবৃতি দিয়ে জানানো হচ্ছে এখানে বর্ণিত হবে যার কাহিনী সে কাপুরুষ, এবং সে আমাদের অতি পরিচিত তাই তার নাম গোপন করা হয়েছে 'জনৈক' শব্দের মধ্য দিয়ে।—এই প্রস্তুতি গল্প পাঠকদের জন্য। পাঠকের মনে হয় কোথাও বোধহয় কোনো ব্যঞ্জনা নেই, প্রতীক নেই, লেখক স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছেন গল্পের উপজীব্য 'কাপুরুষের কাহিনী'। কিন্তু, পাঠ শুরু করলেই আমরা বুঝতে পারি কী অসম্ভব ব্যঞ্জনায় 'কাপুরুষ' শব্দটি দ্যোতিত। জগৎ-জীবনের অতি পরিচিত ছবি কী অনায়াস দক্ষতায় 'গল্প' হয়ে উঠেছে। অতি চেনা কাপুরুষ যুবকেরা 'জনৈক' শব্দের আড়ালে গিয়েও কী ভীষণ রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। অনেক পাঠিকাই করুণার মধ্যে খুঁজে পাবে স্মৃতির পটে হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে আর অনেক পাঠকের সামনেই দর্পণ হয়ে দাঁড়াবে 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'।

কাহিনীর কাপুরুষকে লেখক কোন্ দ্যোতনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার অন্বেষণ করতে হলে দেখা দরকার কাপুরুষ কাকে বলে। পৌরুষের চিহ্ন যদি হয় শক্তি, সাহস, বীর্য তবে কাপুরুষ সেই, যে সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই চিহ্নর প্রমাণ রাখতে অসমর্থ হয়। আসলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসই বীরের কাছে কাম্য আর সেই সাহসহীনতাই কাপুরুষের বৈশিষ্ট্য। আমাদের গল্পের নায়ক শুধু একবার নয় দু'দুবার এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস দেখাতে অসমর্থ হল। সত্য এই যে, করুণা তাকে ভালোবাসে তাকে অবলম্বন করতে চায়, তার সঙ্গে সমস্ত পথ চলতে চায়। তার এই চাওয়াকে পূর্ণতা দিতে সে সামাজিক অনুশাসনকে তুচ্ছ করতে পারে, যে কোনো সম্ভাব্য বিপদকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখাতে পারে। কিন্তু, এই সত্যকে মর্যাদা দেবার সাহস দেখাতে পারে না কাহিনীর নায়ক। নৈতিকতা, ঔচিত্যবোধ, প্রাজ্ঞ জীবনদর্শন তাকে সাহস সঞ্চয় করতে বাধা দেয়, তাকে কাপুরুষ করে তোলে। আমরা দেখি, প্রথমবার করুণা সাহস দেখায় সামান্যই, সে অগ্রাহ্য করেছে তার

বিবাহে অসম্মত প্রথাগত অভিভাবকদের, তখন সে কুমারী। সে সময় বহু কুমারীই এই অভিভাবকদের বস্তাপচা মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে তার ভালোবাসাকে জয়যুক্ত করার জন্য নানারকম ঝুঁকি নিত, করুণাও তার ব্যতিক্রম নয়, সুতরাং তার সাহসিকতা এক্ষেত্রে বিরাট মূল্যের অধিকারী নয়, আর সে কারণেই নায়কের ভীরুতা, সত্যকে স্বীকার করার কুণ্ঠা চরম কাপুরুষতার নিদর্শন হয়ে ওঠে। লেখক আমাদের জানাননি করুণাকে গ্রহণ করতে নায়কের বাধাটা কোথায় ছিল। যদি অনুমান করেও নিই, যে আর্থিক অসংগতি বা পারিবারিক বাধাই একমাত্র ক্যরণ, তবে সে বাধা নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ তা অনতিক্রমণীয় নয়। খুব সামান্য সাহস আর শক্তিই সেই বাধা অতিক্রমের জন্য প্রয়োজন আর করুণাকে সঙ্গে নিলে সেই শক্তি এবং সাহস নিতান্ত সামান্য থাকতও না। তবুও যে নায়ক সেই সামান্য সাহস দেখাতে অসমর্থ হয়েছে তার কাছে দ্বিতীয়বারের জন্য, আরও জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সাহস আশা করাটাই অস্বাভাবিক। করুণা তার আবেগের প্রাবল্যে এই অসম্ভব আশা করতে পারে কিন্তু, সচেতন, যুক্তিনিষ্ঠ পাঠক সে আশা করে না। কারণ, দ্বিতীয়বার করুণা যখন আবারও তার নায়কের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করতে চায় তখন সে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী—অর্থাৎ, সামাজিক অনুশাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এই বাঁধাই তো বড় বাধা। এই বাধাকে অতিক্রম করার বীরপুরুষ বাস্তবে এবং সাহিত্যে খুব কমই জন্মলাভ করেছে। তাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নায়কের প্রত্যাখ্যান অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। এক্ষেত্রে নায়কের বাধা করুণার সামাজিক পরিচিতি এবং বিমলবাবুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা। চরম বিপদের সময় বিমলবাবু তাকে আশ্রয় দিয়ে, আতিথ্য দিয়ে পরম উপকার করেছে। এই কৃতজ্ঞতাও সমাজনির্ভর, ঔচিত্যবোধসম্পন্ন নায়কটিকে নিশ্চয়ই তাড়িত করেছিল। কিন্তু কেন করেছিল? প্রথমবার করুণার সাহসিকতা স্বাভাবিক ছিল বলেই তার ভীরুতাও স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু মধ্যের তিন-চার কি আর কিছু বেশি বছরের স্মৃতির সঞ্চয় কি আমাদের নায়ককে আর একবিন্দু অগ্রসর করেনি, এতটুকু সাহসী করেনি, যেখানে করুণার দুর্জয় সাহস দেখেও তার সুপ্ত সাহস তথা পৌরুষ উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে! করুণা পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন। তার আবেগার্ত কিন্তু সচেতন সাহসী উচ্চারণ—"তোমার অনেক অসুবিধা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে জানি, কিন্তু আমিও তো তারই জন্য প্রস্তুত হয়ে সমস্ত লজ্জা নিন্দা মাথায় নিয়ে এসেছি।"

—করুণার এই দুর্জয় সাহস, সমাজকে তুচ্ছ করার শক্তি, এতবছর ধরে একজন ভীরুর প্রতি বাঁচিয়ে রাখা ভালোবাসা মর্যাদা পেল না তার কাছে। করুণার এই বিরাট শক্তি হারিয়ে গেল কিছু নৈতিকতা, ঔচিত্যবোধ আর ভীরুতার কাছে। আমাদের নায়ক তার পূর্ববর্তী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে একপাও অগ্রসর হন নি, এতটুকু মুক্তি ঘটেনি তার সীমাবদ্ধতা থেকে—এই থেমে থাকা, সীমাবদ্ধ থাকাটাই তো কাপুরুষতা। সেই কাপুরুষকে সমাজ সংস্কারকের দল প্রণাম করতে পারেন কিন্তু রসজ্ঞ পাঠক তাকে করুণাই করবে।

কোনো বিরুদ্ধ মতাদর্শের তার্কিক যদি বলেন, আমরা যাকে কাপুরুষতা বলছি তা আসলে পরিণত মানুষের বাস্তব বিচারবোধের প্রকাশক আর আমরা যে বীরত্ব আশা করছি

তা আসলে ক্ষণিক আবেগসর্বস্বতার অনুভূতি, তবে তাঁর বিরুদ্ধতা করে এই তর্কই করব যে, নায়কের চরিত্রে প্রকৃত পরিণতমনস্কতার যে কোনো লক্ষণই নেই তার চিহ্ন বারে বারে করুণার হৃদয় অনুভূতিকে তোলপাড় করার মধ্যে প্রমাণিত। কলেজে পড়া করুণাকে যে অতীত কাহিনী নায়কের কাছে ছুটে আসার প্রেরণা যুগিয়েছিল সে কাহিনীর রচয়িতা কোনো আবেগার্ত পুরুষই, কোনো পরিণতমনস্ক, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ নয়, কারণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ নারীর বিবাহের বয়সে নিজের বিবাহে অক্ষমতা থাকলে সেই সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হন না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, শান্ত নিস্তরঙ্গ করুণার মনে হিল্লোল তোলে নায়কেরই একটি বাক্য—''দলিলের দাম সকলের কাছে নেই। ও তুচ্ছ জিনিস অনায়াসে পুড়িয়ে ফেলা যায়।'' যে আবেগার্ত হৃদয় থেকে এ কথা উচ্চারিত হয়, সেই হৃদয়ের একটি দায় থাকে দলিল পুড়িয়ে আসা নারীকে হৃদয়ে গ্রহণ করার। সেই গ্রহণের মুহূর্তে বিচারবোধ, ঔচিত্যবোধ যদি পথরোধ করে দাঁড়ায় আর যে পুরুষ তার কাছে পরাজিত হয় সে সত্যই পৌরুষহীন, পরিণত মনস্কর শিরোপা পাবার যোগ্য সে নয়।

স্বল্প সংখ্যক চরিত্রে কাহিনীর দ্বিতীয় চরিত্রটি করুণা—নিতান্ত সাধারণ হয়েও অসাধারণ। ১৯৩৭ সালের বাংলাদেশে এত পরিণত, পরিশীলিত, শিক্ষিত, সাহসী নারী ছিল! শুধুমাত্র সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে নিজের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার সাহসিকতাতেই তার অসাধারাণত্ব নয়, কাহিনীর শুরুতে নায়কের সঙ্গে তার সাবলীল ব্যবহারটাও অভিনব। বিবাহিত জীবনে নিজের সাজানো সংসারে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায় বহুদিন আগের ফেলে আসা জীবনের কাঙ্ক্ষিত পুরুষটির সঙ্গে—এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও নিজের আবেগকে সংযত রেখে পরিশীলিত ব্যবহার করে যাওয়া সত্যিই অভিনব। করুণার এই ব্যবহারটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ তা কাপুরুষ নায়কেরও দৃষ্টি এড়ায় না। সে আশঙ্কা করেছিল যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার তা হল, 'করুণার নাটকীয় একটা কিছু ক'রে বসা', করুণা সেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়নি, দ্বিতীয় যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি নায়ক আশা করেছিল, ''নাটকীয় না হয়ে করুণা অতিমাত্রায় কঠিন ও সংযত হয়ে উঠলে বুঝি সবচেয়ে খুশি হতাম''—সে প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত নয় করুণার আচরণে। সে কোনো রকম অস্বাভাবিক ব্যবহার যা কাহিনীর নিরিখে 'স্বাভাবিক' বলে গণ্য হয় তা করে না, এই অসম্ভব সংযমের কারণটি স্পষ্ট। করুণা তার স্বামী বিমলবাবুর কাছে প্রকাশ করতে চায় না যে এই আগন্তুক পুরুষটি ('কা'পুরুষ কিনা তা বিমলবাবু জানে না) তার হৃদয়ের সূক্ষ্ম এবং গভীরতম অংশটিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো ব্যক্তি। তিনি শুধুমাত্র পূর্বপরিচিত—এটুকু তথ্যই বিমলবাবুর কাছে সত্য করে তোলা করুণার অভিপ্রায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই আশ্চর্য সংযমের শক্তি করুণা পেল কোথায়? কঠিন পরিস্থিতিতে সংযত আচরণের সহজাত ক্ষমতা বোধহয় নারীর রক্তেই থাকে। আব তাই, করুণার শিক্ষা, সংযম, ক্ষমতা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে করুণা-বিমলবাবুর দাম্পত্য জীবনে আপাত হাস্য-পরিহাসমুখর রসিকতা থাকলেও কোনো শিকড়ের বন্ধন ছিল না। তাই, শেষে করুণার স্টেশনে চলে যাওয়া, কাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে বাকি জীবনের সঙ্গী করতে চাওয়া, প্রত্যাখ্যাত হয়ে পিসিমাকে আনতে স্টেশনে

যাবার গৃহিণীসুলভ কর্তব্যের উল্লেখ করে নায়ককে বিরাট প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে পরাজিত করা—সবটাই করুণার পূর্বোক্ত সাহস আর শক্তিরই আরো একটু স্পষ্ট প্রকাশ। পাঠক তাতে করুণা সম্পর্কে তার মূল্যায়ন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, বিস্মিত হয় না।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'মহানগর' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোনো একক ভাবনার গল্প নয়। একই ভাবনার ভিন্নতর কোনো কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অন্যান্য গল্পেও,—স্টোভ, ভস্মশেষ, শৃঙ্খল, তেলেনাপোতা আবিষ্কার ইত্যাদি। 'শৃঙ্খল' গল্পের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য গল্পের সাদৃশ্য অবশ্য খুবই কম। শুধুমাত্র উত্তাপহীন এক দাম্পত্যজীবনের ছবি আছে দুটি গল্পেই, তবে 'শৃঙ্খল' গল্পে তা আরও স্পষ্ট, মর্মান্তিক—এবং সেটাই প্রধান উপজীব্য। 'ভস্মশেষ' গল্পের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য গল্পের সাদৃশ্য ভাবগত দিক থেকে, বস্তুগত দিক থেকে নয়। উভয় গল্পেই প্রেমকে, কাঙ্ক্ষিতকে গ্রহণের অক্ষমতা প্রকাশিত। কিন্তু, 'ভস্মশেষ' গল্পের প্রেক্ষাপট আলাদা। চরিত্রটির অক্ষমতার কারণ, আরেকটি মানুষের সঙ্গে তার শারীরিক, সামান্য হলেও মানসিক যোগ আছে, যে যোগকে সহজে ছিন্ন করার ক্ষমতা তার নাও থাকতে পারে, তাছাড়া সামাজিক সংস্কার, অনুশাসনের বাধা গৃহস্থ নারীকে দুর্জয় সাহসের ক্ষমতা অর্জনে বাধা দেয়, তাই সুরমার অক্ষমতা কাপুরুষোচিত নয়। আমাদের আলোচ্য গল্পের নায়কের 'কাপুরুষতা' প্রমাণিত। এই কাপুরুষতার কিঞ্চিত লক্ষণ আছে 'স্টোভ' এবং 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের নায়কদের চরিত্রে। 'স্টোভ' গল্পের নায়ক শশীভূষণ তার কাঙ্ক্ষিত নারী মল্লিকাকে জীবনসঙ্গী করতে পারে না কেবল তার মায়ের আপত্তির জন্যই। মায়ের মতামত যার জীবন নির্ধারণের মূল, সে মতামতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা যে পুরুষের নেই সে পুরুষ তার হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্য নারীকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে কেন! সে পুরুষ কাপুরুষই। সেক্ষেত্রে শশীভূষণের কাপুরুষতাই 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'র নায়কের কাপুরুষতার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। ভিন্নমাত্রার কাপুরুষতা লক্ষণীয় 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের নায়কের মধ্যেও। প্রত্যন্ত গ্রাম তেলেনাপোতায় সে গ্রাম্য নারী যামিনীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেও তা রক্ষা করে না। তবে এ গল্পে নায়কের এই ব্যবহার ঠিক কাপুরুষোচিত নয়, এ তার চারিত্রিক দুর্বলতা শক্তিহীনতা মাত্র। মুহূর্তের আবেগে সে যামিনীর মায়ের অসহায়তা দেখে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, সেই আবেগেই সে একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু, বাস্তব পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার শক্তি সে পায় না—এ তার দুর্বলতা, কাপুরুষতা নয়, কারণ, মুহূর্তের আবেগের অতিরিক্ত কোনো হৃদয় অনুভূতিকে সে প্রশ্রয় দেয়নি, কিন্তু স্টোভের শশীভূষণ আর 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'র নায়কদ্বয় এর চেয়ে অনেক সামান্য সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারে না এবং অন্য নারীকে দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যা সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। তাই, তারা কাপুরুষ।

'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। কাপুরুষ নায়কটিকে লেখক কথক রূপে উপস্থাপন করেছেন। এই আঙ্গিকটি অভিনব নয় তবে চরিত্রটি যখন কাপুরুষ, তখন তার দায়ভার নিয়ে উত্তম পুরুষে কাহিনী বর্ণন অবশ্যই অভিনব। সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যে

উত্তম পুরুষে বর্ণিত কাহিনীতে কথক তথা লেখক থাকেন নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র হলেও তারা হন হয় মহৎ নয় রিক্ত বঞ্চিত। অর্থাৎ, সে চরিত্র হয় পাঠকের শ্রদ্ধা নয় সহানুভূতি অর্জন করে। কিন্তু, যে চরিত্র পাঠকের করুণা, অশ্রদ্ধা নিয়ে বেঁচে থাকে সে চরিত্রকে উত্তম পুরুষে চিহ্নিত করা অবশ্যই অভিনব। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কারের' আঙ্গিক আরো অভিনব (তার পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক)। সেখানেও আলোচ্য গল্পের মত আমরা দেখি কাপুরুষোচিত দুর্বল চরিত্রের নায়কটিই কাহিনীর কথক। আসলে বোধহয় লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এই দুর্বল, সমাজভীরু পুরুষদের শুধু চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেননি, একজন পুরুষ হিসাবে লজ্জিত হয়ে সমাজের কাছে নিজে সেই ভীরুদের হয়ে দায় গ্রহণ করেছেন।—এখানেই একজন স্রষ্টা তাঁর অবস্থানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিরপেক্ষ জীবনশিল্পী হয়ে উঠতে পারেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তেমনি এক জীবনরসের শিল্পী, একজন বস্তুনিরপেক্ষ, সমাজ ও সম্পর্ক সচেতন দ্রষ্টা ও কালজয়ী সাহিত্যের স্রষ্টা।

পুন্নাম : জীবনের বিরাট বিপুল দায়

সুমিতকুমার দেবনাথ

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত পাঁচটি গল্পের সংকলন-গ্রন্থ—'বেনামী বন্দর'। সংকলিত গল্পগ্রন্থের অন্যতম গল্প—'পুন্নাম' বহন করছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কল্লোলীয়' মানসিকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মনস্তত্ত্বের জটিলতা, নাগরিক জীবনের সম্পর্কের টানাপোড়েন কিংবা মধ্যবিত্ত সমাজ-পরিবারের অর্থনৈতিক বৈষম্য— এ সমস্ত সমস্যা মুখরিত হলেও গল্পকার শেষপর্যন্ত রূঢ় বাস্তবতার কাঠিন্যেই কল্যাণময় জীবন-চর্চার এবং অন্য এক স্বপ্ন-সমাজের আবহ রচনা করেন।

দুই

'অসুখ আর কিছুতেই সারে না।'—বাক্যটি দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে। 'অসুখ না সারার' বিপন্নতা ক্রমশ সমস্ত গল্পের অবয়বকে গ্রাস করেছে। "টিনের চালের একটি বড়ো ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটি নিচু রান্নাঘর আর একফালি সরু উঠন—এই নিয়ে সংসার। কলতলার পাশে একটা নামহীন বুনোগাছ বেড়ে উঠেছে; অসময়ে শীতকালে তাতে অপরিচিত অজস্র ফুল ধরে; তার না আছে গন্ধ, না আছে রূপ। তবু সেইটুকু শোভা। ও যেন দীন সংসারের মুখে হতাশার হাসি।"—সংসারের পরিচয়ে গল্পকার যেন বক্রোক্তিতে জানান যে, এ সংসারে সময়ে, বসন্তকালেও ফুল ফোটে না; এমনই দীন এ সংসার। ললিত, ছবি আর তাদের অসুস্থ সন্তান 'খোকা'কে নিয়েই এই গল্পের সংসার। ললিত ডকে মাল বহনের কাজ করে। তার রোজগারের সমস্তটাই নির্ভর করে ডকে জাহাজ ভেড়ার ওপর। মাসের রোজগারে মুদির ঋণ শোধ হয় না। তবু রোগ বিপর্যস্ত সন্তানের চিকিৎসায় সে কোনো ত্রুটি রাখে না। খোকার অসহনীয় চিৎকার মা-বাবাকে অসহায় করে তোলে—'সে-চিৎকারে বেদনা নেই—আছে শুধু যেন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ললিতের রাতের ঘুম যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য ছবির সচেষ্টতা ক্রমশ তীব্রতর হয়। ছেলেকে ভোলাতে ব্যর্থ মা খোকাকে মারে, আবার 'সন্তপ্ত হয়ে নানারকম করে ভোলাতে চেষ্টা করে।' খোকার চিৎকার বাড়ে, পরিশ্রান্ত ছবি আর ললিতের রাত অনিদ্রায় দীর্ঘায়িত হয়।

খোকার দুরারোগ্য অসুখ —"প্যাকাটির মত সরু চারটে হাত-পা নড়বড় করে, ফ্যাকাসে হলুদবরণ মুখে কাতর অসহায় চোখ দুটি শুধু জুলজুল করে—সে-চোখে বিশ্বের সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সমস্ত বিরক্তি যেন মাখানো।" ডাক্তার শেষপর্যন্ত 'চেঞ্জে' নিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়। অবশেষে ললিত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এক রাঙামাটির দেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসে। কিছুদিনের মধ্যেই খোকা সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ—'কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টনটন করে উঠল।' কিন্তু পাঁচ বছর বয়সের এই শিশুর মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যায়, ছবি আর ললিত তা লক্ষ করে। রাঙামাটির রং আর শালবনের সজীবতার মাঝে খোকার নতুন এক সঙ্গী জোটে। সুশ্রী, সুন্দর, মধুরকণ্ঠ, হাস্যময় রোগা ছোট্ট ছেলেটি, টুনুর সঙ্গে খেলার সময় খোকার হিংসুটেপনা,

স্বার্থপরতা আর অন্যায় অত্যাচার ললিতকে পীড়িত করে। তবু খোকা 'বেশ সেরে' ওঠে, অস্বাভাবিক স্বরে ললিত বলে ওঠে, "...এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, তাই জন্যে আমাদের এই এত আয়োজন, এত ত্যাগ, বুঝেছ?" মধ্যরাতে টুনুদের বাড়ি থেকে 'মড়া'কান্না ভেসে আসে; বায়ুপরিবর্তিত হ'য় তবু টুনুর আয়ু বাড়ে না। পৃথিবীর অসম লড়াইয়ে টুনুর মত ফুল ঝরে যায় আর খোকার মতো স্বার্থপর, অমানবিক, কলহপ্রিয়, 'দাপুটে' ছেলে বেঁচে থাকে। মানসিক পীড়নে ক্লান্ত ললিত আত্ম ধিক্কারে জানায় ছেলেকে বাঁচানোর জন্য চুরি করে জাহাজের গাঁটরি বিক্রির কথা, চুরির টাকায় 'চেঞ্জে' আসার কথা। 'সন্তানকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্ব' পালন করে পিতা আর সমস্ত সহ্য করে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও প্রতীক্ষা করে থাকে পৃথিবী; যুগ-যুগান্তর ধরে।

'পুন্নাম' গল্পের প্লট রচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র ললিতের আত্মসন্ধান, মনোলোকের আলোড়নকে কেন্দ্র করেই। একদিকে দারিদ্র্য নামক সামাজিক অসহায়তা আর অপরদিকে পুত্র-পালনের পিতৃকর্মে টাকা চুরির ব্যক্তিগত ক্রিয়া,— দ্বন্দ্বে জর্জরিত ললিতের মনোলোকের প্রতিচ্ছবিই গল্পের ভিত্তি। পৃথিবীর অসম-বিন্যাসে স্বার্থপর, অমানবিক আর 'অসুস্থ' প্রজন্মের চিরস্থায়ী ঠিকানা লেখার ধারাবাহিকতাকে স্বীকৃতি দেয় পৃথিবী—বিষাদময় এই নিয়তিলিখনকে ললিতের সিদ্ধান্ত রূপে গল্পের ব্যঞ্জনায় উপলব্ধি করে পাঠক। টুনুর মারা যাওয়া আর খোকার বেঁচে ওঠার প্রতিক্রিয়ায় ললিতের মানসিক বিড়ম্বনা গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্ত, যার প্রাবল্য আছড়ে পড়ে স্নেহান্ধ পিতার অন্যায়কর্মের আত্মগ্লানিময় স্বীকারোক্তিতে। চরিত্রের বিকাশে, বিন্যাসে আর পরিণতির দ্যোতনায় 'পুন্নাম' শিল্পসার্থক এক ছোটগল্প হয়ে ওঠে।

তিন

'পুন্নম'এর গল্প বক্তব্যের স্বতন্ত্রতায় সমৃদ্ধি এনেছে গল্পের চরিত্র। বিচিত্র ও সার্থক চরিত্র সৃষ্টিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র অনবদ্য। ছবি, ললিত, খোকা আর টুনু—চারটি ভিন্ন চরিত্রের কার্যকলাপের মাঝে উঁকি দিয়ে গেছেন ডাক্তারবাবু। তাঁব 'পরম আত্মীয়ের মতো' সহৃদয়তা ছবি-ললিতের দমবন্ধ অসহাযতার সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে যেন সতেজ দমকা বাতাস। কলতলার পাশে নামহীন বুনোগাছে অসময়ে ফোটা ফুলের মতোই গল্পে তাঁর অবস্থান; দুঃখভরা জগতের নিষ্ঠুরতার প্রেক্ষিতে ইতিবাচক এক ইশারা। "দেখুন, এমন ক'রে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত—ঠিক বলুন, জেল হওয়া উচিত নয়?"—ডাক্তারবাবুর জিজ্ঞাসা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনমানসে আঘাত হানে। গল্পের মূলভাবনায, বিন্যাসে এ প্রশ্নেরই আবর্তন চলে। 'পুন্নাম'—নামকরণের বিন্দুতেও এ জিজ্ঞাসার দ্যোতনা, ললিতের মনোলোকের উতরোলে এরই প্রতিধ্বনি। ডাক্তারবাবু চরিত্রটি গল্পকারের নৈতিক আদর্শের পক্ষপাতিত্ব করে।

ললিত এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নায়ক। তাঁর মনোলোকের বিবর্তন গল্পের মূল অবলম্বন। স্বামী এবং পিতা হিসাবে ললিতের আচরণ সুস্থ, স্বাভাবিক। স্ত্রীর সঙ্গে সংসারধর্ম পালনে সহৃদয় সহাবস্থান আর স্পর্শকাতর মমত্ববোধে উজ্জীবিত পিতৃত্বের দাবি নিয়ে রক্তমাংসের প্রাত্যহিকতায় বেঁচে থাকে সে। আত্মত্যাগের লড়াইয়ে স্ত্রী'র সহমর্মী হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

বেঁচে থাকার তীব্রতাকে কামনা করে—"আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি-কোটি ছেলে বাঁচবে, বড়ো হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি ক'রে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে? নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্টস্বীকার যে বৃথা ছবি!" ললিতের মানসিকতায় পিতৃত্বের এই স্পর্শকাতর লালন প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনাদর্শকেই প্রকাশ করে।

ললিত 'জীবনের অন্ধ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে না, নিজের বিপুল ব্যর্থতার কথা ভাবেনা—দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসা করার চেষ্টা করে না—ভাবে শুধু ডাক্তার বলেছে, ও-ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে না গেলে চলবে না—কিন্তু সে কেমন ক'রে সম্ভব!'—ললিতের এই ভাবনার মধ্যে চিরন্তন পিতৃসত্তার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের রূঢ়বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে জীবন-আবর্তের কেন্দ্রবিন্দু দৃঢ়-চিহ্নিত হয়ে ওঠে। ছবির পরিণত মনের শিশু সেজে খোকার অসহনীয় মূঢ় স্বার্থপরতা ভোলাবার চেষ্টাকে ললিতের বিসদৃশ মনে হয়, তবু 'লণ্ঠনের আলোয় ছবির সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শুষ্ক মুখ, নিদ্রাবঞ্চিত কাতর দুটি চোখ দেখতে পায়। মনের এই অসংগত আচরণে নিজের ওপরই তার রাগ হয়।' গল্পকার অন্তর্নিহিত মৌলিকবোধের সংকটের সূত্রেই গল্প-সমস্যার জাল বিস্তার করেন—"ললিত স্ত্রীর সে শ্রান্ত অবসন্ন মূর্তির দিকে চাইতে পারে না। পেছন ফিরে শুয়ে মনে-মনে চেঞ্জে যাবার টাকা সংগ্রহের অসংখ্য আজগুবি কল্পনা করে।'

স্বামী এবং পিতা রূপে ললিত চরিত্রের দ্বৈত সত্তার নিরপেক্ষ প্রকাশ ঘটান গল্পকার অনায়াস দক্ষতায়। গল্পকার জানিয়েছেন, 'বিয়ে, পরিপূর্ণ জীবন, নারীর সাহচর্য, একটি একান্ত নিজস্ব সংসার রচনার আনন্দ, অস্পষ্টভাবে এই সমস্তর জন্য ক্ষুধা তার অন্তরকে ব্যথিত করেছে।'—ললিতের জীবনাকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই তাকে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সংকটের বৃত্তে এনেছে, যুগ-প্রতিনিধি রূপে পরিচিতি দিয়েছে। সন্তানের অসুস্থতায় ছবি আর ললিতের সংসারের বিষণ্ণ অসহায়তা, বায়ু পরিবর্তন ও খোকার সুস্থতা, টুনুর মৃত্যু আর ললিতের পাপের স্বীকারোক্তি—গল্পের কাহিনিবৃত্তে ললিতের আবর্তন ক্রমশ বৃহত্তর জীবন চেতনায় উত্তরিত হয়। যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনচর্চার অভিজ্ঞতায় সিক্ত গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনায় আত্মতুষ্টির কৃত্রিম প্রলেপ পড়ে। আত্মসমর্থনের প্রয়াসের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে স্ববিরোধ আর আত্মবিদ্রুপ—'এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।' তার ভাবনার পরিণতি ঘটে সমাজ-প্রকৃতির আবহমানতায়। গল্পকার লেখেন, '...তার মনে হ'ল এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।' অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে আসে জগতের চিরন্তন জীবন-সত্যের, বাস্তবতার চলমানতায়— '...তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধরে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি।' পাপবোধ থেকে দ্বন্দ্ব-বিক্ষত চিত্তের উত্থান, অর্থাৎ বাস্তবতার নিদারুণ সত্যের কাছে ললিতের অসহায় আত্মসমর্পণের ভাষাতে বৃহত্তর জীবনবোধেরই উত্তরণ ঘটে।

ছবি এ গল্পে এক বাঙালি গৃহবধূর আদলে অঙ্কিত। দারিদ্র্য আর অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি স্বামীর প্রতি সহমর্মিতায় স্নিগ্ধ এবং অসুস্থ পুত্রের অবিরাম 'বিদ্রোহে' বেসামাল এই নারী চরিত্রটিকে পরম মমতায় এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'ওই রুগ্ন পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র

ক'রে এই ছোটো সংসারটি ক্লান্তপদে দুঃখের ভার বহন করে নিঃশব্দে আবর্তন করে' আর নিঃশব্দ আবর্তনে খোকার 'বিদ্রোহ' তাই সহনশীল মাতৃত্বকেও কখনো অসহিষ্ণু করে তোলে। 'ছবির এই আকস্মিক অসহিষ্ণুতার পেছনে কি বিপুল বেদনা, হতাশা ও ক্লান্তির ভার যে আছে তা সে বোঝে'—ললিতের উপলব্ধিতে ছবি সমাজ-ব্যবস্থারই শিকার। ললিত চরিত্রের বিবর্তন, অন্তর্দ্বন্দ্ব ছবির চরিত্রে নেই। 'ছবি রাগের মাথায় চাপড় মেরে ফেলে সন্তপ্ত হয়ে নানারকম ক'রে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভীতভাবে স্বামীর বিছানার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করে স্বামীর অসময়ে নিদ্রায় ব্যাঘাত হল কিনা! নিজের দু-চোখ সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমে জড়িয়ে আছে। কিন্তু ......' অথবা, 'কাল খোকাকে কোলে নিতে গিয়ে আমার হাত দুটো টনটন করে উঠল'—এ সমস্ত মন্তব্য ছবির স্বামী-সন্তানের প্রতি প্রেম-স্নেহের নারীসুলভতাকেই প্রকাশ করে। গল্পের পরিণতির ভাবনার পথে সে স্বামীর বিবর্তনে সহানুভূতিশীলা হতে না পারলেও ললিতের পূর্ণ চরিত্রগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "কিন্তু কি সুন্দর জায়গা বাপু, আমার যেন আর কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না"—ছবি জীবনকে ভালোবেসে ফেলে; সমস্যামুখর প্রতিকূলতায় দু'চোখ ভ'রে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। আর এখানেই প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প-ভাবনায়, চরিত্র-চিত্রণে অনবদ্য হয়ে ওঠেন।

'পুন্নাম' গল্প শুরু হয়েছে খোকার অসুখের বর্ণনাতে। ছবি ও ললিতের সন্তানের 'অসুখ আর কিছুতেই সারে না।' ডাক্তারের পরামর্শে চেঞ্জে এলে পরিচয় হয় প্রতিবেশী সন্তান টুনুর সঙ্গে—"ছেলেটি রোগা, মাথায় রেশমের মতো কোমল একমাথা দীর্ঘ চুল—নীলাভ চোখ দুটিতে, ছোট্ট মুখে ম্লান হাসিটি যেন লেগেই আছে।' খোকা আর টুনু স্বভাবধর্মে একেবারেই পরস্পরের বিপরীত। খোকার অসহনীয় আচরণ তার অসুখ সেরে ওঠার পর স্বার্থপরতার নিষ্ঠুরতর রূপ নেয়; প্রায় সমবয়সী টুনুর সঙ্গে তার অন্যায় একাধিপত্য ললিতের পিতৃসত্তাকে পীড়িত করে—'নিজের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীর এই সুশ্রী সুন্দর মধুরকণ্ঠ ছেলেটির সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা ক'রে হঠাৎ ললিত মনে-মনে অকারণে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে।' অকারণে এই অনুভব ললিতের পিতৃসত্তার সীমাবদ্ধতাকে চূর্ণ করে দেয়। খেলার সঙ্গী টুনুর ঘাড়ের ওপর চেপে তার মাথাকে মাটিতে ঠুকে দেবার চেষ্টা, অকারণে প্রাণপণ শক্তিতে চিমটি কাটা কিংবা সজোরে হাত মুচড়ে সন্দেশ কেড়ে খাওয়ার মতো খোকার স্বৈরাচারী স্বভাব আর টুনুর সংযম, অসহায়তা, সরলতা;—দু'য়ের মধ্যে সমাজ-ভেদ জীবনধর্মের পরিচয় রয়েছে। গল্পকার নিপুণ ব্যঞ্জনায় ললিতের কণ্ঠে শ্লেষ ঢেলেছেন —"শোনো না, এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে, ..."।

শিশু চরিত্র দুটিও প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিপুণ শিল্প-সৃষ্টি। বিপরীত বৈশিষ্ট্য ও তার দ্বন্দ্ব—গল্পে বৈচিত্র্য এনেছে, ছোটোগল্পের শিল্প-ভাবনায় এনেছে বিবর্তন; সর্বোপরি ললিতের মনোগত উত্তরণের প্রধান অবলম্বন রূপে গল্পপ্রকরণ এবং পরিণতিরও এক কারণ হয়ে উঠেছে।

চার

পুরাণে আছে, পুত্র না জন্মালে পুন্নাম নরকে যেতে হয়। পিতামাতাকে পুন্নামক নরক থেকে পরিত্রাণ করে পুং-সন্তান, পুত্র। গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী এই নামকরণের পেছনে আছে গল্পকারের রূঢ় বাস্তবজীবনবোধ। গল্পে ছবি-ললিতের শতছিন্ন সংসার, খোকার 'বিদ্রোহ',

শারীরিক সুস্থতার পরও তার মানসিক অসুস্থতার প্রকটতা কিংবা সুন্দর টুনুর সঙ্গে তার স্বার্থপর, স্বৈরাচারী একাধিপত্য—সমস্ত কিছুই প্রতীকী ভাবনার অনুষঙ্গ। পিতা সন্তানের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বের সত্যতা যাচাই করে, প্রতিষ্ঠা করে; তবু ললিত নিজের 'সুস্থ' পুত্রের আচরণে পীড়িত হয়। 'এই খোকা ভবিষ্যতের আশা; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ও পৃথিবীকে ভোগ করবে, ধন্য করবে ......,' —এই ভাবনাতেও তাই তীব্র শ্লেষ লক্ষ করা যায়। অনুশোচনায় দগ্ধ হৃদয় এই 'শিশুর বাসযোগ্য' ভূমিকে নরক বলে অনুভব করে। দায়িত্ব পালন করে পিতা এই পৃথিবীর দায়িত্ব দিয়ে যায় 'খোকা'দের হাতে। যারা এই পৃথিবীকে টুনুর হাত মুচড়ে সন্দেশ কেড়ে খাওয়ার মতো শুধুই ভোগ করে, তারাই শাসন করে এই বসুন্ধরা; বিলোপ ঘটে টুনুর মতো সুস্থ জীবনবোধের। "ভয় নেই, এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না। তাছাড়া পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ করবে বলেই তো পুত্রের জন্ম! তাকে পৃথিবীতে আনবার দায়িত্ব যে করেই হোক পালন তো করতে হবে। এই বক্রোক্তির মধ্যেই মূল বক্তব্য নিহিত আছে। সন্তান-বাৎসল্য সৃষ্টির প্রাচীনতম সত্য—কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, সেই আলেখ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র অসামান্য নিপুণতায় রচনা করেছেন।" (ভট্টাচার্য জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কথা শিল্পী / ভারবি, পৃষ্ঠা-২৯৬-২৯৭)

জীবনধর্মের অন্ধকারময় দিকটি আলোকিত হয়েছে 'পুন্নাম' গল্পে। "কল্লোলীয় অনুপ্রেরক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিশ্ব-নীতির নেপথ্যে যে কুটিল শক্তির ক্রূর রসিকতা দেখে ক্ষোভে যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছিলেন, এই গল্পে সেই সুরই অনুরণিত।"(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় / বাংলা গল্প বিচিত্রা / প্রকাশ ভবন, কল-৭৩ / পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪) বিশ্ব-বিধানে সংসারে সেই স্বমহিমায় বেঁচে থাকার অধিকারী যে হিংসা, হীন-স্বার্থপরতা, ঘৃণায় ভরিয়ে দেয় বসুন্ধরা আর নির্মল, সুন্দর, পরিশীলিত-ইতিবাচক জীবনে ত্বরান্বিত হয় মৃত্যু— "যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশিত কূট ঐশীশক্তি পৃথিবীতে পবিত্র সৌন্দর্যকে সহ্য করতে পারে না; তার বিধানে সেই কুৎসিত হীন-স্বার্থপরতাই প্রাণের অধিকার লাভ করে—যে মানুষের দুঃখকে দুঃসহতম করে তুলবে, তার পাপকে আরো বীভৎস করে দেবে, তার যন্ত্রণাকে আরো প্রলম্বিত লয়ী করে দেবে, তার মুক্তির চতুর্দিকে পাকে পাকে আরো কঠোর দুশ্ছেদ্যতম শৃঙ্খল জড়িয়ে দেবে।"(ঐ)। 'পুন্নাম' গল্পে নিহিতার্থ এ ভাবনাকেই স্বীকৃতি দেয়।

পাঁচ

শিল্পোত্তীর্ণ গল্প—'পুন্নাম'। গল্পের নায়ক ললিতের ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যার মূলে সমাজ-সংকটের প্রভাব আদর্শহীন অস্তিত্বের চিরন্তন প্রবহমানতায় আত্তীকৃত হয়। অথচ এই স্রোতে অবগাহন করেও ললিত উত্তরিত হয় এক দার্শনিক সত্যে। নিম্নবিত্ত পরিবারের ওপর বুর্জোয়া অর্থনীতির, শ্রেণি বৈষম্যে বিভাজিত সমাজনীতির আঘাতে ভেসে যায় মূল্যবোধ—নতুন এক বোধের জন্মে গল্পের নায়ক জীবনের অর্থ খুঁজে ফেরে। আপাত সমাধান গল্প-সমস্যার মূল ভাবনায় আলোড়ন তোলে। গল্পের প্লটে ললিতের এই আত্ম-অন্বেষণ বিস্তারিত হয়।

খোকার দুরারোগ্য অসুখ, নিম্নবিত্ত পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের অসহায়তা, চেঞ্জে আসার জন্য ললিতের নীতিহীন সক্রিয়তা, শিশুর শারীরিক সংকট-মুক্তি—গল্প-ভাবনায় চরমমুহূর্ত

তৈরি হয় অনবদ্য শিল্প-কৌশলে; ললিতের পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বে, নব চেতনার জাগরণে। পুত্রসম টুনুর মৃত্যুসংবাদে বিকৃত স্বরে ললিত বলে ওঠে,—'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল—আশ্চর্য নয় ছবি?' গল্পের আঙ্গিকে এবং বিষয়-ভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ছবির ভয়ে কাঁপা স্বরকে সান্ত্বনা জানায় ললিতের আত্মবিশ্লেষণাত্মক কণ্ঠ—"কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা। এ-চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধরে শুধু আমাকে খোঁচা দেবে।"

একমুখিতা আর ঋজুতা 'পুন্নাম'কে ছোটোগল্পের মর্যাদা দান করে। কাহিনীর সূত্রপাতে প্রস্তাবিত সমস্যাই গল্পে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে এবং সংক্ষিপ্ত ঘটনা অনুষঙ্গে ও সীমিত চরিত্র-ক্রিয়ায় পরিণতির লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়। ছবি-ললিতের জীবন-চর্চার প্রতিকূলতায় অথবা খোকা-টুনুর পারস্পরিক স্বভাবজ বৈপরীত্যে উঠে আসে সমাজ-ভাবনার গূঢ় ইঙ্গিত। বিবৃতিময়তার পরিবর্তে ভাষা ও সংলাপ রচনার নিপুণতা প্রতিছত্রে; গল্প হয়ে ওঠে নির্ভার, গতিময়। পরিণতির ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত 'পুন্নাম' বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। ব্যক্তিগত সমস্যা উত্তরিত হয় বিশ্বজনীন সত্যে, চেতনার মূল্যায়ন বহন করে জীবনের বিপুল দায়। গল্পকার শেষপর্যন্ত আশাবাদী; প্রতিকূলতার অন্ধকার ভেদ করে নবজীবনের আলোকময় উত্থানের অবশ্যম্ভাব্যতায়। ললিতের ভাবনায় তারই প্রতিফলন : "বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হ'ল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি।"

সামাজিক বৈষম্যের প্রতি বিদ্বেষ আর দার্শনিক উপলব্ধিতে উত্তরণ— চেতনার জাগরণের উদ্ভাস গল্পকারের জীবনাদর্শের আলোকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও হিরণ কুমার সান্যাল সম্পাদিত 'কেন লিখি' সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছিল "......কিন্তু আমি লেখার একটিমাত্র কারণই বুঝি,—বুঝি যে সত্যিকার লেখা শুধু প্রাণের দায়েই লেখা যায়—জীবনের বিবাট বিপুল দায়।"(মিত্র প্রেমেন্দ্র, কেন লিখি / কলকাতা, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ / ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৬১)—জীবনের 'বিরাট-বিপুল দায়ে'র তাগিদেই জন্ম নেয় তাৎপর্যপূর্ণ গল্প 'পুন্নাম'।

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে : অসহায় মানবাত্মার ক্রন্দন

ভক্তিপদ দলুই

তত্ত্বতালাশের খোলাবাজারে আধুনিক সাহিত্য আলোচনা ফুকো, দেরিদা অনুসারী। নব্যনির্মাণের যুগে ইতালীয় মানবতা তার কৌলিন্য হারিয়ে আজ বিপ্রতীপ মানবিকতায় বিনির্মাণপন্থী। উত্তর আধুনিক এই প্রেক্ষাপটে সমালোচনার বহুমুখী প্রবাহে লেখক-পাঠ্য-পাঠক সম্পর্ক ছাড়িয়ে সমালোচক আজ লেখকের মৃত্যুও ঘোষণা করে (রোঁলা বার্ত)। কেবল শব্দের অর্থ খুঁজে পাঠ্যে প্রবেশ নয়, সে শব্দের অর্থও ক্রমাগত বদলে যায় আপেক্ষিকতার শর্ত মেনে। ফলে সাহিত্য যুগের দৃষ্টিতে নবনব রূপে আলোচিত হবার দাবি রাখে। যদি যুগের দাবি আধুনিক সাহিত্য বিচারের প্রধান মাপকাঠি হয় তবে বিশ্বায়ন ও বিশ্বরাজনীতিকে অস্বীকার করা যায় না। মননশীল সাহিত্য আজ এই দুই মৌল বিষয়কে এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই আজ বাংলা সাহিত্য ও সমালোচনাও তার প্রান্তিকতা নিয়ে বিশ্ববাজারের কেন্দ্রাভিমুখী।

কল্লোলের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটি তত্ত্ববিশ্বের এই আলোবে বিচার করা যেতে পারে। এক বিগত যৌবনা নারী বেগুন। পৃথিবীর বহু প্রাচীন প্রথা বেশ্যাবৃত্তি তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। স্বৈরিণী তথা বহুবল্লভা এই বেগুনের গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'। কালিঘাট সোনাগাছিতে যে অজস্র নিরুপায় রমণী মোটা দাগের পরিচর্যায় টিকে থাকার লড়াই করে বেগুন তাদের প্রতিনিধি। শরীরের বিনিয়োগে লাভের কড়িতে ক্ষুন্নিবৃত্তিরত বেগুনেরা একসময় হার মানে শরীরের কাছে। ক্ষণস্থায়ী যৌবন সময়ের সরণীতে ঝরে পড়ে বিকেলের রোদ্দুরের মত। আর টিকে থাকার লড়াইয়ে ক্রমাগত হারতে হারতে শেষ আত্মসম্মানটুকুও বিকিয়ে দিতে হয় জীবনের কাছে। কেননা, বেগুনের জায়গা দখলের জন্য উঠে আসতে থাকে খেঁদি বা শশীর মত অন্য কেউ। নিয়তির নির্মম পরিহাসে যাদের অবস্থাও একদিন হয়ে যাবে বেগুনের মতই।

আপাতত রূপ যৌবনের সীমিত ক্ষমতায় বেগুনকে পথে বেরোতে হয় খদ্দেরের খোঁজে। 'দুমাসে একটি মিনসে'ও তার চৌকাঠ মাড়ায়নি। এদিকে দুমাসের বাড়ি ভাড়া ও খোরাকি বাকি পড়ায় বাড়িউলী মাসির হুমকি ও লাঞ্ছনা সয়ে রংচটা সিল্কের শাড়িতে শেষ সম্বলটুকু নিয়ে বিকৃত ক্ষুধার অভিসারে যেতে হয়। প্রতীক্ষাই শ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়ার আসল উপায়— এই আপ্তবাক্যে বেগুন তার প্রথম বীভৎস চেহারার খদ্দেরের সঙ্গ পরিহার করে। তারপরে "কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে" অবশেষে জুয়ার আস্তানায় 'ধরনা' দেয়। সেখানে স্বৈরিণী ছলনাতেও কোন কাজ হল না দেখে নিরুপায় হয়ে এক ভদ্রলোকের পিছু নেয়। লজ্জার মাথা খেয়ে গায়ে পড়ে তার সঙ্গেও আলাপ করতে যেতে মুখোমুখি শশী, তার বাবু ও মাসির। শশীর যৌবনের ক্ষমতায় বাবু রাখার ক্ষমতা ও মাসিক আর্থিক ক্ষমতা যেন ব্যঙ্গ করে অথবা পিছু ছাড়ে না বেগুনের অসহায় অক্ষমতাকে। শশীরা ভুলে যায় তার আজকের ক্ষমতাও ক্রমাগত বেগুন অভিসারী।

অতএব আবার মরিয়া চেষ্টা। এক মাতাল বুড়োকে কব্জা করতে গিয়ে পাহারাওয়ালার

হাতে জিম্মা দিয়ে ফিরতে হল। রূপো নাম্নী নারীর অবর্তমানে তার আর 'সোনা' পাওয়া হল না, হতোদ্দম বেগুন ব্যর্থ মনোরথে প্রথম সুযোগ ছাড়ার আক্ষেপে পূর্বের পথে চলতে আরম্ভ করল। সেই বেঞ্চি, সেই বীভৎস লোক। অথচ পূর্বের মত আর আতঙ্কে শিউরে উঠল না। 'বিতৃষ্ণা ভরা আনন্দ' তাকে গ্রাস করলো। তার পকেট হাতড়ে পয়সা না পেয়েও তার সঙ্গেই বেগুন বাধাহীনভাবে এগোলো। যেখানে শশী নেই, মাসী নেই, পাহারাওয়ালা নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগে পতিতার পঙ্কিল জীবনের ছবি এত বীভৎস ভাবে না হলেও বাংলা সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র প্রভৃতির গল্পে এই পতিতার সমস্যা মধ্যবিত্ত রোমান্টিক আদর্শে অঙ্কিত। বেঁচে থাকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মানের চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে পরাজিত আত্মার হাহাকার ও গ্লানি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত এত তীব্র করে কেউ আঁকেনি। দেহ ও বিত্তে নিঃস্ব এক গণিকা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক বীভৎস মানুষের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে। রোমান্টিক ভাবালুতা নয়, করুণার্দ্র মানবিকতা নয়, যেখানে প্রকাশিত শুধু জীবনতৃষ্ণা, বেগুন শুধু এক পতিতা নয়। সে যেন সমগ্র নারী সমাজের প্রতিনিধি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অহরহ আপন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যার লড়াই।

সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সময়সীমায় এই গল্প বিস্তৃত। বিগত যৌবনা বেগুনের অসহায়তা দিয়ে গল্পের শুরু। পতিতার মূলধন শরীর ও যৌবন। সে দৃষ্টিতেই বেগুন আজ রিক্ত। সীমিত এই পরিসরে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর চোখে দেখা বাস্তবতায় বেগুন চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। রেখা চিত্রের মত প্রয়োজনীয় আঁচড়ে তিনি চেষ্টা করেছেন বেগুনের অন্তরমহলে ঢোকার। বিগত যৌবনা বেগুন তার বর্ণহীন অভাব ক্লিষ্ট জীবনে আত্মসম্মানকে বাঁচিয়ে রাখতে উন্মুখ। তাই তাগাজোড়ার গিল্টির সংবাদটি সে বাড়ির কাউকে দিয়ে ছোট হতে চায় নি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা প্রান্তিক পেশা নিয়ে রচিত এই গল্পে মেকি সভ্যতার অন্তরালে যা লালসাময় অন্ধকার বিরাজ করে বেগুন চরিত্রের উপস্থাপনায় ও ছোট ছোট সিঙ্গেল ইম্প্রেশন-এ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র তা দেখাতে চান। বস্তুতঃ বেগুনের জীবন সংগ্রাম, শশীর যৌবন গর্বিত উপস্থিতি, মাসির স্থূলতা সবই নিরুপায় বীভৎসতার সংযত চিত্র।

সমগ্র গল্পে পতিতা পল্লীর আবহ চিত্রিত। শুধু মেয়েলী শব্দ ব্যবহার নয় তাদের ঈর্ষা, কটাক্ষ, নীচতা, ব্রীড়া প্রভৃতিতে পরিবেশ যথাযথ। শশী এই পরিবেশের মূর্তিমতী নায়িকা, তার যৌবনের কমনীয়তা না থাকলেও শরীরের বাঁধুনি ও উগ্রতায় সে কামোন্মত্ত পুরুষদের কাছে বেশী দামী। সর্বোপরি নায়িকা বেগুনের বর্তমান অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে শশী চরিত্রের দরকার ছিল।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' এই নামকরণটি আবার ভাবনার দাবী রাখে। শিশ্নোদর মানুষ ক্ষুধায় ও যৌনতায় বেঁচে থাকে এটা তার শারীরবৃত্তীয় চাহিদা। কিন্তু সেটা যখন বিকৃত অভিধায় ভূষিত হয় তখনই কোন গূঢ়ার্থকে ব্যঞ্জিত করে। পতিতাপল্লীতে পুরুষের যৌনক্ষুধা আর পতিতাদের পেটের ক্ষুধা দুটোই নিবারিত হয়। একজন পতিতার কাছে স্বাভাবিক যৌনক্ষুধাই উপার্জনের উপায় আর তখনি তার ব্যক্তিগত যৌনতা আর যৌনতা থাকে না।

প্রতিদিনের কার্য-কারণে তা হয়ে ওঠে অভ্যাস। পতিতাপল্লী বিকৃত কামী মানুষের আবাসস্থল, তাহলে এখানে বিকৃত ক্ষুধা কাদের? নিরুপায় বেগুন যখন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে 'চারিদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিকার অনুসন্ধান' করে তখন সে তন্ময় দৃষ্টি কোন্ ক্ষুধাকে চিহ্নিত করে? বস্তুতঃ এ ক্ষুধা আসলে বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম। কেননা যৌনতা তার কাছে শিহরণ নয়। শশীর উপস্থিতি ও মাসির তিরস্কারের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার জন্যই তার এই পুরুষ 'তল্লাস'। তাই খোঁপার ত্রুটি শোধরানো, পায়ের জুতো দিয়ে শব্দ করা, জুয়ার আসরে পুরুষের গা ঘেসে দাঁড়ানো—প্রভৃতি একটা বিকৃতির জন্ম দেয়, আর এ বিকৃতি নারী চেতনার বিপ্রতীপে অবস্থান করলেও বেগুন চরিত্রের অসহায়তাকে প্রকাশ করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র নির্মম বর্ণনায় একান্তই মিতবাক। বেগুনের কাছে যখন শেষ পারানীর কড়ি হয়ে দেখা দিল বেঞ্চির বীভৎস লোকটি তখন পরম নির্ভরতায় অবিচলিত ভাবে সে বলে, "চল, যাবে না?" সে যেন কত দিনের চেনা, এই নির্লজ্জ অভিনয়ে বেগুন যুদ্ধোত্তর সমাজের সংকটকে প্রকাশিত করে আর লোকটিও—

"প্রথম সুখের ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা দুহাতে চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াল। মেলায় লোক আর ছিলনা, বললেই চলে। তারা পাশাপাশি এগিয়ে চলল। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে বেগুনের পা আর চলছিল না। খাবারের দোকানের সামনে বেগুন তাকে থামিয়ে বললে, 'দাঁড়াও, কিছু খাবার আনি, কিছু রেস্ত বের কর দেখি।'

লোকটা ধীরে ধীরে একে একে তিনটে পকেটের ভেতরকার কাপড় উল্টে দেখাল। কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বেগুন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে লাগল, 'মিনি পয়সার ইয়ার্কি দিতে এসেছো, হারামজাদা চোর'।

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের কোনভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আয়নায় প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেগুন হতাশ হয়ে আর একবার তার পকেটে পয়সা লুকোবার সমস্ত সম্ভাব্য স্থান নিজে হাতড়ে দেখল। একটি দেশলাই ও গুটিকতক বিড়ি ছাড়া আর কোন সম্বল ছিল না।

দাঁতে দাঁত চেপে অসীম হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে চল—এবার, তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।"

এই নির্মম বর্ণনায় প্রান্তেবাসী এক অসহায় নারীর চিত্র ফুটে উঠেছে। সাধারণ নারীরা দায়ে পড়ে বেশ্যা হয় না, জীবনের ঘূর্ণায়মান মঞ্চে তাদের বেশ্যা হতে হয়। আর শেষ বয়সে যখন শরীরে মাদকতার চিহ্ন থাকে না। তখন সে বাঁচা হয় কেবল টিকে থাকা। বেগুনও এখানে তেমনি ঐ বীভৎস মূর্তির মানুষটিকে আঁকড়ে ধরে শুধু টিকতে চেয়েছে। কেননা বাঁচা তার অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন? : একটি আলোচনা

পিয়ালী দত্ত চৌধুরী

বিখ্যাত ঘনাদার অসংখ্য আশ্চর্য গল্পের অন্যতম এই গল্পটি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসপ্রতিম ঘনাদা এই গল্পের কথক। দক্ষিণ কলকাতার একটি কৃত্রিম জলাশয়ের ধারে প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচজন প্রৌঢ় সমবেত হন এবংঅঞ্চলটি সম্পূর্ণ জনশূন্য না হওয়া পর্যন্ত নানাবিধ আলোচনা চলে তাদের মধ্যে। এই পাঁচজনের একজন ঘনশ্যামবাবু ওরফে ঘনাদা। ওর পরিচয় এ গল্পে বিশেষ স্পষ্ট নয়; শুধু এটুক, 'কলকাতার কোন এক মেসে তিনি থাকেন ও ছেলেছোকরাদের মহলে ঘনাদা রূপে তাঁর অল্পবিস্তর একটা খ্যাতি আছে এইটুকু মাত্র সবাই জানে। শীর্ণ পাকানো চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা কঠিন, আর তাঁর মুখের কথা শুনলে মনে হয় পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে তিনি যাননি, এমন কোন বিদ্যা নেই যার চর্চা তিনি করেন না।...তাঁর পাণ্ডিত্যে যত ভেজালই থাক তার প্রকাশে যে মুন্সীয়ানা আছে—একথা স্বীকার করতেই হয়।' এগল্পে ঘনাদার পরিচয় যত সামান্যই হোক, তবু বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় এই চরিত্রটির অসামান্য দ্যুতি এখানেও পাওয়া যাবে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের আশ্চর্য মিশ্রণে ঘনাদার অসাধারণ নৈপুণ্য, অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার অপূর্ব দক্ষতার গল্পটি এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ড্যানিয়েল জিফার রবিনসন ক্রুশো গল্পটির রূপকথার অন্তরালে লেখক আবিস্কার করলেন এক চিরন্তন সত্যকে—ঐশ্বর্যের লোভে সভ্য মানুষের আদিম বন্য প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তারের; এই সত্য-ই রূপক হয়ে ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র-র হাতে নানা-সুর কাহিনী হয়ে উঠল।

'রবিনসন ক্রুশো' আসলে একজন মেয়ে ছিলেন—ঘনাদার মুখে এই কথা শুনে তার পারিষদবর্গ যতখানি বিস্মিত, আমরা পাঠকেরাও তেমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মনে মনে না ভেবে পারি না যে, ঘনাদা আবারও একটা গাজাখুরি গল্প বলতে শুরু করলো। কিন্তু পরিণামে তার গল্প মুগ্ধশ্রোতাদের মতোই আমরাও মুগ্ধ এই, একটি নতুন মিথ সৃষ্টির জন্য ঘনাদার সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। আসলে রূপকথার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এইসব সত্যকে আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করিনা। তাই রূপকথা কেবলমাত্র ছেলেভুলানো গল্প হয়েই রয়ে যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার মতো কজনই বা এমন গভীরে মগ্ন হয়ে ওরই মধ্যে থেকে আসল তত্ত্বটুকু খুঁজে নিতে পারে। যে পারে তাকেই বোধহয় বলা সাজে, 'সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কসাইয়ের ছেলে, গেঞ্জি আর টালির ব্যবসাদার ড্যানিয়েল ডিফো এগল্পের সূক্ষ্ম মর্ম কতটুকু বুঝবেন। মোটা বুদ্ধিতে তাই একে তিনি ছেলে ভুলানো গল্প করে তুলেছেন।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, "উপন্যাসের সুবর্ণযুগ যাঁরা সার্থক করেছেন, তাঁদের জাতই আলাদা। তাঁরাও মানুষকে গল্প শোনাতেই বসেন, সে গল্পে আমাদের মনোহরণের উপাদানও কিছু কম থাকে না, কিন্তু সে গল্প শুধু কম-বেশি কটি চরিত্রের সুখ-দুঃখের লীলায় আমাদের মুগ্ধ করেই ছুটি নেয় না। যুগের ছায়া যথাযথবাবে তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েও যুগাতীত কিছু জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধি তার মধ্যে মিশে থাকে।" একই প্রবন্ধে তিনি এরই সঙ্গে বলেছেন, "জীবনের ভাষায় জীবনের কথা যাঁরা বলেছেন পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোন

ভাষায় সেই সমস্ত ঔপন্যাসিক পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে অত্যন্ত পৃথক হয়েও একটি বিষয়ে সমধর্মী। জীবনের ছবি আঁকবার ছলে তাঁরা মানবতার মর্ম সন্ধান করে গিয়েছেন।"

(প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য পরিক্রমা, 'উপন্যাস প্রসঙ্গে', পৃ. ৪৬৭, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬)

প্রেমেন্দ্রর কথা সাহিত্যে এই অনুসন্ধানই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ঘনাদার এই গল্পেও 'রবিনসন ক্রুশোর' কাহিনীর নতুন মূল্যায়ন ওই 'মানবতার সর্স' এরই সন্ধান, 'যুগাতীত কোনো বোধের প্রতিষ্ঠা।.

লেকের ধারে একটি সান্ধ্য আড্ডার আসরে ঘনাদা জমিয়ে তোলেন তাঁর কাল্পনিক মেয়ে রবিনসন ক্রুশোর গল্প। শ্রোতাদের বিস্ময়মিশ্রিত ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করেই তিনি বলেন 'যা জানেন তা ভুল'। ইতিহাসের তথ্যের প্রতিও সমান অবিশ্বাস তাঁর "আত্মম্ভরি ইংরেজ সাহিত্যিকরা আসল কথা চেপে গিয়ে যা লিখে গেছে তাই অম্লান বদনে বিশ্বাস করেছেন।" এরপর কল্পনা শক্তির প্রাচুর্যে ইতিহাস ভুগোল তোলপাড় করা যে কাহিনী ঘনাদা বলে যান তা বিশ্বাস অবিশ্বাসের উর্ধ্বে এক অনাস্বাদিত পূর্ব রোমান্স।

মনমাউথের বিদ্রোহে যোগ দেবার অপরাধে একবার নাকি ড্যানিয়েল ডিফোর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পরে কোনরকমে সেই বিবাদ কাটিয়ে উঠে নতুন রাজা রাণী উইলিয়াম ও মেরীর প্রসাদে ড্যানিয়েল কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সেই সময় ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁকে একবার স্পেনে যেতে হয়েছিল। অর্থই মাদ্রিক এক ইহুদী বুড়োর দোকানে খুঁটি-নাটি জিনিসপত্র ঘাটতে ঘাটতে একটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুঁথি পেয়ে যান তিনি; যার অনুলেখক রাস্টিসিয়ানো আর তার কথক স্বয়ং মার্কো পোলো। এই মার্কো পোলো মাত্র যোলো বছর বয়সে যখন চীন-ভ্রমন করেছিলেন তখনই বিখ্যাত এক চীনালেখক ও সম্পাদক সান কাও চি-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ওই সান কাও চি-র মুখে শোনা একটি চীনা গল্পকেই রবিনসন ক্রুশোর গল্পের প্রধান প্রেরণা, বলে দাবি করেন ঘনাদা।

কল্পনাশক্তির টানে ঘনাদা মার্কো পোলোকে জেনোয়ার কারাগারে বন্দী করলেন এবং সেখানেই অপর এক বাদী পিসার নাগরিক। ফরাসি জানা রাস্টিসিয়ানোর হাতে অনুলিখিত হল মার্কোপোলোর অপূর্ব সব অভিজ্ঞতার কাহিনী, সঙ্গে রবিনসন ক্রুশোর মূল গল্পটিও। ঘনাদা আমাদের বুঝিয়ে ছাড়লেন সান কাও চির সে গল্প মার্কো পোলো শুনেছিলেন, ড্যানিয়াল তাকেই ভোল পাল্টে রবিনসন ক্রুশোর গল্প করে তুললেন। কিন্তু মূল গল্পটির কেবল হাত নয়, স্বাদই যেন অন্যরকম।

পৃথিবীর আশ্চর্যতম শহর কিনসাই-এর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নান-সুর সঙ্গে সেদেশের তরুণ নৌ সেনাপতি সি-হুয়ানের অপূর্ব এক প্রেমকাহিনী ঘনাদার 'মেয়ে রবিনসন ক্রুশোর গল্প।' গল্পটি ঠিক যেন এক রূপকথা। কিনসাই শহরের সদাগর চুয়ান-উর ধন সম্পদের প্রাচুর্য সুবিদিত ছিল, কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তাঁর একমাত্র কন্যা নান-সু। অসামান্য রূপসী নান-সুর সৌন্দর্যের খ্যাতি সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই রূপ-ই তার সর্বনাশ ডেকে আনল। দুর্দান্ত কিতান দলপতি চুয়ো সান চীন সাম্রাজ্য অবরোধ করে জানান নান সুকে পেলে তবেই সে তার দুর্ধর্ষ সেনাদলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। নিরুপায় চীনসম্রাট একটি মাত্র মেয়ের জীবন বলি দিয়ে সমগ্র চীনের শান্তি ক্রয় করতে দ্বিধা করলেন না। অতএব পিতা চুয়ান-উ-কে আদেশ

দেওয়া হল কন্যা নান-সুকে কাইফে, এ কিতান দলপতির হাতে তুলে দেবার। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে প্রণয়ী সি হুয়ানের উপরেই ভার পড়ল নান সুকে পৌঁছে দেবার।

সদ্যযৌবনা নান সু এবং সি হুয়ান প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই পালাবার পরামর্শ করল। রণপোতে সমুদ্রের বুকে সাত দিন সাত রাত তারা এগিয়ে চলল। তাদের চোখে স্বপ্ন—ঘর বাঁধার, সুং সাম্রাজ্যের অবিচার আর বর্বর কিতান বাহিনীর অত্যাচারের সীমার বাইরে গিয়ে তারা তাদের স্বপ্নের ঘর বানাবে। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল। প্রচন্ড ঝড়ের সময় সুযোগ বুঝে যখন সি হুয়ান নান-সুকে ভেলায় নামিয়ে দিয়ে নিজেও জাহাজ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে তখনই সি-হুয়ানের বিদ্রোহী অনুচরেরা তাকে ধরে বেঁধে ফেলে। উন্মত্ত ঝড়ের আঘাতে রণপোত থেকে দূরে ছিটকে যায় নান-সুর ভেলা। দূর থেকে সে কেবল শুনতে পায় সি-হুয়ানের কণ্ঠস্বর : "ভয় নেই নানসু, ভয় নেই। আমি যাচ্ছি। আমি যাব-ই।"

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নান-সু একজন শূন্য দ্বীপে নিজেকে আবিষ্কার করে। একাকীত্বের ভয়াবহতা তো ছিলই তারই সঙ্গে চলে অনভ্যস্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই। বেঁচে থাকা কেবল সি হুয়ানের জন্য প্রতীক্ষায় "ভীরু সলজ্জ নান সুর চোখ,—আঁখিপল্লব তার কাঁপতে কাঁপতে একটু উঠেই চিরকাল নেমে এসেছে, তবু সেই চোখ উৎকণ্ঠিতভাবে গেলে পাহাড়ের চূড়া থেকে দূর সাগরের দিকে চেয়ে থাকতে হল দিনের পর দিন সি হুয়ানের আশায়। আসবে, সে বলেছে, আসবে-ই"। এই প্রতীক্ষার দৃষ্টি নিয়েই নান-সুর দিন যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে একদিন সি হুয়ান এসে পৌঁছায়। প্রেমের গল্প যখন নিটোল পরিণতির প্রান্তে পৌঁছোয়, দু শতাব্দী আগে তার এক বংশধর সি হুয়ান মৌ সেনাপতি ছিল। এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরে পায় নান সু। লুব্ধ নাবিকের দৃষ্টিতে নিজের পরিপূর্ণ নগ্নতাকে আবিষ্কার করেই চমকে ওঠে সে। সি-হুয়ানের উত্তর পুরুষের লোলুপতার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া নান-সু ছুটে পালায় পর্বতের চূড়ার দিকে। লোলুপ সেই পুরুষের উদগ্র বাসনা যখন ধরতে যায় তাকে তখনই খসে পড়ে নান-সুর দুশো বছরের প্রতীক্ষার যৌবন। বহু প্রতীক্ষার শেষে সেই পর্বতের চূড়ায় অভ্যস্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করে নান-সু দেখে আরও হাজার হাজার সি হুয়ানের বংশধর তাকে ধরতে ছুটে আসছে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত নান-সুর প্রতীক্ষার অবসান—বিক্ষোভ প্রতিবাদে 'সেদিন রাত্রে জীবনও মশাল রূপে' ওই পর্বতের শীর্ষ সে উজ্জ্বল করে তুলল।

এই গল্প আসলে লোভ-লালসার আগুনে প্রেমের ভস্মীভূত রূপের রূপক। একই সঙ্গে, আদিম পৃথিবীর প্রকৃতি সভ্য মানুষের হাতে ধর্ষিত, লুণ্ঠিত—তারও রূপক এই গল্প। নারী কিংবা প্রকৃতি কেউই তো তার সারল্য, সহজতার সৌন্দর্য নিয়ে প্রেমিক পুরুষের ভালোবাসা পায়নি। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করেও পায় নি। উভয়েই কেবলমাত্র সম্পদ রূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে কখনও তাদের বিনিময় হয়েছে হস্তান্তরিতকরণ হয়েছে, অথবা তারা লুণ্ঠিতহয়েছে, অধিকৃত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস মানেই হল, আদিম বন্য পৃথিবীকে নিজের প্রয়োজনে, লোভতার বাসনামত্ততায় মানুষ ধ্বংস করেছে, লুঠ করেছে। তাই মনে হয় এ গল্প প্রতীকী অর্থে সভ্যতার অগ্রগতির গল্প, প্রকৃতির চিরন্তন কুমারীত্ব হরণের গল্প।

ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশোর গল্প রূপকথা—ছেলেভুলানো কাহিনী। নির্জন

দ্বীপে নেমে রবিনসন ক্রুশো শুধু নিজের সাহসের জোরে বাঁচবার উপকরণগুলোই খুঁজেছিল এবং সংগ্রহ করে নিয়েছিল। এই নিয়েই তার ব্যস্ততা কিংবা সংগ্রহ। তারই জন্য পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে একটু পরিবর্তিত করে নিতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু এই পরিবর্তিত করে নেওয়ার তাদিদের মধ্যেই সে নান-সুর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে তখনই নবগত জনায়...............কে তুমি? দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত নান-সু কাতর স্বরে বলে ওঠে ''আমি নান-সু'। কিন্তু আগন্তুক তাকে চেনে না, তার খোঁজেও সে আসেনি—এসেছে এক ঐশ্বর্যময় দ্বীপ নান-সুর' খোঁজে। এইখানে এসে প্রেমেন্দ্রের ভাবনাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় ন। নারী ও প্রকৃতি এক সত্তা হয়ে গেল পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে। আসলে তো তাই, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর পুরুষের চোখে লুব্ধতা নারী বা প্রকৃতিকে দখল করার জন্য। যে নান-সু একদিন চীন সাম্রাজ্যের গর্ব ছিল, পিতা চুয়ান-উর-শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল সেই দস্যু কিতান দলপতির হাতে সমর্পিত হয়েছিল সুং রাজসভার সমবেত সিদ্ধান্তে। একটি মেয়ের পরিবর্তে চীনের শান্তি ক্রয় করা হয়েছিল। আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সি-হুয়ানের বংশধর যে নাবিক এল সেও তেমনই লুব্ধ হিংস্র চোখেই নান-সুকে পেতে চায়। নির্জন দ্বীপের আদিম প্রকৃতির মতোই নান-সু সুন্দর এবং অসহায়। লুণ্ঠিত হতে চায় না নারী, প্রকৃতিও।

একটি নির্জন দ্বীপই তো লক্ষ ছিল সিংহুয়ান আর নান-সুর। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে একা নান-সুই পৌঁছেছিল সেই দ্বীপে। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তার অঙ্গ থেকে কখন খসে পড়েছে লজ্জাবাস, সে নিজেই সেই নির্জন দ্বীপের প্রতিতূ প্রকৃতি হয়ে উঠেছে নিজেরই অজান্তে। তাই নির্জন দ্বীপের প্রকৃতির মতোই নান-সু সহজ-সরল চোখ নিয়েই নবাগত নাবিককে সি-হুয়ান নান-সু সহজ-সরল চোখ নিয়েই নবাগত নাবিককে সি-হুয়ান মনে করে জানতে চায় 'আমার খোঁজে তাহলে তুমি আসনি? নারী আর প্রকৃতি আপন সত্তাকে পুরুষের প্রেমের স্পর্শে অনুভব করে' পূর্ণ হতে চায়। কিন্তু পুরুষের লুব্ধতা কেবল ঐশ্বর্যের জন্য—নারীর দেহ'আর প্রকৃতির সম্পদ। বহুপ্রতীক্ষার অবসানেও কাঙিক্ষত প্রেমিকের কাছে আশ্রয় পায় না নান-সুর হৃদয়। তাই এবার সে আর্তনাদ করে ওঠে, বলে, 'তোমার কি কিছু মনে নেই সি-হুয়ান। মনে সেই তোমার রণপোত থেকে কেমন করে ঝড়ের রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?' নাবিক জানায় অতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটি লুকিয়ে আছে জ্যানিয়েল তা ধরতেই পারেননি। দ্বীপের নির্জন অরণ্য প্রকৃতির উপর সভ্যতার আধিপত্য বিস্তার, সেই তো প্রকৃতিকে লুঠ করে নেওয়া। বন্য প্রকৃতির যৌবন সৌন্দর্য যে সারল্যে মণ্ডিত তাকে দেখার চোখ তো সভ্য মানুষের নেই। সভ্য-মানুষ খোঁজে ওই অরণ্যের মাঝে লুকিয়ে থাকা পার্থিব সম্পদ—যা তার বাসনাকে তৃপ্ত করতে পারবে। সি-হুয়ানের বংশধরেরা ঐই পার্থিব বাসনা তৃপ্তির খোঁজেই লোভের হাত বাড়িয়েছিল নান-সুর দিকে। স্থূল লোভ, লালসা আর কামনার দহনে পরে পর নারী' ও প্রকৃতির প্রেমের স্বপ্ন পুড়ে যায়, ঝরে যায়—ঘনাদার আপাত আজগুবি কথার আড়ালে গড়ে উঠল এই অসাধারণ মিথটি। ইতিহাস-ভূগোল তোলপাড় করে গড়ে তোলা এই অসাধারণ রূপক কাহিনীটির জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পনাশক্তি—সভ্যতা প্রসারের মূল শক্তিটিকে বুঝবার সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতেই হবে।

মোট বারো : স্বপ্নভঙ্গের মাঝে স্বপ্নের অনুসন্ধান

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের" তেমনি গল্পের মধ্যেও তিনি শ্রমজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযন্ত্রণাকেই রূপ দিয়েছেন। যাদের কথা কেউ বলে না, কেউ লেখে না, যাদের জীবনে চোখ ধাঁধানোর ছড়াছড়ি নেই, তাদের কথাই তিনি সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। জীবনে যে কত রকমের দুঃখ-দৈন্য আছে, কত অপমান-লাঞ্ছনা আর বীভৎস বিকার আছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই জীবনের অভিজ্ঞতায় শিউরে উঠেছেন, বিচলিত হয়েছেন, অস্থির হয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি শ্রমজীবী এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবতাকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা। তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

"লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়। মানসিক বিলাস নয়। সামনে ও পেছনের এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুর্জ্ঞেয় পণ্যময় জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল দায়।"

এই দায়বদ্ধতারই ফসল 'শুধু কেরাণী', 'পুন্নাম', 'জীবন যৌবন', 'সাগর সঙ্গম', 'হয়তো', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি। এইসব গল্পগুলিতে বঞ্চিত অসহায় মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ প্রাধান্যলাভ করেছে। তাঁর গল্প সত্যিই জীবন ও মাটির স্পর্শ লাভ করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মোট বারো' গল্পটির মধ্যেও এই সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং জীবনবোধের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। গল্পটির কাহিনী অংশে মানুষ ও পশুর সহাবস্থান গল্পটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। গল্পটির কাহিনী অংশ সামান্যই। গঙ্গার একটি বাঁধানো ঘাটের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য দুটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন জনৈক ধার্মিক জমিদার। তাঁর বিগতবিত্ত প্রপৌত্র ঘর দুটি ভাড়া দেয় সামান্য অর্থের বিনিময়ে। তার একটিতে থাকে ঘোড়া, অন্যটিতে তার গাড়ি। গাড়ির সঙ্গে একই সাথে থাকে ঘোড়ার সহিস ঘমন্ডি। ঘমন্ডি আরা জেলার লোক। শৈশবে শোন নদীর বাঁধভাঙ্গা বন্যায় ভেসে এসেছিল। তারপর বিশ বছর সংসারের আনাচে-কানাচে গলিতে-ঘুঁজিতে নিরাশ্রয় ভেসে বেড়িয়েছে। হঠাৎ একদিন এক প্রমত্ত ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে বশীভূত করার সাহস দেখিয়ে সে হয়ে উঠল তার সেবক, রক্ষক ও চালক। এরপর পনেরো বছর কেটেছে। লেখক বলেছেন—'ঘোড়া ও মানুষ পাশাপাশি জীবনের পথে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে।' এই বক্রোক্তির মধ্যেই প্রমাণিত হয় যে, জীবধর্মে মানুষ ও পশুতে কোন ইতর বিশেষ নেই।

ঘমন্ডির ওই একটুখানি ঘরে ঘোড়ার গাড়ির পাশে বসবাসকারী মানুষ ও পশুর সংখ্যা মোট বারো। ঘমন্ডি একা থাকলেও বছর চারেক পরে জুটেছে দুলারী। ঘমন্ডির কাছে সে কিছু ধার করেছিল, ফেরৎ দেওয়ার নাম নেই। কিন্তু তার আচার আচরণে বোঝা যায় যে ঘমন্ডির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। একদিন সে যেচে ঘমন্ডির এঁটো বাসন মেজে দিয়ে গেল। আর একদিন 'রোটিটা' পাকিয়ে দিল। কথায় কথায় ঘমন্ডি-কে জানিয়ে দিল, তার ছাগলী 'বাচ্চা হলেই তো রোজ দুসের দুধ দেবে।' ঘমন্ডি প্রলুব্ধ হয়। জিজ্ঞেস করে—'ছাগলের দুধের ভাও

কত আজকাল?' দুলালীর চোখ আশায় চক্‌চক্‌ করে ওঠে। বলে—'ছাগলের দুধ টাকা টাকা সের। ছাগলের দুধ অমন সস্তা জিনিস নয়!' তারপর 'অনিচ্ছুক ছাগলীটার গলার রসি ধরে টানতে টানতে দুলারী একদিন ঘমন্ডির আস্তানায় এসে উঠল।' ওইটুকু ঘরে একটু স্থানাভাব হয় বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই 'আধবয়সী স্থূলকায়' মেয়েটিকে নিয়ে এগার বছর কাটিয়ে দেয় ঘমন্ডি। ওই একটুখানি ঘরে ঘোড়ার গাড়ির পাশে কে নেই! আছে চারটি ছোট-বড়-মাঝারি কুকুর, তিনটি ছাগল, একটি বেড়াল, একটি তিতির পাখি, আছে ঘমন্ডি ও দুলারী। আর ঘোড়া তো রয়েছেই তার স্বস্থানে। এভাবেই দিনের পর দিন যায়। সকাল হয়, 'মানুষ ও পশু জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়।'

এইভাবেই এগারো বছর কেটেছে। বয়সের ছাপ পড়েছে দুলারী এবং ঘমন্ডি দুজনেরই চেহারায়। এমন সময় একদিন দুলারী ঘমন্ডিকে বললে, তার 'ভৌজাইনের বেমার'—দেশ থেকে খবর এসেছে। তাকে দেশে যেতেই হবে। দুলারীর আত্মীয় স্বজন কেউ আছে বলে এতদিন শোনা যায়নি। তাই হঠাৎ এতদিন পরে ভাজের কথা শুনে ঘমন্ডি অবাক হয়ে গেল। ঘোড়া জুততে জুততে বলেই ফেলল—'কোন পুরুষে তার ভাইয়ের নাম পর্যন্ত শোনা যায় নি, আজ আবার ভাজ কোথা থেকে জন্মাল?' দুলারী বললে তার মা-বাপ ভাই-বোন সবাই আছে। দেশ থেকে লোক এসে খবর দিয়েছে। তাকে যেতেই হবে। কবে যেতে হবে ঘমন্ডি তা জানতে চাইলে দুলারী বলে 'আজই'। ঠিক হয় ঘমন্ডি কাজ থেকে ফিরে আসার পর সে যাবে। এরপর ঘমন্ডি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়। কিন্তু দুপুর বেলায় কি মনে হওয়ায় তার স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, আর একজনের জিম্মায় গাড়ি রেখে সে ঘরে ফিরে এসে দেখে, পোঁটলা-পুঁটলি সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে। দুলারী গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে। ফিরে এসে দেখে, সব খোলা—জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে। তা থেকে অনেক জিনিস বের করে ঘমান্ডি বলে—'আরো কি চুরি করা হয়েছে? দুলারী আত্মপক্ষ সমর্থন করতে যাচ্ছিল। তখনই ঘমন্ডি 'খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে।' এক মুহূর্তে দুলারীর সব সংযম ভেঙে পড়ল। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘমন্ডির পিতৃ-মাতৃকুলের মুন্ডপাত করতে করতে তার উপর যথেচ্ছ কিল, চড়, ঘুঁসি, আঁচড়, কামড় বর্ষণ শুরু করে দিল। লেখক বলেছেন—'তারপর এগার বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই দুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতান্ডব শুরু হল তার বর্ণনা করা যায় না।' ঘমন্ডি বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে দুলারীর কোমর থেকে সাতখানা দশটাকার নোট আর খুচরো সাতটি টাকা বার করে নিয়ে তাকে 'লাথিয়ে ঠেলে রাস্তায় বার করে দিলে।' দুলারীও চুপচাপ থাকার পাত্রী নয়। সেও চিৎকার করে পাড়াকে সচকিত করে তুলল—'ডাকুতে তার টাকা কেড়ে নিচ্ছে, তার অনেক কষ্টে ছাগলের দুধ, ঘুঁটে বেচে, মেহনৎ করে জমান টাকা।' চিৎকার শুনে হরদুঙ্গি ও রামজীবন ছুটে এল মিটমাট করে দিতে—

"রামজীবন বললে, 'মিটমাট কর লে ভাই!'

হরদুঙ্গি বললে, 'হাঁ ভাই মিটমাট কর লে। এগার বরিষ দুনো এক সাথ রহলি'।"

ঘমন্ডি তখন অন্যমনস্ক ভাবে একটা কুকুর ছানার গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। সেভাবেই প্রত্যুত্তর দিল—'এগার বছর তো কি হয়েছে! ও চোর আর এ চৌকাঠ মাড়াতে আসুক দেখি!

বেইমান ভৌজির বাড়ী যাবার ছুতোয় চুরি করা।' দুলারী থানায় যাবে বলায় সে বিদ্রুপ করে ওঠে—'যা তু থানেমে! হুঁয়ে তোহার ভৌজাইন হও।'

গল্পটির স্বল্পপরিসর কাহিনীর ফাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের এক গভীর সত্যকে প্রকাশিত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক পটভূমিতে সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতার কারণে যে চূড়ান্ত হতাশা ও নৈরাশ্য বাঙালী শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে গ্রাস করেছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র তাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতো তাঁর সাহিত্যেও শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই চিত্রিত হয়েছে। আসলে—"যে কালভূমিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকাশ, তাঁর কবি-মানস ও জীবন প্রতীতির অনিশ্চয়তা সেই ভূমিরই শস্য।"[১]

'মোট বারো' গল্পের নায়ক ঘমন্ডির জীবনের মধ্যে দিয়েও এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকেই চিত্রিত করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ঘমন্ডি বিশ্বাস করেছিল দুলারীকে। বিশ্বাস করে ঘর বেঁধেছিল তার সঙ্গে। এগার বছর তারা একসাথে বাস করেছে। অথচ এই দীর্ঘদিনের সঙ্গী দুলারীই তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে—বিশ্বাসের ভীতকে দিয়েছে টলিয়ে। জীবনের এই কদর্য নিষ্ঠুরতা, বীভৎস নির্মমতা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ভাবিয়েছে—বেদনাহত করেছে। যুগের যন্ত্রণায় লালিত তাঁর শিল্পী মানসে প্রশ্ন জেগেছিল—

"সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা। ...

...জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ?" (প্রথমা, সংশয়)

এই জিজ্ঞাসাবোধ যেমন তাঁর শিল্পীসত্তাকে জর্জরিত করেছে তেমনি তাঁর গল্পের নায়ক ঘমন্ডিকেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। বিশ্বাসভঙ্গের আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গিয়ে সে নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে। স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই সে ঝগড়া করেছে, মারামারি করেছে—হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর।

কিন্তু ঘমন্ডির এই উগ্রমূর্তি তার চরিত্রের সাধারণ ধর্ম নয়। সে 'বেইমান' দুলারীকে 'লাথিয়ে ঠেলে' রাস্তায় বার করে দিয়েছে বটে, তাকে ক্ষমা করতেও পারেনি আবার হরদুঙ্গি বা রামজীবনের কথায় মিটমাট করে নেবার কথাও ভাবতে পারেনি ঠিকই—কিন্তু অন্যদিকে সে সেই অবস্থাতেই একটি কুকুর ছানার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী আচরণ ঘমন্ডি চরিত্রে যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যান্য গল্পের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। কখনো কখনো তাঁর মধ্যে দেখা যায় প্রগাঢ় জীবনাসক্তি, পূর্ণতর সৌন্দর্যপিপাসা, আবার কখনো কখনো তিনি সমস্ত প্রসন্নতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সাহিত্যের পাতায় কদর্য নিষ্ঠুরতা, বীভৎস নির্মমতাকে উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই স্ববিরোধী শিল্পী মানস আসলে যুগযন্ত্রণার নির্মম ফলস্বরূপ।

'মোট বারো' গল্পের নায়ক ঘমন্ডি। এই চরিত্রটির মধ্যে বিশেষ এক আত্মপ্রত্যয় রয়েছে। এই আত্মপ্রত্যয়ের জোরেই ভেসে যাওয়া জীবনে কূলের সন্ধান পেয়েছিল সে। সব হারিয়ে সে সংসারের আনাচে-কানাচে গলিতে-ঘুঁজিতে ঘুরতে ঘুরতে ত্রিশ বছর বয়সে এক স্থায়ী

১. বাংলা গল্প বিচিত্রা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্রয় পেয়েছে—একটি ঘোড়ার সৌজন্যে এবং ঘোড়ার মালিকের অনুগ্রহে ঘোড়ার সেবক, রক্ষক ও চালক হিসেবে। কর্তব্যের প্রতি সে অবহেলা করেনি কখনো। ঘমন্ডি সাহসী পুরুষ— একদিন যেমন এই সাহসের বলে সে বেয়াদপ ঘোড়াকে বশ করেছিল, তেমনি পুরনো সহিসের আজগুবি গল্পকেও সাহসের উপর ভর করেই উড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথমদিকে ঘমন্ডির এই সাহসী মনোভাব তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঘমন্ডির জীবনের অপর একটি দিক হল তার পশুপ্রীতি। একদিন শীতের রাতে সারারাত ধরে কয়েকটি সদ্যোজাত কুকুর ছানার বিকট কান্না শুনে ঘমন্ডি ঘুমোতে পারেনি। সকালবেলা খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল একটা 'লেড়ি কুত্তা' কয়েকটি সন্তান প্রসব করে মারা গেছে। মায়ের সাথে সদ্যোজাত দুটি সন্তানও মারা গেছে। জীবিত ছানা দুটিকে সে ঘরে নিয়ে এসেছে। অনেক যত্ন-আত্তি করেও অবশ্য তাদের মধ্যে একটিকেই সে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। অপরটি মারা গেছে। সেই ছানাটিকে ঘমন্ডি আদর যত্ন দিয়ে বড় করে তুলেছে। তার সন্তান সন্ততিও হয়েছে। সকলেই ঘমন্ডির প্রিয় এবং আশ্রিত। সে তার খাবার থেকে তাদের খেতে দেয়। গরীব হয়েও সে তাদের ভরণপোষণের ভার নিয়েছিল। এরপরেও জুটেছিল কয়েকটা ছাগল, বিড়াল ও তিতির পাখি। এদের কাউকেই সে ফেলে দিতে পারেনি। এরা সকলেই ছিল অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত। এরা সকলেই ঘমন্ডির পরিবারের এক একজন সদস্য ছিল।

এদের নিয়ে ঘমন্ডির জীবন বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা এল এক নারীর হাত ধরে। তার জীবনে এল দুলারী নামে এক নারী। এগার বছর ঘর করার পর একদিন 'ভৌজাইন বেমার' এই অজুহাতে দুলারী জিনিস-পত্র, টাকাকড়ি নিয়ে চলে যাবার মতলব করে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। ধরা পড়ে যায় ঘমন্ডির কাছে। দুলারীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় রাগে অন্ধ হয়ে ঘমন্ডি তাকে 'লাথিয়ে ঠেলে' ঘর থেকে বার করে দেয়। ঘমন্ডি মূলতঃ উগ্র চরিত্রের লোক নয়। কিন্তু মানুষ কাউকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করার পর তার কাছ থেকে চরম আঘাত পেলে কখনো কখনো তার মধ্যে পশুবৃত্তি জেগে ওঠে। ঘমন্ডি দুলারীকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু দুলারী সেই বিশ্বাসের সুযোগ নেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই দুলারীর বিশ্বাসঘাতকতায় তার 'ইতর' বৃত্তি জেগে উঠেছিল। কিন্তু মূলতঃ ঘমন্ডি শান্ত, কর্মঠ, সাহসী মানুষ। অপরের সঙ্গে ঝগড়া করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সেদিন সে যে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে ফেলেছিল তার মূলে আছে হতাশা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তিনি হতাশার কাছে, বীভৎস নির্মমতার কাছে নতি স্বীকার করেননি। তাকে দেখেছেন, তার জ্বালায় জর্জরিত হয়েছেন। তবু শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ দেখা যায় 'মোট বারো' গল্পের নায়ক ঘমন্ডির মধ্যে। সে 'বেইমান' 'চোট্টা' দুলারীকে মাফ করতে পারেনি বটে, কিন্তু পশুদের প্রতি তার ভালোবাসা, মমত্ব অটুট আছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'চৌকাটে'র ওপর বসে একটা কুকুর বাচ্চার গায়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে দুলারীর গালাগালির 'প্রত্যুত্তর' দেওয়ার মধ্যে। যে মানবিকতা, বিশ্বাস, সহানুভূতি সে তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী দুলারীর কাছে পায়নি, তা সে পেয়েছে পশুদের কাছে। দুলারী তার কাছে তাই হয়ে উঠেছে পশুরও অধম।

শুধু কেরাণী : নীড়-সন্ধানের গল্প

দোস্ত মহম্মদ (আকাশ)

সাধারণভাবে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখক রূপে পরিচিত হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'প্রবাসী' ও 'বিজলী' পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর বহু আলোচিত প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ, চৈত্র-সংখ্যা) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 'কল্লোল গোষ্ঠী'র সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার পূর্বেই লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র পাঠকের কাছে বহুল পরিচিত ছিলেন। এর কারণ অবশ্যই গল্প হিসাবে 'শুধু কেরাণী'র অভিনবত্ব তথা জনপ্রিয়তা। আসলে আঙ্গিকে, ভঙ্গিতে, রসাবেদনে, জীবনজিজ্ঞাসায়, 'শুধু কেরাণী' বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নিজের স্বাতন্ত্র্য সদর্পে ঘোষণা করেছিল এবং পাঠককুলকে অভিভূত করেছিল। পাঠকের কাছে এই গল্পটি এতটাই সমাদৃত হয়েছিল যে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—"এক গল্পেই প্রেমেনকে তখন একবাক্যে চিনে ফেলার মত।"[১]

প্রেমেন্দ্র মিত্র একদা বলেছিলেন—"মানুষের জীবন তার সাময়িক প্রাকৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়ানো। স্খলনে, পতনে, আশা নৈরাশ্যে, গ্লানি মহিমায়, সার্থকতায় ব্যর্থতায় যেমন তা নিজের যুগে নিজের দেশে দেখেছি তা যতখানি সাধ্য আমার গল্পগুলিতে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি।"[২] লেখকের এই চেষ্টা যে আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ আলোচ্য 'শুধু কেরাণী'- সহ তাঁর প্রথম পর্বের গল্প। 'শুধু কেরাণী' গল্পের পটভূমিতে যে সমকালীন বাস্তব দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা দেশের এক কেরাণী দম্পতির ব্যর্থ-অসহায়, ট্র্যাজিক জীবনরেখা নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক সমসাময়িক বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সুযোগ যে পেয়েছেন তা গল্পের বিষয়বস্তুতেই প্রমাণিত। বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা দেশের সার্বিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে এক কেরাণী দম্পতির অতি সংক্ষিপ্ত যে কাহিনী 'শুধু কেরাণী' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে তা লেখকের সমকালীন বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাপুষ্ট বলেই মনে হয়।

'শুধু কেরাণী' গল্প প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন—"কিছু যাদের নেই,—যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোনো গল্প কি হতে পারে না? হোক বা না হোক, তাদের কথাই লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লিখলাম শুধু এক কেরাণীর গল্প। সেই গল্পের নামই 'শুধু কেরাণী'।"[৩] এই গল্পের কেন্দ্রে বাস্তবিকই রয়েছে নাম না জানা অতি সাধারণ এক কেরাণী দম্পতি; 'অর্থনৈতিক কারণে ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতায়' এক কেরাণী দম্পতির ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীকে লেখক এ গল্পে আবেগহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। পুরুষটি সামান্য খাতা লেখার চাকরি করে—তাই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য স্বপ্নসাধও বাস্তবায়িত হয় নি—সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কেরাণী-বধূ 'সূতিকা' রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেই অসুখ থেকে বেঁচে ওঠার প্রবল বাসনা পাখিদের নীড় বাঁধার মধ্যে প্রতীকায়িত হলেও শেষ পর্যন্ত নীড় ভেঙে গেছে, কেরাণী-বধূ অকালে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ সবমিলিয়ে 'শুধু কেরাণী' হতাশা ও ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে মুখরিত, অসহায় আর্তের হাহাকারে বেদনাদীর্ণ। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তের যুগোচিত হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যেই এ গল্পের আবেদন সীমায়িত নয়। জীবনাবেগের বিপুল সমারোহে ভরপুর। 'শুধু কেরাণী' বাহ্যত নিদারুণ দারিদ্র্য, অসহায়তা ও নীড় ভাঙার গল্প বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা জীবনের গানে মুখরিত, বেঁচে থাকার সুতীব্র ব্যঞ্জনায় মহীয়ান। আসলে,— "যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মধ্যবিত্ত হতাশার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প রচনা শুরু হয়েছিল বলে তাঁর প্রথম দিকের গল্পে ('শুধু কেরাণী' ইত্যাদি) মধ্যবিত্ত চেতনা ও বিপর্যস্ত জীবনের দৃষ্টিই বেশী পাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই বিপর্যস্ত জীবন চেতনার গল্পে এক পরম জীবন মমতার রেশ থেকে গেছে।"[৪]—'শুধু কেরাণী' গল্পের ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য যথার্থ বলে মনে হয়। কেরাণী দম্পতির পারস্পরিক মিষ্টি কথাবার্তা, অসুখের খরচ জোগাতে কেরাণী যুবকের পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা, মেয়েটির রাতদিন কেঁদে জীবনভিক্ষা চাওয়া—প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে গভীর জীবনতৃষ্ণা-ই যেন স্বতোৎসারিত হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, 'শুধু কেরাণী' গল্পে কোনো জমাট কাহিনী নেই। অথচ আমরা জানি, গল্প বা উপন্যাসে সুগ্রথিত 'প্লট' ছাড়া গল্পরস দানা বাঁধতে পারে না। যদিও 'শুধু কেরাণী'তে সুবিন্যস্ত কাহিনী ব্যতিরেকেই কয়েকটি ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র দিয়েই লেখক গল্পরস রচনা করেছেন। কেরাণী দম্পতির কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্তের সামান্য ছবি, আবেগ-বিহ্বল কয়েকটি শব্দরাজি এবং দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলি অতি পরিচিত ক্রিয়াকর্মাদির দ্বারা গল্পদেহ পুষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ সবটাই গতানুগতিক জীবনের বিষয়। এই গতানুগতিক জীবনচিত্রের আবার কোনরকম উত্থান-পতন নেই, সমতলে প্রবাহিত নদীর মতই মৃদুতালে একই মুখে অগ্রসর হয়েছে। আসলে 'শুধু কেরাণী' গল্পে কাহিনী বলতে সামান্যই, যেটুকু কাহিনী আছে তা বেঁচে থাকার মুহূর্ত রচনার ব্যর্থ প্রয়াস। যদিও কাহিনীর এই স্বল্পতা সত্ত্বেও 'শুধু কেরাণী' ছোটগল্পের সংজ্ঞা-বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এক সার্থকতম রচনা। প্রকৃতপক্ষে, কাহিনীর অভাব লেখক পূরণ করেছেন মানব জীবনের সমান্তরালে পাখির 'নীড় বাঁধবার' ও 'নীড় ভাঙার' রূপক সৃষ্টির মাধ্যমে। বস্তুত 'নীড়' কথাটি ক্রমান্বয়ে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ফলে অনেক না বলা কথা পাঠকের চিত্তে 'বলা-রূপ' ধারণ করেছে। 'নীড়'-শব্দ-সমন্বিত বাক্যগুলি ক্রমানুসারে উল্লেখ করা যেতে পারে—

১। 'তখন পাখীদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।'

২। 'নতুন নীড়ে তখন অচেনা অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা।'

৩। 'তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।'

—এই তিনটি উদ্ধৃতির মাঝেই 'শুধু কেরাণী' গল্পের মূলভাব লুকিয়ে আছে। এই তিনটি উদ্ধৃতি ক্রমান্বয়ে গল্পের প্রারম্ভে, গল্পের মধ্যেখানে এবং শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ "মধ্যবিত্তের নীড়ের ক্ষণস্থায়িত্ব, তারই মধ্যে সুখের সন্ধান আর শেষে সেই 'নীড়' ভেঙে যাওয়ার গল্প 'শুধু কেরাণী'। তাই ত্রিভুজের তিন কেন্দ্রে অবস্থান 'নীড়' শব্দের।"[৫] এদিক থেকে 'নীড়' শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। বস্তুত পাখির 'নীড়ে'র সমান্তরালে কেরাণী

দম্পতির জীবনপ্রবাহ ও জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশিত হয়েছে। কেরাণী দম্পতি পাখির মতই জীবনের উঁচুডালে 'নীড়' বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা শেষপর্যন্ত পেয়েছিল সবচেয়ে হাল্কা ও ভঙ্গুর ডাল। যদিও নিজেদের অজান্তেই এই ক্ষণভঙ্গুর ডালে বসে জীবনের গান গেয়ে উঠেছিল—পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতাকে পাথেয় করে সংসারের সঙ্কীর্ণ পরিসরেই স্বর্গসুখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু এক হাল্কা ঝড়েই সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়েছে। বিপর্যস্ত কেরাণী জীবনের সামান্য কাহিনী গ্রন্থনে তাই 'নীড়' শব্দটিকে লেখক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করেছেন। এতে লেখক যা বলতে চান আর যা বাস্তবে ঘটে তার তার্কিক সম্মেলন সম্ভব হয়। পাখিদের 'উৎকণ্ঠিত' ফেরার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কেরাণী আর তার বধূর ক্ষণস্থায়ী সংসারের বীজ, যা কালবৈশাখীর উন্মত্ত তাণ্ডবে 'ফুরিয়ে' যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের সময় পরিধির মধ্যেই ঘটে যায় গল্পের কাহিনীর পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ সামান্য সময়ের আবর্তরেখায় ও অতি সামান্য কাহিনীর রূপরেখায় লেখক কেরাণী দম্পতির সুখস্বপ্ন রচনার এবং সেই সুখস্বপ্নের করুণ পরিণতির বিশ্বস্ত ছবি আঁকার বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাই 'শুধু কেরাণী' গল্পহীন হয়েও অসাধারণ ছোটগল্প।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী' গল্প বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য বর্তমানে উল্লেখ্য বলে মনে হয়—"জীবনের সঙ্গে যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও জিতিতে পারিতেছেন না, তাহাদের ব্যর্থতাকে প্রেমেনবাবু দীপ্তিমান করিয়াছেন গল্পে,—অথচ কোনো আড়ম্বর বা ভাবুকতা নাই।"[৬] —'শুধু কেরাণী' গল্পে এমনটিই ঘটেছে। জীবনযুদ্ধে জয়লাভের অদম্য বাসনা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেরাণী দম্পতি পরাজিত হয়েছে। তাদের বেদনাময় পরাজয়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অবশ লেখক আবেগবিহ্বল হন নি। আবেগহীনভাবে নীড় ভাঙার গল্প বর্ণনা করেছেন—কিন্তু কোথাও কারুণ্যের অশ্রুবাক্য লেখকের কণ্ঠরোধ করেনি। "আসল কথা, প্রেমেন্দ্র মিত্র আবেগের শিল্পী নন, মননের শিল্পী। জীবনের নিছক রূপকার নন, মর্মভেদী বিশ্লেষক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী। জীবনের ভাঙন ও অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর লেখনী অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার বিশ্লেষণে নিপুণ ব্যবচ্ছেদক।"[৭] তাই কেরাণী দম্পতির অসহায় জীবন ব্যবচ্ছেদের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া ভার। কাব্যিক অনুভূতির প্রগাঢ়তা যদিও এ গল্পের শিল্পসৌন্দর্য নির্মাণে ফলপ্রসূ হয়েছে। তবু কাব্যসুলভ ভাবার্দ্রতা গল্পে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। নিটোল গদ্যের নীরন্ধ্র পথে এই কবিত্বভঙ্গি যেন অলঙ্কার স্বরূপ হয়ে উঠেছে। গল্পের শুরুতে পাখিদের নীড় বাঁধার কথা থাকলেও গল্পকার অচিরেই পাখির জীবন থেকে চলে আসেন মানুষের জীবনে। কেরাণী দম্পতির নীড় বাঁধার আয়োজনে লেখক এখানে মনোনিবেশ করেছেন। দারিদ্র্য এবং অসহায়তার মধ্যেও কেরাণী দম্পতি কিভাবে সুখস্বপ্ন রচনায় মগ্ন হয় তা দেখিয়েছেন। অফিস যাত্রী স্বামীকে বিদায় দিতে গিয়ে কেরাণী বধূর করুণ হাসি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য সলজ্জ আহ্বান, কেরাণীর কণ্ঠে কপট অনুযোগ, নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে সুখী করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা—এই নিয়ে অভিযোগ, মান-অভিমান, আনন্দ-গুঞ্জন—ইত্যাদি কাটাকাটা ছবিতে ভরা কেরাণী-যুগলের প্রাত্যহিক জীবন। এরই মাঝে আবির্ভূত হয়েছে নতুন অতিথি, 'একটি খোকা'। অভাবের সংসারেও দেখা দিয়েছে আনন্দের ফল্গুধারা। কিন্তু এই আনন্দধারায় হঠাৎ

ছেদ পড়েছে যখন কেরাণী যুবক জানতে পেরেছে তার কিশোরী বধূ 'সূতিকা' রোগে আক্রান্ত। বন্ধুদের কাছে এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন জেনে সে আরো বেশি মুষড়ে পড়েছে। তবুও মেয়েটি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছে "হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না?"—তখন সে জোর করে হাসিমুখে বলেছে, "বাঁচবে না কেন, কি হয়েছে তোমার?" কিন্তু ক্রমশ দুর্বল হতে থাকা মেয়েটি তার ভবিতব্য সম্পর্কে বেশ বুঝতে পারে। তাই আর বাঁচার কথা বলে স্বামীকে বিব্রত করে না, বরং কৃত্রিম হেসে বলে—"তুমি ভাবছ কেন, আমি ত শীগগীরই সেরে উঠছি।"—এভাবেই তারা পরস্পরের সঙ্গে ছলনা করতে থাকে। কিন্তু এতে শেষরক্ষা হয় নি। সব ছলনার অবসান ঘটেছে যেদিন মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলেছে—'আমি মরতে চাই নি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবনভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু—", দুটি ড্যাশ চিহ্নের মধ্য দিয়ে কেরাণী দম্পতির হতাশা ও ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা প্রাণপণে চেয়েছিল বেঁচে থাকতে, কিন্তু এক অমোঘ বৈরী শক্তির দাপটে পর্যুদস্ত ও পরাভূত হয়েছে। তাই তাদের জীবনের সমস্ত বাসনা-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শেষাবধি এই 'কিন্তু'—জাত হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। এখানেই মানবজীবনের ট্র্যাজেডি।

কেরাণী দম্পতির ট্র্যাজিক পরিণতিতে গল্প শেষ হয়েছে। অথচ সমগ্র গল্পে অসহায়তা ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রতিবাদ নেই। বিধাতার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ ঘোষণা নেই, সামাজিক অসাম্য বা অর্থনৈতিক অনটনের বিষয়েও কেরাণী দম্পতির কোনো ক্ষোভ নেই। অর্থাৎ নিঃশব্দে তারা নিজেদের পরাজয়কে বরণ করেছে। বাস্তব জীবনসত্যকে বিড়ম্বিত করে কেরাণী-দম্পতি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহসও দেখায়নি। অর্থাৎ সংগ্রামীচেতনার আলোকে কোনো দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনার মাধ্যমে লেখক গল্পরসকে ঘনীভূত করতে চান নি। ভাবলেশহীনভাবে কেরাণীর অসহায় আত্মসমর্পণের চিত্রকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আলোচ্য গল্পে আমদানী-রপ্তানীর হিসাবের মধ্যেই কেরাণীর কর্মজীবন সীমায়িত। বহির্বিশ্বের কোনো ঘটনা, রক্তক্ষয়ী কোনো সংবাদে তাই তার আগ্রহ ছিল না। কোনোরকমে বেঁচে থাকাটাই ছিল তার স্বপ্ন। যশ বা খ্যাতি লাভের তাড়না ছিল না। আসলে সবকিছু নীরবে সহ্য করে যাওয়াটা যে তাদের শ্রেণীধর্ম—এই কথাটা কেরাণী দম্পতি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। এজন্য সমাজের চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত দায়কে তারা মাথা পেতে বহন করেছে—কোথাও বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করেনি। ফলত, অফিসে দেরী করে যাওয়ায় বকুনি খেয়ে বা হিসাব ভুলের জন্য তাড়া খেয়ে কেরাণীর কোনো বিকার হয় না। স্ত্রীকে পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে না পারলেও ক্ষোভে ফেটে পড়ে না। প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাদের কোনো অভিযোগ মানুষ বা বিধাতা কারোর কাছেই করে না, বরং—"মানুষের কাছে তারা মাথা নিচু করে চলে, বিধাতার কাছেও।" —এখানেই শোষণের বহুমাত্রিকতা স্পষ্ট হয়; মানুষরূপী কেরাণী দম্পতিকে মানবেতর প্রাণী বলে মনে হয়। এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে রূঢ়, বস্তুবাদী শিল্পী বলে মনে হতে পারে। মনে হতেই পারে, কেরাণী যুগলকে এতবড় অপমানের হাত থেকে তিনি মুক্ত করতে পারতেন। তাদেরকে এতটা হেয় নাও করতে পারতেন। তাদের পরিণতি এত দুঃখজনকভাবে নাও চিত্রিত করতে পারতেন। সবই হয়ত

সম্ভব ছিল—কিন্তু এমনটি হলে গল্পের সারবত্তা থাকত না। বা প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে ক্ষতবিক্ষত কেরাণী দম্পতির বিষাদময় পরিণতি পাঠকের বুকে যেভাবে আঘাত করেছে, পাঠকের অনুভূতিকে বিচলিত করেছে এবং পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে, তা বাস্তবায়িত হত না। সর্বোপরি বাস্তব জীবনেতিহাসকেও অস্বীকার করা হত। সবমিলিয়ে, শিল্পীর প্রকৃত কর্মোদ্যোগ-ই ব্যাহত হত। অর্থাৎ বাস্তবতাকে পাথেয় করে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেকে জীবনবাদী সাহিত্যিকরূপে চিহ্নিত করেছেন এবং কেরাণী-বধূর বেঁচে থাকার সুতীব্র বাসনাকে গল্পে স্থান দিয়ে জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। তাই গল্পের শেষে 'নীড়' বাঁধার স্বপ্ন বাস্তবের আঙিনায় স্থাপিত না হলেও পাখা মেলে মুক্তাকাশে ওড়ার বাসনার মধ্যে প্রবল জীবনাসক্তি প্রকাশ লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরীর বক্তব্যকে যুক্তিপূর্ণ ও উল্লেখ বলে মনে হয়—"তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনায়নের যে নিরুত্তাপ, নিরাবেগ দৃঢ়তা ও অবিচলতা রয়েছে—মাঝে মাঝে তাকে রূঢ় কাঠিন্য বলে ভুল হয়। তবু সিদ্ধকাম এই (Day-Dream) গল্প-শিল্পী 'দিবাস্বপ্ন' দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন,—তাঁর গল্পের জীবনকে নাতিস্পষ্ট জীবন - প্রত্যয়ের আকাশ অভিমুখে উত্তরণ-অভীপ্সু করে দিয়ে। আর এ পথে তাঁর কুশলতা এমনই অভাবনীয় রূপে বিস্ময়কর যে, গল্পের থীমকে নিয়ে কবির জগতে তিনি একবার করে ঘুরে এসেছেন সকলের অজ্ঞাতে, যেন জাদুকরের মতো। মৃত্যুর আগে আর্তকণ্ঠে মেয়েটি বাঁচতে চেয়েছিল; কিন্তু কেন? ছেলেটি চেয়েছিল তার দয়িতাকে বাঁচাতে—সর্বস্ব দিয়ে। তাও বা কেন? তাদের সেই অনামিকা আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পী যেন রূপ দিলেন গল্পের আদি অন্তের দুটি ছত্রে পক্ষিজগতের মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দিয়ে।"[৮]

শৃঙ্খল : বিতৃষ্ণার বন্ধন

মৌসুমী কুণ্ডু

"এস নারী,
আজ তব কানে কানে,
কই প্রাণে প্রাণে,
সৃজন রহস্য কথা
নিখিলের আদিম বারতা।"

(যৌবনবারতা, প্রথমা)

প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত নগরজীবনের কথাকার। জটিলতম মনস্তত্ত্ব, আপাত সুস্থ দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে বৈষম্যের বিষাক্ত বীজবপন ও তার বিস্তৃতির চিত্র, মানব-মানবীর সম্পর্কের ধূর্ত, বুদ্ধিপ্রাণ কৌশল—এসবই তাঁর একাধিক গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। 'ধূলিধূসর' (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শৃঙ্খল' গল্পটিকে এজাতীয় রচনার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা যায়। গল্পটি পাঠকের শিল্পবিবেককেও বিস্ময়ে আপ্লুত করে। বিবাহিত নর-নারীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা, প্রেমহীনতা বা সংশয়ের দুরারোগ্য জটিলতা কিভাবে সাংসারিক জীবন ও জীবনাচরণকে বিষময় ও অনভিপ্রেত করে তোলে 'শৃঙ্খল' গল্পে আমরা তার পরিচয় পাই।

গল্পটির কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত একটি দম্পতির সংসার জীবনের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে। স্বাস্থ্যবান ও চাকরিসূত্রে উপার্জনক্ষম ভূপতির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল বিনতির। লেখক জানিয়েছেন, 'ভালো ছেলে খুঁজিবার সাহস বিনতির বাপমায়ের ছিল না। বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন না থাক, উপার্জনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান বলিয়া ভূপতিকে কন্যাদান করিতে পারিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন'। স্বামী ও শাশুড়ী ছাড়া চতুর্থ ব্যক্তি ছিল না বিনতির সংসারে। ভূপতিকে 'কেমন একটু' মনে হলেও পাত্র হিসেবে তাকে খারাপ মনে করেনি বিনতির পিতামাতা। অবশ্য ভূপতির 'কেমন একটু' স্বভাব গল্পের সূচনায় কয়েকটি শব্দপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে লেখক প্রকাশ করেছেন। যেমন, অনেক রাতে বাড়ি ফিরে 'দরজায় দুইটা মৃদু টোকা', 'নীরবে' ঘরে ঢোকা, 'নিঃশব্দে' বিছানায় শুয়ে পড়া এবং বিনতির সঙ্গে 'একটা কথাও বিনিময়' না হওয়ার মধ্যে দিয়ে স্বামী হিসেবে ভূপতির চরিত্র ধর্মের রহস্য পাঠকমনে জিজ্ঞাসা তৈরি করে। দীর্ঘ সাত বছরের বিবাহিত জীবনের এ ছবি থেকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কটিও গোপন থাকে না। 'একই বাড়িতে যে দুইটি লোক পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করিতেছে এবং আজ সাত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে তাহার কোনো পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে নাই।' পারস্পরিক সম্পর্কের এই ব্যবধান 'সুদূর' অপেক্ষাও অধিকতর। অথচ, বাইরের দিক থেকে ভূপতির সাংসারিক কর্তব্যসাধনে কোন অনিয়ম দেখা যায় না। সকালবেলা বাজার করা, অভ্যাসমতো অফিসে যাওয়ার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যবিনিময় না থাকায় বিনতির সাংসারিক অবস্থান

সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জাগে। এক্ষেত্রে ঘটনাক্রম রক্ষায় লেখক Flash back পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। পনের ষোল বছরের নববধূ বিনতির প্রথম ফুলশয্যার রাতে স্বামী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে পাশ বালিশ ছোঁড়া ও তোলার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে যে উদ্ভট অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয় তা পরবর্তী জীবনে তার স্মৃতি থেকে লুপ্ত হতে পারে নি। 'অস্বাভাবিক হইলেও অত্যন্ত অর্থহীন একটা ঘটনা। বিনতির মনে তাহার স্মৃতও থাকিবার কথা নয়। কিন্তু যতদিন গিয়াছে বিনতির মনে হইয়াছে যে প্রথম রাত্রির ব্যাপারটিতেই বুঝি তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত ছিল।' ইতিমধ্যে ভূপতি অকারণে তার বিধবা মায়ের সঙ্গে যে রূঢ় ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার করে তাতেও বিনতি অপ্রস্তুত হয়। শাশুড়ীর তার প্রতি বা শাশুড়ীর প্রতি তার ব্যবহারে কোন নেতিবাচকতা ছিল না। 'শাশুড়ীর দিক হইতে স্নেহ না থাক বিদ্বেষ ছিল না, বিনতিরও ভালোবাসা না থাক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ ছিল। কিন্তু মাঝে হইতে ভূপতি সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে।' স্ত্রীর কাছে মাকে টাকা চাইতে বলা 'আচ্ছা ওর কাছেই দেব'খন। চেয়ে নিও যা দরকার।' বা তুচ্ছ কথায় বাড়ীতে ঝি রাখার প্রসঙ্গে ভূপতির মনোভাবে ইঙ্গিত হয় যে এর পিছনে বিনতির মদত আছে। "আপিসে যাইবার সময় খাইতে বসিয়া ভূপতি হঠাৎ বলিয়াছে—'আর একটা ঝি না রাখলে চলছে না, 'কি বলো মা!' " বিধবা মা অনেক কষ্ট করে ভূপতিকে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে বড় করে তুলেছিল। 'পরের সংসারে আশ্রিত হিসাবে মানুষ হইয়া একদিকে ঔদাসীন্যে এমনকি নির্যাতন ও অন্যদিকে মায়ের অতিরিক্ত অন্ধস্নেহ ও আদর পাইয়া ভূপতি হয়তো ঠিক স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার প্রকৃতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।' বিয়ের দু'বছর পরে শাশুড়ী মারা গেলে বিনতির মানসিক কষ্ট আরও বেড়ে যায়। একটা ভীতিপ্রদ, দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বিনতি। বিনতির সঙ্গে স্পষ্ট দুর্ব্যবহার ভূপতি করে না, সংসার চালানোর স্বাধীনতাও তার ছিল কিন্তু বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশ পেত ভূপতির ভালবাসা, বিশ্বাসের ধরন। বিনতির মাথার চুল ওঠা নিয়ে ভূপতির অদ্ভুত চিন্তা ও তার জন্য তেলের শিশি কিনে আনা অথবা খবরের কাগজে প্রকাশিত স্ত্রীর পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কর্মের খবর পাঠ করতে স্ত্রীকে প্ররোচিত করার মধ্যে দিয়ে ভূপতির সত্যকার বিকৃত জটিল মনোভাব ফুটে উঠেছে। তাতে বিনতিরও ভূপতির প্রতি ভালবাসা আরও অবনমিত হয়েছে। এর মধ্যেই বিনতি সন্তানসম্ভবা হয়। ভাবী সন্তানের মধ্যে 'ভূপতির ছায়া'র আশঙ্কায় বিনতি মাতৃত্বের অমর্যাদা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়েছে। 'ভূপতিরই ছায়া যদি তাহার মধ্যে দেখা দেয়। তেমনি অপরিচিত, ভয়ংকর দূরত্ব যদি থাকে তাহার মধ্যে। মাতৃত্ব দিয়াও যদি তাহাকে আপন করা না যায়। বিনতি সে কথা ভাবিতে চায় না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার চেষ্টা করে।' জোর করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ভূপতি। মৃত সন্তান প্রসব করে বিনতি নিজেও মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে ফিরে আসে বাড়ীতে। সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়ে উভয়ের ভিন্ন জায়গায় বসা ও মাঝপথে স্ত্রীকে ফেলে ভূপতির চলে আসা ছোটগল্পের যে 'Singleness of aim and singleness of effect'-কে দ্যোতিত করে। গল্পের এটিকেই শীর্ষবিন্দু বা Climax বলা যায়। এতকিছুর পরেও ভূপতিকে বিশ্বাস করেই তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে বিনতি বেরিয়েছিল। তাকে হলে ফেলে চলে আসার মধ্যে

দিয়ে ভূপতির মানসিকতা যে বদলায়নি তার ইঙ্গিত আমরা পাই। বিনতিও বুঝতে পারে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে শৃঙ্খল ছাড়া অবশিষ্ট কিছু নেই।

গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূপতি। তার মনোধর্ম প্রকাশই লেখকের উদ্দেশ্য। ভাষার কৌশলী প্রয়োগে ও ঘটনাক্রমে তার জটিল চরিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পে। ভূপতি চরিত্রটির জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশে লেখক ব্যবহার করেছেন নানা সংকেতময় ভাষা, যেগুলি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ঘটনাক্রমের মাধ্যমে চরিত্রটিকে এভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায়—

ভূপতি চরিত্র (বিশ্লেষণী তালিকা)

বহিরঙ্গ দিক			অন্তরঙ্গ দিক বা মানসিক অবস্থান
১) স্বাস্থ্যবান ২) উপার্জনক্ষম ৩) স্বাভাবিকতার মুখোশ ৪) সাংসারিক কর্তব্য পালন			
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
পাত্র হিসাবে ভূপতি	বিবাহোত্তর পর্যায়ের ভূপতি চরিত্রের অস্বাভাবিকতা (মা মরার আগে ও পরে)	পিতৃত্ব লাভের সময়	সন্তানের মৃত্যু পরবর্তীকাল
কেমন একটু	১) মৃদুটোকা, নীরবতা, নিঃশব্দ শয়ন ২) বাসর রাতে পাশবালিশ ছোড়া ৩) তেলের শিশি কেনা ৪) খবরের কাগজের খবর ৫) মা ও স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি ৬) ছোটখাট নিষ্ঠুরতাজনিত আনন্দ।	হাসপাতাল যাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন।	বায়োস্কোপ সংক্রান্ত ঘটনায় একা চলে আসার মানসিকতা।

একদিকে আপন মাকে সে জর্জরিত করেছে নানা অনুষঙ্গে, অন্যদিকে স্বামীর মুখোশ পরে মানসিক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে নিজের স্ত্রীকে। তার ব্যবহারেই তার প্রতি মা ও স্ত্রীর আন্তরিক ভালবাসা, বিশ্বাস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে জন্ম নিয়েছে দৈনন্দিন তিক্ততা, অবিশ্বাস। তার সুস্থ মাথায় করা অসুস্থ আচরণ বিনতিকে তার স্বাভাবিক নারীত্ববোধ বা সহধর্মিনীর আসন থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

আলোচ্য গল্পটির কাহিনীবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে দু'তিনটি চরিত্রাশ্রয়ে। মনস্তত্ত্বমূলক গল্পে ঘটনাক্রমের থেকে গুরুত্ব পায় চরিত্রের অবচেতন মানসিকতার অভিব্যক্তি। গল্পে আমরা দেখি, ভূপতিকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর একমুখীনতা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। সিনেমা

দেখতে গিয়ে ভূপতির আকস্মিকভাবে চলে আসা পাঠককে এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের সম্মুখীন করে। লেখকের ভাষায়—

'ভূপতি আর কোন কথা বলে নাই। তাড়াতাড়ি হল হইতে বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সিতে সটান উঠিয়া বসিয়া একদিকে চালাইতে বলিয়াছে।'

গল্পটির নামকরণের মধ্যে এর ট্র্যাজিক মর্মস্পর্শী আবেদন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ক্রমাবনতি চরম পর্যায়ে পৌঁছলেও বিবাহবিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি তাদের মধ্যে। এরকম অসহ্য স্বামীর সঙ্গেই বিনতিকে সারাজীবন সংসার করতে হবে যা তার জীবনে শৃঙ্খলের মতোই অনড় সত্য। সারাজীবন এভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী থেকে দিনাতিপাতের মধ্যে তার জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি লক্ষ্য করা যায়।

'শৃঙ্খল' গল্পটি আধুনিক যুগমানসের যেন দলিল হয়ে উঠেছে। কল্লোল যুগের লেখকেরা যেমন রূঢ় বাস্তবতাকে কাহিনির উপজীব্য করেছেন তেমনি পারস্পরিক সম্পর্কের যে অবনতি, মনের গভীরে থাকা অস্বাভাবিক জটিলতা-সে দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। গল্পটি শেষ হয়েছে এইভাবে—'তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কী রহিল— জীবনের কী আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।' স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের এই ভয়ঙ্করতা যেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি অনালোচিত ক্ষেত্র। এসময়ের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে নৈঃশব্দ, অদৃশ্যপ্রাচীর, আতঙ্ক, সংযোগহীনতা এই গল্পে প্রকাশ পায়। এই বিদ্বেষ এবং বিতৃষ্ণাময় সম্পর্ক-শৃঙ্খল আজ অতলান্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়। সমকালীন যুগ আসলে এক শৃঙ্খল-বদ্ধ সময়েরই প্রতিরূপ। ভূপতি যেন তার পরিণাম।

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যাল-এর জন্ম কলকাতায়। প্রবোধকুমার সান্যাল মূলত বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস এবং ভ্রমণ সাহিত্য রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি মানুষের জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিকে না দেখে জীবনের কোন একটা খণ্ডাংশকে গ্রহণ করেই তাকে আলোকিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'যাযাবর'। কিন্তু এই গ্রন্থটির আগেই তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কাজললতা' (১৯২৮) রচনা করেছিলেন। ছোটগল্প রচনাতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—'প্রিয় বান্ধবী', 'তুচ্ছ', 'বনহংসী', 'নবীনযুবক', 'হাসুবানু', 'পুষ্পধন', 'পঞ্চতীর্থ', 'অরণ্যপথ', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়', 'রাশিয়ার ডায়েরী', 'পর্যটকের ডায়েরী' প্রভৃতি। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

অঙ্গার : নৈতিকতার ভাঙন

সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জরিত বাংলা যখন দুর্ভিক্ষে কাতর এমনই এক সময়ের চিত্রকে 'অঙ্গার-এর মধ্যে রূপ দিয়েছেন গল্পকার প্রবোধকুমার সান্যাল। ইংরেজ সরকার কৌশলগত কারণে যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ভারতবর্ষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ক্ষুধা নিপীড়িত সাধারণ মানুষ দুটো নুন ভাতের জন্য অসম সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। ক্ষুধার কবলে পড়ে এইসব মানুষ নীতি নৈতিকতা ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়। একটু খড়কুটোকে ধরে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। আদর্শায়িত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে উদ্ভূত হয় ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী বিকৃত মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত এক সমাজ ব্যবস্থা। অতএব মন্বন্তর শুধুমাত্র মানুষের পেটেই টান দেয়নি, টান দিয়েছিল মানুষের নৈতিকতাকে। অর্থনৈতিক চাপে নৈতিকতার ভাঙন এই সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা। অপরাধ বোধ কখনই তেমন বড় হয়ে ওঠেনি। অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে নৈতিকতাকে মিলিয়ে মানুষ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। অন্যায়কে 'ন্যায়' বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে তারা। অনৈতিককে নৈতিক হিসেবে প্রতিপাদন করাই যেন তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। বুভুক্ষু সমাজ যেন বোঝাতে চায়—''হায়রে পেট, তোর জন্যই মাথা হেঁট।''

'অঙ্গার' গল্পে এই ভয়ঙ্কর সমাজকেই তুলে ধরেছেন গল্পকার। তবে প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হিসাবে গল্পে এসেছে শোভনা চরিত্রটি। গল্পের মূল কথক নলিনাক্ষ। সমাজ দ্রষ্টার ভূমিকা সে পালন করেছে। গ্রাম থেকে ছিন্নমূল শহরে আসা মানুষদের কঠোব জীবন সংগ্রামের চিত্র সেই-ই তুলে ধরতে পেরেছে। ফরিদপুরে পিসিমার বাড়িতে মানুষ হওয়া নলিনাক্ষ তার ছোটবেলার স্মৃতিকে বার বার আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। পিসেমশাইয়ের সহায়তায় দিল্লির চাকরিটা তার হয়েছিল। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শোভনার চিঠিতে সে যখন জানতে পারে শোভনা বিধবা হয়েছে অভাব অনটনে সন্তানকে মানুষ করার জন্য মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা সাহায্য নিতে চায়। ব্যথিত নলিনাক্ষ তারপর সেই দিনই পঁচিশ টাকা এবং প্রতিমাসে পনের টাকা করে শোভনার ছেলের জন্য পাঠাতে থাকে। ক্রমে পিসিমা, শোভনা, দুই পিসতুতো ভাই নুটু-হারু এদের সকলের সঙ্গেই নলিনাক্ষের যোগাযোগ পত্র মারফত বেশ ঘনিষ্ঠ হয়। কোলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে বহু মানুষ যখন মফঃস্বলে পালিয়ে এসেছিল তার ফল হয়েছিল ভয়ঙ্কর। বহু মানুষ আগমনের ফলেই দেখা দেয় খাদ্য সঙ্কট। জিনিসপত্রের দর এত দ্রুত বেড়ে যায় যে অসহায় সাধারণ মানুষ দুমুঠো অন্নের জন্য শহরে পাড়ি জমায়। ছয়মাস পূর্বে পাঠানো পনের টাকা ফরিদপুর থেকে ফিরে আসায় নলিনাক্ষ আশ্চর্য হয়ে যায়। মানি অর্ডারের ছয় মাসের প্রতিটি টাকায় যথা সময়ে ফেরৎ আসে। প্রথম অবস্থায় নলিনাক্ষ মনে করে শোভনার প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মনের কোণে জমে থাকে সংশয়। মাসোহারা সম্পর্কে শোভনা কেন এতটা উদাসীন হল এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে তার মনে।

ডিপার্টমেন্টের সাহেব কর্মসূত্রে কোলকাতা যাচ্ছেন জানতে পেরে নলিনাক্ষ তার সঙ্গী হয়। নলিনাক্ষের অন্তরের বাসনা থাকে, পিসিমাদের খোঁজ করে বের করা। কোলকাতায় এসে যখন

ওঠে, তখন অনুভব করে পূর্বের কোলকাতা শহর আর নেই। কাঙালীপ্রধান এ শহর ভরে ওঠে—যন্ত্রণা আর হাহাকার নিয়ে। অবস্থাপন্ন মানুষ হয়ে যায় সর্বস্বান্ত। প্রবোধ সান্যাল মন্তব্য করেছেন—"দেশের সবাই বলছে দুর্ভিক্ষ; গভর্মেন্টি বলেছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয় খাদ্যাভাব।" সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের ভাষাগত তারতম্য থাকলেও আসলে যে মানুষের অসহায়তা তাই প্রকট হয়েছে। মফস্‌সলের মানুষ যখন শহরে এসে ভিড় জমালো তখন কোলকাতা শহরের চেহারাটাই পালটে গেল। অসংখ্য যানবাহনের শব্দের মধ্যে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের আর্তরব শোনা যায়। গল্পকার বর্ণনা করেছেন—

"জঞ্জালের বালতি ঘিরে বসে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে পড়ে রয়েছে।"

এই চিত্র আমাদের শঙ্কিত করে। মনে করিয়ে দেয় 'আকালের সন্ধানে' 'অশনি সংকেত' 'কিংবা' 'নবান্নে'র কথা। তবে গল্পকার শুধুমাত্র ক্ষুধা নয়, তার সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক পতনের কথাও তুলে ধরেছেন। যেমন শোভনা ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন তুলেছে মায়ের বিরুদ্ধে। মাস্টারকে ঘরে ঢোকানো, হরিশ যোগেনদের কাছে মিনুকে পাঠানো, শোভনাকে কেরানী বাগানের বাসায় পৌঁছে দেওয়া, হারুকে হোটেল থেকে পাঁউরুটি, হাড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনতে বলা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যে শোভনার মা তথা নলিনাক্ষের পিসিমার মদত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার পিসিমার অভিযোগে প্রকাশ পেয়েছে শোভনার নীতিহীনতার কথা—বিনোদ বালার ঠিকানা যোগাড করা কিংবা গাড়ি ভাড়া নেওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে দিয়ে। অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে পরিবারটিকে যে আদিমবৃত্তির পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিনোদবালা এসেছে অভাব মোচনের প্রতীক হিসাবে। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য কলুষতার মধ্যে যে বাঁচার গলি-ঘুঁজি পথ রয়েছে সেই পথেই সে শোভনাদের চলতে শিখিয়েছে। রাজপথের ওপর দিগন্ত জোড়া মুমূর্ষু আর্তনাদের থেকে অন্ততঃ ভালো পথ বলেই সে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকা যে শ্রেয় তাই উঠে এসেছে বিনোদবালার কথায় মধ্যে দিয়ে। এই অন্ধকার নরক কুণ্ডে পড়ে শোভনা বাঁচতে চেয়েছে। সম্ভ্রম বিসর্জিত হলেও সে যে নিজের সঙ্গে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তার উদাহরণ যত্রতত্র। 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসে'র সেই কামুক লোকটিকে বারবার হত্যা করতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে এসেছে এই দ্বন্দ্ব। শোভনার কলকতার জীবনের খদ্দের হয়ে দেখা দিলেও পরোক্ষে 'এসেনসিয়াল সার্ভিসের সেই কামুক লোকটিকে অস্বীকার করতে পারে না। অভাবের তাড়না থেকেই যে তার এই অবস্থা তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিশোরী মিনু ভয়ংকর বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কোন নীতি বা আদর্শ দ্বারা চালিত হয়নি। সে সমস্ত কিছুকে মেনে নিয়েছে। সরল বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করেছে অন্যের কাছে। হরিশবাবুর দেওয়া আধুলি অতি সহজে সে গ্রহণ করেছে। মায়ের কাছে সে তাই অনায়াসে বলেছে—'যোগীন মাষ্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।' পরিবারের রোজগারের জন্য ছোট্ট মিনুও নীতি আদর্শের তোয়াক্কা না করে খোলামেলা জীবন যাপনে উৎসাহী হয়েছে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং তার ভয়াবহ ফলাফল সমাজ জীবনে কত বড় গভীর ক্ষত চিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে তার নানা চিত্র এসেছে গল্পের মধ্যে। সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এসে নলিনাক্ষ কাঙালীর প্রাধান্যের সঙ্গে যুদ্ধ সাফল্যের দিকগুলি দেখতে পায়। যুদ্ধের সময় কনট্রাক্টের সরবরাহ থেকেই মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার যেমন শুরু তেমনি মুনাফাবাজ মানুষের উত্থানের শুরু। সমাজ জীবনে ইস্কুল মাষ্টার চাকুরীই শুধু খোয়ায়নি সংসারটিও তার ভেসে গেছে। যত দিন উপার্জন ছিল ততদিন স্ত্রী পুত্র কন্যা যে সংসার করেছে কিন্তু উপার্জন চলে যাওয়ার পর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী আত্মহত্যা করে। ছেলে দুটি মামার বাড়ি চলে যায়। শোভনা এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জানতে চায় যুদ্ধ থামবে কিনা? শোভনার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—"তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে তাদের বলো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি।" সমস্ত গল্পটির মূল কথা শোভনার উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা, ক্ষুধা এবং মানুষের বাঁচার আপ্রাণ লড়াই এই গল্পে প্রকাশিত।

'অঙ্গার' গল্পটি নামকরণ কবা হয়েছে অবশ্যই গল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি নজর রেখেই। অঙ্গার শব্দটি জ্বলন্ত কয়লা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং একটা গভীর ব্যঞ্জনাও সৃষ্টি কবেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবসত্তাকে আঁকড়ে ধরেই নামকরণটি প্রযুক্ত। ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা নীতিহীনতায় পচনশীল জীবনযাত্রায় দারিদ্র্যে, যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষই যেন অঙ্গারে পরিণত হয়েছে গল্পের চরিত্র নলিনাক্ষ। তার একটি বক্তব্যকে এমনভাবেই উপস্থাপিত করেছেন যার মধ্যে দিয়ে নামকরণের প্রতি একটি ইঙ্গিত দেওয়া যায়—"মনে হলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাগ্রস্ত কাঙালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে।" এই বক্তব্যর সঙ্গে চরিত্রের সংযোগও লক্ষ্য করা যায়। যে সংযোগে পিসিমা এবং শোভনা তাদের যন্ত্রণা-অভিমান প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের জমে থাকা বেদনাও একদিন অঙ্গারের মতই ছাই হয়ে যাবে। প্রতীক হিসেবে পিসিমা কিংবা শোভনা অঙ্গারেই পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য এবং নীতিহীনতায় তারা যে ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং একদিন নিস্তেজ হয়ে যাবে এমন কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার। আর সেই অর্থে নামকরণটিও সার্থক হয়েছে।

'অঙ্গার' গল্পটি সার্থক হয়েছে কিনা তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে বিদেশী শাসন শোষণে জর্জরিত মানুষ যখন অসহায় বিচ্ছিন্নতা বোধে আক্রান্ত তখনই তেতাল্লিশের মন্বন্তর মানুষকে আরও বেশী পরিমাণে হতাশাগ্রস্ত করে। 'অঙ্গার' গল্পে উঠে এসেছে সেই জীবন সংকটের চিত্র। একটি নিটোল কাহিনী গল্পটির মধ্যে রয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে নলিনাক্ষ। তার দৃষ্টিতেই সমস্ত গল্পটির বয়ন। ভালো-মন্দ, নৈতিকতার আদর্শ বা আদর্শচ্যুতি সমস্ত বোধই তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। কাজেই ছোটোগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নলীনাক্ষ আত্মপ্রকাশ করে ছোটোগল্পের একটি বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করেছে। গল্পের নায়িকা হিসেবে শোভনাকে চিহ্নিত করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। গল্পের মূল কাহিনী নলিনাক্ষ ও তার পিসিমার পরিবার। তাদের যন্ত্রণার চিত্র। উপকাহিনী সেভাবে উপস্থিত না হলেও বিনোদবালা, স্কুলমাষ্টার এদের জীবনাচরণের

কথা নানা ভাবেই গল্পে এসেছে। প্রবোধ কুমার শোভনা চরিত্রটিকে যথেষ্টই আবেগ তাড়িত করে এনেছেন। আর এই শোভনাকে কেন্দ্র করেই গল্পটির উত্থান পতনকে নির্দিষ্ট করেছে। গল্পের মধ্যে চরমক্ষণ বা ক্ল্যাইম্যাক্স সৃষ্টি করতে শোভনাকেই ব্যবহার করেছেন গল্পকার। কারণ তার এক দিকে বিগত অতীত ও নৈতিকতা নিয়ে উপস্থিত থেকেছেন গল্পের কথক নলিনাক্ষ। আর একদিকে বর্তমান তথা বাস্তব তথা ক্ষুধার অন্ন দিতে নীতিহীন দুরাচার হিসেবে উপস্থিত সেই এসেনসিয়াল সার্ভিসের লোকটি। শোভনা নীতিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে এবং নীতিহীনতাকে 'বঁটি দিয়ে' হত্যা করতে চেয়েছে বুঝতে পারি। এই শীর্ষ মুহূর্তেই আমরা গল্পের শিল্প সার্থকতাকে বুঝতে পারি তবে গল্পে আরো কিছু কিছু চিত্র এসেছে যেখানে গল্পকার আমাদের সমস্ত মনোযোগকে টেনে রেখেছেন। মান সম্ভ্রম প্রসঙ্গে শোভনা যখন বলে—"কোথায় মান সম্ভ্রম, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক হয়ে গেলুম! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়?" সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ্ শোভনা এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করায় নলিনাক্ষ নিজেও অবাক হয়ে ওঠে। শোভনার কষ্টার্জিত হাসি বদলিত হয়েছে এই ভাবে—"দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো এক প্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠল।"

নলিনাক্ষ ছাড়া শোভনা, পিসিমা, টুনু, মিনু, হারু, মাস্টার মশাই, বিনোদবালা, যুদ্ধ কারখানার এসেনসিয়াল সার্ভিসের সেই কামুক লোকটি সকলেই সমবেত ভাবে সমগ্র গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকে একটা স্থায়ী রসকেন্দ্রে উপস্থিত করে। চরিত্রগুলি আপনি বিকশিত হলেও তারা যে প্রত্যেক্যেই শ্রেণী চরিত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গল্পটি সার্থক হওয়ার লক্ষ্যে গল্পের মধ্যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। যখন নলীনাক্ষ তার পিসতুতো বোন শোভনাকে পেটের দায়ে দেহ ব্যবসা করতে দেখে এবং যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে কামুক লোকটিকে হত্যা করতে চায় তখনই এক গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। আসলে ছোট গল্প হিসেবে ব্যঞ্জনা একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে এখানে উপস্থিত হয়েছে। গল্পটির অন্তিম পর্বে পাঠকের মনের মধ্যে রয়ে যায় জিজ্ঞাসা। পাঠক জানতে চায় নলিনাক্ষের দিল্লী যাবার পর শোভনারা কি ভাবে জীবন কাটায় তারা আদৌও বেঁচে রইল কিনা। গল্প শেষ করেও শেষ না হওয়ার যে প্রবণতা তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করে বলতে পারা যায়—'অঙ্গার' গল্পটি ছোট গল্প হিসেবে সার্থক হয়েছে।

'অঙ্গার' গল্পটি গল্পকার প্রবোধ কুমার নলীনাক্ষের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে শুরু করেছেন। আত্মকথনের ভঙ্গিতে গল্পটি কিছুটা এগিয়ে যাবার পর গল্পকার অন্যান্য চরিত্রগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সত্যদ্রষ্টা হিসেবেই নলীনাক্ষের দৃষ্টিতে জ্বলন্ত বাস্তব ধরা পড়েছে। লেখক গল্পটির বর্ণনা প্রসঙ্গে যথেষ্ট আবেগধর্মী ভাষা ব্যবহার করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুভুক্ষু অসহায় মানুষের অসহয়তার যন্ত্রণা। গল্পটিতে কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগের আতিশয্য চোখে পড়ে। কখন-বা নলীনাক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে কখনও বা শোভনার আত্মদ্রোহিতা গল্পের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই প্রকেশ পেয়েছে সেন্টিমেন্ট, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি নিজেদের চাওয়া পাওয়াকে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছে। ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের চাপে মানুষ

বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে কিংবা ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী হয়ে পড়ে তারই মিশ্র চিত্র উপস্থিত করেছেন গল্পকার। বিবৃতি মূলকতা গল্পের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই কাজ করেছে। মাঝে মাঝে সংলাপ-ধর্মিতা গল্পের মধ্যে গতির সঞ্চার করেছে। তবে শোভনার কিছু সংলাপ বেশ দীর্ঘ, যা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। যথেষ্ট ব্যঞ্জনাগর্ভ এই সংলাপগুলি আবেগধর্মী এবং নাটকীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করলেও শিল্প সার্থকতার ক্ষেত্রে তা কিছুটা প্রশ্নের সৃষ্টি করে। গল্পকার যথেষ্টই কবি দৃষ্টি সম্পন্ন। শোভনা তার সংলাপে বার বার মানবিকতার দরজায় কড়া নেড়েছে। সে জানতে চেয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বের অন্তঃস্থলকে। যে সমস্ত চরিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন তাদের সংলাপেও এসেছে জীবনকে প্রতিফলিত করার মতো ভাষা। গল্পকার গল্পে বিবৃতি ব্যবহার করলেও গল্পটির সুঠাম বয়নে এছাড়া তাঁর কোন পথ ছিল না। কারণ দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গেলে গল্পকারকে ছবি আঁকতেই হবে। আর সে ক্ষেত্রে তুলির টান প্রথমেই গিয়ে পড়বে চরিত্রগুলির উপর। অত্যন্ত সহজ গদ্য ভঙ্গীকে ব্যবহার করে গল্পকার বিষয় উপস্থাপনে প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন—"আমি হাটে হাড়ি ভাঙ্গবো শোভা", কিংবা "আমি কারখানার ভূত, স্যার" বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও এক ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন গল্পকার।

ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত সংযত ভাবে যখন গল্পকার পরিবেশ বর্ণনা করেন তখনও দেখে বিস্মিত হতে হয়—"ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানায় ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এপাশে নর্দমা, ওপাশে কুৎসিত কলতলা। এক ধারে ঝাঁটা, ভাঙ্গা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড়।" জীবন্ত নরক কুণ্ড চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ভাষাকে সংযত ভাবেই ব্যবহার করেছেন গল্পকার আর তাই গল্পটির মধ্যেও পাঠক উপলব্ধি করেছে যুদ্ধ মন্বন্তরে বিদ্ধস্ত তৎকালীন বাংলার নানা চিত্রকে।

ব্রিটীশ শক্তি ঔপনিবেশিক পরিবেশ গড়ে তুলে বাংলার মানুষকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলে দেয়। শোষণের চূড়ান্ত মাত্রা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষকে আরো তীব্র করে তোলে। বুভুক্ষু অসহায় মানুষগুলি শিশু থেকে নারী সকলেই হাড় বের করা চেহারা নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। দুটো ভাতের জন্যে কখন বা একটু ফেনের জন্যে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে কুড়িয়ে চুষেছে। একটু ফেনও আর শেষে পাওয়া যায়নি। শুধু কান্না সম্বল করেই তারা মৃত্যুর দিন গুনেছে। নলিনাক্ষ নিজে এই মৃত্যুর মিছিলের মধ্যে দিয়ে রাতের অন্ধকারে আলোর খোঁজে পাড়ি দিয়েছে। তার কানে ধ্বনিত হয়েছে শোভনার কান্না। কিন্তু অসহায় নলীনাক্ষ সামান্য সাহায্য ছাড়া পিসিমার সংসারে আর কিছু করতে পারে নি। দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস ও দেখাতে পারেনি। তাই গল্পে তার প্রচেষ্টা থাকলেও পিসিমাদের জীবন পরিবর্তনে সে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি এবং নায়কত্বের সম্ভাবনা থাক সত্ত্বেও নায়ক হতে পারেনি। তবে শোভনার মধ্যে দিয়ে গল্পকার নায়িকা চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। শোভনাই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় চরিত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'অঙ্গার' গল্পটিকে সার্থক ছোট গল্পে পরিণত করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী

(১৯০৬-১৯৬৫)

বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় সতীনাথ ভাদুড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করে তিনি পূর্ণিয়ায় ওকালতি আবম্ভ করেছিলেন। সাত বৎসর পরে তিনি ওকালতিবৃত্তি ত্যাগ করে কংগ্রেস-এ যোগদান করে পূর্ণোদ্যমে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বেশ কয়েকবার কারাগারে বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়েছিল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই সতীনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' রচনা করেন ১৯৪৫ সালে। গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে—সে বছরই প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল। এরপর একে একে নানান ধরনের উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর শেষ পর্যায়ের 'অচিনবাগিণী', 'সংকট' ও 'দিগভ্রান্ত'-কে একত্রে উপন্যাস-ত্রয়ী নামে আখ্যায়িত কবা হয়। তবে কেউ কেউ মনে করেন—'ঢোঁড়াইচরিত মানস' বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁব রচিত গল্পসংকলন 'গণনায়ক', অপরিচিতা, চকাচকী, পত্রলেখার বাবা, জলভ্রমি, এবং আলোকদৃষ্টি।

বৈয়াকরণ : মানসিক ব্যাকরণের কথকথা

শিবশঙ্কর ঘোষ

আজীবন পূর্ণিয়াবাসী বাংলা ছোটগল্পের জগতের সফল গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী। জন্ম ১৯০৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ১৯৬৫ সালের ৩০শে মার্চ। শিক্ষাদীক্ষা, ওকালতি কাজকর্ম, রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, অবশেষে সবকিছু ছেড়ে সাহিত্য সেবায় নিজেকে নিবেদিত করা সবকিছুর কেন্দ্রমূলেই ছিল এই পূর্ণিয়া, পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী, মা রাজবালা দেবীর তিনপুত্র, চার কন্যার মধ্যে সতীনাথ সর্বকনিষ্ঠ। পূর্ণিয়ার সদর হাসপাতালের কাছেই ছিল পূর্ণিয়া জেলা স্কুল। ঐ স্কুলেরই কৃতী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন সতীনাথ। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্প এবং উপন্যাসে পূর্ণিয়ার বিভিন্ন স্থান ও পরিচিত ব্যক্তির সমাবেশ সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তেমন ভাবেই এই স্কুলের পরিচয় যেমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে 'জাগরী' উপন্যাসে, তেমন ভাবেই ঐ স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত তুরন্তলাল ঝা উঠে এসেছেন তাঁর ছোটগল্প 'বৈয়াকরণ' এর মধ্যে। তুরন্তলাল ঝা সতীনাথকে এত স্নেহ করতেন যা তাঁকে ক্লাসকী রোশনী (ক্লাসের আলো) বলে উল্লেখ করতেন। এই নিয়ে সতীর্থেরা রসিকতা করতে ছাড়তেন না। কোন দিন সতীনাথ অনুপস্থিত থাকলে ছাত্রেরা মন্তব্য করতেন, "মাস্টার সাব, ক্লাস আঁধিয়ালা হো গয়া!" (মাস্টার মশাই, আলো নিবে গেছে, ক্লাস অন্ধকার)। ক্লাসে তুমুল হাস্যধ্বনি উঠত। বিব্রত হয়ে পড়তেন তুরন্তলাল ঝা।

১৯৫৬সালে প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলন 'চকাচকী'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'বৈয়াকরণ' গল্পটি। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে এটি 'দেবা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ২৯পৌষ সংখ্যায়। গল্পটি যাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেই বৈয়াকরণের নাম তুরন্তলাল মিশ্র। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি, পূজা আহ্নিক করেন, শুদ্ধাচার থাকেন। মিথিলার শোত্রীয় ব্রাহ্মণ তিনি। জেলা স্কুলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়েছেন। মেয়ে স্কুলের পুরুষ শিক্ষক দুজন। একজন তুরন্তলাল মিশ্র, আরেকজন উর্দুর শিক্ষক মৌলবী সাহেব। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় খ্যাতি রয়েছে তুরন্তলালের। স্ত্রীকে নিয়ে নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাতার কালীঘাটে গিয়ে পূজা দিয়েছেন, কামরূপ কামাখ্যায়ও সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন।

টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিতমশাই তুরন্তলালকে স্নেহ করতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন কাব্য না পড়ে, ব্যাকরণ পড়ার জন্য। গুরুর নির্দেশে মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন তুরন্তলাল। ব্যাকরণের কঠিন বিধানের মত সংযমের কঠিন শৃঙ্খলে তুরন্তলাল নিজেকে আবদ্ধ করেছেন। সেই তুরন্তলাল সম্পর্কে মৌলবী সাহেবের তির্যক মন্তব্য আজ বড় বিব্রত করে তুলেছে বৈয়াকরণকে। মৌলবী সাহেব সাদা চুল আর দাড়ি আবার কালো করেছেন। কারণ তিনি আবার নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। বিষয়টি তুরন্তলালের কাছে মোটেই ভালো লাগেনি। যেমন ভালো লাগে না মৌলবী সাহেবের টেবিলের উপর পা তুলে নাড়ানো অথবা দিনরাত আঙ্গুল দিয়ে দাঁত খোটা। সেই মৌলবী

সাহেব আবার বিয়ে করতে চলেছেন বলে তুরন্তলালের বিরক্তির জবাবে মৌলবী সাহেব চরম রসিকতা করে বলেন, 'আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন না? বগুলা-ভকত (বকধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।'

এই স্থূল রসিকতা কিছুতেই হজম করতে পারছিলেন না তুরন্তলাল। তোলপাড় করা মুহূর্তগুলিকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন সতীনাথ। সত্যি কি তুরন্তলাল 'বকধার্মিক'? হয়তো বা নির্দোষ রসিকতা, কথার পৃষ্ঠে কথা। অমন বিশেষণটা হয়ত তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্যই নয়। কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা কথাও যে অষ্টপ্রহর তাঁকে বিড়ম্বিত করে চলেছে, 'ওরা কি ওই চায়!' মৃত্যুপথযাত্রিনীর এমন উক্তি তাঁকে কয়েকদিন ধরে বিব্রত করেই চলেছে। সব কাব্য বা ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে ঐ উক্তিই আলোড়িত করে চলেছে। 'ওরা কি ওই চায়' বাক্যের ওরা শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল 'সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ। ত।' সামান্য একটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে জীবনের শেষ বেলায় সংস্কৃতে পণ্ডিত তুরন্তলাল নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন।

একদিকে মৌলবী সাহেবের মন্তব্য 'বকধার্মিক', অপরদিকে অগ্নিদগ্ধ যুবতী শালাজের উক্তি 'ওরা কি ওই চায়,' এই দুইয়ের টানাপোড়েনে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না তুরন্তলাল। গল্পটি যাতে গম্ভীর হয়ে না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সতীনাথ টুকরো হাস্যরসের অবকাশ রেখেছেন তাঁর গল্পে। যেমন ছেলেদের স্কুলে পড়ানোর সময় দুষ্টুছেলেরা বাইরে যাওয়ার ছুটি নেওয়ার সময় সর্বদাই বলব 'তুরন্ত ফিরে আসব পণ্ডিতজী'। আসলে 'তুরন্ত' শব্দটির হিন্দিতে তাড়াতাড়ি। ক্লাসসুদ্ধ হাসির বন্যা বয়ে যেত। মেয়েদের স্কুলের মালবিকা নামের চপলা একদিন বৈয়াকরণকে তুরন্তলাল নামের মানে জিজ্ঞাসা করেছিল। মেয়েরা ক্লাস চলাকালীন বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, মুখে যাতে বলতে না হয় তাই বৈয়াকরণ প্রতি বার ক্লাসে ঢুকে কয়েকটি পাস টেবিলে এনে রাখেন। যার প্রয়োজন সে পাস নিয়ে বাইরে যাবে। এমন টুকরো টুকরো হাসির মুহূর্তে এই ছোটগল্পটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা দুরন্ত, চঞ্চল। এদের লীডার মালবিকা। মালবিকাকে দেখলে ভালো লেগে যায় বৈয়াকরণ তুরন্তলালের। ভালো লাগে বাঙালি মেয়েদেরও। ঘরে ঘরে ঘুরে বাঙালি ছাত্রী জোগাড় করেছেন তিনি। ভালো লাগবে না? আরও ভালো লাগে তাদের হাসি, তাদের উচ্চারণ। ওদের কথার ধ্বনি যেন মৈথিলির মত মিষ্টি। এরা যে মাঝে মাঝে ভুল উচ্চারণ করে, তাও ভালো লাগে তুরন্তলালের। মনে হয়, আরও শোনেন এই ভুল উচ্চারণ। মালবিকাই একদিন টিফিনের পরের প্রিয়ডে ঝাঁজীর ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?'' সঙ্গে সঙ্গে তুরন্তলাল তার উচ্চারণ ঠিক করতে বসে যান—''ভুল উচ্চারণ করছ'', সঠিক উচ্চারণটিও শুনিয়েছেন ''বিয়াকরণ'' শব্দটি ভেঙে ভেঙে তিরিশ বার উচ্চারণ করে মালবিকা—''বিয়াকরণ'', সমাসের উচ্চারণও শুধরেছেন ছাত্রীদের 'সমাস' নয়, 'সামাসা'। সঠিক উচ্চারণ 'সামাসা' দশবার করে বলিয়ে নেন, যাতে ভবিষ্যতে অন্তত এই উচ্চারণটি আর ভুল না হয়।

শালাজের কথার ইঙ্গিতটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় মেয়েদের সঙ্গে এই ক্লাসের

টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলির মধ্যে। কেন তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন মালবিকার ক্ষেত্রে। মালবিকা সুন্দরী এবং দুরন্ত বলে। ছাত্রীর মধ্যে নারীর কোন্ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান। পড়ার ফাঁকে, পড়ানোর ফাঁকে, মৃত্যুপথযাত্রী শালাজের "ওরা কি ওই চায়" অহরহ তাঁকে পীড়া দেয়। বৈয়াকরণের মানসিক অস্থিরতা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন সতীনাথ। "অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছিল হৃদয় নিঙড়ানো কথা কয়টি। এই বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে গত দু মাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ।" কথা কয়টি শোনার পর থেকে শুরু হল তুরন্তলালের অন্বেষা। ব্যাকরণতীর্থ তিনি, ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। তবু ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, টীকা ভাষ্য সব কিছু একে একে হার মেনে গেল ঐ কথার কাছে। প্রশ্ন একটা থেকে যায়, তিনি নিজেও কি পড়েন ঐ 'ওরা' শব্দের মধ্যে। ক্লাস চলাকালীন 'বিম্বোষ্ঠঃ' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গের রূপ তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলে ঐ রূপসী চঞ্চলা মালবিকার কাছেই। এতদিনে তাঁর মনের উপর থেকে জিজ্ঞাসার আর সংশয়ের পর্দা সরে গেলে। এখন স্পষ্ট হয়ে গেল, ঔ ওরা শব্দের মধ্যে শালাজ কাউকে বাদ দেননি। অদ্ভুত অর্থবোধিকা শক্তি রয়েছে 'ওরা' শব্দটির মধ্যে। 'ওরা' শব্দটি যথার্থই গৌরবে বহুবচন।

গল্পের বিষয় অত্যন্ত সামান্য। 'ওরা' এই একটিমাত্র শব্দের ব্যাকরণগত টীকা টিপ্পনী ও অর্থবোধের উপর গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে। লেখকের ভাষার নিপুণতা, সুচিন্তিত শব্দ প্রয়োগ গল্পটিকে অন্য এক মাধুর্য দান করেছে। ইন্দ্রিয়াসক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া নিষ্ঠাবান, জীবনাচরণের পথকে কখনই মসৃণ করে না, কারণ আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবনকে আরও বিষময় করে তোলে। তাই 'ওরা' শব্দটির আসল অর্থ বৈয়াকরণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। চিন্তন চিহ্ন সমৃদ্ধ তুরন্তলালের চিন্তাস্রোতের এই রূপায়ন উদঘাটিত করে দেয়, তাঁর মনোলোক, আলো ছিটিয়ে দেয় মনোগহনের গভীরে। ভাবতে অবাক লাগে যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে সংসার বাঁধলেন না, তিনি যে কত জীবনমুখী লেখক ছিলেন, তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'বৈয়াকরণ' গল্পটি। মানবমনের গহনে যে চিন্তিত জটিল রহস্য রয়েছে, তার সবটুকু আলো এখনও আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ী খানিকটা চেষ্টা করেছেন। মানবমনের রহস্য ও জটিলতা উন্মোচনে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যই নজিরবিহীন হয়ে আছে 'বৈয়াকরণ' গল্পটির মধ্যে।

চরণদাস এম. এল. এ : রাজনীতির শ্রেণিচরিত্র উদ্‌ঘাটন

অপর্ণা সেনগুপ্ত

বাংলা ছোটোগল্পের গতি-প্রকৃতি সতত পরিবর্তনশীল। যুগের পরিবর্তিত মূল্যবোধ, জীবনবোধ বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে এনেছে পটপরিবর্তনের পালা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে তরুণ লেখক প্রজন্ম তাঁদের গল্পের ডালি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন তাঁদের সম্বল ছিল নতুন চেতনা, যুগ ও জীবনের নিত্যনবায়মান বিচিত্র ধারা। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ব্যক্তিত্ব সতীনাথ ভাদুড়ী। ১৯৪৮-১৯৬৪ খ্রি. মধ্যে তিনি সাতটি গল্পগ্রন্থ এবং প্রায় ৫৮ টি গল্প লেখেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পই সার্থক ও সাহিত্য রসোত্তীর্ণ। তাঁর বিষয়বস্তু, পটভূমি ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্ব বাংলা গল্পের গতানুগতিকতার ধারায় নতুন স্রোত এনেছিল। স্বাতন্ত্র্যের গুণে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের থেকে যেমন পৃথক তেমনি তাঁর কোনো যথার্থ পূর্বসূরী নেই, উত্তরসূরী থেকেও তিনি বঞ্চিত।

সতীনাথ ভাদুড়ির ছোটোগল্পের স্বাদ ও চরিত্র একটু অন্যধরনের। অধিকাংশ গল্প বিহারের পটভূমিতে রচিত এবং বিহারের স্থানিক বৈশিষ্ট্য গল্পগুলিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এছাড়া লেখক প্রথম জীবনে ওকালতির সঙ্গে এবং পরবর্তীতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সাধারণ চরিত্র ও ঘটনাতে বাস্তবতার স্পর্শ দিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর দেশীয় রাজনৈতিক পটভূমি—শাসনগত বিপর্যয়, অর্থগৃধ্নুতা, দায় এড়িয়ে চলার মনোবৃত্তি, নীতিহীন স্বার্থসর্বস্ব মুনাফালোভী, সুবিধাবাদী রাজনীতি, স্বজন পোষণ ও তোষণ সর্বোপরি জাত-পাতগত সমস্যা এবং নানাধনের সরকারী অব্যবস্থা খুব কাছের থেকে তন্নিষ্ঠ ভাবে দেখেছিলেন লেখক। তারই অনুসন্ধিৎসু প্রতিফলন দেখা যায় আলোচ্য গল্পের মত তাঁর বেশ কিছু গল্পে।

১৩৬৮-র শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চরণদাস এম. এল. এ গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬২-তে প্রকাশিত 'জলভ্রমি' ছোটোগল্প সঙ্কলনে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পটিতে লেখকের চোখে দেশীয় আমলাতন্ত্রের বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গল্পের ভাবালুতাপূর্ণ নায়ক-নায়িকা সর্বস্ব ত্রিকোণ প্রেমের পরিবর্তে সমাজের প্রেক্ষিতে মানবচরিত্রের অসঙ্গতি, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার, সাধারণ মানুষের ঘর ও মনের ছবি গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবননিষ্ঠ হিউমার, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার আর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বদলে যাওয়া গল্পটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গল্পটি চরিত্র ভিত্তিক—বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত গল্প। লেখকের কঠোর শিল্প সংযমের বাঁধন গল্পটিকে বাড়তি রসোত্তীর্ণতা দিয়েছে।

দুই

চরণদাস এম. এল. এ গল্পের মূল চরিত্র চরণদাস। আগে এখানকার লোকেরা ভালোবেসে চরণদাসজী ডাকত। এখন স্থানীয় লোকেরা ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বা মায়লে জী বলে। এই উচ্চারণ বিকৃতি একেবারেই স্বাভাবিক কারণে, দুরভিসন্ধিজাত নয়। এম. এল. এ হবার

সুবাদে চরণদাসের বর্তমান ঠিকানা রাজধানী। সে এবং তার পরিবার-পরিজন রাজধানীর বিলাসে ব্যসনে অভ্যস্ত। হাজার সদিচ্ছে সত্ত্বেও সেই অভ্যস্ত জীবনাচরণের বাইরে পুরোনো গ্রামীণ জীবনে কখনো কখনো ফিরে আসা তাই প্রায় অসম্ভবপর। দশ-বারো বছর রাজধানীতে থেকে তার ছেলেমেয়েরা ফিরতে চায় না। স্ত্রীর পুরো অম্বলের অসুখ রাজধানীতে গিয়ে সেরে গেছে। তবু সম্পর্কের টানটা চরণদাস মনে মনে অনুভব করে। সবচেয়ে বড়ো কথা রাজধানীর বন্ধুবান্ধব এমন কি তার ছেলেমেয়েও তাকে এখনো পাড়াগেঁয়ে ভাবে। আর এখানকার লোকেরা তার মধ্যে সম্পূর্ণ শহুরে গুণ খুঁজে পায়। এবার চরণদাসের পুরোনো অঞ্চলে আসার কারণ আসন্ন নির্বাচন। তার পার্টি হাইকমাণ্ড এবার ঠিক করেছে ভোটারদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক কম তাদের আর টিকিট দেওয়া হবে না। কারণ জনতাই হচ্ছে আসল কথা। জনতার রায়ই শেষ রায়। কাজেই জনপ্রতিনিধি সেই-ই যার সঙ্গে জনসংযোগ অনেক বেশি। হাইকমাণ্ডের এই সিদ্ধান্ত চরণদাসের বার বার ইচ্ছে সত্ত্বেও না হয়ে ওঠা সফরকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে, তাকে টেনে এনে ফেলেছে তার পুরোনা কন্সটিটিঅ্যানসিতে। এবার আর সার্কিট হাউস বা ডাকবাংলোয় নয়, সরাসরি এসে উঠেছেন তাঁর সেকালের কর্মক্ষেত্র পুরোনো পার্টি অফিসে। জনপ্রতিনিধি হয়েও ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার অভিযোগে আগামী বছর পার্টি তাঁকে নমিনেশন নাও দিতে পারে—সেজন্যই চরণদাসের 'জনসম্পর্ক' বাড়াবার 'প্রোগ্রাম' গ্রহণ। এই তথ্য লখনলাল, বচ্‌কন্ মাহাতো প্রমুখ পুরোনো কর্মীরা বিলক্ষণ জানে। আর জানে বলেই বাগে পেয়ে চরণদাসকে বিদ্রূপ করতে এরা ছাড়ে না। কখনো তার হোল্‌ড অল, সুটকেস নিয়ে, কখনো পার্টি অফিসে ওঠা নিয়ে, কখনো তাঁর পৈতৃক বসতবাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া নিয়ে, কখনো বা দাঁতন নিয়ে, গ্রামে ঘোরা নিয়ে। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে এই সব ব্যঙ্গের খোঁচা চরণদাস নীরবে সহ্য করেন। এরা চরণদাসকে কখনো 'ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব' বলে, কখনো 'ভোটার-চরণ দাস' অর্থাৎ ভোটারদের চরণাশ্রিত বলে কখনো বা 'এযাত্রায় উনি একেবারে পুরোনো চরণদাসজী সেজেছেন।'—এমত বিদ্রুপও করে। কিন্তু চরণদাস নিজে তাদের গড়ে-পিটে মানুষ করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর যে জীবনাচরণ আজ এদের বিদ্রূপের কেন্দ্রবিন্দু, তিনি এম. এল. এ হবার পর থেকে প্রতি মাসে প্রায় পনেরো কুড়ি দিন সেই বিলাসিতার আতিথ্য গ্রহণ করে এরা, চরণদাসের কাছে থেকে তার সূত্র ধরে হাইকোর্টে নিজেদের মামলা তদ্বির করে, সরকারী দপ্তর থেকে নানারকম সুবিধে পাইয়ে দেবার দরবার করে। চরণদাস এ সব আবদার মেনে এক অর্থে এদের মন যুগিয়ে চলে। তবুও এরা ধুয়ো ধরে তিনি নাকি ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। কাজেই এদের ব্যবহারে চরণদাসের রোষ বাড়ে। কিন্তু রাগ বা তিক্ততা নিজের মধ্যেই মেরে ফেলতে হয়। কারণ এদের দৈনন্দিনতার শিকড় এখনো এই মাটিতে, তাই জনসম্পর্ক বাড়াবার 'প্রোগ্রামে' এরাই চরণ-দাসের হাতিয়ার, মাধ্যম। নিজের জন্যই এদেরকে সহ্য করতে হয় চরণদাসের।

শুরুতেই হোঁচট গেল চরণদাসের প্রোগ্রাম। গ্রামের মেঠো পথে ধুলো কাঁকরের ওপর দিয়ে খালি পায়ে, খালি গায়ে তিনি বেরিয়েছিলেন গণসংযোগের আশায়। প্রত্যাশা ছিল এখানকার মানুষ তাকে এভাবে এ বেশে দেখে তাঁর মধ্যে তাদের পুবোনো দিনের ভালোবাসার

চরণদাসকে খুঁজে পাবে। 'এখানকার লোকে তাঁকে চিরকাল কত ভালোবাসত। আগেকার জীবনে সেইটাই ছিল তাঁর পুঁজি।' আশা ছিল সেটা ভাঙ্গিয়েই চলে যাবে। কিন্তু তা যখন হলো না, আসতে যখন হলো তখনো ক্ষীণ আশা ছিল সাধারণ ভাব অবলম্বন করলে খুব সহজেই মানুষের মনের দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে বাজিমাৎ করা যাবে। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তব ক্ষেত্র দুটো সম্পূর্ণ পৃথক। তাই চরণদাস পথে বেরিয়ে দেখলেন পরিচিত কেউই গুনকে বিরসা, তিরথার মা, চথুরি তার প্রতি সময় নষ্ট করতে বা মনোযোগ দিতে আগ্রহী নয়। সকলের মধ্যেই একটা এড়িয়ে যাওয়া ভাব, একটা তাড়া। সুখ দুঃখ, সমকালীন দেশীয় বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা কোনো সুযোগ সুবিধা কারোরই যেন কিছুই চাওয়ার নেই নির্বাচনের বছরে প্রার্থীর কাছে। কোনো প্রতিশ্রুতি দেবার উপযুক্ত পাত্র নেই। মানুষ যেন এখন অনেক চালাক হয়ে গেছে। মন্ত্রী আমলাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির স্বরূপ তারা বুঝে গেছে। তারা যেন এখন সে সুযোগটুকুও দিতে চায় না আমলাতন্ত্রকে। হতাশা ও দুশ্চিন্তা সঙ্গী করে চরণদাস পার্টি অফিসে ফিরে আসে। শুরু হয় তাদের প্রোগ্রামে কর্মসূচী স্থির করার কাজ। জলখাবারের দায় চরণদাসের উপর বর্তায়। কর্মসূচী স্থির করার ক্ষেত্রেও কর্মীদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। তবু ধৈর্য্য হারান না চরণদাস। এখান থেকে গল্পটি নতুন মোড় নেয়। কর্মসূচী ঠিক করতে বসে চরণদাস অনুভব করেন 'এতদিন সহকর্মীরা এখানকার সম্বন্ধে যে সব খবর দিয়েছিল সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।' কিন্তু দেওয়া হয় নি। সুবিধাভোগী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই হয় নি। আর এই অবসরে বছর তিনেক ধরে এক গুরু মহারাজ এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। এখানকার স্থানীয় মানুষ—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্য। তাঁর সঙ্গে তাদের সংযোগ মনের। ভোট-যোগ নয়, এ হলো ভক্তি-যোগ। তাই চরণদাসকে যেখানে ভোটার চরণ-দাস সাজতে হয়, কর্মসূচী অবলম্বন করতে হয় জনসম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রামের, ভাবতে হয় কীভাবে ভোটার-ভোটারীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। সেখানে স্বামীজী তাঁর কর্মের দ্বারা চরণদাসের ভোটার-ভোটারীর মনে এমন স্থান অধিকার করেছে যে তারা স্বামীজীর জন্য পাগল, 'তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারেন না এমন লোক এখানে নেই।' এ হলো মানবমনের জটিল অন্তর্লোকের উন্মোচন। লেখকের বিশিষ্ট রচনারীতি চরিত্র নির্মাণে অন্তরলোকের পদ্ধতি এভাবেই ছোটোগল্পের পরতে পরতে প্রতিফলিত। চরণদাস বেশ উপলব্ধি করেন জন সম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রাম নয় তার এখন দরকার ভোটার-ভোটারীদের গুরু মহারাজের সন্তুষ্টির প্রোগ্রাম।

এই পর্যন্ত গল্প প্রায় ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ এই সরলরৈখিক গতিতে ভাঁটা পড়ল মৌলবী সাহেবের আগমনে। এখান থেকে গল্পে যুক্ত হলো এক নতুন অধ্যায়। আদমসুমারীর কাজে আসা মৌলবী সাহেবের চরণদাসের প্রতি নিতান্ত নির্দোষ প্রশ্ন—'হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?' চরণদাসের মনের অতি স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত দেয়। সহকর্মীদের বিদ্রূপ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কুইনাইন গেলার মতো কষ্টে গিলতে হয়। কিন্তু মৌলবীর প্রশ্ন! আপাতদৃষ্টিতে যার সঙ্গে নির্বাচনের ভারসাম্যের দিকটি সম্পৃক্ত নয় তার প্রশ্ন কেন সহ্য করবে এম. এল. এ চরণদাস। স্বভাবতই তার ইগো জেগে ওঠে, মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। এতক্ষণে ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতীক চরণদাস ক্ষোভে, ক্রোধে, আক্রোশে ফেটে

পড়ে। চরণদাস দশ-বারো বছর এখানে থাকেন না, তার উপর তাঁর বাড়িটা সরকারী কাজে ভাড়াপ্রদত্ত। সেকারণেই যৌক্তিকতার দিক থেকেই মৌলবী সাহেব প্রশ্নটা করেছিলেন। কিন্তু জনপ্রতিনিধি জনসংযোজনার দিক থেকে প্রশ্নটি যেন মূর্তিমান বিদ্রূপ। চরণদাসের গিল্‌টি-কনশাসনেসে ঘা লাগে, আঁতে লাগে, মারমুখী হয়ে ওঠে চরণদাস। আমলাতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র এখানে উদঘাটিত। সহকর্মীরা কোনো ক্রমে নির্বাচনের অজুহাত দেখিয়ে চরণদাসকে শান্ত করে। স্থির হয় ভোটার-চরণদাস এবার হবে গুরু-চরণদাস। কথাশিল্পীর বাচনভঙ্গীর তির্যকতা এখানে লক্ষণীয়।

বিকেলের দিকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চরণদাস, লক্ষ্মণলাল, বচ্‌কন্ মহতো প্রয়োজনীয় ভেট নিয়ে 'খালি গায়ে, খালি পায়ে' হাজির হলেন শ্রী সহস্রানন্দের আশ্রমে। কিন্তু সেখানেও এক চরম বিভ্রাট। লোকে লোকারণ্য আশ্রম। কিন্তু কারো মধ্যে নেই সেই প্রাণবন্ত লীলা চাঞ্চল্য। কোথায় যেন ঘটেছে ছন্দ পতন। উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে চরণদাস—'আজকে এখানে আসাই বুঝি ব্যর্থ হলো।' কিন্তু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন তিনি। লোক চরিয়ে খান তিনি। লোকমনস্তত্ত্ব তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই 'চোখ বুজে দরাজ গলায় জয় গুরুদেব বলে চেঁচিয়ে উঠে, সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন' তিনি। মুহূর্তে তাঁর স্টান্ট কাজ করল। এতক্ষণে বন্ধ জনতার দরজা অকস্মাৎ অর্গলমুক্ত হলো। জনসংযোগ নয় ভক্তি সংযোগের ধারায় বহতী জনস্রোতে পরিচিতির প্রবাহ ফিরে পেলেন চরণদাস। প্রাণ পেল তাঁর গৃহীত 'জন সম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রাম'। জানতে পারলেন সঙ্কট স্বরূপ। সেনসাস অফিসার মৌলবী সাহেব সরকারী লোকগণনার সময় আশ্রমের বাসিন্দাদের সঙ্গে স্বামী সহস্রানন্দকেও গুণে ফেলছে। সমস্যার সূত্রপাত সেখানেই। ভক্তমনে তিনি মানুষ নয়, দেবতা—গণনার বাইরে। কাজেই সেনসাস ফাইল থেকে তাঁর নামটি কেটে দিতে হবে। এ শুধু ভক্তের আবেদন নয়, চরণদাসের ভোটার-ভোটারীর আদেশ। কাজেই সকালে যে মৌলবীর সঙ্গে একপ্রস্থ লড়াই করে প্রায় গলাধাক্কা দিচ্ছিলেন চরণদাস, যাকে নির্বাচনের পরেই নাকেখত দেওয়ানোর ব্যাপারে প্রায় স্বগত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চরণদাস বিকেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্বাচনকে সামনে রেখে, নিজের তথাকথিত 'মর্যাদা আসনটি'কে বজায় রাখার লক্ষ্যে চরণদাসকে এবার হতে হলো মৌলবী-চরণ-দাস। চরিত্রের এই বিচিত্র রং পরিবর্তন পরম উপভোগ্যতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন লেখক। গল্পটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ গল্প। লেখক সচেতন ভাবে এখানে কয়েকটি পথ অবলম্বন করেছেন। প্রথমত এম. এল. এ শব্দের ভুল উচ্চারণ—কোথায় যেন ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে। সময় বিশেষে নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকতে বা রেকর্ড ভালো রাখতে বা ভোটতন্ত্রটিকে ঠিক রাখার জন্য রাজনীতিকরা কখনো ভেক ধরেন, কখনো নিছক পরিস্থিতির দাস সাজেন, কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা ছোটান। এ ব্যঙ্গ যেন সেই ভণ্ডামির প্রতি। দ্বিতীয়ত উল্লেখ্য হাইকমাণ্ড-এর ভয়। হাইকমাণ্ড একটা অস্তিত্বহীন ভগবানের মতো। অথচ তারই সার্বভৌম ক্ষমতা, সবই তার ইচ্ছাধীন। কখনো এটা দাবাবার অস্ত্র, কখনো বা পার্শ্বচরদের পকেটস্থ করবার হাতিয়ার। আবার এই হাইকমাণ্ডই দেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রা শক্তি। যার ভয়ে চরণদাসের মতো নেতারা ছুটে আসেন জনসম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রামে। গল্পটির নাম—চরণদাস এম. এল. এ। চরণদাস অর্থাৎ চরণের দাস। এম. এল.

এ শব্দটির মধ্য দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না—না নাম, না পদবী, না জাত। সমগ্র গল্পের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চরণদাস। যোগ্যতা বা কোনো কিছু করার মানসিকতা নয়, তার একমাত্র নিজস্ব পেটেন্ট বা কাজ হাঁসিল করা পন্থা পা জড়িয়ে ধরা—চরণাশ্রয়। তাই সে যখন হাইকমাণ্ডের 'হুড়ো' খায় তখন জনস্বার্থ বৃদ্ধির জন্য কিছু না করে হতে চায় ভোটার-চরণ-দাস। ভোটতন্ত্রকে ঠিক রাখার জন্য অতি সহজে সাধারণ মানুষকে দলে টানার জন্য সে হয়ে যায় গুরু-চরণ-দাস। আর সহজ স্টান্ট বিজনেসের জন্যই সে হয় মৌলবী-চরণ-দাস। চরণ-দাসের এই রং বদল—পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেক-ধারণ লেখকের গভীর রাজনৈতিক মনস্কতা এবং পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির ফসল। যে চরণদাস আদমসুমারী করতে আসা মৌলবি নির্দোষ অথচ যথার্থ প্রশ্ন—'হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?' শুনে স্পর্শকাতর হয়ে ওঠেন। তাঁকে মারমুখী করে তোলে। সেই চরণদাসই যখন লেখকের ভাষায় 'ভোটার-ভোটারীদের আদেশ' পান তখন অনায়াসে ভোটযন্ত্র নিশ্চিত রাখার জন্য 'হুমড়ি খেয়ে' পড়েন মৌলবী সাহেবের পায়ে। তাঁর ইগো, তাঁর তথাকথিত অবস্থান বা পজিশন, আমলাসুলভ অহঙ্কার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে এক নিমেষে বলিপ্রদত্ত! বা বলা যায় ধূলায় অন্তর্লীন। সার্থক লেখকের বাস্তববোধ এবং প্রখর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। গল্পটি সার্থকনামাও বটে।

বস্তুত সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর এই গল্পটির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন সেদিনের সুবিধাবাদী, জনস্বার্থ বিরোধী স্বার্থপর রাজনীতিকে। যে রাজনীতি ধর্মের নামে রীতির নামে ব্ল্যাকমেল করে মানুষের বিশ্বাসকে, আবেগকে। যে রাজনীতি শুধু নিজের আখের গোছানোর জন্য, নিজের ক্ষমতাকে কায়েম রাখার জন্য ব্যবহার করে মানুষকে, লেখক জীবননিষ্ঠ হিউমার ও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে আঘাত করেছেন সেই নীতি বিগর্হিত রাজনীতিকে। চরণদাসের এই ক্রমান্বয়ীরূপ পরিবর্তন সেদিনের বাস্তব পটভূমির প্রতীক মাত্র।

তিন

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চরণদাস। চরণদাস চরিত্র নির্মাণে গল্পকার তাঁর বিশিষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য মননপ্রধাণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মার্সেল এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ। মানবমনের রহস্যলোকে—আলো আঁধারির গহন প্রদেশে অনুসন্ধিৎসার আলো ফেলে মানবমনের জটিলতা, 'ইনার রিয়ালিটি'কে তুলে এনেছেন তিনি। তাই তাঁর 'চরণদাস' চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি, সজীবযানা সহজেই স্পর্শ করে পাঠক মনকে। জনপ্রতিনিধি চরণদাস। জনতার জন্য তাঁর বর্তমান অস্তিত্ব—বিলাস ব্যসন সব কিছুই। কিন্তু এই জনতার প্রতিই তাঁর সর্বাধিক অবহেলা। তাঁর মুষ্টিমেয় কর্মীদের জন্য অবশ্য তিনি সদাই 'কল্পতরু বৃক্ষ'—কিছু না কিছু করছেন। কিন্তু আপামর জনতার সঙ্গে সেই 'করার' কোনো সংযোগ নেই। লেখক অসামান্য দক্ষতায় চরণদাসের বিচিত্র ভোটার ধরার পদ্ধতির উপযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন। প্রয়োজনে চরণদাসের গিরগিটির মতো রং খোলস পরিবর্তন একদিকে যেমন বাস্তব ব্যঞ্জনায় জীবন্ত অন্যদিকে পরম কৌতুকর পরিবেশনা। লেখকের জীবনরসরসিকতা চরিত্রটিকে একেবারে রক্তমাংসের সজীবত্ব দান করেছে। চরিত্রটি টিপিকাল সুবিধাভোগী যুগোপযোগী চরিত্র। স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের প্রয়োজনে অনুচরদের বিদ্রূপ সে সহ্য করে। অবস্থা অনুকূল করার জন্য নিজের পুরোনো রূপ যথাসম্ভব প্রতীতিগ্রাহ্য করে তুলতে চায়, আবার যেখানে স্বার্থ-সংযোগ দেখা

যাচ্ছে না সেখানে তাঁর আমলাসুলভ ইগো বা অহংবোধের অকারণ জাগরণ ঘটে অতি সহজেই। জনসম্পর্ক বাড়াবার কার্যপ্রণালী স্থির করার ক্ষেত্রে দেখা যায় 'এম. এল. এ সাহেবের ধৈর্য্যের পুঁজি' অনেক বেশি। অবাক হতে হয় স্বল্পক্ষণের মধ্যেই ধৈর্যবান চরণদাসের ধৈর্য্যহীনতায়। মৌলবী সাহেবের অতি নির্দোষ অথচ অতিবাস্তব প্রশ্নে তাঁর মনের 'এক অতি স্পর্শকাতর জায়গায়' অকারণে আঘাত লাগে। সত্যিই কি এই আঘাত অকারণ—অমূলক। গল্পের বিশ্লেষণী পাঠে দেখা যায়—অজান্তে অভিপ্রায়হীনভাবেই মৌলবী সাহেব চরণদাসকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বিবেকের সামনে। তাঁর অপরাধবোধ—গিল্টি কনশাস আহত হচ্ছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় চরণদাস ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। সরকারী কর্মীর এই প্রশ্ন তাঁর কাছে ধৃষ্টতার নামান্তর। তাই তিনি তাকে 'আইনচঞ্চুমশাই' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। বেয়াদব বলেছেন—'বেয়াদবলোকদের বৈজ্ঞানিকভাবে মেরে শায়েস্তা করতে আমি বিশেষজ্ঞ। আস্তিন গুটিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলল।' শুধু তাই নয় ইলেকশন হয়ে যাবার পর মৌলবীকে অন্যভাবে শায়েস্তা করার জন্যও চরণদাস বদ্ধপরিকর। এখানে চরিত্রটির মজা—খুবই interesting। এরপরেই লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে মৌলবী মারমুখী চরণদাস মৌলবী-চরণ-দাস হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ভোটের জন্য। বা বলা যায় যে 'অহংবোধের জন্য চরণদাসের মৌলবীর প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই 'অহং' বোধের উৎস—তাঁর পজিশন বা এম. এল. এ গিরি বজায় রাখার জন্যই চরণদাস 'হুমড়ি খেয়ে' পড়েছেন মৌলবীর পায়ের উপর। পরম কৌতুককর এই দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে চরণদাস চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টত ফুটে উঠেছে—তা হলো এই চরিত্রের উপর পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ বা বলা যায় নিজস্ব কোনো নৈতিকতা বা দৃঢ়তা নয়, পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে চলা, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তিত করাই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য। চরণদাস চরিত্রের মধ্য দিয়ে নীতিহীন রাজনীতি প্রকট হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের লক্ষ্যে যে ভোটার-ভোটারীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে চায়—'ঠিক করে যে যা চাইবে তাকেই সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে একখানা করে সুপারিশের চিঠি দেবেন, আর আশ্বাস দেবেন প্রাণপণে চেষ্টা করবার।' আবার তাঁর মনে সন্দেহ হয় তাঁর ফন্দি বোধ হয় সবাই ধরে ফেলেছে—'তবে কি এরা সবাই বুঝে গিয়েছে যে, তাঁর চিঠিতে সরকারী মহলে কোনো ফল হয় না! যাঁদের কাছে তিনি চিঠি দেন তাঁদের সকলের কাছে আগে থেকে বলা আছে যে এসব সুপারিশপত্রের ওপর কোনো গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। তাঁর এই চালাকি এরা ধরে ফেলেছে?' তাঁর নিজের অঞ্চলের লোকেরা যাদের ভালোবাসা একসময় তাঁর পুঁজি ছিল তাদের কাছে বিশেষ আমল না পাওয়া তাঁকে যেমন ব্যথিত করেছে, অন্যদিকে ষড়যন্ত্রের সন্দেহও মাথায় দানা বাঁধে—'লখনলালজীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যে প্রচার করেনি তো, এখনকার লোকজনের মধ্যে কিছু বলা যায় না। তার নিজেরই ইচ্ছে থাকতে পারে এই নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে এম-এল-এ-র জন্যে দাঁড়াবার। হাইকম্যান্ডের কাছেও চুপিচুপি তাঁর বিরুদ্ধে লাগায়নি তো কিছু?' একদিন যাদের চরণদাস নিজের হাতে গড়ে তুলেছে—আজও তাঁর 'ভোটার ধরার পদ্ধতির' মূল হাতিয়ার যারা এ সন্দেহ তাদের প্রতি। এ যেন জীবনানন্দের 'সকলের আড়চোখে সকলকে দ্যাখে' যুগচিত্রকে বাস্তব প্রতীতি দেয়।

এই গল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র মৌলবী টোলা পাড়ার মৌলবী চরিত্র। খুব স্বল্প পরিসরে অঙ্কিত এই চরিত্রটি গল্পটির টার্নিং পয়েন্ট। মৌলবী সরকারী লোকগণনার কাজ নিয়ে গ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই পার্টি অফিসেও এসেছেন। সেখানে সসঙ্কোচে তিনি তাঁর আসার কারণ জানান। এবং চরণদাসকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই অধুনা অনাবাসী এম-এল-এ-সাহেবের নাম 'এখান থেকেই' লেখা হবে কিনা তিনি জানতে চান। আর এই জানতে গিয়েই যত বিপত্তি। মৌলবী সাহেবের প্রশ্নটি অতি নির্দোষ, কোনোরকম দুরভিসন্ধিজাত নয়। চরণদাস যেহেতু এখানে থাকেন না, বসত বাড়িরও সরকারকে ভাড়া-প্রদত্ত—খুব সঙ্গত কারণে সরকারী লোকগণনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম এমন স্থান থেকে থাকতে পারে না। তাই এই প্রশ্নের উৎপত্তি। কিন্তু এই প্রশ্ন চরণদাসকে অতিসহজেই রাগোন্মত্ত করে তোলে। মৌলবী অতি সহজে আপন বুদ্ধিমত্তায় চরণদাসের ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে নিজের কাছে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর চরিত্রের এই অনমনীয় দৃঢ়তা এবং প্রয়োজনে অবাঞ্ছিত কথা এড়িয়ে যাবার কর্তব্য লক্ষণীয়। কিন্তু চরণদাস যখন মারমুখী হয়ে তেড়ে গেছেন তার দিকে তখন মৌলবীর শান্ত অথচ অনুপেক্ষণীয় প্রতিবাদ লক্ষণীয়। 'মৌলবী ধীরকণ্ঠে উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—ইনি আমার লোকগণনার কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন; ......একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর আইন সঙ্গত সরকারী কাজে বাধা দিয়েছেন। আপনারা সবাই সাক্ষী। আমি আজই এঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করব।' এরপর বাধ্যত তাঁকে চলে যেতে হয়। কিন্তু যাবার সময়েও তাঁর 'চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্ট' ছিল।

সকালের এই মৌলবী সন্ধ্যাবেলায় একেবারে নতুন রূপে দেখা দিলেন। এত কাজের পরেও চরণদাস যখন নিজের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মৌলবীর দ্বারস্থ হয়েছেন, তখন মৌলবী সাহেব সকালের প্রাপ্ত অভব্য ব্যবহার ভুলে মান্য আতিথিকে যোগ্য অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এখানে তাঁর চরিত্রে অপমানাহত প্রতিবাদী সত্তা অপেক্ষা অতিথিবৎসলতা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই মৌলবী অনায়াসে পূর্ব অপমান ভোলার কথা বলে—'সে পুরোনো কথা আর তোলবার দরকার নেই' বা 'রাগের মাথায় লোকে কতসময় কত কি বলে ফেলে। সেসব কথা কি ভদ্রলোকে মনের মধ্যে গিঁঠ বেঁধে রাখে চিরকালের জন্য?' অহংসর্বস্ব চরণদাসের বিপ্রতীপে মৌলবীর এই অমায়িক মানবতা একদিকে যেমন চরিত্রটিকে মহত্তর ব্যঞ্জনা দিয়েছে, ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে, অন্যদিকে চরণদাস চরিত্রের অসঙ্গতিকে তীব্র করে তুলেছে। চরণদাস যখন তাঁর মূল বক্তব্য পেশ করেছেন তখন মৌলবী বেশ ফাঁপরে পড়েন। কারণ কাজের অঙ্গ হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক পথে তিনি স্বামীজীকে গুনেছেন। কিন্তু চরণদাস তাঁর নিজের রাজনৈতিক অভিসন্ধির জন্যই নামটা কেটে দিতে বলেছেন—নিয়মের এই দ্বিচারিতা যে মৌলবী সাহেবের মনঃপূত নয় তাঁর 'অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে' যাওয়াতেই প্রমাণিত। চরণদাসেরও আসল ভয় ছিল 'মৌলবী সাহেবের বিবেকে বাধতে পারে'। মনে হয় লেখক যেন সচেতনে চরণদাসের নীতিহীন রাজনৈতিকতার সমান্তরালে মৌলবীর মৌনতার মধ্য দিয়ে নীতিবোধকে জাগরিত করে তুলেছেন। মৌলবী ও চরণদাস চরিত্রের বিপ্রতীপতা কাহিনীটিকে নাটকীয়তা ও দ্রুত গতি দিয়েছে।

লক্ষ্মণ দাস বা বচকন মাহাতো চরিত্র আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর সেইসব

সুবিধাবাদী শ্রেণী চরিত্র যারা রাজনীতিতে সদর্থে ব্যবহার না করে একটি বিশেষ দল বা নেতার 'কাছের লোক' হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে চায়। নৈকট্যের সুযোগে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা অনায়াসে ব্ল্যাকমেল করে। স্থানীয় হওয়ার কারণে জনতার আবেগ, মনের ভাঁজ এরা খুব ভালো করে বোঝে। তাই উচ্চপদস্থ নেতা বিপদে পড়লে এরা ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়—নিজেদের ভাণ্ডার পুষ্ট করে। সময় বিশেষে হুল ফোটাতেও ছাড়ে না। উচ্চপদে পৌঁছানোর কোনো যোগ্যতা এদের নেই। কিন্তু এদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা ভাণ্ডার খুবই পরিপুষ্ট। সুনরা, বিরসা, তিরযার মা, চথুধর-এরা একেবারেই গতানুগতিক জনতা চরিত্র। বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থানিক বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই চরিত্রগুলি। এক সময় এরা চরণদাসকে নিজেদের লোক মনে করে ভালোবাসত। চরণদাসের প্রকৃতি এরা বোঝে। প্রতিবাদ না করলেও এরা নীরবে সরে যেতে জানে। তাই 'জন সম্পর্ক বাড়ানোর প্রোগ্রামে' আসা চরণদাসের সঙ্গে কালক্ষেপ এরা করে না। স্বামীজীর প্রতি এদের আস্থা একেবারেই আস্তিক্যবাদী ভক্তিমূলকতা থেকে। এরা সংস্কার পন্থী। সংকটে পড়লে এরা গুরুর চরণে সব কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। এদের আস্থা অর্জন করা যেমন সহজ তেমনি নির্ভরতার জায়গা থেকে সরে গেলে সংস্কারের পথে, আবেগের পথে বিশ্বস্ততার জায়গা আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। অল্প আলোচনা বা প্রচার নয় তখন দরকার হয় বড়ো কোনো স্টান্টবাজি। যার জন্য চরণদাসকে হতে হয় মৌলবী-চরণ-দাস। কোনো রীতি-নীতি বা বাহ্যিক প্রকাশ ছাড়াই এরা সঙ্ঘবদ্ধ। বিপদের দিনে এরা 'মায়লে-ভাইয়ের' কাছে 'আশ্বাসবাণী শুনতে চায়'।

চার

'চরণদাস এম. এল. এ' গল্পটির ছোটোগল্পসুলভ একমুখীনতা, দ্রুতগতি বিশেষ লক্ষণীয়। চাপা ও সূক্ষ্মব্যঙ্গ, অন্তর্গূঢ় তির্যক প্রকাশ ভঙ্গী, বর্ণনা ও ইঙ্গিতধর্মিতা, স্নিগ্ধ ও পরিহাস রসের পরিবেশনা, মনোগহনের পথে স্বচ্ছন্দ বিচরণ, চরিত্র উদ্ঘাটনে অনায়াস দক্ষতা ছোটোগল্পের মনন প্রাধান্য এবং শৈল্পিক নিরাসক্তি গল্পটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। সরল সাবলীল ভাষায় বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনজীবন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের ত্রুটি, নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ গরমিলে ভরা রাজনীতিকদের শ্রেণিচরিত্রের বাস্তবনিষ্ঠ দর্শন এই গল্পটি। যুগমানসের যথাযথ প্রতিফলন গল্পটিকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছে। নবীন গণনায়কদের প্রতি লেখকের চাপা বিদ্রূপ গল্পটির সর্বাংশে সার্থক ভাবে রূপায়িত। গল্পটির কালনিষ্ঠতা রসরসিকতা এবং লেখকের সরস উপস্থাপনারীতি বিশেষ প্রশংসার্হ।

চকাচকী : সম্পর্কের এক অন্য অভিব্যক্তি

গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট

গল্পগ্রন্থের নামগল্প এই 'চকাচকী'। সতীনাথের প্রতিটি গল্পের স্বতন্ত্রতা এ গল্পেরও বৈশিষ্ট্য। ১৩৬৩ তে প্রকাশ এ গ্রন্থের। লেখকের ভাবনার অন্তরকে তার যে যে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছুঁয়ে ফেলা যায়, 'চকাচকী' তেমনই সতীনাথের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প।

ব্যক্তিজীবন সৃষ্টিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তর জীবনই লেখকের অভিজ্ঞতার রসদ, তাও যদি সে জীবন আবার নাটকীয় উপাদানে মোড়া থাকে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। আইন ব্যবসায় মন না টিকলেও এক অসম্ভব আত্মনির্ভরতা সতীনাথকে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে এনেছিল। কংগ্রেস কর্মী ভাদুড়ী-র ভাদুড়ীজী হতে বেশি সময় লাগল না। অসাধারণ প্রতিভাবান এই সতীনাথ স্বাধীনতার পরের বছরই কংগ্রেস ছাড়লেন, তাঁর এই detachment সাহিত্যে স্থায়ী ফসল ফলাল। দূর থেকে নির্মোহভাবে দেখার শক্তি অর্জন করলেন তিনি। এ সমস্ত কিছুর জন্য লেখাজোখার কাজও শুরু করলেন অনেক পরে। তাই প্রতিটি লেখাই এত নিখুঁত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের সঙ্গে সহজেই শিল্পের মিতালি পাতাতে পেরেছে।

গল্পের নাম—'চকাচকী'। নামটি আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই। অভিধানে চক্‌চক্‌ শব্দের অর্থ ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি প্রকাশক। চকাচকী'ও তাই। আপাত যুগ্ম শব্দের ক্ষেত্রে একটির কিন্তু পৃথক অর্থ নেই। মিলনেই এরা অর্থমুখর। চকাচকী'র লেখক গল্পের শুরুতেই জানিয়েছেন এটা তার এক প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রেমের প্রতি, প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রতি নয়। প্রেমিক প্রেমিকার প্রকৃত অভিন্ন মিলনেরই দ্যোতনা এই নামটি।

গল্পটি কথকের জবানিতে লেখা লেখকের রাজনৈতিক জীবন অভিজ্ঞতার গল্প। যে ভাবে গল্পটি বলা হয় কথকের কণ্ঠে,—তাতে গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা এক অন্যমাত্রা পায়। কংগ্রেসের কাজে জেলায় জেলায় ঘোরার সূত্রে লেখককে সহকর্মী মুসাফিরলাল একদিন নিয়ে এসেছিল ধামাহাটার এক দুবে-দুবেনীর কুটিরে। বয়স তাদের ষাট ও পঁয়ষট্টি। প্রথম দর্শনে সেই 'দম্পতির' সরলতা দেখে, আর আপন করে নেওয়া ব্যবহার লেখককে আপ্লুত করে দিয়েছিল। আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় ছিল—

"বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপচে পড়া ভাব বজায় রেখেছে দেখে।"

"তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী"

অভিন্ন আত্মার ঔজ্জ্বল্যকেই বোঝানোর তাগিদে নিশ্চই। যদিও মুসাফির লাল এ নামের কোনো অর্থই খুঁজে পায়নি আকারে-ইঙ্গিতে দুবেনীর যুবতী সময়ের উপর ইঙ্গিত করেছিল সে। তবে লেখকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত সে বিশ্বনিন্দুক।

"সব জিনিসের সে খারাপ গন্ধ পায়"

তারপর বারবার সেখানে কাজে-অকাজে পৌছেছেন লেখক। হয়ত এ কারণেই যে—গভীর অতিথেয়তাকে কে না ভালোবাসে? আর বারংবার এই আসা-যাওয়ার মাঝে সরল

বৃদ্ধ দম্পতির কিছু আশ্চর্য, অবাককরা বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। তা হল "তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খণ্ডন হবে কী করে।"

কিন্তু কি যে তাদের পাপ—তা লেখকের মত পাঠকের কাছেও ঝাপসা থাকে। শেষে এক সময়ে সত্যিই মনে হয় 'পাপ মোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন চকাচকী জেলে যাবার হুজুক তুলল।" তখন কংগ্রেসী আন্দোলনে জেলে যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু এত করেও গোল বাধালেন দারোগাসাহেব। বাহাত্তুরে বুড়ো বলে জেলে পাঠানো হল না দুবেজীকে। তাই বিষম তোড়জোড় শুরু করলেন দুবেজী—গ্রেপ্তারের লোভে, সফল না হলে দুবেনী গভর্নমেণ্টের কাছে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে এল জেল থেকে। এ ঘটনায় চারিদিকে নিন্দার টিটিক্কার পড়ে গেলেও, তাদের যুক্তি—"আমাদের জীবন যখন একসঙ্গে গাঁথা, তখন আমার একার পাপমোচনের চেষ্টায় কী হবে? তাই দুবেনী মাপ চেয়ে বেরিয়ে এসেছে।"

এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য—

"আমাদের জটিল মন দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না তাদের সরল মনের যুক্তির ধারা"

একত্রিতভাবে পাপমোচনের প্রক্রিয়ায় জড়িত না হতে পারার দুঃখে, হতাশায় দুবেজীর শরীরও ভেঙে পড়তে লাগল। আগেই ভাঙতে শুরু করেছিল, এবার মন তার সহায় হল। টাট্টু ঘোড়ায় মাল চাপিয়ে রোজগারের একমাত্র পথও বন্ধ হল। এ সময়ে দুবেনীই পড়ল বিপাকে। সংসারের অর্থকষ্ট যে কী ঝক্‌মারি তা টের পেল হাড়ে হাড়ে। এক সময়ের বহু আশ্রিতের আশ্রয়কর্ত্রী এবার এক মুঠো অন্নের আশায় দোরে দোরে ভিক্ষাপ্রার্থী বনে গেল। স্বভাবতই লেখকও তার তালিকা থেকে বাদ গেলেন না।

কিন্তু মানুষের নিজের জীবনটাকেই তো বইতে হয় প্রত্যেককে। তার বাইরে, পরিবারের বাইরে কারো দায়িত্ব নিতে সে আর পারে কত দিন? শরীরে দয়ামায়ার জেরে যদিও বা কখনো একটু কষ্ট স্বীকার করে। কিন্তু তার পর লেখকের ভাষায়—

'কিন্তু এ মনের ভাব বেশদিন রাখা গেল না—তাদের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও। পরের জন্য লোকের কাছে হাত পাততে কতদিন আর ভালোলাগে' তবুও অনুভূতিশীল সহৃদয় লেখক কথাটা মনে মনে ভাবেন, বন্ধু সহ রাজনৈতিক কর্মী মুসাফিরলাল তো মুখে মুখে শুনিয়ে দেয়, যেমন আমরাও,—"নিজের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য? তিন কূলে কেউ নেই, এমন লোকও হয় নাকি পৃথিবীতে?"।

এরপর মাসখানেক আর দেখা নেই দুবেনীর। তারপর দুবেজীর ভয়ঙ্কর অসুখের সংবাদ নিয়ে একদিন সে হাজির। গল গল করে অসুখ, দুঃখের কথা শোনায় সে। কেমন করে বুড়ো দুবেজীর ভিমরতি চাপলো, দুবেনীর দুঃখে রোজগার করার বাতিক চাপলো,—সব। অসুস্থ অবস্থায় ঘোড়া চাপতে গিয়ে প্রত্যাশিত অঘটনই ঘটল। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মাথায় চোট পেয়ে দুবেজী একেবারে বেহুঁস।

দবেনীর দুঃখ লেখকের ভাষায় 'দুঃখের কাহিনী' মুখ্য উদ্দেশ্য যে টাকা চাওয়া 'বুদ্ধিমান' লেখক তা বুঝে যান সহজেই। আর দুঃস্থ রাজনৈতিক কর্মীদের 'ফাণ্ড' থেকে 'দুশো টাকা' মুসাফিরলালের সম্ভাব্য বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে দিয়েও ফেলেন। মুসাফিরের বিরোধিতা

এই কারণে—দুবেনী গভর্নমেন্টের কাছে মুচ্‌লেকা দিয়ে তাদের রাজনীতিকে অপমানিত করেছে।

কিন্তু এতসব আশ্চর্যের পরও আশ্চর্য থাকতে পারে। দিন-দুই পর কথক দুবেজীকে দেখতে গেলে দেখতে পান এক আশ্চর্য দৃশ্য—

"ঘরের যে কোনায় রঙিন কাগজের রথের মধ্যে রামজীর মূর্তি আছে, তারই সম্মুখে একটি গোরু দাঁড়িয়ে.........পুরুত মন্ত্র পড়ছে। গোদান করছে দুবেজী। দুবেজীকে ছুঁয়ে রামচন্দ্রজীকে বুঝোবার প্রয়াস পাচ্ছে যে, গোদান করছে তারা দু'জন মিলে"

এই 'আশ্চর্যে' লেখকের প্রতিক্রিয়া

"...টাকা দিলাম ঔষুধ পথ্যের জন্য, খরচ করে দিল গোদানে। আমারই ভুল। নগদটাকা না দিয়ে ওষুধপত্র কিনে দেওয়া উচিত ছিল। এদের মনের নাগাল পাওয়া দায়।"

সেই রাত্রেই কুপীর মৃদু আলোতেও বোঝা গেল দুবেনী কাঁদছে, আর কাঁদতে কাঁদতে যা বলছে সেই অলঙ্কারবহুল কৃতজ্ঞতা নিবেদনে' লেখকের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। রাত্রে 'কাউকে বলার নয়' এমন এক ঘটনা কথা রাখার শর্তে প্রায় বাধ্য হয়েই দুবেনী শোনায় লেখককে, গল্পের এই আশ্চার্য নাটকীয় মোড়ে এসে আমরাও উন্মুখ হয়ে পড়ি—

"শোনো তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়ামুখ! আমি দুবেজীর নিকট অত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল। সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক..."

শর্ত ছিল দুবেজীর ছেলেকে যে করে হোক ধরে আনতে হবে। পুণ্যিলাভের চরমতম উপায় 'ছেলের হাতের আগুন'। এর থেকে দুবেজীকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে চায়না দুবেনী। তার জন্য একাত্মা 'চকাচকী' শেষ সময়ে একটু দূরে যেতেও রাজী। যুগ্ম শব্দবন্ধ বিভঙ্গের অর্থহীনতার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে পুণ্যিলাভের শেষ উপায়—সমাজ সংস্কার। দুবেনীর স্পষ্ট আদেশ—"আমি আছি জানলে আসবে না; বলে দিও মরে গেছি"

সাংসারিক ক্রিয়াকর্মের সাতে পাঁচে না থাকলেও দুবেনীকে উপেক্ষা করতে পারেন না লেখক। সাহাবাদ জেলার গ্রামে গিয়ে দেখলেন দীর্ঘ চল্লিশ বছর দুবেজীর ছেলের কাছে 'বাবা' নামক শব্দটির প্রায় সমস্ত অর্থই উধাও করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে এল। তবে বাবার টানে নয়, সম্পত্তির লোভে। জীবনকে লালায়িত করবার এই মোক্ষম চাল। এসে দেখা গেল দুবেজী ইহধাম ত্যাগ করেছেন। দুবেনীকে আর দেখা গেল না। লেখকের অনুভব "—দুবেজীকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তার বুক ফেটে গিযেছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে সে দুবের পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে!"

তারপর শবযাত্রা। ভাদ্রের শ্মশানঘাট। তার মধ্যে লেখকের বুকফাটা কটাক্ষ—

"দুবেজীর ছেলে একটিও কথা বলেনি এখন পর্যন্ত; বোধহয় বাড়ী দেখে হতাশ হয়েছে" কিন্তু হঠাৎই কাশফুলের চুনকামের ফাঁকে খসখসানির ঢেউটি মিলিয়ে গেল। লেখক বুঝলেন। মুসাফিরলাল বুঝল। কিন্তু কানা মুসাফিরলালের চোখ তখন খুলে গিয়েছিল।" শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়' তার দরদ ভরা একথায় সে সহজেই ক্ষমা পেয়ে গেল লেখকের। আমাদের। আমরা ভাবতে লাগলাম, সত্যিইতো প্রকৃত প্রেমই এমন আলোর ঝরনা ঢালতে পারে। একেবারে পাথর-হৃদয়েও আনতে পারে করুণাধারা।

চকাচকীর প্রেম অস্বীকার্য এ হিন্দু সমাজের কাছে। এখনো। এক শতাব্দী-পূর্বে এ অস্বীকার কার্যত প্রতিরোধই ছিল। তবে এই বাঙালাদেশে কুলীন পরিবারে সহমরণ নামে পৈশাচিক প্রথা যেমন ছিল, তেমনি ছিল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। পদাবলীর রাধিকাতো জাতি-কুল-শীল-মান ত্যাগ করেই নিকট আত্মীয় কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, নিবেদিতা। তবে ঐশ্বরিক মহাত্মতার খোলস তাদের আত্মরক্ষার সহায় হয়েছিল। কিন্তু চকাচকীর তো তা ছিল না, আবার তাদের মধ্যে সমাজ ভেঙে ফেলার কোনো সতর্ক আয়োজন ছিল না। নইলে নিজেরা সুখী হয়েও 'পুণ্যি' লাভের ভূত তাদের তাড়িয়ে বেড়াবে কেন? আসলে নিজেদের আকর্ষণ প্রবল ভাবে তাদের গ্রাস করেছে। প্রেমের সেই অমোঘ ঢেউ নিজের অজান্তেই ভেঙেছে নিজের পাড়কে। কিন্তু জীবনের সমস্ত সংস্কার বোধগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং সরলপ্রাণ এই কাঙাল প্রেমিক যুগলের উপর হিন্দু সমাজ তার নিয়মনীতির ভয় দেখিয়ে গেছে। সর্বদা অবশ্য রাজত্ব করতে পারেনি। তবে বয়স যত বেড়েছে পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাও তত পোক্ত হয়েছে। পূর্বের কৃত 'পাপে'র জন্য কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী এ দম্পতি উতলা হয়ে উঠেছে। খুশির সংসারে আশ্রয়দাত্রী দুই চরিত্র ক্রমাগত আশ্রয়প্রার্থী হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত ধ্যান কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে সেই অদৃশ্য পাপবোধের মাঝে।

কি কারণে দুবেজী প্রথম জীবনে এত সাহস সঞ্চয় করেছিলেন আমরা জানি না, কেনইবা স্ত্রীসঙ্গ ও পুত্রলাভের পরে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিলেন এ কথা 'গল্প' আমাদের জানায় না। নিকট আত্মীয় হলে দুবেনী দুবেজীর পূর্বপরিচিতা এটাই স্বাভাবিক। গল্পের কারণে এ 'গল্প' নির্মাণ' একান্তই আমাদের অনুমান নির্ভর। যা অনুভবের অপেক্ষা রাখে না তা হল রূপসী দুবেনীর প্রতি দুবেজীর অসম্ভব ভালোবাসা, যা বেহুঁশ হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত একরকম ছিল। আসলে নিয়ম ও প্রেমের দ্বন্দ্বে, সমাজ ঔচিত্য এ হৃদয়ের দ্বন্দ্বে তারা প্রেমকেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সমাজ সংসারের প্রচলনকে অস্বীকার করতে পারেননি। আজকের 'আমরা'ই বা তার কতটুকু পারি। ভালোবাসার পরিণাম বদলে যায় সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয় দলিলের জন্য। 'রক্ষণশীল বাবা'র রক্তচক্ষুকেই উপেক্ষা করতে পারে ক'জন বঙ্গললনা? সেদিক থেকে 'চকাচকী' আমাদের আদর্শ। এমন প্রেমের কাছে নত হয়ে যায় আমাদের হিসেবী মন। এমন বিদ্রোহ না করতে পারার পঙ্গুত্ব অনুতপ্ত করে আমাদের। দুবেজীর পুণ্যির জন্য দুবেনীর এই ত্যাগ, আর শেষকৃত্যের শেষ সময়ে একবার কাশফুলে ভর দিয়ে প্রেমের সৌরভ, আমোদিত করে দেয় সমস্ত অপ্রেমকে। কানা মুসাফিরলালেরও চোখ ছল ছল করে ওঠে।

'ঔচিত্য' কথাটি সময়-সমাজ নিরপেক্ষ নয়। স্ত্রী-পুত্রদের পরিত্যাগ করে নিকটাত্মীয়ার সঙ্গে ঘরছাড়া চকাচকী'র জীবনে সামাজিক দোষারোপ আনতেই পারেন কেউ কেউ। সমাজের দোহাই না দিয়েও মানবিকতার প্রশ্নকে বড় করে স্ত্রীপুত্র ত্যাগের ঘটনাকে দুঃখজনক ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব কিছু নয়। ঠিক কি কারণে জুবেজী সংসার ত্যাগ করল তার যথার্থ উত্তর নেই এ গল্পে। সংসারে সে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে সেই যাই ঘটুক না কেন একাত্ম চকাচকীকে দেখে আমাদের মনে হয় এ ঘটনা না ঘটলেই বরং এ গল্প হত এক প্রবঞ্চনার গল্প। ঘরের বউ, ছেলে, এমনকি দুবেজীর নিজের আত্মার কাছে এ ঘটনা হত 'আত্মপ্রবঞ্চনা। যদি 'এঘটনা' তাদের মনে বিন্দুমাত্র

রেখাপাত না করত, যদি 'অন্য' কে 'ঠকিয়ে' মজা করত এ ভালোবাসা, তবে তা হত অন্য প্রশ্ন। কিন্তু তা তো নয়ই, বরং সারাজীবনে সম্মিলিত ভাবে ভিতরে ভিতরে প্রেমের কাছে এ পরাজয়, প্রেম দিয়েই জয় করতে চেয়েছিল তারা।

দুবেজী সম্পর্কে গল্পে সামান্য তথ্য পাওয়া গেলেও দুবেনী চরিত্রটির অতীত প্রায় অজ্ঞাত। 'নিকট আত্মীয়া' এই তার প্রথম ও প্রধান পরিচয়। চিরকাল নিকট আত্মীয়াই হয়ে থাকতে চেয়েছেন সে। অসুস্থ দুবেজীর জন্য তার উতরোল আমরা গল্পের অর্ধেক অংশ জুড়ে প্রত্যক্ষ করেছি। বেহুঁশ দুবেজীর খাট ধরে গোদানের মন্ত্র উচ্চারণ করে সে একসঙ্গে 'পুণ্যি পেতে চেয়েছে। লেখকের কথায় ''আমার না বলে 'আমাদের' বলা তাদের চিরকালের অভ্যাস।''

কেবল অভ্যাস কি? এমন অত্মার অহং-এর উত্তরণ কটা লোক ঘটাতে পারে? একে অপরের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েও কী ভীষণ ভাবে গোটা জগৎকে ভালোবাসতে পারে তারা।

বামুন ঠাকুরুণের মত স্বর্গে যাবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ছেলের হাতের আগুন প্রার্থনা করেছিল শরৎচন্দ্রের অভাগী। সে ইচ্ছা ছিল এতই প্রবল যে তা মরণের নবতর অর্থই তৈরী করে দিয়েছিল। গ্রাম্য বিধবার এক সরল বিশ্বাস 'মৃত্যু'কে জয় করার কি অসাধারণ শক্তিই না জুগিয়েছিল। ঔষধ উনুনে ফেলে নিজের অজান্তেই সে জীবনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। শুধু মৃত্যুর কারণে তার জানা হয়নি সে কেন প্রকৃত অভাগী—একটুকরো আগুন জোটেনি তার কপালে। চকাচকীর দুবেনী তো আর এক অভাগীর গল্প। তবে নিজের নয় দুবেজীর পুণ্যিলাভের ব্যবস্থা পাকা করতে, ছেলে থাকতে ছেলের হাতের আগুন থেকে বঞ্চিত না করতে জীবিত অবস্থাতেই নিজের মৃত্যুকে ঘোষণা করেছে সে। সরলপ্রাণা এই দুই নারী গ্রাম জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের বাইরে যেতে চেয়েছে, দুবেনী গিয়েছে। তবে অস্বাভাবিক বিপ্লব ঘটিয়ে নয় জীবনের টান ও সংস্কারের টানকে পৃথক করতে পারেনি তাদের সরল মন।

গল্প, লিখিয়ের অভিজ্ঞতা নির্ভর—একথা পূর্বেই বলেছি আমরা। জীবনকে দেখা, অনুভব করা আত্মস্থ করা আর তারপর রেখায় রেখায় তার কায়া দান কত সুনিপুণ ভাবে ঘটেছে তা গল্পটির মনোযোগী পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। সমাজ ও যা সামাজিক নয়—যেমন এর দ্বন্দ্ব তেমনই রাজনীতির মোটা দাগ ও হৃদয় সূক্ষ্মতার এক গুরুতর দ্বন্দ্ব লেখক যত্নে উপস্থিত করেছেন গল্পে। কানা মুসাফির লালের পরিবর্ত দৃষ্টি লেখকের এক আশাবাদকেই যেন চিহ্নিত করে।

উত্তমপুরুষে লেখা এ গল্পে প্রথম থেকেই 'টানটান' করে ধরে রাখে দর্শককে। গল্পের শুরুতেই 'বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি' শব্দবন্ধ গল্পশেষে 'পোড়ামুখ আমি দুবেজীর নিকট আত্মীয়'-তে রূপান্তরিত হয়ে কেবল একটি গল্পই শোনায় না, অস্থির তোলপাড় চালাতে থাকে পাঠকের হৃদয়ে—মগজে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৮-১৯৫৬)

সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ১৪টি ভাই বোন। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন সাব ডেপুটি রেজিস্টার, মা নীরদাসুন্দরী দেবী। মানিক ষোল বৎসর বয়সেই মাকে হারান।

মানিক শিক্ষার শুরু করেন প্রথমে মিত্র ইনস্টিটিউশনে, পরে টাঙ্গাইল এবং মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। ১৯২৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৮ সালে বাঁকুড়ার ওয়েলসলিয়ান কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এস. সি পাশ করেন। তারপরে অংকে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করেন। এবং সাহিত্যিক হওয়ার তাড়নায় লেখাপড়া এখানেই ছেদ পড়ে।

ছাত্রাবস্থায় কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে 'অতসীমামী' (১৯২৮) গল্পটি লেখেন, এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'বঙ্গশ্রী', 'ভারতবর্ষ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ইত্যাদিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে সমকালীন কল্লোল যুগের ইতিবাচক দিকটি তিনি গ্রহণ করলেও এক নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরের সাহিত্য জীবনে ৩৫টি উপন্যাস এবং ১৮টি গল্প গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৫) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ইত্যাদি। আর ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) 'সরীসৃপ' (১৯৩৯)। 'মিহি ও মোটাকাহিনী' (১৯৩৮) 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) 'আজকাল-পরশুর গল্প' (১৯৪৬) 'খতিয়ান' (১৯৪৭) 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮) 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' যোগদান করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

হারাণের নাতজামাই : একটি মুল্যায়ন

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম শিল্পসম্মত রূপায়ণ ঘটল 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে। এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি রাজনৈতিক ছোটগল্পের অন্যতম। তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই কৃষক রমণীদের চরম দুঃসাহস ও আত্মত্যাগের কথা জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের চিরির বন্দর কিংবা খাঁপুর অথবা দক্ষিণ বঙ্গের হাড়োয়া-সন্দেশখালি-কাকদ্বীপের সর্বত্র একই কাহিনি। আন্দোলন চলাকালীন পুলিশ ও জোতদার বাহিনীর মিলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ফসলের ক্ষেতে তাদেরও রক্ত ঝরেছে, তাঁরাও গুলি বা লাঠিতে প্রাণ দিয়েছেন, ময়মনসিংহের হাজং রমণী রামমণি থেকে কাকদ্বীপের চন্দনপিঁড়ির অহল্যার ইতিহাস এক। (সুস্নাত দাশ,তেভাগার গল্প, ভূমিকা) কবি এবং গল্পকারেরা অনেকেই এই সংগ্রামী নারী চরিত্রগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের জয়মণিকে নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত কবিতা, 'জয়মণি স্থির হও' অথবা অহল্যাকে নিয়ে রচিত সলিল চৌধুরীর 'শপথ', এর ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে। 'হারাণের নাতজামাই'-ও সংগ্রামী নারীচরিত্রের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার জোরালো স্বীকৃতি।

গল্পটির পটভূমি যে উত্তরবঙ্গ নয় তা চরিত্রগুলির মুখের ভাষাতেই বোঝা যায়। কাকদ্বীপ অঞ্চলের অনেক পরিচিত আন্দোলনের সঙ্গে এর মিল। ভুবন মণ্ডলের মতো অনেক কৃষকনেতাকেই তখন গ্রামে-গঞ্জে পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন কবতে হয়েছিল, অনেকক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েরাই লোকলজ্জাকে তুচ্ছ করে তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। তাই ভুবন মণ্ডলের কাহিনি কল্পিত নয়। তার নাম অনায়াসে কংসারী হালদার, গজেন মালি অথবা হেমন্ত ঘোষাল হতে পারত। আবার ময়নার মা হতে পারত চন্দনপিঁড়ির অহল্যার মতো কেউ। এই কৃষক-সংগ্রামের সঙ্গে কেবল তাত্ত্বিক ভাবেই নয়, আত্মিক ভাবেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কতটা জড়িয়ে পড়েছেন এই জাতীয় গল্পই তার নিদর্শন।

আন্দোলনের কোনো ভূমিকা করে গল্প আরম্ভ হয় নি। মাঝরাতে সালিগঞ্জ গ্রামে পুলিশ এবং জোতদার বাহিনীর একত্র হানার বিবরণ দিয়ে গল্পেব শুরু। এই হানার পটভূমি এবং কারণটি ঠিক পরেই জানা যায়। কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডল সেই শীতের রাতে সালিগঞ্জ গ্রামের হারাণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল। পরপর তিনদিন তেভাগার ধানকাটার পরিশ্রমে গ্রামের পুরুষেরা ঘুমে অচেতন। পালা করে ঘরে ঘরে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আগমন সংবাদ শাঁখে আর উলুধ্বনিতে জানাজানিও হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ প্রথমে গোটা গ্রাম ঘিরে ফেললে ভুবন মণ্ডল হারাণের ঘর থেকে পালাতে পারত। কিন্তু পুলিশ এসে সরাসরি হারাণের বাড়িটিই ঘিরে ফেলে। বোঝাই যায় যে, আগে থাক্তে খবর পেয়েই তারা এসেছে। সালিগঞ্জ গ্রামের মানুষের কাছে এ এক চরম অসম্মানের ব্যাপার। তাদের গ্রাম থেকে কৃষক নেতা ধরা পড়লে অন্যদের মুখ দেখানো যাবে না। বিশ্বাসঘাতকটিকে তারা খুঁজে বার করবেই।

এইভাবে এক নাটকীয় পদ্ধতিতে পাঠককে গল্পের কাহিনীর মূল সংঘাতের সামনে দাঁড়

করিয়ে দেওয়া হয়। ভুবন মণ্ডল শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়বে কি পড়বে না—এটিই তখন পাঠকের উৎকণ্ঠার বিষয়। কিন্তু এর পরেই আবার গল্পটি নাটকীয়ভাবে মোড় নেয়। হারাণের মেয়ে ময়নার মা-র অসাধারণ কৌশলে পুলিশ বিভ্রান্ত হয়। সে ভুবনকে তার মেয়ে ময়নার স্বামী সাজিয়ে মন্মথ দারোগার চোখে ধুলো দেয়। পুলিশ ও জোতদার বাহিনী ভুবন মণ্ডলের নামই শুনেছিল কিন্তু তাকে চোখে দেখে নি। তাই ভুবনকে অনায়াসেই ময়নার স্বামী জগমোহন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। পুলিশ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরে।

বহিরঙ্গে যখন এই রাজনৈতিক সংকট, গল্পের অন্তরঙ্গে তখন দেখা দিয়েছে পারিবারিক সংকট। এখানেই গল্পটি নিছক তত্ত্বের আবরণটিকে সরিয়ে ফেলে মানবজীবন-কাহিনিকে গুরুত্ব দেয়। পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনে ময়নার এই অভিনয়ের প্রশংসা পাবার কথা নয়। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী-র পরপুরুষের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটানোর অন্যরকম ব্যাখ্যাও হতে পারে। গ্রামের সংগ্রামী কৃষকের কাছে ময়নার মায়ের সিদ্ধান্তের যে গুরুত্ব তা ময়নার প্রকৃত স্বামী জগমোহনের বোঝার কথা নয়। তাছাড়া নিজের পরিবারেও তাকে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। তাই খবর পেয়েই জগমোহন দ্রুত শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ে ছুটে আসে। পথে লোকজনের মুখে তার শাশুড়ির প্রশংসা তার ভালো লাগে না। তার সমস্যা অন্যদের বোঝার কথা নয়। প্রথমটায় শাশুড়ির আতিথেয়তাকে উপেক্ষা করে সে আগের দিনের ঘটনার কৈফিয়ৎ চায়, শাশুড়ি-জামাইয়ে বেধে যায় কথার লড়াই। তবে এক্ষেত্রেও ময়নার মা তার আদর্শে অবিচল, কৃতকর্মের জন্য তার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। জগমোহনের তিরস্কারে মেয়েকে কাঁদতে দেখে অনায়াসে সে তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, 'বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কী?' জগমোহনের তীব্র ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করে সে নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি রাখে, 'খালি জন্ম দিলেই বাপ হয়না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে।'

স্বভাবতই এই সব যুক্তিতে জগমোহনের কর্ণপাত করার কথা নয়। এটা তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মর্যাদারও প্রশ্ন। যে ময়নার মা ফসলের-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়, জামাইয়ের কাছে সেও যেন হার মানতে বসে। তার এই অসহায় মানসিক অবস্থাটি চমৎকারভাবে ফুটেছে গল্পে, 'সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই।'। এই ময়নার মা এক কৃষক পরিবারের কর্ত্রী, পরিবারের তো বটেই, পুত্র কন্যার নিরাপত্তাও তার কাছে অনেক বড়ো। সে জানে জগমোহনকে যদি বোঝানো না যায় তাহলে মেয়ের জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তার দায়িত্বও কিছু কম হবে না। তাই এক্ষেত্রে তার সংগ্রামী নারী সত্তার সঙ্গে জননীসত্তার যেন দ্বন্দ্ব বাধে। গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। হয় জগমোহন রাগ করে চলে যেত অথবা শেষ পর্যন্ত তার সুবুদ্ধি ফিরে আসত। কিন্তু তাহলে এটি হত অত্যন্ত সাদামাটা ধরনের রচনা।

গল্পের আসল ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হযেছে একেবারে শেষের দিকে, সৃষ্টি হয়েছে এক অপ্রত্যাশিত চমক। যখন কাহিনি জগমোহন ও তার শাশুড়ির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে তখনই বিপরীত দিক দিয়ে নেমে আসে চরম আঘাত। পাঠক এর জন্য প্রস্তুত থাকে না। কথায় কথায় জগমোহনের বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। আর এইরকম একটা পরিস্থিতিতে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই গ্রামে মন্মথ দারোগার নেতৃত্বে পুলিশের আবির্ভাব। এবার পুলিশ আটঘাট

বেঁধেই নেমেছে, তারা আর ঠকতে রাজি নয়। আসল জামাইকে হাতে পেয়ে মন্মথ ময়নাকে নিয়ে অশ্লীল রসিকতা করতে যায় আর তখনই আর এক জগমোহনের দেখা পাওয়া যায়। এই জগমোহন স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য অনায়াসে বিপদের ঝুঁকি নেয়। পুলিশের হাতে তার প্রচণ্ড মার খেতে হয়। কিন্তু বৃদ্ধ হারাণ এবং জগমোহন সহ সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় মন্মথ দারোগার এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়। গ্রামের চেহারা যে পাল্টে গেছে তা তার জানা ছিল না। হারাণের বাড়ির লোকজনের গ্রেপ্তার ঠেকানোর জন্য চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসতে থাকবে এটি তার ধারণার বাইরে ছিল। আসলে ভুবন মণ্ডলকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই যে পরিবারটির এই বিপদ তা সকলেরই জানা। তাই হারাণের পরিবার এখন রাজনৈতিক পরিবার। তাদের বাঁচানো মানে সংগ্রামকে টিকিয়ে রাখা। মন্মথর পশ্চাদপসরণের কারণটি ব্যাখ্যার মধ্যেও যেন কৃষক সংগ্রামেরই প্রতীকী জয়লাভ। কারণ, সত্যিই তো 'মানুষের সমুদ্রের ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।'

রাজনৈতিক ছোটগল্প হিসেবে 'হারাণের নাতজামাই'কে অনেক উঁচু আসন দেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। এর পটভূমিকায় রয়েছে একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ গণ-আন্দোলন। কেবল আন্দোলনের ছবি আঁকলে গল্প হয় না। এখানে প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন রয়েছে আড়ালে। তেভাগার সংগ্রাম কীভাবে গ্রামজীবনকে আলোড়িত করেছে, কীভাবে ভাগচাষীরা অত্যাচারিত হয়েছে, কীভাবে তারা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে এর বিস্তৃত বর্ণনা গল্পে নেই, তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। সালিগঞ্জ গ্রামের এক দরিদ্র সংগ্রামী কৃষক পরিবারে সংগ্রামী নেতা ভুবন মণ্ডলের আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে গল্পে রাজনীতির প্রবেশ। ভুবনকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ময়নার মায়ের পরিকল্পনার মধ্যেও রয়েছে রাজনীতির ছোঁয়াচ। কিন্তু ময়নার স্বামী জগমোহনের আবির্ভাবের পর যে পারিবারিক সংকট দেখা যায় তা রাজনৈতিক সত্য নয়, তা মানবসত্য। এই মানব-অংশটুকু গল্পে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আবার যে মুহূর্তে জগমোহন ময়নার সম্মান বাঁচানোর জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখনই আবার গল্পে রাজনীতির প্রবেশ। গল্পের পরিণতিতে নির্দিষ্ট রাজনীতির দেশকালব্যাপী বৃহত্তর রাজনীতিতে উত্তরণ ঘটে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধই গণআন্দোলনের যে প্রকৃত সাফল্য—সমাপ্তিতে তা উদ্ভাসিত হয়। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে কাহিনির এই যাত্রা-ই 'হারাণের নাতজামাই'কে শিল্প সার্থক ছোটগল্প করে তোলে।

তবে গল্পটির পরিণতিতে ভিন্নতর ব্যাখ্যারও সন্ধান পাওয়া যাবে। ময়নার মায়ের বাড়ির লোকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় আচমকা হাজার হাজার মানুষের পুলিশবাহিনীকে ঘেরাও করার ঘটনাকে লেখকের কল্পনাবিলাস বলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন। কিন্তু ঘটে যা তা যে সবসময় সত্য নয় একথা তো রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে গেছেন। বাস্তব সত্যের ওপরেও আর একরকম সত্য আছে। তার নাম সাহিত্যের সত্য। অর্থাৎ সম্ভাব্য সত্য। সেদিন সেই মুহূর্তে সালিগঞ্জ গ্রামে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ বাস্তব সত্য, না হলেও এটাই সাহিত্যের সত্য। সংগ্রামী মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকের এটাই ছিল প্রত্যাশা। তিনি অন্তত মানসনেত্রে এই গণপ্রতিরোধের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাই গল্পটিতে 'রাজনৈতিক সত্যে'র সঙ্গে 'সাহিত্যের সত্যে'-র প্রকৃত মিশ্রণ ঘটেছে।

ভালবাসা : নবধারার সূচনা

জীবেশ নায়ক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভালবাসা' গল্পটি 'ছোট বড়' নামের গল্প-সঙ্কলনেব অন্তর্ভুক্ত। সঙ্কলনটি উনিশ শো আটচল্লিশ সালে প্রকাশিত হলেও গল্পটি উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের পটভূমিকায় রচিত। সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বনে এমন অনেক গল্প তখন মানিকের কলম থেকে বেরিয়ে আসছে। এই সঙ্কলনে মোট চৌদ্দটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হলেও কয়েকটি পূর্বেই অন্য গ্রন্থেব অবয়বে স্থান করে নিয়েছিল। এখানে তাদের পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে। এগুলিব মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিখ্যাত গল্প হারাণের নাতজামাই-যেটি প্রাগৈতিহাসিক সঙ্কলনেই প্রকাশ পেয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছোটোগল্প রূপে সবদিকের বিচারেই সার্থক হয়েছিল। এই সঙ্কলনের সব গল্পই চাষী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের নানা তুচ্ছ বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। পটভূমিতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারাকে বিপথ চালিত করার জন্য সুকৌশলে মোড় ফিরিয়ে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধানোর ঘটনা। উভয় সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতির সাহায্যে সম্প্রীতির আবহকে কলুষিত আধিপত্যের স্থায়িত্বকে প্রলম্বিত কবা। দাঙ্গার সঙ্গে যোগ দিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে গ্রাম গঞ্জ ও শহরেব সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। গল্প-গুলিতে এইসব মানব বিরোধী উপসর্গের নেপথ্যচারী শক্তিব প্ররোচনার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বয়েছে। গল্পকাবের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমাজ বাস্তবতার নিষ্করুণ ও নির্মম সত্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে প্রতিটি গল্প। ভালবাসা গল্পটি তাবই সার্থক রূপায়ণ।

মাত্র তিন পৃষ্ঠার গল্প পরিসবে লেখক একটি বৃহত্তব ও জটিল জাতীয় সমস্যার উপস্থাপন করে পাঠক সমাজের সামনে ভাবনার বিশাল পরিসর মুক্ত কবে দিয়েছেন। আকার-প্রকার সব দিকের বিচারেই এটি একটি ছোট গল্প। বিষয়বস্তু বা কাহিনীর কাঠামোটি গড়ে তুলতে খুব বেশি যত্ন ব্যয় করতে হয় নি। সামান্য কয়েকটি বাক্য নির্ভর করে একটি নাবী মনের সযত্নলালিত ভালবাসতে পাবাব অহমিকাকে একটি ফুৎকারে নির্বাপিত করে জীবন সমস্যার কেন্দ্রে এনে মুক্ত করে দেওয়াতেই গল্প সম্পূর্ণ। কাহিনীব পরম্পরা ও চবিত্রায়ণের সুদক্ষ গ্রন্থনেব কোন প্রস্তুতি নেই গল্পেব মধ্যে। সরাসরি কিছুই না বলে, শুধু আভাসে ও ইঙ্গিতে ব্যক্তি হৃদয়ের দিশাহারা ভালবাসাকে সমবেত জনতার বিশ্বভাবনায় উত্তীর্ণ করে দেওয়াই গল্পটির উপজীব্য। এই বকম সামান্য আয়োজনে পাঠক মনকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া একটি গীতি কবিতাব সাধর্ম্য পেয়ে গেছে। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে আদ্যন্ত গ্রথিত কোন কাহিনী গড়ে উঠার অবসবই হয়নি এখানে। গল্পটিকে তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মালতীর ক্ষুদ্র মনে স্বামী বিপিনের প্রতি ভালবাসা ও তার পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছেদ। সবশেষে স্বামীর মৃত্যু সংবাদে ক্ষুদ্র গণ্ডি স্বচ্ছন্দে ভেঙে পড়ে, সাধারণ প্রাণেব দাবিতে সামিল হওয়ার স্বস্তি তথা বৃহত্তর মনের সাযুজ্যে মুক্তিব শ্বাস ফেলা।

মালতী তার স্বামী বিপিনকে ভালবাসে। এই ভালবাসায় তার প্রাণ মন পরিপূর্ণ। ভালবাসার

ঐশ্বর্যে সে নিজেকে অতুলনীয়া ঐশ্বর্যময়ী বলে মনে করে। বাপ মায়ের দেখে শুনে বিয়ে দেওয়ার পব ভালবাসার উন্মেষ সচরাচর মান্য হয় না। সেখানে কোন ঝুঁকি, ত্যাগ ও তিতিক্ষার অনিশ্চয় যন্ত্রণা থাকে না। তবু ভালবাসার পাত্রকে ক্ষণে ক্ষণে হারানোর উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তার মন সদাচঞ্চল। সে গরবিনী প্রেমিকার যে অনুভবে স্থিত, তার সঙ্গে কাব্যধারায় চির প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্বেব তুলনা দেওযা যেতে পারত। শাশ্বত প্রেমের রহস্যলোকে প্রেমিকাকে বৈষ্ণব কবিদেব মত উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তির আতিশয্যে অনন্য সাধারণ কাব্য মণ্ডিত করে প্রকাশ করা যেতে পারত। ক্ষণে পেয়ে ক্ষণে হারানোব চিত্তচাঞ্চল্যকে গভীর বেদনালোকে রহস্য মণ্ডিত ভাষায় চিত্রায়িত করা যেতে পারত। কিন্তু লেখক তার কোনটাকেই আশ্রয় কবেন নি। সোজা কথায় বলেছেন—'পরের জন্য মন কেমন করার নামই ভালবাসা। বিপিনেব জন্য কী তেমননটাই করে তার মন।' এই 'পরের জন্য' শব্দটার ব্যাপ্তি যে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তাকে আবদ্ধ করেছে, তাতে তার বাপের সম্বন্ধ করে দেওয়া একান্ত আপন মানুষটার প্রতি অনুরাগই জগতের সীমা নির্দেশ করেছে। তার প্রাণ মন উজাড় করে দেওয়া ভালবাসার অনুভূতি তাকে এমন জালে জড়িয়ে ফেলেছে যে নিজের বাঁধনে সে বাঁধা পড়েছে। এই আত্মরতি তাকে বৃহত্তর জীবন স্রোতের কিনারা থেকে সরিয়ে এনে আত্মহারা বনসীমায় নিক্ষেপ করেছে। যেখানে মালতী এবং তার নিজের ভাললাগার জগৎ ছাড়া আর কিছু নেই। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তার সত্তা এখন তাই নিঃসঙ্গতার অন্ধকূপে দিশাহাবা। লেখক তাঁব সীমিত বাগ্‌বিন্যাসে একেই বর্ণনা করেছেন। 'তারই ভালবাসাব অসাধারণত্বে তার হৃদয় মন যেন অস্পৃশ্য হযে গেছে; জগতের জমজমাট জীবনের বিপুল আলোড়নের ছোঁয়াচ পায় না।' তখন তার অবস্থা মেঘদূতের বিরহী, যক্ষের অনুরূপ 'কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণী জনে কিং পুর্ণদূব সংস্থে।' বাধা কৃষ্ণ লীলার সেই ভাব যেখানে 'দুঁহুঁ কোরে দুঁহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া / আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।' রবীন্দ্রনাথে সেই ভালবাসার আর্তি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম মার্গেব সঙ্গে পার্থক্যও ভুলিয়ে দেয়-ও মোর ভালবাসার ধন।

আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমাব ঢেউ লাগে তখন।

তখন নিজের মনোগহনে এমন আবেশ নেমে আসে যাতে আরো অনেক মনের অনুরূপ আশঙ্কাব বেদনা সাড়া তোলে না। মানবিক সহানুভবের সম্ভাবনা উপেক্ষিত হতে থাকে। অস্পৃশ্যের মত সবার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলে সতর্কতার সঙ্গে।

মালতীর মনের অতলে পূর্ব অভিজ্ঞতায় দাঙ্গাবাজদের পৈশাচিক আস্ফালন ও উল্লাস, মরণাহতের তীব্র আর্তনাদ জীবন্ত হয়ে থাকে। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠলে মনকে ক্লিষ্ট ও আতঙ্কিত করে। কিন্তু পাড়ার অন্য একটি বৌএর মনোভাবে শুধু নিঃসঙ্গ দুপুরটাই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কন্টকিত হয়। কিন্তু মালতীব আত্মমগ্নতাব মাত্রা ঢের বেশি হওয়ায়, তার অন্তর্নিবিষ্টতা তাকে কখনো শান্তি পেতে দেয় না। কেননা দাঙ্গায় প্রাণহানির আশঙ্কা তো একদিনে শেষ হয না। কর্তব্যের তাড়না এবং মানব কল্যাণের আবেগও তার দাবি নিয়ে বসে থাকে। কাজেই মালতী যে ধারণা আঁকড়ে থাকে অভিজ্ঞতা থেকেই তার পুষ্টি। নিত্য খবব পায কোথাও না কোথাও কোন আবাগীর কপাল পুড়ছে। অর্থাৎ গৃহিণী-বধূর স্বামী

দাঙ্গার ছুরিতে প্রাণ দিয়েছে। তাই গৃহবাসিনীদের ভয় ভাবনা সঙ্গী করে কাল কাটাতে হয়। লেখক সেই বিপুল ভাবনা ও বেদনা ভারকে কত অল্প কথায় রূপ দেন : 'কাগজে পড়ি এতগুলো মরেছে; এতগুলো হাসপাতালে গেছে—ওদের মা বৌয়ের কথা ভাবলে বুক ফেটে যায় ভাই, ঘোমটা দিক আর বোরখা পরুক, যে আবাগীর সর্বনাশ হয়.......' লেখক অসাধারণ বাক্ স্বল্পতায় অনেক কিছু না বলেও পাঠকের মনে গল্পের অকথিত অংশগুলিকে মূর্ত করে তুলেছেন। 'ঘোমটা দিক আর বোরখা পরুক' বাক্যাংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত দুই পক্ষকে সামনে নিয়ে এসেছে। দাঙ্গার প্রাণহানি যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার ঘরে সবনাশ ডেকে আনছে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু মালতীর কাছে তখনো তা দূরবর্তী ঘটনার সংবাদের অতিরিক্ত কিছু নয়। অথচ সে জানে যে বিপিনের অভ্যাসে দাঙ্গা থামানোর কাজে মাথা গলানো, শান্তিসেনায় যোগ দিয়ে বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই। সে মনে মনে স্থির করে যে বিপিনকে যেমন করে হোক সে রুখবে। বাড়ি ফিরলে কাল থেকে, চাকরি যায় যাবে, আর কাজে বেরুতেই দেবে না। বিশ্ব সংসারের নিয়মে যার উপর যার মনের টান তার সম্পর্কে অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এর পরেই একমাত্র নাটকীয় পরিস্থিতি। কিন্তু বর্ণনারীতি এমন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে যে নাটকের তিলমাত্র আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেয়নি। বর্ণনায় একটি ঘরোয়া মেয়ের মানসিক টানা পোড়েন তার নিজের জবানিতে প্রকাশিত। সেজন্য তার চিরাচরিত ভূমিকায় যেমন নাটকের অবকাশ কম, গল্পেও লেখক তার প্রতি সম্মান দিয়েছেন। মনে মনে তার শপথ পুঞ্জিত হওয়ার পরই বিপিনের বন্ধু সতীনাথের একক প্রত্যাবর্তন জানালা দিয়ে মালতীর চোখে পড়ে। ফেরার সময় পার হয়ে গেলেও বিপিনের না ফেরার কার্যকারণ মালতীর সামনে স্পষ্ট হয়। কোন রকম চাঞ্চল্য তার মধ্যে দেখা দেয় না। বিপিনের চিন্তায় সর্বক্ষণের জন্য মশগুল হয়ে থাকা তার মনে আকস্মিকতার বিস্ময়ের তার কেটে যায়। সতীনাথ এসে মাথা তুলতে না পেরে চুপ করে থাকলে মালতী কি ঘটেছে জানতে চায়। বিপিনের না থাকার খবর শুনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। সে নিজেই যে অকারণ মিথ্যায় পরিণত হয়েছে, তা অনুভব করতে পারে। লেখক তার কারণ খুঁজে পান—সে ঘর করত স্বামী আর এই আতঙ্ক নিয়ে, এই ছিল বিয়ের পর একবছর তার জীবনের অবলম্বন, তার বেঁচে থাকার মানে। এখন বিপিনও নেই, তার আতঙ্কও নেই।

বাইরের চলমান জীবন ও তার বিপদাশঙ্কা তার কাছে আর কোন অপরিচয়ের রহস্য খাড়া করে রাখে না। সে ভবিতব্যকে মেনে নেয়। সতীনাথের সঙ্গে তার সমস্ত উদ্বেগের পরিসমাপ্তিতে তার কাছ থেকে স্বামীকে কেমন ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তা দেখা যে তার কর্তব্য। যে জগৎ সংসার তার মনে অপরিচয়ের দূরত্বে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, স্বামীর অবর্তমানে সেই পাঁচিলটা যেন নিমেষে চূর্ণ হয়ে গেল। সে পথে নেমে এত মানুষকে চলতে দেখে বরং অভিভূত হয়। তার মনের শূন্যতা যেন তার ফলে পূর্ণ হয়ে যায়, নিমেষে। তার মনে হয়, এত মানুষ যে পথে বেরিয়েছে, তাদের আত্মীয় পরিজনের কথা; তার কিছু ঘটলে যে স্বামীহারা হবে সেই আবাগীর কথা এদের ভাবায় না কেন? পথে এত মানুষের অস্তিত্বে, আতঙ্ককে অগ্রাহ্য করে যারা নিজের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছে, তাদের সান্নিধ্য তাকে যেন

নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয়। তার চোখে পড়ে মানুষের মিছিল, কে যেন তাকে বলে দেয় যে মিছিল শান্তি প্রচারে বেরিয়েছে। সেই মিছিলে যোগ দেওয়া ছেলে মেয়েদের আওয়াজে কান পাতে, তাদের আবেদনের কথাগুলি তার মনে বহুগুন হয়ে বাজতে থাকে। সে অনুভব করতে পারে, তার মন থেকে অনাস্থার পর্দাটা যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। বহু মানুষের সর্বনাশের অবসান ঘটাতে তাদের প্রয়াসে তাকেও সামিল হওয়ার ডাক দিচ্ছে তারা। রবীন্দ্র কবিতার ভাষায় যা বাণী পেয়েছে—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

মালতী অবশেষে তার ব্যক্তি মনের গহনে দীর্ঘ লালিত একাকিত্ব মোচন করে সবার সাহচর্যে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পায়। মালতীব আচরণে অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া নয়, তার মন বিকাশের অনিবার্য খাঁজগুলি পার হয়ে, তবেই এই স্বাভাবিক পরিণতিতে উত্তীর্ণ হয।

গল্পটিতে ঘটনার প্রাধান্য নেই। ঘটনা সব সময়ই নেপথ্যে থেকেছে। মালতীর আত্ম-কথনেই গল্পের অবয়ব সম্পূর্ণতা পেয়েছে। মালতী বা অন্য কোন চবিত্র গড়ে তোলার ব্যগ্রতা লেখক বোধ করেননি; সামান্য তুলির টানে সতীনাথ, বিপিন ও জনতার ছবি আভাসিত করেছেন মাত্র। মালতী নামের অনভিজ্ঞা বধূটির চরিত্রধর্মের আংশিক প্রতি চিত্রণেই গল্পটি ভরে আছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে আলোচ্য গল্পটির আগে পরে যে গল্পগুলি লেখা হয়েছে সেগুলিতে লেখক এই রকম প্রসঙ্গ ও তা নিয়ে গল্পগুলি ফুটিয়ে তোলার সাফল্য অর্জন করেছেন। জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন 'ঘটনার বর্ণনায়, চরিত্র রূপায়ণে, মনো বিশ্লেষণে, চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারে মানিকের 'কুশলতা প্রশংসনীয়। ....নতুন চেতনায নবযুগের সাহিত্য বচনা করে তিনি পাঠকদের চমৎকৃত করে তুলেছেন।'

মানিকের এই পর্যায়ের গল্পগুলি সম্পর্কে 'নতুন চেতনায় নবযুগের সাহিত্য' ধারণাটিব তাৎপর্য বিরাট। বিশ্বযুদ্ধ কেন্দ্রিক শিক্ষিত মনোভাবে ফ্রয়েড ও মনোবিকলনের তত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানিকের সাহিত্যও তাতে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু সে সময় সাম্যবাদের আদর্শ—মার্কসবাদও লেখকদের কাছে বরণীয় হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেই আদর্শে সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণ, 'ভালবাসা' গল্পটি তারই ভাল দৃষ্টান্ত। মানব জীবনের এগিযে চলা, মন থেকে বাধা বিঘ্ন, পিছিয়ে পড়া চিন্তাকে সরিয়ে দিতে পারা, মানবতার বিস্তারে অপরিহার্য। ধনতন্ত্রের যে সব উপসর্গ মনোবিকারের জন্ম দেয়, মানুষকে আত্মতন্ত্রের জালে জড়িয়ে ফেলে তার সমাজবোধকে অবজ্ঞা করে, নতুন যুগের চেতনা তাকেই অমান্য করবে। মানিক বুঝেছিলেন মন ও দেহের বিকার যে জীবন চিত্র আঁকে, তাকে বহুমান্যতা দিয়ে সাহিত্য যুগকেই অস্বীকার করে। ভালবাসা গল্পে মালতীকে সেই একত্বের আত্মরতিতে বিচ্ছেদ কর্ডুয়নের পাত্রী হতে হয় নি। বরং ভালবাসার পাত্র স্বামীর প্রাণবলি স্বীকার করে বাঁচার তাৎপর্যকে নতুন দিশা দিয়েছে। লেখক দাঙ্গা বিধ্বস্ত দেশে দাঙ্গা

প্রশমনে নিযুক্ত মানুষদের প্রতি সহমর্মিতায় তার ব্যক্তিক নিঃস্বতাকে পূর্ণ করে তুলেছেন। ক্ষুদ্র আমির গন্ডি ছাড়িয়ে সর্বহারা নারীকে বৃহত্তর অর্জনের দিকে উন্মুখ করে তুলেছেন। হতাশার অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আশা ও বিশ্বাসের পথ বেঁধে দিয়েছেন। মালতী কখন যে নিজের অজান্তে একাকিত্বের অন্ধকার থেকে সমবেত জনতার আলোকিত যাত্রা পথের সাথী হয়ে গেছে তা কি সে নিজেই জানে!

ভালবাসা গল্পটি সাতশ'র কিছু বেশি শব্দেই সীমাবদ্ধ। গল্পটি পাঠ করে একমাত্র চরিত্র মালতীর সম্পর্কে পাঠকের মন তীব্র আগ্রহ বোধ করে। তার মনে প্রত্যাশা জেগে ওঠে, তার ভালবাসার বিচিত্র অভিব্যক্তির বিন্দুগুলি আবিষ্কার করার। কিন্তু লেখক নির্মমভাবে তাঁর লক্ষ্য স্থির করে বাহুল্য বর্জন করে চলেন অতি সতর্কতায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেতচ্ছায়া মালতীর একনিষ্ঠ ভালবাসার আবেগকে আতঙ্কে আচ্ছাদিত করেই থাকে। এটাই তার ভালবাসার একান্ত ভিত্তি। নিজের অবস্থায়, অন্য নারীদের জীবনে স্বামী হাবানোর ঘটনাকে স্থাপন করার ভাবনা, তাকে একটা প্রস্তুতি দেয়। যার পরিণামে নিজের জীবনে সংঘটিত দুর্ঘটনাও তার কাছে স্বচ্ছন্দেই গ্রাহ্য হয়। অচঞ্চল চিত্তে তার ভবিতব্যকে গ্রহণ করতে পারে। কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। বরং মানবিক বোধের সমগ্রতায় সে স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে গিয়েও, যেন লজ্জিত হয় আত্মপ্রকাশ করতে। মালতীর এই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরে কোন আকস্মিকতাব সুযোগ তার মনের গতি তৎপরতার কাছে অনাবশ্যক হয়ে যায়। ছোট গল্পের প্রকৃতি বিচারে চরিত্র প্রধান্যের বৈশিষ্ট্য একান্ত ভাবেই ভালবাসা গল্পের প্রকৃতি নির্ধারণ কবে দেয়। গল্পটি ভাব ও রূপে 'আধুনিক' অভিধায় স্বীকৃতির তকমা পেয়ে যায়।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী : উদ্দেশ্য ও সার্থকতার যুগলবন্দী

সমরেশ মজুমদার

সমাজ-সচেতন শিল্পী তাঁর পরিপার্শ্বের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে সচেষ্ট হবেন, এটি খুব সাধারণ ঘটনা, কিন্তু যখন নিজের দেখা প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি সঙ্কট, প্রতিটি ঘটমান চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে বিজড়িত করেন তখন তার মাত্রা বেড়ে যাওয়ারই কথা। এই যে নিজেকে বিজড়ন কববার অভীপ্সা কল্লোলোত্তর দুজন কথাসাহিত্যেকের মধ্যে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এর একজন হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর তাঁব নিজস্ব ভূগোলের মধ্যকার প্রতিটি অনুপুঙ্খের সঙ্গে সম্পূর্ণত একীভূত। সেই ভূগোল তথা রাঢ়ের জীবন বিন্যাসের মধ্যে যা কিছু ঘটুক, তিনি তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না. অপরদিকে সমাজ-সচেতন রাজনীতি-সচেতন মনুষ্যের সহযোদ্ধা মানিক সংগ্রামী মানুষের শরিক হয়ে যান অনায়াসেই, তা পুববাঙলাব নদীবেষ্টিত জালিক জীবনই হোক, নিপীড়িত কৃষক বা শ্রমজীবী যে-ই হোক্। ছাত্ররাজনীতি, তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে স্বাভাবিক জীবনে মানুষকে উত্তরণ করিয়ে দেবার জন্যে বারংবার নানান সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছেন—নিষ্ঠাবান পার্টি কমরেড নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন বড়া-কমলাপুবের ব্যাপক অত্যাচার থেকে যে-কোনো মনুষ্যত্ব-নিপীড়নের ক্ষেত্র। ধর্মঘটী শ্রমিকদের আন্দোলন, কৃষক শ্রেণীর সমবেত শক্তির প্রতিরোধের দৃঢ়তা—উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-সহমর্মিতায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন মনুষ্যত্বের পূজারী হিসেবে, সেই ঘটনাসমূহকে অক্ষরে অক্ষয় করে তোলবার জন্যে কলম ধরেছেন। সংগ্রাম শিল্পিতরূপে চিত্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। লেখক হিসেবে দায়বদ্ধতার কথা এক লহমার জন্যে বিস্মৃত হন নি, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য অসুস্থতাকে তুচ্ছ মেনে একটি একটি করে অবনদ্য গল্পমালায় ভরিয়ে তুলেছেন একের পর এক গল্পগ্রন্থ, তারই একটি 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। স্বাধীনতার পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে যে-সমস্ত আন্দোলন ঘটেছে, একজন বিবেকবান লেখক হিসেবে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেই ক্ষান্ত হন নি, ব্যক্তি-মানুষ ও শিল্পী মানুষ মিলেমিশে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছেন। 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একদিকে 'হারানের নাতজামাই'; অন্যপ্রান্তে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' দুটি উৎকৃষ্ট ফসল রূপে দেখা দিয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রশক্তি এদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিকক্ষেত্রে যে দুর্বিষহ শোষণ ও নিপীড়ন তীব্রতর করে তুলেছিল তাতে আসন্ন স্বাধীনতা যে দেশকে অন্তঃসারশূন্যতার দিকে নিয়ে যাবে তারই আভাস প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত হচ্ছিল। মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নির্ঘোষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শোষিত মানুষকে দেয়ালে পিঠ ঠেকাতে বাধ্য করেছিল। এই অবস্থায় প্রতি-আক্রমণের রিফ্লেক্সে অ্যাকশন আসতে বাধ্য—তাই গড়ে উঠেছিল অসন্তোষ নানান বিদ্রোহের আকারে, এদেশের মানুষ মুখ্যত সহনশীল, ন্যায্য পাওনার জন্যে খড়্গহস্ত

হতে শেখেনি—কিন্তু প্রাকৃতিক কারণেই নানান অত্যাচারের ঘটনা মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে শিখিয়েছিল—তেভাগা আন্দোলন তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ভাগচাষীর সমস্যা দিনকে দিন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এখান থেকেই আত্মসচেতনতার সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল। ১৯৩৪-এ নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টি গুপ্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, প্রাদেশিক কৃষকসভা ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে তেভাগার সংগ্রামের প্রস্তুতি রচনা করে। তাতেই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল ভাগচাষীদের দুর্দশার নানান সমস্যার বিষয়ে নির্যাতিতদের মধ্যে তুলে ধরার আবশ্যিকতার দিকটি। যে-সমস্ত জায়গায় কম্যুনিস্ট পার্টির ভাল সংগঠন ছিল, যেমন রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর—সেখান থেকে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পরে ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, পাবনা, বগুড়া, যশোর প্রভৃতি এলাকায়। একটু একটু করে সংগঠন ও তহবিল দৃঢ়তর করবার প্রযত্ন চলে। নরহরি কবিরাজের মতে, 'কৃষক আন্দোলন ভারতে মোটেই নতুন বিষয় নয়। উপনিবেশিক শাসনের আমলে সারা দেশ জুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বড় কৃষক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৭৩ খ্রি রংপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব নীতির প্রতিবাদে এক বড় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে বড় বড় সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। এগুলির মধ্যে বাংলায় পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮২৫-২৬), তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩০), ফরাজী আন্দোলন প্রভৃতির নাম করা চলে। ১৮৩০ খ্রী মহীশূরে রীতিমত এক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দেয়, পার্বত্য জাতীয় লোকদের মধ্যে বিক্ষোভ কোল বিদ্রোহ (১৮৩০) সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) মধ্যেদিয়ে ফেটে পড়ে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে কৃষকেরা ব্যাপকভাবে যোগ দেয়, যদিও এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিক্ষুব্ধ অভিজাত নেতারা। মহাবিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনের রূপ নগ্ন আকারে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে কৃষকদের আন্দোলনও তীব্রতর আকার ধারণ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংগ্রামের পদ্ধতিতেও কিছু নতুনত্ব দেখা দেয়। এই যুগের প্রধান কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে বাংলায় নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), পাবনা প্রজাবিদ্রোহ (১৮৭৩), দাক্ষিণাত্যের মহাজন বিরোধী বিদ্রোহ (১৮৭৫), দক্ষিণ ভারতে বিশাখাপত্তনম অঞ্চলে রাম্পা বিদ্রোহ (১৮৭৯), মালাবারে দীর্ঘস্থায়ী মোপ্‌লা বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (তেভাগা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা. ১৪০৪ পৃ. ৯২)। প্রসঙ্গত তিনি জানান, 'আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল ভাগচাষীরা ফসলের আধাভাগেব বদলে তিনভাগের দুইভাগ নেবে—বেআইনি কোনও আদায় জোতদার মহাজনকে দেওয়া হবে না। প্রচলিত প্রথা ছিল—জোতদারের খেলানে সমস্ত উৎপন্ন ধান জমা করতে হবে। এখন আওয়াজ উঠল—জোতদারের খোলানে ধান-তোলা হবে না, ধান তুলতে হবে নতুন খেলানে অর্থাৎ ভাগচাষীদের দশজনের খামারে। আওয়াজ উঠল—"জান দিব তবু ধান দিব না"। নির্দেশ দেওয়া হল—জোতদারের সাহায্যে যখন পুলিশ আসবে, ৪৪ ধারা জারি হবে, তখন ৪৫ জারি করতে হবে জোতদারের বিরুদ্ধে সমিতির হুকুমে। অর্থাৎ, জোতদারের দালাল ও লাঠিয়ালদের গ্রেপ্তার করতে হবে। জোতদারদের শক্তিকে অচল করে দিতে হবে। যেমন কথা তেমনই কাজ। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম

দিকে সমিতির সংগঠিত এলাকাগুলিতে ধান উঠে গেল নিজ খামারে বা দশের খামারে'। সুধী প্রধানের বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যায়, 'তেভাগা আন্দোলন ও সংগ্রামের ২টী পর্যায় আছে। এটা বলে না রাখলে আজকের দিনে এর তাৎপর্য গ্রহণ করতে আমরা বিপথে চালিত হতে পারি। প্রথম পর্ব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগে তেভাগা আন্দোলন-সংগ্রাম, দ্বিতীয় পর্বে ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরের তেভাগা সংগ্রাম। প্রথম পর্বের পিছনে ছিল—বাংলাতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা প্রতিষ্ঠার পর সেই প্রথার বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণীর কিছু চিন্তাশীলদের সমালোচনার ফলশ্রুতিতে কৃষক আন্দোলনেব সংগঠিত রূপে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং তার সঙ্গে জমির স্বত্বহীন কৃষকদের আংশিক দাবি ভাগচাষীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন'।

তেভাগা আন্দোলন প্রগতিশীল মানুষকে সচকিত করে তুলেছিল। সংগ্রামের প্রতি গভীর আত্যন্তিকতার ফলে এবং কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একাত্মতাবোধের জন্যে 'হারাণের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীনিঃসৃত হয়ে বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। এদেশ বস্তুতই কৃষিতান্ত্রিক, তেভাগার মূলকেন্দ্রভূমির পীঠস্থান বাংলা, এছাড়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যভাগ থেকে অন্তিমলগ্নে কলকারখানার ব্যাপক অভ্যুত্থানের ফলে এক বৃহৎশ্রেণী শ্রমজীবীর ভূমিকা পালন করে এসেছে। ইংরেজ-রাজত্বে শেষপর্বে কলকারখানার শ্রমিকদের অসন্তোষেব ফলে আর এক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। সংগ্রামের দুটি পর্বের প্রতিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব নিত্যদৃষ্টি ছিল। মহাযুদ্ধেব ধাক্কায় অর্থনীতির ছিন্নভিন্ন রূপের প্রভাবে যেমন গল্প-উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন, তেমনি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইংরেজদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বঞ্চনা ও শোষণের যে ধারা অক্ষত থেকে গেল তাও। রাষ্ট্রিক শাসন হস্তান্তর হলেও জোতদার জমিদার ও কারখানা শ্রেণীর একগোষ্ঠী এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপদ প্রকট হয়ে উঠলে দুর্বিষহ কৃষক-শ্রমিকদেব জীবন দারিদ্রে হতাশায় তলানিতে এসে পৌঁছায়। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে এই মধ্যসত্ত্বভোগী এবং দালাল-পুলিশের যুগলমিলনের বিষয়কে লেখক কেন্দ্রভূমিতে রেখেছেন। 'হারাণের নাতজামাই' যেখান থেকে শুরু করেছিলেন মানিক তার অপর পিঠের কাহিনী 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'-তে চিত্রিত হয়েছে। তফাৎ এই কৃষককুলের দিক থেকে তিনি চলে এসেছেন শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দিকে, তবু বলা যায় পরের গল্পটি আরো একধাপ এগিয়ে এখানে কৃষক-শ্রমিক উভয়শ্রেণীর সংগ্রাম একই হাতে পরিবেশিত হয়েছে। লেখক দেখেছেন স্বাধীনতা উত্তরকালে সংগ্রামের পক্ষের পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু শোষকের শ্রেণী চরিত্রের বদল তো হয়-ই-নি, বরঞ্চ শোষণ কৌশলগতভাবে বর্ধিত হয়েছে। এখন ভরসার জায়গাটা পর্যন্ত বিলুপ্ত, একসময় মনে হয়েছিল এদেশ থেকে ইংরেজ-শাসককুল উধাও হলে সকল সমস্যার সমাধান না হলেও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া যাবে। এই স্বপ্নসাধ অচিরাৎ ভেঙে যায়। সেকারণে কৃষিজীবীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমজীবীদের প্রতিরোধের তরবারি খাড়া করে রাখতে হয়েছে। তাই সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল ও শরিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে

উভয় গল্প লিখতে হয়েছে। যা একান্ত বাস্তব এবং যথাযথ-সমসময়ের কৃষক-শ্রমিকের প্রকৃত চেহারা গল্পে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে একারণেই।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পের বিষয়বস্তু অকিঞ্চিৎকর, কাহিনীর এই অকিঞ্চিৎকরতা সত্ত্বেও মৌল উদ্দেশ্যে টানটান উত্তেজনায় গল্পটি স্থির এবং একান্ত লক্ষ্যাভিমুখী। আধঘণ্টা লেট করা গাড়ি গ্রামীণ-এলাকার স্টেশনে এসে পৌঁছয়, যেখানে মিনিট দেড়েক ট্রেন থামে, সে সময়ে ঝিমানো স্টেশনে জেগে ওঠে কলরবমুখরতায়, আজকের অবস্থা অবশ্য ভিন্নতর, দ্রুত যাত্রীরা স্টেশন ফাঁকা করে দেয়; স্টেশনে লাগাও তে-রাস্তার মোড়, দু তিনটে দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলি বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এসময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরা থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে. প্রচণ্ড বটগাছের তলায় দুজন চাষী কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে। স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ, তার সঙ্গে তার স্ত্রী আন্না ছোট শিশুটিকে কোলে নিয়ে বকুলপুরমুখী, দিবাকর দাসের কোলে পুঁটলির সঙ্গে দড়ি বাঁধা হাঁড়ি। বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে কজন বাবুমতো লোক বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল। নাম ধামও জিজ্ঞেস করছিল, দিবাকরের দিকে নজর পড়তেই মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ ঝাঁঝিয়ে বলে, 'চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও'। সিপাই ভরতি অঞ্চল, যেহেতু কাছের কারখানায় ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সিপাই ও ধর্মঘটীদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেছে, ফলত পুলিশের গুলি চলে এবং জায়গাটি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। এহেন গুরুতর পরিবেশে দিবাকরের আবির্ভাব। স্টেশন থেকে ছোটবকুলপুরে যেতে হলে ঘোড়া বা গোরুর গাড়ি প্রয়োজন, ছোটবকুলপুরে যাবে শুনে সেই তিনজন লোক চমকে যায়। পানবিলাসী দিবাকর রাস্তায় পুরো চার পয়সায় তৈরি পান কিনেছে, কাগজের ঠোঙাটা বার করে একটা পান গালে পুরে দেয়। বেঁটে লোকটা বিস্মিত হয়ে জানতে চায়, 'রাত করে ছোটবকুলপুর যাবে? সেখানকার খবর জানো সব?' দিবাকর উত্তরে বলে, 'খবর জেনেই এয়েচি বাবু। আত্মীয়-কুটুম্ব আছে সেথা, খবর নিতে এয়েচি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েচে।' তার 'চাটং চাটং' কথার উল্লেখে জানায় দিবাকর 'না বাবু গরিব মানুষ কথা কোথায় পাব?' তেমাথায় পৌঁছে গাড়োয়ানকে ছোটবকুলপুরের কথা বলতে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে, বলে, 'ওরে বাবারে রাত্রিবেলা, ছোটবকুলপুরে কে যাবে! সেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমত লড়াই চলছে', অতখানি যেতে না চাইলে যতদূর যেতে চায় তাতেই দিবাকর রাজি, গাড়োয়ান রাম রাতের বেলা অত হাঙ্গামায় যেতে না চাইলে আন্না বলে, 'ওমা তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাছে...বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাবে, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ', শেষ পর্যন্ত গগন ঘোষ কমলতলা অব্দি যেতে রাজি হয়। বাকি পথটুকু হাঁটতে ঠিক হয়, যাবার পথে মাঝে মাঝেই বাধা আসে, 'কে যায়? কোথা যাবে?' এদিকে কমলতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। দিবাকরের ছোটবকুলপুর পর্যন্ত যাওয়ারপ্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত রওনা হয়, ছোটবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন তিনটে টর্চের আলো গোরুর গাড়ির ওপর এসে পড়ে। হাঁকডাক শোনা যায়, বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, গগনের আকস্মিক আক্রমণে তারা উত্তেজিত, যদিও

গাড়িতে দুটি বলদ, একদল গাড়োয়ান, একটি পুরুষ, একটি মেয়েমানুষ ও একটি বাচ্চা— ভয়ের বস্তুতই কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন আসে দিবাকর কোথা থেকে এসেছে, নাম কী, বাপের নাম কী? উত্তরে দিবাকর বলে তার নাম দিবাকর দাস, বাপ মনোহর দাস, তিপ্পান্নোর মন্বন্তরে মারা গেছে, উপোস দিয়ে মৃত্যু, হাওড়ায় থাকে, ঘনশ্যাম—বেনেন্ট কারখানায় মজুর খাটে, এদিকে হাঙ্গামা, বৌ শুনে কাঁদে, তার বাপ-ভাই বেঁচে আছে কিনা। এবার প্রশ্নকর্তাদের পুঁটুলির দিকে নজর পড়ে, দিবাকর জানায় বোমা বন্দুক নয়, কাঁথা কাপড়। বদ মতলব আছে কিনা জানতে চাইলে, সাক্ষী-প্রমাণ দিতে পারবে না জানায়। দীর্ঘ থলথলে লোকটিকে আন্না জানায়, সে এখানের মেয়ে। একজন নিচু গলায় জানায় একজন ডেঞ্জারাস মানুষ ছদ্মবেশে এসেছে, তল্লাসি হয়। উত্তেজনার আতিশয্যে মুখবাঁধা হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে গোটা ছয়েক শিঙি মাছ। এ নিয়ে বিদ্রূপ হলে, দিবাকর জানায়, 'শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বাবণ আছে নাকি।' শুনে বিরক্তির মধ্যে আন্নার বাচ্চার নোংরা মাখা কাঁথা ছুঁয়ে ফেলে। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বের হয় সাজা পান, তিনটে পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়, একজন লণ্ঠনের আলোয় ছাপানো কাগজে চোখ রেখে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো ছিটকে আসে, তাতে লেখা 'ছোটবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।' তখন নিগূঢ় উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বলে, 'পাওয়া গেছে'। প্রশ্ন আসে স্বভাবতই এই ইস্‌তেহার কোথায় পেল, আসল নাম জানতে চায়, এবার দিবাকর ও আন্না পরস্পরের দিকে তাকায়।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও গল্পাভাস যা আছে তাতে কাহিনীর সমস্ত পটভূমিকা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। চরিত্রের বাহুল্য নেই, অথচ যতটুকু প্রয়োজন তা রাখতে লেখক কোনো কার্পণ্য করেননি। আড়াই জন যাত্রী, দুটি গাড়োয়ান, স্টেশন চত্বরে তিনটি বিচিত্র মানুষ, পথে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গ, পুলিশ-মধ্যসত্ত্বভোগী— একেবারে মানুষ নেই বলা চলে না, একেবারে ন্যূনতম-ও বলা যায় না। আবার গল্পকথনেব পেছন পর্দায় সংঘর্ষের বাতাবরণ কখনো ছিন্ন হয়ে যায় নি। দিবাকরেব চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে দু'একটি ইঙ্গিতপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে, গোরুর গাড়িতে ওঠার আগে কাগজে মোড়া পান এক লহমার দৃশ্য, এই সামান্য বস্তুটি যে গল্পের অন্তিমলগ্নে কতো তীক্ষ্ণ, কতো ক্ষুরধার হয়ে উঠতে পারে প্রাক্-লগ্নে তার হদিশ পাওয়া যায় নি। কাহিনীর সংক্ষিপ্তি লেখক মিটিয়ে দিয়েছেন চরিত্রসমূহের বাক্যবিন্যাসে, সে দিবাকর আন্নাই হোক, গাড়োয়নধাই হোক্, কারখানার মালিক তথা দালালশ্রেণী যে-ই হোক্ না কেন, তীক্ষ্ণ-শাণিত বাক্যরাজির হীরের বিদ্যুৎ-দ্যুতি চোখ এড়িয়ে যাবার নয়। ঠিক যার মুখে যেমন ভাষা প্রয়োজন, তেমনটি ব্যবহার করে গল্পের বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতাকে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই জাদুতেই গল্প খরস্রোতা নদীর মতো মোহানা অভিমুখী চলেছে। সংগ্রামী মানুষ ও পুলিশের সংঘাত, দালালদের কাজে লাগানোর প্রয়াস যথাযথ বললেই যথেষ্ট হবে না, উপযুক্ততার গুণে উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক গল্পটি সার্থকতার দিকে এগিয়েছে।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পের সর্বত্র ব্যঞ্জনাধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। এ-ব্যঞ্জনা গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যাত্রার উদ্দেশ্যটি শীর্ষনামের মধ্যদিয়ে ধরা পড়েছে,

এখানে যাত্রাটি সাধারণ অর্থে লেখক প্রয়োগে উৎসুক ছিলেন না, এর মধ্যে নিগূঢ়ার্থ নিহিত আছে। গল্পের পটোত্তলনের মধ্য দিয়েই এর পারিপার্শ্বিকতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের একটি স্টেশন, লেট-করা একটি ট্রেন, দ্রুত ধাবমান কতিপয় মানুষ, পুলিশ, আতঙ্কের কালোছায়ায় আবৃত আকাশ, কিছু সন্দেহজনক মানুষ, বুঝতে অসুবিধে হয় না ভাড়াকরা কারখানার মালিকের গুপ্তচর, বিশাল গাছের নিচে নিরুপায়বিধায় মানুষ আনাজপাতি নিয়ে উপস্থিত। বুঝতে পারা যায় প্রত্যহ ছোটবকুলপুর বা অদূর বা দূরতর স্থানে গমনাগমনের জন্যে গোরু না ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষমান থাকে, আজ সব সুনসান, যেন আসন্ন বিপদ ধারে-কাছে ওৎ পেতে আছে। এই বিপদসঙ্কুলতার মধ্যে হাওড়ার কারখানার কর্মী দিবাকর দাস, স্ত্রী আন্না ও ছোটশিশু একটি কাপড়ের পুঁটলি ও মাটির হাঁড়িতে শিঙি মাছ নিয়ে ছোট বকুলপুরের উদ্দেশে রওনা হতে চায়। স্টেশনে চত্বরে কিছু মানুষের সন্দেহ, চতুরালি, গাড়োয়ানদের ভয়ভীতির মধ্যে অনেক কথাবার্তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কমলতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি পায়, তা-ও গাড়োয়ান গগন ঘোষের সাহস ও সহায়তায়। কিন্তু যাত্রাপথে নানান বাধা আসে, জমিদার-জোতদারের ভাড়াটে কিছু মানুষ গ্রাম বেষ্টন করে থেকে নানান প্রশ্নে জর্জরিত করে দিবাকরকে। ছোটবকুলপুরের যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চায়, তল্লাসী করে। আন্না যে ছোটবকুলপুরেরই মেয়ে, বাবা-দাদার সংবাদ সংগ্রহরে জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে ছুটে এসেছে, তাকে চেনেও গ্রামের মানুষেরা—এসমস্ত বার্তা বিশ্বাস করানো কষ্টসাধ্য।

পাহারাদারদের জ্ঞাতব্য এরা সত্যি সাধারণযাত্রী না সংঘর্ষের জন্যে প্রেরিত কোনো চর। যদিও গল্পের শুরুতে দিবাকর ও আন্নাকে দেখে একটি মাঝবয়সী মানুষের উক্তি, 'চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।' গাড়োয়ানদেরও কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয় নি। কিন্তু সন্দেহ ও প্রকৃততথ্যসন্ধানী মানুষেরা, যাত্রাপথে যারা বীরসৈনিকদের সংগ্রাম বানচাল করা যাদের আসল আজ তারা এতসহজে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে চায় না, পারে না। 'বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে' যাদের মোতায়েন করা হয়েছে তারা অতি সরল-সহজভাবে দিবাকরকে মেনে নিতে পারেন, সঙ্গে স্ত্রী ও শিশুসন্তান থাকা সত্ত্বেও। বাচ্চার জন্যে কাপড়ের পুঁটলি, মাটির হাঁড়ির মধ্যে রাখা শিঙি মাছ ধোকার টাটি হতে পারে—এ প্রশ্ন তাদের মাথায় আসতেই পারে। সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, তাদের সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়। পানের ভাগীদার জুটে যাওয়ায় আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে যায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এদের যাত্রা, এত ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করে নিছক বাপ-ভাইকে দেখবার জন্যে আসে নি। লেখকের উদ্দেশ্যেও ছিল দিবাকরের আসল স্বরূপ উদঘাটনের। সেটা একটু একটু করে কোরক খোলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এখানেই শীর্ষনামের সার্থকতা, সাধারণ অর্থে নায়কের নাম দিয়ে বা বিষয়ের নাম দিয়ে নামকরণ এত তাৎপর্যময়, এত ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠতে পারত না।

'ছোট বকুলপুরেরযাত্রী' গল্পের আপাত সারল্যের অন্তরালে রয়েছে শ্রমিক-ধর্মঘট-জনিত বিদ্যুদ্‌গর্ভ পটভূমি। গল্পের সূচনালগ্ন থেকে লেখক আকারে-ইঙ্গিতে ঘনঘোর পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেবার জন্যে স্টেশন-চত্বর, সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গ, গাড়োয়ানদের শঙ্কা এবং রুজি-রোজগারের অনিশ্চয়তা—ইত্যাকার ঘটনাপঞ্জী দিয়ে আবহ তৈরি করে দিয়েছেন। কাহিনীর শেষ-অঙ্কে দিবাকর-আন্নার ছোট বকুলপুরে যাত্রার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর আগে নেহাত নিরীহ

দম্পতির দুর্দশা ও পরিজন এবং নিজেদের নিয়ে শঙ্কা বড়ো বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু অনুক্ষণ সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন প্রায় সকলের বাক্যবিন্যাসে খুব সাধারণ স্তরের ভাষা ব্যবহৃত হয় নি, বাক্যের ভেতরে শ্লেষ-বিদ্রূপ থেকে পরিস্থিতি-অনুযায়ী শব্দ বিন্যস্ত হয়েছে, যার উপরিতল থেকে অন্তর্লোকের তীক্ষ্ণতা ধরা পড়েনি। পূর্বাপর গল্পের সর্বত্র এর ব্যত্যয় ঘটেনি। চরিত্রের মুখ দিয়ে বাক্য-ব্যবহারেই লেখক ক্ষান্ত হন নি, গল্পটির বর্ণনা ও মন্তব্যেও অনুরূপ বাকনির্মিতি লক্ষণীয়। যেমন, 'স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক ওদিক তাকায়। চোখের পলকে তার জানা চেনা স্টেশনটি যেভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে তার। কাল এইখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এরকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল।' তাই আন্নাকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করার বিষয়টি উল্লেখ করে, দিবাকর কিন্তু একাই লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব করেনি, আন্নার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য, গল্পের শুরুতেই তা টের পাওয়া যায়। তার মুখে প্রথমেই শোনা যায়, 'দেখব আবার কি? হাঙ্গামা হয়েছে। পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকোনি, যাই চলো'। এখানে 'থেটার' শব্দটি একাধারে আন্নার তেজদীপ্ততার পরিচয় বহন করে, সেই সঙ্গে গল্পে তার ভূমিকাটি নিশ্চিত করে দেয়। সেই সঙ্গে স্টেশনে বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে কজন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়ানো ছিল, তাদের মধ্যে মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'চাষা ভুষো বাজে লোক, যেতে দাও'।

দিবাকরের মুখে ছোট বকুলপুরের যাওয়ার সংবাদ শুনে বেঁটে লোকটি বিস্মিত দিবাকরের নির্লিপ্ত কথা শুনে,'খবর জেনেই এয়েচি বাবু। আত্মীয়-কুটুম আছে সেথা, খবর নিতে এয়েচি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।' তার 'চাটং চাটং' কথা শুনে বেঁটে লোকটি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি করলে দিবাকর জানায় 'না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথায় পাব?' গোরুর গাড়ির একজন রাম যখন বলে 'রাতের বেলা কে কত হাঙ্গামা করে, না কি বল ঘোষের পো?' এর উত্তরে দিবাকর নয়, আন্নার উক্তিটিও যথেষ্ট সম্ভ্রম-উদ্রেককারী, 'ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ।' এর পাশাপাশি আন্নার আর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্য যুগ করবে'—সাহস ও দৃঢ়তা তার কতখানি এ-হেন বাক্যই তার প্রমাণ দেয়। দিবাকর ইঙ্গিতে একসময় জানিয়ে দেয় তার ছোট বকুলপুরে যাত্রার উদ্দেশ্য। যখন সে কি, কোথা থেকে এসেছে এ-সব প্রশ্ন তাকে করা হয়, 'বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা সগ্‌গে গেছেন—তিপ্পান্নের মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি'। তার সংগ্রামী উত্তরাধিকার পরিচয় সূত্রেই সে জানিয়ে দেয়। অবস্থার বজ্রগর্ভ পরিস্থিতিতে এরকম বাক্য ব্যবহার চকিত-বিস্মিত করার পক্ষে যথেষ্টই। যেমন উদ্ধত তার আরেক উক্তি শিঙি মাছ খাবার প্রসঙ্গে, 'শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?' এমন বহুতর উত্তর-প্রত্যুক্তিতে গল্পটি শাণিত হয়ে উঠেছে, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। একথা স্বীকার করে নেওয়া সমীচীন যে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' সার্থক ছোটগল্পের সমস্ত উপকরণে সজ্জিত হলেও এর সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটি

নিশ্চিত উদ্দেশ্যাভিমুখী যাত্রা, বলা বাহুল্য গল্প এ-ক্ষেত্রেও সার্থকতার শিরোপা পাওয়ার যোগ্য। উদ্দেশ্য বিষয়ে লেখক সদাসর্বদা সচেতন রয়েছেন, কী চরিত্র-চিত্রণে, কী কাহিনী-বয়নে, কী ছোটগল্পের সাঙ্কেতিত-ইঙ্গিতে। এবিষয়ে চরিত্রের প্রধান বা অপ্রধান কোনো চরিত্রের প্রতি বেশি প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি লেখক। গল্পের ইঙ্গিত বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করেই চরিত্র-কাহিনী-ভাবনা সঙ্গমের অভিমুখী হয়েছে। 'তেভাগা'-আন্দোলন সমাজ-সচেতন বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী লেখককে শুধু ভাবিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে দুটি অত্যুৎকৃষ্ট গল্প, বাংলা গল্পভান্ডারকে যা সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ-হাত ঘোরা সংবাদেব ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, চাক্ষুষ করেছেন কৃষকের সংগ্রাম। শ্রমিকের সংগ্রামকে, তিনি অবগত আছেন এ-সব সংগ্রামের শরিক হতে না পারলে ব্যক্তি হিসাবে এবং লেখক হিসাবে সততার পরিচয় স্থাপন করা যায় না। তাই গায়ে-খাটা মানুষের জীবনপণ লড়াইয়ের সঙ্গী হয়েই, সে-সব মানুষের প্রত্যয়ী-সংগ্রামের দলিল চিত্র অঙ্কন কবেছেন, সংঘবদ্ধ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েই থাকে এ-প্রত্যয় তাঁব ছিল। কাহিনীর উপান্তে 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি' পানের খিলিতে জড়ানো কাগজটি বৈদ্যুতিক শকে চমকে ওঠা দালাল শ্রেণীর মানুষেব চোখে পড়ার প্রস্তুতি গল্পের শুরু থেকে একটু একটু কবে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। নিশ্চিত গল্পটির মধ্যে নাট্যধর্মিতা আছে, এই নাটকীয়তা দ্বিস্তর থেকে একটু একটু উর্ধ্বায়িত হয়ে চরমোৎকর্ষে এসে পৌঁছেছে। দিবাকর ও আন্না আপাত নিরীহভাব, আত্মীয়স্বজনের জন্যে উদ্বেগ, প্রতি পদক্ষেপে শঙ্কার ভাব এক নিমেষে সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধিত্ব কববার যোগ্যতায় উন্নীত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয বটে, কিন্তু এতক্ষণের নানান নাটকীয়তা, সঙ্গে শিশু, তাব নোঙরামাখা কাঁথা, মাটির হাড়িতে শিঙি মাছ, ছোট বকুলপুর পর্যন্ত যেতে না পারলেও কমলতলা পর্যন্ত যেতে পেরেই বর্তে যাওয়ার ভাব, বাকি পথটুকু উদ্বেগের সঙ্গে বাপ-ভাইয়ের খবরের জন্যে ছুটে যাওয়া—ইত্যাদি ঘটনারপঞ্জী পাহারাদাবদের চোখ বিস্ফারিত করে দেয়, লেখক লক্ষ্যে এসে পৌঁছন।

ইস্তাহারের মধ্যে দিয়ে গল্পের যবনিকা পতন ঘটে, সংগ্রামী শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রাম জয়যুক্তকরণে হাওড়ার আর এক কারখানার সংগ্রামী অকুস্থলে পৌঁছে যায়, সংগ্রামের সঙ্গী হতে চায়, দুনিয়ার সমস্ত মজদুবের একীভবনই তো কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সার কথা, এই মৌলভূমি অক্ষত রেখে সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়িত্ব করবার জন্যে ছোট বকুলপুরের দুই যাত্রী নিজ কর্তব্য সমাপন করে, এ-পর্যন্ত আসতে গিয়ে কিছু লুকোচুরি কিছু মারপ্যাঁচ বজায় রাখতেই হয়েছে, কিন্তু উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সামান্য পান-জড়ানো কাগজের মোড়ককে ভয়ঙ্কর ইস্তাহারে পরিণত করে উদ্দেশ্য সফলকাম কবে তুলেছে। এখানে উদ্দেশ্যের সার্থকতা এবং গল্পের এ ধরনের গল্পের প্রত্যাশায় কোনো সাহিত্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় রত থাকতে চায়, বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মতো সংগ্রামী, শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের প্রতি পরম মমতাময় লেখক আবির্ভূত হয়ে বাংলা গল্প-ভাণ্ডারকে ধনী করে দিয়ে যেতে পারেন।

প্রাগৈতিহাসিক : অকৃত্রিম এক জীবনের উৎস সন্ধান

মালবিকা মণ্ডল

দেশ-কাল সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত। বহুবিধ ঘটনার উত্তাল ভীড়ে কেটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা। ১৯১৩-১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৭-তে রুশ বিপ্লব, ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন, সর্বোপরি এই সময়ে ফ্রয়েডের তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও প্রচার—সব মিলিয়ে কবি সাহিত্যিকদের মানসিক জগতে এক বিশাল বিপর্যয়।

"বিশ বা ত্রিশের দশকের লেখকদের কৈশোর বা প্রথম যৌবন কেটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে। সেই যুগের অর্থনৈতিক সংকট ও প্রত্যয়ভঙ্গের বেদনার আঘাতে তাদের যৌবন স্বপ্ন বিহ্বল, ক্লান্ত আবার তারি মধ্যে নতুন আদর্শ ও আশায় উজ্জীবিত যুবচিত্ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহের জন্যও যেন প্রস্তুত। এই কিশোর দল যখন যুবক হয়েছেন, যখন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তখন তাদের সেই বিক্ষত যৌবনের যন্ত্রণা, বিদ্রোহ, স্বপ্ন সবই সাহিত্যে রূপলাভ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে কল্লোল পর্ব যৌবনের বিচিত্র সুরে অনুরণিত।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি মধ্যেই রয়েছে বিশ/ত্রিশের দশকের লেখকদের মানসিক অস্থিরতার পরিচয়। প্রেম, সত্য, সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের উপর নেমে এসেছিল আঘাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে। "সমস্ত দিক একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ" নিয়ে জন্ম হল কল্লোগোষ্ঠীর যারা কালিকলম (১৯২৬), কল্লোল (১৯২৩), প্রগতি (১৯২৭) পত্রিকাকে আশ্রয় করে তাদের রবীন্দ্রবিরোধিতাকে হতাশা ও নৈরাশ্যে প্রকাশ করলেন।

কল্লোল ও কল্লোলোত্তর গোষ্ঠীব চিন্তা চেতনা বিক্ষুব্ধ পটভূমিতেই এসেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আঠাশ বছরের সাহিত্য জীবনের আয়ুষ্কালে দুটি গোষ্ঠীর সঙ্গেই তার পরিচিতি ও স্থিতি।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু তাঁকে কল্লোল গোষ্ঠীর কুলবর্বন, 'of Kallol in spirit' বলে দাবী করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবনদৃষ্টি সচেতন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সমকালীন লেখকদের তুলনায় অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান করেছে। কল্লোল গোষ্ঠীর রবীন্দ্রবিরোধিতা মানিকের সাহিত্যে কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। কল্লোল সম্পর্কিত ধারণা "সাহিত্য করার আগে" প্রবন্ধে পরিষ্কার উচ্চারণে জানিয়েছেন—

(১) সাহিত্যে ওই 'আধুনিক মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড সোরগোল তুলে। প্রায় একটা বিপ্লবমার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য দিকপালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই বল্‌গাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

(২) "খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক মানেই জনসাধারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে, স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে যাকে তারিফ করছে। এদের ভূমিসাৎ করে কাব্য সাহিত্যের মোড় ঘুরানো যায় না।"

(৩) "সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিগুলি নিশ্চয় যথেষ্ট তার অবস্থান, চিন্তা ও মানসিকতা অনুধাবনের জন্য। তাই দ্বিধাহীন ভাবে মানিক ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। জীবনের দৈন্যতা, রিক্ততার মধ্যে জীবনসত্য অন্বেষণে উন্মুখ লেখক মানসে ভীড় করেছে সাধারণ মানুষ, প্রতিদিনের জীবনচর্যা থেকে তুলে আনা অসহায়, ক্লিষ্ট, প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষ। মননের গহন গভীরে ডুব দিয়ে অন্তস্থলকে আবিষ্কারের চেষ্টা মানিককে করেছে চরম আধুনিক বাস্তববাদী অনন্য এক লেখক।

অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে লেখকের জীবনদর্শন। শিল্প বিচারের প্রাক্‌কালে প্রয়োজন শিল্পীর চিন্তা চেতনা অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিতি। লেখকের আবেগধর্মী মন নিচের স্তরের মানুষের বলিষ্ঠ প্রেম, সহজ সুস্পষ্ট যৌনচেতনাকে তাদের মতন করে রূপায়িত কবতে পারেনি। তাই মানিকের অন্বেষণও থেকেছে অতৃপ্ত। এই বাস্তবতার অন্বেষণেই সংবেদনশীল বাস্তববাদী লেখক মানিক জীবন বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ। নির্মোহ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে অন্বেষণ করেছেন মানুষের অবচেতন মনের গহন গভীর সর্পিল জগতকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের গল্পের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে মানুষের মনের জটিল পথপরিক্রমা যার পরিচয় মেলে "প্রাগৈতিহাসিক", "আততায়ী", 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্পে। মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে পরীক্ষাব ফলশ্রুতি এই গল্পগুলি।

জটিল মানসিক জগতে পরিক্রমা, রোমান্টিক ভাববিলাসের অবসান, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের গল্পের সচেতন বৈশিষ্ট্য। নানাবিধ ঘটনার আঘাতে অস্থির সমাজজীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করার দায় অস্বীকার করতে পারেন না যুগসচেতন শিল্পী।

"লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে ভযাবহ আর্থিক সংকট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুঃসহ অত্যাচারে দেখা দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতা, যৌনবিকৃতি এবং বিকারগ্রস্ততা"—কথাসাহিত্যে মানিক ঃ সরোজমোহন মিত্র

এই দায়বদ্ধতা, সমাজসচেতনতা, ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর হতাশা, অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার দুর্মর লড়াই এর কাহিনী রয়েছে প্রথম দিকের গল্পগুলিতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে রচিত প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি। (প্রাগৈতিহাসিক গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৭ সালেব ১৭ এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয়)

সর্বাধিক অনূদিত, আলোচিত ও বিতর্কিত এই গল্পটি নিঃসন্দেহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আনুকূল্যে প্রাপ্ত গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায়—

"প্রধানতঃ ইংরেজিভাষায় লেখকের সর্বাধিক অনূদিত গল্প প্রাগৈতিহাসিক"

দুর্ধর্ষ ডাকাত ভিখুর ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তিতে গল্পের শুরু। নূতন করে বেঁচে ওঠার অভূতপূর্ব প্রয়াসের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিক্রিয়া সব কিছু মিলিয়ে একটি নিটোল plot এব আস্বাদন দেয়।

গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনী আবৃত হয়েছে। কিন্তু তারও অদৃশ্য নিয়ামক মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তি—প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই যাব অবাধ সঞ্চরণ। সমগ্র কাহিনীবৃত্ত সেই অদৃশ্য নিয়ামকের অঙ্গুলি সঙ্কেতে আবর্তিত হয়েছে ভিখু যার মাধ্যম মাত্র।

ভিখুর জীবনবৃত্তান্ত সরলরৈখিক গতিতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। ভিখু চরিত্রের পরিস্ফুটনের কাজেই গল্পকারের প্রয়োজন মতো এসেছে পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলি—পাঁচী, বসির, পেহ্লাদ, ভরত। কোন পার্শ্বিক চরিত্রের অনাবশ্যক জটিলতা গল্পটিকে কোথাও ভারবাহী করেনি কিংবা কোন বাড়তি ঘটনার অনাবশ্যক বাহুল্যে ভিখুর জীবনবৃত্ত পরিক্রমায় কোন বাধা পড়েনি। বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি দৃঢ় পিনদ্ধ গঠনে একটি সার্থক ছোটগল্প।

অতীতের স্মৃতিচারণার পথ ধরে আমাদের সামনে এসেছে ভিখুর অতীত জীবন। গল্পের পরিসমাপ্তিতে বিজয়গর্বে ভিখু ভিখারিণী পাঁচিকে পিঠে নিয়ে, জ্যোৎস্নালোকিত পথে হেঁটে চলেছে। এই অপূর্ব পরিসমাপ্তি যেমন পাঠককে ভিখুর জীবনের সদর্থক এক পরিসমাপ্তিতে এনে পৌঁছায় তেমনি এক অতৃপ্ত কৌতূহল জাগিয়ে রেখে গল্পটি শেষ হয়ে যায়। শেষ ছত্রকটিতে মানবজীবনের অন্তর্লীন আদিম প্রবৃত্তি সম্পর্কিত মন্তব্য পাঠককে একটা বোধের সামনে এনে উপস্থিত করে। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "গল্পটির শেষ অংশ যেখানে হত্যাকারী দুবৃত্ত খোঁড়া ভিখিরি মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটি আমার অবিস্মরণীয় মনে হয়। তার সব গল্পের সমাপ্তি এতটা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিকর নয়।"

পেটের ক্ষুধা আর দেহের ক্ষুধার যুগল সম্মিলনে ভিখু আদিম মানুষেব এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি। অন্ধকার জগতের মানুষ তাব অন্ধকারতম প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, জিঘাংসা নিয়ে সশরীরে হাজির গল্পের আসরে।

বসন্তপুরে বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে বল্লমের খোঁচা খেয়েও পালিয়ে আসতে পারে। প্রাণের ভয়ে দশমাইল দৌড়ে শরবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আবার রাত্রির অন্ধকারে নয় ক্রোশ দৌড়ে সাঙাত পেহ্লাদের চিতলপুরের বাড়িতে পৌঁছে যায়। পেহ্লাদ ভিখুকে আশ্রয় দিতে ভয় পায়। গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূর জঙ্গলে ঘন ঝোপের নীচে মাচা বেঁধে ভিখুর থাকার ব্যবস্থা করে। কিছুটা চিঁড়ে গুড় আব জল দিয়ে কদিন পরে আসাব আশ্বাস দিয়ে চলে আসে প্রহ্লাদ।

আহত ভিখু কয়েকটা দিন যে দুর্বিসহ যন্ত্রণা, ভয়ংকর নির্জন পরিবেশ, পিঁপড়ে জোঁকের আক্রমণ, মাথার উপরে ঝুলন্ত সাপ নিয়ে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থাকে তা যে কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লড়াই করে সে শুধু থাকেনা, বেঁচে থাকে। দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "মরিবেনা, সে কিছুতেই মারবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই।"

এরপরের গল্প মরণাপন্ন ভিখুব বেঁচে ওঠার গল্প। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেহ্লাদ ও তার

বোনাই ভরত তাকে উদ্ধার করে আনে ও মাচার উপর খড় বিছিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করে। ধীরে ধীরে বিনা পরিচর্যাতেই সুস্থ হয়ে ওঠে ভিখু। তারপর একদিন প্রহ্লাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রীর হাত চেপে ধরে। ফলতঃ, প্রহ্লাদ ও ভরতের হাতে মার খেয়ে তাকে সেই আশ্রয় ছাড়া হতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের ধর্মানুযায়ী যে কৃতজ্ঞতা প্রহ্লাদের প্রাপ্য ছিল তাতো সে পেলই না উপরন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ভিখু নিজের অচরিতার্থ জৈবপ্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে।

এরপরে শুরু হয় ভিখুর জীবনের পরবর্তী পর্যায়। জেলে ডিঙি চুরি করে তাতে চেপে অচৈতন্য অবসন্ন ক্ষুধার্ত ভিখু মহকুমা শহরে পৌঁছায়। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সে তখন মরীয়া। নদীর জলে গায়ের রক্ত ধুয়ে শহরে প্রবেশ করে। ''বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা''

শুরু হল ভিখুর ভিখারী জীবন। জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া যার জীবনের পেশা ছিল সে আজ একটা হাতের অভাবে লোকের কাছে হাত পেতে জীবিকা নির্বাহ শুরু করল। পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে এই পরিবর্তিত জীবিকা মেনে নিতে। ভিখুর আক্ষেপ ''বাঁটি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান''

ক্রমশঃ নতুন জীবিকায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, রোজগার বাড়ে, পেটভরে খাবার সংস্থান হয়। বিন্নু মাঝির পাশের চালাটি মাসিক আট আনায় ভাড়া নেয়। ধীরে ধীরে শরীরে শক্তি আসে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির একটা উপায়, একটা স্থিতাবস্থা এসে গেলে দৈহিক ক্ষুধা, দেহজ কামনার লেলিহান শিখা তাকে পাগল করে তোলে, ''পৃথিবীর সব নারী সব খাদ্য যদি সে একাই ভোগ করতে পারত''।

বিন্নু মাঝির সুখী দাম্পত্য জীবন তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তাদের ঘরে আগুন দিয়ে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনকে, পারিবারিক শান্তিকে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি পড়ে পায়ে 'তৈলাক্ত ঘা' নিয়ে ভিক্ষারতা যুবতী ভিখারিণী পাঁচার দিকে। শয্যাসঙ্গিনীর অভাবে বিনিদ্র নিরুপায় ভিখু শেষ পর্যন্ত পাঁচীকে প্রস্তাব দেয় পায়ের ঘা সারিয়ে তার সঙ্গিনী হতে। কিন্তু পাঁচীও তার ভিখারিণী জীবনের মূলধন 'ঘা'টিকে সারাতে চায় না। পাঁচির প্রত্যাখ্যান আগুন জ্বালিয়ে দেয় ভিখুর সর্বাঙ্গে। যেমন করেই হোক পাঁচির দেহের অধিকার তার চাই-ই। নারীসঙ্গবিহীন জীবন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক ভিখু আর সহ্য করতে পারে না। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিখুর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দৈহিক পরিতৃপ্তির মধ্যেই-তার জীবনের আনন্দ, বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাওয়া। শেষে প্রবৃত্তিতাড়িত ভিখু একদিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত বসিরকে তীক্ষ্ণ লোহার শিক বিদ্ধ করে হত্যা করে, পাঁচির সহায়তায় বসিরের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে পাঁচিকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী ভিখু জীবনের নূতনতর পথে যাত্রা করে। গল্পের পরিসমাপ্তি এখানেই।

গল্পে ভিখুকে মাধ্যম করে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন লেখক। বিশেষকে অবলম্বন করে সামান্যে, সার্বজনীন সত্যে পৌঁছে গেছেন তিনি অনায়াস দক্ষতায়।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু। তার অন্ধকার জটিল পথ পরিক্রমা এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতা, তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন ভিখুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গল্পে অতীত চারিতায় ও প্রথম কয়েকটা লাইনে। তারপরের ইতিহাস ভিখুর ক্ষমতা হ্রাসের ইতিহাস। কিন্তু মনের গহন কোণে লুকিয়ে থাকে যে প্রবৃত্তি তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। যে জৈব প্রবৃত্তিবশে 'বাসির ঘরে উন্মত্ত রাত্রিযাপন' করত, শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, রাখুর বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছিল হাতিয়ায়, সেই জৈবপ্রবৃত্তির বশেই পায়ে তৈলাক্ত ঘা থাকা সত্ত্বেও পাঁচিকে সঙ্গিণী করতে চেয়েছে কিংবা আশ্রয়দাতা প্রহ্লাদের স্ত্রীর দিকে কামনার হাত বাড়িয়েছে।

এই প্রবৃত্তির শৃঙ্খল সারা গল্প শরীরে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিখুর আচরণে। তাই প্রাগৈতিহাসিক জৈব প্রবৃত্তিকে গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু বললে অত্যুক্তি হয় না।

ভিখু জৈবপ্রবৃত্তিতাড়িত একটি মানুষ। দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির মধ্য দিয়েই সে জীবনের আনন্দ খুঁজে পায়। পুকুরঘাটে স্নানরতা যুবতীর কাছে ভিক্ষা চাওয়া কিংবা বসিরের সঙ্গিনীবে অধিকার করার মধ্যেও তার জৈবতা পরিস্ফুট।

বিন্নু মাঝির ভাড়াটে হওয়ার সুবাদে তার সাংসারিক জীবন, দাম্পত্য প্রেম, পারস্পরিক নির্ভরতা তাকে আকৃষ্ট করেনা বরং বিন্নুর স্ত্রীকে দেখে তার হিংসা হয়, কোন এক অজানা প্রতিশোধের জন্য হাত নিসপিস করে, কিন্তু মানসিক কোন ক্ষুধার তাড়না তার নেই। চাহিদ নেই, শুধুই আছে জৈবিক ক্ষুধা। একেবারেই বলিষ্ঠ, প্রকাশ্য তার চাহিদার অভিব্যক্তি। কোন ভদ্রজনোচিত মুখোশ নেই, রোমান্টিক আবেগ তন্ময়তা নেই।

'পেহ্লাদে'র নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু ডানহাতটা শুকিয়ে যাওয়ায় পুরোনো জীবিকায় আর ফিরতে পারেনি। তবুও সেই জীবনের নৃশংসতা, মাদকত ভিখুকে আজও টানে। "গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদকর নেশা জগতে আর কী আছে?"

কিন্তু নিরুপায় ভিখু শারীরিক ভাবে পঙ্গু-হওয়ায় নতুন নেশা খোঁজে। মানুষের স্বভাবজ সে প্রেম, দয়া, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা এসবের লেশমাত্র তার চরিত্রে নেই। যে 'পেহ্লাদের জন সে প্রাণে বাঁচল, লোভের আগ্রাসী ক্ষুধা তারই স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াল। অচরিতার্থ কামনার আগুনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে উপকারী বন্ধু প্রহ্লাদের ঘরে আগুন দিল। তার মধ্যে কোন নীতিবোধ কাজ করেনা, নেই কোন পাপপুণ্যের বিচার যা আছে তা শুধুই দেহজ কামন পরিতৃপ্তির মাধ্যম সন্ধান। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আদিমতা, জৈবিক প্রবৃত্তি তার চরিত্রে আচরণে, সক্রিয়তায়। দৈহিক যৌনকামনা ও অপরাধ প্রবণতার মিশ্রণে ভিখু চরিত্র সৃষ্টি করে মানিক সাহিত্য জগতে এক নূতনমাত্রা যুক্ত করলেন।

অপরদিকে জীবনের প্রতি অপার মমত্ববোধ কাজ করেছে ভিখুর মধ্যে। সে বেঁচে

থাকতে চায়। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে আপাত দৈহিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির মধ্যে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করে। পরিবর্তিত জীবনে নূতন পরিস্থিতিতে নিজের সামর্থ্য অনুসারে বেঁচে থাকার দুর্দমনীয় লড়াই। বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লেখক মানুষের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখেছেন—তার কামনা, বাসনা প্রতিহিংসা সব শুদ্ধ হাজির করেছেন সাহিত্যের বাসরে।

ভিখুর পাশাপাশি আরও যে সব পার্শ্বচরিত্র গল্পে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে 'পাঁচী' অন্যতম। আদিম মানব ভিখুর যোগ্য সঙ্গিনী 'পাঁচী'। ভিখারিণী পাঁচী বর্ণনাটিতে তাই দেহের বাঁধুনির কথাটি উল্লেখযোগ্য। "বয়স তাহার বেশী নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা"

এই 'ঘা'-টিই তার মূলধন। তার জোরেই সে অন্যদের চাইতে বেশী রোজগার করে। বিশেষ যত্নে তাই ঘাটিকে সারতে দেয় না। জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। সুখে থাকার কোন প্রলোভনেই সে তার মূলধন হারাতে রাজী নয়। জীবন তাকে অভিজ্ঞ করেছে। অন্ধকারময় জীবনে প্রেম, কামনা যে ভিন্নতব অর্থ বহন করে সে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে। সে জানে ভিখুর এই আসক্তি দুদিনের, তারপর তাকে আবার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। তাই অভিজ্ঞ 'পাঁচী' বলে "দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘাটি মুই তখন পামু কোয়ানে?"

ভিখুর আজীবন একনিষ্ঠ থাকার প্রতিশ্রুতি যে কতটা হাস্যকর, মেকী তা সে জানে ফলে সে পার্শ্ববর্তী আর এক খঞ্জ ভিখারি বসিরের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছে। ভিখুর নেশাও ক্রমশ 'তালের রসের' মতো জমাট বাঁধে। প্রেম? নাকি কামের উত্তাপে তার ঘৃণা 'উবে' যায়। "নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারেনা" তাই আবার পাঁচির দারস্থ হয কিন্তু ততদিনে সে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে বসিরের কাছে।

অবশেষে কামনাতাড়িত ভিখু আদিম মানুষের মতোই-বসিরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পাঁচিকে অধিকার করে। পাঁচীর চরিত্রের মধ্যেও সেই পাশব প্রবৃত্তি। জান্তব অনুশাসনই তারও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বসির হত্যা তার মনে কোন দুঃখ, প্রিয় জন হারানোর ব্যথা জাগায় নি। ভয় পেয়েছিল সে নিজের প্রাণের। পরমুহূর্তেই বসিরের সংগৃহীত অর্থ নিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে "ভিখুর হাত ধরে" নতুন জীবনের দিকে যাত্রা করে। যে আদিমতা, জৈব প্রবৃত্তি ভিখুকে নিয়ন্ত্রণ করে, পাচির জীবনের নিয়ন্ত্রণের রাশও তারই হাতে।

গল্পের পাত্রপাত্রীদের মুখের ভাষা একেবারেই অকৃত্রিম। ভাষাশুদ্ধ জীবনটাকে সরাসরি গল্পের আসরে হাজির করেছেন লেখক। পাঁচী, ভিখু তাদের অন্ধকার জীবনের ভাষায় প্রেম করে ঝগড়া করে। বসিরকে হত্যার পর ভিখুর হুমকি "ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবার কইরা—অ্যাঁ?"

যে মুহূর্তে পাঁচী ভিখুর অর্জিত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে ভিখুর ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। বসিরকে হত্যার পর তার আচরণ ও ভাষা অন্ধকার জগতের ভাষাকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে।

লেখকের বিবৃতির ভাষা সাধুভাষা কিন্তু চরিত্রগুলি গ্রাম্য চলিত ভাষায় কথা বলে। (১) পেহ্লাদ—"ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙাত। উটি পাকবো। গা ফুলবো"

(২) ভিখারিনি বলে—'আগে আইবার পার নাই? যা এখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া"

কিংবা

বসির বলিল—"ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।"

কঠিন 'রূঢ়' ভাষায় চরম পর্যবেক্ষকের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মনের গতিপ্রকৃতির কথা আমাদের জানিয়েছেন। মনে হয় যেন লেখকের গবেষণাগারে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ফলশ্রুতি এই চরিত্রগুলি।

'ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্তস্তব্ধতা'—দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যখন ভিখু কামনা তাড়িত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বসিরকে হত্যা করে যৌনসঙ্গিনী পাঁচীর দখল নিতে চলেছে তখন ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্তস্তব্ধতা আবার যখন পাঁচীকে অর্জন করে প্রবৃত্তিতাড়িত আদম ইভকে পিঠে করে তার দেহের ভারে ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছে নতুন করে বাঁচার আশায় তখনও "ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা"

জীবনের সুস্থ কলোরোলের বাইরে অপরাধ জগতের মানুষের সক্রিয়তা, ভিখু ও পাঁচির জীবনের পালা বদল, সঙ্গীবদলও ঘটে গেলে নিঃশব্দে, জীবনের কল্লোলের বাইরে স্তব্ধ পৃথিবীতে।

অমার্জিত চলিত ভাষার প্রয়োগে পাঁচী, বসির-ভিখু জীবন্ত চরিত্র হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। লোভ কামনা সহ পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষ যার আচরণে কোথাও ভদ্রতার মুখোস নেই,—যার অন্বেষণে শিল্পী মানিকের পদচারণা সেই মানুষকে পূর্ণ রূপে যৌন কামনা সহ তুলে আনলেন সাহিত্যে। প্রখ্যাত সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—'ঈঙ্গিত গূঢ় ভাষা, অসাধারণ সংযম, এক একটি উদ্ধৃতিযোগ্য পংক্তিতে এব একটি অভিনব সত্যের বিদ্যুদ্বিকাশ—ছোটগল্পের সফলতম আঙ্গিক রূপে নির্দিষ্ট হতে পারে।"

ভাষাকে মসৃণ করার কোনো প্রয়াস নেই। একেবারে জীবন্ত ছবি এঁকে চলেন—"পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল"—ভিখু চরিত্রের নৃশংসতার দ্যোতক। "জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়াশুষিয়া কচি পটলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়"—একটি অস্বস্তিকর ঘৃণ্য অনুভূতির সচেতন প্রকাশ।

ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করছেন "Manik Bandopadhyay wrote in a direct unornamental style"

যে পরিবেশ, সে জীবনকে বাস্তবভঙ্গীটুকু পর্যন্ত তুলে ধরার প্রয়াসে কলম ধরেছেন লেখক সেখানে 'Ornamental style' চলে না।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পটির নামকরণটি ইঙ্গিতময়। আদিম সুস্পষ্ট প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ ভিখু এই কাহিনীর বৃত্তকেন্দ্রে। আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত একটি মানুষ। ভিখু, পাঁচী, বসিরের নিয়ন্ত্রণের রাশ আদিম জৈব প্রবৃত্তির হাতে। সারা গল্পাঙ্গন জুড়ে নায়কের চলা ফেরা, কথাবলা,

চিন্তাভাবনা সবই মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম জীবনস্বভাব অনুসারী। এই আদিম প্রবৃত্তি প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রতিটি মানুষের মনে অন্তরশায়িত। তারই উন্মুক্ত রূপ কোন ছদ্ম মুখোস ছাড়াই ভিখুর মধ্যে প্রকাশিত। শেষ কয়েকটি লাইনে লেখকের ইঙ্গিতে চরম ব্যঞ্জনার প্রকাশ—

"যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।"

অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যপূর্ণ এই ভাষা ব্যবহারে গল্পটির চরমোৎকর্ষ। লেখক বিশেষকে অবলম্বন করে জীবনের সার্বজনীন সত্যে উপনীত হয়েছেন। এখানেই গল্পটির চরম সার্থকতা ও শিল্পসফলতা।

তথ্যনির্দেশ

১ লেখকেব কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২ সাহিত্যে ছোটগল্প—নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩ বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকবণ—বীরেন্দ্র দত্ত

৪ একালেব ছোটগল্প—ডঃ সবোজমোহন মিত্র

৫ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুবী

দুঃশাসনীয় : একালের দ্রৌপদীর আত্মহত্যা

শুক্লা ঘোষ চৌধুরী

'কল্লোল-কালিকলম প্রগতিকে' কেন্দ্র করে ভাব-বিদ্রোহী তরুণের দল নতুন দৃষ্টি নিয়ে নতুন পথের সন্ধানে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে এসে তারই চরম সার্থকতা দেখা দিল। বস্তুত 'কল্লোল' এর সমস্ত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য যেন সংহতিবদ্ধ হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে এসে। তারুণ্যের দুঃসাহসী কল্পনার সঙ্গে মিলিত হল শিল্পীর সংহতিবোধ, অনাবিষ্কৃত পথে পরীক্ষা নিরীক্ষার কুণ্ঠিত পদক্ষেপের বদলে দেখা দিল অস্খলিত পদচারণাব বলিষ্ঠ চিহ্ন। তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে। যে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই পর্বে তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তারই অনিবার্য পরিণাম হিসেবে গভীর নৈরাশ্যবাদ তাঁর সাহিত্যকে অভিভূত করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মন্বন্তরের মহাশ্মশানে বসে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের সার্থকতা। ফ্রয়েড-শিষ্য—তখন পরিণত হলেন মার্কসের অনুরাগী ভক্তে। ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার গতিরোধ করে নবতর সমাজ গঠনের স্বপ্ন তাঁর মনে বলিষ্ঠ আশায় অনুরঞ্জিত হল। নতুন যুগের জয়যাত্রার সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর লেখায়।

এই পর্যায়ে তাঁর প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত গ্রামবাংলাব নিঃস্ব-রিক্ত মৃতকল্প চেহারার অতিবাস্তব সুনিপুণ বিশ্লেষণে। অর্থনৈতিক শোষণে জর্জবিত সমাজব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের শোচনীয় অপমৃত্যু, দুঃসহ বস্ত্রসংকট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তিনি কতকগুলি অসাধারণ গল্প লিখেছিলেন। এইরকমই একটি উৎকৃষ্ট গল্প হল 'দুঃশাসনীয়'।

বিদেশী সরকারের শোষণে নয়, স্বদেশের সরকারী শাসনে গ্রামবাংলায় দরিদ্র মানুষকে যে অবর্ণনীয় বস্ত্রসংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে—'দুঃশাসনীয়' গল্পে লেখক তার করুণ বাস্তবচিত্র এঁকেছেন। তেরশ-পঞ্চাশের বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরেব পটভূমিকায় লেখা এই গল্পটি। এই গল্পের মধ্যে মন্বন্তরের সামগ্রিক চিত্র হয়ত পাওয়া সম্ভব নয়। ঐ মহামন্বন্তবেব একটি খণ্ডাংশ অবলম্বন করেই এই গল্পের সৃষ্টি। কিন্তু ঐ মহামন্বন্তরেব সমস্ত চিত্রটি পাশাপাশি রাখলে হয়ত পাওয়া যাবে মন্বন্তরের অখণ্ড রূপটি।

এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য-বিষয় সমসময়ের ভয়ঙ্কর বস্ত্রসংকট। বাংলার ইতিহাসেব চরমতম দুর্দিনের কিছু খণ্ডচিত্রকে এখানে জীবন্তরূপে তুলে ধরেছেন লেখক। তেরশ পঞ্চাশে শুরু হয় মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে প্রথমদিকে গ্রামগুলো শ্মশান হয়ে যেতে থাকে। এই দুর্ভিক্ষ যে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট একথা বুঝতে হযত একটু সময় লেগেছিল। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল যে ব্যবসায়ীবা কালোবাজার সৃষ্টি করে সব জিনিসেরই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করে। প্রথমে চাল, তারপর তেল, নুন, কেরোসিন সব জিনিসই বাজার থেকে উধাও হয়ে যেতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত কাপড়ও দুর্লভ। দেশে যেন হাহাকার পড়ে গেল। কাপড়ের অভাবে লজ্জা আর নিবারণ করা যাচ্ছে না। প্রথমে গামছা, তারপরে চট, বস্তা এবং অবশেষে কিছুই জুটল না। সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা তাবই

একটা মর্মন্তুদ বিবরণ আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বিবস্ত্র বাংলার নিঃস্ব পল্লীর নগ্নছবি বলা যেতে পারে এই গল্পটিকে।

আগে রাত্রিবেলায় গ্রামগুলোতে ভয়ে গা ছমছম করত। কিন্তু একসময় দেখা গেল ছায়ার মত মানুষগুলো অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় কাজটুকু সেরে নিচ্ছে। গ্রামের সমস্ত নারীই প্রায় বিবস্ত্রা, নারীর কায়া যেন ছায়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। "কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা-আঁধার, কুরু সভায় দৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"

"সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনি করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ-ভাই স্বামীশ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোক সুলভ লজ্জায়, কোন বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয়, কারণ, বাইরে বেরোবার মত আবরণ একখানিই তাদের আছে।"

দিনের বেলা অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাবরণ অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়, চাষীর বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে। কথা বলেনি, শাকপাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করেছে মরণ।"

ভোলা নন্দী বা বৈকুণ্ঠ মালিক—সকলের বৌ-এর আজ একই অবস্থা—সকলেই অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাই ভূতির বারো বছরের ছেলে কানু খিদেয় কাতর হয়ে মায়ের কাছে খেতে চাইলেও নগ্নদেহে ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের খাদ্য দিতে পারে না সে। অথচ একটুকরো বস্ত্রের আশায় অপেক্ষমান জনতাকে বোকা বানিয়ে ওদেরই প্রতিনিধি সুরেন ঘোষ ও আবদুল আজিজ লরী ভর্তি কাপড় নিয়ে পালায় ওদেরই সামনে দিয়ে। ওদেরই মা বোনের নগ্নদেহের ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় তাড়ির গন্ধের আমেজ সৃষ্টি করতে চায় শাসনকর্তার প্রতিনিধি সুদেব।

অথচ কাপড় যে নেই তা নয়। গোকুলের বোন মালতী-বেনারসী শাড়ি পরে বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ-কুনের ছাউনির দিকে সগর্বে চলে যায়। দাসু কামারের মেয়েটা যে গতকাল রাত পর্যন্ত ছায়া ছিল সে-ও আজ ওদের সঙ্গে জুটেছে। তার পরণেও কাপড় জুটেছে। খালি গুদামে শ' শ' গাঁট কাপড় পড়ে আছে। গ্রামের বঙ্কু আর কয়েকজন কৈফিয়ত চাইতে গিয়েছিল, এত-কাপড়-থাকতে তারা কিছু পাচ্ছে না কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মারপিট ও দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিযোগে হাজতে পাঠিয়েছে। গ্রামের জন্য বরাদ্দ করা কাপড় ডিলাররা লরী করে অন্যত্র পাচার করে দেয়। জনতা হাঁ-করে তাকিয়ে দেখে। তাদের সঙ্গে যোগসাজস আছে দারোগা পুলিশের। ঘুষ খেয়ে তারা ব্যবসায়ীর চোরা-কারবারে সাহায্য করে।

ফলে ঘরে ঘরে ভীষণ সমস্যা দেখা দেয়। আনোয়ারের,স্ত্রী রাবেয়া বিশ্বাসই করতে পারে

না যে, দেশে কাপড় নেই। সে প্রশ্ন করে "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে? আজিজ সাহেবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়?" সকলেই পায় কেবল তার স্বামী অপদার্থ বলেই সে স্ত্রীর জন্য একখানা কাপড়ও জোগাড় করতে পারে না। কাপড় নিয়ে এমনি করে ঘরে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি হয়। জ্বর হলে গায়ে চুনের বস্তা চাপিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু এই যন্ত্রণা রাবেয়া আর সহ্য করতে পারছিল না। তার স্বামী কাপড় জোগাড় করতে না পারায় প্রতিমুহূর্তেই সে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাবেয়া আনোয়ারকে বলেছে—"আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।" স্বামী খেতে দিতে না পারায় তার দোষকে রাবেয়া গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু পরতে দিতে না পারার দোষ সে সহ্য করতে নারাজ এবং সেই কারণেই সে প্রতিমুহূর্তে স্বামীকে গঞ্জনা দিয়েছে। অনাহারের জ্বালা সহ্য করা যায় কিন্তু লজ্জানিবারণের জ্বালা বোঝান যায় না। তাই রাবেয়া শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। এক অন্ধকার রাতে পুকুরের জলে ডুবে রাবেয়া আত্মহত্যা করল। বিবিকে যে পরণের কাপড় দিতে পারে না, এমন মরদের পাশে সে শোবে না বলে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল। অভিমানিনী রাবেয়ার আত্মহত্যা ব্যর্থপৌরুষের দরবারে যেন লজ্জা কাতর নারীত্বের অন্তিম ধিক্কার।

এই গল্পে-অভিমানাহত রাবেয়ার আত্মহত্যার চিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'চিরকালের ছবি' হয়ে থেকেছে। আপাতদৃষ্টিতে রাবেয়ার প্রতিবাদ বস্ত্র জোগান না দিতে পারা অক্ষম স্বামীর বিরুদ্ধে-মনে হলেও তার প্রকৃত প্রতিবাদ অর্থপিশাচ অমানবিক মজুতদারের সৃষ্ট বস্ত্রসংকটের বিরুদ্ধে। কিন্তু শত শত দুঃশাসনের রাজত্বে দরিদ্র চাষীর সাধ্য কি যে সে স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। মহাভারতে আছে দৌপদীর বস্ত্রহরণের দায়িত্ব নিয়েছিল দুঃশাসন, আর একালে আধুনিক ভারতে দুঃশাসনদের অত্যাচারের ফলে অপমানিতা দ্রৌপদীরা বাংলার গ্রামে গ্রামে বন্দিনী ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাভারতে দ্রৌপদীর পক্ষে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়েছিল শত্রুর বুকের রক্তপান করে। কিন্তু একালেব স্বামীদের পক্ষে স্ত্রীদের চূড়ান্ত অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভবপর নয়, সেইকারণে একালের দ্রৌপদীদের রারেয়ার মত আত্মহত্যা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য হল এটা কোন ব্যক্তিবিশেষেব কাহিনী না হয়ে গ্রামবাংলার মর্মন্তুদ কাহিনী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরে অনাহারী উলঙ্গ মানুষের অসহায় দুর্দশার চিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতিশীল মনের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল গ্রামবাংলার অসহায় মানুষের দুর্দশার চিত্রই অঙ্কন করেননি, তাদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন। মানুষের দুঃখদুর্দশার বর্ণনা নয়, কিংবা তার জন্য সংহত প্রতিবাদও নয়, কোন্ কারণে সমাজের কোন্ শ্রেণীর

মানুষ কীভাবে খাদ্যাভাব বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করেছে—তাও মানিক দেখিয়েছেন তাঁর এই গল্পে। সকল পীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন এক একটি প্রতিবাদী চরিত্র।

আলোচ্য গল্পে কাপড়ের অভাব অসহায়ভাবে মেনে নিয়েই শুধু তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা চুপ করে থাকেনি, রাবেয়ার আত্মহত্যার নিরুচ্চারিত নিরুত্তাপ বর্ণনার মধ্য দিয়েও লেখক সমাজের ধনী ও দুর্নীতি পরায়ণ মানুষের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা ও জ্বলন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।

দুঃশাসনীয় নামটি সেইকারণে প্রতীকধর্মী। কালোবাজারে বস্ত্র চোরাচালানকারী মজুতদাররূপী অসংখ্য দুঃশাসন গ্রামবাংলার অসংখ্য দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছে। গল্পের নাম সেইকারণেই দুঃশাসনীয়।

কুষ্ঠরোগীর বৌ : জীবন বিচ্যুতি ও জীবন সংলগ্নতা

সুচরিতা ভট্টাচার্য

১৯৫০ সালে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' নামে একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৫৩ সালে এবং তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৫৮ সালে ঐ একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনা ও ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয় যার মধ্যে আমাদের আলোচ্য গল্পটি পঞ্চম গল্প হিসেবে স্থান পায়। গল্পটি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য আরও একটি তথ্য হল ১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় উদয়াচল্ল পাবলিসিং হাউস থেকে "বৌ" নামে। ঐ গল্প সংকলনে 'কুষ্ঠরোগীর বৌ" ছিল ষষ্ঠ গল্প। সংকলনটি নতুন সংস্করণে ১৩৭০ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র লাইব্রেরী থেকে এবং ঐ বছরেই দ্বিতীয় মুদ্রণ ছ'মাস বাদেই একই জায়গা থেকে মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আলোচ্য গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৩ সাল কিংবা তার পূর্ববর্তী সময়।

আলোচনার প্রারম্ভে এই তথ্য-সংবাদটি এই কারণে সন্নিবেশিত হল যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় সমালোচকেরা পরিষ্কার দুটি পর্যায়ে মানিককে বিভক্ত করে থাকেন, ১৯৪৪ পূর্ববর্তী মানিক এবং ১৯৪৪ পরবর্তী মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের যে সংস্করণ বেশির ভাগ পাঠক পড়েছেন সেটি ১৯৫০ সালের বা ১৯৫৩ সালের অথবা ১৯৫৮ সালের মুদ্রণ। ১৯৪৩ সালে কিংবা তার আগেই অর্থাৎ ঐ অলংঘ্য সীমান্তরেখার আগেই যে গল্পটি লেখা হয়েছিল এটা জানা দরকার। মানিক বিভক্তিকরণ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তও জানানো দরকার। গল্প বিচার করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া অথবা প্রবাদ হয়ে যাওয়া সেই সন্ধান অর্থাৎ ফ্রয়েডের মানিক বা মার্কসের মানিক—এর শতকরা সুদকষার হিসেবে আমরা আদপেই যাব না। ব্যাপারটি আমাদের কাছে শিল্প নিরীক্ষার মানদণ্ড হিসেবে বড় স্থূল অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক মনে হয়। আপাদমস্তক সাহিত্যিক মানিকই আমাদের কাছে শেষ কথা। এই সাহিত্যিক প্রবণতার প্রস্তুতি শুরু হয় তাঁর ১৯-২০ বছর বয়স থেকে এবং তিনি যতদিন সচেতন-সুস্থ ছিলেন অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত ততদিনই লেখার ব্যাপারে নিরলস ছিলেন। দুর্লভ আর পাঁচজন মহৎ সাহিত্যিকের মতই জীবনের সত্যসন্ধানে সাহিত্য রচনা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতীন এবং মহাশ্বেতার দাম্পত্য জীবন কুষ্ঠরোগের কারণে বদলে গেল—এই সরলরৈখিক সারসংক্ষেপ গল্পটির আপাত চেহারা। আসলে অসুখী দাম্পত্য মানিকের প্রিয় বিষয় বা অবসেসন। কাজেই যতীনের শরীরে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব আসলে একটা কৌশল মাত্র। সম্পর্ক যাচিয়ে নেওয়ার ছক। এমনিতে যেভাবে দুজনের সংলাপ শুরু হয়েছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একটি পারস্পরিক প্রেমে আপ্লুত স্বামী-স্ত্রীর গল্প শুরু হল। কিন্তু লেখক যেহেতু মানিক তাই সংলাপের ভাষা বহুমাত্রিকতা পেতে থাকে প্রথম থেকেই। সুদর্শন, সুগঠিত এবং অতিমাত্রায় ধনী যতীনকে মহাশ্বেতা কী কারণে ভালবাসে সে নিজেই জানে

না। সে সংশয়ান্বিত যতীনের রূপ না যতীন তার কাছে বেশি আকাঙ্ক্ষার। অনুচ্চারিত থেকে গেছে না বলা কিছু অনুভব। মহাশ্বেতা বলেছে 'ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!''—ঈর্ষা কেন? যতীনের রূপমুগ্ধ হতে পারে যে কোন নারী যে কোনদিন সেই ভাবনায় ঈর্ষা? সেই অদর্শনাকে ঈর্ষা নাকি যতীনের চেহারার চৌম্বকশক্তিকে ঈর্ষা? নিজের চেহারার সাধারণত্বের তুলনায় স্বামী বস্তুটি বেশ অতিরিক্ত পাওনা বলে মনে করে কী মহাশ্বেতা? খুব জটিল হয়ে পড়ে চরিত্রটি গল্পের প্রথম থেকেই। এই জটিল মানুষের মনের অন্ধকার কুঠুরিগুলিই মানিকের মোক্ষম টার্গেট।

স্বামীর অসুস্থতায় ডাক্তার দেখিয়ে হয়রান মহাশ্বেতা যখন নিশ্চিত জানল যে রোগটা কুষ্ঠ তখন সে বলল, 'আমার কপাল'। পাপীদের কুষ্ঠ হয় এই সংস্কার থেকে সমস্ত পাপের বোঝা নিজের মাথায় নিল সে। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালবাসার কারণে নাকি মহাশ্বেতার নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের ধাক্কায় বিহ্বলতায় এমন কথা বলেছে সংশয় থেকে যায়। চরিত্রটি দ্বিতীয় মানসিক স্তরে এসে পৌঁছায় গল্পে। মহাশ্বেতার মনে হয়েছে ঘটনাটি অত্যন্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত। তার নিশ্চিন্ত দিনরাত হঠাৎ করে ঝোড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়েছে। থাকে থাকে থরে থরে সাজানো জীবনপ্রণালীতে বড় রকমের ফাটল দেখা দিল। ভেঙে পড়ল একেবারেই মহাশ্বেতা। এই অবস্থায় কোনরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারার মত মানসিক জোর সে পায় না। পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করে ঘোরের মধ্যে। এও ভালবাসায় নয়, ''যতীন যা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনো সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না।'' নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর সেবা করার বর্ণনা শোনানোর পরই জানা যায় ''অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না।.....যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত সব কিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোন উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।'' যন্ত্রের মতন সেবা করে যায় মহাশ্বেতা। নির্বাক নিস্তেজ নিরুত্তাপ সেই যত্ন। এ কোনো অর্থেই ভালবাসা নয়। অনেককাল ধরে নারীর অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্বামী পাপী তাপী লম্পট যেমনই হোক তাকে সেবা করতেই পতিব্রতার পারাণীর কড়ি সংগৃহীত হয়। পাঁচালীর মত এই ধ্রুবপদ মা থেকে মেয়ে মেয়ে থেকে মা—চলতেই থাকে অন্তহীন সমাজবিধির মত।

চারবছর দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় অভ্যেস বোঝাপড়া সবটাই বদলে নতুন করে নতুন গতিতে বিন্যস্ত হচ্ছে। জীবনযাপনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে মহাশ্বেতা হতভম্ব। শঙ্কিত বিহ্বল মহাশ্বেতা এতটাই মুহ্যমান যে রক্ত পুঁজে পচে যাওয়া ফেটে যাওয়া হাত দিয়ে যতীন যখন তার হাত চেপে ধরে তখন সে শিউরেও ওঠে না। সংক্রমণের ভয়ও তার নেই যেন। দিনরাত সে ভেবেচলে এ কী হল! তার অদৃষ্টে কেন এমন হল! জীবন তার কাছে স্তব্ধ হয়ে গেছে। রুদ্ধগতির এই জীবনে বেঁচে থাকাটা বেমানান লাগে তার কাছে। তাই যতীন অনুরোধ করলে তার ঐ গলে যাওয়া আঙুলে চুমুও খেতে পারে সে স্বামী আজ্ঞা পালন করার জন্য। এও কিন্তু প্রেম নয়। আত্মঘাতী নিশ্চলতামাত্র। একদিন যতীন রাতে নিজের আলাদা হওয়া বিছানা ছেড়ে স্ত্রীর বিছানায় উঠে আসে। মহাশ্বেতা চুপ করে সহ্য করে। এ গল্প কিন্তু কোন জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার কাহিনি নয়। মানুষের গল্প। তাই দেখা যায় যতীনের

শরীর সংযোগের সময় মহাশ্বেতা চোখ বন্ধ করে থাকে। ভয় থেকে? সংক্রমণের ভয় নাকি কদর্য চেহারার যতীনকে ঘেন্না লাগে দেখতে। যাই হোক, এই প্রথম মহাশ্বেতার ঘোর কাটে তারই একটা প্রতিক্রিয়া হল নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ বন্ধ করা। মহাশ্বেতা তার পরবর্তী তৃতীয় স্তরে পৌঁছল বলা যায়। এরপর সে দ্রুততার সঙ্গে একা একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নেয়। সচেতন এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত। স্বামীর অধিকারে যে বীজ ফেলে যতীন মহাশ্বেতার শরীরে, সেই অনাগত শিশুটিকে পৃথিবীতে না আনার সিদ্ধান্ত নেয় সে। ব্যাধিগ্রস্থ সন্তান সে চায় না। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নিশ্চলতা কেটে গেছে তার। সক্রিয়তা আসছে দ্রুত তার মানসিকতায়। এবার তার দমবন্ধ হয়ে আসে। মুক্ত একটা পরিবেশের জন্য মরিয়া হয় মহাশ্বেতা। যতীনকে কোথাও যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। মহাশ্বেতা সমুদ্রের কাছে যেতে চায়। যতীন নস্যাৎ করে দেয়। যতীনের ব্যবহার রূঢ় থেকে রূঢ়তর হতে থাকে। পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলেছে বলে যতীন যাচ্ছেতাই গালাগালি শুরু করে মহাশ্বেতাকে। মহাশ্বেতা এমন ভাব দেখায় যেন এটা তার একদম নিজস্ব ব্যক্তিগত ঘটনা। যতীনের উদ্বিগ্ন হওয়াটা নিরর্থক। সে যেন ব্যস্ত না হয় ঘটনাটায়। এমনকি যতীন তাকে পাপিষ্ঠা বলাতেও সে মর্মাহত হয় না, হাসে। স্বামীর কাছ থেকে উঠে গিয়ে জানলায় দাঁড়ায়। বলে, "কী বৃষ্টিটাই নাবল। দেখি একটু।" যতীনের কোনো আক্রমণ সে তার কাছে পৌঁছতে দেবে না এমনটাই ঠিক করে নিয়েছে মহাশ্বেতা—'মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে।" আত্মরক্ষার ন্যূনতম প্রচেষ্টা দেখা যায়নি এ যাবৎ তার মধ্যে কিন্তু একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বোঝা যায়। মহাশ্বেতা একঘরে আলাদা বিছানায় না থেকে পাশের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে নিজের। যতীনের ব্যাধি আর ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বইতে গিয়ে মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে দাম্পত্যজীবনের সমস্ত সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথমদিকে বিহ্বল হয়ে নিষ্ক্রিয়তায় যে শান্ত হয়ে গেছিল, এখন যতীন তার জীবন থেকে এক অসংখ্য নিয়মে কেমন বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এটা নতুন অভ্যেস পরিণত হচ্ছে যা আর তাকে অবাকও করে না। কারণ, "মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে।" দুটি ঘরের মাঝে একটি বন্ধ দরজা। যতীনের হিংস্র অধিকারবোধ তাদের যৌথ জীবনের পারাবারের শেষ সেতুটিকে ছিন্ন করে দিয়েছে। দু ঘরে দুজনে বিনিদ্র রাত কাটায়। যতীন নিজেকে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত মনে করে আর মহাশ্বেতা জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কী নিয়ে বর্তমান এবং অনাগত জীবন কাটাবে তাই খুঁজতে থাকে নিঃস্পন্দ হয়ে। ম ম করা দাম্পত্যের প্রথমদিককার শরীরী উৎসবের কথা মনে উঁকি দেয় আর অচিরেই কর্পূরের মত উবে গিয়ে বিকৃত গলিত যতীনের শরীরে এসে সেই ভাবনার স্রোত অসাড় হয়ে যায়। লেখক বলেছেন, "একটি নবজাত শিশু......জন্মিয়া মরিয়া যায়। বার বার জন্মিয়া বার বার মরিয়া যায়।" একটি শিশুর মৃত্যুসংবাদ পাঠক জানতে পেরেছে। তাও শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল না কি ভ্রূণ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছিল তা গল্পে স্পষ্টতা পায়নি। যতীনের এ প্রসঙ্গে আক্রমণের উত্তরে মহাশ্বেতা বলেছে যে, "ছেলে ছেলে করে তো মরছ। গুণে জেনেছ ছেলে?" যাই হোক যে অবস্থাতেই হোক না যে কেন একটি নতুন জীবন জন্মাতে পারেনি মহাশ্বেতার

সিদ্ধান্তের কারণে এটা জানা গেছে। কিন্তু 'বার বার জন্মিয়া বার বার মরিয়া যায়'—কথাটি কেন বললেন লেখক? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সে মহাশ্বেতার চিন্তার সূত্র ধরে কথাটি বলা। এইসব শিশুরা মহাশ্বেতার কল্পনায় জন্মায় এবং জন্মাতেই থাকে আবার ধারাবাহিক ভাবে কল্পনাতেই তাদের মেরে ফেলতে হয় মহাশ্বেতাকে। ব্যাধিগ্রস্থ সন্তান যে পৃথিবীতে আনবে না। অথচ মাতৃত্ব যে কোন নারীরই স্বাভাবিক কামনা, কখনও অন্তিম কামনা। এই মাতৃত্ব এই জীবনে মহাশ্বেতা আর কোনদিন লাভ করতে পারবে না। কোমলে কঠোরে ধীরে ধীরে চরিত্রটি অসামান্য হয়ে উঠতে থাকে। জীবনটাকে মেনে নিয়েছে সে। শুধু নিজের মত করে এবং নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত সে নিচ্ছে পরপর। পরিস্থিতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। পরিস্থিতি এতদিন তাকে চেপে ধরেছিল, এবার সে যুঝছে নিজের সঙ্গতি এবং অস্ত্র সমেত। সুস্থ যতীন যুক্তিবাদী ছিল। নাস্তিকও ছিল। আক্রান্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে দুর্বল মনে ঠাকুর দেবতার প্রত্যাদেশের অলৌকিক কিছু ঘটে যেতে পারে এমন বিশ্বাস করে বসে। ধর্মস্থানে গিয়ে স্ত্রীকে 'হত্যে' দেওয়ার কথা বলে। মহাশ্বেতার ধর্মভাবনা কী ছিল আমরা আগে জানতে পারিনি। স্বামীর কথার উত্তরে সে জানায় যে দেবতায় বিশ্বাস তার নেই আর হত্যে দেওয়ার কথা ভাবলে তার হাসি পায়। অর্থাৎ একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে যাচ্ছে চরিত্রটি। স্বামীর আদেশ পালন না করার সাহস সে দেখাচ্ছে নিজের মতামতসহ। মিসেস দত্ত, যতীন দত্তের স্ত্রী থেকে ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে উঠছে। গল্পের শুরুতেই লেখক বলেছিলেন "নারীর মত মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই," এটাই গল্পটির চাবিকাঠি। মহাশ্বেতা কারুর বৌ বলেই তার মালিকানাধীন সম্পত্তিমাত্র নয় এই সত্য জীবনের মার খেয়ে সে বুঝছে এবং তার প্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছে জীবনাচরণে। এই মহাশ্বেতাকে অভিসম্পাত করে যতীন। পাপী মনে করে। যতীন অভিশাপ দেয় পাপে কুষ্ঠ হবে মহাশ্বেতার। পচন ধরবে শরীরে। আগুনে পোড়া এই দৃপ্ত বর্ণিনীকে রোজকার জীবনে সহ্য করা যে কোন পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন।

এই ঘটনার পর যতীনে সঙ্গ সে প্রায় ত্যাগ করল। সেবা করা আগেই বন্ধ করেছিল এবার আসা যাওয়াও কমিয়ে দিল। সকালে একবার আর রাতে একবার উঁকি দিয়ে যায় ক্ষণেকের জন্য। অবস্থাটা পালটাতে মরিয়া যতীন পীঠস্থানে যাত্রা করে প্রত্যাদেশের প্রার্থনায়। মহাশ্বেতাকে সে রাজি করিয়েছিল সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কথা দিয়েও যাওয়ার সময় দেখা পেল চাকরকে সঙ্গে নিয়ে মহাশ্বেতা কালীঘাট চলে গেছে। প্রত্যয়ী হয়ে ওঠার শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে কুষ্ঠরোগীর বৌ ওরফে আমাদের মহাশ্বেতা। যতীন যেদিন কামাখ্যায় গেছে সেইদিনই মহাশ্বেতা কালীঘাটের ভিখিরিদের একধামা পয়সা বিতরণ করেছে। কীসের আনন্দে? কোন প্রত্যাশায়? ঠাকুর দেবতায় অন্তিম বিশ্বাস করে তাই ভিখিবিদের দান করে পুণ্য অর্জনের আশায়? নাকি যতীনের উপস্থিতি থেকে ক্ষণিক বিরামের আনন্দে? আরো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল পাঠকের কাছে। সেদিনই বাড়ি ফিরে, যতীন-হীন সেই বাড়িতে মহাশ্বেতা কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম খুললো। ভিখিরিদের মধ্যে কেউ কেউ কুষ্ঠরোগীও ছিল। চেহারা তাদের বীভৎস। তাদেরই পাঁচজনকে পথ থেকে ধরে এনে মহাশ্বেতার নতুন জীবনপ্রণালী শুরু হল। সাতদিনের মধ্যেই আশ্রমের সদস্যসংখ্যা পাঁচ থেকে বেড়ে একুশে পৌঁছল। এদের

জন্য চাকরবাকর, জমাদার, ডাক্তার—সবেরই এলাহি ব্যবস্থা করল সে। বাড়ির লোকজন স্থানান্তরিত হল অন্যত্র। নার্সের জন্য, অভিজ্ঞ শিক্ষিত নার্সের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। নার্স ঠিক হওয়ার আগেই আচমকা যতীন ফিরে এল। ফিরে এসে তাজ্জব হয়ে গেল বাড়িতেই কুষ্ঠাশ্রম দেখে। কিন্তু মহাশ্বেতা যতীনকে রেগে যাবার কোন সুযোগই দিল না। যতীনকে সে বলল যে যতীনের কল্যাণের কামনাতেই কালীঘাটের এক তেজালো সন্ন্যাসীর আদেশে সে আশ্রম খুলেছে। যতীন তো অভিভূত। বৌ তার বশেই আছে ভেবে সে বলল যে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটা ওষুধ চেয়ে রাখা উচিত ছিল মহাশ্বেতার। পরিণত মনস্ক মহাশ্বেতার কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হল যতীন। মহাশ্বেতার ফাঁকি, মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া যতীনের চোখেও পড়ল না।

অথচ একদিন ছিল যখন সে মিথ্যে বলতে পারত না। ফাঁকি দিত না। অবিচলিত সত্যকেই স্বামীর সামনে আনত। তখন পদে পদে যতীন তাকে অপদস্থ করেছে। অপমান করেছে। নারীত্বের অবমাননা ঘটেছে। সেবায় ক্লান্ত, ম্লান হওয়া, শ্রান্তিতে স্তিমিত হয়ে যাওয়া মহাশ্বেতার রূপকে যতীনের মনে হয়েছে তার কুষ্ঠরোগের সুযোগ নিয়ে পরপুরুষের আসঙ্গে পরিতৃপ্ত হওয়ার ঐশ্বর্য। তখনো মহাশ্বেতা অভিনয় জানত না। কৌশল জানত না। কিংবা কাছের মানুষের সামনে অভিনয়ের দরকার হয় এটা জানা ছিল না। স্বামীর আচমকা কুষ্ঠ হওয়ার অভিঘাতে সে ছিল হতভম্ব। অবলম্বন খুঁজছিল কাতর মহাশ্বেতা। বিয়ের চারবছরেই নির্ভরতা হারিয়ে সে ছিল দিশেহারা। আজ সে তার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। এই আশ্রম, কুষ্ঠরোগীর সেবায় আত্মনিয়োগেই জীবনের আশ্রয় সে খুঁজে পেয়েছে। তাই কোন কিছুর বিনিময়েই সে আঁকড়ে ধরা এই পরমার্থকে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। সন্তানের জন্য তুলে রাখা সমস্ত মমতা, বুকের সবটুকু ওম দিয়ে পচন ধরা বিকৃত চেহারার মানুষগুলোকে সে সেবা করে। নিজে সে আর কোনদিন গর্ভে সন্তানকে জন্ম দেবে না, তাই এই গলিত মানুষগুলো মহাশ্বেতার মাতৃত্বের সবটুকু সতর্ক উষ্ণতা পায়। একুশ থেকে সংখ্যাটা বেড়ে পঁচিশ হলে তার আহ্লাদের সীমা থাকে না।

মাতৃত্বে মহাশ্বেতা ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে কী ক্রমশ গল্পের শেষে? কিন্তু গল্পকার যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এমন সরলরৈখিক নিয়তি নেই গল্পটির। যতীন অভিযোগ করে, অভিমান করে তার দিকে মহাশ্বেতার নজর নেই। সে খালি আশ্রিত কুষ্ঠরোগীদেরই সেবা করে, স্বামীকে করে না। মহাশ্বেতা উত্তর দেয় না। পূর্ণ মহাশ্বেতা সত্যির সামনে দাঁড়ায়। পরাজিত, নতজানু যতীনকে আঘাত করতে ইচ্ছে হয় না তার। যতীন আজ অসহায়। অসহায় শরীরে যতখানি তার চেয়েও বেশি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়ী মহাশ্বেতার ব্যক্তিত্বের প্রবলতার কাছে। স্বামীত্ব, প্রভুত্ব ফলানো আজ আর সম্ভব নয়। সে জেনে গেছে জোর করে অধিকারের দাবিতে কিছু চাইলে আজ আর কিচ্ছুটি মিলবে না। একদিন মহাশ্বেতা স্ত্রী ছিল শুধুমাত্র। সুদর্শন যতীনের অহংকারী বউ। সে ভালবাসত তার অবস্থানকে। মিসেস দত্ত হওয়ার গৌরবটুকু ছিল তার একমাত্র অনুপম অবলম্বন। তার ধারণা ছিল এই অবস্থানটা অনড়। হঠাৎ সুনামীর ধাক্কায় গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেল তার। বিমূঢ় মহাশ্বেতার নিজেকে সামলাতে সময় লেগেছে। স্বামীর কুষ্ঠরোগকে উপলক্ষ্য করে জীবনকে দেখার দৃষ্টি তার বদলালো। ভয়ংকর রোগটি

যতীনের দেহ নয় তাদের দাম্পত্যের পচনটি দেখিয়ে দিয়েছে মহাশ্বেতাকে। যতীনের অপরূপ দেহটি তার মনটিকে আড়াল করেছিল। গলে যাওয়া শরীর থেকে মাংস খুবলে যখন ভেতরের অন্ধকার কদর্য আড়ালটি বেরিয়ে এল তখনই মহাশ্বেতার নতুন জীবন পরিক্রমা শুরু হল। লেখক বলেছেন একসময় পথের কুষ্ঠরোগীকে সে ঘেন্না করত আর স্বামীকে ভালবাসত, "স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।" "তাই" শব্দটির প্রয়োগ কেন করলেন তা যথেষ্ট ভাবায়। অবান্তর বা অতিরিক্ত নয় এই প্রয়োগ। শব্দটি ভেবেচিন্তে লেখা। স্বামীর রূপের অপরূপ মোহাবশে মহাশ্বেতাকে আচ্ছন্ন করেছিল। নেশাধরা গর্বিতা সেই বউটি জীবনের অন্যদিক দূরঅস্ত নিজেকেও জানার প্রয়োজনবোধ করেনি। অন্ধ ছিল। অন্ধত্বের কারণ ছিল সর্বনাশা রূপের মোহ । স্বামীর কুষ্ঠ হওয়ায় সে নিজেকে জানল। প্রিয় মানুষটি মসৃণ পরিস্থিতি না হলে কেমন ব্যবহার করতে পারে, কত নীচ হতে পারে চিনতে পারল। দাম্পত্য জীবনকে, তার পরিধিকে জানতে পারল। নিজের শক্তিকেও চিনতে শিখল। পথের কুষ্ঠরোগীদের দেহটা শুধু পচেছে মনে পচন ধরেনি। "তাই" আজ সে তাদের ভালবাসে। এই ভালবাসায় অধিকারবোধের হিংস্রতা নেই। প্রতিদান না পাওয়ার আক্রোশ নেই। তবু ওরা প্রতিদান দেয়। আশ্রয় আর সেবার প্রতিদানে ওরা নিরন্তর আশীর্বাদ করে মহাশ্বেতাকে। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের আশীর্বাদ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে। ওদের যা দেয় মহাশ্বেতা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পায় সে। নিজের মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদ পায় মহাশ্বেতা ওদেরই কারণে। তাই মহাশ্বেতাই কৃতজ্ঞ ওদের কাছে। নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছে মহাশ্বেতা। আশ্রিত রোগীরা কত অসহায় জানে মহাশ্বেতা। আশীর্বাদই মাত্র করতে পারে ওরা। ওইটুকুই ওদের ক্ষমতা। ক্ষমতা নেই কিছুমাত্র রোগগ্রস্থ যতীনেরও। কিন্তু অপমান আর অভিসম্পাত করেছে সে মহাশ্বেতাকে সেবার প্রতিদানে। স্ত্রী যে তার সম্পত্তি একথা অসহায় মুহূর্তেও ভোলেনি সে। সে প্রভু। মালিক সে অধস্তনের বেয়াদপি সে বরদাস্ত করবে কেন! অপারগ অবস্থাতেও মহাশ্বেতার মালিকানা আর কারুর হস্তগত হল কিনা সে সংবাদ নেয় এবং কুরুচিকর মন্তব্য করে। "তাই" মহাশ্বেতা পথের কুষ্ঠরোগীদের ভালবাসে, কিন্তু মনের কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত স্বামীকে ঘেন্না করে। দাম্পত্য আর তাদের কোনো অর্থেই বেঁচে নেই তবু স্বয়ংনির্ভর হয়ে ওঠা এই মানুষটিকে শিক্ষিত ভদ্রজনের কাছে সামাজিক পরিচয়ে মিসেস দত্ত আর অশিক্ষিত ইতরজনের কাছে "কুষ্ঠরোগীর বৌ" পরিচয়েই বেঁচে থাকতে হবে।

গোটা গল্পটিতে নামকরণ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত মহাশ্বেতা ছেয়ে আছে। কিন্তু মহাশ্বেতার গল্প হলেও মহাশ্বেতা বাদে যে চরিত্রগুলি আছে তারাও সজ্জার প্রয়োজনে নয় গল্পের তাগিদে এসেছে এবং লেখক অত্যন্ত যত্ন নিয়ে তাদের এঁকেছেন। মহাশ্বেতার স্বামী যতীন চরিত্রটির ডিটেলিং চোখে পড়ার মত। তার অসুখ, অসুখ থেকে তার অসহায়তা, অসহায়তা থেকে সঞ্চারিত তীব্র কুটিল স্বার্থপরতার প্রতিটি স্তর সমান যত্ন পেয়েছে, এমনকি কিছু কিছু অংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার গুণে যতীন চরিত্রটি পাঠকের সহানুভূতিও ছিনিয়ে নেয়। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জন্ম নেওয়া বড় হওয়া পুরুষ মানুষের পক্ষেও কম বিড়ম্বনার নয় কখনও কখনও।

এরা দুজন ছাড়া আর যে চরিত্র গল্পের প্রয়োজনে এসেছে তারা হল চারজন ডাক্তার। যতীনের অসুস্থতা ঠিক কী যখন ধরা পরেনি তখন তিনজন ডাক্তারের তিনরকম সংলাপ গল্পটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভিজিট অনুযায়ী ডাক্তারের সংলাপের ধরণ বদলেছেন লেখক। ভারি চমৎকার। ষোলো টাকা, বত্রিশ টাকা এবং একশো টাকা ভিজিটের তিনজন ডাক্তারের তিনধরনের সংলাপ সমাজমনস্ক মানিককে চিনিয়ে দেয় নতুন করে। এছাড়া মহাশ্বেতা যখন জীবন চিনছে, কুষ্ঠরোগীদের জন্য বাড়িতে আশ্রম খুলেছে, সেই সময় একজন ডাক্তার দু বেলা রোগীদের দেখার জন্য ঠিক করেছিল মহাশ্বেতা। ডাক্তারটির বয়স কত জানা নেই, দেখতে কেমন জানা নেই, শুধুমাত্র তার সংলাপ আছে চার ক্ষেপ। তাতেই যেন মনে হয় ডাক্তারটি প্রৌঢ়, সৌম্যদর্শন, সমাজ সম্বন্ধে, সামাজিক মানুষ সম্পর্কে, আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন জীবন সম্পৃক্ত মানুষ। আর মনে হয় বড় দার্শনিকও মানুষটি। পেশা তাকে দার্শনিক করেছে নাকি দার্শনিক মানুষটি এই পেশাটি বেছে নিয়েছেন জানা নেই। সমাজ ভাবনায় কুষ্ঠরোগ, সামাজিক ব্যবস্থার নাবালকত্ব, আইন ব্যবস্থার ইচ্ছাকৃত গয়ংগচ্ছভাব আর কুষ্ঠের চেয়েও বা কুষ্ঠের মত আরও কত ভয়ানক রোগ যে সংসারে আছে সে সম্বন্ধে মহাশ্বেতাকে সচেতন করতে সাহায্য করে এই ডাক্তারটি। সমাজসংসারের সেই পচন প্রাথমিক স্তরে চোখে দেখা যায় না। শপিংমল, ফ্লাইওভারের মোহাবেশের আড়ালে যেমনটি এখন অর্থনীতির দেউলেপনা, মানবিকতার দীনতা চোখে পড়ে না। একটি মানুষ, তার অসুখ, তাদের দাম্পত্যসূত্র ধরে সমাজের একটি বড় সত্যকে সামনে আনলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাশ্বেতা সবল যে মনোভূমিটি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায় তাতে এই ডাক্তারটির কিছুটা ভূমিকা থেকেই যায়।

গল্পটি বেশ নির্মম। কঠিন সত্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা গল্পটায় ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়েছেন। দেখেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন পক্ষপাতহীন বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে। সাধুগদ্যের এলায়িত ভঙ্গিটি এক্ষেত্রে তাকে সঠিক সঙ্গত করতে পারবে এরকমই মনে করেছেন তিনি। সত্যিই, নির্মমতা যেন খানিক হাঁফ ছাড়তে পেরেছে বিস্তারিত এই গদ্যে। বিষয় প্রখর এবং নির্মম কাজেই মাধ্যমটি যদি টান টান আকাশহীন ফাঁকফোকরহীন চলিত গদ্য হত তবে হয়ত বা নিষ্ঠুরতার নিরুত্তেজ কারুকাজ তেমন দর্শনীয় হত না। মানিক যাঁরা পড়েন তারা অবশ্য রক্তাক্ত হবেন জেনেই পড়েন। সত্য শিব সুন্দরের খোঁজে তাঁরা মানিকে আসেন না। ক্ষত দগ্ধ হয়ে জীবন সত্যের মুখোমুখি তাঁরা হন। সেই সত্যও আবার অবিচল অনড় সত্য নয়। পরিস্থিতি বদলালে বদলে যায় সত্যের প্রকার। কাজেই জীবনের মোহাবেশ আর থাকে না। কিন্তু জীবন এমন ভেলকি জানে যে মানুষ আবার জীবনের কাছেই নতজানু হয়, ফিরে আসে জেনে শুনে বিষপানের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে। এই জীবনবিচ্যুতি এবং জীবনসংলগ্নতাই মানিক-ম্যাজিক।

বিবেক : এক অনতিক্রম্য সংস্কার

স্বাগতা মুখোপাধ্যায়

১৩৪৯ সালেব 'দেশ' পত্রিকায় 'বিবেক' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্প সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয় এটি। পরে ১৩৫৭ সালে বেরোয় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'। সেখানেও এটি নির্বাচিত হয়। আবার ১৩৬২ সালে স্বনির্বাচিত গল্প সংগ্রহেও ছাপা হয় গল্পটি। অবশ্য স্বনির্বাচিত সঙ্কলনের ভূমিকাংশ 'লেখকের কথা'য় তিনি জানিয়েছেন, 'দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।' —এই কারণে যে, সন্তানতুল্য প্রত্যেকটি সৃষ্টির প্রতি পিতৃসুলভ স্নেহান্ধতা এবং মায়া থেকে যায়।—এ উপলব্ধি স্বয়ং লেখকের। তথাপি একাধিকবার সঙ্কলিত হয যে গল্প, তা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

দুই

'চুরি চুরি খেলা' গল্পে বিষাদগ্রস্ত অনন্ত বলেছিল, 'জীবনটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে মাধুরী'। মাধুরী উত্তর দিয়েছিল, 'জীবন দুর্বোধ্য বই কি।' অনন্ত-র ব্যক্তিগত অনুভবকে সচেতনভাবে মাধুরী প্রসারিত করেছে বিশ্বগত সত্যে! জীবন দুর্বোধ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের সেই দুর্বোধ্যতার রূপকাব। কোনও সুনির্দিষ্ট ছকে সে জীবন অতিবাহিত হয় না। তাই পরীক্ষায় ফেল করেও জীবন যুদ্ধে উত্তীর্ণ বিমল, আর নীরেন পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও বেছে নেয় আত্মহননের পথ (পাশ ফেল), স্বামী গণপতির ফাঁসীর আদেশ মকুব হয়ে গেলেও আনন্দে উদ্বেল হয় না স্ত্রী রমা। ববং হঠাৎ একদিন শোনা যায়, 'বাড়ির মেজবৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসী দিয়া মরিয়াছে।' (ফাঁসী), চুরি কবে অদ্ভুত তৃপ্তি বোধ করে মধু (চোর), আর বিপদ-গ্রস্ত দরিদ্র বন্ধুর টাকা নির্দ্বিধায় আত্মসাৎ করে যে, সেই আবার ধনী বন্ধুর থেকে চুরি করা সোনার ঘড়িটি ফেরত দিয়ে আসে (বিবেক)। বোঝা যায়, জীবন দুর্বোধ্য। জীবন দুর্জ্ঞেয়। জীবনের রহস্যভেদ কঠিন। তবে অসম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের যে সকল আচরণকে অসঙ্গতি পূর্ণ মনে হয় তারও নেপথ্যে ক্রিয়াশীল থাকে গভীরতর কোনও কার্যকারণ। অনুসন্ধানী লেখক চরিত্রের মনের গভীরে আলো ফেলে জেনে নিতে চান সেই রহস্য।

তিন

'বিবেক' গল্পের প্রধান চরিত্র ঘনশ্যাম। চাকরী খুইয়ে এই ছাপোষা মানুষটি এখন হতদরিদ্র। দারিদ্রের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদে, প্রথম তিনটি পংক্তিতেই : 'শেষ রাত্রে একবার মণিমালাব নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। শিয়রে ঘনশ্যাম অত্যন্ত সজাগ হইয়াই বসিয়াছিল। স্ত্রীর মুখে একটু মকরধ্বজ দিয়া সে বড় ছেলেকে ডাকিয়া তুলিল।'' প্রথম বাক্যে মণিমালার 'নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার' সংবাদ এবং দ্বিতীয় বাক্যে ঘনশ্যামের উদ্বিগ্ন চিত্তে রাত জাগার তথ্য থেকে বোঝা যায় মণিমালার অসুস্থতা কোনও আকস্মিক অঘটন নয়, এ রুগ্নাবস্থা সম্ভবত বেশ কিছু দিনকার। অথচ তার শিযবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোন সেবিকা নেই। তদুপরি, তার অন্তিম মুহূর্তের শুশ্রূষা শুধুমাত্র

মকরধ্বজ। এই কটি সূত্রে ধরা পড়ে পরিবারের নিরুপায়ত্ব। একটি পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায় এভাবে। এরপর "ঘরে একটিও টাকা নাই, শুধু কয়েক আনা পয়সা।"—বাক্যটি পাঠকের মনে গড়ে ওঠা ধারণাকে স্বচ্ছতা দেয় মাত্র। এখান থেকেই লেখক ঘনশ্যামের চিত্ত বিক্ষেপের প্রতিটি মুহূর্তকে পাঠকের কাছে মেলে ধরেছেন। তার মনো জগতের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি।

চার

এ প্রসঙ্গে প্রশ্নটি অবান্তর নয় যে, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, নিঃসম্বল চরিত্রকে 'বিষয়' করার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্ক্সবাদে বিশ্বাস কোন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল কিনা। উত্তরঃ না। সহজ হিসেবটা এই যে, গল্পটি রচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত লেখক কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হননি। ১৯৪৪ সালে তিনি পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। অবশ্য সদস্য হওয়ার পূর্বে মার্ক্সবাদ তাঁর অপঠিত ছিল ভাবা নির্বুদ্ধিতা। বরং বলা যায়,গল্পে কাদের তিনি উপজীব্য করে তুলবেন তার জন্য তাঁর সাম্যবাদে দীক্ষার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। প্রয়োজন পড়েনি কল্লোলীয়দের অনুসরণ করারও। বুদ্ধদেব বসু An Acre of green grass এ তাঁকে 'belated Kallolean' বললেও কল্লোল থেকে তিনি ছিলেন বহু দূরবর্তী। এই গোষ্ঠির ঘোষণা ও আচরণের অসঙ্গতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। মানিকের নিজের কথায়, "জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পেছনে ছিল না।" আবার তাঁর সমকালের পট পরিবর্তন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, বেকারত্ব, ছাটাই—এই টাল-মাটাল সময় তাঁকে প্রভাবিত করেনি তা নয়। তবু গরীব নীলমণি, (আত্মহত্যার অধিকার), ভিখু (প্রাগৈতিহাসিক) কিংবা ভোলার (দুঃশাসনীয়) কথা তাঁর রচনায় এসে যায় কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বা আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, জীবনের জটিলতম বাস্তবকে ফুটিয়ে তোলার মানসিক তাগিদে। এ তাগিদ তাঁর স্বভাবগত, মজ্জাগত, স্বতঃস্ফূর্ত। লেখকের জীবন যাপনের টুকরো কিছু আলোচনায় এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করা যায়। আমরা জানি, অদ্বৈত মল্লবর্মনের মতো পারিবারিক দিক থেকে নীচুতলার মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু দরিদ্র জীবনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটা তাড়না তাঁর মধ্যে ছিল। ভদ্র জীবনের যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ জমে উঠেছিল তাঁর মনে। তাই কখনো 'ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনে পালিয়ে মনের প্রশান্তি খুঁজেছেন লেখক। সদ্য কৈশোরে হঠাৎ একবার নিখোঁজ হয়ে গেলেন মানিক। খোঁজ পাওয়া গেল, টাঙ্গাইলের নদীর ধারে যে নৌকাগুলি নোঙর করা থাকে, তাদের মাঝি মাল্লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের মধ্যে সে দুচারদিন থেকে এসেছে।' এ আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত পাগলামী। আবার 'রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে' শীঘ্রই হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবে, গল্প লেখার সময় মানিক আত্মীয় পরিজনের পাশাপাশি অসংখ্য পরিচিত মুখ, জেলে, মাঝি, তাঁতি, আরও অনেক পীড়িত ক্লিষ্ট মুখগুলির অব্যক্ত অনুভূতিকে মুখর করে তুলতে চেয়েছেন। খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর গল্পে এসেছে ভিখুরা, ছাটাই হওয়া ঘনশ্যামরা।

পাঁচ

ঘনশ্যামের মানসিক জটিলতা নিয়ে গড়ে ওঠা 'বিবেক' গল্পের কাহিনী সূত্রটি এই রকম—ঘনশ্যাম মৃতপ্রায় স্ত্রী মণিমালার চিকিৎসার জন্য ধনী বন্ধু অশ্বিনীর সাহায্যপ্রার্থী হয়। সেখানে নিতান্তই আকস্মিক ভাবে, ফাঁকা বৈঠকখানায় পড়ে থাকা বন্ধুর সোনার ঘড়িটি সে চুরি করে। চুরি করার কোনো পূর্ব প্রস্তুতি তার ছিল না। অশ্বিনী তাকে মাত্র পাঁচ টাকা দেয়। ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরে আসে। সেখানে অপেক্ষমান তার পুরনো বন্ধু শ্রীনিবাস। উভয়ের পরিস্থিতি একই। শ্রীনিবাসের ছেলেটিও অসুস্থ। স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছে সে। তার থেকে সামান্য কিছু ঘনশ্যামকেও সে দেয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদে ভুল করে শ্রীনিবাস ফেলে রেখে যায় তার ব্যাগটি। সে টাকাও মুহূর্তে পকেটস্থ করে ঘনশ্যাম। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে ঘোষণা করে মণিমালার শেষ অবস্থা সন্নিকট। ঘনশ্যাম এক প্রকার পাপবোধে পীড়িত হতে থাকে। চুরি করার মতো নীরবে অশ্বিনীর সোনার ঘড়িটি ফেরত দিয়ে আসে। গল্পের উপসংহার ঘনশ্যামের মিথ্যা ভাষণে. " টাকা আছে তো? ঘনশ্যাম বলিল, আছে। ওনার গয়না বেচে দিলাম, কি করি।"

ছয়

মণিমালার জীবন বাঁচল কি বাঁচল না —তা এই গল্পের কোনো আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু মণিমালার অসুস্থতা, দ্রুত অবস্থার পতন, কিছুটা ভাল হয়ে ওঠা, খানিক পরে আবার ডাক্তারের জবাব দিয়ে দেওয়া—সবটাই ঘনশ্যামের চেতনার প্রবাহকে ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে চালিত করেছে। সেই মঙ্গলকাব্যে আমরা পড়েছিলাম, 'দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে'। ঘনশ্যামের চুরি করা, মিথ্যাভাষণ, অনন্যোপায় বন্ধুকে প্রবঞ্চনা সবই দারিদ্রের কারণে। কিন্তু দারিদ্র্য তার সমস্ত গুণকে নিঃশেষিত করে দেয়নি। সে গুণ অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি তার মমতা। মণিমালার প্রতি ভালবাসার একটা চোরাস্রোত উপলব্ধি করা যায় ঘনশ্যামের প্রতিটি আচরণে। রুগ্না স্ত্রীর জন্য এই দুর্বলতা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। হয়তো এ অনুরাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই তাকে সচেতন স্তরে উপলব্ধি করে না ঘনশ্যাম। লেখক কিন্তু খুব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে ঘুরিয়ে দেন। স্মরণ করা যায় কয়েকটি ঘটনা, স্ত্রীর শিয়রে সমস্ত রাত্রি সজাগ ঘনশ্যাম; চরম দারিদ্র্যেও স্ত্রীর নিষেধকে মূল্য দেয় ঘনশ্যাম, হাতের রুলি দুটি কোন মতেই খুলতে পারে না সে। ঘনশ্যাম ভাবে, 'রুলি-বেচা পয়সায় কেনা ওষুধ খাইয়া জ্ঞান হইলে হাত খালি দেখিয়া মণিমালা যদি হার্ট ফেল করে।' অবার তারই কৃতকর্মের পরিণতিতে স্ত্রীর মৃত্যু আসন্ন মনে করে, বিপদের ঝুঁকি নিয়েও অশ্বিনীর ঘড়ি ফেরত দিয়ে আসে সে। ঘনশ্যাম চরিত্রটির এ এমন এক অনুভূতি যা প্রকট নয় একেবারেই; অথচ পাঠকের কাছে তা অনুভববেদ্য। পাঠক কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারে না প্রবঞ্চক ঘনশ্যামের পত্নীর প্রতি এই অনুরাগকে।

সাত

সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী কী?—বকের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, মন। দ্রুতগামী সেই মনের প্রত্যেকটি বাঁককে নিপুণভাবে চিহ্নিত করেছেন দক্ষ শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে লেখকের পরীক্ষাগার ঘনশ্যামের মানসভূমি। নিঃসম্বল ঘনশ্যাম ডাক্তারের সঙ্গে সামান্য কপটাচারের কথাটি আগেই ভেবে রাখে। এক্ষেত্রে সে নিরুপায়। ঘনশ্যাম যুক্তি সাজায় এভাবে যে, ডাক্তারকে

প্রথমেই তার অসামর্থের কথা জানিয়ে লাভ নেই। সে কথা পরে জানালেই হবে। কারণ ফিস্ তো পরেই দেয়। এই প্রবঞ্চনাটুকু অবলম্বন করতে বাধ্য হয় ঘনশ্যাম। তা না হলে হয়তো মণিমালাকে দেখবেই না ডাক্তার। কিন্তু 'ডাক্তারকে সে ঠকাইতে চায় না।' আবার 'একজন ডাক্তার না দেখাইয়া মণিমালাকেও মরতে দেওযা যায় না।' পরিবেশজনিত নিরুপায়ত্বের শিকার ঘনশ্যাম। পরমুহূর্তে পাঠককে বিস্মিত করে লেখকের মন্তব্য, 'ডাক্তার আসেন নাই শুনিয়া ঘনশ্যাম আরাম বোধ করিল।' কেন? কারণ প্রথমত, এতক্ষণ ধরে মক্স করা করুণ কথাগুলো তাকে বলতে হবে না, হাত জোড় করে দাঁড়াতে হবে না ডাক্তারের সামনে। দ্বিতীয়ত, এ সংবাদ স্বস্তি দায়ক কারণ আশু অর্থ সংগ্রহের দুশ্চিন্তা থেকে সে মুক্তি পেল।

ঘনশ্যাম চরিত্রটির অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও সে মস্তিষ্ক স্থিব ও শান্ত রাখতে পারে। সর্বদা সজাগ থাকে তার স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত বিবেচনা বোধ। এমন কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত সে নেয় না যা তাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে। ছোট মেয়েটা তার বিছানা ভিজিয়ে ফেলে। ঘনশ্যাম সহ্য করে যায়। যদিও ঘুমন্ত মেয়েকে সজোরে একটা চড় কষানোর প্রবল ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু ছোট মেয়েটি কেঁদে উঠলে তাকে শান্ত করা যায় না। মণিমালা ছাড়া কেউ পারে না তাকে শান্ত করতে। মণিমালা এখন অপারগ। কাজেই ঘনশ্যাম সংযত হয়। কিন্তু বড় মেয়ে লতা তার শার্টের ছেঁড়াটুকু সেলাই না করায় তাকে সটান চড় মাবে ঘনশ্যাম। কারণ সে কাঁদলেও 'নীরবে কাঁদবে'। এই চপেটাঘাত শুধু লতাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার উপায় নয়। বরং এই আঘাত একজন নিঃস্ব মানুষের অভিভাবকোচিত কর্তৃত্ব-বোধকে তৃপ্ত করে। তাই 'চড় খাইয়া ঘনশ্যামের অনুমান মত নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে লতা শার্ট সেলাই করে, আর বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ঘনশ্যাম আড়চোখে তার দিকে তাকায়।' চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ঘনশ্যাম ভাবতে পাবে কোন শার্টটি পরে অশ্বিনীর বাড়ি যাওয়া উচিত, কোনটি নয়। প্রত্যেক পদক্ষেপের পূর্বে যুক্তিসঙ্গত ভাবনা কাজ করে চলে তার মধ্যে। নিরীহ স্বভাবের মানুষ সে নয়, আদর্শ বা সততাকে, সঙ্গত ভাবেই, সে বড় গ্রাহ্য করে না, ভীরু সে নয়, বরং কিছুটা নির্মম। অথচ আপাদমস্তক একজন প্রবঞ্চক বলেও চিহ্নিত করা যায় না তাকে। এতটাই জটিল, সজীব চরিত্র ঘনশ্যাম। লেখক অপূর্ব মুন্সীয়ানায় তার হৃদ্স্পন্দনের শব্দ শুনিয়েছেন পাঠককে।

বহু স্তর বিশিষ্ট ঘনশ্যাম চরিত্রটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তার প্রয়োজন এবং সংস্কারের দ্বন্দ্ব। অশ্বিনীর ফাঁকা ঘরে ঘড়িটি চুরি করার মুহূর্তে ঘনশ্যামের বুকের ধড়ফড়ানি, হাত পায়ের কাঁপুনি তার অযত্নলালিত সংস্কারের ফল। এই সংস্কারই গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তটি রচনা করেছে। এ যেন ফ্রয়েড কথিত Ego আর Super ego-র দ্বন্দ্ব।

আট

কথাটির সামান্য ব্যাখ্যা বাহুল্য হবে না। ''আমাদের কিছু প্রবৃত্তিগত চাহিদা আছে—ফ্রয়েড সেগুলির নাম দিয়েছেন অদস্ (Id)। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে, কোন চাহিদা কিভাবে আর কখন তৃপ্ত করলে সবচেয়ে বেশি সুখ আর সবচেয়ে কম অ-সুখ (Unpleasure) হবে, সেটা ঠিক করে তবেই আমরা চাহিদাগুলি মেটাই। এই ধরনের ক্রিয়ার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন অহম্ (ego)। আবার বাস্তব পরিস্থিতি অনুকূল হলেই যে আমরা সব সময়

আমাদের চাহিদাগুলি মেটাই তা নয়। অনেক প্রকৃতিগত চাহিদাই আমরা আমাদের নীতি-বোধের পরিপন্থী বলে ত্যাগ করি। এই নীতি বোধের দিকটির নাম অধিশাস্তা (super ego)।" Super ego-র দুটি অংশ ego ideal আর Catigorical imperative। Ego ideal-এর কারণে আদর্শ থেকে স্খলিত হলে guilt-sense বা inferiority sense আসে। আর Catigorical imperative এর দাবি অহম্‌কে মানতেই হয়। সেখানে কোনো যুক্তি খাটে না। এই অনুশাসন না মানার সঙ্গে একটা শাস্তির ভয়, fear of punishment যুক্ত থাকে। এও শৈশবে আত্মস্থ অনুশাসনের সঙ্গী। Super ego অতীতের প্রভাবের প্রতীক আর ego মূলত ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বর্তমান এবং আপতিক ঘটনার দ্বারা চালিত।

নয়

ঘনশ্যাম ধনী বন্ধু অশ্বিনীর গৃহে যায় কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশায়। পূর্বেও অনেকবার সে এসেছে এবং খালি হাতে ফেরেনি। অশ্বিনীর ভৃত্য পশুপতির অবস্থা দৃশ্যত ঘনশ্যাম অপেক্ষা ভাল। ভৃত্য পশুপতিও তাই এই প্রভু বন্ধুকে ঈষৎ উপেক্ষা করে। ফলে এই বন্ধু গৃহে পদার্পণ করতে হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত হয় ঘনশ্যাম। এবার অশ্বিনীর গৃহে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে পেয়ে যায় ইচ্ছা পূরণের মুহূর্ত। অশ্বিনীর ফাঁকা বৈঠকখানার টেবিলে কাগজ চাপা দেওয়া একটা সোনার ঘড়ি। ঘনশ্যাম নিয়ন্ত্রিত হল তার অহমের দ্বারা। ঘড়িটি পকেটে তুলে নিল সে। আর ঘর থেকে বের হতেই একেবারে পশুপতির মুখোমুখি। শুরু হয়ে যায় ঘনশ্যামের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এদিনই অশ্বিনীর কাছে চরম উপেক্ষা পায় ঘনশ্যাম। অন্যান্য বার অন্তত পনেরটা টাকা সে পেয়েছে। এবার পেল পাঁচ টাকা মাত্র। সঙ্গে জামা কাচার জন্য একটি সাবান। অপমানে তার বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে যায়। এবার নিজেরই জন্য কৃতকর্মের যুক্তি সাজায় সে—"প্রথমত নিয়মিত ভাবে যে চুরি করিতেছে সেই চাকরের কত আদর তার কাছে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি চুরি করা অন্যায় নয়। ওরকম চুরি করাই উচিত।" এ যেন 'চোর' গল্পের মধু। প্রত্যেক মুহূর্তে মধু চুরি করার যৌক্তিকতা বিচার করে।

পাপ বোধ কখনো পীড়িত করে না তাকে। গল্পের শেষেও মধু তার কাজের সমর্থন পেয়ে যায়। কারণ যে রাখালের ঘরে সে চুরি করেছে তার বড় ছেলে পান্নাবাবুর সঙ্গে সে রাতেই, মধুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, পালিয়ে গেছে মধুর স্ত্রী কাদু। ফিরে এসে ফাঁকা ঘর, খালি বিছানা দেখে, মধু সিদ্ধান্তে পৌঁছায় 'জগতে চোর নয় কে?' ঘনশ্যামের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন পরিণতি ঘটল না।

অশ্বিনীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে ঘনশ্যাম দেখে শ্রীনিবাস বসে আছে তারই অপেক্ষায়। মরণাপন্ন ছেলেটির চিকিৎসার জন্য স্ত্রীর বালা বিক্রী করেছে শ্রীনিবাস। সেই যৎসামান্য টাকা থেকে ঘনশ্যামকে সে দশটি টাকা দেয় মণিমালার চিকিৎসার জন্য। দুজনেরই চাকরী গেছে একসঙ্গে। দারিদ্র্য এবং রোগের চিকিৎসায় দুজনেই বিপর্যস্ত—একই ভাগ্যলিপি আবিষ্কার করে দুজনে হঠাৎ নির্বাক হয়ে যায়। 'আজ হঠাৎ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর ও নিকটতর মনে হইতে থাকে।' কিন্তু ঘনশ্যাম তখনো অহম্ তাড়িত এক ব্যক্তি। শ্রীনিবাস তাৎক্ষণিক আবেগ ও মানসিক অস্থিরতায় ফেলে রেখে যায় মানিব্যাগ। তৎক্ষণাৎ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ঘনশ্যাম। ব্যাগ খুঁজতে দ্রুত ফিরে আসে শ্রীনিবাস। হতাশ হয়ে বলে, তার ছেলেটিকে হয়তো

বাঁচানো যাবে না। তবু বিগলিত হয় না ঘনশ্যাম। মাত্র দশটি টাকা সে বের করে দেয় শ্রীনিবাসকে। নির্মম আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে ঘনশ্যামের মন। পরপর দুটি অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি এবং অপরাধও তার মনে কোনো দ্বিধা আনে না। বরং কৃতকর্মের কৈফিয়ত তৈরি করে মনে মনে—'এতদিন সে যে অশ্বিনীর ঘড়ি চুড়ি করে নাই, কোনো সন্দেহও তার সম্বন্ধে জাগে নাই অশ্বিনীর, কি এমন খাতিরটা সে তাকে করিয়াছে? শেষ রাত্রে মণিমালার নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল শুনিয়া পাঁচটি টাকা সে তাকে দিয়াছে, . সন্দেহ ছোট কথা, অশ্বিনী তাকে চোর বলিযা জানিলেই বা তার ক্ষতি কি?'

পরমুহূর্তে বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ানোব শব্দে সচকিত হয ঘনশ্যাম। সজাগ হয় তার super-ego, শুরু হয় guilt-feeling অশ্বিনী পুলিশ নিয়ে আসেনি তো? না, অশ্বিনী নয়, ডাক্তার। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে দেখতে এসেছেন। উৎকণ্ঠা প্রশমিত হযে আসে ঘনশ্যামেব। সোনার ঘড়িটা কোথায় বিক্রী করা নিরাপদ ও লাভজনক—সেকথা ভাবতে থাকে সে। আর তখনই শুনতে পায় ডাক্তারের শেষ কথা। ঘনশ্যামের ভাবনার স্রোত বদলে ফেলে গতিমুখ, 'মণিমালা বাঁচিবে না?' শুরু হয়ে যায় তার আজন্ম লালিত সংস্কারের নির্দেশ। এ সংস্কারের মূল দৃঢ় ভাবে প্রোথিত থাকে মানুষের মনে। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত না পেলে সচেতন ভাবে তাকে হয়তো উপলব্ধি করাও যায় না। তবু তা প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই সংস্কাবেব বশে ঘনশ্যামের মনে শুরু হয় এক বিপরীত মুখী প্রক্রিয়া—"কেন বাঁচিবে না? এখন তো তার টাকার অভাব নাই, যতবার খুশী ডাক্তাব আনিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিবে। মণিমালাব না বাঁচিবার কি কারণ থাকিতে পারে।" ঘনশ্যাম সিদ্ধান্ত নেয়, "মণিমালার মবণ নিশ্চিত হইয়াছে আজ সকালে।" কাহিনী ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয়, " ঘনশ্যাম যখন অশ্বিনীর ঘড়িটা চুরি করিয়াছিল, তার জীবনের প্রথম চুরি, তখন মণিমালা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ওর চিকিৎসার জন্য পাপ কবিযাছে কিনা, ওর চিকিৎসা তাই হইয়া গিয়াছে নিরর্থক।" গল্পের সার (essence) এই কটি পংক্তি। গল্পের প্রাণবীজ।

দশ

যাত্রায় অনেক সময় বিবেককে দেখানো হত মূর্তি রূপে। আদর্শ বিচ্যুত কোনো চরিত্রকে সংশোধন করা ছিল তার ভূমিকা। মানুষকে স্খলন থেকে বাঁচাত বিবেক। গ্রীক নাটকে কোরাসও অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভূমিকা পালন করত। প্রকৃতপক্ষে বহুকালগত কিছু কিছু নীতিবোধ আমাদের চেতনার গভীর প্রদেশে বাসা বেঁধে থাকে। মা-বাবা-পরিবেশ তাকে পুষ্ট করে। এগুলি অনেকাংশে ট্র্যাডিশনাল। এই সংস্কার সর্বদা আমাদের প্রভাবিত করে না। কিন্তু বাইরের প্রবল কোনো আঘাত সহসা আমাদের সচকিত ও সতর্ক করে তোলে কৃতকর্ম সম্পর্কে। কৃতকর্মের জন্য পাপবোধে পীড়িত হই আমরা। পাপস্খালনে মরীয়া হয়ে উঠি। মণিমালার আসন্ন মৃত্যুসংবাদ ঘনশ্যামের জীবনের সেই প্রবল আঘাত। আপন সংস্কারের বশে সে ভাবতে থাকে, তার জীবনের প্রথম পাপ মণিমালার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। পাঠক পুনরায় আবিষ্কার করে মণিমালাব প্রতি ঘনশ্যামের সহজ, গভীর, প্রচ্ছন্ন ভালবাসা। চরিত্র বাঁক নেয়। সোনার ঘড়ি ফেরত যায় অশ্বিনীর ঘরে।

দেখা যায়, ঘনশ্যাম গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও কাহিনীর মেরুদন্ড কিন্তু মণিমালা।

শয্যাশায়ী হয়েও কেন্দ্রীয় চরিত্রের নিয়ামক হয়ে উঠেছে সে। নিষ্ক্রিয় থেকেও তাই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠেছে মণিমালা। ঘনশ্যাম চরিত্রটির ভাবনার প্রবাহে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক তৈরী করেছে মণিমালার রুগ্নাবস্থা, তার বিকার, কিছুটা যেন ভাল হয়ে ওঠা, শেষে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা। অপরাপর চরিত্রগুলিও সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের বক্তব্য বা বিষয়ে যিনি ভন্ডামী, মেকি আদর্শ আর সস্তা আবেগকে প্রশ্রয় দেননি, চরিত্র নির্মাণ এবং ভাষার ক্ষেত্রে ও তিনি চূড়ান্ত ভাবে আড়ম্বরহীন। অতি কথন মানিকের স্বভাব নয়। তাই তাঁর ভাষা আভরণহীন। চরিত্রগুলিও উপস্থিত স্বল্প রেখায় স্পষ্ট ভাবে। নিজের দক্ষতার পরিচয় তিনি বলিষ্ঠভাবে মুদ্রিত করে দেন নতুন ডাক্তারের সঙ্কোচ ও ব্যবসায়িক মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়ে, ধনী অশ্বিনীর দাম্ভিকতার আঁচ দিয়ে। তার তোষামোদ প্রিয়তা, গরীব বন্ধুর প্রতি অনায়াস উপেক্ষা, শ্রীনিবাসের সংস্কার, সমবেদনা ও কর্তব্যবোধ, সরলতা, অসহায়ত্ব—সমস্ত দিকই নৈপুণ্যের সঙ্গে রূপায়িত।

এগার

পরিশেষে বলা যায়, একজন দরিদ্র এবং আদর্শচ্যুত মানুষের বিবেকের তাড়নায় মহান হয়ে ওঠার কোনো আদর্শায়িত কাহিনী গাঁথেননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এ গল্প কোনো নীতিকথা নয়। যদি তা হত তবে, দরিদ্র বন্ধুর শেষ সম্বলটুকুও যে কোনো উপায়ে ফেরত দিত ঘনশ্যাম। কিন্তু দেখা গেল, শ্রীনিবাসের টাকা চুরি তার জীবনে প্রত্যক্ষত কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি করেনি। তাই সহানুভূতিশীল বন্ধুটিকে প্রতারিত করে কোনো ভাবেই বিচলিত হয না ঘনশ্যাম। বরং বেশ নির্দয় ভাবে উপভোগ করে এই অপরাধকে। লেখক বস্তুত দেখাতে চেয়েছেন মানসিক জটিলতা এবং সংস্কার একজন বিত্তহীন মানুষের জীবন ও আচরণকে কতখানি নিযন্ত্রণ করে। এখানে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, সংস্কার এবং বিবেক কিন্তু সমার্থক নয। সংস্কার সর্বদা যুক্তি মেনে চলে না। ঔচিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কও প্রায় নেই বললেই চলে। সংস্কার যে সর্বদা ইতিবাচক হবে তাও নয়। কিন্তু বিবেকের সঙ্গে ঔচিত্যের একটা সংযোগ আছে। তা সর্বদা ইতিবাচক। আমাদের মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিবেক। বিবেকের দ্বারা চালিত হলে শ্রীনিবাসের ব্যাগটিও ফেরত দিত ঘনশ্যাম। কিন্তু তা ঘটেনি। তার প্রথম চুরি এবং স্ত্রীর অবস্থার অবনতি—কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত দুটি ঘটনা নয়, কোনো যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা মিলবে না। দুটি ঘটনাকে মিলিয়ে দেওযা একটি অপরাধী মনের প্রবল অনতিক্রম্য সংস্কারমাত্র।

তথ্যনির্দেশ

১. সাহিত্য করার আগে—প্রবন্ধ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২. গল্প লেখার গল্প-বেতার ভাষণ ঐ মানিক গ্রন্থাবলী দ্বাদশ খন্ড, ৫৫৩, ৫৪৭ পৃঃ
৩. মানিক গ্রন্থাবলী—চতুর্থ খণ্ড—১৫ পৃঃ
৪. সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনসমীক্ষণের রূপরেখা :- পুষ্পা মিত্র ও মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র
৫. স্বনির্বাচিত গল্প—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-৫৭ পৃঃ
৬. সরোজমোহন মিত্র—মানিক বন্দ্যোঃ জীবন ও সাহিত্য

কে বাঁচায়, কে বাঁচে! : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জু দাস

কে বাঁচায়? কে বাঁচে? পাশাপাশি পরস্পর সম্পর্কিত এই রকম দুটো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়া যায় 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পের কেন্দ্রস্থলে। যেখানে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত জীবনের এক জটিল অঙ্কের ফর্মুলা কষেছেন—মৃত্যুঞ্জয়ের দৃষ্টি দিয়ে। ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গীর পৃথক স্বাভাবিক রূপটার জন্য নিখিলের উপস্থিতি, যে বুঝেছে এভাবে দেশকে বাঁচানো যায় না। তবু মৃত্যুঞ্জয়ের অভিজ্ঞতার কাছে বাঁচা আর বাঁচানোব সূত্র গুলো এই মুহূর্তে ঢুকে গেছে এক ভিন্ন রকম জটিল আবর্তে। যেখানে যুক্তি-তর্ক খাটে না, কথার মার-প্যাঁচ খাটে না। সে লঙ্গরখানায় মারামারি করে খিচুড়ির জন্য, বলে—"গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।"

দুই

খেতে না পাওয়া অর্থাৎ খাদ্য সংকট। সংকট কাল ১৯৪৩ খ্রীঃ, সময়টা 'পঞ্চাশেব মন্বন্তর' নামে পরিচিত। মন্বন্তরের কালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করতেন কলকাতাব টালিগঞ্জের দিগম্বরিতলায় পৈতৃক বাড়িতে। সে সময় গ্রামকে গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, বিশ্বযুদ্ধ এবং এক শ্রেণির মানুষেব তৈরি কৃত্রিম পরিকল্পনায় না খেতে পাওয়া মানুষেবা ভিড় জমাচ্ছে শহর কলকাতায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতাবাসী লেখক একে একে লিখে ফেলেছেন 'সাড়ে সাত সের চাল', 'প্রাণের গুদাম', 'নমুনা','তারপর?', 'অমানুষিক', 'নেড়ী', 'প্রাণ', 'দুঃশাসনীয়', 'রাঘবমালাকার', কিংবা 'আজ কাল পরশুর গল্প'। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—"জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি" ['কেন লিখি' ১৯৪৪ খ্রীঃ]। আমরা বিশ্বাস করি 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে !' গল্পে লেখক সমকালীন অভিজ্ঞতা—উপলব্ধিব ভগ্নাংশ নয়, সম্ভবত একশো শতাংশই আমাদের দিতে পেরেছেন। পারেননি শুধু দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গল্পগুলোকে নিয়ে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে।

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটি সমসাময়িক মন্বন্তরের কালে লেখা সন্দেহ নেই (সম্ভবত ১৯৪৪ সাল)। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে গল্পটি প্রথম ছাপা হয়। পববর্তী কালে ১৯৬৫ সালে শ্রী যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' (চতুর্থ সংস্করণ) গ্রন্থে গল্পটি স্থান পেয়েছে। নিঃসন্দেহে 'দুঃশাসনীয়', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' প্রভৃতি গল্পের মতো 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। ১৯৪৫ সালের ডায়েরিতে (যুগান্তব চক্রবর্তী সম্পাদিত) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষের সমকালীন অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস নিয়ে একটা সংকলন করার ইচ্ছা লিখে রেখেছিলেন। আমরা অনুমান করে নিতে পারি সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলে 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটি সেই সংকলনের একটি অন্যতম গল্প হয়ে উঠতো।

তিন

দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে গল্পটা ('কে বাঁচায়, কে বাঁচে!') সীমাবদ্ধ। আর এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বিকারগ্রস্ততা একটা পূর্ণ মাত্রা পেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় অফিস কর্মচারী (সরকারি না বেসরকারি জানা যায় না)। বাড়ির কাছে ট্রাম, আর ট্রাম থেকে নেমেই অফিস। ফুটপাতে না হাঁটা মৃত্যুঞ্জয়ের একদিন হঠাৎ আবিষ্কার—অনাহারে মৃত্যুর দৃশ্য। মন্বন্তরের বাজারে যা কলকাতার ফুটপাতে এক অতি স্বাভাবিক দৃশ্য। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে এই মৃত্যুর বাস্তবতা ধাক্কা দেয়। আর সেখান থেকেই মৃত্যুঞ্জয়ের পালটে যাওয়া। অফিস বন্ধু নিখিল আদৌ প্রভাবিত করতে পারে না তাকে। ক্রমে ক্রমে কাজকর্মে শৈথিল্য, ভুল করা, দেরি করে অফিসে আসা, চুপ করে বসে বসে ভেবে চলা মৃত্যুঞ্জয় বিলিয়ে দিল নিজের সারা মাসের মাইনে। বন্ধ করল নিজের খাওয়া-দাওয়া। এমনকি বাড়িতে থাকা ছেড়ে দিয়ে কলকাতা শহরের আদি-অন্তহীন ফুটপাত হয়ে উঠল তার ক্ষেত্রসমীক্ষার প্লট। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ—বিছানা শয্যায়, ছেলে মেয়েগুলো অনাদরে-অবহেলায়-প্রচন্ড পেটের জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে। কোন প্রতিকার হয় না। মৃত্যুঞ্জয় এই মুহূর্তে হয়ে ওঠে ফুটপাতের না খেতে পাওয়া মন্বন্তরের মানুষ। যার পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে জমে ওঠা মাটি, আর মুখে খাবারের প্রার্থনা।

চার

"বে-আইনী।... না খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান,...দেশ জুড়ে সবার পেটের চামড়া চামচিকে, ক'জনকে দেব আমি। ...একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়।"—'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পের যোগীর মত মৃত্যুঞ্জয়ের এই সূত্র জানা ছিল না। আসলে বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে আমাদের পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত পালটাতে শুরু করে। এমনিতেই বিশ্বযুদ্ধ, আনবিক বোমার মত বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার, প্রাকৃতিক প্রতিঘাত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা দোলাচল এনেছিল। আর সেই অস্থির দোদুল্যমান অর্থনীতির ফায়দা নিতে এগিয়ে এল কালোবাজারীর দল। সরকার ব্যর্থ হলো। গ্রামের ফসল নিভৃত ষড়যন্ত্রে রপ্তানি হয়ে গেল শহরে। কিছুদিন গেঁড়ি-গুগলি, শাকসেদ্ধ ও কিছুদিন অনাহারে থেকে গ্রামের মানুষগুলো ভিড় জমালো শহরে; উদ্দেশ্য একমুঠো ভাত কিংবা একবাটি ফ্যান। এই রকমই একটা পরিস্থিতিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন—মৃত্যুঞ্জয়-মানসিকতা আর একটা ভিখারির সংখ্যা বাড়ায় মাত্র; এই অবস্থা থেকে একজনেরও উত্তরণ ঘটাতে পারে না। সে শুধু ভাবতে পারে—"আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

· আসলে একটা আদ্যিকালের ভাবালুতা, পচা-ঐতিহ্য আদর্শবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকে মৃত্যুঞ্জয়। কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অফিস কর্মী মৃত্যুঞ্জয়ের ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা পরিণতির দ্বারা বুঝিয়ে দেন—ওভাবে নয়, কাউকে বাঁচাতে গেলে—নিজেকে বাঁচাতে হয় আগে। ফুটপাতের অনাহারীদের আহার দেওয়ার পথ নিজের ও পরিবারের আহার বর্জন নয়। 'রিলিফ'ও নয় প্রতিকারের উৎকৃষ্ট অর্থ। কি সেই পথ?

"তাহার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত,

বর্ষা, রোগ বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান—সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?" ('আত্মহত্যার অধিকার')। —এই প্রশ্ন তুলে নীলমণি তবুও বাঁচার চেষ্টা করছে, আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়! সে রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উলটে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি গড়ে তুলেছে। সম্মিলিত প্রয়াস করেনি, লড়াই করেনি কোন ভাবে। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন—এই অবস্থার উত্তরণ সম্ভব একমাত্র সংগ্রামী প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে। যেখানে লুকিয়ে থাকে পুঁজিবাদ বিনষ্টির মন্ত্র, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন কিংবা বিপ্লবের বীজ। লেখক বুঝিয়ে দেন মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রাচীন ঐতিহ্যধারী আমরাও অনাহারে মৃত্যু দেখে হয় না দেখার ভান করি কিংবা নিজেও একসময় অনাহারী হয়ে উঠি। যা স্বপ্নময় ভ্রান্ত আদর্শবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধে নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন—"এ এক অদ্ভুত মানুষ, যিনি সাচ্ছল্যেব আবহাওয়ায় হাঁসফাঁস করেন এবং স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের স্তরে নেমে আসবার জন্য পরিবাব-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও দ্বিধা করেন না। বস্তুতঃ তিনি উত্তর-জীবনে তা-ই হয়েছিলেন, declasse হবার সাধনায় কার্যতও দারিদ্র্যেব কোঠায় নিজেকে নামিয়ে এনেছিলেন" 'মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা', নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত। দায়িত্ব নিয়ে বলা যায লেখকের দাবিদ্র্যেব কোঠায় নেমে আসার এই মানসিকতা কোন অর্থেই মৃত্যুঞ্জয়ের সমার্থক নয়। অবশ্যই অসহায়তাকে চেনার জন্য, নিবন্নের অনুভূতিকে মজ্জাগত করাব জন্য—তাদের মধ্যে মিশে যাওয়ার সূত্র মানবতার মন্ত্রকেই সমর্থন করে। কিন্তু 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়েব ক্ষেত্রে সেই হিসাবটা ভিন্নরকম। ফলে মানবতা প্রতিষ্ঠার সূত্রে যখন সমালোচক বলেন—"লেখক সেকালের মর্মান্তিক মানবতা বিধ্বংসী মন্বন্তবের প্রেক্ষাপটে গল্প লিখতে বসে গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্বহাবা মানুষের কাছে তাদের সমস্ত হারানোর দিনে যদি বুর্জোয়া সমাজ মিথ্যে খোলস ত্যাগ করে নেমে না আসে, তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর সুস্থ বোধের জাগরণ যদি না ঘটে, নিরন্ন মানুষদের ভিড়ে তাদের গায়ের গন্ধে, ক্ষুধার্ত চীৎকারে অশনে বসনে যদি তা অস্থি-মজ্জা-মাংস-বক্তের মতো মিলিত হতে না পারে, তবে সর্বকালীন মানবতার প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমেই হয় না।" ('দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথা সাহিত্য'—ডঃ মীরা ঘোষ)। —তখন আমরা বুঝতে পারি এও একপ্রকাব ছোঁয়াচে দরদ মাত্র। যেখানে জাগরণের প্রশ্ন আসে না কখনও। এটা সত্য গল্পকার এ গল্পে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির এক নাগরিককে টেনে নামিয়ে এনেছেন নিম্নবিত্ত সর্বহারাদের দলে। এবং শেষ পর্যন্ত উচ্চ শ্রেণির প্রতিভূ মৃত্যুঞ্জয় শারীরিক মানসিকভাবে সর্বহারাদেরই একজন হযে উঠেছে। কিন্তু বাঁচানোর কোন মন্ত্র দিতে পেরেছে কি? পারেনি।

কারণ মৃত্যুঞ্জয় তা পারে না। পৃথিবীতে সমস্ত পরিবর্তনের প্রাক্কালে সবার আগে যে লোকটা পতাকা কাঁধে এগিয়ে গেছে সে মধ্যবিত্ত। মৃত্যুঞ্জয় পদস্থ অফিস কর্মচারী। সে এতদিন খবরের কাগজেই দেখে এসেছে অনাহারে মৃত্যুর কাহিনি। কোন দিন তাকে ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে পর্যন্ত হয়নি। সমালোচক যতই বলুন 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে মধ্যবিত্ত মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাতে অনাহারজনিত মৃত্যু দেখে বিবেকের তাড়নায় নিজেকেই সর্বহারা শ্রেণিব

স্তরে নামিয়ে আনে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে শ্রেণিসামঞ্জস্যের দোহাই দিয়ে কোন প্রকারের গোঁজামিল দেওয়া সম্ভব নয় বলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিলাপের মাধ্যমে সর্বহারার লড়াইয়ে সামিল হতে চেয়েছে''। ['মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা'/ডঃ নিতাই বসু] —সে তত্ত্ব মেনে নিলেও একটা কিন্তু থেকে যায়। কারণ ''মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন আনবার প্রয়োজন উপলব্ধি'' ('সাহিত্য করার আগে') করেছিলেন যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কখনই মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিলোপ শেষকথা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন না। আর লড়াইয়ের প্রসঙ্গতো কোন ভাবেই আসেনি সমগ্র গল্পে। মৃত্যুঞ্জয় অনাহারীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তো দেখেছে ওদের—''কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কিভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানে নি, বোঝে নি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।'' প্রতিবাদ নেই কারণ—''ভিক্ষা দেওয়ার মত অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবী জন্মাবে কিসে?'' বলাবাহুল্য এই প্রতিবাদ বা দাবীর মন্ত্রে বিশ্বাসী মানিকবাবু মেনে নেওয়ার প্রতিবাদহীন দর্শনে বিশ্বাস করেননি কখনো। বরং মন্বন্তরের দুঃখ দুর্দশার চরম উপলব্ধির অভিজ্ঞতা তাঁকে বলিয়েছে—''গরীবগুলোকে কত বললাম—না খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মত রাস্তাঘাটে মরে পড়ে না থেকে তোরা একবার উঠে দাঁড়া। সরকারের তালাবন্ধ শস্যের গুদামগুলো লুঠ করে একদিনও পেট পুরে খেয়ে বাঁচি—তারপর না হয় জেল খাটবি'' ('স্মরণ করি'/'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য'—ডঃ সরোজ মোহন মিত্র)।

পাঁচ

''সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল—অনাহারের মৃত্যু।'' আর এই দেখাটাই মৃত্যুঞ্জয়কে করে তুলেছে এ গল্পের প্রধান চরিত্র। অবশ্যই এক পরাজিত জীবনের, পথ খুঁজে না পাওয়া, ভাবপ্রবণ বস্তাপচা আদর্শবাদের পিছনে ছুটে চলা মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত গল্পটাকে একটা দেখা আর একটা বলার মধ্যে বেঁধে ফেলেছে। দেখাটার মধ্যে দিয়ে গল্পের সূচনা, আর বলাটার মধ্যে দিয়েই গল্পের সমাপ্তি। বলতে পারা যায় এই সূচনা আর সমাপ্তির মধ্যেখানে বাকি জায়গাটুকুতে লেখক মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবর্তন তথা মনস্তত্ত্বের জটিল কাটাছেঁড়ার অঙ্ক কষেছেন। এঁকেছেন মৃত্যুঞ্জয়ের একটা ছবি।

প্রায় ফুটপাত বিহীন, শহরের এক নিরিবিলি অঞ্চলের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয়। চাকর ও ছোটভাইয়ের সৌজন্যে তাকে বাজারে কেনাকাটা করতে হয় না কখনও। বাড়ি থেকে দু-পা হেঁটে ট্রামে চড়ে এবং নামে অফিসের দরজায়। অফিসে অন্যদের থেকে কিছুটা বাড়তি দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়। এই অর্থে দায়িত্বশীল মৃত্যুঞ্জয় ''নিরীহ শান্ত দরদী ভাল মানুষ'' এবং ''সৎ ও সরল।'' পাশাপাশি সে ''প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য—আদর্শবাদের কল্পনা তাপস।'' কিন্তু কোন অর্থেই সেই আদর্শবাদের পিছনে দুর্বল-ভাবপ্রবণতা নেই। তার 'মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়।' তবু একটা অনাহারে মৃত্যুর দৃশ্য মৃত্যুঞ্জয়কে অসুস্থ করে তোলে শারীরিক ও মানসিকভাবে। বাড়ি থেকে খেয়ে আসা ভাত-ডাল-তরকারী-মাছ-দই বমি হয়ে যায়। একটা ''স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে'' মৃত্যুঞ্জয়

আর্তনাদ করে ওঠে "মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল।" এ কথা সত্যি মৃত্যুঞ্জয়ের এই অক্ষেপের পিছনে কোন কৃত্রিমতা নেই, বরং আছে মুক্তির পিপাসা, নিজের প্রতি ধিক্কার— "জেনে শুনেও এতকাল চারবেলা করে খেয়েছি পেট ভরে।........... ধিক্, শত ধিক্, আমাকে।" এই বিবেকের পীড়নেই সে নিজের সারা মাসের মাইনে তুলে দিয়েছে রিলিফফান্ডের জন্য। একটা কিছু করার বাসনায় বিনিদ্র রাত কেটেছে তার, ছেড়ে দিয়েছে একবেলা খাওয়া। এরপর আরও পালটে যাওয়া। অফিস না আসা, ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুরে বেড়ানো; ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, লঙ্গরখানায়, অন্নপ্রার্থীদের ভিড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মৃত্যুঞ্জয় ওদেরই একজন হয়ে যায়। সেও মগ হাতে মারামারি করে দু-মুঠো খাবারের জন্য।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের এই পরিণতি কেন? হয়ত বস্তাপচা আদর্শবাদ তার পথ হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লেখক তো বলেছিলেন—"শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ" মৃত্যুঞ্জয়। বলাবাহুল্য সেই ক্ষয়িত শক্তি একটা শ্রেণিকে Identify করে, মুক্তির উপায় খোঁজে, শেষে তার ব্যক্তি জীবন সেই শ্রেণিতেই হারিয়ে যায়। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা, উচ্চারণ করতে পারে না প্রতিবাদের ভাষা; যেন নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের মত ঝিমানো সুরে বলে চলে ভাগ্যের কথা, দুঃখের কথা, আব ভিক্ষে করে দুটো খাবার। কিন্তু লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাই চেয়েছিলেন? ব্যক্তি জীবনকে গোষ্ঠী জীবনের মধ্যে উত্তরণ ঘটিয়ে লেখক হয়ত বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজের কাঠামোকে আঘাত হেনেছেন ঠিকই। কিন্তু সেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসা শক্তিব কি পরিবর্তন চাননি! চাননি কি সেই শক্তির নবরূপান্তব খাটুক মার্কসীয় দর্শনের আলোতে। যেখানে মৃত্যুঞ্জয় সতিাই অনাহাবী মৃত্যুকে জয় করে হয়ে উঠতে পারত সর্বহারাদের দলনায়ক। তা হয়নি অবশ্যই। যা হয়েছে তা অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয়কে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। একটা অনাহারে মৃত্যু—তার মনে যে ঝড় তুলেছে—তা তাকে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে বইকি! আর সেই মর্যাদাবোধ থেকেই মৃত্যুঞ্জয় এ গল্পের নায়ক চরিত্র।

ধনবাদের রমরমা যখন তুঙ্গে তখনই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মবিলোপের প্রচেষ্টা দেখিয়ে যদি মৃত্যুঞ্জয়ের সৃষ্টি হয়—তবে তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে যে চরিত্রটা সবচেয়ে বেশি সহায়ক সে নিখিল। নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের সহকর্মী, "প্রায় সমপদস্থ"। সে "রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক"। আট বছরের বিবাহ উত্তর জীবনে সে দুটি সন্তানের জনক। "সংসারে তার নাকি মন নেই।" অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়। তাই এই মুহূর্তে ফুটপাতের একটা অনাহারী মৃত্যু নিখিলকে ভাবিয়ে তোলে না। ফুটপাতের ক্ষুধা বা মৃত্যুর বীভৎসতা, না খেয়ে মরা—কি ও কেমন, ক্ষুধার যন্ত্রনা আর মৃত্যুর যন্ত্রণা-কোনটা বেশি এসব নিয়ে বৃথা ভাবে না নিখিল। বরং লেখক নিখিলকে দিয়ে প্রকারন্তরে ভাবিয়ে নেন—"ভিক্ষা দেওয়ার মত অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবী জন্মাবে কিসে? রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়াই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।" তাই

মৃত্যুঞ্জয়ের সারা মাসের মাইনে বিলিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে মত দিয়েছে নিখিল। স্মরণ করিয়েছে তার ন'জনের পরিবার বা স্ত্রীর কথা। সে ভেবেছে—"এভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো না কারো! যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা।" কিন্তু এই মনের কথা নিখিল বলতে পারেনি আদৌ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিলের মধ্যে দিয়ে নিজের alter-ego কে তুলে ধরতে চাইলেও—তার পূর্ণ মাত্রা দেননি। তাই নিখিল যা যা ভেবেছে—তা তার ভাবনার স্তরেই থেমে গেছে, গলায় আটকে গেছে কথাগুলো। বরং পাশকাটানো মধ্যবিত্তের মতো সে শুধু জানিয়েছে—"ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই।...বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড় পাপ।" বন্ধুর বাবা মৃত্যুশয্যায় থাকলে আমরা আজও যেমন শুধু দেখতে যাই—শুধু দেখতে যাওয়ার জন্য, নিখিলও এর পর অনাহারী অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারকে দেখতে এসেছে। টুনুরমাকে সুস্থ হয়ে ওঠার আর্জি জানিয়েছে, মৃত্যুঞ্জয়ের অফিসে ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং একটা সময় সহজ স্বাভাবিক নিয়মে প্রস্থান করেছে।

বস্তুত গতানুগতিক মধ্যবিত্ত নিখিলের ভিতর আর বাইরের দুটো পৃথক রূপকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন এ গল্পে। তাই লেখক নিজের আদর্শকে প্রচ্ছন্নভাবে নিখিলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেও, বাইরের নিখিলকে করে তুলেছেন "টিপিক্যাল মনোবিলাসী মধ্যবিত্ত—(যে) স্বার্থপর, নিজেকে বাঁচানোর কারণে অ-মানবিক" ('বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'/বীরেন্দ্র দত্ত)। কিন্তু নিখিলও জানে আসল সূত্রটা কি। বাঁচার সূত্র শুধু নয়—বাঁচানোর সূত্রটা জানে বলেই নিখিল, চিরকালের ক্ষয়িত মধ্যবিত্ত শক্তি প্রতিনিধি নিখিল পরিবর্তিত হতে চায়—"মৃদু ঈর্ষার সঙ্গে সে তখন ভাবে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।"

টুনুর মা—মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী, 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে যার কোন নাম নেই। আদর্শের দিক থেকে সে মৃত্যুঞ্জয়ের সমধর্মী। শারীরিক দিক থেকে দুর্বল, মানসিক দিক থেকে স্বামীপরায়ণা। মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টুনুর মায়েরও আকস্মিক পরিবর্তনকে যদি হিন্দুধর্মের সতীসাধ্বী স্ত্রীর আইডিয়াতে বেঁধে ফেলা যায় তবে হয়তো সব সমস্যারই সমাধান ঘটে। অবদমিত স্মৃতি সমূহ যা অবচেতনে সুপ্ত রয়েছে; সেগুলো চেতনার স্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রচণ্ড অস্থির আবেগসমূহের চাপে মৃত্যুঞ্জয়ের যে অসুস্থতা—টুনুর মায়েরও আসলে সেই অসুস্থতা কাজ করেছে। গল্পের খুব স্বল্প পরিসরে টুনুর মা মৃত্যুঞ্জয়কে বোঝার বা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট ইতিবাচক একটি চরিত্র। যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের অপেক্ষা করে, ছেলে-বুড়ো সকলকে পাঠিয়ে দেয় তার খোঁজ করতে, নিখিলকে অনুরোধ করে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে নজর রাখতে। পাশাপাশি জানিয়ে দেয়—সে সুস্থ হয়ে উঠলে মৃত্যুঞ্জয়ের

সঙ্গেই পথে পথে ঘুরতো। যে ক্ষয়িষ্ণু শক্তির প্রভাবে মধ্যবিত্ত মৃত্যুঞ্জয়ের মানবিকতাবোধ আঘাত পেয়েছে—উপায় খুঁজেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি; সেই একই মানসিকতার শরিক হয়ে টুনুর মা জেনেছে—"আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভাল করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওঁর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।" আসলে টুনুর মাও মুষড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। যে অনাহারী ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করেনি—ভেবেছে ফুটপাতবাসীর কথা। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় স্বার্থপর পারিবারিক জীবনকে ভেঙে দেওয়ার যে স্বপ্ন, ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী জীবনে উত্তরণের যে পর্যায়—সেই পর্যায়েরই অন্যতমা সদস্যা টুনুর মা, এক পরিবার কর্ত্রী।

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে টুনুর মা, নিখিল, মৃত্যুঞ্জয় ছাড়াও রয়েছে টুনুর মতো চরিত্র। যার নাম আছে কিন্তু বাস্তব উপস্থিতি নেই। গল্পকারের সৌজন্যে শুধু এটুকু অনুমান করে নেওয়া যায় অন্যান্য ভাইবোনের সঙ্গে টুনুও না খেতে পেয়ে, অবহেলায়, অনাদরে শুধু চেঁচিয়ে কেঁদেছে। ফলে টুনুর সমধর্মী এতদিন খেতে পাওয়া চরিত্রগুলো এই মুহূর্তে হয়ে উঠছে খেতে না পাওয়া গোষ্ঠী চরিত্র। আসলে একটা বৃহৎ সর্বহারা-অনাহারী গোষ্ঠীর উল্টো দিকে স্বার্থপর ব্যক্তি ও পরিবারের পরিবর্তনের গল্প বলতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন—এতদিনের খেতে পাওয়া চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিস্বার্থের খোলস ছিঁড়ে অনাহারী গোষ্ঠীতে মিশে যাচ্ছে প্রাথমিক ভাবে।

ছয়

নামের আড়ালে, শিল্পের আড়ালে "অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মরে গেলে বাঁচার পথনির্দেশ দেবে কে?" ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য'—ড. সরোজ মোহন মিত্র)। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি এরকমই একটা অর্থ করে গল্পের নাম 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' রেখেছেন? এটা সত্যি দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত এ গল্পে বাঁচার মন্ত্রটাই বড় হয়ে উঠেছে। তাই এক এক করে দেখা যায়—

১. ফুটপাতের অনাহারী মানুষগুলো বেঁচে থাকার জন্য দুটো খাবার চেয়েছে। পায়নি বলে মরেছে।

২. টুনুর মা আর তার ছেলে মেয়েরা না খেতে পাওয়ার অসুখে ভুগেছে। ফলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে ওদের কাছে।

৩. পাশাপাশি নিখিলও মনে করেছে "বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব।"

এক কথায় খাদ্যের জন্য—বাঁচার জন্য প্রত্যেকেই ভেবেছে, ভিক্ষা করেছে কিংবা নিজের সংগ্রহকে নিজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এ সবের বিপরীতে মৃত্যুঞ্জয়, অনাহারী মৃত্যু দেখা মৃত্যুঞ্জয় বাঁচতে চেয়েছে অন্যভাবে। একটা না খেতে পাওয়া মৃত্যু তাকে নিজের কাছে অপরাধী করে তুলেছে। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে সত্যিই তার বাঁচা বা বেঁচে থাকার অর্থটাই বদলে গেছে। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে—মৃত্যুঞ্জয় নিজেও

বাঁচতে চেয়েছে, নিজের এতদিনের সম্ভ্রান্ত বিলাসী জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু বাঁচাতে পেরেছে কি আর বাকিদের? পারেনি। হয়ত পারার পথ যেদিকে গেছে-তারই সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে মৃত্যুঞ্জয় কিংবা তার চিন্তা-চেতনা-অভিজ্ঞতা। ফলে সে নিজেও বাঁচেনি, অপরকে বাঁচাতেও পারেনি। মৃত্যুঞ্জয়ের আদর্শ-চেতনা কখনও বাঁচার পথ নির্দেশ করতে পারে না। কারণ "মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় চেতনার স্থান নেই একথা বলা হচ্ছে না। সত্যি সত্যি মতাদর্শীয় সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তো সমাজব্যবস্থা বদলায়। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে, সেই চেতনার দ্বন্দ্ব মতাদর্শীয় দ্বন্দ্ব, নানাভাবে গড়ে ওঠে উৎপাদন-সম্পর্ক ও এগিয়ে যাওয়া উৎপাদন-শক্তির দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে। দ্বন্দ্বগুলি মানুষের চেতনায় আসে এবং যা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়। ঠিক যেমন একজন লোক সম্পর্কে আমাদের ধারণা, সে নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে তা দিয়ে ঠিক হয় না, তেমন একটা পরিবর্তনের যুগের বিচার সে যুগের চেতনা দিয়ে আমরা করতে পারি না। বরং উল্টোটা। সেই চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তখনকার অর্থনৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব দিয়ে, সমাজের উৎপাদন শক্তির ও উৎপাদনের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দিয়ে।" (ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্র'-সত্যব্রত সেন/'কার্লমার্কস')। আমরা বলতেই পারি এই বৈজ্ঞানিক দর্শনের ছিটেফোঁটাও কাজ করেনি মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে। তাই মৃত্যুঞ্জয় হতাশায় আক্ষেপে বিলাসী জীবনের স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি নিয়ে সর্বহারা গোষ্ঠী জীবনে মিশে গেলেও; প্রাণের প্রথম চাওয়া 'বাঁচার' অর্থকে অনুভব করেছে ততটা যুক্তি দিযে নয়—দর্শন দিয়ে নয়, যতটা আক্ষেপ আর আবেগ দিযে। ফলে বাঁচা আর বাঁচানোব তাৎপর্যবহ ইঙ্গিত কবে তুলতে গল্প শিরোনাম হয়েছে 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!'

সেই শিরোনামে শ্লেষও আছে কিছুটা। তাই বিস্ময়বোধক চিহ্ন। বস্তুত বিস্ময়ের সূত্র ধরেই লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে শেষ পর্যন্ত বাঁচা আর বাঁচানোর সূত্রটাই প্রকাশ করেছেন—একটু ভিন্ন ভাবে। বুঝিয়ে দিয়েছেন বুর্জোয়া খোলস ত্যাগ করে একটা ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকে অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয় এই মুহূর্তে সর্বহারা দলেব একজন হয়ে গেলেও সে জানে না—বাঁচার শক্তিও এদের হাতে আর বাঁচাবার মন্ত্রও এদের হাতে।

"এ গল্পে কোন প্রচার ধর্মিতা নেই। জোরালো বক্তব্য নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের বিকারের সার্থক শিল্পরূপই পাঠককে ভাবিয়ে তুলবে" ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের জীবন ও সাহিত্য'—ডঃ সরোজ মোহন মিত্র)। সমালোচক যতই একথা বলুন না কেন— আজ একথা প্রমাণিত— মৃত্যুঞ্জযের বিকারজনিত শিল্পরূপের উপর গল্পটা দাঁড়িয়ে নেই। জোরালো বক্তব্য বা প্রচারধর্মিতা এ গল্পে রয়েছে সুপ্ত আকারে। কারণ দুর্ভিক্ষের কালে বসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গল্পকার কেবলমাত্র মধ্যবিত্তের বিকারগ্রস্ততার চিত্র আঁকতে পারেন বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। বরং বিকারজনিত গল্প কাহিনির শিল্পরূপের আড়ালে গল্পকার অন্য কথা বলেন। আর সেই কথাই (যে কথাটা তিনি পাঠককেই ভাবতে দিয়েছেন) এ গল্পের শিল্পময় ব্যঞ্জনার একমাত্র হাতিয়ার। তাই "কোথাও সোচ্চার ঘোষণা শিল্পচেতনাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেযনি। পতনের এবং অবক্ষয়ের নমুনাগুলি তাঁকে ভাবাচ্ছিল। চার পাশের দৃশ্যেব ও ঘটনাব তিনি নিপুণ অথচ নিরাসক্ত চিত্রকর। তবে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর দায়িত্ব অনেক

সময়েই পাঠককে দিয়ে দেওয়া হয়। মধ্যবিত্তের বিবেক -বিপর্যয়ের নানা বীভৎস অথচ বাস্তব নমুনা দেখিয়ে মানসিক ভাবে পাঠককে তিনি তৈরি করতে থাকেন।" ('কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য')।

গল্পের শেষতম বাক্যে গল্পের মহামুহূর্ত রচনা করে গল্পকার গল্পটাকে শেষ করে দিলেও— আসলে তিনি পাঠক মনকে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মননকে সচল রাখতে চেয়েছেন যে সচলতা সমগ্র গল্পে একটা শিল্পময় গতি এনে দিয়েছে। আকারে সংক্ষিপ্ত, ভারহীন এ গল্পের সূচনায় একটা পরিবর্তন ক্রমশ গল্পকে শেষের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। অযথা উপমাহীন, আবেগহীন, কথার মারপ্যাঁচহীন ভাষায় এ গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রের সাথে সাথে গল্পকার পাঠককেও দিয়েছেন একটা অভিজ্ঞতাময় সিদ্ধান্ত। যে অভিজ্ঞতাটাই এ গল্পের প্রধান সূত্র, প্রধান শিল্পময় ব্যঞ্জনা। অবশ্যই সেই শিল্পরূপের পিছনে আছে সহজ গদ্যরীতি, মুখের ভাষার স্বাভাবিক ব্যবহার, আর লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহজ রূপায়ণ। যে রূপায়ণ বা শিল্পসৌধের কারিগরকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে গবেষকের সমীক্ষা—"মানিকের ছোট গল্পের কাঠামোয় Artistic Economy–র সাফল্য তুলনাহীন। অবশ্যই মপাঁসা, ও হেনরী, হেমিংওয়ে, জ্যাক লন্ডন, এলেন পোর সমগোত্রীয়। ঘটনার আকস্মিক উপস্থাপনায় পরিকল্পনায় বাস্তবের রূঢ় কর্কশ বর্ণনায়, অলৌকিকের ধূম্র জাল রচনায়, নাটকীয় পরিণতি টানায়, জটিল চরিত্র চিত্রণে এবং যথাযথ ও যথাস্থানে উপসংহার টানার দক্ষতায় ছোটগল্পের তিনি অদ্বিতীয় রূপকার।" ['পুড়ে যায় জীবন নশ্বর'—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য]

আশাপূর্ণা দেবী

উত্তর কলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম আদি বাসস্থান হুগলীর বেগমপুরে। মাত্র তেরো বছর বয়সে আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য সাধনা শুরু করেছিলেন। বিয়েও হয়েছিল আরেকটি রক্ষণশীল পরিবারে। স্বামীর উদার হৃদয়ের প্রশ্রয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন গভীরভাবে। জীবনে তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি বিন্দুমাত্র। কিন্তু ঘরে বসে বিদ্যাচর্চায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। আর সেকারণে প্রথম জীবনে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হতে কোন বাধা পেতে হয়নি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। তারপর থেকে লিখে গেছেন সমস্তজীবন।

বাইরের জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব কম থাকলেও আশাপূর্ণার দৃষ্টি ছিল প্রশারিত। তিনি ২০০-রও বেশি উপন্যাস এবং প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। এছাড়াও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. ডিগ্রি ও সরকারি খেতাব পেয়েছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মানের অধিকারী হন। শেষ জীবনে সাহিত্য আকাদেমি থেকে ফেলোশিপ লাভ করেন। দেশকালের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত তাঁর গল্প-উপন্যাসে আন্তরিকতার সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে লেখা হয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ তাঁর গল্প উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা—উপন্যাস : টিলজি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'ছোটগল্প' : 'ছন্নমস্তা', 'অভিনেত্রী' ও আরও অনেক ছোটগল্প তিনি রচনা করেন।

ছিন্নমস্তা : একটি অন্বেষণ

সুস্মিতা ঠাকুর

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৫৫ খ্রীঃ) তাঁর 'যা দেখি, তাই লিখি' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, 'আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে কোথাও পা ফেলতে যাই না এবং আমার সেই জগৎটি একেবারে চার দেওয়ালের' মধ্যে সীমাবদ্ধ।....কেবলমাত্র নারী পুরুষের সম্পর্কেব মধ্যেই নয় পারিবারিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যেও কত টানা পোড়েনের কত ভেজাল নির্ভেজাল কারবার। নিরন্তর এই অফুরন্ত জীবনকে দেখে চলেছি। অনুভব করেছি, এবং বলেও চলেছি আমার ছোটো গল্পগুলির মধ্যেই বেশী।'—দেড় হাজারেরও বেশী ছোটগল্পে এইভাবেই আশাপূর্ণা নিজে তাঁর সৃষ্টির সীমা ও অসীমতার পরিচয়চিহ্ন দিয়ে দেন। মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার আশাপূর্ণা সমাজ এবং পরিবারের মধ্যে নিরাবেগ কৌতূহলে জীবন সত্য অন্বেষণ করে চলেন। সমাজ চিত্র নয়, সমাজ মনই তাঁর অন্বিষ্ট, আর তাব মধ্যেও তিনি তাঁর স্বভূমি খুঁজে পান নারীদের মধ্যে।

বাংলা সাহিত্যে এর আগে এক যুগপুরুষ 'সমাজে যারা শুধুই দিলে, পেলে না কিছুই' — সেই নারীদের জন্য লেখনী ধরেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে বিশুদ্ধ আবেগের সংবেদনায় নারী চবিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, আশাপূর্ণা সেখানে বাস্তবের স্বাভাবিক পটভূমিকায় নিরাবেগ নৈর্ব্যক্তিকতায তাঁর নারী চবিত্রগুলিকে তুলে ধরেছেন। শবৎচন্দ্রের গল্পে নারীরা প্রতিবাদ কবেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব প্রতিবাদই আবেগ ও ভাবালুতার বোমান্টিক সমীকরণে মধুব হয়ে উঠেছে,—এমন কি 'শেষ প্রশ্ন'-এব কমলও তাব ব্যতিক্রমও নয়।

অন্যদিকে আশাপূর্ণার নারীরা কেউ অসাধারণ পরিবেশ পবিস্থিতির মধ্য থেকে উঠে আসেনি। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ, তাদের সমস্যাও আপাত দৃষ্টিতে সাধাবণ। অসাধারণত্ব সেইখানে, যেখানে আশাপূর্ণা আটপৌরে সংসারেব জোড়াতালিব নিপুণ সূচিশিল্পকে নিরাসক্ত দর্শকের মতো সুচিহ্নিত কবেন। সূক্ষ্ম, জটিল, দ্বন্দ্ব জর্জর নাবীবা প্রাকৃতজনের মতোই তাঁব গল্পে এসে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে জীবনের যে রান্নাঘরে সব সময়ে কাজ চলেছে, তাব দেওয়াল পলেস্তারা খসা, এখানে ওখানে তার ঝুল ময়লার স্তূপ,—তারই মধ্যে কোথাও লাক্ষাগৃহের প্রস্তুতি, নির্ভুল প্রতিবাদ, কোথাও বা ছোট্ট জানলা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস, এক মুঠো সাদা আলো।—এই সবই প্রাত্যহিকতার গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অণু-পরমাণুব সুমিত সমবায়। আশাপূর্ণা যেন 'পোড়া বাড়ি আর ভাঙা দরজাটা' খুব সহজে দেখিয়ে দিতে চান পাঠককে, তবে মেলাবার দায়িত্ব পাঠকের। তাঁর গল্পে স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভযেবই তুল্যমূল্য দায়িত্ব।

আশাপূর্ণার ছোটগল্পের বেশীরভাগ নারীই সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে নিজেব সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে, কখনো সংসাবেব অপ্রিয় সত্যের বিষ নীলকণ্ঠের মতো হাসিমুখে পান কবেছে, সংসারকে দুঃসহ বেদনাব হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সচেতন ভাবে কাপট্য কবেছে, (পাঠক ভুলতে পারেন না 'অনাচাবে'র সুভাষকাকীমাকে), কখনো ক্ষুদ্র স্বার্থেব জন্য

আঘাত করেছেন প্রতিবেশকে, কখনো সংসার এবং সমাজের সঙ্গে যুদ্ধে রক্তাক্ত হয়েছে,—এরই মধ্য থেকে উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবাদের ভাষা। যদিও বেশীর ভাগ প্রতিবাদই হয়তো স্বগতোক্তির সুরে,—তা চরিত্রগুলির প্রেক্ষাভূমিকে ওলটপালট করে দেয় না, কিন্তু তার মধ্যেই পাঠক চেতনায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো একটি গভীর জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দেয়, এই সূত্রেই আশাপূর্ণা তাঁর লেখক সত্তাকে সম্প্রসারিত করে দেন পাঠক মনে।

আশাপূর্ণা সমাজতাত্ত্বিকের বেশে নয়, কিন্তু বৃহৎ অর্থে ছোট্ট সংসারের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যেই শোষক-শোষিতের দুটি ভূমিকা খুঁজে পান। কখনো শোষকের ভূমিকায় গৃহকর্তা বা সমস্থানীয় পুরুষ, শোষিতের স্থানে নারী; কখনো আশ্চর্যভাবে শোষক শোষিত দুটি ভূমিকাতেই নারী এসে দাঁড়ায়। আর অদ্ভুত আঁধারের এই মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতেই জীবনের চেতনা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।—এমনই একটি গল্প 'ছিন্নমস্তা'।

'ছিন্নমস্তা' গল্পের প্রথম অংশটি বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অতি পরিচিত। বিয়ের পর একমাত্র পুত্র বিমলেন্দু নববধূকে নিয়ে আসছে, তাদের আসন্ন আগমন প্রত্যাশায় চঞ্চল বিধবা জয়াবতী মনের মত করে বাড়ি সাজাচ্ছেন। এরই মধ্যে ফিরে ফিরে আসছে স্বামী পুত্রকে ঘিরে অতীতের সুখস্মৃতি; একমাত্র সন্তানটিকে ঘিরে স্বামী-স্ত্রীর স্বপ্নের শেষ ছিল না, সেই 'সব আশায় ছাই দিয়া দিব্যি কাটিয়া পড়িলেন দেবনাথ।...জয়াবতীর জন্য রহিল আনন্দহীন গুরু দায়িত্বের বোঝা।... ছেলের বিবাহ আজ আর রঙীন কল্পনা নহে, কঠিন কর্তব্য।—বিধবা জয়াবতী সামাজিক নিষেধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে থাকলেও আজ বধূবরণের আলপনা দিতে পারনে না, পারেন না অনেক সাধ করে বিমলেন্দুর 'জলপানির' টাকায় কেনা বেনারসী পরে বধূবরণ করতে। কিন্তু এ যন্ত্রণা তিনি সংগুপ্ত রাখতে চান নিজের মধ্যে, 'সস্তার করুণ রস আমদানি করিয়া অন্তর্নিহিত গভীর বেদনাকে খেলো করিবার প্রবৃত্তি নাই জয়াবতীর।'—চরিত্র প্রধান এই গল্পের প্রথম অংশে উঠে আসে ব্যক্তিত্বময়ী এক নারীর প্রতিচ্ছবি, যিনি পরিবারে তাঁর নিজস্বভূমি ও কর্তব্য বিষয়ে সচেতন।

যদিও এই গল্পের দ্বিতীয় পর্বে পাঠক এক স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। বহুস্বপ্নের সেই নববধূ যখনই এসে দাঁড়ায় শাশুড়ীর সংসারে, তখনই শুরু হয়ে যায় সংঘাত। প্রাচীন নবীনের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাতে প্রাথমিক ভাবে জয় হয় নবীনেরই,—প্রাচীনের দীর্ঘশ্বাসে গল্পাকাশ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।—এই পর্যন্ত গল্পটি কোনো সুরান্তর বহন করে আসেনি; আশাপূর্ণা তাঁর 'ঘূর্ণমান পৃথিবী'তে এই চিত্রটিই তুলে ধরেছেন ভিন্ন পটে;—সেখানে বৃদ্ধ শিবনাথ আবিষ্কার করেছেন—শৈশবে মাতৃহীন যে পুত্রকে পরম মমতায় বড় করেছেন,—সেই শঙ্খনাথ বিয়ের পর, 'কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। একটি সত্তাই শুধু চোখে পড়ে, যে হচ্ছে 'রুচিরা' নামের একটি সুন্দরী সুশিক্ষিতা মধুভাষিনী মেয়ে।'—এদের সংসারে বৃদ্ধ বাবার সামান্য একটি অনুরোধও অনধিকারীর দাবী। 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' শিবনাথের অভিমানী ধিক্কারের মধ্যেই শেষ হয়েছে। কিন্তু 'ছিন্নমস্তা'য় জয়াবতীর ভাবনান্তর আরও বিচিত্র, সর্পিল। আসলে শিবনাথ যেখানে থেকে যান জয়াবতী সেখান থেকেই নতুন রাস্তা ধরেন।

নববধূকে নিয়ে স্বপ্নভঙ্গের পর জয়াবতী আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করেন তাঁর এবং

বিমলেন্দুর মধ্যে এক অদৃশ্য দেওয়াল উঠে গেছে। প্রতিভা প্রতি মুহূর্তে জয়াবতীকে অগ্রাহ্য করছে। তাঁর সৌখিন গৃহসজ্জা প্রতিভার কাছে স্থূল গ্রাম্যতা, 'বাড়ীতে এমন এখানা বড়ো আয়না নেই, যে দাঁড়িয়ে চুলটা বাঁধি। ঘর সংসার গুছিয়ে তবে ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরে আনতে হয়—বুঝলে? বাহারের মধ্যে দরজা জানলার ছেঁড়া কাপড়ের পর্দা ঝোলানো। হাসি পায়।' 'এই বৌ হইল বিমলেন্দুর?'—এরপর রান্নাঘরের আচরণ এবং অধিকার নিয়েও স্বাভাবিক ভাবেই পুরোনো প্রজন্ম ও নতুন প্রজন্মের সংঘাত শুরু হয়ে যায়—এবং, 'দিন যায়। কেমন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে ছেলে, আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে বৌ, নিরুপায় আক্রোশে শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখেন জয়াবতী।'—এখানে লেখিকা ইঙ্গিতগর্ভ দুটি শব্দ ব্যবহার করেন, একটি 'আধিপত্য', অন্যটি 'নিরুপায় আক্রোশ'।—এই শব্দ প্রয়োগের মধ্যেই ধরা পড়ে জয়াবতীর মনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। গল্পের তৃতীয় পর্বে এই 'নিরুপায় আক্রোশে' জয়াবতী তাঁর এতদিনের পরিশীলিত স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ পথে চলতে শুরু করেন। শাশুড়ী ও পুত্রবধূর পারস্পরিক দোষারোপের মাত্রা ক্রমশই তীক্ষ্ণ এবং অমার্জিত হতে থাকে। পূর্ব স্বভাব বিস্মৃত জয়াবতী একদা আড়ি পেতে শোনেন প্রতিভা বিমলেন্দুকে বলছে, 'আসল কথা হিংসে! হিংসে! বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়,...নিজেদের সাধ আহ্লাদ সব ঘুচে গেছে কিনা, তাই পরের সুখ দেখলে হিংসেয় প্রাণ ফাটে। এই যে—তুমি আমার কাছে, একুট বসো কি দুদণ্ড গল্প করো—সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।..এতো বলে মরে যাচ্ছি, কলকাতায় নিয়ে চলো আমায়—

—আমিও তো খুঁজে মরে যাচ্ছি গো প্রতিভারাণী। বাড়ি পাচ্ছি কই?

কে বলিল কথাটা?

বিমল?

জয়াবতী বাঁচিয়া আছেন তো?...আরো বাঁচিবার প্রয়োজন আছে? এরপর স্বভাবতই মাতা পুত্রের বিচ্ছেদও সম্পূর্ণ হয়। শুরু হয় গল্পটির চতুর্থ পর্ব। স্ত্রীকে রেখে কলকাতায় চলে যায় বিমলেন্দু, এবং যেহেতু বাড়িতে 'তৃতীয় কেউ নেই'—তাই রান্নাবান্নার শেষে জয়াবতীই পুত্রবধূকে ভাত খেতে ডাকেন, আর সে আহ্বানও শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করে যায়, 'কি গো বড় মানুষের মেয়ে ভাতটাও খাওয়ার ফুরসৎ হবে? না কি বাঁদী হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে বেলা বারোটা অবধি?' এই সম্ভাষণের পর প্রতিভার আচরণও সভ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, 'প্রতিভা সশব্দে আসে, ভাত-তরকারি ফেলিয়া ছড়াইয়া যথেচ্ছভাবে খায়! উপকরণের ত্রুটি ধরিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে।.....তাহার বাপের বাড়ীতে নাকি তিনরকম মাছ রান্না না হইলে পাতের কাছেই আসে না কেউ, ভাতের চাইতে তরকারির পরিমাণ বেশী না হইলে যে আবার খাওয়া যায়, বিয়ের আগে না কি জানাই ছিল না প্রতিভার, ইত্যাদি।'—এই জাতীয় মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র অসহিষ্ণুতায় জয়াবতী প্রতিভার থালার পাশে তাঁর অতি প্রিয় এক কাঁসি সজনে খাড়ার চচ্চড়ি বসিয়ে দেন, এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় 'প্রতিভা হাতের উল্টো পিঠের সাহায্যে পাত্রটা খানিকটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলে তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদা গাদা চচ্চড়ি খাবার এত সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখতেই পারতেন নিজের জন্যে! আপনার লোভের জিনিস!

—কী! কী বললে বৌমা!

আহত জন্তুর মতো একটা বিকৃত চীৎকার বাহির হয় জয়াবতীর কণ্ঠে।.....প্রতিভা অবশ্য দমে না তাহাতে, মুচকি হাসির সঙ্গে বলে—মিথ্যে আর কী বলেছি? কাঁসি ভর্ত্তি চচ্চড়ি তো খান বসে বসে। দেখেছি বলেই বলছি।'—পাঠকও যেন প্রতিভার এই অশালীন মন্তব্যে লজ্জিত হয়ে পড়েন, কারণ জয়াবতীর এই সজনে ডাঁটার প্রতি দুর্বলতাকে তাঁর স্বামী পুত্র প্রতিবেশীরা চিরকাল স্নেহের চোখেই দেখে এসেছে, 'প্রীতির সেই দুর্ব্বলতাকে 'লোভ' বলে নাই কেউ কোনোদিন। হেনস্থার চোখে দেখে নাই ব্যাপারটা। আদরের ছিল.... আজ বিমলের বৌ আসিয়া সেই বস্তুটার খোঁটা দিল এমন নির্লজ্জ ভাষায়!'—এরপর বিপন্ন অস্তিত্বের আশঙ্কায় জয়াবতী যেন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যান, 'দর্পহারী মধুসূদনে'র কাছে পাগলের মত মাথা কুটে স্বামী সৌভাগ্যে 'দর্পী' এই মেয়েটির উপযুক্ত শাস্তি প্রার্থনা করেন, আর দর্পহারী মধুসূদন যেন সে প্রার্থনায় সাড়াও দেন, 'আর আশ্চর্য! প্রতিভার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর দর্পচূর্ণ করিতে একেবারে গদাটারই প্রয়োজন হইল বীরপুরুষের।... তা নয় তো যে বিমলেন্দু নিত্য দুই বেলা ট্রামের ফুট বোর্ড হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়ে সেই দিনই বা সে সোজাসুজি রাস্তার বদলে রাস্তায় চলন্ত বাসের তলায় পড়িল কেন?'

গল্পটি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। কারণ গল্পটি আদৌ কাহিনী প্রধান গল্প নয়, লেখিকার অন্বিষ্ট বিসর্পিল মানব মন। তাই পঞ্চম পর্বে ছোট একটি উপসংহার সংযুক্ত হয়। প্রতিবেশীরা বলেছিল, 'এ ধাক্কা সামলাতে পারবে না মাগী, পাগল হয়ে যাবে—' কিন্তু কার্যত দেখা গেল জয়াবতী আবার ফিরে গেছেন তাঁর প্রাত্যহিক গৃহকর্মে, শুধু একটি নতুন কাজ সংযোজিত হয়েছে তাঁর দিনলিপিতে,—সদ্য বিধবা পুত্রবধূটিকে 'বিশেষ যত্নে' খাওযানো। 'স্নেহ বিগলিত করুণস্বর করুণতর হইয়া ওঠে অনুরোধ উপরোধের সময়।... পাখা হাতে করিয়া কল্পিত মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে বলেন,—খেতে পারছি না বললে চলবে কেন মা? ভালো জিনিস খাওয়ার বরাত তো ঘুচিয়েছেন ভগবান, পোড়া বিধবার গুচ্ছির শাক পাতা ডাল চচ্চড়ি না খেয়ে উপায় কি?.....আর দু'গাছা ডাঁটা দিই।' জয়াবতী প্রতিভার সেই অশালীন মন্তব্যটির প্রত্যুত্তর দিলেন কি? কিন্তু কাকে বিদ্ধ করলেন?—যদিও জয়াবতীর প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হয়ে দেখেন, এই 'অপয়া' বউটিকে কত যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন তার শাশুড়ী, কিন্তু, 'আচ্ছা—জয়াবতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাঁদের, দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে?... কণ্ঠস্বরে মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার স্নিগ্ধচ্ছায়া?... চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে?—গল্পের শেষ পঙ্ক্তিতে এসে দাঁড়িয়ে পাঠক বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন যেন,—এইখান থেকেই উঠে আসে গল্পটিব গঠন কৌশল এবং নামকরণের সূত্র।

গঠন : চরিত্রভিত্তিক এই গল্পটিকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতই পাঁচটি অঙ্কে বিভাজিত করা যেতে পারে। প্রথম অঙ্ক, পুত্র-পুত্র বধূর প্রথম আগমন প্রত্যাশায়, একটি স্বপ্নের বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে জয়াবতীর মনের চিত্র, যে চিত্রটি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে দীপিত। দ্বিতীয় অঙ্ক জয়াবতীর স্বপ্ন ভঙ্গের ইতিহাস, 'এই বৌ হইল বিমলেন্দুর।... জয়াবতীর দীর্ঘ তপস্যার ফল? প্রায় আজীবনের আশার কুসুম?' এরপর জয়াবতীর চরিত্রটি পরিচিত সুভদ্র

খাত ছেড়ে অপরিচিত রাস্তার বাঁকে এসে দাঁড়ায়। শুরু হয় গল্পের তৃতীয় অঙ্ক। এইখানে পাঠক যেন খুঁজে পান প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইনের বিখ্যাত দুটি তত্ত্বকে,—বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তনের একটি সামাজিক প্রয়োগ চিত্র। জয়াবতী এবার অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে অবতীর্ণ,—এ কাহিনী যেন চিরকালের অধিকার রক্ষা এবং অধিকার স্থাপনের যুদ্ধ। তাঁর এতদিনের সংসার এবং পুত্রের উপর অধিকার ছেড়ে দেবেন না জয়াবতী। অন্যদিকে প্রতিভাও বুঝে নেবে তার সংসার এবং স্বামীকে। স্বভাবতই নবীনের কাছে প্রাচীন হেরে যেতে থাকে, শুরু হয় চতুর্থ অঙ্ক। প্রতিভা তার অধিকৃত এই নতুন পৃথিবীর উপর অধিকার ঘোষণা করে, 'বিধবা মাগীদের মতন গাদা গাদা চচ্চড়ি খাবার এত সখ নেই আমার। ...রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে? আপনার লোভের জিনিস!' এর পরেই জয়াবতীর 'দর্পহারী' মধুসূদনকে ডাকা এবং তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া। হঠাৎ মনে হতে পারে বিমলেন্দু'র দুর্ঘটনায় মৃত্যু-ই গল্পের ক্লাইম্যাক্স। কিন্তু গল্পটিতো কাহিনী রসাশ্রিত নয়, চরিত্রের উদ্ভাসনই এর লক্ষ্য। আসলে ক্লাইম্যাক্সের রসকে পাঠক মনে তীব্রভাবে সঞ্চারিত করার জন্য এখানে একটি সংকট মুহূর্ত বা ক্রাইসিস সৃষ্টি করা হয়েছে! নিঃশব্দে শুরু হয় পঞ্চম অঙ্ক। বিমলেন্দু'র মৃত্যু হঠাৎ যেন গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে স্বামী সৌভাগ্যে গরবিণী প্রতিভার অকাল বৈধব্যের স্তব্ধতা এবং সদ্য বিধবা পুত্রবধূকে জয়াবতীর মাত্রাতিরিক্ত স্নেহের সঙ্গে ভাত খাওয়ানোর চিত্রে। আর এখানে লেখিকা একটি করে প্রশ্ন চিহ্ন আঁকতে আঁকতে বলেন, 'কণ্ঠস্বরে মমতার মাত্রাটা বড়ো বেশী পরিস্ফুট হইয়া ওঠে না?' এরপরই পাঠক চলে আসেন তিনটি ভয়ঙ্কর বাক্য সংবলিত শেষ অনুচ্ছেদে, 'আচ্ছা—জয়াবতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাঁদের, দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে? ... কণ্ঠস্বরে মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার স্নিগ্ধচ্ছায়া? ...চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণে, অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে?''—ও. হেনরী যাকে 'হুইপ্ ক্র্যাক্ এন্ডিং' বলেছেন—এই গল্পের অন্তিম মুহূর্তটি তা-ই। গল্পের শেষ বিন্দুতে ক্লাইম্যাক্সের অবস্থানের জন্য গল্পটিকে আমরা তাই রকেট প্লটের গল্প বলতে পারি। ছোটোগল্পে এই জাতীয় চমক মোপাসাঁর গল্পে বেশী দেখা যায়, সেইদিক থেকে গল্পটিকে মোপাসাঁ রীতির গল্প বলা যায়। তবে, কাহিনী বিস্তারে 'ছিন্নমস্তা' গল্পটি হয়তো ছোটগল্পের সাধারণ সূত্রকে মেনে চলেনি,—একটু দীর্ঘ তার পরিসর;—কিন্তু আশাপূর্ণা ছোটগল্পের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্তটিকেই মেনে নিয়েছেন,—গল্পটি একটি মাত্র সত্যকে বিদ্ধ করতে চেয়েছে,—একটি বিশেষ চরিত্রের অন্তর সত্তার উদ্ভাসনই তাঁর লক্ষ্য,—তাই সেখানে একটিও অপ্রয়োজনীয় চরিত্র অথবা বাক্যবন্ধ নেই। আবেগবর্জিত ভাষায়, অতি সহজ, সর্বদা ব্যবহৃত পরিচিত, ঘরোয়া শব্দের শাণিত প্রক্ষেপণে তাঁর ছোটগল্পটি তীক্ষ্ণ সায়কের মত লক্ষ্যভেদী, সত্য সন্ধানী। কাহিনীর প্রথম থেকেই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রটি গল্পাকাশে উঠে গেছে,—শেষ মুহূর্তে তা আলোর বন্যায় ফেটে পড়েছে। —আর সেই ভয়ঙ্কর আলোতে এক ব্যতিক্রমী নারীর মুখ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, —সত্যিই এই মানুষটি 'ছিন্নমস্তা'।

জয়াবতী : এইখানে পাঠকের একবার মনে পড়তে পারে আশাপূর্ণার 'আয়োজন' গল্পটি, যেখানে পিতামহ তাঁর চোখের মণি আড়াই বছরের নাতিটির পরোক্ষ মৃত্যু কামনা করে

ফেলেছেন অবাধ্য পুত্রবধূকে শাস্তি দেবার জন্য। কিন্তু সেই অসতর্ক বাক্যটি উচ্চারণের মধ্যে জয়াবতীর হিংস্রতা অনুপস্থিত, 'লোকনাথ সেই 'পাঁচ পয়েন্ট ছয়ের' (জ্বর) মুখের দিকে তাকালেন একবার। বুকের মধ্যেটা হাহাকার করে উঠল, মাথাটা ঠুকতে ইচ্ছে হল দেয়ালে।... আর পারলেন না লোকনাথ। পাঁজরের মধ্যেটা মুচড়ে উঠলে মুখ সামলে থাকা কি সহজ?' আসলে লোকনাথের নিষ্ঠুরতা চরিত্রের উপরিতল ভিত্তিক মাত্র। অন্যদিকে জয়াবতীর হিংস্রতার মধ্যে রয়েছে আদিম পৃথিবীর অসংস্কৃত রূপ।

প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় নারী চরিত্র দুর্লভ। কারণ মাতৃত্ব বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট মাত্রা,—যা চরিত্রকে দীপিত করে। কখনো কখনো স্বার্থপরতা বা সুস্থ বিচারবোধের অভাব সে মাতৃত্বকে অস্বচ্ছ করে তুলতে পারে, তবু শেষ পর্যন্ত মানুষ যে মানুষই সেই সত্য-চেতনা লুপ্ত হয় না।—অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে হেরে গিয়ে কোনো মা সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন, এবং বিধবা পুত্রবধূকে দেখে হিংস্র আনন্দে মেতে উঠতে পারেন,—বাংলা সাহিত্যের পাঠকের এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। আর জয়াবতী চরিত্রের এই পরিণতির বীজ ছিল গল্পের প্রথম থেকেই, —হয়তো সে অধিকার প্রবণতা ছিল সুভদ্র মুখোশের আড়ালে,—স্বামী পুত্রকে অতিরিক্ত মমতার অনুষঙ্গে।

পুরাণে আছে দক্ষকন্যা সতী শিবহীন যজ্ঞে অনিমন্ত্রিত ভাবে পিতৃগৃহে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, শিব অনুমতি দেন না। রুষ্টা সতী তখন দশ মহাবিদ্যা রূপে শিবের সামনে প্রকটিত হন,—বলাবাহুল্য এই প্রতিটি রূপই ব্যতিক্রমী ভাবে তীব্র, অসহনীয় সৌন্দর্যে ভাসিত,—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ রূপের মধ্যে ভয়ঙ্করতম ছিন্নমস্তা-রূপ, —যেখানে দেবী নিজের খড়্গে নিজ মস্তক কেটে, কর্তিত মুণ্ডটি সহস্তে ধরে আপন শোণিত পান করছেন। এমন ভয়ঙ্কর দেবী পরিকল্পনা যেমন বিরল, তেমনই এই ভাবনার প্রতিফলন সমাজ জীবনেও বিরল। কিন্তু কখনো কখনো এই বিরল অভিজ্ঞতার মধ্যেও জীবন এসে দাঁড়ায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পের শেষ বাক্যটি মনে পড়বে, 'পুরোহিত বলিলেন, খাও হে চক্রবর্তী।' —সেখানে ওই বিশেষ চরিত্রটি শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডির নির্মমতাকে স্পর্শ করেছে, —এবং পাঠক চেতনাও ওই হতভাগ্য মানুষটির দুর্ভাগ্যের বেদনায় মূক হয়ে গেছে। কিন্তু জয়াবতীর পরিণতিকে পাঠক কি বলবেন? জয়াবতীর পরিণতি পাঠককে যেন এক নিঃশ্বাস বায়ুহীন পৃথিবীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। আসলে জয়াবতী নিজেও জানেন না, ভয়াবহ অহং বোধে তিনি মানুষী সম্পর্কের যাবতীয় অস্ত্যার্থক সীমাকে ভেঙে চুরমার করে, অবশেষে নিজেই একটি জীবন্ত শবদেহ হয়ে গেছেন।

. —যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের শেষ বিন্দুও অপসৃত, সেই মানুষটিকে কোন অভিধায় সীমায়িত করা যাবে? গল্পের শেষ পঙ্‌ক্তিটি নির্মমভাবে এই সত্যটিকে উন্মোচিত করেছে, —জয়াবতী 'ছিন্নমস্তা',—বস্তুত এছাড়া আর কোনো বিশেষণেই তাঁকে নামাঙ্কিত করা যায় না।

অভিনেত্রী : একই সত্তার ভিন্ন রূপ

নবগোপাল রায়

জীবন নামক নাটকের কেন্দ্রে যে অনেক সময় নারীরাই একথা বারংবার উচ্চারিত হয় আশাপূর্ণার গল্পে। 'সবদিক বজায় রেখে' গল্পের 'তনিমা' বা 'অনুপমার ঘর' গল্পের 'অনুপমা' বা 'বীরাঙ্গনা'—প্রভৃতি সকল গল্পতেই দেখি নারীসত্তা কিভাবে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যায় সংসার-রঙ্গমঞ্চে। মনের গোপনস্তরে তাঁর গল্পের নারীরা আত্মসচেতন হলেও সংসার-আঙিনায় সচেতন নয়, কিছুটা হলেও গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান। বলা বাহুল্য সচেতনভাবে গড্ডলিকা-প্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে আশাপূর্ণার গল্পের নারীরা এক ভিন্ন জগৎ তৈরী করেছে, যেখানে এক নারীর মধ্যে অনেক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আপন কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যেমন উপরিস্তরে খুব সাধারণ হলেও অন্তরে প্রজ্ঞাশীলা, ঠিক তেমনই আশাপূর্ণার গল্পের নায়িকার উপরিতলে বাস্তবের প্রতিবিম্বিত চিত্র হলেও চরিত্রের অন্তর্লীনস্তরে তার বিন্যাস অনেক দূর, অনেক গভীরে প্রোথিত তার মূল; যা উত্তরআধুনিক কালের বিচারে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। সমাজ-পট পরিবর্তন, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকাবে আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের নায়িকারা যথার্থ সচেতন।

সংসার-রঙ্গমঞ্চে প্রায় প্রত্যেক নারীই মুখোশ এঁটে অভিনয় করে যায়, আর এই বাস্তবানুগ ঘটনার প্রতিচ্ছবি 'অভিনেত্রী' গল্পে প্রতিবিম্বিত। কিশোরী নববধু অনুপমা কমদিনেই রায়-পবিবারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলি সম্পর্কে সচেতন। তাই গল্পের শুরুতেই যখন 'বৌমার বাপ' এসেছে তখন তার আপ্যায়নের ভার যথাযথ সু-গৃহিণীর মতই সামলাতে হয় অনুপমাকে। 'বাপ-ভাই' কুটুম হয়ে ওঠে শ্বশুরবাড়িতে—চেনা-মানুষগুলিকে অচেনা অতিথির আসনে বসতে দিতে হয়। পাশাপাশি বাবার বাড়ি যাবার ইচ্ছা সকলের সামনে না জানিয়ে কিছুটা আড়ালে গিয়ে 'অস্ফুট স্বরে' প্রকাশ করে অনুপমা তার সচেতন 'বধূমাতাব' তক্‌মাটি বজায় রাখে, সে বাবার খাবার সময় সেকথা বলেনি কারণ সে 'জানতো খাবার সময়টা অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এদিকে।' উৎকণ্ঠিত কিশোরী-হৃদয় হলেও জানে 'বাপের বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রকাশটাও অমার্জনীয় অপরাধ।' তাই পাকা গিন্নীর মত ফিস্‌ফিস্ করে বাপকে উপদেশ দেয় অনুপমা "বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বোলো বাবা, জানোই তো আমার শ্বশুর একটু রাগী মানুষ?" আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না কিশোরী-নববধূর অন্তর্লীন চালিকা-শক্তি কিভাবে উভয়পক্ষকে মানিয়ে চলার জন্য অভিনয়-পটু করে গড়ে তুলছে অনুপমাকে! ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ীর কর্তা 'ছেলের-বৌ' এর যত্ন-আত্তিসহ ভোজন পর্ব সারতে সারতে জানিয়ে দেন যে অনুপমার বাবা তার কন্যাকে নিয়ে যেতে চান। অনুপমার তৎক্ষণাৎ শুরু হয় বিনয় পর্ব, শ্বশুরকে হাতপাখা দিয়ে জোরে হাওয়া দিতে দিতে নিজের বাবার কথা যেন অগ্রাহ্যভরে সরিয়ে দিতে চায় সে, 'মায়ের বাতিক' এবং বাবার অকর্মণ্যভাব কথা উল্লেখ করে, নিজ সংসারের সম্ভাব্য অসুবিধার প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে চিন্তান্বিত ভাব প্রকাশ করে :

"অনুপমার মুখেও বিদ্যুৎরেখা, কিন্তু সুকৌশলে তার উপর একখানি নকল মেঘ ঢাকা

দিয়ে হাতের পাখা নামিয়ে গালে হাত রেখে বলে—সে কি বাবা! কথা দিলেন কি! মার এই শরীর খারাপ, দু দিন বাদে ঠাকুরঝি আসবেন। বামুনঠাকুর 'দেশে যাবো' বলছে—দুশ্চিন্তায় যেন মুষড়ে পড়ে অনুপমা।" শ্বশুর-শাশুড়ীকে 'বাবা-মা' সম্বোধনে সহৃদয়তার বন্ধন প্রকাশ করে মুখে কালো মেঘ তথা দুশ্চিন্তার প্রকাশ করে অনুপমা শ্বশুরের 'মন রাখতে' বেশ সফল। প্রয়োজনে শাশুড়ীমাতার নিটোল দেহখানিতে যেখানে রোগের বিন্দুমাত্র বালাই নেই, সেই শাশুড়ীর 'শরীর খারাপ' এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে কিশোরী অনুপমা বাড়ীর কর্তা-গিন্নী উভয়ের মনোরঞ্জনের এক উৎকৃষ্ট দাওয়াই ব্যবহার করতে সুনিপুণ—পটীয়সী গৃহিণী। শুধুমাত্র বাড়ীর কর্তা নয়, স্বামী তারানাথের সম্ভাব্য বিরহ-বেদনা মুছে ফেলতে প্রণয়িনী হিসাবেও যথেষ্ট পটু সে। বস্তুতপক্ষে স্বামীর পরিবারের সকলেই অনুপমার অন্তর্লীন সত্তার কাছে 'খেলনা পুতুল'। চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে একটা প্রচ্ছন্ন অভিনয়ের গ্রন্থিতে গেঁথে অনুপমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে নারী-শক্তির অন্তর্গূঢ়-চেতনা, বলিষ্ঠতা। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে, বলা ভালো সব দিক বজায় রেখে চলতে অভিনয় করে যেতে হয়েছে অনুপমাকে।

'অভিনেত্রী' গল্পের কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু প্রায় দু'যুগ পরে, দু-যুগ আগে যে কিশোরী-বধূটিকে দেখি, দু-যুগ পরেও সে বিদ্যমান, তবে সে আজ বাড়ীর কর্ত্রী; সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিপূর্ণ তার সংসার। তবে দু-যুগ পূর্বের জিনিসপত্রের 'জলের মূল্যে'র দাম আজ 'অগ্নিমূল্যে' পরিবর্তিত। দিন-বদলের ফলে সংসারের অনিচ্ছাকৃত ব্যয়বাহুল্যের সংকোচন ঘটেছে, তবে অনুপমার জীবন-চর্যা বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে যেভাবে সামলাতে হয়েছে স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ীকে, ঠিক্ তেমনই বর্তমানের পরিপূর্ণ-গৃহিণী অনুপমাকে সামলাতে হয় স্বামী-পুত্রের সম্পর্ক, সঙ্গে সংসারের অনান্য খুঁটিনাটি; 'ছেলেমেয়ের কান বাঁচিয়ে অনুপমাকে বজায় রাখতে হয় সবদিক, বাবু অর্থাৎ তারানাথ—অনুপমার বয়স্ক বেকারপুত্রের দিল্লী বেড়াতে যাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে 'বাবুর বিরুদ্ধে' যে কথা আলোচনা হয়, সে কথা বাবুর কর্ণগোচর হয়েছে বোঝামাত্রই অনুপমাকে ছুটে যেতে হয় বাবুর কাছে এবং তখন আবার স্বামীর-বিরুদ্ধে কথা বলে 'ছেলের মন' রাখতে হয় অনুপমাকে। অন্যদিকে তারানাথ ছেলেকে কিছু বলতে পারেন না, কারণ চল্লিশোর্দ্ধ অনুপমার মুখে চব্বিশ বছরের মানানসই হাসিটি তাকে সব শাসন থেকে বিরত করে দেয়। অনুপমার এই হাসির অর্থ অনুপমাই জানে, কারণ তারানাথের বকুনি যাতে তারকনাথকে সহ্য করতে না হয় এজন্য সদা সচেষ্ট তার মা। আবার তারানাথ চলে গেলে পুত্রের কাছে গিয়ে তার মা ভালো-মন্দের খবর নেয়, শরীরখারাপের জন্য তদ্বির করে; তখন অনুপমা ছেলের অত্যন্ত কাছের মানুষ। যে শানিত বাক্যবাণে তারানাথকে অনুপমা বিদ্ধ করে তোলে, তা ছেলে-মেয়ের সামনে বিন্দুমাত্র নেই বরং 'খোকা' তার মাকে প্রতিবাদ করে, বাবাকে খোসামোদ করে চলার জন্য; নানা যুক্তি-তর্ক দিয়ে তারকনাথ বলে, "খোসামোদ করবে কিসের জন্য? বাবাকেও চিরকাল ভয় করে আর খোসামোদ করে করে এই অবস্থা! কিন্তু কেন? তোমার নিজের একটা সত্তা নেই? ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনা নেই? যুক্তিতর্ক নেই?"—একথা শুনে অনুপমার বাঁকা ঠোঁটের কোণে এক সূক্ষ্ম হাসির রেখাই প্রকাশ করে দেয় তার দৃষ্টিকোণ,

বলা বাহুল্য অনুপমার মধ্যে যুক্তিতর্কের প্রাবল্য এত বেশী আছে যে, তার সেই প্রবলতা 'সমুদ্রস্রোতের মতো ভাসিয়ে দিতে পারে বাপ-ছেলে দু'জনকেই। কিন্তু ভাসিয়ে দিলে- চলে কই অনুপমার?.... বিচার-বিবেচনা? সেটা যে আছে, তার প্রমাণ দিতে গেলেই তো সংসার করা ঘুচে যেত অনুপমার।' আসলে সংসার টানতে গিয়ে নানা ছলনা, অভিনয়-সক্ষমতার মাধ্যমেই অনুপমাকে সব দিক বজায় রাখতে হত। সংসারের বর্তমান কর্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার অভাব আছে এমন নয়, আসলে 'সে বস্তুটাও তো আমসত্বের মতো জলে গুলে রোদে শুকিয়ে ভাঁড়ারজাত করা হয়েছে।' আর তা না করা হলে একইসঙ্গে স্বামীর মেজাজ, পুত্রের তড়পানি... ইত্যাদি সামলানো অনুপমার পক্ষে অসম্ভব হতো; মধ্যবিত্তের জগতে যুক্তি-তর্ক-বিচারবুদ্ধি—সত্তা জিজ্ঞাসা নয়, অনুপমা সচেতনভাবেই অভিনয়ের মাধ্যমে পুরুষশাসিত সমাজে নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখে-নারীসত্তার কথা ভুলে গিয়ে অক্লান্ত অভিনয়ের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখে তার সংসারকে, বস্তুতপক্ষে এসকলের পিছনে প্রতিষ্ঠা পায় তার আত্মকর্তৃত্ব। গল্পের শেষে জানতে পারি—''ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা! ....এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা-লেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশুভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ত—ক'দিন লাগত পৃথিবীটা ধ্বংস হ'তে?'' বলা বাহুল্য সংসার রঙ্গমঞ্চে অনুপমার মত অভিনেত্রীদের বিভিন্ন সত্তার 'বিশাল পক্ষপুটের আড়ালে সযত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে চিরশিশু অবোধ পুরুষজাতিকে।' কখন কোন নিঃশব্দ প্রক্রিয়ায় এভাবেই আপাত ছলনা তথা আনুগত্যের আড়ালে সংসার তথা জগতের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন অনুপমারা, সংসারের 'অভিনেত্রী'রা।

আপাতভাবে মনে হতে পারে 'অভিনেত্রী' গল্পটি বাবা-শ্বশুর, স্বামীর-পুত্রের কাহিনীবৃত্তে মোড়া এক অভিনয়ের গল্প, যে অভিনেত্রীর লীলা-চাপল্যে সংসারে শান্তি বজায় থাকে। দেখা যায় অনুপমা 'নব-বধূ' পর্যায়ে বাবা ও শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে, দ্বিতীয় পর্যয়ে স্বামী-পুত্র- কন্যা নিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছেন, যাতে সব দিক বজায় থাকে—সকলেই যাতে খুশি হয়। পিতা-পুত্রের বিদ্রোহ চল্লিশোর্দ্ধ অনুপমা সামলে দেয় রহস্যময় হাসির চাপল্যে—এই যে কৌশল, আপাত যুক্তিতর্কহীনতার আড়ালে শানিত বুদ্ধির প্রয়োগ, তা রায় পরিবারের শান্তিরক্ষায় নিতান্ত প্রয়োজন, বাস্তবানুগ। পুরুষশাসিত সংসারে নিজের ব্যক্তিসত্তার বিস্ফোরণ সে ঘটতে দেয়নি, ছলনা বা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তা অবদমিত রেখেছে, কারণ এই অভিনেত্রী হয়েই সে গ্রন্থিভুক্ত করে রেখেছে সমগ্র সংসারকে। 'অভিনেত্রী' গল্পে অনুপমা তার উপমা-হীন তথা অনুপম অভিনয়ের সাহায্যে যেভাবে তার সংসারকে ধরে রেখেছে তার ব্যত্যয় ঘটলে সংসারে নেমে আসত সমূহ বিপর্যয়, ভেঙ্গে যেত তথাকথিত সুখাবিষ্ট সংসার। আসলে এই অনুপমা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দেশ-কাল-নির্দেশিত অনুপমা নয়, প্রতিটি মধ্যবিত্ত তথাকথিত সুখী পরিবারেই এই অনুপমাদের দেখতে পাওয়া যাবে। এই অনুপমারাই তাদের অনুপম অভিনয় দিয়ে রচনা করে সুখী গৃহকোণ, আর সেখানেই সার্থক হয়ে ওঠেন এই অভিনেত্রীরা। 'অভিনেত্রী' গল্পের নায়িকা অনুপমা সংসারজীবন বা পরিবারজীবনের অভিনেত্রীদের একজন প্রতীকমাত্র।

'অভিনেত্রী'তে আশাপূর্ণা দেবী কুশীলবদের সংলাপে পরিবারজীবনের বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ

রেখেছেন, আর ঐ নির্মাণের মধ্যেই ধরা পড়ে অন্তর্লীন স্তরের ক্রিয়াকলাপ। অনুপমা মুখের ভাষা দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছে, কিন্তু অন্তর্জগতে তার দাবী অনেক দূর-বোধকরি অনুপমা শুধুমাত্র এক সরলরৈখিক মানুষ হয়ে থাকে না, সে হয়ে ওঠে উত্তর-আধুনিক কালের জিজ্ঞাসায় বহুত্ববাদী সত্তার প্রতীক। চিত্তহীন, ভাবলেশহীনভাবে পুরুষজাতিকে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাতে অনুপমা সুডোল অভিনয় করেছে, তার যুক্তিতর্ক তথা অন্তর্জিজ্ঞাসাকে প্রকাশ করেনি। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, অনুপমা ছলনা করে কেন? বিদ্রোহ করে না কেন?—আশাপূর্ণা এখানে তার অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ জীবনসত্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, বিদ্রোহ করলে বা ছলনাহীন নারী নিজ রূপ পরিগ্রহ করলে নাবালক, শিশু পুরুষজাতি ধ্বংসোন্মুখ হয়ে যেত। ঠিক্ এই সচেতনতার সঙ্গে, নিঃশব্দে, অনুপমা তার অভিনয়—সক্ষমতা দিয়ে আপাত অস্বীকৃত—কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে সংসারে, 'অভিনেত্রী' হয়েই নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে নিজের হাতে।

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে'—বহুচর্চিত এই বচনের যাথার্থতা বোধকরি নারীশক্তিকে অভিনয়ের মাধ্যমেই বজায় রাখতে হয়। সংসার তথা জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ই বোধহয় সুখ তৈরীর জীয়নকাঠি। শেক্সপীয়র 'As you like it' নাটকে লিখেছেন,

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts." (Act -- II, Sc.- VII)

লক্ষ্যণীয় 'রঙ্গমঞ্চে' যেভাবে একের পর এক দৃশ্য গেঁথে সম্পূর্ণ নাটক তৈরী হয়, সেভাবেই নানা 'সিন' তথা কমবেশী ছয়টি দৃশ্যে ধরা পড়েছে 'অভিনেত্রী' গল্পের অনুপমার জীবন। বস্তুতপক্ষে সংসারচক্রে সে 'plays many parts'; যার সহ অভিনেতা-অভিনেত্রী কখনো বাবা-শ্বশুর-শাশুড়ী, কখনো স্বামী-পুত্র-কন্যা। আর এই নিটোল দৃশ্য গ্রন্থনের মধ্যদিয়ে অভিনেত্রী অনুপমা গেঁথে চলে তার সংসার-বৃত্ত, রচনা করে চলে তাদের সারাজীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

সুবোধ ঘোষ

জন্ম বিহারের হাজারিবাগে। হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে পড়াশুনা। ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' রচনা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)। তিনি উপন্যাস বেশি লেখেননি। তবে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ছোটগল্পগুলোকে ঘিরেই। কিন্তু ছোটগল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

'অযান্ত্রিক', 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার' এবং 'সুন্দরম' প্রভৃতি গল্পে সুবোধ ঘোষ নানা দিক থেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'উচলে চড়িনু', 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালির সুবিধাবাদী চরিত্র ও কৃত্রিম মর্যাদা বোধের মুখোশটিকে তিনি উত্থাপন করেছেন। বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, চারুকলা বিষয়ক 'কাগজের নৌকা', 'রঙ্গবল্লী', ইতিহাস বিষয়ক 'ভারতের আদিবাসী', 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' অনুবাদ রচনা, 'ভারতে মাউন্টব্যাটেন' গান্ধীজীবন অবলম্বনে 'অমৃত পথযাত্রী'। এছাড়া 'আকাশমায়া' ছোটদের জন্য লিখেছেন 'পুতুলের চিঠি', 'ঝিনুক কুড়িয়ে মনি', প্রভৃতি। তবে তাঁর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভারত প্রেম কথা' ও 'কিংবদন্তীর দেশে'।

চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ : এক বিপর্যস্ত কালকথা

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' সুবোধ ঘোষের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্পটি বিহারের হাজারিবাগ ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণাকে অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীর আরণ্য হাহাকারকে স্পর্শ করেছে—হয়ে উঠেছে বিশ্বের গল্প।

'রেড ইন্ডিয়ান'ই হোক বা নিউজিল্যান্ডের 'মাওরি' বিভূতিভূষণের 'দোবরু পান্নাই' হোক বা সুবোধ ঘোষের 'রনন্যু হোরো'—বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে শিকড় আলগা। অঞ্চল বা পরিবেশ এ গল্পে আউট অফ ফোকাস। এক এক করে ক্লোজআপে টেনেছেন জনজাতি সংবেদনা যুগযন্ত্রণা এবং শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজকদের সঙ্গে আদিবাসিদের সংঘাত।

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ এক বিপর্যস্ত মূল্যবোধের ছবি—প্রতিবাদ এবং নিঃসঙ্গ জীবন যন্ত্রণার ছবি—এক শিকড়ের টানের ছবি—অরণ্যের একছত্র অধিকারে জন্য লড়াইয়ের ছবি।

স্বাধীনতা-পূর্ব বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে সতীনাথ ভাদুড়ী এবং সুবোধ ঘোষ এই দুই কিংবদন্তী লেখক আগাপাশতলা তুলে এনেছিলেন তাঁদের লেখালেখিতে। কৃতী নৃতাত্ত্বিক হ'তে না পারার ব্যথা ছিল লেখক সুবোধ ঘোষের বিস্তৃত বোধের গভীরে। গল্প শুরু হচ্ছে হাজারিবাগের একটি স্কুলে। একটি ক্লাসঘরে। সেই ক্লাসঘর যেন নৃতত্ত্বের একটি জীবন্ত ল্যাবরেটরি। গোটা ভাতরবর্ষ যেন উপস্থিত সেখানে নানা ধর্ম, নানা স্তরের মানুষ, তাদের লোভ, ঘৃণা, ক্রূরতা। ভালবাসা সব যেন জারিত হবার অপেক্ষায় একটি টেষ্ট টিউবে—সেই ক্লাস ঘরটিতে। কথক একটি বাঙালি ছাত্র। যার জুড়িদার আরও কয়েকটি বাঙালি ও বিহারি ছেলে। অন্যরা বিভিন্ন আর্থসামাজিক স্তর থেকে আসা খ্রিষ্টান এবং অখ্রিষ্টান আদিবাসী। কথকের ভাষায় আদিবাসী রাজার ছেলেগুলো সোনাব্যাঙ আর ওরাঁও মুণ্ডারা কোলাব্যাঙ। টুডু টিগগার। আর্য সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলতে পেলে ধন্য হয়ে যায়। প্রচন্ড রোদে দেড় মাইল দৌড়ে ঝাল বাদাম কিনে এনে হাতে দিয়ে প্রথামত দূরে সরে দাঁড়ায়। জানে করুণাপরবশ হয়ে কখনও দিতে এলেও নিতে নেই। এদের সমকক্ষ হতে চাওয়াটাই ধৃষ্টতা। ফাঁকা প্রশংসায় কৃতার্থ হ'তে পারা যায় শুধু। টিগগা বাগান করে। রান্নার কাঠ কাঠে। জল তোলে। কিন্তু স্টীফান হোরে। কার বা কাদের প্রতিনিধি সে?

'কুড়ুলের মত দৃপ্ত ছিলার মত সোজা চেহারা' চোখের দৃষ্টি তীরের মত। সভ্য সমাজের ধূর্ত রসিকতার ফুসফুস তাকে যেন এক্সরে করে নিচ্ছে।

> "মাথা ঠাসা মোটা মোটা চুলের মুগুর, চেপ্টা নাক, আবলুস কালো চেহারা
> তবু এত অহঙ্কার ?.....কোলা ব্যাঙদের মধ্যে কালকেউটে।"

স্টীফান কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলতে চায় ন। নিরাপদ দূরত্বে থাকে। টুডুদের কৃতার্থ সখ্যতা তার চোখে ধিক্কারের। তার উদ্ধত আত্মসম্মানের কাছে হার মানে বর্ণ হিন্দু সভ্যতার তথাকথিত উচ্চম্মন্যতার অহংকার। স্টীফান বোঝে বাঙালি বিহারি ছেলেদের বা

এককথায় বলতে গেলে সভ্য সমাজের চোখের কোণে একটা ব্যঙ্গের ছায়া উপেক্ষা হয়ে তিরতির করে কাঁপে—যে ছায়া কোনদিন দুপক্ষকে এক হতে দেবে না। সেই ভয়ংকর ছায়াটাকে মুছে দিতে চায় হোরো—টুডুর মত করে নয়। নিজের মত করে। মনের মাঝে গুমরে থাকা প্রতিবাদের ঝাড়ন দিয়ে একঝটকায় ঝেড়ে ফেলতে চায়। সভ্যতার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে তার প্রতিবাদের প্রকাশে। হকিষ্টিক না দেবার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তার ব্যথাহত নীরব অনুভূতি। শিশু কাঠের মত কিশোর পায়ের গোছ দিয়ে তাই স্বচ্ছন্দে খেলে যায় আধুনিক সভ্যতার খেলা হকি। প্রতিপক্ষ ক্রমাগত আঘাত হানতে হানতে আশ্চর্য হয়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে হকি স্টিক ভেঙে গেল বুঝি। অধিকার অর্জনের প্রতীক এই পা দিয়ে হকি খেলা। তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার মতই হোরো নিজের পা ব্যবহার করে প্রতিবাদ জানাতে চায়। নিঃশব্দ বিদ্রোহের আর অপমানের এতবড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

সংশয় আতঙ্ক আর আক্রোশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে প্রতিপক্ষের মনে। লেখাপড়ায় সবার ঘুম কেড়ে নিয়েও শান্তি নেই গোঁয়ার স্টীফানের। অনার্য সন্তান হয়েও সে কিনা পড়বে দেবভাষা। ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া নিয়ে সে যে উষ্ম ছিল অখ্রিষ্টান একমাত্র হিন্দু শিক্ষক পণ্ডিতজীর হোরো সংস্কৃত পড়বে শুনে তারই মুখে একটা খুশীর বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন। অমন ধী বিচ্ছুরিত প্রতিভার ছাত্রকে পড়াবার তৃপ্তিতে? এতদিন মধ্যমেধার অতি সাধারণ ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছেন আর্যভাষা। আশ্চর্যের কথা হল—সেই অনার্য হোরোই আর্যভাষায় সকলকে অনেক পিছনে ফেলে একশতে পঁচাত্তর নম্বর পেল। আর প্রথম প্রতিভাগী ইন্দু? মোটে বত্রিশ। কিন্তু না অন্য সব বিষয়ে খুব সাধারণ নম্বর পেল স্টীফান। ইন্দুই প্রথম হল। ফাদার লিন্তনের দারোগা করে দেবার প্রতিশ্রুতি আর পরীক্ষার পাস করার ইঁদুর দৌড়ে অনীহা এসে গেছে তখন। আপাত নিস্পৃহতার আড়ালে ক্রমাগত সে ভেঙেচুরে যাচ্ছে—দিশাব খোঁজে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ একাকী ছন্নছাড়া উদাসীন ছটফটে এক প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু কেন?

"এত রাগ কেন স্টীফানের? এত অভিমান কেন? কি হ'তে চায়? হাউস অফ লর্ডস এর সদস্য?"

সে কৌতূহল মেটায় টুডু। খবর এনে দেয় স্টীফান এক ঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে গেছে। অরণ্যের আদিম হাতাছানি ওই দিগভ্রান্ত কিশোরকে স্পর্শ করতে চায়। বর্বরবেশী অর্ধোলঙ্গ এক বুড়ো সোধার সঙ্গে দেখা করতে যায় স্টীফান হাটবারে। ছেলেধরা পাদরীরা অরণ্য-আত্মা সোখার অরণ্যের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। অরণ্য বা অরণ্যপন্থী প্রাণ কারো অধিকারই ছাড়বে না সোধা। একতিলও না। কেমব্রিজের এম, এ. সুসভ্য ধর্মযাজক তাই সতর্ক এবং আক্রমক। শুরু হয়েছে টাগ-অফ-ওয়ার। শুরু হয়েছে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। কালিয়া পোলাও চা বিস্কুট স্টীফানকে টানে না। অনায়াস দক্ষতায় গুলতি দিয়ে কাঠবিড়ালি শিকার করে পকেটে পুরে স্পষ্ট ভাষায় দাঁত বেব করে বলে—"খাব"। এরা বলে—"ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও স্টীফান এস আমাদের পিকনিকে।"

সভ্য ছাত্ররা ঘৃণাভরে 'জংলী' স্টীফানকে কাঠবিড়ালি ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলে। ফাদার লিন্তনের মতই ওরা স্টীফানকে ভুলে যেতে বলে অরণ্য জীবন! এ যেন নিজের সভ্যতা-

সংস্কৃতির শিকড় টেনে ছিঁড়ে ফেলতে বলা! সভ্যতার মুখোশধারী ছেলেরা ভূমিপুত্র স্টিফানের অকৃত্রিম আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের অগোচরেই। ওদের বোধ নেই যে 'পিকনিক'-এর আগুনে মেকি সভ্যতার ভ্রূকুটি আরো নূর হয়ে ওঠে। ইংরেজদের বর্ণ বিদ্বেষের হাতিয়ার আরও মজবুত হয়। টুডু চুপি চুপি আরও জানিয়েছে মোরাঙ্গি পাহাড়ের এক না দেখা মুরমু মেয়ে শালফুলের মালা গলায় দিয়ে খোঁপায় বনজবা গুঁজে স্রোতের ভাষার মত খলখল হাসির বন্ধনে হোরোর কালো" হৃদয়ের সব দুরন্তপনাকে বন্দী করে কোন উপত্যকার একটি নিভৃতে নিয়ে চলে গেছে। বনের লতার মত মেয়ে চিরকি মুরমু গান গায় —

"রাতা মাতা বিরকো তালা
রে নালো হোম নিরজা
রাগা ইংগা

প্রিয় মিলনের এই আবেদনের সঙ্গে মাদল বাজায় স্টীফান। চিরকি মুরমুর সুর যেন আদিবাসীদের হ্যামলিনের বাঁশি হয়ে ডাকে। ফাদার চান না স্টীফান বাঁশি বাজাক। বাঁশি এখানে স্বাধিকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। হোরোর এই অব্যর্থ হাতিয়ার তাই ভেঙে ফেলেন ফাদার। সকলেই এক বাক্যে ঝেড়ে ফেলতে বলে অরণ্যজীবন। স্টীফানের মত অ-সাধারণ একটি ছেলেকেই যদি আধুনিক আলোকিত সমাজে এনে কৃপাদৃষ্টি পুষ্ট করতে না পারা যায় তবে সভ্যসমাজের আত্মতুষ্টি অসম্ভব।

অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে। সুবোধ ঘোষের লেখালেখিতে যখনই এসেছে অনুরাগ প্রসঙ্গ তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন এক মায়লোকে। —চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নারাতে —

"স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়ে ছিল ধনুক হাতে। চিরকি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল"...........

"গাযের ফেস্কেতে ঠান্ডা বাতাস লাগাবার জন্য আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো। চিরকি মুবমু আস্তে আস্তে এসে হোরাকে জড়িয়ে ধরেছে।"

এক আদিবাসি কিশোরীর অনুরাগের একটা জলরঙা ছবি পাঠককে এনে দেয় অনির্বচনীয় অর্মত অনুভূতি। চিরকি মুরমুর নির্বাক প্রেমের চিত্রমালা যেন বহুব্যাপ্ত চেতনাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে চেতনা প্রত্যুষে বিস্মৃত আলয়ে তার আবেদন বলেই প্রতিপক্ষও চিরকি মুরমুকে মনে মনে সান্ত্বনা দেয়—'হোরো ফিরে যাবে নিশ্চয় ফিরে যাবে তাব কাছে।'

ধর্মযোদ্ধা ফাদার লিন্তন শুধু বাঁশি ভেঙেই ক্ষান্ত নন ভোজপুরী লেঠেল বা কনস্টেবল নিয়ে মুরমুদের ডিহিতে হানা দেন বারবার। অরণ্যের বুকের ভেতর সিঁধকেটে বোঙার থান কাঁপিয়ে দিয়ে মাটির গীর্জা তৈরী করেছেন। তিনি জানেন কেমন করে থেঁৎলে দিতে হয় পুরনো ঐতিহ্যের গন্ধ, ভেঙে দিতে হয় অরণ্যের অধিকার পেতে চাওয়া স্বাভিমানের মেরুদণ্ড। কেমন করে উপড়ে দিতে হয় মাটিব গভীর ওম থেকে শরীর মেলে দেওয়া শিকড়কে। কেমন করে সুসভ্যতার আফিম খাইয়ে বশ করতে হয় দুরন্ত ছটফটে সবুজ প্রাণ-গুলোকে।

এরা ভাবে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে জয়ী হবে বুড়ো সোধা। পরাজিত হবে মিশনারি ধর্মযাজক। আর্য এলিটদের সঙ্গে অরণ্যের যুদ্ধ। ন্যায় অন্যায় ভুলে একদিকে প্রভুত্ব অন্যদিকে নিজের অস্তিত্ব। একদিকে লিন্তনের অকুতোভয় প্রশ্রয়ের সীমাহীন ছলনা, অন্যদিকে দূরের ফোটা পলাশের আলেয়ার মত চিরকি মুরমু। বুড়ো সোধার জয় অবধারিত।

হোরোরা আমাদের জাতীয়তা আন্দোলনের পিকেটিংকে গ্রাহ্য করে না। ওরা জানে এই স্বাধীনতা ওদের কিছু দেবে না—সভ্যতার পরাধীনতা ছাড়া। এ রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশীদার তারা নয়। হোরোদের লড়াই তাদের নিজস্ব। একার লড়াই। তাই মোরাঙ্গি পাহাড়ের হাঙ্গামাটা ফাদার লিন্তনদের বিশ্বাসের জমিটাতে ভূমিকম্পের আলোড়ন তোলে। কে ভেঙে ধুলো করে দিয়েছে মোরাঙ্গি পাহড়ের মাটির গীর্জাটা? জঙ্গলে এ ধৃষ্টতা কার? ধর্মযোদ্ধা লিন্তন প্রতিশোধে উন্মত্ত। বুড়ো সোধাকে সেসন জজ পাঠিয়ে দেয় যাবজ্জীবন দীপান্তরে।

গল্প এবার শেষ চরণে প্রায়। তার আগে গল্পের একটা স্পর্শকাতর জায়গাকে একটু ছুঁয়ে নেওয়া যায়।

লেখকের শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে প্রবাসে। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তা তাঁর মনকে ছুঁয়ে ছেনে ছিল। তাই প্রবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের বৈষম্য, অসঙ্গতি, এবং ক্লীবত্বের ফুসফুসটাকেও তিনি তীর হয়ে ভেদ করেছেন, স্বরূপটাকে দেখে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন। মানবিকতার উঞ্ছবৃত্তি, প্রবৃত্তির কাঙালপনা, ঈর্ষাকাতরতা এবং সবজান্তা মোড়লি— এ যেন সব বয়সের প্রবাসি বাঙালির অহংবোধে আশ্রয় নিয়ে আছে।

> —"আমরা কজন ইন্টার ক্লাস পরিবারের বাঙালি ও বিহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সর্বকর্মের মোড়লির গৌরব অধিকার করে বসেছিলাম।"

মোড়লি এবং চালাকি এই দুটি দোষেই আজ বিহার ঝাড়খণ্ডে বাঙালির অবস্থান এত সংকটাপন্ন। সহজ সরল টুডুদের দিয়ে কাজ করিয়ে তাদের ঠকানো, ফাঁকা প্রশংসায় তাদের উপহাস ইত্যাদি লেখককে পীড়া দিয়েছে।

> "ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশী পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মত আমাদের গায়ে বিঁধল। বেহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল জানি না কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে তার আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট করল। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম এ স্কুলে অখ্রিস্টানদের ওপর বড়ো অবিচার চলছে।"

জাতপাতের বীজ বপন হয়েছিল সেই ইতিহাসযুগের প্রদোষকালেই। স্টীফান নিম্নবর্গের সন্তান,জংলী, —তাই সে বিজাতীয়! 'ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে যে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত' করেছে! তা সেই কিশোরদলের কাছে জাতীয় অপমানের সমতুল্য? হায় জাতীয়তাবোধ!

চালাকির রাজনীতিতেও বিহারিরা সর্বকালে প্রবাসী বাঙালিদের পিছনে ছিল। বিহারের শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করার অধিকার একছত্র বাঙালিদের, এ তথ্য ইংরেজই বিহারীদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল। একমাত্র অখ্রিষ্টান শিক্ষক, যিনি খ্রিষ্টান বিরোধী এবং অনার্য

বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন তাঁরও অনার্য বর্বর স্টীফানকে ইন্দুর চেয়ে তেতাল্লিশ নম্বর বেশী দিতে কষ্ট হল না? আশ্চর্য!

> "এটা যে আর্যত্বের কতবড়ো পরাভব বিশেষ করে বাঙালীর কতো বড়ো অপমান—তা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা ঠিক রহস্যটি বুঝে ফেললাম—পণ্ডিতজী হলেন বিহারী—তাই।"

প্রবাসী বাঙালি মানসিকতার এর চেয়ে বড়ো অগৌরবের অথচ সত্য দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? তারা আত্মশ্লাঘায় কোনদিন সেই প্রদেশের মানুষকে নিজেদের সমতুল্য মনে করতে পারল না।

সোধার যাবজ্জীবন দীপান্তরের আট বছর পরের কথা আসে গল্পের শেষ চরণে। কথক তখন লোপো থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগা। ভাগ্যের পরিহাস! স্টীফানকে দারোগা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লিন্তন। তা শুনে তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল যে ছেলে, ভেবেছিল—

> "এটুকুই যদি স্টীফান হোরোর জীবনের পরমার্থ হয় হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। তার জন্য এত কষ্ট করে নিউ টেষ্টামেন্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের'।

সেই আজ দারোগা। আর সেই ফাদারের সঙ্গে টেনিস খেলে চা বিস্কুট খাওয়া, নিউ টেস্টামেন্ট মুখস্থ করা, বাসে করে জঙ্গলে ডিহিতে যাওয়া ইত্যাদি সবরকম সুখ ভোগ করেও নিস্পৃহ নিরুচ্চার প্রতিবাদের চোখদুটো কোথায় হারিয়ে গেল? কি হল তার? লোপো থানার দারোগার কাছে জেল থেকে সদ্য খালাস পাওয়া কয়েকজন বিরসাইট মুণ্ডা হাজিরা দিতে আসে। এই বিরসাইটরা সরকারের বিষফোঁড়া যেন। সর্বক্ষণের যন্ত্রণা। এই পুলিশকে মারে তো ওই পাদরীকে। পুল ভেঙে ফেলে, পেয়াদাকে কাটতে যায় টাঙি নিয়ে। একবার স্বরাজ ঘোষণাও করেছিল তারা। সবশেষে হাজিরা দিতে যে লোকটা উঠে এল তার নাম রণন্যু হোরো।

> "চুলের জংলী খোপাটাও জটার চূড়ার মতো হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুর গা, কোমরে ছোট একটা কাপড় জড়ান। হাতে একটা কাঁসার থালা। এই প্রাগৈতিহসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ......."

তীরের মত দৃষ্টি দিয়ে সমবয়সী পড়ুয়াদের বুকের ভেতর ধূর্ত রসিকতাটা দেখতে পেত যে কিশোর, তার দৃষ্টিতে সংগ্রাম আর নৈবাশ্যের ছাপ পড়েছে। কৈশোরের নিষ্পাপ উদাসীনতা বদলে গেছে। অধিকারের লড়াই লড়তে লড়তে, আধুনিকতার ধড়াচূড়াগুলো খুলতে খুলতে, শিকড় উপড়ানোর শৃঙ্খলগুলো ভাঙতে ভাঙতে সেই ধারালো দৃষ্টিতে সুশানিত আধুনিকতার ছাপ পড়ে গেছে। ফাদার লিন্তনের মর্জিমাফিক চললে যে অনায়াসে হয়ে উঠত দারোগা সেই আজ দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে রাজদ্রোহী হয়ে। কথক দাবোগা "ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিগ্যেস করে—

—স্টীফান হোরো?

লোকটা মিষ্টি করে হেসে বলল—আমি রানু হোরো।

—তুমিও একজন বিরসাইট।"

'বিরসাইট' শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা এবং অবজ্ঞাকেও ছুঁয়ে যেতে পারল সেই তীরের মত চোখ দুটো। তাই স্পর্ধিত উত্তর দেয়—

> "আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য। সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। ইংরেজের জেলখানার ভেতর কয়েদিব মত মরে গেছে আমাদের বিরসা ভগবান দেখতে একেবারে যীশুখৃষ্টের মত।"

যে কিশোর একদিন সহপাঠী কথকদের উত্তর দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করত না। যার ঔদ্ধত্যের কাছে এদের "আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত" সেই হোরো আজ বড়ো মিষ্টি করে কথকের ভুল ভেঙে দিতে এতগুলো গোপন কথা বলল। বিরসা ভগবান দেখতে সেই অপাপদ্ধি যীশুর মত, পাপস্খালনের জন্য জন্ম হয়েছিল যাঁর। ফাদর লিস্তনের চাপিয়ে দেওয়া খ্রিষ্টধর্ম সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যীশুখ্রিষ্টের পবিত্রতা তার কাছে ইষ্টমন্ত্রের মত। কোন সন্দেহ নেই তাতে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন তার কাছে মূল্যহীন হ'তে পারে কিন্তু গান্ধীজীর জননায়কত্বে শ্রদ্ধাপ্লুত সে। তাই তাদের বিরসা ভগবানের তুলনা করতে গিযে অনায়াসে উচ্চারিত হয়ে যায় ওই দুটি নাম।

হোরোর বুকের ফুসফুস দুটি এখন ক্ষয়িষ্ণু। এতদিন মনের মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছিল যে অস্তিত্বের সংকট সে এখন রাজরোগ হয়ে বাসা বেঁধেছে ফুসফুসে। লড়াই করার দম জোগাবে কে? দারোগার মনটা এবার ছটফট করে সেই দূরের ফোটা পলাশেব আলেয়ার মত কল্পনার সীমা পার করে দুলতে থাকা জ্যোৎস্নার মত মেয়ে চিরকি মুরমুর খবরের জন্যে।

> "হোঁরো শান্ত ভাবে জবাব দেয় ফাদার লিস্তনের মিশনে চলে গেছে চিরকি। খ্রিস্টান হয়েছে। এখন হাজারিবাগ কনভেন্টে থাকে। স্টীফানের চোখের দৃষ্টিটা চিকচিক করে উঠল। তীক্ষ্ণ তীবের ফলার মতই কিন্তু জলে ভেজা।"

অনমনীয় হোরো তার স্বাভিমানের আভিজাত্য আর আরণ্য-নিস্পৃহতা ভুলে ভিজিয়ে ফেলল সুশানিত চোখের কোণদুটি। 'সুসভ্যতাব এক একটি প্রসাদ খাইয়ে' হোরেকে বশে আনতে চেয়েছিলেম ধর্মযোদ্ধা ফাদার লিস্তন। কারণ অবিচল আত্মগরিমায় উদ্ধত, অকুতোভয় খাঁটি সোনার মত 'সভ্য' স্টীফানকে পরাজিত করতে পারলে লিস্তনেব যুদ্ধ জয় সহজ হবে। তাই যখন হোরো চার্চে না গিয়ে বাইবেলের অপমান করে তখনও ফাদার ধৈর্য হারায় না। আবার যখন সে ডিহিতে যায় হলি খেয়ে নেশা করে, নাচে, গান করে, বাঁশি বাজায়—আর যখন সে বাইবেল ক্লাস সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে চিরকি মুরমুর 'এক রোমাঞ্চকর অনুবাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম' লেখায় তখন ফাদার, আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। টাঙি, বর্শা, তীরধনুকের তীক্ষ্ণ ফলার চেয়ে চিরকি মুরমু হয়ে ওঠে এক সুতীব্র প্রতিরোধ! এই অস্ত্র ভোঁতা করে দিতে, দুর্বিনীত স্টীফানকে নির্বিষ করে দিতে নানা কৌশলে এক অনৈতিক যুদ্ধ আয়োজন করেন ফাদার লিস্তন। 'বুড়ো সোধার মতো এক দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী যাদুমন্ত্রের বিষদাঁত

ভেঙে দেওয়া হয়। আর চিরকি মুরমুর সরলমতি মনে যীশুর বাণীর প্রলেপ দিয়ে তাকে নিজের স্কুলে নিয়ে চলে যান। স্টীফান হোরোর দুই হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে তাকে নির্বিষ ঢোঁড়াসাপে পরিণত করা হয়। বিংশশতক আর প্রাক্‌ইতিহাসের লড়াইয়ের পরিণতি এমন ভয়ংকর রূপ নেয়। 'সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে' খ্রিস্টান হোরোকে ছিনিয়ে 'জঙ্গলের ছেলেকে জঙ্গলে ফিরিয়ে' এনে প্রতিশোধ নেওয়া আর হোল না বুড়ো সোধার। স্টীফান যখন রনন্যু হোরো হয়ে জঙ্গলে ফিরে যায় তখন সে নিঃসঙ্গ এক দিকভ্রষ্ট পরাজিত সৈনিক। তার এই নিঃশব্দ পরাজয় কথকের মনে কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকে।

চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধের এমন ট্রাজিক পরিণতি, পাণিপথের যুদ্ধগুলি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। মারাঠা শক্তির পরাজয় ভারতের মুসলমান শাসনের ইতিহাসকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল। হিন্দু এবং রাজপুতদের উদাসীনতাই ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিল। সে উদাসীনতা উপেক্ষায় বদলে গেল লেখকের মানস প্রসূত চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে।

> "অনাত্মীয় জ্ঞানে অবজ্ঞা ভরে আদিবাসীদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখে রেখে ওদের জীবন সংগ্রামে নিরপেক্ষ রয়েছি বলেই।"

কিন্তু স্টীফান হোরোদের পরাজয় হয়।

গল্পটির এই অন্তিম মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ঢোঁড়াই চরিত্রটি। একা পাক্কী দিয়ে সে এমনকি হেঁটে চলে যাচ্ছে হতাশার গ্লানি তার নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড় আরও দুঃসহ করে তুলেছে। চরিত্রগত দিকে এমনিতে কোন মিলই নেই দুজনের। সর্বস্বান্ত জীবনের হতাশা আর একক চলে যাওয়া, ঢোঁড়া সাপের জাত ঢোঁড়াই যেন জীবনযুদ্ধে পরাজিত নির্বিষ কেউটে সাপ স্টীফনকে এক করে নেয়।

এইভাবেই শেষ হয়েছে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। এমনি করেই হারিয়ে যায় বিরসামুণ্ডা তিলকামাঝি আর চোট্টিমুণ্ডাদের অধিকার ঘোষণার লড়াই।

সুন্দরম্ : সুন্দরের বিনির্মাণ

তরুণ মুখোপাধ্যায়

সুন্দরকে সবাই চায়। দেখতে চায়, পেতে চায়। সুন্দর শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই (দৃ-ধাতু) আছে ভালো লাগা, আদর করা। তবু সুন্দর নির্বিশেষ নয়—অসুন্দরের সঙ্গে তার চলা। চমৎকার বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "একের পক্ষে যা অসুন্দর হলো তার স্বার্থে ঘা দিচ্ছে বলে, অন্যের পক্ষে তাই সুন্দর হয়ে দেখা দিল স্বার্থে ঘা দিল না বলে"। সুন্দর বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে, জানে তার মধ্যে অসাধারণত্ব নেই। ভালো, মধুব, পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ইত্যাদি নানা কথা বলা যায় 'সুন্দর' প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্যেও Beautiful বলতে ভাবা হয় noble, great, Gorgeous, pure ইত্যাদি। প্রয়োজন, অপ্রয়োজন সব জড়িয়েই সুন্দর। "সৌন্দর্যের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন কিছুকে আমরা সুন্দর বলি" (রূপ, রস ও সুন্দর/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)। প্রাথমিক ভাবের দেহবোধ প্রবল থাকলেও তিনি মনে করেন, "সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক।" সৌন্দর্যবোধে মিশে থাকে রূপ ও রসবোধ। প্রাগুক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন,

> মানুষের আশ্চর্য শরীর সৌন্দর্যস্মৃতিব সার্থক আশ্রয় হতে পারে বটে, তাব সঞ্জীবন মন্ত্র রয়েছে বিচার বুদ্ধির অধিকারে, কল্পনার সৃষ্টিধর্মী মায়াবী কৌশলে।

যদি মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বেব সূত্রে একে দেখি, তবে বলতে হয়, মানুষ সুন্দবের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা —'forms objects in accordance with the loves of beauty' (সৌন্দর্যের নিয়মাবলী অনুসারেই মানুষ সৃষ্টি করে। /ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজাফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট)। যে হাত কাজ কবে, ফসল উৎপাদন করে, সেই হাতেই সৃষ্টি হয় শিল্প, সাহিত্য, সুব। সুন্দরের ধাবণায় Harmony শব্দটির প্রয়োগ অনেকেই কবেছেন। সুন্দর প্রসঙ্গে Mikhail Ovsyannikov বলেন, তার তিনটি লক্ষ্য ও লক্ষণ।

1 furthers the consolidation of harmony of social relationships, that is, is progressive in content,

2 represents a truthful reflection of reality and thus furthers the consolidation of the harmony of reality and thus furthers the consolidation of the harmony of social ties,

3 a significant content is expressed in an adequate form, the total being expressive. and artistically perfect

(Problems of Contemporary Aesthetics/Raduga Publishers, Moscow 1984)

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প "সুন্দরম্" প্রসঙ্গে আলোচনায় এসব তাত্ত্বিক কথা হযত অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। তবু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে তাঁব গল্পের ভাবনাব মূলে এই তাত্ত্বিকতাব যোগ আছে। এতকাল আমবা যেভাবে সুন্দরকে দেখি, দেখেছি, তাব থেকে

স্বতন্ত্র হয়ে গেছে সুবোধ ঘোষের ভাবনা। কল্লোল পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে যিনি নতুন সুর এনেছিলেন, তিনি সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের বাসিন্দা হয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর গল্পে আছে তারই প্রকাশ। এই সেই সময়, যখন বাঙালি গল্পকারেরা নতুন বিষয়ের খোঁজে ফ্রয়েড, হামসুন, লরেন্স, জোলার দ্বারস্থ হচ্ছেন না। কিংবা গল্পের আঙ্গিকে বনফুলের মতো চমক সৃষ্টি করছেন না। সাম্প্রদায়িকতা, মন্বন্তর, দেশভাগ, মহাযুদ্ধ, বেকারত্ব, কালোবাজারি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ শরিক এই পর্বের লেখকেরা। হাজারিবাগ থেকে কলকাতা পর্যন্ত সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার জগৎ বিস্তৃত। তাঁর কথায়—

> লেখক হবার আগে জীবনের আলো-ছায়া ও অন্ধকারের অনেকরূপ ও অনেক ঘটনা দেখবার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। শ্মশানের ভয়ানক ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা ও শালবনের মাথার উপর চাঁদের জ্যোৎস্না-বিস্তার দুই-ই দেখবার অভিজ্ঞতা। (সেদিনের আলোছায়া)

ছবি, গান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব—সবই তাঁর আগ্রহের ও পাঠের বিষয় ছিল জানা যায়। মনে প্রাণে গান্ধীবাদী ছিলেন; যারা বঞ্চিত, শোষিত, হতমান তাদের জন্যও ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা, সহানুভূতি। তাঁর প্রতিটি গল্প তাই মানবিক আবেদনে ভরা।

প্রধানত অযান্ত্রিক ও ফসিল গল্পের রচয়িতা রূপে সুবোধ ঘোষ সমধিক পরিচিত। তবে এর পাশে তাঁর 'সুন্দরম্' গল্পটি-ও বহু প্রশংসিত। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য দেখেছেন 'সুন্দরম্' গল্পে 'সৌন্দর্যের ভাব-ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে'। গল্পের নায়ক সুকুমারকে তিনি 'সৌন্দর্য-বিলাসী' বলেছেন। সুকুমারের পিতা কৈলাস ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সৌন্দর্যবাদকে বাতিল করে দেহের 'অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের' খোঁজ করেন এবং অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, ডাক্তারবাবু "এক নতুন সৌন্দর্যচেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চান।" কি এই নতুন সৌন্দর্য-চেতনা, তা' তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। লেখক যা বলেছেন গল্পে তার বাইরে আলোচনাও করেন নি। অথচ সুবোধ ঘোষ যে নিঃশব্দে সৌন্দর্যের বিনির্মাণ ঘটালেন, তা' আলোচনার দাবি রাখে। স্বয়ং সুবোধ ঘোষ তাঁর এই গল্প লেখার পশ্চাৎপট যা বলেছেন, এখানে তা' প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি বলেছেন,

> দেহের রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করবার আখ্যায়িকা এই 'সুন্দরম্'-কে একটি দুরূহ সমস্যায় কিছুদিন অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। ব্যবচ্ছিন্ন দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূপবর্ণনা করবার ভাষা ও পরিভাষা কোথায় পাই? আনন্দ বাজার পত্রিকার লাইব্রেরিতে সহসা একদিন চোখে পড়লো একটি বই, মহামহোপাধ্যায় শ্রী গণনাথ সেনের লিখিত 'প্রত্যক্ষ শারীরম্', সংস্কৃত ভাষায় অ্যানাটমির একটি প্রশস্ত পাঠ্যপুস্তক। এরপর ভাষা ও পরিভাষা পেতে অসুবিধা হয়নি। (শ্রেষ্ঠগল্প : শ্রেষ্ঠ লেখক/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দ্র.)

রূপতত্ত্ব প্রসঙ্গে 'একটি কঠিন জিজ্ঞাসা' আমাদের কাছে সুন্দরের বিনির্মাণ সমস্যা। কি এই বিনির্মাণ? জাক দেরিদা তাঁর নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে যে Deconstruction

ভাবনা প্রকাশ করেছেন, বঙ্গসমাজে ও সাহিত্যে তাই 'বিনির্মাণবাদ' নামে প্রচারিত। বিশেষ ভাবে তাঁর Of Grammatology বইটি সুপরিচিত। যার মুখবন্ধ লিখেছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। সেখানে তিনি জানালেন, "We shall follow its abventures through the text and see the text coming undone as a structure of concealment" আর স্বয়ং দেরিদা এই পাঠকৃতিকে বলেন, 'each act of reading the text is a preface to the next.' অন্যদিকে তাঁর বিনির্মাণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় দেরিদা আরো বলেন, Deconstruction must neithe reframe nor dream of the pure and simple absence of the frame.

দেরিদা ও তাঁর তত্ত্ব বিষয়ে অন্যতম প্রধান আলোচক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য প্রাঞ্জলভাবে বিষয়টি এইভাবে বুঝিয়েছেন—

> ...বিনির্মাণপন্থী পাঠ-পক্রিয়ায় চূড়ান্ত বিন্দু বলে কিছু নেই, এক পাঠ থেকে অন্য পাঠে ক্রমাগত বিবর্তিত হতে থাকে বয়ান। প্রতিটি নতুন পাঠই পূর্ববর্তী পাঠপ্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে এবং প্রাক্তন পাঠস্মৃতিকে মুছতে মুছতে এগোয়। পাঠ থেকে পাঠান্তরের পার্থক্য-প্রতীতিকে অনুধাবন করার প্রক্রিয়াই হলো বিনির্মাণ। (জাক দেরিদা, তাঁর বিনির্মাণ)

এ কথা যথার্থ। কোনো পাঠই একমাত্রিক নয়। প্রতিটি পাঠকই তাঁর রুচি, অনুভব, অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর পাঠকৃতি তৈরি করেন। ফলে, পাঠপ্রতিক্রিয়ায় ভিন্নতা দেখা দেয়। 'সুন্দরম্' গল্প নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন, তাঁরা মুখ্যত দেখেছেন, সুকুমারের দ্বিচারিতা, চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা। কিন্তু এই গল্পের নায়ক যদি কেউ হন, তিনি কৈলাস ডাক্তার। তাঁরই দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে কি সুন্দর, কোনটা সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ সুন্দর প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত দু'বার বদলেছিলেন আমরা জানি। যা সুন্দর তাই আনন্দদায়ক, বলার পর তাঁর মনে হয়েছিল, কথাটা হবে যা আনন্দ দেয়, তা-ই সুন্দর। 'সুন্দরম' গল্পে আমরা এই দ্বিতীয় ভাবনার প্রক্ষেপ দেখি। এই গল্পে সুকুমার আদৌ সুন্দরের দ্রষ্টা বা উপাসক নয়। তার জীবনচর্যার মধ্যে আছে ভ্রান্ত নিয়মের শৃঙ্খল। সেই নাগপাশ যত কঠিন হয়েছে, তার ভিতরের অসুন্দর তত ব্যাকুল হয়েছে। সুন্দরের ধ্যানের মুখচ্ছদে আসলে সে অসুন্দর-প্রবৃত্তিকেই লালন করেছিল। তার ব্রহ্মচর্য পালন, নাটক-নভেল না পড়া, উত্তেজক ছবি না দেখা, না শোনা ইত্যাদি মনে হতে পারে আধুনিক ব্রহ্মচারীর এক পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা। আদতে তা সত্য নয়। তার ভিতরে যে পশুভাব ক্ষুধার্ত, তাকে সুকুমার ভয় পায়। তাই নাভিতে চন্দনের প্রলেপ, ঘরে অগুরু পুড়িয়ে প্রাণপণে মনকে শাসন করতে হয়। দ্বারবন্ধ করে ভ্রম-কে রোধ করার যা হাস্যকর চেষ্টা মাত্র। লেখকের মন্তব্য ঃ 'বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না'। আভাসিত করে সুকুমারের স্খলন-পতন। প্রকৃতির প্রতিশোধ কেমন তা আমরা রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' কিংবা 'চিরকুমার সভা' নাটকে দেখেছি। সুকুমার উপযুক্ত পাত্রী না পাওয়ায় বিয়ে করতে রাজি হয় না। গল্পের শুরুতেই আছে সেই সমস্যার কথা। যোগযুক্ত তার মন; সে যেতে চায় হিমালয়। সবাই ভেবে আকুল, কি হবে? শুধু তার বাবা কৈলাস ডাক্তার মনে করেন, এসব প্রোটিনের অভাব।

কানাইবাবুর প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে সুকুমার উন্মনা হয়। 'কিসের প্রভাব! কাকে যেন চাই।' এই তার ভাব, মতিগতি। তার জন্য পাত্রী দেখা চলে পছন্দ হয় না। কৈলাস ডাক্তার-ও হাল ছেড়ে দেন। তাঁর পছন্দের মেয়ে বাড়িতে মেনে নেয় না। সৎ পাত্রী নাকি সুন্দরীপাত্রী, এই চাওয়ার দ্বন্দ্বে তিনি বিচলিত হন। যদিও পরিবারের লোকজন সৎ পাত্রী নয়, চায় সুন্দরী পাত্রী। বলা চলে, সুন্দরের বিনির্মাণ এখান থেকেই। সংস্কৃত কাব্যে যাকে 'তন্বী শ্যামা পক্ক বিম্বাধর' বলে সেই কি সুন্দরী? জানতে চান কৈলাস ডাক্তার। কানাইকে বলেন, "চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত" এর সত্যতা নেই। লোকে তাকে 'কালোজিভ' বলে—যা তাঁর মতে বর্বর মনের পরিচায়ক। কানাইবাবু 'রূপের স্ট্যান্ডার্ড' বোঝাতে গেলে এক অভ্রান্ত সত্য ও যুক্তি কৈলাস ডাক্তার শুনিয়েছেন।

> ...দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো, আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ।

অর্থাৎ অ্যানথ্রোপলজিস্টরাও চেনে না কি সুন্দর। সত্য দাসের পুরুষালি মেয়েকে বাবা পুত্রবধূ রূপে পছন্দ করেছে জেনে সুকুমার বেঁকে বসে। যুদ্ধে চলে যাবে বলে শাসায়। কাজেই এ বিয়ে বাতিল হয়। হতকুচ্ছিৎ মেয়েকে তো ঘরে আনা যায় না।

এরপরের ঘটনা নাটকীয়ভাবে মোড় নেয়। কৈলাস ডাক্তারের বাড়ির সামনে ভিড় জমায় কুষ্ঠ রোগী হাবু বোষ্টম। ইরানী বেদিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার ও হামিদার মেয়ে তুলসী। ওরা এখন ভিক্ষে করে খায়। আপাতদৃষ্টিতে খাটো ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরা তুলসী। চোদ্দ বছর বয়স তার। খেতে পায়না দু'বেলা।

> তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক।

অসুন্দরের মূর্ত-প্রতিমা সে।

অথচ এই ভিখারিণীকে প্রায়ই দেখা যায় সুকুমারের ঘরের সামনে কলাই-এর থালা হাতে বসে আছে। ঠাট্টা করে তাকে কৈলাস ডাক্তার বলে 'সুন্দরী তুলসী'। যদিও ছেলের ঘরের কাছে বসে থাকা তিনি পছন্দ করেন না। ছেলেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "খুব নজর রাখবে, কখন্ কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।" তবু একদিন কৈলাস ডাক্তারের ঘর তছনছ হয়। বেলেডনার শিশি চুরি যায়। তাঁর মনে হয়, 'দিনটা আজ ভালো নয়'। তবু এইদিনেই কানাইবাবু জানায়, 'সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে' এবং সুকুমার-ও মত দিয়েছে।

দ্রুত ঘটে চলে ঘটনা। আশীর্বাদ করার জন্য রাত্রে কৈলাস ডাক্তার যখন প্রস্তুত, তখনই খবর আসে তিনটে লাশ এসেছে। ময়না-ঘরের ডাক্তার তিনি। কাজেই যদু ডোম খবর দিলে, তাঁকে যেতে হয়। দুটো লাশ আগুনে পোড়া। দেখতে হয় না। তৃতীয় লাশের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন কৈলাস ডাক্তার—এ কে? যদু ডোম বলে, "হাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরি মেয়েটা। কাটা ছেঁড়ার উদ্যোগ চলে। মৃত অথচ মনে হয় ঘুমন্ত মেয়েটি। যার চোখ

দুটি চিমটে দিয়ে ফাঁক করে ডাক্তারবাবু দেখেন, "নিশ্চল দুটি কণীনিকা যেন নিদারুণ অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। ....সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।"

মৃতার এই সৌন্দর্য-দর্শন বোদ্লেয়রীয় কিনা জানি না; তবে সৌন্দর্যের বিনির্মাণ তো বটেই। বাহ্যরূপ মুছে দিয়ে কৈলাস ডাক্তার অভ্যন্তরীণ রূপের বিভায় মুগ্ধ হন। সাদাকালো চামড়ার গুণাগুণে তিনি ঘোর অবিশ্বাসী। তাই খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখেন, "গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান খর বস্তু, শ্বাসবহা নালীটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় স্বররজ্জু পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা"। চিকিৎসা বিদ্যার পরিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে ডাক্তারের সৌন্দর্যদর্শনের অন্যএক রূপ জেগে উঠেছে। এরআগে 'কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপজীবা নারীর লাস' তিনি ঘেঁটেছেন ও কেটেছেন। দেখেছেন 'তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো'। সেখানে তুলসী বাইরে কদাকার হলেও, অন্তরঙ্গে রূপবতী। সুবোধ ঘোষ সযত্নে সেই আশ্চর্য সৌন্দর্য-সন্দর্শনের চিত্র এঁকেছেন। লাশকাটা টেবিলে শুয়ে আছে ব্যবচ্ছিন্ন তুলসী। বাতির আলো এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—

> প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মতো বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ; অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীত পিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মতো উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মতো শত শত মোলায়েম ঝিল্লী।....
>
> থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মতো অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা। .... খণ্ড স্ফটিকের মতো পীতাভ ছোটবড়ো কত গ্রন্থি বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ।

বিমুগ্ধ ডাক্তার দেখলেন, 'ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মতো' এক দেহ—'অছদ্ম মানুষের রূপ'।

বাইরে থেকে যার রূপবিচার করে তিনি তাদের ধিক্কার জানালেন। মনে ভাবলেন, একদিন মানুষের এই বাহ্যরূপ মোহ অর্থাৎ 'তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে'। নতুন যুগের প্রেমিকেরা এই আন্তররূপকে মর্যাদা দিয়ে নতুন তাজমহল সৃষ্টি করবে।

এমন বিহ্বল সৌন্দর্যদর্শন আহত হলো তখনই, যখন দেখা গেল তার গর্ভে এক মৃত ভ্রূণ—'মাতৃত্বের রসে উর্বর' এক 'শিশু এসিয়া'। লাশকাটা ঘরের ডাক্তারের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, কেন এমন অকালে তুলসীকে চলে যেতে হলো। গল্পের শেষাংশ এই রকম :

> আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপল থরথর করে। যদু এসে ডাকলো — হুজুর!
> ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসলো।
> নিতাই বললো—এত দেরী কেন রে যদু?
> —শালা বুড়ো, নাতির মুখ দেখছে।

যদুরা যে-সমাজ-পরিবেশে থাকে, সেখানে এই মন্তব্যই স্বাভাবিক। পাশাপাশি, তথাকথিত ভদ্র ও শিক্ষিত জনেরা কতটা মুখোশধারী, তাও এখানে বিদ্রূপোক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

নিজে কৈলাস ডাক্তার কিন্তু তথাকথিতের দলে নন। যেজন্য ছেলের জন্য চামড়ার রূপে রূপবতী মেয়ে দেখতে চান নি। ময়নাঘরে তিনিই খোঁজেন 'অছদ্ম মানুষের রূপ', চামড়া ছাড়িয়ে যে মানুষ ভিতরে আছে—রক্তশিরামাংসময়—তারই সৌন্দর্যে অভিভূত হতে পারেন। আনন্দ পান। আর যা আনন্দদায়ক তাই তো সুন্দর। লেখকের ভাষ্য পড়া যাক—

> আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়নাঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না—কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মতো আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মতো দ্বিতীয় মানুষ কই?

না, সত্যিই নেই। তিনিই অদ্বিতীয় ও একক ব্যক্তি এই সৌন্দর্য ভুবনে। তাঁর 'ভিন জগতের সুন্দরম্' প্রচলিত সৌন্দর্য ভাবনাকে আঘাত করে, প্রত্যাখ্যান করে। তিনি মানুষের অন্তরঙ্গ ও অছদ্ম রূপের পূজারী। সুবোধ ঘোষ তাঁর "সুন্দরম্" গল্পে সুন্দরের যে নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করলেন, তাকে এই উত্তরআধুনিকযুগের দিশারী বলা যায়। 'simple absence of frame' বলতে যা বোঝায়, 'a structure of concealness' যা, সেই বিনির্মাণ সুন্দরের বিসর্জনে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অসামান্য হয়ে উঠেছে।

গরল অমিয় ভেল : প্রসঙ্গ
আশিস চক্রবর্তী

সুবোধ ঘোষের 'গরল অমিয় ভেল' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। পরে এটি লেখকের 'পরশুরামের কুঠার' গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরশুরাম এবং তার কুঠারের একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে। পুরাণের পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে পিতৃতর্পণ করেছিলেন, আর একালের কথাশিল্পী তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর বলে মধ্যবিত্ত সমাজের সুসজ্জিত মু টাকে উৎপাটন করে তার গভীরতলশায়ী ক্লেদাক্ত রূপটিকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। প্রাসঙ্গিক গল্পেও দেখা যায়, লেখকের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতির তীক্ষ্ণধার ছুরিকাস্পর্শে ব্যবচ্ছিন্ন হয়েছে। কাহিনীর মুখ্য চরিত্র মালা বিশ্বাস এবং অন্যান্যরা। ফলত অপাবৃত হয়েছে তাদের গোপন অন্তরপ্রদেশ,—যেখানে অবচেতনের অন্ধকার বিবরে উন্নিদ্র আদিম কামনা লোকাপবাদের গরলকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-পূরণের অমৃতে রূপান্তরণে উন্মুখ।

বিহারের একটি মফস্বল শহরের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এ গল্পের আখ্যানভাগ। এই শহরের জনৈক চন্দ্রবাবুর মেয়ে মালা বিশ্বাস সমস্ত দিন তাদের বাড়ির জানলার কাছে 'নিসর্গ শোভা' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার ভঙ্গিতে। তার এই অসংকোচ 'আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা' দেখে ঠিক বোঝা যায়না—"এ কি শুধু দেখার নেশা? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা?" আড়ালে থাকতে দমবন্ধ হয়ে যায় মালার, তাই ভিড় খোঁজে, কিন্তু ভিড়ের মানুষ হয়ে হারিয়ে যাওয়া তার অনভিপ্রেত, কারণ সে চায় মানুষ তাকে দেখুক। কিন্তু তার শ্রীহীন মুখাবয়ব আর বেঢপ সাজসজ্জা মুগ্ধতার নেশা জাগায় না, বরং মানুষের বিদ্রূপ ও কৌতুকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শহরের বৈচিত্র্যহীন ও নিস্তরঙ্গ জীবন হঠাৎ-ই উদ্বেল হয়ে ওঠে ক্রসরোডের মোড়ে পঞ্চাশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কালো পাথরের টিলার বুকে কোনো অদৃশ্য হাতের লেখায় ফুটে ওঠা কয়েকটি খড়ির অক্ষরে। কে যেন অশ্লীল ভাষায় কুৎসা রচনা করে গেছে এই শহরেরই মহীতোষ বাবুর মেয়ে পূর্ণিমা বসু সম্পর্কে। এই ঘটনায় শহর জুড়ে পরোয়ানার মতো ছড়িয়ে পড়ে কৌতূহল-লজ্জা-ক্ষোভ আর বিস্ময়। কেবল মালা বিশ্বাস অপার তৃপ্তি লাভ করে। গির্জার সড়কে বেড়াতে গিয়ে যখনই মালার সঙ্গে দোতলার জানালায় বই হাতে বসে থাকা পূর্ণিমার দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে, পূর্ণিমা সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে। তার এই অদ্ভুত আচরণে অপমানিত মালা পূর্ণিমার অপযশের কথা শুনে আজ তাই সারাক্ষণ হেসেছে,—"রূপসী পূর্ণিমা বসুর সকল অহঙ্কার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে।"

পক্ষকাল পরে ক্রসরোডের কালো পাথর আবারও সরব হয়ে উঠল। এবারে তার লক্ষ্য সুমিতা নন্দী। শহরের প্রভাবশালী মানুষজনের চেষ্টায় বসল সতর্ক পুলিশ-প্রহরা। কিন্তু সুমিতা নন্দীর কলঙ্কলিপি মিলিয়ে যেতে না যেতেই শিলাখণ্ড মুখর হয়ে উঠল সুধা বসুর কুৎসায়। কে এই অদৃশ্য লিপিকার—জানা নেই কারও। তাই সবাই সবাইকে সন্দেহ করে,—'সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে'।

মাসাধিককাল কেটে গেছে। ক্রসরোডের পাথরে নতুন কোনো খড়ির লিখন ফুটে ওঠেনি নিস্তরঙ্গ শহর যেন হতাশায় ম্রিয়মাণ—"শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেতলিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াশা শিশির—তারই ছোঁয়ায় প্রতি প্রভাতে কত প্রেমবৈচিত্র্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রসরোডের পাষাণবেদিকা।" এ এক আশ্চর্য ব্যাকুলতা। রহস্যকাহিনীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যেমন পাঠক খুঁজে ফেরে তার উদগ্র উৎকণ্ঠার অবসান, শহরবাসীও তেমনি জানতে চায় পরবর্তী কোনো গোপনচারিণীর গুহ্য কীর্তি। সুদীর্ঘ নীরবতার পর বিকৃতকাম জনপদবাসীর ঔৎসুক্য চরিতার্থ করে কালো পাথর অবশেষে বাঙ্ময় হয়ে উঠল প্রীতি মুখার্জীর পরিবাদে।

কালো পাথর যাদের দুরনাম রটিয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে শহর জুড়ে সহানুভূতি, সন্দেহ আর গুজবের ঢেউ ওঠে। যাদের ঘিরে এত অপযশ, তারা যেন সকলের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কুৎসাই যেন তাদের উন্নীত করে নজরকাড়া পৃথক এক শ্রেণীতে—সেখানে মালা বিশ্বাস ব্রাত্য, উপেক্ষিত, নিষ্প্রভ। একদা পূর্ণিমা বসুর কলঙ্ক-কাহিনী তাকে জয়ের গৌরব দান করেছিল, কিন্তু টাউন সিনেমার গ্যালারির প্রথম সারিতে উপবিষ্টা পূর্ণিমা-সুমিতা-সুধা আর প্রীতির সমবেত উচ্ছ্বাস আর বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো উছলে পড়া হাসি-কলরব মালাকে যেন পরাভবের নিঃসঙ্গ আঁধারে নিক্ষেপ করে,—"মালা জানতো, এই গরবিনীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন ছবি! এ যে নতুন করে মান পাওয়া!"

কালো পাথর যাদের 'দুরধিগম্য মহিমলোকে' ঠাঁই করে দিয়েছে, মালা সেখানে অবাঞ্ছিত হলেও শহরের আর এক যুবতী মুক্তি রায় কিন্তু তার ছাড়পত্র পেয়ে গেল অলক্ষ্য লিপিকরের প্রসাদে। পূর্ণিমাদের উজ্জ্বল বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হল সেও। মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলায় সর্বরিক্ত মালা অনুভব করল তার একাকীত্ব—তার ব্যর্থতা—তার পরাজয়,—"মালা যেন আভাসে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভিড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিনভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মত অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মত সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন—মালা বিশ্বাস—সাধারণের নীচে।" শহরের ওই পাঁচ যুবতী ছিল সকলের দৃষ্টির অগোচরে, অথচ তারাই আজ পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত। আর দৃষ্টি আকর্ষণের নিরন্তর প্রয়াস সত্ত্বেও মালাই আজ সকলের চোখের আড়ালে, মানুষের "সকল কামনার সীমানার ওপারে, এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।"

বাতায়ন পথই ছিল মালার আত্মপ্রদর্শনীর মাধ্যম। এখন সে নিজেকে বন্দী করে ফেলল চার দেওয়ালের মাঝখানে। আয়নার মুখোমুখি বসে থাকতে থাকতে মালা বোঝে—"এ চেহারা যদি গ্রহের মত আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।" বাইরের পৃথিবীতে তার জায়গা নেই; মানুষের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোর কাছে সে অবাঞ্ছিত। পূর্ণিমাদের মতো 'কামনার লীলাকুরঙ্গী'-রাই সেখানে 'প্রার্থিতা'। অস্পৃশ্যের অনুভূতি মালাকে তার স্বপ্নের বিচরণভূমি থেকে নিক্ষেপ করে সকরুণ তুচ্ছতায় ঘেরা গৃহকোণে অবরোধে। তারপর আকাশে চাঁদ ওঠে। ঝড়ো মেঘে আবার তা ঢাকাও পড়ে। মালার মনের মধ্যেও সক্রিয় হয়ে ওঠে অস্থিরতার ঝড়ো মেঘ। অবরোধক্লিষ্ট নারীর যাবতীয় প্রসাধন মুছে যায় দু-চোখের বৃষ্টিতে। রামজীবনকে সঙ্গে নিয়ে মালা

বাইরে বেরোয় অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে। ঝড়ের মধ্যে ঘরে ফেরার পথে পায়ে পায়ে পৌঁছে যায় ক্রসরোডের মোড়ে, যেখানে ঘন আঁধারের অতল রহস্যে মোড়া কালো পাথরখানি যেন মগ্ন হয়ে রয়েছে কারো প্রতীক্ষার ধ্যানে,—"এই সেই পাথর, এই কলঙ্ককীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি।" রামজীবন অনেকটা এগিয়ে গেছে। পরাজয়ের গ্লানি মোচনে মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠল মালা। তারপর পাথরের গায়ে খড়ির আঁচড়ে স্বহস্তে ফুটিয়ে তুলল নিজেরই কলঙ্কলিপি—"মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার.....থাক, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমরা চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।"

'গরল অমিয় ভেল' মুখ্যত চরিত্রপ্রধান গল্প। আখ্যান যেটুকু গড়ে তোলা হয়েছে, তা মূলত মালা বিশ্বাসের জটিল অন্তর্লোক উন্মোচনের প্রয়োজনে। কিন্তু মালা বিশ্বাস কোনো বিচ্ছিন্ন, একক নারী মাত্র নয়, সেও আসলে প্রতিনিধিত্ব করছে অবদমিত বাসনা-বিড়ম্বিত অসংখ্য মালা বিশ্বাসের। ১২৯৮ সালে প্রকাশিত 'কঙ্কাল' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন এমন সর্বনাশা আত্মরতিপরায়ণতার পরিণতি কতখানি মর্মন্তুদ ও ভয়ংকর হতে পারে। 'কঙ্কাল' গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রটি ছিল রূপবতী, আর মালা বিশ্বাস একেবারে তার বিপরীত। সে কুদর্শনা। কালো, মোটা, মুখে বসন্তের দাগ। সাজসজ্জাও বড় বেমানান, মালা যখন বিসদৃশ প্রসাধনে বাইরে বেরোয়, তখন সকলে তাকে নির্নিমেষে দেখলেও তাতে মুগ্ধতার পরিবর্তে বিস্ময় এবং কৌতুক মিশে থাকে। প্রবল ক্ষুধার মতো জীবন বাসনাও বড় অন্ধ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বোধ-বিবর্জিত। তাই পুরুষের দৃষ্টিপ্রত্যাশী মালা অলীক আশায় অনলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাদেব বাড়ির জানলায়, তাদের "বাড়ির মেহেদি গাছের বেড়া, ফটকের ল্যাম্পপোস্ট আর পথের কাছে মাকাল গাছটা'র মতোই। মাকাল গাছের সঙ্গে কোথাও যেন সাধর্ম্য আছে মালা বিশ্বাসের। ওই গাছটির মতো সেও এক অনাদৃতা, মূল্যহীন, নিছক নিসর্গশোভা মাত্র"। তার প্রতি পথিকের বিস্ময়দৃষ্টি কখনও অনুরাগে রূপান্তর পায় না। মালার যৌবন-পিপাসা বাতায়ন পথে তার নিরুচ্চার অবস্থানের মধ্য দিয়ে যেন মাথা কুটে মরে, কিন্তু প্রকাশের পথ মেলে না। তার এই অচরিতার্থ হৃদয় যেন খানিকটা পরিতৃপ্তি পায় শহরের যুবতী কন্যাদের কেন্দ্র করে কালো পাথরের বুকে খড়ির অক্ষরে ফুটে ওঠা অনুক্রমিক কুৎসায়। পূর্ণিমা-সুমিতা-সুধা-প্রীতি-মুক্তির চেয়ে সে অন্তত স্বতন্ত্র। কলঙ্ক এদের সবাইকে কালিমালিপ্ত করলেও তাকে স্পর্শ করেনি,—এই অহংকার মালাকে জয়ের গৌরব দান করে। ওদের মতো সাধারণ নয় সে, কলঙ্কিনী নয়, মানুষের করুণা কিংবা ধিক্কারের লক্ষ্য নয়—এই গর্বই মালার জয়মাল্য, মালার অকৃতার্থ জীবনের পরম অবলম্বন। কিন্তু তার এই বিজয়-গৌরব স্থায়ী হয়নি। বাস্তবের নির্মম প্রত্যাঘাতে মালার মেকি স্বপ্নসৌধখানি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। সবিস্ময়ে সে প্রত্যক্ষ করেছে, যাদের পরাভূতা বলে মনে হয়েছিল, কলঙ্কের হার-ই তাদের মহিমান্বিতা করে তুলেছে। তারাই এখন সকলের দৃষ্টিক্ষুধার ভরকেন্দ্র। যে বর্ণময় আভিজাত্যের উচ্চাসনে পূর্ণিমারা ঠাঁই পেয়েছে, সেখানে মালা অপাঙ্‌ক্তেয়। বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভের প্রগাঢ় বিচ্ছুরণও তাকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে না। বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে মানুষের স্বপ্ন যখন বিচূর্ণ স্তম্ভের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে, তখনই তো তার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। মালার পরাভবও এতদিনে

যেন সম্পূর্ণ হল। ঘরের চার দেওয়ালের স্বেচ্ছা-নির্বাসনে নিজেকে অবরুদ্ধ করল সে, কারণ মালা বুঝে গেছে,—"সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই।" ঘর নয়, সবচেয়ে কঠিন বন্দীশালা তো আসলে মানুষের অবরুদ্ধ হৃদয়। শহরের আনন্দমেলায় কুণ্ঠিত-হৃদয় মালা গেছে আনখশির দীনতার সাজে সেজে। তার 'ছেঁড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ"। মালার এ দীনতা কেবল বাইরের নয়, পরাভবের যে গ্লানি মালাকে প্রতিমুহূর্তে অবলুণ্ঠিত করছে, ভিতরে ভিতরে তাকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে, সেইখানে তার দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি, সেইখানে হতশ্রী প্রস্তরস্তূপের মতো পড়ে আছে তার নিশ্চল, স্থবির যৌবনের বিড়ম্বিত ভার; তার ম্রিয়মাণ আকাঙ্ক্ষার বিদেহী প্রতিমার শব। "জানালার খড়খড়ি দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক ফালি" ঘরে এসে পৌঁছলে, অন্যমনস্ক মালা পলকের জন্য জানলাটা খুলে দিয়েও বন্ধ করে দিয়েছে আবার। এই 'পড়ন্ত রোদ' কেবল দিনাবসানের নয়, মালার অস্তগামী তৃষ্ণারও সূচক যেন। সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নামলে যেমন সক্রিয় হয়ে ওঠে নিশাচর জীবকুল, নিরালোক অন্ধকারে যূথভ্রষ্ট, নিঃসঙ্গ মালার মনের 'শতস্তর তিমিরের তলে' প্রচ্ছন্ন বাসনা-বিকরে তেমনই তৎপর হয়ে উঠেছে এবার প্রতিবিধিৎসার সর্পিল সংকল্পে। পক্ষপাতদুষ্ট যে কালো পাথর তাকে কলঙ্ক-কলুষ থেকে বঞ্চিত করে অন্যদের গরীয়সী করেছে, তার চক্রান্তকে চূর্ণ করতে মালা নিজেই অতঃপর নিজের কলঙ্ক-গাথা রচনা করল, "খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মত ছিটকে পড়লো কালো পাথরের গায়ে।"

কৃষ্ণপ্রেমের দুর্মর আকর্ষণে বিবশ রাধিকা কুলগৌরব বিসর্জন দিয়ে কলঙ্কভাগিনী হয়েছিলেন। কিন্তু যে অতল প্রেমসমুদ্রকে অমৃত ভেবে সংসারের গরল হেলায় শিরোধার্য করেছিলেন, সেই প্রেমের দুরবগাহ স্বরূপ তাঁর কাছে অধরাই রয়ে গিয়েছিল। তাই সন্তাপভারক্লিষ্ট রাধিকা হাহাকার করে বলেছিলেন—"অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"। জ্ঞানদাসের এই চরণটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে তাকে উল্লেখ হিসাবে ব্যবহার করেছেন গল্পকার,—যেখানে গরলই হয়ে উঠেছে অমৃতের অনুকল্প। স্বরচিত অপবাদের মধ্য দিয়ে এক নিঃসম্বল নারী জীবনের কাছে উঞ্ছবৃত্তি করেছে। নিষ্করুণ নিয়তিদত্ত ক্ষতচিহ্নের নিরাময় খুঁজেছে প্রতারক মিথ্যার গভীরে। কিন্তু সত্যের রং যেমন কখনো কখনো বড় ধূসর, তেমনি কোনো কোনো ব্যাধির চেয়েও ভয়ংকর হয়। পরাভবের মালিন্য মোচনের জন্য যে একটা ঘোরতর মিথ্যাকে সত্যের মুখোশে ঢেকে সবাইকে প্রতারণা করল,—পৃথিবীর কেউ না জানলেও নিজের কাছে তাকে প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়তেই হবে। মিথ্যার কঙ্কালটা তার নগ্ন বাস্তবতা নিয়ে যখন অহোরাত্র তাকে ব্যঙ্গ করবে, কল্পনার বুদ্বুদটা ভেঙে চুরে গিয়ে ভিতরের ফাঁকিটাকে স্পষ্ট করে তুলবে, তখন সেই নৈমিত্তিক অন্তর্দাহের উপশম কোথায় খুঁজে পাবে মালা? শেক্সপীয়রের 'Henry V' নাটকে হেনরি বলেছিলেন—"Even as men wracked upon a sand, that look to be washed off the next tide." গল্পের মালা বিশ্বাসও যেন সেই বিধ্বস্ত মানুষগুলিরই একজন,—ঢেউ-এর তাণ্ডবে ভেসে যাবে জেনেও নশ্বর বালুকা বেলায় দাঁড়িয়ে থাকাই যার অনিবার্য ভবিতব্য।

ঘুষ : আর্থ-সামাজিক সংকট

সুপৃথা মুখোপাধ্যায়

পূর্বাশা পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ঘুষ' গল্পটি। এ গল্পের পরিক্রমণ এক সন্ধ্যা থেকে পরের দিনের সকাল। সুরলক্ষ্মী-কুন্তলা-সদানন্দবাবু-শীতাংশু এই চরিত্রগুলির মানস উন্মোচন এবং সেই সঙ্গে হয়তো বা মানব চরিত্রের অসহায় অবনমনের কাহিনী 'ঘুষ'।

'ঘুষ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অন্যায় কাজে সাহায্যের জন্য গোপনে প্রদত্ত পুরস্কার, উৎকোচ। প্রথম প্রশ্ন ও কৌতূহল ঘুষ কে দিচ্ছে বা নিচ্ছে? কি ঘুষ? গল্পটির কাহিনীর অগ্রগতিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন ও কৌতূহল—কিভাবে দিচ্ছে?

এ গল্পের মেরুদণ্ড বা ভরকেন্দ্রে শীতাংশু চরিত্র। গল্পের প্রথমেই গল্পকার পাঠককে জানিয়ে দেন, শীতাংশু জুট রেজিস্ট্রেশন অফিসে কাজ করে, ওর কাজ বে-আইনী পাটচাষের জমির তদন্ত, এই কাজে "খরচাপাতি নিয়ে বরাদ্দের চেয়েও দু-চার বিঘা এদিক ওদিক শীতাংশু অহরহ করে দিচ্ছে।" এর ফলে গৃহস্থদের লাভ হয়, সেইসঙ্গে শীতাংশুদেরও লোকসান নেই। ঘুষ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের এক আধটু ভয় ছাড়া অন্য শুচিবায়ুও শীতাংশুর নেই।

শীতাংশুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় জেঠতুতো ভাইয়ের পিসতুতো শ্বশুর সদানন্দবাবু। তিন চার বিঘে জমিতে বেশি পাট বুনিয়েছেন তিনি এ খবর শীতাংশুর জানাই ছিল, এই কেসটা তার অন্য এক সহকর্মীকে দিয়ে পরিবর্তে অন্য কেস বা বখরা নেবে—এই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই, অবেলার মেঘ বাদলের দিনেও সে সদানন্দবাবুর আতিথ্য স্বীকার করতে চায় নি। অথচ বারো তেরো মাইল একটানা সাইক্লিং করা ক্লান্ত শীতাংশু শেষপর্যন্ত এই প্রৌঢ় মানুষটিকে এড়াতেও পারে না। অগত্যা তাকে মেনে নিতে হয় এই অনুরোধ।

'ঘুষ' গল্পের ভূমিকা এইটুকুই পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না ঘুষ লেন-দেনের প্রাপক ও গ্রাহক কে বা কারা! কিন্তু তখনও অজ্ঞাত কি ঘুষ?

এরপর এ গল্পের পটভূমি সদানন্দবাবুর জীর্ণ বাড়ি। শীতাংশু এ বাড়িতে এসে বুঝতে পারে আগের চেয়ে সদানন্দবাবুদের অবস্থা পড়তির দিকে। এই বাড়িতে আসার পর কাহিনী আঁতুড় ঘরে থাকা সুরলক্ষ্মীর দ্বারাই চালিত হয়। সদানন্দ ও সুরলক্ষ্মীর বিছানো ছলনা ও মায়ার জালে একটু একটু করে মোহগ্রস্ত হয়ে আটকে পড়ে শীতাংশু। সুরলক্ষ্মীর খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে তিনি পুত্রসন্তান প্রসবের পর আঁতুড় ঘরে। প্রৌঢ় সদানন্দ বিলম্বে পুত্রের জন্য আক্ষেপ করলেও তার প্রসন্নতা নৈরাশ্যে ঢাকা পড়ে না। হয়তো এখান থেকেই ছলনার শুরু।

দরিদ্র এই পরিবারটি আতিথেয়তার আন্তরিকতায় যেন দারিদ্র্যের রিক্ততাকে ঢাকতে চায়। শীতাংশু এবং পাঠক উভয়েই আশ্চর্য হয় সরল অকপট স্বীকারোক্তিতে। যে চেয়ারটিতে অতিথির বসার আয়োজন তাতে ছারপোকা এবং দ্বিতীয় আর নেই; অগত্যা আবার অন্তরাল

থেকে পরিচালিকা সুরলক্ষ্মীর নির্দেশ—"চটের আসনখানা চেয়ারের ওপর পেতে দে কুন্তী। নইলে ছারপোকার জ্বালায় একদণ্ডও বসতে পারবে না।"

কুন্তলার প্রবেশ গল্পের মধ্যে। অনেক দিন পরে দেখা যে কোনো অভ্যাগতের মতোই শীতাংশুর কুশল প্রশ্ন। অনেক দিন আগের বালিকা কুন্তলার চাঞ্চল্য আজকের এ কুন্তলার নেই। কিন্তু শীতাংশুর ধারণা ভ্রান্ত—একথা স্পষ্ট হয় সুরলক্ষ্মীর কথায়। আবার সেই সুরলক্ষ্মী যিনি আড়াল থেকে মেয়ের 'দোষকীর্তন' করেন। কিন্তু এর মধ্যেও কি নেই প্রশ্রয়ের সুর। মেয়ের দোষ নয়, যেন মেয়েকেই ইঙ্গিত দিলেন—শীতাংশুকে জয় করার!

কুন্তলা তখন থেকে শীতাংশুর কাছে একটু মোহের নাম, একটু মায়ার নাম হয়ে উঠল। অবশ্য মনে হয়, সন্দেহ জাগে, এতদিন এতদিন পরে দেখা তাতে এক নিমেষে এ ঘনিষ্ঠতা আসে কি করে? কিংবা এত সপ্রতিভ সংলাপ : "কি জানি। কথা বলিনি, তাতেই তা একদফা নালিশ হয়ে গেল শুনলেন তো। আর গোড়াতেই কথা বলতে শুরু করলে মা যে আরও কত কি বলতেন তার ঠিক নেই।" পাঠক বুঝতে পারে সদানন্দ ও সুরলক্ষ্মীর 'ঘুষ' দেওয়ার শরিক হয়ে উঠছে কুন্তলা। বয়সের মোহাঞ্জন ভুলিয়ে দিতে চাইছে 'অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি'-তে, কথায়, আচরণে চাপা চাপল্যে। শীতাংশুর একঘেঁয়ে রোজের কাজে দমকা হাওয়ার মতো এসে পড়েছে কুন্তলা। তার নিজের পরিবারের ভাইপো, ভাইঝি, দাদার সংসারে মা বৌদির নিত্য কলহে প্রসন্নতা ও আনন্দের অভাব ছিল। দুঘণ্টার মধ্যেই তার বাড়ী তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠত। কিন্তু দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সদানন্দবাবুদের এই কয়েক ঘণ্টার সন্ধ্যা তার জীবনে অন্য এক জীবন যেন যোগ করে দিল।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র শীতাংশুর এই পরিতৃপ্তি আনার জন্য কয়েকটি ছোট ছোট চিত্রকল্প দিয়েছেন। সেখানে অতিথিকে চা-খাওয়ানো কিংবা বেশভূষা পরিবর্তনের ব্যবস্থা এই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও বাদ যায়নি। কুন্তলাকে সামনে রেখে সুরলক্ষ্মীর এই ব্যবস্থাপনার তারিফ না করে পারা যায় না। আব শীতাংশুর মধ্যে একটা রূপান্তর ঘটতে থাকে। যে শীতাংশু সদানন্দবাবুর বাড়ী আসতে চায় নি, বিরূপ হয়েছিল, সেই এখানে আসার পর, ঘরদোরের জীর্ণতার মধ্যেও 'আনন্দের নীড়'-র সন্ধান পেয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, শীতাংশুকে এই পরিবেশ অকপট করে তুলল। এবং এখানেও সেই সুরলক্ষ্মী। একটু একটু করে তার পরিবার এবং চাকরির খোঁজ নিলেন। আর যে শীতাংশু নিজের সামর্থ্যের দৈন্য কখনও প্রকাশ করে না, এই সহানুভূতিময় পরিবেশে মনের ভেতরে কিচকিচ করা বালিকে মুক্ত করে দিল। শীতাংশুর চাকরি কিংবা পারিবারিক জীবনের বাস্তবতা এই দারিদ্র্যের মায়ামমতায় স্নেহার্দ্র সান্ত্বনায় অর্গলমুক্ত হয়ে গেল।

কুন্তলার প্রকাশ ঘটল মায়ের পরিচালনায় অতিথির আপ্যায়নে, সদানন্দবাবুর আর দুই মেয়ে চুনু-টুনুর নাচের পরিচালনায় রাতে অতিথির বিছানা প্রস্তুত করাতে কিংবা সন্ধ্যের কর্মলাঞ্ছিত শাড়ীর পরিবর্তে অন্য শাড়ী পরে জলের ঘটি রেখে আসাতে। এভাবেই কুন্তলা দু'দণ্ড শান্তির খোঁজ দিয়েছিল অবিবাহিত যুবক শীতাংশুকে। শীতাংশুর মন উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল কুন্তলার জন্য। আর কুন্তলাও একটু একটু করে মোহের জাল বিস্তার করছিল। কাব্যময় এবং চটুল হলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না নরেন্দ্রনাথ মিত্র সচেতনভাবেই লেখেন

"কুন্তলা আরও একটু কাছে এগিয়ে এল শীতাংশুর, ভ্রূদুটিতে অপূর্ব ভঙ্গি এনে বলল, 'নাচাতে গো নাচাতে'।"

কিংবা "কুন্তলা বলল 'তবে কিসে মুছবেন'। শীতাংশু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আঁচলে গো আঁচলে।"

কয়েক ঘণ্টার এ গল্প কিন্তু মোহময় মায়াময় এই স্থান থেকে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ে শীতাংশু সকাল বেলায়, বিদায়ের সময়ে, "শীতাংশু স্নেহে চুনু-টুনুর গাল টিপে দিয়ে স্মিত মুখে কুন্তলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল তার চোখ দুটি ছলছল করছে। শীতাংশুর বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু এ যেন কেবল বেদনা নয়, তার সঙ্গে এক অনাস্বাদিত আনন্দও যেন মিশে রয়েছে।" এই 'অনাস্বাদিত আনন্দ' কিন্তু এক লহমায় হারিয়ে যায়। এখানেও সেই সুরলক্ষ্মী, যিনি আঁতুড়ঘরের আড়ালে থেকেই এ আখ্যানকে ঋদ্ধ করেন। যে স্বপ্ন শীতাংশু দেখছিল তা খান্‌খান্ হয় যায়। মুহূর্তেই বেরিয়ে আসে দারিদ্র্যের চাপে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ক্ষয়িত সদানন্দের পরিবারের অন্তরের স্বার্থান্বেষী চিত্র। 'ঘুষ' দিতে অপারগ সদানন্দের সামনে এসে দাঁড়ায় সুরলক্ষ্মী-কুন্তলা-রূপ মায়াঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে। সদানন্দকে তিনি প্রায় কথা দিয়েছিলেন ঘুষের থেকে অব্যাহতি দেওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। "ওকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসো, দেখি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে না বলতে পাবে।" সেই কথা তিনি রাখেন।

জমিতে পাট বুনেছিলেন সদানন্দ আর গল্পের আখ্যানভাগে এক নতুন ঘুষের জাল বুনলেন সুরলক্ষ্মী। গল্পের ভরকেন্দ্র যদি শীতাংশু তবে তার চারদিকে পরিধি রচনা করেছেন সুরলক্ষ্মী। তাই দারিদ্র্য আছে, দারিদ্র্যের মায়া আছে, দারিদ্র্যের লোভ আছে এই 'ঘুষ' গল্পে। কিন্তু হারিয়ে যায় শীতাংশুর অনাস্বাদিত আনন্দ। তার বুকের ভিতরে আরো একবার মোচড দিয়ে ওঠে—হিংস্র বিষাক্ত বল্লমের খোঁচার আঘাতের মোচড়। সে রিক্ত হয়ে যায় কটুস্বাদে ভরে ওঠে মন। প্রকাশ্যে তাই সে বলে—"সেজন্য ভাববেন না মাঔমা। সব ঠিক করে নেব। টাকার চেয়ে বেশিই আপনারা দিয়েছেন। এত আর কোথাও পাই নি।" আর মনে মনে বলে—"এমন করে হারাবার দুর্ভাগ্যই আর কখনও হয়েছে।"—পাঠকের দ্বিতীয় কৌতূহলও মিটে যায়।

কিন্তু লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র শীতাংশুর জন্য একটু সান্ত্বনার অবকাশ রাখেন না। তাই, শেষপর্যন্ত শীতাংশু সাইকেলে উঠতে গিয়ে দেখে কুন্তলার দিকে। "মনে হল তার চোখে জল নেই, ঠোঁটের কোণে কৃতার্থতার হাসি ফুটে উঠেছে।" যে চোখের দিকে তাকিয়ে শীতাংশু বিদায়ের বিষণ্ণতা অনুভব করেছিল, যে বিষণ্ণতার অনুভবের অন্তরালে ছিল আনন্দ তা পলকেই মুছে গেল। রয়ে গেল হারানোর বেদনা, হারাবার দুর্ভাগ্য। 'কুন্তলা' তার কাছে এখন শুধুই 'ঘুষ' বা তার প্রতীক মাত্র। হয়তো কুন্তলার চোখে জলের রেশ থেকে গেলে এ গল্প অন্যভাবে ব্যঞ্জিত হত। কিংবা সান্ত্বনা থেকে যেত কুন্তলা অন্ততঃ সদানন্দ ও সুরলক্ষ্মীর ভাবনার শরিক নয়। কিন্তু লেখক অনাবৃত করে দিলেন এইভাবেই সব কিছুকে, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেল জুট রেজিস্ট্রেশন অফিসে কাজ-করা, ঘুষ নেওয়া, অবিবাহিত বাস্তববাদী শীতাংশু।

এ গল্পে লেখক কাহিনীর বুননে প্রকৃতিকে মিলিয়ে দিয়েছেন বেশ কিছু জায়গায়। প্রথমেই মেঘ-বাদলের দিনের বর্ণনা সদানন্দবাবুদের বাড়ি যাওয়ার অনাগ্রহকে কিঞ্চিৎ আগ্রহে পরিণত করে। তারপর জলবৃষ্টির মধ্যে চা-আনার জন্য শতচ্ছিন্ন ছাতা নিয়ে সদানন্দবাবুর বাড়ির বাইরে যাওয়া। বৃষ্টির অবিরাম ধারাপাত, পরিবেশের জীর্ণতা, গল্পের আবহাওয়াটিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে, তৃতীয়ত, গল্পের উপসংহার যেখানে লেখক বলেন, "রাতের সেই টিপটিপে বৃষ্টি আর নেই। নীল নির্মল আকাশে ভোরের সেই সোনালি স্নিগ্ধতা মেঘান্তরিত খররৌদ্রে দুঃসহ হয়ে উঠেছে।" বৃষ্টিহীন নির্মল ভোর শীতাংশুর কাছে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে না। বরং তা মধ্যাহ্নের দুপুরের মতো খর হয়ে দুঃসহ হয়ে যায়, কয়েক মুহূর্তের তৈরী হওয়া ভালো লাগা ছিন্নভিন্ন হয়ে শীতাংশুর মুহূর্তগুলিকে অসহনীয় করে তোলে।

গল্পটি সদানন্দের পরিবারের গল্প। কুন্তলা এর প্রধান একটি নারী চরিত্র, কিন্তু শীতাংশুর সদানন্দবাবুর থেকে ঘুষ নেওয়া কিংবা না-নেওয়া যাঁর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত তিনি সুরলক্ষ্মী। আড়ালে থেকে কুন্তলাকে দিয়ে তিনি কাজ হাসিল করেন। সংসার ও অপত্যমায়ার বন্ধনে, অস্তিত্বের সংকট মোচনের তাগিদে হয়তো এই এই কাজ তিনি বাধ্য হয়েই করেন। দারিদ্র্যের ভারে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে স্বার্থপর (!) কটা মানুষ শীতাংশুকে দেয় উষ্ণ আতিথেয়তা— বিনিময়ে একটু সুবিধা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ঘুষ' গল্পে বর্ণনার পটুত্ব, শব্দের সরলতা, কাহিনী গ্রন্থন গল্পটিকে একটি সার্থক ছোটগল্পে পরিণত করেছে।

মা হিংসীঃ : মানবতা বড় বিষাদে আছে

দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ)

গিরধারী গোপ আর ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি। হেতাল পারেখ আর শনিচরী। গিরধারী কিংবা ধনঞ্জয় দুজনেই জঘন্য খুনের আসামী। এবং ফাঁসির আসামী। দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান পঞ্চাশের কি ষাটের। গিরধারীর গল্পের স্থল-পটভূমি মুঙ্গের জেলায় আর ধনঞ্জয়ের, শহর কলকাতায়।

পঁচিশ বছরের উদ্ধত যুবক গিরধারী আর রাধিয়ার সুখের সংসার। হঠাৎ গিরধারীর মন কাড়ল আরেক মেয়ের মুখ। প্রতিবেশী বন্ধু সহদেব গোপের বউ শনিচরীকে দেখে আকৃষ্ট হল গিরধারী—রাধিয়াকে ভুলেই। শুরু হল অত্যাচার রাধিয়ার ওপর—কারণ অবৈধ ভালোবাসায় সে-ই যে পথের কাঁটা। আর রাধিয়া? স্বামীর অসপত্ন ভালোবাসায় বঞ্চিত হয়ে সে নাকি গিরধারীকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টায় ছিল। জেরার মুখে আসামী কবুলও করেছিল, সেই ভয়ে সে রাধিয়াকে মারধোর করত, এমনকি তাড়িয়ে দিতেও চেয়েছিল। নিগৃহীত, অত্যাচারিত রাধিয়া টিকতে না পেরে একদিন সত্যিই চলে গেল মিঠাপুর গ্রামে, তার বাপের বাড়িতে। বাধ সাধল শনিচরী নিজেই। দেখা গেল, গিরধারীর প্রস্তাবে আদৌ সে সম্মত নয়। যার জন্য গিরধারীর সুখের সংসার ছারখার হল—তারই আপত্তি তাকে সঙ্গদানে! গিরধারী বড় শক্ত পুরুষ—যা চায়, তাকে তার পেতেই হবে। না পেলে, তাকে সরিয়ে দিতেও তার হাত কাঁপে না। প্ল্যান তার প্রায় নিখুঁত। অক্টোবরের কুয়াশা ঢাকা ভোরে শনিচরী কলসি কাঁখে ইঁদারা থেকে জল আনতে গিয়েছিল—যেমন রোজ যায়। পথের ধারে আখের ক্ষেত হেঁসো নিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মত অপেক্ষায় ছিল গিরধারী। গলার ওপর তার জোরালো হাতের স্রেফ তিনটে পোঁচে কেড়ে নিল. অভীপ্সিত রমণীর প্রাণ। অর্থাৎ শরীরে চাই নারীকে, নয় জীবন চাই। গিরধারী ফেরার হল। কিন্তু ভোরের অস্ফুট আলোয় কয়েকজন চাষী তাকে দেখে ফেলেছিল। কাটিহার বাজার থেকে কদিন পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাকে। এইটুকু গিরধারীর গল্পের ফ্ল্যাশ ব্যাক। তারপরেই শুরু হয় মূল গল্প। জজসাহেবের সুদীর্ঘ রায়। বিচারালয়ের ন্যায়বিচার। তারই ভিত্তিতে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ৩০২ ধারায় প্রাণদণ্ডের নির্দেশ।

আর ধনঞ্জয়ের কথা তো এই ২০০৪-এ লিখতে বসে আমাদের সকলেরই টাট্‌কা স্মৃতি। দেশের বাড়িতে বউ ছিল তারও। ভবানীপুরের এক বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে ধর্ষণ এবং খুন (অন্যমতে খুন এবং ধর্ষণ) করেছিল সে স্কুলছাত্রী হেতাল পারেখকে। ৫ মার্চ, ১৯৯০-এর সেই ঘটনার ভয়াবহতায় চমকে উঠেছিল সমস্ত সংবাদপত্র পাঠক। গিরধারীর মতই সে-ও ফেরার হয়েছিল। মাস দুয়েকের ব্যবধানে ধরা পড়েছিল বাঁকুড়ায় গ্রাম থেকে। ১২ আগস্ট, ১৯৯১ আলিপুর আদালত তার ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর দীর্ঘ ১৩ বছরের টানাপোড়েন। শেষ পর্যন্ত ১৪ আগস্ট, ২০০৪ ফাঁসি হল ধনঞ্জয়ের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ধনঞ্জয়ের মত গিরধারীর আপিল করার ক্ষমতা ছিল না উচ্চতর আদালতে। তাই রায়দান আর ফাঁসির দিনের মধ্যে ব্যবধান ছিল না দুস্তর। তাছাড়া গিরধারী ধনঞ্জয়ের মত ধর্ষকও ছিল না। গল্পে পাই, গিরধারী 'তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অস্বীকার

করেছে।' আইনী লড়াই চলেছিল বলে ধনঞ্জয় একবারও কবুল করে নি—সে খুনী। প্রাণভিক্ষা দূরে থাক্, গিরধারী ফাঁসির নির্ধারিত দিনের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত রীতিমত রসিকতা করে—'আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না।' আর ধনঞ্জয় বারবার প্রাণভিক্ষা চেয়েছে—উচ্চতর আদালতে কিংবা রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী বা স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কাছে সব মিল-অমিলের অনুপুঙ্খের চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন—মানুষের চরম অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে কি বিরোধ আছে কোনো, মানবতার আবেদনে?

৫ আগস্ট ২০০৪-এর প্রতি সংবাদ পত্রে আমরা জানলাম, দ্বিধাচালিত রাষ্ট্রপতি অবশেষে খারিজ করেছেন ধনঞ্জয়ের প্রাণভিক্ষার আবেদন। ঐদিনই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল, ধনঞ্জয়ের ফাঁসি সুনিশ্চিত জেনে বুদ্ধিজীবীদের কিছু মন্তব্য। মৃণাল সেনের প্রতিক্রিয়া, 'ফাঁসির বিরোধী। কিন্তু ধনঞ্জয় যে অপরাধ করেছে, আমি রাষ্ট্রপতি হলেও এই সিদ্ধান্তই নিতাম।' সুজাত ভদ্রের কাছে ব্যাপারটা আবার, 'দুর্ভাগ্যজনক। রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত জাতির জনক মহাত্মা গাঁন্ধী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের দর্শনের বিরোধী।' ধর্ষিতা মেয়েটির এক সহপাঠী অদিতি ঘোষ এখন শিক্ষিকা। উল্লসিত সে, 'অনেক দেরিতে হলেও অবশেষে ন্যায়বিচার হল।' মহাশ্বেতা দেবীর সুচিন্তিত, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ''আমি যেমন প্রাণদণ্ডের বিরোধী ছিলাম, তেমনই আছি। এই ফাঁসির পরে সমাজ থেকে ধর্ষণের মত অপরাধ লুপ্ত হলে খুশি হব।' আর সরাসরি বলেন অর্পণা সেন, ''খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সেটা ধনঞ্জয়ের জন্য নয়। আমি মনে করি, শাস্তি কখনো প্রতিহিংসামূলক হওয়া উচিত নয়।' প্রশ্নটা ঠিক এইখানেই। এক খুনের শাস্তি কি সম্ভব, আরেক খুন দিয়ে? তা সে গিরধারী কিংবা ধনঞ্জয়—যে-ই হোক্। তাদের খুন করার মধ্যে ছিল হঠকারিতা। আর ফাঁসি? একদল লোকের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বা অনেকের সম্মিলিত প্রণালীবদ্ধ আয়োজন—যার শেষকথা নিষ্ঠুরতম এক খুন। আচ্ছা, ফাঁসি হল বলেই কি আমরা গিরধারী বা ধনঞ্জয়কে বাড়তি খানিক সহানুভূতি দেখিয়ে ফেলি? তার বদলে যদি বেঁচে থাকার সুযোগ পেত তারা, তবে বরং নিন্দাই হত তীব্রতর! জঘন্য খুনের এক আসামী, 'তার পরমায়ু নীলামে বিকিয়ে গেছে। তাই তার আজ এত দাম!' যতক্ষণ খুনের আসামী, ততক্ষণ ঘৃণা আর উপেক্ষা। আর ফাঁসির আসামী? —তার কদরই আলাদা। প্রতি মুহূর্তের সতর্ক সমাদর। আসামীর 'গায়ে যেন এককণা ধুলো না লাগে'। 'ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল।'

ঘড়ঘড়ে গলায় জজসাহেব ঘোষণা করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড।—'আসামী গিরধারী গোপ...তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণ শেষ হয়ে যায়।' আসামী কেঁদে বা আর্তনাদ করে ওঠে না। সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'বহুৎ আচ্ছা'। 'শানিত বিদ্রূপের হিংসামাখা' সেদুটি শব্দ্ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল আদালত ঘরে। কিন্তু কাকে বিদ্রূপ? বিচারসভাকেই কি নয়? হয়তো বিচারপদ্ধতিকেও। কিংবা প্রতিহিংসামূলক ঐ শাস্তিকেই। আসলে গল্পটার আবেদন এখানেই—মানুষের চরমতম অপরাধের শাসিতস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড বনাম মানবতা। ২০০৪-এ ধনঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বিপক্ষে দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে গেল বাংলার প্রায় সব মানুষ। একদলের কাছে, এমন আসামীর ফাঁসিই মনে হল অনিবার্য।

আরেকদল ফাঁসির মধ্যে দেখল প্রতিহিংসার আস্ফালন—ধর্ষকামী মানসিকতা। মানবতাবাদীরা তাই খুঁজতে চাইলেন প্রাণকে অটুট রেখেই কঠোরতম কোনো শাস্তি। হতে পারে সেটা আমরণ সশ্রম কারাবাস। মিডিয়া ধনঞ্জয়কে নিয়ে অনেক ভেবেছে এবং আমরাও বাধ্য হয়েছে নানাকিছু ভাবতে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কোনো প্রত্যন্ত মফস্বল আদালতের ফাঁসির নির্দেশ নিয়ে ভাবার মত লোকই বা কোথায় ছিল?

থাকার মধ্যে শুধু গিরধারীর দেহরক্ষীরা—অর্জুন সিং, হাবিলদার, কনস্টেবল সাকির আলি কিংবা ভগীরথ পাণ্ডে। সবাই দেখে অবাক, ফাঁসির আসামী একটুও ঘাবড়ায় নি। এমনকি সহানুভূতিও তার সয় না। দুটো ভালো কথা বলে কেউ সান্ত্বনা দিলে রীতিমত রুক্ষকণ্ঠে সে বলে ওঠে, 'আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে আপনারাই ঘাবড়ে গেছেন। বড় বেশি প্রেম দেখাচ্ছেন!' গিরধারী বড় উদ্ধত স্বভাবের—বলাই বাহুল্য। শুধু তা-ই কি সে অহংকারী সুরে বারবার বলে, 'জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না' কিংবা 'আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না'? আদালত থেকে জেলখানায় নিয়ে আসার দীর্ঘ পথ ফুরোয় না কোনো স্তব্ধ বিষাদে। রীতিমত গল্পগাছা চলায় গিরধারী। এতটাই স্বচ্ছন্দ এবং নিরুদ্বিগ্ন সে, যে তার হতচকিত দেহরক্ষিরা ভাবতে শুরু করে — দুঃখ, আশঙ্কায় বুঝি এরই মধ্যে গিরধারীর মাথায় গোলমাল শুরু হয়েছে। পথে পড়ে, অবারিত মাঠের বুক চিরে আশপাশের গ্রাম ছুঁয়ে ছুটে চলা লাল মেঠো পথ। কোথায় গেছে? মিঠাপুর গা পেরিয়ে মুঙ্গের। মিঠাপুরেই তার শ্বশুরবাড়ি। ভাবতেই চোখ মুখে উথলে ওঠে মুগ্ধ আবেশ। সেই গ্রামেরই এক জীর্ণ কুটিরে মেটে ঘরের নিভৃতিতে বুকভরা আকুলতা নিয়ে, গিরধারী যেন স্পষ্ট দেখতে পায়—পথ খুঁজতে এক মন। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান আর বেদনা থেকে উদ্ধার করার জন্য উপায় খুঁজছে রাধিয়া। তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী।

জানতে চায় অর্জুন সিং, সত্যিই গিরধারী শনিচরীকে খুন করেছে কি-না। স্পষ্ট স্বীকারোক্তি গিরধারীর, 'আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনাপাওনার হিসেব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম হিসেব নিয়ে নিলাম'। তবে সে নিশ্চিত—খুন করে সে ভুল করে নি। ভুল হয়েছিল স্রেফ স্থান-কাল নির্বাচনে। 'রাত্রিবেলায় একটু নিরালা জায়গাতেই কাজ খতম করা উচিত ছিল।' নেই সামান্য অনুশোচনা, অনুতাপ বা মর্মপীড়া। আদালতে দাঁড়িয়ে গিরধারী নিজেই আবার রাধিয়ার পরকীয়া প্রেমের কথা বলেছে। সহযাত্রী রক্ষকরা জানতে চেয়েছে সে কথার সত্যতা। এতক্ষণে গিরধারী বেজে ওঠে শান্ত-গভীর সুরে—'সে খবর সে জানে আর আমি জানি।' তবে কি সত্যিই রাধিয়া তাকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল?—শান্ত, সংক্ষিপ্ত উত্তর ধ্বনিত হয়েছিল অবারও—'সে খবর আমি জানি আব সে জানে।' সত্যিই তো গিরধারী জানে, সেই বিষ খাওয়ানোর গল্প 'ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা'। তবে? সে কি কোনো গোপন ইঙ্গিত পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল সেদিন আদালতে হাজির রাধিয়ার উদ্দেশ্যে? স্বামীর বাঞ্ছিত স্ত্রীর অন্তিম কোনো কৃত্য? আদালতের কেউ বোঝে না, গিরধারীর গোপন ইঙ্গিত—শুধু রাধিয়া ছাড়া।

কেন বিষ খাওয়ানোর গল্প ফেঁদে প্রলাপ বকছে গিরধারী? চোখ তুলেই রাধিয়া বুঝে নেয় গিরধারীর ধূর্ত চোখের ভাষা। ঐ প্রলাপের আড়ালে যে লুকিয়ে আছে, গিরধারীর শেষ কামনায়

নিবিড় কোনো আগ্রহের আবছা ইশারা। উচ্চতর আদালতে আপিল করতে পারবে না হতদরিদ্র গিরধারী। কিন্তু ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সে কি আপিল জানাচ্ছে রাধিয়ার কাছে? সেই আবছা ভাষার ষড়যন্ত্র কেউ বোঝে না। গিরধারী নিশ্চিত, রাধিয়া বুঝেছে। তাই সে মহাখুশি রক্ষীদের কাছে খৈনি চায়। গল্প করে। উৎসুক চোখে, হাল্কা মনে চারদিক দেখে। আর মুচকি হেসে বলে বারবার—ফাঁসি তার হচ্ছে না কোনোমতেই। তার আদিম জৈববৃত্তি তাকে শিখিয়েছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মতই, বীরপুরুষ ভোগ্যা নারী। সুতরাং বাঞ্ছিতা নারী যদি প্রতিহত করে পুরুষকে—পুরুষ তবে তার প্রাণ নিতেই পারে। সাকির আলি এর আগেও বেশ কিছু ফাঁসির আসামীকে দেখেছে। সে ভেবে আশ্চর্য হয়, একটা ফাঁসির আসামীও কি অন্যায়ের জন্য আপশোষ করে না! সাদামাটা বুদ্ধির অর্জুন সিং-এর ধারণা, 'ফাঁসির হুকুম না হলে মানুষের মত মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে।' ফাঁসির নির্দেশ শুনে তবে কি ন্যায়নীতির বোধও হারিয়ে যায়? নাকি তার পাপের পাশাপশি অপরাধী দেখতে পায় বিচারের নামে সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের আর এক পাপ? কথায় কথায় গাড়ি এসে পৌঁছায় বিচারশালা থেকে জেলখানায়। অর্জুন সিং অনুরোধ করে, শেষবারের মত মাটিকে সে যেন বিদায় জানায়। জেলের ভিতর সংক্ষিপ্ত বাকি জীবনে তো আর মাটি জুটবে না! 'জ্যান্ত গিরধারীর বাসিপ্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ! খুঁটিয়ে দেখে গিরধারী জেলের চারদিক আর মনে মনে আরো প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে—ফাঁসি তার হবে না কোনোমতেই।'

অথচ চারপাশের সবাই ভাবছে, তাব জীবনেব রথ পথের শেষে এসে পৌঁছেছে। বাকি কদিনের ঠিকানা ঐ পাঁচ হাত-বাই-পাঁচ হাতের কংক্রিটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি নির্মম এক খুপরি। ক'দিন যেতেই জেলের সবাই চিনে ফেলে বেপরোয়া এক অসামীকে। সে চটুল ফিল্মি গান গায়, যখন খুশি ঠাট্টা-ইয়ারকি করে। সারাদিন গোলমাল করে আর মাঝেমাঝেই গর্জায়, 'কত সখ! দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে! ....কোন শালা আমার ফাঁসি দেবে দেখবো'। কত কদর তার আয়ুর পরবর্তী মুহূর্তগুলির! তার জন্য নতুন প্রহরী, নতুন শাস্ত্রী। অবশেষ হাইকোর্টের সইসমেত লাল চিঠি এসে পৌঁছায়। নির্ধারিত হয়ে যায় ফাঁসির দিনক্ষণ। তবে কি সব প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা বৃথা যাবে? মিঠাপুর গ্রাম থেকে পায়ে পায়ে আসবে নাকি 'শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন'। ফাঁসির ঠিক একদিন আগে খবর আসে, এতদিনে দেখা করতে এসেছে রাধিয়া—তার স্ত্রী। পাঁচ-বাই-পাঁচের—সব বন্ধন ছিন্ন করে, কম্বলে লাথি মেরে সে ছুটে বেরিয়ে যায়। বাঁচবে সে। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবে। আর ফিরে আসবে না ঐ সেলে। স্তম্ভিত হয়ে যায় গিরধারী। গরাদে মাথা ঠুকছে রাধিয়া। কান্নাভেজা তার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে জেলের বদ্ধতা থেকে আকাশের ব্যপ্তিতে। —'ছিনিয়ে নিলে গো! তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।' নগণ্য খাবার। পাতায় মোড়া একটু গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া নিয়ে এসেছিল সে। তা-ও কোনোমতে তুলে দেওয়া গেল না গিরধারীর হাতে—এমন কঠোর নিরাপত্তা! জেলের নিয়ম অনুযায়ী ফটকের প্রহরীর কাছে জমা রইল বাড়ি থেকে আনা খাবার। রাধিয়ার কান্না দেখে ডোলরেরও মন গলে। আশ্বস্ত করেন, পছন্দের খাবার নিশ্চয় দেওয়া হবে গিরধারীকে। কিন্তু জেলার কেমন করে জানবেন, কী মহার্ঘ ছিল সেদিনের হালুয়া আর পেঁড়ায়! সে তো নিছক খাবার ছিল না—ছিল ফাঁসির হাত থেকে

মুক্তির উপকরণ। নিষ্ঠুর হত্যার বদলে আরামের অন্তিম নিদ্রার পথ। তা-ও পৌঁছল না গিরধারীর হাতে। অথচ বিচারালয়ের সেই প্রথম দিনটির থেকে এ-ই তো সে চেয়েছিল।

স্তব্ধ হয়ে যায় গিরধারী। এতদিনে যেন শুনতে পায় ফাঁসির ভয়াবহ নির্দেশ। নৃশংস মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে ভয়ে। জিয়নকাঠি ভেঙেছে তার। রাধিয়ার দেয়া চিরশান্তি নিদ্রার স্বপ্ন ঘোচে। গিরধারী বোঝে, 'রাধিয়ার নিজের হাতের তৈরি মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌঁছল না।' এতদিনের উদ্ধত রাগী গিরধারীকে দেখে মনে হয় এবার, যেন মৃত মানুষের মূর্তি। ছোট্ট ছেলের মত বুকফাটা কান্নায় চেঁচিয়ে ওঠে এতদিনে, 'বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!' আসলে গিরধারীর মারতে হাত কাঁপে না—মরতেও ভয় হয় না। ভয় তার ফাঁসির নিষ্ঠুর বীভৎসতায়। বউয়ের হাতে তৈরি মারণবিষে ছিল কত যত্ন, কত ভালোবাসা। তা নয় ফাঁসুড়ে বংশী দোসাদের নির্মম দড়ি! তাছাড়া সে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে যাকে—কেন তার মৃত্যু হবে না তারই হাতে? এই দেয়া-নেয়ার হিসেব বোঝে না অসহায় গিরধারী। মর্মান্তিক আর্তনাদে আতুর হয় তার জীবনের শেষ রাতটা। মরতে ভয় নেই তার। সে তো মরতেই চেয়েছিল রাধিয়ার হাতে। ভয় তার ফাঁসির বীভৎস নিষ্ঠুরতায়।

ওদিকে বধ্যভূমিতে ফাঁসির নিখুঁত আয়োজন শেষ। ফাঁসির তক্তার প্রহরায় অতন্দ্র প্রহরী। দড়ি পরীক্ষা, তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি পরীক্ষা—সবই শেষ। চর্বি-মাখানো দড়িটা পোষা অজগরের মত আবদ্ধ সিন্দুকে। নগণ্য এক মানুষের ততোধিক নগণ্য জীবন নিয়ে কী নিখুঁত সতর্কতা। কতই না মূল্যবান তার জীবন সেই রাতে! কতই বা অর্থমূল্যে? রাত পেরলেই ফাঁসুড়ে বংশী দোসাদের রোজগারের খাতায় জমা হবে পাঁচটি টাকা। অর্থাৎ তাজা জোয়ান ঐ গিরধারীর জীবনের দাম মাত্র পাঁচটি টাকা।

কান্না থামে। রাত গভীরে সেলের মধ্যে গিরধারী নীরব হয়ে যায়। গান শুনতে চায়। নইলে তুলসীবচন। খুঁজতে থাকে নির্ভরতার আশ্রয়। বারবার মৃদুকণ্ঠে বলে 'সীতারাম! সীতারাম!' জেলের বাইরে পথের ধুলোয় শুয়ে সে রাত কাটিয়েছে একলা রাধিয়া। সমস্ত সত্তা একত্রিত করে সে সারারাত শুনতে চেয়েছে জেলের ভেতরের প্রতিটি আওয়াজ রাতের আলো নিভেছে। ভোরের কাক ডেকে উঠেছে। 'সীতারাম! সীতারাম! সীতারা.....!' হঠাৎ অদৃশ্য সেতারের তার ছিঁড়ে গেছে। আশ্চর্য নির্মায়িক তাঁর লেখনী—আর অনুপুঙ্খ!—'হুম্‌ম্—হ্যাঁচকা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভেতর পড়ল।' আবেগের মুহূর্তে সংযত তিক্ততম বাক্য।

লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য ফটকের বাইরে অপেক্ষমান ছিল গরুর গাড়ি। আর ছিল রাধিয়া। কম্বল জড়ানো স্বামীর লাশ শেষবারের মত দেখতে চাইল সে। কী দেখল? সুবোধ ঘোষ বীভৎস বর্ণনায় আবারও অকুণ্ঠ। 'গিরধারীর আধহাত লম্বা জিভ আর দড়ির মত লিকলিকে গলা' দেখে ফুঁপিয়ে ওঠে রাধিয়া। যেন কানে কানে বলে, 'মাপ কর, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, মাপ কর।' বাঁচানো?—অর্থাৎ ঐ ফাঁসির বীভৎসতা থেকে বাঁচানো। তারপরেই রাধিয়া চিৎকার করে ওঠে শোকে, ক্রোধে। আকশে, বাতাসে ছড়িয়ে দেয় তার উদ্ধত প্রতিবাদ, 'ছি ছি, একি চেহারা করে দিয়েছে রে! এর চেয়ে আমার বিষের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল রে! ছুটে আসে ওয়ার্ডরেরা। তাকে ধরবে বলে। রাধিয়া চমকে ওঠে—

'কি দোশ করলাম?' দণ্ডনীয় অপরাধ—'তুমি আসামীকে বিষ খাইয়ে খুন করতে এসেছিলে।' চিৎকারে, কান্নায় ভেঙে পড়ে রাধিয়া। বেজে ওঠে শেষে উদ্ধত প্রতিবাদে, 'তাতে তোদের কী রে মুখপোড়া? আমার স্বামীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম রে মুখপোড়া।'

অনিবার্য এক প্রশ্নে এসে থমকে দাঁড়ায় গল্প। চরমতম শাস্তি হিসাবে ফাঁসি কি আদৌ সমর্থনযোগ্য? না-কি মৃত্যুদণ্ড হলে অন্য কোনো পদ্ধতিতে মৃত্যু? যেমন রাধিয়া বেছে নিয়েছিল শান্ত মৃত্যুর এক পথ। অথবা মৃত্যুদণ্ড কি আদৌ যৌক্তিক? যে ধনঞ্জয়ের কথায় আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল, তার ফাঁসির সূত্রে শহর কলকাতার পথে ঘাটে, ঘুরে ঘুরে, পত্রপত্রিকায়, ট্রামেবাসে বরাবার উঠে এসেছে এমনি নানা বিতর্ক। তারই মধ্যে ফাঁসি হয়েছে—আবারও হয়তো হবে—যতদিন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বজায় থাকবে চরমতম এই মৃত্যুদণ্ড। সেই চিরচেনা পুরোনো প্রসঙ্গ তবু উঠে আসে—কেন ফাঁসি হয়? চরম হিংসাত্মক কোনো কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ। আর কেমন সে সাজা?—চরমতম হিংসাত্মক। প্রশ্নটা এইখানেই—হিংসা দিয়ে কি হিংসা দমন করা যায়? শাস্তি কি কখনো প্রতিহিংসামূলক হওয়া সমীচীন? জাগতিক ন্যায়বিধান বলে, 'মা হিংসীঃ'। আর দণ্ডবিধি রায় দেয়, হিংসাত্মক মৃত্যুদণ্ডের সাপেক্ষে। ফাঁসি হয় গিরধারী কিংবা ধনঞ্জয়দের। সাম্প্রতিক ধনঞ্জয়ের ফাঁসিতে, বৃষ্টিভেজা মধ্যরাতে উপচে পড়ে ভিড়, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের আশেপাশে—ফাঁসির আঁচ পোয়াতে। সুচতুর বিজ্ঞাপনের খেলা চলে কাগজের পাতায়, চ্যানেলে চ্যানেলে—এমনকি যাত্রাপাড়ায়। কবেকার পুরোনো সেই কথায় মরচে জমে—'মা হিংসীঃ'।

গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলি তখন বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। জেলের রসুইঘরে রান্না করতে করতে তার কথাই আলোচনা করছিল সিপাইরা। একজনের অভিমত, গিরধারী বড় শক্ত খুনী। এহেন গিরধারীদের ফাঁসি হওয়াই উচিত। দ্বিতীয়জনের যুক্তি, ফাঁসিতে কোনো লাভ হয় না। তৃতীয়জনের কণ্ঠ স্পষ্টতর, 'সব খুনীর যদি ফাঁসি হত, তবে নাহয় বলা যেত যে, একটা নিয়ম আছে।' কিন্তু ক'জন খুনী ধরা পড়ে? 'যারা খুন করে ধরা পড়ে, তাদেরই শুধু ফাঁসি হয়।' আবার ধরাও পড়ে সাদামাটা খুনীরা। অমোঘ সুরে বাজে চতুর্থ সিপাইয়ের কণ্ঠ, 'ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই—ফাঁসি হয় না?' মেলেনা উত্তর।

অতএব সব হত্যাকারীর একই সাজা নয়। একজনকে মারলেও কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ড—আর খাদ্যে বিষক্রিয়ায় হাজার মানুষের প্রাণ বিপন্ন করেও শাস্তির বদলে বৃহত্তর নতুন ব্যবসার লাইসেন্সপ্রাপ্তিও ঘটে। ভারতীয় দণ্ডবিধি যাই বলুক, মোটকথা আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, এক আইন কিংবা এক দণ্ডাদেশ সবার জন্য নয়। তাই এদেশে গিরধারীদের ফাঁসি হয় আর আরো ভয়ঙ্কর অপরাধীরা কখনো কখনো সম্মানিত হয়। শেষকথায়, হিংসা দিয়ে দমনের সেই মর্মান্তিক প্রক্রিয়ায় মনে হয়—মানবতা বড় বিষাদে আছে।

গোত্রান্তর : শ্রেণীচ্যুতি-স্ববিচ্যুতির সমীক্ষণ

শ্রাবণী রায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার করাল দাঁতে ছিঁড়ছে স্বস্থ জীবনমোহের সমস্ত স্বপ্ন-জড়িমা, ভাঙছে মধ্যবিত্তের চিরচেনা মূল্যবোধ। খসে পড়ছে তার রঙীন আস্তরণ। নিজের নগ্ন স্বার্থসর্বস্ব রূপের সামনে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার মনুষ্যত্ব। ১৯৪৪ সাল, সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ফসিল' প্রকাশিত হল। সেখানে নতুন পুরোনো মিশিয়ে নয়টি আধুনিক ছোটগল্প ঠাঁই পেলো। 'ফসিল' 'গোত্রান্তর' এবং 'সুন্দরম্'-এ বিশেষভাবে মধ্যবিত্তের মুখোশ ছেঁড়া কদর্য রূপের নগ্নতা প্রকাশিত হল। 'ফসিল' গল্পে তবু আদর্শবাদী মুখার্জীর চাপা অনুশোচনায় কোথাও সহানুভূতির পরশ ছিল, মধ্যবিত্তকে তার স্বরূপে উন্মোচিত করলেও তখনও সুবোধ ঘোষ সমাজব্যবস্থার নাগপাশে কোথাও তাঁর অসহায় বন্ধন যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করছিলেন কিন্তু 'গোত্রান্তর' গল্পে তিনি অনেক নির্মম। মধ্যবিত্ত জীবনের ফাঁক আর ফাঁকির কাহিনী লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় অদ্বিতীয় তবু সুবোধ ঘোষ যেমন মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণার সঙ্গে সার্বিক পরাজয়ের চূড়ান্ত হতাশা/ব্যঞ্জক ছবি আঁকেন, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর গল্পকারদের মধ্যে তাঁকে পৃথক পরিচিতি দেয়।

'মকতপুর', একটি আপাত রোমান্টিক এবং প্রায় অচেনা নাম। বাংলা দেশের যে কোন অঞ্চল হতে পারে। আবার বাংলা দেশের বাইরেব কোন গ্রাম বা মফস্বল শহর হওয়াও সম্ভব। তবু হয়তো গ্রাম নয় বরং মফস্বল শহরই, কারণ ক্রমশ সঞ্জয় এবং তার পরিপার্শ্বের হিসেবী চরিত্রসহ আবির্ভাব নগরায়ণের প্রভাব ক্লান্ত, দাবিদ্র্যদীর্ণ মফস্বলকেই ইঙ্গিত করে। সঞ্জয়ের বাড়ির বর্ণনায় যেখানে 'খোলার চালের পুরোনো বাঁশের ঠাট থেকে ঘুণের ধুলো ঝরে পড়ে' স্পষ্ট হয় বিশীর্ণ অতীত আব হতশ্রী বর্তমান। এই ঠাট শুধু কাঠামো না কি আভিজাত্য। যেমন ঘুন ধরেছে শুধু বাঁশে নয়, প্রত্যেকের মনে, সম্পর্কেও। কারণটা হয়তো নেহাৎই আর্থিক নয়। তাই বাড়ির বাসিন্দাদের প্রসঙ্গে 'একপাল' শব্দটি প্রযুক্ত হয়—এবং সন্তান সন্ততিরাও পরিচিত হয় 'বাচ্চাকাচ্চা' রূপে যারা 'শুধু ছেঁড়া কাঁথা আর নোংরা লেপ তোষকের জঞ্জাল' এর মাধ্যমেই নিজেদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখে। মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কই এখানে প্রশ্নের সম্মুখীন। সম্ভবত ঘুণ ধরেছে ভালো থাকার ইচ্ছেতে, ভালোরাখার অভীপ্সায়। তাই 'সুইট হোম'-এর বর্ণনা এমন দাঁড়ায়। আসলে এ বর্ণনা সঞ্জয়ের মনে প্রতিভাত ছবির, সুবোধ ঘোষ এখানে অনুলেখকমাত্র।

পরবর্তী পরিচ্ছেদেই সংসারের দারিদ্র্যের নির্মম ছবি আঁকা হয়। সেখানে ব্যয়বাহুল্য ছেঁটে ফেলার নামে যেন মধ্যবিত্তের সামান্য সম্ভ্রমটুকুও মুছে যায়, স্পষ্ট হয় সংসারের 'নেই নেই করা' বিশাল 'হাঁ' মুখ। সঞ্জয়ের বেকারত্ব এই সংসারের অভিশাপ। তার সঙ্গেই আবার যুক্তহয় বৈকালিক পরিবেশের হাল্কা Romanticism। তাহলে কোথাও সঞ্জয়ের মনে এখনও মাধুর্যের রেশটুকু রয়ে গেছে। সমস্ত সুর ঝরে যাওয়া জীবন থেকে বেঁচে থাকার আস্বাদ

একটু একটু করে কুড়িয়ে নিতে নিতে সঞ্জয়ের অতীত চারণা আঁকেন লেখক। ফুটে ওঠে মধ্যবিত্ত জীবনের সবচেয়ে বড় পরিহাস। সন্তানের কৃতিত্বে মুগ্ধ হওয়া যে আসলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আড়ালে নিজেদের আর্থিক সুরক্ষা খোঁজা, সেখানে ব্যর্থতা মুছিয়ে দেয় তাই ভালোবাসার শেষ স্পর্শটুকু তা স্পষ্ট হয়। তবু সঞ্জয়ের যে সর্ববিদ্যা পারঙ্গম 'মূর্তি' আঁকেন সুবোধ ঘোষ তা বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এত গুণ যার তার চরিত্রে পরবর্তীকালে এত মালিন্য মাখানো কেন? গুণ বেশী বলেই কি হতাশা বেশি আর যন্ত্রণা আরো তীব্র বলেই পদস্খলন এত চূড়ান্ত অনায়াস! তবুও কোথাও যেন আতিশয্য প্রায় অবাস্তবতার ধার ঘেঁষে যায়।

সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সঞ্জয়, এ অশ্রদ্ধা শুধু নিজের ঘরদুয়ার, দাদা, মা, ভাইবোন প্রসঙ্গে নয়, রোমান্সের ছোঁয়ালাগা একটুকরো সম্পর্কটির ক্ষেত্রেও। সঞ্জয়ের শেষ পরাভব সুমিত্রার অনাস্থায়। সে বোঝে সমস্ত সম্পর্ক স্বার্থের কঠোর নিগড়ে বাঁধা। মধ্যবিত্তের সমস্ত জীবনচর্যাটাই যে আর্থিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপটুকুর সন্ধান, গল্পটিতে বারবার তা ব্যাখ্যাত। তাই সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করা আসলে প্রচলিত জীবনযাপনের ধারা থেকেই নিজেকে মুক্ত করা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় আধুনিক অর্থনীতির ছাত্র সঞ্জয় Capitalism এর মূল কথা যে ভোগবাদ, এমন কি মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিও যে একজাতীয় পণ্য তা তার অধীত বিদ্যার সূত্র ধরেই জানে এবং সংসারের দেনাপাওনার হিসেবটা তার মুখস্থ পড়ার সঙ্গে অভিজ্ঞতার নির্যাস মিশিয়ে ঠিকঠাক মিলিয়ে নিতে পারে। আবার "Money makes the bourgeois world go round and this means that selfishness is the thing on which bourgeois society turns, for money is a dominating relation to an owned thing." —Studies in dying Culture গ্রন্থে ক্রিস্টোফার কডওয়েলের বক্তব্যে সঞ্জয়ের ভাবনার যাথার্থ্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু "থাক, সবচেয়ে বড় ভুলটাও ভেঙ্গে গেল।"-এই হতাশা কি কোথাও জমে থাকা ক্ষীণ আশার সূচক নয়! সঞ্জয় নিজের কাছে বড় সোচ্চারে গোত্রান্তর চাইলেও 'ভণ্ডবাস, ভদ্র সংসারের ছলনা' থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও আসলে কোথাও রয়ে গেছে মধ্যবিত্তের চিরন্তন ঘরে ফেরার টানটুকু। নাড়ীর একটা গ্রন্থি আলগা হলেও সূক্ষ্ম জোড়টা ছেঁড়ে নি। তবে এই বিরক্তি, হতাশা সবই তার ব্যক্তিগত এবং নিজের সংসারে দাম না পেয়ে অভিমানে ব্যর্থ পৌরুষ নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা। এ মানুষ কখনো সেই অর্থে শ্রেণীচ্যুত করতে পারে না নিজেকে। শ্রেণীচ্যুতির মত মহৎ ভাবনার পেছনে কোন আদর্শগত টান থাকা জরুরী। সঞ্জয়ের অভীপ্সার উৎস তার ব্যক্তিক পরাজয়। তাকে সমস্ত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি ভাবাটা তাই হয়ত কিছুটা বাড়াবাড়ি।

ত্রিশ টাকা মাইনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ খুঁজে পাওয়া সঞ্জয় কিন্তু রতনলাল সুগার মিলে এসে প্রথমে অভিভাবকদের শেখানো উন্নতির রাস্তাটাই নিজের অগোচরে খুঁজেছিল তারপর ক্যাশ মুন্সী হবার আক্ষেপে অর্থনীতির কৃতী ছাত্রটিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে সে। নিজের পুরানো সত্তাকে বিলোপ করার এই আত্যন্তিক প্রয়াসকে দুটি দিক থেকে বিচার করা যায়। এক, পরাজিত মানুষটির আত্মবিলোপী প্রতিশোধস্পৃহা—নিজেকে নয়, নিজের শ্রেণীসত্তাকে

অবলুপ্ত করে নিজের শ্রেণীর বিপ্রতীপে দাড়িয়ে তাকে অস্বীকারের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ; দুই, নিজের সত্তার সঙ্গে নিজেকেও হারানো। সঞ্জয় কি চার বছরের বেকারত্বজর্জর জীবনে চূড়ান্ত হতাশায় নিজের অস্তিত্বটাই ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল না। এক অন্তহীন একঘেয়েমি কি ক্রমশঃ তাকে নিজের থেকেই দূরে নিয়ে ফেলে তার অনুভূতির বোধটাকেই ভোঁতা করে ফেলছিল না? এই বিবিক্ত অসহায়তা থেকেই কি সঞ্জয় রুক্মিণীর হাত ধরে নি বা নেমিয়ারের ফাঁদে পা দেয়নি। 'গোত্রান্তর' যখন লেখা হচ্ছে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে মঁসিয়ে আলবের কাম্যুর 'Outsider' তখন লিখিত, কিন্তু ভারতবর্ষে পঠিত নয়। এমন কি জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিবাদী দর্শনের কোন প্রভাবও তখন বাংলা সাহিত্যে আসা সম্ভব ছিল না। যার জন্য আমাদের সমরেশ বসু বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্য প্রকারান্তরে 'বিবর' অথবা 'ঘুণপোকা'র জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবু বলা যায়, 'গোত্রান্তর' এদের অগ্রজ হতে পারত। সঞ্জয়ের মধ্যেও ছিল এক চূড়ান্ত নির্লিপ্তি। অতীত বা ভবিষ্যৎকে মুছে ফেলে বর্তমানকে নিশ্চিতভাবে গ্রহণের প্রবণতা। অনুভূতির রামধনু না খুঁজে কোন গাঢ়তর উপলব্ধির নিবিড়তম প্রকোষ্ঠে ঠাঁই না নিয়ে নেহাৎই তাৎক্ষণিকতার আলোয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটিকে যথানিয়মে গ্রহণ, প্রচলিত সমাজ সংস্কারকে অস্বীকার, ঐতিহ্যকে বর্জনের আগ্রহ। তাই বিনা আসক্তিতেই সে রুক্মিণীর শরীরে সুখ খোঁজে, চরম নিরাসক্তি নিয়েই নেমিয়ারের বন্ধুত্ব স্বীকার করে। ঠিক এমনি খেলার নেশায়ই কি সে নেমে পড়ে না শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রামের বৃত্তে। কি আকস্মিকতার ছোয়া এই প্রসঙ্গ বর্ণনায়—"কর্মচারী আর মজুরেরা যে যার ঘরের পথ ধরলো, শুধু সঞ্জয় চললো অন্যদিকে।" কেমন করে বনে গেল সে এই অশিক্ষিত হতদরিদ্র মানুষগুলির দিশারী? তার ভাষাও তো কেমন আত্মগত।—"এর প্রতিশোধ নিতে হবে।" এই প্রতিশোধ কার বিরুদ্ধে? সমস্ত সমাজব্যবস্থা, পরিপার্শ্ব এবং সাজানো বিশ্বসংসারের সমস্ত সুস্থতার বিরুদ্ধেই নয় কি? আসলে এই প্রতিশোধ বড় বেশী ব্যক্তিগত অথচ কৃষক শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে যে বিপ্লবের আগুন ছিল তার শুদ্ধতা সমষ্টি চেতনা থেকে উদ্ভূত। তাই সঞ্জয়ের মত একজন সাধারণ মানুষ বিপরীত শ্রেণী ও সমাজের অংশ হয়েও এবং কোনপ্রকার বিপ্লবীচেতনায় সেই অর্থে দীক্ষিত না হলেও কেমন করে এই শ্রমজীবী মানুষগুলির নেতা বনে যায়, এ ব্যাপারে পাঠকের বিস্ময় কাটে না। শুধুমাত্র হাড়িয়া খেলে এবং তাদের নারী (রুক্মিণী)র আসঙ্গপিয়াসী হলেই কি এই মানুষগুলির আস্থা অর্জন করা যায়। যেখানে নেমিয়ার বা তার বোন রুক্মিণী নিজেরাই একপ্রকার শ্রেণীহারা হলেও তাদের জীবনযাপন কোন যৌথ সংস্কৃতির সুস্থতার পরিপন্থী, এমন কি নেমিয়ারের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি টুকু ছাড়া এমন কিছুই নেই যা তাকে কোনভাবে শ্রমজীবী আন্দোলনের কোন প্রথম সারির নেতা বলে চিহ্নিত করতে পারে।

আসলে গল্পটা যখনই মালিক-শ্রমিক বা কৃষক এই জাতীয় সংঘাতের মধ্যে এসে ঢোকে তখনই লেখক কোথাও উদ্দেশ্য সচেতন হয়ে পড়েন। মধ্যবিত্ত সঞ্জয় শ্রেণীচ্যুত হতে চেয়েছিল পাবিবারিক স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ পরিবেশের স্পর্শে কিন্তু নিজের ভেতর থেকে শিক্ষা এবং আভিজ্যাতের মোড়কটা ছুঁড়ে ফেলেছে ভাবলেও নিজের শোনিতবাহিত সংস্কার থেকে মুক্তি

পাওয়া অত সহজ ছিল না। তাই শ্রেণীহীন এক ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে আবদ্ধ সঞ্জয় যথানিয়মে অন্যতর শ্রেণীর মানুষগুলির সঙ্গ পরিত্যাগ করে নিজের স্বার্থ বাঁচায়, শ্রেণীচ্যুতি তো কখনো কোনভাবেই তার হয়নি। অথচ যে সঞ্জয় প্রেমহীন যান্ত্রিকতায় রুক্মিণীকে ব্যবহার করে, যাকে ব্যবহার করে নেমিয়ারও সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে চেয়েছিল তাকে বিশ্বাস করে অতগুলো মানুষ অতবড় ভুল করলো কেন? না কি সুবোধ ঘোষ এই শ্রমজীবী মানুষগুলোকে অশিক্ষিত, রাজনীতিজ্ঞানহীন, গরীব বেচারিমাত্র ভেবেছেন? তাদের সংগ্রামীচেতনা চালিত স্বাভাবিক বোধের প্রতি এই অশ্রদ্ধা লেখকের একরকম অজ্ঞানতার পরিচয়। যে নিষ্ঠায় সঞ্জয়ের ব্যক্তিজীবন আঁকা হয়, চারিত্র্য নির্মিত হয়, পরিপার্শ্ব প্রস্তুত হয় তার যন্ত্রণার, আত্মাবিলুপ্তির; তার কণামাত্র নিষ্ঠা থাকে না তার স্খলন অঙ্কনের ক্ষেত্রে। এও লেখকের একরকম পরাজয় বই কি। সুবোধ ঘোষ বোঝাতে চেয়েছেন সঞ্জয় চেয়েছিল উন্নতি, তাই কৃষক শ্রমিকদের নিয়ে তার ফৌজ গড়েছিল, যেখানে কুচকাওয়াজ থাকবে, লড়াইয়ের ভূমিকা হবে জোরালো কিন্তু আসলে তা নিশানা অনুশীলনের ফাঁকা আওয়াজ। তাই যথাসময়ে মধ্যস্থতা করে সমস্যা মিটিয়ে সঞ্জয় উভয়পক্ষেরই মুশকিল আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু জীবনের হিসেব সবসময় মেলে না, তাই মালিক পক্ষ থাকে নিশ্চুপ, আর কৃষকরা প্রতিবাদকে গণপ্রতিরোধে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে বিধ্বংসী বিপ্লবে পরিণত করে। সঞ্জয় পড়ে বিপাকে, "একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারে নি।" তার মধ্যবিত্ত নাড়ী ছেড়ে যায় আর কি! পরিস্থিতির এই ছবি বিশ্বাস্য হলেও বিপ্লবী চরিত্রে নেমিয়ারকে যতটা অস্বস্তিকর লাগে, তার মুখে 'কমরেড দাদা' সম্বোধন ততোধিক অন্যায্য মনে হয়। এই স্বেচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগ কি আরও বড় দুরভিসন্ধিমূলক! মধ্যবিত্ত মানসকে বহুবার চাবুক মারলেও সুবোধ ঘোষ আজীবন মার্কসবাদের উল্টো পাঠই নিয়েছেন; এ কথাও স্মর্তব্য রুক্মিণীর সন্তানের জন্ম এবং সঞ্জয়ের চরম বিশ্বাসঘাতকতা এব সূত্রে গাঁথলেন লেখক। যদিও রুক্মিণীর আসন্ন মাতৃত্বের সংবাদ এবং সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী আয়ুষ্কাল গল্পের হিসাবেও অতি সামান্য। তবু মনুষ্যত্বের চরম অপমৃত্যুর মাঝে নবজন্মের ইঙ্গিত কোথাও বোধহয় শুভ সূচক, যার নিশানা আগুনের আভায় লাল পূর্ব দিগন্তে। 'পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ' হচ্ছে যে চুরাশী পরগণা সেখানেই সঞ্জয়ের দায়িত্বহীন লোভ ও অনাচারের ফসল নতুন আলোর ইঙ্গিত আনছে। অথচ তার পরেও সঞ্জয়ের বর্ণনায় গৃহস্থের মুর্গী চুরি করে আনা শেয়ালের গোঁপের রক্ত চাটার ছবি আঁকা হয়। সেই অকল্যাণ আর অভিশাপকেই চিহ্নিত করা হয় সমাপ্তিতে মধ্যবিত্ত সঞ্জয়ের আত্মবিলাসী সত্তার মধ্যে দিয়ে। সঞ্জয়রা চিরকাল নিজেদের অস্তিত্বকে খুঁজতে গিয়ে হারিয়েছে জীবনের পরম প্রাপ্তিগুলোকে। অস্তিত্বের সঠিক সন্ধান ছিল মেহনতী মানুষের ঘামে আর রক্তে, কিন্তু সত্যধ্বংসী মধ্যবিত্ত চিরকাল ভুল পথে চলে জীবনের সংগ্রামগুলোকেও ভুল ঠিকানায় পাঠাতে চেয়েছে। ধনী এবং নির্ধন সমাজের বড় স্পষ্ট এই দুই শ্রেণীর মাঝে হাইফেন হয়ে থাকা মধ্যবিত্ত আজীবন তার 'গোত্র'কে সন্ধান করেছে এবং অনর্থক গোত্রান্তরিত হবার অভীপ্সায় স্বগোত্রের ক্ষতিসাধন করেছে, সেইসঙ্গে হারিয়েছে নিজের শুদ্ধ সত্তাটিকে।

'গোত্রান্তর' গল্পটি মূলত সঞ্জয়ের গল্প, একটি ব্যক্তিজীবনের ওঠাপড়ার গল্প। তবু এই গল্পেও স্বাভাবিক নিয়মে আছে একাধিক প্রধান অপ্রধান চরিত্র। সঞ্জয়ের বাড়ির প্রসঙ্গে টুকরো টুকরো বর্ণনায় ছোট দুটি একটি আধভাঙ্গা সংলাপে তার মা, বাবা, বড়দা, বৌদি এমন কি ছোট্ট ভাইঝিটিও বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যারা দারিদ্র্যের কশাঘাতে ভালোবাসা ও মমতা হারাতে বসা সাধারণ মানুষ, আবার প্রিয়জনের প্রায় চিরতরে ছেড়ে যাবার সংবাদে মনের গোপন কোণে এতদিনের হারিয়ে থাকা ভালোবাসার কণাগুলোর ছিটকে আসা আলোয় ক্ষণিক উদ্ভাসিত। সুমিত্রার লাজনম্র মুখটি পাঠকের চোখে মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেই হারিয়ে যায়, তাই তার বিবাহসংবাদ যেমন সঞ্জয়কে আলোড়িত করে না, তেমনি পাঠককেও সচকিত করতে ব্যর্থ হয়। তাই গল্পের শেষে তার পুনরুল্লেখ সঞ্জয়ের স্মৃতিতে তার পুনর্বার ক্ষণিক ভেসে ওঠা—না জাগায় আশার আলোকাভাস না সঞ্জয়ের ভীরু, মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী চেহারাটাতে যোগ করে নতুন কোন মাত্রা।

অন্যদিকে রতনলাল সুগার মিল এর মালিক রায়বাহাদুর, তাঁর মুনিবজী সূর্যবাবু, কৃষক মনিরাম সুখলাল এরা সবাই গল্পে গুরুত্ববহ ভাবে চিত্রিত। তবুও রায়বাহাদুর পরিচয়ে কোথাও যেন অরাতিদমন মহারাজার ছায়া; যা তাঁর পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং চরিত্রে কোথাও নেই, হয়ত থাকা সম্ভবও নয়। তিনি রতনলাল সুগার মিলের মালিক, ভাবতবর্ষে ধনতন্ত্রের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়কার একজন সাধারণ শিল্পপতি। তাঁর চরিত্রে আভিজাত্যের থেকে অনেক বেশী চোখে পড়ে লাভের কড়ি গোণা ব্যবসায়ী মানসিকতা। সামান্য মানুষটিকেও 'আপনি' সম্বোধন করেন আবার চুরাশী পরগণার কৃষকদের সরকারী রেটের থেকে অনেক কম দামে আখ বেচতে বাধ্য করতে চান। সর্বত্রই তাঁর কাজ গুছানো মানসিকতা, প্রয়োজনে কৃষকদের কাছে হাত জোড় করতেও দ্বিধাবোধ করেন না, আবার শঙ্কর পালোয়ানকে দিয়ে নেমিয়ারকে খতম করানোতেও তিনি সমান নির্দ্বিধ। কৃষক চরিত্রগুলি আপাতভাবে এক রঙা। তারা মূলত সমষ্টিগত পরিচয়ে প্রতিভাত। একটা বিরাট বিপ্লবের সামনে কমবেশী অসহায় হলেও তাদের চরিত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। এরই মধ্যে একটুকরো আগুন তাদের অগ্রনায়ক মুনিরাম। অথচ যে স্পর্ধায় সে সরকারী রেটের প্রসঙ্গ তোলে রায়বাহাদুরের সামনে এবং যে অহঙ্কৃত প্রতিবাদে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, "কাল সকালে ঘরের ছেলেমেয়ে সব পাঠিয়ে দেব। মেহেরবাণী করে গুলি চালিয়ে ওদের শেষ করে দেবেন।"—ক্রমশ তা যেন কেমন হারিয়ে যায়। পন্থানির্দেশের জন্য এমন মুনিরামেরও সঞ্জয়ের সাহায্য প্রয়োজন হয়। কারণ সুবোধ ঘোষ বিশ্বাস করেন, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার মস্তিষ্কের সাহায্য ছাড়া মেহনতী জনতার অগ্রগমনের পথ নেই। তবুও মুনিরামরা বোধহয় নিজেরাই নিজেদের নেতা হতে পারত। অভাবের মুখে সাময়িকভাবে হয়ত বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তারা, নয়তো সঞ্জয়কে এতটা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। যে ভুল সুবোধ ঘোষ প্রথম দিকেব গল্প 'ফসিল'-এ করেন নি। সেখানে দুলাল মাহাতো কুর্মি কুলিদের নিজের লোক এবং মুখার্জীকে কুর্মিরা চিরকাল রাজপ্রতিনিধি হিসাবেই দেখেছে। তবে সবথেকে বিস্ময়কর 'গোত্রান্তর' গল্পে সম্ভবত নেমিয়ার এবং তার চরিত্রের বাঁক নেওয়া। গল্পের প্রথম পর্যায়ে নেমিযাব

একটি ছন্নছাড়া মানুষ, যার পরিবার নেই, নেই কোনওরকম মূল্যবোধও। দারিদ্র্য তার স্ত্রী সন্তানকে ঠেলেছে আত্মহননের পথে আর তাকে নিয়ে গেছে আরো বিপুল ধ্বংসের কিনারায়। পরিবার হারা এই মানুষটির একমাত্র পরিজন বোন রুক্মিণী যাকে সে ব্যবহার করে হয়তো বারবার বাঁচার তাগিদে কিংবা নেহাৎই খেয়ালের বশে। সঞ্জয়ের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় কারণ এই একলা ভদ্রসন্তানটি তার কাছে একটি উপাদেয় আহার। প্রথম দিকে সঞ্জয় তাকে হতাশ করে, তার আত্মীয়তা পাতানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু নেমিয়ার জানে পুরুষের রক্তের দামালপনাকে, তাই ব্যবহৃত হয় সঞ্জয়ের পৌরুষ। রুক্মিণীর সান্নিধ্যের বিনিময়ে তাকে নেমিয়ারের বন্ধুত্ব স্বীকার করতে হয়। আশ্চর্য লাগে এই পোড়খাওয়া ভয়ঙ্কর নেমিয়ারও চুরাশী পরগণার বিদ্রোহে সঞ্জয়কে শুধু বিশ্বাস করোনা, নেতৃত্বে বরণ করে। সঞ্জয়ের শ্রেণীচ্যুতির মিথ্যা অভিনয় নেমিয়ারকেও প্রভাবিত করে। অবশ্য সর্বহারা নেমিয়ারের যন্ত্রণা তার মধ্যে ধিকিধিকি ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে রাখলেও তাকে কৃষকদের লড়াইয়ে এমন অসামান্য অস্ত্যর্থক ভূমিকা নিতে দেখে সঞ্জয়ের মত পাঠকেরও বিস্ময় জাগে। নেমিয়ারের বোন রুক্মিণী এই গল্পে এক চরম ব্যর্থতার নারীনাম। সঞ্জয়ের গোত্রান্তরের প্রশ্নে তার আগমন এবং সঞ্জয়ের জৈবিক ক্ষুধা প্রশমনের উপায়মাত্র হয়েই তার বিদায়। নেমিয়ার তাকে ব্যবহার করে আর সে শুধুই ব্যবহৃত হয়, কেন? গল্পে হয়ত তার ক্ষীণ উত্তর আছে। একবার সে সঞ্জয়ের কাছে বেশ কিছু থোক টাকা চেয়েছে কারণ তার আসন্ন মাতৃত্ব। কিন্তু সে সন্তানের জন্য কোন স্বীকৃতি চায়নি। বিবাহের স্বপ্ন সে নাই দেখতে পারে, কিন্তু যে লোক নেশার ঝোঁকে তাকে 'সরবতের গেলাস' বলে বুঝিয়ে দেয় এই সম্পর্কের ভিত্তি শুধু শরীরের তাৎক্ষণিক উল্লাস, তার সন্তানকে পৃথিবীতে আনে কেন রুক্মিণী? এও কি নেহাৎ Biological need না কি রুক্মিণী কোথাও সঞ্জয়কে নিজের আত্মায় পেতে চেয়েছিল? সে প্রতারিত হয়েছে প্রথমত এমন ভাবলে অবশ্য সমস্যাটা সহজেই মিটে যায় যদিও নেমিয়ার এবং রুক্মিণী কেউই এমন সহজে বিশ্লেষ্য চরিত্র নয়। এদের দুজনকে কোনভাবেই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি ভাবার কোন কারণ নেই অথচ এদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে সঞ্জয় বনে যায় চুরাশী পরগণার কৃষক সমাজের ভাগ্যদেবতা।

সঞ্জয় চরিত্রে গল্পকার সুবোধ ঘোষ একাধিক 'শেডস্ (Shades) 'ব্যবহার করেছেন। মকতপুরে যে সঞ্জয় ছাত্রজীবনে উজ্জ্বলতম, বেকার অবস্থায় সেই কেমন যেন অপরাধবোধে পীড়িত। আবার ধীরে ধীরে তার নির্লিপ্তির মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে জন্ম নেয় এক প্রতিবাদী ঘৃণা, যা তাকে ক্রমশঃ পরিবার এবং চেনা সমাজ পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। রতনগঞ্জে গিয়ে নিজেকে সে ভাসিয়ে দেয় তাৎক্ষণিক মোহান্ধতার আবর্তে, রুক্মিণীর সঙ্গে মনহীন আত্মাহীন শুধুমাত্র ক্ষণবাদী এক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় সঞ্জয়, তবু সে তখন চুরাশী পরগণার সাধারণ মানুষের হয়ে লড়াইয়ে নামে, তাদের মদত দেয় তখন কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় ধনবিজ্ঞানের ছাত্রটি মানবিক সমস্ত শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আজও তার মধ্যে বেঁচে আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার লোভ এবং ভীরুতা চরম বিশ্বাসঘাতকতার

রূপ নিয়ে জেগে ওঠে এবং পাঠক স্মরণ করেন সেই সঞ্জয়কে যার কাছে একদিন পরিবার সমাজ সমস্তই পরিত্যাজ্য মনে হয়েছিল। যে জীবনে শুধুমাত্র নিজেকে ভালোবেসেছে এবং সেই পরাজিত, বিরক্ত, বিচ্ছিষ্ট সঞ্জয় আত্মকেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত মুহূর্তে আজ যখন শ্রমজীবী মানুষদের অস্তিত্বের মূল্যে কিনে নেয় নিজের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা এবং পেশাগত উন্নতি, তখন এই হতাশাক্রান্ত সময়ের ফসল হিসাবে এই 'hollow man' টিকে চিনতে পাঠকের ভুল হয় না।

'গোত্রান্তর' গল্পে সুবোধ ঘোষ এর আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় অথচ তিক্তস্বাদ ভাষার সাহায্য নিয়ে চতুষ্পার্শ্বের মোহমরীচিকার বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন। একদিকে যেমন মকতপুরের প্রকৃতির বর্ণনায় হাল্কা রোমান্টিকতার মিঠে পরশ, অন্যদিকে সঞ্জয়ের বাড়ির পলেস্তারা খসা জীর্ণ দেয়ালের প্রসঙ্গে এবং বাড়ির সদস্যদের আচরণের ব্যাখ্যায় কটু বিদ্বেষের তীব্র সুর। "ঘি, চিনি, চা—সংসারের বুভুক্ষু জিভটার এক একটা অংশ বড়দা প্রতিমাসে ছুরির পোঁচ দিয়ে কাটছেন।"—বলার মধ্যে দিয়ে অর্থনীতির কোপে সম্পর্কের মৃত্যু নির্ধারিত হয়। এই পথ ধরেই সঞ্জয়ের ভাবনার দিগন্তগুলি ক্রমশঃ ধরা পড়ে। পাঠকও বিশ্বাস করতে থাকে, "প্রত্যেকটি আশীর্বাদ এক একটি পাওনার নোটিশ।" তবে সঞ্জয়ের চেতনার সূত্র ধরে চলতে গিয়ে লেখক নিজের অজান্তেই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলি মাড়িয়ে যান, যখন বোঝান সম্পর্কের গভীরে এক তুমুল শূন্যতা,—"একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস।" সঞ্জয়কে গোত্রান্তরিত করার বিপজ্জনক আয়োজনে লেখক ক্রমশ ছিঁড়তে থাকেন "গৃহকূটের সমস্ত রহস্য।" চাই চুরাশী পরগণায় যে সঞ্জয় রুক্মিণীর শরীরে আশ্রয় খোঁজে, তার জন্য শান্তি নয়; বরাদ্দ হয় ধ্বংস। হাড়িয়া খেয়ে নেশাক্রান্ত সঞ্জয়ের চোখের জলে তার অন্যতর পরাজয়ের ইতিহাস রচিত হয়। বাড়ির চিঠিকে 'কুচি কুচি করে ছেঁড়ে' যে সঞ্জয় সে এমন এক 'ক্ষ্যাপা বামুন' যে শুধু অক্ষম ক্রোধে উপবীতই ভস্ম করতে পারে, কিন্তু অন্তর থেকে ব্রাহ্মণত্বকে উপড়ে ফেলতে পারে না। তার মজ্জায় যে সংস্কার, তার অস্তিত্বের শিকড়ে যে পিছুটান তা তাকে নতুন পরিচয়ে বাঁচতে দেয় না। সময়ের আঁচড় লেগে চুরাশী পরগণার শিল্পকেন্দ্রিক জীবন তছনছ হতে থাকে, সমুদ্রপারের হাওয়া এপারের আখের ক্ষেতগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। জাভা চিনির প্রকোপে রতনলাল সুগার মিল সর্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়ায় এবং তার সঙ্গে চুরাশী পরগণার শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যও অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। বড় নিখুঁতভাবে ভারতীয় চিনি শিল্পের এই দুর্দিন আঁকেন সুবোধ ঘোষ। সঙ্গে থাকে হাল্কা ব্যঙ্গও। 'ইন্ডিয়ান চেম্বারে বিষাদ। মতিপুর, চম্পারণ আর কানপুর স্পেশাল বস্তাবন্দী হয়ে কাঁদছে আড়তে আড়তে।" পরমুহূর্তেই যখন চুরাশী পরগণার কৃষকদের সংগ্রামের কথা বলেন তাঁর ভাষা জোরালো এবং স্পষ্ট, সাংবাদিকের মত তীক্ষ্ণ বর্ণনাবহ। সেখানে আর কোন ইঙ্গিতময়তার উঁকি ঝুঁকি নেই। তাই কৃষকদের সঙ্গে সঞ্জয় এবং নেমিয়ারের বৈঠক সোজাসুজি বর্ণিত হয়। কিন্তু সঞ্জয়ের মানসিকতার ব্যাখ্যায় আবার ব্যঞ্জনাবহ ভাষার কারিকুরি। "—এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।" তবে সঞ্জয়কে লেখক বড বেশী ব্যাখ্যা করেন। বারবার তার প্রতিটি

পদক্ষেপ তিনি তাঁর মত করে অকারণ বর্ণনা করেন। প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয় সমস্ত আন্তরিক অভিসন্ধিসহ। ফলে পাঠককে যেন একটি বিশেষ পরিণামের দিকে নিরুপায়ভাবে চালিত হতে হয়। চুরাশী পরগণার আগুনজ্বলা মাঠ, গ্রামের মানুষের দুর্দশা নির্মমভাবে বর্ণনা করে লেখক নেমিয়ারের বিদ্রোহী সত্তাকে আঁকেন। কেন্নো নেমিয়ারকে দেখান ঋজু, কঠিন। পাশাপাশি সঞ্জয় হিসেবী জেলের মত ঝড় উঠতেই নীড় খোঁজে। নিজেই অজান্তেই লেখক সঞ্জয় চরিত্রে (বড় বেশী) পরস্পরবিরোধীতা বুনে দেন। একদিন যে ভেবেছিল "নিঃশেষে লোপ করতে হবে তার পুরাতন সত্তাকে ফেরারী আসামীর মত," —আজ গোত্রহীনতার চরম পরিচয় দেবার দিনেই 'দমকা শিহরে তার হাঁটু দুটো থর থর করে কাঁপে।' পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর দুজন কুপিত ডাইন ও ডাইনীর মতে মনে হয় বিদ্রোহী নেমিয়ার আর আসন্ন প্রসবা রুক্মিণীকে। আসলে লেখক চেয়েছিলেন মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণা, কাপুরুষতা এবং নীচতার 'ব্যালাড' গাইতে। তাই রায়বাহাদুর এবং মুনিবজীর সামনে বিশ্বাসঘাতক সঞ্জয়কে 'বিশীর্ণ রোগীর মত' বসিয়ে রেখেই তাঁর শান্তি নেই, তাবে গেরস্তের মুর্গী চোর রক্তলোলুপ শেয়ালের সঙ্গে এক স্রোতে তৃষ্ণা মেটাতে দিতেও তিনি দ্বিধাহীন। পাশাপাশি আখের খেতের আগুন যখন 'আকাশের বুকে লাল আভা'য় জ্বলে তখন পুড়ে পুড়ে শুধু চুরাশী পরগণাই নয়, সমস্ত সমাজপরিবেশও শুদ্ধ হোক এমন আকাঙ্ক্ষা লেখকের সঙ্গে পাঠকের বুকেও জেগে ওঠে।

পরশুরামের কুঠার : দুই মায়ের মর্মান্তিক পরিণতি

অপূর্ব দে

বহু আলোচিত এই গল্প এক দুধ মায়ের গত-যৌবন অবস্থার করুণ উপাখ্যান। যে নারী যৌবনে তার বক্ষ-সুধায় ভদ্র-পরিবারের শিশুদের সযত্নে লালিত করেছিল, সমাজের অনুশাসন কুঠারে তার জীবন ও যৌবনকে হত্যা করে তাকে পতিতালয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। তিলকের মা ধনিয়া। তিলকের বাবা কে? কেউ জানে না। আত্মীয় বলতে তার কেউ নেই, তার সমাজ নেই। সঙ্গী হিসাবে আছে একটি ছাগল। ছাগল ছাড়া আশি বছরের বৃদ্ধ বুড়ো প্রসাদী ডোমই হল ধনিয়ার একমাত্র পোষ্য। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় যার কেটেছে জেলের ভাত খেয়ে। ধনিয়া বহু-পরিচর্যাকারিণী ভর্তৃহীনা নারী। দু-তিন বছরের ব্যবধানে হাসপাতালে এক একটি সত্যকামের জন্ম দেয় সে। ফলে তার স্তন দুটি মাতৃদুগ্ধে ফুলে ফেঁপে থাকে। জীর্ণস্বাস্থ্য সমাজের এঁড়েলাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু স্তন্যদানে জীইয়ে রাখার জন্য তার ডাক পড়ে—ভদ্রঘরের আঁতুড় ও অন্তঃপুরে। বুকের অমৃতধারা খাইয়ে যাবার ঠিকে। দু'বেলার রেট মাসিক ছ'টাকা। দৈনিক একপো চালের সিধে আর ঠিকে শেষ হলে বিদায় নেবার দিন একটা নতুন শাড়ি এই তার জীবিকা, এই তার জীবনমূল্য।

একদিন সে মূল্য দেউলে হয়ে যায়। সাগর-পার থেকে আমদানি করা হরেক-রকম বিলিতি ফুডের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে হয় পরাজিত। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রসমাজে তার আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। দেখা করতে গেলে সে উপহার হিসাবে পায় দুর্ব্যবহাব। ভদ্রসমাজের নীতিচেতনা যেন টনটনে হয়ে দেখা দেয়। কলিয়ারি-শহর নয়াবাদেব ক্রমোন্নত নগর ব্যবস্থায় পৌরসভার দায়িত্ববোধ যায় বেড়ে। খাতায় নাম লিখিয়ে ধনিয়াকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় পতিতা-পল্লীতে। ভদ্রঘরের যেসব সন্তানদের নিজের স্তন্যধারায় সে একদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল, তাদেরই অসংযত আচরণের যৌন-কামনার শিকার হতে হয় তাকে। নিজেকে নিঃশেষ করে একদিন সে পরম মমতায় বুকের দুধে যাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখত তার কোলে, তারাই আজ তার বুকেব উপর উঠে দাপাদাপি করবে, তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। তার চল্লিশ বছরের আগুনে শুদ্ধ কবা জীবন যৌবন, তার সব খাদ পুড়ে শেষ হয়ে গেল। শুরু হল তার জীবনের এক নতুন অধ্যায়, তার নতুন বাবু হয়ত ধনিয়া নাম পাল্টে রাখবে নতুন নাম। দুধ মায়ের দায়িত্ব আর তাই নেই, তার মাতৃত্বের মৃত্যু ঘটেছে। সে এখন নতুন বাবুদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির রসদমাত্র।

অথচ ধনিয়া দেহ-মনে ছিল একজন মা। তাই পথে অনাথ শিশুদের শোভাযাত্রা দেখে তার মন ভারী হয়ে উঠত। নিজের অনামিক সন্তানের কল্পনায়, প্রিয়সঙ্গসুখের চরমক্ষণে উৎসারিত সজলাসারের মত এক পুলকের বন্যা তার সমস্ত শরীরে উপচে উঠত। উৎসারিত মাতৃধারায় বুকের কাঁচুলি যেত ভিজে। অথচ নিজের জঠরজাত সন্তানের প্রতিপালনেব দায়িত্ব নিতে সে প্রস্তুত নয়। কারণ তার অসামাজিক জীবন সম্বন্ধে সে সচেতন। সন্তান বড় হয়ে তার দুশমন হবে, তা সে সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া তার ঘরে মানুষ হওয়া

মানেই তো ভিখিরির সংখ্যা বাড়ানো। তা সে মনে প্রাণে চায় না। লেডী ডাক্তারের "ভিখিরি মেয়েগুলোও ছেলে ছেড়ে দেয় না'—এই যুক্তি সে সদম্ভে নস্যাৎ করে এ ভাষায়—"ওরা ছেলেকে মানুষ করে না বহিন, ওরা ছেলেকে ভিখিরি করে। আমি তা পারবো না।" সে চায় তার সন্তানেরা নার্সারীতে প্রতিপালিত হয়ে মানুষ হোক। আর বিশেষ পরিচয়ের কলঙ্ক মুক্ত হয়ে নির্বিশেষ অপরিচয়ে হোক শুধু মানবসন্তান। এ চাওয়া তো সত্যিকারের একজন মায়ের অন্তরের চাওয়া। তাই সে বাজারের লাইনে বসতে চায় নি, পতিতা হিসাবে সরকারী খাতায় নাম লেখাতেও চায় নি। তারজন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। ঘটিবাটি বেচে টাউন পুলিশকে ত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়েও সে তার মাতৃত্ব রক্ষা করতে পারেনি। তার মাতৃত্বের শেষ সুধা মরণাপন্ন অথর্ব প্রসাদী ডোমকে পান করিয়ে ক্ষুব্ধ অভিমানে ধনিয়া কেঁদে বলছে :—

"—হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী!

—ছি, ছি, এ কি বলছিস।

—হাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

—আরে না, তুই তো লছমী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

—কোনো গাইয়ের স্বামী নেই, তারা কি লছমী নয়?

—তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই।"

সমাজবদ্ধ মানুষের হাতে মানুষের পশুর চেয়েও বেশি অসম্মান যতটা মর্মান্তিক, তার থেকেও বেশি অমানুষিক। স্তনদায়িনী এক নারীর দেহপসারিণীতে পরিণত হবার এক নির্মম চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

ব্যাপক ও বহুল বিস্তীর্ণ জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি যে শ্রেণীর মানুষ যখন যেমন দেখেছেন, তাদেরই তুলে এনেছেন গল্পের চরিত্র হিসাবে। রাজনীতি ও সমাজচেতনাকে তিনি এমন বলিষ্ঠ ও নগ্ন-ভাবে তাঁর গল্পে ধরেন, নানাস্তরের মানুষের জীবনসংগ্রাম তাঁর আন্তরিক প্রক্ষেপে তাঁর গল্পের টেকনিককে কখনও কখনও গৌণ করে দেয়। সমাজের নিচুতলার মানুষদের জীবন ও জীবিকার ভয়ঙ্কর সমস্যা, শোষণ বঞ্চনা, পরাজয়ের অন্ধকার ও দুর্মর প্রাণশক্তির আলো, সুখদুঃখ হাসিকান্নাকে তিনি পর্যবেক্ষণ কবেছেন বাস্তব জীবননিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির আলোকে। ধনিয়াদের জীবনকে নিছক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন নি, তাদের জীবনক্ষুধা, দুঃখ যন্ত্রণার আগুনের আলোয় মানবিক সত্যের অন্বেষণ করেছেন। অন্ততঃ 'সুন্দরম্' 'পরশুবামের কুঠার', 'তিন অধ্যায়' ইত্যাদি গল্পে এই সত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত।

গল্পকার হিসাবে সুবোধ ঘোষের সাফল্যেব মূলে বয়েছে তাঁর অসাধারণ জীবনবোধের সঙ্গে অনন্য সাধারণ ভাষাশিল্পের সমন্বয়। শ্রদ্ধেয় সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর মত সুবোধ ঘোষকেও নূতন 'স্টাইল' বা গদ্যরীতির স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করা যেতে পারে।" 'পবশুরামের কুঠার' গল্পেরও অনন্য সম্পদ হল এর অসাধারণ ভাষাভঙ্গী। ধনিয়ার আত্মীয় নেই। সমাজ নেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু সন্ধ্যার পর নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে ওঠে, একটা সমাজের অধিবাসী হয়ে যায় সে।

পৃথিবীর আদিমতম অদ্ভুত লীলাখেলায় মেতে ওঠে সে। সেই সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পলেখক লেখেন—"শব্দ এখানে ফিসফিস, গান এখানে শুধু গুঞ্জন। সবই অস্পষ্ট। এখানে কাউকে আসতে দেখা যায় না, কেউ কখনও চলেও যায় না। রাউণ্ডের পুলিশ ছাড়া যেসব অদৃশ্য ছায়া-জীবনের পরিচয় আর কেউ জানে না। কিন্তু তা নিয়ে সোরগোল হয় না কখনও। রাত্রে যতবার ধনিয়ার দরজা খোলে, রাউণ্ডের পুলিশেরও ততবার আয়ের পথ খুলে যায়।" এখানে শ্লেষ ও বক্রোক্তির তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধিদীপ্ত সমাসোক্তির ব্যঞ্জনায় বর্ণনাভঙ্গী কাব্যমণ্ডিত ও গভীর ভাবদ্যোতক হয়ে উঠেছে।

চরিত্রায়ণ ছোটগল্পের ছোট পরিসরে একটি সমস্যা, যেহেতু উপন্যাসের মতো বিস্তৃত সুযোগ এখানে নেই। তবু কয়েকটি সামান্য রেখা, দু'একটি সংলাপ, কিছু চিত্রকল্প, আর অসামান্য ডিটেলের সাহায্যে লেখক ধনিয়া চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তার মানসিক যন্ত্রণা, জীবনবোধ, মাতৃত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা, জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি দিকগুলি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। এ গল্পে যৌন অনুষঙ্গ এসেছে বাস্তবের রূঢ়তাকে এবং জীবনবোধের দৃঢ়তাকে স্পষ্ট করে তুলতে। দেহ-বেসাতিনী ধনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক যখন বলেন-"....পাতলা রেশমী শাড়ির আড়ালে আঁকা দুটি সুপুষ্ট জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। ওপরে একজোড়া দুরন্ত সবুজ গ্রহ, কাঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মতো গতিহারা। সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে এক বিদ্‌ঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া।" তখন বোঝা যায়, স্থান-কালের মহিমায় এই বর্ণনা অসাধারণ নিরাসক্তিসহ জীবনসংগ্রামের অনিবার্য রিয়েলিটিকেই প্রকট করে। আনন্দের বিশেষণ হিসেবে 'বিদ্‌ঘুটে' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। এই একটি শব্দ ব্যবহারে লেখক ধনিয়ার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে মুহূর্তে মূর্ত করে তোলেন। গল্প শেষ হয় এভাবে—"সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত, শেষরাত্রি পর্যন্ত—যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।" এ ভাষার লিরিকাল সৌন্দর্য অথচ রূঢ় ভয়ঙ্করতা কোনটাকেই বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। লেখকের বাগ্‌বৈদগ্ধে এ গল্পের শিল্পরূপ এক নিটোল পূর্ণায়ত বৃত্ত রচনা করে অভিনব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়। 'পরশুরামের কুঠার' কে যদি সুবোধ ঘোষের প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্প হিসেবে ধরি, তাহলে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে, অসাধারণ জীবনবোধের সঙ্গে অসামান্য শিল্পবোধের সমন্বয়ই গল্পকার সুবোধ ঘোষের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

কাঞ্চনসংসর্গাৎ : কাঞ্চনের সংসর্গ—স্খলনের ইতিবৃত্ত

অয়ন্তিকা ঘোষ

কামিনী-কাঞ্চনে পুরুষমানুষের স্বভাব বিনষ্ট করে, একথা সর্বজনবিদিত। Individual বা ব্যক্তিচরিত্রের যাবতীয় অধঃপতনের কারণ এ দু'টি। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' মানুষের জীবনের অন্যতম passion হলেও মনে পড়ে যায় নির্ধন লোকটির হঠাৎ করে অগাধ ধনসম্পত্তি পেয়ে সুখের ঘুম হারানো এবং দুশ্চিন্তাময় জীবনের অবসান ঘটাতে পরের দিন সকালেই সেই ধন প্রত্যর্পণের চেনা গল্পটি। তবু, কাঞ্চনকৌলিন্যের কুৎসিত প্রভাব মানুষের জীবনকে ক্লেদাক্ত করে। অর্থশক্তি কিভাবে মানুষের মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে সে সম্পর্কে গ্যেটের ফাউস্ট থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন কার্লমার্ক্স। তৎকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মার্ক্স দেখিয়েছেন অর্থশক্তি সমাজ-পরিবেশে কিভাবে কলুষ ছড়ায়, গ্লানি ছড়ায়, মানুষে মানুষে লোভের সংঘাত সৃষ্টি করে বিচ্ছেদ ঘটায়। তিনি খুব সহজেই সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি করতে পেরেছিলেন—'Money is the alienated ability of mankind'। মানুষের জীবনে ঐশ্বর্যের সুখী ছবি যেমন আছে, তেমনি আছে ধনলোভের বিকারচিত্র-ও। সাহিত্যে ধনতান্ত্রিক সমাজের সেই বিকারচিত্র স্থান নিয়েছে সঙ্গত ভাবেই। সুবোধ ঘোষের 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ গল্পটি একই সঙ্গে ধনৈশ্বর্যের মহিমাগীতি এবং কদর্য ধনলোভের বিকারগীতি।

এ গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুজন, অটল বসু চৌধুরী ও কান্তিকুমার কেমনভাবে কাঞ্চনসংসর্গের প্রভাবে একজন উর্ধ্বগামী ও আরেকজন নিম্নগামী হয়েছে, তার কাহিনী লিখেছেন সুবোধ ঘোষ। অটলনাথ ধুতি আর কোটের বাঙালী পোশাকে প্রকান্ড একটা পাগড়ি ও একটা তালিমারা ছাতা নিয়ে প্রথম বয়সের দিনগুলি কাটিয়েছেন দু'পয়সা কমিশনে 'গিরিমিটিয়া কুলি রিক্রুট' করে। এর জন্যে মাসের দু-তিনটি দিন বাদে সবদিনই তাঁকে বাইরে থাকতে হত কোনো মান্‌ঝি বা মাহাতোর বাড়িতে খড়ের মাচানের ওপর শুয়ে, ছাতু খেয়েই তিনি কাটিয়ে দিতেন সেই দিনগুলো। আর গোঁসাই পাড়ায় চারটাকা ভাড়ার মেটে বাড়িতে স্ত্রী মণিমালা দুই কন্যা জনা ও প্রীতিকে নিয়ে সংসারের সব দায় একা সামলাতেন। ক্রমে দুই কন্যাও বড়ো হল। দেনা করে মণিমালাই তাদের বিয়ে দিলেন। সে দেনা শোধও করলেন মণিমালা। আর অটলনাথ বিয়েতে দুদিনের জন্য এসে সবাইকে দর্শন দিলেন শুধু। এই মণিমালা এক সপ্তাহের অসুখে ভুগে যখন মারা গেলেন, পাড়া-প্রতিবেশীরা তার আগে অটলনাথকে খুঁজে বার করে আনতে হয়রান হয়ে গেছেন। কিন্তু চিকিৎসার খরচ, ওষুধের ফর্দ, মেয়েদের কান্নাকাটি আর প্রতিবেশীদের সহানুভূতিসুলভ উপদেশ—কোনোকিছুই কৃপণ অটলনাথের টাকার থলিতে থাবা বসাতে পারলো না। মরে বাঁচলো মণিমালা। সেই মুহূর্তে অটলনাথের টাকার থলির রক্ষাকর্তা হল ভালোমানুষ কান্তিকুমার। দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে আর আট ঘন্টা হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে কলম পিষে তার রোজগার। বাবার বন্ধু অটলনাথের কাছে নিয়মিতভাবে সে পনের টাকা সম্মানী-ও পায়। অটলনাথের কাঞ্চনসাম্রাজ্যের কূটনৈতিক দূত সে। কিন্তু নিজে সেই সাম্রাজ্যের ভাগীদার হবার অসৎ স্বপ্ন কখনো দেখে

না। সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অটলনাথের 'মাস্টার' হিসেবে কান্তিকুমার পড়ে শোনায় জন স্টুয়ার্ট মিল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেক কিছুই। আর তার জন্য প্রতি মাসে কান্তিকুমারের প্রাপ্য, বাঁধাদক্ষিণা কুড়িটাকা। মৃতা মণিমালার দুঃখিনী সংসারের ছবিটা ক্রমাগত বদলে যায়। সাধারণ মরকত-কুঞ্জ 'একদিন অসাধারণ বাদশাহী মহল' থেকে হয়ে যায় 'রাজাবাবুর বাড়ি'। 'ছাতুখেকো অটলনাথ' আজ 'রাজাবাবু'। কাঠুরিয়ার হীরে-মানিক কুড়িয়ে পাওয়ার গল্পকেও অতিক্রম করে যায় 'ছাতুখেকো' অটলের ফুলেফেঁপে ওঠার কাহিনী। দশটা জয়েন্টস্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্সির অধিকর্তা তিনি। এখানেই শেষ নয়। আরও সুযোগ ক্রমাগত আসছে। গালা, রেশম, অভ্র, চা আর টিম্বার রপ্তানী কারবারে তিনি এখন একচ্ছত্র অধিপতি। এক হাজার কুলি কেরানী ও কারিগরের অন্নবিধাতা অটলনাথ মানুষের কাছে 'উপ-ভগবান'। তবু তিনি সন্তুষ্ট নন। গোবক্ষা সমিতি থেকে আদিভারত প্রত্নমালা— সর্বত্র তিনি হয় সদস্য, নয় সচিব, কিম্বা প্রেসিডেন্ট বা পেট্রন। এখন তাঁর নয়া চাহিদা— জয়নগরের ডিস্টিলারীর ঠিকে নিয়ে বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকার ফায়দা তোলা। অবসন্নপ্রায় কান্তিকুমারকে নিজের উত্থানপর্বের 'ইন্ধন' জোগাতে প্রেরণা দেন অটলনাথ, নিজের জীবনী লেখার জন্য উৎসাহ দেন, স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর নামের পূর্বের বিশেষণটি বাণিজ্যবীর অটলনাথ লিখতে কোনোভাবেই ভুল হয় না যেন। কান্তিকুমার মেনে নেয়, মানিয়ে নেয়।

কান্তিকুমারের জীবনে রয়েছে জয়া, প্রতাপবাবুর মেয়ে জয়া। বলা ভাল, সাতাশ বছরের জয়ার-ই জীবনে রয়েছে কান্তিকুমার কেননা একদা প্রতিপত্তিশালী প্রতাপবাবুর সংসার এখন চলে কান্তিকুমারের রোজগারে। অবশ্য প্রতাপবাবুর মতে, পুরো টাকাটাই ধার দেয় কান্তিকুমার, ওটা একদিন তিনি শোধ-ও করে দেবেন। কিন্তু কান্তিকুমারের সঙ্গে কন্যা জয়ার বিয়ের কথা ভাবতেও পারেননা তিনি। এ প্রস্তাব তাঁর পক্ষে অপমানের সামিল। অথচ কাহিনীর শেষে এই প্রতাপবাবুই অটলনাথের রাঁচীর স্টোরের মুন্সী হতে চলল আব সংসারের যাবতীয় ঋণ, পাওনা, বকেয়া মিটিয়ে বিনিময়ে জয়াকে তুলে দিল অটলনাথের হাতে। জয়ার ভাগ্যে অবশ্য বৈধ বিয়ের 'তক্‌মা' জুটলোনা, জুটলো আশ্রিতা রক্ষিতার পদমর্যাদা। ধনশালী অটলনাথের কাছে পরাজিত হল শান্তিকামী কান্তিকুমার। কাঞ্চনকৌলীন্যের গর্বে উদ্ধত অটলনাথের কাছে পবাজিত হল তার কাঞ্চনস্ফীতির উৎস, কাঞ্চনহীন কান্তিকুমার। সুবাধ্য কান্তিকুমারের প্রতি অটলনাথের শেষ নির্দেশ—'বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয় মাস্টার, আর ভাল লাগে না। ওটা বদলে দাও। এবাব থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্যঋষি।'

সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী তার মধ্যে একটি হল ধনতান্ত্রিক সমাজে অবক্ষয়ের পটভূমিকায় আর্থিক সম্পর্ক এবং মানবিক মূল্যবোধজনিত অবনমনেব কাহিনীরচনা। বস্তুতই, 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ'* গল্পটি ধন এবং মানসিক মূল্যবোধের মধ্যেকার একজাতীয় পিচ্ছিল সরীসৃপ-সম্পর্কের কাহিনী। টাকাকড়ির আকর্ষণ কিভাবে অপ্রতিরোধ্য সম্মোহন সৃষ্টি ক'রে মানুষকে স্খলনের পিচ্ছিল পথে ক্রমাগত অধঃপতিত করে তার কাহিনী। লেখক দেখিয়েছেন ধনলোভ কি করে সর্বস্তরেব মানুষকে ঘৃণ্য অন্ধকাব পথে চালিত করে—অটলনাথ বসু চৌধুরী, কান্তিকুমার, জয়া, প্রতাপবাবু—সবাই কিভাবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে হীনতার নিম্নতম স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, তারই কাহিনী 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ'।

১. ক. চরিত্র হল, লেখকের অন্তর্লোকের আলোকিত উদ্ভাসন। এই আলোকচ্ছটা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হয়ে স্ফুরিত হয় পাঠকমনে। 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' চরিত্রপ্রধান অনুভববেদ্য এক গল্প। এখানে মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র অটলনাথ বসু চৌধুরী। সামাজিকভাবে তাঁর উত্থান কাহিনী পরোক্ষে চালিত করেছে, অপর তিনটি গৌণ চরিত্রের দিশা—(ক) কান্তিকুমার (খ) প্রতাপবাবু (গ) জয়া। রামগড়ের সাবেকী চেহারার অটলনাথ বাঙালীর মতই ধুতি আর কোট পরেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী নজর কাড়ে তাঁর মাথার বিশাল পাগড়িটি। বগলের তালিমারা ছাতাটি তাঁর কার্পণ্যের প্রথম ইঙ্গিত বহন করে। মাসে পঁচিশদিনই তিনি থাকেন বাড়ির বাইরে—কোনো জংলী পরগণার ডিহিতে অথবা কারও খড়ের মাচানে শুয়ে ছাতু খেয়েই কেটে যায় তাঁর দিন। এত কষ্টের কারণ একটাই—গিরিমিটিয়া কুলি রিক্রুট করে দু পয়সা কমিশনের লোভ। স্ত্রী মণিমালার সঙ্গ বর্জন করেছিলেন তিনি ঐ কমিশনের লোভেই। দুই কন্যা জনা ও প্রীতির ন্যূনতম খোঁজখবরও বাবা হিসেবে তিনি রাখতেন না। পিতৃত্বের সবরকম দায়ই অস্বীকার করেছিলেন অটলনাথ। মেয়েদের বিয়ে হবার পর একদিনের জন্যও স্ত্রী মণিমালার কোনো খোঁজ করেননি অর্থপিশাচ অটলনাথ। এমনকি নিজের সুলুকসন্ধানটুকুও রেখে যাননি পরিবারের কাছে। এ অবস্থায় রুগ্না মণিমালার আয়ু যখন শেষ হয়ে আসছে প্রায়; তখন প্রতিবেশীরা হন্যে হয়ে শিকারী কুকুরের মতো খুঁজেছেন ব্যস্তবাগীশ অটলনাথকে। কিন্তু "মণিমালা মরবেন, অটলনাথের ঘরের প্রদীপটি নিভে যাবে, এর মধ্যেও আজ বিচলিত হবার মত কোন আঘাত পায় না অটলনাথ।" দালালীর কমিশনে অটলনাথের যে থলিটি ভরে উঠেছে—তা স্ত্রীর রুগ্নতার মানবিক কারণ কিম্বা কন্যাদের অকাল রোদনেও উন্মুক্ত হল না। বরং সেই সঙ্কটে অটুট থলি তার নির্ভরযোগ্য স্থান পেল বন্ধুপুত্র কান্তিকুমারের কাছে। অটলনাথ আর্ত ক্রন্দনে ভরসা দিলেন কান্তিকুমারকে—"...এশহরে তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার গায়ের রক্ত-জল-করা এই সামান্য পুঁজি তোমার কাছেই থাকুক। ...আর কেউ টের না পায় যে এটা তোমার কাছে আছে।" স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য এক পয়সাও খরচ করলেন না অটলনাথ, তবু স্ত্রীর মৃত্যুতে খরচ করলেন প্রচুর চোখের জল। অনেক কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের পর অটলনাথ মুক্ত হলেন, আগে পিছুটান থাকতেও কোনো দায় ছিল না। এখন নির্ভার, নির্দায় অটলনাথ অর্থের নেশায় আরও লালসাগ্রস্ত হলেন। কিন্তু শুধু লোভ থাকলেই তো আর মানুষের উপার্জন বাড়েনা; তার জন্য চাই কর্মক্ষমতা, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, কূটকৌশল, সামান্য বিদ্যাশিক্ষা—আরও কত কি! তাই অটলনাথ নির্ভরশীল হলেন কান্তিকুমারের প্রতি—"এটা আমার বুড়ো বয়সের একটা শখ, একটা ব্যামো মাত্র, কান্তি, কারবার করবো। তুমি শুধু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একটু পথ দেখিয়ে দেবে, শুধু দুটো পরামর্শ, এক-আধটা পলিসি, একটুখানি প্যাঁচ, আর একটু...।" বশংবদ সুপুত্রের মতো কান্তিকুমার অটলনাথের উত্থানের সিঁড়ি তৈরি করল। নতুন সড়ক তৈরির কনট্রাক্ট পাবার জন্য হেড্-কেরানীকে সাতশো টাকার নোটের তাড়া ঘুষ দেওয়া হল। পথের কাঁটা গুপ্ত ব্রাদার্সের মেজ গুপ্তকে দু'বোতল হুইস্কি নিয়ে নয়াবাজারের গলিতে ঘর চেনানো হল—এসবই আদর্শহীন, অর্থমুগ্ধ অটলনাথের কারবারের অঙ্গমাত্র। এরজন্য কান্তিকুমারকে পুত্রস্নেহে অটলনাথ পনেরো টাকা সম্মানী দেয়। তা মজুরী নয়, আশীর্বাদ, পারিশ্রমিক নয়, উপহার মাত্র। এখন আরও ফুলে

ফেঁপে উঠেছে 'রাজাবাবু' অটলনাথ। 'ছাতুখেকো অটলনাথ'কে ভুলে গেছে লোকে। কনট্রাক্টর অটলনাথের ব্যবসার রমরমার কথা এখন সবাই জানে। দশটা জয়েন্ট স্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্সি তাঁর হাতে। গালা, রেশম, চা, অভ্র আর টিম্বার রপ্তানীতে বণিক হিসেবে চাঁদসদাগর তিনি। একহাজার কুলি কেরানী আর কারিগরের অন্নবিধাতা অটলনাথ আজকাল শিবাজী উৎসবে বক্তৃতায় বলেন—"বাণিজ্যে বসতে মুক্তি! দেশবাসীর কাছে আমার এই একমাত্র বাণী। মহারাজা শিবাজীর আদর্শকে যদি আজ সার্থক করতে চাই তবে বাণিজ্যের গেরুয়া ঝাণ্ডা আবার তুলে ধরতে হবে। জয়তু শিবাজী!" জনহিতৈষী নির্ভীক অটলনাথের ভাষণে আপ্লুত মানুষ করতালি দেয়। তারা জানেও না এ ভাষণের কারিগর অটলনাথের পরিবর্তে অন্য কেউ। অটলনাথের নিজের বিদ্যে কথামালা, কাকচরিত্র থেকে পঞ্জিকা পর্যন্ত। অথচ তাঁর প্রাসাদের প্রশস্ত কক্ষে লোক দেখানো মেহগনির সারি সারি আলমারিতে রয়েছে মরক্কো বাঁধাই কোটি কোটি বই। সেই মালঞ্চের মালাকার অটলনাথ, কিন্তু প্রকৃত ভ্রমর কান্তিকুমার! অটলনাথ সন্ধ্যের নিভৃতবেলায় কান্তিমাস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি বসে নিঃসঙ্কোচে শিক্ষাবিনিময় করেন। লাইব্রেরীর যেকোনো একটি বইয়ের যে কোনো পাতা থেকে শুরু হয় কান্তিকুমারের গ্রামোফোনের মতো গ্রন্থপাঠ। জন স্টুয়ার্ট মিল নারীকে পুরুষের সমান বলেছেন এ হেন উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে থাকায় মহা-আপত্তি অটলনাথের। কারণ নগদ-নারায়ণ না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সব বিদ্যা-বুদ্ধি-খ্যাতিই বৃথা বলে ধারণা বাণিজ্যপ্রিয় অটলনাথের। তখন নিজেকে বঙ্কিম অপেক্ষা সফল বিদ্যার জহুরী বলে মনে করে কি প্রচণ্ড আত্মতৃপ্ত এই অটলনাথ। আসলে অটলনাথের মতো মানুষগুলোর প্রবৃত্তিই এরকম। পয়সা থাকলে বাঘের দুধ কেনার মতো অহংবোধ ও পরিতৃপ্তিতে তারা এতটাই মশগুল থাকে যে ভুলে যায় অর্জিত বিদ্যার স্থান ক্রয়ক্ষমতার অনেক ওপরে। তবু বিদ্যা আর বুদ্ধিকে কিনতে এদের চেষ্টা বৃথা হয়না, মধ্যবিত্তের অভাববোধ আর যন্ত্রণাদগ্ধ মনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে এরা অচিরেই প্রভু হয়ে ওঠে বিদ্যা-বুদ্ধি-সমৃদ্ধ কান্তিকুমারদের। এই কান্তিকুমারদের পিঠে হাত বুলিয়ে এরা লিখিয়ে নেয় আত্মপ্রচারের ছলনাদর্পণ—'জীবনী।' কান্তিকুমাররা ক্লান্ত হয়, নুইয়ে পড়ে; তবু ফোঁস করে না। সমাজের তাবড় তাবড় সভা-সমিতিতে ডাক পায় অটলনাথরা। গোরক্ষা সমিতি থেকে শুরু করে আদি ভারত প্রত্নশালা পর্যন্ত সর্বত্র তাদের গতিবিধি। কোথাও সদস্য, কোথাও সচিব, কোথাও বা প্রেসিডেন্ট কিম্বা পেট্রন। অটলনাথ সত্যিই মুখোশধারী এক ছদ্মবেশী—তাঁর মনে এক আর মুখে আর এক। একাধারে তিনি সুরাপান নিবারণী সভার বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন আবার জয়নগরের মদের ভাঁটির ঠিকে নেবার জন্য চঞ্চল হন। 'বাণিজ্যবীর হবার জন্য অবাঙালী শিবাজীর নামে জয়ধ্বনি দেন আবার বাঙালীর কেনা মদের টাকার লাভ অবাঙালীর হাতে যাওয়া তাঁর না-পসন্দ্। স্কচ. হুইস্কি পেটে নিয়ে মেয়ে-স্কুলের বক্তৃতার লিখিত বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে উদগাব করেন অটলনাথ। সৌখীন অটলনাথ সোফায় গা এলিয়ে মশগুল চিত্তে বলতে পারেন অর্থের বিনিময়ে অভাবী নারীকে রক্ষিতা রাখার চমকপ্রদ ঘটনাটিও। কিন্তু সেই নারী যে তাঁরই মোসাহেব কান্তিকুমারের একদা প্রেমিকা জয়া। অজগরের মতো জটিল অটলনাথ ভাবলেশহীন, অকম্পিত দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ করে আরও অবশ করে তোলে কান্তিকুমারকে—'বাণিজ্যবীব

নামটা সুবিধের নয় মাস্টার, আর ভাল লাগে না। ওটা বদলে দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্যঋষি"—কি অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে নির্বাক করে তোলে এরা মুখর জগৎ! কি অসম্ভব যাদুমায়ায় এরা ভেঙে দেয় মানুষের প্রীতির মধুর সম্পর্ক! এতটাই লালসাবান; ধনী, কূটকৌশলী এই অটলনাথরা সমাজের উচ্চাসনে অটলভাবে আসীন হয়ে কাঞ্চনকৌলীন্যের গর্বে অঙ্গুলিহেলনে চালায় সমাজের প্রাণশক্তি। মূল্যবোধ মরে যায়, অনুভূতি মরে যায়, হারায় না অর্থসম্পদ, হারায়না অটলনাথ বসু চৌধুরীরা।

১. খ. কান্তিকুমার রয়েছে চাঁদের অপর পিঠে; যে দিকটা সূর্যের আলো পড়েনা, তাই চাঁদের কলঙ্ক-ও ধরা পড়েনা; সেই অন্যদিকে। সমগ্র গল্পের পেশীশক্তিকে টান টান রাখতে সহায়তা করেছে এই কান্তিকুমার—মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এক যুবক। এ গল্পে তার প্রথম পরিচয়—সে আস্থাভাজন, বিশ্বাসী। সারা রামগড়ে অন্য কোনো লোকের কাছে বিশ্বাস করে টাকা রাখতে অটলনাথের মন সায় দেয়নি। একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কান্তিকুমার ব্যতিক্রম। বুঝি তার শারীরিক ও চারিত্রিক কান্তিই এর একমাত্র কারণ। কিন্তু বুদ্ধির খেলায় সে আগেই হেরে বসে আছে অটলনাথ নামক 'প্রভু'-টির কাছে। তাঁর 'জীবনী' লিখবে কান্তিকুমার—এমন একটা স্নেহমিশ্রিত চাপ রয়েছে প্রভুর দিক থেকে। আর তার দিক থেকেও রয়েছে নীরব সমর্থনের ভঙ্গীটি। ধনবিলাসী প্রভুর কাছে যে কারণে বারবার হেরে যায় অভাবী মোসাহেবদের যাবতীয় কৌশল, সেভাবেই কান্তি হেরেছে। কিন্তু যে পরিবারটির কাছে সে প্রকৃত জয়ী তা প্রতাপবাবুর সংসার। তাঁর একমাত্র কন্যা জয়ার সঙ্গে কান্তির মধুর সম্পর্কের রটনা নিয়ে রামগড়ে গুঞ্জন ওঠে। কান্তিকুমার দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে আর আট ঘণ্টা হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে কলম পিষে যা রোজগার করে; এর সবটুকুই ব্যয় করে প্রতাপবাবুর সংসারের জন্য। তাদের পরিবারের জন্য কান্তির প্রবল সহানুভূতি। 'বর্ষার মেঘের মতই কান্তিকুমারের মনটা।' তাই সামান্য উপার্জনে যখন বাড়তি একটা সংসারের ভার জুগিয়ে উঠতে পারেনা; তখন অন্যের কাছে ধার-দেনা করেও প্রতাপবাবুর মন রাখে কান্তিকুমার। একদা সচ্ছল প্রতাপবাবুর আত্মমর্যাদাবোধ আহত হয় কান্তিকুমারের উপকারী মনোভাবে, সুপাত্র হিসেবেও তাকে বেছে নিতে অপারগ অকৃতজ্ঞ প্রতাপবাবু, জয়ার মুখে কান্তিকুমারকে জেনে নিতে হয় প্রতাপবাবু এ টাকা ধার নিচ্ছেন শুধুমাত্র। এর জন্য কোনো কৃতজ্ঞতার বন্ধনে বাঁধা পড়তে তিনি রাজী নন। কিন্তু জয়া সুখের ঘরের ছবি দেখে বাঁধা পড়তে চায় 'বড়লোক' কান্তির বাঁধনে। অটলের দশহাজার টাকা কান্তির কাছে আছে শুনে জয়ার সরল আকুতি 'ফেরত দিও না, কান্তিদা।' কিন্তু কান্তি সৎ, নিষ্ঠাবান। তার আত্মপ্রত্যয়ী প্রত্যুত্তর—'ছিঃ, একথা বলো না,' ধৈর্যশীল কান্তিকুমারের আস্থা রয়েছে মানুষের আবেগপ্রবণ হৃদয়ের প্রতি, 'ভালোবাসা' নামক সূক্ষ্ম অথচ সুন্দর অনুভূতিটির প্রতি। এর জোরেই সে পৃথিবীকে বদলানোর স্বপ্ন দেখে। জয়ার মতো আমাদেরও সিদ্ধান্ত 'বড়ো ভালোমানুষ' সে। এই ভালো মানুষটিকেও অনেকসময় সমাজের জটিলতার সঙ্গে আপোষ করতে হয়। অটলনাথের উদ্দেশে টেণ্ডার দাখিলের খেলায় প্যাঁচ মেরে অন্যকে হারিয়ে দিতে সে বর্তমানে পটুত্ব অর্জন করেছে। এমনকি অফিসের বড়বাবুকে ঘুষ দিয়ে হাত করায় এখন কান্তিকুমারের বেশ সুনাম। হুইস্কির বোতল আর গলির মোহময় ঘর চিনিয়ে মানুষকে বুঁদ করার অনায়াস দক্ষতা এখন তার আয়ত্তে। কিন্তু তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে

সকলেই একমত—সে সৎ, পরোপকারী, নির্ভীক, ভালো ছেলে। তবে কি চাকরীর দায়ে মুখ বুঝে সব সহ্য করা। কান্তিকুমারের মত—'চাকরি বললেও ক্ষতি কি? মাঝি ডাকাতকে খেয়া পার করে দেয়, তার কি দোষ? মাঝি শুধু খাটুনির মজুরি পায়, লুঠের ভাগ তো পায় না। তাই তো সে পাপের ভাগীও হয় না।' কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় সর্বংসহা এই কান্তিকুমার। তার যাবতীয় অপেক্ষা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা সবই জয়ার জন্য—"দেখছোনা, কত দুঃখ; দুর্নাম, পরিশ্রম সহ্য করে দিনের পর দিন শুধু তোমারই জন্য..." কান্তিকুমার পোশাকী পরিচয়ে অটলনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। দুজনে যখন একা থাকে; অন্তরঙ্গ সুরে অটল আপন করে নেয় কান্তিকুমারকে। 'কান্তিমাস্টার' সম্বোধনে আত্মশ্লাঘা বোধ ক'রে কান্তিকুমার আওড়ায় বিদ্যার বুলি আর বিদ্যার জহুরী হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে প্রভু অটলনাথ। মাস্টারির জন্য মাসিক কুড়ি টাকা আর কারবারী দৌত্যের জন্য মাসিক পনের টাকা দক্ষিণা পেয়ে হাত ময়লা করে কান্তিকুমার। কিন্তু জয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধনটা টিকিয়ে রাখার জন্য এই পারিশ্রমিকটা তার কাছে জীবন-মরণের সমান। তাই বশংবদ ভৃত্যের মতো সে বলে চলে—'আপনার কথার কোন ভুল নেই স্যার।' অচিরেই মেনে নেয় 'বঙ্কিম চাটুজ্যের' টাকা নেই বলে তার বিদ্যে বৃথা, বিদ্যে অর্জন করলে হয়না, ভগবান পাইয়ে দিলে হয়—জাতীয় অসিদ্ধ সংলাপ। মদের ভাঁটির ঠিকে নেওয়াটা যে অটলনাথের সাদা চরিত্রে কালো ছোপ ধরাব সামিল একথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেনা কান্তির সচেতন মন। কিন্তু জীবনে পালাবদল এল। কান্তিকুমারের সচেতনতা মাথা নোওয়ালো অভাববোধেব কাছে। জয়াব জ্বর হয়েছে, কান্তির কাছে অনেক টাকা ধার নিচ্ছেন প্রতাপবাবু। কিন্তু এখন টাকা শেষ। অপরের কাছে টাকা ধার করবার আর আশ্রয় নেই কান্তির। তবে কি উপকারের বাঁধন ছিঁড়বে এবাব! হ্যাঁ ছিঁড়লো। প্রতাপেব সংসারের যাবতীয় পাওয়া মিটিয়ে অটল হলেন জয়ার দেখ্‌ভাল—করনেওযালা। কান্তি হারলো কাঞ্চনস্ফীতির অভাবে। জয়ার অসুখ সারল, মনের রঙও বদলালো, গায়ে নতুন গয়না উঠল, অটলনাথের আশ্রিতা হল সে। অটলনাথকে ভালোবেসে সে চিঠিও লেখে। আর প্রতাপবাবু চললেন অটলেরই তাঁবেদারী করতে রাঁচীর অফিসে। কান্তিকুমার ভেঙে খানখান হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত ভদ্রতার শেষ নজিরটুকু জড়ো করেও প্রতিবাদী হতে পারল না কান্তিকুমার। মনের মত আক্রোশ নিয়ে জ্বলে উঠেও চোয়াল শক্ত কবে পিছু হটল কান্তিকুমার—এটাই বুঝি মধ্যবিত্তের মানানসই সহনশীলতা! জীবনীশক্তির শেষ দর্পটুকু নিয়েও আত্মপ্রবঞ্চক কান্তিকুমার অবনমিত হল। মাথায় পেতে নিল 'বাণিজ্যঋষি'র জীবনী লেখার দায়িত্ব! কারণ? হাতে হাতে নগদনারায়ণের অবশ্যম্ভাবী আকাঙ্ক্ষা—মধ্যবিত্তেব বক্র মেরুদণ্ডের সামনে ঝোলানো এক 'সুবর্ণ-সুযোগ'। সে সুযোগের কাছে নত হল কান্তি। অবশ্য জানা যায় না কান্তির কৌমার্য চিরকাল একই ভুলে অটুট রইল কিনা!

১. গ. জয়া বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের এক ছাপোষা মেয়ে। সাতাশ বছরের ভরা যৌবনে মনে যার 'নারীত্ব' উঁকি মারে অহরহ। কিন্তু এখনও তেমন করে ভালোবাসার ডাক পায়নি সে। এই অবসাদে তাকে আক্রান্ত করেছে বয়সের ঈষৎ ভার আর তার অপেক্ষমান স্তব্ধ মালিন্য—'যার সময় পার হতে চলেছে, তার কাছে কান্তিকুমাব তো সোনার তরুয়ার চেয়েও বেশি।' রামগড়ের নতুন গোপন কানাকানি এখন তাই জয়া আর কান্তি, কান্তি আর

জয়া। প্রতাপবাবু জয়ার বাবা। একদা অবস্থাপন্ন প্রতাপবাবু সংসারের টানাটানিতে বাধ্য হয়েই ধার নেন কান্তির কাছে। জয়া, বাবা আর কান্তির সেই অদৃশ্য বাঁধন উপভোগ করে। কিন্তু কৃতজ্ঞতার অপর নাম নতজানু হয়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া নয়। তাই জয়া আর কান্তির বিয়েতে মত নেই তাঁর। বাস্তবের সঙ্গে জীবনভাবনার এমনতরো অসঙ্গতিতে জয়া মনে মনে হাসে—যেন কান্তিকে জয় করা তার হয়েই গেছে। কিন্তু কঠোর পরিস্থিতি জয়াকে অভিমানিনী করে তোলে। এখন বাবাকে ছেড়ে সে শুধু কান্তিকে চায়, কান্তির বড় হবার, কান্তির বড়লোক হবার স্বপ্নে বিভোর মানিনী হতাশায় কাঁদতে বসে। কিন্তু কান্তির ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য যে জয়ার নেই—'ধৈর্য্য, সৎপথ, ভালবাসা ঠিক রাখতে হবে, বাবার মন বদলাবে, এতগুলি ছুতো মানতে গিয়ে তোমার দফা শেষ হবে, দিন ফুরিয়ে যাবে। তারপর...তারপর আর কোন কিছুর মানে হয় না। গল্পের পরিণতিতেও বোঝা যায় কোনো অর্থহীন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি জয়া। যে অটলের টাকা লুঠ করার পরামর্শ একদা সে কান্তিকে দিয়েছিল; সেই অটলেরই আশ্রিতা হল সে। জীবনের সদর্থক গুণাবলীর বিপরীত গলিতে খুঁজে নিল অবৈধ এক নিশ্চিত আশ্রয়। আপোষ করল জয়া—, সব সংসর্গ ত্যাগ করে খুশি হল কাঞ্চনসংসর্গে।

১. ঘ. প্রতাপবাবু অবস্থাপন্ন ঘরের পিতৃদায়গ্রস্ত এক মানুষ। 'প্রবাদ আছে সোনার ছিপে মাছ ধরতেন।' বর্তমানে মুনসেফ আদালতের এক কোণে দোয়াত-কলম নিয়ে বসেন। দরখাস্ত লেখার কাজ পেলে রোজগার হয় সামান্য। কিন্তু সংসারের হতশ্রী দশার শ্রী বলতে একমাত্র কন্যা জয়া। তার সঙ্গে কান্তির সম্পর্কের যে কোনোরকম নৈকট্য তাঁর অপছন্দ। সংসারের টানাটানিতে কান্তিকুমারের কাছ থেকে টাকা ধার নেন প্রতাপবাবু। কিন্তু একদিন সমস্ত ঋণশোধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তিনি ঋদ্ধ। বিকল্পে, কন্যার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব অবমাননাকর ছাড়া আর কিছুই নয়—বংশমর্যাদা আর ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের গর্ব প্রতাপবাবুর এতটাই। তবু কান্তির কাছে ধার চেয়েই তিনি মদ্যপানে জীবনাসক্তি ফিরে পান। নতুন কেনা সিগারেটের সুখটানে অস্তিত্বের নতুন স্বাদ পান। কিন্তু যখন কান্তিকুমার নামক 'উপকারী মহাজন, এর কাছে আর টাকা পাওয়া যায় না, তখন উপকারের বাঁধন যায় ছিড়ে। প্রতাপবাবুও চলেন সাক্ষাৎ কাঞ্চনসংসর্গে—অটলনাথের কাছে, সরাসরি। মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবও দেন স্নেহবুভুক্ষু পিতা। কিন্তু অটলনাথ শুধু অন্নদাতা হবে, স্বামী নয়; আশ্রয়দাতা হবে, জীবনসঙ্গী নয়। প্রতাপবাবু ক্ষণভঙ্গুর মধ্যবিত্ত মেরুদণ্ডও অবনমিত হয় ধনগরিমার কাছে। ওষুধের বিল, বকেয়া বাড়ি ভাড়া, কাপড়ওয়ালার বিল, স্যাকরার পাওনা-সব মিটিয়ে প্রতাপবাবু নিশ্চিন্তে চলে যান তাঁবেদারী খাটতে। বিনিময় মূল্য হল কন্যাধন। এ ধন হস্তগত করেছেন অটলনাথ বসু চৌধুরী। সামাজিকতার দায় রক্ষা করে বিজয়ী হন জয়ার বাবা প্রতাপবাবু আর কাঞ্চনসর্গের লোভনীয় আকাঙ্ক্ষায় কন্যারত্ন বিকিয়ে নিম্নগামী হন স্বার্থপর প্রতাপবাবু।—হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় দুই চারিত্রবৈশিষ্ট্যে কোনো প্রভেদ নেই—কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কৌশল অবলম্বনের এ এক চেনা ছবি।

দুই

'কাঞ্চন' অর্থাৎ 'সুবর্ণ', 'স্বর্ণ', 'ধন', আর 'সংসর্গ' তথা 'নৈকট্য' বা 'সাযুজ্য'-য় মানুষের জীবনে যে পালাবদল ঘটে, 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পে রয়েছে তার দ্বিমুখী রূপান্তর

চিত্র। প্রায় নির্ধন অটল হয়েছে ধনশালী, বৈভবময় ধনবিলাসী আর প্রতিপত্তিশালী প্রতাপবাবু হয়েছে জৌলুসহীন নির্ধন। এই দুই বিপ্রতীপ গতিপথের কেন্দ্রে অবস্থান করছে ছাপোষা মধ্যবিত্ত কান্তিকুমার। ধনের আকাঙক্ষা, অর্থের বিলাসিতা আর সোনার হরিণের মায়ায় মজে অটলনাথ ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে লক্ষ্মীলাভ করেছে। এমনকি অর্থের বিনিময়ে সে কিনেছে মনুষ্যত্ববোধ, সততা, বুদ্ধিবৃত্তি পর্যন্ত। এভাবে সমাজে তার আর্থিক কদর বেড়েছে আর নৈতিক মূল্যমান কমেছে। তবু হৃদয়হীন, অমানুষ, ধনলোভী অর্থপিশাচ অটলনাথ বসু চৌধুরীর ঘটেছে উত্থান আর আরেকদিকে তারই সঙ্গে সমান গতিতে ঘটেছে প্রতাপবাবুর পতন। সামাজিক ব্যাধির মতোই আর্থিক সুরক্ষার ভাবনা আন্দোলিত করেছে প্রতাপবাবুর মন। ধার নিতে নিতে ক্লান্ত প্রতাপবাবু এবার অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চিত উৎসটুকুকে কব্জা করতে পেরে যারপরনাই সুখী, নিরুদ্বেগ। অর্থগৃধ্নু প্রতাপবাবু মানবিক সম্পর্কের মায়াজাল অতিক্রম করে কন্যারত্নকেই যৌতুক রেখেছেন বিকিকিনির হাটে পসরা করে—নিম্নগামী হয়েছে তাঁর মানবিক প্রবৃত্তি। এদিকে নিজের চেষ্টাতেই অর্থোপার্জন করে প্রতাপবাবুর কন্যা জয়াকে একদিন অর্থগৃধ্নু বাবার কাছ থেকে মুক্ত করে নিতে পারবে—এ বিশ্বাস ছিল কান্তিকুমারের। কিন্তু গল্পের শেষভাগে দেখি, অটলনাথ তার প্রাসাদে অনাদৃতা স্ত্রীর বহুমূল্যবান অয়েলপেন্টিং সযত্নে টাঙ্গিয়ে রেখে তার স্বামীমাহাত্ম্য ঘোষণা করছেন আর কান্তিকুমার সেই অটলনাথের একটি পবিত্র জীবনী রচনা করছে। অটলনাথ সামান্য কৌশলেই প্রতাপবাবুকে দূরে সরিয়ে দিয়ে জয়াকে নিজের রক্ষিতারূপে রাখবার ব্যবস্থা করেছে আর কান্তিকুমারকে সেই কথাটা জানিয়ে দেবার পর ধাপে ধাপে নির্দেশ দিয়েছেন যেন কান্তিকুমার তাঁর জীবনীতে তাঁকে 'বাণিজ্য ঋষি' বলে উল্লেখ করে। জয়াকে রক্ষিতা করে রাখবার প্রস্তাবে কান্তিকুমার বৃশ্চিকদংশনের জ্বালায় আহত সাপের মতো ফুঁসে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই অটলনাথের হুকুমে অতিবাধ্য মোসাহেবের মতো চেয়ারে বসে পড়ে ও অবশেষে অটলনাথের শেষ হুকুম মাথায় করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কেননা কয়েক মুহূর্ত আগে অটলনাথ জানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং জয়াও এই অর্থের পৈশাচিক খেলায় যোগ দিয়েছে ও অটলনাথের কাছ থেকে ধারদেনা শোধ থেকে শুরু করে গয়নাগাটি পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছে। শেষ মুহূর্তে কান্তিকুমারও অনুভব করল, সে-ও কয়েকটি টাকা মাসিক বৃত্তির শক্ত দড়িতে বাঁধা পড়ে গেছে—সেখান থেকে ছিঁড়ে বেরোনোর উপায় তার আর নেই। কাঞ্চনসংসর্গের পরিণামে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে মানুষ ভিন্ন পথে চালিত হয়ে যে ভিন্ন পরিণতি পায়, তা একান্তই বাস্তব। সেই পরিণতিতেই কান্তিকুমার এক যন্ত্রণাদায়ক শিকলে বাঁধা পড়েছে। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে মুখার্জীর শৃঙ্খল তার নিজের তৈরি, 'গোত্রান্তর' গল্পের সঞ্জয়ের উচ্চাশা ও লোভজনিত আক্রোশ-ও তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে তৈরি আর এই গল্পের কান্তিকুমারের শিক্ষাগত ও রুচিগত যোগ্যতা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অটলনাথের বশংবদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে আর্থসামাজিক পরোক্ষ শ্রেণীচ্যুতির রূপটি স্পষ্ট। কাঞ্চন সংসর্গের ফলে কেউ তিক্ত অভিজ্ঞতার পথে বিদ্ধ হয়েছে, কেউ সাফল্যে তৃপ্ত হয়েছে, কেউ অমানবিক হৃদয়হীনতায় দড় হয়েছে; আবার কেউ বিফলতায় নিরাসক্তির সান্ত্বনা পেয়েছে—ভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন উপস্থাপনে জীবনের বাস্তব ছবিটি যথার্থ নামকরণে ও বিষয়ব্যঞ্জনায় সফল ও ইঙ্গিতবাহী হয়েছে। তবে 'সংস্কৃতগন্ধী' নামকরণটি

গল্পকারকে বোধহয় বেছে নিতে হয়েছে একটি শব্দের মাধ্যমে পাঠকমনে তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া জাগানোর জন্যই। অর্থলোভের পচনে গেঁজিয়ে ওঠা সমাজের কোলাজ ছবি 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ'।

তিন

ছোটোগল্প এক বিশেষ সাহিত্যরূপ। কিন্তু ছোটগল্প অর্থে কি ছোট আকারের গল্প—এই প্রশ্নের উত্তর একইসঙ্গে হ্যাঁ বা না। বিশ্বসাহিত্যে পাঁচ-ছটি শব্দে গঠিত একটি বাক্যের ছোটোগল্প আছে; আবার সম্ভাবনায় ছোট, কিন্তু আকারে বড় গল্পও, নামে ছোটগল্প। আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' অবশ্যই না ক্ষুদ্রাকৃতি, না বিশালাকৃতি; তবে সাধারণ রূপে অবশ্যই একটি ছোটগল্প। স্বল্প পরিসরে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ছোটগল্পকে তার বিষয় পরিস্ফুট করতে হয়। তাই রামগড়ের সামগ্রিক জীবন না হলেও; সেই জীবনের ক্ষণিক দ্যুতি রচনা করেছে, সুবোধ ঘোষ লিখিত এই গল্পটির কাহিনী। সাধারণত, ছোটগল্পে একক বিষয়ের প্রতীতি থাকে। এই গল্পটিতে বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা একটি বিন্দুতে সীমাবদ্ধ। তা হল অর্থবৈভবের সান্নিধ্যে মানুষের উন্নয়ন ও অবনমনের কাহিনী। দু তিনটি ঘটনা বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পকার ঘনপিনদ্ধ একটি প্রতীতিতেই সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছেছেন। বহু বিষয়ের ব্যঞ্জনা দিয়ে পাঠককে দিক্‌ভ্রান্ত করেন নি। একটি মাত্র প্লটের একমুখী বিন্যাসে গল্পের গতি বাধাপ্রাপ্তও হয়নি। ছোটগল্পে চরিত্রের 'পূর্ণাঙ্গ' নিখুঁত বিকাশ আশা করা যায় না। ক্ষণপরিসরে চরিত্রের কিছু স্ফুলিঙ্গ অনুভূতির নিবিড় মুহূর্ত শুধু চকিতে ধরা পড়ে। যেভাবে অটলনাথের অর্থবুভুক্ষ মন, কান্তিকুমারের নীরব অন্তর্বেদন, জয়ার চিরাচরিত জীবনের আকর্ষণ আর প্রতাপবাবুর অস্তিত্বের লড়াই ধরা পড়েছে লেখকের আঁচড়ের অভিঘাতে, তাতে চমকিত পরিণতি পাঠককে শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে গিয়েই বিস্ময়ের পাথারে নিক্ষেপ করে। সত্যিই জানা যায় না জয়া সুখী হয়েছিল কিনা, কান্তি প্রতিবাদ করেছিল কিনা অথবা অটলনাথ তার ঐশ্বর্যে অটল ছিল কিনা। এই অসম্পূর্ণ জীবনাভিজ্ঞতাই ছোটগল্পের প্রাণ। গল্পকার চান গল্পের গভীরে ডুব দিয়ে পাঠক দোলায়িত ইশারায় আন্দোলিত হতে থাকুন—সেটাই তাঁর সৃষ্টির চরম সার্থকতা। লেখক সুবোধ ঘোষের অপূর্ব মুন্সীয়ানায় যাবতীয় বাহুল্য বর্জিত হয়ে পরিমিত পরিসরে, বিষয়ের ঘনত্বে, পরিণামী ব্যঞ্জনায়, একমুখী গতিতে 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' হয়ে উঠেছে অপূর্ব একটি ছোটগল্পের নিদর্শন।

৪. 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পটির গঠনরীতি একটি 'লিফ্‌ট্‌-এর সঙ্গে তুলনীয়। 'লিফ্‌ট্‌' টি যখন উঠে যায়, সঙ্গের তারটি তখন নেমে আসে আর 'লিফ্‌ট্‌' টি যখন নামে, তখন তারটি উঠে যায়। এই গল্পটিতেও ঠিক তেমনি ঘটনাবিবর্তনের দুই বিপরীতমুখী গতি। একদিকে হৃদয়হীন অর্থপিশাচ অটল নাথের উত্থান, আরেকদিকে প্রতাপ ও কান্তিকুমারের পতন। একই দড়িতে বাঁধা তারা, বৃত্তায়িত গতিতে চালিত। সুবোধ ঘোষ দেখিয়েছেন স্থান-কাল-ঘটনার ভাবগত ঐক্যে ধন ও মানবিক মূল্যবোধের আভ্যন্তরীণ এক পিচ্ছিল সম্পর্কের ওঠাপড়ার কাহিনী। এই মূল কাহিনী কাঠামোর মাঝে কয়েকটি রেখার আঁচড়ে আরো এমন ঘটনার উল্লেখ ও ইঙ্গিত করেছেন যেগুলি সবই ধনলোভের বিকাশের ফলে উদ্ভূত পচনশীল, ঘুণধরা সমাজের বাস্তবতার ছবি। সুদক্ষ শিল্পীর মতোই সুবোধ ঘোষ প্রমাণ করেছেন কার্লমার্ক্স-এর উক্তি—'Money is the alienated ability of mankind.'

বারবধূ : একটি লজ্জিতা বধূ

সন্দীপকুমার মণ্ডল

'যতদিন সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সতীত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে করা হবে ততদিন বিবাহ প্রথার সঙ্গে আরো একটি প্রথা সহযোগী হিসাবে রাখতে হবে, দরকারে বিবাহ প্রথার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতে হবে। আমি এখানে সহযোগী প্রথা হিসাবে বেশ্যাবৃত্তিকে বোঝাচ্ছি।'
বার্ট্রান্ড রাসেল/বিবাহ ও নৈতিকতা

এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না

লতা বারবধূ। অন্য পরিচয় তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি, জমিদার প্রসাদ রায়ের 'বাঁধা মেয়ে' মানুষ। বারজনের বধূ হ'য়ে যদিও লতার জীবন বেশিদিন কাটেনি। প্রসাদের সৌজন্যে সে একটা সময় পঞ্চীবিবি থেকে লতা হ'য়ে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দিয়েছে। অর্থের বিনিময়ে সুঠাম দেহ-সুধা বিক্রি করেছে লতা আর তার পাশাপাশি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে স্ত্রী সুলভ সত্তার জাগরণ। বাঁধা মেয়ে জানে অর্থ সর্বস্ব জীবন। খরিদ্দার পুরুষটিকে তৃপ্ত করাই বিক্রেতা-নারীর কাজ। স্বভাব কিংবা অর্থাভাবের কারণে কোনো কোনো নারী পণ্য হ'য়ে ওঠে আর পণ্য নারী বিজ্ঞাপিত হয় 'বেশ্যা' নামের আড়ালে। তবু বারবধূ লতা বৃত্তির যাবতীয় ধর্ম আত্তীকরণ ক'রেও অনেকখানি মানবীয় হ'য়ে উঠেছে, দৃষ্টির আড়ালে কখনো কখনো একান্ত গোপনে অনুভব করেছে বধূরূপের নির্ভেজাল আনন্দ। সবখানি ফেলো কড়ি মাখো তেলের মতো নিয়ম-নিষ্ঠ যান্ত্রিকতা নয়। সুবোধ ঘোষ লতার মধ্যে পেশাদারিত্বের ছাপকে একশ' শতাংশ স্পষ্ট ক'রে তুলেও অসামান্য মানবিক বোধে উত্তীর্ণ করেছেন। 'অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত' আছে লতা ও প্রসাদের মধ্যে।

'বাঁধা মেয়ে মানুষ' রাখা উনবিংশ-বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বঙ্গের জমিদার, জোতদার, অর্থবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের এক অভিজাত বিলাস-ব্যসন। সুরা-নারীর সম্মিলিত স্পর্শে জীবন যে কখনো বৈচিত্র্যপূর্ণ কখনো অর্থহীন তা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস উন্মোচিত হয়। স্বভাবতই আভিজাত্যের পরিচিত দিকটিকে সংগোপনে ক্রেতারূপী লম্পট পুরুষ মূর্ত করে তোলে, আর আড়ালে থাকে অবৈধ সংহার। যে সমাজ-ব্যবস্থাতে নারীকে বেশ্যারূপে ক্রয় করা যায়, ভোগ করার ব্যবস্থা বা সংস্কৃতির চর্চা আছে, সেখানে লক্ষ লতা লাঞ্ছিত হ'লেও হিসেবে কোনো গোলমাল ঘটে না। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডিকামঙ্গল' কাব্যেও লক্ষ্য করা গেছে : 'লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে/একভিতে হইয়া অধিষ্ঠান।' বারবধূরা স্বভাবতই লম্পট পুরুষের প্রত্যাশা করে। লতা সে রকম বারবধূ নয়, তার পুরুষটি লম্পট কিন্তু একান্ত সংখ্যাধীন। বধূর যাবতীয় কর্ম সে নিখুঁত ভাবে করে চলেছে কেবল পাইনি স্বীকৃতি। এ কথা সত্য যে, সম্পর্ক যদি অর্থ (Moncy) নির্ভর হয় আর অর্থ কেবল শ্রম (labour) নির্ভর, তবে লতা পেশাদারিত্বকে সম্পূর্ণ আযত্ব করতে পারেনি। স্বভাবতই বহির্বিশ্ব জানে, বারবধূব

বাঁধা পুরুষ কখনো থাকে কখনো থাকে না, কিন্তু কদাচিৎ পুরুষটি যদি বাঁধা পড়ে যায় বারবধূর রঙীন অঞ্চলে তবে বধূটিও যে বাঁধা পড়ে যেতে পারে একদিন তেমনি ইঙ্গিত আছে গল্পের পরতে পরতে। লতার অন্তর্বিশ্বে প্রগাঢ় বধূ ছাপ ফেলেছে প্রসাদের কৃত্রিম সংসার। প্রসাদকে অর্থের বিনিময়ে আনন্দ দিতে দিতে লতা অজান্তে ভালোবেসে ফেলেছে আর সে ভালোবাসা অধিকার করে নিয়েছে নারীসত্তার সর্বোত্তম বিকাশ-প্রকাশকে। লতার রমণীয় সত্তা দু'কূল প্লাবিত ক'রে প্রসাদের বধূ হ'তে চেয়ে জ্বলে উঠেছে। সব নদীর উদ্দাম-উচ্ছলতা যেমন সমুদ্রে মিলিত হওয়ার আনন্দ পায় না, তেমনি লতাও পায়নি বধূ স্বাদ। হয়তো নারী জায়া-জননীতে সম্পূর্ণতা পায়। লতার মানবজীবন অসম্পূর্ণ, সার্থক পুরুষের অভাবে।

প্রাচীন ভারতে গণিকাদের বিশেষ সম্মান ছিল। এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করত রাষ্ট্র। যে সমাজ ব্যবস্থাতে একাধিক বিয়ের সানন্দ অনুমোদন ছিল সেখানে কেউ কেউ যে গণিকাদের বিয়ে করতেন না এমনটিও নয়। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে দেখা যায়, চারুদত্তের দ্বিতীয় পত্নী রূপে বারাঙ্গণা বসন্ত সেনা পতিব্রতা রমণী হ'য়ে জীবন কাটিয়েছে। সম্ভ্রান্ত বারাঙ্গনার অবস্থান অনেকটাই সেদিন ছিল উপপত্নীর মতো; বেতনভোগী কর্মচারীর মতো। এ সকল বারাঙ্গনাদের দায়িত্ব থাকত নানাবিধ। 'লম্পট' পুরুষটির সেবাসহ সবরকম পরিচর্যা। আর পুরুষটি যদি কর্তৃত্ব সম্পন্ন হতেন তো কথাই নেই। পুরুষটি যেখানে যেতেন গণিকা বা গণিকারাও সেখানে যেতেন। এ ঘটনা ঘটত রাজা বা সমতুল্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অভিজাত ব্যক্তিবর্গের উপপত্নী রাখবার বিশেষ চলন দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' প্রবন্ধে এই উপপত্নীর কথা উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে বারাঙ্গনা নারীর মার্জিত রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে। নারীকে পণ্য ক'রে ব্যবহারের মাত্রা আজ পাল্টেছে। আধুনিককালে নারী নিজেকে পণ্য করে বা পুরুষ যখন নারীকে পণ্য বানায় তখন উভয় পক্ষের থাকে মুখোশ, আড়াল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ তথা নারীচেতনার ক্রমবিকাশে নারী শ্রমের মূল্যে ব্যবহৃত হয়। যৌন কর্মীর প্রসঙ্গ আধুনিক রাষ্ট্রের একটি দিক বিশেষ। বারাঙ্গনা সম্পর্কিত যে অতীত ঐতিহ্য আছে তা প্রায় ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা হয়, সময় অঙ্কের সূক্ষ্ম নিক্তিতে মাপা হয় সমস্ত প্রক্রিয়াটি। অন্তরে অন্তরে নিবিড়তার অভাব ঘটে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যৌন-আনন্দকে পরম করতে যতটুকু প্রয়োজন বারাঙ্গনা নারীটি ততটুকু পরিবেশন করে কিংবা বিক্রি করে। একাধিক দিনের জন্যেও কৃত্রিম বধূ ক'রে কিংবা পরিচয় দিয়ে অ-পেশাদারী পণ্য-নারীর দৃষ্টান্ত মেলে সাহিত্য, সমাজ-জীবনেও। সেখানে নারীটি যেমন পণ্য হ'তে পারে তেমনি পুরুষটিও। যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে নারী বারাঙ্গনা হোক না কেন আজকের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতে বারবধূদের স্বীকৃতির প্রশ্নটি সুধীজনের অনুমোদন পায়নি। লতাকে তাই জমিদার প্রসাদের 'বাঁধা মেয়ে' হ'য়েও পরিচয় আত্মগোপন করতে হয়েছে। অচেনা-অপরিচিতের কাছে সে পতিব্রতা রমণী আর পরিচিতের কাছে নষ্টনারী, তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি। এই বিশেষ ফারাকটুকু সভ্যতার নিজস্ব সৃজন। সময়ের সাথে মূল্যবোধ পাল্টে গিয়ে নিরস, যান্ত্রিক হ'য়ে উঠেছে প্রথা, বৃত্তি। শাস্ত্রগতভাবে নারীকে যে হীন সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে গণিকাবৃত্তি সেই ব্যবস্থাপনার উপর আঘাত। শাস্ত্রীয়ভাবে নারীকে পদানত করার বিপ্রতীপে গণিকাবৃত্তি একটা উন্মেষ। ঐতিহ্য পরম্পরা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা অভিঘাত

এখানে আছে। নারী যেমন 'আপন ভাগ্য জয়' করবার কারণে কখনো সখনো বাধ্য হয় এ বৃত্তি গ্রহণ করতে, তেমনি পুরুষের আধিপত্য নারীকে অসহনীয় ভাবে দেহোপজীবী করেও তোলে। নারী নষ্টা কিংবা ভ্রষ্টা হওয়ার জন্য সমাজবেত্তার ছলের কোনো অভাব নেই। প্রসাদের একটি উক্তিতে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, 'ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালীর বাচ্চী।' কিসের কারণে 'ভ্রষ্টা' গল্পে তার প্রকাশ নেই কিন্তু ভ্রষ্টা নির্ণীত না হ'লে লতা যে এই বৃত্তিতে আসতো না এমনি ইঙ্গিত এখানে আছে নাকি? লতার জীবনে সকল সঙ্গীত কোন ইঙ্গিতে গেছে থেমে, কে জানে। গল্পকার সেকথা স্পষ্ট করেননি দু'একটি ইঙ্গিত ছাড়া।

প্রেরণা নেই, তবু যেন নিজের দমেই চলে

'বারবধূ' গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় দেহজীবী এক নারীর করুণ বৃত্তান্ত। স্বভাবতই দেহকে কামার্ত কিংবা লোলুপ পুরুষের কাছে পণ্য করে ভারতীয় তথা বিশ্বের নানা রাষ্ট্রে একশ্রেণির নারী অর্থোপার্জনের মাধ্যেমে জীবন-যাপন করে। লতা তাদের একজন। যে পরিস্থিতিই তাকে এমন কাজে প্রাণোদিত করুক না কেন এ ব্যাতীত তার অন্য কোনো আয়ের উৎসের সন্ধান আমাদের জানা নেই। লতার মা মুড়ি ব্যবসায়ী। নিম্নবিত্ত পরিবারের গ্রামীণ নারী এই লতা। তারকেশ্বরের কোনো প্রান্তে তার জন্ম হ'লেও দেহ-ব্যবসা দাবী করে বাকচাতুরী, কর্মকুশলতা, উপস্থিত বুদ্ধি কিংবা বাস্তব বোধ। এ সকল চারিত্রিক সক্ষমতা নিয়ে গল্পে লতার ওঠে আসা।

বারবধূ গল্পের বিষয়টিতে লক্ষ্য করা যায়, প্রসাদ রায় গল্পের নায়ক বেলেল্লা পনায় অভ্যস্ত কামাতুর পুরুষ। সে নারীকে অর্থের বিনিময়ে ভোগ করে। কিন্তু এই ভোগ প্রচলিত ভোগ নয়। দেহক্ষুধাকে তৃপ্ত করার সাথে সাথে নারী-পণ্যটির কাছে সে আবার স্ত্রীর মতো আচরণ প্রত্যাশা করে। লতার মধ্যে সতী স্ত্রীর যাবতীয় প্রকাশ ছিল। সে জানে বরাকরের গেষ্ট হাউসে মাসাধিক কাল স্ত্রী সুলভ আচরণ করলেও সে প্রকারান্তরে প্রয়োজনের ভোগ্য সামগ্রী। বেশ্যার অতিরিক্ত প্রত্যাশা যেমন আরো আরো অর্থের (money) কারণে হ'তে পারে এ ক্ষেত্রেও তাই। যদিও লতার আরো একটি বাঁধা পুরুষের উল্লেখ গল্প পাঠে অবগত হওয়া গেলেও প্রসাদের সান্নিধ্যে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত পুরো বিষয়টি লতার কাছে অভিনয় হ'য়ে থাকেনি। নানান ঘটনার সংস্পর্শে লতার হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে আর বধূ না হ'য়েও বধূ হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। সে কিছুতেই বিস্মৃত হয়নি সেও একটি নারী, যে অর্থের বিনিময়ে দেহকে শ্রমিকের মতো ব্যবহার করে। আধুনিক ভাষায় যৌনকর্মী। শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের যে সম্পর্ক লতার সঙ্গে প্রসাদেরও তাই। মালিক যেমন শ্রমিকের কাছ থেকে সর্বাধিক শ্রমকে গ্রহণ করতে যে পন্থা অবলম্বন ক'রে থাকে প্রসাদও তাই করেছে। 'লক্ষ্মী'র মতো শব্দোচ্চারণ করে প্রসাদ লতার হৃদয়ে দাগ কাটতে চেয়েছে। প্রসাদের উদ্দেশ্য আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে লতার মধ্যে 'বধূবৃত্তির' উন্মেষ ঘটানো। শ্রম যেখানে একান্তই দেহ নির্ভর সেখানে হৃদয়ের আবেদন প্রত্যাশিত নয়। লতা তো হৃদয়টানে বরাকরের কলোনিতে মাস দেড়েক কাটায়নি, ক্রেতার দেহটানকে চরিতার্থ করতে কাটিয়েছে এতটা দিন। সে জানে বিনিময়ে অর্থ পাবে যথাযথ। তবু তার হৃদয়ের সম্মতি প্রত্যাশা করলে যা যা ঘটা উচিত তাই-তাই ঘটেছে। যে কাজে হৃদয় অর্থহীন, দেহ সর্বস্ব সেখানে মিথ্যা 'সতীবধূ' হওয়া একজন

বারবধূর পক্ষে সহজ নয়। লতা 'ভদ্দোপণার ভড়ং'কে তাই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি লতার উক্তিতে বাস্তব চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

১. 'এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকবো কেন? থিয়েটারে খাটলে দু'দশ শো হ'তো।'

২. 'প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে, ডুডু খাবে খোকা? ভদ্দরলোকের বুক ভয়ে দুরদুর করে, মেয়ে মানুষ রাখার শখ কেন? শ্যাম রাখি না কুল রাখি—দুই-ই একসঙ্গে হয় না।'

এমন উক্তি গল্পের নানা স্থানে আরো আছে। এ থেকে একটি বিষয় মনে হওয়া সঙ্গত যে, লতা সামান্য নারী হ'লেও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রখর। প্রসাদের ঘরে রণজিৎ, রাখালবাবুরা প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাই, একটি বারবধূ বধূবেশে অপরিচিতের কেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমাজের গণ্যমান্যরা জানেন না লতা পঞ্চিবিবি অথচ বধূবেশে তার আত্মপ্রকাশে কোথাও কোনো খাদ নেই। বরাকরের প্রাকৃতিক পরিবেশে চেঞ্জে আসা রাখাল বাবুরা বুঝতে পারেন না প্রসাদের স্ত্রী নামে পরিচিত মহিলাটি তার কোনো কালের কোনো স্ত্রী সে নয়। লতাও পরিবেশের সঙ্গে পরিবর্তিত হ'য়ে মানিয়ে গেছে অনায়াসে। বধূবেশে নারীর যে মান্য আচরণ প্রত্যাশিত লতা তাই-ই করেছে। 'চওড়া-পাড় একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে লতা। ঘরে ঢুকে সামনেই বুড়ো রাখালবাবুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় লতা, মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে সামনে নামিয়ে দেয়। লতার সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই, তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।' প্রসাদের সুলক্ষণা স্ত্রীর ভূমিকায় লতার এ অভিনয় সহজাত। তবু অভিনয়ের মধ্যে কোথাও যথার্থ অভিনেত্রীর হৃদয়ের যোগে শিল্পকর্ম যেমন স্বতস্ফূর্ত হ'য়ে ওঠে লতার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লতা জানে প্রসাদ তাকে বিয়ে করবে না অথচ স্ত্রীর অধিক সে ব্যবহৃত হবে। প্রসাদ রায় কিংবা জীবনের মহত্তর কোনো দিক তাকে অন্তরের টানে এগিয়ে আনেনি, আলিঙ্গন করেনি উষ্ণতায়। প্রেরণাহীন এ দেওয়াতে আনন্দশূন্য। বিধবা আভার সান্নিধ্যে আসার পর থেকে প্রসাদের ভোগ-যন্ত্র আবারও বাঁধন হারা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে যারা নারী পাল্টে চলে, পরিবর্তন করে স্বাদ তাদের সামর্থ্য ও উদ্দীপনা থাকলেও 'ব্যবহৃত' নারী সেও, হয়তো আবার চলে অন্য কোথাও নিজেরই হৃদয়হীন দমে, প্রেরণাহীন অনিবার্য আবেশে। লতাও সেই নারী।

লতা : সত্যিই যেন একটি লাঞ্ছিতা বধূ

কখনো কখনো লাঞ্ছিতা বধূও হ'তে পারে বারবধূর অন্য পিঠ। লতার মধ্যে সামাজিক-লৌকিক বোধ আছে। ভোগলোলুপ পুরুষটি হৃদয়শূন্য, লোভ সর্বস্ব হ'লেও লতা তা নয়। লতার বাহ্যিক আবরণ কঠিন, কিন্তু হৃদয় নরম। প্রসাদ তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ নয়, তবু প্রসাদের কাছে সে থাকে, জীবিকার কারণে। এই থাকাতে দেহ বিক্রির যোগ আছে হয়তো কিন্তু আত্ম-বিক্রয়ের কোনো যোগ নেই। লতা লুব্ধ পুরুষটিকে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা জানিয়েছে। সে জানে পুরুষটির অধীনতা স্বীকার করা এ জীবিকার অন্যতম শর্ত তবু পুরুষটির সব চাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত মুক্তকরা কিংবা কলঙ্কহীন করা তার কাজ নয়। ভদ্র লোকেদের 'মেয়ে মানুষ' রাখার শখকে লতার চোখে কাপুরুষ সুলভ মনে হয়েছে। মেয়েদের

সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। অনেক সম্পর্ক সমাজ মেনে নেয় না। তবু পুরুষটি যে মেয়েটির সম্মান অক্ষুন্ন রেখে সাহসি হবে সে কথাই লতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। লতা বেশ্যা, লতা জানে আর জানে বলেই সেও সমাজের কাছে বেশ্যার সম্মানিত চিত্রটি মূর্ত করতে চায়। ক্রেতা পুরুষটি বেশ্যার মাথায় অপ্রকৃত বধূবেশ তুলে দিলে বেশ্যা বধূ হ'য়ে যায় না কিন্তু ক্রেতা পুরুষটি সমাজের চোখে নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে থাকে। 'বারবধূ' গল্পে শখের মেয়ে মানুষ রাখা পুরুষের প্রতি লতার ঘৃণা আছে, প্রতিবাদ আছে। এ প্রতিবাদকে লতা প্রকাশ করেও পুরুষ মানুষটির আপাত অসহায়তা থেকে মুক্ত করতে সে এগিয়ে এসেছে। লতার এ আসা নিঃসন্দেহে নির্বিকার আসা, হৃদয়হীন শ্লথ হ'য়ে আসা। তবু এই আসাতেই জমিদার প্রসাদ রায়ের আভিজাত্য বৃদ্ধি পায়, সম্মান ভূলণ্ঠিত হওযার সকল সম্ভাবনা গৌরব নিয়ে ফিরে আসে লতার সুনিপুণ স্ত্রীবেশে।

গল্পকার সুবোধ ঘোষ লতা চরিত্র সৃজনে নারীর কোমল সত্তার প্রতি সজাগদৃষ্টি রেখে চরিত্রের গভীরে ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তি সত্তার নির্মোহ প্রকাশ। প্রতিবেশী রাখালবাবু, রণজিতদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত লতা সেই সমাজ নির্দেশিত 'বেশ্যা' নারী যে পুরুষটির সঙ্গে কথা-বার্তায় যুক্তিবাদী, বাস্তববোধ সম্পন্ন। মেকি ভদ্রতায় তার কোনো সম্মতি নেই—না থাকারই কথা। যে সমাজ ব্যবস্থা কেবল পুরুষের ভোগ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার অনুকূলে সম্মতি জানায়, গোপন অনাচারকে প্রকাশ্য দিবালোকে কর্তৃত্বের আস্ফালনে ভ্রান্ত কবে দেয়, সেই পুরুষ শাসিত ব্যবস্থার প্রতিকূলে লতা অসামান্য নারীসত্তায় প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখতে জমিদার প্রসাদ রায়কে অসহায় ভাবে দয়া প্রার্থনা করতে হয় একটি 'বাঁধা মেয়ে'র কাছে আব তখনই অনুমেয় লতার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা কতটা গভীরে প্রোথিত। সমাজে বারবধূর কদব নেই, অথচ বারবধূর প্রয়োজন আছে। প্রসাদের জীবন নারী ছাড়া আস্বাদহীন, কতটা অর্থহীন আভার আগমনে আমাদের কাছে সত্য হ'য়ে ওঠে।

আভার আগমন 'বারবধূ' গল্পে একটি বিশেষ বাঁক। লতা এতদিনেব অবকাশে যে সত্যে উপনীত হ'য়ে উঠতে পারেনি আভার সামান্য কয়েকদিনের উপস্থিতিতে তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। প্রসাদের কাছে 'বাঁধা মেয়ে' যে চূড়ান্তভাবে বাঁধা নয়, বাধা নয় লতাকে অনায়াসে ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে এবং আভার দিকে ছুটে যাওয়াতে স্পষ্ট হ'যে ওঠে নাকি? আভাও এক বিধবা নারী। বিধবাব কি বিশেষ কোনো গত্যান্তর নেই বলে পরপুরুষ কিংবা আন-পুরুষেব সঙ্গে মেলা মেশা, যৌনসুখ লাভ? এ প্রশ্নটা উঠত না যদি না প্রসাদ মোহাবিষ্ট হ'য়ে আভাব দিকে ছুটে যেত। প্রসাদের কাছে নাবীসঙ্গ নারীভোগ ছাড়া যে আর কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করতে পারে গল্প পাঠে তা আমাদেব মনে একবারের জন্যেও বোধ হয়নি। লতা বেশ্যা অন্তর্বিশ্বে তাই যদি সত্য হয়, তবে বহির্বিশ্বে প্রসাদের সান্নিধ্যে সমাজস্বীকৃত গৃহবধূর মতো একনিষ্ঠ নারী। এ নারীবেশ সমস্ত অনিচ্ছাকে দূরে সরিয়ে ফেলে বৃত্তির অপরিহার্য সত্তাকে গ্রাহ্য করেই পালন করতে হয়। লতা তা করেছে। লতার এই সাবলীল সক্ষমতা বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জনায় মূর্ত হ'য়ে ওঠে। যৌনতাকে বিক্রি কবে জীবন জীবিকার উৎস সংগৃহীত হয় যে পেশা থেকে লতা সেই দেহোপজীবী নারী। কিন্তু দেহের প্রয়োজনীয় ব্যবহারে পাশাপশি মন যখন কথা বলে ওঠে তখন বেশ্যাবৃত্তিব আড়ালে আবডালে যে এক চিরন্তন সত্য উঁকি মেবে ওঠে 'বধূবেশ'

রূপে গল্পে সেই ব্যঞ্জনাই আমাদের আঘাত করে। আভাকে লতা ঈর্ষা করে আর এ ঈর্ষা আভার ভবিষ্যতে 'বধূ' হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে কিনা আমরা জানিনা, তবু বেশ্যার ভীরু অভিমান কিংবা করুণ মূর্তির উন্মেষ অন্য কোনো গভীরতর হৃদয়-জাগরণকে আভাষিত করে সন্দেহ নেই। কি বলবো আভার এ আচরণকে।

'বোধহয় আলোর ধাঁধানি থেকে দৃষ্টি আড়াল করার জন্য হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিল লতা। কী আশ্চর্য, সত্যিই যেন একটি লাঞ্ছিতা গৃহবধূ; ভীরু অভিমানের একটি করুণ মূর্তি। আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে লতা বলে—না, তুমি ক্ষতি করনি; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো।'

'অভিমান' তো ভালোবাসা-লাগা থেকে জন্ম নেয়। কেবল অর্থ নয়, লতার শারীরিব সংগঠনের ভিতর থেকে মানসিক দেয়া-নেয়া তাকে লাঞ্ছিতা বধূধর্মে পরিণত করেছে। প্রসাদের কাছে লতার এ বন্ধন বিবাহের সমধর্মী। তবে কি বিবাহ মেয়েদের কাছে পরিচিত জীবিকার উৎস হ'য়ে ওঠে? বার্ট্রাণ্ড রাসেল মনে করেছিলেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যৌনসঙ্গীর কর্তব্য বেশ্যাদের চেয়ে স্ত্রীদের পালন করতে হয় বেশি। কেন যেন মনে হয়, 'বাঁধা মেয়ে' লতা প্রসাদের সেই স্ত্রী যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৌন সঙ্গী হয়, ধারণ করে স্ত্রীবেশ। সমাজ স্বীকৃত স্ত্রী না হ'য়েও যে লতা হ'য়ে উঠতে পারে যথার্থ স্ত্রী, মুখোশটাকে সরিয়ে দিলে যে মুখ স্ত্রী হ'য়ে ওঠে, সে নারী-বধূ অন্তরে-বাইরে; 'বারবধূ' তার সামাজিক-শাস্ত্রীয় মুখোশ মাত্র।

লতা একটি বারবধূর নাম। নরম হৃদয়ের চিহ্ন গল্পের মধ্যে লতাকে বেশ্যাবৃত্তির পরিচিত ছক থেকে বাইরে এনেছে। বরাকরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার আন্তরিক মেলামেশাতে ফুটে ওঠেছে সত্যিকারের গৃহবধূর রূপ। মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে থাকা লতা ও প্রসাদের 'চোরাবালির' সংসার যে কোনো মুহূর্তে ধ্বসে যেতে পারে জেনেও লতা অন্তরে যতই ক্ষুব্ধ হোক না কেন বাইরের জগতের কাছে সে প্রশান্ত থেকেছে। প্রসাদ তার 'বাঁধা' পুরুষ হয়েও একদিন বাঁধন ছেড়ে পালিয়ে গেলেও লতা তার বৃত্তিকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করেনি। প্রসাদের প্রতি ক্ষোভে তার মন ধীরে ধীরে 'হিংস্র' হয়ে উঠলেও প্রতিশোধ গ্রহণের কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ সে নেয়নি। বরঞ্চ লতা সাময়িক বধূবেশের আড়ালে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবেগপ্রবণ, আত্ম-বিভোর হ'য়ে উঠেছে। ঘোমটা, সিঁদুর, শাঁখা, নোয়া দিয়ে সাজানো ছদ্ম মূর্তিটায় তার মায়া পড়েছে বেশি বারবধূর এই মানসিক উত্তরণ গল্পের উপজীব্য বিষয়। লতা এবং আভাদের মতন নারী সভ্য সমাজের গভীরে চোরা স্রোতের মত বয়ে গিয়ে কেবল বেঁচে থাকে হয়তো, কিন্তু পরিণামে যা দেয় তা ওই সমাজকেও কখনো কখনো সময়ের ক্ষত চিহ্ন বুঝতে না দেওয়ার মতনই গুরুত্বপূর্ণ। লতারা মরে কিন্তু বাঁচায় প্রাসাদের 'দুলাল' প্রসাদদের। এদের ইতিহাস কানাগলি বাঁকে শেষ হলেও শেষ পর্যন্ত সভ্যতার চিহ্ন হিসাবে আলোক বর্ষিত করে। সুবোধ ঘোষের অন্তর্দৃষ্টি সে জীবনকে একালের প্রেক্ষিতে মূর্ত করেছে।

ফসিল : সভ্যতার দস্তাবেজ

ভাস্কর চৌধুরী

এক

উত্তর-রৈবিক বাংলা ছোটগল্প প্রকৃতি ও প্রকরণে, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের নানা জটিলতর অভিনিবেশে যেভাবে নিত্যনতুন পথে বাঁক নিয়েছে, বদলেছে তার পুরোনো স্থানাঙ্ক, সেই পরিব্রজনের অন্যতম সারণিক সুবোধ ঘোষ।

'ফসিল' শুধুমাত্র সুবোধ ঘোষের রচনাবিশ্বেই নয়, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসেও একটি মাইলফলক। ছোটগল্পের কলাবিধি প্রসঙ্গে বলেছিলেন হাডসন : "Singleness of aim and singleness of effect are, therefore, the two great canons by which we have to try to the value of a short story as piece of art."[১] ঈক্ষণীয়, 'ফসিল' গল্পে সভ্যতার পটপরিবর্তনের বহুকৌণিক অভিঘাতকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যাকে কখনই 'singleness of aim' বলা চলে না। এই গল্পের কালক্ষেত্র যথেষ্ট ব্যাপ্ত। যা অনেকটাই উপন্যাসেব বিষয়ানুগ। বংচটা সামন্ততন্ত্রের শূন্যগর্ভ দেমাক আর শোষণনীতির চুম্বকতথ্যে গল্পেব শুরু। এরপব সময়-চাকাব ঘূর্ণাবর্তে লুপ্তশ্রী অঞ্জনগড়ের শ্রীময় হবাব ইতিহাস। যাব অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে বিদেশী বেনিয়াতন্ত্রেব দাপট ও সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের সংঘাতে গল্পের এগিয়ে চলা। ইতিহাসের এই পটপরিবর্তনকে চলচ্চিত্রের দ্রুতগামী clipping এর মত. ব্যবহার করা হয়েছে 'ফসিল' গল্পে। অথচ দুটি সিস্টেমের সংঘাত আর আতাঁতের পালাবদলে এগিয়ে চলা পরিণতিটি একাধিক 'aim' ও 'effect'-কে সঙ্গে নিয়ে বিন্দুবৎ লক্ষ্যে এসে মিশেছে। 'ফসিল'-এর উপন্যাসোপম বিষয়ভাবনার ছোটগল্পধর্মী সিদ্ধি এখানেই।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের রচনাকাল ১৯৪২। 'ফসিল' গল্প-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নামগল্প এটি। গল্পটিকে ভূমিষ্ঠ করেছে যে সময় সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে গল্পের স্বরূপ সন্ধান অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

চল্লিশের দশক শুধু ভারতের ইতিহাসেই নয়, বৈশ্বিক মানচিত্রেরও এক ভাঙনকাল। একদিকে দ্বিতীয় মহাসমরের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গিয়েছিল মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত ধ্যানধারণা। রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটা নিষ্ঠুর সময়ের দিকে তাকিয়ে মানুষ উপলব্ধি করলো সে অমৃতের পুত্র নয়, রণরক্তসফলতাই সভ্যতার অন্তিম গন্তব্য। 'ভবিতব্য ভারাতুর' সভ্যতাকে ইতিহাসের পটে প্রতিষ্ঠিত করে সুধীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ যেন আর্ত সময়দ্রষ্টাব সভ্যভাষণ

১ An Introduction to the study of literature (1944), Page 340

"জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যতো না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।"

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাভূমিতে জন্ম নিয়েছে 'ফসিল'-এর মত গল্প। এই গল্পে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি চিত্রিত না হলেও বেনিয়ার ছদ্মবেশে সাম্রাজ্য আগ্রাসনের বিষয়টি স্পষ্ট। এদেশের সামন্তপ্রভুরা নিজেদের বিত্ত ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার কারণে বিদেশী রাজশক্তি বা বণিকশক্তির সঙ্গে সেসময় গাঁটছড়া বাঁধতো, এমন দৃষ্টান্তও সুলভ ছিল। বাংলা সাহিত্য ব্যতিরেকে সমকালীন প্রতিবেশী সাহিত্যেও আমরা এই সম্পর্ক-সমীকরণের ছবি পাই। ঝাবের চন্দ মেঘানীর গুজরাটী উপন্যাস 'সোরেঠ, তেরা বহেতা পানি' (১৯৩৭), অড়িবি বাপিরাজুর তেলুগু উপন্যাস 'নারায়ণরাও' (১৯৪৪), গজানন্দ ত্র্যম্বক মাডখোলকরের মারাঠীতে লেখা 'শাপ' (১৯৩৯) প্রভৃতি রচনায় শাসকের অত্যাচারে কৃষকদের অসহায়তার ছবি যেমন আছে, তেমনই অর্থনৈতিক পালাবদল ও যুগসন্ধির অস্থিরতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই ভাঙনকালেরই দস্তাবেজ হয়ে উঠেছে ফসিল।

দুই

'ফসিল' গল্পের শুরুতেই লেখক এই গল্পের ঘটনাস্থল অঞ্জনগড়ের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই পরিচিতি শুধুমাত্র স্থানিক বা ভৌগোলিক বিবৃতি নয়, অঞ্জনগড়ের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোটিরও উল্লেখ রয়েছে গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে।

Narrative form-এ রচিত এই গল্পে অঞ্জনগড় সম্পর্কে প্রথমেই বলা হয়েছে এটি একটি নেটিভ স্টেট অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য। তবে লেখক এই রাজ্যের যে আয়তন নির্দেশ করেছেন (সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল) তা রাজ্যটির অতিকৃশতাকেই প্রকাশ করে।

অঞ্জনগড়ের ক্ষুদ্রত্বের বিপ্রতীপে সেই রাজ্যের শাসকের ফিউডাল দেমাকের হাস্যকর অতিরেককে গল্পকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইলের অধীশ্বরের গোটা কুড়ির উপর উপাধি—এই আয়রনিটি গল্পের শুরুতেই অরাতিদমনের চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এহেন অরাতিদমনের রাজ্যপাট চালানোর অমানবিক নির্মমতাও অভ্রান্ত ইঙ্গিতে স্পষ্ট—"......অপরাধীকে শুধু উলঙ্গ করে নিয়ে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।"

অঞ্জনগড়ে অরাতিদমনের রাজ্যপাটের সংক্ষিপ্ত অথচ জরুরী ময়নাতদন্তের পর গল্পকার জানিয়েছেন রাজ্যের প্রজাদের জীবনযাত্রার কথা। স্বাভাবিকভাবেই করদ রাজ্যগুলির পীড়িত প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক ভগ্নদশা নিয়তির অমোঘতায় জীবনে লেপ্‌টে থাকে। 'ফসিল' গল্পেও প্রজাপীড়নের সেই ধারা অব্যাহত। তারই প্রমাণ রয়েছে এই বাক্যে :

"সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের চাপে উত্যক্ত হয়ে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পড়েছে

দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।"

সত্যজিৎ রায় তাঁর 'হীরক রাজার দেশে'-তে চারণ কবির গলায় আমাদের শুনিয়েছিলেন সামন্ততন্ত্রের অভ্রান্ত 'সুভাষিত'—"সোনার ফসল ফলায় যারা, দুই বেলা জোটে না আহার।" 'ফসিল' গল্পে অঞ্জনগড়ের কুর্মী আর ভীল প্রজাদের নিয়তিও এই গতেই বাঁধা। তাই তারা 'বেহায়াব মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিনসন্ধ্যার সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়।"

গল্পেব প্রথম অংশে এভাবেই অঞ্জনগড়ের 'উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে'-র এক সংহত ছবি এঁকেছেন গল্পকার। যেখানে শাসনতন্ত্র আর লাঠিতন্ত্র একাকার। অঞ্জনগড়ের সামন্তশাসনের এমনই পড়তি দশায় দরবারের ল এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হলেন মিস্টার মুখার্জ্জী। গল্পের পরবর্তী অংশে কাহিনীর বাঁক পরিবর্তনে মুখার্জ্জী চরিত্রটিকে গল্পকার দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গল্পে মুখার্জ্জী চরিত্রটির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে গল্পকার যে কয়েকটি বাক্য ব্যবহার করেছেন তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তার শিক্ষিত, আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত সত্তাটি :

"আমাদের মুখ্যার্জ্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলায় ইতিহাস-পড়া ডিমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িযে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস কবে—যে সৎসাহসী যে কখনো পবাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।"

মুখার্জ্জীর স্বপ্ন আর উদ্যমেব সোনারকাঠির ছোঁয়ায় লুপ্তশ্রী অঞ্জনগড় হয়ে উঠল শ্রীময়। আবিষ্কৃত হল অঞ্জনগড়ের আন্তর্ভৌম সম্পদ। গ্রহণলাগা সামন্ততন্ত্রের ভবিষ্যৎ রাহুমুক্ত হল। কেননা ভূগর্ভে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের বিশাল ভাঁড়ার খুঁজে পাবার পর কলকাতার মার্চেন্টদেব ডাকিয়ে ঐ কাঁকুরে অঞ্চলগুলিকে লাখ লাখ টাকার ইজারা করিয়ে দেওয়া হল। গড়ে উঠল মাইনিং সিন্ডিকেট, ধাওড়ার পর ধাওড়া। অত্যাচারিত কুর্মী আর ভীল প্রজারা চাষাবাদ ছেড়ে যোগ দিল খনিশ্রমিকের জীবিকায়।

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সম্পর্কটি ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ একটির বাড়বাড়ন্তে অপরটির ধ্বস নামা নিশ্চিত। তাই অঞ্জনগড়ে গিবসনের উত্থান অরাতিদমনের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। আসলে উভয় ব্যবস্থারই টিকে থাকার প্রধান মূলধন শ্রমজীবী মানুষ। অরাতিদমনের রাজ্যে যারা ছিল কুর্মী কৃষক তারাই পরিণত হল খনিমজুরে। কৃষক প্রজাদের এই মজুরে রূপান্তর কৃষিনির্ভর সামন্ততন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। সে কথা শোনা গেছে মুখার্জ্জীর উচ্চারণে : "সব কুর্মী প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলেছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহলে কি করে বাঁচে বলুন তো?"

এরপর শুরু হল শ্রমজীবীদের কেন্দ্র করে দুই পরজীবীর প্রকট প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বুর্জোয়া শক্তির এই সংঘাতকে প্রথমদিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল শ্রমজীবী কুর্মী

ও ভীল গোষ্ঠীরা। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল দুলাল মাহাতো। মরিসাসের চিনির কলে সারাজীবন প্রাণপাতের বিনিময়ে যে দুলাল বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য পেয়েছে নগদ সাতটি টাকা আর বুক ভরা হাঁপানি। সে চায় না অঞ্জনগড়ের নতুন খনিশ্রমিকরা তার মতো ভুল করুক। তাই তার জীবনমন্ত্র হল : "এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।"

জীবন থেকে শেখা এই সারসত্য দুলাল শুনিয়ে দেয় তার সহজীবীদের। আর সেই প্রত্যয়েই তারা জোটবদ্ধ হয়ে জানিয়ে দেয় সামন্তপ্রভুকে : "যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির সাহেবদের কথা মানতে বাধ্য।"

এবার অরাতিদমনের সামনে দেখা দেয় এক নতুন চ্যালেঞ্জ। রাজার দীর্ঘদিনের অনুগত প্রজারা হঠাৎই হয়ে ওঠে অবাধ্য। বলাবাহুল্য সঙ্গে ছিল ইংরেজ সাহেবদের মদত। চোখরাঙানি আর শাস্তির হুঙ্কারেও যখন কাজ হল না তখন সমঝোতার পথ খোঁজার চেষ্টা করল রাজতন্ত্র। সেই চেষ্টার সারথি মিস্টার মুখার্জী। 'রথের রশি' নাটিকার দূরদর্শী মন্ত্রী যেমন শূদ্রদলের সুপ্ত শক্তিকে চিনতে পেরে বলে উঠেছিল—

"বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।"

—ঠিক তেমনই দলিত গোষ্ঠীর নেতার সঙ্গে কথা বলে মুখার্জীর মনে হয়েছিল— "রোগ তো ধরেই ছিল অনেকদিন; এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।"

মুখার্জীর দ্বিতীয় উদ্যোগও ব্যর্থ হল ইংরেজ বণিকসংঘের সঙ্গে কথা বলার পর। তুঁষের আগুনের মত জ্বলতে থাকা প্রজাবিদ্রোহকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে চাইল ইংরেজ বেনিয়ারা। মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলে প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে তারা সরব হল। নিজেরা যে 'মনিমেকার' নয় এমন 'মহৎ' বিজ্ঞাপনে তারা মুখার্জীর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল সরাসরি। তাকে চিহ্নিত করল 'মংকি অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' রূপে।

নব্য বণিকতন্ত্রের এই দাপট অঞ্জনগড়ের রাজনীতির আকাশে ঘনিয়ে তুললো সঙ্কটের কালো মেঘ। অসহায় মুখার্জী ভাষা খুঁজে পেল না রাজাকে আশ্বস্ত করার। নিজের জীবিকাগত দায়বদ্ধতা নিয়েও সে দোলায়িত। অরাতিদমনের নিষ্ফল আক্রোশ আর অন্তর্দাহ মুখার্জীকে করে তুললো আরও বিভ্রান্ত, যন্ত্রণার্ত। সে অব্যাহতি চাইল তার কর্মভার থেকে। যদিও মহারাজার আস্থা আর নির্ভরতা এই সিদ্ধান্তকে বানচাল করে দিল। গল্পের মাঝপথে মুখার্জীর অস্থিতি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব এক অনবদ্য চিত্রকল্পে প্রতীকায়িত। ক্যান্টারে ঘোড়া ছুটিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত পোলো লনে ছুটে বেড়ানোর বর্ণনাটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় তার তোলপাড় মনের ছাইচাপা টেনশানকে।

তাঁতের মাকুর মত শ্রমজীবীদের নিয়ে দুই বিবাদমান বুর্জোয়া গোষ্ঠীর টানাটানি যখন চরমে তখনই এগিয়ে আসে গল্পের ক্লাইম্যাক্স। একই সঙ্গে ঘটে যায় দুটি বিপর্যয়। বিনা টিকিটে কুর্মীরা লকড়ি কাটছিল। ফরেস্ট রেঞ্জার তাদের বাধা দেয়। ফৌজদারদের গুলিতে প্রাণ হারায় বাইশ জন প্রজা। অন্যদিকে চোদ্দ নম্বর পীট ধসে পড়ায় শতাধিক কুর্মী কুলি মারা যায়। প্রথম দুর্ঘটনার দায় অরাতিদমনের। দ্বিতীয়টি বণিকসংঘের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিণাম। ধনতন্ত্রের এই দুটি স্তম্ভ পিঠ বাঁচানোর দায়ে পারস্পরিক শত্রুতাকে ধুয়ে মুছে আঁতাতের এক জঘন্য খেলায় নামে। এই খেলায় তারা দুলাল মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে। অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায় দলিতদের গণআন্দোলন। যদিও এই গ্রেপ্তারের পরিকল্পনা মুখার্জীর মস্তিষ্কপ্রসূত। তবুও আমরা বুঝি সে তার সিদ্ধান্তের ফলপরিণাম আঁচ করতে পারেনি। কেননা গিবসন আর ম্যাককেনারা যখন বন্দি দুলালকে দাবার শেষ চালের ঘুঁটি করে তখন—"নিরুত্তর মুখার্জী চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।"

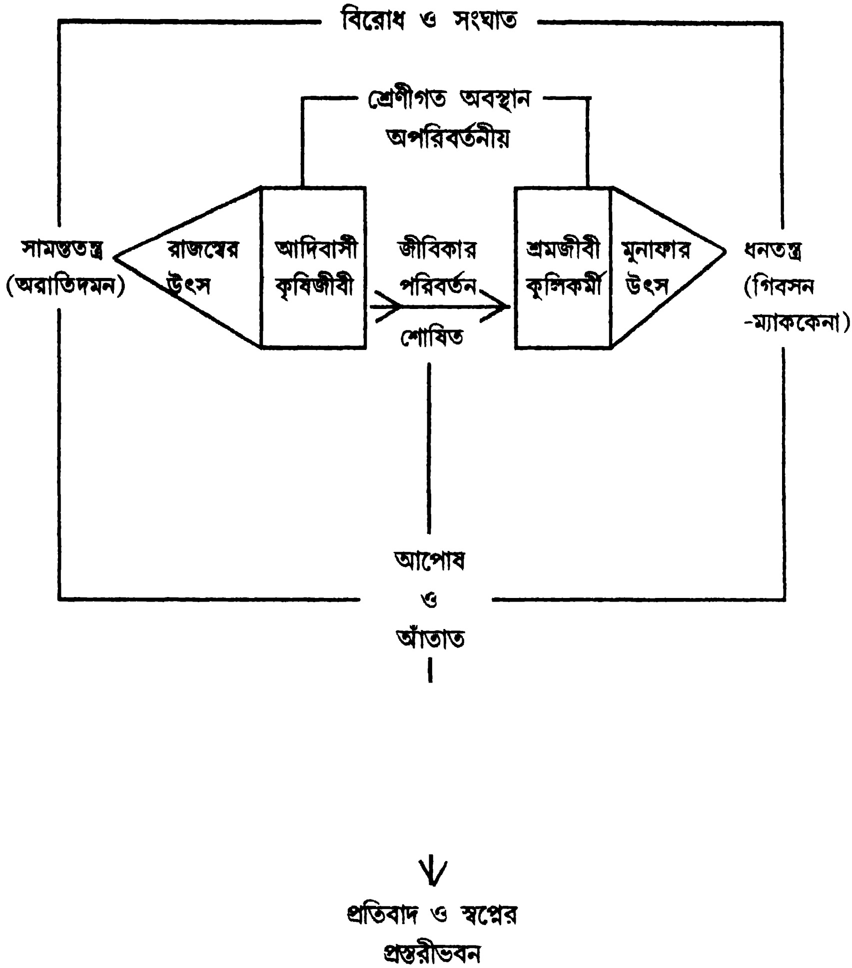
পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা নতুন নয়। বুর্জোয়ারা পরস্পবের প্রতিযোগী হলেও দলিতদের অভ্যুত্থানে এরা বেসামাল হলে একযোগে মারণমৃগয়ার আয়োজন করে। দুলালকে হত্যার পরিকল্পনায় দলিত শক্তির আন্দোলনের বীজটিকেই খনিগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ধসে পড়া পীটের তলায় প্রস্তরীভূত হয়েছে জনমানবের বিপ্লব প্রচেষ্টা।

গল্পের উপসংহারটি এক গভীরতর ব্যঞ্জনায় 'সভ্য' পৃথিবীর পাঠক-চৈতন্যকে অভিঘাতগ্রস্ত করে। যে 'সভ্য' পৃথিবীতে এই গণ আন্দোলনের রুধিরাক্ত কাহিনী কোন দিনই প্রকাশের পথ খুঁজে পাবে না। এই গণনিধন হয়তো ব্যাখ্যাত হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাত্ত্বিকতায় :

"জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল.....। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের দাগ নেই।"

সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস এভাবেই অব্যাখ্যাত, অনির্দেশ্য থেকে যায়। 'জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল' তার হদিশ খুঁজে পায় না। গল্পের পরিণামে পলেস্তারার আড়াল খসিয়ে আমরা যেন মুখোমুখি হই সভ্যতার উলঙ্গ রূপটির। সমাজের প্রপীড়িত গোষ্ঠীকে নিয়ে পরশ্রমভোজী বুর্জোয়াদের অশুভ প্রতিযোগিতা ও শোষক-শোষিতের মেরুগামী সম্পর্কের ধ্রুবত্বকে এই গল্পে অব্রণ রূপনির্মিতিতে তুলে ধরেছেন সুবোধ ঘোষ। ফলত অবিবেকী সভ্যতার এক অভ্রান্ত প্রচ্ছদ হয়ে উঠেছে 'ফসিল'।

'ফসিল'-এর প্রতিপাদ্য কাহিনীবিন্যাসের লেখচিত্র।



তিন

'ফসিল' গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায়, গল্পকারের কৈশোরজীবনের অভিজ্ঞতাধৃত স্মৃতিচারণার কয়েকটি লাইন—

"কৈশোর কালের একটি প্রাপ্ত সম্বলের কথা মনে পড়ে, যার রূপটা বস্তুত রূপকথারই মত একটি আবেশ দিয়ে গড়া। পিতামহের বন্ধু রায়বাহাদুর পার্বতী নাথ দত্ত, যিনি ভারতের

জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, তিনি নদী, পাহাড়, সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার গল্প বলতেন, বড় বড় প্রাণীর হাড় পাথর চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়।"

কৈশোরে পিতামহের বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এই জীবাশ্মের গল্পই হয়তো লেখকের শিল্পচেতনায় সুপ্ত ছিল। ধরে নিতে পারি, সেই স্মৃতিকেই তিনি হয়তো ফসিল গল্পে শিল্পমূল্যে ঢালাই করেছেন শ্রমজীবী বিপ্লব-প্রচেষ্টার অপমৃত্যুকে প্রতীকায়িত করার জন্য।

'ফসিল' গল্পটির নামকরণের ব্যঞ্জনাবহতা দুটি ভিন্নস্তরে ভিন্নমাত্রায় করা উচিত। ফিউডাল ব্যবস্থার শোষণ ও মুনাফাখোর বণিকসংঘের বিবাদ ও আঁতাতের কাহিনী বেয়ে যেভাবে এই গল্পে কুর্মি প্রজাদের আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল, গল্পের নামকরণে তা প্রতীকায়িত। আবার মিস্টার মুখার্জীর স্বপ্ন-উদ্যম-আদর্শের প্রস্তরায়ণের প্রেক্ষিতেও নামকরণের শিল্পসিদ্ধি বিচার্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকে যক্ষপুরীর খনিশ্রমিকদের যে বিরামহীন যন্ত্রপেষিত জীবনযাত্রাকে দেখিয়েছেন অঞ্জনগড়ের খনিশ্রমিকদেরও ভবিতব্য সেই একই সুরে বাঁধা। যক্ষপুরীর খনিশ্রমিকদের চিহ্নিত করা হয়েছিল সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়ে। তারা কেউ '৬৯ঙ', কেউ '৪৭ফ'। কেননা ধনতন্ত্রের পরিচালকেরা এদেব শুধুমাত্র উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য করে। রক্তকরবীতে এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে—"আখের মত চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে।" ফসিল গল্পে দুলাল মাহাতো ও তার সহজীবীরা এই একই সিস্টেমের শিকার। যে দুলাল মাহাতো সম্পর্কে বলা হয়েছে "বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে।" গল্পের পরবর্তী স্তরে এই দুলালের নেতৃত্বেই নিজেদের দাবী আদায়ে সরব হয়েছে অঞ্জনগড়ের খনিশ্রমিকরা। মাহাতো তার অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে অধিকার কেড়ে নিতে হয়। সে নিজের শ্রমিকজীবনের উপান্তে এসে সকলকে সংঘবদ্ধ করেছে।

কিন্তু বুর্জোয়াদের নিঃশব্দে ছুবি চালানোর কৌশল সম্পর্কে দুলালের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল না। বিনা টিকিটে লকড়ি কাটায় জঙ্গলে ফৌজদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় বাইশ জন কুর্মি প্রজা। ঘায়েল হয় পঞ্চাশের ওপর। অন্যদিকে খনিগর্ভে ধস নামায় কোয়ার্টার্সের তলায় চাপা পড়ে যায় নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুর্মি কুলি। খনিগর্ভে কুলিরা চাপা পড়ায় চূড়ান্ত গাফিলতির কারণে কোণঠাসা হয়ে যায় ইংরেজ বেনিয়ারা। অন্যদিকে জঙ্গল-রক্ষীদের বেপরোয়া গুলিতে নিরীহ প্রজারা নিহত হওয়ায় ধসে যায় অরাতিদমনের প্রতাপ।

সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের শীর্ষনেতৃত্ব যুযুধান সম্পর্কের তিক্ততা বদলে গিরগিটির মত রং পাল্টে আঁতাতের হাত মেলায়। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে তারা কুর্মিদের

অবশ্যম্ভাবী প্রতিবাদ-প্রচেষ্টাকে সমূলে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাতের অন্ধকারে ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে লাসবোঝাই ট্রাক এসে থামে খনিগর্ভের সামনে। সেইসঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা দুলাল মাহাতোকে হত্যা করে তার কম্বলে মোড়া লাশ আসে নিধনযজ্ঞের সমিধ হিসাবে। এ যেন শুধু কুর্মি কুলিদের নয়, সভ্যতার নিহত বিবেকের শবযাত্রা। গল্পকার এই মারণমৃগয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এক নিরাবেগ শ্লেষোক্তিতে।

গল্পের শেষে নামকরণের অব্যর্থ ইঙ্গিতটি আনুভাব্য হয়ে ওঠে যখন গল্পকার পরবর্তী পৃথিবীর চোখ দিয়ে অঞ্জনগড়ের খনিগর্ভে চাপা পড়া কুর্মি কুলীদের তাত্ত্বিক তদন্তের ছবি আঁকেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকরা হয়তো এই হতভাগ্যদের মৃত্যুর কারণ হিসাবে আকস্মিক ভূ-বিপর্যয়কে দায়ী করবে। তাদের ঘামে-রক্তে মাখামাখি জীবনযুদ্ধ, তাদের নারকীয় পীড়নের ইতিহাস, জানা থাকবে না ভবিষ্যৎ পৃথিবীর।

হয়তো এটাই সভ্যতার ভবিতব্য। ইতিহাস হয়তো সংকলিত তথ্যের ভিড় শুধু, সেখানে জীবন ও তার প্রবাহ স্বরূপে, স্বধর্মে প্রতিভাত হয় কি? 'ফসিল' গল্পে শুধুমাত্র একটি অন্ত্যজ শ্রমজীবীগোষ্ঠীকেই হত্যা করা হয়নি, নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে এক নিদারুণ জীবনসত্যকেও। ইতিহাসের সাজানো তথ্যেব তৈরী করা ভিড়ে এভাবেই চাপা পড়ে যায় সভ্যতার রুধিরাক্ত সত্যগুলি। 'ফসিল' নামকরণটি এই শিল্পসার্থকতাতেই উজ্জ্বল।

এবার আসা যাক নামকবণের দ্বিতীয় তাৎপর্যে। মুখার্জী রাজাকে দেখাতে চেয়েছিল বাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয়, সেটাও একটা আর্ট। তাই ঘোড়ানিম আর ফণিমনসায় ছাওয়া অঞ্জনগড়ের অনুর্বর মাটিতে সে শিরাউপশিরার মত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তার ইরিগেশন স্কীমের প্রকল্পটি। সে চেয়েছিল ভূমি বণ্টনের সাম্য। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথাপিছু এক বিঘা জমি দিয়ে বিনা সেলামিতে, পাঁচ বছরের খাজনা মকুব করে তাদের দিয়ে ফসল ফলাতে চেয়েছিল সে। লেখক মুখার্জীর স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন— "শিল্পীর তুলির আঁচড়েব মত এক একটি এস্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে।" মুখার্জীর এই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সাবয়ব হয়ে ওঠেনি। যে মানুষদের জন্য তার এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সে নিজের অজান্তেই সেই দলিত গোষ্ঠীর হত্যালীলার চক্রান্তের অংশীদার হয়ে উঠেছে।

'কল্যাণকৃৎ' মুখার্জীর প্রকল্প আর প্রত্যাশা যেভাবে তার প্রভুদের অঙ্গুলিহেলনে নিষ্ফল হয়ে গেছে, তাও এই গল্পের নামকরণে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। স্বপ্নসন্ধানী মুখার্জী পরাভূত সৈনিকের মতই 'রণরক্তসফল' পৃথিবীতে নিজের আদর্শ আর পরিকল্পনার প্রস্তরীভবন লক্ষ্য করে। এই গল্পে আমরা তার শুভঙ্কর স্বপ্নের এক বিনষ্ট জীবাশ্মকেই খুঁজে পাই শুধু। এভাবেই 'ফসিল' গল্পের নামকরণটি একাধিক বেদ্যমানতায় আমাদের অভিনিবেশকে সচেতন করে

তোলে। বিবেককে বিদ্ধ করে সায়কের মত। শব্দসিদ্ধ সুবোধ ঘোষ এই গল্পের নামকরণে যে অভ্রান্ত শিল্পসার্থকতার সিলমোহরটি মুদ্রিত করেছেন, তা প্রমাণ করে গল্পকার হিসাবে তাঁর অপ্রতর্ক সার্থকতা।

চার

গল্প হিসাবে 'ফসিল' চরিত্রমুখ্য নয়, ঘটনামুখ্য। সমাজ-অর্থনীতির পটপ্রেক্ষায় শোষক-শোষিতের চিরায়ত সম্পর্কের বিন্যাস ও পরশ্রমভোজী ধনতন্ত্রের স্বরূপ এ গল্পে মস্তাজের দক্ষতায় চিত্রিত। সেই সূত্রেই এ গল্পের চরিত্রগুলি স্বল্প পরিসরে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শ্রেণীপরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অঞ্জনগড়ের অরাতিদমন আসলে স্বাধীনতার অনতিপূর্বে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় কোনক্রমে টিকে থাকা অবসন্ন সামন্ততন্ত্রের এক চেনা প্রোটোটাইপ। তবে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের চিত্রণে তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন ছিল সুবোধ ঘোষের তা নয়। বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্রের উদয়ের সন্ধিলগ্নে 'জলসাঘরে'র বিশ্বম্ভর রায়, 'কালিন্দী'র রামেশ্বর চক্রবর্তী বা 'কীর্তিহাটের কড়চা'-র রত্নেশ্বর রায় আভিজাত্যে সন্দীপ্ত। এরা অনেকেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ, বিলাসী ও আত্মগরিমায় অন্ধ হলেও প্রজাবৎসল, কর্তব্যপরায়ণ। মহিম গাঙ্গুলী, বিমলবাবু বা গোপীচন্দ্রের মত প্রত্যাসন্ন কালের পুঁজিপতিদের আগমনে এদের অস্তমিত প্রতাপ অনেকটাই ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায় চিত্রিত।

'ফসিল' এর অরাতিদমন এই গোত্রের নয়। গল্পকার তাকে এঁকেছেন কিছুটা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রথম থেকে শেষ পরিচয়ে যে শুধুই অত্যাচারী। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেই অরাতিদমনের নির্মম শাস্তিবিধানের বিভীষিকা দিয়ে তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় শুরু। অপরাধীকে উলঙ্গ করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া, তসিলদারদের দিয়ে প্রজাদের ফসল লুঠ করানো, লাঠিতন্ত্রের যত্রতত্র দাপট—তার শাসনতন্ত্রের এমনই কিছু নমুনা গল্পের প্রথম দিকে বর্ণিত। এই শাসকই যখন 'নরপাল' বা 'ধর্মপাল' বিশেষণে আখ্যায়িত হন তখন তা হয়ে ওঠে এক সুতীব্র শ্লেষ। অত্যাচারী সামন্তপ্রভুর টিপিক্যাল মডেল হিসাবে অরাতিদমন চিত্রিত বলেই, তার মধ্যে কোন মানবিক টানাপোড়েন বা বিষণ্ণ ট্রাজেডির ছোঁয়া এসে লাগেনি।

অর্থনৈতিক পালাবদলের দুটি পর্যায়েই অরাতিদমনের চরিত্রের মৌলিক প্রবণতা একইরকম থেকে গেছে। সামন্ততন্ত্রের একচ্ছত্র ব্যবস্থায় রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাই প্রজাপীড়নও চলতো নির্বিচারে। কিন্তু নবোদিত ধনতন্ত্রের আগমনে রাজাকে সতর্ক হতে হল। দলে দলে কুর্মি কৃষকদের শ্রমিকে রূপান্তর অরাতিদমনের কপালে ভাঁজ ফেললো। সামন্তপ্রভুরা যেহেতু রাজ্যপাটে অসপত্ন আধিপত্য পেতেই অভ্যস্ত তাই গিবসন-ম্যাককেনাদের সতর্কবার্তা,

প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন হুমকি রাজার ইগোকে ধাক্কা দিল বড়রকমের। যদিও ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বে বিবাদমান শাসকেরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তারা মতৈক্যে পৌঁছায় শোষণযন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে। আর সেই নিয়ম মেনেই অরাতিদমন হাত মিলিয়েছে ইংরেজ বণিকসংঘের সঙ্গে।

গল্পকার যদি অরাতিদমনকে সিংহের উপমানে তুলনায়িত করেন তবে আমরা গিবসন-ম্যাককেনাদের ধূর্ত নেকড়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। নবোদিত ধনতন্ত্রের এই প্রতিভূরা সামন্তপ্রভুদের থেকেও মারাত্মক। কেননা এদের শোষণ ছদ্মবেশী। নিপীড়িত মানুষদের সেবায় ও স্বার্থরক্ষায় এরা নিবেদিতপ্রাণ—এমন এক মানবিক খোলস সামনে রেখে এরা শোষণ করে। শ্রমিকেরা এদের দৃষ্টিতে উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এই পুঁজিবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে। আজকের পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটিকায় —"এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও/ বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টঙ্কার।/ তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে/ ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।"

গল্পের শেষে এই স্বার্থান্ধ বেনিয়ারাই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরা জানি বুর্জোয়াগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালালেও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মুহূর্তে তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হয় 'বৃহত্তর' স্বার্থে। সভ্যতার এই উলঙ্গ রূপটি ইতিহাসের আবহমান ধারায় পুনরাবর্তিত হয়েছে বারবার। আমাদের মনে পড়ে যায় ক্রিস্টোফার কডওয়েলের "স্টাডিস ইন ডাইং কালচার" গ্রন্থের সেই উচ্চারণ—

"Society seems held together, not by mutual love or tenderness or obligation, but simply by profit. Money makes the bourgeois world go round and this means that selfishness is the hinge on which bourgeois society turns, for money is a dominating relation to an owned thing."

পাঁচ

ধনবিজ্ঞানের মর্মস্থল ফসিল গল্পের মুখার্জীও আবিষ্কার করেছেন নিজের পেশাগত অভিজ্ঞতায়। তবে প্রত্যেক চরিত্রই যেহেতু শ্রেণীগত পরিচয়কে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি চরিত্রই, তাই 'গোত্রান্তর'-এর সঞ্জয়ের সঙ্গে মুখার্জীর শ্রেণীগত সামীপ্য থাকলেও চরিত্রগত তফাত অনেকটাই। সঞ্জয় যতটা বিশ্বাসঘাতক এবং আত্মসুখান্বেষী মুখার্জী ততটা নয়। তাই 'গোত্রান্তর' গল্পে সঞ্জয়ের পরিণতি যেমন চরিত্রটির স্খলনকে স্পষ্ট করে তোলে, 'ফসিল' এর মুখার্জীর পরিণতি পরিবর্তে জাগিয়ে তোলে এক বিষণ্ণ সংবেদনা।

মুখার্জী এমন এক ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখত যেখানে প্রতিটি প্রজা হবে শিক্ষিত। স্বনির্ভর। যেখানে রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক হবে পিতা-পুত্রের মত। মুখার্জী আইনী উপদেষ্টার দায়িত্ব নেবার পরেই তার প্রতিটি পরিকল্পনাকে সাবয়ব করে তোলার লক্ষ্যে অবিচল ছিল। সে দেখাতে চেয়েছিল : "রাজ্যশাসন লাঠিবাজী নয়, এও একটা আর্ট।"

উদ্যমী মুখার্জী তার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা প্রথম টের পেল প্রজাদের জন্য স্কুল করতে গিয়ে। বাধা দিলেন স্বয়ং রাজা। এরপর থেকেই ক্রমশ তার স্বপ্নভঙ্গের পালা শুরু। দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে কুর্মি প্রজাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের উদগীরণ আর গিবসনদের প্রজাবিদ্রোহে মদত অঞ্জনগড়ে ঘনিয়ে তুললো এক নতুন সঙ্কট। মহারাজা সেই সঙ্কটমোচনের দায়িত্ব দিলেন মুখার্জীকে। মাহাতোর সঙ্গে কথা বলে সে বুঝল—"রোগ তো ধরেই ছিল অনেকদিন, এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।"

গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে মুখার্জী মুখোমুখি হল আরও এক কঠোর পরিস্থিতির। যে ইংরেজ বণিকসংঘকে সে নিজে অঞ্জনগড়ে প্রবেশের পথ করে দিয়েছিল তারাই মুখার্জীকে চিহ্নিত করল—"মংকি অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর" অভিধায়।

মুখার্জী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অন্তর্দাহ গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য সাংকেতিকতায়— ঘোড়ার পিঠে চড়ে খ্যাপা ঝড়ের মত পোলো খেলার বর্ণনায়। সে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয়— "পরের রথের সারথ্য আর বোধহয় চলবে না তার দ্বারা"। আবার অরাতিদমনের অসহায়তা ও অশ্রুভেজা চোখ তার মনকে দুর্বল করে তোলে। এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়েই তার চরিত্রে প্রবেশ করে স্বপ্নভঙ্গের ট্র্যাজেডি। আসলে মুখার্জীর বিবেকী মানসিকতার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ট্রাজেডিব বিপর্যয়।

অঞ্জনগড়ের কুর্মি প্রজাদের প্রতিনিধি হিসাবে দুলাল মাহাতো চরিত্রটিও স্পষ্টরেখায় উজ্জ্বল। নিজের জীবনজাত অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে শ্রমজীবী মানুষেরা আসলে উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র। কখনও সামন্তপ্রভুর রাজকোষ ভরাতে তারা অত্যাচারিত আবার কখনও পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতায় তারা নিষ্পেষিত। পাবলো নেরুদার ভাষায় :

"নিজেদের মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে-করে
রোগা হয়ে গেছে তারা সবাই,
তাদের ছোট্ট, সংক্ষিপ্ত অহর্নিশ মৃত্যুর জন্যে।"[২]

দলিত মানুষদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সেই প্রথম সংঘবদ্ধ করেছে মার খেতে খেতে শেষ হয়ে যাওয়া কুর্মি শ্রমিকদের। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সে একত্রিত করেছে তার জাতিভাইদের।

২ মাচু পিচুব শিখব : পাবলো নেরুদার বচনাসংগ্রহ, অনুবাদ ও সম্পাদনা—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে তাদের জীবন-সংগ্রামের ইস্তাহার—"পেট আর ইজ্জত, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনমতেই ক্ষমা নয়।" কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে সে যেমন অরাতিদমনকে সবিনয় দৃঢ়তায় জানিয়েছে তাদের দাবী, তেমনই খনিশ্রমিকদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেন্ট, ছুটি, ভাতা, ওষুধের ব্যবস্থা নিয়ে কথা চালিয়েছে খনিমালিকদের সঙ্গে। কিন্তু বুর্জোয়া শক্তি তার এই নেতৃত্বকে ভাল চোখে দেখেনি। তারা বুঝেছিল—"এই মেঘেই বজ্র থাকে।" তাই দুলালের নেতৃত্বে দলিতদের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতেই অরাতিদমন আর গিবসনেরা আঁতাতের হাত মিলিয়ে তাকে হত্যা করল। তার মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে গেল কুর্মি প্রজাদের প্রতিবাদ। পৃথিবীর ইতিহাসে এভাবেই দুলাল মাহাতোদের মরতে হয়েছে শোষকশ্রেণীর ষড়যন্ত্রে। 'ফসিল' গল্পে খনিগর্ভে চাপা পড়া কুর্মি প্রজা আর দুলাল মাহাতোর মৃত্যু সেই সত্যেরই প্রতিভাস।

অযান্ত্রিক : অ-যান্ত্রিক

সুতপা মুখোপাধ্যায়

গল্পটি যন্ত্রকে নিয়ে। যন্ত্রের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য যান্ত্রিকই হবে। অন্যরকম হতে পারে না। কিন্তু পুরো গল্প জুড়ে দেখানো হয়েছে, প্রত্যাশিতভাবে এবং স্বভাবত যা যান্ত্রিক তা কিন্তু যান্ত্রিকতাকে ছাড়িয়ে বুঝি বা জৈবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রাণশক্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। যন্ত্রের যান্ত্রিকতা ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ লক্ষ্যসীমাকে ছাড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্যক দ্বন্দ্ব ও আততি অতিক্রমকারী আশ্চর্য আখ্যানের সেই শিল্পাঙ্গিকের নাম অযান্ত্রিক। স্রষ্টা : সুবোধ ঘোষ।

মানুষ যেখানে অতিরিক্ত নির্মম, মানবিকতার লেশমাত্র তাদের কাছে প্রত্যাশিত নয় বা এভাবেও বলা যেতে পারে বাংলা গল্প সাহিত্যে মানবেতর প্রাণীকে মানবিকতার চেয়ে বেশি আবেগজাত উদ্দীপনায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখি অনেক ক্ষেত্রেই। নিদর্শন স্বরূপ বাংলা সাহিত্যের যেকোনো পাঠক এক নিশ্বাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী, শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পদুটির কথা মনে করতে পারবেন। কয়েকমুহূর্ত পরেই পাঠকের হয়তো মনে পড়ে যাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালাপাহাড়, নারী ও নাগিনী প্রভৃতির কথা। কিন্তু যন্ত্রের মানবিকীকরণ বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে। যন্ত্র ও মানুষের চরিত্র চিত্রণে অসামান্য ভারসাম্য সৃষ্টিতে 'অযান্ত্রিক' গল্পটি উজ্জ্বল।

'বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। দেখতে যদিও জবুথবু কিন্তু কাজের বেলায় বড়ই অদ্ভুতকর্মা বিমলের এই ট্যাক্সি। বড় বড় চাঁইগাড়ির পক্ষে যাহা অসাধ্য, তা ওর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলীপথে ঘোর বর্ষার রাত্রে যখনই ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়িই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি। তাই সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে একমাত্র তখনি শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।'

গল্পের শুরু এভাবেই। বস্তুত, যন্ত্র হয়েও মানবিকতার চেয়ে বেশি আবেগজাত উদ্দীপনায় আত্মপ্রকাশ 'অদ্ভুতকর্মা বিমলের এই ট্যাক্সি'র। মানুষ নয় বা মানবেতর কোনো প্রাণীও নয়, একটি আপাদমস্তক জড় পদার্থ একটি যন্ত্র, যন্ত্র হয়েও কী করে হয়ে উঠল অ-যন্ত্র, একটি মানবিক সত্তার আশ্রয়স্থল, সেই কাহিনীরই আশ্চর্য বুনন 'অযান্ত্রিক'।

'অযান্ত্রিক' বিমল আর জগদ্দলের সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। বিমল জগদ্দলকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকতে চেয়েছে। জগদ্দলকে ঘিরে তার স্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা। সবমিলিয়ে জগদ্দলই হয়ে উঠেছে তার জীবন বা এভাবেও বলতে পারি তার একমাত্র দোসর। বিমলের কাছে জগদ্দল প্রাণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ একটি মানুষী সত্তা।

সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পটি পড়তে পড়তে যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে

নিছক যন্ত্র তো যান্ত্রিক শুদ্ধতায় একেবারেই সক্রিয় হতে পারে না; তাহলে একটি যন্ত্র কীভাবে একটি মানুষের আবেগের আশ্রয় হতে পারে? আসলে নিছক যন্ত্রের তো কোনো মূল্য নেই। মানুষের মতো মানবিক আহ্বানের অপেক্ষায় তাকেও উদ্যত হয়ে উঠতে হয়। 'বুড়ো জগদ্দল'ও বিমলের সেই গভীর আহ্বানে সাড়া দিয়েই হয়ে উঠেছে অ-যান্ত্রিক।

'বস্তুত বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি চমকপ্রদ। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' যুগের সৃষ্টি নিরীক্ষায় মরশুমী অজস্রতার অবসানের পর যেমন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', তারাশঙ্করের 'জলসাঘর'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' নবযুগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' 'ফসিল' গল্প দুটি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নবপ্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করে দিল। অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে, কিন্তু 'অযান্ত্রিকে'র মতো সর্বাঙ্গসুন্দর গল্পটিই নাকি লেককের প্রথম রচনা।'

সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প ভূমিকাংশে একথা লিখেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য।

শ্রীহীন হয়ে 'অপূর্বশ্রী' জগদ্দল ব্যতিক্রম ঐ ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলির তুলনায়। ঔপনিবেশিক চাকচিক্যের নিষ্প্রাণতার আড়ালে জগদ্দল যেন সপ্রাণ প্রতিবাদ। 'জমকালো তরুণ নিউ মডেলের' সঙ্গে পাল্লা দেয় 'তালিমারা হুড, সামনের আর্শিটা ভাঙা, তোবড়ানো বনেট, কালিকুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো' বিমলের জগদ্দল। জগদ্দল যেন গল্পটিতে নিজের মুখে কথা বলে উঠতে চায়। নিজের জরাজীর্ণ অবস্থা জেনেও নিজের কর্মজগতে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণাব লড়াই-এর যুদ্ধে জগদ্দল মুখর একটি চরিত্র।

ক্লাবকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিকতার মোহে বিমল নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। বরং জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে প্রতি মুহূর্তে যুঝতে চেয়েছে জগদ্দলকে সঙ্গে নিয়ে। ঔপনিবেশিকতার জাঁতাকলে বন্দী মানুষ তার মানবিক সত্ত্বা হারিয়ে সুবোধ ঘোষের গল্পে কোথাও হয়ে উঠেছে যন্ত্র, কোথাও বা রঙ চড়ানো সামন্ততন্ত্র ও বণিকবেশী ধনতন্ত্রের বাহ্যিক বিরোধের অন্তরালে পরিশ্রমজীবী মানুষকে শোষণের সূত্রে এই দুই শক্তির মিলন আমাদের নির্মম পরিণতিকেই সুচিহ্নিত করেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করলেও মানুষ মুক্তি পায় না বরং মাকড়সারূপী শোষণতন্ত্রের জালে আরও যেন জড়িয়ে যায়। জগদ্দলের প্রতি অসীম মমত্বকে সঙ্গে নিয়ে এখানেই বিমল প্রতিবাদী। 'হাল-মডেলের বেশ্যা'র চেয়ে নানা অক্ষমতা সত্ত্বেও বিমলের 'আরবী ঘোড়া' জগদ্দল অনেকবেশি প্রাণচঞ্চল, তার সজ্জা প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক হলেও বিমল সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে কারও কাছে দায়বদ্ধ নয়। 'কুদৃশ্য বুড়ো গাড়িটাই বিমলের গর্বের স্থল। হাল-মডেলের গাড়ির প্রতি বিমলের ঔদাসিন্য বিমলকে আর একভাবে গল্পে উপস্থাপিত করে।

সুবোধ ঘোষ যখন যন্ত্রের মানবিকীকরণ দেখাচ্ছেন তখন একই সঙ্গে একই গল্পে ক্লাবকেন্দ্রিক মানুষ অনায়াসে কীভাবে মনুষ্যত্বের উপর যান্ত্রিক অভিধা সঞ্চারে ব্যস্ত তা-ও দেখিয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তার গল্পে অনিবার্যভাবেই এসেছে জীবনের দুই নিদর্শন—

'লোকটাও একটা যন্ত্র'—বেঙ্গলী ক্লাবে আলোচনা হয়। 'নইলে পনেরো বছর ধরে অহর্নিশি মোটরধ্যান। এ মানুষের সাধ্য নয়।'

বিমল নিজেই বলে, পোড়া পেট্রলের গন্ধে ওর কেমন-বেশ একটু মিঠে মিঠে নেশা লাগে।

'আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছে ভাল। বিমল খুশি হয়ে মনে মনে হাসে। কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষের মত, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না, এইটেই যা দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে। আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব—জগদ্দল যেন এটুকু বোঝে।' পুঁজিবাদী শ্রেণীবিভক্ত শোষণ ব্যবস্থায় একশ্রেণীর মানুষ মানবেতর প্রাণীর মতো যখন ব্যবহার করছে তখন যন্ত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা একেবারে Unic।

'অযান্ত্রিক' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। পরিচালক মহান চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক। অযান্ত্রিক চলচ্চিত্রায়িত করার প্রসঙ্গে তিনি অনেক মন্তব্যই করেছেন। 'চলচ্চিত্র সাহিত্য ও আমার ছবি'তে বলছেন—'আমার নিজের ছবি অযান্ত্রিক। সুবোধ ঘোষের একটি বহুখ্যাত গল্পের ভিত্তিতে তৈরি। সে গল্প আপনারা নিশ্চয়ই সকলে পড়েছেন। ঐ এগারো পাতার গল্পটিকে একটি সম্পূর্ণ ছবিতে পরিণত করতে আমাকে নিশ্চয়ই ভাবতে হয়েছিল। কতখানি সার্থক হয়েছি সেটা আপনারা বলবেন—তবে আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি। সুবোধবাবুর মূল বক্তব্যের প্রতি আমি চেষ্টা করেছি বিশ্বস্ত থাকতে।' অর্থাৎ ঋত্বিক ঘটকের মতো মহান চলচ্চিত্রকারেব মন্তব্য থেকে বুঝতে পারি পরিচালকের গল্পের মূল বক্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই মূল কথা বলে মনে হয়েছিল।

বস্তুত মানুষ যেখানে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে সেখানে যন্ত্রের মানবিকীকরণ আমাদের মর্মবিদ্ধ করে। বিমলের মানবমনের সহমর্মী খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং মানুষের কাছ থেকে সে শুধু পায় অবহেলা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। তার দুর্দিনে কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায় না, আজকের যন্ত্রযুগে বিমলের মনের মহমর্মী খুঁজে পাওয়া যায়না, একটি যন্ত্রই হয়ে ওঠে তার সঙ্গী। পনেরো বছর ধরে বিমলের সুখে দুখে একমাত্র মর্মসঙ্গী। বিমলের স্বীকারোক্তি 'জগদ্দল' তার গত পনেরো বছরের বিলাস-ব্যাসনে দুর্দিনে নিত্য-সহচর। একাগ্র সেবায় তাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে। দেব নরসিংহের কাছে কত লোক কত বিচিত্র মানত করে—কত রূপং দেহি যশো দেহি। বিমল দুপয়সার ফুল বাতাসা নরসিংহের পায়ের কাছে রাখে, মনে মনে ধ্বনিত হয়—একান্ত প্রার্থনা, সামান্য একটু দাবী। 'হে বাবা, জগদ্দল যেন বিকল না হয়। এ বয়সে আর আমার সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।'

গল্প এভাবেই এগিয়ে যায়।

বুলাকি পাগলা একটি চরিত্র এই গল্পে। বুলাকি পাগলা সম্পর্কে লেখক গল্পে মাত্র দুটি বাক্য খরচ করলেও এই চরিত্রটির গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি ভাঙা টিনের গামলার প্রতি তাঁর ছিল অসীম মমত্ব। নিজে বৃষ্টিতে ভিজে ছাতা দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখত টিনেব ভাঙা গামলাটিকে।

বুলাকি পাগলেব ভাঙা গামলার প্রতি মমত্বেব সঙ্গে তুলনীয় বিমলেব জগদ্দলের প্রতি

আসক্তি। বিমলের বুদ্ধিকে 'কারবারী বুদ্ধি' নামে অভিহিত করে গল্প-লেখক বিমল-জগদ্দলের সম্পর্ককে আরও গভীররূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। জগদ্দলের প্রতি বিমলের 'উৎকট মায়া'ই সঙ্গীদের চোখে 'মক্ষিচোষক কৃপণ' বিমলের কারবারী বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়।

বিমল জানে বাস্তব অবস্থা। তার গাড়িতে কনসেসান রেট না দিলে কেউ আসবে না এই নিদারুণ ও বাস্তবতা বিমল মেনে নিতে বাধ্য। আগন্তুক যাত্রীর কানে কনসেসান রেটের তথ্য জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে 'চলা আও চলা আও' আহ্বানের মধ্যেই যেন গোপন থেকে যায় বিমলের জীবন বাস্তবতার করুণ কাহিনী। ছজনের জায়গায় চোদ্দজন অনায়াসে ধরে যায় বিমলের গাড়িতে। জগদ্দলকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না তার চারপাশের মানুষজন। বুড়ো গাড়ি কী করে 'হর্ণের বিলাপে বাজার মাত করে এক টুকরো কালবোশেখীর মত' উড়ে যায়! পানওয়ালা বলে ওঠে 'আজব এক চীজ হ্যায় বিমলবাবুকা ট্যাক্সি'। জগদ্দলের রহস্যময়তাই অন্যদের চোখে তাকে হিংসার পাত্র করে তোলে।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে জগদ্দলের উপস্থিতি সূর্যোদয়ের চেয়েও নিশ্চিত। বিমলের সমব্যবসায়ীরা জগদ্দলকে 'খুনখনে বুড়ো' ছাড়া আর অন্যকোনোভাবে দেখতে চায় না। অথচ এই 'খুনখুনে বুড়ো' 'যদি দিনের পর দিন অনায়াসে লাফ ঝাঁপ ডনকুস্তি মেরে বেড়ায়, কোন্ জোয়ান না তাকে হিংসা করে'।

এই গল্পে সুবোধ ঘোষ একটি দীর্ণ, কুদৃশ্য ট্যাক্সিকে কেন্দ্র করে যেভাবে বিমলের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপকে আবর্তিত করিয়েছেন তা তাঁর পরিকল্পনার ও উপস্থাপনভঙ্গির আশ্চর্যরকম বৈচিত্র্য, মৌলিকতা ও বিশ্লেষণ গভীবতাকেই সুচিহ্নিত করে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—'সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পের উপরই এই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়—ভূগর্ভ প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল-পথিক সীমান্ত প্রদেশ হইতে তিনি কত না মৃদুসৌরভপূর্ণ বন্য ফুল চয়ন করিয়েছেন।'

জগদ্দলতো বিমলের কাছে 'মৃদুসৌরভপূর্ণ বন্যফুল'।

জগদ্দল প্রমত্তবেগে ছুটে চলে। ওর লোড টানার শক্তি, ওর প্রাণস্ফূর্তির শিহর, ওর আরবীঘোড়ার তেজ এক ইতিহাস। এর পরেই অন্য আর এক ইতিহাসের সম্মুখীন হতে হয় বিমলকে। জগদ্দলকে কেন্দ্র করে বিমলের বিশ্বাসের পাহাড়টা একটু যেন টলে যায়। এক অজানা আশঙ্কায় তোলপাড় হতে থাকে বিমলের হৃদয়। উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুরদুর করে তবে কি জগদ্দলের ছুটি নেওয়ার সময় এগিয়ে এল? কী করবে বিমল? তার এতদিনের কাণ্ডারীর সঙ্গে সম্পর্ক কি এবার সত্যিই কাটতে চলল? ভাঙনের এক চূড়ান্ত বাস্তবতার মুখোমুখি বিমল।

তবু থেমে থাকে না বিমল। জগদ্দলকে সে হারাতে চায় না। যেমন করেই হোক জগদ্দলকে সারিয়ে তুলবেই 'মোটর বিশারদ পাকা মিস্ত্রী বিমল প্রতিজ্ঞা করল'। সর্বস্ব দিয়ে জগদ্দলকে সারিয়ে সর্বস্বান্ত বিমল আনন্দে আত্মহারা 'সর্বস্ব তো গেল, যাক। পনেরো

বছরের বন্ধু জগদ্দল এবার খুশি হবে, সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যা হোক, এবার নতুন হুড, রং আর বার্নিস পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে'।

'আমার যে Protogonist, বিমল, তাকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পরেন, আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ এক জায়গাতে এই তিনই এক। সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রাণ আরোপ করার প্রবণতা। এবং এটি একটি Archetypal reaction, আদিম প্রতিক্রিয়া। শিশুর যে-কোনো অসাড় বস্তু দেখে জজু কল্পনা করা, পাগলের মেঘ দেখে খেপে ওঠা এবং অনাহৃত আদিবাসীর প্রথম রেলগাড়ি দেখে তাকে দেবতা কল্পনা করা—একেবারে একই প্রক্রিয়া।'

এই মন্তব্য ঋত্বিক ঘটকের। বিমলকে যেভাবে তিনি দেখেছিলেন চলচ্চিত্রে তাই-ই করেছেন। 'চলচ্চিত্র চিন্তা' নামক নিবন্ধে আরও বলেছেন—'যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান আমি অযান্ত্রিকে দেখিয়েছি তাতে—'কোহা বোঙ্গা', 'খাতুরা', 'চালি বেচানা', 'ঝুমের', 'লুঝরি' ইত্যাদি বহু সাংকেতিক নৃত্যের সমাবেশে মহাযাত্রা দৃশ্য সন্নিবিষ্ট জন্ম, শিকারে যাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা এবং নবজন্ম এই সমস্ত Cycle টা।'

'অযান্ত্রিকের main theme মৌল উপজীব্য ছিল এটাই; যাকে আমরা The law of life, জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে ভুলে যাওয়ার নিষ্ঠুর দৃশ্য এবং সর্বশেষে এক শিশুর হাতে জগদ্দলের ক্রেংকার ধ্বনি, যাতে বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে ভুলিয়ে দিয়েছিল এগুলোতে সেই কথাই প্রকাশ করছে। এযেন variaion on a minor scale of the main theme, a sort of echo, যা যে-কোনো Symphonic structure-এর প্রাণবস্তু।'

অযান্ত্রিক সম্পর্কে টুকরো টুকরোভাবে তিনি অনেক মন্তব্যই করেছেন বিভিন্ন নিবন্ধে। ঋত্বিক ঘটক একদিকে যেমন গল্পকারের মূল বক্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন, তেমনি ঐতিহ্যের সাহায্যে অনিবার্যভাবেই কোনো মৌল প্রতীকশক্তির মাধ্যমে 'গোটা মানুষের অস্তিত্বের নির্যাস'কে চলচ্চিত্রে তুলে আনতে চেয়েছেন।

বিমল চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তার সৃষ্টিশীল দিকটি আমরা 'অযান্ত্রিক' সিনেমাটি দেখলেই বুঝতে পারি। 'মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি-করা ও আমাদের প্রচেষ্টা' নামক নিবন্ধে বলছেন—'ধরুন, 'অযান্ত্রিক'। বিমল চরিত্রটি archetypal। বুলাকি পাগল তার absurd extension এবং নৃত্যপরায়ণ আদিবাসী ওরাওঁরা তার Sublime extreme. পিয়ারা সিং হচ্ছে tough minded as opposed to tender mindeness of বিমল। কাদা ছোঁড়া বাচ্চার দল বিমলের আর একটা রূপক এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি-জীবনের নিষ্ঠুরতার প্রতীক।'

কোনো তথাকথিত রাজনৈতিক পটভূমিতে গল্পটি লেখা না হলেও স্তরবিভক্ত শ্রেণীসমাজের সূক্ষ্মসূত্রগুলি অনুপস্থিত নয়। গান্ধীবাদ গ্রহণের আগের পর্বে 'অযান্ত্রিক' রচিত। লেখকের জীবনদর্শন, জীবনকে দেখার পদ্ধতিই অযান্ত্রিক গল্পে প্রতিফলিত।

'অযান্ত্রিক' গল্পটির অনুধাবনের প্রেক্ষাপটটি কী হতে পারে 'চলচ্চিত্রে পরিচালকের বক্তব্য' অংশে মহান পরিচালক ঋত্বিক ঘটক সেই প্রসঙ্গেই মন্তব্য করেছেন—''অযান্ত্রিককে অনুধাবন করার যে ভঙ্গি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি সেটুকু বলছি। ইংরাজি ভাষায় absurd বলে একটা কথা আছে যার একটা সাহিত্যিক সংজ্ঞাও আছে। আমাদের বাংলায়

ওটাকে উদ্ভট কার্যও বলা চলে। যাঁরা সীতা ও শান্তাদেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা' পড়েছেন কিংবা 'নিরেট গুরুর কাহিনী' পড়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন এর রসের স্বাদ। যার সবচেয়ে বেশি অগ্রসরণ হয়েছে আমাদের সুকুমার রায়ের লেখায়।

''অযান্ত্রিককে সেইভাবে দেখতে হবে। ফাজিল মন নিয়ে। গুরুগম্ভীর ভঙ্গি করে এধরনের জিনিসের স্বাদ পাওয়া যায় না। হতে হবে শিশু, হতে হবে এক আদিবাসী ওরাওঁ, হতে হবে বিমল। আমার ছবিতেও এই তিনটি স্তরই আছে। গোটা ছবিটাই হচ্ছে কিংবদন্তি।'

লেখক সমগ্র গল্প জুড়ে অসম্ভব টেনশন ধরে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত জগদ্দলের পরিণতি কি হবে? বিমল কি পারবে জগদ্দলকে বাঁচিয়ে রাখতে? বিমল চেয়েছে নিজের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত জগদ্দলকে তার পাশে রাখতে। জগদ্দলের প্রতি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেও কি রক্ষা করতে পেয়েছে জগদ্দলকে?

অযান্ত্রিক গল্পে জগদ্দল বিমলের এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। মানবিক বেদনাবোধে পরিশ্রুত সে ইতিহাসের কাহিনী। যার অন্তরে থেকে গেছে যন্ত্র-মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন।

জগদ্দলকে নতুনরূপে সাজায় বিমল। চোখে-মুখে খুশি যেন আজ উপচে পড়ে। বিমলের মনে হয় 'যেন একটা তেজি পেশিওয়ালা পালোয়ান।' জগদ্দলকে নিয়ে সে আবার নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়। মানুষ যেমন কপর্দকশূন্য হয়েও প্রিয়মানুষকে মৃত্যুব প্রান্তর থেকে ছিনিয়ে আনার লড়াই চালায় জগদ্দলকে কয়েকদিনের অক্লান্ত সেবায় ফিরিয়ে এনেছে বিমল সেভাবেই। জীবনসংগ্রামের একমাত্র সঙ্গীকে হারাতে-হারতে দিতে চায় না বিমল। জিততেই হবে ওকে।

বিমলের ঘুমেও ভাগ বসায় জগদ্দল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জল জগদ্দলকে 'স্রেফ ঘা' করে দেবে বিমল জানে। ছুটে যায় ওকে বাঁচানোর জন্য। ইঞ্জিনের উপর ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়তে দেখে বিমলের আমূল চমকে ওঠে। সমস্ত দুর্যোগ, গঞ্জনা থেকে প্রতিমুহূর্তে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে জগদ্দলকে। তাড়াতাড়ি শোবার ঘর থেকে বর্ষাতি, সতরঞ্জি, চাদর টেনে আনে। যেমন করে হোক জগদ্দলকে বাঁচাতে হবে। ইঞ্জিনের উপর কম্বল চাপিয়ে দেয়, তার উপর বর্ষাতিটা দিয়ে দেয়, সতরঞ্জি আর চাদর দিয়ে জগদ্দলকে ঢেকে দিয়ে 'নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে; নতুন নরম গদিটার ওপর গুটিসুটি মেরে বিমল শুয়ে পড়ল। আরামে তার দুচোখে ঘুমের ঢল এল নেমে।'

'পরের দিনের ইতিহাস'। জগদ্দলের সাজসজ্জা সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। স্ট্যান্ডের উদগ্রীব, স্তুতিমুখর জনতা দেখে 'বিমলের অপূর্ব মিস্ত্রী-প্রতিভার নিদর্শন'। কিন্তু বিমল? তার অস্বচ্ছ হাসি 'শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল' কেন? বিমল জগদ্দলের যে আওয়াজ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে, জগদ্দলের সারা শরীর মন জুড়ে বিরাজ করত যৌবনের যে দর্পিত পদধ্বনি সেই সুগভীর প্রাণের স্পন্দন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে একথা বিমল স্পষ্টই বুঝতে পারে। বিমল জগদ্দলের 'দুরন্ত বনহরিণের গতি'কে খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় উদগ্রীব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত!

'চল্ জগদ্দল চলল; গাঁটে গাঁটে আর্তনাদ বেজে উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। অসমর্থ আর পারবে না জগদ্দল এ ভার বইতে।

'এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদ্দলকে যমে ধরেছে—এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কলজে জগদ্দলের ঘুণ ধরল আজ। কৃতান্তের কীট—আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।'

বিপর্যয়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিমলের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে 'আমি শুধু রৈনু বাকী পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল—কিন্তু আমারো তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোঁকের মত গা ছেয়ে ফেলেছে সব।

জগদ্দল আগেই যাবে বলে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভালো মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে। যা কোনোদিন হয়নি তাই হলো। ইস্পাতের গুলির মতই শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দুফোঁটা জল।'

এমন সময় হঠাৎ বিমলের হৃদয়ে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে গোবিন্দ। বিমলের সন্ধানী চোখ অসহায়ভাবে আলোড়িত হতে থাকে। বুঝি বা গাড়ির কোনো এজেন্ট এসেছে জগদ্দলকে নিয়ে যেতে। জগদ্দলকে কেন্দ্র করে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, সফলতা-ব্যর্থতার প্রান্তসীমায় বিমল। তাব সমস্ত অনুভূতিই আজ হিমশীলত ঠান্ডার আবরণে আবৃত। গভীর হতাশায় বিমল আচ্ছন্ন।

যুগান্তর সৃষ্টিকারী ঘটনা যে ঘটতে চলেছে বিমল তা বুঝতে পাবে। বিমলের বুক চিরে ছিনিয়ে নিতে এসেছে হয়তো বা জগদ্দলকে। দিশেহারা বিমল। তাব স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে। যন্ত্র-মানুষের মানবিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সিক্ত হয়ে ওঠে বিমলের অনুভবে।

তবু বর্তমান থেমে থাকবে না। ভবিষ্যৎ আসবেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

মারোয়াড়ী ভদ্রলোক বিমলের ভুল ভেঙে দেয়। পুঁজিবাদী শোষণের আগ্রাসনের কঙ্কালময় রূপ ফুটে ওঠে গল্পে। গোবিন্দ নামক লোকেবা তার দালালি করেই নিজের নিজের ভবিতব্যকে সুনিশ্চিত করতে চায়। মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের হয়ে সে জানায় 'গাড়ির এজেন্ট নন উনি; পুরোনো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমাব তো গাদাখানেক ভাঙা এ্যাক্সেল রিমটিম জমে আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।'

নেশার ঘোরে বিমল নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে—'হাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়িটাও। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল—সে কি গো বিমলবাবু?'

বিশ্বযুদ্ধের ফলেই লোহার দাম বেড়েছে। বাইরের যুদ্ধ আর বিমলের জীবন সংগ্রাম দুই-ই এক বিন্দুতে মিলেছে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটোগল্পে সুবোধ ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

সৃজনশীলতার জগতে অপূর্ব লেখনশৈলীর সাহায্যে তিনি যে প্রত্যয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার একদিকে ছিল অপার মনের গভীরতা, অন্যপ্রান্তে ছিল চারপাশের জটিল আবর্তেব চক্রে নিষ্পেষিত মানব-ইতিহাসের কাহিনী। জীবন উপভোগের মধ্যে জীবন নামক জিজ্ঞাসাব উত্তর সন্ধানে কৌতূহলী সুবোধ ঘোষ। ভাষা বর্ণনাভঙ্গি-কাহিনীবয়ন সবমিলিয়ে তাঁর সাহিত্যিক স্টাইল তাঁকে নিজস্বতায় সুচিহ্নিত করেছে।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত সংযমী বিশ্লেষণ, তীব্র অনুভববেদ্য সংলাপ তাঁর কলমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সুবোধ ঘোষের কলমে আত্মবিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই সাহসী হয়ে উঠেছে। জীবনদর্শনের তরঙ্গমুখর দিকগুলিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। বিমলের ছিন্নভিন্ন হৃদয়কে কোনো পেলব মসৃণতার মধ্যে আবদ্ধ না করে জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্বের সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

অযান্ত্রিক-এ যন্ত্র-মানুষের চরিত্র চিত্রণে অসামান্য ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন লেখক। গল্পে চমকপ্রদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই সম্পর্ককে :

ক. 'বিমলের কাছ থেকে একটা আদুরে নাম পেয়েছে এই গাড়ি জগদ্দল।'

খ. 'ভারী তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল? তাই হাঁস ফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া, বাবা দাঁড়া।'

গ. জগদ্দল! বিমল আস্তে আস্তে ডাকে। স্নেহে দ্রব হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর।

ঘ. কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল। আমি আর তুই আছি।

ঙ. উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুর দুর করে। তবে কি শেষে সত্যই জগদ্দল ছুটি নেবে।

চ. চল বাবা জগদ্দল। একবার পক্ষিরাজের মতো ছাড় তো পাখা।

এরকম আরও নানা সংলাপ ও সংলাপ-বহির্ভূত লেখকের বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে বিমল-জগদ্দল তথা যন্ত্র-মানুষের সম্পর্ক।

গল্পের শেষাংশ এই সম্পর্কের চরমপ্রান্ত ছুঁয়ে যায়।

জগদ্দল বিমলের সম্পর্কের চরমক্ষণ আজকে। ভেঙে যাচ্ছে বিমলের হৃদযন্ত্র। হৃদয় খুঁড়লে আজ কোনো ঝর্ণার জলধ্বনি শোনা যাচ্ছে না, কেবল গভীর বেদনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে দ্রিমিদ্রিমি ববে। অসহায় বুকচাপা কান্নার আওয়াজ সেই শব্দে। বিমল শুধু জগদ্দলকে হারাচ্ছে না, হারাচ্ছে যেন নিজেরই অস্তিত্বকে। ঔপনিবেশিক সভ্যতায় জগদ্দলই ছিল বিমলের আইডেনটিটি। বিমলের বুক চিরে লাঙল চালাচ্ছে ঐ মাড়োয়ারী। রক্তে ভেসে যাচ্ছে যন্ত্র-মানুষের সম্পর্কের মাঠ। ঘোর অন্ধকার, শুধু যেন মুহূর্তে মুহূর্তে ভারী নিশ্বাসেব সঙ্গে পাখা ঝাপটানোর শব্দ।

অসহায় বিমল। গল্প এগিয়ে চলে—

'নেশা ভাঙল এক ঘুমের পর। তখনো রাত, বিমল আর এক বোতল পান করে শুয়ে পড়লো।

ভোব হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল উপচে একটি শুধু শব্দ বিমলের কানে এসে আছড়ে পড়ছে ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মাবোয়াড়ীর লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ি টুকরো টুকরো কবে খুলে ফেলেছে।

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলেব চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং—জগদ্দলের সমাধি খনন চলেছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।'

'অযান্ত্রিক' গল্পটিতে মানুষের নিত্যসহায় তার ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তির একমাত্র সহযোগী

বন্ধু যে সহমর্মী প্রাণাধিক প্রিয় মর্মসত্য হয়ে উঠতে পারে সুবোধ ঘোষ 'অযান্ত্রিক' গল্পে এক সজীব স্বতস্ফূর্ততায় মনুষ্যত্বের সেই স্বরূপদর্শন করিয়েছেন।

বস্তুত, যান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ যখন যন্ত্র তখন যন্ত্রকেই মানবিক অনুভূতির স্পর্শে সংবেদনশীলতায় স্পর্শক্ষম করে তোলাই শোষণ-বিরোধী কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব।

পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থায় নির্বিচার অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিক্রিয়ায় মানবিকতাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যান্ত্রিকতার প্রতিপত্তি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবিস্মরণীয় 'মুক্তধারা' নাটকে। পুঁজিবাদী শোষণপদ্ধতি একই পথে চলে না। দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুসারে শোষণ তীব্রতর, তীক্ষ্ণতর ও ছদ্মবেশধারণে বাধ্য হয়। কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির মর্মার্থ অনুধাবন করলে দেখা যায়, মানুষ যান্ত্রিকতায় যন্ত্রকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এতদূর ছাড়িয়ে গেছে যে, আধুনিক যান্ত্রিক মানুষের তুলনায় যন্ত্রকেও বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতে দেখি। পুঁজিবাদী শোষণ যে মানুষকে যন্ত্র করে তুলেছে এই রূঢ় সত্যটি কাল-মার্কস এর দর্শন-চিন্তার মধ্যেই ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প।
২. ঋত্বিককুমার ঘটক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু।
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।
৪. Marx. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

কালাগুরু : কালা শিল্প

শ্রাবস্তী রায়

"আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে—কিন্তু ইন্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি।"—মিস্টার জেরোম টি এল টেনব্রুক শুধু ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে চেনেননি, বশে আনতেও শিখেছেন। এ রীতিমতো তাঁর অধীত বিদ্যা—ভুল হবার নয়। কারণ তিনি ইণ্ডোলজিস্ট। তার উপর তাঁর গবেষণা প্যান্‌থেইজম্ নিয়ে। কাজেই ইণ্ডিয়ার আত্মার গতিপ্রকৃতি তো তাঁর নজরে থাকবেই। ভারতীয়দের সিভিলাইজড্ করে তোলার জন্যই সিভিল সারভেন্ট টেনব্রুকের আগমন।

টেনব্রুকের পছন্দ কালাগুরুর সুগন্ধ। সে জিনিষটা আবার না পোড়ালে গন্ধ পাওয়া যায় না। আর দহন অত্যন্ত নিঃশব্দ প্রক্রিয়া। কে জানে কালাগুরুর দহন প্যানথেইজম্ চর্চার ধারা বহন করে কিনা!

ইণ্ডোলজিস্ট প্রাণপণে ইণ্ডিয়ার সেবা করেন। গরীব, মন্দভাগ্য দেশটার হাসপাতাল সংস্কার করেন। তার পাশাপাশি দেশীয় সংস্কারগত আচারানুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কোনোমতেই সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টে আঘাত করেন না। জয়জয়কার পড়ে যায়। এই না হলে রাজার জাত!

রাজার প্রধান কাজ প্রজাশাসন। টেনব্রুক সে কাজে নিঃশব্দ। যেমন করে কালাগুরু পুড়ে যায়; তেমন করেই টেনব্রুকের প্রজারা শাসিত হয়। শাসনকার্য একটা আর্ট—সিভিলাইজড আর্ট। এই আর্টের সাধনা করতে গিয়ে কখনো কখনো এক ঢিলে দুই পাখি মারতে হয়। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রতিশোধস্পৃহাও চরিতার্থ হয়ে যায়।

সেখপুরা শহরে স্বাধীনতাব আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলো। লোকাল বোর্ডের সদস্যরা ইস্তফা দিলো। হরতাল হলো। কোলিয়ারীতে ধর্ম্মঘট হলো। জনসভাও হলো। এ সমস্ত নির্দোষ আন্দোলন টেনব্রুককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করলো না। কারণ এ আন্দোলন নেহাতই বাহ্যিক—ভারতবর্ষের আত্মার আন্দোলন নয়। সেখপুরার পাবলিকের কাছে শুধু বিনীত আবেদন রাখলেন যে 'ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়'। প্রতিটি উত্তেজনা নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম করলে স্তিমিত হযে পড়ে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতয় হলো না। কিছুদিন পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। টেনব্রুক তাঁর এক্সপেরিমেন্টের অভাবিত সাফল্যে খুশি।

শুধু এক জায়গায় খুঁত থেকে গেল। প্রভাতফেবী বন্ধ করা গেলো না। ভোররাতেব গানের সুবটা ধীরে ধীরে মানুষের বোধের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল। টেনব্রুক এই সামান্য সুরটুকুকে নিয়ে চিন্তিত—কারণ তিনি ভারতবর্ষের আত্মাকে চেনেন। তাই প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ শুরু করলেন আমূল চিকিৎসা, ঔরঙ্গজেবের অনুসরণে।

মূলোৎপাটন শুরু হল। কী আশ্চর্য অব্যর্থ পদ্ধতি! বিকেলে স্কুল ছুটীর পরে ক্লান্ত পড়ুয়াদের সান্ধ্যফেরী চললো রাত দশটা পর্যন্ত। যাতে পরদিন ভোববেলার প্রভাতফেরীতে

যোগ দেবার বিন্দুমাত্র শক্তি এদের অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু প্রাচ্যের শরীরে শক্তি থাক বা না থাক; মনে যে থাকবেই; সে বিষয়েও টেনব্রুক নিশ্চিত। প্রাচ্যবিদ তাঁর শত্রু সনাক্তকরণে নির্ভুল। সেখপুরায় তাঁর একমাত্র শত্রু এই বলাইয়ের দল। এরাই ভারতবর্ষের মুক্তির আকাঙক্ষার প্রতীক। ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে গেলে এই প্রতীককে কিছুতেই মূর্তি পরিগ্রহ করতে দেওয়া যাবে না। অতএব ভারতবর্ষের ডেমোক্রেসীর ডিসিপ্লিন রক্ষার্থে নিরুপায় টেনব্রুক বলাইয়ের দলকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলেন। দগ্ধ কালাগুরুর প্রাচ্য সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হলো।

মানুষের অন্যতম আদি প্রবৃত্তি প্রতিশোধস্পৃহা। যে মানুষ যত শিক্ষিত; তার প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থা ততই পরিশীলিত। ফুটবল খেলার মাঠে বলাইয়ের সঙ্গে টেনব্রুকের পরিচয়। খেলতে গিয়ে বলাই সাদা চামড়াকে রেয়াৎ করে না। টেনব্রুককে পিছন থেকে লেঙ্গিমারার চেষ্টা করে। অবশ্য টেনব্রুকের তাতে কোনো বিরক্তি নেই; বরং বলাইকে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে যান। কিন্তু গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা থেকে যায়। অনাদি মাস্টারের অভিজ্ঞ মন সেই কাঁটাটা অনুভব করে।

প্রভাতফেরীর দলে বলাইকে দেখতে পেয়ে আবার সেই পুরোনো কাঁটা নতুন করে মাথা চাড়া দেয়। তাই সান্ধ্যফেরীতে সেই বলাইকেই দেওয়া হলো পরিচালকের ভূমিকা; যাকে কিনা গাইতে হবে টেনব্রুকেরই রচিত একখানা 'যীশুগীতি'। অর্থাৎ, যতই পিছন থেকে লেঙ্গি মারার চেষ্টা করো, তুমি হলে মূর্খ, অর্বাচীন একটি বালকমাত্র, সাহেবের অঙ্গুলি হেলনে যাকে উঠতে হবে, বসতেও হবে। যতই অন্ধকারের মানুষকে জাগাবার গান গাও না কেন; তুমি হলে শেকলে বাঁধা একটি 'ছোট মেষ' মাত্র, সাহেবের ইচ্ছে হলেই তাকে পিষে মারতে পারে।

যাইহোক, টেনব্রুক সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বীটি ভালোই বেছেছেন। তিনি জানেন যে শত্রুকে কখনো দুর্বল মনে করতে নেই। শত্রু যত ক্ষুদ্রাকারই হোক না কেন, সে শত্রুই। দেশলাই কাঠি ছোট হলেও তার দাহিকা শক্তি কোনমতেই কম নয়। সেই কারণেই গল্পের শেষ দৃশ্যে বলাইয়ের কপালে ব্যাণ্ডেজ আর কোমরে দড়ি। লেঙ্গি মারার অবশ্যম্ভাবী ফল। বড়ো বিদ্রোহ দমনের আড়ালে এই ছোট প্রতিশোধটি তেমন করে নজরে পড়ে না। অনাদি মাস্টারের আশঙ্কা সত্যি হয়ে যায়।

গবেষক টেনব্রুকের কাজকর্ম সুশৃঙ্খল। তিনি দেখলেন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে "ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে পিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমা রেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানীর ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।" অতএব সাধারণ মানুষের আবেগ সেই নিহত সৈনিকদের পক্ষে। এদিকে গুজব রটতে শুরু করেছে যে প্রভাতফেরীটা আসলে প্রভাতফেরী নয়; নিহত সৈনিকদের আত্মার কান্না। এই গুজবের ফল হতে পারে দ্বিবিধ—যার কোনোটাই টেনব্রুকের কাছে প্রীতিপদ নয়। প্রথমত, জনগণের মনে বিগত দিনের কার্ণাইল সাহেবের সূত্রে বর্তমানে

টেনব্রুকের প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত; ভবিষ্যত প্রজন্ম টেনব্রুককে অত্যাচারী শাসক হিসেবে চিহ্নিত করবে; 'হিস্ট্রি রিপিট্স্ ইটসেল্ফ' তত্ত্বের অনুসরণে। কাজেই এই গুজব নামক অসুখটিরও চিকিৎসা দরকার। প্রথমেই টেনব্রুক একটি 'পৌরাণিক গল্প' ফাঁদলেন।—যাতে কিনা ইতিহাসের পুনরাবর্তন জনিত তত্ত্বানুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্য হয়ে উঠলো রামরাজত্ব আর গান্ধীজী হয়ে গেলেন সেই রাজত্বে উৎপীড়নকারী এক দস্যু। অতএব সেই দস্যুর বিনাশ সাধনেই দেশের এবং দশের মঙ্গল। গল্পটি টাইপ করে তিনি আগের বিবরণটির উপর ধাপে ধাপে আটকে দিলেন। একখানা সূত্র; হলেও পরোক্ষ, বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এহেন বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী, 'সু'শাসকের প্রতিস্পর্ধী ছোট্ট কিশোর বলাই। সেটা আর কেউ না জানুক, টেনব্রুক জানেন। কারণ ভারতাত্মার যে ছবিটা তিনি চেনেন তার মুখটা আসলে 'বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ভীরু'। বর্ণচোরা, কারণ এত ছোটো যে সহজে চেনা যায় না। হিংসুক, টেনব্রুকের মতো 'দয়ালু' রাজাকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেয় না। ভীরু, কারণ সামনাসামনি লড়াই না করে পিছন থেকে ল্যাং মারার চেষ্টা করে, রাতের অন্ধকার থাকতে প্রভাতফেরী বার করে। বলাই এ কাহিনীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ। তবু সেই এই বিশাল টেনব্রুক চরিত্রের 'ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর'। তার উপস্থিতি এই উদার, নীতিবান, ভারততত্ত্ববিদের স্বরূপ উদঘাটিত করেছে। একটি বিশাল চিত্রপটে বর্ণসংযোজনে ভারসাম্য আনতে যেমন একবিন্দু লাল রং যথেষ্ট; তেমনি প্রবল ক্ষমতাধারী শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার কাহিনীকে ভারসাম্য দিতে একটি বলাই চরিত্রই যথেষ্ট।

টেনব্রুককে চিনেছেন দু'জন। অনাদি মাস্টার আর ডি. এস. পি জানকীপ্রসাদ। তবে একসময়ে অনাদি মাস্টারের আশঙ্কা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন টেনব্রুক। মানবচরিত্র গঠনকারী মানুষটিও পাশ্চাত্য পরিশীলনের ফাঁদে পড়ে ভুল বুঝতে শুরু করেছেন—সেক্ষেত্রে মাস্টারমশাই বিফল। জানকীপ্রসাদ নামক প্রভুভক্ত সারমেয়টি কিন্তু পুরোপুরি সফল। তার ঘ্রাণশক্তি প্রবল। প্রভুটি জনসভায় যা-ই বলুন না কেন, সবই ভান। শেষপর্যন্ত 'চার্জ' করার হুকুম দেবেনই। সারমেয় শুধু আদেশের অপেক্ষায়।

'শাসন' করতে যে কেউ পারে না। বিষয়টি শিক্ষনীয়। শাসককে হতে হবে শিক্ষিত, হতে হবে বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি হতে হবে মনস্তত্ত্ববিদ। এই সব কটি গুণের মেলবন্ধন ঘটাবে সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। নিষ্ঠুরতা না থাকলে আর শাসন করে আনন্দ কি! এই বিশেষ গুণটি সহজদৃষ্ট নয়। যে প্রয়োগ করে এবং যার উপর প্রযুক্ত হয় তারাই শুধু জানে এর অস্তিত্ব। এই সব রকমের শিক্ষার একাধার টেনব্রুক। ইণ্ডোলজিস্টের পাশাপাশি তাকে সুশাসক এবং মনস্তাত্ত্বিক —এই ডিগ্রিগুলোও দেওয়া যেতে পারে। অতএব 'কালাগুরু' শব্দটির দ্বিতীয় একটি অর্থ আবিষ্কৃত হয়। নেতিবাচক জীবনশিল্পের গুরু। সে গুরু টেনব্রুক স্বয়ং। জন কোম্পানীর বেনে বুদ্ধিধারী কোনো সাহেব তাঁর কাছে পাঠ নিতে পারে।

গল্পটিতে গল্পকার সুবোধ ঘোষের তীব্র তির্যক ভঙ্গি লক্ষণীয়। এই তীব্রতা সৃষ্টি হয়েছে কাহিনির দ্বিস্তরীয় অর্থবোধের উপর নির্ভর করে। বাহ্যিক দিক থেকে গল্পটির শব্দচয়ন এবং

বাচনভঙ্গি অত্যন্ত সহজ কিন্তু অন্তরে সান্দ্র। মানুষের শিরার মধ্যে অল্প মাত্রায় সাপের বিষ ঢুকিয়ে দিলে যেমন ধীরে ধীরে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে নেশাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে; বোধ বুদ্ধিকে গ্রাস করে ফেলে; গল্পটির প্রথম পাঠে পাঠকের অবস্থা ঠিক সেইরকম হয়। ভালোমন্দ সম্পর্কেই সে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানুষ কী পারে এইরকম অদ্ভুত নিষ্ঠুর হতে? হ্যাঁ; কেবলমাত্র মানুষই পারে এইরকম আচরণ করতে। মানুষের পক্ষে কি এই দুষ্টগ্রহকে প্রতিহত করা সম্ভব? হ্যাঁ; একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব ঘুরে দাঁড়ানো।

গল্পের পটভূমি বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন। ইতিহাস বলছে সে আন্দোলনে বিপ্লবীদের ছিলো না কোনো অস্ত্রসম্ভার। সম্বল ছিলো শুধুমাত্র মনের জোর। সেই জোরের কাছে বিদেশী শাসক মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ শক্তির অস্ত্রে নয়, মস্তিষ্কে। অতএব টেনব্রুক যতই 'চার্জ' করুন না কেন বলাইয়ের প্রভাতফেরী সূর্যোদয়ের পথে অগ্রসর হবেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী

কুমিল্লা জেলার অধিবাসী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী। কলকাতায় আসেন চব্বিশ বছর বয়সে। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তিনি নানারকম বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই বৃত্তি গ্রহণের সূত্রে জীবনের অভিজ্ঞতাও হয়েছিল বৈচিত্রময়। কিন্তু কর্মজীবনে কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত সাহিত্য রচনাই তাঁর জীবনের নেশা এবং পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস রচনা করেন এবং অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সূর্যমুখী' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। তাঁর সর্বাধিক প্রশংসিত গ্রন্থ 'বারো ঘর এক উঠোন'। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— 'মীরার দুপুব', 'আততায়ী' 'শেষ বিচার' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল—'শালিক কি চড়াই' (গল্পগ্রন্থ), তাঁর নির্বাচিত গল্প সংকলনও রয়েছে।

চোর : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা

সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের প্রথম লগ্নে 'দেশ' পত্রিকা বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে বিশাল ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলা ছোটগল্পে আবার ফিরে এসেছিল মধ্যবিত্ত নায়কেরা। মধ্যবিত্তের জীবন-নীতি ও জীবন-ভাষ্য অবলম্বনে নতুন ধারার যে সামাজিক গল্প লেখা হয়েছিল, সেই লেখকদের অন্যতম গল্পকার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। একদিকে 'দেশ', অন্যদিকে 'পরিচয়' ও 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় দুটি ভিন্ন ধারার গল্প প্রকাশিত হত। তবে তখনো সাহিত্য পণ্য হয়নি, তাই নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা বিমল করের গল্পের ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর-সম্পর্কের বিন্যাসকে কিছুতেই বাণিজ্যমনস্ক লেখা বলা যায় না। সে সব গল্পে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও জটিলতার উদ্ঘাটন ঘটতো। শ্রেণিচেতনার গল্পও লেখা হত। তা ছিল এক অর্থে জীবনের বাস্তবতার গল্প। তাই আজ সময় সমাজ রুচি বদলে গেলেও এই সব গল্পের আবেদন নষ্ট হয়ে যায়নি।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষের কথা বলেছেন তাঁর গল্পে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই মতো এক বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি নাগরিক জীবনের শ্রেণিবৈষম্যকে দেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে যে মূল্যবোধের ভাঙনজনিত অসহায়তা সমাজজীবনে ছিল, তার পূর্ণ রূপটি তিনি দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। তাই তাঁর আঁকা মধ্যবিত্ত মানুষ কেবল অর্থনীতির বিচারেই নয়, বোধবুদ্ধি আবেগময়তা এসবের বিচাবেও মধ্যমানের। বিষয়ের পাশাপাশি তাঁর গল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যটিও ছিল লক্ষণীয়। বিষয়ে সমকালকে ছুঁয়ে আবার তাকে পেরিয়ে যাবার কৌশলটি ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন। তাই প্রতীক-প্রয়োগে নিরাসক্তি, সূক্ষ্ম কবিত্ব ও গভীর অভিজ্ঞতাকে তিনি সমন্বিত করেছেন। গল্পের প্রয়োজনে যৌনতাকে আনলেও তাকে মধ্যবিত্ত ভদ্র জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে তোলায় ছিলেন তিনি যত্নশীল। বার্তাজীবী হলেও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গতাপ্রিয়। তাই শবৎ বা হেমন্তের নির্জন ভোর তাঁর প্রিয় ছিল, সঙ্গীহীন ভাবেই তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যসুধা পান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিজের সঙ্গেই চলতো তাঁর নীরব কথোপকথন।

আলোচ্য 'চোর' গল্পেও প্রকৃতির প্রয়োগ আছে কী অসীম ব্যঞ্জনায়! চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের এই রচনায় এক কিশোরের গাছের চারা পুঁতে গাছ তৈরির স্বপ্নের কথা আছে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারেনি। লেখক সেই না পারার যে গল্প শুনিয়েছেন তাতে মিশে আছে আমাদের সমাজের শ্রেণিবৈষম্য। গল্পের প্রতীকী উপস্থাপন লেখকের অনুভবের গভীরতাকেই প্রমাণ করে। গল্পটি এক নিম্নবিত্ত কিশোরের জবানিতে লেখা, নাম তার মিন্টু। গল্পের সূচনায় তার সক্রিয়তা ও সমাপ্তিতে তার বিশেষ উপলব্ধির কথা আছে। গল্পে খুব নিটোল কোনো কাহিনি নেই, বরং চরিত্রদের সূত্রেই এই অনুভূতি-নির্ভর গল্পটি তার গঠন পেয়েছে।

গল্পের কাহিনিটি এমন—কিশোর কথক চরিত্র মিন্টু স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার নর্দমার পাশ থেকে সবুজ কচি একটি পেঁপে চারা তুলে এনে পুঁতে দেয় নিজেদের বাড়ির রান্নাঘর সংলগ্ন ছাই-জঞ্জাল ফেলার ছোট্ট জায়গায়। সেদিনই ওদের বাড়িতে কাজের খোঁজে আসে মদন, যে মিন্টুর স্কুলের বন্ধু সুকুমারদের বাড়িতে আগে কাজ করতো। ধনী সুকুমারদের বাড়িতে তুচ্ছ কারণে কাজ হারিয়ে সে এসেছিল নিম্নবিত্ত মিন্টুদের বাড়িতে চাকরের কাজের আশায়। চাকর রাখার ক্ষমতা না থাকলেও মিন্টুর মাস কয়েকের বোনের কারণেই গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করতে মিন্টুর মা খুব সামান্য মাইনে আর থাকা খাওয়ার বিনিময়ে মদনকে কাজে রাখেন। মদন ক্রমশ হয়ে যায় সমবয়সী মিন্টুর বন্ধুস্থানীয়। উভয়ের পরিচর্যায় ঐ পেঁপে চারা সতেজ হয়ে ওঠে, গাছে কুঁড়িও দেখা দেয়। মদন বিনাদোষে কাজ হারিয়ে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ছিল ভূতপূর্ব মনিবের প্রতি। তাই সে চেষ্টা করতো তাদের সাজানো বাগান থেকে দু-একটা ভালো গাছের চারা চুরি করে এনে মিন্টুদের জমিতে লাগাতে, তার এই অভিযান অবশ্য ব্যর্থ হয়। এক বৃষ্টি-ধোওয়া বিকেলে মদন ইচ্ছে করেই স্কুল-ফিরতি সুকুমারের গায়ে রাস্তার কাদাজল দেয় এবং সুকুমারের সঙ্গী ভূষণমালির দ্বারা ধৃত হয়ে সুকুমারদের বাড়িতেই রাত কাটায়। উদ্বিগ্ন মিন্টুর বাবা-মা পরদিন সকালে মিন্টুকে ভালো জামাপ্যান্ট পরিয়ে মদনের খোঁজে সুকুমারদের বাড়িতে পাঠান। মিন্টু জেনে আসে—মদন সুকুমারের মায়ের নির্দেশে আবারো বহাল হয়েছে তাদেরই বাড়িতে। এর দিন তিনেকের মাথায় এক বর্ষার রাত ভোর হলে দেখা যায় মিন্টুদের সামান্য বাগান তছ্নছ হয়ে গেছে এবং তার সাধের পেঁপে চারাটিও নেই। নিজের হাতে লাগানো গাছের এমনভাবে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনাও মিন্টুর মাথায় আসেনি। এরপর মিন্টু তার ঐ পেঁপে চারাকেই একদিন আবিষ্কার করে সুকুমারদের সুন্দর সজ্জিত বাগানে। পরীক্ষার পর গল্পের বই আদান প্রদানের মাধ্যমে অসম অবস্থার মিন্টু ও সুকুমারের মধ্যে যখন বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল, তখনি একদিন মিন্টু জেনেছিল তার পেঁপেগাছের হারিয়ে যাওয়ার রহস্য। মিন্টু তার এই যন্ত্রণাময় আবিষ্কারের কথা তার মাকেও বলেনি। বরং একা একা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে তার মনে হয়েছে মদনই শুধু গাছটা চুরি করে নেয়নি, ঐ পেঁপে গাছটা যেন মিন্টুকেও তার দরিদ্র পরিবার থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায়। তাই মিন্টু রোজ বিকেলেই ধনী সুকুমারদের বাড়িতে যেতে উদগ্রীব থাকে, তার মায়ের আদর যত্ন পেতেও থাকে উন্মুখ। এই উপলব্ধিতেই যেন সুকুমারদের বাড়ি-বাগান-পেঁপে গাছ—সবেরই ঘোর ভেঙে গেছে মিন্টুর; এবং সে আর কখনোই সুকুমারদের বাড়িতে যায়নি।—এই বিশেষ ভাবব্যঞ্জনায় গল্পটির সমাপ্তি।

লক্ষণীয়, এখানে কাহিনিতে নেই বিবরণধর্মিতা। চরিত্রচিত্রণেও নেই আতিশয্য বরং লেখক অসাধারণ সংযমে ও প্রতীকের প্রয়োগে গল্পটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। এমন সংযত জমাট কাহিনি গ্রন্থনা এবং এমন অমোঘ সমাজসত্যের চকিত উদ্ভাস —বাংলা ছোটগল্পে খুবই কম দেখা গেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র এখানে মিন্টু ও মদন আর অবশ্যই প্রতীকী পেঁপে গাছটি। অন্যান্য চরিত্রগুলি—মিন্টুর মা-বাবা, সুকুমার, সুকুমারের মা, অপ্রধান এবং গল্পের মূল তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়ক মাত্র। নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মিন্টু প্রথম থেকেই গল্পে আত্মসচেতন, তাই ধনী ব্যারিস্টারের ছেলে সুকুমার তার সহপাঠী হলেও

গল্পের প্রথমে বন্ধু বলে উল্লেখিত নয়। মিন্টুর মা বাবাও তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। কাজ হারা সমবয়সী মদন তাদের বাড়িতে থাকুক—এমনটাই চেয়েছে মিন্টু এবং অচিরেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। মদন দীর্ঘদিন সুকুমারদের বাড়িতে কাজ করলেও কখনোই সুকুমারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়নি, হবার কথাও নয়। কর্মচ্যুত মদনের সুকুমারদের বাগান থেকে গাছ চুরির প্রস্তাবে মিন্টু সানন্দে রাজি হয়—এ যেন অক্ষমের প্রতিহিংসা পালনের চেনা গল্প। মদনকে ঘিরেই কিন্তু দুটি অসম অবস্থার প্রতিবেশী পরিবারে একটি টেনশন গড়ে ওঠে। এই টেনশনের চূড়ান্ত মুহূর্তটি আসে মদনের দ্বাবা সুকুমারের গায়ে কাদাজল ছেটানোকে ঘিরে আর এরপরই শাস্তি দানের জন্য ধৃত মদন আবার সুকুমারদের বাড়িতে কাজে বহাল হয়ে যায়। সর্বহারা মদনের নেই মান-অপমানের তীক্ষ্ণ মধ্যবিত্তসুলভ বোধ। তাই যারা তাকে সামান্য কারণে কাজ থেকে বরখাস্ত করে, তাদেরই আহ্বানে সে আবার সেখানেই বহাল হয়। কারণ, ওখানেই সে পাবে অপেক্ষাকৃত এক নিশ্চিন্ত জীবন। যারা তাকে তার দুঃখের দিনে (কর্মচ্যুতির) আশ্রয় ও কাজই শুধু দেয়নি, দিয়েছিল আপনজনসুলভ উষ্ণতা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে ভুলতে একটু সময় লাগে নি মদনের। সমাজের এই পরজীবী স্বার্থপর শ্রেণীটিকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন লেখক।

অন্যদিকে মিন্টুর আত্মসচেতনতা ছিল তার পরিবার সূত্রে পাওয়া। মিন্টু নিজের ও সহপাঠী সুকুমারের অবস্থাগত পার্থক্যকে তেমন করেই বুঝতো, যেমন বুঝতেন তার বাবা-মা। তাই ময়লা ছেঁড়া জামাপ্যান্ট পরে মিন্টু স্কুলে গেলেও প্রথমদিন সুকুমারদের বাড়িতে মদনের খবর নিতে তাকে পাঠানো হয়েছে ধোয়া ফর্সা জামা প্যান্ট পবিয়ে। নিজেব পেঁপে চারাকে সুকুমারদের বাগানে পুষ্ট সতেজ চেহারায় বড় হয়ে উঠতে দেখে মিন্টু দুঃখ পেলেও মনকে শান্ত রেখেছিল। সুকুমারদের বাড়ির বৈভব, তার মায়ের সৌন্দর্য, তাঁর আপ্যায়নের রীতি, তাদের বাগানের শ্যামল প্রাচুর্য—সবই প্রথমে মিন্টুকে মোহগ্রস্ত করেছিল। তাই পরীক্ষার পর রোজ বিকেলেই খেলা ছেড়ে সে বই আনার অছিলায় চলে যেত সুকুমারদের বাড়িতে। বড়লোকদের বাড়ির সান্নিধ্যে সে যেন সাময়িকভাবে ভুলে থাকতে চাইতো নিজের বাড়িব বাস্তব শ্রীহীনতাকে। তবু গল্পের শেষে নিজের শ্রেণী সম্পর্কে সচেতনতা তাঁকে বিত্তবানের বাড়িতে আর না যাওয়ার মানসিক প্রতিজ্ঞায় পৌঁছে দেয়। এভাবেই পেঁপে গাছের প্রতীকে মিন্টুর মানসিক টানাপোড়েন এবং স্ব-স্থানে ফিরে আসা—গল্পের কেন্দ্রীয় চবিত্রের বিশিষ্টতা ও গভীরতাকে চিহ্নিত করে। মদন চরিত্রটির তুলনায় মিন্টুর বিশেষত্ব বুঝে নিতে আমরা সচেষ্ট হই। মদনও কাজ হারিয়ে ধনী সুকুমারদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে, নিম্নমধ্যবিত্ত মিন্টুদের সংসারের উষ্ণতার ছোঁয়ায় তাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠতে চেয়েছে। তাই কাজ শেষের পর সে খেলার সাথী হয়েছে মিন্টুর, বা তাদের অযত্নচর্চিত ছোট্ট একফালি বাগানকে চুরি করা গাছের সম্পদে সম্পন্ন করতে চেয়েছে। কিন্তু এই মদনই আবার সুকুমারদের বাড়ির চাকরির নিরাপত্তার (যতই তা সে আপাত হোক না কেন) আকর্ষণে আবার তাদেরই কাজে লেগে পড়েছে। শোষণের ফাঁদ তার চেনার কথা নয়, তাই সে সহজেই ফাঁদে পড়েছে। অন্যদিকে স্কুলে পড়া মিন্টু তার অন্তরের অনুভূতিতেই উচ্চবিত্তের আধিপত্যকে বুঝেছে ও তাকে অস্বীকার করেছে মনে মনে।

মিন্টুর মা-বাবা-মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সমন্বিত চরিত্র। তাঁরা মদনের মতো নিচের তলার মানুষের প্রতি মানবিক, নিজেদের সাধ্যের গণ্ডির মধ্যে থেকেই তাঁরা অসহায়ের সহায়তা করেছেন। আবার খুব সচেতনভাবেই ধনী প্রতিবেশীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। বড়লোকদের এঁরা সম্মান করেন, আবার ভয়েই কিছুটা এড়িয়ে যান, তাই মিন্টুর বাবা মদনের খোঁজে সুকুমারদের বাড়িতে যেতে চাননি। নিজের সাধারণ বাড়ির আব্রু নিয়ে মানুষটি যেমন চিন্তিত ছিলেন, তেমনি নিজের আত্মসম্মান রক্ষার্থেও ছিলেন সর্বদাই যত্নবান। অন্যদিকে সুকুমারদের পরিবার তাদের চাকর-মালি-ড্রাইভার পরিবৃত হয়ে থাকাকালীন প্রতিবেশীদের সুখদুঃখে কখনো অংশীদার হ'ন নি; তবে তাদের প্রতি যে পোষণ করতেন তুচ্ছতার ধারণা তা সুকুমারের মায়ের কথাতেই স্পষ্ট। মিন্টুদের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি মদনকে গরিব বাড়ির কাজ ছেড়ে আবার তাঁদের বাড়িতেই বহাল হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিন্টুকে ছেলের সহপাঠী জেনে তিনি রোজ ফল মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করতেন, তাঁর এই আতিথেয়তায় লুকানো ছিল নিজের অভিজাত বৈভবপূর্ণ উন্নত অবস্থাটি তুলে ধরার মানসিকতা। তাই আজও বড়লোকের বাড়িতে গেলে অবহেলায় দেওয়া দামি খাবার অনিচ্ছাতেও খেতে হয় তাঁর সম্মান রক্ষার্থে। কিন্তু গরিবের বাড়িতে কখনো উপরতলার মানুষের পদধূলি পড়লেও তাঁরা গরিবের শত যত্নে কষ্টে হাজির করা মিষ্টির একটাও মুখে না দিয়ে চলে যান—যেহেতু গরিব গৃহস্বামীর মানরক্ষার দায় তাঁর থাকে না। এই গল্পেও লেখক তাই দেখিয়েছেন—সুকুমার আসেনি মিন্টুদের বাড়িতে, বরং মিন্টুই লোভীর মতো বারবার গিয়েছে সুকুমারদের বাড়িতে। কিশোর বয়সেই সুকুমার জেনে গিয়েছিল নিজের শ্রেণীগত তারতম্য। তাই তার বন্ধু নির্বাচনেও ছিল আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত। মদন তার বন্ধু নয়, আর মিন্টু সহপাঠী বলেই যেন কৃপার্থে বই আদানপ্রদানের যোগ্য।

গল্পটি অবশ্যই সামাজিক, যেখানে সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসগত বিভিন্নতার বোধ। তিনটি প্রায় সমবয়সী কিশোর চরিত্র এখানে আমাদের সমাজের তিন শ্রেণীর বাসিন্দা। আমরা জানি সমাজে একেবারে উপর তলার ও নিচের তলার বাসিন্দারা তাদের কাজে কর্মে অনেকটাই দ্বিধাহীন, কিন্তু মাঝের তলার বাসিন্দারাই সমাজের ভয়ে নিজেদের আচারআচরণ নিয়ে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। এই গল্পেও তাই কাজের লোক মদন তার পেটের প্রশ্নে দ্বিধাহীন। এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে সে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। আবার উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান সুকুমার নিজের স্বাতন্ত্র্যে আভিজাত্যে নির্দ্বন্দ্ব। যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এখানে তৈরি হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মিন্টুর মনে। সে মদনের মতো গায়ের জ্বালা মেটাতে অন্যের বাগানের গাছ চুরি করতে পারে না, পারে না অন্যের গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিতে বা আত্মসম্মান ভুলে অন্যায়কারীর পদলেহন করতে। আবার সুকুমারের মতো কেবলই বই-এর দুনিয়ায় মুখ গুঁজে রাখতেও সে পারে না, পারে না চাকর দিয়ে পায়ে পরা জুতোয় পালিশ করাতে। তাই মিন্টু স্কুলপাঠ্য বই-এর পড়া শেষে গল্পের বই-এর খোঁজে যেমন সুকুমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, তেমনি বাড়ির কাজের ছেলে মদনকে নিয়ে খেলায় বা বাগান করায় মেতে ওঠে। সমাজে মধ্যবিত্তকে এভাবেই বাকি দুই শ্রেণির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চলতে হয়। আবার সচেতন থাকতেও হয় যাতে এই প্রান্তীয় দুই শ্রেণীর চাপে তার

নিজস্ব অবস্থানটির নড়নচড়ন না ঘটে। তাই মিন্টু মদনেরই মতো সুকুমারদের বৈভবের আনুগত্যে বাঁধা পড়তে পড়তেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করেছে। গল্পশেষে মিন্টুর উপলব্ধি যেন আমাদের মনে এক সূক্ষ্ম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে।

গল্পটি আশ্চর্য নির্মেদ। ঘটনা, চরিত্রে কোথাও নেই অতিকথন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য একমুখী লক্ষ্যে গল্পটি এগিয়ে গিয়েছে। আলাদা আলাদা ঘটনাগুলির দ্বারা লেখক যেভাবে মূল প্লট ও চরিত্রগুলিকে সাজিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি করে। গল্পটি পরিণামে ঘটনাময়তা থেকে অনুভববেদ্যতায় পর্যবসিত। তাই পেঁপে গাছ চুরির ঘটনার পরে এসেছে মিন্টুর প্রতিক্রিয়া—যা এক অন্যতর চুরির উপলব্ধিতে মিন্টুকে এবং আমাদেরও পৌঁছে দিয়েছে। অবশেষে নিজের অস্তিত্ব চুরি যাওয়া বোধ করতে মিন্টুর ভয়-মিশ্রিত পলায়নে যে ব্যঞ্জনা এনেছেন লেখক, তা গল্পে এনেছে কবিত্বের আস্বাদ। মিন্টুর এই আত্মউদ্‌ঘাটন যেন নাটকীয়ভাবে আমাদের-ও অস্তিত্বের মূল ধরে নাড়া দেয়। অথচ গল্পে লেখক বিবরণধর্মিতাকে প্রশ্রয় দেন নি। আগাগোড়াই গল্পটি বলা হয়েছে ইঙ্গিতের ভাষায়। একটি অকুলীন পেঁপে গাছের প্রতীকে লেখক নিরাসক্তভাবে সমাজের অবস্থান ও বৈষম্যকে দেখিয়েছেন। মদনের ব্যবস্থার কাছে বিকিয়ে যাওয়া আর মিন্টুর নিজেকে বিকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে প্রতিরোধ করার পরিণামী বক্তব্যে লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি এই চেনা সমাজের আয়নায় আমাদের মানুষী দুর্বলতা আর হার-জিৎ জনিত ক্লান্ত মুখগুলির প্রতিবিম্বকে দেখেছেন।

গল্পের নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের চুরি যাওয়া পেঁপে গাছটি মদন মিন্টুদের জঞ্জাল ফেলা জমি থেকে এক বৃষ্টির রাতে চুরি করে নিয়ে লাগিয়েছিল তার তৎকালীন প্রভু সুকুমারদের বাগানে। সুতরাং এদিক থেকে গল্পে চোর হয়ে ওঠে মদন নামক চরিত্রটি। এই মদন আগে মিন্টুদের বাড়িতে থাকার সময়ে সুকুমারদের বাগান থেকে গাছ চুরি করে আনার পরিকল্পনা করেছিল, যাতে সায় ছিল মিন্টুর। মিন্টু গল্পে কখনোই প্রত্যক্ষভাবে চুরি করেনি, কারণ তার আনা পেঁপেচারাটিও চুরি করা কোনো বাগানের গাছ ছিল না, বরং সেটি সে এনেছিল রাস্তার ধারে নর্দমার পাশ থেকে। অথচ ঐ পেঁপেগাছটিই যখন সুকুমারদের বাগানে মালির যত্নে দিব্যি সতেজ সবুজ হয়ে উঠেছিল, তখন মিন্টু রোজই প্রায় ঐ গাছটিকে গিয়ে দেখতো। আর এভাবেই একদিন সে উপলব্ধি করেছিল— মদন পেঁপে গাছটি চুরি করে নিয়ে যায় নি, বরং পেঁপে চারাটাই মদনকে তাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে আর তাকেও চুরি করে নেওয়ার যেন চেষ্টা করছে। এভাবে গাছটির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে লেখক বক্তব্যের ব্যঞ্জনাকে ঘনীভূত করেছেন। গল্পের শেষের দিকে দেখি সুকুমারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদেই মিন্টু ওদের বাড়ির বাগান অবধি পৌঁছতে পেরেছে। যেখানে সে দেখেছে তার পেঁপে গাছটির চমৎকার সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্য—যা দেখার জন্য রোজই তার পা চলে যেত সুকুমারদের বাড়ির দিকে। ঐ গাছ তাকে টানতো, তাই বন্ধুর সঙ্গে গল্প করলেও তার চোখ চলে যেত বাগানে ঐ বিশেষ গাছটির দিকে, যেন গাছটাকে দেখে দেখেও তার দেখার আশ মিটতো না। সে নিজের চোখেই দেখেছিল তাদের ছাই-জঞ্জালের জমিতে গাছটির যে গড়ন ছিল তা অনেক বেশি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল ধনীর বাগানের সারযুক্ত

মাটি পেয়ে বা মালির যত্ন পেয়ে। একই ভাবে তাই সে মদনের মনস্তত্ত্ব বুঝে আব মদনের উপর রাগ করতে পারেনি। সুকুমারদের মতো ধনীর সাহচর্যেই নিম্নবিত্তরা উপরে উঠতে চায়। তাই মদন মিন্টুদের কম মাইনের চাকরি ছেড়ে সুকুমারদের বেশি মাইনের চাকরি নিয়েছে—আর এটা উপলব্ধি করার পাশাপাশি মিন্টু বুঝেছে তার মধ্যবিত্ত অস্তিত্বকেও যেন গোপনে গ্রাস করতে চায় ধনীর বিলাসবাসন। বাস্তবেও আমরা দেখি গরিব ছেলেমেয়েরা কেমন করে বড়লোকদের পোশাক ইত্যাদির নকল করে। তারা নিজস্বতা ভুলে সস্তা উপকরণেই উপরতলার বাসিন্দাদের মতো হয়ে উঠতে চায়। এভাবেই মানুষ তার শিকড়ের টানকে ভুলে অন্যের আধিপত্যের শিকার হয়। আবার সচেতন মানুষ এই কৌশলটি বুঝে ফেলে এই বিতত বীতংস থেকে বেরিয়েও আসতে চায়—যেমন চেয়েছে মিন্টু। তাই সে ক্ষণিক মোহগ্রস্ততাকে ঝেড়ে ফেলে আবার ফিরে আসে তাদের মলিন শ্রীহীন সংসারের চৌহদ্দিতেই। —'আর আমি কোনদিন ও-বাড়ি যাইনি'—মিন্টুর শপথসুলভ উচ্চারণ যেন তার আগের আচরণের অনুতাপময় প্রায়শ্চিত্ত। সে পারেনি পেঁপেগাছের চুরি যাওয়াকে ঠেকাতে, বা পাবে নি মদনকে নিজেদের বাড়িতেই কাজে বহাল রাখতে। তবে ঐ কৈশোরেই সে পেরেছে নিজের অস্তিত্বকে মনের জোরে টিকিয়ে রাখতে। 'চোর' গল্পে কিশোর চরিত্র মিন্টু যা পেরেছে, ব্যাপ্ত আধিপত্যবাদের কালে এভাবেই তো নিজেদের পৃথক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা বাড়ছে।

সামনে চামেলি : এক ভিন্নস্বাদের গল্প

নিলয় বক্সী

কীভাবে গল্প আরম্ভ করবেন, তার সারা অঙ্গ কী' রকম হবে, সেখানে বর্ণনা বেশি থাকবে, না সংলাপ বেশি থাকবে—সে সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন থাকতেন এবং একটা পূর্ব-পরিকল্পনা করে রাখতেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। গল্পের সিচুয়েশান্ ও থীম্ অনুযায়ীই আঙ্গিক নির্মাণের পক্ষপাতী তিনি। সেদিক থেকে 'সামনে চামেলি' গল্পটিকে বলা যায়—বিবরণধর্মী বা বর্ণনাধর্মী গল্প। এর শুরু বা শেষ, কোথাও নিছক প্রাকরণিক চমক তৈরি করতে চাননি গল্পকার। অত্যন্ত Naturalistic ঢঙে লেখা এই গল্প। অর্থাৎ, এটিকে বলা যেতে পারে, গল্পকারের স্বভাববাদী এবং স্বীকারোক্তিমূলক রচনা।

বাস্তবিকই এক মগ্ন অন্তর্মুখিনতার গহনে আমাদের নিয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি' গল্পটি। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক ভিন্নস্বাদের গল্প এটি। এই গল্পের একজন কথক আছে। এছাড়া, আর একটি চরিত্র রয়েছে—'সে'; যার কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়ে চলে কথক, যার স্বভাব-আচরণ ইচ্ছা-অনিচ্ছা-ই সাধ স্বপ্ন-ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে criticise করে কথক। দুজনের মধ্যে কথোপকথন এবং বোঝাপড়া চলে সারা গল্প জুড়ে। কথক এবং 'সে' কিন্তু অভিন্ন সত্তা, একই মানুষ—"কিন্তু কাউকে তুমি চোখে দেখছ না। সে দেখেনি। আমি দেখিনি। হুঁ, আমি সে। ঘুরতে ঘুবতে এই রাস্তায় এসে গেছি।" অথচ গল্পে, দুজনকে স্পষ্ট আলাদা রাখলেন গল্পকার। কখনো তারা পরস্পরের সঙ্গে overlap করে যায়।

কথক এবং 'সে' একই মানুষ হলেও—দু'জনেব চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। গল্পটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়, কথক হয়তো-আমাদেরই মধ্যে কেউ একজন—গড়পড়তা সাধারণ মানুষ; তাকে আমরা চিনি-জানি। কিন্তু, 'সে'-যেন আমাদেরই মধ্যে লুকোনো কোনো রোমান্টিক সত্তার প্রতীক, কোনো এক পরা-বাস্তব-জগতের বাসিন্দা। তাকে হঠাৎ আমরা চিনতে পারি না, কিন্তু ভালোবাসি, তার জন্য আমাদের মনে সঞ্চিত থাকে সহানুভূতি এবং সমবেদনা। আমাদের মন তাকে প্রশ্রয় দেয়। কথক তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। বড়ো কিছু পাওয়ার আশা তার নেই। কিন্তু, 'সে' একদম সচেতন নয় তার বাস্তব সম্পর্কে, সুন্দরকে সন্ধান করাই যেন তার জীবনের মূল লক্ষ—"সুন্দর রাস্তা সুন্দর বাড়ি গাছপালা ফুল পাখি দেখতে সে চিরকাল ভালবাসে। হুঁ আমি। ছেলেবেলা থেকে আমাব মনটা রোমান্টিক।" 'উদাস চোখ মেলে' চারিদিকে যেন কিছু খোঁজে এই মানুষটি। 'সুন্দরের পিপাসা, রূপের তৃষ্ণা, পরিচ্ছন্নতার মোহ'-যেন তাকে কোনো এক স্বপ্নময় কল্পজগতের অধিবাসী করে তোলে।।

দুই

'সামনে চামেলি' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটি ভারি নির্জন অভিজাত রাস্তা। তার দু-পাশে অজস্র ইউক্যালিপ্টাস, রাধাচূড়া ও ছোট-হলদে মে-ফ্লাওয়ার ফুলের গাছ; বড় বড গ্রীল দেওয়া সুসজ্জিত ব্যালকনি বিশিষ্ট সারিবদ্ধ সুন্দর সব বাড়ি। এরই মধ্যে সুন্দবকে

খুঁজে চলে—কথকেরই বিকল্প সত্তা (alter ego)-'সে'—"সুন্দর কিছু খুঁজছে সে সুন্দর পরিচ্ছন্ন মার্জিত—তাই এই নির্জন বিশাল রাস্তাটায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তাকিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় সারাজীবন সে যে-স্বপ্ন দেখেছে এখানে প্রায় তার সবকিছুই ছবি হয়ে চুপ করে আছে।"

গল্পটি শুরুই হচ্ছে রাস্তার বর্ণনা দিয়ে। ব্যক্তিভেদে তো দেখার ধরন বদলেই যায়, চলতে চলতে দেখা কিংবা থমকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখা—দুটো এক নয়। লোকটি কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল রাস্তাটিকে—তন্ময় হয়ে। পাশাপাশি 'সে' আমাদের কাছে জানতে চায়, রাস্তাটিকে আমরা কেমন করে দেখেছি। 'সে' যেন, আমাদের সাধারণ চোখ দিয়ে চলতে চলতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে না দেখার সঙ্গে, তার 'বিশেষ ভাবে' দেখাকে তুলনা করতে চায়। রাস্তাটি সত্যই যেন তার কাছে অনেক বড় কিছু। সেটিকে থমকে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে গুরুত্বদান-সহ না দেখাটা যেন মানুষের জীবনের কী বিরাট ক্ষতি!

এইভাবে প্রথম থেকেই 'সামনে চামেলি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে ঐ নির্জন-সুন্দর-রাস্তাটি। এ-গল্পের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গীর বা কাহিনীবয়নরীতির মধ্যে যে চমক এবং অনন্য-সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে–তা মানতেই হবে। কতোগুলি কারণের জন্য ঐ রাস্তাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে লোকটি।

প্রথমত, 'সে' পঙ্গু, অল্পবয়সে বন্ধুর অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে তার একটা পা কাটা যায়। 'সে' যখন কলেজের ছাত্র-তখন এইভাবেই অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবনেই বিপর্যয় ডেকে আনে। তারপর থেকে তার পঙ্গুজীবনে কাটা পায়ের বিকল্প হিসেবে এসেছে-ক্রাচ, 'ক্রাচে ভর দিয়ে মন্থরগতিতে-নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেই 'সে' ভালোবাসে, যেখানে ভিড় নেই, পথচারী নেই, খুব বেশি যানবাহন চলাচল করে না, লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় না। তাই, এ' রকম একটি জনহীন—অভিজাত-রাস্তাকে যে 'সে' পছন্দ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না—"কাজেই যে রাস্তায় ভিড় নেই, খুঁজে খুঁজে তেমন রাস্তা ধরেই আমি হাঁটি, হাঁটতে ভালবাসি।" বাস্তব বা রিয়ালিটিকে অতিক্রম করে সুন্দর স্বপ্ন-কল্পনার তথা এক অভূতপূর্ব মায়াবাস্তবতার জগতে পৌঁছানোব প্রতীক হিসেবেই হয়তো এসেছে 'ক্রাচ'—'আজ? যেন ঠিক এই জিনিসের পরীক্ষা দিতে কাটা পা নিয়ে ক্রাচ ঠুকে ঠুকে এই আশ্চর্য সুন্দর জগতে চলে এসেছি।"

দ্বিতীযত, লোকটি নিজের সম্পর্কে অসম্ভব হীনম্মন্যতায় ভোগে। তার বেশভূষা মলিন, চেহারাও ম্লান এবং বিষণ্ণ। দুর্বল স্বাস্থ্য। সাংঘাতিক রকমের অপুষ্টি আব রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত মানুষটি। নিজেকে সে মনে করে অতি-সাধারণ, নগণ্য, দুঃখী, বঞ্চিত ও ব্যর্থ, ভিতবের দিক থেকেও 'সে' নিঃস্ব ও রিক্ত—সেইসঙ্গে আশাতীত রকমের ভীরু, এবং অনাবশ্যক রকমের লাজুক, পরনে তার পাঁচ টাকা দামের একটা জেলজেলে ছিটের কলার ছেঁড়া-শার্ট এবং জীর্ণ মলিন ধুতি। পেশায় 'সে'-প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। অতএব, ইচ্ছে থাকলেও কোনোদিন লোকটি অসাধারণ কিছু হতে পারবে না। সুন্দরী মহিলাদেব সম্পর্কে আগ্রহ থাকলেও কারো চোখের দিকে তাকিয়ে 'সে' কথা বলতে পারবে না, এক কথায়

বললে, ভয়ানক—Inferiority complex-এ ভোগে। এইরকম একটি লোকের কাছে নির্ভর-যোগ্য আশ্রয় হয়ে ওঠে জনহীন-পরিচ্ছন্ন ঐ রাস্তা—"এইজন্যই নির্জনতা-ফাঁকা রাস্তা আমার প্রিয়। ভিড় নেই, গায়ে ধাক্কা লাগে না, ক্রাচে ভর করে আস্তে আস্তে হাঁটবার সুবিধে হয়। তার চেয়েও বড় কথা—মানুষজন নেই বলে কারো চোখের দিকে তাকাবার দরকার পড়ে না, কারো সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে ছোট নিঃস্ব অপদার্থ চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় না। নিজের মতন করে আমি চলতে পারি, ভাবতে পারি।"

তৃতীয় কারণটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা'-হলো সুন্দরকে খোঁজা। এই সুন্দরকে খোঁজার নেশা তার 'ছেলেবেলা' থেকেই; 'সে' রোমান্টিক-প্রকৃতির মানুষ, তরুণ বয়সে কবিতাও লিখেছে। কিন্তু পরবর্তীকালের দুর্ধর্ষ জীবন সংগ্রামের অন্তহীন লড়াইয়ে ধীরে ধীরে যতো জড়িয়ে পড়েছে, ততোই তার জীবন থেকে একটু একটু করে হারিয়ে গিয়েছে কবিতা। এই মনোরম রাস্তায় চলে আসার মূল-কারণ-ও আসলে তার সুন্দরকে খোঁজারই আগ্রহ—"হুঁ, মে-ফ্লাওয়ার ও রাধাচূড়া গাছগুলি বৈশাখী হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাসের মতন শব্দ করে। মেয়েদের মুচকি হাসির মতন একটু সময়ের জন্য ঠান্ডা পরিচ্ছন্ন জুঁইয়ের গন্ধও টের পাই। বলতে কি, সবটাই আমার কাছে ভীষণ রোমান্টিক মনে হয়। বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মৃদু হয়ে আসে। আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়। আমি মুগ্ধ হই, আমার এত ভাল লাগে, ঘুরতে ঘুরতে যখন এই রাস্তায় চলে আসি।" তাই হয়তো 'সে' আজ, জীবন সম্পর্কে সুস্থ স্বাভাবিক এবং শ্রীসম্পন্ন নান্দনিক দৃষ্টিকেই ঈশ্বর বলে ভেবে নেয়।

আসলে, সুন্দরের চেতনাটা তার মধ্যে স্বাভাবিক বলেই তো জীবন তার কাছে আশ্চর্যের। বিস্ময়ের কতো উপাদানই না ছড়িয়ে রয়েছে এই নিসর্গজগতে। আর সেগুলি উপভোগের জন্য—আস্বাদনের জন্য—মানুষের মন সর্বদাই তৃষিত থাকে। বিস্ময়, প্রেম আর কল্পনা দিয়েই আমাদের মন প্রকৃতির রহস্য-নিকেতনের দরজা খুলতে চায়। সৌন্দর্যতৃষ্ণা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পদ। কাজেই, ঐ লোকটির সাথে জনহীন বনেদী-রাস্তার আদৌ কোনো সম্পর্ক না-থাকা সত্ত্বেও, লোকটি তার অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঘিঞ্জিগলির কুৎসিত পরিবেশের বাসস্থান ছেড়ে—এই পরিচ্ছন্ন-রাস্তায় চলে আসে। সুন্দর কিছু খোঁজার বিপুল-স্পৃহা, রোজ বিকেলে স্কুলছুটির পর তাকে বাড়ি ফিরতে না দিয়ে এই রাস্তায় টেনে আনে। এর আকর্ষণ 'সে' উপেক্ষা করতে পারে না। কথক এবং 'সে'-এর দ্বান্দ্বিকতা আর একবার প্রকট হলো কথকেরই ভাষ্যে—"আমার দরকার এখন প্রচুর বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার—কিন্তু ঐ যে, আমার মধ্যে একটি 'সে' আছে, ভীষণ একরোখা, অতিমাত্রায় রোমান্টিক, খারাপ স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত খাটুনি—কিছুই ভ্রূক্ষেপ নেই, যতক্ষণ ছেলে পড়াল, পড়াল, যতক্ষণ স্কুলে থাকল, থাকল, বাকি সময়টা ক্রাচ ঠুকে ঠুকে হাঁটছে হাঁটছে, সুন্দর কিছু খুঁজছে সে—সুন্দর পরিচ্ছন্ন মার্জিত।"

তিন

রাস্তার চারপাশের প্রকৃতির ও পরিবেশের মধ্যে চলে সুন্দরের আয়োজন। গন্ধ, দৃশ্য, শব্দ—এরা একত্রিত হয়ে এ'-গল্পের মূল আবহ বা পটভূমি নির্মাণ করেছে। গন্ধের স্মৃতি খুব বেশি পরিমাণে কাজ করেছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যজীবনে, হয়তো একাকী ঘরে জানলার ধারে বসে রয়েছেন তিনি; হঠাৎ বিশেষ কোনো দৃশ্য বা গন্ধ 'হন্ট' করলো তাঁকে।

তৎক্ষণাৎ আলোড়িত হয়ে উঠল তাঁর অন্তরের স্মৃতির সমুদ্র। মাথায় এসে গেলো গল্পের কোনো প্লট, অমনি তা দ্রুত লিখে ফেললেন। আসলে, অশৈশব এক তীক্ষ্ণ ঘ্রাণানুভূতি তাঁর লেখালেখি করার নেপথ্যে কাজ করে গিয়েছে। আত্মকথায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন— ‘সবকটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই শৈশব থেকে আমার নাকটা অতিমাত্রায় সজাগ-সচেতন।’’

‘সামনে চামেলি’ গল্পে গন্ধ-শব্দ এবং আলোর-চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদেরকে আমরা স্থূলভাবে—দু’টি ভাবে বিভক্ত করতে পারি। কোনো, শব্দ এবং গন্ধ সুন্দর—, কেউ কেউ আবার অসুন্দর। এ’গল্পে রয়েছে অজস্র ফুলের উপস্থিতি। নামকরণের থেকেই আমরা পাচ্ছি চামেলী ফুলকে। এ’ছাড়া রয়েছে রাধাচূড়া, হলদে রঙের ছোট ছোট মে-ফ্লাওয়ার ফুল, কিংবা হেনা বা মাধবীলতা, সন্ধ্যাবেলার বৈশাখী বাতাসে ভেসে আসে জুঁই ফুলের গন্ধ—‘‘হয়তো কোনো ব্যালকনিতেই জুঁই লতিয়ে উঠছে।’’ কখনো আবার হাস্নুহানার চড়াগন্ধে বাতাস ভরে ওঠে। কোনো কোনো বাড়ির ব্যালকনি থেকে, টবে ফোটা চাঁপা, বেল, কি বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসে—দক্ষিণা বাতাসে। এ’ছাড়া, গোলাপ-ফুল তো রয়েছেই। লোকটি, ফুলের গন্ধের স্বাদ নিতেও এ রাস্তায় চলে আসে বার বার। তথাপি তার আক্ষেপ—‘‘ফুল চেনা হয়নি, এই জীবনে ভাল করে ফুল দেখা হয়নি।’’

গন্ধ শুধু যে ফুলেরই—তা নয়, পাশাপাশি, রয়েছে পাকা-ভেড়ার মাংস-সেদ্ধ হওয়ার মিঠে মিঠে গন্ধ, ক্রিম-পাউডার-সেন্ট এবং শ্যাম্পুর গন্ধ, ডেটল কি ফিনাইলের গন্ধ, কিংবা গাড়ির পেট্রলের পোড়া পোড়া গন্ধ। এ’-সব গন্ধেও ভরা থাকে বাতাস। কোনো গন্ধের চরিত্র সুন্দর, আবার কোনো গন্ধ—আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পীড়া দেয়।

অভিজাত রাস্তাটিকে আমাদের সামনে অবয়বগ্রাহ্য করে তোলার জন্য, বিচিত্রধরনের ধাতব শব্দের প্রয়োগ করেছেন এখানে গল্পকার। রাস্তাটির নির্জনতাকে কখনো হয়তো বিদীর্ণ করে প্রেসার-কুকারের হিস্-হিস্ শব্দ, বিলাতি কুকুরের গুরুগম্ভীর ডাক, কিংবা অ্যালসেসিয়ানের ডাকের শব্দ, সিমেন্টের ওপর দিয়ে ভারি জুতো পায়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দ, গাড়ি চলাচলের শব্দ, কিংবা পেভমেন্টের ওপরে সিকি বা আধুলি পড়ার শব্দ। এই শব্দগুলি জাতে তীক্ষ্ণ, চরিত্রে অসুন্দর—এবং শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে সুখপ্রদ বা আরামদায়ক আদৌ নয়। উপরন্তু, তারা রাস্তার নির্জন স্বভাব ও গাম্ভীর্যকে চিরতরে নষ্ট করতে পারে না। এর বিপরীতে রয়েছে, গাছের ডালে পাখির ডানা ঝাপটানোর ক্ষীণ শব্দ, কিংবা কোনো রেডিও-তে একটানা বাজতে থাকা সেতারের মৃদু আলাপের রিন্-রিন্ শব্দ; এরা কিন্তু ভিন্নজাতের। এবং সুন্দরের অনুষঙ্গবাহী। এইভাবে গল্পকার বাস্তব এবং স্বপ্নের মধ্যে দোটানা তৈরি করেন। পাঠক হিসেবে দুটো সমান্তরাল জগতের অস্তিত্ব টের পাই আমরা। নিছক গড়পড়তা বাস্তবের-ভেতরে কোথাও হয়তো থেকে যায় পরাবাস্তবের ছোঁয়া, অথবা স্বপ্নময় সৌন্দর্যময় কোনো অধিবাস্তব জগৎ। এইভাবে দুই বাস্তবের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সুন্দর ও অসুন্দরের যুগপৎ সন্নিধি—একদিকে গল্পটিকে যেমন ভিন্নস্বাদের করে তোলে, তেমনি অন্যদিকে রাস্তাটিকে ‘অপার্থিব’’ কোনো চরিত্র দান করে—‘‘সেই অপার্থিব রাস্তার প্রগাঢ় স্তব্ধতার সঙ্গে, প্রেসার কুকারের বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ বা সেতারের সুমিষ্ট আলাপের আরও গভীরে সে ক্রমশ লীন হয়ে যেতে চাইছে, আমার তাই মনে হল।’’

এ'-গল্পে যেমন ধরা থাকে ধ্বনি ও নৈঃশব্দ্যের সূক্ষ্ম টানাপোড়েন, তেমনি-এর ভেতরে চলতে থাকে আলো এবং আঁধারের গোপন-খেলা। গল্পের সময়কাল অবশ্যই গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা। শুরুতেই কথক বলছে—"আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার মুখে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। বৈশাখ মাস; তাই বোধকরি সবটা রাস্তায় দু'পাশে খুব রাধাচূড়া ফুটেছিল।" কোলকাতা শহরে সূর্যডোবার দৃশ্য হয়তো কোথাও চোখে পড়ে না, অন্ধকারই শুধু দেখা যায়। নানা আলোর বর্ণিল সমাবেশ রাস্তাটির আভিজাত্যকে বাড়িয়ে তোলে—"পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে আর তখুনি রাস্তায় বাড়িতে নিওন ফ্লোরেসেন্ট আলো দপদপ জ্বলে ওঠে। যেজন্য হঠাৎ কেমন কিম্ভূত-কিমাকার মনে হতে থাকে শহরটা। কিন্তু, সেদিনকার রাস্তাটা ভারি সুন্দর ছিল। খুঁটির মাথায় মাথায় নীলাভ রূপালি আলো, গাছে গাছে অজস্র ফুল, তার ওপরে গাঢ় নির্জনতা।"

সন্ধ্যার মুখে আলো জ্বলে ওঠে—এবং পেভমেন্টের ওপর 'চিকরিকাটা ছায়ার আলপনা' সৃষ্টি করে। ফলে, রাস্তাটিকে মনে হয়, আরো বেশি 'রহস্যময়'। বনেদি রাস্তাটিকে নানাবর্ণের—আলোর সাজ পরিয়ে দেয় যেন সন্ধ্যা। উঁচু উঁচু থামের মাথায় বেগুনি রূপালি আলো জ্বলে ওঠে; সারি সারি গাছের মাথায় সেই আলো ঝরে পড়ে পরিচ্ছন্ন পেভমেন্টে ছায়ার আলপনা এঁকে দেয়। দক্ষিণা বাতাসের তালে তালে ছায়াগুলি আপন মনে থিরথির করে কাঁপতে থাকে। এ'-সব দেখে 'সে' উৎসাহিত হয়; তাইতো লোকটি সন্ধ্যার ঠিক আগে আগেই এ'-রাস্তায় চলে আসে-বর্ণ গন্ধ এবং আলোর অপূর্ব সমারোহ দেখবে বলে। পাতার ছায়া ও রাস্তার আলো একসঙ্গে চুঁইয়ে পড়ে তার শুকনো ফ্যাকাশে নখগুলিকে চিত্রিত করে তোলে।

চার

'সামনে চামেলি' গল্পে একই সঙ্গে দু'টো সময় (time) ক্রিয়াশীল। একদিকে রিয়ালিটি, স্বপ্নহীন-রূঢ় বাস্তব—তাকে বারবার অতিক্রম করে লোকটি সুন্দরকে অন্বেষণ করতে থাকে, মনের মধ্যে লালন করে চলে কতো স্বপ্নের ভ্রূণ—পোষণ করে কতো আকাঙ্ক্ষা আর বাসনার তাপ; চিতার আগুনে শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে'গুলি একজন মানুষের শুকনো পাঁজরের নিচে লুকিয়েই থাকে, মরে না। কথক এখানে 'ক্রিটিকে'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ—"স্বপ্ন খুঁজছে, শুকনো পাঁজরের নিচে রমণীয় আশা নিয়ে এ মসৃণ চকচকে রাস্তায় চলে এসেছে। পাগল আর কাকে বলে।"

অন্যদিকে রয়েছে লোকটির কাঙ্ক্ষিত শৈশব। মাঝে মাঝেই 'সে' অতীতচারী হয়ে ওঠে। শৈশবের স্মৃতিচারণার থেকে পুরোনো দিনের স্বপ্নরা তার মনের জানালায় এসে উঁকি দিয়ে যায়। কথক বলে "ঐ যে মনোহর মার্জিত কিছু খুঁজছে সে, এই খোঁজা তার সেই ছেলে-বেলা থেকে। যখন ন'দশ বছর বয়স। একটা উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ-আশার মতন। ভাল কিছু দেখব, সুন্দর কিছু পাব, হাত বাড়ালেই পাব। পরিচ্ছন্ন নয়নাভিরাম শ্রীসম্পন্ন কোনো জগতে একদিন গিয়ে আমি দাঁড়াব—দাঁড়াতে পারব। মনে মনে হেসেছি আমি। কেননা আমি জানতাম, তখন থেকেই জেনে গেছি। এটা তার দুরাকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কোনো দিনই পূরণ হবার নয়। এবং হয়ওনি আজ সাতাশ বছর বয়সে এসেও তাই দেখেছি।"

ঐ গল্পে ফ্ল্যাশ-ব্যাকেরও ব্যবহার করেছেন গল্পকার। লোকটির মনে পড়ছে সে'-সব

দিনের বেদনাময় স্মৃতি, যে-দিন 'সে' কোনো এক অপরিচিত পথচারী ভদ্রলোকের হাতে লাল-গোলাপের তোড়ার থেকে একটি গোলাপ ফুল চেয়ে ভর্ৎসিত হয়েছিল; কিংবা কোনো এক দুপুরে কাজের কথা ভুলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ময়ূরের পেখম ধরা দেখেছিল। ফুল, পাখি—ঐ সব এক হিসেবে খুব সাধারণ জিনিস হলেও—"এই সাধারণ চাওয়া সাধারণ আকাঙ্ক্ষা থেকেই অসাধারণ কিছু দেখে অসাধারণ কোনো কোনো স্বপ্ন ও বাসনা তার বুকে বাসা বাঁধতে" আরম্ভ করেছিল।

প্রাইমারী স্কুলেও লোকটি ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদেরই পড়ায়, যাদের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়নি। মাস্টারমশাইয়ের প্রতি তাদেরও রয়েছে সমবেদনা এবং সহানুভূতি। লোকটি ওদের পছন্দ করে, ভালোবাসে—"তাদের মন কত নরম, কত সরল। আমি জানি, আর একটু বড় হলেই তাদের এই মন থাকবে না।" গন্ধ, বর্ণ, আলো, ফুল, পাখি—ইত্যাদির পাশাপাশি শৈশবও হতে পারে এ গল্পে অন্যতম এক প্রধান 'মোটিফ' (motif)।

অধ্যাপক ড: তপোব্রত ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি' গল্পটিকে মনে করেন—"ভিক্ষা-ফিরিয়ে দেওয়া এই এক আশ্চর্য ভিখারির গল্প।" (ভাঙা কাঁচের শিল্প)। তাঁর মনে হয়েছে, ঐ গল্পে আগাগোড়া প্রথম পুরুষ আর উত্তম পুরুষের অদল-বদলে গল্পের চরিত্রের সঙ্গে স্বয়ং গল্পকার লুকোচুরি খেলে চলেন। সবটাই আসলে একটা লোকের গল্প— যে, তার নিজের মনের ভেতরের অপর এক সত্তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ব্যস্ত। গল্পবয়নরীতিতে কথক ও 'সে'-এর মধ্যে কথোপকথনের আটপৌরে ভঙ্গিমাও ব্যবহৃত হয়েছে—"কী করুণ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তোমাকে ঐ গাছতলাটায় ভাবতে পার! চল, ফিরে চল, চাপা-গলায় তাকে ডাকলাম, ধমকালাম। শুনল না, আমার নিষেধ গ্রাহ্য করল না।......এত মায়া লাগছে তোমাকে দেখে। ভীরু লাজুক বঞ্চিত দুঃখী, পা-কাটা মানুষ। কানে কানে হিসহিস করে বললাম, তোমার জায়গায় তুমি ফিরে চল, তোমার পরিচিত জগতে।"

ঐ গল্পের সংলাপ কাটা কাটা, অনতিদীর্ঘ, কখনো বা আত্মমগ্ন বা আত্মগত। গল্পে রয়েছে অজস্র কৌণিকতা। গল্পের স্বচ্ছন্দগতিকে বজায় রাখার জন্য গল্পকার একদিকে যেমন টেকনিককে—যতোটা সম্ভব ফ্রি বা মুক্ত রেখেছেন, তেমনি অন্যদিকে কাহিনী বর্ণনার মধ্যে এনেছেন স্বতঃস্ফূর্ততা।

প্রবন্ধের শেষদিকে এসে, এ'গল্পের নামকরণের যথার্থতা নিয়ে দুচার কথা বলা বাঞ্ছনীয়। 'চামেলি'-তো একটা বিশেষ ফুলের নাম। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন ধরনের ফুল কেমন করে গুরুত্ব পেয়েছে এই গল্পের। আর 'সামনে' শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট দিকে চলার কথাই বলে। 'সামনে চামেলি' গল্পের প্রধান 'মোটিফ'-ই (motif-এ) হলো এই চলমানতা, সামনের দিকে এগিয়ে চলা।

বাড়িতে, রাতে শয্যাশায়ী অসুস্থ বাবা, মা, তিন-ভাই-বোন সহ কথককে নিয়ে সংসারে মোট ছ'জন খাইয়ে। তাই, প্রাইমারী স্কুলের একশ'কুড়ি টাকা মাইনেতে কুলোয় না বলেই, তাকে দু'বেলা 'দুটো টুইশনি'-ও করতে হয়। 'সে' বুঝে গিয়েছে,—'অনেক স্বপ্নই তার সফল হবার নয়, পৃথিবীর অনেক বাসনাই কোনো কোনো মানুষকে বর্জন করে চলতে হয় 'কাটা পা নিয়ে কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না।' " তবু তো সে একদিন-গাড়ি ভর্তি

রূপসী মেয়েদের একলা অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, কিংবা কল্পনা করেছিল তারই জন্য অপেক্ষমাণা 'আঁটোসাঁটো বিস্ফোরিত খোঁপা বিশিষ্ট দীর্ঘাঙ্গী'—কোনো যুবতীকে—"তার নয়নাভিরাম শাড়ির আঁচল প্রায় আমার মাথা ছোঁবে বলে মনে হচ্ছিল।"

আজ 'সে' সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভুলে গিয়ে, স্বপ্নের সরণি বেয়ে সুন্দরের নির্দিষ্ট অভিলক্ষে এগোতে চায়—'এত রূপ, এত স্পষ্ট, এত কাছাকাছি!' অভিজাত রাস্তার চারপাশ জুড়ে রূপের এই সমারোহ। 'অসীম ধৈর্য' আর 'পর্বতপ্রমাণ প্রত্যাশা' নিয়ে কাটাপায়ে ক্রাচে ভর দিয়ে সামনের দিকেই এগোতে চায় 'সে'—"আজ? যেন ঠিক এই জিনিসের পরীক্ষা নিতে ক্রাচ ঠুকে ঠুকে এই আশ্চর্য সুন্দর জগতে চলে এসেছি।"

এ যেন এক অপূর্ব মায়াবাস্তবতার জগৎ। ভিক্ষেতে লোকটির প্রয়োজন নেই। মনের দিক থেকে 'সে'-তো দীন নয়—ঐশ্বর্যবান। গল্পের শেষ কথায়ও আসলে এর নামকরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা এবং মূল তাৎপর্যই ধরা থাকে—"পুরানো জামায় তার দরকার নেই। শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়ে, যেন সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছে, ঠুকঠাক করে ঠিক এগোতে লাগল।" অর্থাৎ, তার স্বপ্ন মরেনি, সুন্দরকে খোঁজাও শেষ হয়নি—তাই, তার এরূপ পথচলা।

এখানেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনবদ্য। তিনি দৃশ্য, ধ্বনি, গন্ধ, আর আলোর বহু বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে লোকটির মনের ভেতরে স্বপ্নের জগৎকে বুনে দিয়েছিলেন। গল্পটি শেষ করার পর, পাঠক হিসেবে অনুভব করতে পারি, যে ঐটি পড়তে পড়তে আমরাও যেন চলে গিয়েছি, কোন্ মগ্ন অন্তর্মুখিনতার গহীনে, ডুব দিয়েছি-আমাদেরই অতীত-শৈশবের স্মৃতি স্বপ্ন-আর আকাঙ্ক্ষার অতল সমুদ্রে, যেখান থেকে দক্ষিণা বাতাসে ভেসে আসছে অনবরত চামেলি ফুলের গন্ধ।

কমলকুমার মজুমদার

(১৯১৫-১৯৭৯)

কমলকুমারের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণাব টাকী। গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক কমলকুমাব বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। মিনিয়েচার-চিত্রণ, বই অলঙ্করণ, হরফ নির্বাচন ও মুদ্রণ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। লোকশিক্ষা, মঠ ও মন্দির বিষয়েও তাঁর কৌতূহল ছিল। তাঁর ছড়া সংকলন 'আইকম-বাইকম'-এ তিনি নিজেই চিত্রাঙ্কন ও অলঙ্করণের কাজ করেছেন। 'পানকৌড়ি' তাঁর আরেকটি ছড়ার বই। নাটক অভিনয়েও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। 'দানসা ফকির' তাঁর নিজের লেখা নাটক। 'হরবোলা' নাট্যগোষ্ঠীর তিনি পরিচালক ছিলেন। আবার 'অঙ্কভাবনা' নামে একটি গণিতের পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। দীর্ঘদিন সাউথপয়েন্ট স্কুলে শিল্পকলার শিক্ষক ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল 'নিম অন্নপূর্ণা', 'শ্যাম নৌকা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'সুহাসিনীর পমেটম' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ', 'খেলার প্রতিভা' প্রভৃতি। তাঁর গল্প উপন্যাসের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল তাঁর ভাষা। ভাষা নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিছু রচনায় তিনি তাঁর ভাষা-পরীক্ষায় আন্তরিক আবেগ ও গভীরতা আনতে পেরেছিলেন। অপর কিছু রচনায় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুরূহ হয়ে উঠেছে। বিতর্কিত হলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসের স্বতন্ত্র স্বাদকে কিছুতেই অস্বীকাব করা যাবে না।

মতিলাল পাদরী : শিল্পীর সন্ন্যাস

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

আমাদের এই তন্ত্রমন্ত্রের দেশে ধর্ম একটা বড় শক্তি। এই শক্তি যখন কোনো মানুষ আত্মস্থ করে তখন তা অন্তঃশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই অন্তঃশক্তির বলে জীবনের একটা বড় শিক্ষা সে পেয়ে যায়। সে শিক্ষা হলো ঔদাসীন্যের শিক্ষা। দীক্ষাও বলতে পারি, কেননা এ শিক্ষা ক্রমশ তার চরিত্রের মজ্জাগত হয়ে পড়ে। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ সন্ন্যাসের মূল্য কোথায়? তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমাজ-পরিবেশ ও জীবন পদ্ধতির যান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেও মানুষের নিঃসঙ্গতা বেড়েছে বই কমেনি। মানবিক সম্পর্কের মধ্যে আঘাত, বিচ্ছেদ, মৃত্যু বেদনা এখনো অটুট। এবং এগুলিকে অভিজ্ঞতার মধ্যে পেতে গেলে হয়তো শ্মশানে গিয়ে শবসাধনা করতে হয় না, কিন্তু জীবনের এই অতিসভ্য মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র ভাঙা-গড়ার মধ্যে মনের মধ্যে ওই 'সন্ন্যাস'টিকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

কমলকুমার মজুমদারের মধ্যে ওই সন্ন্যাসবোধ পুরো মাত্রায় জাগ্রত ছিল। তবে 'অন্তর্জলী যাত্রা'র লেখক কখনো 'শুকনো সন্ন্যাসী' হতে চাননি। সত্যিকারের শিল্পী কখনো তা হয় না। জীবনের দুর্দান্ত কামাসক্তি বা ভয়ঙ্কর পাপের তাড়নার সামনে সে উদাসীন দ্রষ্টা হয়ে যায়। এই উদাসীনতার দীক্ষা কমল পেয়েছিলেন রামপ্রসাদ, কাঙাল হরিনাথ বা রামকৃষ্ণেরই মনীষাদীপ্ত বাক্যে। এইদিক থেকেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'মতিলাল পাদরী'-কে বিশ্লেষণ করলে বোধ হয় তাঁর মানসিকতার অন্তত একটি মৌলিক লক্ষণকে খানিকটা চিনতে পারব।

বাঙলাদেশ-বিহার সীমান্ত যেখানে মিশেছে সেই অঞ্চলে এক সাঁওতাল-অধ্যুষিত এলাকায় মতিলাল পাদরীর এক টিলার ওপর গির্জাঘর। গির্জার ওপরকার শালকাঠের ক্রুশটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। মাটির গির্জাঘরে মাটিরই বেদীতে সাঁওতালী-কারু-নৈপুণ্য। বেদীর ওপরে লাল পাতার ক্রুশ। টিলার কষা জমির ওপর গির্জা হলেও কুয়োর জলে কিছু গাছ স্থানটিকে মনোরম করে রেখেছে। আশেপাশের পাপী মানুষ সভয়ে গির্জায় পা দেয়। গির্জার কিছু দূরে একটি খড়ো চালায় মতিলাল পাদরীব বাস। আষাঢ় মাসে এক জল-ঝড়ের রাত্রে গির্জার ঘরের দিকে কুকুরের ডাকাডাকি ছোটাছুটি শুনে গিয়ে দেখলেন একটি সাঁওতালি মেয়ে বিবস্ত্র হয়ে গির্জাঘরের মধ্যে মাটি আঁকড়ে প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। হতভম্ব মতিলাল তাঁর সহকারী ফুলনকে ডাকলেন। তাকে দিয়ে ধাই বীণাকে ডাকা হলো।' সরঞ্জাম এল। গির্জার মধ্যে এমন ব্যাপারে ফুলন বিচলিত। মতিলাল লজ্জিত। তাঁরা দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। নবজাতকের কান্না শোনা গেল। পাদরী যেন আলো দেখলেন, কালো আকাশে বক কিংবা নীল আকাশে পায়রা। যে পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টান হবার আশা তিনি করতেন এই নবজাতক কি সেই ঈশ্বর পুত্র হয়ে এসে তাঁকে পুরস্কৃত করছেন? যাইহোক এই 'এক ধামা দেবশিশু' আর তার জন্মদাত্রী মা ভামর তাঁর আশ্রয়েই রইলো। এই নতুন সোনার মানুষটি জন্মাবার পর থেকেই মতিলালের এক ঐশ্বরিক স্নেহ জাগল। অন্যদিকে ভামরকে নিয়ে কানাঘুষো

চাষী-মজুরদের মধ্যে। আবার তারাই ফসলের আশায় বা রোগ সারাবার আশায় দেবশিশুর কাছে এসে প্রার্থনা করে। ক্রমে শিশুর মা পাদরীর সহকারীদের সংস্পর্শে বিড়ি খাওয়া ধরেছে। মতিলালের খারাপ লাগে। দেবশিশুর মাকে বলেন 'নির্মল হও'। এদিকে আশ-পাশের লোকজনের সন্দেহ বাড়ে। দেবশিশুকে দেখতে এলে পাদরীর সামনে ভামর ছেলে কোলে নিশ্চিন্তে বসে। পাদরীর আড়ালে দর্শনার্থীর নানা প্রশ্ন ভামরকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। মানসিক যন্ত্রণায় ভামর একদিন মতিলালের পায়ে ধরে গির্জার মধ্যেই কেঁদে পড়ে। পাদরী তাকে বোঝান। অনুতাপের ফলেই সে নতুন জীবনের জন্ম দিয়েছে। নবজাতকের নাম প্রচার করেই তার মুক্তি। কিন্তু ভামরের যন্ত্রণা কমে না, একদিন মধ্যরাত্রে পাদরীর ঘরের বারান্দায়, আরেকদিন নিঃসঙ্গ এক টিলায়, আরো একদিন পাহাড়ী সারেনগো নদীর ধারে ভামরের সেই একই ভূলুণ্ঠিত ব্যাকুলতা, তার কী হবে। পাদরীর মনে হয়, এই ব্যাকুলতাই তার শুদ্ধতাকে অতুলনীয় করেছে।

এদিকে শিশুপুত্রটি বড় হয়েছে। পাদরীর সর্বক্ষণের সঙ্গী। একদিন শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে ফেরার পথে শাল-মহুয়া কুঞ্জে পাদরীর চোখে পড়ল দুচার জন চাষী মানুষের মত্ততার মধ্যে ভামরের বিরাট দেহ বিবসনা হয়ে পড়ে আছে। এবারেও আচ্ছন্ন ভামর পাদরীর পায়ে পড়ে, তার কী হবে। প্রবঞ্চিত পাদরী গির্জায় গিয়ে কাঁদলেন। ঘরে গিয়ে বাইবেল খুলে বৃথাই মন দিতে গেলেন। তারপর কান্না। শিশুপুত্রটিও কাঁদছে। হঠাৎ এক তীব্র বেদনার আবেগে শিশুটিকে নিয়ে তিনি ক্ষিপ্র গতিতে জঙ্গলের দিকে চললেন। বনভূমির মধ্যে এক ঝরনার কাছে পাদরী পকেট থেকে ঝুমঝুমি বার করে একটু দূরে ফেলে দিয়ে শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন। শিশুটি যখন ঝুমঝুমি কুড়োতে গিয়ে পাতা থেকে জল পড়ার দিকে তাকিয়ে আছে, হাত পাতছে, ঝুমঝুমি তুলে খেলছে এবং হাত তুলে পাদরীর জামা ধরার চেষ্টা করছে তখন পাদরী দৌড়ে দিয়ে একটি গর্তে নেমে পড়লেন। শিশুটি তখন কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে। আর মতিলাল গর্ত থেকে উঁকি মেরে দেখছেন। শিশুটি কাঁকুরে মাটিতে পড়ে আবার উঠে টলতে টলতে আসতে থাকে। তার কান্নায় পাখি ওড়ে, পাতা পড়ে, শালফুল ঝরে। হঠাৎ এক তীব্র আত্মধিক্কারে গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে এসে পাদরী 'ও প্রাণ ও প্রাণ' বলতে বলতে শিশুটির দেহে মুখ ঘষেন। তার হাঁটুতে মুখ বুলিয়ে চোখের জলে বলেন 'আমি সত্যই খ্রিস্টান নাই গো বাপ্।'

বেশ বড় একটি গল্পকে এতো ছোট আকারে পরিবেশন করা অন্যায় জেনেও শুধু গল্পটির অন্তর্নিহিত আদিরূপ বা আর্কিটাইপের দিকে লক্ষ্য রেখেই সংক্ষিপ্ত করে বলেছি। নেহাৎই এক ধর্মপ্রাণ যাজকের বাৎসল্যের গল্প এটি নয়। গল্পটির আদিরূপ হিসেবে কাজ করেছে কুমারী মেয়ের গর্ভজাত সন্তানের কাহিনি। যীশুখ্রিস্টের জন্মসূত্রে কুমারী মেরীর কাহিনি সকলেরই জানা। খ্রিস্টপূর্ব যুগের গ্রিক পুরাণেও সংস্কৃতি সম্পন্ন কোনো মানবগোষ্ঠীর নায়করাও অনেকেই এইরকম কুমারী-গর্ভের সন্তানরূপে কল্পিত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনিতেও এইরকম সন্তান 'আকাশ দেব' ও 'পৃথিবী কন্যা'র যৌথমিলনের সৃষ্টি। পিতা 'আকাশ দেবতা' sky God বলেই সে প্রত্যক্ষ নয়। হিব্রুদের বিশ্বাস মতে তাদের ত্রাণকর্তার জন্মও কুমারী-গর্ভে। আর যেহেতু কুমারী-সন্তান সমাজ অনুমোদিত বিবাহ-ব্যবস্থার সচেতন মিলনের

সৃষ্টি নয়, সেই জন্যে কুমারী-কন্যার দেব সারল্য তার সন্তানকেও নিষ্পাপ সারল্যের প্রতীক করে তোলে।

কুমারী কন্যার গর্ভজাত সন্তানের কাহিনি virgin-birth এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের কাহিনি (Unfathered child) 'মতিলাল পাদরী' গল্পটির ভিত্তি-সূত্ররূপে কাজ করছে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই মৌলিক সূত্রটির কিছু পরিবর্তিত রূপ এ গল্পে দেখি। প্রথমত ভামর যে কুমারী-কন্যা এ কথা কোথাও গল্পে বলা নেই। বরং গির্জাঘরে ভামরের সন্তান-প্রসবের পর ভামর-কে নিয়ে যে সব জল্পনা কল্পনা হয়েছে তাতে ভামরকে 'নষ্ট মেয়ে' 'পাঁচ হাত তোলা', 'লাঙ সোঁযারি' ইত্যাদি বলা হয়েছে। অর্থাৎ দেব-সম্ভব সন্তানের মা বলে আশ-পাশের মানুষ তাকে স্বীকার করছে না। সুতরাং ভামরের সন্তান-প্রসবকে কুমারী মেরির শুচিতায় দেখা হয়নি। ব্যতিক্রম কেবল মতিলাল পাদরীর ক্ষেত্রে। একমাত্র তার মনেই গির্জাঘরে দুর্যোগের রাত্রে এই জন্ম এক বর্ণচ্ছটার মতো। যেন অনেককালের প্রতীক্ষার পর এই পুরস্কার। এই একটি মাত্র মানুষের মনেই মহামানবের আগমনের সংস্কার কাজ করেছে, ভামরের শিশু তার কাছে ঈশ্বরের পুত্র। এমনকি যে হিজরে বদন চাষী এসে ভামরের সন্তানের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখিয়ে গেছে, শিশুটিকে 'দূতবাবু' বলে সম্বোধন করেছে, সেও আড়ালে ভামরকে 'মাগী লাঙ সোঁযারি' বলেছে। যদু, পতাকী ইত্যাদিরাও কেউ ভালো ফসলের আশায়, কেউ রোগ সারাবার আশায় 'দূত ঠাকুর'কে দেখে গেছে। অন্যদিকে ভামর নিজেও তো নিজেকে ঈশ্বর পুত্রের জন্মদাতা বলে বিশ্বাস করেনি। বদন হিজরে নাচতে নাচতে যখন ভামরকে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে তখন রোমাঞ্চিত ভীম ভামর পাদবীর সামনে থেকে উঠে যাবার অছিলায় ছেলেকে চিমটি কেটে কাঁদিয়েছে। ভামর-শুদ্ধ সব চাষী মজুরই প্রবৃত্তির দাস। শুধু একজন মানুষের ঈশ্বর-পুত্রের সংস্কারকে সামনা সামনি তারা অপমান করতে পারেনি। তাদের পাপবোধই মতিলালের সামনে তাদেব অনেকখানি সংযত করে রেখেছে।

ভামরের সন্তানের পিতৃপরিচয়কে গোপন রাখার পেছনেও পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের পৌরাণিক কাহিনির সংস্কার কাজ করছে। কিন্তু ওই জাতীয় কাহিনিতে সন্তান সম্পর্কে যে দৈব সংস্কার কাজ করে যার জন্যে সন্তানের মানবিক পিতৃত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা থাকে, সে চেষ্টা গল্পে নেই। যে দৈবসংস্কার পাদরীর মনে কাজ করছে বলে পাদরী নানান ইঙ্গিতময় প্রশ্ন এড়িয়ে গির্জাঘরে জন্ম নেওয়া শিশুকে ঈশ্বরপুত্র ভাবেন এবং বলেন, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের কোনো গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হতে চলেছে এই শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে, সে রকম দুর্মর সংস্কার গ্রামের কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। নেই বলেই ভামর যখন পাপবোধের তাড়নায পাদরীর পায়ে পড়েছে অন্তত বার চারেক তখন পাদরী তাকে দেবশিশুর মা বলে সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মহুয়াকুঞ্জে ভামরকে উন্মত্ত ও বিবসনা দেখে পাদরী প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। মনে হয়েছে তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। তাই যে শিশুপুত্রকে তিনি নিত্যসঙ্গী করেছেন অসীম আন্তরিক স্নেহে, সেই শিশুপুত্রকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে বিপজ্জনকভাবে ছেড়ে ভামরের প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে গেছেন। এই প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা খুবই মানবিক, কিন্তু পাদরীর নিজের কাছে তা অখ্রিস্টানসুলভ।

তাই মুহূর্তের পাপে বিচলিত ও অনুতপ্ত হয়ে তিনি সেই দৈব 'প্রাণ' কে আঁকড়ে ধরেছেন। দেব জন্মের যে সংস্কারে তিনি সমস্ত নিন্দা ও সন্দেহকে দূরে রেখে এক অপার্থিব আলোর প্রত্যাশী ছিলেন, জন্মদাত্রীর বীভৎস বিবসন বিকার দেখে তার প্রত্যাশায় ঘা লেগেছে, তার অসীম স্নেহের শিশুটিকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন এবং এই চেষ্টাকে পাপ জেনে পরমুহূর্তে অনুতপ্ত হয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরেছেন। সে ঈশ্বরানুরক্তি তাঁকে গভীর স্নেহবন্ধনে জড়িয়েছিল, চারপাশের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তাঁর সেই অনুরক্তি জনিত স্নেহবন্ধনকে ছিন্ন করতে চেয়েছে এবং সেই ছিন্ন করার নাটকীয় মুহূর্তটিই গল্পের প্রাণ, আদিরূপক থেকে শিল্পের তলরূপে ওখানেই গল্পটি সরে এসেছে। যে ধর্ম একই সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাস ও মানবিক স্নেহ ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দেয় সেই ধর্মই মানুষকে রসে-বশে রাখে, জন্ম-মৃত্যুর প্রতি সমদর্শিতার জন্ম দেয়। প্রাপ্তি ও ত্যাগকে সমান মর্যাদা দেয়, সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে এক চমৎকার ভারসাম্য আনে। মতিলালের মনে যখন চারপাশের পাপের বিকার ধাক্কা দিয়েছিল তখন মুহূর্তের জন্যে সে স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে 'শুকনো সন্ন্যাসী' হতে চেয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় ভালোবাসার ঐশ্বরিক দায় তাকে পরমুহূর্তে ফিরিয়ে এনেছে মমতার বন্ধনে; অখ্রিস্টান আচরণে সে অনুতপ্ত হয়েছে। এও এক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

যে উদাসীনতা মানবিক স্বভাবকে মেনে মহত্তর সত্যের অপেক্ষা করে তাই সত্যিকারের 'উদাসীনতা', সত্যিকারের 'সন্ন্যাস'। উঁচুদরের শিল্পীও সে দিক থেকে উদাসীন সন্ন্যাসী। কমল কুমারের দৃষ্টির মধ্যে সেই সন্ন্যাসের দীক্ষা ছিল। তাই দীক্ষিত মতিলাল, 'নিজের বুকে যেন লাথি মেরে' অসহায় শিশুর কান্নায় 'ও প্রাণ, প্রাণ' বলে ছুটে এসেছিল। মনে রাখতে হবে, এই একই জীবন বোধে রামপ্রসাদ, হরিনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভু যীশু একইভাবে উদ্দীপ্ত। কমলকুমারের শিল্পবোধে এই উদ্দীপনাই কাজ করেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সদরদি ভাঙা গ্রামে নরেন্দ্রনাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালের ৩০ জানুয়ারী। পিতা মহেন্দ্রনাথ, মাতা বিরাজবালা। শৈশবেই তিনি মাতৃহারা হন, আর সেকারণেই তাকে বিমাতা জগৎমোহিনীর স্নেহছায়ায় বড় হতে হয়েছে।

প্রথম লেখাপড়ার সূত্রপাত গ্রামের অক্ষয় মাস্টারের কাছে, পরে এম. ই স্কুলে। তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই এ এবং কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। দেশভাগ হওয়ার ফলে কলকাতায় চলে আসেন সপবিবারে নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এরপর তিনি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চেকারের কাজ ছেড়ে দৈনিক 'কৃষক', 'স্বরাজ', 'সত্যযুগ' প্রবৃতি পত্রিকায় অস্থায়ী পদে থেকে স্থায়ীভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ বিভাগে যোগ দেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র লেখালিখি শুরু করেন কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'সুখ' নামের কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় আর 'জীবন ও মৃত্যু' নামের গল্পটি প্রকাশিত হয় এই একই বৎসর। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জোনাকি' (১৯৩৯), প্রথম উপন্যাস 'হরিবংশ' (১৯৪২)। এই উপন্যাসটি পবে 'দেশ' পত্রিকায় 'দ্বীপপুঞ্জ' (১৯৪৬) নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পগ্রন্থ অসমতল (বঙ্গাব্দ ১৩৫২)। এরপরে একে একে প্রায় পঞ্চাশটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, পরিচয়, দেশ, জনসেবক, গণবার্তা, ইদানীং, চতুষ্কোণ, চতুরঙ্গ, মানসী, ভারতবর্ষ, বসুধারা, সত্যযুগ, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি।

অভিনেত্রী : বাস্তব জীবনের মায়াময় শিল্প

জয়তী ঘোষ

প্রারম্ভ

'অভিনেত্রী' ছোটগল্পটির প্রথম প্রকাশ যুগান্তর পত্রিকায় ১৩৫৭-র শারদ সংখ্যায়। ঐ বছরেরই ভাদ্রমাস এটির রচনাকাল। বঙ্গাব্দের এই সময়টি ইংরাজি চারের দশকের শেষ বছর। স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীর মধ্যে লেখক নরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ের কলকাতার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন।

'অভিনেত্রী' ছোটোগল্পটিতে লাবণ্য আর তার স্বামী বিনয় চক্রবর্তী জয় মিত্র স্ট্রিটের একটি পুরনো বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকে। বিনয় আপাতত বেকার, লাবণ্য কোনোরকমে দিন গুজরান করে। সে একটি রুগ্ন সন্তানের মা। বিনয়ের বন্ধু অনিমেষ চৌধুরী মাঝে মাঝে এখানে আসে। দরিদ্র এই দম্পতির আতিথেয়তা তার ভালো লাগে। সম্প্রতি সে সহকারী পরিচালক থেকে নতুন একটি ছবির পরিচালক হয়েছে। প্রযোজকের অনুরোধ সস্তায় ছবিটি করতে হবে। তাই অভিনেত্রী মালতী মল্লিকের কাছে সে যায়। তাকে বাড়িতে না পেয়ে অনিমেষ হঠাৎই বিনয়ের বাসায় চলে আসে। বন্ধুর পরিবারের আর্থিক অনটনের সামান্য সুরাহা করতে সে বলে তার নতুন ছবিতে লাবণ্যের মতই একটি ছোটো চরিত্র আছে। দু তিন দিনের জন্য ছেলে বিন্তুকে নিয়ে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। পারিশ্রমিক তিনশ টাকা। লাবণ্য কথা দিল সে পারবে। বাঁচার লড়াইয়ে তাকেও সামিল হতে হবে। চোখে তার স্বপ্ন, বিন্তুকে নতুন প্যান্ট জামা, ফুড কিনে দিতে হবে। বিন্তুর নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। বিনয়ের জন্যে একটা সিগারেট কেস আর তার একটা নতুন শাড়ির জন্য বিনয় নিশ্চয় বলবে। কিন্তু শুটিং-এর দিন অভিনয় করতে গিয়ে লাবণ্য কীরকম নার্ভাস হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত কিছুতেই যেন পারল না। গরীবের ঘরের এক বউ-এর চরিত্রে চুটিয়ে অভিনয় করে দেখিয়ে দিল পেশাদার অভিনেত্রী মালতী মল্লিক। নতুন স্টার দেখার কৌতূহলে সেদিন সেও ফ্লোরে ছিল। ছবি রিলিজের তিন চারদিন পর দুটি পাস নিয়ে অনিমেষ যখন বিনয়দের বাসায় এল ঠিক সেই সময়েই বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক এল দু মাসের বাকি ভাড়া চাইতে। লাবণ্য তার স্বামীর দাস্তবমির কাল্পনিক অসুখের কথাকে এমন নিখুঁত অভিনয়ে মূর্ত করে দিল যাতে বাড়িওয়ালা আর কথা না বাড়িয়ে চলে যেতে বাধ্য হল। অনিমেষ চৌধুরী এসব দেখে অবাক হয়ে বলল 'আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?' লাবণ্য স্থির দৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।'

এরপরেও লেখক নরেন্দ্রনাথ তিনটি বাক্যে ছোটোগল্পটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন—'লাবণ্যর ধরা গলায় দুই বন্ধু চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকায়। লাবণ্যের ঠোঁটে সেই হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো হঠাৎ অমন ছলছল করছে কেন?' নরেন্দ্রনাথের

ছোটোগল্পে এই জল ভরা চোখের রহস্য পাঠককেই আবিষ্কার করতে হয়। কারণ লেখক জানেন এও এক ধরনের বাঁচা। আর এই ভাবেই নরেন্দ্রনাথ তার কলমের আঁচড়ে চারপাশের দেখা মানুষদের পাঠকের কাছে সুপরিচিত করে তোলেন। সাধারণ মানুষের আলো আঁধারিতে ভরা অতি সাধারণ গ্লানিময় দিনযাপন থেকে ঝকমকে মুক্তোর মতো গল্প এই ভাবেই খুঁজে নেন নরেন্দ্রনাথ।

সময়কাল

নরেন্দ্রনাথের এই গল্পের সময়কালকে চিহ্নিত করা দরকার। ভারত দু টুকরো হয়ে স্বাধীনতা পেল। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা অন্যায় অবিচাব নেমে এল বাংলায়। এই কাহিনীর সর্বত্র হয়তো রাজনৈতিক ঘটনার স্পষ্টতা নেই কিন্তু ভারত বিভাগের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার করা যাবে কী ভাবে? স্বাধীনতার পরপরই পূর্ববাংলার বহু মানুষ কলকাতা এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলে চলে আসেন। ফলে হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ও আরো নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় স্থানাভাব। তেমনই একটি সমস্যায় দীর্ণ পরিবার বিনয়দের। তারা কোনরকমে কলকাতার সরু গলির একতলার একটি ঘরে ভাড়াটে হিসেবে বাস করে। গরীব ঘরের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন লেখক। কেউ এলে তাকে তক্তপোশেই বসাতে হয়। ডাক্তারের কাছে টাইফয়েডে ভোগা ছেলেকে নিয়ে গেলে ওষুধ নয়, পথ্যের কথাই শুনতে হয় অর্থাৎ খাওয়া দাওয়াটা ভালো করে করতে হবে। সত্তর টাকা মাস মাইনের কেরানী বিনয়ের পক্ষে এক কৌটো ওভালটিন যোগাড় করার চেয়ে অসম্ভব আর কিছুই হতে পারে না। সে পকেট হাতড়ে যে সিগারেটটি বন্ধুকে দিতে গেল সেটা পাসিংশো। অত্যন্ত কম দামের এই সিগারেট দিয়ে লেখক বিনয়েব অবস্থাটাই বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য লেখক এ কথাও জানিয়ে দেন চলচ্চিত্র পরিচালক অনিমেষ গোল্ডফ্লেক খায় কারণ তার অবস্থাটা ভালো।

লাবণ্য অভিনয় সূত্রে তিনশ টাকা পাবে জানার পব তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া 'সে যে অনেক।' তার কল্পনায় মুহূর্তের মধ্যে যা যা ঝলকে ওঠে সবই তার অভাবের সংসারে প্রয়োজনের সামগ্রী। বিন্তুর চিকিৎসার খরচ, ভালো ফুড, জামা, জুতো, প্যান্ট, বিন্তুর নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিনয়ের জন্যে জামা, সিগারেট কেস। এই চাহিদাগুলির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সেই সময়কালের নিম্নবিত্ত মানুষের আরও একটু ভালোভাবে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

নরেন্দ্রনাথের 'অভিনেত্রী' ছোটোগল্পটি লেখার কাছাকাছি সময়ে নিউ থিয়েটার্স-এর সঙ্গে 'সংশয়' গল্পের চুক্তি হয়। কিন্তু তা চলচ্চিত্রায়িত হয়নি। পরে 'গোধূলী' ছবিটি হয়েছিল। অভিনয় জগতের সঙ্গে কি মঞ্চ কি চলচ্চিত্র তাঁর যোগাযোগের অভাব ছিল না। পত্রপত্রিকায় চাকরি সূত্রে এবং নানা জিনিষের প্রতি তাঁর আগ্রহে অভিনযের জগৎটা তাঁর চেনাই ছিল। তিনি নিজেই লিখছেন 'সব লেখকই নিজের চেনা জানা গন্ডির ভেতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাঁদের ব্যতিক্রম নই। তবে কেউ কেউ বলেন আমার লেখায় সামান্য ছদ্মনামের আড়াল যদি বা থাকে, ছদ্মবেশেব আড়ালটুকু থাকে না।'

সাহিত্য রচনার আগে থাকে তার ঘটনা আর তার খবর। লেখক নরেন্দ্রনাথকে ঘটনা এবং সেই সময়কাল এই গল্পটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। লেখক নিজেই বলেছেন, 'লেখকের গল্পগুলির উৎস নিয়ে হয়তো....কারো কারো মনে কৌতূহল আছে। আমার নিজের তেমন খুব একটা কৌতূহল নেই। গল্পের নেপথ্যে যে গল্প থাকে তা না শোনানই ভালো। আসল গল্পের রসহানি ঘটে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার আনাগোনা কখনো রাজপথে কখনো সুড়ঙ্গপথে। কখনো সেই পথরেখা চোখে দেখা যায়, কখনো বা তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অগোচরতাই লেখকের নিজের পক্ষে বিস্ময়কর এতেই তার সৃষ্টির আনন্দ।'

কলকাতার গলির গলি তস্য গলিটির নাম জয় মিত্র স্ট্রিট। পুরনো বাড়ির একতলা ঘরে বিনয় চক্রবর্তী ভাড়া থাকে। তার স্ত্রী লাবণ্য, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। তাদের বছর তিনেকের রোগা ছেলে, টাইফয়েডের পর একটা পা টেনে টেনে হাঁটে। লাবণ্য সুশ্রী, রঙ ফর্সা, টানা নাক চোখ। মুখের গড়নের মধ্যে লাবণ্য আছে। দীর্ঘ দোহারা চেহারা। অভাব অনটনের মধ্যেও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েনি। মাতৃত্ব ওর সৌন্দর্যকে স্নিগ্ধ করেছে। তার স্বামীর বন্ধু অনিমেষ, যে সহকারী থেকে চিত্র পরিচালক হয়েছে সে খবরও রাখে। অভাবের সংসার। অনিমেষ এলে তাকে চা-টা দিয়ে যতদূর পারে আদর যত্ন করে। লাবণ্যের ব্যবহারে অনিমেষও একটা সরল আন্তরিকতার স্বাদ পায়। কিন্তু অনিমেষের চোখ দিয়ে লাবণ্যকে যখন দেখি তখন তার মুখ ভার, ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো, বিনয়ের জামাটা মেঝেতে, দুপাটি জুতো পড়ে আছে দু প্রান্তে। এই পরিস্থিতিই বলে দেয় বিনয়ের মাস গেলে সত্তর টাকার কেরাণীগিরিতে আর চলছে না। বিনয় অনিমেষকে একটা পার্ট টাইম কাজ দেখে দিতে বললে সে তার অক্ষমতার কথা জানায়। তখনই এক বেকার স্বামীর স্ত্রী ও রুগ্ন সন্তানের মায়ের ভূমিকায় লাবণ্যের অভিনয় করে দেবার প্রসঙ্গটি ওঠে। লাবণ্য প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে হাসি ঠাট্টা বলেই মনে করেছে। লোকনিন্দার ভাবনাটিও তার মনে এসেছে। তাই সে সেদিনই অনিমেষকে কোনো কথা দিতে পারেনি। পরদিন সকালে বিনয় গিয়ে অনিমেষকে লাবণ্যর রাজি হওয়ার খবর দিয়েছে। ফ্লোরে লাবণ্যকে দেখে প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দার খুশি হয়ে বলে ওঠেন, 'বেশ বেশ। আমার কুঁড়ে ঘরে লক্ষ্মীর আগমন হয়েছে।' কিন্তু সাজানো সেটের মধ্যে মহড়া দিয়েও দুঃখ নৈরাশ্যের কোনো ভাবই লাবণ্যর মুখে ফুটে উঠলো না। বরং বহু লোকের দৃষ্টির সামনে লজ্জা ও সংকোচে বিব্রত হল সে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে অনিমেষ অসহায়ের মত বললো 'হল না'। ছবি মুক্তির চার সপ্তাহ পরে অনিমেষ দুটি পাস নিয়ে বিনয়ের বাসায় গেল। দুঃখ-দারিদ্র্যের ছাপ ঘরের সর্বত্র আরো বেড়েছে। ঠিক তখনই বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক দু মাসের বাকী ভাড়া চাইতে এল। হাতে টাকা নেই, বিনয়ের পঁচিশবার দাস্তবমি হওয়ার কাল্পনিক ছবি এঁকে লাবণ্য সেবারের মত গোবিন্দ প্রামাণিককে ফিরিয়ে দিল। অনিমেষ লাবণ্যকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলো 'আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?' তখন লাবণ্যর শেষ প্রত্যয়ী উত্তর, 'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার মধ্যেও কুলোত না।' লাবণ্যের ধরা গলা, ঠোঁটে হাসি, ছলছলে চোখ। লাবণ্যের এই অভিনয় নিষ্ঠুর

বাস্তব জীবনেরই। আগে তো জীবন, তারপরে তা অন্যের কাছে শিল্প। লাবণ্যের এই আচরণ মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বাঁচার প্রশ্নে সঠিক প্রয়াস। দ্বিতীয় কোন শিল্প মায়া নয়, এ তার বাস্তব জীবনের মায়াময় শিল্প।

লাবণ্য নিম্নবিত্ত ঘরের বউ যার কেরানী স্বামীর রোজগার মাসে সত্তর টাকা মাত্র। তাঁরই লেখা 'সেতার', 'অবতরণিকা' ছোটোগল্পগুলিতেও দেখি অভাবী স্বামীর পাশে থেকে কিছু করার ভাবনা তাদের স্ত্রীদের পেয়ে বসেছে। কলকাতার বনেদী পরিবারের এমনটা তখনও দেখা যেত না। কিন্তু এ কাহিনীতে সে প্রসঙ্গ বড় হয়ে ওঠেনি। বড় হয়ে উঠেছে স্বামী পুত্র সবাইকে নিয়ে তার সংসারেব জন্য কাল্পনিক মিথ্যাকে সত্য করে তোলার জন্য লাবণ্যের নিখুঁত অভিনয়।

মালতী মল্লিক, চিৎপুর অঞ্চলে বাস। বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। চোখে মুখে অমিতাচারের ছাপ। প্রাণপণে বয়স ঢাকবার চেষ্টা করে সে। অভিনয়ে খুব একটা তেমন খ্যাতি নেই। যা হোক করে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারে সে। রুগ্ন সন্তানের মা, বেকার স্বামীর স্ত্রী ও পরিবারের ছোট বৌ এর ছোট ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য ছবির পরিচালক অনিমেষ চৌধুরী কাছ থেকে ডাক পায় সে। আশি-পঁচাশি হাজারের মধ্যে তাকে ছবি শেষ করতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীরা অনেক বেশি টাকা নিতে পারে ভেবে মালতীর সন্ধানে চিত্র পরিচালক অনিমেষকে আসতে হয়। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। ঝি ক্ষান্তমনি হেসে অনিমেষকে জানায় দিদিমনি বাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই। দেখা করবার সময় ও স্টুডিওর নাম কাগজে লিখে রেখে সে চলে আসে। নির্ধারিত সময়েব পাঁচ মিনিট আগেই মালতী স্টুডিওতে হাজির হয়। কিন্তু অনিমেষের ব্যবহার তার মোটেই ভালো লাগে না। চেঁচামেচি করে 'এক মাঘে শীত যায়না' বলে সেদিনের মত মালতী বেরিয়ে যায়। কিন্তু যেদিন তাব বদলে লাবণ্যের স্যুটিং সেদিন সে ফ্লোরে এসে হাজিব হয়। সকলের সামনে লাবণ্যের অভিনয় করতে না পারার অক্ষমতা মালতীর সামনে অভিনয়ের সুযোগ এনে দেয় পলিত কেশ প্রৌঢ় প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের বিশেষ অনুরোধে। এক হাজার টাকার কমে সে এ কাজ করবেনা জানিয়ে সে রাজি হয়। কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করে। ফ্লোরে বিন্তুকে দেখে তার ছুঁতে ঘেন্না হলেও মুহূর্তের মধ্যে সে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে শঙ্কিত বিহুল মুখে চরিত্রটি হয়ে যায়। সকলেই মুগ্ধ হয়। চিত্র পরিচালকের নির্দেশের বাইরেও নিজের অনুভবকে কাজে লাগায় সে। এই দৃশ্যটি ছবির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে সকলেই এ কথা স্বীকার করেন। জলভরা চোখে সেট থেকে নেমেই মালতী প্রযোজককে বলে, 'কই চেকটা দিন'। আর অনিমেষকে বলে, 'ভালো অভিনয়? কী করে করলুম জানেন, হিংসেয় ডিরেকটার মশাই, হিংসেয়।....এবার টের পেলেন তো বিন্তুর কে মা আর কে সৎ মা।'

যাবার সময় প্রযোজকের গাড়িতেই সে বাড়ি ফেরে। চরিত্র চিত্রণে পাক্কা এক পেশাদারী অভিনেত্রীকে তুলে ধরেছেন লেখক। লাবণ্যের বিপরীতে মালতী মল্লিককে চমৎকার এঁকেছেন লেখক। ঝি ক্ষান্তমনির হাসি মালতী সম্পর্কে গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। পাক্কা পেশাদারের মতো অভিনয়টা করে দিয়ে নিজের পাওনাটি পুরোপুরি সে আদায় করে নেয়। সে যা নয় মুহূর্তে তা হয়ে ওঠার মধ্যে যে কৃতিত্ব মালতীর তা জানা আছে বলেই সে এক্ষেত্রে সফল

হয়েছে। পেশাদারদের ঈর্ষা তার চরিত্রটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সে নিজেও বলেছে, 'স্বভাব হল অভিনয়, মদ আর মাৎসর্য ছাড়া হবার নয়।'

বহুকাল সহকারী থেকে অবশেষে শর্তসাপেক্ষে নিজেই একটা ছবি পরিচালনার ভার পেয়েছে অনিমেষ চৌধুরী। মাত্র আশি পঁচাশি হাজারের মধ্যে ছবিটা করতে হবে। মালতী মল্লিককে না পেয়ে সে সন্ধ্যায় হঠাৎ বন্ধু বিনয় চক্রবর্তীর বাসায় যায়। মাঝে মাঝে ভালোই লাগে দরিদ্র এই বন্ধুটির বাসায় কাটিয়ে যেতে। বিনিময়ে অনিমেষ দু-একখানা সিনেমার পাস সংগ্রহ করে দেয়। লাবণ্য সামান্য চা, রুটি তরকারী, কোনোদিন বা একটু সুজি দেয়। সে গেলে এমন করে যেন অনিমেষ এক মহামান্য অতিথি। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বিনয়ের বাসায় গিয়ে সে বুঝতে পারে খানিক আগেই খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। অভাবী সংসারে রোজই অশান্তি। বিনয় তাই বন্ধুর কাছে পার্ট টাইম চাকরি চেয়ে বসে যদি দু দশ টাকা আসে। মালতী মল্লিককে না পাওয়া, বিনয়ের পার্ট চাওয়া, অভাবী সংসারের গৃহিণী লাবণ্যকে দেখে অনিমেষ বলেই ফেলে, 'আমি বলি কি বৌদি, বিনয়ের দ্বারা তো হবেনা, কিন্তু আপনি পারলেও পারতে পারেন। আপনি নিশ্চয় পারবেন। করবেন'? অনিমেষ এর জন্য তিনশো টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে জেনে রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে থাকে লাবণ্য। পরদিন বিনয় গিয়ে তাদের সম্মতির কথা জানিয়ে আসে। স্টুডিওর সেটে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও লাবণ্য কিছুতেই অভিনয় করতে পারেনা, শেষ পর্যন্ত অনিমেষের ধমকও খায়। একটা অদ্ভুত ভয় লাবণ্যকে পেয়ে বসে। অবশেষে অনিমেষকে অসহায়ের মতো বলতে হয় 'হল না।' মালতী শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে। অনিমেষের ছবি মোটামুটি উৎরে যায়। ছবিটি মুক্তির চার সপ্তাহ পরে দুটি পাস নিয়ে সে যখন বিনয়ের বাসায় হাজির হয় তখন ওদের অবস্থা আরো খারাপ। অনিমেষের সামনেই ভাড়া চাইতে আসা বাড়িওয়ালাকে নিপুণ অভিনয় করে ফিরিয়ে দেয় লাবণ্য। অনিমেষ বুঝতে পারে পাওনাদারকে বোকা বানাতে লাবণ্যর জুড়ি নেই। বিনয় বলে, 'দেখলে তো? তোমার চেয়ে আমি নেহাৎ খারাপ ডিরেকটার নই।' অনিমেষ বলে 'এমন পাকা অভিনেত্রীর ডিরেকটারের দরকার হয় না।' চিত্র পরিচালক অনিমেষ অনুভব করে লাবণ্যের সাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের আবেদন কি বিস্ময়কর। সে শুধুমাত্র একজন চলচ্চিত্র পরিচালকই নয় সে লাবণ্য চরিত্রের পর্যবেক্ষকও, তার পর্যবেক্ষণেই সমগ্র কাহিনী রূপ পেয়েছে। অনিমেষ চৌধুরী একাধারে কাহিনীর একটি চরিত্র, পর্যবেক্ষক, যেন স্বয়ং লেখক।

গল্পটিতে মোট চারটি প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি কিছু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে যেগুলি লেখনীর গুণে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামানিক, প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পক্ককেশ বৈকুণ্ঠ নতুন অভিনেত্রীকে উৎসাহ দেবার জন্য লক্ষ্মী বলতে যেমন দ্বিধা করেন না, তেমনি বিপদে পড়ে মালতী মল্লিককে অনুরোধ করে কাজ করিয়ে নিতেও জানেন। কম খরচে ছবি করার জন্য একজন কাজ জানা সহকারীকে পরিচালক বানাতেও তার আপত্তি হয় না। গল্পের প্রয়োজনে একজন টিপিক্যাল প্রযোজককে তিনি সৃষ্টি করেছেন। বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিক কাল্পনিক মিথ্যায় গলে গিয়ে চলে যান। গল্পের প্রয়োজনে তিনি সহানুভূতিশীল, নির্বিরোধী এক ভালো মানুষ। রুগ্ন দুর্বল বিন্তুকেও

পাই চমৎকারভাবে। মা হিসেবে লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিন্তুর জন্যেই। অপ্রধান চরিত্রগুলি লাবণ্যের দুটি অস্তিত্বের মধ্যে বিরোধিতা ও বৈপরীত্য সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে।

লাবণ্যর স্বামী বিনয় চক্রবর্তী রোগে ভোগা তিন বছরের বিন্তুর বাবা। সত্তর টাকার কেরানীগিরিতে আর চলে না। কলকাতার একটি সরু গলির ভাড়া বাড়িতে তাদের বসবাস। সহকারী থেকে চিত্র পরিচালক হবার পরে অনিমেষ, একদিন তার বন্ধু বিনয়ের বাসায় আসে। বিনয়ের বন্ধুত্ব ও তার বউ এর আতিথেয়তায় অনিমেষ খুশি হয়। তার ভালো লাগে। এদিন একটু আগেই রুগ্ন পুত্র বিন্তুকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। বিন্তুকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো দরকার, টাইফয়েডে তার একটা পা দুর্বল হয়ে গেছে। তার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মত যা যা করা দরকার তা দেবার ক্ষমতা বিনয়ের নেই। কথায় কথায় লাবণ্যের ফরমায়েস বিনয়ের পক্ষে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই নিয়েই কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। দারিদ্র্যের প্রবল চাপে বিনয় একবার মুখ খারাপ করে ফেলে। অনিমেষের কাছে একটা পার্ট টাইম চাকরি চায়। এমন কি টাকার জন্য বিনয় অভিনয়ের ব্যাপারেও আগ্রহ দেখায়। বিনয় মুখচোরা সে কি করে অভিনয় করবে? তাই অনিমেষের অন্য প্রস্তাব শুনে সে হাসে। রুগ্ন সন্তানের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে লাবণ্যকে। তিন চারটি মাত্র শট-বেশির ভাগই ছেলে আর বুড়ো ডাক্তারের সঙ্গে। এমন কি ছেলে বিন্তুকেও নামানো হবে রুগ্ন ছেলের ভূমিকায়। সেদিনই কথা দিতে পারলোনা বটে, কিন্তু পরের দিন সকালেই বিনয় অনিমেষকে গিয়ে খবর দিয়ে আসে লাবণ্য রাজি তবে নামটা বদলে দেওয়াই ভালো।

গল্পে বিনয়ের ব্যবহারে বোঝা যায় সে দারিদ্র্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে পরেই ভাড়া বাড়িতে থেকে সত্তর টাকা কেরানী কত অসহায়ত্বের মধ্যে অবস্থান করছে তা তার সংলাপে স্পষ্ট হয় যখন সে লাবণ্যকে বলে 'ছেলে নিয়ে এর চেয়ে বেশি আদর আহ্লাদ করবার শখই যদি ছিল, কেরানীর সন্তান পেটে না ধরে কোন বড়লোকের ঘরে গিয়ে ছেলে বিয়োলেই হত।' লাবণ্য বুঝেছে বিনয়ের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, ঝগড়া ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকতে পারেনা—কিন্তু সেও অসহায়।

স্টুডিওর ফ্লোরে লাবণ্য যখন ওই রোলে অভিনয় করতে পারলোনা, বিনয়ও যেন ঐ না পারার বেদনার শরিক হয়েছে। ছবি মুক্তির চার সপ্তাহ পরে অনিমেষ যখন দু খানা পাস নিয়ে এল ঠিক সেই সময় বাড়িওয়ালা এল দু মাসের বাড়ি ভাড়া চাইতে। বিনয় কাঁথা মুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। লাবণ্য অপূর্ব অভিনয়ের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে দিলো। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেই বিনয় কাঁথা ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসে তার নির্দেশেই যে এসব হল অনিমেষের কাছে সেই কথা জানাল। অনিমেষ তার উত্তরে জানাল এমন পাকা অভিনেত্রীর ডিরেকটারের দরকার হয় না। তার উত্তরে লাবণ্য জানায় মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত। বিনয় অনিমেষ দুজনেই তার এ কথায় চমকে ওঠে। তারা দুজনেই প্রত্যক্ষ করে লাবণ্যের ঠোঁটে হাসি আর দুচোখে জল। এ দেখা কী শুধু লেখক নরেন্দ্রনাথের, না বিনয়েরও। অর্থের টানাপোড়েনে যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিনয় শেষপর্যন্ত কিন্তু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ

করে। তার অসহায়ত্বের বড়ো কারণ সে নিজে নয়—তার সামাজিক অবস্থাজনিত পরিস্থিতি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কাহিনীতে একজন পেশাদার অভিনেত্রী আছে, মালতী মল্লিক। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় তাকে ভেবে গল্পের নামকরণ হয়নি। এ কাহিনীতে আরো একজন অপেশাদার শখের অভিনেত্রীকে পাই, চিত্র পরিচালক অনিমেষ চৌধুরীর বন্ধু বিনয়ের স্ত্রী লাবণ্য। মালতী মল্লিক পেশাদার হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, অন্যজন শখের অভিনয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ, লজ্জায় অনুশোচনায় দগ্ধ। দুটি অর্থেই দুজনকেই অভিনেত্রী বলা যায়। এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র লাবণ্য। লাবণ্যর অভিনেত্রী হতে চাওয়া, তিনশো টাকা অর্জনের স্বপ্ন দেখা স্টুডিও ফ্লোরে দিয়ে যখন তার অপেশাদারিত্বের ফলে লজ্জায় সংকোচে ব্যর্থ হয় তখনই, ঠিক তখনই কাহিনীটির নামকরণ 'অভিনেত্রী' যেন আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে।

লাবণ্য মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে কোনোদিনই অভিনয় করেনি। নিম্নবিত্ত অভাবি সংসারের দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েই তার সংসার। দুঃখকষ্ট আছে, তারই সঙ্গে আছে মানিয়ে নেওয়ার সহজ ক্ষমতা। স্বামীর সঙ্গে বচসার পরেও, স্নেহময়ী মা কোলে তুলে নেয় তার রুগ্ন ছেলেকে, এখানে নেই কোনো অভিনয়। কিন্তু স্টুডিওর ফ্লোরে গিয়ে তার মত একটি চরিত্রকে লাবণ্য অভিনয় দিয়ে ফোটাতে পারে না। সেট থেকে শুরু করে সংলাপ সব কিছুর কৃত্রিমতা তাকে করে তোলে আড়ষ্ট। অথচ বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিকের সামনে সে যে কথাগুলি বলেছিল তা ছিল মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে বাঁচবার এক আকুল প্রয়াস। স্টুডিওর ফ্লোরে লাবণ্যের অভিনয়, অভিনয় বলে ধরা পড়ে যাচ্ছিল, তাই তা ছিল পরিচালকের কাছে বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। পরে সেই অনিমেষই যখন ঘরের মধ্যে বাস্তব লাবণ্যকে দেখল যে অনায়াসে মিথ্যাকে দ্বিধাহীন সংলাপে সত্য করে তুলতে পারে তখন সে তাকে অনন্য অসাধারণ অভিনেত্রী বলে মানতে বাধ্য হল। অভিনয় শিল্পের মূল কথাটি, 'অভিনয় জিনিষটা যদিও মোটের ওপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে ঝোঁক বেশি দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে।' (অন্তরবাহির, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) লেখক নরেন্দ্রনাথ যেন কাহিনীর মধ্যে শিল্পের একটি সংজ্ঞাকেই পরীক্ষা করে দেখেছেন। সেদিক থেকেও নামকরণটি ব্যঞ্জনাময়।

পেশাদার অভিনেত্রী স্টুডিওর ফ্লোরে সফল, লাবণ্য জীবনের প্রয়োজনে সংসারের মধ্যে সফল। এই অভিনয় লাবণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়। সংসারের অভাব মেটানোর যে সুযোগ তার হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল তা হারানোর যন্ত্রণা বাড়িওয়ালা গোবিন্দ প্রামাণিককে অভিনয় করে সামাল দিতে পারার জয়ের আনন্দের সাথে মিলে যেন এক হয়ে গেছে। লাবণ্যের এই অভিনয় ক্ষমতা পেশাদার অভিনেত্রী মালতীকেও হারিয়ে দিতে পেরেছে আর সে কারণেই 'অভিনেত্রী' নামকরণটির মধ্যে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় ইঙ্গিত।

লেখক-পুত্র অভিজিৎ মিত্র লিখেছেন 'শিল্প এবং শিল্পী বাবার সব চেয়ে প্রিয়। তাদের নিয়ে অজস্র গল্প লিখেছেন। লেখক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, বাদক-সকলেই এসেছে তাঁর গল্পে।...বাবা জীবনের মধ্যে থেকে সৌন্দর্যবোধ আবিষ্কার করতো। টাকা-আনা-পাইয়ের জীবনচর্যা যেমন জরুরি—যা না থাকলে যেমন সম্পূর্ণ হয়না-বাবার এই বিশ্বাস ছিল।'

লেখক এ কাহিনিতে যেন এক তত্ত্বকেও গ্রহণ করেছেন। পেশাদার বনাম অপেশাদার, অভিনেতা বনাম অনভিনেতা, এঁদের মধ্যে প্রবল কে? কোনটা ঠিক? মালতীর অভিনয়ে কৃত্রিম অশ্রু যাতে প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের চোখ হয়ে ওঠে সজল করুণ নাকি লাবণ্যের অভাবী সংসারের চৌহদ্দিতে লাবণ্যের অভিনয় যাতে তার নিজের চোখেই জল আর অন্যেরা স্তব্ধ। চলচ্চিত্র শিল্পে 'ন্যুভেল ভাগ' এর স্রষ্টারাও এই রচনার একটু আগেই এসে পড়েছেন। নরেন্দ্রনাথকে তা আলোড়িত করেছিল বলেই মনে হয়। দু ধরনের অভিনেত্রীর চরিত্রায়ণ নামকরণের ক্ষেত্রে অপূর্ব সার্থকতা এনেছে। লেখক না বলে দিলেও লাবণ্যের দিকে যে ভাবনার পাল্লাটি ভারী তা খুব সহজেই বোঝা যায়।

'অভিনেত্রী' ছোটগল্পটির মধ্যে পরিবেশ প্রাধান্য পেয়েছে, আর পেয়েছে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বগত সমস্যার সংকট। বহমান জীবনপ্রবাহ থেকে লেখক একটি প্রতীতি আহরণ করে নিয়েছেন। একটি কাঙ্ক্ষিত সত্যকে আবিষ্কার করেছেন, কঠিন বাস্তবতা ও অভিনয়ের দুই রূপের এক অনন্য সুন্দর বৈপরীত্য রচনা করেছেন। গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্বের একটা সুন্দর রূপ দেখা যায়। অনিমেষ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ নিজেকেই অভিব্যক্ত ও সম্প্রসারিত করেছেন। ধরা পড়েছে সমাজ, পরিবেশ, শিক্ষাসংস্কৃতি, লেখকের মনন, ভাবনা। 'অভিনেত্রী' গল্পে এভাবেই লেখককে পেয়ে যাই। লেখক তাই বলতেও পারেন 'নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর স্বীকার করে আমি সারাজীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সংকীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।'

গল্পটিতে ভাবের একমুখিনতা রক্ষায় গল্পকারের পরিকল্পনায় কেউ কেউ শিল্পগত শৈথিল্য, মূল গল্পটিতে প্রবেশের আগে অনাবশ্যক বিস্তার, অনেক ক্ষেত্রেই একটু বেশি ন্যারেটিভ হয়েছে বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক-পুত্রের লেখা থেকে একটি অংশের উল্লেখ করা যেতে পারে—'বাবা বললো, বলতো একটি বিয়ের এতখানি বর্ণনা কেন? ...পরে এই বিয়ে ভেঙ্গে যাবে'। সামগ্রিক ছন্দগত কারণেই কোনো অংশ বেশি কোনো অংশ কম বলে মনে হলেও, প্রকরণ মেনে ছোটগল্প লেখার চাইতে, প্রায় পাঁচশো ছোটোগল্প লিখে তিনি ছোটগল্পের নব নব প্রকরণ সৃষ্টির পথে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ কাহিনীতে ভাবের একমুখিনতা রক্ষিত হয়েছে লাবণ্য চরিত্রটিকে ধরেই। কিছুটা বিবরণধর্মী তবে বিবরণের মূলে আছে অনিমেষ চরিত্রটির সক্রিয়তা। লাবণ্য স্টুডিও ফ্লোরে ব্যর্থ কিন্তু জীবন যুদ্ধে একজন পেশাদার অভিনেত্রীকে অপেশাদার সংসার রঙ্গমঞ্চের সফল অভিনেত্রী মারাত্মক এক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— 'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।'

নরেন্দ্রনাথ এখানেই কাহিনীটি শেষ করতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। লাবণ্যর ধরা গলা, ঠোঁটে হাসি, ছলছল চোখের পরিচয় দিয়ে কাহিনীটি শেষ করেছেন। কোনো তত্ত্ব বা উপদেশ দেবার চেষ্টা নেই, এরপরেও পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যাবে, শেষের পরেও মনে হবে শেষ তো হল না। গল্পের যেখানে শেষ সেখান থেকেই তো পাঠকের আস্বাদনের শুরু। পাঠকের মনে ভাবের অনুরণন চলতেই থাকবে। বিচিত্র ভাবের এমন ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ

মুহূর্তের মধ্যে গল্পটিকে পাঠকের কাছে শিল্পিত করে তোলে। 'মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তার সুখ দুঃখের কথা নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেমন সাবলীল ও প্রাণস্পর্শীভাবে তাঁর গল্পগুলিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তেমন আর কাউকে করতে দেখলাম না। (সত্যজিৎ রায়, স্মরণসভা পুস্তিকা ১৪.৩.৮৩)

মোপাসাঁকে অনেকে বলে থাকেন Cutter of life—জীবনকে তিনি খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কিন্তু সত্যি বলতে কি আদর্শ ছোটোগল্প তো সত্যি Cut piece, বিরাটের খণ্ডাংশ। নরেন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম নন। 'গল্পকে গল্প করে বলা, সেই সঙ্গে শিল্পের স্বচ্ছতম গুণটিকে ঘাসের শীষে শিশিরবিন্দুর মতো ধরে রাখা নরেন্দ্রনাথের জাদু শক্তি বলুন, জোর বলুন সব এখানেই। আর অনায়াস তাঁর সিদ্ধি। সেখানেই তিনি মোপোসাঁ, ও হেনরি, চেকভ কি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে।' (সন্তোষ কুমার ঘোষ, আনন্দবাজার ১৪.৩.৮৩)

গল্পে নরেন্দ্রনাথ শুধু সমস্যার যন্ত্রণাটুকু দেখিয়ে নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন না। সমস্যার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পাঠকের মনে স্নিগ্ধ আলোটুকুও জ্বালিয়ে দিতে পারতেন।

মহাশ্বেতা : মনোলোকের বিবর্তনের কাহিনী
বাসন্তী চাকী

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহাশ্বেতা' এক জটিল মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। মনোজগৎ উদঘাটনে তাঁর দুর্লভ ক্ষমতা এই গল্পটিকে এক ব্যঞ্জনাময় শৈল্পিক রূপ দান করেছে।

'মহাশ্বেতা' অমিতা নামে এক সুন্দরী রুচিশীল শিক্ষিত বিধবা যুবতীর মনোলোকের বিবর্তনের কাহিনী। বছর পঁচিশের অমিতা বর্তমানে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। পাঁচ বছর আগে তাঁর স্বামী অমূল্যের মৃত্যু হয়েছে। গল্পের শুরু শুভ্রবেশধারী নিরলঙ্কৃত অমিতার প্রতি প্রেমিক চিন্ময়মোহনের মুগ্ধতাবোধ দিয়ে। অমিতার বৈধব্যের শুভ্রতার মধ্যে চিন্মোহন এক প্রশান্তি লাভ করে। তাই সে অমিতার নাম দিয়েছে 'মহাশ্বেতা'। চিন্মোহন অমিতাকে বিয়ে করতে চায়। অমিতারও পাঁচ বছরের বৈধব্যের আচারনিষ্ঠ জীবনে স্বামী অমূল্যের স্মৃতি ক্রমশ বিলীয়মান। সে চিন্মোহনের প্রেমের আকর্ষণে তার নিরাভরণ জীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে এক নতুন সত্তা আবিষ্কার করে, চিন্মোহনের কাছে আত্মনিবেদনই তার কাছে সত্য হযে ওঠে। বিবাহে চিন্মোহনের মা প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত মত দেন। বিবাহের পর প্রথমদিনে শ্বশুর বাড়ীতে শাশুড়ীর তার প্রণাম গ্রহণ না করা, ভাসুরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কে অনুকম্পাজনিত উদারতা প্রদর্শন, ননদ সুনন্দা ও জা সুরমার ঠানদির আপত্তিজনক মন্তব্য—এ সবই অমিতা বিবাহিত জীবনের অঙ্গ বলে মেনে নেয়। অবশেষে প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটিয়ে সে নববধূর বিশেষ সাজে সজ্জিত হয়ে চিন্মোহনের কাছে উপস্থিত হয় এক অদ্ভুত তৃপ্তিবোধ নিয়ে। কিন্তু অমিতার বিবাহপূর্ব বৈধব্যরূপের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন চিন্মোহন নবসাজে সজ্জিত অমিতাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারে না। বিস্ময়-বিমূঢ় চিন্মোহনের কাছে অমিতা তখন এক 'বিশ্রী সঙ'। এবং "এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চমকে উঠে চোখ তুলতেই অমিতা দেখতে পেল চিন্মোহনের শিয়রের খানিকটা ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দিন কয়েক আগেকার অমিতারই একগাদা ফটো। নিচে সযত্ন হস্তে লেখা," মহাশ্বেতা।" এক বিষাদঘন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে স্তব্ধ অমিতার চেতনার গভীরে তখন মরুভূমির রিক্তরূপ ফুটে ওঠে।

কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অমিতা তার সংস্কারজাত (বৈধব্যজনিত সংস্কার) সঙ্কোচ ধীরে ধীরে ত্যাগ করে যখন নতুন জীবনে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হয়েছে সেই সময় সে সদ্যবিবাহিত স্বামীর কাছে লাভ করেছে অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাত। আসলে চিন্মোহন মানুষ-অমিতাকে নয়, তাব বিবাহপূর্ব বৈধব্যের শুভ্ররূপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল এবং সেই রূপকে ঘিরে তার মধ্যে যে রোমাণ্টিক আবেশেব সৃষ্টি হয়েছিল বিবাহিত অমিতার 'বিচিত্র বর্ণবাক' দর্শনে তা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। তাব গড়ে তোলা নিজস্ব কল্পনার জগৎ থেকে সে যেন সজোরে বাস্তবভূমিতে পতিত হয় যা তার কাছে ছিল একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত। সে যদিও জানতো বিবাহের পর 'কোন স্ত্রী শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে না বা নিরাভরণ থাকে না।

কিন্তু অমিতার সাজসজ্জার এতখানি পরিবর্তন হয়তো সে প্রত্যাশা করেনি। অমিতার বর্তমান রূপ দর্শনে তার নিজস্ব রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ গভীবভাবে আহত হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অমিতাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

সামাজিক ও মানসিক সংস্কার যে মানুষের প্রেমভাবনাকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করে তা অমিতার হৃদয়লোক উন্মোচনে ও চিন্মোহনের বিসদৃশ আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের মনের যে অবচেতন স্তর আছে যার সম্পর্কে আমরা সবসময় সচেতন নই সেই স্তরের নানা কার্য আমাদের আচরণকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত করে। চিন্মোহন নববেশে সজ্জিত অমিতাকেই বিবাহ করতে চেয়েছিল কারণ এটাই স্বাভাবিক যে বিবাহের পর কোন বিধবা নারী নিরাভরণ শুভ্রবাসে থাকে না। চিন্মোহনের কথার মধ্যেও সেই ভাবনা প্রকাশিত "এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।" কিন্তু চিন্মোহনের অবচেতন মনে ছিল অন্য এক অনুভূতি—অমিতার শুভ্রবেশ পরিহিত নিরাভরণ রূপের প্রতি মুগ্ধতাবোধ। অবচেতন মনের এই ভাবনাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিবাহ-পরবর্তী নববধূরূপে সজ্জিত অমিতার প্রতি বিসদৃশ আচরণে। এই সূত্র ধরে এসেছে অমিতার জীবনে রিক্ত জীবনের শূন্যতার অনুভূতি। এই কাহিনীতে লেখক চেতন ও অবচেতন মনের বিচিত্র ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সূচীমুখ বিশ্লেষণে যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা অনবদ্য।

'মহাশ্বেতা' গল্পে রয়েছে এক নিটোল বৃত্ত (Plot)! আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত সংযত সুশৃঙ্খল কাহিনী অবলম্বনে 'মহাশ্বেতা'র বৃত্ত রচিত হয়েছে। বিধবা যুবতী অমিতার সঙ্গে চিন্মোহনের প্রেম ও বিবাহ এবং বিবাহের পর প্রথম রাত্রে চিন্মোহনের কাছে অপ্রত্যাশিত আঘাতে অমিতার হৃদয়ে রিক্ততার অনুভূতি—এই হচ্ছে ঘটনা। এখানে 'নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা।' কাহিনীর একমুখীনতা গল্পটিকে গতিদান করেছে। সেখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দ্বন্দ্বসংকুল জটিল মনের নানাতরঙ্গের উদ্ভাস। বিধবা অমিতার প্রতি চিন্মোহনের মুগ্ধ প্রেম এবং অমিতার প্রথমে কিছুটা দ্বিধা ধীরে ধীরে চিন্মোহনের ভালবাসার আহ্বান উপেক্ষা করতে না পারবার দোলাচল চিত্তবৃত্তি দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে। কাহিনীর মধ্যভাগে এসেছে অমিতার 'চিন্মোহনকে বিবাহে সম্মতিদান, বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছুটা সংস্কারজাত সঙ্কোচ ও পরে সেই ভাব কাটিয়ে আত্মনিবেদনে উন্মুখ অমিতার নববধূরূপে সজ্জিত হওয়া এবং কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে চিন্মোহনের শ্লেষপূর্ণ বাক্যের ('তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে?' 'একেবারে চতুর্দশী বালিকা-বধূ') আঘাতে অমিতার শূন্যতা বোধে। এই গল্পের turning point টি চমৎকার। নতুন জীবনে প্রবেশের মুহূর্তে পূর্বজীবনের স্মৃতি জাগরণে নববিবাহিত অমিতার কিছু দ্বিধা ও প্রায় সেই সঙ্গে নতুন জীবনকে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষায় সেই দ্বিধা সংকোচ অনীহা কাটিয়ে আত্মসমর্পণের একান্ত বাসনার মুহূর্তটিই হচ্ছে এই গল্পের turning point। এর পরই তার জীবনে নেমে আসে চরম আঘাত। রূপান্তরিত অমিতা ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে চিন্মোহনের কাছে এলে চিন্মোহনের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি তাকে পৌঁছে দেয় ভয়ঙ্কর এক রিক্ততাবোধে। এই গল্পের পরিণতি এসেছে সংযত ও স্বাভাবিক ভাবে। তাঁর অন্যান্য ছোটগল্পের মত এই গল্পের পরিণতিও গুরুত্বপূর্ণ। এর তীক্ষ্ণ চকিত পরিসমাপ্তি

পাঠকচিত্তকে এমন আলোড়িত করে যে তার রেশ থাকে দীর্ঘক্ষণ। "এমন একটি মৃদু শিহরণ জাগিয়ে তিনি গল্পটি শেষ করেন যাতে পাঠকের প্রত্যাশা প্রবল কোন বিপরীতমুখী উদ্ঘাটনে আমূল বিচলিত না হলেও সূক্ষ্ম একটি মোচড়ের ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হতে থাকে।"—জনৈক সমালোচকের এই মন্তব্যটি 'মহাশ্বেতা' সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য। আয়ান রিড ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন—'The story typically centres on the inword meaning of a crucial event, on sudden momentons intuitions.' 'মহাশ্বেতা'র নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলে বৃত্তকে করেছেন ঘনপিনদ্ধ।

'মহাশ্বেতা' গল্পটি অমিতা ও চিন্মোহন—এই দুটি চরিত্র অবলম্বনে গড়ে উঠলেও এর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে অমিতা। অমিতা নিঃসন্দেহে এই গল্পের মূল চরিত্র, নায়িকা। অমিতার মনোলোকের টানাপোড়েন শেষপর্যন্ত রিক্ত অনুভূতি আঁটসাঁট বুননের মধ্য দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। অমিতা শুধু মুখ্য চরিত্র নয়, pivotal (চালক শক্তি) চরিত্রও বটে। Lajos Egri বলেছেন—'A pivotal character is a driving force ' অমিতার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সে শুধু কাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে না, কাহিনীকেও গতিময় করেছে। তবে এ ব্যাপারে চিন্মোহনের বিশেষ ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই। অমিতার বাবা ভুবন বাবু, মন্দাকিনী (অমিতার বর্তমান শাশুড়ী), মনোমোহন (চিন্মোহনের বড় ভাই), ননদ সুনন্দা, জা সরমা ঠানদি হলেন পার্শ্বচরিত্র। এরা অমিতার মনোলোক উদ্ঘাটনে সহায়তা করেছে। শিক্ষিত সুন্দরী অমিতার মধ্যে ছিল সংযত শ্রী—"রূপ যেমন আছে, সংযত রুচিও তেমনি। ...বিদ্যার সঙ্গে—বন্দুকের সঙ্গীণের মত—তীক্ষ্ণাগ্র অহংকার উঁচু হয়ে নেই।" মানসিক নানা টানাপোড়েনের পর বিধবা অমিতা দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দিলেও প্রথম বিবাহের আনুষ্ঠানিক আচার আচরণের পুনরাবৃত্তিতে প্রথমে তার সায় ছিল না। ('আবার সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি! কিছুতেই মন সায় দেয না)। এই ধবনেব পরিস্থিতিতে এখন স্পর্শকাতরতা যে কোন স্বাভাবিক নারীর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেতেই পারে। তবে নতুন জীবনকে বরণ করার আন্তরিক কামনায় সেই স্পর্শকাতর অনুভূতিকে শেষ পর্যন্ত সে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু ব্যাপারটি সহজ ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর সে বৈধব্যের আচারনিষ্ঠ জীবন পালন করেছে। পরে চিন্মোহনের প্রেমের স্পর্শে তার মনের বরফ গলতে শুরু করে। বর্তমানে মৃত স্বামী অমূল্যের স্মৃতি তাকে আর সেভাবে নাড়া দেয় না, তার মন আগের মত স্বামীর স্মৃতির প্রতি একনিষ্ঠ নয়। বিধবার আচার নিয়ম মেনে চললেও তার নিঃশব্দ চোখের জলের মাঝে ভেসে ওঠে অমূল্যের মুখ নয়—চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি। এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য তার কম সময় লাগেনি। চিন্মোহনের তাকে বিয়ে করার তাগিদের মধ্যে পরিবর্তিত অমিতা এক অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করে। একজন পুরুষ তাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসে এই অনুভূতি তার মধ্যে শিহরণ জাগায়। একসময় চিন্মোহন তাকে বিবাহের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে তার সেই অসহিষ্ণুতা অমিতার বেশ লাগে। তার মনের মধ্যে ভালোবাসার ঘোর জাগে—

"ওর এই অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে বেশ লাগে অমিতার। আরো বেশি অসহিষ্ণু, বেশি

রূঢ় যদি হয়ে উঠত চিন্মোহন, তা হলে অমিতার দায়িত্ব যেন আরো অনেক কমত। তার সমস্ত দ্বিধা সংশয়ের তন্তু নির্দয় হাতে উন্মোচিত ক'রে ফেলুক চিন্মোহন। অমিতা বাধা দেবে না।"

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত অমিতা এক সময় তার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়—"এবার সে শিথিল দেহে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে। দুর্বার স্রোত যেখানে খুশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।"

এই মানসিক পরিবর্তনে তার মধ্যে জন্ম নেয় এক নতুন নারী যে শুধু চিন্মোহনের প্রিয়া ও সহধর্মিনীরূপে নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়। সে বিধবার আচারনিষ্ঠ ধূসর জীবন থেকে বর্ণময় জীবনে প্রবেশ করতে উন্মুখ। সেই জীবনে বিধবার সংযম বা সহিষ্ণুতা নয়, নবসাজে নবরূপে নিজেকে চিন্মোহনের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণের এক অনাস্বাদিত আনন্দ অমিতা পেতে চায়। কিন্তু নতুন জীবনে প্রবেশের মুহূর্তে সে প্রবল আঘাত লাভ কর চিন্মোহনের কাছ থেকে। চিন্মোহন নববধূর সাজে সজ্জিত অমিতাকে দেখা মাত্র চরম বিদ্রুপে ফেটে পড়ে। তার কাছে অমিতার বিধবার শুভ্রসাজ বেশি পছন্দের। তাই সে অমিতাকে 'বিশ্রী সঙ' ও 'চতুর্দশী বালিকা বধূ' বলে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে অমিতা স্থাণু হয়ে যায়। তখন "এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমিতে রিক্ততায় ধুধু করছে।" এই ঘটনায় পাঠককুলও স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য তাদের চেতনা যেন অসাড় হয়ে যায়। অমিতার মত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শিক্ষিত উপার্জনক্ষম নারী বর্ণহীন জীবনের বোঝা টেনে চলবে, নাকি স্ফুরিত ব্যক্তিত্বে একদিন জ্বলে উঠে চিন্মোহনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে—এমন অনেক সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে উঁকি দেয়। অমিতার মানসিক টানাপোড়েন, রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও বিষাদময় পরিণতি অমিতাবে মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্পের অন্যতম নায়িকা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

চিন্মোহন বিধবা অমিতার প্রেমিক। সে তার বৈধব্যের শুভ্র নিরাভরণ রূপে মুগ্ধ। সে এই শুভ্রতার মধ্যে লাভ করে এক অপূর্ব অনুভূতি। অমিতার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে তার জীবনধারা ছিল অন্যরকম। অমিতার সংস্পর্শে তার জীবনে পরিবর্তন আসে। অমিতার স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির মাধ্যমে এক অপরূপ ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করে। "রূপের এই অনুভূতি চিন্মোহনের জীবনে নতুন। এতকাল উজ্জ্বল শিখায় নিজেকে আহুতি দিয়েছিল আনন্দ। দহন জ্বালায় নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করা যেত। কিন্তু অমিতার সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনে মধুর প্রশান্তির এই আস্বাদন আর হয়তো ঘটে উঠত না।" বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পূজারী চিন্মোহন তাই শ্বেত বসনধারী অমিতার নাম দিয়েছে 'মহাশ্বেতা'। সে অমিতার শুভ্ররূপের মধ্যে আবিষ্কার করেছে এক ধরনের পবিত্রতা। তার এই ভালো লাগা অমিতাকে প্রায় দেবীর আসনে বসিয়েছে। তাই শ্বেতবসন পরিহিতা এলায়িত চুলে বসে থাকা অমিতাকে দেখে তার মনে হয়েছে—

"ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।" এই বিদেহী সৌন্দর্যবোধ চিন্মোহনকে বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই বিমূর্তরূপ

কল্পনায় বিভোর চিন্মোহনের কাছে নবসাজে সজ্জিত অমিতা 'বিশ্রী সঙ' ব্যতীত কিছু নয়। আসলে চিন্মোহনের সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে খণ্ডিত দৃষ্টি তাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছে। 'যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' সে প্রেম কখনই সার্থক হতে পারে না। চিন্মোহনের সৌন্দর্য দর্শন অমিতাকে শেষ পর্যন্ত দিয়েছে বেদনাময় তিক্ত অভিজ্ঞতা। চিন্মোহনের আহত সৌন্দর্যবোধ স্বল্প কথায় লেখক আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন—''আধো-শোয়া ভাবে কি একটা বই পড়ছিল চিন্মোহন। অমিতাকে দেখে হঠাৎ যেন চমকে উঠল। ...চিন্মোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে? ...দশ বছর বয়স ক'মে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা-বধূ।'' চিন্মোহনের খণ্ডিত সৌন্দর্যদর্শন অমিতার দুই রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি।

চিন্মোহনের মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা লক্ষ করা যায়। অমিতা তার মনের মত সজ্জিত হয়ে আসেনি বলে সে বিবাহের প্রথম রাত্রে নিষ্ঠুরভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সে একবারও অমিতার হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। বিবাহের পূর্বেও সে একবার অমিতার স্পর্শকাতর মুহূর্তে তার সঙ্গে কিছুটা রূঢ় আচরণ করেছিল। আসলে চিন্মোহন নিজের তৈরি যে জগতে বিচরণ করছিল তার বাইরে সে যেতে চায়নি। তাই সে কোন মানুষ নয়, তার idea (অমিতার বৈধব্যের শুভ্রতার মধ্যে সৌন্দর্যের অপরূপতা উপলব্ধি)-কে গুরুত্ব দিয়েছে। শুভ্র সৌন্দর্যের ধ্যানে মুগ্ধ চিন্মোহন তাই অমিতার হাসির রঙের মধ্যে 'সাদা এক গুচ্ছ জুঁই ফুলের' সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে। এই ধরনের সৌন্দর্য প্রীতি জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই মাত্রা হারিয়ে বিষণ্ন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। 'মহাশ্বেতা' গল্পের পরিণতি তাই বিষাদঘন। তার এই ধরনের মানসিকতা তার আচরণবিধিকে অনিয়ন্ত্রিত ও সামঞ্জস্যহীন করে তুলেছিল। আসলে চিন্মোহনের মত চরিত্র superiority complex-এ ভোগে। ফলে এরা বিভ্রান্তিকর মানসিকতার শিকার হয়। তারই পরিণতি চিন্মোহন ও অমিতার মানসিক দূরত্বের ভয়াবহতা। অমিতার প্রেমাকাঙ্ক্ষাও শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা চিন্মোহনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। অমিতার মনোজগতের ক্রমবিকাশ, অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব ও বেদনাঘন পরিণতিতে চিন্মোহনের ভূমিকা শুধু অপরিহার্য নয়, শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত।

'মহাশ্বেতা' গল্পের নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের নায়িকার প্রকৃত নাম মহাশ্বেতা নয়। এ নামটি প্রেমিক চিন্মোহন নায়িকা অমিতাকে দিয়েছে। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গ্রন্থে মহাশ্বেতা নামটি পাওয়া যায়। সেখানে 'সর্বশুক্লা অষ্টাদশী' কন্যা মহাশ্বেতা অচ্ছোদসরোবরে স্নান করতে গেলে মুনি-কুমার পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ লাভ করে। উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং একসময় মহাশ্বেতা-বিরহে পুণ্ডরীক প্রাণত্যাগ করলে বিধবা মহাশ্বেতা প্রিয়তমকে ফিরে পাওয়ার জন্য তপস্যা শুরু করে। বর্তমানে গল্পের নায়িকা বিধবা অমিতা তপস্যারত। তবে সে তপস্যা পূর্বস্বামীর জন্য নয়, চিন্মোহনের জন্য। বৈধব্য জীবনের নানা বাধানিষেধ পেরিয়ে, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় জীবনকে অতিক্রম করে চিন্মোহনকে পাওয়ার জন্য যেন তার তপস্যা। যদিও এই তপস্যার নিষ্ফলরূপই আমরা দেখি। তাই নামটি যেন তির্যকরূপে নামকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আবার আর একটি দিক থেকে নামটি বিশেষ তাৎপর্যময়।

চিন্মোহন অমিতার বৈধব্যের শুভ্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নাম দিয়েছিল 'মহাশ্বেতা'। এর সমর্থন মেলে অমিতার প্রতি চিন্মোহনের উক্তিতে—

"মহাশ্বেতা তো। আমার দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্য শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু তুলে দিয়েছো।"

সে সর্বদা অমিতার শ্বেতশুভ্র রূপই দেখতে চেয়েছিল। আবার নববিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার মুহূর্তে চিন্মোহনের শ্লেষভরা মন্তব্যে অমিতার জীবনে নেমে এল চরম রিক্ততা যা সে প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর লাভ করেছিল—সেই অর্থে অমিতা সত্যি সত্যিই শুভ্রমূর্তি মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা নামকরণের এখানেই সার্থকতা।

'মহাশ্বেতা' গল্পের সৌন্দর্য তার আখ্যানের আঁটসাঁট বুননের মধ্যে নিহিত। গল্পের অপরূপ আরম্ভ ও চমকপ্রদ সমাপ্তি, চরিত্রের সুষম বিকাশ ও নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার এই গল্পের বাঁধুনিকে করেছে আকর্ষণীয়। গল্পের একমুখীনতা, চিত্রল ব্যঞ্জনাময় ভাষা কাহিনীর মূল বক্তব্যকে সার্থকভাবে মেলে ধরেছে। এখানে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা গল্পের মূল ভাব প্রকাশের বিশেষ সহায়ক। এই ভাষা মূলত ইঙ্গিতধর্মী। শুধু তাই নয়; এই গল্পের প্রতিটি বাক্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে লেখকের গভীর জীবনদৃষ্টি। শব্দ নির্বাচনে লেখকের সচেতনতা বিস্ময়কর। এখানে একটি শব্দও বাদ দেওয়া যায় না—সবই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর গদ্যভাষা কাহিনীর প্রেক্ষিত, ক্রমবিকাশ ও পরিণতিকে ব্যঞ্জনাময় শৈল্পিক রূপ দান করেছে।

কাহিনীর প্রেক্ষিত রচনায় লেখক শুরু করছেন এইভাবে "সদ্য চুনকাম করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিলে দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা।"

এই গল্পের স্থানে স্থানে অলঙ্কার ব্যবহার গদ্যভাষার মধ্যে এনেছে কাব্যিক স্পন্দন। যেমন অমিতার রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে—"ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।" অথবা "ওর হাসির রঙও যেন সাদা এক গুচ্ছ জুঁই ফুলের মত।"

ছোট ছোট বাক্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ এখানে বিচিত্র কুশলতায় মনের গভীর কথা ও আবেগ ধ্বনিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটি স্মরণ করা যায়,—

"সারাদিনের মধ্যে চিন্মোহনের আর সাক্ষাৎ নেই। ভিড়ের মধ্যে বাইরে বাইরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে দেখাই যায় না আর। মনে মনে অমিতা হাসে। এতদিনের সেই সপ্রতিভ চিন্মোহন বিয়ের পর হঠাৎ এমন লাজুক হয়ে উঠলো কি ক'রে।" নরেন্দ্রনাথ নিজের বর্ণনার ওপর যতটা নির্ভরশীল ছিলেন পাত্রপাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তিকে তিনি ততটা গুরুত্ব দিয়েছেন। সংলাপের স্বাভাবিকতা এই গল্পটিকে প্রাণময় করে তুলেছে। একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক,—

"সন্ধ্যায় সরমা আর সুনন্দা প্রসাধনের নানা উপকরণ নিয়ে বসল, অমিতাকে নিজেদের পছন্দ মত সাজাবে।

বিব্রত হয়ে অমিতা বলল, এসব কেন এত?

সুনন্দা বলল, কেন নয়? আগের মত আজো কি সেই সাদা—

চোখের ইসারায় সরমা তাকে নিষেধ ক'রে বলল, ছি!"

আবার কাহিনীর শেষ অংশে চিন্মোহনের অমিতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ করতে পারি— 'তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে? একেবারে চতুর্দশী বালিকা-বধূ!'

—এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপ মানুষের জটিল মনোজগৎ উদঘাটিত করেছে। এবং চিন্মোহনের আঘাতে বেদনাহত অমিতার অনুভূতি স্বল্প কথায় ("স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমিতে রিক্ততায় ধূধূ করছে।" আমাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন নরেন্দ্রনাথ—এখানেই তাঁর অসামান্যতা।

কাহিনী গ্রন্থনের শিল্পময়তায়, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তাৎপর্যে অপরূপ ভাষা প্রয়োগ কুশলতার ব্যঞ্জনাময় চমৎকারিত্বে 'মহাশ্বেতা' শুধু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পই নয়, বাংলা ছোটগল্প জগতের অন্যতম সম্পদ।

দাম্পত্য : প্রেম-অপ্রেমের ছায়া-ছবি

নিমাই দাস

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আত্মপ্রকাশ, অথচ উক্ত দশকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উৎকট প্রকাশ তাঁর গল্পে নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতি ঘটনায় এই দশকটি অতিবিক্ষত। সেই ক্ষত নিশ্চয় নরেন্দ্রনাথেরও মনে অন্তঃশীল ছিল। কিন্তু যে অর্থে জগদীশ গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা সুবোধ ঘোষ সময়ের দংশিত বিবেকের রূপকার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তা নন। সমকালকেই তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নগ্নভাবে নয়। প্রখর সমাজবাস্তবতার গল্প তিনি প্রায় লেখেনই নি। তিনি অবলম্বন করেছেন মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা ও আশাহীনতা, সমস্যা-সংকট, প্রেম-অপ্রেম, মনস্তত্ত্ব নিয়েই নরেন্দ্রনাথের গল্প অবয়ব পেয়েছে। লেখকের ভঙ্গী নির্মোহ। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী অনাড়ম্বর, স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ। তীক্ষ্ণ বাস্তবকে প্রকাশ করতে চাননি বলেই বোধ হয় তাঁর ভাষায় কঠোরতা নেই, ব্যঙ্গপ্রবণতা নেই, তির্যকতা নেই। আপাত সহজতার মধ্যে তাঁর গল্পে নিহিত থাকে আশ্চর্য এক গভীরতা। এই রকমই একটি গল্প 'দাম্পত্য'।

'দাম্পত্য' গল্পে বর্ণিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য। এই গল্পের কথক নির্মল। সে বলেছে তার বন্ধুস্থানীয় দূরসম্পর্কের মাসতুতো ভাই বীরেনদা ও রমা বৌদির দাম্পত্য-দ্বৈরাজ্যের গল্প। অর্থাৎ এই গল্পে নির্মল হয়ে উঠেছে লেখকের দ্বিতীয় সত্তা। তারই দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে গল্পে। নির্মল ও বীরেন থাকে কলকাতার এক মেসবাড়িতে। বীরেনের সংসার খুলনা জেলায় তাদের গ্রামের বাড়িতে, সেখানে আছে তার স্ত্রী রমা এবং পাঁচটি মেয়ে আর তার মা। এতগুলি কন্যাসন্তানের জননী রমা স্বামীর প্রতি নানা কারণেই ক্ষুব্ধ। রমার ইচ্ছা কলকাতায় এসে বসবাস করা। সেখানে অন্তত মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করার মত সুযোগ পাওয়া যায়। আর্থিক কারণেই বীরেন স্ত্রীর এই ইচ্ছাকে তেমন আমল দেয় না। কিন্তু তার জন্য রমার মনে জমা হয় ক্ষোভ। স্বামীকে সে অকর্মণ্য বলেই ভাবে। তার আরো রাগ, সব মেয়েগুলোই পেয়েছে বাপের গড়ন এবং মুখের আদল, রমার মত একটিও হয়নি। কথকের বর্ণনায়—"তখন পর্যন্ত চারটি না পাঁচটি যেন মেয়ে হয়েছিল বীরেনদার, দেখতে দাদার মতই কালো। গড়নও ওইরকম লম্বা, পাকাটে, বীরেনদার মতই বড় চোয়ালে জ্যামিতিক চতুর্ভুজের মত মুখের আদল।" সন্তানের গড়ন পিতার মত হবে না মাতার মত হবে, এব্যাপারে পিতামাতার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। তবু রমার মনে এজন্য ক্ষোভই জন্ম নেয়। বোধ হয় সেই ক্ষোভের পশ্চাতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটা প্রভাব আছে এবং তা থেকেই রমার মনস্তত্ত্বে জটিলতা তৈরী হয়। এতগুলি মেয়ে, দেখতে ভাল নয়, বৈদ্য বংশ—রমার মনে হতাশা, আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল। সেখান থেকেই রাগ বা ক্ষোভের জন্ম।

ক্ষুব্ধ রমার কলকাতায় বসবাস করার ইচ্ছা একদিন চরিতার্থ হয়। বীরেন কলকাতায় মলঙ্গা লেনের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির একতলায় দুটি ঘর ভাড়া নেয়। 'এজন্য বীরেনের ইচ্ছা অপেক্ষা রমার তাগাদা বেশি ছিল। কাজেই বীরেন গ্রামের সংসারকে শহরে আনতে বাধ্য হয়। কলকাতায় এসে স্বভাবতই রমা খুশি হয়। মেয়েদের কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেয়। কলকাতার ফ্যাশান-মাফিক মেয়েদের জামা-জুতো কিনে দেয়, চুল ছাঁটায়, নিজেও শাড়ী-স্যান্ডেলে আধুনিকা হয়ে ওঠে। নিম্নমধ্যবিত্ত এক ঘরণীর সাধ পূরণ হয়। কিন্তু সংসার চালাতে বীরেনকে হিমসিম খেতে হয়। চাকরির পরেও আবার টিউশনি এবং লাইফ-ইনসিওরেন্সের দালালি করে উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করে বীরেন। ক্রমে রমা আরো দুটি কন্যাসন্তানের জননী হয় এবং দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হয়ে গেলে বীরেন তার মাকে কলকাতার বাসায় আনতে বাধ্য হয়। পরিবারের সদস্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক খরচ বাড়ে, সেইসঙ্গে রমার মেজাজও চড়তে থাকে। রমার গঞ্জনা বীরেনকে অসহায় করে তোলে। সম্ভবত রোজগার বাড়াতে একটা চাকরি ছেড়ে আর একটায় ঢোকে। কিন্তু সে চাকরিও টেকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর গঞ্জনা বীরেনের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই একদিন সে আত্মহত্যা করে।

এই পর্যন্ত গল্পটি সরল ও ঋজু। এখানে স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্কের মধ্যে ত্রিভুজ প্রণয়ঘটিত কোন সমস্যা নেই, মনস্তত্ত্বের সংকট নেই। প্রধানত আর্থিক অনটনই তাদের দাম্পত্য কলহের কারণ। রমা তার স্বামীকে রোজগার বাড়ানোব জন্য যে তাড়না দিত, সেটা নিজের শাড়ী-গয়না কেনার জন্য নয়। সাতটি সন্তানের জন্য যেটুকু ন্যূনতম খরচ, সেটুকু জোগাড় করাই বীরেনের পক্ষে কষ্টকর ছিল। অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা তারা ভাবেনি। বীরেনেরই ভাবা উচিত ছিল। রমা এজন্য স্বামীকেই দোষ দিয়েছে। বিধবা হওয়ার পরেও রমার বুকে জমা থাকে মৃত স্বামীর জন্য একরাশ ঘৃণা ও ক্ষোভ। রমাবৌদির সঙ্গে কথা বলে নির্মল বুঝতে পারে সেটা। নির্মলের এই মন্তব্যটি লক্ষণীয়—"মৃতেব সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম নেই, কিন্তু দেখছি মেয়ে মানুষের আছে।" বীরেনের মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁর কথায় নির্মল জানতে পারে—বীরেনের হতাশার কাবণ অর্থনৈতিক দুর্বলতা, কিন্তু তার থেকেও বড় কারণ রমার গঞ্জনা। বীরেনের মা পুত্রের মৃত্যুর জন্য পুত্রবধূকেই দায়ী করেন—"কেন আবার ঘরে যে রাক্ষুসী আছে তার জন্যে। দিনরাত কেবল খাই-খাই আর খাই-খাই। বলি, এখন খাচ্ছিস তো? কোন্ আখার ছাই পোড়ামাটি খাবি এখন শুনি?" পুত্রহারা মায়ের শোক ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে পুত্রবধূর উদ্দেশে ঝরে পড়ে।

এতগুলি সন্তান নিয়ে রমা স্বভাবতই বিভ্রান্ত। সেই বিভ্রান্তিজনিত কারণেই রমার মুখ থেকে মৃত স্বামীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নয়, ঘৃণা উৎসারিত হয়—"এবার আমার জন্যে কোন একটা দাসী বাঁদি গিরির চেষ্টা দেখ নিমু ঠাকুরপো। খেতে তো হবে, যে কুকুর-বিড়ালগুলিকে রেখে গেছে তাদের খাইয়ে বাঁচাতে তো হবে।" নিজের সন্তানদের 'কুকুর-বিড়াল' আখ্যা দেওয়াতে একদিকে নিজের প্রতি ধিক্কার অন্যদিকে স্বামীর অবিবেচনা প্রসূত মানসিকতার প্রতি ঘৃণা ক্ষোভ প্রকাশিত। সেদিন রমা বৌদিকে যাহোক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নির্মল বিদায় নেয়।

কিছুদিন বাদে রমাবৌদির পাঠানা একটি চিঠি পায় নির্মল। চিঠিতে রমাবৌদি সত্বর দেখা করার জন্য অনুরোধ করে। দেখা করে নির্মল জানতে পারে একটি আশ্চর্যজনক খবর। রমা মরিয়া হয়ে নির্মলকে বলে "আমি আবার—আমি আবার—সে আমার আবারও সর্বনাশ করে গেছে নিমু ঠাকুরপো।" নির্মল বুঝতে পারে রমাবৌদি আবার অন্তঃসত্ত্বা। সাতটি কন্যা সন্তানের পর আবারও একবার বিবেচনাহীন কাজের জন্য এবার নির্মলেরও বীরেনদার উপর রাগ জন্মায়—"মৃত বলেও বীরেনদাকে আমি আজ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলাম না।" রমা তার গর্ভের অষ্টম সন্তানকে নষ্ট করতে চায়। ক্ষুব্ধ রমা বলে—"সে যে প্রতিশোধ নিয়ে গেল, আমি তার ওপর শোধ তুলব না? আমি কিছুতেই তার কাছে আর একবার জব্দ হব না। জীবনে সাত-সাতবার হয়েছি। আর নয়।"

রমা তার শেষ সন্তানটিকে নষ্ট করতে পারেনি। যথাসময়ে বীরেনের অষ্টম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নির্মল রমা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলল, "এ মেয়ের মুখ চোখ বোধ হয় বেশ চোখা চোখা হবে বউদি।" নির্মলের কথা শুনে রমা লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, "মেয়ে কে বলল তোমাকে? ছেলে।" গল্পটি এইখানেই ভিন্ন মাত্রা পেয়ে গেল। রমার এই শেষ উক্তিটি ঝড়ে বিধ্বস্ত অথচ ঝরে না-পড়া ফুলের মত। সে নির্মলকে বলে, "তার অনেক দিনের সাধ ছিল এ জিনিস দেখবে। দেখে যেতে পারল না। কেন অমন করে গেল, কেন অমন করে সে চলে গেল ঠাকুরপো?" চোখের জলের ধারায় ভিজে গেল রমা বৌদি। আনন্দ ও বেদনা মেশানো এই চোখের জলের স্বরূপ, এই দাম্পত্যের অন্তর্লীন কথাটি যেন অনেকটাই অনির্বচনীয়, এবং এখানেই গল্পের রস নিষ্কাশন।

দুই

'দাম্পত্য' গল্পটিকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত দাম্পত্যের গল্প বলা চলে। এই গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুটি ধরা আছে নারীর মাতৃত্বের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে। দাম্পত্যের সম্পর্ক শুধু নারীর প্রেম সম্পর্কে বাঁধা থাকে না, তার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে নারীর মাতৃত্ব এবং পুরুষের পিতৃত্বের চরিতার্থতার বোধ। সংসারে সব নারীই সচ্ছলতা কামনা করে। সেই সচ্ছলতার কামনা শুধু শাড়ী-গয়নার জন্য নয়, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য। রমাও তাই চেয়েছিল। কিন্তু সেই স্বাচ্ছন্দ্য রমা পায়নি। সে ক্রমাগত কেবল কন্যাসন্তানেরই জননী হয়ে গেছে। মা হিসেবে একটা গোপন বেদনা তার মর্মে জমা ছিল। মেয়েগুলি সুদর্শনা নয়। এটাও তার উৎকণ্ঠার কারণ। গ্রাম থেকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সুযোগ ছিল না। মেয়েদের বিয়ে কি করে হবে, তাদের সৎপাত্রস্থ করা যাবে কিনা—এইসব চিন্তা রমাকে উদ্বেগাকুল করে রাখত। সে কারণেই কলকাতায় তাদের আনার জন্য সে স্বামীকে প্ররোচিত করত। শহরে এসে স্বামীকে উপার্জন বাড়ানোর জন্য সে যে তাড়না দিত, তারও কারণ একটু ভাল থাকা, মেয়েদের ভাল রাখা। কিন্তু স্বামীর সক্ষমতার সীমা সম্পর্কেও রমার ভাবা উচিত ছিল। রমা তা না ভেবে স্বামীকে গঞ্জনা দিয়ে গেছে। রমাকে আমরা সুগৃহিণী কিছুতেই বলতে পারি না।

অন্যপক্ষে বীরেনও একজন বিবেচক গৃহী নয়। তারমধ্যে একটা মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কার আছে। দিন দিন মানুষের 'সেন্স অব ভ্যালুস' কমে যাচ্ছে বলে মর্মাহত হয় সে। মানুষ

হিসাবে মূল্যবোধ হারিয়ে ফেললে মানুষের আর কিছু থাকে না এটা ঠিকই। কিন্তু গৃহী মানুষকে সংসারের কথাও ভাবতে হয়। মূল্যবোধ বিসর্জন না দিয়েই কিভাবে সংসারে শান্তি বজায় রাখা যায়, বীরেন সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সংসারে ভাল থাকা বা ভাল খাওয়া-পরাটাই একমাত্র জীবন নয় বলে সে মনে করে। তার স্ত্রী সম্পর্কেও সে মন্তব্য করেছে, "স্থূল প্রকৃতির রুচির মেয়েমানুষ। সংসারে খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছু চিনল না।" এই নিয়ে নির্মলের সঙ্গে বীরেনের তর্কও হয়েছে। নির্মল বলেছে, "প্রাইম্যারি নিডসগুলি তো আগে মেটা চাই।" বীরেন বলেছে, "দেখ, ও একটা কথার কথা, নেহাতই বাজে অজুহাত।...নীডসকে প্রশ্রয় দিলে ওরা তোমার ঘাড়ে চাপবেই।" বীরেনকে মনে হয় যতখানি তাত্ত্বিক, ততখানি বিবেচক মানুষ নয়। তারমধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ পলায়নী মনোবৃত্তি অনেকটাই বিদ্যমান। নির্মলের মন্তব্য : "তাছাড়া বীরেনদারও দোষ যথেষ্ট। চাকরি করা ওঁর ধাতে নেই। মন দিয়ে কাজকর্ম করলেন না। এত বয়স হল, মন দিয়ে কোন কাজ শিখলেনও না, চিরকাল কেবল এড়িয়ে এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন।" বীরেন স্বভাবে মধবিত্ত, আর সংগতিতে নিম্নমধ্যবিত্ত। সে কারণে তার বাস্তব আর তার 'সেন্স অব ভ্যালুস'-এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। আর সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের সহজ পথ হিসাবে আত্মহননকে বেছে নেয়।

দাম্পত্যের গল্প মানেই প্রেমের গল্প—কথাটা সত্যি নাও হতে পারে। বীরেন ও রমার দাম্পত্যের যে বাহ্য পবিচয় গল্পে প্রতিফলিত, সেখানে প্রেমের ছিটেফোঁটাও নেই বলে মনে হবে। আমাদের সমাজে প্রেমহীন দাম্পত্যের পরিচয় কম নেই। মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর অমোঘ দুটি লাইন—'জগতে ঢের আছে পত্নী ও পতি/অথচ প্রেমিকের অনটন'। রমার আচরণ একসময় নিশ্চয় বীরেনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল, না হলে সে আত্মহত্যা করত না। রমাও স্বামীকে হারিয়ে কতটা মর্মাহত, তা বোঝা যায় না। বরং সে স্বামীর আত্মহত্যায় ক্রুদ্ধ এই কারণে যে তাকে একা সারা জীবন সাতটি মেয়ের দায় সামলাতে হবে। কিন্তু গল্পটির বাইরের এই তিক্ত ও কর্কশ পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে সংগোপনে লালিত হচ্ছিল দাম্পত্যের মধুরতর একটি কেন্দ্রবিন্দু। সেটাই গল্পের চমক। বিধবা রমা অষ্টম সন্তানটি প্রসব করে সেই অন্তঃশায়ী মধুর দাম্পত্যের কেন্দ্রবিন্দুটিকে উন্মোচন করে দিয়েছে—অষ্টম সন্তানটি 'মেয়ে' নয় 'ছেলে'। রমার কণ্ঠস্বর আবেগে বেদনায় ভেজা ভেজা—"তার অনেক দিনের সাধ ছিল এ জিনিস দেখবে। দেখে যেতে পারল না। কেন অমন করে, কেন অমন করে সে চলে গেল ঠাকুরপো?" রমা ও বীরেনের দাম্পত্যের চরিতার্থতায় পুত্রসন্তান লাভের অব্যক্ত কামনাটি একমাত্র মানসিক সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

রমা তো এই সন্তানটিকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল। সাতটি মেয়ের দায় সামলাতে যে বিধ্বস্ত, সে আর কোন ভরসায় অষ্টমটিকে পৃথিবীর আলো দেখাবে? সে নিশ্চয় ভেবেছিল সাতটির পর অষ্টমটিও মেয়েই হবে। এই আশঙ্কা থেকেই ভ্রূণ নষ্ট করার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পুত্রসন্তান লাভের পর রমার মনস্তত্ত্ব ঘুরে গেছে। এক অপরিসীম পরিতৃপ্তি তার চোখেমুখে। অতিরিক্ত একটি সন্তানের

ভরণপোষণের চিন্তায় সে আড়ষ্ট নয়। নির্মল যখন বলেছে, "হয়েছে যখন একটা ব্যবস্থা হবেই। যেমন করে হোক চলে যাবেই। আপনি ভাববেন না।"—তখন রমা বলেছে, "সে কথা আমি ভাবছি নে নিমু ঠাকুরপো!" এখানে দেখা যাচ্ছে, পুত্রকে মানুষ করার দায়ভার বহন করার ব্যাপারে রমা একটুও চিন্তিত নয়। তার চোখে জল এসেছে—তার নিজের মানুষটি পুত্রের মুখ দেখে যেতে পারল না বলে। আজ আনন্দের দিনে সেই মানুষটিই রমার স্মৃতিপট জুড়ে বিরাজ করছে। গোটা গল্প জুড়ে যে নারীকে স্বামীর প্রতি প্রেমহীন, মমতাহীন, মুখরা বলে মনে হয়েছিল, সে তার আসল পরিচয় নয়। তার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল একটি স্বামী-সোহাগিনী পত্নীর হৃদয়। আজ পুত্রসন্তান লাভ করে সেই নারীর বাহ্য পরিচয় খসে গেছে, আর অন্তরাত্মাটি চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর্থিক চাপে মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য অকস্মাৎ প্রেমের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। গল্পের নামকরণে এই ব্যঞ্জনাটিই উঠে আসে।

অবতরণিকা : এক বিষণ্ণ উপলব্ধির নির্জন শিখর

পূরবী বিশ্বাস (ঘোষ)

চল্লিশের দশকের খ্যাতকীর্তি গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সমকালীনদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাঁর দেখার ধরন ও বলার ভঙ্গি। দেশ-কাল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা বিষয়ে তিনি অনবহিত নন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা সবই তাঁর মনে নাড়া দিয়ে গেছে এবং গল্পের পটভূমিতেও ছায়া ফেলে গেছে; কিন্তু কোনোটির তীব্র প্রতিফলন পড়েনি তাঁর গল্পে। অতিপরিচিত সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রতিদিনের জীবনযাপনে এবং ব্যক্তিচেতনার বিকাশ ও ক্রমবিস্তারে যে ছোট ছোট নাটকীয় বাঁক জেগে ওঠে, তার তীব্র গভীরতার অব্যর্থ রূপায়ণে তিনি যেন রাজাধিরাজ। ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি, গৃহবধূ, ঠিকে ঝি, চোর, রূপমুগ্ধ বৃদ্ধ, কলেজে পড়া তরুণী, স্কুলমাস্টার—এমনি সব সাধারণ মানুষের জীবনকথার ছোট্ট পাতার বাঁশিতে তিনি ভরে দিয়েছেন সমুদ্রশঙ্খের ধ্বনি। তাঁর প্রিয় লেখক চেখভের মতই তিনি কানাকড়ি নিয়েও অনায়াসে খেলতে পারেন।

এমনই একটি গল্প 'অবতরণিকা'। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিষয় ও আঙ্গিকের সামগ্রিক বিচারে তাঁর সেতার, চোর, চড়াই-উৎরাই, বিকল্প, রস প্রভৃতি গল্পের শাণিত সৌন্দর্যে ধন্য নয় এ গল্প। এ গল্পের আকর্ষণ তার অনুচ্চকিত ক্রমবিস্তারের মধ্যে দিয়ে সাবলীল আরণ্যবৃক্ষেব সৌন্দর্যে জেগে ওঠা এক নারী। তার নাম আরতি। জীবনের আলো-অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়িয়েছে অশ্রুনদীর কূলে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তিনি মেয়েদের নিয়ে, মেয়েদের হয়ে এবং মেয়েদের জন্যে লেখেন। বাংলা সাহিত্যে মানবীচর্চার ইতিহাসে তাঁব গল্পের একটি বিশেষ জায়গা আছে এবং অবতরণিকা গল্পটি এক্ষেত্রে পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে।

চল্লিশের দশকের জটিল আর্থসামাজিক পটভূমিতে, এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বেঁচে থাকাব লড়াই, মূল্যবোধের সংঘর্ষ, মানবিক সম্পর্কের ভাঙন এবং এক চাকুরিজীবী গৃহবধূর তীব্র মানসিক সংকট এ গল্পের বিষয়বস্তু।

গল্পের কাহিনী দীর্ঘ। সরোজিনী ও প্রিয়গোপালের পুত্রবধূ আরতি সংসারের প্রয়োজনে এবং স্বামী সুব্রতর সম্মতিক্রমে চাকরি করতে বেরিয়েছে এবং সৌন্দর্যে, সপ্রতিভতায় ও কর্মদক্ষতায় অফিসে সুনাম অর্জন করেছে। প্রিয়গোপাল ও সরোজিনীর সযত্ন-অনুশীলিত মূল্যবোধ আরতির এই নতুন পরিচয়কে স্বীকার করতে পারে না। অথচ আরতির উপার্জিত অর্থ সংসারের প্রয়োজনেই লাগছে, এই রূঢ় সত্যকে তাঁদের মেনে নিতে হয়। তাঁদের মধ্যে আরতির সম্বন্ধে একধরনের দ্বিচারিতা কাজ করে। দ্বিচারিতা সুব্রতর আচরণেও বর্তমান। সে সংসাবের প্রয়োজনে আরতিকে চাকরি করতে পাঠায়, আবার প্রয়োজন মিটে গেলেই তাকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে বলে। যখন আরতি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানায়, তখন

আবার সুব্রত তাকে ব্যঙ্গ করে। কারণ, তখন সুব্রতর চাকরি চলে গেছে এবং আরতির চাকরি করা একান্ত প্রয়োজন। গল্পের বিষয়বস্তুতে দেশকালের ছায়া পড়েছে অনিবার্যভাবে এবং আরতিকে কেন্দ্র করে নতুন প্রজন্মের চাকুরিজীবী নারীর জীবনযন্ত্রণা ও উত্তরণের অনবদ্য শিল্পরূপ রচিত হয়েছে।

গল্পের শুরু হচ্ছে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। রাত আটটা। আরতি অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে। সমস্ত বাড়ি যেন তার দেরিতে ফেরার জন্য বিমুখ। ভেসে আসে শ্বশুরের তিক্ত মন্তব্যের টুকরো—'এত রাত্রি অবধি কোন্ গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে। ...আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়—'। সুব্রতও রূঢ়ভাষায় তিরস্কার করে। সে চায়না, আরতি 'শুধু একটা টাকা-আনা-পাইয়ের থলি হয়ে থাক।'

এরপরে গল্পকার পাঠককে নিয়ে যান মাস ছয়েক আগে—উন্মোচিত হয় আরতির চাকরি করার অনিবার্যতা। এতবড় সংসার সুব্রতর একার চাকরিতে চালানো সম্ভব নয়; তাই শ্বশুর-শাশুড়ির বিরূপতা, কোলের ছেলে-মেয়ের বায়না—সব কিছু পেরিয়ে ছলছল চোখে আরতিকে বেরিয়ে পড়েতে হয় 'সপ্তরথীর চক্রব্যূহ' মহানগরের পথে। ক্রমে আরতি সাবলীল হয়ে ওঠে তার অফিসের কাজে। আর্থিক স্বয়ম্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিস্তার, আত্মসচেতনতার বিকাশ, পরিবারের অভাব দূর করতে পারার আনন্দে লাবণ্যময় উচ্ছ্বাস, ঘরের বাইরে কাজের জগতে সমবৃত্তির ও সমান সামাজিক অবস্থানের এডিথ, রমা ও মল্লিকার সঙ্গে অপূর্ব 'কমরেডশিপে'র আস্বাদন—এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে পলকাটা হীরকখণ্ডের মত বহুমুখ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে আরতির ব্যক্তিরূপ। এই উদ্ভাসিত ব্যক্তিরূপের আনন্দে সুব্রত-প্রিয়গোপাল ও সরোজিনীর রূঢ়তাকে উপেক্ষা করে চলে আরতি। তিক্ততা ও পৌরুষের অভিমান সত্ত্বেও অফিসের পথে সহযাত্রিণী আরতির 'সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্যময় রূপ', যৌথ যাত্রার রোমান্স সুব্রতর মনে যেন প্রাক্-বিবাহ প্রেমের অনুভব সঞ্চার করে।

কিন্তু অচিরে সেই 'রোমান্স' হারিয়ে যায় সুব্রতর হীনম্মন্যতা এবং আরতির অফিসের কর্তা হিমাংশু মুখুজ্যের প্রতি তীব্র ঈর্ষায়। আরতি ও সুব্রতর বিপর্যস্ত দাম্পত্য গিয়ে ঠেকে সুব্রতর অশালীন হুমকিতে—'তোমার হয় চাকরি ছাড়তে হবে, নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা কর।'

সহসা গল্পে নাটকীয় বাঁক আসে। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সুব্রতর চাকরি যায় এবং সেই মুহূর্তেই আরতির চাকরি করা খুব জরুরি হয়ে ওঠে তার কাছে। যতখানি অশালীনতায় সুব্রত আরতিকে চাকরি করতে নিষেধ করেছিল, এখন তার চেয়েও বেশি অভব্য ভঙ্গিতে সে স্ত্রীর চাকরি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে ওঠে। আরতির ক্লান্তি, বিবর্ণতা কিছুই এখন তার নজরে পড়ে না।

দুজনের সম্পর্কের অস্থিরতা তুঙ্গে ওঠে আরতির চাকরি ছেড়ে দেওয়ায়। আরতি চাকরি ছাড়ে সহকর্মী এডিথের প্রতি হিমাংশুর ইতর অভিযোগের প্রতিবাদে—আত্মমর্যাদার প্রশ্নে। সরোজিনী, সুব্রত—সকলেরই মুখ থেকে মুখোশ খসে পড়ে। সরোজিনী বলেন—'এই কি

আমাদের মেজাজ দেখাবার গোঁয়ার্তুমি করবার সময়?' সুব্রত তিক্ত হেসে আরতির চাকরি ছাড়াকে সেন্টিমেন্টাল বাঙালী মেয়ের মূর্খতা বলে ব্যঙ্গ করে।

সমস্ত গল্প জুড়ে আরতির ক্রমবিকাশমান ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ফাঁপা পারিবারিক মূল্যবোধের—সুব্রতর পুরুষসুলভ অহং এবং স্বামীসুলভ উগ্র অধিকার চেতনার ও সুবিধাবাদী নির্লজ্জতার দ্বন্দ্ব চলে। গল্পটি মহামুহূর্তে পৌঁছয় আরতির বিস্মিত ও বেদনার্ত উচ্চারণে—'তুমি, তুমিও তাই বলছ?' আর 'এতদিন বাদে' আরতির আয়তসুন্দর চোখদুটি জলে ভরে ওঠে। 'এতদিন বাদে'—শব্দদুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের সূচনাকাল থেকে শেষ পর্যন্ত—'এতদিন' অপমান ও যন্ত্রণা সয়েছে আরতি; তবু কোথাও হয়তো তার বিশ্বাস ছিল, সুব্রত তাকে বুঝবে। সেই সুব্রত, যে তার রাত করে বাড়ি ফেরা পছন্দ করেনা, যে আরতিকে 'টাকা আনা পাই' আর 'স্থূল ব্যবসায় বুদ্ধি'র আওতা থেকে সরিয়ে রাখতে চায়, যার কাছে 'টাকার চাইতেও বড় প্রেস্টিজ'—সে আজ এডিথের সঙ্গে তুলনা করে আরতিকে 'সেন্টিমেন্টাল বাঙালী মেয়ে' বলে ব্যঙ্গ করবে—এ যেন আরতি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। হিমাংশুবাবুর মত ইতরস্বভাবের মানুষের কাছে আরতি কাজ করুক, সুব্রত আজ তা-ই চাইছে। আরতির আর ধৈর্য থাকে না। তার ভেঙে পড়ার মধ্যে দিয়েই কাহিনীটি এক অপূর্ব ছোটগল্পের মাত্রা পায়। 'তুমিও' শব্দটির মধ্যে উচ্চারিত হয় এক গভীর বিষাদ। পারিবারিক প্রতিকূলতা, জটিল মহানগরের পথে পথে পরিক্রমার ক্লান্তি—এসব সে অনায়াসে পেরিয়ে গিয়েছিল সুব্রতর সহযোদ্ধা হিসেবে সংসারের দায়িত্বপালনের আনন্দে। তার কষ্টের মধ্যেও গর্ব ছিল। সুব্রত যখন তাকে আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে কেবল অর্থউপার্জনের মেশিন হতে বলে, তখন আরতির পায়ের তলায় আর মাটি থাকে না। তাহলে হিমাংশু মুখুজ্যের সঙ্গে সুব্রতর তফাত কোথায়? হিমাংশু আরতিকে একটি শ্রমসক্ষম মানুষ-মেশিন হিসেবে দেখে এবং অনায়াসে আরতির সামনে 'এডিথ' সম্বন্ধে অশালীন উক্তি করে। এডিথের অসম্মানে আরতির মর্মপীড়া তার কাছে বিস্ময়কর, কারণ মেশিনের হৃদয়-আত্মা-মগজ বলে কিছু থাকে না। সুব্রতও আরতিকে অনুভূতিহীন যন্ত্র হয়ে উঠতে বলছে। হিমাংশুর আচরণে কপটতা নেই। সুব্রতর দ্বিচারিতা তাকে হিমাংশুর চেয়েও নিচে নামিয়েছে। হিমাংশুর চাকরিতে এক কথায় ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। কিন্তু সুব্রতর সঙ্গে দাম্পত্যের বন্ধন-জননী-বধূ ও প্রিয়া হিসেবে পারিবারিক পরিচয়—তা কি এক কথায় ছেঁড়া যায়? আরতির অবসাদ-বিষাদ আর মানসিক সংক্ষোভের ইঙ্গিতটুকু রেখে গল্পটি যাত্রা করে অশেষের মহাসমুদ্রে; ছোটগল্পের ঈপ্সিত লক্ষ্যে।

প্রসঙ্গত 'অবতরণিকা' নামকরণের গভীর তাৎপর্যটি দেখে নেওয়া যায়। অবতরণিকা শব্দের অর্থ ভূমিকা, সোপান শ্রেণী। সমগ্র গল্পজুড়ে রচিত হয় এক চাপা যন্ত্রণার অবতরণিকা—সেই সোপানশ্রেণী বেয়ে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আরতি পৌঁছয় এক বেদনাময় আত্মসাক্ষাৎকারের মুহূর্তে। তার আয়তসুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে যায়। অতঃপর এই জলধারা কোন্ রূপ নেবে? পার্বত্য স্রোতস্বিনীর না বাড়বাগ্নিসংক্ষুব্ধ মহাসাগরের? আরতির নিঃশব্দ কান্নায় কিসের ভূমিকা রচিত হল, কেউ সে কথা জানে না। আরতির নিজেকে জানা বোধহয় এখান থেকে শুরু হল। হয়তো এবার সে খুঁজবে 'নিজস্ব এক ঘর'—যার কথা বলেছেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌।

আলোচ্য গল্পে চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে ধীর চলনে, কাহিনীর মন্থর বয়নের ভাঁজে ভাঁজে। আমাদেরই খুব চেনা জগৎ থেকে উঠে এসেছে। স্খলন-পতনে-মানুষী দুর্বলতায় ঘেরা এই সব চরিত্র;—সুব্রত, সরোজিনী প্রিয়গোপাল, হিমাংশু, নিবারণ। অর্থকষ্টপীড়িত, হীনম্মন্যতাগ্রস্ত, জেদী আত্মাভিমানী ও রূঢ়ভাবে দ্বিচারিতাপরায়ণ সুব্রত চরিত্রটি কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে মনে করিয়ে দেয় 'সেতার' গল্পের সুবিমল, 'মহাশ্বেতা' গল্পের চিন্ময়োহন, 'চোর' গল্পের অমূল্য এবং 'রস' গল্পের মোতালেফকে। এ চরিত্র চেনা ছকের বাইরে যেতে পারেনি।

অবতরণিকা গল্পের সম্পদ আরতি চরিত্র। সে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ। সংসারের প্রয়োজনে চাকরি নেওয়া, ক্রমে চাকরিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এবং অন্নলোভাতুর সংসারের সীমার বাইরে প্রসারিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া—এই ঘটনাস্রোত ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয় তার চরিত্র। সংসারের প্রয়োজনে তার নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন, প্রতিদিনের রূঢ়তার কাঁটাগুলি সতেজ ধৈর্যে পায়ে দলে পথ চলা, বেশভূষায় রুচির মাধুর্য কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যক্তিরূপের ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসী উজ্জ্বলতা নানা কোণ থেকে তার ওপর আলো ফেলে। তার ব্যক্তিত্ব বহুমাত্রিক। স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওর-ননদ-সন্তান এবং নিজের বাবার সঙ্গে নানামুখী সম্পর্কের আভায় তাকে দেখি। সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, কর্মক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা, পেশাদারি দক্ষতা ও আত্মমর্যাদাবোধ বাইরের জগতেও তাকে এনে দেয় স্বাতন্ত্র্যময় সফলতা।

সাধারণ পরিবারের কর্মরতা বধূর সমস্যার সমস্ত ধাপ তাকে পেরোতে হয়; মেটাতে হয় সমস্ত সম্পর্কের দাবি। চাকরির কল্যাণে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা, অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ আকাশে উড়ান আর প্রিয়জনকে সাধ্যমত দুটি একটি উপহার দেওয়ার আনন্দ তার সম্পদ হয়ে ওঠে। আবার, মেশিন বিক্রি করতে গিয়ে বড়লোক ক্রেতাদের রূঢ়তায় আহত আরতির কাছে চাকরিজীবনের প্রাথমিক রোমাঞ্চে ভাঁটা পড়তেও দেরি হয় না। গল্পের শেষাংশে যে উন্নত নৈতিকতায় ভাস্বর প্রতিবাদী ভূমিকায় আরতি অবতীর্ণ হয়, তা মনে করিয়ে দেয় 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালকে। এখানে জীবনানন্দের কবিতার অংশবিশেষকে একটু পালটে নিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—

> 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—
> এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।
> সে অনেক শতাব্দীর মানবীর কাজ;'—

আরতির মত মেয়ের জীবন যেন নিখিল মানবীর দীর্ঘ আয়াসসাধ্য কাজের কোনো এক নতুন অধ্যায়ের অবতরণিকা রচনা করে। এখানে গল্পকে ছাপিয়ে যায় জীবন, যে জীবন অপরিমেয়।

অবতরণিকা গল্পের ঐশ্বর্য তার অনতিমুখর, সাংকেতিকতায় উজ্জ্বল ভাষা। গল্পকার কোনো কিছুই জোর করে প্রমাণ করতে যান না; তাঁর শব্দগুলি নীরবে আলো ছড়ায়। যেমন, গল্পের শুরুতে যখন প্রিয়গোপাল আস্তাবলের ঘোড়ার সঙ্গে ঘরের বউ ঝির তুলনা করেন, তখন এই বক্রোক্তি সংকেতে জানিয়ে দেয়—পরিবারে আরতির ভূমিকা ভারবাহী

জন্তুর মত। তাই আরতিকে সুব্রত অনায়াসে 'বসে খাওয়ার' খোঁটা দেয়, ইচ্ছেমত চাকরি করতে ও ছেড়ে দিতে আদেশ দেয় ও আপন প্রভুত্ব ঘোষণা করে। অফিস থেকে ফিরে আরতি মাথায় ঘোমটা টানার জন্য সুব্রতকে হাতের জিনিসগুলো ধরতে বলে। সুব্রত অশালীন ভাষায় তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এরপর আরতি ঘরে এসে ঢোকে—'দেখা গেল সুব্রতর সাহায্য ছাড়াই সে মাথায় আঁচল টানবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে'।—এই বাক্যটির ব্যঞ্জনা হৃদয়স্পর্শী। সুব্রতর মত ভাণসর্বস্ব দ্বিচারী পুরুষের সাধ্য কি, বজ্রমাণিকে গাঁথা এই আশ্চর্য মেয়ের মাথায় আঁচল টানতে সাহায্য করে! 'ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে।' সুব্রতকে একখানা ধুতিতে পাঁচদিন চালাতে হয়, আরতি তিনদিন বাদে বাদে শাড়ি বদলায়। এ নিয়ে আরতিকে কটাক্ষ করলে সে সুব্রতকে বলেছিল, তার অফিসের কর্তা 'শ্যাবিনেস' বড়ো অপছন্দ করেন। 'শ্যাবিনেস' শব্দটি যেন তীব্র ঝঙ্কার হানে—পরোক্ষে মনে করিয়ে দেয় সুব্রতর অন্তরের দৈন্য ও মলিনতাকে। একদিন আরতিকে তার মেশিন বিক্রির সূত্রে এক মাড়োয়ারী ক্রেতার গাড়িতে উঠতে হয়েছিল। সে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির সঙ্গে ইংরেজিতে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে হিন্দীতে আর ড্রাইভারের সঙ্গে বাংলায় কথা বলেছিল—সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে উচ্ছল হয়ে আরতি সুব্রতকে বলে—'একসঙ্গে তিন-তিনটি ভাষা—তোমার কোনদিন সুযোগ হয়েছে বলবার?'—কী প্রগাঢ় সাংকেতিকতা এই বাক্যে—আরতি যেন খাঁচা থেকে বেরোনো পাখি, সে আকাশের স্বাদ পেয়েছে—শিখে নিচ্ছে বহুস্বর জীবনের বিচিত্র ভাষা—উপলব্ধি করছে নিজের ব্যক্তিসত্তার বহুল সম্ভাবনাকে—যেন নিজেকেই ছাপিয়ে যাচ্ছে সে, এবং সুব্রতকেও। আরতির সাজসজ্জা প্রসঙ্গে একাধিকবার তার 'হাইহিল' জুতোর উল্লেখ্য লক্ষ্য করার মত—তা যেন আরতির আত্মবিশ্বাসদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের ঋজুতারই দ্যোতনা আনে। গল্পের শেষ বাক্যটির গভীর সৌন্দর্য তো ব্যাখ্যার অতীত। Frank O' Connor বলেছিলেন, ছোটগল্পের স্বরূপলক্ষণ হল—'an intense awareness of human loneliness'। শেষ বাক্যটি যেন পাঠককে সেই উপলব্ধির নির্জন শিখরে দাঁড় করিয়ে দেয়।

রস : এই রস জীবনের, ভালোবাসার

সুব্রত ঘোষ

'গল্প লেখার গল্প' শোনাতে গিয়ে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছিলেন, "আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার আনাগোনা কখনো রাজপথে, কখনো সুড়ঙ্গপথে। কখনো সেই পথরেখা চোখে দেখা যায়, কখনো বা তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অগোচরতাই লেখকের নিজের পক্ষে বিস্ময়কর। এতেই তার সৃষ্টির আনন্দ।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'রস' গল্পটির কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের জানা আছে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক স্মরণীয় সৃষ্টি 'রস' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পৌষালি চতুরঙ্গ পত্রিকায়। এই গল্প সম্বন্ধে লেখক অবহিত করেছেনঃ

"এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূব দিকে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুর গাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণকে সেইসব খেজুর গাছের মাথা চেঁছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখতে। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে বড় বড় মাটির হাঁড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা-জ্যেঠীমারা। শীতের দিনে রস থেকে গুড় তৈরির এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমার চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে রস গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু রসের যে কাহিনী অংশ, মোতালেফ মাজু খাতুন আর ফুলবানুকে নিয়ে যে হৃদয় দ্বন্দ্ব, খেজুর রসকে ঘিরে রূপাসক্তির সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত তা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। সেই কাহিনী আমি দেখিওনি, শুনিওনি। তা মনের মধ্যে যেন আপনা থেকেই বানিয়ে বানিয়ে উঠেছে।"

'রস' গল্পের কাহিনিটি গড়ে উঠেছে মোতালেফকে কেন্দ্র করে। মস্ত নামডাক তার গাছি হিসাবে। ঢেউ খেলানো বাবরি আর নীল লুঙ্গিতে বেশ মানায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের জোয়ান মোতালেফকে। গল্পের শুরুতেই আমরা জেনে যাই " কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুড়তে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজু খাতুনকে।" সবাই তো রীতিমত অবাক। কারণ বয়স তার তিরিশের কাছাকাছি। বিষয়-সম্পত্তিও এখন কিছু নেই। "দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজু খাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।" আসলে রূপে-রসে টলমল করছে এমন একটি মেয়েকে পাবার জন্যেই মাজু খাতুনকে ঘরে তুলেছিল মোতালেফ। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানু তার উনিশের নজর কাড়া সৌন্দর্য নিয়ে বৃদ্ধ স্বামী গফুরকে মেনে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ঝগড়া করে তালাক দিয়ে এসেছে তাকে।" কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে।" ফুলবানুকে নিকে করার জন্যে এলেম শেখ মোতালেফের কাছে

পাঁচকুড়ি টাকা হেঁকে বসে। যেহেতু সেই মুহূর্তে টাকা দেবার সামর্থ্য গাছির নেই, সেই কারণে তাকে পিছিয়ে আসতে হয় সাময়িকভাবে, আশ্রয় নিতে হয় ভিন্নতর কৌশলের। এই ভিন্নতর কৌশলের ফলশ্রুতি মাজু খাতুনের সঙ্গে তার বিয়ে, গল্পের শুরুতেই যে প্রসঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি।

রূপের বাহার হয়তো মাজু খাতুনের নেই। কিন্তু দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় যে গুড় সে তৈরি করে তার কদর বড় কম নয়। সারাদিন তার বিশ্রাম নেই। কোনো অসুবিধাকেই সে আমল দেয় না। "অনেক দিন পর মনের মত কাজ পেয়েছে মাজু খাতুন, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।" বাজারের মধ্যে সেরা গুড় মোতালেফের, চড়া দাম পায় সে। মোতালেফের উৎসাহ দেখে তো সকলে অবাক।

কিন্তু প্রয়োজনের টাকা জোগাড় হতেই স্বভাব-চরিত্রের দোষ দিয়ে মাজু খাতুনকে তালাক দিল মোতালেফ। এক ভয়ঙ্কর শূন্যতার শিকার হতে হতে মাজু খাতুন মোতালেফকে বলে, "তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরি তোমার মনে? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর্ দূর্!" মোতালেফের এ-সব শোনার এখন সময় নেই। সে এখন ডুব দিতে চায় ফুলবানুর রূপ-সায়রে।

মাজু খাতুন মোতালেফকে পেয়ে তার নিঃসঙ্গতা ভুলেছিল। নিজেকে উজাড় করে ভরাতে চেয়েছিল দু'জনেরই মন। এখন কিন্তু সবকিছুই অন্যরকম। পড়শিরা মোতালেফ-ফুলবানুর নতুন সংসারে ঢেউ-ভাঙা সুখের গল্প শোনায় : "বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজু খাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে।" অবশেষে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদ তার দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে নদীর ওপারে তালকান্দা গ্রামের মাঝি নাদির শেখের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ আনে। অপমানিত বঞ্চিত নারী এখন ভয়ঙ্কর স্মৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্তি চায়, সুতরাং এই প্রস্তাবে আপত্তি নেই তার। ওয়াহেদকে সে মনের কথা জানিয়ে দিতে ভোলে না, "রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালে খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজু খাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজু খাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।" মাজু খাতুনের প্রথম স্বামী রাজেক ছিল তল্লাটের সবচেয়ে বড় গাছি। তারই কাছে মোতালেফ আয়ত্ত করেছিল "খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা"। আর মাজুখাতুনের হাতের ছোঁয়াতে রস থেকে যে গুড় তৈরি হয়—তা বাজারের সেরা। তা সত্ত্বেও মাজু খাতুন সব কিছু ভুলতে চায়, মুছে দিতে চায় রসের স্মৃতি। এ রস আক্ষরিক অর্থেই খেজুর রস আবার মেতোলেফের ভালবাসার পরিচয়ও। মোতালেফের যৌবনকে আজ আর বিশ্বাস নেই মাজু খাতুনের, এর চেয়ে পঞ্চাশের নাদির তার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

গল্পের মধ্যে এর পরেই প্রকট হয়েছে ভিন্ন এক সমস্যা। এই সমস্যার মূল কারণ রস ঠিকমত জ্বাল দিয়ে উৎকৃষ্ট গুড় তৈরি করায় ফুলবানুর ব্যর্থতা। সন্দেহ নেই এই ব্যর্থতাই মুহূর্তের মধ্যে গল্পের গতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। ফুলবানুর ব্যর্থতার পাশাপাশি আর একটি নারীর মুখ ভেসে উঠেছে। মাজু খাতুন। মোতালেফ রসের হাঁড়িতে উঠোন

ভরিয়ে দেয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উনানের ধারে বসে মুখ শুকায় ফুলবানুর। তার সঙ্গে শুকাতে থাকে মনের রসও। অনেক চেষ্টায় চলনসই গুড় সে করতে শিখলেও "দর ওঠে না গতবারের মত। খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।" নিজের বিরক্তি আর হতাশা চাপা রাখতে পারে না মোতালেফ গাছি। রাতে বিছানায় মোতালেফ যখন ফুলবানুকে ভাল গুড় তৈরিক কৌশল শেখানোর চেষ্টা করে, তখন বিরক্তি উগরে দেয় সে। আর তখনই ফুলবানুর পাশে শুয়ে মোতালেফ গাছির মনে পড়ে যায় মাজু খাতুনের মুখ, আগ্রহের সঙ্গে যে সব কিছু জানতে চাইত—শিখতে চাইত। একদিন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল, গুড় পুড়ে যাওয়াতে মোতালেফ ক্রুদ্ধ হয়ে সপাসপ কঞ্চি চালাল ফুলবানুর শরীরে। এইভাবেই চিড় ধরতে শুরু করে দুজনের সম্পর্কে, ক্ষয় শুরু হয়ে যায়। এলেম শেখ মেয়েকে কোনোমতে ঠাণ্ডা করলেও একদা রঙিন হতে চাওয়া দুটি মনই এখন ফ্যাকাসে। মুখের কথা এখন মুখ থেকেই বেরোয়, "মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে।"

আমরা জানি নরেন্দ্রনাথ মিত্র হলেন অন্তর্জগতের ব্যাখ্যাতা। মোতালেফের শূন্যতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি যেভাবে খেজুর রসের সঙ্গে বিপ্রতীপ ভাবনায় তার মনকে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন তা উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে।

> "খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না। কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।"

অবশেষে "দুটি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু হাঁড়ি রস নিয়ে" মোতালেফ এসে দাঁড়ায় নাদির শেখের উঠানে। মাজু খাতুনের কোনো আঘাতই এখন তার কাছে আঘাত মনে হয় না। "বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগালি তিরস্কারের মধ্যেও কোথাও যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজু খাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইছে চুঁইয়ে পড়ছে রস।" নাদিরকে মোতালেফ জানিয়েছে—সে গুড় খেতে দিতে আনেনি, মাজু খাতুন যদি জ্বাল দিয়ে দুই সের গুড় বানিয়ে দেয়, তাহলে সেই গুড় ঠাণ্ডা করে মোতালেফ হাটে নিয়ে যাবে, অচেনা খদ্দেরের কাছে বেচবে সেই গুড়।

এই মুহূর্তে মোতালেফ যেন মাজু খাতুনের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা চায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, একদিন যার কাছে সে জানাতে পারত অসহযোগিতার দাবি, এখন তার কাছেই সানুনয়ে পৌঁছে দিতে চায় করুণার জন্যে কাতর প্রার্থনা। না বলা আরও কত কথার মধ্যেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে আর এক না-বলা কথার ভিতর অনেক কথা বলার সেই দৃশ্য, "বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছে।" আমরা নিশ্চিত ভাবেই উপলব্ধি করতে পারি এই সজল ভাষায় যে অক্ষর ফুটে

উঠেছে, সেখানে এই মুহূর্তে ক্রোধ নয়, ঘৃণা বা বিদ্বেষও নয়, ভালবাসা আর মমতা দিয়েই একদা প্রত্যাখ্যাত মাজু খাতুন আশ্বাসের দ্যোতনা জাগায়, অন্বয়ের স্বপ্ন খোঁজে।

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে এসেছে নাদির শেখের। চুপ করে মাজু খাতুনের দিকে তাকিয়ে থাকা মোতালেফের উদ্দেশ্যে সে বলে ওঠে, "ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার? হুঁকোতে মুখ দিয়ে মোতালেফ উত্তর দেয়, না মেঞাভাই, নেবে নাই।"

শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না এ-গল্প; যেমন নিবে গিয়েও নিভতে চায় না মোতালেফের হুঁকোর আগুন। আরে জেগে থাকে বোধকরি মনের আগুনও। এই আগুনে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে ঊর্ধ্বায়নের ইঙ্গিত। ফুলবানুকে কেন্দ্র করে মোতালেফের মনে যে ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রকাশ সেখানে হয়তো সম্ভোগের সুখ ছিল, কিন্তু যা ছিল না তা হল প্রেমের, কর্মতৎপরতার স্বতঃস্ফূর্ততা। সহযোগিতায় এবং কর্মচঞ্চলতায় মাজু খাতুনের যে কল্যাণী রূপটি গল্পে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, মোতালেফ তা অগ্রাহ্য করেছিল। সে কারণে অবশ্য মূল্যও দিতে হয়েছে তাকে। নিজস্ব মতলব চরিতার্থ করার জন্য মোতালেফ যে-ভাবে মাজু খাতুনকে ব্যবহার করেছে, তাতে তার প্রতি আমাদের মন সহজেই বিরূপ হয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে জমাট বাঁধতে থাকে এক বঞ্চিতা নারীর জন্য আমাদের সহমর্মিতার বোধ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মোতালেফকে বুঝে নিতে হয়েছে, জীবনের মূল লক্ষ্য যেখানে যথার্থভাবে বাঁচতে চাওয়া, তখন সেই চরম উদ্দেশ্যের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় রূপাসক্তির আবেদন। এ-কথা ভাবা যেতেই পারে, যেহেতু ফুলবানুর রূপসর্বস্বতা প্রয়োজনের তথা জীবনচর্যার বৃহত্তর তাগিদ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, সেই কারণেই পিছিয়ে পড়তে হয়েছে সেই নারীকে। অথচ রূপহীনতার মধ্যেই মাজুখাতুনের শ্রমনিষ্ঠ ভঙ্গি তার ভালবাসাকে যেরকম মর্যাদা দান করেছে তার গুরুত্ব খর্ব হবার নয়। কোনো তত্ত্বকথার বাঁধুনিকে প্রশ্রয় না দিয়েও বলা যায়, চলিষ্ণু জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মুহূর্তে শ্রমের দীক্ষায় এই কল্যাণী রূপটি নিঃসন্দেহে আমাদের উজ্জীবিত করে, এগিয়ে যাবার সামর্থ্য জোগায়।

মাজু খাতুনের শরীরে হয়তো রূপের তরঙ্গ খেলা করে না; কিন্তু তার মনের মধ্যে সক্রিয় ছিল পরিশ্রমের কঠিন সাধনা। এই শ্রমের ভিতর দিয়েই সে গড়ে নিতে চেয়েছে তাদের আশ্রয়। মোতালেফের জন্যে প্রকৃতই তার বুকের মধ্যে ভালবাসার ব্যাকুলতা জেগে উঠেছিল। মোতালেফের প্রতিষ্ঠায় তার চেষ্টার ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ভুলে যেতে চাইলেও দুঃসহ স্মৃতির কবল থেকে কি অব্যাহতি মিলেছে তার? ভেঙে পড়া মোতালেফের জন্য তার ব্যথার্ত সজল চোখের ভাষা এই জিজ্ঞাসার ইন্ধন জুগিয়েছে সন্দেহ নেই। নাদিরের সঙ্গে ঘর করতে মাজু খাতুন নদী পার হয়ে গেলেও মোতালেফের মন থেকে সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। আপদ বিদায় হল বলে মুখে সে যতই স্বস্তি প্রকাশ করুক, একটি অদৃশ্য কাঁটা তার বুকে বিঁধেই ছিল। "গাছির আদর গাছেই সইতে পারে,"—কথাগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা যাক গাছির যন্ত্রণা গাছেই বুঝতে পারে। এই কারণেই হতমান মোতালেফ আবার ছুটে গেছে মাজু খাতুনের কাছে। বিপর্যস্ত মানুষটি নতুন করে নিজেকে ফিরে পেতে চায়, ঘুরে দাঁড়াতে চায়, আর এই কারণেই পেতে চায় সেই নারীর কর্মপ্রাণতার আশ্বাস, সহযোগিতার

ছোঁয়া। এক অসাধারণ পুনর্জাগরণের বিভাতে দীপিত হয়ে উঠেছে এই ছোটগল্পের অবয়ব। ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যেও নরেন্দ্রনাথ যেভাবে জীবনের রসকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, আস্বাদ্যমানতার আমেজ সৃষ্টি করেছেন, তাতে বিস্মিত ও আবিষ্ট না হয়ে উপায় নেই।

শিল্পী নরেন্দ্রনাথ এই গল্পের মধ্যে জীবনরসের যে উৎসার ঘটিয়েছেন তার মূল্য জীবন-জিজ্ঞাসার মহাকাশেই অন্বিষ্ট। নেতি কবলিত সংশয়কে উপেক্ষা করে এই কারণেই শেষ পর্যন্ত গল্পের মধ্যে জেগে উঠেছে মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতা, মানব-মানবীর চিরন্তন হৃদয় আকুতির রহস্য। "না মিঞা ভাই, নেবে নাই",—এক না নেভা আগুন একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে সর্বত্র। এই আগুনেই তো টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকবে গাছির খেজুর রস। একই সঙ্গে পরিশুদ্ধ হতে থাকবে সম্ভাবনাবাহিত জীবন-রসও। সুতরাং অগ্নিশুদ্ধ জীবন এবং জীবনের সমার্থক খেজুর রস উভয়ের মধ্যেই গল্পকার তাঁর রসচেতনার সিদ্ধি ঘটান। ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে গল্পের শীর্ষ পরিচয় অনায়াসেই তার দাবিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে। সিদ্ধি পায় লেখকের উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধ হতে থাকে পাঠক-প্রত্যাশা। আমরা নিশ্চিত ব্যঞ্জনার্থের নিবিড়তায়, রূপকার্থের তন্নিষ্ঠতায় 'রস' একদিকে সঞ্চারিত হতে চেয়েছে প্রেমনিষ্ঠায়, অন্যদিকে শ্রমদীক্ষায়; সব মিলিয়ে গভীর ও ব্যাকুল জীবন-জিজ্ঞাসায়।

'রস' গল্পের আলোচনায় শিল্পীর ভাষা-সংলাপ-বর্ণনার ভঙ্গি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নিজস্ব অভিজ্ঞতার স্বভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি একটি বিশেষ পেশায় যুক্ত নরনারীর মুখের কথাকে অদ্ভুত দক্ষতায় তাঁর গল্পে প্রয়োগ করেছেন। ফরিদপুরের এই প্রত্যন্ত গ্রামের ভাষা কিন্তু অনায়াসেই আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর সংলাপ-বর্ণনা-উপমা ইত্যাদির মধ্যে জড়িয়ে থাকে সাধারণ মানুষের ঘাম, আকাঙ্ক্ষার স্বাদ আর মাটির গন্ধ। নাগরিকতা তথা মধ্যবিত্ত মানসিকতার সুদক্ষ রূপকার হয়েও তিনি এই সামাজিক পরিকাঠামোর একটি বিশেষ স্তরকে অনায়াসে স্পর্শ করেছেন, তাতে শিল্পীর মরমী সত্তা তাঁর সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির মতই যে সমানভাবে ক্রিয়াশীল, সে তথ্য আমাদের কাছে অজানা থাকে না।

লেখকের বর্ণনার মধ্যে অদ্ভুত এক মুন্সীয়ানা। অনুপম গদ্যশৈলিতে গড়ে ওঠা তাঁর বর্ণনার মধ্যে কখনো প্রকৃতির অনুষঙ্গ, কখনো বা বাস্তবের প্রতিরূপ। অধিকাংশক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার ইঙ্গিত। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যাক :

(১) "যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে"

(২) "কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের।"

(৩) "দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিকচিক করে রাত্রির জমা শিশির।"

(৪) "ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।' মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর একজনের পান খাওয়া ঠোঁটের রস লাগে।"

(৫) "ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খটখট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটাফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি খালি মনে হয় দুনিয়া।"

এই সব উদ্ধৃতির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংলাপের সাবলীলতা, বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্য, তুলনার অভিনবত্ব। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে শিল্পী মানব-মানবীর জীবনকে সংস্থাপিত করেছেন; প্রতিতুলনার সূত্রে আবদ্ধ করে গভীর মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার পরিচয় রেখেছেন।

> "নিজের স্বভাবকে দেখে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারাজীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি।"

শিল্পীর কথাকে মান্যতা দিয়েই 'রস' গল্পের পরিণাম যেন সেই ভালোবাসার কথাকেই শেষপর্যন্ত প্রকাশ করতে চেয়েছে। আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে যায়, সহস্র চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়েই এই আশ্চর্য জীবন সঞ্চরণশীল। কল্যাণের অনুভব সেই পথের বাঁকে তার আশ্বাস ঝরিয়ে যায়, সাময়িকভাবে হয়তো আমরা তাকে ভুলে থাকি, পিছিয়েও পড়ি; কিন্তু এই বিপর্যয় কখনই চিরকালের জন্য নয়। 'রস' গল্পের পরিণামও সেই মূল্যবোধের স্ফুলিঙ্গকে উস্‌কে দিয়েছে। "না মেঞাভাই, নেবে নাই।"—এই অন্তিম উক্তির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পরিচিত স্বর কোথা থেকে যেন তার গূঢ়তাকে প্রকাশ করে ওঠে, স্বতন্ত্র বোধের প্রেক্ষিত থেকেও জাগিয়ে দেয় অভিন্ন উদ্ভাস—"হায় জীবন এত ছোট কেনে"।

এক পো দুধ : মধ্যবিত্ত মন ভালোবাসা ও সংশয়

শ্রীমতী মজুমদার

চল্লিশ-পঞ্চাশের বছরগুলির অন্যতম জনপ্রিয় কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যাঁর প্রথম গল্প সঙ্কলন 'অসমতল' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫-এ, স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের ভাঙন, অবক্ষয় বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের দ্রুত অবলুপ্তি তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল এবং এই উদ্বেগের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বৃহত্তর জনসমাজের অভাব, অনটন অনাচার ভ্রষ্টাচার সম্পর্কিত ভয়ানক অভিজ্ঞতা। এই দুঃসময়ের এক ব্যতিক্রমী রূপায়ণেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। বলা যায়, এই দুঃসময় তাঁর সাহিত্যের নায়ক। খেয়াল করবার বিষয় এই যে, প্রতিবাদ ও ক্রোধ কখনো তাঁর সাহিত্যে প্রধান হয়নি, পরিবর্তে এক অসহায়তার প্রশান্ত বিষাদ তাঁর রচনার মূল আকর্ষণ।

১৩৫৯ (ইং ১৯৫০) সালের 'মুখপত্র' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় 'এক পো দুধ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটির প্রেক্ষাপট হিসেবে আমরা পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়াবৃত এক বিবর্ণ, শ্রীহীন কলকাতাকে। বন্যার জলরাশি সরে যাবার পর যেমন অনাবৃত হয় মৃত্যুজর্জর ক্ষয়াক্রান্ত নির্মম পচনের রূপ, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণনাশী দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলার সমাজজীবন তথা পরিবারজীবনেও তখন প্রকট হয়েছিল তীব্র অবক্ষয়, আর্থিক দুরবস্থা ও মানবিক সম্পর্ক ও মূলবোধের ক্ষীয়মাণ রূপটি। যদিও গল্পের মধ্যে লেখক প্রত্যক্ষভাবে অথবা সামান্য ইঙ্গিতেও সেই সময়ের উল্লেখ করেননি, যখন প্রকৃত অর্থেই অদ্ভুত এক সর্বব্যাপী সর্ববিনাশী অন্ধকার গ্রাস করে বসেছিল বাঙালির সার্বিক জীবন ও জীবনধারা। আগাগোড়াই তা নীরব উচ্চারণের মত রয়ে গেছে।

গল্পটি গড়ে উঠেছে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে, যে পরিবারের কর্তা বিনোদ দাস এণ্টালির এক একতলা ভাড়া বাড়ির কোণের দিকের ঘরে স্ত্রী দুটি সন্তান ও একটি বেকার ভাইকে নিয়ে বাস করে, আর পটলডাঙা স্ট্রীটের বাণী পাবলিশিং এর অফিসে প্রুফ রিডিং এর কাজ করে। মাস গেলে সামান্য সত্তর-পঁচাত্তর টাকা, তার রোজগার। এর ওপর উপরি আয় হিসেবে মাঝে মধ্যে ছাত্র-টিউশনির সামান্য কটা টাকা আর ইনসিওরেন্সের এজেন্টরূপে অল্প-স্বল্প কমিশন—এর উপরই নির্ভরশীল তার সংসার—নিজের ও আরো চারটি প্রাণীর খাওয়াপরা, ন'বছরের ছেলে সুনীলের লেখাপড়াও। এই সংসারের মানুষগুলির সামান্য সুখ-দুঃখে গাঁথা জীবনটি গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ নিয়মে চলছিল। সেখানে কোনো ঢেউ ছিল না। হঠাৎ সামান্য এক পো দুধকে কেন্দ্র করে, সেই সংসারে ঢেউ উঠল, আবর্তের আলোড়নে শান্ত সংসার জীবন নড়ে উঠল। বিনোদের স্ত্রী লতিকা এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারটির শান্তশ্রী, সত্যার্থেই শ্রীময়ী স্ত্রী, মা এবং বৌদি, তিন রূপেই তার এই কল্যাণী রূপটির প্রকাশ। সংসারটির শ্রী রচনাই তার একমাত্র ব্রত। সংসারের জোয়াল টানতে টানতে ক্লান্ত, অকালে হৃত-যৌবন স্বামীটির মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর মমতায় তার মন ভরে ওঠে। আর তাই সংসারের সকলের মুখ বাঁচিয়েই স্বামীর জন্য সে রোজ এক পো দুধেব ব্যবস্থা করে। বিনোদ সেই সাধারণ মানুষ যে পরিবার-

বর্গের মুখে দুবেলা দু-মুঠো ভাত তুলে দেবার জন্য নিরন্তর জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত। জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদই তার কাছে 'অধরা'—হয়তো ভেতরে ভেতরে সে বুভুক্ষু অতৃপ্ত এক সত্তা, কিছু সহজ মানবিক মূল্যবোধ তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি। 'এই তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দুগাল ভেঙেছে, চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায়না'—লেখকের দৃষ্টি অনুসরণ করে পাঠকের মনেও এক সহানুভূতির জায়গা তৈরি হয় তাকে ঘিরে। হঠাৎ একদিন সকালে নিত্যবরাদ্দ হাতল-ভাঙা কাপে এক কাপ মলিন, বিস্বাদ চায়ের পরিবর্তে যখন স্বাস্থ্য, সুখ, উজ্জ্বলতা ও প্রাণবন্ত জীবনের তরলায়িত রূপ এক কাপ দুধ নিয়ে লতিকা উপস্থিত হয়, তখন মুহূর্তে বিস্ময় ও সঙ্কোচের এক মিশ্র অনুভূতি বিনোদকে গ্রাস করে, আবার পরক্ষণেই স্ত্রীর এই মনোযোগ সহানুভূতি তার মনপ্রাণ ছুঁয়ে যায়। আর তাই স্ত্রীর চোয়াল জাগা ফ্যাকাসে মুখ, রক্তশূন্য শরীরের অন্তরালে টলটলে অমলিন এক প্রেমের ধারার স্পর্শে তার হৃদয় দ্রবীভূত হয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এক অপরাধবোধ তাকে পীড়া দেয়, তাই সামনে পাঠরত ছেলেকে সঙ্কোচভরে সে একবার দুধটুকু সাধে। কিন্তু পরিহাসপ্রিয় ভাই এর ঠাট্টাটুকু "...ও তাই বল, চুরি করে দাদাকে খাওয়ানো হচ্ছে?'—প্রসন্নমনে সে মেনে নিতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথ এক অদ্ভুত নরম মনের কথাকার। তাঁর অধিকাংশ গল্পের বীজই সমাজবৃত্ত অথবা তারই সবথেকে ছোট একক অর্থাৎ পরিবার জীবন থেকে সংগৃহীত। সমাজের শঠতা, হিংসা, ক্রূরতা, বঞ্চনা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি কিন্তু তা কখনো তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে আগুনের উত্তাপ আনেনি বরং বিপরীতে আছে ভালবাসার যতগুলি রূপভেদ, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-বন্ধুত্ব এই সবই তাঁকে বারবার স্নিগ্ধ জীবনরসের সন্ধানে হাতছানি দিয়েছে। কখনো কখনো মনে হয় তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বারবার মনে হয় সেখানে নিয়ামক শক্তি হল দুঃসময়-লাঞ্ছিত মন এবং গল্পে তার প্রকাশ দ্বিবিধ। একদিকে তাঁর কাহিনীগুলিতে চিত্রিত নানা ঘটনার অন্তরালে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার বিবর্তনই হল তাঁর মূল লক্ষ্য, অন্য প্রান্তে তাঁর বিশ্লেষণী গভীর সংবেদনশীল মন, যে মন মধ্যবিত্তের সঙ্কট-সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরতে চায় করুণ সহমর্মিতায়—নিস্পৃহ সমালোচনায় নয়। আর তাই মধ্যবিত্তের শতছিদ্র দীর্ণ জীর্ণ বর্ণহীন জীবনের মতো প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় যে গল্পের শুরু হয়, পরিণতিতে তা সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মহত্তর কোনো উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের আলোচ্য গল্পটির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এমন এক 'বস্তু' আপাতদৃষ্টিতে যা অতি তুচ্ছ মনে হলেও, বাঙালির জীবনের সঙ্গে তার যোগ চিরন্তন। সুস্থ, সুন্দর, সমৃদ্ধ জীবনের প্রতীক এটি। আর তাই বারবার বাঙালির লৌকিক জীবনের বিভিন্ন আচরণ ও সাহিত্যেও তা বারবার উঠে এসেছে পরম মমতায় ও প্রাত্যহিক জীবন-মূল্যের গুরুত্বে। প্রাক্ বাংলা সাহিত্যে 'প্রাকৃত কবি পিঙ্গল-এর কবি' কান্তার দেওয়া পুণ্যবান স্বামীর আদর্শ আহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ('ওগগর ভওা, রম্ভঅ পওা/গাইর ঘিওা, দুদ্ধ সজুওা') কলার পাতায় ওগরা চালের ভাত, গাওয়া ঘি ও গরম দুধের কথা বলেছেন, অন্নদামঙ্গলে অন্নদার কাছে ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা—আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে—আজ প্রবচনে পরিণত, এমনকি বাংলাসাহিত্যের অমর সৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের সঙ্গে সোশালিষ্ট বিড়ালের বাদানুবাদের উপলক্ষও সেই প্রসন্ন গোয়ালিনীর দিয়ে যাওয়া সামান্য দুধ। আলোচ্য গল্পেও সেই বস্তুটিকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিম্নমধ্যবিত্ত এক সংসারের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন যার অন্তরালে রয়ে গেছে একাধিক ভাঁজ, যেগুলি মেলে ধরলে কখনো প্রকাশিত হয় চরিত্রগুলির পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের চিত্রণ, কখনো বা গল্পটি হয়ে ওঠে এক নিটোল ভালবাসার গল্প, সে ভালবাসা কোনো দুঃসহ পরিস্থিতিতেও ম্লান হয়না, আবার অন্তিমে মনে হয়, সমস্ত রকম নিচতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি ও উত্তরণই হল এ গল্পের ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনাই তো ছোটগল্পের রসমূর্তি।

নিপুণ কথাকার নরেন্দ্রনাথ, সামান্য 'এক পো দুধ' অবলম্বন করে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে অনায়াস গতিতে গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যান আর আমাদের মনের সামনে একে একে ধরা দেয় মানব সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাগুলি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গল্পের মূল চরিত্র বিনোদ যেন সংসারে তার প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নির্মম হয়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ ও সংসারের একমাত্র উপার্জক হিসেবে ওই বাড়তি এক পো দুধের ওপর তার অধিকার বোধ জন্মে যার— প্রথমদিনের দুধ তার অন্তরের বহুকালের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। অকস্মাৎ রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত ক্রমশই হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে সে যা তার সুস্থ শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে ফেলে, আর তাই এক মাস বাদে যখন তার স্ত্রী বাড়তি সংসার খরচের কথা ভেবে গয়লাকে দুধটুকু বন্ধের নির্দেশ দেয় বিনোদ অসন্তুষ্ট হয়, তা অগ্রাহ্য করে এবং লতিকার মুখে দুধের বাড়তি পয়সা কোথা থেকে আসবে এই প্রশ্নে সমস্ত শালীনতা ভুলে নির্লজ্জভাবে স্ত্রীকে বলে ওঠে—'টাকা কি তুমি দাও, যে টাকার ভাবনা ভাবছ? টাকা যে দেয় সে দেবে। সারাদিন তোমাদের জন্য খেটে মরছি আর এক ফোঁটা দুধ জুটবেনা আমার কপালে?' তারই পয়সায় কেনা দুধ বন্ধ করে দেওয়ার উদ্ধত সিদ্ধান্ত তাকে ক্ষুব্ধ ও অসংযমী করে তোলে আর তাই সে অনায়াসে বলতে পারে— 'খাবই তো, আমার টাকা-পয়সায় আমি খাব, আমি পরব, তাতে তোর কি'। ঘটনা এখানেই থেমে যায় না, সামান্য মনোমালিন্যের পর সকালে দুধের কাপ প্রত্যাখ্যান করলেও, তৃষিত হৃদয়ে বিনোদ অপেক্ষা করতে থাকে ওই দুধটুকুর জন্য—'সারাদিনের খাটুনির শেষে অনেক বঞ্চনা, অনেক আশাভঙ্গের পর রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে বাজে আটার রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে শেষে যখন ছোট একটু বাটিতে সাদা তরল পানীয়টুকু দেখতে পেল বিনোদ, ওর মন বলে উঠল,—এই সেই হারানো বস্তু, এই সেই পরম বস্তু।' শুধু তাই নয়, সামান্য ওই দুধটুকু খাওয়ার প্রতি তার আকর্ষণই শুধু বাড়িয়ে দিলনা এবং সময়ে তা তার নিত্যদিনের দাবি হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্যার সমাধান তো এত সহজে হয়না, মানব-মনের জটিলতা গূঢ়, গভীর। তাই নিয়ে ছোটখাটো অশান্তি লেগেই থাকল। লতিকা তো শুধু বিনোদের স্ত্রী নয়, তার আর এক বড় পরিচয় সে সুনীলের মা, তার সুস্থ বিচারবোধ থেকে সে ভেবেছিল সপ্তাহখানেক বা দিন পনের পরে বিনোদের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হবে এবং সে নিজে থেকেই এই দুধের দাবিটুকু ছেড়ে দেবে। আর তখন লতিকা তার ছেলের মুখে ওই দুধটুকু তুলে দেবে, আর পরীক্ষার সময় তার 'সোনা'র জন্য রোজ দুধ রাখবে। মাতৃহৃদয়ের অতি স্বাভাবিক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই তো তাই। চিরকাল তো মায়েরা তাই চেয়ে এসেছে '—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'—লতিকার এই আশা তো সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি মাত্র। এমনকি সে, দেওর বিজনের প্রতিও তার কর্তব্যটুকু

অস্বীকার করতে পারেনা, তাই মাঝে মাঝেই বিনোদের বরাদ্দ দুধটুকু কখনো সুনীলের কখনো বা বিজনের মুখে তুলে দেয়। মা হয়েও যেদিন একবেলাও সে সুনীলের পাতে এক টুকরো মাছ দিতে পারেনা সেদিন ওই দুধটুকুই সে ঘাটতি পূরণ করে। আর কখনো বা চাকরির জন্য ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ ক্লান্ত বিজনের প্রাত্যহিক বরাদ্দ ওই চিংড়ির কুচো আর পুঁই চচ্চড়ির সঙ্গে সামান্য ওই দুধ আর আমসত্ত্ব দিয়ে একটু বৈচিত্র্য, একটু তৃপ্তি আনার চেষ্টা করে লতিকা। কোনোদিন বা দুরন্ত অবুঝ বালক স্কুল থেকে ফিরে চুরি করে দুধটুকু খেয়ে নেয়—কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই বিনোদ সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে এগুলি মেনে নিতে পারে না—কখনো সে গম্ভীর হয়ে ওঠে, কখনো বা বেকার অপদার্থ ভাইয়ের প্রতি স্ত্রীর এই সহানুভূতি, মমতা, তার মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। আর সেই নগ্ন ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে এইভাবে...'দুধই খাওয়াও আর আমসত্ত্বই খাওয়াও, জীবনে ওর চাকরি হবেনা বলে দিলাম'। মুদ্রারাক্ষুসে (inflation) অর্থনীতির অসহায় শিকার বিনোদের সুস্থ নীতিবোধ, আদর্শ, এমনকি পিতৃস্নেহটুকুও ধীরে ধীরে যেন হারিয়ে যেতে থাকে। তাই ন' বছরের বালক বাবার বরাদ্দ দুধটুকু চুরি করে খেয়ে মায়ের 'কড়া শাসন'এ লাঞ্ছিত হয়েছে শুনেও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়না, উপরন্তু সাময়িকভাবে তার ক্রোধ, বিকারগ্রস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন সামান্য প্রশমিত হয় মাত্র, এমনকি বেহায়ার মত এই মন্তব্য করতেও তার আটকায়না—'ছেলেবেলা থেকেই এত লোভ ভাল না'। কাহিনী চরম বিন্দুতে পৌঁছে যায় এবং নাটকীয়ভাবে মোড় নেয় আবার দিন কয়েকবাদে যখন বিনোদ রাতের খাবারের সঙ্গে তার বরাদ্দ দুধটুকু পেলনা এবং প্রশ্ন করে জানতে পারল পাশের বাড়িব সাদা বেড়ালটা এসে দুধটা খেয়ে গেছে। লতিকার চূড়ান্ত অসতর্কতা তাকে রাগে অন্ধ করে দেয়, নিমেষে সে কটূক্তি করে—'পয়সা তো আর নিজে কামাই কর না। কি বুঝবে তার মর্ম।' পরমুহূর্তেই যখন সে জানতে পারে সত্যিই বেড়ালে এসে দুধটা খেয়ে যায়নি, লতিকার অম্বল হয়েছিল বলে দোতলার মাসিমার পরামর্শে সে সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষ তার স্বামীর মুখের দুধটুকু খেয়ে নিয়েছে, তখন স্ত্রীর সেই লোভ তাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে তোলে। কর্কশভাবে সে বলে ওঠে—'খেয়েছ খেয়েছ তার এত ভণিতার কি ছিল! বেড়াল, অম্বল কত কি! বললেই পারতে দুধ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই খেয়েছি' —বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয়না, স্ত্রীর ঐ দুধ খাওয়ার ইচ্ছেটুকুই বিনোদের কাছে অসহনীয়, আকস্মিক আঘাতে লতিকার সঙ্কোচের আবরণটিও যেন ছিঁড়ে খুলে পড়ে তিক্তভাবে তাই সে বলে ওঠে, 'খেয়েছি তো বেশ করেছি। তুমি তিরিশ দিন খেতে পার আর আমি একদিনও পারিনে।' ক্রমাগত উত্তেজনার মাত্রা চড়তে থাকে, এবং যখন বিনোদ স্ত্রীকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করে বলে সে বিনোদের দুধ খাওয়া সহ্য করতে পারেনা, হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে, তখন বিনোদের মনে না থাকলেও, পাঠকের মুহূর্তে মনে পড়ে যায়, কিভাবে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে, নাবালক সন্তানকে বঞ্চিত করে লতিকা স্বামীর জন্য এই দুধের ব্যবস্থা করেছিল। বিনোদের এই অভিযোগ শুধু তাৎক্ষণিক উত্তেজনারফল নয়, আগাগোড়া তার মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করলে আমরা মনে মনে দীর্ঘশ্বাসটুকু গোপন করতে করতে বুঝি এই হল মূল্যবোধের অবক্ষয়; আমরা এও বুঝি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিই বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষকে 'বামন'-এ পরিণত করেছিল। (Robert Leon Kinsky তাঁর 'Dwarfing of Man—1948, বইটিতে এই Minerva Associates, নৈতিক অধোগমনের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।)

দেখতে দেখতে দাম্পত্যের কুৎসিত বিকৃত রূপ অনাবৃত হয়ে পড়ে, লতিকা স্বামীকে 'বুড়ো বেটা' বলে সম্বোধন করে, তার স্বার্থপরতা ও লোভের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চরম ধিক্কার জানায় এবং বিনোদ স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে, এমনকি মারতেও যায়—স্বামী-স্ত্রীর যে সুস্থ সম্পর্কের উপর একটি পরিবারের অস্তিত্ব নির্ভর করে, মুহূর্তে জটিল সময়ের আবর্তে সেই অস্তিত্বলুপ্তির আশঙ্কা পাঠককে আচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ করে তোলে। ন' বছরের ছেলে সুনীলের ঘুমভাঙা চোখের বিস্ময় ও মার ওপর প্রতিহিংসাস্পৃহা আমাদের আরো ভয়ঙ্কর সর্বনাশের ইঙ্গিত দেয়। অবশেষে বিজনের হস্তক্ষেপে সে রাতের ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর অবসান হয়; এরপর শুরু হয় সাময়িক পতন থেকে বিনোদের উঠে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা। টলস্টয় তাঁর 'রেজারেকশান' উপন্যাসে একেই বলেছিলেন 'পলাতক আত্মার প্রত্যাবর্তন'। মান-অভিমানে রাতটুকু কেটে যায় আর পরবর্তী উজ্জ্বল ভোরে বিনোদ সব হীনতাকে জয় করে 'তিমিরবিনাশী' হবার সাধনার ব্রতী হয়, তাইতো স্ত্রী-র এগিয়ে দেওয়া দুধের কাপ সে অবলীলায় স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়। মানবতাবাদী লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র আবার একটি মানুষকে নৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন—মানবিকতার আলোয় উদ্ভাসিত করেন।

গল্পটি শেষ হয় অসাধারণ এক উত্তরণে যখন দুধের কাপটি লতিকার হাত ঘুরে বিজন এবং সুনীল হয়ে অবশেষে পৌঁছে যায় বস্তিবাসী উপোসী অসহায় বালক ফটিকের হাতে—আর এক মন্ত্রধ্বনির মতো মহৎ অলঙ্ঘনীয় উচ্চারণ আমাদের শিহরিত, পুলকিত করে,—'তুমি খেলেই আমার খাওয়া'—'তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে'—নরেন্দ্রনাথ আবার মধ্যবিত্তদের নৈতিক বিবেককে জিতিয়ে দেন আর আমাদের সুগভীর প্রত্যয়ে ও প্রত্যাশায় বলতে ইচ্ছে করে—

'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।।'

নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন—'আমার মন সেই কীর্তন, ভাগবতপাঠ, পূজাপার্বণ, যাত্রা, কবি, কথকতার মধ্যে রসের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল'—বলাবাহুল্য এ রস 'জীবনরস' এবং সেই জীবনরস অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনায় তাঁর গল্পগুলিতে অনুরণিত হয়েছে, এবং পাঠককে গভীর প্রশান্তির অনুভূতি এনে দিয়েছে। বিনোদের এবং তার সঙ্গে সারা পরিবারটির আরোগ্যলাভে আমরাও মনের ক্লেদ ও গ্লানির রুগ্নতা থেকে আরোগ্যলাভের দিশা খুঁজে পাই। মধ্যবিত্ত মন যে মরেও মরেনা, নতুন করে বারবার বাঁচে এই আশ্বাসে নরেন্দ্রনাথ আমাদের শান্তও করেন। মধ্যবিত্তের অন্তর্লীন সত্তায় নানা বাধা-বিঘ্ন, পতন-বিপর্যয়ের মধ্যেও সত্য ও কল্যাণবোধের একটি দীপ জ্বলতেই থাকে, কতবার ঝড়বাতাসে কেঁপে ওঠে কিন্তু নেভে না। মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির এই চিরন্তন স্বরূপ নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই চিত্রিত হয়েছে, 'এক পো দুধ'ও তার ব্যতিক্রম নয়।

হেডমাষ্টার : কেরানি মাষ্টারমশাই ও প্রেম

শম্পা মিত্র

আমাদের মধ্যবিত্ত চেতনায় 'মাষ্টার' শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে একটি বিশেষ মূল্যবোধ। সেই মূল্যবোধ একটি বিশেষ সময়-লাঞ্ছিতও বটে। যা গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষা-চেতনার উন্মেষলগ্নে। পাঠশালার টিকিধারী পণ্ডিতের সঙ্গে ততদিনে তার ব্যবধান ঘটে গেছে বিস্তর। সেই থেকেই মাষ্টার শব্দের সঙ্গে সংলগ্ন থেকেছে এক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি। আদর্শবাদী, নিয়মনিষ্ঠ, পণ্ডিত আপোযহীন এমন এক চরিত্র যার পরনে ময়লা ধুতি, সস্তার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা, শতচ্ছিন্ন ছাতা ও কাঁধে সুতির ঝোলা ব্যাগ; পায়ে ছেঁড়া-ফাটা চটি—যার সংসারে নিত্য দারিদ্র্য। এই ছবিটা প্রায় বিশ শতকের সাতের দশক-এর মধ্যকাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। তারপর দিনকাল বদলেছে, সামাজিক রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারের অবস্থাও বদলেছে—আজকের 'মাষ্টারে'র সঙ্গে তার সংস্কৃতিগত দূরত্বও স্পষ্ট হয়েছে—আজ আর তার ঘরে তেমন দারিদ্র্য নেই, পরনে নেই মলিন ধুতি, পায়ে ছেঁড়া চটি। বদলে গেছে মূল্যবোধ। নতুন মূল্যবোধের জোয়ারে পুরনোকালের সেই মাষ্টার আজ মিথ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় মিথ হয়ে যাওয়া এরকমই এক মাষ্টারের ছবি এঁকেছেন তাঁর 'হেডমাষ্টার' গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পুজো সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৬ সালে। ধরে নেওয়া যেতে পারে সেই সময়ের আশেপাশেই বৃত্তায়িত হয়েছে এই গল্পের প্রেক্ষিত। প্রায় ষাট বছর আগের কাল এ গল্পের সময়। 'হেডমাষ্টার'-এর ব্যক্তিগত জীবনছবি লিখতে বসে লেখক অজানিতেই গল্পে সাজিয়ে দিয়েছেন সম সময়ের মূল্যবোধ ভাঙা-গড়ার এক সন্ধিক্ষণের পটচিত্র। সেই মূল্যবোধের অন্দরে রয়েছে একজন মাষ্টারের সামাজিক দায়বোধ ও ব্যক্তিজীবনের দ্বান্দ্বিক অবস্থান।

স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় গল্পের স্বল্পায়তনে লেখক টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন হেডমাষ্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকারের জীবনের নানা উত্থানপতনের মানচিত্র—আর তার স্তরে স্তরে শিলায়িত থেকেছে সমকালীন সমাজের নানা পটবদলের স্মৃতিধুলো। গল্পটি প্রথমপুরুষে কথিত। আর এই প্রথমপুরুষটি নিরুপম নন্দী—হেডমাষ্টারের একদা প্রিয় ছাত্র। তারই দৃষ্টিকোণে পরিবেশিত হয়েছে ঘটনাসূত্র। স্বভাবতই হেডমাষ্টারের নিজস্ব অবস্থানটি রয়ে গেছে অনালোকিত। কেবল কথোপকথনের অংশগুলোতে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তিটি ফুটে ওঠার সুযোগ ছিল কিন্তু সেখানেও প্রায় বৈশিষ্ট্যহীনভাবে তার সংলাপগুলো লেখা হয়েছে। এবং ভিন্নতর মাত্রা যোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর উচ্চারণ কথক নিরুপমের দৃষ্টিভঙ্গিরই সম্প্রসারণ মাত্র। আর এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখক তথা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের আলোকেই সবকটি চরিত্রের আনাগোনা। নিরুপম নন্দী থেকে হেডমাষ্টার, লাবণ্য থেকে পরিমলবাবু সকলেই শেষমেষ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজস্ব ভুবনেই ঘোরাফেরা করেন। আপন আপন বাস্তবতা প্রকাশ করেন না। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গল্পকারের অভিপ্রেত চমকটি

একটা বিশেষ সময়ের জন্মচিহ্ন বুকে নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। আর এই চমকটুকুই প্রাপ্তির আরাম।

হেডমাষ্টারের জীবনের তিনটি পর্ব—ধারাবাহিকভাবে নয়, বরং এলোমেলো ভাবেই কথকের মেজাজকে নির্ভর করে ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। কৈশোর যৌবনের স্মৃতিকথা মেদুর প্রেমের কলকাতা পর্ব, সাগরপুর গ্রামে এম ই স্কুলের মাষ্টারি পর্ব এবং কলকাতার ব্যাংকে কেরানীজীবনের ধূসর অধ্যায়। কথক নিরুপম অতীত ও সদ্য-অতীতের গল্পগুলো বলতে গিয়ে মাঝেমাঝেই বর্তমান ভেঙে ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গেছেন। নিরুপমের চোখ দিয়েই আমরা হেডমাষ্টারের সঙ্গে লাবণ্যর পরিচয়, প্রেম ও দাম্পত্য পর্ব থেকে সাগরপুরের হেডমাষ্টারির দীর্ঘযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। এক একটি পর্বের শেষে ফ্ল্যাশব্যাক ডিজলভ করে আবার বর্তমানে ফিরে আসি, আর এই ফিরে আসার মধ্যেই পরতে পরতে উন্মোচিত হয় হেডমাষ্টারের বর্তমান জীবন। বর্তমানেই গ্রাম ও শহরের লাবণ্য, কেরানী কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার, ব্যাংকের বিচিত্র সব করণিক এবং অফিসার, নিরুপম নন্দীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেখানে নিরুপম নন্দীর মনোগত অবস্থানটি অনেক বেশি স্বাবলম্বী।

'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণে (চৈত্র, ১৩৬৯) 'বলাবাহুল্য' শীর্ষক ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—''আমার কোনো রচনায় অপরিচিতদের পরিচিত করাবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।' আর তাই বোধহয় 'হেডমাষ্টার' গল্পের মাষ্টারমশাই অজানা-অপরিচিত মানসভঙ্গিমার কোনও আকস্মিক উন্মোচন না ঘটিয়ে শেষাবধি আমাদের সুপরিচিত মিথিক্যাল হেডমাষ্টারের বলয়েই রয়ে যান। যা লেখকের পূর্বনির্ধারিত, পূর্বপরিকল্পনার ফসল। হেডমাষ্টারের চরিত্রের অন্যতর কোনও ব্যক্তিগত উত্তরণ ঘটে না। একটা বিশেষ মূল্যবোধ ও টিপিক্যালিটির বাহক মনে হয় তাঁকে। গল্পমালার বেশিরভাগ গল্পেই এরকম টাইপ চরিত্রের ছড়াছড়ি। তারা এক বিশেষ সময়-পর্বের মাত্র। আর সে কারণেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক বিশেষ সময়ের পদচিহ্ন বুকে নিয়ে আজ কিছুটা আড়ালেই চলে গেছেন।

তবুও, মূল্যবোধ সংকটের কিছু পরিচয় লেখক সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে। প্রথম আবির্ভাবেই হেডমাষ্টারের চেহারার টিপিক্যাল চিহ্নগুলো আমরা নিরুপমের চোখেই দেখে নিই—''দাঁতগুলো শক্ত থাকা সত্ত্বেও গাল দুটো ভাঙা ভাঙা, চোয়াল জেগে উঠেছে। গভীর রেখা পড়েছে কপালে। কালো লম্বাটে মুখখানায় কেমন এক ধরনের করুণ শীর্ণতা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু কালোর চেয়ে সাদা রঙের ভাঁজই চুলে বেশি। হঠাৎ যেন ধাক্কাটা খেলাম। হেডমাষ্টার মশাইও বুড়ো হয়েছেন।'' ছোট ছোট বাক্যে নিপুণ রেখায় এক হেডমাষ্টারের আদত ছবি। এই বর্ণনা একাধারে বাস্তবসম্মত এবং সুপরিচিত।

এই গল্পের এবং হেডমাষ্টারের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং রোমান্টিক কাহিনিটি লগ্ন হয়ে আছে লাবণ্যর সঙ্গে। ব্যাংকের চাকরিতে সদ্য যোগ দেওয়া হেডমাষ্টারের সঙ্গে এক বিকেলে ডালহৌসির মোড়ে নিরুপম শুনেছিল তাঁর সদ্য কৈশোর পেরনো যৌবনের গল্প। তখন অস্ত যাচ্ছে সূর্য—গঙ্গার পাড় ছোঁওয়া পশ্চিমের আলো ঢেকে দিচ্ছে একটি প্রাচীন শহরের জনাকীর্ণ রাজপথ, এখানেও লেখক প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতেই হেডমাষ্টারের প্রেমকে

প্রকাশ করাবার জন্য তাঁর বলিরেখাময় মুখে গোধূলির আলো ফেলে পরিবেশের গায়ে মাখিয়ে দিয়েছেন রোমাণ্টিক ছোঁয়া—"লজ্জায় কি আরক্ত দেখাচ্ছে মাষ্টারমশাইর মুখ, না কি এ রঙ সূর্যাস্তের?" লাবণ্যর সঙ্গে প্রেমের প্রথম পর্বটি সাতাশ বছর আগের ঘটনা। কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার তখন সিটি কলেজের ছাত্র। হস্টেলে থাকে। জিমনাসিয়ামে বারবেলের খেলা দেখায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ক্লাবে ডিবেটিং করে; ফুটবল মাঠে গোলপোস্ট আগলায় বীরের মত। এই বর্ণনা হেডমাষ্টারের চরিত্রের ঋজু ও দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে তারই জেঠতুতো বোনের শ্বশুরবাড়িতে, বোনের ননদ লাবণ্যর পড়াশুনোর ভার পান তিনি। এই লাবণ্যই তাকে বলেছিল—"মাষ্টারির মতন্ এমন মহৎ কাজ আর নেই।" অথচ দুবছর বাদে গৃহিণী লাবণ্য সাগরপুরের গ্রামে কৃষ্ণপ্রসন্নর মাষ্টারির চাকরির কথা উঠলে বেঁকে বসেছিল। সেই থেকেই লাবণ্যের একটা বিরাগ আছে মাষ্টারির প্রতি, পরবর্তীতে দেখি সংকটাপন্ন অবস্থাতেও কৃষ্ণপ্রসন্ন হেডমাষ্টারি ছাড়তে রাজি না হওয়ায় লাবণ্য বলেছিল—"তুমি থাক তোমার হেডমাষ্টারি নিয়ে, আমি চললাম।" কিন্তু একদিন তো এই লাবণ্যের অসুস্থতার খবর পেয়েই কৃষ্ণপ্রসন্ন কলকাতার কলেজে বি.এ. পরীক্ষা না দিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। বাবার ব্যঙ্গাত্মক কথায় কিছুমাত্র দমিত না হয়ে সে বলেছিল—"স্ত্রীর জীবনের চাইতে আমার পরীক্ষা বড় নয়।" তারপর কতবার কলেজ খুলল, বন্ধ হল। কৃষ্ণপ্রসন্নর আর কলকাতায় পরীক্ষা দেওয়া হল না। এতে গ্রামে তার স্ত্রৈণ বদনাম জুটলেও দক্ষিণপাড়ার চৌধুরীরা সাগরপুরে এম ই স্কুল প্রবর্তন করলে। সেখানেই বিনাদ্বিধায় মাষ্টারির কাজ নিলেন। কালক্রমে হয়ে উঠলেন হেডমাষ্টার।

এই লাবণ্যকেই আমরা কলকাতা শহরের বস্তিতে আরেক রূপে দেখব। এখন সে বাস করে কালীঘাটের টিনের চালের বস্তিতে। দেশ ছেড়ে সদ্য তারা কলকাতায় এসেছেন, দারিদ্র্যও এসেছে পিছুপিছু। নিরুপম দেখে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাদের প্রেমে এতটুকু মালিন্য ধরায়নি। মেয়ে গীতাকে দেখে নিরুপমের চোখে ভেসে উঠেছে অতীতের যৌবনময়ী লাবণ্য—যিনি মমতাময়ী, সুহাসিনী, সংসারকাজে নিপুণা, ছাত্র তৈরির কারিগর কৃষ্ণপ্রসন্নর যথার্থ সহচরী—'দীর্ঘ দোহারা চেহারায়, মুখের ডৌলে, নাক চোখের সুন্দর গড়নে ষোল সতের বছর আগেকার আর একটি তরুণী গৃহিণীর কথা মনে পড়ল। জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ করতে করতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত, সলতে আসত নিবু নিবু হয়ে তখন মাষ্টারমশাইর স্ত্রী উঠে এসে বোতল থেকে আমাদের হ্যারিকেনে তেল ঢালতে ঢালতে বলতেন,.......।" —এই লাবণ্য ছিল সাগরপুর গ্রামে অদ্বিতীয়া, নভেলের নায়িকার মতন, এমনকি চৌধুরী বাড়িতেও এমন সুন্দরী বউ ছিল না।

কিন্তু জীবনযুদ্ধের ছাপ আজ সেই তরুণীটিকে কিঞ্চিৎ প্রৌঢ়া করে তুলেছে। তবুও শরীরের অনুজ্জ্বলতা মনের গভীরে কোনও ধূসরতা তৈরি করতে পারেনি। সদ্য ব্যাংকে চাকরি পাওয়া স্বামীকে সে যত্নে মমতায় সাজিয়ে দেয় নিজের হাতে, ধুতি ইস্ত্রি করে দেয়। যে মাষ্টারির কাজকে একদিন লাবণ্য মহৎ কাজ মনে করত, অভাবের তাড়নায়, বাস্তব পরিস্থিতির চাপে সেই সব ছেড়ে, সাগরপুর ছেড়ে, কলকাতায় পাড়ি জমাতে হয়। দেশভাগের এই জ্বলন্ত বাস্তবতার চিত্র আঁকতে নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ কোনও কসরৎ করতে হয়নি।

কেবল ধর্মীয় কারণেই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেও দলে দলে মানুষ সেদিন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে জীবনের খোঁজে ভারতমুখী হচ্ছিল, ভিড় জমাচ্ছিল কলকাতা শহরে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল গ্রামপতনের শব্দ—এতদিনকার পুরনো জীবিকা ছেড়ে মানুষ বৃত্তি বদলের বাধ্যতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছিল। হেডমাস্টারকেও আমরা দেখব মাস্টারি ছেড়ে ব্যাংকের কেরানি পদে যোগ দিতে। সময়টাই ছিল এমনি, জীবনের ছন্দপতনের সময়।

একদিন মাস্টারির আড়ালে কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রেমকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, আর একদিন প্রেমকেই জেতাবেন বলে মাস্টারিকে বেছে নিয়েছিলেন, আর গল্পের শেষের সেদিনে দেখি সবকিছু থেকে আড়াল করে মাস্টারিকেই শেষখেলায় জিতিয়ে দিলেন। এ হল নিরুপমের ভাষায়, 'লুকোচুরি'—এই লুকোচুরি কৃষ্ণপ্রসন্ন আজীবন খেলেছেন প্রেমে ও মাস্টারিতে। গল্পের চাবিকাঠিটা তাই ঐ শব্দটার আড়ালেই রেখে যান লেখক। একজন মাস্টারই ছাত্র গড়েন, মূল্যবোধগুলো চারিত করে দেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্তরে। আর এ কাজ করতে করতে কখন যেন তিনি প্রকাশ্যে অন্তরালে লুকোচুরি খেলতে থাকেন। এই ছলনা নরেন্দ্রনাথের শব্দে-ভাষায় বড় মদিরতায় প্রকাশ পায়। এই মায়া খেলার আড়ালে এক ভীতু হেডমাস্টারের সামাজিক দায়বোধের আণবিক বিশ্বাসও আভূমি বিস্তার পায়।

হেডমাস্টারের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি দীর্ঘ সাতাশ বছরের। এখানেও সমাজ ভাঙনের নানা ছবি এসেছে, গ্রামজীবন, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি এসব নরেন্দ্রনাথ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই পেয়েছিলেন। বিশেষত, ফরিদপুরে থাকাকালীন বালক নরেন্দ্রনাথের তীব্র পর্যবেক্ষণ শক্তির জোরে তার সাহিত্যজীবনের উপাদানগুলো চয়িত হয়েছিল বোঝা যায়। 'গল্পমালা'র বেশিরভাগ গল্পে সেই বাল্যস্মৃতি একটা অনুভবের চাদর বিছিয়ে রেখেছে আদিগন্ত। মনে পড়ে দেশভাগের শিকার হয়ে তাঁকেও একদিন দেশ ছাড়তে হয়েছিল একত্রিশ বছর বয়সে। সেখানে এবং পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্য ছিল তাঁর সঙ্গী। আনন্দবাজারে চাকরি নেবার আগে পর্যন্ত, দারিদ্র্যের জাল দিয়েই তিনি দেখেছিলেন মানবজীবনের অপার রহস্য ও বিচিত্র পরিক্রমা। নরেন্দ্রনাথকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল, জড়াতে হয়েছিল বিচিত্র সব পেশায়, টিউশনিও করতে হয়েছে বহুকাল। যেসব চাকরি তিনি করেছিলেন তা যেমন ছিল কম আয়ের তেমনি অনিশ্চিতির—এসবই যেন হেডমাস্টারের আশঙ্কা ও ভীতি হয়ে ঢুকে পড়েছে এই গল্পে। জীবনের সিংহভাগই তাঁকে বাস করতে হয়েছে অপ্রশস্ত বাসস্থানে। কালীঘাটের টিনের বস্তির জীবন তাঁর অপরিচিত ছিল না। সেইসব অভিজ্ঞতার ধূসর দিনগুলো 'গল্পমালা'র গল্পে গল্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু এত মালিন্যের মধ্যেও তিনি ছিলেন মুক্তোসন্ধানী। খুঁজেছেন সততা, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, আনুগত্য—নানা গুণে ভরা মানুষের অন্তঃকরণের বিশল্যকরণী।

হেডমাস্টারকে আমরা গল্পে প্রথম দেখেছিলাম, নিরুপমের অফিসের ঘরে, যিনি ছাত্রের প্রণামটুকুর অপেক্ষা করেন, আর যাকে প্রণাম করতে গিয়ে ছাত্র নিরুপম ভেবেছিল, নিজের শার্টের সঙ্গে লেগে থাকা টাইটা কেমন করে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল। হেডমাস্টার ছাত্রের কাছে প্রাপ্য প্রণাম সম্পর্কে একটি আদি মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন। আর এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন একটি পুরনো মূল্যবোধের জীবন্ত মিথ। যাঁর চেহারায় সবচেয়ে আকর্ষক যে দিকটি

নিরুপম নিমেষে প্রত্যক্ষ করেছিল—সামনের দুটো দাঁত নেই, আর সেই দন্তহীনতা তাঁকে যেন কিছুটা বাড়তি বার্ধক্য এনে দিয়েছে। এই প্রাক্তন মাষ্টার আজ ছাত্রের কাছে উপস্থিত চাকরিপ্রার্থীরূপে—এতে তাঁর কোনও সংকোচ নেই, হয়ত বা দ্বিধাসংকোচের বিপুল পাহাড় অতিক্রম করেছেন বহু বেদনায়। হয়ত বা অবর্ণনীয় কোনও দুরবস্থা শেষমেশ তাঁকে দোলাচলতার সীমান্ত পার করে দিয়েছে।

ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে দক্ষিণ কলকাতাগামী ট্রামে উঠে নিরুপম শুনে নেয়, মাষ্টারের সাগরপুর অধ্যায়ের অতীত এবং সদ্য অতীতের ইতিবৃত্তান্ত। সেই সুযোগে লেখক গ্রামের স্কুলের কিছু ছবি এঁকে ফেলেন—মমতায়, বোঝা যায় সমকাল, গ্রামের পুরনো সমাজনীতি-অর্থনীতি রূপান্তরণের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এটি দেশের স্বাধীনোত্তর কাল—যখন ধনতান্ত্রিক সমাজের তপ্ত নিঃশ্বাস প্রাচীন সামন্ত সংস্কৃতির ঘাড়ে পড়ছিল। এই পর্বেই আমরা লেখক তথা নিরুপমের সঙ্গে নিত্যনারায়ণ চৌধুরীর বনেদি উঠোনে পা রাখি—ইনিই ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি, তাঁরই বাড়িতে দীর্ঘকাল প্রাইভেট টিউশনি করে সংসার নির্বাহ করেছেন কৃষ্ণপ্রসন্ন, কারণ স্কুলের বেতন ছিল যৎসামান্য। এই বাড়ির তিনপুরুষকে তিনি পড়িয়েছিলেন। কিন্তু দেশভাগ হয়ে গেল, তৈরি হল পূর্ব পাকিস্তান আর দলে দলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পাড়ি জমালেন পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়, বিহারে, এলাহাবাদে। অবশেষে হেডমাষ্টারও। একদিন কৃষ্ণপ্রসন্ন কলকাতা ছেড়ে সাগরপুরের সামান্য মাষ্টার হয়েছিলেন যে মাযায়, তার বন্ধনও কেটে গেল নিরন্নতার দাবদাহে। গ্রামের স্কুলমাষ্টাররা প্রত্যেকেই দ্বিতীয় জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন ততদিনে, কৃষ্ণপ্রসন্ন পারেন নি, তিনি মাষ্টারি ছাড়া আর কীই বা পারেন।

কৃষ্ণপ্রসন্নর ছাত্রদরদের নমুনা আমরা নিরুপমের স্মৃতিচারণাতেই পেয়েছিলাম। সদরদি এবং পরে ফরিদপুরে থাকার সময় নানা বরণের মানুষকে নরেন্দ্রনাথ অলক্ষ্যে দেখেছিলেন, তারাই গল্পে ভিড় করে এসেছিল। তাই অনেক ব্রাত্য চরিত্র, আজলক (নিচু জাতের) মুসলমানদের কথা তাঁর গল্পে পাই। এই গল্পে দেখি নিরুপমের পাঠসঙ্গী মুরুদ্দিনকে, যারা মাষ্টারের বাড়ির একই তক্তাপোষে রাতজেগে পড়াশুনো করত। আর মাষ্টারের স্ত্রী লাবণ্য তাদের জন্য উপুড় করে দিতেন মাতৃস্নেহের অপার ধাবা।

যদিও কোনও দৃঢ় যুক্তি অন্তত গল্পে নেই, কেন মাষ্টারি করতে হেডমাষ্টারের এত গ্লানি জন্মাল। একটি কারণ সম্ভবত দারিদ্র্য। কিন্তু পেশাটার প্রতি তাঁর এত কঠিন মনোভাব কেন? বেশ কয়েকবার তিনি এই বিতৃষ্ণার কথা বলেছেন নিরুপমকে। কালীঘাটের বস্তির ঘরে বসে তিনি বলেছিলেন—"না নিরুপম, আর মাষ্টারি নয়। না খেয়ে মরবো, তবু মাষ্টারি আর জীবনে করব না। কেরাণীগিরি থেকে কুলিগির যা বল করতে রাজী আছি। কিন্তু মাষ্টারি আর নয়। সাতাশ বছর ধবে মাষ্টারি করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।"—আসলে এই গ্লানি তাঁর অন্তরের সত্য নয়, মুখে তিনি নিরুপমকে যাই-ই বলুন, মাষ্টারি করতে তাঁর ভালই লাগে, মাষ্টারি করার স্বভাব তাঁর অবচেতনের সত্তার শিকড়ে চারিয়ে গেছে। অথবা, লেখক গল্পের শেষের চমকটুকু প্রত্যাশামত নির্ণীত করবেন বলেই হয়ত, মাষ্টারির প্রতি অনীহার মনোভাবকে জোরালো করতে চেয়েছেন। এটি লেখকের প্রাক্-নির্ধারিত চরিত্র কল্পনার চিহ্ন। কিন্তু লাবণ্য তো তাঁর স্বামীকে ঠিকই চিনেছিলেন—তাই

ব্যাংকের চাকরির খবর নিয়ে নিরুপমের সেই বস্তির ঘরে পুনরাবির্ভাব ঘটলে লাবণ্য গরীব মাষ্টারমশাইর বাসায় একটু সুজি খেয়ে যাবার নেমন্তন্ন করেন, ভাবী ব্যাংকের করণিক কৃষ্ণপ্রসন্ন বিরক্তিতে বলে ওঠেন—"মাষ্টারি ছেড়ে দিলাম, তবু মাষ্টার মাষ্টার করা ছাড়লে না তোমরা।" তিনি যে আদতে এক জন্মমাষ্টার গল্পের শেষে তা আমরা মিলিয়ে নিই, মাষ্টার কেবল নিরুপমের নয়, কানাইয়ের নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও।

হেডমাষ্টারের মিথটা সাময়িকভাবে ধূসর হয়ে যায়, কৃষ্ণপ্রসন্নর জীবনের তৃতীয়পর্বে এসে। মাষ্টার সংক্রান্ত মূল্যবোধও চ্যালেঞ্জড হয়ে পড়ে এই পর্বের প্রথমাংশেই। নিরুপমের সৌজন্যে ব্যাংকে তাঁকে উঁচুপদের কাজই দেওয়া হয়। একদিন তিনি লাবণ্যর জন্যই বি এ পরীক্ষা না দিয়ে গ্রামের হেডমাষ্টার হয়ে থেকে যান, আর লাবণ্যর সুখের জন্যই আজ ধোপদুরস্ত পোশাকে ব্যাংকে হাজির হন, প্রয়োজনে তিনি কোট-টাইও পরতে পারেন—'ইস্ত্রি করা সাদা পাঞ্জাবীতে কালো বোতাম লাগানো। ঝুলন্ত কোঁচাটা নিপুণ হাতে কোঁচানো, পায়ের পামশুটা পুরনো হলেও সদ্য পালিশে চক্‌চক্ করছে। গোঁফ-দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো।" অচিরাৎ বোঝা যায় শরীর থেকে তিনি মাষ্টারির গন্ধ মুছে ফেলতে চাইলেও মনের গহনে তিনি মাষ্টারই রয়ে গেছেন।

ব্যাংকে যোগ দেবার সাতদিন যেতে না যেতেই রাশি রাশি অভিযোগ জমা হতে থাকে নিরুপমের কাছে। প্রথমে আসেন ক্লিয়ারিং অফিসার পরিমলবাবু, তিনি অভিযোগ জানান, মাষ্টার ছোকরা কর্মচারীদের সামনে ইংরাজির ভুল ধরেন, অশ্লীল আলোচনায় বাদ সাধেন। কৃষ্ণপ্রসন্নকে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন সব যুক্তি পাড়েন যে নিরুপম বিরোধ এড়াতে তাঁকে বিল ডিপার্টমেণ্টে বদলি করে দেন। সেখান থেকে অভিযোগ আসে আরও দ্রুত। বাধ্য হয়ে আবার স্থানান্তরণ। এবার কিছুটা ভয়ার্ত স্বর পাই হেডমাষ্টারের গলায়—"না বাবা দোহাই তোমার, চাকরি টাকরির যেন কোন গোলমাল না হয়।...আচ্ছা আমিও না হয় তার কাছে ক্ষমা চাইব।" বিপন্ন কৃষ্ণপ্রসন্নর ছিন্নমূল সত্তা মাষ্টার কৃষ্ণপ্রসন্নকে ছাপিয়ে ওঠে, কিন্তু এত বিপন্নতাও শেষপর্যন্ত তার অবচেতনের অভীপ্সাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

একে একে সব ডিপার্টমেণ্ট মাষ্টারের ঘোরা হয়ে যায়, লেজার, লোন, ফিক্সড ডিপোজিট, একাউন্টস, ডেসপ্যাচ—কৃষ্ণপ্রসন্ন সবার ওপর মাষ্টারি ফলাবার নেশা ছাড়তে পারেন না; শেষের দিকে নিরুপমের প্রতি তার অভিমানাহত স্বর ফুটে উঠছিল—"বারবার তুমি আমারই দোষ দেখ নিরুপম। শাস্তি দিয়ে আমাকেই সরাচ্ছ।" অবশেষে নিরুপায় নিরুপম তাকে বেয়ারাদের দেখাশোনার ভার দেন। পদমর্যাদার দিক থেকে এটি তার অবনমন হলেও, নিরুপমের প্রতি কোনও বিদ্বেষ বর্ষিত হবার বদলে, অভিমান ও অপমানের যুগল মিলনে এক অদ্ভুত বিষাদ ঘনিয়ে আসে তার মুখে, নীরবে নিষ্ক্রান্ত হন নিরুপমের ঘর থেকে।

প্রথমদিকে বেয়ারারা কৃষ্ণপ্রসন্নর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিল, তিনি বড় বেশি খুঁতখুঁতে; এমনকি হাজিরা সম্পর্কেও তাঁর ভারি কড়া মনোভাব। কিছুদিন যেতে না যেতে পরিস্থিতিটা উল্টো সুরে বেজে উঠল। এবার অভিযোগ এল অন্যান্যদের কাছ থেকে—কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু বেয়ারাদের হয়ে অন্যদের কাছে সালিশি করছেন, তিনি নাকি বেয়ারাদের আস্কারা দিয়ে

মাথায় তুলছেন। ছুটির শেষে তড়িঘড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদে নিরুপম দেরাজের চাবি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল, ততক্ষণে অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে, পুনরায় দেরাজ বন্ধ করে ফেরবার পথে অফিসের দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে আলো দেখে থমকে দাঁড়ায় নিরুপম। ক্রমে সে আবিষ্কার করে, মাষ্টারমশাই কাদের যেন স্বাধীনতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বোঝাচ্ছেন। ক্রুদ্ধ হবার বদলে নিরুপম বিস্মিত হয়ে দেখে, তার সাগরপুরের মাষ্টার আজ সমাজের নিচুতলার কতকগুলো অবহেলিত মানুষের মাষ্টারে উত্তীর্ণ হয়েছেন। চোখে তীব্র ঔজ্জ্বল্য জাগিয়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন নিরুপমকে বলেন—কানাইকে কিভাবে শিক্ষা দিলে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট করে তোলা যায়। কিন্তু তিনি চান না না একথা লাবণ্যর কানে উঠুক—একটা আড়ালের কথা বলেন—নিরুপমের ভাষায় 'লুকোচুরি'। একদিন তিনি লাবণ্যর প্রেমকে মর্যাদা দেবার জন্য মাষ্টার হয়েছিলেন, আজ তিনি মাষ্টারির প্রেমকে মর্যাদা দেবার জন্য লাবণ্যর কাছেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান। নরেন্দ্রনাথ মিত্র একবার বলেছিলেন—"নিজের স্বভাবকে মেনে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি প্রবণতাকে মেনে নিয়ে আমি সারাজীবন শুধু ভালবাসার গল্পই লিখেছি।" (১৩৮২ বৈশাখ, 'গল্প লেখার গল্প' শীর্ষক বেতার কথিকা)। হেডমাষ্টারের প্রথম প্রেম লাবণ্য, দ্বিতীয় প্রেম মাষ্টারি—আর এই দ্বিতীয়টির ভিত্তিভূমি জীবনের উপান্তে এসে তার চরিত্রের উজ্জ্বলতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়ে যায়।

চল্লিশের বিপর্যস্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন শুরু। আধুনিকতার হাত ধরে আসা মানবতাবাদের দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। একাকী, অসফল, বেদনার্ত, অপমানিত, নীরব মানুষের প্রতি তাঁর সহজ পক্ষপাতিত্ব ছিল, আর এই পক্ষপাতের কারণেই তাঁর গল্পের ভাষা আপাত সহজ-সরল, সাদামাটা, নিরলঙ্কার, সংলাপপ্রধান হয়েও কিন্তু ভীষণ উষ্ণ, আন্তরিক, সমবেদনাপূর্ণ। বাইরের অলঙ্কারহীনতা তাঁর অন্তরের দর্শনকে চাপা দিতে পারেনি। গল্পের পরতে পরতে হঠাৎ হঠাৎ ঠিক্‌রে বেরিয়ে এসেছে সেই বাউল দর্শন। গ্রামারে এখনও পুরনো মিসটেক হয় কিনা কৃষ্ণপ্রসন্নর এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুপম মনে মনে ভেবেছে—'ভাষার গ্রামারের কথা জানি না, জীবনের গ্রামারে এখনো যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি হয়।"

নরেন্দ্রনাথ 'ধ্বনি' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"যেখানে আমরা মহৎ, শক্তিমান সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পরিচয় আছে।" হেডমাষ্টারের যথার্থ পরিচয় মাষ্টারিতে, সমস্ত দীনতাকে ছাপিয়ে ওঠেন সেই জায়গাটায়। এর বাইরে তার যে মানুষ হিসেবে অন্যতর পরিচয়ও থাকে, গল্পে সেই শূন্যস্থানটুকু ভরাট হয় না। সাগরপুরের স্কুলে তিনি কেবলমাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন, কলকাতায় এসে তার জীবনের পরিধিটা বহুদূর প্রসারিত হয়ে যায়। একটা ছক ভেঙেও তিনি লেখকের অভিপ্রায়ে শেষপর্যন্ত আবার একটা ছকেই বন্দী হয়ে গেলেন। সাগরপুরে নিত্যনারায়ণ চৌধুরীর নাতনি বলেছিল "কেন দাদু, সরকারকাকা রইলেন, দারোয়ান মন বাহাদুর রইল, ঝি রইল, মাষ্টারমশাই তাদেরই তো পড়াতে পারবেন।" কৃষ্ণপ্রসন্ন স্কুলমাষ্টারি ঘুচিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রের মাষ্টারে পরিণত হলেন—এও একধরনের উত্তরণ, তবে সে উত্তরণে অপার বিস্ময়ের উড়াল নেই। এই-ই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সীমাবদ্ধতা ও সিদ্ধি।

চড়াই-উৎরাই : অভিজ্ঞতার উচ্চাবচতা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চড়াই-উৎরাই' গল্পটা পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা ভুল চোখে পড়ল। সতর্ক পাঠক মাত্রই ভুলটা লক্ষ করে থাকবেন। গল্পটা শুরু হচ্ছে দু-খানা চিঠির প্রসঙ্গ দিয়ে। সকালের ডাকে দুটো চিঠি এসে পৌঁছালো কল্যাণের হাতে। একখানা এনভেলাপ আর একখানা কাঁঠালী চাঁপা রঙের বড় লেফাফা। এনভেলাপ ও লেফাফা—অর্থাৎ দুটো চিঠিই খামে ভরা—অপ্রকাশ্য, অজানা। কিন্তু গল্প এগোনোর কিছু পরে একখানা এনভেলাপ হয়ে গেলো পোস্টকার্ড। যা ছিল আবৃত ও অপ্রকাশ্য তাই হয়ে উঠল দিবালোকের মত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গোপনতাহীন। নরেন্দ্রনাথের মত জাত শিল্পীর হাতে এই এনভেলাপের পোস্টকার্ডে রূপান্তরণ জাতীয় ভুল ক্ষমার্হ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে; কিন্তু এই ভুলটাই যেন গল্পের অনেক সত্যকে ব্যক্ত করে দিল। গল্প কোন্ পথে এগোবে তারও যেন একটা আভাস পাওয়া গেল এই ভুলের মধ্যে দিয়ে। আমাদের জীবনের প্রতিটা অভিজ্ঞতাই তো এক একটা খোলা চিঠির মত—যা হয়তো এতদিন চাপা পড়ে ছিল খামের আড়ালে। কিন্তু হঠাৎই কোনো এক মুহূর্তকে আশ্রয় করে কিংবা কোনো এক ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রকাশ্য হয়ে পড়ল সব কিছু। ঠিক যেমনটা হল এই গল্পের নায়ক কল্যাণের কাছে। দুটি চিঠির সূত্রে জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কল্যাণ পৌঁছালো অভিজ্ঞতার সেই চূড়ায় যেখানে কিছু মানুষের স্বরূপ প্রচ্ছদবিহীন গ্রন্থের বর্ণমালার মতই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সকালের ডাকে দুটো চিঠি পেয়েছিল কল্যাণ। দুটোর মধ্যে একটায় ছিল শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ। সহপাঠী অসিতের বিয়ে। হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার পরেশ মজুমদারের ছেলে অসিত একদা কল্যাণের সহপাঠী ছিল। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ অসিতও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কলেজে পড়ার সময় অসিতের সঙ্গে কল্যাণের ঘনিষ্ঠতা ছিল অল্পস্বল্প। তারপর বহুকাল ছাড়াছাড়ি। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাড়িওলার টাইটেল স্যুটের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল অসিতের সঙ্গে। চেনবার কথা না থাকলেও কল্যাণকে চিনে ফেলেছিল অসিত। বহুদিন পর দেখা। তবু সেদিনের সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনে অসিতের তরফ থেকে আন্তরিকতার সামান্যতম অভাবও ছিল না। বন্ধুর সাহিত্যচর্চার কথা সে কলেজ জীবন থেকেই জানতো। সুতরাং আবদার। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু একটা লিখে দিতে হবে; তবে কবিতায় নয়, একেলে মানুষের ভাষা গদ্যে। কল্যাণের চট করে কোনো জিনিস লেখার অভ্যাস না থাকলেও বন্ধুকৃত্য করতে যেমন তেমন করে দু-চার-ছত্র লিখে দিয়েছিল। সেদিনই সে জেনেছিল অসিতের বিয়ে। মৌখিক নিমন্ত্রণও পেয়েছিল অসিতের কাছ থেকে। তাই যেদিন কাঁঠালী চাঁপা রঙের 'শুভবিবাহ' লেখা খামটা এসে পৌঁছালো, সেদিন সেই নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তির মধ্যে ছিল না কোনো চমক। বিবাহের সেই সংবাদে অপ্রত্যাশিতও ছিল না কোনো কিছু। তবু কল্যাণকে বিবাহানুষ্ঠানে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো তার জন্য বোধ হয় কখনই সে প্রস্তুত ছিল না। জীবনপথের বন্ধুর যাত্রা মানুষকে যে কতটা

বেসামাল করে দেয়, তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে কেমন করে চেনা মানুষও গিরগিটির মত রঙ বদলিয়ে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ তা সেদিন জেনেছিল কল্যাণ। কিন্তু 'চড়াই-উৎরাই' গল্পটা তো শুধু একটা চিঠির নয়, এখানে আছে আর একটা চিঠির প্রসঙ্গ; যার মালিক কল্যাণের স্ত্রী ইন্দিরা। চিঠিটা লিখেছে কল্যাণের পিসতুতো ভাইয়ের শালী মল্লিকা। মল্লিকা বিয়ে করেছিল ইন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের (নাকি জেঠতুতো ভাইয়ের? কারণ গল্পে দুটোই আছে।) সম্বন্ধীকে। সুতরাং দুই তরফ থেকেই আত্মীয়তার একটা ক্ষীণ সূত্র ছিল। মল্লিকা পাঠিয়েছিল নিতান্ত সাদামাটা গতানুগতিক একখানা চিঠি। নিছকই কুশল জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত সংবাদ জানানোই ছিল সেটার উদ্দেশ্য। চিঠিটা অকিঞ্চিৎকর হলেও গল্পের শেষে প্রথমটার মত এই চিঠিও মহামূল্যবান হয়ে উঠল। যদিও এই গল্পে চিঠি নিছকই গৌরচন্দ্রিকা, তবু মূলপালায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এই গৌরচন্দ্রিকারও আছে বিশেষ ভূমিকা। তাই চিঠির সূত্রে আমরা যখন মূল গল্পে প্রবেশ করি তখন একটা বিষয় জলের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের সকল অভিজ্ঞতাই সমানায়তনিক নয়, তারও আছে নানা উচ্চাবচতা ও নানা অম্লমাধুর্য। এই সবের আস্বাদ নিতে নিতেই তো জীবনের দিগন্ত প্রসারিত হয়, অভিজ্ঞতার ঝুলি ক্রমশই পূর্ণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত 'চড়াই-উৎরাই' তাই হয়ে ওঠে কল্যাণের অভিজ্ঞতার উপাখ্যান।

বন্ধুকৃত্য করতে ফুলশয্যার দিন খান দুই স্বরচিত বই, একখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলি ও একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিয়ে কল্যাণ পৌঁছালো অসিতদের সদানন্দ রোডের তেতলা বাড়িতে। বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে অসিতের তরফ থেকে আপাত আতিথ্যের কোনো ত্রুটি ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়, হাসিঠাট্টা সবকিছুই চলেছিল স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু এত ঐশ্বর্য-আভিজাত্য ও আধুনিকতার মাঝে কোথায় যেন সুর কেটে যাচ্ছিল। এমন এক বড়লোকের পার্টির আয়োজনে কল্যাণের মত সামান্য এক লেখক যে নিতান্ত বেমানান তা অসিতের বাবা পরেশবাবুর আচরণে টের পেয়েছিল কল্যাণ। তার মত লেখকের সংবেদনশীল মন এটা বুঝেছিল যে খাওয়ার ব্যাপারে পরেশবাবু মুখে যতই বলুন, 'নিন নিন, সংকোচ কিসের অত!' কিন্তু একটু যেন বিরক্তির আভাস ছিল তাঁর গলায়। অসিতও বুঝেছিল লুচিমণ্ডা খেয়ে অভ্যস্ত কল্যাণের আইসক্রীম আর কফিতে পেট ভরেনি। কিন্তু বন্ধুর জন্যে বন্ধুর এই উপলব্ধিতে আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও কি ছিল? কারণ মুখে সে যতই বলুক বাবার মত অসিতও ছোটবেলা থেকে পার্টি-কালচারে অভ্যস্ত ছিল। তাই যে কোনো ভূরিভোজনের অনুষ্ঠানে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ভালবাসতো। তবু এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। তার ছিঁড়ে তানপুরা সম্পূর্ণ বেসুরো হয়ে গেলো যখন দয়া-পরবশ হয়ে অসিত দু-টাকার একটা নোট কল্যাণের ঝুল পকেটে ফেলে দিল। বাড়ি ফেরার রিক্সাভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে ঝাঁ-চকচকে আত্মম্ভরিতাটাকে অসিত এতই নগ্ন করে দিল যে তার বিবাহানুষ্ঠানকে ঘিরে গড়ে ওঠা রঙিন স্বপ্নটা কল্যাণের কাছে মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেলো। মানুষের আত্মসম্মান নিয়ে মানুষের এই ছিনিমিনি খেলা নাটকের দর্শক হয়ে কল্যাণ শুধু হতভম্ব হল না, বিষিয়ে গেলো মনটাও। চেনা মানুষকে অচেনা করে পাওয়ার এই উপলব্ধিটাকেই নবেন্দ্রনাথ ধরতে চেয়েছেন গল্পের ক্যানভাসে।

কিন্তু মানুষের সব অভিজ্ঞতাই তো আর তিক্ত নয়, কখনো কখনো সেখানে মাধুর্যেরও কিছু মূল্য আছে। জীবনের যাত্রাপথে 'চড়াই-উৎরাই' দুটোই সত্য। সদানন্দ রোডের বিয়েবাড়ি থেকে যে অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে বেরিয়ে এলো কল্যাণ তা ক্ষণিকের জন্যে হলেও কেমন করে যেন মুছে দিল পূর্ব প্রণয়ী মল্লিকা। সঘন-গহন-অন্ধকারের পরে মল্লিকা যেন এক চিলতে আলো। সেই মল্লিকা, ইন্দিরাকে বিয়ের পর যাকে ভুলেই গিয়েছিল কল্যাণ। বহুদিন পরে ইন্দিরাকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিঠিই তো জাগিয়ে দিল স্মৃতি। গৃহশিক্ষক হিসাবে পড়াতে গিয়ে একদিন যে ছাত্রীর সঙ্গে হৃদয়-বিনিময় হয়েছিল, ঘরে তাকে বধূ করে আনা যায়নি ঠিকই, তবু তো মল্লিকা মল্লিকাফুলের মতই সৌরভময়। তাই দীর্ঘ ব্যবধানের পর ক্ষণিকের সাক্ষাতেও আতিথ্যের কোনো ত্রুটি ছিল না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ মল্লিকা। স্বামীর সামান্য কম্পোজিটারীর চাকরি। অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতই অবস্থা। তবু সেদিন অর্ধভুক্ত কল্যাণের সামনে পরম যত্নে সে সাজিয়ে দিয়েছিল লুচি আর মিষ্টির প্লেট। ভালো লেগেছিল কল্যাণের। অন্তত অসিতদের সঙ্গে তুলনায় মল্লিকার আতিথ্যে ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিল সে। কিন্তু ছবিটা হঠাৎই বদলে গেল গল্পের শেষে পৌঁছে। ক্ষণিক সাক্ষাতের পরে কল্যাণের যখন ফিরে আসার পালা তখন দোরগোড়ায় পৌঁছে হঠাৎই মল্লিকার দুই ছেলেমেয়ে চেপে ধরল তার হাত। বলল, 'কাকাবাবু বাঃ দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছেন। পয়সা দিলেন না।' পয়সা দেওয়ার প্রত্যাশায় না থেকে সযত্নে কল্যাণের ঝুল পাঞ্জাবীর পকেটে দুই ভাইবোন বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত। তুলে নিয়েছিল অসিতের করুণার দান দু-টাকার নোটখানা ও আনা দুই খুচরো পয়সা। ননী-ময়নার এ আচরণ অস্বাভাবিক নয়। ছোট ছেলেমেয়ে হিসাবে পিতৃতুল্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে এ প্রত্যাশাটুকু থাকতেই পারে। কিন্তু ননীর হাত থেকে টাকা দুটো কেড়ে নিয়ে যখন আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখল মল্লিকা এবং আনন্দে চকচকে হয়ে উঠল তার দুটো চোখ তখন হঠাৎ করেই যেন চেনা মল্লিকা অচেনা হয়ে গেল কল্যাণের কাছে। আতিথ্য-আন্তরিকতা ও যত্নে যে উপলব্ধির মিনারটা গড়ে তুলেছিল মল্লিকা, নিজের হাতেই যেন সেটা সে এক লহমায় ভেঙে দিল। বিয়ের পর মল্লিকা যে কতটা লোভী ও বৈষয়িক হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি কল্যাণের। অভাবই তো মানুষের স্বভাব নষ্ট করে। সেখানে সৌজন্য-শালীনতা কোনো কিছুরই মূল্য থাকে না। সংসারের দারিদ্র্যই মল্লিকাকে করেছিল লোভী। তাই ছেলের হাত থেকে টাকা দুটো কেড়ে নিয়েও সে তা তুলে দিতে পারেনি কল্যাণের হাতে; অন্তত কল্যাণকে আতিথ্য করার বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের মুড়ি-মুড়কির খরচটা তো জোগাড় করা গেলো!

প্রথম অভিজ্ঞতার পর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার আঘাতটা বড় বেশি করে বাজল কল্যাণের বুকে। মল্লিকার ধারণা হয়েছিল লেখালিখি করে কল্যাণের এখন ভালোই রোজগার। মল্লিকার প্রশ্নের উত্তর কল্যাণ নেতিবাচক ভঙ্গিতে দিলেও কথাটা বিশ্বাস করেনি মল্লিকা। বলেছিল, 'আহা বললে বুঝি সব আমি কেড়ে রাখব না? ভয় নেই, তা আমি রাখতে পারব না, তা আপনি দিতেও পারবেন না। কিন্তু দু-একটা নাইট সিনেমা দেখাতে তো পারেন? মনে আছে, সেই কতকাল আগে একবার একসঙ্গে—আসবেন একদিন? ওঁর তো আর সময় হয় না।' কল্যাণকে উদ্দেশ্য করে মল্লিকার এই সংলাপ কি নিতান্তই ইচ্ছাপূরণ? নাকি পুরোনো

দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার একান্ত আগ্রহ? হলেও হতে পারে। তবু মনে হয় এই সংলাপে যতীশের বউ মল্লিকার বৈষয়িক মনোবৃত্তিটাই বেশি করে লুকানো ছিল; যা সে আগেই প্রকট করে তুলেছিল খুঁটে টাকা বেঁধে রাখার ঘটনায়। অভাব আর দারিদ্র্যের সংসারে কবেই হারিয়ে গেছে প্রেমের সৌরভ। মল্লিকা জানতো যে দিন গেছে চলে তা নিছকই অতীতের কঙ্কাল। তাকে জাগিয়ে তোলার আয়োজন যতই থাক তাতে আর কখনই প্রাণ সঞ্চারিত হবে না। পুরোনো প্রেম, রোমান্টিকতা এ সব তো কেবলই স্মৃতি। তবু মাঝে মাঝে প্রাত্যহিক দিনযাপনের গ্লানি মুছে ফেলে কোন্ মানুষ না স্বপ্নের অলিন্দে এসে দাঁড়াতে ভালোবাসে। সিনেমার রঙিন জগৎ তো সেই নিভন্ত স্বপ্নকেই উসকে দেয়। সামান্য মাইনের চাকুরে স্বামী যে স্বপ্নের আস্বাদ দিতে ব্যর্থ, পূর্বপ্রণয়ীকে দিয়ে তা-ই যদি একদিনের জন্যে পূরণ করে নেওয়া যায় মন্দ কী? এখন আর এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা কল্যাণের কাছে মল্লিকা করেও না—করেওনি। সুতরাং পোড়-খাওয়া মল্লিকার শেষের আচরণেও প্রকাশ পায় সেই বৈষয়িকতা ও হিসেবী মনোবৃত্তি যা নিমেষের মধ্যে মল্লিকা সম্পর্কে কল্যাণের ধারণাটাই বদলে দেয়। গল্পের শেষে এসে সূচনার দুটো চিঠির অন্তর্নিহিত অর্থ এক হয়ে যায় তার কাছে। সে বুঝতে পারে দারিদ্র্য, লোভ ও কৃত্রিমতায় আক্রান্ত আজকের সমাজে সব অভিজ্ঞতাই হল চড়াই-উৎরাইয়ের সংকর। এখানে অবিমিশ্র ভালো বলে সত্যই কিছু নেই। যা আপাতভাবে ভালো পবিণামে হয়তো তা-ই ভয়ঙ্কর রকম খারাপ। অসিত ও মল্লিকা—দুটো অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত কল্যাণকে এক অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যেন মনে হয় আমাদের এই জটিল জীবনে আলো নয়, অন্ধকারই হল শেষ কথা।

সেতার : জীবনের সত্যসংগীত

শম্পা ভট্টাচার্য (বসু)

খাঁচার পাখি ছিল নীলিমা। খোলা আকাশের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ পেল স্বামী সুবিমলের অসুস্থতার সূত্রে। অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে ঘরে ফিরিয়ে আনার ঐকান্তিক আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় যে নারী ডানা মেলেছিল খোলা আকাশটিতে, সেই পাখীই কখন যেন বিস্তৃত আকাশপটে খুঁজে পেল প্রাণের আনন্দ। মনের আরাম। সেতার বাজানো-শেখানোর মধ্য দিয়ে প্রাণের মুক্তির এই যে নভোচারী ঊর্ধ্বগমন উল্লাস তা শেষ পর্যন্ত একদিন সীমায়িত হয়ে যায় স্বামীর ঐকান্তিক কামনার কাছে। কর্তব্য না খ্যাতি—কোন্‌টি নির্বাচন করবে সে? সব দ্বিধা ঘুচিয়ে স্বামীর আহ্বানে সাড়া এবং বহির্জগতের ডাক উপেক্ষা করে নিজের সীমানায় বদ্ধ হয়ে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে কাহিনীটির সমাপ্তি। গল্পের শেষে অনুরণিত হয় একটি 'হৃদয়বেদনা'। সেতারের তারে তা মিলেমিশে যায়। জলসায় যেতে পারে না সে। স্বামীর আবদারে তার কাছেই বসে থাকে, বাজায সেতাব। কিন্তু লেখকের প্রশ্ন—'কিন্তু তার এই থাকাটাই কি পুরোপুরি থাকা'?

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'সেতার'। 'গল্প লেখার গল্প' অংশে ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র উল্লেখ করেছিলেন—'বাস্তব আর কল্পনার মিলনে লেখা গল্পগুলো 'আমারই জীবনবৃত্ত'। যে কোনো গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে লেখকের মানস-মনন এবং সেই সঙ্গে সমকালীন যুগচিত্রণের একটি অবয়ব। তিনি বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচিত এক কথাশিল্পী—ব্যক্তি স্বভাবে সমুজ্জ্বল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালের লেখক হয়েও তিনি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র।

'ধ্বনি' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের লেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন—"সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি।...কিন্তু সমাজজীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। যেখানে আমরা মহৎ, শক্তিমান, সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পবিচয় আছে।" তাই 'চড়াই-উৎরাই' 'চোর' 'মহাশ্বেতা' 'রস' প্রভৃতি গল্পে সমস্যার ছায়াপাত থাকলেও তা জীবনভারে দুর্বহ নয়। জীবনরহস্যের চকিত দীপ্তি তাঁর গল্পকে করে তোলে উপভোগ্য ও ব্যঞ্জনাবাহী।

১৯৪৬ সাল নানা দিক দিয়েই উত্তপ্ত এবং সময়ের স্রোত তখন অস্থির। যুদ্ধ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চারিদিকে আর্থনীতিক বিপর্যয়, কালোবাজার, সমাজে ও পরিবারে ভাঙনের অনিবার্য নিয়তি। যুদ্ধ-ক্লান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শেষ মরণকামড়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের দাবি এবং তার প্রতিবাদে দুই ভিন্ন কণ্ঠস্বরের মুখর আলোড়ন। সচেতন হচ্ছে সবাই-চারিদিক উত্তপ্ত। কিন্তু পঙ্কিলতার আবর্তে মগ্ন হয়েও নরেন্দ্রনাথ মিত্র কালিমায় কালো করেননি তাঁর পাখাকে। খুব সহজেই জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই বিধৃত করেছেন গভীর জীবনের গহন সুর। মহত্তর ভাবনার ইমারত নির্মিত হয়ে তাঁর চেতনা স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশিত।

'সেতার' গল্পের পটভূমিকায় আছে একটি স্বচ্ছলতাহীন মধ্যবিত্ত পরিবার, যেখানে সুবিমলের স্ত্রী নীলিমা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং সে সংসার সুবিমলের 'থাইসিস' নামক ক্ষয় রোগের ফলে ক্রমশঃ হয়ে পড়ছে অচল, সেখানে স্ত্রীকেই বেছে নিতে হয় সংসারে গতি আনার সূত্রটিকে। সুতরাং প্রথমে অনুনয়; গান শিখিয়ে টাকা রোজগারের। সুবিমলের ক্ষীণ আপত্তি; কারণও খুব সহজ—এক, রক্ষণশীলতা। দুই, নিজের আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু সংসার তো চলনশীল অথচ অচল হয়ে পড়ার মুখে। তাই অর্থসাহায্যের সমস্ত উৎস যখন বন্ধ হবার মুখে, সংসারে ছটি ভাইবোন বোঝাস্বরূপ, তখন বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয় স্ত্রীর এই আব্দার। দাম্পত্যপ্রেমের গভীরতায় সুবিমল নীলিমার শরীর ভেঙে যাওয়ার ভয় পায়, তবে নীলিমা ভয় পায় না। আসলে অন্তরের বাঁধনে দৃঢ় দুজনেই, সুবিমল বলে—'তোমার শরীরের জন্য ভাবব না, তোমার মনের জন্য ভাবব না। তবে ভাবব আর পৃথিবীতে কিসের জন্য?' কালীমোহন আর্দ্র কণ্ঠে বলেন—'নিতান্ত দূরদৃষ্টি না হলে কুললক্ষ্মী তুমি, তোমাকে আজ বেরোতে হয় টাকার চেষ্টায়।' ভবানীপুর থেকে কালীঘাট—এই কটা স্টপেজের দূরত্বে নীলিমা গান শেখাতে বেরোলে বিচলিত কণ্ঠে তিনি বলেন—'খুব দেখে শুনে সাবধান মত চল মা।' নীলিমার পায়ের পুরোনো স্যাণ্ডাল, পরনে অনেক কাল আগের ফিকে হয়ে যাওয়া শাড়ী থেকে স্পষ্টতই ফুটে ওঠে আর্থিক অনটনের ছবি।

যে বাড়ীতে গান শেখাতে যায় নীলিমা, তারা অবস্থাপন্ন সুখী পরিবার। গৃহকর্ত্রী কাত্যায়নী, গৃহকর্তা রায়সাহেব, তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিলেও বার বার মনে করিয়ে দেন, সুবিমল 'রাজা-রাজড়াদের ব্যাধি'তে আক্রান্ত, "নীলিমার গুণের চেয়ে, তার প্রয়োজন, স্বামীর অর্থসাহায্যের কথাই যে ওঁরা বেশী করে বিবেচনা করেছেন একথা নীলিমাও বুঝল, ওঁরাও বুঝিয়ে দিলেন।" কিন্তু যার চরিত্রে আছে সততা, স্বামীকে সুস্থ করে তোলার ঐকান্তিক আগ্রহ, তার 'কিসের দৈন্য, কিসের ক্লেশ?" সুতরাং 'সখ নয়, আনন্দ নয়, প্রয়োজন আর পেশা' অথবা 'স্বামীর হাসপাতালের খরচ তাকে সংগ্রহ করতেই হবে"—দরিদ্র হলেও স্বামীর প্রতি ভালোবাসার ভাব কোথাও শিথিল তাই নিজে ভিক্ষাবৃত্তির পথকে শ্রেয় বলে মনে করেছে, স্বামীকে ভিক্ষা গ্রহণ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে।

শুরু হয় তার সংগীত সাধনা। নিজেকে নতুন করে তৈরি করার এক অদম্য বাসনা তাকে কঠোর সংগ্রামে ব্রতী করে। মনোরমা বিরক্ত হন তার গলা সাধায়, নীলিমা ব্যথিত হয়। কিন্তু স্বামীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেব সংগীতচর্চার সমর্থন চায়। এরপর ঘটনার দ্রুত বিস্তার, পুরন্দরের বাড়িতে গিয়েই আবার নিজেকে আবিষ্কার করে নীলিমা, হাতে তুলে নিতে চায় সেতার। ওস্তাদজী নারায়ণ ত্রিবেদীর কাছে সেতার শেখার প্রস্তাব দেন পুরন্দর। পুরন্দরের কাছে সেতার শিল্পবিলাসের মাধ্যম, কিন্তু নীলিমার কাছে তা অর্থ উপার্জনের অন্যতম পথ। স্বামী চিন্তায় বিভোর কিন্তু নীলিমা। কারণ স্বামীকে 'চেঞ্জে' নিয়ে যেতে হবে। সে ভাবে 'সেতারের টিউশনিতে শুনেছি টাকাও বেশি পাওয়া যায়।' পুরন্দর তার টাকার ভাবনা শুনে দুঃখ পায়, নীলিমা ভাবে টাকার কথা—'তার মনে না থাকলে চলবে কি করে?'

গান শেখাতে গিয়ে যেদিন সেতারে হাত দিয়ে ঝংকার তুলল নীলিমা তার সামনে

আবিষ্কৃত হল এক নতুন জগৎ—"তার চেয়েও বেশি ঝংকার লাগল নীলিমার, হৃদয়ে।" অবশেষে সেতার শেখার ব্যবস্থা। পুরন্দরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে আদর্শের একটা পটভূমিকা থাকে; সুতরাং নীলিমা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন দেখি দ্বিতীয় পুরুষের এই হৃদ্যতার পাশেও সে কিন্তু স্বামীর আরোগ্য লাভের চিন্তায় বিভোর। ওস্তাদজী নীলিমাকে বলেন—"মা আনন্দের জিনিস তাকে তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে লাগাতে চাচ্ছ।" অথবা "অকালে শক্তির এমন অপচয় কোরো না, তাকে সঞ্চয় কোরো নিজের মধ্যে। ভবিষ্যতেও তার প্রয়োজন হবে।" কিন্তু তার হৃদয়ে একটাই সুর বেজে চলে অবিরাম, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্বামীকে চেঞ্জে পাঠাতে হবে; অর্ধভুক্ত নিঃস্ব পরিবারকে আশার আলো দেখাতে হবে। তাই হৃদয়ের দাবী, ভালোবাসার বিশ্বাসে সে সেতারকে করে নিয়েছে উপায়—সব গ্লানি, দীনতাকে উপেক্ষা করে। কোথাও পায় প্রশংসা, কোথাও জোটে উপেক্ষা।

তার সংকীর্ণ ভুবন একদিন ডাক পায় বৃহত্তর জগতের—'এল সার্থকতার নতুন অর্থ, মহত্তর সম্ভাবনা।' বড় জলসায় সেতার বাজাতে হবে তাকে। দেশের কাজে দেশের জন্য জলসায় সেতার বাজাতে সম্মত হল সে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য শুধু সুনাম বা পরিচিতি প্রাপ্তি নয়, উদ্দেশ্য মহৎ ও বৃহৎ।

এদিকে দীর্ঘ অসুস্থতার পর বাড়ি এল সুবিমল। সেদিনই নীলিমাকে যেতে হবে জলসায়। লেখকের ভাষায়—"কত রোগ যন্ত্রণা মৃত্যুভয় পার হয়ে সে এসে পৌঁছেছে তার স্ত্রীর কাছে। এত দীর্ঘদিনের বিরহের পর স্ত্রীর সঙ্গে তিলমাত্র বিচ্ছেদ যেন তার সহনাতীত।" তাই স্ত্রীকে সে কাছ-ছাড়া করবে কি করে? 'নীলিমা বাঈজী' বলে উপহাস করে সুবিমল দাবী জানায়—জলসা হবে 'কেবল তোমাতে-আমাতে।' নীলিমার হাতে তুলে দেয় সেতার। 'আসল সুর' শোনার জন্য কাতর আহ্বান জানায়। নীলিমা শোনে বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ। সে ডাক বড় মধুর, তীব্র তার আমন্ত্রণ। 'ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কি করি।' কিন্তু সুবিমলের পীড়াপিড়িতে কোলে তুলে নেয় সেতারকেই। বাইরের ভাবকে উপেক্ষা করে স্বামীসঙ্গকেই বেছে নেয় নীলিমা। বাইরে না যেতে পারার বেদনা বোধহয় সঞ্চারিত হয়ে যায় তার বাজনার মিড় থেকে গমকে। সেতারের সে সুর জলসায় না যেতে পারার বেদনায় করুণ, না স্বামীর আহ্বানে মধুর হয়ে শ্রুত হয়, তা আর পাঠকের জানা হয় না।

ছোটগল্পের সার্থকতা সেখানে, যেখানে 'শেষ হয়ে হইলো না শেষ'। তাই যে সম্মান, খ্যাতি সে পেতে পারত সেদিন, যে আহ্বানগীতি তাকে আরো অর্থ উপার্জনেব সহায় করে দিতে পারতো, তা কোন্ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছলো, তা আমাদের অজানা থেকে গেল। লেখকের জিজ্ঞাসা, "তার এই থাকাটাই কি পুরোপুরি থাকা?" এই গল্পের উৎস সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'গল্প লেখার গল্প' অংশে বলেছেন—হাসপাতালে বহু যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে তাঁর আলাপ। এরকমই এক 'গীতানুরাগিণী একটি গৃহবধূ'র সঙ্গে পরিচিতির সূত্রেই এই গল্পের বিস্তার। মনের কোন আক্ষেপ, ভাবাবেগ থেকে এই গল্প সৃষ্টি হয়েছিল, তা লেখকের স্মৃতিতে আর স্পষ্ট নয়, তবে তাঁর ভাষায় 'এই আখ্যানটির দুটি প্রধান চরিত্র, তার কাহিনী অংশ, আর কাহিনীসঞ্জাত যে হৃদয়বেদনা, তা আগে দেখিওনি, শুনিও নি।" আবার অন্যত্র

বলেছেন—"মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।" তাই স্বামীর প্রতি ভালোবাসার টানে সে সেতার একদিন হাতে তুলে নিয়েছিল নীলিমা, সেই প্রেমের মাহাত্ম্যেই সে বাইরের ডাককে উপেক্ষা করে স্বামীসঙ্গকেই সে নির্বাচন করে নেয় সেদিনের মত। খাঁচা থেকে মুক্ত হওয়া পাখি, আবার ফিরে আসে খাঁচায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন জীবনের সামগ্রিকতার আভাসের বদলে তাঁর গল্পে জীবনের অসংখ্য টুকরো মুহূর্ত ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। 'ম্যাজিকের' মত তা যেন একটি নতুন দিগন্তকে, একটি অভাবিত সত্যকে প্রকাশ করে তোলে। 'সেতার' গল্পের শেষে তাই 'কড়া নাড়া'র তাৎপর্য যেমন এক ব্যঞ্জনা বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি অন্যদিকে এক 'অভাবিত সত্যের' জালে ধরা পড়ে পাঠক; গল্পটি রসসার্থকতায় পূর্ণ হয়।

পালঙ্ক : বিছিন্নতা ও শিকড়ের সন্ধান

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

"হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই।" এই 'নেই' এই একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতা, সবকিছু থেকেও সব হারানোর বিষাদ, শিকড় থেকে উপড়ে নিতে চাওয়া জীবনের বিচ্ছিন্নতা ছেয়ে ফেলছে একটা মানুষকে। যে চায় সবকিছু, তাঁর গ্রাম, তাঁর মাটি, ভিজে পাটের ঘ্রাণ, দেবদারু পাতায় অল্প হাওয়ার দোলা। তাঁর সন্তান-সন্ততি, পাশের মানুষজন, তাঁর ঘর, ঘরের প্রতিটি আসবাব, প্রতি ধূলিকণা, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে চেনা বাতাসের অনুরণন—এই সব চায় সে। এর বাইরে সে আর কিছু জানতে চায় না। বিরাট বিশ্বপৃথিবীর কোথায় কী ঘটে চলেছে, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, রক্ত, ক্ষুধা, ধর্ম-অধর্ম, সন্ধি-চুক্তি-শান্তি, কোনও কিছুই তাঁর জীবনবোধে এতটুকু বদল ঘটায় না। নিজের হাতে উপ্ত বাড়ির দক্ষিণ সীমান্তের দেবদারুর মতোই তিনি ধীর অচঞ্চল। তিনি জানেন আপন সংসারটুকুকে, চেনেন নিজের মাটিকে, সমস্ত সত্তা দিয়ে আঁকড়ে রেখেছেন বস্তুপৃথিবীর জল মাটি কাদার এই ভূমিপ্রান্তটুকু। যে ভূমির কোনও হিন্দুস্তান-পাকিস্তান নেই। লাভ-লোকসানের হিসেব নেই। বেচা-কেনার সত্ত্ব নেই। উত্তরাধিকারের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তাঁর হিসেব-নিকেশের বাইরে যে বদল ঘটেছে মঞ্চসজ্জার; ঘটে গেছে যুগবদলের, পালাবদলের এক অন্যতর নাট্যাঙ্ক। তাই জন্মগ্রহণের মুহূর্ত থেকে যাকে ছুঁয়ে, দেখে, আস্বাদন করে। অন্তর্গত সত্তায় উপলব্ধি করে জীবন নিজেকে বিকশিত করে সেই ভূমি আর ভূম্যর্জিত অধিকারবোধের অমৃত আকণ্ঠ পান করে রাজমোহন হয়েছেন নীলকণ্ঠ। কারণ অমৃতের সঙ্গে যে বিষটুকু লুকিয়ে ছিল তাকে তিনি বাদ দিতে পারেননি। বাদ দেওয়ার সাধ্যও তাঁর নেই। যে বহিঃপৃথিবীর দিকে ফিরে তিনি মগ্ন ছিলেন আপন সংসারে, সেই পৃথিবীর ঘটনা-পরম্পরার তুমুল অভিঘাত এসে পৌঁছেছিল তাঁর 'প্রশস্ত উঠোনে'ও। তাই যে রাজমোহন 'জীবনে কিছুই বিক্রি করেননি', তিনিই বাধ্য হয়ে বিক্রি করেন পুত্রবধূর বিয়ের যৌতুকের পালঙ্ক। বিক্রির পরমুহূর্তেই হাহাকার করে ওঠে তাঁর মন—"কেন করলেন—কেন বিক্রি করলেন পালঙ্কখানা? হঠাৎ তাঁর এ কী মতিভ্রম হল। জিনিসটা আর কি তিমি উদ্ধার করতে পারবেন না?" কিন্তু না, ফিরবার বা ফেরাবার পথ আর তাঁর জানা নেই। তিনি তখন নিঃসঙ্গ, অসহায়. এক বিচ্ছেদকাতর দর্শকমাত্র। কালের গতি তাঁকে তাঁর দেবদারু গাছটার মতোই নিশ্চল করে রেখে একটি একটি করে পায়া খুলে গোটা পালঙ্কটাই ডিঙিনৌকোয় পার করে নিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, নিষ্ফল আক্রোশে চীৎকার করলেন, 'চিতার-কাঠ' বলে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন পালঙ্কটাকে। কিন্তু পুবের ঘরের, পুত্র-পুত্রবধূর ঘরের পালঙ্কখানার শূন্যস্থানকে কোনওমতেই ভরাট করতে পারলেন না। মনে হল, 'কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেঁছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে, এই শূন্য সংসারে তিনি নিতান্তই নিঃসঙ্গ।"

কী অবলীলায় অসীমা কলকাতা থেকে তাঁর শ্বশুর রাজমোহনকে চিঠিতে লিখলেন, "আমার বিয়ের সময় আমার দাদুর দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানি আপনি এবার বিক্রি ক'রে দিন।" ছেলে সুরেনও, "স্ত্রীর চিঠির কোনায় এক লাইনে একটু সুপারিশ করেছে, 'আমার মনে হয় অসীমার প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।" তাঁদের যুক্তি অবশ্য খুবই কঠিন। বেলেঘাটার ভাড়া বাড়িতে স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেয় শুয়ে ছেলেমেয়েদের অসুখ করছে। তাই এই পালঙ্কবিক্রির টাকায় খাট বা তক্তপোষ কিছু একটা কিনতে হবে। কিন্তু শুধুই কি অর্থাভাব? গল্পের প্রায় শেষদিকে আমরা জানতে পারি যে রাজমোহন পালঙ্কবিক্রির পঞ্চাশ টাকার সঙ্গে ঘর থেকে আরও দেড়শ টাকা বেশি পাঠিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে। আসলে তো তাঁদের সবই আছে। সুদূর পূর্ব-পাকিস্তানে (এখন বাংলাদেশ) এক ছোট্ট গ্রামে ক্ষেতভরা ফসল, ঘর-ভর্তি জিনিস; কোনও কিছুরই অভাব নেই। শুধু দেশভাগ— এই একটি মর্মন্তুদ ঘটনা তাদেরকে 'দুধে-ভাতে'-র আবাল্য নিরাপত্তা থেকে সজোরে ছিঁড়ে-উপড়ে এনে ফেলেছে কলকাতার নাগরিক সংগ্রামের উপান্তে। কিন্তু এ কি শুধুই দেশভাগ-আরোপিত বাহ্যিক বিচ্ছেদ? শুধুই বাধ্য-বাধকতার বেড়াজাল? না কি ভৌগোলিক সীমান্তের ওই বিভাজন চারিয়ে গেছে অন্তর-সীমান্তেও? বস্তুত দেশভাগের আগেই সুরেন বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই দূর থেকে পুত্র-পুত্রবধূ বাবার জন্য দুঃখিত হলেও, তাঁর সঙ্গহীনতার জন্য উদ্বিগ্ন হলেও তাঁদের চিঠির কোথাও দেশ-ছাড়ার জন্য নিজেদের নিঃসঙ্গতার উল্লেখ থাকে না। উপরন্তু রাজমোহনের পাকিস্তান ছেড়ে না আসার সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছে অবিবেচনারই নামান্তর। তাঁরা বুঝতেই পারেন না, কেন রাজমোহন একছটাক জমিও বিক্রি করবেন না। 'মুসলমানেরা সব লুটে-পুটে খাবে'—তা স্বীকার করেও কেন তিনি সব আঁকড়ে পড়ে আছেন। তাই যে পালঙ্ক বিক্রির কথা তাঁরা সহজেই বলতে পারেন, তা বিক্রি করতে রাজমোহনের বুক ফেটে যায়। বাস্তবিক 'সব-আঁকড়ে থাকার' মমত্বটুকু ধীরে ধীরে নিঃশেষিত অসীমা-সুরেনদের মন থেকে। দুটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী এভাবেই পালটে দিয়েছে মানুষকে। বদলে দিয়েছে জীবনের ভরকেন্দ্রকে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যবিত্ত মানসের ভাঙন এক বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের সূচনা করে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার নিরাপত্তার পরিচিত ঘেরাটোপ থেকে হঠাৎই নতুন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অনিশ্চয়তা মধ্যবিত্তকে গ্রাস করে। অথচ এরই মধ্যে দেখতে পায় সুখৈশ্বর্যের হাতছানি। অর্থ আর স্বাচ্ছন্দ্যকে পাবার নতুন এক ইশারা। যাকে উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ ছুটতে শুরু করে। ছুটতে শুরু করে মধ্যবিত্ত সমাজ। পিছনে পড়ে থাকে এতদিনের মূল্যবোধ, শিক্ষা, সংস্কার, ভেঙে যায় যৌথ পরিবার। ভাঙন ধরে মূল্যবোধের ভিত্তিভূমিতে। তা চারিয়ে যায় মধ্যবিত্তের 'value judgement' অর্থাৎ মূল্যবিচারের নীতিপদ্ধতিতেও। যে মধ্যবিত্ত মানস একদা বস্তুস্বাচ্ছন্দ্যের ঊর্ধ্বে উঠে আশ্রয় নিয়েছিল এক অভাবনীয় শব্দে—'আনন্দ'। সে নিজেই সেই আনন্দলোক থেকে ক্রমে সরে যেতে থাকে স্বার্থবোধের জগতে। গত অর্ধশতক ধরেই নিরন্তর ঘটে চলেছে এই সরণ। আজ আর তাই ভূমি কিংবা ভূমানন্দ, কোনওটারই আকর্ষণ নেই। একটি দেবদারু কি একটি পালঙ্ক, একটি ঘর বা একটুকরো মাটি সেখানে আর কোনও স্থায়ী চিহ্ন আঁকতে পারে না।

মানুষ ভুলে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে শিকড়কে। "জমি-জায়গা, ভিটে-মাটি, ধান-পাট, গাছ-পালা"-র তুচ্ছ সেন্টিমেন্টকে পাশ কাটিয়ে বুভুক্ষু মানুষ এগিয়ে চলেছে অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের লিপ্সায়। এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে মধ্যবিত্ত জনমানস আজ, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৌঁছে গেছে 'global citizen'-এর ধারণায়। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনাগরিকত্বের ভাবনা এ নয়। বিভূতিভূষণের অপুর সন্তানকে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামে 'পূর্ণ' মানুষ হতে দিয়ে বিশ্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনির্দেশ যাত্রাও নয়। বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি ছেড়ে এ এক অন্যতর যাত্রা। "পত্র-পাঠ আপনি পালঙ্কখানা বিক্রির ব্যবস্থা করবেন"—অসীমার এই চিঠিতে যার সূচনা করে গেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সত্যিই তো "ও পালঙ্ক রেখেই বা কি হবে? কারো তো আর ভোগে আসবে না।" মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়ে জীবনের ভিত্তি এখন ওই একটি মাত্র শব্দে সীমায়িত—"ভোগ"। রাজমোহন কিন্তু ভোগ করেন না। তবুও "রোজ একবার ক'রে এসে দেখেন উঁই, ইঁদুরে কাটল কিনা। রোজ একবার ক'রে কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধুলো মোছেন। "বিপরীতে সুরেন-অসীমা চিন্তিত। পালঙ্কখানা 'মিছামিছি উঁইয়ে কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। এখানেই ঘটে গেছে ফারাক, যার অবধারিত পরিণতি বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ মানুষে-মানুষে, মানুষে-বস্তুতে৷ বিচ্ছেদ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে তার মূলগত শিকড়ের। তাই "রাজমোহন আর সে (পুত্র সুরেন) এখন দুই ভিন্ন দেশকালের মানুষ।" দেশভাগের বাহ্যিক ভেদরেখা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দুই মানুষের মাঝে, দুই প্রজন্মের সীমানায়।

গল্পের শুরু অসীমার তাঁর শ্বশুর রাজমোহনকে লেখা একখানি চিঠি দিয়ে। চিঠি পড়েই রাজমোহন ক্ষণিক উত্তেজনায় প্রতিবেশী দিনমজুর মকবুলকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে দেন্ পালঙ্কটি। কিন্তু বিক্রির পর থেকেই তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন পালঙ্কটা ফিরে পাবার চেষ্টায়। এই সামান্য বিক্রি অসামান্য আঘাত এনেছে তাঁর সামন্ততান্ত্রিক আত্মাভিমানে। আভিজাত্য রক্ষার লড়াইয়ে তখন তিনি মরিয়া। এই সময়টায় যেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায়ের চকিত ঝলক আমরা দেখতে পাই। সাড়ে ষোল পাতার গল্পটিব (গল্পমালা, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ) প্রথম পাঁচ পাতার মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায় পালঙ্ক। তারপব গোটা গল্প জুড়ে চলতে থাকে সেটি ফিরে পাবার এক অসাধারণ টানাপোড়েন। মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পালঙ্কটি কেনে মকবুল। ধলাকর্তা অর্থাৎ রাজমোহন তাকে পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচ টাকা বেশি দিতে আগ্রহী, শুধু পালঙ্কটি ফিরে পেতে। কিন্তু মকবুল বাজি হয় না। সে হতে পারে না। কেননা সে যে হঠাৎই এক অধরা স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় ধরতে পেরেছে। যে পালঙ্ক এতদিন মনিবের ঘরে পাতা ছিল, সেই সুদূর কল্পলোকের অপ্রাপনীয় বস্তুটি কিভাবে যেন সে এনে ফেলেছে তার দীনাতিদীনের বাস্তবে। যাকে 'লুব্ধদৃষ্টিতে' সে দেখেছে মাত্র, আজ সেই 'রাজা-বাদশার পালঙ্ক' তার বাঁশের বাখারি আর পুরনো করোগেট টিনের তৈরি ছোট, একখানা ঘরে বাস্তবিক বিরাজমান। ফ্রয়েড-শিষ্য মনোবিজ্ঞানী গুস্টাভি ইয়ুং মানুষের মধ্যেকার যে অচেতন অন্ধকার মনোভূমি ও সেখানে প্রোথিত গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন, পালঙ্কটি মকবুলের সেই নিহিত কামনাকেই উজ্জীবিত করেছে।

তাই সে কিছুতেই আর পালঙ্কটি হাতছাড়া করতে পারছে না। এ যেন শেলি কথিত "a desire of the moth for the star"; অতিক্ষুদ্র পতঙ্গেরও নক্ষত্রলোকে যাওয়ার সাধ। মকবুল তো সেই নক্ষত্রলোকেরই স্বাদ পেয়েছে। বিত্তহীন যে মানুষ কোনওদিন কোনও আভিজাত্যের স্বাদ পায়নি, ঘটনাচক্রে পালঙ্ক কিনে আজ সেই অহঙ্কার তার করায়ত্ত। তাই স্ত্রীর নিষেধ, ভবিষ্যৎ-চিন্তা, দেড়শ টাকা দাম কিংবা মুরুব্বির ধমক কোনওটাই তাকে নিরস্ত করতে পারে না। ওই এক পালঙ্কের "চারটি পায়ার বড় বড় বাঘের থাবা"-য় ভর করে সে পৌঁছে যেতে চায় অধরা আভিজাত্যের জগতে। এ গল্পের মকবুল, সুরেন, অসীমা সকলেই চলে যেতে চাইছে অন্য এক জগতের দিকে। এমনকি গাঁয়ের আর সকলে, শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, বদন সিকদার, পেদু মুন্সী ইত্যাদিরাও সময়ের স্রোতের পক্ষে হাঁটছেন। একমাত্র রাজমোহন অবিচল তাঁর ধ্রুপদী আত্মাভিমানের দৃঢ়তায়। তাঁর মূল্যবোধ অপরিবর্তনীয়, মমত্ব সু-প্রোথিত, জীবননীতি সুনির্দিষ্ট। পালঙ্ক ফিরে পাবার আশায় প্রথমে তিনি পাড়া-প্রতিবেশী ডেকে মকবুলের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তারপর তার দিনমজুরীর কাজ বন্ধ করে প্রতিশোধ নিতেও দ্বিধা করেন না। তাতেও ব্যর্থ হলে বাসক পাতা নেবার ছলে নিয়মিত মকবুলের বাড়ি যান—পালঙ্কটা একবার চোখের দেখা দেখতে আর মকবুলের স্ত্রী ফতেমাকে বুঝিয়ে যদি মকবুলকে রাজি করানো যায়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে হেরে যেতে থাকেন তিনি। শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং এরপরই ঘটে তাঁর অন্য এক পথ চলা।

প্রচণ্ড জ্বরে আর আমাশয়ে রাজমোহন যখন শয্যাশায়ী, একদিন খবর পেলেন, তালাকান্দার আতাজদ্দি সিকদারের কাছে মকবুল দেড়শ টাকায় পালঙ্কটি বিক্রি করে দিয়েছে। সেদিনই আতাজদ্দি এসে পালঙ্ক নিয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে নিস্পৃহতার ভাব দেখালেও সন্ধ্যার পর আর তিনি থাকতে পারলেন না। রাতের খাবারটুকুও খেতে পারেননি। অবশেষে রাতের অন্ধকারে, সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে এলে দরজায় তালা দিয়ে লাঠিগাছটা সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজমোহন। বৃষ্টির রাতে ছাতা বা হ্যারিকেন কিছুই সঙ্গে নেননি। একা, দুর্বল, কম্পিত শরীরে হাজির হলেন মকবুলের উঠোনে। ভেবেছিলেন পালঙ্কটি বুঝি আর দেখতে পাবেন না। কিন্তু না, মকবুল তা বিক্রি করেনি। সপরিবারে দু'দিন উপোস থেকেও সে পালঙ্ক আগলে রেখেছে। কিন্তু এবার সে দিয়ে দেবে পালঙ্ক। ফিরিয়ে দেবে ধলাকর্তাকেই। তবে কোনও অর্থের বিনিময়ে নয়। যে স্বপ্নের আভিজাত্যকে সে ধরতে চেয়েছিল, এ ক'দিনের জীবন অভিজ্ঞতায় সে বুঝে নিয়েছে বিত্তহীনদের কাছে তা শুধুই অধরা স্বপ্ন। তাই সে বলে, "হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়ে যান না পালং। আইজ আমি রাখিলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?" এই সংশয়ের মুহূর্তটিতেই সে পৌঁছে যায় অন্য এক মানুষী পূর্ণতার জগতে। পেটের খিদের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে অনুভূতি আর ভালোবাসার নিবিড়তা। ধলাকর্তাও তখন তাঁর শ্রেণী, সম্প্রদায়, আভিজাত্য আর অহঙ্কারের বৃত্ত পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এক অপূর্ব মানবলোকে। যেখান থেকে ওই পালঙ্কের উপর ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে থাকা মকবুলের শীর্ণকায় সন্তানদের মধ্যে দেখতে পেলেন নিজের রাধাগোবিন্দকে। আর তাঁর "চৌদোলা খালি না"। সব হারানোর শূন্যতা ঘুচে গিয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় তিনি এসে

দাঁড়ালেন মকবুলের পাশে। মুখোমুখি—দুটি পূর্ণ মানুষ। তখনই সৃষ্টি হল মানবরস, যা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সব গল্পেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং গল্পটি মুহূর্ত মধ্যে গল্পের সীমানা ডিঙিয়ে শিল্পের অঙ্গনে প্রবেশ করল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মধ্যবিত্ত জীবনদৃষ্টি ও মধ্যবিত্ত মানসের অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ গল্পের আধার। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'পালঙ্ক' গল্পের প্রকাশ। সদ্যসমাপ্ত দেশভাগই এ গল্পের পটভূমি। কিন্তু বস্তুতপক্ষে দেশভাগ গল্পের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পালাবদল, যা বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল মধ্যবিত্ত জনমানসের মূলকে। তাকেই লেখক ধরতে চেয়েছেন সহজ কথার ধ্রুপদী নৈপুণ্যে। বিচ্ছিন্নতাবোধের যে সূচনা তিনি এ গল্পে করেছিলেন, আজও, অর্ধশতক পরেও, সেই বিচ্ছিন্নতাই মানুষের প্রধান সংকট। কী পাশ্চাত্য, কী প্রাচ্য। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিবিদ্যা গোটা বিশ্বকে প্রায় হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। প্রাকৃতিক ও স্থানিক বাধা অতিক্রম করে আজ সহজেই এক মানুষ পৌঁছে যেতে পারে অন্য মানুষের কাছে। কিন্তু দুটি হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটে কি?

বিকল্প : প্রেম ও একটি মৃত্যুর কথা

বিশ্বজিৎ কর্মকার

যে কোন লেখার মধ্যেই থাকে লেখকের ব্যক্তি জীবন বা ব্যক্তি অনুভূতি। কিন্তু মহৎ সৃষ্টি তো ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে হয়ে উঠে সার্বিক। আমাদের আলোচ্য নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বিকল্প' গল্পটির মধ্যেও আমরা যেন পাই নরেন্দ্রনাথের অনুভূতি অনুভব এবং ব্যক্তি জীবনের খণ্ডাংশ। 'বিকল্প' গল্পের নায়ক ইন্দুভূষণ ছিল মধ্যবিত্ত এবং বর্ণহিন্দু। জীবন এবং জীবিকার তাগিদে ইন্দুভূষণকে টিউশন পড়াতে হয়। আর গল্পের স্রষ্টা স্বয়ং নিজেই মধ্যবিত্ত এবং বর্ণহিন্দু। এবং প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকেও টিউশন পড়াতে হয়েছিল।—১৯৩৫ সালে ফরিদপুর থেকে প্রথম বিভাগে আইন পাশ করে নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন। বি এ পড়ার সময়ও তাঁকে গৃহশিক্ষকতা করে চালাতে হয়। উত্তর কলকাতায় এক মেসে তিনি আরও চারজনের সঙ্গে ভাগ করে একই ঘরে থাকতেন।

লেখকের ব্যক্তি-চেতনায় লালিত পালিত হয়ে পরিপুষ্ট হয়েছিল 'বিকল্প' গল্পটি যা 'শনিবারের চিঠি'-র ভাদ্র ১৩৬২-র সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে দেশভাগের অত্যন্ত বাস্তব এবং জীবন্ত ছবি। যারা দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে চলে এসেছে; তারা সহায়সম্বলহীন অসহায়। ওদেশে ছিল যাদের নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি আজ তারা উদ্বাস্তু ছিন্নমূল 'বাঙাল' মাত্র, করুণার পাত্র। এরকম চিত্র তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই আমরা পাই—'হেডমাস্টার', 'অবতরণিকা', 'পালঙ্ক'—বেশি গল্পের নাম উল্লেখ করা এখানে অপ্রয়োজনীয়। হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের। তারা আবার তখন থেকে করে যাত্রা শুরু। অবশ্য এর সঙ্গে 'বিকল্প' গল্পে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছেন লেখক—হিন্দু সমাজের অরুচি বা কুরুচিপূর্ণ দিক, জাতপ্রথা।

দেড়শ টাকা বেতনের কেরানী হরগোবিন্দর ছোট্ট সংসার। সংসারে মোট তিনজন। মেয়ে সুধা, আর ছোট ছেলে হাবুল। হরগোবিন্দর স্ত্রী নির্মলা যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে শেষ পর্যন্ত সকলের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। সুধাও বেশ বড় হয়েছে এখন। পাত্রস্থ করা দরকার ওকে। বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে—"তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ বাবা। তুমি যেমন চাইবে তেমনি হবে।" হরগোবিন্দর আনন্দে পুলকিত চিত্ত। মেয়ে তার মনের মত। যদিও সুধার এই কুড়ি বছবে কোন পুরুষ আসেনি এখনো, তাইতো সে বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল স্বাভাবিক উত্তর তো দিতেই পারে।

একদিকে চলছে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রের সন্ধান। আর অন্যদিকে নিজের বংশ প্রদীপকে সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যোগ্য মাস্টার প্রয়োজন হরগোবিন্দর। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ইন্দুভূষণ দাসকে। প্রাইভেট টিউটর ইন্দুভূষণ 'বয়স ছাব্বিশ, সাতাশ, রঙ কালো, আকার মাঝারি, চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা।' রূপতো প্রয়োজন নয় হরগোবিন্দর। লেখক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ইন্দুভূষণকে সুপুরুষ বলা যায় না কিছুতেই।

আর ইন্দুভূষণ নাকি স্বভাবশান্ত নিরীহ পুরুষ বলতেও দ্বিধা হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা মনে পড়ে যায় আমাদের—'আমি রূপে তোমায় ভোলাবোনা ভালোবাসায় ভোলাবো।' এই ইন্দুভূষণ শ্যামনগরের ওদিকে কোন একটা হাইস্কুলে পড়ায় আর পাশাপাশি টিউশন করে। বেলগাছিয়ার ওদিকে আরও দুটো একটা বাড়িতে ও পড়ায়। মাস্টার হিসেবে বেশ সুনাম করেছে। ইন্দুভূষণের জন্য হরগোবিন্দর কাছে সুপারিশ করেছিল তারই দু তিন জন প্রতিবেশী।

ইন্দুভূষণ এলো হরগোবিন্দর বাড়িতে তার একমাত্র ছেলে হাবুলের প্রাইভেট টিউটর হয়ে। যদিও 'শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি করে কুড়ি টাকায় ইন্দুভূষণকে' পেয়েছিলেন হরগোবিন্দ। ইন্দুভূষণ যেদিন প্রথম এলো হরগোবিন্দর বাড়িতে, সেদিনই এক অদ্ভুত ভালোলাগা তৈরী হল সুধার মনে প্রাণে। হরগোবিন্দর সঙ্গে কথা বলছিল ইন্দুভূষণ, যেই কথা মোহিত ও চমকিত করে সুধাকে।" বঁটি থেকে চোখ তুলে ইন্দুভূষণের দিকে তাকাল সুধা। তার ঠোঁটে তখন একটু হাসি লেগে রয়েছে। সুধার মনে হল, এমন শান্ত সুন্দর হাসি সে জীবনে আর কারও মুখে দেখেনি। তাছাড়া পাল্টা জবাবটাও ভারি চমৎকার লাগল। এমন কথা যে কোন পেশাদার শিক্ষকই হয়তো বলেন, বলতেন। কিন্তু মনে হল, এমন অন্তর দিয়ে কেউ বলতে পারতেন না।" সেই শুরু—ভালো লাগা, ভালোবাসা। ইন্দুভূষণ রোজ সন্ধ্যায় হাবুলকে পড়াতে আসে। সুধা রান্না করে তখন। রান্নার ধোঁয়ায় অসুবিধে হয় কিনা জানতে চায় একদিন সুধা। এখান থেকেই শুরু হলো দুজনের কথা বলা; দুজন দুজনের মনের কাছাকাছি আসা। সুধাকে রান্না করতে দেখে ইন্দুভূষণের মনে পড়ে যায় সেই পুরনো কথা, পুরনো স্মৃতি। মনে পড়ে ওর মায়ের কথা; সেই ছোটবেলার কথা। সুধাকে বলে ইন্দুভূষণ—"...আপনাকে রাঁধতে দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন পড়াতুম না, পড়তুম। বাবা ছিলেন ওষুধের ক্যানভাসার। বাইরে বাইরে ঘুরতেন। মার ওপর ছিল সব ভার। তিনি জোর করে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে বসাতেন। হলুদ মাখা হাতে কালো শ্লেটের ওপর অঙ্ক লিখে দিতেন। অনেকদিন পরে সেই রান্নার ঝাঁজ, রান্নার গন্ধ আজ পেলাম এখানে।" আসলে হরগোবিন্দর অন্য আরেকটি রান্না ঘর ছিল না। যেখানে রান্না করা হত সেটি ছিল শোবার ঘরের সঙ্গেই লাগানো। ইন্দুভূষণ সুধার রান্না ধরে ওর মায়ের রান্নার হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আবার আবিষ্কার করেন। এই গন্ধের মধ্যেই থেমে থাকেনি ইন্দুভূষণ। এরপর ওর কপালে জুটেছে সুধার রান্না করা খাবার। একথা অবশ্য একবারও জানতে পারেনি হবগোবিন্দ। হাবুলকেও বশ করেছিল ওরা দুজন। হাবুলকে 'পড়ানো হয়ে গেলে ইন্দুভূষণকে খেতে বসতে হয়। আয়োজনে পরিবেশনে খুবই যত্ন নেয় সুধা।...এধরনের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ মাসে দুই তিন দিন লেগেই থাকে।' ওদিকে বাথরুমে, কলতলায় বাড়ির আরো সব ভাড়াটেদের ঘরেও আলোচনা হতে থাকে ইন্দুভূষণ এবং সুধাকে নিয়ে। কেউ কেউ তো সুধাকে তীব্র কষাঘাতে আক্রমণও করে। শ্লেষ বক্রোক্তিতে কেউই কম না। শুধুমাত্র মেয়েরাই যে এই ব্যাপারটা নিয়ে মেতে আছেন সর্বক্ষণ তা নয়, পুরুষেরাও। সুধা যাদের কাকাবাবু, মেসোমশাই বলে সেই পঞ্চানন সরকার, হীরালাল গাঙ্গুলি, বীরেশ্বর মিত্র সকলেই সুধাকে বাঁকা চোখে দেখে। রণজিৎ আব সুরেনকে সুধা দাদা বলে ভাবতো। সেই

দাদারাও তাদের ভাবভঙ্গিতে, হাসিতে বাঁকা চোখের চাহনিতে বুঝিয়ে দিয়েছে সুধাকে ওরা সব জানে। সুধা কারো কথা, কারো আকার ইঙ্গিতকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। বরং আরো নিবিড় ভাবে গল্প করে ইন্দুভূষণের সঙ্গে।

ইন্দুভূষণ সুধার কাছে একটা অচেনা জগৎ। সে জগতে তার এই চিরচেনা কলতলার, বাথরুমের মেয়েরা নেই। সে জগতে তার এই মেসোমশাইরা নেই, নেই কোন কাকু। সে জগৎ ইন্দুভূষণের। সে জগৎ বইয়ের। এর আগে সুধা জানতো না যে পৃথিবীতে এত ভালো ভালো বই আছে। 'আর সে সব বইয়ের লেখকেরা সুধারই মনের কথা চুরি করে নিয়ে লিখেছে।' এই সব বই আসতো সুধার কাছে ইন্দুভূষণের হাত দিয়ে। সুধার মনে এসে বসেছে পরিপূর্ণ এক যুবতী নারী। সে একজন তার মনের মতো পুরুষ চেয়েছে। চোখের সামনে এতদিনকার পড়ে থাকা জিনিসও এখন বহুমূল্যবান। ছিলতো সবই কিন্তু এতকাল, এতদিন দেখা হয়নিতো কিছুই। "এর আগে কে জানত তাদের বাড়ীর সামনে ছোট্ট পুকুরটার ধারে যে দুটো নারকেলগাছ রয়েছে তাদের পাতাগুলো সবুজ, বোসেদের বাড়ির ছাদে সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকার টবগুলি এত সুন্দর। তারও ওপরে অগুণিত তারা ভরা আরও সুন্দর আকাশ কি চোখে পড়েছে এর আগে।" আসলে সেই তো পুরনো কথা রবীন্দ্রনাথ শুনিয়ে ছিলেন আবো আগে—"আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ... গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম সুন্দর, সুন্দর হল সে।" মনের মতো চাওয়া যদি হয়ে যায় পাওয়া কিংবা পাওয়ার মতো। তবে তো 'আনন্দ ধারা বহিবে ভুবনে'। সুধারও তো হল তাই। ভুলে গেল যে ও নিজে ওর সামাজিক অবস্থান, সামাজিক গণ্ডী। ভুলে গেল বাবাকে দেওয়া সেই কথা। ভুলে গেল বাড়ি সুদ্ধ লোকের সমালোচনা।

শেষপর্যন্ত হরগোবিন্দর চোখ এড়াতে পারেনি সুধার আনন্দ। ইন্দুভূষণের ফুল উপহার দেওয়া। ওর চোখে সব কিছুই ধরা পড়ে। সুধার সাজও মেনে নিতে পারেনি ওর বাবা। রূঢ়, রুক্ষ হয়ে উঠেছেন হরগোবিন্দ। হরগোবিন্দর ইন্দুভূষণকে মনে হয়েছে, 'মিটমিটে শয়তান ছোকরা।' হরগোবিন্দ যে কোন মুহূর্তে পারে তার বাড়ির থেকে ইন্দুভূষণকে তাড়িয়ে দিতে। ছাড়িয়ে দিতে পারে ইন্দু অপ্রয়োজনীয় বলে। কিন্তু তা করবে না হরগোবিন্দ, এটুকু অপমান করলে লঘু শাস্তি দেওয়া হয়ে যায় ইন্দুভূষণকে। "হরগোবিন্দের ইচ্ছা আরও কঠিন শাস্তি দেন ওকে। শূদ্র হয়ে বামুনের মেয়ের দিকে তাকাবাব গুরুদণ্ড। না, কাজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে দেবেন না হরগোবিন্দ। কাজ বহাল রেখেই ওকে অপমান করবেন। ওর চোখের সামনে সুধার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ের দিন নিমন্ত্রণ করে এনে চাকরের মত ফাই-ফরমায়েস খাটাবেন। সুধা শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে ওর আরও পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে টিউটরের চাকরিতে বহাল রাখবেন। তারপরে ছোকরা খালি ঘরে কিভাবে ছটফট করে দেখবেন চেয়ে চেয়ে।" ইন্দুভূষণকে শাস্তি দেওয়ার কি ভয়ংকর পরিকল্পনা এঁটেছেন মনে মনে হরগোবিন্দ। মন যে হরগোবিন্দর হয়ে উঠেছে আগুন। এই আগুনের উপর জল ঢেলে দেয় তার সৃষ্টি, তারই মেয়ে সুধা। সুধা জানিয়েছে হরগোবিন্দকে— "..ওসব বিয়ে টিয়ের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই।" হরগোবিন্দর মন-মেজাজ সপ্তমে উঠেছে। অসহ্য মনে হয়েছে তার নিজের মেয়েকেই। হরগোবিন্দর চোখের থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে 'মিচকে

ছোকরা'। সেই রাতে বাবা মেয়ের কথোপকথনে সংঘর্ষটাই যেন গল্পের পটভূমিকে অন্য দিকে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে তুলে ধরা যেতে পারে একটু—

"সুধা বললে, 'না বাবা, তা কোনদিনই করব না। আমি কোন দিনই জীবনে বিয়ে করব না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।'

হরগোবিন্দ চটে উঠে বললেন, 'বিয়ে করবি কেন, দিন রাত সেই মাস্টারের সঙ্গে ফস্টি-নষ্টি করবি। নিন্দেয় পাড়া ভরে গেল। কাকে পছন্দ করিস তাই শুনি?'

সুধা 'তেমনি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার শুনে লাভ নেই বাবা। তার সঙ্গে তুমি কোন দিন আমার বিয়ে দেবে না। আর তোমার অমতে আমিও তাকে বিয়ে করব না। যেমনি আছি তেমনি থাকব।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন হরগোবিন্দ, বললেন, 'থাকা না থাকা বুঝি তোমার ইচ্ছে? হারামজাদী! ওই হতভাগা মাস্টার ছোকরাকে তুমি সব সমর্পণ করে বসেছ।..." মনে মনে জ্বলে ওঠে হরগোবিন্দ। সবাইকে তার শত্রু মনে হয়; ছেলে মেয়ে সবাইকে। তবুও পরের দিন হাবুলের থেকে সব কিছু শেষ পর্যন্ত জেনেছে হরগোবিন্দ। হাবুল বলেছে ভয়ে; আবার নানান রকম প্রলোভনে।'

পরের দিন অফিস থেকে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসেছে হরগোবিন্দ। সুধা এতে আবাকও হয়েছে কিছুটা। অবশ্য সুধা একবারও জিজ্ঞেস করেনি বাবাকে, কেন এত তাড়াতাড়ি এসেছে বাড়িতে। আর হরগোবিন্দ ভেবেছিল গতরাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য মেয়ে বুঝি ওর কাছে ক্ষমা চাইবে। সুধা কিছুই বলেনি মৌন থেকেছে শুধু। সুধার এই মৌনতার মধ্যে হরগোবিন্দ লক্ষ্য করেছে ওর বেপরোয়া ভাব, আর তাতেই জ্বলে উঠেছে তার পুরুষ মনখানি। আর তার কিছু পরেই ইন্দুভূষণ রজনীগন্ধা ফুল নিয়ে হাজির হয়েছে। ইন্দুভূষণ হাবুলকে বলেছে ফুলগুলো তুলে রাখতে। আর সেই মুহূর্তে হরগোবিন্দ মেজাজকে শান্ত করে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করে বলে—"আমি রাখছি। বাঃ চমৎকার মোটা-মোটা ডাঁটাগুলি তো! এফুল বোধ হয় ধারে কাছে পাওয়া যায় না, কি বলেন মাষ্টার?" হরগোবিন্দর এই কথায় লাজুক ইন্দুভূষণ আরও লজ্জা পেয়ে বলে, 'কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে এনেছি।'

পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন যেন থমথমে তা বুঝতে পারে ইন্দুভূষণ। সুধাকে তা জিজ্ঞেস করতেই সুধা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে ইঙ্গিত করে। আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল ভাই বে-দলী হয়েছে। তাই 'আরও সাবধান আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়েছে সুধা আর ইন্দুভূষণের।' ফুল তুলে রেখে হরগোবিন্দ বাইরে বেরিয়েছিল। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে চুপ করে বসেছিল কিছুক্ষণ। ইন্দুভূষণের পড়ানো হয়ে গেলে হরগোবিন্দ ওকে এগিয়ে দিতে যায়। মাস্টারের সঙ্গে হরগোবিন্দর কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে, তাই ইন্দুভূষণকে এগিয়ে দিতে আসা। সুধা অবশ্য প্রতিবাদ করে বলেছিল—'ওঁকে যা বলবার আমার সামনে বল বাবা। ওঁকে তুমি কিছুতেই অপমান করতে পারবে না।' হরগোবিন্দ মেয়েকে জানিয়েছিল, অপমান করবে না, শুধুমাত্র দু একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবে মাত্র। তারপর ওরা পুকুর ছেড়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। মাঠ পেরিয়ে শহরতলির নির্জন সরু অন্ধকার গলিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় হরগোবিন্দ। ইন্দুভূষণকে বলে—"মাস্টার, তোমার পেশাটা কি সত্যি করে

বলতো? ছেলে-পড়ানো না মেয়ে-বখানো?' ভয়ে ইন্দুভূষণের বুক কাঁপছিল, কিন্তু মুখের বড়াই অত সহজে ছাড়ল না, 'আপনার ও ধরনের কথার জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।' সে সময় কয়েকটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। ইন্দুভূষণও চেনে এই ছায়ামূর্তিগুলোকে—এরা সুধারই সেই প্রতিবেশী দাদারা।

তারপর কারা যেন মেসের সামনে দরজার কাছে রেখে গিয়েছিল আহত ইন্দুভূষণকে। প্রথমে মেসের লোকেরা তেমন কেউই গ্রাহ্য করেনি। অবস্থা যখন ভীষণ খারাপ হল তখন ওকে রেখে এলো হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে। হাসপাতালেই জ্বরবিকারে মৃত্যু হয়েছে ইন্দুভূষণের। ইন্দুভূষণের মৃত্যুর খবর পেয়ে হরগোবিন্দ বলে—"সুধা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর, এতটা যে হবে আমি ভাবতে পারিনি। আমরা ওকে শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম, সরিয়ে দিতে চাইনি।" সুধা বাবার কথা শুনে কোন মন্তব্য করে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বৈধব্য বেশ গ্রহণ করে। কালো পেড়ে শাড়ি পরে। কোন গয়না পরে না। মাছ মাংসও ছেড়ে দিয়েছে। ওর বাবা ওর জন্যে হার কিনে আনলেও ও জানিয়ে দেয় ওতে ওর কোন আগ্রহ নেই। হরগোবিন্দ বুঝতে পারে মেয়ে কোন কথা না বলে, কোন মন্তব্য না করে প্রতিশোধ নিচ্ছে। মেয়েকে জানিয়ে দেয় হরগোবিন্দ, 'তুই এর চেয়ে থানা পুলিশ কর, আইন আদালত কর, সে অনেক ভাল।' সুধার হাসি পায় বাবার একথা শুনে। সুধা যে মনেপ্রাণে ইন্দুভূষণকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছে তার উত্তর পাওয়া যায় এখানে ওর কথার মধ্যেই। এক দিকে বাবা, আরেক দিকে প্রেমিক। আবার প্রেমিকের খুনী ওর বাবা, এসব কিছু মেনেই সুধা বলে—"সে সব যারা করতে পারত তেমন আত্মীয় স্বজন তাঁর কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছি আমি। কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে। তুমি খুন করে এলে তোমার সেই হাত আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেব। সে হাতে শিকল পরাব কেন? আমি যে তোমাব মেয়ে।"

এরপর হরগোবিন্দ বাড়ি পালটেছেন। উত্তর কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণ কলকাতায়। কালীঘাটের সদানন্দ রোডে পাঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। এখানেও হরগোবিন্দর বেশ পরিকল্পনা, দুখানা শোবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম সব আলাদা আলাদা। আগের মত নয় আর। মেয়ে জামাই এসে মাঝে মাঝে যদি থাকে, তবে যেন কোন অসুবিধে না হয় সেদিকে নজব দিয়েছে হবগোবিন্দ। কিন্তু ঘর পালটালে কি মানুষের মন পালটে যায়! যায়না বোধ হয়। আর সেই জন্যই সুধা বলতে পারে স্পষ্ট ভাষণে, বিয়ে সে করবে না কিছুতেই।

সুধা এখন বাবা আর ভাই-এর সঙ্গে এক ঘরে থাকে না। থাকে পাশের ঘরে। দেখবার মত নেই অবশ্য সে ঘরে কিছুই। ও নিজেও রাখতে দেয়নি নিজের ঘরে কোন দামী আসবাবপত্র। এমনকি একখানা তক্তপোষ পর্যন্ত রাখতে দেয়নি ঘবে। "ঘরের এক কোণে দেয়ালের ধারে বিছানা গুটানো। ডানদিকে ছোট একটা বইয়ের সেলফ। বইগুলি না খুলেও হরগোবিন্দ বুঝতে পারেন এগুলি তার দেওয়া, সে শত্রু মরেও মরেনি। তাকের ওপরে একটি শূন্য ফুলদানি। সেদিন ফিরে এসে হরগোবিন্দ রজনীগন্ধাগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর ফুলদানিতে আর কোন ফুল রাখেনি সুধা।" ওর বাবা ওর মনের ফুলটাকে শুকিয়ে মেরেছেন। সেটা আমরা বুঝতে পারি। সুধা আমাদের আরেকবার জানিয়ে দিয়েছে

কখনো ভালোবাসার মৃত্যু হয় না। মানুষের মনের উপর যে জোর করে কোন রাজত্ব করা যায়না তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। শেষ পর্যন্ত হরগোবিন্দও বুঝতে পারে। আর সেই জন্যই তো হরগোবিন্দ বলে—"আমাকে কি তুই ক্ষমা করতে পারিস নে?" উত্তরে সুধা বলেছিল সাধারণ একটা কথা যা ওর বাবার মনে অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারে একটা গভীর ক্ষতের। বলেছিল সুধা—'ওসব কথা থাক বাবা।' এরপর সুধাকে আর কোন দিনও হরগোবিন্দ বিয়ে করতে বলেনি। বরং অফিসের কলিগ সুরেনবাবুকে বলেছিলেন একটা ছেলে দেখে দিতে। বলেছিলেন, বামুনের ছেলে হলেই ভালো হয়, অন্য জাতের হলেও হবে। সুরেন বাবু ভেবেছিল জামাই করার জন্য। আর তাই সে জোর দিয়ে বলেছিল অন্য জাতের কেন। আমরা গল্পের শেষ পংক্তিতে এসে যেন একটা প্রবল ধাক্কায় আচমকা চমকে উঠি। হরগোবিন্দর কথায়। সুরেন বাবুকে হরগোবিন্দ বলেছে—"একজন প্রাইভেট টিউটর—ছেলের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর।"

শুরুর কথায় ফিরে আসি আর একবার। বলেছিলাম 'বিকল্প' গল্পের বিকল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সত্যিকথা বলতে পৃথিবীতে কোন কিছুরই ঠিকমত বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন সুধা পায়নি আর কোন ইন্দুভূষণকে খুঁজে। আর হরগোবিন্দ ইন্দুভূষণের বিকল্প স্থানীয় আরেকজন প্রাইভেট টিউটর খুঁজছে। কিন্তু সত্যিই কি সেই টিউটর হবে কখনো কোনদিন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইন্দুভূষণের বিকল্প। মনে হয় কখনোই সে ছুঁতে পারবেনা ইন্দুভূষণের সৃষ্টি করা জগৎকে। ছুঁতে পারবেনা সুধাকে। কিন্তু গল্প লেখক যে গল্পের নাম রেখেছেন 'বিকল্প'। আমার আলোচনাতে বলার চেষ্টা করেছি বিকল্প হয়না যেকোন কিছুর। তবে কি লেখকের গল্পের নামকরণ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়? না তা নয়। আসলে এটা যে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ।

ইন্দুভূষণ সুধার মনে যে ভালোবাসার জগৎ সৃষ্টি করেছিল সেখানে ইন্দুভূষণই তো সুধার ভালোবাসার পুরুষ। প্রাইভেট টিউটর হিসেবে ইন্দুভূষণ এসেছিল বলে আর একটি প্রাইভেট টিউটর দিয়ে সুধার ভালোবাসার মানুষের বিকল্প পাওয়া যাবে—এই চিন্তাটাই হাস্যকর। কিন্তু নিরুপায় হরগোবিন্দ ওই পথেই এগোতে চেয়েছেন। একটি ছেলেকে কেন্দ্র করে ভালোবাসা উদ্বেলিত হয়েছে তাঁর নিজের মেয়ের মনে, তার স্বরূপটি তিনি বুঝতেই পারেন নি। এই করুণ অক্ষমতা 'বিকল্প'-চিন্তার মধ্যে যেমন জড়িয়ে আছে তেমনি ভালোবাসার মানুষটির হয় না—এমন একটি অনুভবেই সুধা যেন ক্ষমাপ্রার্থী বাবার সামনে 'ওসব কথা থাক, বাবা' বলে চলে নিজের অ-বিকল্প অনুভবকে মনের মধ্যে চেপে রেখে বাবার বিকল্প-চিন্তাকে যেন প্রায় নীরবেই প্রতিবাদ করে গল্পটির কারুণ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সাবিত্রী রায়

সাবিত্রী রায়ের ঢাকায় জন্ম (১৯১৮, ২৮ এপ্রিল)। কিন্তু তাঁর আদি নিবাস ফরিদপুরের বালুচরাতে। ১৯৩৮ সালে বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন, পরে বি. টি. পাশ করেন। পূর্ববাংলার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'অরণী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা বেরোয়। 'সৃজন' (১৯৪৬) ও 'ত্রিস্রোতা' (১৯৫০) উপন্যাস দুটির পর হাজং ও তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখেন 'পাকা ধানের গান' (তিনখণ্ড)। অন্য উল্লেখযোগ্য, উপন্যাস হল 'মেঘনা-পদ্মা', 'মালশ্রী', 'স্বরলিপি' ইত্যাদি। 'নতুন কিছু নয়' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন।

অন্তঃসলিলা : একটি অন্তরঙ্গ পাঠ অভিজ্ঞতা

কণিকা বিশ্বাস

অধুনাবিস্মৃত-প্রায় সাহিত্যিক সাবিত্রী রায়ের (১৯১৮-১৯৫৫) একটি বিশিষ্ট গল্প অন্তঃসলিলা। গল্পের নামটি ব্যঞ্জনামূলক। ফল্গু নদী—যার জল বালুরাশিতে সতত আবৃত থাকে তারই আরেক নাম অন্তঃসলিলা। এই গল্পে শকুন্তলা দেবী নামে এক লেখিকার কথা আছে। তার সৃজন প্রতিভা ঢেকে রাখে প্রতিকূল সংসার। তবু ঐ প্রতিভার অস্তিত্ব মরে না। আর সে নিজে তার বুকের তলায় লুকিয়ে রাখে অতলান্ত অশ্রুর সজলতা। পীড়িত অসহায়ের মনবেদনার স্মারক চিহ্ন। গল্পটি আমরা পর্যালোচনা করে বুঝে নিতে চাইব সাবিত্রী রায়ের সাহিত্য-স্বভাবের নিজস্বতা।

দুই

অন্তঃসলিলার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরকম : রাধারাণী প্রকাশনা সংস্থার সাথে যুক্ত দেবব্রত শকুন্তলা দেবী নামে এক নবাগতা লেখিকার লেখা মুদ্রিত করতে চান। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর দু'টি বই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কফিহাউসের বন্ধু-বান্ধবেরা অবশ্য শকুন্তলা দেবী সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলে থাকেন। 'পুরনো লেখকবন্ধু শিবনারায়ণ ব্যানার্জী বলেন 'মেয়েদের লেখা আবার উপন্যাস। নির্ঘাত "লস" দিতে হবে রাধারাণী পাবলিশারকে। তাঁর মতে শকুন্তলা দেবী গল্পলেখার 'টেকনিক' জানেন না বলে তাঁর গল্প গল্পই হয় না। রঞ্জন রায়ের বক্তব্য, মহিলার হাত এখনো কাঁচা—'ঘষতে ঘষতেই' কালক্রমে 'পেকে যাবে'। এইসব ব্যঙ্গাত্মক প্রতিকূল মন্তব্য দেবব্রতকে প্রভাবিত করে না। তিনি সংগৃহীত ঠিকানা খুঁজে মহিলার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন।

অত্যন্ত সংকীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন আবছা অন্ধকার একটি গলির মধ্যে শকুন্তলা দেবীর ঘর। 'একটা বহু পুরনো আমলের স্যাঁতসেতে বাড়ী'র সাত ভাড়াটের এক ভাড়াটে তিনি। জল-কল সব এজমালি।

একটি মোটে ঘর। মেঝে চটাওঠা। দেওয়াল ভ্যাপসা গন্ধযুক্ত। তাতে ঝোলে গুরুদেব আর যতরাজ্যের দেবদেবীর ছবি। ঘরের মাঝখানে পর্দা টানিয়ে দুভাগ করা। একপাশে জোড়া তক্তোপোশের উপর স্তূপীকৃত বালিশ ঘরের বাসিন্দাদের সংখ্যাধিক্য বুঝিয়ে দেয়। ঐ একই ঘরে রাঁধা-খাওয়া-শোয়া-বসা সবকিছু। বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। ধোয়া-মোছা-রাঁধা-বাড়ার সব কাজ শকুন্তলা দেবীকেই করতে হয়। তদুপরি আছে বৃদ্ধা শাশুড়ি ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিশেষ সেবাযত্নর দায়িত্ব।

তিনি লেখিকা। অথচ লেখার অনুকূল কোনও পরিবেশই তিনি পান না। তাঁর অবসর নেই, উপকরণ নেই, সমর্থন নেই। নিজের ছাত্রীজীবনের একটি নোটের খাতার অবশিষ্ট পৃষ্ঠাতে তিনি সাহিত্য লেখেন। ঐ খাতাতেই আঁকা থাকে তাঁর শিশুকন্যার পাঠাভ্যাসের চিহ্ন। একটানা লেখার মত ক'টি পরপর সাদা পাতাও তাঁর সর্বদা জোটে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেই লেখা 'ছিন্ন ভিন্ন গল্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে'র মত। যাদের

'লেখিকার খণ্ডীকৃত সাধনার ও জীবনের প্রতিফলন ভাবা যেতে পারে। স্থানাভাবের ও সময়াভাবের কারণে লেখা খাতাটি সযত্নে গুছিয়ে রাখার সুযোগ নেই। তা কোনও ক্রমে গুঁজে রাখা হয় জানালার উপরের তাকে 'একপাঁজা পুরানো রং-ধরা-খাতা'-পত্রিকা-পাঁজির স্তুপে। উনুন ধরাবার কাগজ যেখান থেকে সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থেকে যায়। লেখিকার এত সময়াভাব যে প্রকাশকের সাথে দু'দণ্ড সুস্থির ভাবে দু'টো কথা বলা বা তাঁর হাতে নিজের লেখার প্রকাশযোগ্য অনুলিপি তুলে দেওয়াটাই তাঁর পক্ষে কখনও কখনও অসহজ হয়ে ওঠে।

তাঁর লেখার জন্য তিনি কোথাও আনুকূল্য বা সমর্থন পান না। বরং বিরোধিতা পান। অন্য লেখকেরা তাঁর দোষ ধরেন। প্রকাশক পয়সা দিতে চান না। শাশুড়ি-দেওর প্রকাশ্যেই কটুমন্তব্য বা ব্যঙ্গ করেন। যেমন শাশুড়ি বলেন : 'মেয়েটা গলা ফেটে মরছে—কানেও কি যায় না। ছেলে-পুলের মায়ের কি আর দিনরাত কলম নিয়ে বসে থাকলে চলে।' বিষঝরা ইঙ্গিত সূচক মন্তব্যে দেওর ঠাট্টা করেন : 'কি বৌদি, গল্প লিখতে গিয়ে নিজেই আবার গল্পের নায়িকা হ'য়ে পড়ো না যেন।' প্রফেসার স্বামী অবশ্য বাধা দেন না কিন্তু দু'দণ্ড লেখা শুনেও স্ত্রীকে প্রেরণা দেবেন তাঁরই বা সেই সময় কোথায়? কলেজ, টিউশান, কালোবাজারে ঘুরে সংসার টানতে টানতে তিনি এত জেরবার যে নিজের রুগ্ণ শিশুর জন্য ডাক্তারের কাছে যাবারও অবসর তাঁর মেলে না।

দারিদ্র্য ও নারীত্ব—এই দুই বাধা লেখিকার বিকাশকে প্রতিহত করে। শকুন্তলা দেবীব 'চোখের গভীরে' তাই 'গভীর বেদনার ছায়া' ফুটে ওঠে। বাধ্য হয়ে তাঁকে আগে গৃহিণী—পরে লেখিকা হতে হয়।

তিন

"অন্তঃসলিলা গল্পের অসামান্য গঠনরীতি। শকুন্তলা দেবীর অতি দরিদ্র ও অকরুণ সংসারে অতি নিঃসঙ্গ, অনাদৃত সাহিত্য রচনার ইতিহাস প্রকাশক জানতে পারেন দেওয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসা বাকি সংসারের বিষাক্ত, বিরুদ্ধ মন্তব্য থেকে।' এই গল্পে যেহেতু উত্তম পুরুষের নিরীক্ষণ বিন্দু ব্যবহৃত সেহেতু বক্তব্যে নিরপেক্ষতার স্বাদ আসে। মহিলা শিল্পীর সংকট লেখিকার একটি প্রিয় বক্তব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মেঘনাপদ্মা এবং মালশ্রীতেও তিনি ঐ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এ'টি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় ছিল : "লেখিকা-সত্তার সঙ্গে গৃহিণী-সত্তার দ্বন্দ্ব মাকে লাগাতার পীড়িত করেছে।" সাবিত্রী রায়ের সাহিত্যচর্চা ছিল নিছক সময় কাটানো নয় আত্মপ্রকাশের 'হাতিয়ার' এবং 'এক সামাজিক কর্তব্য' ও। নারী সমস্যা নিয়ে ভাবিত ঐসব সাহিত্য পরিকল্পনা লেখিকার তীক্ষ্ণ সমাজ ও রাজনৈতিক বোধ থেকে উঠে আসতো।

অন্তঃসলিলার ভাষা স্পষ্ট, ভাবালুতাবর্জিত, যথাযথ : "এই গলিই। দেবব্রত এগিয়ে চলে। একটু অসতর্ক হ'য়ে হাঁটলেই গায়ের জামাটায় ছোঁওয়া লেগে যায় দুপাশের বাড়ীর দেওয়ালে। অসাবধানী পানের পিকের দাগে নানা আকারের চিত্র আঁকা দেওয়ালে। কোথায় ও বা সর্দি বসা পাকা পাকা কফ লেগে আছে।" প্রসঙ্গত বলা যায় লেখিকার ঐরকম বাস্তবানুগ ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষাও আয়ত্তে ছিল। অনেক লেখাতেই তাঁর ভাষার মেজাজ রোমাণ্টিক :

"সুতৃপ্ত নিদ্রা শেষে সতেজ প্রেরণা নিয়ে নীড় ছেড়ে পৃথিবীর আঙ্গিনায় নেমে আসে ছোটবড় সব পাখী। বিহঙ্গ সখীরা কলকাকলিতে চলে উষাস্নানে।

পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার ব্যথায় উষার ওড়নায় মুখ ঢাকে অশ্রুসিক্ত রাত্রি। রাত্রির সে বিদায়-নিঃশ্বাসে আমার ভেতরটাও কেঁদে ওঠে এক দুর্বোধ্য ব্যথায়। যেন কোন এক 'সুদূর' হারিয়ে গেল শিশির-ভেজা হেমন্তের আঁধারে।"

অন্তঃসলিলার ভাষাতে ডিটেলের কাজ লক্ষণীয়। ক্যামেরার 'ফোকাস' গিয়ে পড়ছে একেকটি জায়গাতে আর 'জুম' করে তুলে আনা হচ্ছে বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঁজগুলি। ধৃত বস্তুটি হতে পারে কফিহাউসের টেবিলে জমে ওঠা আড্ডা, লেখিকার নিরাভরণ মুখশ্রী অথবা যা কিছু।

অন্তঃসলিলাতে অনেক চরিত্র রয়েছে। দু'চারটি সংলাপে ও আচরণে স্কেচের নৈপুণ্যে তাদের মূল ভূমিকাটি ধরে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্বিষ্ট শাশুড়ি, নিরুত্তাপ স্বামী, ব্যঙ্গমুখর দেওর, ছিদ্রান্বেষিণী প্রতিবেশিনী, সহৃদয় খুকি, পরশ্রীকাতর অন্য লেখক, সদাশয় প্রকাশক, নিরুপায় লেখিকা—সবাইকে বেশ চিনে নেওয়া যাচ্ছে। লক্ষণীয় চরিত্রগুলি উঠে আসছে ভেদ-বিভক্ত সমাজভূমি থেকে। নারী ও পুরুষের ভেদ। অপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিতের ভেদ। দরিদ্র ও ধনীর ভেদ।

সাবিত্রী রায়ের চরিত্রগুলি একরঙা নয়। অন্তঃসলিলাতে শাশুড়ি পুত্রবধূর প্রতি বিদ্বিষ্ট—তবু মাঝে মাঝে তাঁর অসুবিধাগুলি বোঝেন, নিজের সীমাবদ্ধতার জন্য দুঃখও পান। তাই তাকে 'ভিলেন' ধরনের মনে হয় না। আসলে মানুষের বহুমাত্রিকতা ও বিচিত্রতা বিষয়ে একধরনের ভারসাম্যযুক্ত বোধ সাবিত্রী রায়ের মধ্যে কাজ করে। তাই অন্তঃসলিলাতে আমরা শিবনারায়ণ ব্যানার্জী-রঞ্জন রায় ও শকুন্তলা দেবীর সংকীর্ণচিত্ত দেওরের পাশাপাশি সুব্রত ও দেবব্রতর মত উদার মানুষদের দেখাও পাই।

চার

শকুন্তলা দেবীর গল্পের প্রথম লাইনটি ছিল এই রকম—"ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার মানুষের মিছিল।" এই লাইনটুকু ও মরণোন্মুখ অ-দেখা কর্মীর জন্য তাঁর জাগ্রত সহানুভূতির চিহ্নে তাঁকে রাজনীতি-সচেতন লেখিকা বলে মনে হয়। শকুন্তলা দেবী যাঁর সৃষ্টি তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারে কেমন ছিলেন তা এবার দেখা যাক।

সাবিত্রী রায়ের কন্যা তাঁর জননী সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'প্রথম মহিলা রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসাবে ওঁকে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না।' লেখিকার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে আমাদের কোনও সংশয় নেই। কিন্তু তার প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আছে।

তাঁর দ্বিতীয় বই ত্রিস্রোতার প্রকাশক তাঁর সাহিত্যে গণসাহিত্যের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন : 'মধ্যবিত্ত মন নিজের সমাজের খোলস ছাড়িয়ে বের হয়ে পড়েছে অনন্ত যাত্রার পথে। উদ্বেগ, বিভ্রান্তি আর সমস্যা-সংশয় জড়িত সে পথ। আর তার পাশেই চলেছে দিগ্বলয় রেখায় কাতার দিয়ে বলিষ্ঠ মানুষের দল—শোষিত সর্বহারার মিছিল—উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র ব্যাকুল!........তাদেরই দলে মিশতে হবে তাঁকেও। সেই অবিনাশী প্রাণশক্তির শিকড়ের সন্ধান যে লেখিকা খুঁজে পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহ। আর কিছু না হোক, গণ-সাহিত্য সৃষ্টির

সযত্ন প্রচেষ্টা এর প্রতি ছত্রে সুপরিস্ফুট।' উদ্ধৃত লেখাটি ১৯৫৩ সালের। ১৯৯৯ সালে তনিকা সরকার সাবিত্রী রায়ের আধা-সাম্যবাদীর লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন দ্বিতীয় মূল্যায়নটিই সঠিক বলে মনে হয়। লেখিকার কন্যা গার্গী চক্রবর্তী জানাচ্ছেন : "উনি ছিলেন বিশেষভাবে রাজনীতি-সচেতন মানুষ। যদিও মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও শারীরিক সীমাবদ্ধতার জন্য উনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রইলেন। সাম্যবাদী বাম চিন্তাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের স্থান নেই। কারণ সেখানে ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী বা দল বড়। তাই সাবিত্রী রায় যদি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হন তবে তিনি সাম্যবাদী হবার শর্ত পালন করতে অপারগ থাকেন। সাম্যবাদী সংস্কৃতি চিন্তার ফসল গণসাহিত্য ভাবনা তাঁকে ছকে ঢালতে পারে না এবং সেই কারণে গণসাহিত্যিক রূপে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। তাহলে তনিকা সরকার তাঁকে 'আধা-সাম্যবাদী' বলেন কেন? কারণ তাঁর মধ্যে সাম্যবাদী সাহিত্যের কিছু আবেগ, কিছু উপকরণ, কিছু প্রকাশভঙ্গি যা রয়েছে। উদাহরণ দেওয়া যাক। তাঁর লেখাতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চেতনা স্পষ্ট। স্মরণীয় 'ওরা সব পারে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' গল্প দুটি। বিত্তহীন অথবা হীনবিত্ত মানুষের চলাফেরা তাঁর সাহিত্য জুড়ে। যেমন নতুন কিছু নয় এই গল্পগ্রন্থের 'সমঝ্দার', 'হাসিনা', 'প্যারামবুলেটর' নামে লেখা তিনটি। এই শ্রেণীর মানুষের ছোটখাট চাওয়া-পাওয়া কিংবা চাওয়া-না পাওয়া এবং তাদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে লেখা হয়েছে তাঁর ছোটগল্প 'নূতন কিছু নয়' ও 'সাময়িকী'। সাধাবণ মানুষের মুখের বুলি তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেন। গণসাহিত্যের আদর্শানুরূপ বাস্তব-ঘেঁষা, সোজা-সাপটা, বলিষ্ঠ বাক্ভঙ্গি প্রয়োজনমত তাঁর কলমে উঠে আসে।

তবু তাঁকে পুরো সাম্যবাদী বলা যাবে না কেন? কারণ তাঁর লেখাতে সাম্যবাদী সাহিত্যের সব লক্ষণ মেলে না এবং নিজস্ব কিছু লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন তাঁর লেখাতে সর্বদা শ্রেণীসংগ্রাম ও তার পরিণামে জনতার বিজয় দেখান হয় না। অনেক সময়েই তাঁর লেখাতে ফুটে ওঠে রোমাণ্টিক বাক্ভঙ্গিমা এবং নিজস্ব আবেগ-উপলব্ধি। আর তিনি নারীর সমস্যার কথা বিশেষ ভাবে বলতে চান। এই শেষ লক্ষণটি পৃথকভাবে গুরুত্ব আরোপের যোগ্য। কারণ সেখানেই তাঁর সাম্যবাদ থেকে সরে আসার সবচেয়ে বড় লক্ষণ চিহ্নিত হয়ে যায়।

সাম্যবাদী চিন্তায় নারীর সমস্যাকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু সবিত্রী রায় তাঁর নিজের কাছে নিজের বোধকে প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন এই সমাজজীবনের সর্বত্র পুরুষ ও নারীর অবস্থান এক নয়। নারীকে দৈহিক ও মানসিক চাহিদা সম্পন্ন—দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়াযুক্ত প্রাণী বলে ভাবা হয় না, যথেচ্ছ ব্যবহারের উপযুক্ত বস্তু বলে ভাবা হয়। ঐ নারী যদি দরিদ্র হয় তবে তার উপর পিতৃতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের (এবং অন্যান্য তন্ত্রেরও) আক্রমণ তীব্রতর হয়। আক্রান্ত রমণীর দুঃখ-কষ্টকে গ্রাহ্য না করাটাই সমাজের নিয়ম। এই বোধের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছিলেন মালশ্রী, অন্তঃসলিলা, মাটির মানুষ, নতুন কিছু নয়, রাধারাণী ইত্যাদি রচনা। মালশ্রী ও অন্তঃসলিলাতে নারীশিল্পীর বিপন্নতা, মাটির মানুষে বিবাহিত ধর্ষণের অভিজ্ঞতা ও অবশিষ্ট গল্প দুটিতে দরিদ্র যুবতী হবার অভিশাপের বিবরণ আছে। রাজনীতি সর্বদা নারীকে প্রয়োজনীয় 'স্পেস' বা পরিসর

যে দেয়না তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন রাজনৈতিক—এমন কি বাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নর-নরীর বৈষম্য আছে। তাই দেখা যায় "বামপন্থী সংসারেও সামন্ততন্ত্রী পরিবারের ধাঁত ফিরে আসে।... বিপ্লবের ডাকে সর্বত্যাগী পুরুষ সর্বহারার যন্ত্রণায় সাড়া দেয় কিন্তু নিজের স্ত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকে....। আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তেও বধূকে রান্নাঘরে আটকে থাকতে হয় এবং পারিবারিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত অবস্থাতেও পুরুষের কাছে সংসারের দায়িত্ব দায় মাত্র।"

কেন এমন হয় এই বিষণ্ণ প্রশ্ন সাবিত্রী রায় বারে বারে তুলতে থাকেন। কিন্তু তার সহজ সমাধান দেন না এবং তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে 'সাম্যবাদের ভাবাদর্শের দীপ্তি' 'ম্লান হয় না'। তাঁর অনেক নায়িকা যেমন সরস্বতী, রাখী, লতা, শকুন্তলা "তাঁদের মূল্যবোধ, চেতনা ও প্রত্যয়কে আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারেন।"

সাবিত্রী রায়ের নারীবাদে নারীর অবস্থানগত ধারণাতে কিছু পিছুটান, কিছু প্রগতিশীলতা আছে। অনেক সনাতনী আদর্শ সম্পর্কে তাঁর মোহ রয়েছে। তাঁর মালশ্রীর নায়িকা রাখী 'তীব্রভাবে অনুভব করে যে সম্পত্তির মতো প্রেমের ওপরও ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখা কত নিষ্ঠুর। তবু তার কাছে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ এক গভীর, অর্থবহ মূল্যবোধ, যার টান সে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে।" স্নেহ-প্রেম-মমতার দীপশিখা জ্বালানো কল্যাণী মাতৃমূর্তির ধারণা সাবিত্রী রায়কে চিরকালই আবিষ্ট রেখেছে। সাধারণত আত্মত্যাগিনী সর্বংসহা ভাবমূর্তি এমন মাতৃকা ভাবনার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পিতৃতান্ত্রিক ধারণার ফাঁদে সাবিত্রী রায় ধরা পড়েন নি। তিনি নারীর বাধ্যতামূলক অপ্রাপ্তি ও নিরুপায় সহিষ্ণুতাকে উদার ও মহান রূপে প্রতিপন্ন করতে চাননি। তাকে বঞ্চনা ও নির্যাতন রূপেই দেখিয়েছেন। এটাই তাঁর প্রগতিশীলতা।

পাঁচ

তাহলে মতাদর্শগত দিক থেকে সাবিত্রী রায় কোথায় দাঁড়ান এবং কেনই বা সেটি তার অবস্থান হয় এই প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠে আসে। সাবিত্রী রায় পুরো নারীবাদী বা পুরো সাম্যবাদী বা পুরো রোমান্টিক কোনটাই নন। কারণ তিনি এক বিমিশ্র চেতনার অধিকারিণী। তাঁর কালের থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর নারীবাদ দিয়ে তাঁর সাম্যবাদের দেহে কিছু নূতন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেন। এজন্য তাঁকে 'সাম্যবাদিনী' নামে কোনও নূতন বিশেষণ দেওয়া যাবে কিনা সে প্রশ্ন তনুকা সরকার তুলেছেন। এর উত্তর আগামী দিনের কাছে গচ্ছিত আছে।

পূর্বপ্রসঙ্গ ফিরে আসে। মনে প্রশ্ন ওঠে, সাবিত্রী রায় কেন তাঁর সাহিত্যে অপ্রথাগত হয়ে সাম্যবাদের সাথে নারীবাদকে মিশিয়ে দেন? আমাদের বিশ্বাস, তিনি তা করেন রোমান্টিক প্রেরণা থেকে। তাঁর কন্যার মাতৃস্মৃতিচারণে ঐ স্বভাবের স্বীকৃতি আছে : "সঙ্গীতপ্রিয় এই মানুষটি ছিলেন বড় রোমান্টিক। জ্যোৎস্নারাতে নারকেল গাছের পাতায় চাঁদের আলোর বন্যা, নিঝুম রাতের সৌন্দর্য, খোলা মাঠ মার শিল্পীমনকে হাতছানি দিত। ওঁর অধিকাংশ রচনা প্রেম-প্রধান। সুস্থ জীবনবোধকে লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরাই ওঁর চেষ্টা ছিল।" রোমান্টিকেরা আদর্শ পৃথিবীর, সুন্দর পৃথিবীর অন্বেষণ করেন। বৈষম্য থেকে অনাদর্শ ও

অসৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়। তাই একজন রোমান্টিকের পক্ষে বৈষম্যের প্রতিবাদী হওয়া সম্ভব। আর অর্থনৈতিক বৈষম্য ও লিঙ্গগত বৈষম্য যে সাম্যবাদ ও নারীবাদের গোড়ার কথা একথা তো সকলেই জানেন। এখানেই সাবিত্রী রায়ের সঙ্গে মতবাদগুলির প্রাথমিক মিল হয়ে যায় কিন্তু চূড়ান্ত মিল হয় না। কারণ ঐ মতবাদ দুটির অন্যসব শর্ত পূরণ করা তাঁর রোমান্টিক স্বভাবের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাবিত্রী রায়েব স্বভূমি রোমাণ্টিকতা থেকে তাঁর নারীবাদ ও সাম্যবাদ উঠে আসে বলেই এমনটি ঘটে।

বৃক্ষ কেমন ফল দান করবে তা কেবল বীজের উপর নির্ভর করে না। মাটি, জল, আলো-বাতাস, পরিচর্যা ইত্যাদি অন্যান্য শর্তও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সাবিত্রী রায়ের ভূমি তৈরি হয়েছিল পরম্পরাগত ঐতিহ্যে—যাতে বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল গোষ্ঠী ও প্রগতি-সাহিত্যিকেরা। তাঁর আলো-বাতাস মিলেছিল সমকালীন বিশ্ব ও স্বদেশের ঘটনাবহুল ও দ্বন্দ্ববহুল ইতিহাস থেকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৮ সালে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙি গ্রামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস বাসুদেবপাড়া, বরিশাল প্রকৃত নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই কৃতী ছাত্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন।

প্রথমে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ওখান থেকে চলে আসেন কলকাতার সিটি কলেজে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনাতেও তাঁর সুনাম ছিল কিংবদন্তিতুল্য। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ'। প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'বীতংস'।

ক্যালকাটা কেমিক্যালের উদ্যোগে প্রকাশিত 'কথাশিল্প' গল্প সংকলনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পটি শ্রেষ্ঠগল্প রূপে জনমত লাভে ধন্য হয়। আনন্দ পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। কিশোরদের জন্য রচিত 'টেনিদা'র কীর্তিকাহিনী-সমন্বিত গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য বসুমতী পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্য পুরস্কারও পান। কিশোর সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন 'রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার।' তিনি বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৪১ সালে মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বীতংস : সারল্যের নির্মোকে নির্মম গল্প

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

নির্মম ছোটগল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একেবারে লেখেননি এমন নয়, 'হাড়', 'টোপ', 'মহলা' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের কথা এই মুহূর্তেই মনে করতে পারছি, কিন্তু 'বীতংস' গল্পের সুন্দরলালের মতো এমন একটি নারকীয় চরিত্র—যাকে ইংরেজিতে বলা চলে confounded rogue, লেখকের আর কোনো রচনায় খুঁজে পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। গল্পটি সেই কারণেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্মমতম গল্প হিসাবে অভিহিত হতে পারে, অন্তত আমার পাঠ ও স্মরণের চৌহদ্দির মধ্যে ধরলে। এর একটা কারণ এমন হতে পারে—রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' (পঞ্চভূত) রচনায় জমিদারদের 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানকে প্রধানত দীপ্তি ও ক্ষিতি যে রকম ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—একটা অসুন্দর জিনিসকে অসুন্দর হিসাবেই দেখালে তাকে হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু সৌন্দর্যের প্রলেপ মাখাতে গেলে তা সহনীয়তার মাত্রা হারায়, তা একেবারে কুৎসিত হয়ে পড়ে, সেই সত্যটা এখানে যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। 'বীতংস' গল্পে সুন্দরলাল যা করেছে তা এককথায় পাশবিক, কিংবা হয়তো তার চেয়েও ঘৃণ্য, কিন্তু লেখক ব্যাজস্তুতির ভঙ্গিতে তাকে যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তাতে অনুভূতিশীল পাঠকের কাছে তা আর সহনীয় থাকে নি।

ছোটগল্পেব যে একমুখিনতা তাকে শিল্পসিদ্ধি দিতে পারে, 'বীতংস' গল্পে তা পুরোমাত্রায় বজায় আছে। একমুখিনতাব ব্যাপাবটা চিন্তা করলেই গল্পের গোত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই গল্পে কাহিনী একটা থাকলেও, এবং ছোটগল্পেব বিশিষ্ট প্রতীতি অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, গল্পটি চরিত্রমুখ্য, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে story of Character। সুন্দরলালের চরিত্রই গল্পের উপজীব্য, তাকে দিয়েই গল্প শুরু হয়েছে শেষও হয়েছে তাকে দিয়েই। কিন্তু যে মোহ-মুদ্গরে দীক্ষিত সংসারবিবাগী সুন্দরলালকে গল্পের প্রথমে আমরা দেখি, গল্পের শেষে যে সে ঘুরে যায় একেবারে একশো আশি ডিগ্রি, এটাকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করাটাই অসাধারণ শিল্পনিপুণতার কাজ। লেখক সমস্ত গল্পে টান টান সাসপেন্স রেখেছেন, চরিত্রটির শেষ উন্মোচন যে এইরকমই হতে চলেছে তা আগে থেকে বুঝতে দেননি, অথচ যাতে গোটা ব্যাপারটা কোথাও বিশ্বাসযোগ্যতা না হারায়, সে জন্য, গোয়েন্দা গল্পে যেমন সূত্র রেখে যাওয়া হয়, তিনিই ছোটখাট ইঙ্গিত এবং অস্পষ্ট অথচ অব্যর্থ এমন কিছু পূর্বাভাস রেখে গিয়েছেন যে অনুভবী পাঠক দ্বিতীয় পাঠে বুঝতে পাবেন সূত্রগুলি এই কারণেই বুনে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং বলতেই হবে, প্রয়োগকৌশলের দিক থেকেও এটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের স্বীকৃতি পেতে পারে।

যেভাবে গল্প শুরু হয়েছে তাতে মনে হয় তিরিশ বছর বয়সেই সংসার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ মানুষ সুন্দরলাল নিজের আপন ভাইয়ের জঘন্য স্বার্থপরতায়, মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমার জ্বালায়, স্ত্রীর স্বৈরিণী আচরণে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে অগস্ত্যযাত্রায় এবং এসে পড়ে এমন এক শান্তশ্রীমণ্ডিত প্রকৃতির কোলে যেখানে থাকলে কদর্য সংসারের স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যায়—

'সামনে একখানা ছবির মতো নীল পাহাড়, তার সর্বাঙ্গে সাঁওতাল পরগণার অপূর্ব বনশ্রী! .....এখানে জঙ্গলের মধ্যে ডুম্ ডুম্ করে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। যখন মহুয়াবন অকস্মাৎ আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট গোলাপজামের মতো মহুয়ার সাদা ফুলগুলি তিক্তমধুর রসে টস্‌টস্ করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে তখন সুন্দরলালেরও যেন নেশা ধরে যায়'।

আমাদের জানানো হয়, এই অঞ্চলের সাঁওতালরা সুন্দরলালকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাসও করে। সে গেরুয়া নেয় নি, কিন্তু সন্ন্যাসী। কোনো ধর্মের ওপরই তার বিদ্বেষ নেই কিন্তু সাঁওতালদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে সে হাত দেখতে জানে বলে, শেকড়-বাকড় সম্বন্ধেও তার প্রচুর জ্ঞান বলে। এইখানে আমাদের একটু খটকা লাগতেও পারে, কারণ তার এসব জ্ঞানের পরিচয় আগে আমরা পাইনি, কিন্তু লেখক একটু আন্দাজ দিয়ে রেখেছিলেন, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই তিনি বলেছিলেন 'এবং সুন্দরলাল বুদ্ধিমান লোক',—লক্ষ করবার মতো, অনুচ্ছেদ এবং বাক্য শুরু হচ্ছে 'এবং' দিয়ে। যদি আমাদের শঙ্কিত করে আমাদের কিছু, তাহলে তা এই সংবাদ যে এই ভোল পাল্টানো ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে মাত্র দু-মাসে এবং 'এর মধ্যেই সাধু সুন্দরলাল মহাপুরুষ সুন্দরলালে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম করছে।'

তখনই আমরা নিঃসন্দেহ হই, সুন্দরলাল বুদ্ধিমান লোক বটে, এবং যখন দেখি ভুটানী খচ্চর চেপে সে বিভিন্ন জায়গায় যায়, হয়তো শহরেও যায় শিষ্য-সামন্তকে দর্শন দেবার জন্য, তখন এটাও বোঝা যায়, তার সংসার থেকে বেরিয়ে আসার কারণ, আর যাইহোক, সংসার-বৈরাগ্য নয়, কারণ এখানেও সে বেশ 'ভোগের' উপকরণ গুছিয়েই বসেছে। আমাদের এই অনুমান যে মিথ্যা নয়, লেখকের এই বর্ণনাই তার প্রমাণ—'মাথার পাগড়িটা খুলে একপাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সুন্দরলাল'। কাঁচা চামড়ার তৈরি পুরোনো নাগরা জুতোটার কাঁটা লোহাগুলোতে একটা কর্কশ শব্দে বেজে উঠল, আর সেই শব্দটাকে ছাপিয়ে ময়লা চাপকানটার লম্বা পকেটে ঝন ঝন করে সাড়া দিলে কয়েকটা ধাতুমুদ্রা।' সাঁওতাল পরগণার ওইরকম একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি ধাতু মুদ্রা কী 'দুর্লভ' জিনিস আমরা মোটামুটি অনুমান করতে পারি। সুন্দরলাল যেরকম 'ভাবমূর্তি' তৈরি করেছে তাতে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো অসুবিধা তার নেই, এটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। তবু এই টাকা পয়সা সংগ্রহ করা যে নিজের দাম আরো বাড়াবার জন্যই, সে কথা আমরা স্পষ্ট বুঝে যাই। পরে আমরা দেখেওছি, এমনভাবে সে এই অর্থ বিতরণ করে, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই। 'সন্ন্যাসী' এবং 'মহাপুরুষ' সুন্দরলালকে স্বভাবটাকে ভালো করে বোঝাবার জন্য আরো বেশ কয়েকবার টাকার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন লেখক :

(ক) 'চলার সঙ্গে সঙ্গে পকেটের টাকাগুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠেছে।'

(খ) 'চাপকানের পকেটে হাত দিয়ে সুন্দরলাল টাকা পয়সাগুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে বৈরাগী, সে হিসাবে ধাতব বস্তুর ওপরে তার যতটা অনাসক্তি থাকা উচিত তা নেই। সুন্দরলালের ভারী ভালো লাগে টাকা বাজানোর শব্দটা, ঠিক যেন গানের মতো কানে বাজে।'

(গ) 'পায়ের কাঁচা চামড়ার জুতোটা দূরে ছিটকে পড়েছে—পকেটের টাকাগুলো সমানতালে বাজছে ঝন্ ঝন্ করে।'

স্বভাব স্পষ্টতর করার জন্য অবশ্য, 'সন্ন্যাসী' সুন্দরলালের সম্বন্ধে আরো তথ্য লেখব দিয়েছেন—'চুলটি দিব্যি করে আঁচড়ানো, চাপকানের পকেট থেকে পিতলের ডিবে বের করে তা থেকে মস্ত একটা খিলিপান মুখে পুরে দিলে। জর্দার চমৎকার গন্ধটা দস্তুরমতো লোভনীয়।'

গল্পের এই পর্যন্ত এসে আমরা বুঝতে পারি, সংসার-বিতৃষ্ণা আসলে 'সুন্দরলালের ভণ্ডামি'। মামলা-মোকদ্দমায় সে 'জেরবার হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর পরিশ্রম করেও সম্ভবত সারা বছরের গমের খোরাক সে ব্যবস্থা করতে পারত না ('পাথরের মতো নির্মম রাঙা মাটিতে কঠিন পরিশ্রমে লাঙল ঠেলেও যদি ভালো গমের ফলন না করা যায়, তা হলেও এখন আর সংবৎসরের ভাবনা ভাবতে হয় না।'), স্ত্রীকে যেন ছেড়ে এসেছে তার অজুহাত হিসাবে স্ত্রীর আচরণ এবং ছট্টু তেওয়ারির বদমাইসির কথা বলা হলেও, আসল কারণটা প্রকাশিত হযে পড়েছে যখন সাঁওতাল মেয়েদের যৌবন ধরে রাখার রহস্য সে মনে মনে চিন্তা করেছে—'অল্পেতেই এরা বুড়িয়ে যায না বলেই হয়তো এদের যৌবন সব সময়ে বয়সের হাত ধরে চলে না। সুন্দরলালের সংসারাশ্রমের কথা মনে পড়ে। তার স্ত্রীর বয়স তো এখনো কুড়ি পার হয়নি, কিন্তু'—

সুন্দরলাল নিজের সংসার ত্যাগ করে সাঁওতাল পবগণায চলে এসেছে বৃহত্তর লাভেরই জন্য, এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। সেই জন্য সে সবল আদিবাসীদেব বিশ্বাস অর্জন করেছে বিস্তর মিথ্যা কথা বলে। সে ভাগ্যবিচাব করতে পাবে, ভূতপ্রেত তাড়াতে পারে, বাণ মারতে পারে এবং আরো অনেক অসাধ্য সাধন কবতে পাবে, কাবণ সে যে পিশাচসিদ্ধ। এই গল্পটা বিশ্বাস করাবার জন্য তাকে হিমালযেব চুড়োয় পাঁচশো বছর ধবে ধ্যান করা নাঙ্গাবাবার গল্প শোনাতে হয়, বলতে হয় নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে ধ্যান করার সময় সেই মূর্তি দর্শনেব কথা, তিনি যে তাকে পিশাচসিদ্ধ হবার বর দিয়েছেন, এ গল্প প্রচুর মশলা সহযোগে পরিবেশন করতে হয়। বোঝা যায় সুন্দরলাল আসলে একটি ভণ্ড, প্রতারক জাল সন্ন্যাসী মাত্র, সরল সাঁওতালদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছে এখানে। এই নিশ্চিন্ত জীবনকে আবো নিশ্চিত করবার জন্য সে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ির যে পথটা ধরেছে সেটা জেনে আমরা আরো আতঙ্কিত হই, কারণ এ প্রায় আগুন নিয়ে খেলা—'সাঁওতালেরা জানে মাঝে মাঝে তার ওপর ঠাকুব দেবতার ভর হয।' এই সময় নিজের অভীষ্ট সাধনেব কথাগুলো কায়দা করে বলে সে, অথচ সাঁওতালদের বিশ্বাস 'দেবতার নামে যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে সব।' দেবতার একটি কুদৃষ্টিতে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যান্ত মানুষ মরে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে—গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে।'

আদিবাসী মানুষের সাবল্যের এই অপব্যবহার, এই বর্বর শোষণ যে কেবল পাশবিক নয়, তার চেয়েও বেশি, সে কথা একটি অব্যর্থ ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন লেখক। এইরকম 'ভর' হওয়ার সময়—'শুধু অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভুটানী খচ্চরটা। কী একটা অস্বস্তি অনুভব করে খট খট শব্দে সে মাটির ওপর পা ঠুকতে লাগল।'

সুন্দরলাল যে মোহ-মুগদগরের শ্লোকেব সজীব উদাহরণ নয়, সংসার বৈরাগ্য যে তার সংসার উপভোগের নির্মোক মাত্র, এ কথা আমবা বুঝতে পেরেছি, নাচের সময় 'তরুণী'

মেয়ের আন্দোলিত দেহবল্লরীর ওপর গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়তে পারে তার দৃষ্টি, এটাও আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু সে যে আরো কত ভয়াবহ চরিত্র হতে পারে তার সামান্য একটা আভাস আমরা পাই গল্পে 'হঠাতই' একসময়, এবং সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকের কাছে তা সহসা-ব্যবহৃত দুর্বোধ্য কয়েকটা বাক্য মনে হতে পারে, যেন গল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রক্ষিপ্ত একটু অংশ :

'তত্ত্বচিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছে সুন্দরলালের মন। এমন করে আর চলে না। দুমাস—মাত্র দুমাস সময়, অথচ একটু একটু করে এগোতে গেলে গোটা বছরই যে কাবার হয়ে যাবে। ওদিকে ''সীজন টাইম'' পেরিয়ে গেলে এ সবের কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না।'

অর্থের একটা আভাস আমরা পেতে শুরু করি যখন বিনি সাঁওতালনীয় মানসিকে শিং বোঙার পুজোর আসরে ভর হয়ে পড়ে যায় সুন্দরলাল, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সেই প্রসঙ্গে—'পায়ে লোহার নালতোলা কাঁচা চামড়ার জুতো আর কুর্তার পকেটের টাকাগুলোমিলে উঠল একটা চকিত যুগ্মধ্বনি।' আর সেই মুহূর্তে অপ্রকৃতিস্থ অলৌকিক রহস্যময় কণ্ঠে সুন্দরলালের ঘোষণা : 'ঝড়ু সাঁওতাল শুনছিস? আমি শিং বোঙা তোদের ডাকছি—শুনছিস?' সুন্দরলাল এখন ওদের দেবতা স্বয়ং। সে ডেকে কী বলছে? বলছে গাঁয়ে 'হায়জা'-র মড়ক লাগবে, 'করম দেবতার রাগ পড়েছে, একটি মানুষও বাঁচবে না সেখানে। তাহলে উপায়? উপায়ও বলে দিচ্ছেন সুন্দরলালের মুখ দিয়ে দেবতা শিং-বোঙা—'নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সন্দরলালকে আঁকড়ে ধর। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে চলে যা। সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকবি।

দেবতার আদেশ! তাই যায় তারা। সঙ্গে সুন্দরলাল থাকতে তাদের ভাবনা কী! কিন্তু সুন্দরলাল 'কেন' হঠাৎ এই ভবিষ্যৎ-বাণী করতে গেল, কেন সাঁওতালদের পুনর্বাসনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল, কেন সাঁওতাল যুবতীদের শহর-চুড়ি-তেল-শাড়ির স্বপ্ন সফল করার জন্য এই বিরাট উদ্যোগ নিল, এই সব প্রশ্নে যখন আমরা দিশাহারা, তখনই গল্পের উপান্তে পাই সব কিছুর উত্তর, আবার সেই প্রক্ষিপ্ত অংশের মতো কয়েকটি পংক্তি :

'আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই।' এব সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে গল্পের সম্পদ এবং তাতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে সুন্দরলালের পরিচয়, একট মাত্র বিশেষণে—আড়কাঠি! বলা হয়েছে, 'বুধনীকে বাদ দিয়ে —আড়কাঠি সুন্দরলালের হিসেব করতে লাগল : বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে তার কমিশন পাওয়া হয় কত।'

সুন্দরলালের নারকীয় চরিত্র সম্পূর্ণ করেছে 'বুধনীকে বাদ দিয়ে' শব্দকটি। সাঁওতালদের সরল বিশ্বাসকে মূলধন করে তাদের সে বিক্রি করে দেয় চা বাগানের সাহেবদের কাছে, যৌবন লালসায় বুধনীকে যদি নিজের কাছে রেখে দিত, তবু তার পাশব সত্তাকে আমরা স্বীকার করতে পারতাম। সুন্দরলাল যে সে জন্য তাকে বাদ দেয় না, গল্পে তারও আভাস আছে, সেখানে বলা হয়েছে বাগানে অনেক মেয়ে আছে, 'কিন্তু বুধনীর জুড়ি নেই। সুন্দরলালের দুটো চোখে যেন গোখরো সাপ উঁকি মারতে লাগল। সায়েব ভালো জিনিসের কদর বোঝে।

অথচ সুন্দরলালের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটিতে উন্মোচিত হওয়ার পরেও লেখক আমাদের জ্বালা আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য বলেছেন—'বনবাস ছেড়ে আবার সংসারের দিকে ফিরতেই হল সুন্দরলালকে। উপায় নেই।' করম দেবতার কোপ থেকে এই নিরীহ সাঁওতালদের তার রক্ষা করতেই হবে। আর বিপন্নকে উদ্ধার না করলে তার কিসের সন্ন্যাস!

কথাসাহিত্য বিশ্লেষণে যাঁরা শব্দ-চাবির (Key word) সন্ধান করেন তাঁরা ভাবতে পাবেন ওই 'কাঁচা চামড়ার' জুতো এবং 'ধাতুমুদ্রা'-র কথা লেখক এতবার করে ব্যবহার করেছেন যেন—আমরা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি, উল্লেখ হয়নি এমন জায়গাও আছে একাধিক। সেকি এই অস্পষ্ট ইঙ্গিত যে মানুষের সজীব কাঁচা চামড়ার বিনিময়ে অর্থ উপার্জনেরই একটি অমানুষী গল্প এটি! শব্দ-সন্ধানী গবেষক ভেবে দেখতে পারেন।

দুই

গল্পের প্রয়োগ কৌশলের আর একটি অসাধারণ দিকের উল্লেখ না করলে গল্পটির প্রতি অবিচার করা হবে। সেটি হ'ল তাঁর প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবহার। মানুষের নৃশংসতা ও অর্থ-গৃধ্নুতার নারকীয় নির্মমতা ঢেকে রাখাবার জন্য এবং সেই একই সঙ্গে স্পর্শকাতর পাঠকের অনুভূতিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করবার জন্য এক-একটি নৃশংস আচরণের পরেই প্রকৃতির শান্তশ্রীর ছবি এঁকেছেন কখনো লেখক। যেমন দুমাসের মধ্যে সুন্দরলালের সাধু থেকে মহাপুরুষে পরিণত হওয়ার নীচতা উল্লেখ করার পরেই লিখেছেন—'আকাশ সন্ধ্যার রঙ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের অরণ্য মণ্ডিত চুড়োয় চুড়োয় নিবিড় ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগল।'

গল্পের শেষে যখন সাঁওতালদের সর্বনাশ সম্পূর্ণ। সুন্দরলালের পাতা ব্যাপ্ত বীতংসের ফাঁদ এড়িয়ে পালাতে পারেনি, ধরা পড়েছে সেই ফাঁদে, এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে, ঠিক তখনকার প্রকৃতির বর্ণনা :

'সকালের আলোয় সাঁওতাল পরগণার বনশ্রী অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে বসন্ত যেন আনন্দের উল্লাসে তরঙ্গিত। ছোট ছোট গোলাপজামের মতো সাদা মহুয়ার ফুল তিক্তমধুর রসে পরিপূর্ণ হয়ে টুপ টুপ করে খসে পড়ছে। ডালে ডালে সবুজের ছিট দেওয়া হরিয়ালের নাচ—ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক।'

প্রকৃতিকে ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে একটা প্রবল ঐকনাদের (resonance) সৃষ্টি করেছেন লেখক, এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে। রাত্রে নাচের আমন্ত্রণে গিয়ে বসার পর বর্ণনা এই রকম 'শালবনের ওপর দিয়ে চাঁদ তখন অনেকখানি উঠে এসেছে। মেয়েদের উজ্জ্বল চোখগুলিতে, সুঠাম সম্পূর্ণ দেহশ্রীর ওপর দিয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়তে লাগল তরল লাবণ্যের মতো।'

সুন্দরলাল ঠাকুরের ভয় হবার পর ভবিষ্যৎবাণী করছে, সাঁওতালরা সে কথায় বিশ্বাস করছে—এই অসুন্দর ব্যাপারের মধ্যে যে নৃশংসতা আছে, প্রাকৃতিক বর্ণনায় তা স্পষ্ট : দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নির্মম চাঁদের আলো অসীম প্রীতি আর বিশ্বাসের মতো ঝরে পড়েছে—ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন রজনীগন্ধার অসংখ্য ছিন্ন পাপড়ি। মহুযার গন্ধে শালফুলের বিষাক্ত নিশ্বাস চাপা পড়ে গেল।'

গোটা গল্পের একটা পূর্বাভাস কি রেখায়িত আছে গল্পের প্রথম দিকের একটা বর্ণনায়!

সেটা এরকম—'শালবন ঘেরা দুরের উপত্যকাটা থেকে যে ছোট পথটা ঘুরে ঘুরে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাসের প্রসারিত নিশ্চল বাহু।'

গল্পটির উপসংহারের কথা আলাদা করে বলতেই হবে এবং সেটা এই প্রসঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত। একটি নির্মম গল্পের শেষে হয়তো সমান্তরাল ভাবেই, প্রাকৃতিক বর্ণনা ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনীর' উপসংহার। পাখির করুণ মৃত্যু এবং 'কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্ গজ্ করতে লাগল'—এই করুণ তথ্যে রবীন্দ্রনাথ গল্প শেষ করেন নি, শেষে একটি অসাধারণ প্রকৃতি-বর্ণনা রেখেছেন—বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।'

অনুভূতিশীল পাঠকের এই উপসংহার মনে পড়বেই যখন তিনি 'বীতংস' গল্পের উপান্তে দেখবেন সুন্দরলালের পাশব অর্থগৃধ্নুতায় গল্প শেষ হচ্ছে না তার পরেও আছে এমন একটি প্রাকৃতিক চিত্র যার তুলনা 'তোতাকাহিনী' ছাড়া আর কোনো গল্প হতেই পারে না:

'সাঁওতাল পরগণার বিমুক্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে বসন্তের অকৃপণ আনন্দধারা। সকালের হাওয়া লেগে পাহাড়ী পথের ওপর কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল।'

বনতুলসী : বিশ্বে প্রতিবিম্ব

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎকট রোমান্টিকতায় স্বভাবমেজাজী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গত শতাব্দীর চারের দশকে মধ্যবিত্ত জীবনভাবনার এক নিয়মিত অংশীদার। গল্পমেজা বাঙালীর কাছে তিনি বিচিত্র উপভোগের দিশারী। এক দশক জুড়ে (তিনের দশক) প্রান্তিক মানুষের জীবনে শিকড় সন্ধান করে যুদ্ধধ্বস্ত বাংলার কথাসাহিত্য তখন অনেকটাই ধাতস্থ। নিশ্চিন্দিপুর, কেতুপুর, গাওদিয়া, বাঁশবাদির গ্রাম পর্যবেক্ষণার বিপুল উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসে চারের দশকে দাঁড়ে বসে শ্রমবিনোদনের আবার সময় এসেছে। নগরকলকাতার জীবনচেতনার দিকে অভিমুখ ফিরতে শুরু করেছে। নারায়ণবাবু এই স্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েই বস্তুতান্ত্রিক সমাজচৈতন্যের সঙ্গে রোমান্টিক ভাবকল্পনার টানাপোড়েন কাজে ব্যস্ত। অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণে নাগরিক জীবনস্তরের যন্ত্রণা, মধ্যবিত্তের গোত্রান্তর ভাবনার বিলাস, থিকথিকে বাস্তবতার গহনে চোরাযৌনতার দাপাদাপি, দিগভ্রান্ত যুব শক্তির বিপুল অপচয়ে উদ্বিগ্নতার বাণী বিস্তারে নারায়ণবাবুকে ততটা নিয়োজিত অবস্থায় আমরা দেখি না। বরং বাস্তবতার অভিশাপকে দেখে বুঝে জেনেও তিনি ভালো লাগার এক মরমী প্রতিবেদন গড়ে তুলেছেন। এজন্য কী ঐতিহ্য, কী প্রকৃতি প্রেম কারও হাত তিনি চূড়ান্তভাবে ছাড়েন নি। সেদিন উপনিবেশে প্রাগৈতিহাসিক হিংসার পাশে আরণ্যক প্রণয়োন্মাদনার গৃহশ্রীকে একই পাত্রে তিনি অনায়াসেই বিতরণ করলেন, বাঙালী পাঠক মুহূর্তেই তাঁর ধাতুপ্রকৃতিব সঙ্গে পরিচিত হলো। নারায়ণবাবুর কথা রস আর আমাদের শ্বাসরোধকারী বাস্তবতায় আটকে না রেখে পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গের উন্মুক্ত প্রকৃতির রাজ্যে একবার ছুটি কাটিয়ে আসার ডাক দিলো। এইভাবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঘশিকাবেব জন্য মানবশিশুর টোপ আমাদের চোখেব সামনে ঝুলিয়ে রেখেই আমাদের উত্তরবঙ্গেব আরণ্যকন্যার মনোজ্যোৎস্নায় (বনজ্যোৎস্না গল্প) অবগাহন স্নান সেরে নিতে বলেন, প্রকৃতির সর্বগ্রাসী মাদকতায় আচ্ছন্ন চৈতন্যে addicted হবাব ডাক দেন। নারায়ণবাবু অনবদ্য উদ্ভাবনী প্রতিভার মুখোমুখি হয়ে আমাদের আদিম গল্পক্ষুধা এইভাবেই অনেকটা শান্ত হওয়াব অবকাশ পায়। যাঁবা সম্ভ্রবান হয়ে গল্প পাঠ করিনা, সতর্ক পা ফেলে ফেলে যাঁরা ভেতরেব ফোকব খুঁজে বেড়ান না, তাঁদের কাছে নারায়ণবাবুর গল্পে উৎকেন্দ্রিকতার টুকরো বর্ণবাহারগুলি অন্য এক মজা নিয়ে অনায়াসেই ধরা দেয়।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বর সাহায্যে উদ্ভট রসের প্রবর্তনায় সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী যেমন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তেমনি—বাস্তবের সূত্রে অবাস্তবতার আয়োজনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক দক্ষ শিল্পী। 'বনতুলসী' গল্পটিকে ধবে এই অনুমানের প্রামাণিকতায় সহজেই পৌঁছানো যায়। গহন উদ্ভিদবাসনার এক বিচিত্র উদ্‌ভাবনা থেকে এ গল্পের জন্ম হয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে এমন মাংসাশী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায়, মানবদেহের রক্ত-রস যাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু তাই বলে মানবশরীরের কাছে উদ্ভিদ শরীরের রমণসুখ প্রার্থনার কোন দূরতম বিজ্ঞানভিত্তি নেই। অলীক অতিকল্পনার বিষয় বলা চলে এমন ধারণাকে। অথচ নারায়ণবাবু অনায়াসেই এমন

ভাবসম্পাতনের সাহসিক ব্যবস্থা করলেন। মনে হলো, ফরাসী সাহিত্যবিদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বালজাকের বিশ্ববিখ্যাত গল্প Passions of the Desert গল্পের কাছে এই অনুভব সূত্র ধার করে থাকতে পারেন। আশ্রয় সন্ধানের তাগিদে মরুভূমিতে এক সিংহীর গুহায় আশ্রয় নিতে গিয়ে মৃত্যুর উদ্যত থাবার সামনে পড়েছিলেন নায়ক। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য নায়ক একই জীব-চক্রের সদস্য হিসাবে ধীর পরিকল্পিত সোহাগে নারী সিংহকে পৌরুষ-প্যাশনের জালে বন্দী করে ফেলে। এক অনবদ্য শিল্পসুষমায় মোপাসাঁ সেখানে জীবনবাসনার বীজধর্মটিকে ঠিকই চিহ্নিত করেছিলেন। ঐ অসম প্রীতি সত্যপ্রণয়ের এক সুনিশ্চিত দলিল হয়ে উঠেছিল। পরিবেশের দায় ও অপরিহার্যতা ঐ মহান গল্পের জাদুরচনায় এক অনিবার্য ভূমিকা পালন করেছিল। ও গল্প ছিল প্যাশন জাগানোরই গল্প, কোন পারস্পরিক সংলিপ্ততার গল্প ছিল না। নায়কের দক্ষ হাতের কামকলায় সিংহীর নারী দেহে শিহরণ ছড়িয়ে পড়েছিল, বাঁচার কেন্দ্রীয় আগ্রহেই সেদিন পুরুষের সঞ্জীবক হাত কথা বলে উঠেছিল। নারায়ণবাবুর 'বনতুলসী' গল্পের সঙ্গে ঐ গল্পের কোনই ভাবসাদৃশ্য নেই। 'বনতুলসী' উভয়পক্ষেই বাসনা-সংলিপ্ততার গল্প। আর প্রক্রিয়াটাও উল্টো ধরনের। নায়িকা বনতুলসীই এখানে স্বেচ্ছা-কামচারিণী। পুরুষটি এখানে তারই কামপরবশ্যতার শিকার। দ্বিতীয়ত, প্রথম গল্পে একই life-cycle-এর অন্তর্গত ছিল সিংহী এবং মানবপুরুষ। এরা দুজনেই প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের যৌন ক্রিয়ার ধরনও একই প্রকারের। কিন্তু 'বনতুলসী'র কল্পনায় সত্যসঙ্গতার সংস্পর্শে নেই বললেই চলে। উদ্ভিদ মানবসহবাসের কল্পনায় নূতনত্ব থাকলেও তার অলীকতাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। পাঠককে যদি সম্ভাব্যতা সূত্র সন্ধান করতেই হয়, তবে গল্পের অন্য এক মাত্রায় চোখ রাখা ভালো। তখন এই অসম শরীরী আবেশের কোন বাস্তব প্রতিপাদনমূল্য থাকে না। গল্পটি আত্মরসায়ন বা আত্মকণ্ডুয়নের এক প্রতীকী গল্প হয়ে দাঁড়ায়। 'বনতুলসী' তখন অনিবার্যভাবে দ্বিমাত্রিক গল্প হয়ে ওঠে।

আরও একটি কথা। 'বনতুলসী' গহন অরণ্যের কোন অজানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাছও নয়। এ উদ্ভিদ সচরাচর লোকালয়েই পাওয়া যায়। নির্জন ঝোপঝাড়ের অযত্ন সমতলে মরশুমী কাশফুলের মতোই বনতুলসীর ঝাড় বেড়ে ওঠে। সাধারণ গৃহী মানুষও এর লম্বা ডগা, মঞ্জরি এবং ধূসর রঙের বড়ো পাতা দেখে নিত্যপূজায় ব্যবহৃত তুলসীর সঙ্গে এর ভেদ করতে পারে। বাঙালীর শুচি পবিত্রতার ধারক তুলসী পাতার মতই এর কষায় কটুস্বাদ। গন্ধও ঝাঁঝালো। গন্ধ-স্বাদে বনতুলসীর পার্থক্য শুধু degree বা মাত্রা ভেদে। উভয় তুলসীর ওষধিগুণ প্রায় সবার জানা। কিন্তু বনতুলসীর দেহরসে একধরনের মাদকতা আছে এবং তা চেতনা আচ্ছন্ন বা লুপ্তির আংশিক ক্ষমতাবিশিষ্ট, এসব সূত্র উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাছে পাওয়া গেছে। বনতুলসী গাছে প্রচুর উদ্বায়ী camphor জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেটা ঘ্রাণের সাহায্যে মানবদেহে ঢুকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে কাজ করে। ফলে এক ধরনের হালকা ঝিমুনি ঘটতে পারে। হয়তো এই সূত্রকেই অতিরঞ্জিত করে নারায়ণবাবু এই গল্পের পরিকল্পনা করেছেন। তবু 'বনতুলসী' গল্পে নায়কের চেতন্যলুপ্তিকে অবাস্তবতার দায়মুক্ত করতে হলে অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। আর এখানেই গল্পের চমৎকারিত্ব চূড়ায় ওঠে। 'বনতুলসী' তখন বহিরাবরণের মোড়কে মোড়া মানবীয় চেতনারই গল্প হয়ে দাঁড়ায়। পাঠককেও দুই

অসম শ্রেণীচক্রের সহবাসের তলসন্ধানে অযথা গলদঘর্ম হতে হয় না। 'বনতুলসী' হয়ে ওঠে মানবীয় জীবনচক্রেরই এক মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

এতেই সব কিছুর সুরাহা হলো এমনটা না ভাবাই ভালো। আগেই বলেছি, লেখকের কল্পনাধর্মী গল্পে উৎকেন্দ্রিক মুহূর্তগুলির বাড়তি এক মজা আছে। সেগুলো সমেতই গল্পের আস্বাদ নেওয়া বিধেয়। যেমন, এখানে অবসন্ন স্নায়ু দশায় নায়কের একবার মনে হলো কৈশোরের প্রণয়-সঙ্গীকে ভরাযৌবনে ফিরে পাওয়ার পর বনতুলসী ঝড়ের স্মৃতি-গ্রন্থি নাড়া খেয়ে উঠেছে এবং তারই আকুলতায় লাল লাল ডগাগুলি তাকে আলিঙ্গন বেষ্টনে ধরার জন্য ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানেও বিশ্বাসযোগ্যতার ফোকরটা এই, মানুষ বিশেষ স্থানের পূর্ব অভিজ্ঞতার জেরে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ঐ স্থানের আধারে বা সাধারণভাবে স্মৃতিলোকে ধরে থাকতে পারে এবং ঐ স্মৃতিবাহিতায় একজাতীয় আত্মরতিও থাকে, কিন্তু বিপরীতে কোন উদ্ভিদে সে ক্ষমতা আরোপের কোন জায়গাই নেই। অতএব অনুমান করতে হয়, ওটাও নায়কের মনোবিলাসের আর এক অংশ। যৌনাবেশের কল্পসুখে তলাতে তলাতে নায়ক ভাবছে অপরপক্ষের গাঢ় আলিঙ্গন বেষ্টনীর কথা। তাই বনতুলসীর ডগার আন্দোলনকে সাপের কিলবিলিয়ে ধরার উপমায় ভাবতে নায়ক আনন্দ পাচ্ছে। এইভাবেই বনতুলসী গল্পে দ্বি-মাত্রিক ব্যাখ্যার এক সত্য-সৌধ গড়ে ওঠে। আর কেবলমাত্র তখনই উৎকেন্দ্রিকতার ফাঁক ফোকরগুলো আপনা থেকে ঢেকে যায়।

গল্পটির কার্যকারণের সেই অদৃশ্যগ্রন্থিটি সর্বাগ্রে খোলা দরকার। গল্পের নায়ক ঘটনামুহূর্ত অবধি যে মধুর আশ্লিষ্ট স্মৃতিকে বহন করছে, তার সূত্রপাতের এক কৈশোর মুহূর্ত আছে। শরীর রহস্যের আনন্দে বিভোর সদ্যকিশোর যেভাবে নির্জনকল্পনায় অনেক কিছু গড়ার কারিগর হয়ে ওঠে, নায়কও সেই বয়সে এক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। এক নির্জন পল্লী প্রকৃতির উধাও সৌন্দর্যের সঙ্গে রসায়ন সূত্রে শরতের সোনাঝরা আকাশ (যা রক্তের মধ্যে মদের মতো ক্রিয়া করে), ছোট্ট অনাদৃত গ্রাম্য নদী, বনতুলসীর কিছু ঝোপ এবং রসায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এক গ্রাম্য কিশোরীর উপস্থিতি, এ সবের সমন্বয়েই নায়কের অবচেতনায় এক সুখকর কৈশোর স্মৃতি জন্ম নিয়েছিল। আত্মমুখী কিশোরের অবচেতনায় যৌনবাসনার সঙ্গে ঐ স্মৃতি বিজড়িত হয়ে অর্থবহ বিশিষ্টতা পায়। নারায়ণবাবু তাঁর কারুকর্ম লুকিয়ে না রেখেই পাঠকের সামনে ফ্রয়েডীয় কার্ডটি পেশ করেছেন। "...ছোট ছোট মঞ্জরী ছিঁড়ে নিয়ে ডলে ডলে দুহাতে তার অরণ্য গন্ধটা মাখিয়ে নেওয়া। এই গন্ধবিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডীয় মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্যই সেদিন আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম সে কথাটা অস্বীকার করবার জো নেই।' অবচেতনের এই নিঃশব্দ স্বপ্ন রচনাই সত্য কথা, কাজেই 'হয়তো'র কোন স্থান নেই এখানে। অনাকাঙ্ক্ষিত যৌনতার নিবৃত্তি পুরুষের কাছে নারীতে। তাই নারীর ভূমিকা ছাড়া এই চেতনার রেহাই নেই। যতদিন তা না হয়, ততদিন প্রতীক নিয়েই অবচেতনার লীলা বহাল থাকে। 'বনতুলসী' গল্পও এই সত্যসাধনের দিকে অগ্রসর। এ জন্যই কৈশোরের উদ্রিক্ত মুহূর্তের স্থায়ীত্ব পাওয়ার সমর্থন শিল্পীর রচনাসাক্ষ্যেই পাওয়া গেছে।

● হাতের থেকে সেই উদ্ভিদ রসের কষায় গন্ধটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু রক্তের থেকে নয়। বহুদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সরু সরু লালরঙের ডাঁটাগুলো বাতাসে

ঢেউয়ের মতো দুলছে; অনেক নিঃসঙ্গ ভাবনার অবকাশে শুনতে পেয়েছি ছোট ছোট সরু পাতাগুলোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শিরশিরানি শব্দ। রোমান্টিক মনের মুহূর্ত বিলাস আমন্থর হয়ে উঠেছে কটু কষায় একটা গন্ধের উল্লাসে।

গল্পটি যে এক নিখুঁত যৌন-তৃষ্ণার গল্প তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনের কোটারবন্দী অবদমিত যৌনচেতনার অকস্মাৎ প্রবল আত্মপ্রকাশ উত্তেজনাতেই নায়ক হতচেতন হয়ে পড়েছে। স্বপ্নাশ্রয়ী যৌনতাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল আবারো এক নারী। এক্ষেত্রে এক নিরাবরণা সাঁওতাল যুবতী। এখানে স্বপ্ন রূপায়ণের সেই সজীব অনুঘটক। কিন্তু আবারও সজ্ঞান পরিশীলিত মন বাধা দিলো। তখন আর অবচেতনে স্বপ্নাকারে তার পুনঃপ্রেরণের সুযোগ নেই। তাই নিরুপায় নায়ক প্রতীকের কাছেই চেতনামুক্তির খোরাক চাইলো। কাজেই গল্পের শীর্ষবিন্দুর মিলন বাসর নায়কেরই নিজস্ব কল্পনা। চেতনালুপ্তি তার স্নায়বিক উত্তেজনার নিয়ন্ত্রণহীনতাও হতে পারে, আবার অবদমিত বাসনাতৃপ্তির পরবর্তীকালীন অবসাদও হতে পারে।

আগের উদ্ধৃতি থেকে আর একটি সুন্দর উৎকেন্দ্রিকতার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। নায়কের যৌবন স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়েছে এক গন্ধোল্লাসে। গল্পেও বারবার কষায় গন্ধের কথা পুনরুচ্চারিত হয়েছে। এমন গন্ধব্যাকুল যৌনতার সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় ছিল না। উদ্ভিদ-মানবের সঙ্গরঙ্গ থেকে শিল্পী এবার পতঙ্গ মানব প্যাটার্নের অভিমুখী হলেন। পতঙ্গ বিজ্ঞানে গন্ধ যৌন সঙ্কেতের এক প্রক্রিয়া। পুরুষ ও নারীপতঙ্গ গন্ধ বা শব্দের টানে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখানে নায়কও পতঙ্গ জনোচিত গন্ধামোদের অধীন। গল্পের তুলসী পর্বে দেখা গেছে কটু-কষায় গন্ধের সম্মোহনেই নায়ক বনতুলসীর ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারেনি, সেখানেই শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে।

এবার অনুঘটক সূত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কমলাবিলে ইটালিয়ান ডাকশিকারে গিয়ে নায়ক এক সাঁওতাল রমণীর দেখা পেয়েছিল। ঐ পূর্ণযৌবনা নারীটি না থাকলে এ গল্প আদৌ দাঁড়াতো না। তাকেই এ গল্পের মুখ্য ভাব সঞ্চলিকা বলা যায়। সাক্ষাতের বিবরণ এইরকম—

● চোখে পড়ল কালো পাথরে তৈরী ভেনাস। পূর্ণ যৌবনা সাঁওতালের মেয়ে। বিন্নাবনের আড়ালে নির্জনখালের ধারে দাঁড়িয়ে সযত্নে গাত্রমার্জনা করছে। চারিদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসঙ্কোচ এবং একান্ত নিরাবরণ। কনক-চাঁপা রঙের রৌদ্রে উদঘাটিত অপূর্ব দেহশ্রী।

এখানে নায়কের প্রতিক্রিয়াটাও সযত্নে ধরা আছে।

● লোভের বিকৃত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে আমি তাকাইনি—সে প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর ছিল।

না, সম্পূর্ণ অবান্তরতার কথা ওঠে না। পরিশীলিত বাহ্যদৃষ্টিতে বিকৃত ক্ষুধার বদলে তন্ময়তা থাকলেও ফ্রয়েডীয় মতে তাকে নিরপেক্ষ রূপারতি বলে না। দর্শনের সময়ক্ষণ নিয়ে খেয়াল না থাকার পরিণামে ছদ্ম যৌনাকাঙ্ক্ষাই বর্তমান থাকে। না হলে নায়ক কেনই বা বলে,

● আমার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন রণিত হয়ে উঠল কৈশোরের সেই গান, সেই মীড়-মূর্চ্ছনা। আমার দুহাতের ভিতরে যেন ফিরে এসেছে একটা কটু-কষায় উদ্ভিদ গন্ধ। ....কেমন যেন মনে হল সেই হারিয়ে যাওয়া নায়িকা

আজ পরিপূর্ণ যৌবনে ওই বন-তুলসীর কুঞ্জে আমারি জন্যে অপেক্ষা করছে।

শারীরিক ক্রিয়া এবং ঐ সাঁওতাল রমণীর আসঙ্গ লিপ্সায় বনতুলসীর ঝোপকে সঙ্কেত কুঞ্জ হিসাবে অনুমান সবটাই যৌন-বাসনার পরিষ্কার প্রকাশ। লেখকও যে বিনা আড়ালে ঐদিকেই গল্পকে ঠেলেছেন তাও পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর জবানিতে। ফ্রয়েডীয় যৌনতার কথা আগেই মেনেছেন। এবার স্বীকার করলেন তার বিধিমত প্রতিক্রিয়াকে।

● ......বলেছি আমার মগ্ন-চৈতন্যের ভেতরে সেই বন-তুলসীর বিচিত্র আস্বাদ। হয়তো তখন আমার মনের ভেতরে ওলট্-পালট্ হয়ে গিয়েছিল, চেতনসত্তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছিল অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপে; আমি বনতুলসীর জঙ্গলের দিকে নেমে এলাম।

প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন হাঁটার মতোই। অবচেতনার নির্দেশে নিষিদ্ধ মিলন উন্মুখতায় প্রতীক্ষমানা যুবতীর সন্নিধানে নায়কের যাত্রা। ভিতরের গুপ্ত মানসিকতা বলছে নিশ্চিতভাবে ঐ ঝোপের মধ্যেই সাঁওতাল রমণীকে পাওয়া যাবে। এগল্পে আবৃতবাসা ভদ্রনারী থাকলে এই মানস বিস্ফোরণটি ঘটতো না। পূর্ণযৌবন এবং সাঁওতাল রমণী যে আদিমতার বোধকে জাগিয়ে দিয়েছিল, নিরাবরণ দশা তার মধ্যেই তৈরি করে দিলো যৌনক্ষুধাকে। তবেই নিশির ডাকে বনতুলসীর বনের পথে নায়কের নেমে পড়া। না, বনতুলসী তার কোন নিজস্ব প্রভাবগুণে নায়ককে আহ্বান করলো না। নায়কই এগিয়ে গেল বনতুলসীর ঝোপের দিকে। কারণ অবচেতনার অন্ধকারে পিপাসিত যৌনতা হঠাৎই অনুকূল সুযোগে আড়াল-নির্জনতায় কল্পিত সংঘটন চাইলো। নিষিদ্ধসুখের চোবা আনন্দে এইভাবেই মনস্তত্ত্বপ্রবণ মানুষকে মত্ত হতে দেখা যায়। নায়ক এক উত্তেজনা প্রবণ যৌন-আবেশে মত্ত। তার স্নায়ুর পারদ চড়া, বনতুলসীকে আগ্রাসী ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠতে দেখা সবই তার মানসকল্পনার ফল। নায়কের অবরুদ্ধ উদ্দীপনার রঙেই প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে বনতুলসী। বনতুলসী এবং কাম্য সাঁওতাল কন্যা এখানে অভিন্ন হয়ে গেছে তার কাছে।

● ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল লাল ডাঁটাগুলিতে রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

উদ্দীপ্ত বাসনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনার যোগ সুনিবিড়। তুরীয় দশায় মেরে ফেলা বা মৃত্যু চাওয়ার প্রার্থনা সাহিত্যে সাঙ্গীকৃত হয়ে যেতে দেখা যায়। তাই এ গল্পের নায়কও উৎকল্পনার ঝোঁকে ভাবছে—

● এইখানে মরে যাবো আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তার পর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্ঠুর, আরো একরাশ বন-তুলসী।

এইরকম তীব্রতার রোমহর্ষক ঝোঁকেই কথা বলতে ভালবাসেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এটাই তাঁর স্বভাববৈচিত্র্য। প্রাকৃত সত্যের গভীর থেকে অপ্রাকৃত বাষ্প উঠে এসে কখন আমাদের ছেয়ে ফেলে। মনে হয়, এক তেজস্ক্রিয়তার অতলে আমরা কেবলই তলিয়ে যাচ্ছি।

'বনতুলসী' গল্প হিসাবে মাঝারি ধরনের গল্প। ঘটনা ও 'ইম্প্রেশন' এর মাঝামাঝি জায়গায় এ গল্পের অবস্থান। চকিতে ক্লাইমেক্সের মধ্যে নিক্ষেপ করে পাঠককে গোড়াতেই

উৎকণ্ঠার জালে জড়িয়ে ফেলার ভাব এখানে অনুপস্থিত। বরং মূল সম্পাতন বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য গল্পকারকে অনেক আগে নিজও সাধারণ সংযোগসূত্র ধরে অগ্রসর হতে হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে গল্পের প্রতিপাদন সূত্রকে গোড়ায় ঝুলিয়ে দিয়ে পরিণামে তার পুনরুচ্চারণ করেছেন। এতে ভাবকাঠামোর ছবিটা খানিকটা তৈরি হয়েছে পাঠকের মনে। না হলে একাধিক বিন্দুতে সরে যাওয়ার মুহূর্তগুলিকে (shifted moments) মিলিয়ে জড়ো করার পরিশ্রমে পাঠকের মন রসপরিণামে বেশিক্ষণ স্থিত থাকার অবকাশ পেতো না। বন্ধু বিমলেন্দুর তৃতীয় কন্যা লাভের জেরবার দশা থেকে একটি তর্কবিন্দু সাধারণভাবেই জন্ম নিলো। 'বৌ, ছেলেমেয়ে বাঁধা রুটিনের চাকরী, যক্ষ্মার মতো জীবন। তার চাইতে অনেক ভালো আকাশ, একটা অবারিত দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে—' দায়িত্বশূন্য অবাধ উপভোগের মন্ত্রের জন্যই মহুয়া এবং সাঁওতালের মেয়ে প্রক্ষিপ্তভাবেই এসে গেছে। আর এ গল্পের কেন্দ্রবীজ সাঁওতাল কন্যার একটা পূর্বাগম সঙ্কেতও স্বচ্ছন্দে মিলছে। যেন শ্মশানভূমি থেকে গোরুর রচনায় অনুপ্রবেশের এক বানানো ছিদ্রপথ। বিমলেন্দুর রুটিনবদ্ধ জীবন-বীতস্পৃহা কিন্তু বেশ স্পষ্ট। তর্কচ্ছলেই তাই নায়ক প্রতিপাদ্যসূত্রটির যোজনা করলো—'কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়—প্রকৃতির প্রেমও ওইরকম সর্বগ্রাসা।' এই সূত্রানুষঙ্গেই নায়ক বিবৃত করলো তার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনীকে, যার 'উপক্রমণিকায় কৈশোরের অপ্রস্তুত যৌন-আসঙ্গের আর এক উপকাহিনী গড়া হলো। তাহলে, লেখক গল্পের শীর্ষ চূড়ায় স্বয়ং আরোহণ করলেন না, এজন্য গল্প বর্ণিত নায়কের ভাবদণ্ডটিকে তাঁকে ধরে রাখতে হলো। পাঠকও বুঝলেন, মনুষ্য প্রেম নয়, সর্বগ্রাসী প্রকৃতিপ্রেমের কাহিনীর জন্যই এতো পাঁয়তাড়া। গল্পের প্রারম্ভ লগ্নে স্বাধীন মুক্ত মনুষ্য প্রেমের সঙ্গে সর্বগ্রাসী প্রকৃতিপ্রেমের সাদৃশ্যের কথা ছিল। গল্পের শেষে অভিনব উদ্ভিদ-প্রেম থেকে নিষ্কাশিত হলো এই প্রত্যয়-সূত্রটি—

> ● তাই তোমাকে বলছিলাম, তবু আমাদের কলকাতাই ভালো। আর ভালো মানুষের প্রেম, যেখানে তুমি না থাকো, সৃষ্টির স্বাক্ষর সন্তানের মধ্য দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে—প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর তোমাকে একেবারে অবলুপ্ত করে নেবে না—

এখানে দুই প্রেমের স্বভাব-সাদৃশ্যকে ছাপিয়ে গেল 'বনতুলসী'র প্রেম। মানুষের প্রেম যে অন্যপক্ষের অবলুপ্তির ফরমান নিয়ে আসে না, এটাই তার নির্ভরতা ও সহনীয়তার দিক, গল্প একথাই বোঝাতে চাইলো। এই প্রতিপাদনতত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক শেষ paraটি না থাকলে গল্প এক খাপছাড়া উদ্‌ভ্রান্তিতে কাটা ঘুঁড়ির মতোই ঘুরপাক খেতো। তার বদলে প্রারম্ভবিন্দুর সংযোগে ফেরাটা বোধ হয় একজাতীয় স্বস্তিই তৈরি করে দিলো। গল্পটির উদ্ভাবন চমৎকারিত্ব কিন্তু অন্য এক প্রশ্নে নিহিত। মানুষের মগ্নচৈতন্যে (অবচেতনা) ঘুমও যৌন প্রণয়-বাসনার মুক্তির জন্য সোজা পথ অবলম্বন না করে নারায়ণবাবু এক ঘুরপথের পাকদণ্ডী ধরলেন। উদ্ভিদের স্বভাবশান্ত প্রকৃতির মধ্যে এক সর্বগ্রাসা শরীরী আসঙ্গের দাহ তৈরি করতে হলো, যার সহযোগে প্রতীকের (বনতুলসী তো আসলে সাঁওতাল মেয়েরই প্রতীকছায়া) মানরক্ষা হলো। ঘুরপথের পরিক্রমায় শিল্পীর কবিত্ব এবং উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে আমাদের আর একবার পরিচয় ঘটলো, এই যা গুরুতর লাভ।

হাড় : প্রবঞ্চিতের চোখে যাদু-স্বপ্ন

শুকদেব সিংহ

পৃথিবীর দু জাতীয় মানুষ সম্পর্কে কার্ল মার্কস্ বলেছেন এক জাতীয়ের কিছু নেই, তারা নিঃস্ব, have-nots। অন্য জাতীয়ের প্রচুর আছে তারা the haves।

লেখক এই গল্পে the haves এর অন্তর্গত এক রায়বাহাদুরের কথা বলেছেন যিনি নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলেন। কোথাও অভিজ্ঞতার নামে, এ্যাডভেঞ্চারের শখে, ভৌতিকতার ওপর বিশ্বাসে নিজের সমস্ত জীবনটাকে ব্যয় করে ফেলেন।

গল্পের বক্তা ও লেখক তার বাবার বন্ধু রাসবিহারী এভেন্যুর এক রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন চাকরির উমেদারি করতে। বাবার একখানি চিঠি নিয়েই।

রাসবিহারী এভেন্যুর কোলাপসিবল ঘেরা বাড়ির সামনে গিয়ে লেখক নিজেকে বিব্রত বোধ করেছেন কী করে তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকবেন একথা ভেবে। বাড়ির সামনে একটা ডাস্টবিনকে কেন্দ্র করে কয়েকটি হাড্ডিসার কুকুর কয়েকটা হাড়ের টুকরো নিয়ে তুমুল লড়াই শুরু করেছে।

এদের দেখেই লেখকের মনে হল এরা have-not এর প্রতিনিধি। অন্যদিকে রোলিং-এর ফাঁক দিয়ে লেখক লক্ষ্য করলেন ভেতরে বলিষ্ঠ দুটি কুকুর বাড়ির সর্তক প্রহরী রূপে মোতায়েন রয়েছে।

লেখক পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের কাছ থেকে একটা চাক্‌রির সুপারিশ পত্র জোগাড় করার আশায় বাড়ির গেট ছেড়ে যেতে পারলেন না। তিনি হঠাৎ দেখলেন একটি কিশোরী বাড়ির বাগানের মধ্যে ঘুরছে।

অনেক আশা দিয়ে লেখক কিশোরীটিকে ডাকলেন। কিশোরীটি তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। বাবার দেওয়া চিঠিটি রায়বাহাদুরের হাতে দিতেই তিনি চিঠিটি পড়ে বললেন—প্রমথ-র ছেলে তুমি সামান্য কেরানিগিরির জন্য সুপারিশ চাইতে বললেন, এসেছো? বাবা ছোটবেলায় কত সাহসী ও বেপরোয়া ছিল। লোভনীয় চাক্‌রি থেকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

লেখক তখন বললেন—নানা রকম অসুবিধায় পড়ে তিনি এম-এ্ পাশ করেও চাকরির প্রার্থী। অনিশ্চিতের মধ্যে কারণ সংসার চালাতে হচ্ছে।

রায়বাহাদুর বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বললেন, জীবনটাই তো অনিশ্চিত হে। আমিও নিজেকে একদিন ভাসিয়ে দিয়েছিলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে। অনেক দেশে গিয়েছি, পৃথিবীটাকে চোখ মেলে না দেখলে বাঁচার অর্থ নেই কোনো।

লেখক রায়বাহাদুরের কথায় অগত্যা সায় দিলেন। রায়বাহাদুর নিজের গল্প তিনি ড্রয়ার থেকে বার করলেন একটা ভেলভেটের বাক্স। তাতে প্রত্যেকটি ছোট বড় হাড় থেকে ঝুলছে এক একটা লেবেল। বললেন প্যাসিফিক ঘুরে তিনি এগুলিকে সংগ্রহ করেছেন।

রায়বাহাদুর একটুকরো হাড় হাতে নিয়ে বললেন চিনতে পারো এটা কিসের হাড়?

ভয়ে ভয়ে লেখক বললেন—গরিলার হাড়।

—ননসেন্স্—রায়বাহাদুর একটা ধমক দিয়ে বললেন—প্রশান্ত মহাসাগরে গরিলা আছে, শুনেছো কখনো?

এটা রোডেসিয়ান স্বজাতির কোনো আদি-মানবের চোয়ালের হাড়।

রোডেসিয়ানের নাম লেখক জানেন কি না জিগ্যেস করতে।

মোসাহেবের মতোন লেখক বলতে বাধ্য হলেন—আজ্ঞে জানি বৈকি।

রায়বাহাদুর নিজের জ্ঞানের বাহাদুরি জাহির করার জন্য বললেন—মিণ্ডানাও দ্বীপে কাটাবাটু বলে জায়গা আছে একটা। তারই কাছাকাছি একটা গাঁয়ের সর্দারের কাছ থেকে হাড়টা পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছিলেন তিনি।

ছুরির মতো চ্যাপটা আকৃতির, অনেকটাই ছুরির মতো। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় ওটিকে রায়বাহাদুরের কুকুরগুলির বিবর্ণ দাঁতের মতো মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় হাড়টির প্রসঙ্গে বললেন, তাহিডি দ্বীপে সূর্যগ্রহণের সময় পুজো করে কুমারী মেয়েকে বলি দেয় ওখানকার অধিবাসীরা। তাকে পুড়িয়ে হাড়গুলো যা থাকে মাটির তলায় পুঁতে দেয়। সাত বছব পরে হাড়গুলো তুলে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। পরে মহাসমারোহে সেগুলো তুলে আনতে পারে যে সে হয় যাদুবিদ্যার মালিক। সব প্রেতাত্মারা হয তার অনুচর। তার পায়ের চাপে পাথর হয় সোনা, লতাগুলো সাপ হযে যায়।

মোহ ভেঙে গেল লেখকের। আহিতি দ্বীপের মানুষ পুড়ছে, না, পুড়ছে কলকাতায়, ক্ষুধার আগুনে।

রায়বাহাদুর বিরক্তিতে ভ্রুকুঞ্চিত কবলেন। মানুষেব ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এক মুহূর্তে ভুলে যাওয়া যায় না। রায়বাহাদুর বললেন—হাড় জোগাড় করেছি, কিন্তু মন্ত্র শিখতে পারিনি।

লেখক অগত্যা বললেন—কিন্তু চাক্‌রিটা পেলে........। রায়বাহাদুর উদ্দীপিত হয়ে বললেন—প্রমথর ছেলে তুমি! হোয়াট এ স্‌প্লেন্‌ডিড বয় হি ওয়াজ। তুমি একটা সামান্য চাক্‌রির জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিও না। আই উইশ য়ু অল্ সাকসেস্ ইন্ লাইফ্।

লেখক বেরিয়ে এলেন রায়বাহাদুরের ঘর থেকে দেখলেন ডাস্টবিনের ধারে কাঠির মতো হাত পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটি ছেলে হাড় চুষছে।

গল্পের সমস্ত ঘটনাগুলো বৈপরীত্যের বিন্যাসে সাজানো হয়েছে। এদিকে রায়বাহাদুরের বড় বাড়ি, অ্যাস্‌ফল্ট্‌ বাঁধানো রাস্তা বন্ধ লোকের গেট থেকে চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত। বাগানে ফুটন্ত গ্ল্যাডিফোরা। খালি জল দিচ্ছে ঝাঁজরিতে। গেটের ওধারে দুটো বীরৎসদর্শন কালো কুকুরের গর্জন। অন্যদিকে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ মিলিয়ে অদূরে পার্কে বুভুক্ষু মানুষের কলোনি—দেশজোড়া ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। একদিকে সুসজ্জিত রায়বাহাদুরের নীল স্নিগ্ধ আলোয় সাজানো বসাব ঘর। শ্বচ্ছোজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মেয়ে। অন্যদিকে তাঁরই সামনে তাঁর এক 'স্পিরিটেড' টিউশানি-করা সহপাঠীর/ছেলে চাকরিপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে। একদিকে অ্যাডভেঞ্চারাস রায়বাহাদুরের দেশবিদেশ থেকে সংগ্রহ করা 'অমানুষিক গুণের' নানা হাড়ের কালেকশান-

ভরা ঢাকা-খোলা ভেলভেটের বাক্স, অন্যদিকে টিউশানির তাড়া-খাওয়া দর্শক-ছেলেটির অধৈর্য। একদিকে ক্ষুধার্ত ছেলেটির সামনে মেলে-ধরা চা আর খাবারের প্লেট, অন্যদিকে, দূরে ওলটানো ডাস্টবিনের ধারে বুভুক্ষুদের ঝগড়া আর খিচুড়ি গেলা। একদিকে রোডেলিয়ান আদিবাসীর দুর্লভ 'যন্ত্রপূত' হাড় এবং বলি-দেওয়া কুমারী মেয়ের 'যাদুশক্তি'-ময় হাড়, অন্যদিকে ডাস্টবিনের ধারে কটি-হাত-পা আর বেলুন-পেট একটি ছেলের প্রাণপণে হাড়-চোষা। সব মিলিয়ে 'উইশ-ইউ অল সাকসেস' শুনে ব্যর্থ-মনোরথ চাকরি-প্রার্থীর চোখে 'যাদুমন্ত্রে' বদলে-যাওয়া পৃথিবীর স্বপ্ন—পাওয়া আর না-পাওয়ার ব্যবধান যেখানে নেই। শেষ পঙ্ক্তিটিতে গল্পের কথক বক্তার মন্তব্যে ('মন্ত্রপাওয়াটাই বাকী') তীব্র ব্যঙ্গও থেকে গেছে। বঞ্চিত-প্রবঞ্চিতরাই তো যাদুমন্ত্রে বদলে যাওয়া পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। নির্মম বাস্তবের মতো নির্মেদ হাড়টাই বড় জোর হাতে আসে। মন্ত্রটা বাকিই থেকে যায়।

দুঃশাসন : আজকের মহাভারত

আনন্দময়ী সিংহ

পূর্ববঙ্গের বরিশালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর পূর্বনাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পূর্বজ একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের নাম অনুরূপ থাকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজ নাম স্বেচ্ছায় পরিবর্তন করে নেন। দিনাজপুর জেলা স্কুলে পড়ার সময় রাজনৈতিক আবর্তে তিনি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ফরিদপুরের কলেজে I.A.class-এ পড়ার সময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী পরতেন। সেইসময় তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী (বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী) শিবানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা (সম্ভবত জ্যাঠতুতো দাদা) শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রভাবও স্মরণীয়। শেখর বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক ছিলেন। একসময়ে নারায়ণ ও শেখর এঁদের একজন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবেন, অন্যজন লেখাপড়া ও সাহিত্য রচনা নিয়ে থাকবেন—এমন পরিকল্পনা করেন, অবশ্য শেখর গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ করায় নারায়ণবাবুর রাজনীতি করা সম্ভব হয় না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরিশালে যখন ছিলেন তখন গ্রামের আড়তদার পুলিশ অফিসার ও গ্রামের সাধারণ মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাছাড়া মার্কসীয় দর্শনের পাঠ তাঁর ছিল আশৈশব। তাই তিনি মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে চলেন নি। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত তিনি পড়েছেন। নবোদ্বুদ্ধ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুরানো মনোভাবের মূল্যায়ন তিনি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুর রাজসভায় সর্বসমক্ষে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বৃত্তান্ত তিনি একালেও প্রত্যক্ষ করেছেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ সভাসদ পিতামহ প্রভৃতির সামনে মধ্যম কৌরব দুঃশাসন ভ্রাতৃজায়া দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করেছে। —এর চেয়ে কুরুচিপূর্ণ অশালীন ব্যবহার আর কিছু হতে পারে না। এই চিন্তায় আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক সমাজের অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করেছেন।

যুদ্ধের অক্টোপাসী আশ্লেষে গ্রামে ও শহরে যখন অন্ন-বস্ত্রের অভাব, তখনই সাধারণ মানুষের দুর্গতি চরমে উঠেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেখক 'দুঃশাসন' গল্পে দুঃশাসনের স্বরূপ দেবীদাসের কর্মকৃতির আলেখ্যে উপস্থাপিত করেছেন। গঞ্জের আড়তদার দেবীদাসের কাছে একজন অতি দরিদ্র গ্রামবাসী এসেছে লজ্জা নিবারণের একজোড়া বস্ত্র চাইতে, সম্ভবত একখানি যুবতী কন্যার জন্য, অন্যখানি স্ত্রীর প্রয়োজনে। কিন্তু দেবীদাসের কারো প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য নেই, সে বরাবর বলে চলেছে, আমদানি নেই, তাই তার আড়ৎ-ও ফাঁকা, একখানি কাপড়ও নেই। অথচ তালা দেওয়া আড়তে কাপড় জমা আছে সাধারণ লোক-চক্ষুর আড়ালে বেশি মুনাফায় কাপড় বেচবে বলে সে এমন করেছে। পায়ে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করা সত্ত্বেও দেবীদাস একখানা কাপড় দিয়ে লোকটিকে সাহায্য করল না।

তখন দেবীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরদাস বলেছে—একখানি কাপড় দিয়ে দিলেই হত। আধুনিক কালের প্রগতিশীলতা এ পর্যন্তই। দেবীদাস বলেছে, তবে আর উপায় ছিল না। বিরাট একটা জমায়েত তার আড়তের সম্মুখে খাড়া হয়ে যেত কাপড় চাইতে। যাই হোক কাপড় দেওয়া হল না। অথচ এই অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে থানার দারোগাবাবু শচীকান্তের পাঠানো কানাই দে-কে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবীদাস দিল যাত্রাগানের জন্য পঞ্চাশ টাকা। মনটা বিরস হয়ে উঠলেও থানায় যাত্রাগান দেখতে গেল নিজের স্বার্থে দেবীদাস ও তার ভাইপো গৌরদাস। প্রথম প্রথম মনে পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার কাঁটা বিঁধতে থাকলেও শেষপর্যন্ত দেবীদাস দুঃশাসনের রক্তপান নাটকে মশগুল হয়ে গেল। দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণে দেবীদাস আর-সকলের মত অত্যন্ত অভিভূত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। যাত্রা শেষ হলে দেবীদাস ভাইপো গৌরদাসের সঙ্গে বাড়ী ফেরার পথে মুচি লক্ষ্মণকে খোঁজ করতে গেল তার জুতা তৈরির অর্ডারের ব্যাপারে। লক্ষ্মণকে ডাকাডাকি সত্ত্বেও সাড়া না পেয়ে বাড়ীর পিছনের পুকুর ঘাটের দিকে নজর দিতেই দেবীদাস অন্ধকারের মধ্যে একটি মেয়েকে জল আনতে দেখল। অন্ধকারেও অনুমান হল নারীটি বিবস্ত্র। দুঃশাসন যেমন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে চেয়েছিল, তেমনি এ যুগের দেবীদাস কাপড় আড়তের মধ্যে রেখে অভাবগ্রস্ত মেয়েটিকে বিবস্ত্র করে দিয়েছে। মনে হয় মনে মনে দেবীদাসের কিছু অনুতাপ হল।

এভাবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই পৌরাণিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলমান এ যুগের অন্যায় অবিচারের একটি সূত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। মার্কসীয় দর্শনের রঞ্জনরশ্মিতে তিনি সমাজের স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার আলেখ্য উপস্থাপিত করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুঃশাসন গল্পের মাধ্যমে পুরাকালের অন্যায় অবিচারের চলমান রূপটি প্রগতিশীল সমাজে সভ্যতার মুখোস লাগিয়ে অন্যভাবে প্রদর্শন করেছেন।

মহাকাব্যিক যুগের দুর্যোধনের ভ্রাতৃজায়াকে অঙ্কে বসতে আহ্বান করা, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা, আবার শাস্তি হিসাবে দুঃশাসনের বক্ষ চিরে তার রক্তপান বা দুঃশাসনের রক্তপাতে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন—এসব আধুনিক সভ্যজগতে কখনও সম্ভব নয়। তবে পুরাকালের ঐ সব ব্যাপার আজও ঘটে চলেছে একটু মার্জিত রূপে। দুঃশাসনরূপী দেবীদাস জাতীয় মানুষ আজও সমাজে ওই ধরনের শোষণ করে চলেছে দীন দরিদ্রদের। মুনাফার লোভে আড়তে বস্ত্র ভরে রেখে দুঃস্থা রমণীদের করে চলেছে বস্ত্রহীন।

আধুনিক কালের সভ্যতার প্রগতিশীলতায় মানুষের বিবেকবোধ কিছুটা নিশ্চয় জেগেছে। দুঃশাসন গল্পে গৌরদাসের মধ্যে তার পরিচয় কিছু মেলে। দেবীদাসের আড়তে কাপড় থাকা সত্ত্বেও সে যে বস্ত্রহীনাদের বস্ত্র দিচ্ছে না—তখন গৌরদাসের বিবেকে দেবীদাসের এ আচরণ বিঁধছে।

গৌরদাস খবরের কাগজে একটা সাবানের বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল। সাবান মলিন কিছুকে পরিষ্কার করার জন্য, তাৎপর্য এ সমাজও পরিমার্জনীয়।

যাত্রা থেকে ফেরার পথে বিবস্ত্রা রমণীকে দেখে গৌরদাসের মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

প্রভাবে অন্ন-বস্ত্রহীনদের প্রতি সভ্য মানুষের মনে একটু সহানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। কাগজ পড়া এ যুগের লোক গৌরদাস জানে পৃথিবীটা বদলাচ্ছে—মুনাফাখোরি বেশীদিন চলবে না। তাই সে দেবীদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলেছে—কিন্তু এ ভাবে চলবে কদিন ?

আমরা কর্মফলে বিশ্বাসী। গল্পের শেষে গৌরদাস দেখছে অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্র চাষীদের হাতের তীক্ষ্ণ ধারওয়ালা কাস্তে সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। একদিন দেবীদাসরূপী দুঃশাসনকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তাই চাষীদের হাতের তীক্ষ্ণ ধারওয়ালা কাস্তের ঝলকানি। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়—চিরকালের এই আত্মবিশ্বাসও হয়েছে প্রতিফলিত।

টোপ : ব্যঞ্জনাধর্মী গল্প

পঞ্চানন মালাকর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'টোপ' গল্পের পটভূমিকা হিসেবে নির্বাচন করেছেন টেরাইয়ের আরণ্যক পরিবেশ। গল্পটির মধ্যে যে আদিম নৃশংসতা রয়েছে—তাকে জীবন্ত করে তুলতে গেলে যেন এমন একটি পরিবেশ দরকার। আর সে কারণেই গল্পটি হয়ে উঠেছে গভীর অর্থদ্যোতক।

'টোপ' একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। বীভৎস রসের গল্পটিকে অবাস্তব বলে মনে হতে পারে, তবুও এ গল্পটি বাংলা সাহিত্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তার কারণ এর বিষয়বস্তু কিছুটা ব্যতিক্রমী প্রয়াসে পরিবেশিত হয়েছে।

উত্তম পুরুষের বয়ানে লিখিত গল্পে বলা হয়েছে লেখক একটি পার্সেল পান। পার্সেলটি খুলে দেখেন—একজোড়া ঝকঝকে নতুন বাঘের চামড়ার তৈরি চটি। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি টেরাইয়ের রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন.আর.চৌধুরী; যাঁর আমন্ত্রণে আটমাস আগে লেখক শিকার দেখতে গিয়েছিলেন। আর সেই শিকার দেখার 'কমপ্লিমেন্টস' হিসেবেই এই জুতোপ্রাপ্তি। আর এই জুতো দেখেই তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠল আটমাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, এক বিচিত্র শিকার কাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের সূত্রও লেখকের তেমন ভালো মনে নেই। তবে তাঁর এক বন্ধুর রাজাবাহাদুরের এস্টেটে চাকরি করার সুবাদে কোনো এক উপলক্ষে লেখক দু-চার ছত্রের প্রশস্তি রচনা করেই রাজাবাহাদুরের নেকনজরে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝেই চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেতেন। তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্যে লেখক একটি দামি ঘড়ি উপহার পেলেন। তাঁর মনে হল রাজাবাহাদুব এক বিরাট হৃদয়বান মানুষ। তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি যেন তার ভক্ত হয়ে গেলেন। বন্ধুরা তাঁকে মোসাহেব বলে উপহাস করলেও তিনি গায়ে মাখলেন না। তাঁর মনে হল ওটা ওদের গায়ের জ্বালা, তাঁর সৌভাগ্যকে ওরা ঈর্ষা করেই এসব বলে। রাজাবাহাদুরকে তার গুণগ্রাহী বলেই মনে হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাও করেন।

শিকারের নিমন্ত্রণে রামগঙ্গা এস্টেটে গিয়ে লেখক রাজাবাহাদুরের আদর অভ্যর্থনায় আপ্লুত হলেন। তাঁর মতো একজন সাধারণ মানুষকে রাজাবাহাদুর শিকারসঙ্গী করে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করলেন।

রাজাবাহাদুরের বাংলোয় রাজসিক আদরে থাকতে থাকতেই লেখক তাঁর উদারতার অনেক পরিচয় পেয়েছেন। প্রথম দিন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে তিনি চা না খেয়ে বসে ছিলেন। এত গুণ না থাকলে কি রাজা হওয়া যায়!

রাজার অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত অনেক পেয়েছেন তিনি। লেখকের প্রতি আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। জঙ্গলের মধ্যে যেন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। এমন দামি খাবার লেখক এর আগে কখনো মুখে তোলেননি। এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করেননি। জঙ্গলের

মধ্যে গ্রান্ড হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটানোর এমন অভিজ্ঞতা—এর আগে লেখকের ছিল না। এসব ঘটেছে রাজাবাহাদুরের অকৃপণ আতিথ্যে।

রাজাবাহাদুরের বাংলোর সামনে তিন চারটে ছোট-ছোট নোংরা ছেলে-মেয়েকে খেলা করতে দেখেছেন লেখক। তারা হিন্দুস্থানি কিপারের বেওয়ারিশ সম্পত্তি। রাজাবাহাদুর ওদের বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন। দোতলার জানালা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন। ওরা সেগুলো লোফালুফি করে। লেখকের মনে হয় এটা রাজা মানুষের ঔদার্য। সামান্য কিপারের ছেলে-মেয়েদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতে কার্পণ্য করেন না তিনি।

রাজসিক মেজাজ এন.আর.চৌধুরীর। তিনি লেখককে নিজের শিকার দেখার জন্য আমন্ত্রণ করে এনেছেন। অথচ শিকার দেখাতে পারেননি। জঙ্গল যেন তাঁর সঙ্গে বসিকতা করছে। রাতের অন্ধকারে জন্তু-জানোয়ার কোথায় যে লুকিয়ে পড়েছে কে জানে। কিন্তু রাজাবাহাদুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁর শিকার দেখানোর জন্যে; নইলে যে তাঁর সম্মান থাকে না। লেখক যখন জানালেন কলকাতায় ফিরে যাবেন তখন রাজাবাহাদুর আফশোষ করে বললেন যে, তিনি তাঁর শিকার দেখাতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, লেখক হয়তো বিশ্বাসই করেছেন না তাঁর শিকারের গল্প। লেখক সে কথায় প্রতিবাদ করে জানালেন তিনি তা মোটেই ভাবছেন না। শিকার তো অনেকটা অদৃষ্টের মতো। কিন্তু সে কথা মানলেন না রাজাবাহাদুর। তিনি জানালেন অদৃষ্টও বদলানো যায়।

এ থেকে বোঝা যায়, রাজাবাহাদুর মানুষ হিসেবে অহংকারী, দাম্ভিক ও জেদি। তিনি লেখককে আদর যত্ন করে ডেকে এনেছেন শিকার দেখাতে। তা না পারলে তাঁর অহং-এ আঘাত লাগে। একারণেই হান্টিং বাংলোর পিছনে অভিনব শিকারের জায়গায় লেখককে ডেকে নিয়ে গেলেন। শিকার তিনি করবেনই, আর তার সাক্ষী হিসেবে লেখককে থাকতেই হবে।

রাজাবাহাদুর লেখককে শিকারের সরঞ্জাম এবং আয়োজন দেখান। তাঁর রাজসিক আচরণে লেখক যেন মুগ্ধ হন, তেমনি মনে মনে ভীত হয়ে পড়েন। শিকারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে এন.আর. চৌধুরীর অনুকম্পার পাত্র হয়ে ওঠেন। তবুও তিনি সেই আরণ্যক পরিবেশের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গভীর জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে শিকারে সঙ্গী হয়ে নতুনতর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। জঙ্গলকে এভাবে কখনো দেখেননি এর আগে। রাতের অন্ধকারে শিকারের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা পাঠককে মুগ্ধ করে :

"জঙ্গলের ভেতর বসে আছি মোটরে। দুটো তীব্র হেড-লাইটের আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীর্ণ পথে আর দুধারের শাল বনে। ওই আলোক-রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারদিকে—অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে রয়েছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।"

জঙ্গলের ভয়ঙ্কর পরিবেশে তিনরাত চেষ্টা করেও রাজাবাহাদুর বাঘ শিকার করতে

পারলেন না। লেখক এবার ফেরার প্রস্তাব দিতে তিনি আর একটি দিন থাকার অনুরোধ করেন। আশ্বাস দিলেন তাঁকে মাছ ধরার অভিনব শিকার দেখাবেন। হান্টিং বাংলোর পিছনে রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো এক পাটাতন। সেখানে দুটো কপিকলের মতো জিনিস। সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ি নদীর রেখা। চারশো ফুট নিচে নুড়ি মেশানো সঙ্কীর্ণ বালুতটের দুপাশে জঙ্গল আর জঙ্গল। যাকে রাজাবাহাদুর বলেন 'টেরাইয়ের ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টস। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।'

টেরাইয়ের ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টস্-এ রাজাবাহাদুর তাঁর অভিনব মাছধরা দেখাতে রাজি হয়েছেন। তবে সে শিকারের কথা কাউকে বলা যাবে না। আর তার পরদিনই লেখককে চলে যেতে হবে। কারণ রাজাবাহাদুর ভালো টোপ না পেলে মাছ ধরেন না। এমন সব রহস্যে লেখককে ডুবিয়ে রেখে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যাবার আদেশ দিলেন তিনি। সময় হলে তাঁকে ডেকে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

গভীর রাতে লেখককে ডেকে তুলে সাঁকোর ওপরে গেলেন। সেখানে শিকারের সব বন্দোবস্তো করাই ছিল। চারশো ফুট উপরের হান্টিং বাংলোর পিছনের কাঠের রেলিং দেওয়া সাঁকোর উপর থেকে একটি কপিকলের সাহায্যে টোপ নামিয়ে নিচের টেরাইয়ের জঙ্গলের কোণ ঘেঁসে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর নুড়ি-বেছানো বালুতটের ওপবে নামিয়ে দিয়ে উপর থেকে বাঘ শিকারের এক নতুন অভিজ্ঞতাই গল্পের বিষয়। কিন্তু লেখকের কাছে সবচেয়ে অমানবিক ঘটনা রাজাবাহাদুরের বাংলোর হিন্দুস্থানি কিপারের বেওয়ারিশ সন্তানদের মধ্য থেকে একটিকে তিনি টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিপারকে কেনাকাটার কাজে শহরে পাঠিয়ে তারই একটি শিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে বিশাল রয়েল বেঙ্গল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর। লেখককে কথা দিতে হয়েছিল, একথা তিনি কাউকে বলতে পারবেন না। হয়তো তারই পুরস্কার স্বরূপ এসেছে চমৎকার একজোড়া জুতো। সে-রাতের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু রাজাবাহাদুরের দেওয়া চটিজোড়া যেমন নরম তেমনি আরামদায়ক।

(গল্পটিতে একটি অবাস্তব ঘটনা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু লেখকের বক্তব্যে খুব সহজেই ধরা পড়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনেব এক অনবদ্য ছবি। টেরাইয়ের রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুরের বিলাসিতা সেখানে মিথ্যে নয়। গভীর অরণ্যের মধ্যেও তিনি যে রাজকীয় জীবন যাপন করেন তা থেকে সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের মানসিকতা এবং জীবনযাপনের ছবি ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছে মূল্যহীনের মতোই অবাস্তব মনে হয়। তাঁর বিশ্বাস রাজাবাহাদুর হতে গেলে মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে হয়। এমন কি মানুষ না মারতে পারলে কেউ রাজা হয় না এটাও প্রমাণ করতে দ্বিধা করেন না। লেখকের মতো সাধারণ মানুষ তাঁদের অনুকম্পাই পাওয়ার যোগ্য, অন্য কিছু নয়।

এছাড়া তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁর কাছে ভিখারি কুকুরের মতোই ব্যবহার পায়। লেখকের বক্তব্যে তা ধরা পড়ে।

"বাংলোর সামনে তিন-চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন,

কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারি বিশ্বাসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন ছুটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতলার জানালা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন। নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।"

এখানে রাজাবাহাদুরের আচরণে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ধরা পড়েছে। তাঁর কাছে কিপারের সন্তানদের অস্তিত্ব ভিখিরির মতো। তাদের সামনে খাবার বা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে তিনি কৌতুক অনুভব করেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিভেদ যে-সমাজ সৃষ্টি করে রেখেছে—তাকেই লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। রাজাবাহাদুর রাতের অন্ধকারে কিপারের একটি শিশুকে বাঘ শিকারে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। লেখক এই অমানবিক আচরণকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।

"কীপারের একটি বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়াল বেঙ্গল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর—লোককে ডেকে দেখানোর মতো।"

লেখক সমাজের যে রূপকে তুলে ধরেছেন তা হয়তো অবাস্তব মনে হতে পারে; কিন্তু ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব এক সময় সত্য হিসেবে ছিল। লেখক সেই সমাজ-লাঞ্ছিত মানুষের কথা ভুলতে পারেননি; তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে এ গল্পে তা ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

গল্পটির পূর্বকথনে বলা হয়েছে, গল্পের অভিনবত্ব এর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পন্থা। লেখক একটু একটু করে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকেই জানা যায় এক বিচিত্র শিকার-কাহিনী তাঁর বিষয়। এবং এই শিকারের মুখ্য ভূমিকা রাজাবাহাদুরের। শিকারের সেই চরম মুহূর্তে পৌঁছতে গিয়ে লেখককে একটি বাতাবরণ তৈরি করতে হয়েছে। গল্পের শেষে যে চমক পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করছে তার ঝটকা তীব্র থেকে তীব্রতর করার জন্যেই লেখক তাঁর গল্পের প্রস্তাবনা করেছেন। মনে হতে পারে লেখকের প্রস্তাবনা এত দীর্ঘ কেন? তবে তা যে অপ্রাসঙ্গিক হয়নি একথা বলা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী, যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"

এ সংজ্ঞা মেনে নিলে দেখা যায় টোপ গল্পের বক্তব্য ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করেছে। আর সেই ঐক্য-সংকটে পৌঁছতে গিয়ে লেখক যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তার প্রয়োজন ছিল, নাহলে গল্পের চরম মুহূর্তে পাঠকের জন্য যে চমক অপেক্ষা করে আছে তার গুরুত্ব কমে যায়। গল্পের বক্তব্য দীর্ঘ হলেও কোথাও তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়নি। গল্পটিকে নিবিড়ভাবে পাঠ করলে আমরা কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করবো—যে স্তরগুলি অতিক্রম করেই গল্পের Climax-এ পৌঁছতে হয়। এবং সেখানে পৌঁছে পাঠক একটি ধাক্কা খায়। কারণ এই গল্পের শেষে শিকার করতে গিয়ে রাজাবাহাদুর যে টোপ ব্যবহার করেছেন—তা সাধারণ টোপ নয়। বাঘ শিকারে সাধারণভাবে ছাগশিশুকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করা

হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে শিকার করতে রাজাবাহাদুর টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন একটি মানবশিশুকে। এই অমানবিক আচরণে সংবেদনশীল পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করে। পাঠককে লেখক এক অভাবিত ঘটনার সামনে দাঁড় করিয়ে দেন।

গল্পের এই চরম পরিণতিতে পৌঁছতে গিয়ে লেখক কতকগুলি স্তরকে অতিক্রম করেছেন। গল্পের শীর্ষবিন্দুকে অবশ্যম্ভাবী করতেই লেখক এক একটি প্রসঙ্গ এনেছেন। মূল শিকারের ভিত্তি হিসেবে টেরাইয়ের আরণ্যক পরিবেশের ভয়াবহতা একটি পশ্চাৎপট রচনা করেছে। লেখক রেল স্টেশন থেকে রাজাবাহাদুরের পাঠানো মোটরে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করার সময় অবগত হয়েছেন সে জঙ্গলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। এমন বিপদ সংকুল অরণ্য পরিবৃত রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুরের বাংলোয় অতিথি হওয়া এক বিপদের সামনে দাঁড়ানোর মতোই ঘটনা। লেখক এক-একটি প্রসঙ্গ এনে গল্পটিকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন।

প্রথমত, রাজাবাহাদুরের চারিত্রিক উদারতায় লেখক মুগ্ধ। তাঁর মতো একজন গুণবান মহীয়ান রাজার অনুগ্রহ লাভ করে শিকারের সহযাত্রী হওয়ার আহ্বান পেয়ে তিনি অনুগৃহীত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, আমন্ত্রণ লাভ করে টেরাইয়ের নিকটবর্তী ছোট একটা রেল স্টেশনে নেমে রাজাবাহাদুরের বাংলোয় পৌঁছানোর ঘটনা। গভীর জঙ্গলের পথে যেতে যেতে তার ভয়াল-রূপের পরিচয় পাওয়া।

তৃতীয়ত, রাজাবাহাদুরের বাংলোতে আতিথ্য গ্রহণ। রাজকীয় সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য প্রকৃতির অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াল অরণ্য প্রকৃতির হিংস্রতার কথা শুনে মনে মনে শিহরিত হওয়াও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

চতুর্থত, রাতের অন্ধকারে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে শিকারের সহযাত্রী হওয়ার অভিজ্ঞতা। পরপর তিন রাতের অভিযানেও কোনো শিকার না পাওয়া এক আশ্চর্য ঘটনা। টেরাইয়ের অরণ্যে এত হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকা সত্ত্বেও শিকার পেলেন না রাজাবাহাদুর। তাঁর মতো একজন বড় শিকারি, যিনি লেখককে শিকার দেখার নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। তাঁর কাছে এমন ঘটনা খুবই অভাবিত। কিন্তু তিনি তো হেরে যেতে পারেন না। তাঁর অহং-এ আঘাত লাগে। তিনি আর একটা দিন থাকার অনুরোধ করেন। এবং তাঁর মাছধরা দেখার অনুরোধ করেন। এটাও তাঁর এক ধরনের শিকার।

পঞ্চমত, রাজাবাহাদুর তাঁর বিশ্বাসী কীপারের মা-মরা ছেলে মেয়েগুলোকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দিয়ে অনুগৃহীত করেন। রাজাবাহাদুরের এই অনুগ্রহের চোখে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখা খুবই ইঙ্গিতবাহী। কারণ গল্পের শেষে জানা যায় চারশো ফুট নিচের টেরাইয়ের ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্ট থেকে বিশাল এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার মেরেছিলেন এক মানবশিশুকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে। আর সে শিশু ওই কীপারের বেওয়ারিশ শিশুদের মধ্যে একজন।

(গল্পটির মধ্যে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন লেখক। রাজাবাহাদুরের চরিত্রের উদারতা দেখিয়ে তাঁকে একজন হৃদয়বান মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যিনি লেখককে সামান্য

কারণে সোনার ঘড়ি উপহার দেন, স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও লেখককে শিকারে আমন্ত্রণ জানান এবং লেখক একজন সাধারণ মানুষ হলেও তাঁকে রাজকীয় আতিথ্য দান করেন। অন্যদিকে কীপারের ছেলে মেয়েগুলিকে অনুগ্রহের চোখে দেখেন। অথচ-এ মানুষটিই অভিনব মাছ ধরা শিকারে কীপারের একটি শিশু-সন্তানকে টোপ হিসেবে বাঘের মুখের সামনে নামিয়ে দেন। বিনিময়ে এক বিশাল রয়াল বেঙ্গল শিকার করেন—যা লোককে ডেকে দেখানোর মতো। এই বক্তব্যের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে। লেখকের বক্তব্যে তা ধরা পড়ে:

"কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই।"

এই বক্তব্য থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে জঙ্গলে কীপারের একটি ছেলে হারিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এটাকে সমর্থনযোগ্য করতেই লেখক টেরাইয়ের জঙ্গলের ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। সে জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, অজগব—এমন কি যত হিংস্র জানোয়ার সবই আছে; এমন একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছেন লেখক। তা হলে দেখা যাচ্ছে লেখক এক একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পের চরম পরিণতির দিকে এগিয়েছেন। হয়তো মনে হতে পারে তিনি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গল্পটিকে বড় করতে চেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তা নয়। তিনি যে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছেন—তার সমর্থনে একটি পশ্চাৎপট রচনা করেছেন।

অন্যদিকে দেখা যায় রাজাবাহাদুরের মদ্যপানের প্রসঙ্গেও লেখক বেশ কিছু পংক্তি রচনা করেছেন। তিনি নিজে মদ্য পান করেন না প্রকাশ করায় রাজাবাহাদুরের অনুকম্পার পাত্র হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে শিকারে যাওয়ার আগে রাজাবাহাদুর এত মদ্য পান করেছেন যে তাঁকে লেখকের স্বাভাবিক মনে হয়নি। এরও একটি কারণ আছে,—তা হল রাজাবাহাদুর শিকারে যে টোপ ব্যবহার করেছেন (কীপারের একটি শিশু-সন্তান) তা স্বাভাবিক অবস্থায় করা হয়তো সম্ভব নয়। সে কারণেই তাঁকে অতিরিক্ত মদ্যপান করতে হয়েছে। শত হলেও তিনি তো একজন মানুষ—অমানবিক আচরণ করতে গেলে নেশাগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। 'টোপ' গল্পের মধ্যে যে বীভৎস রস সৃষ্টি করেছেন লেখক তা একজন শক্তিমান লেখক না হলে করা অসম্ভব। গল্পটি পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক ব্যতিক্রমী গল্প 'টোপ'। এ গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন:

"'টোপ' গল্পের ব্যঞ্জনায় 'গরু মেরে জুতা দানে'র রসিকতাটি মর্মান্তিক পরিহাস হয়ে উঠেছে। এ গল্পের রাজাবাহাদুরের শ্রেষ্ঠ ব্যসন হল শিকার। টেরাইয়ের প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বে রাত্রির তমসায় যখন হিংসা সজাগ হয়ে ওঠে তখন রাজাবাহাদুরের পেগপ্রসাদিত রক্তেও জেগে ওঠে শিকারের হিংস্র উল্লাস। আর তাঁর হান্টিং বাংলোয় শ্রেষ্ঠ শিকারের নাম তিনি দিয়েছেন মাছ-ধরা। পেছনে চারশ' ফুট খাড়া পাহাড়ের নীচে কপিকলের সাহায্যে টোপ ফেলে তিনি এই শিকার ধরেন। আসলে ওটা হিংস্রতম ব্যাঘ্রহননের ছদ্মনামকরণ। রাজাবাহাদুরের আবার ভাল টোপ ছাড়া পছন্দ হয় না। তাই একটি ছাগশিশু কিংবা গোবৎসের সাহায্যে অনায়াসে যা করা যেতে পারে, সে কাজ তিনি করেন মানবশিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। সত্য অনেক সময়ই কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত। তাই মানবশিশুর তৈরী টোপ এমনকি বাস্তবে সত্য হলেও সারস্বত বিশ্বাসকে বিচলিত করতে চায়। তথাপি

কয়েকটি ইঙ্গিতে রাজাবাহাদুরের যে অদ্ভুত হিংস্র চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং লেখকের বর্ণনাগুণে যে প্রাণঘাতী অরণ্য পরিবেশ প্রস্তুত হয়েছে, সেখানে এ কল্পনা সম্পর্কে শিল্পপ্রতীতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। গল্পটি লেখকের শক্তিমত্তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।"

একথা স্বীকার করতেই হয়, 'টোপ' গল্পের মধ্যে লেখক এক মানবিক আবেদন রেখেছেন। গল্পের শেষে এসে আমরা বুঝতে পারি তিনি তির্যক ব্যঙ্গে রাজাবাহাদুরের মাছ-ধরার নাম করে যে শিকারের আয়োজন, তাকে আঘাত করতে চেয়েছেন। এখানেই লেখকের সার্থকতা। (রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর চরিত্রের দুটি দিক গল্পের মধ্যে দুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অভিজাত রাজ পরিবারের সন্তান। তাঁর মধ্যে একদিকে এক উদারমনের মানুষ-এর সবগুণই যেমন বর্তমান, তেমনি নির্মম অহংবোধ সম্পন্ন এক দাম্ভিক মানুষও রয়েছে। যাঁর কাছে মানুষের মূল্য ভিখিরি কুকুরের সমগোত্রীয়।)

কোনো এক জন্মদিনে দুছত্র স্তুতিগাথা লিখে লেখক সোনার ঘড়ি উপহার হিসেবে লাভ করেন। লেখক রাজাবাহাদুরের গুণগ্রাহী হয়ে উঠলেন। একদিন রাজাবাহাদুরের আমন্ত্রণ লাভ করে শিকারের সঙ্গী হবার জন্য তিনি টেরাইয়ের অরণ্য প্রকৃতির বুকে রামগঙ্গা এস্টেটের বাংলোতে উপস্থিত হলেন। রাজা বাহাদুর তাঁকে রাজকীয় আতিথ্য দান করলেন। এমন আন্তরিক উষ্ণ অভ্যর্থনা একমাত্র রাজা হলেই করা সম্ভব। অবশ্য এই অভ্যর্থনা পাওয়ায় পেছনে লেখকের আনুগত্য কাজ করে। অনুগতের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাজাবাহাদুরের এমন সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছেন লেখক। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি হিন্দুস্থানী কীপারের মা-মরা ছেলেমেয়েগুলির ক্ষেত্রেও। তারা রাজাবাহাদুরকে 'সেলাম হুজুর' বলে দাঁড়াতেই তিনি বাংলোর দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি, বিস্কুট ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর অনুকম্পা প্রকাশ করেন। এই অনুগ্রহের পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনি নিজের শিকারের শখ মেটানোর জন্য এদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন তিনি তাঁর অনুগৃহীত লেখককেও শিকার দেখানোর জন্যে ডেকে নিয়ে আসেন নিজের বাংলোয়। শিকার করতে তিনি কোনো পশুশাবককে টোপ হিসেবে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু করেন না, কারণ তাঁর ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন যে পৃথিবী, হুইস্কির রঙিন নেশায় যে পৃথিবীর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে হিন্দুস্থানী কীপারের বেওয়ারিশ শিশুগুলিও তাঁর কাছে পশু-শাবকের মতোই। মানবশিশুর আলাদা কোনো অস্তিত্ব তাঁর কাছে নেই। তাঁর আভিজাত্যের অহং তাঁকে এমন এক উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছে, যেখানে কীপারের সন্তান এবং মধ্যবিত্ত লেখকের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তিনি তাঁদের অনুকম্পার চোখে দেখলেও তাঁর মধ্যে রয়ে গেছে এক পাশবিক দরদ। নিজের শখ মেটানোর জন্যে তিনি তাঁদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন না। এখানেই সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের কাছে মানবাত্মার অপমান।

রাজাবাহাদুরের দ্বৈতসত্তার মধ্যে তাঁর অন্তর জগতে বাস করে এক নিষ্ঠুর, অহংসর্বস্ব, আভিজাত্যে অন্ধ এক পাশবিক মন। সেখানে তাঁর অন্তর্গত রক্তের মধ্যে খেলা করে এক আদিম হিংস্রতা। তিনি চোদ্দ বছর বয়স থেকেই রাজকীয় নেশা ধরেছেন। তাঁর হাতে যে

কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র অনায়াসে উঠে আসে। লেখকের ভাষায় : 'রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা।" শুধু তাই নয়, রাজাবাহাদুরের মন্তব্য, মানুষ মারতে না পারলে কেউ রাজা হতে পারে না। এ থেকেই বোঝা যায় মানুষের জীবনের কোনো মূল্যই তাঁর কাছে নেই। তিনি অবলীলায় কীপারের মাতৃহীন শিশুকে টোপ করে বাঘের সামনে তুলে দিতে পারেন। সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তাঁর বুকেও রাইফেলের নল ঠেকিয়ে চুপ করিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। এখানেই তিনি রাজা। তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। বারো বছর বয়সেই তাঁর হাতে উঠে এসেছে রিভলবার। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন মদ্যপানে। বিলাস-ব্যসনে রাজাবাহাদুরের যে জীবন—তার প্রধান নেশা শিকার। আর তাঁর শিকারের উপযুক্ত স্থান টেরাইয়ের অপূর্ব সুন্দর, আশ্চর্য সবুজ অরণ্য-প্রকৃতি। যাকে তিনি 'প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব' হিসেবে চেনেন। সে রাজত্বে তিনি অবলীলায় পশু শিকার করেন। মদের রঙিন আবেশে যিনি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে বন্য পশুর মোকাবিলা করেন। তাঁর কাছে মানুষ-পশু সব সমান। মানবিকতার কোনো মূল্য তিনি দেন না। কারণ তিনি রাজা। রাজারা অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারেন। লেখকই শুধু নয়, তাঁর বাংলোর আর্দালি, হিন্দুস্থানী কীপার, কীপারের মাতৃহারা শিশু তাঁর অনুকম্পার পাত্র হয়ে ওঠে। টেরাইয়ের আদিম হিংস্র পরিবেশে তাঁর চোখে হায়না হয়ে যায় ছুঁচোর সমান, বাঘ অবলীলায় তাঁর চোখে হয়ে যায় মাছ আর সে মাছ ধরার জন্য মানব শিশু মাছ ধরার টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লেখক এখানে দর্শক। রাজাবাহাদুরের গুণগ্রাহী মোসাহেব তিনি। রাজাবাহাদুরের প্রশস্তি রচনা করে তাঁর কাছ থেকে তিনি সোনার হাতঘড়ি উপহার হিসেবে পেয়েছেন। তিনি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। রাজাবাহাদুরের সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতার মানুষ। রাজা সাহেব যখন তাঁকে হুইস্কি নিতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর অভ্যেস নেই বলে ও-নেশার প্রতি তাঁর অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজাবাহাদুরের আগ্নেয়াস্ত্র দেখে তিনি তারিফ করলেও তা হাতে নিতে ভয় পান। কারণ ও-সব অস্ত্র হাতে নেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। অরণ্য প্রকৃতির বন্য জন্তুর কথা শুনে ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। রাজাবাহাদুর তাঁকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁকে নিজের বাংলোর পেছনের শিকারের জায়গা দেখিয়ে বলেছেন—এটা তাঁর মাছ ধরার বন্দোবস্ত। এটা একটা শিকারের আয়োজন হলেও লেখককে মাছ ধরার বন্দোবস্ত বলে ভোলাতে চেয়েছেন। কীভাবে মাছ ধরবেন তাও আগে থেকে প্রকাশ করেননি। তাঁকে অতিথি হিসেবে নিজের বাংলোয় ডেকে এনে রাজসিক আতিথেয়তায় ভোলাতে চেয়েছেন। শিকারে তাঁর সঙ্গী হিসেবে পুতুলের মতো আচরণ করেছেন লেখক। এখানে তাঁর মধ্যবিত্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখককে রাইফেল হাতে নিতে বললে তিনি তখনকার মতো সেটি রেখে দিতে বললে রাজাবাহাদুর মন্তব্য করেছেন—এখন ভয় পেলেও একবার হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন তিনি কত বড় শক্তিমান। আর ছাড়তে চাইবেন না—

"হঠাৎ তাঁর চোখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠল মুখের পেশীগুলো: অ্যান্ড এ রাইভাল্—

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যেন সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকেই যদি লক্ষ্যভেদ করে বসেন তা হলে—

আতঙ্কে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।"

রাজাবাহাদুরের কাছে লেখক যে অনুকম্পার পাত্র তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। রাজকীয় আতিথ্যে লেখক যে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছেন তা তাঁর কাছে অভাবনীয়। নরম বিছানায় শুয়ে প্রথম রাতে তাঁর ঘুম হয়নি। নিবিড় জঙ্গলে গ্রান্ড হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে কাটাতে লেখকের মনে হয়েছে শিকার না হলেও কোনো ক্ষতি নেই। তিনরাত শিকার না পেয়ে লেখক কলকাতায় ফিরতে চেয়েছেন। রাজাবাহাদুরের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু রাজাবাহাদুরের অহং-এ আঘাত লেগেছে। তিনি আর একটি দিন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। তাঁকে তাঁর সেরা শিকার, যার নাম দিয়েছেন মাছ ধরা। এবং এ শিকার খুব গোপনে করেন তিনি। লেখককে কথা দিতে হয়েছে এ-শিকারের কথা কাউকে বলা যাবে না। এবং শিকার দেখার পরে লেখকের আর সেখানে থাকা চলবে না। এ রাজাবাহাদুরের অনুরোধ নয়, আদেশ। লেখক তো তাঁর আদেশ মতোই চলবেন।

'শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম বেশিক্ষণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না কবাই ভালো।"

লেখক এখানে দর্শকের ভূমিকায় থাকলেও তাঁকে রাজাবাহাদুরের মেজাজ-মর্জির ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে। তিনি কোথাও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। একবার মাত্র প্রতিবাদ করেছিলেন। যখন রাজাবাহাদুরের ছোঁড়া গুলিতে অতিকায় এক ব্যাঘ্র যখন অন্তিম সময়ে একটা থাবা টোপের পুটুলিতে চাপিয়ে লেজ আছড়াচ্ছিল। তখনই ক্ষীণ মানবশিশুর চাপা আর্তস্বর শুনে লেখক প্রশ্ন করেছিলেন—"রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?"

কিন্তু সে প্রতিবাদ ক্ষণস্থায়ী। রাজাবাহাদুরের রাইফেল লেখকের বুকে এসে ঠেকল। তিনি চুপ না করলে রাজাবাহাদুর তাকে হয়তো চুপ করিয়ে দেবেন। তার আর দরকার হয়নি। লেখক টেরাইয়ের ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টে রাজাবাহাদুরের নির্মম শিকার দেখার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকলেন। তাঁর সেই আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে আটমাস পরে পেলেন বাঘের চামড়ায় তৈরি ঝকঝকে নতুন চটি। যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানেই লেখক কাহিনীর বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন। লেখক এমন জুতো ডাকে পেয়েছেন যা পায়ে না দিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। লেখক আটমাস আগে দেখা নির্মম শিকার কাহিনীর একমাত্র দর্শক। কিন্তু রাজানুগ্রহে সেদিনকার নিষ্ঠুর সত্যকে মনে রাখতে চান না। এখানে তাঁর মানবিকতা লাঞ্ছিত করা রাজাবাহাদুরের পাঠানো চটিজোড়া পাওয়াকেই বড় করে দেখছেন। যে মানুষটি মানবশিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, সেই মানুষটির পাঠানো চটিজোড়ার মধ্যে কোথাও নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতার চিহ্নও নেই। স্বার্থপর মোসাহেব তোষামোদকারী মানুষ হিসেবে লেখকের চরিত্রের বিবেকহীনতাও ধরা পড়েছে গল্পের শেষ

বক্তব্যে : "আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতিমনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।"

শেষ বাক্যটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে। তিনি রাজাবাহাদুরকেই নয়, নিজেকেও বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। মানবিকতার অপমানে তাঁর অন্তরাত্মাও যে ব্যথিত হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায়।

'টোপ' গল্পের গঠনশৈলীতে একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, তা হল লেখক এক-একটি প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে গল্পের চরম পরিণতিতে পৌঁছেছেন। টোপ হিসেবে একটি মানবশিশুকে ব্যবহার করার মধ্যে যে অবিশ্বাস্যতা রয়েছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও অবশ্যম্ভাবী করতে চেয়েছেন। গল্পের আরম্ভে নতুন ঝকঝকে বাঘের চামড়ার চটি প্রাপ্তির পেছনে যে মর্মান্তিক ঘটনা লুকিয়ে আছে তা প্রথমে বোঝা যায় না সত্য, কিন্তু গল্পের শেষে তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। লেখক রামগঙ্গা এস্টেটের হান্টিং বাংলোতে পৌঁছতে গিয়ে যে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করেছেন তার ভয়াবহতার প্রসঙ্গ এখানে খুবই দরকার ছিল। যে অরণ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই, সেখানে কীপারের একটি মা-মরা শিশু রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতেই পারে। রাজাবাহাদুরের সহৃদয়তা লেখককে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু সে মানুষটির মধ্যে যে এক আদিম হিংস্রতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়—তারও উদ্‌ঘাটন করেছেন লেখক। তাঁর আভিজাত্যের মধ্যে যে অহংবোধ—তা স্বাভাবিক। তাকে আরো স্বাভাবিক করে তুলেছে হুইস্কির রঙিন জলের নেশা। অরণ্য প্রকৃতির বুকে তিনি যেন এক আরণ্যক মানুষ। পর পর তিন রাত্রির শিকার অভিযান ব্যর্থ না হলে রাজা বাহাদুরের মাছ-ধরা শিকার দেখার সুযোগ লেখক পেতেন না। তাই তিনরাত্রির ব্যর্থ অভিযানের অবতারণা করতে হয়েছে। রাজাবাহাদুর তাঁর বাংলোর হিন্দুস্থানী কীপারকে শহরে পাঠিয়েছেন—নইলে তাঁব শিকার অভিযান সফল হবে না। কীপার তাঁর অনুগত। কীপার, তার মা-হারা বেওয়ারিশ শিশুদের অবলীলায় বাংলোয় ছেড়ে চলে গেছে। তাদের নিবাপত্তার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই রাজাবাহাদুরের ওপরে পড়ে। তিনি বাইরের দিক থেকে তাদের প্রতি সহৃদয়; অনুকম্পার চোখে দেখেন বলেই দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দিয়ে কৌতুক অনুভব করেন। এই অনুকম্পার পেছনে যে গভীর অভিসন্ধি কাজ করছে তা গল্পের শেষে বোঝা যায়।

গল্পের নাম 'টোপ'। গল্পের শেষে দেখা যায় রাজাবাহাদুর চারশো ফুট নিচের টেরাইয়ের জঙ্গলে উপর থেকে টোপের সাহায্যে শিকার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় বাঘ শিকারে ছাগশিশুকে টোপ করা হয়। এখানে রাজাবাহাদুর টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন একটি মানবশিশুকে। বাহ্যিক দিক থেকে গল্পের নামকরণ যেমন সার্থক, তেমনি ব্যঙ্গার্থেও নামকরণ সার্থক। এখানে বাঘের কাছে মানবশিশুই হোক আর ছাগশিশুই হোক টোপ হিসাবে সমান। অন্যদিকে লেখককে সোনার ঘড়ি উপহার দিয়ে শিকারে নিমন্ত্রণ করাতেও একটি টোপই দেওয়া হয়েছে। লেখক শিকারের সঙ্গী হয়েছেন আরো কিছু প্রাপ্তির আশায়। আবার কীপারের বেওয়ারিশ মাতৃহারা শিশুদের কাছে রাজাবাহাদুরের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাও এক

ধরনের টোপই। কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে গেছে মানবশিশুকে টোপ করে বাঘ শিকারের আয়োজন করা। এদিক থেকে গল্পের নামকরণ সার্থক এবং দ্ব্যর্থবোধক।

'টোপ' গল্পের মধ্যে যে আদিম অরণ্য প্রকৃতিকে চিত্রিত করেছেন লেখক, তার সঙ্গে রাজাবাহাদুরের চরিত্রেরও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দিনের বেলা টেরাইয়ের যে অরণ্য আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়, রাতের বেলা সেই অরণ্য শ্বাপদ সংকুল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অতিথি পরায়ণ রাজাবাহাদুর লেখকের আনুগত্য লাভ করেন তাঁর উদার মানসিকতার জন্য। অথচ সেই মানুষটি শিকারের সময় হয়ে ওঠেন এক হৃদয়হীন হিংস্র মানুষ, যাঁর কাছে মানবিকতার কোনো মুল্য নেই। রাজাবাহাদুরের সেই বীভৎস আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখে লেখক স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতায় তিনি প্রতিবাদও করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। রাজাবাহাদুরের প্রতি আনুগত্যে তিনি যে টোপ গিলে বসে আছেন। তিনি যে রাজাবাহাদুরের মোসাহেবে পরিণত হয়েছেন। আর তার প্রতিদানে বাঘের চামড়ায় তৈরি ঝকঝকে নতুন চটি উপহার পেয়েছেন। চটি জোড়ার আরাম ও বাস্তবতায় তিনি মুগ্ধ হলেও তাঁর মনেব গভীরে আটমাস আগের ভয়ঙ্কর শিকার কাহিনী স্বপ্ন হয়ে গেলেও তো সত্য। এই দুই সত্য আজ তাঁর সামনে এসে তাঁকে দংশন করবে। তিনি রাজাবাহাদুরের নির্মম শিকারের সঙ্গী হিসেবে নিজের দায় এড়াতে পারেন না বলেই তো তির্যক ভাষায় নিজেকেই ব্যঙ্গ করেন। এসব দিক বিচার করে বলা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' একটি অন্য স্বাদের গল্প, যা মানবাত্মার আর্তনাদে আমাদের শিক্ষিত মনকে নাড়া দিয়ে যায়। লেখক গল্পটিকে এককথায় শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন।

'টোপ' গল্পে লেখকের ভাষার মোহময় জাদুর স্পর্শও অনুভব করা যায়। অরণ্যপ্রকৃতি ও মানুষ তাঁর প্রকাশগুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রায় অবিশ্বাস্য বিষয়কেও অতি সহজে বিশ্বাসযোগ্য করে যে তুলতে পারেন, 'টোপ' গল্পই তার প্রমাণ।

পুষ্করা : সংস্কার ও জীবনের দ্বন্দ্ব

বসুধা বিশ্বাস

'পুষ্করা' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র 'তর্করত্ন'। পেশায় সে পুরোহিত, অর্থের লালসায় সর্বক্ষণ মগ্ন। আশেপাশের দশখানা গ্রামের সমস্ত মানুষ কলেরার প্রকোপে আক্রান্ত। কলেরাকে দূর করতে শুক্লা চতুর্দশীর দিন শ্মশানকালীর পুজোয় বসেছে তর্করত্ন। শ্মশানের বুকে এরকম একটি পূজোর বীভৎসতা ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। গল্পের প্রারম্ভে তার চিত্রটি এরকম—

"শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনের জ্যোৎস্না শুভ্র আকাশ, কোথা থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর সে জল গলানো রুপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রঙ এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে। তর্করত্ন কিছুটা পরিমাণে কারণ গলাধঃকরণ করে হালকা শীতের আমেজ গায়ে মেখে বিহ্বল চোখে দেবীর প্রতীক্ষায় বসে আছে।

পেট্রোম্যাক্সের তেল ফুরিয়ে আসার জন্য সাদা দীপ্তিটা ক্রমশ নীলাভ হয়ে আছে। ঠিক তেমনই আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতায় তর্করত্নের বুকের ভিতরটা করুণ হয়ে আসছে। শ্মশানে তর্করত্নের সঙ্গী গাঁজাখোর কালীকুমোর। দেবী ভোগ গ্রহণ করতে আসবে না— একথা কালীকুমোর বলায় রক্তবস্ত্রধারী তর্করত্নের আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে ওঠে। তর্করত্ন তখন বলে ওঠে—দেবী না এলে পুষ্করাতে সমস্ত গ্রামের মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেবীর কোপ হতে কেউ রক্ষা পাবে না।

তিনশো টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ তাকে ডেকে এনেছে দেবীর কোপকে শান্ত করার জন্য। শেয়াল এসে ভোগ গ্রহণ না করলে পূজো ব্যর্থ হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে বলাই ঘোষকে সামনে পেলে শাপান্ত করতে তিনি পিছপা হতে ছাড়তেন না।

অন্ধ সংস্কারের বিশ্বাসে তর্করত্ন নিজের পরিবারকে দেবীর কোপ হতে বাঁচানোর জন্য সদাতৎপর। শিবারূপে দেবী আসবেন ভোগ গ্রহণ করতে। তবেই না বোঝা যাবে তিনি মৃত্যুভীতকে দয়া করবেন। শ্মশানে কালীর পুজোয় বসে তর্করত্নের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়—'দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ', দূরে কলাপাতার ওপরে শীতের স্পর্শে শিবাভোগ ঠাণ্ডা আর বিবর্ণ হয়ে আসছে। সারাজীবন ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবীর আরাধনা করেছেন তিনি। কোন ফাঁকি ছিল না তাতে। তাঁর আহ্বান দেবীকে শুনতেই হবে।

দেবী আসার আগের মুহূর্তে রহস্যের আবরণ তৈরী করেছেন লেখক। তিনি বর্ণনায়িত করেছেন এভাবে—"দপ দপ দপ, আকস্মিকভাবে খানিকটা দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠেই পেট্রোম্যাক্সটা নিভে গেল, আর সংগে সংগেই চারিদিকের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে এসে ভেঙে পড়ল বিরাট একটা বন্যার স্রোতের মতো।" কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল

করে জ্বলছে। দুহাতে সে শিবাভোগ গোগ্রাসে খাচ্ছে। তর্করত্ন তীব্র রোমাঞ্চ অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শেয়ালের তো হাত থাকে না, তাহলে দেবী নিজেই এসেছেন আর্তের প্রার্থনায় সাড়া দিতে। তর্করত্ন নিজেকে পুণ্যবান মনে করে গর্ব অনুভব করেন। চারিদিক নিকষকালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ; আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে। এই অবস্থায় তর্করত্নের ভীত মিশ্রিত গলায় উচ্চারিত হতে লাগল ক্ষীণ প্রার্থনা—"দেবী প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, মারীভীতদের রক্ষা করো।"

দেবী প্রসন্না হয়ে শিবাভোগ গ্রহণ করেছেন। এই খবর ভোর হতে না হতেই গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ঘটনায় গ্রামের সমস্ত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। পুষ্করার হাত থেকে তারা সবাই রক্ষা পাবে। আর কোন বিপদ থাকবে না। মৃত্যুমগ্ন গ্রামের উপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠেছে।

(যুদ্ধের বাজারে পাঁচশো টাকা তর্করত্ন নিয়ে যাচ্ছেন নিজের দেশে। স্টেশনের পথে নির্জনমাঠের মধ্যে শিবাভোগ খেয়ে পড়ে আছে ডোমপাড়ার পাগলী। তিনটে ব্যাটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে। যেতে যেতে জ্যোৎস্নাভরা প্রকৃতির শোভা দেখে তর্করত্নের মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

"দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা, পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক, মা মহাকালী তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।")

তবে তর্করত্ন একটা জিনিস বুঝতে পারেননি, তার শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলীটার রূপ ধরেই। দীর্ঘদিন অনাহারের পর দেবভোগ তার সহ্য হয়নি। লেখক গল্পের শেষে অসাধারণ জীবন দর্শনের পরিচয় রেখেছেন—"কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে, মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।"

(গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখকের সমাজ সচেতনতার কথাই বারবার প্রকাশ পেয়েছে। মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের বিভীষিকাময় জীবনের আলেখ্য 'পুষ্করার' মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষের কথা সহানুভূতির সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন। সামাজিক অবক্ষয়, অন্ধ কুসংস্কার তর্করত্নের মতো মানুষদের নির্মম, লোভী হতে শেখায়। বিত্তভোগী মানুষের অন্ধ দেবভক্তি ও পুরোহিততন্ত্রের মিথ্যাচারী কপটতার প্রতি লেখকের বিদ্রূপবাণী সরোষে এখানে উচ্চারিত হয়েছে। এই গল্পে অন্ধসংস্কারের পাশাপাশি যুদ্ধকালীন সময়ে বুভুক্ষু মানুষের চরম রূপ অন্য তাৎপর্য পেয়েছে।)

সৈনিক : সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র

ঊর্মি রায়চৌধুরী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পটি তাঁর 'রেকর্ড', 'টোপ', বা 'হাড়'-এর মত জনপ্রিয় বা বহুলপ্রচলিত গল্প নয়। কিন্তু, স্বল্পপরিচিত এ গল্পটি আমাদেরকে ভাবায়। কিছু গভীর কথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পে বলে গেছেন।

গল্পটিতে নাটকীয়তা আছে। আছে ঘটনার ঘনঘটা। ক্লাইম্যাক্স ঘটেছে গল্পের সমাপ্তি অংশে। প্লট সংহত ও একমুখী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটি আমাদেরকে টেনে রাখে।

'সৈনিক' গল্পটি দেবীকোট রাজবংশের দুই পুরুষের কাহিনী। এ গল্পের প্রধান অবলম্বন বা কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু কোন মানুষ নয়, 'নীলবাহাদুর' নামের একটি হাতি। 'নীলবাহাদুরই এ গল্পের রসকেন্দ্র। আর, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল একটি টিলা, যার অপর নাম পালগ্রাম। ঐ টিলা গল্পের শুরুতে ছিল নিতান্তই অনাদৃত, তুচ্ছ। পরবর্তীকালে ঐ টিলাটিই জমিদার ইন্দ্র চৌধুরীর চোখে হ'য়ে উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনীর শুরুতে জঙ্গলে ভরা ঐ টিলাতে এসে একদিন সাঁওতালরা তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর স্নেহচ্ছায়াতলে তাদের দিন কাটছিল। নীলবাহাদুর হ'ল চন্দ্র চৌধুরীর বাহন। চন্দ্র চৌধুরীর মত হাতিটির সঙ্গেও সাঁওতালদের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। তারপর চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর গ্রামের নতুন জমিদার হলেন ইন্দ্র চৌধুরী। তিনি ইতিহাসের এম. এ। ঐ টিলাটি খুঁড়ে তিনি ইতিহাসের নতুন উপাদান আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলেন। এভাবে তিনি অমর হতে চাইলেন। তাঁর বাহন বেবি অস্টিন নামক মোটগাড়ি। নীলবাহাদুর তার চোখে অস্থি-মাংসের অপব্যবহার। তাকে তিনি ঘৃণা করেন। টিলা থেকে সাঁওতালদেরকে উচ্ছেদ করার কাজে নীলবাহাদুরকে সৈনিক হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেন তিনি। অর্থাৎ সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে। এ তার শুধু জ্ঞানজগতের দাবী নয়। নিজের শক্তিকে তিনি যাচাই করতে চাইলেন। তিনদিন না খেতে দিয়ে নীলবাহাদুরকে তিনি সাঁওতালদের পাকা ধানের ক্ষেতে ছেড়ে দিলেন। সাঁওতালদের বিষাক্ত তীরে নীলবাহাদুর মারা গেল। মারা যাবার সময় সে ঐ বেবি অস্টিন গাড়িটিকেও শেষ করে দিয়ে গেল। নাটকীয় এই গল্পের ঘটনাপ্রবাহ একমুখী।

এ গল্পে সৈনিক কে? আমরা লক্ষ্য করি, এ গল্পে সৈনিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে নানাভাবে।

১। সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, ''বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে আগে তো এখান দিয়ে মানুষ চলতে পারত না। তোরা হচ্ছিস আমার নিজের লোক, আমার জঙ্গী-পলটন''।

এখানে 'সৈনিক' না বলে 'পলটন' বলা হয়েছে সাঁওতালদের।

২। আমরা লক্ষ্য করি, ইন্দ্র চৌধুরী অভুক্ত নীলবাহাদুরকে তার সৈনিক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। টিলা থেকে সাঁওতাল উচ্ছেদের কাজে নীলবাহাদুরকে তিনি সুকৌশলে ব্যবহারে করলেন সৈনিক হিসাবে। প্রশাসন যেমন তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৈনিককে

ব্যবহার করে, জমিদার ইন্দ্র চৌধুরীও তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীলবাহাদুরকে সৈনিক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাঁওতালরা ছিল নীলবাহাদুরের অকৃত্রিম বন্ধু। ঐ অরণ্যের মানুষদের সঙ্গে এই অরণ্যের পশুটির ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক। তাদের মনের সুর একতারে বাঁধা ছিল। সাঁওতালদের মাদলের শব্দে নীলবাহাদুর তাই অকৃত্রিম আনন্দে নাচত। কিন্তু, ইন্দ্র চৌধুরীর কৌশলের কাছে সে সম্পর্ক চুরমার হ'য়ে গেল। তিনদিন খেতে না দিয়ে তিনি নীলবাহাদুরের মধ্যের ঘুমন্ত হিংস্র পশুটিকে জাগিয়ে তুললেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন সাঁওতালদের পাকা ফসলের মাঠে। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায়, "বুভুক্ষার অন্ধকার তাড়নায় আজ সে অত্যাচারীর হাতে হিংস্র সৈনিক মাত্র।"

সাঁওতালদের বিষাক্ত তীরে নীলবাহাদুর প্রাণ হারালো। কিন্তু, প্রাণহারানোর আগে এই সৈনিক কিন্তু প্রশাসন অর্থাৎ ইন্দ্র চৌধুরীর বিপক্ষে কাজ করল। "সে নতুন যুগের যন্ত্রবাহনকে নিজের বিরাট দেহের চাপে পাখির নীড়ের মতই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল।" এ গল্পের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে নীলবাহাদুর। "কিন্তু নতুন যুগের প্রজা ও জমিদারের দ্বন্দ্বে সৈনিক হিসাবে সে শুধু প্রাণই দিল না, এ দ্বন্দ্বের স্বরূপটিও উদঘাটিত করে দিয়ে গেল।"

৩। গল্পের শেষ দিকে দেখি, "সমস্ত সাঁওতাল পাড়াকে মুখর করে নাগড়া বাজতে লাগল। পালগ্রামের টিলার ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে নতুন যুগের সৈনিকের দল। হাতে তাদের উদ্যত তীর আর ধনুক। সংশপ্তকের অস্ত্রের লক্ষ্য আজ বদলে গিয়েছে।" এখানে 'সৈনিক দল' শব্দটি লেখক সাঁওতালদের সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন। যদিও, গল্পের নামকরণের 'সৈনিক' শব্দটি নীলবাহাদুরকে লক্ষ্য করেই করা হ'য়েছে। নীলবাহাদুরই এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা প্রাণকেন্দ্র।

এ গল্প তো সেই চিরন্তন গল্প। 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' প্রজাকে উচ্ছেদ করে রাজা আপন খেয়ালে ইতিহাসের নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব চেয়েছেন।

পশু নিয়ে গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু মহেশ (শরৎচন্দ্র), কালাপাহাড়, (তারাশঙ্কর) নারী ও নাগিনী (তারাশঙ্কর), আদরিণী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়), বাঘিনী (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), সাদা ঘোড়া (রমেশ সেন) ইত্যাদি নানা গল্প আমরা পড়েছি। বালজাকের বিখ্যাত 'Passion in the Desert'-ও আমরা পড়েছি। এ গল্পের ঘটনাগুলিকে অনেকটাই নীলবাহাদুরের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। নীলবাহাদুর চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও, অরণ্যের একপাল সাঁওতালের সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, "'সৈনিক' গল্পের নীলবাহাদুর ব্যক্তি সম্পর্ককে অতিক্রম করে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।"

নীলবাহাদুরের অনুভূতি এ গল্পে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তার যৌবন, তার বার্ধক্য লেখকের কলমের মুন্সিয়ানায় নিপুণ ভঙ্গিতে উঠে এসেছে। একদা সে আকাশ-ছোঁয়া সরল গাছগুলোকে দেশলাইয়ের কাঠির মতো অনায়াসে ভাঙতো, "ভরা বর্ষায় সানন্দে অবগাহন করত তরঙ্গমাতাল ব্রহ্মপুত্রের জলে। বসন্তে তার মদস্রাবের গন্ধে পাহাড়ে পাহাড়ে চঞ্চল হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচারিণী হস্তিনীর দল।"

আবার, সাঁওতালদের মাদলের ধ্বনি নীলবাহাদুরকে যেন জন্মান্তরে নিয়ে যায়। তার মনে পড়ে, 'বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙ্গাড় নামছে হুড় হুড় শব্দে; নদীর বুকের ওপর অনেকটা জুড়ে ফেনিল জলের বাষ্পকুয়াশা.........”

নীল বাহাদুরকে ঘিরে ঘিরে সাঁওতালরা যখন নাচে, তখন, আভিজাত্যের অনুভূতিতে নীল বাহাদুরের মন ভরে ওঠে। সে অনুভব করে, "শুধু ডাণ্ডস্ খেয়ে দিন কাটানোই তার শেষ কথা নয়, সে গজেন্দ্র যূথপতি। আর, অরণ্যের প্রতিধ্বনি হয়ে অরণ্য-মানুষ এই লোকালয়েও বয়ে এনেছে তার যথাযোগ্য সম্বর্ধনা।" আবার, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে আসে তন্দ্রাবিলতা।

তবু নীলবাহাদুরের গলার ঘণ্টাধ্বনি বহন করে চলে বহু যুগের রাজশাসনের ইতিবৃত্ত। "ঠন্ ঠন্ ঠন্।"

নীলবাহাদুরের ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার কথাও বর্ণনা করেছেন লেখক। তার জায়গা নিয়েছে বেবি অস্‌টিন। কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে নীলবাহাদুর যানটাকে দেখে, তার প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করে, তার পেট্রোলের গন্ধ নাকের মধ্যে টেনে নেয়। অপ্রয়োজনীয় হলেও হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রৈলোক্যনাথের 'চঞ্চলার গাই-গরু' গল্পের ডমরু ধরের সেই প্রশ্নটি। "মোটর গাড়ী টানিবার নিমিত্ত ঘোড়া থাকে না। তবে ইহার ভিতর কোনরূপ বিলাতি জন্তু জানোয়ার থাকে কি না, তাহা আমি জানি না।"

পিলখানায় তন্দ্রাতুর নীলবাহাদুর সন্দিহান হ'য়ে ওঠে। আজ সে পর্যাপ্ত খাদ্য ও যত্ন পায় না। পায় না সম্মান। সে বুঝতে পারে, সে অনাবশ্যক।

ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিনের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে নীলবাহাদুর। "হঠাৎ একটা প্রচণ্ড জিঘাংসা যেন তার ঘুমন্ত চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে। কেমন করে কে জানে, সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী।......এক আছাড়ে ওই জানোয়ারটাকে কি ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না?" নীলবাহাদুর যদি সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হয়, বেবি অস্‌টিন, তবে ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রকে শত্রুরূপে দেখে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' গল্পেও 'ছোটগিন্নী' নামক হস্তিনীর কথা আছে। এগল্পেও নূতন ধনী গাঙ্গুলীরা মোটর গাড়ি কিনেছে। এখানেও হাতি সামন্ততন্ত্রের প্রতীক এবং মোটর ধনতন্ত্রের প্রতীক। এ গল্পেও সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের কথা আছে। এ গল্পে গ্রামের লোকের কাছে, "তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধ হস্তিনীর খাতির বেশী।"

পিলখানার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র চৌধুরীর মনে হয়, নীল বাহাদুর যেন মর্মভেদী দৃষ্টিতে তার মনের সব গোপন কথা পড়ে নিচ্ছে।

লেখক অসীম আন্তরিকতার সঙ্গে নীল বাহাদুরের অন্তিম প্রহরের ছবি এঁকেছেন।

গল্পের সমাপ্তি আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগায়। লেখক কি বলতে চাইছেন? সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রকে পদপিষ্ট করল। এখানে কি সামন্ততন্ত্রের হাতে ধনতন্ত্রের পরাজয় দেখালেন লেখক? লেখক কি তবে তারাশঙ্করের মত অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক? নাকি, এটা নিছকই একটা বাস্তব ঘটনার চিত্র অঙ্কন?

এ গল্পেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী Naturalistic। তিনি শুধু ঘটনাটি বিবৃত করলেন। কোন

মন্তব্য করলেন না। Naturalistic realism-এর স্বাক্ষরবাহী গল্পটি কিন্তু অনবদ্য। যদিও কোন কোন সমালোচক বলেন, এ গল্পে লেখকের কোন কমিটমেন্ট নেই। সোমনাথ লাহিড়ীর গল্পের মত বা সোমেন চন্দের দাঙ্গার গল্পের মত হয়েছে গল্পটি। গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই 'হাড়', 'বীতংস', বা 'টোপ' গল্পের কথা মনে করায়। তত্ত্বসন্ধানী পণ্ডিতেরা যাই বলুন না কেন, গল্পটি যে বাস্তবসম্মত, একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। গল্পটি একটি রসোত্তীর্ণ গল্প, একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ গল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, চন্দ্র চৌধুরী ও নীল বাহাদুরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। "কিন্তু, একক চন্দ্র চৌধুরী অসম্পূর্ণ। তাঁর নামের সঙ্গে আর একটি প্রাণী জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য হয়ে—সে নীল বাহাদুর। "চন্দ্র চৌধুরীকে নীল বাহাদুরের সঙ্গে বারে বারে এক করে দেখানো হয়েছে। হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসতে শুনে প্রজারা বলে ওঠে, 'জমিদার এসেছে।' 'জমিদার' শব্দের সঙ্গে 'নীলবাহাদুর' নামের হাতীটি মিলেমিশে গেছে।

আবার, নীলবাহাদুরের জরা বর্ণনার পরই লেখক চন্দ্র চৌধুরীর জরা বর্ণনা করেছেন।

নীল বাহাদুরের সঙ্গে সাঁওতাল প্রজাদের সুসম্পর্ক। "ক্ষুদে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে সে যেন একবার সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে নিলে।" চন্দ্র চৌধুরীও সাঁওতালদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ভালো আছিস তোরা সব?"

'আদরিণী' গল্পে জয়রাম মোক্তারের সঙ্গে আদরিণীর পিতা-পুত্রী সম্পর্ক ছিল। কিন্তু, তারা দুজন মিলে মিশে এক হয়ে যায়নি। তাদের দুজনের পারস্পরিক টানও খুব গভীর ছিল। আদরিণী মারা যাবার অল্প কিছুদিন পরেই জয়রাম মোক্তার মারা যান। কিন্তু, তাদের দুজনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল।

এ গল্পে লেখকের ভাষাভঙ্গি অনবদ্য। অপূর্ব কাব্যিক ভাষা। ভাবের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক। কখনও ভাষায় আসে 'কালিদাসে'র 'মেঘদূতে'র-(পূর্বমেঘ) অনুষঙ্গ। যেমন—'সমস্ত দিন বপ্রক্রীড়া করেও এতটুকু স্বস্তি নেই নীল বাহাদুরের'। 'বপ্রক্রীড়া' শব্দটির অনুষঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায়, 'বপ্রক্রীড়-পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ। আবার, কখনও বা তাঁর ভাষায় লক্ষ্য করি রবীন্দ্রপ্রভাব "ওদের নাগাড়া টিকারা ওদের রণডঙ্কা" রণডঙ্কা শব্দটি আমাদের মনে আনে 'ওরা কাজ করে' কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তিটি, "রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।" আবার, 'ঝড়ের মেঘের মন্দ্র জাগে তার নির্মোঘে'—পড়ে মনে পড়ে, "মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্ত্র জাগে/বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে।"

কখনও বা ভাষায় লাগে রূপকথার ছোঁয়া। 'ডুম ডুম ট্রুম—সাঁওতালদের নাগাড়া বেজে উঠল। বরেন্দ্রভূমির ঘুমন্ত আকাশে অনেক দিন পরে জাগরণের ছোঁয়া লেগেছে।" রূপকথার রোম্যান্টিক আবেশে গল্পের মোহময় সূচনা ঘটান লেখক। 'জাগরণের ছোঁয়া' শব্দটি মনে আনে রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায় সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে তোলার কাহিনীকে। বরেন্দ্রভূমি যেন রাজকন্যা। ঘুমন্ত রাজকন্যার বা ঘুমন্ত বরেন্দ্রভূমির ঘুম ভাঙাবে সাঁওতালের দল। কুমারী মাটির ঘুম ভাঙবে। মাথার উপর চিলের তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উড়ে যাওয়া, আল মাটির অসংখ্য টিলার এখানে ওখানে বিরাট্‌কায় শঙ্খিনী সাপের পেট টেনে টেনে মন্থরগতিতে

এগিয়ে চলা সমস্ত কিছু মিলিয়ে যেন এক রূপকথা। কিন্তু, রূপকথার ঢঙে সূচনা হ'লেও এটি আসলে নিতান্তই বাস্তবধর্মী এক গল্প।

দুঃসাহসিক যাযাবর বৃত্তির দৌলতে অজানা পৃথিবী সাঁওতালদের হাতের মুঠোয়। "বিমুখ প্রকৃতিকে ওদের ভয় নেই এতটুকুও। মাটির বুক থেকেই ওরা ছিনিয়ে আনতে পারে প্রতিদিনের উপকরণ।" এ অংশটি মনে করিয়ে দেয় নজরুল ইসলামের 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সেই অংশকে—

"বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা / যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।" কিংবা, "শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে / ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।"

কখনও বা সরল ভাষায় বর্ণিত হয় সরল সাঁওতাল জাতির আদিমতাময় সরল জীবন ছন্দ। 'নাগড়া বাজিয়ে ওরা বাঘ মারে, আর যুদ্ধ করে মাদল বাজিয়ে ওরা নাচে, আর বাঁশী বাজিয়ে ওরা ভালোবাসে।"

কখনও বা কাব্যিক দ্যোতনা লাগে ভাষায়—'মজে যাওয়া দীঘিতে ওদের চোখে পড়েছে কুমীরের ছায়া। স্মরণে আসে, "যারা বর্বর, হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে/বনের ব্যাঘ্র, মরুর সিংহ, বিবরের ফণী লয়ে।"

"প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো গ্রানাইটের তৈরী কিরাতের দল।" অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা। 'কিরাত' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়।

গল্পের প্রথম অংশটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে এই লেখকেরই 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি।

চন্দ্র চৌধুরীর চেহারার যে বর্ণনা দেন লেখক তা আমাদের নজর কাড়ে। চন্দ্র চৌধুরীর চেহারার সঙ্গে বীরত্ব এবং জমিদারী বা সামন্ততন্ত্র জড়িয়ে রয়েছে। "কপালের দুপাশে শিরা দুটো অত্যন্ত স্ফীত। বাঁ-হাতে তিনটে আঙুল নেই। হিজল বনে একবার বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন তিনি—বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হয়েছিল তাঁকে। শোনা যায় আছাড় মেরেই তিনি বাঘটাকে বধ করেছিলেন—এমন শক্তিমান পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী" চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুও জমিদারসুলভ। পাগলা ঘোড়ার পিঠ থেকে আছড়ে পরে মৃত্যু।

চন্দ্র চৌধুরীর আভিজাত্য মণ্ডিত চেহারা,—'টকটকে লাল চেহারা, রক্তের চাপে সমস্ত মুখ যেন ফেটে পড়ছে। আমাদের মনে আসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই 'হাড়' গল্পে রায়বাহাদুরের চেহারা। 'ভারী গোল একখানা মুখ টকটকে ফরসা ত্বকের ভেতর দিয়ে রক্ত-কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। ব্লাডপ্রেশার কথাটার ডাক্তারী সংজ্ঞা জানি না, কিন্তু কথাটার বাংলা অর্থ যদি রক্তাধিক্য হয় তা হলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশারে ভুগছে।'

জমিদার বা রাজাদের বাঘ শিকারের কাহিনী সুবিদিত। চন্দ্র চৌধুরীর বাঘ শিকার সূত্রে মনে পড়ে 'জলসাঘর' (তারাশঙ্কর) গল্পের বিশ্বম্ভর রায়কে। "বড়দরের শিকারী বাঘ মারা ওঁর খেলা।" কিংবা জলসাঘরের দেওয়ালে টাঙানো রাবণেশ্বর রায়ের ছবি। "রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কি-বল্লম, পিঠে

ঢাল।" 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর মানুষের বাচ্চাকে বাঘ শিকার করার জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করতেন। তবে, দুজনের শুধুমাত্র বাঘ শিকারটুকু মেলে। চন্দ্র চৌধুরী অসম্ভব প্রজাবৎসল জমিদার। তুলনায়, ইন্দ্র চৌধুরীর প্রজার প্রতি মমতা অনেক কম।

গল্পের কোথাও পাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। সাঁওতালরা শিকার করে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে একটি দাঁতালো শুয়োরকে। "অপরিচ্ছন্ন কালো শরীরে আট দশটা তীর শরশয্যার মত বিঁধে রয়েছে। সর্বাঙ্গে থকথকে গাঢ় রক্ত রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়ে আলকাতরার মতো চটচট করছে।" একেবারে জীবন্ত বর্ণনা।

সাঁওতালদের মুখে তাদের ভাষাই বসিয়েছেন গল্পকার। চন্দ্র চৌধুরী "তাই বলে শুয়োর দিয়ে কী করব রে" প্রশ্নের জবাবে সাঁওতালরা বলে,—'খাবি বাবু'। চন্দ্র চৌধুরীর প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত সাঁওতালরা বলে, "তবে তোকে আমরা কী দেব বাবু?"

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতালরা খরগোশ মেরে এনে জমিদার পুত্র অহীন্দ্রকে উপহার দিতে চেয়েছিল। "সারী বলিল—আপোনার কাছে এলম গো, আমরা আজ সব শিকার করলম, তাই আনলম দুটো সুসুরে—উই যি, তোরা কি বুলিস সেই?......সারী বলিল, হুঁ, খরগোশ আনলম আপনার লেগে গো। "বলা বাহুল্য, অহীন্দ্রও মৃত খরগোশ দুটি নেয়নি।

জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর সামনে এসে সাঁওতালের দল সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন জানালো, তাঁর প্রজা হতে চায় তারা। ঠিক এইভাবে 'কালিন্দী' (তারাশঙ্কর) উপন্যাসে সাঁওতালরা জমিদার পুত্র অহীন্দ্রর কাছে এসেছিল। "আপনার কাছে তো এলম গো। বুলছি আমাদের জমি কটির খাজনা তুরা লে, আমাদিগকে চেক-রসিদ দে, তা নইলে কি করে থাকবো গো?" (কালিন্দী) দুটি ক্ষেত্রেই আমরা একেবারে জীবন্ত বর্ণনা পাচ্ছি। চন্দ্র চৌধুরী অতি সদয় জমিদার। তিনি সাঁওতাল প্রজাদের কাছে খাজনাও নেন না। 'তোদের কাছে আবার খাজনা কিরে।"

নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জের ভাষায় লেগেছে সাঁওতালদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব। "সাপ তো সাপ হুজুর, বাঘের মাংস পেলে তাও কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, বলে কী জানেন? বাঘ যখন আমাদের মাংস খাবে, তখন আমরাই বা বাঘকে ছেড়ে দেব কেন?" গল্পের শেষ দিকে এই নায়েবকেও কিন্তু আমরা সাঁওতালদের প্রতি মমতাময় হ'য়ে উঠতে দেখি। "সেই জীবন্ত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে কঙ্কালকে পুজো করতে হবে—এ কোন দেশী খেয়াল?"

ইতিহাসের এম. এ. নব্য কালের জমিদার ইন্দ্র চৌধুরী কথা বলেন ইংরাজী ভাষা মিশিয়ে। "আনন্দ হচ্ছে এই যে, হয়তো টিলাটা এক্সক্যাভেট করিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার নাম।" পক্ষান্তরে, চন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ দেখি না।

ইন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় সাঁওতাল প্রজাদের প্রতি তার অবজ্ঞা প্রকাশিত—"খাইয়ে দে সমস্ত ধান, দলে পিষে শেষ করে দে। জমি ছাড়বে না—রামরাজত্ব পেয়েছে।"

কোথাও বা গভীর ব্যঞ্জনাবাহী পংক্তি পাই। তিনদিন খেতে পায়নি নীল বাহাদুর। একসঙ্গে তার মধ্যে জেগে উঠেছে বুভুক্ষা আর বার্ধক্য। তবু সে এগিয়ে চলেছে, 'লক্ষ্যহীন অন্ধ চোখে'; 'আর মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল পিছনে বহুদূরে সে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটার

অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে—হাওয়ায় আসছে পোড়া পেট্রোলের বিচিত্র গন্ধ।" অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতেই তো সামন্ততন্ত্রকে তাড়া করছে ধনতন্ত্র। এই রূপকের ব্যবহার আমাদেরকে চমকিত করে।

কখনও বা দেখি নীল বাহাদুর বুঝতে পেরেছে, ঐ জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র তো সত্যই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কি সহজ ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়েছে কি গভীর কথা। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতার বক্তব্যকে লেখক (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) তুলে ধরেছেন তাঁর কলমের একটি লাইনে। "চন্দ্র চৌধুরীর মনে হল, বার বার মনে হল : সেদিনের পালগ্রাম আবার জেগে উঠেছে নীরবতার সঞ্জীবনীতে। অত্যাচারী রাজার একক প্রতাপে নয়—বহু মানুষের, বহু মাটির মানুষের লৌহ কঠিন পেশীর শক্তি-মুখে।"

মনে পড়ে যায়—

"রাজছত্র ভেঙে পড়ে,
রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,

....

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের পরে,
ওরা কাজ করে।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের শক্তিকে অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই।

উপমার অভিনবত্ব লক্ষ্য করবার মত। পুরানো শ্লেটের মতো কালো গলার চামড়া ঝুলে পড়ছে নীচে।" কিংবা, "আদমের প্রথম পুত্রের মতো বোরোর জমি থেকে উঠে এল কর্দম মলিন আধা-উলঙ্গ পুরুষের দল।"

কোথাও বা পাই গদ্যে লেখা একটি কবিতা। "লাঙ্গলের ফলা দুমড়ে বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা করেছে তারা; তীরের আগায় নির্বংশ করেছে দাঁতালো শুয়োরের পাল, বল্লমের মুখে বিঁধে তুলেছে দীঘির পাড়ে ঘুমন্ত কুমীরকে।"

কাব্যিক পংক্তি প্রচুর। "মজে যাওয়া দীঘির শীতল কাদার তলায় শিলা লেখন হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসেব বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে" কিংবা "জন্মান্তর? আজ এই মাদলের ধ্বনি যেন নীল বাহাদুরকে আবার জাতিস্মর করে তুলল! কোনো ঝড়ের রাত্রে মর্মরিত অরণ্যের সুর; বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙড় নামছে হুড় হুড় শব্দে।" অনেকটা এই ধরনের ভাবনা আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রেকর্ড" গল্পে।

'সৈনিক' গল্পে নীল বাহাদুরের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে আমরাও অরণ্যের সুর শুনি, সাঁওতালদের মাদলের শব্দে তার মতই আমাদের চিত্তও আলোড়িত হয়। তার মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা বোধ করি। 'সৈনিক' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অসামান্য সৃষ্টি, একথা আমরা একবাক্যে মেনে নিই।

ভাঙ্গা চশমা : আত্মদর্শন

বৈশালী বসু

সাহিত্যিক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচরণ বিস্তৃত এক অঙ্গনে। আঙ্গিক বদলালেও সত্তা একই থাকে, যে সত্তা নিশ্চিত প্রত্যয়ে জানায়—"আজকের কাহিনির কথা তো ব্যক্তি মানসের উদ্ভাসন নয়। আজকের জীবন সমাজ চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। আজ প্রত্যেকটি মুহূর্তে অনুভব করি আমরা কেউই নিজের নিভৃত লোকে বসে নেই, আমাদের চারিদিকে যে অসংখ্য মানুষের চলাচল—তাদের সেই সমগ্রতায় আমিও একটি অপরিহার্য কণাংশ। তাই সমগ্রকে বাদ দিলে আমি কেউই নই—না ব্যক্তিগত না সমাজগত" (উপন্যাস এবং পটভূমি-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)। এই জীবনের কথা কিভাবে তিনি পাঠককে জানাবেন সে সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত স্পষ্ট; ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—"জীবনের ক্ষতি ও ক্ষতই শেষ কথা নয়, জীবনকে ভালোবাসাই একমাত্র সত্য।" জীবন যেমনই হোক—মসৃণ অথবা বন্ধুর, সুন্দর অথবা অসুন্দর, রঙিন অথবা সাদাকালো—সবটাই আমাদের বড় আপন, তার প্রতিটি পল আমরা নিজস্ব অনুভবে মিশিয়ে নিই, স্বাদ নিয়ে গন্ধ নিয়ে নিয়ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি তাকে—সরাসরি দেখি কখনো, কখনো সাহিত্যিকের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে তা উজ্জ্বলতর এক রূপ ধারণ করে। উজ্জ্বলতর মানে আরো বেশি সুন্দর নয়, আরো বেশি স্পষ্ট। জীবনের যে কোণগুলিতে আমাদের দৃষ্টির, অনুভবের আলো পড়েনা—সাহিত্যিক তাঁর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে, বিশ্লেষণী ক্ষমতা নিয়ে, তীক্ষ্ণ কলম হাতে পৌঁছে যান সাধারণের পক্ষে আপাত অগম্য সেইসব কোণেও—তাই সে বীক্ষণ আমাদের করে তোলে সচেতন, সমাজমনস্ক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের হাত ধরে আমরা এভাবেই তাঁর সহযাত্রী হই জীবনের সেই অনন্ত যাত্রায়।

কবিতায় যাঁর সাহিত্যজীবন শুরু, সেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে এক সময় এসেছে একের পর এক ছোটগল্প। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, এর জন্য এমন একটি অভিঘাত অবশ্যই প্রয়োজন যার অনিবার্য-প্রভাবে সাহিত্যিক তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ কোন সাহিত্যমাধ্যমের আশ্রয় নেবেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমনই এক অভিঘাত। পৃথিবীকে অনিশ্চয়তায়, অবিশ্বাসে, অপ্রেমে, হিংসায়, দ্বন্দ্বে, নিষ্ঠুরতায় কাঁপিয়ে দেওয়া বিশ্বযুদ্ধের হাত ধরে এদেশে এসেছিল মন্বন্তর, দাঙ্গা, বিক্ষোভ। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবন-সমাজ-সময়সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে এই পাল্টে-যাওয়া সময়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরায় দায়বদ্ধ ছিলেন—ছোটগল্পের মাধ্যমে জীবনের টুকরো টুকরো ছবি এঁকেছেন তাই শুধু অবক্ষয়ের ছবিই আঁকেননি—অবক্ষয়ের বিপরীতে আপাত-অদৃশ্য অস্তিবাদী সত্তাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন সহজেই—তাঁর ছোটগল্প এই বৈপরীত্যেরই দর্পণ। 'ভাঙা চশমা' এমনই এক প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটগল্প। চল্লিশের দশকের বাংলা দেশকে আমূল বিদ্ধ করেছিল এক শ্রেণীর মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষ, ভয়াবহতা, বীভৎসতা ও মৃত্যুর সংখ্যায় এই দুর্ভিক্ষ নির্মমভাবে হারিয়ে দিয়েছিল ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের

মন্বন্তরকেও। "বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল" (১৯৪৬-৪৭—জীবনানন্দ দাশ)। মৃতপ্রায় অথচ জীবিত কিছু মানুষ গ্রাম থেকে পালিয়ে শহরে এসে আস্তাকুঁড়ের কুকুরদের সহভোজী হয়েছিল—অনেক বেশিসংখ্যক মানুষ বেঁচে থাকার প্রাত্যহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল—আর এদের বাইরের গুটিকতক মানুষ অতীতের ছায়া হয়ে গ্রামে থেকে অদূরে ওত পেতে বসে থাকা নিশ্চিত মৃত্যুর অমোঘ থাবার দিকে এগিয়ে চলছিল। জীবনের চরমতম অবমাননার এই বিভ্রান্ত সময়ই 'ভাঙা চশমা' গল্পের পটভূমি।

'ভাঙা চশমা' এক যুবকের আত্মকথন। গল্পের শুরুতে সে ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাস্টার, যদিও তার উপার্জন আর একটু বেশি—দুটি টুইশনির কুড়ি টাকা করে যোগ করে মোট একশ টাকা। কন্ট্রোল, কালোবাজার, ইনফ্লেশনের ত্রিমুখী যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে যায় স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখ। কঠোর এই বাস্তব থেকে পালিয়ে যাবার মানসিক সবলতাও (!) নেই তার। দুঃসময়ের খাঁচায় আটকে পড়া এই অস্থিরতার মাঝেই সামনে এল এক অভাবনীয় সুযোগ, —গ্রামে গ্রামে রিলিফ ওয়ার্কের জন্য সাব-ডেপুটি গ্রেডের অফিসার হওয়ার সুযোগ—স্কুল শিক্ষকের অগ্রাধিকার। চাকরিটা হয়েও গেল। গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলির ভাগ্যবিধাতা হওয়ার অহংকার উপভোগ করতে করতেও কোন গোপন মুহূর্তে স্কুল-মাস্টারের অবদমিত সত্তা দংশন করে তাকে আর বাস্তব মনটা প্রাণপণে দূরে সরিয়ে দেয় এই সব 'অবান্তর ভাবনা', দিন চলছিল এমনই গতানুগতিকতায়—কিন্তু হঠাৎই সামনে এসে দাঁড়ালেন মাইনর স্কুলের এক হেডমাস্টারমশাই। তাৎক্ষণিক এক সমস্যার সমাধান চান তিনি-সাব-ডেপুটির কাছে,—অনাহারের সমস্যা না—রিলিফ পাওয়া না পাওয়ার সমস্যাও না—যে সমস্যায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত তা হল ছাত্ররা যদি ঠিকমত প্রিপজিশন না শেখে, তাহলে তারা কেমন করে ইংরেজী শিখবে। বলাই বাহুল্য, আমাদের পরিচিত প্রাক্তন স্কুল মাস্টার—অধুনা সাব-ডেপুটির কাছে এর কোন উত্তর ছিলনা, সমাধান কিন্তু একটা ছিল—ভদ্রলোককে পাগল ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু অত সহজে নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। প্রোষিতভার্য যুবকটি এক রাতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে বসে যখন স্ত্রী-বিরহের শূন্যতায় ভারাক্রান্ত—তখনই 'মাঠ ফুঁড়ে' এসে দাঁড়ান হেডমাস্টারমশাই—বাধ্য করেন যেতে তাঁর অনেক পরিশ্রমে অনেক স্বপ্নে গড়ে তোলা একদা ছাত্র-ভরা স্কুলে—আর এক শিক্ষা-তপস্বীর সামনে থেকে, হয়তো বা নিজের অভ্যন্তরের স্কুল-শিক্ষকের কাছ থেকেও পালাতে চেষ্টা করে যুবকটি।

এ গল্পের মূল চরিত্র দুটি—কথক যুবক এবং হেডমাস্টারমশাই। এ দুটি চরিত্রেরই কেন্দ্রীয় রূপ শিক্ষকের। একজন শিক্ষকতা নামক পেশায় যুক্ত ছিলেন, পেশাগতভাবে অসুখী ছিলেন এবং প্রথম সুযোগেই অক্লেশে এবং সাগ্রহে পেশাটি ত্যাগ করেছেন। দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা তপস্যা, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত ভালবাসা। এক জায়গায় দুজনের অসম্ভব মিল—এঁরা কেউই আর তথাকথিত শিক্ষক নন—একজন স্কুল মাস্টারী ছেড়ে সাব-ডেপুটির গৌরবময় (!) আসনে বসেছেন, অন্যজনের ছাত্ররা দুর্ভিক্ষে হয় মৃত, নয়তো গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়েছে—স্কুলটিরও ভগ্নদশা—তাই তিনি হেডমাস্টারমশাই নন, প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাই। কিন্তু এ মিল তো বহিরঙ্গের, মূলত দুজনের অবস্থান একেবারে বিপ্রতীপ।

প্রথমে আসি কথক যুবকটির কথায়। প্রথমেই তার কণ্ঠে বাজে নিজ অবস্থার প্রতি চূড়ান্ত

শ্লেষ- "একশো টাকা একজন ফার্স্ট-ক্লাশ এম-এর জীবনে চূড়ান্ত আর্থিক পরিণতি"—বড্ড অসুখী সে, বড্ড অখুশি, নিজ পেশার প্রতি তাচ্ছিল্যেই সে উচ্চারণ করে বুনো রামনাথের কথা। তাঁর পর্ণকুটিরের দরজায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রার্থী হয়ে আসার ঘটনাটিকে সে স্মরণ করে, কারণ তাতেই সে খুঁজে পায় শিক্ষকতার পরমার্থ। কিন্তু আমরা জানি ঘটনাটি ওখানেই শেষ হয়ে যায়নি—বুনো রামনাথ অসীম নিস্পৃহতায় কৃষ্ণচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, ঐহিক সুখ-অর্থ-রাজসম্মানের কোন গুরুত্বই ছিলনা তাঁর কাছে—বিদ্যাচর্চা এবং বিদ্যাদানেই (বিদ্যাবিক্রি নয়) ছিল তাঁর আনন্দ। শুধু তাই নয়—তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সর্বপ্রকার ঐহিক মোহমুক্ত, তিনি জানতেন তাঁর স্বামীর আসন কোথায়। কথক যুবক এবং তার স্ত্রী-দুজনের কাছেই এই প্রত্যাখ্যান গুরুত্বহীন। তাই সাবডেপুটি পদের অস্থায়ী চাকরিকেও যে 'উচ্চকাঙক্ষার চতুর্বর্গ' ভাবে। অন্তরে নিশ্চিত জানে এ চাকরিটা "আবু হোসেনের নবাবী"—তবুও লোভ সামলানো দায়। নিঃস্ব মানুষগুলির দন্ডমুন্ডের কর্তা সাজার মধ্যেই সে খুঁজে পায় এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার সত্যিকারের সম্মান। বিদ্যার স্নিগ্ধ দীপ্তি নয়, ডিগ্রীর প্রবল তেজই তার কাম্য। মাঝে মাঝে সংশয় উপস্থিত হয়—সত্তা বদলের সংশয় নয়—রিক্ত মানুষগুলিকে অনাবশ্যক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয়। যে মানুষগুলির ত্রাণের দায়িত্ব নিয়ে সে এসেছে—তাদের 'ত্রাতা' হওয়ার অহংকারকে সে উপভোগ করতে চায় অবশ্যই—কিন্তু মৃত্যুর অন্ধকার থেকে জীবনের আলোয় উত্তরণের প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধেই সে সন্দিহান—সুতরাং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে তার দায়বদ্ধতা সহজেই অনুমেয়। সাব-ডেপুটি হওয়ার অন্য সুবিধাজনক দিকগুলিও সে আয়ত্ত করে সহজেই-মাইনে ছাড়াও আর যা মেলে তা অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করে। সততা-শুভবোধের ধারণাগুলি বিস্মৃত হয়, শুধু তাই নয় তাকে স্কুলমাস্টারী বিবেক বলে ব্যঙ্গও করে। ছাত্র-পড়ানোর 'মল্লযুদ্ধর দিনগুলি অতিক্রম করে 'ভিক্ষের জয়' পাওয়ার মত সুবিধাবাদী, অমানবিক মানসিকতা তার করায়ত্ত। সব হারানো মানুষগুলো যখন শুধুমাত্র করুণার প্রত্যাশী হয়ে বেঁচে থাকে, বাঁচার ন্যূনতম রসদের জন্য ভিড়-করে-নিজের অবস্থানজনিত উন্নাসিকতায় ও উদাসীন নিষ্ঠুরতায়, সে ভাবে এটি "অমানুষিক মানুষের একটা বীভৎস সমাবেশ"। "স্কুল মাস্টারী বিবেক" একটু-আধটু খোঁচা মারে, যখন সরকারী কর্মচারীর লোভের দৃষ্টি পড়ে অসহায় তরুণীর ওপর। মাইনর স্কুলের হেডাস্টারমশাই-এর অসঙ্গলগ্নতা প্রাথমিকভাবে খুব বেশি বিচলিত করে না তাকে। কিন্তু রাতের আঁধারে যখন আবার তাঁকে দেখে তখন তাঁর অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক চেহারা তাকে বিপর্যস্ত করে দেয়—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে যেতে হয় ভূতপূর্ব স্কুলবাড়িটিতে—আর সেখানেই সে আবিষ্কার করে সত্যিকারের শিক্ষক ছাত্রের শারীরিক অনুপস্থিতিতেও শিক্ষাদানে বিরত থাকেন না—গভীর অন্ধকারের গোপন উৎস থেকে যে প্রজ্ঞার আলো উৎসারিত হয়—সেই আলোয় নগ্ন হয়ে যায় এই যুবকটির লোভ, আদর্শচ্যুতি, মননহীনতা—তার আত্মদর্শন এবং আত্মোপলব্ধি ঘটে একই সঙ্গে।

ঠিক এর বিপরীতে অবস্থান মাইনর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই-এর। সাব-ডেপুটির যেমন বাস্তব জীবনে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটেছে, অর্থে এবং পদমর্যাদায়, হেডমাস্টারমশাই তেমনই সব হারিয়েছেন—অনেক কষ্টে-তৈরি করা স্কুলটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে, ছাত্ররা কেউ মৃত, কেউ পলাতক—স্বাভাবিকভাবেই তিনি চাকুরিহীন—কিন্তু এ তো সাংসারিক

সাধারণ অঙ্ক-কষা লোকেদের যোগ-বিয়োগের হিসেব। হেডমাস্টারমশাই তো আমাদের মতো ছোট মাপের চেনা দুঃখ চেনা সুখ নিয়ে বাঁচা যে কোন একজন মানুষ নন—তিনি শিক্ষক। শিক্ষকতা তাঁর পেশা নয়, তাঁর সত্তা। এ গল্পে তাঁর প্রবেশ প্রায় মাঝপথে-অথচ ঋজু প্রত্যয়ে অনমনীয় এই মানুষটিই এই গল্পের চালিকাশক্তি, পাঠকদের তিনিই দেন সেই সত্যের সন্ধান যা জটিল অস্থির টালমাটাল সময়ের দীপবর্তিকা।

এই দুটি মানুষের টানাপোড়েনের ছবিটি সম্পূর্ণ করেছে আরো কিছু চরিত্র। প্রথমেই যার কথা উল্লেখ করতে হয়—সে অনু, কথক যুবকটির স্ত্রী, প্রত্যক্ষভাবে তার উপস্থিতি এ গল্পে নেই—কিন্তু অদ্ভুত নিপুণতায় এই চরিত্রটিকে উপস্থিত করেছেন লেখক। তার পরোক্ষ ভূমিকাই এক শিক্ষককে সাব-ডেপুটিতে রূপান্তরিত করে। কারণ তার স্বামী প্রথমেই আমাদের জানিয়ে দেয়-"বাইরের ঝড়ঝাপটা যদি বা সহ্য হয়, প্রেয়সীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে বানপ্রস্থ নিতে ইচ্ছে করে।" বিশেষত প্রেয়সী শুধু বনেদি পরিবারের মেয়েই নয়, গ্র্যাজুয়েটও। এত শিক্ষিত মেয়ে বলেই সে হয়তো শিক্ষকতার পেশাটিকে ধিক্কার দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে! [আর, হেডমাস্টারমশাই স্ত্রীর গলায় হার বিক্রী করে গ্রামের স্কুলের চালাঘর উঠেছিল-সে মহিলা নিশ্চয়ই গ্র্যাজুয়েট ছিলেন না।]

সাব-ডেপুটি হয়ে কথক শিক্ষার পরিমন্ডল থেকে কতটা দূরে এসে পড়েছেন তার মূর্তিমান প্রমাণ হৃদয় প্রামাণিক। তাকে ত্রাণ নিতে হয়না—ত্রাণকর্মের সে অংশীদার, সুতরাং গ্রামের না খেতে-পাওয়া মানুষগুলির থেকে তার অবস্থান আলাদা। ত্রাণকর্মের অংশীদার হওয়ার মধ্যে যে মহত্ত্ব থাকার কথা—হৃদয়-চরিত্র তার ঠিক উল্টো। দুর্ভিক্ষপীড়িত তরুণী মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টিতে শকুনের লালসা—আর হেডমাস্টারমশাইকে 'পাগল' বলে তাচ্ছিল্য করা—এই দুটি ঘটনাই আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়-একদা যাকে নবীন ছাত্ররা ঘিরে থাকত-সেই সাব-ডেপুটির সঙ্গী এখন কারা।

লেখকের ছোটগল্পের ভাষা একদিকে তীব্র রোমান্টিক, অন্যদিকে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক। 'ভাঙা চশমা'ও এর ব্যতিক্রম নয়। ছোট্ট ছোট্ট ব্যঙ্গের তির্যকতায় গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যান লেখক। একজন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রেশন কার্ডের অবরুদ্ধ অঞ্জলি দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় যা চুঁইয়ে পড়ে তাতে চিঁড়ে ভেজে না।" যে স্কুলে কথক চাকরি করত সে স্কুলের হেডমাস্টারমশাই-এর চরিত্রটি একটি বাক্যে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি "সেক্রেটারীর বাড়িতে খোল বাজিয়ে নাম-কীর্তন করেন"। যে গ্রামে কথক সাব-ডেপুটি হয়ে যায়-সেই গ্রামের অনাহারক্লিষ্ট মানুষরা তার "প্যান্টের ক্রীজ আর হ্যাটের ঔদ্ধত্য দেখে চমকে ওঠে", হঠাৎই জেগে ওঠা বিবেক তাকে জানায় সে "একটা বিরাট প্রহসনের বিদূষক", খুব তাড়াতাড়ি সে উন্নতির পথটাকে চিনে নেয়, অনায়াসেই বলে "মড়কবিশেষ না হলে জীববিশেষের পার্বণ হয়না, আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে।" কত অনায়াসে একটিমাত্র বাক্যে সুবিধাবাদী, বিবেকহীন, অমানবিক একটি চরিত্রকে চিহ্নিত করে দেওয়া গেল। এই চরিত্রটির কেন্দ্রীয় সুবিধাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেখক বারবার শেয়াল সম্পর্কিত-বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করেছেন—ধূর্ততা, অনৈতিকতার প্রতিভূই যে এই প্রাণীটি—এ তো আমরা সবাই জানি।

কিন্তু শুধু শ্লেষের সুতো দিয়ে তো গল্পের বুনোটকে শক্ত করা যায় না—তার জন্য আর একরকমের সুতো লাগে—এখানে যা রোমান্টিকতার সুতো। "বাইরের ধানকাটা মাঠ তারার আলোয় বিষণ্ণ পাণ্ডুর হয়ে পড়ে থাকে"—চরাচরব্যাপী এক রিক্ততার বাতাস যেন বইয়ে দিয়ে যায় এই বর্ণনা। স্ত্রীর সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ বৈষ্ণব পদাবলীর উল্লেখে মেদুর। বিরহক্লিষ্ট তারই মতো তার বাংলা দেশও বড় দুঃখে আছে—কথক এ কথা অনুভব করতে পারে বলেই সে দেখতে পায়,-"বাঙলাদেশের চোখের জলের মতো শিশিরবিন্দু চাঁদের আলোয় টলমল করছে।" হেডমাস্টারমশাই-এর বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আদর্শ দর্পণের মতো যুবকটির আত্মবিম্ব দর্শন করায়—সে উপলব্ধি করে "বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই—আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে"। ছাত্রহীন পোড়ো আটচালা জ্ঞানতাপস হেডমাস্টারমশাই-এর স্পর্শে হয়ে ওঠে প্রাচীন তপোবন, যেখানে প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর "মন্ত্র উচ্চারণের মতো টানা কণ্ঠস্বর"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের হাত ধরে আসা কিছু কালোবাজারী মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষ—এ সময় থেকে এগিয়ে এসেছি অর্ধশতাব্দী পার হয়ে আরো এক দশক—তবুও এই কথক যুবকটিকে বড়-চেনা লাগে এখনো। চারপাশে তাকালেই আমরা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের মুখগুলি দেখতে পাই—যারা ভালো থাকার জন্য, আরো ভালোতে থাকার জন্য-শিকড় থেকে নিজেদের উৎপাটিত করে নিচ্ছে বড় সহজেই। বিরাট এই বসুন্ধরা যখন ভুবনগ্রামে পরিণত হয়েছে—এক সর্বগ্রাসী বাজার গ্রাস করে ফেলছে—তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে—তখনই বেড়ে চলেছে মুষ্টিমেয়র ক্রয়ক্ষমতা, অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের উপবাসকে নিশ্চিত করেই। বহুতলের ঝাঁ চকচকে বিলাসী শহরকে তিলোত্তমা করে তোলার জন্য- যেসব মানুষগুলো সব হারিয়ে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে এককোণে-রিলিফ নিতে জড়ো হওয়া আর্ত মুখগুলোর সঙ্গে সেই মুখগুলো একাকার হয়ে যায় কখন। স্বচ্ছলতার মরীচিকা যখন দৃষ্টিকে আবিল করে তোলে—তখনই স্পষ্টভাবে সুস্থভাবে সুস্থ পৃথিবীকে দেখার জন্য স্বচ্ছতার চশমা লাগে। কিন্তু তাতেও কি মনের চোখ খোলে? সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ যখন ফুরিয়ে যায়, কর্কশ বাস্তব অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে অতীতের ছায়ার মতো বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে-তখনো কিন্তু আপন প্রত্যয়ে অটল থাকা কিছু মানুষের অন্তর্দৃষ্টি—থাকে সজাগ, জীবনের প্রতি আস্থায় তাঁরা থাকেন অবিচল। এই গল্পের হেডমাস্টারমশাই-এর মতো মুহূর্তের হতাশায় হয়তো বলে ওঠেন—"কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা?"—কিন্তু আপন অন্তরের সত্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পান—"আছে, সবাই আছে। তারা কোথাও যায়নি, যেতে পারে না"। শেয়াল-শকুনের সমগোত্রীয় হয়ে বেঁচে থাকা সাব-ডেপুটির আত্মদর্শন ঘটান যে মানুষটি—'ভাঙা চশমা' প্রতীকীভাবে তাঁর চোখে থাকলেও তাঁর প্রত্যয়ের উদ্ভাস সাব-ডেপুটির মলিন-হয়ে যাওয়া নজরে আনে আত্মোপলব্ধির দর্শন। একটি-ছোটগল্পের ছোট্ট পরিসরে কথক চরিত্রটির জীবনাদর্শের ক্রমপরিবর্তন এবং আত্মউন্মোচন 'ভাঙা চশমা' গল্পটিকে উপন্যাসের ব্যাপ্তি দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে আরো অনেক কিছুর মতোই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল জাপানের একটি ছোট্ট স্কুল—তোমোই গাকুয়েন। সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই সোসাকু

কোবায়াশীও বড়ো যত্নে, বড়ো মমতায় বড়ো ভালোবাসায় গড়ে তুলেছিলেন স্কুলটি। ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"এরপর আমরা কেমন স্কুল তৈরি করবো?"—হেরে যাননি মানুষটি, তাই তাঁর স্কুলটি বাহ্যিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেলেও হারিয়ে যায়নি। সেই স্কুলের এক ছাত্রী তেৎসুকো কুরোয়ানাগি বড়ো হয়ে লিখেছেন 'তোত্তো-চান' নামে একটি-অসাধারণ বই—যে বইতে আঁকা আছে তোমোই গাকুয়েনের ছবি আর এক হেডমাস্টারমশাই-এর কথা—যিনি আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন ছোটদের জন্য একটি সত্যিকারের ভালো স্কুল তৈরি করার। 'ভাঙা চশমা' গল্পের মাইনর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই হয়তো সোসাকু কোবায়াশীর মতো বাস্তব পৃথিবীর মানুষ নন—নেহাতই গল্পের এক চরিত্র, কিন্তু এ গল্প তো কল্পনার আকাশে ডানা মেলে হারিয়ে যাওয়ার গল্প নয়—বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে শিকড়-ছড়িয়ে পৃথিবীকে বিশুদ্ধ-বাতাসে ভরিয়ে দেওয়ার গল্প। লেখক তাই এমন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যে চরিত্র সমকালীন রিক্ততা-জটিলতা-লোভ-উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া মানুষদের বিপরীতে-দাঁড়িয়ে সুস্থতার, বিশ্বাসের, আশাবাদের নির্মলতা দান করবেন—শিক্ষকের মতো নিপুণভাবে এই কাজটি আর কেই বা করতে পারেন? বুনো রামনাথ- সোসাকু কোবায়াশী-মাইনর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই—এঁরা সবাই এক হয়ে প্রতিরোধ করেন সমাজের অবক্ষয়কে, সামাজিক মানুষের লোভজনিত পতন থেকে উত্তরণের দিশা দেখান, কেবল এঁরাই বায়ুকে পারেন বিষমুক্ত করতে।

রেকর্ড : এক অজানা সুরের মূর্ছনা

অদীপ ঘোষ

রক্তস্রোতের মতই মুক্তিকামী সত্তার দেশকাল ব্যক্তি নিরপেক্ষ অনন্ত বহতা। রক্তস্রোত থেমে গেলে জীবন থেমে যায় কিন্তু মানুষের এই সত্তার বহতা চিরকালের; কারণ মানুষের মৃত্যু হলেও মানুষ তো মরে না। তার ভেতরকার এই প্রবণতা একদিকে যেমন সহজাত, তেমনি একই সঙ্গে তা এক প্রজন্ম থেকে অন্যপ্রজন্ম যেন উত্তরাধিকার সূত্রে অনিবার্যভাবে লাভ করে। তাই তার প্রকাশ নিতান্ত অজানা অচেনা হলেও হৃদয়গত আত্মীয়তার টানে হৃদয়ে হাত রাখে। দেশ কাল ভাষা সংস্কৃতি সেখানে কোনো প্রাচীর তুলতে পারে না। নির্বাধ তার সংক্রমণ, অনুসরণ।

'রেকর্ড' গল্পে নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই সত্যেরই উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। কাহিনির মূল কেন্দ্রে রয়েছে পুরোনো রেকর্ডের দোকান থেকে কেনা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষা ও সুরের একটি কোরাসের রেকর্ড। যার একরাশ অদ্ভুত বাজনার কনসার্ট ও তারপর অদ্ভুত সুরে গাওয়া অচেনা ভাষার গান লেখককে খুব ভেতর থেকে এক অমোঘ টানে আকর্ষণ করেছিল; মনে হয়েছিল, এই গান ও সুরের সঙ্গে অচেনা হলেও কোথাও একটা আত্মীয়তাবোধ তার জেগে উঠছে। তাই সসম্ভ্রমে বিনা দরাদরিতেই রেকর্ডটা তিনি কিনে নেন।

বাড়ি ফিরে রেকর্ডটি চালালে তাঁর স্ত্রী-ও প্রাথমিক বিরক্তবোধের পরেই সেই একই রকম টান অনুভব করেন। হাতের কাজ রেখে উঠে আসতে বাধ্য হন রেকর্ডটির কাছে। মন ভরে যায় এক নাম-না জানা অস্বস্তি ও বিষণ্ণতায়। লেখকের মতোই তাঁরও মনের ভেতর গানটি এমন একটা দোলা দেয় যা খুব সাধারণ নয়, যা অস্থির করে তোলে তাঁর বোধিকে। এ ভাবই কাহিনীব প্রথম পর্বে রেকর্ডটির অন্তর্নিহিত রহস্য ও তার উন্মোচনের জন্য উন্মুখতা এই দম্পতি ও পাঠককেও আবিষ্ট করে। কাহিনির দ্বিতীয় পর্বে রেকর্ডটির স্বরূপ উদঘাটনেব প্রাণপণ প্রয়াস। এই প্রযাস-প্রতিফলের মধ্যেই রেকর্ডটির গান ও তার সুরের বহুমাত্রিকতা আন্তর্জাতিকতা আভাসিত হয়।

লেখকের সহধর্মিণী করুণার মনে হয়েছে আসামের খাসিয়াদের গানের সঙ্গে এই বিশেষ গানটির মিল আছে; আবার মনে হয়েছে, প্রকৃতির দুরন্তপনার দিনে ব্রহ্মপুত্রের ডাকের সঙ্গে নাগাদের ঢাকের আওয়াজের যেন চলন্ত কোলাজ এই গানটি। গানটিতে লেখক খুঁজে পেয়েছেন মানভূমের গ্রামীণ নির্জন অন্ধকার থেকে উঠে আসা নাগারা-টিকারার আওয়াজ। প্রসঙ্গত এসেছে তারও আগে শোনা বালুরঘাটের সাঁওতালি গ্রাম থেকে ভেসে আসা নাগরা টিকারার রোল। মনে পড়েছে তার পরের রাতটিতেই পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের তীব্র সংঘর্ষ হয়। এঘটনা বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের।

উল্লেখযোগ্য, লেখকের ক্ষেত্রে দুটি অতীত স্মৃতিই পরম্পরা মেনে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে রেকর্ডের গানের সঙ্গে, যার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক-সামাজিক অন্যটি সামাজিক-রাজনৈতিক।

অবশ্য 'সামাজিক' শব্দটির ক্ষেত্রে 'সাংস্কৃতিক' শব্দটিও ব্যবহার করা যায়। এরপর পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বলে প্রচারিত শ্রীমতী আইভি-ও গানটির নামগোত্র নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে লেখকের কানে এল বাঘের ডাক। 'আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ।' সার্কাসের তাঁবু থেকে বাঘের গর্জনের সঙ্গে সেই রেকর্ডের গানের মিল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সুন্দরবনে কথা মনে পড়ে বাঘের এই গর্জন।

কাহিনি এবার সমাধান পর্বে এসে হাজির হয়েছে। এক ভূপর্যটক শেষপর্যন্ত রেকর্ড-রহস্যের সমাধান করেছেন। জানিয়েছেন, ইউরোপের ছোট একটি দেশে নাৎসী অধিকারের সময় রেকর্ডটি হয়েছিল; এটি সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের গান, হিটলার বাহিনী এর প্রত্যেকটি কপি, এর অরিজিনাল-এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে 'লিকুইডেট' করেছিল।

গল্পের অন্তিম পর্বে এসে অতীত মিলে গেছে বর্তমানে। ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশের বর্বরোচিত অভিযান এই যোগসূত্র হয়ে উঠেছে। ছাত্রদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা ও তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে লেখক সেই স্বাধীন সত্তার বিপর্যয় ও তার বিরুদ্ধে চিরকালীন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ যোগ খুঁজে পেয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন সেই দুরন্ত শক্তি যা প্রকৃতিতেও নিহিত, যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তার মুক্তি সংগ্রামে। রেকর্ডটির গান ও সুরের উৎসভূমি এরকমই মুক্তি সংগ্রামের ছিল; যে মুক্তি চেতনা লেখকের অন্তরলোকেও রক্তস্রোতের মত নীরবে নিরন্তর বয়ে চলেছে—করুণার ভাষায় তা 'কেড ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি, কেউ পারবে না।'

গল্পটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ঐ অচেনা লেবেলের, অচেনা ভাষায় রেকর্ডটির সম্পর্কে কতগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করি,—

১) রেকর্ডটির গানের ভাষা ও তার সুর লেখক তথা ভূপর্যটক ছাড়া সকলেরই অচেনা ছিল, তা সত্ত্বেও লেখক ও তাঁর স্ত্রী গানটির সঙ্গে বিচিত্র আত্মীয়তা অনুভব করেছেন।

২) রেকর্ডটি শোনার পর করুণার মনে হয়েছে তার সঙ্গে আসামে থাকাকালীন শোনা খাসিয়া নৃত্যের মিল আছে।

৩) বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের ডাকের সঙ্গে বুনো হাতির গর্জন ও নাগাদের ঢাকের আওয়াজের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য টানা হয়েছে।

৪) মানভূমের ঝালদায় অন্ধকার নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে শোনা দূরাগত নাগরার আওয়াজের সঙ্গেও লেখক রেকর্ডটির মিল অনুভব করেছেন।

৫) মিল পেয়েছেন ঘুমন্ত কলকাতার বুক চিরে সার্কাসের বন্দী বাঘের গর্জনে।

৬) সবশেষে রাস্তায় ছাত্রদের শোভাযাত্রা ও তার উপর পুলিশি অত্যাচার রেকর্ডটির সুনিশ্চিত ভাবে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছে লেখক, করুণা তথা পৃথিবীর যে কোনো কালের যে কোনো দেশের মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে।

এই বিষয়গুলি থেকে যে সত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা হল,—

ক) সাধারণভাবে মানুষ মাত্রেই তার অস্তিত্বের সচেতন ভূমিতে রয়েছে স্বাধীন সত্তার আধিপত্য; যে সত্তাকে বুলেট-বেয়নেটে অবরুদ্ধ করা যায় না; কারণ এই অবরুদ্ধতা তাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যেখানে মৃত্যুর থেকেও মুক্তি বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। দেশে

দেশে মানুষের মুক্তি সংগ্রামে কোটি কোটি আত্মোৎসর্গের ঘটনা তারই অকাট্য সাক্ষ্য।

খ) প্রকৃতির আত্মজ মানুষ; তাই মানুষের মধ্যে প্রকৃতির নানা চরিত্রধর্ম রয়েছে। প্রকৃতির মতো একদিকে সে যেমন স্বাধীনচেতা, তেমনি প্রকৃতির মতোই তার দুর্বার প্রতিবাদী প্রবণতা। তাই মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে যে শক্তি কাজ করে তার সমান্তরালে লেখক বারবার প্রাকৃতিক ও লোকজ পরিবেশ ও দৃষ্টান্ত টেনেছেন বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় ভেঙে নেমে আসা বুনো হাতির গর্জন, সার্কাস-বন্দী বাঘের গর্জনের সঙ্গে; শুধু তাই নয়, লোকসমাজের অনুষঙ্গ এই সাদৃশ্যসূত্রে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। (যেমন, নাগাদের পরব, ছৌ নাচের পালা, খাসিয়াদের নাচ); কারণ প্রকৃতির মতোই লোকসমাজ-সংস্কৃতি তার আদিমতাকে আজও দৈনন্দিন দিন-যাপনের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে; আর স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা আদিম এক প্রবণতা।

গ) 'রেকর্ড' শব্দটির মধ্যেই অতীতের মাত্রা স্পষ্ট। কিন্তু এক অর্থে তো অতীত বলে কিছু আলাদা করা যায় না। বর্তমান তো অতীতেরই চলমানতার ফসল। তাই ক্রীতদাস থেকে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন, অবিচার, অপমান প্রাচীন কালের মতো আজও চলছে; শুধু বদল হয়েছে রূপের। আর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদী ভূমিকা আজও স্পার্টাকাসকে মনে করায়। প্রাচীনকালের রাজতন্ত্রের অত্যাচার আজ রূপ বদলেছে সাম্রাজ্যবাদের মুখোশে, সভ্যতার মুখোশে; নাৎসী বাহিনীর পাশবতা বিশ্বযুদ্ধেই শেষ হয় নি, তা ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজও কম শক্তিমান নয়,

আবার সমান্তরাল ভাবে তার বিপরীতে মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, মুক্তিসংগ্রাম আজও অব্যাহত, চিরকালের প্রমিথিউসের মত। গল্পের অন্তিম পর্বে ছাত্রদের মিছিল ও তার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাসচার্জ এই সূত্রকেই অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠারই ঘোষণা করুণার 'শেষতম সংলাপে,—'এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।'

শেষপর্যন্ত প্রমাণ হয়ে যায়, ঐ অচেনা লেবেলের রেকর্ডটির অচেনা সুর ও ভাষায় গানটি পৃথিবীর কোনো মানুষেরই অচেনা নয়। ওর মধ্যে আছে মানুষের বাঁচার চিরকালের আর্তি ও লড়াইয়ের ইতিহাস। তাই নাৎসী অধিকৃত ইউরোপীয়ান দেশটির মুক্তিযোদ্ধাদের গান শুধু তাদেরই নয়, তা সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের আত্মীয়। না চিনতে পারলেও তার সঙ্গে লেখক ও তাঁর স্ত্রী আত্মীয়তা অনুভব করেছেন; উপলব্ধি করেছেন, 'ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।'

ছোটগল্পের সংযম ও তার উন্মুখ গতি 'রেকর্ড'কে গাঠনিক দিক থেকেও সার্থক করেছে। সারা গল্প জুড়ে রয়েছে রেকর্ডের পরিচয় রহস্য উন্মোচনের জন্য পাঠকের কৌতূহলের রসদ। আবার পরিণতি পর্বের সঙ্গে সমঞ্জস ইঙ্গিত দিতে দিতেই কাহিনী অতীত থেকে নেমে এসেছে বর্তমানে এবং তারওপর আবহমান কালে। কোথাও এতটুকু মেদ নেই যা গল্পের গতি ভারাক্রান্ত করে।

ইতিহাস : অতীতের দর্পণে সমকালের প্রতিচ্ছবি

রূপা চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস বিয়াল্লিশের উত্তাল আন্দোলন এবং.এক সর্বনাশা প্লাবনের মধ্যে। সর্বজনীন ঐক্যের ভবিষ্যৎ স্বপ্নসম্ভাবনা এই তিনটি সূত্রের নিটোল বুননে গড়ে উঠেছে 'ইতিহাস' এর গল্পরূপ। কাল-আজ-কালের যে অনন্ত সময়ধারা, একটা ছোটগল্পের আঙ্গিকে তাকে বাঁধার দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন গল্পকার। অতীতের ইতিবৃত্তে বর্তমানকে খুঁজে পাওয়া, আবার বর্তমানের পরিণামে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ—ইতিহাসবিদ অমরেশের এই চিন্তাসূত্রে ধরা পড়েছে বাঙালীর প্রবহমান জীবনেতিহাস।

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পের বিষয়বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর পটভূমিতে মধ্যবিত্তের হতাশা, বেদনা, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, মন্বন্তর, দাঙ্গা। 'ইতিহাস' গল্পে গল্পকার লিখেছেন পরাধীন বাংলাদেশের বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। পিতা অমরেশ, কন্যা প্রণতি, পুত্র লোকেশ—তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস, বৃহত্তর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত জীবন এবং সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল তাদের জীবনবোধ 'ইতিহাস' গল্পটিকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রসারিত করেছে।

এক

স্কুল শিক্ষকের পেশাগত জীবন থেকে অবসর নিয়ে অমরেশ বাংলার অতীত ইতিহাসচর্চায় মগ্ন। গৌড়বঙ্গের ইতিহাস রচনায় তিনি ব্যাপৃত হয়েছেন কোনো খ্যাতির লোভে নয়। তাঁর অভিপ্রায় শুধু এটুকুই যে 'বাঙালী নিজেকে জানুক'। ইতিহাসের সত্য সন্ধানে ব্রতী অমরেশ এবং পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ পিতা অমরেশ—এই দুটি সত্তা সমগ্র গল্প জুড়ে সক্রিয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনে যখন অমরেশ জিজ্ঞাসা করেন 'লোকেশ ফেরেনি এখনো' তখন যেমন বোঝা যায় স্নেহব্যাকুল পিতার উদ্বেগের কথা, সেরকমই আবার প্রণতির শত অনুরোধ সত্ত্বেও লোকেশকে বাধা দিতে না চাওয়ার মধ্যে রয়েছে আদর্শ পিতৃত্বের চেতনা। সারাজীবন ইতিহাসের মর্মসত্য উদঘাটনে রত যে পিতা তাঁর জীবনের উপলব্ধি এটাই যে 'ভুলের মধ্যে দিয়েও সত্যকে খুঁজে পাবেই একদিন।' একদিকে ইতিহাসব্রতী অমরেশ জানেন যে দেশের দারুণ দুর্দিনে গণশক্তি জেগে ওঠে; তিনি বোঝেন কোন্ নিপীড়ন, কোন্ অপমানের উদগ্র জ্বালায় অস্থির হয়ে পরাধীন দেশের মুক্তিকামী মানুষ মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে চায়, অন্যদিকে, বৃদ্ধ, অশক্ত, সন্তানস্নেহে দুর্বল পিতা পুত্র লোকেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে। তাই যে পুত্র নিজের ভবিষ্যতের সোনালী সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে অনিশ্চিতকে জীবনে বরণ করে নিতে উদ্যত তার উদ্দেশে পিতার সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়—"কিন্তু এই পথই তুমি বেছে নিলে শেষ পর্যন্ত। আরো তো অনেক কিছুই করবার ছিল তোমার। লেখাপড়া, কাজকর্ম....."। আদর্শবাদী প্রত্যয়ে স্থিত পুত্র লোকেশ অমরেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর আজীবনের ইতিহাসচর্চার মূল সুরটুকু—

"আপনি তো জানেন, এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজের জন্য যা কিছু সব মিথ্যে হয়ে যায়, তার চাইতে ঢের বড় কাজের ডাক আসে। আমি জানি, একথা আপনি মনের থেকে বলেননি।"

অমরেশ তো সত্যিই জানেন অষ্টম শতাব্দীর অরাজক বাংলায় গণশক্তির অভ্যুত্থানেই গোপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন—বাংলার রাজলক্ষ্মী আবার নষ্ট মহিমা ফিরে পেয়েছিল। বিয়াল্লিশের বাংলাও কি অরাজক নয়? পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা, অর্থনৈতিক শোষণে পঙ্গু এই বাংলার বুকেও যে দরকার ঠিক ওরকমই এক জনজাগরণ একথা বোঝেন অমরেশ। আর তাই পিতৃসত্তার সাময়িক দৌর্বল্যকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর চারিত্রিক ভারসাম্য। ক্লিষ্টকণ্ঠেও শেষপর্যন্ত অমরেশ বলেন 'বেশ'। হৃদয় আর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বন্দ্বে জয়ী হয় বুদ্ধিবৃত্তি। ইতিহাসের সত্যবোধ অমরেশের চরিত্রটিকে দিয়েছে ব্যাপ্তি। ইতিহাস অমরেশকে শিখিয়েছে যে, 'জয়-পরাজয়, দুঃখ-দৈন্য-মৃত্যুর মধ্য দিয়া আগাইয়া চলে বাংলার জীবন।' পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যেই যে জীবন সীমাবদ্ধ নয়, তারও উপরে সমকালীন বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার যোগ যে নিগূঢ় এই চেতনাই অমরেশকে দিয়েছে সন্তানশোককে তুচ্ছ করার শক্তি। তিনি পারেন পরাধীন বাংলার সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে অষ্টম শতাব্দীর বাংলার অরাজক অবস্থাকে কিংবা পালবংশের অন্তিম লগ্নের বরেন্দ্রভূমির দুঃস্বপ্নকে অন্বিত করতে।

অমরেশের স্বদেশপ্রীতি তার দুটি সন্তান প্রণতি ও লোকেশের চরিত্রে দুরকমভাবে ক্রিয়াশীল। প্রণতি সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী। 'ডু অর ডাই' এর আহ্বান যে সর্বনাশা মূর্তি ধরে আগুন জ্বালিয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে তা প্রণতির কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। তার প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা এই যে, এ আগুনে তাদের ছোট্ট পরিবারও ধ্বংস হয়ে যাবে। পারিবারিক স্নেহবন্ধনকে অটুট রাখতে সে সচেষ্ট। অন্যদিকে, লোকেশ বিশ্বাস করে "এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজের জন্য যা কিছু সব মিথ্যে হয়ে যায়, তার চাইতে ঢের বড় কাজের ডাক আসে।" শান্ত, সুখী গৃহকোণের মঙ্গলদীপ প্রণতি। আর লোকেশ জানে, "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ তার জন্য নয়, সন্ধ্যার দীপালোকও তার নিভে গেছে।" ঝড়ের দাপটে খড়কুটোর মত ভেসে যেতে পারে জেনেও ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে নির্ভয়। কারণ লোকেশ অন্তর থেকে বিশ্বাস করে শতাব্দীর লাঞ্ছনা দুর্গতি অপমানের অবসানে এই ঝড়েরই প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসেব আজ তুচ্ছ। পাহাড়ী ঝোরার সন্ধানে যেভাবে সে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করে দুর্গমগিরি অতিক্রম করেছিল; আজ দেশের স্বাধীনতাকল্পে ঠিক একইভাবে সে পারিবারিক মমতার বন্ধনকে তার এগিয়ে চলার পথে বাধা হয়ে উঠতে দিতে চায় না। সেদিনের সেই মৃত্যুর সম্ভাবনাকে রসিকতা করে বলেছিল 'ফলেন এঞ্জেলের গ্লোরিয়াস ডেথ' আর আজ দেশের জন্য তার আত্মাহুতি সত্যিই এক 'গ্লোরিয়াস ডেথ' এ পরিণত।

'ডু অর ডাই' এর সঙ্কল্পকে বরণ করে নিয়ে জীবন দিতে সে প্রস্তুত। জীবন দেয়ও। পুলিশের গুলিতে নিহত লোকেশের শবব্যবচ্ছেদে ক্ষতবিক্ষত দেহ বাড়িতে আসে তিনদিন পর—রাশি রাশি কলাপাতায় মুড়ে কয়লার গুঁড়ো মাখা অবস্থায়। কিন্তু লোকেশরা তো কখনও মারা যায় না। তারা শুধু যে বোনের চোখের জলে কিংবা পিতার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই

বেঁচে থাকে তাই নয়—তারা বেঁচে থাকে সেই অজস্র অনামা বীর সৈনিকের সারিতে যারা দলে দলে এগিয়ে চলে ইতিহাসের অবিনশ্বর পথে।

বৃহতের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে অমরেশ, লোকেশ। একজন স্বদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে, অন্যজন দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্পে মগ্ন। ব্যক্তিক সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসানের খতিয়ান নিয়ে তারা বসে থাকেনি। এরা মহৎ—পাঠকের হৃদয়ে তাদের জন্য আছে শ্রদ্ধার আসন। এদের পাশেই অনায়াসে জায়গা করে নেয় প্রণতি তার স্নেহ, ভালোবাসা, আশঙ্কা, উদ্বেগ, দুঃখ-বেদনা-শোক নিয়ে। দাদার মৃত্যুতে,

"প্রণতির মুখে হাসি নেই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সারাক্ষণ কাঁদে লোকেশের জন্য। ......'ফলেন অ্যাঞ্জেলের গ্লোরিয়াস ডেথ' দেখেছে প্রণতি—দেশের জন্য নিজেকে বলি দিয়েছে সে। তবু মনে একমুহূর্ত শান্তি নেই, তবু প্রতিক্ষণ বুকের ভেতরের ক্ষত চুঁইয়ে রক্ত পড়ে।"

এক রক্তাক্ত বেদনাকে বুকে নিয়ে লোকেশকে বাঁচিয়ে রাখে প্রণতি স্মৃতিতে। অমরেশের প্রতি কর্তব্যে তার ত্রুটি নেই। কিন্তু তা কর্তব্যের যান্ত্রিকতা মাত্র। দেবদূতের মহান মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখতে রঙ তুলিতে কাগজে রেখা টেনে ফুটিয়ে তুলতে চায় লোকেশের ছবি—কিন্তু সে ছবিও শেষ হয় না। চোখের জলে ধুয়ে যায় রঙ। এই তীব্র ব্যক্তিক শোকেও প্রণতি হারিয়ে ফেলেনি বিবেচনাবোধ। নষ্ট হয়নি গান্ধিবাদের প্রতি তার অটুট বিশ্বাস। 'দাঁতের বদলে দাঁত', 'চোখের বদলে চোখ' নেবার নীতিতে তার আস্থা নেই।' শুধু ব্যক্তি মানুষের আক্রোশ থেকেই নয়, প্রকৃতির চূড়ান্ত বিরূপতায় যখন অসহায়ভাবে লোকেশের মৃত্যুর জন্য দায়ী সেই দারোগা স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে প্রণতির আশ্রয়ে, তখনও জনরোষের হাত থেকে, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে প্রণতি। ব্যক্তিক অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে বিপন্ন মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া এই প্রণতি মানবতাবোধে উজ্জ্বল এক মানবী।

দুই

গল্পের মধ্যে নাটকীয়তার সুর আদ্যন্ত বজায় রেখেছেন লেখক। আর তাই যখনই গল্পে পটপরিবর্তনের সময় এসেছে তখনই দেখা গেছে তার উপযোগী প্রাকৃতিক বর্ণনা। সন্ধ্যার অস্তায়মান সূর্যের রক্তরাগে, সাদা কাশের বনে, ঝোড়ো মেঘের কালো রং ধরার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পাঠক অমরেশের স্মৃতি রোমন্থনের জগৎ থেকে এল তার সংসারের বর্তমানে। দেখা গেল কিভাবে সেখানেও থমকে রয়েছে অজানা আশঙ্কার ঝোড়ো মেঘ। অমরেশ প্রণতির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উঠে এল দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে উদগ্রীব লোকেশের সম্পর্কে প্রণতির ভয়-উদ্বেগ-আশঙ্কার কথা। যে বাংলার অতীত ইতিহাসের রূপকার অমরেশ তারই বর্তমানের অন্যতম কাণ্ডারী লোকেশ। এই কথোপকথনের মাঝখানেই আকাশ-বাতাস উত্তাল করে ধ্বনিত হল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। জনসমুদ্রের সেই গর্জনে কেঁপে উঠল সন্ধ্যার অন্ধকার।

প্রকৃতি শুধু যে আবহ রচনাতেই ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। গল্পের মধ্যে একটি মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তুলতেও পারিপার্শ্বিকের অনবদ্য ব্যবহার করেছেন লেখক। প্রণতি লোকেশের আন্দোলনের রক্তাক্ত পথকে মেনে নিতে পারেনি। আর তাই প্রশ্ন করেছে, 'কিন্তু দাদা,

সত্যাগ্রহের দীক্ষা কি আমরা এইভাবেই নিয়েছিলাম?" গল্পের মধ্যে কোথাও লোকেশকে একমুহূর্তের জন্যও দ্বিধান্বিত দেখা যায় নি—তা সে নিজের গ্লোরিয়াস ডেথের উল্লেখ প্রসঙ্গেই হোক্ বা বাবাকে ইতিহাসের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময়েই হোক্। এমনকি নিশ্চিন্ত বিপদের মধ্যে পা বাড়ানোর মুহূর্তেও বোনকে অবিচলিত কণ্ঠে বলেছে, 'আজ অনেককেই অনেক কিছু দিতে হবে, হয়তো আমার ক্ষতিও তোদের সইবে'। কিন্তু সত্যাগ্রহের অহিংসার দীক্ষা থেকে সরে যাওয়াটা ঠিক কি ভুল এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে বাবার ঘরে চা দিতে বলে গেছে। অস্বস্তিতে ভরা এই মুহূর্তকটি পারিপার্শ্বিক বর্ণনার গুণে পাঠকের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে—

"কয়েক মুহূর্ত লোকেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ যেন বহুদূর থেকে আসা ঝড়ের গর্জন। প্রণতির চোখে মুখে স্টোভের নীলাভ আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে। বাইরে ঘন হয়ে উঠেছে স্তরে স্তরে অন্ধকার। রাত্রির হাওয়ায় মাঠ থেকে ভেসে আসছে পাকা ফসলের গন্ধ।"

'কাল' এর নিখুঁত বর্ণনার ক্ষেত্রেই নয়, 'পাত্র' এর চরিত্র বিশ্লেষণেও প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন লেখক। 'ডু অর ডাই' এর সঙ্কল্প নিয়ে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত লোকেশের কোনো আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত নয়। দুঃসাহসিকতা তার অনন্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় পাহাড়ী ঝর্ণার পথ বেয়ে দুর্গম গিরি লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা। পাহাড়ী পথের দুর্গমতাকে যেমন সে তুচ্ছ করে ঠিক সেইরকমই স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিপদসঙ্কুলতাকে সে অগ্রাহ্য করে অনায়াসে। কারণ 'ফলেন অ্যাঞ্জেলের গ্লোরিয়াস ডেথ' লোকেশের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। দুর্গম প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেশের প্রাণবন্ত চেহারা পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। হিমালয়ের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা তিস্তার ঘননীল জলধারা, কালো পাহাড়ের গায়ে শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্য, পাথরের চাঙড়ে আটকে আছে শালগাছ—এরই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে লোকেশ, হাওয়ায় তার জামা উড়ছে আর মুখে ঝক্‌ঝক্ করছে দিনান্তের সূর্য। দাদার এই মূর্তিই প্রণতিরও প্রিয়। রঙতুলিতে এই লোকেশকেই সে জীবন্ত করে তুলতে চায় বারবার।

লোকেশের মৃত্যু প্রণতির হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছে। অমরেশ ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্যের ভিড়ে সন্তানশোক ভুলেছেন। কিন্তু সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে প্রণতি সংসারে প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতাকে খুঁজে পায়। তবু প্রিয়জন হারানোর বেদনাতেও সে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে ওঠে না। লোকেশের মৃত্যুর সাক্ষী নিতাইকে নিবৃত্ত করে এই বলে যে, 'যে নিমিত্ত, তার ওপরে রাগ করে লাভ নেই।' এই বিবেচনাবোধই গল্পের শেষে এসে উদার মানবিকতার প্রকাশে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সে প্রেক্ষিত ভিন্ন। রুষ্ট প্রকৃতির সুতীব্র রোষের মাঝে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে সেই উদ্ধার করে তার দাদার ঘাতক সপরিবার দারোগাকে। সাইক্লোন ও তৎপরবর্তী প্লাবনের এক অসামান্য বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। গল্পে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দুর্যোগ শুধু প্রণতির চরিত্রের মানবিকতার প্রকাশে সহযোগী তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে অমরেশ তথা লেখকের জীবনচেতনা সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করে পাঠক। আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, বিভেদ ভুলে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীমূলে সংগঠিত হয়

যে গণশক্তি তাই পারে সর্বনাশের পঙ্কতলে নিমজ্জিত দেশের পুনরুদ্ধার করতে। গল্পকারের এই জীবনাদর্শের পরিচয় সুতীব্র জলগর্জনে রাখীবন্ধনের মন্ত্রোচ্চারণ শোনায়।

তিন

'সাহিত্যে ছোটগল্প' শীর্ষক গ্রন্থে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি ছোটগল্পের বিশ্লেষণে যে কটি বিষয়ের বিচারের কথা বলেছেন তার প্রথমটি হল গল্পের শ্রেণী নির্ণয়। 'ইতিহাস' পাঠে পাঠকের প্রধান উপলব্ধি এটাই যে একটি ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠাই লেখকের গল্পরচনার মূল উদ্দেশ্য। 'ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়' এই ভাবসত্যই গল্পটির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে রসপরিণতি লাভ করেছে। গল্পের সূচনায় সপ্তম শতাব্দীর গৌড়বঙ্গের ইতিহাস রচনার সূত্রে অমরেশ অতীতের তাম্রলিপ্ত অধুনা মেদিনীপুরের প্রেক্ষাপটে গল্পটিকে উপস্থাপিত করেছেন। অশোকের অজেয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কত বীরমল্ল, কত সহস্রমল্ল প্রাণবিসর্জন দিয়েছিল সেই ইতিহাস রচনায় যখন অমরেশ রত তখনই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে বাঙালীর অপরাজেয় মনোভাবনার পরিচয় আর একবার প্রকাশিত হয়েছে। দিগ্বিজয়ী অশোকের বিরুদ্ধাচরণ করতে যেমন পিছপা হয়নি ঠিক সেরকমই স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে '৪২ এর বাংলায়। অষ্টম শতাব্দীর অরাজক বাংলায় মাৎস্যন্যায় দূর করতে গণশক্তি জাগরিত হয়েছিল। অমরেশ সেকথা লিখেছেন তাঁর পাণ্ডুলিপিতে। আর তাঁর পুত্র লোকেশ দেশের দারুণ দুর্দিনে গণশক্তি উদ্বোধনের ঋত্বিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের চরমশিক্ষা এই যে বিভেদের বিষে জাতি যখন শতদীর্ণ তখন তাকে প্রাণশক্তিতে উদ্দীপিত করতে পারে সর্বজনীন ঐক্য। লোকেশের হত্যাকারীকে প্রাণে বাঁচিয়ে প্রণতি সেই ঐক্যেরই শুভসূচনা করেছে। 'ইতিহাস' গল্পটি নিশ্চিতই তাই এক ভাবাদর্শের গল্পরূপ।

গল্পের বিন্যাসে ভাবাদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠলেও এই গল্পে চরিত্রায়ণ একেবারেই গৌণ নয়। চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট যে পরিণামের লক্ষ্যে তাদের রূপায়ণ হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুণে তিনটি চরিত্রই সমৃদ্ধ। অমরেশ, প্রণতি, লোকেশ—এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র জীবনভাবনার অধিকারী হয়েও গল্পকারের ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠায় নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এখানেই ঘটনাবৃত্ত ও চরিত্রগুলির সমন্বয়সাধনে লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশিত।

'ইতিহাস' গল্পের চরম মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে সাইক্লোনের দুর্যোগঘন সময়ে। হাজার ডাইনীর অভিসম্পাতের মতো ধেয়ে এসেছে সাইক্লোন। 'ওপারের বন্দরটা মাটিতে শুয়ে আছে, কোথাও বা চালাহীন ঘরের কয়েকটা খুঁটে। একটা নগ্ন পরিহাসের মতো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে'—ঝড় থামার পর এই যখন অবস্থা তখন প্লাবন এসে শেষ সর্বনাশটুকু করেছে। সহায় সম্বলহীন মানুষের দল অমরেশের বাড়ির দিকে ছুটে এসেছে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। এসেছে নিতাই, প্রসন্ন, জামাল। নামগুলি লক্ষ্য করার মতো। নিতাই, প্রসন্নের সাথে জামালও আছে। ঐক্যের ভিত্তি প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আশ্রয়প্রার্থীর দলে রয়েছে একমাসের শিশুকে বুকে নিয়ে নতুন দারোগার স্ত্রী আর তার পেছনে দারোগা—লোকেশের হত্যাকারী। উপস্থিত আড়াইশো জোড়া দৃষ্টির তীব্র প্রত্যাখ্যানে আর্তবিহ্বল দারোগার স্ত্রীকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস দিতে এগিয়ে এলো প্রণতি। দাদার অকালমৃত্যু তাকে যতই বেদনার্ত করে থাকুক, বিপদের দিনে দাদার হত্যাকারী ও তার পরিবারের দিকে হাত বাড়িয়ে

দিল সেই। বিভেদের বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে তার এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতের ঐক্যের স্বপ্ন সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটিত করেছে। ইতিহাসবিদ অমরেশ তাই যখন তাত্ত্বিকতার দৃষ্টিকোণে লিখে চলেন,

"অন্ধকার বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য দেখা দিবে। চরম সর্বনাশের পটভূমিতে, চরম দুর্গতির পরমলগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে।"

তখন, বাস্তবে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণ তলেই সর্বজনীন ঐক্যের বেদী প্রস্তুত হয়। গল্পের শুরু থেকেই লোকেশের জন্য প্রণতির বাঁধভাঙা শোকের তীব্রতাও পাঠক অনুভব করে। সেই লোকেশের হত্যাকারী এসে দাঁড়িয়েছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে—সমবেত মানুষের নীরব রূঢ় প্রত্যাখ্যান—ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাওয়া একমাসের শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে দারোগার স্ত্রীর আর্তবিহ্বল দৃষ্টিতে প্রাণবাঁচানোর আকুতি সব মিলিয়ে এক মহামুহূর্ত বা চরমক্ষণের সৃষ্টি হয়েছে। পাঠকের মনও সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে—কী করবে প্রণতি? প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন দারোগার পরিবারকে আশ্রয় না দিয়ে দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে নাকি তার অহিংসার নীতির প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকবে? আগেই বলা হয়েছে, এই চরমক্ষণটি স্থান-কালের সুনির্বাচনে ভীষণভাবে বাস্তবানুগ। বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের মেলবন্ধন ঘটে যখন ব্যক্তিক শোকের চেয়ে মানবিকতা বড় হয়ে দেখা দেয়—

"প্রণতি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দারোগার স্ত্রীকে বললে, আপনি ভেতরে এসে কাপড়টা ছেড়ে নিন। খোকার ঠাণ্ডা লাগছে।" প্রণতির এই সহৃদয়তা গল্পের চরমক্ষণটিকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তুলেছে তাই নয়, পারস্পরিক বিভেদ-দ্বেষ-হিংসা ভুলে সর্বজনীন ঐক্যের শুভচেতনার ইঙ্গিত দিয়েছে। লেখক বিশ্বাস করেন এই ঐক্যই পারে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে। দেশ-কাল ও জীবনাদর্শের দ্বারা গঠিত লেখকের ব্যক্তিত্ব আর গল্পরসের সমন্বয়ে 'ইতিহাস' গল্পটি স্বতন্ত্র মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

শরৎকালীন প্রকৃতির ছোট্ট বর্ণনা দিয়ে গল্পের সূচনা। এই প্রকৃতিবর্ণনা পাঠককে স্থান সম্পর্কে সচেতন করে। এরপরই প্রকৃতি থেকে ফোকাসটা আস্তে আস্তে ঘুরে যায় গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র অমরেশের দিকে। তাঁর লেখা ও চিন্তার মধ্যে দিয়ে পাঠকের ভাবনায় গল্পের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে বাংলাদেশ বিশেষত মেদিনীপুরের পটভূমিকায় গল্পটি রচিত। প্রণতির প্রবেশ ও অমরেশের সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্যেই ধ্বনিত হয় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। প্রণতির মুখের কালো আশঙ্কার ছায়া, অমরেশের চিন্তাব্যাকুল প্রশ্ন, 'লোকেশ ফেরেনি এখনো'?—গল্পের কালকেও নির্দিষ্ট করে দেয়। ১৯৪২ এর আগষ্টমাসে যখন আসমুদ্রহিমালয় 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র শপথে উত্তাল তখন গল্পের তৃতীয় চরিত্র লোকেশও সামিল সেই রক্তঝরা আন্দোলনে। প্রণতির উদ্বেগ আশঙ্কা, অমরেশের পিতৃসুলভ স্নেহ ব্যাকুলতা আবার ইতিহাসবিদ রূপে অতীত ইতিহাসের রোমন্থন এবং লোকেশের সংশয়-দ্বিধাশূন্য মনোভাব প্রকাশের মধ্যে দিয়ে গল্প এগিয়ে চলে। লক্ষ্য করার বিষয়, গল্পটিতে মাঝে মাঝেই প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে, রয়েছে বাংলার অতীত ইতিহাসের বর্ণনা কিংবা লোকেশ সম্পর্কে প্রণতির স্মৃতিচারণ। কিন্তু কোনোটাই অপ্রয়োজনীয়ভাবে গল্পে জায়গা দখল করে নেই। গল্পকার চরিত্র বা ঘটনার উপযোগী করে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।

গৌড়বঙ্গের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস বিশ্লেষণে অতীত-বর্তমানের সমন্বয় সাধন করে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারা সম্পর্কে পাঠক-মনে সচেতন ধারণা গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। আর প্রণতির স্মৃতিচারণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লোকেশ চরিত্রটি। অর্থাৎ গল্পেরই প্রয়োজনে লেখক কখনো কখনো গল্পে ভাবনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন আবার প্রয়োজনে গুটিয়ে এনে পরিণামের লক্ষ্যে তাকে এগিয়ে দিয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক বিস্তার গল্পের গতি কমিয়ে দিয়েছে। একটি উদাহরণেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। লোকেশের মৃত্যুর তিনমাস পর ফিরে এল নিতাই। নিতাই-এর বুকেই লুটিয়ে পড়েছিল গুলিবিদ্ধ লোকেশ। প্রতিহিংসার তীব্র আগুন জ্বলছে নিতাই-এর বুকের ভিতর। প্রণতিকে সে জানাচ্ছে কার গুলিতে নিহত হয়েছে লোকেশ। কিন্তু অহিংসাব্রতে নিবিড়ভাবে বিশ্বাসী প্রণতি মাত্র দুটি বাক্যে নিতাই এর মনোভাব সম্পর্কে তার দৃঢ় অসমর্থন ব্যক্ত করেছে। প্রচুর চোখের জল, প্রচুর বাকবিতণ্ডা কিছুই এখানে নেই। আছে দেশের কাজ করবার সদর্থক দিকটির প্রতি নিতাই এর দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা। এই চেষ্টাই প্রণতির ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়। গল্পের চরমমুহূর্তে ওই দারোগাকে সপরিবার আশ্রয় দিয়ে প্রণতি প্রমাণ করে দিয়েছে অহিংসার বাণী তার কাছে কথার কথা মাত্র নয়। তিনটি চরিত্রের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ আছে, তাদের জীবনভাবনাও একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এই বিরোধ গল্পের গতিমুখের একমুখীনতাকে তো বিনষ্ট করেই নি বরং তা গল্পের আস্বাদ্যতাকে বাড়িয়েছে। দেশ যখন বিপন্ন তখন সর্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে ইতিহাসের মূল সুর—লেখকের এই জীবনাদর্শ গল্পের পরিণাম রচনায় সুস্পষ্টরূপ লাভ করেছে।

ইতিহাস যে শুধু সন তারিখের বোঝা নয়, তা যে প্রবহমান কালের মর্মকথাও—'ইতিহাস' গল্পে তারই পরিচয় ব্যক্ত করেছেন গল্পকার। গৌড়বঙ্গের অতীত বৃত্তান্ত এবং সমকালের সুষম সমন্বয়ে এই গল্পে প্রবহমান কালচেতনার পরিচয় রেখেছেন লেখক। সেই কালেরই ধারা বাঙালির চরিত্রগত অপরাজেয় মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আত্মবিস্মৃত জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, বিপন্নতার কালে আত্মস্বার্থ ভুলে, হিংসা-দ্বেষ-গ্লানি-বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে একত্রে মিলতে হবে। এই মহামিলন মানবতার আলোয় শুচিসুন্দর। গল্পের 'ইতিহাস' নামকরণটি তাই সুপ্রযুক্ত।

উস্তাদ মেহের খাঁ : সাধক শিল্পীর শিল্প বৃত্তান্ত

সামিম রেজা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম জীবনবোধ সমকালীন বাস্তব প্রেক্ষিতে ধরা পড়েছে 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পে। জীবনকে যাঁরা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর থেকে মূল্যায়ন করেন উস্তাদ মেহেরা খাঁ তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। একটি জীবনবৃত্তে নানান ঘটনা কিভাবে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈল্পিক উপস্থাপনায় তাই প্রতিভাসিত, পাঠক হিসাবে আমাদেরও আস্বাদনীয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম জীবনদর্শন, শিল্পচেতনা ও সমাজ সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রতিটি গল্পের পাতায়। 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে একজন সাধক শিল্পীর কুলীন শিল্প সাধনা কালের যাত্রাপথে ক্রমশঃ বর্জনীয় শিল্পচর্চায় অপসারিত এবং শুনিয়েছেন আধুনিক কালের ঝঞ্ঝা কবলিত বন্ধ দরাজে ধাক্কা খাওয়া এক প্রেমিক শিল্পীর নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ বর্বর মানুষের হাতে নির্মম মৃত্যুর উপাখ্যান।

গল্পের বক্তা লেখক নিজেই। বক্তা হিসাবে তিনি পর্যবেক্ষক ভাষ্যকার রূপে নিযুক্ত। সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এর উদাহরণ অপ্রতুল নয় যেখানে লেখক নিজেই বক্তা। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিসত্তা আর বক্তার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এক বৃহৎ ব্যবধান আছে। দুই সত্তার মধ্যেকার এই ব্যবধান নিরূপণের প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কবি ব্যক্তিত্ব ও সমালোচক টি. এস. এলিয়ট। এলিয়ট তাঁর নৈর্ব্যক্তিক (Impersonality Theory) তত্ত্বের উপস্থাপনা করে দেখাতে চেয়েছিলেন, লেখকের ব্যক্তিসত্তা বক্তার ব্যক্তিসত্তা থেকে শুধুমাত্র আলাদা তাই নয়, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সমন্বয়ই নেই। পরবর্তীকালে ফুকোর 'What is an Author?' এবং রোলা বার্থের 'The Death of the Author' গ্রন্থদ্বয়ে যে উত্তরগঠনবাদ তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে সেখানে লেখকের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষণীয় হিসাবে বিবেচ্য হয়েছে। কার্যত, উত্তরগঠনবাদ তত্ত্ব প্রয়োগের দ্বারা 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পের বিষয়ভিত্তিক আলোচনাতে অবতীর্ণ হতে হলে, প্রথমেই এই গল্পের যিনি লেখক তিনি কে, তিনি কোন প্রসঙ্গে বা কোন প্রেক্ষাপটে এই গল্প লিখেছেন—এই সমস্ত প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রাখব। বরং গল্পকে বুঝতে, গল্পের ভাব ও রসকে বুঝতে গল্পেরই মধ্যে নিমজ্জিত নানাবিধ অর্থের আলোচনা করব। সমালোচনার বস্তাপচা সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ছাড়িয়ে এই আলোচনা বহুমুখী হবে এই আশা রাখি। তবে একথা শিরোধার্য যে এই আলোচনা সমাজ ও রাজনীতির গণ্ডিকে অতিক্রম করবে মাত্র, অস্বীকার নয়।

'কোথা থেকে কোথায়! নিজের কাছে নিজেকেই এখন একটা অপরিচিত মানুষের মত মনে হয় উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের'। জীবনযুদ্ধে মেহেরা খাঁ পরাজিত। তাঁর অস্তিত্বের সমস্ত কণায় জড়িয়ে ছিল কেবলমাত্র তার সখের সেতারটি আর মননের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে জায়গা করে ছিল তার হারানো ভালোবাসার মূর্তি ও মুহূর্তগুলি। সেতারে জীবনের সন্ধ্যাসঙ্গীতের সুর তুলতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন উস্তাদ মেহেরা খাঁ আর মেহের আলীর মধ্যেকার

বিস্তর ফারাক। উস্তাদ মেহের খাঁর অস্তিত্ব তার সেতারের তারের ঝংকারে। কিন্তু মেহের আলী? সে মানুষ ও মুসলিম; অথবা সে মুসলিম ও মানুষ। মানুষের পরিচয়ে সে আবার প্রেমিক যার ব্যর্থতা-উত্তর জীবন কেটেছে তার ভালোবাসার সেই বিগ্রহের স্মরণে ও বিস্মরণে। সে অবিবাহিত, পৃষ্ঠপোষক শিষ্য জগন্নাথ চৌধুরীর পাণিগ্রাহী ও তার পুত্র (সুযোগ্য কি কুযোগ্য, সে প্রশ্ন পরের) শঙ্করের অনুগ্রহভাজন। গল্পের ক্লাইম্যাক্সে এসে তার ক্ষণিকের উপলব্ধি, 'যো দিন যাওয়ি বাহুড়ি সো আওয়ি!'—যে দিন যায় সেই দিন আবার ফিরে আসে। বক্তার কথায়, 'আবার নতুন করে মনের কাছে ফিরে এসেছে আশিক বাঈ। সব রাগ রাগিণীর পাঠ তাকে দিতে চেয়েছিলেন, শুধু দিতে পারেননি টৌড়ী! ব্যথা ছিল, বেদনা ছিল, ছিল নিজের ভেতরে নিভৃত দুঃখসম্ভোগের মোহ। কিন্তু আর সে মোহ নেই; সে দুঃখের অবসান হয়ে গেছে। যাকে তিনি সব ধরে দিলেন, আজ তাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য, তাঁর টৌড়ী তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই দেওয়ানা ফকিরের!' তাই মুক্তির খোঁজে পুনরায় তিনি ফিরতে চেয়েছিলেন শঙ্কর চৌধুরীর বাড়িতে—সমস্ত অপমান আর লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু এই মুক্তির পূর্বেই তাকে মুক্ত করা হয়েছে জীবন থেকে, এই পৃথিবী থেকে।

নীটচে'র কথায় 'ঈশ্বর মৃত'—God is dead', ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কোন আত্মিক যোগ নেই। আর নেই বলেই গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উস্তাদ মেহেবা খাঁ আর মেহের আলী দুজনেই মৃত। উস্তাদ নামের মধ্য দিয়ে স্বল্প শিল্পী সত্তার পরিচয় ছাড়া তার অস্তিত্বের কোন গুরুত্বই নেই। যা সবার ক্ষেত্রে সত্য, তিনিও তার ব্যতিক্রম নন—তিনি এসেছিলেন মারা যাওয়ার জন্যই। জীবনের প্রতিটি সম্ভাবনাকেই তিনি বিলীন করে দিয়েছেন চেতনার অন্তস্থলেই। ভাব ও দুঃখবিলাসিতা ব্যতিরেক জীবনের নতুন সংজ্ঞা জ্ঞাপনের অলসতাটুকুও তার ছিল না। আর শেষ মুহূর্তে যখন জীবনের অর্থ নিরূপণে ব্যর্থ হয়ে তিনি তার শিল্পের শাশ্বত করণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পশ্চাৎগামী হলেন, তখন বাস্তববিমুখ শিল্পীর প্রতি রুষ্ট সমাজদেবী প্রতিশোধ তুলে নিল 'অন্ধকার কানা গলিটার ভেতরে।'

শিল্পী হিসাবে উস্তাদ মেহেরা খাঁ সর্বদাই নিজের শেখা শিল্পের মধ্যেই ছিলেন চিরকাল সীমাবদ্ধ। এই সীমা ছাড়িয়ে তিনি বার হননি বা বার হওয়ার কোন প্রচেষ্টাও করেননি। অর্থাৎ যুগের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারেননি তিনি। আধুনিকতার বিচারে তাই তিনি ও তার শিল্প বর্জনীয়। উস্তাদ মেহেরা খাঁ সম্পর্কিত শঙ্করের সমস্ত উক্তিই এই তথ্যেরই পরিপন্থী। মাঝেমধ্যে শঙ্করের আপাত শালীনতার মোড়কে ভরা রুষ্টতা তার ক্ষীণ দৃষ্টির অগোচর হয়নি। কিন্তু এই বিষয়টিকে তিনি আমল দেননি বা দিতে চাননি। বলা যেতে পারে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কিন্তু ক্ষুব্ধ হননি। আধুনিক সংগ্রামী মানসিকতা তার ছিল না। তাই শুধুমাত্র তিনি সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাই নয়, বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তিনি নিজের কাছ থেকেও। শঙ্করের বিবাহের দিনের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। শঙ্করের স্ত্রী রমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী উস্তাদ মেহেরা খাঁ ছিলেন সবার থেকে আলাদা, পুরাতন সাজে ও স্বাদে। বক্তার পরিভাষায়—"আর সেই নতুনদের মাঝখানে কী বিচিত্র দেখাচ্ছিল উস্তাদজীকে, পাকা দাড়ি, ময়লা পাজামা, অতিরিক্ত দীর্ঘ দেহে বলে একটু কোলকুঁজো, মিটমিটে চোখের

দৃষ্টি। মাথা নিচু করে গান শুনছিলেন।'—রমা সেইদিন ঘোমটার আড়াল থেকে 'একটা কিছু' অনুমান করতে পেরেছিল। বিদগ্ধ পাঠকও এখন অনুমান করতে পারেন নিশ্চয় যে এই 'একটা কিছু' ছিল তার সমস্ত কিছু। জীবনের স্বাদ, আহ্লাদ, আশা আকাঙক্ষা সব কিছু এই 'একটা কিছু'র সঙ্গে জড়িত ও বলা বাহুল্য নিঃশেষিত।

সংস্কৃতির আঙিনাতে আধুনিকতার ছোঁয়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কিন্তু যুক্তি-তর্কহীন আধুনিকীকরণ অপসংস্কৃতির নামান্তর। অবক্ষয়বাদের অশুভ সূচনা এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পের প্রেক্ষাপট হল বাঙালী সমাজের এই অবক্ষয়ের সূচনা লগ্ন। গল্পের নায়ক অবহেলিত। কারণ? শঙ্করের কথাতেই উত্তর দেওয়া যাক, 'মানেটা অত্যন্ত পরিষ্কার। উনি গান শেখেননি, শিখেছেন গানের ব্যাকরণ। সেও অবশ্যি সেকালের ব্যাকরণ, কিন্তু সে কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কি জানো? ব্যাকরণ পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, বাহাদুরী পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্য রচনা করা যায় না। ওর জন্যে চাই আলাদা কবি প্রতিভা, আলাদা একটা রসিক মন। সে মন ওঁর নেই।'—কথাগুলি শঙ্কর বলেছিল তার স্ত্রী রমাকে। শঙ্করের নীতি জ্ঞান ছিল প্রখর কিন্তু নৈতিকতা ছিল না। তাই শঙ্করের উপরোক্ত কথার উত্তরে যখন রমা মৃদু-বিদ্রোহিনী হয়ে বলেছিল, "কিন্তু এই যে তোমাদের সব একঘেঁয়ে গান? চাঁদ, রজনীগন্ধা, বিরহের বালুচর, উদাসী পথিকের আকুল বাঁশির ডাক, আমি ভালোবাসার ভিখারী, প্রেমের চাকোর—এগুলো বুঝি সব উঁচু দরের কবিতা?'—তখন, শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'যা বোঝোনা, তা নিয়ে কেন বাজে তর্কে আসো বলতো?' বক্তার কথায়, 'মেয়ে মানুষের বেশি তর্ক করাটা শঙ্করের পছন্দ হয় না, অন্তত এদিক থেকে চৌধুরী বংশের ঐতিহ্যকে কিছু পরিমাণে বজায় রেখেছে শঙ্কর।'

অবক্ষয়ী বঙ্গসমাজের সার্থক প্রতিনিধি শঙ্কর। সে যুক্তি দেখাতে ভালোবাসে, কিন্তু যুক্তিকে ভয় পায়। তাই রমাকে ধমক দিয়ে চুপ করানো ছাড়া তার গত্যন্তর থাকে না। সে 'রিলিতি বাজনা' গিটার শিখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়েছে। স্বীয় ধারণায় সে আধুনিকতার অনুগামী। উস্তাদের গান তার 'ম্যাও ম্যাও' আর 'মারি ঘং' শুনতে লাগে। অথচ শানাই বাদক যখন ভুল বাজাতে শুরু করে সেটিকে সে আধুনিকতার খানশামাতে পরিবেশন করে। উস্তাদজীর প্রতি তার এক ভক্তিহীন কর্তব্যবোধ কাজ করে। তাই বাবা জগন্নাথ চৌধুরীর প্রিয় শিল্পীকে সে বিতাড়িত করতে পারে না। কিন্তু ক্লাইম্যাক্সে এসে সে এই অসম্পূর্ণ কাজকেও সম্পূর্ণ করেছে।

গল্পের শেষ পর্যায়ে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে। তাই দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ করা অবশ্যই কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিকের কাজ হবে। কিন্তু একথা বোধগম্যতার প্রতিকূল নয় যে, এই দাঙ্গা অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না, দাঙ্গা বাধে না বরং বাধানো হয়। স্বাধীনতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছিল বঙ্গভঙ্গ বা ভারতভঙ্গের নিদর্শন। এই দাঙ্গা সমগ্র ভারতবাসীর জীবনে অভিশাপ। মেহেরা খাঁ সহ গল্পের সমস্ত চরিত্রই এই অভিশাপে কবলিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা ছাড়িয়ে সামগ্রিকতার দিকে প্রণিপাত করলেও একই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। গল্পের উল্লিখিত চার-পাঁচটি হিন্দু ছেলে যারা শঙ্করকে কলকাতার দাঙ্গার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছিল

তাদের কথা ধরা যাক। কোন সঠিক নীতি নয়, কোন সমাধান-সুলভ মানসিকতা নয় বরং প্রতিশোধাত্মক দৃষ্টিকোণে ঘটনার ব্যাখ্যা ও তদুপরি রূঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল এই যুব সমাজের বৈশিষ্ট্য। খালপারের মসজিদে গভীর রাত্রে মুসলিম যুবকদের লাঠি খেলা একই অবক্ষয়ী পরিস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। চাঁদা না দিলে মুসলিম যুবকরা রাম জেলের ঘরবাড়ি লুঠ করবে; আর তার প্রত্যুত্তরে হিন্দু যুবকেরা 'কত ধানে কত চাল বেরোয়' তা বুঝিয়ে দেবে। এহেন সামাজিক পরিস্থিতির কবলে পড়ে শঙ্করের কাছে উস্তাদজীর পরিচয় 'গুরুজন' বা 'বাবার গুরু' নয় বরং 'কেউটে সাপের জাত'। বক্তার কথায়, 'এতদিনে একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হল শঙ্করের কাছে, খুলে গেল একটা নতুন দিক। উস্তাদজীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে একটি মাত্র পরিচয় মনের মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল : উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন, তিনি মুসলমান। ফলে তাকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পে নারী-পুরুষ সম্পর্ক প্রসঙ্গটি প্রথম পর্যায় আন্দোলনের ক্ষণিক পরের পরিস্থিতি। পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়েও, জীবন সম্পর্কে নিজের মত করে ভাবতে শিখেছে তারা। প্রতিবাদে দৃঢ়তা না থাকলেও, প্রতিবাদের ভাষা শিখেছে তারা। শঙ্করের স্ত্রী রমার উস্তাদজীর হয়ে সওয়াল করার প্রতিরোধাত্মক মানসিকতা উপরিল্লিখ তত্ত্বের সাক্ষ্য বহন করে। চরিত্রের কাঠামোতে উপস্থিত না থাকলেও, সর্বদা যার অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছে মেহেরা খাঁয়ের চিন্তা-চেতনার মধ্যে দিয়ে, সেই আশীক বাঈও দ্বিতীয় পর্যায় নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম বিভাগের নারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ঠিক কি কারণে সে মেহেরা খাঁয়ের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল তা বক্তার কথায় স্পষ্ট নয়। তবে কারণ-অনুসন্ধানের ধাঁধায় অনুপ্রবেশের ধৃষ্টতা দেখিয়ে লাভ নেই। একথা ঠিক আশীক বাঈয়ের সিদ্ধান্তে এক ধরনের স্বচ্ছতা আছে। এ তার একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে আশীক বাঈ যে দৃঢ়তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, রমা তা পারে না। এই ব্যবধান তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ব্যবধান জনিত কারণেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে থেকেও আশীক বাঈ উপার্জনক্ষম। তাই স্বয়ংজীবী। কিন্তু রমা পরজীবী তাই সিদ্ধান্তের দোরপ্রান্তে এসে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আশীক বাঈয়ের মধ্যে এই কুণ্ঠাবোধ নেই।

'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পে নারীকে সামগ্রিকভাবে তিনটি ভূমিকাতে পাই। সে স্ত্রী, সে প্রেমিকা ও সে কন্যা। রমার প্রথম পরিচয় সে চৌধুরী বংশের কুলবধূ, শঙ্কর চৌধুরীর স্ত্রী। স্ত্রী হিসাবে সে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু অধিকার পায় নি। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহবধূ। তাই বিবেক ও বিচারবুদ্ধি থাকলেও তা শঙ্করের ঔদ্ধত্যে অবদমিত ও চারদেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এহেন স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নিতান্তই অগভীর ও ভিত্তিহীন। আলাদা কোন পরিচয় ও অস্তিত্ব রমার নেই। একবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে হয়ত বা ইবসেনের নোরার মত (A Doll's House নাটকে) রমা স্বামীগৃহ ত্যাগ করার সাহসিকতা দেখাতে পারত কিন্তু তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক হিন্দুসমাজে এই পদক্ষেপ নেওয়া রমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মেহেরা খাঁর কাছে রমার স্থান ছিল কন্যার মত। রমাও তাকে পিতৃ-তুল্য শ্রদ্ধা করত। পিতা-কন্যার এই সম্পর্কটি ছিল তাদের একান্ত নিজের। কিন্তু শঙ্করের চোখে বা সামাজিক

দৃষ্টিতে এই সম্পর্কের কোন ভিত্তি সে সময় ছিল না। এমনকি, এই পবিত্র সম্পর্ককে কালিমা লিপ্ত করার মত মানুষ ও মানসিকতারও অভাব সে সময় ছিল না। সম্ভবত কন্যা হিন্দু আর বাবা মুসলিম বলেই। অন্যকোন সম্ভাবনা যদি থেকে থাকে তা হলে তা আরও ভয়ংকর। গল্পের উপস্থাপনা থেকে সহজেই অনুমেয়, উস্তাদ মেহেরো খাঁ আর রমার ভিতরকার সম্পর্ক ছিল পর্দার এপার আর ওপারের। এমনকি, শঙ্করের উপস্থিতিতেও তাদের দুজনের মুখোমুখি কথোপকথন সম্ভব হয়নি কোনদিন। সেই কারণেই বোধ হয়, রমাকে একদিন লুকিয়েই, শঙ্করের চোখের আড়ালে, সন্ধ্যার অন্ধকারে উস্তাদ মেহেরো খাঁর কাছে আসতে হয়েছিল। তাদের দুজনের সামাজিক ব্যবধান যে কতবেশি তা তাদের কথা থেকেই স্পষ্ট :

'কে ওখানে?

মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল : আমি উস্তাদজী।

ওঃ। কিন্তু এভাবে না এলেই ভালো করতি বেটি।

এছাড়া যে উপায় নেই উস্তাদজী।

কিন্তু বেটি, এ লুকোচুরি বড় খারাপ। এ অন্যায়।

কিছু অন্যায় নয়। আমি আলোটা জ্বালি।

সেদিন রমা যে সাহসী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল, ঘটনার ক্লাইম্যাক্সে সে সেই সাহসিকতা দেখাতে পারেনি। তাই শঙ্করের দৈবাৎ উপস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে পালিয়ে গেছিল পিছন দরজা দিয়ে। এই ভীতি কোন অপরাধজনিত ভীতি নয়। তবুও সেদিন রমা শঙ্করের মুখোমুখি হতে পরেনি। পারেনি, কারণ অবক্ষয়ী সমাজের মাঝে সে এই পবিত্র সম্পর্ককে কালিমালিপ্ত করতে চায়নি। উস্তাদজী নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা পালন করেছেন অথচ একটি বারের জন্য তার কন্যাতুল্য অনুগত শিষ্যার নামটি মুখে আনেন নি, আনতে পারেন নি। আশীক বাঈকে ভালোবেসে একসময় তিনি হৃদয়ের শেষ নির্যাসটুকুও প্রেমের বেদিতে অর্ঘ্য করেছেন। তাকেই তিনি দিতে চেয়েছিলেন জীবনের সমস্ত কিছু উজাড় করে। নিতে পারেনি আশীক বাঈ। কিন্তু, 'চোখের সামনে পৃথিবীর আলো যখন দিনের পর দিন নিভে আসছে, তখন গভীর ব্যথার সঙ্গে এই কথাই বারে বারে মনে হত—তাঁর এত বড় সুরের ঐশ্বর্যকে কৃপণের সম্পদের মতোই আগলে গেলেন তিনি, কারো কোনো কাজে লাগল না।' সেই গভীর ব্যথা আর বেদনার দিনের অবসান ঘটেছিল। আশীক বাঈ যা প্রত্যাখ্যান করছিল রমা তা স্বীকার করছে। তাই 'পিয়ারীকে যা দিতে পারেননি, বেটিকেই তা দিয়ে যাবেন।' কিন্তু সেই স্বপ্নও ডুবে গেল বিধ্বস্ত তরীর মত।

আলোচ্য গল্পের নামকরণ গল্পের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে। এখানে প্রধান চরিত্র হলেন মেহের আলী, একজন মুসলিম সেতার শিল্পী তথা গায়ক। শৈল্পিক পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে তিনি নামের পূর্বে 'উস্তাদ' আর পরে 'খাঁ'। তবে মেহের আলী কিভাবে 'মেহেরো' হয়ে গেলেন তা বক্তার কথাতেই ধরা যাক—'মেহের আলী সংক্ষেপে হয়েছে মেহেরো, অতিরিক্ত আকারটার তিনি প্রতিবাদ করেন না, লোকেও নিরঙ্কুশ।'—এই কথার প্রেক্ষিতে অনুমেয় যে, গল্পের নামকরণ বিষয়টি যথেষ্ট স্ববিবেচিত ও পরিকল্পিত। তবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নামকরণ হওয়ার সুবাদে গল্পের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রিকতা অনুধাবনযোগ্য হলেও ব্যাপ্তি অধরাই থেকে

যায়। এই ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা উভয়েই শিল্পীর শিল্প-শৈলীর উপর নির্ভর করে। যাইহোক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নামকরণ পদ্ধতিটি লেখকদের অতি পুরাতন অথচ সহজ এক পরিবেশন প্রণালী। পাঠকবৃন্দের কাছেও এই পদ্ধতি যথেষ্ট সমাদৃত। কারণ নামকরণের এই প্রণালীর উদ্দেশ্যই হল বহুবাদী দৃষ্টিকোণে কোন একটি ঘটনার পর্যবেক্ষণ।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের দুটি পরিচয়—ব্যর্থ প্রেমিক আর ব্যর্থ শিল্পী। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ কিয়দংশ তিনি নিজে আর বৃহদংশে সমাজ-পরিস্থিতি। এ প্রসঙ্গ আগের আলোচনাতে কিছুটা উঠে এসেছে। যাইহোক, গল্পের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে মেহের আলীর ব্যর্থ জীবন আর তাকে ঘিরে স্থান পেয়েছে বহুবিধ আলোচনা প্রসঙ্গ—শিল্প, প্রেম, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সবরকম। বলা যেতে পারে, 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' গল্পে মেহের আলী উপলক্ষ মাত্র আর তাকে ঘিরে সমস্ত তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রগুলি হল মূল লক্ষ্য। আরও স্পষ্ট করে বলতে চাইলে, বক্তা বলছেন মেহের আলীর কথা আর লেখক বলছেন শিল্প, প্রেম এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবেশের কথা, অবশ্যই সমকালীন প্রেক্ষাপটে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে লেখকের উদ্দেশ্য যদি তাই হবে তবে গল্পে মেহের আলীর ভূমিকা কি অথবা গল্পের নামকরণের সার্থকতা কোথায়?

মেহের আলী একজন সৎ সাধাসিধে. নিপাট ভালোমানুষ যিনি প্রেমে ব্যর্থ। ব্যর্থ প্রেম বাঙালী সেন্টিমেন্টে সর্বদা বিশেষ জায়গা দখল করে। আর মেহেরা খাঁ একজন শিল্পী যিনি আধুনিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট। সর্বোপরি, উস্তাদ মেহেরা খাঁর জীবন এক ট্রাজেডি। তাই প্রেম ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েও তিনি পাঠক হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি, অনেক চেনা এক ব্যক্তি। তার পরিপতির জন্য যে বা যাই দায়ী হোক না কেন, তা আমাদের আবেগ ও অনুভূতিকে ছুঁয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও নীরবতা পালন করে ফেলি তার আত্মার শান্তি কামনায়। আর এখানেই গল্পের নামকরণের প্রকৃত সার্থকতা।

ছোটগল্প হিসাবে 'উস্তাদ মেহের খাঁ', নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য কীর্তি। বিষয়বস্তুর যুগপৎ সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতায় এই গল্প বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় বিশেষ স্থানের দাবি রাখে। প্রেম ও শিল্পের অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বঙ্গভঙ্গ-উত্তর ভারতে অবক্ষয়ী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, দাঙ্গা-কবলিত সমাজে শিল্প ও শিল্পীর অস্তিত্বের অসারতা—এই সমস্ত বিষয়গুলিই হল এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে বহুবিধ বিষয়ের এমন সুন্দর সন্নিবেশ এই গল্পের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এককথায় পরিপুষ্ট শিল্পরসে জারিত 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' বাঙলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

নক্রচরিত : লালসার উদগ্র রূপ

রূপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

যেকোনো বিবেকবান সাহিত্যিকই সামাজিক অরাজকতা নীতিহীনতার নগ্ন বিকৃত রূপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং এইসকল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে কুঠারাঘাত করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর সাহিত্যেও সমকালীন সমাজ রাজনৈতিক টানাপোড়েন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা, ব্ল্যাক আউট, ১৩৫০-এর মন্বন্তর, খাদ্য ও বস্ত্রসঙ্কট, কন্ট্রোল-কালোবাজার, ইনফ্লেশন, স্পেকুলেশন, কলেরার মড়ক, ১৯৪১-এর ভারতরক্ষা আইন বা Defence of India Act, ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, মেদিনীপুরের বন্যা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, দেশভাগ ও তৎপরে উদ্বাস্তু সমস্যা—এককথায় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বেদনারক্তিম অধ্যায়কে নিয়ে তিনি তাঁর একটি বিশিষ্ট সাহিত্যধারা গড়ে তুলেছিলেন।

দুই

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার (যুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারতরক্ষা আইন, মজুতদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি) দ্বারা গঠিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'নক্রচরিত' গল্পের কথাকায়া মূর্ত হয়ে উঠেছে গল্পকারের অসাধারণ চরিত্র সৃজন ক্ষমতার দ্বারা। আলোচ্য গল্পের মোট চরিত্রের সংখ্যা তেরো—নিশিকান্ত কর্মকার, কষ্টবালা ওরফে বিশাখা, ইব্রহিম দারোগা, নিশিকান্ত-এর নিকট আগত মদন, যোগী ও তাদের সঙ্গী দুজন (গল্পে নামহীন) ডাকাত, গোলাপাড়া হাটের তিনজন মহামান্য মহাজন-মধুসূদন কুণ্ডু, নিত্যানন্দ পোদ্দার, জগন্নাথি চক্রবর্তী, ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার মতি পাল ও তার স্ত্রী প্রভৃতি। তন্মধ্যে গোলাপাড়া হাটের মহাজন ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিশিকান্ত কর্মকাব আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র। মন্বন্তর, মজুতদারি-কালোবাজারি-তজ্জনিত অন্নাভাব ও অনাহারে দরিদ্র মানুষের প্রাণহানি প্রভৃতি গল্পের নেতিবাচক যুগগত বৈশিষ্ট্যকে সে-ই যেন সযত্নে ধারণ ও লালন করেছে। গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তার সদাসক্রিয় উপস্থিতি এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির তার দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে সে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

নিশিকান্ত-এর নেতিবাচক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার নামটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার চরিত্রটি নিশির মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যময়। গল্পে দেখা যায় যে—মদন, যোগী প্রভৃতি ডাকাতের সঙ্গে তার গোপন আঁতাত, ডাকাতির গয়না ও তার আর্থিক মূল্যের আদানপ্রদান; কল্কি অবতার কর্তৃক 'কলির কলুষ' দূরীভূত করে 'ভক্তিবৃক্ষের মুক্তিফল' আনয়নার্থে 'বৈষ্ণব তিলক' নিশিকান্ত-এর উপস্থিতিতে হরিসভায় অষ্টপ্রহর কীর্তন—ধুনি খিচুড়ি-গাঁজা-তাড়ি খোল—নৃত্য সহযোগে কদম্বকেশরের মতো রোমাঞ্চ—অষ্টসাত্বিক ভাবেব জাগরণ; তার মতো মহাজনদের স্পেকুলেশন—কালোবাজারির কারণে মতি পাল ও তাব বউ-এর মত দরিদ্র—নিঃস্ব-রিক্ত-অভুক্ত-অসহায় মানুষদের প্রাণত্যাগ ও ইউনিয়ন বোর্ডেব

প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে নিশিকান্ত-এর তাদের বীভৎস 'দানবীয় বিভীষিকা'-ময় মৃতদেহ পরিদর্শনে গমন; নিশিকান্ত-এর প্ররোচনাতেই তার 'বৃন্দাবনলীলার লীলাসঙ্গিনী' বিশাখার ইব্রাহিম দারোগার অঙ্কশায়িনী হওয়া—নিশিকান্তকেন্দ্রিক এই সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে নিশিকালে, যা তার নামকে সার্থকতা দান করেছে।

নিশিকান্ত-এর সমগ্র সত্তা জান্তব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তার শকুনের চাইতেও সুতীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি (সময় বিশেষে যা অতি বিনয়ে 'কাতলামাছের মতো', স্বেচ্ছাকৃত্য নির্বোধ হয়ে যায়), সরীসৃপের মতো সর্পিল রেখাযুক্ত কপাল, অরণ্যের মতোই দুর্গম ও রহস্যময় মন, রেখাজটিল মুখ এই জান্তব বৈশিষ্ট্যকে উচ্চকিত করে তুলেছে। এছাড়া গল্পের শিরোনাম অনুযায়ী তো তাকে স্পষ্টতই নক্র বা কুমীর (ইব্রাহিম দারোগার ভাষায়—'সাক্ষাৎ ঘোড়েল-ভুঁড়ো কুমীর') বলে অভিহিত করা যায়। তবে ক্ষুন্নিবৃত্তিরকালে নারীর প্রতি কুমীরের পক্ষপাত কাঙ্ক্ষিত নয়, কিন্তু নিশি প্রধানত নারীমাংসাভিলাষী। যৌবনকালে তার সুতীব্র প্রকৃতির লেলিহান শিখায় গ্রামের সকল সুন্দরী মেয়েই ভস্মীভূত হয়েছিল। এমনকি, যে বিশাখার গলায় নিশি একদা তুলসীর মালা পরিয়ে দিয়েছিল, বর্তমানে তাকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করে ইব্রাহিম দারোগাকে বশ করে সে তার সুমহান সুকীর্তিগুলিকে আড়াল করতে সদাব্যস্ত।

প্রকৃতপক্ষে নিশিকান্তের জীবনে 'জমা'-'খরচ'—এই দুটি হল মোক্ষশব্দ। সুদীর্ঘকাল ধরে সে মহামূল্যবান অলঙ্কার, কাঁচা সোনা, প্রভৃত অর্থ, প্রতিপত্তি, বিশাখার মতো অসংখ্য সুন্দরী নারী, মন্বন্তরকালে আটশো মন চাল প্রভৃতি ক্রমাগত জমা করেছে; আবার প্রয়োজনে নারী শরীরের জন্য, খরচও করেছে। কিন্তু এতে যে তার সমগ্র মানবসত্তাই ধীরে ধীরে খরচ হয়ে যাচ্ছে—এই ব্যাপারটি সম্পর্কে সে অবগত নয় এবং তার মত চরিত্ররা অবগত হতে চায়ও না।

আর তাই পরম অধার্মিক নিশিকান্ত বারংবার তার প্রয়োজনার্থে তার প্রতি অবিশ্বাসীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপাদনের জন্য মোক্ষম সময়ে অবলীলায় ধর্মাস্ত্র প্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কলাইগঞ্জের সাহাদের হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারকে দু'শো টাকার বিনিময়ে হস্তগত করার জন্য মদন-দের সে যখন বলে যে—

> "—কেন এত অবিশ্বাস বলো তো। তোমাদের এত কষ্টের রোজগার, মিথ্যে প্রবঞ্চনা যদি করি তা কি ধর্মে সইবে কখনো! তা ছাড়া পরলোকে জবাবদিহিও তো করতে হবে। যথা ধর্ম তথা জয়—অধর্মের রোজগার গোমাংস আর গোরক্ত।"

অথবা, অভুক্ত মানুষদের মুখের গ্রাস আটশো মন চালের মজুত থাকার কথা গোপন করে মুনাফা লাভের জন্য ইব্রাহিম দারোগাকে সে যখন বলে যে—

> "হরে কৃষ্ণ! আমার আড়ত? এমন শত্রুতা আমার সঙ্গে কে করলে। আমার কি ধর্মভয় নেই একটা। পরলোকে জবাবদিহি তো করতে হবে।"—

—তখন তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়।

তবে এহেন নিশিকান্ত-এর মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য বিবেকবোধের চকিত জাগরণ পরিলক্ষিত

হয়। মতিপাল ও তার বউ-এর মৃত্যুর পর তাদের বাড়িতে যাবার সময় 'পথের দুধারে বাঁশের ঝাড় বাতাসে শব্দ' করলে তার মনে হয়—

> "সেই বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে মাংসচর্মহীন অস্থিময় কতগুলো ছায়ামূর্তি—তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরছে তাদের প্রেতদেহ। আচমকা একটা ভয়ে নিশ্বাস আটকে এল তার; মনে হল : সেই মূর্তিগুলো আর্তনাদ করে উঠবে—আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার খত, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু—এখন? এখন? এখন?"

কিন্তু তার এই জাগ্রত বিবেকের তাড়না ক্ষণিক পরেই দূরীভূত হয়ে যায় এবং বাড়িতে ফিরে সে সোজা তার গোলা ঘরের দিকে দিকে পা বাড়ায় তার রুপোর পাহাড়' (আটশোমন চালের স্তূপ) পরিদর্শন করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করার জন্য। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে ঘরের টিন দিয়ে বর্ষার জল চুঁইয়ে তার অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মন চাল নষ্ট হয়ে যায়। আর এই পচা চালের গন্ধ পাবার পর নিশিকান্ত-এর মনে লেখক অপূর্ব কৌশলে এক রূপক চিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, যার ফলে গল্পটিতে একটি অনন্য মাত্রা সংযোজিত হয়েছে—

> "হঠাৎ নিশির মনে হল কেন কে জানে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মনে হল, ঠিক এই রকম একটা গন্ধই পেয়েছিল আর একবার। শিবপুরের হাট থেকে সে ফিরছিল। চোখে পড়েছিল—মাঠের মাঝখানে একটা **গলিত গোরুর দেহ** আগলে বসে আছে একটা **ঘেয়ো কুকুর**; চারদিক থেকে শকুনেরা উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।"

—এক্ষেত্রে 'গলিত গোরুর দেহ'-এর রূপকে পচা চাল এবং 'ঘেয়ো কুকুর'-এর রূপকে নিশিকান্ত-কে যখন লেখক ইঙ্গিতায়িত করেন, তখনই এই চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রেত মনোভাবটি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

তিন

'নক্রচরিত' গল্পের নামকরণটি প্রতীকধর্মী। 'নক্র' শব্দের অর্থ হল কুমীর। সেদিক থেকে 'নক্রচরিত' বলতে বোঝায় কুমীরের আখ্যান। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র নিশিকান্ত এবং একদিক থেকে দেখতে গেলে গল্পটি যেহেতু 'বৈষ্ণব তিলক' নিশিকান্ত-এর ধর্মপথ অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে (?নাকি জান্তব পরিণতিতে) উত্তরণের উদগ্র বাসনার কাহিনী, সেহেতু 'নক্র' বলতে এখানে তাকেই ইঙ্গিতায়িত করা হয়েছে বলেই মনে হয়।

কুমীর তার শিকার ধরার জন্য নিশ্চলভাবে পড়ে থাকে। তারপর সুযোগ বুঝে সচলতা প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র শিকারকে সে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিতে দিতে গলাধঃকরণ করে। আলোচ্য গল্পের মদন-যোগী প্রভৃতি ডাকাত, বিশাখা তথা গ্রামের সব সুন্দরী মেয়ে, ইব্রাহিম দারোগা, দুর্ভিক্ষের সময়কার অসংখ্য দরিদ্র নিরন্ন মানুষ কোনো না কোনো ভাবে নিশিকান্ত-এর শিকারে পরিণত হয়েছে। গল্পের সূচনাতেই আমরা দেখি যে মদন ডাকাত তার দলবল নিয়ে কালাইগঞ্জের সাহাদের প্রায় হাজার টাকা গয়না লুঠ করে নিশির কাছে তা বেচতে এলে নিশি

তাদের 'সস্নেহ এবং স্বর্গীয়' দেবতুল্য হাসি ও নীতিবাক্য উপহার দিয়ে মাত্র দু'শো টাকায় গয়নাগুলি শিকার করে।

অতঃপর কাহিনী যতই অগ্রসর হয়, ততই শিকার ধরার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা সুপ্রমাণিত হয়। নারীদেহের জন্যে উদগ্র আগ্রাসী ক্ষুধা নক্রবৈশিষ্ট্য সমর্থিত। তবে পূর্বেও বলা হয়েছে যে মাংসাশী জীব নক্র-এর ক্ষুন্নিবৃত্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দেহগত ভেদরেখা সুস্পষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত নয়; কিন্তু নিশিকান্ত-এর নারীমাংস লোলুপতা প্রমাণিত হয় তার নিম্নোক্ত ভাবনা থেকে

> "—বুড়ো!—তা বটে। সমস্ত শরীর দিয়ে সে আজ অনুভব করে তার শিরাস্নায়ুগুলোর নিরুপায় পঙ্গুতা। অথচ এককালে গ্রামের কোন্ সুন্দরী মেয়েটাকে অন্তত সে দু'দিনের জন্যে আয়ত্ত করেনি?"

আবার, যে কণ্ঠবালা ওরফে বিশাখাকে তুলসীর মালা পরিয়ে সে তার 'বৃন্দাবনলীলার লীলাসঙ্গিনী'-তে পরিণত করেছিল, নিজের কুকর্মকে চিরস্থায়ীভাবে প্রশাসনের নজরের আড়ালে রাখার জন্য তাকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করে নক্র নিশি ইব্রাহিম দারোগা-কে শিকারে পরিণত করেছিল।

গল্পের অন্তিমে যুদ্ধ ও মন্বন্তরকালে স্পেকুলেশনের নীতির সদ্ব্যবহার পূর্বক মহাজন নিশিকান্ত জীবনদায়ী খাদ্য আটশো মন চাল মজুত করে মতি পাল ও তার বউ-এর হয়তো তাদের মতো আরও অনেক দরিদ্র অভুক্ত প্রাণকে শিকারে পরিণত করলে তার অন্তর্গত নক্রবৈশিষ্ট্যই মূর্ত হয়ে ওঠে।

এছাড়া লেখক কপালে 'সরীসৃপের মতো সর্পিল' রেখাবিশিষ্ট নিশিকান্ত-কে স্পষ্টত সরাসরি নক্র বা কুমীরের সঙ্গে সাযুজ্যে উপনীত করেছেন। ইব্রাহিম-দারোগা তার আড়তে চাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে স্পষ্টতই তা অস্বীকার করার পর ইব্রাহিম দারোগা যখন বলে যে—

> "তুমি বাবা একটি সাক্ষাৎ ঘোড়েল—ভুঁড়ো কুমীর। তোমার আড়ত সার্চ করলে যে এখুনি পাঁচশো মন চাল সীজ করা যায়, সে খবর আমি পাইনি ভাবছ?"

—তখন নিশিকান্ত চরিত্রের নিরিখে গল্পের শিরোনাম চয়নের সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

তবে আলোচ্য গল্পে যেহেতু মানুষিক ঘেরাটোপে অ-মানুষিক অর্থপিশাচ, নারীদেহলোলুপ, পাশবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবদের চরিত্রাঙ্কন করা হয়েছে, সেহেতু কেবল নিশিকান্ত নয়, সুযোগের সদ্ব্যবহার পূর্বক মদনের মতো ডাকাতরা, ইব্রাহিম দারোগা প্রভৃতিরাও নক্র-এর মতো শিকারের উপর শানিত সুবিশাল দন্ত ও থাবা বিস্তার করে। গল্পের সূচনাতেই দেখা যায় যে রাত্রির অন্ধকারে ডাকাতির জিনিসপত্র নিয়ে মদনরা নিশির কাছে এলে সে প্রথমেই তাদের আনীত ট্রাঙ্ক ও পুটলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে ঐগুলির গহ্বরে লুক্কায়িত দ্রব্যাদি কি 'আজকের শিকার?' এক্ষেত্রে 'শিকার' শব্দটি স্পষ্টতই লক্ষণীয়, মদনের মতো ডাকাতদের নিকট বহুমূল্যবান রত্নালঙ্কার থেকে শুরু করে নারীর প্রাণ পর্যন্ত সবই শিকারের অন্তর্ভুক্ত। এইকারণেই পাথর বসানো কানের দুল ছিনিয়ে আনার মুহূর্তে সময় সংক্ষেপ করার

জন্য গোটা কানটাই যদি তাদের কেটে আনতে হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। বরং 'নারীদেহের উত্তাপ আর স্বেদের গন্ধ' বিজারিত বহুমূল্য অলঙ্কার লাভ করে যখন তারা পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হয়, তখনই তারা গল্পের শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে অবশ্যই ইব্রাহিম দারোগারও নামোল্লেখ করতে হয়। তার চরিত্রাঙ্কনকালে লেখক যে সকল ইঙ্গিত দান করেছেন, তাতে তাকেও আদিম লালসার দাসানুদাস, এক ভয়ঙ্কর জন্তু বলে অনুভূত হয়। তার কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক যখন—

> "পান খেয়ে খেয়ে দারোগার মুখটা কি অস্বাভাবিক লাল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় লোকটা রক্ত খায় বুঝি!"

অথবা—

> "কালো চাপ দাড়ির ফাঁকে দারোগার জন্তুর মতো মুখে জন্তুর হাসি দেখা দিল......"

—প্রভৃতি পংক্তি সৃজন করেন, তখনই চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর যথাযথ মনোভাব অনুধাবন করা যায়। আবার, লেখক যখন শানিত ভাষায় বিশাখার প্রতি দারোগার দর্শনজাত রতিক্রিয়াব স্বরূপ উন্মোচিত করেন—

> "—চলি তা হলে—দারোগা উঠে দাঁড়াল। তারপর বিশাখার মুখের ওপর **দৃষ্টি ভোজনের মতো দুটো ক্ষুধার্ত চোখ** বুলিয়ে নিয়ে বললে, আজ বড্ড ব্যস্ত, কাল আসব।—"

—তখন 'নক্রচরিত' গল্পে 'নক্র' বলতে তিনি যে ইব্রাহিম দারোগাকেও ইঙ্গিত করেছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আবার, গল্পে নারায়ণবাবু বিশাখার সঙ্গে ইব্রাহিম দারোগা অবৈধ সম্পর্কের কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিশিকান্ত এবং ইব্রাহিম দারোগা উভয়কে যখন একত্রে 'কুমীর' বলে অভিহিত করেন—

> "মাঝে মাঝে দারোগা রাতটাও কাটিয়ে যায় নিশির বাড়িতেই। গ্রামের সবাই ব্যাপারটা জানে কিন্তু একটি কথা বলবার সাহস নেই তাদের। জলে বসতি করে কুমীরের সঙ্গে বিরোধ না করার প্রাজ্ঞতাটুকু অন্তত আশা করা যায় তাদের কাছ থেকে। গোলাপাড়া হাটের সবচেয়ে বড় মহাজন নিশি কর্মকার ; আর দারোগার প্রতাপ সম্বন্ধে কিছু না ভাবাই ভালো—যুদ্ধ বাধবার পর থেকে ভারত রক্ষা আইনের অস্ত্রে-শস্ত্রে সে আপাদমস্তক মণ্ডিত হয়ে আছে।"

—তখন গল্পের শিরোনাম চয়নের ক্ষেত্রে লেখকের প্রতীকধর্মী বক্তব্যের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত হয়। এই কারণে উপরিউক্ত বিশ্লেষণের নিরিখে বলা যায় যে—আলোচ্য গল্পের প্রতীকধর্মী 'নক্রচরিত' শিরোনামটি মননধর্মী ও সার্থক।

সন্তোষকুমার ঘোষ

ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ষোল বছর বয়সে তিনি কলকাতা চলে আসেন। ২২ বৎসর বয়স থেকেই বৃত্তি হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতা। বিভিন্ন কাগজে তিনি সাংবাদিক রূপে যুক্ত ছিলেন। অবশেষে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুগ্ম সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য রচনাও করেছেন। তিনি দশটি উপন্যাস এবং বহু ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কিনু গোয়ালার গলি (১৯৫০) এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক সর্বশেষ উপন্যাস—'শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে'। ১৯৫৩ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করে। সন্তোষকুমার ঘোষের সমস্ত গল্প—চারখণ্ড উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন। অসামান্য ভাষাশিল্পী হিসেবে এই কথাসাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবেন।

কানাকড়ি : আদর্শচ্যুতির গল্প

শুকদেব ঘোষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ক্ষয়, মানবতা কলঙ্কিত করা দাঙ্গার রক্ত, দেশভাগের দাহ, ডানাভাঙা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষোভ ও সন্তাপের বেদনায় ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তা— এই হল বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের বাঙালির জীবনকথা। ইত্যাকার ঘটনাস্রোত বদলে দেয় বাঙ্‌লা ও বাঙালিকে। বন্ধ্যা রাজনীতি ও ধ্বস্ত অর্থনীতি মানুষকে, পরিবার ও জীবনকে দেয় ঘুণধরা অনিকেত স্বভাব। বিনষ্টি হয় মূল্যবোধের। অবসিত হয় সুস্থ জীবনবোধ। মধ্য-নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দেয় অবক্ষয় ও আত্মধ্বংসী নীতিহীনতা। পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কে জন্ম নেয় ভ্রষ্টাচার, সুযোগসন্ধান, নৈরাশ্য। সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানে নারীকেও ঘোমটা খসিয়ে জীবনসংগ্রামের কঠিনভূমিতে নামতে হয়। এই কঠিন সময়ের এই চাপ ও তাপকে অঙ্গীকার করে যাঁরা বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'বহুমাত্রিক জীবনের ক্ষেত্রসন্ধানী' সন্তোষকুমার ঘোষ অন্যতম। এই অবক্ষয়িত সমাজ ও জীবনকে, তার যন্ত্রণা ও সন্তাপকে সন্তোষকুমার মেধায়, মননে ও সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং শাণিত লেখনিতে তা প্রকাশ করেছেন নিষ্ঠুর নিপুণতায়। এমনই এক নির্মম-নিপুণ সমাজ ব্যবচ্ছেদের, নিম্নমধ্যবিত্তের শ্রেণি-বদলের গল্প 'কানাকড়ি'।

দুই

সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' আদর্শচ্যুতির গল্প। নীতিবোধে আত্মস্থ, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত একটি নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের নীতিভ্রষ্ট হবার গল্প এটি। পঙ্গু আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ভিতরে ভিতরে সৎ মানুষ কিভাবে 'নষ্টমানুষ' হয়ে যায়—তারই গল্পরূপ 'কানাকড়ি'। দারিদ্র্য-তাড়িত অথচ 'ভেতরটা...খাঁটি' এমনই দম্পতি মন্মথ-সাবিত্রী। সদ্যজাত কন্যাকে নিয়ে তারা আহিরীটোলার একটি বাড়িতে ভাড়াটে হিসাবে আশ্রয় নেয়। পাশের ঘরেই থাকে অবিবাহিতা মল্লিকা। মল্লিকার আগ্রহেই সাবিত্রীর সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়। এই পরিচয়সূত্রেই মন্মথ ও সাবিত্রীর চোখে, রঙ মেখে সঙ্‌ সেজে মামাতো কিংবা জ্যাঠতুতো ভাই শশাঙ্কর সঙ্গে বাইরে ঘুরে বেড়ানো নাচ-গান করা মল্লিকা একটা বেশ্যা, 'একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে মানুষ।' প্রথম থেকেই সাবিত্রী মল্লিকাকে এড়াতে চায়, তার সংস্পর্শে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়। এজন্য সে মন্মথকে এ বাড়ি ছাড়ার কথাও বলে। কিন্তু 'এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায় না।' এক বাড়িতে থাকলে দু'চারবার মুখোমুখি হতেই হয়। এইভাবেই তাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আসা-যাওয়া বাড়তে থাকে। দেয়া-নেয়া শুরু হয়। মন্মথর অপছন্দ সত্ত্বেও সাবিত্রীকে এসব করতে হয় নিছক মান বাঁচাবার জন্যই।

ঘটনার আবর্তে মন্মথ অফিসে ছাঁটাই হয়ে যায়। শরীর 'মাটি করা' ঘোরাঘুরি করেও মন্মথ নতুন কাজ জোটাতে ব্যর্থ হয়। ক্ষুধা নামক হিংস্র জন্তুটি ক্রমশ গিল্‌তে থাকে

তাদের। অথচ গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে রাখতে হয় তাদের দুঃখ অনটনকে, যা 'অনশনের সোদর'। বাইরের ঠাঁট বজায় রাখতে ভিতরে ঘুণপোকার স্বভাবকে লালন করতে বাধ্য হয় তারা। তাই ধুলোমুঠো দিয়ে সোনা পাবার আশায় সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দেয়। রেস খেলে (মল্লিকার সহায়তায়) পাঁচ আনায় সুদে-আসলে ফিরে পায় আট আনা। এই প্রথম নীচে নামার পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায় সাবিত্রী। সাবিত্রী এই প্রথম অনুভব করল সে ও মল্লিকা 'একই-পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে'। কেননা 'মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসী'। এরপর আর 'শাক দিয়ে মাছ' না ঢেকে সব অহঙ্কার-অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে সাবিত্রী অকপটে স্বীকার করেছে 'মন্মথর চাকরি না থাকার কথা; অভাবের কথা; উপোস দেওয়ার কথা'। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মল্লিকা।

মল্লিকার পরামর্শ মতো নিজের কাজ নিজেই গুছিয়ে নেবার জন্য ভয়কে জয় করেই সাবিত্রী সিনেমা হলে সেই শশাঙ্কর সঙ্গিনী হয়, যে শশাঙ্ক একদিন তাকে দেখেছিল 'পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি'। সিনেমা হলে, চায়ের কেবিনে সে শশাঙ্কর সঙ্গিনী হয়ে নিষ্ফল ঘুরে বেড়ায়। কেননা, সিনেমার নায়িকার হবার পক্ষে সে অনুপযুক্ত। 'শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে' দিয়েছে চুল ওঠা কপাল, নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, লিকেলিকে হাত, 'সমতল বুকের কবরে দুটি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ, এ চেহারা হিরোয়িনের সাজে না'। এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, নিজের বাইরের রূপ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে শঙ্কাতুর মনে বাড়ি ফিরে আসে। শশাঙ্কর সঙ্গে একই গাড়িতে না আসা, 'একটু ছোঁয়াছুঁয়ির ঘুষ দিয়ে' কাজ হাসিল করতে না পারা, 'শুচি বায়ুর' বাড়াবাড়িতে সব-মাটি' করে ফেলা—মন্মথর এই নির্বিবেক কুৎসিত অভিযোগে সাবিত্রীর অবশিষ্ট নৈতিক শক্তিটুকুও চুরমার হয়ে যায়। মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে সাবিত্রী 'ফুপিয়ে ফুপিয়ে একটানা' কাঁদতে কাঁদতে অনুভব করে ভিতরে ও বাইরে—তার এত দিনের বিশ্বাস কত ঠুন্‌কো। শশাঙ্কর কাছে তার শরীরের যেমন মূল্য নেই, মন্মথর কাছে তেমনি তার 'চরিত্রতেজের', ভিতরের 'খাঁটিত্বের' কোন মূল্য নেই। সাবিত্রীও আজ হয়ে গেছে মল্লিকার দোসর, আর একটা 'নষ্ট চরিত্রের মেয়ে মানুষ'। এই উপলব্ধিতেই গল্পটির সমাপন ঘটেছে।

তিন

সন্তোষকুমার ঘোষ ছোটগল্পের বিষয়, গঠনশৈলী ও অন্তর্বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অক্লান্ত। 'একালের গল্পকে গল্পের কাছে ফিরতে হবে'—এই ছিল তাঁর শিল্প আত্মস্থিত প্রজ্ঞা। সাধারণত তাঁর গল্পে আগে আসে বক্তব্য। গল্পের বুনন গড়ে ওঠে বক্তব্যকে ঘিরেই। 'কানাকড়ি' গল্পের কাহিনী বৃত্ত আবর্তিত হয়েছে মন্মথ ও সাবিত্রীকে ঘিরেই। মল্লিকা-শশাঙ্ক প্রসঙ্গ এ কাহিনীর সংকট ও সংকটমোচনে সহায়তা করেছে অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের পুষ্টি জুগিয়েছে, দিয়েছে গতিও।

গল্পটি সংলাপে গ্রথিত। গঠন একাধারে নাট্যধর্মী ও চিত্রধর্মী। মন্মথদের ভাড়া বাড়িতে

আসা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাশের ঘরের ভাড়াটে মল্লিকার সঙ্গে সাবিত্রীর আলাপ-পরিচয়, গোপনতার প্রাচীর ভেঙে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, সাবিত্রীর শশাঙ্কর বিড়াল-দৃষ্টির সামনে পড়ে যাওয়া, মন্মথর আফিস থেকে ছাঁটাই হওয়া ও নতুন চাকরি খুঁজে ব্যর্থ হওয়া, রেসে বাজি ধরার জন্য মল্লিকার হাতে সাবিত্রীর পাঁচ আনা গুঁজে দেওয়া, মৃত সন্তান প্রসব করে 'ফ্যাকাশে, শাদাকাঠি' সাবিত্রীর বাসায় ফিরে আসা, আত্মবিশ্লেষণে সাবিত্রীর মল্লিকার সমগোত্র ভাবা, শশাঙ্কর সঙ্গিনী হয়েও সাবত্রীর 'কিছু সুবিধে' করতে না পারা, বাড়ি ফিরে এসে মন্মথর জান্তব আক্রমণের মুখে পড়া ও সাবিত্রীর অন্তর্মানসে তীরবেঁধা পাখির মতো রক্তাক্ত ছটফটে অসহায় আত্মনিঃশেষের ছবি—এই সব টুক্‌রো টুক্‌রো ফিলম্‌শটের মতো ছবিগুলো একত্র করে গল্পকার চরিত্রের বাহ্যিক ও আন্তরগত সংকট-সমস্যাকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন।

ফিলম্‌শটের মতো বলছি এই কারণে যে, গল্পটিতে ঘটনাভিত্তিক মাত্রা বা 'episodic dimension' আছে। একাধিক দিনের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন দিনের ঘটনায় লেখক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, চিত্র থেকে চিত্রান্তরে চলে গেছেন অবলীলায়। মনে হতে পারে, এতে গল্পের বুনন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে, ঘটনার গতি ও ভাবের একমুখিনতাও নষ্ট হয়েছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, প্রতিদিনের ঘটনার ভিতর একটা গল্পবীজ আছে। যা অবক্ষয়িত সমাজ প্রেক্ষণে সাবিত্রী ও মন্মথর ক্রমাবনমনের ধাপগুলি চিত্রিত হয়েছে। গল্পকার সেই গল্পবীজগুলিকে পদ্মবীজ মালার মতো গেঁথে মূল প্লটকে নিটোলতা দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে সন্তোষকুমারের শিল্পসংযমের ফলে, নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ফলে। তিনি যেন এখানে 'উদাসীন ভগবান'। ভাবটি এমন যেন কোন কিছুতেই তাঁর কোন দায় নেই। সব দায় চরিত্রগুলির অন্তশ্চেতনার। অথচ লক্ষ্য তাঁর কেন্দ্রাভিসারী। ফলে কাহিনীতে এসেছে সংক্ষিপ্ততা, ক্ষিপ্রতা। তাই দু'দিনের ঘটনার মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে তা পাঠকের নজর এড়িয়ে যায়।

'কানাকড়ি' গল্পে সন্তোষকুমার চমৎকার নাটকীয়তা এনেছেন। একই দিনের ঘটনার মধ্যে যখন প্রসঙ্গান্তরে গেছেন লেখক, তখন এই নাটকীয়তাকে ব্যবহার করেছেন ঈর্ষণীয় দক্ষতায়। যেমন, একদিন দুপুরে সাবিত্রী মল্লিকার ঘরে গেল। মল্লিকার সঙ্গে কথাসূত্রে, তার সিনেমায় যাওয়া, জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে বাইরে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ সাবিত্রী মন্মথকে বলল—"অনেক পরে.......গরম ভাতের থালায় হাওয়া দিতে দিতে"। Situation-টা একেবারে বদলে গেল। আবার গল্পের শেষ পর্বে, শশাঙ্কর সঙ্গে বাইরে বাইরে নিষ্ফল ঘুরে বেরিয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে সাবিত্রীর ঘরে ফেরার সাথে সাথে পাঠকেরও উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। বাড়িতে মন্মথর প্রশান্ত মুখ, নিরুত্তাপ কণ্ঠ, নীচুস্বরে কথা বলা Situation কে পাল্টে দেয়। আবার মন্মথর স্বর যত চড়া হয়েছে নাটকীয় উৎকণ্ঠা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ চরিত্রের সংলাপের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই পাঠকের উৎকণ্ঠার চড়াই-উতরাইকে গল্পকার অদ্ভুতভাবে ধরে রেখেছেন। এখানেই গল্পের বয়ন ও অন্তর্বয়নের শিল্পরূপের স্বাতন্ত্র্য। বয়নে ও অনুভবে সমৃদ্ধময় 'কানাকড়ি'গল্পটি হয়ে উঠেছে ও'কোনর কথিত। 'Pieces of artistic Organisation'

চার

"ছোটগল্প ছোট হবে গল্পও হবে। আবার বিশেষ ছোট নাও হতে পারে, এমনকি গল্প নাও হতে পারে। একটা মুড, একটা মুহূর্ত, একটা উপলব্ধি, এ নিয়েও ছোটগল্প হয়।"

'শরীক' গল্পে নীলিমার মুখ দিয়ে এভাবেই ছোটগল্পের রূপ বর্ণনা করেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ছোটগল্পে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ আধুনিক জীবনভূমির একটি মুহূর্তের মধ্যে একটি অখণ্ড ছায়ারূপ দানের চেষ্টা থাকে। চলমান জীবন সম্পর্কে লেখকের থাকা দরকার 'ঘন নিবিড় অনুভব তন্ময়তা'। রচনা হবে ব্যঞ্জনাধর্মী। ঘটনা বিন্যাসে থাকবে পরিণতিগত ঐক্য। থাকবে নাটকীয়তা, গতিময়তা। চূড়ান্ত মুহূর্তটি উন্মোচিত হবে সাংকেতিকতায়। ভাষা হবে ইঙ্গিতধর্মী, গূঢ়ার্থ সাংকেতিক। অপরূপ সুপিনদ্ধতা, শক্তিশালী পরিমিতিবোধ ছোটগল্পের অপরিহার্য অঙ্গ। ছোটগল্পের সমাপ্তিতে থাকবে একধরনের অন্তর্দৃষ্টি, সেই সঙ্গে অতৃপ্তিও।

'কানাকড়ি' গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে সার্থক কিনা এমন প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। উপরের আলোচনাতে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি, গঠনগত দিক থেকে 'episodic' হলেও পরিমিতিবোধে ও সুপিনদ্ধতায় গল্পটি একমুখিন হয়েছে। এক্ষেত্রে গল্পকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। শিক্ষিত নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থিক অনটনকে ঘিরে আত্মিক অবনমনের মুহূর্তটিকে ধরার জন্য লেখক আদ্যন্ত অভ্রান্ত লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন। গল্পের সূচনা ও শেষাংশের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। গল্পের—সূচনাংশ "দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী। ভেতর থেকে সাবধানগলা সাড়া এলো; কে। আমি। দরজা খুলে গেল।"

গল্পের শেষের দিকে স্বামী-কন্যার জন্য সাবিত্রী কাজের তাগিদে পরপুরুষের (শশাঙ্ক) সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে বাড়ি এসে দেখে 'দরজা খোলাই ছিল'।

গল্পের শুরুটা নাটকীয়, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ও ইঙ্গিতধর্মী। নতুন বাসায় অজানা অচেনা পরিবেশে 'ভয়ে কাঠশরীর' সাবিত্রী দরজায় ছিট্‌কানি ও খিল্ দিয়ে বসেছিল। মন্মথর ডাকে দরজা খুলে দিল। গল্পের শেষ পর্বে স্বামী মন্মথর তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে সাবিত্রী সেই খোলা দরজা দিয়েই 'টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি।' বিবাহিতা নারী ও তার শরীর স্বামীর সম্পত্তি। আর্থিক অনটনের সময় স্বামী-সন্তানের জন্য সেই শরীরকে কাজে লাগিয়ে যদি কিছুটা অর্থোপার্জন হয় তাতে দোষ কোথায়! বিশেষ করে স্বামী যখন ভাবে 'মান ধুয়ে জল' খেলে 'পেট ভরবে না' বা 'একটু ছোঁয়াছুয়ির ঘুষ' দিয়ে কাজ হাসিল হতে পারে, তখন নারীকে রুচির, সতীত্বের, আদর্শের খিল-ছিটকানি খুলে শরীরের দরজা খুলে দিতেই হয়। গল্পের প্রথমে মন্মথর ডাকে সাবিত্রীর দরজা খোলার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল, গল্পের শেষে তারই চূড়ান্ত পরিণাম লক্ষিত হয়। এভাবেই গল্পকার সমকালীন সমাজসত্যকে মন্মথ-সাবিত্রীর অধঃপতনের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের পতনের এরূপ প্রতীক-প্রতিম চিত্রাঙ্কনে গল্পকার অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। নির্মমতায় তিনি পূর্বসূরি প্রেমেন্দ্র মিত্র বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কারুর চেয়ে কম নন্। এ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমারের 'দুটি নাটক একটি

ঘর', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা' ও সরোজ রায়চৌধুরীর 'ছন্নছাড়া' গল্পগুলির কথা মনে পড়ছে। প্রেক্ষিত আলাদা হলেও নারীর অবনমনের গল্প হিসেবে এগুলিও উল্লেখযোগ্য।

'কানাকড়ি' গল্পের শীর্ষমুহূর্ত এসেছে মন্মথ ও সাবিত্রীকে ঘিরেই। সাবিত্রী প্রথম ঘরের গণ্ডী ডিঙিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছে স্বামীর সম্মতি ছাড়াই। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ব্যর্থতার শূন্যতা নিয়ে মতিচ্ছন্ন সাবিত্রী বাড়ি ফিরে এলে গলাধাক্কা নয়, চেঁচামেচি বা কেলেঙ্কারিও নয়, আশ্চর্যভাবে মন্মথ নীচু স্বরে যখন বলে 'তা সুবিধে হল কিছু' তখন থেকেই গল্পের শীর্ষমুহূর্ত শুরু। কিন্তু শীর্ষমুহূর্ত চূড়ান্ত চূড়া স্পর্শ করেছে 'শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে'?—মন্মথর এই শেষ সংলাপে। এ উক্তি ঘটনার পক্ষে, চরিত্রের পক্ষেও 'একাগ্নী বাণের' মতো স্থির লক্ষ্য, তাৎপর্যমণ্ডিত।

এ গল্পের ভাষা জীবন্ত, চরিত্রানুগ। সংলাপ নির্ভর হওয়ায় গল্পটির ভাষায় এসেছে নাটকীয় ক্ষিপ্রতা, সাংকেতিকতা, সংক্ষিপ্ততা ও ব্যঞ্জনা। বাহুল্য নিষ্ঠুরভাবে বর্জনীয় তাই ভাষা হয়েছে ঋজু, নির্মেদ। চরিত্রের অন্তর-বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বর্ণনা প্রশ্রয় পেলেও তা সংযমের বাঁধনে বাঁধা। বাক্যগুলি ছোট ছোট হওয়ায় গল্প গতিময় হয়েছে। অবশ্য সন্তোষকুমার মাঝে মাঝেই বাক্যকে অলঙ্কৃত করেছেন গল্পের প্রবাহকে নষ্ট না করেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতেই পারে—

উপমা : ১. অবাড়ন্ত শরীর মেয়েদের বয়সের মতো, এ বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না।

২. সাবিত্রীর কপাল প্রাকসকাল আকাশের মতো স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভশুভ্র....।

৩. গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ, এই অনটন, যা অনশনের সোদর।

৪. হারমোনিয়মের নিখুঁৎ সাজানো রীডের মতো দাঁতের পাতি বার করে যখন হাসল....।

সমাসোক্তি : ১. শেষরাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোজে.....।

২. মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাইহিল।

৩. তারপর থেকে গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে।

চিত্রাশ্রিত বাক্য : ১। মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ।

২। অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ।

কখনো ভাষা ব্যবহার না করে অভিব্যক্তির সাহায্যে ঘটনার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা আছে। ছাঁটাই প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করেছে মন্মথ 'কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে'। চূড়ান্ত নাট্যিক অভিব্যক্তি। আবার কখনো কখনো অকৃত্রিমভাবে প্রবাদ-প্রবচনকে ব্যবহার করেছেন গল্পকার। যেমন 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কি দিয়ে', 'জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর', 'ভিখারীর আবার বাছ্‌বিচার'।

এ তো গেল বলার ভাষা। ছোটগল্পে 'না বলা বাণী'র বা নীরব ভাষারও এক নিজস্ব গভীরতা থাকে। কেননা, ছোটগল্প 'বলে কম, বোঝায় বেশি'। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 'কানাকড়ি' গল্পের সমাপ্তি অংশটি উৎকলন করতে পারি :

''ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা।

এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার; মল্লিকা কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।"

সাবিত্রীর আত্মনিঃশেষের বর্ণিত এ ভাষা নান্দনিকতায় ঋদ্ধ। এ ভাষা কেবল অনর্গল অশ্রুক্ষরণের নয়, রক্তক্ষরণেরও। সাবিত্রীর জীবন ঘরে ও বাইরে—কানাকড়ি অর্থাৎ মূল্যহীন হয়ে গেছে। স্বামীর কাছে তার সতীত্বের তেজ আর শশাঙ্কর কাছে রূপের অহংকার—দুইই মিথ্যা হয়ে গেছে। সর্বস্ব খোয়ানো নারী একথা কাউকে বলতে পারে না, বলা যায় না। একদিকে ক্রমাগত কান্না অন্যদিকে এই নীরব ভাষার মধ্য দিয়েই গ্রথিত হয়েছে মূর্ততা ও বিমূর্ততার যুক্তবেণী। না বলতে পারার এ 'কাঁটা' শুধু সাবিত্রীর নয়, এ 'কাঁটা' আত্মধ্বংসী যন্ত্রণাবিদ্ধ আজকের মানুষের এক অনিবার্য নিয়তি।

সহজে অনুমেয়, সন্তোষকুমার এই অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই তুলে ধরেছেন অনন্ত সিন্ধুর ছবি। ব্যক্তিক ট্র্যাজিক সংবেদনা চারিয়ে গেছে সর্বজনীনতায়। প্রতীকী ইঙ্গিতে দ্যুতিময় 'মর্যাদাভিমানের ক্রমশ ক্ষয়ে চলা বিপন্নতার ক্ষুব্ধ প্রতীতি' দিয়েই এ গল্প শেষ হয়েছে। আবার 'কানাকড়ি' নামের মধ্যেও কেন্দ্রীয় বক্তব্যের চমৎকার ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে। 'সব মিলিয়ে নামকরণের দিক দিয়ে, সমাজ-সমস্যামূলক গল্প হিসেবে 'কানাকড়ি' সুন্দর। অসহ্য সুন্দর।

পাঁচ

চরিত্রচিত্রণে সন্তোষকুমার দক্ষ শিল্পী। সীমিত পরিসরেও গল্পকার 'কানাকড়ি' গল্পের চরিত্রগুলিকে 'কুঁদে নির্মাণ' করেছেন। সাধারণত আমরা দু'ধরনের চরিত্র দেখে থাকি—এক. বিবর্তিত চরিত্র, দুই. সমতলজাতীয় চরিত্র। আলোচ্য গল্পে মন্মথ, সাবিত্রী ও শশাঙ্ক বিবর্তিত চরিত্ররূপে ও মল্লিকা সমতলজাতীয় চরিত্ররূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই যে, উপন্যাসে যেমন চরিত্রর উত্থান-পতন, উচ্চাবচ বাক্যগুলিকে সানুপুঙ্খ দেখানো সম্ভব, ছোটগল্পে তা সম্ভব নয়। ছোটগল্পে চরিত্রের বিবর্তনের বাঁকগুলিকে দেখানো হয় 'এক পলকে একটু দেখা'র মতো। সন্তোষকুমার অবশ্য তাঁর শিল্প-বুদ্ধি দিয়ে চরিত্রগুলিকে 'কলের পুতুল' করেননি। প্রতিটি চরিত্রই সজীব, স্বতন্ত্র, স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ভাস্বর।

মন্মথ 'কানাকড়ি' গল্পের নায়ক। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান সে। স্ত্রী কন্যা নিয়ে তার সংগ্রামী জীবন। নিজের মতো করে সে বাঁচতে চায়। এজন্যই তার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে নতুন বাসায় আগমন। সে আমদানি রপ্তানীর অফিসের কর্মী। সংসারের স্বচ্ছলতার জন্যই মন্মথ অফিস-ফেরতা দুটো টিউশনি করে। স্বামী হিসেবেও মন্মথ আদর্শবান। স্ত্রীর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। তাঁর চরিত্রকে বোঝার জন্য কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করছি :

ক. আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেরা সন্দেহ করে যেন ছোট না করি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দুজনের দাম থাকলে হল।

খ. আমরা দুজনকে নিয়ে দুজন, কারুর কাছে ছোট হব না...।

গ. আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি।

মল্লিকা-শশাঙ্ক সম্পর্ক প্রসঙ্গে সাবিত্রীকে বলা মন্মথর এইসব উক্তির মধ্যে তার সততা, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের আভিজাত্য লক্ষণীয়। অফিস থেকে ছাঁটাই হয়ে নতুন কাজ জোটাতে ব্যর্থ হবার পর মন্মথ বাইরে ও ভিতরে, স্বভাবে ও মানসিকতায় বদলাতে থাকে। কিন্তু 'পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস' তখনও সে ছাড়তে পারেনি। তাই রেস খেলে সাবিত্রীর প্রাপ্তির কথা শুনে এবং এব্যাপারে সাবিত্রীর উৎসাহ দেখে 'অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ'। গম্ভীর স্বরে বলেছে "এও তো এক হিসেবে তোমার রোজগারই। ছি ছি।....না খেয়ে থাকবো সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।" বোঝা যায়, আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিত্ব ও শ্রেণিচেতনা তখনও তার মধ্যে জাগরুক।

কিন্তু এই চরিত্রেরই বিস্ময়কর বদল ঘটে। অফিস ছাঁটাই জনিত বেকারত্ব, অর্থাভাবে নতুন কাজ জোটাতে ব্যর্থতা, হাড়-হাভাতের গ্লানি তাকে বেপরোয়া করে তোলে। আপন অস্তিত্ব রক্ষায়, নিছক টিকে থাকার সংকল্পে সে অন্যমানুষ হয়ে ওঠে। মন্মথর বদ্‌লে যাবার ব্যাপারটি লেখক চিত্রায়িত করেছেন এইভাবে :

অভিব্যক্তি	**স্বরক্ষেপণ**	**উক্তি**
প্রশান্তমুখ/নিরুত্তাপ কণ্ঠ	নীচু স্বর	'সুবিধে হল কিছু?'
ধৈর্যচ্যুতি	উচ্চ স্বর	'অভ্যাস নেই! নেকি। কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে, না? কিসে, নিজের ভাল হয়, তাও বোঝ না?'
মুখ ভেংচে	তীব্রস্বর	'কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ী করে বাড়ি পৌঁছে দিত?'
'পলক পড়ছে না, মণি দুটো জ্বলছে'	তীব্রস্বর	'শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে?'

বোঝা যায় অন্তরে-বাইরে মন্মথর এই ভাঙনকে, তার অভিব্যক্তির সাহায্যে, স্বরক্ষেপণের উত্থান-পতনের সাহায্যে গল্পকার নিপুণ দক্ষতায় মূর্ত করে তুলেছেন। একই সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালের অনিবার্য সামাজিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার বিস্রস্ত রূপকে মানবিক রূপদান করেছেন মন্মথ চরিত্রের মাধ্যমে।

সাবিত্রী : সাবিত্রী মন্মথর মতোই একটি বিবর্তিত চরিত্র। তার নামটিই তার ধাতুপ্রকৃতির শব্দ সংকেত। সাবিত্রী নামের মধ্যেই নিহিত কেবল কায়িক সতীত্বে নয়, সে স্বামীর অনুব্রতাও বটে। আবার সাবিত্রী নামটিই যেন ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অভাবী হলেও তার রুচিবোধ ও মান-সম্মান জ্ঞান প্রখর। একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে তার মধ্যে। গল্পের প্রথমদিকে নতুন পবিবেশে তার ভয়-জড়তা ভাব চবিত্রের পক্ষে অসংগত নয়। মল্লিকাব আচার-আচরণ, শশাঙ্কর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জেনে তাকে 'নষ্ট চরিত্রের মেয়ে মানুষ'

বলতে সাবিত্রী দ্বিধাবোধ করেনি। এক্ষেত্রেও নারীসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহল তার চরিত্রে বর্তমান। আবার বাইরের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য নিজেদের 'অভাবের ফুটো কলসী'র কথা গোপন করার মধ্যে টিপিক্যাল নিম্নমধ্যবিত্ত মানসপ্রবণতা তার মধ্যেও রক্ষিত। এজন্য ছলনার আশ্রয় নিতে তার বাধে না। তবে তার চরিত্রতেজের, ভেতরের খাঁটিত্বের প্রতি স্বামীর শ্রদ্ধা অটুট জেনে যেমন সে গর্ব অনুভব করে; তেমনি শশাঙ্কর লোলুপ দৃষ্টিতে নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

সাবিত্রী বদলাতে থাকে মন্মথ ছাঁটাই হবার পর। মল্লিকার সঙ্গে সে মিশ্‌তে চাইত না সেই সাবিত্রীই একদিন মল্লিকার বশীভূত হল। অনটনকে লুকিয়ে রাখার ছলনায় সাবিত্রী যখন ক্লান্ত, রিক্ত তখনই সুযোগ বুঝে মল্লিকা তাকে 'বিব্রত, বে আব্রু' করত 'একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি' প্রশ্নে। আত্মবঞ্চনা ও কৃত্রিমতার ছদ্ম আবরণ ছিঁড়ে সাবিত্রী নীচে নামতে থাকে মল্লিকার সহায়তায় রেস খেলার মাধ্যমে। স্বামীকে লুকিয়ে একাজ তাকে আরও 'অসমসাহসিক কাজ' এ প্রাণনা জোগাল। গৃহবধূ পথে নামল পরপুরুষকে খুশি করে কাজ হাঁসিলের আশায়। এক দিকে স্বামী-কন্যার উপবাস অন্যদিকে এতদিন ধরে লালিত সতীত্ব, শুচিতাবোধ—.এই বিপরীতমুখী টানাপোড়েনে রক্তাক্ত সে। সিনেমা হলে ও চায়ের কেবিনে তার অন্তর্মানসে চলা এই রক্তাক্ত লড়াই আমরা দেখেছি। সাবিত্রী ক্ষতাক্ত অপিচ মরিয়া। বাঁচতে হবে, স্বামী-কন্যাকে বাঁচাতে হবে তা যে কোন মূল্যেই। শেষ পর্যন্ত সে হেরে গেছে। তার ফ্যাকাশে, শাদাকাঠি, লাবণ্যহীন শরীর শশাঙ্কদের কাজে লাগে না, কাজে লাগেও নি। আবার বাড়ি ফিরে এসে স্বামীর কাছে তার অক্ষত মন ও দেহের শুচিতা মূল্য পেল না। সব হারাল সাবিত্রী। মান ও কুল দুই-ই গেল। ঘরে ফেরার পথ তার কাছে হল 'অফুরান'। আর মল্লিকাই হল তার শেষ আশ্রয়—এই নিদারুণ উপলব্ধির মধ্য দিয়েই সাবিত্রীর দ্বন্দ্ব, পতন স্বভাবকে প্রতীকায়িত করেছেন গল্পকার। এই বিষাদ প্রতিমার জন্য পাঠক হৃদয়ে এক গোপন 'কাঁটা' বিঁধতে থাকে।

মল্লিকা : মল্লিকা সমতল জাতীয় (Flat)-চরিত্র। তার চরিত্রে কোন বাঁক নেই। নেই কোন বিবর্তন, দ্বন্দ্ব। মল্লিকা মিশুকে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, রঙ্গরসিকা। ধবধবে রঙ, টান টান শরীর তার। সাজ-পোশাকে ফিট্‌ফাট্। ট্যাক্সিতে ঘুরে, সিনেমা দেখে, রেস খেলে, গান-বাজনা করে—তার দিনযাপন। এ আচরণ গৃহস্থ স্বভাবী নয়। 'এ গরম তোমার বয়সের', 'ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে', সিনেমা হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু করেছে'—এসব উক্তিতে অবিবাহিতা এই মহিলার কৌতুকের সঙ্গে যৌনতার প্রতি অদম্য বাসনাও স্ফুরিত হয়েছে। প্রতিবেশিনীর প্রতি তার সমবেদনা, সহমর্মিতাও লক্ষণীয়। কিন্তু তার চিন্তাভাবনায় কোন গভীর জীবনবোধের ছাপ নেই। থাকলে নারী হয়ে সাবিত্রীর গোপনচারী বেদনাকে সে বুঝতে পারত। তবে গল্পে তার সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। আসলে গল্পকার সাবিত্রীর বিপ্রতীপে মল্লিকাকে এনে সাবিত্রীর চরিত্রের বিবর্তনকে শিল্পসুষমা দান করেছেন। এদিক থেকে চরিত্রটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শশাঙ্ক : শশাঙ্ক অনেকাংশেই বিবর্তিত চরিত্র। গল্পেব প্রথমে তার অবস্থান নেপথ্যে।

মল্লিকার কথায়, ট্যাক্সির হর্ণে, মশমশ জুতোর চলাফেরার আভাস-ইঙ্গিতে শশাঙ্কর পরিচয় মেলে। সাবিত্রীকে দেখার মধ্যে তাকে নারীর 'দেহ্ চাটা' যৌনবিকারগ্রস্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু সিনেমা হলে বা চায়ের কেবিনে সে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রীর দেহ স্পর্শ করেনি। সাবিত্রীর সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গ সূত্রে শশাঙ্ক যে দৃষ্টিতে সাবিত্রীকে দেখেছে তাতে আগের মতো 'পাতের পাশে বসে থাকা বেড়াল'-এর দৃষ্টি ছিল না। এ এক অন্য মানুষ। সিনেমার নায়িকার অভিনয়ে অনুপযুক্ত এই কারণে সাবিত্রীকে কাজ দিতে না পারায় শশাঙ্ক দুঃখ প্রকাশ করেছে। বলেছে 'এবার কিছু করতে পারলাম না। তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে।' এখানে শশাঙ্ক পুরোপুরি মানবিক। গল্পের মূল তাৎপর্যে, ব্যঞ্জনার গভীরতা দানে শশাঙ্ক অবধারিত চরিত্ররূপ।

সন্তোষকুমার ঘোষ খুবই নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন। মূল চরিত্র দুটির যে বিবর্তন দেখান হয়েছে তা স্বতঃস্ফূর্ত, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য। লেখকের বানানো নয়। বস্তুত 'কানাকড়ি' এক অন্যস্বাদী শিল্প-মননের গল্প।

ভেবেছিলাম : এক শহর কলকাতা
প্রিয়াংকা চৌধুরী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পরিবেশ বাংলা কথা সাহিত্যকে যে চিরস্থায়ী নামগুলি উপহার দিয়েছিল, সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৫৫) তাঁদের অন্যতম। একই সঙ্গে সাহিত্যের নানা জমিতে ফসল বুনেছেন তিনি। কবিতা লেখা, নাট্যচর্চা, প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি সফল ঔপন্যাসিক এবং অসামান্য ভালো ছোটগল্পকার। তাঁর উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তাকে মনে রেখেও, দৃপ্ত-মনোজ্ঞ-সচেতন এবং সমকালমুখী ছোট গল্পগুলিকেই তাঁর আত্মপরিচয়বাহী বলে মনে হয়।।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বিলাতী ডাক'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অক্টোবর ১৯৩৭-এ প্রকাশিত। 'যাত্রাভঙ্গ' তাঁর শেষ প্রকাশিত গল্প। বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, সংখ্যায়। তিনি যে সুদীর্ঘকাল ধরে ছোটগল্প লিখেছেন, উপরের পরিসংখ্যান তারই পরিচয় দেয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী। মোট গল্প গ্রন্থ ১৭টি। তাছাড়াও 'সংকলন বহির্ভূত বেশ কিছু গল্প রয়েছে।

কিন্তু শুধু সাহিত্য পরিবেশ নয়, সমকালীন ও পরবর্তী বিশ্ব-ইতিহাস—রাজনীতি-সমাজ বড় দ্রুত বদলাতে শুরু করলো। সারা বিশ্ব জড়িয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। তারই পথ ধরে এলো রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্ল্যাক আউট, দাঙ্গা, মন্বন্তর, মন্দা, বেশরী। মৃত্যু হল মানবিকতার, মূল্যবোধের, শান্তির, নিরাপত্তার। বাংলা ভাগ হয়ে গেল। আর এ সমস্ত কিছুকে সঙ্গে নিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। স্বপ্নের একটা স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠলো ঠিকই, কিন্তু এতো কালো দু-হাতে ততদিনে মাখা হয়ে গিয়েছিল যে একটা স্বাধীনতার প্রলেপ তাকে স্বচ্ছ-সুন্দর করে দিতে পারল না।

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পের পটভূমি এই সময়কেই ধারণ করে আছে। বাহ্যিক আঘাত মানুষের মনোজগৎকে কিভাবে কতখানি ক্ষয় করে তাকেই তিনি সাহিত্য প্রাধান্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। মূল্যবোধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বারবার মেকী সমান-ব্যবস্থাকে উপহাস করে ছাড়লেন।

পেশাগত ভাবে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বলে সাংবাদিক সুলভ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সন্তোষ ঘোষের রচনা শৈলীর অন্যতম প্রধান দিক। বাংলা ভাষা সাহিত্যের আধুনিকতম দিক বললেও ভুল হয় না। তবে তা অনায়াস ছিল না হয়তো। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ধীরে ধীরে তা আয়ত্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশ স্বতন্ত্র ও বলিষ্ঠ।

সন্তোষকুমারের ছোটগল্প পরিক্রমার মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস-গতভাবে উত্তাল এই সমকালকে রোজ প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছিল তাঁকে, আর পাঁচজন মানুষের থেকে আলাদা ভাবে, আরো কাছ থেকে—আরো তীক্ষ্ণ ভাবে।

কথায় বলে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তার আওয়াজ হয় না, সন্তোষ কুমার এই স্বপ্ন পতনের শব্দ এনে দিয়েছেন বাংলা ছোটগল্পে। 'ভেবেছিলাম' এমনই এক 'স্বপ্নধ্বস্ত গল্প'। (প্রথম প্রকাশ:) ?

'ভেবেছিলাম' একটি পরিবারের গল্প। কিন্তু কোন একটি বিশেষ পরিবারের গল্প নয়ও।

'ভেবেছিলাম' গত শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সব বাঙালী পরিবারের গল্প। 'ভেবেছিলাম' একটি বিশেষ সময়ের গল্প। 'ভেবেছিলাম' একটি ক্ষয়গ্রস্ত স্বপ্নের গল্প। 'ভেবেছিলাম' ঠিক যেন গল্পও নয়—বীভৎস এক সত্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা।

এই সত্যের সাক্ষী নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি কিশোর। গল্পে যার নাম নেই—যার পরিবারের কারুর নাম নেই। তার সম্বল কয়েকটি নিকট সম্পর্ক—মা-দিদি-বাবা, আর একটি স্বপ্ন। যে স্বপ্নের নাম 'কলকাতা'। 'কলকাতা' তার আছে, তাদের কাছে শুধু একটি শহরের নাম নয়। কলকাতা সব কষ্টের, সব সমস্যার, সব অপ্রাপ্তির একমাত্র পূরণক্ষেত্র। কলকাতা এক আর্তি—এক সব পেয়েছির দেশের ঠিকানা। কলকাতা ঠিক যেন আলাদীনের আশ্চর্য দীপাধারটি, যাকে ছুঁতে পারলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। কলকাতা মানে, তারা সবাই ভাবতো, সব ঠিক হয়ে যাওয়া।

আটটি শব্দের একটি বাক্যে এ গল্প শুরু হয়েছে। —'আমরা ভাবতাম, কলকাতায় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই একটি বাক্যে সমগ্র প্রেক্ষাপটটি গল্পকার সামনে এনে ধরেছেন। প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ বন্ধন-'আমরা ভাবতাম'-অর্থাৎ সে ভাবনা পুরনো হয়ে গেছে, এখন আর ভাবিনা বা এই ভাবনা আর ভাবায় না। তারপরই আসে সেই ভাবনাটির স্বরূপ- 'কলকাতায় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অর্থাৎ যে সময় ভাবনাটি ভাবা হত, সে সময় কোন কিছু ঠিক ছিল না। কলকাতায় সেই সব কিছু ঠিকের সম্ভাবনা ছিল। লেখক বলেছেন-'ভাবতাম'। বড় বিষাদময় এই শব্দটি যেন শুরুতেই গল্পের আবহাওয়া তৈরী করে দেয়। একই সঙ্গে তৈরী করে কৌতূহল আর আশঙ্কাও।

গল্পের দ্বিতীয় বাক্যে সময়ের প্রেক্ষিতটি স্পষ্ট, সেখানে এই গল্পের সময়কালটি নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া আছে—'উনিশশো ত্রিশ সালের মাঝামাঝি।' লেখকের দেওয়া এই তথ্য আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় ইতিহাসের সত্যের সামনে। সেই সত্যেব সামনে দাঁড়িয়ে দেখি কলকাতা থেকে অনেক দূরের মফস্বলের এক শহরে এক কিশোর তার মা আর দিদির সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে আছে। —'ফি বর্ষায় সেখানে খুব জল হত। সদর রাস্তা ভেসে আমাদের বাড়ি পৌঁছবার নিচু পথটা তলিয়ে যেত। নড়বড়ে সাঁকো ধরে পার হতাম।' সেখানে 'উঠোন থৈ থৈ, ঘরেও জল। 'এ ঘর ও ঘরের মধ্যে কাঠের পাটা পাতা হত।'

এমন প্রচণ্ড বর্ষা যে ট্রেনও বন্ধ থাকতো। ঝড় বৃষ্টিতে জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল। নড়বড়ে মাটির বাড়িতে রাতের অন্ধকারে এক অসহায় সম্বলহীন মা তার দুই পুত্রকন্যাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন। সেখানে সেই দুর্যোগের রাত কেটে যে সকাল হয় তা শুধু রাতের তান্ডবের সাক্ষ্য বহন করে, জীবনে নতুন কোন আলোকপাত করে না।

'সকালে উঠে দেখি, রান্নাঘরের ভিটেটা ন্যাড়া মাথা, উধাও চালটা ও বাড়ির নারকেল গাছের মাথায় ছাতা। বারান্দার কোণে সারারাত ধরে ভেজা বেড়ালটা আধমরা হয়ে এক পাশে পড়ে।'

একটানা বর্ণনার পর, উপলব্ধিতে পৌঁছে দেন লেখক। পাঠকের মনটিকে ভিজিয়ে তোলেন। গল্প কথক কিশোরের খারাপ হয়ে থাকা মনের সামিল হই আমরাও।

'ভাল লাগত না, একটুও না।' এমন আন্তরিকভাবে, এমন বেদনাঘন আবেদনে ভালো না লাগার কথা বলতে বাংলা সাহিত্য খুব কম শুনেছে বলেই মনে হয়। কোন প্রতিরোধ নেই,

প্রতিবাদের কোন আড়ম্বর নেই, কেবল স্মৃতি হাতড়ে ভালো না লাগার -রেশটা তুলে আনা যেন। সেই ভালো না লাগার অনেকগুলো কারণ—'স্যাঁৎসেঁতে পরিবেশ, বারবার জ্বর-'কুইনিন মিক্সচারে তেতো আর বার্লিতে বিস্বাদ দিনগুলিকে ভালোবাসা শক্ত। কাঁথার তলায় কম্পজ্বরে কয়েদি হয়ে কতবার পুজোই দেখতে পাইনি।' আরও কারণ ছিল, গরম পোশাকহীন শীতঋতু, ফুরিয়ে যাওয়া তেলের লণ্ঠন, ক্রমশ মিইয়ে আসা বাটির মুড়ি, বাবার মনি অর্ডারের জন্য মাসের পর মাস ধরে ব্যর্থ অপেক্ষা, বড় হতে থাকা দিদির প্রতি বদলাতে থাকা আশপাশের নজর, প্রায় বে-আব্রু হয়ে আসা এক সঙ্কটাপন্ন অস্তিত্ব।

এই সমস্ত বিধ্বস্ততার মধ্যেও তারা প্রাণপণে বেঁচে ছিল একটাই স্বপ্নকে বুকে লালন করে—'কলকাতা গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' সমস্ত বাস্তব যেখানে এই তিনটি প্রাণীকে কোণঠাসা করে করে উপর থেকে, ভেতর থেকে ক্রমশ জীর্ণ করে, শীর্ণ করে আধমরা করে তুলছিল, সেখানে একটাই আলোক উৎস ছিল—

'একটা কিছু হবেই। বরাবর আমরা এখানে থাকবো নাকি। আ-ম-রা ক-ল-কা-তা যাব। শেষের কথা কটি মা বলত ধীরে ধীরে, বিশ্বাস দিয়ে মেখে মেখে। যেন আলুসিদ্ধ ভাতে চট্‌কে বড় বড় গ্রাস করে আমাদের মুখে তুলে দিচ্ছে।'

কলকাতার সেই স্বপ্নে—'মা দিদিকে মারবে না, মনি অর্ডারের জন্য পিওনের পথ চেয়ে কানা হবে না।' সেখানে সব—'ঝকমকে, খটখটে। সব আলোয় আলো'।

ছেলেটি আর তার দিদি এই স্বপ্ন নিয়ে দিনকে পার করে, রাতকে সকাল হতে দেয়। মায়ের শৈশব স্মৃতির প্রায় মুছে যাওয়া কলকাতার গল্পের ওপর নিজেদের স্বপ্ন সাজায়, স্বপ্ন বানায়। সেই কলকাতায় যাওয়ার দিন গোনে।

'আমরা যাবই। জানতাম। একদিন।'

অবশেষে বাবার চিঠি তাদের কলকাতায় ডেকে নিল।

'ভেবেছিলাম' গল্পের প্রথম পর্যায়টি এই পর্যন্তই। সেখানে এক দুঃসহ বাস্তবের বর্ণনা আছে। তীক্ষ্ণ অথচ ছোট ছোট বাক্যে বড় যন্ত্রণার চালচিত্রটিও আছে স্পষ্টভাবে। আর আছে এক 'ইউটোপিয়া'। এক রোমান্টিক স্বপ্নালু কল্পনা যা বাঁচিয়ে রাখে, বাঁচতে বাধ্য করে, বাঁচার সম্ভাবনাকে সিঞ্চিত করে।

এই গল্পের পরবর্তী পর্যায়টির প্রেক্ষাপট শহর কলকাতা। বাস্তবতা সেখানে আরও ঘোরতর, স্বপ্ন সেখানে দূরত্বের সুযোগে ডানা মেলতে পায় না। স্বপ্নের কলকাতায় আসার পর শুধুই কলকাতা জেগে থাকে, স্বপ্নেরা যেন কোথায় গা ঢাকা দেয়।

গল্পের পরিবারটি কলকাতায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভেবে রাখা স্বপ্নের স্তরগুলি একে একে আঘাত পেয়ে ভাঙতে শুরু করে। যন্ত্রণামুক্তির যে আশ্বাস তাদের শহরে নিয়ে এলো, যুগযন্ত্রণার নিদারুণ অভিঘাতে সেই আশ্বাস শুধু বিপর্যস্তই হলো না—একেবারে চূড়ান্ত নগ্ন হয়ে দেখা দিল। ভাবনা আর ঘটনার এই প্রচণ্ড অসংগতি গল্পকার তুলে এনেছেন এক অসামান্য ভঙ্গীতে।

—'সেই কলকাতায় এলাম।.......

মা বলল্, বাস্ রে এই! ......

আমাদের বাসা হল।

যে রাস্তা সারাদিন পাগলের মতো বকে, সে রাস্তায় না। যে রাস্তায় আলোর জেল্লায় রাতগুলো আসলে নকল দিন সেজে থাকে, সে রাস্তায় না।'

তাদের নতুন ঠিকানা 'সাপের বাচ্চার মতো কালো কিলবিলে' এক গলিতে। সেখানে যেমন নোংরা, তেমনি গা গুলিয়ে দেওয়া গন্ধ।........'একটা ঘুপচি ঘর একটাই মোটে, আমাদের সকলের জন্যে। ভাড়াটে আরও দু ঘর আছে, কিন্তু কলতলাটা এজমালি, সাঁতলায় ছোপ-ধরা এবং একটাই।'

এই শহরে আকাশ দেখা যায় না। আকাশ দেখতে সিঁড়ি বেয়ে কারো ছাতে উঠতে হয়। এজমালি ভাড়া বাড়িতে আব্রু রাখতে সারাক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ রাখতে হয়। অন্যের আব্রুর প্রতি আড়চোখে তাকাতে কেউ বাদ যায় না। এই শহরকে সেই কিশোর আর তার দিদি যদিও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কিছুটা চিনল, তাদের মা-র সেটুকুও হল না। কেবল হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে 'তার হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি'। ফি রবিবার বাবার বেড়াতে নিয়ে যাবার আশ্বাস, পরের রবিবারের জন্য তোলা থাকতো। এরই মধ্যে সংসারের সম্বন্ধগুলো, সম্পর্কগুলো ক্রমশ আলগা হতে শুরু করেছিল। অল্প সম্বল, প্রায় নিঃসম্বল এই পরিবারের প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি এক নিষ্ঠুর ঈর্ষা অনুভবে দিন যাপন করতে থাকে।

ঠিক 'এই সময়ই বাবা যে কারখানায় কাজ করত তার হাত বদল হল।'

বিপর্যয় তার পূর্ণ দাক্ষিণ্যে এই পরিবারের যাবতীয় ভরসাকে কোণঠাসা করে দিল। তবু কোথায় যেন একটা আশা তখনও রয়ে গেল, সব ঠিক হয়ে যাওয়ার আশা। একের পর এক কাজের সন্ধান চলল। 'অথচ বাবা দিনকে দিন গম্ভীর হচ্ছিল। তার মেজাজ চড়ছিল।'

শেষমেশ অংশীদারীতে চায়ের দোকান খোলা নিয়ে অধঃপাতের চূড়ান্ত রূপটি সামনে এসে দাঁড়াল। তবু কিছু বাকি রয়ে গেছিল বলেই যাকে বন্ধু বলে ঘরে ডেকে ব্যবসার আলোচনা চলেছিল, যাকে চা দেবার অছিলায় নিজের স্ত্রীকেই এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত হয়েছিল, সেই লোকটিই যখন ঘরের কৈশোর-উত্তীর্ণা মেয়েটির হাত চেপে ধরে—তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। উপার্জনের সম্ভাবনার যে ক্ষীণ আশাটি অন্তত তৈরী হয়েছিল, তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনমাসের ভাড়া বাকি পড়েছে ততদিনে। বাড়িওলাও গৃহকর্তার মেজাজের কাছে রেয়াত পেল না।

তারই মাঝে বাড়িতে হঠাৎ করে আত্মীয়-পরিজনের আসা-যাওয়ায় পরিবেশ কিছুটা সহনশীল মনে হয়। কিন্তু তাও সাময়িক। আতিথেয়তার খরচ যোগান দেওয়া সহজ নয়। আপাত উচ্ছ্বাসের আড়ালে আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে। এর থেকে উদ্ধার করতে হঠাৎ এসে পড়েন বরুণ মামা। যার সম্পর্কটি—'মা বলে দিল বলেই আমরা বললাম বরুণ মামা।' সেই বরুণমামা গিয়ে উঠলেন অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ি। এনিয়েও বাবার আচরণ শুধু তিক্ততাই তৈরী করলো। এই কদর্য বচসার মধ্যেই বেড়াতে আসা আত্মীয়া রাঙা জ্যাঠাইমা গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে এলেন। এবং অবস্থা গতিক দেখে সেদিনের দুপুরের গাড়িতেই রওনা হতে হল তাকে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে একটু একটু করে অন্ধকার আরও ঘন হচ্ছিল।

'একটি একটি করে নাটুকে ব্যাপার ঘটছিল। একটু একটু করে আমরা চারজন আলাদা হয়ে

পড়ছিলাম। দিনের বেশির ভাগ সময় মা মেঝেয় আঁচল পেতে পড়ে থাকত। বাবা থাকত বাইরে বাইরে।'

মেয়েটিও বুঝেছিল এই একটি ঘরের বৃত্ত তার জীবনকে তার মায়ের মতোই বঞ্চিত করে রেখে দেবে। খাদের কিনারে দাঁড়ানো মানুষ যখন কোন কিছু আঁকড়ে বাঁচতে চায় তখন বোধহয় তাকে আর স্বার্থপর-ঈর্ষাকাতর বলা চলে না। আপাত স্বার্থপরতার আড়ালে এই মেয়েটিও বোধহয় বাঁচতেই চাইছিল। ক্রমশ তাই নিজের জগৎ তৈরী করে নিচ্ছিল। পাড়ার সমবয়সের বান্ধবীর বাড়ি যাতায়াত, সেই অবকাশে প্রতিবেশী কলেজে পড়া নিমাই নামের ছেলেটির সঙ্গে তার নিজস্ব সম্পর্ক তৈরী হতে থাকে। ঘরের মানুষগুলো যখন শুধু অবহেলা দেয়—বাইরের কেউ শুধু পাশে এসে দাঁড়ালেও তার প্রতি একটা নির্ভরতা তৈরী হয়ই। ঘরের মেয়েটি ঘরের বাইরে সেই নির্ভরতা খুঁজতে শুরু করে। এর ফলাফল হল মারাত্মক। নিমাই-এর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া দিদিকে তার বাবা দেখে ফেলেছিল। ফলতঃ 'দিদির ঘুম ভাঙিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে বাইরে বের করে দিল। তারপর-তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মাকে কী সব বলল। —তোমার দোষে, তোমার দোষেই তো। মেয়েকে শাসনে রাখতে পারোনি। হঠাৎ বাবা হাত তুলল। মাকে মারল। মা বেরিয়ে গিয়ে আরও মারল দিদিকে।'

এরপরের ঘটনা দ্রুত গল্পের পরিণতিকে টেনে এনেছে।

পাশের ঘরের জি-পিও বৌয়ের চটকদার শাড়ি পরে দিদি তার বিয়ের জন্য দেখতে আসা পাত্রপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াল একদিন। ছেলেটি আর তার মা দিদিকে দেখতে আসা দুজনকে সাধ্যাতীত আপ্যায়ন করছে যখন, তখনই জানা গেল, তারা পাত্রপক্ষ নয়। 'মেয়েছেলের টাউট' মেয়েটির বাবাই তার নিজের মেয়েকে তাদের হাতে বেচে দেবে বলে ডেকে এনেছে।

সমস্ত ক্ষয়কারী জীবাণু এই পরিবারটিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিলই। এই ঘটনা সেই ক্ষয়কে, সেই অনিবার্য অপমৃত্যুকে সম্ভব করে তুলল। এই ঘটনার অভিঘাত শুধু এই পরিবারটিকে নয়—এই গল্পের পাঠকমাত্রকেও শিহরিত করে দেয়। সমস্ত বিশ্বাসের তলানীটুকুও এক নিঃশ্বাসে কে যেন শুষে নিল।

'বিষটিষ কোথায় পাবে, দিদি বাবার একটা ব্লেড গলায় চেপে ধরেছিল। লালে লাল, দিদির ব্লাউজ লাল, মার আঁচল লাল, ফিনকিব ছিটে আমার গায়েও লাগল।

.........রক্ত বন্ধ হতে দেরি লাগল না। ভোঁতা ব্লেডে আর কত বড় ঘা হবে। ডাক্তার হাত ধুতে ধুতে বলে গেলেন, বড় জোর একটা কাটা দাগ থেকে যাবে।'

এনিয়ে অশালীন কানাকানি হল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলার মধ্যে দিদির গলার কাটা দাগটির মতো সেই পরিবারে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘস্থায়ী রেখা টানা হয়ে রইল।

সেই দিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হল শহরে। ঘরের ফাটা ছাত দিয়ে জল পড়ে। দিদির বিছানা টানাটানি করে যেদিকে বৃষ্টি নেই সেদিকে নিয়ে যাওয়া হল। একই ছাদের নীচে থেকেও ঘরের মানুষগুলি পরস্পরের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল।

গল্পের শেষ তিনটি লাইন এ গল্পের অনিবার্য পরিণতি। যেখান থেকে গল্পকার তাঁর এই গল্পটি শুরু করেছিলেন, সেখানে আশা-নিরাশার একটা সংশয় ছিল যেন। শেষ লাইনে গল্প লেখক সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

'দেশের বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন এরকম হত, তবু তখন কলকাতা ছিল। ভাবতাম কলকাতায় এলেই ...এলাম, অথচ আসাও হল না। তার চেয়ে বড় কথা, এই ক' বছরে আর একটা কলকাতাও তৈরী করা হয়নি, আমাদের আর কোন কলকাতাই রইল না।'

বিপর্যয়ের তুঙ্গে দাঁড়িয়েও মানুষ বাঁচে। বাঁচে, কেননা কোথাও না কোথাও একটা উত্তরণের সূক্ষ্ম আশা রয়ে যায়। এ গল্পে না-দেখা কলকাতা সেই স্বপ্ন, সেই আশা হয়ে মানুষগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাস্তবের কলকাতা তাদের কাছ থেকে সেই স্বপ্নটাও নিঃশেষে কেড়ে নিল। স্বপ্নহীন-আশাহীন-ধ্বস্ত এক ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিল তাদের। এরপরও হয়তো তারা বাঁচলো, কিন্তু সে বাঁচা ঠিক মানুষের মতো বাঁচা নয় বোধহয়।

সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতা সাহিত্যে কমবেশী ছায়া ফেলেই। সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য ক্ষেত্রও তা থেকে আলাদা নয়। বিশেষ করে সেই সময়ে লেখকের আশপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী তাঁকে কি ভাবে ক্রমাগত পীড়িত করেছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় এ গল্পে রয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্তোষকুমারের নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতা।

এই গল্পের পরিবারটির মতোই সন্তোষকুমার ঘোষও উনিশশো ত্রিশ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় থাকতে আসেন বরাবরের জন্য। দূর থেকে দেখা আর ভেবে রাখা কলকাতার ছবি বাস্তবের সামনে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন সেকথা, "দ্বিতীয় পর্বের শুরু কলকাতায় পড়তে এসে, যখন শেষ কৈশোরে ঘা খেলুম, টের পেলুম জীবনটা নেহাৎ মধুর বায়ে রঙ্গে রসে ভেসে যাওয়া নয়।... যে কলকাতা আগে দেখে গিয়েছি, এ তার থেকে স্বতন্ত্র, কৃপণ, সঙ্কীর্ণ, কুটিল। অতি দুঃস্থ নিম্নবিত্ত পরিবার, আমাদের থাকতে হল একটি অন্ধ গলিতে।" এই গলিই 'ভেবেছিলাম' গল্পের পরিবার টিরও ঠিকানা, আবার এই গলিই 'কিনু গোয়ালার গলি'-ও। আর এক জায়গায় বলছেন—'বাসা বদল হল। এবার ভদ্রতর পরিবেশ, কিন্তু কিছুমাত্র উন্নত নয়। অন্যশরিকদের সঙ্গে সেই সনাতন ঝগড়া।...আত্মীয় স্বজন এলে মুখে খুশির ভাব দেখাতে হত, কিন্তু মনে অস্বস্তি, শুনতুম বাজারের থলে হাতে নিয়ে বাবা মাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছেন, কদিন থাকবে কিছু আন্দাজ পেলে'? 'ভেবেছিলাম' গল্পের সঙ্গে লেখকের এই নিজস্ব অভিজ্ঞতা কী ভাবে জড়িয়ে আছে, তা আমাদেরও আর অজানা থাকে না এরপর।

এই গল্পে কথকের বলার ভঙ্গিটি আশ্চর্য নিরাসক্ত। আবার তা দরদী এবং মর্মস্পর্শীও। পরিবারের ছেলেটি তার অভিজ্ঞতাকে শুধু বর্ণনা করে গেছে। গল্পের পরিণতিতে যে শূন্যতা জেগে ওঠে গোটা গল্পে তারই এক প্রচ্ছন্ন আবহাওয়া। দুর্যোগ পীড়িত একটি মানুষকে তার অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে বলা হলে সে যেমন আশ্চর্য এক ভঙ্গীতে কথা বলে গল্পের ছেলেটিও সেইভাবেই কথা বলে গেছে। ছোট ছোট টুকরো বাক্যে, উচ্ছ্বাসহীন-উদ্যমহীন বলা শুধু। যেন কোন তাড়া নেই। কোন অপেক্ষাও নেই।

উনিশ শতকের মধ্যভাগের দেশব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই গল্পের কেন্দ্রীয় নিয়ন্তা। এই বিপন্নতা গল্পকারের পরিচিত উপলব্ধি। বারবার সন্তোষকুমারের গল্পে উপন্যাসে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাপনের যে মৌলগত পরিবর্তন, তার বিকারগ্রস্ততা এবং মূল্যবোধগত যে পতন তা নিয়ে অনেকগুলি গল্প লিখেছেন তিনি।

'কানাকড়ি', 'পনেরো টাকার বউ', 'শনি', 'চীনেমাটি' 'একমেব', 'দ্বিজ', 'বসুধৈব,'—এইসব গল্পগুলির কেন্দ্রেই অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা ক্রিয়াশীল।

'ভেবেছিলাম' গল্পের ক্ষেত্রেও এই সঙ্কটটিই প্রধান। চারদিকে ঘনিয়ে থাকা এই সঙ্কটে বর্ষায় নাকাল হলেও ঘর সারানোর খরচ জোটেনা, মানি অর্ডারের আশায় চোখ ক্ষইয়ে ফেলতে হয়, দিনফুরালে কাল কি খেতে দেবে সন্তানদের মা তা জানেনা, সংসারে বাড়ির মোটে একটি ছেলেরই বেশী দূর পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ সম্ভব, একটি মেয়েরই ভাল ঘরে বরে বিয়ে সম্ভব। এই সময়কালে গৃহস্থ বধূ একশোটাকার নোটও হয় একথা জেনে বিস্মিত হয়, বাড়ির ছেলে একপো পুঁটিমাছ এর জন্য ধাঁধায় পড়ে, লাঞ্ছিত অপমানিত বাড়ির মেয়ে মরবার জন্য বিষও জোগাড় করতে পারে না।

গ্রাম থেকে কলকাতায় বাধ্য হয়ে থাকতে আসা একটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবনমনের এবং তার সঙ্গে জীবনের বাকি সবকিছু ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার গল্প এটি। 'কলকাতা' ছিল এই পরিবারের কাছে সেই জীবনদায়ী ঔষধ, একটা প্রত্যয়, একটা প্রতীতী। কিন্তু বাস্তব কলকাতা শুধু তাদের সেই প্রত্যাশাকেই ধ্বংস করেনি, তার সঙ্গে স্বপ্ন দেখার মনটিকেও বিনষ্ট করে দিয়েছে। বিপর্যস্ত অর্থনীতি মানুষের স্বপ্নজগৎকে কি ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয় এই গল্পে তার কথাই বলা আছে। সমকালীন পরিস্থিতি সেদিন মানুষকে শুধু সহায় সম্বলহীনই করে দেয়নি, তার স্বপ্ন দেখার মনটিকেও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। স্বপ্নহীন এক কদর্য সময়কালই এই গল্পের কাহিনী অবলম্বন।

এই গল্পের আর একটি দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেটি এই গল্পের 'গৃহকর্তা', ছেলেটির 'বাবা' চরিত্রটি। যে কিশোরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখক এই গল্প এঁকেছেন, সেই কিশোরের জীবনের যাবতীয় জীয়নকাঠির নাম ছিল কলকাতা। কিন্তু কোথায় যেন মনে হয় 'কলকাতা' এই শহর তার বাবার চরিত্রের সঙ্গে অনেকটাই আত্মগত হয়ে গেছে। গল্পের শুরুতে দুটি প্রত্যাশা রয়েছে। একটি কলিকাতা যাওয়ার প্রত্যাশা, আর একটি বাবার মণি অর্ডারের প্রত্যাশা। তাদের জীবনের এই দুটিই প্রার্থিত আলোক বলয়। এর একটাও ঠিকঠাক পূরণ হলে জীবনটাকে থামিয়ে রাখতে হয় না। দুটি ক্ষেত্রেই একটা আশা জেগে থাকে—ভালো থাকার পথ চাওয়া জেগে থাকে।

দ্বিতীয়ত : বলা চলে, কলকাতাকে ঘিরে দুই ভাইবোনের যে কল্পনা, যে বানানো অলীক অথচ সুন্দর ভাবনা, তার প্রায় সবটাই মায়ের কাছে শোনা। ধোঁয়া ধোঁয়া স্মৃতি নির্ভর। অথচ নির্ভরতার ক্ষেত্র। সে ভাবনার কলকাতা আলোয় ঘেরা, সেখানে অভাব নেই, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া নেই, বেআব্রু হয়ে যাওয়া নেই, অসহায় মায়ের শাসনের নামে নিজেকে আড়াল করা নেই।

অপরপক্ষে তাদের বাবা সম্পর্কেও ছিল এই রকমই কিছু ধারণা। তাও মায়ের কাছেই শোনা কথা। তারা বাবার সেই রূপ দেখেনি, কিন্তু শুনেছে-'খুব চওড়া ছাতি ছিল আর জওয়ান। পুকুরটা বার দশেক পারাপার করে উঠে আসত। চোখ টক্‌টকে হত কিন্তু হাঁফাত না।

আর প্রাণ দিয়ে লোকের জন্য করত। সমাজসেবা, দেশপ্রেম।'

কলকাতায় আসার পর তারা সেই শহর এবং সেই বাবা দুজনকে নিয়েই থাকতে গিয়ে দেখল কল্পনার সঙ্গে ভাবনার সঙ্গে দুক্ষেত্রের কোনটাই মিলল না। কলকাতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ

পরিচয়তো সেই বাবারই হাত ধরে, বাবারই চোখ দিয়ে তিনি যেমন রাখলেন, যেমন দেখালেন সেইভাবেই। বেকার সমস্যায়, অর্থনৈতিক মন্দায় সব হিসেব উল্টে দিয়ে কলকাতার তখন যে দিশেহারা অধঃপাতী চেহারা তারই যেন প্রতিচ্ছবি বাবার চেহারায়, আচরণে, চরিত্রে। কলকাতার যে জীবন ক্রমশ অন্ধকার থেকে আরো ঘন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের, সেই জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত, হতোদ্যম, পরাজিত এক স্বপ্নপুরুষ—তাদের বাবা। যাকে ঘিরে গর্বিত মূল্যবোধ তৈরী হওয়ার কথা, সেই মানুষটিই ক্রমশ সমস্ত বোধের জগৎকে রসাতলে নিয়ে গেছেন। তাই মার মুখে শোনা চিতোনো ছাতি আর দরাজ মনওয়ালা যে মানুষটির ছবি চোখের সামনে ছিল, সেই মানুষটিই যখন সামান্য কারণে তার একমাত্র পুত্রকে 'শুয়ার কা বাচ্চা' বলেন, যখন তিনমাসের ভাড়া বাকি রেখে বাড়িওয়ালাকে 'শালা' বলেন, যখন মাঝরাতে দিদিকে চুলের মুঠি ধরে বাইরে বার করে দেন, স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন, মেকী-মিথ্যে পরিচয়কে সত্য বলে চালাতে থাকেন, অতিথি আপ্যায়নের অজুহাতে যখন নির্লজ্জ স্বার্থপরতার চূড়ান্ত করেন, নিজের মেয়েকে যখন মেয়েধরা টাউটদের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত করেন—তখন সে ধাক্কা, সে যন্ত্রণা, সেই ভেবে রাখা 'সবঠিক হয়ে যাবে'-র রঙে ছাপানো ছবিটা আর্তনাদ করে ওঠে।

কলকাতাও ঠিক একইভাবে তাদের ভাবনার ছবিটাকে মিলতে দেয়নি। যে বাসা, যে অবস্থা, যে যাপন ছেড়ে তারা কলকাতায় এসেছিল তার খুব কমই বদল হল। সেখানেও মাথার ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ত এখানেও তাই, সেখানেও আব্রু বাঁচানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা ছিল, এখানে তা আরও বেশী। সেখানে কারণে অকারণে মার বকুনি ছিল, মার ছিল, এখানেও তার কারণের অভাব হল না। সেখানেও রাত জাগা ছিল, এখানের রাতেও ঘুম বড় নিটোল হলো না। সেখানেও ক্ষুধা ছিল, অভাব ছিল—এখানে তা আরো বিকট চেহারায় দেখা দিল।

সেখানে তবু একটা আকাশ ছিল-কলকাতায় সেই আকাশকেই খুঁজতে হয়। সেই আকাশের দেখা পাওয়াও সহজ হলো না বলেই হয়তো স্বপ্নজগৎ ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে এলো। এই স্বপ্নকে বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত ধাক্কা দিয়েছে কলকাতার সমকাল আর ভেতর থেকে তাকে নাকাল করেছে বাবার ক্রমাগত বদলে যাওয়া ছবিটা। এই বদলের ক্রমবিকাশ বহুক্ষেত্রেই সমার্থক বলে মনে হয়। এই বদলেরই অনন্য প্রতীক হয়ে 'ভেবেছিলাম' গল্পটি স্বমহিমায় স্বতন্ত্রতা দাবি করে সন্দেহ নেই।

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন—"সুনিপুণ তাঁর কলম। দৃঢ় অকম্পিত স্মিতবাক সে কলমের মুখে সূক্ষ্ম তীব্র জ্বালাই বেশি বলে যদি মনে হয়, তাহলে সে তার কলমের দোষ নয়। দোষ বর্তমান কাল ও রুগ্ণ ক্ষতবিক্ষত রাষ্ট্র ও সমাজ দেহের, যেখানে সমবেদনা ও করুণার হাত বুলোতে গেলেও শুধু ব্যথাই বাজে।"

'ভেবেছিলাম' গল্পটি এই মন্তব্যকেই শুধু সমর্থন করে না। একটি বিশেষ যুগধর্মকে ধারণ করে থাকে সচেতন ও সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে।

সোমেন চন্দ

(১৯২০-১৯৪২)

মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে খুন হয়ে যান সোমেন চন্দ। ১৯২০ সালের ২৪ মে তাঁর জন্ম। তাঁর যখন মাত্র চার বছর বয়স তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ঢাকা সদরঘাট অঞ্চলের পোগোজ স্কুলে। ১৯৩৬ সালে এই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং মিটফোর্ট মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। সোমেন চন্দ ডাক্তারি পড়ার সময় পরিচয় হয় কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশির সঙ্গে। তারপর ১৯৪১ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের প্রধান ছিলেন। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলনের আহ্বান করেন সোমেন চন্দ। এই মিছিল-ই সোমেন চন্দের জীবনের শেষ মিছিল। তারপর সেখানে কোন অজ্ঞাত শত্রুর হাতে সোমেন চন্দকে জীবন দিতে হয়—তিনি খুন হয়ে যান প্রকাশ্যে। সোমেন চন্দ মোট ২৪টি গল্প, একটি উপন্যাস, দুটি একাঙ্কিকা, তিনটি গদ্যকবিতা রচনা করেছেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'বন্যা' উপন্যাসটি লেখেন। তাঁর এই স্বল্প লেখার মধ্যে দিয়েই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, তিনি একজন বড় সাহিত্যিক। তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল—'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর', 'সত্যবতীর বিদায়', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি। আর তাঁর 'আগুনের অক্ষর' একটি কালজয়ী উপন্যাস। তাঁর রচিত ইঁদুর গল্পটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সত্যবতীর বিদায় : একটি মূল্যায়ণ

বীতশোক ভট্টাচার্য

'সত্যবতীর বিদায়' নাম না করে সোমেন চন্দ যদি এই ছোটগল্পের নাম সত্যবতীর আগমন ও বিদায় করতেন তাহলে কি ঠিক হত? এ প্রশ্ন মনে আসে এজন্য যে সত্যবতীর আগমন দিয়েই এই ছোটগল্পের শুরু। সত্যবতী রায় নাম এক মহিলা একা গ্রাম থেকে এসে খুঁজে খুঁজে কলকাতায় তার সৎছেলের বাড়ির উঠোনে পা দিয়েছেন, এখান থেকে ছোটগল্পটির সূচনা হয়েছে। প্রায়-শেষ অনুচ্ছেদে এসে তাঁর বিদায়দৃশ্যটি দেখতে পাওয়া গেছে, কয়েকদিন পরের এক ভোরে সত্যবতীকে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পা দিতে হয়েছে, শেয়ালদার বাসের খোঁজ করতে হচ্ছে, এখানেই ছোটগল্পটি শেষ। তবু এ ছোটগল্পের নাম 'সত্যবতীর আগমন ও বিদায়' না হয়ে 'সত্যবতীর বিদায়' হওয়াই সমীচীন, কারণ সত্যবতীর যে-বাড়িতে আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই, গোড়া থেকেই সত্যবতী সেখানে অবাঞ্ছিত, আগাগোড়াই অবাঞ্ছিত তিনি। এক কথায় এ ছোটগল্প সত্যবতীর অনতিবিলম্বিত এবং বাধ্যতামূলক বিদায়গ্রহণের ছোটগল্প।

সত্যবতীর এবং এ ছোটগল্পেরও আয়রনি এই যে সত্যবতী প্রথমাবধি বুঝতে পারেন না তিনি এ বাড়িতে পুরোপুরি অবাঞ্ছিত, তাঁর চেহারাচরিত্র সবই এ বাড়ির লোকজনের হাসির বিষয়, সমালোচনার প্রসঙ্গ। সৎমা নাকি নামেই সৎমা, স্বামী যে এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর জন্যই প্রথম পক্ষের মাতৃহারা বালকপুত্র রাজকুমারের খোঁজ নিতেন না, সমাজে এমন সমালোচনা স্বাভাবিক। এবং তার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত পুত্রটিও যে নারীটিকে মাতৃসমা মনে করবেন না, এরকম ভাবাও স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র এমনকি বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে সৎমা-সৎছেলেদের মিলন ও পুনর্মিলন সহজ সম্ভব, কিন্তু সোমেন চন্দর এ ছোটগল্পটিতে তা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা। রাজকুমার যে প্রয়োজনে বিমাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করেন না, একথা কেউ বলেন নি, বরং ছোটগল্পের প্রায়-শুরুতেই সত্যবতী নিজেই জানিয়েছেন, একদা তিনি পাঁচ টাকার চাহিদা জানালে রাজকুমার সঙ্গেসঙ্গেই তার যোগান দিয়েছেন। রাজকুমারের কর্তব্য ঐ টুকুতেই সমাধা হয়েছে। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে পাঁচ টাকার দাম পাঁচ টাকা নয়, তবু যে নারী মাত্র পাঁচ টাকা দাবি করেন তাঁর কাছে পাঁচ টাকার মূল্যই অনেক, তিনি হয়তো জানেন তাঁর ক্ষীণ আত্মীয়তার সম্পর্কের সুতো পাঁচ টাকার বেশি ভর সয় না। কিন্তু চিঠিতে পাঁচটাকা চাওয়া এক কথা, আর হঠাৎ বাড়িতে উড়ে এসে জুড়ে বসা আর-এক কথা তা সত্যবতী জানেন না।

সত্যবতী হয়তো মানেনও না তিনি এ বাড়িতে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। সৎছেলেদের এখন নিজের ছেলের মতোই দেখতে হবে, একথা তিনি যেন এবাড়িতে পা দেওয়ার আগেই নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নামমাত্র চেনা এক বিধবা সৎমাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে হবে, কলকাতা মহানগরীতে এমন কোনও নিয়ম নেই। তার উপর সেই মহিলা যদি দরিদ্র কদাকার অশিক্ষিত এবং বে-তরিবত্ হন তাহলে ধনীর সম্পন্ন সুন্দর সুসভ্য

সংসারে তাঁর প্রবেশের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু সত্যবতী বোধহয় মনে করেন, বিমাতাও মা, দীর্ঘকালের অদর্শনেও সে মাতৃত্ব অটুট থাকে। মা না হলেও রাজকুমারের মাতৃসমা হয়ে ওঠার আনন্দেই তিনি বিভোর, সর্বসমক্ষে রাজকুমারকে তিনি 'আমার ছেলে' বলেন, সন্তানহীনা বিধবার এই উচ্চারণে সম্ভবত কোনও ভন্ডামি নেই। মাতৃত্বের মৌলিক অধিকারে যেন নিজের অজ্ঞাতে এই বিরাট সংসারে তিনি সহজেই অভিভাবিকা হয়ে বসেন, তাঁর এই কর্তৃত্ব যে কেউই মেনে নিতে পারছে না, নারীসুলভ স্বাভাবিকতায় তিনি তা অগ্রাহ্য করতে থাকেন। এই মনোভাবের ফল সুখকর হয় না, ফলে সত্যবতীকে ফের পথে নামতে হয়। সত্যবতীর এই সহজ কিন্তু জটিল মনোভঙ্গি লেখক সুন্দর ফুটিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে প্রথম পক্ষের বালক সন্তানটিকে দেখাশোনা না করার জন্য তাঁর অপরাধ কতটা এবং এই উদাসীনতার জন্য তিনি প্রকৃতপক্ষে কতটুকু দায়ী, এক্ষেত্রে তাঁর দায় তাঁর স্বামীর চেয়ে বেশী না কম—এইসব নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ এ গল্পে নেই। একসময় সত্যবতী রাজকুমারের প্রতি বিমুখতা দেখান বা না দেখান, এখন সত্যবতী সত্যসত্যই রাজকুমারের প্রতি একটুও বিরূপ নন তা তাঁর প্রতি পদক্ষেপেই ধরা পড়ে।

মধ্যেকার দুটি অনুচ্ছেদ সত্যবতীর অতীত পরিচয় সাঙ্গ করে লেখক তাঁকে বর্তমানে নিয়ে এসেছেন, কয়েকটি দিনের সাক্ষ্যবহ এই ছোটগল্পের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সত্যবতীর ঐ সহজ স্বাভাবিকতার সঙ্গে রায়বাড়ির পারিবারিক ও নাগরিক চেতনার বিরোধ বেধেছে। অন্য কেউ হলে জলের মাছকে ডাঙায় ছেড়ে দেওয়া এই অবস্থায় খাবি খেত, কিন্তু সত্যবতী তাঁর ব্যবহারে আশ্চর্যরকম যথাযথ, প্রাথমিক দ্বিধা ও অসহায়তা ঝেড়ে ফেলে তিনি সপ্রতিভ, মনে মনে আড়ষ্ট ও ক্লিষ্ট বোধ করলেও বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। এই ছোটগল্পের শুরুতে দেখা যাচ্ছে সত্যবতী রায়বাড়ির এক চাকরকে এবং তারপরে এক ঝিকে প্রায় একই প্রশ্ন করেছেন। 'আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ি না?' দুটি জিজ্ঞাসার একই জবাব এসেছে : 'রাজু! রাজু কে!' এবং 'রাজু-টাজু কেউ এখানে নেই গো।' এককথায় জবাব দিয়ে চাকরটি উধাও হয়ে গেছে, ঝি মতির-মার গলা উত্তর দিতে গিয়ে খানখান করে বেজে উঠেছে। তারা সকলেই কর্মব্যস্ত, তারা সকলেই তিতিবিরক্ত। কিন্তু সত্যবতী রাজকুমার না বলে তার ডাকনাম 'রাজু' বলেই ডেকেছেন, এটি তাঁর গ্রাম্যতার পরিচয় হতে পারে, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠতা দেখানোর ভান নয় বলেই বোধ হয়, 'আমাদের রাজু' পদবন্ধটির ব্যবহারে, আমার বলবার বদলে 'আমাদের' শব্দটির ব্যবহারে, গৌরবার্থে বহুবচনের রীতি এবং যৌথ পরিবারের স্মৃতি সক্রিয় হয়ে থেকেছে। ছোটগল্পের শেষেও সত্যবতী যাকে কাছে পেয়েছেন তার কাছে একটিই প্রশ্নের পুনরুক্তি ঘটিয়েছেনঃ 'হ্যঁা গো, তোমাদের বাস শেয়ালদায় যাবে?' দেখা যাচ্ছে সত্যবতী তাঁর ঘরের ঠিকানা জানেন না, ঠিক পথের দিশাও তার জানা নেই, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলবার ব্যক্তিত্বটুকু তাঁর আছেই আছে। একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে এই জাতের এবং এই ধাতের মায়েদের দেখা মেলে।

সোমেন চন্দ এক সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে রায়বাড়িতে সত্যবতীর প্রবেশ ও

প্রস্থান লক্ষ করেছেন। এই কথনক্রিয়া এক ভোর থেকে কয়েকদিন পরের আর- এক ভোরের কালগত বিস্তারে এবং রাজপথ থেকে ঘরে ও ঘর থেকে রাজপথের স্থানগত বিস্তারে ছোটগল্পটিকে নিটোল করে বেঁধেছে। ছোটগল্পটির মধ্যে সত্যবতীর উপকথা বলবার কথনক্রিয়া—গল্পের ভেতর গল্পের সংস্থাপন-শিল্পসাফল্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। ছোটগল্পটির এবং উপকথাটির ভিতর পাখি প্রসঙ্গের অবতারণা সত্যবতীর বন্ধন ও মুক্তিকে প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে পেরেছে। সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলতে ইচ্ছা করে যে সত্যবতী এবং অন্যদের সম্বন্ধ দ্বিক বা বাইনারি সম্পর্কের জালে বাঁধা। অর্থাৎ এ সম্পর্ক গ্রাম ও নগরের, অসুন্দর ও সুন্দরের, কালো এবং ফরসার, অশিক্ষা ও শিক্ষার, সংস্কার ও সংস্কারমুক্তির, অসভ্যতা ও সভ্যতার, সুস্থতা ও অস্বাস্থ্যের,অনুভব ও অসাড়তা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। কিন্তু লেখকের রচনার জগতে এই দ্বন্দ্ব সংশ্লেষ উপনীত হয়েছে ভিন্ন ভঙ্গিতে। ফলে নাগরিক অস্তিবাদী চেতনার আধুনিক সংকট গ্রামীণ সত্যবতীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সত্যবতী গ্রামে থেকেও একা, মহানগরীতে রায়বাড়ির চরিত্রগুলি একই পরিবারভুক্ত হয়েও পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। সত্যবতী উত্তীর্ণ পঞ্চাশ প্রৌঢ়া মাত্র, কিন্তু লেখকের পরিভাষায় তিনি 'বৃদ্ধা', রায়বাড়ির কাছে তাঁর 'বুড়ি' পরিচয়ই সত্য। সত্যবতীর জাতিগত ও শ্রেণিগত অবস্থান এ ছোটগল্পে চিহ্নিত। বুড়িকে কাঁদতে দেখে শিশুরা যখন হাসে তখন সত্যবতী রাগ করে বলেন ঃ 'আমরা গরীব বলে মানুষ নই বুঝি?' এবং সদ্যস্নাত সত্যবতীকে ঝি ছুঁয়ে দিলে সত্যবতীর ও ঝির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার মতন, এইমাত্র চান করে এলাম, আর অমনি ঝিমাগি আমায় ছুঁয়ে দিল, আবার বলে কিনা, আমরা ছোটলোক নইগো, অদেষ্ট মন্দ বলেই আজ ঝিগিরি করে খাই! বলে কিনা কায়েত কায়েত না আরও কিছু, ও কথা বললেই আমি বিশ্বেস করি।' দুটি কথার মধ্যেই জাতপাতের চিহ্ন ছাপিয়ে উঠেছে অপরিমোচনীয় দারিদ্র্যের অভিজ্ঞান।

সোমেন চন্দ পুরুষলেখক, কিন্তু নারীবাদী সমালোচক এ গল্পে আপত্তি করবার মতন বিশেষ কিছু পাবেন না। এ ছোটগল্প নারীনির্ভর, রাজকুমার ব্যতীত উল্লেখের যোগ্য পুরুষচরিত্র নেই, এবং রাজকুমারও প্রায় নেপথ্যচারী। এ রচনা সত্যবতী নাম্নী এক মানবীর গল্প, পুত্রবধূ মনোরমার সঙ্গে তাঁর ঘাত-প্রতিঘাতের গল্প, মনোরমা ছাড়া জয়ন্তী সুনন্দা মতির-মা এসব নারীচরিত্রও তাদের ভূমিকা পেয়েছেন। তরুণী বধূ সত্যবতী,নিঃসন্তান বিধবা একা সত্যবতী, শহরে সৎছেলের বাড়িতে আশ্রয় খুঁজতে এসে ব্যর্থ হয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়া প্রৌঢ়া সত্যবতী, বালকবালিকা পরিবৃত গল্প বলিয়ে সত্যবতী বিচিত্র রূপে এ গল্পে এসেছেন। সত্যবতীর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক উদ্ঘাটনে অতি তরুণ লেখকের দক্ষতা বিস্ময়কর। সত্যবতীর উপকথায় একটি তেঁতুলগাছের উল্লেখ আছে যা 'কবে কোন্ ঝড়ে উপড়ে পড়ে রয়েছে, তবু আজও মরেনি, বছর বছর দিব্যি পাতা গজায়, তেঁতুল গজায়।' বেঁচে থাকার এই দুর্মর বাসনায় সত্যবতীও সঞ্জীবিত, রায়বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যানের অন্তিম আঘাতও তাঁকে প্রতিহত করতে পারে না, 'নববধূর মতো' তিনি আবার বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ান, 'এক নিঃসঙ্কোচ কলেজ-বালিকার মতোই' তারুণ্য তাঁর মনকে ছেড়ে যায় না। নাছোড় ঐ তেঁতুলগাছটির মতো প্রাণশক্তিতে ভরপুর সত্যবতীর জৈব ও ক্রমোদ্ভিন্ন পরিচয় গল্পটির মধ্যে সতেজ

সরস ভাবের সঞ্চার করে, সত্যবতী চরিত্রর বিপন্ন বিষণ্ণতা এবং বাস্তবের রূঢ়তা, রুক্ষতা ছাড়িয়ে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এই ভঙ্গিটি শেষ পর্যন্ত মন টানে।

গল্পটির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যৌন ইঙ্গিত বিকীর্ণ হয়ে থাকে। ইংরিজিতে যে কোনও নারী সম্পর্কে ব্রডস্ নামক রুক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে যুবতী সত্যবতীর শরীর সম্পর্কে 'প্রশস্ত' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। 'প্রশস্ত' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফিরে এসেছে রায়বাড়ির সিঁড়ির বিশেষণরূপে প্রৌঢ়া সত্যবতী 'ঘোমটা টেনে বাইরে গিয়ে থপ থপ করে ওপরে' উঠেছে ঐ সিঁড়ি বেয়ে। তরুণী সত্যবতীর 'প্রশস্ত শরীর তখন দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, ধুধু করে।' মরুভূমির এই উৎপ্রেক্ষা পুনরাবৃত্ত হয়েছে ঐ সিঁড়ি সম্পর্কে 'যেন একটা মরুভূমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।' সত্যবতী যেহেতু সন্তানহীনা তাই তার সম্পর্কে মরুভূমির তুলনা সার্থক। কিন্তু তরুণী সত্যবতী তার স্বামীর সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম, তাই তার 'রসসিক্ত' শরীরের কথাও লেখক একই সঙ্গে বলেছেন। যুবতী সত্যবতীর শরীর একই সঙ্গে মরুভূমি ও রসসিক্ত, তার সরসতা ও অনুর্বরতা এভাবে একটি অ্যামবিভ্যালেন্ট সম্পর্ক রচনা করেছে। নাতি এবং ঠাকুমার সম্পর্ক সমাজনিষিদ্ধ সম্পর্ক, কিন্তু এই ট্যাবু-ভাঙা একধরনের সকৌতুক সম্বন্ধ স্থাপনের উচ্চারণ প্রথাসিদ্ধ, ভারতের গ্রামীণ সমাজে তা অন্যায় নয়। প্রৌঢ়া সত্যবতী তাঁর নাতিকে দেখে হাত বাড়িয়ে বলেছেন; 'এই রাজকন্যের মতো সুন্দরী বউকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না?' তাঁর এই গ্রাম্য পরিহাস বলা বাহুল্য মনোরমার পছন্দ হয়নি। সত্যবতী যদি রাজকন্যা হন তাহলে তাঁর সৎছেলের নাম রাজকুমার হতে পারে। লোককথায় সতিনের ছেলে আর বিমাতার সম্পর্ক পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সত্যবতী যৌবনে 'রসসিক্ত' ছিলেন, মনোরমাকে তাঁর 'ভারী শুকনো শুকনো' লেগেছে। মনোরমার বড় মেয়ে জয়ন্তীকেও সত্যবতীর মনে হয়েছে 'মরা ঘাসের মতো শুকনো।' মনোরমার এই 'অসুখ' সারানোর জন্য সত্যবতী তাঁর দৈব ওষুধ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। শরীরী সম্পর্কের আদিমতা, জড়িবুটি, মন্ত্র ও লোককথা সমন্বিত হয়ে গল্পটিতে ভিত্তিস্থানীয় এক লোকায়ত তল রচনা করেছে।

সত্যবতীর সম্পর্কে লেখক কদাকার কুৎসিত এসব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। কুৎসিতের একপ্রকার নেতিবাচক আকর্ষণ আছে, মনোবিজ্ঞানীর মতে যা কুশ্রী তা লোভনীয় ও হাস্যকর হতে পারে। সত্যবতীর শরীরের বেয়াড়া গড়ন তাঁর স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় ছিল, রায়বাড়ির বালক-বালিকাদের কাছে তাঁর কুরূপের বিকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারেনি, প্রাথমিকভাবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করলেও তাঁর গল্পের টানে তারা তাঁর চারদিকে ঘনিয়ে বসেছে। সত্যবতীর মিশকালো শরীরের বর্ণনা লেখক বিশেষভাবেই দিয়েছেন, সত্যবতীর কালো শরীর পৌরাণিক কালী হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

সত্যবতীর কথা থেকে জানা গিয়েছে যে, তিনি কালী পেয়েছেন এবং এজন্য তাঁর গ্রামে তাঁর বিশেষ সমাদর। সত্যবতীর স্বামী সম্পর্কে 'পাগল' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিব পাগল, সত্যবতীর স্বামী যেন পাগল, সত্যবতী কালী হলে তাঁর স্বামীর শিব হতে বাধা নেই। কালী বিপরীতরতাতুরা, শিবের উপর তাঁর অবস্থান, এ গল্পে যে সব সিঁড়ি 'চিৎ হয়ে শুয়ে আছে' তার উপর সত্যবতী রাত্রে উঠেছেন। পুরাণে সত্যবতীর অপর নাম কালী। শুধু সত্যবতী নয়, এ ছোটগল্পের প্রধান আর এক নারী চরিত্র সেই শক্তিদেবীর রূপান্তর, সে

হচ্ছে জয়ন্তী। জয়ন্তী কালীর রূপান্তর, তাই জয়ন্তী অমাবস্যার 'রাত্রেও দিব্যি চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যবতীর গল্পে পাখির বদলে 'সাদা কাপড় পরে এত বড়ো ঘোমটা টেনে এক বউ দেখা দিয়েছে' সে যেন মূর্তিমতী ধূমাবতী। কালীর আর্কিটাইপ এভাবে এ গল্পের কেন্দ্রে এসে পড়েছিল, লেখক শেষে তাকে স্থানচ্যুত করেছেন। রায়বাড়ি থেকে যখন রাজপথে নেমেছেন সত্যবতী তখন তিনি 'সাদা কাপড় পরে এত বড়ো ঘোমটা টেনে এক বউ। এই বউটি বিধবা, এবং এই বউটি 'নববধূর মতো'। এই উভযোজী সম্পর্ক সত্যবতীর ধর্মের ক্ষেত্রেও সংশ্লেষ রচনা করেছে। কালো শরীরে তিনি কালী, কিন্তু তাঁর শরীরে 'একখানি নামাবলি' জড়ানো। সত্যবতী যেন একই সঙ্গে কালী এবং রাধা, অজানার উদ্দেশে তাঁর 'দুঃসাহসিক' অভিসার।

কালীর সঙ্গে ভূতপ্রেতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সত্যবতী ছেলেদের ছমছমে ভূতের গল্প বলেছেন। কালীর সঙ্গে আগুনের যোগের কথা বলা হয়েছে। সত্যবতী কথিত ভূতের চোখদুটি 'আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে।' এবং 'সত্যবতীর ছাইরঙা দুটি চোখ', তাঁর মেয়েলি বাক্‌ব্যবহারে 'ছাই' ও 'পোড়াকপাল' শব্দদুটি প্রায় শোনা যায়, এবং সত্যবতীর 'কয়লার টুকরোর মতো কয়েকটি দাঁত' তাঁর ভেতরকার আগুনের ইঙ্গিত বহন করে। এই আগুন আছে সত্যবতীর ব্যক্তিত্বে। তাই এই গল্পে তাঁর প্রসঙ্গে অনুষঙ্গে ইস্পাতের কথা এবং মেশিনের কথা চলে আসে।

পূর্বে সত্যবতীর চরিত্র ও ছোটগল্পটির উদ্ভিদোপম বৃদ্ধি ও জৈব সংসক্তির কথা বলা হয়েছে। সত্যবতীর নিজস্ব গল্পে একবার এসেছে এক অদ্ভুত তেঁতুলগাছের প্রসঙ্গ, আর একবার ভূত দেখা দিয়েছে 'তালগাছের মতো তার দুটি ঠ্যাং, মিশমিশে কালো শরীর' নিয়ে। এ চেহারায় যেন সত্যবতীর বিপর্যস্ত আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। সত্যবতীর শরীর রাঢ়ের 'দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, ধু ধু করে', তারই মধ্যে তালগাছ মানানসই মানচিত্র রচনা করেছে।

'সত্যবতীর বিদায়' ছোটগল্পটিতে দুটি সত্যিকারের পাখি প্রতীকী মূল্য বহন করেছে। সত্যবতীকে রায়বাড়ির যে ঘরটিতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল 'তার অন্ধকার কোণের দিকটিতে একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে।' এ চড়াই হয়তো এ বাড়ির ফাঁকফোকরে নীড় বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু তার অপমৃত্যু হয়েছে, চাকর গিয়ে সে চড়াইটা বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছে। সত্যবতীকেও শেষে এই বাড়ি থেকে বাইবে চলে যেতে হয়েছে। এই ছোটগল্পে আর আছে একটা কাকের কথা, তার কাকা শুনে সত্যবতী তাড়া দিয়ে বলেছেন 'আ-মর, আবার এখানে এসে পড়ে মরছিস কেন? যা, এখান থেকে যা।' কালো কর্কশভাষী কাক এবং সত্যবতী, কাক যেমন অবাঞ্ছিত সত্যবতীও তেমনি। আর সত্যবতীর নিজস্ব উপকথায় এক সুন্দর পাখি তাঁর ঘরের উঠোনের সামনে এসে দাঁড়ায়, 'দুহাতে রূপের হাট খুলে এদিক ওদিক হাঁটে', সে প্রায় ধরা দিয়েও শেষপর্যন্ত ধরা দেয় না, তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বনে, আর দেখা যায় পাখি নেই, আছে 'সাদা কাপড় পরে ঘোমটা টেনে এক বউ।' বছর দুই আগে সত্যবতী কালী পেয়েছেন, আর বছর দুই আগে প্রেরণার প্রসাদে লাভ করেছেন এই দৃশ্য। সত্যবতী আসলে প্রত্যক্ষ করেছেন যেন নিজেকেই। এই পাখি, এই ঘোমটাপরা বিধবা মূর্তি তাঁর একই সত্তার দুই রূপ, ঘরের-পাখি বনের পাখি বন্ধন ও মুক্তির উভযোজী

সম্পর্ককে অন্বিত করেছেন। এক 'কুয়াশাচ্ছন্ন' ভোরে সত্যবতী কলকাতার রায়বাড়িতে এসেছিলেন, আর-এক 'পরিচ্ছন্ন' ভোরে তাঁকে রায়বাড়ি ছেড়ে যেতে হল, কিন্তু কুয়াশার মতো রহস্যময় আচ্ছাদন থেকেই গেল, সাদা কাপড়-পরা ঘোমটা-টানা উপকথার ঐ বউটির সঙ্গে বাস্তবে সত্যবতীর মিল শেষপর্যন্ত সাব্যস্ত হয়ে থাকল।

উপকথার কথক সত্যবতী শিল্পী, এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে আছে কল্পনাপ্রবণতা, এক দিব্য প্রেরণার প্রণোদনায় তিনি সৃষ্টিশীল, সন্তানের জননী না হয়েও তিনি বহু উপকথার প্রসূতি। 'তার কুঞ্চিত পেটের ঘরখানায় আরও গল্প আনাগোনা করে।' সোমেন চন্দ সত্যবতীকে নিয়ে ছোটগল্পটির পরিশীলিত কাঠামোর মধ্যে সত্যবতীর কথিত লোকায়ত গল্পের সংস্থাপন ঘটিয়ে রচনাটিকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছেন। সত্যবতী তাঁর প্রান্তিকায়িত অবস্থানে থেকেও রচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন। তার কারণ এ ছোটগল্পের দুটি থিম পরস্পর সংলগ্ন। একটি হচ্ছে ব্যক্তি বনাম সমষ্টির থিম। সত্যবতী একা, গ্রামে ও মহানগরে বিরোধিতা সহ্য করেই তিনি অগ্রসর। পিরানদেল্লোর একটি অস্তিবাদী ছোটগল্পের কেন্দ্রে আছে এক প্রেমিক তরুণ, তার গ্রামীণ প্রণয়িণীকে সে শহরে এসে নতুন করে আবিষ্কার করে বানিয়ে তোলা মক্ষিরানী রূপে, ভালোবাসার স্মৃতি নিয়ে একা গ্রামের ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া তখন তার আর কোনও পথ থাকে না। সোমেন চন্দর সত্যবতী চরিত্রে এই অস্তিত্বের সংকট ছিল, কিন্তু সংলগ্ন দ্বিতীয় থিমটি এক্ষেত্রে সত্যবতীকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সে থিমটি নারীর আদিমতায় প্রত্যাবর্তনের থিম। সত্যবতীর কালী পাওয়া, ভূত দেখা, মন্ত্র বলা, দৈব ওষুধ দেওয়া, কালী ও ভূতের সঙ্গে তাকে একাকার করে দেখানোর শিল্পায়াস এই সবই উপনিবেশের ইংরেজি শিক্ষিত সভ্যতা থেকে তাঁকে অন্ধকার আদিমতায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে তিনি আলোর অধিক এক অন্ধকারের উৎস হতে শক্তি উৎসারিত হতে দেখেন। মহাভারত কথক ব্যাসের মাতা সত্যবতীর মতো এই সত্যবতীর উপকথা তাঁর লোকায়ত ও মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার। এ গল্পে 'স্বদেশী' আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন উল্লেখ আছে, ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলকাতায় বসে বলা সত্যবতীর উপকথা বা এই আর-এক ঠাকুমার ঝুলি তার থেকে কম স্বদেশি নয়, এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি হচ্ছে সত্যবতীর কথিত লোককথা, স্বদেশি আন্দোলনের অলংকৃত পুরুষালি বাগ্মিতা সত্যবতীকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার সৃষ্টিশীলতার এমন গল্প অ্যালিস ওয়াকারের অনেক আগেই সোমেন চন্দ আমাদের উপহার দেন।

ইঁদুর : একটি অন্বেষণ

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

জঙ্গম জীবনের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে নানা আবর্ত, বাঁক, যুগ পরিবর্তনের সকট ও ক্ষতচিহ্ন। সোমেন চন্দ-র গল্প আগুনের অক্ষরে সেকথাই বলে থাকে। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। পার্টি সদস্য। ফলে জীবন ও জগতকে এই বিশেষ রাজনীতির আলোকেই তিনি দেখবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পরচনার ক্ষেত্রে এই বিশেষ ছক-কে অতিক্রম করে সংযম ও সংকেতচেনায় তাকে শিল্পসিদ্ধির উচ্চস্তরে পৌছে দেন।

সময় ও সমাজ আসলে এক বিতত বিতংস। 'ইঁদুর' গল্পটি যখন লেখা হয় তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন চলছে। ১৯৩৮-এ সোমেন চন্দ আরো লেখেন 'স্বপ্ন', 'সংকেত', 'মুখোস', 'অমিল', 'এক্স সোলজার' কিম্বা 'সত্যবতীর বিদায়'-এর মতো অসামান্য আরো অনক গল্প।

সবক্ষেত্রেই সংগ্রামী বিশ্বাসকে গল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। আবার শিল্পগুণও অক্ষুন্ন রেখেছেন ঋজুতা কখনো শ্লোগানে পরিণত হয় না। 'অন্ধ শ্রীবিলাসেন, অনেক দিনের একদিন', 'দাঙ্গা' কিম্বা 'ইঁদুর' গল্পে প্রধান হয়ে ওঠে একটি টেনশনের আবহ।

'ইদুঁর' গল্পের রক্তা-চরিত্র সুকুমার একটি বিষবৃত্তের বাইর যাবার জন্য পথ খোঁজে। একটি ছোটগল্পের ফ্রেমে সোমেন দেখান মধ্যবিত্তশ্রেণির সমগ্র অবস্থানটির সংহত প্রতিফলন। সর্বতোভাবে তারা আত্মপ্রবঞ্চক। তাদের চাওয়ার অর্থ সামান্য কয়েকটি পয়সা, বিনোদ দিবাস্বপ্নে, প্রভুত্ব অসহায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের উপরস ভোগের উপকরণ স্ত্রীর দেহ, আর বীরত্বের আস্ফালন কয়েকটি ইঁদুর ধরা পড়ায়।

এই 'ইঁদুর' টি motif গল্পে প্রথম থেকেই ব্যবহৃত। পুঁজিবাদী সমাজের এই নিচের স্তরটির শিরায় শিরায় চলে বেড়ায় ইদুঁদের আক্রমণ। একটি ইঁদুর-মারা কল কেনারও পয়সার অভাব। অবশেষ কোনোক্রমে কয়েকটি ইদুঁর ধরা পড়েছে বলে সেই ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বড় করে দেখা-আসলে কোনো প্রতিকারই যাতে হবে না। সুকুমার এর বাইরে যাবার স্বপ্ন দেখে। রেল-শ্রমিক সংগঠনে সে দেখে এসেছে নতুন কালের কর্মী মানুষের সংকল্প। গল্পটি ঘুরে এসে আবার বন্দী ইঁদুর ধরার গর্বে উল্লসিত সুকুমারের পিতার ছবিতে শেষ হয়েছে। লেখক গল্পটির শেষ বিন্দুতে সত্যের ছবিই ধরে রেখেছেন। নিছক স্বপ্নের ছবি নয়।

ফাঁদে পড়া জীব যেমন মুক্তির জন্য, জন্মান্তরের জন্য আকুলিবিকুলি করে 'ইঁদুর' গল্পের সুকুমার। সুকুমারের বাবা ও মা তেমনই অসহায় জীবনের যন্ত্রণাকাতর প্রতিনিধি। ইঁদুরের উপদ্রব-সূত্রেই গল্পে আসে নানা মনস্তাত্ত্বিক ভাঁজ বা পরত। আরো একটি ফাঁদ আছে-সে হল দারিদ্র্য। প্রচণ্ড সংসার-ইঁদুরের কথা ভেবেছে সুকুমার :

'একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে। এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরণের কথা এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে, যা

কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময়-জল মেলে, কিন্তু এ মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়।'

এই 'মরুভূমি' আসলে সংসার। সেখানে সাধ-রূপ জল কোথায়? তা ফাঁদে-পড়া জীবের মতো শুধু ছটফট করে সুকুমার। অর্থ-লাঞ্ছিত সংসারে তার বাবা-মা ঝগড়া করে, আর রাত্রির অন্ধকারে জেগে থেকে অনিচ্ছুক সুকুমার তা শোনে। শুনতে বাধ্য হয় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বাবার গলার স্বর বোমার মতো ফেটে পড়ে—'তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কিনা বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগি' ....

এরপর কানে অঙুল দিয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পনে থাকে সুকুমার। অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয়ের এই ছবি। আমরা এই অসহায়তার অংশভাক হয়ে পড়ি। তবে শেষ বিচারে সোমেন চন্দ নৈরাশ্যবাদী নন। জীবনের নীরক্ত রূপটিকেই তিনি আঁকেন না শুধু।

তাই দেখি, এই ফাঁদে-পড়া মানুষের ভিন্ন আর একটি ইতিহাস দেখান তিনি। রহস্য জবন সম্মিলনে সে ইতিহাস মুখর, বিস্ময়কর সেই মধ্যরাত্রির কথাকাব্য। এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে জেগে ওঠে সুকুমার।

'শুনতে পেলুম, বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন—ও কণক, ঘুমুচ্ছো? বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধ'রে! ভারি চমৎকার মনে হলো, মনে মনে বাবাকে অমরা বয়স ফিরিয়ে দিলুম; আর আমার প্রতি ভালোবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার বউকেও এমনি নাম ধ'রে ডাকবে, চিৎকার ক'রে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সংগীতে প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলবে।—কণক? ও কণক?

প্রৌঢ়া কণকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো উত্তর দিলেন না. কোনোবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনোবার উঃ আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম, লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটলো।'

ফাঁদে-পড়া মানুষের এহেন প্রেম সম্মিলনকে বিস্ময়কর বলা ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি? রাজনীতির উপরে বড়ো হয় জীবন তার উপরে ছেলের চোখে বাবা-মার এমন সম্মিলনের চিত্র এঁকে সোমেন চন্দ্র আমাদের প্রচলিত সংস্কারেও আঘাত দেন। কিন্তু এইভাবেই সুকুমারের পিতা একরাত্রির তফাতে মানব হয়ে ওঠেন। আগের রাতেই তার এই সমানপ্রতিমাটি ধ্বসে গিয়ে জান্তব চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল।

ইঁদুর-দর্শনই হ'ল—পরস্ব অপহরণ করা। পরের সমস্ত কিছুকেই আক্রমণ করা। যা ভোজ্য নয়, ভোগ্য নয়-তাকেও কুটিকুটি করে কাটা, আসলে সমস্ত নির্মাণ, সমস্ত সৃষ্টিই ইদুঁরের আক্রমণের বস্তু। সুকুমারের মধ্যবিত্ত বাবার ক্ষেত্রে যেমন, আজন্মলালিত মানবতাকে ফর্দাফাঁই করে বেরিয়ে আসে জান্তব সত্তাটি।

বিশ্বায়িত মিকি মাউসের আরণ্যক যথেচ্ছাচারে আজ ফালা-ফালা হয়ে গেছে আমাদের কথামালার গল্প, ঠাকুরমার ঝুলির মায়া, ময়মনসিংহ গীতিকা—সব। এখন আমাদের স্বপ্নে দূরাগত কোনো অশ্বক্ষুরধ্বনি বেজে ওঠে না। সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে না কোনো রাজকুমার। যার হাতের খোলা তলোয়ার রাক্ষস-হন্তারক, পারুল বোন হারিয়ে গেছে

স্বপ্ন থেকে। ছিঁড়ে গেছে চাঁদের বুড়ির চরকায় কাটা, সুতোয় বোনা সব স্বপ্ন। যথেচ্ছাচারী মিকি মাউসের এমনই দৌরাত্ম্যে 'ইঁদুর' গল্পটির নতুন রকম পাঠ শুরু হতে পারে।

ইদুঁরের ধারাবাহিক আক্রমণের শান্ত মোকাবিলার প্রচেষ্টার সংবাদও নিচুস্বরে সোমেন গল্পের শরীরে মিশিয়েছেন। এই সন্ত্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করার শর্তগুলি, প্রস্তুতি আর প্রচেষ্টার কথাও বলেছেন। নিজেকে একটি ট্রেঞ্চে বা গর্তে লুকিয়ে রেখে ধারাবাহিক নাৎসী আক্রমণ চালিয়ে যাওয়াই ইঁদুরাদর্শ, মধ্যবিত্ত সুকুমার ভাবে 'ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা ওখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? 'মা, বাবাকে বলে একটা কল আনতে বলতে পারো না? কোনদিন দেখবে, আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করেছে।' বাবা-মায়ের সম্পর্কের সেতুটিকে কেটে ছিঁড়ে নোংরা করে দিয়েছে এই ইদুঁরেরাই।

'চুহাচক্কর' কিষণ চন্দরের গল্পে সংযোগ কোটেছে, নৈতিকতা কেটেছে, ভালোবাসাও কেটেছে। তাদের কর্মনীতির অন্যতম ভয় পাইয়ে দেওয়া। ইঁদুরের গল্প পেলেই সুকুমারের মা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। এই ইঁদুরের সংখ্যা ভারতরাষ্ট্রে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সোমেন চন্দ-র গল্পের বাসাটিতেও তাই। 'আমাদের বাসায় ইদুঁর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। দিনমানে তারা দেয়াল আর মেঝের কোণ বরাবর ছুটোছুটি করে। রাত্রে ভযঙ্কর।'

ঐ 'অপদার্থ জীব কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে বাতের আসর খুলে বসেছে।' কেরোসিন দাহ্য পদার্থ। ঐ আগুন নিয়েই খল ইঁদুরেরা খেলতে ভালোবাসে, জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা নানা দাহ্য বিষযে উস্কানি দিয়ে রাষ্ট্রে রাত্রি ঘনিয়ে আনাটাই তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের নীতি।

'বলেছি তো, প্রথম ডাকেই উত্তব দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।' আমি তখন গোরুর মত শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম,'—সুকুমারের এই অনুভব তথা মূল্যায়ন থেকে আমরা বুঝে নিই মধ্যবিত্তকে দ্বিধা কাটাতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে তৎপব হতে হবে। ইঁদুর মারা কল গড়তে হবে। জীবনানন্দেব কবিতাব 'রক্তফেনামাখা মখে ইঁদুরের মতো ঘাড গুঁজে' থাকলে চলবে না।

সুকুমার এই মধ্যবিত্ত ভাবিবিলাসকে কাটিয়ে ওঠে। রেলশ্রমিকদেব সংগঠনে জড়িয়ে পড়ে। আর এই সময়েই তার চোখে ধবা পড়ে বাবা-মায়ের সম্পর্কের অন্তঃসার সৌন্দর্যের বিস্তার। জানতে পারে অতি সাধারণ ড্রাইভার শশধরের কিংবা গ্যাঙ্ম্যান ইয়াসিনের মেরুদণ্ডের ইস্পাত। ইয়াসিনের কাছেই জানতে পারে শহবের শ্রমিকের মতো গ্রামের কৃষকদেরও সংগঠিত হবার আকাঙ্ক্ষার বৃত্তান্ত। আর শোনে সেই বিস্ফোরণ সংলাপ : 'চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে না, না? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না?'

এইসময়ই সুকুমাব যথাযথ তৎপরতায ভীত কিন্তু লড়াকু মানুষের ডাকে সাড়া দিতে শিখে গেছে—'ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলাম। আমি হাত প্রসারিত ক'রে দিলাম জনতার দিকে,.........।' সমাজে যখন শ্রমিক শশধর-ইয়াসিনরা চোয়াল-শক্ত লডাইয়ে নেমে পড়ে, যখন কৃষকেরা সংগঠিত শ্রমিককে দেখে প্রেরণা পায়—তখন ব্যক্তিজীবনে সুকুমারেব বাবা নিজের ভেতরে ছডানো ঐতিহাসিক প্রত্নমানবকে ফুটিয়ে

তোলেন মধ্যরাত্রে। পরের রাত্রেই আশাপ্রদ জীবনবোধে উত্তরণ। আরও গভীর রাতে বাবার গলায় গুনগুন গান বেহালার মতো বাজে সুকুমারের কানে। এরপরই ইঁদুর মারার অস্ত্র স্থাপন করেন যথাযথ। মানুষের তৈরি কলে মানুষের শত্রু ইঁদুরের কয়েকটি ধরা পড়ে। তাদের ঘিরে উল্লসিত নির্মম জনতা—হাতে লাঠি, বড়ো বড়ো ইট। জান্তব থেকে মানব হয়ে ওঠার জন্য দরকার কলের জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

জীবনানন্দের থ্যাঁতলানো ইঁদুরের অনুষঙ্গে হতশ্রী জীবনের বিষাদ আসে। আসে করুণা কিম্বা বিবমিষাও। অন্যদিকে বিড়ালের নিঃশব্দ চলাচল আর সকলের মতোই জীবনানন্দকে এতোটাই সন্ত্রস্ত করেছিল যে, তাঁর বিড়াল, পৃথিবীতে অন্ধকার ছড়ায় কেবল। কাফ্কার ইদুঁর-বেড়াল খেলা আবার উল্টো। সেখানে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তাতে বেড়ালের পেটে যাওয়া ইঁদুরটিকে খুব নিরীহ মনে হয়। সহানুভূতি জাগে।

বিপ্রতীপে সুকুমার রায়ের হুলো ছুকছুকেস লোভী, চোর, আকাশে আধখানা বাঁকা চাঁদ দেখে সে হুলোর মনে পড়ে আধখাওয়া অবস্থায় মটকায় রাখা আধখানা মালপোয়ার কথা, একে কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য চমৎকার বিশ্লেষণে নাম দিয়েছিলেন 'হুলোস্থেটিক্স।'

সেই বাঁকা চাঁদপ্রতিম মালপোয়াখানা কানকাটা হেনি সাঁটিয়ে দিলে হুলোর কাছে গোটা জগৎটাই মিথ্যে মনে হয়। লোভী, পরস্বাপহারী, চোর বেড়ালের জন্য এক ধরমের স্নিগ্ধ প্রশ্রয় সুকুমারের কবিতায় রয়ে গেছে। কেননা—বিড়ালকে, বাঘের এই অণুসংস্করণটিকে প্রকৃতি মানুষের গৃহস্থজীবনের সঙ্গী করেছে তার স্বভাবের ইতিবাচকতার জন্য।

বিড়াল-কুকুর-গরু মানুষের স্বাভাবিক অতিথি। ইঁদুর কিন্তু হানাদার, এই হানাদারটিকে রুখবার জন্যই প্রকৃতি বাঘের মিনিয়েচার সংস্করণটিকে পাঠায়। বিড়াল ইদুঁর ধরবেই। একটা ইঁদুর ধরবার জন্য প্রয়োজনে সারারাত অপেক্ষা করবে।

বিড়ালকে আর এড়িয়ে চলে সাপ। সাপের উৎক্ষিপ্ত ফণা পলকের মধ্যে তাকে থাবাবন্দি করতে দেখেছেন অনেক অনুসন্ধানী। অবশ্য এটাও ঠিক, গৃহস্থের পোষা বেড়াল পর্যাপ্ত পরিমাণ উচ্ছিষ্ট সারাদিন ভোজনের সুযোগ পেলে গালে থাবা রেখে আরশোলার খেলা দ্যাখে। ইঁদুর শিকারের উৎসাহেও কিছুটা ভাঁটা পড়ে। তবু কি যেন বৈরিতা আছেই, ইঁদুরের গন্ধে বেড়ালের ক্ষিপ্রতা বেড়েই যায়।

তাই মনে হয়, প্রতীক নির্বাচনে বঙ্কিম সুকুমার-সোমেনের অন্তত কাফ্কা-জীবনানন্দের বিভ্রান্তিটুকু ঘটে নি। বিড়াল ভোজ্য ছাড়া কোনোকিছুতে আকৃষ্ট হয় না। সাপ বুকে হাঁটে। ইঁদুর প্রায় মাটিতে বুক পেতে হাঁটে বলে সামান্যতম স্পন্দনেও এরা সতর্ক হয়। তাই প্রকৃতি সম্ভবত বিড়ালের নখকে থাবার মধ্যে লুকোতে পারার আশ্রয় দিয়েছে। পদতলে দিয়েছে অমন নির্মম নৈঃশব্দ্য।

এই শব্দহীনতা, হীনতম প্রাণীগুলির হাত থেকে মানুষ ও তার নির্মাণকে রক্ষা করবার তাগিদেই। কারণ, ইঁদুর সবকিছুতেই দাঁত বসায়। তাকে ক্ষমা দুর্বলের ছিন্নবস্ত্র। সবকিছুকে কেটে ছিন্নভিন্ন করাই তো তার চরিত্র। এই চরিত্র নির্ধারণে কাফ্কা বিভ্রান্ত। এই চরিত্রহীন আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিড়ালের ভূমিকা মূল্যায়নে জীবনানন্দেরও বিভ্রান্তি রয়ে গেছে।

লক্ষণীয়, প্রতীক নির্বাচনে সোমেনের এই বিভ্রান্তি নেই। একুশ শতকের গোড়া থেকেই ঘরে ঘরে চৌখুপি বাক্সের চৌষট্টি চ্যানেলের বেনোজল নিয়ে ইলেকট্রনিক ইঁদুরটি ঢুকে পড়ে ভেতরে-বাইরে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে মানুষের সযত্নলালিত মূল্যবোধগুলি। ভেতরে-বাইরে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তাকে। একেও যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সোমেন চন্দ-র 'ইঁদুর' গল্পের অন্যরকম পাঠ। আজো এই image তাই ভয়াবহ, নিষ্ঠুর সত্য। বহুমাত্রিক, বহুস্বরিক ছন্দে সোমেন তাকে ধরতে চান।

আমাদের কথামালার কৃতজ্ঞ ইঁদুরটি একটি মহাপাপ করে রেখে গেছে। সে পশুরাজ সিংহকে জালমুক্ত করে গেছে। জি-সেভেন প্রসারিত মিডিয়া-ইঁদুর আমাদের সর্বস্ব ছিন্ন করার যে ইঁদুরকৃষ্টি ক্রমাগত প্রচার করে যাচ্ছে, সেটাই শেষ কথা নয়। শেষকথা, এর পরও নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে স্বয়ং পশুরাজ। বেজে ওঠে জীবনের আর্কেস্ট্রা।

কখনো দার্শনিকের ঔদাস্য, কখনো ডায়েরির ছক, কখনো কবির সরল সৌন্দর্য, কখনো বা ধারাবিবরণী রক্ষার উদাসীন চলন এভাবেই গল্পের শৈলীটি গড়ে ওঠে। ব্যক্তির, পরিবারের রোগাটে ঝর্ণাধারা থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ ব্যাপ্ত নদীর আকার নিয়ে সমাজ-সঙ্গমে ঢ'লে পড়ে। তখনো সোমেন স্বাভাবিক ও নির্বিকার উচ্চারণ করেন 'ব্যাপার কিছুই নয়, কয়েকটি ইদুঁর ধরা পড়েছে'—প্রগতিসাহিত্য-শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে ও ভাষা বাস্তবেই অনুকরণীয় হ'তে পারতো। কুরে কুরে খায় যারা তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ঐ ইঁদুর দারিদ্র্য, আবার ইঁদুর মনের। ঐ ইঁদুর রাজনৈতিক চৈতন্যের অভাবের প্রতীক। 'আমি'-র নতুন চেতনায় উত্তরণই, নবদর্শনই পার ঐ ইঁদুরকে হত্যা করতে। ঠিক এখানেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থরোপিত বনস্পতির কোটরেও ফাটলে যেসব অস্বস্তিকর ইঁদুরের উৎপাত, তার কারণ অনুসন্ধানে 'ইঁদুর' চমৎকার motif হয়ে উঠলেও সুকুমারের আশাপ্রদ জীবনবোধে উত্তরণই গল্পটির পরমা পরিণতি হয়ে ওঠে।

'সংকেত' গল্পটির কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানেও সোমেন রাজনীতির সক্রিয় ও জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ, মালিকের পেটোয়া দালালপক্ষ-সবই এই গল্পে আছে। আছে মালিকের অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা। মিলের গেটে শ্রমিক-মালিক মুখোমুখি হয়ার টেন্‌শন। তবু সেখানেও তিনি যথার্থ শিল্পীর নিরপেক্ষতা ও রসবোধ নিয়ে গল্পের উপসংহার রচনা করেন। সস্তা শিল্পীর মতো মালিকপক্ষকে পরাজিত করেননি। বরং এমন একটি ঘটনায় ও মূল চরিত্রে নিঃসঙ্গ ভাবনায় গল্প শেষ হয়, যা শৈলীগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবেই অনবদ্য হয়ে ওঠে।

সংকেত : একটি আন্তরিক উপলব্ধি

অপূর্ব কোলে

দুটি বাঘ এবং কয়েকটি ছাগল। বাঘদুটি হালুম-সর্বস্ব শ্রীনাথ বহুরূপী নয়। একেবারে আসল। কোরখান্। এরকম দুটি বাঘ যদি এসে পড়ে ছাগলের পালে? উত্তরমালা ওল্টানোর দরকার নেই। উত্তরটা আমাদের সকলের জানা। বাঘবন্দী খেলায় বরাবরই জিৎ হয় বাঘেদের। এটাই নিয়ম। এমনটাই হয়। হয়েছে। হচ্ছে। এবং হবেও। কিন্তু কথাটা আমবা ইতর-প্রাণীবিশেষে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি ঘুরিয়ে ধরি মানুষের দিকে! তাহলে, 'হবেই'—এই নিশ্চিত প্রত্যয়টি কি উচ্চারণ করতে পারব আমরা, আজ, এইসময়?

অত্যন্ত সঙ্গতভাবে জানি, এবং মানিও, শক্তিমান আব শক্তিহীন—এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিরকালই স্বাভাবিক নিয়মে হার হয়েছে দুর্বলের। কিন্তু এই পরাভবের দায় করা? পাঠক, আসুন, একটু ইতিহাসের দিকে চোখ বাখি। একটু গভীব অভিনিবেশ আমাদের বলে দেবে এর সামগ্রিক দায় ধনতন্ত্রের। রাজার ঘবে যে ধন থাকে, তা সত্যি-সত্যিই টুনটুনিদের থাকে না। রূপকথার গপ্পোগাছায় থাকাটা ভীষণ রকমের অবাস্তব। তাই সেটা নিরিখ হতে পারে না। আসলে, রক্তমাংসময় যে জ্যান্ত-জান্তব বাস্তবতা, সেখানে অসম অর্থনীতিই একমাত্র ভিত্তি। ঠিক সে-কারণেই পৃথিবীর অধিক-সংখ্যক মানুষের একমাত্র শীলমোহর দুঃসহ দারিদ্র্য। সেইসব বহুসংখ্যক মানুষেরা কিছু মুষ্টিমেয় ধনগর্বীর হাতে যুগে-যুগোত্তরে, কালে-কালান্তরে শোষিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে। কতো-শত ভাঙা-সাম্রাজোব ইটের স্তূপের ওপর গাঁইতি কোদাল চালাতে চালাতে তারা বুড়ো থেকে আরো বুড়ো হয়ে শেষমেশ কোনোরকমে কাটিয়ে দিয়েছে তাদের বেঁচে থাকার পাণ্ডুর অনিশ্চয় দিনগুলি রাতগুলি। এভাবেই এগিয়ে গেছে পৃথিবী এবং তার তাবৎ মানুষেরা।

কিন্তু একদিন শুরু হলো উল্টোপথ এবং উল্টো রথের পালা। জীর্ণ-শীর্ণ-দীর্ণ মানুষগুলোর নৌকোর পালে আছড়ে পড়লো এক ভিন্নমুখী হাওয়া। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত যে পীড়িত জীবন তারা ক্রুশের মতো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল এতোকাল, সেই নীরক্ত জীবনে যৌথভাবে বেঁচে থাকার রূপ-রস-রঙ ছড়িয়ে দিলেন মার্কস্ এবং লেনিন। সেই ক্ষুরধাব বৈপ্লবিক বার্তায় প্রাণিত হলো বাশিয়া-চিন-ভিয়েতনাম। রচিত হলো নতুন ইতিহাস। রুশ বিপ্লব। সংগ্রামী জীবনের এমন রণ-রক্ত-সফলতা আটকে থাকলো না কেবলমাত্র সোভিয়েতের আকাশে। নগর ছাড়িয়ে মহানগরে, দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশে, মহাদেশ ছাড়িয়ে মহাপৃথিবীতে সঞ্চারিত হলো 'তিমির হননের গান'। সেই গান একদিন ভেসে এলো সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী পেরিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের উপল-উপকূলে। ভারতবর্ষেরও কিছু মানুষ—পণ্ডিত, দার্শনিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক প্রগাঢ় অন্তবঙ্গতায় বাড়িয়ে ধরলেন তাঁদের দু-হাত। ধরতে চাইলেন সেই গান। আলো ও হাওয়া। তাঁদেরই একজন সোমেন। অনেক—অনেকটাই পরে জন্মানো ঢাকার উজ্জ্বল তরুণ সোমেন চন্দ। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সমাজ-বদলের গভীর প্রাণনায় যিনি পাঠ নিয়েছিলেন মার্কস্ এবং লেনিনের, হয়ে

উঠেছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। যিনি তাঁর সমস্ত তারুণ্যকে নিঙড়ে দিয়েছিলেন তথাকথিত প্রলেতারিয়েতদের পুনর্জীবিত করার জন্য। খুব স্বাভাবিকভাবে তাই তিনি আর ভাবতে পারলেন না বাঘেদের সুনিশ্চিত জয়। আপাদমাথা এই রাজনীতিক সঙ্গে সঙ্গে এ-ও উপলব্ধি করেছিলেন—শুধু রাজনীতির মধ্যে দিয়ে গণচেতনার বিকাশ সম্ভব নয়, সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশই গণমানুষের চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আর এই কারণেই তিনি অন্যহাতে তুলে নিলেন ক্ষুরধার কলম। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসকে নন্দনগ্রাহ্য করে তুলতে তাঁর কলম জন্ম দিল একের পর এক ছোটোগল্প ও উপন্যাস। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তা হয়তো স্বল্প, কিন্তু সেই অল্পসংখ্যক সাহিত্য তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভাষ্য হলেও, একথা ঠিক, তা কখনো আত্মস্থ করেনি স্লোগানের স্থূলধর্মকে। বরং সবদিক থেকেই তা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বিশুদ্ধ সাহিত্য। সবলের বিরুদ্ধে সমবেত-দুর্বলের অসম লড়াই। রুখে দাঁড়ানোর সংকেত। আমাদের আলোচ্য 'সংকেত' গল্পটি আসলে সেই রুখে দাঁড়ানোর সংকেত-ই।

গল্পটি প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। রবিবাসরীয় পাতায়। ১৯৩৮-এ। লেখকের প্রথম গল্প সংকলন 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪২) গ্রন্থে আলোচ্য গল্পটির সঙ্গে আরো পাঁচটি গল্প অন্তর্গত হয়। এর মধ্যে চারটি গল্প—'একটি রাত', 'সংকেত', 'দাঙ্গা' ও 'ইঁদুর'—প্রায় একই রাজনৈতিক বক্তব্যের ধারক। সেই ভয়ংকর রাক্ষসপ্রহরে গল্পগুলোর জনন ও জন্ম, যখন ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোর নির্ঘোষ, হিটলারী নাৎসীবাদের বর্বর সন্ত্রাস। একদিকে বিধ্বংসী মানবক্ষয় রুখতে গণশক্র ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে সোভিয়েতের লালফৌজ; অন্যদিকে, ভারতবর্ষে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে উত্থিত হচ্ছে দেশীয় রাজনৈতিক শক্তি। শাসকগোষ্ঠীর প্যাঁচ-পয়জারে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। তার ওপর পুঁজিবাদের চোখরাঙানি। সব মিলিয়ে এক আর্থসামাজিক ও আর্থরাজনৈতিক সংকট। যা ক্রমে ক্রমে ঘনিয়ে তুলছে এক প্রগাঢ় আন্তর্মানবিক সংকটকেও। সেই অশুভ লগ্নেই গল্পগুলি রচনা করেছেন সোমেন। যা পাঠ করার পর আজকের কোনো মেধাজীবী পাঠক-ও ভাবতে পারেন না এগুলো কোনো অল্পবয়সী তরুণের লেখা। বরং তাঁরা পায়ে পায়ে পৌঁছে যান চল্লিশের সেই যুদ্ধ-ধ্বস্ত অগ্নিবর্ণ রক্তাক্ত-ক্ষতাক্ত দিনগুলোতে। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন 'সুকুমারের মা' কেন 'পাভেলের মা' হয়ে উঠতে চান (একটি রাত), ইঁদুরকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা আল্‌গা সমস্যা কীভাবে খুলে দেয় বিশ্বরাজনীতির নতুন বাঁক (ইঁদুর)।

হয়তো ঠিক এমনটা নয়, তবু আমরাও, সোমেনের 'সংকেত' গল্পের নিবিড় পাঠ নিতে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি সাতষট্টি বছর আগেকার এক গণ্ডগ্রামে—যার কেতাবি পরিচয় 'বনগ্রাম' নামে, যাকে মানুষ চেনে 'বনগাঁ' হিসেবে। যে গ্রামে কয়েকঘর কৃষক-তাঁতি-জনমজুরদের বাস—দারিদ্র্যই তাদের একমাত্র প্রধান চিহ্নায়ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সেখানে হার্দ্য ও প্রীতিসঞ্চারক। সে-গ্রামে বাস করে অন্ধ দশরথের পাশে বৃদ্ধ ইয়াসিন মিয়া, রাম-বলরামের পাশে আকবর-রহমানেরা। যেখানে নাগরিক বিষবাষ্পের চিহ্নমাত্র নেই। সর্বত্রই সবুজ-সংহিতা। কিন্তু কতোদিন বেনিয়া-চক্ষুর আড়ালে থাকতে পারে সবুজ-উপনিষদ! আমরা, আজকের এই শূন্যদশকেও উত্তীর্ণ-পঞ্চাশ স্বাধীন-স্বদেশেও প্রতিনিয়ত ধ্বংস হতে দেখছি

শস্যফলনের সমূহ সম্ভাবনা। পরিবর্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে চিম্‌নির উল্লম্ব আস্ফালন। আজকের এই অহংকৃত আত্মঘোষণার সূচনা যেন 'সংকেত'। তাই দেখি, বনগাঁর সবুজ-উপনিষদ ভেঙে দিতে সেখানে শহর থেকে পৌঁছে গেছে এক অ-লৌকিক জলযান। সেই জলযান থেকে বেরিয়ে এসেছে পুঁজিবাদের লোল-জিহ্বা, উগ্র আগ্রাসন।

কিন্তু যাকে আমরা বলি আখ্যান বা গল্পত্ব, ঠিক সে-রকম বুনন নেই 'সংকেতে'-র শরীরে। চারটি পরিচ্ছেদে, যাদের শীর্ষে সংখ্যা-শব্দ ১, ২, ৩, ৪—যাদের মধ্যে চতুর্থটিই প্রধান এবং দীর্ঘতর, ঠিক যেন স্টেয়ারকেস্ প্লটের পারম্পর্যে, দুটো দিন ও একটা রাতের সময়সীমায় গল্পকার সোমেন চন্দ তাঁর আন্তরিক অনুভব ও প্রখর অভিজ্ঞতাকে বুনে দিয়েছেন 'সংকেতে'-র জমিনে। ভাবনা আর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে লেখক কখনো ব্যবহার করেছেন 'ওম্‌নিসিয়েন্টে'র প্রেক্ষণবিন্দু; কখনো-বা গল্পের নায়ক রহমানকে ভূমিকা দিয়েছেন কথকের। গ্রাম আর শহর—এই দুই বিপ্রতীপ প্রেক্ষাপটের মাঝখানে রহমানকে রেখে, মূলত রহমানের সামাজিক অস্তিত্বের উন্মোচনকে, ছোটো পৃথিবী থেকে বড়ো পৃথিবীর দিকে প্রধাবনকেই কেন্দ্রীয় উপজীব্য করে তুলেছেন আলোচ্য গল্পে।

'সংকেত'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল গদ্যকার ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করছি। সোমেনেরই 'ইঁদুর' গল্পটির পাঠ-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন :

> "ব্যক্তি থেকে পরিবার আর পরিবার ছাড়িয়ে সমাজ—ক্রমসঞ্চারের এই বৃহত্তর ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই গল্পের (ইঁদুর) তরুণ কথক (সুকুমাব) ধীরে কিন্তু নিশ্চিন্ত-ভাবেই বুঝতে পারে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারাটাকে। তার চোখের সামনে খুলে যায় শ্রেণি উপলব্ধির সোপান।"
>
> [সোমেন চন্দের ইঁদুর : একটি ব্যক্তিগত পাঠ/হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে'—পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৭/বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ]

আশ্চর্য, প্রায় একই থীম 'সংকেত' গল্পটিরও। 'ইঁদুর' নিম্নমধ্যবিত্তযুবা সুকুমারের চোখে ধরা পড়েছিল "ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারা', আর 'সংকেত' নিম্নবিত্ত রহমান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের (পদ্মানদীর মাঝি) বা মদন তাঁতির (শিল্পী) মতো যে গরীবের চেয়েও গরীব, তার ক্রম-সঞ্চরমান চোখ দেখেছে ধনতান্ত্রিক শক্তির অক্টোপাশ শোষণ, তার ফলশ্রুতিতে নিরন্ন শ্রমজীবী-শোষিত মানুষের আন্দোলন, গণ-প্রতিরোধ। অবশেষে শোষকের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির আঁতাতে রক্তলোলুপ পুলিশী অত্যাচারে—অজস্র আহত ও নিহত মানুষের রক্তস্রোতে। যা সেই প্রথম দেখলো রহমান। সেই দেখা একটা সময় পরে তাকে করে তুললো শ্রমজীবী মানুষগুলোর সহমর্মী। এবং সে-যে তাদেরই একজন ভবিষ্য-প্রতিনিধি—একথা উপলব্ধি করতেও বিলম্ব হলো না তার। সহধর্মিতায়—সহমর্মিতায় তার দুটো চোখে টলটল করে উঠলো জল। গল্প ছাড়িয়ে সে হয়ে উঠলো একজন রক্তমাংসময় বাস্তব মানুষ—ইতিহাসের সাক্ষী, বিপ্লবের শরিক।

অর্থাৎ 'সংকেত' বিশুদ্ধভাবে একটি লড়াইয়ের গল্প। এ লড়াই শোষকের বিরুদ্ধে সমবেত-শোষিতের, গণমানুষের। এ-লড়াই প্রগতি আন্দোলনের নেতা সোমেনের নিজেরও।

এ লড়াইকে সোমেন কখনো দেখেছিলেন কাছ থেকে, কখনো নেতৃত্ব দিয়েছেন—কখনো দেখিয়েছেন শিল্পে। গল্পে। যেমন, এখানে আমরা দেখছি নায়ক রহমানের চোখ দিয়ে। রহমান আর সোমেন যেন একই বিন্দু। দুজনেরই চোখজোড়া অজস্র আতুর স্বপ্ন। খেয়ে-পরে, সকলকে খাইয়ে পরিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বপ্ন। রহমানের চোখের কোণের কোত্থাও ছিল না স্বপ্নভঙ্গের মতো বিরোধাভাস। স্বপ্নভাঙার অনেক আগেই দুটো দিনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতায় পরিণত-রহমানকে চলে আসতে হয়েছে সেই নদীর পাড়ে, যে নদীর কোনো এক তীরে বনগাঁ নামের একটি গ্রামে তাদের ঘর—ঘরে অসহায় বৃদ্ধ বাবা, পাটভাঙা বউ। সোমেনের কিন্তু ফেরা হয়নি ঘরে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে (সঠিক হিসেবে একুশ বছর ন-মাস পনেরো দিন) তাঁকে খুন হতে হয়েছে ফ্যাসিস্ত শক্তির নির্মম আক্রোশে। যেন লোরকা, কডয়েল, র‍্যালফ ফক্সের ভারতীয় সহযাত্রী। সেই সোমেনের গল্পের কাছে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যাশা একটু অন্যরকমের, অন্যধরনের। অন্যরকমের বলেই এখন আমরা গল্পটির দরোজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছি। এবার ঢোকা যেতে পারে ভেতরে। আন্তরিক উপলব্ধির স্তরীভূত শিলাস্তরে রাখা যেতে পারে চোখ।

দুই

> "তখনও আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই, নানা রকমের পাখি আগামী দিনের ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে, বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়িল।"

নিসর্গের এই বাকপ্রতিমাটি দিয়েই গল্পের সূচনা। বনগাঁর মরাগাঙে বান নয়, কুয়াশামাখা পাখি-ডাকা ভোরে ঝড় তুলে এসেছে এক জলযান। নদীর পাড়ে বসে থাকা জনমজুর অন্ধ দশরথ টের পেয়েছে সেই ঝড়। দশরথের ছেলে রামচন্দ্র, সে তখন ব্যস্ত বাবার জন্যে একছিলিম তামাক ভরায়, সে পায়নি সেই ঝড়ের আভাস। আসলে, শব্দভেদী বাণ দশরথদেরই থাকে। তাদের নিক্ষিপ্ত তীরে শ্রমণরা বিদ্ধ হয়। তারপর অন্ধমুনির অভিশাপ বুকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে হয় দশরথদেরই। এভাবেই, পুরাণকে, রাম-অয়নকে চকিতে ছুঁয়ে যান লেখক। আবহমান কাল ধরে দশরথ-রামেরা আছে, থাকবেও। তাদের চোখের সামনে ঘটবে জীবননাট্যের নানান পরিবর্তনলীলা। তাদেরই সহ্য করতে হবে জীবনযন্ত্রণার মতো দায়ভার। গল্পের রাম বাবার কথার-আভাসে বিশ্বাস রাখেনি। এমনকি চোখ তুলে পর্যন্ত তাকায়ও নি; বরং সংশয় প্রকাশ করে বলেছে :

> "তা অইলে তুমি কিছু দেখতে পাও, না বাবা"।

কিন্তু সত্যি-সত্যি সে যখন দেখতে পেয়েছে ছোটো জাহাজটাকে, দারুণ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখ-মুখ। আর 'পরক্ষণেই এই অদ্ভুত খবরটি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল'। কৌতূহলী জনগণ। কৌতূহল পাঠকেরও! এই অজগাঁয়ে কোন্ বার্তা বয়ে আনলো ওই অলৌকিক জলযানটি! অজস্র বিস্ময়াবিষ্ট চোখের সামনে লঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো সপারিষদ যে লোকটি—

> "তাহার গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর, পায় চকচকে পাম্প-শু, মুখে একটি সিগারেট আর মৃদু হাসি।"

প্রথম পরিচ্ছদের আখ্যানভাগ এটুকুই। এর মধ্যে অনেক কিছুই সংকেতিত করেছেন লেখক। বিশেষ করে নিসর্গের চিত্রকল্পটি। তখনো আকাশ প্রায়ান্ধকার—পাখিরা ডানা ছড়িয়ে দেয়নি আকাশে এবং মরানদীর কঠিন বুকে ঝড় উঠেছে। ভাবতে হয়, এ সমস্ত কিছু কীসের মেটাফর? এমন নৈসর্গিক চলচ্ছবিতে কোন্ ইঙ্গিত জড়িয়ে দিতে চান লেখক? আমরা জানি, আগেই বলেছি, গল্পটা রহমানের, তার শ্রেণিবোধ জাগরণের—ব্যক্তি-ছাড়িয়ে সমবেত শ্রমজীবীদের একজন হয়ে ওঠার। কিন্তু তা তো গল্পের একেবারে শেষের ব্যাপারে! তাহলে? তাহলে কি তার-ই সংকেত সূচিত করতে চান গল্পকার নিসর্গের এই ব্যঞ্জনায়! তারো আগে ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে শান্ত-নিস্তরঙ্গ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবনে এই ঝড় কোন্ দ্যোতনাকে বহন করে আনলো। সমালোচক ড. তপোধীর ভট্টাচার্য আলোচা গল্পটির নিবিড় পাঠ-প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন :

> "তবুও তখন মরানদীর কঠিন বুকে ঝড় তুলত সময়; পুঁজিবাদী ঘাতকের মায়া হত সর্বগ্রাসী। ছোটগল্পের নিজস্ব চিহ্নায়িত বাচনে তারই বার্তা বয়ে এনেছে লঞ্চের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। পুঁজির থেকে নিস্তার ছিল না কারো, বনগ্রামের মতো কোনো এক অজ পাড়াগাঁয়েরও নয়।"
>
> [সোমেন চন্দের সংকেত ও ইঁদুর : নিবিড় পাঠ/তপোধীর ভট্টাচার্য; 'ছোটগল্প : বিকাশ, পরিণতির উপলব্ধি/সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার জ্যোতিপ্রসাদ রায়—পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২৪, সাহিত্যসঙ্গী]

অধ্যাপিকা সুদক্ষিণা ঘোষও প্রায় একই মন্তব্যের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন :

> "গ্রাম বাংলার কৃষক শ্রমিকের জীবনেও 'ঝড়' তথা বিপর্যয় নেমে আসবে, তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল সূচনা-বাক্যটিতে।"
>
> [শ্রেণি চেতনার শিল্পরূপ : সোমেন চন্দের দুটি গল্প/সুদক্ষিণা ঘোষ, ঐক্যতান : সোমেনচন্দ স্মারক সংখ্যা-২/সম্পা. নীতীশ বিশ্বাস—পৃষ্ঠাঙ্ক : ২১৫]

সমালোচকদের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করতে বাধ্য। এই ঝড় আসলে সবুজ-উপনিষদ ধ্বংস করার ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন আমাদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—লাভ ও লোভের ঝড় তুলে যে চক্চকে লোকটি পা রাখলো বনগাঁর মাটিতে, কে সে? কী-ই বা তার পরিচয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরু। চোখাচোখি-কথাকথিতে জানা গেল লোকটা শহরের কোনো এক কাপড়কলের ম্যানেজার। বনগাঁয় এসেছে তাদের মিলের জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করতে। অর্থাৎ জীবনানন্দের সেই 'উঁচু লোক', যাদের হাত থাকে 'অনির্বচনীয় হুণ্ডি'—যারা 'সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়'। 'কালিন্দী'-র বিমল মুখার্জিকে মনে করতে পারি, প্রসঙ্গত। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভূ যারা লোভের মশাল জ্বেলে ধাঁধিয়ে দেয় অজগ্রামের গরিব, কৃষিজীবীদের চোখ। যাদের ধূর্ততা কক্খনো ধরতে পারে না এই সরল সাদাসিধে মানুষগুলো। কলের ম্যানেজার সেই গোত্রেরই একজন মধ্যস্বত্বভোগী আড়কাঠি, পুঁজিবাদের দালাল। যে সরল-বীজগণিতের মতো বনগাঁর সাধারণ জোলো ও কৃষিজীবী গরিব মানুষগুলোর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের মিল-শ্রমিকে পরিণত করতে চায়

'রক্তকরবী'-র সর্দারদের মতো। তাই 'তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত রহিল না।'

এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলার অন্যান্য প্রান্তিক অঞ্চলের মতো অজ-বনগাঁর দুর্ভেদ্য লোকালয়েও তখন পৌঁছয়নি শিক্ষার আলো। সময়-হিসেবে বাচ্চা-মৌলবিই একমাত্র সেখানে দুনিয়াদারির খবরাখবর রাখে। শহরের সঙ্গে তারই একমাত্র নিয়মিত যোগাযোগ। তাকে মান্য করে গ্রামের সমস্ত মানুষজন। সে তাদের খবরের কাগজ পড়ে যুদ্ধের খবর শোনায়। সমাধান করে দেয় হাজারো সমস্যার। তাই, বাচ্চা-মৌলবি ছাড়া তারা বিশ্বাস করতে পারে না বিদেশি এই কল-ম্যানেজারকে। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানান রঙিন গুজব ওঠে। ছড়ায়। আকবর আলি বলে :

> 'লড়াইয়ের খবর রাখনি ইয়াসিন মিএগ? হেইর লেইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?'

ইয়াসিন, যে প্রথম সাক্ষাতে ম্যানেজারকে সেলাম জানিয়ে, উঁচু-নিচুর শ্রেণিগত তফাত করে বাহাদুরি দেখিয়েছিল প্রথম পরিচ্ছেদে, এমন কথায় সে রেগে যায় রীতিমতো। ফলশ্রুতিতে বচসা। এবং ঝগড়া যখন উত্তুঙ্গে, তখনই দেখা যায় তাদের প্রার্থিত বাচ্চা-মৌলবিকে। মৌলবিকে ঘিরে ধরে কৌতূহলী জনতা। চোখে-মুখে হাজারো জিজ্ঞাসা। মৌলবি জানায়, কলের ম্যানেজার তার পূর্বপরিচিত এবং সতি-সতি ওবা ওদের মিলের জন্যে কাজেব লোক খুঁজতে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে, বনগ্রামের বুনোলোকগুলোব সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-কৌতূহলেব অবসান ঘটে যায় মৌলবির কথায়।

এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। বিজ্ঞান-যুক্তি যেখানে মুখ ঢেকে থাকে অন্তবালে, সেখানে এইসব অশিক্ষিত বা আধাশিক্ষিত মৌলবি বা বাবাজিরা রাজ চালায়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে তাদের শাসন-ই যে বলবৎ থাকে, তাকেই নিপুণভাবে ধরেছেন সোমেন। 'ধর্ম জনগণেব আফিম্'—এই আপ্তবাক্যেরই শিল্পরূপ যেন বা আলোচ্য অংশটি। বাচ্চা-মৌলবি সেই ধর্মীয় দালালের প্রতিনিধি। তাই গল্পে দেখা যায়, প্রচণ্ড-অবিশ্বাসী আকবর আলিও তার ভাইযের চাকরির জন্যে মৌলবিকে ধরে :

> "আমার ভাই-এর লেইগা একটু কইয়া দিবা তুমি—"

এভাবে, ঠিক এভাবেই, সকলের বিশ্বাসের জমি শক্ত করে তরতর করে চলে যায় সে। 'মহেশে'র গফুরকে মনে করতে পারি আমরা। কাশীপুরেব কৃষিজীবন ত্যাগ করে ফুলবেড়ের শ্রমজীবন তাকে মেনে নিতে হয়েছিল অনেক যন্ত্রণার কারণে। এই গল্পে, অন্ত্যেবাসী এই মানুষগুলো সাগ্রহে শহরের শ্রমজীবনকে স্বাগত জানিয়েছে। যেমন 'রক্তকরবী'-তে স্বর্ণলাভের প্রসূ সম্ভাবনায় গ্রহণলাগা পুরী জেনেও যক্ষপুরীতে পতঙ্গের মতো ছুটে গিয়েছিলো খনি-মজুরেরা। ফেরার সমস্ত পথ রুদ্ধ জেনেও। তেমন নয় হয়তো। তবু কোথাও যেন এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য রয়েছে। যক্ষপুরীর মতো এ-মিলটাও যে গ্রহণ লাগা—এই খবরটাই শুধু তাদের অজানা। কিন্তু ব্যতিক্রম রহমান। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, সে-ই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু, ভবিতব্য। সোমেনের দর্শন-ধারক।

এবং গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই আমরা রহমানকে প্রধান ভূমিকায় পেয়েছি। অবশ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মৌলবি যখন ম্যানেজারের সঙ্গে তার সম্পর্কের দীর্ঘ-ইতিহাস ব্যক্ত

করছিল জনসমক্ষে, সেই সময় একবার আমরা তাকে দেখেছিলাম চকিতে। মৌলবি বলেছিলো :

> "রহমান, তোমার ঘরে তো তাঁত আছে, তোমারে নিব আগে।"

এই কথা সদ্য-বিবাহিত রহমান, যার চুলগুলি চমৎকার পরিপাটি, চোখে সুরমা, পরনে রঙিন জামা আর লুঙ্গি—হেসে ফেলেছিলো। ঠিক সেই আবেগেই মুখ আর মুখোশের ফারাক চিন্‌তে ভুল হয়েছিলো তার। নাম লিখিয়েছিলো ম্যানেজারের কাছে।

রাত বারোটায় লঞ্চ ফেরার পথ ধরবে। ছেলের চাকরি হবে—এমন স্বপ্নে বুক বেঁধেছিলো রহমানের বুড়ো বাপ। সাংঘাতিক উৎকণ্ঠায় বলেছিলো :

> "তাড়াতাড়ি খাওন-দাওন সাইরা শুইয়া পড়ো, বারোটা বাজলে পর আমি ডাইকা দিমুনে, যাও, শুইয়া পড়ো গিয়া।"

ঠিক সময়েই বুড়ো বাপ ডেকেছিলো। সাড়া মেলেনি। সদ্যবিবাহিত যুবা কীভাবে দেবে সাড়া? সদ্য-বিবাহিতা বধূর শারীরিক আকর্ষণ ছিন্ন করে চলে যাওয়ার বেদনা যে কি অসম্ভব মানবিক, সেই মানবিক স্বাভাবিকতাকে বিস্মৃত হননি গল্পকার। নিপুণ চিত্রকরের মতো তাই তিনি অন্ধকারকে বর্ণময় করে তুলেছেন ক্যানভাসের সমতল প্রেক্ষাপটে।

বুড়ো বাপটাও যে সেকথা বোঝেনি, তা নয়। তারও মনে পড়েছে মৃতা স্ত্রীর কথা। মনে মনে হেসেছে। কিন্তু বারোটা বাজার উৎকণ্ঠা ফের বুড়োকে টেনে নিয়ে গেছে বাড়ির ভেতরে। ঢুকতেই নজরে পড়েছে :

> "দাওয়ার খুঁটি চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে নিঃশব্দে রহমান বসিয়া আছে।"

তার শরীরে যেনবা এক-পৃথিবীভার। সব ছেড়ে চলে যাওয়ার ভার। এই ঘর-গেরস্থালি, বউ-বাপ-গাঁ-নদী ছেড়ে চলে গিয়ে তাকে রচনা করতে হবে অন্য এক জীবন-পাঁচালি। সে যদি মিলের কাজে যায়, তবেই এই মাটির ভাঙা কুটিরে একদিন আলোর রোশনাই জ্বলবে। রহমান—খোদার রহম। আলোর দূত। বুড়ো-বাপ সেই আলোর স্বপ্নেই বিভোর। তাই এক হাতে পুরনো লণ্ঠন আর অন্যহাতে প্রকাণ্ড চক্‌চকে একটা লাঠি নিয়ে সে নিজেই এগিয়ে দিতে আসে ছেলেকে। ছেলের ঘুম-ভরা চোখে তখনো বিজড়িত স্বপ্ন-মায়া, কারো ফুলের মতো বুকে মুখ গুঁজে রাখার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সত্য-মায়ার মধ্যে দিয়ে যখন তারা লঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছয়, তখন বাপ আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। বাপ-ছেলের বিচ্ছেদ-বেদনার চিত্রে সোমেনের রাজনৈতিক ক্ষুরধার কলমও হয়ে ওঠে তীব্র রোমাণ্টিক :

> "একটু নির্জনতায় ছেলেকে টানিয়া বুড়া আবার বলিল, 'বাপ!'
>
> —'কও!'
>
> —'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গেলাম, তুমি আমারে ছাইড়া কোনোকালে কোনোখানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমার মনডারে কী দিয়া বান্ধুম, তুমিই কও?"

এমন অসহায় দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয়নি রহমানকে কোনোদিন। আজ, এই প্রথম। সে কখনো তার বাপকে এভাবে কাঁদতে দেখেনি। দুটি বেদনা—স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, আর বাপকে শূন্যতায় নিক্ষেপ করার কষ্ট বুকের মধ্যে চেপে ধরে রহমানকে অবশেষে উঠতেই হয় লঞ্চে। যে জলযাত্রা তাকে, তাদেরকে, একদিন মুঠোভর্তি সুখ এনে দেবে। আর এখান

থেকেই রহমানকে গল্পের কেন্দ্রভূমিতে এনে ফেলেন লেখক। একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের শরিক হয়েও গল্পকার তাঁর নিয়ন্ত্রিত ভাষা-ব্যঞ্জনায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন এমনভাবে :

> "কয়েকহাত নীচেই তাহাদের গ্রামের নদী। আজ ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া অত্যন্ত আপনার বলিয়া মনে হয়। নদীর জলে লঞ্চের আলো পড়িয়া চিকমিক করিতেছে। লঞ্চের ভিতরের মানুষগুলির আবক্ষ ছায়াও সেখানে দেখা যায়, অন্ধকারের বুকে কেবল আরও কতকগুলি গভীর অন্ধকারের মতো মনে হয়।"

এই অংশটির ভাষাবিন্যাস যদিও আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রথম অনুচ্ছেদটিকে মনে করিয়ে দেয়, তবু এই ডিকশান আমাদের কাছে এই খবরই বয়ে আনে—গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়েই একদল সহজ সরল গ্রামীণ মানুষের 'যাত্রা হল শুরু'। সেই অন্ধকার রহমানকে ক্রমশ গিলতে থাকে। তার ভীষণ ঘুম পায়। ঘুমের দেশে জেগে ওঠে স্বপ্ন। নদী ও নারীর স্বপ্ন। নদী ও নারী সেখানে একীভূত হয়ে যায়। মনোবিকলনের গহন থেকে লেখক তুলে আনেন জীবন-সত্য। ....বুকের মাঝখানে রহমানের হাতখানা রেখে তার বউ বলে :

> "এই দ্যাখো, এহান কেমুন ব্যথা। তোমারে ছাইড়া আমি থাকতে পারুম না বন্ধু, মইরা যামু।'

এখানে যে রহমানকে সৃজন করেছেন সোমেন, সে যেন শাশ্বত হৃদয়বান প্রেমিক। জীবনানন্দ। কিন্তু বাস্তববাদী লেখক জানেন—তাঁর গল্পের লক্ষ্য রোমান্স-সৃষ্টি নয়। তাই অচিরেই ভেঙে দেন এই মায়া-ঘোর। বাচ্চা-মৌলবির দেখা মেলে। সে ডাকে রহমানকে। বলে :

> "ভোর হইয়া আইছে, আর কত ঘুমাইবা?"

মানিকের হোসেন মিয়ার কণ্ঠেও ছিল এই স্বরগ্রাম—'বন্ধু, কত ঘুমাইবা'। কিন্তু সেই স্বরের সঙ্গে এ স্বরের আকাশ-জমিন ব্যবধি। এই ভোর কীসের? তখনো তো বাইরেটায় চাপ চাপ ব্ল্যাকবোর্ডের মতো অন্ধকার। কেবল ম্যানেজারের ঘর থেকে চুঁইয়ে পড়ছে যান্ত্রিক আলো। তাহলে কি অন্য তাৎপর্যকে ছুঁতে চান লেখক ভোরের ব্যঞ্জনায়। খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তপোধীরবাবু :

> "এই ভোর পুঁজিবাদের; নিপীড়িত শ্রমিকবর্গের জন্যে তা আসলে অন্তহীন রাত্রির সূচনা মুহূর্ত।.........সমস্ত আলো তখন কেন্দ্রীভূত শোষকের মধ্যে।"
>
> (প্রাগুক্ত প্রবন্ধ)

আমরা মনে করি, এটা অত্যন্ত সঠিক মূল্যায়ন। এরপর আর কোনো নতুন কথা বলার থাকে না। গল্পের শেষে গিয়ে আমরা পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করতে পারবো নিপীড়িত শ্রমিকদের জীবনে কীভাবে অনন্ত-অন্ধকারে ঘনিয়ে তুললো পুঁজিবাদের রাক্ষসীপ্রত্যুষ।

বাস্তবিক ভোর এলো আরো অনেকটা পরে। ছোটো নদী দোর খুললো বড়ো নদীতে এসে। প্রথম ভোরের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন :

> "সূর্যের আলোয় জলের উপর কেহ কতকগুলি চকচকে নূতন টাকা ছড়াইয়া রাখিয়াছে মনে হয়।"

রহমানরা তো সেই টাকা সংগ্রহের জন্যেই আসছে। বৃত্তিবদলের অঙ্গীকার করেছে। সময়ের তালুতে বন্দী হয়ে এভাবেই মানুষ তার নিজস্ব বৃত্তিগুলি, মানবিক সম্পর্কগুলি বদল করে নিতে যায়। লেখকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়। সোমেনের প্রজ্ঞাও তার ব্যতিক্রম নয়।

এবং অবশেষে, বনগাঁ-বাসীদের চোখে ধরা পড়ে মিলের চিমনির স্পষ্ট আভাস। কিন্তু ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ কোনো কারণে মিল বন্ধ। কেন বন্ধ—তা ভাঙেন না লেখক; বরং রহস্যের এক কুয়াশাঘোর তৈরি করেন নিপুণ কৌশলে। আবার দেখা মেলে বাচ্চা মৌলবির। সে এসে বলে যায় :

"আমরা আইসা পড়ছি।"

এভাবে, তিনটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে কেবলমাত্র একটি যাত্রাপথ তৈরি করেন গল্পকার। লেখকের প্রধান অন্বিষ্ট যে পুঁজিপতি শোষক শ্রেণির সঙ্গে শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর অসম লড়াই, বাঘবন্দী খেলা, মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী বা আড়কাঠি ম্যানেজার ও মৌলবির কৌশলী চঙ্ক্রমণ, যা দেখানো হবে গোটা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ধরে, তার প্রস্তুতিপর্ব পূর্ণ হয়ে উঠলো 'আমরা আইসা পড়ছি'—এই কথায়।

একথা একবাক্যে সবাই স্বীকার করবেন, চতুর্থ পরিচ্ছেদটাই আসল গল্প, গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলা যায় চরমবিন্দু। তিনটি পরিচ্ছেদ ধরে যে আয়োজন, শেষ পরিচ্ছেদে এসে তারই সম্পূর্ণতা। গল্পটা যে রহমানের রোমান্টিক বেদনার নয়, অনিবার্য শ্রেণি সংগ্রামের, তা বোঝা যায়নি আগে। বুঝতে দেননি লেখক নির্মাণ-কৌশলের নৈপুণ্যে। আমরা দেখলাম, চতুর্থ পরিচ্ছেদে এসে ঘুচে গেল মুখ আর মুখোশের পার্থক্য। বেরিয়ে পড়লো শোষকশ্রেণির হাঙর-দাঁত। কৃষক আর জনমজুর বোঝাই লঞ্চটি যখন তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তখনো বোঝা যায়নি, কী ঘটতে চলেছে আসলে! তাই ম্যানেজারের চোখে আমরা দেখেছি বিশ্বজয়ের ছবি। অবাধ্য-শ্রমিকদের শাস্তি দিতে পারার সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু হঠাৎ-ই :

"একটা ভীষণ কলরব, সহস্র কণ্ঠের মিলিত চিৎকারধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল।"

সেই সম্মিলিত কলরোলে ম্যানেজারের উজ্জ্বল মুখ মুহূর্তের মধ্যে ম্লান হয়ে গেল। কয়েক মিনিটেই হাজার হাজার লোকে ভরে গেলো নদীটির ধু ধু বালিচর। হতভম্ব রহমান বিস্ময়ে ফ্যাকাশে হয়ে সবকিছু দেখছিলো। তার মনে হলো :

"যেন একটা প্রকাণ্ড নদীর মুখ হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত জল বিপুল বেগে সারাটা পৃথিবী ভাসাইয়া লইল।"

এই ভাসান আসলে শ্রমজীবীদের একতাবদ্ধ হওয়াব সংকেত। নতুন রাজনীতি-জন্মের, নতুন সমাজচেতনার সংকেত। আর এখান থেকেই গল্পের ভরকেন্দ্রটিকে সুচারুভাবে বদলে ফেললেন গল্পকার। একদিকে মিল-মালিকের অবিচার ও শোষণক্রিয়ায় ছাঁটাই হওয়া গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠিত হাজার হাজার শ্রমিক, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগী ম্যানেজার ও মৌলবির গ্রাম থেকে বয়ে আনা গণচেতনাশূন্য কৃষি-জনমজুর। একদলের লড়াই, অন্যদল কেবল দর্শক।

সেই অন্যদলেরই একজন রহমান। দেখতে দেখতে যে উপলব্ধি করতে পারছে আসল সত্যিটা কী। তার বোধের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পরিবর্তনের, নবচেতনার হাওয়া।

এখানে নিয়ে এসে সবকিছু জলের মতো পরিষ্কার করে দিলেন লেখক। কী ঘটেছে—কী ঘটতে চলেছে এবং কী ঘটবে। অবাধ্য ধর্মঘটী-শ্রমিকদের শাস্তি দিতে মালিকপক্ষ যে নবাগত শ্রমিকদের আমদানি করেছে, তাদের লঞ্চ তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকেরা ঘিরে ধরলো লঞ্চটিকে। আগতদের বোঝাতে চাইলো প্রকৃত ঘটনাটা কী। তাদের মধ্যে একজন, নেতৃস্থানীয়, দৃপ্তস্বরে ধর্মঘটের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এইভাবে ভাষণ দিচ্ছিল:

> "......যারা আপনাদের চাকরি দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাদের আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি। আমরা তাদের কাছে শুধু আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাতে গিয়েছিলাম, আমাদের সামান্য কয়েকটা মাত্র দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু তারা গ্রাহ্যই করেনি। তারা আমাদের মুখের ওপর লাথি মেরেছে। কিন্তু আমরা কেন তা সহ্য করব। আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের এই শক্তিকে পিষে ফেলবার জন্যে, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়ার জন্যে তারা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনারা তাদের বিশ্বাস করবেন না।.....আমরা আপনাদের ভাই, ভাই-এর কথা একটিবার মন দিয়ে শুনুন, ভাই এর কথা বিশ্বাস করুন—আপনারা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদের, যে লোক আজ আপনাদের ভাই-এর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তার উল্লাসকে বাড়াবেন না।—"

রহমান স্তব্ধ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না তাদের স্থানাঙ্ক। তারপর, তার চোখের সামনেই ঘটে নানান বীভৎস বিপর্যয়। মিল-ম্যানেজার জোর করে কৃষকদের নামিয়ে আনে লঞ্চ থেকে। বাচ্চা-মৌলবির সাহায্যে তাদের ঢোকাতে চেষ্টা করে মিলের অন্দরে। কিন্তু তখন চতুর্দিকে শ্রমিকদের ব্যারিকেড। সে ব্যারিকেড ভাঙার ক্ষমতা কারুর নেই। না ম্যানেজারের, না মৌলবির। এইরকম এক স্তব্ধ রণক্ষেত্রের সামনে বহমান যেন একা অভিমন্যু। স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে যায় সকলে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের আঁচ প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে ওঠে। তখনো 'জোর প্রতিরোধ'। প্রতিরোধ থেকে শ্রমিকরা সরে দাঁড়ায় না একচুল। মৌলবি বিভ্রান্ত কৃষকদের নিয়ে ভাঙতে থাকে সেই দেওয়াল। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বোঝা না বোঝার সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা রহমান ক্রমশ টের পেতে থাকে, সে আসলে শোষিতদেরই একজন। যে ছেলেটি তাকে বলে 'যার আর কোনো উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনার ইচ্ছে হয়?' রহমানের ইচ্ছে হয় তাকে একটা বিড়ি খাওয়ানোর। এর মধ্যে দিয়ে হয়তো লেখক কৃষক-শ্রমিকের শ্রেণি-মৈত্রী গড়ে তোলার সংকেত দেন। হয়তো বা তা গণচেতনার আলোয় নিশ্চেতনার অন্ধকার কেটে যাবার ইঙ্গিত। "হাজার হাজার লোকের এমন বিপুল সমাবেশ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমন বিস্ময়কর

ঘটনাবলির সাক্ষাৎ''—রহমানকে আশ্চর্যের পৃথিবীতে পৌঁছে দেয়। ক্রমে বিকেল নামে। তখনো গোলমাল অব্যাহত। রহমান দেখে, সেই ছেলেটি প্রাণপণে যখন চিৎকার করছে—গেট জুড়ে শুয়ে কয়েকটি লোক, তাদের পা দিয়ে মাড়িয়ে কতকগুলো লোক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে তাদের একান্ত আপনার জন বাচ্চা-মৌলবি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। স্তব্ধতার ভেতর সমস্ত কিছু তার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এটাই চাইছিলেন লেখক। তাই বিভ্রান্ত, অশান্ত রহমানের ভেতরে ভেতরে পালাবদলের একটা ইঙ্গিত যোজনা করে দেন। কারণ, সেই তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর জীবনদর্শনের ধারক ও বাহক।

আস্তে আস্তে গল্প ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছোয়। মালিক পক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবাদী শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ করার বা প্রতিরোধী ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার শেষ উপায়। অজস্র আহত ও নিহত মানুষের রক্তে শীতের দিনের গৈরিক ধুলো রক্তবর্ণ হয়ে যায়। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হতে থাকে। এক স্তব্ধতা থেকে আর এক স্তব্ধতায় রহমান হতভম্ব। যখন খেয়াল ভাঙে, তখন হাত-পা কাঁপছে, কানের ভেতরটা পর্যন্ত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ওঠে সে। দৌড়তে থাকে। দৌড় দৌড়-দৌড়......। অনেকটা দূরে গিয়ে বসে পড়ে। বুকে হাঁফ—মাথার ওপর কৃষ্ণচূড়ার ছায়া। তখনও ''হাত-পা তাহার....... ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে, বুকের ভিতর কালবৈশাখির ঝড়। পেছনে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছে, ... সেদিকে আবার চাহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, চক্ষু তাহার বুজিয়া আসিল।'' তার ঘুম যখন ভাঙে, তখন অনেক রাত। কোনোরকমে হাঁটতে হাঁটতে সে সেই নদীর পারে এসে দাঁড়ায়। তার মনে পড়ে সেই লোকটার কথা, যে তাদের বলেছিলো : 'আজ আমাদের যারা শুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাথি থেকে রেহাই দেবে না!'' একটা গোটা দিন ও সন্ধ্যার ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্যে দিয়ে—এই সত্যের যাথার্থ্য অনুভব করতে পারে সে। আর যখনই সে নিজেকে দুনিয়ার শোষিত শ্রমিকদের সহমর্মী বলে ভাবতে পারে, ঠিক তখনই তার রেটিনা ফেটে বেরিয়ে পড়ে জল। সেই জল-চোখে সে তাকিয়ে থাকে সেই নদীর দিকে, যে নদীর সঙ্গেই তার একমাত্র যোগ। সমস্ত সংশয় থেকে উত্তরিত হয় তার চেতনা। এই উত্তরণ প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্যের অভিভাষণ প্রণিধানযোগ্য :

> ''গণচেতনার উদ্‌ভাষণ নিশ্চয় সামূহিক উদ্যমের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইতিহাসই ব্যক্তিকে ভাঙে এবং গড়ে আর ঐ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। রহমান এইজন্যে কেবল গল্পের চরিত্র নয়, সে ইতিহাসের মানুষ। মানবিক নিষ্কর্ষের উদয়মুহূর্তে বৈপ্লবিক গণচেতনায় উত্তরণের প্রথম ধাপটি আভাসিত হয় বলে অন্তিম বাক্যটি হয়ে উঠেছে সংকেতগর্ভ।'' (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২৮)

এবং এইভাবেই গল্পকার সোমেন চন্দ 'সংকেত' গল্পের মধ্যে বুনে দিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন অর্থনীতির বিপর্যস্ত চেহারাটিকে। কৃষকনির্ভর অর্থনীতি কীভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে, আর কীভাবে-বা কৃষক পরিণত হচ্ছে শ্রমিক এবং তার মধ্যে থেকে এক আধজনের মধ্যে ঘটছে শ্রেণি ঐক্যবোধের জাগরণ—তারই সমাজতান্ত্রিক বাস্তব রূপায়ণ 'সংকেত' গল্পটি।

তিন

শিল্পীসংগ্রামী সোমেনচন্দকে লেখক হিসেবে অবশ্যই আমরা 'কমিটেড' বলতে পারি। তাঁর মন ও মনন বামপন্থী আদর্শকে আঁকড়ে ধরলেও তাঁর যে কমিটমেন্ট, তা কোনো গোষ্ঠীর সংকীর্ণ আদর্শবদ্ধ নয়; বরং বামপন্থী আদর্শ থেকে পাওয়া তাঁর কমিটমেন্টে যেন বা নিহিত থেকেছে আত্মচৈতন্য থেকে বিশ্বচৈতন্যে উত্তীর্ণ হবার আত্যন্তিক আধুনিক আগ্রহ। আর সেই আগ্রহই 'সংকেত' গল্পে ধ্বনিত করেছে নিম্নবিত্ত কৃষকজীবনের নিস্তরঙ্গ দিনযাপনের মধ্যে তলিয়ে থাকা মুক্তিকামী মানুষের চিরন্তন বিপ্লবের বিশ্বগত সুরকে।

পরিশেষে, একটি কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, একটিমাত্র গল্পের পাঠকৃতি থেকে একজন লেখককে ছোঁয়া যেতে পারে সামান্যই। সংবেদনশীল মন নিয়ে যে-জীবনকে দেখেছিলেন তিনি, মার্কসীয় মতাদর্শকে জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তাঁর, সেই অর্জন তাঁর কথাসাহিত্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। সুযোগ পায়নি। বিকাশের আগেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঘাতে তাঁর কলম থেমে গেছে, তাঁর ওপর নেমে এসেছে পূর্ণচ্ছেদ। ঠিক এখানেই একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় :

> "সুকান্তের জন্য আমবাঙালির যে স্বাভাবিক বেদনাবোধ সঞ্চিত, সোমেন চন্দের অকালমৃত্যু শিক্ষিত সকলের মধ্যে সেভাবে অপচয়ের যন্ত্রণা সঞ্চার করেনি কেন?" (প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯২)

এর দায় একান্তভাবেই আমাদের, আমাদের সময়ের। তাই বোধ করি এপারে ওপারে নতুন করে শুরু হয়েছে সোমেন-চর্চা। এই চর্চাই একদিন সমস্ত ঘাটতির অবসান ঘটাবে। এবং এই বিশ্বাসের দিকে চোখ রাখা যেতে পারে।

বিমল কর

চব্বিশ পরগনার টাকী অঞ্চলে বিমল করের জন্ম হলেও তাঁর বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে বাংলা, ও বিহার, উত্তর প্রদেশে। বিশেষভাবে বাংলার সন্নিহিত কয়লাখনি অঞ্চলে। তিনি আঠারো বৎসর বয়সে কলকাতা আসেন এবং পঁচিশ বৎসর বয়স থেকেই স্থায়ী অধিবাসীরূপে গণ্য হন।

বিমল কর উপন্যাস লিখতে শুরু করেন পাঁচের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। প্রায় দুশো গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তবে তাঁর তিন খণ্ডে 'দেয়াল' উপন্যাসটিই পাঠক মহলে সব থেকে জনপ্রিয়। এছাড়া অন্য উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'পূর্ণ-অপূর্ণ', 'অসময়', 'কেরানীপাড়ার কাব্য', 'খোয়াই', 'খড়কুটো', 'যদুবংশ', 'বালিকাবধূ' প্রভৃতি।

'ছোটগল্প : নতুনরীতি' নামে একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন। বেশকিছু উৎকৃষ্ট মানের ছোটগল্প তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল—'আত্মজা', 'মানবপুত্র', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'যযাতির প্রেম', 'সোপান', 'জননী', 'সুধাময়' প্রভৃতি।

জননী : এক অনুভবী গাথা

সুস্নাত জানা

'জননী' বিমল করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এর কাহিনী, গঠনকৌশল, নির্মাণশৈলী, ভাষাবিন্যাস, চরিত্র রূপায়ণ অসামান্য পরিপাটি, ছোটগল্পের মিতকথন-নাতিদীর্ঘ বর্ণন শৈলীর ভেতর দিয়ে গল্পের সুদূরপ্রসারী প্রেক্ষাপটের বিস্তার; সর্বপরি ছোটগল্পের চমক জননীর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে বাংলা সাহিত্যে দৃঢ় করে।

জননী শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাতর্পণ। মায়ের প্রতি সন্তান-সন্ততিদের শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠদান বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনবত্বের দাবী রাখে। শ্রাদ্ধ এখানে এভাবে আধুনিক মানবিক দৃষ্টিকোণে রূপান্তরিত হয়ে আসে। এ গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব—গল্প যত এগিয়ে চলে ততই মনে হয় যেন কোনো সত্যি ঘটনার বিবরণ আমরা পড়ছি। বাস্তব পটভূমি ক্রমশ অলৌকিক হয়ে ওঠে। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সংকার বেদীর ওপর এক কাঙ্ক্ষিত অলৌকিক পরিবেশ গড়ে সেখানে এক একজন সন্তান-সন্ততি তাঁদের শ্রেষ্ঠ দান মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন। আবার মৃত মায়ের বেদীকে ঘিরে—প্রতীকী বর্ণনায় মৃত মায়ের অবস্থানটি অলৌকিক বাস্তব। জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারি, কদম্ববৃক্ষের ছায়া, দূরে দশরথের ছেলেব বিয়ের মজলিসের সঙ্গীতের ধ্বনির বিপ্রতীপে পাঁচজন অবিবাহিত ও বিবাহ বিচ্ছিন্না পুরুষ ও নারীর জবানবন্দী। যার ভেতর দিযে তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা-বাসনাও প্রকাশিত হযে আসে ব্যর্থতাব ব্যঞ্জনায় যন্ত্রণাকঠিন উচ্চারে। এ যেন অন্য এক মহাপ্রস্থানের পথ ছবি। চসারের ক্যান্টার-বারি টেল্‌সের কাহিনী যে বকম এক এক করে আত্মকথন ভঙ্গিতে—এও এক যাত্রা, পথের মধ্যযামে থেমে আছে, মহাপ্রস্থানেব যাত্রী আত্মা। পাঁচজন নারী-পুরুষের শ্রেষ্ঠ সৎ উচ্চারণের পব-প্রজন্ম আবাব স্বর্গারোহণের পথে অভিযাত্রা করবেন। মহাভারতের বনবাস পর্বে এই ছাঁচে অন্যরকম কাহিনির প্রক্ষেপ আছে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীব কথনকে ঘিরে।

গল্পের এই চমকপ্রদ অংশের আগে একটি প্রেক্ষাপটে লেখক সুকৌশলে পাঁচটি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন কড়ে বা কনিষ্ঠ ভাই-এর কথক ভূমিকার ভেতর দিয়ে। যদিও সে পরিচয় দানও বেদনাময় মলিন উচ্চারণের ভেতর দিয়ে অসংখ্য শোককে চিনিয়ে দিতে।

মা-এর রূপ সবটাই পেয়েছিল বড়দি অনু-ঠাকুমাব ইচ্ছা অনুযায়ী। অনুপমা তার নাম। অথচ জীবনের সবচেয়ে বেশি ভাগ্য তাড়িত বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে তাকেই। বিয়ের পরই এসেছিল তাব স্বামীর রক্তের অচেনা বোগের প্রকোপে প্রথম বিকলাঙ্গ সন্তানের মৃত্যু, দ্বিতীয় পেটের ভিতর নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে ছিটকিনি তুলে চলে এসেছিল, বাপের বাড়ি আর ফেরেনি—এই প্রথম শোক।

দ্বিতীয় শোকের কাহিনি—মেজদা দীনুর দুটি চোখই বেলের কামরায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনার, দানাপুর থেকে ফেরার পথে। তৃতীয় শোক বাবার মৃত্যুতে। চতুর্থ শোক সবচেয়ে ছটফটে ছোট-র রোগকে ঘিরে। হয়তো সে আর কোনোদিন বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারবে না। মা-র বিশ্বাস ছিল এই রোগে সে মরে যাবে। এবং পঞ্চম শোক মার মৃত্যুকে

ঘিরে। এই শোকই গল্পের শুরুর কারণ। কিন্তু আরও দুটো না বলা ঘটনা শোকই এক রকমের। যা আমরা জানতে পেরেছি অনেক পরে। বড়দার না বিয়ে হওয়ার কারণ এবং গল্পের কথক কড়ের অবিবাহিত জীবন—যা গল্পে কোথাও ব্যক্ত হয়নি। হয়তো পাঁচ ভাই বোনের পঞ্চম সংখ্যাটির সঙ্গে গল্পের পাঁচটি শোককে সংখ্যাতত্ত্বে মিলিয়ে দেওয়ায় দুটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নৈঃসঙ্গ্য উপেক্ষিত হয়েছে।

চারটি শোকের পর পঞ্চম শোক মায়ের মৃত্যু। যদিও স্বাভাবিক সেই মৃত্যু—মার সাদা চুল, জড়ানো দুধের সরের মতো কোঁচকানো চামড়া, কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ। তবু হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো সংলগ্ন পাঁচ ভাই-বোনের শোক নৈঃসঙ্গের সান্নিধ্যে মাকে হারানোর অসহায়তা—এই ছিল সবচেয়ে বড় শোক।

সঙ্গত কারণেই মাকে বারোয়ারি শ্মশানে নিয়ে যেতে চায়নি পাঁচ সন্তান। পাঁচিল দেওয়া পাঁচ বিঘে জমির বাগান বাড়ি। উত্তরের দিকে করবীর ঝোপ, স্থলপদ্মের রাশিকৃত গাছ। কদমগাছ মার চিতার মাথার ওপর, পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা (বাবার মতো দাঁড়িয়ে)—এই হল পটভূমি।

ফাল্গুনে মার মৃত্যুর পর চৈত্রে শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে চিতার ওপর সুন্দর একটা বেদী করে কাশীর সাদা পাথরে সে বেদী মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নির্মিতির কাঁচা গন্ধ, হাত রাখলে পাথরের ঠাণ্ডা নরম মসৃণ স্পর্শ—এ সবই মৃত মা-র টাটকা স্মারক।

মাসান্তে বেদীর মাথার ছোট্ট কুলঙ্গিতে বড়দি জ্বালিয়েছেন প্রদীপ, ধূপ-বাতাসের ঝাপটাহীন সে দীপশিখা অকম্প-মা এর চরিত্রের মতো। অগুরু চন্দনের ধূপের গন্ধে ফিকে স্মৃতি বাতাসে ভর করে আছে। আর চৈত্রের পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় সাদা বেদীর ধপধপে রঙ। এক সহজ অনাড়ম্বর অথচ নির্মল শ্রদ্ধা তর্পণের পটভূমির স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতা ভেঙে হাতের পাঁচ আঙুলের সবচেয়ে বড় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ—বড়দা বললেন, একটি নিয়মের কথা। মাসের এই দিনটিতে একসঙ্গে সবাই বসবার প্রথা। দিদি বড়দার সমর্থক হয়েই এ রীতিকে মান্য করেও একটি ক্ষোভ যুক্ত করলেন, যদি বাবারও এরকম একটি বেদী থাকত। কিন্তু মার রাজি না হওয়ার সম্ভাবনার ভেতর দিয়ে অন্ধ মেজদাই প্রথম জানালেন, শ্মশানে পোড়ালে অনেক সঙ্গীসাথী থাকে, কেননা মৃত্যু যেহেতু আত্মার তীর্থ যাত্রার নামান্তর—তাই যাত্রার সঙ্গী পায়। মেজদার এই কথার ভেতর দিয়ে তার অন্তর যেন শব্দময় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই তীর্থযাত্রা যদি স্বর্গ হয়, তবু স্বর্গ তো শেষ কল্পনা, আরও একটা পথ আছে যা স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝের পথ। জননী গল্প এইখানে এসে অতিমর্ত্যলোকে যাত্রা করেছে। আর এই মর্ত্যসীমা অতিক্রম করবার জন্য ছোটর সব সন্দেহ পেরিয়ে দীনুর দৃষ্টিহীন অন্তরলোকের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হল।

রাঁচীর দিকে মুণ্ডা না মুণ্ডারীদের গ্রামে এক বাড়িতে দীনু একটি ছবি দেখেছিল, মাটির বাড়ির বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে আঁকা একটা বাচ্চা ছেলের ছবি, ঘোড়ায় চড়া সেই ছেলের একহাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম, কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্য জলের ঘটি—দীনুর অন্ধ চোখের ভেতরের এই ছবি স্মৃতি থেকে আসা।

'স্নেহ মমতা, ইহলোকের মায়া ও দুঃখ, পরলোকের দুর্ভাবনা—সব যেন এই ছবিতে মহৎ ও সুন্দর হয়ে কল্পিত ছিল।'

আসলে মৃত্যুর পরপারে স্বর্গারোহণের পথের যাত্রীর এই ছবি অবধারিত ভাবে পাঁচ সন্তান-সন্ততিকে দেখিয়ে দিয়েছিল আর এক ছবি—তাঁদের জননীর একক যাত্রার। শ্মশানহীন মায়ের পৃথক সংকার বেদীতে মায়ের একক অভিযাত্রায় তাই বড়দির মুখেই প্রথম স্ফুরিত হল—'মার হাতে কী দেব'—'আমায় যদি কেউ মার হাতে কিছু দিতে বলে কী দেব।'

মার হাতে কী দেব—এই প্রশ্ন এবার প্রত্যেকের মধ্যে সংক্রমিত হল। ক্ষণিক স্তব্ধতায় প্রত্যেককে অসংবিত ও বিমূঢ় করে দিল। এই কথার পরিপূর্ণ মর্ম হৃদয়ের ভেতর গিয়ে তাদের প্রত্যেককে পর্বতের অন্তিম চূড়ায় পৌঁছে দিল। যেখান থেকে তাদের হৃদয়ের নিবেদনের একক যাত্রা শুরু হবে মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রেষ্ঠ ও চরম দানের ভেতর দিয়ে। সন্তান-সন্ততির যে দান তাদের মায়ের যাত্রাপথের সঙ্গী হবে। বড়দা তাই ধীরে সুস্থে নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'আমরা কেউ মৃত্যুর পরটর বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভালো লাগছে, আমাদের মা দীনুর গল্পের মতন দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবে, আমরা মার জন্য কে কী দিতে পারি?'

যেন এইখান থেকেই অন্য এক গল্প শুরু হল, বিশ্বাসহীন আধুনিক পাঁচ পুরুষ ও নারীর সংকার গাথা। যেন এই দীর্ঘ অন্তহীন অনির্দিষ্ট কল্পিত পথে কিছু সময়েব জন্য তাঁরাও যাত্রী। বিশ্বাসহীন মন নিয়েও স্বর্গপথের পথিকের জন্য তাঁরা কিন্তু দান করেছেন তাঁদেব জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস। যে উচ্চারণ বা আত্মকথনের ভেতর দিয়ে তাঁরা এতদিন পরে আবার নিজেদেরকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন। একে অপরেব না বলা কথা পরস্পরকে নিবেদন করছেন। পরস্পরের মনেব দূরত্ব সরে যাচ্ছে, হাতেব পাঁচটি আঙুল সংলগ্ন হচ্ছে স্বর্গারোহণের পথপ্রান্তে।

তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জীবনচর্চা থেকে আহৃত বিশ্বাসই তুলে দিয়েছেন মা-র উদ্দেশ্যে।

বড়দা—মার নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ের প্রাস্তাব মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁর বন্ধু অবনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির ভাব ছিল। তাই বড়দা আব কোনোদিন বিয়ে করেন নি। তবু অবনীর প্রতি অনুবক্তিময় কনক সুন্দরী তাই ভাবী সুন্দব বংশধারার কথা ভেবে মা চেয়েছিলেন ঐ মেয়ের সঙ্গে বড়দার বিয়ে হোক। কিন্তু ভালোবাসাহীন সৌন্দর্য বড়দা সহ্য করতে পারেননি। বড়দার স্বীকারোক্তি—'আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা আরও বেশি ভালবাসি'। বড়দা তাই মাকে স্বর্গযাত্রার পথে ভালবাসার মন দিতে চেয়েছেন।

অনু—সেই স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এলে মা হাজারো চেষ্টা করেছিলেন, অনু যেন আবার সেই স্বামীর কাছে ফিরে যায়। যদিও মা-বাবাব ইচ্ছে ছিল তবু, চামড়ার ব্যবসাদারের কাছে আর ফিরে যেতে চায়নি। আগের স্বামীকে ছেড়ে এসে অনু নিজেকে বাঁচিয়েছে কিন্তু নিজের দরকারটুকু পায়নি। ওর আবার বিয়ে করবার ব্যাপারে মার সাহস ছিল না বাড়ির মর্যাদার প্রশ্নে। অনুর তাই মনে হয়েছে, মা মর্যাদা চাইত আর সে চাইত সাহস। মা কে তাই সে দিতে চায় উচিত সাহস, সৎ সাহস।

ছোট—সমস্ত অসুখ নিয়েও সুশান্তর উপস্থিতিতে সুস্থ বোধ করত। কিন্তু মা তাকে তাড়িয়ে দিল। সুশান্তর উপস্থিতিতে রোগক্লিষ্ট ছোট ওরফে নিরুর মধ্যে যে বিশ্বাস, যে ভালোলাগার স্রোত বইতে শুরু করেছিল সেদিন - তার ফল্গুধারা যেন এখনও বহমান। নিরু

তাই বলে, মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখে নি। ছোট তাই মাকে মন-আশা-ভরসা দিতে চায়।

গল্পের কথক কড়ি মার মধ্যে দেখেছিল অদ্ভুত এক স্বার্থপরতা, যে স্বার্থপরতায় কাশীর মতো মৃত্যুপরবর্তী স্বর্গারোহীর যাত্রা পথের দ্বাবে মা নির্মম ভাবে শচীন জ্যেঠামশাইকে ঠকিয়েছিলেন। কাশীর বাঙালীটোলার অন্ধকার গলির নরকে শচীনজ্যেঠার অংশীদারী নাকচ করতে, বাবার মৃত্যুর পর বাবার সঙ্গে যৌথ ব্যবসার কাগজপত্রের অংশীদারী মা নাকচ করেছিলেন মাত্র দুশ টাকায়।

বাবাও যে কাঠের ব্যবসা আর করতেন না। কিন্তু অন্যের তদারকিতে দেওয়া সেই ব্যবসা থেকে হাজার দুয়েক টাকা আসে। মা-র এই দীন আর কৃপণ মন দেখে কড়ের মনে হয়েছিল মা স্বার্থপর। মাকে তাই সে দিতে চায় স্বার্থত্যাগ—আর কিছু নয়।

এই চারটি স্বীকারোক্তিই জননী গল্পের প্রধান বিষয়—যার ভেতর দিয়ে এই চারটি চরিত্র নিজেদের উন্মুক্ত করেছে, সুন্দর বিকশিত হয়েছে। আধুনিক নর-নারীর স্বার্থ-প্রেম, অনুশোচনা, যন্ত্রণাবোধ, না পাওয়ার তৃপ্তিহীনতা এবং তার ভেতর দিয়েই তারা নিজেদের উন্মোচন করেও মাকে দিতে চেয়েছে নিষ্কলুষ মানবতা, চরিত্রের সংগুণ। মা ও সন্তানের দুই প্রজন্মগত বিশ্বাসের বিপ্রতীপ ফসল।

মেজদা দীনুর মাকে দেওয়া সংকার তর্পণ আপাত চমকহীন তবুও সর্বশ্রেষ্ঠ তর্পণের মতো। মেজদা নিষ্ঠুর নিয়তির আঘাতে সময়ের দায়ে অন্ধ। তাই তার অন্তরের অন্তহীন আলো নিষ্কলুষ ভাবে দীপিত করেছে জননী তর্পণকে। মেজদা সাদামাঠা সুরেলা গলায় বলল : 'সংকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে! তোমরা মার সংকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই।' কয়েকদণ্ড থামল মেজদা তারপর বলল, 'আমাকে যেমন একটা নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম। ...এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'

এরপর একটি উজ্জ্বল কামনার ভেতর দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ভাবেই গল্প শেষ হয়েছে 'মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।'

মেজদার আগের চারজনের দীর্ঘ বিস্তৃত অজ্ঞাত জীবনকাহিনি কথনের পর সংক্ষিপ্ত অথচ সংবদ্ধ উচ্চারণ সংকার বেদীর স্তব্ধতার পোষক। একই সঙ্গে পূর্বোক্ত চারটি উচ্চারণে মা চরিত্রের যে অভাব তাদের চোখে ধরা পড়েছে, যেন তার সঙ্গত যুক্তি দিয়ে মাকে অপবাদ মুক্ত করা হল এই বক্তব্যে—'মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল।'

সমগ্র জননী গল্পকে বেষ্টন করে আছে শ্মশানের স্তব্ধতা। মার বেদীকে ঘিরে এই স্তব্ধতা—মাত্র একমাস বিগতের টাটকা স্মৃতি, বাবা নয় কেবল মা-র বেদী, চৈত্রের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি, বৃন্দাবন থেকে আনা কদম্বগাছের ছায়া, মায়ের মাথার কাছে বাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো কনকচাঁপার গাছ—এ সবেরই অনুষঙ্গে সব চেয়ে বেশি জীবন্ত হয়ে মাকে মনে করিয়ে দেয় অগুরুচন্দন ধূপের গন্ধের সঙ্গে কুলঙ্গীতে রাখা অকম্প দীপশিখা—মার চোখের মতো স্থির।

এই স্থিরতার শিল্প আঁকতে গিয়ে প্রতিটি চরিত্রের শ্রদ্ধা তর্পণের পরই স্তব্ধতার উপমাশব্দ এঁকেছেন কথক লেখক :

১। সাদা বেদীটার গায়ে চাঁদের আলো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মলিন হল সামান্য। আমরা নির্বাক হয়ে বসে থাকলাম।

২। কথা শেষ করে বড়দি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আমরা স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাস এসে কদমের কয়েকটি শুকনো পাতা ফেলে গেল।

৩। ছোট নীরব হল। মার বেদীতে কদম ছায়া উঠে এসেছে। বড়দার পাশ দিয়ে ছায়াটা বড়দির কোলে গিয়ে বসেছে।

৪। আমি নীরব হলে বৃন্দাবনের কদমগাছ তার ছায়া আরও দীর্ঘ করল। বড়দির বুকে সেই ছায়া দেখলাম। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে।

৫। মেজদা আর কিছু বলল না। ...শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম। আমাদের মার সৎকার যেন এই মাত্র সমাধা হল।

পাঁচটি চরিত্রই যে কাহিনি-আত্মজীবন কথা উদ্‌ঘাটনের মধ্যে দিয়ে তাদের মাকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস ও অনুভব পাথেয় হিসেবে দিতে চাইছিল, তাও ছিল প্রত্যেকের কাছে অজ্ঞাত— করুণ তার সমাপ্তিও। মৃত্যুতে মার অভাবের অনুভবও প্রত্যেকের কাছে নতুন তাই তার বিস্ময়ের আঘাতও ছিল অনুবর্তী নীরবতার বাহক।

চরিত্রগুলি কথকের বর্ণনায় হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো পরস্পর সংলগ্ন থাকলেও প্রত্যেকের হৃদয়ের নৈঃসঙ্গ্য তাদের স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। ছায়াকে আধুনিক গদ্যের নানা আঙ্গিকে সাজিয়ে এই নৈঃসঙ্গ্যের স্পর্শ দিতে চেয়েছেন বিমল কর। দীনু যখন মৃত্যুর ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সেই ছোট ছেলেটার গল্প শেষ করল, (যেন ডাকঘরের অমল মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অমর্ত্যলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে।) তখন : 'অনেকক্ষণ বুঝি কেউ কোনো কথা বলল না আর। চৈত্রের চঞ্চল বাতাস বাগানের তৃণ এনে আমাদের গায়ে মাথায় ফেলে দিচ্ছিল। বেদীতে আমাদের পাঁচজনের ছায়া; পরস্পরকে স্পর্শ করে যেন ছায়ার একটি আশ্চর্য রকম জাফরি তৈরি হয়েছে।' অথবা 'আমরা আমাদের ছায়ার নকসা থেকে চোখ তুলে কখন যে শূন্য-দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানি না।'

আর এক ভাবে, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে মার বেদীতে সমবেত পাঁচ সহোদর সহোদরার বাক্‌তর্পণের ভেতর দিয়ে তাদের অসহায়তাও প্রকটিত হয়ে উঠেছে। যে অসহায় ভাঙা মুচড়ানো হৃদয়ের রুদ্ধ যন্ত্রণার আর্তি গোটা গল্পের একাধিক শব্দ ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে শৈলী বিজ্ঞানের ধারায় :

১। চাঁদের আলো ছোঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে মলিন হল

২। চৈত্রের বাতাস করবী ঝোপের তলা থেকে ধুলোর গুঁড়ো এনে মাখিয়ে গেল...

৩। হাঁটু ভেঙে একপাশে হেলে বসেছিল বড়দি...

৪। তার সমস্ত শরীর রেশম দিয়ে মোড়া সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল, ভাঙা হাঁটু মাটির ওপর ভর করা হাত...

৫। ধূপগুলো ফুরিয়ে গেছে আমরা আর গন্ধ পাচ্ছিলাম না...

৬। ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে রেল লাইনের বাতি...

৭। খুব যেন ক্লান্ত হয়ে ছোট তার মাথা আমার কাঁধে রাখল...

৮। আমার গলার শিরা যেন কেউ আঙুল জড়িয়ে জড়িয়ে টানাছিল...

৯। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে। দশরথ ধোপাদের বস্তিতে গানের সুর থেমে গেছে। একটি রাত্রিগামী ট্রেন সাঁকোর ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হুইসিল দিচ্ছে পথের জন্য। ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এখানে ভেসে আসছিল...

এসব লাইনে স্পষ্টত 'ছেঁড়া মেঘ', 'মলিন', 'ধুলোর গুড়ো', 'ভাঙা হাঁটু', 'সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ফুরিয়ে যাওয়া ধূপের প্রসঙ্গ বা দশরথের বস্তিতে বিয়ের গান থেমে যাওয়া, রাত্রিগামী ট্রেনের পথের জন্য সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে হুইসিল দেওয়া—এসবই নৈঃশব্দ্য, দুঃখ ও মৃত্যুবোধক।

আবার সমগ্র পরিবেশটিকে ঘিরে ছিল রাত, রাত্রির প্রহরান্তর। বাতাসের শব্দহীন বহমানতা। রাত্রির অন্ধকারে জ্যোৎস্নার আলোর খেলা, আলো-অন্ধকারের দ্বৈত চিত্রনাট্য পরিবেশের অলৌকিক বাস্তবতাকে তীব্র করেছে। আবার এইসব আর্তিময় নৈঃশব্দ্যের স্তব্ধতাকে আলোকিত করেছে জ্যোৎস্নালোকের চেতনাপ্রবাহধর্মী খেলা, যা আধুনিক কবিতার ভাষাভঙ্গিকে সম্ভব করে তুলে। যেরকম :

(ক) মেজদা যেন অন্ধ চোখে জ্যোৎস্না মেখে সামান্য মুখ ফেরাল...উত্তরকালে জয় গোস্বামী একটি কবিতায় এরকম অনুভবই লিখেছেন :

> জন্মান্ধ মেয়েকে আমি জ্যোৎস্নার ধারণা দেব বলে
> এখনো রাত্রির এই মরুভূমি জাগিয়ে রেখেছি। স্নান/জয় গোস্বামী

(খ) চাঁদটা সমুদ্রের জলের মতোই নীল অনেকটা। পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না।

(গ) চাঁদের আলো কদম গাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে।

(ঘ) চন্দ্রকিরণে বড়দিকে রেশমের মতন মসৃণ দেখাচ্ছিল।

(ঙ) দুধের ফেনার মতন জ্যোৎস্নায় আমার চারটি উৎকর্ণ আত্মীয় নিষ্পলকে আমায় দেখছে।

(চ) অমল জ্যোৎস্না তার সমস্ত মুখ লেপে রেখেছে, তার দুই অন্ধ নয়ন নিবিড় করে সেই আলো মাখছিল।

এসব লাইনে জ্যোৎস্না কিংবা চাঁদের আলো উল্লেখী (referencial) নেই আর, ক্রমশ তা অনুভবী (emotive) হয়ে উঠেছে।

জননী গল্পে মার সৎকার বেদীর সামনে উপবিষ্ট পাঁচটি ভাই বোন মার স্বর্গারোহণের পথে নিজেদের জীবনার্জিত অভিজ্ঞতা দান করতে গিয়ে একদিকে যেমন পরস্পরের কাছে আসছিল আত্মকথনের দ্বারা নিজেদের ভেতরের অন্যের কাছে অজ্ঞাত ইচ্ছার উন্মোচন করে। অন্যদিকে তেমনি তারা নিজেদেরকেও চিনছিল নতুন করে! উজ্জ্বল প্রসারিত ভাষায় মহাপ্রস্থানের পথযাত্রী জননীকে ঘিরে এ গল্প যেন এক সৎকার গাথা।

নিষাদ : একটি গুপ্ত হত্যার গল্প

অমরেশ মণ্ডল

চল্লিশের দশকে বিমল কর গল্প লেখা শুরু করে পরের দশকেই বাংলা ছোটগল্পে রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়েছেন। তাঁর লেখা পঞ্চাশের দশকের গল্পের সংখ্যা ৩১টি। এর মধ্যে ইঁদুর, বরফসাহেবের মেয়ে, মানবপুত্র, কাচঘর, আত্মজা, জানোয়ার, আঙুরলতা, সুধাময়, নিষাদ প্রভৃতি গল্প বহু আলোচিত ও প্রশংসিত। তাঁর এইসব বিখ্যাত গল্পগুলির প্রধান আধেয় হল মানুষের চেতন সত্তায় ও বাহ্য আচরণে, মনোগহনের আলো-ছায়ায় নানা জটিলতার অনুসন্ধান। অবচেতন মনের ক্রিয়াশীলতার বিপুল প্রভাব তাঁর এই সময়ের গল্পে একধরনের ট্র্যাজিক নিয়তিবাদের জন্ম দিয়েছিল। বিমল করের কোন গল্পই সরল গল্প নয়। ঘটনা প্রবাহ সেখানে তেমন গুরুত্ব পায় না। idia-তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয়। কাহিনীর গভীরে মানব মনের নিগূঢ় যে চিন্তা ও বোধের জগৎ, আত্মচিন্তা, আত্মকথন, তাই তাঁর গল্পকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাঁর এই ধারারই দৃষ্টান্তমূলক একটি গল্প হল 'নিষাদ'।

দুই

'নিষাদ' গল্পটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশ পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির কেন্দ্রে জলকু নামের একটি বছর বারোর বালক থাকলেও এগল্প বড়দের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতারই গল্প। ছোটগল্প জীবনের ছোট ছোট আপাত তুচ্ছ মুহূর্তকে সুনিপুণ কৌশলে ব্যঞ্জিত করে ও বৃহত্তর ভাবের অবতারণা ঘটিয়ে জগদ্বিখ্যাত। জীবনে এমন অনেক ক্ষুদ্র-তুচ্ছ ঘটনা ঘটে যা নিতান্তই মূল্যহীন, বিস্মরণযোগ্য বলে মনে হয়; কিন্তু সেই একই ঘটনা অন্যজনের জীবনে সমসময়ে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে। 'নিষাদ' গল্পের জলকু গল্পের শেষে ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে। মূলত মৃত্যু তার কাছে কীভাবে অমোঘ-অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে একদিন তাকে পরাস্ত করল সেই কথাই 'নিষাদ' গল্পে আছে। গল্পটিতে আমরা একটি নয় দু'টি মৃত্যুর উল্লেখ পাই এবং এই দুটি মৃত্যুই পরস্পর সংবদ্ধ। প্রথম মৃত্যুটি একটি ছাগলছানার, জলকুর আদরের মানিকের। মানিকের মৃত্যু ঘটেছিল গল্প কথকের হাতে। মানিক একদিন কথকের যত্নলালিত টবের ডালিয়ার ফুল ছিঁড়ে এবং ডাল ভেঙে অপরাধ করেছিল। আর একদিন মানিকের জলকু ঘন মেঘলায় আঁধার হয়ে আসা দুপুরে তরুলতা এবং কথক যখন নিভৃতে রুদ্ধ-ঘরে পাশাপাশি বসেছিল তখন জলকু তার মানিকের খোঁজে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে তাদেরকে অপ্রস্তুত করেছিল। উপর্যুপরি এই দুটি ঘটনার পরিণামে ছাগল ছানাটির মৃত্যু ঘটল কথকের হাতে। জলকু এই সত্য জানত না। তাকে কোনদিন জানানোও হয়নি। সে মৃত রক্তাক্ত মানিককে টিলার কাছের রেললাইনে খুঁজে পেয়েছিল এবং এই জন্যই সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল ঐ লৌহ দানবের আঘাতেই তার প্রিয় মানিকের মৃত্যু হয়েছে। আর এই জন্যই সে প্রতিশোধের জন্য চাপা আক্রোশে দিনের পর দিন রেললাইনে বিরামহীন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছে এবং একদিন মৃত্যুর মধ্যেই তার প্রতিবাদের চরম সমাপ্তি ঘটেছে।

তিন

'নিষাদ' গল্পে উল্লিখিত এই দুটি মৃত্যুর আড়ালে গল্প কথকের মানসলোকের যে দ্বন্দ্বময় চিন্তনের ছবি বিমল কর ফুটিয়ে তুলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে গল্পটির উপস্থাপনা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগগত তাৎপর্য আমরা বিশ্লেষণ করব। উত্তম পুরুষে বলা এই গল্পের প্রথম থেকেই Sunspense-এর ভাঙাগড়ার খেলা লক্ষণীয়। গল্পটির প্রথম বাক্যটি এই রকম : "ছেলেটি মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ...কিংবা কাল...।" লক্ষ্য করার মত এই সূচনা। গল্পের শুরুতেই পাঠক জেনে গেল কী ঘটতে চলেছে গল্পের পরিণতিতে। জলকুর কথা বলতে বলতে আরো তিনবার অর্থাৎ মোট চারবার পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলেটির অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা—ঐ একই বাক্য বিন্যাসের পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত গল্পের অনিবার্য পরিণতি—"ছেলেটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মরেছে। আজ...।"

গল্পটির সূচনায় গল্পকার একটি ইংরেজি বাক্য যুক্ত করেছেন : "You begin by killing a cat and you end by killing a man."—এতে আরো একটা চমক সংযোজিত হয়েছে। প্রথমে এই উদ্ধৃতি ব্যবহার প্রসঙ্গে গল্পকারের মন্তব্য শোনা যাক্-"একটা বই পড়েছিলাম—সম্ভবত The Conformist, গভীরতা ছিল। ওর মধ্যে একটা লাইন ছিল "You begin by killing a cat and you end by killing a man"—লাইনটা আমাকে চমকে দিয়েছিল। এই যে প্রবৃত্তি-খুনের-এটা যদি তোমার মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাহলে ফেরার আর পথ নেই। মৃত্যু তোমাকে অদৃশ্যে টেনে নিয়ে যাবে খুব কাছে, আরও কাছে। 'নিষাদ' গল্পের জলকু-ও যেন ছাগল ছানার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মারমুখী হয়ে রেললাইনের দিকে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুর খুব কাছে।" (তীব্র কুঠার : বিমল কর বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৪) আবার এই উদ্ধৃতির সাপেক্ষে গল্প কথকের কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে। গল্পের শেষে কথকের গোপন করে যাওয়া জলকুর আদরের ছাগলছানা মানিকের কথা এসেছে। স্বীকারোক্তি বা confession-এর মত করে কথক মৃত জলকুর উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছে, "জলকু, কে জানত গ্রামোফোনের দম দেওয়া অতটুকু হ্যান্ডেল ছুঁড়ে মারলে তোমার মানিক মরে যাবে। ...এই টুকুতেই কত কী যে মরে যায়! আশ্চর্য!"—কথকের অভিপ্রেত জিজ্ঞাসা—কে জানত 'অতটুকু হ্যান্ডেলের' আঘাতে ছাগল ছানার মৃত্যু ঘটা কিংবা একটা সামান্য 'ছাগল ছানার' মৃত্যুই জলকুর মৃত্যুকে এমন অমোঘ করে তুলবে? এই বাস্তবতা অন্তত সহজলক্ষ্য নয়! অতঃপর কথক বর্ণনা করে যান—"নিজের কথা নিজের কানেই ফিরে এসে লাগল। আমি শুনলাম তারপর স্বপ্নের মতন দেখছিলাম, সারা দুপুর বিকেল সন্ধে এবং প্রায় সাবারাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা মানিককে আমি কেমন করে লুকিয়ে ছেঁড়া এক টুকরো চটে করে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি টিলার ওপর...।" পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, কেন জলকু রেল লাইন তাক করে পাথর ছোঁড়ার ভয়ংকর খেলায় মেতেছিল; কী সে খোঁজবার চেষ্টা করত টিলার ওপর উঠে, রেললাইনের দিকে তাকিয়ে। কেন জলকু মারা যাবার পর কথকের মনে হয়েছে ঃ "তারপর চাঁদ একটু উজ্জ্বল হল, মুহূর্তের জন্যে...। এক মুঠো করুণ বিষণ্ণ আলো দুলে দুলে রেল লাইনের একটু জমিতে কাঁপল। যেমন কাঁপা জলে আলো কাঁপে। জলকুর রক্ত বুঝি ওখানেই ছিল। কিংবা

... মানিকের রক্ত বুঝি পাশেই ছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল কবে। কবেই।" —এখানেই তো স্পষ্ট হয়ে যায় কেন গল্পের নাম 'নিষাদ' এবং কেন গল্পের প্রথমেই ওই ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার? 'নিষাদ'-অর্থাৎ ব্যাধ বা শিকারী; নিজেকে গুপ্ত রেখে শিকারকে বিদ্ধ করার মধ্যে যে উপলব্ধি করে একপ্রকার প্রবৃত্তিগত উল্লাস। এখানে অবশ্য উল্লাস নেই, আছে সীমাহীন অন্তর্দহন।

'নিষাদ'গল্পের উপস্থাপনা নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যায়। গল্পের প্রথম দিকে জলকুর রেললাইনে পাথর ছুঁড়ে মারার খেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে কথক বলেন—"ছেলেবেলায় কে না এই খেলা খেলেছে। রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে আমরাও লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়েছি। দেখেছি, টিপটা কী রকম; হাতের জোব কতটা, লাইনের গায়ে পাথরের চোট লেগে ফুলকি জ্বলে কিনা, শব্দটা কেমন হয়।" এই বর্ণনার মধ্যে কথকের গ্রামোফোনের দম দেওয়া হ্যান্ডেল ছুঁড়ে মানিককে মারবার কী চমৎকার পূর্বাভাস আছে। আরো আশ্চর্য হল জলকুর এই খেলায় কথকের ভূমিকা। "...জলকু পাথর ছুঁড়ছে, রেললাইন তাক করে। আর প্রায় রোজই ওকে ধরে আনতে হয়। আমায়।" —এখানে একটি স্বতন্ত্র বাক্যে 'আমায়' শব্দের ব্যবহারে কথকের অপরাধ বোধেরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই গল্পে কথকের মনস্তাত্ত্বিক সংকট ধরা পড়েছে গল্পের অজস্র বর্ণনায় ও চিত্রকল্পের মধ্যে। কয়েকটি এই ধরনের উদ্ধৃতি নিম্নে সাজানো হল।

১. 'গলাটা আমার রুক্ষ বিরক্ত কঠিন, তোমায় রোজ বলি এভাবে একা লাইনে এসে দাড়িয়ো না—সব সময় গাড়ি আসছে যাচ্ছে—কোনদিন কাটা পড়বে লাইনে।'

২. '...গরম হাওয়া ঝাপ্টা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে, দূরের পুলের কাছ থেকে রেল লাইনের ধনুকের মতন বাঁকটা বিরাট এক তলোয়ারের মতন জ্বলছে, শানানো, ক্ষুরদীপ্ত আভায়।'

৩. 'আদুল গা, ছোট একটু ইজের, উদোম পা, স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে ধারালো শক্ত পাথর তুলে নিচ্ছে মুঠোয় আর পলকের মধ্যে হাতটা অসম্ভব কঠিন, হিংস্র, উন্মত্ত ভঙ্গিতে ওপরে তুলতে না তুলতেই পাশ কাটিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারছে। ইস্পাতের মসৃণ চকচকে একটা সাপ যেন অর্থহীন ছেলেখেলার আঘাত সয়ে যাচ্ছে; গ্রাহ্য নেই।'

৪. 'সমস্ত আকাশটাই যেন জ্বলন্ত সূর্য, আগুনের ঝলসানিতে গনগনে আঁচের মতন রঙ ধরেছে শূন্যে। ... আমার গাল মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল ভীষণভাবে, গলার কাছে বুকের তলায় দরদর করে ঘাম ঝরছিল...।'

৫. 'অদ্ভুত ভীত এক অনুভূতি হল আমার। মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হারালাম, চোখ অন্ধকারে ঠিকরে পড়ল, অসহ্য এক ব্যথা ঘাড়ের কাছে ছুরির ফলার মত বিঁধে গেল।'

৬. 'টিলার উপর দিয়ে যখন উঠে আসছি, জলকুর হাত আমার হাতে, মনে হল, নীচের ইস্পাতের দুটি উজ্জ্বল হিংস্র অজগর যেন তার অফুরন্ত ওষ্ঠে হাসিব আভা খেলিয়ে ঝকঝক করছে। বিদ্রূপে।'

—জলকুর জ্বরে পড়ার আগেকার এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টত একটা তীব্রতা ও প্রখরতা লক্ষ্য করা যায়। গল্প কথকের দেওয়া উদ্ধৃত বর্ণনায় এবং চিত্রকল্পে ব্যবহৃত গরম হাওয়া, তলোয়ার,ধারালো ফলা, সাপ, হিংস্র অজগর, জ্বলন্ত সূর্য, গনগনে আঁচ, ভয়ংকর দহন এবং তৎসহ গাল মুখ পুড়ে যাওয়া, চোখ জ্বালা এবং দরদর করে ঘাম—এই সমগ্র শব্দ

চয়নের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র অন্বিত হতে থাকে খুবই সূক্ষ্মভাবে। গড়ে উঠতে থাকে এক ভীষণ দৃশ্যপট। পাঠকের কাছে তখন ধীরে ধীরে 'নিষাদ' শব্দটির তাৎপর্য স্পষ্ট হতে থাকে। অতঃপর জলকুকে নিয়ে কথকের উঠে আসার ব্যঞ্জনাময় বিবরণ। উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুচ্ছের ষষ্ঠ বর্ণনাটি পাঠককে পুনরায় চমকিত করে। ঐ উদ্ধৃতির একটি শব্দে গঠিত বাক্যটি লক্ষণীয়—'বিদ্রূপে'—কাকে এই বিদ্রূপ? ইস্পাতের দুটি হিংস্র অজগর সদৃশ রেললাইন কথককে বিদ্রূপে বিদ্ধ করছে। কেননা, কথক জলকুকে অবধারিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে দিয়ে তারপর তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আর এখানেই তো স্পষ্ট হয়ে যায় কথকের অপরাধ মনস্তত্ত্বের পরিচয়।

জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর জলকু শেষবারের মত আবার রেললাইনের সেই মরণখেলায় মেতে উঠেছিল। এই সময়কার বর্ণনায় অর্থাৎ জলকুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের বর্ণনার মধ্যেও কথকের মনস্তত্ত্বের আভাস মিলবে।

১. বারান্দা থেকে নামলাম। কদম গাছের তলায় আসতেই কেমন এক লালচে আভা দেখলাম পাঁচিলের মাথায় চুপ করে পড়ে আছে।'

২. 'হঠাৎ কিসের আকুল করা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের একটা দমকা এসে ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডে ঝাপটা দিল। ঝাপটা নয়, ছোবল। বুক থেকে পলকে সাপের কিলবিল করা এক অনুভূতি মাথার স্নায়ুতে উঠে এল।'

৩. 'বরফের বিরাট একটা দেওয়ালে কে যেন আমার পিঠ ঘাড় ঠেসে ধরেছে। ঝিমঝিম করছিল মাথা!'

৪. 'চাকার বিশ্রী জঘন্য সেই শব্দটা এখন আবার কানের পরদায় শুনছিলাম। চাকা চলছে...চলছে; ইস্পাতের হিংস্রতা হাসছে। ছেলেটা মারা গেছে। কেন যেন আমার হঠাৎ আজ মনে হল।'

৫. 'আকাশে টকটকে রক্তগোলা রঙ, সূর্যটা লাল অসহ্য লাল আজ। ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল।'

৬. 'এই আলো অসহ্য গাঢ় আশ্চর্যরকম লাল। আমি জীবনে কখনও এই রঙ দেখিনি, কখনও নয়। এত ঘন, জীবন্ত, ভাষাময় হতে পারে রঙ, আমি জানতাম না।'

উদ্ধৃতিগুচ্ছে ব্যবহৃত বর্ণনায় ও চিত্রকল্পে যেন ভীতিকর, আশঙ্কাজনক এক আবহের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুকে দ্যোতিত করার জন্য একাধিক ইঙ্গিতপূর্ণ চিত্রকল্প এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস'; 'বরফের বিরাট একটা দেওয়াল', 'সাপের কিলবিল করা এক অনুভূতি'—এ সবের মধ্যে মৃত্যুর হিমশীতল অনুভূতিই ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'টকটকে রক্তগোলা রঙ', 'সূর্যটা লাল, অসহ্য লাল', 'আলো অসহ্য গাঢ় আশ্চর্যরকম লাল'—এই এতগুলো অসহনীয় 'লাল' আসলে জলকুর ক্ষতবিক্ষত শরীরের রক্ততারই দ্যোতনা। 'নিষাদ' গল্পের আদ্যন্ত এ জাতীয় চিত্রকল্পের ব্যবহার, কথকের মনস্তাত্ত্বিক নানা অশুভ সংকেত গল্পটিতে একটি রহস্যের বাতাবরণ তৈরী করেছে। আসলে বিমল করের গল্পে শেষ পর্যন্ত suspense ধরে রাখার আশ্চর্য কৌশলই এই রহস্যের মূল কারণ। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা মুখ্যত ইঙ্গিতের ভাষা, বিবৃতির নয়। গল্প নির্মিতিতে তাই সংকেতের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

চার

'নিষাদ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জলকু। সমগ্র গল্পটি কথকের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। কাজেই

এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কথক স্বয়ং। এছাড়া জলকুর বাবা, মা এবং পিসির কথাও বলতে হবে। গল্পটিতে জলকুর আদরের একটি ছাগলছানার প্রসঙ্গ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

এই গল্পের প্রায় সব চরিত্রই মিতভাষী এবং অন্তঃচারী। সমগ্র গল্পটি যাকে নিয়ে আবর্তিত সেই জলকুর মুখ দিয়ে একটিও শব্দ বলাননি গল্পকার। জলকুর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াশীলতার ছবি দিয়েই তার বক্তব্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। জলকু আদুলগায়ে নোংরা একটা ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে জেদি একগুয়ে ছেলের মত সারাদিন রেল লাইনের কাছে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শানিত করে চলে। প্রথম দিকে সে রেল লাইনের পাশের টিলার উপরে দাঁড়িয়ে থাকত। চারপাশে তন্ন তন্ন করে কাকে যেন খোঁজার চেষ্টা করত, দেখত। পরে রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে জলকু বেললাইন তাক করে করে ছুড়তে থাকে। সে ক্লান্তিহীন, বিরক্তিহীন ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ্দুরে. তাপে, লু-য়ে পাথর ছুঁড়ে যায়। তার এই সীমাহীন আক্রোশের কারণ তার আদরের ছাগলছানার মৃত্যুকে সে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তার প্রিয় মানিকেব মৃত্যুকারীকে (সে মনে করে রেল লাইনেই-তার মানিকের মৃত্যু হয়েছে।) আঘাত করে সে যেন প্রতিশোধ নিতে চায়। কিংবা সে মনে মনে বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুকারীর নিকট থেকে তার প্রিয় মানিককে পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে জলকু বোঝাপড়া করতে গিয়ে জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর থেকে সেরে উঠে সে আবার কোন এক অলক্ষ্যের ইশারায় রেল লাইনে চলে যায় এবং তার পুরানো খেলায় মেতে ওঠে। অবশেষে যন্ত্রদানবের আঘাতে জলকুর তুলতুলে নরম দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার প্রতিশোধ নেবার শিকার খেলার শেষ হয়। মৃত্যু একটা অমোঘ নিয়তি। তার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। বাবো বছরেব বালক জলকু এই মৃত্যুব হাত থেকে রেহাই পাবে কী করে?

জলকুর বাবা অসুস্থ, পঙ্গু। তাদের একতলা ছোট টালি-ছাওয়া বাড়ীর এক অংশে তারা থাকে আর বাকী অংশে ভাড়াটিয়া বসানো। গল্পের কথক জলকুদেব বাড়ীব ভাড়াটিয়া। জলকুর পীড়িত বাবা ভীষণ কম কথা বলেন। "ভদ্রলোকেব সেই দুর্লভ গুণ আছে, দুর্ভাগ্যের কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে যারা চান না।" বাড়ির ভাড়াটিয়া অর্থাৎ কথকের সঙ্গে সামান্য কিছু প্রয়োজনের কথা-ঘরের ভাগ-বাঁটরা, ভাড়া, ভাড়ার তারিখ এইসব খুঁটিনাটি ভিন্ন অন্য কোনরকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা কোনদিন হয়নি। ভদ্রলোক সহানুভূতি পাবার জন্য তাঁর পঙ্গুতার ইতিবৃত্ত-ও কখনও কারো কাছে শোনাতে চান না। অতিশয় চাপা প্রকৃতির স্বল্পবাক্ এই ভদ্রলোক রুগ্নতা ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে কখনও কখনও অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। এই চরিত্রটির মধ্যে কোন রকম সমস্যার বিরুদ্ধে সক্রিয় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

এই গল্পে জলকুব মাকে দিয়েও গল্পকার কোন কথা বলাননি। জলকুর মা "রোগা, রুগ্ন, কালো, অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া গ্রাম্য। মুমূর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুকছে। রান্না ঘর আর উনুন, মসলা বাটা, ঘর ঝাঁট, কুয়া তলায় বসে বাসন মাজা সংসারের এই শ'খানেক অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে জলকুর মা-র ভোর শুরু হয় এবং স্বামীর অসাড় দুর্গন্ধ শরীরে মালিশ মাখাতে

মাখাতে মাঝরাতের বেহুঁশ ঘুমে ঢুলে পড়ে দিনটা তার ফুরিয়ে যায়।" পারিবারিক প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তিনি নীরবে সংগ্রাম করে চলেছেন। এই চরিত্রটির মধ্যেও সহজে বিচলিত না হবার মত মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এবং তাঁকে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবারের কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে দেখা যায়।

জলকুর পিসি তরু-তরুলতা। "ঢেঙা রোগাটে গড়ন। মুখের ছাদটি লম্বা ধরনের। গায়ের রঙ মাজা কালো।" তরুর বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। বিয়ে হয়নি। একটি দু'টি বসন্তের না মেলানো দাগের সঙ্গে হতাশা এবং কাতরতা মাখানো সেই মুখ কেমন যেন রিক্ত শূন্য অবোধ দেখাত। সে ঘরের কাজ সামলে জলকুকে দেখাশোনা করত। জলকু তার শাসন এড়িয়ে রেল লাইনে পালিয়ে গেলে যে বিরক্তি মাখা সুরে জলকুকে ডাকত। বাড়ীর সীমানার বাইরে তাকে বড় একটা যেতে দেখা যেত না। আর এই রক্ষণশীলতার জন্যই হয়ত কথককেই রেল লাইন থেকে প্রায়ই জলকুকে ধরে নিয়ে আসতে হত। তরু গান ভাল বাসত। কথক যখন তাঁর গ্রামোফোন বাজাতেন তখন তরু তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনত, পরের দিন দেখা হলে বলত, "ওই গানটা আজ আর একবার দেবেন? বড্ড ভাল গান।" কখনও কখনও কথকের ডাকে পাওয়া বাংলা মাসিক পত্রিকা চেয়ে নিয়ে তরু পড়ত। তার গল্প পড়তে খুব ভাল লাগত। 'নিষাদ' গল্পে তরু এবং কথকের উপর অনঙ্গদেবের পুষ্পধনুর শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যদিও গল্পে তা যুগপৎ ঈষৎ প্রচ্ছন্ন থেকেছে এবং গল্পের অবধারিত পরিণতির দিক নির্দেশক হয়েছে। তরু এবং কথকের মধ্যে মানসিক নৈকট্য স্থাপিত হতে শুরু করেছিল। গল্পে কথকের স্বীকারোক্তি : "গল্প করতে, গান শুনতে তরু এলে আমি বোধ হয় অখুশী হতুম না।" জলকু পালিয়ে গেলেই তাকে ডাকতে ডাকতে তরুলতা কথকের বারান্দার কাছে এসে থামত। তরুর এই পরোক্ষ অনুনয়ে কথক সাড়া না দিয়ে পারতেন না। তিনি তখন রেল লাইনের কাছ থেকে জলকুকে নিয়ে আসতে যেতেন। এ যেন তাদের নিত্য দিনের ভাববিনিময়। তরুর দাদা পঙ্গু, অক্ষম ফলে বাড়িতে সক্ষম পুরুষ মানুষ বলতে কথকই আছেন। কাজেই দুর্বল এই পরিবারটি কথকের উপর বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। তরুও কথকের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। নারীমনের ক্রিয়া বড়ই রহস্যময়। কথকের দেওয়া হোমিওপ্যাথ ওষুধে জলকুর জ্বর সেরে যাওয়ার পর তরু কথককে কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানাতে ভুল করায় তাকে রীতিমত ধমক খেতে হয়েছে। তরু অবশ্য এই শাসনের কোন প্রতিবাদ করেনি, বরং তাঁর এই ধমক দেওয়ার অধিকারকে সে অনুমোদন করেছে। তরু প্রসঙ্গে কথকের একটি স্বগতোক্তি : "তরু কি চলে গেছে? তরু জানত, আমি ফুল ভালবাসি, তরু জানত, আমি গান ভালবাসি, তরু জানত আমি তাকেও ভালবাসতে শুরু করেছিলাম—সবই জানত তরু।" তাহলে তরু কী জলকুর ছাগল ছানার হত্যাকারীকে জানত? মৃত্যু মানুষের জীবনে এক অনিবার্য নিয়তি। এই নিয়তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ সম্ভব নয়। শুধু কৃত পাপকর্মের জন্য আছে সীমাহীন অন্তর্দহন, দুঃখ ও বেদনা। আর এই দুঃখ-দহন থেকেই জন্ম নেবে আত্মশুদ্ধি।

রমাপদ চৌধুরী

(জন্ম : ১৯২২)

বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় রমাপদ চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম শিক্ষা জীবন এখানে অতিবাহিত করার পর সতের বছর বয়সে কলকাতা আসেন। 'চতুরঙ্গ', 'পূর্বাশা' প্রভৃতি সাময়িক পত্র এবং 'দেশ' পত্রিকাতেও তাঁর নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হতে থাকে।

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' (১৯৫৪) তারপর থেকে অনেক উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনা করেছেন—'লালবাঈ', 'অরণ্য আদিম', 'এই পৃথিবী পান্থশালা' 'বনপলাশীর পদাবলী', 'বাঘবন্দী' প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন।

উপন্যাসের পাশাপাশি প্রায় একশো ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল—'করুণ কন্যা', 'অঙ্গপালি', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'দরবারী', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ : সভ্যতার সংকট

স্বস্তি মণ্ডল

বিংশ শতাব্দীর উত্তরসাতচল্লিশে যাঁরা ছোটগল্প লিখে পাঠকের মনে বিস্ময় জাগিয়েছেন, রমাপদ চৌধুরী এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'ভারতবর্ষ', 'গতযুদ্ধের ইতিহাস' 'তিতির কান্নার মাঠ', 'মানুষ-অমানুষের গল্প', 'ইমলী', 'ব্রীজ', 'বড়বাজার' এরকম বেশ কিছু গল্পের নাম করা যায়। প্রথম গল্প লেখেন ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সিতে পড়বার সময়। গল্পটির নাম 'ট্র্যাজেডি'। ওয়াই এম. সি.এ. রেস্তোরাঁয় বসে গল্পটি লেখেন এবং 'আজকাল' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হয়। 'দেশে' প্রকাশিত প্রথম গল্প 'তিতির কান্নার মাঠ।' রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প 'বারোঘোড়ার আস্তাবল'; পরে নামবদলে রাখেন 'শাস্ত্রা'। গল্প উপন্যাস দুইই কম লেখেন। নিজে প্রচারবিমুখ। আজ পর্যন্ত তাঁর লেখালিখির সংখ্যা খুবই কম। নিজে মিতবাক; লেখা-লিখির ক্ষেত্রেও মিত সংযমী এক বিশিষ্ট লেখক।

'ভারতবর্ষ' গল্পটি রমাপদ চৌধুরীর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। এটির প্রকাশকাল ১৯৬৮। গল্পটি অনুবাদ করেছিলেন ক্লিনটন বি.সিলি। গল্পটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লিটারারি ওলিম্পিয়ানস্ গ্রন্থে স্থান পায়। এ গল্পটি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির গল্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট এর রচনার কেন্দ্রীয় সময়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগ্রাসী নীতি, লোভ, কালোবাজারী, মূল্যবোধহীনতা নিয়ে লেখা গল্পের ছক এখানে ব্যবহৃত হয়নি। অন্তর্মুখী স্বভাবের ছোটগল্পকার রমাপদ চৌধুরী তাকিয়েছেন ব্যক্তি ও সমাজের গভীর মর্মমূলে। একটা যুদ্ধের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক জীবনধারা কিভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়; নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তার সতর্ক অনুসন্ধান করেছেন গল্পকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় দুদশক পরে লেখা এই গল্পে স্বাভাবিক ভাবেই নির্মোহ আবেগ আঁকা নিখুঁত বীক্ষার স্বাক্ষর সহায়ক হয়েছে। এই বীক্ষা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে লেখকের ইতিহাসবোধ, জাতীয়তাবোধ। গল্পের শেষবাক্য মর্মন্তুদ আত্মযন্ত্রণাজাত বেদনাকেই বাঙ্ময় করে তুলেছে—

'ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখারি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব-সব ভিখারি হয়ে গেল।'

অস্তিত্বকে হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হলো শুধু মাহাতো গাঁ নয়; যেন একটা গোটা দেশই এই সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের আত্মসম্মান হারানোর গল্প এটি। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীনভারতবর্ষে ষাটের দশকের প্রান্তে এসে জাতীয় জীবনের নিদারুণ হতাশা দেখে বিমর্ষ সংবেদনশীল গল্পকার এরকম একটি গল্প লিখলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দুটিদশকে চারপাশের সামগ্রিক বঞ্চনা, হতাশা, বিক্ষোভ, বেকারত্ব লেখককে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে তিনি এমন এক মানবিক অপচয়ের গল্প লিখতে পারলেন।

যে সময়ে দাঁড়িয়ে গল্প লিখছেন সেই সময়ের বেদনার্ত স্পন্দন তাঁকে অনুসন্ধানী

করেছে। কিভাবে কবে থেকে তিলে তিলে সব হারানো, সব খোয়ানোর পালা শুরু হয়েছিল তার উৎস খুঁজতে খুঁজতেই তিনি সদ্য পার হয়ে আসা মহাযুদ্ধ প্রভাবিত সময়কালকেই উপযুক্ত মনে করে সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমান সময়েব অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সদ্যঅতীতকেই খুঁড়ে তার গভীর তলদেশকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সে কারণেই গল্পের কথক রূপে বেছে নিয়েছেন ঠিকাদার চরিত্রকে যিনি আমি অর্থাৎ উত্তমপুরুষের বচনে এই পরিণতির কথা; ভারতবর্ষের রূপান্তরিত চেহারাটা বর্ণনা করেছেন। এই উত্তমপুরুষই একদিন মাহাতো ছেলেমেয়েকে শিখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আনুগত্য, দাক্ষিণ্য কিভাবে গ্রহণ করতে হয়। তিনিই বলেছিলেন 'সাহেব বখশিস দিয়েছে; বখশিস তুলেনে'। তিনিই চকচকে আধুলি, টাকা কুড়িয়ে মাহাতোদের হাতে দয়ার দান তুলে দিয়েছেন। উপনিবেশবাদের আনুগত্য-শিখিয়েছিলেন যিনি, তিনিই গল্পের শেষে মানুষগুলিকে ভিখিরিতে পরিণত হতে দেখে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পেয়েছেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের দ্বন্দ্ব আর সুগভীর ট্র্যাজেডিই এ গল্পের পরিণাম নির্দেশিত করছে। এটাই হলো ভারবর্ষের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি। চরম নৈতিক বিপর্যয়ের জন্য কে বা কারা দায়ী এই গভীর সত্যই উচ্চারিত হয়েছে গল্পের শেষবাক্যে। গল্পটির চূড়ান্ত বক্তব্য ও উপস্থাপনা অনবদ্য।

নাম নেই, পরিচয় নেই, চাকচিক্য কিছুই নেই-এমন একটা অখ্যাত জায়গায় ট্রেন বোঝাই করে আসাযাওয়ার পথে দুদন্ড থামত, চা ব্রেকফাস্ট খেত আমেরিকান সৈন্যদল অথবা ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীর দল। এটা কোনো স্টেশন বা জংশন স্টেশন নয়। ফৌজী সংকেতে জায়গাটা বি.এফ.থ্রি-থার্টি-টু নামে চিহ্নিত হত। প্ল্যাটফর্ম, টিকিটঘর যাত্রী ট্রেন থামা-ওঠা কোনটাই এখানেই হয় না। কোনো আপ ডাউন ট্রেন কিছুই দাঁড়ায না, শুধু সৈনিকে বোঝাই ট্রেন হঠাৎ হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থামত ব্রেকফাস্ট নেবার জন্য। গল্পের কথক ঠিকাদার, কুক বিহারী ভগোতীলাল জানত ট্রেন থামবে। তাই তারা সৈনিকদের জন্য ডিমসেদ্ধ পাঁউরুটি আর কফি বানিয়ে ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করে রাখত। জায়গাটায় ব্রেকফাস্টের ডিমেব খোলা জমতে জমতে একদিন নাম হয়ে গেল 'আন্ডাহল্ট'। আর কিছু দিনের মধ্যেই জায়গাটা কাঁটাতারে ঘেবা দিয়ে মোরাম দিয়ে উঁচু করা প্ল্যাটফর্মের চেহারা নিল। রাতারাতি জায়গাটা জাতে উঠল। বন্দীদল ছাড়াও মিলিটারি স্পেশাল দাঁড়াতে লাগল। গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, হিপপকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান মিলিটাবি সৈন্যরা ট্রেন থেকে নেমে পাইচারি করত, ঠাট্টা হাসিতে হল্ট স্টেশন সরগরম করত, আবার চলে যেত।

হল্টের অদূরে ছোট বেঁটে খাটো পাহাড়ী টিলাব নীচে মাহাতোদের গ্রাম। হাঁস মুরগী পালত মাহাতোরা, হাটে হাটে মুরগীর ডিম বেচত, ক্ষেতিতে কাজ করত। এরা দূর থেকে মাঠের ধারে দাঁড়িযে ট্রেনের আসা যাওয়া দেখত অবাক চোখে। ঠিকাদার কথকের কথায় জানা যায়—'ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে খামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খটাস মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মতো কখনো কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়।' মাহাতো গ্রামের ছেলে-বুড়ো-যুবা নিজেদের সবল জীবন ছন্দেব বহমানতায় নিজেদের মতো বেড়ে উঠেছিল। ওদের জীবনযাত্রায় ছিল প্রাকৃতিক জীবনের স্বাভাবিকতা। কিন্তু হল্ট স্টেশন ক্রমে ক্রমে তাদের বদলে দিল। এরা দূর থেকে সোৎসাহে দাঁড়িয়ে ট্রেন

দেখত। একদিন হঠাৎ মাহাতো গাঁয়ের একটা ছেলে নেংটি পরা চেহারা নিয়ে কাঁটাতার থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে দেখছে আমেরিকান সোলজারদের। সৈনিকদের একজন ছেলেটার উদ্দেশ্যে উঁচুগলায় শব্দ করলে ছেলেটা গাঁয়ের দিকে ছুটে পালাল। কিন্তু আর একদিন ট্রেন থামলে আবার সেই ছেলেটা কাঁটাতারের ওপারে এসে দাঁড়াল সাহসে ভর করে। সে একা নয়; আর একটি একটু বড়ো তাবিজ গলায় ছেলেও দেখছে সৈন্যদের। তাদের নেংটি পরা রোগা শীর্ণ শরীর, কালো গায়ের রঙ, রুক্ষ চেহারা দেখে একজন সৈনিক কফিতে চুমুক দিতে দিতে আর একজনকে বলল 'অফুল'। ছেলেদুটো কথার মানে বোঝেনি; তারা তাকিয়ে দেখেছে মানুষগুলিকে। ক্রমে ক্রমে মাঠের কাজ ফেলে ছেলেদুটো ছাড়াও বছর পনেরোর একটি মেয়ে, দুজন মাহাতো পুরুষ এসে দাঁড়াল। ট্রেন চলে যাবার পর তারাও হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল। যাদের খেতের কাজ ছেড়ে কোথাও নড়বার অবসর নেই, তারাই এখন মিলিটারি ট্রেন এসে দাঁড়ালে সবকাজ ছেড়ে ছুটে আসে কাঁটাতারের ধারে। এখন একজন, দুজন, পাঁচজন নয়। দলে দলে সারি দিয়ে কাঁটাতারের ধারে দাঁড়ায়। এভাবেই বদলে গেল গ্রামীণ মানুষগুলির অনেক কিছু। অর্ধনগ্ন, রিক্ত শীর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইয়াঙ্কি বর্ণ-গৌরব নিয়ে দাম্ভিক অহঙ্কারে সৈন্যদের কেউ কেউ করুণা ছুঁড়ে দিল কাঁটাতারের ওপারের মানুষগুলির উদ্দেশ্যে। চকচকে আধুলিটা দেখে মাহাতোরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করত লাগল। কিন্তু তারা আধুলিটা হাতে তুলে নেয় নি। ঠিকাদার কথকই মাহাতো বুড়োর হাতে আধুলি তুলে দিলেন। এরপর ট্রেন এসে দাঁড়ালেই গ্রামের ছেলেবুড়ো মেয়ে সবাই কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করত। সমস্বরে বলত 'সাব বকশিস্ বকশিস্।' আর আমেরিকান সৈনিকরা তাদের উদ্দেশ্যে মুঠো মুঠো আনি, দুয়ানি ছুঁড়ে দিত। ওরা হুমড়ি খেয়ে পয়সাগুলো কুড়োতো। কাঁটাতারে হাত পা ছড়ে যেত; কারোর কারোর নেংটি কাপড় তারে লেগে ফেঁসে যেত। একমাত্র মাহাতো বুড়ো আসত না। সে খেতে মাটি কোপাত অথবা গাঁয়ের ছেলেবুড়োদের পয়সা নেওয়ার জন্য ধমক দিত।

বিদেশী সৈনিকদের কাছে নিজের দেশের মানুষের এই ভিক্ষাবৃত্তি; এই কাঙালপনা প্রকাশ করতে দেখে ঠিকাদার কথক ক্ষুব্ধ হতেন। আমেরিকান অফিসার যেদিন 'অফুল' বলেছিল সেদিনও ঠিকাদার ব্যথিত হয়েছিলেন। যতবার সৈন্যরা পয়সা ছুড়ে দিত ততবারই ঠিকাদার কথক নিজের দেশের মানুষের হীনম্মন্যতায় লজ্জিত হতেন। আবার মনেমনে মাহাতোবুড়োর ব্যতিক্রমী আচরণের জন্য গর্ব হতো। কারণ মাহাতো বুড়ো ক্ষেতের কাজ ফেলে এসে ভিক্ষা চায়নি। যেদিন অফিসার কালো দীন দরিদ্র মাহাতোগাঁয়ের মানুষগুলিকে 'ব্লাডি বেগার্স' বলে কটাক্ষ করল সেদিন জানকীনাথ ও কথক অপমানে মাথা তুলে তাকাতে পারলেন না। ট্রেন চলে যেতেই ভগোতীলালকে নিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে তেড়ে গেলেন। দেশীয় মানুষের বিদেশীর কাছে হীনবৃত্তি প্রকাশ অসহ্য মনে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুড়ো হাসতে হাসতে কুড়নো পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে গাঁয়ের দিকে চলে গেল। সজীব মাটির মতো সরল মানুষগুলির হীনপরিবর্তনে কথক অপমানিত বেদনার্ত হলেন।

ঠিকাদার কথকের কাছে মাহাতো বুড়োর আচরণ ছিল গর্বের বিষয়। একা মাহাতো

বুড়োই যেন তার গ্রামের মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। কিন্তু আত্মসম্মানের এই শেষ অবলম্বনে মাহাতো বুড়োও একদিন গড্ডলিকা স্রোতে মিশে গেল। সেও সেদিন ট্রেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব মাহাতো নারীপুরুষের সঙ্গে সমস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল 'সাব বখ্‌শিস, সাব বখ্‌শিস! উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।'

হল্ট স্টেশনে আর ট্রেন থামবে না। যুদ্ধ শেষ, সৈন্যদলের গলায় মুক্তির গান। ট্রেন ভর্তি সৈনিক গান গাইতে গাইতে চলে গেল। কিন্তু যে মাহাতোরা ক্ষেতের কাজে, নিজস্ব জীবন যাত্রায় ছিল স্বাধীন, অবাধ মুক্ত আনন্দের অধিকারী, তারা সবাই পাল্টে গেল। ক্ষেতের চাষ করত ঘাম ঝরিয়ে; ফসল ফলাতো অবাধ আনন্দে, তারা সবাই এখন ভিখিরি হয়ে গেল। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী কর্মহীন হয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হল। আত্মসম্মান বিকিয়ে 'বলাডি বেগার্স' রূপে করুণা ভিক্ষার হীনতার বেদনায় নিঃশেষিত, এখানেই গল্পটি শেষ হয়েছে।

এ গল্পের ছত্রে ছত্রে লেখকের দেশপ্রেম প্রচ্ছন্ন আছে। গল্পের কথক ঠিকাদার, ভগোতীলাল আর জানকীনাথ যেন এ দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, যারা ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় আত্মঅবমাননার যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয় আবার নিজেদের কাজের দ্বারা পরোক্ষে আত্মঅবমাননার পথ তৈরী করে—এই দ্বন্দ্ব তীব্র তীর্যক বাক্যে বারবার স্পষ্ট হয়েছে। ঠিকাদার কথক মিলিটারি সৈন্যদের ব্রেকফাস্টের তদারকিতে শশব্যস্ত, সাপ্লাই ফর্ম মেজরকে দিয়ে ও. কে করানোর জন্য তৎপর হতেন। সুযোগ পেলেই হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করতেন পরের দিনের ব্রেকফাস্টেব কন্ট্রাক্ট পাবার জন্য। আবার এই ঠিকাদার কথক যখন একজন সৈনিককে দাঁড়িয়ে থাকা মাহাতোদের সম্বন্ধে 'অফুল' বলতে শোনেন তখন মর্মাহত হলেন। ঠিকাদারই একদিন মাহাতোদের উদ্দেশে সৈনিকদের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আবার এই চরিত্রকেই মাহাতোদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখে কুণ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছে। অধীনতাস্বীকার ও মুক্তির দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব। যেদিন মার্কিন অফিসার কালো কালো নেংটি পরা মাহাতোদের উদ্দেশে 'ব্লাডি বের্গাস' কথাটি বলেছিল সেদিন কথক নিজেকে চরম অপমানিত বলে মনে করেছিলেন—'আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু আমি রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলাম।' এ অপমান একজন ভারতবাসীরূপে। শাসকশ্রেণীর শোষণ অবজ্ঞা যেন 'ব্লাডি বের্গাস' কথাটায় নির্মম আঘাত সৃষ্টি করেছে। সৈন্যদের পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া আর মাহাতোদের পয়সা কুড়িয়ে নেওয়া কথকের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। অস্তিত্ব যে বিপন্ন এ বোধ এগল্পে কথকের মানসিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মনে উনিশ শতক থেকেই যে দ্বন্দ্ব অবিরত দানা বেঁধে চলেছে তারই যন্ত্রণাময় প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে।

'ভারতবর্ষ' নামটি ব্যঞ্জনাময়। ভারতবর্ষ থমকে আছে কাঁটাতারের ওপারে সমবেত মাহাতো নারীপুরুষের ভীড়ে। তাদের সমুচ্চ কণ্ঠস্বরের আকুতিতে উচ্চারিত হয়েছে ভারতবর্ষের

প্রকৃত অসহায়তা। ঠিকাদারের ভারতবর্ষ সর্বদা সন্ত্রস্ত বিদেশী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে ও. কে. সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিজের ঠিকাদারী বা কন্ট্রাক্টকে কায়েমী করে রাখতে ব্যস্ত অন্যদিকে অগণিত নেংটি পড়া রুক্ষচুল ভয়মিশ্রিত কৌতূহলীর দৃষ্টিতে আর এক ভারতবর্ষ থমকে আছে। সুযোগ পেলেই বখশিস্ বখশিস্ করে নিজেদের দীনতা নগ্নতাকে হাসতে হাসতে মেলে ধরে এরা। স্বজাতির এই ভিক্ষাবৃত্তির হীনতা যে ঔপনিবেশিকতা মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষেও অব্যাহত আছে সেটা গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। সার্বিক অবক্ষয় যে ভারতবাসীকে গ্রাস করে রেখেছে সেটাই শাণিতব্যঙ্গে প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধশেষ চারিদিকে মুক্তির বার্তা। তবুও মানুষগুলি ভিক্ষুক রয়ে গেল—এটাই উপনিবেশবাদের মর্মন্তুদ ট্রাজেডি। মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, অগণিত সাধারণ মানুযের ভারতবর্ষ সব একাকার হয়ে গিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষকশক্তির অবজ্ঞাভরা করুণার দান দুএকটি সিকি আধুলি ছুঁড়ে দেওয়া ও সেই দাক্ষিণ্য পাবার জন্য কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনায়। 'ভারতবর্ষ' নামটি এই কারণেই প্রতীকতা লাভ করেছে। মাহাতোগাঁয়ের সমবেত মানুষগুলিও খেতকাজ হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। তারাও প্রতীকতা পেয়েছে—'উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চীৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো'—সবাই মিলে আত্মসম্মান হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবী কৃষকের ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া—এই হলো ঔপনিবেশিক শাসনে বিক্ষত ভারতবর্ষের অমোঘ নিয়তি। যারা রৌদ্রে পুড়ে জলে ভিজে শাসন শোষণ অত্যাচার উপেক্ষা করে অন্ন তুলে দিত সকলের মুখে, তারাই এখন স্বাধীনবৃত্তির গৌরব হারিয়ে অন্নদাস ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। একটা জাতির চারিত্রিক মানসিক স্বাধীনবৃত্তির আমূল করুণ পবিবর্তনের ছবি এঁকেছেন লেখক। যাদের নিয়ে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস-মাটি-প্রান্তর ফসলের মাঠ গর্বিত ছিল তারাই গর্বের গিরিচূড়া থেকে চূড়ান্ত পতন ঘটিয়ে দাসত্বের ভিক্ষুকবৃত্তিকে স্বীকাব করে ভারতবর্ষের সার্বিক রূপান্তর ঘটিয়েছে—জ্বালা ক্ষোভ তীর্যক ব্যঙ্গ বেদনায় এই চরম সত্য উচ্চারিত হযেছে 'ভারতবর্ষ' নামকরণে।

ছোটগল্পের শৈল্পিক সংগঠনেই একটা গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে। ভালো ছোটগল্প আকারে ক্ষুদ্র, ভাবগভীরতায় অখন্ড উদ্ভাস ঘটায়। আঁটোসাঁটো গঠনে সূক্ষ্মব্যঞ্জনা প্রতীকী তাৎপর্য সৃষ্টি করে ভালো ছোটগল্প। সেখানে থাকে গল্পকারের অন্তরঙ্গ গভীর নির্জন কণ্ঠস্বর। 'নির্জন' এই অর্থে যে সে স্বর তাঁর একান্ত নিজস্ব বোধ ও অনুভূতি থেকে জাত। সবমলিয়ে ভালো ছোটগল্প দক্ষ শিল্পীব সুন্দরতম অনুভবের সার্থক প্রকাশ। আলোচ্য গল্পে রমাপদ চৌধুরীর শিল্পীমনের মৌলিকতার সুন্দরতম প্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালকে পটভূমি করে ঐ সময়ের মর্মভেদী যন্ত্রণাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ নিজস্ব নির্জনভঙ্গিতে। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলিকে ভাবঐক্যে সুগ্রথিত করে তাঁর বেদনাবোধ ও ইতিহাসচেতনাকে বাঙ্ময় শিল্পরূপ দান করেছেন। মরমী পাঠকের মনে গল্পপাঠ শেষে ঘনীভূত বেদনার শিল্পবাণী বৃহত্তর ভাব ব্যঞ্জনা জাগায়।

একটি খণ্ডিত অংশ বেছে নিয়ে গল্পকার দেখালেন হল্ট স্টেশন কিভাবে তৈরী হলো; কারা কখন সেখানে আসত, তাদের দু একটি কথা, হাঁটা চলায় তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট এঁকে সীমার মধ্যে চূড়ান্তের বিস্ময় বেদনাকে স্থাপন করেছেন। হল্ট স্টেশনের অদূরে মাহাতো গ্রাম;

একজন, দুজন করে অনেকজনের মাহাতো ছেলে মেয়ে, নারীপুরুষের ভিড়; তাদের উদ্দেশ্যে ইয়াঙ্কি সৈন্যদের হাসি বিদ্রূপ, করুণা ছুঁড়ে দেওয়া, ধীরে ধীরে দ্বিধা কাটিয়ে মাহাতো দীন মানুষগুলির দান গ্রহণ ও ভিক্ষার আবেদন-এমনি খন্ডখন্ড অংশের সংযোজনে Pieces of artistic organisation গড়ে তুলেছেন লেখক। আর চূড়ান্তে এসে চলন্ত ট্রেনের সৈনিকদের কাছে 'বখশিস্ বখশিস্' বলে সকলের সঙ্গে স্বাধীন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মাহাতো বুড়োর স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্বর মেলানো মর্মবিদারী ট্র্যাজিক বেদনা জাগিয়েছে। তখনই ছোটগল্পের চূড়ান্ত শিল্প সার্থকতা ঘটেছে। বিন্দুর মধ্যে যেন সিন্ধুদর্শন করালেন লেখক। গল্পটি প্রতীকতা লাভ করল। তখন এ গল্প শুধু ভারতবর্ষের কোনো এক অখ্যাত পাণ্ডববর্জিত স্থান ও মুষ্টিমেয় মাহাতো মানুষজনের তাৎক্ষণিক ক্ষয় ও পতন এবং বিচ্যুতির গল্প হয়ে থাকল না। গল্পের এই চূড়ান্ত পরিণতিতে উঠে এল গোটা ভারতবর্ষের অমোঘ অনিবার্য নিয়তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণকে অবলম্বন করে ছোটগল্পের সীমিত পাত্রে ভারতবর্ষের সামগ্রিক সামাজিক সঙ্কট ও পরিণতিকে ছোটগল্পকার তাঁর সুগভীর ইতিহাসবোধ ও দেশপ্রেমের অন্তরঙ্গ নির্জন কণ্ঠস্বরে সার্বিক বেদনা রূপে প্রকাশ করলেন। মাহাতো বুড়ো যে মানবিক আদর্শ ও মূল্যবোধ আঁকড়ে অস্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করে ঠিকাদার কথকের নৈতিক অবলম্বনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেও যখন ভিখারিতে পরিণত হল তখন অস্তিত্ব হারানোর যন্ত্রণা অপমান ছাড়া ভারতবর্ষের মানুষের আর কিছুই টিঁকে থাকল না—এই মর্মভেদী নিরুচ্চার বেদনা পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। ঠিকাদার কথকের বাচনে নির্মম সত্য উচ্চারিত হয়—'আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের সবাই ভিখারী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সবাই ভিখিরী হয়ে গেল।' এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর সুগভীর নির্জন কণ্ঠস্বর যাকে 'The lonely voice' বলা হয়েছে সেটাই গল্পের অন্তিমবাক্যে ব্যঞ্জনা প্রতীকতায় অখণ্ডতাবোধ জাগিয়েছে। মার্জিত গদ্যময় বাস্তবতায় একটা জাতির, একটা গোটাদেশের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণার আর্ত মৌন ক্রন্দন অসামান্য বক্তব্য ও উপস্থাপনায় শিল্প সার্থক হয়েছে।

সমরেশ বসু

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন সমরেশ বসু। অল্প বয়সেই নৈহাটির নিকটবর্তী আতপুরে চলে আসেন এবং কিছুদিন পর থেকেই নৈহাটির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। জীবনের শেষ দিকে কলকাতাবাসী হলেও মাঝে মাঝে নৈহাটি চলে যেতেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখেন 'আদাব' গল্পটি। গল্পটি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। উত্তরঙ্গ (১৯৫১) তাঁর প্রথম উপন্যাস। অনেক উপন্যাস এবং ছোটগল্পের রচয়িতা তিনি। তবে 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'গঙ্গা', 'বি. টি. রোডের ধারে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

'আদাব'-এর মধ্যে দিয়ে ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত। এরপর তিনি অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'অকাল বৃষ্টি', 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' 'ষষ্ঠ ঋতু' 'সুচাঁদের বারমাস্যা', 'উত্তাপ', 'পাড়ি', 'ফুলবরিষা', 'মানুষ রতন' 'পার', 'কিম্‌লিস', 'শহীদের মা', 'আদাব'—ইত্যাদি।

অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। তাছাড়া 'কালকূট' ছদ্মনামেও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন তিনি। কালকূট নামে লেখা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শাম্ব'।

পার : সমকালীন পটভূমি

প্রতাপরঞ্জন হাজরা

সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী লেখক। তাঁর অধিকাংশ গল্পে তাঁর সংবেদনশীল ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অর্থনীতিতে, দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে এবং দেশের নিয়ন্তাদের অপরিকল্পিত কর্মধারার ফলে ভীষণ চাপ পড়ে। এর ফলে স্বাধীনতার আনন্দটুকু বিষাদক্লিষ্ট হয়ে যায় দেশের আপামর জনসাধারণের মনে। কবি সাহিত্যিকদের সহানুভূতিশীল স্পর্শকাতর মনে তার ছায়াপাত ঘটার ফলে সে সময় সাহিত্য থেকে বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করে ওই সমস্ত বাস্তুহারা, হতভাগ্য, নিরন্ন দুঃখীদের ব্যথা ও কথা জানাতে বেশকিছু সাহিত্যিক এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কথাশিল্পী হলেন সমরেশ বসু।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের তত্ত্ব রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকাল সাহিত্যে তাকে প্রতিবিম্বনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। মধ্যবিত্তের সেই হতাশা, নৈরাশ্যের বিম্বিত সাহিত্য স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আরো এগিয়ে এসে বস্তিবাসী, সর্বহারা, শোষিত ও নিরন্নদের জীবনের নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রচারেপ্রয়াসী হল। ননী ভৌমিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার,অদ্বৈত মল্লবর্মন, নবেন্দু ঘোষ, সুশীল জানা, শৌরি ঘটক-এর মতো সমরেশ বসুও সেই ভাবনা অনুযায়ী লেখক হয়ে যান।

মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সরে এসে নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে যে কজন কথাশিল্পী আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন সমরেশ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পলাতক স্বভাব তাঁকে যেমন ভবঘুরে করে তুলেছিল, তেমনি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল। তারই সার্থক পরিণতিতে তাঁর গল্পে নানা চরিত্র নানা পরিবেশের সন্নিবেশ ঘটেছে। ব্যক্তিগত জীবনের এই অভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পগুলিকে অনন্য বাস্তবতা দান করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে সমরেশ বসু ছিলেন মার্কসবাদে দীক্ষিত কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) সদস্য। ফলে তাঁর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টি স্বভাবতই মধ্যবিত্তের চেয়ে বিত্তহীনদের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছে। পরিণত কালে সাহিত্যে নানা শ্রেণির ব্যক্তি ও সমাজের চিত্র অঙ্কন করলেও প্রথম দিকে শুধু তাদের কথাই বলেছেন, যাদের বিত্ত নেই। বেঁচে থাকার অধিকারটুকু স্পষ্ট করে জানাবার অধিকার নেই। সংহতি নেই, সংগ্রাম নেই, নেতৃত্ব কিছুই নেই, তাদের কথা, তাদের হয়ে কথা বলতে তিনি সৃষ্টি করেছেন একাধিক গল্প ও উপন্যাস। তাঁর রাজনীতি সচেতনতা ও শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা এবং মার্কসীয় চেতনায় দীক্ষিত মানসিকতার মূল থেকে এসেছে 'পার' গল্পটি।

বস্তিবাসী সর্বহারাদের বলতে সর্বত্রই তাঁর সাম্যবাদী তত্ত্বের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কাজ করলেও, সর্বত্র গল্প বলার সময়, প্রত্যক্ষ মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগ না করে, সহজবোধ্য গল্প কথকের উজ্জ্বল মানসিকতা ধরা পড়ে। তার ফলে বস্তির বা একেবারে নিচুতলার মানুষের গল্প মানেই মার্কসবাদ, সাম্যবাদ এ ধরনের লঘু সিদ্ধান্ত তাঁর গল্প সম্বন্ধে মনে আসে না। তিনি প্রকৃতই নিচুতলার মানুষের মধ্যে ডুব দিয়ে তাদের মুখের কথাগুলোকে সাহিত্যে রূপ দান করেছেন। সেই সূত্রেই মার্কসবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে গল্পগুলির মধ্যে।

'পার' গল্পটিতে সমরেশ বসু নৈহাটি-জগদ্দলের শিল্প কারখানা সন্নিহিত গঙ্গা নদীর সংলগ্ন চর ও বস্তি অঞ্চলের জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত ছবি এঁকেছেন।

সুদূর বিহার থেকে নট জাতের যুবক স্বামী-স্ত্রী গ্রামের মানুষ ননকুর প্রলোভনে বংলা দেশের গঙ্গানদী সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে এসেছিল ঝাড়ুদারের কাজ করার জন্য। ননকু এখানে ঝাড়ুদারদের সর্দার। ওরা গ্রামেই ভাল ছিল। সেখানে বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর-ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় দুজনে অনেক ভালো ছিল। তবু সেখানে ছিল দুবেলা অন্নের নিশ্চিন্ত আশ্বাস। দেড় মাস এখানে সাফাই কাজ করার পর মিউনিসিপ্যালিটির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কোনো আহার নেই, কেবল ধাঙড় বস্তিতে থাকার একটা প্রতিশ্রুতি। আরম্ভ হল অনাহার এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ননকুর প্রতিশ্রুতি মত মাসিক ষাট টাকার পরিবর্তে দুজনে মাত্র বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে। কাজ না থাকা মানেই অনাহার।

ধাঙড় বস্তিতে সাতদিন ওদের খাইয়ে ছিল বস্তির মানুষগুলো। দুদিন আগে শেষ খাবার পড়েছিল পেটে। শহরের মধ্যে আর থাকা যায় না। এমনকি বস্তিতেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ বেরিয়ে পড়া কুকুরের মতো হাঁফাতে হয় সেখানে। কাউকে খেতে দেখলেই খিদে পায়। তাই গঙ্গার পাড়ে নির্জন ঝোপের মধ্যে অনেকটাই শান্তিতে থাকা যায়। কিন্তু ওরা বোধহয় আর পারছিল না। দুজনের হৃৎপিন্ড দুটি পেটে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জিইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল, সেই ভয়টাকে প্রতিহত করার জন্যই ওদের এই সাহস সঞ্চয়।

গঙ্গার জোয়ারের ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একপাল শুয়োর। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এলো কালো কুঁতকুঁতে চোখো, ছুঁচলোমুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল। ওরাও দুজনে উঠে বসল গায়ে গায়ে। শূয়োরের দল এবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে। পশুগুলোর সংগে ছিল দুটি লোক। কানে সোনার মাকড়ি, সামনের দুটি দাঁত সোনার। লোক দুটি এ অঞ্চলের ধাঙড় বস্তি ঘুরে ঘুরে শুয়োরগুলি কিনেছে, নিয়ে যাবে গঙ্গার ওপারে। ওদের দেখে সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি দরিয়ার ওপারে নিয়ে যেতে পারবি? কেননা সে নৌকার জন্য কোনো পয়সা খরচ করতে পারবে না। একথা শুনে দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল। কাজ মানেই পয়সা, পয়সা মানেই খাওয়া। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। দুজন কাপড়ে

কবুনি দিল। ঠিক হল ঊনত্রিশটি জানোয়ারের জন্য ঊনত্রিশ আনা মজুরি। উপরি পাওনা হিসেবে কিছু কড়ুয়া তেল গায়ে মাখার জন্য। অন্যদিকে একটি জানোয়ার খোয়া গেলে ছ মাস হাজত বাস।

তারপর শুরু ওদের দু'জনের অস্তিত্বের লড়াই। আষাঢ়ের গঙ্গা, অম্বুবাচির পর ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারি হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোতও সর্পিল হচ্ছে। এই গঙ্গা দিয়েই ওরা পশুগুলোকে ওপারে নিয়ে যাবার কাজে হাত দিয়েছে। পশুগুলোকে পার করতে করতে সামনে এল বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ। হেই মায়ী। পুরুষটি ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল পশুগুলোকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা তার পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হলো, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া তার পরণের কাপড় ছিনিয়ে নিল। জল হাসছে কল্ কল্ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস? আয়, আরো আয়। বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্ করে আসছে। হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী। মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোনো দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

আকাশ আরো নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই শব্দ হলো। সংগে সংগে জানোয়ারগুলো মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল। যে দু একটা জেলে নৌকা ছিল আশেপাশে তারাও সব পাশ ঘেঁষছে। যত পশ্চিম, ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল সেখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। এখনো অর্ধেক পথ বাকি। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠেছে। রাত্রি নামছে, অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠল। সোজা ওদের মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ থামলে জলের শব্দ দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল। সংগে সংগে গতি বাড়ল ওই ভীত জানোয়ারগুলির। পার হতে হবে শুয়োরগুলোকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা। অবশেষে ভয়ংকর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ওরা দুজনে জানোয়ারগুলোকে দরিয়ার ওপারে পৌঁছে দিয়ে দুদিন পরে আবার খাবার পেল।

সমরেশ বসু বাংলা ছোটগল্পের একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্প একই সংগে বৈচিত্র্য ও নতুন মাত্রা পেয়েছে। গল্পের নামকরণেই-এর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশ বিভাগ এবং স্বাধীনতার অব্যবহিতকালে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো যখন প্রায় ভেঙে পড়েছিল, সেই সময় বিলাসী সাহিত্যের আসর ত্যাগ করে সমাজ সচেতন যে সমস্ত কথাশিল্পী বস্তিহারা, শোষিত-নিপীড়িত, নিম্নমধ্যবিত্ত অবহেলিতদের জীবনতত্ত্ব আপামর জনসাধারণকে জানাতে কলম ধরেন সমরেশ বসু তাঁদেরই একজন। মূলত এই অবহেলিতদের কথাকার হিসেবেই সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। আগেই

উল্লেখ করা হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। এরজন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়, চাকুরীও খোয়াতে হয়। মার্কসীয় চেতনায় দীক্ষিত তাঁর দর্শন মনস্কতা এবং জনদরদী মনোভাব তাঁকে নিপীড়িত সর্বহারাদের জীবনতত্ত্ব সম্বলিত সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে। লেখক বস্তিবাসী সর্বহারা জীবনের গভীরে গিয়ে তাদের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার কথা জানাতে থাকেন তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পের মাধ্যমে। আলোচ্য 'পার' গল্পটিতেও তিনি সর্বহারার জীবনধারার গভীরে ডুব দিয়ে তাদের অন্তরের কথা বলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'পার' গল্পে দুরন্ত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে দুজন ক্ষুধার্ত সামান্য খাদ্যের আশায় পার হতে চায়। প্রকৃতি এখানে মুখ্য চরিত্র। আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচির পর ঢল নেমেছে তার বুকে। যে গঙ্গা দুলছে,নাচছে, আছড়ে পড়ছে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠছে। কখনও পাশে, কখনও বা সোজা মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। এই গঙ্গার বুকে যত্রতত্র বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ। এই গঙ্গা দিয়েই মাত্র উনত্রিশ আনার বিনিময়ে উনত্রিশটি শুয়োরকে পার করে দিতে হবে। আবার একটা খোয়া গেলে ছ'মাস হাজত বাস। বাংলার বাইরে থেকে নটজাতের যুবক স্বামী-স্ত্রী প্রকৃতির সঙ্গে দুরন্ত লড়াই শেষে জয়ী হয়েছে। তাদের ক্ষুধার জ্বালা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দরিয়া পার করে দিয়েছে জানোয়ারগুলোকে। এই পারাপারের মধ্যে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা গল্পটিকে সার্থক নামা করে তুলেছে।

সমাজের অসংগতি, উচ্চস্তরের মানুষের অন্যায়-অবিচার এবং বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের অসহায় করুণ অবস্থা সমরেশ বসুর বিভিন্ন গল্পে আশ্চর্য মিতভাষিতায় তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে ঝল্‌সে উঠেছে। বিভিন্নগল্পে তাঁর অসাধারণ সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং মধ্যবিত্তের ছদ্ম আভিজাত্যবোধকে তীব্র ব্যঙ্গে তিনি বিদ্ধ করেছেন। সমরেশ বসুর ছোটগল্পের আলোচনা প্রসংগে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করে বলেছেন—"ছোটগল্প লেখকের আবিষ্কারের চক্ষু থাকা চাই—তিনি জীবনের এমন সমস্ত খণ্ডাংশ নির্বাচন করিবেন যাহারা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। যাহারা যুগপৎ অপ্রত্যাশিত ও রসসমৃদ্ধ। সমরেশ বসুর অধিকাংশ গল্পের উপরই এই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়। ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবনসংঘটনের অনেব বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।"

সমবেশ বসুর বেশ কিছু গল্প উপন্যাসে নদী-সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা-টান-আবর্ত প্রভৃতি প্রকট ও গোপন বিপদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুরহস্যের সম্মুখীন, জলস্রোত ও মনোস্রোতের বেগবান প্লাবনের মধ্যে অত্যাজ্য সংস্কারে পরিণত জীবননীতির নোঙরে দৃঢ় সংবদ্ধ জীবনের অপূর্ব পরিচয়। প্রবহমান নদী ও রহস্যময় সমুদ্রের মধ্যে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তাদের মনে প্রাকৃতিক বিপদ ও অতিপ্রাকৃতের অনুভব যেন একই অভিজ্ঞতার ভেতর ও বার বলে প্রতিভাত হয়। তাদের আঁকে-বাঁকে অসীম বারিবিস্তারের বিভ্রান্তিকর নিঃসঙ্গতায়, ঢেউ-এর ওঠা-নামায়, ঝড়ের দুর্দম ঝাপটে ও আবর্তের অদৃশ্য আকর্ষণে এক কুটিল রহস্যময় শক্তির অতন্দ্র হিংসা, এক মানববোধাতীত মায়াসত্তার সর্বব্যাপ্ত, নিঃশব্দ

সুযোগ প্রতীক্ষা জলবিহারী মানুষের মনে এক আতঙ্ক কুহকের অনুভূতি জাগায়, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এক অজ্ঞাত বিভীষিকার আবির্ভাব-প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত করে।

সমরেশ বসু তাঁর শিল্পীজীবনের উত্তরপর্বে বিভিন্ন ধরনের, সমাজের বিভিন্ন স্তরের চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করে থাকলেও গল্প রচনাচর্চা শুরু করেছিলেন অবহেলিত বস্তিবাসীদের কেন্দ্র করে। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনালেখ্য বর্ণনা করে। মার্কসবাদী চিন্তা, চেতনে ও দর্শনে বিশ্বাসী সমরেশ এইসব অনুন্নত শ্রেণীর কথা বলার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনচর্চায় নিজেকেও নিয়োজিত করে অনুভবে তাদের অন্তরবেদনা অনুভব করে তারপর লিখেছেন হৃত দরিদ্র শোষিতদের জীবন কাহিনি। যাদের না আছে শিক্ষা, না আছে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা এবং উপায়, না আছে নেতৃত্ব দেবার বা নেবার ক্ষমতা। তাদের জীবনকথাই তিনি তাঁর গল্পে বলেছেন। নিচুতলার মানুষের জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে তাদের মুখের ভাষায় কথায় তাদের বেদনা, তাদের অসহায়তাকে তুলে ধরে যে সব গল্প তিনি লিখেছেন, 'পার' গল্পটি তাদের মধ্যে অন্যতম এক অসাধারণ গল্প।

ম্যাক্সিম গোর্কি ও সমরেশ বসু এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার নাম নয় নিশ্চয়ই। রাশিয়াও নয় বাংলাদেশ। তবুও কোথায় যেন কি একটা মিল থেকেই যায়। একটা আত্মিক যোগাযোগ যেন কোন গভীরতার বলয়ের জন্যই এসে মিলিয়ে দেয় এঁদের দুজনকে। লোকের দুঃখ দেখে বুদ্ধ হওয়ার বাতিক নয়। দুঃখী লোকেদের তল্লাটে নেমে এসে, তাদেরকে সাহিত্যের পাদপ্রদীপে এনে নিজেকেই সম্মানিত বোধ করা—এই একই মনস্তত্ত্ব কাজ করে এঁদের সকলের মর্মে মর্মে। 'পার' গল্পে সমরেশ বসুরও সেই একই মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে।

বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবন একদিন বাংলা কথাসাহিত্যে উপেক্ষিত ছিল। রবীন্দ্রনাথই বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন ও গ্রাম্য জীবনকে প্রথম ছোটগল্পের বিষয় করে ছোটগল্পের সীমানাকে প্রসারিত করে দেন। শিলাইদহ পর্ব শেষ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় চলে এলে তার ছোটগল্পেরও পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে এসে তাঁর স্বাভাবিক সংস্কার বশে শেষ করেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর লেখকগোষ্ঠী মোটামুটিভাবে সেখান থেকে তা শুরু করেছেন। সমরেশ বসুর পূর্ববর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কথাশিল্পি একাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। তাঁর গল্প যুগযন্ত্রণায় রচিত হয়েও যুগোত্তীর্ণ হয়েছে। ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করেছে।

আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি সমরেশ বসু সমাজসচেতন এবং তাঁর গভীর সমাজমনস্কতা তাঁকে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারি করে তুলেছে। সমাজ সচেতন বলেই তৎকালীন নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অর্থ-সংকটের চিত্র তাঁর গল্পে ফল্গুধারার মতো বহমান। বুর্জোয়া সমাজে অনেকেই বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে বৃত্তির মন্দ দিকটি তুলে ধরে একটা সংস্কার চান, পাঠক সমাজের সমবেদনার উদ্রেক করেন। একথা ঠিক যে "A part of the bourgeois desirous of redressing social grievances, in order to secure the continued existense of bourgeois society"[৭] (Communist Manifesto)। অথচ সমরেশ বসু তাঁর গল্পগুলিতে সংস্কারের পরিবর্তে সমাজের আমূল পরিবর্তন চান। অর্থনৈতিক সংকট

মানুষের জীবনধারাকে কতখানি হীনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনে—এরই সার্থক শিল্পরূপ ঘটেছে 'পার' গল্পে। আজও এ দেশের বুর্জোয়া সামাজিক কাঠামোয় পুরুষ প্রধান সংসারে নারীরা যে পুরুষের দয়ার উপর নির্ভরশীল। সমরেশ বসুর একাধিক গল্পে তার নিদর্শন আছে। এঙ্গেলস্-এর কথায়—"The dependence of the wife upon her husband and the children upon the parents conditioned by private property." আজও সেই আধিপত্য সমাজে সুপরিকল্পিতভাবে প্রোথিত।

সমরেশ বসুর 'পার' একটি অসাধারণ শিল্পসমৃদ্ধ ছোটগল্প। কি নামকরণে, কি শব্দচয়নে, কি আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যে গল্পটি অসাধারণ শিল্পসুষমা লাভ করেছে। গল্পের নামকরণেই আমরা দেখি, গল্পের গতি-প্রকৃতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হবে। নামকরণেই ইংগিত আছে আষাঢ়ের দুরন্ত গঙ্গার সংগেই নটজাতের স্ত্রী-পুরুষের সংগ্রাম কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবে। গঙ্গার যে বর্ণনা লেখক এখানে উপস্থাপিত করেছেন—তা বোধহয় তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসের বর্ণনাকেও অতিক্রম করেছে। গঙ্গার এই বর্ণনাই যেন গঙ্গাকে একটি অসাধারণ জীবন্ত চরিত্রে রূপান্তরিত করেছে। তাঁর গল্প কথনের ভঙ্গিতেই নামকরণের তাৎপর্য ছত্রে ছত্রে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। একমাত্র সমরেশ বসুর হাতেই এই জাতীয় গল্প সার্থকতার শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম।

শব্দচয়ন শব্দটিকে স্বতন্ত্রভাবে না বলে বরং শব্দচয়ন এবং সংলাপ পর্যায়ে চিহ্নিত করে আলোচনা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। কেন না এই নটজাতীয় ভিনদেশী অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের চরিত্র আঁকতে লেখক অবিকল তাদের মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। সেই ভাষাকে ব্যবহার করার সময় মাঝে মাঝে তিনি কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, একমাত্র সেগুলিকেই আমরা শব্দচয়ন আখ্যা দিতে পারি। শব্দচয়নের কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক—'উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে', 'বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার সব খেয়ে ফেলবে', 'আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠল', 'জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে', 'নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি'। এরকম আরো অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। এবারে গল্পের কাহিনি যে দুজনকে নিয়ে, সেই ভিনদেশি নটজাতের স্বামী-স্ত্রীর মুখে ব্যবহৃত সংলাপ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক্। লেখক তাদের মুখে যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন—তা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার, বিশ্বাস ও সংস্কারের সংগে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে গঙ্গা সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে লোকবিশ্বাস ছিল—তাকেও লেখক অনায়াস ভংগিতে গল্পে ব্যবহার করেছেন। যেমন—'হেই মায়ী। মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোনো দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।' 'আরে বাপ! হেই মায়ী', 'চুপ, চুপ, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষা হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম'। এ ছাড়াও খরস্রোতা গঙ্গা বক্ষে জানোয়ারগুলোকে পার করার সময় তাদের পরস্পরের সংলাপ একান্ত ভাবেই তাদের নিজস্ব মুখের ভাষা বলে বুঝে নিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

গল্পের স্বল্প পরিসরে সামান্য দু'একটি তুলির আঁচড়ে সমরেশ বসু চরিত্রগুলিকে অসাধারণ

শিল্পসুষমা দিয়েছেন। গঙ্গার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে গঙ্গা নিজেই এ গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। স্বল্প আবির্ভাবে সোনার মাকড়ি যেমন কৃপণ তেমনি মূর্তিমান শয়তান শোষক হয়ে উঠেছে। তুলনায় সহায় সম্বলহীন ভিনদেশীয় ক্ষুধার্ত মানুষ দুটি একদিকে অসহায় দাসে পরিণত হয়েছে, তেমনি অসাধারণ সংগ্রামশক্তি গল্পটিকে অবশ্যই ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। চরিত্র চিত্রণে সমরেশ বসু একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র নির্মাতা।

'পার' কাঠামোগত দিক থেকে এক আশ্চর্য নিপুণ সৃষ্টি। গল্পটি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যামুক্ত তীরের গতিতে ছুটে গেছে। আরম্ভ করেই পাঠক দেখতে পান—তাঁকে একেবারে বিনা ভূমিকাতেই স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর দাঁড়াবার এক পলও সময় নেই। সমরেশ বসু গল্পের শুরুতেই একেবারে আষাঢ়ের তরঙ্গ সংকুল গঙ্গা ও দুটি উপোসী মানুষের ছবি এঁকেছেন। লেখকের গল্প কথনের ভঙ্গিতে পাঠক বুঝে নেন—এই গঙ্গার সংগে দুটি মানুষের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। লেখক গল্পটিকে অত্যন্ত দ্রুত climax-এ নিয়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ গল্পের সমাপ্তিতে চমক ও ব্যঞ্জনাধর্মী পরিণামের যুগপৎ মিশ্রণে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

শানাবাউরীর কথকতা : প্রতিবাদী দর্শনের স্বরূপ

স্বরাজ গুছাইত

সাহিত্যে উপেক্ষিত অভাজনদের জীবনদর্শনের যে পৌনঃপুনিকতার 'এসেন্স' চিরায়ত মনুষ্যত্বের তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে ধরা একটা বড়ো রকমের মর্ডানিজমের দর্শন। ভারতীয় উপেক্ষিত অভাজন মানুষদের সঙ্গে অভিজনদের একটা 'ডিফারেন্স' আছে, কিন্তু সেই 'ডিফারেন্স' যেখানে 'ডাইভারসিটি' তৈরি করে সেখানে প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষের 'সাচ্চা-ঝুটা' আত্মা আছে; উত্তর-আধুনিকেরা যাকে বলেন 'নোডাল পয়েন্ট'। এই নোডাল পয়েন্ট আসলে ধারণ-নির্ধারণের বা টোটালিটির 'সদর দরজা'। নামেই টোটালিটির সদর দরজা, কারণ সেই 'সদর দরজা' খোলার চাবি সাধারণ কলম-পেষা লেখকের কাছে নেই। সমরেশ বসু অবশ্যই সেরকম একজন অভিজন কলম-পেষা মজদুর যাঁর কাছে সেই 'সদর দরজা' খোলার চাবি আছে। অভাজনদের মধ্যে তিনি 'মার্জিন অব্ মার্জিন' হিসেবেই থাকতে বাধ্য হয়েছেন কিংবা থেকে দেখেছেন, আবার তিনি কলমের শক্তিতেই সেই 'মার্জিন অব্ মার্জিন'কে ভেঙেই নিজেকে অভিজন লেখক হিসেবে বাঙালির পাঠাভ্যাসে ও পাঠগত শ্রদ্ধার মধ্যে একটা 'স্ট্র্যাটেজিক এসেন্সিয়ালিজম' তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

'স্ট্র্যাটেজিক এসেন্সিয়ালিজম' অর্থে পাঠক ও লেখকের মধ্যে 'আদান-প্রদানের নৈকট্য', কাহিনীগত মানবিক-সম্পর্কের নৈকট্য যা মূলত প্লট ও ভাষানির্ভর। গল্পের ন্যারেটিভ স্টাইল ও লোকায়ত কথকথার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক না রেখে কীভাবে বোধ্য ও বাস্তব আদর্শগত স্টাইল তৈরি করা যায়, স্টাণ্ডার্ড সংলাপ-ভাষ্য তৈরি করা যায় সে বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গল্পকার তথা কথাকারগণ, কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে কেউবা সার্থক হয়েছেন কেউবা ব্যর্থ। লোকায়ত কথকতার মধ্যেই অন্তর্জাত আত্মপরিচয়ের পুনরাবিষ্কার ঘটেছে সমরেশ বসুর 'শানাবাউরীর কথকতা' গল্পটিতে। প্রান্তীয় নিম্নবর্গীয় মানুষজন ও গ্রামীণ জনপদকেন্দ্রিক গল্পে বস্তুত আত্মপরিচয়ের পুনরাবিষ্কার ঘটে জীবনদর্শনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় যেখানে 'শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের' নৈকট্য ও বিচ্ছেদ-ভাবনা দু'টিই সমান্তরালভাবে আছে। বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাচনে, কথকথায়, ন্যারেটোলজিতে নিম্নবর্গীয় জীবন নিরাভরণ বলেই 'নিশ্ছিদ্র সততায় দেশজ' কিন্তু তা কখনই ভব্যসমাজের গণ্ডিকে উড়িয়ে দিয়ে ফলিত-সাহিত্যে অভিজনের সহযাত্রী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই শানা বাউরীদের চিরদিনের জন্য মোট বইতে হয়, তাদের গতরের মধ্যেই প্রাণ আছে, ('গতরটোর মধ্যে পানটো আছে—') জীবন সম্পর্কে 'ওভারডিটারমিনেশন' বা অতিনিয়ন্ত্রণের 'জেনেটিক সম্ভাবনা' তাদের মধ্যে নেই। এই মনস্তত্ত্বের অভাব পিছিয়ে পড়া শ্রেণি-বর্গ-চরিত্রের মধ্যে আছে, ব্রাত্য-জীবন সম্পর্কে লক্ষ-কোটি গবেষণা সত্ত্বেও তাদের যাপনীয় জীবনের মধ্যে পৌনঃপুনিকতা থেকে যাবে। অগত্যা শিল্পশৈলীগত প্রকরণের আধুনিক বৈদগ্ধ্য ইতিহাসের ও জীবনের বিশ্বাস্য পটভূমিকে লেখক শি[illegible] করেন বিপ্লবী সাহি[illegible] প্রতি দায়বদ্ধতায় বা কমিটমেন্টে এবং সংগ্রামগত জয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায়।

রাজনৈতিক শূন্যতা যে ভাববাদ ও বস্তুবাদকে তার ডায়ালেকটিক্যাল স্তর থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে পারে, প্রতাপের দাপটে যে ডিফারেন্স বা বিচ্ছিন্নতা থেকেও ইউনিটি তৈরি হতে পারে সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণ ছিল সমরেশ বসুর কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদারের। অনেক আগেই সেই উপলব্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিম্নবর্গীয় শ্রেণিচরিত্রের অন্তর্লোক উন্মোচনেই ছিল তারাশঙ্করের শিল্পায়াস, থিয়োরি তাঁর কথনতত্ত্বকে আক্রান্ত করেনি এবং এসব কিছুরই 'ফিনালথ্রপি বা মানবদরদী' দায়িত্বের স্বীকৃতি 'নানান সামাজিক কর্মকাণ্ড' ও বিষয়-বিষয়ীরূপে লিখনতত্ত্বকে গ্রহণ করায় মহাশ্বেতাদেবী প্রথাগত বিশ্লেষণ ও চর্চার বাইরে অতিরিক্ত গুরুত্ব পাচ্ছেন। শিল্পীর দায়বদ্ধতার সূত্রে সাহিত্যনীতি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, দলীয় রাজনীতির কাছে দায়বদ্ধতার সূত্রে সাহিত্যকর্মে বিতর্ক থাকতে পারে এবং ঐসব সহজ সূত্রানুসরণের বাইরে, এমনকি শ্রেণিসংগ্রামের তাত্ত্বিক সীমানার বাইরে কেবল হৃদয়ের টানে প্রান্তিক মানুষদের সহযোগী ভেবে সহমর্মিতায় যিনি তাদের কাছে পৌঁছে যান তিনিও তাঁর নিজস্ব প্রগতিশীলতার ভাবনার বিতর্কের মধ্যে চলে আসেন। সমরেশ বসু উক্ত ভাবনার শেষ পর্যায়ের লেখক যেখানে রাজনীতি, ভাববাদ, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি খোঁজা নিরর্থক। শানাবাউরীর কথকতা ও পাপপুণ্য গল্প প্রসঙ্গে অমর মিত্র তাই মন্তব্য করেছেন : "এইসব গল্পে যত না অভিজ্ঞতার চিহ্ন দেখতে পাই, তার চেয়ে দেখতে পাই উপলব্ধির ভার, মননচর্চা। বিচিত্র মানুষকে না চিনিয়ে মানুষের ভিতরের বৈচিত্র্যকে সমরেশ চিনিয়েছেন ওই দুই গল্পে।" (এবং জলার্ক : সমরেশ বসু সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর '৯৯)। 'মানুষের ভিতরের বৈচিত্র্য' বলতে আমরা অনেক কিছুই বুঝি, যা বুঝিনা তা হল : মানুষের অন্তর্গত মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (বিজ্ঞানের ভাষায় : এম পি ডি) এবং এই বিশেষ 'এরিয়েল ভিউ' বা গল্পের অন্তর্জাত বিষয়টিকে সমরেশ তুলে ধরেছেন 'শানাবাউরীর কথকতা' গল্পে। সাহিত্যেরও একটি মননগত স্নায়ুবিজ্ঞান আছে এবং সেই মননগত বিজ্ঞানেরও একটি আই. কিউ আছে যা আদৌ কোন থিয়োরিকেন্দ্রিক নয়, মস্তিষ্ককেন্দ্রিক। শানাবাউরীর কথকতায় সেই জাতীয় মস্তিষ্ককেন্দ্রিক বা ধীকেন্দ্রিক চিন্তন আছে, যা শনাক্ত করা আদৌ সহজসাধ্য নয়। বলা বাহুল্য, সেই ধীকেন্দ্রিক চিন্তনের নির্ভরেই সমরেশ তাঁর গল্পগুলিকে জীবন ও শিল্পের আঁটোসাঁটো খাপে-খোপে জুড়ে দেন। কেবল স্বজ্ঞাশক্তির দ্বারাই সমরেশ দক্ষ শৈল্পিক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন; আনন্দ বাগচীর মতে : সমরেশের স্বজ্ঞাশক্তিই ছিল তাঁর প্রতিভার তৃতীয় মাত্রা। এই সজ্ঞাশক্তিই বলে : পিছিয়ে-পড়া-শ্রেণি-বর্গ সমাজের কোন গন্তব্যস্থল নেই; উচ্চাবিত্ত-মধ্যবিত্ত সবারই গন্তব্যস্থল আছে, তাই শানাবাউরি রায় বাড়ুজ্জে গাঙ্গুলীদের বিশেষ গন্তব্যে এগিয়ে দেওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত হয়েই থাকে কিন্তু তার নিজের গন্তব্য সাঁওতাল পরগণার বীরভূম ঘেঁসে গ্রামটাতেই পড়ে থাকে। সংগ্রামহীন (বিপ্লব শব্দটি সেখানে মৃত) নিস্পন্দ সাঁওতাল পরগণা ঘেঁসে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রান্তিক গ্রামেই সামন্তপ্রভুদের অবশিষ্টাংশের দ্বারা শোষিত ও ক্ষয়িত হতে হতে বেঁচে থাকে শানাবাউরীর দল। যেভাবে বেঁচে থাকে 'শালবন, হঠাৎ খাড়া খাড়া তালের সারি। সারি নয় তো ঘিরে থাকা জটলা।' প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা এই অজ্ঞাত (গ্রামের আইডেনটিটি গ্রামেতেই পড়ে থাকে।) গ্রামটির মানুষজন দলিত-শোষিত-প্রচারিত হ'তে হ'তে

সহনশীলতায় যেন 'বৃক্ষ' হয়ে গেছে। তাই উৎসব ছাড়া গ্রামীণ পরিবেশ ঠাণ্ডা, সমরেশের ভাষায় : "যেন কোনো এককালে মানুষ ছিল। এখন অভিশপ্ত, নিশ্চল বোবা।" শানাবাউরীর কথকথা তাই প্রকৃত অর্থে অভিশপ্ত, নিশ্চল, বোকাবাউরীর কথকথা। সারা গল্প জুড়ে পাঠককে সে যেসব গ্রামীণ কথকথা শুনিয়েছে, কিন্তু তার প্রকৃত জবাব সে পায়নি, জবানবন্দী সে একাই দিতে দিতে আপনকারাদের হাতে আত্মিক দিক থেকে জবাই হয়েছে। প্রকৃত জবাই-এর ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে কালীপুজোর সময়ে। সেই পুজোর দু'দিনের স্মৃতিসুখকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে গ্রামীণ মানুষেরা। 'দিন চলে গেছে, মনটা পড়ে থাকে পিছনে।' এই হল গ্রামীণ কথকথার ন্যারেটিভ। গ্রামীণ জীবনের আর্কাইভে গড়ে তুলেছেন সমরেশ উৎসবের আদিমতায় শতাব্দীর সঞ্চিত উপেক্ষার প্রত্ন-জিজ্ঞাসা। উপেক্ষার প্রত্ন-জিজ্ঞাসা কেবল শানাবাউরীর কণ্ঠে প্রতিবাদী ও স্বেচ্ছাচারী, অন্যত্র বোবা, কেবল কালীপুজোর সময় উৎসবের দু'দিনে মদ আর রক্তে বীভৎসভাবে মাখামাখি। বাক্যের জোড়ে গ্রামীণ-সাঁওতালকেন্দ্রিক প্রত্ন-লোকাচারের আদিমতাকে তার নিজস্ব আকাঁড়া আদিম শক্তিতেই তুলে ধরেন কথক সমরেশ তার প্রত্যক্ষ বাচনে, এরকম :

> শূন্য মণ্ডপে মশা ডাকে, তাড়ি-পচুয়ের কলসী গড়াগড়ি যায়, হাঁড়িকাঠের কোল থেকে নিহত পশুর রক্ত জমে থাকে সারা গ্রামের পথে পথে, উঠোনে, মন্দিরের দেওয়ালে। গ্রামের আর আশেপাশের সাঁওতাল-বাউরীরা আদাড়ে-পাদাড়ে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষে খোয়ারি কাটায়।

দুই

গ্রামীণ-চিত্র অনুষঙ্গে গ্রামীণ-পটভূমিকাকেন্দ্রিক গল্পে পাঠক-মনস্তত্ত্বকে নির্মাণ করবার জন্য লেখক সমরেশ যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন তার নাম দৃশ্যভাষা। যে দৃশ্যভাষা কেবল গ্রামীণ 'ভাষা-ছবি দেখায়' সে ভাষার যেমন ঐশ্বর্য-মূল্য আছে তেমনি যে দৃশ্যভাষা নিজে জেগে থাকে বলে অক্ষরকেও ঘুমিয়ে থাকতে দেয় না তেমন শাণিত দৃশ্যভাষারও আদিম কর্কশ-মসৃণ শিক্ষিত নাগরিক ঐশ্বর্য-মূল্য আছে। গ্রামীণ দৃশ্যভাষা রচনায় কী গ্রামীণ কী শহুরে গরিবকাতর লেখক সমানভাবেই দক্ষ এবং এই দক্ষতার অন্তর্গত গরিবিয়ানাতেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব যা সম্পূর্ণরূপে বাংলা সাহিত্যে অস্বীকার করতে পেরেছেন সমরেশ বসু কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদার। সমরেশ বসু তারাশঙ্করের গ্রামীণ দৃশ্যভাষার যে পরিমার্জিত ও আধুনিক রূপ আবিষ্কার করেছিলেন বাস্তবে যার কোনও উত্তরাধিকার নেই। 'মানুষকে জানবার জন্য (লীলা রায়কে কথাপ্রসঙ্গে সমরেশ বলেছিলেন) হয়তো সব লেখকই লেখেন কিন্তু 'শব্দতক বাহুল্যবর্জিত একরোখা গল্প' খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন। শব্দের মেটোনিম ও মেটাফর বিষয়ে সমরেশ ছিলেন সচেতন, শব্দকে চক্ষুষ্মান ও 'গতিময় সত্তা'তে রূপান্তর করাতেই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার অঙ্গীকার। হিরণ মিত্রের ভাষা ধার করে এভাবেও বলা যায় : অক্ষর অপেক্ষায় থাকে পাঠক এসে কখন তার মনে হাত রাখে। সে ছবি হয়ে ছায়া ফ্যালে।

ছোটগল্প জন্মের আগেই তার ভ্রূণ থেকে সামন্ততান্ত্রিকতা, আধা-সামন্ততান্ত্রিকতা, ঔপনিবেশিকতা ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্পষ্টত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু শানাবাউরীর প্রতিবাদী 'কাটা-কাটা' কথা জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনাকে প্রতিফলিত করলেও

একটা স্থির সময়ের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে তা আবদ্ধ রয়েছে। সময়ের ধ্রুবক জনজাতিগোষ্ঠীকে বিভাজিত করে দিয়েছে, সেখান থেকে যেন তার মুক্তি নেই; সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত 'বিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়' জনজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ দুটো জিন মাইক্রোসেফালিন এবং এএসপিএম-এর ক্ষেত্রে কোন সমতা নেই, 'হেরফের' আছে, এই হেরফের থেকেই নাকি মানুষের 'রকমফের'। পৃথিবীর সত্তর ভাগ মানুষের বিবর্তনীয় মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে যা সত্য, সেই সত্যের মধ্যে প্রান্তিক জনজাতিগোষ্ঠীর না-থাকারই সম্ভাবনা বেশি। মাত্র নব্বইটি জনজাতিগোষ্ঠীকে গবেষণার স্তরে আনা হয়েছে তার মধ্যে সাঁওতালেরা আছে কিনা জানা নেই। তপশিলিভুক্ত আদিবাসী হিসেবে সাঁওতালরা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবিদার নয়, সাঁওতাল পরগণার বাইরে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়ায় সাঁওতাল সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাঁওতালদের আদি বাসস্থান মানভূম জেলার সিখারভূম আর 'শানাবাউরীর কথকতা' গল্পের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে সাঁওতাল পরগণার পুবে, বীরভূম ঘেঁসে। রঞ্জন গুপ্ত তাঁর 'রাঢ়ের সমাজ, অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ' গ্রন্থে বীরভূম জেলার যে পরিচয় দিয়েছেন তা হল এরকম : "মুণ্ডারি ভাষাগোষ্ঠীতে 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল, সংস্কৃত শব্দ 'ভূমি' বা 'ভূমের' অর্থ মাটি দেশ।" গৌতম চট্টোপাধ্যায় উক্ত বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে লিখছেন : 'অপর একটি মত অনুসারে প্রাচীনকালে 'বীর' নামে এক অনার্য'জাতির বাস ছিল এই জেলায়, যাদেব নাম থেকে বীরভূম নামের উৎপত্তি।" (বঙ্গদর্শন, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৪)। অনার্য জাতি হিসেবে সাঁওতালদের পরিচয় জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্র'-এর সাক্ষ্য অনুসাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে কিন্তু প্রাসঙ্গিক গল্প আলোচনার ক্ষেত্রে তাদেব জিনগত বা উৎসগত পরিচয়টুকু নেওয়া যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে তারা "বেঁটেখাটো, কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ। তবে তারা ছিল পাকা ধনুর্ধর, আর শ্রমশীল দক্ষ কৃষক।" সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল ইংরেজ শাসনকালে, ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন। ভগনাডিহির মাঠ থেকে যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী স্বীকৃতি মিলেছে কিন্তু গল্পের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রমাণ করে যে গল্পের প্রেক্ষিত সময় স্বাধীনতাপূর্ব কোনও একটি সময়বিন্দুতে ধৃত। এই সময়টিকে পূর্ণত তুলে ধরবার দায় হয়তো গল্প বিচারের ক্ষেত্রে নেই, তবু 'ভারতের দুটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্যতম সাঁওতাল' জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি সংবিধানে আছে বলেই তাদের শোষণের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের কিয়দংশ উৎকলন করছি। উনিশ শতকের শেষদিকে সাঁওতাল পরগণার বিশিষ্ট আইনজীবী দিগম্বর চক্রবর্তী '১৮৫৫-এর সাঁওতাল হুলের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

"জাব্‌দি (Jabdi) ও দামিন (Damin) এই দুই খাস সরকারি গ্রামের বড়হাইত বাজার আর মিরানপুর ছিল সাঁওতাল এবং দিকু অর্থাৎ অ-সাঁওতালদের সাধারণ লেনদেনের প্রধান দুটি কেন্দ্রবিশেষ। এই অঞ্চলে তখন একটি ধনী মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং ঘটনা হচ্ছে যে এরাই ছিল এই সাঁওতাল হুলের প্রধান নেপথ্য কারণ, সরল প্রাণ সাঁওতাল জাতিকে ধ্বংসাত্মক পথে যেতে বাধ্য করেছিল এরাই। সুদীর্ঘ শোষণ পীড়নের পরিণাম এই ঘটনা যেখানে নীরবে ধৈর্যে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছিল এই অকৃত্রিম রাজনীতি ছাড়া মানুষগুলি যারা

জানতই না কীভাবে আইনি পথে নিজের অধিকারের জন্য মুখোমুখি হতে হয় সেই সব প্রতারক প্রতিবেশীদের সঙ্গে; তবে নির্মম উপেক্ষা আর নিষ্ঠুরতা তীব্রভাবে অনুভব করেও কোনও উপায়ই ছিল না এর থেকে আত্মরক্ষার।'' (সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ : সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা : ১২০২ পৃ. ৮)।

সাঁওতালদের স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে বিশেষ জনজাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি তাদের বিবর্তনশীল ইতিহাসের নিয়মে উন্নীত করেছে, কিন্তু মুক্তদশা ঘোষিত হয়নি। শানাবাউরীর কথকতার মধ্যে যেসব প্রয়োজনীয় বিদ্রোহাত্মক ও অপ্রয়োজনীয় জীবনকেন্দ্রিক কথন ও সংলাপ আছে তার সঙ্গে মিশে আছে সমরেশের নিজস্ব ন্যারেটিভ স্টাইল। গল্পটির মিথ, মোটিফ, আর্কেটাইপ এবং স্টাইলের মধ্যে আছে জটিল গ্রন্থন কৌশল ও জটিল কথনতত্ত্ব।

কথকতার মধ্যে কেবল শানাবাউরীই কথক নয়, শানাবাউরীর কথকসত্তার মধ্যে সমরেশের লেখকসত্তা লুকিয়ে আছে, আবার স্বতন্ত্রভাবে লেখক স্রষ্টা-পাঠকের সঙ্গে আলাপ করছেন ও একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। শানার মধ্যেও আছে স্পিলট পার্সোনালিটি অর্থাৎ অনেক বিদ্রোহী সাঁওতালদের কথা সে একাই বলেছে, সে গল্পে একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র কিন্তু নায়ক নয়। যদিওবা শানাবাউরীকে আলোচ্য গল্পের নায়ক বলে স্বীকার করেও নিই তবে সে একজন পরাজিত নায়ক যে 'ভদ্র-অভদ্রের একভাষা, মাতৃভাষা'য় তার দীর্ঘায়ত জীবনের সংক্ষিপ্ত কথকতা শোনায় কিন্তু নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রমকে (হায় সতীত্ব!) মর্যাদা দিতে পারে না। সাঁওতাল নারীর সতীত্ব এই গল্পে স্বল্পমূল্যে বিনিময়যোগ্য, শানাবাউরীর স্ত্রী সুখী, সুখী জানে না যে সতী শব্দটির বিপরীত কোন পুংলিঙ্গ শব্দ নেই; তাই সে সুখ পায় না। কেননা তাদের অভাবের সংসার। শাশুড়ি কুটনী অসহায়া শাশুড়িমাতা। ''আপনকাদের ঘরবাসী ব্যাটারা, মায়ের হাতে দুটো পয়সা দিলে, বউকে জোর করে তুলে দেয়।'' এরকম শাশুড়ির কাছে সুখীর কোনও সুখ নেই। দু'দুবার সে বাপের বাড়ি পালিয়েছে, শানাবাউরী তাকে ফিরিয়ে এনেছে, গল্পের শেষে তৃতীয়বার পালানো স্ত্রীকে আবার সে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে, পা বাড়িয়েছে শ্বশুরবাড়ির দিকে।

তিন

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল আদিবাসীদের অস্তিত্ব পরিচয়ের সংকট (identity crisis) তুলে ধরা হয়েছে সমরেশ বসুর 'শানাবাউরীর কথকতা' গল্পে। এই গল্পের 'এরিয়েল ভিউ' কিন্তু 'বিত্ত ও যৌনতা' নয়। (সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী প্রমুখ সেভাবেই বিচার করেছেন।) সুদূর অতীত থেকে অদূর (ধন্য আশা কুহকিনী!) ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে আবহমান সুস্পষ্ট একটা সম্পর্ক তৈরি করাই আছে যাকে আমরা বলি শোষক আর শোষিতের সম্পর্ক, কলোনিয়াল যুগ শেষ হলে পোষ্ট-কলোনিয়াল যুগের মেশিনারী চালু হয়, চিরায়ত সত্যরূপে 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' বজায় থাকে। বেশির ভাগ আলোচকই আলোচ্য গল্পের অন্তঃসার খুঁজেছেন সেই অংশে যেখানে সুন্দর রায়, জীবন বাড়ুজ্জে আর হারান গাঙ্গুলীকে তাদের চাকুরিস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শানা দুমকার পথে হাঁটা রাস্তায় বোঁচকা -বুচকি নিয়ে চড়াই- উত্তরাই পোরোতে পেরোতে বলছে :

''ক্যাদার শালো, উয়াদের মতন মানুষের ঘরে কত বেজন্মা আছে আমি জানি। গগন

বাড়ুজ্জে মশায়ের দশ কুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে, ওঁয়ার ছোট ব্যাটা ক্যাদারের আইবুড়ো বুনটার সঙ্গে শোয়। কেন? না, চার কুড়ি দশ কুড়িতে অনেক তফাত আছে হিসেবে। বিশ কুড়ি বিঘার মানুষ নাই আর গাঁয়ে, না হলে গগন বাড়ুজ্জা মশায়ের টুকটুকে লাতীনটাকে মন্দিরে লিয়ে শুয়্যা থাকত একজনা।"

গল্পটাতো এখানেই শেষ হয়নি, বরং ঠিক এর পরেই গল্পটির নান্দনিক অন্তঃসার, ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে চৈতন্যের বিচার সূচিত হয়েছে এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শোষণ আর শাসনকে সংকেতিত করেছে। উৎকলনের পরের অংশ :

তিনজনে প্রায় এ প্রসঙ্গে ফুঁসে উঠলেন, তু চুপ যা শানা বাউরী।

কেনে?

হুঁ, চুপ যা।

কেনে?

বাঁশের সাঁকোটা দুলছে বাতাসে। মানুষের পায়ের চাপে মড়মড় করছে। নিচে কলকল করছে নদীর জল।

শানার গলাটা আরও চড়ল, হিসাব করেন কেনে, আপন কাদের চেয়ে ক্যদার শালোর জমি বেশি আছে।

একটা ভয়ংকর ইঙ্গিতে সুন্দর এবার শানার মতোই চিৎকার করে উঠলেন, হেই শানা বাউরী।

শানা বলে, আপনকারা বাউরী লয়। ক্যাদারের ধান আছে, উয়ার চোখে সবাই বাউরী"

সর্বকালে এবং সর্বদেশে ধনবানদের একটাই দর্শন থাকে, তার নাম ভোগবাদ। গরিব যদি ধনবান হয় তখনও সেই একই ভোগবাদী দর্শন তার মনে কাজ করে। "শানা বাউরীর ধন থাকলে, ক্যাদারের বউটোকে লিয়ে শুতে যেত" ?

এখানে বস্তুত শানার প্রতিবাদী চেতনা খুঁজে ফেরেন সমালোচক কিন্তু লেখক বলেন উক্ত প্রশ্নগর্ভ বাক্য নিছক গালিগালাজ মাত্র। এই গালিগালাজের একটাই উত্তর। প্রশ্নকর্তাকে চিরজন্মের মতো পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। "দেড়শো বছরের মধ্যে তিনটে বাউরীকে শুধু পিটিয়ে মারা হয়েছে কর্তাদের আত্মসম্মানের জন্য।" এই অভিজন আর অভাজনদের দ্বন্দ্বগত প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই মার্কসবাদে আছে কিন্তু মার্কসবাদ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন প্রস্থান বা সিস্টেম নয় সর্বোচ্চ অনুসরণীয় একটি দার্শনিক পদ্ধতি বা মেথড সেহেতু নোয়াম চমস্কির একটি বক্তব্য স্মৃতিধার্য মনে করছি।

"The concept of justce is thus reduced to a pretext advanced by a class that has or wants to have access to power. The task of a reformer or revolutionary is to gain power, not to bring about a move just society. Questions of abstract justice are not posed, and perhaps cannot even be posed intellingbly." (On Languag, Penguin, 2003, P. 80)

সমরেশের শানাবাউরীর কথকতা ছোট গল্পটি যেন একপ্রকার 'কনসেপচুয়াল আর্ট' যেখানে অর্থ ও যৌনতা নয়, যেখানে 'একটি প্রবন্ধের মতো বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবনার আবেদন' আছে, সেই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবনার আবেদনে সাড়া না দিলে গল্পের প্রশ্নাত্মক স্থানগুলোও নির্বস্তুক সারহীন বিচারের পরিণতি লাভ করে।

প্রতিরোধ : সময়ের নিরিখে

শুভ্রা বৈশ্য (দাশগুপ্ত)

'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' যে লেখক কালকূট সমরেশের যাত্রা শুরু হয়, কোথায় পাবো তারে— এই গান গেয়ে সে-ই ঘুরে বেড়ায় অনির্দিষ্টের পথে। অবশেষে সমরেশ পান। 'মানুষ রতনে'র সন্ধান। কাম ও প্রেম, সংরাগ ও বৈরাগ্য, ঘর ও পথ দুইকেই যিনি জীবনের দুটি অনিবার্য দিক বলে জানেন, তিনি এও জানেন, মানুষ, একমাত্র মানুষই সর্বশক্তির উৎস। জীবনের নানা দুঃখ সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি খোঁজেন 'শিকল ছেঁড়া' সেই হাত, যা 'প্রতিরোধ'-এ উদ্দাম, অথচ বিরহে বিধুর। সেই পরম জীবন সন্ধানী, জীবন সংগ্রামী সমরেশের আশ্চর্য-নিটোল জীবনধর্মী গল্প 'প্রতিরোধ'। 'প্রতিরোধ' সময় সচেতন, সময়ের নিরিখে লেখা গল্প। "সেই আকালের দিনে কাঙাল কঙ্কালের মেলায় মনাই আর রাধার সঙ্গে সুবলের পরিচয়। তখন থেকে সবাই জানে সুবলকে—সে কবি-গায়ক। সেই থেকেই সুবল ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র, সুবল সকলের আপনার।" ১৯৪৩-এর বাঙলার বীভৎস, প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষের দিনে মনাই ও রাধা নামে এক কৃষক-দম্পতির সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে গেল সুবল। 'আকাল'-এর ভয়ঙ্কর নিরন্ন দিনের ধ্বংসের মধ্যে মানুষের চিরন্তন ভালোবাসাই বিজয়ী হল। রাধা ও সুবল—দুটি নামের এক তারায় ঝংকার তুলে দিল বৈষ্ণবীয় প্রেমের মাধুর্য। সুবল কবি-গায়ক। সে শিল্পী। দুর্ভিক্ষ মানুষের পেটের খাবার কেড়েছে। কিন্তু মনের মাধুর্যকে ঐ মন্বন্তরও নষ্ট করতে পারেনি। আকালকে তুচ্ছ করে বেজেছে সুবলের গান। সূর্যাস্তের পরে সূর্যোদয় যেমন নৈসর্গিক সত্য, তেমনি দুঃখের চক্রাবর্তনে আসে সুখ। ১৯৪৩-এর সেই মহামন্বন্তর আবার জীবনের উল্লাসে মাঠভরা ফসলে মন ভরা আনন্দে নূতন সুখে বেজেছে। 'আকাল গেছে, আবার মানুষ ভিটায় ফিরে এসেছে। আবার শুরু হয়েছে জীবনের গান—বাঁচার অভিযান।" দুঃখের অন্ন ভাগ করে খেতে পিছ-পা হয় না এদেশের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। আবার সেই শূন্য মাঠ ফসলে ভরার স্বপ্নে মনাই ও সকলের সঙ্গে মহাজন পীতাম্বর সা-র খাতায় টিপ সই দিয়ে বীজ-ধান নিয়ে এসেছে। পীতাম্বরের মাঠেই ভাগচাষী হয়ে ফসল ফলাবে মনাই।

'প্রতিরোধ' অবশ্য গত শতকের বিখ্যাত '৪৩-এর মন্বন্তরের গল্প নয়। 'প্রতিরোধ' মন্বন্তরের শেষে নূতন আশায় বুক বাঁধা কৃষকের আরেক প্রতিরোধের গল্প। এই গল্পের পটভূমি বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলন। বাংলার অন্যতম এই কৃষক আন্দোলন বিশেষত উত্তরবঙ্গের এক বিরাট এলাকার ভাগচাষীদের উৎপন্ন ফসলের দুই ভাগ পাওয়ার দাবিতে এককাট্টা করেছিল, তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল মহাজন-জোতদারদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ ভারতের হিংস্র শাসকের ভয়াবহ মার খেতে খেতে প্রতিরোধ গড়েছিল মনাইয়ের মত অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল-রাজবংশী কৃষকেরা, বিশেষত যে অশিক্ষিত কৃষক-বধূরাও সেদিন গণসংগঠনের চূড়ান্ত দক্ষতা ও দুর্জয় মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল, 'প্রতিরোধ' গল্পে আছে সেই মেয়েদের কথাও। সংগ্রামী সমরেশের রুখে-ওঠা প্রতিরোধের আগুন-ঝরা জীবনচিত্রের

পাশে কবি-গায়ক সুবলের গানে গানে ঝরে পড়ে যেন কালকূটের সেই আর্তি—'কোথায় পাবো তারে'। সুবলের মানসী প্রতিমা রূপ নিয়েছিল রাধার মধ্যে। রাধার রূপ পাগল করে সুবলকে। সে একতারার সুরে প্রাণের প্রেমের ভাষা মিশিয়ে রাধাকে বলে-"সখি তোমার রূপের আলো পড়ে আমার চোখেতে,/কালো ভোমরা পাগল হইল, পুইড়া মইল, তোমার রূপেতে,/ও বঙ্কিম নয়ন তুইলা আমার পানে চাইও না,/ওই হাসি দিয়া ভুলাইও না এই মিনতি করি তোমার পায়েতে।" সুবলের এই নম্র রূপানুরাগ রাধার মনে এক বিপ্রতীপ বেদনা সৃষ্টি করে। আর তখন এই গল্পটিও স্বতন্ত্র আরেকটি মাত্রা পেয়ে যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে জেনে নিতে হবে তেভাগা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, যার চালচিত্র ছাড়া গল্পের প্রতিমা নির্মিত হ'ত না।

বাংলার কৃষকরা চিরকালই জমিদার-মহাজন-জমিদার কেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রের নির্যাতনের শিকার। বিশশতকের চল্লিশের দশক—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্বন্তরের পর ইংরেজ শাসক তখন থমকে দাঁড়িয়েছে শেষ সীমান্তে। আইন অমান্য আন্দোলন, আই. এন. এ. আন্দোলন, একের পর এক প্রতিরোধের ঝড় আছড়ে পড়ছে দেশের মধ্যে। আর সাধারণ কৃষকের রুটিরুজিতে লাগছে ভাঁটার টান। চিরকালের দুর্বিষহ অনশনের যন্ত্রণা এখন আরো নগ্ন হয়ে উঠছে। তাদের তখন দেয়ালে পিঠ, রুখে না দাঁড়ালে নিশ্চিত মৃত্যু। আর তখনই তাই নূতন প্রতিরোধ রচনা করে ঘুরে দাঁড়াল বাংলার কৃষকেরা। 'রক্তে বোনা ধান' আর তারা তুলে দেবে না মহাজনের হাতে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই শেষ প্রহরে বাংলার মরিয়া কৃষকেরা তখন শুরু করল অন্য এক স্বাধীনতার লড়াই। ফসলের তিন ভাগের দুভাগ চাই তাদের। জোতদার জমিদারদের ঘরে সব ধান আর তারা যেতে দেবে না। এই তেভাগা আন্দোলন রুখতে শাসক ইংরেজের পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বশক্তি নিয়ে। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় নখদন্ত নিয়ে এগিয়ে এল সামন্ততান্ত্রিক জোতদার-মহাজনের দল। দলে দলে কৃষক ও কৃষক-বধূরা নির্যাতন নিল বক্ষ পেতে। কেমন ছিল 'তেভাগা'-পূর্ববর্তী বাংলার কৃষকদের অবস্থা? ইংরেজ সরকার তখনকার বাংলায় ভূমি রাজস্ব কমিশন বসিয়েছিলেন। তৎকালীন এই 'ফ্লাউড কমিশনে'র রিপোর্ট সূত্রে জানা যায় "তখন বাংলার শতকরা ৪৬ জনেরই জমি ছিল দুই একরেরও নীচে। তার ভেতর আবার ২২.৬ ভাগের জমি ছিল ২ থেকে ৫ একরের ভিতর। অর্থাৎ গরীব চাষি ও জমিহীন চাষির সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৪ ভাগেরও বেশি।" এছাড়া ভাগচাষিদের অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ। "এদের বেশির ভাগই ছিল জমিহারা। যাদের বা সামান্য দু-এক বিঘা জমি ছিল তাদেরও দিন গুজরানের কোনও প্রশ্নই ছিল না। জোতদারের জমি চাষ করে ফসলের আধভাগ তাদের পাবার কথা। কিন্তু জোতদারের বর্বর আইনি তাবওয়াব মিটিয়ে বেশির ভাগ আধিয়ারকেই শূন্য ডালা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হত। আবার এসে হাত পাততে হত সেই জোতদার মহাজনের কাছেই। ফলে গলার ফাঁস আরও শক্ত হত।" ("তেভাগার লড়াই" বিভূতি গুহ, ২.১৯, 'তেভাগা আন্দোলন' সম্পাদনা ধনঞ্জয় রায়।)

'প্রতিরোধে'র মনাই এমনই একজন ভাগ চাষী, পীতাম্বরের কাছ থেকে বীজধান ধার নিয়ে তারই জমিতে ভাগ চাষ করে দিয়ে মনটা তাদের বড় খুশী-খুশী লাগে এখন। সেই আকাল আর নেই, কিন্তু সুবলের কণ্ঠে আকালের গান তখনো পুরনো ক্ষতকে জাগিয়ে তোলে। স্মৃতির

আবেশে, ব্যথার আবেগে সুবল সেই আকালের গান গায়। সুবলের গান যেন জীবন্ত ইতিহাস। যারা আকালের অনেক পরে জন্মেছে, সেই শিশুরা তো সুবলের গানেই শোনে—একদিন কোন্ মহাদুর্দিন এসেছিল তাদের দেশে। 'মানুষের শত্রুদের' তৈরি সেই মহাদুর্ভিক্ষের গান গায় সুবল—

"শুন গো দেশবাসী, শুন মন দিয়া,
কহিতে পরাণ কান্দে, কান্দে আকুল হিয়া।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইল, মইল উলুখড়,
আশি ট্যাকা মন চাউল হইল বাড়ল ধানের দর
শুকনা মাঠ দৈত্যের মত হাঁ কইরা রইছে,
পানি দেওয়ার লোক নাই সব মরণ শয্যা লইছে।
কামারশালে আগুন নাই—হাপরে নাই টানা।
বাজারে নাই লোহা—কামারের প্যাটে নাই দানা।"

সেই মহাশূন্যতার দিনগুলি স্পষ্ট হয় আবার। পুরোনো ক্ষতের পোকাগুলি যেন কিলবিল করে ওঠে। খাদ্যহীন-বস্ত্রহীন মন্বন্তরের গান গেয়ে কবিয়াল সুবল কামনা করে 'দূর কর এই অরাজকতা।" কিন্তু সুবল শিল্পী, কবি হলেও নির্ভীক। মানুষের শত্রুদের চিনিয়ে দিতে ভয় পায়নি সুবল। বরং যারা চাষীদের ক্ষুধার ধান চুরি করে নিজেদের পেট ভরিয়েছে, তাদের দিকে আঙুল তুলে বলেছে সুবল—

"রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাতে।
আড়তদার রঘুসাউ গুদামে বইয়া চাউলের পোকা ঝাড়ে।'
ও ভাই চাউলের বস্তায় পচানি ধরেছে;
সোনা মিয়ার আড়তে ভাই বস্তা নাহি ধরে,
ও ভাই—কলিরাজা মরণ বাড় বেড়েছে;"

এই গান বেঁধে সুবল অবশ্য দারোগাবাবুর ধমকও খেয়েছিল। এত সাহস সুবলের, আড়তদারদের দোষ ধরে। কিন্তু সাধারণ মানুষগুলির ভালোবাসা, মনাইয়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, রাধার বাঞ্ছিত সাহচর্য পেয়েছে সুবল, তাতেই সে ধন্য। মনাই চাষবাস করুক, কিন্তু সুবল আর রাধা ব্যস্ত থাকে—'মানস জমিন' আবাদ করার কাজে। তারা "গান বাঁধে গান গায়-গল্প করে"। আকালের দিন মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালসার রাধা রূপ-যৌবনে ভরে উঠেছে। তার চোখের চাঞ্চল্যে, ঠোঁটের রক্তিম মাধুর্যে, তার উদ্ধত বক্ষে যৌবনের সৌন্দর্য উথলে ওঠে। কিন্তু সুবল তো কামুক নয়, সে রূপতাপস। তাই রাধার রূপকে সে শরীর দিয়ে চায় না সে তাকে "সুরের মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে।" তাকে নিয়ে গান বাঁধে, আবার মনে মনে সঙ্কোচে মরে যায় সুবল। কিন্তু রাধাও সেদিন অপলকে চেয়ে থাকা সুবলকে বলেই ফেলে "আমারে চাইয়া চাইয়া দেখ, আর নিশ্বাস ফেলাও ক্যান? কিছু কওনা যে?" সুবল, লজ্জিত কণ্ঠে বলে "তুমি হইলা আমার মঘা, বঁধু, তোমারে দেখুম না—দেখুম কারে? দুটো চোখ ভইরা খালি তোমার রূপই দেখি আর ভাবি—কালার মনমোহিনী রাইমনিও কি এমুনিই আছিল না। কিন্তু ব্যর্থ হয় সুবলের রূপানুরাগ। তার আদরের রাইমনির অন্তর মথিত করে আসে দীর্ঘশ্বাস।

অথচ রাধার রূপের স্তুতিকে এতদিন পরে ভাষায় রূপ দিতে পেরে খুব তৃপ্তি পায় সুবল। "এমন তৃপ্তি সে পেয়েছিল মন্বন্তরের গান বেঁধে। এমন তৃপ্তি পেয়েছিল যাত্রার দল থেকে বেরিয়ে প্রথম যেদিন সে একতারাটা নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার গান-মুগ্ধ লোকেরা বাবাজী বলে যখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলেছিল, নাম আমার সুবল সাধু।" তার ঠিকানা-জিজ্ঞাসু জনতার রসিকতার জবাবও দিয়েছিল সে। সে নামে, কর্মে সাধুই, চোর বাটপাড় নয়। কিন্তু রাধা যে আজ তার মনচুরি করে, তার গানের ভাষা চুরি করে নিশ্চুপ হয়ে গেল, সে কেন প্রশংসা করে না তার? সুবল স্বভাবকবি। রাধার ভালোবাসা তার কণ্ঠে আজ গান এনে দিয়েছে। কিন্তু রাধাকে তো কোথাও খুঁজে পায় না সুবল। হঠাৎই সে দেখে রাধা যে অশ্রুসাগরে দলিত মথিত ঝরা ফুলের মতো অঝোরে কেঁদে চলেছে। গভীর বিস্ময়ে সুবল বলে, "কী-হইল সখি, আমার গান সুইনা দুঃখ পাইছ?" রাধার অন্তর জুড়ে যেন কোন পুঞ্জীভূত মেঘ গলিত হয়ে ঝরে পড়েছে দরবিগলিত অশ্রুধারে। যে গান তার সখীকে এমন দুঃখ দিল, সে গান বাঁধল কেন সুবল? অনুশোচনায় মরে যায় সে।

রাধা কান্নাভেজা গলায় এবার তার কান্নার কারণ ব্যক্ত করে। সে রূপবতী, কিন্তু এ তার ব্যর্থ রূপ, তার যৌবন জ্বালা ধরায়, ফলভারের পূর্ণতা আনে না। আজো সে সন্তানহীনা। বন্ধ্যানারীর এই ব্যর্থ-রূপরাশি যে তার কলঙ্ক? সুবলও এবার বোঝে, তার বন্ধু মনাই এই জন্যই অন্যমনস্ক, উদাসীন। সন্তানহীনতার সমস্যা রাধা-মনাইয়ের দাম্পত্যেও বুঝি চিড় ধরিয়েছে! রাধা তাই সুবলের রূপের স্তুতি শুনে হাহাকারে ফেটে পড়ে। বলে—"আমার এই পোড়া রূপই সার—মাকাল ফলের বাহার—এই রূপের কথা শুনলে পরে আমার বড়ো কষ্ট লাগে।" মনাইকে সে একটা সন্তান দিতে পারে না। "বন্ধ্যা কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ডুকরে ওঠে সে। সুবলের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বন্ধুর এই দুঃখটা তো সে এমন করে ভাবেই নি এতদিন। কিন্তু সন্তান যে বিধাতার দান। তাই যেন সেই বিধাতার লীলা না বোঝার আক্ষেপেই সুবল গান গেয়ে ওঠে-"প্রভু অবুঝ মোরা, বুঝি না তোমার রঙ্গ হে।/মা করিয়ে গড়েছো যারে দিয়েছো এতেক রূপ/তবু শূন্য বুক, শূন্য গর্ভ ও তোমার কেমন রঙ্গ হে"। রাধার অন্তরে মাতৃত্বের কামনা জেগেছে, শূন্য বুকে কোনোদিন কি সে সন্তানের স্পর্শ পাবে না? তার শূন্য গর্ভে উপ্ত হবে না শিশুর নবজীবনাঙ্কুর?

এখানেই এ গল্প অসামান্য আর একটি তাৎপর্যে যুক্ত হয়ে যায়। 'প্রতিরোধ' কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী। ধান্যলক্ষ্মীর, ক্ষেত্র-জননীর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মাটির সন্তানদের কাহিনী। কিন্তু নারী ও ভূমি, জননী ও ধরিত্রী এখানে একাকার হয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথাটা ব্যক্ত করেছে। আদিম পৃথিবী ছিল মাতৃতান্ত্রিক, মাতৃপূজক। উর্বরা স্ত্রী শক্তির প্রজনন ও ধরিত্রীর ফসল সেদিনের লোকচেতনায় একাকার হল কর্ষণে, জলসিঞ্চনে ধরিত্রী হয় গর্ভবতী, তার রুক্ষ মৃত্তিকা সরস হয়, তখন "নব অঙ্কুর জয় পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ।" মাঠ-ভরা ফসল বুকে নিয়ে ধরিত্রী জননী হয়, আর নারী শূন্যগর্ভও যেন বন্ধ্যা ধরিত্রী, পুরুষের ঔরসে নবজীবনের বীজবপনে নারী হয় জননী। ফসল ও সন্তান—একটি মানুষের উদরের খাদ্য, অন্যটি তার জীবনধারার উত্তরাধিকার—দুই-ই যে একই অর্থ বহন করে। তাই পৃথিবী ও জননী দুই-ই পালয়িত্রী—দুই-ই জন্মদাত্রী। মনাই-শ্রীশ ফকির মধু-হেম-মানুরা মাঠ ভরা ফসলের স্বপ্ন

দেখে, আর রাধা স্বপ্ন দেখে কোল ভরা সন্তানের। কবিয়াল সুবল এই জীবন-রঙ্গ ও জীবন-বেদনার গান গায়। সে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, জীবনধাত্রী পৃথিবীর সে চারণ-কবি।

কিন্তু সুবলের কাছে সন্তান হারা রাধার কান্না ছাপিয়ে যেন মনাইয়ের চাপা উত্তেজনার সুরটাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মনাই-শ্রীশ-ফকির-মধু-হেম এরা সবাই—কামারবাড়ী যাচ্ছে। সুবলকে গান গাওয়ার অনুরোধ করে গেল তারা। কিন্তু কেন এই আর্জি, কিসের গান বাঁধতে হবে সুবলকে? মন্বন্তরের না নবজীবনের সুখ-সমৃদ্ধির গান। চিঁড়ে-মুড়ির পুঁটলি নিয়ে বেরোনোর সময় স্ত্রী রাধার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যায় মনাই—"কামারবাড়ি যাইতেছি। কাম রইছে মেলা।" অভিমানী রাধার অন্তর্বেদনা সুবলের আনমনা একতারার তারে মিশে যেতে থাকে বারবার।

কৃষক-বধূ রাধা, ঢাকের বোলের অর্থ তার অজানা নয়, কামার বাড়ি যাওয়ার মানেও বোঝে সে। আসছে ফসল কাটার মরসুম, কাস্তেতে শান দিতে হবে এবার। নিজেদের দাবি বুঝে নিতে মাঠে নামছে চাষার দল। এবার অন্য রকম ধান কাটার পালা। কামার বাড়ির কাস্তে বানিয়ে ওরা যেন বলছে—"বেয়নেট হোক যত ধারালো/কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!" দীনেশ দাস। ঢাকের বোলে আজ ধান্য-লক্ষ্মীর বিসর্জনের কথা ভাবছে না ওরা। এতকাল তো রোদে জলে-শ্রমে ফলানো ফসল ওরা তুলে দিয়ে এসেছে মহাজন পীতাম্বর সা-র গোলায়। এবার তেভাগার ডাক পৌঁছেছে তাদের কানে। পাগলা গাজনের মাতন বাজে বুঝি ঢাকের বোলে। "জীবন ভর পেটের জ্বালার পরিসমাপ্তি করবে আজ তারা। তাই-অজস্র ক্ষুধার্ত আর ম্যালেরিয়া রোগীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাঠে। নিজেদের পেটের দানা আজ তারা কেড়ে নেবে। লড়াই তারা করবে, প্রাণ তারা দেবে, তবু ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবে বহুদিনের সঞ্চিত সমস্ত ঝামেলা, কাঁটার বোঝা।" ১৯৪৩-এর মহামন্বন্তর তারা প্রতিরোধ করেছে, সেদিন ওরা বেঁচেছে ওদের আশ্চর্য জীবনী শক্তিতে। সেই দুর্ভিক্ষ ওদের আরো বেশী করে শিখিয়েছে, ওদের মাঠের ফসল কিভাবে মহাজনের ঘরে জমা হয়ে তাদের লোভের প্রাসাদ গড়ে। আজ ওরা নিজেদের উৎপন্ন ফসল ব্যবহারের স্বাধীনতা দাবী করেছে। কৃষক-বধূ রাধার উত্তেজিত-করুণ-কোমল হাত জড়িয়ে ধরে সুবলের হাতটাকে। সুবলের মধ্যে জাগে তীব্র আবেগ। যে আবেগে সে মন্বন্তরের গান বেঁধেছে। সেই একই আবেগে আজ সে গাইবে তেভাগার গান, আধিয়ারের গান। এই আধিয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে ইতিহাস বলছে : "১৯৪৬-৪৭ সালের ধান কাটার মরসুমের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে অখণ্ড বাংলার প্রায় উনিশটি জেলায় আধিয়ার কৃষকরা তেভাগা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। ওই সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ওই অঞ্চলে বর্গাদাররা আধিয়ার নামে পরিচিত।" (অবিস্মরণীয় আধিয়ার বিদ্রোহ, সুশীল সেন, ২১৩, তেভাগা আন্দোলন, সম্পাদনা ধনঞ্জয় দাস।) মহাজন জোতদাররা সেদিন এই আধিয়ারদের থেকে নানা ছুতোয় ধান কেড়ে নিত। সেই সঙ্গে "কর্জ ধান পরিশোধের নামে সুদসহ দ্বিগুণ তিনগুণ দাম কেটে নিত। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধেই সেদিন আধিয়াররা প্রতিরোধ করেছিল।" (ঐ)

সমরেশ বসুর জীবন চেতনা সেদিনের না-খেতে-পাওয়া কৃষকদের আগুন-ঝরানো, হৃদয়-গলানো অধিকারের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুবলের বাউল চোখে তিনি দেখেছেন

"যেন কী এক উল্লসিত স্বপ্নের ছায়া।" বিদ্রোহের তরবারি হাতে তুলে নিতে গিয়ে এই সুবল একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবে বাউলের একতারা। প্রতিরোধের লড়াইয়ে হারিয়ে যাবে তার কবিত্বের স্বপ্ন।

'সুবলের মনে পড়ে মনাইয়ের কথাগুলি। জোতদারের ঘরে এবার অর্ধেক ফসল তারা তুলে দিয়ে আসবে না। তিনভাগের দুভাগ তারা নেবে, এটা হক—ন্যায্য প্রাপ্য।" 'জমি যার লাঙল তার' ফসলের হকও তাদের এই দাবী নিয়ে সেদিন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চিরশান্ত, চিরসহিষ্ণু কৃষিজীবী বাংলা। রুখে দাঁড়ালো মনাই-রহিমের মত অসংখ্য হিন্দু মুসলমান-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার কৃষক সমাজ। তারাই তো "বীজধান থেইক্যা শুরু কইর‍্যা" রোদে-জলে ভিজে পুড়ে গোটা কৃষিকর্ম সমাধা করে, আর বখরা নেবার বেলায় পীতাম্বর, দেনার দায়ে জমি-ভিটা ঐ মহাজনের কাছে বেচে দিয়েই তো আজ তারা তারই জমিতে ভাগচাষী। রাধা সেদিন মনাইয়ের এসব কথার মানে বুঝতো না। সে তো চিরকাল জেনে এসেছে, মহাজনদের নির্দেশ মেনে চলাই কৃষকদের রীতি। না খেয়ে মরাই তাদের ভবিতব্য। কিন্তু আজ জেগে উঠেছে নতুন যুগের নিপীড়িত মানুষ। কণ্ঠে কণ্ঠে তারা আওয়াজ তুলছে, নিজেদের হক কেড়ে নেবে ওরা। সুবল গানে গানে মনাইদের জানায় তার সমর্থন—"সুবলের বুকের মধ্যে দুলে ওঠে। এক উন্মত্ত নেশায় যেন পাগল হয়ে ওঠে সে।" সুবল ঢাকের মত্ত বোলের সঙ্গে গান ধরে-"আমার খুনের দানা কাইটা লমু মানি না হুকুমদারি কলিজার খুনের পর দায়-প্রাণ বাচামু সত্য যুগের হকদারি।" 'রক্তে বোনা ধানে' তাদের চিরকালের, হক, কবিয়াল সুবল যেন চারণের বেশে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে হকের ফসল ঘরে তুলতে উদ্দীপ্ত করে কৃষকদের। ধারালো কাস্তের চকমকিতে উজ্জ্বল হয় কৃষকের এতদিনের মৃতপ্রায় অস্তিত্ব। এবার ধান কাটার পালা এসেছে। নবচেতনার উদ্দীপনায় চাষার দল যেন শহরের কলের মেশিনের মত 'একযোগে' নেমে পড়েছে মাঠে। দ্রুত চলছে ধান কাটার কাজ, সব চাষার ভয়ের বিষকে নীলকণ্ঠের মত শুষে নিয়ে, সুবল ক্লান্তিহীন কণ্ঠে নূতন গান বাঁধে, সেই গানই হয় তাদের কর্মের প্রেরণা।

কিন্তু মনাইয়ের তো শুধু মাঠ-ভরা ফসল হলেই চলবে না। তার বৌয়ের কোল-ভরা শিশুটি যে কবে তার সংসারের ফসল হয়ে আসবে? তাই ধান কাটার উত্তেজনার মধ্যেই মনা রাধার জন্য আনে মহেশ ঠাকুরের 'জলপড়া', 'মা ষষ্ঠীর চরণ-ধোয়া জল।' এর বাইরে তো কিছু জানে না এই গরীব-গুর্বো অশিক্ষিত সাধারণ মানুষগুলি, দেবতার দয়া হলেই সন্তান আসবে, এই বিশ্বাসে দেবতার দোর ধরেই থাকে মনাই। সেই কোন্ দূরের নিমাইহাটা থেকে ঠাকুরের জল এনেছে সে, এবার হয়তো তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই, কিন্তু মনাই তখনো জানতো না, রাধা ততদিনে সন্তানসম্ভবা, তার কোল আলো করে শিশু এল বলে। মাঠের মত, রাধাও এবার তার শরীরের ফসল দেবে মনাইকে। সুবল অবাক হয় মনাইয়ের কত 'আশা অনুপ্রেরণা'র কথা ভেবে। সন্তানের জন্য এত ব্যাকুলতা তার। সারাদিনের ধান কাঠার পরিশ্রমের পরেও সে নিমাইহাটা গেছিল রাধার জন্য? রাধা জল খেয়ে প্রণাম জানায় ঠাকুরকে।

ধান কাটার পালা প্রায় শেষ হয়ে আসে। সুবলের কণ্ঠে বাজে সাহসের গান, আশার গান, ভীরু মানুষগুলির প্রেরণার গান। কিন্তু সুবল হঠাৎ যেন থমকে গিয়ে দেখে রাধার রক্তিম মুখে,

সুস্বাস্থ্যের দীপ্তিতে যেন আসন্ন নবজন্মের কোনো ইঙ্গিত? ঠিকই—রাধা এবার জননী হতে চলেছে। ধরিত্রীর মতই তারও কোল ভরা ফসল ফলবে এবার। মনাইকে তো বলেনি এতদিন রাধা। এই সুখ-সম্ভাবনাকে শঙ্কার সঙ্গে সে শুধু নিজেরই মনে লালন করে গেছে। পাঁচমাসের গর্ভবতী রাধা "নিজের সামান্য স্ফীত জঠরে" 'মুগ্ধ বিস্ময়ে' গভীর মমতা'য় হাত বুলিয়ে অনুভব করতে চায় সন্তানের হৃৎস্পন্দন।' তার আর মনাইয়ের সন্তান আসছে। রাধা আর শুধু মনাইয়ের স্ত্রী নয়, সে তার সন্তানের মা। আর তাকে কেউ বাঁজা বলবে না, আর মন খারাপ করবে না তার স্বামীর। আর ধানের পালা কেটে তার জন্য ঠাকুরের জল আনতে নিমাইহাটা ছুটতে হবে না মনাইকে। "সে আজ বিজয়িনী, সে আজ সত্যি গরবিনী।" কিন্তু এত সুখের খবরটা মনাইকে দিতে গিয়ে থমকে যায় রাধা। এবার প্রতি-আক্রমণে নেমেছে পীতাম্বর সা, সোনা মিয়া, জহুরুদ্দিনের মত জোতদারের দল, তাদের লোভের প্রাসাদ ভেঙে পড়তে দেখে লোভী-জানোয়ারের মত হিংস্র থাবা চাটতে চাটতে ওরা বেরিয়ে এসেছে কুটিল অন্ধকারে।

কিন্তু সুবল ও রাধার সহজ সারল্যের কাছে বিপদের বার্তা ঘনীভূত হয়না এখনো। আজ ওরা দুজনেই বড় খুশী। রাধা খুশী তার সম্ভাবিত মাতৃত্বে, সুবল খুশী তার বন্ধুর আনন্দিত মুখচ্ছবিতে। সুবল গান শোনায় রাধাকে। 'মালক্ষ্মীর ধানের গোলা ভরার গান। আবারও মাটি ও মা একাকার হয়ে যায় এই গানে। "পরাণ ছেঁচিয়া সোনা তুলিয়া নিজ ঘরে,/ সোনায় আনিল সোনা মলিনার গর্ভে। জননী হাসিতে মা লক্ষ্মীগোলা ভরে।"—রাধারও মনে হয়, তার সখাও 'মানানসই গান, গেয়েছে এবার। সোনার ফসল তার গোলায় ভরেছে, তার গর্ভেও ভরে আছে ভারি সোনার সন্তানের স্বপ্ন। রসিকতাও করে সুবল। তার সখী যে মনাইকে খুঁজতে কেন মাঠে এসেছে তা তো সে জানে। স্বামীসোহাগিনী রাধার তপস্যা আজ সফল। কতদিন পরে সে স্বামীকে দেবে নিজের মাতৃত্বের সংবাদ।

কিন্তু আনন্দেরও তো সময় নেই এখন। জোতদারদের এককাট্টা হওয়ার সংবাদও নিশ্চয় পৌঁছেছে মনাইদের কাছে। তারা সমিতির ঘরে জমায়েত হয়ে প্রতিরোধের পরিকল্পনা করবে এবার। রাধার নারীমন ভীত হয়। কী দরকার এত সভাসমিতির! অভিমানী রাধাকে সুবল বোঝায়— "সখি, এই দুনিয়ার মানুষের কিছুতে হক কাড়তে হইলে পরাণ দিয়া লড়তে হইব না তারে।" এবার বোঝে রাধা। সত্যই তো তার স্বামীর দায়িত্ব কত! সে যে সংগ্রামী সৈনিক। মাঠভরা ফসলের জিম্মা রাখবে সে। সে সৈনিকের স্ত্রী। কাঁদলে চলে তার? না অভিমান তাকে মানায়?

পীতাম্বর সা-দের সভা শেষে লোকজন মাঠ দিয়ে ফিরতে ফিরতে দেখে ধান-কাটা মাঠের শূন্যতা। রাত্রির অন্ধকারে কচুরিপানা ছাওয়া বিল আর জলে ভরা ঘাসগুলি দেখে স্বপ্ন জাগে কৃষকের মনে। "অনাহার নয়, দেনা নয়, রোগ নয়, মৃত্যু নয়, মা-লক্ষ্মী থাকবে ঘরে বাঁধা।" আবার পৌষ লক্ষ্মীর আসন পাতা হবে মাঠ-ভরা ফসলে। শুধু তো ফসলে মাঠ ভরবে না, আর বছরেও হয়তো এমনি করে কোল ভরবে রাধার। নূতন সন্তান-সম্ভাবনা ফুটবে তার শরীরে। কী চমৎকার সুখের সে জীবন!

কিন্তু লক্ষ্মীর বিদায়ও বুঝি আসন্ন হবে এবার। ছিঁড়ে দুটুকরো হবে রাধার দেখা এই সুখের ছবি। তারই পূর্বাভাস বাজে রাধার কণ্ঠে। সন্ধ্যেবেলায় আরতি করতে গিয়ে তার হাত থেকে ধূপতি পড়ে গেছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় রাধা সুবলকে বলে, সে যেন একবার খুঁজে আনে

মনাইকে। রাতের আকাশে যেন যুদ্ধের ঘনঘটা। একটু আগে অন্ধকার বিলের সেই ঘাস আর কচুরিপানার শান্ত সৌন্দর্য বদলে যায় আকাশ ভরা রক্তলেখায়। "দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে উঠছে।" না—এ প্রকৃতির রক্তাভা নয়। আগুন লেগেছে কোথাও। "দাউ দাউ করে ওঠে লেলিহান আগুনের শিখা।" লোভের আগুন—হিংসার আগুন—পীতাম্বর সার দলবলের ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে এককাট্টা কৃষকদের সমিতি ঘর। আজ জোটবদ্ধ কৃষকদেরও শুরু হবে শেষ সংগ্রাম। বাড়ি এসে চিঁড়ে মুড়ি কাপড়ে বেঁধে নিয়ে মনাই দৌড়য় নিমাইহাটার বংশী মন্ডলের বাড়ির দিকে। হুলিয়া বেরিয়েছে তাদের নামে। প্রতিরোধ গড়তেই হবে তাদের। জমিদার-জোতদারদের রোধ করতেই হবে এবার। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে কে বাঁচাবে মাঠের ফসল, এতগুলি মানুষের প্রত্যাশা, যাবার আগে রাধাকে একবার জিজ্ঞাসা করে মনাই -"দেখিস পারবি তো?" ধানের গোলায় সবে ভরতি হয়েছে মাঠভরা ফসল। সেই ফসল আবারো লুঠে নিয়ে যাবে না তো পীতাম্বর সা-র দলবল? এই প্রথম রাধা যেন দুর্গা হয়ে ওঠে। তার অশ্রু বিগলিত, অভিমানী, প্রেমার্ত কণ্ঠস্বর কতই তো শুনেছি আমরা। সে এবার রণরঙ্গিনী চামুণ্ডার মতই ধানের গোলা রক্ষার আশ্বাস দিয়ে মনাইকে বলে—'আমি শিবদাস মোড়লের মাইয়া না? ধান কাড়বনি আমার কাছ থেইক্যা? কত মায়ের দুধ খাইছে ঢ্যামনরা দেইখ্যা লমু! তুমি যাওগা—দেরি কইরো না।" না—রাধার এই বীরাঙ্গনা রূপের মধ্যে একটুও অস্বাভাবিকতা নেই। এ কোনো কল্পনার ছবিও নয়। আধিয়ার ও তেভাগা আন্দোলনে বাংলার কৃষাণী মেয়েরা সেদিন যে অসম সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। "যে অজ্ঞ কৃষক একদা পুলিশের লাল পাগড়ি দেখলে ভয়ে শিউরে উঠত, সেই কৃষককে অসীম সাহস জুগিয়েছে কৃষক আন্দোলন। তাই তো কৃষক-মেয়েও পুলিশের বন্দুক কেড়ে নেবার স্পর্ধা রাখে। এমনি করেই তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে কৃষক মেয়েরা।

..."তেভাগা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ অনেক অজ্ঞাত কৃষক নারীকে মরণজয়ী সংগ্রামের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এমনি বীর নারী ছিলেন খাঁপুরের যশোদারানি ও কৌশল্যা। ধুমনিয়ার শুকুর চাঁদের স্ত্রী, পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ তুচ্ছ করে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু পেছু হটেন নি।" (তেভাগার লড়াই, বিভূতি গুহ, তেভাগা আন্দোলন/ সম্পাদনা-ধনঞ্জয় রায়) গল্পের রাধা বাস্তবের এই কৃষক-বধূদেরই কল্পরূপ।

যাবার আগে সুবল মনাইকে রাধার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ দেয়। এই খুশীর সংবাদে আনন্দিত মনাই লড়াই-য়ে যেতে চায় না। কিন্তু রাধার তখন রূপান্তর ঘটেছে। সেও তো কৃষক কন্যা—কৃষক বধূ। আত্মপ্রাণের জন্য সমষ্টিব স্বার্থকে বিপন্ন করতে পারবে না সে। তার বাবা ছিল গাঁয়ের মোড়ল, দশজনের সুখের জন্য নিজের দুঃখকে তুচ্ছ করতে না পারলে নেতা কীসের? রাধার স্বামী কি শুধু তার কথা, তার সন্তানের কথা ভাববে, এই দীনতা হয়তো তাকে অস্থির করে তোলে। তাছাড়া স্বামীর নিরাপত্তাব কথাও যে তাকে ভাবতে হয়। বাড়িতে থাকলে মনাই ধরা পড়ে যাবে। পালাতে তাকে হবেই। জোর করে মনাইকে সরিয়ে দেয় রাধা। "তারপর সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে থাকে। সমস্ত গ্রামটাই প্রতীক্ষা করে থাকে অনিবার্য লড়াইয়ের দৃঢ় প্রতিবোধের জন্য। শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে সবাই। জান কবুল, তবু ধান ছাড়বে না কেউ। এ তাদের অভাব অনটনের রোগ শোক ছাড়িয়ে বাঁচার অভিযান।"

তাদের রক্তে ভাসে আকালের দুঃসহ স্মৃতি, কণ্ঠে বাজে প্রতিরোধের গান। তাদের শ্রমের ফসল শুধু তাদের। এবার প্রতিরোধের লড়াই ঐ ভণ্ড লোভী জোতদারগুলির সঙ্গে। রাত্রি ভোরে আসে ঐ মানুষ-নেকড়ের দল। সকলের আর্তনাদ শুনে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে সুবল ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ওর একতারাটা। "থাক যাক; চকিতে একবার সেদিকে দেখে নে বেরিয়ে পড়ে" সুবল। বাউলের একতারা ফেলে বুঝি এবার তাকেও তুলে নিতে হবে প্রতিরোধের রাঙা নিশান। রাধার রূপের গান বেজেছে যে একতারায় তা এবার ছিন্ন-ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে রইল পথের ধূলায়। সে একতারা বুঝি আর বাজবে না। সব শেষ করে দিয়েছে। শ্রীশের বউ পড়ে আছে রক্তস্রোতের মধ্যে। বাড়ীঘর লণ্ডভণ্ড, শ্রীশোর বারো বছরের ছেলেটা গোলার কাছে গিয়ে মায়ের দেহের ওপর পড়ে আর্তনাদ করছে—"পুলিশের লোক আমার মায়েরে খাইয়া ফেলাইছে।" পুরুষেরা সব গ্রামের বাইরে। আত্মরক্ষা অথবা আগামী-প্রতিরোধ পরিকল্পনার তাগিদে গ্রাম ছেড়েছে তারা। ধান্যলক্ষ্মী স্বরূপা মেয়েরা-মায়েরা গোলা আগলে পড়ে রয়েছে। জান কবুল করে ধান বাঁচানোর শপথ নিয়েছে তারা। তাদের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থেকেছে গোলার সামনে। বাংলার মেয়েদের এই অসামান্য রূপ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল গোটা দেশ। রহিমকেও মেরে ফেলেছে ওরা। "কবি সুবলের দাঁতে দাঁত চেপে বসে যায়। নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তার পদক্ষেপ। এ লড়াই কি শেষ লড়াই।" কবি সুবলের আর প্রয়োজন নেই একতারার-প্রতিরোধের শক্ত লড়াইয়ে এবার সামিল হবে সে-ও। ভূমি লুঠ হয়, লুণ্ঠিত হয় নারীর সম্মান। যে কোনো যুদ্ধেরই রীতি এই। নারী ও ভূমির পরিণাম একই। কর্ষিত ভূমির লোভে নরপশুর হাতে ধর্ষিত হয় নারীশরীর। মানুর বৌকে নগ্ন করে পথে নামিয়েছে পশুর দল। ছুটছে মানুর বৌ—প্রাণ মান রক্ষার তাগিদে। রুখে দাঁড়িয়েছে গোটা গ্রামের মেয়েরা। শিশু পালন আর গৃহকার্যের কোমল হাতে তারা তুলে নিয়েছে দা, কুড়ুল, লাঠি।

"সর্বাগ্রে রহিমের বৌ—হাতে কাটারি।" মানবতার এক নূতন ব্যাখ্যার সামনে থমকে দাঁড়াই আমরা। রহিমের পাঁজরায় অস্ত্র বিঁধিয়ে মেরেছে ওরা। রহিমের বৌ রণরঙ্গিনী বেশে ছুটে আসছে। তার রক্তে যেন আগুন ধরেছে। "আশ্চর্য! একদিন পেটের জ্বালায় রহিমকে ছেড়ে না সে অপরকে নিকা করেছিল। অপরের পর্দানসীন বিবি সে।" অথচ সেই পরপুরুষের পর্দা, সমাজের বিধানের পর্দা ফেলে সে নেমেছে রাস্তায়। তেভাগা আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার বিষলাড্ডুকে নীলকণ্ঠের মত গিলে ফেলেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই শেষ প্রহরে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সাম্প্রদায়িক দাবি জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। তার পরোয়া না করে হিন্দু মুসলমান কৃষকেরা সেদিন মিলিত প্রতিরোধ রচনা করেছিল জোতদারদের বিরুদ্ধে। শ্রীশ আর রহিম, মানুর বৌ আর রহিমের বৌ-এর মধ্যে সেদিন কোন ভেদ নেই। তথ্য বলছে "১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহিদ শিবরাম ও রুদ্দিন। কলকাতার আত্মঘাতী দাঙ্গার প্রায়শ্চিত্ত করলেন এই দুই কৃষক সন্তান। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্ত নতুন ইতিহাসের দিগন্ত রচনা করলো" (ঐ)।

'আদাবে'র সমরেশ ও 'প্রতিরোধে' হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের গল্প রূপ দিলেন আরো একবার।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মানুর বৌটা ধরা পড়ে গেল ঐ নেকড়েগুলোর হাতে। 'ইস :

পাশবিক ধর্ষণের এমন বীভৎস রূপ কল্পনা করতে পারে না সুবল। ধান-কাটা মাঠের শক্ত খোঁচা ডাঁটাগুলোর উপর ফেলে হিংস্র কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব। ভোরের স্পষ্ট আলো ঝাপসা হয়ে আসে সুবলের চোখে। পীতাম্বর সা-র উল্লসিত মুখটা কুৎসিত অট্টহাস্যে কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।" মারমুখী মেয়েদের ছুটে আসতে দেখে নারীমেধে উল্লসিত পশুগুলি পীতাম্বর সার পেছনে পেছনে পালিয়ে যায়। উদ্বিগ্ন মেয়েরা ভেঙে পড়ে আর্ত হাহাকারে—"হায় ভগবান বাঁচবনি?" দীনবন্ধু মিত্রের ক্ষেত্রমনি থেকে সমরেশ বসুর মানুর বৌ-রাধা-সব মেয়ের ভাগ্যই এক। কবি সুবলের কবিত্ব হারিয়ে যায়। ভোরের আলোয় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ঝাপসা হতে থাকে তার কোমল চোখে। আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস যেন থমকে দাঁড়ায় এবার। পুলিশ নিয়ে পীতাম্বর সা-কে গ্রামে ঢুকতে দেখেই একলা রাধার জন্য উদ্বিগ্ন সুবল ছোটে গ্রামের দিকে। বন্দুকের শব্দে তার বুক কেঁপে ওঠে। পেছন থেকে তাকে ডাকে মনাই। সুবল ভয় পায়—গ্রামে পুলিশ, মনাই তবু আসে কেন? আসলে মনাইয়েরও যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে আছে। "রাধার পেটে না পোলা।" কতদিনের আশা, সেই সন্তান, সেই সন্তানের মায়ের জন্য মনটা ব্যাকুল হয় না। ওদের সে দেখতে এসেছে—এবার। সুবল ও মনাই দ্রুত যেতে থাকে গ্রামের দিকে, সুবলকে আশ্বস্ত করে মনাই, রাধাকে একটু দেখেই আবার নিমাইহাটা চলে যাবে সে।

পুলিশ সরে গেছে তখন। মনাই বাড়ীতে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে যায়, "অক্ষত গোলার সামনে উবু হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত রাধা। তার তলপেট থেকে নির্গত অবিরল রক্তধারায় ভিজছে মাটি। মনাইয়ের কতদিনের আশা—তার 'পোলা'—তাকে ছিঁড়ে খেয়েছে পীতাম্বর সা-র পোষা জানোয়ারের দল। ধান্যলক্ষ্মী রাধা প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছে ধানের গোলা। এও এক অনন্য প্রতিরোধ। "সুবলের বুকে আগুন জ্বলে।" সখীর জন্য চোখে জল আসে তার। সারা জীবনের স্মৃতিতে সখীকে সঞ্চয় করে রাখবে সে। মাঠের ফসল রক্ষা পায়, কিন্তু মৃত্তিকার মতই সহিষ্ণু স্নেহময়ী নারীর প্রাণের বিনিময়ে রচিত হয় শয়তানের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল প্রতিরোধ। আগুন ঝরা বিদ্রোহ মনাইয়ের আর্তনাদে, সুবলের ঝাপসা চোখের জলে হয়ে ওঠে বিষাদময়।

কালচেতনার এই গল্পে কৃষক বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক সময় এভাবেই মানবিক মূল্যবোধে জীবন্ত হয়ে ওঠে আঞ্চলিক লোক-ভাষায়, কবিয়ালের সংগীত, রাধার মত নারীদের দৃপ্ত প্রতিরোধে ও যন্ত্রণা সহনে, আর মনাইয়ের মত শত শত কৃষকের বলিষ্ঠ প্রতিরোধের মধ্যে।

স্বীকারোক্তি : একটি অস্বীকৃতির গল্প

সত্রাজিৎ গোস্বামী

সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪-তে নৈহাটির 'ছোটোগল্প নবনিরীক্ষা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। মনে রাখতে হবে, 'স্বীকারোক্তি' নামেই সমরেশ বসু একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন ১৯৬৭ নাগাদ। অবশ্য 'স্বীকারোক্তি' উপন্যাসটি কোনোভাবেই সমনামের ছোটোগল্পটির বর্ধিত রূপ নয়, একান্তই পৃথক কাহিনি। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য যেটুকু, তা হল—প্রথমত, দু'টি কাহিনিই আত্মকথনের ভঙ্গিতে বিন্যস্ত; দ্বিতীয়ত, দু'টি ক্ষেত্রেই সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি তীব্র শ্লেষ ও অস্বীকৃতি প্রকাশিত এবং তৃতীয়ত, উভয়তই কাহিনির প্রধান চরিত্রটি একান্তভাবে আত্ম-উন্মোচন বা স্বীকারোক্তি করেছে তার পাঠকের কাছে—অর্থাৎ পাঠকের অন্তরাত্মা ও বিবেকবুদ্ধির প্রতি আস্থা বা স্বীকৃতির একটি অন্তর্লীন সুর শোনা যাবে দু'টি রচনাতেই।

১৯৬৪-তে প্রকাশিত 'স্বীকারোক্তি' গল্পটিই আমাদের আলোচ্য। তবে আলোচনার সূচনাতেই গল্পের শেষে পাদটীকায় উল্লিখিত লেখকের একটি মন্তব্য সন্ধানী পাঠককে একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক আলোড়নের ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। পাদটীকায় লেখকের মন্তব্যটি ছিল—''১৯৪৯ সালে বেআইনী ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত।''

বাম-অতিবাম কিংবা সংশোধনবাদী—নৈরাজ্যবাদী বামপন্থী মতাদর্শের আভ্যন্তর বিরোধ সমরেশের নানা গল্প-উপন্যাসে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। আর এই-জাতীয় কাহিনিগুলির মধ্য দিয়েই সমরেশ উন্মোচিত করেছেন সমকালীন সাম্যবাদী তথা প্রগতিবাদী রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা, যথার্থ রাজনৈতিক লক্ষ্যবিচ্যুত হয়ে স্বার্থ ও ক্ষমতাদখলের সংঘর্ষ, দলীয় নিয়মতন্ত্রের নামে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষমতার ঔদ্ধত্য ও সন্ত্রাস এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধের আত্মঘাতী সর্বনাশা সময়কে। সমরেশ দেখিয়েছেন লক্ষ্যচ্যুত এই বামপন্থী আন্দোলন আত্মঘাতী বিরোধের জেরে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র রাক্ষসকে কেমনভাবে জোগান দিচ্ছে প্রাত্যহিক আমিষাহার। সমাজতন্ত্রের মুখোশ-আঁটা দক্ষিণ ও বাম রাজনীতির এই যুগল অথবা সমবেত নৃত্যের নৈরাজ্যের অন্ধকারে, আশাহীনতায়, স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণার ধোঁয়ায় কেমন করে জন্ম নিচ্ছে 'প্রজাপতি'-র সুখেনের মতো হাজার লুম্পেন; অথচ যাদের স্বপ্ন ছিলো, সম্ভাবনা ছিলো, প্রেম ছিলো, শক্তি ছিলো। যৌবনশক্তির এই সমূহ অপচয়, প্রেমের রিরংসায় পরিণতি, শক্তির দানবে পরিণতির এই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটির দিকে সমরেশ বারবার আঙুল তুলেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষা ও কাহিনি-বয়নের মধ্য দিয়ে।

আমরা জানি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ সদ্য-স্বাধীন এই বাংলায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র সেদিন শুধু প্রগতিবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের উপরেই দমন-পীড়ন নামিয়ে আনেনি, যে-সমস্ত গণসংগঠন কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মী এই প্রগতিবাদের সমর্থক বা প্রচারক, তাদের উপরেও নামিয়ে এনেছিল দমনের খড়্গ।

কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ-ভারতের কাল থেকেই এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেও। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রাক্কালে কংগ্রেসি নেতাদের দেওয়া জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি প্রায় সবই ভুলে বসেছিলেন স্বাধীন দেশের নেতৃবৃন্দ। দুর্নীতি দমন, কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেওয়া, দরিদ্র শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের আর্থিক সুরাহা, দেশীয় পুঁজির যোগ্য ব্যবহারে জাতীয় উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের বিকাশ, যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সদ্য-স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার গোটা দেশকে নিয়ে গেলেন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও বিদেশি পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। সরকারি উদাসীনতায় চোরাকারবার ও কালোবাজারি প্রশ্রয় পেয়ে গেল, দ্রব্যমূল্য বেড়ে চললো লাফিয়ে লাফিয়ে, বেকারত্বের যন্ত্রণা শিক্ষিত যুবকদের ঠেলে দিল স্বপ্নভঙ্গের নৈরাশ্যে, শ্রমিক-কৃষক ভুগতে থাকলো যুগপৎ ক্ষুধা ও নিরাপত্তাহীনতায়। তারই সঙ্গে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পনেরো দিনের মধ্যেই সংঘটিত ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর প্লাবন বাংলাকে এক তীব্র সংকটের মধ্যে ফেলে দিল। ফলে এই স্বাধীনতাকে যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারলেন না প্রগতিপন্থীরা। ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিল, তা স্বার্থান্বেষী কংগ্রেসি প্রশাসনের পক্ষে অনুকূল ছিল না।

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে শান্তিকমিটি গঠন করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে, মহল্লায় মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মাধ্যমে পাহারা বসিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধে, আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অন্ন-বস্ত্র চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপনায়। সেইসঙ্গে জমিতে জোতদারের প্রতিপত্তি ভেঙে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের যথাযোগ্য মজুরি ও মানবিক সম্মানের আন্দোলন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের এবং ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করা ইত্যাদি কাজেও কমিউনিস্টরা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র আট মাসের মধ্যেই ঔপনিবেশিক ইংরেজ প্রশাসনেরই কায়দায় স্বাধীন দেশের সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নামিয়ে আনল স্বৈরাচারী আঘাত। রাজ্যের তথা সমগ্র দেশের নিরাপত্তার ধুয়ো তুলে সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বেই বিধানসভায় আনা হল পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ নিরাপত্তা বিল। এই বিলে ছিল বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি যাবতীয় স্বৈরতান্ত্রিক দমননীতিকে আইনগত স্বীকৃতির কৌশল। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সমস্ত মানুষই এই কালা-কানুনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রদিবাদ ও গণআন্দোলনকে অগ্রাহ্য করে ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮ এই বিল আইনসভায় পাশ হয়ে যায়। এই কালো আইনকে কার্যকর করতে ১৯ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে প্রফুল্লচন্দ্রকে সরিয়ে বসানো হয় ড. বিধানচন্দ্র রায়কে। আর এই আইনেরই বলে ২৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় কমিউনিস্ট পার্টির যাবতীয় কার্যকলা। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা ছাড়াও বিনা বিচারে আটক করা হয় ২৫,০০০ কমিউনিস্ট কর্মী-সমর্থককে। জেলের ভিতরেও চলতে থাকে অকথ্য পীড়ন।

সদ্য স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তথা বাংলার সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পটভূমিকে 'স্বীকারোক্তি' গল্পে তুলে আনলেন সমরেশ বসু। অতএব স্পষ্টভাবেই 'স্বীকারোক্তি' একটি রাজনৈতিক গল্প। স্বভাবতই গল্পে উঠে এল রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র এবং কৌশলী চেহারা। রাজনৈতিক কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য জেলকর্তৃপক্ষের মানসিক পীড়ন-কৌশল, এক জেল থেকে অন্য জেলে, এক সেল থেকে অন্য সেলে টানাপোড়েনের মধ্যে তৈরি করা আতঙ্ক, স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে 'কম্বল-ধোলাই'-এর দাগহীন ব্যবস্থা, অফিসারদের চোখে-মুখে 'শিকারের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি', সেলের আকাশহীন আলোহীন পরিবেশের ভয়ঙ্করতায় সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেহারাটা বিশ্বস্তভাবেই এঁকে দিয়েছেন সমরেশ।

লালবাজার হাজতের 'টিমটিমে অকম্পিত সেই আলো'-জ্বলা ঘর, দেওয়াল জুড়ে হিজিবিজি অক্ষরে লেখা কুৎসিত অশ্লীল শব্দাবলী, কখনও অর্ধোন্মাদ বন্দী, কখনও খিস্তিবাজ সমকামী লুম্পেন যুবকদের সাহচর্যের দমবন্ধকরা পরিবেশে রাজনৈতিক বন্দীকে রাখার সুপরিকল্পিত কৌশল রাষ্ট্রযন্ত্রের সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী হিংস্র চেহারাটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দেয়। রাজনৈতিক বন্দীটি—যার নাম সে বলেছে অনল—স্পষ্টই বোঝে—"......তাতে আমার মনোবল আরো নষ্ট হবে, আমি আরো বেশি গ্লানি বোধ করব, মুক্তির ইচ্ছে আমার প্রবল হয়ে উঠবে! আর তা উঠলেই ওরা আমার কাছে যা জানতে চাইছে, ওদের ধারণা, তা সহজ হয়ে উঠবে।"

একজন রাজনৈতিক বন্দীর কাছে কী জানতে চাইছিল রাষ্ট্রযন্ত্র তথা পুলিশ প্রশাসন? যদিও রাজনৈতিক বন্দীর কঠিন হয়ে ওঠা স্নায়ুর কাছে সেগুলো হয়ে উঠেছিল 'মামুলি প্রশ্ন', যেমন—"নাম, ধাম, পেশা, পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয়, পার্টিতে কত সালে এসেছি, কোন্ কোন্ নেতাকে আমি চিনি, তারা কে কোথায় আছে ইত্যাদি।" দিনের পর দিন ক্রমাগত এই একই প্রশ্ন করে যাওয়ার মধ্যেও এক ধরনের বিরক্তির উৎপাদনকারী পীড়ন লুকিয়ে থাকে। সেইসঙ্গে থাকে সন্ত্রাসের পরিবেশে একেবারে সার্বিকভাবে বন্দীকে ঘিরে রাখার কৌশল—স্পেশাল ব্রাঞ্চের সেলে নিশ্ছিদ্র একাকীত্ব, ছুঁচলো মোটা ঠোঁট-নোংরা দাঁত-কালো মুখ-মোটা লেন্সের চশমা পরা অফিসার, বন্দুকধারী প্রহরী, অফিসারদের মধ্যে ইঙ্গিতময় চাহনির নিঃশব্দ আদান-প্রদান, কম্বল-ধোলাইয়ে অচৈতন্য কোনো বন্দীর টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকার চকিত ছবি, ক্রূর উত্তেজনায় ঝলকানো অফিসারদের হিংস্র মুখ, কালো মোটা রুল, স্বীকারোক্তি আদায়কারী অফিসারের লোমহীন চোখের দৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপাতভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এই ছবি 'স্বীকারোক্তি' গল্পের পরিসরে যথেষ্ট বিশ্বস্ত বলে মনে হলেও এই দমন-পীড়নের পশ্চাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের যথার্থ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয় না কখনও। কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা কোন্ ক্ষমতাকেন্দ্রকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার দরকার হয় সদ্য-স্বাধীন এ রাষ্ট্রের, সেই প্রেক্ষাপট কিন্তু সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে দেন গল্পকার। সংক্ষিপ্ত ভাষা-স্কেচে শুধু ফুটে ওঠে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের একটা আলগা ছবি, যা এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্পষ্ট যথার্থ কোনো বিরূপতা তৈরি করতেই পারে না পাঠকের মনে।

কিন্তু বিপরীতপক্ষে, সমগ্র গল্পটিতে পাঠক মানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয় লেখক-

বর্ণিত আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দলের চরম নিয়মতান্ত্রিক যান্ত্রিকতা, ক্ষমতাকেন্দ্রের দর্পিত হিংস্রতা, আত্মঘাতী অন্তর্বিরোধ এবং সে কারণে পরোক্ষ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির হাতে পীড়নের অস্ত্র তুলে দেবার হঠকারিতা। ফলে 'স্বীকারোক্তি'-কে রাজনৈতিক গল্প হিসাবে স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সামগ্রিক এক রাজনৈতিক দর্শন বা সমকালীন রাজনৈতিক আদর্শ অথবা আদর্শচ্যুতিগুলির স্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ ছবি গল্পটিতে প্রতিফলিত হয় নি। বরং লেখক সমরেশের খণ্ড একদেশদর্শী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটিই এ গল্পে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত।

গল্পের রাজনৈতিক বন্দীটির (অনল) স্বগতভাষণ বা স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধের কারণেই সে ধরা পড়েছে। যে নিষিদ্ধ বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে ধরা পড়েছে অনল, সেই দলের কর্মসূচি, যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্র, অনুদার মতাদর্শ, দলীয় নেতাদের ক্ষমতাদম্ভ, দলবিরোধীদের শাস্তি দেবার নামে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতাকে কোনোদিনই অন্তর থেকে স্বীকার করে নিতে পারেনি সে। স্বীকারোক্তিতে অনল স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে— "পার্টির পরিচালকেরা জানে তাদের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে আমার মতভেদ আছে।"

যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ সেদিন পার্টির অভ্যন্তরে দানা বেঁধে উঠেছিল, গল্পে সেই মতভেদের মূল রাজনৈতিক সূত্রটিকেও এড়িয়ে গেছেন সমরেশ। মতভেদের বা পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের যে সূত্রটি সমরেশ গল্পে এঁকেছেন, সেটি একান্ত নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন। তাছাড়া একদা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, সেই একই অভিযোগ উঠতে পারে 'স্বীকারোক্তি'-র বিরুদ্ধেও। কেননা তৎকালীন বামপন্থী রাজনীতির সদর্থক দিকগুলি যেন চোখেই দেখলেন না সমরেশ, তাই এঁকে গেলেন মিহিরের মতো ক্ষমতালোভী ভঙ্গিসর্বস্ব ষড়যন্ত্রকারী এক নেতাকে, তাকেই গড়ে তুললেন পার্টির প্রতিভূ করে।

নিষিদ্ধ দলের আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে গোপনতা রক্ষার প্রয়োজনেই সেদিন কর্মীদের প্রতি কিছু কঠোর নিয়মতান্ত্রিক নির্দেশাবলি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়মতন্ত্রকেই অনল নামের পার্টিকর্মীটি দেখেছে অসহনীয় বন্ধন হিসাবে। তার মনে হয়েছে, মনুষ্যত্বের যে মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম, পার্টির অনুদার অমানবিক নিয়মতন্ত্র সেই মুক্তিসাধনাকেই পরিণত করেছে এক যন্ত্রণাময় বন্দিত্বে। প্রাণের অমৃতসন্ধানের বদলে পার্টি এনে দিয়েছে শুধু প্রাণের ওপর পীড়ন, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নের থেকে এ পীড়নের কোন তফাৎ নেই। মদভেদের দ্বিতীয় কারণ পার্টি-নেতৃত্বের ক্ষমতার ঔদ্ধত্য। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত ধ্রুব নামের একটি যুবককে আশ্রয়দানের কারণেই অনলের সঙ্গে পার্টির বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার আগে এই ধ্রুব ছিলো একজন সৎ পার্টিজান, যথার্থ দেশপ্রেমিক, চিন্তাশীল, বিবেকবান জননেতা। কিন্তু পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পরে এলাকায় নেতা বদলে গেল। ধ্রুবকে যেতে হল আন্ডারগ্রাউন্ডে। কেননা পুলিশ একসময়ের জননেতাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল কথা আদায়ের জন্যে। মিহিরের মতো পার্টির অ্যাকশন কমিটির নেতারা এই সময়েই ধ্রুবকে বহিষ্কার করে। আসলে—"বিবেকবান ধ্রুবর সঙ্গে জেলার একজন নেতা ও অ্যাকশন কমিটির মিহিরের ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে তাকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছিল।"

ধ্রুবকে বহিষ্কার করা মানে, সেই মুহূর্তে তাকে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এব', তার মানেই তাকে ধরা পড়তে হবে পুলিশের হাতে। এই অবস্থায় পার্টির নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে কেবল বিবেকের তাড়নাতেই অনল ধ্রুবকে আশ্রয় দিয়েছিল, পার্টি ও পুলিশের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু নিজ বিবেকের তাড়নায় অনল সমস্ত অপরাধ অস্বীকার করেছিল অ্যাকশন কমিটির সামনে। তার মনে হয়েছিল—"এই অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা বিবেকহীন দাস মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।"

পার্টির এই নিয়মতন্ত্রের অন্তরালস্থিত ক্ষমতালোলুপতার ষড়যন্ত্র অনলকে পার্টির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। পার্টির নির্দেশকে শুধু ক্ষমতার হিংস্র দর্পিত হুহুংকার বলে মনে হয়েছিল তার। শৈশবে বাবার নির্মম শাসনের বা প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী রেবার দাম্পত্য বিশ্বস্ততা দাবির পীড়নের কিংবা স্বাধীনতা-পূর্ব বিপ্লবী দলের নির্মম নিয়মতন্ত্রের অথবা স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রীয় পীড়নের সঙ্গে এই দর্পিত পার্টি-নিয়মতন্ত্রের কোনো তফাৎ নেই। এ সমস্ত পীড়নই তাই সমার্থক হয়ে যায় যুবকটির কাছে। এস. বি. সেলে স্বাধীন বাংলার পুলিশ অফিসারদের স্বীকারোক্তি আদায়ের ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই বারবার অনলের স্মৃতিতে কোলাজের মতো ফুটে উঠতে থাকে অভিজ্ঞতার টুকরোগুলো।

শৈশবে বদ্ধ জীবনের আগল ভেঙে মুক্তির স্বাদ নিতে যাবার অপরাধে অনলকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল পিতৃশাসনের—"বাবার খালি গা, পেশল শক্ত শরীর ও ক্রুদ্ধ মুখটা মনে হচ্ছে বাঘের থেকে ভয়ংকর, সিংহের থেকে হিংস্র। গলায় হিংস্র জিজ্ঞাসা : 'বল্, ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছিলি? নৌকা বাইতে? মাছ ধরতে? বল্ বল্ বল্। তা নইলে খুন করব আজ তোকে'।"

সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই দেশের মুক্তির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েও অনলকে দেখতে হয়েছিল নিয়মতন্ত্রের স্বরূপ। বিপ্লবী দলের সদস্য হিসাবে ব্রিটিশ প্রভুর অনুগ্রহপ্রাপ্ত রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের নাতনী অলকাকে ভালোলাগা অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল সেদিনের সেই বিপ্লবী পার্টির কাছে। অলকার প্রতি অনলের এই প্রেম, এই অন্যনিরপেক্ষ একান্ত মানবিক আকর্ষণ পার্টির নিয়মতন্ত্রের বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়েছিল। অতএব অনলকে দাঁড়াতে হয়েছিল বিপ্লবী পার্টির বন্ধুদের হিংস্র আক্রমণের মুখোমুখি। এস. বি. সেলে রাষ্ট্রযন্ত্রের হিংস্রতার সামনে দাঁড়িয়ে অনলের মনে পড়েছিল—"ঢাকা শহরের সেই প্রায়ান্ধকার গলিটার কথা, যেখানে মাত্র একটি কেরোসিনের লাইটপোস্ট ছিল, এবং তিনজন বন্ধু আমাকে ঘিরে ছিল। পার্টির বন্ধু। আজকের এই পার্টি নয়, অন্য পার্টি, সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টি। তিনজনেরই চোখমুখ ভীষণ নিষ্ঠুর আর হিংস্র দেখাচ্ছিল।"

বিবাহিত জীবনে স্ত্রী রেবার সন্দেহ-জড়িত দাম্পত্য বন্ধনের দমবন্ধকরা পরিবেশে একটু ভালোবাসার মুক্ত আকাশ খুঁজেছিল অনল। সেই মুক্তির শ্বাস নেবার আকুতি নিয়েই নীরার কাছে গিয়েছিল সে। কিন্তু এই ভালোবাসা সামাজিক নৈতিকতার চোখে, রেবার চোখে সামাজিক তথা দাম্পত্য চুক্তিভঙ্গের ভয়ংকর অপরাধ। তাই রেবার হিংস্র আক্রমণ ও স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টার মুখোমুখি হয় অনল—"আমার স্ত্রী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার বুকের কাছে জামাটা সে খামচে ধরে আছে।..... ....স্বীকারোক্তির জন্যে ও

আমার জামায় হ্যাঁচকা টান মেরে ফুঁসে উঠল, 'বল, কাল তুমি নীরার সঙ্গে দেখা করেছিলে কিনা'।"

কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কোনো স্বীকারোক্তি করে না অনল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অস্বীকার করে তার প্রতি তোলা অভিযোগগুলোকে। এ অস্বীকার যেন সমস্ত ব্যবস্থা, সমস্ত প্রচলিত যান্ত্রিক নিয়মকানুনের প্রতি অনলের অস্বীকৃতি। অনলের কাছে নীরা যেন এক মুক্তি-প্রতীক। সেই মুক্তির স্বাদ অর্জন করতে হয় রেবাকে ফাঁকি দেয়েই, যেমন করে নিয়মতন্ত্র-নিরপেক্ষ স্বাধীন মতামত ও আত্মবিবেকের মর্যাদাকে রক্ষা করতে হয় পার্টি-শাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ-রাঙানিকে ফাঁকি দিয়েই—"...যে আলিঙ্গন আমার স্ত্রীকে, সমাজকে, পার্টিকে এবং গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে অর্জন করতে হয়।"

সমরেশ যেন অনল-নীরার গল্পটির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত জীবন ও বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের আপাত বিচ্ছিন্ন সত্তা দুটিকে একই বিন্দুতে মিলিয়ে দেন। অনলের বোধে নীরাকে ভালোবাসার নিষিদ্ধ অপ্রতিরোধ্য টানটি যেন রাষ্ট্রীয় পীড়নের অতন্দ্র চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি বলিষ্ঠ সৎ আস্থার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়—"রাজনৈতিক মতবাদ যেমন একটি সৎ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নীরাকে ভালোবাসাও তেমনি...।" কিন্তু সেই রাজনৈতিক বিশ্বাস যদি যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রের আর সুবিধাবাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়, তাহলে সমরেশ অনায়াসে সেই বদ্ধতাকে, সেই মানবতাহীন নিয়ম-সর্বস্বতাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি বা দুর্বল অসৎ কুসংস্কার বলে অস্বীকার করেন। আর এখানেও মিলে যায় রাজনৈতিক সত্তা ও ব্যক্তিগত সত্তাব সেই অবিচ্ছেদ্য চেহারাটি—"....পার্টিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির মতো মেনে নেওয়া একটা অসৎ দুর্বলতা, ভীরুতা, তেমনি এই সমাজের বৈবাহিক বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণগুলোকেও মেনে নেওয়ার মধ্যে পাপ লুকিয়ে আছে।" এই যান্ত্রিকতাগ্রস্ত পার্টিতন্ত্রকে এমনকি মৌলবাদী ভাবনার সঙ্গেও তুলনা করতে পারে 'স্বীকারোক্তি'-র নায়ক—"...বর্তমানে পার্টি, আমার মতে ধর্মীয় দল ও আচার অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যুক্তিতর্ক বোধবুদ্ধিহীন অলৌকিক বিশ্বাসে আত্মদানে উন্মুখ, আমার স্ত্রী একজন সেইরকম বিশ্বস্ত কমরেড....।"

মানবতা ও বিবেকের পরিবর্তে পার্টির নিয়মতন্ত্রকে প্রায় অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে লালন করায় পার্টির অ্যাকশান কমিটির কাছে রেবা তার স্বামী অনলের নামে নালিশ জানায়। অনল মিথ্যাচারী; সে ধ্রুবকে পার্টির নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছে; অনল অপরাধী—রেবার চোখে, পার্টির চোখে। কিন্তু যে নীরাকে মুক্তির স্বপ্নের প্রতীক-প্রতিমা হিসাবে অন্তরে স্থাপন করেছিল অনল, সেই নীরাই যখন পার্টির কাছে অনলের পার্টিবিরোধী কাজের কথা প্রকাশ করে দেয়, তখন বাস্তবিকই যেন পায়ের তলার মাটি সরে যায় অনলের। তবু শেষ বারের জন্যে সমস্ত মনোবল সংহত করে আরো একবার সে অস্বীকার করে সবকিছু, এবং এবার সম্ভবত নীরাকেও।

স্বাধীন ভারতের পুলিশ প্রশাসন যখন ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পীড়নের যাবতীয় হাতিয়ারগুলি প্রয়োগ করতে থাকে, তখন অনলের চেতনাস্রোতে স্মৃতির পথ ধরে অন্যতর পীড়নের ছবিগুলিও ভাসতে ভাসতে একটি

ঘূর্ণিকেন্দ্রে এসে মেলে। সমস্ত পীড়নগুলি-ই যেন একই তাৎপর্যে আভাসিত হয়। সমস্ত যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রকে অস্বীকার করেই যেন স্বাধীন অনমনীয় সত্তার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে চায় অনল নামের রাজনৈতিক বন্দীটি। চরম সহিষ্ণুতার মূল্যে সুতীব্র অস্বীকৃতির শক্তিতে এই পীড়নের ঊর্ধ্বে নিজেকে অচঞ্চল রাখে সে। ধলেশ্বরীতে ঝড়ের মাতলামির মধ্যে পবন মাঝির সেই আকুল ডাকের মতো চতুর্দিকে ঝড়ের তোলপাড় আর তুমুল প্রতিকূলতার মধ্যে শুধু একটিই আশ্বাস যেন জেগে থাকে—'রও হে, আর দশ ঠেলা!' পবন মাঝির এই হাঁকের স্মৃতির মধ্যেই যেন সংকেতিত হয় অস্বীকৃতির এই চাপ-চাপ যন্ত্রণার ঢেউ ঠেলে একদিন নিশ্চিন্ত কূলে পৌছানোর আশ্বাস।

ছেঁড়া তমসুক : নারীঘ্ন সমাজের কাহিনী

দীপালি নাগ

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন—নানা শ্রেণীর মানুষেরা সমরেশের গল্পে স্থান পেয়েছে। সমরেশের লেখা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। মূলতঃ অভিজ্ঞতাই সমরেশের লেখক চরিত্র তৈরী করেছিল। বিচিত্র, ব্যাপক অথচ খুবই বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে মিশেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নৈহাটী শিল্পাঞ্চল এবং গঙ্গার দুই পারের মানুষেরা। মানুষকে দেখার নেশাই তাঁকে স্বতন্ত্র লেখকে পরিণত করেছিল, এযেন তারাশঙ্করের সার্থক উত্তরসূরী। অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীর মমতা ও ভালবাসার মিশ্রণে তাঁর গল্পগুলির স্বাদ বদলে গেল।

মানুষ এবং তার জীবন—এটাই সমরেশের গল্পের মূল উপজীব্য। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। লেখক নিজে জীবন শুরু করেছিলেন শ্রমিকরূপে। পেশাগত ভাবে তাই তিনি একদা শ্রমজীবী মানুষদের মাঝখানে ছিলেন। এই নিম্নশ্রেণী তথা শ্রমিকশ্রেণীর মানুষেরা প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করে চলেছে। এদের জীবনের সমস্যা দ্বিবিধ। একদিকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম, অন্যদিকে জৈবিকতাকে অতিক্রম করে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা। প্রতিনিয়ত সংগ্রাম এবং সংগ্রামের পর মানবিক উত্তরণ-ই—তাঁর লেখা গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। "ছেঁড়া তমসুক"—গল্পটি এজাতীয়। তিন পথভ্রষ্ট যুবকের মানবিক উত্তরণ-ই—গল্পের প্রাণ।

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজু ওরফে বিজলী ব্যানার্জী, ভটচার্জি পাড়ার রাধু বাড়ুজ্যের মেয়ে সে, বয়স তেইশ, ফেমাস বিজু নামে সকলের কাছে পরিচিত। অর্থাভাবে তৃতীয়বর্ষে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। টিউশানি করে কোন মতে দিন চলে। কলেজ জীবনে তাকে ঘিরে ছাত্রমহলে কৌতূহলের শেষ ছিল না। কখনও কখনও সহপাঠী ছেলেরা তার প্রতি "বাণীর স্তুতি করত বিদ্রূপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে।— কিন্তু বিজু কখনও কারোর বিরুদ্ধে নালিশ করে নি, খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মত শুধু হেসেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের।" বিপক্ষে কলঙ্কিনী আখ্যাই জুটেছিল তার। নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর— বিজুর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম। এদের প্রত্যেকেরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাদের অবস্থা সম্বন্ধে গল্পকারের বক্তব্য, "ছাত্রজীবনের যেখানটায় থাকা উচিত ছিল নিশ্চিত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাসা, ওদের সেই আসল নৌকাটাই ছিল তলাফুটো। জীবনে যে ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আগুন-লাগা অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মনে নেই বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভুলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বেকারি আর অনাহারের জ্বালায় কবে ওরা শহরের সেরা দুর্বিনীত ও বেযাদপ বলে কুখ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে কথাও ওরা জানে না।"

বর্তমানে নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর 'অসামাজিক জীব' বলে পরিচিত। টাকার জন্য তারা

পারে না এমন কোন কাজ নেই। তারা তিনজনই বিজুর স্তাবক হলেও, বিজু সম্বন্ধে তাদের ভুল ধারণা ছিল। তারা ভাবত উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী নকুড় পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল— বিজুর যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন মেটায়। ব্রজেন পালের অনেক টাকা। কিন্তু একদিন কথা প্রসঙ্গে বিজলীর প্রতি তাদের ধারণা পাল্টে যায় এবং "সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে জীবনের সত্যের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।"

সেইদিনই শহরে রটে গিয়েছিল তিন কুখ্যাতের সঙ্গে বিজলীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কথা। "গণেশ কাফে"তে তাদের আড্ডা বসে প্রতিদিনই। গণেশ কাফেতে যারা আসে, তারা অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক, সমাজবিরোধী নামে পরিচিত। কবে যে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অখণ্ড জুটি হয়ে গিয়েছে, নিজেদেরও বোধ হয় মনে নেই।" এমনি ভাবেই ওদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। এরপর কাহিনী ভিন্ন রূপ নেয়—

পৌষমাসের কোন এক শনিবার, সময় রাত প্রায় আটটা, গণেশ কাফেতে সকলে যখন আড্ডায় মসগুল, হঠাৎ খবর এল বিজলী নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, মালগাড়ির তলায় রেল লাইনে কাটা পড়েছে। বিজুর এই আত্মহত্যার ঘটনায় নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের মনে অনেক জিজ্ঞাসা? বিজু কেন এই কাজ করল? পরদিন মর্গ থেকে খবর এল যে বিজলী গর্ভবতী ছিল। একথা জানার পর নরেশ-প্রভাত-শংকর—তিনজনের চোখে প্রজ্বলিত ঘৃণা দপ্‌দপ্‌ করে ওঠে। হিংস্র কুটিল সন্দেহে ওরা নিজেরাই পরস্পরকে হানছে। কারণ অকলঙ্ক বিজুকে যে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে আত্মহননে বাধ্য করেছে, তাকে হত্যা করার জন্য তারা মেতে ওঠে। তাদের তিনজনকে কবুল করতে হবে। কেননা তাদের ধারণা তারা "তিনজন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিঘ্ন করেই এই দুর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভুজকে সে আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, তার সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনজনের কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিনজনেরই কাছে,বন্ধুত্বের মূল্যে। সাহস, প্রীতি আর স্নেহের মূল্যে। তাদের তিনজনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা জীবাণুদের সমস্ত আশ্রয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাব মূলে, বিজু তার ভিতর দুয়ারের কপাটও দিয়েছিল হাট করে খুলে। রাখেনি কোন সদর অন্দর। তাদের তিনজনের পাঁশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজ-আঙিনাটায় নিশ্চিন্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফুলের মত।......বন্ধুত্বের হাতে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে দেবার তমসুক ছিল তাদেরই হাতে। তাঁরাই কেউ ছিঁড়েছে সেই তমসুক। কবুল করতেই হবে।"—তারা নিজেরাই এক এক করে তাদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। কিন্তু বিজুর—তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে। "ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুত্বের দুর্গের অটলপ্রহরী বিজু।" সবরকম নীচতার হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছিল। রাত বাড়তে থাকে। 'গণেশ কাফে' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা পথে নেমে আসে এবং উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে চলতে উত্তরদিকে তারা এগিয়ে চলে, যেখানে বিজুর মৃত্যু ঘটেছিল। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাদের নজরে পড়ে

এক ছায়ামূর্তি—তাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখে যে, সে আর কেউ নয়, ব্রজেন। ব্রজেনকে তারা তিনজন ঘিরে ধরে, বিজুর খবর জানার জন্য।

যে মেয়েকে লাভ করার জন্য সকল পুরুষের মনেই গোপন ইচ্ছা ছিল, সমাজের যাবতীয় পঙ্কিলতার হাত থেকে বাঁচিয়ে যে মেয়ে পথ চলছিল, শত বিপদেও যে মেয়ে বিচলিত হয় নি, নিজেকে পবিত্র, মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত চরম দারিদ্র্যের কাছে, তার পরিবারকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করার জন্য মাত্র সাতশ টাকার বিনিময়ে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, ব্রজেনের কাছে, যে ব্রজেন পালকে সে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করত। সব ঘটনা জানার পর নরেশ-প্রভাত-শংকর তিনজনই হতবাক হয়ে যায়। তারা ব্রজেনকে মারতে উদ্যত হলেও শেষ পর্যন্ত মারতে পারে না। কেননা বিজু যেন তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে, তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। ব্রজেন যেন উন্মাদে পরিণত হয়েছে। সে যেন ঐ রেললাইনে মরবার জন্য এগিয়ে চলে, তারা বাধা দেয় না। তাদের তিনজনের বুকে এক ভয়ংকর যন্ত্রণা টনটন করে ওঠে। এখানেই গল্পের সমাপ্তি।

গল্পটি সরলরেখ এবং একমুখিন। কাহিনী বিন্যাসে গল্পকার কোথাও জটিলতাকে স্থান দেন নি। বক্তব্য সহজ, সরল। একটি মেয়ের জীবনকথাই এই গল্পের বিষয়বস্তু। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে সেই মেয়েটি কিভাবে তিনটি পথভ্রষ্ট যুবককে নিজবৃত্তে নিয়ে আসে—এ তারই গল্প। বিজু দরিদ্র পিতার সন্তান হলেও সে আত্মসচেতন। তার আত্মসম্মান বোধ অতীব তীব্র। তেইশ বছরের একটি মেয়ে, অর্থাভাবে যাকে তার পিতা পাত্রস্থ করতে পারে নি, অর্থাভাবে কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মেয়েটি সুশ্রী এবং আকর্ষণীয়, আর ছিল তার বিজলী চমক হাসি, 'যে হাসিতে এই মফস্বল শহরের সবাই কোনও না কোনও দিন একবার চমকেছে।'

অথচ এই মেয়েটি অর্থাৎ বিজুর অঙ্গের ভূষণ ছিল কলঙ্ক। 'যে কলঙ্কিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর-ভদ্র। যাকে সহজলভ্য মনে করে সেই চিরকালের টোপ ফেলাফেলি খেলা অনেক হয়েছে, কিন্তু প্রচন্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। বিজুকে নিয়ে সব পুরুষই খেলা করতে চেয়েছে, কিন্তু নিরাপত্তা দেবার জন্য কোন পুরুষকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার পরিবারকে আশ্রয়হীন হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাত্র সাতশ' টাকার বিনিময়ে নিজেকে ব্রজেনেব কাছে সঁপে দিতে হয়, যে ব্রজেনকে সে ঘৃণা করতে সব চেয়ে বেশী। আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে ব্রজেন তাকে ভোগ করলেও, তার মনকে সে ছুঁতে পারে না। কলঙ্কিত হয়ে সে বাঁচতে চায় না, তাই আত্মহননের পথ সে বেছে নেয়। অপরদিকে পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে কাছে পেয়েও তার মনকে স্পর্শ করতে না পারায় ব্রজেন অনুতাপের জ্বালায় জ্বলতে থাকে। বিজুর মৃত্যুতে সে যেন উন্মাদে পরিণত হয়েছে।

একটি তেইশ বছরের কলেজে পড়া মেয়ে, হাসি খুশি, আত্মসচেতন—সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি। আত্মহননের মধ্যে দিয়ে নিজেকে শেষ করেছে। আমাদের এই আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় বিজুর মত আরো কত শত বিজু অকালে ঝরে পড়ে—কেউ তার খবর রাখে না। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে খুঁজলে এমন অনেক বিজুই দেখা যাবে।

গল্পটিতে প্রধান চরিত্র বিজলী ছাড়াও রয়েছে তিন বেকার যুবক—নরেশ, প্রভাত এবং শংকর। এরা তিনজনই বিজুর সহপাঠী, অর্থাভাবে কলেজের পড়া শেষ করতে পারেনি। চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিফল হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকার জন্য বিপথে চালিত হয়েছে। বিজু এই তিন পথভ্রষ্ট যুবককে প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে। যে গণেশ কাফেতে বসে তারা আড্ডা দিত, সেই কাফেও যেন একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এই কাফেতে স্থানীয় বেকার যুবকেরা—যারা সমাজবিরোধী নামে পরিচিত—তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এখানে কাটিয়ে দিত। এখান থেকে যেন জীবনে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করত বেকারেরা। এখানে এসে তারা মুক্তির আস্বাদ লাভ করত। পরস্পরের সমস্যাকে তারা অনুভব করার চেষ্টা করত।

গল্পটির নাম 'ছেঁড়া তমসুক'। 'ছেঁড়া তমসুক'—কথাটির আভিধানিক অর্থ হল—'ছেঁড়া'—অর্থাৎ ছিন্ন করা, ছিঁড়িয়া উৎপাটন করা বা ছিঁড়ে খাওয়া।

'তমসুক'—অর্থাৎ আদান-প্রদান করা বা ঋণ স্বীকার করা।

একটি মেয়েকে জীবন থেকে ছিঁড়ে উৎপাটন করার কাহিনী—ছেঁড়া তমসুক গল্পের বিষয়বস্তু। অপরদিকে একনারী ও তিন পুরুষ—এই চারজনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও বিচ্ছেদ-গল্পের বিষয়ীভূত হয়েছে। বিজলী—নরেশ-প্রভাত-শংকর—এই তিন বিপথগামী যুবককে নিজবৃত্তে ফিরিয়ে এনেছিল প্রীতির দ্বারা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। চূড়ান্ত অভাব অনটনের মধ্যেও সেই সম্পর্কই ছিল তাদের কাছে জীবনরস স্বরূপ বা বেঁচে থাকার রসদ। বিজুর প্রতি তাদের তিনজনেরই দুর্বলতা ছিল। প্রত্যেক বন্ধুই যখন এক এক করে নির্জন মুহূর্তে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে, তখন তিনজনকেই বিজু শান্ত করে এবং বলে যেকোন একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধলে, অন্য দুইজন বন্ধুর প্রতি অবিচার করা হবে। তার চেয়ে তাদের চারজনের বন্ধুত্বেব সম্পর্কটাই বজায় থাকুক। তিন যুবকই তার কথা মেনে নেয়। কিন্তু বিজুর হঠাৎ মৃত্যুতে যেমন তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, অপর দিকে তিন যুবকই পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে, এবং দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হয়—কারণ বিজলীকে যে কলঙ্কিত করেছে, তাকে তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। প্রকৃত দোষীর সন্ধান পেয়ে তারা ব্রজেনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু হত্যা করতে পারে না, বিজু যেন তাদের আগলে রেখেছে। রূপকধর্মী এই নামকরণটি তাই যথার্থ বলেই মনে হয়।

অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে রচিত হলেও গল্পটি গল্প হয়ে উঠেছে লেখকের লেখনীর গুণে। সমরেশ মানবতাবাদী। তাই গল্পের শেষে তিন যুবক যখন দুর্বিনীত হতে পারল না বিজুর জন্য, তাদের মনের এই মানবিক উত্তরণ গল্পটিকে অসামান্যতা দান করেছে। বিজলীর সাহচর্য তাদেরকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের কথাবস্তু এর সমার্থক। একমাত্র কাঠামোগত মিল ছাড়া অমিলটাই বেশি। ছেঁড়া তমসুক—নায়িকাপ্রধান। চতুষ্কোণ—নায়কপ্রধান। ছেঁড়া তমসুকে নায়িকাকে কেন্দ্র করে তিন পুরুষ চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। চতুষ্কোণে—নায়ককে কেন্দ্র করে তিন নারী চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটি যৌন মনোবিকারের

চূড়ান্ত উদাহরণ। নায়ক রাজকুমারের যৌন আকর্ষণ অসাধারণ। রিনী মালতী ও সরসী—প্রত্যেকেই তার সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদগ্রীব। রাজকুমার কিন্তু সম্ভোগ অপেক্ষা রোমন্থনেরই পক্ষপাতী। রাজকুমারের মনে নানা উদ্ভট খেয়াল গজিয়ে ওঠে। এই প্রতিবেশে সমাজ জীবনের সমস্ত নৈতিক অনুশাসনকে ত্যাগ করে আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা মানুষ ও তার মানস সমগ্রতাকে বাদ দিয়ে, সাধারণতঃ অবদমিত অংশবিশেষকে যৌনকল্পনার ছায়াছবিগুলিকে একটা অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, একটা অখণ্ড জীবনের প্রতিরূপ দেওয়া হয়েছে।

ছেঁড়া তমসুকের কাহিনী ভিন্নরূপ। এখানে যৌন আবেদনের কোন তীব্রতা নেই। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রতিনিয়ত লড়াই, নিজবৃত্তে টিকে থাকা, মানবিক উত্তরণ—ইত্যাদি বিষয়গুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে। মানবতাবাদী লেখকরূপে এখানেই সমরেশের সার্থকতা।

কিমলিস : এক আলাক্ চীজ

সন্তোষকুমার মণ্ডল

'কিমলিস জিস্‌কো বল্‌তা কামনিস্' অর্থাৎ কম্‌উনিস্ট (communist) কোন ধর্ম নয়, জাতি নয়, কোন সম্প্রদায় নয়; কম্‌উনিজম বা সাম্যবাদে বিশ্বাসী মানুষ। এই মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। সমরেশ বসুর 'কিমলিস' গল্পের আলোচনায় তার প্রয়োজনও নেই। সুতরাং তত্ত্ব নয়, সমরেশ বহিরাগত এই মতবাদকে একেবারে অন্ত্যজ অশিক্ষিত মানুষের মনে কিভাবে সঞ্চারিত করেছেন, তার শিল্পকৌশলের স্বরূপ উন্মোচনই এই প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

'কম্‌উনিস্ট ম্যানিফেস্টো' নামের একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ কিভাবে জীবনের কেন্দ্রীভূত শক্তি রূপে জাতি-ধর্ম-বর্ণকে নস্যাৎ ক'রে সর্বহারার সংস্কৃতি গড়ে তোলে এ গল্পে তার কিঞ্চিৎ আভাস আছে। এ গল্পের প্রথমে 'সে' পরিচয়ে কিমলিস গল্পের ভেতরে ঢোকে। তারপর বেচন নামে উল্লিখিত হলেও সে নিজেই তার পরিচয় দেয়—'আরে হাম, হম বেচন, তুমকো লেড়কা।' অর্থাৎ পিতৃ-পরিচয়ে সে পরিচিতি চায়। গল্পের পরিণামে তার পিতা বনোয়ারী বলে 'বাবুসাহেব হাজার হো হম তো এক কিমলিস কো বাপ হ্যায়।' দেখা যাচ্ছে পিতা সন্তানের পরিচয়ে পরিচিতি চাইছে।

সমরেশ বসু তিনটি স্তরে গল্পটিকে সাজিয়েছেন। প্রথম স্তরে 'সে' হল আগন্তুক—নিজের বস্তিতে নিজের পরিবারে ও প্রতিবেশীদের কাছে অপরিচিত। স্বয়ং জন্মদাতা পিতা 'ফিটফাট পাটলুন' পরা আগন্তুকের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করে—'আপ'—। দ্বিতীয়স্তরে 'হা-হা-হি-হি' হাসিতে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আগন্তুকের বেচন হয়ে ওঠা—'আরে হাম, হম বেচন, তুমকো লেড়কা।' পিতৃ-পরিচয়ে তার পরিচিতি ও বস্তির একজন হয়ে ওঠা। তৃতীয় স্তরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সমবেত শ্রমিকের মাঝে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ছাঁটাই বন্ধ হওয়ায় বেচন 'এক আলাক্ চীজ' হয়ে ওঠে। সুতরাং একজন কিমলিসের নির্বিশেষ থেকে বিশেষ ও পরিশেষে সবিশেষ হয়ে ওঠার কাহিনীই হল এ গল্পের গঠনকাঠামো।

রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পরপরই সাম্যবাদ ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীদের মগজ ধোলাই শুরু করে। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে সাম্যবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বই সাম্যবাদের মূলভিত্তি। শ্রেণী-সংগ্রামই সাম্যবাদের মূল পাথেয়। শ্রেণীবিহীন সমাজ সাম্যবাদের অভিপ্সিত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছানো যায় না কখনো, কিন্তু সেই লক্ষ্যের দিকে চলতে থাকলেই শ্রেণী-বৈষম্য কমতে থাকে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয়। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে আসে লালঝাণ্ডা। বুদ্ধিজীবী থেকে শ্রমজীবী মানুষের চিত্তে এই মতবাদ সঞ্চারিত হতে লেগে যায় কয়েক দশক। তবে বাংলা কথাসাহিত্যে একদশকের মধ্যেই কম্‌উনিস্ট এসে যায় তারাশঙ্করের

উপন্যাসে। কিন্তু তারাশঙ্করের শিল্পীমন সাম্যবাদী চেতনায় আস্থা রাখতে পারেনি বলেই খাঁটি কম্যুনিস্ট চরিত্র আঁকতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্ক্সীয়তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে শ্রেণী-বৈষম্য, শোষণ-শাসন এ সংগ্রামের ছবি স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। কিন্তু সমরেশ তত্ত্বকে অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনসত্য করে নেওয়ার প্রাণপণ প্রয়াসকে অন্ত্যজ, অশিক্ষিত বস্তিবাসীর চিত্তে যেভাবে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন, শৈলীর বিচারে তা অসাধারণ।

কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী-বৈষম্য, শোষণ-শাসন অত্যাচার-উৎপীড়ন ছিল কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ছিল না। সাম্যবাদ শোষিত মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি জোগায়। সেই শক্তির জাগরণও বহুমূল্যে অর্জিত হয়। এই গল্পের নায়ক বেচনের মধ্য দিয়ে সমরেশ তাকে শিল্পিত রূপ দেন।

শিল্পাঞ্চলে বড় হওয়া সমরেশ শৈশব থেকেই কারখানা ও শ্রমিকের চালচিত্র প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। তাই বহু গল্প-উপন্যাসে বস্তিবাসী শ্রমিক জীবনের ছবি উঠে এসেছে। এ গল্পেও সমরেশ শীতের সন্ধ্যায় কর্মক্লান্ত শ্রমিকের বস্তিতে ফিরে আসার ছবি এঁকেছেন। শীতের সন্ধ্যায় উলঙ্গপ্রায় বাচ্চারা খেলা করছে। কেউ উঠানের উপরেই কাপড় কাচছে, বৌঝিদের কেউ জল তুলে এনে স্নান করছে। কাছেই খাটিয়াতে বসে পুরুষদের জটলা—কথা, হাসি গান, ঝগড়া। যেন তুলির আঁচড়ে আস্ত একটা বস্তির চিত্র ফুটে ওঠে কয়েকটি কথায়। নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র।

সুদূর রাশিয়া থেকে শোষক-শোষিতের তত্ত্ব এসে হাজির হয়েছে বস্তিবাসী মানুষের কাছে। অথচ এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্য তত্ত্ব-আবির্ভাবের বহু পুরানো ঐতিহ্য বস্তির রূপকে সারা ভারতবর্ষেরই অভিজ্ঞতার ফসল। বিদেশী তত্ত্ব এ দেশীয় মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে যায়। বেচনের পোষাকে-আসাকে চালচলনে বিদেশী গন্ধ, তত্ত্বের মতোই বেচন বস্তিবাসীর কাছে বিস্ময়ের বস্তু :

> "এদের সঙ্গে বস্তির প্রায় সকলেই এই ফিটফাট পাটলুন পরা আগন্তুকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বনোয়ারী বেচারী তো কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বার-দুয়েক কপালেই হাত ঠেকিয়ে ফেলল। তার গোঁফের ফাঁকে সংশয়ের হাসি। একে অপরিচিত, তায় রীতি মত বাবু।"

শোষণ আর বেচন বনোয়ারীর অস্তিত্বের স্মারক অথচ শোষণের তত্ত্ব আর বেচনের সাহেবিয়ানা দুই-ই বিদেশী অপরিচয়ের দ্যোতক।

বনোয়ারী ও তার স্ত্রী রামদেই-র মতো বস্তিবাসীর সকলেই নির্মম শোষণে অভ্যস্ত। তারা শোষিত হতে হতে রিক্ত, নিঃস্ব। শোষণের বোধটাই অন্তর্হিত, অভ্যাসে পরিণত। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা তা বোঝে কিন্তু বুদ্ধিজীবীর তত্ত্ব দিয়ে শোষণের স্বরূপকে তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তেমনি বেচন যখন বলে 'আরে হাম, হম বেচন, তুমকো লেড়কা।' তখন বস্তি জুড়ে বিস্ময়ের ঘোর—"এ বলে, হায় রাম! ও বলে, হে ভগবান!

সে বলে কাহা যায়।' বেচনের গর্ভধারিণী জননী রামদেই সন্তানের অভাবিত পরিণামে ঢুকরে কেঁদে ওঠে—'এ হামার কা ভইল্‌ হো!' তার বিয়ে করা বউ ঝুনিয়ার চোখেও বিস্ময়ের ঘোর; বিয়ের পর মাত্র দেড় মাস বেচনের ঘর করেছে সে। তারপরই বেচন হওয়া। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরে দিয়েছে জেলে। কিন্তু সেই বেচনের একটি মূর্তি আঁকা ছিল ঝুনিয়ার মনে। অথচ তার সঙ্গে একদমই মেলে না—'একি সর্বনাশ হ'ল তার। এ কোন দেশী আজব মরদ। এ তো তার সে মানুষটা নয়।' শাশুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেও জুড়ে দেয় কান্না। আর জন্মদাতা পিতা বনোয়ারী বিস্ময়ের সুরে বলে—'আরে তু তো বনোয়ারী কাহার কা লেড়কা নহি, কাঁহাসে সাহব বনকে আইলান অ্যা?' এই বেচনের মতোই মার্ক্সীয় তত্ত্ব শ্রমজীবী মানুষের কাছে সত্য ও তত্ত্বের আলো-আঁধারীর মধ্যে দ্বিধা-সংশয়-আকর্ষণ-উদ্বর্তনের মেঘ-রৌদ্রের মতো খেলে গিয়েছিল।

চোর-বাটপাড়দের কাছে জেল হল শ্বশুর বাড়ি। সেখানে অন্নচিন্তায় দিন গুজরান করতে হয় না। সময় হলেই নিয়মিত আহার জোটে। তাই এই মজাদার অভিব্যক্তি। বেচন নগিনা মুচির ছেলে কিংবা রাজিন্দারের ব্যাটার মতো চুরি-বাটপাড়ি করে জেলে যায়নি। বেচন কারখানার কর্মীদের রেশন হরতাল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। হরতাল কমিটির মেম্বার। কারখানার শ্রমিকদের বরাদ্দ রেশনের কমতি, ক্রমাগত খারাপ মান ও 'জ্যায়দা' দাম নিয়ে অসন্তুষ্টি তো ছিলই, তাও কোম্পানী বন্ধ করে দিলে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তাদের খেঁকিয়ে তুলতে বেচনকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। লাগাতার হরতাল, ম্যানেজার ঘেরাও ইত্যাদি ঘটনার পর শ্রমিকদের দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিল। কর্মীরা আবার কাজে যোগ দিল। কারখানার চিমনি আবার নিয়মিতই আকাশের বুকে উগরে দিতে থাকলো কালো ধোঁয়া।

এই কর্মকাণ্ডের হোতা বেচনকে ম্যানেজার বাবু একক ভাবে ডেকে পাঠানোয় তার গুরুত্বের কথা ভেবে খুশী মনেই হাজির হয়েছিল ম্যানেজার বাবুর ঘরে। সেখানে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে উপস্থিত দারোগাবাবু 'বাকডোর' দিয়ে চালান করে দিয়েছিল কলকাতার জেলখানায়, যাতে ভবিষ্যতে সে আর শ্রমিকদের খেপিয়ে তুলতে না পারে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করায় দারোগাবাবু বেচনকে বলেছিল—''আসলি কারখানামে, যেখানে পুরা রেশন মিলবে, আর পুরা হরতাল কমেটি হাজির আছে।'' অর্থাৎ একে একে কৌশল করে হরতাল কমিটির সমস্ত সদস্যকেই কলকাতায় চালান করে দেওয়া হয়েছে। 'আসলি কারখানা' শব্দটির মধ্যে ধরা পড়েছে শ্লেষ। বাস্তবের কারখানায় শ্রমিকেরা কোম্পানীর শোষণে-নিপীড়নে বঞ্চনায় অত্যাচারে জীবন-যৌবন খোয়াতে খোয়াতে যন্ত্রে পরিণত হয়, 'আসলি কারখানা' অর্থাৎ জেল, যেখানে হরতালের 'হ'ও করা সম্ভব নয়, দারোগার এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে গূঢ় ব্যঞ্জনা। সেখানকার অন্ধকারে বসেই শক্তি অর্জন ক'রে জেলবন্দী শ্রমিক। রাজবন্দী ওরফে 'ভেটিউন' হওয়ার গৌরবে বেচনের বুক ফুলে ওঠে। ভয়কে জয় করে বেচন হয়ে ওঠে যন্ত্রী। তার গৌরবান্বিত ছবি এঁকেছেন সমরেশ—''কথাটা মনে হতেই সে আবার ঝাড়পাড়া দিয়ে উঠল তার অপ্রতিভতা ছেড়ে। সার্টের কলারটা ঠিক করে নিল,

বার দুয়েক প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বেশ সহ্বত দেখিয়ে, 'কেয়া তোমলোক সব আচ্ছা হ্যায় তো?'' জেলখানায় পুলিশি অত্যাচারের জবাবে বেচনের নির্ভীকতার প্রকাশেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আসলি কারখানায় আসলি কিমলিস হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত।

জেলে যাওয়ার আগে যা ছিল আবেগ, জেল ফেরত বেচনের তাই হয়ে উঠলো জীবনবেগ। কারখানার সকলের মুখে এমনকি ম্যানেজার বাবুর মুখেও বেচন তার নিজের নাম শুনে, তার প্রতি সকলের নজর দেখে সকলের জন্য আপন জানটাকেই তুচ্ছ করার জন্য একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। একেই বলে আবেগ। আর জেল ফেরত বেচন ছোকরা দোস্তের কাছে কারখানার হালচাল জিজ্ঞেস করে ছাঁটাই, চার্জসীট, ওয়ার্নিং ইত্যাদির পীড়নেও আতঙ্কে শ্রমিকদের অসহায়তার কথা শুনে শ্রমিক সংগঠনে ও প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— 'দেখো ভাই বাহানোঁ জিসকো বোলতা মজদুর তুম্ ওহি হ্যায়।' শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বে তাদের অবস্থানটা চিহ্নিত করে সমবেত সংগ্রামে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। এই শক্তিই হল তার জীবনবেগ।

জেলখানায় বসে বেচন জেলবন্দী শিক্ষিত কমিউনিস্ট বাবুর সাহচর্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অনেক কথাই শিখেছে। এমনকি, বেচন একদিন নিজের নাম বলতে গিয়ে বাপের নাম বলতো, সেই বেচন জেলখানায় বসে লেখাপড়া শিখেছে। তার ট্রাঙ্কের ভিতরে তিনখানা বই পাওয়া গেছে। বই তিনটি হল ঋষি কার্ল মার্কস্ এর 'কমিউনিজম্', মহামতি লেনিনের 'মার্কসবাদী শিক্ষা' ও তৃতীয়টি রামনরেশ গুপ্ত রচিত 'ভূখা মজদুর'। মজদুর রাজ কায়েম করার মত, পথ ও পাথেয় সম্পর্কে বেচন ঐ বইগুলি থেকে অবগত হয়েছে, অন্যদের অবগত করেছে। ফলে প্রথমে যে বিস্ময় ও বিরুদ্ধতা ছিল, পরে আস্তে আস্তে তা কমতে থাকে। কিছু ভক্ত, কিছু বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। দেহে মনে একেবারেই আগন্তুক এই মানুষটা ক্রমে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে থাকে।

বেচন তার স্ত্রী ঝুনিয়াকে তার জীবনের সংকল্পের কথা বলে। শ্রেণী সংগ্রামের কথায় তার কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে—''এ জান চলা যায়, তব্‌ভি মালিক কা জুলুম খতম করনে হোগা। কেয়সে? না, লড়নে হোগা।'' শ্রেণীসংগ্রামে মেয়েরাও যে পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে এসেছে। এ কথা উল্লেখ করে বেচন ঝুনিয়াকেও তাব কর্মসঙ্গিনী করে নিতে চায় —''দুনিয়ামে বহুত অওরৎ মরদকো সাথ কাম করতা, তুমকো ভি হমকো সাথ লে লেগা।'' একেবারে অপ্রত্যাশিত ও অপূর্বশ্রুত বক্তব্য শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ঝুনিয়া। ঝুনিয়ার মনে হয় 'দোসরা মরদ' যাকে সে চেনে না। ফলে তার কাছে আত্মসমর্পণও সহজ হয় না।

বস্তিবাসীদের হিতাকাঙ্ক্ষীর মুখোশের আড়ালে শোষকের প্রতিভূ বাড়িওয়ালা কালিকা প্রসাদ সর্দার বেচনের অভাবনীয় পরিবর্তনে বিস্মিত হয়। বেচনের কথার ভঙ্গিতে ও দৃঢ়চেতা মানসিকতায় কালিকাপ্রসাদ স্থির বিশ্বাসে বলে—'বেচন তু কিমলিস বন্‌কে আয়া, না?' কেননা, কিমলিস 'বঢ়িয়া চীজ' তার কাছে। হরতালের হোতা, জেল ফেরত, চল্লিশ

দিনের উপোসী মরদ কম কথা নয়। আগে থেকে সাবধান না হলে বস্তিটাই হয়ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই খুব সন্তর্পণে পা ফেলে কালিকাপ্রসাদ। বনোয়ারীকে বোঝাতে চেষ্টা করে 'কিমলিস এক আলাক্‌ চীজ'। এদের জাত নেই, ধর্ম নেই, গুলিগোলা বোমাবাজিতে এদের বিকল্প নেই।

ছেলে কিমলিস বনে যাওয়ায় ক্ষেপে ওঠে বনোয়ারী। কালিকাপ্রসাদ বনোয়ারীকে ক্ষেপিয়ে তুলে বেচনকে ঘরছাড়া করতে চায়। প্রথমেই উত্তেজিত বনোয়ারী বেচনকে শর্ত দিয়ে বসে—"যো ভি হো, হপ্তা মে হমকো দশ রুপেয়া দেনে হোগা, ফোকটমে খানা নহি মিলে গা, এ পহ্‌লেই বোল দেতা।" বেচন জেলখানা থেকে প্রাপ্ত পয়সায় বৌ ও মাকে এক জোড়া নতুন ধুতি, বাপকে একটা ধুতি ও কামিজ দিয়েছে। সেই সঙ্গে বস্তির দোস্তদের গোটা তিনেক কামিজ ও পায়জামা দান করেছে, কিন্তু তাতে বনোয়ারীর মন ভোলেনি। বরং দরিদ্রের সংসারে এই অপচয়কে ব্যঙ্গ করেই বলেছে—'বড়া তালুকদার আইলান! আধা পয়সাকে বাচ্চা নাই, চাঁদি কা বাপ্‌ বনতা হ্যায়।' 'জেহ্‌লকে বাচ্চা' বলতেও বনোয়ারী ছাড়েনি বেচনকে।

বেচন রোজগারের চেষ্টা করেনি এমন নয়। কিন্তু 'কামনিস্‌' বলেই কোনো কারখানাতে তার কাজ জোটেনি। মালিকপক্ষ এতটাই আতঙ্কিত যে মনে হয়, কারখানা ক্যানসার রোগের জীবাণু বহন করে এই কম্যুনিস্ট ব্যাকটেরিয়া। তাদের এড়িয়ে চলার প্রবণতা এতটাই তীব্র। অবশেষে একটা কাজ জুটেছিল তার। লালাসাহেবের কুড়িটি রিক্সা খুঁজে খুঁজে প্রতিদিনের পাওনা আদায় করে মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার বিশ্বস্ত কাজ। কিন্তু বেচন রিক্সাওয়ালাদের বোঝাতে চেষ্টা করে কিভাবে মালিক তাদের ঠকাচ্ছে। মালিকের কানে এ কথা যেতেই তার চাকরি গেল। তারপর গদিতে চাকরের কাজও একটা পেয়েছিল। এবং মালিককেই মজদুররাজের কথা বোঝাতে গিয়ে কাজটাকে খোয়ালো। একেই তো বলে কিমলিসগিরি যে নিজের কাজ জোটাতে পারে না, কাজ জুটলেও রক্ষা করতে পারে না, অথচ অন্যের কাজ জোটানো কিংবা কাজের যোগ্য মজুরি পাওয়ার লড়াইয়ে নিজের প্রাণ পর্যন্ত পণ করে বসে। তাই কারখানাতে যখন জনা চল্লিশ লোককে ছাটাইয়ের কথা চলছে, তখন তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বেচন। সেই ছাটাইয়ের তালিকায় মায়ের নাম থাকায় মাকেও বোঝানোর চেষ্টা করেছে বেচন মজদুররাজের মাহাত্ম্য। আর বাবা বনোয়ারী তেড়ে এসে বলে—'শালা, কিমলিসগিরি দেখানে আয়া?'

ঘরে-বাইরের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা বেচনকে একরোখা করে তোলে। খাঁটি 'কামনিসে'র মতো 'মজদুরের জিন্দীগী' বদলে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। রেশন হরতালের সাফল্য, জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা ও মজদুররাজের আকাঙ্ক্ষা সমস্ত হতাশা ও অসহযোগিতাকে ভুলিয়ে বেচনকে সংগ্রামমুখর করে তোলে। শিউপূজন কিংবা নারানবাবুর মতো তাত্ত্বিক নেতা বেচন নয়, কিন্তু তার সংগ্রামী চেতনার একনিষ্ঠতায়, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় শ্রমিকেরা তার উপর ভরসা রাখে। তাত্ত্বিক নেতা শিউপূজন আলোচনার মাধ্যমে ছাটাই

বুঝতে না পেরে ত্রস্তপায়ে কারখানা ছেড়ে চলে যায়। ছাঁটাই নোটিশ জারি হয়ে গেলে চল্লিশ জন মেয়ে পুরুষ বুক চাপড়ে কোম্পানির মা-বাপ তুলে গাল দিতে দিতে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে।

বেচন আত্মপ্রত্যয়ের সুরে কারখানার সামনে মাইলপোষ্টের ছয় ইঞ্চি জায়গার উপর কোন মতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে—"হম বেচন। হম্ বোলতা, তুলোক ঠার যা। ছাঁটাই জরুর বন্ধ করনে হোগা।' যেদিন কারখানার জনস্রোত বেচনের বক্তৃতার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অতীতের সাফল্যে বেচন তার ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে চাইছে—"হম বেচন, জেহ্লমে গয়া। কাহে? না রেশন কা হরতাল কিয়া। তু লোক উস বাত ভুল গয়া? তু ভুল গয়া, ঔর কারখানা ছোড়কে চলা যাতা?" কামতাপ্রসাদ ও নরেনবাবুর তারিফ আর শ্রমিকদের গোগ্রাসে তার বক্তৃতা গেলার সুবাদে বেচন উচ্চকণ্ঠে মজদুররাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখায়—"মজদুর তু খানা বিনা সব মর জায়গা তো জামানা কৌন বদলে গা।' সর্বহারার সমর্থনসূচক ধ্বনিতে ভরে ওঠে কারখানার চত্বর।

বেচন জেলখানায় বসে কম্‌উনিস্ট নেতার মুখে, কিছুটা কেতাবি বিদ্যায়, আর বেশিটা বাস্তব অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, মালিক কখনো শ্রমিকের স্বার্থ দেখে না। শ্রমিককেই লড়াই করে তার অধিকার আদায় করতে হয়। বেচন স্পষ্টভাবেই যে কথা ঘোষণা করে—"কেয়া, তু মধু খানে মাংতা হ্যায় কি নাহি? মাংতা? তব ইয়েভি খেয়াল রাখো, চাক টুটানে পড়েগা, মৌমাছিকে হুল খানে হোগা, সমঝা?" সেই হুলের মতোই গুলি এসে বিধেঁছে বেচনের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো বেচন ঝরে পড়েছে মাইল পোস্টের গায়ে। এই ঘটনায় শ্রমিকরা অন্তরে-বাহিরে আলোড়িত হয়েছে। রামদেইয়ের বিকট চীৎকারে স্তব্ধ হয়েছে জনতা। বেচনকে বুকে তুলে পরম অপত্যস্নেহে বলে ওঠে—'এ তু কেয়সা বুজদিল কিমলিসোয়া বনকে আয়া, অ্যা? জেহ্ল কোম্পানি তুহ্কো কেয়া বন দিয়া।' ঘটনার চমকে অবাক হয়ে যাওয়া বনোয়ারী রক্তের টানেই বেচনকে দু'হাতে তুলে নেয়। বেচনকে ডাক্তারখানা থেকে মাথায় সুঁই দিয়ে বস্তিতে নিয়ে আসে। কারখানার শ্রমিকেরা তাতে সামিল হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কেউ আর কারখানায় যায়নি। রেশন হরতালের পুনরাবৃত্তি ঘটে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে। শেষপর্যন্ত ছাঁটাই তুলে নিতে কোম্পানি বাধ্য হয়।

কিমলিস সন্তানকে প্রত্যাখ্যান না করে বনোয়ারী তাকে ঘরে তুলে নিলে খেঁকিয়ে ওঠে কালিকাপ্রসাদ—'কেয়া, তু ভি কিমলিস বন্ গয়া?' কিমলিস শব্দ উচ্চারণে এখন বনোয়ারীর চোখে বিস্ময়ের ঘোর নেই। পরম বিশ্বাসে অপ্রতিভ ভাবে সম্পর্কের সূত্র ধরে বলে—'বাবু সাহেব হাজার হো হম তো এক কিমলিসকো বাপ হ্যায়।' তারপর সেও শ্রেণীসংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠে। 'সন্তান গৌরবে গরবিনী মা রামদেই মাতৃত্বের অধিকারে আনন্দাশ্রু ঝরিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে—'তু কেতনা বড়া কিমলিস বন্ গয়া। তু চলা যানেসে, কিস্‌কো যায়েগা। এ রামদেই কা কি নহি?" আর বনোয়ারী বেচনের কাছে আবেদন জানায়—'হমকো তুমকো সাথ জোড় লে।' রাশিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনে এমনই সব ঘটনা ঘটেছিল। বড়লোক

পিতার সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে তরুণ সন্তান শ্রেণী সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করে মজদুররাজ গড়ে তোলে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার উন্নতিতে মুগ্ধ হয়ে অনেক বড়লোক পিতাই তাদের সমস্ত সম্পত্তি দেশের স্বার্থে ত্যাগ করে আপন সন্তানের কাছে কাজ চেয়ে নেয়। সন্তানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার ব্রত গ্রহণ করে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সমরেশ বঙ্গদেশের বস্তিবাসীর জীবনে সত্য করে তুললেন। চরম বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই গল্পে বনোয়ারী শেষপর্যন্ত সন্তানের মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েছে, তার ব্রত গ্রহণ করতে চেয়েছে। সমরেশ বসু এই গল্পে এক সাধারণ বস্তিবাসী তরুণের সাম্যবাদী চেতনায় সত্তার জাগরণকেই দেখাননি, তার উদ্বর্তনের ছোঁয়ায় শ্রমজীবী মানুষের সামগ্রিক জাগরণকেই ভাষা দিয়েছেন।

শহীদের মা : অন্তহীন জননী-যন্ত্রণা

তরুণকান্তি রায়

'শহীদের মা' স্পষ্টতই রাজনৈতিক গল্প। গল্পটির প্রথম প্রকাশ : আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭৭ একটি বিনাশী ঘটনা, একজন রাজনৈতিক কর্মীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড রয়েছে ঐ গল্পের কেন্দ্রে। এবং সে হত্যাকাণ্ডের তিনমাস পরে তার স্মৃতিচারণের সূত্রে গড়ে উঠেছে এই গল্পটি। কিন্তু যাঁর স্মৃতিচারণ বা অভিজ্ঞতার দর্পণে এই গল্পটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে, যাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে, তিনি নিজে যেমন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন, তেমনি নিহত যুবকটিও তাঁর কাছে কোনো পলিটিকাল আইডেনটিটিতে চিহ্নিত নয়; যুবকটি তাঁর নাড়ী-ছেঁড়া সন্তান—কনিষ্ঠপুত্র বাদল! আর তিনি যথার্থই 'শহীদের মা'! নিহত সন্তানের উনিশতম জন্মদিনে তার বিয়োগ-বেদনার যন্ত্রণাদগ্ধ স্মৃতি হাতড়ে-বেড়ানো জননীর নীরব প্রতিবাদ ও আগামীর অমোঘ পরিবর্তনের আশায় বুক বেঁধে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হবার ইতিবৃত্ত উচ্চারিত হয়েছে এই গল্পে। একই সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েদের অবস্থানগত অসহায়তা এবং আমাদের যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাও জননীর কঠিন প্রত্যাখ্যানের ভাষায় দ্যোতিত হয়েছে। যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্মদিনে প্রত্যেক বছর বিমলা পায়েস রাঁধতেন, আজ (গল্পে বর্ণিত ঘটনার দিনে), তার ১৯তম জন্মদিনে, ভাঙা শহীদবেদীর দিকে স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি রেখে, মৃত পুত্রের স্মৃতি মন্থন করতে করতে, গর্ভের মধ্যে তার পুনরাবির্ভাবের সমস্ত জৈবিক লক্ষণকে আত্মস্থ করে, পরিবারের কারোর জন্যই আজ আর তিনি রাঁধবেন না ব'লে ঘোষণা করেছেন। এটাই তাঁর বিদ্রোহ! যাদের জন্য তাঁকে রোজ রাঁধতে হয়, বাদলের মৃত্যুর কারণ হাতড়ে হাতড়ে তাঁর মনে হচ্ছে : পরিবারের 'ওরা' কেউ তাঁর স্বামী বা পুত্র নয়! তারা প্রত্যেকেই এক-একটা ভিন্ন রাজনৈতিক দলেব কর্মী! বা, প্রতিনিধি! এবং প্রত্যেকেই তীব্র অন্তর্কলহে লিপ্ত। এতটাই যে, পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যমূলক বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই! এরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে বাদলের রাজনৈতিক সক্রিয়তার ব্যাপারে বিমলাকে সতর্ক করেছিল। বাদল শোনেনি। এমনকি, সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করবার পরিণতি যে অনিবার্য মৃত্যু-এই হুমকি সত্ত্বেও বাদল শোনেনি। তাই, আজ, আত্মোপলব্ধির চূড়ান্ত ক্ষণে বিমলার মনে হয়েছে : এদেরই কেউ না কেউ বাদলের হত্যাকারী—অন্ততঃ প্রতীকী তাৎপর্যে তো বটেই! এটাই মায়ের স্থির বিশ্বাস! ব্যক্তি হিসেবে না হলেও, দল হিসেবে এদেরই কেউ না কেউ বাদলের মার্ডারার! তাই তাদের জন্য আর রাঁধবেন না বিমলা! তারা বরং যার যার পার্টির কাছে যাক, সেখান থেকেই খেয়ে আসুক! এটাই তাঁর বিদ্রোহ! সমগ্র গল্পের অবয়বে মায়ের এই নিরুচ্চার বিদ্রোহের উত্তাপ ছড়িয়ে রয়েছে। এটাই গল্পের মূল থীম। তবে, টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখের মাধ্যমে বাদলের জন্ম-বৃত্তান্ত, বেড়ে-ওঠা, ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও শেষে করুণ মৃত্যু, শহীদ স্মৃতিচারণের সভা—সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখে একটি বিনাশী ইতিবৃত্ত যেন তার আনুপূর্বিক সমগ্রতা নিয়ে

হাজির হয়েছে এই গল্পে। জীবিত বিমলার মতো মৃত বাদলও যেন এই গল্পে তাৎপর্যপূর্ণভাবে জীবন্ত চরিত্র।

তাই, রাজনৈতিক পটভূমি ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বাতাবরণের গল্প হলেও এ'গল্প শেষ বিচারে মানবিক মূল্যবোধের গল্প! মা ও সন্তানের চিরন্তন অচ্ছেদ্য সম্পর্কের গল্প, অন্তহীন জননী-যন্ত্রণার গল্প।

দুই

আগেই বলেছি, 'শহীদের মা' গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে একজন জননীর দৃষ্টিকোণ থেকে—তিনি বাদলের মা—শহীদের মা! তাঁর স্মৃতিচারণের ন্যারেশনেই গড়ে উঠেছে এই গল্পের কাঠামো! শুধু স্মৃতিচারণই নয়, এর মধ্যে বিমলার মগ্নচৈতন্যের অন্তর্স্বর মাঝে মাঝেই অনুরণিত হয়েছে। এই বিচারে 'শহীদের মা' গল্পে চেতনাপ্রবাহের রীতি নিরীক্ষামূলকভাবে ও সীমিতক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে বললে ভুল বলা হয় না। এসব প্রসঙ্গ পরে বিবেচ্য। আপাতত মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা যাক : 'শহীদের মা' গল্পটি আগাগোড়া বিমলার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত।

গল্পটি শুরু হয়েছে বিমলার শরীরের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের জানান-দেওয়া নড়াচড়ার ইঙ্গিত দিয়ে। প্রৌঢ়া বিমলা এখন জৈবিকভাবে মাতৃত্বের সম্ভাবনাশক্তিরহিত। অথচ তাঁর এই বয়সেও গর্ভের মধ্যে আসন্ন সম্ভাবনার আলোড়ন। রান্না করছিলেন। রান্নাঘরে বসেই এই আলোড়ন অনুভব করলেন—বাদলের মৃত্যুর তিনমাস পরে! সামনের উনোনে তরকারি ফুটছে, চড়চড় করে তার শব্দ হচ্ছে। এখনই জল না দিলে কড়াইয়ের তলার তরকারি পুড়ে যাবে। তবুও তাতে জল ঢেলে দেবার উদ্যোগ বিমলার ভেতর থেকে এলো না! কারণ, আজ বাদলের জন্মদিন! বড় বেশি ক'রে আজ তাঁর মনে পড়ছে বাদলের কথা। প্রিয় সন্তানের স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট, নিথর ক'রে রেখেছে যেন—"সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?' "

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটে। মগ্নচৈতন্যের মধ্যে যেন নতুন ক'রে বাদলকে গর্ভে ধারণ করবার অনুভূতিকে লালন করতে লাগলেন। দৃষ্টি অস্থির হয়ে উঠলো। শ্রবণ উন্মুখ হ'য়ে উঠলো বাইরের দিক থেকে কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষায়। বাইরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য একবার মনে পড়েছিল রান্নাঘরে চাপানো তরকারিটার কথা! কিন্তু অপ্রতিরোধ্য বাইরের টান তাঁকে রান্নাঘরে নিবিষ্ট থাকতে দিল না। বেরিয়ে এলেন। ভাবলেন : তরকারিটা 'নষ্ট হয় হোক! কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক।' রান্নাঘরের প্রাত্যহিক ইতিকর্তব্য আর তাঁকে ধরে রাখতে পারল না! পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। সারা বাড়িটা নিঝুম। টিনের দেওয়াল, টিনের চালের বাড়িটা যেন স্তব্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করছে একটা প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার। আকাশে মেঘ ঘন হ'য়ে এসেছে, পুবের বাতাস যেন অন্যকিছুর সঙ্কেত দিচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় টগর, শিউলির নরম গাছগুলো যেন মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। পাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশিনীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে

বিমলাদেব ঘবেব দবজা হাট ক'বে খোলা। একবাব ফণিমনসাব বেড়া ডিঙিয়ে সামনেব বাস্তাব দিকে, আব একবাব হাট কবে খোলা নিজেব ঘবেব দবজাব দিকে তাকালেন।

কযেক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ কবলেন বিমলা। তাবপব সামনেব দিকেব বাস্তা এড়িয়ে গেলেন বান্নাঘবেব পিছনেব দিকে। পেছনেব দিকে, উত্তব-দক্ষিণে লম্বা-লম্বি বিস্তৃত কলোনিব বাস্তাটা। পাকা বাস্তা নয, অনুন্নত কলোনিব বাস্তা যেমন হয— ঘেঁসছাইযেব বাস্তা। বিমলা উত্তব দিকে তাকালেন। উত্তবদিকে, বাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে, সেখানে একটা ভাঙা শহীদবেদী। কযেকমাস আগেও সেটা অক্ষত ছিল। এখন কযেকটা বিক্ষিপ্ত ইটেব সমষ্টি জানিয়ে দেয ওটা একটা শহীদ বেদীব ভগ্নস্তূপ। বাকি ইঁটগুলো যদি কেউ তুলে নিয়েও যায, তাহলে আব কোনো চিহ্নও এব থাকবে না। কে যে বেদী ভেঙে ইঁটগুলো নিয়ে গেল তা কেউ জানে না। আগে একটা কুকুব বেদীটাব গা ঘেঁষে শুযে থাকত, এখন আব তাকে দেখাও যায না। এখন শহীদবেদী বলতে বযেছে শুধু গোটাকতক ইঁট। বিমলা জানেন, শহীদবেদীটি বাইবেব বিজ্ঞাপনমাত্র। যদিও ওটা বাদলেব স্মৃতিতেই তৈবি হযেছিল, কিন্তু বাদল ওখানে নেই। তাই তাব স্মৃতিও নেই। শ্মশানেই তাকে দাহ কবা হযেছিল। শহীদবেদী তৈবিব সময অবশ্য বাদলেব দলেব ছেলেবা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। এ বাড়িব আব কাউকে নয, শুধু বিমলাকে বাদ দিলে এ' বাড়িতে আবও তিনজন সদস্য—বাদলেব বাবা হবপ্রসাদ, তাঁব বড়ছেলে কৃপাল। আব তাব ভাই দযাল। তিনজনে তিনটে আলাদা দলেব সদস্য। বাদলেব পথ ছিল একেবাবে আলাদা—এদেব তিনজনেব পথ বাদল অনুসবণ কবেনি। তাই বাদলেব দলেব ছেলেবা শুধু বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল—কাবণ তিনি তো শুধু অবাজনৈতিক ব্যক্তিই নন, তিনি যে শহীদেব মা। তাবা এসে একবাব অনুবোধ জানিয়েছিল—'মাসীমা আপনি একবাব চলুন।' ঘোব-লাগা আচ্ছন্নেব মতো বিমলা সেদিন গিয়েছিলেন। তাব মাত্র দু'দিন আগে ঠিক ওই জাযগায নিষ্ঠুব গণপ্রহাবে বাদল নিহত হয। পিটিয়ে মাবা হযেছিল আঠাবো বছবেব তবতাজা যুবা বাদলকে। সেই প্রতিবোধহীন ভাবে আক্রান্ত, অসহাযভাবে নিহত বাদলেব ছবি এখনো বিমলাব চোখেব সামনে স্পষ্ট "ক্ষতবিক্ষত' বাদল। মুখে মাথায শবীবেব নানান জাযগায বক্তজমাট। নিথব বাদলকে এ বাড়িব উঠোন ওবা নিয়ে এসেছিল।"

বিমলাব মনে পড়ছে, বাদল তাঁব শেষ সন্তান নয। বাদলেব পবে আবও দু'টি সন্তান প্রসব কবেছিলেন তিন। কিন্তু, বাঁচেনি। তাই বাদলেব পবে আব কেউ ছিল না। শেষ জীবিত সন্তান হিসেবে হযতো একটু বেশি প্রিযতা অর্জন কবেছিল বাদল। সেজন্যই বাদলেব স্মৃতিব তাড়না আজ বিমলাকে ঘব থেকে বাইবে টেনে এনেছে।

উঠোনে বাদলেব মৃতদেহ দেখে চিৎকাব ক'বে কেঁদে উঠেছিলেন বিমলা। মাটিতে আছড়ে প'ড়ে জড়িয়ে ধবেছিলেন বাদলেব মৃতদেহ। কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হযেছিল শ্বাশত জননী কণ্ঠেব বিলাম—'কে তোকে এমন ক'বে মাবল। ওবে বাদল।'

তখন উঠোন জুড়ে মানুষেব মেলা। তবু বাদলেব দলেব ছেলেবা বিমলা বা তাব পবিবাবকে বেশিক্ষণ শোকপালনেব অবকাশ দেযনি। ফুলেব মালায সাজিয়ে তাবাই দ্রুত

নিয়ে গিয়েছিল খুনের বদলা খুন-এর হুঙ্কারে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে। বিমলা বা তাঁর পরিবার যেমন স্বতন্ত্রভাবে শোকপালনের সুযোগ পাননি, তেমনি বাদলের সৎকারের অধিকারও কেড়ে নিয়েছিল বাদলের পার্টি। যেন বাদল একান্তই তাদের সম্পত্তি-এ'বাড়ির কেউ নয়, এ' পরিবারের কোনো সদস্য নয়।

কীভাবে বাদল খুন হয়েছিল, তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে বিমলার। যদিও এ' সংক্রান্ত প্রত্যক্ষদর্শীর কোনো যথাযথ বিবরণ তাঁর অভিজ্ঞতায় নেই, তিনি নিজেও কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নন। দ্রুত অভিমত থেকেই এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি পুনর্নির্মাণ করেছেন তিনি। সেদিন তাঁদের এই কলোনীর স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। বাদলের দলের সভা নয়, অন্যকোনো দলের সভা। সেই সভা চলাকালীন 'কি একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল।' সেই গোলমালটার স্বরূপ যে কী, তা কেউই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারেনি। তাই বিমলারও জানা হয়নি। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র ঘনিয়ে উঠেছে, তখন কারা যেন বাদলকে তাড়া করেছিল। বাড়ির দিকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়ে আসছিল বাদল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমের ওই মোড়ের মাথা আর পেরতে পারেনি। কেউ কেউ বলে, একলাই ফিরছিল ঘরমুখো বাদল। তার খুনীরা আড়াল থেকে অপেক্ষা করছিল। এ-সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা আরও নানা কথা নানা বৃত্তান্ত বিমলার কানে এসেছে। সেসবের কোনটা সত্যি আর কোন্‌টা যে মিথ্যা তা বিমলা এখনও বুঝে উঠতে পারেন না। বাদলের আর্ত চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ! রক্তাক্ত, নিহত বাদল একাই ওখানে প'ড়ে ছিল। আর কাউকে দেখা যায়নি। পুলিশকে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম বলেছিল বাদলের দলের ছেলেরা। কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। হত্যাকাণ্ডের অপরাধে যাদের নামে মামলা হয়েছিল, তারা সকলেই এখন জামিনে মুক্তি। বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। কেস চলছে বটে, তবে তার গুরুত্ব নেই তেমন।

বাদল নিহত হবার দু'দিন পরে তৈরি হয় ওই শহীদবেদী। মাঝের দু'টি দিনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে আরও কিছু সংঘর্ষ হয়েছে ওই কলোনীতে, অগ্নিসংযোগ হয়েছে দোকানপাঠে। কেন এত হিংসা বা প্রতিহিংসা, এসবের উত্তর জানা নেই বিমলার। তাঁর শুধু মনে আসে সেদিন আচ্ছন্নের মতো তাঁর শহীদবেদীর দিকে যাওয়ার কথা। লেখক খুব সতর্ক ডিটেলেব সাহায্যে বর্ণনা করেছেন প্রিয়তম সন্তানের নামাঙ্কিত শহীদবেদী জননীর প্রথম প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা—

"পনের ষোলটা ইঁট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল।"

বিমলাকে ঘিরে দলের ছেলেরা বাদলের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছিল আবার খুনের বদলা খুনের শ্লোগান—প্রতিহিংসার পুনরুচ্চারণ। একটি ছেলে তখন উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছিল। তার সব কথা আচ্ছন্ন বিমলার কানে যায়নি। আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, আচ্ছন্নের যতোই ফিরে এসেছিলেন। একটা ঘোরের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছিলেন রান্নাঘরে, নিত্য সাংসারিক কাজে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে—

'হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন।

কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেননি।"

এরপর বিমলার স্মৃতিচারণের দর্পণে একে একে সব ঘটনাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পুত্রহারা জননীর অন্তর্গত চৈতন্যের মধ্যে সব ঘটনারই অনুপুঙ্খঅত্যন্ত সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাদলের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ খুব একটা ভেঙে পড়েননি। অন্ততঃ বাইরে থেকে তাঁর তেমনটিই মনে হয়েছে। বরং হরপ্রসাদের ওই খেদোক্তি তাঁকে পরিস্থিতির পুনর্বিবেচনায় প্রণোদনা দিয়েছে—

"কতবার বলেছি, ওই দলটাব সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।" অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যই বাদলের এমন মর্মান্তিক পরিণতি! পূর্ব-নির্দিষ্টই ছিল। যেন হরপ্রসাদ জানতেন যে এমনটাই ঘটবে। তাই বোধ হয়, বাবা হয়েও হরপ্রসাদ দুঃখ পাননি। কৃপাল দয়ালও বোধহয় তেমন দুঃখ পায়নি। তবে, এর মধ্যেও শুকনো সান্ত্বনা দিয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন—"মনকে শক্ত কর। এছাড়া আর কী করবার আছে।"

যেন মন শক্ত করার মধ্যেই পুত্রহারা জননীর যাবতীয় শোকের সান্ত্বনা নিহিত আছে। দেখা যাচ্ছে, বাদলের মৃত্যুব আগে ও পরে তার জনক ও অগ্রজদের মধ্যে তেমন কোনো শোকের বা উদ্বেগের আলোড়ন হয়নি। স্বজন বিয়োগের বেদনা এঁদের কাউকেই তেমন ভাবে উদ্বেলিত করেনি।

অর্থাৎ হরপ্রসাদের পুরুষতন্ত্রের পরিবারের কেউ বিমলার যন্ত্রণাব শরিক হয়নি। পরিবাবে তেমন কোনো আলোড়ন ওঠেনি, যেন কাউকে কিছু হারাতে হয়নি। সবকিছুই থমথমে স্বাভাবিকতায় চলেছে। একান্ত দরকারী সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া অন্যদের সঙ্গে বিমলার আব কোনো কথা হয়নি। পরিবারেব কোনো সদস্য বা হরপ্রসাদের স্বজনের মৃত্যু হয়নি, মরেছে অন্যকোনো পার্টির ছেলে। বাড়িতে ওদের মধ্যে একান্ত দরকারী কথা ছাড়া আর কোনো কথা হয় না। কথা ওরা অনেক বলে বটে, তবে নিজের নিজের দলীয় বৃত্তের মধ্যে। অর্থাৎ দলতন্ত্র এক অদ্ভুত যান্ত্রিকতা আরোপ করেছে এই পরিবারটির মানবিক সম্পর্কের বৃত্তের মধ্যে—এই যান্ত্রিক আনুগত্য অবশ্যই মানবতা-বিরোধী! দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার সুবাদে এই বিদ্বেষ-পরায়ণ যান্ত্রিক রাজনীতির নঞর্থক দিক সমরেশের লেখক-সত্তাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, এই গল্পের হরপ্রসাদের পরিবার তারই বিশ্বস্ত দর্পণ। পরবর্তীকালের আরও অনেক লেখায়-গল্পে ও উপন্যাসে, মানবিক দায়বদ্ধতার অবস্থান থেকে সমরেশ দেখিয়েছিলেন দলীয় অনুশাসন ও আনুগত্যের মধ্যে নিহিত নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার স্বরূপ! এই যান্ত্রিকতা আরও বেশি প্রাণহীন, আরও বেশি অমানবিক ব'লে মনে হয় যখন পাঠক তাঁর মানবিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটিকে পুনর্নির্মাণ করেন, যখন পাঠক গল্পটির পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় এই উপলব্ধিতে উপনীত হন যে, হরপ্রসাদ কৃপাল বা দয়াল কেউই তাদের রাজনৈতিক অবস্থানে ঠিক জায়গায় নেই, যতই তারা সঠিক অবস্থানে থাকার ভান করুক না কেন! শেষ বিচারে রাজনীতি মানুষকে নিয়েই,

মানুষকে ভালোবাসার মধ্যেই বৃহত্তর মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলাই যেকোনো রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত; বিদ্বেষের বিষবাষ্পে ক্রমাগত রক্তের কাঁচাগন্ধে মাতোয়ারা হওয়া নয়, সেই মহৎ লক্ষ্য ও বৃহৎ উদ্দেশ্য থেকে হরপ্রসাদরা সকলেই যে বিচ্যুত, তা পুত্রহারা জননীর অরাজনৈতিক মাতৃহৃদয়ের অভিজ্ঞতার দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই গল্পে।

বিমলার স্মৃতিচারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে বাদলের ভূমিষ্ঠ হবার ঘটনা। গর্ভের মধ্যে আজ যখন নতুন করে বাদলের প্রতীকী পুনরাবির্ভাবের আলোড়ন টের পাচ্ছেন, তখন আঠারো বছর আগে বাদলের ভূমিষ্ঠ হবার স্মৃতি যে এ গল্পের অবয়বে অনেকখানি পরিসর নেবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই! বাদলের জন্মমুহূর্তের স্মৃতিই বিমলাকে বারবার নাড়া দিয়েছে। তাঁর মাতৃসত্তার, বৃহত্তর তাৎপর্যে তাঁর মানবী-সত্তার অন্তশ্চৈতন্য বারবার যেন জাগিয়ে দিয়ে যায় আঠারো বছর আগের সেই দিনটির স্মৃতি। এ' শুধু বাইরের কোনো ঘটনা-নির্ভর স্মৃতির তাড়না নয়, একান্ত জৈবিক সত্তার তাড়না।

যখন দশ মাসের পূর্ণগর্ভের বেদনা শুরু হয়েছিল, তখন বাড়িতে পুরুষ-অভিভাবক কেউ ছিল না! বিমলাদের সীমিত সাধ্যের ভুবনে নার্সিংহোম আয়া-নার্স ইত্যাদি কোনো সুবিধাই আয়ত্ত ছিল না, চিরকাল প্রচলিত বাঙালির ঘরোয়া পদ্ধতিই তাঁর ক্ষেত্রে বারবার অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর আগে তিনি দু দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, সুতরাং টের পেয়েছিলেন তৃতীয় সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার সময় এসেছে। প্রবল বৃষ্টিধারার মধ্যে, প্রতিবেশিনীর সক্রিয় সহায়তায় কলোনীর অভিজ্ঞা ধাই মা মেঘুর মায়ের 'হাতযশ'-এ বাদলের জন্ম! সুস্থ-সবল, বড়সড় বাচ্চা হয়েছিল তৃতীয়টি। জন্ম-কান্না থেকেই চিনেছিল মেঘুর মা : 'মাতৃমুখী পুত্র'! বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি। গভীর যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্যেও 'মাতৃমুখীপুত্র' শুনে গোপন সুখ অনুভব করেছিলেন বিমলা। কারণ মেয়ে মহলে এই প্রবাদ খুবই জনপ্রিয় যে, 'মাতৃমুখীপুত্র' সুখী হয়! হরপ্রসাদ চেয়েছিলেন একটি কন্যাসন্তান, তবে পুত্র হয়েছে শুনে তিনি অসুখী হননি। বিশেষত : নবজাতকের মুখদর্শনের পর তিনি অবাধ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এই বলে যে, এই তৃতীয় সন্তানটি বেশ রূপবান, আগের দু'টির মতো হয়নি। তৃতীয় সন্তান মাতৃমুখী, তাই সুন্দর! সেই প্রথম মুখদর্শনের সময়েই হরপ্রসাদ নবজাতকের নামকরণ করেছিলেন : বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এসেছে, তাই ওর নাম হওয়া উচিত 'বাদল'! ছোট্ট ভাইকে নিয়ে কৃপাল আর দয়ালের আহ্লাদের সীমা-পরিসীমা ছিল না, আঁতুড়ঘরের নিষেধও মানতে চায়নি ওরা, তখন কোলে তুলতে চেয়েছিল।

কৃপাল-দয়াল ছিল দু'জনে পিঠোপিঠি ভাই। এদের তুলনায় বাদলের বয়স বেশ কম, বাদল দয়ালের চেয়েও সাতবছরের ছোটো। মাঝখানে দু'জন মারা গেছে। অবুঝ মাধুর্যের মধ্য দিয়ে বাদলের শৈশব যেন কোথা দিয়ে অতি দ্রুত কেটে গেল। বাদলের দশম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থা পর্যন্ত এই ভ্রাতৃসুলভ মাধুর্য ছিল! বিমলার মনে পড়ছে, ছোটবেলায় বাদলের একবার টাইফয়েড হয়েছিল, দুই ভাই রাত জেগে তার সেবা করেছে, ডাক্তার ডেকে এনেছে। কিন্তু এই মাধুর্য দ্রুত অপসৃত হলো বাদলের বয়ঃসন্ধির পর্যায়ে। তখন বাদল একটু একটু বুঝতে শিখেছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছে এবং বুঝতেও শিখেছে যে, বাড়ির সকলেই অল্প

বিস্তর রাজনীতি করে! এবং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দল করে। বাবা তার প্রাচীন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাদাদের দলীয় রাজনীতি পছন্দ করেন না। আবার, দাদারাও তাদের নবীন রাজনীতির পরিবর্তিত অবস্থান থেকে বাবার সুরে সুর মেলাতে পারে না! বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে বাদলের প্রাথমিক সমর্থন ছিল দয়ালের দিকে। মাকে সে প্রায়ই বলতঃ ছোড়দাই (দয়াল) নাকি সঠিক কথা বলে! তার স্কুলের উঁচুক্লাসের ছেলেরা নাকি দয়ালের কথাতেই বেশি মুগ্ধ হয়। কিন্তু বাদলের এই বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের মুগ্ধতাও বেশিদিন স্থায়ী হলো না। সময় যত প্রবাহিত হতে লাগল, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আবর্ত যত জটিল ও বক্রপথগামী হ'য়ে উঠতে লাগল, তত যেন এই পরিবারটির সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। একদিন এই বিমলার উপলব্ধি প্রকাশ্যে চলে এলো যে, বাদলও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে! এবং বাদল তার অগ্রজ বা পিতার পথের অনুগামী হয়নি। বাদলের পথ একেবারেই আলাদা পথ! বাদলের ভরা যৌবনে বঙ্গীয় রাজনীতিতে যে নতুন মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে, যে নতুন তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়েছে, বাদলের মতো সদ্য তরুণরা তার নতুন পথিক। এই পথে যেতে বিমলা বারণ করেছিলেন। মাতৃহৃদয়ের একান্ত অমঙ্গল-আশঙ্কা থেকেই এই বারণ! এর মধ্যে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ বিদ্বেষ ছিল না, যা হরপ্রসাদের নিষেধাজ্ঞায় ছিল। হরপ্রসাদেব নিষেধাজ্ঞা বীতিমত শাসানি! কিন্তু বাদল বরাবরই স্বল্পবাক। নম্রকণ্ঠে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে বাদল তাব অভ্যস্ত মিতকথনে উত্তর দিয়েছিল— "আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।" হবপ্রসাদের সঙ্গে বাদলের যখন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্ক চলছে, তখন যেন বাদলকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন বিমলা। রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট মিতবাক্ তার্কিক বাদলকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছিল : এই বাদলকে তিনি চেনেন না, চিনতে পারছেন না। উত্তেজিত তর্কবিতর্ক নয়, অস্থির আস্ফালন নয়, গলা-চড়ানো কথা নয়, কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠের দৃঢ়প্রত্যয়ের উচ্চারণ! বিস্মিত-বিমলা ভেবেছেন : এইভাবে কবে কথা বলতে শিখল বাদল!

এই পরবর্তী স্তবেই এসেছে যাবতীয় শাসানি ও হুমকি : বাদল যেন এখনই তার রাজনৈতিক সংসর্গ বর্জন করে! পার্টি ছাড়ার এই হুমকি কোনো বাইরের শক্তি থেকে আসেনি, এসেছে পরিবারের ভেতর থেকে! প্রথম হুমকি এসেছে পরিবারের প্রধান অভিভাবক হরপ্রসাদের তরফ থেকে। তার সোজা কথা · এ বাড়িতে থাকতে হ'লে পার্টি ছাড়তে হবে! লক্ষ্যণীয়, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু বাদল সম্পর্কেই, কৃপাল বা দয়াল প্রসঙ্গে নয়। বাদল যথারীতি নীরব প্রত্যাখ্যানে নিজের অনড় মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছে। এরপর সময়ের নদীতে যত জল গড়িয়েছে, কাল যত প্রবাহিত হয়েছে, বাইরের ঘটনার উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ যখন ঘরের মধ্যে এসে আছড়ে পড়েছে, বাদলের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বেড়েছে, কৃপাল দয়াল বা হরপ্রসাদের দলের সক্রিয়তা বেড়েছে, কৃপাল দয়াল বা হরপ্রসাদের দলের সঙ্গে মত পার্থক্য যখন সংঘর্ষের পথে নেমে এসেছে, তখন হুমকির মাত্রাও বেড়ে গেছে। বাড়ির তিনজন সদস্যই আলাদা আলাদাভাবে হুমকি দিয়েছে বাদলকে। এবার আর বাড়িতে থাকা বা বাড়ি ছাড়াব হুমকি নয়, সরাসরি প্রাণসংশয়ের হুমকি। আগুন নিয়ে সর্বনাশ খেলায় মেতে উঠলে

যে পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই অমোঘ মর্মান্তিক পরিণতির হুমকি! প্রথম এইজাতীয় হুমকি শোনা গেল কৃপালের কণ্ঠে—"বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কি ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।" এর পরের হুমকি কৃপালের—

"বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারা মারি করে বেড়াচ্ছে।"

লক্ষণীয় ঘটনা হলো, এরা প্রত্যেকেই তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা উগরে দিয়েছে মায়ের কাছেই। সরাসরি বাদলকে কেউ কিছুই বলেনি। হয়তো বলার মতো সৎসাহস ছিল না তাদের। যেন মায়ের প্রশ্রয়েই বাদলের এমন বাড় বেড়েছে! হরপ্রসাদের বা দয়াল-কৃপালের ইঙ্গিত সেদিকেই। এইরকম শাসানি আর হুমকির মধ্যে একদিন তিক্ত কণ্ঠে বিদ্রোহ করে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—"আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদী আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।"

এ'যেন সতীনাথের 'জাগরী'র মায়ের খোদোক্তিব হুবহু প্রতিধ্বনি!

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শের সঙ্কট ও অন্তর্কলহ দেখে বিমলা আত্মজিজ্ঞাসায় মগ্ন হয়েছেন। যে রাজনীতির জন্য একই পরিবারের মধ্যে এমন তীব্র রেষারেষি, হত্যার হুমকি, সেই হানাহানির রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন ক্রমশঃ। পরিবারের মধ্যে যাবা তাঁর একান্ত আত্মজন, যাবা তাঁরই অস্তিত্বের একটা জৈবিক অংশ—তাদেরকে এই অমানবিক রাজনীতির প্রশ্নহীন বাহক বা কর্মী হ'তে দেখে ক্রমশঃ তাদের সঙ্গেও দূরত্ব অনুভব করেছেন বিমলা। বাদলের সঙ্গে কথা বলে, ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝেছেন, পায়ে পা বাধিয়ে আগ বাড়িয়ে ঝগড়া বাধানো বাদলের নীতি নয়। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য মারামারির পথে যেতে বা অস্ত্রধারণ করতে সে আপত্তির কোনো কারণ দেখে না।

এরপরেই ঘটেছে সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা। বিরোধী পক্ষের দুষ্কৃতীরা পিটিয়ে মেরে ফেলে বাদলকে। রাজনীতির পরিভাষায় শহীদ হয়ে যায় বাদল। এতদিনে হরপ্রসাদ বা কৃপাল-দয়ালের শাসানী সত্যে পরিণত হয়। বাদলের এই অকালমৃত্যু যেন তাদের প্রত্যাশিতই ছিল, কিছুটা যেন কাঙ্ক্ষিত। তাই বাদলের মৃত্যুর বেদনা এই পরিবারের পুরুষসদস্যদের মধ্যে কোনো শোকের ছায়া ঘনিয়ে তুলতে পারেনি। কোনো আত্মজন নয়, কারোর পুত্র বা ভাই যেন মারা যায়নি, মরেছে তো শত্রুপক্ষের একজন কর্মী—সেটা বোধ হয় হরপ্রসাদের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল! শুধু তাই নয়, তারা কেউ বাদলের সৎকার বা শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করেনি। শুকনো আক্ষেপ বা দায়সারা মন্তব্যে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। সেটা বিমলার গভীর বেদনাসম্ভূত পর্যবেক্ষণও বটে!

বাদলের মৃত্যুর তিনমাস পরে, আজ যখন রান্নাঘর ছেড়ে এসে ফণিমনসার বেড়ার ধারে এসে বিমলা শহীদবেদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, সেদিনের মতোই আজ আকাশে মেঘের জটলা, আজও একইরকম বৃষ্টির ধারা। আজ বাদলের জন্মদিন। আঠারো বছর আগে এমনই এক বর্ষণমুখর দিনে বাদল এসেছিল এ পৃথিবীতে। আঠারো বছর পরে আজ আবার গর্ভের মধ্যে নতুন করে বাদলের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা অনুভব করছেন

বিমলা। আঠারো বছর আগে হুবহু এই একই রকম গর্ভযন্ত্রণা জানান দিয়ে বাদল এসেছিল এই পৃথিবীতে। আজ আবার আসছে। একইভাবে! শরীর অশক্ত, সন্তানধারণের মতো শারীরবৃত্তীয় উপকরণগুলি প্রায় শুষ্ক, জৈবিক নিয়মক্রমেই আজ তিনি অসহায়, তবুও বিমলা তাঁর অন্তশ্চৈতন্যের মধ্যে গভীর আত্মগত বিশ্বাসের মধ্যে টের পাচ্ছেন : বাদল আসছে! আবার জন্মাবার জন্য বাদল আসছে। যত প্রবলভাবে নিবিড়ভাবে তিনি তাঁর শুষ্ক গর্ভের মধ্যে বাদলের পুনরাবির্ভাবের প্রতীকী সম্ভাবনা টের পাচ্ছেন, ততই কঠোরভাবে নির্মোহচিত্তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারছেন নিজের পরিবারের সঙ্গে—দুটি প্রক্রিয়াই সমান্তরালভাবে চলেছে—

"বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।"

এবং—

"এরা তাঁর স্বামী-পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।"

বাদলের প্রতি সন্তান বাৎসল্যের নিবিড় একাত্মতা থেকেই এই বিচ্ছিন্নতার চেতনা। লক্ষ্যণীয় যে, স্বামী বা অন্য দুই পুত্র, আজ এই বিশেষ দিনে, নিছকই 'পার্টির লোক' বিমলার দৃষ্টিতে। কিন্তু বাদল, একমাত্র বাদলই, তাঁর আত্মজন—তাঁর সন্তান! এহেন আত্মিক বিচ্ছিন্নতার আরও একট সম্ভাব্য কারণ হলো বিমলার স্থির বিশ্বাস : তাঁর অটল অকম্প্র বিশ্বাস তাঁকে এই সিদ্ধান্তে চালিত করেছে যে, পরিবারের এই 'পার্টির লোক রা'ই তাঁর প্রিয়পুত্রের হত্যার জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে আরও ভাবা যেতে পারে যে, নিবিড় বাৎসল্যের ঐকান্তিক আনুগত্যের টান বিমলাকে ক্রমশঃ বাদলের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সমীপবর্তী করেছে, বাদলের বিশ্বাসের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করেছেন বলেই শুষ্ক, প্রসবসম্ভাবনাহীন—গর্ভের মধ্যে বাদলের (বাদলদের) পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা তাঁর জৈবিক সত্তার মধ্যে অনুভব করেছেন, আর একইসঙ্গে, সমান্তরাল বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় হরপ্রসাদের সঙ্গে দূরত্ব তথা আত্মিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছেন! এইভাবে শহীদের মায়ের জননী-যন্ত্রণার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে বাদলের রাজনীতি, বাদলের বিশ্বাস ক্রমশ চারিয়ে যেতে থাকে। একান্ত অরাজনৈতিক জননীও ক্রমে তাঁর অজান্তে পুত্রের রাজনৈতিক বিশ্বাসের বাহক হয়ে ওঠেন। জন্ম দিতে চান সেই বিশ্বাসের দায়বদ্ধ উত্তরাধিকারীদের নতুন বাদলদের আর এভাবেই গল্পটি এগিয়ে চলে এক মহতী উত্তরণের লক্ষ্যে।

বাদলের জন্মদিনে মৃত্যুশোক বিমলাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছে। সেজন্যই তিনি হরপ্রসাদ ও কৃপাল দয়ালদের জানিয়ে দিতে পারেন যে, আজ আর তিনি রাঁধবেন না। এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে পরম যত্নে তিনি সংসারের সকলের জন্য রেঁধেছেন, আজ আর রাঁধবেন না। আজ বরং ওরা যার যার পার্টির কাজে যাক! আজকে বিমলা বরং একটু একা থাকতে চান। আজ তাঁর নিরন্ন শোক যাপনের দিন উপবাসে থাকার দিন। বাদলের অষ্টাদশতম

জন্মদিনে তার সদ্য মৃত্যুর স্মৃতি তাঁকে এমন উপবাসে থাকবার প্রণোদনা দিয়েছে, তাঁর মাতৃহৃদয় ঐকান্তিকভাবে চাইছে যে বাড়ির আর সকলে আজকের দিনটা তাঁর এইসব হারানোর অনুভূতির অংশীদার হোক! নিরন্ন থেকে, উপবাস যাপন করে শোকের অশৌচ পালন করুক।

বিমলার এই প্রাত্যহিক গার্হস্থ্যক্রমে অনীহার বিষয়টিকে যে ভিন্ন মাত্রায়, অন্যতর এক কৌণিক বিন্দু থেকেও দেখা যায় সেকথা আমরা আগেই বলেছি। নিজের জৈবসত্তার মধ্যে বাদলের বিদ্রোহের উত্তাপকে তিনমাস যাবৎ একটু একটু করে আত্মস্থ করে শহীদের মা ধীরে ধীরে বাদলের বিশ্বাসের জগতের সমীপবর্তী হয়ে পড়েছেন। বাদলের মতোই তিনি প্রচলিত সব অভ্যাস ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চেয়েছেন—পরিবার নামক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি হয়ে উঠেছে তাঁর বিদ্রোহ উদ্‌গারের আধার! যে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যই বাদলের তথাকথিত 'বাড়াবাড়ির' বিরুদ্ধে শাসিয়েছে প্রাণ সংশয়ের হুমকি দিয়েছে, যে পরিবারের কেউ না কেউ, অথবা সবাই একত্রে, ব্যক্তিগতভাবে না হোক, দলগতভাবে, বাদলের হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী, যে পরিবারের কেউ বাদলের মৃত্যুর ঘটনায় সহমর্মী হয়নি, সৎকারে পর্যন্ত আগ্রহ দেখায়নি; স্মরণসভায় যাওযার তো প্রশ্নই ছিল না, সেই পরিবারের যান্ত্রিক দলীয় আনুগত্য বা অমানবিক নিষ্ঠুর নিস্পৃহতার বিরুদ্ধ বিমলার এই জাগ্রত বিদ্রোহই গল্পের মূল বিষয়। একদিকে শুষ্ক, জন্মসম্ভাবনার জৈবিক ক্ষমতাহীন মাতৃগর্ভে বাদলের প্রতীকী পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনায় যে কনট্রাস্ট বা আপাতবৈপরীত্যের আবহ তৈরি হয়, তা লেখকের বিপ্লবী ইতিহাসের অনিবার্য অগ্রগতির প্রতি অটুট আস্থারই দ্যোতক। আবার, গল্পের অবয়বে বারবার বাদলের এই পুনর্জন্মের সম্ভাবনা দ্যোতিত হওয়ায় তা একটি প্রতীক বা 'মোটিফ' এর মর্যাদা অর্জন করে—বিপ্লবী তথা প্রাণের দুবন্ত আবেগের আপোসহীন লড়াকু সত্তার অমরতা, আর অন্যদিকে সেই লড়াকু পুত্রের পাশে সত্যনিষ্ঠ মায়ের বিবেকী সহাবস্থান! এই তাৎপর্যে লগ্ন হ'য়ে গল্পটি শেষ হয় বলেই 'শহীদের মা' এক মহতী উত্তরণের দ্যোতনায় ভাস্বর।

চার

'শহীদের মা' গল্পে রাজনীতি একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। সঠিক তাৎপর্যে একে পুরোপুরি রাজনৈতিক গল্প বলতে হয়তো অনেকেরই আপত্তি হবে, গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে আবহ বা বাতাবরণ গড়ে উঠেছে যা যে মূল ঘটনাটির ওপর গল্পের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তা পুরোপুরি রাজনীতি-স্পৃষ্ট। যদিও রাজনৈতিক তত্ত্বের কচকচি ছাপিয়ে মানবিক উত্তরণই এ' গল্পের কেন্দ্রীয় 'মেসেজ' হয়ে উঠেছে, তবুও রাজনীতির অমোঘ প্রভাবকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। গল্পের যে সেন্ট্রাল মোটিফ-বাদলের হত্যাকাণ্ড এবং তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় বাদলের জন্মদিনে তার প্রতীকী পুনর্জন্মের ইঙ্গিত—এই বুনটের পেছনে আছে একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের শক্তপোক্ত ভিত! শহীদ জননী বিমলা যে শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে দিয়ে, সব পেছুটানকে অতিক্রম করে তাঁর নিহত পুত্রের পাশে এসে দাঁড়াল—তা নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উত্তরণ নয়, প্রতীকী তাৎপর্যে বাদলেরই রাজনৈতিক বিশ্বাসের

জিত! এদিক থেকে, গল্পের অন্তর্বয়নের মধ্যেই অনিবার্য চোরাস্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে সত্তরের প্রতিস্পর্ধার রাজনীতি!

এ' গল্পে হরপ্রসাদের পরিবারটিকে পুরোপুরি রাজনৈতিক পরিবার হিসেবে চেনা যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু-নীলুর পরিবারকে যেমন বৃহত্তর তাৎপর্যে 'রাষ্ট্রীয় পরিবার' বলা হয়, হরপ্রসাদের পরিবারের গুরুত্ব তেমনই। ভারতীয় রাজনীতির চতুর্মুখী ধারাকে চিনে নেওয়া যায় হরপ্রসাদের এই পরিবারের দর্পণে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গত কারণেই মনে পড়তে পারে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''শোকমিছিল', সৌরি ঘটকের 'কমিউনিষ্ট পরিবার' বা সমরেশ বসু-র 'তিনপুরুষ' উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিবারগুলির কথা। হরপ্রসাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আলাদা আলাদা পলিটিকাল আইডেনটিটি! সমকালীন বঙ্গীয় তথা ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোতের এক একটি ধারার প্রতিনিধি তারা সকলেই! সেই তাৎপর্যে সত্তরের রাজনৈতিক ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র একক বা সংস্করণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে হরপ্রসাদের পরিবারটিকে।

হরপ্রসাদের অবস্থান, বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে তাঁর অ্যাটিটিউড বা প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁকে ভারতের প্রাচীনতম রক্ষণশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক বলেই মনে হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কৃপালকে গ্রহণ করা যেতে পারে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাচীন অংশটির অর্থাৎ সি.পি আই এর রাজনীতির একান্ত অনুগত। দয়াল তার প্রথম যৌবনে কৃপালের ভক্ত ছিল, পরে তার মতামত পাল্টায়। বোঝা যায়, দয়াল পরবর্তীকালে সি.পি.আই(এম)-এর অনুগামী হয়। বাদল দয়ালের চেয়ে সাত বছরের ছোট। গল্পটি সত্তর একাত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। ৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের ইতিহাস মনে রাখলে, সত্তর বা একাত্তরে পার্টির আবার ভাঙন এবং নকশালপন্থী আন্দোলন তথা সি.পি.আই (এম এল) এর উত্থানের তাৎপর্যে দযাল ও বাদলের অবস্থানকে চিনে নেওয়া যায়। লক্ষণীয় গল্পে উল্লেখ আছে যে, রাজনৈতিক বিশ্বাসের উন্মেষলগ্নে, কৈশোর দয়ালের অন্ধ ভক্ত ছিল। মায়ের কাছে বাদল প্রায়ই বলত, হরপ্রসাদ বা কৃপাল নয়, স্কুলের উঁচুক্লাসের ছাত্রবা দয়ালের বক্তৃতায় বেশি প্রভাবিত হয়। বাদলও তার পরে, রাজনীতির বক্রস্রোত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যত প্রবাহিত হয়েছে, বাদলের বিশ্বাস তত ভিন্নপথগামী হয়েছে। লেখক সরাসরি বলেননি, তবে নানা অনুপুঙ্খ ও উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, বাদল সত্তরে জন্ম-নেওয়া নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শের পথিক! সেই বাদলের হত্যা এবং তার পরবর্তী ঘটনাই গল্পের মূল থীম! বাদল তার পরিবারের কাছেই দুঃসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তার জৈবিক অস্তিত্ব পরিবারের অন্যদের (বিমলা ব্যতীত) তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছিল, কারণ বাদল তথা বাদলের রাজনীতি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, বিশ্বাসের ভিত ধরে নাড়া দিয়েছিল, নতুন করে সবাইকে ভাবতে বাধ্য করেছিল, নিজেদের অবস্থনের পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য করেছিল বাদলের প্রতিস্পর্ধার রাজনীতি। এর সঙ্গে তারুণ্যের বাঁধভাঙা শক্তি, অপ্রতিরোধ্য ভাঙনের উল্লাস ও আপোসহীন বলিষ্ঠতাও জড়িয়ে ছিল। কিন্তু সিস্টেমকে রক্ষা

করবার পবিত্র কর্তব্যের আহ্বানে হরপ্রসাদরা সবাই একজোট, তাই বাদলকে মরতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটাই এ' গল্পের মূলীভূত রাজনৈতিক নির্যাস।

কিন্তু বাদলরা মরে না। যুগে যুগে, ইতিহাসের অমোঘ আহ্বানে, বারে বারে জন্মায়! বাদলের পুনর্জন্মের প্রতীকী সম্ভাবনার মধ্যে তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের বা আপোসহীন লড়াকু সত্তার জয়ই দ্যোতিত হয়েছে। বাদলের আঠারো বছরে জন্মদিনে, বিমলার স্মৃতিচারণের ন্যারেশনে এ'গল্পের অবয়ব গড়ে ওঠায় সুকান্ত-র 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' মনে পড়বেই! মানবিক দায়বদ্ধতা ও উত্তরণের গল্প হয়েও তাই 'শহীদের মা' গল্পকে কোনোভাবেই তার সমকালের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মহতী উত্তরণের এই গল্প তো পরবর্তীকালের তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের ভিত তৈরি করেছে—সেখানেও তো এই অন্তহীন জননী-যন্ত্রণার পরম্পরা।

আদাব : সম্প্রীতির পথে

সংহিতা সিন্‌হা

চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সমরেশ বসুর আবির্ভাব 'আদাব' গল্পের মাধ্যমে। ১৯৪৬-এর শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় যখন এই গল্প প্রকাশিত হয়, তখন তিনি মাত্র বাইশ বছরের যুবক। অথচ গল্প পড়ে তা বোঝার উপায় নেই। গল্পের কোথাও কোনও অপরিণতির ছাপ পড়ে নি। আকারে ছোট কিন্তু ভাবনায় সুগভীর এই গল্প পাঠককে সহজেই অভিভূত করে। ১৯৫৩ সালে 'মরশুমের একদিন' নামক গল্প সংকলনে 'আদাব' গল্পটি গ্রন্থভুক্ত হয়।

সমরেশ বসু প্রায় দ্বিশতাধিক গল্প রচনা করেছেন। বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এইসব গল্পে তিনি বারংবার জীবনের কথা, জীবন সংগ্রামের কথা বলেছেন। আর দেখিয়েছেন, "জীবন বীভৎস, জীবন অশান্ত, জীবন ক্লিন্ন—কিন্তু সেই সঙ্গে জীবন দুর্মর এবং অপরাজেয়।" (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'আদাব'-ও তার ব্যতিক্রমী নয়। আদাবের প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে আছে মনুষ্য জীবনের গভীর মানবতার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট তৎকালীন মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে'র ডাক দেয়। শুরু হয় হিন্দু মুসলমানের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ক্রমশ এই দাঙ্গা সারা বাংলা হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রবল বিশ্বাসহীনতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, সন্দেহ আর আক্রোশ। এরই পটভূমিতে লেখা হয়েছে 'আদাব' গল্পটি।

কাহিনীর শুরু বিভীষিকাময় দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে। দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে তখন উন্মত্ত হিন্দু-মুসলমান তৈরী পরস্পরকে নিধন করাব জন্য। চতুর্দিকে দাঙ্গাকারীদের উল্লাস, বস্তিতে আগুন, আর মরণভীত নারী-শিশুদের কাতর আর্তনাদ। এর মধ্যে রয়েছে শাসনকর্তার কারফিউ অর্ডার এবং ১৪৪ ধারা। এহেন রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে প্রাণভয়ে ভীত একটি লোক আশ্রয় নেয় দুটি গলির মধ্যবর্তী স্থানে রাখা এক ডাস্টবিনের আড়ালে। পড়ে থাকে নিঃসাড়ে, মাথা তোলার সাহসটুকুও তখন তার লুপ্ত। এমন সময় নড়ে ওঠে ডাস্টবিনটা। অপর পাশে তারই মত আর একটি লোক, ভীত-সন্ত্রস্ত। দুজনেই দুজনকে অবিশ্বাস করে। তীব্র শঙ্কায় আর সন্দেহে অপেক্ষা করে থাকে প্রতিপক্ষের আক্রমণের। কিন্তু না, কোন আক্রমণ আসে না। উৎকণ্ঠায় অধৈর্য হয়ে তখন শুরু হয় পরিচয়ের পালা। এক্ষেত্রেও আবার অপ্রত্যয়। ক্রমশ পরিষ্কার হয় তাদের পেশা, জানা যায় তাদের আবাসস্থল। একজন 'নারাইনগঞ্জের' সুতাকলের শ্রমিক, অপরজন নৌকার মাঝি, বাড়ি 'বুড়ি-গঙ্গার হেইপারে সুবইডায়'। প্রাথমিক পরিচয়ের পরেও বিশ্বাসহীনতা দানা বেঁধে থাকে মনেব মাঝে। সময়ের সহযোগে, কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় আতঙ্ক আর অবিশ্বাস ধীরে ধীরে দূরে সরতে থাকে। পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে—"তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?" উভয়ের পরিচিতিও স্পষ্ট হয়। নৌকার মাঝি মুসলমান আর সুতাকলের শ্রমিক হিন্দু। ক্রমে নিবিড় দুজনে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-আত্মীয়ের মত পরস্পর কথা বলে। দাঙ্গার জন্য ব্যবসার ক্ষয়ক্ষতি,

পারিবারিক অসহায়তা, অযথা প্রাণহানি এবং শোচনীয় পরিস্থিতির প্রসঙ্গ ওঠে। এমন সময় টহলদারি পুলিশের ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। মাঝির নির্দেশমত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তারা পৌঁছায় পাটুয়াটুলি রোডে। ইংরেজ অফিসারের দৃষ্টি এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকে দুজনে। অদূরে মুসলিম এলাকা, ইসলামপুর ফাঁড়ি। সেখানেই পৌঁছাতে হবে মাঝিকে। তারপর বুড়িগঙ্গা পার হলেই তার বাড়ি। পরদিন ঈদ। এদিন বাড়ি ফিরলে সকলের আনন্দ। সোহাগী 'বিবি' আর 'পোলামাইয়া' অধীর অপেক্ষায় রয়েছে তার আনা নতুন জামাকাপড়ের আশায। বাড়ি তাকে যেতেই হবে। একরাশ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর দুর্ভাবনা নিয়ে সুতাকলের শ্রমিক মাঝিকে বিদায় জানায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, 'ভগবান—মাজি য্যান বিপদে না পড়ে।' তারপর ভাবতে থাকে মাঝি বাড়ি ফিরলে বিবির সোহাগের কথা, মেয়ের আনন্দের কথা। এমন সময় গর্জে ওঠে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র। কম্পিত হয় শ্রমিক, সন্দেহ জাগে মাঝি হয়তো পারলো না বাড়ি ফিরতে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বুকের রক্তে রাঙা হয়ে যাচ্ছে মেয়ে ও বিবির পোশাক। বেদনায় কাতর হয়ে মাঝি যেন তাকে বলছে, "পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।"

সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রেক্ষিতে রচিত এই গল্প অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী। জাতি ধর্ম নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব পরিবারে-সংসারে-পারস্পরিক মানব-সম্পর্কে কী বিষময় কুফল, কী ভয়ংকর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে আসে লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন। নির্দয় জীবনবিরোধী পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু চরম মানবতার কাহিনী শুনিয়েছেন। গল্পের প্রথমে দাঙ্গাকালীন পরিবেশেব যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তার মধ্যে দিয়েই বিভীষিকাময় হানাহানির ভয়াল রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এইরকম রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে দুটি আতঙ্কগ্রস্ত প্রাণভীত অপরিচিত মানুষের মানসিক অবস্থা পরিস্ফুট হয় ছোট ছোট বাক্যবন্ধেব মাধ্যমে। অসাধারণ সে বর্ণনা, অন্ধকার রাত্রির মৃত্যুর বিভীষিকা যেন আমাদের চোখের সামনে—

> "হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে বইল ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে। ...নিশ্চল নিস্তব্ধ।
>
> বোধ হয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্য লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা ...ও-পাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটা মাথা। মানুষ। ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনি।"

এরপর মানুষদুটির সংলাপে স্পষ্টতর হয় তাদের পারস্পরিক সন্দেহ, ভয়, আশংকা, উদ্বেগ এবং আতঙ্ক। পরিবেশ-পরিস্থিতি অতিক্রম ক'রে ক্রমশ চরিত্র দুটি মুখ্য হয়ে ওঠে। কাহিনী এগিয়ে চলে অনামা দুটি চরিত্রের কথোপকথনকে অবলম্বন করে। তারপর জানা যায় তাদের ধর্ম ভিন্ন। চরিত্র দুটির কোনো নামকরণ করেন নি লেখক। আসলে তারা কোনো

একক ব্যক্তি নন। দুই ধর্মের প্রতিনিধি, যারা সোচ্চারে জানায় যুদ্ধবিরোধী মতামত। তাদের বড় পরিচয় তারা মানুষ। মানবধর্মই তাদের ধর্ম। তাই ধর্মমত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা ঘনিষ্ঠ হয়, তাদের বন্ধুত্ব বাড়ে। এবং তা সম্ভব হয়েছে তখন যখন সেই বিশেষ দুই ধর্মের মানুষ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে লিপ্ত। এরা কিন্তু দাঙ্গার স্রোতে গা ভাসায় নি। বরং প্রশ্ন তুলেছে, —

"আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?"

এ জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র মাঝি কিংবা শ্রমিকের নয়, সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই। এক শ্রেণীর মনুষ্যত্ববর্জিত অত্যাচারী মানুষই দাঙ্গা বাধায় অতি তুচ্ছ কারণে। আর ক্ষেত্র বিশেষে তা পরিণত হয় সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ভয়াবহ সব ধর্মীয় যুদ্ধে। হিংসা মারামারির ঘটনায় তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ হয়, একধরনের পাশবিক আনন্দে তারা তৃপ্ত হয়। আর তার কুফল ভোগ করে সাধারণ নিরীহ সব মানুষেরা। সমরেশ বসু 'আদাব' গল্পে সেই কথাই বলেছেন শিল্পিত কৌশলে। যুদ্ধপ্রিয় মানুষেরা কিন্তু ধর্ম, রাজনীতি বা সমাজনীতির দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে আলাদা করতে পারে না। সাধারণ মানুষ তাদের যুক্তিবুদ্ধিনিষ্ঠ মানবতাবোধের সহায়তায় পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে, একাত্ম হয়; যেমন হয়েছে সুতাকলের শ্রমিক এবং নারায়ণগঞ্জের মাঝি। দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে নিজেরা বাঁচার জন্য, তাদের পরিবারকে বাঁচাবার জন্য তারা একসঙ্গে লুকিয়ে থাকে, একে অপরকে বাঁচাবার পথ দেখায়। একজনের পরিবারের সুখদুঃখ খুশির কথায় অন্যজন সামিল হয়। অবশেষে গুলির শব্দে, প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে—স্থবির হয়।

গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের কথাই বলেছেন লেখক। দ্রুতগতিতে টানটান উত্তেজনায় কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। কোথাও বর্ণনার আধিক্য নেই, বা আবেগের আতিশয্য নেই। দুটো মাত্র চরিত্রের কথন, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কাহিনী এবং লেখকের বক্তব্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই লেখকের শব্দচয়ন, ভাষাব্যবহার, ঘটনাস্থলের নামকরণ। ইসলামপুর ফাঁড়ি, বুড়িগঙ্গা, বাদামতলির ঘাট, নারায়ণগঞ্জ, পাটুয়াটুলি রোড, অশ্বারোহী ইংরেজ সৈন্য, রায়টের প্রসঙ্গ গল্পকে একেবারে বাস্তব পটভূমিতে দাঁড় করিয়েছে। মনে হয় চোখের সামনে ঘটে যাওয়া সত্য কাহিনী, কল্পনার অবকাশটুকুও যেন নেই। গল্পে বর্ণিত দাঙ্গার পরিবেশ যে ১৯৪৬ এর আগস্টের মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'কে কেন্দ্র করে তা স্বচ্ছ হয় সুতামজুরের ছোট কথায়—

"দোষ ত' তোমাগো ওই লিগওয়ালাগোই। তারাই ত' লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।"

প্রথম রচিত গল্পে পরিণত এই শৈল্পিক নিপুণতা সত্যি অভাবনীয়। ভাবনায় স্বভাবে মননে সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে "আদাব"। কাহিনীতে নাটকীয়তা এসেছে, কিন্তু কখনই তা অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি করে নি। এসেছে চরম মুহূর্ত বা climax; সুতামজুরের ভাবনায় সংশ্লিষ্ট হয়ে,—

"সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

হলট্ ...

ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক,"

বাসনা আব বাস্তবের মধ্যে কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! কাহিনীর কী অসাধারণ সন্ধিক্ষণে সৃষ্ট হয়েছে ক্লাইম্যাক্স! দাঙ্গামুখর একটি রাতের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই গল্প। একাধিক ঘটনা নেই, নেই চরিত্রের আধিক্য। সুসংবদ্ধ নির্ভার, নির্মেদ হয়ে কাহিনী এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। তবু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই চরিত্রগুলির বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রথমে তারা ছিল অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত, পরস্পরের প্রতি আস্থাহীন, সন্দিহান। পরে খানিক পরিচিত হল তারা, তবু মনের কোণে সন্দেহ রয়েই গেল। একজনের বক্তব্যের সন্দেহজনক অন্তর্লীন অর্থ খোঁজে অপরজন। ক্রমশ সন্দেহ দূরীভূত হয়, আস্থা আসে, ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, বন্ধুতা হয়। শেষে বিচ্ছেদমুহূর্তে মুসলমান মাঝি বলে,—

"যাই ...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।" সৌজন্যের আন্তরিকতায় আবেগে বিহ্বল হয়ে সুতামজুর বলে, — "আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।" কাহিনীর উত্তরণ এখানেই। সুতামজুর হিন্দু হাওয়া সত্ত্বেও নিজ-ধর্মের রীতিতে আবদ্ধ থাকে নি। এক হয়ে গেছে দুজনে। এখানে তাদের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য স্থান পায় নি। উভয়ের মানব অনুভূতিই হয়ে উঠেছে প্রধান। দাঙ্গার চরম হিংসাত্মক পটভূমিতে তারা যে মানবতার নিদর্শন রেখে গেল তা অভাবনীয়। এখানেই কাহিনীটির অনন্যতা, একটি রাত্রিকালীন ঘটনা সমকালের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

জোয়ার ভাঁটা : জীবিকার আকর্ষণে বিকর্ষণে

প্রদীপ বৈদ্য

'ক'টা লাও আসবে বাবু?'—এই প্রশ্নের ঢেউ-এ শুরু হয় 'জোয়ার ভাঁটা' গল্পটি। নদীর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই গল্পের কাহিনি। ক্ষুধার মতো আদিম প্রবৃত্তি কিভাবে মানুষের জীবনের সুখ দুঃখকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রমাণ রয়েছে এই গল্পে। কাজের স্বপ্ন কখনো সুর টেনে আনে, কাজ না পাবার দুঃস্বপ্ন সুর দুর করে তাড়িয়ে দেয় জীবন থেকে। আশা-নিরাশার দোলাচলতার ঢেউয়ে গল্পে বর্ণিত মানুষগুলির জীবন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপরে টাল মাটল নৌকার মতো। পেট ভর্তি হলেই জীবনীশক্তি ফিরে আসে মানুষের সম্পর্ক তৈরি হয় মানুষে মানুষে। নাম হয়ে ওঠে সেই সম্পর্কের সাঁকো। অনাহারে নামের কোনো গুরুত্ব নেই। গল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতিতে তাই সবুজ শাড়ি পড়া কামিনীটি নামহীন। মানুষগুলো যেন এখানে সত্তাহীন—মূল্যহীন। জীবিকাহীনতা তাদের নিরাশ করে তোলে। সস্তা রঙীন শাড়ি হয়ে ওঠে তাদের পরিচয়। সেই পরিচয়কে সামনে রেখেই দুই নারীর সুর বাঁধায় গল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতি। সমরেশের বর্ণনায় তা এরকম—'সবুজ আর লাল শাড়ি-পড়া দুটি কামিন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে সরু গলায় গেয়ে উঠল :

ওই আসে গো ওই আসে লা'য়ে ভরা টালি
ঘরে আমার ছা ঘুমোয়
মিন্‌সে পড়ে শুড়ি খানায়
বেলা না যেতে আমি লাও করব খালি।

মেয়ে ছিল জনা-পাঁচেক, পুরুষ ছিল পনের জন।''—এই জনা পাঁচেক মেয়ে এবং পনেরো জন পুরুষই এই গল্পের মূল কাহিনী তৈরি করেছে। সমরেশ এই গল্পের কাহিনী তৈরিতে যথেষ্ট কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন গানকে। উপরি উক্ত গানটি থেকে মেয়েদের জীবনের তিনটি দিক পাওয়া যেতে পারে—

১) জীবিকার স্বরূপ
২) সংসারের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ
৩) নেশাখোর স্বামীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়া

নারী পুরুষের গান—প্রতিগানে একটা লড়াই লড়াই খেলা জমে উঠেছে গল্পে। সবুজ আর লাল শাড়ির গানের জবাব দেয় পুরুষরা গানেই। পৌঢ় ভোলা পুরুষের প্রতিনিধি হয়ে মেয়েদের গনের প্রতিপক্ষে যুক্তি সাজায়। আর এইভাবে সকালবেলাকার গঙ্গার ধার মেয়ে-পুরুষের মিলিত গলায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে;—'হাসি হুল্লোড়ের ঢেউ বয়ে যায়'। কাজ পাবার আশায় এরা আনন্দিত। কাহিনীর এই ভিতে এবং চরিত্রগুলির মানসিকতার এই স্তরে সমরেশ একটি নিসর্গের ছবি আঁকেন,—যা প্রতীকী। তুলে আনা যাক লেখকের বর্ণনা—'সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। এঁঠা-পড়া গলা ও লাল জলে লেগেছে বৈশাখী রোদের ধার। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা চকচক করে রোদে। ভাঁটার জল নেমে পলি পড়েছে ধারে ধারে'।

দুটি বিষয় লেখক বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। একদিকে সূর্য ওঠা—জলে সূর্যের রঙ মিশে যাওয়া। আর বৈশাখী রোদের সেই ছোঁওয়ায় ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথাগুলির উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। বর্ণনার অন্য একটি দিক হল নদীতে ভাঁটা পড়া; কাদা মিশ্রিত গলা জল আর পলি পড়ে পড়ে নদীর জল তলানিতে এসে ঠেকা। নিসর্গের এই দুটি মাত্রার মধ্যেই প্রতীকায়িত হয়ে রয়েছে কামিন এবং পুরুষগুলির জীবন যাপনের ইতিহাস। সাহিত্যে যে প্রথাসিদ্ধ প্রতীক (Conventional Symbol) বা জনগোষ্ঠী গ্রাহ্য প্রতীক (Public Symbol) ব্যবহার করা হয়, সূর্যোদয় তার অন্যতম। সকাল বেলার সূর্যোদয় বরাবরই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সফলতার প্রতীক হয়ে এসেছে। গল্পে সমরেশ সূর্যোদয়কে ঐ একই প্রতীকে ব্যবহার করেছেন। গল্পের দিন মজুর চরিত্রগুলি প্রতিদিন দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না। বাঁধা কাজ তাদের নেই। কবে কাজ পাবে, নির্দিষ্ট করে তারা জানে না। কাজ পেলে তার খেতে পাবে। আজকে তেমনই একটা দিন—নৌকা ঘাটে এলেই সেই শুভ মুহূর্তের সূচনা। কাজ পাওয়ার আনন্দে তারা তাই আন্দোলিত, উচ্ছ্বসিত। সকালবেলার বৈশাখী রোদ সেই ব্যঞ্জনাই নিয়ে আসে। 'ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা চকচক করে রোদে'—এই বাক্যটির ব্যঞ্জনা আরও সুদূরপ্রসারী। এখানে ঢেউগুলি শুধু আক্ষরিক অর্থে জলের ছোট ছোট আন্দোলন নয়, এই নাম না জানা মানুষগুলি যেন এক-একটি ঢেউয়ের মতো, কাজের স্বপ্নে তাদের চোখ চকচক করে ওঠে। আবার ঢেউয়ের আঙ্গিককে লক্ষ করলে তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আর এক ট্রাজেডি। এই ছোট ছোট ঢেউগুলির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য নেই। শরীর আছে, কিন্তু শক্তি নেই। সামান্য আন্দোলন আছে, কিন্তু স্থিরতা নেই। এঘাট ওঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে মিলিয়ে যাওয়াই তাদের ভবিতব্য। এই মানুষগুলোকেই কি পেয়ে যাই না ঢেউয়ের এই বৈশিষ্ট্যে! জীবনের কোনো বাঁধা স্বচ্ছলতার ঘাটে এই মানুষগুলি কোনোদিনই নোঙর ফেলে স্থির হতে পারে নি। জীবনের ওঘাট এঘাট ছুঁয়েছে তারা—কিন্তু সে স্পর্শ এতই নগণ্য, যা কোনো জলছাপও রেখে যায় না। আর শীর্ণ শরীর ও মন নিয়ে সংগ্রামের ভাবনা ও শক্তি তাদের নেই। মানুষগুলির জীবনের এই ট্রাজেডি নিসর্গের দ্বিতীয় মাত্রাটিতে ধরা পড়ে। খিদের জ্বালায় ভাঁটার কর্দমাক্ত জলের মতোই তাদের জীবন। স্বচ্ছলতার স্বচ্ছ জল কোনোদিনই তারা পান করতে পারে নি।

এইসব দিনমজুর বেশিরভাগ দিনই কাজ পায় না। কাজ না পাওয়া দিনগুলি তাদের কাছে অভিশাপের মতো। অস্থায়ী অনিশ্চিত কাজ আর স্থায়ী নিশ্চিত খিদের দ্বন্দ্বকে খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন লেখক।—'এ ছন্নছাড়া আয়ের মতো জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশী হোক কেন বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা আছে পেট। তবে এ জীবনে পেটটাকেও গোঁজামিল দিতে শিখেছে ওরা। খরও নেই, বারও নেই জীবনের রঙ্গ অঙ্গ সবটাই এখানে। এখানটায় ফাঁক গেলে সব আঁধার। আঁধারের সব কুরূপ না ওৎ পেতে আছে ওদের চারধারে। তাই হাতে যেদিন কাজ থাকে, সেদিন মূর্তিমান আনন্দ। বন্ধনহীন মন, তোলপাড় হৃদয়, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ নয়, যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ আশ।'—আজ তেমনই একটি দিন, যেদিন তাদের কাজ পাবার আশা রয়েছে। তাই সকালবেলায় নদীর ধারে গানের মজলিস বসিয়েছে তারা। গানের বিষয় হয়েছে কখনো 'গোরা সাহেবের ঝি'-র কড়া

মেজাজের কথা, আর কখনো কাজে মনোযোগ দেওয়ার কথা। মদনের গানের সুরের টান ধরে এরপর অবশ্য গেয়ে ওঠে না মেয়েরা। গল্প ঘুরে যায় প্রাকৃতিক দৃশ্যে। গল্পের নামকরণের দিকে লক্ষ রাখলে বোঝা যায় নদীতে জোয়ার আসা বা ভাঁটা লাগা—এ গল্পের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গল্প শুরু হয়েছিল ভাঁটার টানে। অবশেষে ভাঁটা সরিয়ে জোয়ারের জল এসে পড়ে গঙ্গার বুকে। এই জোয়ারের জলে ভেসে আসবে নৌকা—তাদের কাজের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে কামিনরা এবং তাদের পুরুষসঙ্গীরা আবার মেতে ওঠে গান-প্রতিগানে। এরই মাঝে লেখক কর্মের ভিত্তিতে চরিত্রগুলির পর্যায়গত কয়েকটি বিভাজন দেখিয়েছেন। বিভাজনটিকে একটি রেখাচিত্রে সাজানো যেতে পারে। বিভাজনটি এরকম—

আড়তের বাবু

↓

ট্রাক ড্রাইভার কানাই

↓

আড়তের বাঁধা কুলি

↓

কামিন ও তাদের পুরুষসঙ্গী,
যাদের স্থায়ী কাজ নেই

চরিত্রগুলির এই বিভাজনের মূল ভিত্তিই হল অর্থ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কামিন এবং তাদের পুরুষ সঙ্গীদের। কাজ ও অর্থ সেই মারাত্মক অস্ত্র যা সমশ্রেণির মানুষের মধ্যেও বিভাজন ঘটায়। কামিন ও সঙ্গী পুরুষদের চীৎকার ও হৈ হৈ করে গানের প্রেক্ষিতে আড়তের বাঁধা কুলির মন্তব্য তারই প্রমাণ। সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে সমরেশ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই—এই শ্রেণির মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রণ পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। সমরেশের বর্ণনা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—"আড়তের বাঁধা কুলিটা বসেছিল দরজার কাছে, বেগড়ানো মুখে। সে কুলি বটে, কিন্তু বাঁধা কাজের মানুষ। সেই আভিজাত্য বোধেই দিনমজুরগুলোর কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে বসেছে। বাবুর গালাগালটা শুনে সেও ঠোঁট উল্টে বলল, 'শালা লুচ্চা লাফাঙ্গার দল'। আর আড়তবাবুর কাছে এরা তো মানুষের পর্যায়েই পড়ে না। আড়তবাবুর চোখে এরা 'জানোয়ারের দল'।

কাহিনীর শুরুতে এই কামিন ও দিন মজুরদের নাম ছিল না। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে আমরা তাদের কারুর কারুর নাম জানতে পারি। কাহিনীর মাঝামাঝি পর্যায়ে সবুজ শাড়ির শ্যামা আর লাল শাড়ি একযোগে যে গান গায়, তাতে ফুটে বেরিয়েছে তাদের জীবন যন্ত্রণার কথা। জীবনের চরম দারিদ্র, স্বামীদের কর্মহীনতা তাদের পিষে ফেলছে। পুরুষরা গানের কথা ভুলে গিয়ে যন্ত্রণায় অবশ হয়ে যায় যেন। গানের বদলে তাদের কারুর গলা থেকে বেরিয়ে আসে—'আমরা বেইমান'। এই যন্ত্রণা, এই হতাশা, এই দারিদ্র্য তাদের প্রায় প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। কোনো কোনো দিন কাজের স্বপ্নে তারা উদ্দীপিত হয়। রঙহীন মনগুলোতে মুহূর্তের জন্য গুন্‌গুন্‌ করে ওঠে সুর। বিবশ হৃদয় ক্ষণিকের জন্যে হলেও হৃদয়ের কথা বলে। স্বপ্নের এই প্রেক্ষাপটে তেমনই এক ছবি ধরা পড়ে লাল শাড়ি আর

কৈলাসেব মধ্যে। অবশ্য চূড়ান্ত ক্ষুধা এই সমস্ত সুব তোলা স্বপ্নগুলিকে মুহূর্তেব মধ্যে শুষে নেয। তাই কৈলাসেব গানেব বেশ ধবে শ্যামা ও লালশাড়ি যে গান গায, তা চূড়ান্ত কঙ্কালসাব বাস্তবেব কথা বলে। প্রথমে উদ্ধৃত কবা যাক গানটিকে—

'কৈলাসেব গানেব বেশ শেষ হবাব আগেই ফুঁপিযে কান্নাব ভঙ্গীতে দ্রুত তালে আবাব গেযে উঠল, শ্যামা ও লাল শাড়ি,

বাবু সাহেব গো, পেট ভবেনি,
কাজ কবিযে প'সা দেও, ক্ষুধা মবেনি।
দেখ আমাব শুকনো বুক ছাযেব তোষ মেটেনি,
বযস কালেব শবীলে মোব বং লাগেনি।'

—এই গানটিই যেন এই গল্পেব কেন্দ্রবিন্দু। এই মানুষগুলিব জীবনেব ধ্রুবসত্যটি এই গানেব মধ্যেই ধবা পডেছে। চূড়ান্ত দাবিদ্র্য তাদেব চাবপাশেব যা কিছু সুন্দিব—সবকিছু বাক্ষসেব মতো গিলে নিযেছে। গল্পে এব পবে একটি প্রতীক চিত্র নির্মাণ কবেন সমবেশ। চিত্রটি এবকম—'বৈশাখেব খব হাওযায সে গানেব সুব ভেসে যায মাঠ ভেঙে শহবে গাঁযে গঙ্গাব ছল্‌ছল্‌ তালে ঢেউযেব পব ঢেউযে এপাব ওপাব। এ-গানেবই সুব তালে দোলে আডতেব ন্যাডা আব দূবেব কৃষ্ণচূডা গাছ, দোলে মাথা আকাশেব'। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্ষুধাব বাজ্যে গদ্যময। নিবন্ন মানুষেব হাহাকাব যেন পৃথিবী জুডে। মানুষগুলিব চোখে শূন্য দৃষ্টি। ক্ষুধাব থাবায মানুষগুলি যেন আব মানুষ নেই। গল্পেব বর্ণনাগুলি এবপব সামগ্রিকভাবে ব্যঞ্জনাময হযে ওঠে। গল্পেব শেষ দিকে একটা নাটকীয ঘটনা আছে। কাজ না পাওযাব আশঙ্কায এই মানুষগুলি নিজেদেব মধ্যেই মনুষ্যেতব জীবেব মতো মাবামাবি কবতে শুরু কবে। সেই ঘটনাব চূড়ান্ত মুহূর্তে যাওযাব আগে সমবেশ অত্যন্ত কৌশলে সচেতন শব্দ ব্যবহাবেব মধ্যে থেকে ব্যঞ্জনাব দ্যুতি আনাব চেষ্টা কবেন গল্পে। আব সে চেষ্টা একেবাবেই সার্থক। এবাব লক্ষ কবা যাক, যে মানুষগুলি গান এবং কাজেব স্বপ্নে বিভোব হযে ছিল এতক্ষণ, সমবেশ কিভাবে বদলে দিচ্ছেন তাদেব অবযবগুলি। তুলে আনা যাক এমন কিছু বর্ণনা—

(১) 'নেংটি-পবা খালি গা বং-বেবং-এব মানুষগুলো শূন্য দৃষ্টিতে বসে থাকে চুপচাপ। দূব থেকে দেখে মনে হয যেন স্তূপাকাব কবা হযেছে কতকগুলো বেঢপ মাল।'

(২) 'গোববেব ভাঙ্গাচোবা মুখটা কালো, মাটিব ড্যালাব মত ধসধসে হযে ওঠে।'

(৩) ''কাজ নেই।' যেন বাঘা কুত্তাব মত গব্‌গব কবে ওঠে গোবব, অস্থিব হযে ওঠে হঠাৎ।''

(৪) 'এখন আব মানুষগুলো বং-বেবং নয, গঙ্গাব পাডে যেন কতকগুলো কালো কালো শকুন বসে আছে।'

শুধু মানুষগুলিব পবিবর্তন নয, এদেব চাবপাশেব প্রকৃতি-পবিবেশেব ছবিগুলিও ধীবে ধীবে বদলে যায। প্রকৃতিব কযেকটি ছবিকে সাজিযে নেওযা যাক নিচে—

(১) 'এব মধ্যেই সূর্য কখন লাটিমেব মত পাক খেযে উঠে এসেছে মাথাব উপবে। তেতে উঠেছে ছডানো বালি আব টালিভাঙা টুকবো।'

(২) 'কাজ নেই। ...... বৈশাখী সূর্য জ্বলে গন্‌গন্ ক'রে মাথার উপর। আগুন গলে গলে পড়ে গায়ে, মুখে। গা জ্বলে, ঘাম ঝরে ঝল্‌সে যাওয়া রসালির মত।'

(৩) 'ন্যাড়া গাছগুলো যেন মরাকাঠের খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে চাওয়া যায় না। যেন ঝলসানো আগুন। ঘোমটা-টানা খোঁপার কৃষ্ণচূড়া শুকিয়ে বিবর্ণ। যেন কামিনদের মুখ।

(৪) 'সূর্য চলে গেছে, ছুটির ভোঁ বেজে গেছে চটকলগুলোতে। কলরব ক'রে ফিরে চলেছে খেয়া নৌকায়, ছুটি পাওয়া মানুষেরা। ফিরে চলেছে স্টীমলঞ্চ গাধাবোটকে খালাস দিয়ে। লঞ্চের ছাদে, পশ্চিম মুখে বসে নামাজ পড়ে সারেঙ সাহেব। ভাঁটা পড়েছে, জল নেমেছে, আবার পড়েছে পলি।'

প্রকৃতির এই পরিবর্তন প্রতীকী। মধ্য গগনের আগুন উগরে দেওয়া বৈশাখী সূর্য, উত্তপ্ত বালি, রোদে পুড়ে যাওয়া গাছের সবুজ-শূন্যতা—এই সব বর্ণনার মধ্যে প্রাকৃতিক সত্যতা যেমন রয়েছে, পাশাপাশি তেমনই প্রতীকায়িত হয়েছে মানুষগুলির মানসিক পরিবর্তনের রূপরেখাটি। বর্তমান আলোচনায় চরিত্রগুলির পরিবর্তনের মাত্রাগুলি বোঝাতে যে বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার সঙ্গে প্রকৃতির এই বর্ণনাগুলি মিলিয়ে পড়লেই সামগ্রিক পরিবর্তনের রূপটি ধরা পড়বে পাঠকের চোখে। পাশাপাশি স্পষ্ট হবে লেখকের সংহত কৌশলী অভিপ্রায়ও। কাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ের স্থির স্বপ্নময় আবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে অস্থির দুঃস্বপ্নের ভয়াবহতার দিকে। আর এই ভয়াবহ পরিবর্তনকে ঘটিয়ে তোলার জন্য বার বার সমরেশ আগুনের চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। আগুনের এখানে বিভিন্ন বিভঙ্গ। মনের-পেটের-পরিবেশের আগুনে এই মানুষগুলি দাউদাউ করে পুড়ে যায়। পুড়তে পুড়তে মানুষগুলি রূপান্তরিত হয় যেন কালো কালো শকুনে। আগুনের চিত্রকল্পটি ছাড়াও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে অন্য একটি বিষয়ও—সূর্য ডুবে গেছে আর ভাঁটা পড়েছে নদীতে। কাজ পাওয়ার আশা যে নিঃশেষ হয়ে গেছে তারই প্রতীকী ব্যঞ্জনা রয়েছে এই অংশে। যখনই মানুষগুলি বোঝে সারাদিনের স্বপ্ন বৃথা, অপেক্ষা অর্থহীন, আজকে অন্যজায়গায় কাজ পাওয়াও অসম্ভব—আর নিজেদের ঠিক রাখতে পারে না। সামান্য কারণেই নিজেদের মধ্যে মারমারি শুরু করে দেয়। মানুষগুলি তখন আর মানুষ নেই যেন। সমরেশের বর্ণনায় অসাধারণত্ব পেয়েছে এই অংশটি—'চকিতে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর মারামারি শুরু করে দিয়েছে। কে কাকে মারছে, তার ঠিক নেই। সবগুলোতে মিলে একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছে মানুষের। শোনা যাচ্ছে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন, চীৎকার, কান্না।

একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে ধসিয়ে ফেলছে দুনিয়াটাকে। মাটি কাঁপছে থর্‌থর্ করে। ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ফেঁড়ে ফেলবে আকাশটাকে। কেউ উলঙ্গ হয়ে গেছে, কয়েকজনের পায়ের তলায় পড়ে গেছে কেউ। .... কেন এই মারামারি, তারা নিজেরাই যেন জানে না।' —এই প্রেক্ষাপটে গল্প নাটকীয় মোড় নেয়, খবর আসে তাদের বহু প্রতীক্ষিত 'লাও আসছে'। মুহূর্তে যেন জাদুমন্ত্রে থেমে গেল সমস্ত লড়াই। আবার তারা পরস্পরের বন্ধু-সাথী। আর তখন 'পুবে উঠেছে আধখানা চাঁদ; তার আলোয় ঝিলমিল করছে ভাঁটার জল.

গল্পে পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের ব্যবহারও সুন্দর করেছেন লেখক। সকালের সূর্য পূর্ব

আকাশ নির্দেশ করছে—যার প্রেক্ষাপটে আশা, গান, আনন্দ আছে মানুষগুলির জীবনে। নৌকা আসার পরে পূর্ব আকাশে চাঁদের বর্ণনাও ঐ বিষয়কেই ব্যঞ্জিত করে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে আলোক উদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র নয়, আধখানা খণ্ডিত চাঁদ। পূর্ণ স্বচ্ছলতা—বাঁধা কাজ এদের জীবনে নেই। পাশাপাশি পশ্চিম আকাশ নিরাশা ও শূন্যতার প্রতীক হিসেবে এসেছে। এই মানুষগুলি জীবিকাহীনতায় অপমানুষ হয়ে ওঠে,—সমাজই দায়ী তার জন্য। সামান্য কর্ম প্রাপ্তিই আবার মানুষে রূপান্তরিত করে তাদের। মানুষের সম্পর্ক পূর্ণতা পায় জীবিকার যথাযথ আশ্রয়ে এসে। জীবিকা না থাকলে প্রেমও নেই। গল্পের একেবারে শেষে কৈলাস আর লাল শাড়ির সম্পর্ক-মাধুর্যকে অবর্ণনাত্মকভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। এরা একটি দিন কাজ পেয়েছে—তাই হৃদয় দিয়েছে, তখন নদীতে জোয়ারের টান।

কর্মহীন, জীবিকাহীন অগ্নিশিখায় মানুষগুলি পুড়তে থাকে। অন্যদের পোড়ানোর মন্ত্র ও শিক্ষা তারা পায়নি। তবে পোড়ানোর ইচ্ছে যে নেই তা কিন্তু নয়। তার প্রমাণ রয়েছে কানাই, লরির ড্রাইভার ও গোবরের কথোপকথনে। উদ্ধৃত করা যাক প্রয়োজনীয় অংশকে—

> "বলে কানাই ড্রাইভারকে, 'ওস্তাদ, এখন যেন জীবনটা হয়েছে পোকাখেগো ছিঁটেবেড়া। জীবনভর হাতের চাকার মতো আমরা গড়িয়ে চলি, যেন তোমার মেশিন। চালালে চলি, তেল না দিলে কঁ্যাচ কঁ্যাচ করি।'
>
> কানাই তার নিজের অভিজ্ঞতায় চ্যাপ্টা মুখে হেসে বলে, 'বিগড়ে যাও।'
>
> 'বিগড়ে যাব?'
>
> 'হ্যাঁ। দেখ না, মেশিন বেগড়ালে তার পায়ের তলায় শু'য়ে তেল মাখি। তেমনি বিগড়ে যাও।'
>
> এক মুহূর্ত কানাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে গোবর, 'ঠিক শালা বিগড়ে যাব, আমরা বিগড়ে যাব।........'
>
> আড়তের বাবু জপের মালাটি কপালে ছুঁইয়ে ভরে রাখেন ক্যাশ বাক্সে।"

—এখানে হঠাৎ করে ঝলসে ওঠে যে বাক্যটি, তা হল—'ঠিক শালা বিগড়ে যাব, আমরা 'বিগড়ে যাব'। সমরেশের মতো একজন মার্কসবাদী ও সংগ্রামী লেখকের কলম থেকে এ বাক্য রচিত হলে তার অভিঘাত থাকে প্রচণ্ড—উদ্দেশ্যে থাকে ছোট বাঁধা বিপ্লব-স্বপ্ন। সে বিপ্লব সংগঠিত হলে পুঁজিবাদী-ক্যাশ বাক্স লুঠ হতে দেরি হবে না। মেরু-দাঁড়ায় ভয় ঢুকে যাবে পুঁজি-পুঞ্জিত আড়ত বাবুর। তখন জপের মালা ক্যাশ বাক্সে ছুঁইয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতে হবে। পেটের আগুনে যারা আজ পুড়ছে—নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, সেই আগুনেই তারা পোড়াবে। লড়াই করবে—কিন্তু নিজেদের মধ্যে নয়, আড়তদারের বিরুদ্ধে। শক্তিশালী লেখক তপ্ত ক্ষুধার বিধ্বস্ত বাঁজা মরুভূমির মধ্যে সযতন কৌশলে পুঁতে দেন একটি বীজ। সবুজ মহীরুহ হয়ে ওঠার জন্য তার পরিচর্যা করতে হবে—অপেক্ষা করতে হবে।

অকাল বসন্ত : তিনে এক একে তিন

প্রসূন মাঝি

লেখক সমরেশের খুব পরিচিতি কালকূট এবং সমরেশ বসু—এই দুই নামে স্বতন্ত্র। তবে ছোটগল্পকার সমরেশ যে ঔপন্যাসিক সমরেশের নীচে চাপা পড়ে যায়নি, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। তাঁর অনেক ছোটগল্পই রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোটগল্প এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে তিনি যে বিশেষ স্থানের অধিকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমরেশের কৃতিত্ব শুধুমাত্র বহুসংখ্যক ছোটগল্পের জনাই নয়; বিষয় বৈচিত্র্য এবং কথনভঙ্গির বিশেষত্বের জন্যেও বটে।

বহু উল্লেখযোগ্য গল্পের স্রষ্টা সমরেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো—"অকাল বসন্ত"। বসন্ত অথচ তা অকালে বা অসময়ে এসেছে; এমন একটা নামকরণই যেন পাঠককে উন্মুখ করে তোলে। গল্পটি শুরুই হয়েছে শরতের শুরুতে মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মধ্যে সুখের অনুভূতি ও দুঃখের যন্ত্রণার মতো লুকোচুরি খেলা দিয়ে। আবার লেখক এও বলেছেন—"তার কালো মুখের ছায়া টুকরো টুকরো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে আকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়েছে সেই মেঘের গায়ে। হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লাল ছোপ ধরে গেছে সেই মেঘে।" এই রকম বর্ণনার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি এই গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র ভারী ট্রাকের ড্রাইভার অভয়পদ শেষ পর্যন্ত একটা ঠাঁই খুঁজে পায়। এই ঠাঁই পাওয়ার বিষয়ে তাকে সাহায্য করে প্রৌঢ় ভেলো অর্থাৎ ভোলারাম, যে এখানকার স্থানীয় লোক।

অনেক অলিগলি পেরিয়ে ভেলো ও অভয়পদ এমন একটি রুদ্ধশ্বাস কানাগলির মধ্যে ঢুকলো যেখানে তাদের গলির লোকগুলি সবাই একবার করে দেখে নিচ্ছে। ভাবখানা এমন যেন কোন আপদ এসে আবার জুটল এই পাড়ায়। অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানি খাকির জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যান্ট। মাথায় চাষাদের টোকার মতো দীর্ঘবেড় টুপি। সাথের জিনিসপত্র বলতে হাতে একটা টিনের সুটকেস ও ছোট বিছানার বাণ্ডিল। অভয়ের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ লেগে থাকলে তাকে খানিকটা সহজবোধ্য মনে হয়, নয়তো দুর্বোধ্য।

হঠাৎ রাস্তার সামনেই একটি চালাঘর যেন ঠেলে এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। তারই পাশ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্য রকম একটা খোলা জায়গায় সে পড়বে, তা যেন অভয়পদ ভেবেই উঠতে পারেনি। সামনেই একটা মুচকুন্দ গাছ। "বড় বড় শালপাতার মতো অজস্র কালচে কালচে সবুজ পাতা আর ছাগলবাটি লতার বেষ্টনীতে ঝুপসি ঝাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে গাছটা।" পাশেই একটা পুকুরের জল কালো, গভীর কালো জল। গভীর ও নিস্তরঙ্গ। এই জলের বর্ণনাই যেন এর পরে গল্পে যা যা ঘটেছে তার একটা ব্যঞ্জনা পাঠকের সামনে তুলে ধরে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এলো অভয়পদ, তাদের এবং তার নিস্তরঙ্গ জীবনের গভীরতা বা ব্যাপ্তিতে অল্প সময়ের জন্য হলেও যে রোমাঞ্চিত করবে তা যেন গল্পকার এখানেই বলে দিয়েছেন।

বাড়িওয়ালির সঙ্গে যখন বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত আলোচনা চলছে তখন হঠাৎই ছিটবেড়ার আড়াল থেকে একটা মুখ বেরিয়ে এল। একটি মেয়ের মুখ। রংটা মাজা-মাজা, ফর্সা বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়, যদিও সিঁদুর নেই কপালে। এই হলো বিনি, বিবাহযোগ্য মেয়েটিকে দেখে অভয়পদ বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য নিজের বাড়ির কথা মনে পড়েছে, নিজের অবিবাহিতা বোনটির কথা। বাড়িয়ালি ভেলোর সম্পর্কের বৌঠানের তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে—নিমি, বিনি ও টুনি। তিন মেয়ের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিতা বৌঠানের চিন্তা, হতাশা, নিরুপায় অবস্থার কথা ঝরে পড়ে এইভাবে—"এই বুকে আর গলায় করে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারিনে, রাখতেও পারিনে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি যেদিন আমি থাকব না।"

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে এই বাড়িতে ফিরে আসে অভয়পদ, তখন এক অসহ্য ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়ে। ভারী ট্রাকের হুইলের কাঁপুনি গায়ে মাংসপেশীতে ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে, নাকের ভিতরে ভারি শ্লেষ্মার মতো ধুলো জমে যায়। কোনমতে বিছানা পেতে বিড়ি ধরিয়ে লম্ফটা নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ে। আর সেই সময় ঠিক এর বিপরীত চিত্র চুড়ির রিনিঠিনি। "পুকুরঘাটে শোনা যায় বাসন ধোয়ার আওয়াজ।" তিন বোনের গলা যেন একই রকম মনে হয় অভয়ের। কেউ বলে—"তাড়াতাড়ি কর, বড্ড ঘুম পেয়েছে।" কেউ বা বলে—"সেই মুখ পোড়া সাউটা সাত সকালেই মাল নিতে আসবে, বাকসের গায়ে তো এখনো লেবেল আঁটা হল না।" তিন বোনে পিচবোর্ডের বাক্স বানিয়ে সংসার চালায়, আর তাদের মায়ের ঘুটের পয়সা জমে, মেয়েদের বিয়ের জন্য—যা তিন বোনেরই হাসির উপাদান। অভয় অশরীরী সাক্ষীর মতো উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদের হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়ের ঘরে। এই আলো কি অভয়ের গুমোট জীবনেও একটুকরো আলোর ইশারা নয়? সেদিন রাতে ফেবার সময় কৃষ্ণকলির বনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অভয়। কে যেন কাঁদছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝতে পারে কান্না নয়, গান গাইছে। দুটি গলার মিলিত সুর; যা গায়িকা দু'জনের জীবনসত্য রূপেই যেন মনে হয়—

"বনের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুন কেউ না দেখে,
সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।"

দুই বোনের এই গানটির গভীরতা যে তাদের দু'জনের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা তীব্র যন্ত্রণার এক অনুভূতি, যা কুণ্ডলি পাকিযে গলার কাছে এসে আটকে থাকে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে থমকে দাঁড়ায় অভয়। সে শুনতে পায়—'না এখনো আসেনি।" আবার আর একজন বলে—'মাইরি, লোকটা যেন কী। আমাদের যেন ভয় পায়।" একথা শুনে অভয়ের গায়ে যেন আগুন লাগে। নিজেকে কিছু জিজ্ঞাসা করেও জবাব না পাওয়ায় বোকার মতো সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মুহূর্তের সংকোচ ও আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে তোলার জন্য যেন দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢোকে অভয়।

তিন বোনকে যেন মনে হয় তিন রকম—"নিমি যেন এক ছেলের মরা মা, বিনি মন গোমড়ানো বৌ, টুনি প্রেমিকা কিশোরী।" তিন বোনে গায়ে গায়ে পুকুরের জলে নামে। কচুরিপানাগুলি যেন কালনাগিনীর মতো ফণা তোলে, দোলে। চেষ্টা করেও সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না অভয়। জানলা থেকে সরে আসবে আসবে করেও আসতে পারে না। হঠাও দীর্ঘশ্বাসে চমকে ওঠে অভয়। পেছনে দেখে বুড়ি মা। ফিসফিস করে মা বলে—"বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে, গলায় ধড়ফড় করে। কোথা, যাই কোথা। খালি তরাসে তরাসে মরি।"

কয়েকদিন পরে, বিকেলে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় অভয়। দেখে অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে খয়েরী রং-এর ধূমায়িত চা। ধীরে সুস্থে চায়ের গেলাসটি নিয়ে চুমুক দেয়। "মনে হলো গেলাসটা সাগ্রহে চুমুকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সংশয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখে।" চায়ের ঢোকের উষ্ণতাতে যেন বুকের মধ্যে একটা দরজা খুলে যায়। চায়ের গেলাসটা দিয়ে আসার জন্যই অভয়ের পাঁচিলের ওপারে যাওয়া। যেন সমস্ত বাধা, জড়তার আগল ঠেলে এগিয়ে চলা। এই ভাঙা বাড়ির বুকে মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসি বোধ হয় এই প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়। হঠাৎ টুনি বলে ওঠে, "আমরা তো শঙ্করী। নিজের না জুটলে কে আমাদের ডাকবে?" বিয়ে হবে না কখনো—এই বোধ তিন বোনকেই গ্রাস করেছিল। কথাটা শুনে অভয়ের যেন জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে, বুকে পাথর চাপা। এ বিশ্বসংসারে সবার গলা চেপে রেখেছে যেন কোন অদৃশ্য দানব। বুকের মধ্যে এত গুলতানি, মুখ দিয়ে ফোটে না।

নিমি খেতে দিয়ে অভয়ের সর্বাঙ্গ আঁতিপাতি করে দেখে। তার চোখে মমতা, ঠোঁটের কোণে বেদনার হাসি। অভয় বলে—"কী দেখছ?" নিমি বলে—"দেখছি তোমাকে। জাত মারলুম মিস্তিরি, তবু তোমার শরীরটা ভালো করে তুলতে পারছি না।" নিমি অভয়কে গোরাচাঁদ করে তুলতে চায়। আর সেই গোরাচাঁদের পায়ে সব কিছুই ফেলে দেবে নিমি। ভাবতে ভাবতে নিমির বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার করে। নারীহৃদয়ের চিরন্তন ইচ্ছাটাই যেন নিমির মধ্যে ভালো লাগার আবেশ হয়ে ঝরে পড়ে। বিনি টুনির অভয়ের প্রতি অনুভূতি অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। তারা কেউই জানে না তাদের কি হয়েছে। চারজনে যেন আকণ্ঠ ডুবে আছে। নতুন গড়া এক ভরা সংসারের তারা যেন চারজন মানুষ। টুনি গুন-গুন করে ওঠে—

আর রইতে নারি হয়ে নারী,
তোমার বাঁশি শুনে গো।
আর চলতে নারি হয়ে নারী
এ কি বিষম দায় গো।"

বিনিও তাতে গলা মেলায়। আর নিমি বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অভয়কে তারা তিন জনে তিন রকমে টানে।

হঠাৎই একদিন অসময়ে অভয়ের বুটের শব্দ পাওয়া যায়। তিন বোন ছুটে এসে দেখে দরজায় হেলান দেওয়া অভয় যেন ভেঙে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অভয়ের ট্রান্সফার হয়ে যায়

পানাগড় ডিপোতে। একথা বলার আগে তার মনে হয়—"সব যায় যাক, তবু পারব না ছেড়ে যেতে, পারব না এমনি করে ভাসিয়ে দিতে।" তিন-বোনের চোখেই যেন নেমে আসে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না যেন থমকে রয়েছে তাদের চোখে। অভয়কে চলে যেতেই হয়, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ যতই হোক না কেন! বুড়ি মা দেয়ালের নোনা ইটে মুখ চেপে যতই কাঁদুক যেতে তাকে হবেই।

গল্পটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের যামিনীকে পূর্বে একজন কথা দিয়ে ফিরে আসে নি। এখানে কিন্তু তা নয়। তিনটি বিবাহযোগ্যা মেয়ের মা অভয়ের মধ্যে যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেতে চেয়েছিল। আশির দশকে লেখা এই গল্পের চরিত্র অভয় সেই অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে না। কারণ বাড়িতে তার মা, ভাই-বোনের শুকনো বুভুক্ষু মুখ। হঠাৎ এক স্বপ্ন, ভালো লাগার অনুভূতি, অবলম্বন—সবকিছু মিলে যে ইমারত গড়ে ওঠে, তা ভেঙে পড়ে। সে সময়ে সমরেশ গল্পটি লিখেছেন, সেই সময়ও তাকে সে অনুমতি দেয় না। দেয় না মিলনান্তক পরিণতির অনুমতি।

ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে ছ'টি চরিত্রকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে এই গল্পের ঘটনাধারা। মূলত চারটি চরিত্র বিনি-অভয়-টুনি-নিমি-কে নিয়েই চলেছে এই গল্পের ঘটনাপ্রবাহ। সুতীক্ষ্ণ পরিণামমুখী গল্পটির যেখানে যবনিকাপাত ঘটেছে, সেখানে পাঠকের মনের মধ্যে থেকে যায় অজস্র প্রশ্ন। গল্পটিকে একটি সার্থক ছোটগল্প হিসেবে স্বীকার করে নিতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। কারণ ছোটগল্পের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই 'অকাল বসন্ত' গল্পে ফুটে উঠেছে। আবার ইঙ্গিতময় নামকরণটিও গল্পের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যেন খাপে খাপে এঁটে যায়। তাই 'অকাল বসন্ত' গল্পটিকে সার্থকনামা একটি ছোটগল্প বলা যেতেই পারে। শীতের রুক্ষতার পরে আসে বসন্তের সুন্দরতর প্রকাশ। গল্পেও তা দেখা যায়। অভয় সেই বসন্ত হয়েই যেন এসেছে, তিনটি বোনের শীতের রুক্ষ জীবনে। আবার বসন্ত চলে গেলে আসে গ্রীষ্মের দাবদাহের তীব্র জ্বালা। সে জ্বালাও ধরিয়ে দিয়ে গেছে অভয়ের হঠাৎ ট্রান্সফার। তাই নামকরণটিও যে সমরেশ বসুর সুচিন্তিত চিন্তাভাবনার ফসল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিকল কাটার ছল : মধ্যবিত্ত এবং স্ববিরোধিতা

উত্তম বিশ্বাস

গল্প রচনায় সমরেশ বসুর আবির্ভাব ১৯৪৬ সালে 'আদাব' গল্পটি রচনার মধ্য দিয়ে। এই প্রথম গল্পটিই সমরেশ বসুর জাত চিনিয়ে দিয়েছিল। সমরেশ বসু যখন গল্প রচনায় প্রবেশ করেন তখন একদিকে রবীন্দ্রনাথ (যদিও রবীন্দ্রনাথের তখন মহাপ্রয়াণ ঘটে গেছে) অন্যদিবে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রভাব গগনচুম্বী। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বভাব-শিল্পী; তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত নয় তাঁর সাহিত্য, দু'চোখে দেখা জগতের সত্যরূপকে প্রতিষ্ঠা করতেই তিনি বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন মার্কসবাদে বিশ্বাসী; এই মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষের খুব কাছে ভিড়তে পেরেছিলেন; সর্বোপরি তিনি ছিলেন আন্দোলনকারী, শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলন করে রাজবন্দীও হয়েছেন। আর এই জীবন অভিজ্ঞতাই তাকে মহান শিল্পী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আর এগুলির সত্যরূপ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে; তবে তাঁর কথা সাহিত্যে মূলত যে বিচিত্রমুখীনতাগুলি আমরা পাই সেগুলিই হল—গ্রামীণ শ্রমিক সমাজ; পেটি বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয়; মধ্যবিত্তের আশ্রয় হীনতা, অস্থিরতা, ক্রোধ-প্রেমের অন্বেষণ, ব্যক্তির মূল্য সন্ধান, নিঃসঙ্গ মানুষের একক সংগ্রাম। আমাদের আলোচ্য 'শিকল কাটার ছল' গল্পটি এই বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত মধ্যবিত্তের জীবন জিজ্ঞাসারই অন্তর্ভুক্ত। এখন সেই আলোচনাতেই আমরা মনোনিবেশ করব।

গল্পটির শুরু আর শেষের মধ্যে একটি বিশেষ সাযুজ্য আছে। শুরু আর শেষের বাক্যক্রমই তার প্রমাণ স্বরূপ। শুরুর বাক্যটি হল—'ও যেন ঠিক আমারই মতো'। শেষের বাক্যটি হল—'আমরা এক, অভিন্ন।' শুরুর বাক্যটিতে একটি সন্দেহ বাচক শব্দ 'যেন' উপস্থিত ছিল, কিন্তু শেষ বাক্যে সেই ভ্রমের উৎখাত ঘটেছে। অর্থাৎ গল্পটির গঠন কৌশলে cyclical ব্যাপ্তি আছে; সুতরাং ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ' এই বক্তব্যের চাইতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন' এই সংজ্ঞাটিই গল্পটির বিশেষ দিককে উন্মোচিত করেছে। কারণ এই একটি মেয়ের (খুকু) মধ্যদিয়েই গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা তথা সেই সমাজের মেয়েদের ভূমিকা ও অধিকারে যে ন্যূনতম সিদ্ধান্ত উপস্থাপনের সাহস পর্যন্ত এখনো নেই বা তৈরী হয়নি, সেটি প্রতিফলিত ও প্রকাশ করাই লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গল্পের নামকরণ পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনটি মাত্র শব্দের বন্ধনীতে নামকরণটি গড়ে উঠেছে—'শিকল কাটার ছল'। এই নামকরণের সঙ্গে মূল গল্পের ওতপ্রোত সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্কের বেড়াজাল তৈরি হয়েছে সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে, যেটি গল্পটিরও প্রেক্ষাপট। এবং, এই প্রেক্ষাপট যাকে নিয়ে আবর্তন করেছে সেই খুকু কিন্তু ঘেরওয়ের বাইরে বেরুতে পারেনি।

গল্পের প্রধান চরিত্রই গল্পের কথক। উত্তম পুরুষের জবানীতে সমগ্র গল্পটি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সমগ্র গল্পটিতে আশ্রয় করে আছে একটি টিয়া পাখি, এবং

যেহেতু গল্পটি কথকই পরিণতি দান করেছে তাই আমরা লক্ষ করি খুকু কখনও পাখিটির সাথে খুনসুটির মাধ্যমে বা আত্মকথনে তার অন্তর্লীন কথনকে প্রকাশ করেছে। যুবতী মেয়ে খুকু, পাখিটি তাকে ডাকে 'কো কো' বলে। জীবন ও যৌবনের চিরন্তন টানেই সে ভালোবেসেছে দাদারই বন্ধু বিভাসকে। তার মনের ইচ্ছা এই বিভাস মিত্রকেই সে বিয়ে করবে কিন্তু যুবতী খুকুর বিয়ের ব্যাপারে তার নিজেরও যে একটি স্বাধীন বক্তব্য আছে সেই বিষয়ে কারো মাথাব্যথা নেই এবং কখনো মাথাব্যথা হয়ওনি; খুকুর সেই মানসিক ট্রাজিক অনেতিহাসের ইতিহাসই সমরেশ বসু এই গল্পটিতে তুলে ধরেছেন। যে মেয়েটি নিজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে অন্তর্নিহিত জাগরূক সত্তাকে নিষ্পেষিত করেছে শুধু সমাজ, বাবা ও মায়ের কথা ভেবে। অথচ মেয়েটির জন্য তাঁরা তড়িঘড়ি একটি স্বচ্ছল পরিবারে একটি প্রতিষ্ঠিত ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে আশীর্বাদও করে ফেলেছেন যে কিনা—'কোন অফিসে চাকরি করে কেরানির। শিগগিরই নাকি বড়বাবু হবে তার ডিপার্টমেন্টের'। কিন্তু এতটুকু ধৈর্য তাঁরা ধরতে পারলেন না খুকুর মনের কথা ভেবে। লক্ষণীয় গল্পের মধ্যে কিন্তু সেই রকম কোন হা হুতাশও নেই যে বিভাস মিত্র চাকরিটা এমন সময়ে পেল যখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। আসলে এই ট্রাজিক পরিণতির জন্য খুকুর পরিবার কোন রকমই চিন্তা বা দুশ্চিন্তায় ছিল না! সর্বোপরি বিষয়টি 'গায়ে না মাখার' একটা ভান তাঁদের ছিল। এই ভান থেকেই গল্পটির আসল স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকেনি, তবু ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় এবং উত্তরকালে বাঙালি মধ্যবিত্তের যে ধারণা আমরা পাই তা হল উচ্চ ও নিম্নবিত্তের মধ্যবর্তী স্তরের জনসাধারণকেই মধ্যবিত্ত বলে ধরা হয়। কিন্তু সেই মধ্যবিত্তের নানা ধরনের সামাজিক অবস্থান আছে; বর্তমান গল্পের পরিবারটি মফস্বল-বাসী একান্নবর্তী [একান্নবর্তী শব্দটি গল্পে উল্লেখ নেই তবে বাবা, কাকা একত্র বাস এমন] মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। এই ধরনের পরিবারতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—এঁদের সাধ ও সাধ্যে সামঞ্জস্য বিধান খুবই দুরভিসন্ধি প্রক্রিয়া এঁরা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে জানে, স্বপ্নপূরণের প্রক্রিয়াকে রপ্ত করতে পারে না। এঁরা পুরোপুরি বাস্তববাদীও নয়, আবার পুরোপুরি ভাববাদীও নয়। স্বপ্ন আছে স্বপ্নের প্রক্রিয়া নেই। এঁরা বিত্তহীনও নয়, আবার বিত্তবানও নয়। স্বাভাবিকভাবেই মাঝখানে পড়ে কোন দিকেই পদচালনা করতে পারে না খানিকটা আধুনিক গানের কলির সঙ্গে মেলানো যেতে পারে—'আমি ডানদিকে রই না/আমি বামদিকে রইনা/আমি মধ্যিখানে রই/পরান জলাঞ্জলি দিয়া।' সুতরাং মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বহুমুখী দুশ্চিন্তা ক্রিয়া করে মন ও মনের বৈশিষ্ট্য সঞ্চালনে এঁরা দুর্বল হতে বাধ্য, কারণ এঁদেরকে জীবনের সমস্ত দিক বজায় রাখার মতো বুদ্ধি প্রতিনিয়ত জোগাতে হয়; মানুষের জীবনে সম্ভ্রমের বা এর বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল যা যা সমস্ত কিছুই মধ্যবিত্ত মানসলোকে বিরাজ করে। অন্য দুই বিত্তকে এতবেশি জটিল প্রক্রিয়ার জীবন যাপন পুরোপুরি অতিবাহন করতে হয় না। আখেরে উচ্চ এবং নীচ এই দুই শ্রেণি অনেক বেশি দুশ্চিন্তা মুক্ত। তাই সমস্যা এই মধ্যবিত্তকে নিয়ে। সমাজের যা কিছু সমস্যা, পরিবর্তন বা করণীয় তার

সমস্তই যেন আবর্তিত হয় এই মধ্যবিত্তদের ঘিরে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বা উত্তরকালে মধ্যবিত্তের অবস্থানও যেন এমনই এক ঘুণ ধরা মাটির ফাটলে জর্জরিত। সেই 'চেনা মহলের অচেনা দিকেই' যেন গল্পকার সমরেশ বসুর দৃষ্টি খুব সূক্ষ্ম ভাবেই ঢুকে গেছে এই গল্পটির মধ্য দিয়ে।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার কেন দেওয়া হবে না এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন বিধাতার কাছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে তার যেমন পরিবর্তন ঘটেনি, এখনও এই একবিংশ শতকে কতটা হয়েছে তাও প্রশ্নবহুল। এরজন্য দায়ী কে? বেশির ভাগ সময়ই ভুয়োযুক্তি ও কৌশলে মেয়েদের উপর দোষ চাপান হয়, কিন্তু প্রগতির চাকা কি কখনো আটকে রাখা যায়? প্রতিনিয়ত যাদেরকে হাজারো সমস্যার বেড়িতে আটকে রাখা হয় তা এই পুরুষ শাসনেরই দৌলতে। আধুনিক কবি—কবিতা সিংহের 'আমি সেই মেয়েটি' কবিতায় জন্ম থেকে সমাজে নারীর অবস্থান ঠিক কি—সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

'আমি সেই মেয়েটি—
যে জন্ম থেকেই বিবাহের জন্য বলি প্রদত্ত।
যার বাইরের চেহারা
চোখ, নাক, মুখ, ত্বক, চুল, রং নিয়েই দর কষাকষি—
কালো না ফর্সা, খাঁদা না টিকালো, লম্বা না বেঁটে কুঁতকুঁতে না টানাটানা
যার মাথার বাইরের টা নিয়েই সকলের ভাবনা
মাথার ভিতরটা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই।'

আলোচ্য গল্পের গড়নটিও এর ব্যতিক্রম নয়। টিয়া পাখির সঙ্গে আত্মকথনে খুকু বলে উঠেছে—''আমার পাশেও কঠিন লোহার খাঁচা ঘিরে রয়েছে বাবা, মা, কাকা, দাদা, ভাই বোন, সমাজ, সংসার, আমাদের বাড়ি, আমাদের মন সব মিলিয়ে সেই অদেখা খাঁচাটি বড় কঠিন নিশ্ছিদ্র, নিটুট নিষ্ঠুর। ঐ খাঁচার ঘেরাওয়ে আমাদের এই মফস্বল শহরের কলেজে আমাকে আই এ পাশ করানো হয়েছে। শিক্ষার অধিকারে আমি কলেজে পড়িনি। সংসারের মাঝে দাঁড়াবার জন্য শিক্ষার শক্তি নয়। 'শিক্ষিতা পাত্রী' হিসেবে আমাদের পারিবারিক মর্যাদার জন্য আমাকে পড়ানো হয়েছে। আমি যাদের বউ হব, তারা বলবে, 'লেখাপড়া জানা বউ।' আমাকে পড়ানো হয়েছে, নইলে মেয়ে মূর্খ হয়ে থাকবে। কিন্তু তা বলে মেয়েকে লাভের অধিকার দেওয়া হবে, তা যেন আদপেই না মনে করি। আমাকে পড়ানো হয়েছে, নইলে দুষ্টু সরস্বতী ঘাড়ে চাপে যদি?'' খুকু অনুভব করে ফেলে কন্যা সন্তান সে! ধীরে ধীরে বাইশটি বছরও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এখন তার সামনে নতুন পাঠক্রম! আগের চাইতে জীবনের বেড়িটাও যেন সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বাড়িতে সে এখন গলার কাঁটা। গল্পে আছে—'প্রতিরবিবারে স্কুলমাস্টার, কেরানী, ব্যবসায়ী, ওভারশিয়ার নানরকম পাত্রেরা আনাগোনা করছে, আসে খাবার খায়, আমাকে গিয়ে সেজে বসতে হয়। তারপর সেই একই কথা। নাম কি? বাবর নাম কি? কদ্দুর পড়াশুনা হয়েছে? হাতের লেখা দেখি। গান বাজনা জানা আছে? যেন ওরা এক সঙ্গেই ইন্দ্রের বউ শচী, আর সভাতলের উর্বশীকে চায়।

ভগবান। ওদের কি মরণ হয় না? এই সমস্ত ভাবনার পরেও খুকু তাদেরকে পুরো দোষ চাপিয়ে দেয় না। নিজের পরিবারের প্রতিও যুক্তি সঙ্গত আঙুল সে তুলে ধরে—'হবে কি করে? ওরা কি ইচ্ছে করে আসে? বাবা কাকারা ওদের ডেকে নিয়ে আসে, তাই আসে।'' খুকু যে বিভাস মিত্রকে ভালোবাসে সে খবর বাড়ির কেউ জানে না এমনটি নয়—জেনেও তাদের কোন হেলদোল নেই। হেলদোল না থাকবারই কথা কারণ তারা এই 'একটু আধটু' বিষয়কে গুরুত্ব দেয় না। আর গুরুত্বই বা দেবে কেন? অনাদি মিত্রের ছেলে বিভাস মিত্র যে এখনো কোন চাকরি করে না, স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেনি, সবচেয়ে বড় কথা জাতিতে ভিন্ন, অন্যদিকে খুকু কৈলাস ভট্টাচার্যের মেয়ে তার একটা সামাজিক মর্যাদা থাকলেও মানসিক মর্যাদা নেই। সুতরাং মিত্র ও ভট্টাচার্যের প্রেম মিলনেও পরিণত হতে পরে না। সমাজের এক অলৌকিক বেড়াজাল! এই বেড়া ভাঙার জন্য চাই মনের প্রসারতা, যুক্তির বৈধতা—এদুটির কোনটিই খুকু জন্মসূত্রে লাভ করেনি। ফলে ওরকম একটু আধটু বিষয়ের গলাধঃকরণ তারা কখনো করবে না, তারা বিষয়টি নিয়ে তোলপাড়ও করবে না ভালোয় ভালোয় নিজের কাজটি সেরে হাত গুটিয়ে নেবে। 'গলার কাঁটা, বেশি ঘাঁটিয়ে খুঁচিয়ে লাভ কি? দুটি শুকনো ভাত আলতো করে গিলে ফেললেই যদি রেহাই পাওয়া যায়, তবে তাই হোক।' মধ্যবিত্তের এই জোড়াতালি দেওয়া জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার শুভ চেতনা তাই নির্ভর করছে 'অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'-এর অপেক্ষায় থেকে।

গল্পটির নাম যদি 'শিকল কাটার ছল'-ই হয় তবে প্রশ্ন ওঠে শিকল কাকে আটকে রেখেছে? কেন আটকে রেখেছে? তার প্রথম উত্তর হ'ল সমাজ এবং সমাজের সামগ্রিক মানুষের মন এবং মননকে, একটু বাড়িয়ে বল্‌লে মানসত্তাকে। দ্বিতীয় উত্তরটি হ'ল প্রাচীন ঐতিহ্য যুক্তিহীন বদ্ধমূল ধারণায় আবদ্ধ থাকার জন্য। এখানে গোয়ার্তুমি আছে কিন্তু মনের প্রসারণশীলতা নেই। যে কোন ধরনের সামাজিক মানসিকতা গড়ে ওঠে তার অর্থনৈতিক এবং সূক্ষ্ম নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের আধারে, এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের ফসল নয়, সামগ্রিক মানুষের সুচিন্তিত বুদ্ধিবলেই এই রকম সমাজায়ন সম্ভব হয়। খুব সূক্ষ্ম ভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে অনুভব করব, গল্পে খুকু যে বিভাস মিত্রকে ভালোবেসেছিল তার মধ্যে কোন খাদ ছিল কি? যে টিয়া পাখিটির মধ্যে সে বিভাসদার সমস্ত কিছু লক্ষ্য করত পাখিটিকে বিভাস মিত্রের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হ'ত, এছাড়া পাখি এবং বিভাস মিত্রের অলক্ষ্যে সে বিভাস মিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত ধারণা পোষণ করত তার মধ্যে কি কোন ছল ছিল? বিভাস মিত্রের ভালোবাসার মধ্যেও কোন ছল ছিল না। প্রশ্ন উঠতে পারে এদেব ভালোবাসা ততটা গাঢ় ছিল না। কিংবা আরো বলা যেতে পারে খুকু বা বিভাস মিত্র এরা দুজনেই সমাজ ও পরিবারের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের ঝড়ও তুলতে পারেনি, তাই তাদের শেষ পরিণতি বিচ্ছেদেই পর্যবসিত হ'ল। কিন্তু গল্পের মূল সমস্যাটা এখানে নয়। গল্পের মূল সমস্যাটা লেখক সুন্দর শিল্পসুষমায় পরিব্যাপ্ত করেছেন। তবু ছোট্ট করে একটা প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে—সমাজের বেড়িটা দেখানোই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে প্রত্যেককে সুযোগ দিয়েও দেখানো যেতে পারত না কি? খুকুকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার পরিবার যখন উঠে পড়ে লেগেছে একটা ভালো ছেলের জন্য চাকরিওয়ালা ছেলের জন্য,

তখন কিন্তু বিভাস মিত্র বেকার, সুতরাং বিভাস মিত্রের পাত্র হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায় তার কোন কর্মস্থল নেই বলে। খুকুর যখন বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেছে তখন অপ্রত্যাশিত ভাবেই বিভাস মিত্রের চাকরির খবরটাই চাউর হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল বিভাস মিত্র যদি আশীর্বাদের আগে চাকরিটা পেত তবে খুকুর পরিবার কি করত, বা তাদের বিয়ে হ'ত কিনা সে প্রশ্নটা উঠে আসত, কিন্তু এই সুযোগটা গাল্পিক দিতে পারেন না তাহলে গল্পের মূল রসটা ক্ষুণ্ণ হয়; সর্বোচ্চ সমস্যা সৃষ্টিকারী জায়গাটি দেখানো সম্ভব হয় না। আর কোন অবস্থান থেকেই প্রশ্ন তোলা হোক না কেন তবে তার দায়ভার বর্তাত পাত্র-পাত্রীর উপর, নতুবা তাদের অধিকারকে চাপা দিতে হয় সম্ভ্রমের পর্দায়; সম্ভ্রমের বইরে তারা কোন রকম সমাজ বহির্ভূত কর্মে মনোনিবেশ করতে পারবে না এবং গল্পে সেটাই ঘটেছে। যদিও বিভাস মিত্র সামান্যতম প্রশ্ন তুলেছিল খুকুর কাছে—যে কাকে কাকে বলতে হবে বাবা, দাদা, কাকা। খুকু সভয়ে বলেছিল 'কাউকে না'। যে এক সময়ে বলেছিল—'আমি পারব। আমি তো পাখি নই।' সেও তখন স্ববিরোধী যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বিছানায় গিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়েছে। এই কান্নার অন্তর্নিহিত অর্থ খুকুর মা অনুধাবন করেননি; করার চেষ্টাটিও করেননি, তিনি চিরাচরিত মাতৃরীতির কথা—'মেয়েরা কি বাপের ঘরে চিরকালই থাকে?' বলে সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু খুকুর মনকি সেই বাক্য শুনতে প্রস্তুত? মানসিক অন্তদ্বন্দ্বে শ্বশুরের দেওয়া মডার্ন ডিজাইনের হার তার কাছে সোনার শিকল বলে মনে হয়েছে। কারণ তার মনের ভাবনাটাকে পরিবারের কেউ-ই প্রাধান্য দেয়নি। গায়ে না মাখার ভান করে মুখের কথা শুনতে পর্যন্ত চায়নি। বিভাসদাকে নিয়ে তার যে প্রতিনিয়ত ভাবনা, প্রেমের খেলা, সেই স্বপ্নময় জীবন তার পূর্ণতা পেল না! অন্য দিকে নিজেও বেড়ি ভাঙার মতো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারল না। আসলে আমরা প্রতিনিয়ত জীবনের ভাঙা-গড়া দেখে দেখে এমন ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠি যে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া আমাদের মনকে কখনে সায় দেয় না; সেখানে যে পাহাড় প্রমাণ বেড়িটা আছে সেখানে উপস্থিত—'বাবা, মা, কাকা, দাদা, ভাই, বোন, সমাজ সংসার আমাদের মন'। পরিবারের মান সম্মান, জাতিকুল বজায় রেখে দিয়েই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এগিয়ে যায় ফলত আন্তমৌল চাহিদারও নিবৃত্তি দিতে হয়। এযেন এক রানওয়ের বাঁধাধরা গণ্ডি, সেই গণ্ডি থেকে বাইরে বেরুলেই জীবন বাজেয়াপ্ত। আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার যে সম্পর্ক সেখানে আত্মপ্রত্যয় এবং অপরাজিত যত্নই প্রধান কথা। এই আত্মপ্রত্যয় এবং অপরাজিত যত্নের খোলসকে শেষ করে দিতে পারে একমাত্র স্ববিরোধিতা। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্ববিরোধ-ই প্রতিবাদী কণ্ঠের কাছে প্রধান অন্তরায়। আর এই অন্তরায়ই খুকুর মনোভাবকে তথা প্রেমকে মন্দীভূত করে দিয়েছে এবং এই মন্দন সূত্র সে লাভ করেছে জন্মসূত্রেই। এর থেকেও মুক্তি সম্ভব যদি নিজের হাতে কাটা খালে জীবনটাকে প্রবাহিত করা যায়। কিন্তু খুকু চলেছে চিরাচরিত সমাজের হাতে কাটাখালে ফলে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয়; স্বাভাবিক ভাবেই নিজের এই ব্যর্থতার মধ্যে অভিযোজিত জীবন যাপনকেই বড় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের দুই পাখি কবিতায় আমরা লক্ষ্য করেছি খাঁচার পাখি বনের পাখিকে বলেছে—'হায়মোর শক্তি নাহি উড়িবার' এই গল্পেও গল্পের মনোভাবের রূপদানকারী পাখিকে খুকু যখন বীত রাগ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল

তখন পাখিটি উড়ে গিয়ে প্রকৃতির দলে মিশতে পারেনি। পুনরায় লোহার খাঁচায় ঢুকে গেছে; তার প্রতিনিয়ত জীবনযাপন ঐ লোহার খাঁচাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে, প্রকৃতির বুকে পাখা মেলার মতো শক্তি ও মুক্তির স্বাদ তার উধাও হয়েছে। লেখক তাই বলেছেন—'মুক্তিটাকে চিনতে পারে না।' এবং একথাও সত্যি বন্ধনীতে কেউ আবদ্ধ থাকতে চায় না, আবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে চায় কিন্তু প্রবৃত্তি যখন নিশ্চেতন হয়ে শিকল কেটে বেরুতে চায় তখন সময় থাকে না। অসময়, দুঃসময় একই সাথে হাজির হয়। মন তখন প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চায়। সেই প্রতিবাদের মধ্যে একটা না-পারাজনিত ছল কাজ করে যা শেষে আত্মদহনে পর্যবসিত হয়। এই আত্মদহন মুক্তির জন্যই, আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। সমরেশ বসু তাই নজরুলের 'দেশাত্মবোধক' কবিতা 'শিকল পরার গান' গানকে উল্লেখ করে শিকল কাটারই ছলকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় 'ছল' শব্দটির জন্য; আবার ছল কেন থাকবে?

আসলে শিকল পরার মধ্য দিয়েই একদিন শিকল বিকল ঘটবে এই আশাতেই গল্পের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবী

(জন্ম : ১৯২৬)

মহাশ্বেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে। ১৯৪৬ সালে ইংরেজি অনার্স পাশ করেন বিশ্বভারতী থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে এম. এ. পাশ করেন ইংরেজি সাহিত্যে। পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন, রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়-এ শিক্ষকতা করেছিলেন। অধ্যাপনা করেছেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে।

১৯৩৯ সালে 'রং মশাল' পত্রিকায় মহাশ্বেতার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'নটী' (১৯৫৭)। প্রচুর গল্প উপন্যাস লিখেছেন মহাশ্বেতা দেবী এখনো লিখছেন এবং বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করেছেন বিভিন্ন পত্রিকায়—'যুগান্তর', 'বসুমতী', 'আজকাল', 'বর্তমান', 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি', 'বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড', 'সানডে', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'নিউ রিপাবলিক', 'যোজনা', প্রভৃতি। ১৯৩৯ সাল থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বর্তিকা' সম্পাদনা করছেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—'অরণ্যের অধিকার', 'হাজার চুরাশির মা', 'ঝাঁসির রানী', 'নটী', 'সুভাগা বসন্ত'। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি 'সাঁঝ সকালের মা', 'জাতুধান', 'কি বসন্তে কি শরতে' (গল্পগ্রন্থ), 'সপ্তপর্ণী' (গল্প সংকলন)। ১৯৩৯-তে আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

জাতুধান : অন্নময় ভুবনের স্বপ্ন বিভোর

শিবানী ভট্টাচার্য

অবহেলিত, বঞ্চিত এই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলোর কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা প্রথমে মানুষের প্রাথমিক এবং প্রয়োজনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটি হলো খিদে। এই খিদের জ্বালায় এরা বারবার জর্জরিত হয়েছে। 'জাতুধান' এরকমই একটি গল্প। খিদে এবং খাবার জন্য অফুরান আগ্রহ মহাশ্বেতার অনেক গল্পেরই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। 'জন্মতিথি', 'বাণ', 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি গল্পের পটভূমিও এই খাবার অন্বেষণের ব্যাকুলতাতে আবর্তিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নাগরিক জীবনের অংশীদার হয়েও মহাশ্বেতা ভেবেছেন তাদের কথা যারা শহর থেকে অনেক দূরে বাস করেও শহুরে শোষণ থেকে মুক্তি পায় না। সমাজের সেই অবহেলিত মানুষরা মহাশ্বেতার লেখায় এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। আর তাদের মুখের ভাষা মহাশ্বেতার লেখায় ইন্ধন যুগিয়ে চলে। 'জাতুধান' গল্পে সাজুয়া তিওর সেভাবে না মরেও মৃতের ভূমিকা পালন করে নিজের শ্রাদ্ধের চাল সংগ্রহ করেছে তা সত্যিই চমক জাগায়। নিজের শ্রাদ্ধের জ্ঞাতিভোজের জন্য বরাদ্দ চাল নিয়ে সাজুয়া পালাতে চেয়েছে পরিচিত পরিধি থেকে। পাছে সে জীবিত আছে জানলে রামসিংজিকে সেই চাল ফেরত দিতে হয়। তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী' গল্পের সাথে এই গল্পের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। 'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তী নিজের ছেলের পিণ্ডির অন্ন গ্রহণ করেছে। এই খিদের জ্বালাতেই শনিচরীকে হতে হয়েছে রুদালী, পেট বাঁচাতে, নাতি হরোয়াকে বাঁচাতে বাঁচাতে শনিচরী পেশাদার কাঁদিয়ে হয়ে ওঠে। অথচ স্বামী কিংবা পুত্রের মৃত্যুতে শনিচরী কাঁদার অবকাশ পায়নি। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকতে হবে পেটের দায়কে তো অস্বীকার করা যাবে না। তাই ভিতরের কান্না বুকে চেপে বাইরের সাজানো কান্নায় শনিচরীকে হতে হয় রুদালী।

'জন্মতিথি' 'রাক্ষস' ইত্যাদি গল্পেও অন্নসংগ্রহের চেষ্টা অর্থাৎ পেটের চাহিদাটাই মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে। বড়লোকের বাড়ির সামনে উচ্ছিষ্টের জন্য অপেক্ষা করেও কুড়োন আর তার মা তা সংগ্রহ করতে পারে না। জন্মতিথির উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ পরিষ্কার করার জন্য গাড়ি আসে আর কুড়োন-এর মা ছেলেকে চাপাকল থেকে জল টিপে এনে খাওয়ায় খিদের জ্বালা মেটানোর জন্য। 'রাক্ষস' গল্পের ভবতারণবাবু অপরিমিত খেয়ে 'রাক্ষস' আখ্যা পান। আর এই প্রভূত খাবার রহস্যটি ফাঁক করতে গিয়ে তিনি জানান সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি খান। পুরো সংসারটি যে একমাত্র তার পেনসনের উপর ভরসা করেই চলে। তিনি খেয়ে না বাঁচলে পুরো সংসারটিই যে ভেসে যাবে।

খিদের কথা কত বিচিত্রভাবে, ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়েছে মহাশ্বেতার গল্পে তারই একটি উদাহরণ 'বাণ' গল্পটি। 'বাণ' গল্পের বালক চিনিবাস-এর মধ্যেও আমরা দেখতে পাই খিদের প্রবল আগ্রহ। ভাতের গন্ধ জাতুধানি এর মতো চিনিবাসকেও আকুল করে তোলে। এই

তাগিদেই সে বড় আচার্যির বাড়িতে রান্নাপুজোর দিন মনসাগাছ এনে দেবার প্রস্তাব দেয়। অথচ বাগদীদের ছেলে চিনিবাসের প্রতি বড় আচার্যির পত্নীর প্রবল বিরাগ। কেননা চিনিবাস এর জন্মের সাথে যে জড়িয়ে রয়েছে বড় আচার্যির সংযোগ। একথা চিনিবাসের জানার নয়, চিনিবাস যেটা জানে সেটা হল ওদের রান্নাঘরের খবর। চিনিবাসের নাকে রান্নাঘরের দোর দিয়ে গরম ভাতের গন্ধ ভেসে আসে। জাতুধানের মতো সে শুধু ভাত-ডালের জন্য লালায়িত নয়। চিনিবাসের লালসা আচার্যি বাড়ির দুধ দিয়ে রাঁধা সাদা ধপধপে লাউয়ের ঘন্টের জন্য, মুলো বড়ি নারকেলের ঘন্টে। ঘি চপচপে সম্বারের চারদিকে ম-ম করা গন্ধে চিনিবাসের খাবার প্রীতির আকুলতা আরও বাড়িয়ে দেয়। চিনিবাস বুড়ি দিদিমার কাছে বাণের গল্প শোনে। গল্পের একটি জায়গা তার বড় প্রিয়, যেখানে সে শুনতে পায় বাণের সময় চাল-ডাল-মুড়ি-বাতাসা দিয়ে যারা সাহায্য করেছিল তাদের কথা। তার কাছে এসব কথা রূপকথার চাইতেও আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। ভাবে—"বাণের সময় মানুষেরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, নইলে এমন কান্ড করবে কেন।" বড় আচার্যির বাড়িতে গৌরাঙ্গ আসবেন এবং তিনি আসলে সকলে আচার্যের বাড়িতে প্রসাদ পাবে। এতো যেমন তেমন বাণ নয়, গৌরাঙ্গ প্রেমের বাণ। চিনিবাসের মা রান্নাপুজোর আয়োজন করতে না পারলে কি হবে, গৌরাঙ্গ প্রেমের বাণে বামুন-বাগদীর ফারাক থাকবে না। চিড়ে মুড়ি ছাড়াও আরও অনেক কিছু জুটবে, এবং যেটা সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার সেটা হলো সকলে একসাথে প্রসাদ পাবে। কিন্তু চিনিবাসদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে গৌরাঙ্গ আসেন না। পেসাদ-এর বদলে আচার্যির অনুগত জনেরা মুড়ি বাতাসা বিলি করতে নামে। রাগে-ক্ষোভে চিনিবাস মাকে মেরে মুড়ি বাতাসা ফেলে পালিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত মাঠের ধারে অবসন্ন চিনিবাসকে খুঁজে পায় তার দিদিমা, বাড়ির দিকে যেতে যেতে চিনিবাস বলে—"গৌরাঙ্গের বানের চে' সে বাণ ভাল রে আয়ী! তেমন বান আর আসে না? সেই যে যেমন বাণে চিড়ে মুড়ি-চাল দেয় এত? দুক্কু ঘুচে যায়?"

অন্নময় ভুবন। আর এই অন্নময় ভুবনে বাস করেও চিনিবাসদের অন্নের জন্য কাঁদতে হয়। ফেরারি হতে হয় অন্নেরই হাহাকার নিয়ে সাজুয়াকে। বেঁচে থেকেও মৃতের মিছিলে যোগ দিতে হয়। ভাগীরথীর কূলে অবস্থিত একটি জায়গা বেলেটি। সাজুয়া তিওর এই বেলেটিরই বাসিন্দা। জায়গাটি গ্রাম ও শহরের মাঝামাঝি পরিবেশে থিতু হয়ে থাকে। তিওররা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত এবং অতি অবশ্যই এই অবহেলিত শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য দারিদ্র্য তাদের জীবন জুড়ে থাকে। যখন যেরকম সম্ভব সেভাবেই এরা জীবিকার সন্ধান করে। জীবিকা যাই হোক না কেন অন্ন জোগাড় করার তাগিদটাই এদের কাছে বড়। এদের নেতা মাতং, বৃদ্ধ মাতং নানাভাবে এদের অন্নের সংস্থান করার চেষ্টা করে। নেতৃত্বের দায় পালনটা ওর কাছে আবশ্যিক কর্ম। তাই মাতং এর উপর তিওর গোষ্ঠীর লোকেদের অগাধ বিশ্বাস। প্রতি বছর মাতং ওদের নিয়ে রাঢ় দেশে চলে যায় ধানচাষের জন্য। শীত পড়ার আগে আগে ধান কেটে নিজেদের পারিশ্রমিক হিসেবে অর্জিত ধান নৌকায় চাপিয়ে এরা ফিরে আসে। মাতং এর নজর সর্বদিকে। সাজুয়ার পেটের খোরাক যে অন্য পাঁচজনার চাইতে

আলাদা একথা মাতং ভালোভাবেই জানে। তাই মাতং চেষ্টা করে ওর জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে। পেটভাতায় সাজুয়ার কাজের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া মাতং এদের জন্য অন্য কাজও জুটিয়ে দেয়। অবিশ্বাস্য কম মজুরি ও পেটভাতায় কন্ট্রাক্টরদের পথ মেরামতি, জোগাল্ধি কাজ ও অন্যান্য কাজ করতে এদের আপত্তি নেই বলে মাতং এর পক্ষে এদের জন্য কাজ জোটাতে খুব একটা অসুবিধে নেই। রাম সিংজি বেলেটি গ্রামের একজন মাতব্বর। তার উপার্জনের রাস্তা একাধিক। প্রভাবশালী রামসিংজির জমিতে এই তিওররা বর্গাদার। যে জমিতে তারা বর্গাদার, জমিটি চরজমি। চরটি যদি একবছর জেগে থাকে তবে অন্যবছর ভাগীরথী তাকে ভাসিয়ে দেয়। উক্ত চরজমিটি তাই সবসময় চাষবাসের উপযোগী থাকে না। সাজুয়াদের মধ্যে তাই অন্নের তাগিদটা থেকেই যায়। এই রামসিংজির মা এক গোলায় ধান ওঠা অঘ্রানের দিনে মারা যায়। মাতৃশ্রাদ্ধের দিন রামসিংজি তিওর পাড়ার সকলকে পাত পেড়ে খাবার আমন্ত্রণ জানায়। এই অভাবিত সৌভাগ্যে তিওররা অবশ্যই অভিভূত হয়। মহাউৎসাহে তারা কাঠ কেটে আনে, কলাপাতা আনে, উঠোন পরিষ্কার করে এবং কি আশ্চর্য ভরা শীতও এসময় এদের কাবু করে না। উচ্চবর্ণের মানুষদের [illegible] বাঁচাতে এদের বাইরে বসে থাকতে হয়। যাহোক্ ভাত তো জুটবে। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা থাকলেও এদের জন্য বরাদ্দ চিরাচরিত ভাত, ডাল, কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। এতে অবশ্য ওদের কোনো অভিযোগ থাকে না। সাজুয়া এ দিয়েই ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল। সাজুয়ার খাওয়া দেখে অন্যেরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। পুরুত এসে সাজুয়াকে বলে—এ বেটা 'জাতুধান'। জাতুধান মানে যে রাক্ষস এটা সাজুয়ার জানা ছিল না। রামসিংজির মায়ের শ্রাদ্ধে সাজুয়া শুধু পেট ভরে খেতে পেল এমন নয়, একটা শিরোপাও জুটে গেলো তার। বেশ গালভরা নাম। রাক্ষস বললে যেমন সাদামাটা শোনায়, তেমন নয়।

জাতুধান শিরোপা জুটলে তো শুধু হবে না। পেটের অন্নও যে জোটাতে হবে। চাষহীন দিনে সাজুয়াকে তাই অন্নের সন্ধানে বাইরে বের হতে হয়। রামসিংজির কাছ থেকে ধার নিয়ে যতদিন চলে তো চলে, কিন্তু তারপর। এদিকে পেটের খোরাকটা বেশি হবার দরুন সাজুয়া বোঝে সে বেশিদিন ঘরে বসে থাকলে মা-বৌ এর ভাতে টান ধরবে। কেননা কম খেয়ে বেশিদিন-এর জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখাটা সাজুয়ার স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল। তাই মা-বৌ কে আশ্বস্ত করে পেটের টানে সাজুয়াকে বাইরে বের হতে হয়। বর্ষীয়ান মাতং ওদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তার বয়স হয়েছে, সুতরাং নিজেদের কাজের তত্ত্বতালাস এখন থেকেই ওদের করা উচিত।

সাজুয়ার ভাতের খিদে কোনোভাবেই মেটে না। পঞ্চাশের আকালের সব খিদে ওর পেটে। সজুয়ার মায়ের ভাষায়—'ও পেটে, মোরা ক্যানিং টাউনে, পঞ্চাশের আকাল হল। তা আকালের যত মানুষের খিদা ওর পেটে।' ঘর ছাড়তে সাজুয়ার যে কষ্ট হয়না তা নয়। বিশেষ করে বৌ এবং কোলের ছেলেটার জন্য ওর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু পেটের দায় যে বড় দায়। সাজুয়াকে তাই বাড়ি ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে হয়। সেবারে

রামসিংজি তাকে কাজ দেয়। গোয়াল তোলার কাজ। ভাগীরথীর পাড় ঘেঁষে রামসিংজির প্রথম পক্ষের গরু-মোষ নিয়ে তিনজন চাকরের অবস্থান। সাজুয়ার মাথায় কিন্তু এ প্রশ্ন জাগেনা কেন রামসিংজি গোয়াল তোলার কথা বলেছে। ভরপেট খেতে পাবে এই আনন্দেই ও আত্মহারা হয়। মাতং বোঝে নিশ্চয় বাণ ডাকবে। দুজনে মিলে রামসিংজির কাছে গেলে সে তাদের এই বলে আশ্বস্ত করে বাণ ডাকলেও তাদের কোনো ভয় নেই। ভয় শুধু যারা নাবালে আছে তাদের এবং যেহেতু বাথানটার অবস্থানও নাবালে তাই সেটা সরাতে হবে।

রামসিংজি সাজুয়াদের আশ্বস্ত করলেও ভাগীরথী কিন্তু তাদের আশ্বস্ত করে না। তাই নিঃশব্দে ডোমপাড়া জলে ভাসে। ফারাক্কা বাঁধকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডোমপাড়াকে ভাসাতে হয়। তারা এসে আশ্রয় নেয় রামসিংজির বাগানে। ডোমপাড়ার সর্বত্র জুড়ে শুধু জল আর জল। সাজুয়াদের উদ্দেশ্য করে রামসিংজি বলে—"বাইরে চালা বাঁধ।" হতাশাগ্রস্ত মাতং অনুযোগ জানায়—"বাবু। বাথান সরালে সদর হতে খবর পেয়ে। একবার বললে না, তাতে ডোম পাড়া ডুবল। চতুর রামসিংজির উত্তর—"বুঝি নাইরে বাপ"।

সাজুয়ারা চরে যেতে চায়। রামসিংজির সন্দেহ জাগে চর আছে কিনা, যেখানে তার সুপুষ্ট ধানের খেত। দ্বিধাগ্রস্ত রামসিংজি বলে—"নৌকায় যা। চিড়াগুড় লয়ে যা। জলের গতিক কে জানে? যদি আজ না ফিরা হয়।" সাজুয়ারা নৌকা নিয়ে ভেসে পড়ে এবং অতি আশ্চর্যের সঙ্গে তারা দেখে চরটি অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওরা প্রবল উৎসাহে খেতের আগাছা ওপড়ায়। জলের গতিক লক্ষ্য করার জন্য মাচান বাঁধে। অন্যরা চর দেখে ফিরে গেলেও সাজুয়া ফেরে না। পেট ভরে চিড়ে গুড় খেয়ে সে মাচানে উঠে শুয়ে পড়ে এবং সন্ধে নামতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে চর ভেসে যায়। সাজুয়া ভাবে সে বুঝিবা স্বপ্ন দেখছে। ভেসে যেতে যেতে সাজুয়ার ভীষণ কষ্ট হয় নিজের জন্য, কোনো সাধ যে পূর্ণ হলো না তার।

চর ভেসে যাবার খবরে তিওরদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সাজুয়ার জন্য অনেক খোঁজ খবর নেওয়া হয় কিন্তু তবুও তার সন্ধান মেলে না। শেষ পর্যন্ত একটা তথ্য জানা যায় নদী থেকে মাইল তিনেক আগে, একটা গলিত শবদেহ দেখা গেছে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে লোহার বালা। আর কোনো সন্দেহ থাকে না মাতংদের। এ সাজুয়া না হয়ে যায় না। সাজুয়ার মা আর্তনাদ করে, বৌ বুক চাপড়ে কাঁদে। সাজুয়ার মায়ের ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাওয়া দেখে মাতংএর মনে রামসিংজির প্রতি এক ভয়ানক ক্রোধ জন্ম নেয়। তিওররা মৃতের প্রতীক হিসেবে খড়ের পুতুল দাহ করে, রামসিংজির কাছে সাজুয়ার শ্রাদ্ধের জ্ঞাতিভোজনের জন্য চাল দাবি করে, নিরুপায় রামসিংজি চালের বস্তা দিলে তারা সাজুয়ার বাড়িতে চালের বস্তা নিয়ে রেখে দেয়। চালের বস্তার স্পর্শে সাজুয়ার মা এবং বৌ কেন যেন অন্নকাঙাল সাজুয়ার স্পর্শ অনুভব করে, অনেকদিন পরে মা বৌ একত্রে গভীর প্রশান্তিতে ঘুমায়। গভীর রাতে দরজায় করাঘাতের সাথে সাজুয়ার অস্পষ্ট গলার আওয়াজ পেয়ে তার মা ভাবে সাজু 'বুঝি প্রেত হয়ে এসেছে। পর মুহূর্তে মাতং এর গলা পেয়ে সজাগ হয়ে দরজা খোলে

এবং অতীব বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে মাতং এর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাজুয়া। বিশ্বাস করা কষ্টকর হলেও ঘটনাটি সত্য এবং সাজুয়ার বেঁচে আসার বৃত্তান্তও ব্যক্ত হয়। এদিকে মাতং যখন জ্ঞাতিভোজনের চালের বস্তা ফেরত দেবার কথা বলে তখন সাজুয়া মাতংকে বিনীত অনুরোধ জানায়, পরিবারের সবাইকে নিয়ে চালের বস্তা সহ সে ধামনা চলে যাবে। মাতং যেন সবাইকে বলে সাজুয়ার মা এবং বৌ কোথায় গেছে সে জানে না। মাতং শুধোয়, রামসিংজি শুধোলে কি বলবে।—সাজুয়া বলে—"কিছু বলবানা। বান শুকালে আবার চলে আসব। বলব জাতুধান আমি, তাতেই ভাগীরথী ফিরায়ে দিল।" সাজুয়া হেসে আবারও বলে "আয়ে এমন ছরাদ্দ হয় নাই। যার ছরাদ্দ সে এত ভাত খায়। কেউ এমন ছরাদ্দ দেখেছে?"

এদের প্রতি স্নেহমিশ্রিত অনুকম্পায় মাতং রাজি হয়ে যায় এসব তথ্য গোপন রাখতে। নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা মাথায় নিয়ে পালাতে থাকে জাতুধান। খিদের প্রবল তাগিদে সাজুয়া নিজেকে ভাগীরথীর চেয়েও শক্তিমান বোধ করে।

মহাশ্বেতার গল্পে আমরা দেখি দারিদ্র্যের কথা নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। অসহায় মানুষ কিভাবে খিদের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি বহন করেছে এসব গল্প। প্রধানত ব্রাত্য জীবনের রূপকার হলেও দারিদ্র্য মানুষকে কি নির্মম-উদাসীন করে তোলে এ সত্য ধ্বনিত হয়েছে মহাশ্বেতার কলমে।

সাঁঝ সকালের মা : স্বপ্নভঙ্গ ও সময়ের বিনির্মাণ

অনন্যা বড়ুয়া

For time flows oh, and if it did not it would be a poor look out, for those who have no golden tables to sit at. Methods wear out, Stimuli fail. New Problems loom up and demand new techniques. Reality alters; to represent it the means of represent it the means of representation must alter too.

—Bertolt Brecht.

ব্রেখটের এই উক্তি মহাশ্বেতা দেবীর প্রায় প্রত্যেকটি লেখনী সম্পর্কেই সর্বাংশে সত্য। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের আঙ্গিক বদলের রীতিটিকে সমীকৃত করে সামাজিক দায়কে নীরবে পালন করে চলেন এই জনপ্রিয় লেখিকা। মহাশ্বেতা দেবীর 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে স্বপ্নবয়ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক বেদনাময় ইতিহাসের উপস্থিতি। লেখিকার প্রায় প্রতিটি উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্তেবাসী জীবন বিশিষ্ট মাত্রা পেয়ে থাকে। সমাজের অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবহেলিত জনসাধারণের জীবনভাষ্য রচনাতে তাঁর লেখনী চিরকালই সোচ্চার। ঘুণধরা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে কোনদিনই তাঁর লেখনী আপোষ করেনি। আলোচ্য গল্পটির মধ্যে একদিকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাধি ও বিকারের চিত্রগুলিকে যেমন বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যদিকে তেমনি ফুটে উঠেছে আদিবাসী জীবনের অভিশাপকে বরণ করে নিয়ে জীবন অন্বেষণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। জীবন যাদের চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছে সেসব মানুষগুলির মর্মন্তুদ জীবন কাহিনীই তাঁর সাহিত্যে নিপুণভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবু জন্মপরিচয়ের গ্লানিকে মেনে নিয়েই মানুষগুলি উত্তরণের পথ খোঁজে। কারণ লেখিকা মনে করেন সামাজিক দায় পালনের দায়িত্বও লেখকের লেখনীকে প্রভাবিত করে। জীবনের রোমান্স তাই তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় না, জীবনবাস্তবতার নির্মম চিত্রণে তিনি লেখাকে সমৃদ্ধ করেন।

মহাশ্বেতার গল্পের একটি পরিচিত রীতি তিনি গল্পের পরিসমাপ্তি থেকে শুরু করেন। 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পটিতেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাধনের মা জটি ঠাকুরাণী পাখমারাদের মেয়ে হাসপাতালের বেডে শায়িতা। অশিক্ষিত, সংস্কারান্ধ জটির বিশ্বাস হাসপাতালে এলে কেউ বাঁচে না। একমাত্র পুত্র সাধনকে অনুরোধ করে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। তার ধারণা বড়লোকেরা মারা গেলে তাদের সামাজ দেওয়া হয় কিন্তু দরিদ্র মানুষের মৃত্যু ঘটলে তার আত্মাকে 'বুতলে' পুড়ে রাখে ডোম 'লাড়ী' ছিড়ে নেয়। এই বিভাজনের ধারণা জটির বঞ্চিত জীবন থেকেই লব্ধ। কারণ জটি জরাব্যাধের বংশধর, যাদের ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জরা বাণমারা করার ফলেই তাদের বর্তমান অবস্থা। স্থিতিলাভের আশায় ঘুরে বেড়িয়েও স্থিতি তাদের স্বপ্নই থেকে যায়। কিছু টোটকা ওষুধ বিক্রি করে, পাখি ধরেই তাদের দিন গুজরান চলে। পাখমারারা যৌথবদ্ধভাবেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় ভগবানকে বাণমারার অভিশাপ মাথায় পেতে নিয়ে। জটি এই সম্প্রদায়েরই মেয়ে। স্থিতিলাভের আশায় পিতামহীর নির্দেশ অমান্য করে উৎসবের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল। সেই স্বপ্ন তার হারিয়ে যায়। অভিশপ্ত জীবন তার পিছু

ছাড়ে না। উৎসবের মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান সাধনকে নিয়ে ফিরে যেতে চায় নিজের সম্প্রদায়ের কাছে। জটি বিভ্রান্ত হয়। এই বিভ্রান্তি থেকেই পরিত্রাণ পাবার জন্য জটি লাল কাপড় পরে ঠাকুরাণী হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। মরণাপন্ন জটি—

—মৃত্যু মুহূর্তে সাধনকে জানাতে চায় তার দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতার কথা। দশমাস পেটে ধরার পরও নিজের ছেলের কাছে সে শুধু "সাঁঝ সকালের মা"। দিনের এই বিশেষ সময়টুকুই তার একান্ত, ব্যক্তিগত। বাকী সময়টুকু সর্বসাধারণের। মৃত্যু মুহূর্তে তাই সব তুচ্ছ করে মাতৃ পরিচয়ের গভীর আলিঙ্গনে সে বদ্ধ হতে চায় কিন্তু তা তো হবার নয়। সে পথ রুদ্ধ করেছে সে নিজেই। নিজের রচনা করা পরিচয়ের গণ্ডীতেই জটি বদ্ধ হয়ে যায়। ঠাকুরাণী পরিচয়েই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

সমালোচক Robson তাঁর "The definition of Literature" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— "We are now in a period of crisis. Every man, who is acutely alive is acutely wrestling with his own soul." 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পটিতে সময়ের সংকট ও সংকটের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। "সাঁঝ-সকালের মা" এই শিরোনামে জটির মর্মন্তুদ জীবনকাহিনী আলোচিত হলেও মহাশ্বেতা এরই আধারে সমাজবাস্তবতার এক করুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এক অসহায়া, নিঃসম্বল নারীর কঠোর জীবনসংগ্রাম, শত প্রলোভনের হাত থেকে আত্মরক্ষা, উপায়ান্তর না দেখে ঠাকুরাণী হয়ে যাওয়া—এরই এক বাস্তব আলেখ্য রচনা করেছেন মহাশ্বেতা। এরই পাশাপাশি অঙ্কিত হয়েছে ছেলের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দেবার আনন্দস্মৃতি। ভাগ্যের হাতে দীর্ণ হতে হতে জটি একটু স্বস্তি পায় ঠাকুরাণী পরিচয়ে, সারাদিন ভিক্ষা করে সে গৃহস্থের বাড়ি থেকে শুধু এক পালি চালই সংগ্রহ করে। সন্ধেতে সেই চাল রান্না করে সাধনের মুখে ভাত তুলে দেয় কারণ ভাতের গন্ধ সাধনের ভাললাগে। সে কারণেই সাধনের কাছে তার মা 'চন্দ্র-সূর্য, সমগ্র জগৎসংসার।" সমাজের বলিষ্ঠ সমালোচক বলেই জীবনের সত্য ও বাস্তবতাকে মহাশ্বেতা জোরালো ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। কোনো কাব্যিক আড়ালের দ্বারস্থ হন না। জীবন যেখানে নির্মম ও সত্য সেখানে কি ছলনা চলে? সাধনের মুখে সবটুকু অন্ন তুলে দিতে দিতেই অনাহারে জটি অপুষ্টির শিকার হয়। এই ব্যাধির শিকার সমগ্র বাংলা। এর প্রতিকারের উপায় কারোর জানা নেই। এই জটিল অসুখের নিরাময় যে কার হাতে সে বিষয়ে সকলেই প্রশ্নাকুল। কারণ এ ব্যাধির কারণ সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি। মহাশ্বেতা জটির ব্যাধির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বৃহত্তর সমস্যার কেন্দ্রে জটিকে স্থাপন করেছেন। তাই ডাক্তার ব্যাধির নিরাময় করতে পারে না, শুধু জানায়, "এ দেব-রোগ সাধন, এর চিকিৎসা আমি জানি না"। সচেতন লেখিকা মহাশ্বেতা জানেন সমাজের এক বিরাট অংশ এ রোগের শিকার। তাই তিনি উল্লেখ করেন, "জটির রোগ বড় ছোঁয়াচে। আজও ভারতভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয়নি কোন, এ রোগের নাম অনাহার।" এর নিরাময়ের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে অসুস্থ সমাজদেহের পরিবর্তনের মাধ্যমে হাসপাতালের ডাক্তার সেকারণেই জটির অসুখ সঠিক নির্ণয় করতে পারলেও নিরাময়ের সন্ধান দিতে পারে না। মহাশ্বেতার গল্পকথনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক তিনি গল্পের শুরুতে একক সমস্যার ছবি আঁকতে আঁকতে পৌঁছে যান সার্বিক সমস্যার গভীরে। ফলে সমস্যাটির শিকড় সন্ধান অনিবার্য

হয়ে পড়ে। ব্যক্তিক সমস্যা রূপ নেয় সমষ্টির সমস্যায়। সমস্যাটি কার্যত বৃহত্তর রূপ নেয়। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে জটির সমস্যা তা হয়ে দাঁড়ায় দেশের সামগ্রিক সংকট। ফলে জটি গল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করে চলে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট না পেলে পরিণতিতে সাধনের প্রবৃত্তির পাশবিকতা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠত না। জটির জীবনকাহিনীর সূত্র ধরেই মহাশ্বেতা দেশের এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন।

সাঁঝে ও সকালে মা ডাক শুনেই জটিকে পরিতৃপ্ত থাকতে হয়। 'দিনমানে' সে হয়ে ওঠে ঠাকুরাণী। সাধনের কাছেও ঠাকুরাণী। সাধন প্রতীক্ষা করে থাকে মাতৃসঙ্গ পাবার। শিশুর মতো সরল, নির্বোধ সাধন জানে জগতে মা ছাড়া তার অন্য কোনো আশ্রয় নেই। জটির ভক্তসংখ্যা অগণন। জটির কাছে এসে তারা পাপ স্খালন করে যায়। পাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায় তাগা-তাবিজ সংগ্রহ করে। পাখমারাদের দলে থাকার কারণে এসব গুপ্তবিদ্যা কিছুটা জটির করায়ত্ত। জটির কাছে পাপের কথা বলে কিছুটা স্বস্তি পায় তারা। জটিও তাদের প্রবোধ দেয়। এমনই এক চরিত্র অনাদি ডাক্তার। প্রথমদিকে ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা না পেয়ে শেষপর্যন্ত খুন, জখম হওয়া মৃতদেহগুলিকে "ডেড অফ্ হার্ট ফেলিওর" লিখে ও কুমারী মেয়েদের মাতৃত্ব সম্ভাবনাকে নষ্ট করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খ্যাতি পেয়ে যায়। এসব পাপকাজের পরই ছুটে আসে জটি ঠাকুরানীর কাছে। জটি অনাদি ডাক্তারের জন্য সংগ্রহ করে রাখে পাখির নখ, হাড় ইত্যাদি। আশ্বাস দেয় এগুলি বালিশের তলায় রেখে শুলে পাপ লাগবে না। প্রতিশ্রুতিমতো অনাদি ডাক্তার প্রতিদিন চাল পাঠায় জটিকে। মহাশ্বেতা খুব সূক্ষ্মভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাব দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা যেমন উন্নত হয়েছে পাশাপাশি সহজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ডাক্তারদের অসদুপায় অবলম্বনের প্রতিও মহাশ্বেতা কটাক্ষপাত করেছেন। অনাদি বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থার দ্যোতক হিসাবেই প্রকটিত হয়েছে। যে প্রকৃত চিকিৎসকের ভূমিকা পালন না করে অন্ধকারময় জগতের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। আর এদেরই জন্য জটি ঠাকুরানীকে গোসাপের হাড়, মৃত কচিছেলের আঙ্গুল সংগ্রহ করে রাখতে হয়, বিনিময়ে জোটে এক পালি ধান, জটিল সময়েও অনাদি প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয় না। অনাদির পরামর্শেই সাধন ও বলরাম জটিকে সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। অনাদির নির্দেশেই জটিকে চন্দন কাঠে পোড়ানো হয়। জটির মৃত্যুতে অনাদি আশঙ্কিত হয়, কে তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবে? কিন্তু পরে নিষ্কৃতিও খুঁজে পায়। এরই সঙ্গে আসে বলরামের প্রসঙ্গ। বলরাম সাধনের সঙ্গী। দরিদ্র অবস্থা কাটিয়ে উঠে সে কিছুটা সুস্থিতি খুঁজে পায়। যাদবপুরের কলোনিতে তার বাড়ি ও রয়েছে তার নিজের রিক্সা। জটিকে যখন হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সেসময় ডাক্তার ও বলরামের কথোপকথন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সে ডাক্তারকে স্পষ্ট ভাষায় জানায় হাসপাতাল সর্বসাধারণের। ডাক্তারের কোনো অধিকার নেই জটিকে ফিরিয়ে দেবার। মহাশ্বেতার প্রায় প্রতিটি লেখায় সমাজমনস্ক এক লেখিকাকে খুঁজে পাওয়া যায়। বলরামেব মতো মানুষের মুখ থেকে তিনি অধিকার সচেতনতার স্পষ্টস্বর সঞ্চারিত করেন যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলরাম জানাতে পেরেছে "এ বাংলা বাপের নয়, দাপের।" মহাশ্বেতা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই অধিকারবোধকে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রসারিত কবতে চান।

অনিয়ম, দুর্নীতির প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি আলোচিত হযেছে সরকারী অফিসের

বর্তমান অব্যবস্থার কথা। "কামাই করলে সরকারী অফিসের চাকরি যায় না" তাই সরকারী অফিসের কর্মী সদানন্দ জটির মৃত্যুতে কামাই করে "হরিনাম সঙ্গে নিয়ে হরিপদে যাও হে" কীর্তন করতে করতে শবযাত্রায় সঙ্গী হয়েছে। হাসপাতালে সিট থাকলেও রোগীকে ফিরিয়ে দেবার প্রচলিত ধারা এসবকিছুই ধরা পড়েছে মহাশ্বেতার অপূর্ব লেখনীশৈলীতে। এসব চিত্র আসলে সামাজিক ব্যাধির মতো। জটির মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এই ব্যাধিগুলিকেই মহাশ্বেতা স্পষ্ট করতে চান। "সাঁঝ-সকালের মা" গল্পটিতে সমাজবাস্তবতার প্রত্যক্ষ রূপ যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি রয়েছে জটির মানবী থেকে ঠাকুরাণীতে উত্তরণের কাহিনী, সে কাহিনীতেও রয়ে গেছে এক কারুণ্যের স্পর্শ। জটি পাখমারা সম্প্রদায়ের রূপসী মেয়ে। পাখমারারা প্রাচীন জনজাতি। তারা পাখি মেরে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনই একদিন জঙ্গলে পাখি ধরতে এসে পাখমারাদের সুন্দরী মেয়ে জটির সঙ্গে দেখা হয় উৎসব কান্দোরীর। তাদের পেশা "আশচাজ্জা চিকনপাটি" বোনা জটি জালে পাখি ধরলে উৎসব সেই পাখিগুলো উড়িয়ে দিত। এভাবেই উৎসব ও জটি পরস্পরের মনের কাছাকাছি চলে আসে। উৎসব জটিকে স্বপ্ন দেখায় মাচায় ধানের তোল, উঠোনে শিশুর কলহাসি, জটির এ স্বপ্ন ভালো লাগে কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। ভগবানকে বাণমারার কারণে তারা চির অভিশপ্ত। সমাজ বিধানানুসারে তারা অন্য জাতের ছেলেকে বিবাহ করতে পারবে না। তাই প্রতি মুহূর্তে জটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়। জটির পিতামহীর কাছে ছুটে আসে সাধন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পিতামহীর চোখে সব ধরা পড়ে, হেসে জটিকে সাবধান করেন, নিয়ম-কানুনের নিষেধ অমান্য করেই জটি একদিন সাধনের হাত ধরে তার সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সংসার হয়, সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা ও উৎসবের দেখানো স্বপ্নে বিভোর হয়ে জটির দিন কেটে যায়, মাস ঘুরে বছর। এরই মাঝে আসে একমাত্র সন্তান সাধন কান্দোরী। পিতামহীর অভিশাপের কথা মনে রেখেই এত আনন্দের মধ্যেও জটি স্বস্তি পায় না। ডুম-ডুম আওয়াজ শুনলেই সচকিত হয়ে ওঠে, ঐ বুঝি তার সম্প্রদায়ের মানুষজন এল। উৎসব তাকে আশ্বস্ত করে কিন্তু জটি এক অজানা আশঙ্কায় প্রতিনিয়ত ভীত হয়ে থাকে। উৎসব তাকে বোঝায়, "মোদের জাত ফেলনা নয় জটি। মোরা পণ দিয়ে মেয়ে নিই, সমাজকে ভাতখাসী দিই"। তবুও উৎসব জটিকে বিয়ে করার পর থেকে উঁচু জাতে ওঠার স্বপ্নে মেতে ওঠে। অবমাননার শিকার হতে হতে উপেক্ষিত মানুষগুলির উত্তরণের চরম আকাঙক্ষার চিত্র মহাশ্বেতার কাহিনীর প্রাণস্পন্দন। এক পরিচয় থেকে অন্য পরিচয়ে যাত্রার মধ্যে রয়েছে তাঁর গল্পের বাঁক। তাঁর প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যেও এই বক্তব্যের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। সংবেদনশীল লেখিকা বলেই তাঁর রচনায় নতুনের শুভ সূচনা মূর্ত হয়ে ওঠে। উৎসব চিকনপাটি বোনা ছেড়ে কুলীর কাজ নেয়। মোট বয়ে উপার্জন তার ভালোই হয়। ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কুলীগ্যাংয়ের বস্তির সকলকে ভাত খাসি দেয়, রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠে চোলাই মদের বিষক্রিয়ায় উৎসব মারা যায়।

জটির মনে হয় পিতামহীর ছোড়া বাণের ফল ফলতে শুরু করেছে। পরদিন ছেলে কোলে করে তার সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানে প্রত্যক্ষ করে তার সম্প্রদায়ের মানুষদের অনস্তিত্ব। কেবলমাত্র অফিসের খাতায় সংরক্ষিত উপজাতি হিসাবে আজও তারা চিহ্নিত হয়ে আছে। ফলে জটি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। ভেবে পায় না

কার আশ্রয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাবে? ভাবতে ভাবতেই ট্রেনে উঠে বসে। ট্রেনেই পরিচয় ঘটে এক ব্যক্তির সঙ্গে, লোকটি ট্রেনে গান গায়। জটিকে আশ্রয় দিতে চায়। সমাজ অনভিজ্ঞ জটি লোকটির কথায় এসে উপস্থিত হয় তার ঘরে। বেশিদিন যায় না, এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই আশ্রয় ছাড়তে হয় জটিকে। জটি স্থির করে সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে নিত্য নিয়মিত পুলিশের আনাগোনা, সন্ন্যাসীর হয়রানি ও অসংখ্য পুরুষের প্রলোভনের চাপে পড়ে জটি লালচেলী ও ত্রিশূল হাতে নিয়ে ঠাকুরানী হয়ে যায়। উৎসব স্বপ্ন দেখতো জাতে ওঠার তাই সে পুরুষানুক্রমে চলে আসা ব্যবসা ছেড়ে কুলী হয়ে যায়। তার মনে হয় কান্দোরী; মান্দোরী শুনে লোকে ভাবে নীচু জাত তাই সে দাস পদবীতে উত্তরণ চায়। নিজের নামের পাশে দাস পদবী বসিয়ে একধরনের উচ্ছ্বাস অনুভব করে। ঠাকুরাণী হয়ে আজ জটি ভাবে উৎসবের কথা। জাতে ওঠার নেশায় বিভোর উৎসব নেই। পাখমারার মেয়ের জীবনে এ তো স্বপ্নই। সমাজবাস্তবতার নির্মম পেষণে এই পরিচয়ই জটিকে নিরাপত্তা দেয়, এই পরিচয়ের কারণেই দশ মাস পেটে ধরা ছেলে সাধনের কাছে তার অস্তিত্ব শুধু 'সাঁঝ সকালের মা' হয়েই থাকে। নিজের অতৃপ্ত মাতৃস্নেহকে সাঁঝ হলেই ছড়িয়ে দেয় সাধনের মধ্যে। সাধন তাই বলে, "মাথা আখব, মা বলে ডাকব, তা বাদে কত অঙ্গ করব মোরা। উয়ার দিনেমানে ভক্তজনা আছে। কিন্তু এতের বেলা আমি বিনা উয়ার ক্যাও নাই।' জটির আদরে সে বিহ্বল। সাধনও প্রতীক্ষা করে থাকে এই সময়টুকুর জন্য।

জটির মৃত্যু সাধনকে বিভ্রান্ত করে, সাধন ভাবতে পারে না তার অন্নের সংস্থান কিভাবে হবে? অনাদি ডাক্তারের কাছ থেকে এক পালি চালের সাহায্যে জটি সাধনের বিরাট পাকস্থলীকে পূর্ণ করতো। জটির চিকিৎসায় দেওয়া অনাদির কটি টাকায় সাধন খাবার খায়। কারণ মহাশ্বেতা উল্লেখ করেন সাধনের বড় রোগ খিদে। জটি মারা যায় "দিনমানে"। ফলে সাধন এক গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি। কারণ ঠাকুরাণীর মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। ভক্তজনের সামনে জটির মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। অনাদির ব্যবস্থাপনায় চন্দন কাঠে পোড়ানো হয়। জটির অন্তিম ইচ্ছানুসারে সাধনকে হাতি, ঘোড়া দান করতে হয়। বলরামের পরামের্শে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে সাধন তার মায়ের উদ্দেশে হাতি, ঘোড়া দান করে। আঠারো টাকার বিনিময়ে মায়ের পিন্ডদান পর্ব শেষ হলে সাধন নিষ্কৃতি পায়। শ্রাদ্ধান্ন প্রস্তুত হওয়ার গন্ধে তার ভেতরের খিদেটা জেগে ওঠে। কদিনের অভুক্ত সাধন গামছায় পড়ে থাকা চালগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পরমুহূর্তেই লুণ্ঠন করে নেয় পুরোহিতকে দেওয়া চাল। বলরাম বাধা দিতে যায়, সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে গামছায় বাধা চাল নিয়ে সাধন পালিয়ে যায়। পুরোহিত বৃথা আক্রোশে অভিসম্পাত দিতে থাকে সাধনকে। সাধনের বিশ্বাস এ শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হতে পারে না কারণ সে হাতি দিয়েছে, ঘোড়া দিয়েছে। সে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে মা হাসিমুখে স্বর্গে গমন করেছে। সাধন তাই মনের সুখে ভাত খাবে। তার বিশ্বাস ভাতের গন্ধের মধ্য দিয়ে সে মায়ের স্পর্শ পাবে। তার মা তাকে খাইয়ে আনন্দ পেত। মায়ের অনুপস্থিতির যন্ত্রণাকে সাধন ভাতের গ্রাসের মধ্য দিয়েই ভুলে থাকতে চায়। গল্পের এই পরিণতি মূল সুরকে এমন এক উচ্চতা দান করে যার ফলে গল্পের বাঁধনে তা বাঁধা থাকে না, সমাজবাস্তবতার এক অনন্য নাজির হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

এ গল্পে চিত্রকল্পের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের শুরুতে রয়েছে যে চিত্রকল্পটি, "বৈশাখের তাতে মাঠের ছাতি ফাটে" বৈশাখের রুদ্ররূপ ও সাধনের মা হারানোর বেদনা যেন সমীকৃত হয়ে যায়। আবার "ডোমে লাড়ী ছিড়ে, আঁত ছিড়ে, ডাক্তার বুতলে আঁত রেখে দেয়" জটির এ জীবন বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় পাখমারাদের জীবন ব্যঞ্জনা। মহাশ্বেতা এমন কৌশলে চিত্রকল্প রচনা করেন যা তার গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবন্ত হয়ে পাঠকের চোখে ধরা দেয়। সাধনের দৈহিক গঠনের বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যবহৃত উপমা-"মোষের মত শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ফুসফুস রক্তজবার পাপড়ির মতো হৃদযন্ত্র, সাপের মতো পিচ্ছিল নাড়ী, ভোরের দোপাটির মতো কুসুমকোমল জীবকোষ, কিছু নেই ওর শরীরে। শুধু একটা পাকস্থলী আছে। আর আছে খিদে"। শরীরের বর্ণনা কোনো কাব্যিক উপমায় বাধা পড়ে নি। সাধনের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তার দেহের বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে। স্বভাবের উগ্রতার সঙ্গে মিশে গেছে মোষ, রক্তজবা, সাপ ইত্যাদির অনুষঙ্গ। মৃত্যুপথযাত্রী জটি ঠাকুরাণীর বর্ণনা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা উল্লেখ করেন, "ভয়ানক দুর্গন্ধ জটির ঘরে।" মৃত্যুর গন্ধ তো ভয়ানকই। "তক্তপোষে টকটকে লালরঙের ময়লা চেলী পরে জটি ঠাকুরাণী রূপকথার রাক্ষসীর মতো চিৎ হয়ে পড়েছিল, পেট ফুলে উঁচু, হাত-পা চিতিয়ে ফেলে রাখা। জটি ঠাকুরাণীর চোখে শুধু আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল।" মৃত্যুর বীভৎসতার পাশাপাশি মৃত্যু দর্শনকারী চোখের বর্ণনা। শত যন্ত্রণার নিবৃত্তি সে মৃত্যুতে, সেই মৃত্যু ধরা পড়েছে জটির চোখে। তাই পিচুটিভরা চোখের দৃষ্টি এতো সুন্দর। বলরামের চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রেও রয়েছে একধরনের সচেতনতা। বলরাম যখন গরীব ছিল তার চরিত্রে ছিল "ধলেশ্বরীর শীতলতা ও ধানক্ষেতের নম্র শ্যামলিমা।" পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে বলরাম আজ পরিবর্তিত। বলরাম জানে 'বর্তমানে এ বাংলা বাপের নয়, দাপের। তাই ভদ্রলোক দেখলে, নম্র ব্যবহার পেলে মিষ্টি কথা শুনলে ওর থু থু ছেটাতে ইচ্চে করে।' বলরাম সেই বদলে যাওয়া মানুষ যারা শোষিত হতে হতে একসময় বুঝে যায় টিকে থাকবার অদ্ভুত কৌশল। আবার ভাতের গন্ধে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠা সাধনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে "ক্ষ্যাপা মোষের" মতো। জান্তব আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রাদ্ধান্ন কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে এ চিত্রকল্প ব্যবহার যথাযথ। সমালোচকেরা চিত্রকল্প ব্যবহারে হয়তো যথার্থ অনুশীলনের অভাব লক্ষ্য করবেন কিন্তু চিত্রকল্প ব্যবহারের সরলতা ও প্রয়োগ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্রকল্পগুলি কষ্টকল্পিত নয়, অনায়াসে বিষয়ের গভীরে পাঠক প্রবেশ করতে পারে। সমাজের জ্বলন্ত রূপ যেমন চিত্রকল্পের মাধ্যমে ধরা পড়েছে তেমনি প্রাণের আবেদন নির্মিতিতেও মহাশ্বেতা সজাগ হয়েছেন। জটির রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে "নীল চোখ" এর চিত্রকল্পে মনে হয় জটির চোখে উৎসব সে ভালোবাসার সমুদ্র দেখতে পেয়েছিল তার রং তো নীল। এই সমুদ্রের হাতছানিতেই উৎসব তার সমাজ ছেড়েছিল আর "জটির পেছন পেছন ঘুরে ঘুরে জটিকে নতুন নতুন অচেনা সব স্বপ্ন দেখিয়েছিল।" শ্রাদ্ধের চিত্রকল্পটিও উল্লেখযোগ্য। বলরামের ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন ঘটেছে। মহাশ্বেতা এর মধ্যে দিয়ে নিয়মবদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়েছেন তেমনি অবস্থার বিপাকে সাধন এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। কারণ জটি ঠাকুরাণী পরিচয়ে মারা গেছে সাধনের মা হয়ে মারা যায় নি। ঠাকুরাণী পরিচয়ের

মধ্যে দিয়েই সে ভক্তজনের কাছে অলৌকিক পরিচয়ে বাঁধা পড়েছে। এজন্যই এতো বিপুল আয়োজন। নিয়ম পালনের মধ্যে এই ফাঁকি না থাকলে সাধন মাতৃদায় থেকে কোনোক্রমেই উদ্ধার পেত না। মহাশ্বেতা এই চিত্রকল্প রচনার মধ্য দিয়ে যেমন সামাজিক রীতি পালনের ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করেছেন তেমনি আবার এই ফাঁকই কিভাবে সাধনের পরিত্রাণ লাভের পথ হয়ে দাঁড়ায় তাকেও অনবদ্য ভাষায় চিহ্নিত করেছেন।

সময়, সমাজ, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে অনবদ্য ভঙ্গিমায় মহাশ্বেতা এ গল্পে ব্যবহার করেছেন। গল্পের শুরুতে মৃত্যু বর্ণনা থাকলেও মৃত্যুতে গল্প থেমে থাকে নি। জীবনকে আঁকড়ে ধরে জীবনের অসঙ্গতির দিকগুলিকেই খুঁজে বের করা হয়েছে। সংস্কার বিশ্বাসের কথা দিয়ে শুরু হলেও সেই সংস্কার বিশ্বাসের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে জেগে থাকে শুধু জীবন। এ গল্প তাই জীবনের জলছবি। মহাশ্বেতা তাঁর গল্প ও উপন্যাসে জীবনেরই ছবি আঁকেন। উপসংহারে সাধন চোখের জলে মাতৃতর্পণ করতে করতে মায়ের উদ্দেশে জানায়, "মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।" মায়ের মৃত্যু সাধনকে বিহ্বল করলেও তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এ ক'টি চাল সাধনের কাছে মহার্ঘ। সাধন পুরোহিতের দুর্ব্যবহার ভুলে ঐ চাল কটি কেড়ে নেয়। মায়ের শ্রাদ্ধান্নেই সাধন তার বেঁচে থাকার স্বপ্নকে খুঁজে পায়। এখান থেকেই জটিহীন সাধনের একাকী পথচলা, জীবনের সূচনা।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায়, ১০ নভেম্বর ১৯৩৩। আদি নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরের কাছে ইছাপুর গ্রামে। পড়াশোনা করেছেন দেওঘর বিদ্যাপীঠে, প্রেসিডেন্সি কলেজে স্কটিশচার্চ কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। ১৯৫৪ সালে তখনকার কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৫৮ সাল থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। ১৯৫৩ সাল থেকে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার একক সম্পাদক হন। 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখতেন। সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি হয়ে লেবানন ও মস্কো গিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তৃতীয় ভুবন, বিবাহবার্ষিকী, খাম, শোকমিছিল, চর্যাপদের হরিণী, অশ্বমেধের ঘোড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অশ্বমেধের ঘোড়া : স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা কাঞ্চন-রেখা। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে।

তথাকথিত উন্নতি আর প্রগতির অশ্বমেধের ঘোড়া। বিজিত জনপদের মতো পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্মতা আর সংবেদন, হারিয়ে যাচ্ছে মুগ্ধতা আর অভিমান। নাগরিক সাফল্যের কুহক যেন দুচোখে ঠুলি হয়ে আছে। দিগ্বিজয়ের উল্লসিত হ্রেষায়, তার তুখোড় গতির পরাক্রমে, হর্ষের হর্সপাওয়ার দীপ্তিতে পুরনো সহজ মানবিক সেন্টিমেন্টগুলি ছিটকে পিছু হটে গেছে কবে! ছুটছে অশ্বমেধের ঘোড়া। সময়-সমাজ-স্বভাবের মিলিত বর্ণময় কোলাজ তার শরীরে।

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন দেখছে এইসব, আর ভাবছে, "এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বর হচ্ছে, সূক্ষ্মতার নামে দরকচা মেরে যাচ্ছে।" ত্রিমাত্রিক তঞ্চকতার এমন এক বিশ্বে দাঁড়িয়ে একজন রেখা দেখেছে এইসব, আর বলছে, "এত বাণী দিও না মাস্টার মশাই। লোকে ধরে বেঁধে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে।" এদের দ্যাখা আর এদের অনুভব-অভিমানটুকু দ্যাখানোর দায়ভার যেন সেধে নিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অসামান্য গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র অক্ষবে অক্ষরে। কাঞ্চন এবং রেখা সেই গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

জীবনের গল্পগুলিতে সাধারণত যেমন হয়, প্রথমে ওদের বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম। তারপর চুপিচুপি বিয়ে। রেজিস্ট্রি। গোপন গেরিলাযুদ্ধের মতো এই বিয়ের শরিকও দুচারজনই মাত্র, সুকুমার, প্রফুল্ল, চন্দন। কারণ বাড়ি মানেনি, সমাজও সম্ভবত না। সইসাবুদ-শেষে প্রতীকী মালাবদলের মালা হাতে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত যুগলে বাঘমার্কা ডাবলডেকারে উঠে এবং আর এক প্রস্থ অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমে বাস কন্ডাকটারের টিটকিরি শুনতে শুনতে ঠিক যে কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথ যেন তাদের হয়েও তাদের নয়। সানাইয়ের সুর, কান্নার স্বাদ আর অসম্মানের গন্ধমাখা সেই রাজপথে মাঙ্গলিক মালাজোড়া অভিমানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা দেখেছিল, "একটা স্থবির বলদ সেটি চিবুচ্ছে।"

ওরা, কাঞ্চন আর রেখা। স্বামী-স্ত্রী। অথচ চারপাশের কেউ জানে না ওদের বিয়ের কথা। কারণ একসাথে থাকে না ওরা, থাকেনি একদিনও। "রেখা রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর মুছে" ফেলেছিল সেই রেজিস্ট্রির দিনেই। তারপর থেকে শুধুই ভয়। লুকোচুরি। যেন গোটা পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। এবং তারপরও প্রাপ্য আর প্রাপ্তের ব্যবধানে দাঁড়ানো দুটি স্পর্শকাতর, অতএব স্পষ্ট কাতর নারীপুরুষের পরস্পর সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে বাঁচার বিচিত্র বারোমাস্যা। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের চেয়ে ঢের বেশি সংবেদনশীল আর কল্পনাপ্রবণ হওয়াটাই যেন কাঞ্চনদের ক্ষেত্রে সত্যিকার সমস্যা। যে নির্বোধ হঠকারিতাকে আমরা সাহস বলি, যে বাচাল চাতুরিকে আমরা সপ্রতিভতা বুঝি, যে বৈষয়িক ধূর্ততাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল হওয়া ভাবি—সেই সবের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এরা দ্যাখে,

সৌন্দর্য আর স্বপ্নের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল, যেন কুৎসিত ক্যাকোফনির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। যেন আসলে ভেঙে যাচ্ছে তাদেরই ঘরবাঁধার স্বপ্নটা। আর সেই নষ্টনীড় বেদনাবেলায় গল্পে তাদের শুধু বারবার দ্যাখা যায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে, কিংবা বাসে চেপে গোধূলিমদির শহরের অলিগলি ঘুরে আবার যে যার মতন ডেরায় ফিরে যেতে। সুসভ্য প্রেমিকসুলভ এই শোচনীয় অবদমনই অগত্যা তাদের অনন্যোপায় দাম্পত্য। অথবা, তার শতচ্ছিন্ন ছদ্মবেশ। সুতরাং জয় করে তবু ভয় কিছুতেই যায় না। তবু এই ভীরু প্রেমের মেঘাচ্ছন্ন মন্থর আকাশে ধ্রুবতারাটির মতো বেঁচে থাকে তাদের কমিটমেন্ট। ভালোবাসা।

বড্ড বেশি বুদ্ধিজীবী ওরা। একটু বেশিমাত্রায় পোশাকিও যেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পারস্পরিক ব্যবধানের দীর্ঘশ্বাস পার হয়ে তাদের দ্যাখা হলেও তারা যতোটা আন্তরিক ততোটাই যেন অ-শরীরী। বহমূল্য মুহূর্তগুলি শুধু কথায় ভরে রাখে তারা, কুণ্ঠিত হাতে হাত রাখা কিংবা পায়ে পায়ে সতর্ক পথচলা বিনা কতোটুকু উষ্ণতা বিনিময় হয় তাদের? লোকলোচন এড়িয়ে, এই সুবিমলদের মতো পরিচিতের অশালীন কৌতূহল এড়িয়ে চলতে চলতে কতোটুকু উষ্ণতা বাঁচিয়ে রাখাই বা সম্ভব? হয়তো কিছু মর্মান্তিক সত্যকে দুজনেই দুজনের কাছে আড়াল করতে চায় এবং চায় বলেই বৃথা এত কথার ইমারত রচা। হয়তো তাই কাঞ্চন কখনো বা বলেই ফ্যালে "জানো, এই কথার খেলা সত্যি আর ভাল লাগে না।" তবু এমন খেলা চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আশেপাশে পড়ে থাকে হেলাফেলা সারা বেলা, আশাহত। এমনি করে বিধিবদ্ধ বেঁচে থাকার ফাঁকেই, কী আশ্চর্য, বছর ঘুরে যায়! ফিরে আসে কাঞ্চন আর রেখার প্রথম বিবাহবার্ষিকী। গল্পের মূল সময়াঙ্ক সেই দিনটাই।

ভয়াবহ বাস্তবের প্রহারে পাংশু এরা দুজন ঠিক করেছিল, একটু আলাদাভাবে কাটাবে দিনটা, একটু বেশি যত্নে, একটু বেশি মর্যাদার সঙ্গে। সহজে লজ্জা পাওয়া অথবা সহজে দুঃখ পাওয়ার ভদ্রলোকি অভ্যেস জলাঞ্জলি না দিয়েও একটু বেশি সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের ব্যক্তিগত বড়ো দিনটাকে বাড়তি একটু মূল্য দিতে চাইলো দুইজনে। স্মৃতিকাতর কাঞ্চন পুরনো সেই দিনের মতো আবার যেন সন্ধ্যার বাতাসে শুনতে পেল চন্দ্রকোশ, সঙ্কোচের বিহ্বলতা ছেড়ে রেখা আবার পথের প্রৌঢ় পসারির থেকে কিনে নিলো ফুলমালা। এবং সেই ব্যতিক্রমী শুক্লপক্ষে হঠাৎ যখন কাঞ্চনের "বেশ একটু মোগলাই মেজাজ হচ্ছে" ওরা দুজনে সাব্যস্ত করলো, আজ যে যার ঘরে ফেরার পথটায় আর বাসযাত্রার জনগণতান্ত্রিক নিয়মে অথবা, ট্যাক্সির বেলেল্লা দ্রুতির ডানায় ভর করে ফিরবে না, ফিরবে সময়কে উপভোগ করতে করতে বেশ আয়েস করে, স্মরণযোগ্যভাবে। কার্যত যা হবে, এমন দিনে, দুজনকে দুজনের দেওয়া সেরা উপহার।

আইডিয়াটা কাঞ্চনের! তারা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ফিরবে। যেন বা উনিশশতকী বাবুর মতো, অলৌকিক দুলকি চালে, গতিময় নগরের তাৎপর্যহীন ব্যস্ততাকে করুণা করতে করতে! নিজস্ব নির্জনতায়, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে মেলামেশা রঙিনতম মুহূর্তগুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে। কারণ তারা তো জানেই গোটা বছরভর কিছুই দিতে পারে নি তারা

নিজেদের, অবশিষ্ট পরিচিত পৃথিবীর থেকে পালিয়েছে শুধু, কারণ তারা তো জানেই :

> "ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, একপেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ আকর্ষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। একদিন কোনও এক নিকট অথচ বিস্তৃত অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। আর আজ, আর এখন, ঘেন্না করে।"

সুতরাং, আজ, এখন, এই বিশেষ স্মরণের সরণিতে দাঁড়িয়ে, ঘৃণা মুছে, নানান মাত্রার অভাব পাশে সরিয়ে ওরা এই সময়টুকুর সম্রাট হতে চেয়েছে, তাই কাঞ্চন চিৎকার করে ডাকে— 'গাড়োয়ান রোককে'। তারপর বিস্মিত রেখার অবাক উপস্থিতি এবং নীরব তারিফকে তারিয়ে তারিয়ে গ্রহণ করতে করতে উঠে বসে ফিটনে। ওরা দুজন, কাঞ্চন আর রেখা। এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর—এই নিত্যযাত্রাপথ আজ একটু অচেনার আবহে বর্ণময় হোক, এই ভেবে। সহিস বলে :

"পোলের ওপারভি যাবেন?

না।

গঙ্গার কিনারা দিয়ে?

হ্যাঁ।

চার টাকা লাগবে স্যার।"

এই হতভাগ্য শহরে, এই বর্তমানে, স্বপ্নেরও দরদস্তুর চলে। কংক্রিটের এই জঙ্গলে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে চলে নিয়ত টানাপোড়েন। সেই নৈমিত্তিক দড়ি টানাটানির খেলায় অতিস্পর্শকাতর কাঞ্চন সহজে আহত হয়। তার হীনম্মন্যতা ও ব্যর্থ পৌরুষ কখনো কখনো রেখার প্রতি ক্রোধ হয়ে ঝরে। একসময় অশিষ্ট গাড়োয়ানের সঙ্গেও বার্গেনিং শেষ হয় আড়াইটাকায়। ওরা ঘোড়া-গাড়িতে উঠে বসে। কাঞ্চনের "অদ্ভুত আনন্দ" হয়।

> "তারপর গাড়ি চলতে শুরু করল। পরপর কতগুলো বাস বাতাসের ঝাপট দিয়ে চলে গেল। জানলার পাশে দু একজন যাত্রী একটু ঝুঁকে কাঞ্চনদের দেখল।...গাড়িটা দক্ষিণে ঘুরল।... কাঞ্চন এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে সে অত্যন্ত কমপ্লেক্স বোধ করছিল।
>
> আর বৃষ্টি নামল। রেখা বাইরে হাত পেতে ধরল। ফোঁটা ফোঁটা জলে হাতটা অপরূপ হয়ে উঠল। আঙুলগুলিতে একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে হঠাৎ নূপুরের মৃদু শব্দতরঙ্গের অনুষঙ্গ এল। সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোশ বেজে উঠল।"

এই মন্ত্রমুগ্ধ পরিপার্শ্ব কাঞ্চনের অতিরোমাণ্টিক অনুভূতির কোণে যে ফাল্গুনী রচনা করে চলেছিল, হঠাৎ তার মগ্নতায় ধাক্কা দিয়ে, সমস্ত সূক্ষ্ম মীড়ের মায়াজালকে নাকচ করে দিয়ে সহসা সহিস হেঁকে বললো :

"বাবু?

কেন?

পর্দাটা ফেলে দিব?

কাঞ্চন জানত না এ জাতীয় ফিটনে পর্দা থাকে। অবাক হয়ে বলল 'দাও'। মুহূর্তে যেটাকে ভেবেছিল গাড়ির ছাউনি, তার ওপর থেকে দুপাশে দুটো চামড়ার পর্দা ঝুলে পড়ল। আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

অতএব, পুনর্বার স্তব্ধতা ও বিস্ময়। যে নির্জনতা ও নৈকট্য তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা ছিল এতোদিন, অথচ যা শহর কলকাতার রকমারি ঔৎসুক্য আর তার হৃদয়হীন নিরেট ব্যস্ততা দ্যায় নি, হঠাৎ তা-ই পেয়ে প্রথম বিবাহবার্ষিকীর অন্তরাতে এসে তারা কিছুটা হতবাক হয়ে গেল। কাঞ্চনের আত্মসমালোচক মন এই অবকাশে অকস্মাৎ জানালো :

> "রেখাকে নতুন করে কিছুই জানি নি। রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না। আসলে আমরা দুজনেই আমাদের আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।"

যে সুস্থ পারিবারিক জীবন পরস্পরকে চেনার স্বাভাবিক সুযোগটুকু করে দ্যায়, কাঞ্চন-রেখার পক্ষে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চেনাজানার সেই সুযোগ ছিল না। কেন ছিল না, কেন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার সৎসাহস 'সাহিত্যের অধ্যাপকের' ছিল না, কেন রেখার অনমনীয় জেদ প্রেমটুকুকে বিমূর্ত আদর্শের মতো আঁকড়ে ধরে থাকলেও তার স্বাদু সাধ, অথবা সাধু স্বাদকে পেতে চাইবে না? না, গল্পে এই জরুরি প্রশ্নের কোনো বুদ্ধিবিবেচনাগ্রাহ্য সদুত্তর নেই। কেন নেই? মন মন, তোমাদের কী শরীর নেই কাঞ্চন-রেখা?

তবু যে তারা ড্রইংরুমের দম দেওয়া সিন্থেটিক পুতুল নয়, চলমান কোনো প্লেটোনিক থিয়োরি নয়, রক্তমাংসের মানুষ, এই ছোট্ট মুহূর্তের একান্ত আড়ালে তার কিছু পরিচয় ধরা ছিল কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষার ভাষায় :

> "ছুঁতে ইচ্ছা করছে। খোঁপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মত চুলগুলোকে যদি রেখার মুখে বুকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দি? হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম্? আমার রক্ত আমার মন বৃষ্টি হতে চায়।"

কিন্তু দ্বিধাও আছে। পরাজিতের দ্বিধা নয়, বিজয়ীর দ্বিধা, প্রকৃত পুরুষের স্বাভিমান। যে নারী তার নিজস্ব, তার স্ত্রী, তাকে পেতে চাওয়ার এই কাঙালপনা কি কাঞ্চনের সাজে? কোনো মর্যাদাবান প্রেমিকের সাজে? সুতরাং তার মনে হয় :

> "আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।"

কাঞ্চন পারে না এই অন্ধকার নির্জনতার সুযোগ নিতে। রেখা পারে না তার ভীষণ ভালোলাগাকে অযথা ভিখারি বানাতে। কারণ তারা তো সত্যি সত্যি ভালোবাসে পরস্পরকে। সময় ছেনতাই করা এই ব্যতিক্রমী সুখটুকুকে তাই গলায় বরণমালা করে পরে নিতে চায় রেখা, সম্পর্কের স্বীকৃতি যেন, আর কিছু নয়, বেয়াদপ আদর না, কারণ কামনাকে লালসায় বদলে নিতে তার, তাদের রুচিতে বাঁধে। যা দামি, তাকে মূল্যহীন করেনি তারা। অথচ সময় আর সড়ক তো থেমে থাকে না। গন্তব্য এসে যায়।

"গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল—বাবু?

কী?

খিদিরপুর।"

ফিটন থেকে নামলো ওরা, দুজনে মিলে ভাড়ার আড়াইটাকা গাড়োয়ানের দিকে বাড়িয়ে দিতেই বিপত্তি :

"সে চটে উঠে বলল 'সে কী? পাঁচ টাকার কম হবে না।'

কাঞ্চন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল 'কেন? তুমিই তো বলেছিলে।'

গাড়োয়ান বলল, 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?"

ভাবতে ইচ্ছা করে, ঠিক কি রকম মুখভঙ্গি ছিল তখন এই গাড়োয়ানের, এই কথাগুলো বলার সময়? ঘোলাটে রক্তিম দুচোখে ঠিক কতটা অশ্লীল আশ্লেষ মাখা ছিল? সকলে যে একইরকম হয় না, সব ব্যক্তিমানুষেরা যে একই রকম সুখ দুঃখে বিষণ্ন বা উল্লসিত হয় না, তা এই মূর্খ গাড়োয়ান জানবে কি করে। জানবে কি করে একটা সামান্য কথার খোঁচা কতোটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে কোনো কোনো নিরীহ, নির্বিরোধ, সন্তর্পণে বেঁচে থাকা স্বপ্নদর্শী মানুষের বুক, কিভাবে খেলাচ্ছলে খুন করে তাদের মূল্যবোধ। কাঞ্চনেরা অনুভব করে, এ গল্পের পাঠকের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করে, মজ্জাগত স্থূলতায় ভরে গেছে শহরের দেহমন। হিংস্র অভব্যতা চারিদিকে। মজ্জাগত ধর্ষকাম, মানুষের। না হলে এমন জঘন্য ইঙ্গিত সত্যি কি পাওনা ছিল কাঞ্চনদের? যে নিভৃত মুহূর্তে তারা তাদের ফেলে আসা দিনগুলির দিনগত পাপক্ষয়ের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল চাওয়া পাওয়া না পাওয়ার দরিয়ায় ডুবে সেই পাপস্খালনে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সমবেত ব্যর্থতাকে ভুলে নিজেদের মধ্যে একটু খুশি, একটু আনন্দ বাঁটোয়ারা করে নিতে— সেই মুহূর্তটুকু-কে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলো তাবা, এমন অপ্রত্যাশিত আঘাতে চূর্ণ হতে দেখলো। হয়তো বুঝলো, হয়তো বুঝলো না, যে ভদ্রলোক, ভালোমানুষ, প্রখর অনুভূতিপরায়ণের জন্য পৃথিবীটা নেই আর, কর্কশ স্থূলতার রোমহর্ষে বেপথুমান হয়ে গেছে সমস্ত সংবেদনশীলতা! মানুষকে অনায়াসে ভুল বোঝা, মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে দেগে দেওয়া এই সময়ের এক ইতব অভ্যেস। "মালাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল"— আবার! ওদের চোখের কোণে তখন ফোঁটা ফোঁটা নোনতা সেন্টিমেন্ট, স্বপ্নভঙ্গ। আঁধার ঘনিয়ে আসা এ শহরে ওরা যেন একেবারে অপরিচিত, আউটসাইডার। রেখা আর কাঞ্চন। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে। অশ্বমেধের ঘোড়া। "সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়!" সেই যজ্ঞের আহুতি শুধু একালে যোগ্যের আহুতিতে বদলে গেছে। তুমি অতিরিক্ত সেনসেটিভ হবে, আর তার শাস্তি পাবে না, তা কি হয়? সবকিছুর একটা সমাজমান্য মাপ আছে, জানো না?

দুই

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটির আধুনিকতা নির্ভর করে আছে অনেকখানি তার কথনভঙ্গির অনন্য স্বভাবে। আখ্যান-অংশটি সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য আখ্যানকে অসামান্য মুন্সিয়ানায় চেতনা-অবচেতনে জুড়ে, সময়ের সরলরৈখিক চলনকে দুমড়ে মুচড়ে নিয়ে এখানে পাত্রপাত্রীর একদিন প্রতিদিনকে চিরদিনের বৌদ্ধিক উচ্চতা ও

আদল দেওয়া হয়েছে। আখ্যানের চরিত্রও স্থির নয়, কেন্দ্রীয় অনুভবটি বারবার বদলে বদলে গেছে, প্রথম পুরুষ থেকে উত্তমপুরুষে। অর্থাৎ গল্পের বয়ান কোথাও লেখকের, কোথাও বা নায়ক কাঞ্চনের এবং এই দ্বিমাত্রিক ন্যারেটিভের কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে স্থান বদল ঘটেছে। সতর্ক পাঠকের অনুভবে লেখকের সঙ্গে কাঞ্চনের এমন একাকার অস্তিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। একটানা কাহিনিবুননের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথ ছেড়ে দীপেন্দ্রনাথ কখনো ঘটনার মধ্যে থেকে আবার কখনো ঘটনার বাইরে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে অনুভূতিশীল মানুষের অসহায়তায় গল্প লিখেছেন। যে গল্পের মেজাজ লিরিক্যাল, কিন্তু পরিণতিতে আছে গদ্যের কড়া হাতুড়ির প্রচণ্ড ধাক্কা।

কাঞ্চন বা রেখা যে সব কারণে দুঃখ পায়, তা হয়তো গড়পড়তা বাঙালি মধ্যবিত্তের চেনা দুঃখ নয়, তারা যাতে আনন্দ পায় তা-ও হয়তো সকলের জন্য নয়। তবু তো হাইপার সেনসেটিভ এমন বিরল কিছু মানুষ থাকেই। তাদের পৃথিবী ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ধরনটাও আর সকলের মতন হবার নয়। এই গল্পের কাঞ্চন এবং রেখার জীবন যাপন, প্রাপ্তি ও প্রক্ষোভ, তাদের প্রবণতা এবং প্রশমন এই কারণেই জটিলতর বিন্যাসে গড়া। তারা সাধারণতন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও বৈশিষ্ট্যে 'বিশেষ'। নিয়মিত জীবনপ্রবাহে ভাসমান ব্যতিক্রমী প্রাণকণা। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই সব দলছুট মানুষের বিপন্নতার, বিষণ্ণতার কথকতা। এমন আততায়ী সময়ের মহাট্র্যাজেডি।

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পের নানা দুরন্ত বাঁকে কিছু আশ্চর্য প্রতীকের প্রয়োগ দ্যাখা গেছে। যেমন এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এসেছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এমন সুরের আবহ, ক্ষেত্রবিশেষে অন্তত, বাস্তবে নেই বোধহয়, সুর শুধু বাজছে কাঞ্চনের কল্পনায়। চারদিকের বেসুরো বেতালা বেঁচে থাকাকে পাশ কাটিয়ে, অর্থহীন নানা শব্দবমনের মাঝে কাঞ্চন, শুধু কাঞ্চনই খুঁজে নিতে পারে যে সুরেলা স্বর। সানাইয়ের বিষণ্ণমধুর মিশ্র সুরতরঙ্গের অনুষঙ্গে এই গল্পের স্মৃতি ও সময় একবছরের বিস্তৃত প্রেক্ষিতে মথিত হয়েছে—বিয়ে থেকে বিবাহবার্ষিকী।

পুরাণ এবং পরম্পরা সাক্ষী, অশ্বমেধের ঘোড়ারা কখনও নিজের জন্য যুদ্ধ করেনি, করার কথাও নয়, অথচ তারা যুদ্ধজয়ের পতাকা বহন করেছে, হয়ে উঠেছে বীরত্বের চিহ্নিত প্রতীক, বিজয়ের নিরঙ্কুশ আইকন। তারপর নানা নিষিদ্ধ কলাকুশলী যৌনাচারের শেষে, তাদের হত্যা করে আর্য সম্রাটেরা হয়েছেন রাজচক্রবর্তী। বলাবাহুল্য, ইতিহাসের অন্ধকার আস্তাবলেও ঠাঁই হয়নি সেইসব হতভাগ্য চারপেয়েদের। অনেকগুলো টুকরো এক্সপ্লয়টেশনে এভাবে পূর্ণ হয়েছে কতিপয়ের অ্যামবিশান, ঠিক যেমন আধুনিক সভ্য সমাজের মুখ বারবার ঢেকে গেছে তথাকথিত শিষ্টতার বিজ্ঞাপনে। নানা হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেশে উপদেশে গুরুকুল ও প্রতিষ্ঠান বরাবর চেয়েছে জনসাধারণ হয়ে উঠুক সহজ সরল, অনুগত এবং দায়বদ্ধ। কিন্তু প্রথাগত, ঘোষিত সুসমাচারের বাইরে, বাস্তবে, দ্যাখা গেছে বিপরীত রঙ্গ, যাদের নাকি আদর্শ হওয়ার কথা, তারাই হয়ে উঠলো চাঁদমারি, তেমন মানুষদেরই মনে মনে মেরে দিল এই বর্তমান, প্রতিদিন পুঁতে দিল ষড়যন্ত্রী নিন্দার পাঁকে। দ্যাখা গেল, বাস্তবে সরলতার অন্তর্ধানপটে প্রতিদিন লেখা হচ্ছে সফলতার সাম্প্রতিক ব্যালাড! অর্থাৎ আর এক ধরনের

সূক্ষ্মতর এক্সপ্লয়টেশন, ক্ষমতার অলিন্দ থেকে যা অহরহ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে একালেও, আর এক ধরনের বর্বরতা, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ভিন্ন নামে। ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্নতর পরিভাষায়। সুতরাং সরাসরি বলা না হলেও একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এই বিশেষ গল্পে গল্পকার কেন এবং কীভাবে সেই রণজয় আর হননবৃত্তান্তকে এখানে শিল্পের প্রত্যহে, নামকরণের মধ্যে, উচিত প্রতীকী মূল্যে গ্রহণ করেছেন। কেন এবং কীভাবে একালের কাঞ্চনেরা সেই অস্বস্তিকর প্রতারক পরম্পরায় অসচেতনভাবে লগ্ন হয়ে যায়।

গল্পে সত্যি পৌরাণিক 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ নেই, যজ্ঞাশ্বও নেই। তবু একটা ঘোড়া আছে। তাকে কেন্দ্র করে আছে সেই আবহমানের চলচ্ছবি। রেখা আর কাঞ্চন ঘোড়াগাড়ির ছোট্ট পরিসরের বাধ্যত প্রাপ্ত চলমান নিরালায় যেন নিরীক্ষণ করেছে সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার, মনে মনে, এক বিপরীত বিশ্বের ব্যাহত সময়ে, আকাঙ্ক্ষার অপচয়ের মাঝে :

> "অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড় কন্যা আর্য ঘোড়াসওয়ারের পায়ের তলায় হাহা করে কেঁদে উঠলো। তারপর চেঙ্গিজ খাঁ অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এমন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঝে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বাজি দৌড়ায়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াইটাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে।"

পুবনো যুদ্ধ, যৌনতা আর দিগ্বিজয়ের ধরনটা বেসাতির এই বেশরম সময়ে বদলে গিয়ে যে গৌরবহীন ভোঁতামির নামান্তর হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী। বরং এই পরিবর্তনেব মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই কিছু রয়ে গেছে।

আরও বেশ কিছু বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল নানা প্রতীকের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার এই গল্পে চোখে পড়েছে। যেমন ভেঙে পড়া সেনেট হল যেন নব্যনাগরিক বাঙালির ঐতিহ্য হারানো আর পতনশীল বোধের প্রতীক, যেখানে সৌন্দর্যের বদলে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আটপৌরে প্রয়োজনের মোটা দাগকে। বিবাহচিহ্ন মালাটিকে বলদের খাদ্য বানানোর নির্মম ছবিতেও আছে নির্বোধ স্থূলতার ভয়ঙ্কর সংকেত। ফিটনের খোপে অপ্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতায় কাঞ্চনের শারীরিক উত্তেজনার অসামান্য চিত্ররূপ, "আমার এই শবীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে"—দ্যোতনাময় এই প্রকাশভঙ্গিমা যৌনতার শরীরী আবেশকে অনবদ্যতায় বদলে দিয়েছে। গল্পের আরও একাধিক অংশের দৃষ্টান্ত পেশ করে দ্যাখানো যায়, শব্দে শব্দে ছবি আঁকা দীপেন্দ্রনাথের প্রিয় অভ্যেস। এবং এইসব চিত্রকল্পের মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সংশ্লেষ নির্ভুল জটিলতায় মিশ্রিত হয়েছে।

এই গল্প প্রধানত কাঞ্চনের। তার আবেগ, আবেদন এবং অবদমনের। হীনম্মন্যতা আর হীন নাগরিক তামাসার বাইরে নিজস্ব নিরালম্ব অবস্থিতির, আততি ও উচ্ছ্বাসের। রেখার প্রতি তার মনোযোগের, এমনকি অমনোযোগের, ভালোবাসাময় অধিকারবোধের, ছেলেমানুষির আবার ব্যর্থকাম হতাশার। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হবার জন্যই একটু বেশি এক্সপ্রেসিভ সে। মুহূর্তে মুহূর্তে তার আবেগের রঙ বদলায়। কখনো সানাইয়ের সুর শুনে "চমকে" ওঠে

তো কখনো রেখার মন্তব্যে "হা হা করে হেসে" ওঠে। পরক্ষণেই "লজ্জা" পায়, আবার প্রায় পরে পরেই রেখার সাহস দেখে "স্তম্ভিত" হয়। তার সমস্ত মানবিক আবেগগুলিই সৎ, শুধু সংবেদনশীলতা সৃষ্টিছাড়া। হিংস্র-অসুন্দর এক কেজো জগতে সে বেমানানরকম মৃদু ও ম্রিয়মাণ, অনুকম্পায়ী, অতএব ক্ষণে ক্ষণে আক্রান্ত, সন্ত্রস্ত এবং রক্তাক্ত। তবু জীবনকে, জীবনের পেলব নান্দনিকতাকে সে ভালোবাসে। তাই জীবন থেকে পালানোর কথা ভাবতেও পারে না। একধরনের মৌলিক দায়িত্ববোধ তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারসাম্যে ভরে রাখে। রেখাকে সে তীব্রভাবে ভালোবাসে। রেখাকে ভালোবাসাই তার জীবনকে ভালোবাসা। গোটা গল্পে রেখার ভূমিকা কিছুটা গৌণ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি সে অনেকটাই যেন কাঞ্চনের ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের অভাব নেই, তার অনুভূতি ও পছন্দগুলিও বৈশিষ্ট্যময়। সে স্বার্থপর নয়, সে জানে সে এমন কাউকে ভালোবাসে, যে মানুষটা একটু আলাদা, জটিল ধরণের, বিশেষভাবে অন্তর্মুখী। রেখা তার কথা আর কাজের মধ্যে কাঞ্চনকে নানাভাবে সমর্থন যোগায়। সে বোঝে, তার অস্তিত্ব কাঞ্চনের কাছে কতোটা দামি। তার ভালোবাসা ছাড়া, সে বোঝে, কাঞ্চনের অস্তিত্ব কতোটা বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই এই ভালোবাসা রেখাকে অহংকারী করে, একজনের জীবনে তার ভূমিকা এবং তাৎপর্য এতোখানি, বোঝার অহংকার। কেতাবি নারীবাদ যে অহংকারকে কখনো বুঝবে না।

একটা নাছোড় খটকা তবু ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি আনে। আচ্ছা, আমরা, মানে মধ্যবিত্ত পাঠকেরা, মধ্যবিত্ত কাঞ্চন ও রেখার পক্ষে দাঁড়িয়ে গল্পটাকে পড়ছি বলে একধরনের ভুল পক্ষপাতে ঘোড়াগাড়ির ঐ গাড়োয়ানকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভিলেন বানাচ্ছি না তো? লোকটার কাছে আমরা যে ভাষারুচি, যে ব্যবহার আশা করছি, তা আমাদেরই মধ্যবিত্ত সুলভ 'আদর্শ' ব্যবহারের বানিয়ে তোলা প্রত্যাশা নয় তো? কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা ভোঁতা, ভালগার। হ্যাঁ, সে অসৎ, অপারচুনিস্টও। কিন্তু তার শ্রেণি-স্বভাবের পক্ষে তার এই আচরণ এতোই স্বাভাবিক, যে, তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি রকম হা হুতাশ করাটাই অতিকল্পনা বলে মনে হতে পারে। আচ্ছা, কোন্‌টা বেশি আঘাত করেছে কাঞ্চনদের—অন্যায়ভাবে বাড়তি টাকা চাওয়া, নাকি 'ফুর্তি' জনিত যৌন ইঙ্গিত? মধ্যবিত্ত তো দীপেন্দ্রনাথ নিজেও, তবু তাঁর মার্কসবাদী মন ও মনন নিশ্চয় স্বীকার করবে, গাড়ি, শ্রম এবং 'সুযোগে'র বিক্রেতা হিসেবে মওকা বুঝে চাপ দিয়ে এই 'বাবু'-দের (কাঞ্চনকে এই সম্বোধন সে গল্পে বারবার করেছে) থেকে বাড়তি দুপয়সা কামিয়ে নেওয়াটা এই গাড়োয়ানের পক্ষে অন্যায় হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কার্যত তার অশালীন উচ্চারণের মধ্যে ভিতু, হিপোক্রিট, পেটে খিদে মুখে লাজ এই বাবুশ্রেণির প্রতি আগে থেকে স্থির, পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্ধারিত একরকম ফিচেল বদমায়েশি-ধারণারই প্রকাশ ঘটেছে। "ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না"—বলাটা তাই মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে, মধ্যবিত্ত লেখকের কাছে, এমনকি মধ্যবিত্ত নায়ক-নায়িকার কাছে যতোটা অশালীন, অতএব শকিং—স্বয়ং বক্তার কাছে কিন্তু আদৌ তেমন নয়। তার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়েছিল, এমন ক্ষেত্রে বাবুরা একটু আধটু ফস্টিনস্টি কোরে থাকে, তাই সে ঘটনাচক্রে দাঁও মারতে চেয়েছে, সত্যি বলতে কি, আঘাত করতে চায়নি, করবে কেন, খদ্দেরকে কেউ চটায়? আসলে শালীনতার সংজ্ঞাও তো

শিক্ষিত ভদ্রসাধারণ নিজেদের মতো করে নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, ঝোপ বুঝে কোপ মারা, খুচরো ব্ল্যাকমেল এবং অশালীন ইঙ্গিত খুব অন্যায়। কিন্তু শিক্ষিত অধ্যাপকের ন্যায়বোধ আর প্রান্তিক সহিসের ন্যায়বোধকে কবেই বা এক মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে? শ্রেণিবিভক্ত সমাজ জানিয়েছে, 'ওরা' আর 'আমরা' এক নই, কারণটা সহজে অনুমেয়। তাদের সমস্যা, সমাজ, বেঁচে থাকার ব্যাকরণ, আর্থসামাজিক পরিকাঠামো—কোন্‌টা একরকম? ন্যায় অন্যায়ের ধারণা তো জীবনযাপনের এই সমগ্র থেকেই উঠে আসে। তাই 'ওদের' আচরণ আর 'আমাদের' আচরণের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তাছাড়া আমরাও কি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আলাদা হয়ে ওঠা, আলাদা দুঃখ সুখের বোধ, আলাদা প্রতিক্রিয়াকে সব সময় সততার সঙ্গে স্বীকার করি? একই রকম পরিস্থিতিতে দশজন মানুষ যে সত্যি সত্যি দশটা আলাদা রকম আচরণ করতে পারে—এই মৌলিক সত্যে আমরা নিজেরাই কি যথেষ্ট বিশ্বাস রাখি? আমরা, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও কি প্রতিটি পৃথকের মূল্য না বুঝে, তারতম্য না বুঝে, মেরে দিই না সবকিছুতে গড়পড়তা সাধারণীকরণের মোটা মার্কা? কাঞ্চনেরা যে সুভদ্র, আলাদা ধরনের মানুষ—গাড়োয়ান তা বোঝে নি। কিন্তু অন্যেরা কি তা বুঝেছে? না হলে সারা বছর এভাবে তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয় কেন? কিসের ভয়ে? কাদের ভয়ে? আসলে কারণ তো একটাই, তারা বড্ড বেশি ভালো, বড্ড আলাদা। কারণ তারা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। নিয়মের দুনিয়া তাই তাদের আঘাত করে। ক্রমাগত আঘাত করেই চলে। কিন্তু তবু সব জেনে-শুনে-বুঝেও পাঠক রেখা আর কাঞ্চনের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের সঙ্গে একাকার আইডেনটিটি, অনুভব খুঁজে পায়। অনুভব করে, এই যন্ত্রণা এই অপমান তাদের কখনো প্রাপ্য ছিল না। এটা আর যাই হোক, জাস্টিস নয়।

এবং সেই কারণেই হয়তো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কাঞ্চন আর রেখার মতো দুজনকে তবু কেন শুনতে হবে "ফূর্তি করবেন, হোটেলভাড়াভি দিবেন না?" তবে কি এই ধরনের অশ্লীল মন্তব্য, কু-ইঙ্গিত, সন্দেহ আর সুযোগসন্ধানই প্রচলিত রীতি বলে? সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুতাপহীন জীবনাচার বলে? কিছু কিছু তাপ-উত্তাপশূন্য মানুষ—কী আশ্চর্য—বুঝতেই পারে না, তাদের আচরণ বিচরণ উচ্চারণ আর একজন মানুষের গভীরে কতোটা রক্তপাত ঘটায়। সামান্যতম সহমর্মিতাও কেমন সব দিক থেকে হারিয়ে গেছে যেন। অবশ্য নির্বোধরা কবেই বা নিজেদের নির্বোধ বলে চিনেছে! যেমন কাঞ্চনের তথাকথিত 'বন্ধু' সুবিমল রেখার দিকে তাকিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে "আপনার বোন?

না।

ছাত্রী?

না।

ও বুঝেছি। সুবিমল মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, 'দেখেও আনন্দ।"

কেন এত অপবিত্র কৌতূহল? একজন প্রাপ্তবয়স্কের ব্যক্তিগত এলাকাকে আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক কেন সম্মান করবে না? যথাবিহিত মান্যতা দেবে না? তা হলে এ কেমন শিষ্ট সমাজ, এ কেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সদাচার, সহবত? এ কেমন প্রগতি তবে? এ কোন্‌ অশ্বমেধের ঘোড়া? এ কিসের দিগ্বিজয়?

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন ভাবছিল এই সব। একজন রেখা দেখছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির এই জগৎকে। মানুষ গড়তে গড়তে ভাঙছে, আবার ভাঙতে ভাঙছে গড়ছে। তারা দেখছিল এই ঘুরপাক, এই পাল্লাদৌড়, এই ঘরবারান্দা দরদালানে মিলিয়ে বাঁচার নানা কসরত। যার শেষ অভিমুখ তবু তো সেই মানুষ। সেই মানুষ, যে উদাসীন, প্রশান্ত, আবার যে আগ্রাসী, জাঁহাবাজ। যে জীবনের রাজপথে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা হাসিল করে কৃতার্থ, হিসেবি, চৌখস, চাকচিক্যময়। পরম বিজয়ী। আবার যে চরম পরাজিত। সোনালি সফলতার সহজপাঠ যে জীবনেও পড়েনি, পড়তে চায়নি। ইঁদুরদৌড়ের পৃথুল হ্যাংলামির থেকে ঢের দূরে থেকেছে। যে একেবারে হেরে হেরে ভূত, জীবনের সরাইখানায় ভুল নেশায় চুর, ফতুর—হাসতে হাসতে কপর্দকশূন্য—এদের সব্বাইকে নিয়ে, এদের সবাইয়ের জন্যই দীপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। সময়টা ছিল ষাট-সত্তরের গোধূলিসন্ধি, নতুন মিলেনিয়াম তখনও ঢের দূরে।

আর এখন, আমরা দেখছি বিশ্বায়ন, বিন লাদেন, বাজার অর্থনীতি, আর বেবাক বুদ্ধিজীবীদের উত্তর-আধুনিক তত্ত্বতামাসা। বুঝেছি, "অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে/ আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।" ভাবছি, সমস্ত কাঞ্চন কি কাচ হয়ে গেল তবে? কোনো রেখাই কি তবে সরল নয়? শেষ পর্যন্ত তারা সবাই কি সময়ের কারসাজিতে বৃত্তাকার শূন্যে হারিয়ে যায়?

তপোবিজয় ঘোষ

বাংলার ১৩৪৪ সাল ইং ১৯৩৭, ২৭ জুলাই। ময়মনসিংহ জেলার নারায়ণপুর গ্রামে জন্ম নেন তপোবিজয়। পিতা ধনঞ্জয় ঘোষ, মাতা জ্ঞানদাদেবী। মাত্র ন-বছর বয়সে মাকে হারান। কিশোর তপোবিজয়ের জীবনকে চেনা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জেরে ছিন্নমূল হয়ে আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুকেন্দ্রে। বাস্তুহারানোর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক বছরের মধ্যেই পিতাকে হারান। রামপুরহাট স্কুল থেকে পাশ করে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াকালীন শুরু হয় সাহিত্যচর্চা। ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রবিবারের যুগান্তর সাময়িকীতে প্রথম গল্প 'মা' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়তে আসা। পরবর্তী জীবনে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হন। 'নন্দন', 'চতুষ্কোণ', 'লেখা ও রেখা', 'মাসিক বাংলাদেশ', 'বসুমতী', 'সত্যযুগ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা থেকে পরপর প্রকাশিত হতে থাকে শিহরণ জাগানো ছোটগল্পগুলি। এগুলি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'কালচেতনার গল্প' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত হয়। ১৯৪৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'সামনে লড়াই'। লিখলেন 'রাত জাগার পালা (নন্দন শারদীয় ১৯৪৮); চালচিত্র (১৯৫৫); দহনদাহন (১৯৫৮)। নির্ভীক লেখক তপোবিজয় যার হৃদয়ের পরতে পরতে কালচেতনা স্পষ্ট দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধি তাঁর লেখনীকে স্তব্ধ করে দেয় ১৩৫৫ সালের ১০ই ভাদ্র ইং ১৯৪৮ ২৭ আগস্ট।

এখন প্রেম : একটি নিবিড় বিশ্লেষণ

মিতালী ভট্টাচার্য

এক

"সমগ্রদেশ যখন একদিকে ক্ষুধা, ঘৃণা প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে দাউ দাউ জ্বলছিল, আর অন্যদিকে বুলেটে বেয়নেটে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পথে প্রান্তরে অরণ্যে বন্দীশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছিল—তখন নিরাপদে গৃহকোণে বসে বাঁশি বাজাইনি। সেই আতঙ্কপাণ্ডুর সন্ত্রাসের অবস্থার মধ্যেই আমরা লেখক শিল্পীরা একদিকে গড়ে তুলেছি 'গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী' (১৯৫৮), অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করেছি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সাহিত্যরচনায়।"

(লেখকের কথা/ কালচেতনার গল্প)

—এ অঙ্গীকার তপোবিজয় ঘোষের। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব একজন বলিষ্ঠ, নির্ভীক রাজনৈতিক লেখক হিসেবে। তাঁর আবির্ভাবের আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এসে গেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী পৌঁছে যাচ্ছে চরিত্রের গহন অন্তর্লোকে। সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিতে সমাজ নতুনভাবে বিশ্লেষিত হচ্ছে। সমরেশ বসু, নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশ সেন প্রমুখরা বাংলা ছোটগল্পকে নতুন রূপ দিলেন। আসলে পরপর দুই বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা পাল্টে দিল মানুষের জীবনের চেহারা। এরই প্রতিফলন পড়ল ছোটগল্পে। আর এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বেড়ে ওঠা তপোবিজয় ঘোষের লেখাতেও ফুটে উঠেছে কঠোর সমাজবাস্তবতার ছবি। আমরা পাচ্ছি নিম্নমধ্যবিত্ত নিঃস্ব সীতানাথের মত চরিত্র যারা বাজারের সেরা পণ্যগুলি শুধুমাত্র দেখে চলে আসেন; অথবা 'ক্ষুৎকাতর' গল্পের শচীকান্তদের, যারা নাভির চারপাশের ক্ষিদের অনুভবটুকু চেপে রেখে ভোরের প্রতীক্ষা করে; অথবা কুণ্ডুবাবুর কুকুর আমি এবং 'ভূতনাথ' গল্পের মাস্টারমশাই-এর কথা, কুণ্ডুবাবুর কুকুরের সামনে জুঁই ফুলের মত সাদা ঘন টলটলে দুধের গামলা দেখে যার মনে পড়ে যায় অভুক্ত ছোট ভাইবোনদের কথা, বা রোগা মায়ের হলুদ চোখের জলের ধারার কথা।

এই তপোবিজয় যখন ষাট ও সত্তর দশকে মোটামুটি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল হয়ে কলম ধরেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গে চলছে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক সন্ত্রাসের রাজত্ব; অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ দিবারাত্র শুনছে গুণ্ডাবাহিনীর জান্তব উল্লাস ও মানুষের বাঁচার জন্য আর্তনাদ। খুঁজে পাওয়া গেল না শোভন, সুমনদের মত তরতাজা ছেলেদের। 'কপাটে করাঘাত' করে ভুবন মাস্টারের মত এমন অনেক বাবা-মা-র সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত সন্তানকে। ষাট ও সত্তর দশকের এই বধ্যভূমির ইতিহাস তাঁর প্রত্যেকটি

সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। 'এখন প্রেম' (প্রথম প্রকাশ শারদীয় লেখা ও রেখা পত্রিকায়, ১৯৫৮ সনে) গল্পের মধ্যেও দেখিয়েছেন কিভাবে সত্তর দশকের বীভৎসতা মানুষের সুখানুভূতিকে পর্যন্ত অসাড় করে দিয়েছে।

দুই

সীতেশ এক মধ্যবিত্ত কেরাণী। মাসের প্রথম রবিবার সে তার প্রেমিকা কৃষ্ণাকে নিয়ে সিনেমা দেখে। এমন কোনো এক রবিবার সিনেমাহলের সামনে সীতেশ অপেক্ষা করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কৃষ্ণা পৌঁছাতে পারে না। পরদিন কৃষ্ণার ফোনে সব জেনে অফিস থেকে ফেরার পথে সীতেশ নিজেই উপস্থিত হয় কৃষ্ণার টালিগঞ্জের বাড়ীতে। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই সেখানে শুরু হয়ে যায় সত্তর দশকের সেই তাণ্ডবলীলা। কৃষ্ণার উদ্বেগের বেড়া ছিন্ন করে সীতেশের সে রাতে বাড়ী ফেরা হয় না। অনেকরাতে সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি শান্ত হলে দুটি নরনারী তাদের অবরুদ্ধ কামনার ডাকে পরস্পরের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। সেই সময় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে পুলিশের রাইফেলের গর্জন ও এক আকুল আর্তনাদ এবং তারপরই এক যুবকের অর্ধমৃত দেহকে নিয়ে পুলিশের জান্তব উল্লাস সারারাত্রির মত তাদের সুখানুভূতিকে অসাড় করে দেয়। "তারপর সারারাত্রি ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। সারারাত্রি পরস্পরের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। ঠাণ্ডা নীল পাংশু মুখে শক্ত কঠিন শরীর নিয়ে এই দুই যুবক-যুবতী ভাঙাচোরা বাড়িটার তিনতলার একটি অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি তন্দ্রাহীন নির্ঘুম চোখে নিঃশব্দে বসে থেকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।"

তপোবিজয়ের যুগচেতনা এতই স্পষ্ট ছিল যে, অধিকাংশ গল্পের প্রেক্ষাপটেই এসেছে সত্তর দশকের বীভৎসতা। 'এখন প্রেম' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গল্পের শিরোনামের দুটি শব্দ উচ্চারণ করলেই বোঝা যায় এখানে প্রাধান্য পেয়েছে প্রথম শব্দটি। অর্থাৎ লেখক জানাতে চাইছেন সেই বিশেষ সময়কে, যে সময় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে প্রেম তাকেও নিস্পন্দ করে দেয়। এত নিখুঁতভাবে তিনি এই সময়ের ছবি এঁকেছেন যে এই গল্প শেষ করার পর সত্তর দশকের সেই আতঙ্কগ্রস্থ দিনগুলির কথা স্মরণ করে কৃষ্ণা ও সীতেশের মত আমাদের সুখানুভূতিগুলি কিছুক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে যায়। এইখানেই এই গল্পের শিরোনামের সার্থকতা। আর তপোবিজয়ের এই গল্পগুলিকে ঠিক 'ট্রাডিশনাল' প্রেমের গল্প আখ্যা দেওয়া যায় না বরং প্রতিটি গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র এক অনুভব। এ অনুভব মানব-মানবীকে আরো দৃঢ়, প্রত্যয়ী এবং সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে।

তিন

'এখন প্রেম' গল্পটি যতটা বিষয়মুখী ততটা চরিত্রপ্রধান নয়। তবু এই গল্পে লেখক জীবনাভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন প্রতিটি চরিত্র। সীতেশ, কৃষ্ণা, কৃষ্ণার মা—প্রত্যেকের অনুভব, বিশ্বাস, সহমর্মিতা, সুবিধাভোগী মানসিকতার শিল্পিত রূপ এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

এ গল্পের নায়ক সীতেশ হাজার টানাপোড়েনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে তাদের প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। মাসের প্রথম রবিবার প্রেমিকা কৃষ্ণাকে নিয়ে সিনেমা দেখার 'শৌখিনতাটুকু' তার 'সদ্য-মাইনে-পাওয়া পকেট' 'পারমিট' করলেও তার মধ্যবিত্ত বিবেকের পারমিশন পেতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া চালাতে হয়। তাই আগে সে হিসাব করত নিজেদের এই ভালোলাগাটুকু থেকে বঞ্চিত করলে সংসারের কি কি উপকার—হতে পারে। কিন্তু 'সমুদ্রে যে শয়ন করেছে শিশিরে তার কি ভয়-গোছের একটা নির্লিপ্ততা সীতেশকে এখন মরিয়া করেছে।'

শুধু 'চক্ষুলজ্জার' জন্য সীতেশ ইচ্ছা করলেও তিন টাকার টিকিট আড়াই টাকা মুনাফায় বিক্রি করতে পারে না। বরং "সত্যি সত্যি 'ব্ল্যাক' করে বসে—এই ভয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া মানুষের ভিড় ঠেলে রাস্তায় নেমে সামনে যাকে পায় তার হাতে গুঁজে দিয়ে টাকা তিনটে নিয়ে ময়দানের দিকে হাঁটতে শুরু করে।" সীতেশের এই ভয় প্রমাণ করে সে মধ্যবিত্ত। তাই সনাতন মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটাতে পারে নি সীতেশ। পাশাপাশি নিজের অভাবী মনটাকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারে না—তাই তার দ্রুত পলায়ন।

আবার কৃষ্ণার জন্য সীতেশের উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণার অনুপস্থিতিতে তার ক্ষিপ্ত বিষণ্ণতা, পরদিন সব রাজনৈতিক অস্থিরতা উপেক্ষা করে কৃষ্ণার বাড়ীতে ছুটে যাওয়া—সবকিছুর মধ্যে ফুটে ওঠে সীতেশের প্রেমিক সত্তাটি। সীতেশ ও কৃষ্ণার মর্মমূল যে একইসমাজে প্রোথিত। তাই সীতেশ সহজেই অনুভব করতে পারে কৃষ্ণার যন্ত্রণা। অদ্ভুত সহমর্মিতায় সংসারের পেষণে ক্লান্ত কৃষ্ণাকে সে বুঝিয়ে দেয় এই সংগ্রামই জীবন। হেরে না গিয়ে বরং তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হয় এই লড়াইকে। সার্কাসের মেয়েদের রঙীন ছাতা হাতে সরু তারের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সঙ্গে উপমিত করে তাঁদের প্রাত্যহিকতার লড়াইকে। সীতেশ কৃষ্ণাকে বোঝায় 'আমাদের বাঁচাটাও তেমনি, রকমারি সমস্যার সরু তাদের ওপর দিয়ে হাঁটা-চলা, বেড়ে-ওঠা। আর ওই রঙচঙে ছাতাটা আমাদের ভালোবাসা, জীবনের ব্যালান্স রাখে।'

এ গল্পে সীতেশের মত কৃষ্ণাও তার ক্ষোভ, বিষণ্ণতা, উৎকণ্ঠা, আবেগ সবটুকু নিয়েই নিটোল-ভাবে চিত্রিত। সে 'মধ্যবিত্ত ঘরের স্কুল-মাস্টারনী।' সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষ্ণা আজ ক্লান্ত বিধ্বস্ত। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা তার অজানা। এই জীবন তার কাছে আর কোনো নতুন অর্থ বহন করে না। তাই প্রেমিকের পাশে বসেও কৃষ্ণা কোনো সুখস্বপ্ন রচনা করতে পারেনি বরং তাদের গল্পের বিষয় হয়েছে স্কুলের বকেয়া ডি.এ.। 'পথ হাঁটতে মানুষ' গল্পের অর্চনার মতো কৃষ্ণাও বোঝে সংসারের প্রতিটি মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনুভব করে যেন তার মা সীতেশকে আজ আর সহ্য করতে পারে না। তাই ক্লান্ত বিষণ্ণতায় সীতেশকে জানায় এই জীবন আর তার ভালো লাগে না।

তবে এই ক্লান্তিটুকুই শেষ কথা নয়। লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কৃষ্ণার আবেগ, ভালোবাসার মানুষের জন্য উৎকণ্ঠা, অবরুদ্ধ কামনার প্রকাশ। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সীতেশকে তাদের বাড়ী আসতে দেখে গভীর উদ্বেগে উত্তেজিত কৃষ্ণা সীতেশকে প্রশ্ন করে 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে? কেন এলে?' এই উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণা সীতেশকে মুগ্ধ করে।

"যেন অনেকদিন পরে ভালোবাসার একটা গাঢ় জীবন্ত রঙ কৃষ্ণার চোখে-মুখে টলটল করতে দেখে সীতেশ।" এত দুর্যোগের পরও রাত্রির নিস্তব্ধতায় সীতেশের বক্ষলগ্ন হয়ে কৃষ্ণা তার কামনাকে মুক্তি দিতে চায়। এখানেই পরিপূর্ণ এক মানবীর প্রকাশ ঘটে তপোবিজয়ের লেখনীতে।

সীতেশের জবানীতে কৃষ্ণার-মার যে সুবিধাভোগী রূপ ফুটে উঠেছে তা আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে না, বরং সীতেশের মত আমাদেরও সেই বৃদ্ধাকে অসহায় ও করুণ বলেই মনে হয়। সীতেশের এই 'আবাল্য পরিচিত মাসীমা', একদিন যিনি তাকে 'প্রায় পুত্রবৎ' স্নেহ করতেন 'সেই স্নেহ টলটলে মাসীমার মুখে এখন কি অসম্ভব কর্কশতা।' এর জন্য দায়ী আর্থসামাজিক কাঠামো। এই সমাজকে তপোবিজয়বাবু নিবিড়ভাবে চিনতেন। তাই যে সমাজে মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক রসদ জোগাড় হয় না, সেই সমাজের অর্চনারা মা, ভাইবোনের চাহিদার সামনে চীৎকার করে বলে উঠতেই পারে :

> "পারব না। আমি আর কিছু পারব না মা। আমাকে মুক্তি দাও।" (পথ হাঁটতে মানুষ)

বৃদ্ধ সীতনাথদের কৌশলে দোকানিকে ফাঁকি দিয়ে চিড়ে, গুড় সংগ্রহ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার মধ্যে কোনো অপরাধ থাকে না। অথবা, কৃষ্ণার মা-এর মতো অসহায় বৃদ্ধারা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো ভাবী জামাইকে বলতে বাধ্য হয়—

> "সীতু, কৃষ্ণার বাবা বেঁচে থাকলে ভাবতাম না। এখন আমার সংসারের যা অবস্থা, মন্টুর একটা চাকরি-বাকরি না হলে..........."

শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তিটুকু নিবারণের জন্য মানুষেব এই অসহায় স্বার্থপরতা দেখে সীতেশের মতো আমাদেরও বুকের ভেতরটা ব্যথিয়ে ওঠে।

এই গল্পে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে সময়। এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা কৃষ্ণা ও সীতেশের প্রেম সত্তর দশকের এক বিভীষিকাময় রাতে কিভাবে দলিত মথিত করে ফেলা হল তারই বাস্তব ছবি এখানে উঠে এসেছে। আসলে তপোবিজয়বাবু এখানে দেখতে চেয়েছেন কীভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল কালো রাতের অন্ধকারে, রাইফেলের গর্জনে এবং আকুল আর্তনাদে। সীতেশ যে রাতে কৃষ্ণার বাড়ী থেকে যেতে বাধ্য হয়, সেই রাতে দুটি পূর্ণ যুবক-যুবতীর যে মিলন একান্ত কাঙ্ক্ষিত ছিল তা পরিপূর্ণতা পায় না পুলিশের জান্তব উল্লাস ও কোনো এক তরতাজা যুবকের মৃত্যুর বীভৎসতা দেখে। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় তারা দেখল সত্তর দশকের আর একটি কালিমালিপ্ত রাতকে। জান্তব উল্লাসে কজন পুলিশ যে তরতাজা যুবকের দেহ দুই পা ধরে টানতে টানতে আনছে তার 'মুখ থেৎলে গেছে, চোখদুটি বিস্ফারিত সারা শরীর রক্তে মাখামাখি।' পুলিশ যখন তাদের গাড়ির পাটাতনের উপর সশব্দে দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিল তখন ছেলেটির যন্ত্রণায় ছিন্ন ভিন্ন প্রাণ 'একটা তীব্র ক্রুদ্ধ গোঙানি'র মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের এই চূড়ান্ত অবমাননার প্রতিবাদ জানিয়ে গেল শেষবারের মতো।

এই বীভৎসতা দেখার পর মানুষের যে কোনো সুখানুভূতির যে পরিণতি হয় 'এখন প্রেম' গল্পের কৃষ্ণা-সীতেশের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরস্পরের দিকে চোখ তুলে

তাকানোর ইচ্ছাটুকুও চলে যায়। "ঠাণ্ডা নীল পাংশু মুখে শক্ত কঠিন শরীর নিয়ে এই দুই যুবক যুবতী ভাঙাচোরা বাড়িটার তিনতলার অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি তন্দ্রাহীন নির্ঘুম চোখে নিঃশব্দে বসে থেকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।"

এখানেই তপোবিজয়ের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কোনো গল্পই ভাঙনের মধ্যে শেষ হয়নি। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে রয়েছে উত্তরণের ইঙ্গিত। এই গল্পেও কৃষ্ণা ও সীতেশের প্রেম অবিশ্বাস ও অস্থিরতার অমানিশায় হারিয়ে যায়নি; বরং তারা নিঃশব্দে বসে থেকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করেছে। 'নক্ষত্রের আলো' গল্পেও দেখি মেয়েটি যখন পড়ার খরচ চালানোর জন্য তার ঘড়িটি বিক্রি করে এল তখন তার শ্বেতশুভ্র নগ্ন হাতটি তার সহপাঠী ছেলেটির বুকের মধ্যে যন্ত্রণার উদ্রেক করলেও, এই নিঃস্বতার মধ্যে গল্প শেষ হয়নি। পরমুহূর্তেই ছেলেটি অনুভব করেছে এক গভীর প্রত্যয়—"তোমার সাহসে আমিও সাহসী হলাম, তোমার চোখের মণিতে এখনও যে দীপ্তি জ্বলজ্বল করছে, বুঝলাম, এ সহজে নিভে যাওয়ার নয়, নয় সহজে হারাবার।" একগুচ্ছ টাট্‌কা রজনীগন্ধা কিনতে না পারার জন্য সরলা ও সুরঞ্জনের বিয়েতে পাওয়া ফুলদানীটা হয়ত অব্যবহৃতই থেকে গেছে কিন্তু এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই সুরঞ্জনা ও সরলা শত্রুদের চিনতে শিখেছে। এই বিশ্বাসের জগতে উত্তরণ ঘটানোতেই তপোবিজয় ঘোষের সিদ্ধি।

চার

শেষকথায় এই গল্পের ভাষা নিয়ে কিছু না বললে একটু অপূর্ণতা থেকে যায়। কারণ তপোবিজয় বাবুর ভাষাব্যবহারে এক বিশেষ প্যাটার্ণ লক্ষ্য করা যায়। ছোটো ছোটো কাটা কাটা বাক্যে বর্ণনার মাধ্যমে সরাসরি ঘটনার মাঝখানে এনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। অধিকাংশ বাক্যে অন্বয়গত বিপর্যয় ঘটলেও তা লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে বলেই মনে হয়। যেমন :

(১) হলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল সীতেশ।

অথবা, মাসের প্রথম রবিবারে একটা সিনেমা দেখে ওরা।

এখানে কর্তাকে বাক্যের শেষে এনে ব্যক্তির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরিস্থিতি অনুসারী বাক্যগঠন এই গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গল্পের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কৃষ্ণার জন্য অপেক্ষমান সীতেশের ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা বোঝাতে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন:

> "সীতেশ হাঁ করে বাস দেখে, ট্রাম দেখে। এমনকি, দেরী হয়ে গেছে বলে এলেও আসতে-পারে ভেবে অবিশ্বাসী দৃষ্টিপাতে ট্যাক্সিও দেখে। কৃষ্ণার মতোই শাড়ী-পরা পাতলা গড়নেব কাউকে দেখে 'যাক এসে গেছে' ভেবে খুশি হতে গিয়ে পচাবাদাম মুখে পড়ার বিস্বাদে রাগান্বিত হয়ে ওঠে।"

আবার পাশাপাশি চলমান সিনেমা হলের ক্ষিপ্রতা বোঝাতে তৃতীয় অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

"ভেতরে মূল ছবিটাও শুরু হয়ে গেছে। বাইরে হাউস-ফুল টাঙানো। জমজমাট বই।....."

এরই পাশাপাশি রোমান্টিক পরিবেশের বর্ণনায় কাব্যিক গদ্যভাষার ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। যেমন, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সীতেশের চোখে কৃষ্ণার বর্ণনা—

"ওর টান করে বেণী বাঁধা চুলের মাঝখানে বড় সাদা সিঁথিটায় বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর চিকচিক করে।........"

অথবা, "যেন অনেকদিন পরে ভালোবাসার একটা গাঢ় জীবন্ত রঙ কৃষ্ণার চোখে মুখে টলটল করতে দেখে সীতেশ।"

দীর্ঘ বর্ণনা নয়, বরং ভাষার স্বচ্ছতা ও দৃশ্যমানতা তপোবিজয়ের লেখাকে পাঠকের অনেক কাছাকাছি এনেছে। লেখকের বিশেষণ প্রয়োগের চিত্রধর্মিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। যেমন :

সরু ঘোলাটে চাঁদ, ক্ষিপ্ত বিষণ্ণতা, ভয়-ভয় বিবর্ণ হাসি, মৃত্যুর মত হিমশীতল স্তব্ধতা, জান্তব উল্লাস, ধাবমান, ব্যস্ততা, দলবদ্ধ ছুটন্ত বুটজুতার বিকট শব্দ ইত্যাদি।

চরিত্রকে ফোটাবার জন্য পৃথক পৃথক মেয়েলি অব্যয় বা ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভাষাকে জীবন্ত করেছে। যেমন: কৃষ্ণার কথা—

১। 'ধুৎ, আর ভালো লাগে না'।

২। 'ধুৎ, ইয়ার্কি ভালো লাগে না'।

৩। 'ঢঙ্। সোজাসুজি বলছ না কেন?'

৪। 'ছাই হবে। অমন বহুবার বলা হযেছে।'

৫। ভাল্লাগে না।

এই শ্রেণীগত উপভাষার ব্যবহার অবশ্যই তপোবিজয় ঘোষের জীবনঘনিষ্ঠতারই পরিচায়ক।

শেষে একটা কথা বলতেই হয় 'মহৎ সাহিত্যের' একটি বিশেষ লক্ষণ যদি হয় পাঠককে 'নাড়া দেওয়া' তবে এই গল্প শেষ করার পর সৎ পাঠককে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভাবিত হতেই হয়। এখানেই ছোটগল্প হিসাবে 'এখন প্রেম' গল্পের সার্থকতা।

[লেখকের ব্যক্তিপরিচয় জানতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে লেখকতনয়া পারমিতা ঘোষের 'যখন শুধুই স্মৃতি' প্রবন্ধটি।]

সাধন চট্টোপাধ্যায়

(জন্ম : ১৯৪৪)

জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। পদার্থবিদ্যায় অনার্স-সহ স্নাতক। পেশা শিক্ষকতা। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই বছরই 'নন্দন' পত্রিকায় প্রথম গল্প 'বন্যা' প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্পের মোট সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়েছে। উপন্যাস এবং প্রবন্ধও লেখেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— জলতিমির, মাটির অ্যান্টেনা, গুল্মতলায় ইলেক্ট্রন, পিতৃভূমি। তিনখণ্ডে গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

স্টীলের চঞ্চু : দুই সময়ের সংঘাত

আশিস পাঠক

দুটো ভিন্ন সময় মিলতে পারছে না একে অপরের সঙ্গে। আর সেই সংঘাতকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন গল্পকার। হয়তো বা তিনি নিজে দুই সময়েই যাপন করেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পটির প্রথম পাঠ এই অভিজ্ঞতারই জন্ম দেয়।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতাতেই গল্পটির শেষ নয়, তার মধ্যে নিহিত থাকে কিছু প্রশ্নচিহ্নও, বলা ভাল কিছু সমস্যাচিহ্ন। যে সমস্যাগুলির সমাধান হয় না, কিন্তু যেগুলিকে বোঝার চেষ্টার মধ্যেই সম্ভাবনা থাকে গল্পটির ভিতরের পরতগুলি খুলে দেখবার।

স্টীলের চঞ্চু পড়তে গিয়ে সেই চেষ্টাটাই করব। কিন্তু তার আগে ভিতরে ও বাইরে, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য ও তারিখে চিহ্নিত করে নেওয়া জরুরি ওই দুই সময়কে।

চরিত্রনামই ওই দুই সময়ের সার্থক চিহ্নায়ন—রুনুর সময় এবং ভূপতির সময়। লক্ষ্য করার বিষয়, এ দুয়ের কোনওটিই কেবল ব্যক্তিগত নয়; রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনার টানাপোড়েন দুই সময়কেই প্রভাবিত করেছে, শৃঙ্খলিত করেছে, এবং শৃঙ্খল ভেঙেও দিয়েছে।

রুনুর সময়ের বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে আমাদের প্রধান অবলম্বন তার আত্মকথন। কিন্তু সেই সময়ের তারিখ সরাসরি গল্পে আসেনি, না-আসাটাই স্বাভাবিক, আমি পরোক্ষ সাক্ষ্যে তাকে একটা মোটামুটি দশকে চিহ্নিত করতে চাইব। রুনু সম্পর্কে তার পিতা ভূপতি-র *কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে, অ্যাকউন্ট ক্লার্কের চাকরিটি হাতে পায়, ভেবেছিলাম আমার দীর্ঘ ঘানি টানার দিন অস্তমান।* অর্থাৎ রুনুর বয়স ধরে নেওয়া যায় পঁচিশের কাছাকাছি। ও দিকে ভূপতি বলেছে সে ৪২-এ ম্যাট্রিক পাশ করেছে, সারা পাঁচের দশক মাইলের পর মাইল হেঁটেছে, তার পরে চাকরি, তার পরে বিয়ে—একটু বেশি বয়সে। অর্থাৎ ১৯৬২-৬৩ নাগাদ তার বিয়ে। অর্থাৎ যে সময়ে রুনু এই আত্মকথন লিখছে তা আটের দশকের শেষ দিক, ধরে নেওয়া যায়।

এখন, এই আটের দশকের শেষ দিক পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের ভাটারও পরবর্তী কাল। এই সময়ে কোনও টালি আর দরমার বেড়ার ঘরে গোপন চক্র, তার প্রেসিডেন্ট আর চার সদস্য নিয়ে পলিটব্যুরো ইত্যাদি কিছুটা সময়-অসঙ্গত বলে মনে হয়। আর সেই অসঙ্গতিবোধটা থাকে বলেই রুনুর আত্মকথন, প্রেসিডেন্টের উপরে তার অন্ধ বিশ্বাস এবং পলিটব্যুরো মিটিংয়ের প্রেক্ষিত-পরিবেশ এক ধরনের মজা তৈরি করে।

একটা পুরনো, ভুল যান্ত্রিক অবিশ্বাস আর একটা পুরনো, ভুল যান্ত্রিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইছে খানিকটা লড়াইক্ষ্যাপার মতো—এইখানেই মজাটা তৈরি হয়। রুনু বলছে, *সমাজ না পাল্টালে অসুখ সারে? মেশার মানুষ কোথায়? এরা সব অন্ধ, বধির। অতীত সম্পূর্ণ উপড়ে সব কিছু বদলে না দিলে শরীরের ময়লা যায় না।* বস্তুত রুনু এবং তার প্রেসিডেন্টের সব ধারণাই এই রকম, পুরনো সব বাতিল করে অকস্মাৎ কোনও নতুন

সমাজ এনে ফেলার অলীক স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেখা এবং কল্পিত গোপনীয়তার আঁচ পোয়ানোতেই তাদের বিপ্লব-বিলাস। সে বিলাস এই ভাবে ধরা পড়েছে গল্পে, রুনুর আত্মকথনে :

আমাদের কথাবার্তা, হাসি অত্যন্ত গোপন। অনেকটা তন্ত্রসাধনার মতো। প্রেসিডেন্ট নতুন প্রস্তাব দিলেন। আমাকে উদাহরণ টেনে বললেন,

ভালো কাজ, জনগণের কাজ সর্বদা ক্যামোফ্লেজে করতে হয়। রুনু অসুস্থ, বুর্জোয়া ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে—এটা যেমন ছদ্মবেশ, কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেকে অংশীদার না করা। এই চক্রও সেরকম দাতব্য হোমিওপ্যাথি খুলতে চায়। জনগণের জন্য ফ্রি চিকিৎসা। উপরে ওষুধপত্র থাকবে আর মাটির নীচে রাখব অস্ত্র। কেমন আইডিয়া?

এই রোমাঞ্চকর আইডিয়ার পরেই পলিটব্যুরোর চায়ের দরকার হয়। কিন্তু তার পয়সা আসবে কোথা থেকে? চা-দুধ-চিনি আনতে যায় সুতপা, চক্রের একমাত্র মহিলা সদস্য সুতপা, তার বাবার পকেট থেকে চুরি করে আনা পয়সায়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সেই ব্যবস্থা থেকেই চুরি করে আনা পয়সায় গরম চা-সহযোগে 'বৈপ্লবিক' আড্ডা—এই স্ববিরোধ এ গল্পে যত না মুখ্য তার চেয়ে বেশি এই অসঙ্গতি যে এ লড়াই কার বিরুদ্ধে?

আমাদের পূর্বকথিত ওই সময়-সংঘাতের জন্মও এই প্রশ্ন থেকেই। আমরা দেখি, ওই পলিটব্যুরোর যে চরিত্রটি এ গল্পে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে সেই রুনুর লড়াইটা আসলে তার বাবা, ভূপতির বিরুদ্ধে। ভূপতিকে সে এই সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি বলে মনে করে। সমাজব্যবস্থার প্রতি শত্রুতা তার যত অন্ধ, তার চেয়েও যেন বেশি অন্ধ ভূপতির সঙ্গে তার শত্রুতা। তাই ভূপতি তাকে স্নান করতে বললেও সে রেগে যায়, ভূপতি এবং তার শ্রেণি সম্পর্কে বলে, *ওরা শুধু ছেঁড়া কাঁথায় তালি লাগাবার কথা বলে। সমাজের অসুখের মূল খোঁজে না।*

কিন্তু প্রশ্ন হল, রুনুরাই কি সমাজের অসুখের মূল খুঁজেছে? না কি অসুস্থ বলে সমাজটাকেই বাতিল করতে চাইছে, ঠিক যেমন মাথাব্যথা হলে মাথাটাই কেটে ফেলবার কথা বলা? শত্রু কে সেটা চিহ্নিত করতে না পেরে, শত্রুর একটা অলীক মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে রুনু, নইলে যুদ্ধ-বিলাস সার্থকতা পায় কী করে?

রুনুদের বিপ্লব-বাসনা তাই এক যুদ্ধু যুদ্ধু খেলায় পর্যবসিত হয়। রুনু দেখতে পায় (বলা ভাল, দেখতে চায়) :

ঐ তো মরা গাছটার শুকনো, কঙ্কাল শাখায় কাকটা বসে আছে, কত দিন ধরে, মানুষগুলোর নজরে পড়ে? আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। কী ভয়ঙ্কর বিপদ যে শিয়রে দাঁড়িয়ে, বোঝায় কার বাপের সাধ্যি। বলতে গেলেই আমার অসুখের প্রশ্ন তোলে। এত বড় বিশাল কাক সহসা চোখে পড়ে না। ঝিম কালো। সন্ধানী-চোখজোড়া সম্পূর্ণ চঞ্চু। ঝকঝকে। রোদের ঝিলিকে চোখ অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি স্পষ্ট জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। চতুর্দিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছে। কঠিন চঞ্চুতে পেট, নাড়ি-ভুঁড়ি চিরে, খুবলে শেষ করে দেবে। একটু আগেই বোধহয় ইঁদুর ধরেছিল, তাজা রক্তের দাগ। এখন খুঁজছে শিশুদের যকৃৎ।

এই 'স্টীলের চঞ্চু' নামকরণের মধ্যে এক ধরনের ব্যঙ্গও আছে লেখকের। রুনু ও তার সঙ্গীদের 'বিপ্লব' যে জীবন-বিচ্ছিন্ন, কৃত্রিম সেই ইঙ্গিত এই ব্যঙ্গকে সম্ভব করে তুলেছে।

আবার এই চিত্রকল্পের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি করা কৃত্রিম মন্বন্তরের আভাস আছে। আমরা যদি ভূপতির আত্মকথন থেকে তার সময়টাকে বোঝবার চেষ্টা করি তবে দেখব সেখানেও ছিল এ রকম এক সর্বগ্রাসী অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই। ভূপতি কেবল ছা-পোষা, পলায়নপর মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ নয়, সেও একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিপ্লবের টানে। ভূপতি বলছে, *মুক্তির বাস্তব রূপ কাঠামো চিনতাম না, আবেগের বিপুল বাতাসে উড়ে, কলেজ সাঙ্গ করেই, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম দেশের কাজে। কমরেড! সারা পাঁচের দশক মাইলের পর মাইল হেঁটেছি, কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, কত সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশ্বাস করতাম মানুষের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। সেবা, দায়বদ্ধতা, রাজনীতি—যে বিশেষণই দেওয়া হোক না কেন।*

কিন্তু রুনুরা তা বিশ্বাস করে না। স্মরণীয় প্রেসিডেন্টের কথা,—*ভালো কাজ, জনগণের কাজ, সর্বদা ক্যামোফ্লেজে করতে হয়।* রাষ্ট্রযন্ত্রের বাধা এড়াতে গোপনীয়তা অনেক সময়েই অবলম্বন করতে হয় বিপ্লবীদের, কিন্তু যেখানে বিপ্লবটাই অলীক, উদ্দেশ্যহীন এবং ইউটোপিয়ায় আক্রান্ত সেখানে এ ধরনের ধারণা গোপনীয়তার রোমাঞ্চ অনুভব ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হয়।

এবং, এখানেই জন্ম নেয় অসুখ। উদ্দেশ্যহীনতার অসুখ। তত্ত্ব আর জীবনকে এক করে ফেলার অসুখ। রুনু মানসিক বিকারগ্রস্ত কি না সে প্রসঙ্গ তর্কাতীত না হলেও এই অসুখে যে সে আক্রান্ত সেটা বুঝে নেওয়া যায়। তাই ভূপতি-র চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়েও সে অ্যাম্বুল্যান্স ফিরিয়ে দেয়, তত্ত্ব আওড়ে বলে,

আমি প্রথমে দেখব ঐ হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, সমস্ত ব্যবস্থাটা কতটুকু সায়েন্টিফিক্, তারপর সিদ্ধান্ত নেব। আজ অ্যাম্বুলেন্স ফিরে যাবে।

এই বিচার, রুনুদের ক্ষেত্রে কোনও দিনই আত্মবিচার, আত্মসমালোচনা হয়ে ওঠেনি। নইলে তারা নিজেদের প্রশ্ন করতে শিখত। প্রশ্ন করত, 'ফিউডাল' সম্পর্কে যিনি তার মা তিনি কেন তার খাওয়ার সময়টা হাতে ওষুধ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন? 'জনগণের প্রকৃত শত্রু' তার বাবা কেন এই বার্ধক্যেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য উপার্জন চালিয়ে যান?

কিন্তু, কেউ কথা কোয়ো না, শব্দ কোরো না, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না...এ যেমন ফ্যাসিস্টদের মর্মবাণী, তেমনই অতি-বিপ্লবীদেরও। তাই নিজের মধ্যে কোনও প্রশ্ন উচ্চারিত হতে না দিয়ে, নিজের মধ্যের স্ববিরোধের শত্রুকে চিনতে না পেরে শূন্যে ঝাঁপ দেয় রুনু। হত্যা করতে চায় অলীক শত্রুকে, সেই স্টিলের চঞ্চুবিশিষ্ট কাকটিকে। ফল, পতন।

যে সময়-সংঘাতের কথা বলেছিলাম এ লেখার একেবারে প্রথমে তা আসলে বহু ক্ষতে জীর্ণ এক সময়ের সঙ্গে অস্থির, শূন্য এক সময়ের।

লেখক পরিচিতি

অচিন্ত্য বিশ্বাস	:	অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা।
অঞ্জনা গুহঠাকুরতা	:	অধ্যাপিকা, নেতাজী নগর ডে কলেজ, কলকাতা।
অদীপ ঘোষ	:	অধ্যাপক, বসিরহাট কলেজ, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
অনন্যা বড়ুয়া	:	অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়	:	শিক্ষিকা, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্কুল, বিধাননগর।
অনির্বাণ রায়চৌধুরী	:	অধ্যক্ষ, আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ডোমজুড়, হাওড়া।
অনিলকুমার রায়	:	অধ্যাপক, সুশীল কর কলেজ, চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	:	প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলকাতা।
অনুজা শেঠ	:	অধ্যাপিকা, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, (প্রাতঃ) কলকাতা।
অপর্ণা দত্ত (চক্রবর্তী)	:	অধ্যাপিকা (আংশিক), কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর, হুগলী।
অপর্ণা সরকার	:	কৃতি ছাত্রী, গবেষক।
অপর্ণা সেনগুপ্ত	:	অধ্যাপিকা, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলকাতা।
অপু দাস	:	অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ (দিবা) পশ্চিম মেদিনীপুর।
অপূর্ব কোলে	:	শিক্ষক, বালি নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল, বালি।
অপূর্ব দে	:	অধ্যাপক, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, হুগলী।
অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়	:	কৃতি ছাত্র, প্রাবন্ধিক।
অমরেশ মণ্ডল	:	অধ্যাপক, হুগলী-মহসীন কলেজ, (দিবা) হুগলী।
অয়ন্তিকা ঘোষ	:	অধ্যাপিকা, আনন্দমোহন কলেজ, কলকাতা।
অরুন্ধতী ভট্টাচার্য	:	অধ্যাপিকা, বিদেশি ভাষা বিভাগ, (স্প্যানিশ) বাঙ্গালোর ইউনিভারসিটি, বাঙ্গালোর
অশোককুমার মিশ্র	:	অধ্যাপক ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ, বেলঘড়িয়া, কলকাতা।
আকাশ চন্দ্র পাত্র	:	কৃতী ছাত্র, প্রবন্ধ লেখক।
আণবিকা গঙ্গোপাধ্যায়	:	কবি, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।
আনন্দময়ী সিংহ	:	অধ্যাপিকা, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি।
আব্দুর রহিম গাজী	:	অধ্যাপক, মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার।
আশিস চক্রবর্তী	:	অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, বীরভূম।
আশিস পাঠক	:	গবেষক, প্রবন্ধ লেখক।
ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী	:	অধ্যাপিকা, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, কলকাতা।
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	:	কলিকাতা বিশ্ববিদালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।
উত্তম বিশ্বাস	:	অধ্যাপক, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা।
উৎপল মণ্ডল	:	অধ্যাপক, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া।

ঊর্মি রায়চৌধুরী	:	অধ্যাপিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঋতব্রত বসু মল্লিক	:	গবেষক, নবীন প্রাবন্ধিক।
কণিকা বিশ্বাস	:	অধ্যাপিকা, দুর্গাপুর সরকারী কলেজ (দিবা), বর্ধমান।
কাজরী মুখোপাধ্যায়	:	শিক্ষিকা, প্রাবন্ধিক।
কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস	:	অধ্যাপক, মহাদেবানন্দ মাহবিদ্যালয়, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
কিশলয় জানা	:	অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজকলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
কৃষ্ণগোপাল রায়	:	অধ্যক্ষ, চাপড়া বাঙ্গালঝি কলেজ মহাবিদ্যালয়, নদীয়া।
গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট	:	শিক্ষক, বজবজ পি. কে. হাইস্কুল, বজবজ।
চন্দনা মজুমদার	:	অধ্যাপিকা, উইমেন্‌স ক্রিশ্চান কলেজ, কলিকাতা।
চৈতালী ব্রহ্ম	:	অধ্যাপিকা, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা।
জয়িতা জানা	:	গবেষক, প্রাবন্ধিক।
জয়তী ঘোষ	:	অধ্যাপিকা, লাল বাবা কলেজ, হাওড়া।
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয, কলকাতা।
জয়ন্তকুমার মণ্ডল	·	নবীন প্রাবন্ধিক।
জীবেশ নায়ক	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
তপতী রাউত	:	অধ্যাপিকা, রায়গঞ্জ ইউনির্ভাসিটি কলেজ, উত্তর দিনাজপুর।
তপন মণ্ডল	.	অধ্যাপক, ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
তপোধীর ভট্টাচার্য	:	উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম।
তরুণকান্তি রায়	:	অধ্যাপক, এ. বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার।
তরুণ মুখোপাধ্যায়	:	বিভাগীয় প্রধান, বাংলাবিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
তুষারকান্তি নস্কর	:	কৃতি ছাত্র, গবেষক।
দিলীপ সাহা	:	অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ, বর্ধমান।
দীপালি নাগ	:	প্রাবন্ধিক, গবেষণার বিষয় সমরেশ বসুর গল্প।
দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়	:	অধ্যাপক, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা।
দেবযানী দে	:	গবেষিকা, নবীন প্রাবন্ধিক।
দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ)	:	অধ্যাপিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
দেবাশিস জানা	:	শিক্ষক, কেদারপুর রাম-নন্দ উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
দোস্ত মহাম্মদ (আকাশ)	:	শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক।
নন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়	:	অধ্যাপিকা, প্রসন্নদেব উইমেন্‌স' কলেজ, জলপাইগুড়ি।
নবগোপাল রায়	:	গবেষক, নবীন প্রাবন্ধিক।
নিবেদিতা চক্রবর্তী দত্ত	:	অধ্যাপিকা, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
নিমাই দাস	:	অধ্যাপক, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ, হাওড়া।

নির্মাল্য মণ্ডল	:	অধ্যাপিকা, 'নিউ আলিপুর কলেজ, কলকাতা।
নিলয় বক্সী	:	অধ্যাপক, হুগলী মহসিন কলেজ।
পঞ্চানন মালাকর	:	অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ, বর্ধমান।
পরমেশ আচার্য	:	অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর।
পার্থ শর্মা	:	অধ্যাপক, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, হুগলী।
পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	:	শিক্ষিকা, মুখদা বালিকা বিদ্যালয়, ইছাপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
পিয়ালী দত্ত চৌধুরী	:	অধ্যাপিকা, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা।
পিয়ালী দে মৈত্র	:	অধ্যাপিকা, শ্রীচৈতন্য কলেজ অব কমার্স, হাবরা
পূরবী বিশ্বাস (ঘোষ)	:	অধ্যাপিকা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ, কলকাতা।
প্রণয়কুমার কুণ্ডু	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রতাপরঞ্জন হাজরা	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, হীরালাল পাল কলেজ, হুগলী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রদীপ বৈদ্য	:	অধ্যাপক, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাসাত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
প্রসূন মাঝি	:	অধ্যাপক, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ, কলকাতা।
প্রসেনজিৎ মৃধা	:	অধ্যাপক, জিউনারায়ণ রামেশ্বর ফতেপুর কলেজ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
প্রিয়াংকা চৌধুরী	:	অধ্যাপিকা, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী।
বসুধা বিশ্বাস	:	অধ্যাপিকা, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
বাবুল হোসেন	:	আংশিক সময়ের অধ্যাপক, ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার।
বাসন্তি চাকি	:	অধ্যাপিকা, বঙ্গবাসী কলেজ (প্রাতঃ), কলকাতা।
বিদিশা সিন্‌হা	:	অধ্যাপিকা, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা।
বিপুল মণ্ডল	:	আংশিক সময়ের অধ্যাপক, পাথর প্রতিমা কলেজ।
বিবেক সিংহ	:	অধ্যাপক, কাঁচরাপাড়া কলেজ, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
বিভাবসু দত্ত	:	অধ্যাপক, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগা, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
বিভূতিভূষণ বিশ্বাস	:	অধ্যাপক, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়, কোচবিচার।
বীতশোক ভট্টাচার্য	:	অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, আংশিক সময়ের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশ্বজিৎ কর্মকার	:	অধ্যাপক, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
বিপ্লব চক্রবর্তী	:	অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, আংশিক সময়ের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্রততী ঘোষ রায়	:	প্রাক্তন অধ্যাপিকা, রায়গঞ্জ ইউনির্ভাসিটি কলেজ, উত্তর দিনাজপুর।
বৈশালী বসু	:	অধ্যাপিকা, গর্ভণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী।
ভক্তিপদ দলুই	:	অধ্যাপক, বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ, বাঁকুড়া।
ভাস্কর চৌধুরী	:	অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলী।
মননকুমার মণ্ডল	:	অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।
মনোজ ভোক্ত	:	অধ্যাপক, সামসি কলেজ, মালদা।
মহুয়া বসু ঘোষ	:	অধ্যাপিকা, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া।
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	:	অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
মালবিকা মণ্ডল	:	অধ্যাপিকা, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়,ভদ্রেশ্বর ও হুগলী।
মিঠু নাগ	:	অধ্যাপিকা, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।
মিতালী ভট্টাচার্য	:	অধ্যাপিকা, ইষ্ট ক্যালকাটা গালর্স কলেজ, কলকাতা।
মিলনকান্তি বিশ্বাস	:	অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
মন্দিরা রায়	:	অধ্যাপিকা, চাকদহ কলেজ (দিবা) নদীয়া।
মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়	:	অধ্যাপিকা, বি.আর.এ.বিহাব ইউনির্ভাসিটি, মজফফ্‌রপুর, বিহার।
মুক্তিপদ বিশুই	:	শিক্ষক, ননীবালা বযেজ, ঝাডগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর।
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়	:	অধ্যাপিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
মীনাক্ষী সিংহ	:	প্রাক্তন অধ্যাপিকা, হীবালাল মজুমদার কলেজ অব উইমেন্‌স, দক্ষিণেশ্বর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
মনোরঞ্জন গোস্বামী	·	অধ্যাপক, প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি, পশ্চিম মেদিনীপুর।
মৌ দত্ত	.	অধ্যাপিকা, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়, হাওড়া।
মৌমিতা নায়ক	:	কৃতি ছাত্রী, নবীন প্রাবন্ধিক।
মৌসুমী কুণ্ডু	:	কৃতি ছাত্রী, নবীন প্রাবন্ধিক।
রতনকুমার নন্দী	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেন্‌স, নৈহাটী, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
রঙ্কু দাস	·	অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
রাজেন্দ্রপ্রসাদ দে	:	অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
রানু ঘোষ (কর্মকার)	:	আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, রামসদয় কলেজ, আমতা, হাওড়া।
রীতা মোদক	:	অধ্যাপিকা, নেতাজী নগর ডে কলেজ, কলকাতা।
রুপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়	:	শিক্ষিকা, রাজার হাট বিদ্যালয়, কলকাতা।
রুপা চট্টোপাধ্যায়	:	অধ্যাপিকা, সুশীল কর কলেজ, চম্পাহাটি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়	:	অধ্যাপিকা, খিদিরপুর কলেজ, কলকাতা।
ললিতা রায়	:	অধ্যাপিকা, স্কটিশ চার্চ কলেজ কলকাতা।
শর্মিষ্ঠা সরকার	.	অধ্যাপিকা, দীনবন্ধু এন্ড্রুস কলেজ গড়িয়া, কলকাতা।

শর্মিষ্ঠা গন্ডরায় : অধ্যাপিকা, গুরুদাস কলেজ, কলকাতা।
শর্মিলা বাগচী : অধ্যাপিকা, টি.এম. ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার।
শম্পা মিত্র : অধ্যাপিকা, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগা, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
শম্পা ভট্টাচার্য (বসু) : অধ্যাপিকা, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস, কলকাতা।
শ্যামলী পাল : অধ্যাপিকা, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ উত্তর চব্বিশ পরগণা।
শ্রাবণী পাল : অধ্যাপিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
শ্রাবণী রায় : অধ্যাপিকা. প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা।
শ্রাবস্তী রায় : অধ্যাপিকা, এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর।
শিবানী ভট্টাচার্য : অধ্যাপিকা, বঙ্গাইগাঁও কলেজ, আসাম।
শিবশঙ্কর ঘোষ : অধ্যাপক রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলকাতা।
শ্রীমতী মজুমদার : অধ্যাপিকা, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস, কলকাতা।
শ্রীময়ী আগরওয়ালা : কৃতি ছাত্রী, নবীন লেখিকা।
শুকদেব ঘোষ : অধ্যাপক, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া।
শুকদেব সিংহ : প্রাক্তন অধ্যাপক, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি।
শুক্লা ঘোষ চৌধুরী : অধ্যাপিকা, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, হুগলী।
শুভ্রা বৈশ্য (দাশগুপ্ত) : অধ্যাপিকা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা।
সমরেশ মজুমদার : প্রাক্তন অধ্যাপক, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।
সন্দীপকুমাব মণ্ডল : অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম বাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
সনৎকুমার নস্কর : অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সংহিতা সিন্‌হা : অধ্যাপিকা, টাকি সরকারি কলেজ, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
সন্তোষকুমার মণ্ডল : প্রাবন্ধিক, সম্পাদক উদ্দালক পত্রিকা।
সত্রাজিৎ গোস্বামী : অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ফর উইমেনস্ কলেজ, নৈহাটী, উত্তর চব্বিশ পবগণা।
সামিম রেজা : প্রাবন্ধিক, গবেষক।
সিক্তা মুৎসুদ্দি : অধ্যাপিকা, আনন্দ চন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি।
স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপিকা, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা।
সিদ্ধার্থ সেন : নরসিংহ দত্ত কলেজ (সান্ধ্য) কলকাতা।
সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সুচরিতা ভট্টাচার্য · অধ্যাপিকা, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
সুজাতা কোলে : অধ্যাপিকা, শিলিগুড়ি কলেজ, শিলিগুড়ি।
সুজাতা বাগ : আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, রামসদয় কলেজ, আমতা, হাওড়া।
সুতপা মুখোপাধ্যায় : অধ্যাপিকা বহরমপুর গার্লস কলেজ, মুর্শিদাবাদ।
সুতপা সাহা সরকার : শিক্ষিকা, শ্রী শিক্ষায়তন বিদ্যালয়, কলকাতা।

সুপৃথা মুখোপাধ্যায় : অধ্যাপিকা, ক্যালকাটা গার্লর্স কলেজ, কলকাতা।
সুফল বিশ্বাস : অধ্যাপক, বেথুয়া ডহরী কলেজ ও শান্তিপুর কলেজ (আংশিক সময়ের) নদীয়া।
সুব্রত ঘোষ : অধ্যাপক, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যালয়, বিরাটী, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
সুস্নাত জানা : অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
সুস্মিতা ঠাকুর : অধ্যাপিকা, কান্দি রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ।
সুমিতকুমার দেবনাথ : অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ।
সুমিতা রায় : অধ্যাপিকা, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ, উত্তর দিনাজপুর।
সুস্মিতা সাহা : অধ্যাপিকা, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা।
সুরজিৎ বসু : অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ (সান্ধ্য), কলকাতা।
সুশান্তকুমার চাকু : অধ্যাপক, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ, বনগা, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
সোনালী চক্রবর্তী মিশ্র : অধ্যাপিকা, উমেশচন্দ্র কলেজ, কলকাতা।
সোমা রায় : অধ্যাপিকা, বিবেকানন্দ কলেজ, মধ্যমগ্রাম উত্তর চব্বিশ পরগণা।
সোমদত্তা ঘোষ (কর) : অধ্যাপিকা, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়, বরানগর, কলকাতা।
সৈকত মণ্ডল : অধ্যাপক, ডিরোজিও কলেজ, কলকাতা।
সৌগত চট্টোপাধ্যায় : অধ্যাপক, বেলদা কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুব।
সৌমি দাশ : আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা), কলকাতা।
সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় : অধ্যাপক, বালুরঘাট কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর।
স্বাত্বনা চক্রবর্তী : সরজিনী নাইডু কলেজ, দমদম, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
স্বস্তি মণ্ডল : প্রাক্তন অধ্যাপিকা, হরিমোহন ঘোষ কলেজ, গার্ডেনরিচ, কলকাতা।
স্বরাজ গুছাইত : অধ্যাপক, খড়গপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
স্বাগতা মুখোপাধ্যায় : অধ্যাপিকা, হীরালাল মজুমদার কলেজ অব উইমেন্স, দক্ষিণেশ্বর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায় : অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
হীরেন চট্টোপাধ্যায় : প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা।